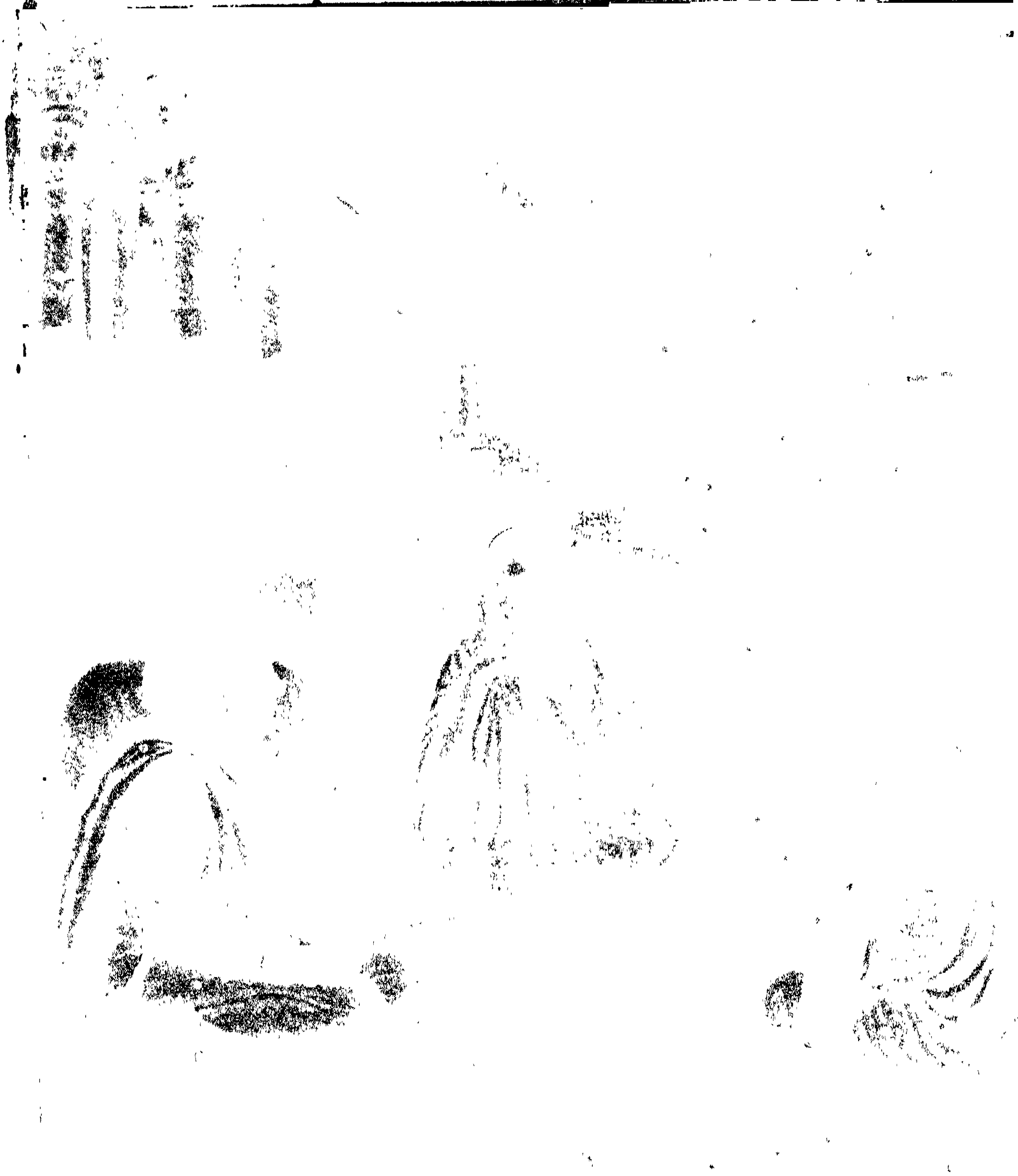


অশোক বনে সীতা

[শিল্পী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বাগচী



আষাঢ়, ১৩২৬

প্রথম খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [

পুরুষোত্তমদেবের শাসনপত্র

বিহার ও উড়িষ্যার মান্যবর ছোটলাট বাহাদুর স্যার এডোয়ার্ড গেট্,

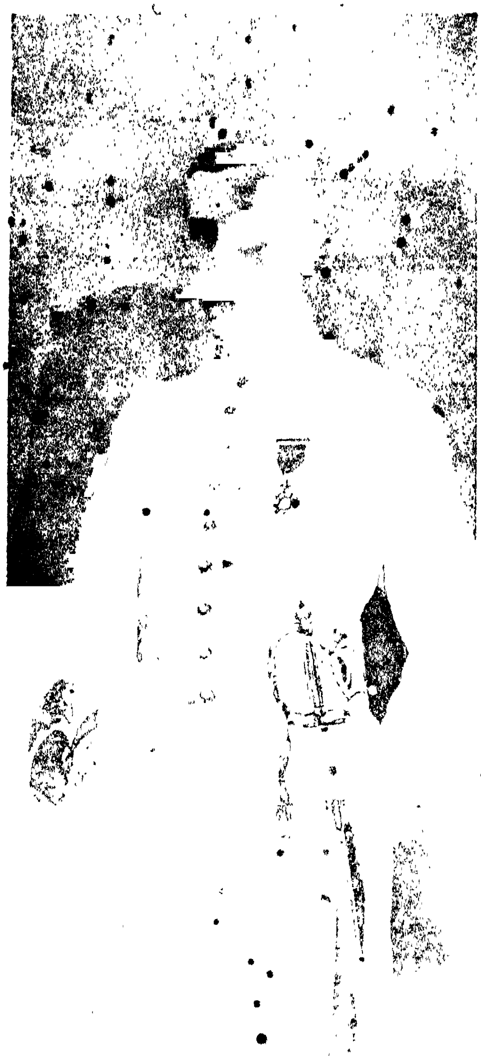
বিদ্যাসাগর, কে-সি-এস্-আই, সি-আই-ই]

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বালেশ্বর পরিদর্শনকালে তত্রস্থ অন্যতম ডেপুটী-কালেক্টর মৌলভী আবদুস্ সামাদ আমাকে জ্ঞাত করেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহারা পোতেশ্বর ভট্টের সন্তান। এই পোতেশ্বর ভট্ট রাজা পুরুষোত্তমদেবের নিকট হইতে শাসনপত্রযোগে কিছু ভূমি লাভ করেন।(১) বঙ্গের নবাব কর্ত্তৃক এই ভূমি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর পোতেশ্বরের বংশধর সর্ব্বেশ্বর দিল্লী যাইয়া বাদশাহ্ আওরংজেবের নিকট দরবার করিলে, সর্ব্বেশ্বর যদি ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার ভূমি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে, এইরূপ আদেশ হয়। তদনুযায়ী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি তাঁহার ভূমি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ মুসলমানই আছেন। কিন্তু, তাঁহারা হিন্দুদের ন্যায়ই আচার-ব্যবহার করেন, এবং তাঁহাদের ন্যায় ইস্লামধর্ম্ম-পরিগ্রাহী বংশের সহিতই বিবাহাদি ব্যাপারে আদান-প্রদান করেন।

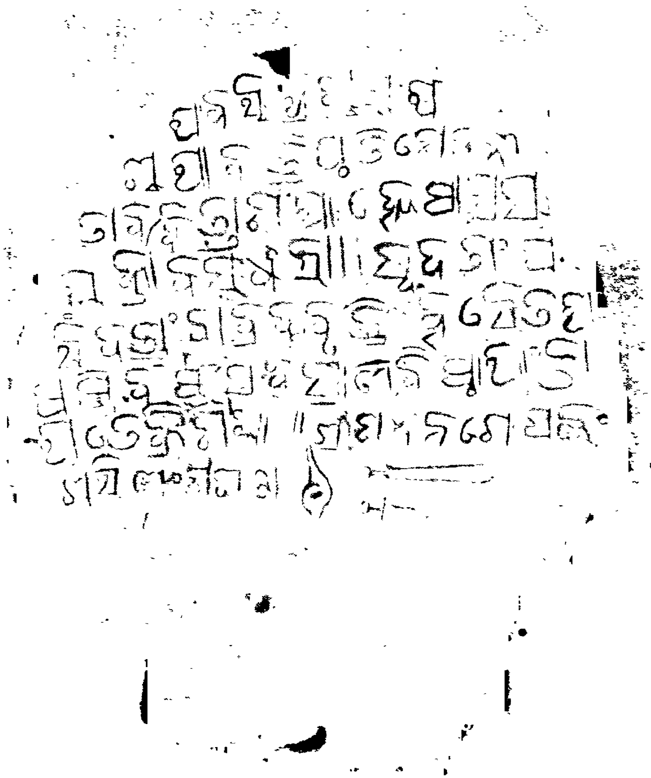
রাজা পুরুষোত্তমদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত কোন শাসনপত্র তাঁহার গৃহে আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে মৌলবী সাহেব একখানি তাম্রশাসনের উল্লেখ করেন। যথাসময়ে তিনি এই শাসনখানি আমাকে প্রেরণ করেন। তাম্রশাসনখানি বিশেষ মূল্যবান্। ১৯১৭ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে "বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান সমিতি"র বাৎসরিক অভি-ভাষণে আমি যে কতকগুলি তাম্রনির্ম্মিত অসম্পূর্ণ কুঠারের অগ্রভাগের (Axe-heads) কথা উল্লেখ করি, তাহাদের আকার ও এই শাসনের আকার একই প্রকার। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, তাম্রনির্ম্মিত এই যন্ত্রগুলি,

---

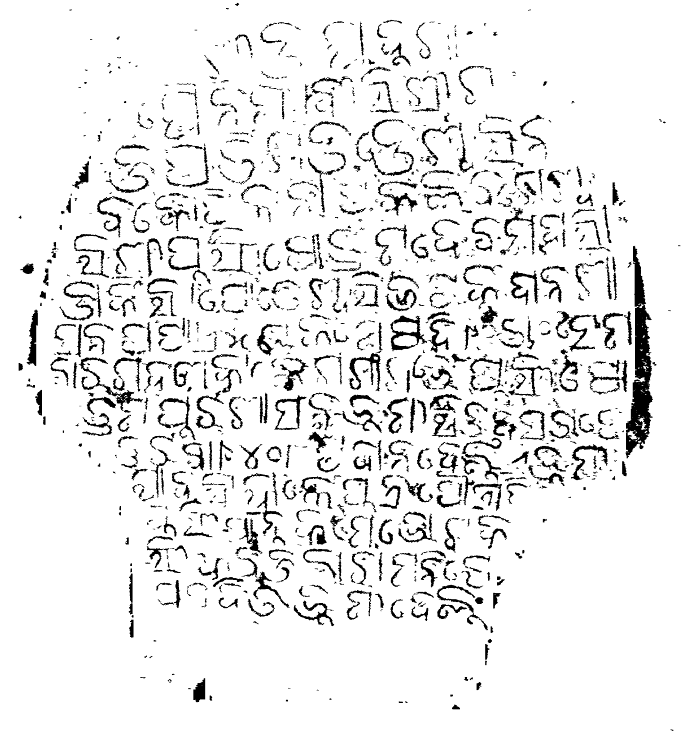
(১) পুরুষোত্তম ১৪৬৬ হইতে ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তেলেগু প্রদেশের বিস্তীর্ণ ভূভাগের নরপতি ছিলেন। তেলেগু ভাষায় লিখিত তাঁহার এক শাসনপত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণের জন্য এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা ১৩।১৫৫, এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণল ৬২.৮৮ দ্রষ্টব্য।



বিহার ও উড়িষ্যার মান্যবর ছোটলাট বাহাদুর স্যার এডোয়ার্ড গেট্,
বিদ্যাসাগর, কে-সি-এস্-আই, সি আই-ই



শাসন (পশ্চাৎভাগ)



শাসন (পুরোভাগ)

লৌহ নিৰ্ম্মিত এই শ্রেণীর দ্রব্য দ্বারা অপসারিত হইলেও, অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্ত্তমানে যাহাদিগকে জনসাধারণে বজ্র বলিয়া বিশ্বাস করে, সেই সকল লৌহের দ্রব্য ভারতবর্ষের অনেক স্থানের অজ্ঞ গ্রাম্য লোক ভেষজ বলিয়া মনে করে; দার্জ্জিলিংয়ে হাতুড়ে বৈদ্যদিগের জন্য এ সকল এখনও গোপনে প্রস্তুত হয়

অনুমিত হইয়াছিল যে, ঐগুলি যুদ্ধার্থ বা শোভাযাত্রার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল (চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্র)। যখন শাসনলিপি-সমন্বিত এই কুঠার পাওয়া গিয়াছে, তখন মনে হয় যে, ময়ূরভঞ্জে আবিষ্কৃত উল্লিখিত কুঠারখণ্ড নির্ম্মাণ (২) নীয় অধিবাসিবৃন্দ যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছিল, ধানযোগ্য।



চতুর্থ চিত্র—কুঠার

বঙ্গদেশের অনেক জাতির মধ্যে বিবাহকালে উজ্জ্বল পিত্তলখণ্ড যে কন্যাকে উপহার দেওয়া হয়, তাহাও আদিমকালে প্রচলিত এতাদৃশ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত।

চিত্রান্তরে প্রদর্শিত তাম্রনির্ম্মিত কুঠারগুলি যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলিয়াছিল যে, এগুলি শাসন উৎকীর্ণ হইবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছিল। তাম্রনির্ম্মিত আর কোন উপাদান এরূপ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইবার প্রমাণ ইতঃপূর্ব্বে আর পাওয়া যায় নাই বলিয়া তখন

শাসনপত্রের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল। পুরোভাগ উড়িয়া ভাষায় ও পশ্চাদ্ভাগ সংস্কৃতে লিখিত।

পুরোভাগ

শ্রীজয়দুর্গায়ৈ নমঃ। বীরশ্রী গজপতি গৌড়েশ্বর নব কোটি-কর্ণাট কলবর্গেশ্বর শ্রী পুরুষোত্তম দেব মহারাজঙ্কর

(২) "বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান সমিতি"র দ্বিতীয় বৎসরের পত্রিকায় এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে; উহার মর্ম্ম পরিশিষ্ট স্বরূপ প্রদত্ত হইল।



পঞ্চম চিত্র - কুঠার

পোতেশ্বর ভট্টংকু দান শাসন পট্টা। ২৫ অঙ্ক মেষ দি ১০ অ। সোমবার গ্রহণকালে গঙ্গাগর্ভে পুরুষোত্তমপুর শাসনভূমি চৌদশ অষ্টোত্তর বা ১৪০৮ টা দান দেলুম্। ইভূমি যাবৎ চন্দ্রার্কে পুত্র পৌত্রাদি পুরুষানুক্রমে ভোগ করুতিব। জলাগম নিক্ষেপ সহিত ভূমি দেলুম্।

পশ্চাদ্ভাগ

যাবৎ চন্দ্রাশ্চ সূর্য্যাশ্চ যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী তাবৎ দত্তা ময়া হ্যেষা শস্যযুক্তা বসুন্ধরা। স্বদত্তাম্ পর দত্তাম্ বা ব্রহ্মবৃত্তিম্ হরেত ইয়ঃ ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি বিষ্ঠায়াম্ জায়তে ক্রিমিঃ। শ্রীমদনগোপাল শরণম্ মম।

অঙ্কর বা সাঙ্কর, শঙ্খ, তরবারী, ছুরী।

অনুবাদ

পুরোভাগ

শ্রীজয়দুর্গাকে প্রণাম করি। বীরবর শ্রীগৌড়েশ্বর নবকোটী কর্ণাট এবং কলবর্গেশ্বর কর্তৃক পোতেশ্বর ভট্টকে দান শাসনপত্র। সোমবার মেষের (অর্থাৎ বৈশাখের) দশম দিবসে অমাবস্যাতিথিতে আমার রাজত্বের (৩) ২৫ অঙ্কে গঙ্গাগর্ভে, গ্রহণকালে আমি পুরুষোত্তমপুর শাসন ১৪০৮ বাটী (৪) ভূমি দান করিতেছি। পুত্র, পৌত্র ও বংশানুক্রমে, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তুমি

(৩) এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণাল ৬২।১।৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৪) বাটী = ২০ একর।

এই ভূমি ভোগ করিবে। আমি জলনিক্ষেপ ও দানপত্রসহ এই ভূমি দান করিতেছি।

পশ্চাদ্ভাগ

যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী থাকিবে, ততদিন সশস্য এই ভূমি দান করিতেছি। ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত ভূমি স্বয়ং বা অন্যে পুনর্গ্রহণ করিলে ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠায় ক্রিমি কীটরূপে জন্মগ্রহণ করে।

মদনগোপালদেব আমাকে রক্ষা করুন।

অক্ষর বা সাঙ্কেত, শঙ্খ, তরবারী, ছুরী।

পরিশিষ্ট

ময়ূরভঞ্জের অন্তর্গত গুলুন্দা নদীতীরে ভাগাপীর গ্রামে ছয়সাতখানি তাম্রনির্ম্মিত কুঠার পাওয়া যায়। ইহাদের কয়েকখানির প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। দেখিলে মনে হয় যে, এই কুঠারগুলি যুদ্ধার্থ ব্যবহৃত হইত। এই কুঠারগুলির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎখানি দৈর্ঘ্যে ১৮½ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১৫½ ইঞ্চি। হয়ত এখানি শোভাযাত্রা বা অর্চ্চনাকালে ব্যবহৃত হইত। অন্য দুইখানির একখানি ১০×৮½ ইঞ্চি এবং ১০½×৭ ইঞ্চি। প্রথম দুইখানি প্রায় ½ ইঞ্চি পুরু এবং তৃতীয়খানি [illegible] ইঞ্চি পুরু। সকলগুলিরই পার্শ্বদেশ তীক্ষ্ণ। দেখিলে মনে হয় যে, এগুলি পিটাইয়া বা ঢালাই করিয়া প্রস্তুত করিয়া পরে পার্শ্বদেশ ধারাল করা হইয়াছে।

(চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্র।)

ময়ূরভঞ্জে যখন এইগুলি প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন মনে করা হইয়াছিল যে, এইগুলি যুদ্ধার্থ বা পূজার জন্যই প্রস্তুত হইত। কিন্তু, পুরুষোত্তমদেবের শাসনপত্র আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে মনে হয় যে, এগুলি নির্ম্মাণের অন্যান্য উদ্দেশ্যও ছিল।

রথযাত্রা

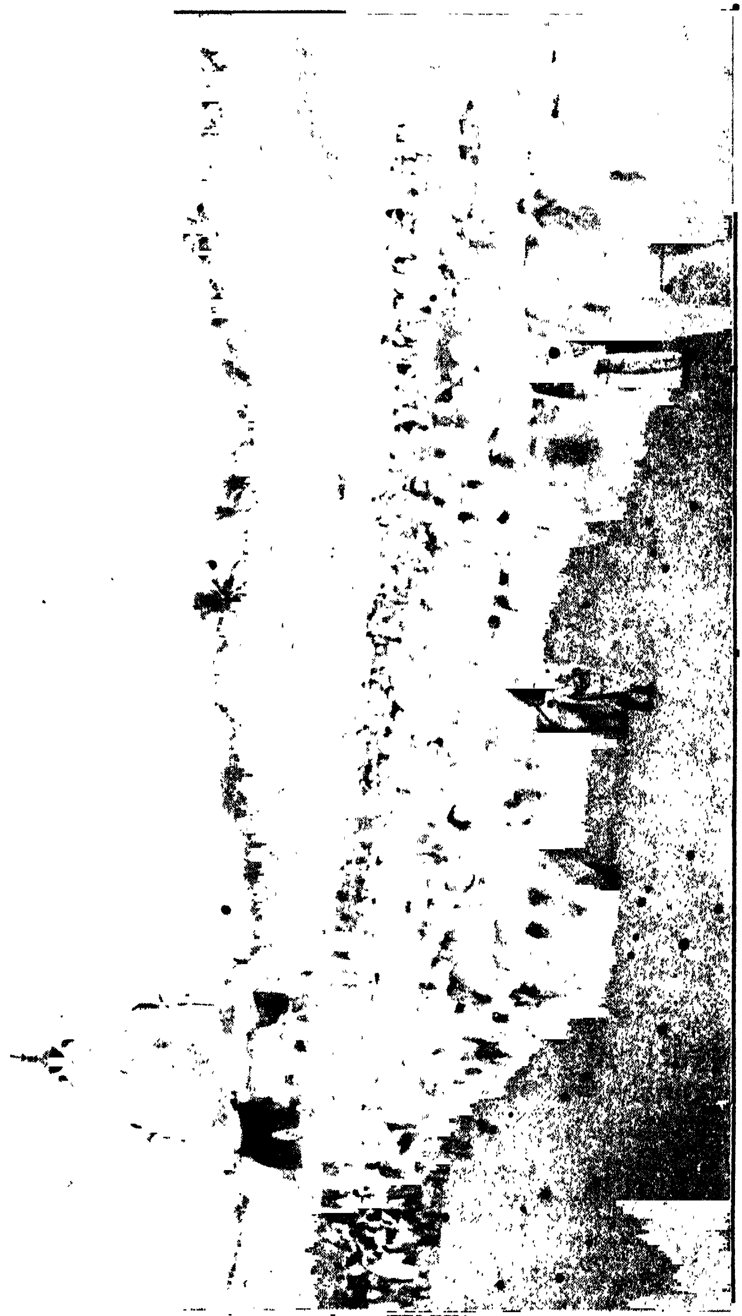
[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

রথের দড়ায় কে লুটাবি আয়, আয় আয় কোটি প্রাণ,
সারথীর বেশে দাঁড়াইয়া আজি পতিতের ভগবান।
অম্বর ভরি' গুরু গম্ভীর আহ্বান তার ছোটে,
বিষ জর্জ্জর বাসুকীর ফণা রক্তচরণে লোটে।
মহামিলনের যাত্রার পথে ছুটেছে নির্দেশ তার,
বৈরীর বুকে বৈরীরে বাঁধি করে দিতে একাকার।
রথের রজ্জু ধরি আজি জোর করে,
তুচ্ছ করিয়া রুদ্র শমনে দাঁড়া রে বিশ্ব 'পরে।

স্বরগ মর্ত্ত্য মন্দ্রিত করি' শঙ্খ যে তাঁর বাজে,
পঙ্গুর দেহে শক্তির গতি চাহে আজ প্রতি কাজে।
সরণির প্রতি ধূলিকণা আজি তাহারি আশীষ মাখা,
যাত্রার সারা পথ ভরি' তারি চরণ চিহ্ন আঁকা।
তাঁরি পদরেখা চুম্বিয়া মোরা ছুটিয়াব নরনারী,
মিথ্যা মোহের বিলাস-বাঁধনে আর কি রহিতে পারি?
খুলে গেছে, আজি সকল বাঁধন লাজ,
সারথীর বেশে এসেছেন ওই বিশ্বের অধিরাজ।

তাঁর শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তম আজি যে রে সব ঠাঁই,
পসাদী অন্নে স্বজাতি বিজাতি ভেদ নাই ভেদ নাই
চিরবাঞ্ছিত নীলাচল মহামুক্তির পীঠ ভবে,
মানবজীবন ওইখানে গেলে তবে রে ধন্য হবে।
আশ্রয় শুধু বুকে শুধু বল তাঁহারি করুণারাশি,
প্রভুর আশীষ রজ্জু ধরিয়া পৌঁছিব হাসি হাসি।
সেইখানে গিয়া নিশ্চয় জানি মনে,
মৃত্যুহরণ মন্ত্র শোনাব মর্ত্ত্যেরি জনে জনে।

বিশ্বের আজি সব পথ ওরে তাঁহারি মুক্তদ্বার,
তারি আনন্দ-বাজারে স্বার্থ হয়ে গেছে একাকার।
এ মহাতীর্থ-প্রাঙ্গণে মোরা গাব আজ তাঁরি জয়,
নাহি শোকতাপ দুঃখ দৈন্য, নাহি রে শঙ্কা ভয়।
রথের চক্রে পুঞ্জিত গ্লানি হয়ে যাবে চুরমার,
ধর্ম্মের রাজা এসেছেন দিতে ধর্ম্মের অধিকার।
অভয় রজ্জু ধরি তাঁর প্রাণপণে ;
নন্দনে যাব আমরা পরমানন্দেরি প্রয়োজনে।



রথযাত্রা

মরণের দেশ দলি চলে যাবে তাঁর মহা স্যন্দন
চাকায় চাকায় ছিঁড়ে যায় যত নিখিলের বন্ধন।
শৈল হইতে শৈলেরি পারে সকল সিন্ধু দলি',
এ মহাগতির নাহি বিশ্রাম ; উঠিবে সে উজ্জ্বলি'—
সহসা নিখিল ধর্ম্মের শিরে ; সে আলোকে নমি শির,
হাজার দেবতা পঙ্ক তিলক মুছে দিবে ধরণীর।
পাঞ্চজন্যে বেজেছে তাঁহার গান ;
মানবের মহামুক্তির তরে এসেছে পরিত্রাণ।

অন্ধ খঞ্জ দুর্ব্বল দীন আজি ওরে কেহ নয়,
বিশ্বের রাজা আমাদের পিতা, আমরা বিশ্বময়।
রত্নবেদীতে, মুক্ত যে আজি মহামিলনের স্থান,
এক জাতি মোরা, একটী ধর্ম্ম, আমরা একটী প্রাণ
তাঁহারি নামের কল্লোলে আজি ভরে দিব মহীতল,
নাহি বিচ্ছেদ নাহি অভিশাপ নাহি রে অশ্রুজল।
'রথরজ্জুতে বাঁধি আয় মনপ্রাণ ;
সারথীর বেশে এসেছেন আজি আর্ত্তের ভগবান।'

অদ্বৈতবাদ—"জগৎ মিথ্যা"

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ]

সমগ্র অদ্বৈতবাদটি মাত্র অর্দ্ধ শ্লোকে সুন্দররূপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

"কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, অর্দ্ধ শ্লোকে তাহা বলিব। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই - অপর কিছুই নহে।" অতএব অদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্ব তিনটি। (১) ব্রহ্ম সত্য, (২) জগৎ মিথ্যা, (৩) জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্ম সত্য—এই তত্ত্বটি অতি সহজ। কিন্তু অপর দুইটি তত্ত্বের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা দুরূহ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এই দুইটি তত্ত্ব আমাদের সহজ জ্ঞানের বিরোধী। যে জগৎ আমরা দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, তাহাকে মিথ্যা বলি কি প্রকারে? আমার এই ক্ষুদ্র শক্তি, অল্প জ্ঞান, পাপপূর্ণ হৃদয়,—কি প্রকারে সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" পরব্রহ্মের সহিত আমাকে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিব? কিন্তু এই তত্ত্বগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে, সহজ জ্ঞানের সহিত উহাদের কোন বিরোধ নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দ্বিতীয় তত্ত্বটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। অদ্বৈতবাদী যে বলেন জগৎ মিথ্যা, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি?

প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, জগৎ মিথ্যা, অর্থাৎ জগৎ মনের ভ্রম। আমাদের মনে হইতেছে বটে যে, বৃক্ষ-লতা-পত্র-পুষ্প-সমন্বিত শ্যামল বসুন্ধরা সম্মুখে শোভা পাইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক কিছুই নাই; থাকিবার মধ্যে আছে, আমাদের মনের মধ্যে কতকগুলি ধারণা বা idea; মনের বাহিরে কিছুই নাই; মনের মধ্যবর্ত্তী এই ধারণা বা idea গুলিকেই আমরা বাহ্য জগৎ বলিয়া কল্পনা করিতেছি। এখানে দুই রকম পদার্থের প্রভেদ করা হইতেছে; (১) কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা idea; আমাদের মন কোন বিশেষ আকারে আকারিত হইলে আমরা তাহাকে ধারণা বা idea বলি; অতএব ধারণাগুলি আমাদের মনের অংশ-বিশেষ; (২) বস্তুর স্বরূপ (the thing in itself, apart from our ideas) ইহা মনের বাহিরে অবস্থিত। এই মত অনুসারে প্রথম শ্রেণীর পদার্থেরই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থের কোন অস্তিত্ব নাই। অর্থাৎ আমাদের মনের মধ্যে জগৎ সম্বন্ধে নানা বিচিত্র ধারণা আছে সত্য, কিন্তু এই সকল ধারণা বা idea ব্যতীত মনের বাহিরে কোন স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব নাই। ইংলণ্ডে বার্কলি (Barkeley) এই মতের প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, অদ্বৈতবাদ মোটামুটি Berkeley প্রচারিত এই Idealism ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই প্রচলিত বিশ্বাস যে যথার্থ নহে, অদ্বৈতবাদ যে Idealism হইতে একান্ত ভিন্ন, তাহা "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই

সূত্রের (ব্রহ্মসূত্র ১ম অধ্যায়, ১ম পাদ, ২য় সূত্র) শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য হইতে প্রতীত হইবে। ভাষ্য হইতে আমরা নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

ন তু বস্তু এবং নৈবং অস্তি নাস্তি ইতি বা বিকল্প্যতে। বিকল্পনাস্তু পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ। ন বস্তু যথাত্মজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষং। কিং তর্হি? বস্তুতন্ত্রমেব হি তৎ। ন হি স্থাণাবেকস্মিন্ স্থাণুর্বা পুরুষোঽন্যো বেতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তত্র পুরুষোঽন্যো বেতি মিথ্যাজ্ঞানং। স্থাণুরেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ। এবং ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রং।

অনুবাদ।—কোন একটা বস্তু দেখিয়া বস্তুটি এই রকম বা এই রকম নহে, আছে বা নাই, এই প্রকার ধারণা হয় না। কারণ পুরুষ নিজ বুদ্ধি অনুসারে নানারূপ কল্পনা করিতে পারে, কিন্তু নিজ বুদ্ধি অনুসারে বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান নানারূপ হইতে পারে না। বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান তাহা হইলে কাহার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। একটা স্তম্ভ দেখিয়া ইহা স্তম্ভ বা পুরুষ এইরূপ জ্ঞান হইলে তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে না। এক্ষেত্রে স্তম্ভকে পুরুষ বলিয়া জানা মিথ্যাজ্ঞান, স্তম্ভ বলিয়া জানা তত্ত্বজ্ঞান। কারণ এই তত্ত্বজ্ঞান বস্তুতন্ত্র (বস্তুর অধীন)। এইভাবে কোন বস্তুর প্রামাণ্য ঐ বস্তুর অধীন।

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হইল যে, কোন বস্তুর ধারণা (idea) ব্যতীত, বস্তুটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। অতএব, সাধারণতঃ যে শোনা যায় অদ্বৈতবাদীর মতে বাহ্য বস্তুর কোন অস্তিত্ব নাই, শুধু মনের মধ্যে কতকগুলি ধারণা আছে,—এ কথা যথার্থ নহে।

আমাদের মনের ধারণা ব্যতীত বাহ্য বস্তুর কোন অস্তিত্ব নাই—ইহা বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ। "নাভাব উপলব্ধেঃ" এই সূত্রে (ব্রহ্মসূত্র ২য় অধ্যায়, ২য় পাদ, ২৮ সূত্র) এই বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ন খল্বভাবো বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ। উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতি প্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ—স্তম্ভঃ, কুড্যং, ঘটঃ, পট ইতি। ন চ উপলভ্যমানস্য এব অভাবঃ ভবিতুমর্হতি। * * "ননু নাহং ব্রবীমি ন কশ্চিদর্থমুপলভ ইতি। কিন্তু উপলব্ধি ব্যতিরিক্তং নোপলভ ইতি ব্রবীমি।" বাঢ়মেবং ব্রবীমি নিরঙ্কুশত্বাৎ তে তুণ্ডস্য। ন তু যুক্ত্যুপেতং ব্রবীষি। যত উপলব্ধি ব্যতিরেকোঽপি বলাদর্থস্য অভ্যুপগন্তব্যঃ, উপলব্ধেরেব। ন হি কশ্চিৎ উপলব্ধিমেব স্তম্ভঃ কুড্যং চেত্যুপলভতে। উপলব্ধি বিষয়ত্বেনৈব তু স্তম্ভকুড্যাদীন্ সর্বে লৌকিকা উপলভন্তে।

অনুবাদ।—বাহ্য বস্তু নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। কেন? যেহেতু তাহার উপলব্ধি হয়। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যয়ের সময় বাহ্য বস্তু উপলব্ধ হইয়া থাকে— স্তম্ভ, ভিত্তি, ঘট, পট এই প্রকার। যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা নাই ইহা বলিতে পারা যায় না। * * * (বিজ্ঞানবাদী হয় ত বলিবেন), "আমি ত ইহা বলিতেছি না যে, কিছুই উপলব্ধি হয় না। কিন্তু উপলব্ধি ব্যতীত কিছুই উপলব্ধ হয় না।" (শঙ্করাচার্য্যের উত্তর) হাঁ তুমি বলিতে পার, কারণ তোমার তুণ্ড নিরঙ্কুশ (তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া থাক)। কিন্তু তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ অর্থ (বিষয়) যে উপলব্ধি হইতে ভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, যেহেতু ঐরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। কেহ উপলব্ধিকেই স্তম্ভ বা ভিত্তিরূপে অনুভব করে না। সকলেই স্তম্ভ ভিত্তি প্রভৃতিকে উপলব্ধির বিষয়রূপেই অনুভব করিয়া থাকে। (১)

প্রশ্ন হইতে পারে, অদ্বৈতবাদী যদি বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে জগৎ মিথ্যা বলেন কি করিয়া? ইহার উত্তর এই যে, অদ্বৈতবাদীর মতে অস্তিত্ব বা সত্তা দুই

---

১) এ সম্বন্ধে পরলোকগত ডাক্তার প্রিয়নাথ সেন তাঁহার Philosophy of the Vedanta পুস্তকে লিখিয়াছেন; It is said that by denying the reality of the world, the Vedantists flatly contradict the testimony of perception. Whoever has read the Vedanta Sustras, and Samkara's commentary on the aphorism "না ভাব উপলব্ধেঃ" will, however, think twice before making such criticism, for there in refuting the Bauddha Yogachara doctrine, a doctrine very similar to the subjective Idealism of Berkeley, the great commentator strongly controverts all attempts to maintain that the world does not exist as an object of perception, and advocates a theory much akin to Natural Realism.

প্রকার,—পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক। জগতের ব্যাবহারিক সত্তা আছে, পারমার্থিক সত্তা নাই। পারমার্থিক সত্তা এক ব্রহ্মের আছে, আর কিছুর নাই। বাহ্য বস্তুর নাই,—বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা idea-রও নাই। কিন্তু ব্যাবহারিক সত্তা উভয়েরই আছে। অর্থাৎ যদি স্বীকার করা যায় যে, আমাদের জগৎ বোধ রহিয়াছে। যদি idea-র অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। তাহা হইলে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। ইহা ব্যাবহারিক সত্তা।

যে বস্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকে, তাহার পারমার্থিক সত্তা আছে বলা যায়। তাহাই প্রকৃত সত্তা। আর যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান নহে, তাহার সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা। যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ তাহাদিগকে সত্তাবান্ বলিতে হয়; ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা ব্রহ্মসত্তায় বিলীন হইয়া যায়। যাহা প্রকৃতপক্ষে আছে, তাহার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকা উচিত। (২) যাহা এখানে আছে সেখানে নাই, যাহা আজ আছে কাল নাই, যাহা আজ এক রকম দেখি কাল আর এক রকম হইয়া যায়, তাহার থাকা প্রকৃত থাকা নহে। জগতের যাবতীয় পদার্থ এইরূপ; কারণ, তাহারা অনিত্য (৩) ও সসীম; সুতরাং জগতের যাবতীয় পদার্থের পারমার্থিক সত্তা নাই। একমাত্র ব্রহ্মই প্রকৃত সত্তা।

আপত্তি হইতে পারে যে, জগতের যাবতীয় পদার্থকে অনিত্য বলিতে পার, ক্ষুদ্র বা সসীম বলিতে পার, কিন্তু মিথ্যা কি করিয়া বলিবে? এই একটা ফল রহিয়াছে,—দুই দিন পরে ইহা থাকিবে না বটে, কিন্তু এক্ষণে এই স্থানে ইহা রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার কর কি করিয়া? ইহার উত্তর দিতে হইলে 'এক্ষণ' ও 'এই স্থান' এই যে দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হইল, ইহাদের অর্থ প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক। নিত্য ও অসীম আত্মার পক্ষে 'এক্ষণ' ও 'এই স্থান' কি? আত্মার নিকট সর্ব্বক্ষণই 'এইক্ষণ', সর্ব্বস্থানই 'এই স্থান'(৪)। অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই তাঁহার নিকট যুগপৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন স্থান তাঁহার পক্ষে দূরে অবস্থিত নহে, সকল স্থানই নিকটবর্ত্তী। সুতরাং ইহা দূরে, ইহা নিকটে, ইহা বর্ত্তমান, ইহা অতীত বা ভবিষ্যৎ—আত্মার এ বোধ হইতে পারে না। আমরা আমাদিগকে দেহবদ্ধ ও জন্ম-মরণশীল মনে করি; সেই জন্য আমরা দেশ ও কালের নানা প্রভেদ কল্পনা করি। দেহমুক্ত, বাধাহীন আত্মার পক্ষে সেই সকল প্রভেদ বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং অনন্ত আত্মার দৃষ্টিতে কোন বস্তু এক্ষণে এই স্থানে আছে বলিলে বুঝিতে হইবে, বস্তুটি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আছে, কারণ আত্মার পক্ষে এইক্ষণ মানে সর্ব্বক্ষণ, এই স্থান মানে সর্ব্বস্থান। জগতের কোন পদার্থ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বর্ত্তমান নহে। সুতরাং অনন্ত আত্মার দৃষ্টিতে জগতের কোন পদার্থ সম্বন্ধে বলা যায় না যে, ইহা এক্ষণে ও এই স্থানে আছে। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা। ইহাই পারমার্থিক দৃষ্টি; কারণ নিত্যতা এবং অসীমতাই আত্মার স্বভাব,—ইহার অনিত্যতা ও পরিচ্ছিন্নতা কাল্পনিক।

গণিতের সিদ্ধান্তের সাহায্যে আমরা এই তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। কোন একটা বস্তু গ্রহণ করুন। ইহা যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে, অনন্ত আকাশের তুলনায় তাহা নিরতিশয় ক্ষুদ্র (infinitely small); ইহা যে পরিমাণ সময় ধরিয়া বর্ত্তমান থাকে, অনন্ত কালের তুলনায় তাহা নিরতিশয় ক্ষুদ্র। যাহা নিরতিশয় ক্ষুদ্র, তাহা নগণ্য (negligible) অর্থাৎ (Zero)। Zero is that which is infinitely small। সুতরাং অসীম আকাশ ও অনন্ত কালের তুলনায় ঐ বস্তু যে সময় ও স্থান ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করে তাহা শূন্য মাত্র। অর্থাৎ অসীমের দিক

'কিন্তু শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অদ্বৈতবাদীর মায়াবাদ-উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "ইহাই দার্শনিকের পরিচিত Idealism—বিজ্ঞানবাদ। ইংলণ্ডে বার্কলি (Berkeley) প্রথম এই মতের প্রচার করেন।" (গীতায় ঈশ্বরবাদ, ১৬৫ পৃঃ) আমরা এই মতের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমাদের মনে হয়, বিজ্ঞানবাদ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(২) গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"—যাহা "আছে" তাহা কখনও কোন্ অবস্থায় "নাই" হইতে পারে না।

(৩) আকাশও অনিত্য। মহাপ্রলয়ের সময় ব্রহ্মই থাকেন, আর কিছুই থাকে না। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্) সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সত্য (ব্রহ্ম)ই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না।

(৪) "With God, as it is a universal HERE so it is an everlasting NOW."—Carlyle, Sartor Resartus.

হইতে দেখিলে (from the point of view of infinity) ঐ বস্তুটির অস্তিত্ব নাই। অনিত্য ও সসীম সকল পদার্থ সম্বন্ধেই এইরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অসীমের দিক হইতে দেখিলে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। জগতের যাবতীয় পদার্থই অনিত্য ও সসীম। সুতরাং অসীমের দিক হইতে দেখিলে জগতের যাবতীয় পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা। এই ভাবে অসীমের দিক হইতে দেখিলেই পূর্ণ সত্য গ্রহণ করা যায়। আমরা সাধারণতঃ যে ভাবে দেখি, তাহাতে পূর্ণ সত্য গ্রহণ করিতে পারি না; কারণ, সাধারণতঃ দেখিবার সময় আমরা দেশ ও কালের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র গ্রহণ করি—অধিকাংশ দেশ ও কাল আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে। কিন্তু অসীমের দিক হইতে দেখিবার সময় দেশ ও কালের কোন অংশ দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে না, সমগ্র দেশ ও কালই দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত থাকে। অতএব, অসীমের দিক হইতে দেখাই পারমার্থিক দৃষ্টি এবং এই দৃষ্টিতে যাহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়, তাহারই পারমার্থিক সত্তা আছে। কিন্তু যদিও ইহাই প্রকৃত পারমার্থিক দৃষ্টি, তথাপি এভাবে দেখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কারণ, অনন্ত কাল এবং অসীম স্থানের ধারণা করিতে আমরা অক্ষম। আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র ও সান্ত; এ হৃদয়ের দ্বারা অনন্তের ধারণা করা যায় না। হৃদয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে পর আত্মা অনন্তের ধারণা করিতে পারে। ব্রহ্মদর্শন হইলে হৃদয়ের বন্ধন ভিন্ন হইয়া যায়; কারণ, উপনিষদ বলিয়াছেন

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বপাপানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে

অনুবাদ—সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মকে দেখিলে হৃদয়ের বন্ধন ভিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং সকল পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।

অতএব ব্রহ্ম-দর্শন হইলে আত্মা মুক্ত হয় এবং অনন্তের ধারণা করিতে পারে। তখন সেই মুক্ত আত্মা দেখিতে পায়, জগতের যাবতীয় পদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা ব্রহ্ম সত্তায় বিলীন হইয়া গিয়াছে (৫)। তখন বুঝা যায়, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

কিন্তু ব্রহ্মদর্শন না হইলে এ বোধ হয় না; কারণ, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে জগতের পদার্থ সকল যে পরিমাণ দেশ ও কাল ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করে, তাহা অসীম আকাশ এবং অনন্ত কালের তুলনাতেই নগণ্য,—পরিমিত দেশ ও কালের তুলনায় নগণ্য নহে। সুতরাং যতদিন ব্রহ্মদর্শন না হয় ততদিন তাহারা নগণ্য নহে; কারণ ততদিন পরিমিত দেশ ও কালেরই ধারণা হয়, অনন্ত দেশ ও কালের ধারণা হয় না। অতএব, যতদিন ব্রহ্মদর্শন না হয়, ততদিন জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। এজন্য এই অস্তিত্বের নাম ব্যাবহারিক সত্তা। এই ব্যাবহারিক সত্তাকে conventional reality বলা যাইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বাহ্য বস্তু এবং তৎ সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যবর্ত্তী ধারণা (idea) এতদুভয়ের মধ্যে বিজ্ঞানবাদী বলেন, প্রথমটি কল্পিত পদার্থ, উহার বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই; দ্বিতীয়টি বাস্তবিক পক্ষে আছে। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, যথার্থ কথা বলিতে গেলে, উহাদের মধ্যে কাহারও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই; কারণ, একমাত্র ব্রহ্মেরই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে, আর কাহারও নাই,—জগৎ মিথ্যা (৬)। কিন্তু যে হিসাবে বলা যায় যে, আমাদের মনের মধ্যে কতকগুলি ধারণা বা idea আছে, সে হিসাবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ ধারণা বা idea ব্যতীত বাহ্য বস্তুও আছে। ইহা ব্যাবহারিক সত্তা। যতদিন ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততদিন ব্যাবহারিক সত্তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই (৭)।

(৫) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনে আমরা এইরূপ দৃষ্টিলাভের কথা পাঠ করিয়া থাকি—

"কালী-ঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়। কোশাকুশী, বেদী, ঘরের চৌকাঠ – সব চিন্ময়! মানুষ, জীব, জন্তু—সব চিন্ময়!—তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পুষ্পবর্ষণ ক'রতে লাগলাম!" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ, ৭২ পৃষ্ঠা।

(৬) স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের সমষ্টি লইয়া জগৎ। সুতরাং জগৎ মিথ্যা বলিলে বুঝিতে হইবে যে, বৃক্ষলতাদি স্থূল পদার্থ এবং মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ সকলই মিথ্যা। মন যখন মিথ্যা, তখন ধারণা বা ideaগুলিও মিথ্যা; কারণ এই ideaগুলি মনের বিশেষ আকারে পরিণতি মাত্র। বলা বাহুল্য, ইহা পারমার্থিক হিসাবে।

(৭) "তস্মাৎ প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মতা প্রতিবোধাৎ উপপন্নঃ সর্ব্বঃ লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ।" অনুবাদ—অতএব ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের পূর্ব্বে সকল লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার উৎপন্ন হইল।

শারীরক-মীমাংসাভাষ্য ২।১।১৪।

জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, আবার ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। ব্রহ্ম কারণ, জগৎ কার্য্য। অদ্বৈতবাদীর মতে, কার্য্য কারণ ব্যতীত একটা স্বতন্ত্র বস্তু নহে (৮)। কারণগত বস্তুটি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যরূপে পরিচিত হয়,—উভয়ের মধ্যে অবস্থাগত প্রভেদ থাকিলেও বস্তুগত কোন প্রভেদ নাই। রসায়ন-শাস্ত্রেও ইহা একটি মূল সিদ্ধান্ত যে, রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের আবির্ভাবের সময় কোন নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয় না। রাসায়নিক সংযোগের পূর্ব্বে যে বস্তু ছিল, তাহারই পরমাণুগুলি ভিন্ন পদ্ধতিতে সজ্জিত হইয়া নূতন পদার্থের আকার দেখায়, কিন্তু কোন নূতন বস্তুর উৎপত্তি হয় না। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত এই, রাসায়নিক সিদ্ধান্তের অনুরূপ। যে হেতু ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, অতএব এই সিদ্ধান্ত অনুসারে জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত একটা স্বতন্ত্র বস্তু নহে। ব্রহ্মরূপ বস্তুই কখন কখনও জগৎরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। জগৎ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু নাই। জগতের মধ্যে যাহা বস্তু, তাহা সেই ব্রহ্মই। ব্রহ্মই সত্য। জগৎ অনিত্য, মিথ্যা।

ব্রহ্ম হইতেই যদিও জগৎ উৎপন্ন হয়, তথাপি জগৎ উৎপত্তির পরও ব্রহ্মের কোন বিকার বা পরিবর্ত্তন হয় না, ইহা বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতবাদী বলিয়া থাকেন, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তির ন্যায় নহে,—অস্পষ্টদৃষ্ট শুক্তিতে যেরূপ রজতবোধ হয়, ইহা সেইরূপ। কিন্তু এ কারণে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, অদ্বৈতবাদীর মতে বাহ্য জগতের কোন অস্তিত্ব নাই, ইহা মনের কল্পনা মাত্র। কারণ, অদ্বৈতবাদীর মতে শুক্তিতে রজত-ভ্রমও শুদ্ধ মনের কল্পনা নহে; তাঁহার মতে রজত-ভ্রমের সময় মনের বাহিরে এক প্রকার রজতের উৎপত্তি হয়,—অদ্বৈতবাদী তাহার নাম দিয়াছেন, "প্রাতিভাসিক রজত"। ইহা সাধারণ রজতের ন্যায় নহে; যতক্ষণ আমাদের রজত-বোধ থাকে, ততক্ষণ এ প্রাতিভাসিক রজতও বর্ত্তমান থাকে, ভ্রম নিরস্ত হইলে প্রাতিভাসিক রজতও বিলীন হইয়া যায় (যাবৎ প্রতিভা অবর্ত্তিতে)। মহামহোপাধ্যায় ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র তাঁহার প্রণীত বেদান্ত-পরিভাষা নামক প্রামাণিক গ্রন্থের প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে এই প্রাতিভাসিক রজত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমি বলিতে চাহি না যে, সকলেই এ প্রাতিভাসিক রজতের মতবাদ (theory) গ্রহণ করুন। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অদ্বৈতবাদী যখন শুক্তিতে রজত-ভ্রমের দৃষ্টান্ত দেন, তখন তিনি এই প্রাতিভাসিক রজতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন; সুতরাং তাহার এই দৃষ্টান্ত হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তাঁহার মতে মনের বাহিরে জগতের কোন অস্তিত্ব নাই (৯)। অদ্বৈতবাদীর অপর দৃষ্টান্ত—জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট রথ গজাদির ন্যায়। এই দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেও উক্ত কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, কারণ, স্বপ্ন দেখিবার সময় প্রাতিভাসিক রথ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়, ইহা অদ্বৈতবাদীর মত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, জগৎ মিথ্যা ইহার অর্থ জগতের পদার্থ সকল ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী। এই অনন্ত কাল প্রবাহের মধ্যে জগতের বস্তুসমূহ বুদ্বুদের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছে এবং অত্যল্প সময়ের অস্তিত্বের পর পুনরায় সেই কালসাগরে মিশাইয়া যাইতেছে, অনন্তকালের মধ্যে আর তাহাদিগকে দেখা যায় না। তাই অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন —হে মায়ান্ধ মানব, এই সংসার অনিত্য ও অসার। কেন এই মিথ্যা সংসারে আকৃষ্ট হইয়া সেই পরম সত্যকে ভুলিয়া থাকিতেছ। তুমি এ আসক্তি, এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর। যাহা অনিত্য এবং অশেষ দুঃখের আকর, তাহা ছাড়িয়া, যাহা নিত্য এবং অনন্ত সুখের আশ্রয় সেই ব্রহ্মে তোমার চিত্ত নিবিষ্ট কর। তুমি ধন্য হইবে। ভারতবর্ষের সাধু সন্ন্যাসী ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণের উপদেশাবলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা এই অর্থেই জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

(৮) "তদনন্যত্বং আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ"। (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৪) তাৎপর্য্য, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অনন্য, কারণ শ্রুতিতে আছে "যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" (হে সৌম্য একটী মৃৎপিণ্ড জ্ঞাত হইলে যেমন যাবতীয় মৃন্ময় পদার্থ জ্ঞাত হয়, কেবল মাত্র বাক্যে মৃত্তিকার বিকারকে স্বতন্ত্র ভাবে আছে বলা হয়, ইহা নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য,—সেইরূপ ব্রহ্মকে জানিলে বিশ্বজগৎ জানিতে পারা যায়)।

(৯) চৈত্রের ভারতবর্ষে প্রকাশিত "জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত না বিকার?" এই প্রবন্ধে এই দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল।

ইমানদার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফৈজু উর্দ্ধশ্বাসে জমীদার-বাড়ীর দিকে ছুটিতেছিল ;—কিন্তু ততদূর পর্য্যন্ত যাইতে হইল না, মাঝপথেই সুনীলের সঙ্গে দেখা হইল। সুনীল ভিন্ন গ্রামে কোন এক ধনী ব্যবসায়ীর কাছে হাজার কতক টাকা ধার পাওয়া যাইবে কি না জানিতে গিয়াছিল,—তত বেলায় অস্নাত,—অভুক্ত অবস্থায়, শুষ্ক, ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিতেছে।

ফৈজু থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "খবর কি ছোটবাবু?"

সুনীল সংক্ষেপে বলিল যে, সুমতির পিস্তুতো দেবর সঙ্কটপুরের জমীদার নীলকণ্ঠ বাবু—অর্থাৎ সেজবাবু—সুমতির জয়দেবপুর মহলের অংশীদার ছিলেন এতদিন—এবার সেটার সমুদয় অংশ আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা জমীদারী-কেতায় কতকগুলি কারচুপী খেলিয়াছেন ; মহলটি না কি নীলাম হইতে বসিয়াছে ;—ইহার বেশী সে আর কিছু জানে না। তাই সঠিক সংবাদ জানিবার জন্য গোমস্তা হারাধন বাবু ফৈজুর পিতাকে লইয়া সঙ্কটপুরে গিয়াছেন,—এখন তাঁহারা না ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত কোন খবর জানিবার উপায় নাই।

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ফৈজু বলিল, "আমি তবে খেয়ে-দেয়ে এখুনি বেরিয়ে পড়ি ছোটবাবু—"

শুষ্কমুখে একটু হাসিয়া সুনীল বলিল "আমিও তাই শোনবার অপেক্ষা করছি। কিন্তু সর্দ্দার বারবার ক'রে বারণ ক'রে গেছে যে, ফৈজুকে খবর্দ্দার যেতে দেবেন না।"

ফৈজু ভিতরে-ভিতরে একটু অধৈর্য্য হইয়া, ঈষৎ তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল,—"বাঃ!—তা হ'লে ফৈজু কি এখানে বসে' ঘাস কাটবে? সেখানে তাঁরা বিপদ মাথায় করে' দুষমণ্-পুরীতে গিয়েছেন্ ; আর আমি এখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে হাত-পা গুটিয়ে ঘুমোব? না ছোটবাবু, সে হবে না, আপনারা হুকুম দিন—"

সুনীল বলিল, "আঃ! কেন খামকা মাথা গরম ক'রে তুলছ ফৈজু,—এ কি ছেলেখেলা, যে, নীলকণ্ঠ বাবু তাঁদের ওপর যা খুসী তাই করবেন? আর তা হ'লেও—আমাদের মিত্তির মশাই কাঁচা লোক নন,—"

বাধা দিয়া ফৈজু বলিল, "সব জানি ছোটবাবু—কিন্তু ন্যায়ের শক্তির চেয়ে গায়ের জোরের শক্তিটা ঢের বেশী জবর! সঙ্কটপুরের বাবুরা আপনাদের আত্মীয় ;—চাকর আমি, আমার মুখে তাঁদের সম্বন্ধে কোন কথা ভাল শোনাবে না ; কিন্তু জানেন তো তাঁদের কথা সব—"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুনীল বলিল "তা হ'লেও ভয় নেই। ওরা প্রথমে সোণামুখীতে যাবেন। সোণামুখীর পুলিশ থানার দারোগা মিত্তির মশাইয়ের বেয়াই। তাকে সঙ্গে নিয়ে মিত্তির মশাই সঙ্কটপুরে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আবার সোণামুখীতেই ফিরে আসবেন,—তা হ'লে আর ভাবনা কি?"

ফৈজু বাঁ-হাতের আঙ্গুলে ঘন ঘন গোঁফে চাড়া দিয়া, উদ্বিগ্নচিন্তায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিল। তার পর সংযত স্বরে বলিল, "অবশ্য, সেখানে যদি দরকার না থাকে তো আমি যেতে চাই না ; কিন্তু যে রকম গতিক শুনেছি ছোটবাবু, তাতে আমার পক্ষে এখানে ব'সে মিছামিছি হল্লা করার চেয়ে, সেখানে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাই উচিত।"

সুনীল বলিল "এখন নয় ফৈজু, এখন নয়—এখন চুপ কর ; তাঁরা ফিরে আসুন,—শোন আগে ব্যাপারটা কি—তার পর তোমার কথা হবে। এখন তুমি কোন কথা কোয়ো না, সর্দ্দার শুনলে চটে যাবে।" একটু থামিয়া, সকরুণ ভাবে হাসিয়া সুনীল পুনশ্চ বলিল, "দ্যাখো দেখি ফৈজু, বাড়ীতে এলে আমার আর একটুও পড়বার সময় থাকে না—খালি ঝঞ্চাট, খালি হাঙ্গাম, একবার বই হাতে করবার ফুরসুৎ নেই! আমারি এমন দুঃখ হ'চ্ছে ফৈজু,—কলকাতায় আমরা বেশ ছিলুম, না?"

ফৈজুর মুখের দুশ্চিন্তা-গাম্ভীর্য্যের অন্ধকার মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল। অসঙ্কোচে সুনীলের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া,

ঠিক যেন সুনীলের স্নেহশীল অগ্রজটির মত, কৌতুক-স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "তাই তো ছোটবাবু, আপনার জন্যে আমার বড়ই দুঃখ হ'চ্ছে,—পড়া তো হ'চ্ছেই না—তার পর, না হ'চ্ছে একটু কুস্তি খেলা, না হ'চ্ছে ঘুসী লড়া, না হ'চ্ছে একটু গান-বাজনা! বড়ই আপ্‌শোষের কথা! আর আপ্‌শোসের ওপর আপ্‌শোস, আপনার হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের ভূতের গল্প এখানে একেবারেই নাই!"

ফৈজু মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। সুনীল অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "হাঁ, তার জন্যে বৈ কি! না ফৈজু, ঠাট্টা নয়! সত্যি বল্‌ছি, দিদির এই হাঙ্গামাটা ঘাড়ে পড়ায় আমার যেন—"

বাধা দিয়া ফৈজু হাসিমুখে বলিল, "মন খারাপ ক'রে লাভ নেই ছোটবাবু! হাঙ্গাম যখন ঘাড়ে এসে পড়েছে, তখন মাথার ওপর ওকে তুলে নিতে'হবেই! ভয় কি আপনার, —ফৈজুর হাতে লাঠি আর ঘাড়ে মাথাটা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ সে আপনাকে ভাবতে দেবে না। যান যান,— অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, স্নান ক'রে দুটো মুখে দিয়ে নেন—"

অন্যের মুখে এই মৌখিক আশ্বাস বচন উচ্চারিত হইলে সুনীলের কাণে কি রকম লাগিত বলা যায় না, কিন্তু ফৈজুর মুখের এই ক্ষুদ্র আশ্বাসটুকু আজ তাহার বিপন্ন-বিসন্ন অন্তঃকরণকে বেশ একটু তৃপ্তির আনন্দ দান করিল। সুনীল ক্ষণেকের জন্য নীরব থাকিয়া, সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি কোথাও পালিও না ফৈজু, সন্ধ্যাবেলা এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।"

সুনীল বাড়ীর দিকে চলিল,—ফৈজু সেলাম করিয়া ঘাটের পথ ধরিল। স্নান সারিয়া বাড়ী আসিয়া, কাপড় ছাড়িয়া ফৈজু আহারে বসিল। রহিমা অন্ন ব্যঞ্জন সাজাইয়া দিয়া দুঃখ করিতে লাগিল,—আজ সুমতি-দিদি কপি পাঠাইয়া দিয়াছেন, কত যত্নে সে কপি রাঁধিল, কিন্তু শ্বশুরকে খাওয়াইতে পারিল না। এতদিন থাকিতে আজই যে তাহার শ্বশুরকে বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইল—সে শুধু রাঁধুনী রহিমার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়!

ফৈজু একটু অন্যমনা ভাবে—সংক্ষেপেই সময়োচিত দু একটা কথা কহিয়া তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া লইল।

রহিমা বলিল, "কপিটা কেমন রান্না হ'য়েছে? নুণ ঠিক হ'য়েছে তো?"

ফৈজু তখন জয়দেবপুর মহল আর সঙ্কটপুরের জমীদার বাবুদের কথা ভাবিতেছিল। তার মাঝে কপি-রান্নায় লবণের পরিমাণ তদন্তের আদেশ পাইয়া হঠাৎ একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। একটু ভাবিয়া বলিল, "কি জানি, আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি, তোমরা খেয়ে দেখো, বোধ হয় নুণ একটু কম হয়েছে।"

রহিমা রাগিয়া বলিল, "তোমার মত মানুষকে খেতে দিয়ে কিছু তৃপ্তি নাই। এতক্ষণের পর 'বোধ হয় নুণ কম হ'য়েছে'!"

হাসিয়া ফৈজু বলিল, "আমি অত খুঁৎ ধরায় মন দিতে পারি না।"

রহিমা বলিল "তা পারবে কেন? চিরটা দিনই তোমার এক ভাবে যাবে! শোন, এখন পাড়ায় টহল দিতে পালিও না, বাড়ীতে থাক,—আমি নানীর বাড়ীতে চর্‌কা কাট্‌তে যাব।"

বিস্মিত হইয়া ফৈজু বলিল "বাঃ, আমি বাড়ীতে থাক্‌ব? —তা আমি পারব না, আমার ঢের কায আছে।"

রহিমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সে ব'ল্লে হবে না। তোমার কায বিকেলে হবে, দুপুরবেলা বাড়ীতে থাক।"

"বাস্‌, এ যে অন্যায় জুলুম!" বলিয়াই, হঠাৎ পাশে রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, বিদ্রোহী ফৈজু থতমত খাইয়া থামিয়া পড়িল। দেখিল দুটি আগ্রহ-করুণ আঁখি, একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে।—চোখোচোখি হইতেই টিয়া সন্ত্রস্তভাবে দৃষ্টি নামাইয়া চকিতে অদৃশ্য হইল।

একটু থামিয়া ফৈজু কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিল, "তুমি কতক্ষণ পরে ফিরবে খলিফা?"

খলিফা বেশ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "তা এখন কি ক'রে বল্‌ব? শীতকালের বেলা, এতো এখুনি শেষ হ'য়ে যাবে। তুমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নাও না!"

"দেখা যাক্‌" বলিয়া ফৈজু আঁচাইতে গেল,—রহিমা রান্না-ঘরে উঠিয়া গেল।

দু' জায়ে আহার শেষ করিয়া অল্পক্ষণ পরে রান্না-ঘরের বাহিরে আঁচাইতে আসিল। টিয়া আগে আঁচাইয়া লইল, তার পর টব হইতে আর এক ঘটি জল তুলিয়া রহিমাকে

আঁচাইতে দিয়া পান আনিতে ঘরে ঢুকিল। রহিমার সকল সদ্‌গুণের মধ্যে একটি মস্ত দুর্ব্বলতা ছিল,—পান-দোক্তার উপাসনা! ভাতটা না হইলে একদিন চলিত, কিন্তু নেশাটা না হইলে, তাহার কষ্টের সীমা থাকিত না!

বারেণ্ডার কোণে ফৈজু তখন এক রাশ শণ ও ঢেরা লইয়া দড়ি কাটিতে বসিয়াছিল। টিয়া ঘর হইতে পান ও দোক্তার কৌটা লইয়া বাহিরে যাইতেছে দেখিয়া, হঠাৎ সে ঢেরা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে সাগ্রহে বলিল, "ও কি? খলিফার দোক্তার কৌটো? দাও তো আমায়—"

খপ্ করিয়া কৌটাটা বুকের মধ্যে লুকাইয়া অনুযোগ-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া টিয়া বলিল, "বাঃ, তা কেন হবে? আমি নিয়ে যাচ্ছি, আমিই নিয়ে যাব, তোমায় কেন নিতে দেব?"

ফৈজু বলিল "আহা, দাও না আমায়,—খলিফাকে একটু রাগিয়ে দিই,—অনেকদিন ওকে রাগান হয় নি,—দাও, দাও—"

হাত ছাড়াইয়া লইয়া, সজোরে ঘাড় নাড়িয়া টিয়া বলিল, "কক্‌খোনো না!" তার পর তিরস্কারের স্বরে বলিল—"আমি এখন দোক্তার কৌটো নিয়ে যাচ্ছি—তুমি এখন কেন কথা কইতে আসছ? তুমি চুপ করে থাক।"

"বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া ফৈজু হাসিয়া আবার শণের দড়ি কাটিতে বসিল। টিয়া বাহিরে আসিয়া রহিমাকে পান-দোক্তা দিয়া, উঠানের রৌদ্রে পিঠ দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

রহিমা পানটি মুখে পুরিয়া দোক্তা লইতে-লইতে বলিল, "তুই এসে অবধি আমি নিজে পান নিয়ে খাওয়া ভুলে গেছি,—তুই আমায় বেজায় কুঁড়ে ক'রে তুলবি এবার দেখ্‌ছি টিয়া!"

টিয়া সলজ্জ হাস্যে বলিল, "ভারি তো কায!" তার পর একটু থামিয়া মাটীর দিকে চোখ নীচু করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দিদি, তুমি ভাই আমায় সঙ্গে নিয়ে চল না—"

সবিস্ময়ে রহিমা বলিল "কোথায় রে?"

টিয়া অধিকতর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "ঐ যে নানীর বাড়ী, না কোথা তুমি যাচ্ছ—"

রহিমার বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল,—হতবুদ্ধি হইয়া বলিল "তুই সেখানে গিয়ে কি করবি? ফৈজু বাড়ীতে রয়েছে—"

একটা প্রচ্ছন্ন লজ্জা-পীড়িত অপমানের অন্তর্দ্দাহ, যাহা এতক্ষণ স্তব্ধ-বিদ্রোহে টিয়ার মনের মাঝে জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছিল, খোঁচা খাইয়া এবার সেটা একটু যেন বিচলিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া টিয়া মুখ তুলিয়া একটু জোরের সহিত হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তাই তো বল্‌ছি, আমিই বা এখানে থেকে কি করব? যাদের বাড়ী তারা ব'সে আগ্‌লে থাকুক না, চল তোমাতে-আমাতে বেড়িয়ে আসি আজ—"

ব্যাপারটা এইবার রহিমার হৃদয়ঙ্গম হইল! একটু হাসিয়া টিয়ার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিল, "এইবার সুদের সুদ পর্য্যন্ত উশুল করতে চাস্—নয়? যাঃ, দুষ্টুমী করিস্ না,—ওর ওপর এখন আর রাগ করতে হবে না।"

ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া টিয়া বলিয়া উঠিল, "কে রাগ করেছে দিদি, খামকা কেন রাগ করতে যাব? আমার দরকার কি রাগ করবার?" কিন্তু হইল না, হইল না! বেচারা টিয়ার মুখের আস্ফালন মুখেই রহিয়া গেল,—তাহার সে আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ মূলহীন প্রমাণ করিয়া সহসা চোখ হইতে বড়-বড় দুইটা ফোঁটা ঝরিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া বুকে পড়িল। সে ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল।

রহিমা হাসিয়া বলিল, "হয়েছে—হয়েছে, আর তোকে সাফাই গাইতে হবে না, থাম! এরি মধ্যে ঝগড়াও ক'রে নিয়েছিস, না? তাই তখন অমন তর্কের আওয়াজ পেলুম বারেণ্ডায়, বটে!"

তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া লজ্জা-বিব্রত টিয়া বলিল, "না দিদি, সে কিছু নয়, কিছুই নয়।"

রহিমা বলিল, "নয় বৈ কি! আমি কালা কি না—শুনতে পাই নি কিছু—"

উল্টা-চাপের তাড়ায় অস্থির হইয়া টিয়া বলিল, "সত্যি না,—সত্যি না, সে কিছুই তর্ক নয়, অন্য কথা নিয়ে ঝগড়া—"

বাধা দিয়া চুপি-চুপি বিদ্রূপের স্বরে রহিমা বলিল, "হাঁ-হাঁ, ঝগড়া ভিন্ন ভাবের কথা যে অমন সুরে চলে না, সেটা আমার জানা আছে—"

লজ্জায় লাল হইয়া টিয়া বলিল, "আঃ, কি যে বল তুমি

দিদি,—যাও! তোমার দোক্তার কৌটো কেড়ে নিতে এসেছিল, তাই—যাক্‌গে, চল আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে—” টিয়া নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিল, “তোমার পায়ে পড়ি—”

হাসি বন্ধ করিয়া রহিমা বলিল, “না, বাড়াবাড়ি করিস্ নি। ছাখ টিয়া, সম্পর্কে ঠাট্টার মানুষ তাই—নইলে তোরা আমার পেটের ছেলের মত, তোদের আর কি বল্‌ব বল। ছিঃ, অমন কান্না কাটি করিস্ নি, আমার ভারি দুঃখ হয়। ছাখ্, সংসারে আমার কি আছে বল দেখি? তোদের নিয়েই আমার সব, তোদের হাসি তোদের আনন্দেই আমার তৃপ্তি। তোরা যদি অমন করবি—” রহিমা সহসা চুপ করিল; তাহার মুখখানা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে ভরিয়া গেল! আসল কথা, সংসারে অতি ব্যথিত মানুষের মন একটু ত্রুটির আঘাতেই অনেকখানি বেদনাতুর হইয়া পড়ে। হাসির মাঝেই অকস্মাৎ অকারণে শোকের অশ্রু চোখে আসিয়া পড়ে! হিসাবের অবসর নাই।

টিয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল, লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে একটু বেদনাও বোধ করিল! ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, নম্র ভাবে অনুনয়ের স্বরে বলিল, “কিন্তু তুমি একটু সকাল সকাল ফিরো দিদি!”

“ফিরব—ঝুয়ারটা বন্ধ করে দিয়ে যা—” বলিয়া রহিমা ঘোমটা টানিয়া রাস্তা পার হইয়া ওদিকের প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল। টিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া বারেণ্ডায় গিয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফৈজু ঘাড় হেঁট করিয়া এক-মনে দড়ির পাক লক্ষ্য করিতেছিল,—টিয়া আড়চোখে একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল; তার পর নিঃশব্দে পাশ কাটাইয়া গিয়া শয়ন-কক্ষে ঢুকিল।

ফৈজু মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল,—তার পর ঢেরা ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া, একবার বাহিরের চারিদিকটার অবস্থা খোঁজ লইয়া আসিয়া, ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “খলিফা চলে গেছে?”

টিয়া তক্তপোষের উপর বালিশটি লইয়া তখন শয়নের উদ্যোগ করিতেছিল; ফৈজুকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া, একটু সঙ্কুচিত ভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল, “এতক্ষণে বুঝি তোমার খেয়াল হল?”

“হোল একটু—” বলিয়া ফৈজু খাটের পাশে বসিয়া, স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, “উঠ্‌ছ কেন? শোও না,—ঘুমবে না কি?”

বাঁ হাতে কপাল চাপিয়া ধরিয়া, ক্লান্ত স্বরে টিয়া বলিল, “না,—মাথাটা একটু, যেন কি-রকম করছে,—তাই একটুখানি—”

আগ্রহের সহিত ফৈজু বলিল, “শোও শোও, তবে শুয়ে পড়! জানালা দুয়ার বন্ধ করে দিয়ে আমি উঠে যাব?”

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া টিয়া বলিল, “না, অত কাণ্ড করতে হবে না। রোদে দাঁড়িয়েছিলুম কি না, তাই চট্ করে মাথাটা কেমন ধরে গেল, ও এখনি ভাল হয়ে যাবে।” টিয়া শুইয়া পড়িল।

সরিয়া বসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ফৈজু বলিল, “এখনো কি তোমার সেই রকম মাথার যাতনা হয়?”

টিয়া মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া খুব সংক্ষেপে বলিল,—“না।”

ফৈজু আর একটু সরিয়া বসিয়া নিজের উরুর উপর তাহার মাথাটি টানিয়া বলিল, “অম্বলের অসুখটা এখন একেবারেই সেরে গেছে, নয়? এখন কিছুই জান্‌তে পার না—কেমন?”

তিন বৎসর পূর্ব্বে—টিয়া যখন চোদ্দ বৎসর বয়সে প্রথম শ্বশুরালয়ে আসে, তখন নানাবিধ অসুখের উপসর্গের সঙ্গে নিদারুণ স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য ব্যাধি জুটিয়া, তাহার প্রাণ-সংশয় অবস্থা ঘটাইয়া তুলিয়াছিল। অনেক যত্ন চেষ্টায় এবং সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া বহুব্যয়সাপেক্ষ হাকিমী চিকিৎসার অধীনে থাকিয়া সম্প্রতি সে তাহার নষ্ট-স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছে।

কিন্তু এই ঘটনা উপলক্ষে ফৈজু একটা অতি দুঃসাহসিক কায করিয়া বড়ই গোলমাল বাধাইয়া ফেলিয়াছে! স্ত্রীর অসুখের সময় ফৈজুর আয় অত্যন্ত সামান্য ছিল। সে তখন সহরের কোন নামজাদা মুসলমান উকীলের কাছে সবেমাত্র মোহরের কাযে ভর্ত্তি হইয়াছে। স্ত্রীর অসুখের হাঙ্গামায় সে উপর্য্যুপরি কামাই করিয়া প্রথমেই সেই চাকরীর পরমায়ু লোপ করিয়া দিল। তার পর

গ্রাম্য হাতুড়ে চিকিৎসকগণের উপর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, পিতার অজ্ঞাতে সহর হইতে একজন নামজাদা হাকিমকে লইয়া গিয়া স্ত্রীর যথোচিত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা ঠিক করিল, এবং পিতাকে কিছু না বলিয়া গোপনে ঋণ করিয়া, সে সকল ব্যাপারের খরচ জুটাইল।

সংসারে একদল মানুষ আছে, যাহারা আলস্যের আরামটা নষ্ট হইবার ভয়ে, সকল বিষয়ে নিরীহ নিশ্চেষ্ট থাকে; কিন্তু পরছিদ্র অন্বেষণে তাহাদের দৃষ্টি বড় সূক্ষ্ম এবং পরকুৎসা রটনা ও ঘোষণায় তাহাদের রসনা অসীম উদ্যমশীল! সেই সব লোকহিতৈষী মহাত্মগণের অনুগ্রহে ফৈজুর সেই অসম সাহসিকতার বিরুদ্ধে পল্লীর ঘরে ঘরে তীব্র সমালোচনা হইয়া গেল! ফৈজুকে সকলে ছিঃ ছিঃ তো করিলই— আর সেই সঙ্গে এমন পাষণ্ড স্ত্রৈণ পুত্রের পিতা হওয়ার জন্য, ফৈজুর পিতাকেও সকলে শত ধিক্কার দিল। পুত্রের স্বাধীন কর্তৃত্বে পিতা বেশী কিছু পরিতৃপ্ত হন নাই; কিন্তু লোক সমাজের নিন্দা গ্লানিতে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন,—পুত্রকে কঠোর তিরস্কার করিলেন! পুত্র মর্ম্মাহত হইয়া স্তব্ধ রহিল। বাহিরের লোক তাহার প্রয়োজনের দিকে তাকাইবে না সেটা সহজ কথা, কিন্তু পিতাও যে সে দিকে তাকাইবেন না, শুধু তাহার দুঃসাহস স্পর্দ্ধাকেই দেখিবেন, এটা ফৈজুকে বড় আঘাত দিয়া—বড় নিগূঢ় অভিমানে অভিমানী করিয়া তুলিল। ফৈজু কোন প্রতিবাদ না করিয়া নিঃশব্দে রহিল এবং নিঃশব্দেই সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া—স্ত্রীকে পশ্চিমে তাহার পিতার বাসায় পাঠাইয়া দিয়া, নিজে একদিন অকস্মাৎ অদৃশ্য হইল! পনের দিন পরে করাচি বন্দরের পোষ্ট আফিসের ছাপ খাইয়া—ফৈজুর এক পত্র ও ৫২৲ টাকার মণি অর্ডার আসিয়া সুনীলের হাতে পৌছিল। ফৈজু বহুৎ বহুৎ আদব অন্তে সসম্মানে ছোটবাবুর কাছে নিবেদন করিয়াছে যে, ফৈজুর অতি বড় দুঃসময়ে, স্নেহময়ী সুমতি দিদি যে তাহাকে দয়া করিয়া টাকা ধার দিয়াছিলেন, সেটা ফৈজু আজ খুব আনন্দের সহিত ফিরাইয়া দিতেছে এবং কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছে, তাঁহাদের অনুগ্রহের কাছে ফৈজু চিরদিনের জন্য ঋণী রহিল। আপাততঃ ফৈজু জলন্ধরের প্রসিদ্ধ ধনবান বণিক আগা সাহেবের সহযাত্রী হইয়া তুরস্ক দেশে বেড়াইতে চলিল; বছর দুই পরে সেখান হইতে ফিরিয়া সে দেশে যাইবে,—বার বার মার্জ্জনা ভিক্ষা সহ এ কথাটা তাহার পিতাকে জানাইতেছে! ছোট বাবু যেন তাহাকে একটু জানান।

পুত্রের এই দেশত্যাগের সংবাদে পিতার অন্তঃকরণটায় কি যে হইল সে তত্ত্ব অন্তর্যামী জানেন,—প্রকাশ্যে তিনি চুপ করিয়া রহিলেন; এবং গ্রামের লোক যখন নূতন হুজুগে মাতিয়া আবার নূতন সুরে শতেক ছিঃ ও সহস্রেক ধিক্কার দিতে উদ্যত হইল, তিনি তখন শুধু কঠোর ঔদাস্যে বলিলেন, "জাহান্নামে যাক্!"

পুত্রের সম্বন্ধে তিনি সেই থানেই নীরব হইলেন বটে, কিন্তু পুত্রবধূর সম্বন্ধে যথাসাধ্য তত্ত্বাবধান করিতে ত্রুটি করিলেন না। সুদীর্ঘ কাল পরে বধূ একটু সুস্থ হইলে, মাঝে মাঝে নিজালয়ে আনিতে লাগিলেন; কুটুম্বের সহিতও যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর চিকিৎসা খরচ শ্বশুরকে পাঠাইয়া, বাকী টাকা ফৈজু পিতার জন্য সুনীলের কাছে পাঠাইতে লাগিল; কিন্তু পিতা বাপ করিয়া তাহার এক পয়সাও লইলেন না, ফৈজু দেশে ফিরিলে তাহার টাকা তাহাকেই ফেরৎ দিবার জন্য বলিয়া দিলেন। টাকা সুনীলের কাছে জমিতে লাগিল।

প্রায় আড়াই বছরের পর ফৈজু দেশে ফিরিয়া পিতার সঙ্গে প্রথমেই দেখা করিতে আসিল। পিতা প্রথমে রাগে কথাই কহিলেন না। তার পর কথা যখন কহিলেন, তখন তিরস্কারের উপর তিরস্কার চলিল; এবং সে তিরস্কারটা শুধু মাত্র ফৈজুকে নয়—তাহার প্রভু আগা সাহেবকে শুদ্ধ! কারণ তিনিই তো দাগাবাজী করিয়া তাহার পুত্রকে অত দূরদেশে লইয়া গিয়াছিলেন!

ফৈজু চুপ করিয়াই সব শুনিল, কোন কথা কহিল না; কিন্তু তার পর যখন পিতার রাগ পড়িল—তিনি যখন পুত্রবধূকে আনিতে যাইবার উদ্যোগ করিলেন, তখন ফৈজুও নিঃশব্দে নিজের তল্পী তল্পা গুটাইয়া পুনশ্চ জলন্ধর পলায়নের উপক্রম করিল। স্ত্রৈণ ফৈজুর এই অদ্ভুত ব্যবহারে, গ্রামের সকলেই যারপরনাই বিস্মিত হইয়া কৈফিয়ৎ চাহিল। ফৈজু চুপ করিয়া রহিল—শুধু বন্ধু-বান্ধবদের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া সংক্ষেপে হাসি মুখে উত্তর দিল "সংসার যখন পাতিয়াছি, তখন টাকা চাই—"

অনেক যুক্তি, তর্ক, দৃষ্টান্ত, উপদেশ ব্যয় হইল, কিন্তু ফৈজুর সঙ্কল্প অটল! সে কিছুতেই বাড়ীতে থাকিবে না! পুত্রের এই অভাবনীয় অবাধ্যতায় পিতা আবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাবনায় পড়িলেন। তাঁহার বড় ভয় হইতে লাগিল যে, আগা সাহেবের কাছে দাসত্ব স্বীকার করিতে গেলে অমনি ভাবে ত চার বছরের পথে সফরে থাকিতে থাকিতে, পুত্র পারিবারিক জীবনের বন্ধনচ্ছেদ করিয়া একেবারেই উৎসন্ন যাইবে! বৃদ্ধ নিজে অত্যন্ত সচ্চরিত্র মানুষ ছিলেন; মানুষের চরিত্রহীনতা দোষটা তিনি চিরদিনই মর্ম্মান্তিক ঘৃণা করিতেন; কাজেই নিজের পুত্রের সম্বন্ধে সে আশঙ্কাটা যখন একবার তাঁহার মনে পড়িল, আর তাঁহাকে ঠেকায় কে?, চিন্তা অসহিষ্ণু বৃদ্ধ হঠাৎ এক সময় পুত্রকে কটু দিব্য দিয়া বলিলেন, "আগা সাহেবের ওখানে তুই যাস্ তো—!"

সুনীল সেই সময় ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কলিকাতায় আই এ পড়িতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। কলিকাতার বাসার তত্ত্বাবধান-কার্য্যের জন্য ছোট গোমস্তা 'মণ্ডল মশাই'য়ের যাওয়ার কথা হইতেছিল। পিতার কাছে তাড়া খাইয়া বিপন্ন ফৈজু সুনীলকে ধরিয়া বসিল। সুনীলের আহ্লাদের সীমা নাই! সে তাড়াতাড়ি দিদির কাছে অনুমতি লইতে ছুটিল। তারপর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ সর্দ্দারকে বলিয়া-কহিয়া মত করাইয়া লইল। নিজের পুত্রের চেয়ে প্রভুপুত্র 'খোকাবাবু' বৃদ্ধের কম স্নেহ ও শুভভাবনার বস্তু ছিল না; কাজেই তাহার জন্য পুত্রকে ছাড়িয়া দিলেন। ফৈজু সুনীলের সঙ্গে কলিকাতায় গেল। তার পর সাত আট মাস পরে, এই তাহার প্রথম বাটী প্রত্যাগমন!

ফৈজু টিয়ার মাথাটি যখন টানিয়া লইল, টিয়া বাধা দিল না, কিছুক্ষণ মোহাবিষ্টের ন্যায় স্তব্ধ নিঝুম হইয়া রহিল। ফৈজু প্রশ্ন করিল, সে উত্তর দিল না,—আবার প্রশ্ন হইল—শেষে ফৈজু তাহাকে ধরিয়া সজোরে নাড়া দিয়া বলিল, "শুনতে পাচ্ছ না? জবাব দাও—"

টিয়ার চমক ভাঙ্গিল। শুষ্ক মুখে সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিতে গেল; কিন্তু সহসা তাহার দুই চোখ আবার জলে ভরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নিজের মাথাটা টানিয়া লইয়া, ঢোক গিলিয়া, ঈষৎ বিদ্রোহসূচক স্বরে বলিল, "কেন তুমি আবার ঐ সব কথা তুলছ? না, তুমি আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করতে পাবে না, তুমি চুপ কর—সরে বস—" সঙ্গে-সঙ্গে তাহার চোখ ছাপাইয়া টস্-টস্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল!

ফৈজু খাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই নাও! তা হলে আমি নাচার! ওম্নি করে কান্না কাটি যদি করবে, তা হলে—"

চোখের জলকে বাধা দিবার চেষ্টায় প্রাণপণে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে রুদ্ধস্বরে টিয়া বলিল, "কে তোমার কাছে কাঁদতে চাইছে? আমি ডেকেছিলুম তোমায়? তুমি বসলে কেন এখানে এসে?"

একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল, "তা বটে, আমারই অন্যায়! কিন্তু ভাখো, একে মাথা কেমন করছে বলছি, তার ওপর ফের যদি ঐ রকম কান্না সুরু কর,—"

বাধা দিয়া, অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে কি একটা কথা বলিতে গিয়া রাগে ক্ষোভে টিয়ার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল! তাড়াতাড়ি বালিশটা টানিয়া লইয়া সে মুখে চাপিয়া ধরিল, আর কথা কহিল না।—ফৈজু হতবুদ্ধির মত ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিল, "যা খুসী কর তোমার"—সঙ্গে সঙ্গে সে ধীরপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে, সহসা কি যেন মনে পড়ায়, অত্যন্ত উৎসাহিত পদে পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া, ফৈজু পূর্ব্বস্থানে বসিল। স্ত্রীর মুখখানি টানিয়া ফিরাইয়া—ব্যগ্রভাবে বলিল "শোন শোন, একটা কথা বলবো, ঠাট্টা নয়—মুখ-ঝামটা রাখো, শোন—"

টিয়া চোক মুছিয়া বলিল "বল—"

ফৈজু উৎসুক দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল "আমার সম্বন্ধে তুমি কি সব গুজব শুনেছ বল তো?"

ঈষৎ চকিত হইয়া, স্বামীর মুখপানে চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্য কি যেন ভাবিয়া, টিয়া বিচলিত ভাবে সরিয়া গেল। ফৈজু উত্তর প্রত্যাশায় ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া অধিকতর উৎসুক ভাবে বলিল "বল।"

টিয়া বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—"মনে নাই, ভুলে গেছি—"

একটু উত্তেজিত হইয়া ফৈজু বলিল "মিথ্যা কথা!—

টিয়া তুমি আমার কাছেও কথা গোপন করবে? আমাকেও তুমি বিশ্বাস করবে না?"

টিয়া মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল নীরবে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল। তার পর একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "আমি কি তোমায় অবিশ্বাস করছি?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ফৈজু বলিল, "তবে! কি এমন সাংঘাতিক গুজব তুমি শুনেছ যে, আমায় সেটা বলে বলবার সাহস তোমার নেই!"

অধিকতর কুণ্ঠিত হইয়া টিয়া বলিল "সেটা শুনে তোমার কোন লাভ নেই।"

বাধা দিয়া ফৈজু বলিল "সেটা আমি বুঝবো—খোদা আমাকেও সাধারণ লাভ-লোকসানটা বোঝবার মত বুদ্ধি বিবেচনা দিয়েছেন বোধ হয়। এখন তুমি আমার সম্বন্ধে কি গুজব শুনেছ তাই বল।"

একটু ভীত হইয়া টিয়া বলিল "সে যে তোমায় বলতে মানা করে দিয়েছে!"

"কে মানা করেছে?"

"সবাই"

"সবাই? মানে?"

"যারা বলেছে, যাদের কাছে গুজব শুনেছি—"

ফৈজুর ভ্রূযুগল আবার দৃঢ় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ঈষৎ তীব্রস্বরে সে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, বড় চমৎকার বন্দোবস্ত তো! আমার সম্বন্ধে—নিশ্চয়ই সে আমার দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে—যে কোন রকম হোক কুৎসা কেলেঙ্কারীর গুজব,—অথচ সেটা শুধু আমারই শুনতে মানা; কিন্তু সেটা তুমি শুনলে কোন হানি নাই,—সেটা মনে পড়লে মনস্তাপে তোমার চোখে জল আসবে, তাতেও কোন লোকসান নাই,—শুধু আমি শুনলেই সব মাটী!"

ফৈজু অধীরভাবে খাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—কিন্তু পরক্ষণেই আত্ম-সংবরণ করিয়া—আবার বসিল; দৃঢ় স্থির কণ্ঠে বলিল "ত্যাখো, স্বামী বলে যখন আমায় মনে করেছ, আর স্ত্রী বলে যখন তোমায় মনে করতে হচ্ছে আমাকে—তখন তোমায় আমি একটা কথা বলে দিই—তোমার-আমার সম্পর্কের মধ্যে ও রকম লুকোচুরির দ্বিধা রেখো না! মনের মধ্যে ঘৃণা অবিশ্বাসের পাহাড়-পর্ব্বতের আড়াল রেখে—শুধু লৌকিকতার খাতিরে গৃহস্থালী বজায় রাখবার জন্যে তুমি যে স্বামী বলে আমার মুখপানে চাইবে, সে আমি সইতে পারব না, সে যে আমার মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের বিষয়! তার চেয়ে তুমি সত্য কথা খুলে বল, তাতে যত লোকসান হয় হোক—সে আমি সহ্য করতে পারব।"

টিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উঠিয়া বসিয়া—সহসা বিচলিত ভাবে বলিল, "তুমি বিশ্বাস করবে আমায়? আমার কথা?"

ফৈজু স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া ততোধিক স্থির কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, করব, নিশ্চয় করব, কিন্তু সত্যি কথা বল, দ্বিধা করো না।"

বিনীত ভাবে টিয়া বলিল "তবে মাপ করো আমায়, সে সব লক্ষ্মীছাড়া গুজব আমি মুখে আনতে পারব না। কিন্তু তুমি ঠিক জেনো; তুমি চরিত্রহীন হয়েছ, এটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি, বিশ্বাস করতে গেলে আমার কান্না আসত, আমি কেঁদে মরেছি, তবু বিশ্বাস করি নি।"

"আমি চরিত্রহীন হয়েছি!" ফৈজু হাসিল, একটু থামিয়া বলিল "কোন সবজান্তা মহাপুরুষ এ তত্ত্বটা আবিষ্কার করেছে বল দেখি?"

মিনতি করিয়া টিয়া বলিল "তার নামটা জেনে তোমার কি হবে? মিছামিছি তার ওপর চিরদিনের জন্য তোমার একটা রাগ থেকে যাবে!"

হাসিয়া ফৈজু বলিল "কিছু না! ক্ষমতা প্রতিপত্তি-শালী মানুষদের ওপর হিংসা হলেই, সাধারণ গুজবদার মনুষ্যেরা গুজব তৈরী করতে মাথা খাটায়। কিন্তু আমার মত অকৃতি অধমের জন্যে যে মানুষ দয়া করে এত খাটুনীটা খেটেছে, তাকে চিনে রাখলে ভবিষ্যতে মঙ্গল হবে। কিন্তু আমার কুৎসার জন্যে আমি তার ওপর রাগ করব না; বরং চেষ্টা করব যেন পরমেশ্বরের কাছে তাঁর কল্যাণ প্রার্থনাই করতে পারি। তুমি বল, তার নামটি কি?"

টিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ফৈজু বলিল "সে যেই হোক—আমি কিন্তু ঠিক বলছি সে মানুষটা নিজে নিশ্চয় চরিত্রহীন অপদার্থ—তার কোন ভুল নেই!—"

টিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, তার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি ঠিক বলেছ,—সবাই তো তাদের সেই কথাই বলে!"

ফৈজু বিস্মিত হইয়া বলিল, " 'তাদের!' তা'হলে তারা এক জন নয়!"

টিয়া থতমত খাইয়া গেল! ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, "চুলোয় যাক ও সব কথা। আর ও-কথা ভাবতে হবে না। করুক গে তারা গুজব তৈরী, তাদেরই পাপ!"

একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল "তোমার মত এমন সাদা চোখে যদি সংসারের সবাই পাপকে দেখে নিতে পারত, তা'হলে বোধ হয় সংসারের সমস্ত গোলযোগের সাড়াটা একেবারে মিটে যেত। কিন্তু জানো না তো, কত হাজার জাতের মানুষ এখানে বাস করে! তুমি মনে রেখো, আজ যে মানুষ আমার নামে গুজব তৈরী করেছে, কাল সে আবার হয় তো আর একজন নিরীহ নিরপরাধ মানুষের নামে,—হয় তো তোমার নামেই, মিথ্যা গুজব তৈরী করবে! তখন? তখন যদি সেটাও সহিষ্ণু হয়ে ক্ষমা করি, তা'হলে সেটা আমার ভাল কাজ হবে কি? অন্যায় যে করে, তার পাপ কতখানি জানি না; কিন্তু অন্যায় যারা সয়, তাদের পাপ আরো বেশী—আমার তো এই রকম মনে হয়।" ফৈজু উঠিয়া গিয়া ঘরের উঁচু কুলুঙ্গি হইতে একখানি ছিন্ন মলিন কোরাণ-শরিফ পাড়িয়া, তাহার পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। টিয়াকে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না।

টিয়া ব্যথা পাইয়া, চুপচাপ খানিকক্ষণ কি ভাবিল। তার পর একটু হাসিয়া বলিল, "শোন!"

ফৈজু নিজ মনে পড়িতে পড়িতে বলিল, "উঁ।"

টিয়া বলিল, "এ দিকে চাও।"

অন্যমনস্ক দৃষ্টি তুলিয়া ফৈজু বলিল, "কি?"

স্নিগ্ধ কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, অতি সুকোমল স্বরে টিয়া বলিল, "এই বলছি কি— তোমার অন্যায়গুলো যদি আমি চুপ করে সয়ে থাকি, তা'হলে সেটাও আমার পাপ তো?"

"হুঁ" বলিয়া ফৈজু অন্যমনে পুনরায় কোরাণের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে গিয়া—একটু চমকিয়া বলিল, "কি বল্লে তুমি? আমার অন্যায়? হাঁ নিশ্চয়, সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকা তোমার মোটেই উচিত নয়;—আমি না বুঝে যদি কোথাও ভুল করে থাকি, তা হলে তোমার কর্ত্তব্য সংশোধন করে দেওয়া বৈ কি!"

দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া টিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা'হলে তোমার অন্যায় একটু দেখিয়ে দিই;—আচ্ছা, তুমি যে তুর্কিস্থানে পালালে, তা' আমায় কি একবার বলে যাওয়া তোমার উচিত ছিল না?"

ফৈজু কোরাণখানি যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে বলিল, "ছিল, কিন্তু তার ফলে তুমি যে কি রকম ভাবে কান্নাকাটি করে আমার যাওয়ার সুবিধা ঘটাতে, সেটাও তোমার ভেবে দেখা উচিত!"

তর্কে পরাস্ত হইয়া টিয়া একটু উত্তেজনার সহিত "আচ্ছা তার পর? যখন হিন্দুস্থানে ফিরলে, তখন? তখনো কি একবার—" কথা অসমাপ্ত রাখিয়া—অনুযোগ-ব্যথিত ছল্ ছল্ নয়নে সে ফৈজুর পানে চাহিল।

ফৈজু স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখপানে চাহিল। তার পর অন্যদিকে চোখ ফিরাইয়া ধীর কোমল কণ্ঠে বলিল, "তখন? হাঁ, সেটা অন্যায় বলতে পার। কিন্তু আমারও কি ইচ্ছা হয়নি যে গিয়ে তোমায় দেখে আসি? খুবই ইচ্ছা হয়েছিল,—কিন্তু তা বল্লে কি হবে? গরজ বড় বালাই। আমি তো বলেছি তোমায়, হাকিম সাহেবদের কথা—"

দেওয়ালের গা হইতে নিজের বর্শাটা খুলিয়া লইতে লইতে ফৈজু মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি ভাল আছ খবর পেয়েই আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম; সেই জন্যই আরো ইচ্ছা করেই যাই নি। আর তুমি তো আমার খবর বরাবরই পেয়ে আসছ,—পাওনি?" ফৈজু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল।

"পেয়েছি—" বলিয়া ম্লানমুখে টিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ফৈজু নীরব মনোযোগে বর্শার মরিচাগুলি নখে করিয়া উঠাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব।

একটু পরে দৃষ্টি ফিরাইয়া চাহিয়া, টিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বাড়ীর কারুর জন্যে তোমার মন কেমন করত না?"

একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল "করত বোধ হয় একটু একটু—" তার পর আড়চোখে চাহিয়া কৌতুকপূর্ণ ভ্রূভঙ্গি-সহ—বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "কিন্তু তাই বলে রাগের চোটে অমন চোখ দিয়ে জল আমার বেরুতো না, সেটা ঠিক!"

সলজ্জ-সঙ্কোচে টিয়া বলিল, "আচ্ছা—!"

বৈজ্ঞানিকের প্রাণ*

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, এম-এ]

আজ প্রাণের সন্ধানে বাহির হইয়াছি। কোথায় সে অতুল প্রাণের দর্শন পাইব, যাহার অক্লান্ত সাধনার অঙ্গুলিস্পর্শে প্রকৃতি দেবীর লৌহ-অর্গলিত অনন্ত মহল রহস্য-নিকেতনের সমস্ত গুপ্ত কক্ষের দ্বার নিমেষে খুলিয়া যায়,—যাহার মোহন হাসিতে বিশ্ব-সৃষ্টির আলো-আঁধার একাকার হইয়া হাসিয়া উঠে,—যাহার সর্ব্বভেদী দৃষ্টির সম্মুখে রূপ ও অরূপে কোলাকুলি করে, জড় ও চৈতন্যে গলাগলি করিয়া নৃত্য করিতে থাকে? সেই কঠোর-মধুরের সন্ধানে চলিয়াছি; সন্ধান মিলিবে কি? প্রকৃতিদেবী নিরন্তর আমাদের সম্মুখে গোপন ইঙ্গিত করিতেছেন। আমাদের উন্মুখ একাগ্র চেষ্টা তাঁহার ইঙ্গিত ধরিতে যত্ন করিতেছে; তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিলেই তিনি আরও একটু কাছে আসিয়া দাঁড়ান, তখন আমরা তাঁহার হৃদয় স্পন্দন শুনিতে পাই; এবার আরও—আরও নিকটে আসিয়া তিনি আমাদের কানে-কানে ধীরে ধীরে কথা কহিয়া যান। এইরূপে আমাদের হস্ত, হৃদয় ও মস্তকের নিকটে অনবরত তাঁহার আহ্বান আসা-যাওয়া করিতেছে। এই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান-পূত হইলে তবেই তাঁহার মন্দিরে আমাদের প্রবেশাধিকার মিলিবে।

বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে চাহেন। প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির বিবিধ ঘটনাবলীর মধ্যে একটি শৃঙ্খলা দেখিতে তৎপর হন। এই বিচিত্র ও অনবদ্য ঘটনাসমূহকে এমন একটি সূত্রে বাঁধিতে চেষ্টা করেন, যাহার দুই প্রান্ত ধরিয়া একবার দাঁড়াইতে পারিলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটা যোগ-সৃষ্টি হইতে পারিবে, নিখিল বিশ্বের স্বচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরমাণু হইতে বিরাট চন্দ্র-সূর্য্য-তারকাদির একই জীবনেতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। বৈজ্ঞানিকের পথ সরল ও কুসুমাস্তীর্ণ নহে; কি পাথেয় লইয়া তিনি পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তীব্র আনন্দে অগ্রসর হন, এখন তাহাই দেখিব।

ঘটনার প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য—সত্যপ্রিয়তা

আমাদের প্রথম জ্ঞানের সঙ্গেই স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাই,—প্রকৃতির সৃষ্টিমধ্যে সর্ব্ববিষয়ে সমান দুইটি পদার্থ বা ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না। পদার্থের মধ্যে এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য লইয়াই প্রকৃতি-রাজ্য। সাধকের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি লইয়া যদি আমরা না দেখি, তাহা হইলে উপরের আবরণের মধ্যেই আমাদের সমস্ত অন্বেষণ মাথা খুঁড়িয়া রক্তাক্ত হইয়া মরিবে, প্রকৃত সত্যের সুধারসে সকল সন্ধান রস-সিক্ত হইয়া সার্থক হইতে পারিবে না। বৈজ্ঞানিকের প্রধান কর্ত্তব্য, প্রকৃতির প্রত্যেক খুঁটিনাটির মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য দেখা; এবং যত অস্ফুটই হোক না কেন, প্রকৃতির অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট বাণী শুনিবার চেষ্টা। এই চেষ্টার মধ্যে বৈজ্ঞানিকের সমস্ত অস্তিত্ব তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পূর্ব্বানুভূতি হইতে মুক্ত হইয়া সেই সময়ের ঘটনাবলীর মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। যে সত্যের অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক সাধক লিপ্ত হইবেন, তাঁহাকেও সেই সত্যের সহিত এক সুরে বাঁধা হইতে হইবে। একবার এই যোগ সাধিত হইলে সাধনার মধ্য-পথ হইতে আর ফিরিবার উপায় নাই। তখন সাধারণ ঘটনার উপর আর দৃষ্টি স্থির থাকিতে চাহিবে না, প্রত্যেক পদার্থের মূল উৎসের দিকে বৈজ্ঞানিকের সাধনা দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতে থাকিবে। সাধারণ অবৈজ্ঞানিক মানব সকল পদার্থের মধ্যেই 'প্রায়' ও 'যেন' লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে; কিন্তু বৈজ্ঞানিককে সেখানে দাঁড়াইলে চলিবে না, তাহাকে 'যথার্থ' ও 'প্রকৃত'কে পাইবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে। এক কথায়, সত্যের প্রতি বৈজ্ঞানিকের একান্ত অনুরাগ থাকিবে;—প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ না হইলে, প্রকৃতির সিংহদ্বারে প্রবেশাধিকার

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের (হাওড়া) বিজ্ঞানবিভাগে পঠিত।

মিলিবে বটে, কিন্তু যেখানে অনন্ত প্রাণের সত্য-রস উৎসারিত হইতেছে, তাহার বাহিরে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

সুতরাং বিজ্ঞান মানুষকে একান্ত নির্ভরতা শিখাইতেছে। প্রত্যেক ঘটনার সম্মুখে শিশুর মত বসিতে যত্ন কর, আপনার পূর্ব্ব সঞ্চিত সমস্ত ধারণা পরিত্যাগ কর, এবং সরল প্রাণে ও বিনয় সহকারে যে দিকে ও যে গভীর গোলকধাঁধার মধ্যে প্রকৃতি তোমায় লইয়া যান, সেই দিকে অগ্রসর হও, তবে প্রকৃত সত্যের সহিত মিলন ঘটিবে। ইহাই দার্শনিক হাক্সলির মত। জগৎ জোড়া এই বিচিত্রতা এমনি ভাবে চিরদিন রহিয়াছে। যাহা আছে, তাহা লইয়াই মানবের কাজ। বৈজ্ঞানিক সত্য পদার্থগত, ব্যক্তিগত নহে। সুতরাং পদার্থ বা ঘটনাকে বুঝিতে ও জানিতে হইলে, তাহাদেরই দিয়া তাহাদের বুঝিতে ও জানিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে সাধকের নিজের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা ত্যাগ না করিলে সত্য ঘটনা ব্যক্তিগত কল্পনায় অস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এই জন্যই ব্যক্তিত্বকে বর্জ্জন করিয়া ঘটনার সম্মুখে পূজানিরত হইতে হইবে। হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন—

"Devotion to science is a tacit worship—a tacit recognition of worth in the things studied; and by implication in their cause. It is not a mere lip homage, but a homage expressed in actions,—not a mere professed respect, but a respect proved by the sacrifice of time, thought and labour."

সুতরাং বৈজ্ঞানিককে কর্ম্মযোগী হইতে হইবে। এই বিশাল প্রকৃতি-রাজ্য তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র এবং প্রত্যেক ঘটনা তাঁহার পূজার উপকরণস্বরূপ হইবে। বেকন, ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল, আগাসী, জগদীশ প্রভৃতি প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ ঋষিরা সকলেই এই একই মন্ত্রের উপাসক। শিশুকাল হইতেই প্রত্যেক ঘটনা দেখিয়া ম্যাক্সওয়েল সাধারণ ভাবে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না। প্রত্যেক ঘটনা ও পদার্থের মধ্যেই একটা বিশেষ ভাব জানিতে চাহিতেন; সকল সময়েই তাঁহার কথা ছিল—"But what's the *particular go* of it?" মহামতি ফ্যারাডে নিজের ধারণার উপর অনুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। যতক্ষণ না প্রত্যেক ঘটনা তিনি একান্ত মনোযোগ সহকারে দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেন, ততক্ষণ কিছুতেই নিরস্ত হইতেন না; তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"আমি নিরন্তর প্রকৃতির কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত আছি, এবং কি উপায়ে তিনি এই বিশ্ব জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলা রচনা করিতেছেন, তাহাই দেখা আমার একমাত্র কাজ হইয়াছে। ঘটনাবলী আমার নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাহারা আমায় রক্ষা করিয়াছে। আমি তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতাম।" এইরূপ নির্ভরতা লইয়াই প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ আগাসী তাঁহার ছাত্রদিগকে পরীক্ষার বিষয় স্থাপন করিয়া দিনের পর দিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"কি দেখিতেছ,—আরো কি দেখিতেছ?" তিনি তাঁহার পরীক্ষাগৃহকে পবিত্র দেবনিকেতন বলিয়া মনে করিতেন,—তাই তিনি বলিয়াছেন—

"The study of nature is an intercourse with the highest mind. You should never trifle with Nature. At the lowest her works are the works of the highest powers, the highest something in whatever way we may look at it. A laboratory of Natural History is a sanctuary where nothing profane should be tolerated. I feel less agony at improprieties in churches than in a scientific laboratory." আর জগদীশচন্দ্রের মনীষা উদ্ভিদের ভিতরে প্রাণের স্পন্দন শুনিবার আগে বলিয়াছে,—

"প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।"

সুতরাং বৈজ্ঞানিকের প্রথম বিশেষত্ব, ঐকান্তিক একাগ্রতা। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই, সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। সত্যের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা লইয়া, সমস্ত দুঃখ একাগ্র ধৈর্য্যের

সহিত বহন করিতে পারিলেই, সমস্ত সাধনা সফল হইয়া উঠে।

মত-প্রচারে সতর্কতা

আগেই বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিকের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ও সরল নহে,—বন্ধুর ও কঠোর পথের তিনি সাধক যাত্রী। কোনও মতবাদ প্রচার করিবার আগে তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, প্রাকৃতিক বিদ্যার বিচারালয়ে প্রমাণ ব্যতীত কিছুই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার বিশিষ্ট পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা এমন যুক্তিবাদ গড়িয়া তুলিতে হইবে যে, তাহা যেমন তাঁহার নিজের কাছে সত্য, প্রত্যেক ব্যক্তির মনের নিকট সেইরূপ সত্য হইবে। অতএব, ঘটনাবলীকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজান, তাহাদের পরস্পরের বিশিষ্ট স্থান ও যথার্থ অর্থ জ্ঞাপন করা—ইহাই বিজ্ঞানের কাজ; এবং ব্যক্তিগত সমস্ত ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া এই ঘটনাবলীর উপরই মত গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস করাই বৈজ্ঞানিকের বিশেষত্ব। বৈজ্ঞানিকের ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এ জন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। যতক্ষণ না দুই দিক হইতে মিলন হয়, ততক্ষণ তিনি কোনও এক দিক গ্রহণ করিতে পারেন না।

সাধারণতঃ, মানুষ নিজের অনুভূতি দিয়া বিচার করিয়া থাকে; কোনও একটি সুন্দর ভাব বা সরল যুক্তি পাইলে সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। সাধারণ মানুষের এই দুর্বলতা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সমূহ বিপদ আনয়ন করে। বৈজ্ঞানিক যতক্ষণ না ঘটনাবলীর প্রামাণ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হন, ততক্ষণ তাঁহার সর্ববিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যায়, ততক্ষণ তিনি কোনও মতপ্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। এই সকল বিষয়ে অসন্তুষ্টি ও সন্দেহের ভাব একটি জার্মাণ বাক্যে সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে, যে—"যিনি সর্ব্বদা ভিন্ন মত পোষণ করেন, তিনিই অধ্যাপক; আর আমাদের সংস্কৃতেও উক্ত হইয়াছে,—"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" বৈজ্ঞানিক যেমন নিজের মতের সাক্ষী, সেইরূপ আপনার প্রত্যেক পরীক্ষার তিনিই কঠোর বিচারক। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার না করিয়া যদি তিনি কোনও মত প্রচার করেন, তবে সে মতের মধ্যে কিছু অসত্য থাকিয়া গেলে, তজ্জন্য তিনি মানব-সমাজের নিকট দোষী হইয়া থাকেন। কি কঠোর ভাবেই হাক্সলি বলিয়াছেন—"যে মতবাদ প্রামাণ্যের বাহিরে যায়, উহা যে কেবলমাত্র ভ্রম, তাহা নহে,—উহা পাপ।" সুতরাং মত-প্রচার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন; তাঁহার বিচার-বুদ্ধি কেবলমাত্র সত্যের দিকে অনিমেষে চাহিয়া থাকিবে। তাঁহার ভিতর ও বাহিরের মিলন হইলেই, তিনি জগতের নিকট সে মিলনের বার্ত্তা বহন করিবার উপযুক্ত হইবেন।

প্রকৃত ভাবে ফ্যারাডে বলিয়াছেন—"বৈজ্ঞানিক সাধকের মনের দ্বারে আসিয়া কত অসংখ্য চিন্তা ও মতবাদ যে তাঁহার বিরুদ্ধ পরীক্ষা ও কঠোর বিচারের দ্বারা নীরবে ও গোপনে চূর্ণীকৃত হইয়াছে,—জগৎ তাহার অতি অল্পই সংবাদ রাখে। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটেও তাঁহার সমস্ত প্রস্তাব, আশা ও কামনার দশমাংশও সত্যে পরিণত হইয়াছে কি না সন্দেহ।" সুতরাং প্রকৃত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হইতে হইলে,—বাহিরের প্রত্যেক লোকের কথা শুনিতে যদিও প্রস্তুত থাকা উচিত, কিন্তু শেষ বিচারের ভার নিজের উপর রাখিতে হইবে। তিনি কোনও মানুষের সম্মান করিবেন না, ঘটনা ও বস্তুই তাঁহার পূজা পাইবে। কেবলমাত্র ঘটনাদির উপরে বিশ্বাস রাখিয়া, তাহাদেরই যথাস্থানে স্থাপন করিয়া, যদি এমন মূর্ত্তি গড়িতে পারা যায় যে, বিশ্ব মানবের চক্ষুর ও মনের সম্মুখে তাহার প্রতি অঙ্গ যথার্থ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তবেই তাহা দেবমূর্ত্তির পূজা পাইবে,—নতুবা সত্যজ্ঞানের পদাঘাতে ধূলায় গড়াগড়ি যাওয়া ভিন্ন তাহার আর উপায় নাই।

যখন একবার একটি মতের সৃষ্টি হইবে, তখন যদিও বৈজ্ঞানিক তাহার মতটিকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিবেন, তথাপি তাঁহার মন ও যুক্তি নূতন ভাব গ্রহণ করিতে সতত উন্মুখ থাকিবে। বদ্ধ জলাশয়ের মত কোনও ভাব বা সত্যকে সীমাবদ্ধ করা পাপ,—মানব মন নিয়ত প্রবহমান নদীর মত পরিপূর্ণতার দিকে চলিয়াছে। নদী যেমন তাহার নিজের ভার লইয়া একটা বিশেষ গতির দিক স্থির করিয়া চলিলেও, দুই কূলের বাধনের নিকট দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে, তেমনি বৈজ্ঞানিকও আপনার বিশিষ্ট মতবাদ ধরিয়া চলিলেও, পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন যুক্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার

করিয়া থাকেন। কোনও সত্যই সীমাবদ্ধ নহে,—সীমার মধ্য হইতে পরিপূর্ণ সীমাহীন হইবার দিকেই তাহার গতি। ইহাই বৈজ্ঞানিকের প্রাণের বিশেষ কথা। এই জন্যই ফ্যারাডে বলিয়াছেন—"জীবন পরিপূর্ণতার দিকে গড়িয়া উঠিতেছে। জ্ঞানের রাজ্যে যে মানুষ মতান্তর গ্রহণের ও পরিবর্ত্তনের অবস্থায় না থাকে, সে ঘৃণ্য, অপদার্থ।" ইহাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের প্রাণের কথা।

দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও কল্পনা

পদার্থ-বিজ্ঞানের জন্মদাতা নিউটনের সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

"Nature and Nature's laws lay hid in night,
God said, 'Let Newton be!' and all was light."

নিউটনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে কোনও আবরণ থাকিতে পারিত না। কি মর্ম্মদেশভেদী মনীষার দীপ্তি লইয়াই তিনি বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন! তিনি চক্ষু চাহিয়াই দেখিলেন—উত্তাপ ও আলোক, বর্ণ, শব্দ, গতি, চুম্বক ও তাড়িতের আকর্ষণ বিকর্ষণ, বজ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, তুষার, শিশির, অণু, পরমাণু, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা—স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার হইয়া গিয়াছে। মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠিতেছে, স্বর্গ মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিতেছে। কোথাও ত তাহাদের জীবনের পার্থক্য নাই! যে গুণে বৃক্ষের শাখাচ্যুত হইয়া আপেল ফল ভূমিতে পড়ে, সেই গুণেই চন্দ্র, পৃথিবী, বৃহস্পতি পরস্পরের দিকে ছুটিতে গিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতেছে!—এই মাধ্যাকর্ষণ-বলেই বায়ু বহে, তরঙ্গিনীর তরঙ্গ-লীলা হয়, বৃক্ষের পত্রাবলী নাচিয়া থাকে। এই একই সূত্র স্বর্গ মর্ত্ত্য বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। যদি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ওই দিকে আরও কিছু থাকে, তবে তাহাদেরও বুঝি বাঁধিয়া ফেলিতে পারে।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি মর্ম্মভেদী, কল্পনা সর্ব্বগামী। জগতের প্রত্যেক পদার্থ তাহার সম্মুখে আসিয়া অকপটে তাহার জীবন-কথা বলিয়া যায়। রসায়নের ঘটনার সাহায্যে 'ডাল্টন' পদার্থের গঠন স্থির করিতে গিয়া পরমাণুবাদ সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর আরো অগ্রসর হইয়া পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ তাড়িতণুবাদ গড়িয়া তুলিলেন। 'কোলরস' (Kohlrausch) ফ্যারাডে সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "তিনি সত্যের আঘ্রাণ পাইতেন।" সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমস্ত ক্ষেত্রে ফ্যারাডে পরীক্ষা করিয়াছেন,—তাহার মধ্যে তিনি ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। প্রত্যেক তথ্যই তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। সে সকলের শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া তিনি কিছুতেই নিরস্ত হইতেন না। নিউটন ও পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছিলেন, জড় পদার্থের ধর্ম্মই স্থিতিপ্রবণতা (inertia) বা জড়ত্ব। কিন্তু ফ্যারাডেই প্রথমে দেখাইলেন—তাড়িত জড় না হইলেও—তাহার জড়ত্ব আছে। যেদিন এই তথ্য উদ্ভাবিত হইল, সেদিন বিজ্ঞানের এক মাহেন্দ্রক্ষণ।

এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও কল্পনার বলেই বিজ্ঞান জড় হইতে চৈতন্যের দিকে চলিয়াছে। সত্যদ্রষ্টা মনীষী ফ্যারাডেই এই মন্ত্রের প্রথম সাধক। তিনিই প্রথমে জড়-পদার্থের পরমাণুর (atom)এর পরিবর্ত্তে শক্তিকেন্দ্রের (centre of force) কথা বলিয়াছেন। আর তাঁহার মর্ম্মভেদী শক্তিরেখাগুলি (lines of force) তাঁহার সমস্ত বিচারের অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার তীব্র কল্পনা এই শক্তিরেখাগুলির আকুঞ্চন, কম্পন ও পরস্পরের মধ্যে অপসরণ-বৃত্তির সাহায্যে সমগ্র ঘটনাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকের কল্পনার লীলা দেখিতে হইলে একবার এই বিশাল জগতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে। আমাদের সূর্য্যটির আয়তন পৃথিবীর তের লক্ষ গুণ। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি কুড়ি লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। যে কয়টি তারার দূরত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তারা হইতে আলোক আসিতে সওয়া তিন বৎসর অতীত হয়; আলোকের বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। মনে কর, তারকাদির পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব কত! আর একবার জগতের নীহারিকা-বাদের কথা ভাবিয়া দেখ দেখি! হর্সেল পিতাপুত্র যেদিন নীহারিকাগুলিকে তারকাপুঞ্জ বলিয়া স্থির করিলেন, সেদিনের কথা একবার ভাবিয়া দেখ;—নীহারিকাগুলি অনেক দূরে আছে বলিয়া কুজ্ঝটিকার মত দেখায়, তাহারা এক-একটি জগৎ। আমরা একটি সৌর-জগতের বিশালতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই আপনাদের শক্তিহীনতায় ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই অনন্ত সৃষ্টিকে দর্পণে প্রতিবিম্ব-দর্শনের

মত সজীব, সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার কল্পনা এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপনার পক্ষপুটের ভিতর অনায়াসে টানিয়া লইতে পারে।

বৈজ্ঞানিক শুধু দৃষ্ট ও শ্রুত জগতের মধ্যে আপনার শক্তিকে নিঃশেষে ব্যয় করিয়া দেউলিয়া হইয়া পড়েন না। দৃষ্টির আলোক যেখানে হার মানে, সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিয়া থাকেন; শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায়, সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিন-রাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্ব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন, এবং সেই উত্তরকেই মানব ভাষায় যথাযথ ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন। নিউটন যে দিন সূর্য্যালোককে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে প্রধান সাতটি রঙের কাহিনী বাহির করিলেন, তখন এই সাতটি রঙ তাঁহার চক্ষুর তৃষ্ণা মিটাইতে পারে নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন "তবে কি এই অসীম আলোকের সাত সমুদ্র পার হইয়াও অসীম আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে?" ইহার উত্তরও মিলিয়াছে! এই বিষয়ে মহামতি জগদীশচন্দ্র, জার্ম্মাণীর অধ্যাপক হার্টজ্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ দেখাইয়াছেন, রক্ত, পীত, সবুজ, নীল প্রভৃতি সাতটি রঙের রাজ্যের দুই দিকে অদৃশ্য আলোক রাজ্য প্রসারিত রহিয়াছে। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, আকাশে ছোট-বড় নানা তরঙ্গ উঠিতেছে। নিরন্তর এই তরঙ্গগুলি আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিতেছে; কিন্তু আমাদের ক্ষীণ ইন্দ্রিয় তাহাদের সকলগুলিকে ধরিতে পারিতেছে না। আকাশের প্রত্যেক অণু কাঁপিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন, সমভাবাপন্ন, সমাবয়ব, অতীন্দ্রিয় এই আকাশ বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে। অবিরত এই আকাশের অণুগুলির কম্পনে আকাশের মধ্য দিয়া তরঙ্গ চলিয়াছে; সেই তরঙ্গ আমাদের নিরন্তর আঘাত করিতেছে। যখন এই কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে প্রায় চারি কোটি কোটি বারে পৌঁছায়; তখন আমরা লাল রঙ দেখিতে পাই। সংখ্যা আরো বাড়াইলে ক্রমান্বয়ে পীত, সবুজ, নীল প্রভৃতি রঙ দেখা দেয়। যখন কম্পন-সংখ্যা আরো বাড়িয়া সেকেণ্ডে প্রায় আট কোটি কোটি বার হইয়া দাঁড়ায়, তখন বেগুনি রঙ দেখা দেয়। কম্পন-সংখ্যা আরো বাড়াইলে আমাদের দৃষ্টিশক্তি পরাস্ত হইয়া যায়, আর আমরা দেখিতে পাই না। এই অনন্ত আকাশ-তরঙ্গের অতি অল্পই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাই আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন, —

"আকাশ-সঙ্গীতের অসংখ্য সুরসপ্তকের মধ্যে একটি সপ্তকমাত্র আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীটিই আমাদের দৃশ্য রাজ্য। আমরা কতটুকু দেখিতে পাই? নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর! অসীম জ্যোতিঃরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। দুঃসহ এই জ্যোতির ভার, অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই, সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।"

জড় ও চৈতন্যের সম্বন্ধ বাহির করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকের কল্পনা আপনার শক্তিতে আপনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ফ্যারাডে প্রথমে দেখাইলেন, তাড়িত-স্রোতের জড়ত্ব (inertia) আছে। যখন তাড়িতণু বা ইলেকট্রণ উদ্ভাবিত হইল, তখন এই তাড়িতের জড়ত্ব বিষয়ে এক নূতন পথ খুলিয়া গেল। একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর জড়ত্ব মাপিবার পথ আজ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই; এই পরমাণুই অনোরণীয়ান্ বলিয়া বিজ্ঞান স্বীকার করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও উদার কল্পনা পরীক্ষার সাহায্যে দেখাইয়াছে, প্রায় আঠার শত পঞ্চাশটি তাড়িতণু একত্র করিলে একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর মত হয়। সুতরাং তাড়িতণুকে শুধু তাড়িত বিন্দু বলিলেও চলে। সাধারণতঃ তাড়িতণুর জড়ত্ব নাই; কিন্তু যখন এই বিন্দুটি ছুটিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার জড়ত্ব দেখা দেয়; আর যতই তাহার বেগ বাড়িয়া যায়, ততই তাহার জড়ত্ব বাড়িতে থাকে। তবে কি পদার্থের জড়ত্ব জড়ের স্বধর্ম্ম নহে, তাড়িতের বেগের ধর্ম্ম? তাহা হইলে জড় বলিয়া কিছু রহিল না,—রহিল শুধু তাড়িত ও তাহার বেগ। কিন্তু আমাদের সাধারণ জড়-পদার্থের জড়ত্ব ত সকল সময়েই সমান আছে। যদি বেগযুক্ত তাড়িতই জড়ত্বের কারণ হয়, তবে ইহার উত্তর কি হইবে? বৈজ্ঞানিকেরা বলিলেন—আমরা যাহাদের জড় বলি, তাহারা অন্য কিছুই নহে,—কতকগুলি তাড়িতণুর সমষ্টি। পদার্থ যত ক্ষুদ্রই হউক

না কেন, তাহার মধ্যের তাড়িতণু গুলি তাহার মধ্যে ছুটাছুটি করিতে পারে ; এবং এই ভ্রমণের বেগ এত বেশী যে, আমরা তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি না। সুতরাং পদার্থের জড়ত্ব এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারিতেছে না। জগতে এই তাড়িতণু লীলার মধ্যেই এত বিচিত্র পদার্থের বিবিধ রূপের সৃষ্টি হইতেছে। তাহার পর কুরীদম্পতির রেডিয়াম আবিষ্কারের পর জড় হইতে শক্তির দিকে বিজ্ঞানকে আরো একটু অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। এই রহস্যময় ধাতু হইতে অবিরত তাড়িতণুর সহিত রণ্‌জেন্ রশ্মি ও অসংখ্য অদৃশ্য আলোকরশ্মি চতুর্দ্দিকে নির্গত হইতেছে। ইহা ব্যতীত অনেক প্রকারের বায়বীয় ও কঠিন পদার্থসমূহ এই ধাতুর ক্রমিক অবনতিতে নিরন্তর সৃষ্ট হইতেছে। একটি প্রকারের রেডিয়াম পরমাণু ভাঙ্গিয়া অবিরত তজ্জাত তাড়িতণুর সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু সৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং জড়জগতের মলে শক্তি বিদ্যমান। শক্তিই অবস্থাবিশেষে জড়রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জড় বস্তু বলিয়া কোন পদার্থ নাই। কি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সর্ব্বভেদী কল্পনা লইয়াই বৈজ্ঞানিক জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন! যখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্ম্মাণ করিয়া জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে অধিকক্ষণ কর্ম্মের পর আর তাহার কল সাড়া দিল না। মানুষের লেখা ভঙ্গি হইতে যেমন তাহার শারীরিক চঞ্চলতা ও ক্লান্তি অনুমান করা যায়, কলের সাড়া লিপিতে তিনি সেই চিহ্ন দেখিলেন। অল্প বিশ্রামের পর ক্লান্তি দূর হইলে কল আবার সাড়া দিতে লাগিল। দার্শনিক জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা তখনই জড়ের মধ্যে জীবনের লক্ষণ দেখিতে পাইল। অমনিই তাঁহার বাধনহারা কল্পনা জড়ের মধ্যে প্রাণের সন্ধানে বাহির হইল। তিনি বলিলেন—

"গাছের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তের ইতিহাস উদ্ধার করাই আমাদের লক্ষ্য। জন্মেজন্ম জানিতে চাই, তাহার উপর প্রত্যেক অনুকূল, প্রত্যেক প্রতিকূল ঘটনার ছাপ—তাহার সহিত আলো-অন্ধকারের ক্রীড়া, তাহার উপর পৃথিবীর টান ও ঝটিকার আঘাত। কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, কত প্রকারের আঘাত, কত প্রকারের সাড়া! এই স্থির, এই নিশ্চলবৎ প্রতীয়মান জীবন-প্রতিমার ভিতরে কত অদৃশ্য ক্রিয়া চলিতেছে। কি প্রকারে এই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করিব?"

তাঁহার সাধনা, তাঁহার নির্ম্মল দৃষ্টি জয়যুক্ত হইয়াছে। রূপের আড়ালে যে অরূপের লীলা চলিতেছে, তাহার উৎসব প্রাঙ্গণে তাঁহার নিমন্ত্রণ মিলিয়াছে!

একের দিকে গতি

এইরূপে বৈজ্ঞানিকের সমস্ত সাধনা ও আকুল অনুসন্ধান জড়ের মধ্য হইতে শক্তির দিকে, প্রকাশ হইতে অপ্রকাশের দিকে, বিচিত্রতা ও পরিবর্ত্তনশীলতা হইতে এক ও শাশ্বতের দিকে অসীম আবেগে ধাবিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক যতই পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের গভীরতার দিকে চলিয়াছেন, ততই তিনি অনন্ত সৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছেন, আর এই সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে যে সর্ব্বব্যাপী বিরাট শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহার সহিত মিলন ঘটিতেছে। বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। কবি পথের কথা ভাবেন না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। কবি আপনার আবেগের মধ্য হইতে প্রমাণ বাহির করিতে না পারিয়া, উপমার ভাষা ব্যবহার করেন। সকল কথায় তাহাকে 'যেন' যোগ করিতে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিককে কঠোর নিশ্চিতের পথ দিয়া সেই অনন্ত রহস্যের দিকেই ধাবিত হইতে হইতেছে। তিনি এমন রহস্যময় রাজ্যের মধ্যে গিয়া উপনীত হইতেছেন, যেখানে অদৃশ্য আলোকরাশির সম্মুখে স্থূল পদার্থের 'কঠিন বাধা স্বচ্ছ হইয়া পড়িতেছে,—জড় ও শক্তি একাকার হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপে চক্ষুর আবরণ হঠাৎ অপসারিত হওয়ায়, যখন এক অনির্ব্বচনীয়, অচিন্তনীয় রাজ্যের ছবি বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করিয়া ফেলে, তখন তিনি আনন্দে নৃত্য করিয়া বলেন —'যেন নহে,—এই সেই।' একের দর্শন পাইয়া তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব মধুময় হইয়া উঠে ;—তিনি করজোড়ে স্তব করেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

সাহিত্যের নেশা *

[৺আমোদর শর্ম্মার খসড়া হইতে সংগৃহীত]

[আমাদের কলেজ-ইউনিয়নের উদ্‌বোধন উপলক্ষে একটা স্থানকালোপযোগী হালকাধরণের হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য ইউনিয়নের উৎসাহী সম্পাদক মহাশয় ও অপর কয়েকজন সভ্য কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এরূপ প্রবন্ধ রচনায় আর প্রবৃত্তি নাই, বোধ হয় সে শক্তিও আর নাই। সুতরাং নূতন প্রবন্ধ রচনার চেষ্টা না করিয়া ৺আমোদর শর্ম্মার দপ্তর হইতে একটি পুরাতন প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া দিলাম। আশা করি, প্রবন্ধের অন্য কোন গুণ না থাকিলেও ইহা যে হালকা, হাস্যকর ও অসার, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ হইবে না।]

"ছাড়িয়া জননী স্তন্য ধরিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম,
যথাকালে উপজিল মাথার ব্যারাম।"

কিন্তু তবু সাহিত্যের নেশা জমিল না। পাছে প্রথম যৌবনে ছাত্রজীবনে হৃদিবৃন্দাবনে সঞ্চিত কাব্যরস কর্ম্ম জীবনের উত্তাপে শুকাইয়া যায়, এই ভয়ে হাকিমীর উমেদারী বা ওকালতীর দিগ্‌দারীতে রাজী হইলাম না, কাব্যশাস্ত্র-বিনোদেই সারাজীবন কাটাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম; কিন্তু তবু সাহিত্যের নেশায় বুঁদ হইতে পারিলাম না। বাঁতিকের গতিকে চুল পাকিল, কিন্তু তবু সাহিত্যের নেশা পাকিল না। সমস্যায় পড়িয়া বন্ধুদের বৈঠকে প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম,—'এখন উপায় কি?' বলিবামাত্র চারিধার হইতে বিনামূল্যে উপদেশ-বৃষ্টি আরম্ভ হইল,—'কা'র সাধ্য রোধে তা'র গতি?' [পীড়ার বেলায়ও দেখা যায়, প্রত্যেক নরনারী একটা না একটা মুষ্টিযোগ জানেন এবং তাহার প্রয়োগ করিতে অর্থাৎ medical advice gratis দিতে তাঁহাদের সবুর সহে না। অথচ নিজেরা যখন রোগে ভোগেন, তখন সে সব মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করেন না কেন? নিজের বেলায় বুঝি সেগুলি ফলে না? তাই দেখি, চিকিৎসকেরা নিজের বা পরিজনের পীড়া হইলে অন্য চিকিৎসক ডাকেন! যাক, বাজে কথা ছাড়িয়া এক্ষণে আসল কথা বলি।]

আমার প্রশ্ন-শ্রবণমাত্র রঙ্গলাল বাবু আরক্ত চক্ষুঃ অর্দ্ধ উন্মীলিত করিয়া বলিলেন: "এ প্রশ্নের উত্তর ত অতি সহজ। যেমন জলেই জল বাধে, তেমনি নেশায়ই নেশা বাধে। অতএব যদি সাহিত্যের নেশা জমাইতে চাও, তবে একটু গোলাপী নেশা অভ্যাস কর, অর্থাৎ মধুপান করিতে শিখ। দেখিও ঠিকে ভুল করিও না। এ 'মধু' মক্ষিকাবিশেষের উচ্ছিষ্ট বস্তু নহে। কাব্যরসিক হইয়া 'ঋতুসংহারে'র 'প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস বিকম্পিতং মধু' ভুলিলে চলিবে কেন? আর হিন্দু হইয়া 'গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্' চণ্ডীর এই উক্তি ভুলিলেই বা চলিবে কেন? যদি নজির চাও ত দেখ, নব্যবঙ্গের আদিকবি কলির বাল্মীকি 'দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন' 'সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ' এই মধুপানে বিভোর হইয়াই কল্পনা-মধুকরীকে সাধাসাধি করিয়াছিলেন—'কবিচিত্তফুলবন মধু লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' আর কবির ভক্ত শিষ্য উচ্ছ্বাসভরে গাহিয়াছেন:—

'নামে মধু, হৃদে মধু, বাক্যে মধু যার,
এ হেন মধুরে ভুলে সাধ্য আছে কার?'

আমিও কবির কথায় বলি, 'মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।' আবার মধুসূদনের ঈষৎ পরবর্ত্তী কালের সাহিত্য-দিক্‌পালগণও এই রসের রসিক ছিলেন।"

কথাগুলা আমার বড়ই বেতালা লাগিল। কবি বলিয়াছেন, 'ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে। শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।' অতএব মহতের নিন্দা সত্য হইলেও অশ্রাব্য। কিন্তু রঙ্গলাল বাবুর একবার মুখ ছুটিলে

---

* বঙ্গবাসী কলেজ-গৃহে কলেজ-ইউনিয়ন উপলক্ষে পঠিত। (২৩এ মার্চ ১৯১৯)

ছিপি আঁটিয়া দেয় কা'র সাধ্য ? তিনি আরও রঙ্গ চড়াইয়া বলিতে লাগিলেন :—

"আবার দেখ, যে ইংরাজী সাহিত্যের বীজের গুণে আমাদের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন বিচিত্র দানা বাঁধিয়াছে, সেই ইংরেজী সাহিত্যের ওস্তাদগণ এই গুণেই দিগ্‌বিজয়ী সাহিত্যরথী হইয়াছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়ার, বেন্ জনসন্ প্রভৃতির Mermaid Tavern এর কীর্ত্তিকথা সর্ববিদিত। যে Addison এর রচনামাধুর্য্যে ও চরিত্র গাম্ভীর্য্যে তোমরা মুগ্ধ, সেই Addison এর বর্গণ্ডির বোতল উপুড় না করিলে প্রতিভার বিকাশ হইত না, তাহা কি জান না ? আর তাঁহার সহচর Steele ও পরবর্ত্তী কালের Goldsmith, Fielding, Sheridan, Burns, Lamb প্রভৃতির ত কথাই নাই। ইহাদের রচনা-মাধুর্য্যের মূল প্রস্রবণ যে পানপাত্র, তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে ? তাই কবিযশঃপ্রার্থী কীট্‌স্ 'O, for a draught of vintage !' 'O for a beaker full of the warm south !' বলিয়া ভাবে মসগুল হইয়াছেন। আর বাইবেলে লিখিয়াছে, 'Wine which cheereth God and man'; আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রেও সুরা 'দ্রবময়ী তারা'।"

রঙ্গলাল বাবুর বোতলবাহিনীর স্তবস্তুতি ও জ্বালাকর গুণগান আরও কতক্ষণ চলিত জানি না, কিন্তু সুখের বিষয়, যেমন কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার হয়, অথবা শেক্‌স্‌পীয়ারের ভাষায়, 'One fire drives out one fire ; one nail, one nail,' 'Falsehood falsehood cures, as fire cools fire', সেইরূপ এক বক্তার দাপটে অন্য বক্তার কণ্ঠরোধ হইল।

সিদ্ধেশ্বর বাবু বলিয়া উঠিলেন, "ধীরে, রঙ্গলাল, ধীরে ! আর বাড়াবাড়ি করিও না। তুমি বাইবেলের বেদবাক্যই ঝাড় আর তন্ত্রশাস্ত্রেরই দোহাই দাও, ব্রাহ্মণসন্তান আমি 'মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্' বলিয়াই জানি। আর বড়বড় লেখকদিগের যে পানদোষের কথা বলিলে সে 'তেজীয়সাং ন দোষায়'। তাই বলিয়া হারা-নরা চু'কলম লিখিতে পারে বলিয়া ঘোর মদ্যপ হইয়া দাঁড়াইবে, এ ব্যবস্থার সমর্থন করা যায় না। তবে, হাঁ, তুমি যে বলিয়াছ—নেশায় নেশা বাঁধে, এ কথাটা লাখ কথার এক কথা। কিন্তু মদ ছাড়া কি আর নেশা নাই ? সদাশিব সিদ্ধির নেশায় ভোর হইয়া 'আগম'-শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহাই ত তন্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস। তিনি কি শেক্‌স্‌পীয়ার মাইকেলের উপরে নহেন ? আর দেখ, 'সিদ্ধিরস্তু' বলিয়া যখন লেখাপড়া আরম্ভ করিতে হয়, তখন 'সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে' এবং তাহার ফলে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হয়, ইহা কি আর বুঝাইতে হইবে ? অতএব শুধু বিজয়াদশমীর রাত্রে কেন, প্রতিরাত্রেই সিদ্ধিপান কর, সাহিত্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে। 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু প্রসাদাত্তস্য ধূর্জ্জটেঃ'।" [আমিও মনে মনে বলিলাম, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।]

সিদ্ধেশ্বর বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই চিনিবাস বাবু মিহিস্বরে ধরিলেন, "সিধু ভায়া, চেপে যাও, ওসব সেকেলে অসভ্য নেশার কথা তুলিও না। উঁহু এখন গোপাল উড়ের যাত্রায় ও দরওয়ান মহলে আশ্রয় লইয়াছে। এখন সভ্যসমাজের সুরুচিসম্মত নেশা চা। 'স্বল্পাক্ষর মসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ।' তীব্র হলাহল সুরা ও উগ্র উত্তেজক ভাঙ্গ উভয়ই বর্জ্জনীয়। যদি জলপথেই যাইতে হয়, তবে চায়ের চেয়ে আর সাহিত্যচর্চ্চা চালাইবার মত নেশা কি আছে ? শুধু 'এক পেয়ালা চা' খাইয়া ও গাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কি কাণ্ডটা করিলেন, দেখ দেখি। গান, কবিতা, নাটক, সমালোচনা, কিছু কি বাকী রাখিয়া গিয়াছেন ? শেষে গোটা 'ভারতবর্ষ'রই ভার বহিয়া বাল্মীকির সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইয়াছিলেন !

"আর যদি ইংরেজী নজির না পাইলে নিরস্ত না হও, তবে কুপারের বাক্যটি স্মরণ কর :—'The cups that cheer but not inebriate', অর্থাৎ তাতায় কিন্তু মাতায় না, তীব্র সুরা ও উগ্র ভাঙ্গের মত জ্ঞানহারা বা মাথা গরম করে না, কেবল রক্তের জড়তা দূর করিয়া একটু চনমনে করে। চুমুকে-চুমুকে এই চা পান করিয়া তিনি অবহেলে ষড়ধ্যায়ী Task কাব্যখানা লিখিয়া ফেলিলেন, যেন Task নহে,—sport (খেলা) ! তোমার গোল্ড্‌স্মিথ্ Madeira মদিরা উদরস্থ করিয়া Vicar of Wakefield ও Deserted Village এর মত সরস আখ্যায়িকা ও খণ্ডকাব্য লিখিয়া ফেলিলেন বলিয়া গুমর কর, কিন্তু দেখ ত তাঁহারই দোস্ত জনসন্ একাসনে বসিয়া

পঁচিশ পেয়ালা চা সাবাড় করিয়া তাহা অপেক্ষা লাখো গুণে (Solid) সারবান্ Rasselas ও Vanity of Human Wishes ত লিখিলেনই, তাহার উপর (বোঝার উপর শাক আঁটিটা!) বিরাট্ Dictionary খানা লিখিলেন, আর নিজ বাহুবলে দারিদ্র্য-সমুদ্র অক্লেশে সাঁতারে পার হইয়া Earl of Chesterfieldকে বেশ গরম-গরম দু' কথা শুনাইয়া দিলেন!—'Is not a patron, my lord, one who looks with unconcern on a man struggling for life in the water, and when he has reached ground, encumbers him with help'?"

চিনিবাস বাবুর কথাগুলি চিনির মতই মিষ্ট লাগিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, চায়ের কটুস্বাদ যদি ভাল না লাগে তাহা হইলে না হয় চায়ের জলটুকু ফেলিয়া দিয়া চিনি মিশান গরম দুধ খাইয়া উদরপূর্ত্তি ও সাহিত্য-স্ফূর্ত্তি হইবে। কিন্তু চিনিবাস বাবুর কথা শেষ হইলে কালাচাঁদ বাবু চক্ষুঃ মেলিয়া মিটিমিটি চাহিয়া চাঁচা গলায় বলিতে আরম্ভ করিলেনঃ—"ভায়া হে, জলীয় চায়ের গুণ এত কি গায়িতেছ? উহাতে পদার্থ কতটুকু? আর ওটা ত বিদেশীর কাছ হইতে শেখা নেশা। নেশার ক্ষেত্রেও কি আমরা পরমুখাপেক্ষী হইব? বরং এই খাঁটি স্বদেশীর দিনে স্বদেশী নেশা অহিফেনের সেবা কর, যে 'চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি' হইবে। সুলেখক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর সাহিত্য-কীর্ত্তি একবার স্মরণ কর দেখি। আর যদি স্বদেশী হইবার সময়ও তোমরা বিলাতী নজির খোঁজ—(তোমাদের ও রোগ আছে জানি)—তবে একবার অহিফেনসেবী কোলরিজ-ডিকুইন্সির অতুলনীয় রচনার কথা ভাব দেখি। শুধু কলমবাজিতে কেন, বৈঠকী আলাপেও তাঁহারা অদ্বিতীয় ছিলেন।"

এই সময়ে পণ্ডিত নসীরাম তর্কবাগীশ মহাশয় ফট্ করিয়া বলিয়া বসিলেন, "যদি স্বদেশীরই অত গোঁড়া হও, তবে নিতান্ত ঘরের জিনিস নস্য কি করিল? ইহার এক এক টিপ্ লইলেই ত মাথা খোলসা হইবে, সাহিত্যরসও স্বতঃ নিঃসৃত হইবে। জানই ত 'নস্যপ্রিয়াঃ পণ্ডিতাঃ।' আর ম্লেচ্ছ সুইফ্‌ট্ জন্‌সন প্রভৃতিরও নস্যপ্রিয়তার কথা ইংরেজিনবিশদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি খুব এক টিপ নস্য নাসারন্ধ্রদ্বয়ে প্রবেশ করাইয়া একটা বিরাট হাঁচি হাঁচিলেন এবং নস্যদানিটি সোৎসাহে আমার দিকে আগাইয়া দিলেন।

এতক্ষণ তাকিয়া ঠেস্যান দিয়া গড়গড়ি দাদা আয়েস করিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন; এখন তামাক পুড়িয়া আগুন নিবিয়া যাওয়াতেই হউক, অথবা তর্কবাগীশের বিরাট্ হাঁচির শব্দেই হউক ধ্যানভঙ্গ হওয়াতে হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, "কালাচাঁদ দা' ত বড়বড় করিয়া অনেক কথা বকিয়া গেলেন, কিন্তু আফিঙ কিরূপ অগ্নিমূল্য হইয়াছে তাহার খবর রাখেন কি?"

এই বলিয়া তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভায়া, অত সাশ্রয়চে হইবার দরকার নাই, তার চেয়ে তামাক ধর, দেখিবে ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের কত খেয়াল গজাইবে। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের তামাকুসেবার সহিত সাহিত্যসেবার কত নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, তাহা জাঁদরেল সমালোচকের মারফত জানিয়াছ ত! বিলাতে গুড়ুকের চল না থাকিলেও কার্লাইল টেনিসনের কড়া চুরুট টানার ব্যাপার কি কাহারও অবিদিত আছে? নেশাতত্ত্বটা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বুঝাইতেছি, অবহিত হইয়া শুন। পদার্থের কঠিন, দ্রব ও বায়বীয়, এই তিন অবস্থান্ সুরা, সিদ্ধি, চা, তিনই দ্রব অবস্থায় সেবন করিতে হয়, সুতরাং এ সব 'জলবত্তরলম্' উহাদের কোন অন্তঃসার নাই। আফিঙ কখনও জমাট আকারে কঠিন, কখনও laudanum-রূপে দ্রব, আবার কখনও গুলি চণ্ডু প্রভৃতির আকারে বাষ্পে পরিণত হইয়া, নেশাখোরের মৌতাত যোগায়। অর্থাৎ একটা নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, মতিস্থির নাই, সুতরাং 'অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ'। এই বিংশ শতাব্দীতে, এই বৈজ্ঞানিক যুগে, কঠিন স্থলপথ ও তরল জলপথ অপেক্ষা বিমান পথই সুখসেব্য। সুতরাং তামাকের ধূমপানই শ্রেষ্ঠ নেশা। আর নাক হইতে নসীরাম পণ্ডিত যে ফেঁড়া তুলিলেন, তাহার উচিত জবাব এই যে, কোন কোন রোগীকে নাসাপথে আহার (nasal feeding) করাইতে হয় বটে, কিন্তু নাসাপথে নেশা করা কখনই সুস্থ শরীরের চিহ্ন নহে।"

'কঃ পন্থাঃ' এই প্রশ্নের উত্তরে ষড়্দর্শনের ন্যায় নিঃশ্রেয়স-লাভের ছয়টি পথ ছয়জনে নির্দ্দেশ করাতে কতকটা

দিশাহারা হইয়া পড়িলাম—(রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, 'আমায় ছয়'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে' পদে পদে তাই ভুলি হে')—কিন্তু সস্তা বলিয়াও বটে এবং সব চেয়ে নিরীহ নেশা বলিয়াও বটে, শেষ পরামর্শটাই শিরোধার্য্য করিয়া একেবারে আড্ডার ফেরত হুকা-কলিকা তামাক টিকা কিনিয়া ঘরে ফিরিলাম। কিন্তু টিকায় আগুন না দিতেই গৃহে আর এক আগুন জ্বলিল। সরঞ্জাম দেখিয়া গৃহিণী তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া ঝঙ্কার তুলিলেন—"এ সব আবার কি উৎপাত? ঘরদোর নোংরা হ'বে, তোমার কে দশজন চাকরদাসী আছে যে পরিষ্কার করবে, লেপ তোষোক মশারী পুড়বে, খেসারত কি তোমার পরামর্শদাতা বন্ধুরা দেবেন?" আমি দ্বিরুক্তি না করাতে —(ইহাই সনাতন গার্হস্থ্য নীতি)—একটু নরম হইয়া বলিলেন, "ও সব বদ নেশা অভ্যাস করিও না, বরং পানের সঙ্গে একটু একটু সুরতি কি জরদা চাও ত দিতে পারি।" (গৃহিণীর পরামর্শটা কি নিতান্ত নিঃস্বার্থ?) আমি 'শয়নে পদ্মনাভ' স্মরণ করিয়া নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম, এ সমস্যাসিন্ধুর কূলকিনারা কিছুই পাইলাম না।

পরদিন কলেজে আসিলে প্রস্তাবিত কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক মহাশয় বুঝাইলেন—তিনি পূর্ব্বাদনের বৈঠকের বৃত্তান্ত সমস্তই জানিতেন—যে, "গড়গড়ি মহাশয় কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থা লইয়া যতই গাঢ় গবেষণা করুন না কেন, কঠিন পদার্থের মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এমন আর কিছুই নাই। তাই ইংরেজিতে বলে, Nothing like leather; আর বায়বীয় পদার্থ সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা, It ended in smoke; অতএব কলেজে একটা ইউনিয়ন স্থাপন করিয়া য[...] ভাল রকম ভক্ষ্যভোজ্যের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হই[...] সাহিত্যের নেশা না জমিয়াই পারে না *।"

তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ সুতরাং জমাট-বাঁ[...] (Solidification) সম্বন্ধে তাঁহার মীমাংসা মানিতেই হয় আর আমিও ভাবিয়া দেখিলাম, কথাটা ঠিক। পূর্ণিম[...] মিলন, সাহিত্য-সম্মিলন পরিষদ্, সংসদ্, সঙ্গত, সঙ্ঘ, সর্ব্বত্র এই নিয়ম খাটে। যেখানে খানাপিনার ঢালাও বন্দোব[...] আছে, সেখানেই সাহিত্য-সাধনা সফল হইয়াছে। যেম[...] দেখুন, চব্যচূষ্যের চাপেই সাহিত্যসম্মিলন বৎসর বৎস[...] জমে। এইরূপ ভূরিভোজনে পরিপুষ্ট হইয়াই ইহা দ্বাদ[...] বৎসরে পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে, যেখানে এই আসল ঘ[...] ফাঁক, সস্তায় চা চুরুটে বা পাণ তামাকে সারিবার চেষ্ট[...] হইয়াছে, সেইখানেই উৎসাহের আগুন নিবিয়া গিয়াছে[...] পরিষদে একেবারেই ও ব্যবস্থা নাই, তাই অনেক সম[...] quorum হয় না! তবে চা চুরুটে না সারিয়া রীতিম[...] চপ কটলেট্, কচুরি নিমকি, সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলে, ইউনিয়নের সফলতা অবশ্যম্ভাবিনী, অত্র সন্দেহো নাস্তি। শুধু রুক্ষ প্রবন্ধ গলাধঃকরণ করিতে সুধীসমাজ নারাজ। তাহাদিগকে ত আর লেক্‌চারে percentage রাখিতে হইবে না যে বাধ্য হইয়া কমঠ-কঠোর বক্তৃতা কর্ণগোচর করিতেই হইবে।

* লেখক ছয় রকম নেশাকে ষড়্‌দর্শনের সহিত উপমিত করিয়াছেন। এটী কি ষড়্‌দর্শনের অতিরিক্ত—চার্ব্বাক-দর্শন?—সংগ্রাহক।

মিলন-গীতি

[শ্রীমোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্ বি-এ]

১

আর করিনে ভয়।
আজ বিভুর বরে মিলন-গীতি
হচ্ছে ভারতময়,
ও ভাই, হচ্ছে ভারতময়!

আজ সে গানের মোহন তানে,
সবার প্রাণে প্রীতি আনে,
আজকে মহা মিলন-যজ্ঞে
ভাবের বিনিময়,
মোদের ভাবের বিনিময়!

২

ভয় নাই ভয় নাই।
ভারতবর্ষে হিন্দু-মোস্‌লেম্‌
আমরা দু'টী ভাই,
ওরে, আমরা দু'টী ভাই!
একই মায়ের স্তন্য পিয়ে,
আমরা দোঁহে আছি 'জিয়ে'
নিদ্রা এলে মায়ের কোলটা'
ভিন্ন গতি নাই,
মোদের ভিন্ন গতি নাই!

৩

কুক্ষণে কে জানে,
ভায়ের উপর ভায়ের ঈর্ষা
উদয় হ'ল প্রাণে,
ওরে, উদয় হ'ল প্রাণে!
সেই হ'তে ত নিত্য শত,
ঝগড়া ঝাটি হ'ত কত,—
স্নেহশীলা মায়ের পরাণ
কাঁদ্‌ত অভিমানে,
ও ভাই, কাঁদ্‌ত অভিমানে।

৪

আর করিনে ডর।
আজ বিভুর বরে ভাইকে মোরা
চিন্‌ছি পরস্পর,
ও ভাই, চিন্‌ছি পরস্পর!
তাই 'মস্‌জিদে' আজ ভায়ের মিলন,
'মন্দিরে'ও প্রেমালিঙ্গন
আজ বুঝেছি বিবাদ করে'
নিজের ঘরে পর,
মোরা নিজের ঘরে পর!

৫

তোমার রাম সীতা,
ভীম, যুধিষ্ঠির, দ্রোণাচার্য্য,
'মহাভারত', 'গীতা',
ও ভাই, 'মহাভারত', 'গীতা',
তোমায় শুধু জান্‌ব বলে,
পড়ছি মোরা কুতূহলে,
বল্‌তে পারি কে কার স্বামী
কে কাহার বা পিতা
ও ভাই, কে কাহার বা পিতা

৬

তোমরা সবাই আজ,
এস এস আমার গৃহে
নাইকো কোন লাজ,
ও ভাই, নাইকো কোন লাজ!
আমার গৃহের রত্নরাজি
'আগুল' ভরে দিব আজি,
ভাইকে বড় করাই আমার
হবে গর্ব্বের কাজ,
ও ভাই, হবে গর্ব্বের কাজ!

৭

নই ত আমি দীন,
ঐ দেখ ভাই, কাঠ, কপাটে
আছে রত্নের চিন্‌,
ও ভাই, আছে রত্নের চিন!
জগজ্জয়ী খালেদ, অলিদ,
আয়শা, জোহ্‌রা, হারুণ-রশিদ্‌,
এদের ঘরে জন্ম আমার
নই ত আমি হীন,
ভাই রে, নই ত আমি হীন!

৮

দু'ভাই মোরা যবে
অতুল প্রেমে স্নিগ্ধ হ'য়ে
দাঁড়াইব ভবে,
ও ভাই, দাঁড়াইবু ভবে,
আকাশ হ'তে আশীষ রাশি,
আস্‌বে মোদের শিরে ভাসি',
মোদের সুযশঃ গন্ধে ধরা
পূর্ণ তখন হবে,
ও ভাই, পূর্ণ তখন হবে! *

* হাওড়া দ্বাদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

মোগলযুগে স্ত্রী-শিক্ষা *

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

পূর্ব্বভাষ

মোগল-আমলে, ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল না— ঘোর অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া মোগল মহিলাগণ জীবন যাপন করিতেন, ইতিহাস এ মত সমর্থন করে না। সাধারণ লোকের গৃহে বালিকা ও রমণীদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা ইতিহাসে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ না থাকিলেও, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও মোগল সম্রাটগণ স্বীয় অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের শিক্ষাবিষয়ে যে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষা বিধানের জন্য যথোপযুক্ত অর্থব্যয় করিতেন, ইতিহাসে তাহার যথাযথ প্রমাণ রহিয়াছে। শাহজাদীরা হারেমের মধ্যে গৃহশিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষালাভ করিতেন—বিদ্যালয়ে যাইতেন না। তাঁহাদের অনেকেরই বিবাহ হইত না—হইলেও ১৮।২০ বৎসরের পূর্ব্বে নহে; এই সময় তাঁহারা অনেকেই বিদ্যার্জ্জন ও জ্ঞানানুশীলনে অতিবাহিত করিতেন, এমন কি তাঁহাদের অনেকে প্রাপ্ত বয়সেও একান্তে অন্তঃপুরে বসিয়া বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন। কঠোর অবরোধ-প্রথার ফলে স্ত্রী-শিক্ষার পরিসর সঙ্কীর্ণ ছিল সন্দেহ নাই, কেন না একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স অতিক্রান্ত হইলে (বোধ হয় আট বৎসরের পর) মুসলমান বালিকার বিদ্যালয়গমন নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু বাল্যকালে তাহাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের কোনরূপ বাধা ছিল না।

এ সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে আমরা বাদশাহগণের অন্তঃপুরের সন্ধান লইতে চাই, কেননা সেখানেই অবরোধ-প্রথা আপনার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিস্তার করিবার অবকাশ পাইয়াছিল। অসার আমোদ ও অলীক সুখৈশ্বর্য্যে বিভোর হইয়া মোগল শুদ্ধান্তঃবাসিনীবৃন্দ অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে তাঁহাদের অশিক্ষিত জীবন যাপন করিতেন, ইহাই সাধারণের ধারণা; কিন্তু ইতিহাসে আমরা যে সকল মোগল-মহিলার পরিচয় পাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের উৎকর্ষ সত্যসত্যই আমাদিগকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে। তাঁহাদের সুশিক্ষার পরিচয়—তাঁহাদের স্বরচিত গ্রন্থে, কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় এবং তাঁহাদের রুচিজ্ঞানে বিশেষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা এই স্থানে তাঁহাদের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

[বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্বকাল]

গুল্‌বদন : যে সকল পুণ্যশীলা, জ্ঞানগরিমা-শালিনী মহীয়সী মহিলার নাম মোগল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবার যোগ্য, বেগম গুলবদন তাঁহাদের অন্যতমা। তিনি ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা অক্লান্তকর্ম্মী, অধ্যবসায়শীল সম্রাট বাবরের কন্যা, উত্থান-পতনের বিচিত্র লীলাস্থল হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভগিনী, এবং মোগলকুলচন্দ্র 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' আখ্যার যোগ্যতম অধিকারী বাদশাহ আকবরের পিতৃষ্বসা। গুলবদনের সুদীর্ঘ জীবন ভূয়োদর্শনের আদর্শ; তিনি যথাক্রমে বাবর, হুমায়ুন ও আকবর, মোগল বংশের এই তিনজন কৃতি পুরুষের অভ্যুদয়, ভাগ্যবিপর্য্যয় এবং প্রতিষ্ঠা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া মানব জীবন সম্বন্ধে অপরিসীম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই অনন্যসুলভ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্নেহমমতার অপূর্ব্ব মিশ্রণ তাঁহার জীবনকে এক অভাবনীয় বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। অন্যান্য মহিলার ন্যায় গুলবদনও সুখে-দুঃখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, দান-খয়রাৎ করিয়াছেন, তাহার পর অন্তিমে অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন; তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে কখন তিনি রাজকার্য্যে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করেন নাই সত্য; কিন্তু তথাপি তাঁহার জীবন ব্যর্থ নহে। তিনি যে 'হুমায়ুন্‌ নামা' রচনা করিয়াছিলেন, সেই বহুমূল্য গ্রন্থই তাঁহার জীবনের চরম উদ্যম—গৌরবময়ী কীর্ত্তি। কেবল এই একটা মাত্র কার্য্য করিয়াই তিনি

* হাবড়া গোবর্দ্ধন সঙ্গীত সমাজ অনুষ্ঠিত "পূর্ণিমা মিলনে" পঠিত।

…রজগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন ; এই কারণেই তিনি সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লাভের অধিকারিণী ; আর এই জন্যই তাঁহাকে মোগল-বিদুষীদিগের অন্যতমা বলিয়া অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে-সমস্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক মোগল-রাজত্বের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কোন গ্রন্থেই গুল্‌বদনের "হুমায়ূন্-নামার" উল্লেখ নাই। 'আইন্-ই-আক্‌বরী'তে ব্লকম্যান্ সাহেব গুল্‌বদন্ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই। গুল্‌বদন্‌কে তিনি এক স্থলে ভ্রমক্রমে 'আকবরের বেগম' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন ! *

বাবর ও হুমায়ূনের ইতিহাস রচয়িতা Erskine সাহেবও 'হুমায়ূন-নামা' দেখেন নাই ; ইহার সাহায্য পাইলে তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত বাবরের পুত্রপরিবারবর্গের কাহিনী অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করিত, সন্দেহ নাই। গুল্‌বদন্ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে 'হুমায়ূন্ নামা'ই আমাদের প্রধান অবলম্বন।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত, হস্তলিখিত 'হুমায়ূন নামা' খানি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল জর্জ্জ উইলিয়ম্ হ্যামিল্‌টনের বিধবা'র নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছিল। এই মহামিলা গ্রন্থখানির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বিদুষী বেভারিজ পত্নী আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গুল্‌বদন্ লিখিয়াছেন—'সম্রাট্ আক্‌বর আদেশ প্রচার করেন, বাবর ও হুমায়ূনের বিষয়ে যাহা জান, লিপিবদ্ধ কর। এই রাজ-অনুজ্ঞায় গুল্‌বদন্ 'হুমায়ূন্ নামা' রচনা করিয়াছিলেন। আবুল্ ফজল্ আক্‌বর কর্ত্তৃক 'আক্‌বর নামা' গ্রন্থের উপাদান-সংগ্রহের আদেশ প্রচারের কথা লিখিয়াছেন এবং ইহারই ফলে আমরা জৌহর ও বায়াজীদ্ বীয়াতের স্মৃতিকথা পাইয়াছি। খুব সম্ভব, গুল্‌বদন্ সম্রাট্ আক্‌বরের এই আদেশের কথাই লিখিয়াছেন ; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, 'হুমায়ূন্-নামা' ন্যূনাধিক ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে (৯৯৫ হিজ্‌রা) লিখিত হয়। আবুল্-ফজল্ হুমায়ূন্-নামা সম্বন্ধে নীরব ; তবে তিনি যে 'আক্‌বর নামা' রচনাকালে বেগমের পুস্তকের সাহায্য লইয়াছিলেন, এ বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। *

হুমায়ূন্ নামার প্রথমাংশে বাবরের কথা। ইহার অধিকাংশই বাবরের আত্মজীবনচরিত অবলম্বনে লিখিত ; কারণ পিতার মৃত্যুকালে গুল্‌বদনের বয়ঃক্রম মাত্র ৮ বৎসর ; সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে বাবরের রাজত্বকালের বিশেষ বিবরণ জানিবার আশা করা অনুচিত। দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ মিউজিয়মের এই পুঁথিখানি অসম্পূর্ণ, শেষের কয়েক পৃষ্ঠা হারাইয়া গিয়াছে, হুমায়ূনের দ্বিতীয়বার ভারত বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস ইহাতে আছে। গুল্‌বদন্ হুমায়ূন্ নামা রচনা করিয়া ইতিহাসের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহা প্রকাশিত না হইলে বোধ হয় বাবরের পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজনবর্গ ও তাৎকালীন কয়েকটী পরিবারের সঠিক বৃত্তান্ত আমাদের অজ্ঞাত থাকিত।

নিজের বা আত্মীয়স্বজনগণের অযশমূলক কথা, দোষ প্রভৃতি গোপন করিবার চেষ্টা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। জহাঙ্গীর আত্মকাহিনী 'তুজুক্-ই জহাঙ্গীরী'তে কেমন করিয়া মেহের উন্নিসাকে (নূরজহান্) লাভ করেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। কেবল জহাঙ্গীর কেন, বাবর আত্মকথা 'তুজুক্-ই-বাবরী'তে শাহ্ ইসমাইলের নিকট তাঁহার অধীনতা স্বীকার, গাজ্‌দাওয়ানের পরাজয় ব্যাপার ও আলাম লোদীর প্রতি তাঁহার ব্যবহারের কথা একেবারে গোপন করিয়াছেন। স্নেহময়ী গুল্‌বদনও এই ক্রটির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই ; তিনিও স্বীয় গ্রন্থে ভ্রাতা হিন্দাল ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হুমায়ূনের দোষাদি গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হুমায়ূন নামায় প্রদত্ত তারিখগুলি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত, কারণ অনেক স্থলে গুল্‌বদন্ ভ্রম করিয়াছেন।

'হুমায়ূন্ নামাই' গুল্‌বদনের একমাত্র কীর্ত্তি নহে ; তিনি তৎকাল-প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বহু ফার্সী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। মীর মাহ্‌দী শারাজী 'তজ্‌কিরতুল্ খওয়াতীনে' তাঁহার কোন কবিতার এই দুইটী চরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

'হর্ পরী কেউ বা-আশিক্ ই খুদ্ ইয়ার নীস্ত।

---

* *Ain-i-Akbari*, i, 48

* *Akbarnama*, i, 29-30.

* *Humayun-nama*, p. 78*n*.

তু ইয়াকীন্ মীদান্ কি হেচ্ অজ্ উমর্ বর-খুরদার নীস্ত ।"

অর্থাৎ, নিজ প্রেমিকের প্রতি বিমুখ প্রত্যেক পরী ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, কেহই জীবনরূপ ফল পূর্ণরূপে আস্বাদন করে না। অর্থাৎ জীবন নশ্বর, তাহার মধ্যেই যতটুকু পার সুখভোগ করিয়া লও।'

গুলবদনের অধ্যয়নস্পৃহা বলবতী ছিল। এই বিদুষী রমণী একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পুস্তকালয়ের জন্য তিনি নানাস্থান হইতে বহু পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (*Humayunnama*, p. 79)

[আকবরের রাজত্বকাল]

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে রাজ-অন্তঃপুরবাসিনীদের নিয়মিত শিক্ষাদানের সুবন্দোবস্ত ছিল। এই উদ্দেশ্যে সম্রাট্ ফতেপুর সীকরীর রাজপ্রাসাদের কয়েকটা কক্ষ বিদ্যালয়রূপে ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। Smith সাহেবের *Architecture at Fathpur Sikri* (Pt. i, p. 8.) গ্রন্থে প্রদত্ত নক্সা (Plan) হইতে প্রাসাদের ঠিক কোন স্থানে এই বিদ্যালয় অবস্থিত ছিল, তাহা জানা যায়।

আকবরের রাজত্বকালে আমরা কই জন বিদুষীর সাক্ষাৎ লাভ করি।

১। **সলীমা সুলতান্ বেগম** :—সম্রাট্ আকবরের রাজ-অন্তঃপুরে সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুরা, বুদ্ধিমতী এবং বাকপটুতায় অদ্বিতীয়া বলিয়া সলীমার খ্যাতি ছিল; তিনি বাবরের দৌহিত্রী,—হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভগিনীর কন্যা।

পতনপ্রায় আফ্‌গান শক্তি যাঁহার প্রতিভাবলে আর্য্যাবর্ত্তে অমানুষিক বলে বলীয়ান হইয়াছিল, তিনি সাসেরামের জনৈক ভূম্যধিকারীর পুত্র শের শাহ্। কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুন শেরের নিকট পরাজিত হইয়া, দিল্লীর রাজসিংহাসন শত্রুকরে সমর্পণ করিয়া, পারস্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হ'ন। পারস্য-সম্রাট্ হুমায়ুনের দুর্দ্দিনে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন; তাঁহার নিকট সৈন্যসাহায্য পাইয়া হুমায়ুন্ দ্বিতীয়বার ভারত-বিজয়ের সঙ্কল্প করিলেন। যাহার একাগ্র চেষ্টায় ও ভুজবলে প্রকৃতপক্ষে মোগল সাম্রাজ্য পুনরধিকৃত হয়, ইতিহাসে তিনি সমর-প্রধান বয়রাম্ খাঁ নামে পরিচিত। হুমায়ুন্ বয়রামের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, ভারত-বিজয় হইলেই তিনি সলীমার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন। তদনুসারে পঞ্জাবের জলন্ধর নামক স্থানে সলীমা ও বয়রাম্ খাঁর উদ্বাহক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল; কিন্তু বয়রামের ভাগ্যে দীর্ঘকাল পত্নী-সাহচর্য্য ঘটে নাই; বিবাহের প্রায় তিন বৎসর পরে মক্কা-গমনকালে জনৈক আফ্‌গান্ গুপ্তঘাতক তাহাকে হত্যা করে। ইহার পর বিধবা সলীমাকে আক্‌বর বিবাহ করেন।

উভয় স্বামীর ঔরসে সলীমার কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। নিঃসন্তান সলীমা তাঁহার হৃদয়ের চিরসঞ্চিত স্নেহ মমতা কুমার সলীমের (জহাঙ্গীর) উপরেই বর্ষণ করিয়াছিলেন; সপত্নী-সন্তান হইলেও তিনি সলীমকে নিজ গর্ভজ পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করেন। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সলীম যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, সেই সময় পিতার কথায় আত্মীয়-স্বজনের ভয়ে সলীমা স্বয়ং এলাহাবাদে তাহার নিকট উপস্থিত হন। তিনি নানারূপে কুমারের দুর্ব্বুদ্ধির পরিণাম বুঝাইয়া তাহাকে পিতৃসন্নিধানে লইয়া আসেন, এবং পিতাপুত্রে মিলনসাধন করিয়া দেন।

বিদুষী সলীমার অধ্যয়নস্পৃহা যেমন অতুলনীয়, তাঁহার অধীত পুস্তকের বৈচিত্র্যও তেমনই বহু-বিস্তৃত। বদায়ূনীর গ্রন্থপাঠে জানা যায় (*Bad.*, ii, 380, 186) সলীমা 'বত্রিশ সিংহাসন' পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বদায়ূনী স্বয়ং গদ্য ও পদ্যে পারস্য ভাষায় এই পুস্তক অনুবাদ করিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন 'খিরদাফজা'। কবিতা-রচনাতেও সলীমার বিপুল প্রতিভা ছিল। 'মখ্‌ফী' (গুপ্ত ব্যক্তি) নাম দিয়া তিনি বহু ফার্সী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সলীমার নিম্নলিখিত বয়েৎটী তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়া খাফি খাঁর গ্রন্থে (K. K., i, 276) উদ্ধৃত আছে :—

"কাকুলৎ রা মন্ জেমস্তী রিস্‌তা-ই-জান্ গোফ্‌তা আম্।
মস্ত্ বুদম্ জীঁ সবব্ হর্ফ-ই পরেশান্ গোফ্‌তা আম্।"

অর্থাৎ—"মোহবশে তোমার চাঁচর কেশকে 'জীবন-সূত্র' বলিয়াছি, ইহা উন্মত্ত-প্রলাপ।"

খাফি খাঁ সলীমাকে 'খাদিজা উজ্ জমানী' অর্থাৎ 'নব যুগের খাদিজা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সম্রাট্ জহাঙ্গীর স্বীয় আত্মকথা 'তুজুক্-ই-জহাঙ্গীরী'তে সলীমার নির্ব্বিতর্ক গুণরাশি, মনের উৎকর্ষতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার সুশিক্ষারও বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছেন।

(২) **মাহম্ অনগ**:—মাহম্ অনগ সম্রাট্ আকবরের প্রধান ধাত্রী। মোগল-যুগে যে সমস্ত মহিলা শিক্ষাবিস্তার-কল্পে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাহমের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎকালে তিনি একজন সুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন। শিক্ষার প্রসারকল্পে তিনি দিল্লীতে একটী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; ইহা 'মাহম্ অনগের মাদ্রাসা' নামে পরিচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, এক্ষণে ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মাদ্রাসার প্রতিকৃতি Hearn's *Seven Cities of Delhi* পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

[জহাঙ্গীরের রাজত্বকাল]

নূরজহান্:—মানবজীবনে সময়ে সময়ে কি অসম্ভাবনীয় পরিবর্ত্তনই না সাধিত হয়। অতি হীন অবস্থা হইতে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের অত্যুচ্চ শিখরে অধিরূঢ় হইবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি মরুভূমির সন্তান—মেহের-উন্নিসা, অতি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে শেষে সম্রাট্ জহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী সম্রাজ্ঞী নূরজহান্ বা জগজ্জ্যোতিঃ হইয়াছিলেন।

নূরজহানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না। তাঁহার ছিল অলোক-সামান্য রূপ, আর সূচ্যগ্র বুদ্ধি। প্রথমে তিনি রূপের মোহে জহাঙ্গীরকে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন ও তাঁহাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, সম্রাট্ জহাঙ্গীর একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার হস্ত হইতে ধীরে-ধীরে রাজ্যভার লইতে লাগিলেন। আমীর-উমরাহ, মন্ত্রী সভাসদ্ সকলেই এই মহিলার নিকট পরাজয়-স্বীকার করিলেন। এই জন্যই ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, জহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগকে নূরজহানের রাজত্বকাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্রাট্ নিজেই বলিতেন, 'নূরজহানকে আমি তাঁহার বুদ্ধিশালিনী ও রাজ্যভার গ্রহণের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার উপর শাসনকার্য্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছি। আমি মাত্র একটু মদ ও কিঞ্চিৎ মাংস পাইলেই সন্তুষ্ট।' প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের যাবতীয় কার্য্যই নূরজহান্ কর্তৃক পরিচালিত হইত—জহাঙ্গীর নামেমাত্র সম্রাট্ ছিলেন। প্রজাবর্গ নূরজহানকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষেই দেখিত। কেহ তাঁহার অনুগ্রহ-ভিখারী হইলে, নূরজহান্ কখনও তাহাকে বঞ্চিত করিতেন না। তিনি বহু অনাথ বালিকাকে অর্থসাহায্য করিতেন; এমন কি স্বীয় ব্যয়ে অন্যূন পাঁচশত বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন।

নূরজহানের সৌন্দর্য্যবোধও খুব প্রবল ছিল। কেহ কেহ বলেন, তিনি স্বয়ং 'অতর্-ই-জহাঙ্গীরী' নামে এক গোলাপ-সারের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। * পেশোয়াজের দুদামী, উড়ানীর (veils) পাঁচতোলিয়া, বাদ্‌লা (brocade), কিনারী (lace) এবং ফরাস্-ই-চন্দনী (চন্দন কাষ্ঠের বর্ণ বিশিষ্ট কার্পেট) তাঁহারই মস্তিষ্ক প্রসূত। †

শিকারেও নূরজহান বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কে জহাঙ্গীর একদিন নূরজহানকে লইয়া শিকারে বহির্গত হন। ভৃত্যেরা চারিটী ব্যাঘ্রকে বেষ্টনী মধ্যগত করিল; নূরজহান্ স্বয়ং তাহাদিগকে নিহত করিবার জন্য সম্রাটের অনুমতি চাহিলেন ও অব্যর্থ লক্ষ্যে দুইটী ব্যাঘ্রকে দুইটী গুলিতে এবং অবশিষ্ট দুইটীকে, দুইটী করিয়া চারিটী গুলিতে বধ করেন। 'তুজুকে' সম্রাট্ স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, তিনি এ পর্য্যন্ত এরূপ অব্যর্থ লক্ষ্যে ব্যাঘ্র শিকার দেখেন নাই; হস্তীতে আরোহণ করিয়া হাওদার ভিতর হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে চারিটী ব্যাঘ্র শিকার করা বড় সহজসাধ্য কার্য্য নহে। জহাঙ্গীর ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, নূরজহানকে এক লক্ষ টাকা মূল্যের এক জোড়া হীরার

* অন্যান্য গ্রন্থে প্রকাশ, নূরজহান্-জননীই ইহার আবিষ্কার করেন। See *Tuzuk-i-Jahangiri*, i, pp. 270-71; Gladwin's *Reign of Jahangir*, p. 24.

† দুদামী ওজনে দুই দাম, পাঁচতোলিয়া—ওজনে পাঁচ তোলা।

পুঁছি (bracelet) ও এক হাজার আশ্রফি উপহার দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সম্রাটের একজন সভাসদ্ নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন :—

"নূরজহান্ গরচে বাসুরৎ জন্ অস্ত্।
দর সফ্‌ মর্দান্ জানে শের আফ্‌কন অস্ত।"

অর্থাৎ, 'নূরজহান' যদিও আকৃতিতে স্ত্রীলোক ; কিন্তু বীরপুরুষের দলে তিনি ব্যাঘ্রহন্ত্রী নারী।' দ্বিতীয়ার্থে শের আফ্‌কনের (নূরজহানের প্রথম স্বামী) স্ত্রী।

নূরজহান একজন বিদুষী মহিলা। আরবী ও ফার্সী উভয় সাহিত্যে তাঁহার অধিকার ছিল।† তিনি তাৎকালীন রীতি অনুসারে 'মখ্‌ফী' নাম দিয়া পারস্যভাষায় বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কীন্ (Keene) বলেন, যে সমস্ত গুণের জন্য নূরজহান্ সম্রাটের হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার কবিত্বশক্তি অন্যতম।† লাহোরে তাঁহার সমাধিগাত্রে খোদিত নিম্নলিখিত কবিতাটী তাঁহারই রচনা বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত :

"বর্ মজারে মা গরীবাঁ না চিরাগে না গুলে
না পরে পরওয়ানে আয়েদ্ না সদায়ে বুল্‌বুলে।"

অর্থাৎ—'দীন আমি,—পতঙ্গের পক্ষ দহিবারে
জ্বেল না আলোক মম সমাধি-আগারে।
আকাঙ্ক্ষিত বুল্‌বুল্ আকুল সঙ্গীত—
কোর না কুসুমদামে কবর ভূষিত।'

যৌবনে যে রূপবহ্নিতে অনেক পতঙ্গ পুড়িয়াছিল ;—অনেক নিষ্ফল প্রেম-গাথা যে কুসুমিত কিশোরীর কর্ণ আকুল করিয়াছিল ; বোধ হয়, তাহারই অন্তিম অনুশোচনা মর্ম্মাহতা মহিষী নূরজহান্ সেই মর সৌন্দর্য্যের সমাধি'পরে অক্ষয় অক্ষরে তাঁহার মর্ম্মবাণী চিরাঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন !

শাহ্‌জহানের রাজত্বকাল।

সম্রাট্ শাহ্‌জহানের রাজত্বকালেও বিদুষী মহিলা অসদ্ভাব নাই।

(১) **মুম্‌তাজ-মহল** :—যে লাবণ্যময়ী ললনা স্মৃতি রক্ষাকল্পে নীলসলিলা যমুনার তটে সৌন্দর্য্যের মর্ম্মরস্বপ্ন ভুবনবিশ্রুত সৌন্দর্য্যাধার তাজমহল্ রচিত হইয়াছিল ইতিহাসে তিনি প্রেমিক সম্রাট্ শাহ্‌জহানের প্রিয়দয়িতা মুম্‌তাজ-মহল নামে খ্যাত। পতিপরায়ণা মুম্‌তাজের অপূর্ব্ব প্রেমকাহিনী, অপত্যস্নেহ, আশ্রিত-বাৎসল্য ও উদার বদান্যতার কথা ইতিহাস আজিও গৌরবে কীর্ত্তন করিতেছে। মুম্‌তাজ্ বিদুষী রমণী ; পারস্য ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং এই ভাষাতে কবিতাদিও রচনা করিতে পারিতেন।*

(২) **জহান্-আরা** :—জহান্ আরা সম্রাট্ শাহ্‌জহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা। জগদ্বিখ্যাত তাজ যাঁহার স্মৃতি অমর করিয়া রাখিয়াছে, সেই মুম্‌তাজ-মহল ইঁহার জননী। তাঁহার অলোক সামান্য রূপরাশির জন্য তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল—'জহান্ আরা' বা 'জগতের অলঙ্কার।'

শৈশবের শিক্ষা এবং সহবৎ সৌজন্য জহান্-আরার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের বিশেষ সহায় হইয়াছিল। মুম্‌তাজ-মহল্ কন্যার উপযুক্ত শিক্ষাবিধানের জন্য সতী-উন্নিসা নামে এক উচ্চশিক্ষিতা, সদ্বংশজাতা পুণ্যবতী মহিলাকে নিযুক্ত করেন। সতী-উন্নিসার একাগ্র চেষ্টায় শাহ্‌জহান-নন্দিনী অল্পকালের মধ্যেই কুরাণ পাঠ করিতে অভ্যস্ত হইলেন। ফার্সী ভাষায় জহান্-আরার সুন্দর হস্তাক্ষর শিক্ষয়িত্রীর নিখুঁত শিক্ষাদানের আর একটী নিদর্শন।

নৈতিক বল এবং মানসিক মাধুর্য্যবিকাশে দেশকাল-পাত্রের যেরূপ শুভসংযোগ ও কল্যাণকর প্রভাব প্রয়োজন,

* 'The Influence of women in Islam' Justice Ameer Ali, *The 19th Century*, 1899, p. 767.

† "One of the accomplishments by which she captivated Jahangir is said to have been her facility in composing extemporary verses."—Beale-Keene's *Oriental Biographical Dictionary*, p 304.

অভ্যাসকুশলা রাজবালার পক্ষে তাহার কিছুরই অভাব হয় নাই; কেন না, যাঁহার অলৌকিক জীবন লোকাতীত রূপ গুণ, সহৃদয়-সৌজন্য, মোহিনী বাক্‌পটুতা ও রাজনৈতিক প্রতিভার দুর্ল্লভ সমাবেশে সমুজ্জ্বল, সেই লোকললামভূতা নূরজহান্ তখনও রাজ-অন্তঃপুরে অমল রশ্মিপাত করিতে ছিলেন। এই মহিয়সী মহিলার মহান্ আদর্শে মোগলের অন্তঃপুর যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী মুমতাজ্ তাহা অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেন নাই। এইরূপ আদর্শ মাতা এবং মাতার পিতৃস্বসার অজস্র যত্নসিঞ্চনে ও পুষ্টিকর পারিবারিক আব্‌হাওয়ার বেষ্টনে রাজ-অন্তঃপুরলতা, জহান্-আরার জীবন রস আবাল্য সঞ্চারিত হইয়াছিল। শাহ্‌জহান্-সুতা জীবনে বিবাহ করেন নাই—আমরণ কুমারী ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মোগল-বিদুষীদিগের মধ্যে জহান্-আরার স্থান অতি উচ্চে। প্রধানতঃ ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনাই তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল, বিশেষতঃ সুফী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের আলোচনা। কুরাণে তাঁহার প্রকৃষ্ট অধিকার ছিল; তাঁহার রচিত প্রবন্ধাদিতে এই ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রাসঙ্গিক বচনাবলী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া পাওয়া যায়। জহান্-আরা অনেকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; * কিন্তু তন্মধ্যে কেবল 'মুনিস্-উল্-অরওয়া' নামে একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাতে আজমীরের সুবিখ্যাত সাধু মুঈন্-উদ্দীন চিশ্‌তী ও তাঁহার কয়েকজন শিষ্যের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

'মুনিস্-উল্-অরওয়া' জহান্-আরার মৌলিক রচনা নহে;—ইহা প্রধানতঃ 'আখ্‌বার-উল-আখিয়ার' ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত; কিন্তু এই পুস্তক সঙ্কলিত হইলেও, বিশেষ চিত্তগ্রাহী; অধিকন্তু ইহা হইতে গ্রন্থরচয়িত্রীর তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তি, মার্জ্জিত রুচি এবং মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে গভীর ধর্ম্মভাবের বিকাশ সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। ইহার লিখন-ভঙ্গী প্রাঞ্জল অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।

সমসাময়িক সাধারণ লেখকগণের চিরাভ্যস্ত দোষ—অনাবশ্যক উপমা ও অলঙ্কারে এই গ্রন্থ ভারাক্রান্ত নহে। এ কথার যাথার্থ্য যাঁহারা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রীযুক্ত ইয়াজ্‌দানীর প্রবন্ধে মুনিস হইতে উদ্ধৃত ফার্সী অংশটুক ও আওরংজীব্‌কে লিখিত জহান্-আরার পত্রখানি পাঠ করিবেন। *

ডাক্তার রিউ (Dr. Rieu) আওরংজীব্‌কে লিখিত জহান্-আরার একখানি পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা 'রকাইম্-ই-করাইম্' গ্রন্থমধ্যে (*Or.* 1702) সন্নিবিষ্ট আছে। আকীল খাঁ রাজীর 'জাফরনামা-ই-আলমগীরী' ও 'অমল-ই-সালিহ' (fols. 698-99) গ্রন্থদ্বয়ে জহান্-আরার যে পত্রখানি সন্নিবিষ্ট আছে, এ পত্রখানি তাহারই অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। পিতার বিদ্যমানে আওরংজীব্ সিংহাসন অধিকারার্থ দাক্ষিণাত্য হইতে অভিযান করিলে জহান্-আরা তাঁহাকে এই অন্যায় কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। তিনি এই পত্রে লিখিয়াছিলেন:—

"তোমাকে লিখি—এই অভিযানে সমরানল প্রজ্বলিত করাই যদি তোমার মনোগত অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তোমার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলে পরিণামে অখ্যাতি অর্জ্জন ব্যতীত আর কোনই ফললাভ হইবে না। আমরা এই নশ্বর জগতে অতি অল্পদিনের জন্যই আসিয়াছি। মর্ত্ত্যভূমির আনন্দরাশি আমাদিগকে নানা অন্যায় কার্য্যে প্রলুব্ধ করিয়া অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি করে। এই কার্য্য হইতে তোমার বিরত থাকা উচিত। সাধ্যমত সম্রাটকে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা কর; কারণ ইহজগৎ ও পরজগতের ভূমানন্দলাভের ইহাই একমাত্র উপায়। সম্রাটকে ভগবানের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে।"

সিরমূরের রাজা বুধপ্রকাশকে লিখিত জহান্-আরার ছয়খানি পত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। (*J. A. S. B.* July, 1911) গড়ওয়াল্‌রাজ ও কয়েকজন পণ্ডিতা

* আনন্দরাম মুখলিস্ তাঁহার 'চমনিস্তান্' গ্রন্থে (পৃঃ ২৫) জহান্-আরার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, জহান্-আরা দুই-একখানি ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

* *Punjab Historical Socy.'s Journal*, 1914, Vol. II, pp. 152-69. "Jahanara"—G Yazdani, M. A.

প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বুধপ্রকাশ বেগমকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সিরমূর রাজের শত্রুপক্ষ হইতেও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ অভিযোগ আসিয়াছিল; এই কারণে জহান্-আরা বুধপ্রকাশকে লিখিয়াছিলেন:—"আমরা এরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না; তিনি এবিষয়ে শাহানশাহের নিকট একখানি 'আরজ্‌দশ্‌ত' প্রেরণ করুন।" এই সকল পত্র হইতে কেবলমাত্র জহান্-আরার বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় না; পরন্তু তিনি যে অনেক সময়ে প্রত্যক্ষভাবে রাজকার্য্য পরিচালনায় সহায়তা করিতেন, ইহাও স্পষ্ট উপলব্ধ হয়।

পুরাতন দিল্লীর পথে শেখ নিজাম্ উদ্দীন্ আউলিয়ার যে বিশাল সমাধি ভবন আছে, তাহার ভিতরে প্রাচীর-বেষ্টিত এক স্বল্পায়তন স্থানে জহান্-আরা সমাহিতা। তিনি জীবদ্দশায় স্বয়ং এই সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সমাধিভূমে শ্যামতৃণাস্তরণতলে নিরভিমানিনী জহান্-আরা অনন্ত নিদ্রায় শায়িতা। কবরশীর্ষে কৃষ্ণপ্রস্তরে যে কবিতাটী খোদিত আছে, তাহা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে রচিত:—

"হু— আল্ হাই আল্ কিউম্
বঘাএর্ সব্‌জা ন্ পোশদ্ কসে মজার্ ই-মরা
কে কব্‌রপোষ্ ই-ঘরিবান্ হামী গিয়া বসস্ত্।
আল ফকীরা আল ফনীয়া জহান্ আরা
মুরীদ্ ই খাজ্‌গান্ ই চিশ্‌তী বিন্‌ত্ ই শাহ্‌জহান্
বাদ্‌শাহ্ আনারুল্লা বুরহানুহু সনে ১০৯২।"

অর্থাৎ—তিনিই জীবন্ত- আত্মস্থ। (কুরাণ তৃতীয় অধ্যায়) আমার সমাধি তৃণভিন্ন কোন [বহুমূল্য] আবরণে আবৃত করিও না। দীন-আত্মাদিগের পক্ষে এই তৃণই যথেষ্ট সমাধি-আবরণ। শাহ্‌জহান্-দুহিতা, চিশ্‌তী সাধু-দিগের শিষ্যা, বিনশ্বর ফকীরা জহান্-আরা ১০৯২ হিজ্‌রা।

এই কবিতামধ্যে শাহ্‌জহান্-নন্দিনীর 'জীবনভরা নিঃসঙ্গতা ও দৈন্যের যে করুণকাহিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা পাঠ করিলে ধূলায় ধরণীর ব্যর্থ আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা অন্তর মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া বেদনায় সমস্ত হৃদয়কে ক্লিষ্ট করিয়া দেয়।'

(৩) **সতী-উন্নিসা**:—পারস্যবাসিগণকে এসিয়ার ফরাসী বলা যাইতে পারে। কথাটা অতিরঞ্জিত নহে; কারণ ভারতীয় মুসলমান্ বাদ্‌শাহ্‌গণের দরবারে যে সমস্ত উজ্জ্বল রত্নের সমাবেশ হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই পারস্যের দান। পারস্য হইতে আসিয়াছিলেন—দাক্ষিণাত্যের বাহ্‌মনী সুলতানগণের স্বনামধন্য মন্ত্রী গাওয়ান্; আওরংজীবের দক্ষিণহস্ত—মীরজুম্লা; আক্‌বরের সুহৃদ্ ও চিকিৎসক—আবুল ফৎ; ইতিহাস প্রসিদ্ধ আলী মর্দান্ খাঁ; আওরং-জীবের রাজস্ব সচিব রুস্তম্ খাঁ। এইরূপ আরও অনেক কর্ম্মবীরের নাম করা যাইতে পারে। আর আসিয়াছিলেন পারস্য হইতে—বহু সদ্‌গুণসম্পন্না সতী উন্নিসা!

সতী উন্নিসা পারস্যের অন্তর্গত মাজেন্দ্রানের জনৈক সম্ভ্রান্ত অধিবাসীর কন্যা। যে পরিবারে তাঁহার জন্ম, তাহা বিদ্বান্ ও চিকিৎসা শাস্ত্রবিদের বংশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সতীর ভ্রাতা তালিবাই আমলী জহাঙ্গীরের দরবারের রাজকবি; শব্দসম্পদে সে যুগে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সতীর স্বামী নাসিরা বিখ্যাত চিকিৎসক রুকনাই কাশীর ভ্রাতা। ভারতে স্বামীর মৃত্যু হইলে সতী-উন্নিসা সম্রাজ্ঞী মুম্‌তাজ্-মহলের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। অল্প-দিনের মধ্যেই এই সদাচার-রতা বিধবার নির্ম্মল চরিত্র, কর্ম্ম-নৈপুণ্য, মিষ্টভাষিতা প্রভৃতি বহুগুণের পরিচয় পাইয়া মুম্‌তাজ বুঝিলেন সংসারে এরূপ প্রত্যয়পাত্রী বিরল; তিনি সতীকে স্বীয় মোহর রক্ষার ভার দিয়া সম্মানিত করিলেন। সতী উন্নিসা অতি সুন্দরভাবে কুরাণ পাঠ করিতে পারিতেন। এই ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য যে সমস্ত সাহিত্যে অধিকার থাকা আবশ্যক, তাহা সতীর ছিল; পারস্য গদ্য ও পদ্য উভয় সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; এমন কি চিকিৎসা-শাস্ত্রও তাঁহার অধিতব্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সাহিত্যিক জ্ঞানগরিমার জন্য তিনি বাদ্‌শাহ্‌জাদী জহান্-আরার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হ'ন।

[আওরংজীবের রাজত্বকাল]

সম্রাট্ আওরংজীবের রাজত্বকালে আমরা দুই জন বিদুষী বাদ্‌শাহ্‌জাদীর পরিচয় পাই :—

(১) **জেব্-উন্নিসা** :—আওরংজীবের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেব্-উন্নিসা একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। হাফিজা মরিয়ম্ নামে জনৈক বিদুষী মহিলার উপর জেবের শৈশব শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। অত্যল্প বয়স হইতেই তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা অতীব বলবতী ছিল। তিনি কুরাণ শুনিতে ভাল বাসিতেন; একদিন পিতার নিকট সমস্ত কুরাণখানির আমূল আবৃত্তি করিয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন। কন্যার অনন্য-সাধারণ স্মরণশক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আওরংজীব্ বালিকা কন্যাকে ৩০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন ও তাঁহার সুশিক্ষার জন্য কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দেন। বলা বাহুল্য, জেব্-উন্নিসা এই শিক্ষার সুফল সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে কিছুমাত্র আলস্য করেন নাই। আরবী ও ফার্সী উভয় ভাষাতেই তিনি লেখনী পরিচালনা করিতে পারিতেন। ইহার মধ্যে আবার আরবীয় ধর্ম্মতত্ত্বে তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। পুত্রীকন্যাদিগের মধ্যে সম্রাট্ তাঁহার এই বিদুষী ধর্ম্মানুরাগিনী কন্যাটীকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। অধিকাংশ সময়ই জেবের সহিত তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা হইত।

ভারতেশ্বরের আদরিণী কন্যা হইয়াও, জেব্ বিলাস-ব্যসনে আমরণ নিমগ্ন থাকা অপেক্ষা জ্ঞানানুশীলন ও সাহিত্য-চর্চ্চাকেই তাঁহার পুণ্যময় জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুস্তকাগারে সংগৃহীত ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা ও পবিত্র জীবন যাপনের সাক্ষ্য স্বরূপ বিদ্যমান ছিল। আবার এই সাহিত্য-চর্চ্চা শুধু যে তাঁহার নিজের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, এমন নহে; তিনি নিজেও যেমন সাহিত্যানুরাগিনী, সাহিত্যিকগণের সাহিত্যানুরাগেরও তেমনই উৎসাহদাত্রী। বহু দুঃস্থ লেখক তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়া সাহিত্যসেবার সুযোগ লাভ করিতেন। সাহিত্যের উন্নতিকল্পে জেব্ অনেক সুপণ্ডিত মৌলভীকে যোগ্য বেতনে নূতন পুস্তক প্রণয়নের জন্য, অথবা তাঁহার নিজের ব্যবহারার্থ দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথির নকল-কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আওরংজীব্ কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন না; এই কারণে কোন কবিই তাঁহার দরবারে রাজ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু করুণারূপিনী জেবের করুণা হইতে যে তাঁহারা বঞ্চিত হ'ন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কন্যার করুণার ফল্গুধারা, আওরংজীবের আমলের সাহিত্যকে এইরূপে সঞ্জীবিত রাখিয়া ধন্য হইয়াছিল।

'দেওয়ান্-ই-মখ্‌ফী'তে জেব্-উন্নিসার বহু কবিতা স্থান পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে কোন্ মখ্‌ফী? কবিরা গুপ্ত নাম ধরিয়া যে-সকল কবিতা প্রচার করেন, ফার্সীতে তাহাকে 'মখ্‌ফী' বলে। ফার্সী ভাষায় মখ্‌ফী এক নহে—বহু। বাদ্‌শাহ্‌জাদীর হৃদয়ের অতুলনীয় ভাবসম্পদ্ কোন্ মখ্‌ফীর সৃষ্টি পুষ্টি করিয়াছিল, তাহা আজ কে নিশ্চয় করিয়া বলিবে?*

প্রকৃতি জেব্-উন্নিসাকে সৌন্দর্য্যের ললামভূতা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাহিরের রূপ, আর অন্তরের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রতিভা তাঁহার অসামান্য গৌরবের কারণ হইয়াছিল। মোগলের নিভৃত অন্তঃপুরে ঘনঘোর পর্দ্দান্তরালে বসবাস করিয়াও, জেব্ পর্দ্দাবগুণ্ঠনে বিকশিত, সুরভি, সৌন্দর্য্যমণ্ডিত গোলাপ পুষ্পের ন্যায় আপনাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে লুক্কায়িত রাখিতে পারেন নাই—দেশ দেশান্তরে তাঁহার যশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

জেব্-উন্নিসা ভ্রাতা মুহম্মদ্ আক্‌বরকে নিরতিশয় স্নেহ চক্ষে দেখিতেন। এই জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রতি আক্‌বরেরও অগাধ বিশ্বাস, অপরিসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। আক্‌বর একখানি পত্রে জেব্‌কে লিখিয়াছেন—'যাহা তোমার, তাহাই আমার; এবং যাহা আমার, তাহাতে সর্ব্বসময়ে তোমার অধিকার রহিয়াছে।' পত্রের অন্যত্র আছে—'দৌলৎ ও সাগরমলের জামাতাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ বা কর্ম্মচ্যুত করা তোমার ইচ্ছাধীন। তোমারই আদেশে আমি তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছি। সমস্ত বিষয়েই তোমার আদেশ আমি কুরাণ ও প্রেরিত-পুরুষের 'হদীসে'র (*Tradi-*

* খান্ সাহিব্ আব্‌দুল্ মুক্‌তাদীর 'দেওয়ান্-ই-মখ্‌ফীর' বিস্তৃত সমালোচনা ও পরীক্ষা করিয়াছেন। See *Bankipur Oriental Library Catalogue*, Persian Poetry, iii. M 250 I.

tions) ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে প্রতিপালন করি।' ভগিনীর কিরূপ স্নেহ ও আন্তরিকতার জন্য আক্‌বর তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা, এত নির্ভর করিতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহই জেবের কালস্বরূপ হইয়াছিল।

আক্‌বর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন; কিন্তু রাজসৈন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; আজ্‌মীরের নিকট তাঁহার যে শিবির সন্নিবেশ হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভ্রাতা আক্‌বরকে জেব্‌-উন্নিসা যে সকল গুপ্ত চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, রাজসৈন্য কর্ত্তৃক শিবির অধিকৃত হইলে (১৬ই জানুয়ারী, ১৬৮১) তৎসমুদয় সম্রাটের করতলগত হইল। অপরাধী পুত্র তাঁহার হস্তচ্যুত; সুতরাং বিদ্রোহীর সহিত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে আওরঙ্গজীবের সমস্ত ক্রোধ পতিত হইল—জেব্‌-উন্নিসার উপর। ক্রোধান্ধ বাদ্‌শাহ্‌ কন্যার সমস্ত সম্পত্তি ও বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা বৃত্তি বন্ধ করিয়া তাঁহাকে আমরণ কালের জন্য সলীমগড় দুর্গে বন্দী করিলেন (১৬৮১-১৭০২)।'

তাহার পর সুদীর্ঘ দ্বাবিংশতিবর্ষ স্নেহময়ী কুসুম-কোমলা জেব-উন্নিসাকে ঐ স্থানে বন্দিনীর কঠোর জীবন যাপন করিতে হয়। কারা-প্রাচীরের আবেষ্টনের মধ্যে নিঃসঙ্গ বন্দীদশায় তখন তাঁহার কবি-চিত্তে বেদনাভরা কত ভাবের উদয় হইত, কত বিষাদগীতি মুকুলিত হইয়া ঝরিয়া পড়িত, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? মনে হয় ঐ সময়েই তিনি খেদ করিয়া গাহিয়াছিলেন:

"কঠিন নিগড়ে বদ্ধ যতদিন চরণ-যুগল
বন্ধু সবে বৈরী তোর, আর পর আত্মীয় সকল।
সুনাম রাখিতে তুই করিবি কি, সব হবে মিছে,
অপমান করিবারে বন্ধু যে গো, ফেরে পিছে পিছে।
এ বিষাদ-কারা হ'তে মুক্তি তরে বৃথা চেষ্টা তোর,
ওরে মখ্‌ফী, রাজচক্র সুদারুণ বিরূপ কঠোর;
জেনে রাখ্‌ বন্দী তুই, শেষ দিন না আসিলে আর,
নাই নাই, আশা নাই, খুলিবে যে লৌহ-কারাগার।"

(*Diwan of Zeb-un-nissa*, p. 17.)

লৌহদ্বার আর সত্য সত্যই মুক্ত হয় নাই;—হইয়াছিল একদিন, যেদিন মৃত্যুর ভবভয়হারী মহাবল আনন্দময় বাহু জেব্‌-উন্নিসাকে শান্তিপ্রদ মুক্তিরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য প্রসারিত হয় (২৬এ মে, ১৭০২)। বাদ্‌শাহের সমগ্র রাজ্য সেদিন শোকভারাক্রান্ত হইয়াছিল;—আর যে বাদ্‌শাহ্‌ এতদিন স্বার্থের অমানুষী মায়া ও রাজনীতির কুটিল চক্রে অপত্য-স্নেহ ভুলিয়াছিলেন, তিনিও শোকাবেগ ধারণ করিতে পারেন নাই; প্রাণপ্রতিম কন্যার মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে বৃদ্ধ আওরঙ্গজীবের পাষাণ চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুধারা বহিয়াছিল।

(২) **বদর্‌-উন্নিসা**:—ইনি সম্রাট্‌ আওরংজীবের তৃতীয়া কন্যা। সমগ্র কুরাণখানি ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল; কিন্তু জ্যেষ্ঠা ভগিনী জেব্‌-উন্নিসার ন্যায় বদর্‌-উন্নিসা উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না।

[প্রথম বাহাদুর শাহ্‌র রাজত্বকাল]

নূর-উন্নিসা:—প্রথম বাহাদুর শাহ্‌-পত্নী নূর-উন্নিসাও একজন বিদুষী মহিলা। তিনি মীর্জ্জা সঞ্জর নজম্‌ সানীর কন্যা। খাফি খাঁ লিখিয়াছেন (ii, 330) নূর-উন্নিসা সুন্দর হিন্দী কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

[শেষ কথা]

উপরিলিখিত প্রমাণাদি হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মোগল বাদ্‌শাহ্‌জাদীগণের শিক্ষা বিষয়ে তাৎকালীন বাদ্‌শাহ্‌বৃন্দ উদাসীন ছিলেন না; এবং ঘোর অবরোধবাস সত্ত্বেও তাঁহাদের কেহ কেহ যেরূপ সুশিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসার্হ। অনেক স্থলে দেখা যায়, ফার্সী পত্র ও কুরাণ কণ্ঠস্থ করা মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষার চরম সীমা ছিল। দুঃস্থ গৃহস্থেরা অনেক সময়ে কন্যার জন্য শিক্ষক রাখিতে পারিতেন না, অথচ কন্যাগণকে বিদ্যালয়েও পাঠাইতেন না;—এরূপ ক্ষেত্রে পিতা তাঁহাদের শিক্ষা বিষয়ে যত্নবান্‌ না হইলে তাঁহারা অশিক্ষিতা থাকিতেন। তবে এ কথা ঠিক যে, সম্ভ্রান্ত মুসলমান-গৃহে শিক্ষা-বিধানের যে প্রকার সুব্যবস্থা ছিল, সাধারণ গৃহস্থের



নূরজহান



জেব্-উন্নিসা



জহান্-আরা



মুম্‌তাজ্-মহল্



অধ্যায়নরতা মোগল-বাদশাহ্‌জাদী

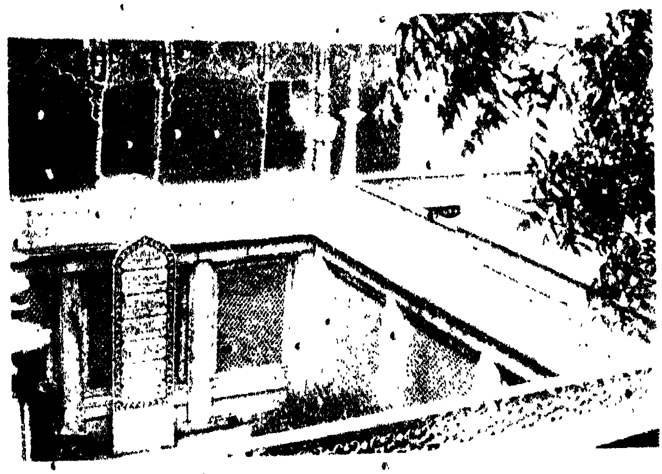

বাবর

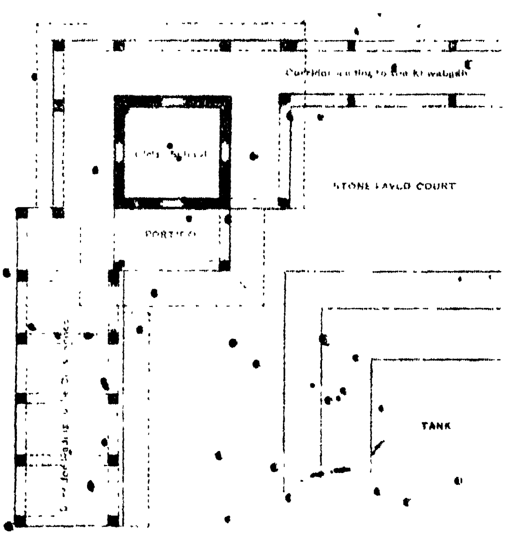

হুমায়ূন


আকবর শাহ


আওরংজীব


প্রথম বাহাদুর শাহ


জহান্-আরার সমাধি



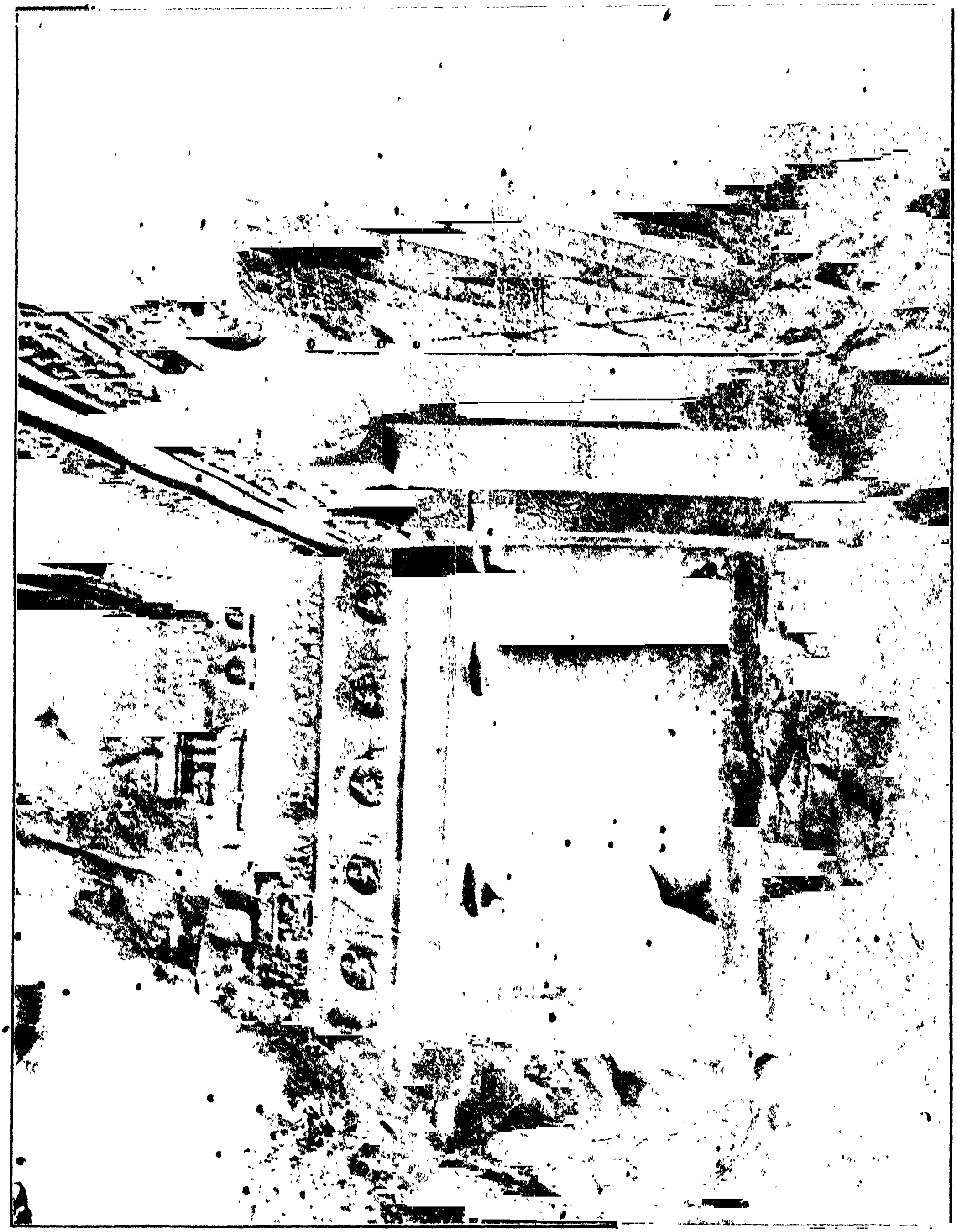
সীক্রীর রাজপ্রাসাদস্থ বালিকা-বিদ্যালয়ের নক্শা

সবে হয় ত তেমন ছিল না, কিন্তু তাহা হইলেও ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাবৃন্দের মধ্যেই যে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিল এবং অন্যত্র ছিল না, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের গৃহে যে সমস্ত আচার-ব্যবহার আদৃত হইয়া থাকে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা তাহা অবলম্বন করিতে বিশেষ সচেষ্ট হইয়া থাকেন। সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ মহিলারা যখন লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতেন, তখন যে আর সকলেই অজ্ঞান তমসায় নিজ নিজ স্ত্রীকন্যাদিগকে নিমজ্জিত রাখিতেন, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। অবরোধের মধ্যে অবস্থান করিয়া যতদূর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা হইত; এ কথা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রই মানিয়া লইবেন। *

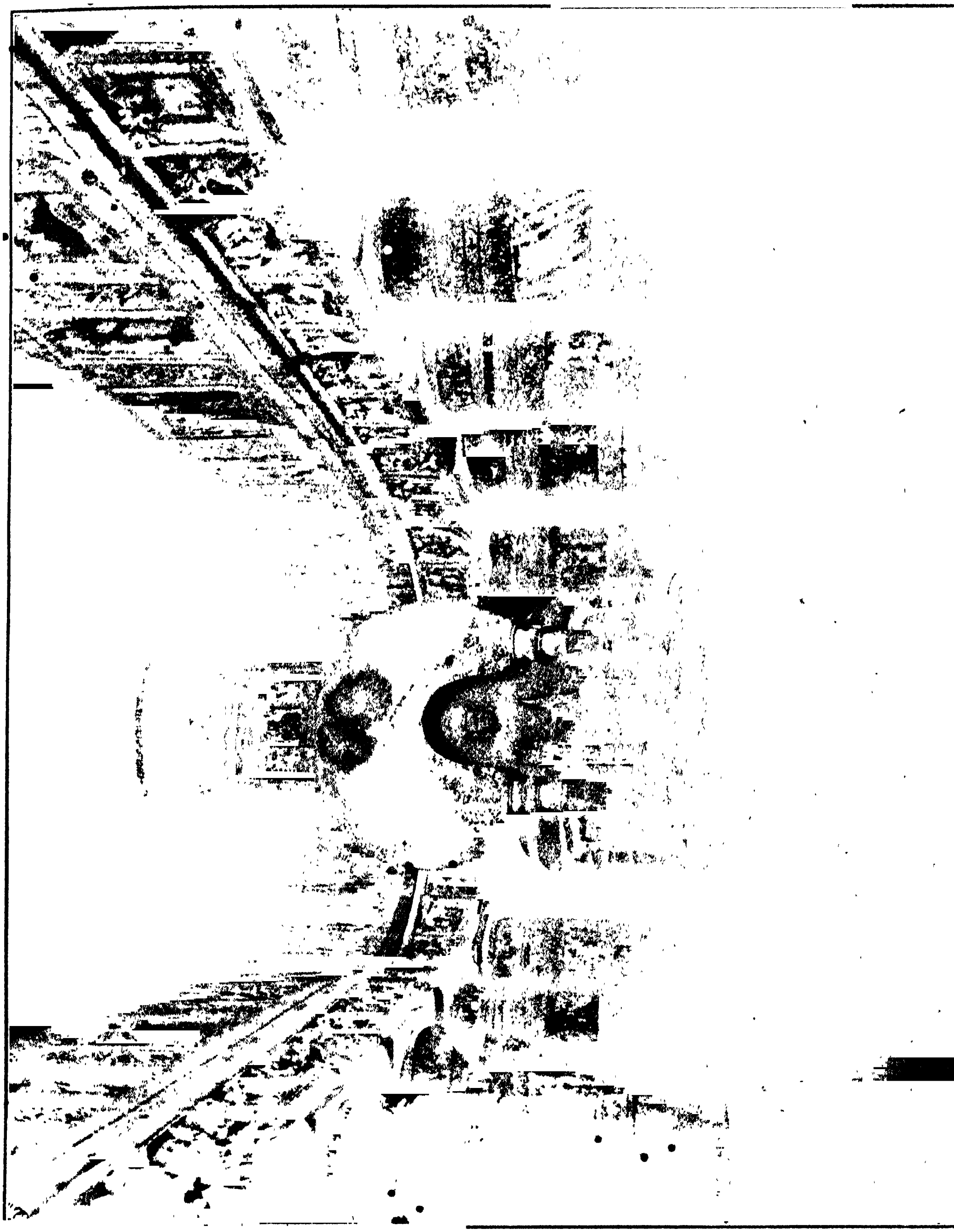
* এই প্রবন্ধের 'অধ্যয়নরতা মোগল-বাদশাহ্জাদী' ছবিখানি, বাঁকিপুরের ব্যারিষ্টার-প্রবর শ্রীযুক্ত জি, সি, মানুক মহোদয় প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া প্রবন্ধ-লেখককে অনুগৃহীত করিয়াছেন।



টিপুস্থলতান ও হায়দর আলির সমাধি—মহীশূর



১ নং গুহার বারাণ্ডার দক্ষিণ প্রান্ত—অজন্তা



১নং গুহার অভ্যন্তর—অজন্তা

সঞ্চয়

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

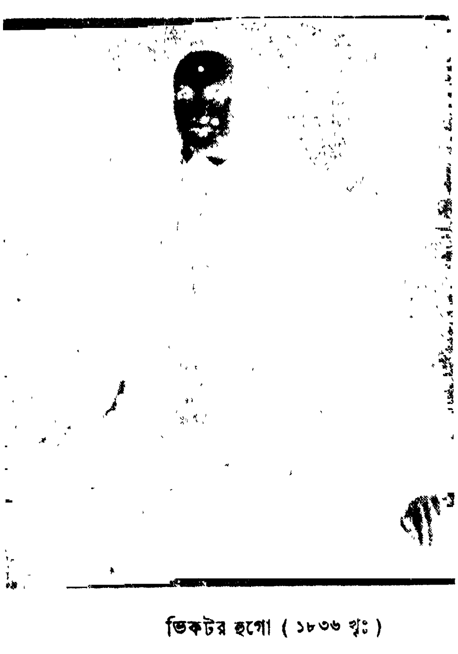


ভ্যানডাইকের আঁকা "স্বর্গীয় পরিবার"



রেমব্রাণ্ডের আঁকা "ছাত্র"

বাজার দর খুব কম করিয়া সাড়েসাত লাখ টাকা

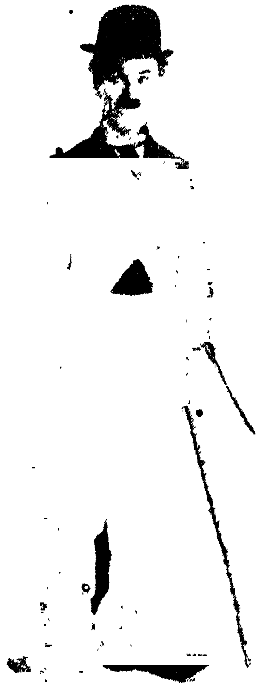


ভিকটর হুগো (১৮৩৬ খৃঃ)



গিরল্যাণ্ডেজোর আঁকা একখানি ছবি

এর বাজার-দর পনেরো লাখ টাকা



"বাঃ! মেয়ে মানুষটিকে বেড়ে দেখ্‌তে তো!"



"তার রং যে বড্ড ফরসা, তারে পাব ভয় না পসা।
তার জন্যে প্রাণ আমার করচে আনচান।"



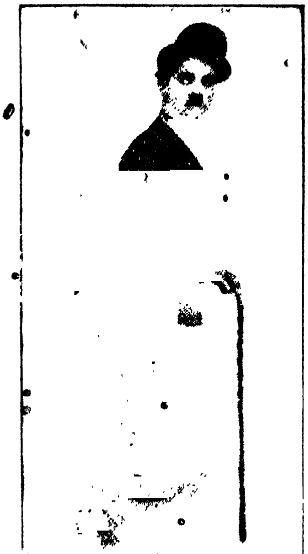
"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! বলিস্ কি রে?"



"যে আজ্ঞে, কৃতার্থ হলুম!"



"হুঁ, লোকটার মতলোব ভালো নয় দেখছি।"



"মারবে? ওঃ, মারে অমন সব শা–



"আঃ, পয়সা-পয়সা করে' জ্বালিয়ে খেলে যে!
এই নে, যাঃ, পালাঃ!"



"আঃ, এখন একটু ঘুমিয়ে বাঁচি!
সারা দিন খেটে-খেটে জান বেরিয়ে গেছে!"

ভিক্টর হুগো

হুগোর জীবন-কথা অনেকবার কথিত ও আলোচিত হইয়াছে। বিশ্বসাহিত্যের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকের যাদু-মন্ত্রের মত অপূর্ব্ব রচনা যিনিই পাঠ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অন্ধ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের লুকানো দিকটা অনেকের চোখই এড়াইয়া গিয়াছে। হুগো নিজে একবার গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, 'সাধারণের দুর্ব্বলতা আমার মধ্যে নাই।'—কিন্তু সাধারণের দুর্ব্বলতা যে তাঁহার ভিতরে কিছুমাত্র কম ছিল না, জর্জ স্যাণ্ড-এর জীবনীতে সঙ্গীত-শাস্ত্রে-বিখ্যাত Chopin, তাহার কিছু-কিছু প্রমাণ দিয়াছিলেন। সংপ্রতি Juliette Adam নামে একজন ফরাসী-মহিলা হুগোর আরো-অনেক দুর্ব্বলতার কাহিনী বলিয়াছেন। Juliette Adam দ্বিতীয় নেপোলিয়নের শেষ রাজত্বকালের একজন রূপবতী ও গুণবতী মহিলা। ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধের পর ফ্রান্সে যখন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তাঁহার আলয়ে দেশের যতসব নামজাদা লোক আসিয়া আসর জমাইয়া বসিতেন। সে আসরে সাহিত্যসেবী কলাবিদ্ ও রাজনৈতিক সকলেরই

সমান আনাগোনা ছিল। Juliette ও তাঁহার স্বামী হুগোকে পরম বন্ধুর মত আদর-যত্ন করিতেন। এই ঘনিষ্ঠতা সূত্রে হুগোর প্রতিভার মধ্যে যে ক্ষুদ্রতা, যে তুচ্ছ যশোলিপ্সা, যে অর্থলোভ দেখিয়াছিলেন, এতদিন পরে Juliette তাহা খুলিয়া বলিয়াছেন।

হুগো নিজে কুলীনতন্ত্র আর প্রজাতন্ত্র এই দুই তন্ত্রের মাঝামাঝি পথের লোক ছিলেন। তাই তাঁহার বাড়ীতে যখনি কোন কাজ-কর্ম্ম হইত, তখন ঐ দুই সম্প্রদায়ের লোকেরাই কবির কাছ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র পাইতেন। লোকের প্রশংসা পাইবার জন্য সর্ব্বদাই তিনি লালায়িত হইয়া থাকিতেন - অত-বড় প্রতিভার মধ্যে এত বেশী যশোলিপ্সা ছিল অত্যন্ত অশোভন। পথে ঘাটে জনসাধারণের চোখে পড়িবার জন্য সকলের সঙ্গেই তিনি আগ্রহভরে কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং জনতা যখন 'হুগোর জয়' বলিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিত, তখন তাঁহার মুখ দেখিলে মনে হইত, তিনি যেন আনন্দের সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছেন!

বন্ধুবান্ধবদের মাঝখানে বসিয়া খাইতে খাইতে হুগো প্রায়ই নানা প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতেন। সে সময়ে তাঁহার খাওয়ার বহর বা তাঁহার বাকচাতুরীর কায়দা— কোনটি যে বেশী বাহাদুরীর, তাহা বুঝিতে পারা যাইত না! হুগোর মতন পেটুক ও খাইয়ে লোক খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার আহার্য্যের পরিমাণ ছিল বিপুল এমন-কি ভীষণ! যেমন ঝুড়ী-ঝুড়ী খাবার তিনি পেটে পূরিতে পারিতেন, তেমনি পান করিতে পারিতেন তিনি বোতল-বোতল মদ! (এই প্রসঙ্গে Juliette Adam বলেন, নেপোলিয়নের সৈন্যদলে তাঁহার এক ঠাকুরদাদা ছিলেন; দিনে ঠিক দশ-দশটি বোতল মদ নহিলে তাঁহার জিভও ভিজিত না, মনের সাধও মিটিত না!) প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী Juliette Drouet যে তাঁহার উপপত্নী ছিলেন, এ-কথা সকলেই জানেন। এই অভিনেত্রী পাকস্থলীর অসুখে এক সময় বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। হুগো তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ও-সব অসুখ-টসুখের কথা কিচ্ছু ভেবো না! পেট ভরে খুব বেশী করে' খেতে সুরু কর, দেখ্‌বে সব অসুখ চট্‌পট্ সেরে যাবে!" হুগোর পেটুকতা যে কেমন ছিল, এই উক্তিই তাহার নমুনা। এত খাইয়াও হুগোর স্বাস্থ্য কিন্তু ভাঙিয়া পড়ে নাই!

নানা প্রসঙ্গ লইয়া হুগো যখন আলোচনা করিতেন, তখন তাহা যে কতটা উপভোগ্য কতটা চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিত, সে কথা আর বলা যায় না। তাঁহার মুখে গল্প শুনিলে তাঁহার সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলিয়া যাইতে হইত।

Lecomte de Lisleর সঙ্গে হুগোর একদিন তর্ক বিতর্ক হইতেছিল। তর্কের বিষয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব। কবি de Lisle তর্ক করিতেছিলেন জড়বাদীর মত, হুগো মায়াবাদীর মত। Juliette Adam ও সে তর্কে পৌত্তলিকরূপে যোগদান করিলেন। হঠাৎ কি কথাপ্রসঙ্গে de Lisle হুগোকে বলিলেন, "তুমি যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করবে, এ আর আশ্চর্য্য কি! তুমি যে নিজেই একজন দেবতা!"

Juliette Adam এই প্রশংসামুখর যুবকের অতিবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "না উনি দেবতা নন— উপদেবতা!"

হুগো কোন জবাব না দিয়া শুধু একটু হাসিলেন। যাহার রূপ ও যৌবন আছে, এমন রমণীকে হুগো আদরের চোখে দেখিতেন। তিনি সুন্দরীর কথায় কখনো প্রতিবাদ করিতেন না। যেখানে সৌন্দর্য্য থাকিত, হুগোর ব্যবহার ও ধরণ-ধারণ সেখানে মিষ্ট ও চমৎকার ছিল। দ্বিতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে হুগো সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এবং তিনি নিজেও একজন কুলীন (Peer) ছিলেন। এমন পদস্থ ব্যক্তি হইয়াও তিনি যখন কোন সুন্দরীর রূপে একটু বেশীরকম মজিয়া যাইতেন, তখন সেকেলে ফরাসীদের মতন একেবারে সেই সুন্দরীর পায়ে পড়িয়া চুমো না-খাইয়া আর ছাড়িতেন না!

হুগো ছিলেন অত্যন্ত কৃপণ ও অর্থলোভী। একটি ব্যাপারে তাঁহার চরিত্রের এই দিকটি বুঝা যাইবে। তাঁহার বিশেষ বন্ধু ও ভক্ত Rochefort একবার কোন কারণে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়াও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। Rochefort কিন্তু কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া নিউ-সাউথ্-ওয়েল্‌সে চলিয়া যান। সেখান হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক হাজার পাউণ্ডের জন্য তিনি স্বদেশে একখানি টেলিগ্রাম পাঠান।

মুখে Rochefortকে যতদূর সুখ্যাতি করিবার হুগো তা করিতেন; কিন্তু Juliette Adam যখন তাঁহার এই বিপদগ্রস্ত বন্ধুর প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইলেন, হুগো তখন

টাকা খরচের ভয়ে একেবারেই জড়সড় হইয়া পড়িলেন। বাধো বাধো স্বরে তিনি বলিলেন "আমার হাতে ত টাকা নেই!" Juliette Adam বেশ জানিতেন ভগো অনেক টাকার মানুষ, এক এক হাজার পাউণ্ড তাঁহার কাছে দু'চার টাকার মত নগণ্য ব্যাপার। কাজেই হুগোর কথা শুনিয়া তিনি ভারি অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হুগো বলিলেন, "আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ না বুঝি? আচ্ছা, তুমি এই আমার টেলিগ্রাফটা খুলেই দেখ! এই নাও চাবি!" Juliette Adam তাঁহার সে কথাও আমোলে আনিলেন না দেখিয়া হুগো আর একটা নূতন ওজর তুলিয়া বলিলেন, "কিন্তু কোন জুয়াচোর যে Rochefort এর নাম নিয়ে এই টেলিগ্রামখানা পাঠায় নি, তার প্রমাণ কি?" —কিন্তু হুগোর এ ওজরটুও যখন ফাঁসিয়া গেল, তখন তিনি আর কিছুতে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া, ভালো ভাবে এক হাজার পাউণ্ডের জায়গায় একখানি ছয় মাসের মেয়াদী চল্লিশ পাউণ্ড মাত্র দান করিলেন! হতভাগা Rochefort বন্ধুর এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা কখনো জানিতে পারেন নাই, জানিলে হুগোর প্রতি তাঁহার ভক্তি ভালোবাসা না জানি কতটা আহত হইত!

প্রতিভা

'ডেলি মেলের' বিখ্যাত সংবাদদাতা হ্যামিলটন ফাইফ বিলাতের একখানি সাহিত্যিক পত্রে প্রতিভা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লেখার মোদ্দা কথাটা তুলিয়া দিলাম।

"প্রতিভা লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। 'যাতনা সহ্য করিবার অসীম ধারণাশক্তি' যাহার আছে, কার্লাইলের মতে তিনিই প্রতিভাবান। তাঁহার এই উক্তিটি খুবই প্রসিদ্ধ। কেউ বলেন: "সংসারের বাধা রাজ-পথে না চলিয়া যিনি আপনার জন্য একটি নূতন ও আলাদা পথ আবিষ্কার করিতে পারেন, তাঁহার ভিতরে নিশ্চয় কোন স্বর্গীয় উপাদান আছে।"—কিন্তু অনেক খুনী ও বদমাইসও সবাই যে-পথে চলে সে-পথে পদার্পণ করে না,—তাহাদের কার্যকলাপে ত স্বর্গীয় বলিয়া কোন কিছু নাই! কেউ বা বলিতে চান, প্রতিভাবানরা পাগল। কিন্তু জুলিয়াস্ সিজারকে যদি পাগল বলিতে হয়, তবে এই পৃথিবীতে পাগল নন কে? কেউ বা বলেন, "প্রতিভাবানরা সারগ্রাহী।" কিন্তু আমরা জানিতে চাই, আর-সকলের মধ্যে কেবল তাঁহারাই বিশেষভাবে ঐ বিশেষ গুণের অধিকারী হইলেন কেন? এ জিজ্ঞাসার জবাব নাই!

আমরা আরো অনেক কথা জানিতে চাই। সেক্‌স্‌পিয়ার কেন অদ্বিতীয় কবি হইলেন, কিম্বা নেপোলিয়ান কেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট হইলেন? শুধু এ কথা নয়—এ সব বিরাট প্রতিভার কথা নয়—আমরা ক্ষুদ্রতর প্রতিভার কথাও জানিতে চাই। ডিলেন কেন টাইমসের সম্পাদক হইলেন, জন বার্ণস্ কেন মন্ত্রীসভায় প্রবেশলাভ করিতে সক্ষম হইলেন, সার লিপ্‌টন কেন পৃথিবীময় চা বিক্রী করিবার ক্ষমতা পাইলেন? আবার, একদল কুলি মজুরের ভিতরে কেবল একজনই বা সর্দার হয় কেন, এক-দঙ্গল পাঠশালার পোড়োর ভিতরে বিশেষ করিয়া একজনই বা চাঁই হইয়া হুকুম চালায় কেন? শ্রেষ্ঠ প্রতিভার একটা সঠিক ধারণা করিতে পারিলেই আমরা ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রেও তাহার কার্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিব। সুতরাং প্রতিভাকে বাড়িতে হইলে সাফল্যের মূল কারণ কি, আগে সেটা বোঝা দরকার।

এই 'সাফল্য' বা সিদ্ধি আমি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। আমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা যে-কোন কার্যে সফলকাম হই, আমি এখানে সে সমস্তকেই সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত বলিয়া ধরিতেছি। এটা ত সর্বদাই আমাদের চোখে পড়ে যে, পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নানা শ্রেণীর নানা কাজেই অধিকাংশ লোক যেখানে অজ্ঞাত ও দরিদ্র থাকিয়া যাইতেছে, সেখানে জনকতক লোক অনায়াসে যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইতেছে। আমরা এ অসামঞ্জস্যের সদুত্তর না পাইয়া অবাক হইয়া যাই। কারণ, সমৃদ্ধিশালী লোকগুলি যে সব সময়েই অকৃতকার্য লোকগুলির চেয়ে বিদ্যায় বা চরিত্রে শ্রেষ্ঠ হন, তাও নয়। মনের দিক হইতে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, সিজারের চেয়ে শিশেরো বড় ছিলেন। সেক্‌স্‌পিয়ারের চেয়ে বেন জনসনের বিদ্যা ছিল ঢের-বেশী। নেপোলিয়নের চেয়ে Babeufএর অভিপ্রায় ভালো হইলেও তিনি তাঁহার মাথা বাঁচাইতে পারেন নাই। অলিভার ক্রমোয়েলের চেয়ে স্যর হ্যারি ভেনের বিপ্লববাদে

স্নায়ুশক্তি ছিল অধিক। তবু কি গুণে সিজার, নেপোলিয়ন, সেক্সপিয়ার ও ক্রমোয়েল তাঁহাদের সঙ্গীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করিয়াছিলেন? সে গুণ কি গভীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি, উচ্চ নৈতিক উদ্দেশ্য, যশোলাভে আন্তরিক ইচ্ছা? না, তাঁহারা দেখিয়া-শুনিয়া সন্তর্পণে পা ফেলিয়া এবং আট-ঘাট বাঁধিয়া নিখুঁত চক্রান্ত করিয়া মহামানব হন নাই। তাঁহারা বিন্দুমাত্র চেষ্টার ভাব প্রকাশ না-করিয়াই সকলের আগে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছিলেন,—কারণ, তাঁহারা ছিলেন আর সকলের চেয়ে বেশী-জীবন্ত!

বড় হোক ছোট হোক সকল রকম প্রতিভারি সিদ্ধির কারণ হচ্ছে, জীবনী শক্তি। এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন ধার না-ধারিয়া প্রতিভাবানরা অশ্রান্ত শক্তি ও অক্লান্ত উৎসাহে কাজ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। জীবনী শক্তি যাঁহাদের প্রবল, তাঁহারা কখনো স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। কর্ম্মোৎসাহ তাঁহাদিগকে জোর করিয়া ঘর হইতে পথে টানিয়া লইয়া যায়। কাজ তাঁহাদের নেশার মত।

তাঁহারা জনসনের মত অলস হইতে পারেন। তাঁহারা কার্লাইলের মত মৌন এত ভালোবাসিতে পারেন; তাঁহারা সিনসিনেটাসের মত যুদ্ধ ও রাজ্যচালনার চেয়ে চাষার কাজ বেশী পছন্দ করিতে পারেন; কিন্তু, তবু তাঁহারা বিশ্বের কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া আপনাদের ইচ্ছামত নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতে পারেন না। আগ্নেয়গিরির অগ্নিপ্রবাহ যেমন অস্থির হইয়া বাহিরে ফুটিয়া ওঠে, তাঁহাদের প্রচণ্ড জীবনী শক্তিও তেমনি কিছুতেই অন্তর্গূঢ় হইয়া থাকিতে চাহে না। যাঁহারা দেশজয় এবং সাম্রাজ্য গঠন করেন, কেবলমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রবণতার কারণ নয়; উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা যশোলিপ্সা তাঁহাদের মনের খানিকটা সীমাবদ্ধ অংশের উপরে কাজ করে মাত্র।

ঠিক ঐ কথাগুলি ক্ষুদ্রতর প্রতিভার মধ্যেও খাটে। ক্ষুদ্রতর প্রতিভার মধ্যেও ঐ একই জীবনী শক্তির উচ্ছ্বাস বর্ত্তমান,—যে কোন প্রকারে তাহা বাহিরে ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে।

আমাদের চারিধারে এই যে হাজার-হাজার লোক দেখিতেছি, ইহাদের অধিকাংশের ভিতরেই এত-অল্প জীবনী শক্তি আছে যে, কোনরকমে কায়ক্লেশে তাহারা স্বধু বাঁচিয়া থাকিতে, পেটের খোরাক যোগাইতে এবং আপনাদের পরিবার পালন করিতে পারে মাত্র। তার চেয়ে বেশী কিছু করিতে গেলে তাহাদের সাধ্যে কুলায় না। বাঁচিয়া থাকিবার, খোরাক যোগাইবার ও পরিবার পালন করিবার চেয়েও বেশী জীবনী শক্তি যাহার ভিতরে যতটা বর্ত্তমান থাকে, তাহার সফলতাও সেই অনুপাতে তত বেশী হয়, তাহার প্রতিভাও সেই অনুপাতে তত বড় হয়। প্রতিভাবানকে খালি দেখিতে হইবে, তাঁহার জীবনী শক্তি তাঁহাকে যেন ভুল পথে টানিয়া লইয়া না যায়। ভুল পথে চলিয়া, অকারণে জীবনী শক্তি খরচ করিয়া জগতের অনেক প্রতিভাধর শেষকালে হতাশার গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছেন।

মনের উপরে দেহের প্রভাব

মনোবিজ্ঞান লইয়া যাহারা নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা বলেন, "দেহের উপরে মনের প্রভাব আছে ষোলআনা। দেহের আধি ব্যাধির মূল কারণ হচ্ছে মানুষের মন। সুতরাং মনের চিকিৎসা করিলেই মানুষের দেহের অসুখ সারিয়া যাইবে।" কিন্তু আর একজন পণ্ডিত Mr. Leslie Wilson ঐ সিদ্ধান্তের ঠিক উলটা কথাই বলিতেছেন। তাঁহার মতে মানুষের অনেক মনের অসুখের আসল কারণ হচ্ছে অসুস্থ দেহ। দেহ যদি ব্যাধি মন্দির হয়, তাহা হইলে মনের কর্ত্তাগিরি সেখানে খাটিবে না, কেননা, মানুষের মন অসুস্থ দেহের গোলাম মাত্র। দেহের অসুখ মানুষের চরিত্র পর্য্যন্ত খারাপ করিয়া দেয়।

উইলসন সাহেব আপনার মত সমর্থন করিবার জন্য ভিনিসের বিখ্যাত দীর্ঘজীবী Luigi Cornaroকে সাক্ষী মানিয়াছেন। Cornaro ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তিনি তাঁহার Discourses on a Sober and Temperate Life নামে পুস্তকে এই মর্ম্মে বলিয়া গিয়াছেন, "দুঃখ, হতাশা, অবসাদ ও হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি অন্যান্য কারণে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। দেহকে নিয়মিত আহার নিদ্রায় তুষ্ট রাখিতে পারিলে, মনের ব্যামো তাহাকে ছুঁইতেই পারিবে না, বরং মনের উপরেই দেহ হুকুম চালাইতে পারে অবলীলাক্রমে। এ সত্য আমার নিজের জীবনেই পরীক্ষিত। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এক সময়ে কয়েকজন নামজাদা ও শক্তিশালী লোক আমার বিরুদ্ধে

দাঁড়াইয়াছিলেন। আমাকে অত্যন্ত অসহায় দেখিয়া আমার পরিবারের লোকেরা এতদূর দুঃখিত ও হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে অকালে ইহলোক ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল। আমি যেমন নিয়মিত জীবন যাপন করিতাম, আমার পরিবারের আর সবাই তেমন করিতেন না। ফলে তাঁহারা যে দুঃখ কষ্টের ভয় সহ্য করিতে পারেন নাই, আমি অম্লানবদনে সেই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছি এবং নিয়মিত পান-ভোজনের দরুণ আমার শরীরের ও বিন্দুমাত্র অপকার হয় নাই।"

উইলসন সাহেব বলেন, "মানুষের দেহে প্রকাশ্যে যে সব রোগের লক্ষণ দেখা যায়, সেগুলি যে রোগীর মনকে কাবু করিয়া ফেলে, এটা ত সকলেই মানিয়া থাকেন। কিন্তু সকল রোগ লক্ষণই স্পষ্টাস্পষ্টি মানুষের দেহে ফুটিয়া ওঠে না—দেহের ভিতর তাহারা কাজ করে খুব গোপনে, সাধারণের চোখ এড়াইয়া; এবং এই-সব গোপন ব্যাধি ভিতরে-ভিতরে মানুষের মনকে যে আক্রমণ করিয়া থাকে, আমরা অনেকেই হয় ত সে কথা জানি না। যথার্থ রোগীকেও বাহির হইতে দেখিয়া আমরা মনে করি সে ভালো আছে। কিন্তু তাহার স্নায়বিক ও মানসিক বিশেষত্ব দেখিয়া বিশেষজ্ঞের এ কথা বুঝিতে দেরি হয় না যে, তাহার দেহের ভিতরে গুপ্ত ব্যাধি আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছে!

অল্প বয়সেই অনেক ছেলের স্বভাব বিগ্‌ড়াইয়া যায়; কিন্তু তাহাদের বাহিরের স্বাস্থ্য অটুট থাকার দরুণ কেউ সন্দেহ করিতে পারেন না যে, তাহাদের মনের উপরে দেহের কোন অস্বাভাবিক প্রভাব আছে! অথচ ব্যাপারটা আসলে তা ছাড়া আর কিছু নয়। যে-সব ছেলে কঠিন খাদ্য ও গুরুভোজনের ভক্ত, সাধারণত তাহারা দুষ্ট প্রকৃতির ও নির্ব্বোধ হয় এবং পরের অনিষ্ট করিতে ভালোবাসে। কিন্তু অধিক কল্পিষ্ঠ ও জীবন্ত ছেলেরা তেমন পেটুক হয় না; তাহারা হাল্‌কা ও মিষ্ট খাবারই পছন্দ করে বেশী।

যাহারা নিদ্রাহীনতা রোগে কষ্ট পান, তাহাদের মন প্রায়ই দেহের দাস হইয়া পড়ে। বৎসরে যত লোক আত্মহত্যায় মরে, তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ শেষ রাত্রে বা খুব ভোর বেলায় ঐ কার্য্য করে এবং ইহার অধিকাংশই নিদ্রাহীনতার ফল। ডাঃ হেগ বলেন, অগ্নিমান্দ্য রোগ অনেক আত্মহত্যারই প্রধান কারণ।

যে-সকল লোক পুরাতন রোগে আক্রান্ত হয়, তাহারা অনায়াসে খুনখারাপি পর্য্যন্ত করিতে পারে। ক্যাল্‌ভিন নামে একজন লোক তিন তিনটি খুন করিয়াছিল। রোগজীর্ণ দেহ তাহার মনকে নিশ্চয় ঝাঁঝ্‌রা ও বিকল করিয়া দিয়াছিল; কারণ এ ছাড়া তাহার অপরাধের আর কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।" বাত ও মূত্র-পাথরী রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া ক্যাল্‌ভিনের মনের শান্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

ফরাসী-বিপ্লবের বিখ্যাত পাণ্ডা ম্যারাটের চরিত্র আমাদের কথার আর-একটি দৃষ্টান্ত। ম্যারাট্ প্রথম জীবনে ছিল ডাক্তার। কিন্তু অস্ত্র-চিকিৎসার সময়ে পাছে রোগীর গায়ে ব্যথা লাগে, এই ভয়ে যে-ম্যারাটের কোমলপ্রকৃতি একসময়ে কাতর হইয়া পড়িত, সেই ম্যারাট্ই পরে বিপ্লবের যুগে অগুন্তি লোকের মাথা কাটিবার হুকুম দিতে একটুও ইতস্ততঃ করে নাই! ম্যারাটের ভিতরে দু-ধরণের ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য্য প্রকাশ দেখা গিয়াছে। কখনো সে দয়ালু হইত এবং কখনো-বা সে এমন নিষ্ঠুর হইয়া উঠিত যে, তাহার তুলনায় দানবও খাটো হইয়া পড়িত। তাহার এমন অস্থির প্রকৃতির একমাত্র সঙ্গত কারণ হচ্ছে, ব্যাধিদুষ্ট দেহ। ম্যারাট্ একরকম দুরারোগ্য ভয়ানক চর্ম্মরোগে এত বেশী কষ্ট পাইত যে, তাহা আর বলিবার নয়। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া স্নানের ঘরে সর্ব্বাঙ্গ জলে ডুবাইয়া সে বসিয়া থাকিত, এইতেই সে একটু যা শান্তি বোধ করিত। এই অবস্থায় বসিয়াই সে শত শত নর-হত্যার হুকুম দিত এবং আপনার সম্পাদিত খবরের কাগজ চালাইত।

অপস্মার রোগ যখন দেহের মধ্যে অস্পষ্ট আকারে বর্ত্তমান থাকে, তখন তাহার অস্তিত্ব সহজে কেউ ধরিতে পারে না। একই মানুষের প্রকৃতি যদি দুই বা তিন রকমের হয়, তবে বুঝিতে হইবে, সে ঐ অস্পষ্ট অপস্মার রোগের কবলে পড়িয়াছে। এ-সব রোগী খুব পেট ঠাসিয়া খাইতে ভালোবাসে। ঝাল আর মিষ্ট বা আমিষ আর নিরামিষ—এই দুইশ্রেণীর খাবারই তাহারা পছন্দ করে। অস্পষ্ট অপস্মার রোগে ভুগিয়া দু-জন লোক যে শেষে হত্যাকারীতে পরিণত হইয়াছে, আমরা তাহারও প্রমাণ দেখাইতে পারি। অনেক সময়ে এই দলের রোগীর চরিত্রে, এক সঙ্গেই ধর্ম্ম-প্রবণতা ও প্রবঞ্চনার বৈচিত্র্য দেখা যায়!

সেকেলে পটের একেলে কিনিয়ে

পনেরো লক্ষ টাকা! রেমব্রাণ্ড আজ বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয় এই ভাবিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার আঁকা একখানা পটের দাম এত চড়া হইতে পারে! আর, র‍্যাফেলও বড় কম-অবাক্ হইতেন না। কারণ, পনেরো লাখ টাকা খরচ করিয়াও এখন কেউ যদি তাঁহার আঁকা একখানা ছবি কিনিতে পায়, তবে নিজের ভাগ্যকে সে সুপ্রসন্ন মনে করে!

কিন্তু এখনকার এই ছবি-কেনার হুজুগে রসবোধ ততটা নাই, বড়মানুষী ও বাতিকের মাত্রা আছে যতটা। আর এ-রকম বড়-মানুষী কারখানায় জনসাধারণও বিষম হতভম্ব হইয়া যাইতেছে। এই সেদিন হোলবিনের আঁকা "মিলানের ডাচেস" নামে একখানা ছবি নগদ বারো লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রী হইয়া গেল! সাধারণ লোকেরা ক্রেতাকে নিশ্চয়ই পাগল মনে করিতেছে!

আঠারো শতাব্দী হইতে উনিশ শতাব্দীর প্রথম কয় বৎসর পর্য্যন্ত, ইংরেজ ধনীরাই ছবির বাজারে বড় খরিদ্দার বলিয়া নাম কিনিয়াছিলেন। রুবেনের আঁকা একখানা ছবি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে স্যার রবার্ট পীল বিলাতের "জাতীয় চিত্রশালা"র জন্য বাহান্ন হাজার পাঁচশো টাকায় কিনিয়াছিলেন। তখনকার দিনে ভালো ছবির এই দামই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হইত।

তারপর পুরাণো ছবির বাজারে আমেরিকান খরিদ্দারেরা আসিয়া জুটিলেন। পুরাণো ছবির দাম এ-সময়ে ভারি নামিয়া গিয়াছিল; আমেরিকান ধনীদের বাতিকের হাওয়ায় ছবির বাজার আবার হুহু করিয়া চড়িয়া গেল। বিলাতের "জাতীয় চিত্রশালা"র কর্তৃপক্ষরা যে সব ছবি অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সে সব পটও বেজায় চড়া দামে বিকাইয়া যাইতে লাগিল। যেমন, গেনস্‌বরোর আঁকা "ডিভনশায়ারের ডাচেস" নামে প্রত্যাখ্যাত ছবিখানি। আমেরিকার মর্গ্যান সাহেব এখানি সাড়ে চার লাখ টাকায় কিনিয়া নেন।

Corotএর আঁকা যে-সব ছবি আগে তিন বা বড়-জোর সাড়ে চার হাজার টাকায় অনায়াসে পাওয়া যাইত, সেই-সব ছবির দামও ক্রমে নিলামের ডাকে সাড়ে চার লাখ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়া গেল! ছবির দাম ক্রমেই উঠিতে লাগিল। চার পাঁচ ছয় সাত লাখ হইতে একখানা ছবির দাম শেষটা দাঁড়াইল গিয়া পনেরো লাখ টাকায়! দাম এখনও চড়িতেছে! র‍্যাফেলের আঁকা "Madona degli Ansedei" নামে ছবিখানির বাজার দর এখন নাকি সাড়ে বাইশ লাখ টাকার চেয়েও বেশী!

কোন-রকমেই আমেরিকান ধনীদের আঁটিয়া উঠিতে না-পারিয়া ইংরেজ ধনীরা আজকাল একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন! তাঁহাদের চোখের সামনেই য়ুরোপের অনেক আদরের ভালো ভালো ছবিগুলি সমুদ্র পার হইয়া সিধা আমেরিকায় চলিয়া যাইতেছে!

আগেই বলিয়াছি, এই ছবি কেনার হুজুগে রসবোধের মাত্রা বড় অল্প। নীচের ঘটনাটিই তাহার স্পষ্ট নজির।

শিকাগোর একজন ধনী ব্যবসায়ী বিলাতের এক চিত্রশালায় ছবি কিনিতে ঢুকিলেন। সুমুখেই একখানি ছবি দেখিয়া তাঁহার ভারি পছন্দ হইল। সেখানি ওস্তাদ পটুয়া টার্ণারের আঁকা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "বাঃ, টার্ণারের ঐ ছবিখানি ত চমৎকার! এর জন্যে আমি তিন লাখ পঁচিশ হাজার টাকা দিতে রাজি আছি!"

দোকানী বলিল, "আজ্ঞে, এখানি টার্ণারের নয়—জর্জ চেম্বার্সের আঁকা। এর দাম সাড়ে সাত হাজার টাকার বেশী নয়!"

নাক সিকায় তুলিয়া ধনী ক্রেতাটি বলিলেন, "মোটে সাড়ে সাত হাজার টাকা? আরে ছ্যাঃ, এমন সস্তার মাল আমি কিনতে চাই না। আমি চাই দামী ছবি!"

ধনীদের এমনি চূড়ান্ত সখ দেখিয়া ছবির বাজারে জুয়াচোরের আমদানি হইয়াছেও যথেষ্ট। তাহারা সেকালের ওস্তাদ পটুয়াদের নকলে জাল-ছবি আঁকিয়া খুব চড়া দামে বিক্রী করিতেছে। কিন্তু, বার বার ঠকিয়া ধনীরাও এখন চালাক হইয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের না-দেখাইয়া তাঁহারা আর ছবি কেনেন না!

বাজারে আদর ও দাম হয় সেকেলে ছবির। সেকাল-কার অনেক চিত্রকর, যাঁহারা খাইতে না পাইয়া কলা-লক্ষ্মীর সেবা করিয়া অনাদৃত জীবন কাটাইয়াছেন, আজ এতকাল পরে তাঁহাদেরই হাতের কাজ হীরা মাণিকের মত বিকাইয়া যাইতেছে! এতে সেকালের চিত্রকর বা সেকালের আর্টের

কোনই উপকার হইতেছে না। এইসঙ্গে যদি এখনকার গরিব ও গুণী শিল্পীরাও এই আদরের খানিক ভাগ পাইতেন, তবে তাঁহারাও যথার্থ উৎসাহ লাভ করিতেন এবং আধুনিক শিল্পকলাও অনেকটা পরিপুষ্ট হইবার সুবিধা পাইত। মরা মানুষকে খাবার দিয়া লাভ কি?

বায়স্কোপের অভিনেতা

বায়স্কোপের অভিনেতারা কথা কহিতে পারেন না—শুধু অঙ্গভঙ্গি ও মুখভঙ্গির দ্বারাই তাঁহাদিগকে কথার কাজ নিপুণভাবে সারিতে হয়;—তাই রঙ্গালয়ের চেয়ে বায়স্কোপের অভিনেতাদের কাজ ঢের বেশী শক্ত। কাব্যের কথা রঙ্গালয়ের অভিনেতাদের কাজ খুব সহজ করিয়া দেয়। অনেক অভিনেতা ভঙ্গিপ্রকাশে তেমন দক্ষ না হইলেও খালি কাব্যের কথার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া দর্শক ও শ্রোতার মন ভুলাইতে পারেন। বায়স্কোপের অভিনেতাদের এ সুবিধাটুকু নাই। ভঙ্গিই তাঁহাদের সবেধন নীলমণি। মানুষের মনের ভাব ও মুখের কথা, এ দুই-ই তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র সঙ্গত ভঙ্গিতে ফুটাইয়া তুলিতে হয়; তাই যিনি ভঙ্গিপ্রকাশে সুপটু নন, বায়স্কোপের অভিনয় তাঁহার দ্বারা চলে না।

স্বর্গীয় জন বানি এবং ম্যাক্স লিণ্ডার, প্রিন্স, চার্লি চ্যাপ্লিন, ফ্যাটি, আম্ব্রোস ও হ্যারল্ড লয়েড প্রভৃতি বায়স্কোপের হাস্যরসের অভিনেতাদের সঙ্গে এদেশের অনেকেরই পরিচয় আছে। ইহাদের মধ্যে জন ব্যানি, ম্যাক্স লিণ্ডার ও প্রিন্স উচ্চশ্রেণীর হাস্যরস সৃজনে যথেষ্ট শক্তি জাহির করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া ম্যাক্স লিণ্ডার। চার্লি চ্যাপ্লিন প্রভৃতি অন্যান্য অভিনেতাদের অভিনয় জনপ্রিয় হইলেও নিম্নশ্রেণীর; কিন্তু শ্রেণী-হিসাবে এঁদের ভিতরে অনেক তফাৎ থাকিলেও, ভঙ্গিপ্রকাশে এঁরা কেউ কারুর চেয়ে খুব-বেশী খাটো নন।

বায়স্কোপের অভিনেতা হইয়া চার্লি চ্যাপ্লিন যেমন লাখ লাখ টাকা রোজগার করিয়াছেন, তেমন আর কেউ নন। সাধারণ লোকে যে রকম অভিনয় ভালোবাসে, টাকা রোজগারের ফিকিরেই চার্লি ঠিক সেই-রকমের অভিনয় করিয়া থাকেন। কিন্তু অভিনেতা-হিসাবে চার্লি উচ্চতর শ্রেণীরই লোক। এবং সকলেই আশা করিতেছেন, চার্লি শীঘ্রই নিম্নশ্রেণীর ছেলেভুলানো খেলা ছাড়িয়া তাঁহার আসল ক্ষমতার পরিচয় দিবেন।

আমেরিকায় চার্লিকে চেনে না, এমন লোক খুঁজিয়া মেলা ভার। তাঁহার অদ্ভুত টুপী, জুতা ও পোষাক, তাঁহার ছাঁটা গোঁফ, হাতের ছড়ী ও চলা-ফেরার কায়দা এ-সমস্তের মধ্যে এমন একটা স্বতন্ত্র আছে যে, তাঁহাকে একবার দেখিলে আর ভুলিবার যো নাই! বায়স্কোপের হাস্যচিত্রে এখন চার্লির অনুকারী শত শত অভিনেতাকে দেখা যায়; কিন্তু হাজার নকল করিয়াও চার্লির মৌলিকতাকে আজ পর্য্যন্ত আর কেউ খর্ব করিতে পারেন নাই।

জনপ্রিয়তা-হিসাবেও তিনি আর-সকলের চেয়ে অনেক উঁচুতে। চার্লি যদি কোন হোটেলে ঢুকিয়া এক গেলাস জল পান করেন, তবে সেই গেলাসটি তখনি নিলামে চড়ে এবং চার্লির কোন না কোন ভক্ত সেটিকে চড়া দামে কিনিয়া নেয়,—স্মৃতিচিহ্নের মত কাছে রাখিবে বলিয়া!

ভঙ্গিপ্রকাশে চার্লি যে কতটা দক্ষ, সেটা বুঝাইবার জন্য আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভে কয়েকখানি ছবি দিলাম।

খোদার উপর খোদকারী

বিলাতের রথওয়েলে এডগার ফোর্বস্ নামে একটি নয় বছরের ছেলে সম্প্রতি গাড়ী চাপা পড়িয়াছিল। ফলে তাহার মুখখানা ভাঙিয়া চুরিয়া তাল পাকাইয়া একেবারে আকারহীন একটা পিণ্ডের মত হইয়া গিয়াছিল।

উইনিপেগ হাসপাতালে যখন তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহার মুখখানা মানুষের কি আর কোন-কিছুর, সেটুকুও চিনিবার যো ছিল না। হাড়গুলো ও চোখদুটো মাংসের ভিতরে ঢুকিয়া বসিয়া গিয়াছিল। নাসিকা-দণ্ডটি ভাঙিয়া টুক্‌রো-টুক্‌রো হইয়া পড়িয়াছিল। X-ray দিয়া পরখ করিয়া, নাকের টুক্‌রো হাড়গুলো গলার ভিতর হইতে বাহির করা হইয়াছিল।

ডাক্তাররা এই বালকের জন্য একটি আন্‌কোরা নূতন মুখ তৈরি করিতেছেন। চারজন দন্তচিকিৎসক পরস্পরের সঙ্গে কয়েকদিন ধরিয়া পরামর্শ করিয়া, একটি কৃত্রিম তাল গড়িয়া দিয়াছেন। ডাক্তাররাও বলিতেছেন, তাঁহারা মুখের হাড়গুলোকে আবার জোড়া-তাড়া দিয়া অবিকল স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া তুলিবেন!

য়ুরোপের রণক্ষেত্রেও অস্ত্র-চিকিৎসার গুণে নানা অসম্ভব অনায়াসে সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই সেদিন যুদ্ধস্থানে গুলি লাগিয়া একটি লোকের হাতের বুড়ো আঙুলটি উড়িয়া গিয়াছিল। বুড়ো আঙুল না-থাকিলে মানুষের হাত একেবারে অকেজো হইয়া যায় বলিয়া, ডাক্তার তাহারই পায়ের বুড়ো আঙুলটি কাটিয়া, চাঁচিয়া-ছুলিয়া হাতের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। আর একটি লোকের হাতের চার-চারটি আঙুল উড়িয়া যাওয়াতে, তাহার পায়ের চারটি আঙুল কাটিয়া হাতে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে! পায়ের আঙুল ঠাই-নড়া হইয়া হাতে আসিয়া বসাতে, না কি দেখিতেও কিছু খারাপ হয় নাই এবং তাহাদের দ্বারা কাজকর্মও না কি দিব্য চলিয়া যাইতেছে,—একালকার ডাক্তারের ছুরি চালানোর কায়দা এমনি আশ্চর্য!

স্মৃতি-রক্ষার লালসা

মরণের পর দেহ কোথায় থাকিবে, হিন্দু জীবিত থাকিয়াও সে ভাবনা ভাবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের মোগল বাদশাহ এবং নবাব আমীর ওমরাহরা যে সে ভাবনা যথেষ্ট ভাবিতেন, তাজমহল প্রভৃতি অগণ্য কবর-প্রাসাদ তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। একালে, যতদিন বাঁচিয়া থাকি, ততদিনই দেহের ভাবনা ভাবা মুস্কিল হইয়া উঠিয়াছে, তার উপরে আবার যদি মরণের পরে দেহের দশা কি হবে, সে-ভাবনাও ভাবিতে হয়, মানুষের পক্ষে তবে ইহলোকে টিকিয়া থাকাই শক্ত হইয়া উঠিবে! কিন্তু, যাঁহাদের সংসারের ভাবনার চাইতে টাকার থলি বেশী বড়, তাঁহারা বোধ হয় ও-সব ভাবনা না-ভাবিয়া থাকিতে পারেন না। নহিলে পাশ্চাত্যের মত একালে ভাব প্রধান দেশেও সেকেলে নবাবীর স্বপ্ন সৃষ্টি হইতেছে কেন?

গুজম্যান ব্লাঙ্কো দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অল্পদিন আগে প্যারী-নগরীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে তিনি কেবল আপনার দুইশতখানা তৈলচিত্র আঁকাইয়া এবং বারোটা পাথরের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াই পরিতৃপ্ত হন নাই; পাছে তাঁহার গুণের কথা ঢাকা থাকিয়া যায়, সেই ভয়ে তিনি তাঁহার প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির তলায় নিজের হাতে বড়-বড় হরফে লিখিয়া দিয়াছিলেন, "গুজম্যান ব্লাঙ্কো আমেরিকার ভেনেজুয়েলার সুখশান্তিস্থাপক, পুনর্জন্মদাতা, মহাবিখ্যাত প্রেসিডেন্ট!"

অ্যালবার্ট পেল নামে বিলাতের পার্লামেন্টের একজন সভ্য, মরণের অনেক দিন আগেই নিজের এবং স্ত্রীর জন্য চমৎকার একটি স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই স্মৃতিসৌধে তিনি আপনাদের নাম, পরিচয় ও জন্মতারিখ সমস্তই জ্বলন্ত অক্ষরে খুদিয়া দিয়াছিলেন—দেন নাই শুধু মৃত্যুর তারিখ!

জন নিল নামে আর একজন ইংরেজও মরণের আগে একটি পাহাড়ের উপরে, আপনার স্মৃতিরক্ষার জন্য সুদীর্ঘ এক স্তম্ভ খাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। লোকে সেটিকে "নিলের স্তম্ভ" বলিয়া ডাকিত। স্তম্ভটিকে ঘিরিয়া নাচগানের বাৎসরিক বন্দোবস্ত করিতেন ও করিবেন বলিয়া, সেখানকার নগরাধ্যক্ষ ও পাদরী সাহেবের জন্য জন নিল ইচ্ছাপত্র লিখিয়া কিছু টাকা পুরস্কারের বরাদ্দ করিয়া দিতেও ভোলেন নাই!

দিগ্বিজয়ী

[শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী]

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্গীতেরও সমাধি হ'য়ে গেল। মনে হ'ল, যেন যমুনার উচ্ছল, উদ্দাম গতি থেমে গিয়ে, হঠাৎ তার বুক ফুঁড়ে, একটা বিশ্রী বালির চড়া ফুটে উঠল। হাজার বৎসর ধ'রে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় আর্য্যাবর্ত্তে যে সুরের প্রাসাদ তৈরি হ'য়ে উঠেছিল, তার অভ্রভেদী গম্বুজের চূড়ার ঠিক উপরেই যে আকাশের বাজ বাসা ক'রে বসেছিল, সেটা কেউ বুঝতে পারে নি। আত্মীয়-স্বজনের সহস্র আদর ও ভালবাসার অবিরাম বর্ষণ সত্ত্বেও, মাতৃহীনের বুকের ভেতর যেমন একটা ক্ষুধাতুর খালি জায়গা প'ড়ে থাকে, বাদশার মৃত্যুর পর সঙ্গীতকে জাগিয়ে

তোলবার অনেক চেষ্টা সত্বেও, সহরের সঙ্গীত-পিপাসুদের প্রাণের মধ্যে তেমনি একটা জায়গা হা-হা করতে লাগ্‌লো। যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় চাঁদনী চকের সামান্য দরজীর দোকান থেকে আরম্ভ ক'রে, শাহানশার দরবার অবধি কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ত, একটীমাত্র লোক চ'লে যাওয়াতে সেখানকার সমস্ত আনন্দ একেবারে থেমে গেল।

বাদশার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে অন্য অন্য সৌখীনদের সখও ক'মে এল ; বড় বড় ওস্তাদদের সঙ্গীত-প্রতিভা জঠরাগ্নির তাপে শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কেউ কেউ বিরক্ত হ'য়ে অন্য জায়গায় চাকরী নিয়ে চ'লে গেলেন, কেউ বা গান-বাজনা ছেড়ে দিয়ে অন্য ব্যবসা ধর্‌লেন। দুই-একজন সৌখীন লোকের বৈঠকে মাঝে মাঝে 'জলসা' চলতে লাগল বটে, কিন্তু দিল্লীশ্বরের মুক্ত হস্ত মুহুর্মুহু যাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে, ছোট খাটো রইসদের অনুগ্রহ-ভিখারী হ'য়ে থাকা তাদের অপমানজনক বোধ হ'তে লাগ্‌ল।

দিল্লীতে সে সময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাজিয়ে ছিল সের খাঁ। সমস্ত ভারতবর্ষে এমন গাইয়ে বাজিয়ে কেউ ছিল না, যে সের খাঁকে না চিন্‌ত। দরবারে সে যে দিন বাজাত, সে দিন ত দূরের কথা, তার পরেও ছয় সাত দিন আর কারো বাজনা আসরে তেমন জম্‌তো না। অন্য জায়গা থেকে বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েরা এসে যখন দিল্লীর সঙ্গীতের গরিমা ক্ষুণ্ণ ক'রে দেবার উপক্রম করত, দিল্লীর বাদশার মান সে সময় সের খাঁ না হ'লে বজায় থাকা মুস্কিল হ'য়ে পড়্‌ত। সমস্ত ভারতে সের খাঁর বাজনার কথা প্রবাদের মত রটে গিয়েছিল ; লোকে বলত, সে যখন বাজায়, তখন স্বয়ং সরস্বতী তার কাছে এসে বসেন।

সে সময়ে ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যে আর একটা প্রতিভাবান গাইয়ে বাজিয়ের দল তৈরী হ'য়ে উঠেছিল। তাদের প্রধান আড্ডা ছিল হায়দ্রাবাদে। সঙ্গীতের আলোচনা নিয়ে দুই দলে তুমুল তর্কযুদ্ধ চল্‌ত, কেউ কাউকে মান্‌ত না। দিল্লী থেকে গান-বাজনার চর্চ্চা উঠে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে, হায়দ্রাবাদের দল মাথা-ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। শুধু তাই নয়, তারা দিল্লীর বড়-বড় ওস্তাদদের মাইনে ক'রে নিজেদের দরবারে রেখে দিল্লীর মুখে চূণ-কালী লাগিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

সের খাঁকে এই সময় চারদিক থেকে সৌখীনেরা অনেক টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগ্‌ল ; কিন্তু সে দিল্লীর মায়া কাটিয়ে কোন জায়গায় যেতে পার্‌লে না. সংসারের সঙ্গে হিসেব চুকিয়ে দিয়ে সে সুর-বাহার নি নিজের ঘরে এসে বস্‌ল। পৃথিবীতে বন্ধু, সহায়, সম্ব বল্‌তে তার যা কিছু ছিল,—সে তার বিবি মুন্না, আর বাদশ নিজের হাতে উপহার দেওয়া সুর-বাহার। তার বাজন কদর তার বিবি যতটা করত, বাদশাও ততটা করতে পা তেন না। সকাল সন্ধ্যে সে সুর-বাহারে রাগিণী ভাঁজ মুন্না ব'সে ব'সে শুনত, আর ভাব্‌ত—মিঞা বোধ হয় কে দেবতা, তা না হ'লে মানুষের হাতে এমন বাজনা কখ বেরোয় ?

বিদেশের দুই-একজন বড়লোক প্রায়ই সের খাঁর বাজ শোন্‌বার জন্য তার কাছে লোক পাঠাত ; কিন্তু মুন্না তা কোথাও যেতে দিত না। সে যেতে চাইলে মুন্না বল্‌ত, " বুড়ো বয়সে কোথায় যাবে ? সেখানে কি তোমার গুণে আদর করবার মতন সমজ্‌দার আছে ?" বৃদ্ধ মুন্নার মুখে দিকে চেয়ে চেয়ে ভাব্‌ত,—তাই ত, এমন সমজ্‌দার কোথা পাব !

এই সময় হায়দ্রাবাদে চান্দোলাল নামে একজন বিখ্যা ধনী লোক ছিলেন। তাঁর গান বাজনার খুব সখ ছিল। শু গান বাজনা নয়, তার মতন দাতা সে সময় আর ছিল না এই চান্দোলালের দাক্ষিণ্যের পায় সমস্ত বড় ওস্তাদদে মাইনে ক'রে রেখেছিলেন। দিল্লীর ওস্তাদরা যখন ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়্‌ল, তখন তাদের মধ্যে অনেকেই এসে চান্দোলালের অধীনে চাকরী নিয়ে হায়দ্রাবাদে বাস করতে লাগল। দিল্লীর সঙ্গে হায়দ্রাবাদের অনেকদিন ধ'রে যে একটা রেশারেশি চ'ল্‌ছিল, এতদিন পরে সেটা বড় বিশ্রী আকার ধারণ করলে। হায়দ্রাবাদের ওস্তাদরা নিজেদের কোটে পেয়ে দিল্লীর ওস্তাদদের যখন-তখন নির্য্যাতন ও অপমান করত ; আর দিল্লীর ওস্তাদরা পেটের দায়ে সেই সব নির্য্যাতন নীরবে হজম ক'রত। সাত-শ মাইল দূরে থাকলেও, সের খাঁর কাণে দিল্লীর এই অপমানের কথাগুলো এসে পৌছুতে দেরী হোত না ;—অপমানে বৃদ্ধের আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠ্‌ত।

এক দিন সে মুন্নাকে বল্লে,—"একবার ছেড়ে দাও,—যাই একবার, দক্ষিণের গুমর ভেঙ্গে দিয়ে আসি। দিল্লীর অপমান, আমাদের বাদশার অপমান আর ত সহ্য হয় না।" তার

র মুন্না যে সব কথা বলত, সাত-শ মাইল দূরে হায়দ্রাবাদী দদের কাণে সেগুলো পৌছলে তারা যে সের খাঁর চেয়ে চঞ্চল হোয়ে উঠত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দের সৌভাগ্য যে সে সব কথা হায়দ্রাবাদে পৌছত না।

চান্দোলালের দরবারে দিল্লীওয়ালারা প্রায়ই সের খাঁর করত,—হুজুরকে জানাত, যদি শুনতে হয় ত সের খাঁর না। চান্দোলাল অবজ্ঞার হাসি হেসে নিজেদের দলের ক চেয়ে দেখতেন। খোসামুদের দল তখনি হাত নেড়ে লে উঠত, অনেক খাঁকেই দেখা গেল,—এখন বাকী আছে সের খাঁ!

মহম্মদ শাহের সেই প্রশান্ত মুখ মনে পড়ে' দিল্লীর ওস্তাদদের মাথা হেট হোয়ে যেত, চোখে জল আসত।

সের খাঁর গুণ গান শুনতে-শুনতে এক দিন চান্দোলালের নিজেই তার বাজনা শোনবার ইচ্ছা হ'ল। তখনি তাকে নিয়ে আসবার জন্য হায়দ্রাবাদ থেকে দিল্লীতে লোক ছুটল।

হায়দ্রাবাদ থেকে তলব এসেছে শুনে সের খাঁ বেচারী একটু ফাঁপরে পড়ে' গেল। তার হায়দ্রাবাদে যাবার ইচ্ছা মনে মনে ছিল, কিন্তু মুন্নাকে রেখে কেমন ক'রে যাবে, এই ভাবনাটা এতদিন কিছু করতে দেয় নি। চান্দোলালের লোককে সে বল্লে, "দুই এক দিন সবুর কর, যদি বন্দোবস্ত করতে পারি ত তোমার সঙ্গেই চলে যাব।"

কি করে মুন্নার কাছে কথাটা পাড়বে, সেই ভাবনায় সের খাঁ দিন রাত ছট্‌ফট্ করতে লাগল। একদিন সন্ধ্যাবেলা বাজনার সুর বাঁধতে-বাঁধতে সে মুন্নাকে বলে ফেল্লে, "ক'দিন থেকে হায়দ্রাবাদের লোক আসা যাওয়া করছে—" মুন্না স্বামীর বিছানার এক পাশে একটা বালিস নিয়ে শোবার যোগাড় করছিল,—হায়দ্রাবাদের নাম শুনতেই তার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—"কোথা থেকে লোক এসেছে?"

"হায়দ্রাবাদ থেকে।"

"কেন?"

"আমাকে নিয়ে যাবার জন্য।"

বিচ্ছেদ-ভয়-কাতরা মুন্নার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। সে ভাবতে লাগল—হায়দ্রাবাদ, সে কতদূর যেতে আসতেই ত লোকের ছ'মাস কেটে যায়। সেখানে গেলে আর কি দেখা হবে? হয় ত আর তারা আসতে দেবে না,—বোধ হয় আর দেখাও হবে না। ভাবতে ভাবতে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সের খাঁ তখন আফিংয়ের রঙ্গিন নেশায় স্বপ্ন দেখছিল,—জগতের যত গুণী লোক তার তারিফ করছে। কেউ বা গায়ের জামেয়ার, কেউ বা গলার হার খুলে দিচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ একটা আনাড়ি রকমের মোচড় দিতেই, পঞ্চমের তারটা পট্ করে ছিঁড়ে গেল। সে মুখ তুলতেই দেখতে পেলে, মুন্নার গাল বয়ে জল পড়ছে! মুন্নার চোখের জল দেখেই তার নেশা টেশা সব ছুটে গেল। সে তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বস্ত করে, তার চোখের জল মুছিয়ে দিলে; তার কাছে প্রতিজ্ঞা করে ফেল্লে, সে কখনো সেখানে যাবে না। সে-দিন আর তার বাজনা হোল না। সুর-বাহারকে সেই রকম অবস্থায় রেখে দিয়ে সে মুন্নার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করল। সে দিন যদি লুকিয়ে কেউ তার গল্প শুনত, তবে মনে হত, সের খাঁ বুড়া বয়সে নিশ্চয় ক্ষেপে গিয়েছে।

পরের দিন চান্দোলালের লোককে সের খাঁ বলে দিল যে, সে যেতে পারবে না। চান্দোলালের অনুচরেরা কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিলে, সেখানে সমজ্‌দার কে আছে? তার বাজনার তারিফ করতে পারে এমন লোক দক্ষিণে নেই। সমস্ত সহরে কিন্তু রটে গেল, বুড়া বয়সে সের খাঁ বিবির মায়া কাটিয়ে যেতে পারলে না।

সে-দিন চান্দোলালের দরবারে একজন বিখ্যাত বীণকারের মুজরা ছিল। সহরের যত বড়-বড় গুণী ও ধনী তার দরবারে হাজির,—বীণের আওয়াজে আসর একেবারে জম্‌জম্ করছে, এমন সময় দিল্লী থেকে সের খাঁর খবর নিয়ে লোক ফিরে এসে বল্লে, "সের খাঁ বলে দিয়েছে, তার মতন লোক চান্দোলালের দরবারে মুজরা করতে যায় না,—দক্ষিণে গান বাজনার কে কি জানে?"

দূতের কথা শুনে দরবার শুদ্ধ লোক একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বীণার তান আগেই থেমে গিয়েছিল। মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসগুলোর মতন তারগুলো এক-একবার ঝন্‌ঝন্ করে উঠতে লাগল। আসরের মধ্যে একটা উঁচু তক্তের উপর চান্দোলাল মোটা মখ্‌মলের তাকিয়া হেলান দিয়ে জড়োয়া ফরসীতে তামাক টানছিলেন,—টপ্ করে মুখ থেকে নলটা খসে তাঁর কোলের উপর লুটিয়ে পড়ল।

সের খাঁর বেয়াদবি সেই আসরের অধিকাংশ লোককেই

চঞ্চল করে তুললে; শুধু দিল্লীওয়ালারা মনে-মনে বলতে লাগল, সের খাঁ সের-বাচ্চার মতই জবাব দিয়েছে।

সেদিনকার সেই ভাঙ্গা আসর আর জমল না, আস্তে-আস্তে পা টিপে টিপে যে যার বাড়ী চলে গেল। সেই নিস্তব্ধ, উজ্জ্বল ঘরে একলা বসে রইলেন চান্দোলাল। দতের কথাগুলো যেন তখনো সেই বড় দরবার ঘরের খিলান-গুলোতে ঠেকে দ্বিগুণ জোরে তাঁর কাণে এসে বাজতে লাগল।

চান্দোলাল, তাঁর লোকজনকে ডেকে বলে দিলেন, "ছলে, বলে অথবা কৌশলে জীবিত কিম্বা মৃত সের খাঁকে হায়দাবাদে আনতেই হবে, যেমন করে পার তাকে নিয়ে এস।" সে হুকুম বলে আবার তারা দিল্লী ছুটল।

সে দিন বোধ হয় মাত্রাটা একটু বেশী হোয়ে গিয়েছিল। আফিংয়ের ঝোঁকে সের খাঁ স্বপ্ন দেখছিল, বেহেস্ত থেকে চারজন জিন তাকে নিয়ে যেতে এসেছে, সেখানকার দরবারে তাকে বাজাতে হবে। প্রথমটা তারা অনুনয় করতে লাগল, সে বল্লে, সে কোথাও যেতে পারবে না, ঘরে তার বিবি একলা থাকবে, সে যেতে পারে না। তারা বল্লে, ভালয় ভালয় না গেলে তাকে জোর করে নিয়ে যাবে। এই বলে খাটিয়ার চার কোণে চারজন গিয়ে দাঁড়াল। সে তাড়াতাড়ি চারপায়া ছেড়ে নেমে পড়বে, এমন সময়ে তাকে-শুদ্ধ তারা খাটিয়াখানা তুলে আকাশে উড়তে আরম্ভ করে দিলে।

চিলের মতন ঘুরে ঘুরে তারা উপরে উঠতে লাগল। ক্রমে পাখীদের রাজ্য, তার পর সাদা মেঘ, সোণালী মেঘের রাজ্যের ভেতর দিয়ে তারা উড়ে চলতে লাগল। সের খাঁ একবার নীচের দিকে চেয়ে দেখলে, সেখান থেকে তার বাড়ীটা একটা ছোট কাল দাগের মতন দেখা যাচ্ছে। ক্রমে সেটুকুও মিলিয়ে গেল। নিরুপায় সের একবার চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে, জিনদের জিজ্ঞাসা করলে—"আর কতটা যেতে হবে বাবা?" মাথার দিকের একটা জিন ধমক দিয়ে তাকে বল্লে—"এই, চুপ কর,—বেশী গোল করলে এখুনি এইখান থেকে তোকে ছেড়ে দেবো,—একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবি।" সে আর কোন কথা না বলে, আল্লার নাম জপতে লাগল।

সোণালী মেঘের রাজত্ব ছাড়িয়ে তারা আঁধারে মেঘের রাজত্বের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। ওঃ! সে কি ঘুটঘুটে অন্ধকার! কিছু দেখতে পাওয়া যায় না,—শুধু একটা শাঁ-শাঁ আওয়াজ তার কাণে আসতে লাগল। আঁধারে মেঘের সীমানা পেরিয়ে তারা চাঁদের রাজত্বে এসে পড়ল। এইখানে দরবার হবার কথা;—জিনেরা এইখানে এসে তার খাটিয়াটা নামিয়ে দিলে।

দরবার তখন সবে আরম্ভ হয়েছে। একজন হুরী জর্দ্দা ও ফিরোজা মেঘে বোনা একটা ওড়না উড়িয়ে তান ধরেছে,—এমন সময়ে জিনেরা তাকে নিয়ে এসে দরবারে হাজির করলে। একটা জিন সভাপতিকে নিবেদন করে বল্লে,—"হুজুর, লোকটা কিছুতেই আসতে চায় না,—তাই জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি।" সভাপতি তার মালকোঁচা মারা দাড়িতে একবার হাতটা বুলিয়ে, গম্ভীর ভাবে—"বেশ করেচো"—বলে তাকে বাজাতে বল্লে।

চাঁদের দরবারের চকমকানি দেখে, সের খাঁ বেচারী বাজাবে কি, সে একেবারে হকচকিয়ে গেল, ভাল করে সুর বাঁধতেই পারলে না। সবাই বলতে লাগল—লোকটা কিছু জানে না। তার পর তার বাজনা শুনে ত তারা হেসেই অস্থির। রাজা বল্লে "থাম না, ওকে ছেড়ে দিয়ে আয়, ও কিছু জানে না।" সের খাঁ তার যন্ত্রটা নিয়ে কোন রকমে আসর থেকে উঠে বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

জিনেরা আবার তাকে খাটের উপর চড়িয়ে নামতে লাগল; তারপর যেখান থেকে তার বাড়ীটা ছোট্ট একটা কাল দাগের মত দেখা যাচ্ছিল, সেই জায়গাটাতে এসে তারা তাকে বল্লে,—"ঐ দেখ, তোর বাড়ী দেখা যাচ্ছে। এইখান থেকে আমরা তোকে ছেড়ে দেবো, তুই একেবারে ঠিক তোর বাড়ীর ছাদের ওপর গিয়ে পড়বি।" সের বেচারী এই প্রস্তাব শুনে ত ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল; কিন্তু তারা কোন রকম ওজর না শুনে, তাকে শূন্য থেকে ছেড়ে দিলে। শোঁ-শোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে খাটিয়াখানা মাটির ওপর দড়াম্ করে এসে পড়ল।

অত উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে তার ঘুমটা চট্ করে ভেঙ্গে গেল। 'ইয়া আল্লা' বলে সে উঠে পড়ে যখন দেখলে যে, নিজের বিছানায় শুয়ে আছে, তখন একটা নিশ্চিন্দির হাঁফ ছেড়ে পাশ ফিরে শুল।

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। পূর্ব্ব-গগনে সোণার আলো আজান দিয়ে জগতের লোকদের ডাকছিল, 'ওঠো—

ওঠো, জাগরণের সময় হয়েছে।' সের খাঁ নেমাজ পড়বার জন্য তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে দেখলে, বাড়ীর যেখানে সে শুয়েছিল, এ ত সে জায়গা নয়! এই গভীর জঙ্গলের ভেতর, সে কি করে এসে পড়ল? রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে হতেই তার অন্তরাত্মা শিউরে উঠ্‌ল। সে ভাবছিল, তবে কি। এমন সময়ে একজন ভদ্রবেশী লোক এসে তাকে অভিবাদন করে অতি মোলায়েম ভাষায় বল্লে,—অনিচ্ছাসত্ত্বে তারা তাকে নিদ্রিত অবস্থায় তার বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। মহারাজের হুকুম, তাকে হায়দ্রাবাদে যেতে হবে।

সের খাঁর চোখের সামনে তখন মুন্নার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানা ভাসছিল। নির্ব্বাক হয়ে সে আবার নিজের খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়্‌ল। সে দিন সকালে তার আর নেমাজ পড়া হোল না।

এম্‌নি করে কখনো হাতী, কখনো ঘোড়া, পাল্কী চড়ে প্রায় দু'মাস পরে তারা সের খাঁকে হায়দ্রাবাদে নিয়ে এল। সে বেচারার মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না যে, কি করে ঘুমন্ত অবস্থায় একটা লোককে খাটিয়া সমেত বাড়ীর ভেতর থেকে এরা তুলে নিয়ে এল!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সহরময় রটে গেল, দিল্লী থেকে সের খাঁ এসেছে। হায়দ্রাবাদের ওস্তাদেরা দিল্লীওয়ালাদের না মানলেও, সের খাঁর বাজনা শোনবার জন্য তাঁরা মনে মনে উৎসুক হোয়ে ছিল।

একদিন চান্দোলাল ঠিক করলেন, আজ সের খাঁর বাজনা হবে। দেশ-বিদেশে রটিয়ে দিলেন, যে-কোন লোক সে দিন তার দরবারে এলে, সের খাঁর বাজনা শুন্‌তে পাবে। সের খাঁর নামে দলে-দলে লোক সে দিন আসরে এসে জম্‌তে লাগ্‌ল।

সের খাঁর বাজনা হবার আগে অন্য কয়েকজনের বাজনা হল। রাত্রি যখন প্রায় দশটা, তখন চান্দোলাল নিজের জায়গা থেকে সেরকে ডেকে বল্লেন,—"খাঁ সাহেব, এবার তুমি বাজাও।" সের মাথা নীচু কোরে—'যো হুকুম' বলে নিজের বাজনা সুরে মিলিয়ে বাজাতে সুরু কর্‌লে।

সের খাঁর বাজনা কিন্তু সে দিন একেবারেই জম্‌ল না। হায়দ্রাবাদের ওস্তাদেরা প্রথমে হাসি, শেষ টিট্‌কারি পর্য্যন্ত দিতে আরম্ভ করলেন। চান্দোলাল ভাবতে লাগলেন—এই সের খাঁ! এরি নাম সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে! এত কষ্ট, এত অর্থব্যয় করে কি এই বাজনা শোনবার জন্য দিল্লী থেকে একে জোর করে নিয়ে এলুম! নিজের মূর্খতায় চান্দোলাল নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

চান্দোলাল হাত নেড়ে বাজনা বন্ধ করতে বল্লেন। সের খাঁ যন্ত্রটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে গেল।

দিল্লীর অপমানের যেটুকু বাকী ছিল, সে দিন সের খাঁর বাজনার পর সেটুকুও হোয়ে গেল। চান্দোলাল হেসে তাদের বল্লেন,—"এই তোমাদের সের খাঁ!" তারা আরজি করলে, হয় ত দেশ থেকে এসে খাঁ সাহেবের মন মরজি খারাপ আছে, সেইজন্য বাজনা সেদিন জমেনি; হুজুর আর একদিন দয়া করে হুকুম দিলে, হয় ত অন্য রকম হোতে পারে। চান্দোলাল ভাবলেন, হয় ত বা হোতেও পারে। প্রকাশ্যে বল্লেন—'আচ্ছা দেখা যাবে।'

সের খাঁ নিজের ঘরে একলা বসে ভাবছিল বাড়ীর কথা। সেখানে মুন্না একলা কি করছে! বিবাহের পর এই পঞ্চাশ বছর একদিনও সে চোখের আড়াল হয় নি। তাকে ছেড়ে আজ সে কেমন করে দিন কাটাচ্ছে! একটা ভাবনা সেরের বুকের ভেতর গুমরে গুমরে উঠ্‌ছিল, কিছুতেই সেটার হাত থেকে নিজের মনকে ছাড়াতে পারছিল না। সে ভাবছিল, যদি আর তার সঙ্গে না দেখা হয়! ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার বুকের ভেতর কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সের খাঁ ভাবতে লাগল, কেমন করে এখান থেকে পালান যায়। চারদিকে খাড়া পাহাড়, পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে প্রাণ যাবারই সম্ভাবনা। নানা রকম আকাশ-পাতাল ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল। এমন সময় প্রহরী এসে সংবাদ দিলে,—এখনি মহারাজের দরবারে বাজনা নিয়ে হাজির হোতে হবে। 'আচ্ছা' বলে যন্ত্র নিয়ে আবার সেদিনকার মত সে দরবারে গিয়ে বসল। সে দিন সের খাঁর মন বড় খারাপ ছিল। মুন্নার চিন্তা তার সমস্ত মনকে এমন করে ঢেকে রেখেছিল যে, অন্যদিকে কিছুতেই সে মন দিতে পারছিল না। আগেকার দিনে সে তবু একটু বাজাতে পেরেছিল;—এদিনে ত একেবারে কিছুই বাজাতে পারলে না। মিনিট পাচেক বাজাতে না-বাজাতেই তার হাত কাঁপতে লাগ্‌ল। হায়দ্রাবাদী ওস্তাদের দল চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—"হুজুর, একটা পাঁচ বছরের ছেলেও এর চেয়ে ভাল বাজাতে পারে।" চান্দো-

লাল কিন্তু সেদিন তাদের ঠাট্টায় যোগ দিতে পারলেন না। তিনি ভাবছিলেন, নিশ্চয় এর মধ্যে একটা কিছু গোলমাল আছে ; তা না হলে, যার এত নাম, সে কি এই রকম বাজায়! সভা ভেঙ্গে গেলে সকলেই উঠে চলে গেল ; শুধু বসে রইল সের খাঁ আর চান্দোলাল। চান্দোলাল আস্তে-আস্তে নিজের জায়গা থেকে নেমে এসে, সের খাঁর পাশে বসে, তাকে ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন,—"আচ্ছা, ভাই খাঁ সাহেব, এই কি তোমার বাজনা? এই বাজনায় তুমি সমস্ত ভারতবর্ষকে মুগ্ধ করে রেখেছো?" সের খাঁর মনে হচ্ছিল, এই অপমানটা সহ্য করবার জন্যই বুঝি আল্লা এতদিন তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। চান্দোলাল আবার বলতে লাগলেন—"দিল্লীর সব চেয়ে বড় ওস্তাদ তুমি,—কিন্তু সেখানকার ছোট ছোট ওস্তাদরা যে তোমার চেয়ে ঢের ভাল বাজাতে পারে।" সের খাঁ চোখ মুছে জবাব দিলে,—"হুজুর, আমি আপনার চাকর, হুকুম দিলেই আমাকে বাজাতে হবে। কিন্তু এই যে আমার সুর-বাহার, এ যন্ত্র দিল্লীর বাদশার নিজের হাতের। বাদশার যন্ত্র ত আপনার তাঁবেদার নয়। এর যে দিন মরজি হবে, সে দিন বাজাবে, আমি কিংবা আপনি শত চেষ্টা করলেও এ থেকে সে সুর বার করতে পারব না, যে সুরে সমস্ত ভারতবর্ষ মজেছে।"

চান্দোলাল ভাবলেন—তাই ত! একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, "আচ্ছা, বলতে পার, এ কবে বাজবে?"

সের খাঁ বল্লে—"তা ত বলতে পারি না জনাব! তবে হুকুম করে দিন আপনার লোকদের যে, এ যখন বাজবে, তখন আপনি যে রকম অবস্থায় যেখানে থাকবেন, আমি যেন সেখানে যেতে পারি। যখন এর মরজি হবে, আপনার কাছে ছুটে আসব।"

চান্দোলাল বল্লেন—"আচ্ছা, তাই হবে।" সেদিনকার মত সভা ভেঙ্গে গেল। চান্দোলাল বাড়ীর লোকজন, এমন কি, অন্দরের প্রহরীদের পর্য্যন্ত হুকুম দিয়ে দিলেন যে, সের খাঁ যখন তার কাছে আসতে চাইবে, তাকে যেন আসতে দেওয়া হয়।

সে দিন সন্ধ্যেবেলা চান্দোলাল সবেমাত্র দরবারে এসে বসেছেন, দুই-একজন করে লোক আসতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় শুনতে পেলেন যে, সের খাঁ পাগল হোয়ে গিয়েছে। লোক পাঠিয়ে খবর নিতে-না-নিতে সের দরবারে এসে উপস্থিত হোল। আলুথালু বেশ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ, ঠিক যেন পাগল! এক হাতে সুরবাহার, আর এক হাতে কুর্ণিশ করে সে সভায় বসেই চান্দোলালকে ডেকে বল্লে, "মহারাজ, আজ শুনুন ; সুর-বাহারের মেজাজ আজ বড় ভাল।"

সুর-বাহারটাকে তুলে ধরে প্রথমে সে একটা ঝঙ্কার দিলে। ক'দিন যার বাজনা শুনে চান্দোলালের মনে হোয়েছিল, এ রকম বাজনা যে-সে বাজাতে পারে, আজ কিন্তু এই প্রথম ঝঙ্কারেই তিনি বুঝতে পারলেন, যার-তার হাতে এ রকম ঝঙ্কার ওঠে না। বাতাস লাগলে ঝাড়ের বাতিগুলো যেমন চনমন করে ওঠে, প্রথম ঝঙ্কারেই তার প্রাণের ভেতরটা তেমনি চনমনিয়ে উঠল।

সের খাঁ মাটীর দিকে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে একটা রাগিণী বাজাতে আরম্ভ করলে। প্রত্যেক মীড়ে সূক্ষ্ম শক্তি বেরিয়ে চান্দোলালের অন্তরে ধীরে ধীরে গিয়ে আঘাত করতে লাগল। তাঁর অন্তরটা বুঝতে পাচ্ছিল, এ রকম বাজনা তিনি জীবনে কখনো শোনেন নি। সের খাঁর বাজনা শুনে তাঁর বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল। তার মনে হোতে লাগল, এ কি ভাষা, যা বুঝতে পারা যায় না, অথচ বুকের ভেতর যে রক্ত বয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে এর পরিচয় আছে। এ যেন লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব জন্মের বিস্মৃত কোন একটা সুখ স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। বিস্মৃতির অস্বচ্ছায়াটা মুছে গিয়ে, সেটা একটু ফুটে ওঠবার আগেই, আবার সুরের জালে সমস্তটা ঢাকা পড়ে। কার যেন অতি ক্ষীণ স্বর কাণে আসছে, এ যেন কতদিনের পরিচিত—কোথায় শুনেছি, কবে,—আবার সব মিলিয়ে গিয়ে গমগম করে তারের ঝনঝনায় সব ঢাকা পড়ে। প্রত্যেক মূর্চ্ছনায় মনে হোতে লাগল, যেন দেওয়ালের বাতিগুলো পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়বে! প্রতি গমকে মনে হচ্ছিল, এখনি বুঝি সুর-বাহারের বুক ফেটে, ঝলকে-ঝলকে রক্ত বেরুবে।

চান্দোলাল নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে আসন ছেড়ে সের খাঁর সামনে এসে বসেছেন, তাঁর মাথার তাজ কখন যে সেরের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছে, তা সভা-শুদ্ধ কারো নজরে পড়ে নি। দরবারের আজ সকলেই তাঁরি মত মুগ্ধ।

বাজনা শুনতে শুনতে চান্দোলালের বুকের ভেতর

একটা ব্যথা জাগতে লাগল। তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না, কিসের এ ব্যথা। চিরসুখী, রাজার দুলাল চান্দোলালের অগাধ আনন্দপূর্ণ প্রাণের তলায় এত যে ব্যথা কোথায় লুকিয়ে ছিল, তার খোঁজ তিনি জানতেন না। অলক্ষ্যে তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তার পর আর এক ফোঁটা! চান্দোলাল তার রেশমী রুমালে চোখ ঢেকে, বাজনা শুনতে লাগলেন।

তাঁর সেই ব্যথা, যেটা বুকের ভেতর গুমরে গুমরে, চোখ ফেটে ঝরে পড়ছিল, ক্রমে সেটা বাড়তে বাড়তে কান্নায় পরিণত হল, মহাবীর চান্দোলাল নিজেরই অজ্ঞাত বেদনায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। শুধু যে চান্দোলালই কাঁদছিলেন, তা নয়; সভায় যত লোক উপস্থিত ছিল, সকারই চোখ ছলছল্ করছিল। তার পর কাঁদতে কাঁদতে যখন চান্দোলালের প্রায় দমবন্ধ হোয়ে এসেছে, এমন সময় তিনি চোখ থেকে রুমাল নামিয়ে বল্লেন,—"বাস্, খাঁ সাহেব, খুব হোয়েছে, আর না! ধন্য তোমার সাধনা! ধন্য তুমি! আর তোমার বাজনা শুনে আজ আমিও ধন্য হলুম। এই নাও আমার গলার মালা, এই নাও আমার তাজ, আর এই সমস্ত লোকের সামনে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি যা চাইবে আমি তাই দেবো।"

সের খাঁ মাথা নীচু করে বল্লে,—"হুজুরকে খুসী করতে পেরেছি, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার, আর কিছু চাই না।"

চান্দোলাল উঠে সের খাঁকে আলিঙ্গন দিয়ে বল্লেন—"দাক্ষিণাত্যের সমস্ত ওস্তাদ আমায় যা দিতে পারে নি, তুমি আজ আমায় তাই দিয়েছ।"

দিল্লীর যে-সব ওস্তাদ এত দিন ধরে নির্যাতন সহ্য করে আসছিল, তারা সবাই মিলে চীৎকার করে উঠল,—"জয়, সের খাঁর জয়।"

সের খাঁ সেই বুড়া-বয়সের ভাঙ্গা-গলায় আর একবার গেয়ে উঠল—"জয়, মহম্মদ শার জয়।" সে দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে আবার আর্য্যাবর্ত্তের জয়গান বেজে উঠল। সের খাঁ হাত জোড় করে চান্দোলালকে বল্লে—"মহারাজ, যদি সুখী হোয়ে থাকেন, তবে আমায়, যেখান থেকে নিয়ে এসেছেন, আবার সেইখানে রেখে দিয়ে আসতে হুকুম করে দিন—আজকেই যেন রওনা হোতে পারি।"

* * *

ছ-মাস পরে আবার এক দিন সন্ধ্যেবেলা চান্দোলালের লোকেরা দিল্লীর এক কোণে সের খাঁকে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। যে দিন তারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে দিন আর আজকের দিনের কত প্রভেদ! অনেক দিন পরে আবার হিন্দুস্থান সের খাঁর যশোগান করতে আরম্ভ করেছে, উদ্ধত দাক্ষিণাত্য মাথা নীচু করে তার গলায় জয়মালা পরিয়ে দিয়েছে।

ছুপুরবেলাকার জলন্ত সূর্য্য তখন ঠাণ্ডা হোয়ে, পশ্চিমের নীল সমুদ্রে আধখানা গা ডুবিয়ে, পৃথিবীর দিকে একবার শেষ চাওয়া চেয়ে নিচ্ছিল। ডুবন্ত সূর্য্যের দিকে চেয়ে চেয়ে সের খাঁর মনে হোল, আমার যশোসূর্য্য এখনো অস্ত যায় নি। নবীন উৎসাহই তার বুকে আবার যুবকের বল ফিরে এসেছে। প্রশংসার নেশায় মাতাল সের খাঁ নিজের দরজায় এসে হাঁকদিলে, "মন্না—!"

দরজা খোলা ছিল। সে বাড়ীর ভেতরে গিয়ে ডাকলে, "মন্না—মন্না—" ছাদের ওপর থেকে কে যেন বিদ্রূপের স্বরে তারি গলায় জবাব দিলে মন্না। এ ঘর ও ঘর করে অনেক ক্ষণ ডাকাডাকির পর, একজন প্রতিবেশী এসে খবর দিলে, মন্না নাই—সে নিরুদ্দেশ হবার সাত দিন পরে সে না খেয়ে শুকিয়ে মরে গেছে। মাথা ধরে সে সেইখানেই বসে পড়ল।

দিগ্বিজয়ী সের খাঁ ভাবতে লাগল, যাকে জয় করবার জন্য তাকে কোন দিন কোন কষ্ট পেতে হয় নি, আপনি এসে যে ধরা দিয়েছিল, হঠাৎ দেবতার মতন নিষ্ঠুর হোয়ে সে কেন এমন করে চলে গেল!

দিনের আলো একটু একটু করে কমতে কমতে একেবারে নিভে এল, যেন কার মসীমাথা করস্পর্শে পৃথিবীটা হঠাৎ কালো হোয়ে গেল। আর সেই ঘন অন্ধকার ফুঁড়ে একটা করুণ সুর সের খাঁর কাণে এসে বাজতে লাগল—কোথায় তুমি? চোখের সামনে একখানা সজল মুখ শুধু একবার চক্‌মক্ করে আবার মিলিয়ে গেল। সের খাঁ উঠে দাঁড়াল, মাথায় চান্দোলালের দেওয়া যে জরীর পাগড়ীটা ছিল, সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সে ছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কোথায়? কার সন্ধানে?

ব্রহ্মাণ্ডের এক নূতন শক্তি

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ]

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে একদিন ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটীর সভাগৃহে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর সমক্ষে স্যার্ জে, জে, টমসন্ 'পদার্থের গঠন' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিতেছিলেন। ঐ সভায় একজন বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শেষে তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে বলেন, "ভাই হে, যাহা শুনিলাম তাহাতে দেখিতেছি, তোমার অবস্থা আমার অপেক্ষা ঢের ভাল, যদিও তুমি বিজ্ঞানের কোন ধারই ধার না, এবং আমি আজীবন বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেছি। কারণ, তোমার এখন গোড়া হইতে আরম্ভ করিলেই হইল; আর আমি প্রথম দফায় যাহা শিখিয়াছি, তাহা আমাকে ভুলিতে হইবে; তাহার পর আবার নূতন করিয়া পত্তন করিতে হইবে।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসরের যে সকল আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকদিগের বহুদিন-পোষিত অনেক মতকে এইরূপে ধাক্কা দেয়, রেডিয়মের আবিষ্কারই তাহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই রেডিয়ম আবিষ্কারের মত রহস্যময় ঘটনা আর বোধ হয় পাওয়া যায় না। ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল গোড়া হইতে বরাবর এক ভুল পথে চলিয়া।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রন্‌জন্ কর্ত্তৃক অদৃশ্য আলোকের (X. Rays) আবিষ্কারই এই রেডিয়ম আবিষ্কারের প্রথম সূচনা। অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে প্রথম পরীক্ষাগুলিতে দেখা গেল যে, বায়ুহীন কাচের গোলকের মধ্যে যেখানে ক্যাথোড রশ্মি প্রতিহত হইয়া সবুজবর্ণ আলোক উৎপাদন করিতেছে, এই অদৃশ্য আলোক তথা হইতেই উদ্ভূত হইতেছে। সুতরাং তখন এইটাই সিদ্ধান্ত করা হইল যে, অদৃশ্য আলোক কাচগোলকের এই সবুজ আলোকের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। ইহা হইতে এই স্থির হইল যে, যদি অন্য কোনও উপায়ে এই প্রকারের সবুজ আলোক আমরা পাই, তবে সঙ্গে-সঙ্গে এই অদৃশ্য আলোকও পাইব। আমরা জানি, কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহারা বাহির হইতে নীল বা বেগুনে আলোর প্রভাবে এই সবুজ আলোক বিকীর্ণ করে,—যেমন, য়ুরেনিয়ম নাইট্রেট (Uranium Nitrate)। প্যারীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি বেকারেল্ য়ুরেনিয়ম নাইট্রেট হইতে উদ্ভূত এই আলোক-মধ্যে অদৃশ্য আলোকের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একখানি ফটোগ্রাফির কাচ কাল কাগজে বেশ করিয়া মুড়িয়া এই য়ুরেনিয়ম নাইট্রেটের নিকটে রাখিলেন। ৫।৭ দিন এইরূপ রাখার পর দেখা গেল যে, অদৃশ্য আলোকের নিকটে ধরিলে এইরূপ কাচখণ্ডে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, এখানে ঠিক সেই পরিবর্ত্তনই হইয়াছে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, এই য়ুরেনিয়ম নাইট্রেট হইতে অদৃশ্য আলোক উদ্ভূত হইতেছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কতকগুলি পরীক্ষায় দেখা গেল, আগেকার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ধাতব য়ুরেনিয়ম বাহিরের আলোক প্রভাবে সবুজ বর্ণ আলোক বিকীর্ণ করে না, শুধু য়ুরেনিয়ম নাইট্রেটই করিয়া থাকে, অথচ ধাতব য়ুরেনিয়ম য়ুরেনিয়ম নাইট্রেটের ন্যায় সমভাবে ফটোগ্রাফির কাচের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটায়। এখন দেখা গেল যে, নাইট্রেট অবস্থায় হউক, বা ধাতুর আকারে হউক, য়ুরেনিয়ম হইতে রশ্মি নির্গত হইতেছে; এবং এই রশ্মি রন্‌জন্-আবিষ্কৃত আলোক রশ্মি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

বেকারেলের আবিষ্কৃত এই নূতন রশ্মির—ফটোগ্রাফির কাচের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধন ব্যতীত অন্যান্য গুণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। দেখা গেল যে, তড়িৎ-প্রবাহের প্রতিকূল গ্যাসের মধ্য দিয়া এই কিরণ ছড়াইয়া পড়িলে, এই গ্যাস তড়িৎ প্রবাহের সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়া উঠে। পরন্তু জিঙ্ক সুল্‌ফাইডের ন্যায় পদার্থের পর্দ্দার উপর এই আলোক পড়িলে, ঐ পর্দ্দা সুন্দর আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে। য়ুরেনিয়মের এই নব ধর্ম্ম আবিষ্কারের পর বৈজ্ঞানিকগণ এই গুণযুক্ত অন্য পদার্থের সন্ধানে লাগিয়া গেলেন। পিচ্‌ব্লেণ্ড নামক খনিজ পদার্থ হইতে য়ুরেনিয়ম পাওয়া যায়। ম্যাডাম কুরি দেখিলেন, য়ুরেনিয়ম বাহির করিয়া লইবার পর পিচ্‌ব্লেণ্ডের যে অংশটা অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দেওয়া হইত, উহা এই নব-ক্ষমতাপন্ন রশ্মি বিকীরণে সম-ওজনের

য়ুরেনিয়ম অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। সুতরাং এই পরিত্যক্ত পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে এমন পদার্থ আছে, যাহা য়ুরেনিয়ম অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন। ঐ ত্যক্ত পিচ্‌ব্লেণ্ড হইতে এই পদার্থকে ছাঁকিয়া বাহির করিবার জন্য উহার নানারূপ রাসায়নিক বিশ্লেষণ চলিতে লাগিল। প্রতি রাসায়নিক ক্রিয়ার পর উহার ক্ষমতা প্রতি পদে দশগুণ, শতগুণ, সহস্রগুণ বাড়িতে লাগিল,—যেন এ শক্তির কোন সীমা নাই, কোন অন্ত নাই। অবশেষে অজস্র অর্থব্যয় ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে স্তূপীকৃত পর্ব্বত-প্রমাণ পিচ্‌ব্লেণ্ড হইতে সরিষা ভোর এই তীব্র ক্ষমতাশালী পদার্থ বাহির করা হইল। সমুদ্র মন্থন করিয়া এই যে অমৃত উঠিল, ইহাই রেডিয়ম।

বিজ্ঞান বলে, এই বিশ্বে শক্তির হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই। এক স্থান হইতে যে শক্তি লুপ্ত হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে, ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি অন্য স্থানে অন্য রূপে দেখা দিতেছে। উত্তাপ হইতে গতিশক্তি, গতিশক্তি হইতে তাড়িৎশক্তি, আবার বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে তাপ-শক্তি—শক্তির অবিরাম রূপান্তর চলিতেছে। এই রূপান্তরে শক্তি এতটুকু বাড়িতেছে না, বা কমিতেছে না। দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যকিরণের যতটুকু শক্তি কয়লার মধ্যে নিহিত ছিল, আজ ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি ইঞ্জিন চালাইয়া জল তুলিতেছে, ময়দা পিষিতেছে, মানুষকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

থড়্‌কের ডগায় করিয়া একটু রেডিয়ম জিঙ্ক সল্‌ফাইডের পদ্দার সাম্‌নে ধরিয়া, একখানি স্থূল-মধ্য কাচের ভিতর দিয়া নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায়, অসংখ্য আলোক-স্ফুলিঙ্গ ঐ পদ্দাটীকে আলোকিত করিতেছে। আজ দেখ, কাল দেখ, দু'দিন পরে দেখ, দু'বছর পরে দেখ—ঐ আলো সমভাবে ঐখানে দেখা যাইতেছে। শুধু এই আলোক উৎপাদন করা নয়,—দেখা যায়, রেডিয়ম হইতে তাপ স্বতঃই উদ্ভূত হইতেছে; এবং ইহা হইতে অনুক্ষণ যে রশ্মি নির্গত হইতেছে, তাহা তড়িৎ-সংযুক্ত। দিন নাই, রাত নাই, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই যে নানাজাতীয় তেজ অবিরত নির্গত হইতেছে, এক কণা রেডিয়মের এই প্রচণ্ড শক্তি কোথা হইতে আসিল? ছেলেদের বইএ একটা গল্প আছে; এক দরিদ্র বালক তাহার গুরু মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে তাহার দীনবন্ধু দাদার প্রদত্ত একটা ছোট দইয়ের ভাঁড় লইয়া হাজির হয়। সেই ভাঁড় যতই উপুড় করা হইল, ততই তাহা হইতে দই বাহির হইতে লাগিল; এবং দুই হাজার লোক খাওয়ানর পর নাকি দেখা গেল সেই ভাড়ে দই ঠিক সমভাবে বজায় আছে। এই প্রকার গল্প তো এতদিন ছেলেদের বইএ ছিল; রেডিয়ম আবিষ্কারের পর এখন কি উহা বিজ্ঞানের বইএও দেখা দিল! কিন্তু এমনও তো হইতে পারে, রেডিয়মের এ শক্তি তাহার নিজস্ব নয়, ধার করা। বাতাস যতই স্থির আছে বলিয়া মনে হউক, ইহার অণুগুলি ভীমবেগে চারিদিকে ছুটিতেছে। রেডিয়মের প্রকৃতি, ইহার গঠন হয় ত এইরূপ যে, এই অণুগুলির আঘাত-জনিত শক্তিকে রূপান্তরিত করিয়া উত্তাপ, আলোক ও তড়িৎ বিকীর্ণ করিতেছে। কিন্তু তাহা যদি হয়, তো, বাহিরের বাতাসের উত্তাপ বা শৈত্যের প্রভেদে, উহার চাপের আধিক্যে বা হ্রাসে, রেডিয়মের শক্তি উদ্গীরণ করিবার ক্ষমতার তারতম্য হইবে। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, একই মাত্রায় রেডিয়ম হইতে তেজ নির্গত হইতেছে, বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে ইহা সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। তবে তো ইহার শক্তি বাহির হইতে পাওয়া নয়। জন্তুবিশেষকে পিটিয়া অপর জন্তুতে পরিণত করা যায় না। প্রতিভা জন্মগত হইয়া থাকে। রেডিয়ম তাহার শক্তি তাহার জন্মের সহিত পাইয়াছে; অপরে তাহা ইহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছে না।

একটুক্‌রা সোণাকে ক্রমাগত ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে চলিলে, শেষে উহা এমন অবস্থায় গিয়া পৌঁছায়, যখন আর উহাকে ভাঙ্গা চলে না। এই অবস্থার পদার্থকে বৈজ্ঞানিকেরা এটম্ বলেন। এই এটম্‌কে যে আর ভাগ করা যায় না,—বিজ্ঞানের এ কথাকে এখন আর শেষ কথা বলিয়া ধরা চলে না। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, এ এটম্‌কেও ভাঙ্গা যায়; এবং উহা ভাঙ্গিয়া যে ইলেক্‌ট্রন্ পাওয়া যায়, সে ইলেক্‌ট্রনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই—তা যে ইলেক্‌ট্রন্ যে পদার্থ ভাঙ্গিয়া পাওয়া যাউক না কেন! সোণা ও সীসা ভাঙ্গিয়া যদি সেই একই ইলেক্‌ট্রন পাওয়া যায়, তো, সোণার ও সীসার এ পার্থক্য কোথা হইতে আসিল? সোণা কিছু আর সীসা নয়! সংযোগ-তড়িৎ-যুক্ত অপেক্ষাকৃত একটা বড় পদার্থকে ঘিরিয়া বিয়োগ-তড়িৎ-যুক্ত কতকগুলি ছোট ইলেক্‌ট্রন দ্রুত বেগে ঘুরিতেছে। সূর্য্য ও তাহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণ্যমান গ্রহ-উপগ্রহ

লইয়া যেমন এই সৌরজগৎ— সেইরূপ, এই সকল চলন্ত ইলেকট্রন লইয়া এক একটা এটম্। সোণার এটম্ সীসার এটম্ হইতে ভিন্ন, কারণ উভয়ের মধ্যে ইলেকট্রনদের সংখ্যা ও ঘুরিবার ধারা পৃথক্। সোণার এটমে ইলেকট্রনগুলি এক রকমে ঘুরে,— সীসার এটমে তাহারা সংখ্যায় ভিন্ন ও ভিন্ন রকমে ঘুরে,— তফাৎ শুধু এই। সোণাকে সীসা করা যায় না; কারণ, ইলেকট্রনদের ঘুরিবার ধারা মানব আজও বদলাইতে পারিতেছে না। কিন্তু মানব আজ যাহা পারিতেছে না, প্রকৃতির রাজ্যে তাহা স্বতঃই সম্পাদিত হইতেছে। রেডিয়ম হইতে দিন রাত ইলেকট্রন ছুটিয়া বাহির হইতেছে। তাহারই ফলে, ইহার শক্তির বিকাশ; এবং অঙ্গীভূত ইলেকট্রনদিগের ত্যাগের পরিণামে ইহা ক্রমশঃ ভিন্ন পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

অন্তরস্থ ইলেকট্রনদের গতিজনিত পদার্থের আভ্যন্তরিক শক্তির পরিমাণের একটা আভাস পাওয়া গিয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে রাসায়নিক শক্তি, মাধ্যাকর্ষণের শক্তি, আলোক, উত্তাপ ও চুম্বকের শক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত, চমৎকৃত হইতেছি। এই বিশ্বের বিশালত্ব আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু আজ আমরা দেখিতেছি— একটা সামান্য বালুকণা যাহাকে এতদিন আমরা নীরব, নিথর, নির্জ্জীব, ক্ষুদ্র বলিয়া অবহেলা করিয়া আসিয়াছি, কি প্রচণ্ড শক্তি উহার মধ্যে নিহিত না রহিয়াছে! প্রাকৃতিক শক্তিকে করায়ত্ত করিয়া মানব সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে। অল্প ব্যয়ে প্রভূত শক্তিলাভ তাহার সভ্যতার চরম লক্ষ্য। তাহার দুঃখ এই যে, এই পৃথিবীতে কয়লার খনি এত অল্প, জলপ্রপাত এত বিরল। তাহার চেষ্টা, কি করিয়া সে সৌর তেজকে করায়ত্ত করিবে,—বাতাসের গতিকে কাজে লাগাইবে। কিন্তু আজ সে এক বিরাট শক্তির উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছে। কোথায় লাগে ইহার কাছে সৌরতেজ, কোথায় দাঁড়ায় ইহার নিকট মাধ্যাকর্ষণের বল! এ উৎস তাহার দরজার গোড়ায়, তাহার বাড়ীর ভিতর, তাহার মুঠার মধ্যে। করস্থিত এতটুকু বাতাসের আভ্যন্তরিক শক্তি প্রয়োগে সে পর্ব্বত উপড়াইতে পারে, এক চিম্‌টা লবণের ভিতরের শক্তি বাহির করিয়া সে একটা নগরকে নগর ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। এই বিশাল শক্তির উৎস সে খুঁজিয়া পাইয়াছে—শুধু তাহার জানিতে বাকী, কি করিয়া এই শক্তি সে আপন করায়ত্ত করিবে।

রেডিয়ম হইতে যে শক্তি স্বতঃই নির্গত হইতেছে— আজ হউক, কাল হউক, দশ বৎসর পরে হউক, শত বৎসর পরে হউক, মোটরের পেট্রোলের মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দিয়া যেমন সে ভীমবল আহরণ করিতেছে, সেইরূপ আপাততঃ অজ্ঞেয় কোন উপায়ে সে প্রতি পদার্থ হইতে তাহার আভ্যন্তরিক শক্তি টানিয়া বাহির করিবে। তখন এই ধরাধামের ইতিহাস আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। পৃথিবীর সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য তখন নূতন ভিত্তির উপর দাঁড়াইবে,— বর্ত্তমান অর্থনীতি, অর্থশাস্ত্র তখন একেবারে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কলিকাতা হইতে লণ্ডনে যাইতে হইলে তখন সোণার গিনি দিয়া টিকিট কিনিতে হইবে না,— ঐ গিনির আভ্যন্তরিক বলই তখন লণ্ডনে পৌছাইয়া দিবে। হাতে আংটী বা গলায় হার পরা তখন পুরাতন অসভ্য যুগের প্রথা বলিয়া বিবেচিত হইবে, তখন খপ্ করিয়া বাজুবন্দ দিয়া আর গৃহিণীর মুখভার দূর করা যাইবে না। সে দিন যখন আসিবে, তখন গৃহস্থ কাঠকয়লা বা তেল পোড়াইবে না,—তখন বোম্বাই মেলের ইঞ্জিন খুলিয়া এক-টুকরা সোণা লাগাইয়া দেওয়া হইবে। সে দিন ভূতত্ত্ববিৎ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ব্যতীত আর কেহ কোন দিন প্রয়োজনীয় বোধে কয়লা সংগ্রহ করিবে না।

আজ বিজ্ঞান ব্রহ্মাণ্ডের এক বিরাট শক্তির উৎসের সন্ধান দিয়াছে। তাহার আশা আছে, কাল সে ঐ শক্তি আহরণ করিয়া মানবের কাজে লাগাইবে।

প্রায়শ্চিত্ত

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ]

(১)

পত্নী-বিয়োগের পর বাসগৃহ জ্যেষ্ঠের সহিত পৃথক করিয়া লইয়া, সঞ্জীব সেই যে দেশত্যাগ করিয়াছিল, তাহার পর দীর্ঘ ছয় বৎসরের মধ্যে একটীবারও সে দেশে ফিরে নাই। এত কাল অজ্ঞাতবাসের পর যখন সে সহসা দেশে ফিরিয়া আসিয়া, গৃহ সংস্কার ও নির্ম্মাণ কার্য্যে মন দিল, তখন সে যে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহা সকলেই অনুমান করিয়া লইল। সে লক্ষপতি হইয়া আসিয়াছে, কিংবা পঞ্চাশৎ সহস্র-মুদ্রার অধিকারী হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রতিবেশিগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও, সে যে প্রভূত অর্থশালী হইয়াছে, সে বিষয়ে সকলেই একমত হইল। বৈঠকখানা নির্ম্মাণ শেষ করিয়া, যখন সঞ্জীব বাড়ীর ভিতরকার দক্ষিণ দুয়ারী সব চেয়ে ভাল ঘরটী ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া, সেখানে ফুলবাগান আরম্ভ করিয়া দিল, তখন দেশের বুদ্ধিমান লোক সহজেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে অর্থ, বিদ্যাবুদ্ধির অপেক্ষা আদৌ রাখে না; এবং মানুষের শরীরের যে অংশটুকুর উপর বিধাতৃ পুরুষ থাকের কলম দিয়া বিদ্যার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহারি উপর ধনোপার্জ্জন মূলতঃ নির্ভর করিয়া থাকে।

সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। যে গৃহে কমলার অধিষ্ঠান হয়, শুনা যায়, সে গৃহে পরিজনবর্গের কখনও অভাব ঘটে না। কিন্তু সেই যে একটা পাচক ও ভৃত্য লইয়া সঞ্জীব গৃহ-প্রবেশ করিয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত শুধু তাহারাই গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিয়া আসিতেছে। গৃহের বহির্ভাগের শ্রী সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া গেল; কিন্তু তাহার অভ্যন্তরের সৌন্দর্য্য কখন যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, তাহার সুদূর সম্ভাবনাও বাহিরে বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাইল না। ঝড়-ঝাপটের সম্মুখে রহিয়া কতজনেরি ত পর্ণকুটীর ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু তাহা নূতন করিয়া গড়িতে কয়জন বিলম্ব করিয়া থাকে?

সুবুদ্ধি যখন আপনা হইতে আসে না, তখন বাধ্য হইয়া অপরকে তাহা যোগাইতে হয়। জন-কয়েক হিতৈষী প্রতিবেশী সঞ্জীবকে বলিল, দুখানি কোমল, রাতুল চরণের নূপুর নিক্কণ, দুটী ইন্দীবর নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত ভিন্ন এ সুসজ্জিত গৃহ অশোভন দেখাইতেছে। আর এই দারুণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দু ফোটা জল বাতিরেকেই বা পিতৃপুরুষের প্রাণ কি প্রকারে বাঁচিবে?

গদাধর পুরোহিত, একদিন শিখাতে একটা ফুল বাঁধিয়া, নামাবলী গায়ে দিয়া সঞ্জীবের গৃহে দর্শন দিলেন। খুব আত্মীয়তা দেখাইয়া বলিলেন— "কোন দুঃখে সোণার পুরী এমন শ্মশান করে রেখেছ বাবা? আমি দিব্যি সুন্দরী মেয়ে দেখে এসেছি,— আসছে বৈশাখেই তোমার বিবাহ দিয়ে আনব।"

সঞ্জীব সবিনয়ে জানাইল যে, এ বৃদ্ধ বয়সে তাহার জন্য দুর্ভাবনায় নিজের শরীর খারাপ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। দরকার হইলে সে নিজেই দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে পারিবে।

বাহিরে আসিয়া গদাধর পুরোহিত প্রকাশ করিয়া দিল, লোকটা এতকাল ধরিয়া নিশ্চয় কিস্কিন্ধ্যায় অজ্ঞাতবাস করিতেছিল,—তাই এমন কাটখোট্টা হইয়া ফিরিয়াছে। তখন সঞ্জীবের সকল শুভানুধ্যায়ীরা একযোগে তাহার হিত-কামনা ত্যাগ করিল।

২

ছোট্ট একটা ছিদ্রের দোষে বড় বড় জাহাজকে সমুদ্রের তলশায়ী হইতে হয়। যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি সত্ত্বেও উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য সঞ্জীবের ভ্রাতা রাজীব ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া আসিতে-ছিল। চক্ষুর পানরক্তিমাবসানে একদিন রাজীব পত্নী গিরিজায়ার কথায় চাহিয়া দেখিল— কন্যা নলিনীর বয়স চতুর্দ্দশ উত্তীর্ণ-প্রায়। সেই দিন হইতে রাজীব কন্যার পাত্রের জন্য মাঝে-মাঝে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। পাত্র অনেক মিলিল, কিন্তু তাহার মূল্যের কথা শুনিয়াই রাজীবকে সাত হাত হটিয়া আসিতে হইল।

গিরিজায়া বুঝিল, তাহার স্বামীর উপরে নির্ভর করিলে,

নলিনীর বিবাহের পূর্ব্বেই তাহাদের দুর্নামে দেশ ভরিয়া উঠিবে। স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া সে একটা উপায় স্থির করিল।

একদিন অপরাহ্ণে সঞ্জীব তাহার বাগানের সমস্ত ফুলগুলি একত্র করিয়া, তাহারি রোপিত শেফালীর নীচে ফুলশয্যার মত করিয়া সাজাইতেছিল, এমন সময় গিরিবালা ছোট ছেলেটীকে কোলে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সঞ্জীব হাতের ফুলগুলি সেন সাজাইয়া দিয়া, ভ্রাতৃজায়ার বাক্যের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

গিরিজায়া একটু সস্নেহে বলিল "ঠাকুরপো, পুরানো কথা মনে করে এখনও কষ্ট পাচ্ছ কেন?" সঞ্জীব তাহার পানে চাহিয়া রহিল, কিছু উত্তর দিল না।

এ সব কথা অপ্রিয় অনুমান করিয়া, গিরিজায়া চাপিয়া গেল। অন্য কথা তুলিয়া বলিল—"নলিনী এই চৌদ্দ বছরে পড়েছে। তার বিয়ে না দিলে তো আর চলে না; এখন বিয়ে না দিলে তো তোমারও নিন্দে হবে।"

সঞ্জীব তথাপি নিরুত্তর রহিল।

গিরিজায়া বলিয়া গেল—"তোমার দাদা একটী ছেলে দেখে এসেছেন, ছেলেটী ডাক্তারি পড়ছে, অবস্থাও ভাল। আসছে শনিবারে তার বাপ নলিনীকে দেখতে আসবেন। দু'হাজার টাকা হলেই বিয়েটা হয়।"

এতক্ষণ পরে সঞ্জীব কথা কহিল; বলিল "তা আমার কাছে এ সব কথা বলছ কেন?"

গিরিজায়া উত্তর দিল—"তোমার দাদার অবস্থা তো জান ভাই, অত টাকা কোথায় পাবেন?" সঞ্জীব নিতান্ত পরের মত পরামর্শ দিল "তা হলে যেখানে কমে হবে, সেখানেই চেষ্টা দেখা উচিত।"

একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া গিরিজায়া বলিল—"ঠাকুরপো, তুমি থাকতে তোমার ভাইঝি যে পয়সা অভাবে অপাত্রে পড়বে, সে কি তোমারি ভাল লাগবে?"

সঞ্জীব নিতান্ত হৃদয়হীনের মত উত্তর দিল—"তার জন্যে আমার বিশেষ দুঃখ হবে না। ২০০০৲ টাকার কথা ছেড়ে দেও, ২০০৲ টাকা দেবারও আমার ক্ষমতা নেই। আর ক্ষমতা থাকলেও দেবার আমার ইচ্ছে নেই। তুমি মিছামিছি এতখানি কষ্ট করে এসেছ।"

ক্ষোভে ও দুঃখে গিরিজায়ার চক্ষে জল আসিল। সে আর দ্বিতীয় কথাটী না বলিয়া ফিরিয়া গেল। বাড়ী ফিরিতেই রাজীব জিজ্ঞাসা করিল—"কি হল, কিছু সুবিধা করতে পারলে?"

চক্ষু মুছিয়া গিরিজায়া বলিল—"তোমারি জন্যে তো আমাকে আজ এ অপমান সইতে হ'লো। নইলে ঠাকুরপো তো এমন ছিল না।"

টাকা পাওয়া যাইবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া রাজীব ঘরে বসিয়াই একটু পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ পানীয়-বিশেষ উদরস্থ করিয়াছিল। ঈষৎ জড়িতকণ্ঠে পত্নীকে বলিল—"যাও তুমি কোন কম্মের নও।" গিরিজায়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

তবু সেই সুপাত্রের সহিতই নলিনীর বিবাহ হইল। নলিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী; তাহাকে দেখিয়াই পাত্রের পিতা রামরূপ মুখোপাধ্যায়ের কেমন একটু সস্নেহ মমতা হইল। আজি-কালিকার দিনে দুর্লভ হইলেও রাজীবের অক্ষমতা জানিয়া তিনি বিনাপণে রাজীবের কন্যাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করিলেন। সঞ্জীব একবার বিবাহ-বাটীর ছায়াও মাড়াইল না। সকলেই বুঝিল, আত্মীয় যখন পর হইয়া যায়, তখন নিঃসম্পর্কীয়ের চেয়েও অনাত্মীয় হইয়া দাঁড়ায়।

২

অপরাহ্ণে ব্রজেন্দ্র আসিয়া কহিল "সঞ্জীব, সব শুনেছ?" ব্রজেন্দ্র সঞ্জীবের বাল্যবন্ধু ও সতীর্থ। সে এখন কলিকাতার এক বে-সরকারী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা করে।

সঞ্জীব উত্তর দিল—"কি শুনব?"

ব্রজেন্দ্র। তোমার দাদার কীর্ত্তি।

সঞ্জীব। হাঁ, শুনেছি বৈ কি।

ব্রজেন্দ্র। এখন উপায় কর।

সঞ্জীব। আমি আর কি উপায় করব, আদালত ত এক রকম করেই দিয়েছে।

ব্রজেন্দ্র। তা বটে; কিন্তু সে ত বড় সহজ কথা নয়। আজ ডেপুটি দয়া করে ছেড়ে দিয়েছেন, পরশু হয় জরিমানার ২০০০৲ টাকা দিতেই হবে; না যদি পারেন এক বৎসর জেল অনিবার্য্য। এক রকম ক'রে গোলমালটা মিটিয়ে দাও।

সঞ্জীব। দেখ ব্রজেন, অনাথার একটীমাত্র মেয়ে, তার নামে যে কলঙ্ক দিতে যায়, তার যে সর্ব্বনাশ করতে যায়—

তার শাস্তি হওয়া কি উচিত নয়? যদি তার স্বামী সে দিন দৈবগতিকে উপস্থিত না থাকত, সব ঘটনা যদি স্বচক্ষে না দেখত, তা'হলে কি সন্দেহ তার মনে চিরকালের মত লেগে থাকত, ভাব দেখি। আর, মেয়েটাকে যদি তার স্বামী ত্যাগ করত, কি উপায় হ'ত তাদের? তার স্বামী যে লোক-জানাজানির ভয় না ক'রে মানহানির মকদ্দমা এনেছে, এতে আমার সত্যিই আনন্দ হ'য়েছে। এ সব অপরাধের শাস্তি না হ'লে এগুলো আরও বেড়ে ওঠে।

ব্রজেন্দ্র। তা সত্য বটে, কিন্তু এখন তোমার দাদার হাতে সত্যিই কিছু নেই। তুমি টাকা না দিলে তো উপায় নেই। হাজার হোক তোমার দাদা—তুমি 'না' বলতেও পার না।

সঞ্জীব। কেন পারিনে? তিনি যে ভয়ানক অপরাধ করেছেন, এ অর্থদণ্ড তার তুলনায় অতি সামান্য। আর, সে দণ্ডও যদি আমি দিই, তাহলে তাঁর কি শাস্তি হ'ল? ব্রজেন, আমার এ টাকা অনেক কষ্টে, অনেক দুঃখে উপায় করেছি— ও রকমে সেগুলো অপব্যয় করতে পারব না।

ব্রজেন্দ্র। কি বলছ তুমি সঞ্জীব? তোমার দাদাকে জেল থেকে বাঁচাবার জন্যে তুমি যে টাকা দেবে, সেটা তোমার অপব্যয় হ'বে?

সঞ্জীব। এ ক্ষেত্রে তাই হবে।

ব্রজেন্দ্র। তোমার বৌদিদি আজ আমাদের বাড়ী গিয়েছিলেন। আমাকে বলে এলেন—'ছোটবৌ মারা যাবার পর থেকে ঠাকুরপো আমাদের ওপর অনর্থক রাগ করে আছেন,—তুমি গিয়ে তাঁর দাদাকে উদ্ধার করতে বলে এস। আমরা বললে কিছু হবে না।' আমি তাঁকে বলেছিলাম,— 'এ অবস্থায় সঞ্জীব আপনাদের সাহায্য করবে না, এ মনে করাই আপনাদের ভুল।' এখন দেখছি আমারি ভুল। তুমি কি করে এমন হ'লে সঞ্জীব?

সঞ্জীব অত্যন্ত বেগের সহিত কি একটা বলিতে গিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইল। তাহার উত্তেজনা কমিয়া গেলে, পূর্ব্ববৎ ধীর স্বরে বলিল—"আমি বরাবরই এমনি ছিলাম, ব্রজেন্দ্র, তোমরা চিনতে পার নি।"

ব্রজেন্দ্র এবার বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল— "তাহ'লে তুমি সাহায্য করবে না?"

সঞ্জীব অবিচলিত স্বরে কহিল—"কিছুতেই না।"

ব্রজেন্দ্র প্রস্থানোদ্যম করিয়া একটু দাঁড়াইয়া বলিল— "সঞ্জীব, দেশের মধ্যে তুমিই একমাত্র বন্ধু ছিলে,—তুমিও পর হ'লে।"

সঞ্জীব কপালে হাত রাখিয়া বলিল—"আমার দুর্ভাগ্য!"

ব্রজেন্দ্র শেষবার বলিল—"তোমাকে যে কতখানি শ্রদ্ধা করতাম সঞ্জীব, তা তুমি জান না। টাকা তোমার এত বড় হয়েছে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আজ সত্যিই তোমার ওপর ..."

সঞ্জীব শেষটুকু জোগাইয়া দিয়া বলিল—"ঘৃণা হচ্ছে, না ব্রজেন? শুনে সুখী হ'লাম।"

ব্রজেন্দ্র আর সেখানে দাঁড়াইল না।

সব শুনিয়া রাজীব চারিদিক অন্ধকার দেখিল। স্ত্রীর গায়ে এমন কিছু অলঙ্কার নাই যাহা বিক্রয় করিয়া দুইশত টাকার বেশী সংগ্রহ করিতে পারে। বাড়ীখানাও ২০০০ টাকায় বন্ধক পড়িয়াছিল।

গিরিজায়া পরামর্শ দিল "তুমি নিজে একবার ঠাকুরপোর কাছে যাও, যদি কিছু ফল হয়।" রাজীবের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল; সে বলিল "আমি কি করে যাই?" গিরিজায়া বুঝাইয়া দিল "এখন আর চক্ষুলজ্জার সময় নেই, যেতেই হবে। তুমি গেলে সে কিছুতেই 'না' বলতে পারবে না।" সন্ধ্যার পর বিদ্রোহী পা দুটাকে কোন প্রকারে টানিয়া লইয়া রাজীব কনিষ্ঠের গৃহে গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া রাজীব উদ্বিগ্ন স্ত্রীকে সংবাদ দিল— "সে আমার সঙ্গে দেখাও করলে না। তার চাকর এসে বললে—'বাবু বললেন, তিনি একটা টাকাও আপনাকে দিতে পারবেন না, বৃথা এসেছেন।'" কথা কয়টি বলিয়া অপমানে সত্যই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

আপনার অশ্রু গোপন করিয়া গিরিজায়া বলিল "তুমি যাই হ'ও, তবু তো তার বড় ভাই। একটা দিনও তো তার উপকার করেছ। এই বিপদের দিনে সে এমনি করে সরে দাঁড়াল!" রাজীব অশ্রু মুছিয়া বলিল "তাহ'লে জেল খাটাই অদৃষ্টে আছে দেখছি।" গিরিজায়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"ছি, ও কথা মনেও কোরো না। কাল ভোরে উঠেই তুমি একবার গোঁসাই-বাড়ী যেও, খুব বেশী সুদ স্বীকার করে অন্ততঃ একমাসের জন্য টাকাটা নিয়ে এস। তার পর এ বাড়ী বিক্রী করে, বন্ধকের দেনা আর

গোসাইদের দেনা শোধ কর। নিজেরা না হয় বাসা করেই থাকব।"

যাহাকে সে চিরকাল অবজ্ঞা করিয়াই আসিয়াছে, যাহার প্রতি নির্য্যাতন করিতেও ত্রুটি করে নাই, সেই পত্নী আজ তাহাকে একটীবারও দোষের জন্য ভর্ৎসনা না করিয়া, কিসে সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে, তাহারি জন্য নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে,—ইহা দেখিয়া তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন চিত্তে এত কাল পরে অনুতাপের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। এত দিন পরে আজ তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের অপরাহ্নে, তাহার উপেক্ষিতা স্ত্রীর পানে শ্রদ্ধাপূরিত অনুরাগের সহিত চাহিয়া রাজীব বলিল—"এবার যদি রক্ষা পাই, আর কখন তোমাকে মনঃকষ্ট দেব না। যে জিনিষ আমার সর্ব্বনাশ করেছে, তা আর কখন ছোঁব না।"

কিসের একটা আবেগ রোধ করিতে না পারিয়া, বসনাঞ্চল মুখে দিয়া গিরিজায়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সে রাত্রি প্রভাত হইল। সকালে উঠিয়াই রাজীব টাকার জন্য শেষ চেষ্টায় বাহির হইল।

অতিরিক্ত সুদেও কোন স্থানে টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বেলা ৯টায় যখন রাজীব ব্যর্থমনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিল, দেখিল, বাহিরের ঘরে একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। রাজীব সে ঘরে প্রবেশ করিতেই, ভদ্রলোকটী বলিলেন—"আপনি কি রাজীব বাবু?"

রাজীব বিস্মিত হইয়া বলিল "আজ্ঞা হাঁ, আপনাকে তো চিনতে পারছি না।"

আগন্তুক বলিলেন—"আপনার আত্মীয় নকুল বাবুকে জানেন?" রাজীব শুনিয়াছিল, তাহার দূর সম্পর্কের এক শ্যালক নকুল বাবু কলিকাতায় থাকিয়া পাটের দালালি করেন। কিন্তু তাহাকে সে কখনও দেখেও নাই, তাঁর বাসাও চিনে না।

সে বলিল—"আপনি কি নকুল বাবু?"

আগন্তুক—"আজ্ঞা না, আমি তাঁর একজন কর্ম্মচারী। তিনি লোকমুখে আপনার বিপদের কথা শুনে, আপনার সাহায্যের জন্য ২০০০৲ টাকা পাঠিয়েছেন। নিজেই আসতেন, কিন্তু বড়ই কাজের ভিড়ে আসতে পারলেন না। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।" বলিয়া আগন্তুক পকেট হইতে দুইটী বড় নোটের তাড়া বাহির করিয়া, অতিমাত্র বিস্মিত রাজীবের হস্তে দিলেন।

আগন্তুক তাহার এক ঘণ্টা পরেই কিছু জলযোগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে জরিমানার টাকা দিয়া রাজীব মুক্তি লাভ করিল।

(৪)

আশ্বিনের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময় প্রভাত। নিজহাতে-রোপিত শেফালি বৃক্ষ হইতে অজস্র ফুল ঝরিয়া পুষ্পাস্তীর্ণ যে স্থানটাকে আরও ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার কাছে দাঁড়াইয়া সঞ্জীব একদৃষ্টে সেই পুষ্পশয্যার পানে চাহিয়া ছিল। সহসা পিছন হইতে কাহার করস্পর্শে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল, ব্রজেন্দ্র।

সেই ঘটনার পর দুইমাসের মধ্যে দুই বন্ধুর আর সাক্ষাৎ হয় নাই। ব্রজেন্দ্র বলিল—"আমায় ক্ষমা কর ভাই! আমি তোমার ওপর বড় অবিচার করেছিলাম।" সঞ্জীব একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—"ক্ষমা কেন?"

ব্রজেন্দ্র বলিল—"আমি সব জানতে পেরেছি।"

সঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিল—"কি জানতে পেরেছ?"

ব্রজেন্দ্র বলিল—"ঘরের মধ্যে চল বলছি।"

ঘরের ভিতর আসিয়া দুইজনে বসিল। ব্রজেন্দ্র বলিয়া গেল "দেখ, যেদিন শুনলাম, তোমার দাদার মেয়ের বিবাহে তুমি কিছু দিতে চাওনি, তখন একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। তার পর যখন শুনলাম যে, এক ভদ্রলোক বিনা পণে—তা' আবার শিক্ষিত ছেলের—বিবাহ দিচ্ছেন, তখন আরও বিস্মিত হ'লাম। একটু সন্দেহও হ'ল। বরাবর দেখে এসেছি, যিনি পণ নেবেন না বলেন, হয় তিনি এমন জায়গায় ছেলের সম্বন্ধ স্থির করেন, যেখানে না চাইলেই বেশী পাওয়া যায়—না হয় যত দিন না সুবিধামত সম্বন্ধ আসে, ততদিন ছেলের বিবাহ বন্ধ রাখেন, গরীব বা গৃহস্থ কন্যাদায়গ্রস্ত এলে বলেন, ছেলে উপার্জ্জনক্ষম না হলে বিবাহ দেবেন না, নইলে কোন আপত্তি ছিল না। তার পর বেশ অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক এলেই আর অনুরোধ এড়াতে পারেন না। এ হেন দেশ ও কালে ওরূপ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখলেই পাপ মনে সন্দেহ হয় বৈ কি। তার পর যখন বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেল এবং তাতে তুমি নিতান্ত উদাসীনের মত রইলে, মোটেই যোগ

দিলে না, তখন সে সন্দেহটা প্রায় ভুলে গেলাম; ভাবলাম, হবেও বা! লোকের মন উঁচুই হচ্চে আজ কাল।

"তার পর তোমার দাদার মুক্তির জন্য টাকা চাইতে এসে যে দিন বিফল হ'য়ে ফিরি, সে দিন ক্ষোভে, ক্রোধে আমার চোখ ফেটে জল আস্‌ছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, 'আর কখন তোমার বাড়ীর চৌকাট মাড়াব না। তোমাকে আমরা বরাবর sentimental বলে ঠাট্টা করে এসেছি;—সেই তুমি কি করে এমন কঠিন হ'লে, কিছুতেই আমি ভেবে ঠিক করে উঠ্‌তে পারি নি। মন থেকে জোর করে ও-সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে তার পর দিন সকালে কলকাতায় চলে যাই।

"পরের সপ্তাহে ফিরে এসেই শুনলাম, তোমারি দাদার কোন আত্মীয় টাকা পাঠিয়ে তোমার দাদাকে বাঁচিয়েছেন। এত বড় আত্মীয় এমন ভাবে আপনাকে এত দিন গোপন করে রেখেছিলেন যে, তার সঙ্গে তোমার দাদার কখন দেখা পর্য্যন্ত হয় নি। এ সব জেনে আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। সঙ্গে-সঙ্গে মনে একটা কৌতূহলও জাগ্‌ল। একটা সন্দেহও যে এর সঙ্গে ছিল না, তা নয়। সামনেই দিন পাঁচেকের ছুটী ছিল। সে কটা দিন আমি সেই মহাত্মার অনুসন্ধানে কাটিয়ে দিলাম। তোমার দাদার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শুনলাম, তিনি ১০ বৎসর দেশেই যান নি। কল্‌কাতায় আছেন এবং পাটের দালালি করেন, এই পর্য্যন্ত তাঁরা বল্‌তে পারেন।

"অনেক পরিশ্রম করে, এক মাস পরে যখন তাঁর সন্ধান করে, তাঁর অপূর্ব্ব দানশীলতার জন্য তাঁকে অভিনন্দন কর্‌লাম, তখন তাঁর মুখে যে ভাবটা ফুটে উঠ্‌ল, সেটা আর যাই হোক, বিনয়ের সঙ্গে তার যে কোন সম্বন্ধই নেই, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। তাঁর যে রাজীব নামে এক ভগিনীপতি আছেন, তা তাঁকে অনেক কষ্টে স্মরণ করিয়ে দিতে হ'ল। বুঝে নিলাম, তাঁর দ্বারা সাহায্য কাজটা হয় নি। মনে হ'ল, যৌতুক না নেওয়া এবং এই টাকা দেওয়া—এ দুটোর ভেতরে হয় ত একটা সম্বন্ধ আছে। তাই মনে করে, নলিনীর শ্বশুর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। সেখানে একটা সূত্র পেলাম। তার পর অনেক বুদ্ধি খরচ করে, ও অনেক কষ্টে রহস্য ভেদ করে, গুপ্ত সাহায্যকারীর কাছে উপস্থিত হয়েছি।"

সঞ্জীব এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া সব শুনিতেছিল। ব্রজেন্দ্রের কথা শেষ হইলে, একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিল—"এ সমস্ত জানবার কি দরকার ছিল তোমার, ব্রজেন? কিসের জন্যে তুমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে, এরই অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছ? কেন তুমি বন্ধু হ'য়ে আমার শত্রুর কাজ করলে? কিসের জন্যে তুমি আমার সমস্ত আয়োজন, সকল চেষ্টা এমন করে ব্যর্থ করে দিলে?"

সঞ্জীবের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ও তিরস্কারে ব্রজেন্দ্র একটু হতবুদ্ধি হইয়া গেল। একটু পরেই বলিল- "এতে কি অন্যায় করেছি সঞ্জীব? তুমি ইচ্ছা করে লোকের কাছে আপনাকে ঘৃণিত করে রাখছিলে, আমি তোমার সেইটেকে দূর করে দেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি। কিন্তু তবু সব প্রথমে তোমার কাছে এসেছি।"

সঞ্জীব তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"না ব্রজেন, এ কথা তুমি জীবনে কাকেও বল্‌তে পাবে না। কেন যে এ সব আমি অতি গোপনে রেখেছি, তা তোমায় বল্‌ছি শোন।" সঞ্জীব আবার শয্যার উপর বসিয়া বলিতে লাগিল—"আজ ছবৎসর পরে, যে কথা কাউকে বলিনি, সে কথা তোমার কাছে বাধ্য হয়ে প্রকাশ কচ্ছি। আমার যখন স্ত্রী-বিয়োগ হয়, কলকাতায় থেকে তুমি তখন বোধ হয় বি-এ, পড়। সবাই তোমরা জান, সে হঠাৎ apoplexyতে মারা যায়। কিন্তু সেটা মিছে করে রটান হয়েছিল,—সে apoplexyতে মরেনি। ঐখানে যে দক্ষিণমুখো ঘরটা ছিল, তারি ছাদের উপর সে সে দিন বড়ি তুলে আন্‌তে উঠেছিল। সে একমনে সেগুলি গুছিয়ে তুলছে, এমন সময় কার পায়ের শব্দে চমকিত হয়ে দেখেছিল একজন পা টিপে টিপে তার দিকে আসছে। তার লালসাদীপ্ত চক্ষু ও চলিবার ভঙ্গী দেখিয়া নিরুপমা বুঝিয়াছিল যে, তাহার স্বাভাবিক অবস্থা নাই। তাকে ও অবস্থায় দেখে তার যে কি লজ্জা, কি আতঙ্ক হয়েছিল, তা হয় ত আমরা অনুমানই করতে পারব না। সেই সকল লজ্জা ও অপমান হতে আপনাকে বাঁচাবার জন্য, সে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে, ছাদ হ'তে লাফ দিয়ে পড়েছিল। তা'ছাড়া সে সময়ে তার আর গত্যন্তর ছিল না। সেই মরণের দূত যে কে, এতদিন পরে তোমার কাছেও তার নাম মুখে আন্‌তে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আস্‌ছে।"

ব্রজেন্দ্রের চোখ-দুটা ঠিকরিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতে-

ছিল। সঞ্জীব বলিয়া গেল—"জরুরী তার পেয়ে আমি যখন তার পরদিন সকালে এসে পৌঁছুলাম, তখন তার শেষ অবস্থা। প্রলাপের ভিতরে মাঝে মাঝে সে তখন আতঙ্কে কেঁপে উঠছিল। আমার মা তখন জীবিত ছিলেন। নিরুপমার প্রলাপ থেকে কতক অংশ সংগ্রহ করে, বাকী অংশ যখন মা'র মুখে শুনলাম, তখন আমার মনের অবস্থা যে কি ভয়ানক হয়েছিল, তা এতদিন পরে তোমাকে বোঝাতে পারব না। মরণাপন্না স্ত্রী ও ব্যথিতা জননীর পাশে বহুক্ষণ স্থাণুজ্ঞানশূন্য হয়ে বসে ছিলাম। সেই দিন হতে আমার যা কিছু কোমলত্ব ছিল, সে সমস্ত হৃদয় হ'তে বার হয়ে কোথায় যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে, তার কোন সন্ধান আজ পর্য্যন্ত আমার কাছে পৌঁছেনি। মায়াদণ্ড স্পর্শে মানুষ যে মুহূর্ত্ত মধ্যে পাষাণে পরিবর্ত্তিত হয়ে যেতে পারে, তা আমি সে দিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। মরণের কিছু পূর্ব্বে তার একবার মাত্র জ্ঞান ফিরে এসেছিল। সে সময়ে কি অভিযোগ ভরা করুণ দৃষ্টিতে সে আমার পানে চেয়েছিল, তা আমি জীবনে কখন ভুলতে পারব না। তার কাছে আমার দোষের মার্জ্জনা চাইতেই সে আমার পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে বলেছিল—'ছি ও-কথা বলতে নেই। তুমি তো কখন আমাকে একটা মন্দ কথাও বলনি। দেখ, আমার তো শেষ হ'য়ে আসছে, তোমাকে একটি কথা বলব। তুমি যে সংসারী হয়ে সুখী হতে পারনি, এ আমার বড় দুঃখ। তুমি আবার বিয়ে কোরো; কিন্তু তাকে এখানে ফেলে রেখো না। তাকে আর মাকে নিয়ে তোমার কাছে রেখে দিও। আমার অদৃষ্টে তো সে সুখ ঘটল না।'

"এমন তীব্র ভর্ৎসনা কখন কি শুনেছ? সে মুহূর্ত্তে যে আমার হৃদয় শতখণ্ড হ'য়ে গলে যায় নি, সে কেবল আমি পাষাণ হয়ে গিয়েছিলাম বলে। সব কথা তাকে গুছিয়ে বলতে পারি নি। শুধু তার শীতল হাত দুখানি বুকের উপর চেপে ধরে বলেছিলাম যে, তারি সঙ্গে আমার জীবনের সব সুখ, সব শান্তির বিসর্জ্জন হবে। এই দীর্ঘ পথ পার হ'য়ে যেদিন সন্ধ্যায় তার সেই অমর-লোকের সিংহদ্বারের বাহিরে গিয়ে অসহায় হ'য়ে দাঁড়াব, সে দিন আমার সব অপরাধ মার্জ্জনা করে সে যদি এগিয়ে এসে তারি পুণ্যে, তারি প্রেমের বলে আমাকে সেখানে নিয়ে যায়, তবেই আমার কাটার জীবনে সার্থকতার ফুল ফুটে উঠবে। আমার উরুদেশের উপর মাথা রেখে তার মুখে একটা তৃপ্তির আভাস ফুটে উঠেছিল। তার পর তার চক্ষুদুটী ধীরে-ধীরে চিরকালের জন্য মুদে গিয়েছিল। তার মুখের ক্ষীণ হাসিটুকু একটু উজ্জ্বল হয়ে সেখান হ'তে উঠে দিগন্তে মিলিয়ে যেতে-যেতে, আমাকে সে পথের একটা সূক্ষ্ম রেখা নির্দ্দেশ করে দিয়ে গেল।"

সঞ্জীব খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। বাতাসের ঘায়ে তখনও দুই চারিটা করিয়া শেফালি সেখানে ঝরিয়া পড়িতেছিল। সঞ্জীব আবার বলিতে আরম্ভ করিল—"ঐ যে বাইরে ফুলের রাশি দেখছ—যার উপর শেফালি প্রত্যহ তার অজস্র পুষ্পবর্ষণ করে যায়—একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে ঐখানে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। যে ঘরের ছাদ হ'তে সে মরণের মুখে পড়েছিল, সে ঘরটা আমার চোখে যেন দিনরাত লোহার শলাকা বিঁধিয়ে দিত। তাই আমি তাকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছি। ঐখানকার মাটি তার ফুলের মত বুকটিতে কঠিন হয়ে বেজেছিল, তাই প্রতি সকাল সন্ধ্যায় বাগানের সমস্ত ফুল একত্র করে ওইখানটিতে সাজিয়ে দিই, মনে ভাবি, ওই কঠিন মাটা যদি এক বিন্দুও কোমল হয়ে আসে। পানোন্মত্তের নিকট হতে যে ওরূপ অসম্ভব ব্যবহারও সম্ভব, তা আমার মনে করাই উচিত ছিল। তা ছাড়া, তার আরও অনেক কষ্ট ছিল—তাও আমি জানতাম। কিন্তু তবু আমি তাকে এ হিংস্র স্থান থেকে নিয়ে যাইনি। কেন জান? অন্য দু'চারটা ছোট কারণ থাকলেও, তার প্রধান কারণ ছিল লোকনিন্দা। লোকে বলবে—সঞ্জীব দু'পয়সা উপায় করতে শিখেই স্ত্রীকে নিয়ে একরকম পৃথক হ'ল; নিজের স্বার্থ বেশ করে বুঝল;—এইটেই আমার স্ত্রীকে সুখী করবার প্রধান অন্তরায় হ'ল। নিরুপমার কষ্ট দেখে অনেকবার মনে হ'ত, একে নিয়ে যাই। কিন্তু প্রত্যেক বারই আমার ঐ দুর্ব্বলতা আসত। কিন্তু সে দিন তার মৃত্যুমলিন মুখের পানে চেয়ে আমার কি যে অনুতাপ হয়েছিল, তা তুমি জান না। তার সেই মৃত্যুশয্যা স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—যে লোকনিন্দার ভয়ে তোমাকে কষ্ট দিইছি, তোমাকে অকালে হত্যা করেছি,—যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন তার সহস্রগুণ লোকনিন্দা মাথায় করে, চিরকাল কৃত-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। দেশের সবাই আমার নিন্দা করত; কিন্তু

…দের নিন্দা আমি গ্রাহ্য করতাম না বলে, আমার প্রায়শ্চিত্ত …যথেষ্ট বলে মনে হ'ত না। কিন্তু যে দিন তুমি আমাকে …ঘৃণা কর বলে চলে গেলে, সে দিন সত্যিই আমি অনেকটা …তৃপ্ত পেয়েছিলাম। তোমার ঘৃণা আমাকে যে পরিমাণে কষ্ট দিয়েছিল, তার শতগুণ আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। সে দিন সন্ধ্যায় ওইখানকার কঠিন মৃত্তিকায় নিজের মাথাকে …আহত করে তাকে বলেছিলাম- "ভগো, এইটুকু ভাই দয়া …করে গ্রহণ করে যাও যে, আমার অবশিষ্ট জীবন তোমার প্রতি …অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তে কাটাচ্ছি।" ব্রজেন্দ্রের চক্ষু দিয়া ঝর …ঝর করিয়া অশ্রু পড়িতেছিল। সে হাত যোড় করিয়া …বলিল - "আমাকে মাপ কর ভাই, তোমার নিকট আমি …বড় অপরাধী।

সঞ্জীব তাহার হাত দু'খানি পৃথক্ করিয়া দিয়া বলিল, …তোমার কিছুই দোষ নেই ব্রজেন। তুমি তো এ সব …জানতে না। কিন্তু তুমি এ কথা আর কাকেও বলবে না,- …তুমি নিজেও এ কথাটা ভুলে যেতে চেষ্টা কর। আর একটা কথা—আমার এখানে থাকা আর চলবে না। অন্ততঃ ২।৪ বছরের জন্য আমি বেড়াতে বার হ'ব। এখানে কেউ আমাকে মনে মনে প্রশংসা কচ্ছে, শ্রদ্ধা কচ্ছে, এ চিন্তা আমার অসহ্য। তা'ছাড়া, যে কথা তুমি জেনেছ, আর কেউ যদি তা জানে, তা'হলে আমার বাকী জীবনটাই নিষ্ফল হ'বে। সেই জন্য কালই আমি দেশ ছেড়ে পালাব। যাবার আগে তোমার হাতে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়ে যাচ্ছি, যখন ওদের অভাব হবে, তুমি ওদের সাহায্য করবে। ওরা যেন জানে তুমিই সাহায্য করছ। বৌদিদির কি দোষ? তিনি আমার সামনে চোখের জল ফেলে গিয়েছেন, তবু আমি তাঁকে প্রকাশ্যে একটি পয়সাও সাহায্য করতে পারি নি। আমার শেষ অনুরোধ রেখো ভাই আর কোন বাধার কথা বোলো না।"

অশ্রুজলে ভাসিয়া ব্রজেন্দ্র বলিল "তা'হলে আমিই তোমায় দেশত্যাগী করলাম!"

সান্ত ও অনন্ত*

[অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম-এ]

…শনশাস্ত্রের সমস্ত বিষয়ই অতি পুরাতন। আমাদের প্রবন্ধের …বিষয়ও বহুকাল আলোচিত হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে; …রূপ বিষয় সম্বন্ধে যে খুব নূতন কথা বলিতে পারিব, সে …আশা করি না; তবে বিষয়টা যে ভাবে বুঝিতে চেষ্টা …করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে যত্নবান হইব।

…সারসত্তার স্বরূপ দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এই …প্রবন্ধে আমরা সারসত্তা অসীম কি সসীম, এই বিষয় …আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে এই বিষয় লইয়া মতভেদ …আছে। ভূয়োদর্শনবাদিগণের (experients and experi…entialists) মতে ভূয়োদর্শনই জ্ঞানের একমাত্র উপায়। …ভূয়োদর্শন দ্বারা আমরা সান্ত বা সসীমের জ্ঞানই লাভ করি। …আমরা সান্ত ও সসীম, আমাদের জ্ঞানও তাই সান্ত। আমা…র সসীম বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। অসীম …বলিতে আমরা বুঝি, যাহা সসীম হইতে ভিন্ন, যাহা সান্তের অভাবস্বরূপ, যাহা বাস্তবের বিরুদ্ধস্বভাবাপন্ন, অর্থাৎ যাহা কাল্পনিক, যাহা কোন সময়ে কাহারও প্রত্যক্ষগোচর হয় না, যাহার সত্তা স্বীকার করা যায় না। অসীম প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; সুতরাং অসীমের বাস্তবরাজ্যে কোন সত্তা নাই। অসীম কল্পনার বিষয়;- জ্ঞানের বিষয় নহে। সসীম ভাবিতে ভাবিতে এবং সসীমকে ক্রমাগত বর্দ্ধিত করিতে-করিতে আমাদের মনে অসীম সম্বন্ধে একটা কল্পনা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই অসীম ভাবস্বরূপ নহে; উহা অভাব-স্বরূপ (negative idea)।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। তাঁহারা বলেন, সারসত্তা অনন্ত,—অসীমও অভাব-কল্পনা নহে, উহাই প্রকৃত ভাবস্বরূপ। অনন্তের অস্তিত্ব সান্তের অস্তিত্বের পূর্ব্বে; অনন্তের অংশ লইয়াই সান্তের সৃষ্টি।

* সাহিত্য-পরিষদের নদীয়া শাখার মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

আমাদের জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে বোধ হইবে, যেন সান্তই প্রথমে, অনন্ত পরে। শিশুদিগের সান্ত বস্তু-বিষয়ের জ্ঞানই প্রথমে হয়। কিন্তু যাহা জ্ঞানের দিক দিয়া, পূর্ব্বে, অর্থাৎ যে বস্তুর বিষয়ে আমাদের প্রথম জ্ঞান হয়, তাহার অস্তিত্বও যে সর্ব্বপ্রথম, তাহা নহে। সত্তা বা অস্তিত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে, অনন্তের অস্তিত্ব সান্তের পূর্ব্বে ; কারণ, সান্ত বস্তুকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিলে কখনও অনন্ত হইতে পারে না। সসীম যত বৃহৎ হউক, তথাপি তাহা সান্ত ; কিন্তু অনন্ত বা অসীমকে সীমাবদ্ধ করিলেই সান্ত হইয়া যায়। এই সম্প্রদায় সান্ত ও অনন্ত উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন ; কিন্তু বলিতেছেন যে, অনন্তের অস্তিত্ব সান্তের অস্তিত্বের পূর্ব্বে, এবং অনন্তই সান্তের মূল। যে বস্তুর সীমা আছে, তাহা সসীম ; যে বস্তুর সীমা নাই, তাহা অসীম। উভয়স্থলেই দেখা যাইতেছে, বস্তুর অভাব হইতেছে না। সুতরাং অসীম বা অনন্ত, ও সসীম বা সান্ত উভয়েই ভাবস্বরূপ, কিন্তু অসীম সত্তার সীমাবদ্ধ ভাবই সসীম সত্তা ; সেইজন্য অসীম সত্তা সসীম সত্তার পূর্ব্বে।

ফরাসী দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক দেকার্টে (Descartes) বলেন, অসীমের যে ধারণা আমাদের মনের মধ্যে আছে, ঐ ধারণাই অসীম সত্তার পরিচায়ক ; কেন না, কার্য্য কারণ ব্যতিরেকে হইতে পারে না ; এবং কারণ কার্য্যোৎপাদনক্ষম হইবার দরকার। অসীম সসীম অপেক্ষা বৃহত্তর ; সুতরাং সসীম হইতে অসীমের ধারণার উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব, অসীম ধারণার উৎপাদক অসীম সত্তা। দেকার্টের এই তর্ক অবশ্য প্রমাদশূন্য নহে। যে বস্তুর কল্পনা করিতে পারা যায়, সে বস্তুর অস্তিত্ব আছে ; কারণ, বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে, বস্তুর কল্পনার উৎপাদক থাকে না,—কারণহীন কার্য্য হইয়া পড়ে,—এরূপ তর্ক খুব যুক্তিযুক্ত নহে। তাহা হইলে, কাল্পনিক ও বাস্তবের কোন প্রভেদ থাকে না। কিন্তু অসীমের কল্পনা অন্যরূপ। ভূয়োদর্শনবাদিগণের মত যদি বলি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় না হইলেই তাহা কাল্পনিক, তাহা হইলে, দর্শনশাস্ত্রের অসীম সত্তার আলোচনা নিষ্ফল। দর্শনশাস্ত্র শুধু ইন্দ্রিয়দৃশ্য বস্তুর বিচার করে না ; যুক্তিদৃশ্য বস্তু হইলেই তাহা দর্শনশাস্ত্রের বিচার্য্য। অসীম সত্তা যুক্তিসঙ্গত হইলে উহা বাস্তব, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অসীমের কল্পনা এরূপ নহে যে, ইচ্ছা করিলে আমরা উহা ত্যাগ করিতে পারি। সসীম বুঝিতে হইলেই অসীম আসিয়া পড়ে সুতরাং অসীমের কল্পনা শুধু কল্পনা নহে, অসীম বাস্তব ;—এই কথাটাই য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের অন্যতম মহামতি হেগেল বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। একটী বস্তুকে অপর একটা বস্তু হইতে পৃথক্ না করিতে পারিলে, সে বস্তুর জ্ঞান হয় না (differentiation)। ঘট জিনিসটা কি বুঝিতে হইলে, ইহা যে পট প্রভৃতি অন্য দ্রব্য হইতে ভিন্ন, এই জ্ঞান থাকা দরকার। সেইরূপ সসীম কি—ইহা বুঝিতে হইলে "সসীম"কে অন্য জিনিস হইতে পৃথক্ করিতে হইবে। সুতরাং "সসীম" জানিতে হইলে "সসীম" হইতে ভিন্ন অর্থাৎ "অসীম"কে জানা আবশ্যক। সেইরূপ, অসীমকে জানিতে হইলেও সসীমের জ্ঞান আবশ্যক। সান্ত জ্ঞান অর্থাৎ সান্তের সান্তত্ব জ্ঞান তাহার অনন্ত-জ্ঞান অর্থাৎ অনন্ত সম্বন্ধে জ্ঞানের পূর্ব্বেও নহে, পরেও নহে। যে মুহূর্ত্তেই সান্ত বুঝিতে পারিতেছে যে সে সান্ত, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার অনন্ত সম্বন্ধে জ্ঞান হইতেছে। সান্তকে বুঝিতে হইলেই অনন্তকে বুঝিতে হইবে। অনন্ত বুঝিতে হইলেই সান্তকে টানিয়া আনিতে হইবে। যে ব্যক্তির অন্ত জ্ঞান নাই, সে কিরূপে অন্ত বা সীমার অভাব বোধ করিতে পারে ? আমার যদি গৃহজ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে আমি গৃহশূন্য, এ কথা বলিতে পারি না। আমি প্রকৃত গৃহহীন হইলেও জানিতে পারি না যে আমি গৃহহীন। কোন বস্তুর জ্ঞান হইতে হইলে, সেই বস্তু ভিন্ন অন্য কিছুর জ্ঞানের প্রয়োজন ; সুতরাং, অন্তের জ্ঞান হইতে হইলে, অন্ত ভিন্ন অন্য কিছু, অর্থাৎ অনন্ত-জ্ঞান দরকার। তবেই দেখিতেছি, সান্ত ও অনন্ত পরস্পর সংযুক্ত। আমরা শুধু সান্ত নহি, কেন না আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা সীমাবদ্ধ। আমাদের মধ্যে অসীম সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে, যাহার সহিত তুলনা করিয়া আমরা দেখি যে আমরা সীমাবদ্ধ। আমরা যদিও সসীম, যদিও সান্ত, যদিও ক্ষুদ্র, তথাপি এমন জিনিস আমাদের মধ্যেই আছে, যাহা অসীম, যাহা অনন্ত, যাহা মহান্,—যাহা আমাদের বলিয়া দিতেছে যে, আমরা সীমাবদ্ধ, আমরা সান্ত। আমাদের নিজেদের সসীমত্ব জ্ঞানই দেখাইয়া দিতেছে যে, আমরা সসীমের উপরে। তাই সক্রেটীস (Socrates) বলিয়াছিলেন, "আমি জ্ঞানী, কেন না আমি জানি যে আমি জ্ঞানী নহি।" আমরা অসীম, কেন না আমরা জানি যে আমরা অসীম নহি। মূর্খ নিজেকে মূর্খ বলিয়া

জানে না। যে শুধু সসীম, সে নিজেকে সসীম বলিয়া জানে না। যে সসীমকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, সেই জানে যে সে সসীম। তাই আমরা সসীম ভাবিতেই অসীমকে ভাবিয়া ফেলি ; তাই আমরা সসীমের মধ্যেই অসীমকে অনুভব করি। কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, "সীমার মাঝে অসীম তুমি।" আর, অসীম যদি সসীম হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে ত অসীম আর অসীম থাকে না। তাহা হইলে সসীম অসীমের বাহিরে পড়ে ও অসীম সসীম হইয়া যায়। আবার, সসীম যদি অসীম হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে সসীমের রাজ্যেও অসীমের অধিকার থাকে না ; তাহা হইলে সসীমও অসীম হইয়া পড়ে। তাই দেখা যাইতেছে যে, সসীমকে অসীম হইতে পৃথক্ করিতে গেলে, দুই ই এক হইয়া যায় ; অর্থাৎ সসীম অসীম হয়, অসীম সসীম হয়। উহাদের এমনই সম্বন্ধ যে, পৃথক্ করিতে গেলে এক হয়, কিন্তু একত্র দেখিলে পৃথক্ থাকে। অসীম সসীমের অভাব নহে বা সসীম অসীমের অভাব নহে। অসীম বস্তুই সসীমের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। হেগেলের মতে সসীম যেমন অসীমেরই অংশ, তেমনি অসীমও সসীমের বাধা। সসীম ভিন্ন অসীমের পৃথক্ সত্তা নাই।

ইহাই বুঝি পাশ্চাত্য দর্শনের শেষ কথা। আমাদের বেদান্তমত অনেকটা হেগেলের মতের মত হইলেও, কিয়দংশে তাহা হইতে ভিন্ন ও উচ্চতর। বেদান্তমতে, অসীমের নিজের সসীম হইতে পৃথক্ সত্তা আছে,—অনন্তের স্বরূপ সান্তের উপর নির্ভর করে না। যখন আমাদের অনন্তের স্বরূপ জ্ঞান হয়, তখন আমাদের ও অনন্তের মধ্যে পার্থক্য থাকে না ; তখন ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়,—আমরা সর্ব্বত্র অনন্ত দেখিতে থাকি ; তখন অনন্ত ভিন্ন অন্য কিছুই লক্ষিত হয় না ; সুতরাং সান্তের কথা আমরা ভুলিয়া যাই, সান্তের অস্তিত্ব তখন থাকে না। তাই বেদান্ত বলিতেছেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। ইহাই ব্রহ্মের অর্থাৎ সারসত্তার স্বরূপ। ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ, ব্রহ্ম অনন্ত, ব্রহ্ম সকল সত্য বা সত্তার আশ্রয়, সকল জ্ঞানের আধার, অনন্ত দেশ-কালব্যাপী। ব্রহ্মের সত্তা কোন বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মা সকল জীবাত্মাতে সমভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ইহা কি করিয়া সম্ভব দেখা যাউক। "রামের সত্তা আছে" "হরির সত্তা আছে", "যদুর সত্তা আছে",—এই তিন স্থলেই সত্তা সাধারণ। রামের ও হরির সত্তা বা অস্তিত্ব ব্রহ্মেরই সত্তা ; কিন্তু ব্রহ্ম রামের ন্যায়, হরির ন্যায় স্থানকালবদ্ধ নহে ; কেননা, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ। সেইরূপ রামের জ্ঞান, হরির জ্ঞান, সবই সেই ব্রহ্মের জ্ঞান ; কেন না, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, রামের জ্ঞান ও হরির জ্ঞান উভয়েই ব্রহ্মের জ্ঞানের অংশ হইলেও, উহাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই পার্থক্য উপাধি-সম্ভূত। সমস্ত জ্ঞানই ব্রহ্মের বিকাশ, কেন না ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ। ব্রহ্ম জ্ঞানরূপে রামের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া হরির মধ্যে অবস্থান করিতে পারেন না, এইরূপ যুক্তি প্রমাদশূন্য নহে। জ্ঞান এমন পদার্থ, যাহা জড়ের স্বভাব বিরোধী। জড়পদার্থ সান্ত,—এক স্থানে, এক সময়ে সীমাবদ্ধ। কিন্তু জ্ঞান অনন্ত, স্থান কাল ভেদ-শূন্য। নিখিল জ্ঞানের আধার, চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই বিরাজিত। ব্রহ্ম জ্ঞানী নহেন, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ ; তাই ব্রহ্ম রামের মধ্যেও থাকিতে পারেন, হরির মধ্যেও থাকিতে পারেন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও থাকিতে পারেন। নিজের অস্তিত্ব ঠিক রাখিয়া সকল পদার্থে অবস্থান করাই জড়বিরুদ্ধ পদার্থের স্বভাব। জ্ঞান যতক্ষণ রামের মধ্যে অবস্থিত, ততক্ষণ "রামের জ্ঞান" বলিয়া কথিত হয়, আবার সেই জ্ঞানই হরির মধ্যে অবস্থিত হইলেই "হরির জ্ঞান"। অতএব জ্ঞানের অর্থাৎ ব্রহ্মের অস্তিত্ব রামের ও হরির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। তাই "জ্ঞানী রাম" সান্ত, কিন্তু জ্ঞান অনন্ত।

অনন্তই যদি ব্রহ্মের স্বরূপ হয়, তবে সারসত্তার সান্ত ভাব কি মিথ্যা কল্পনা ? না, সান্ত মিথ্যা নহে। সান্ত অনন্তেরই রূপান্তর, সান্ত অনন্তের বিবর্ত্ত। অনন্ত উপাধি পরিগ্রহ করিলেই সান্ত ভাব প্রাপ্ত হন। যদি সান্তকে অনন্ত হইতে ভিন্ন মনে করি, তাহা হইলে অবশ্য অনন্ত সত্য। সান্ত সত্য হইতে ভিন্ন অর্থাৎ মিথ্যা, এই দিক্ দিয়া বেদান্ত বলিতেছেন, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা"। কিন্তু যদি সান্তকে অনন্তের বিবর্ত্ত মনে করি, যদি উপাধিগত অনন্তই সান্ত ইহা, বুঝিতে পারি, তাহা হইলে ত সান্ত অনন্ত হইতে ভিন্ন নহে। তাহা হইলে সান্ত শুধু সান্ত নহে, কিন্তু সান্ত-অনন্ত বা অনন্ত-সান্ত। কবির কথায় আবার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, "সীমার মাঝে অসীম তুমি"। "জ্ঞানী রাম" এক দিক দিয়া দেখিলে শুধু সান্ত, সসীম ; কারণ, স্থান-কাল-ভেদাপন্ন ; কিন্তু আর

একটু মনঃসংযোগ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই স্থান কাল-ভেদ উপাধি রামেরই মলিনত্ব। প্রকৃত জ্ঞান, শুদ্ধ, অনন্ত, স্থান কাল ভেদ রহিত। রামের জ্ঞান আছে, রামের মধ্যে অনন্ত আছে, কিন্তু ঐ অনন্ত উপাধির জন্য সান্ত। তাই অন্য দিক দিয়া দেখিলে, "জ্ঞানী রাম" শুধু সান্ত নহে, কিন্তু অনন্ত সান্ত বা সান্ত অনন্ত। এই শেষের ভাবটুকু পর্যান্ত হেগেলের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানের শুদ্ধ অবস্থা, সারসত্তার বা ব্রহ্মের স্বরূপ বা পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধে হেগেল কিছুই বলেন নাই। বেদান্ত মতে যাহা সান্ত অনন্ত, যাহা ঈশ্বর, যাহা ব্যবহারিক জগতে সারসত্তা বলিয়া পরিগণিত, তাহাই হেগেলের "Absolute"। কিন্তু বেদান্তের পারমার্থিক সত্তা, "সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম" এই ভাব বেদান্তের নিজের সম্পত্তি। হেগেল অন্য কোন দেশের কোন দার্শনিক কল্পনা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না।

আমরা এ বিষয়ে বেদান্তের মীমাংসাই গ্রহণ করিব। দেখিতে পাইলাম যে, সান্ত ও অনন্তের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, সান্ত অনন্তেরই বিবর্ত্ত। সারসত্তা এক ভাবে অনন্ত, অন্য ভাবে সান্ত অনন্ত। কিন্তু এই ভাবটা সম্যক বুঝিতে না পারার জন্য অনেক সময় বিরোধ উপস্থিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, সারসত্তা প্রকৃতপক্ষে অনন্ত হইলে, সান্তভাবে তাহার মিথ্যা কল্পনা করা হয়। তাহারা বলেন যে, আপোসে মিটমাট করিলে প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা হয় না। তাহারা আপোসের বিরোধী, এক দিকে ডিক্রী দিতে চান। ব্রহ্ম সাকার হইলে কখনও নিরাকার হইতে পারেন না, কিম্বা প্রকৃতপক্ষে নিরাকার হইলে কখনও সাকার হইতে পারেন না। ইহার উত্তরে শুধু একটা কথা বলিব। ব্রহ্মে আকার যুক্ত হইলেই ব্রহ্ম সাকার; ব্রহ্মে আকার আরোপ না করিলেই ব্রহ্ম নিরাকার। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ নিরাকার হইলেও, তাহাতে আকার আরোপ করিলেই তিনি সাকারভাবাপন্ন হন। এস্থলে "আরোপ" কথা লইয়া আবার Spinozaর মত বিপদ আসিয়া পড়িতে পারে। তাই ভাল করিয়া বলিতেছি। Spinoza (স্পিনোজা) ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়াছেন—কেন না গুণবান্ হইলেই তিনি সসীম হইয়া পড়েন। আবার কিছুক্ষণ পরেই বলিয়াছেন—তিনি সকল গুণের আধার, কেন না তাঁহাতে কিছুরই অভাব নাই। পাশ্চাত্য টীকাকারেরা কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, স্পিনোজার (Spinoza) প্রথম মতই ঠিক। দ্বিতীয় মতে তিনি বলিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরকে গুণোপেত বলিয়া মনে করি, কিন্তু তিনি নিজে নির্গুণ। আবার কেহ কেহ বলেন যে, স্পিনোজার দ্বিতীয় মতই তাঁহার ঠিক মত; তাঁহার নির্গুণ ঈশ্বরের ধারণা অসঙ্গত, ইত্যাদি। এস্থলে স্পিনোজার মতের সহিত বেদান্তমতের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আমরা যদি একদিকে ডিক্রী না লইয়া, দুইটা মতই সত্য বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে বেদান্তমতে আসিয়া পড়ি। দুইটী কথাই স্পিনোজা বলিয়াছেন। সুতরাং দুইটিকেই সত্য প্রমাণ করিলে একটাকে মিথ্যা বলিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ব্রহ্মের স্বরূপ নির্গুণ। তিনিই আবার গুণ গ্রহণ করিলে সগুণ হন। ব্রহ্মের এই সগুণ ভাব শুধু আমাদের কল্পনা নহে, এটা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত (কিন্তু বিকার নহে)। ব্রহ্মের স্বরূপ ইহাতে পরিবর্ত্তিত হয় না। শুধু জড়পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল, অজড় পদার্থ নিত্য। সারসত্তা সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও এমন ধারণা নাই, যিনি বলিবেন যে, সারসত্তা আকার গ্রহণে অসমর্থ। তিনি সীমার মধ্যে আসিলেই সসীম, না আসিলেই অসীম। এই সীমার মধ্যে আসা বা সৃষ্টিই তাঁহার লীলা।

এখন

"অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতং
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।"

এই শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এখন আর বিরাট্ মূর্ত্তির বর্ণনা কল্পনা বলিতে পারি না—

"অনেক বাহূদর বক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্॥"

ইহা কবিকল্পনা নহে, স্থির সত্য।

বৈরাগ্-যোগ

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ]

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তখন আমাদের মঠের কর্ত্তা। সে অনেক দিনের কথা ; কিন্তু আজো তাঁকে আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

উন্নত গৌরবর্ণ দেহ—প্রশস্ত সুন্দর কপালের উপর কাঁচা-পাকা একরাশ চুল। চোক দুটো অসম্ভব রকম উজ্জ্বল,—দেখ্‌লেই মনে হয় প্রতিভা ফুটে বার হচ্চে। কপালে বয়সের একটি দাগও পড়েনি। মুখে সব সময়ে ক্ষমার হাসি লেগে রয়েছে !

তাঁর রাগ আমরা দেখিনি ; রাগের কিছু কারণ ঘট্‌লে কেমন একটা অদ্ভুত হাসি হাস্‌তে থাকতেন।

জন পঁচিশেক ব্রহ্মচারী আমরা মঠে থাকতুম্। আমাদের প্রতি তাঁর অগাধ স্নেহ ছিল ; তিনি আমাদের বাপ্ যেমন করে ছেলেকে ভালবাসে, তেমনি ভালবাসতেন। কিন্তু এই স্নেহ ভালবাসা একদিনের জন্যও শাসনের কঠোরতাকে শিথিল করেনি।

আমাদের মঠের উদ্দেশ্য ছিল লোক সেবা। এই কাজের যোগ্য হবার জন্যে আমাদের সাধন করতে হত। তার উপদেশ স্বামীজি আমাদের দিনে রাতে, অবসরে-অনবসরে এমন করে দিতেন যে, এক দিকে আমরা নির্ভীক হয়ে উঠ্‌ছিলাম—অপর দিকে আমাদের ত্যাগ আর ক্ষমার সীমা পরিসীমা ছিল না।

অতি প্রত্যূষে বৈদিক ব্রহ্মচারীর নিয়মানুযায়ী আমরা শয্যা ত্যাগ করে উঠে ব্রহ্ম চিন্তায় চিত্ত-নিবেশ করতাম। তপ, জপ, বেদগানে আমাদের আশ্রমটি মুখরিত হয়ে উঠ্‌ত। ওঁকার ধ্বনি, ভ্রমর-গুঞ্জনের মত আমাদের চিত্ত শতদলকে বিকচ করে তুল্‌ত।

স্বামীজি শেষরাত্রে উঠ্‌তেন ; তাঁর ভজন-পূজনের বিধি নিয়ম একেবারে স্বতন্ত্র ছিল। এক-এক দিন তিনি এমন গভীর ধ্যান-নিমগ্ন হয়ে যেতেন যে, সমস্ত দিন আর তাঁর সাড়া-শব্দ থাক্‌ত না। নিবাত নিষ্কম্প দীপের শিখাটির মত তাঁর দেহটি যেন ঊর্দ্ধের দিকে কিসের অন্বেষণে সে দিনের মত আপনাকে হারিয়ে ফেলত। আমরা আর সে ঘরে যেতাম না ; বাইরে বাইরে নিজেদের কর্ত্তব্য করতে থাক্‌তাম।

বর্ষার শেষে বোধ হয় শরতের ঠিক আরম্ভেই, একদিন স্বামীজি তাঁর ধ্যান ঘর থেকে বার হলেন না। আমরা নিয়মমত সপ্তপর্ণীর তলায় বসে নাম গান জুড়ে দিলাম। পরিষ্কার নীল আকাশ—সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল। পাখীর গান আর আমাদের বেদ-গাথায় যেন মনে হল যে, মহাব্যোমের সমস্ত শূন্যতা পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমাদের গা শিউরে শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যে দিন স্বামীজি ধ্যান থেকে আর উঠ্‌তেন না—সেদিন আমাদের ঠিক এমনিই হত। সেদিন যেন আকাশে-বাতাসে-আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে আমরা কি এক অভিনব সত্তার উপলব্ধিতে তন্ময় হয়ে যেতাম ; যেন কিসের প্রতীক্ষায় আমাদের মন প্রাণ স্তম্ভিত হয়ে আসত।

অপরাহ্ণে আমলকি তলার বেদীর উপর বসে' আমরা পুরাণ চর্চ্চা করছিলাম। কেমন করে জড় ভরত তাঁর হরিণের অন্বেষণে ছুটেছিলেন। সে ছোটাকে বাধা দেবে কে ? নদ নদী, পর্ব্বত, বন কিছুরই বাধা দেহ মানে না, যখন মন ছুটে চলে। কি অপূর্ব্ব এই চলা। তেমনি করে ছুটে যাবার সাধ আমার মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌ছিল।

সমস্ত দিন কড়া রোদের পর একটু হাওয়া উঠ্‌বার উপক্রম করছে। হঠাৎ পূবের আকাশে নজর পড়ে গেল—দেখ্‌লাম, অন্ধকারের মত একটা মেঘকে পিছনে করে, একটা উদ্দাম ঝড় তার ধূসর জটাজুট আকাশের দিকে দিকে উড়িয়ে দিয়ে, তাণ্ডব নৃত্যে আমাদের দিকে ধেয়ে আস্‌চে। কাক, পাখী ভয়ে ছুটে পালাচ্চে। হঠাৎ গঙ্গার রং যেন আতঙ্কে শিটিয়ে ইস্পাতের মত হয়ে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাছপালা জখম করে দিয়ে ঝড়টা উত্তর দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার পর হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এল। যেন মনে হল, এক দিনে সমস্ত পৃথিবী ডুবে যাবে।

আমরা মঠের তেতালার ঘরের প্রকাণ্ড আলোটা জোরে

জ্বালিয়ে গঙ্গার বুকের উপর ফেলে-ফেলে দেখ্‌তে লাগলাম —যদি কোন নৌকা বিপদে পড়ে থাকে। এমন অনেক দিন হয়েছে যে, আমরা কত ডুবন্ত লোককে উদ্ধার করে এনেছি।

তখনি রাত জাগবার পালা ঠিক্ হয়ে গেল। দু'জন করে ব্রহ্মচারী এমন দুর্দ্দিনে সেই ঘরের মধ্যে আলো জেলে বসে থাক্‌বে। অন্ধকার ও বৃষ্টিতে চারি দিক ঝাপসা দেখাতে লাগল। বিপদের ঘণ্টা ঢং ঢং করে সমস্ত রাত মঠের উঁচু চূড়ার উপর থেকে বাজ্‌তে লাগ্‌ল। আলো আর আওয়াজে যদি কেউ বেঁচে যায়।

প্রাতে স্নান করতে গিয়ে স্বামীজি আমাদের সকলকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি এক অচিন্তনীয় ব্যাপার!

বাঁধা ঘাটের পাশে যেন একটি কুমুদ ফুল দিনের আলোতে ঢলে পড়েছে! অপরূপ লাবণ্য সেই মেয়েটির— মাথার ঘন কাল এক রাশ চুল কতকটা মাটিতে লুটোচ্ছে, আর শেষের দিকটা জলে ভাসচে, গলা অবধি পাড়ে তুলে যেন সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার সংজ্ঞা ছিল না।

স্বামীজি ঠিক অনুমান করেছিলেন' বল্লেন, একখানা কাপড় নিয়ে এস। নিশ্চয়ই ওর পরনে কাপড় নেই—তাই উপরে উঠ্‌তে পারেনি।

কাপড় জড়িয়ে ডাঙ্গায় তুলে পরীক্ষা করে আমরা দেখ্‌লাম যে, নাড়ী অতি ধিকোধিক চলচে,—কখনো বা চল্‌চে, আবার কখনো বা বন্ধ হচ্চে।

বেশী নাড়া চাড়া করতে সাহস হল না—সেখানে কাঠ এনে আগুন জ্বেলে আমরা তাকে সেঁক দিতে লাগলাম। আমাদের হাতে ফোস্‌কা উঠে পড়ল, কিন্তু মেয়েটির জ্ঞান আর সে দিন হল না।

সন্ধ্যার সময় সন্তর্পণে, ধীরে-ধীরে একটা খাটে শুইয়ে, মেয়েটিকে মঠের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল।

সমস্ত রাত তার মাথার শিয়রে ব্রহ্মচারীরা জেগে সেবা করতে লাগ্‌ল। শেষ রাত্রে মেয়েটি চোখ চেয়ে একবার দেখ্‌লে। তার পর যেন ঘুমিয়ে পড়ল। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে তার গা আগুনের মত তপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। আর বিছানায় কিছুতেই থাকতে চায় না; বলে, 'ছেড়ে দাও, বাবার কাছে যাব।'

সকাল হতে-হতে ঘোর বিকার দেখা দিল। এই জল দাও, এই বাতাস কর—কিছুতেই স্বস্তি নেই। এমনি করে সে দিন কাট্‌ল।

এমনি করে যে কতদিন কেটে গেল, ঠিক মনে নেই—খুব কম হলেও তিন মাস হবে। আমাদের তপ জপের সঙ্গে চকিতার সেবাটা অঙ্গীভূত হয়ে গেল। ঐ নাম স্বামীজি মেয়েটির দিয়েছিলেন।

চকিতা সেরে উঠ্‌ল বটে, কিন্তু তাকে নিয়ে আমাদের কম বিপদ দাঁড়াল না। সবাই মনে করেছিলাম যে, সে সেরে উঠে তার ঠিক ঠিকানা বলতে পারলে তাকে তার বাপের বাড়ী কি স্বামীর ঘরে রেখে আসা যাবে। কিন্তু ভীষণ ব্যায়রামে ভুগে তার পূর্ব্ব-স্মৃতি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার কথাবার্ত্তা শুনে মনে হত, যেন সে সবে সে দিন আমাদের মঠেই জন্মেছে।

বনের হরিণীর মত তার সর্ব্বাঙ্গ স্বচ্ছন্দ গতি। একদল ব্রহ্মচারীর মধ্যে সে যেন ঘন কাল মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত চমকে বেড়াত। সকলেই তাকে ভালবাসত;—সবাই যে তাকে হাতে করে বাঁচিয়েছে!

স্বামীজি গম্ভীর মুখে তার চঞ্চলতা দেখ্‌তেন। সে সকাল-বেলা লম্বা চুল পা অবধি ঝুলিয়ে দিয়ে, ফুলের বনে সাজি হাতে করে ঢুকে পড়ত। সেখানে হয় ত ফুলের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে—হয় ত একটা প্রজাপতির পিছনে ঠিক তারই মত নেচে বেড়াচ্ছে!

অনেক অনুসন্ধান হলো; কিন্তু চকিতার কোন আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। কাজেই মঠই তাকে আশ্রয় দিলে।

স্বামীজির স্নেহ এবং শাসনের বন্ধনে সে ক্রমেই আবদ্ধ হয়ে পড়তে লাগ্‌ল। দেব-সেবার অসংখ্য কাজের ভার আস্তে-আস্তে তার কাঁধে স্বামীজি চাপিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। তাকে পূজার ফুল তুল্‌তে হতো, পুষ্পপাত্রে সেগুলিকে থরে থরে রং-এর পর রং মিলিয়ে সাজিয়ে দিতে হতো; চন্দন ঘষা, দূর্ব্বা বাছা,—সাত-সতেরো কাজের বেড়ে তাকে এমনি জড়িয়ে ধরলে যে, সে আর ছাড়া পেত না।

কিন্তু তাকে ছাড়া দেখ্‌তে আমাদের বেশ ভাল লাগ্‌ত।

গুমটের মধ্যে হঠাৎ গাছের পাতা নড়িয়ে দমকা হাওয়া বয়ে গেলে যেমন ভাল লাগে—তেমনি ভাল লাগ্‌ত তাকে —যখন সে আমাদের ধারাবাহিক কাজের মধ্যে উদ্দাম ভাবে এসে পড়ে সব ওলট-পালট করে দিত।

কিন্তু স্বামীজি সেটা যে পছন্দ করতেন না—তা বুঝতে পারা যেত তাঁর নিষ্ঠুর গাম্ভীর্য্যে! এটা আমরা উপলব্ধি করতাম; কিন্তু চকিতা যে কিছু বুঝত বলে ত' আমার বোধ হয় না। এই মেয়েটি তখনো পুরুষ আর মেয়ের বিভিন্নতাই উপলব্ধি করতে পারে নি। কেন তাকে তফাৎ হতে হবে? একথা আমরাও ভাল করে বুঝতাম না; আর স্বামীজিও ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন না।

মানুষের সঙ্গে মানুষের খোলাখুলি ব্যবহারে আর কিছু না থাক দম্ আটকাবার ভয় থাকে না। খোলা কথা আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে; কিন্তু তাতে ভিতরের সঞ্চিত বাষ্পে মনটাকে ফাটিয়ে দেবার সম্ভাবনা নেই। স্বামীজিকে আমরা খুব ভালবাসতুম,—তবুও এই চাপা ব্যবহারে আমাদের মধ্যে যে রাগ সঞ্চিত হচ্ছিল না—এমন কথা বলা যায় না।

চকিতার দেহে যৌবন-সুলভ সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না; কিন্তু মনে সে নিতান্ত বালিকা ছিল। আমরা আহারে সংযম করতে শিখেছিলাম—আচারে সমস্ত বিধি-নিষেধকে মানতুম; কিন্তু সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে সংসারের এই বৃহৎ সমস্যার কোন ধারই ধারতাম না। স্বামীজি যে ছাট-খাট বাধা সৃজন করবার প্রয়াস পেতেন, তাতে বাঁধের মুখে নদীর গতির মত তা' দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ত!

এক দিন সকাল বেলায় হঠাৎ পরামর্শ ঘরে আমাদের মধ্যে বাছা-বাছা জন কয়েকের ডাক পড়ল।

স্বামীজি প্রশস্ত ললাটখানি ঈষৎ কুঞ্চিত করে বসে রলেন। তাঁকে সে-দিন ঠিক শীতকালের জলাশয়ের মত দেখাচ্ছিল। তাই দেখে আমাদের মনগুলো যেন শিটিয়ে গেল।

তিনি বল্‌লেন—"মঠের অতি দুঃসময় উপস্থিত হয়েছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার হতে হলে, অন্ততঃ একজনকে সর্ব্বত্যাগী হতে হবে।"

আমরা অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি বল্লেন, "ঠিক এমনি বিপদে একদিন বুদ্ধদেব পড়েছিলেন, যখন মেয়েরা এসে তাঁর শিষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা জানালে। তিনি প্রথমে কিছুতেই রাজি হন নি।"

আমাদের ভিতর ব্রহ্মচারী চন্দ্রনাথ বল্‌লেন, "আমার মনে হয়, বুদ্ধদেব অযথা ভয় পাচ্ছিলেন।"

বিশুদ্ধানন্দ, "তাই যদি হয়ে থাকে, তবে তুমি বল্‌তে চাও যে, আমার এই ভয়টাও মিছে ভয়?"

চন্দ্রনাথ মাথা নীচু করে রইল। এখানে কথার উত্তর দেওয়াটা ঔদ্ধত্য হত।

বিশুদ্ধানন্দ বল্‌লেন, "আমি গোড়ায় তাই মনে করেছিলাম। আমি বিশ্বাস করি যে, ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় আমাদের মঠের কোন অমঙ্গল হবে না। কিন্তু আর একটা কথা সেই সঙ্গেসঙ্গেই আমার মনে হচ্ছে ক'দিন থেকে। যে জিনিসটা আমাদের সাম্‌নে আজ উত্থিত হয়ে উঠেছে— তা' থেকে নিজেদের রক্ষা করবার বুদ্ধিও ত' তিনি দিয়েছেন। 'আমি যা' বলছি— তা' আরো পরিষ্কার, স্পষ্ট করে বলবার প্রয়োজন হয়েছে।

"মনে কর, আমার হাতে যদি এমন একটা বিষাক্ত সাপ কামড়ায়—যাতে আমার হাতটাকে বাঁচাতে গেলে প্রাণ যেতে পারে, সেখানে কি হাতটার মায়া ত্যাগ করে প্রাণটাকেই বাঁচান উচিত নয়?"

আমরা বল্লাম, "নিশ্চয়ই।"

"এই মঠ", তিনি বল্লেন, "যে উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা' মানুষের জীবনের সমগ্র মঙ্গলকে ধারণ করে উঠ্‌তেই পারে না। মানুষের আত্মা যেমন কোথাও গিয়ে শেষ হবে না—তার হিত চিন্তারও কোথাও শেষসীমা নেই। কিন্তু এই সংসারটা,—আমাদের শক্তি সামর্থ্য সবই সসীম। তাই এখানে বৃহৎকে খণ্ড করে আন্‌তে হয়, কেবল তাকে আমাদের ক্ষুদ্র নাগালের গণ্ডীর ভিতর টেনে আন্‌বার জন্যে!"

এই কঠিন তত্ত্ব চট্ করে আমাদের মাথার মধ্যে প্রবেশ করলে না দেখে, স্বামীজি খানিক চিন্তা ক'রে বল্লেন:—

"আমরা সকলে লোকহিত ব্রত গ্রহণ করেছি। এই লোকহিত ব্রত কি সংসারে থেকে বিবাহ করে করা চলত না? এখানে মতভেদ আছে। হয় ত কেউ বল্‌বেন, 'চলত'। কিন্তু আমরা মনে করছি যে তা চলে না; তাই সংসার ত্যাগ করে এসেছি। সংসারে থাক্‌লে মানুষ

নিজেকে নিয়ে এত বিব্রত হয়ে পড়ে যে, পরের চিন্তা আর সম্ভবপর হয় না। দুনিয়াতে এমন একদল লোক থাকবে, যারা নিজের কথা একটিবারও ভাববে না,—পরের মঙ্গলের কথাই তাদের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত হয়ে থাকবে। এই ত আমাদের উদ্দেশ্য। সংসার পাছে জড়িয়ে ফেলে—তাই সংসার থেকে এত দূরে আমরা, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছাতেই আজ যেন আমরা জড়িয়ে পড়চি। যে বিষ আমাদের ভারাক্রান্ত করচে, তাকে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে যেতে না দিয়ে কোন একটু অঙ্গের মধ্যে নিবদ্ধ রাখতে পারলেই কি আমাদের ভাল হয় না?"

বিশুদ্ধানন্দ আমাদের দিকে তাঁর প্রশান্ত দুটি জিজ্ঞাসু চোখ ফেলে উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

চন্দ্রনাথ এবার একটু উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল—"যুক্তি তর্কের মধ্যে উপমার জাল ছড়িয়ে দিলে অনেক সময়ে ঈপ্সিত সত্যে উপস্থিত হওয়া যায় না। আপনি যাকে বিষ বলচেন, তা বিষ নাও হতে পারে। আমার মনে হয়, সংসারে যে স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ দাঁড়িয়েছে, সেটা পুরুষের স্বাভাবিক উপর ক্ষমতার অপব্যবহারের ফল। সেটা পুরুষের স্বার্থপরতা—আমরা সন্ন্যাসীর দল কি তার বহু ঊর্দ্ধে নয়?"

স্বামীজি তার সেই অদ্ভুত হাসিটি প্রয়োগ করে চন্দ্রনাথের তর্কের সমস্ত উষ্মা এক পলে ঠাণ্ডা করে দিলেন।

"তা বটে চন্দ্রনাথ; কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা একটা মস্ত জিনিস,—তাকে ভুললে চলে কই? তুমি যদি বল সাপের বিষ যে মারাত্মক,—তা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমার দেহে প্রমাণ হচ্চে, ততক্ষণ স্বীকার করবে না, এমন বলার যে সৎ সাহস আছে, তাকে আমি খুবই সুখ্যাত করি—কিন্তু তোমার প্রাণটা কি এই ব্যাপারে আমি নষ্ট হতে দিতে পারি? এইখানেই শাস্ত্রের মূল্য। শাস্ত্র অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কি? আর, উপমার ভিতর কি কোন সত্য নেই?

"একটা কথা আমার মনে পড়ল—একদিন এক মুর্খের প্রসঙ্গে জেনেছিলেম যে, তার মার খুব জ্বর হওয়াতে সে তাঁকে একটা টবের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল। লোকে যখন কারণ জিজ্ঞেস করলে, তখন সে হেসে বল্লে, সে ত খুব সহজ—যা গরম হয়, তাকে ত জল দিয়েই ঠাণ্ডা করতে হয়। সে বোধ হয় একখণ্ড লোহার কথা ভেবে বলেছিল।

তার পর সেদিন চকিতার অসুখে ডাক্তার যখন তাকে এক টব জলে ডুবিয়ে রাখলে, তখন আমার সেই মুর্খকে আর মূর্খ বলে মনে হচ্ছিল না—তার উপর কেমন একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠছিল।

"মোট কথা, আমাদের মঠ এত দিন যা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে এসেছে,—আজকে হঠাৎ তাকে বদলে দেবার আমি কোন প্রয়োজন দেখচিনে। ব্রহ্মচারীর জীবনের মধ্যে রমণীর কোন স্থান নেই;—কিন্তু এই নারীটিকে আমি অত্যন্ত অসহায় ভাবে সংসারের আবর্ত্তের মধ্যেও ফেলে দিতে পারিনে। তাই আমি ভাবচি যে, তোমাদের মধ্যে একজনকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ত্যাগ করে গার্হস্থ্য গ্রহণ করতে হবে। এই ত্যাগ-স্বীকার করতে কে প্রস্তুত আছ—আমি জানতে চাই।"

স্বামীজির এই প্রস্তাব শুনে ত আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কারুর মুখে একটি কথাও ফুটল না।

বিশুদ্ধানন্দ চন্দ্রনাথকে আহ্বান করে বল্লেন—"চন্দ্রনাথ, তুমি প্রস্তুত নও চকিতাকে বিবাহ করে সংসার ধর্ম্ম গ্রহণ করতে?"

"আপনার অনুজ্ঞা অবহেলা করতে পারিনে; কিন্তু যদি আমার স্বাধীন মতামতের উপর এই জিনিসটাকে ছেড়ে দেন—তা হলে বলতে পারি যে, ব্রহ্মচারীর জীবনকে আমি পবিত্রতর বলে মনে করি—গৃহী হতে আমার জীবনে কোন দিন সাধ হয় নি।"

ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কোন কাজ করে, এমন মত স্বামীজির ছিল না।

ব্রহ্মচারীরা কেউ সম্মত হল না।

বিশুদ্ধানন্দ পনর দিনের জন্য মঠ ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। মঠের কর্ত্তৃত্ব আমার হাতে ন্যস্ত হলো।

(৩)

সেদিনকার তর্ক বিতর্কের ফলে চন্দ্রনাথ অনেকখানি বিমনা হয়ে পড়েছিল। তাকে দেখলেই স্পষ্ট বুঝা যেত যে, তার বুদ্ধির উপর যেন সমস্যার একটা সূক্ষ্ম পর্দ্দা পড়ে গিয়েছিল—যেটাকে কিছুতেই সে ছিঁড়ে ফেলতে পারছিল না।

সন্ধ্যা-বন্দনা শেষ করে সে একদিন গঙ্গার তীরে বাঁধা

ঘাটের উপর চুপটি করে বসে ছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত; চাঁদের আলোতে পূবের আকাশ তখন ঈষৎ উজ্জ্বল—তারি ছায়া গঙ্গার বুকে পড়ে ঢেউয়ের মাথায় ঝক্‌ঝক্ করে উঠ্‌ছিল।

চন্দ্রনাথের মন কিন্তু ঢেউয়ে ছিল না; পূবের আকাশে ছিল না; তাই আমি যখন তার পিঠের উপর আমার হাতখানি ধীরে ধীরে রেখেছিলাম, তখন সে শিউরে উঠেছিল—সেই শিওরানির সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার দেহের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উদ্দামতা স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম।

সে একটু রাগ করেই বল্লে, "এমন করে ভয় দেখান তোমার ভাই, ভারি অন্যায়।"

আমি বল্লাম "সত্যি কথা বলবি? বল ত তুই কাকে মনে করেছিলি?"

চন্দ্রনাথ ইতস্ততঃ না করেই বল্লে, "চকিতাকে।"

"এমন অসম্ভব মনে হবার কি কারণ?"

"অসম্ভব মানে?"

"এ সময় চকিতা ত নীচে থাকে না!"

"কিন্তু তার নীচে আসবার মানা ত নেই।"

"তা বটে, কিন্তু পথও ত খোলা নেই।"

চন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে বল্লে—"অত জানিনে—সে এমন মাঝে মাঝে এসেছে—তাই মনে হলো, তার আসা অসম্ভব নয়!"

"বটে, সে কথা আমি জানি নে।"

চন্দ্রনাথ নির্ব্বাক হয়ে বসে রইল। তাকে দেখে আমার নিশীথের কথা মনে হ'লো—গতিহীন স্তব্ধতার নীচে ঝিল্লী-ধ্বনির কি ক্ষুব্ধতা! চন্দ্রনাথের চিন্তায় চিত্ত লোড়িত হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ দুজনে স্তব্ধভাবে বসে রইলাম,—দেখি, তখন চাঁদ আকাশের পথে অনেকখানি উঠে পড়েচে। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখী উড়ে যাওয়াতে চন্দ্রনাথ বুঝতে পারলে যে তার কথা না কওয়াটা ঠিক হচ্চে না।

কিন্তু কি কথা সে কইবে? বল্লে, "স্বামীজি কবে ফিরচেন?"

"আরো দিন পাঁচেক পরে।"

"তাই ত"···বলে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

"কেন?"

"তাই বল্‌ছিলাম—তিনি ফিরলে আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই, একটা কথা।"

"কি কথা?"

"তিনি—আমাকেই কেন বিশেষ করে আহ্বান করলেন।"

"ঠিক, এ কথা আমাদের সকলেরই মনে নিয়েছে।"

"আচ্ছা তুমি কিছু কারণ মনে করতে পার?"

"হয় ত তিনি তোমাকে সব চেয়ে যোগ্য বলে মনে করেছেন।"

"ও সব বাজে।"

"এই বিষয়ে যোগ্য হতে পারি।"

"তার মানে কি?"

"গৃহীর গুণ হয় ত তোমাতেই সব চেয়ে বেশী আছে।"

চন্দ্রনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে, "তা নয়, স্বামীজি আমাকে সব চেয়ে অযোগ্য মনে করেছেন। এ যেন ঠিক তেমনি ঐ কোন্ দেশের রুগ্ন ছেলেকে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে দেওয়া।"

আমি কথার উত্তর খুঁজে পেলাম না। সে বল্লে, "মঠের সব চেয়ে কম ক্ষতিতে সব চেয়ে বড় লাভ হয়, যদি আমি সংসারী হই। মঠের জন্যে প্রাণ দিতেও আমি প্রস্তুত আছি; কিন্তু এমনি করে নয়—এতে আত্মার অধোগতি হবে।"

"কেন?"

"আমি মনে করি" চন্দ্রনাথ একটু হেসে বল্লে, "চকিতার সঙ্গে বিবাহিত স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থাপন করাই যেতে পারে না। তার যে মনের অসামাজিক অবস্থা—স্বামীজির এইখানেই মস্ত ভুল হয়েছে। স্ত্রী এবং পুরুষের মিলনের কারণ যদি প্রেম ভালবাসা না হয়, তা'হলে সে মিলন সুখের হয় না—তাতে সমাজের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল বেশী হয়।—বিবাহ ব্যাপারটাকে কেবলমাত্র সামাজিক নিয়ম-পদ্ধতিতে পর্য্যবসিত করে শাস্ত্রকারেরা আমাদের সমাজের প্রভূত ক্ষতি করেছেন। মানুষের জীবনটাকে অমন করে বিধি-নিয়মে দিয়ে বেঁধে আড়ষ্ট করে দিলে—আর সবই তাতে থাকে, কেবল সে প্রাণহীন হয়ে পড়ে,—সে তার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে,—স্বেচ্ছায় বেড়ে উঠ্‌বার আর অবসর পায় না। আমাদের সমাজের অধঃপতনের এই একটা মস্ত

কারণ বলে আমার মনে হয়। নিয়মগুলোর দোষ যে, সেগুলো সমাজের বাড়ের সঙ্গে বেড়ে উঠ্‌তে পারে না। চীনাদের লোহার জুতোর মত সমস্ত সমাজকে খর্ব্ব ক'রে কুৎসিত করে দেয়। যে নিয়ম মানুষের স্বাধীনতাকে লোপ করে দেয়—সেই নিয়ম সমাজের কোন উপকার করে না—সে সমাজের অপকারই করে।

"চকিতাকে আমি যদি চাই ত' সে তার রূপের জন্যে ;—এ চাওয়া দেহের চাওয়া, মনের চাওয়া নয়। এমন করে কীট পতঙ্গ জন্তু জানওয়াররা চায় ;—এই চাওয়ার ফলে যা লাভ হয়—সে লাভের যোগ্য মানুষ নয় ; মানুষকে আমি তার চেয়ে অনেক বড় বলে মনে করি ;—মানুষ যা' মন দিয়ে, এবং তার বুদ্ধি দিয়ে চায়—সেইটেই তার আসল চাওয়া ;—তেমন করে তাকে না চাইতে শেখালে সে আসল জিনিস পেতেই পারে না।

"স্ত্রী পুরুষের মিলনের যোগসূত্র যদি কেবল মাত্র লালসা হয়, ত' তার ফলে আমরা মানুষ পাইনে—জানওয়ার পাই ;—এই কারণে আজকাল আমাদের দেশে মানুষের চেয়ে জানওয়ারের সংখ্যা এত বেশী হয়ে পড়চে।

"বুঝলে ভাই, আমি বলতে চাই—চকিতার বিবাহ হতেই পারে না—তার দেহের বিবাহের বয়স হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার মনের সে বয়স হয়নি।"

আমি বল্লাম, "তোমার এই তর্ক আরো একটু টেনে নিয়ে গিয়ে যদি বলি যে, আমাদের দেশের মেয়েদের যে বয়সে বিবাহ হয়—তাতে মনটা ত' কাঁচাই থেকে যায়—কিন্তু বিয়ে কি বন্ধ থাকচে তাই বলে ?"

"বন্ধ থাকচে না বটে—কিন্তু রাখা উচিত নিশ্চয়। যে মন শিক্ষার দ্বারা পুষ্ট হয়ে ওঠেনি, তাকে অধিকার দিলেও সে অধিকার রাখতে পারে না। এই কারণেই আমরা নারীকে সম্মান করিনে। তারাও সম্মানের দাবী করে না। আমরা মনে করি তারা রিপু চরিতার্থ করিবার উপায় মাত্র।"

চন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বার হচ্ছিল—সে উত্তেজিত হয়ে বল্লে—"এই বিবাহ ব্যাপারে আমার ঘোর আপত্তি আছে। আমি প্রাণ থাকতে এ কিছুতেই ঘটতে দেব না।"

তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল!

(৪)

স্বামীজি ফিরিলেন,—সঙ্গে তাঁর গুরুদেব। প্রকাণ্ড পিঙ্গল জটা, দীর্ঘ দাড়ি গোঁফ সাদা ধপ্‌ধবে। দেখেই মনে ভক্তি হয়। মনে হলো যেন কৈলাস ছেড়ে স্বয়ং সদাশিব নেমে এলেন!

তেতালার হল-ঘরে তিনি দুপুরটা কাটাতেন একটা প্রকাণ্ড হরিণের চামড়ার উপর বসে ; কিন্তু রাত্রিবাস তিনি ঘরের মধ্যে করতেন না—কি শীত, কি গ্রীষ্ম—এই তাঁর নিয়ম।

আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলাম—তিনি হাস্‌তে লাগ্‌লেন ; বল্লেন, এ ভেদ-জ্ঞান ব্রহ্মচারীদের থাকে, সন্ন্যাসীর থাকে না।

তাঁর আসাতে মঠে যেন উৎসব পড়ে গেল। স্বামীজি বল্লেন, "যে ক'দিন গুরুদেব আছেন, সে ক'দিন তোমরা আপন আপন ইচ্ছায় চল—তোমাদের কোন নিয়ম পালন করতে হবে না।"

মেঠো রাস্তায় চাকায় কাটা গর্ত্তের পথ ছাড়া যেমন গরুর গাড়ী যেতে পারে না, তেমনটি ঠিক হয়ে পড়েছিল আমাদের ; অনিয়মের উঁচু নীচু উবড়ো খেবড়ো পথে চলবার সাধ্যই ছিল না। আমরা কতকটা বিপদেই পড়ে গেলাম ; সমস্ত দিনটা কেমন করে কাটে।

একদিন দুপুরে তেতালার উত্তরের ঘরে বসে হঠাৎ আমার একটা পুরোনো অসম্পূর্ণ ছবিকে সম্পূর্ণ করে তোলবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠ্‌ল। সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এসে, ইচ্ছাকে অবিলম্বে কাজে পরিণত করতে লাগ্‌লাম।

ছবিটা গায়ত্রীর। ছবি আঁক্‌ছিলাম। চারদিকে জল, মাঝখানে একটা ছোট পাহাড়ের উপর একটি সুন্দরী মেয়েকে দাঁড় করিয়ে তার দৃষ্টিটা উর্দ্ধে, বহু উর্দ্ধে নীল আকাশ ভেদ করে যেন কোথায় লীন (সংলগ্ন) করে দিতে চাচ্ছিলাম। মুখখানা কতবার পুঁছলাম—কতবার আঁকলাম ; কিছুতেই আর পছন্দ হয় না। সমস্ত দিন তার উপর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন ছবিটা সে দিনের মত রেখে দিতে যাব, তখন অস্পষ্ট আলোতে পরিষ্কার দেখ্‌তে পেলাম যে, আমি চকিতার মুখ এঁকেছি!

অদূরে স্বামীজি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার মনে হল তাঁর চোখ দুটো হাসিতে ভরা! সে হাসিতে দুষ্টুমি ছিল, আর

প্রসন্নতা ছিল। তিনি বল্লেন, "জ্ঞানানন্দ, এত কম আলোতে ছবি এঁক না, চোখ খারাপ হয়ে যাবে।" আমি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে রইলাম।

অনেক রাত পর্য্যন্ত চোখে ঘুম এল না; বিছানায় শুতে একেবারে ভাল লাগে না; আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলাম। জোৎস্না ফুট্‌ফুট্‌ করচে। গভীর নিস্তব্ধতার উপর ঝিঁ ঝিঁ যেন শব্দের একটি সূক্ষ্ম রেখার আঁচড় অবিশ্রান্ত ভাবে টেনে চলেচে। মনে হ'ল, তার আদি নেই, অন্ত নেই; মনে হ'ল সে শব্দও যেন অনন্তেরই যাত্রী! হঠাৎ আমার সমস্ত জীবনকে একটা বিরাট স্বপ্নের মত বোধ হলো।

এমন-সব অদ্ভুত কথা মনে হওয়াতে বেশ বুঝতে পারলাম, মাথাটা গরম হয়ে উঠেচে; খানিকটা গঙ্গার ঠাণ্ডা জল মাথায় দিতে ইচ্ছা হলো। ধীরে ধীরে বাঁধা ঘাটের উপর গিয়ে দাঁড়াইতেই দেখ্‌লাম, স্বামীজি আর তাঁর গুরুদেব। স্বামীজি গুরুর পদ সেবা করচেন। তাঁরা যে সকল কথাবার্ত্তা কইছিলেন, তা' আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

গুরুদেব বল্লেন, "ফলিত জ্যোতিষের ফলাফল চূড়ান্ত ভাবে কিছুই বলা যায় না। ফলাফলের উপর মানুষের কর্ম্মের প্রভাব খুব বেশী পরিমাণেই থাকে। মনে কর, আমার পরমায়ু জ্যোতিষ হয় ত বল্লে একশ' বছর; আমি কিন্তু আশীর বেশী বাঁচলাম না,—তা'হলে কি বলতে হবে, গণনা ভুল? এখেনে বুঝতে হবে যে, আমার বাঁচার সম্ভাবনা ছিল একশ' বছরই; কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা আমি তাকে খাটো করে ফেল্লাম। যারা এই কাজে বহুদর্শিতা লাভ করেছেন, তাঁরা গণনার ভিতর এই কর্ম্মের প্রভাবটাও ধরেন। এই হিসেব বড় কঠিন!

"মেয়েটির হাত দেখে মনে হয়, তার বিয়ে এখনো হয়নি, খুব শীঘ্র হবে বলেও মনে হয় না; সন্নিকটে তার একটা ফাঁড়া আছে—সেটা উত্তীর্ণ হতে পারে কি না সন্দেহ;—গণনা ঐখানেই বন্ধ করেছি।"

"তাকে মঠে রাখার বিষয়ে কি বল্লেন?" স্বামীজি প্রশ্ন করলেন।

"মেয়েটির স্বভাব অত্যন্ত বিশুদ্ধ" গুরুদেব বল্লেন,—"আর ব্রহ্মচারিরাও সোণার চাঁদ—কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা করবার দরকার কি?"

"চকিতাকে নিয়ে কি করি, বুঝেই উঠ্‌তে পারি না। এ বিষয়ে আপনি কি উপদেশ দেন?" স্বামীজি প্রশ্ন করলেন।

উত্তরে গুরুদেব বল্লেন "ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে এই কন্যাটির এই মঠে বসবাস মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, পরন্তু একান্তই বাধা স্বরূপ হবে বলেই মনে করি। ধ্যান ধারণা, ভগবৎ চিন্তার জন্যে চিত্তের যে ঐকান্তিকভাব প্রয়োজন, মঠে নারীর বর্ত্তমানে তাতে সবিশেষ বিঘ্ন ঘটবে বলেই বোধ হয়। এই সব ভেবে চিন্তে আমি বলি যে, মেয়েটিকে অন্যত্র পাঠাবার কেন ব্যবস্থা কর না!"

স্বামীজি বল্লেন "তার চেষ্টা করেছি—এমন চেষ্টাও করে ছিলাম যে, ব্রহ্মচারীদের মধ্যে যদি কেউ তাকে বিয়ে করে গৃহী হয়; কিন্তু তাতেও কেউ সম্মত হয়নি। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তা'ও আমি বুঝে উঠতে পারিনে। এই সব চিন্তায় মনটা এমন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল যে, আপনার কাছে গিয়ে না পড়লে হয়ত' বিশেষ বিপন্ন হয়ে পড়তাম।"

স্বামীজি চুপ করলেন।

হঠাৎ মনে হলো, এমন করে তাদের কথাবার্ত্তা শুন্‌বার আমার কোন অধিকার নাই; তাই ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে, স্বামীজির পায়ের তলায় বসলাম।

তিনি বিস্মিত হয়ে বল্লেন "জ্ঞানানন্দ, তুমি যে এত রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে রয়েছ?"

স্বামীজির স্বরে যথেষ্ট স্নেহ মাখানো ছিল; কিন্তু হঠাৎ সন্ধ্যাবেলার ঘটনাটা মনে পড়ে গেল; লজ্জায় আমার সমস্ত মনটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। সহসা কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না।

মাথার উপর দিয়ে একটা নিশাচর পাখী তার ডাক ডেকে চলে গেল; অপদেবতাদের উপহাসের অট্টহাসির শাণিত ছুরিটা মনে হলো যেন আকাশ থেকে আমার চিত্ত অবধি বিস্তৃত!

নির্ব্বাক দেখে স্বামীজি আমাকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন লক্ষ জীবনের রাশি-রাশি কান্না উত্তুঙ্গ হয়ে উঠ্‌ল। মনে হল, যেন তারা আমার দেহের নবদ্বার ভেঙ্গে বার হবার জন্যে ভীষণ হানাহানি করছে। তারপর কি হলো মনে নেই। (ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

আরব জাতির জ্ঞান-স্পৃহা

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-টি]

এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে যে বালুকাময় ভূখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানের নাম আরবদেশ। আরবদেশ আমাদের দেশের ন্যায় শস্যশ্যামল, নদীবহুল সমতলক্ষেত্র নহে। সে দেশ অনুর্ব্বর, ও বৃক্ষলতাহীন ভীষণ মরুভূমিতে পরিপূর্ণ। সেই স্থানের অধিবাসিবৃন্দকে জীবিকার্জ্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। তাই তাহারা সুস্থকায়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম। দৈহিক আকৃতির ন্যায় তাহাদের প্রকৃতিও কঠিন। তাহারা রণপ্রিয়, বিক্রমশালী ও দুর্দ্ধর্ষ বীরপুরুষ। তাহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এক সময় সমস্ত য়ুরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই জাতি অতিশয় স্বাধীনতা-প্রিয় ছিল। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ কালেও, এই দেশ স্বীয় স্বাধীনতা ধনে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহাদের পর-জাতি-বিদ্বেষ-ভাব এত প্রবল ছিল যে, তাহারা বহুদিন পর্য্যন্ত অন্য কোনও দেশের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক বা সংস্রব স্থাপন করিতে প্রয়াস পায় নাই। এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা তাহাদিগকে অতি প্রাচীন কাল হইতে খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত লোকলোচনের অন্তরালে রাখিয়াছিল।

খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে আরবদেশে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহাম্মদ একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া আরবদেশকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। মোহাম্মদের অলৌকিক প্রভাবে আরবগণ ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত বিজয়-পতাকা সমস্ত পৃথিবীতে উড্ডীন করিতে প্রয়াসী হইল।

অনেকের ভ্রান্ত বিশ্বাস এই যে, মোহাম্মদ একমাত্র অসি-বলে ও দৈহিক শক্তিপ্রভাবে তাঁহার ধর্ম্মমতের প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার নীতিপূর্ণ উপদেশ পাঠ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ-তত্ত্ব অবগত আছেন, যাঁহারা তাঁহার সমাজসংস্কার ও আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মাত্রও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষ্য দিবেন যে, এরূপ কথার কোন ভিত্তি নাই। বস্তুতঃ, মোহাম্মদের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ, তাঁহার ধর্ম্মমতের নীতিমূলকতা ও সমদর্শিতা, তাঁহার জ্ঞানানুরাগ ও বিদ্যোৎসাহিতা তৎকালীন বহু-ঈশ্বরবাদী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দুর্নীতিপরায়ণ, বিদ্বেষভাবপূর্ণ, অজ্ঞান তিমিরাবৃত জনমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

পবিত্র কোরাণশাস্ত্রের একটী মাত্র সূরা পাঠ করিলেই মোহাম্মদ-প্রচারিত ধর্ম্মের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব অনুভব করা যায়।

The Qur'an says :—Righteousness is not that ye turn your faces to the East or to the West, but Righteousness is this :—

Whosoever believeth in God and the Last Day, and the angels and the Book and the prophets, and whoso for the love of God, giveth of his wealth unto his kindred and unto orphans, and the poor and the traveller, and to those who crave alms, and for the release of the captives, and whoso observeth prayer and giveth in charity; and those who, when they have covenanted, fulfil their covenant, and who are patient in adversity and hardship, and in times of violence; these are the Righteous and they that fear God. (১)

এই পরম পবিত্র কোরাণ বাক্য হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃত মুসলমান ধর্ম্মের দুইটি দিক—আধ্যাত্মিক ও আনুষ্ঠানিক বা ব্যবহারিক।

এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি, শেষ বিচার দিনে বিশ্বাস, স্বর্গীয় দূত, কোরাণশাস্ত্র ও পয়গম্বরদিগের উপর বিশ্বাস, মুসলমান ধর্ম্মের মূল সূত্র।

এই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃত ইস্‌লাম-উপাসককে কতকগুলি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তিনি, ঈশ্বর-প্রীতির জন্য, তাঁহার নিঃস্ব আত্মীয়-স্বজনকে ও অনাথ বালক-বালিকাকে অর্থ-সাহায্য করিবেন, পথিক ও দরিদ্র ব্যক্তির সহায়তা করিবেন, ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষা প্রদান করিবেন, বন্দীর উদ্ধারার্থ অর্থদান করিবেন, দৈনিক উপাসনা করিবেন, দানকার্য্য সম্পাদন করিবেন, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন। তিনি বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করিবেন, ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কখনও ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না।

মোহাম্মদের ধর্ম্মমত বা নৈতিক উপদেশ আলোচনা করিবার সুযোগ ও সময় এই প্রবন্ধে হইয়া উঠিবে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু মহাপুরুষ মোহাম্মদের গভীর জ্ঞানানুরাগ এবং তৎপরবর্ত্তী খলিফাগণের

---

(১) Khoda Bakhsh.

অপূর্ব্ব জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানানুশীলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

মোহাম্মদ জ্ঞানের উপাসক ছিলেন। তিনি জ্ঞানকে সর্ব্বধর্ম্মের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানের প্রভাবেই পারত্রিক সুখলাভ করিতে মানব সমর্থ হয়, এই তাঁহার অভিমত ছিল। তিনি বলেন,—

Acquire knowledge, because he who acquires it in the way of the Lord performs an act of piety; who speaks of it, praises the Lord; who seeks it adores God; who dispenses instruction in it, bestows alms; and who imparts it to its fitting objects, performs an act of devotion to God.

Knowledge enables its possessor to distinguish what is forbidden from what is not; it lights the way to heaven; it is our friend in the desert, our society in solitude, our companion when bereft of friends; it guides us to happiness; it sustains us in misery, it is our ornament in the company of friends, it serves as an armour against our enemies. With knowledge the servant of God rises to the heights of goodness and to a noble position, associates with sovereigns in this world and attains to the perfection of happiness in the next.

Amir Ali—Spirit of Islam.

"জ্ঞান অর্জ্জন কর, কারণ ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট পথে থাকিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করা ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম করা একই কথা। যে জ্ঞানালোচনা করে, সেই পরমেশ্বরের প্রকৃত গুণকীর্ত্তন করে; যে জ্ঞানান্বেষণ করে, সেই পরম দেবতার প্রকৃত পূজা করে; যে জ্ঞান-সম্বন্ধীয় উপদেশ বিতরণ করে, সেই প্রকৃত দানকার্য্য সম্পাদন করে; যে উপযুক্ত পাত্রে জ্ঞানদান করে, সেই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা করে।

"জ্ঞানবান্ ব্যক্তি জ্ঞানের প্রভাবে নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ কার্য্যের বিচার করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান তাহার স্বর্গের পথে আলোক স্বরূপ হয়। জ্ঞান সংসার-মরুভূমে আমাদের সুহৃৎ, নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমাদের সঙ্গী, বন্ধুহীন অবস্থায় আমাদের বন্ধু। ইহা আমাদের শান্তিসুখ আনয়ন করে ও দুঃখ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ সহ্য করিতে আমাদিগকে বল দান করে। সুহৃৎ-সম্মিলনে জ্ঞান আমাদের ভূষণ স্বরূপ; প্রতিপক্ষের সম্মুখে জ্ঞান আমাদের বর্ম্মস্বরূপ। জ্ঞানের প্রভাবে ঈশ্বর-সেবক ইহরাজ্যে উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে ও সমাজমধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করে; মর্ত্ত্যলোকে রাজেন্দ্রসঙ্গ লাভ করে, ও স্বর্গলোকে অনন্ত অবিমিশ্র শান্তি-সুখ ভোগ করে।"

খলিফা আলীও একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিভৃতে জ্ঞানের আলোচনা করিতেন এবং কাব্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস ও গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা করিতেন। মহাপুরুষ মোহাম্মদের যেরূপ জ্ঞানানুরাগ ছিল, তাঁহার প্রিয় শিষ্য আলীরও সেরূপ প্রবল জ্ঞানস্পৃহা ও বিদ্যানুরাগ ছিল। তাঁহার শাসনকালে জ্ঞান-চর্চ্চা ও বিদ্যালোচনার জন্য বসোরা ও কুফা এই দুইটি স্থান ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে। জ্ঞানোন্নতি-সাধন উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল অমূল্য ও সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রভাবে সুষুপ্ত মোস্‌লেম সমাজ জাগ্রত ও অনুপ্রাণিত হয়। তাহার প্রভাবে ইস্‌লাম জগতে এক অতৃপ্ত জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা সঞ্জাত হয়, এবং তাহারই প্রভাবে ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বিগণ সঞ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করেন। আলী বলেন ;—

"The greatest ornament of a man is erudition. He dies not who gives life to learning.

(Amir Ali)

"জ্ঞান মানবের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। যিনি বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা উহা সঞ্জীবিত রাখেন, তিনি জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যান।"

আরবদেশে মোহাম্মদ এক অভিনব রাজত্ব স্থাপন করিয়া যান। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে-বিভক্ত আরবজাতিকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাগণের রাজত্বে আরবের আধিপত্য দিন দিন বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মোহাম্মদের মৃত্যুকালে শুধু আরবদেশে তাঁহার রাজত্ব সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর খলিফাদের শাসন সময়ে আরবগণ সিরিয়া (৬৩৫ খৃঃ), বেবিলন (৬৩৭), আসেরিয়া (৬৪০) মিশর (৬৪২ খৃঃ) প্রভৃতি দেশে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করে। তাহাদের এক দল ভারত আক্রমণ করিয়া সিন্ধুদেশ অধিকার করে ও সেখানে আরব উপনিবেশ স্থাপন করে।

এই সকল প্রাচীন সুসভ্য বিজিত দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিকট বিজেতা আরবগণও মস্তক অবনত করিল। তাঁহাদের শিক্ষা, তাঁহাদের দর্শন, তাঁহাদের বিজ্ঞান, আরবগণের জাতীয় চরিত্রের উপর এক অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করিল। রোমকগণ যেরূপ বিজিত গ্রীসের শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এক নূতন জাতীয় জীবন লাভ করিয়াছিল, আরবগণও সেইরূপ এই সকল সুসভ্য জাতির শিক্ষা-সংস্পর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাচীন লুপ্তপ্রায় সভ্যতার জীবন-সঞ্চার করিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্ত খৃষ্টধর্ম্ম-যাজকগণ সুসভ্য গ্রীসের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তাঁহাদের ত্রিসীমা হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন। এইরূপে য়ুরোপ হইতে বিতাড়িত হইয়া গ্রীক সভ্যতা ও শিক্ষা সুদূর এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্তে সিরিয়া দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সিরিয়া প্রদেশ দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তীকাল হইতেই গ্রীক-ভাবাপন্ন হইয়াছিল। এখন সে এই নির্ব্বাসিত গ্রীক শিক্ষা ও সভ্যতাকে সাদরে গ্রহণ করিল। গ্রীক বিদ্যার চর্চ্চা সিরিয়াতে পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হইল। আণ্টিয়ক, হার্‌রণ, নিসিবিস প্রভৃতি স্থানে গ্রীক জ্ঞান-কেন্দ্র স্থাপিত হইল। এইরূপে

য়ুরোপে যখন শিক্ষা অনাদৃত হইতেছিল, সেই সময় এই সকল জ্ঞান-কেন্দ্রে পঞ্চম শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত, ভারতীর অপূর্ব্ব পূজা চলিতেছিল।

যখন সিরিয়াতে গ্রীক বিদ্যার এইরূপ প্রভাব, সেই সময় আরবগণ ইহা হস্তগত করেন। আরবগণ দেখিলেন, এই সকল সুশিক্ষিত অধিবাসীর নিকট তাহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করিতে হইলে, ইহাকে শুধু অন্ধ বিশ্বাসের উপর স্থাপন করিলে চলিবে না; সুতরাং উদার শিক্ষা ও উদার ধর্ম্মের পক্ষপাতী, উন্নত ভাবাপন্ন এক মোসলেম সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা ইসলাম ধর্ম্মকে জ্ঞানের (reason) সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইলেন এবং গ্রীকগণের উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ ধর্ম্মভাবের সাহায্যে স্বকীয় ধর্ম্মমত সমর্থন করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রথমতঃ দামাস্কাসে এই নব মোসলেম সম্প্রদায়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। পরিশেষে ইরাক প্রদেশের অন্তর্গত বোগদাদ, বসোরা, কুফা প্রভৃতি নগরে ইহা বিস্তৃত আকার ধারণ করে। ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল স্থানে শিক্ষাক্ষেত্র প্রসারিত হইতে থাকে। অবশেষে ইরাকের বিদ্বন্মণ্ডলী এক নূতন শিক্ষা-মন্তব্য (Scheme of Education) প্রকাশ করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডেভিডসন (Davidson) বলেন এই অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিক্ষা-মন্তব্যের তুলনা জগতে মিলে কি না সন্দেহ। (২)

এই অতুলনীয়, সুচিন্তিত 'শিক্ষা মন্তব্য' যাঁহাদের মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হয়, তাঁহারা ইরাকে 'সরলবিশ্বাসী ভ্রাতৃদল' (Brothers of Sincerity) নামে সুপরিচিত ছিলেন। সংখ্যায় তাঁহারা অতি অল্প হইলেও বিদ্যাবত্তায় ও উদারতায় তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ ছিল না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ ছিল। প্রকৃত সত্য ও ধর্ম্মের সমর্থন করিতে যাইয়া তাঁহারা তদানীন্তন মোসলেমগণের অন্ধ অদৃষ্টবাদ (fatalism) ও ধর্ম্মোন্মাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন; এবং সময়োচিত বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন। ধর্ম্ম সংস্কার বিষয়ে তাঁহারা প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত প্লেটো ও আরিষ্টোটেলের (Aristotle) নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। অনেকাংশে তাঁহারা এই দুই দার্শনিক পণ্ডিতের পন্থাবলম্বনে স্বীয় ধর্ম্মমত গঠন করেন। এই "সরল বিশ্বাসী ভ্রাতৃদল" কোরাণের উক্তিসমূহের তৎকাল প্রচলিত বিসদৃশ ও কুসংস্কারমূলক মীমাংসার খণ্ডন করিয়া, প্রকৃত রহস্যের উদ্ঘাটন করেন, এবং ইসলাম তত্ত্বের মূলে যে সরল ও যুক্তিসিদ্ধ সত্য নিহিত আছে, তাহা জনসমাজে প্রচার করেন। (৩)

---

(২) "The scholars of araq had drawn up a scheme of education which, for completeness and thoroughness, looks in vain for an equal.—Davidson.

(৩) এই সরল বিশ্বাসী ভ্রাতৃসঙ্ঘ অনুমান ১০০০ খৃষ্টাব্দে এক বিশ্বকোষ (Encyclopædia) রচনা করেন। ইহাতে তাঁহাদের শিক্ষা-মন্তব্য (Scheme of Education) অতি বিস্তৃতভাবে ও বিজ্ঞতার সহিত আলোচিত হইয়াছিল। ডেভিডসন বলেন—এই বিশ্বকোষ চারি খণ্ডে (volume) দুইবার মুদ্রিত হয়—প্রথম ১৮১২ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়বার ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে। এই বিশ্বকোষে সর্ব্বশুদ্ধ ৫১ খানা পুস্তিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং এই পুস্তিকাগুলি বিষয়-বিভাগ অনুসারে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

শকুন্তলা

[শ্রীযোগেন্দ্রদাস চৌধুরী এম্-এ]

শকুন্তলার ইতিবৃত্ত জগদ্বিশ্রুত, তাই উহার সন্নিবেশে রচনার কলেবর বর্দ্ধিত করিলাম না। ৺চন্দ্রনাথ বসু মহোদয় লিখিয়াছেন,—"পুরুষ শরীরের বলে বলিষ্ঠ, রমণী হৃদয়ের বলে বলিষ্ঠা। পুরুষ সর্ব্বদা কর্ম্মক্ষম, রমণী কেবল হৃদয়ের বেগে বেগবতী হইলেই কর্ম্মক্ষম। পুরুষ সর্ব্বক্ষণই জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন; রমণী কদাচিৎ কখন জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা দেন। কর্ম্মশীলতা পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, রমণীর অবস্থা-সাপেক্ষ ধর্ম্ম। কিন্তু রমণী যখন সেই অবস্থাপতিত হন, তখন তাঁহাতে এবং পুরুষেতে কোনও প্রভেদ থাকে না, তখন কোমলতম নীলোৎপল পত্র কঠিনতম শমীবৃক্ষ হইয়া উঠে। স্ত্রীলোক এই আশ্চর্য্য বৈপরীত্যের আধার বলিয়া জগতের প্রধান রহস্য মধ্যে পরিগণিত।" আর শকুন্তলা সেই রহস্যের উজ্জ্বল চিত্র! রহস্যময়ী বলিয়াই "শকুন্তলা" কালিদাসের 'সর্ব্বস্ব', কালিদাসের শ্রেষ্ঠ রচনা।

শকুন্তলার চরিত্রে আমরা অনেক বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সন্নিবেশ দেখিতে পাই। শকুন্তলা স্বভাবতঃ কোমলা হইলেও কার্য্যকালে কঠোরা, ভীতা হইলেও সাহসিকা, মৃদু হইলেও বজ্ররূপিণী। তাই ভবভূতি বিস্মিত হইয়া এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

শকুন্তলা সামান্য একটী ক্ষুদ্র ভ্রমরের আক্রমণে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলেন, "কে আছ, আমায় রক্ষা কর।" অথচ তিনিই আবার রোষ-গর্জ্জনে বিরাট্ রাজসভায় দাঁড়াইয়া ভারতের সম্রাট্ দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিতে সাহস পান। কুশাঙ্কুরে শকুন্তলার কোমল চরণ বিদ্ধ হয়, উহা হইতে রক্ত নির্গত হয়, বন্যবৃক্ষবল্লরীতে দু'এক কলসীমাত্র জল সেচন করিয়া তিনি বিষম ক্লান্ত হইয়া পড়েন; তাহা দেখিয়া দুষ্মন্ত অতি দয়ার্দ্র-হৃদয়ে "স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপণাৎ"—ইত্যাদি বলিয়া কত সহানুভূতি প্রকাশ করেন, অথচ, যখন প্রেমের উত্তাপ জাগে, ভালবাসার আকর্ষণ হৃদয়ে প্রবল হয়, তখন সেই শকুন্তলা হিমাচল হইতে সুদূর নিম্নে দুষ্মন্তের রাজধানীতে পদব্রজে গমন করেন, তাহাতে তাঁহার সামান্য ক্লান্তিবোধ হয় না। মার্ত্তণ্ড-তাপ, সেই উজ্জ্বল

সৌন্দর্য্য কিছুমাত্রও ম্লান করিতে পারে না, সেই দুষ্মন্তই আবার রাজসভায় আসন্নপ্রবেশকারিণী অপরিচিতাকে দেখিয়া বলেন,—

"কাস্বিদবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুট শরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্॥"

শকুন্তলার হৃদয় আছে। কিন্তু সে হৃদয়ের গভীরতা অনন্ত সমুদ্রের গভীরতাপ্রায়। পুরুষ, চরিত্র-বিস্তারে সমুদ্রবৎ, রমণী হৃদয় গভীরতায় সমুদ্রবৎ! দুষ্মন্তের চিন্তায় শকুন্তলা নিমগ্না। তাঁহার জীবাত্মা যেন পরমাত্মায় লীন হইয়া গিয়াছে। শকুন্তলা ক্রমে পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুলিলেন, চন্দ্র-সূর্য্যের অস্তিত্ব ভুলিলেন, নিজের অস্তিত্ব ভুলিলেন, তাঁহার মন-প্রাণ, জীবাত্মা-পরমাত্মা সমস্তই এক মহাপুরুষ 'দুষ্মন্তের' মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে। আশ্রম-দ্বারে দুর্ব্বাসা আসিয়া গর্জ্জিলেন। শকুন্তলা শুনিলেন না! দুর্ব্বাসা বিষম-ক্রোধে আবার গর্জ্জিলেন,—মুখ হইতে তীব্র বিষের মত অভিশাপ স্খলিত হইল, শকুন্তলার ধ্যান ভাঙ্গিল না! তুচ্ছ দুর্ব্বাসার গর্জ্জন! যদি সেই মুহূর্ত্তে শকুন্তলার মস্তকের উপর ঊর্দ্ধ হইতে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত, কাণের পাশ দিয়া শত বজ্র গর্জ্জিয়া যাইত, যদি ভূমিকম্প হইয়া পৃথিবীর বক্ষ খসিয়া পড়িত, শকুন্তলা তাহাতেও জাগিতেন না, সেই গভীর ধ্যানাবস্থায়ই সেই মহাপ্রলয়ের অন্তরালে সরিয়া যাইতেন! ধন্য কবি! তোমার রচিত প্রেম কত গভীর, কত ভয়ঙ্কর, অথচ কত উন্নত, কত উজ্জ্বল! হৃদয়ের গুণেই যে রমণী পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, তুমি তাহা দেখাইয়াছ! এমন চিত্র জগতের আর কোন নাটকেই নাই!

শকুন্তলা সাক্ষাৎ মাতৃমূর্ত্তি! শকুন্তলা আশ্রমের প্রাণ-স্বরূপ। পতি-গৃহে প্রস্থানকালে বৃক্ষবিহারী দেবতাগণ, তাঁহাকে শাখাহস্ত প্রসার করিয়া বস্ত্রাভরণ প্রদান করে। ময়ূর নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে, মৃগশাবকগণ পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, হরিণী আসিয়া পশ্চাৎ হইতে বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে। শকুন্তলা তাঁহাদের মাতৃরূপিণী। বৃক্ষপাদে জল-সেচন না করিয়া, মৃগ-ময়ূরের মুখে নীবারমুষ্টি অর্পণ না করিয়া শকুন্তলা অন্নজল স্পর্শ করেন না। হরিণীর প্রসব-সময়ে চিন্তায় রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় না। কুশগ্রাসে মৃগাদির মুখ ক্ষত হইলে শকুন্তলাই ইঙ্গুদী তৈল দিয়া উহা শুষ্ক করেন! সর্ব্বত্রই শকুন্তলা বন-বালিকা! প্রকৃতির প্রিয় কন্যা! প্রকৃতির গুণে গুণময়ী। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিতা! তাই শকুন্তলা "বনলতা" হইয়াও রাজার "উদ্যানলতা"কে পরাভূত করিয়াছিলেন, বিকট বল্কল-বেশেও পৃথিবীর সম্রাটের মনোহরণ করিয়াছিলেন। শকুন্তলার সৌন্দর্য্য নিরুপম, অতুল! স্বর্গের সুষমা তাহার কাছে মলিন হইয়া যায়! স্রষ্টা অতি যত্নে প্রথমতঃ মানসপটে, তৎপরে চিত্রে, শকুন্তলার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রচিত করিয়াই, তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন, উহা যে ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি, শৈবালদলে রক্তকোকনদ, মেঘান্তরালে পূর্ণচন্দ্রমা,—তাই তিনি বল্কলবেশেও দুষ্মন্তের মনোহরণ করিতে পারেন। যে রূপ দেখিয়া স্বর্ণ-পুষ্প-ভ্রমে কাল ভ্রমর তাঁহার অনুসরণ করে, সেরূপ মানুষে সমবেদনা, বোধ হয় দামিনী-প্রভাও সেই সৌন্দর্য্যে হার মানে! তাই বিস্মিত নরপতি বলিয়াছিলেন—

"মানুষীষু কথং বা স্যাৎ অস্যরূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভাতরলং জ্যোতি রুদেতি বসুধাতলাৎ॥"

শকুন্তলার সম্পর্কে যে আসে, তাহাকেই মায়ায় ক্রন্দন করিতে হয়,—শকুন্তলা যেন দৈবমায়া, মূর্ত্তিমতী স্নেহ! গভীর স্নেহবশে কণ্ব শকুন্তলার উপরই অতিথি-পরিচর্য্যার ভার দিয়া যান,—আবার বিদায়-মুহূর্ত্তে, সংসারত্যাগী মুনি সেই পবিত্র মূর্ত্তিকে বক্ষে লইয়া সকরুণ স্বরে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন! শকুন্তলার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয় না এমন প্রাণী নাই! তৎকালে গান্ধর্ব-বিবাহ প্রচলিত থাকাতে, কুমারীগণ অনেক সময়ে পিতামাতার বিনানুমতিতে স্বেচ্ছাচার করিতে পারিত। শকুন্তলাকেও বর্ত্তমান যুগের সাধ্বী রমণীরা স্বেচ্ছাচারিণী বলিয়া দোষ দিতে পারেন। কণ্ব শকুন্তলার পিতা-মাতা সকলই। বিশেষতঃ, স্থান পবিত্র আশ্রমভূমি! উহাতে শকুন্তলা দুষ্মন্তের সহিত যথেচ্ছাচরণ করিয়া পাপ করিয়াছিলেন, সেই গুপ্তপাপের ফলও ভুগিয়াছেন। রাজ সভায় পরিত্যাগ কালে বৃদ্ধ শার্ঙ্গরব মুখের উপর বলিয়াছিল—"গুপ্তপ্রণয়ের ফল ভোগ কর! চপলা নারী নিজকৃত দোষে এইরূপেই বিনাশ পায়।" গৌতমীও মিষ্টবাক্যে রাজাকেও দুইকথা শুনাইয়া দিলেন। উভয়ের বদন লজ্জায় নমিত হইল!

আশা মায়াবিনী। আশাই নানা রকম কুহক সৃষ্টি করিয়া মুগ্ধ জীবকে ক্লেশ দিয়া থাকে, আকাশকুসুম বড়ই ভয়ঙ্কর! যখন মোহ ভাঙ্গিয়া যায়, যখন মরীচিকার চমক মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তখন অগ্রে-পশ্চাতে ধূ ধূ মরু-প্রান্তর হেরিয়া, লক্ষ্যহীন জীব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। শকুন্তলা দুষ্মন্তের ধ্যানে মগ্ন হইয়া মনে-মনে নানা রকম আকাশকুসুম রচনা করিতেছিলেন, সেই আশার কুহক, সেই মহামোহ এত গভীর হইয়া উঠিয়াছিল যে, শকুন্তলা নিজের কর্ত্তব্য করিতে ভুলিলেন। ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আসিয়া দ্বার হইতে ফিরিয়া গেল,—শকুন্তলা ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তাহারই ফল দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান!

পবিত্র প্রেমে কর্ত্তব্যহীনতা নাই। যদি থাকে, তাহার পশ্চাতে কঠোর দুঃখ অপেক্ষা করিয়া থাকে! কত আশা করিয়া, কত সুন্দর চিত্র কল্পনা-পটে আঁকিয়া শকুন্তলা দুষ্মন্তের দ্বারে আসিয়াছেন। কিন্তু দুষ্মন্ত তাঁহাকে চক্রান্তকারিণী বেশ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন; মাথার উপর বজ্র গর্জ্জিয়া গেল, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল! এ কি পরিণাম! শকুন্তলা ত এক দিনের জন্য স্বপ্নেও ইহা ভাবিতে পারেন নাই তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, আশা কত মায়াবিনী। Wordsworth এর কথায় বুঝিলেন—

"How fancy sickens by vague hopes beset,
How baffled projects on the spirit prey,
And fruitless wishes eat the heart away."

শকুন্তলা সতী! যখন অনন্ত পরীক্ষার পরও রামচন্দ্র তুষ্ট হইলেন

না, বলিলেন 'আবার পরীক্ষা দাও', আর পুত্রসম প্রজাগণের মুখপানে চাহিয়াও কিছুমাত্র সহানুভূতি পাইলেন না, তখন আমরা জানকীর কাতর প্রার্থনা শুনিয়াছি। তিনি ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—"মা বসুন্ধরে, তোর বক্ষে আমায় স্থান দে।" বসুধা সেই কাতরোক্তিতে বিদীর্ণা হইয়াছিল। আজ মর্ম্মপীড়িতা অসহায়া শকুন্তলাকেও আমরা দেখিলাম। ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিতেছেন—"ভগবতি, দেহি মে বিবরম্!" সতীর ক্রন্দনে স্বর্গ চমকিল, দেবতারা দয়ার্দ্র হইলেন, আর নিমেষ মধ্যে আকাশ-বক্ষ হইতে কি এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃ নামিয়া স্বর্গের শকুন্তলাকে স্বর্গে উঠাইয়া লইল। তৎপর পতির সহিত মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত যতদিন তিনি মারীচের আশ্রমে ছিলেন, ততদিন সতীধর্ম্ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। এক বেণীধরা, ব্রহ্মচারিণী সাজিয়া তিনি আজীবন পুত্র ও পতির মঙ্গল-চিন্তা করিয়া দিনযাপন করিতেছিলেন।

হিন্দু জ্যোতিষের বিশিষ্টতা

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাসগুপ্ত, বি-এ]

"East and West" পত্রের জুলাই সংখ্যায় ভারত-গভর্ণমেণ্টের গ্রন্থশালার অধ্যক্ষ ও "ভারতের গণিত" শীর্ষক গ্রন্থ প্রণেতা Kaye সাহেব "ভারত জ্যোতিষে গ্রীক প্রভাব" নামে একটি ঊনবিংশতি পৃষ্ঠা-ব্যাপী গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটির এক স্থলে তিনি বলিতেছেন, "হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। হিন্দুর পক্ষে বিদেশীয় শিক্ষকের ঋণ স্বীকার করা সঙ্গত নয়; এই কারণেই বোধ হয় তাঁহাদের সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে বিদেশীয়গণের নিকট ঋণ স্বীকৃত হয় নাই, সুতরাং বেলী মোক্ষমূলর প্রভৃতি অতি বিশ্বাসী ইতিহাস-রচয়িতৃগণ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইয়াছিলেন।" এই সাধারণ ভ্রমটা দেখাইয়া দিবার জন্যই না কি Kaye সাহেবের এই প্রবন্ধের অবতারণা। Kaye সাহেবের উপরের উক্তিটির প্রসঙ্গে তথাকথিত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ বেণ্টলি (Bently) সাহেবের একটী প্রসিদ্ধ উক্তির কথা মনে পড়ে; বেণ্টলি সাহেব তাঁহার "হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাস" গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন—"সাহিত্যে জালিয়াতি ভারতে এতটা প্রচলিত হইয়াছিল যে, কোন্ পুস্তকখানি ভারতে কৃত্রিম, কোন্‌খানি বা জাল, তাহা বুঝিয়া উঠা দায় না। সাহিত্যে যে-কোন ভয়ানক জুয়াচুরি করিয়া তাহারা ধরা পড়ুক না কেন, মানুষের এমন কোনও বাধ্যতামূলক বিধি-বিধান নাই, যাহার কবলে পড়িবার ভয় তাহাদের আছে। ধর্ম্মের বা বিবেকের এমন কোনও শক্তি নাই, যাহা তাহাদিগকে এ পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারে। বিশেষ দণ্ডের অধীন হইবারও এমন কোন ভয় নাই, যাহা তাহাদিগকে এইরূপ কর্ম্ম হইতে বিরত করিবে।" অবশ্য হিন্দু জ্যোতিষের অনেক বিষয় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু এই অবান্তর বিদ্বেষভাব বড়ই সৌজন্য-বিরুদ্ধ। এইরূপ পক্ষপাতিত্ব একেবারেই প্রশংসার যোগ্য নহে; বরং ইহা হিন্দু জ্যোতিষে তাঁহাদের অনভিজ্ঞতাই সূচিত করে। Kaye সাহেব ও Bently সাহেবের এই যে মানসিক বিকৃতি, ইহাতে আমাদিগের মনে স্বতঃই সন্দেহ হয়, হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার তাঁহারা যোগ্য কি না; এবং ইহা নিশ্চয় যে, এই সকল বিষয়ের বর্ণনাকালে তাঁহারা এমন কতক তথ্যের অবতারণা করিতে বাধ্য, যাহার সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আবার, Kaye সাহেবের প্রবন্ধে বিচার-শক্তি ও যথাযথ প্রমাণ-প্রয়োগের এতটা অভাব যে, আমাদের মনে হয়, অপক্ষপাত হৃদয় সত্য তথ্যের আলোক-সম্পাতে প্রবন্ধটির পুনর্বিচার একান্ত প্রয়োজনীয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী হিন্দু জ্যোতিষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রথম বৈদিক যুগের জ্যোতিষ এবং দ্বিতীয়টি পরবর্ত্তী সময়ের পর্য্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ জ্যোতিষ। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বৃহৎ সংহিতা, সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থে এই পর্য্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ জ্যোতিষেরই সম্যক আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। বেলী, মোক্ষমূলর প্রভৃতি সহৃদয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ বৈদিক যুগের জ্যোতিষ-শাস্ত্রকেও খুব উন্নত ও নির্ভুল বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু বেণ্টলিপ্রমুখ কতিপয় তথাকথিত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বৈদিক যুগের জ্যোতিষে কিছুমাত্র বিজ্ঞানমূলক তথ্য দেখিতে পান না; এবং আমাদের মনে হয়, Kaye সাহেব শেষোক্ত সম্প্রদায়ের একজন উদ্যোগী পুরুষসিংহ। Kaye সাহেব কিন্তু ইহাতেই সন্তুষ্ট নহেন। তিনি আরও বলেন, "দ্বিতীয় যুগের হিন্দু জ্যোতিষও অর্থাৎ আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্কর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গবেষণাও সর্ব্বৈব গ্রীক জ্যোতিষ হইতে গৃহীত। হিন্দু লেখকগণ সকলেই যবন (অর্থাৎ গ্রীক) শিক্ষকদিগের পাণ্ডিত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এমন কি দুইখানি গ্রন্থ—রোমক ও পৌলিশ সিদ্ধান্ত গ্রীক জ্যোতিষের অনুবাদ।" এ স্থলে তিনি আর একটী নূতন কথার উত্থাপন করিয়াছেন। গ্রীক জ্যোতিষ যে পারস্য দেশের মধ্য দিয়া ভারতে উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা সপ্রমাণ করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, "হিন্দুরা, সূর্য্যোপাসক ময়ের মুখ দিয়া জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন, এই হিন্দুদিগের ময় পারসীদিগের "অহুর মজ্‌দা"র নামান্তর মাত্র।" এই ময় নামের উল্লেখে Weber সাহেবও বিচলিত হইয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, বোধ হয় ইহা গ্রীক টলেময়ের নামান্তর। আমরা এই প্রবন্ধের যথাস্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিব, এই কৌতুকাবহ উক্তি দুইটি কিরূপ অযৌক্তিক; এবং হিন্দুদিগের কীর্ত্তি খর্ব্ব করিয়া গ্রীকদিগের গৌরব বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টাও কিরূপ অকিঞ্চিৎকর।

হিন্দু-সভ্যতার শৈশবে হিন্দু সাধকগণ প্রত্যেক জ্যোতিষ্ককে ঐহিক শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাসের উপরই হিন্দু জ্যোতিষের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা মনে করিতেন, পরব্রহ্ম প্রত্যেক জ্যোতিষ্ককে ঐশিক গুণান্বিত করিয়া পাঠাইয়াছেন,—তাহার দ্বারা উহারা বিশ্বের সকল কার্য্যের নিয়ন্তা হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মকে সম্যক-

রূপে বুঝিতে হইলে, উহাদের গতি পর্য্যবেক্ষণ, এবং সময় ও ঋতুর বিভাগ গণনা একান্ত আবশ্যক। এইরূপে জ্যোতিষের আলোচনা সাধক হিন্দুগণের নিকট পুণ্যকার্য্য বলিয়া গণ্য হইল; এবং ঐ জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এক একটী দৈবতরূপে কল্পিত হইয়া পূজিত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রথম যুগের হিন্দু জ্যোতিষিকগণের প্রধান চেষ্টা হইল, নভোমণ্ডলের বৈচিত্র্যসমূহের একটা সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় নির্দ্ধারণ করা। এই কারণে বেলি সাহেব তদ্‌রচিত "হিন্দু জ্যোতিষ" নামক পুস্তকে লিপিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রহগণের গতি পর্য্যবেক্ষণ করা হইত। এমন কি, কেহ-কেহ বলেন, বেদের যাগযজ্ঞও জ্যোতিষ-গণনার ফল-প্রসূত। অন্ততঃ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন কি, বৈদিক যুগেও ভারতবাসীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের বহু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদিক যাগযজ্ঞ নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য্যের পারস্পরিক অবস্থিতির দ্বারা নিয়মিত; এবং সেই ধর্ম্মোদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পর্য্যবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রসিদ্ধ বেদবিৎ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কৃত বেদ-সূক্তির অনুবাদ হইতে আমরা জানিতে পারি, বৈদিক যুগেও হিন্দুগণ গ্রহগণের (অন্ততঃ পাঁচটির) গতি এবং সৌর ও চান্দ্র গ্রহণের কারণ অবগত ছিলেন। অন্যান্য বৈদিক পণ্ডিতেরা বলেন বেদ-সূক্তির জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা করিলে দেখিতে পাই, সে সময়ের হিন্দুগণ বিষুব বিন্দুদ্বয় ও অয়নান্ত-বিন্দুদ্বয় (equinoctional and solstitial points) সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞ ছিলেন না। বস্তুতঃ, এই সকল তথ্য হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, হিন্দু জ্যোতিষের প্রথম ভাগও প্রকৃত জিজ্ঞাসুর নিকটে আদর ও অনুধাবনের সম্পূর্ণ উপযোগী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সূর্য্যসিদ্ধান্তে ময় নামের উল্লেখ থাকায় অনেক লেখকের পক্ষে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ওয়েবার সাহেব বলেন, হিন্দুদিগের ময় গ্রীকদিগের টলেময়ের (Ptolemois) সংস্কৃত অনুবাদ মাত্র; এবং ইহা হইতে তিনি অনুমান করিয়াছেন, হিন্দু জ্যোতিষ গ্রীকদিগের নিকট বিশেষ ঋণী। আমরা এ স্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিব, এই ধারণা কিরূপ ভিত্তিহীন। পুরাণের অনেক স্থলে প্রসিদ্ধ শিল্পী ময়ের উল্লেখ দেখিতে পাই, এবং রামায়ণ ও মহাভারতের শতাধিক স্থানে "মায়াবী" ময়ের নাম পাওয়া যায়। এই স্থানে মায়াবী শব্দে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীই বুঝাইতেছে। রামায়ণ ও তৎপরবর্ত্তী মহাভারতের রচনাকালে টলেময়ের আবির্ভাব হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেই মহাভারতের রচনা সম্পূর্ণ হয়, ইহাই পণ্ডিতগণের মত। কিন্তু খ্রীষ্ট জন্মিবার অন্ততঃ একশত বর্ষ পরে টলেময় আবির্ভূত হ'ন। এসকল যুক্তি ছাড়াও যদি বা তর্কের খাতিরে ধরিয়া লই যে, হিন্দুদিগের ময় গ্রীকদিগের টলেময়ের সংস্কৃত অনুবাদ, তাহাতেও হিন্দু জ্যোতিষের ঋণ স্বীকার করিবার কারণ দেখা যায় না। সমগ্র সূর্য্যসিদ্ধান্তের কোনও স্থানে ময় জ্যোতিষের আচার্য্যরূপে বর্ণিত হন নাই, তিনি কেবল সূর্য্যের নিকটে উপদেশচ্ছলে জ্যোতিষের শিক্ষা লইতেছেন। এবং সকলেই এ কথা নিশ্চয় মানিবেন, সূর্য্য বিশেষ ভাবে হিন্দুদিগের দেবতা। ফলতঃ, ওয়েবার সাহেবের কথা ধরিয়া লইলেও, আমরা একেবারে বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আবার, Kaye সাহেব সম্প্রতি একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, সম্ভবতঃ ময় পারসিদিগের অহুর মজ্‌দার অপভ্রংশ। এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ব্যতীত ইহাও বলা যায়, ময় ও অহুর মজ্‌দা (যাহার অর্থ Omnipotent God) এই দুই শব্দের ধাতুগত কোনও মিল নাই। আর, পারস্যদেশের জ্যোতিষের বর্ণনা পাঠ করিলে সকলেই স্বীকার করিবেন, উহা সূর্য্য-সিদ্ধান্তের জ্যোতিষ ভাগের তুলনায় আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। বস্তুতঃ, এরূপ ধারণা কেবল বিষম ভ্রান্তিমূলক বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ব্রহ্ম, সৌর, সোম ও বৃহস্পতি এই চারিটিই সমধিক আদৃত হইত। ইহা ব্যতীত আরও দুইটি সিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছিল,—উহাদের নাম রোমক ও পৌলিশ। অনেকের ধারণা, এই দুইখানিই গ্রীকদিগের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনুবাদ; এবং এমনও অনেকে মনে করেন, হিন্দু জ্যোতিষে ইহাদিগের সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য রোমক সিদ্ধান্তের নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়, উহা কোন গ্রীক কি রোমীয় জ্যোতিষের অনুবাদ। ডাক্তার ভাউ দাজি (Dr. Bhau Daji) একখানি রোমক সিদ্ধান্তের হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, রোমক সিদ্ধান্তের বিচার-প্রক্রিয়ার সহিত হিন্দুগণের সিদ্ধান্তগুলির বিচার-পদ্ধতির একেবারেই মিল নাই; ইহাতে সময় ও দিন গণনায় Alexandriaর মধ্যাহ্ন গ্রহণ করা হইয়াছে। বোধ হয় ইহা টলেমীর কোনও গ্রন্থের সঙ্কলন এবং সম্পূর্ণ রূপে বিদেশ হইতে গৃহীত। ইহার বিচার-পদ্ধতি হিন্দু জ্যোতিষে ব্যবহৃত হওয়া দূরে থাকুক, হিন্দুদিগের সিদ্ধান্তসমূহে ইহার উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায় না। Dr. Kern বলেন, সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে রোমক সিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছিল; কারণ, মাঝে-মাঝে ইহাতে সম্রাট বাবরের নামোল্লেখ আছে। সুতরাং আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে ধারণা করিতে পারি যে, রোমক সিদ্ধান্তের সহিত হিন্দু জ্যোতিষের উন্নতির কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু পৌলিশ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ঠিক এই কথা বলা চলে না। ইহার বিচার-প্রক্রিয়ার সহিত, হিন্দুদিগের প্রচলিত জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তের অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। তবে উহার সৌর ও চান্দ্র গ্রহণ-গণনা সূর্য্যসিদ্ধান্ত কিম্বা ভাস্করের সিদ্ধান্তশিরোমণির গ্রহণ গণনার ন্যায় অতটা নির্ভুল ও বিশুদ্ধ নহে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের ধারণা, পৌলিশ সিদ্ধান্ত গ্রীক জ্যোতিষী পলাশ এলেক্সেণ্ড্রিনাসের (Paulus Alexandrinus) গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। এ কথাও কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে পুলিশ নামে একজন জ্যোতির্ব্বিৎ ঋষি বর্ত্তমান ছিলেন। নামের ঐক্য দেখিলেই যে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, ইহা বড় বিপজ্জনক যুক্তি। ডাক্তার কার্ণ বৃহৎ সংহিতার ভূমিকা লিখিতে গিয়া বলিতেছেন—"পলাশ এলেক্সেণ্ড্রিনাস (Paulus Alexandrinus) ও পৌলিশ যে একই

ব্যক্তি, ইহা অনুমান করিবার আমাদের কোনও অধিকার নাই। যখন নামটি উভয় ক্ষেত্রে এক, তখন নামের ঐক্য আদৌ একটা যুক্তির মধ্যে ধরা যাইতে পারে না।" অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তৎপ্রণীত "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"পৌলিশ সিদ্ধান্ত গণিত জ্যোতিষের গ্রন্থ, অপরদিকে Paulus Alexandrinus এর গ্রন্থ ফলিত জ্যোতিষের সম্বন্ধে সমধিক আলোচনা করিয়াছে; সুতরাং পৌলিশ গ্রন্থ যে ভারতের নিজস্ব এবং কোনও বিদেশীয় গ্রন্থের অনুবাদ নয়, ইহার আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই।"

হিন্দু জ্যোতিষের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ সিদ্ধান্তের যুগে গণিত জ্যোতিষের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালীন জ্যোতিষের বিচার-পদ্ধতি এতটা নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত যে, এই বৈজ্ঞানিক যুগের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণও উঁহাদের রচয়িতা বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারিলে গৌরব বোধ করিতে পারিতেন। সে সময়কার সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত, সূর্য্য সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত-শিরোমণিই আধুনিক হিন্দু-জ্যোতিষিগণের নিকট বিশেষ ভাবে আদৃত। উহাদের রচনার কাল সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সুধীমণ্ডলীর মধ্যে মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনও কারণ নাই। যে হেতু, পাশ্চাত্য লেখকগণ, যাঁহারা হিন্দু জ্যোতিষের একটা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হ'ন, তাঁহাদের অধিকাংশই বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ নহেন। অবশ্য তাঁহারা শ্রমশীল ঐতিহাসিক সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে যে সকল স্থানে রচনার কাল সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা দেখিতে পাইয়াছি, সেই সেই স্থানে বেলি সাহেব, ব্রেণেণ্ড সাহেব ও পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদীর মতই গ্রহণ করিয়াছি।

জ্যোতিষের ক্ষেত্রে আর্য্যভট্টের আবির্ভাব হিন্দুদিগের গণিত-জ্যোতিষের একটা নূতন যুগ বলিয়া সূচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মগুপ্ত ও অপরাপর পরবর্ত্তী লেখকগণ অনেক স্থলে আপনাদিগের মতের পরিপোষকরূপে আর্য্যভট্টের রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্তের আলোচনা হইতে আমরা জানিতে পারি, ভারতে সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যভট্টই স্থির করেন যে, পৃথিবীর পরিভ্রমণের দ্বারা নক্ষত্র ও গ্রহগণের উদয়াস্ত হইতেছে। আর্য্যভট্ট যে পৃথিবীর গতিনিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মগুপ্তের টীকাকার পৃথূদক স্বামী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বচন হইতে বেশ প্রমাণিত হয়—

ভূপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহাণাম্॥

নক্ষত্রমণ্ডল স্থির রহিয়াছে; কেবল পৃথিবীর আবৃত্তি অর্থাৎ পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত হইতেছে। পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ডে পৃথিবীর গতি বিষয়ে কোপারনিকসই সর্ব্বপ্রথমে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন (পাইথাগোরাস ইহার সঙ্কেত দিয়াছিলেন মাত্র); কোপারনিকসের আবির্ভাব-কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। আর হিন্দুমতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এবং পাশ্চাত্য মতে খ্রীষ্ট পরে প্রথম শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট জীবিত ছিলেন। বস্তুতঃ, ইহাই অনুমান করা সঙ্গত যে, হিন্দুগণের এই সিদ্ধান্ত-প্রস্রবণ গ্রীকদেশের মধ্য দিয়া অন্তঃসলিল-প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া য়ুরোপে বেগবতী স্রোতস্বতীরূপে পরিণত হইয়াছে। এখানেও Kaye প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকগণ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

আর্য্যভট্টের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে এই যে মতদ্বৈধ, তাহার প্রধান কারণ, পাশ্চাত্য লেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশই লক্ষ্য করেন নাই যে, ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট নামে দুইজন লোক বর্ত্তমান ছিলেন। প্রথম, আমাদিগের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ-শাস্ত্রকার আর্য্যভট্ট তিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন; অপর আর্য্যভট্ট খৃষ্টপরে ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনিও জ্যোতিষের আলোচনা করিতেন, তবে তিনি মৌলিক গ্রন্থ রচনা না করিয়া টীকা ও সঙ্কলনেই মন দিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তের একটা টীকা রচনা করেন। ডাক্তার ভাউ দাজি বলেন, শেষোক্ত আর্য্যভট্ট কৃত যে রচনার কথা আলবারুণি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকা। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নবম শতাব্দীর পূর্ব্বেও সূর্য্যসিদ্ধান্তের বর্ত্তমান সংস্করণ প্রচারিত ছিল। কিন্তু ইহাও প্রমাণ করা সহজ যে, বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্তের কতকটা অংশ মূলসূত্র রচনার পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল।

আর্য্যভট্টের পর ব্রহ্মগুপ্তের আবির্ভাব জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খৃষ্টপরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্ত বর্ত্তমান ছিলেন। পৃথিবীর কোনও আধার নাই কেন, এবং কেনই বা গোলাকার হইয়াও উহা পৃথিবীবাসীর নিকট সমতল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইহা আর্য্যভট্ট ও পরে ব্রহ্মগুপ্তই সর্ব্বপ্রথম যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। গ্রীক জ্যোতিষে কিন্তু আদৌ এই তত্ত্বের বর্ণনা নাই। ব্রহ্মগুপ্ত বলিতেছেন—"ব্যোমমণ্ডলে আপন শক্তির বলেই নিরাধার পৃথিবী দৃঢ় ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। কারণ, পৃথিবীর যদি আধার থাকিত, তাহা হইলে সেই আধারেরও আর একটা আধার থাকিতে বাধ্য; এইরূপে কেবল আধারের পর আধারই চলিবে, ইহার কোনও অন্ত থাকিবে না। সর্ব্বশেষে যদি স্ব শক্তিবলে আধারের অভাব কল্পনা করিতেই হয়, তবে প্রথমেই কেন করি না? তবে কেন পৃথিবীকে নাস্ত্যাধার অনুমান করি না? পৃথিবী আপন আকর্ষণ-শক্তি বলে নিকটবর্ত্তী বায়ুস্তরে অবস্থিত গুরু দ্রব্যকে নিজ কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট করে, এবং উহা পড়িতেছে বলিয়া বোধ হয় (যেমন প্রস্তরখণ্ড)। কিন্তু অনন্ত ব্যোমমণ্ডলের কোথায় পৃথিবী পড়িবে? শূন্যতা সকল দিকেই সমান অনন্ত। পৃথিবী যদি পড়িতে থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে শূন্যে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড প্রবর্ত্তক বেগ (projectile force) নিঃশেষ হইলে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে না। কারণ, উভয়ই নিম্নাভিমুখে পড়িতেছে, এবং ইহাও বলা চলে না যে প্রস্তরখণ্ডের গতির আধিক্যবশতঃ উহা পৃথিবীতে আসিয়া পড়িবে;

যে হেতু পৃথিবীর গুরুত্ব অনেক অধিক এবং তজ্জন্য উহার পতনের গতিও অনেক অধিক; কারণ, দ্রব্যের গতি গুরুত্বের অনুপাতেই হইয়া থাকে।" আর্য্যভট্টও এক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"যদ্বৎ কদম্বপুষ্পগ্রন্থিঃ প্রচিতঃ সমন্ততঃ কুসুমৈঃ।
তদ্বদ্ধি সর্ব্বসত্ত্বৈ র্জলজৈঃ স্থলজৈশ্চ ভূগোলঃ।"

অথবা ব্রহ্মগুপ্তের পরে ভাস্কর যাহা লিখিয়াছেন--

"নান্যাধারেঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতী হ্যস্য পৃষ্ঠে।
নিষ্ঠং বিশ্বং চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ।"

পৃথিবী কেন সমতল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আর্য্যভট্ট তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—

সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ
পৃথ্বী চ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্।
নরশ্চ তৎপৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না
সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা॥

যে হেতু পৃথিবী অত্যন্ত বৃহৎ এবং মনুষ্য তাহার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, সেই জন্য পৃথিবীর যেটুকু তাহার দৃষ্টিগোচর হয়, উহা সম্পূর্ণ সমতল বলিয়া বোধ হয়।

বরাহমিহির ব্রহ্মগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন,—তিনিও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি মৌলিক গবেষণা করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন নাই, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি সঙ্কলন-গ্রন্থই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বৃহৎসংহিতায় সন্নিবিষ্ট একটী শ্লোকের উল্লেখে Kaye প্রমুখ কয়েকটি পাশ্চাত্য লেখক ধারণা করিয়া লইয়াছেন যে, বরাহ স্বীকার করিয়াছেন, হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে অনেক বিষয়ে ঋণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এখনই দেখিব, তাঁহারা কিরূপ ভ্রান্ত হইয়াছেন, এবং শ্লোকটির কিরূপ বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। Kaye সাহেব শ্লোকটির এরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—গ্রীকেরা সত্যই বিদেশী, কিন্তু তাঁহারা জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন; সুতরাং তাঁহারা ঋষিবৎ পূজা পাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ, বরাহ-লিখিত শ্লোকটি এই—

ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দৈববিদ্ দ্বিজঃ॥

অবশ্য ইহা এমন কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, পাশ্চাত্য লেখকেরা তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ সংস্কৃত-জ্ঞান লইয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইবেন; এবং হিন্দুরা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের জন্য গ্রীকদিগের নিকট ঋণী, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিবেন। কিন্তু ইহাই বড় আশ্চর্য্য যে, তাঁহারা এ বিষয় লক্ষ্য করেন নাই, শ্লোকটি বৃহৎসংহিতার ফলিত-জ্যোতিষ বিভাগে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে এবং "দৈবজ্ঞ" অর্থাৎ ফলিত-জ্যোতির্ব্বেত্তা এই কথার সহিত উহার বিশেষ সম্পর্ক আছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় তেমন অভিজ্ঞ নহেন। পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী সঙ্কলিত বৃহৎসংহিতা হইতে দেখিতে পাই, সমস্ত গ্রন্থে ষোলবার যবনের (গ্রীক) নাম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, এবং সর্ব্বত্রই লগ্নশুদ্ধি ও বারশুদ্ধি গণনার পরিপোষক স্বরূপ;—কোথাও গণিত জ্যোতিষের পরিপোষকরূপে নহে। এই সকল হইতে ইহাই মনে হয় যে, তৎকালীন বিদেশিগণ গণিত জ্যোতিষ বিষয়ে অল্পই অবগত ছিলেন; এবং তাহাও অতি সামান্য জ্ঞানে প্রসিদ্ধ হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের নিকট আদৌ আদর লাভ করিতে পারে নাই।

হিন্দু জ্যোতিষের আর একটি বিশিষ্টতা নীচোচ্চবৃত্তের সাহায্যে গ্রহণের গতি নির্দ্দেশ। Kaye প্রমুখ কয়েকজন পাশ্চাত্য লেখকের ধারণা, উহাও হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রথম অধ্যায়ে গ্রহগতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে; এবং প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের রচনায় উহার উল্লেখ থাকায়, আমাদের বিশ্বাস, গ্রহগতি নির্দ্দেশ সূর্য্যসিদ্ধান্তের সর্ব্বপ্রথম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট ছিল, আর ইহাও নিশ্চিত যে, উহার রচনাকাল সূত্র-সূত্র রচনার পূর্ব্বে ভিন্ন প্রবর নহে। সেই শ্লোক কয়টি আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম-

পশ্চাদ্‌ব্রজন্তোঽতিজবান্ নক্ষত্রৈঃ সততং গ্রহাঃ।
জীয়মানাস্তু লম্বন্তে তুল্যমেব স্বমার্গগাঃ॥ ১।২৫
প্রাগ্‌গতিত্বমতস্তেষাং ভগণৈঃ প্রত্যহং গতিঃ।
পরিণাহবশাদ্‌ভিন্না তদ্বশাদ্ ভানি ভুঞ্জতে॥ ১।২৬
শীঘ্রগস্তান্যথাল্পেন কালেন মহতাল্পগঃ।
তেষাংতু পরিবর্ত্তেন পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ॥ ১।২৭

অর্থাৎ গ্রহগণ প্রবহবায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, নিজ-নিজ কক্ষোপরি নক্ষত্র সকলের সহিত পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিরন্তর তুল্যবেগে গমনকালে, গতি বিষয়ে নক্ষত্রগণের নিকট পরাজিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ নক্ষত্রগণের পশ্চিমবাহিনী গতি গ্রহগতি হইতে অধিক। এই জন্য গ্রহসকলকে পূর্ব্বদিকে অপসৃত হইতে দেখা যায়। গ্রহদিগের কক্ষার ন্যূনাধিক্যবশতঃ তাহাদিগের প্রাত্যহিক গতি সমান নহে। ভগণদ্বারা ত্রৈরাশিক করিলেই ঐ গতির ন্যূনাধিক্য জানা যাইবে। শীঘ্রগামী গ্রহগণ অল্প সময়ে ও অল্পগামী গ্রহগণ অধিক সময়ে স্বীয় কক্ষাতে একবার পরিভ্রমণ করে; এইরূপে ক্রমমান গতিতেই গ্রহগণ রাশির চক্র ভোগ করিয়া থাকে। গ্রহগণের এই পরিভ্রমণের নাম ভগণ; অর্থাৎ একটি নক্ষত্রের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার সেই নক্ষত্রের শেষ পর্য্যন্ত একবার ভ্রমণে এক ভগণ হয়।

হিন্দু ও গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ উভয়েই গ্রহগতি নীচোচ্চবৃত্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর্য্যভট্ট স্থির করিয়াছিলেন, নীচোচ্চবৃত্তের আকার অনেকটা বৃত্তাভাসের ন্যায়। গ্রীক দেশে Apollonius প্রথমে এই তথ্যটির উদ্ভাবন করেন। তিনি ধরিয়া লইলেন যে, পৃথিবীর কেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত হইতেছে। সেই বৃত্তের পরিধির উপরিস্থিত একটি বিন্দুকে কেন্দ্র ধরিয়া পরিভ্রমণকালে গ্রহটি আর একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিতেছে। কিন্তু হিন্দুদিগের গ্রহগতি নির্দ্ধারণ করিবার দুইটি নিয়ম ছিল। একটি যদিও Apolloniusএর নীচোচ্চবৃত্তের ন্যায়, তথাপি প্রভেদও বিস্তর ছিল; আর একটি সম্পূর্ণ

ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথমটির বিশিষ্টতা এই যে, হিন্দুরা নীচোচ্চবৃত্তের পরিধি পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দু ও গ্রীকদিগের নীচোচ্চবৃত্তের প্রভেদ দেখাইবার জন্য আমরা একটি ভিন্ন প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং এস্থলে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, উভয় প্রণালীই নিরপেক্ষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল; অন্ততঃ জ্যোতিষিক প্রমাণে ইহার সম্ভাবনা এত অধিক যে, উহা নিশ্চিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

হিন্দু জ্যোতিষের আর একটি বিশিষ্টতা—রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশিতে বিভাগ। Kaye সাহেব এ স্থলেও কোন যুক্তি না দেখাইয়া একেবারে ধরিয়া লইয়াছেন, হিন্দু জ্যোতিষিদগণ গ্রীকদিগের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে বিবেচনা করি। গ্রহণ-গণনায় ক্রান্তিবৃত্ত (ecliptic) বা সূর্য্যকক্ষা ও রাশিচক্রের (zodiac) বিভাগের বিশেষ প্রয়োজন। হিন্দুদিগের গণনা করিবার দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল,—একটি চান্দ্র তিথির দ্বারা অপরটি রাশির সাহায্যে। অবশ্য প্রথমটি দ্বিতীয়টির বহুপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়। কারণ, তারকাপুঞ্জের মধ্যে চন্দ্রের দৈনিক অবস্থান বা গতি আমরা প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারি; কিন্তু দৈনিক গতির দ্বারা নিয়মিত সূর্য্যের তারকাপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিতি পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে। যে হেতু সূর্য্যের নয়ন-ঝলসান আলোকে নিকটবর্ত্তী তারকাপুঞ্জও দৃষ্টিপথে আসিতে পারে না। অথচ বিবিধ বাহ্য শক্তি-পুঞ্জের আকর্ষণে চন্দ্রের গতি সূর্য্যের গতির ন্যায় একটা স্থায়ী নিয়মের অধীন নহে; এবং আমাদিগের দৈনিক অভিজ্ঞতার সহিত সূর্য্যের গতি নির্দ্ধারণ একেবারে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারের জন্য রাশিচক্রের দ্বারা জ্যোতিষ গণনা একান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়িল; এবং ক্রমে পূর্ব্বোক্ত তিথি-বিভাগ প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যে পরিগণিত হইল। এই যে তিথিবিভাগের দ্বারা জ্যোতিষ-গণনার প্রচলন, ইহা বহু প্রাচীন বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দু-দিগের সর্ব্বপ্রথম তিথিবিভাগের অনুক্রমে কৃত্তিকা নক্ষত্র মহাবিষুব বিন্দুর চিহ্ন স্বরূপ রহিয়াছে। তাহাতে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, অন্ততঃ ২৩০০ বৎসর খৃষ্টপূর্ব্বে এরূপ বিভাগ সম্ভব হইতে পারিত। তাঁহারা আরও সিদ্ধান্ত করেন যে, ক্রান্তিবৃত্তের এইরূপ বিভাগ জ্যোতিষিগণের প্রাচীনতম চেষ্টা। সুতরাং আমাদিগের মনে হয়, যখন হিন্দুগণ একটি বিভাগের আবিষ্কর্ত্তা, তখন সম্ভবতঃ ক্রমিক উন্নতির সাধারণ নিয়মানুসারে অপেক্ষাকৃত কার্য্যোপযোগী রাশিচক্রের বিভাগটিও হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গবেষণাপ্রসূত। হিন্দুরা চন্দ্রের দৈনিক গতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য ক্রান্তিবৃত্তকে প্রথমে ২৮শ ভাগে, পরে ২৭শ ভাগে বিভক্ত করেন; এবং প্রতি বিভাগ সূচিত করিবার নিমিত্ত এক-একটা তারকাপুঞ্জ স্থির করেন। তাঁহাদিগের শেষ বিভাগটিই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত; কারণ, ইহাতে এক একটি বিভাগের পরিমাণ চন্দ্রের দৈনিক গতির প্রায় সমান, এবং একটি নাক্ষত্রিক আবর্ত্তনের সময় (mean sidereal revolution) অর্থাৎ চন্দ্রের গতি একটি তারকাপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের সেই তারকাপুঞ্জে ফিরিয়া আসিতে ২৭⅓ দিন যাপিত হয়, এবং ভগ্নাংশ বাদ দিলে ২৮শ দিন না ধরিয়া ২৭ দিন ধরাই বিধেয়। এই ২৭টি চান্দ্র বিভাগ সূচিত করিবার জন্য হিন্দুরা ২৭টি তারকাপুঞ্জ স্থির করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পুঞ্জের উজ্জ্বলতম তারকাটিকে তাঁহারা যোগতারা বলিতেন এবং সমগ্র বিভাগটিকে নক্ষত্র আখ্যা দিয়াছিলেন। ঐ যোগতারা প্রতি বিভাগের আদিপ্রান্ত সূচিত করিত। এইরূপে প্রত্যেক বিভাগ বিভাগীয় নক্ষত্রের ন্যায় নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিত, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট বিভাগগুলির সাহায্যে চন্দ্রের দৈনিক গতি স্থিরীকৃত হইত। বায়ট সাহেব বলেন যে, প্রথমে চীন জ্যোতিষিগণ সাইএন (sien) নাম দিয়া ক্রান্তিবৃত্তের বিভাগ বাহির করেন। পরে ইহা হইতে হিন্দুদিগের নক্ষত্র ও আরবদিগের মঞ্জিল (manzil) উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাপক ওয়েবার সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, চীনবাসীদিগের সাইএন ও আরবদিগের মঞ্জিল হিন্দু জ্যোতিষের পরবর্ত্তী কালের বিভাগ হইতে গৃহীত। এই বিভাগে উপনীত হইবার পূর্ব্বে হিন্দুজ্যোতিষকে বিবিধ স্তর পার হইয়া আসিতে হইয়াছে। ইহাতে তিনি বলেন যে, চন্দ্রের গতি নির্ণয়ের জন্য তিথি-বিভাগ হিন্দুর গবেষণাপ্রসূত; এবং পরে আরববাসী উহার অনুকরণে আপনা-দিগের মঞ্জিল বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলেই অধ্যাপক ওয়েবার বলেন যে, বেবিলন দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রথমে এই বিভাগ-প্রণালীর আবিষ্কার করেন। এই সিদ্ধান্তটি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নহে; কারণ, বেবিলন দেশের বিভাগটি সূর্য্যের দৈনিক গতির সহিত সম্বদ্ধ। কিন্তু হিন্দুদিগের প্রথম বিভাগটি চন্দ্রের দৈনিক গতির উপর নির্ভর করে এবং ইহার পরে হিন্দুদিগের রাশিচক্রের বিভাগ আবিষ্কৃত হয়। সুতরাং বেবিলনবাসীদিগের বিভাগপ্রণালী হিন্দুদিগের বিভাগপ্রণালীর নিকট অনেকটা ঋণী বলিয়া বোধ হয়। কারণ, আমাদিগের বিশ্বাস যে, প্রথম অবস্থায় যখন বিভাগ-প্রণালীটি ভারতের নিজস্ব, তখন উহার বিশেষ উন্নতিও ভারতে হইবার সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

পরবর্ত্তী যুগের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের রচনা হইতে আমরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি যে, প্রাচীন হিন্দুজ্যোতিষিগণ বিষুব-বিন্দুদ্বয়ের অয়ন-গতি অবগত ছিলেন; এবং বেশ বিজ্ঞানসম্মতরূপেই উহাদের অয়নাংশের মীমাংসা করিয়াছিলেন। সূর্য্যের গতিমার্গ বৃত্তাকার এবং ব্যোমমণ্ডলে ইহার তলভাগ (plane) নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে; সুতরাং ব্যোমের কেন্দ্র ভেদ করিয়া রবি-কক্ষার উপর যে লম্ব (perpendicular) অবস্থিত, উহাও নিশ্চল। পৃথিবীর অক্ষ (axis) এই লম্ব রেখার চারিধারে আবর্ত্তিত হয়, এবং ২৬০০০ বৎসরে একটি আবর্ত্তন সমাপ্ত হয়। এই দোলনের গণনাকে অয়নাংশ গণনা কহে। এইরূপ ধ্রুবাক্ষ (polar axis) যে বিন্দুতে নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া যায়, সেই বিন্দুটি ক্রমে ব্যোমে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত গঠিত করিবে এবং ইহার ফলে এই বৃত্তের দ্বারা চিহ্নিত পথে যে

তারকাগুলি অবস্থিতি করিবে, উহারাই ক্রমে-ক্রমে একটির-পর-একটি ধ্রুব নক্ষত্র আখ্যা পাইবে। এই ব্যাপার যখন চলিতে থাকে, তখন নিরক্ষবৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের ছেদক রেখা, যাহা বিষুব বিন্দুতে অবস্থান কালে সূর্য্যের কেন্দ্র ভেদ করিয়া যায়, তাহা ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ভিন্ন-ভিন্ন নক্ষত্রের সূচনা করিবে।" ইহাই কথার একটু সরল করিয়া বলিতে হইলে আমরা বলি, ভিন্ন-ভিন্ন আবর্ত্তনে সূর্য্য বিষুব-বিন্দুতে বিভিন্ন নক্ষত্রের সূচনা করিবেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে—

ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্ গুণাদ্ ভূদিনৈর্ভক্তাৎ দ্যুগণাদ্ যদ বাপ্যতে ॥
তদ্দোস্ত্রিঘ্নাদশাপ্তাংশাঃ বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ।
তৎ সংস্কৃতাদ্ গ্রহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়া, চরদলাদিকম্ ॥
স্ফুটং দৃক তুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুবদ্বয়ে।
প্রাক্চক্রং চলিতং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে ॥
অন্তরাংশৈরথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে ॥

অর্থাৎ বিষুববিন্দুদ্বয়ে ও অয়নবিন্দুতে যখন সূর্য্য থাকেন, তখন সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিলে এই নক্ষত্রপুঞ্জের দোলন বা অয়নাংশের গতি দৃষ্টিগোচর হয়। গণনাদ্বারা প্রাপ্ত সূর্য্যের স্পষ্ট স্থান যদি ছায়াগত (অর্থাৎ স্পষ্ট) অর্কস্থান (সূর্য্যের ভুজাংশ) হইতে যত অংশ ন্যূন হয়, নক্ষত্রপুঞ্জ তত অংশ পূর্ব্বদিকে এবং যত অংশ অধিক হয়, তত অংশ পশ্চিম দিকে স্থিত হইবে।

হিন্দু জ্যোতিষের আর একটা উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা—ইহার লম্বন গণনা (calculation of parallax)। Kaye প্রমুখ কয়েকজন পাশ্চাত্য লেখকের ধারণা, ইহা হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ গ্রীকদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, অতি প্রাচীন কালেও হিন্দুগণ গ্রহণ-গণনার সকল তথ্যই অবগত ছিলেন; এবং চান্দ্র ও সৌর-গ্রহণের আরম্ভ, মধ্য ও সমাপ্তির সময় নির্ণয় করিবার বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই উহাদের অতটা বিশুদ্ধির জন্য অক্ষাংশ ও ভুজাংশের লম্বন গণনা একান্ত আবশ্যক ছিল। বস্তুতঃ, ইহা বিশ্বাস করা স্বাভাবিক যে, এমন কি বৈদিক যুগেও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান কল্পে, গ্রহণ গণনায় হিন্দুগণ সূর্য্যের লম্বন নির্দ্ধারণ করিতেন। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে লম্বন গণনা সম্বন্ধে প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণের রচনা হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

পর্ব্বান্তেঽর্কং নতমুডুপশ্চিছন্নমেব প্রপশ্যেৎ
ভূমধ্যস্থো ন তু বসুমতীপৃষ্ঠনিষ্ঠস্তদানীম্।
তদ্দৃক্ সূত্রাদ্ধি যৎ চরধো লম্বিতোঽর্কগ্রহেঽতঃ
কক্ষাভেদাদিহ খলু নতিলম্বনং চোপপন্নম্ ॥

সিদ্ধান্তশিরোমণি অষ্টম অধ্যায়, ২য় শ্লোক।

সমফলকালে ভূভালগস্থি মৃগাঙ্কে যতস্তয়া
স্থানং স্বর্কে পশ্যন্তি সমং সমকক্ষতান্ন লম্বনাবতো। ৩য় শ্লোক।

সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েরই বর্ত্তুলাকার অবয়ব, সূর্য্যের আকার চন্দ্র অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। সুতরাং যখন সূর্য্য চন্দ্রের অন্তরালে আইসে, তখন অতিদূরবর্ত্তী পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত দর্শকের নিকট সূর্য্য গ্রহণ হইলেও, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের দর্শকেরা গ্রহণের কোনও উদ্দেশ পাইতে পারেন না; কারণ, ঐ স্থানবর্ত্তী দর্শকের দৃষ্টিরেখা সূর্য্য ও চন্দ্রের কেন্দ্র-ভেদ করিয়া যায় না; এই জন্যই সূর্য্যগ্রহণে অক্ষাংশ ও ভুজাংশের লম্বন গণনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যখন সূর্য্য ও চন্দ্র ষড়্ভান্তরে থাকে, তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে, এবং চন্দ্র-গ্রহণ পৃথিবীর সকল স্থান হইতে সমান দেখা যায়। এইজন্য চন্দ্র-গ্রহণে লম্বন গণনার প্রয়োজন হয় না।

ইহাই হিন্দু জ্যোতিষের কয়েকটি বিশিষ্টতা। হিন্দু জ্যোতিষ আলোচনা করিতে বসিলে, ইহাতেই প্রথমে দৃষ্টি পড়ে। বস্তুতঃ, এই সকল দেখিয়া কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে হিন্দু জ্যোতিষ বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করিবার সম্পূর্ণ স্পর্দ্ধা রাখে।

কাঙ্গালের ঠাকুর

[শ্রীজলধর সেন]

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ে একজন জগন্নাথদেবের পাণ্ডা আমাদের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদের সোণাপুর গ্রামখানি খুব বড় নহে, বড়মানুষের বাসও তেমন বেশী নহে; প্রায় সকলেই আমাদেরই মত সামান্য অবস্থার গৃহস্থ; তাই প্রতি বৎসরই পাণ্ডা ঠাকুরের শুভাগমন হয় না—জগন্নাথ দর্শনার্থী যাত্রী বছরে বছরেই পাওয়া যায় না; দুই চারি বৎসর অন্তর পাণ্ডা ঠাকুর আসেন, এবং যেমন করিয়া হউক, দশ বিশ জন যাত্রী লইয়া যান।

আমি যেবারের কথা বলিতেছি, তাহার পূর্ব্ব বৎসর আমার পিতাঠাকুর স্বর্গারোহণ করেন। আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র দে মহাশয়—আমার ও আমার মাতাঠাকুরাণীর তখন অভিভাবক। পিতাঠাকুর বর্ত্তমানেই কাকা

পৃথক্ হন, বাড়ীও পৃথক করেন। আমরা জাতিতে স্বর্ণ বণিক।

পূর্ব্বে পিতাঠাকুর ও কাকা মহাশয় যখন একান্নভুক্ত ছিলেন, তখন আমাদের একখানি বেণে-মসলার দোকান ছিল; পৃথক হইবার পর পিতা একখানি নূতন দোকান করেন, পূর্ব্বের দোকানখানি কাকাকেই দান করেন। পিতার মৃত্যু সময়ে আমার বয়স ১৩ বৎসর; সে সময়ে আমি কি আর নিজে দোকান চালাইতে পারি? তাই আমার এক মামাতো ভাই দোকানের ভার গ্রহণ করেন,—গিরিশ দাদা আর আমি দুজনে দোকানের কাজকর্ম্ম করি। গিরিশ দাদা মাসে চোদ্দ টাকা পান, আর আমাদের বাড়ীতেই থাকেন। এই খরচ বাদে যাহা লাভ হয়, তাহাতেই আমাদের মাতাপুত্রের সংসার একরকম চলিয়া যায়; দিদির বিবাহ বাবাই দিয়া যান; দিদিদের অবস্থা ভাল। সংক্ষেপে এই আমাদের সাংসারিক অবস্থা।

জগন্নাথের পাণ্ডাঠাকুর গ্রামে আসিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া যাত্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আমার কাকা জগন্নাথ দর্শনে যাইবেন, স্থির করিলেন। মা কি এমন সুযোগ ত্যাগ করিতে পারেন? তিনি কাকাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহাকে সঙ্গে লইতে হইবে। কাকার আর তাহাতে আপত্তি কি? তিনি জানিতেন, মায়ের তীর্থভ্রমণের ব্যয়-ভার তাঁহাকে বহন করিতে হইবে না; সুতরাং তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু গোলযোগ বাধিল আমাকে লইয়া, আমি বলিলাম "মা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

কাকার তাহাতে আপত্তি, মায়েরও আপত্তি। আমি ছেলেমানুষ, জগন্নাথের পথ বড় খারাপ, নানা বিপদের সম্ভাবনা; এক মাসের পথ হাঁটিতে হয়, রাস্তায় চোর ডাকাত আছে; যাত্রীদের প্রায়ই নানা পীড়া হয়,—অনেকে প্রাণত্যাগ করে। এ অবস্থায় আমার মত ছেলেমানুষকে কিছুতেই সঙ্গে লইতে পারা যায় না। আমি যদি সঙ্গে যাইতে চাই, তাহা হইলে কাকা মাকে লইয়া যাইতে পারিবেন না—স্পষ্ট জবাব দিলেন। মা আমাকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু আমি কাঁদিয়া আকুল হইলাম। অবশেষে মা বলিলেন "তা হ'লে আমার অদৃষ্টে আর জগন্নাথ দর্শন নেই। যাক্,—আমি আর যাব না। পাপীর কি এমন ভাগ্য হয়।" তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রার বাসনা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

লেখাপড়া অতি সামান্যই শিখিয়াছিলাম। বেণের ছেলে; একটু লিখিতে পড়িতে পারিলে এবং হিসাবপত্র রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট। তাই বাবা আমাকে স্কুলে দেন নাই,—পাঠশালার বিদ্যা কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিয়াই বার বৎসর বয়সে আমি দোকানে যাইতে আরম্ভ করি। সে ভালই হইয়াছিল, নতুবা তাহার এক বৎসর পরেই যখন বাবা মারা গেলেন, তখন যদি আমি দোকানের কাজ মোটেই না জানিতাম, তাহা হইলে বড়ই বিপদ হইত। তা' লেখাপড়া জানি আর না-ই জানি—বিদ্যা না-ই থাকুক, মায়ের দীর্ঘনিশ্বাস আমার সেই চোদ্দ বৎসর বয়সের বুকে বড়ই বাজিল। আমি দেখিলাম, মায়ের তীর্থধর্ম্মের আমিই অন্তরায় হইলাম। তখন আর নিজের কথা ভাবিলাম না, মায়ের তীর্থধর্ম্মে বাধা দিব না, এই কথা আমার মনে হইল। আমি মাকে বলিলাম "আমি তোমার সঙ্গে যাব না মা! তুমি একেলাই কাকার সঙ্গে যাও। আমি আর গিরিশ দাদা বাড়ীতে বেশ থাকতে পারব। আর কতদিনই বা, বড় বেশী হ'লে মাস দুই—কেমন মা?"

মা বলিলেন "তা বই কি। দুটো মাস তোরা দুই ভাই তোর কাকীমার কাছে থাকিস, কোন কষ্ট হবে না। ছোট বৌ এতে অসম্মত হবে না, কি বল ঠাকুরপো?"

কাকা বলিলেন "তার আর কথা কি! তুমি ত জান বড়বৌ, আমি কি আর ইচ্ছে ক'রে পৃথক হয়েছিলাম। দাদাই জোর ক'রে পৃথক ক'রে দিলেন; বল্লেন, যে দিন কাল পড়েছে, তাতে পৃথক হ'লেই মনের মিল থাক্‌বে। তাই ত পৃথক হয়েছিলাম—আমার কি আর ইচ্ছে ছিল। তারপর দাদা মারা গেলেও ত তোমাকে ব'লেছিলাম, আর কেন, দুই দোকান এক ক'রে ফেলে এক সঙ্গে থাকি। তখন তোমার ভাই ই ত তাতে বাধা দিলেন। যাক্, সে কথা থাক্। সুরেশ আর গিরিশ আমার ওখানেই থাক্‌বে। আর তুমি ত আমার সম্বন্ধী রাইচরণকে জান। সেই এ মাস দুই এখানে থেকে আমার দোকান দেখ্‌বে, বাড়ীরও ভার নেবে।"

মা বলিলেন "তা হ'লে ঠাকুরপো, ছোটবৌকেও নিয়ে যাই না। এমন সুবিধে কি তার আর মিল্‌বে!



নিদাঘে

শিল্পী শ্রীঅনিলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

Emerald Printing Works
CALCUTTA

ছেলেপিলে ত হোলো না যে, তাই নিয়ে থাকবে। তাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।"

কাকা বলিলেন "এই শোন কথা! আজ তিনদিন ধ'রে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করেছি, এখন তুমি আবার তাল তোল। শেষে দেখ্‌ছি কারও যাওয়া হবে না। আর তার কি এখন তীর্থধর্ম্মের সময়। সে পরে হবে। তুমি আর ও গোল তুলো না বড়বৌ! সুরেশ বাড়ী রইল; তাকে দেখ্‌বে কে?"

"সে কথা ঠিক ব'লেছ ঠাকুরপো। তার হাতে ছেলেকে সমর্পণ ক'রেই ত আমি যাব। না, সে থাক্। বেঁচে থাক্, তোমার লক্ষ্মীশ্রী বাড়ুক, সে কত তীর্থধর্ম্ম করতে পারবে।"

(২)

২রা আষাঢ় শুভদিনে গ্রামের আরও আটদশজন মেয়ে পুরুষের সঙ্গে কাকা ও মা জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করলেন। এখনকার মত সে সময় ত রেল হয় নাই। তখন আমাদের গ্রাম থেকে হেঁটে গিয়ে রেলে কলিকাতায় যেতে হোত; সেখান থেকে নৌকায় উঠে উলুবেড়ে; তারপর যাদের অবস্থা ভাল, তারা গরুর গাড়ীতে পুরী পর্য্যন্ত যেত; যাদের অবস্থা ভাল নয়, তারা সারা পথ হেঁটে যেত। পথে চটিতে থাক্‌তে হোতো। রাস্তা কি কম! পাণ্ডা ঠাকুর গল্প করত, সে দেশে আমাদের দেশের মত ক্রোশ নয়—ডালভাঙ্গা ক্রোশ। রাস্তার কোন স্থানের গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে পথ হাঁটতে-হাঁটতে যখন ডালের পাতাগুলো শুকিয়ে যেত, তখন এক ক্রোশ পথ চলা হোত। তাই, তখন লোকে বল্‌ত, বাবা জগন্নাথের কথা যেন মনে হয়, পথের কথা মনে না হয়। এই রকম কত কথা যে সে সময় শুনেছিলাম, তার সব কি আর মনে আছে!

মা চলে যাবার পর প্রথম-প্রথম প্রতিদিনই তাঁর কথা মনে হোত, গিরিশদাদার সঙ্গে মায়ের কথাই হোতো। দোকান বন্ধ ক'রে যখন কাকার বাড়ীতে রাত্রিতে আহার করতে যেতাম, তখন কাকীমার কাছে ব'সে মায়ের কথাই বল্‌তাম।

একদিন কাকীমা বল্‌লেন "দেখ্ সুরেশ, তুই যে রোজই কেবল মায়ের কথা বলিস্, তাতে তাঁর তীর্থধর্ম্ম হবে না। এত কষ্ট ক'রে জগন্নাথে গিয়েও দিদি ঠাকুরের দর্শন পাবেন না।"

আমি বলিলাম "ঠাকুরের দর্শন পাবেন না কেন? আমরা এখানে ব'সে কথা ব'ল্‌ছি, তাতে কি দোষ হচ্চে।"

কাকীমা বললেন "ওরে হাবা ছেলে, তুই যখন এখানে ব'সে তোর মায়ের কথা ভাবিস, তখন তিনি যেখানেই থাকুন, সেখানেই তাঁর তখন তোর কথা মনে হয়। শুনেছি, —অদেষ্টে নেই, নিজের কথা ব'লতে পারিনে—শুনেছি ছেলে কাঁদলে, কি ছেলের কষ্ট হ'লে, যত দূরেই হোক না কেন, মায়ের প্রাণ অমনি কেঁদে ওঠে। ও নাড়ীর বাঁধন বড় শক্ত বাঁধন। তুই যদি এখানে ব'সে তোর মায়ের জন্য এখন কাঁদিস্, তা হোলে সেই পুরীর পথে চটিতে বসে এই এখনই তোর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌বেই; তাঁর মনে তোর কথা জাগ্‌বেই। তা হ'লে তাঁর আর জগন্নাথ দর্শন হবে না।"

আমি বললাম "সে কি করে' হবে কাকীমা!"

কাকীমা বললেন "তাই হয় রে বাবা, তাই হয়। তুই তাঁর কথা যখন-তখন ভাবলে, তাঁকেও তোর কথা ভাবতেই হবে। তার ফল কি হবে শুনবি? আমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ের একজন বিধবা—এই তোর মায়ের মত—একবার তোরই মত, কি তোর চাইতে হয় ত একটু ছোট, একটা ছেলেকে বাড়ীতে রেখে জগন্নাথে গিয়েছিল। বিধবা সারা পথ শুধু ছেলের কথাই ভাবত, ছেলের কথাই বলত;—এই আমার খোকা এখন ভাত খাচ্চে, এই আমার খোকা এখন হয় ত খেলা করছে, এই আমার খোকা বুঝি কাঁদছে, এই আমার খোকার বুঝি খিদে পেয়েছে;—হতভাগী সারাটা পথ শুধু এই ক'রেই গিয়েছিল। সাথী যারা ছিল, তারা কত নিষেধ করত,—বলত, খোকার মা, খোকার কথা ভেব না, জগন্নাথদেবের কথা ভাব। সে কিন্তু তা পারত না, তার মন পড়েছিল যে তার খোকার কাছে। তারপরে কি হোলো শুনবি? পুরীতে পৌঁছে যখন তারা ধূলপায়ে জগন্নাথ দর্শন করতে মন্দিরে গেল, তখন আর সকলে ঠাকুরের চাঁদমুখ বেশ দেখ্‌তে পেলে, কিন্তু ঐ হতভাগী খোকার মা বল্‌তে লাগল কি—'কৈ, মন্দিরের মধ্যে ত জগন্নাথদেব দেখ্‌তে পাইনে; ও যে আমার খোকার মুখ।' তিন দিন উপরি-উপরি দেখতে গেল, খোকার মুখ ভিন্ন আর কিছু দেখ্‌তে পেলে না। রথে যখন ঠাকুরকে তোলা হোলো, তখনও দেখ্‌তে গেল; কিন্তু সে

চাঁদমুখ আর তার দর্শন হোলো না,—সে তার খোকার মুখই দেখ্‌ল। ঠাকুর তাকে দর্শনই দিলেন না। জগন্নাথ যে সে ঠাকুর নয় সুরেশ! তাঁরই দিকে মন দিয়ে না গেলে তিনি দর্শন দেন না। আরও শুন্‌বি? গল্প শুনেছি, এক বুড়ি একবার জগন্নাথে গিয়েছিল। যাবার সময়ে তার বাড়ীর উঠানে একটা সজনে গাছে ফুল ফুটতে দেখে গিয়েছিল। বুড়ী সারা পথ সেই সজনের ফুল আর খাড়ার কথা ভাবতে, ভাবতে গিয়েছিল, মন্দিরে গিয়ে সে না কি সজনে খাড়াই দেখেছিল। জানিস, এ সব সত্যি কথা। তাই তোকে বলছি, মায়ের জন্য অত কাতর হ'লে তোর মায়ের মনও তোর জন্য কাতর হবে; তখন তিনি মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের দর্শন পাবেন না, দেখ্‌বেন তোর মুখ। এত কষ্ট, এত খরচ, সব বৃথা হ'য়ে যাবে।"

কাকীমার কথা শুনে মনে বড়ই ভয় হোল। তা হ'লে ত মায়ের কথা ভাবা ঠিক নয়! কিন্তু মন কি সে কথা বোঝে। সংসারে মা বিনে আমার যে আর কেউ নেই; এই চোদ্দ বৎসর তাঁরই স্নেহ ধারায় যে আমি পুষ্ট, বর্দ্ধিত! আমার সেই স্নেহময়ী জননীর কথা যে সময়ে অসময়েই আমার মনে হোতে চায়, কোন বাধা বিপত্তির কথা যে মনে থাকে না! দুই এক দিনের পথ হোলেও না হয় মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম, কিন্তু এ যে দীর্ঘ পথ; আর সে পথে কত বিপদ, কত কষ্ট। মা যে কোন দিন এত কষ্ট সহ্য করেন নাই। পথে তাঁর যদি অসুখ হয়, তা হ'লে কে তাকে দেখ্‌বে? কাকা কি তেমন করে তার সেবা করবে? ডাক্তার কবিরাজ কি আর মিলবে? মা যদি মারা যান। কথাটি আমি ভাবতে যে পারি না। আমি তখন কাতর প্রাণে জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা করতাম, হে ঠাকুর, আমার মাকে ঘরে ফিরে এনে দাও। এ সংসারে মা-ছাড়া আমার কেউ নেই ঠাকুর!

কাকীমার সঙ্গে কথা হওয়ার পর মুখ ফুটে আর মায়ের কথা কাহাকেও বলতাম না; তার ফল এই হোতো যে, মনে সর্ব্বদাই তাঁর কথা উঠ্‌ত; হাজার চেষ্টা করেও আত্ম-সংবরণ করতে পারতাম না।

সেবার ২৪শে রথ। ২৪শে পর্য্যন্ত চুপ করেই ছিলাম। তারপর ত আর ভয় ছিল না, মায়ের জগন্নাথ দর্শন ত হয়ে গিয়েছে, এখন ত তিনি বাড়ী ফিরবেন, এখন আর তাঁর কথা বললে তাঁর ঠাকুর দর্শনের কোন ব্যাঘাতই হবে না। তখন আমি দিন গণতে আরম্ভ করলাম। ২রা তারিখে তাঁরা বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন; ২০শে ২১শে নিশ্চয়ই পুরীতে পৌঁছে গিয়েছেন। তা হোলে যেতে লেগেছে আঠারো দিন। ২৪শে রথ হয়ে গেছে; তাঁরা না হয় আরও একদিন কি দুই দিনই সেখানে বাস করবেন। তা হোলে ২৬শে, নিতান্ত না হয় ২৭শে নিশ্চয়ই যাত্রা করেছেন। সেই ২৭শে থেকেই আমি দিন গণতে আরম্ভ করে দিলাম! কোথায় সোণাপুর, আর কোথায় সেই অজানা অচেনা পথ-পুরী। সে পথের কোন সংবাদই আমি জানতাম না; তবুও প্রতিদিন আমি সেই পথের কথা ভাবতাম। এই একদিনে মা তিন ক্রোশ পথ এসে একটা চটিতে উঠেছেন, এই তারপর দিন মা খুব জোরে পথ চলছেন, তাকে শীঘ্র বাড়ী আসতে হবে, আমি যে তাঁর পথ চেয়ে বসে আছি, মা তা বেশ বুঝতে পারছেন। কাকীমা যে বলেছেন, মায়ে ছেলের প্রাণ এক তারে বাঁধা। আমি যে কত আকুল হয়েছি, মা সে কথা বেশ জানতে পারছেন। পথে বিলম্ব, তা তিনি কিছুতে করতে পারিবেন না। যেতে যদি আঠারো দিন লেগে থাকে, তা হ'লে ফিরতে পনর দিনের বেশী কিছুতেই লাগবে না—মাকে যে ছুটে আসতে হবে। যাঁরা সঙ্গে গিয়েছে, তারাও ছুটছে বই কি, সবারই ত বাড়ী ঘর আছে। কাকা কি আর পথে বিলম্ব করতে পারেন—তাঁর উপর দোকান, সংসার ফেলে তিনি কি আর নিশ্চিন্ত আছেন। আমি সোণা-পুরে আমাদের দোকানে বসে প্রতিদিন তাঁদের পথ-হাটা দেখি, তাঁদের জোরে পথ চলাই, পথে বিশ্রাম করতে দিই না; এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা হোলেই চটি থেকে পথে নামাই, ঝড় বৃষ্টি বা প্রখর রৌদ্র কিছুই মানি নে;—আমার যে গরজ বেশী।

পনর দিন চলে গেল, ষোল দিনও গেল। কৈ, মা ত ফেরেন না, গ্রামের যারা গিয়েছিলেন, তাঁদেরও সংবাদ নাই। কাকারই বা কি বিবেচনা! সেই পুরী পৌঁছে একখানি পত্র লিখেছিলেন, তারপর এই এত দিনের মধ্যে একটা সংবাদও দিলেন না; দুই লাইন একটা পত্র লিখতে এত আলস্য!

আঠারো দিনও গেল—উনিশ দিন এল। যেতে ত

আঠারো দিনের বেশী লাগেই নাই; তবে আসতে এত বিলম্ব হচ্চে কেন? কাকার ত কোন অসুখ করে নাই? মা ত ভাল আছেন? আমি যে আর ভাবতে পারি না!

(৩)

আরও দুইদিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় দোকানে আছি, সংবাদ পেলাম, এই মাত্র পুরীর যাত্রীরা ফিরে এসেছেন। গিরিশ দাদাকে দোকান বন্ধ করে আসতে ব'লে আমি উৰ্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে ছুটলাম।

আমাকে অধিক দূর যেতে হল না, পথের মধ্যেই কাকার সঙ্গে দেখা হল। তিনি বিষণ্ণ বদনে ধীরে ধীরে বাজারের দিকেই আসছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে বললাম, "কাকা, তোমরা কতক্ষণ এসেছ?"

কাকা আমার কথার উত্তরে 'হা হা' করে কেঁদে উঠে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখে আমি যে কি করব, ভেবে পেলাম না; তবে মায়ের যে কিছু হইয়াছে, তা বেশ বুঝতে পারলাম। তবুও প্রাণপণ শক্তিতে জিজ্ঞাসা করলাম, "মা ভাল আছে ত?"

কাকা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "ওরে বাপ আমার, বড় বৌ আমাদের ছেড়ে গেছে।"

আর কি শুনব! শুনবার যা, তা শুনলাম! আমার তখন কি হল, আমি চীৎকার করে কাঁদতে পারলাম না। কে যেন আমার বুকের উপর দশ মণ ভার চাপিয়ে দিল, কে যেন আমার গলা চেপে ধরল।

আমার এই অবস্থা দেখে কাকা আমাকে তাঁর কাঁধের উপর ফেলে বাড়ীর দিকে ফিরলেন,—তখন সত্য-সত্যই আমার চলবার সামর্থ্য ছিল না, কথা বলবার শক্তি ছিল না।

বাড়ী আসিলে কাকী-মা আমাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন—আমাকে আর কি সান্ত্বনা দেবেন। একটু পরে নিজে কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে বললেন, "বাবা, আর কেঁদে কি করবে। জগন্নাথ তাঁকে টেনেছিলেন, তাই তিনি চলে গেছেন। তুমি ত সবই বোঝ বাবা, তোমাকে আর কি বলব। হায় হায়, বিদেশে বিভূঁয়ে কেমন করেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে গিয়েছে।"

তখনও কান্না থামে না; আমার যে শরীরের সব শুকিয়ে গিয়েছে; চক্ষে জল আসবে কোথা থেকে।

রাত্রিতে কাকার মুখে যা শুনলাম, তার সংক্ষেপে কথা এই যে, ফিরবার সময় কোন্ একটা চটিতে এসে মায়ের ওলাউঠা হয়। সেখানে আর ডাক্তার কবিরাজ কোথায় পাওয়া যাবে। চটিওয়ালা ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়, সঙ্গীরা অন্য চটিতে চলে গেল, চটিওয়ালাকে বেশী পয়সা দিয়ে কাকা সারারাত্রি মায়ের সেবা করলেন। কিছুতেই কিছু হোলো না, একেবারে সাক্ষাৎ কাল এসে ধরেছিল। ভোরের বেলায় মার দেহত্যাগ হলে কাকা প্রায় ত্রিশ টাকা খরচ করে অনেক কষ্টে লোকজন ডেকে মায়ের সৎকার করেছিলেন। সঙ্গী যাত্রীরা ভোরেই সে চটি ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছিল, কাকা অনেক কষ্টে এসে তাদের সঙ্গ পান। ৭ই শ্রাবণের কথা। যেদিন কাকা বাড়ী এলেন, সেদিন ১৫ই শ্রাবণ। ৮ দিন হল মা দেহ ত্যাগ করেছেন।

সব মিটে গেল। বাবা গেলেন; মা ছিলেন, তিনিও গেলেন। চোদ্দ বৎসর বয়সে আমি একেবারে অনাথ হলাম। আপনার বলতে এক দিদি;—সেও ত পরের ঘরে।

কাকাই কর্ত্তা হয়ে মায়ের শ্রাদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন; দিদিকে তার শ্বশুর বাড়ী থেকে নিয়ে এলেন; বড় মামা ও মামীকে আনা হোলো; যেখানে যে কুটুম্ব ছিল, সকলকেই সংবাদ দেওয়া হোলো, এই যে আমার জীবনের শেষ কাজ। কাকা মায়ের শ্রাদ্ধে খরচপত্র একটু কম করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমার ভগিনী ও ভগিনীপতি তাতে সম্মত হলেন না। মায়ের বাক্সে কিছু টাকা পাওয়া গেল, কিন্তু সে খুব বেশী নয়—মোটে আটশত টাকা। দিদি বললেন, "আট-শ টাকা! সে হতেই পারে না; আমি বাবার শ্রাদ্ধের সময় নিজের চক্ষে দেখে গিয়েছি, নগদ প্রায় আড়াই হাজার টাকা ছিল, এর পর কিছু লগ্নী ছিল। সে সব টাকা কোথায় গেল।"

কাকী-মা বললেন, "বোধ হয় লগ্নী আরও বাড়িয়ে গেছেন। তারপর জগন্নাথে যাওয়ার সময়ও পাঁচ-শ টাকা

নিয়ে গিয়েছিলেন ; সে ত আমিই জানি। ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, মরবার সময় দিদির কাছে কি টাকা-কড়ি ছিল ; তাতে শুনলাম, সে সব কি তখন খোঁজ নেবার সময় ; যদি কিছু থেকে থাকে, তা দিদির সঙ্গেই গেছে।"

দিদি বললেন, "যাক্‌, মা-ই যখন গেলেন, তখন তাঁর টাকার কথা আর ভেবে কি হবে।"

কাকীমা বললেন, "কথা ত সত্যি, কিন্তু মরবার সময় দিদির কাছে নিশ্চয়ই দেড়শ দুশো টাকা ছিলই ছিল। তোমার কাকার কি সে সব দেখা উচিত ছিল না ; সে তার কিছুই জানে না বল্লে।"

আমি বললাম, "সে কথায় আর কাজ কি, আমার যা আছে তাই দিয়েই মায়ের কাজ ভাল করে হোক—আর ত মায়ের জন্য কিছু খরচ করতে হবে না।" সেই ভাবেই আয়োজন হ'তে লাগল।

দেখতে দেখতে শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হল। আত্মীয় কুটুম্ব, প্রতিবেশীতে বাড়ী ভরে গেল, কাকার আর অবকাশ নাই। সমস্ত আয়োজনই যথারীতি হল; আমাদের বৃষোৎসর্গ করতে নেই, পূর্ব্বেও কোন শ্রাদ্ধে তাহা হয় নাই, সুতরাং সে আয়োজন করা হোল না।

যথাসময়ে সকলে সভাস্থ হলেন, পুরোহিত মহাশয় সমস্ত গোছাইয়া লইলেন। আমি সবে শ্রাদ্ধাধিকারীর আসন গ্রহণ করতে যাব—বেলা তখন প্রায় দশটা সেই সময় বাড়ীর বাহিরে মহা গোলযোগ আরম্ভ হল। কি হল দেখবার জন্য কয়েকজন লোক বাহিরে ছুটে গেল, কাকাও গেলেন। একজন তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে বলে উঠলেন, "ওরে, শ্রাদ্ধ রাখ্‌, যার শ্রাদ্ধ করতে বসেছ, তিনি এসে হাজির! সুরেশের মা মরেন নাই, ফিরে এসেছেন।"

মা মরেন নাই—ফিরে এসেছেন! সে কি কথা! এও কি হয়? আমার মাথা ঘুরে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেলাম।

আমার যখন জ্ঞান হোলো, তখন দেখলাম সত্যসত্যই মা আমাকে কোলে করে বসে আছেন, দিদি আমার পাশে। আমি অতি ধীরে বললাম, "মা, মাগো!"

"এই যে বাবা আমি।" বলে' মা আমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। আর ত অবিশ্বাস নাই—সত্যই ত আমার মা ফিরে এসেছেন। সে যে কি আনন্দ, তা আর আমি বলতে পারিনে। যে মা আজ একমাস মারা গিয়েছেন, সেই মা এসেছেন—ওরে আমার মা এসেছেন। আমার ইচ্ছা হতে লাগল, আমি প্রাণপণে চীৎকার করে বলি, "ওরে আমার মা ফিরে এসেছেন।"

এই সময় কাকার বাড়ী থেকে একজন লোক এসে বলল, "ওগো, তোমরা শীগ্‌গির এস, ছোট কর্ত্তা গলায় দড়ি দিয়েছেন।"

এই কথা শুনেই মা ও কাকীমা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন এবং দিদিকে আমার কাছে থাকতে বলে কাকার বাড়ীতে চ'লে গেলেন। আমার যাবার শক্তি ছিল না,—আর শক্তি থাকলেও আমি যেতাম না। কিন্তু কাকার কি হল জানবার জন্য বড়ই আগ্রহ হল। দিদিকে বললাম, "দিদি, তুমি একবার খবর নিয়ে এস ত, কি হয়েছে।"

দিদি প্রথম আপত্তি করল ; শেষে আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখে চলে গেল এবং একটু পরেই এসে বললে, "আমরা তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। কাকা যে কখন চলে গিয়েছেন, কেউ বলতে পারে না। তিনি বাড়ী গিয়েই গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন। পাড়ার সকলে দড়ি কেটে নামিয়েছে, ডাক্তার এসেছে, কাকার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। সকলেই বল্‌ছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। মা এখন আর আসতে পারবেন না।" কাকার শোচনীয় পরিণাম শুনে তাঁহার মহা অপরাধের কথা ভুলে গেলাম, তাঁহার জন্য বড়ই কষ্ট হল।

(৪)

এই ঘটনার দুই দিন পরে এক সময় মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মা, এ কয়দিন এই সব গোলমালে কোন কথাই জানতে পারি নাই। তুমি কি করে বেঁচে এলে, বল না মা ; কাকা ত তোমাকে মেরে ফেলে, তোমার সৎকার পর্য্যন্ত করে এসেছিলেন ; তারপর কি হোলো।"

মা বললেন, "সে কথা তোর আর শুনে কাজ নেই। আর যদি শুনতে হয়, অন্যের কাছে শুনিস্‌—সকলেই শুনেছে। আমি আর সে কথা তোর কাছে বল্‌ব না।"

অনেক অনুরোধে মা বললেন, "নিতান্তই ছাড়বিনে। তবে শোন্‌। পথের কথা, আর জগন্নাথ দেবের কথা

তাকে আর কি বল্‌ব,—তুই তার কি-ই বা বুঝ্‌বি। প্রথম থের পরদিনই আমার বেরুবার ইচ্ছা—তখন ত আর াকুরের টান নেই—তোর টান। ঠাকুর তার খুব কল য়েছেন—খুব সাজা দিয়েছেন। সঙ্গে যারা ছিল, তাঁরা কলেই আরও ছ'দিন থাকতে চাইলে। কি করি, কেতে হোলো; কিন্তু প্রাণ তখন বাড়ীর দিকে—তোর কে। তিন দিনের দিন সকলে মিলে বেরিয়ে পড়লাম। ামার তখন এমন হয়েছে যে, ছদিনের পথ একবেলায় আমার লতেও আপত্তি নেই, আর সকলেরও প্রায় তাই। ঠাকুর েন, বড় বেটা, তোর শাগ্‌গির বাড়ী যাওয়া ঘুচিয়ে দিচ্ছি! ্য দিন বেশ এলাম, এগারদিনের দিন পথের মধ্যে আমার েটের অসুখ হোলো। কাউকে সে কথা বল্লোম না; ি কষ্টে পথ চলতে লাগলাম। সন্ধ্যার সময় একটা টীতে এসে আমি একেবারে অসাড় হয়ে পড়লাম। খুব দ বমি হতে লাগল। আমরা যে ঘরটায় আশ্রয় য়েছিলাম, আমার অবস্থা দেখে সঙ্গীরা সে ঘর ছেড়ে র একটা ঘরে চলে গেল। তোর কাকা আমার কাছে স থাক্‌ল। কেমন করে চটিওয়ালা সেই খবর পেল। র পাবে কোথা—সে একেবারে একখানা লাঠী হাতে র এসে বলল 'এখনই বেরোও, নইলে মেরে তাড়িয়ে ব'। ঠাকুরপো কত মিনতি করতে লাগল, বেশী পয়সা ত চাইল; কিছুতেই সে রাজী হল না। তখন কি মার আর উঠ্‌বার শক্তি ছিল। অনেক কষ্টে বসে বসে ান রকমে বাহিরে এলাম। এখন এই রাত্রে যাই োথায়! নিকটেই একটা গাছ ছিল; তারই তলায় য় শুয়ে পড়লাম। ক্রমে আমার মনে হোতে লাগল, মার হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসছে; তখন আর কথা বার শক্তি নেই। তোর কাকা আমাকে সেই অবস্থায় লা ফেলে চটিতে গেল। সেখানে কি হোলো জানিনে। ্টু পরেই দেখি, সকলে চটি থেকে সেই রাত্রেই বেরিয়ে ল। বুঝলাম, আমাকে এই গাছতলায় একেলা ফেলে থ সাথীরা সবাই পালাচ্ছে। তখনও কিন্তু মনে হয় নাই, রপোও চলে যাবে—সে কি কখন হয়। একটু পরেই য ঠাকুরপো আমার কাছে এল। আমার মনে আশা লো, সে আমাকে এমনি করে ফেলে রেখে যাবে না। রপো এসে কি করল শুন্‌বি। সে এসে আমার নাকের কাছে হাত দিল—দেখ্‌ল আমি বেঁচে আছি কি না। তারপর আমার কোমরে যে টাকার গেজে বাঁধা ছিল, সেইটি টেনে খুলে নিল। আমার তখনও বেশ জ্ঞান আছে, কিন্তু কথা বলতে পারছিনে, হাত-পাও নাড়তে পারছিনে। সে তখন চলে যায় দেখে আমি প্রাণপণে চীৎকার করবার চেষ্টা করলাম,—আমার কি তখন সে শক্তি ছিল? সেই অন্ধকার রাত্রিতে গাছতলায় আমাকে ফেলে সে সত্যিই তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। আমার বুকের ভিতর তখন যে কি করে উঠল, তা তোকে কি করে বুঝাব বাবা! সে অবস্থা যেন অতি বড় শত্রুরেরও কখন না হয়। তখন আমি সব ভুলে গেলাম—তোর মুখখানিও ভুলে গেলাম—ঘর সংসারের কথা তখন আমার মনে এল না। আমার মনে এল বাবা জগন্নাথের কথা। আমি তখন মনে মনে তাঁকেই ডাকতে লাগলাম—তাঁরই পায়ে মন ঢেলে দিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার যেন কি হোল; আমার চক্ষের সম্মুখে সব আঁধার হয়ে আসতে লাগল; কিন্তু মনের মধ্যে—ওরে আমার বুকের মধ্যে তখন দেখতে পেলাম ঠাকুরের সেই মুখখানি। তারপর কি হোলো তা জানিনে।

যখন আমার একটু জ্ঞান হোল সে কতক্ষণ পরে তা কি করে বলব—যখন একটু জ্ঞান হোল, তখন যেন মনে হোলো, কে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সে যে কি তা তোকে বলতে পারছিনে! আমার শরীর যেন সেই হাত লেগে সব শীতল করে দিচ্ছিল। চোখ আর চাহিতে পারিনে,—চোখের উপর কে যেন দশ মণ পাথর চাপা দিয়েছে ব'লে মনে হোল। অনেক চেষ্টা করে একবার চাইলাম। কি দেখ্‌লাম শুন্‌বি বাপ আমার! মুখে যে সে কথা আসে না,—কেমন করে সে কথা তোকে বলব। আমি চেয়ে দেখলাম ঠাকুর—সত্যিই ঠাকুর রে—সত্যিই জগন্নাথদেবের মুখ দেখ্‌লাম। তিনিই আমার পাশে ব'সে রয়েছেন—তাঁরই সেই চাঁদমুখ আমি দেখতে পেলাম। একবার—শুধু একবার দেখা,—তারপরই আবার চোখ বন্ধ হ'য়ে এল! আমি চীৎকার ক'রে ডাকলাম—প্রভু, দয়াল ঠাকুর আমার—ঠাকুর, আর একবার আমার চোখ দুটো খুলে দাও—আর একবার তোমার চাঁদমুখখানি দেখতে দাও;—তারপর আর আমি চোখ খুলব না—আর আমি কিছুই চাইব না। হায় রে অভাগী, হায় রে আমার কপাল—

ঠাকুরের আর দয়া হোলো না! আমার চোখ আর খুলল না। কিন্তু তখনও সেই শীতল হাত আমার গায়ে রয়েছে। আমার তখন মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, আমি অতি ধীরে বললুম, একটু জল। স্বরেশ, বাবা আমার, ভাল করে শোন্। সত্যিই আমার মুখে কে জল দিল। সে এ জল নয়—সে চরণামৃত। তেমন জল ত কখনও খাইনি,—কি যে তার গন্ধ আর কি যে তা স্বাদ। সে অমৃত রে বাপ, সে অমৃত। আমার সকল জ্বালা যন্ত্রণা যেন দূর হয়ে গেল। এ স্বপন নয়, বাবা! সত্যি কথা। আমার শরীর যেন জুড়িয়ে গেল, আমার রোগ যেন পালিয়ে গেল। যাকে সন্ধ্যার সময় সকলে মড়া মনে করে ফেলে গিয়েছিল, সে যে চাঙ্গা হয়ে গেল। হঠাৎ গাছের উপর একটা পাখী ডেকে উঠল। সেই ডাকে আমার বুকে যেন বল এল। আমার চোখ খুলে গেল। আমি চেয়ে দেখি, ভোর হয়ে গেছে; পথ দিয়ে যাত্রীরা সব যাচ্ছেন কিন্তু, আমার কাছে ত কেউ নেই। সেই গাছতলায় আমি একেলা শুয়ে আছি। শরীরে কোন যন্ত্রণা নেই, বাড়ীর যে মরতে বসেছিলাম, তেমন বোধও হোলো না। আমার যে অসুখ হয়েছিল, তার চিহ্নমাত্রও নেই। আমি তখন উঠে বসে হাত যোড় করে ঠাকুরকেই ডাকতে লাগলাম—প্রভু, কাঙ্গালের ঠাকুর, এত দয়া তোমার এই অভাগীর উপর। বাবা, তোর মা কত ভাগ্যবতী! তোর মায়ের সব আশা পূর্ণ হয়েছে বাপ! আমার মত মহাপাপী ঠাকুরের চরণামৃত পেয়েছিল—বেঁচে গেছে। তারপর আর কি? সঙ্গে পয়সা ছিল না। তাতে কি? যাবার সময় এত টাকা সঙ্গে থাকতেও এক এক দিন খেতে পাইনি; কিন্তু যখন একটা পয়সাও নেই, তখন দয়াল ঠাকুর আমাকে উপোস করতে দেন নি! ঠাকুর আমার জন্য আগে থাকতেই সব ঠিক করে রেখে দিতেন—সব ঠিক! পথে যেখানে গিয়েছি, কাউকে বলতে হয় নাই; আমাকে ডেকে লোকে খেতে দিয়েছে। এ তাঁরই খেলা—ওরে তাঁরই। উলুবেড়ের নৌকার মাঝী আমাকে নিয়ে এল—পয়সা নিল না; বলল 'তোমার কাছে ত কিছু নেই বলে মনে হচ্ছে; তোমাকে ভাড়া দিতে হবে না।' কে তাকে এ কথা বলে দিল? কলকাতায় এসে শিয়ালদহের ষ্টেসনে এক পাশে বসে আছি, একটী বাবু এসে বলল 'মা, তুমি কোথায় যাবে?' আমি গ্রামের নাম বললাম। সে বলল 'এখানে বসে কেন? টিকিট কিনলে না!' আমি কোন উত্তর দিলাম না। বাবুটী কি ভেবে চলে গেল—একটু পরেই এসে আমাকে একখানি টিকিট দিয়ে বলল 'এস মা, তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিচ্ছি।' এ সব তাঁরই খেলা রে, তাঁরই খেলা। পথে যারা খেতে দিয়েছিল, উলুবেড়ের সেই নৌকার মাঝী, আর ষ্টেসনের সেই বাবু—এরা সব আমার সেই কাঙ্গালের ঠাকুর! ঠাকুরই এই সব বেশ ধরে আমাকে তোর কাছে এনে দিয়ে গেলেন! বাবা, একটা কথা তোকে বলি;—কোন দিন মানুষের দিকে চাস্‌নি—যখন বিপদে পড়বি, আমার সেই দয়াল ঠাকুর, সেই কাঙ্গালের ঠাকুরকে ডাকিস্—তোর কোন অভাব থাকবে না। তোকে আজ আমার ঠাকুরের চরণে নিবেদন করে দিই।" এই বলিয়া মা আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন,—আমার বেশ মনে হইল, কোন্ এক দেবতা আমাকে বুকে করে নিলেন। মায়ের 'রথযাত্রা'র ফলে আমার 'জীবন-যাত্রা'র পথ ঠিক হয়ে গেল—সেই চোদ্দ বৎসর বয়সেই আমি পথ পেয়েছিলাম।

সে কথা আজ নয়—আর একদিন!

ছল

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

প্রেম কহে "এততেও না পাইনু হৃদি তব
ওগো অভিমান,
কথায় কথায় আজো মনান্তর;"

অভিমান কহে হাসি "সে শুধু ছলনা মোর
তোমারি সম্মান
বাড়াইতে বঁধু, নিত্য নিরন্তর।"

শিবাজী ও আফজল খাঁ

(অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার এম-এ, পি-আর এস্)

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বিজাপুর আক্রমণ ত্যাগ করিয়া সিংহাসন লোভে আওরংজীব উত্তর ভারতে যাত্রা করিলে, বিজাপুর-সরকার বিশ্রামের অবসর পাইলেন এবং রাজশক্তি সহসা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। সত্য বটে, গত যুদ্ধে আওরংজীবের সহিত যোগ থাকার মিথ্যা সন্দেহের ফলে বৃদ্ধ উজীর খান মহম্মদকে খুন করা হয়, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী খাওয়াস খানও অতি যোগ্য মন্ত্রী ছিলেন। বলিতে গেলে, রাজমাতা বড়ী সাহেবাই রাজ্যশাসন করিতেন। অবশেষে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কায় গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রাজোচিত গুণপনার অধিকারিণী ছিলেন, রাজ্য শাসন-কার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতাও ছিল। সীমান্তে নিজ মোগল-ভীতি হইতে কিছুদিনের জন্য অব্যাহতি লাভ করিয়া, বিজাপুর সরকার এক্ষণে তাঁহাদের অবাধ্য সামন্তগণকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্রোহী পুত্রকে শাস্তি দিবার জন্য শাহজীকে আদেশ করা হইল ; কিন্তু শাহজী পত্র দ্বারা শিবাজীকে ত্যাজ্যপুত্র বলিয়া প্রচার করিলেন এবং বিজাপুর-সরকার তাঁহার খাতির না করিয়া স্বচ্ছন্দে শিবাকে দণ্ড দিতে পারেন, এ কথাও নিবেদন করিলেন। তখন বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক শিবাজীকে দমন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইল। (সভাসদ বখর ১২)

কিন্তু কাজটা তত সহজ নয় ; শিবাজীর সৈন্যবল নিতান্ত নগণ্য ছিল না ; জঙ্গলময় পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ করিতে যাইবার কথা মনে করিয়া বিজাপুরের ওমরাহগণ শঙ্কিত হইলেন। তখন শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য বিজাপুররাজ সম্ভ্রান্তগণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আফজল খাঁ নেতৃপদ গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। (সভাসদ ১৩ ; চিটনিস ৫৪ ; পোবাড়া ৬৭ ; সেড্ ২৪)।

আবদুল্লা ভাটারি, ওরফে আফজল খাঁ প্রথম শ্রেণীর ওমরাহ। তিনি বিজাপুরের ভূতপূর্ব্ব সুলতান মহম্মদ আদিল শাহের আমলে পদমর্য্যাদা ও ক্ষমতা লাভ করেন। রাজ্য মধ্যে তাঁহার অপেক্ষা উচ্চপদস্থ আর কেহ ছিল না তিনি বাহ্‌লোল খাঁ এবং রণদৌলা খাঁয়ের সমকক্ষ। মোগলগণের সহিত বিগত যুদ্ধে অতুল বীর্য্য ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই যুদ্ধের ফলে, এবং অবরোধবাসিনী পুরমহিলার প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্য শাসিত হইলে যে অর্থকৃচ্ছ্রতা ও বিশৃঙ্খলা হইয়াই থাকে তাহারই ফলে, বিজাপুর দরবারের তখন সৈন্য সংগ্রহ এবং সমরায়োজন করিবার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। আফজলের সঙ্গে কেবল মাত্র ১০,০০০ অশ্বারোহী সেনা (১) দেওয়া যাইতে পারিল। এদিকে লোকমুখে রটিতেছিল যে, জাওলী অধিকারের ফলে শিবাজীর মাওলী সৈন্য সংখ্যা ৬০,০০০এ পরিণত হইয়াছে ; এবং বিজাপুরের পদচ্যুত পাঠান সেনাগণের মধ্য হইতেও তিনি একদল সুশিক্ষিত পল্টন নিজ সৈন্যদলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। (চিট ৩৮, তারিখ ই শিবাজী ১৫ বি)। এই কারণে আফজল শিবাজীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে বলপরীক্ষা করিতে সাহস করিলেন না। প্রকৃতপক্ষে রাজমাতা স্বয়ং তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন যে, শিবাজীর সহিত "বন্ধুত্বের ছলনা" করিয়া, এবং তাঁহার অনুরোধে আদিল শাহ্ তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন এই আশ্বাস দিয়া, তিনি শিবাজীকে হয় বন্দী করিতে, না হয় হত্যা করিতে চেষ্টা করুন। (২)

---

(১) সমসাময়িক ইতিহাসে (যথা,-- তারিখ-ই-আলি ২য়, ১৬ পৃঃ এবং পরবর্ত্তী পাদটীকায় উদ্ধৃত ইংরেজী পত্র) আফজলের সৈন্য-সংখ্যা এইরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের পরবর্ত্তী যুগের মহারাষ্ট্রীয় বিবরণে দেখা যায়, আফজলের পদাতি সেনা ছাড়া, অশ্বারোহী সেনার সংখ্যা ১২০০০ ছিল। (পোবাড়া, ৭, সভাসদ, ১৩) ; ৩০,০০০ ; তন্মধ্যে স্থানীয় অবস্থাভিজ্ঞ ৩০০০ মাওলী সৈন্য ছিল। (চিট্, ৫৪) M. A. N. ৫৭৭ *du hazar* নিশ্চয়ই *dah hazar* এর স্থলে ভুল ক্রমে ছাপা হইয়াছে। শেডগাবকরবখর ২৫এ মুদ্রিত পত্রখানি কাল্পনিক।

(২) "এই বৎসরে রাণী ১০,০০০ অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্য সহ আবদুল্লাকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, এবং এই পরিমাণ

বিজাপুর সেনাপতি প্রথমে গর্ব্বপ্রণোদিত হইয়া এই সৈন্য-পরিচালনার ভার লইতে স্বীকার করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি প্রকাশ্য দরবারে অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শিবাজীকে বন্দী করিয়া আনিবেন, এবং এজন্য তাঁহার অশ্ব হইতে অবতরণ পর্য্যন্ত করা আবশ্যক হইবে না। কিন্তু তাঁহার কার্য্যের গুরুত্বের কথা ভাবিয়া তাঁহার মন নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ভয় প্রদর্শন এবং কৌশলের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার মতলব করিলেন। বিজাপুর হইতে এক অভিযানে সোজাসুজি উত্তর দিকে তুলজাপুরে গমন করিলেন। এই স্থানটি মহারাষ্ট্রের মধ্যে অন্যতম পবিত্র তীর্থ এবং এখানে ভোঁসলাবংশের কুলদেবতা ভবানী অধিষ্ঠিতা। আফজলের মতলব এই ছিল যে, হয় তিনি শিবাজীর দক্ষিণ দিকের দুর্গ ছাড়িয়া মহারাষ্ট্র রাজ্যের অরক্ষিত পূর্ব্বদিক ভেদপূর্ব্বক পুণায় প্রবেশ করিবেন; না হয়, তাঁহার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অত্যাচার দ্বারা শিবাজীকে উত্তেজিত করিয়া উন্মুক্ত রণক্ষেত্রে বিজাপুরের সেনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য করিবেন। তুলজাপুরে তিনি ভবানীর প্রস্তরময়ী প্রতিমাটি একটি যাঁতায় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দলিতে পরিণত করিবার আদেশ দিলেন। (সভা, ১৩, চিট্‌ ৫৪; শিবদিগ্বিজয়, ১০৯)।

তখন তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল যে, শিবা রাজগড় পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রতাপগড়ে গমন করিয়াছেন। আফজল এক্ষণে পুণায় গমনের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন এবং সোজা পশ্চিমে প্রতাপগড়ের দিকে ফিরিলেন। পথে তিনি অনেক দেবমূর্ত্তির অপমান এবং মাণিকেশ্বর, পান্ধারপুর ও মহাদেবের ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন (সোবাড়া ৮৯), এবং পনের দিনের মধ্যে সাতারার ২০ মাইল উত্তরে বাই নামক স্থানে পৌঁছিলেন। এই শেষোক্ত নগরটি তাঁহার জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই স্থানে তিনি কয়েক দিন অবস্থান করিয়া, কৌশলে শিবাজীকে তাঁহার পার্ব্বত্য আবাস হইতে বাহির হইবার জন্য প্রলুব্ধ করিবার অথবা স্থানীয় সর্দ্দারগণের সাহায্যে তাঁহাকে বন্দী করিবার উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। (Dig. 138; Chit. 54) তিনি গুঞ্জন মাওলের দেশমুখ বিঠোজী হাইবত রাওকে পত্র লিখিয়া তাঁহার লোকজন সহ জাবলীর নিকটে বিজাপুরী সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইতে, এবং তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব পরামর্শ মতে সহায়তা করিতে উপদেশ দিলেন। রোহিড়-খোরের দেশমুখী লাভের জন্য খান্দোজী খোপড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী কাণহোজী জেধে বাই নগরে আসিয়া আফজলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং দেশমুখী প্রাপ্ত হইলে শিবাজীকে বন্দী করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি-পত্র দিলেন। (Rag XVII. 31 XV. 393 and 317; *Dig.* 165; *T. S.* 16*a*.)

বাই নগরে এইরূপ ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল; এদিকে আফজল তাঁহার দেওয়ান কৃষ্ণাজী ভাস্করকে একখানি প্রলোভনপূর্ণ পত্র দিয়া শিবাজীর নিকট পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি এই কথা লিখিয়াছিলেন যে, "তোমার পিতা আমার বহু কালের বন্ধু; অতএব তুমি আমার অপরিচিত নও। এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর; তাহা হইলে আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়া আমি আদিল শাহের দ্বারা তোমার কঙ্কনের অধিকার এবং যে সকল দুর্গ এখন তোমার হস্তে আছে সে গুলিও স্বত্ব মঞ্জুর করাইব। তা ছাড়া, আমি আমার সরকার কর্ত্তৃক তোমাকে আরও সম্মান এবং সামরিক সরঞ্জাম প্রদান করাইব। তুমি যদি দরবারে আসিতে চাও, সেখানে সমাদরের সহিত তোমার অভ্যর্থনা হইবে। কিংবা যদি তুমি তথায় হাজিরা দিতে অনিচ্ছুক থাক, তাহা হইলে, তোমাকে যাহাতে দরবারে হাজিরা দিতে না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা যাইবে। (সভা, ১৩-১৪)

ইতিমধ্যে আফজলের আগমন সংবাদে শিবাজীর অনুচরগণের মনে আতঙ্ক ও উদ্বেগের সঞ্চার হইল। এ যাবৎ তাহারা অপ্রসিদ্ধ দুর্গগুলি অতর্কিতভাবে আক্রমণপূর্ব্বক অধিকার করিতেছিল, অরক্ষিত দ্রব্যসম্ভার লুণ্ঠন

সৈন্যের সাহায্যে তিনি শিবাজীকে বাধা দিতে পারিবেন না জানিয়াই তিনি শত্রুর সহিত বন্ধুত্বের ছলনা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন; এবং তিনিও তাহাই করিয়াছিলেন। এবং অপর পক্ষও (অর্থাৎ শিবাজী) গুপ্ত সংবাদ পাইয়াই হউক, অথবা সন্দেহবশতঃই হউক (কোন্‌টা তাহা ঠিক জানা যায় না) তাঁহার সহিত বন্ধুত্বের ছলনা করিয়াছিলেন,—ইত্যাদি। Factors of Rajapur to Council at Surat, 10 Oct. 1659. F. R. Rajapur).

করিতেছিল এবং বেসরকারী জায়গীরদারদিগের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সেনাদলের সহিত ছোট-খাটো যুদ্ধ করিতেছিল। এইবার তাহাদিগকে বিজাপুরের সুশিক্ষিত সেনাগণের সহিত সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ করিতে হইবে; এই শত্রুদল সুবিখ্যাত সেনানী কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং সংখ্যায় ১০০০০; তদানীন্তন সর্ব্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত সেনাদলের উপযোগী গোলন্দাজ, যুদ্ধসম্ভারবাহী এবং অন্যান্য সরঞ্জামে সজ্জিত। তদুপরি, আফজলের সেনাদলকে বিজাপুর হইতে বাই নগরে গমনকালে কোথাও কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন পাইতে হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্মুখ-যুদ্ধে তাহাদিগকে বাধা দিতে সাহস করে নাই। আফজল শিবার রাজ্যভুক্ত যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়াছেন, সেই সকল স্থান তিনি অবাধে লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিতে করিতে আসিয়াছেন। (Tarikh-i-Ali II. 76-77) তাঁহার অদম্য শক্তি এবং নিষ্ঠুরতার নানা কাহিনী মহারাষ্ট্র-শিবিরে পৌঁছিতে লাগিল। শিবাজীর সেনানীরা স্বভাবতঃই আফজলকে বাধা দিতে ভীত হইতেছিলেন। শিবাজী যে প্রথম মন্ত্র-মন্ত্রণা সভার অধিবেশন করিলেন, সেই সভায় সকলে শিবাজীকে সন্ধি করিবার পরামর্শ দিলেন; তাহার কারণ, শত্রু অতি প্রবল, এবং যুদ্ধ করিলে তাহাদের অত্যন্ত লোকক্ষয় হইবে। (সভা, ১৪ ; চিট ৫৫)।

ইহাই শিবাজীর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সঙ্কটকাল। তিনি যদি আফজল খাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে পদস্থ ও স্বাধীন হইবার সকল আশা-ভরসা চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিতে হয়। এদিকে রাজবিদ্রোহী হওয়ায় তিনি বিজাপুর রাজের হৃদয়ে যে প্রতিশোধ-বাসনার উদ্রেক করিয়াছেন, তাহা হইতে কোন ক্রমে অব্যাহতি পাইলেও, তাঁহাকে বিজাপুরের অনুগত সামন্ত ভাবে জীবন শেষ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, এখন যদি তিনি প্রকাশ্যভাবে বিজাপুর-রাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে ঐ রাজের সহিত সদ্ভাব স্থাপনের দ্বারও চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহাকে সেই রাজের এবং মুঘলগণ ও অন্যান্য শত্রুর শক্তির বিরুদ্ধে নিজের জীবন ও স্বাধীনতারক্ষার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে; তখন এই সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীতে তাঁহার এমন একজনও বন্ধু বা রক্ষাকর্ত্তা থাকিবে না, বিপৎকালে তিনি যাঁহার আশ্রয় লইতে পারেন। তাঁহার মন্ত্রী এবং সেনাপতিগণ তাঁহাকে এই অপমানজনক পন্থা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেছিলেন। শিবাজী স্বয়ং বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তিনি কেমন পথ অবলম্বন করিবেন, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বীরোচিত পন্থাই নির্ব্বাচন করিলেন। তাঁহারই সমসাময়িক একটী কাহিনী হইতে জানা যায় যে, এই চিন্তাক্লিষ্ট সেনাপতির নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া ভবানী দেবী তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং তাঁহাকে নির্ভয়ে আফজলের সম্মুখীন হইতে আদেশ করিলেন। এমন কি, ইহাও প্রতিশ্রুত হইলেন যে, যুদ্ধস্থলে তিনি স্বয়ং শিবাজীকে রক্ষা করিবেন ও শিবাজী জয় লাভ করিবেন।

সঙ্কল্প স্থির হইল। পরদিন প্রভাতে পুনরায় মন্ত্রণা সভা বসিল। শিবাজীর বীরোচিত বক্তৃতা শ্রবণে সমবেত লোকদিগের আত্মসম্মান জ্ঞান প্রবুদ্ধ হইল, তাহার উপর দেবীর আশীর্ব্বচনের কথা শুনিয়া তাঁহারা যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন শিবাজী বিশেষ দূরদর্শিতা ও কৌশল সহকারে যুদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাঁহার জননীর নিকট বিদায়-আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য উপস্থিত হইলে, জিজা বাই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, যুদ্ধে তাঁহারই জয়লাভ হইবে। যুদ্ধে যদি তাঁহার মৃত্যুই হয়, তাহা হইলে তাঁহার অবর্ত্তমানে কিরূপভাবে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিলেন। কঙ্কন ও ঘাট প্রদেশ হইতে যথাক্রমে মোরো ত্রিম্বক পিঙ্গলে এবং নেতাজী পালকরের অধীন সেনাদল আহূত হইল। তাহারা আসিলে, প্রতাপগড় হইতে অচিরে এবং সহজে পৌঁছান যায় এমন স্থানে তাহাদিগকে স্থাপন করা হইল। (সভা, ১৫ ; চিট, ৫৫, ৫৭ ৫৯)।

এই সময়ে সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য আফজলের দূত কৃষ্ণাজী ভাস্কর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবাজী তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং রজনীতে গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনুনয় পূর্ব্বক কহিলেন, তিনি হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ, অতএব আফজলের প্রকৃত অভিপ্রায় কি তাহা তিনি ব্যক্ত করুন। শিবাজীর অনুনয়ে কৃষ্ণাজী এতদূর বিচলিত হইলেন যে, খাঁয়ের কু-অভিসন্ধি থাকাই সম্ভব, এ কথা পর্য্যন্ত তিনি ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। শিবাজী তখন তাঁহার প্রতিনিধি গোপীনাথ পন্থকে সঙ্গে

দিয়া কৃষ্ণাজীকে আফজলের নিকট প্রতিপ্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি আফজলের সহিত সাক্ষাৎকারের প্রস্তাবে সম্মত আছেন ; তবে তাঁহার কোন বিপদ না হয়, সে সম্বন্ধে আফজলকে প্রতিশ্রুত হইতে হইবে। গোপীনাথকে পাঠাইবার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আফজলের সৈন্যবল কত, তাহার তিনি সন্ধান লইবেন, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিবেন, এবং খাঁয়ের প্রকৃত মতলব কি, তাহাও তিনি জানিবার চেষ্টা করিবেন। গোপীনাথের মারফত শিবাজী প্রতিশ্রুতি পাঠাইলেন যে, তিনি আফজলের কোন অনিষ্ট সাধন করিবেন না, এবং আফজলও নিজের পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুত হইলেন যে, তাহার উদ্দেশ্য সৎ। কিন্তু গোপীনাথ প্রচুর উৎকোচ প্রদান করিয়া অবগত হইলেন যে, আফজলের সেনানীগণের মনে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, শিবাজী যাহাতে এই সাক্ষাৎকার সময়ে বন্দী হন, আফজল তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, কারণ, শিবাজী এমন নহে যে, সম্মুখযুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করা সম্ভব। (সেনা, ১৮ ; গোপীনাথ ফিরিয়া আসিয়া শিবাজীকে সকল কথা বলিলেন, এবং পরামর্শ দিলেন যে, সন্ধি স্থাপনের জন্য আফজল বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, পাছে শিবাজীকে আক্রমণ করিবার পূর্বে, শিবাজী তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবেন। (সেনা, ১৮১৮, চিট্, ৫১ পৃ., ডফ্, ৫৯ পৃ.)।

গোপীনাথের নিকট হইতে এইরূপ ইঙ্গিত পাইয়া শিবাজী আফজলের প্রাণবধ করিবার, এবং বাই নগরে গিয়া আফজলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিলেন। পরিবর্ত্তে প্রস্তাব করিলেন যে, যদি আফজল অগ্রসর হইয়া শিবাজীর বাসস্থানের নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং নিজমুখে প্রতিজ্ঞা করেন যে, শিবাজী নিরাপদ হবেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহাকে রক্ষা করা হইবে, তবেই তিনি আফজলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। আফজল শিবাজীর অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন। শিবাজীর আদেশে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া বাই হইতে প্রতাপগড় পর্য্যন্ত পথ কাটা হইল, এবং বিজাপুর বাহিনীর জন্য ঐ পথের নানাস্থানে খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত রাখা হইল। রাডতোণ্ডি গিরিপথ দিয়া (এই গিরিসঙ্কট মহাবলেশ্বর মালভূমির বম্বে পয়েণ্টের নিম্নে অবস্থিত) আফজল খাঁ সসৈন্যে 'পার' পর্য্যন্ত আসিলেন। এই 'পার' গ্রাম প্রতাপগড়ের এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। আফজলের সৈন্যদল তথায় উপত্যকার গভীরতর অংশে কয়না নদীর উৎপত্তিস্থলে প্রত্যেক জলাশয়ের নিকট বিচ্ছিন্নভাবে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।

খাঁ যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শিবাজীকে সংবাদ দিবার জন্য গোপীনাথকে পাহাড়ের উপর প্রেরণ করিলেন। পরদিনই সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। একটা উচ্চ টিলার শিখর তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই স্থান প্রতাপগড় দুর্গের নিম্নে অবস্থিত এবং এখান হইতে কয়না নদীর উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়। শিবাজী পথের উভয় পার্শ্বে পাহাড়ের উপরিস্থিত প্রাসাদ পর্য্যন্ত নানাস্থানে বাছা-বাছা সৈন্যগণকে গুপ্তস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। এইস্থানে শিবাজী বস্ত্রাবাস সন্নিবেশ করিলেন এবং রাজ অতিথির যোগ্য বহুমূল্য বস্ত্রখচিত চাঁদোয়া খাটানো হইল ; তন্নিম্নে জাজিমের উপর গালিচা ও তাকিয়া বিস্তৃত হইল। তখন তিনি সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার গাত্রাবরণের নিম্নে লোহার জালের বর্ম্ম লুক্কায়িত ছিল, এবং মাথার খুলি রক্ষার জন্য পাগড়ীর নিম্নে ইস্পাতের টুপি লুক্কায়িত রহিয়াছিল। তাঁহার নিকটে কোন আক্রমণোপযোগী অস্ত্র ছিল কি না, তাহা কাহারও জানিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি একসেট তীক্ষ্ণ ইস্পাতের নখ (বাঘনখ) বাম হস্তে গুপ্তভাবে রাখিয়াছিলেন। উহা দুইটা আংটার দ্বারা অঙ্গুলির সহিত আবদ্ধ ছিল। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের জামার আস্তিনের ভিতর একটী তীক্ষ্ণ ধার পাতলা ছোরা সংগুপ্ত ছিল। এই অস্ত্রের নাম বিছুওয়া। সঙ্গে দুইজনমাত্র অনুচর, কিন্তু সেই দুইজনই অত্যন্ত সাহসী ও ক্ষিপ্রগতি। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যাহার নাম জীবমহালা, সে তরবারি-চালনে সিদ্ধহস্ত। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম শম্ভুজী কাবজি। এই ব্যক্তি হনুমন্ত রাও মোরেকে হত্যা করিয়াছিল। ইহারা দুইখানি করিয়া তরবারি ও একটা করিয়া ঢালে সজ্জিত হইল।

তাঁহারা যখন দুর্গ হইতে যাত্রা করিবেন, তখন সহসা তাঁহাদের সম্মুখে এক জাগ্রত দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। ইনি শিবাজী-জননী জিজা-বাই। শিবাজী জননীকে প্রণাম

করিলেন। মাতা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তোমার জয় হউক!" তৎপর তিনি শিবাজীর অনুচরদ্বয়কে আদেশ করিলেন, তাহারা যেন শিবাজীকে নিরাপদে রক্ষা করে। তাহারা তাঁহার আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হইল। তখন তাঁহারা দুর্গের পাদদেশে গমন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে আফজল খাঁ তাঁহার 'পার' গ্রামস্থিত শিবির হইতে যাত্রা করিলেন। সহস্রাধিক বন্দুকধারী সিপাহী রক্ষকরূপে তাঁহার সঙ্গে চলিল। গোপীনাথ আপত্তি করিলেন যে, এইরূপ সৈন্যের আড়ম্বর করিলে শিবাজী ভয় পাইয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন না। অতএব শিবাজী নিজে যেরূপ করিয়াছেন, খাঁয়েরও সেইরূপ দুইজন মাত্র শরীর রক্ষক সঙ্গে লওয়া কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিয়া, আফজল খাঁ তাঁহার সৈন্যগণকে কিয়দ্দূর পশ্চাতে রক্ষা করিয়া, পালকী আরোহণে পার্ব্বত্য পথ দিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সহিত দুইজন সৈনিক, সৈয়দ বান্দা নামক একজন, বিখ্যাত তরবারি ক্রীড়ক এবং গোপীনাথ ও কৃষ্ণাজী নামক দুইজন ব্রাহ্মণ দূত চলিলেন। শিবিরে পৌঁছিয়া আফজল খাঁ সেখানে রাজকীয় আসবাব এবং সাজসজ্জা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "এ সকল দ্রব্য একজন জায়গীরদারের পুত্রের প্রকৃত অবস্থা অপেক্ষা বড় দরের।" কিন্তু গোপীনাথ তাঁহাকে এই বলিয়া শান্ত করিলেন যে, শিবাজীর বশ্যতা-স্বীকারের প্রথম ফলস্বরূপ এই সকল মূল্যবান দ্রব্য শীঘ্রই বিজাপুর প্রাসাদে নীত হইবে।

শিবাজী দুর্গের পাদদেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে সত্বর আনিবার জন্য সংবাদ-বাহক প্রেরিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে, পথিমধ্যে সৈয়দ বান্দাকে দেখিয়া আর অগ্রসর হইলেন না;—বলিয়া পাঠাইলেন, এই ব্যক্তিকে অন্যত্র পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তাহাই করা হইল। অবশেষে শিবাজী শিবিরে প্রবেশ করিলেন। উভয় পক্ষেই চারিজন পুরুষ উপস্থিত রহিল—তন্মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি, দুইজন সশস্ত্র অনুচর এবং একজন দূত। কিন্তু শিবাজীকে দেখিয়া নিরস্ত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল,—যেন একজন পরাজিত বিদ্রোহী, ধরা দিতে আসিয়াছে। এদিকে খাঁয়ের কটিদেশে যথারীতি তরবারি বিলম্বিত ছিল। (৩)

সহচরেরা নিম্নে দণ্ডায়মান রহিল। শিবাজী উচ্চ বেদীর উপরে আরোহণ করিয়া নতশিরে আফজলকে অভিবাদন করিলেন। খাঁ তাঁহার আসন হইতে উত্থিত হইয়া, কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, শিবাজীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু দ্বয় প্রসারিত করিলেন। খর্ব্বাকার, ক্ষীণকায় মারাঠা তাঁহার শত্রুর কাঁধ পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন। সহসা আফজল তাঁহার বাহুবেষ্টনীর মধ্যে শিবাজীকে সবলে চাপিয়া ধরিলেন, এবং বাম হস্তে সজোরে শিবাজীর গলা টিপিয়া, দক্ষিণ হস্তে তাঁহার সুদীর্ঘ সোজা ছোরা বাহির করিয়া শিবাজীর পাঁজরে আঘাত করিলেন। কিন্তু অদৃশ্য বর্ম্ম এই আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিল। শিবাজী যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে শিবাজী এই অতর্কিত আক্রমণ হইতে নিজেকে সামলাইয়া লইলেন, এবং তাঁহার বাম বাহুর দ্বারা আফজলের কটি বেষ্টন করিয়া, ইস্পাতের নখের আঘাতে তাঁহার উদর চিরিয়া ফেলিলেন। তার পর দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে আফজলের বাম পার্শ্বদেশে বিছুয়াটি বিদ্ধ করিয়া দিলেন। আহত আফজলের হস্ত শিথিল হইয়া আসিল; শিবাজী তাঁহার আলিঙ্গন হইতে নিজেকে জোরে মুক্ত করিয়া লইলেন। তার পর বেদী হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নিম্নে অবতরণ করিয়া অনুচরদিগের দিকে ধাবিত হইলেন।

খাঁ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বিশ্বাসঘাতক খুন করিল! এস—এস!" অনুচরেরা চতুর্দিক হইতে দৌড়িয়া আসিল। সৈয়দ বান্দা শিবাজীর সম্মুখীন হইয়া তাহার সুদীর্ঘ তরবারির (পাট্টার) এক আঘাতে তাঁহার পাগড়ী দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন, তরবারির ফলক পাগড়ীর নিম্নস্থ ইস্পাতের টুপি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া একস্থানে বেঁকাইয়া দিল। শিবাজী তাড়াতাড়ি জীব মহালীর হস্ত হইতে একখানি তরবারি লইয়া তাহা সঞ্চালন পূর্ব্বক সৈয়দ বান্দার আঘাত প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জীব মহালা তাঁহার অপর তরবারি হস্তে ধরিয়া আসিয়া সৈয়দের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তার পর তাঁহাকে বধ করিলেন।

(৩) খাফি খাঁ II. 117, বলেন, আফজল ও শিবাজী উভয়েই নিরস্ত্র হইয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কমর ওয়া কর্দ্দা অর্থাৎ "কটিদেশে অসি বিলম্বিত না থাকাই" পরাজিত পক্ষের নিয়মিত অবস্থা—পার্শী ইতিহাসে ইহাই পুনঃ-পুন বর্ণিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে বাহকেরা আহত খাঁকে পাল্কীতে তুলিয়া শিবিরাভিমুখে দৌড়িল। কিন্তু শম্ভুজী কাবজী বাহকদের পদে আঘাত করিলে তাহারা পাল্কী ফেলিয়া দিল। তখন তিনি আফজলের মাথা কাটিয়া সেই কর্ত্তিত মস্তক লইয়া বিজয় উল্লাসে শিবাজীর সঙ্গে মিলিত হইলেন।(৪)

বিপন্মুক্ত হইয়া শিবাজী ও তাহার অনুচরদ্বয় প্রতাপগড়ের শীর্ষদেশে গমন পূর্ব্বক একটা কামানের আওয়াজ করিলেন। নিম্নের উপত্যকায় তাহার সৈন্যগণ এই সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ মোরো ত্রিম্বক এবং নেতাজী পালকরের সৈন্যগণ এবং সহস্র সহস্র মাউলী চারিদিক হইতে বিজাপুরী শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইল। অধ্যক্ষের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া সকলেই হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল; তার উপর এই অপরিচিত স্থানে যেখানে প্রত্যেক ঝোপে শত্রুর অস্তিত্ব লক্ষিত হইতেছিল, এইরূপ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া আফজলের সেনানী ও সৈন্যগণ সকলেই ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ, কাজেই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হইল; ফাঁদে পতিত সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই ছোট ছোট পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিল। তাহাদের কোন সাধারণ রণনায়ক ছিল না, তাহাদিগকে পরিচালন করিবারও কেহ ছিল না। অপর পক্ষে মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজেদের ভূমিতে, তাহাদের পথঘাটে বিজয়লব্ধ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। তাহারা রণপণ্ডিত সেনানীবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত, এবং প্রয়োজন হইলে নিকটেই আরও সাহায্যকারী সৈন্য উপস্থিত আছে, এরূপ বিশ্বাসও তাহাদিগকে সবল করিয়াছিল। কাজেই বিজাপুরী সৈন্যদলে প্রভূত পরিমাণে লোকক্ষয় ঘটিল। "যাহারা দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া প্রাণ ভিক্ষা করিল, কেবল তাহারাই প্রাণে বাঁচিল; অবশিষ্ট সকলে তরবারির মুখে আত্মাহুতি প্রদান করিল।" (কয়েক দিন পরে রাজাপুরে ইংরাজদের কুঠীতে এই যুদ্ধের যে সংবাদ পহুছিয়াছিল, তাহাতে জানা যায়, ৩০০০ লোক হত হইয়াছিল।) মাউলী পদাতি সেনারা পলায়মান হস্তীগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। তাহাদের "কাহারও বা পুচ্ছ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, কাহারও বা দন্ত ভগ্ন হইয়াছিল। কাহারও বা পদ কাটা পড়িয়াছিল।" এমন কি উষ্ট্রগণ আততায়ীদের পথ অতিক্রম করায় তাহাদিগকেও কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণও প্রচুর। সমস্ত কামান, মাল বহনের গাড়ী, গোলা বারুদ, ধনরত্ন, তাঁবু ও সাজসজ্জা, ভারবাহী পশু এবং একটা অসম্পূর্ণ বাহিনীর সমস্ত মালপত্র বিজয়ীদের হস্তগত হইল। তন্মধ্যে ৬৫টা হস্তী, ৪০০০ অশ্ব, ১২০০ উষ্ট্র, ২০০০ বাণ্ডিল বস্ত্র এবং নগদে ও অলঙ্কারে দশ লক্ষ মুদ্রা ছিল।

বন্দীদের মধ্যে একজন উচ্চপদস্থ সর্দ্দার, আফজলের দুইটী পুত্র এবং যশ্বাজী ভোঁসলা ও ঝুঝারর রাও ঘাটগে নামক দুইজন মারাঠা সর্দ্দার ছিলেন। সমস্ত বন্দী স্ত্রীলোক, শিশু, ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্যবর্গকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দান করা হইল। পরাজিত বাহিনীর এক অংশ খান্দোজী খোপড়ে এবং তাহার ৩০০ মাউলী অনুচরের পরিচালনে কয়না নদীর উৎপত্তিস্থল ঘুরিয়া পলায়ন করিল। এই দলে আফজল খাঁর পত্নীগণ এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফজল খাঁ ছিলেন। (৫) প্রতাপগড়ের নিম্নে শিবাজী বিজয়ী সৈন্য পরিদর্শন করিলেন। বন্দী শত্রু-গণ—সেনানী ও সেনা—উভয়কেই মুক্তি দান পূর্ব্বক, অর্থ, খাদ্য এবং অন্যান্য উপহারসহ নিজ নিজ গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। যে সকল মারাঠা সৈন্য সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা ত পুরস্কৃত হইলই; মৃত যোদ্ধগণের বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র থাকিলে তাহাদিগকে সৈন্যদলভুক্ত করিয়া তাহাদের পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। অন্যথা, তাহাদের বিধবাগণকে তাহাদের বেতনের অৰ্দ্ধেক বৃত্তিস্বরূপ প্রদত্ত হইল। আঘাতের গুরুত্ব অনুসারে আহত সেনারা ২৫ হইতে ২০০ হুণ মুদ্রা (৬) পুরস্কার প্রাপ্ত হইল। সেনানীরা হস্তী, অশ্ব, পোষাক অলঙ্কার ও ভূমি উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

আফজল খাঁর অপঘাত-মৃত্যু তাঁহার নিজ দেশে এবং তাঁহার শত্রুর দেশেও জনসাধারণের চিত্ত একেবারে অধিকার

(৪) এই মস্তক নিম্নের দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব্ব পার্শ্বের একটা ইন্দিকের অংশে একটা বুরুজের নিম্নে সমাহিত হয়। ঐ বুরুজ আবদুল্লা বুরুজ নামে প্রথিত। ইহারই অনতিদূরে শিবাজীর নির্ম্মিত ভবানী মন্দির অবস্থিত। (*Bom. Gaz.* XIX 546-547) সাবাসন প্রণীত মহাবলেশ্বর গ্রন্থে ১৪৩ ও ১৪৪ পৃষ্ঠায় ইহার চিত্র দ্রষ্টব্য।

(৫) আফজল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ; সভা, ১৯-২০ ইত্যাদি।

(৬) হুণ—পাঁচ টাকা দামের স্বর্ণমুদ্রা, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। ইংরাজেরা ইহাকে প্যাগোডা বলিতেন।

করিয়া ফেলিল। তাঁহার নিজ গ্রাম, বিজাপুর নগরের নিকটবর্ত্তী আফজলপুরায় এই কাহিনী প্রচারিত হইয়া গেল যে, এই মারাত্মক অভিযানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর পূর্ব্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং পাছে তাঁহার ৬০টী স্ত্রীর মধ্যে কেহ অপরের শয্যাভাগিনী হন, এই ভয়ে তিনি তাঁহাদের প্রত্যেককে নিহত ও সমাহিত করিয়া যান। কৃষকেরা এখনও একটী উচ্চ স্থান দেখাইয়া দিয়া বলে যে, সেখান হইতে আফজলের ঈর্ষার বলিস্বরূপ এই সকল হতভাগ্য রমণীকে নীচে গভীর জলাশয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। যে পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া তাঁহাদের জলমগ্ন দেহগুলি আকড়ের সাহায্যে টানিয়া তোলা হইয়াছিল এবং যেস্থানে তাঁহাদের গোর দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও কৃষকেরা দেখাইয়া দেয়। তথায় একই ভূমির উপর একই সময়ের একই আকারের ও গঠনের ৬০টী সমাধি শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান আছে, এবং তথায় ঐ ৬০টী মৃতদেহ বিশ্রামলাভার্থ স্থাপিত হইয়াছে। সে স্থানটী এখন সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য, পরিত্যক্ত। যেখানে এক সময়ে বহুজনপূর্ণ অট্টালিকা বিরাজ করিত, তথায় এখন পথিক দীর্ঘতৃণসমাচ্ছন্ন নির্জ্জন পরিত্যক্ত ভূমি, কণ্টকময় গুল্ম এবং অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ মাত্র দেখিতে পায়। এই দৃশ্যই তাহার নষ্ট গৌরবের পরিষ্কার চিহ্ন। এখানে জীবনের একমাত্র লক্ষণ দুই একটী নির্জ্জনতাপ্রিয় পক্ষী দেখা যায়; তাহারা মনুষ্য সমাগমে অনভ্যস্ত—মানুষের সাড়া পাইলেই চমকিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। অপরাপর কিংবদন্তী-সূত্রে শোনা যায় যে, শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযানের প্রারম্ভ হইতেই নানা কুলক্ষণ আফজলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

আফজল খাঁর বিনাশ সাধিত হইলে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে আনন্দোৎসব পড়িয়া গিয়াছিল। এই ঘটনা তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা-সূর্য্যের উদয়ের সূচনা করিয়াছিল। বিজাপুরের পরাজয় সম্পূর্ণ। সর্দ্দারের পতন এবং তাহার সেনা-বাহিনীর অস্তিত্ব লোপ হইয়াছিল। কি লোকক্ষয়ে, কি লুণ্ঠিত দ্রব্যজাতে—এই জয়লাভ যতদূর সম্ভব, সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এই ঘটনা মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের চিত্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল; তাহাদের জাতীয় ইতিহাসে এমন গৌরবাত্মক ঘটনা আর ঘটে নাই। ভ্রমণকারী গায়ক- (গোন্ধালী) গণ শীঘ্রই এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া গাথা (পোবাড়া) রচনা করিয়া ফেলিল। চারণগণের গীতে এই যুদ্ধ-ঘটনা বিস্তৃতি লাভ করিয়া হোমরের কাব্যের দ্বন্দ্বের আকার ধারণ করিল; ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে কৃত্রিম অলৌকিক ব্যাপার মিশ্রিত হইয়া গেল। শম্ভুজীর দরবারের সভাসদগণ হইতে আরম্ভ করিয়া শিবিরস্থিত সৈন্যগণ এবং কুটীরবাসী কৃষকগণ পর্য্যন্ত চারণকে ঘিরিয়া তাহার মুখে তাহাদের জাতীয় জীবনের এই প্রথম বিজয়গাথা শুনিবার জন্য ভীড় করিত। কবিও এমন নিপুণতার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণসহ এই গাথা এমন উজ্জ্বল ভাষায় বিবৃত করিয়াছিল যে, সমগ্র ঘটনার চিত্রটী যেন তাহাদের সম্মুখে ঘটিতেছে বলিয়া মনে হইত। সেনাগণের পদধ্বনি, প্রতিদ্বন্দ্বী সর্দ্দারগণের যুদ্ধযাত্রা, তাহাদের সাক্ষাতালাপ, তাহাদের পরস্পরের প্রতি গালিবর্ষণ, তাহাদের যুদ্ধ এবং অবশেষে মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণের বিজয়লাভ,—এ সমস্তই যেন গাথার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গায়িত পদগুলিতে প্রতিধ্বনিত হইত। কবির বর্ণনা যেমন যুদ্ধের এক ঘটনা হইতে দ্রুতগতিতে অপর ঘটনায় অগ্রসর হইত, শ্রোতৃমণ্ডলীও সেইরূপ রুদ্ধশ্বাসে অখণ্ড মনোযোগ সহকারে তাহার অনুসরণ করিত। তাহাদের ধমনীতে রক্তও যেন পদগুলির সঙ্গে সঙ্গে তালে-তালে পা ফেলিয়া প্রবাহিত হইত। তার পর যখন সেনাগণের কুচ বা যুদ্ধের বর্ণনা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিত, তখন তাহাদের উত্তেজনা চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিত।

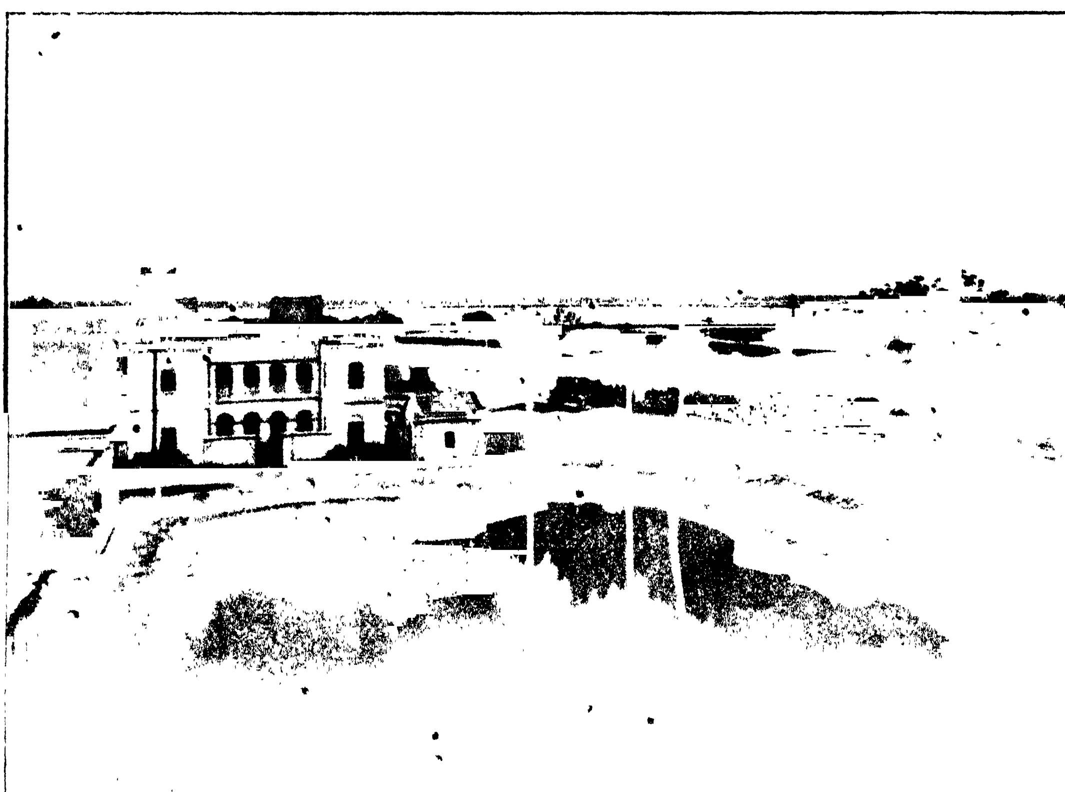
আফজলের সহিত যুদ্ধ ঘটনা মহারাষ্ট্রীয়গণের চক্ষে জাতীয় উদ্ধারকল্পে, এবং মন্দির অপবিত্রকারিগণের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান। তাহারা আফজলকে এই ভাবে দেখিত যে, তিনি একজন অতি সাহসী দুষ্ট লোক, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার সহিত অত্যাচার করিতে সদাই প্রস্তুত, এবং মানুষ বা ঈশ্বর কাহাকেও মানিতে চাহেন না। তাহাদের ঐতিহাসিকেরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই ঘটনায় খুনের কোন লক্ষণ দেখিতে পায় নাই। তাহারা বরাবরই ইহাকে গৌরবসূচক কার্য্য, বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতার নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। এই সকল গুণে তাহাদের জাতীয় বীর তাহার নিজ জীবনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতামূলক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন, এবং চক্রান্তকারীকেই সেই চক্রান্তের ফলভোগ করাইয়াছেন এবং তাহাদের দেবগণের ও তীর্থক্ষেত্রের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ

করিয়াছেন। শিবাজীর সভার রাজকবি ভূষণ আফজলের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে ভীম কর্তৃক লম্পট গুণ্ডা কীচকের বধের ন্যায় প্রতিশোধমূলক ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। আফজল খাঁর প্ররোচনায় কনকগিরির কিল্লাদার কর্তৃক শিবাজীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শম্ভুজীর বিশ্বাসঘাতকতামূলক হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধের জন্য শিবাজী কর্তৃক আফজলের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই মত পরবর্ত্তী যুগের একটী গাথায় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা ঐতিহাসিক সত্য নহে।

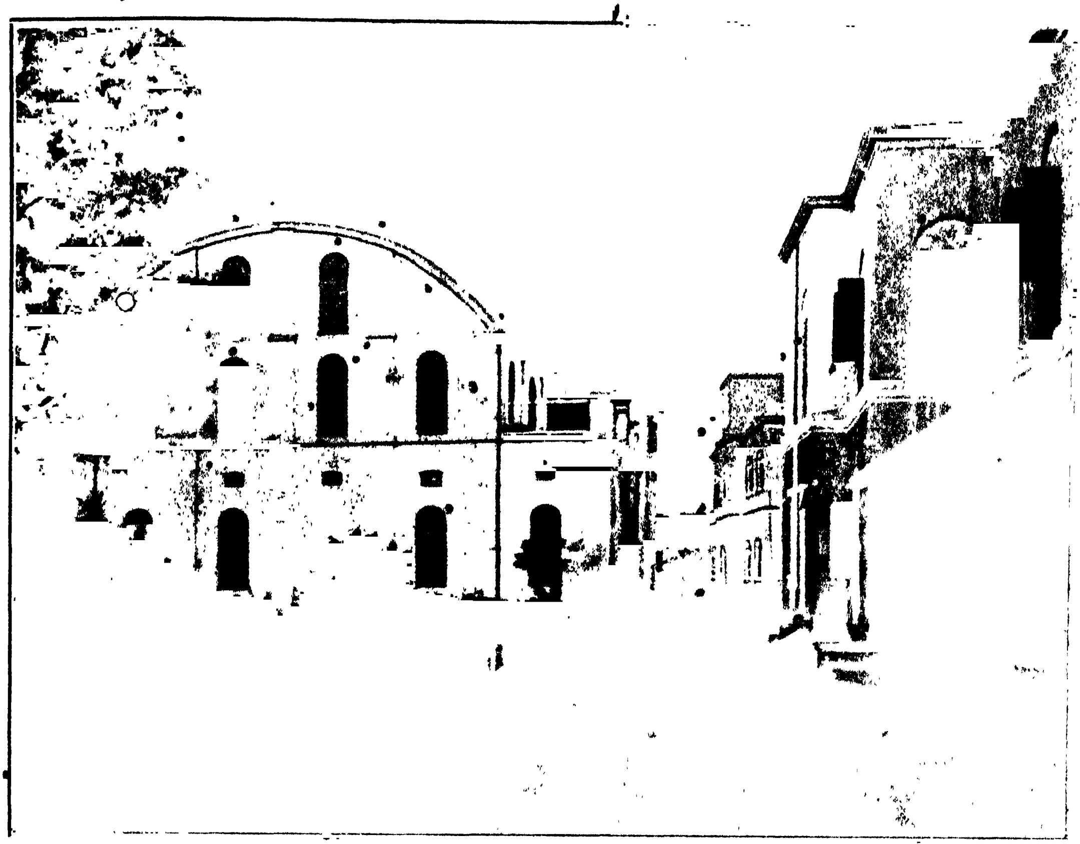
আফজল খাঁর উপর বিজয়-লাভের উল্লাসে (সেপ্টেম্বর ১৬৫৯) এবং তাহার সৈন্যদল ধ্বংস হওয়ার ফলে মহারাষ্ট্রীয়গণ দলে-দলে দক্ষিণ কঙ্কন এবং কোলাপুর জেলায় অবতীর্ণ হইতে লাগিল; তাহারা খাঁর একটী বিজাপুরের সেনাদলকে পরাজিত করিয়া পানহালার দুর্গ অধিকার করিল এবং অক্টোবর ১৬৫৯ হইতে ফেব্রুয়ারী ১৬৬০র মধ্যে বিজাপুরের রাজ্যের অন্তর্গত এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড অধিকার করিয়া বসিল।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস

[শ্রীজলধর সেন]



কারখানা-পরিচালকদিগের বসতবাটি,—পশ্চাতে বিস্তীর্ণ জলাভূমি



কারখানার একটি প্রশস্ত রাস্তা

বাঙ্গলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। এই কারখানার নাম বাঙ্গালাদেশের সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ নহে; উহা আজ আসমুদ্র হিমাচল সারা ভারতবর্ষে এবং কোন কোনও পাশ্চাত্য দেশেও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই কারখানায় প্রস্তুত 'যমানি জল', 'গুলঞ্চ', 'কালমেঘ', 'বাকস', 'অগুরু', প্রভৃতির কল্যাণে বাঙ্গলার বহু নিরক্ষর অন্তঃপুরিকাও বেঙ্গল কেমিক্যালের নামের সহিত সুপরিচিত হইয়াছেন। এক কথায় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ বাঙ্গালীর মূলধনে স্থাপিত, বাঙ্গালীর বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত এবং বাঙ্গালীর কর্ম্মোৎসাহে সঞ্জীবিত ঔষধ, এসিড ও যন্ত্রপাতির একমাত্র অদ্বিতীয় কারখানা। এত বড় এসিডের কারখানা বাঙ্গলাদেশের আর কোথাও নাই। এই কারখানার বিবরণী নব্য বাঙ্গলার অলিখিত শিল্পোন্নতি প্রচেষ্টা-ইতিহাসের এক গৌরবময় পৃষ্ঠা।

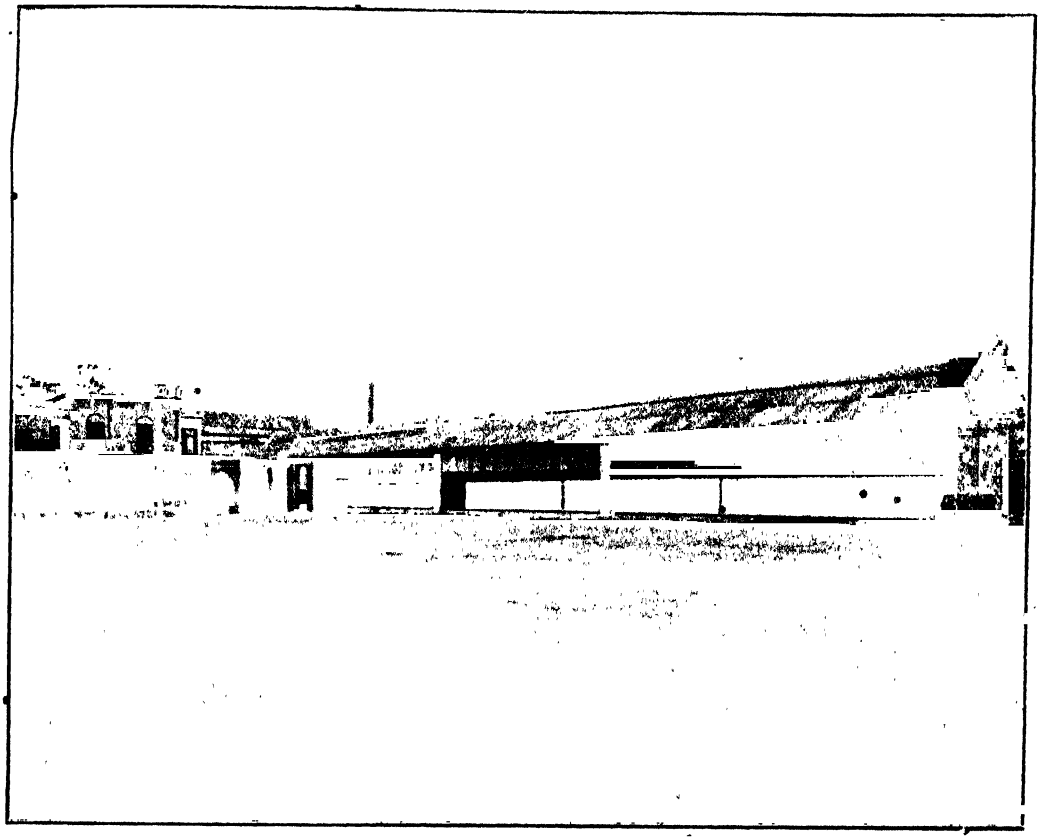
কলিকাতা সহরের উপকণ্ঠে মাণিকতলা মেন রোডের প্রান্তে ৮০ বিঘা ভূমির উপর এই কারখানা প্রতিষ্ঠিত। মারহাট্টা ডিচ্ বা খাল পার হইয়া ধূলিধূসর সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে যতই কারখানার নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, লোকের বসতি ততই কমিতে থাকে, সহরের কোলাহল ক্ষীণ হইয়া আসে, নগ্ন প্রকৃতির মূর্ত্তি কতকটা চোখে পড়ে। এই সকলের মধ্যে অত্যন্ত কদর্য্যরূপে চোখে পড়ে



কারখানার প্রধান প্রবেশ-পথ

পথের দু'ধারের অনাবৃত, পঙ্কিল, দুর্গন্ধ পয়ঃপ্রণালী। অবশেষে কয়েকটা অযত্ন-রক্ষিত বাগানবাড়ী অতিক্রম করিয়া সহসা যখন কারখানার সম্মুখে আসিয়া পড়ি, তখন বিস্ময় এবং আনন্দের আর অন্ত থাকে না। শুধু কি বিস্ময়! শুধু কি আনন্দ! অতুলনীয় গর্ব্বে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। এই অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান যাহাদের চেষ্টা, যত্ন ও অভাবনীয় আত্মত্যাগের মহিমায় আজ উদ্ভাসিত, তাহারা আমাদেরই দেশের লোক—আমাদেরই আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব—আমাদেরই ভাই। এ গর্ব্বে আমরা উৎফুল্ল হইব না কেন? এই অবজ্ঞাত, জঞ্জালপূর্ণ ধাপার মাঠে যাহারা এই নন্দন-কানন সাজাইয়াছেন, শিল্পের এই দেবায়তন গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের শুধু ধন্যবাদ করিতে ইচ্ছা হয় না,—তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিতে ইচ্ছা হয়,—তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা হয়। এ যে আমাদেরই জিনিস!

বহুদিন আগে, ১৯০৫ অব্দে এই স্থান দেখিয়াছিলাম,—তখন সবে কারখানার পত্তন সুরু হইয়াছে। চারিদিকে অপরিচ্ছন্ন, বিস্তীর্ণ জলাভূমি,—নিরানন্দ, নির্জ্জন। দু-চারখানা ঘর উঠিয়াছে, কলকব্জা কিছু কিছু বসিতেছে। চৌদ্দ বৎসর পরে আজ আবার কারখানা দেখিতেছি। মনে হইতেছে, কোন্ শক্তিমান্ যাদুকরের ইন্দ্রজালে নির্জ্জন জলাভূমি জনপূর্ণ, পরিচ্ছন্ন কর্ম্ম-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে! আজ



যন্ত্র-গৃহ ও সম্মুখস্থ ক্রীড়াভূমি

এখানে দিকে-দিকে প্রাণের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট। নানা বিভাগে সহস্রাধিক কর্ম্মী শৃঙ্খলার সহিত স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অক্ষমতার কলঙ্ক মুছিয়া দিতেছে।

অপার সার্কুলার রোডে, নব-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজের পার্শ্বে, এখন যেখানে কারখানার হেড আপিস অবস্থিত, পূর্ব্বে সেইখানেই আপিস এবং কারখানা সমস্তই ছিল। তাহা দেখিয়াই সে সময়ে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলাম। কিন্তু ভীরু, উদ্যমবিহীন বাঙ্গালী আমি—তখন কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, তাহার এই পরিণতি হইবে;—বাঙ্গালীর এই প্রতিষ্ঠান এমন ভাবে গড়িয়া উঠিবে। সেই সময়ের একদিনের কথা মনে পড়ে। শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদিগকে সকল যন্ত্র দেখাইতে দেখাইতে বলিয়াছিলেন—"ভাই, কত জনের কত নেশা থাকে; কেউ গাঁজা খায়, কেউ মদ খায়, আমার এই মাত্র এক নেশা!" সেই নেশাখোর আজও বাঁচিয়া আছেন;—আর সেই নেশার কল্যাণে আজ দেখিতেছি—এই প্রতিষ্ঠান! এই রকম নেশাখোরেরাই জগতে কাজ করে!

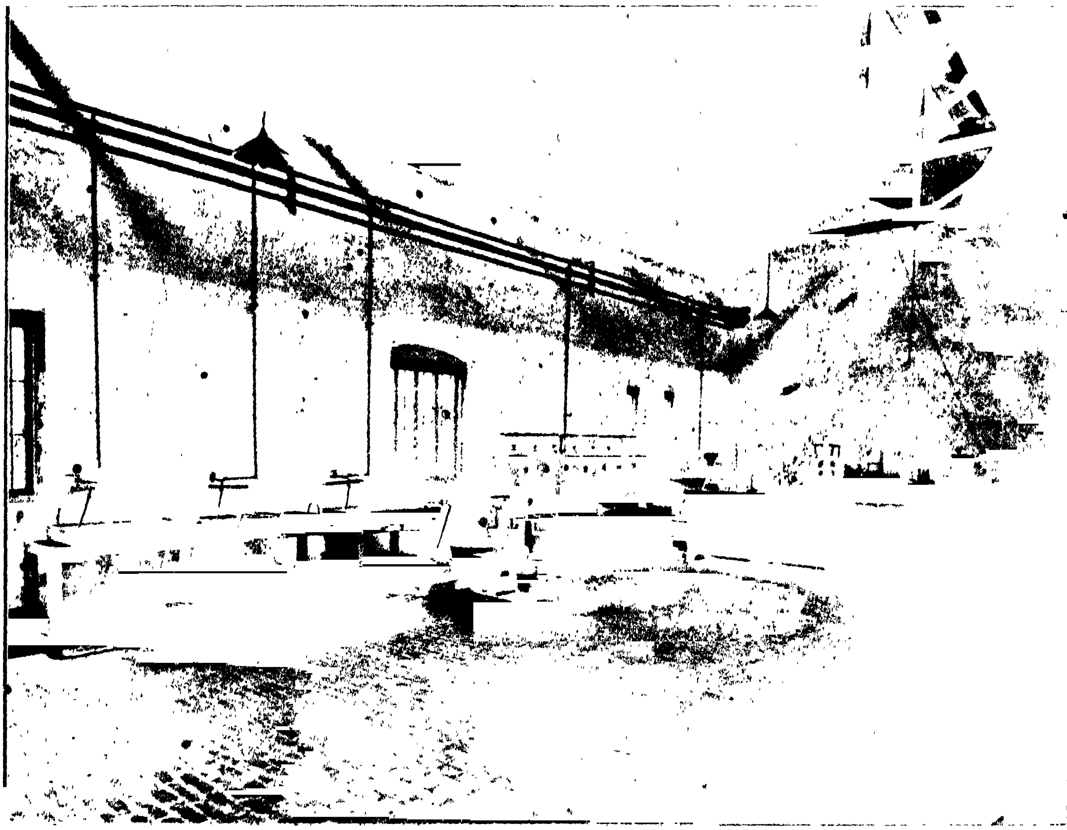
এখন এই প্রতিষ্ঠানের কথা একটু বলি। ১৯০১ অব্দে কারখানাটি লিমিটেড্ কোম্পানি বা যৌথ কারবার রূপে



একটি ঔষধ-প্রস্তুতাগার

রেজেষ্টারি করা হয়। তখন হইতে কারখানার কাজ বাড়িতে থাকে। তার পর এসিডের কাজ আরম্ভ হইলে, কারখানার বিশেষ উন্নতি আরম্ভ হয়। য়ুরোপের মহাযুদ্ধে অনেক ব্যবসায় যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তেমনি কোন-কোনও ব্যবসায় প্রচুর পরিমাণে লাভবানও হইয়াছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। যুদ্ধে ব্যবহার্য্য মাল সরবরাহের অভাব পাইয়া, কারখানার কর্ম্মের পরিমাণ সহসা বহু গুণ বাড়িয়া যায়। ১০,০০০ মণ পরিষ্কৃত সোরা, ১৮,০০০ অগ্নিনির্ব্বাপক যন্ত্র Fire King, ১,২০,০০০৲ টাকার Bandage, Gauze, Cotton ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত সরবরাহ করা অল্প কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। আজকাল কারখানা ও আপিসে মোট কর্ম্মীর সংখ্যা ১,০০০র উপর। কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় দু'শ; তার মধ্যে প্রায় ২৫ জন উচ্চ-শিক্ষিত। কোম্পানির রেজেষ্টারি করা মূলধন ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে ৭,০০,০০০ সাত লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে।

কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদিকে মোটামুটি তিনটি বিভাগে ফেলা যায়। (১) রাসায়নিক; (২) ঔষধ; (৩) যন্ত্র। রাসায়নিক বিভাগে প্রস্তুত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রধান পদার্থ হইতেছে, সাল্‌ফিউরিক্ এসিড। ইহার প্রধান উপাদান গন্ধক এককালে ২০,০০০৲ টাকা হইতে ৪০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের আমদানী করা হয়। প্রত্যহ ৫ টন বা প্রায় ১৩৫



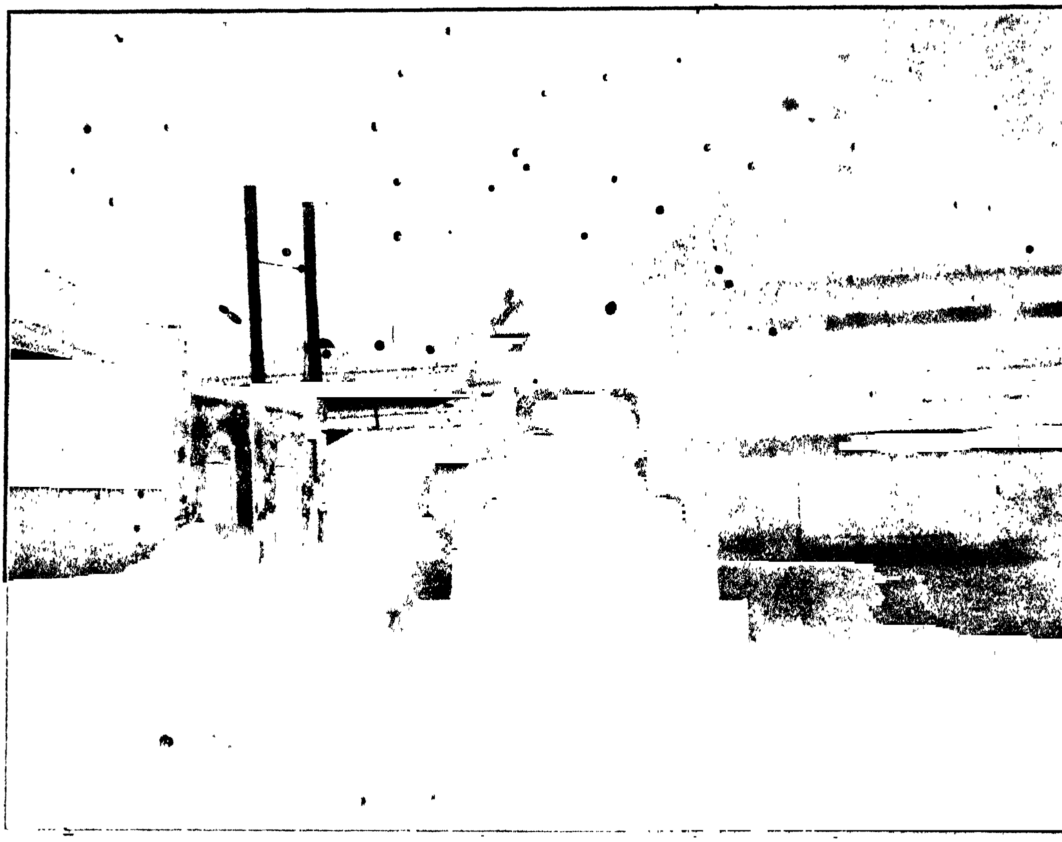
ঔষধ প্রস্তুতাগারের অভ্যন্তর

মন এসিড্ প্রস্তুত হয়। তার মধ্যে ৩ টন বা প্রায় ৮১ মণ কারখানা নিজের কাজে খরচ করে; অবশিষ্ট ২ টন বা প্রায় ৫৪ মন বাজারে বিক্রী হয়। ইহা ব্যতীত, এই বিভাগে Ammonia, Mag. Sulph., Soda sulph., Ferr. Sulph., Potass. Nitrate, Potass. Carbonate, Soda Hyposulph., Soda Sulphite, Thymol প্রভৃতিও প্রস্তুত হয়।

ঔষধ-বিভাগে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র-অনুমোদিত সকল রকম টিংচার, একষ্ট্রাক্ট প্রভৃতি, এবং দেশীয় গাছ-গাছড়া হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাপ্রকার ফলপ্রদ ঔষধও প্রস্তুত হয়। সে সকল ঔষধের সহিত বাঙ্গালাদেশের জনসাধারণ অল্পবিস্তর পরিচিত। Surgical Dressings বা অস্ত্র করার পর প্রয়োজনীয় তুলা, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতিও এই বিভাগে প্রস্তুত হয়।

কারখানায় প্রস্তুত ঔষধাদির গুণপরীক্ষা এবং নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ৬ জন রাসায়নিক নিয়ত ব্যস্ত রহিয়াছেন।

যন্ত্র বিভাগে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হয়। কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক কলেজে এই কারখানায় নির্ম্মিত যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়। তা-

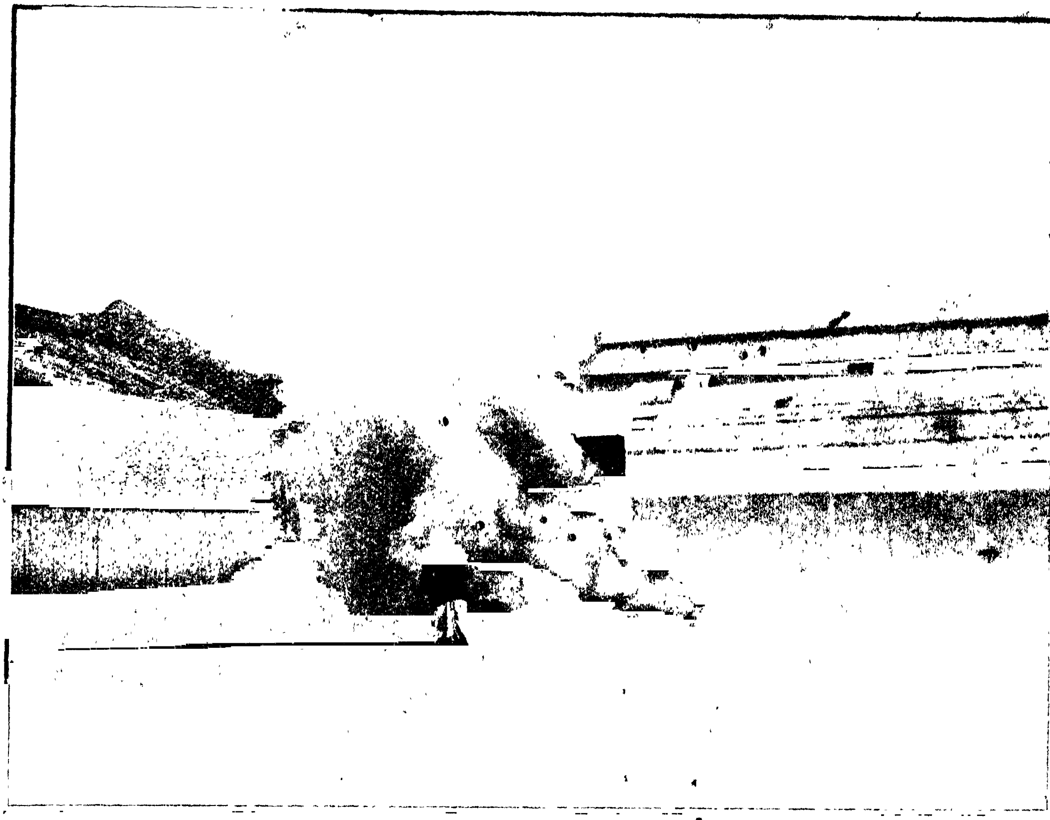


'ফায়ার-কিং' দ্বারা অগ্নি-নির্বাপণ, অগ্নি প্রজ্বালিত হইয়াছে

ছাড়া, ইঁহারা অনেক কলেজে জল ও গ্যাস সরবরাহের সরঞ্জাম, টেবিল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোগে আধুনিক Laboratory বা বিজ্ঞানাগার সাজাইয়া দিয়া থাকেন। এখানকার কারিগরদিগের কর্ম্মকুশলতা সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহারা জার্ম্মাণিতে প্রস্তুত অতি সূক্ষ্ম, জটিল Sartorius Chemical Balance এর এমন একটি নকল প্রস্তুত করেন যে, উহা আসল যন্ত্রটিকেও পরাস্ত করিয়াছিল। কারখানার উদ্ভাবিত কয়েকটি যন্ত্র সাধারণের যথেষ্ট সমাদর ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যেমন, Fire King বা আগুন নিবাইবার যন্ত্র, পাখা, Oxycrit বা অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত করিবার যন্ত্র ইত্যাদি। শেষোক্ত যন্ত্রটি নিউমোনিয়া রোগীর চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অদূর ভবিষ্যতে এখানে Caffeine, Dextrine, Phosphoric Acid, Phosphates, Alum, Aluminium Sulphate এবং আরো কতকগুলি chemicals প্রস্তুতের জন্য প্রচুর আয়োজন চলিতেছে।

এই কারখানায় পরিষ্কৃত Nitre বা সোরা বিলাতে চালান গিয়াছে। তাহার বিশুদ্ধতার পরিমাণ শতকরা ৯৯৬। এস্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বেঙ্গল কেমিক্যালের Nitre Refinery ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বৃহত্তম।



'ফায়ার কিং' দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপণ,—ফায়ার কিং ব্যবহারের প্রারম্ভে

আধুনিক কারখানা যেমন হওয়া উচিত, এই কারখানাও তেমনি নিত্য-প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যের জন্য আত্মনির্ভরশীল, ইংরাজিতে যাকে বলে Self-dependent।

কারখানার মাল পাঠাইবার জন্য নানা আকারের প্যাকিং বাক্সের প্রয়োজন হয়। সে সব বাক্স কারখানাতেই প্রস্তুত হয়। প্রয়োজনমত, তক্তা মোটা, [illegible], ছোট বা বড় করিয়া চিরিবার জন্য করাত-কল চলিতেছে। কারখানার চিঠির কাগজ, খাম, চালান-পত্র, মূল্য-তালিকা, ক্যাটালগ, ঔষধের লেবেল প্রভৃতি বিবিধ ছাপার কাজ কারখানার নিজস্ব ছাপাখানায় হইতেছে। ছাপাখানারই এক বিভাগে কার্ডবোর্ডের বাক্স প্রস্তুত হইতেছে। সমস্ত কারখানা আলোকিত করিবার এবং মোটর চালাইবার জন্য যে পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন, তাহা কারখানাতেই প্রস্তুত হইতেছে। কারখানার এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে সহজে এবং অবিলম্বে ঠেলা গাড়ীতে মাল পাঠাইবার জন্য, কারখানার মধ্য দিয়া এক মাইলের উপর সরু রেল লাইন পাতা আছে। কারখানা ও হেড আপিসে কার্য্য-প্রসঙ্গে অনবরত কথাবার্ত্তা চলে; সে জন্য উভয় স্থানের মধ্যে private telephone এর ব্যবস্থা আছে।

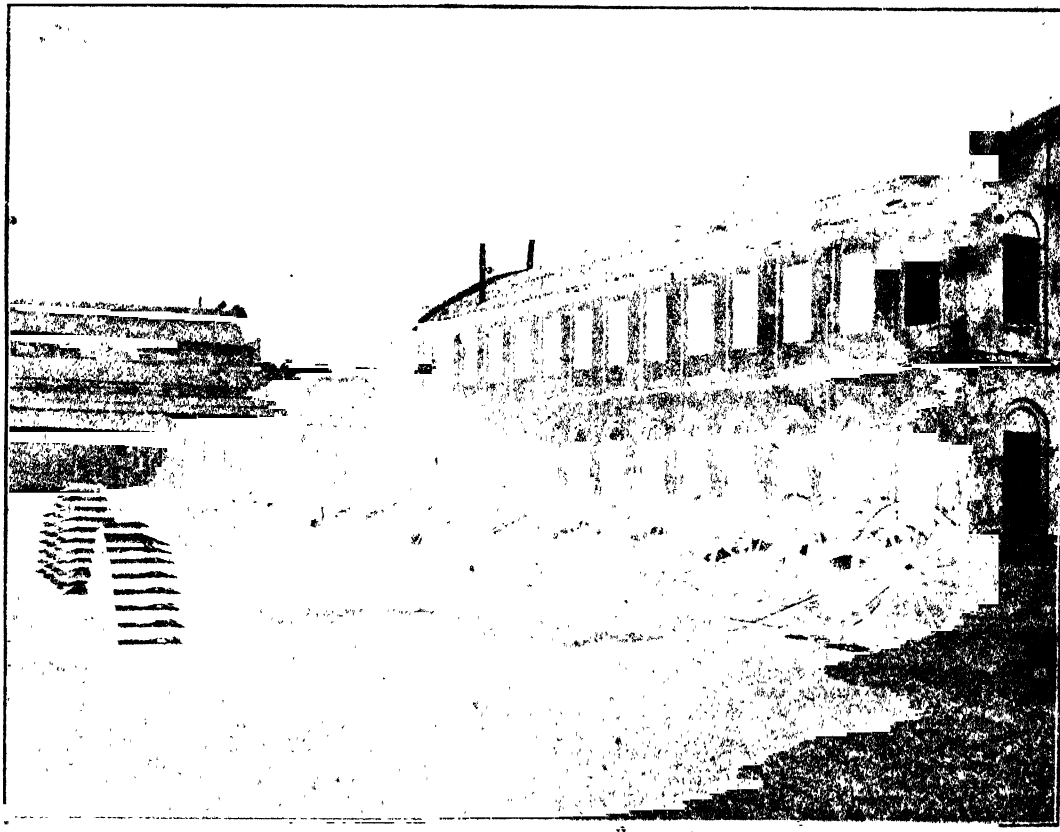
কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ যদি কেবলমাত্র কর্ম্মচারীদের



ফায়ার-কিং দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপণ,—ফায়ার কিং ব্যবহারের ৪০ সেকেণ্ড পরে সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত

নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইয়া, মাসান্তে নির্দ্ধারিত বেতন দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হইতে পারিত না। কারখানার প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা ও অনুরাগ না থাকিলে কোন কাজই সুসম্পাদিত হইতে পারে না। কর্ম্মচারীদের অন্তরে এই অনুরাগ জন্মাইতে হইলে, কারখানাটিকেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, খেলাধূলা, আমোদ-আহ্লাদ,—এক কথায় সর্ব্ববিধ সামাজিক এবং মানসিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র করিয়া তোলা আবশ্যক। সুখের বিষয়, কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে অনবহিত নহেন। প্রথমতঃ, বহু কর্ম্মচারী কারখানাতেই বসবাস করেন, —তাহাদের থাকিবার সুব্যবস্থা আছে। তার পর কারখানার যাবতীয় কর্ম্মচারীর যাহাতে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে, সেদিকে কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ক্লাব' তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই ক্লাবের দুইটি বিভাগ আছে; খেলার বিভাগ, এবং পাঠের বিভাগ। খেলার মধ্যে ফুটবল, টেনিস, ড্রিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাঠের বিভাগে পুস্তকাগার ও পরিচ্ছন্ন, সুন্দর পাঠাগার আছে। এই পাঠাগারে ভারতবর্ষের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র—দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক—রক্ষিত হয়। মাসে অন্ততঃ দুইবার করিয়া ক্লাবের সাধারণ

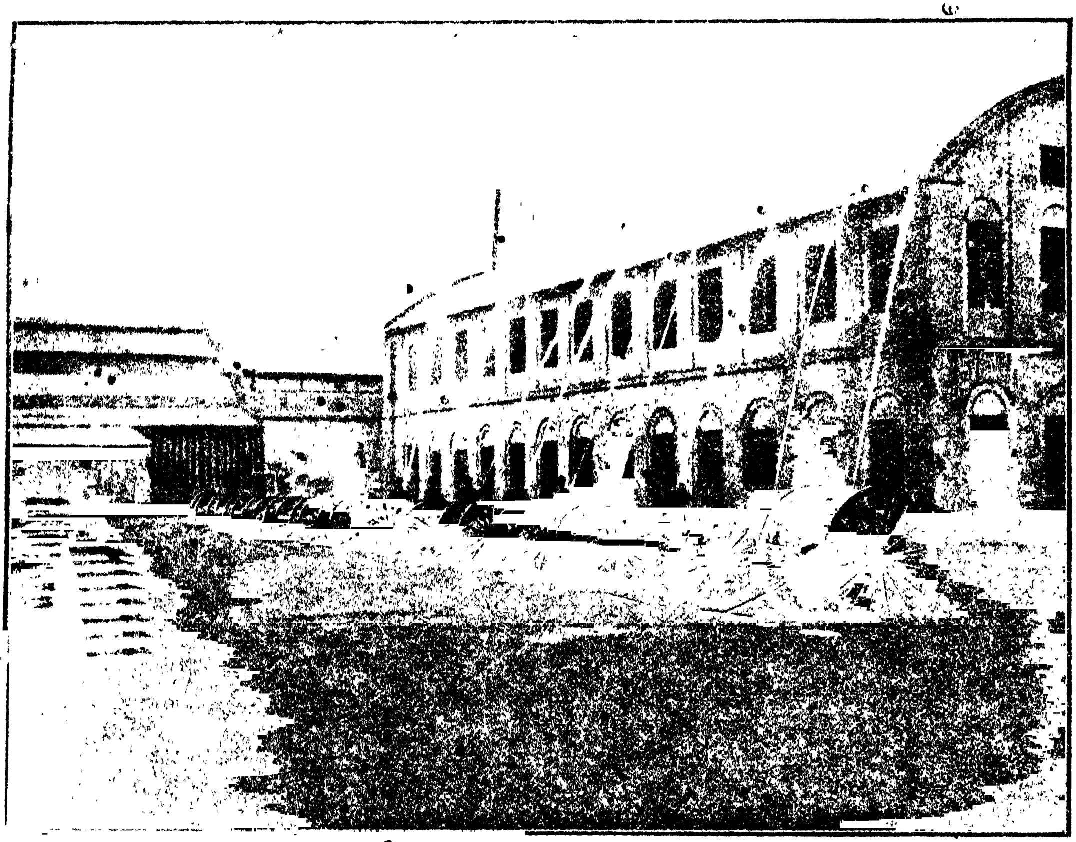


এক সেট বড় 'ফায়ার কিং' চাকার উপর বসানো (মেসোপটেমিয়ায় প্রেরিত)

অধিবেশন হয়। এই সব অধিবেশন পরস্পর একত্র কিছুক্ষণ মেলামেশা, কোনো বিষয়ের আলোচনা, পাঠ বা বক্তৃতা, এবং জলযোগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক অধিবেশনেই জলযোগের ব্যবস্থা থাকে,—এবং থাকাই উচিত; কারণ, একত্র আহার সামাজিকতার এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতি বর্দ্ধনের একটা প্রধান অঙ্গ।

কেবল কর্ম্মচারীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করিয়াই কারখানার কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত হন নাই;—এখানে যাহারা দিন-মজুরি করে, সেই সকল মজুরের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও তাঁহারা দৃষ্টি রাখিয়াছেন। কারখানা-সংলগ্ন নূতন খালের পরপারে খানিকটা জমি ইজারা লইয়া, তাহারা মজুরদের থাকিবার জন্য সুশৃঙ্খল, পরিপাটী কুটীরশ্রেণী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এখানে বাসস্থান পাওয়াতে মজুরদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। অস্বাস্থ্যকর, আবর্জ্জনাময় স্থানে তাহাদের বাস করিতে হয় না এবং দূর পথ অতিক্রম করিয়া প্রত্যহ কারখানায় যাওয়া আসা করিতে হয় না।

আধুনিক কালে একটা বড় কারখানা পরিচালনের জন্য যে যে বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, সেই সব বিষয়ে যাহাতে কর্ম্মচারীদের একটা মোটামুটি জ্ঞান জন্মে, এই উদ্দেশ্যে কারখানার কর্তৃপক্ষ একটা ট্রেনিং ক্লাশ স্থাপন করিয়াছেন। সপ্তাহে দুই দিন এই ক্লাশ বসে। যিনি যে বিষয় অজ্ঞ



বড় 'ফায়ার কি' হইতে অগ্নি নির্ব্বাপক ধারা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে

শীলন করিয়াছেন, তিনি সেই বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। আজ যিনি বক্তৃতা দিলেন, কাল তিনিই ছাত্র-রূপে অন্যের বক্তৃতা শোনেন। এই প্রকারে পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান-বিনিময়ে সকলেই যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হ'ন। ক্লাশে আলোচিত বিষয়গুলির উল্লেখ করি—(১) হিসাব; (২) মহাজনী, আমদানী, রপ্তানী; (৩) আপিস পরিচালনা; (৪) অঙ্কন; (৫) পূর্ত্তকার্য্য; (৬) যন্ত্রবিদ্যা; (৭) সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান। ইহা হইতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হইবে।

যাঁহারা অল্প উপার্জ্জন করেন, ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা টাকা জমাইতে পারেন না। মাসান্তে গৃহে বেতন লইয়া গেলে, তাহা হইতে কিছু বাঁচানো দায়। ভুক্তভোগী সকলেই এ কথা জানেন। অথচ, অর্থ-সংস্থান প্রত্যেক গৃহস্থেরই একটী অত্যাবশ্যক ব্যাপার। বিপদ-আপদের দিনে এত বড় সহায় আর নাই। এখানে যে সব কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, প্রত্যেকেরই যাহাতে কিছু-কিছু অর্থ-সংস্থান হয়, এই উদ্দেশ্যে কারখানার কর্তৃপক্ষ একটা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি মাসে ১৫৲ টাকার অধিক বেতনভোগী প্রত্যেক কর্ম্মচারীর বেতন হইতে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে কাটিয়া লইয়া, তাঁহাদের নামে জমা রাখা হয়। প্রতি বৎসর বেঙ্গল কেমিক্যাল যে লাভ করেন, তাহার একটা অংশ (শতকরা ২৷৷৹ হিসাবে) সকল কর্ম্মচারীদের মধ্যে,

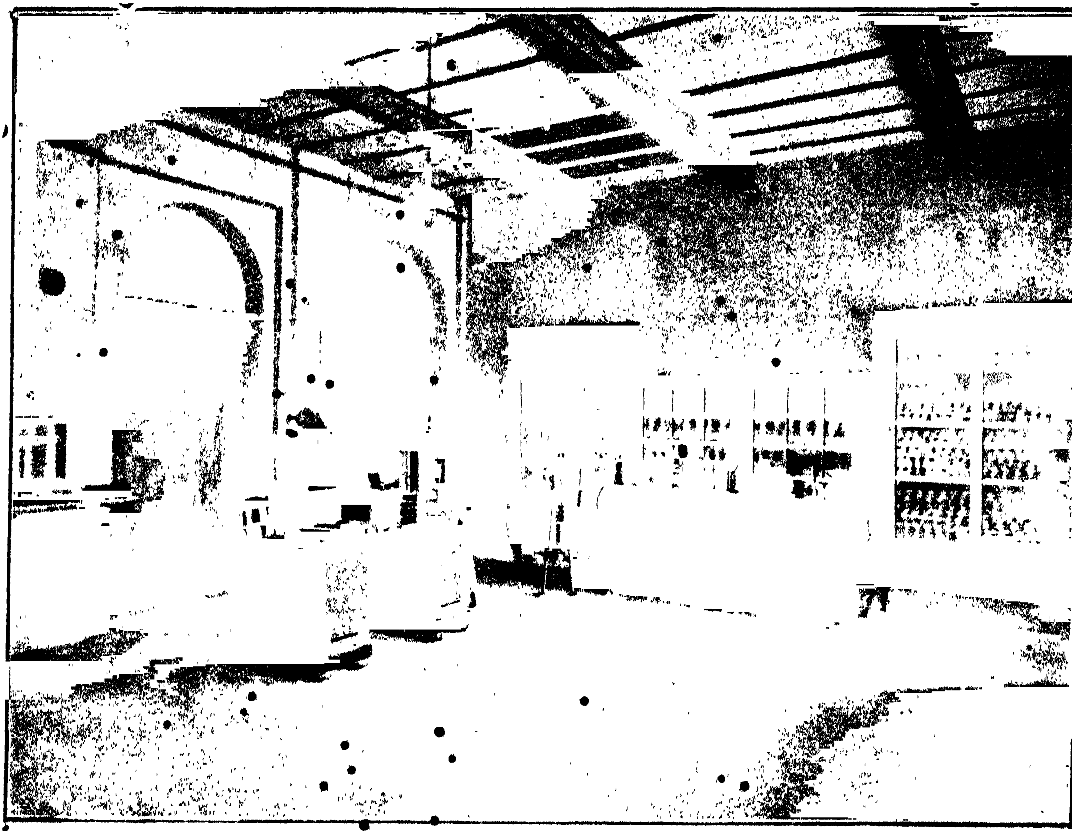


যন্ত্রাগারের অভ্যন্তর-ভাগ

তাঁদের গচ্ছিত টাকার পরিমাণ অনুসারে, ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কোম্পানীর কর্ম্ম হইতে বিদায় বা অবসর গ্রহণ করিবার সময়ে আপনি সুদ সমেত আপনার গচ্ছিত অর্থ তো পাইবেনই, অধিকন্তু পাইবেন উপরিউক্ত কোম্পানী প্রদত্ত লভ্যাংশ। দেখা গিয়াছে, এই লভ্যাংশের পরিমাণ আসলের প্রায় কাছাকাছি দাঁড়ায়।

'কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি' এই কারখানার আর একটী উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ইহা একটী 'যৌথ-কারবার,—বেঙ্গল কেমিকালের যে কোন কর্ম্মী এই কারবারের অংশ খরিদ করিতে পারেন। প্রত্যেক অংশের দর ১০৲ টাকা। প্রয়োজন হইলে যে-কোন অংশী এক-কালীন তাঁর অংশের মূল্যের দশগুণ পরিমাণ পর্য্যন্ত টাকা বার্ষিক শতকরা ১২॥০ সুদে কর্জ্জ করিতে পারেন।

অতি সংক্ষেপে, একটা বৃহৎ ব্যাপার বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু আসল কথা এখনও বলা হয় নাই। শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাঙ্গলা দেশে যে হয় নাই, তা নয়। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে,—তা সে যে কারণেই হোক। বেঙ্গল কেমিকালের সাফল্যের মূলে আছে অর্থ, জ্ঞান, বুদ্ধি; কিন্তু সব চেয়ে বড় জিনিস যা আছে, তা হইতেছে কারখানা পরিচালকদের জ্বলন্ত উৎসাহ। তাঁহারা নিরুৎসাহ হইবার পাত্র নহেন। পরাজয় তাঁহারা মানেন না। পদে-পদে বাধা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা



রাসায়নিক পরীক্ষাগার

জয়যুক্ত হইবেনই। কবির কথায় বলিতে গেলে, তাঁদের "চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে!" এই অদম্য উৎসাহই জগতের সকল সিদ্ধির মন্ত্র।

এই কারখানার একটা অতি সামান্য বর্ণনা দিলাম, কারণ ইহার অধিক কিছু বলিবার বিদ্যা আমার নাই। কোন্ কারখানায় কি হইতেছে, কেমন করিয়া কোন্ কল চলিতেছে, কিসে কিসে মিলিয়া কোন্ ঔষধ, কোন্ আরক কেমন করিয়া প্রস্তুত হইতেছে, তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তি ও সামর্থ্য আমার নাই। আমি শুধু একই এক ঘরে গিয়াছি, আর হাঁ করিয়া দেখিয়াছি; এবং বাহির হইবার সময় বলিয়াছি—"বাঃ, বেশ!" যাঁহাদের চক্ষু আছে, যাঁহারা দেখিতে জানেন, তাঁহারা একবার—ঐ ত এইখানেই—ঐ মাণিকতলা মেন রোড দিয়া মাইল দুই যাইয়া, বাঙ্গালীর এই মহান্ কীর্ত্তি দেখিয়া আসুন;—দেখিয়া আসুন, তাঁহাদের দেশের লোকে—তাঁহাদের ভাইয়েরা কি সুন্দর দেবায়তন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন!

আমরা যে দিন এই কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম, সে দিন শনিবার। এই কারখানার অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ও তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়দ্বয় এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে পরম উৎসাহে সমস্ত দেখাইয়াছিলেন; আমাদের সঙ্গী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রসিদ্ধ চিত্রকর



প্রদর্শনী গৃহ ও পুস্তকাগার

হইলেও, এ সকলেরও খুব খোঁজ রাখেন ; তিনিও অনেক কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুঝিব কি ? আমার তখন সেই অবস্থা, যে অবস্থায় কবি বলিয়াছেন "Gaze, and wonder and adore."

সে দিন সন্ধ্যার সময় কর্ম্মচারীদিগের আনন্দ সম্মিলন ছিল। তাহা না দেখিয়া কি ফেরা যায় ? সোদর-প্রতিম ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসুকে সঙ্গে লইয়া আনন্দ সম্মিলন দেখিতে গেলাম। কারখানার কর্ম্মচারিবৃন্দ কবিতা ও আমোদজনক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন ; কয়েকটী সুন্দর গান করিলেন। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুশীলবাবু স্যার রবীন্দ্রনাথের একটী কবিতার সুন্দর ব্যাখ্যা করিলেন। তাহার পর জলযোগ—ইংরাজীতে যাহাকে বলে light refreshment ; কিন্তু জলযোগ অপেক্ষাও মিষ্ট লাগিল এই আনন্দ-সম্মিলন। সেই আনন্দের স্মৃতি লইয়া ঘরে ফিরিয়াছিলাম। তাহারই ফলে অক্ষমের, অব্যবসায়ীর এই ক্ষুদ্র চেষ্টা !

সংগ্রহ

[শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী]

নকল চোখ

খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে মিশরে যখন মাম্মীর চলন ছিল, সে সময় তাহারা মৃত দেহের মুখের উপর একটা মুখোস পরাইয়া রাখিত। এখনও য়ুরোপের অনেক যাদুঘরে এই প্রকার মুখোসের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মুখোসে সুন্দর সুন্দর কাচের চক্ষু বসান থাকিত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে জীবিত মনুষ্যের নষ্ট চক্ষুর গহ্বরে নকল চক্ষু বসাইয়া দিবার কোন প্রকার প্রথা ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে ইতালী, গ্রীস, এবং বিশেষ করিয়া ফরাসী দেশে এই রকম নকল চক্ষু তৈয়ারী করিবার চেষ্টা হয়। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া সেখানকার চিকিৎসকগণ ইহাতে কতকটা পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গত যুদ্ধের সময় হইতে এবং যুদ্ধের পরে এখনও ইহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। মানুষের একটা চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলে, তাহার মুখের চেহারা একেবারে বদলাইয়া যায়; শুধু যে বদলাইয়া যায় তাহা নহে, সে দেখিতে অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া যায়। এতদিন পর্য্যন্ত এই সকল নকল চক্ষু পরাইয়া তাহাদের শ্রীহীনতাকে কতক পরিমাণে মানাইয়া লওয়া হইতেছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে যে, কামানের গোলা লাগিয়া কাহারো-কাহারো চক্ষু পাতা সমেত উড়িয়া গিয়াছে,—কাচের চক্ষু পরাইবার জন্য সেখানে যতটুকু স্থানের প্রয়োজন, সেটুকু পর্য্যন্ত নাই। Henri Einus নামে একজন ফরাসী চিকিৎসক এই সকল হতভাগ্যদের নষ্ট শ্রী কতক পরিমাণে পূরণ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি প্যারাফিনের এক প্রকার নূতন চক্ষুর আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চক্ষু চুলের মতন সরু তার দিয়া চশমায় আটকানো থাকে; চশমাটি পরিলে একেবারেই বুঝিতে পারা যায় না যে, নকল চক্ষু পরা হইয়াছে। বাহির হইতে ধূলা কিংবা অন্য কোন পদার্থ যাহাতে উড়িয়া চক্ষের ভিতরে পড়িতে না পারে, তাহারও বিশেষ বন্দোবস্ত করা আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দূরবীণ

আকাশের চির-রহস্যময় উজ্জ্বল গ্রহগুলির ভিতর কি আছে, সেগুলির গতিবিধি কি প্রকার,—এই সকল বিষয় সম্পূর্ণ রূপে জানিবার জন্য পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতেরা বহু যুগ ধরিয়া প্রাণপণ করিয়া চেষ্টা করিতেছেন। দূরের জিনিসকে নিকটে ও আকারে বৃহৎ করিয়া দেখিবার জন্য দূরবীক্ষণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু লক্ষ-যোজন দূরে যে সকল জ্যোতিষ্ক চিরকাল আমাদের পৃথিবীর দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত অনেক শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যেও যাহাদের দূরত্ব ও গতি নিরূপণ করিতে পারা যায় নাই, হয় ত বা উইলসন মানমন্দিরের এই নূতন দূরবীক্ষণের সাহায্যে তাহাদের গতিবিধি মানুষের গোচরে আসিতে পারিবে। আমরা খালি চোখে, কোন প্রকার যন্ত্রের সাহায্য না লইয়া, পাঁচ হাজারের অধিক তারকা দেখিতে পাই না। আবার এই পাঁচ হাজার গ্রহের চলন ফিরন, ধরণ-ধারণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে আমাদিগকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের শরণাপন্ন হইতে হয়। দূরবীক্ষণ যত শক্তিমান হইবে, এই সকল পরীক্ষাও তত বেশী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে। এইজন্য গত শতাব্দীর শেষ হইতে দূরবীক্ষণের শক্তি বাড়াইবার চেষ্টা আরম্ভ হয়।

আমেরিকার Carnegie Instituteএর পণ্ডিতেরা প্রথমে তাঁহাদের পরিচালিত Mount Wilson মানমন্দিরে একটী ৬০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীক্ষণ বসাইয়া জগতকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে ২১৯,০০০,০০০টী তারার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। ইহার কিছু দিন পরে কানাডার Dominion মানমন্দির ৭২ ইঞ্চি ব্যাসের একটা দূরবীক্ষণ বসাইলেন। সেদিন পর্য্যন্ত এই যন্ত্রটীরই, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র বলিয়া খ্যাতি ছিল। কিন্তু Mount Wilson মানমন্দিরের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটী বৃহৎ দূরবীক্ষণ তৈয়ার করাইয়াছেন। ইহার অপেক্ষা বৃহত্তর দূরবীক্ষণ পৃথিবীর আর কোনও মানমন্দিরে নাই; এই যন্ত্রে যে লেন্সটির ভিতর দিয়া দূরের জিনিস দেখিতে হইবে, তাহার ব্যাস ১০১ ইঞ্চি এবং কাচটীর ওজন সাড়ে চার টন মাত্র। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এই কাচটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য ফরাসীদের অর্ডার দেওয়া হয়। ছাঁচ প্রস্তুত, ঢালাই ইত্যাদি করিতে তাহাদের প্রায় তিন বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সেটী নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা কালিফোর্নিয়ায় পাঠাইয়া দেয়; কিন্তু সেখানে পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইল যে, সেটাতে বিস্তর গলদ রহিয়াছে। তাহারা আবার সেটাকে ফ্রান্সে পাঠাইয়া দেয়। তার পর অনেকবার নষ্ট হইয়া যাইবার পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কাচখানি নির্দ্দোষ রূপে তৈয়ারী হয়। কালিফোনিয়াতে আসিবার পর এইটীকে পালিশ করিয়া ও ঘসিয়া মাপসই করিতে আরও তিন বৎসর সময় লাগে। সম্প্রতি এই যন্ত্রটীকে সমুদ্র হইতে ছয় হাজার ফিট উচ্চ একটী পাহাড়ের চূড়ায় বসান হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা আশা করিতেছেন, ইহার দ্বারা ত্রিশ কোটি গ্রহের গতিবিধি জানিতে পারা যাইবে।

সৈনিকের ভাতা

যুদ্ধে যে সকল সৈনিক আহত হইয়াছে, তাহাদের মাসিক ভাতা সম্বন্ধে কি করা হইবে, তাহা লইয়া স্বাধীন দেশসমূহে এখন আলোচনা চলিতেছে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, আহত ব্যক্তি মাত্রেই মাসে কিছু করিয়া দক্ষিণা পাইবে; কিন্তু দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে অনেকের প্রতি অবিচার করা হয়। হয় ত যাহার হাত উড়িয়া গিয়াছে, সে যাহা পায়, যাহার একটী মাত্র আঙ্গুল নষ্ট হইয়াছে, সেও তাহা পাইয়া থাকে। ফ্রান্সে, এই জন্য, আহতদিগের মধ্যে কাহার কতখানি জীবনী শক্তি নষ্ট হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া তবে ভাতা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহাতে অবিচার হইবার কোন ভয় নাই। সকলেই জানেন যে, মানুষ মাত্রেরই শারীরিক বল ও জীবনী-শক্তি সমান নহে। হয় ত এমনও হইতে পারে, যাহার আঙ্গুল নষ্ট হইয়াছে, তাহার জীবনী শক্তি, যাহার হাত উড়িয়া গিয়াছে তাহার অপেক্ষা বেশী হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত পরীক্ষা কি করিয়া হইতে পারে, তাহা লইয়া ফরাসী চিকিৎসকদিগের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছিল। তবে বেশী দিন সে জন্য তাঁহাদিগকে ভাবিতে হয় নাই; সেখানকার দুই তিনজন চিকিৎসক মিলিয়া শীঘ্রই এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছেন। Dr. Jean Camus, Dr Dupont ইত্যাদি এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার দ্বারা এই বিষয় সঠিক-রূপে,—ঘড়ির মত,—আহত ব্যক্তির স্নায়ুর স্পন্দন হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; এবং এই স্নায়ুর স্পন্দন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার জীবনের কতটা পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে। এক্ষণে পরীক্ষার দ্বারা সেই ক্ষতির হিসাব করিয়া পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

কলের ঘোড়া

যুদ্ধের সময় পেট্রোলের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায়, আজকাল বিলাতে কয়লার গ্যাস দিয়া পেট্রোলের কাজ চালাইয়া লওয়া হইতেছে। সেখানে আজকাল সরকারী মালটানা গাড়ী ও যাত্রীদের বড়-বড় 'বাস্' গাড়ীগুলির ছাদের উপর বড়-বড় থলির ভিতর কয়লার গ্যাস ভরিয়া তাহার সাহায্যে গাড়ী চালান হইতেছে। আমেরিকায় এই যুদ্ধের সময় এক প্রকার নূতন গাড়ীর চলন হইয়াছে। সেখানকার কারিগরেরা এক রকম দু'চাকার গাড়ী আবিষ্কার করিয়াছেন,—এই গাড়ী গ্যাসোলীনের সাহায্যে চলিয়া থাকে। পেট্রোল অপেক্ষা গ্যাসোলীনের দাম অনেক কম। এই দু'চাকার গাড়ী ঘোড়ার মত অন্য গাড়ীর সঙ্গে জুতিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে দুইটী রাশ লাগান থাকে; গাড়োয়ান কোচবাক্সে বসিয়া এই রশ্মির সাহায্যে গাড়ীকে ডাহিনে, বাঁয়ে—যে দিকে ইচ্ছা চালাইতে পারে। যুদ্ধের কাজে এই গাড়ীর প্রথম ব্যবহার হয় বলিয়া, সেখানকার লোকেরা ইহার নাম দিয়াছে 'আর্ম্মি হর্স'।

পতঙ্গের জীবনী শক্তি

কথায় বলে—'হাতীর পায়ে কুলের আঁটী লাগিলে সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে।' বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, বড় প্রাণীরা ছোট প্রাণীদের অপেক্ষা অল্প আঘাতেই কাতর হইয়া পড়ে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, খুব ছোট প্রাণীর দেহের কোন অংশ ছিঁড়িয়া কিংবা ভাঙ্গিয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহারা দিব্য ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে পারে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, অন্যান্য বড় প্রাণী অপেক্ষা ইহাদের জীবনী-শক্তি অনেক বেশী; অন্ততঃ, তাহারা আহত হইলে অন্য বড় প্রাণী অপেক্ষা কম কাতর হয়। Robert Cunningham Miller নামক একজন পতঙ্গ তত্ত্ববিদ্ এই বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার একটী প্রজাপতি ধরিয়া, তাহাকে ক্লোরোফরম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া, পরে একটি লোহার সরু পিন আগুনে লাল করিয়া, সেটার বুকে বিঁধিয়া তিনি তাহাকে এক জায়গায় আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরের দিন প্রজাপতিটিকে দেখিয়া তাঁহার মনে হয় যে, সেটি মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু দিন পাঁচেক পরে দেখা গেল যে, সেটা মরে নাই; উপরন্তু, সেই অবস্থায় গুটিকয়েক ডিম পাড়িয়া বংশ বৃদ্ধির চেষ্টায় মন দিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, একবার গুটিকয়েক পতঙ্গকে তিনি ঐ প্রকারে একটা বোর্ডে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন রাত্রিতে কিসের একটা আওয়াজ শুনিতে পাইয়া তিনি উঠিয়া দেখিলেন যে, পতঙ্গগুলি সব উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। মিলার সাহেবের অনুসন্ধানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, এমন অনেক সামুদ্রিক পতঙ্গ আছে, যাহাদের মুণ্ড কাটিয়া দিলেও, তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে পারে।

বিচিত্র বর্ষণ

আকাশ হইতে শুধু যে জল, বরফ, করকা, তুষার ও উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়া থাকে, তাহা নহে; দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, সেখান হইতে মধ্যে মধ্যে ভেক ও মৎস্য-বৃষ্টিও হইয়া থাকে। এই প্রকার বিচিত্র বর্ষণ সম্বন্ধে একবার একজন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, আকাশ হইতে মৎস্য কিংবা ভেক, এমন কি, মধ্যে-মধ্যে মানুষও পড়িতে পারে; বরং সেটা না পড়াই বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়। বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন যে, একটু জোরে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলেই, গাছের পাতা, কাগজের টুকরা প্রভৃতি ছোট-ছোট জিনিস সব আকাশে উড়িতে থাকে। মধ্যে মধ্যে এক একটা বড় ঝড় অনেক ভারী ভারী জিনিস এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল তারিখের ঝড়ে একটা সুতার কলের ৬৭৫ পাউণ্ড ওজনের একটী লোহার ক্রু উড়িয়া প্রায় ৯০০ ফিট দূরে যাইয়া পড়ে। আর একবার ৭৫ পাউণ্ড ওজনের একটী মুরগীর খাঁচা ঝড়ে চার মাইল দূরে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। আর একবার একটী

টিনের চাল প্রায় পনেরো মাইল দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। সেই ঝড়েই একটা গির্জ্জার চূড়া সতেরো মাইল দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। এখন কথা হইতেছে যে, যাহা উপরে উঠিবে, মাধ্যাকর্ষণের গুণে তাহাকে নীচে নামিতেই হইবে। গির্জ্জার চূড়া, টিনের চাল, এমনি কি, অত্যন্ত ভারী লোহার জিনিসও যখন ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া যায়, তখন সামান্য ওজনের মাছ কিংবা ভেক যে ঝড়ে উড়িয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়া পড়িবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সম্প্রতি Monthly Weather Review পত্রে Mr. W. L. McAtee এই বিচিত্র বৃষ্টি সম্বন্ধে একটা চমৎকার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সচরাচর আকাশ হইতে যে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা ছাড়া পৃথিবীর যেখানে যখন এই রকম অদ্ভুত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, Mr. McAtee তাহার একটা তালিকা দিয়াছেন।

অনেক সময়ে লাল বর্ণের বৃষ্টি হইতে দেখা গিয়াছে। লোকে এই লাল বৃষ্টিকে রক্ত বৃষ্টি বলিয়া থাকে। আগে অনেকের ধারণা ছিল যে, স্বর্গে দেবতারা যখন যুদ্ধ করেন, তখন এই রকম বৃষ্টি হইয়া থাকে। কখন-কখন বৃষ্টির সময়ে অনেক প্রকার পতঙ্গও পড়িতে দেখা গিয়া থাকে। Mr. McAtee একবার এই রক্ত-বৃষ্টি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাতে Lepidoptera নামক এক প্রকার পতঙ্গের রক্ত (শরীরের রস) পাওয়া যায়। এই প্রকার রক্ত-বৃষ্টির আসল কারণ হইতেছে, ঝড়ে এক স্থান হইতে নানা রকমের পতঙ্গ উড়াইয়া আর এক স্থানে আনিয়া ফেলে। এই সঙ্গে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পোকা কিংবা কোন পতঙ্গের রক্তবর্ণ ডিম্বও উড়িয়া আসে; এবং সেগুলি বৃষ্টির জলের সহিত মিশিয়া গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করে। সময়-সময় দেখিতে পাওয়া যায়, ঝড়ে রাশি-রাশি লাল ধুলা বহন করিয়া আনিয়াছে; অথচ সে স্থানের ধুলার বর্ণ হয় ত কাল। এই প্রকার ধুলাও বৃষ্টির জলের সহিত মিশিয়া রক্ত বৃষ্টির মত হইয়া থাকে।

একবার Nova Scotiaতে পুষ্প পরাগের বৃষ্টি হইয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছিল যে, সেগুলি পাইন পুষ্পের পরাগ। Monthly Weather Review বহুদিন পূর্ব্বে একবার জানাইয়াছিলেন যে, America Boung প্রদেশে একবার ভীষণ শিলাবৃষ্টির সময় একটা বড় গোছের কচ্ছপ পড়িয়াছিল।

মস্কোর ঘণ্টা

পৃথিবীতে মনুষ্যের হস্তনির্ম্মিত যে সাতটী অত্যাশ্চর্য্য জিনিস আছে, মস্কোর বৃহৎ ঘণ্টা তাহাদের অন্যতম। সচরাচর দেখা যায় যে, জগতের যাহা কিছু বৃহৎ এবং আশ্চর্য্য, তাহাকেই সাধারণ মানব কল্পনার দ্বারা আরও রহস্যময় করিয়া তুলে। মিশরের সুবৃহৎ পিরামিডগুলি আজও যেমন সেখানকার জনসাধারণের নিকট রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে, মস্কোর এই বৃহৎ ঘণ্টা সেখানকার সাধারণ লোকদের নিকটে ঠিক তেমনি আশ্চর্য্য ও তেমনি রহস্যের আধার স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। অন্যান্য বৃহৎ ও আশ্চর্য্য জিনিসের ন্যায় এই বৃহৎ ঘণ্টা সম্বন্ধেও অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে যে সকল বিদেশী পর্য্যটক এই বৃহৎ ঘণ্টা দেখিতে যাইতেন, তাঁহারা সেখানকার অধিবাসীদের নিকট হইতে এই ঘণ্টা এবং তাহার নির্ম্মাতাদিগের সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত গল্প শুনিয়া আসিয়া, সত্য ভ্রমে সেগুলি স্বদেশে প্রচারিত করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যত লোক এই ঘণ্টাটী দেখিয়া সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়া কিংবা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারো বিবরণের সহিত অপর কাহারো বিবরণের মিল হয় না। ইঁহাদিগের মধ্যে Montferrand যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া ধরিতে হইবে। তাহার কারণ, তিনি নিজের হাতে ঘণ্টাটিকে অনেক দিন ধরিয়া নাড়াচাড়া করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ঘণ্টাটির জন্মের ইতিহাস এই;—১৭০১ খৃষ্টাব্দের ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে Tsar Alexis Michaelovitchএর বৃহৎ ঘণ্টাটি নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, তখনকার সম্রাজ্ঞী Anna Ivanovna সেটী অপেক্ষা আরও একটা বৃহৎ ঘণ্টা তৈয়ারী করিবার আদেশ প্রদান করেন এবং তাঁহারই আদেশানুযায়ী ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ঘণ্টা প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে এইরূপ কথা হইয়াছিল, যে স্থানে গর্ত্ত করিয়া এইটীর ঢালাই কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে, সেইস্থানেই একটী সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া এইটাকে ঝুলাইয়া রাখা হইবে; এবং সেই প্রাসাদের সহিত Ivan Veliki প্রাসাদের যোগ থাকিবে। সম্রাজ্ঞীর আদেশমত তখনকার বড়-বড় ইঞ্জিনীয়ারগণ মিলিয়া উক্ত প্রাসাদের নক্সা প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেন। কোথায় গ্যালারী হইবে, কোথায় রাস্তা হইবে, সব ঠিক হইতেছে, এমন সময় একদিন আগুন লাগিয়া সমস্ত সহর পুড়িয়া একেবারে ছারখার হইয়া গেল। এই সময় ঘণ্টাটার চতুর্দ্দিকে কাঠের ফ্রেম লাগাইয়া সেটিকে একটু উচ্চ স্থানে তুলিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু অগ্নিতে কাঠের ফ্রেম পুড়িয়া ঘণ্টাটী মাটিতে পড়িয়া যায়। অগ্নির উত্তাপ এবং উচ্চ স্থান হইতে পতনের ফলে ঘণ্টাটীর এক অংশ একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই ভগ্ন অংশটুকুর ওজন এগার টন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে মস্কোতে এই বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড হয় এবং তাহার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত ঘণ্টাটি সেই অবস্থায় সেইখানেই পড়িয়া থাকে। পড়িয়া থাকিবার কারণ—সে সময় অত ভারী জিনিসকে মাটীর ভিতর হইতে উঠাইবার কল ছিল না—সেজন্য সাহস করিয়া কেহই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিত না। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে Guirt নামক এক ব্যক্তি ঘণ্টাটিকে তুলিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার সদিচ্ছা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কারণ সেখানকার অধিবাসীরা Guirtএর এই প্রস্তাব শুনিয়া বিষম আপত্তি করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, ঘণ্টাটিকে ঐ স্থান হইতে উঠাইবার কোনরূপ চেষ্টা করিলেই তৎক্ষণাৎ উহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে উহাকে সমাধি হইতে উঠাইবার আর একবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু সেবারও নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে Tsar Nicholas I সে সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ারকে ঘণ্টাটিকে সেখান হইতে তুলিবার আদেশ দেন। এই ইঞ্জিনীয়ারের নাম Aug. de Montfarrand। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে

জুলাই তারিখে কুড়িটি কপিকলের সাহায্যে ইহাকে একশত বৎসরের সমাধি হইতে উঠান হয়।

মস্কোর এই বৃহৎ ঘণ্টার উপরিভাগ অতি সুন্দর কারু ও শিল্পকার্য্য শোভিত। সেখানকার খোদিত মূর্তিগুলির গঠন অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক, সেগুলি উচ্চতায় এক-একটি জীবিত মনুষ্যের সমান; কিন্তু মূর্তিগুলি উত্তমরূপে পালিস করা নহে। খোদিত মূর্তিগুলির মধ্যে Tsar Alexis Michelanovitch এবং সম্রাজ্ঞী Anna Ivanovnaর মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রাজ-দম্পতির মূর্তির মাঝখানে কতকগুলি খোদিত অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলি এত অসংলগ্ন যে, আজ পর্য্যন্ত তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। উপরের দিকে যীশু খৃষ্ট ও তাঁহার জননী কুমারী মেরী, গুটিকয়েক পরী ও দেবতার মূর্ত্তি আছে। ঘণ্টার চতুর্দ্দিকে খুব বড়-বড় পাতার নক্সা খোদাই করা আছে। সেখানকার সাধারণ লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, ঘণ্টাটী সোনা এবং রূপা এই দুই ধাতু মিশ্রিত করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঘণ্টা নির্ম্মাণের জন্য যখন ধাতু গলান হইতেছিল, তখন অনেক ধনী ব্যক্তি সেই পাত্রে সোণা ও রূপার মুদ্রা ফেলিয়া দিত; কিন্তু সে সোণা কিংবা রূপার ভাগ ইহাতে এত কম আছে যে, একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ইহাতে প্রায় তিন লক্ষ পাউণ্ডের সোণা আছে। এই ঘণ্টাটিকে এখন Ivan Veliki প্রাসাদের খুব নিকটে এক স্থানে একটী অষ্টকোণ বিশিষ্ট গ্রানাইট পাথরের উপর রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাথরের একদিকে প্রাচ্য ভাষায় ইহার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া আছে। সেটিকে ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিলে এই হয়--

This Bell, cast in 1733, under the reign of the Empress Anna Ivanovna after having been buried in the earth for more than a century, was raised to this place, August 4, 1836, by the will and under the glorious reign of The Emperor Nicholas The First.

Montfarand ঘণ্টাটীর সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, উচ্চতায় সেটি কুড়ি ফিট সাত ইঞ্চি; ইহার ব্যাস বাইশ ফুট আট ইঞ্চি এবং ওজনে একশত তিরানব্বই টন মাত্র।

সাময়িকী

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের আশীর্ব্বাদে এবং গ্রাহকগণের অনুগ্রহে 'ভারতবর্ষ' সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। ইহাতে আমাদের গৌরবের কথা কিছুই নাই--ভগবানের নামই জয়যুক্ত হইল।---তাঁহারই দিকে চাহিয়া আমরা এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম; তিনিই দয়া করিয়া দেশের কৃতী লেখকগণকে 'ভারতবর্ষে'র সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন,--তিনিই আমাদের গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন;--আমাদের কৃতিত্ব কিছুই নাই;--আমরা কেবল আদেশ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি। তাই, আজ সর্ব্বাগ্রে শ্রীভগবানের চরণে প্রণাম করি। তাহার পর আমাদের লেখকবৃন্দ ও পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বিগত ছয় বৎসর যাঁহাদের সহায়তা ও অনুগ্রহ লাভ করিয়া আমরা 'ভারতবর্ষ' পরিচালন করিয়াছি, ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল-বিধান করুন,--'ভারতবর্ষে'র সেবার জন্য তাঁহাদিগকে অধিকতর আগ্রহশীল করুন। পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলালের বড় সাধের 'ভারতবর্ষ'কে যে আমরা এই ছয় বৎসর বাঁচাইয়া রাখিয়াছি,--শুধু বাঁচাইয়া কেন--তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি, এ প্রেরণা দ্বিজেন্দ্রলালের। যত দিন 'ভারতবর্ষ' জীবিত থাকিবে, তত দিন, তাঁহার অমর নাম 'ভারতবর্ষে'র ললাটে অঙ্কিত থাকিবে।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষ' যে দিন প্রথম প্রকাশিত হয়, সে দিন এই পত্রের প্রতিষ্ঠাতা অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল 'সূচনা'য় বলিয়াছিলেন--"আমরা আশা করি যে, রাজপুরুষগণ, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা পড়েন না, তাঁহাদিগকে এই বাঙ্গালা সাহিত্য পড়াইব, এবং প্রাচ্য ভাবসম্পদে প্রতীচ্যকে সম্পৎশালী করিব।" দ্বিজেন্দ্রলালের সে 'আশা' আশাতীত ভাবে সফলতা লাভ করিয়াছে। রাজপুরুষগণ শুধু বাঙ্গালা ভাষা পড়িতেছেন না; কেবল বাঙ্গালায় বক্তৃতা দিতেছেন না; শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দারকে বঙ্গভাষায় পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছেন না, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর। আজ তাই, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষে' এক প্রধানতম রাজপুরুষের

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। বিহার ও উড়িষ্যার ছোট লাট মহোদয়ের ন্যায় সুপণ্ডিত, মনস্বী, প্রজারঞ্জক, ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার যে বিশেষ অনুরাগ, আমাদের বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধই তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। বাঁকীপুরে দশম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন-সংসৃষ্ট প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন কালে শ্রীযুক্ত লাট সাহেব বলিয়াছিলেন, "Bengali was my first love among the vernaculars"—অর্থাৎ প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাই সর্ব্ব প্রথমে আমার প্রীতি আকর্ষণ করে। সেই প্রীতির স্মৃদ নিদর্শন আজ আমরা বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া ধন্য হইলাম। শ্রীযুক্ত ছোট লাট মহোদয় বঙ্গভাষায় কথোপকথনেও সুদক্ষ। কিছুদিন পূর্ব্বে, বালক বালিকাগণের উদ্যান সম্মিলনে, তিনি অধ্যাপক সমাদ্দারের কন্যা কুমারী শ্রীমতী ভারতীর সহিত বাঙ্গালা ভাষায় বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথোপকথন করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। আমরা মাননীয় শ্রীযুক্ত ছোট লাট মহোদয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার ন্যায়, অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী যদি বঙ্গ সাহিত্যকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদের ভাষা আরও সম্পৎশালী হইবে। কবি বলিতেছেন,—

"আসিবে, সে দিন আসিবে!"

'ভারতবর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা হাওড়া সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি মহোদয়গণের অভিভাষণের উল্লেখমাত্র করিয়াছিলাম; বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা কয়েকটী অভিভাষণ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিব। প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়, ভারতে এক ভাষা প্রচলন সম্বন্ধে একটা অতি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"কেহ কেহ বলেন,—সমগ্র ভারতে এক ভাষার প্রচলন আবশ্যক, কেন না ভাষাভেদে মনোভেদ, সুতরাং মতভেদ অনিবার্য্য। তাই তাঁহাদের মতে অন্ততঃ হিন্দিভাষা সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত।

আমি কিন্তু এ মতের সমর্থন করিতে পারি না। যে কারণে, ইংরাজীভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দি বা অন্য কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সর্ব্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরাজীভাষা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে যেমন,—প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া, অশ্বত্থপাদপজাত উপবৃক্ষের মত হইয়া পড়িবে,—সেইরূপ হিন্দিকে সমগ্র ভারতের ভাষা করিতে গেলেও, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ তাহার নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে। যে মধুরতার জন্য, যে প্রসাদগুণের জন্য, যে মনোহারিতার জন্য—বাঙ্গালা ভাষা এত স্পৃহার বস্তু, তাহা ক্রমে সিকতারাশিতে বারিবিন্দুর ন্যায় কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইবে! অন্য প্রদেশের সম্বন্ধেও এই একই কথা। সুতরাং, আমার মতে, যে প্রদেশে যে ভাষা চিরদিন প্রচলিত, তথায় তাহা সেইরূপই থাকুক,—সেই ভাষায় সেই প্রদেশের জাতীয় সাহিত্য ক্রমে বর্দ্ধিত হউক,—শ্রীসম্পন্ন হউক। সে পক্ষে কোন বাধার প্রয়োজন নাই। কেন না, যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, তাহারা বড়ই হতভাগ্য, জগতে তাহাদের স্থান অতি অল্প, কালের অক্ষয় শিলাফলকে তাহাদের কথা খোদিত থাকে না, তাহারা প্রাতঃকালীন শিশিরকণার ন্যায়, অচিরকাল মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের জাতীয় ভাষার বিলোপ না ঘটাইয়া,—অন্য প্রদেশবাসীদিগকেও সেই ভাষা শিখিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হোক্। প্রত্যেক প্রদেশ স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সম্পন্ন হইয়াও অন্য প্রদেশের ভাষার যাহা গ্রাহ্য, তাহা স্ব স্ব ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউক। এইরূপ করিতে পারিলে কিছুকাল পরে,—ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা ভাবের একতা, চিন্তার একতা, ক্রমে মনের একতা জন্মিবে। নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও এক ভাবে ভাবিত হইয়া, ভারত একই লক্ষ্যের দিকে, সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে। ভারতের ভিন্ন প্রদেশের জাতীয় সাহিত্যের ধারা যাহাতে প্রতিহত হয়, দেশহিতৈষী কোন ব্যক্তিরই তাহা করা উচিত নহে।—আপনার ধর্ম্মে আপনিই যাহা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, তাহাকে ব্যস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি বাড়াইবার জন্য বিরূপ করা কোনমতেই যুক্তি-সঙ্গত বা নীতি-সঙ্গত নহে।"

পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় দেশীয় ভাষা প্রচলনের জন্য শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ কত চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। এই দেশীয় ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে সার আশুতোষ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—

"একটা তর্কের মীমাংসা আবশ্যক মনে করিয়াছি, তাহা এই :—এদেশে, আজকাল ইংরাজীর ভূয়ঃ প্রচার হইয়াছে। জ্ঞানের জন্যই হউক, আর উদরের জন্যই হউক, অথবা আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই হউক,—সকলেই অল্প বিস্তর ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে, আবার নূতন করিয়া এই ভারতীয় ভাষার প্রচলনের প্রয়াস কেন? যে কার্য্যসাধনের জন্য এত প্রয়াস, সেই কার্য্য বা সেই উদ্দেশ্য ত অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ইংরাজীতেই হইতে পারে, তবে এ শিরোবেষ্টন পূর্ব্বক নাসিকা স্পর্শ কেন? ইহার উত্তরে, আমার মাত্র দুইটা কথা বলিবার আছে।

১মটা—জাতীয় ভাব বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষার সেবা আবশ্যক। বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য-গঠনের চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য্য। দশভুজার পাদপদ্মে রক্ত জবার অর্ঘ্যই মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃপদের অযোগ্য। ইহার অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না।

২য় কথা—ইংরাজী ভাষা আমাদের অর্থকরী হইলেও, ভারতের অধিকাংশ লোক,—ইতর-সাধারণ তাহা জানে না, বা এখনও জানিবার জন্য তাহাদের প্রাণে তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না। সুতরাং ইংরাজীর সাহায্যে তাহাদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস করা বৃথা। যদি তেলগু ভাষায় বা উৎকলীয় ভাষায় বাঙ্গালার রামপ্রসাদ ভারত-চন্দ্রের ভাবসম্পদ্ ফুটাইতে পারা যায়, তবে তাহাতে, ইংরাজীতে যতটা ফললাভের আশা করা যায়, তদপেক্ষা লক্ষগুণ ফল যে অধিক হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তুলসীদাসের রামায়ণ ইংরাজীতে তরজমা করিয়া আমরা কয় জনে পড়িয়া থাকি বা পড়িয়া প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারি? তাই আমার মনে হয়, জাতীয় ভাব ফুটাইতে হইলে, সকলকে এক—অদ্বিতীয় জাতীয়তার সূত্রে গাঁথিতে হইলে, জাতীয়-সাহিত্যে একতা-বন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির ভাবের আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা স্ব স্ব জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া করিতে হইবে। উচ্চশিক্ষিত হইতে নিরক্ষর কৃষককুল পর্য্যন্ত এক উদ্যানের আনায়ে বেড়িয়া ফেলিতে হইবে। অন্যথা একীভাব অসম্ভব।"

এইবার ইতিহাস শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণের একটা অংশ উদ্ধৃত করিব। শ্রীযুক্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় অর্থ নীতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাহার অভিভাষণে তিনি অর্থনীতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই, শুধু পাঠ করা নহে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন—

"আমাদের শিল্প বিষয়ে কতটা সুবিধা আছে এবং শিল্পোন্নতির পথে কোন্ কোন অন্তরায় আছে, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। এদেশে শিল্পকলার উপাদানের অভাব নাই। কল কারখানা চালাইবার উপযুক্ত কয়লাও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই যে, এত সুবিধাসত্ত্বেও আমরা শিল্পের উপাদান সকল বিদেশে পাঠাইয়া দিই, এবং ঐ উপাদান হইতে বিদেশে প্রস্তুত দ্রব্য সকল যখন এদেশে আসে, তখন তাহা অধিক মূল্যে কিনি। অনেকে হয় ত শুনিয়া অবাক হইবেন যে, আমরা চামড়া ও চামড়া হইতে জুতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার রাসায়নিক উপকরণ সকল একই জাহাজে বোঝাই করিয়া বিলাতে রপ্তানি করি।

এই ত গেল সুবিধার কথা। অনেকগুলি অসুবিধাও আছে। তাহার মধ্যে একটা প্রধান অসুবিধা—মূলধনের অভাব। বাঙ্গলায় অর্থশালী ব্যক্তির সংখ্যা খুব অল্প। যাহাদের হাতে অর্থ আছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দরিদ্র কৃষকদিগকে অতিরিক্ত সুদে টাকা ধার দিয়া যথেষ্ট লাভ করেন। আর এক শ্রেণীর ধনী আছেন, যাঁহারা অত্যন্ত ভীরুস্বভাব। তাঁহারা সামান্য সুদের কোম্পানীর কাগজে টাকা আবদ্ধ রাখেন, এবং লোকসানের ভয়ে শিল্প-ব্যবসায়ে টাকা লাগাইতে চাহেন না। মধ্যবিত্ত লোকের হাতে যে সামান্য টাকা থাকে, তাহা কারবারের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধনের সমষ্টি করিতে পারিলে, বৃহৎ বৃহৎ কারবার চলিতে পারে। এই প্রকারের যৌথ

কারবার স্থাপন করা আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা ও সফলতার জন্য, আমাদের চরিত্রে কতকগুলি গুণের বিকাশ হওয়া আবশ্যক। যাহারা কারবারের পরিচালক বা তত্ত্বাবধায়ক হইবেন, তাঁহাদের সাধুতা, কর্ম্মপটুতা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতা বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিলে চলিবে না। অংশীদারগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক।

আমাদের আর একটি অসুবিধা ব্যাঙ্কের অভাব। কারবারের মূলধন যতই অধিক হউক না কেন, কারবারীকে সময়ে সময়ে ঋণ করিতেই হইবে। বিদেশীয় ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ দেশীয় কারবারের জন্য টাকা ধার দিতে বড়ই অনিচ্ছুক। অতএব স্বদেশীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন। বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত দুই একটা ব্যাঙ্ক আছে বটে; কিন্তু তাহাদের অর্থসম্পৎ নিতান্ত অল্প, এবং পরিচালনকার্য্য তেমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি সুবিখ্যাত টাটা কোম্পানী একটা বড় ব্যাঙ্ক খুলিয়াছেন। আমাদের ভরসা আছে যে, ইহা দ্বারা বাঙ্গলার শিল্পোন্নতির সহায়তা হইবে। সরকারের তহবিলে অনেক সময় বিস্তর টাকা অনাবশ্যক পড়িয়া থাকে। একটা সরকারি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে, ঐ টাকা দেশীয় শিল্পোন্নতি কল্পে প্রযুক্ত হইতে পারে।

শুধু মূলধন থাকিলেই ব্যবসায় চলে না। অনেক স্থলে, মূলধনের অপব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন না করিলে আমাদের শিল্পোন্নতি সম্ভব হইবে না। বৈজ্ঞানিক পথা অনুসারে আমাদিগকে শিল্প-কার্য্য চালাইতে হইবে, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্য লইতে হইবে। কার্য্য-শৃঙ্খলা আর একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ। ইহার উপর কারবারের সফলতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আত্মনিয়োগশীল, কর্ত্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন পরিচালক না পাইলে শিল্পোন্নতি অসম্ভব। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আমাদের শিল্পীরা তেমন কার্য্যদক্ষ নহে। এজন্য উৎকৃষ্ট শিল্প-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরু দায়িত্ব আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য-বিষয়েও শিক্ষা প্রদান করা উচিত। কারণ বাণিজ্য ও শিল্প পরস্পরের সহায়।"

সর্ব্বশেষে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি মনস্বী শ্রীযুক্ত গিরিশ-চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে আমাদের বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে যে কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—

"বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ইংরেজী মত্ততার কথা অগ্রেই বলিয়াছি। এই মত্তাবস্থায় আমরা বাঙ্গালা ভুলিয়া ছিলাম; বাঙ্গলা ভুলিয়াছি এ কথার প্রচার করা শ্লাঘা মনে করিয়াছিলাম, পিতামাতা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে বাঙ্গলায় চিঠিপত্র লেখা মূর্খতার চিহ্ন মনে করিয়াছিলাম; বাঙ্গালা গ্রন্থপাঠ কলুর ঘানিতে ও পাড়াগাঁয়ের নিভাজ বাঙ্গালীর বৈঠকখানায় আশ্রয় লইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম আমলেও এ নেশার ঘোর কাটে নাই। সুখের বিষয় আজি কালি নেশার ঘোর একেবারে না কাটিলেও অনেকটা ফিকে হইয়াছে। বাঙ্গলাতে চিঠিপত্র লেখা, বাঙ্গলা পুস্তক সাপ্তাহিক দৈনিক মাসিক পড়া, সাধারণ সভায় বাঙ্গলায় অভিভাষণ পাঠ করা, আর লজ্জার কথা নাই। ইংরেজী ভাষা সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানের সম্পর্কে, বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন, মেঘান্তর্হিত সূর্য্যের ন্যায়, পুনরায় দীপ্তি বিস্তার করিয়া যুগান্তর সৃষ্টির সূচনা করিয়াছে। ইহার ফল মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি মহারথিগণের আবির্ভাব আর বাঙ্গলা ভাষার প্রতি অপ্রাকৃত বিদ্বেষের দূরীভবন। পুরাতন বাঙ্গলা পুথির ও ভাষার উদ্ধার এবং নূতন বাঙ্গলা ভাষার ও পুথির প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। বিলাতী ভাব ও বিলাতী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আমরা বাঙ্গলা পরিচ্ছদ পরাইতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু সেই পরিচ্ছদে এখনও প্যাণ্ট কোট-কলারের দাগ ঘুচে নাই, সেই ভাব-জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিদেশী ভাব এখনও রহিয়াছে, এখনও উহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার জিনিষ করিয়া লইতে পারি নাই। "চা-বাটীতে তুফান" (tempest in a tea pot) বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা ইংরেজী ভাষা ও ভাব নহে কি? "শ্যাম বলিলেন তিনি (শ্যাম) ভাল আছেন", আর "শ্যাম বলিলেন আমি ভাল আছি", ইহার মধ্যে কোন্‌টা খাঁটী বাঙ্গলা ও কোন্‌টা ইংরেজী ছাঁচে ঢালা বাঙ্গলা, বলিয়া দিতে হইবে কি? "গোপালে উড়ে" (flying Gopal), এই বাঙ্গলা নামের ইংরেজী তর্জ্জমা বাঙ্গালী শুনিয়া হাসিয়াছে এবং এখনও হাসে, কিন্তু ইহা বাঙ্গলা-অভিমানী ইংরেজের বাঙ্গলা। কিন্তু

বাঙ্গালী-লিখিত "সুবর্ণ সুযোগ" (Golden opportunity), "স্বর্ণের যুগ" (Golden era), "চন্দ্রাহত" (Moon-struck), "তপ্তযৌবন" (Hot youth), "সাধারণ আত্মা" (Public spirit), "কেতাব-কীট" (Book-worm) ইত্যাদি পড়িয়া আমরা হাসিব না কাঁদিব? "উলঙ্গ সত্য" (Naked truth) পড়িয়া আমার এক বন্ধু বলিয়াছিলেন, যিনি "উলঙ্গ সত্য" লিখিতে পারেন, তাঁহার উলঙ্গ নৃত্য দেখাইবার আর বিলম্ব নাই। বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি, কোন্ নির্ভেজাল বাঙ্গালী উহাদিগকে বাঙ্গলা বলিয়া চিনিতে পারে? কোন্ ইংরেজী নবিশ বাঙ্গালী বা বিনা আয়াসে উহাদিগকে হজম করিতে পারে? বাঙ্গলা গ্রন্থে, সাপ্তাহিকে, দৈনিকে, অভিভাষণে, এমন সকল পদ ও বাক্য দেখি ও পড়ি, যাহা নির্ভেজাল বাঙ্গালী বুঝে না, ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীও আগে ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিয়া না লইলে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। নব্য বাঙ্গলা সাহিত্যে যে সকল সামাজিক চিত্র সচরাচর চিত্রিত দেখি, তাহা কি আমাদের সমাজের প্রতিবিম্ব? না বাঙ্গলা ভাষা পরিচ্ছন্ন বিদেশী সমাজের চিত্র? আমাদের সমাজ পল্লীতে, সহরে নহে। পল্লীবাসী কি এই সকল চিত্র আপন আপন সমাজের চিত্র বলিয়া চিনিতে পারে? "দীন চক্ষে জো" যে নাটকে পড়িয়াছি, সেরূপ সমাজের উজ্জ্বল চিত্র খুব কমই দেখিতে পাই। তবে আশা করি এবং আশা তেই লোক বাঁচিয়া থাকে, বাঙ্গলা সাহিত্যের সে দিন দূর নহে, যে দিন সম্পূর্ণ আমাদের বলিয়া তাহাকে চিনিতে পারিব।"

বর্ণ ও বিবাহ

[শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল্]

এই বিষয়টা নানা দিক হইতে বিবেচিত হইতে পারে। আমি কেবল মানব তত্ত্ব ও সমাজ তত্ত্বের দিক হইতে কয়েকটী মাত্র গুরুতর কথার অবতারণা করিব। তাহাও বিস্তৃত রূপে উল্লেখ করিবার সাধ্য হইবে না। যাহা হউক, আমার বিশেষ লক্ষ্য বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ।

মানবের বর্ণ।—মানব জাতির বর্ণ পাঁচ প্রকার; শ্বেত, পীত, তাম্র,(১) কটা ও কৃষ্ণবর্ণ। তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ, পীতবর্ণ ও শ্বেতবর্ণের মানবই অধিক সংখ্যক। প্রথমেই যদি কৃষ্ণবর্ণের মানব জাত হওয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা হইতেই পীত ও তাহা হইতে শ্বেতবর্ণের মানব হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, কৃষ্ণবর্ণ একটু ফর্সা হইলে কটা, কটা একটু উজ্জ্বল হইলেই তাম্রবর্ণ, আর একটু ফর্সা হইলেই পীত এবং আর একটু ফর্সা হইলেই শ্বেতবর্ণ হয়। সুতরাং এই পাঁচটি বর্ণ যেন একের পর অন্যে জাত হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ ক্রমে কমিয়া শ্বেতবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। শ্বেতবর্ণ ক্রমে কমিলেও কৃষ্ণবর্ণ হয়।

যদি মানবকে প্রথমতঃ কৃষ্ণবর্ণ বিবেচনা করা যায়, তবে সে ক্রমে বিবর্ত্তন-বাদের নিয়মানুসারে শ্বেত হইয়াছে। আর, যদি প্রথমে মানব শ্বেতবর্ণ ছিল, এইরূপ বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলেও ঐ নিয়মেই ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, বলিতে হয়। কিন্তু শ্বেত প্রথম বর্ণ, কি কৃষ্ণবর্ণই প্রথম বর্ণ, সে বিষয়ের আলোচনা করা এস্থলে অনাবশ্যক।

বর্ণোপকরণ।—কিন্তু বর্ণ কি? দেহের আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির অথবা তাহা হইতে নিঃসৃত রসের বর্ণের কথা বলিতেছি না; বাহ্য-ত্বকের উপরিভাগের বর্ণের কথা বলিতেছি। এই বর্ণানুসারেই মানবকে শ্বেত, কাল, পীত ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। ইহা দৈহিক ক্রিয়াবশতঃ

(১) প্রকৃতপক্ষে লোহিত বর্ণের কোন মানব ছিল না। যাহাদিগকে লোহিত বলা হইত, তাহারা তাম্রবর্ণ ছিল।

দেহ-কোষ হইতেও জাত হইতে পারে ; অথবা ভুক্ত বস্তু হইতেও গৃহীত হইতে পারে (২)। বাহ্য-ত্বকের বর্ণ প্রধানতঃ ভুক্ত বস্তুর বিবিধ উপকরণ হইতে গঠিত হয়। এই নিমিত্ত উহাদিগকে বর্ণোপকরণ (Pigment) বলা যায়। উহা মলমূত্রাদির ন্যায় পরিত্যজ্য (৩) পদার্থ। উহা ভুক্ত বস্তু হইতে প্রস্তুত হইয়া বাহ্য ত্বকের (Epidermis) নিম্নদেশে আসিয়া সঞ্চিত হয়, এবং তথা হইতে ত্বকের মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া যায়। উহা ভুক্ত বস্তুর পরিপাকেই গঠিত হয়, সুতরাং উহা দৈহিক ক্রিয়ার ফল। উহাতে সাধারণতঃ অঙ্গার, লৌহ, গন্ধক, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি থাকে। মানবের দৈহিক ক্রিয়ার প্রভেদ অনুসারে বর্ণোপকরণও বিভিন্ন হইয়া উঠে। তাহাতেই মানবের বর্ণও নানাবিধ হইয়া থাকে। দৈহিক ক্রিয়া ভাঙ্গা গড়া। জগতের সকল ক্রিয়াই ভাঙ্গা গড়া। এই নিমিত্ত ভুক্ত বস্তুর ভাঙ্গা গড়া (পরিপাক) হইয়া দৈহিক ক্রিয়াবশতঃ মানবীয় বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হয়। যে ব্যক্তির কিম্বা জাতির দেহ ত্বকের নিম্নে (৪) যেরূপ বর্ণোপকরণ সঞ্চিত হয়, তাহার বর্ণও তদ্রূপ হয়। কিন্তু বর্ণোপকরণ ব্যতীত আরও একটা কারণ উল্লেখ করা আবশ্যক ; এ কারণটা যদিও প্রধান কারণ নহে, তথাপি উল্লেখযোগ্য। ইহা আর কিছুই নহে, ত্বকের গঠন, বিশেষতঃ উপরিভাগের গঠন। সকলেই জানেন, সূর্য্যকিরণ কোন পদার্থের উপর পতিত হইলে, উহার সপ্তবর্ণের মধ্যে কোন কোন বর্ণ ঐ পদার্থের মধ্য দিয়া চলিয়া যায় ; কোন বর্ণ উহার উপরিভাগ হইতে ফিরিয়া আসে, কোন বর্ণ উহার মধ্যেই রহিয়া যায়। কখনও বা সমস্ত বর্ণই উহার উপর হইতে ফিরিয়া আসে, তখন উহা শ্বেতবর্ণ দেখায় ; কখনও বা সকল বর্ণই উহার মধ্যে রহিয়া যায়, তখন উহা কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। সুতরাং বস্তুর উপরিভাগের গঠনের উপর (এবং মধ্য ভাগের গঠনের উপরও) উহার বর্ণ নির্ভর করে। জীবদেহেরও তদ্রূপই হইয়া থাকে (৫)। সুতরাং জীবদেহের বর্ণ বর্ণোপকরণের এবং দেহত্বকের উপরিভাগের গঠনের উপর নির্ভর করে, ইহা বুঝা যাইতেছে। এই দুইটী কারণ ব্যতীত অন্যান্য বহু কারণ আছে। সে সকল বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করিব না।

বর্ণের পরিবর্ত্তন।—যাহা হউক, বর্ণ এক দিকে পরিবর্ত্তনশীল, অন্য দিকে স্থির। এই কথা বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। বলিয়াছি, বর্ণ দৈহিক (ভাঙ্গা গড়া) ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, এবং উহার উপকরণ ভুক্ত বস্তু হইতে গৃহীত হয় ; আর, উহা দেহ-ত্বকের উপরিভাগের গঠনের উপরও নির্ভর করে। দেহ ত্বকের উপরিভাগ পুরু এবং পাতলা, উভয় প্রকারই হইতে পারে ; উহার ছিদ্রগুলিও সকলের সমান নহে। বিশেষতঃ, ত্বকের নিম্নভাগেই বর্ণোপকরণ সকল আসিয়া সঞ্চিত হয়। বর্ণোপকরণ মল-মূত্রাদির ন্যায় পরিত্যজ্য পদার্থ (waste products), তাহাও বলা হইয়াছে। উহার পরিত্যাগের দ্বার ত্বকের ছিদ্রসমূহ। ঐ সকল ছিদ্র দ্বারা পরিত্যক্ত হইবার নিমিত্তই বর্ণোপকরণ আসিয়া ত্বকের নিম্নে সঞ্চিত হয়, এবং ঐ পথে ক্রমে পরিত্যক্ত হয়। এই সকল কথা স্মরণ করিয়া ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে যে, ব্যক্তির বর্ণ চির-স্থির নহে। আহার্য্য বস্তুর ভেদবশতঃ, উহা পরিপাকের তারতম্য হেতু, বর্ণের উপকরণগুলি নিত্য সমভাবে জাত না হইতে পারে ; অথবা কোন বিশেষ পদার্থ আহার করিলে উপকরণগুলির কোন একটী অথবা ততোধিক পদার্থ জাত হইবার বিঘ্ন হইতে পারে। (৬) পীড়া, দুর্ব্বলতা, বয়স, উত্তেজনা অথবা

(২) In some cases pigments are built up in the ssues of an animal, in others they appear to be rived from the food. Ency. Brit Vol. 6 p 736 1th Ed).

(৩) Pigments of many kinds are physiologically garded as of the nature of waste products. Geddes l Thomson, The Evolution of Sex p. 23.

(৪) ত্বকের নিম্নে, চতুর্থ স্তরে। (Stratum mucosum).

(৫) The colouration of the surface of animals is either caused by pigments, or by a certain structure of the surface by means of which the light falling on it or reflected through its superficial transparent layers undergoes diffraction or other optical change. Ency. Brit. 9th Ed. Vol. 27, p. 150.

(৬) যথা, একটু একটু আর্সেনিক্ খাইয়া মেম সাহেবরা বর্ণ সাদা করে ; উহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তথাপি ঐরূপ করে।

অবসাদ বশতঃ দৈহিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয়; এবং ত্বক্ সুতরাং ত্বকের ছিদ্রগুলি সঙ্কোচিত অথবা বিস্তৃত কিম্বা শিথিল হইতে পারে। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা অথবা উত্তেজনা বশতঃও এরূপ হইতে পারে। এ সকল স্থলে দেহের বর্ণ সমান থাকিতে পারে না, থাকেও না। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। প্রতিদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় ও রাত্রিকালে বর্ণের তারতম্য হয়। পীড়ায়, বার্দ্ধক্যে বর্ণ মলিন হয়; ক্রোধে এবং যৌবনে রক্তাভ হয়; ভয়ে শ্বেত অথবা শ্বেতাভ হয়, ইহা সকলেই জানেন। গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে, গ্রীষ্মপ্রধানদেশে এবং শীতপ্রধানদেশেও বর্ণের প্রভেদ হইয়া থাকে।

কিন্তু এ সকল তারতম্য ব্যক্তিগত এবং তাহার মাত্রাও অধিক নহে। এ সকলের বংশগত স্থায়িত্ব ত নাইই; ব্যক্তিগত স্থায়িত্বও নাই। যে শ্বেতকায় ব্যক্তি ভারতবর্ষে আসিয়া লোহিতাভ হয়, তাহার পুত্র লোহিতবর্ণ হয় না, শ্বেতবর্ণই হয়। সে ব্যক্তি নিজেও শীতপ্রধান দেশে ফিরিয়া গেলে, পুনরায় শ্বেতবর্ণ পূর্ণ মাত্রায় অথবা অংশতঃ লাভ করে। সুতরাং উল্লিখিত কারণ বশতঃ যে বর্ণভেদ উৎপন্ন হয়, তাহা স্থায়ী নহে, ইহা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

স্থায়ী বর্ণ।—কিন্তু মানবের একটা স্থায়ী বর্ণও আছে; তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইংরাজ শ্বেতবর্ণ, নিগ্রো কৃষ্ণবর্ণ, চীনা পীতবর্ণ। এ সকল বর্ণ জাতিগত ভাবে স্থির থাকে। যদিও সকল ইংরাজ সমান শ্বেতবর্ণ নহে, সকল চীনা সমান পীতবর্ণ নহে, সকল নিগ্রোও সমান কৃষ্ণবর্ণ নহে; তথাপি ইহাদিগের জাতিগত বর্ণ যথাক্রমে শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বর্ণ জাতিগত ভাবে স্থির। চিরতুষারাবৃত লাপ্‌লেণ্ডদেশের এস্‌কুইমক্স জাতি এবং উষ্ণপ্রধান চীনদেশের চীনাগণ একই বর্ণের দেখা যায়। উভয়েই ন্যূনাধিক পীত। নিদারুণ শীতেও এস্‌কুইমক্সকে শ্বেত করিতে পারে নাই। উহারা এবং চীনাগণ, উভয়েই মঙ্গোলীয় জাতি। সুতরাং জাতিগত বর্ণ সর্ব্বত্রই স্থির থাকে দেখা যাইতেছে। অতিশয় শ্বেতকায় টুরেগ জাতি এবং নিগ্রোগণ উভয়েই উত্তর-আফ্রিকার অত্যুষ্ণ মরুপ্রদেশে বাস করে; কিন্তু গ্রীষ্ম এবং উষ্ণতা টুরেগগণকে কৃষ্ণবর্ণ করিতে পারে নাই। উহারা জাতিগত শ্বেতবর্ণই বংশাবলিক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বলিভিয়া প্রদেশে মারোপাগণ তাম্রবর্ণ, আইমরগণ কৃষ্ণবর্ণ, মোক্সোগণ পীতবর্ণ, অথচ ইহারা পরস্পরের প্রতিবাসী। এই সকল এবং অন্যান্য বহু কারণবশতঃ পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে, জাতিগত বর্ণ স্থির, সর্ব্বত্রই স্থির। অর্থাৎ বর্ণসাঙ্কর্য্য না হইলে স্থির।

ব্যক্তিগত বর্ণ এত অস্থির, তথাপি জাতিগত বর্ণ স্থির থাকিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বর্ণ প্রধানতঃ শারীর ক্রিয়ার ফল। উহা শারীর ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বর্ণোপকরণ (Pigment) নামক পদার্থের উপর নির্ভর করে। এই পদার্থে অঙ্গারের ভাগ অধিক থাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয়, অল্প থাকিলে শ্বেত বর্ণ হয়। (৭)।

যদি জাতীয় বর্ণ সর্ব্বত্রই স্থির থাকা প্রতিপন্ন হইল, এবং যদি উহা শারীর ক্রিয়ার ফল বলিয়াই প্রতীয়মান হইল, তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, কোনও নির্দ্দিষ্ট জাতির শারীর ক্রিয়াও স্থির। শ্বেত যদি ইংরাজ জাতির স্থির বর্ণ হয়, এবং কৃষ্ণ যদি নিগ্রো জাতির স্থির বর্ণ হয়, তবে নিশ্চয়ই ইংরাজগণের শারীর ক্রিয়া স্থির ভাবে, বংশানুক্রমে শ্বেত বর্ণোপকরণই প্রস্তুত করিতেছে; এবং নিগ্রো জাতির শারীর ক্রিয়াও বংশানুক্রমে নির্দ্দিষ্ট ভাবে কৃষ্ণ বর্ণোপকরণই প্রস্তুত করিতেছে। ইহাদিগের উভয়ের জাতীয় বর্ণ বিভিন্ন, সুতরাং উভয়ের জাতীয় শারীর ক্রিয়াও বিভিন্ন। কিন্তু ইহাদিগের প্রত্যেক জাতির বর্ণ নির্দ্দিষ্ট, সুতরাং শারীর ক্রিয়াও নির্দ্দিষ্ট। এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এই ভাবে আমরা বুঝিতে পারি যে, জাতীয় বর্ণ বিভিন্ন হইলে জাতীয় শারীর ক্রিয়াও (Physiological action) বিভিন্ন হইবে। যদিও মোটের উপর সকল মানবেরই শারীর-ক্রিয়া প্রায় এক প্রকার, কিন্তু তাহারই মধ্যেই বিভিন্ন জাতির শারীর ক্রিয়া কালক্রমে বংশানুক্রমের বিধান অনুসারে কিছু কিছু বিভিন্ন হইয়াছে (৮)। মানবের

(৭) The black colour resides in a carbonaceous substance, the Pigmentum, which is deposited in a layer in the mucous tissue on the cuticle. Figuier—The Human Race p. 572.

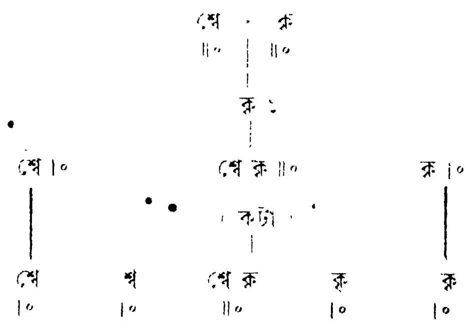
(৮) ইংরাজের দেহতাপ গড়ে ৯৮।॰ ডিগ্রী, বাঙ্গালীর ৯৭।

আকৃতি, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি যদিও একই প্রকার, অর্থাৎ মানবীয় আকৃতি দেখিলে এবং কণ্ঠস্বর শুনিলে অন্য কোনও জীবের আকৃতি অথবা কণ্ঠস্বর বলিয়া ভুল হইবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই, কারণ উহা মানবীয়ই, অপরের নহে; তথাপি ঐ একত্বের মধ্যেই বহুত্ব আছে। কারণ, প্রত্যেক মানবের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর অপর মানবের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর হইতে বিভিন্ন, এবং প্রত্যেক জাতির আকৃতি ও কণ্ঠস্বর অপর জাতি হইতে বিভিন্ন। শারীর ক্রিয়া সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। কোন জাতির মধ্যেই প্রত্যেক ব্যক্তির শারীর ক্রিয়া সমান নহে, তথাপি সেই জাতির মোটের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট শারীর ক্রিয়া আছে। সুতরাং মোটের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট জাতীয় বর্ণও আছে।

এই নিমিত্তই বলিয়াছি, যাহাদের জাতীয় বর্ণ বিভিন্ন, তাহাদিগের শারীর ক্রিয়াও বিভিন্ন। অত্যন্ত বিভিন্ন জাতিতে শারীর ক্রিয়া অত্যন্ত বিভিন্ন।

বর্ণশঙ্কর, মেণ্ডেলের বিধান। কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বর্ণভেদ দেখা যাইতেছে, কখন অল্প, কখন অধিক মাত্রায় দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালীর মধ্যেও অত্যন্ত ফর্সা লোক আছে; নিগ্রো জাতির সকলে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নহে, কেহ কেহ (মলেটোগণ) কিছু কিছু ফর্সা হয়; ইংরাজগণ সকলে শ্বেত নহে; মেটে ইংরাজও আছে, মেটে ফিরিঙ্গীরা য়ুরোপীয় ফর্সা সাহেবদিগেরই বংশধর। মানব জাতির প্রথমাবস্থায় জাতীয় বর্ণের যেরূপ স্থিরতা ছিল, বর্ত্তমান কালে আর সেরূপ নাই। ইহার কারণ কি? পশ্চাতে বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইহাও আবশ্যক হইবে।

ইহার কারণ, বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন জাতীয় সুতরাং বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিগণ মধ্যে যৌনসম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া। নিগ্রো জাতি মধ্যে যে মলেটোরা একটু ফর্সা, তাহারা শ্বেতবর্ণ য়ুরোপীয় ব্যক্তিগণের এবং নিগ্রোর যৌন সম্বন্ধ হইতে জাত। মেটে ফিরিঙ্গীরা কাল, তাহারা শ্বেতবর্ণ য়ুরোপীয়গণের এবং কৃষ্ণবর্ণ ভারতবর্ষীয়গণের যৌন সম্বন্ধের ফল। কিন্তু মলেটোরাও সকলে ফর্সা নহে, অনেকে নিগ্রো জাতির মতই কৃষ্ণবর্ণ। মেটে ফিরিঙ্গীরাও সকলে কাল নহে, অনেক ফিরিঙ্গী ফর্সাও আছে। আমি দুইটি ফিরিঙ্গী দেখিয়াছিলাম, তাহারা সহোদর ভ্রাতা। অথচ একজন অতি কাল, অন্যজন সুন্দর ফর্সা। বাঙ্গালী জাতির মধ্যেও এরূপ অনেক আছে। বিভিন্ন বর্ণ একত্র মিশ্রিত হইলে, অর্থাৎ যৌন সম্বন্ধ দ্বারা মিশ্রিত হইলে, অপত্য উভয় বর্ণই হইতে পারে। কিন্তু প্রথম পুরুষে এক বর্ণ হয়; পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি অধস্তন পুরুষে বিভিন্ন বর্ণ হইয়া যায়। ইহার একটা সূত্র আছে; এই নিয়ম সূত্রাকারে বলা যাইতে পারে। ইহা বর্ণ-সাঙ্কর্য্যের নিয়ম। ইহা "মেণ্ডেলের বিধান", অথবা "মেণ্ডেলের নিয়ম" নামে পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত। শ্বেত ও কৃষ্ণ এই দুইটা প্রধান বর্ণ যৌন সম্বন্ধে সংগত হইলে অপত্য বংশানুক্রমে কিরূপ বর্ণের হইবে, তাহা নিম্নে অক্ষর দ্বারা লিখিত হইল। শ্বেতের পরিবর্ত্তে "শ্বে" এবং কৃষ্ণবর্ণের পরিবর্ত্তে "কৃ" ব্যবহার করিলাম। অবশ্যই শ্বেতবর্ণ পিতা, কৃষ্ণবর্ণ মাতা হইলেও পর্য্যায়ক্রমে সন্তান সন্ততিগণের যেরূপ বর্ণভেদ হইবে, কৃষ্ণবর্ণ পিতা এবং শ্বেতবর্ণ মাতা হইলেও অপত্য শ্রেণী পুরুষ পরম্পরায় তদ্রূপই হইবে।



ইহার অর্থ এই যে, নর-নারী মধ্যে কেহ শ্বেত, কেহ কৃষ্ণবর্ণ হইলে প্রথম পুরুষে অপত্য কৃষ্ণবর্ণ হয়। তৎপরবর্ত্তী পুরুষে শ্বেত-কৃষ্ণের সংযোগে অথবা কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণের সংযোগে অপত্য শ্বেত, কৃষ্ণ ও উভয় বর্ণ মিশ্রিত কটা (১) বর্ণ হয়। এ স্থলে সিকি অপত্য শ্বেত, সিকি কৃষ্ণ, এবং অর্দ্ধেক পরিমাণে কটা হয়। তৎপরবর্ত্তী পুরুষে শ্বেতের সহিত শ্বেতের ও কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণের সংযোগে অপত্য জাত হইলে, শ্বেত শ্রেণীতে শ্বেতই হয়, কৃষ্ণ শ্রেণীতে কৃষ্ণবর্ণ অপত্যই হয়। কিন্তু কটা অর্থাৎ মিশ্রগণ উহাদিগের সংস্রবে অপত্য উৎপাদন করিলে অথবা নিজেরাই সম্মিলিত হইলে পর পুরুষে

(১) ইহাও কৃষ্ণবর্ণই।

পুনরায় সিকি শ্বেতবর্ণ, সিকি কৃষ্ণবর্ণ এবং অর্দ্ধেক কটা বর্ণ হয়। বিভিন্ন বর্ণ নর-নারীর মিশ্রণে অপত্যগণ চারি পাঁচ পুরুষেই প্রবল বর্ণ (১০) প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সকলে প্রাপ্ত হয় না। চক্ষে দেখিতে সিকি শ্বেত ও বারআনা ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। কারণ যে সিকি কৃষ্ণবর্ণ তাহারা, এবং যে অর্দ্ধেক "শ্বেত কৃ" অর্থাৎ কটা কিম্বা পাতলা কাল তাহারা, একত্র বারআনাই ন্যূনাধিক কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। সুতরাং কোন জাতি মধ্যে শ্বেত, কৃষ্ণ এবং কটা এইরূপ নানাবিধ বর্ণের ব্যক্তি থাকিলে তাহারা মূলে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিগণের অপত্য বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

পূর্ব্বে অনেকের বিশ্বাস ছিল, এবং এখনও কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, মোটের উপর শীতপ্রধান দেশের মানুষ শ্বেতবর্ণ এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিন্তু এই বিশ্বাস এখন আর বৈজ্ঞানিক-সমাজে প্রায় কাহারও নাই। যাহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শীত গ্রীষ্মের দেহগত সুতরাং বর্ণগত ক্রিয়া কেবল মানবেই সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন। কারণ, যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানব কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় তাহারা ঐ বর্ণ গ্রীষ্মবশতঃ হওয়া বিবেচনা করেন, সেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গো, মেষ, মহিষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল, পক্ষী শ্রেণী, কীট পতঙ্গ শ্রেণী এবং উদ্ভিদগণকে নানা জাতীয় বর্ণের দেখিয়াও ঐ মতের সত্যতা সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হন না!! মানুষ যদি গ্রীষ্মবশতঃ কৃষ্ণবর্ণ হইল, তবে সেই দেশেই গো, অশ্ব ইত্যাদি সকল পশু এবং সকল পক্ষী এবং সকল উদ্ভিদই কৃষ্ণবর্ণ হয় না কেন? গ্রীষ্ম কি কেবল মানুষের দেহেই ক্রিয়া করে, অন্যের দেহে ক্রিয়া করে না? নিদাঘের দেশে ব্যাঙের ছাতা (১১) সাদাবর্ণ হয় কেন? তাহার দেহে প্রখর সূর্য্য-কিরণ কি কোন ক্রিয়া করে না? পক্ষান্তরে, তেমনই যে শীতপ্রধান দেশে মানব শৈত্যবশতঃ শ্বেতবর্ণ হওয়া বিবাদী বিবেচনা করেন, সেই দেশেই কৃষ্ণবর্ণ পশু, পক্ষী ও উদ্ভিদগণ দেখিয়াও তাহারা সে মত পরিবর্ত্তন করেন না! শীত কি কেবল মানব দেহেই ক্রিয়া করে, ইতর প্রাণীর অথবা উদ্ভিদের দেহে ক্রিয়া করে না? উদ্ভিদগণ মধ্যে এবং পশু পক্ষী মধ্যে জাতিগত বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়। একই উদ্ভিদেরই অথবা একটা ইতর প্রাণীরই দেহের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মানবেরও দেহের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণ; সকল মানবেরই এইরূপ। শীত গ্রীষ্ম-বাদিগণ (১২) কি বলিবেন যে, একের দেহেই কোন স্থানে শীত ও কোন স্থানে গ্রীষ্ম ক্রিয়া করিয়া দেহের নানা অংশে নানারূপ বর্ণভেদ উৎপন্ন করে? তাহা হইলে বহুবর্ণ খচিত ময়ূরপুচ্ছ সম্বন্ধে তাঁহারা কি বলিবেন? স্থলে সাবানের বুদ্বুদে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া বিশ্লেষণ বশতঃ যেরূপ নানা বর্ণ প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ না বলিয়া উপায়ই নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তুষারাবৃত লাপলাণ্ড দেশের এস্কুইমক্স্ শ্বেতবর্ণ নহে; অগ্নিকুণ্ড সদৃশ সাহারা মরুভূমির নিকটবর্ত্তী দেশের টুয়েগ জাতিও কৃষ্ণবর্ণ নহে। ফলতঃ, শীতপ্রধান দেশে শ্বেতবর্ণ এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কৃষ্ণবর্ণ, এ মত কোন ক্রমেই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বর্ণ শারীর ক্রিয়ার ফল। ব্যক্তিগত শারীর-ক্রিয়ার ফল কালক্রমে জাতিগত আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং বর্ণ জাতিগত; আর, ত্বকের অবস্থাগত। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের নরনারী যৌন সম্বন্ধে সংগত হইলে মিশ্র বর্ণের বংশানুক্রম বিধি (Mendel's Law) অনুসারে পর পর বংশে বিভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন জাতিগত বর্ণ স্থির থাকে না। অনতি-বিলম্বেই শ্বেত জাতির বহু ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ অথবা কটা বর্ণ হয়; তদ্রূপ কৃষ্ণবর্ণ বংশেও এই কারণেই শ্বেতবর্ণ অপত্য লাভ হইতে পারে।

কিন্তু, সকল স্থলেই এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বর্ণ যখন প্রধানতঃ শারীর-ক্রিয়ার ফল, তখন যাহাদিগের বর্ণ

---

(১০) শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ প্রবল। পণ্ডিত Figuier বলেন, "Only four or five generations of mixed blood are required in order to render the Negro stock white and no more are wanted to make the white black." The Human Race. p. 573 এতদ্দেশের ফিরিঙ্গিগণ ৩।৪ পুরুষেই কাল হইয়া গেল।

(১১) কেহ ইহাকে কুকুরছাতা বলেন। ইহা Fungus শ্রেণীর উদ্ভিদ।

(১২) যাঁহারা শীত বশতঃ সাদাবর্ণ ও গ্রীষ্ম বশতঃ কালবর্ণ বলেন, তাঁহাদিগকে সংক্ষেপে ঐরূপ বলিলাম।

বিভিন্ন তাহাদিগের শারীর-ক্রিয়াও বিভিন্ন। অল্প বর্ণভেদে অল্প ক্রিয়াভেদ, অধিক বর্ণভেদে অধিক ক্রিয়াভেদ। তাহা জাতিরও যে প্রকার ব্যক্তিরও সেই প্রকার। প্রকার একই শ্রেণীর, কেবল মাত্রায় তারতম্য। এক জাতিস্থ বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিগণ মধ্যে শারীর ক্রিয়াভেদ যে পরিমাণ হইয়া থাকে, বিভিন্ন জাতিস্থ বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিগণ মধ্যে শারীর ক্রিয়াভেদ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে হয়, এই মাত্র প্রভেদ।

এই সিদ্ধান্ত বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনার সময় বিশেষ ভাবে আবশ্যক হইবে।

সারনাথের ইতিহাস

(সমালোচনা)

[অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী

সে দিন (২৩শে চৈত্র, ১৩২৫) "বারাণসী শাখা সাহিত্য পরিষদে"র বিশেষ অধিবেশনে কবিবর স্যর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"কাশীর পার্শ্বেই ভারতের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ক্ষেত্র সারনাথ; এই বিভাগেও এখানকার সাহিত্য-পরিষদ্ অনেক কাজ করিতে পারেন। একজন বাঙ্গালী সারনাথের সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছেন। বইখানি পড়িয়া আমি আনন্দ লাভ করিয়াছি।"

"সারনাথের ইতিহাস"-লেখক এই বাঙ্গালীর নাম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ। গ্রন্থকার সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত; ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার লিখিত গবেষণাপূর্ণ নানা সন্দর্ভ প্রায়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অল্পকাল মধ্যে বঙ্গভাষায় কয়েকখানি ভাল ভাল ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে। ইহা যে আনন্দের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কপিলবাস্তু, কুশীনগর, বুদ্ধগয়া ও সারনাথ—এই চারিটী স্থান, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মহাতীর্থ। তন্মধ্যে এই সারনাথেই ধ র্ম্ম চ ক্র প্র ব র্ত্ত ন সূ ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানেই তাঁহার নবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। পালি গ্রন্থে সারনাথের নাম—ই সি প ত ন মি গ দা য়। এই ইসিপতন মিগদায়ে বসিয়াই বুদ্ধদেব পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকট আ র্য্য অ ষ্টা ঙ্গি ক মা র্গে র নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"এক সময়ে এই সারনাথে অথবা ইসিপতন মিগদায়ে বহুশত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী একত্র সম্মিলিত হইতেন, শত-শত ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ "সদ্ধর্ম্মে"র আচরণে সম্বদ্ধ হইয়া নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইতেন। একদিন সারনাথেই ভারতের প্রান্তদেশ হইতে,—চীন, জাপান, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ হইতে তীর্থযাত্রিগণ অপূর্ব্ব পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ছুটিয়া আসিতেন। * * * সেই অনাড়ম্বর বৈরাগ্য-কথা স্মরণ করিলে আজিও আমাদিগকে অপূর্ব্ব পুলকে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। কালের অখণ্ডনীয় পরিবর্ত্তন ধারায় আজ যে ধ্বংসাবশেষের বিরাট্ ভূমিতে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের কৌতূহল দৃষ্টি নূতন-নূতন তথ্যাবিষ্কারের খ্যাতি-লালসায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, সেই ভূমিখণ্ডেই একদিন বৌদ্ধ যোগিগণ পরপারের জন্য প্রশান্ত সুস্থির মনে মহাপীঠের গভীর সাধনায় নিমগ্ন হইতেন। আবার, এই সারনাথেই অশোকের রাজাজ্ঞা বিঘোষিত হইয়াছিল, তাঁহার সুচারু পাষাণ-স্তম্ভ মস্তক উত্তোলিত করিয়াছিল। অশোকের পরে মহারাজ কনিষ্কও সারনাথ বিহারের নানা উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সর্ব্বধর্ম্ম-প্রতিপালক গুপ্ত রাজগণও প্রত্যক্ষ ভাবে এ স্থানের কোন উন্নতি না করিলেও, তাঁহাদিগের সময়েই ইহার শিল্প-কীর্ত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। * * মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের পরে বৌদ্ধধর্ম্মের হ্রাসের যে সূত্রপাত হইয়াছিল, এ স্থানেও তাহার পরিচয় বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের নবাভ্যুদয়ে পালরাজগণ কোন প্রকারে বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। * * দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্ক-মুসলমানগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে অন্তর্হিত হইল, সারনাথের বিখ্যাত বিহারও তদবধি পতিত হইয়া পড়িল। এই সপ্তদশ শতাব্দী ধরিয়া সারনাথ বিদ্যা, সাধনা ও ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়া যে খ্যাতি রক্ষা করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস নিতান্ত অবহেলার বিষয় নহে।"

—(১-২ পৃঃ)

অধ্যাপক বৃন্দাবনচন্দ্র, অনেক বৎসরের পরিশ্রমে বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করিয়া সারনাথের একটী সম্পূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের সহিত সারনাথের সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া, বর্ত্তমান চিত্র-শালিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত, এই গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায়। সারনাথে প্রাপ্ত লিপিগুলিরও কালক্রমানুসারে বিভাগ করিয়া গ্রন্থকার সুন্দর ভাবে তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন। ফল কথা, সারনাথ সম্বন্ধে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ, ইতঃপূর্ব্বে কোনও ভাষাতেই রচিত হয়

নাই। গ্রন্থকার, যে সময়ে সারনাথের একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার অভিপ্রায়ে "আর্য্যাবর্ত্ত", "ভারতী" "Indian Antiquary" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন, তখন সারনাথ সম্বন্ধে কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থই বর্ত্তমান ছিল না। দয়ারাম সাহনী রচিত সারনাথের ক্যাটালগ তাহার অনেক পরে বাহির হয়। তার পর, অধ্যাপক বৃন্দাবনচন্দ্র এই "সারনাথের" ইতিহাসে অনেক নূতন কথা লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার ইংরাজী ভাষায় সুলেখক। তিনি এই গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় লিখিলে সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিতেন; তথাপি তিনি যে এই ইতিহাস-গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় রচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার অকৃত্রিম বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ পি-এইচ-ডি এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ভূমিকার উপসংহারে যথার্থই তিনি লিখিয়াছেন,—"গ্রন্থখানি বিষয় গৌরবে, বিচার-নিপুণতায় ও ভাষার মাধুর্য্যে অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইহার সর্ব্বত্র সমাদর একান্ত প্রার্থনীয়।"

"সারনাথের ইতিহাস" সাতখানি চিত্রে সুশোভিত; ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। মূল্য ১।০ টাকা। প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স) ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহিত্য-সংস্কার

[শ্রীনিবিড়ানন্দ নকলনবীশ]

বাঙ্গালার সাহিত্যিক ধুরন্ধরেরা যখন "সতী"র উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন, "বেহুলা"কে ভেলা সমেত জলে ডুবাইতে উদ্যত, "শান্তিনিকেতনে" অবিশ্রান্ত লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন স্বর্গের সাহিত্যরথিগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্বানে নন্দন কাননের square field এ একটি সাহিত্য সভাধিবেশন হইল; ও তথায় অমরার সাহিত্যিকবৃন্দ বাঙ্গালা সাহিত্য সংস্কার সম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। (বলা বাহুল্য, দেবর্ষি নারদ উক্ত সভায় বীণাবাদন করিয়াছিলেন এবং opening ও closing song গাহিয়া সভার মর্য্যাদা সম্যকরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন।) সভায় স্থিরীকৃত হইল যে, স্বর্গবাসী যে-কোন-চারিজন সাহিত্য-সেবী বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা পরিদর্শন করিতে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু কে কে আসিবেন, এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু, ইন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কেহই সম্মত নহেন। কি জানি কি একটা নিগূঢ় কারণে সকলেই সশঙ্ক। বঙ্কিম ও হেমচন্দ্রের ত বিশেষ আপত্তি। পূর্ব্ব বঙ্গের দীন কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের মুখে তাঁহারা বাঙ্গালার সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা সম্যক অবগত হইয়া অবধি বাঙ্গালার নামটি পর্য্যন্ত মুখে আনেন না। বিষম গণ্ডগোল; কিছুতেই ইহার মীমাংসা হয় না। অবশেষে মাইকেল lottery র প্রস্তাব করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন ইহাতেও আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু "ভোটে" তাঁহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। যথাকালে lottery ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়—নাম উঠিল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, মধুসূদন ও দ্বিজেন্দ্রলালের। সভা ভঙ্গ হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ত পা চলে-চলে চলে না। আতঙ্কিত ছাত্রের পরীক্ষা মন্দিরে প্রথম পাদক্ষেপের মত পা চলে চলে চলে না; কারাদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত, শ্লথপদ ব্যক্তিবিশেষের মত পা চলে-চলে চলে না; 'কালাচাঁদ' প্রেমোন্মত্ত, ঈষন্মুদিত নয়ন, কালিমমণ্ডিত বদন কঙ্কালসারের গঙ্গাস্নান গমনের মত পা চলে চলে চলে না। হেমচন্দ্রের temperature 97 এ গিয়া দাঁড়াইল। দ্বিজেন্দ্রলাল ত স্পষ্টই মুখ ফুটিয়া বলিলেন—

"একটা ভীষণ বিপদ বিভীষিকার মত হাঁ করে' আমাদের অদূর ভবিষ্যতে দাঁড়িয়ে আছে। সে মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ, হিংসার চেয়েও ক্রূর, মড়কের চেয়েও নির্ম্মম। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না, এঁরা আমাদের এই চারজনকে মর বাঙ্গালায় পাঠিয়ে কি কাজই বা করাবেন; চারজনের ফের্‌বার আশাও খুব কম। এ যেন একটা উৎপীড়ন, একটা নিষ্পেষণ, একটা অত্যাচার!"

দ্বিজেন্দ্রলালের কথাগুলি শুনিয়া হেমচন্দ্রের কথঞ্চিৎ জীবনী সঞ্চার হইল। তিনি নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—

দিক দীনবন্ধু, দিক হে নবীন,
দিক ইন্দ্রনাথ, হে জ্ঞানপ্রবীণ,
নিজেদের রাখি শান্তি নিরাপদে,
মোদেরে ঠেলিছ বিষম বিপদে,
ইহা তোমাদের শঠতা শুধু।
প্রয়োজন হ'লে হেথায় মরিব,
কভু না ফিরিব, কারে না ডরিব,
কাপুরুষপ্রায় কটিনা বাঁধিব,
না বাহিব পথ, চল ভাই দ্বিজু,
এস হে বঙ্কিম, ওঠ না মধু?

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মধুসূদন তখন অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন—

সত্য যা কহিলে বন্ধু, কিন্তু কি কুক্ষণে
হায় প্রস্থানিত হেন, ভাবিয়া না ভাবি
তিল! লভিলাম যদি ঘটিবে সঙ্কট
হেন, সে প্রমাদ সাধি হানি কি কুঠার
আপনা হইতে কভু আপনার পদে
দুর্ভাগ্য? কি করিনু, উঃ, আপনি মজিনু
হায় সবে মজাইনু। হায়রে যেমতি
মজিলা কর্ব্বুরকুল অম্বুদে অর্ব্বুদে
নৈকষেয় অপরাধে একদা অকালে।

কবিবর ভারতচন্দ্র এতক্ষণ এক কোণে বসিয়া তাঁহার সদ্যঃপ্রসূত "বঙ্গদেশ সুন্দরী" কাব্যখানিকে কোন্ মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষের শ্রীকরে সমর্পণ করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। বঙ্গদেশ যাত্রায় আদেশপ্রাপ্ত কবিগণের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে আসিলেন। বলিলেন—

বল ক্রন্দন ভাই কিসের তরে,
চলি যাও সুখে সব গর্ব্ব ভরে।
অতি তুচ্ছ ভয়ে ছি ছি মূর্চ্ছিত হে,
সব সাহস বঞ্চিত কুঞ্চিত হে!
জগবন্দন ভরত নন্দন রে,
ঘন ক্রন্দন, নাহিক স্পন্দন রে!

আরও জনে জনে নানা উৎসাহ-বাণীতে সকলকে বুঝাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। বসিয়া বসিয়া এতক্ষণ শুক্লাম্বরা সর্ব্বসন্তাপ সংহারিণী শিক্ষকাধ্যাপক-ভর্ৎসিত-জন-চিত্তবিকারবিনাশিনী সিগারেট দেবীর সেবায় তন্ময় হইয়াছিলেন। কুণ্ডলীকৃত ধূম্ররাশি তাঁহার স্বর্গ-সমীর-সঞ্জাত গুম্ফগুচ্ছে লুক্কায়িত থাকিয়া বরেণ্যগণকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছিল।

(২)

যথাকালে তাঁহাদিগকে রওনা করিবার জন্য মন্দাকিনী তীরে এক বিরাট জনতা আরম্ভ হইল। আজ আর অমরার বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির কাহারও আসিতে বাকী নাই। আজ এই বিদায়-মিছিলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুমোদনে ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে স্বামী বিবেকানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি বিদায়কালে জলদ-নির্ঘোষে যাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

সহোদর চতুষ্টয়! শুধু বাঙ্গলা বলে' নয়, সমগ্র ভারতটাই উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। সাহিত্যে বিষম আবর্জ্জনা জন্মেছে; সমালোচকেরা একদেশদর্শী হ'য়ে পড়েছে। আপনারা অতি মহৎ ব্রত নিয়ে বাঙ্গলায় যাচ্ছেন। অনেক কবি আগাছার মত সাহিত্যক্ষেত্রকে ছেয়ে ফেলেছে। আপনারা সে সব বেছে বেছে বের করবেন। ঢুকবেন—মুদি-মাল্লার দোকানে, গোলাগঞ্জ বাজারে, পাট তেল-কল-কারখানার কুঠরীতে-কুঠরীতে; ঢুকবেন—হাজার বাধা পদদলিত করে' গবর্ণমেন্ট অফিসের চেম্বারে-চেম্বারে; ঢুকবেন—স্কুল-কলেজের মেসে-মেসে, হোষ্টেলে হোষ্টেলে। ঢুকে' এক-একটা রোদে পাকা, টেঁসো কবি ও সাহিত্যিক টেনে টেনে বের করবেন। জানবেন—এ শুধু সাহিত্য-সংস্কার নয়, মা ভারতীকে অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা করা। যখন এই মহৎ ব্রত নিয়ে যাচ্ছেন, তখন গৌরবের সঙ্গে এর উদ্‌যাপন করতে হবে। যখন যাচ্ছেন, তখন একটা দাগ রেখে আসবেন।

(৩)

সমগ্র বাঙ্গালাময় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। স্বর্গের সাহিত্যিক-চতুষ্টয় কলিকাতায় আসিতেছেন, এই শুভ

সমাচার লোকে-লোকে, মুখে-মুখে, তারে-তারে, থামে-থামে, কার্ডে-কার্ডে, দিকে-দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। স্কুলের ছাত্রেরা শিক্ষকের বেত্রাঘাতকে তুচ্ছ করিল, কলেজের ছাত্রেরা percentage কে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিল, অফিসার বাবুরা বিলাতী বিনামার অনুভূতি একেবারে ভুলিয়া গেলেন। স্বদেশ সেবায় যাহারা এতদিন মাতোয়ারা ছিলেন, তাঁহারাও এদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কেবলমাত্র উকিলেরা কাছারীর মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না এবং চামারেরা রাস্তার "মোড়ে মোড়ে" বসিয়া থাকিয়া অধোবদনে পথিকগণের পাদুকার প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

এদিকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভা-মণ্ডপ তৈয়ারী হইতে লাগিল। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তাহারা মজুর দ্বারা কোনও কাজ করিতে দিতেছে না। নিজেরাই বুকের রক্ত দিয়া, বাহুর শক্তি দিয়া, উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সভার কর্তৃপক্ষেরও মজুরের খরচ বাঁচিয়া গিয়াছে। কেবল "কাঁচি" মার্কা সিগারেটে যাহা কিছু খরচ হইতেছে মাত্র।

'Bengal Literary Society' এই উদ্যোগ আয়োজনের বিশেষ ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। আগামী কল্য সভা। সুতরাং অদ্যই মফঃস্বলের কবিকুল দলে দলে, পালে-পালে, যূথে-যূথে, কাতারে-কাতারে উপনীত হইলেন। এক এক জন কবির এক-এক রকম ভাব। কাহারও উদাস দৃষ্টি ঊর্দ্ধে উত্থিত, কাহারও ললাট চিন্তার প্রাবল্যে ত্রিরেখায় কুঞ্চিত, কেহ বা চক্ষু-দুইটিকে 'উপ নয়নে' আবৃত রাখিয়া আদি-রসের plot খুঁজিতেছেন ও শিস্ দিতেছেন। অধিকাংশ কবিরই চাঁচর চিকুর তরঙ্গায়িত। আগামী কল্যকার সভায় পাঠ করিবার জন্য কবিবৃন্দ আপন-আপন কবিতা-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। কবিতা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তজ্জন্য সকলেই সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিলেন। কালরাত্রি প্রভাত হইল।

প্রভাত হইবামাত্র সকলে সভামণ্ডপে উপনীত হইলেন। সকলেই ঊর্দ্ধমুখে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন। যেই গগন মণ্ডলে সূর্য্যদেব প্রথম দেখা দিয়াছেন, তখনই জনৈক দূরবীক্ষণ-লগ্নাক্ষ বাবু সোৎসাহে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঐ পুষ্পক রথ।" অমনি অযুত কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" ও "Hip Hip Hurrah" ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। পুষ্পক রথখানি যখন সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইল, তখন উহা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের প্রায় দুই মাইল উত্তর দিকে হেলিতে দুলিতে আসিতেছে। দেখিবামাত্র সহস্র সহস্র কবি ও সাহিত্যিক সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া, ছিন্নসূত্র ঘুড়ীর পশ্চাতে, বালকবৃন্দের মত, "পুষ্পক" লক্ষ্য করিয়া দৌড়াতে আরম্ভ করিলেন। "পুষ্পক" ব্যোমপথে হেলিতে দুলিতে চলিতে লাগিল এবং কলিকাতার রাজবর্ত্মে অসংখ্য ব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে তুরঙ্গ গতিতে ছুটিতে লাগিল। "পুষ্পক" যখন হেদোর উপর দিয়া বীডন স্কোয়ারের উপরে, বিরাট জনমণ্ডলী তখন ছত্রভঙ্গ হইয়া কেহ বা বলরাম দের ষ্ট্রীট দিয়া Short-cut করিতে লাগিলেন, কেহ বা বিডন ষ্ট্রীট দিয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে চলিলেন, কেহ কেহ সোজা মানিকতলা ষ্ট্রীট দিয়া দৌড়িতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত বৃদ্ধেরা হেদোর ধারেই বসিয়া পড়িলেন।

"পুষ্পক" নিমেষের মধ্যে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে উপনীত হইল। স্বর্গবাসী সাহিত্যিক চতুষ্টয় অবতরণ করিয়া দেখেন যে, সভামণ্ডপ জনশূন্য। বঙ্কিমচন্দ্র এতাদৃশ ব্যাপার সন্দর্শন জনিত একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, হেমচন্দ্র 'আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে' বসিয়া পড়িলেন, মধুসূদন 'নিশার স্বপন সম' ব্যাপার দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল ত 'স্থাণুর মত নিশ্চল, মৃতের মত নিস্পন্দ, স্তম্ভিতের মত নির্ব্বাক্'।

ক্রমশঃ লোক জুটিতে আরম্ভ হইল। কেহ ট্রামে, কেহ মোটরে, কেহ সাইকেলে ক্রমে-ক্রমে সকলেই আসিলেন। সমাগত সাহিত্যিক চতুষ্টয়কে নব্য কবিকুল পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন।

(৪)

যথারীতি সভা আরম্ভ হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অশেষ-মণিমণ্ডিত হারমধ্যস্থ-কৌস্তুভবৎ সভাপতির সিংহাসন সমালঙ্কৃত করিলেন। পুনরায় তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হইল। সভাপতির দক্ষিণে হেমচন্দ্র ও মধুসূদন এবং বামে দ্বিজেন্দ্রলাল। সভারম্ভে আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালার জনৈক শ্রেষ্ঠ কবির সাগরেদ রচিত একটি অভ্যর্থনা সঙ্গীত গীত হইল।

(গান)

কোন্ অচিন্ দেশের আলোক থেকে
এলে মোদের মাঝখানে।
ভরিয়ে দিলে পরাণ মোদের
কী যে মধুর তানে।
ওগো, কত কালের চেনা,
আজি চুকিয়ে দেব দেনা,
আজি নিবিড় ছোঁয়ে উঠ্‌চে পুলক
আলোক ছোঁয়া প্রাণে।
কী যে মধুর তানে।
আজি জোয়ার এল সাগর বুকে,
পাগল হাওয়া বইলো রুখে',
আবেগ ভরে কইলে কথা
হটেল কানে কানে।
কী যে মধুর তানে।
আজি বিজলী ঘন বাদল রাতে,
জাগিয়ে দিলে মচ্ছ নাতে,
বাড়িয়ে দিলে অসীম পটে
কোমল তুলির টানে।
কী যে মধুর তানে।

গান থামিল। চতুর্দ্দিকে করতালি ও আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইল। যাহারা অনুপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের টেলিগ্রাম ও পত্র পঠিত হইল।

এইবার জনৈক উদীয়মান সাহিত্যিক "বাঙ্গালা সাহিত্যের অধোগতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। তিনি মহা আস্ফালনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ তর্জ্জনী সঞ্চালন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন--

Gentlemen,

Bengali আমাদের mother-language, Bengal আমাদের mother-land. কিন্তু কি unfortunate আমরা, আমাদের এই জননী জন্মভূমির প্রতি for a moment দৃক্‌পাত করিনে। Moreover, Gentlemen, moreover আমরা তাঁর উপর একটা lawless conduct দেখিয়ে আস্‌ছি। সহজ কথায় বল্‌তে গেলে, Gentlemen, আমরা যেন murder caseএর accused হ'য়ে পড়েছি। সকল পাপের একটা expiation আছে, কিন্তু—কিন্তু Gentleman, it is too gross an offence to be atoned for. To speak the truth, আমাদের এই mother-languageএর প্রতি বড়ই oppression আরম্ভ হ'য়ে পড়েছে। Sanskrit হাজার হ'লেও আমাদের mother-language নয়, সে কেন Gentlemen, এই পবিত্র মন্দিরে trespass করবে? মসলমান ভ্রাতাদেরও mother-language বাঙ্গলা, তাঁরাই বা Persianকে কোন্ law অনুসারে allow করেন।

হঠাৎ সভাপতি মহাশয় বক্তা মহাশয়কে এক টুকরা কাগজ দিয়া পাঠাইলেন। উহা পাঠ করিয়া তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায়, ক্ষুণ্ণ মনে স্বস্থানে উপবেশন করিলেন।

এইবার কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন—

"বাজ্ রে ভেরী, বাজ্ এই রবে,
পূরিয়াছে ধরা সাহিত্য গৌরবে,
সবাই শীতল সে মহা সৌরভে
বাঙ্গালা শুধুই পিছিয়ে রয়।
আরবী, পারসী, ইংরাজী, লাতিন,
তারাও প্রধান, তারাও স্বাধীন,
হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, উড়িয়া,
ফেলেছে জড়তা সুদূরে ছুঁড়িয়া,
বাঙ্গালা শুধুই পিছিয়ে রয়।
ধিক্ বঙ্গবাসী, ধিক বঙ্গ-কবি,
জাগে না কি প্রাণে অতীতের ছবি,
উদিবে না কি রে সে গৌরব-রবি
সে কি রে অলীক স্বপন কথা?
ভুলিয়াছ সব চণ্ডীদাস গান,
ঈশ্বরচন্দ্রের নাহি রে সম্মান,
কাশী কৃত্তিবাস হ'য়েছে অতীত,
—মুদি পসারীর দোকান ব্যতীত---
কহিতে উপজে হৃদয়ে ব্যথা!
"নবীনের" কোথা সেই ভীম ভাষ,
"কুরুক্ষেত্র" আর "পলাশী" "প্রভাস,"
কোথা "অমিতাভ" কোথা "রৈবতক,"
গিরিশের কোথা সে মহানাটক
কভু কি ফিরিয়া পাব না আর?

"দীনবন্ধুর" সে ললিত ছাঁদ,
সে "নীলদর্পণ" সেই "নিমচাঁদ"
ভাঙ্গিয়াছে সেই সুকঠোর বাঁধ,
তুলনা খুঁজিলে বিরল যার।
"এখন তোরা যে শত কোটি তার"
পাড়ুকা পীড়িত যত আফিসার,
পারিস ত খুব কলম পিষিতে,
খাইতে ঔষধ শিশিতে শিশিতে,
হিমাদ্রি অবধি কুমারী হইতে,
বদলী হইয়া চাক্‌রী বহিতে,
বারেক তাহাতে হয় না ভুল।

এমন সময়ে শ্রোতৃবৃন্দ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"Shame" "Shame", কেহ বলিলেন "hear" "hear"; বক্তৃতা চলিতে লাগিল—

তেমতি কবিতা ভাবছন্দোযুক্ত,
বিশাণ গোলাম লেখনী-প্রসূত,
কবির দেহটি ম্যালেরিয়া ভরা,
কবিতায় তাই ঘিরিয়াছে জরা,
কাটিলে শিকড় ফুটে কি ফুল?
ছিল বটে আগে উপদেশ-ফলে,
হইত কবিরা তৈয়ার সকলে,
কবিতা বাখানায় আসিত সদলে
শান্ত শিষ্ট সমালোচকগণ।
"এখন সে দিন নাহিক রে আর,"
শিষ্ট মিষ্ট বোলে সাহিত্য-সংস্কার
"হবে না হবে'না খোল তরবার,"
এ সব কবিরা নহে তেমন।

হেমচন্দ্রের বক্তৃতা শেষ হইলে কতিপয় কবি পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। এইবার বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের এক নবীন সেবক বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"খেয়া-ঘাটের ওপার থেকে যে চার জন আমাদের এই ভাঙা-ঘরের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদেরকে আমরা বরণ কোরে তুলে' নিচ্চি। কোনো-কিছু যখন সীমার বাইরে গিয়ে পড়ে, তখনি তাকে অসীমের রাজ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই হয়। তাই, আমাদের ভাষা-মায়ের উপর এই যে অত্যাচার যখন সীমার বাইরে গিয়ে পড়্‌লো, তখন ঈশ্বর পাঠিয়ে দিলেন অসীমের রাজ্য থেকে এই চার জন দেবদূত।

"কবিত্ব সেইখেনে নয়, যেইখেনে কবি শুধু শব্দ সাগরের বেলায় বোসে বোসে উপলখণ্ড সংগ্রহ করচেন। কবিত্ব যখন ঊর্ম্মিমালার ফেণার মুকুট পোরে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়, তখনি আমরা কবির বাহাদুরী বুঝ্‌তে পারি! এইটে, আমাদের দুর্ভাগা দেশের সমালোচকেরা বোঝ্‌বার ঘণ্টার মধ্যে ভালো কোরে ধর্‌তে পারেন না।

"কবিতা হচ্চে সাহিত্যের এসেন্স্। বিলাসকে সন্ন্যাসীর বিভূতির মতো যাঁরা জীবন-মরণের যাত্রা-পথে টিকেট কোরে চলেচেন, তাঁরাও ভেতরকার রুমালখানায় দু'ফোঁটা মাখিয়ে নিয়েচেন। এমনি কোরে কবিতা অপ্সরী গন্ধ ও অনুভূতি বিলিয়ে দিতে দিতে কোন অজানা দেশের উদ্দেশে ডানা মেলে চলেচেন। এইটে সকলকে বুঝে' নিতেই হবে, কবিতা নিয়ে আলোচনা করবার আগেকার মুহূর্ত্তে।

"আমাদের দেশের কবিরা বড্ড নিরীহ, তাই সমালোচকদের অত্যাচার চোখ বুজে স'য়ে আসচেন। এঁরা তরল খুব, কিন্তু সোডা ওয়াটারের মতো অতুল শক্তি বুকে কোরে এদের দেশ-মাতার কোলের বোতলে বোসে আছেন। এরা মায়ের কোলে বোসে আছেন, তাই কেয়ার করচেন না নিন্দুকদের এই ব্যবসা চালানো বুলি। কিন্তু সবারি একটা সীমা আছে; যখন এই স'য়ে যাওয়াটা সীমা অতিক্রম করচে, তখন এঁরা বেরিয়ে পড়্‌চেন যে দিকে খুসী সে দিক দিয়ে। আর তখনি এঁরা এঁদের শক্তির পরিচয় দিচ্চেন, যখন আঘাত পড়চে এঁদের মাথার উপরে।

"আরেক কথা বল্‌তে হোতো বাংলা ব্যাকরণের অত্যাচার সম্বন্ধে। কিন্তু সভাপতি মহাশয় শ্লিপ পাঠিয়ে দিয়েচেন, তাইতে আমি বোস্‌তে বাধ্য হলুম।"

টিফিনের জন্য আপাততঃ সভা বন্ধ হইল। বক্তৃবৃন্দ ও শ্রোতৃবর্গ স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

(৫)

অপরাহ্নে সভায় যাইবার জন্য সকলেই রওনা হইয়াছেন। কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়াই সকলেই সন্ত্রস্ত-গতিতে

প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। পরদিন সংবাদপত্র পাঠ করিয়া জানা গেল—"তিন জন রাজনৈতিক সন্দেহভাজন বহুদিন হইতে পলাতক ছিল, সম্প্রতি তাহারা ধরা পড়িয়াছে।" "পম্পকে"র নিকট মাইকেল একাকী বসিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন :—

"ছিল আশা ভ্রাতৃগণ, আসিয়া হেথায়
বন্ধু চতুষ্টয় মোরা, সংস্কারিয়া নব
বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্র, সংস্কারিয়া দেশ
চলি যাব মহাসুখে। সাহিত্য কানন
পূর্ণ শোভা অনুপম সদা উজলিবে
জন্মভূমি, পশ্চাতিবে কবিতা কুসুম
বিতরি প্রবাস দেশে ;— ষোড়শ মাতে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'
কিন্তু বৃথা আশা! চলি গেলা বন্ধুত্রয়
কেবা কোন্ অন্ধকারে, হায় রে যেমতি
পড়ি গেলা ক্রৌঞ্চকুল নিষাদের শরে
নিমেষে। শুনিবে যবে স্বর্গবাসী সব,
সান্ত্বনিব কোন ভাষে, হায় রে কেমনে?
"কোথা দ্বিজ, কোথা হেম, কোথায় বঙ্কিম"
সঘনে শুধাবে যবে অমর নিকর
কি ক'য়ে বুঝাব সবে, হায় রে কি ক'য়ে?
হা মিত্র, হা বীরশ্রেষ্ঠ, চিরজয়ী রণে,
হা মাতঃ সাহিত্য লক্ষ্মি, কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া, দারুণ বিধি অভাগার ভালে?"

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শীতের সূর্য্য অপরাহ্ণ বেলায় ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, এবং তাহারই ঈষত্তপ্ত কিরণে শোননদের পরপারবর্ত্তী সুদূর বিস্তীর্ণ বালুময় ধূ ধূ করিতেছিল। এমনি সময়ে একটা বাঙ্গ্লো বাটীর বারান্দার রেলিং ধরিয়া অচলা সেই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার নিজের জীবনের সঙ্গে ওই দগ্ধ মরুখণ্ডের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল কি না, সে অন্য কথা, কিন্তু ওই দু'টি অপলক চক্ষুর প্রতি পলকমাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইতে পারিত যে, তেমন করিয়া চাহিয়া থাকিলে দেখা কিছুই যায় না, কেবল সমস্ত সংসারটা একটা বিচিত্র ও বিরাট ছায়াবাজীর মত প্রতীয়মান হয়।

দিদি?

অচলা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। যে মেয়েটি একদিন 'রাক্ষসী' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া আরা ষ্টেসনে নামিয়া গিয়াছিল এ সেই। কাছে আসিয়া অচলার উদ্ভ্রান্ত ও একান্ত শ্রীহীন মুখের প্রতি মুহূর্ত্তকাল দৃষ্টি রাখিয়া অভিমানের সুরে কহিল, আচ্ছা, দিদি, সবাই দেখ্‌চে সুরেশবাবু ভাল হয়ে গেছেন, ডাক্তার বল্‌চেন আর একবিন্দু ভয় নেই, তবু যে দিবারাত্রি তোমার ভাবনা ঘোচেনা, মুখে হাসি ফোটেনা এটা কি তোমার বাড়াবাড়ি নয়? আমাদেরও কর্ত্তারা আছেন, তাদের অসুখ বিসুখেও আমরা ভেবে সারা হই, কিন্তু সত্যি বল্‌চি ভাই, তোমার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

অচলা মুখ ফিরাইয়া লইয়া শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, কোন উত্তর দিল্‌না।

মেয়েটি রাগ করিয়া বলিল, ইস্! ফোঁস্ করে যে কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লে বড়! বলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন অচলার নিকট হইতে কোনপ্রকার জবাব পাইলনা, তখন তাহার একখানি হাত নিজের মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সুরমাদিদি, সত্যি কথা বোলো ভাই, আমাদের বাড়ীতে তোমার একদণ্ডও মন টিক্‌চেনা, না? বোধ হয় খুব অসুবিধে আর কষ্ট হচ্চে, সত্যি না?

অচলা নদীর দিকে যেমন চাহিয়া ছিল তেম্‌নি চাহিয়া

রহিল, কিন্তু এবার উত্তর দিল। কহিল, তোমার শ্বশুর আমার যে উপকার করেছেন সে কি এ জন্মে কখনো ভুলতে পারবো ভাই।

মেয়েটি হাসিল, কহিল, ভোলবার জন্যেই যেন তোমাকে আমি সাধাসাধি করে বেড়াচ্চি! এবং পরক্ষণেই কৃত্রিম অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, আর সেইজন্যেই বুঝি তখন বাবার অত ডাকাডাকিতেও সাড়া দিলেনা? তুমি ভাবলে বুড়ো যখন তখন—

অচলা একান্ত বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, না, এমন কখ্খনো হতে পারে না—

রাক্ষসী জবাব দিল, পারেনা বই কি! তবু যদি না আমি নিজে সাক্ষী থাকতুম! ঠাকুর ঘর থেকে আমার কাণে গেল, সুরমা? ওমা সুরমা? এমন চার পাঁচবার শুনলুম বাবা ডাকচেন তোমাকে। পূজোর সাজ করছিলুম, একপাশে ঠেলে রেখে ছুটে এসে দেখি তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্চেন। সত্যি বলচি দিদি তামাসা করচিনে।

অচলাই শুধু মনে মনে বুঝিল কেন বৃদ্ধের 'সুরমা' আহ্বান তাহার বিমনা-চিত্তের দ্বার খুঁজিয়া পায় নাই। তথাপি সে লজ্জায় অনুতাপে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কহিল, বোধ হয় ভাই ঘরের মধ্যে—

রাক্ষসী বলিল, কোথায় ঘরের মধ্যে! যাঁর জন্যে ঘর তিনি যে তখন বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন! উঠোন থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম ঠিক এমনি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। বলিয়া একটু থামিয়া হাসিমুখে বলিল, কিন্তু তুমি ত আর তোমাতে ছিলেনা ভাই যে, বুড়ো-হুড়োর ডাক শুনতে পাবে! যা' ভাবছিলে তা' যদি বলি' ত—

অচলা নীরবে পুনরায় নদীর পরপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, এই সকল ব্যঙ্গোক্তির উত্তর দিবার চেষ্টা মাত্র করিলনা। কিন্তু, এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে রাক্ষসীর নামের সহিত তাহার স্বভাবের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিলনা। এবং নামও তাহার রাক্ষসী নয়, বীণাপাণি। জন্মকালে মা মরিয়াছিল বলিয়া পিতামহী রাগ করিয়া এই অপবাদ দিয়াছিলেন, এবং প্রতিবেশী শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট হইতে এ দুর্নাম সে গোপন রাখিতে পারে নাই।

অচলাকে অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া নির্ব্বাক হইতে দেখিয়া সে মনে মনে লজ্জা পাইল, অনুতপ্ত স্বরে বলিল, আচ্ছা, সুরমা দিদি, তোমাকে কি একটা ঠাট্টাও করবার যো নেই ভাই? আমি কি জানিনে বাবাকে তুমি কত ভক্তি শ্রদ্ধা কর? তাঁর কাছে ত আমরা সমস্ত শুনেচি। তিনি সকালে বেড়িয়ে আসছিলেন, আর তুমি এই অজানা যায়গায় কাঁদতে কাঁদতে ডাক্তার খুঁজতে ছুটেছিলে। তারপরে তিনি তোমার সঙ্গে গিয়ে সরাই থেকে তোমার স্বামীকে বাড়ী নিয়ে এলেন। এ সবই ভগবানের কাজ দিদি, নইলে এ বাড়ীতে যে তোমাদের পায়ের ধুলো পড়বে সেদিন গাড়ীতে এ কথা কে ভেবেছিল! কিন্তু আমার প্রশ্নের ত জবাব হোলোনা। আমি জিজ্ঞেসা করেছিলুম আমাদের এখানে যে তোমার একদণ্ডও ভাল লাগচেনা সে আমি টের পেয়েচি। কিন্তু কেন? কি কষ্ট, কি অসুবিধে এখানে তোমাদের হচ্চে ভাই, তাই কেবল জানতে চাইচি। বলিয়া পূর্ব্বের মত এবারও ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া হঠাৎ এই মেয়েটির মনে হইল, যে কোন কারণেই হোক সে উত্তরের জন্য মিথ্যা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। তখন যাহাকে তাহার শ্বশুর সসম্মানে আশ্রয় দিয়াছেন, এবং সে নিজে সুরমা দিদি বলিয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার মুখখানা জোর করিয়া টানিয়া ফিরাইবামাত্রই দেখিতে পাইল তাহার দুই চক্ষের কোণ বাহিয়া নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা বহিয়া যাইতেছে। বীণাপাণি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং অচলা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া শূন্য দৃষ্টি অন্যত্র সঞ্চালিত করিল।

পরদিন অপরাহ্ণ বেলায় সদ্যপ্রাপ্ত একখানা মাসিকপত্র হইতে একটা ছোটগল্প বীণাপাণি অচলাকে পড়িয়া শুনাইতেছিল। একখানা বেতের চৌকির উপর অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া অচলা কতক বা শুনিতেছিল, কতক বা তাহার কাণের মধ্যে একেবারেই পৌঁছিতেছিলনা, এমনি সময়ে বীণাপাণির শ্বশুর রামচরণ লাহিড়ী মহাশয় সিঁড়ি হইতে 'মা রাক্ষসী' বলিয়া একটা ডাক দিয়া বারান্দার উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়েই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বীণাপাণি একখানা চৌকি টানিয়া আনিয়া বৃদ্ধের সন্নিকটে স্থাপিত করিয়া উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবা?

এই বৃদ্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু। তিনি ধীরে সুস্থে আসন গ্রহণ করিয়া অচলার মুখের প্রতি সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, একটা কথা আছে মা। ভট্‌চায্যি

মশাই এইমাত্র এসেছিলেন, তিনি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর নামে সঙ্কল্প করে নারায়ণকে যে তুলসী দিচ্ছিলেন তা' কাল শেষ হবে। তাই কাল তোমাকে মা, একটু কষ্ট স্বীকার করে বেলা পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকতে হবে। তিনি আমাদের বাড়ীতেই নারায়ণ এনে কাজ সমাপ্ত করে যাবেন, আর কোথাও তোমাকে যেতে হবে না। কথা শুনিয়া অচলার সমস্ত মুখ একেবারে কালীবর্ণ হইয়া উঠিল। ম্লান আলোকে বৃদ্ধের তাহা নজরে পড়িলনা, কিন্তু বীণাপাণির পড়িল। সে হিন্দু ঘরের মেয়ে, জন্মকাল হইতে এই সংস্কারের মধ্যেই মানুষ হইয়াছে, এবং পীড়িত স্বামীর কল্যাণে ইহা যে কতবড় উৎসাহ ও আনন্দের ব্যাপার তাহা সে সঙ্গীরের মতই বুঝে, কিন্তু অচলার মুখের চেহারার এই উৎকট পরিবর্ত্তনে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিলনা। তথাপি, সখীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, নারায়ণকে তুলসী দেওয়ালে ত তুমি সুরেশবাবুর জন্যে, তবে তিনি উপোস না কোরে দিদিকে করতে হবে কেন?

বৃদ্ধ সহাস্যে কহিলেন, তিনি আর তোমার এই দিদিটি কি আলাদা মা? সুরেশবাবু ত তাঁর এ অবস্থায় উপবাস করতে পারবেননা, তাই তোমার সুরমাদিদিকেই করতে হবে। শাস্ত্রে বিধি আছে, মা, কোন চিন্তা নেই।

অচলা ইহারও প্রত্যুত্তরে যখন হাঁ, না, কোন কথাই কহিলনা, তখন তাহার এই নিরুদ্যোগ নীরবতা অকস্মাৎ এই শুভানুধ্যায়ী বৃদ্ধেরও যেন চোখে পড়িয়া গেল; তিনি সোজা অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, এতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে সুরমা? বলিয়া একান্ত ও পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদের প্রত্যাশায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অচলা সহসা ইহারও কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, তাঁকে বল্‌লে তিনিই করবেন বোধ হয়।

তাহার পরে সকলেই নীরব হইয়া রহিল। কথাটা যে কিরূপ বিসদৃশ, কত কটু ও নিষ্ঠুর শুনাইল তাহা যে ব্যক্তি উচ্চারণ করিল তাহার অপেক্ষা বোধ করি কেহই অধিক অনুভব করিলনা, কিন্তু শুধু অন্তর্যামী ভিন্ন তাহা আর কেহই জানিতে পারিলনা।

বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তবে তাই হবে, বলিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন। ভৃত্য আলো দিয়া গেল, কিন্তু দু'জনেই সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মাসিকপত্রের সেই অতবড় উত্তেজক ও বলশালী গল্পের বাকিটুকু শেষ করিবার মত জোরও কাহারও মধ্যে রহিলনা।

বাহিরে অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং তাহাই ভেদ করিয়া পরপারের ধূসর সৈকত-ভূমি এক হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এই দু'টি ক্ষুব্ধ, মৌন, লজ্জিত নারীর চক্ষের উপর স্বপ্নের মত ভাসিতে লাগিল।

এই ভাবেও হয় ত আরও বহুক্ষণ কাটিতে পারিত, কিন্তু কি ভাবিয়া বীণাপাণি সহসা তাহার চৌকিটা অচলার পাশে টানিয়া আনিল, এবং নিজের ডান হাতখানি সখীর কোলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া চুপি-চুপি কহিল, ও-পারের ওই চরটার পানে চেয়ে-চেয়ে আমার কি মনে হচ্ছিল জান দিদি?—মনে হচ্ছিল যেন ঠিক তুমি। যেন অমনি অন্ধকার দিয়ে ঘেরা একটুখানি,—ওকি, এমন শিউরে উঠলে কেন ভাই?

অচলা মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক থাকিয়া ঠিক যেন প্রাণপণ চেষ্টায় গলা দিয়া একটা অস্ফুট স্বর বাহির করিয়া বলিল, হঠাৎ কেমন যেন শীত করে উঠ্‌ল ভাই।

বীণাপাণি উঠিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একখানা গরম কাপড় আনিয়া অচলার সর্ব্বাঙ্গ সযত্নে ঢাকিয়া দিয়া স্বস্থানে বসিল, কহিল, একটা কথা তোমাকে ভারি জিজ্ঞেসা করতে ইচ্ছে হয় দিদি, কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করে। যদি রাগ না কর ত—

অজানা আশঙ্কায় অচলার বুকের ভিতরটা দুলিতে লাগিল। পাছে বেশি কথা বলিতে গেলে গলা কাঁপিয়া যায় এই ভয়ে সে শুধু কেবল একটা 'না' বলিয়াই স্থির হইল।

বীণাপাণি আদর করিয়া তাহার হাতের উপর একটু-খানি চাপ দিয়া বলিতে লাগিল, এখন যেন তুমি আমার দিদি, আমি তোমার ছোট বোন। কিন্তু সে দিন গাড়ীতে ত আমি তোমার কেউ ছিলামনা, তবে কেন নিজের পরিচয় আমার কাছ থেকে অমন কোরে লুকোতে চেয়ে-ছিলে? যিনি স্বামী তাঁকে বল্‌লে কেউ নয়,—বল্‌লে পীড়িত স্বামী অন্য কামরায়, তাঁকে নিয়ে জব্বলপুরে যাচ্চ,—অথচ, সুরেশ বাবুরও তখন এতটুকু অসুখ ছিলনা, আর আমাকে ঠকাতে পারোনি। আমি ঠিক চিনেছিলাম উনি

তোমার কে। আবার বল্লে তোমরা ব্রাহ্ম, বলিয়া এবার সে একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তোমার কর্ত্তাটির পৈতের গোছা দেখ্‌লে বিষ্ণুপুরের পাচক ঠাকুরের দল পর্য্যন্ত লজ্জা পেতে পারে। আচ্ছা ভাই, কেন এত মিথ্যে কথা বলেছিলে বল ত?

অচলা জোর করিয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, যদি না বলি?

বীণাপাণি কহিল, তা'হলে আমিই বোল্‌ব। কিন্তু আগে বল, যদি ঠিক কথাটি বল্‌তে পারি কি আমাকে দেবে?

অচলার বুকের মধ্যে রক্ত চলাচল যেন বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইল। তাহার মুখের উপরে যে মৃত্যু পাণ্ডুরতা ঘনাইয়া আসিল বাতির ক্ষীণ আলোকে বীণাপাণির তাহা চোখে পড়িল, কি না, বলা কঠিন, কিন্তু সে মুখ টিপিয়া আবার একটুখানি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, কিছু দাও আর না দাও, যদি সত্যি কথাটি বলতে পারি আমাকে কি খাওয়াবে বল অচলা দিদি?

অচলার নিজের নামটা নিজের কানে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রবেশ করিল, এবং পরক্ষণ হইতেই সে এক প্রকার অর্দ্ধচেতন, অর্দ্ধঅচেতনের মত কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

বীণাপাণি কহিতে লাগিল, আমাদের দুই বোনের কিন্তু তত দোষ নেই, ভাই, দোষ যত, আমাদের কর্ত্তা দুটির। একজন জ্বরের ঘোরে তোমার সত্যি নামটি প্রকাশ করে দিলেন, আর অপরটি তাই থেকে তোমার সত্যি পরিচয়টি ভেবে-ভেবে বার করে আনলেন।

অচলা প্রাণপণ বলে তাহার বিক্ষুব্ধ বক্ষকে সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি পরিচয়টি কি শুনি? বীণাপাণি বলিল, সত্যি হোক আর নেই হোক, ভাই, বুদ্ধি যে তাঁর আছে সে কিন্তু তোমাকে মানতেই হবে। তিনি একদিন রাত্রে হঠাৎ এসে বল্‌লেন, তোমার অচলা দিদির কাণ্ডটা কি জানো গো? তিনি ঘর থেকে পালিয়ে এসেছেন। আমি রাগ কোরে বল্লুম, যাও চালাকি করতে হবে না। এ কথা দিদির কানে গেলে ইহজন্মে আর তিনি তোমার মুখ দেখ্‌বেন না। অচলা চেয়ারের হাতায় দুই মুঠা শক্ত করিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। বীণাপাণি কহিতে লাগিল, তিনি বল্‌লেন, মুখ আমার তিনি দেখুন আর নাই দেখুন, এ কথা যে সত্য সে আমি দিব্যি কোরে বল্‌তে পারি। যা' ননদের সঙ্গে ঝগড়া করেই হোক্, আর শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে বনিবনাও না হওয়াতেই হোক্, স্বামী নিয়ে তিনি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। সুরেশ বাবুর ত ভাবগতিক দেখে মনে হয় তোমার দিদি তাঁকে সমুদ্রে ডুব্‌তে হুকুম করলেও তাঁর 'না' বলার শক্তি নেই। তার পরে যেখানে হোক একটা ছদ্মনামে অজ্ঞাত-বাসে দুটিতে থাক্‌বেন, যতদিন না বুড়ো বুড়ী পৃথিবী খুঁজে সেধে-কেঁদে তাঁদের বৌ ব্যাটাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এই যদি না আসল ঘটনা হয় ত তুমি আমাকে-

আমি বল্লুম আচ্ছা, তাই যেন হোলো, কিন্তু গাড়ীতে আমার মত একটা অপরিচিত মুখ্যু মেয়েমানুষের কাছে মিথ্যে বল্‌বার দিদির কি এমন গরজ হয়েছিল? কর্ত্তা তাতে হেসে জবাব দিলেন, তোমার দিদিটি যদি তোমারই মত বুদ্ধিমতী হতেন, তা' হলে হয় ত কোন গরজই হোত না। কিন্তু তা তিনি মোটেই নয়। যাই শুন্‌লেন তোমার বাড়ী ডিহরীতে, তুমি দুদিন পরে ডিহরীতেই যাবে, তখনই তিনি অচলার বদলে সুরমা, ডিহ্‌রীর বদলে জব্বলপুর যাত্রী এবং হিন্দুর বদলে ব্রাহ্ম মহিলা হয়ে উঠ্‌লেন। এটা তোমার মাথায় ঢুকলনা, রাক্ষসী; যারা টিকিট কিনে জব্বলপুর যাত্রা করে বেরিয়েছেন, তাঁরা হঠাৎ গাড়ী বদল করে এ দিকেই বা ফিরবেন কেন, আর পীড়িত স্বামী নিয়ে কোন বাঙালীর বাড়ীতে না উঠে এই অতদূরে হিন্দুস্থানী পল্লীতে, একটা ভাঙা সরাইয়ের মধ্যে গিয়েই বা হাজির হবেন কেন? বলিতে বলিতেই বীণাপাণি অকস্মাৎ পাশে হেলিয়া অচলার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং স্নেহে প্রেমে বিগলিত হইয়া তাহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, বলনা দিদি কি হয়েছিল? আমি কোন দিন কাউকে কোন কথা বলবনা,—এই তোমাকে ছুঁয়ে আজ আমি দিব্যি করচি।

বীণাপাণির মুখে তাহাদের সম্বন্ধে এই সত্য আবিষ্কারের মিথ্যা ইতিহাস শুনিয়া অচলার সমস্ত দেহটা যেন একখণ্ড অচেতন পদার্থের মত, সখীর আলিঙ্গনের মধ্যে ঢলিয়া পড়িল। ইহজীবনের চরম লজ্জা মূর্ত্তি ধরিয়া এক পা এক-পা করিয়া যে কোথায় অগ্রসর হইয়া আসিতেছে তাহা সে চাহিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু সে যখন অত্যন্ত অকস্মাৎ অচিন্তনীয় রূপে মুখ ফিরাইয়া আর এক পথে

চলিয়া গেল, তাহাকে স্পর্শ মাত্র করিল না, তখন এই বিপুল সৌভাগ্যকে বহন করিবার মত শক্তি আর তাহাতে ছিল না। শুধু দুই চক্ষের অবিচ্ছিন্ন অশ্রুপ্রবাহ ব্যতীত বহুক্ষণ পর্যান্ত কোথাও জীবনের কোন লক্ষণ আর তাহারি মধ্যে অনুভূত হইল না।

এমন কতক্ষণ কাটিল। বীণাপাণি আপন অঞ্চলে বারবার করিয়া অচলার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সস্নেহ করুণ স্বরে কহিল, সুরমা দিদি, তুমি বয়সে বড় হলেও ছোট বোনের কথাটা রাখো ভাই, এইবার বাড়ী ফিরে যাও। আমি বলচি, এ যাত্রা তোমাদের সুযাত্রা নয়। অনেক দুঃখে হাতের নোয়াটা যদি বজায় রয়েই গেছে দিদি, তখন অভিমান করে আর গুরুজনদের দুঃখ দিয়োনা, আর তাঁদের ভাবিয়োনা। হেঁট হয়ে শ্বশুরঘরে ফিরে যেতে কোন লজ্জা, কোন অগৌরব নেই দিদি।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে পুনরায় কহিল, চুপ করে রইলে যে ভাই? যাবেনা? মা-বাপের ওপর রাগ কোরে, বাড়ী ছেড়ে সুরেশ বাবু কখনো ভাল নেই। তোমার মুখ থেকে এ কথা শুনলে তিনি খুসিই হবেন, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি।

অচলা চোখ মুছিয়া এইবার সোজা হইয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল বীণাপাণি তেমনি উৎসুক মুখে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। প্রথমটা উত্তর দিতে তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু শুধুমাত্র নির্বাক থাকিয়াই যে এই মেয়েটির কাছে মুক্তি পাওয়া যাইবেনা তাহাতে যখন আর কোন সংশয় রহিলনা, তখন সে সমস্ত সঙ্কোচ জোর করিয়া পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমাদের বাড়ী ফিরে যাবার কোন পথ নেই বীণা।

বীণাপাণি বিশ্বাস করিলনা। কহিল, কেন পথ নেই? তোমাকে আমি বেশি দিন জানিনে সত্যি, কিন্তু এটুকু জানি তাতে সমস্ত পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে দিব্যি করে বলতে পারি তুমি এমন কাজ কখনো করতে পারো না দিদি, যার জন্যে কেউ তোমার কোন দিকের পথ বন্ধ করতে পারে। আচ্ছা, তোমার শ্বশুর বাড়ীর ঠিকানা বলে দাও, আমরা ত পরশু সকালের গাড়ীতেই বাড়ী যাচ্চি, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজে তোমাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হব, দেখি বুড়ো-বুড়ী আমাকে কি জবাব দেন। তোমার যাঁরা শ্বশুর-শাশুড়ী, তাঁরা আমারও তাই,—তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে আমার কোন লজ্জা নেই।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, তোমরা পরশু দেশে যাবে এ কথা ত শুনিনি? এখানে কে কে থাকবেন? বীণাপাণি কহিল, কেউনা, শুধু চাকর-দরয়ান বাড়ী পাহারা দেবে। আমার জাঠশাশুড়ী অনেক দিন থেকেই শয্যাগত, তাঁর প্রাণের আশা আর নেই,—তিনি সকলকেই একবার দেখতে চেয়েচেন।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শ্বশুর বাড়ীটি কোথায়?

বীণাপাণি বলিল, কলকাতার পটলডাঙায়।

পটলডাঙার নাম শুনিয়া অচলার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে কহিল, বীণা, তা'হলে ত আমাদের এ বাড়ী ছেড়ে কালই যেতে হয়। এখানে থাকা ত আর চলেনা।

বীণাপাণি হাসিয়া উঠিল। বলিল, তাই বুঝি তোমাদের বাড়ী ফেরবার জন্যে এত সাধাসাধি করচি? এতক্ষণে বুঝি আমার কথার তুমি এই অর্থ করলে! না দিদি, আমার ঘাট হয়েচে, তোমাকে কোথাও যেতে আর কখনো আমি বলবনা, যতদিন ইচ্ছে এই কুঁড়ে ঘরে তোমরা বাস কর, আমাদের কারও আপত্তি নেই।

কিন্তু এই সদয় নিমন্ত্রণের অচলা কোন উত্তরই দিতে পারিলনা। মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের যাওয়া কি সত্যিই স্থির হয়ে গেছে? বীণাপাণি কহিল, স্থির বই কি। আজ আমাদের গাড়ী পর্য্যন্ত রিসার্ভ করা হয়েচে। বাবার ঘরে যদি একবার উঁকি মারো ত দেখতে পাবে, বোধ হয় পোনর আনা জিনিস-পত্রই বাঁধা ছাঁদা ঠিক্‌ঠাক্।

দাসী আসিয়া দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিল, বৌমা, মা একবার তোমাকে রান্নাঘরে ডাকচেন।

যাই, বলিয়া সে একটু হাসিয়া সহসা আর একবার দুই বাহু দিয়া অচলার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া কানে কানে কহিল, এতদিন লোকের ভিড়ে অনেক মুস্কিলেই তোমাদের দিন কেটেচে। এবার খালি বাড়ী—কেউ কোথাও নেই,—আপদ-বালাই আমিও দূর হয়ে যাবো,—এবার, বুঝলেনা ভাই দিদি মণিটি? বলিয়া সখীর কপোলের উপর দুটি

আঙুলের একটু চাপ দিয়াই দ্রুত পদে দাসীর অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল।

একটুকরা আনন্দ, খানিকটা দক্ষিণা হাওয়ার মত এই সৌভাগ্যবতী তরুণী লঘুপদে দৃষ্টির বাহিরে অপসৃত হইয়া গেল, কিন্তু তাহার কানে-কানে বলা শেষ কথা দুটি অচলা, দুই কানের মধ্যে লইয়া সেইখানে পাষাণ মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আজিকার রাত্রি এবং কালকার দিনটি মাত্র বাকি। তাহার পরে আর কোন বাধা, কোন বিঘ্ন নাই—এই নিস্তব্ধ নীরব পুরীর মধ্যে—কাছে এবং দূরে, তাহার যতদূর দৃষ্টি যায়—ভবিষ্যতের মধ্যে চোখ মেলিয়া দেখিল—কেবল একাকী এবং একমাত্র সুরেশ ব্যতীত আর কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

বাঙ্গালার মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলি খুলিলেই আজকাল দেখা যায়, সেগুলি স্থানীয় দুর্ভিক্ষের সুদীর্ঘ বিবরণে পূর্ণ। প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্রেই এই একই রকম সংবাদ প্রতি সপ্তাহে বাহির হইতেছে। ধান চাউলের মূল্য এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, দরিদ্র লোকে চাউল ক্রয় করিতে পারিতেছে না। এই কলিকাতাতেই ১০ টাকা সাড়ে দশটাকা, ১১ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে। অথচ, এই দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের বিবরণের পাশাপাশি এমন সংবাদও প্রকাশিত হইতেছে যে, মহাজনের আড়তে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল মজুত; কিম্বা, এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণে ধান-চাউল বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রতিকারের উপায় কি?

যে সকল সংবাদপত্রে এই দুর্ভিক্ষের বিবরণ এবং তৎসহ মজুত চাউলের বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে, সেই সকল সংবাদপত্রের পরিচালকেরা, এবং কলিকাতারও কতকগুলি সংবাদপত্রের পরিচালকগণ এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। কেহ-কেহ পঞ্জাবের ন্যায় বাঙ্গলা দেশেও মার্শাল ল' চালাইবার পরামর্শ দিতেছেন,—যদি সেই সুযোগে ধান-চাউলের মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অথবা গবর্ণমেণ্ট যদি খাদ্য-দ্রব্যাদির মূল্য বাঁধিয়া দেন। অবশ্য এ কথা সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন যে, এই মার্শাল ল' জারির প্রার্থনা—ইহা কখনই আন্তরিক নহে; কেবল খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দরুণ প্রজার কষ্ট এমন বাড়িয়া গিয়াছে যে, খাদ্য সুলভ হইলে তাহারা মার্শাল ল'য়ের শাসনও বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত—এই ভাবটুকু প্রকাশ করাই মার্শাল ল' প্রার্থনার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা হইতেই, লোকের যে কি রকম কষ্ট হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এখন অবস্থাটা, এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, ঘরে যথেষ্ট খাদ্য মজুত থাকা সত্ত্বেও আমরা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছি না। কেন এমন হইতেছে? প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে, ধান-চাউলের আড়তদার মহাজনদিগের অতি লাভের লোভই এইরূপ অবস্থার একমাত্র কারণ। তাহারা এখন যো পাইয়াছে, এবং এই সুযোগে যথাসাধ্য লাভের চেষ্টা করিতেছে। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, খরিদদারের পক্ষ হইতে যাহাই হউক, মহাজনদের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, তাহাদের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিকও হয় না, অন্যায়ও হয় না। কেবল ধান চাউল নহে, সকল প্রকার পণ্যদ্রব্যের মূল্যই খরিদদারের গরজ বুঝিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। খরিদদার যদি এমন বে-কায়দায় পড়ে যে, মহাজন বা বণিক তাহার বিক্রেয় দ্রব্যের জন্য যে মূল্য চাহিবে, খরিদদারকে তাহা দিতেই হইবে, তাহা হইলে, মহাজন এমন সুযোগ ছাড়িবে কেন? সে ব্যবসা করিতে বসিয়াছে, দানসত্র করিতে বসে নাই। মাল ধরিয়া রাখিলে যদি তাহার দু' পয়সা লাভ হয়, তাহা হইলে, সে চেষ্টা সে করিবেই; সে জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না।

তেমনি খরিদদারের পক্ষে ক্রেয় পণ্যের দাম কমাইবার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। খরিদদারের যদি এমন অবস্থা হয়, যে, সে যাহা মূল্য দিতে চাহিবে, মহাজনকে সেই মূল্যেই মাল ছাড়িয়া দিতে হইবে,—

নচেৎ, তাহার মাল নষ্ট হইয়া যাইবে, সমস্ত লোকসান হইবে, সে ক্ষেত্রে খরিদদারেরই সুবিধা; খরিদদারও এমন সুযোগ কখনও ছাড়ে না—ছাড়িতে পারে না। ক্রয় এবং বিক্রয়—বাণিজ্যের এই দুইটি অবস্থাই এখন আমাদের দেশে পূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। ধান চাউলের ব্যবসায়ে বিক্রেতা মহাজনের সুবিধা যাইতেছে, এবং পাটের ব্যবসায়ে ক্রেতার সুবিধা যাইতেছে। অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশের প্রজা-সাধারণের অবস্থা এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, সে দুই দিক হইতেই পিষ্ট হইতেছে। এক ভগবান ছাড়া, এরূপ অবস্থায় কেহ তাহাদের রক্ষা করিতে পারে না। সরকার বাহাদুর অবশ্য ইচ্ছা করিলে প্রজা রক্ষার্থ, প্রজার প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া, খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বাঁধিয়া দিয়া প্রজাকে সাহায্য করিতে পারেন; কিন্তু একপ বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, রাজবিধান দ্বারা বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতিকে বাধা দিতে গেলে, বাণিজ্য লোপ অবশ্যম্ভাবী। বোধ হয় এইজন্যই,—নিতান্ত অনিবার্য না হইলে,—গবর্ণমেণ্ট সহজে এরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চা'ন না। অতএব *দেখা যাইতেছে, আমাদের এই দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার কোনই সহজ উপায় নাই।*

একটু ভাবিয়া দেখিলেই, স্থির বুঝা যায়, আমাদের এই যে অন্ন বস্ত্রের অভাবজনিত দুঃখ-কষ্ট,—ইহা আমাদেরই নিজের হাতে গড়া। দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালা দেশে, তথা, ভারতবর্ষে আজ নূতন নয়। যত দিন হইতে সংবাদপত্রের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তত দিন হইয়াই দেখিতেছি, এবং শুনিতেছি যে, দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে; কেবল, কোনবার একটু বেশী, কোনবার একটু কম। অথচ, এই দুর্ভিক্ষের দিনেও সকলেরই দিন এক রকমে চলিয়া যাইতেছে। কোন-কোনবার একটু বেশী কষ্ট হইলে, সরকার-বাহাদুরকে "রিলিফ ওয়ার্ক" খুলিতে হয়, বা তকাবি দাদন দিতে হয়; কিন্তু আমাদের বাঙ্গলায় যাহাকে মন্বন্তর বলে, যাহার ফলে অন্নাভাবে অনশনে শত-শত, সহস্র-সহস্র লোকের মৃত্যু হয়,—লোকে ক্ষুধার জ্বালায় উন্মত্ত হইয়া মানুষের অকর্ত্তব্য কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সেরূপ অবস্থা এই যুদ্ধের দুর্দ্দিনেও হয় নাই, এবং ঈশ্বর করুন, কখনও যেন না হয়। এখনকার দুর্ভিক্ষের প্রকৃত অর্থ অন্নাভাব নহে, অর্থাভাব। দেশে ধান-চাউল যথেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু আমাদের তাহা ক্রয় করিবার সামর্থ্য কমিয়াছে। মহাজনের গোলাতে ধান-চাল যথন মজুত রহিয়াছে, এবং সে যখন ব্যবসা করিতে বসিয়াছে, তখন সে উপযুক্ত দাম পাইলে মাল ছাড়িবে না কেন? আমরা সে দাম দিতে পারিতেছি না, তাই আমরা তাহা কিনিতে পারিতেছি না। পক্ষান্তরে, বিদেশের বণিকেরা আমাদের দেশ হইতে চাল কিনিয়া নিজেদের দেশে লইয়া যাইতেছে। তাহাদের গরজ আমাদের অপেক্ষা বেশী, তাহারা আমাদের অপেক্ষা ধনী; তাই তাহারা আমাদের অপেক্ষা বেশী দাম দিয়া চাউল কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। তাই, দেশের লোকের কষ্ট সত্ত্বেও, এখনও এ দেশ হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানী হইতে পারিতেছে। এখন আমাদিগের মাত্র দুইটা পথ খোলা আছে। হয়, আমাদিগকে বাজার দরে চাউল কিনিতে হইবে, অর্থাৎ, বিদেশী বণিকেরা যে মূল্য দিবে, আমাদিগকেও সেই মূল্য দিতে হইবে; আর যদি সস্তায় চাউল পাইতে হয়, তাহা হইলে আমাদের সেই সাবেক ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে; আবার পল্লীবাসী হইতে হইবে,—সেকালে যেমন আমাদের গৃহস্থ-ঘরের প্রয়োজনীয় সমুদায় দ্রব্যই নিজের ঘরে এবং ক্ষেত-খামারে উৎপন্ন হইত, সেইরূপ ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ইহাতে কিন্তু কিছু ত্যাগ-স্বীকার করার প্রয়োজন হইবে। অনেক বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে হইবে। বিলাসিতা ছাড়িতে হইবে বটে, কিন্তু দুঃখ-কষ্টের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। তা' যদি না পারি, বিলাসিতা উপভোগের লোভ যদি সামলাইতে না পারি, তাহা হইলে, চাউলের মণ ১৫ টাকা, এবং ধুতি-সাড়ির জোড়া আট দশ টাকা হইলেও, প্রতিবাদ বা আপত্তি করা চলিবে না; অর্থাৎ, বিলাসিতার নামে চির-দুঃখ, চির অসন্তোষ, *চির-অভাব সহিতে হইবে। এই দুই পথ খোলা, এখন যাহার যেটা পছন্দ,* তিনি তাহাই বাছিয়া লউন।

অন্নের অবস্থা ত এই। বস্ত্রের অবস্থারও আশু কোন প্রতিকার হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধ আপাততঃ থামিয়াছে বটে, কিন্তু সন্ধি এখনও হয় নাই; কাজেই যুদ্ধের আয়োজন এখনও কিছু-কিছু রাখিতে হইতেছে। এবং যে-হেতু বস্ত্রের জন্য আমাদিগকে ম্যাঞ্চেষ্টারের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইতেছে, এবং যে হেতু, বাজারে তুলা এখন খুব দুষ্প্রাপ্য, এবং ল্যাঙ্কাসায়ারের কাপড়ের কলওয়ালাদের ভারতের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিবার এখনও পূর্ণ অবসর ঘটে নাই, এবং যে হেতু বিলাত হইতে কাপড় আনাইতে হইলে জাহাজ চাই, এবং জাহাজগুলা যত শীঘ্র ডুবিয়া গিয়াছে, তত শীঘ্র নূতন জাহাজ তৈয়ার হইয়া উঠিতেছে না,—অতএব বস্ত্র-সমস্যার শীঘ্র সমাধানের কোন আশা নাই। বোম্বায়ের শ্রীযুক্ত সার দিনশা ওয়াচা "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" পত্রে প্রবন্ধ ছাপিয়া এই ভাবেরই আভাষ দিয়াছেন। তিনি ভারতবাসীকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, এখনও অন্ততঃ আরও এক বৎসরকাল বিলাত হইতে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী পরিমাণে বস্ত্র এ দেশে আমদানী হইতে পারে না। সার দিনশা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধের পাঁচ বৎসরে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী শতকরা ৭০ অংশ কমিয়া গিয়াছে। এদিকে তুলার দাম ক্রমাগতই চড়িতেছে। দেশীয় কাপড়ের কলগুলিতেও এত বেশী পরিমাণে বস্ত্র উৎপন্ন হইতে পারে না, যদ্দ্বারা দেশের অভাব মিটিতে পারে। কারণ, বেশী কাপড় প্রস্তুত করিতে হইলে, কল-কব্জাও বাড়াইতে হয়; কিন্তু এখন কল-কব্জা আনাইবার সুযোগ এত অল্প যে, নাই বলিলেই হয়। কলের কাপড়ের অবস্থা ত এই। পক্ষান্তরে, তুলার চাষ করিয়া দেশীয় তাঁতে কাপড় বুনাইয়া দেশের বস্ত্রাভাব দূর করিবার জন্য এই কিছুদিন আগে যে এত আন্দোলন চলিতেছিল, এখন সে সম্বন্ধে আর কোন

উচ্চবাচ্য শুনা যাইতেছে না,—যেন আমাদের বস্ত্রাভাব একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে!

———

গত মাসে "চিনির কথা" প্রবন্ধে চিনির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গিয়াছে; এ মাসেও আরও একটু আলোচনার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। এখন চিনির বাজার-দর কি রকম আগুন, তাহা সকলেই জানিতেছেন; কারণ, চিনি দিয়া চা আজকাল নর নারী, দরিদ্র-ধনী-নির্ব্বিশেষে সকলকেই খাইতে হয়। চিনির এই যে দর বাড়িয়াছে,—ইহাও বাণিজ্যের স্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের লোকে বৎসর কয়েক পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে চা খাইত না, সুতরাং তাহাদের এত চিনিরও দরকার হইত না। এখন চায়ের সঙ্গে চিনি চাই; চা এখন সর্ব্বসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য; সুতরাং চিনির খরচও কাজে-কাজেই অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কেবল আমাদের দেশে কেন, দেশ-বিদেশের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা বলিতেছেন, পৃথিবীর সকল দেশেই চিনির ব্যবহার বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং দাম বাড়িবে বই কি।

———

কেবল ব্যবহার বাড়িতেছে বলিয়া নহে, যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণে চিনি সরবরাহ হইতেছিল, এখন তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে,—প্রায় অর্দ্ধেকের কাছাকাছি। যুদ্ধের পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবীতে বৎসরে ১৮০০০০০০ টন চিনি উৎপন্ন হইত। ইহার মধ্যে বিট হইতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ ৯০০০০০০ টন; এবং ইক্ষু হইতেও ঐ পরিমাণ চিনি পাওয়া যাইত। এখন বিট চিনির আর আমদানী নাই বলিলে চলে। কারণ, যে ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, এবং অষ্ট্রিয়ায় বিটের চাষ হইত, এবং তাহা হইতে চিনি উৎপন্ন হইত, এখন ঐ তিন দেশে যুদ্ধের দরুণ বিটের চাষ এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া বন্ধ আছে। সুতরাং বিট চিনি আসিবে কোথা হইতে? কাজেই দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বের উৎপন্ন চিনির অর্দ্ধেকেই এখন কাজ চালাইয়া লইতে হইতেছে। ইহাতে চিনির দাম না বাড়িবে কেন?

———

তার পর, ভারতবর্ষে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতি বর্ষে বিদেশ হইতে ১০ লক্ষ টন চিনি আমদানী হয়। আগে প্রধানতঃ অষ্ট্রিয়া হইতে এই চিনি আসিত, তার পর মরিচ দ্বীপ (Mauritius) হইতে চিনি আমদানী হইতে আরম্ভ হয়। এখন ভারতের প্রয়োজনীয় সমস্ত চিনিই যাভা হইতে আসিতেছে। ভারতে এক কালে চিনি উৎপন্ন হইত, এবং দেশের প্রয়োজন বাদে কিছু-কিছু বিদেশে রপ্তানীও হইত। কিন্তু জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে খুব আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিনি উৎপাদিত হইতে লাগিল। তাহাতে চিনি উৎপাদনের পড়তা এত কম হইত যে, ভারতে রপ্তানী করিয়াও ঐ চিনি ভারতজাত চিনি হইতে কম মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিত। বিশেষতঃ, জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণ চিনির কারখানাওয়ালাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। সেই bounty-fed জার্ম্মাণ চিনির সহিত আর কোন দেশের চিনি প্রতিযোগিতা করিতে পারিল না। এইরূপে জার্ম্মাণ চিনি ভারতীয় চিনির সর্ব্বনাশ করিল। ভারতীয় চিনির কারখানাগুলি তুলিয়া দিয়া কারখানাওয়ালারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ভারতীয় চিনির সেই দুরবস্থার আর কোন প্রতিকার হইল না।

———

এখন কথা হইতেছে, আমদানী চিনির দাম যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে, ভারতে আবার চিনির কারখানা খোলা সম্ভবপর কি না? বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইক্ষুর চাষ করিয়া খুব কম খরচে উৎকৃষ্ট জাতীয় ইক্ষু উৎপাদন করিতে, আমাদের দেশের চাষাদের পক্ষে এখনও অনেক সময় লাগিবে। তার পর, যে শ্রেণীর ইক্ষু এখন স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইতেই সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিনি উৎপাদন করাও বহু ব্যয় সাপেক্ষ; এবং সে পক্ষে অনেক শিক্ষা এবং উদ্যোগ-আয়োজন আবশ্যক। ইহা যে আমাদের পক্ষে কতখানি কঠিন, "চিনির কথা" প্রবন্ধে তাহার কিছু আলোচনা করা হইয়াছে; সুতরাং এখন স্বভাবজাত ইক্ষু হইতে অনুন্নত এবং অবৈজ্ঞানিক উপায়েই অর্থাৎ সেই সেকেলে সাবেক প্রথায় চিনি উৎপাদন করিতে থাকিলে, তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় বেশী দরের বিদেশ হইতে আমদানী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কি না? কর্ত্তৃপক্ষ এখন সেই চেষ্টাই করিতেছেন। সেই চেষ্টার কিছু পরিচয় দিতেছি।

———

ভারতে আবার চিনির কারখানার কাজে হাত দিবার পূর্ব্বে দুইটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার হইতেছে। প্রথমতঃ আমদানী চিনির এই যে মূল্য-বৃদ্ধি—ইহা কি স্থায়ী হইবে? অথবা, সাজগোজ করিতে দোল ফুরাইয়া যাইবে?—চিনির কারখানা খুলিতে-খুলিতে, কল-কব্জা বসাইতে-বসাইতে, ইক্ষু সংগ্রহ করিতে-করিতে এবং প্রকৃত কাজ আরম্ভ করিতে-না করিতে আমদানী চিনির দাম কমিয়া যাইবে না ত? কারণ, একটা চিনির কারখানা খোলা সহজ ব্যাপার নহে; ইহাতে অনেক কাঠ খড় ত চাই-ই, অধিকন্তু ইহা যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ। হয় ত রীতি-মত কারখানা স্থাপন করিয়া চিনি উৎপাদনের বন্দোবস্ত করিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া যাইতে পারে। তত দিন পর্য্যন্ত আমদানী চিনির বর্ত্তমান বেশী দাম বজায় থাকিবে কি? তা যদি না থাকে, তাহা হইলে ত সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনই পণ্ড হইয়া যায়! তবে এ বিষয়ে একটী আশার কথা এই যে, যুদ্ধের দরুণ সকল দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যই অনেকটা পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতের চিনির প্রধান প্রতিযোগী ছিল ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া। যুদ্ধের দরুণ এই তিন দেশের সকল প্রকার বাণিজ্যের অবস্থাই খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে। এই তিন দেশেই সব গুছাইয়া লইয়া, পুনরায় বিটের চাষ করিয়া সস্তায় চিনি উৎপাদন করিতে নিশ্চয়ই বৎসর কয়েক, অনুমান হয়, ১৫।২০ বৎসর লাগিবে। তত দিন সমস্ত পৃথিবীকে যাভা ও মরিসসের চিনির উপর নির্ভর করিতে হইবে। এই দুই স্থানে এখন

যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সমস্ত পৃথিবীর প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে কখনই যথেষ্ট হইবে না। সুতরাং মনে হয়, যত দিন পর্য্যন্ত না ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মাণীতে বিট চিনি আবার উৎপন্ন হয়, তত দিন বাস্তা, মরিসসের চিনির দাম বেশীই থাকিবে। তত দিনেও কি ভারতবর্ষ চিনির কারখানা গুছাইয়া লইয়া অন্ততঃ নিজের প্রয়োজনীয় চিনি উৎপাদন করিতে পারিবে না? ক্রমে কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইক্ষুর চাষ করিতে শিখাইয়া এবং আধুনিক উন্নত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া, তত দিনেও কি ভারতবর্ষ বিদেশী আমদানী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে না? আরও একটা আশা আছে যে, চিনির দাম এখন যাহা রহিয়াছে, বরাবরই তাহা থাকিয়া যাইবে। কারণ, চিনির ব্যবহার দিনদিন বাড়িতেছে, এবং ভবিষ্যতেও বাড়িবে বই কমিবে না। সুতরাং বাজার টান বরাবরই থাকিবে। অন্ততঃ আশা করা যায়, ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে আর চিনির দর কমিতেছে না। তার পর জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়াতে সস্তা দরের চিনি উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইলেও, তাহা সহজে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। সন্ধি হইলেও, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া এখনও কিছু দিন আমাদের শত্রুই থাকিবে। সুতরাং সস্তায় জার্ম্মাণ, অষ্ট্রিয়ান চিনি আসিয়া আবার যাহাতে ভারতের চিনির সর্ব্বনাশ করিতে না পারে, সে পক্ষে গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই সাবধান হইবেন।

দ্বিতীয়তঃ, ইক্ষুর চাষ। এই বিষয়টি যেমন জটিল, তেমনি কঠিন। জল-বায়ুর অবস্থা, ভূমির অবস্থা, উর্ব্বরতা শক্তি, অন্যান্য শস্যের চাষের ক্ষতি না করিয়া ইক্ষুর চাষে অধিকতর ভূমির নিয়োগ, ইক্ষুর জাতি নির্ব্বাচন, সার প্রয়োগ প্রভৃতি নানা বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। এই সকল ব্যাপার কর্ত্তৃপক্ষের অধিকারভুক্ত; এবং তাঁহারা এ সম্বন্ধে যথোচিত উপায় অবলম্বনও করিতেছেন। বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রে এ বিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা হইতেছে। এই পরীক্ষার ফল দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। যত দিন না পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়, তত দিন চিনির কারখানা স্থাপন কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে না।

যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। সংবাদপত্রের সহিত কিঞ্চিৎ সংস্রব থাকায় কাগজের বাজারের দুর্দ্দশা আমাদিগকে হাড়ে-হাড়ে বুঝিতে হইতেছে। তাই কাগজের সংস্রবে কোন কথা শুনিলেই তাহা লইয়া একটু আধটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে। সম্প্রতি The Indian Trade Journalএ কাগজের একটা উপাদানের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। দেরাদুনের Forest Research Institute and Collegeএর Forest Economist Mr. R. S. Peason I.F.S., F.L.S., মহাশয় বিবেচনা করেন, আসাম প্রদেশজাত Elephant grass হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার উপাদান কাষ্ঠ-মণ্ড (wood pulp) পাওয়া যাইতে পারে। বাঁশ হইতে যে কাষ্ঠ-মণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে, ইহা এখন সর্ব্বজনবিদিত সত্য। ব্রহ্মদেশের বাঁশবন ইজারা লইয়া কোন-কোন কোম্পানী তাহা হইতে কাষ্ঠ-মণ্ড প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এবং যেহেতু বাঁশ ও ঘাস উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান-মতে একজাতীয় উদ্ভিদ, সুতরাং ঘাস হইতে যে কাষ্ঠ-মণ্ড প্রস্তুত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? Elephant grassএর অপর নাম Savannah grass। Mr. Raitt "*Report on the investigation of savannah grasses as material for production of paper pulp*" শীর্ষক পুস্তিকায় এই ঘাসের রসায়নের দিকটার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কেবল রাসায়নিক কার্য্য অর্থাৎ ঘাসকে কাষ্ঠ-মণ্ডে পরিণত করাই এ সম্বন্ধে শেষ কাজ নয়। এই জিনিসটি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে কি না, এবং তদপেক্ষাও প্রয়োজনীয় বিষয়, ইহা সংগ্রহ করিতে বা ইহার চাষ করিতে খরচা পোষাইবে কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। তাহা বিবেচনা করাও হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, আসাম প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র ও মোনাস নদদ্বয়ের সংযোগ-স্থলে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে গোয়ালপাড়ার সম্মুখে লোটিবাড়ী, আর্মিগুড়ি, পিডারধারা এবং ন্যায়শান্ত্র গ্রামগুলিকে লইয়া অতি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এই ঘাস স্বচ্ছন্দে স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই স্থানটি কামরূপ বিভাগের বড়পেটা মহকুমার অন্তর্গত। ঘাসবনটি ১৫৮০০ একার বা ৪৭৪০০ বিঘা জমি লইয়া অবস্থিত। আবার গোয়াল পাড়ার নিম্ন দিকে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরেও এইরূপ বড় আর একটা ঘাসবন আছে। এই ঘাসের চাষ, উৎপন্ন ঘাসের পরিমাণ, কত ঘাস হইতে কতখানি কাষ্ঠ-মণ্ড পাওয়া যাইতে পারে, ইহাতে পড়তা কত পড়ে—প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিবরণ যতদূর সাধ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহার নমুনা ইংলণ্ডে এবং ভারতীয় একটা কাগজের কলে পাঠানো হইয়াছিল। তাহাতে পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক বলিয়া জানা গিয়াছে। স্থির হইয়াছে, এই ঘাস হইতে যে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা মন্দ হইবে না, এবং ইহাতে খরচও অপেক্ষাকৃত কম পড়িবে। এই ঘাসজাত কাগজের নমুনা দেরাদুনের ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ফরেষ্ট ইকনমিষ্ট মহাশয়ের নিকট আছে; যে কেহ তাহা দেখিতে পারেন। ব্রহ্মপুত্রের অন্যান্য অংশে এবং ব্রহ্মদেশেও এই ঘাস পাওয়া যায়। ফিলিপাইন দ্বীপের ব্যুরো অব ফরেষ্ট্রির ডাক্তার ডবলিউ, এইচ, ব্রাউন পিএইচ-ডি বলেন, এই ঘাসের কাগজ bleaching powderএর সাহায্যে খুব সাদা হইতে পারে।

প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মেসার্স বামার লরি এণ্ড কোম্পানী যখন বেঙ্গল পেপার মিল স্থাপন করেন, তখন আমরা কাগজের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হইবার জন্য শ্যামা ঘাস বা সাবুই ঘাস অথবা সাবাই ঘাস নামে এক প্রকার ঘাসের কথা কোন সুযোগে জানিতে পারিয়াছিলাম। মাড়োয়ারী দালালেরা এবং মহাজনেরা উক্ত কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিয়া পাটনা অথবা দানাপুরের নিকটবর্ত্তী

স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে এই ঘাস সরবরাহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইহার ফল কি হইয়াছিল তাহা অবশ্য আমরা জানি না। সম্প্রতি জানিতে পারিলাম, টিটাগড় কাগজের কলে এই সাবাই ঘাস এখনও ব্যবহৃত হইতেছে। এখন কথা এই, পূর্ব্বোক্ত savannah grass এবং সাবুই বা শ্যামা ঘাস, কি একই, না আলাদা আলাদা ? যদি একই জিনিস হয়, তাহা হইলে *অবশ্য কথাই নাই ;—কেবল এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে, যে,* ৩০-৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও এই ঘাস কাগজের উপাদান রূপে ব্যবহার করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। আর, যদি স্বতন্ত্র জিনিস হয়, তাহা হইলে, এটীর সম্বন্ধেও অনুসন্ধান হওয়া উচিত ? কারণ, কাগজের উপাদানের যখন এমন দুর্ভিক্ষ,—এবং কাগজের উপাদানের সংস্রবে যখন ইদানীং ইহার সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইতেছে না,—তখন এটীর সম্বন্ধেও অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

এই সঙ্গে আরও একটা কথা মনে হইতেছে। স্বদেশীর সময়ে আমরা মধ্য প্রদেশের কোটা রাজ্যের অমৃত ম্যাচ ফ্যাক্টরী হইতে কিছু দেশালাই আমদানী করিয়াছিলাম। সেই দেশলাইয়ের প্যাকিং বাক্সের তক্তাগুলি দেখিয়াছিলাম, কেবল অংশুময়। সেই তক্তায় কাষ্ঠের অংশ ছিল না বলিলেই হয় ; সমস্ত তক্তাটা স্তরে স্তরে আঁশের দ্বারা গঠিত এবং অল্প চেষ্টাতেই স্তরগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারিত। সেই তক্তাগুলি দেখিয়া আমাদের তখনই মনে হইয়াছিল, তাহা কাগজের উপাদানে পরিণত হইতে পারে, এবং bleaching powderএর সাহায্যে যদি তাহা সাদা নাও হয়, তথাপি, তাহার দ্বারা ব্রাউন বা বাদামী কাগজ স্বচ্ছন্দে প্রস্তুত হইতে পারে। এখানে এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র, আমাদের নিজেদের পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কোন সুযোগ না থাকায়, ঐ তক্তা হইতে কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাই নাই। আমাদের এখানে এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ আর কিছুই নয়,—যদি কাহারও পরীক্ষা করিবার সুযোগ থাকে, তবে তিনি এই বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আর একটা কথা। পরীক্ষা ভিন্ন এ সকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না, কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে না। সেই জন্য আমরা আমাদের নিজস্ব একটী পরীক্ষাগারের আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি। Commercial Research বা Experimental Laboratoryর ধরণের দুই-একটী পরীক্ষাগার থাকিলে, ৯৯টি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইবার পরও যদি ১টি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, তাহা হইলেও, লাভ যথেষ্ট। এইরূপে এখন যে সব জিনিস শুধু নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সেই waste products হইতে প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান পণ্য প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপ পরীক্ষার সুযোগ বাঙ্গলা দেশের কোথাও আছে কি ? না থাকিলে, দেশবাসী এ বিষয়ে অবহিত হইবেন কি ?

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(১৪)

সংসারে যখন যেটি দরকার, ঠিক তাহার বিপরীতটি ঘটিতেই প্রায় অধিকাংশ সময় দেখা গিয়া থাকে। চাষের জন্য যখন বর্ষার প্রয়োজন, তখন অনাবৃষ্টি, এবং উহারই জন্য যখন বৃষ্টি না হওয়া দরকার, ঠিক সেই সময়টিতেই অতি-বৃষ্টির প্লাবনে জলে জলময় হইয়া থাকিতে দেখা যায়। দুর্গাসুন্দরীর ব্যাপারটায়ও ঠিক যেন এই প্রকার ঘটনাই ঘটিয়া উঠিল। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকে একেবারে সহজেই নিজের বেশি দিন বাঁচিয়া থাকা পছন্দ করে না। তাহার উপর মেয়ে আনিতে গিয়া বৈবাহিকের সহিত "কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির করা"র মত যে ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহার পর এক তিলমাত্র সময়ও আর মরণে বিলম্ব করা তাঁহার পক্ষে উচিত হয় না—এমনই একটা অনতিক্রমনীয় কর্ত্তব্যের ভারে নিজেকে তাঁহার নিজের কাছেই বদ্ধ বোধ হইতে লাগিল। যত শীঘ্র তিনি মরিতে পারিবেন, মেয়ের শ্বশুর ঘরের বদ্ধ দ্বার তাহার নিকট হয় ত ততটুকু সহজে মুক্ত হইবার সুযোগ দিবে, ইহা তিনি অসংশয়ে অনুভব করিয়াই, আর সব ভয় ভাবনা প্রাণপণ শক্তিতে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া, একান্ত ও একাগ্রচিত্তে কেবল মাত্র মরণেরই ধ্যান ধরিয়া, তাহারই পথ চাহিয়া রহিলেন। মেয়ের শ্বশুর যখন দেখিবে, সত্য সত্যই মায়ের শেষকৃত্য করিতে মেয়ে আনিতে যাওয়া হইয়াছিল, জুয়াচুরি করিতে যাওয়া হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই এই মাতৃহীনা অনাথা মেয়েটাকে তাহারা ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবে না। এখন ইহাকে,—এই মা বাপের অপরাধের ভারে নিমজ্জনোন্মুখী নিরপরাধিনী কন্যাকে রক্ষা করিবার একমাত্র সদুপায়ই তাঁহার সত্বর মরণ। এ মরণ যে এখনি

নাও হইতে পারে, এমন সন্দেহ-লেশ তাঁহার বা অপর কাহারও মনের কোণেও উঁকি পাড়ে নাই; ভয় শুধু নিজেদের।

এমন করিয়া দিন কাটিতে-কাটিতে, হঠাৎ একদিন কবিরাজ মহাশয় নাড়ি টেপা শেষ করিয়া, নস্য-টেপার প্রারম্ভে রায় দিয়া বসিলেন যে, রোগিণীর নাড়ীর গতি অপেক্ষাকৃত ভাল দেখা দিয়াছে।

শুনিয়া মনোরমার বিষণ্ণ মুখে ঈষৎ আনন্দের আভা প্রকাশ পাইল; দীননাথ একটা নিঃশ্বাস খুব দীর্ঘ করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে ত্যাগ করিলেন।

রোগিণীর পাণ্ডুর মুখে কিন্তু কোন অবিশ্বাসের অতি মৃদু ছায়া প্রকটিত হইয়া উঠিল; মাথা নাড়িয়া উঁহাদের আশ্বস্ত হইতে নিষেধ করিয়া যেন এই কথা বলিতে লাগিল যে, এ একেবারে আনাড়ি, ইঁহাকে বিশ্বাস করিও না, ভাল কিছুই হয় নাই, হইবেও না, ভাল হইবার প্রয়োজনও নাই।

কিন্তু বেশি দিন এমন করিয়া মনকে আঁখি ঠারা চলিল না। বৈদ্যরাজ প্রত্যহই নাড়ী টিপিতে টিপিতে পরম আশ্বাসে ঘন ঘন ঘাড় নাড়েন, আর তাঁহার স্বনবজ্ঞ পাঁচনের গুণ, এবং উহারা কোন কোন্ মরণোন্মুখ নরনারীর পক্ষে কোথায় কোথায় ধন্বন্তরীর কাজ করিয়াছিল, উঁহাদের ব্যবহার ফলে কে-কে আসন্ন মৃত্যু জয়পূর্ব্বক আজও সত্তর বৎসর বয়সে আখ চিবাইয়া খাইতেছে, কোন্ এক স্ফূর্ত্তিবান সাতষট্টি বৎসর বয়সে বর সাজিলেও তাঁহাকে মোটেই বেমানান দেখায় নাই, এবং বাসর ঘরে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ আন্দাজ করা হইয়াছিল, এই সব সুসমাচার চতুর্ম্মুখে অনর্গল প্রচার করিয়া রোগিণীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে চাহেন, দুর্গাসুন্দরীর রোগ-জর্জ্জর চিত্তের জ্বালা ততই অসহ হইয়া উঠে। প্রথম প্রথম এই আত্মশ্লাঘাকারী প্রগল্‌ভ মূর্খের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পারই দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি মনে-মনে হাসিয়া আত্মতৃপ্তি সম্পাদন করিয়া লইতেন; কিন্তু তার পর যখন একদিন সহসা তাঁহার নিজের কাছেও এই আনাড়ি বৈদ্যের নাড়ীজ্ঞানের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইয়া পড়িল, তখন রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে তাঁহার যেন আর জ্ঞান-বুদ্ধি পর্য্যন্ত রহিল না। কি করিলে যে এই হতভাগা নাড়ীগুলার গতি ফিরাইয়া উহাদেরই অগতিতে টানিয়া লইয়া যাওয়া যায়, সেই চিন্তার উদ্বেগে সেদিন জ্বর বৃদ্ধি হইলেও, পরদিন সে জ্বরও আবার হু হু করিয়া কমিয়া আসিতে লাগিল। দুর্ব্বল শরীরে তাড়াতাড়ি জ্বর থামিতে-থামিতে, যে সকল উপদ্রবকে বৈদ্যক শাস্ত্রে চরম লক্ষণ বলা হয়, বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিয়াও সেই সকল মন্দ লক্ষণের একটিকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিন্তু তথাপি সহজে কি বিশ্বাস হয়? একটু-একটু ঘাম দেখা দিতেই, পরম আশ্বাসে চরম কালের আশা মনে জাগিয়া উঠে। এইবার বুঝি কাল ঘামে শরীরের রক্তটুকু জল করিয়া দিয়া অনভিজ্ঞ কবিরাজের ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়! নিজেই নিজের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া মনে হইল, বড় বেশি টিপ টিপ করিয়া পড়িতেছে। স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো দেখ! আমার চতুর্থী করিয়েই তুমি মনুকে ভাগলপুরে রেখে এসো। সঙ্গে করে রেখে আসাই ভাল। ওরা বাঁধা মানুষ—একটু রাগারাগি হয়ে গেছে যখন, তখন নিজেদেরই নিচু হওয়া ভাল।"

দীননাথ সব কথা স্ত্রী বা কন্যার কাছে প্রকাশ করিতে পারেন নাই,—শুধু তিনি দুর্গাসুন্দরীর মিথ্যা রোগের ছুতায় বেহাইকে অসন্তুষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, এই কথাই সবাই জানিয়াছিল।

কিন্তু সত্য বেশি দিন গোপন রহিল না। মনোরমার মনের মধ্যেও তাহার মন্দভাগ্যের কালো ছায়া একখানা ঘন কালিমাখা মেঘের মত দিনে দিনে জমিয়া উঠিতেছিল। একখানা তো বটেই, কখন কখনও দুইখানা লেফাফায় ভরিয়া অরবিন্দর পত্র প্রত্যহ মনোরমার উদ্দেশে আসিত। এমন একটি দিনের কথা মনোর স্মৃতি-ফলকে লিখিত ছিল না, যে দিনটিতে এই ঈপ্সিত অথচ পাঁচজনের হাসি-ইঙ্গিতের মধ্যে লজ্জা-কুণ্ঠায় ভরা প্রিয় পত্রাবলী তাহার কাছে আসিয়া, তাহার দূরাপসৃত প্রিয়জনের উদ্ঘাটিত হৃদয়-রাজ্যের শত সমাচার শুনাইয়া, তাহারই অজস্র আদরের স্নিগ্ধ ধারায় তাহার হৃদয় প্রাণ জুড়াইয়া, তাহার ভবিষ্যৎ আশা মন্দিরে সহস্র আলোক জ্বালাইয়া দেয় নাই।

আজ এতগুলা দিনের উদয়াস্ত হইয়া গেল,—তেমন চিঠি তো নয়ই,—কোন রকমেই এতটুকু একটু কুশল সংবাদও সে স্বামী বা শ্বশুরবাড়ীর কাহারও নিকট হইতে পায় নাই। যে শরৎ তাহাকে প্রত্যহ পত্র দিবার জন্য নিজেই প্রতিশ্রুত করাইল, সেই-বা একখানি পত্র পর্য্যন্ত না দিয়াই এমন করিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইল কেন? প্রথম-প্রথম কয়দিন

মায়ের অত অসুখের মধ্যেও, সে মনের মধ্যে কি যেন একটা প্রকাণ্ড আশা করিয়া, উহারই ভিতর কেশ-বেশের উপর একটুখানি নজর না রাখিয়া থাকিতে পারিত না। বিকালবেলা মায়ের জেদেই গা-ধুইবার জন্য মায়ের ঘর হইতে বাহির হইবার পর, এই আশাটা প্রবলভাবে দেখা দিয়া বড়ই লুব্ধ করিয়া তুলিলে, প্রতি দিনের ব্যর্থতার ক্ষোভ সেই নবোন্মেষিত আশালোকে বিসর্জ্জন দিয়া নূতন বলে সে বুক বাঁধিত। তখন কেমন করিয়া সব ভয় ভাবনা আপনা হইতে দূরে সরিয়া যাইত; এবং আশ্বাস ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া, তাড়াতাড়ি চুলটা যদি-বা বাঁধা নাও হয়, তো সাম্‌নেটা একটু আঁচড়াইয়া লইয়া, বেশি ভাল বা দামী সাড়ী না পরিলেও, একখানা খয়ের রংয়ের বা চাঁদের আলো খোলের একটুখানি বাহারে সাড়ী পরিয়া বসিত। মায়ের অত অসুখ,—ভালও লাগে না, ভাল দেখায়ও না; তথাপি হঠাৎ যদি তাহাদের এই ভগ্ন কুটীরে সেই সর্ব্ব-সুখ সৌভাগ্য-সম্পন্ন ব্যক্তিটির উদয় হয়, ইহার সহস্র ছোট বড় অসুবিধার ত্রুটিতে তাহাকে যে কতখানি কষ্ট স্বীকার করাইবে, সে-কথা সে তো ভালরূপেই জানে। তাই তাহার যথাসাধ্য সে ত্রুটি সে পূর্ব্ব হইতেই সারিয়া রাখিতে চাহিত। ঘর দ্বার ঝাঁট দিয়া, মশারির ছিদ্র মেরামত করিয়া, ঝুল ঝাড়িয়া, নূতন কুঁজায় জল ভরাইয়া, আরও যে কত কি টুকিটাকি ব্যবস্থা সে সবার অলক্ষ্যে সম্পন্ন করিয়া লইতেছিল, সে শুধু যিনি সব দেখিতে পান, তিনিই দেখিতে পাইয়া মনে-মনে নিশ্চয়ই পরিহাসের হাসি হাসেন নাই; পরন্তু সম-বেদনার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্ততঃ একবারও “আহা” বলিয়াছিলেন। সংসার-শুদ্ধ নির্ব্বোধ নরনারী যে আশালতাটিকে জিয়াইয়া রাখার উদ্দেশ্যে প্রাণান্ত শ্রমে জল ঢালে, তার যে বাঁচিবার পথ রুদ্ধ করিয়া বহুপূর্ব্বেই তাহার মূল, হয় শুষ্ক নয় ছিন্ন হইয়াছে, ইহা বুঝিতে মানুষের যতটা সময় লাগে, ঐ একমাত্র ‘সর্ব্বতশ্চক্ষু’ অজ্ঞাতদ্রষ্টা অনেক পূর্ব্বেই ইহাদের সে দুর্দ্দশার খবর পাইয়া থাকিলেও, এই অন্ধজ্ঞদের দুর্দ্দশায় হাসিতে পারেন কি? বোধ করি পারেন না। তবে যে মানুষের সকল দুঃখে তাঁহাকে একান্ত, উদাসীন দেখায়, তা সে দোষ তো আর তাঁরই নয়। তিনি কি করিবেন, মানুষের ভাগ্য যে অপ্রতিবিধেয়।

(১৫)

দিনের পর রাত্রি কাটিয়া আবার অহোরাত্র অতীত হইয়া চলিয়া যায়, আর দুশ্চিন্তার জাল নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া মনোরমার সর্ব্ব দেহমনকে আঁটিয়া-আঁটিয়া বাঁধিতে থাকে। চিন্তাজ্বরে তাহার অটুট স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া অম্লান সৌন্দর্য্যে কালি ঢালিয়া তাহাকে এই তরুণ বয়সে প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় পৌছাইয়া দিল। কিছু হইয়াছে; কিন্তু, সে ‘কিছু’ কি? শ্বশুর নিশ্চয় ভাল আছেন, নতুবা সংবাদ আসিত। শাশুড়ী সম্বন্ধেও ঐ একই যুক্তি খাটে। তবে আর কি হইতে পারে? শরৎও তো কই একখানা চিঠিরও জবাব দিল না? তবে কি তাহারই কিছু? না-না, তা হইলে কলিকাতা হইতে কি একখানাও পত্র আসিত না? তবে কি,—তবে কি,—হা ভগবান! এ রাক্ষসীর মাথায় বাজ পড়ে না কেন? হয় ত একজামিনের পড়ার জন্য। কিন্তু এত অনুনয়, উদ্বেগ, ব্যাকুলতায় দুটি-ছত্রের একখানি পত্রোত্তর দিলেও কি একজামিন মাটি হইয়া যাইত? নিজে না হয় নাই আসিতেন,—এতটুকু একটুখানি সময়ও কি তার ‘মনুর’ জন্য খরচ করা চলিত না?

দুর্গাসুন্দরী এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। কিন্তু এই জীবন-মরণের সংঘাত ঠেলিয়া বাঁচিয়া উঠিতে তাঁহার সময় লাগিল নেহাৎ অল্প নয়। ধীরে, অতি ধীরে, মৃদুমন্দ গতিতে রোগ আরোগ্যের পথে রোগিনীকে অগ্রসর করিয়া দিতে-দিতে, মনোরমার পিতৃ-গৃহে আসার কিঞ্চিদধিক তিনমাস কাল পরে তিনি বিছানা হইতে কষ্টে নামিয়া বসিয়া অন্ন পথ্য করিলেন; এবং যে দিন এই কার্য্য সম্পন্ন হইল, সেই দিনই কন্যাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। মনো-রমার বিমর্ষ মুখে হাসির আভাষ প্রকাশ পাইল।

প্রতিবেশিনী বাঁড়ুয্যে গৃহিণী এবং ঘোষ-জায়া আসিয়া বলিলেন, “সে কি মনোর-মা, এ মাসে কখন ওকে শ্বশুরবাড়ী যেতে দিতে আছে! এটা যে জোড়ামাস পড়লো। তুমি কি রকম মা, গা? এত দিন কিছু জান্‌তে পার নি? আমার প্রথম থেকেই সন্দো’,—ওকে কতদিন শুধিয়েওছি,—তা মেয়ে শুধু হাসে আর ঘাড় নাড়ে,—বলে না তো কিছু!”

দুর্গাসুন্দরী আনন্দের মধ্যেও ঈষৎ চিন্তান্বিতা হইয়া কহিলেন, “তা হলে তো ও-মাসেও ওর যাওয়া

হবে না দিদি,—জ্যেষ্ঠ বউ, জষ্টিমাসে তো যাবার যো নেই!—"

ঘোমটায় কহিলেন, "আষাঢ়ে আটমাস হবে, 'আটে কাঠে' চড়া তো একেবারেই নিষেধ। তা'হলে সেই শ্রাবণ মাসে সাধ খেতে যাবে আর কি।" "আর না হয় এইখানেই সাধটাধ খেয়ে একেবারে বেটা বগলে নিয়ে শ্বশুরকে দেখাতে যাবে। সেই ভাল মনোরমা, তাই করো,—কিপ্‌টে মিনসে যেমন চসমখোর, তেমনি জব্দ হোক। বেটার বিয়ে দিয়ে নিয়ে গিয়ে অবাধ এক হাঁড়ি মুড়ির মোয়া দিয়েও কুটুমের মর্য্যাদা রাখলে না, এখন দোছ্‌ব হলে তো আর তেল সন্দেশ বন্ধ করতে পাল্লে না, যতই খোক্।"

দীননাথের কাণে এই শুভ সংবাদটা যতখানি আশ্বাস বর্ষণ করিয়াছিল, ঠিক সেই পরিমাণে মাপিয়াই তীব্র হতাশ্বাস তাঁহার পত্রোত্তরের পরিবর্ত্তে তাঁহারই স্বহস্ত লিখিত পত্র রূপ ধরিয়া ভাগলপুর হইতে ফেরৎ আসিল। কাল কালিতে লেখা শুভ-সন্দেশের বার্ত্তাবহনকারী সে পত্র কেহ খুলে নাই, শুধু খামের উপরকার ঠিকানা কাটিয়া পত্র-প্রেরকের নিজের ঠিকানাটি সেইখানে ছোট অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। লেখকের হস্তাক্ষর দীননাথের অচেনা নয়,—তাহা মহামান্য মৃত্যুঞ্জয় বসুরই হাতের লেখা।

পিতা বলিলেন, "হোক জোড়ামাস, বলো তো মনোকে শ্বশুরবাড়ী রেখে আসি।" মাতা উত্তর দিলেন, "অমন কথা বলো না। জোড়ামাসে গিয়ে বাছার যদি কোন অমঙ্গল হয়, তখন যে জন্মকে আপ্‌শোষে মাথা মুড় খুঁড়ে মরতে হবে। সে কাজ করে কাজ নেই।"

জৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠীর তিথি সেবার মাসের প্রথমেই পড়িয়াছিল। নিমন্ত্রণপত্র এবং তাহাতেই আবার একবার পাঁচমাসে কাঁচা সাধের কথা স্মরণ করাইয়া এবার রেজিষ্ট্রী করিয়া পাঠান হইলে, পতি-পত্নী উভয়েই কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বলাবলি করিলেন যে, এইবার যা'হোক খবরটা তো পৌঁছবে। খবর পেলে যতবড় পাষণ্ডই হোক, রাগ করে থাকতে পারবে না। অবশ্যই একটা জবাব দেবে। আর না করে, নাই করলে। আমাদের কাজ তো করা হলো, জামাইও সব জানলে। সেও তো আর খোকাটি নয়।

যথাকালে রেজিষ্ট্রী-করা চিঠিখানি ফেরৎ আসিল। হাতে লেখা (Re···) "লইতে অনিচ্ছুক।"

শ্রাবণ মাসের ৩রা তারিখ শুভদিন। সেইদিন কন্যা লইয়া পিতা বৈবাহিক-গৃহে যাত্রা করিবেন। ঠিক ইহার পূর্ব্বরাত্রে কম্প দিয়া জ্বর আসিয়া মনোরমাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিল,—যাওয়া হইল না। দিন-পনের রোগ ভোগের পর যখন জ্বর ছাড়িল, তখনও নিমোনিয়ার জের এবং গভীর অবসন্নতা তাহার ক্ষীণ, দুর্ব্বল শরীরকে একেবারে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। রাজ-কবিরাজ কুলদারঞ্জন রোগিণীর জীবন সম্বন্ধে একপ্রকার ভরসা দিলেও, গর্ভস্থ শিশু সম্বন্ধে তখনও ঘোর সন্দেহের আভাষই ব্যক্ত করিলেন। অত্যন্ত সাবধানে ও সন্তর্পণে রাখিয়া সযত্ন শুশ্রূষায় ধীরে-ধীরে জীয়াইয়া তুলিতে হইবে, উঠা-বসা নড়া-চড়া না হয় এ সম্বন্ধে বারম্বারই সতর্ক করিয়া যাইতে ভুলিলেন না। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দীননাথ কতকটা আত্মগতই কহিলেন, "তা'হলে আর এখন হলো না; যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে, ছেলে কোলে নিয়েই একবারে যাবে।"

মা জবাব দিলেন, "আগে ও আমার বেঁচেই উঠুক। মেয়েই যদি না বাঁচে, তা'হলে ওরা রাগ করলো, কি খুসী রৈলো, তাতে আমার কি যায়-আসে।"

মনোরমার অসুখের সময় তাহার স্বামী ও শ্বশুরকে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র রেজিষ্ট্রী পত্রে খবর দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের দশাও যে সেই পূর্ব্ববারের চাইতে বেশি ভাল হয় নাই, ইহা বোধ করি না বলিলেও চলে।

ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহে, অনেক দুঃখ-কষ্ট পাইয়া, সেই সমস্ত দুঃখেরই সান্ত্বনা স্বরূপ মনো একটি চাঁদের মত সুন্দর-কান্তি সন্তান লাভ করিল। শরীরের এবং ততোঽধিক মনের অবস্থায় নিয়তই তাহাকে যে মরণের দিকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, জীবনের সমস্তটাই যে ইতোমধ্যে তাহার কাছে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই রিক্ত প্রাণটা তাহার এই এতটুকু একটুখানি সম্বল লাভ করিয়াই যেন একমুহূর্ত্তে হুহু করিয়া ভরিয়া উঠিল। যেন কি ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারই তাহার করায়ত্ত হইয়াছে! এমন করিয়াই সে অনিমেষ চক্ষে ছেলেটির মুখের দিকে সারাক্ষণ চাহিয়া থাকে,—সবার অলক্ষিতে কোন মতে দুর্ব্বল মস্তক উঠাইয়া তাহার ঘুমন্ত মুখে চুমা খায়,—চক্ষের অসম্বরনীয় অশ্রুজলে কখন-কখন আপনি ভাসিয়া তাহাকেও ভাসাইয়া দেয়, আবার কখনও বা তাহার

আড়ামোড়া দিয়া, গা ভাঙ্গিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া হাত পা মেলিয়া নিদ্রা যাওয়ার ভঙ্গি দেখিয়া, তাহার রক্তহীন বিশীর্ণ অধরে এতটুকু হাস্য ভাসিয়া উঠে।

খোকা হওয়ার সংবাদ পত্রে লেখা ব্যর্থ জানিয়া, চির-প্রথামত লোক পাঠাইয়াই খবর দেওয়া হইয়াছিল। বেহারি নাপিত মনোরমাকে জন্মিতে দেখিয়াছে,—মনোর বিবাহেও সে উপস্থিত ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া মনোর শ্বশুরের এত বড় ছোটলোকমি সেও মুখ বুজিয়া সহিতে পারিল না।

নিরপরাধ পরলোকনিবাসী বসু গোষ্ঠীয়গণের প্রতি যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া, সমস্ত গ্রাম তোলপাড় করিয়া তুলিয়া, সে ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিল যে, মনোরমার পিতা ধনলোভে তাহার যেখানে বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহারা ভদ্রসন্তান, কায়স্থসন্তান নহে, পরন্তু হাড়ি মুচিও তাহাদের অপেক্ষা ভদ্র। জাতে ইহারা চামার, ব্যবসায়ে কসাই, ব্যবহারে ডোমেরও অধম। এ হেন কুটুম্বিতার ফল যাহা হয়, এক্ষেত্রে তাহার একটুও ব্যতিক্রম হয় নাই। ভদ্রকন্যা মনোকে লইয়া তাহারা কি করিবে? সে তো আর তাহাদের সঙ্গে জুটিয়া জবাইএর কার্য্য করিতে পারিবে না, তাই উহারা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে।

মনোর শ্বশুর বেহারিকে যে কি-কি কথা বলিয়াছেন, সে সব খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিবার কৌতূহল না থাকা সত্ত্বেও, দীননাথকে হেঁট-মুখে বসিয়া একটা-একটা করিয়াই শুনিতে হইল। আরও অজস্র কটু-কাটব্যের মধ্যে তিনি বলিয়াছেন, যাহার জন্ম-সংবাদ এত ঘটা করিয়া দিতে আসা হইয়াছে, তাহার সহিত তাঁহার বা এই বসু-বংশের কোনই সম্বন্ধ নাই। তাঁহার গৃহে পুত্র ও বধূর পৃথক্ থাকাই তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এবং এ সংসারে তাঁহার ব্যবস্থা কখনই অমান্য হয় না। বিশেষতঃ, তাঁহার পৌত্র জন্মিলে, তাহার জন্ম-সম্ভাবনা যখন দীন মিত্র কন্যা লইয়া গিয়াছিল তাহার সাতদিনের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছান উচিত ছিল,—তা যখন হয় নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে ঐ শিশু…এবং উহার মাতা পবিত্রা নয়; অতএব অতঃপর উহারা সম্পূর্ণ রূপেই তাহাদের পরিত্যক্ত।

পূজার ষষ্ঠী। আঁতুড় হইতে উঠিয়া মনোরমা সেদিন অনেক চেষ্টার পর কোনমতে মুখ ফুটিয়া মাকে বলিয়া ফেলিল "মা, আমাদের আজ কি কাল একবার হাবড়ায় দিয়ে এলে হোত না?" মাতাপিতায় কয়দিন ধরিয়া এই আলোচনাই চলিতেছিল, পিতার মত মেয়ে পাঠান, মায়ের মন ইহারি বিরুদ্ধে। তিনি বলেন "ঐ সব কথার পর,—বিশেষ জামাই শুদ্ধ যখন ঐদিকে,—তখন ওকে কি ঐ শরীরে মেরে ফেলতে পাঠাব? ছেলেটাকেই কি ওরা যত্নের চোখে দেখবে? অথচ ঐ গুড়োটুকু নিয়েই ওর বেঁচে থাকা।" দীননাথের মনেও স্ত্রীর যুক্তিটাকে একেবারে ঠেলিয়া ফেলার মতই তুচ্ছ ঠেকিতেছিল না বলিয়াই, তিনিও ইহার পর আর বেশি জেদ করিতে পারেন নাই।

মেয়ের কথায় মা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঐ দেহ নিয়ে তুই কেমন করে যাবি রে?" "না গেলে এর কি হবে মা?" বলিতে বলিতে টপ্‌টপ্ করিয়া চোখের জল ছেলের গায়ে ঝরিয়া পড়িয়া গেল। ছেলে চমকিয়া দুই হাত নাড়া দিয়া কাঁদিয়া জাগিল। মাতা অশ্রু অন্ধ নেত্রে মুখ ফিরাইলেন।

বৈবাহিকের পূজা বাড়ী হইতে লাঞ্ছনা কশাহত চিত্তে ফিরিয়া আসিবার পর দীননাথ, শেষ আশা বিসর্জ্জনে, একেবারেই ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন। রাগ-অভিমানের ব্যাপার নয়,—যথার্থ ই ইহারা অতি সামান্য কারণকে ছুতা করিয়া, তাঁহার নিরপরাধিনী কন্যাকে জন্মের মতই পরিত্যাগ করিয়াছে। শুধু তাই নয়,—জানিয়া শুনিয়াই, শুদ্ধ নিজেদের স্বার্থের জন্য, সতীর পবিত্র নামে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। ভগবন্! ভগবন্! তোমার হস্ত কি ইহাদের সৃষ্টি করে নাই? তবে এতটুকু একবিন্দু মনুষ্যত্ব দানে কেন ইহাদের তুমি বঞ্চিত করিয়া সৃজন করিলে? পিতা, পুত্র, জননী—এতগুলার মধ্যে বিবেকের এতটুকু লেশ কি কোথাও ছিল না? তবে এমন করিয়া দরিদ্রের সর্ব্বনাশ তোমরা কেন করিয়াছিলে? শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, ধনী-সন্তান! ধনী-গৃহে তোমার উপযুক্তা পাত্রীর তো অভাব ছিল না! অনর্থক কিসের মোহে ক্ষণিকের কোন্ লঘু খেয়ালবশে এই অন্ধের যষ্টিটুকু লইয়া খেলিবার সাধ হইল! দু'দিনেই তোমার সখ ফুরাইয়া গেল,—পুরাতন খেলানার মত নাড়িয়া-চাড়িয়া ফেলিয়া দিলে! তোমার ইহাতে ক্ষতি কি? লক্ষ-পতি পিতা বিদ্যাধরী কন্যা আনিয়া তোমার হাতে সঁপিয়া

দিবে,—যেহেতু তুমি বিদ্বান্, সচ্চরিত্র ধনী-পুত্র। কিন্তু তোমার ঐ তুচ্ছ খেয়াল দরিদ্রের আজ যে সর্ব্বনাশ সাধন করিল, তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার কি কিছু আছে? না—না, এ প্রায়শ্চিত্ত! লোভাতুরের অতি লোভের—মহাপাতকের, মহাপ্রায়শ্চিত্ত! এর জন্য এখন কাঁদিতে বসিলে চলিবে কেন? গরীব কেন গরীবের মত থাকে না? সংসারে তো দরিদ্রের সংখ্যা অল্প নয়! উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দেওয়া কি জগতে সবচেয়ে কঠিন? তা যদি হয়, তবে এ দুর্দশা না ঘটিবে কেন?

অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীমান্ অরবিন্দ বসুর সহিত ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ · কন্যা শ্রীমতী বজরাণীর শুভ পরিণয়বার্ত্তা যখন লোক পরম্পরায় দীন মিত্রের গৃহে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দীননাথ রোগশয্যায় শয়ানই ছিলেন। এই সুসংবাদ কর্ণগোচর হওয়ার পর তাঁহার পরলোক-গমনের কাল আর বহু-বিলম্বিত হয় নাই। মরণের পূর্ব্বে নিজের দুইবারের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই তিনি কন্যার কাছে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। বুকভাঙ্গা হাহাকারে মনো ইহার জবাব দিয়াছিল, "বাবা, তুমি আমার জন্যে যা করেছ, ক'জন বাপে তা পারে? আমার কপাল, তুমি কি করবে!" এই সান্ত্বনাটুকুকে সম্বল করিয়া লইয়াই বোধ করি পিতা তাহার অতঃপর শান্ত হইয়া চোখ মুদিলেন।

এ সব অতীত কাহিনী,—এখন বর্ত্তমানের খবর লওয়া যাক্।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন সম্পাদিত "পার্ব্বতী" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৷৷০।

শ্রীযুক্ত কানাইলাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত "পুণ্যের আলো" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন বৃহৎ উপন্যাস "সিন্দুর কৌটা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৷৷০।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম-এ প্রণীত "পরিণাম" ৷৷০ আনা সংস্করণের ৩৯ সংখ্যক গ্রন্থ; আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবে।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মায়ের প্রাণ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১।০৭

শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন বি-এ প্রণীত "উইলিয়ম টেল বা সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৷৷০।

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত "উর্ব্বশী" নাটক প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "আকালের মা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৸০।০

হরিসাধন বাবুর নূতন ঐতিহাসিক উপন্যাস "নীলা বেগম" আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবে; মূল্য ১৷৷০।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.



[illegible]বাই ও জেব্ উন্নিসা

শিল্পী— শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার]

["রাজসিংহ"— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপা

Emerald Printing Works
CALCUTTA

সচিত্র মাসিক পত্র
ভারতবর্ষ

শ্রাবণ, ১৩২৬

প্রথম খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি

[অধ্যাপক রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর]

মুসলমান রাজত্বের সময় বহু আর্বী ও ফার্সী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল। কতকগুলি স্থায়ী হইয়া গিয়াছে, ইংরেজী শব্দ দ্বারা কতকগুলি পরাভূত হইয়া স্থান ত্যাগ করিয়াছে। এখন ইংরেজী ভাষার কাল। ঘরে বাহিরে ইংরেজী। কলিকাতায় কত ইংরেজী চলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। দূরবর্ত্তী নগরেও ইংরেজীর প্রচলন অল্প নহে। তথাপি কলিকাতায় গেলে আশ্চর্য হইতে হয়। নূতন বাঙ্গালা শব্দ রচিত হইতে কদাচিৎ দেখিতে পাই। যাহা বা দেখি, তাহা ইংরেজীর এমন অনুবাদ যে আকারে বাঙ্গালা হইলেও কুলশীলে প্রায় ইংরেজী। মানুষ স্বভাবতঃ অলস; সমুখে যাহা পায় তাহা দিয়া কাজ চালাইয়া লয়, ভাল মন্দ প্রায় বিচার করে না। সে দিন কলিকাতা গিয়াছিলাম; মনে করিয়াছিলাম, দেখি কে কি ইংরেজী শব্দ বলে। ঘণ্টা দুই পরে পাণ্ডিত ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। দেখিলাম, সকালে পা-ই-পের জল আসিলে, ড্রেন পরিষ্কার করা, কো-ক কয়লা দিয়া আগুন জ্বালা, ই-স্কু-লে ছেলে পাঠানো, ছেলের বই, সে-স্লে-ট পে-ন্-সি-ল, পে-ন, নী-ব প্রভৃতির খোজ লওয়া, এ সব ত আছেই। সি-ল্কের শাড়ী সে-মি-জ, জ্যা-কে-ট, ই-য়া-রিং, ব্রু-চ, বু-রু-স, এ-সে-ন্-স ইত্যাদি হিন্দুকুল-বধূ স্বচ্ছন্দে বলিয়া যাইতেছেন। বাড়ীর বাহিরে ষ্ট্রী-ট, রো-ড, লে-ন প্রভৃতির সহিত উপপদ হে-রি-শ-ন, ওয়ে-লিং-ট-ন, ক-র্ণা-লি-শ প্রভৃতি যুক্ত হইয়া কলিকাতা যে ইংরেজ রাজধানী তাহা বিঘোষিত করিতেছে। চা-টা-র্জী ব্রা-দা-র্-স্ এ-ণ্ড-কোং, সে-ন্-ক্রে-ণ্ড-স্ এণ্ড-কোং প্রভৃতি নাম দেশী কি বিদেশী, তাহা বুঝিবার জো নাই। বাড়ীর ন-ম্ব-র বাড়িতেছে, নম্বরের পর বা-ই-ন-ম্ব-র যুক্ত হইতেছে। ট্রা-ম, মো-ট-র, বা-ই-ক ছুটিতেছে। "সঞ্জীবনী" বলেন, মো-ট-র-উৎপাত বাড়িতেছে। তথাপি লোকে আ-পি-সে, মা-র্কে-টে, সি-টি-তে ছুটিতেছে। গে-সের আলো, ই-লে-ক্-ট্রি-লা-ই-ট পাইতে হইলে মু-নি-সি-পা-ল্-টির টে-ক্স বাড়েই বাড়ে। ই-ন্-ফ্লু-এ-ঞ্জা, নি-মো-নি-আ, প্লে-গ প্রভৃতির কৃপায় ডা-ক্ত-রের ও ডি-স্-পে-ন্-স-রির বি-ল 'পে' করিতে

করিতে লোকে কাতর হইয়া পড়িতেছে। এদিকে ফে-শ-ন মতন চলিতে হইলে হে-ট-কো-ট-বু-ট চাই। কলিকাতায় কলিকালেও 'হিন্দু-আশ্রম', 'মহতাশ্রম' প্রভৃতি সেকালের চারি আশ্রমের অন্যতম থাকিতেও হিন্দু-হো-টে-ল অল্প লোকের 'আশ্রম' হয় নাই। শহরেই এই, হাওড়ার বি-জ পার হইয়া রে-ল ষ্টে-স-নের ব্যাপার বলিতে গেলে সময়ে কুলাইবে না।

এই সকল ইংরেজী শব্দ লোকের কান যেমন শোনে, জিব যেমন বলে, তেমন চলে। কেহ সাধুভাষায় অনুবাদ করিতে বসে না, শব্দের অর্থ বুঝিতে যায় না, বস্তু নির্দেশ হইলেই হইল। আমরা জন কয়েক, গ্রন্থে ও বক্তৃতায়, শব্দগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া থাকি। বিশেষতঃ যাঁহারা বাঙ্গালা লেখা-পড়া করেন, অন্যকে করিতে বলেন, তাঁহারা কোন্ মুখে ইংরেজী উচ্চারণ করিবেন? কিন্তু রহস্য এই, ইঁহারা সবাই ইংরেজী ভাষা জানেন, এমন জানেন যে বাঙ্গালা ভুলিয়া গেলেও ইঁহাদের ক্লেশ হইত না। শিশু-কালাবধি ইংরেজী পড়িয়া পড়িয়া, ইংরেজী যাঁহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা মুখের কথায় ও হাতের লেখায় ইংরেজী ছাড়িতে চাহিলেও ইংরেজী ছাড়ে না। আমরা হাজার সাবধান হই, ভাষায় ইংরেজী গন্ধ ঘোচে না। আমাদের ভাষা রীতিতে (style) ইংরেজী, রূঢ়িতে (idiom) ইংরেজী না হইয়া পারে না। কারণ আমরা ইংরেজীতে ভাবিয়া বাঙ্গালাতে অনুবাদ করি। 'জাতীয়তা' রক্ষা উচিত মনে করি, কিন্তু করিতে পারি কই?

কয়েকটা উদাহরণ তুলি। আমরা ইংরেজী use কথাটা শিখিয়াছি; কিন্তু ইংরেজীর যাবতীয় প্রয়োগের যোগ্য একটা শব্দ বাঙ্গালাভাষায় নাই। প্রত্যেক ভাষার রূঢ়ি-প্রয়োগ স্বতন্ত্র। ইংরেজীর রূঢ়ি বাঙ্গালায় নাই, বাঙ্গালার রূঢ়ি ইংরেজীতে নাই। ইহা ভুলিয়া আমরা বাঙ্গালায় যেখানে-সেখানে ব্য-ব-হা-র লাগাইতেছি। জুতা ছাতার ব্য-ব-হা-র হইতে ভাত-কাপড়ের ব্য-ব-হা-র, গাড়ী-ঘোড়ার ব্য-ব-হা-র হইতে হাত-পা-মাথার ব্য-ব-হা-র, শক্তির ব্য-ব-হা-র হইতে কবি-প্রতিভার ব্য-ব-হা-র চালাইতেছি। আশ্চর্য বোধ হয়, বড় বড় পণ্ডিত আচার-ব্য-ব-হা-র ভুলিয়া যাইতেছেন। একবার এক বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছিলাম, "আমাদের সহিত ব্য-ব-হা-র করিয়া দেখুন, তুষ্ট হইবেন।" বিজ্ঞাপনের ভাষা প্রায়ই অ-বাঙ্গালা। কিন্তু উক্ত বিজ্ঞাপনে ব্য-ব-হা-র খাঁটি বাঙ্গালা। ব্য-ব-হা-র অর্থে usage আছে বটে (যেমন দেশীয় ব্য-ব-হা-র), কিন্তু usage, custom আর use এক কি? আমরা ভাত খাই, ওষুদ খাই, কাপড় পরি, গাড়িতে চড়ি, হাত দিয়া কাজ করি, মাথা লাগাই, খাটাই, চালাই ইত্যাদি। যাবতীয় use বাঙ্গালা এক কথায় নাই।

আর একটা শব্দ ধরুন, দা-য়ী। ইহা ইংরেজী responsible শব্দের অনুবাদ। কিন্তু অনুবাদ ঠিক হইয়াছে কি? ইংরেজী response উত্তর, প্রত্যুত্তর, প্রতিবাদ। কিন্তু সংস্কৃত কিংবা বাঙ্গালা দা-য় কি তাই? সংস্কৃত ও বাঙ্গালা দায়, দান, দেয়, যেমন কন্যা-দায়; বিভক্তব্য পিতৃ-দ্রব্য যেমন দায়-ভাগ। দেয় অর্থ হইতে বলি 'আমায় দা-য় পড়ে নাই।' দা-য় শব্দের এক অর্থ ক্ষতি, নাশ। ইহা হইতে দা-য়-দফা, 'দা-য়-শিরে দেখা যাবে।' ইংরেজী who will be responsible? ক্ষতি সহিবে কে? অনুযোগের উত্তর দিবে কে? আমার বোধ হয় উত্তর-দা-য়ী (উত্তরদাতা) শব্দের উ-ত্ত-র কাটা পড়িয়াছে। পূর্বকালে সংস্কৃতে বলা হইত ব-ক্ত-ব্য কে? কাহাকে বলা বা বকা যাইবে।

আজ-কাল শুনি, ভি-ত্তি-স্থাপন, ভি-ত্তি-শূন্য। ভি-ত্তি, ইংরেজী foundation শব্দের অনুবাদ। কিন্তু ভি-ত্তি, ভি-ৎ অর্থে কাঁথ; foundation অর্থে পোত, ভিত্তিমূল। পোতের উপরে ভিত্তি। বলার উদ্দেশ্য ভি-ত্তি-মূল স্থাপন, কিংবা পোত বা বাস্তু-প্রতিষ্ঠা।

সংবাদপত্রে বহু নূতন নূতন শব্দ দেখা দিতেছে। সংবাদপত্রের লেখা তাড়াতাড়ির। ভাবিবার চিন্তিবার সময় থাকে না। কিন্তু একবার দুইবার ছাপা হইয়াছে বলিয়া সে সব যে বিনা বিচারে বাঙ্গালাভাষার অঙ্গীভূত করিতে হইবে, এমন কথা কি আছে। এখন agitation আর আ-ন্দো-ল-ন চলিতেছে। কথার আ-ন্দো-ল-ন, কিংবা কথা লইয়া আ-ন্দো-ল-ন বুঝি; বুঝি এ পক্ষ হইতে সে পক্ষ বিচার, অর্থাৎ discussion। কিন্তু যখন কেহ সংবাদপত্রে আ-ন্দো-ল-ন করিতে বলেন, 'ঘোর', 'তুমুল', 'ভয়ঙ্কর' 'আ-ন্দো-ল-ন করিতে বলেন, তখন বুঝি বাদানুবাদ, বিচার, প্রতিবাদ পার হইয়া যাইতে হইবে। তখন কেবল দেহ কিংবা মাথা দোলাইলে চলিবে না। মন দোলাইবারও

সময় নাই। কারণ মনের দোলনে সংশয়; আর, সংশয় থাকিলে, শুভও হইতে পারে মনে হইলে, আ-ন্দো-ল-ন তুমুল করা যাইতে পারে না। ভাবী অমঙ্গলে নিঃসংশয় হইলে উদ্‌বেগ, আকুলতা, ক্ষোভ জন্মে। চিন্তান্দোলিত চিত্তে ব্যাকুলতা আসে বটে, কিন্তু ভাষা শীর্ণ হয়। শব্দের অর্থ-সম্প্রসারণ হয়-ই হয়, এবং হয় বলিয়াই এককালে রচিত শব্দদ্বারা বহুকাল কাজ চলে। কিন্তু যখন দেখি আ-ন্দো-ল-ন শব্দ দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্যের ভেদ পাইতেছি না, তখন ভাষার বৃদ্ধি দেখিতে পাই না। সামান্য (general) ভাব বুঝাইতে শব্দ থাকা চাই, এবং সে ভাব হইতে বিশেষ ভাব আসা স্বাভাবিক। এই হেতু দিয়া ব্য-ব-হা-র শব্দ ব্য ব-হা-র করা যাইতে পারে। পারাপারি কেন, সর্ব্বদা করিতেছি। আর, লোকে যাহা বলে, লেখে, তাহাই ভাষা। সবই ঠিক; তথাপি অপর সহস্র ব্যবহারে যেমন সংযম-রশ্মি না থাকিলে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়, ভাষাতেও পবিত্রতা-বাদী চাই। স্বাস্থ্য-রক্ষা ও দীর্ঘ জীবন লাভের নিমিত্ত আয়ুর্বেদ আমাদিগকে কত কি করিতে বলেন; আমরা সে সব করিতে পারি না, প্রত্যহ শত পাপ করিতেছি। কিন্তু আয়ুর্বেদ আমাদের কৃতকর্মের দোষা দোষ না বলিলে শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকে না।

আর একটা শব্দ ধরুন। National fund বাঙ্গালা করা হইয়াছে, 'জাতীয় ধনভাণ্ডার'। জা-তী-য় পরে বিচার করিব। এখন fund দেখি। ভা-ণ্ডা-র শব্দ, ভা-ণ্ডা-গা-র শব্দের 'গা' লোপে জাত। ভা-ণ্ডা-গা-র বা ভা-ণ্ডা-র, ভাঁ-ড়া-র store room। কলিকাতায় 'স্বদেশী বস্ত্র-ভাণ্ডার অনেক দেখিয়াছি। বৃহৎ পরিবারে ভাঁ-ড়া-র, ভাঁ-ড়া-রী থাকে। অর্থে সন্দেহ নাই। ধ-ন-ভা-ণ্ডা-র store room of wealth। ইহা হইতে stock or capital না বুঝাইতে পারে, এমন নয়। কেহ কেহ ফ-ণ্ড লেখেন, কেহ বা ত-হ-বি-ল বলেন। আশ্চর্য এই, ভা-ণ্ড শব্দ কাহারও মনে আসে নাই। স ভাঁ-ণ্ড শব্দে অর্থ-সম্প্রসারণের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত পাই। পাত্র মাত্রে ভাঁ-ণ্ড, সে পাত্র ঘট-ঘটী বাটা-বাটী থালা-থালী হাঁড়া-হাঁড়ী (যেমন পান-ভাণ্ড, পাক-ভাণ্ড); সিন্দুক বাক্স পেঁড়া, পেঁটারা তোড়ং 'কেস' (case, যেমন নাপিতের ক্ষুর-ভাণ্ড, বাঙ্গালায় ভাঁড়); শস্ত্র, করণ (instrument); বাদ্য (যেমন বাদ্য-ভাণ্ড); মালের বস্তা; অশ্ব-ভূষা, পালান (বোধ হয়, ঘোড়া দ্বারা মাল বহা হইত); ভূষণ মাত্রে; দোকানের মাল, পণ্য, মূলধন; নদীর গর্ভ, দুইতীরের মধ্যবর্ত্তী স্থান। (ভা-ণ্ড অর্থে বিদূষক, যেমন গোপালভাঁড়, ভাঁ-ড়া-মি। বোধ হয় ভ-ণ্ড হইতে ভা-ণ্ড। পশ্চিমবঙ্গে ভাঁ-ড়া-রী ভাঁড়ার-রক্ষক। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে ক্ষুর-ভাণ্ড রাখে বলিয়া ভাঁ-ড়ারী নাপিত।) অতএব ধ-ন-ভা-ণ্ডা-র না বলিয়া ভাণ্ড বলিলেই যথেষ্ট হইত। ভা-ণ্ড হইতে ওড়িয়াতে বলে পা-ন্ঠি। বাঙ্গালাতে অন্য শব্দ আছে, পুঁ জি-পা-টা, স পু-ঞ্জি-পা-ত্র। (পু-ঞ্জি রাশি, পা-ত্র ভাণ্ড।) পু-ঞ্জি শব্দও যথেষ্ট।

কিন্তু যে বি-ভা-গে লেখা-পড়া ও বিদ্যা আছে, সে বি-ভা-গেও জোড়া-তাড়া দিয়া কাজ চালাইবার লক্ষণ দেখিতে পাই। Education শি-ক্ষা বুঝি; যদিও শি-ক্ষা instruction, training, তালিম, (যেমন পাখীকে বোলি শেখানা, ছেলেকে ক-খ শেখানা), তথাপি শি-ক্ষা education হইতে পারে। কিন্তু high education উ-চ্চ-শি-ক্ষা? উ-চ্চ-পদ ঠিক। Highly educated উ-চ্চ-শিক্ষিত, না প-র-ম-শিক্ষিত, সু-শিক্ষিত? High school উচ্চ-বিদ্যালয় বলিলে কিন্তু দ্ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আ-ল-য়টি অবশ্য উ-চ্চে স্থিত নহে। উ-চ্চ-বিদ্যা যে বিদ্যা উচ্চ স্থানে আছে। এ সব মানিতে পারি; কিন্তু উ-চ্চের বিপরীত নী-চ না হইয়া নি-ম্ন হইয়া গিয়াছে। নি-ম্ন-বিদ্যালয় অবশ্য নিম্নে, গর্ত্তে, গভীর স্থানে নহে। ইহাও যেন বুঝিলাম; কিন্তু Lower Primary আর Upper Primary নি-ম্ন ও উ-চ্চ প্রা-থ-মি-ক হইলে ... হইয়া দাঁড়ায় না কি? নি-ম্নের বিপরীত উ-ন্ন-ত, যেমন নী-চের বিপরীত উ-চ্চ। এক গ্রন্থকার নি-ম্ন-ভূগোল নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। নি-ম্ন বঙ্গ জানি, সে অঞ্চল নামাল। Primary প্র-থ-ম নহে, প্রা-থ-মি-ক। এইরূপ, secondary বাঙ্গালায় কি দাঁড়াইয়াছে জানি না। কারণ সংস্কৃতে দ্বি-তী-য় ছাড়া শব্দ নাই। বস্তুতঃ বিপদ ঘটাইয়াছে, শিক্ষা-নীতি; Lower Primary, Upper Primary, Lower secondary, Upper secondary বুঝি। কিন্তু Primary ও Secondary এই দুইএর মাঝে Middle vernacular অথবা Middle English। আ-দ্য, ম-ধ্য-ম, অ-ন্ত্য মন্দ হইত না। Lower, Upper,

অ-ন্ন ব-হু, কিংবা ত-ন্ন পু-রু করিলে বোধ হয় পারিভাষিক হইতে পারিত। আজকাল বিদ্যালয়ে standard হইয়াছে, বাঙ্গালাও হইয়াছে মা-ন! পূর্বকালে তুলা-মান, অঙ্গুলি-মান ছিল, এখন হইল বিদ্যা-মান!

আমরা চলতি কথায় বলি, 'পরীক্ষা দেআ', 'পরীক্ষা লআ'। সাধু ভাষায় পরীক্ষা-প্রদান, পরীক্ষা-গ্রহণ। আমার বোধ হয় এখানে ভাষা-বিভ্রম ঘটিয়াছে। পরীক্ষা examination অর্থ হইলে একজন যিনি পরীক্ষক, দর্শক, তিনি পরীক্ষা ক-রে ন। তখন অন্যজনের কর্তব্য কিছুই থাকে না। আদালতে বিচারক অভিযোগ বিচার করেন, পরীক্ষা করেন; বাদী-প্রতিবাদী বাদপ্রতিবাদ দে-য় না, ক-রে। অতএব 'পরীক্ষা দেআ লআ' বুঝিতে পারা যাইতেছে না। পরীক্ষা test, trial; এই পরীক্ষা দেয় কে? যিনি পরীক্ষক, তিনিই দেন; অন্য জন লয়। অতএব ছাত্র পরীক্ষা দে য় না, সে পরীক্ষা লয়। পরীক্ষা test, a means of trial অর্থ ধরিলে এই হেতুবাদ আরও স্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। কারণ যাহা দ্বারা ছাত্রের বিদ্যার বিচার হইবে, তাহা পরীক্ষক নির্ণয় করেন। পরীক্ষক বলেন, "দেখ এই পরীক্ষা দিলাম, তুমি যদি লইতে পার, লও।" পূর্বকালে জল ও অগ্নি দ্বারা সাধুতার পরীক্ষা হইত। সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল। এইরূপ, কবিকঙ্কণে খুল্লনা পরীক্ষা ল-ই-য়া-ছি-ল।* ইংরেজীতেও she took the test, she did not 'give' the test। প রী-ক্ষা-র্থী শব্দেও তাহা ব্যক্ত আছে। পরীক্ষার্থী পরীক্ষা প্রার্থনা করে, সে দে-য় না। অতএব পরীক্ষক পরীক্ষাদাতা, পরীক্ষার্থী পরীক্ষা-গ্রহীতা। অথচ ভাষায় উল্টা চলিতেছে। কারণ কি? আমার বোধ হয়, he appeared in the test, ইহার অনুবাদে 'সে পরীক্ষায় দর্শন দিয়াছিল', হইতে 'সে দর্শন দিয়াছিল' দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে 'দর্শন-গ্রহণ' বলিতে হয়। 'দর্শন-গ্রহণ' কি রকম?

আজ-কাল ই-স্কু-ল ও ক-লে-জ শব্দদ্বয়ের অনুবাদ শুনি না। কিন্তু বি-শ্ব-বি-দ্যা-ল-য় ছাড়া ইয়ুনিভর্ষিটি শুনি না। কানে শুনি; ছাপায় পড়ি না। কিন্তু বিদ্যার আলয়ের গৃহ নির্মাণ আবশ্যক হইলেও universityর আলয় আদৌ না থাকিলেও চলে। কারণ উহা বিদ্বানের সঙ্ঘ, বিদ্যা-দাতা সঙ্ঘ, corporation। সংক্ষেপে মহাবি-দ্যা-পীঠ। কলেজ ও ইস্কুল যখন ইংরেজী রূপেই চলিতেছে, তখন মহাবিদ্যা-পীঠ বলিলে সে সব বুঝাইবে না।

শি-ক্ষ-ক teacher, instructor। কিন্তু আশ্চর্য, স্ত্রীলিঙ্গে শি-ক্ষ-কা কিংবা শি-ক্ষি-কা না হইয়া নূতন শব্দ শি-ক্ষ-য়ি-ত্রী! কলেজের professor অ-ধ্যা-প-ক নাম লইতেছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অ-ধ্যা-প-ক বেতন গ্রহণ করিতেন না। অদ্যাপি টোলের ও চতুষ্পাঠীর অ-ধ্যা-প-ক বেতন গ্রহণ করেন না; তাঁহারা বিদ্যা দান করেন। কেহ কেহ ভৃতি লইতেছেন বটে; কিন্তু সে ভৃতি বেতন নহে। কলেজের professor এবং উ-পা-ধ্যা য়, সেকালের ও-ঝা। তথাপি বিপদ এই, সংস্কৃত নাম লইলে সংস্কৃত বিদ্যা মনে আসে; অথচ ইস্কুল কলেজে সংস্কৃত দূরে থাক, বাঙ্গালা বলিবারও জো নাই। এই দুই ভাষা শেখানো হয় বটে, কিন্তু ইংরেজী দিয়া। (পণ্ডিতে medium মা-র্গ না বলিয়া বলেন শিক্ষার বা হ-ন ইংরেজী!) ইহার প্রমাণ, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্রে জ্বল্-জ্বল করিতেছে। কাশীর আ-চা-র্য উপাধি অবশ্য পণ্ডিতবর্গ দ্বারা অনুষ্ঠিত। আ-চা-র্য ইংরেজী doctor উপাধির তুল্য। প্রাচীনকালে আ চা-র্য কিন্তু বৈদিক আচারও শিখাইতেন। পরে আ-চা-র্য কিছু লঘু হইলেও সম্মানে বড় ছিলেন। ভাস্কর আ-চা র্য ছিলেন, কারণ তিনি একটা মত doctrine প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। বোপদেব গো-স্বা-মী বড় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ইংরেজী doctorকে আ-চা-র্য কিংবা গো-স্বা-মী বলা চলে না। কারণ সংস্কৃতবিদ্যা শীঘ্র উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। কলেজের professor যদি উ-পা-ধ্যা-য়, তাহা হইলে lecturer প্র-ব-ক্তা, demonstrator প্র-যো-ক্তা। ব-ক্তৃ-তা, বা-গ্মি-তা অর্থে eloquence, lecture নহে।

ইদানী বা-ধ্য-তা-মূ-ল-ক শিক্ষা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার মর্মচ্ছেদ করিতে বসিয়াছে। যে মস্তিষ্ক হইতে এই অপরূপ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার কোষে কোষে ইংরেজীর বাধা-বাধকতা নিশ্চয়ই আছে। একবার পুরীর এক

---

* প্রচারিত কবিকঙ্কণে এক স্থানে দে-উ-ক আছে, এবং দুই স্থানে খুল্লনা পরীক্ষা ক-রি-ব বলিয়াছে। বহু স্থলে পরীক্ষা ল-ই-ল আছে। একজনের মুখে ক-রা, ল-আ বাহির হইতে পারে না। মূল পুথী ভুল?

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা বা-ধি-ত বলে কেন? আমি বলিয়াছিলাম, কারণ তাহারা অনুগ্রহপ্রাপ্তি নিগ্রহ মনে করে। তিনি না-কি বঙ্গদেশীয় এক পণ্ডিতের পত্রে বা-ধি-ত পাইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিয়াছিলেন। বা-ধি-ত দ্বারা এমন বিরুদ্ধ ভাব ঘটে, তাহা স্মরণ কর্তব্য। বা-ধ্য-বা-ধ-ক-তায় এক জন পীড়ক, অপর পীড়িত। বাধ্যতা-মূলক শিক্ষায় শিশু পীড়িত হইবে, শিশুর পিতা মাতাও বাধিত হইবেন। বোধ হয়, আইন বাধক হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা নাম হইতে সূচনা হইতেছে। ইংরেজী শিষ্টাচারে কথায় কথায় obliged হইতে হয়, thanks জানাইতে হয়। দেশীয় শিষ্টাচারে এত বাড়াবাড়ি ছিল না, কিন্তু তা বলিয়া যে আ-ন্ত-রি-ক-তা (একটা নূতন রচিত শব্দ) থাকিত না, এমন নহে। বোধ হইতেছে, বা-ধি-ত আর পূর্বের মতন প্রবল নাই। আমি মনে করি, ব-দ্ধ স্থানে ভুলে বা-ধি-ত; 'আপনার নিকট বাঁধা থাকিলাম', 'আপনার দয়া-বদ্ধ হইলাম', এইরূপ অর্থ। এইরূপ ব-শ্য স্থানে ভুলে বা-ধ্য। 'সে আমার বা-ধ্য', আমার বশ্য। যাহা আমার বশে নহে, তাহা অ-ব-শ্য। Compulsory education শিশুকে না শিখাইয়া ছাড়িবে না, অ-ব-শ্য-শিক্ষা পাইতেই হইবে। কিন্তু অ-ব-শ্য এত প্রচলিত যে এখানে চলিবে না। অ-নু-বি-হি-ত শিক্ষা অনুমোদিত হইতে পারে।

আর এক শব্দ, বি-ভা-গ ধরুন। Burdwan division বর্দ্ধমান বি-ভা-গ; education department শিক্ষা-বি-ভা-গ। বি-ভা-গী-য় ইনস্‌পেক্টর কে, তাহা বুঝিবার জো নাই। Division বি-ভা-গ, একটা কিছুর ভাগ। কিন্তু department তেমন ভাগ নহে। পূর্বকালে অ-ধি-ক-র-ণ বলা হইত। Departmental Head অ-ধি-কা-র-ণি-ক, কিংবা আ-ধি-ক-র-ণি-ক। Education department শিক্ষাধিকরণ, Judicial department ধর্মাধিকরণ, Executive department দণ্ডাধিকরণ, ইত্যাদি। কে-রা-নি শব্দ সংস্কৃতের ক-র-ণ, কা-র-ণি-ক হইতে আসিয়াছে। (আমার বাঙ্গালা কোষে মনে করিয়াছিলাম, ব্যুৎপত্তি পর্তুগীজ।) ওড়িষ্যায় ক-র-ণ, জাতিবিশেষ। কিন্তু ক-র-ণ officer; কা-র-ণি-ক, ক-র-ণি-ক আধুনিক কেরাণি। মূল শব্দের শেষের 'ক' লুপ্ত এবং আগের 'কা' বা 'ক', 'কে' হইয়া গিয়াছে।

দেখা যাইতেছে, থোড় বড়ী-খাড়ার পরিবর্তন না হওয়াতে বাঙ্গালা ভাষা শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। নূতন নূতন ভাব আসিতেছে, কিন্তু ভাষা আসিতেছে না। আরও দুই একটা দৃষ্টান্ত দিই। ইংরেজী Presidency, যেমন Bengal Presidency, শব্দের বাঙ্গালা প্র-দে-শ লেখা হইতেছে। কোন্ কালে কি কারণে Presidency নাম হইয়াছিল, তাহা জানিয়া সম্প্রতি ফল নাই। কিন্তু President নাই, আছেন Governor। তা থাকুন; Presidency প্র-দে-শ, Province প্র-দে-শ, বাঙ্গালায় এক হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু আমরা বলি বঙ্গ-দেশ, বাঙ্গালা-দেশ; বঙ্গ-প্রদেশ কিংবা বাঙ্গালা-প্রদেশ কদাচিৎ বলি। সেটা আমাদের ভুল হইতে পারে; কিন্তু দে-শ ও প্র-দে-শ বলিলে যা বুঝি, Presidency বলিলে তা বুঝি না। Bengal Presidency, Bengal Province রাজার আজ্ঞায় ছোট-বড় হইতেছে, কিন্তু দে-শ ও প্র-দে-শ, বোধ হয়, বহুকাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। আমার বোধ হয় রাজকৃত যে ভাগ, তাহা ম-ণ্ড-ল নামে বলা ভাল। ম-ণ্ড-ল ছোট-বড় হইতে পারে। বঙ্গ-ম-ণ্ড-লে ম-ণ্ড-লে-শ্ব-র আছেন। তাঁহাকে মা-ণ্ড-লি-ক প্র-শা-স্তা বলিতেও পারা যায়। এইরূপ বোম্বাই মণ্ডল, মান্দ্রাজ মণ্ডল, ইত্যাদি Presidency ও Province দুই বুঝাইবে।

যখন Self-government কথাটা প্রথম শোনা গিয়াছিল, তখন কেহ কেহ আত্ম-শা-স-ন বুঝিয়াছিলেন। পরে স্বা-য়-ত্ত-শা-স-ন হইয়াছে। বোধ হয়, এখনও ঠিক হয় নাই। কারণ শাসন নিজের আয়ত্তে আসিলে স্বা-য়-ত্ত হইবে। ইহাতে বুঝায় নিজের শাসন নহে, অপরের শাসন আয়ত্তে আনা হইবে। কিন্তু Self-government দ্বারা স্পষ্টাস্পষ্টি নিজের দ্বারা শাসন। অর্থাৎ স্ব-য়ং-শা-স-ন। ইহার বিপরীত প-র-শা-স-ন। Home rule দেশী-শাসন।

কিন্তু ইংরেজী government নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়। সংবাদপত্র-চালক মহাশয়েরা বাঙ্গালাতে গ-ব-র্ণ-মে-ণ্ট লিখিতেছেন, কিন্তু শব্দটা পড়িতে গ্রাম্যজন হাঁফাইয়া উঠে। গ-ব-র্মে-ণ্ট বলিলে বরং কিছু রক্ষা। বাস্তবিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ করিতে পারা যায় না, এমন নহে। তবে একটা শব্দে কুলাইবে না। Government কোথাও

ত-ন্ত্র বা দণ্ড-নী-তি, কোথাও ম-ণ্ড-ল, কোথাও রা-জ-পু-রু-ষ, কোথাও বা রা-জা কিংবা প্র-ভু। এই-রূপ, adminstration কোথাও শা-স-ন, কোথাও পা-ল-ন, কোথাও নি-র্বা-হ।

কিন্তু কষ্টে ফেলিয়াছে nation কথাটা। কষ্ট বাস্তবিক ছিল না, মিথ্যা মিথ্যা কল্পিত হইয়াছে। ফলে জা-তি শব্দ লইয়া টানা হেঁচড়া চলিতেছে। জা-তী-য় মহা-স-মি-তি, জা-তী-য় ধন-ভা-ণ্ডার, জা-তী-য় জীবন, জা-তী-য় সাহিত্য, জা-তী-য়-তা প্রভৃতির অন্ত নাই। এগুলা যে কি তাহা ভাবিয়া দেখিলে পনর আনা কষ্ট কাটিয়া যাইবে। এই জাতিবহুল দেশে জা-তি ও জা-তীয় শব্দ যেখানে সেখানে বসাইতে পারা যায় না। জা-তি অবশ্য species; কাজেই জন্মগত সম্বন্ধ না থাকিলে জা-তি বলিতে পারা যায় না। এক দেশে জন্ম, অতএব এক জা-তি; বলিতে গেলে সব সময় অর্থ পরিস্ফুট হইবে না। জা-তী-য় পরিচ্ছদ আর কিছু নহে, দেশীয় পরিচ্ছদ; তাহা বঙ্গীয় হউক আর ভারতীয় হউক, দেশীয়। জা-তী-য় উন্নতি দেশের উন্নতি; জা-তী-য় শিক্ষা, দেশীয় শিক্ষা, ইত্যাদি। অবশ্য জা-তী-য় জীবন আলঙ্কারিক প্রয়োগ। অলঙ্কার ছাড়িতে পারিলেই ভাল; অলঙ্কার দ্বারা বস্তু প্রচ্ছন্ন হয়। জা-তী-য় জীবনের বস্তুটা কি? বস্তুজ্ঞান হইলে ঠিক শব্দ পাওয়া যাইতে পারে। Nation রা-ষ্ট্র মন্দ নহে। রা-ষ্ট্র দেশ বটে, যেমন মহারাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, গঙ্গারাষ্ট্র। কিন্তু মূলার্থ রাজ্য, realm, dominion। ব্যুৎপত্তিতেও না কি রা-জ ধাতু। রা-ষ্ট্র শব্দে a people, nation। রা-ষ্ট্র-বিপ্লব সমুদয় জনের সংক্ষোভ। রা-ষ্ট্র-তন্ত্র a system of government, or government। রা-ষ্ট্র-পতি the lord, রা-ষ্ট্র-পাল a protector। রা-ষ্ট্রি-ক দ্বারা রাষ্ট্রবাসী, রাষ্ট্রপতি বুঝায় বটে, nationalistও বুঝাইতে পারে। রা-ষ্ট্রি-য় বা রা-ষ্ট্রী-য় রাষ্ট্রসম্বন্ধী সব। তবে, national রা-ষ্ট্রী-য়। কিন্তু congress স-মি-তি নয়। স-মি-তির বিশেষ নাই, congressএর বিশেষ delegates অ-ধি-কৃ-ত। প্রচলিত শব্দ দিলে প্রচলিত অর্থ চলিয়া আসে। সুতরাং স-ভা, স-মি-তি চলিবে না। সং-স-দ্ তত প্রচলিত নাই। রা-ষ্ট্রী-য় সং-স-দ্ মন্দ হইবে না।

আজ-কাল conference স-ম্মি-ল-ন, স-ম্মি-ল-নী বলা হইতেছে। কিন্তু এই দুই শব্দে union, meeting মাত্র বুঝায়। Conferenceএ গুরুতর বিষয়ের বিচার বা বিমর্শ হয়। Provincial conference মাণ্ডলিকগণের প্রীতিভোজনাদির স্থান নহে; সেখানে দেশের নানা বিষয়ের পর্যালোচনা হয়। বিলাতের Peace conferenceএ নানা দেশের অধিকৃতবর্গের বিমর্শ চলিতেছে। প্রাচীন স-ভা Court of justice হইলেও Conferenceএর তুল্য। Delegate আর representative এক নহে। Delegate অ-ধি-কৃ-ত, representative প্র-তি-নিধি। Parliament প্র-তি-নি-ধি-সভা। ইহার স-ভ্যকে পা-ত্র বলা যাইতে পারে। সেকালে রাজার পা-ত্র-মিত্র-সভাসদ্ থাকিতেন। Council পা-র্ষ-দ্; councillor পা-র্ষ-দ্য। রাজার হইলে অবশ্য ম-ন্ত্রী। Ligislative বি-ধি-দে-শ-ক; executive কা-র্যা-ন্ত-ক, president অবশ্য প-তি। Minster অ-মা-ত্য।

কেহ কেহ State বাঙ্গালায় ষ্টেট লিখিতেছেন। কিন্তু রা-জ্য বলিলে দোষ কি? পূর্বকালে নানাবিধ রা-জ্য ছিল। প্র-জা থাকিলে রা-জা। প্র-জা progeny, পরে people, পরে subjects। এদেশের feudatory states সা-ম-ন্ত রা-জ্য। আমেরিকার 'যুক্ত-রাজ্য' ঠিক নহে; রা-জ্য-বৃ-তি ঠিক। Federal বুঝাইতে বরং রা-জ্য-যূথ। President রা-জ্য-যূ-থ পতি। ('ভক্তমাল' গ্রন্থে রাধা কৃষ্ণের 'যূথ' আছে।) যদি States অর্থে রাজা রাজ্য বর্জন করিতে হয়, তাহা হইলে প্র-কৃ-তি। পারিভাষিক করিতে প্র-কৃ-তি-ক।

ইংরেজীতে cracy যোগে কতকগুলা শব্দ হইয়াছে। যেমন bureau-cracy। কেহ কেহ না কি আ-ম-লা-শা-স-ন করিয়াছেন। কিন্তু রাজ্য যেমন হউক, আমলা থাকিবেই। আমলার দ্বারা শাসন bureaucracy নয়, বটেও। ছোট হইতে বড়, উপরে উপরে আমলা বা ক-র-ণ officers, ছোট হইতে বড় একজনে গেলে bureaucracy। প্রথমে cracy শব্দ দেখি। দৈবক্রমে cracy মূলে গ্রীক শব্দ, এবং সে শব্দ ও সংস্কৃত ক্র-তু এক কিংবা অনুরূপ। cracy অর্থে ক্ষমতা power। ক্র-তু শব্দের এক অর্থ তাই। অন্ততঃ ক্রিয়াসংকল্প [কেশব], ইচ্ছা [মেদিনী]। Bureaucracy প-র-ম্প-রা-ক্রতু।

Autocracy স্ব-ক্র-তু, democracy জ-ন-ক্র-তু, aristocracy শ্রে-ষ্ঠ-ক্র-তু। এইরূপ, ইংরেজী শব্দের কিঞ্চিৎ ধ্বনি, রচিত শব্দে রাখিতে পারিলে ইংরেজী-ভাষাজ্ঞ সহজে অর্থ বোধ করিতে পারিবেন। Monarchy এ-কা-র্কী (এক+অর্কী shining), Oligarchy কু-লা-র্কী। Republic কেহ কেহ জ-ন-ত-ন্ত্র করিয়া থাকেন। কিন্তু ত-ন্ত্র a system; a form of government [তন্ত্রং স্বরাষ্ট্রব্যাপারে]। Republican form of government জ-ন-ত-ন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু democracyতে জ-ন লাগিলে republic শব্দে অন্য এক শব্দ বসাইলে ভাল হয়। অবশ্য republic আর democracy কাছে কাছে। যাহাকে আমেরিকার রাজ্য-যূথ বলা গিয়াছে তাহা federal republic। Republic শব্দেও রা-জ্য বসাইতে পারা যায়। প্র-কৃ-তি অর্থে citizens, corporations of citizens আছে। Republic প্র-কৃ-তি-রাজ্য। পূর্বকালে কু-ল-রাজ্য (of a clan), স্বী-রাজ্য ছিল। Constitution ধা-র-ণা, সং-স্থা, নি-য়-ম। নি-য়-ম শব্দের বিশেষ অর্থ বাঙ্গালায় লোপ পাইয়া বিধি-সামান্যে দাঁড়াইয়াছে। তথাপি নি-য়-ম চলিতে পারে। Constitutional নি-য়-ম-বর্তী, নিয়মানুসারী, নিয়মগত, নিয়ম-মত, ইত্যাদি। ধা-র-ণা a settled rule, সং-স্থা establishment বলা যাইতে পারে। অবশ্য ইহার অন্য অনেক অর্থ আছে। Public শব্দের বাঙ্গালা সা-ধা-র-ণ, যেমন public road সাধারণ রাস্তা, প্রায়ই সরকারী রাস্তা। Public service সরকারী চাকরি। কিন্তু রাজাপ্রজার সম্বন্ধ না বুঝাইয়া public শব্দের বাঙ্গালা চাই। Public আর people মূলে এক, people জ-ন; কিন্তু ইহা হইতে জ-ন্য করিলে বাঙ্গালায় চলিবে না। কারণ, হেতু, নিমিত্ত, অর্থ, প্রভৃতি নানা অর্থে জ-ন্য বলা হইতেছে। Public spirit জ-ন্য উৎসাহ, public man জ-ন্য পুরুষ ইত্যাদি বলা চলে না। প্র-কৃ-তি people, কিন্তু বিশেষণ প্রা-কৃ-ত, প্রা-কৃ-তি-ক বলা চলে না। জ-ন-প-দ the people as opposed to the sovereign। বিশেষণ জা-ন-প-দ belonging to the people হইতে পারে। Public library 'জন-গ্রন্থশালা', public man জা-ন-প-দি-ক। অবশ্য যেখানে জ-ন চলে, সেখানে জা-ন-প-দ বা জ-ন-প-দ ভাল শুনাইবে না। যেমন জন-বাদ বা জন-প্রবাদ, জন-শ্রুতি, জ-ন ব্যবহার, জন-নায়ক। এইরূপ, public man জন-পুরুষ বলা যাইতে পারে।

এখন স-ভা স-মি-তি দেখি। এই দুই ছাড়া স-মা-জ, প-রি-ষ-দ্, স-ম্মি-ল-ন শব্দও চলিতেছে। স-ম্মি-ল-ন বিচার করা গিয়াছে। এই পাঁচ শব্দের প্রয়োগে ভেদ দেখিতে পাই না। ইংরেজীতেও এইরূপ অর্থবাচক শব্দের ভেদ পাওয়া কঠিন। বাঙ্গালাতেও কেন একটা স-ভা, অন্যটা স-মি-তি, কিংবা স-মা-জ, কিংবা প-রি-ষ-দ্ নাম পাইয়াছে, তাহা কার্য দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। এমন কি, যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহারাও একমত হইতে পারেন নাই। কলিকাতায় বঙ্গীয় সা-হি-ত্য-প-রি-ষ-দ আছে, সা-হি-ত্য-স-ভাও আছে, ঢাকায় সা-র-স্ব-ত-স-মা-জ আছে। কলিকাতায় একদিকে ব্রা-হ্ম-ণ-স-মি-তি, অন্যদিকে কা-য়-স্থ-স-ভা আছে। বি-জ্ঞা-ন-স-ভা, শি-ল্প-স-মি-তি, শা-খা-স-মি-তি, সবই আছে। জা-তী-য় ম-হা-স-মি-তি আছে, আর দিনে দিনে অলিতে গলিতে স-ভা স-মি-তি বসিতেছে। একটা নূতন নামও আছে ধ-র্ম-ম-হা-ম-ণ্ড-ল। কিন্তু সকলেরই এক এক স-ভা-প-তি আছেন। স-ভার প-তি স-ভা-প-তি বুঝি। কিন্তু স-মি-তির স-ভা-প-তি, প-রি-ষ-দের স-ভা-প-তি, স-মা-জের স-ভা-প-তি, ম-হা-ম-ণ্ড-লেরও স-ভা-প-তি, কাঁঠালের আমসত্ত্ব। স-মি-তি-পতি, প-রি-ষ-ৎ-প-তি, স-মা-জ-প-তি, ম-হা-ম-ণ্ড-ল-প-তি বলিলে ঠিক হইত না কি? Vice president স-হ-কা-রী-সভাপতি। যদি vice স-হ-কা-রী, তাহা হইলে assistant secretary স-হ-কা-রী-সম্পাদক হইতে পারেন না। Vice সহকারী নহেন, Viceroy সহকারী রাজা নহেন। Viceroy রাজ-প্রতিনিধি, বা উপ-রাজা। তেমনই Vice-president উপ-স-ভা-পতি। আমার বিবেচনায় সভা ছাড়া স-মি-তি, প-রি-ষ-দ্ প্রভৃতির স-ভা-প-তি থাকিতে পারে না। স-ভার স-ভা-প-তি, সে সভার president। অন্যত্র স-মা-জ-প-তি, ইত্যাদি। Chairman অ-ধ্য-ক্ষ। যদি presidentএর পৃথক নাম চাই, তাহা হইলে অ-ধি-প-তি, vice-president উ-পা-ধি-প-তি।

Treasurer হইয়াছেন কো-শা-ধ্য-ক্ষ। টাকার নাম কো-শ। কিন্তু তিনি কোশের অ-ধ্য-ক্ষ-তা করেন না; টাকা আদায় করেন কিংবা নিজের কাছে রাখেন, এবং সভার আজ্ঞামত ঋন দেন। এই লেনা দেনার কর্ম্ম অ-ধ্য-ক্ষ-তা হইতে পারে না। যে গৃহে মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখা হয়, তাহার নাম কো-শ। ইহা হইতে কোশে রক্ষার যোগ্য সোনা-রূপা হীরা-মাণিক প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যও কোশ। সভার কোশা-ধ্য-ক্ষ কেবল টাকা পয়সা রাখেন, সভার মূল্যবান অস্থাবর দ্রব্য রাখেন না। বোধ হয়, ইহা দেখিয়া কেহ কেহ ধনা-ধ্য-ক্ষ বলেন। কিন্তু ধন-সম্পত্তি সুলভ নহে; আর সব ধন গৃহ মধ্যে রক্ষা করিবারও নহে। চাঁদায় পাওয়া টাকার নাম ধন হইলে wealth শব্দের গতি কি হইবে? ন্যাস-রক্ষ-ক নামও দেখিয়াছি। ন্যাস কিন্তু deposit। বেঙ্কে ন্যাস-রক্ষ-ক আবশ্যক; সামান্য সভার ন্যা-সের মধ্যে চাঁদার টাকা। এত ঘোরা-ঘুরি না করিয়া treasurer অর্থ-পা-ল বলিলে দোষ কি হইত? তিনি যদি টাকা আদায় করেন, তাহা হইলে তিনি আ-হ-র্তা (collector)।

বাঙ্গালার স-ম্পা-দ-কের কর্ম নির্দিষ্ট নাই। পুস্তকের স-ম্পা-দ-ক হয় editor, নয় publisher; মাসিকপত্রের স-ম্পা-দ-ক editor; ছাপাখানার স-ম্পা-দ-ক বোধ হয় keeper; দোকানের স-ম্পা-দ-ক বোধ হয় manager। সেদিন দুর্গা-পূজার স-ম্পা-দ-কের সই-করা চিঠি পাইয়াছি। স-ম্পা-দ-ক মাত্রেই কিছু-না-কিছু সম্পাদন করেন। কিন্তু সে কিছু যে কি, তাহা নাম হইতে বুঝিবার জো নাই। সভার স-ম্পা-দ-ক সভার আজ্ঞাবহ, অন্যের সহিত ব্যবহার তাঁহার মুখ্য কর্ম। রাজা-রাজড়ার যে private secretary থাকেন, তাঁহারও কর্ম অন্যের সহিত ব্যবহার। অতএব secretary ব্য-ব-হ-র্তা। ওড়িয়্যার রাজাদিগের এক একজন 'ব্যবর্তা' আছেন; তিনি আর কেহ নহেন, রাজার private secretary ব্য-ব-হ-র্তা। হিন্দীতে secretary মন্ত্রী হইয়া গিয়াছেন। মন্ত্রীর সহিত রাজা মন্ত্রণা করেন; কিন্তু সভার ব্যবহর্তা মন্ত্রণা দেন না; সভার বিচারের সময় উপস্থিত থাকেন বটে, কিন্তু বহু সভা এমন আছে যেখানে বিচারে তাঁহার অধিকার নাই। Assistant secretary অনুব্যবহর্তা, joint secretary সহ-ব্যবহর্তা। Editor হিন্দীতেও প্রায়ই স-ম্পা-দ-ক হইয়া থাকেন। তথাপি সে ভাষায়, বিশেষতঃ সংস্কৃতে সং-শো-ধ-ক। সং-স্ক-র্তা নাম আরও ভাল। নতুবা পুস্তকের সং-স্ক-র-ণ বলিতে পারা যায় না। Manager স-ম্পা-দ-ক, নি-ষ্পা-দ-ক, নি-র্বা-হ-ক, তিনই হইতে পারেন। যিনি assistant, তিনি অনুবর্তন করেন; অতএব তাঁহার নামে অ-নু থাকিলেই চলিবে। এইরূপ, যিনি superior, তাঁহার নামে অ-ধি যোগ করিতে হইবে।

প্রত্যেক সভা প্রায়ই দ্বিবিধ। একটার নাম সা-ধা-র-ণ স-ভা। সা-ধা-র-ণ general শব্দের অনুবাদ।* ইংরেজীতে কিন্তু general association শুনি নাই। কারণ association কখনও general হইতে পারে না; সভা লইয়া সভা। বাঙ্গালায় এই দুর্গতির কারণ বোধ হয় সভার কা-র্য-নি-র্বা-হি-কা সভা। যখন দুইই স-ভা, তখন বড়কে সা-ধা-র-ণ করা হইয়াছে। কেহ কেহ স-ভার আবার স-ভা ভাল মনে করেন না। তাঁহাদের নিকট কা-র্য নি-র্বা-হি-কা সমিতি। কা-য-কা-রি-ণী সভাও না কি আছে। এত পাণ্ডিত্যে না গিয়া কেহ কেহ কা-য-ক-রী সভা বলেন। দেখিতেছি, executive অনুবাদে কা-র্য-নি-র্বা-হি-কা। অনুবাদকার্য ভাল হইয়াছে, কিন্তু শব্দটি দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। কা-র্য কাটিয়া নি-র্বা-হি-কা দ্বারাও কার্যনির্বাহ হইতে পারিত। এদিকে executive service, executive officer প্রভৃতির বাঙ্গালা নামে কা-র্য নাই, (যদিও কা-র্য-বি-ধি অনায়াসে চলিতে পারে), আছে 'শাসন-বিভাগ'। অতএব বোধ হইতেছে কা-র্য-নি-র্বা-হি-ক' নাম কার্যকারী হয় নাই। এক কথায়, কা-র্যা-ন্ত-ক বলিলে সব সোজা হইয়া যায়। কিন্তু executive association নহে, committee। ইহার নিমিত্ত ব্যাকুলতার প্রয়োজন ছিল না, প-ঞ্চ-ক গ্রামের লোকেও বলে। প-ঞ্চা-য়-ৎ কেবল পাঁচজনের যুতি নহে, দশ-বার জনেরও হইতে পারে। প-ঞ্চ-ক committee, প-ঞ্চা-য়-ৎও committee। প্রথম শব্দটি সংস্কৃত, দ্বিতীয় শব্দটি সংস্কৃত-বাঙ্গালার মিশ্রণ; পঞ্চ + যুত বা পঞ্চ-যুতি, কিংবা সংস্কৃত প-ঞ্চ-ৎ শব্দের অপভ্রংশ। Executive

* General Remarks বাঙ্গালায় কি? সাধারণ মন্তব্য? ঠিক হইল কি?

committee কা-র্যা-ন্ত-ক-প-ঞ্চ-ক। শুধু প-ঞ্চ-ক বলাও চলে। ইহার member কা-র্যা-ন্ত-ক। বোধ হয় এই নাম গ্রহণ করিলে সা-ধা-র-ণ সভা বলিতে হইবে না। সভার স-ভা, সমিতির স-মি-তি-ক, সমাজের স-মা-জি-ক, পরিষদ্ ও সংসদের পা-রি-ষ-স্থ সাং-স-স্থ না করিয়া স-দস্য করা চলে।

আরও মজার শব্দ অ-ধি-বে-শ-ন। সভা-সমাজের অ-ধি-বা-স-ন বুঝিতে পারি; সেকালে চন্দনাদি সুগন্ধ দিয়া সভ্যের পূজা করা হইত। সভ্যেরা নিশ্চয়ই আসনে উপবেশন করিতেন; কিন্তু মঞ্চোপরি অধিরূঢ় হইয়া অধিবিষ্ট হইতেন কি না জানি না। কে কবে কোথায় অ-ধি-বে-শ-ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন জানি না। কিন্তু দেখিতেছি উৎকল হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল সর্ব্বত্র সভার অ-ধি-বে-শ-ন হয়। যাহা হউক, ইদানী বঙ্গদেশে কাহার কাহারও দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাঁহারা বৈ-ঠ-ক লিখিতেছেন। শব্দটি কিন্তু বাঙ্গালা নয়, হিন্দী। বাঙ্গালার বৈ-ঠ-ক থা-না পুরাতন বোধ হয় না। কেবল বৈ-ঠ-ক নয়, থা-না দেখিলেই বুঝি ডাক্তার-খানার তুল্য নূতন। এখনও অনেক স্থানে বলে মেলা। গ্রামেও কিন্তু বৈ-ঠ-ক বসে, অর্থ committee। তথাপি অ-ধি-বে-শ-ন স্থানে বৈ-ঠ-ক মন্দের ভাল। কিন্তু "বিচ্ছাং" পরিষদের বৈ-ঠ-ক ভাষায় মানন্ত হয় না। সভা যখন ব-সে, তখন সভার উ-প-বে-শ-ন বলিলে দোষ হইতে পারে না। সভার উপবেশন অবশ্য গৃহের নহে, সভ্যের। তথাপি যদি সন্তোষ না হয়, তাহা হইলে সভার স-মা-গ-ম। Quorum নি-য়-ত স-মা-গ-ম্য, vote ম-তি, majority of votes ভূয়িষ্ঠ মতি, casting vote সংস্থান ম-তি। মতিসংস্থান দ্বারা বিপক্ষকে পরাস্ত করা রীতি আছে।

এখনও auditor আছেন। তিনি আয়-বায়-পরীক্ষক। কোথাও বা হিসাব পরীক্ষক। কোথায় যেন দেখিয়াছিলাম, তিনি লিখিয়াছেন, "পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল হিসাব নির্ভুল।" অবশ্য তিনি টের পান নাই যে তিনি বাঙ্গালীর বেশে ইংরেজের অভিনয় করিতেছেন। কারণ বাঙ্গালী বলে "হিসাবে ভুল নাই," কিংবা "হিসাব ঠিক আছে"; ইংরেজে বলে, Examined and found correct। পূর্ব্বকালে সংস্কৃতে auditorকে বলিত ব্যয়-প্রত্যয়ক। তিনি audit করিতেন, আয়-ব্যয়-প্রত্যয় করিতেন। ব্যয় দেখাই প্রধান; তিনি আ-গম voucher মিলাইয়া ব্যয় দেখিতেন। আমরা র-শী-দ বই জানি না। ওড়িয়াতে বলে পা-উ-তি, সংস্কৃত প্রা-প্তি।

যাহা হউক, আর গ্রন্থবাহুল্য করিব না। বাঙ্গালা ভাষার না কি দ্রুত উন্নতি হইতেছে? ভাষা উপর দিকে উঠিতেছে বটে, কিন্তু জোড়-কলমে উঠিতেছে। জোড়-কলমের গাছ শীঘ্র ফলে, কিন্তু বীজের গাছের মতন তেজী হয় না। অর্থভেদে শব্দভেদ হইলে বুঝি ভাষার বৃদ্ধি হইতেছে, ভাষার জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে। উপরে থোড়-বড়ী-খাড়ার বহু উদাহরণ পাইয়াছি। এই তিনের মাত্রাভেদ করিয়া যত বান্নই রাঁধি, সবেই স্বাদের ঐক্য থাকিবে। নানা অর্থে একই শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখিলে বুঝি ভাষা অকাল-পক্ক হইতেছে, তাহাতে আলস্য ও জরা আসিয়াছে। একটি শব্দের বহু অর্থ থাকিলে শুনিবামাত্র বিবক্ষিত অর্থ মনে আসে না, কথাপ্রসঙ্গ ধ্যান করিতে হয়। যেমন ইংরেজী point, points। ইহা ভাষার গুণ নহে, ভাষার দোষ। অথচ ইংরেজী ভাষায় যত শব্দ আছে, কোনও ভাষায় তত নাই। এখন ইংরেজীতে সাড়ে চারি লক্ষ শব্দ আছে; বৎসরে বৎসরে না কি পাঁচশত নূতন প্রবেশ করিতেছে। এই অতিবৃদ্ধিও দোষ। এক এক শব্দের অর্থে এত সূক্ষ্ম ভেদ হইয়াছে যে বিদেশীর পক্ষে সে ভেদ আয়ত্ত করা কঠিন। ইংরেজের পক্ষেও ইংরেজী ভাষার শব্দবাহুল্য গুণও বটে, দোষও বটে। বোধ হয় দোষের ভাগ বেশী। অল্প কথায় তুষ্ট হইতে দেয় না, বলিতে বলিতে মনে হয় সব বলা হইল না, আরও বলিলে ভাল হইত। কেহ বক্তৃতা করিয়াছেন, ছাপিতে সংবাদ-পত্রের এক পৃষ্ঠা লাগিয়াছে, পড়িতে এক ঘণ্টা গেল, কিন্তু সার কতটুকু? তিল তিল করিয়া ভাব আসিতে থাকে, কারণ শব্দ প্রচুর আছে। পড়িবার শুনিবার সময় মন্দ লাগে না। মনে হয় কতই না নূতন কিছু পাইতেছি। ইহা এক প্রকার গুণ বটে। কিন্তু আমাদের দেশীয় ভাষায় বাগ্‌বিস্তর দোষের মধ্যে গণ্য। সভায় মিতভাষিতা প্রশংসনীয় ছিল। এখন ইংরেজীর সম্পর্কে আমাদের সে গুণ খর্ব হইতেছে। যিনি যত পৃষ্ঠা লিখিতে পারেন, তিনি

তত বড় লেখক ; যিনি যত বলিতে পারেন, তিনি তত বড় বাগ্মী। এ দিকে কিন্তু থোড়-বড়ী-খাড়া পুঁজি।

আমাদের ভাষা বৃদ্ধির তিন উপায় আছে ; (১) সংস্কৃত ভাণ্ডার হইতে শব্দ চয়ন, (২) বাঙ্গালা ধাতুপ্রত্যয় দ্বারা নূতন শব্দ রচন, (৩) বিদেশী শব্দ গ্রহণ।

(১) সংস্কৃত কাব্য হইতে বহু শব্দ বাঙ্গালায় আসিতেছে, কিন্তু কেবল কাব্যের ভাষায় দিন চলে কই? যাঁহারা পণ্ডিত, সংস্কৃতের অধ্যাপক, তাঁহারা যত্নবান্ হইলে আধুনিক ভাব-প্রকাশক বহু শব্দ যোগাইতে পারেন। যাঁহারা পালি, বিশেষতঃ বৌদ্ধ জাতক আলোচনা করেন, তাঁহারাও অনেক যোগাইতে পারেন। কেবল শব্দ কুড়াইয়াও যে দেশের হিত করিতে পারেন, জ্ঞান বাড়াইতে পারেন, তাহা একবার বুঝিলে শীর্ণ বঙ্গভাষার পুষ্টি হইবে। কারণ এক এক শব্দ জ্ঞানের আকর। 'শিশু', 'বালক', 'কিশোর', 'পোগণ্ড', 'যুবা', প্রভৃতি এক এক শব্দ দ্বারা জ্ঞানের প্রসার বাড়িয়া যায়, স্থূল-দৃষ্টি হইতে সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আসে। 'ছেলে' বলিলে যাহা মনে হয়, তাহা এক কথায় বলা চলে না। এইরূপ প্রভেদ দেখাইবার অভিপ্রায়ে আমি উপরে কতকগুলি শব্দ বিচার করিয়াছি। প্রবন্ধের শেষেও দিতেছি। কতকগুলি নিজের রচিত, অধিকাংশ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। আমি এমন বলি না যে এই সব শব্দ চলুক, কিংবা চলিতে পারে। আমাদের আবশ্যক বহু শব্দ সংস্কৃত হইতে পাওয়া যাইতে পারে, ইহা প্রদর্শন প্রধান উদ্দেশ্য। যাঁহার সময় আছে, তিনি বিচার করিতে পারেন, এবং রুচি হইলে গ্রহণও করিতে পারেন। যথাসময়ে ঠিক শব্দ জোটে না বলিয়া সা-ধা-র-ণ সভা ও অ-সা-ধা-র-ণ সভা বলিতে হইতেছে। যদি কেহ এইরূপ শব্দ বাছিয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করেন, তিনি ভাষার উ-ন্ন-তি (? স্থৌল্য ?) নিশ্চয়ই করেন।

(২) বাঙ্গালা ধাতুপ্রত্যয়-যোগে নূতন শব্দ রচনায় বিঘ্ন আছে। (ক) বাঙ্গালায় ধাতু যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্রত্যয় অল্প। সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা পৃথক হইয়াও হইতে পারে নাই। ইহাতে দোষ হইয়াছে, কি গুণ হইয়াছে, তাহা বলা বড় সোজা নয়। এ কথা ঠিক, সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা বিচ্ছিন্ন করা চলে না ; পরে চলিবে কি না, কে জানে। এই হেতু কেহ কেহ দুঃখ করেন ; তাঁহারা বলেন সংস্কৃতের উপতাপে বঙ্গভাষা ব্য-ঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যে দুঃখ মনের মধ্যেই খেলিতে থাকে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় না, সেটা দুঃখ নহে, মোহ। তথাপি কতক শব্দ বাঙ্গালা ধাতুপ্রত্যয় দ্বারা গড়িতে না পারা যায়, এমন নহে। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে কর্ম্ম আমাদের, ইংরেজী-জানা লোকদের, দ্বারা হইবে না। শৈশব হইতে ইংরেজী ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া ভাবিবার শক্তি গিয়াছে। "বিদ্যা-মহাসত্ত্ব" বলেন মুখস্থ করিও না ; কিন্তু বলেন না মুখস্থ করা ছাড়া আর কি উপায় আছে। নূতন ভাষা শেখার আর কি উপায় থাকিতে পারে, তাহা ভাবিয়া পাই না। সে কথা এখন থাক্। ফল কিন্তু প্রত্যক্ষ হইতেছে। আমরা অনুবাদে দক্ষতা লাভ করিতেছি। উপরের উদ্ধৃত শব্দরচনায় বিলক্ষণ দেখা গিয়াছে। যাহারা ইংরেজী জানে না, তাহাদের দ্বারা অনুবাদ চলে না ; তাহাদের নিকট সে পথ বন্ধ। কাজেই তাহাদিগকে ভাবিতে হয়, কোথাও সাদৃশ্য দেখিয়া কোথাও প্রয়োগ বুঝিয়া শব্দ গড়িতে হয়। একটা উদাহরণ দি-ই। আমি কলিকাতা হইতে একটা "ইক্‌মিক কুকার" কিনিয়া আনিয়াছিলাম। দুই পাঁচ দিন রান্নার পর দেখি উহার যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাঙ্গালা নাম হইয়া গিয়াছে! দাঁড়া উনানের হাঁড়ী বেড়া চোঙ্গ চাপা, সব বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। বলিতে কি, সে সবের বাঙ্গালা নাম আমায় করিতে হইলে আমি ইংরেজীর তর্জ্জমা করিতাম। (খ) বাঙ্গালায় রচিত শব্দ সহজে বিশেষ অর্থ পায় না, পারিভাষিক হয় না। (গ) সে শব্দ "এক-ভারতভাষা"র বিরোধী হইয়া পড়ে, ভারতময় ব্যাপ্ত হইতে পারে না। বাঙ্গালার বহু শব্দ অন্যান্য মণ্ডলে চলিবার বিশেষ কারণ; সে সব শব্দ সংস্কৃত। অশুদ্ধ হইলেও, অসার্থক হইলেও, সংস্কৃত রূপের গুণে অন্যত্র সমাদৃত হয়। High School বড় ইস্কুল, compulsory education ন-ই-লে-ন-য় শিক্ষা, ইত্যাদি শব্দ গড়া যাইতে পারে, কিন্তু অল্প, এবং বঙ্গ ছাড়া অন্যত্র অবোধ্য হইবে।

(৩) বিদেশী শব্দ দ্বিবিধ ; (ক) বঙ্গ বিদেশী, যেমন হিন্দী মরাঠী ; (খ) ভারত বিদেশী, যেমন ইংরেজী। (ক) বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দী শব্দ অনেক চলিতেছে। কারণ বিহার, মধ্যপ্রদেশ, 'যুক্তপ্রদেশ' মারবাড় প্রভৃতি হইতে যাহারা বঙ্গে আসে তাহারা হিন্দী বলে। হিন্দীভাষী নূতন

শব্দ গড়িতে পারে, কিন্তু সে শব্দ প্রায়ই বাঙ্গালার ধাতে মেশে না। হিন্দী হইতে এক আ-লা বা ৱা-লা প্রত্যয় বাঙ্গালায় চলিয়াছে। যেমন কা-প-ড়-ৱা-লা। বাঙ্গালায় আ-ল আ-লা ছিল বলিয়া ৱা-লা চলিতে পারিয়াছে। কিন্তু হিন্দীভাষীর রচা শব্দ সংস্কৃতও হইতে পারে, তখন সে শব্দ বাঙ্গালায় স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। হিন্দী মরাঠী বড় বড় ভাষা অবশ্য ঘুমাইয়া নাই। তাহাদিগকেও নূতন শব্দ গড়িতে হইতেছে। এই এই ভাষায় সংবাদ-পত্র ও মাসিক-পত্র পড়িলে সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ দেশী সামন্ত রাজ্যে অনুসন্ধান করিলে দেশী শব্দ পাওয়া যাইতে পারিবে। কারণ সেদেশে এখনও ইংরেজীর অনুবাদ তত চলে নাই। ওড়িয়ায় দেশী নাম অনেক ছিল, রাজার personal officer ছামু-ক-র-ণ (সম্মুখ করণ, প্রায়ই accountant general হইতেন), শ্রী-ক-র-ণ, না-য়-ক officer, প-ট্ট-নায়ক ইত্যাদি ছিলেন। কোন কোন নামে ক-র-ণ, না-য়-ক উহ্য হইত, কর্ম্মানুসারে নাম হইত, যেমন পা-ঞ্জি-আ chamberlain (প ঞ্জি budget দেখিয়া আয়-ব্যয় কারক); গ-স্তা-য়-ত, গ স্তা-ঘ-রি-আ treasurer (সংগ্রহ শব্দের এক অর্থ ধন আছে), ইত্যাদি। এইরূপ ইয়া প্রত্যয় যোগে বাঙ্গালীতেও অনেক শব্দ রচিত হইতে পারে। Librarian গ্র-ন্থি-য়া স্বচ্ছন্দে হইতে পারে। র-স-ই-য়া, মো-টি-য়া, ভা-রি-য়া, না-ই-য়া (না = নৌকা) ইত্যাদি অনেক শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। সে যাহা হউক, কলিকাতায় বসিয়া দেশের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে না। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও অন্য দুই এক স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ আছে। ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় অঞ্চলে কৃতবিদ্য বাঙ্গালী আছেন। তাঁহারা যত্ন করিলে সে সে অঞ্চলে প্রচলিত উত্তম উত্তম শব্দ আহরণ করিয়া বঙ্গভাষা পুষ্ট করিতে পারেন। ভিন্নভিন্ন ভাষার উত্তম উত্তম সাহিত্যও বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া মাসিকপত্র কিম্বা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে পারেন। দেশদেশান্তরের শব্দ ও সাহিত্য সংগ্রহ করিয়া ইংরেজী ভাষার ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। সকল ভাষা ও সাহিত্য স্ব স্ব ধন দান করিতে ব্যগ্র, গ্রহণ করিলেই হয়। বাঙ্গালা মাসিকপত্রে লম্বালম্বা গল্প না ছাপাইয়া দেশের কোথায় কি হইতেছে, তাহার বিবরণ ছাপাইলে পত্র সার্থক হইবে।

(খ) ভারত বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজী অবশ্য প্রধান। ভূরি-ভূরি ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালার রক্তমাংস হইয়া যাইতেছে। কাহারও সাধ্য নাই, সে সকলকে তাড়াইয়া দিয়া দেশী শব্দ চালাইতে পারে। স্বদেশ-মানী কেহ কেহ ইংরেজী শব্দের প্রবেশে আত্মগ্লানি অনুভব করেন, তাঁহাদের দুঃখের কারণ বুঝি, কিন্তু উপায় কি? যাহাকে প্রত্যহ কু-ই-নী-ন খাইতে হইবে, ডা-ক্তা-র ডাকিতে হইবে, তাহাকে কু-ই নী-ন ও ডা-ক্তা-র, দুই-ই বলিতে হইবে। যেটা এদেশে ছিল না, অন্য-দেশ হইতে পাইয়াছি, সেটার সেদেশী নাম নিশ্চয়ই লইতে হইবে। ল-ণ্ঠ-ন, রে-ল, কে রা-সী-ন প্রভৃতির বাঙ্গালা হইতে পারে না।' অথচ বড় বড় পণ্ডিত দ্রব্য বাচক শব্দের বাঙ্গালা খুজিতে বসিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তা বলিয়া কি ইংরেজী অভিধান বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপাইয়া লইতে হইবে? তাহাও নয়। উভয়-সঙ্কটেই বিবেচনা আবশ্যক হয়। গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক শব্দ বাঙ্গালা হইতে হইবে। ইহাতেও ব্যতিক্রম আছে। এত লোক পা-শ, ফে-ল বলিতেছে যে কাহার মুখে চাপা দেওয়া যাইবে? কিন্তু যদি কেহ 'পা-শ করিয়াছে', 'ফে-ল মারিয়াছে' বলে, বাঙ্গালা ভাষা তাহাকে কুলাঙ্গার বলিবে। ইংরেজী ভাষা হইতে শব্দ লইতে হইবে, বঙ্গভাষা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিবার তরে লইতে হইবে, ব্যঙ্গ (deformed) করিবার তরে নহে। ইংরেজী ভাষা হইতে শব্দ লইবার সময় বাঙ্গালার নাড়ী স্মরণ করিতে হইবে। শুনি, বাঙ্গালা না কি মধুর ভাষা। ইংরেজীর কার্কশ্য দূর করিতে হইবে, দৈর্ঘ্য হ্রস্ব করিতে হইবে। ইংরেজীতে 'ত' বর্ণ নাই, আছে এক 'ট'। আমাদের ভাষায় ট্ দংষ্ট্রা বিকশিত করে। উ-ষ্ট্র হয় উ-ষ্ট, বড় জোর উ-ট্র, সোজা উ-ট। ফলে দেখিতেছি, ই লে-ক্-ট্রি-ক, ষ্ট্রী-ট কোমল হইয়া ইলেকটি, ষ্টী-ট (বরং ই-ষ্টি-ট) হইয়াছে। ইংরেজী দুই তিন অক্ষরের শব্দ বাঙ্গালায় চলে, কিন্তু চারি পাঁচ অক্ষরের হইলে মাঝের অক্ষর কাটিয়া ফেলিতে হইবে। গ-ব-র্ণ-মে-ণ্ট, সু-পা-রি-ন্-টে-ন্-ডে-ন্-ট, এ-সো-সি-এ-শ-ন্ প্রভৃতি বাঙ্গালায় দুষ্প্রবেশ্য। কাটিয়া গ-ব-র্মে-ণ্ট, সু-প-রি-ণ্ট, এ-সো-শে-শে-ন, অন্ততঃ চারি অক্ষরে নামাইতে হয়। মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজী ভাষামানী, প্রাকৃতজনের কিছু উপরে উঠিতে পারেন,

অধিক পারেন না। 'হাসপাতাল' শব্দ আমরা রচনা করি নাই, তাহারা করিয়াছে ; আমরা হয় 'রুগ্ন শালা', কিম্বা 'হস্পিটাল' করিতাম।

যত ইংরেজী শব্দ সর্বদা শুনি, এবং যাহার বাঙ্গালা দেখি, সে সকলই এখানে সংগৃহীত হইল না। উদাহরণ অল্প হইলেও চলে। অনেক শব্দ চাণক্যের অর্থ-শাস্ত্র হইতে, কিছু মনুসংহিতা হইতে সঙ্কলিত। স্ব-রচিত শব্দের পাশে তারা চিহ্ন দেওয়া গেল। সভাসমিতি প্রভৃতিতে যে অর্থ লাগে, সে অর্থ মনে রাখিতে হইবে।

Account ...	সংখ্যান
Accountant ...	সংখ্যায়ক
Adjourned (meeting)	বিলম্বিত*
Aeroplane ...	বিমান
Affiliation ...	অভ্যুপগম*
Agenda	করণীয়
Agent	নিয়োগী
confidential „	আপ্তকারী
Aggregate (in the)	সমাহারে
Agreement (compact)	সময়, নিয়ম
Alliance (of states)	সংশ্রয়
Allotment ...	উপকল্পন*
Amendment	শোধন
Amount	সংখ্যা, সমুদায়
Anarchist	রাজদ্বেষী
Apparatus	উপস্কর
Architect ...	স্থপতি
Architecture	স্থপতিশিল্প
Aristocracy	শ্রেষ্ঠ-ক্রতু*
Arts (not science)	কলা
fine „	কান্তকলা*
practical „ ...	বাহ্যকলা
Artisan ...	কারু
Artist ...	কলাবিৎ
Assembly ...	সমবায়, সভা
Assets and liabilities	ঋণ-রিক্থ
Assistant ...	সহায়, অনুচর
asst— ...	অনু-
Association ...	সমাজ
-member ...	সমাজিক
-president ...	সমাজপতি
Attendant (bearer)	উপস্থায়ক
Auditor	সংখ্যা-প্রত্যায়ক
Auction sale ...	বিক্রয় সংঘর্ষ
Autoracy ...	স্ব ক্রতু*
Average, on an	হারাহারি*
Balance (acct.) ...	পরিশেষ
„ sheet ...	পরিশেষ পত্র
„ net ...	নীবী
„ last ...	সংক্রান্ত আয়
Bank	টঙ্কপণ*
Bidding	প্রতিক্রোশ
Bidder	প্রতিক্রোষ্টা
Board (a body)	বর্গ
Body (of men)	পঙ্‌ক্তি
Bonus	উদ্ধরণ*
Brought forward ...	অনুবৃত্ত
Budget ...	স্থানপঞ্জি * (আয় ব্যয় ও স্থিতি। স্থিতি অর্থে স্থান)
Bureaucracy ...	পরম্পরা-ক্রতু*
Business ...	কার্য
to conduct at a meeting ...	বিনির্ণয়
Cabinet ministers	গূঢ়ামাত্য
Calamity ...	উপনিপাত
Capital (of traders)	পরিপণ, ধন, মূল
Capitalist ...	পরিপণিক, ধনিক
Catalogue ...	সংগ্রহ
Centralised ...	একমুখ, একমুখীকৃত
Certificate ...	নিদর্শনপত্র*
Cess ...	কর, বলি
Chairman ...	অধ্যক্ষ*

Charitable-	...	ধর্ম-
Chief (of a state)	...	মুখ্য
Cipher code	...	গূঢ়লেখা, সংজ্ঞা
City	...	পুর, পুরী
Citizen	...	পৌর
Clerk	...	কারণিক
Club	...	গোষ্ঠী
Collection		আদান
to collect		সাধা, (চাঁদা সাধা)
Collector	...	আহর্তা, সমাহর্তা
Combination (trade)		অবরোধ
Commerce		ব্যবহার, ব্যাপার
Commission	..	নিয়োগ, নিযুক্ত
Commissioner		প্রদেষ্টা
„ municipal		নাগরক
Committee	..	পঞ্চক, পঞ্চৎ
Commodity	..	দ্রব্য ; পণ্য
Communique	...	প্রজ্ঞাপন
Company	...	গণ ; সম্ভূয় ; পঙ্ক্তি
(and co.	..	আদি)
formation of	..	সমুত্থান
promoters of		সমুত্থাপক
Compensation	...	বৈধরণ
Concession	...	অনুশয়, অনুগ্রহ
Confederacy	...	সংহতি
Conference	...	সভা
Confused, disordered		সঙ্কুল
Congress	...	সংসদ্ *
Conservative	...	অনুদার, রক্ষাশীল
Consolidation	...	সমাহরণ *
Constitution (of a society)	...	নিয়ম
Contract	...	সংবিত্তি
breach of	...	ব্যতিক্রম
Contribution	...	উপায়ন *

Contributor	...	উপায়ক
Convocation	...	নিমন্ত্রণ*
Co-partner	...	সংসৃষ্ট
Cooperative	...	সমবেত
„ credit society		ঋণদান-সমবায়*
Corporation		সঙ্ঘ ; সঙ্ঘাত
Copyist		লেখক
Co-(receiver)		সহ-(গ্রাহী)
Cornering (trade)		পণ্য-নিচয়
Court of justice	...	ধর্মাসন
„ martial	...	রণাসন *
Credit (of a bank)		প্রত্যয়*
Credited to (acct)	...	অর্পিত
Creditor	...	ধনিক
Criticism	...	বিচার, সমালোচনা
Cost per each	...	(গড় পড়তা)
Council	...	পরিষদ্ ; পার্ষদ্ ; মন্ত্রী পরিষদ
Councillor	...	পার্ষদ্য ; মন্ত্রী
Culture	...	কৃষ্টি
Custodian	...	সন্নিধাতা
placed in custody		উপনিহিত
Customs duty	...	শুল্ক ; বর্ত্তনী
Debate	...	হেতুবাদ
Debtor	..	ধারণিক
Decentralised	...	বহুমুখ, বহুমুখীকৃত
Deficit	...	ন্যূনতা
Delegates	...	অধিকৃত
Demand and supply		যাচনা ও পূরণা*
according to	...	ক্রয়বিক্রয় বশে
Democracy	...	জনক্রতু*
Demonstrator (of a college)		প্রযোক্তা
Department	...	অধিকরণ
-al head	...	অধিকরণিক

Deposit ...	নিক্ষেপ
-or ..	*নিক্ষেপক, নিক্ষেপ্তা*
„ *in a sealed cover*	উপনিধি
Design ...	পরিকল্পন, অভিপ্রায়
-or ...	পরিকল্পক
Detail, in ...	বিক্ষেপে, সবিস্তার
Director ...	অধিকারী
Managing ..	কর্ম্মাধিকারী
Discipline ...	বিনয়
Discount ...	অনুশয়
Dismissal ..	অবক্ষেপ
Distribution ..	বিক্ষেপ
District officer ...	স্থানিক
Division	ভাগ, বিভাগ
Domicile ...	নিবেশ
Duties (of an officer)	কর্ম্ম, প্রচার
Economical ...	অর্থযুক্ত
un- ...	অনর্থযুক্ত
Editor ...	সংকর্ত্তা, সংশোধক
Education ...	শিক্ষা
Primary ...	আদ্য *
Secondary ..	অন্ত্য *
Lower, upper ...	তম্ন, পুরু
Efficiency ...	সামর্থ্য
Election ...	বরণ, নির্ব্বাচন
Emergent ..	আত্যয়িক
-ence ...	অত্যয়
Emigration ...	বমন, প্রবহ *
Empire ...	অধিরাজ্য
Emperor ...	অধিরাজ
Employer ...	ভর্ত্তা, নিযোক্তা
Employee ...	ভৃতক, নিযুক্ত
Endowment ...	স্থাপ্য
Enquiry ...	পৃচ্ছা
Establishment ...	সংস্থা

Excellency, His ...	পুরুষশ্রী *
Executive ...	কার্য্যান্তক
Excess profit, or tax	ব্যাজি
Exhibit ...	প্রেক্ষা
Exhibition ..	প্রেক্ষা
Expert ...	কুশল
Export ...	নির্গমন, প্রবহ
Extremist ...	অত্যন্তী, অতিগামী *
Federation ...	যূথ *
Federal ...	যৌথ *
Fellow (of an incorporated society) ...	সপঙ্‌ক্তি *
Forecast ...	পূর্ব্বচিন্তন *
Form ...	ধরণ*, কোষ্ঠ*
to fill up a form	কোষ্ঠ পূরণ
Freight ... / Fare ...	হাটক, ভাটক
Frontier province ...	প্রত্যন্ত মণ্ডল
Fund ...	ভাণ্ড, পুঞ্জি
Furniture ...	পারিণাহ্য, পরিবাপ
Governor ...	প্রশাস্তা
Government ...	তন্ত্র, দণ্ডনীতি, দণ্ডধর
Grant ...	পরিদান
Guidance ..	প্রবৃত্তি
Guilds ...	শ্রেণী
Hall ...	ইন্দ্রশালা
Handicraft ...	কলাকৃত*
Highness, His ...	মহিমশ্রী*
Home ...	দেশ, স্বদেশ
„ rule ...	দেশীতন্ত্র
„ ruler ...	দেশীতন্ত্রবাদী
„ industry ...	স্বদেশী ব্যবসায়
Honorarium ...	পূজাবেতন
Hotel ...	ঔদনিক
Immigration ...	আবহন

Import	...	আবহ, আনয়ন
-er	...	আবহক
Income	...	আয়
heads of	...	আয় শরীর
sources of	...	আয় মুখ
current	...	বর্ত্তমান আয়
accidental	...	আপতিক আয়
Indigenous	...	মৌল
Industry	...	ব্যবসায়
Industrial arts	...	ব্যবসায়কলা
Inspector	...	নীক্ষক *
sub-	...	অধোনীক্ষক *
asst-	...	অনুনীক্ষক *
Interpellation	...	অন্তঃপৃচ্ছা *
Irrelevent	...	অপ্রস্তুত
Institute	...	সংস্থা
Institution	...	সংস্থান *
Inventor	...	মনোতা
Items	...	পদ
Investment	...	বিক্ষেপ
Joint-	...	সহ-
Joint stock co	...	সাংব্যবহারিক
Knowledge	...	জ্ঞান
practical	...	দৃষ্টজ্ঞান, কৃতজ্ঞান, কর্ম্মজ্ঞান
Laboratory	...	প্রয়োগশালা, অভ্যাসশালা
Labourer	...	ভৃতিক
Laws	...	বিধি (of nature বিধান)
bye-	...	উপবিধি
League	...	পূগ
Lecture	...	ব্যাখ্যান ; প্রপাঠ (in a college
Lecturer	...	বক্তা ; প্রবক্তা (college)
Legislative	...	বিধিদেশক
Liberal	...	উদার, ত্যাগশীল
Library	...	গ্রন্থসংস্থা ; গ্রন্থশালা
Licence	...	অনুজ্ঞা
Lost	...	নষ্ট (যেমন নষ্ট সম্পত্তি)
Machine	...	যন্ত্র
Machinery	...	যন্ত্রসামগ্রী
wear and tear		ক্ষয়ব্যয়
Magazine (monthly)		সঞ্চয়নী*
Magistrate	...	দণ্ডধর
Majesty, His	...	রাজশ্রী *
Manager	...	সম্পাদক, নিষ্পাদক
Manual training	...	শয়-শিক্ষা*
Manufactory	...	কর্ম্মান্তশালা, কলাশালা
Manufacturer	...	কলাকর্ত্তা
Matriculate	...	পাণ্ডুক্রেয় *
Matriculation Exam.		পাণ্ডুকৃত্যা পরীক্ষা *
Mechanic	...	শিল্পকার
-al	...	যান্ত্রিক ; যন্ত্রতুলা
Mechanics	...	যন্ত্রবিদ্যা
Medal	...	কীর্ত্তি-মুদ্রা
Meeting	...	সমিতি, সমাগম
place of	...	আস্থান
sense of	...	অভিপ্রায়
Member	...	পাত্র
Memo	...	প্রণিধি
Merchant	...	বৈদেহিক, বণিক্
Mess	...	সংবাস
Middleman	...	নিস্পৃষ্টার্থ
(Mill) hands	...	সঙ্ঘভৃত
Minister	...	অমাত্য
foreign	...	পরামাত্য
prime	...	মহামাত্য
powers of	...	অমাত্য-বিভব
Miscellaneous	...	প্রকীর্ণক

Mission ... প্রণিধি, চার
Moderates ... মন্থরগামী, অনতিগামী*
Monarchy ... একার্কী *
Moral ... সাধু; ধর্ম্ম
„ character ... আচরণ, চরিত্র
Motion (at a meeting ... উপন্যাস, উপক্ষেপ
Motor ... ভ্রামক
Nation ... রাষ্ট্র
Negotiation ... নির্ধারণা*
Neutrality ... উদাসীনতা
Occupation ... বার্ত্তা
Office ... উপস্থান
Officer ... করণ
Official ... রাজপুরুষ
Superior ... আধিকারিক
Oligarchy ... কুলরাজ্য*
Omission ... লোপ, বর্জ্জন
Orderly ... তৎপুরুষ
Organisation ... ব্যবস্থা
Overseer ... অধিকর্ম্মকর
Paragraph ... বর্গ
Park ... বিহারারাম
Passport ... প্রবেশনী*
Patronage ... পরিগ্রহ
Percent ... শতকে, শতকরা
Pension ... কর্ম্মান্তবেতন
Plan, arrangement ... সম্বিধা
Policy ... নীতি
of state ... রাজনীতি
of Govt. ... দণ্ডনীতি, শাসননীতি
Polytechnic ... পুরু-তক্ষক*, বিশ্বকর্ম্মালয়*
Postpone, to ... অতিপাত
Practice ... ক্রিয়া, অভ্যাস
Precedent ... ধারণা, অধিষ্ঠান
Premium ... কারিতা

President ... অধিপতি
Princes ... রাজক
Proceeding ... কার্য্যবিবরণ
Professor (college) ... উপাধ্যায়
Profit and loss ... ক্ষয়-বৃদ্ধি
Profit, net ... উদয়
Profitable ... উৎপাদিক
Programme ... প্রক্রম*
Promissory note ... সময়াদেশ*
Proposal ... প্রস্তাব
Province ... মণ্ডল
Public ... জন, জানপদিক, সর্ব্বসাধারণ
man ... জন-পুরুষ*
works dept. ... সেতুবন্ধাদিকরণ
servant ... অনুজীবী
Punishment ... নিগ্রহ
reward ... সংগ্রহ
Quorum ... নিয়ত সমাগম্য*
Rate (cess) ... শুল্ক
„ (price) ... অর্ঘ
„ stipulated ... প্রক্রয়
at the rate of ... অনুরূপ, অনুক্রমে
„ (proportion) ... হার (ভাগ)
Raw materials ... অসিদ্ধ দ্রব্য*, মাত্রিকা*
Realised ... সিদ্ধ
Register ... নিবন্ধ
keeper of ... নিবন্ধক
to enter in ... অবতারণ
Regulation ... বিধৃতি
Rejoinder ... প্রতিবচন
Remission ... মোচন*
Report ... আখ্যান
Representative ... প্রতিনিধি
Reproductive ... পুনরাবর্ত্তক
Republic ... প্রকৃতিরাজ্য*

Resolution ...	নির্দ্ধার
Parts of ...	অঙ্গ
Review ...	বিবেচন
-er ...	বিবেচক
Rise and fall ...	উদয় পতন
Rules ...	বিধি
to frame ...	প্রণয়ন
Sealed ...	সমুদ্র
unsealed ...	অমুদ্র
Science ...	বিদ্যা, বিজ্ঞান
„ theoretical ...	অমূর্ত্ত বিজ্ঞান*
„ applied ...	মূর্ত্ত*
„ practical ...	কার্মিক*
Treatise on ...	শাস্ত্র
Scrutiny ...	সমালোচনা
Seconding a resolution ...	অনুমোদন
Secretary ...	ব্যবহর্ত্তা *
Private ...	সমক্ষ ব্যবহর্ত্তা*
Secretariat ...	ব্যবহর্ত্তাবর্গ
Self-determination ...	স্ব-সংকল্প *
„ government ...	স্বয়ং-শাসন *
„ -contained ...	স্ব-স্থিত
Senate ...	বৃদ্ধ-পঙ্‌ক্তি *
Simultaneous ...	যুগপৎ
Sitting ...	উপবেশন, সমাগম
Socialism ...	ধনসাম্য *
Society ...	সমাজ
„ member ...	সামাজিক
„ president ...	সমাজপতি
Sovereignty ...	ঐশ্বর্য
„ absolute ...	একৈশ্বর্য
limited ...	পরিহীন ঐশ্বর্য *
Specialist ...	প্রাজ্ঞ
Standard (in school)	কাষ্ঠা
States ...	রাজ্য, প্রকৃতিক *

feudatory ..	সামন্ত রাজ্য
federal ...	রাজা-যূথ *
Statistics ...	পরিসংখ্যা
Stipend ...	বর্ত্তন
Stock, merchandise	ভাণ্ড
Strike ...	সংঘট্ট
Sub- ..	অপঃ-
Subsidy ...	পরিক্রয়
Subsistence ...	ভক্ত (ভাতা)
Superintendent ...	অধ্যক্ষ
Supplement ...	উত্তর-
Supporting a resolution	সমর্থন, প্রতিপাদন
Surplus ...	উদ্বর্ত্ত
Syllabus ...	পাঠ্যসংক্ষেপ
Syndicate ...	সন্দীক্ষিত *
System ...	তন্ত্র
Tax ...	কর
„ payer ...	করদ
„ not ...	অকরদ
Teacher ...	শিক্ষক, শিক্ষিকা
Asst- ...	অনুশিক্ষক *
Technical school ...	কলাশিক্ষালয় *
Technique ...	কলাকৌশল *
Technical matter ...	শাস্ত্রীয়
Technology ...	কলাবিদ্যা *
Theatre ...	প্রেক্ষা
Theory ...	কল্পনা, কল্প
Testimonial ...	প্রত্যায়ন*
Time server ...	সময়চারিক
Time table ...	সময়বিধা
Title ...	মান
-holder ...	মানী
Toll ...	শুল্ক
Total ...	অগ্রাণি (একুন)
„ receipt ...	সঞ্জাত আয়
„ disbursement ...	সঞ্জাত ব্যয়

Grand	...	সমুদয়পিণ্ড	Union	...	যুতি
Toto, in ; generally		সংক্ষেপে	University	...	মহাবিদ্যাপীঠ
Trade	...	বাণিজ্য	Upkeep	...	সংস্থান
Trader	...	বণিক, বৈদেহিক	Urgent	...	আত্যয়িক
Trade centre	...	পণ্যপত্তন	Vice-	...	উপ-
union	...	পূগ	Vote	...	মতি*
Training	...	শিক্ষা	Casting	...	সংস্থান মতি *
" school	...	শিক্ষালয়	majority of	...	ভূয়িষ্ঠমতি
Treasure	.	নিধি	Voucher	...	আগম
Treasury	...	রাজকোষ	Warning	...	বাগ্‌দণ্ড
Treasurer		অর্থপাল	Workman	...	কার্মিক

ইমান্‌দার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বৈকালের বেলা পড়িয়া আসিতেই, ফৈজু সেই বর্শাটা হাতে লইয়া নদীর উদ্দেশে চলিল। গ্রামের প্রান্তেই দামোদর। বর্শাটা শাণাইয়া লইবার জন্য একটা সুবিধামত পাথর খুঁজিতে-খুঁজিতে নদীর বাঁধের উপর দিয়া কিছু দূর আসিয়া, ফৈজু একটা বনের পাশে উপস্থিত হইল। কয়েকটা বড় পাথর সেখানে পড়িয়া ছিল,—ফৈজু তাহারই একটা মনোনয়ন করিয়া বর্শা শাণাইতে সুরু করিল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ অদূরে একটি পরিচিত কিশোর কণ্ঠের গানের সুর শুনিয়া, ফৈজু চমকিয়া উঠিল। কাণ পাতিয়া আওয়াজটা একবার ভাল করিয়া শুনিয়া, সে তাড়াতাড়ি বর্শাটা তুলিয়া ধার পরীক্ষা করিল ; কিন্তু শাণ তখনো ঠিক হয় নাই ; কাযেই ফৈজু আবার শাণ দিতে লাগিল—কিন্তু মন তাহার চলিয়া গেল গানের দিকে !

একটু পরেই শাণ ঠিক করিয়া, বর্শা তুলিয়া ফৈজু উৎসুক চিত্তে গানের শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। বনের পাশে, অদূরে, বালুচরের উপর একটি ছিপ্‌ছিপে লম্বা, গৌর-বর্ণ তরুণ বালক আড় হইয়া শুইয়া গান গাহিতেছে। ছেলেটির সামনে একটি ধব্‌ধবে শাদা 'কইলে' বাছুর শুইয়া আছে। তারই মুখের কাছে হাত নাড়িয়া উচ্চ চীৎকারে মনের সুখে ছেলেটি গাহিতেছে—

"পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে
ওগো যাও, কোথা যাও ?
সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
ওগো চাও, কারে চাও—"

ঐ পর্য্যন্ত গাহিয়া গায়কপ্রবর, সহসা নিরীহ বাছুরটির গলা জড়াইয়া ধরিয়া, পরম সমাদরে তার এগালে-ওগালে চুমা খাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "আহা ! আর তো ভাই ও গানটা জানি না, তা আর কি করব ? আচ্ছা, আর একটা গাইছি, তুমি চুপ্‌টি করে বসে শোনো—" তার পর প্রাণপণ চীৎকারে গাহিল :—"তুমিই আমার নবীন নধর শ্যাম !"

শ্রোতা বাছুরটি এবার সে চীৎকারে ভয় পাইয়া, চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু গায়ক ছাড়িবার পাত্র নয় ; তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রহস্তে তাহার কাণ ধরিয়া টানিয়া, নিজের গলা হইতে পৈতার গোছা খুলিয়া, বাছুরটার গলায় উত্তম রূপে দুই

প্যাঁচ কসিয়া দিয়া,—মহা খুসীর সহিত হাসি মুখে বলিল, "নাও ভাই, রাগ কোরো না,—তোমায় পৈতেটা দান করে দিলুম! এবার লক্ষীটি হয়ে বসে গান শোন—'তুমিই আমার নবীন নধর শ্যাম!'"

অকস্মাৎ পিছন হইতে কে আসিয়া দৃঢ়হস্তে তাহার চোখ চাপিয়া ধরিল। ভাবমুগ্ধ গায়কের কণ্ঠের মধ্যেই নিতান্ত বেসুরা ছন্দে আর্ত্তনাদ করিয়া সঙ্গীত বেচারা সহসা থামিয়া পড়িল! গায়ক ব্যতিব্যস্ত হইয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, "কেরে! কে আমার চোখ ধরেছে?"

হাস্যরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর হইল, "তোমার 'নবীন নধর শ্যাম' নয়, তা বলে!"

বাছুরটাকে ছাড়িয়া, লোকটার হাত সরাইবার জন্য প্রাণপণে টানাটানি করিতে-করিতে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গায়ক বলিল—"ঈস্! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি! দেখ্‌বি এখনি, এক চড়ে তোর মুণ্ডুপাত করে দেব!"

"পারবে কি ঠাকুর? আমার মুণ্ডুটা নাগাল পাবে তো?" বলিয়া হাসিতে-হাসিতে ফৈজু চোখ ছাড়িয়া দিল! গায়ক তীরবেগে পিছু ফিরিয়া চাহিয়া,—সবিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ও হরি! ফৈজু মামু! তুমি!"

ফৈজু হাসি মুখে বলিল, "দ্যাখো তো শ্যামল মামু, আমার মুণ্ডুটা নাগাল পাবে? চড় তুলে দ্যাখো—আরে না! ধর-ধর বাছুরটাকে—ও তোমার পৈতে নিয়ে পালাচ্ছে—"

শ্যামল এক লাফে গিয়া পলায়নপরায়ণ বাছুরটির কাণ ধরিয়া গালে এক চড় বসাইল। তার পর পৈতা খুলিয়া লইয়া নিজের গলায় পরিতে-পরিতে দারুণ ভৎসনার স্বরে বলিল, "তোর কি ভাই একটুও আক্কেল নেই?—আমার পৈতেটা চুরি করে পালাচ্ছিস্,—তোর কত পাপ হবে বল্ দেখি!"

ফৈজু হাসিয়া বলিল, "বাস্, ওর পাপ হবে কি রকম? তুমি তো আচ্ছা মজার লোক মামু! তুমি তো পৈতে ওকে দান করেছ!"

শ্যামল বুকের উপর পৈতা গুছাইতে-গুছাইতে গম্ভীর মুখে বলিল, "সে কি আর সত্যি-সত্যি দান! সে মিছিমিছি! ও গান শুনতে চাইছিল না কি না, তাই ওই বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখ্‌ছিলুম"—বাছুরটার দিকে চাহিয়া ধমক দিয়া বলিল, "এই! ঠ্যাং ছুড়ে ছট্‌ফট্ করে মরিস নি, থাম! আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তোকে পার্ব্বতী-পিসির বাড়ীতে পৌছে দেব,—নইলে একলা গেলে এখনি কোথাও পথ হারিয়ে গিয়ে মর্‌বি, বুঝ্‌ছিস্ না!"

ফৈজু হাসিয়া বলিল "তাই বটে,—বাছুরটার বুদ্ধি-সুদ্ধি বড় কম! সৎপরামর্শ বোঝে না!"

বিজ্ঞতার সহিত মাথা নাড়িয়া শ্যামল বলিল, "ছেলে-মানুষ কি না! এই মোটে একমাস ওর বয়েস! যাক গে সে কথা, তুমি কবে এলে ফৈজু মামু?"

ফৈজু বলিল "কাল রাত্রে এসেছি; কই, তোমায় তো ওখানে দেখ্‌তে পেলুম না,—কাল কোথা ছিলে?"

মুখ ভার করিয়া শ্যামল বলিল, "কি আর করব বল! মা রাগ করে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।"

ফৈজু সবিস্ময়ে বলিল, "মা? তোমার মা? দিদিমণি? সুমতি দিদি?"

অধিকতর গম্ভীর হইয়া শ্যামল বলিল, "তা নয় তো কে? মা রাগ করে বল্লেন, 'তুমি নিজের পথ দ্যাখো'—তাই নিজের পথ দেখ্‌তে এলুম। পাঁচ দিন ওখান থেকে চলে এসেছি। তিন দিন শ্যাম গোসাঁই'এর বাড়ীতে রেঁধেছি; কিন্তু আজ ওখানকার কায ছেড়ে দিয়েছি।"

ফৈজু বলিল, "কেন ছাড়্‌লে?"

শ্যামল বলিল "গিন্নি মা বড় খিট্‌খিটে—আমার মন টিক্‌ল না। দুপুরবেলা রেঁধে-বেড়ে সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে বল্লুম, 'মা, আমি চান করে আসি'—বলেই ব্যস্ চম্পট্! তার পর আর যায় কে? দ্যাখো ফৈজু মামু, মার জন্যে দুটো পাকা পেপে রেখেছি,—কাকে দিয়ে যে পাঠাই, ঠিক পাচ্ছিনে,—তুমি দিয়ে আসতে পারবে? কিন্তু আজই দিয়ে আসা চাই। কাল সোমবার, মা তো কাল খাবেন না—তুমি আজই দিয়ে এস না—" শেষ কথাটি বড় গভীর আগ্রহ ভরা অনুরোধের সুরে উচ্চারিত হইল।

ফৈজু অবাক্ হইয়া এক দৃষ্টে শ্যামলের মুখ পানে চাহিয়া রহিল। তাহার প্রশান্ত, আয়ত চক্ষু দুটি তাহার অজ্ঞাতসারে স্নেহ-করুণ ব্যথার আলোকে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল।

ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া মৃদু স্বরে ফৈজু বলিল, "রেঁধে-বেড়ে চান্ করতে পালিয়ে এসেছ, আর যাও নি—তা হলে আজ তুমি ভাত খেতে পাও নি?"

উদাস ভাবে শ্যামল বলিল, "তা' আর কি করে পাব ? বনের ঐ পেপে গাছটায় তিনটে পেপে পেকেছিল,—পেড়ে নিয়ে একটা খেলুম, দুটো মার জন্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম—ঐ বালির গাদার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি ! দ্যাখো না কেমন সুন্দর পেপে—" শ্যামল বালি উট্‌কাইয়া দুটা সুবৃহৎ পেঁপে বাহির করিয়া ফৈজুকে দেখাইল।

ফৈজু মহূর্ত্ত কাল নীরবে কি ভাবিয়া—একটু হাসিয়া বলিল—"দুটো পেপেই মাকে দেবে ? তুমি নিজে রাত্রে তা হলে খাবে কি ?"

ঘোর তাচ্ছিল্যের সহিত শ্যামল বলিল, "আমি ! ওঃ, আমার যা-হোক জুট্‌বে অখন্। না জোটে একদিন উপোস করে থাক্‌ব, তার আর কি হয়েছে। কিন্তু মাকে দুটো পেপে না দিলে তো চল্‌বে না মামু—বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে না খাইয়ে তিনি তো কোন জিনিস খাবেন না, জান তো তাঁর স্বভাব !"—একটু থামিয়া দুঃখিতভাবে বলিল, "একবার একটিমাত্র আতা পেয়েছিলুম, মাকে দিয়েছিলুম,—তা সবাইকে খাওয়াতেই মার ফুরিয়ে গেল। নিজে আর খেতে পেলেন না—" শ্যামল আরো অনেকগুলো উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করিল—তাহার অবাধ্য 'মা'র জন্য দুটা পেপেই পাঠান চাই ! ফৈজু বলিল, "খাওয়াটা না হয় জোটে জুট্‌বে, না জোটে না জুট্‌বে—কিন্তু রাত্রে থাক্‌তে তো হবে এক জায়গায়। শীতের রাত্রি—থাকবে কোথায় ?"

নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে শ্যামল বলিল, "তা যেখানে হোক ঠাঁই করে নেব। শীত আবার কি ? আমার শীত-টিত করে না ! আমি বনমানুষ !" শ্যামল সকৌতুকে হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিল !

ফৈজু একটু হাসিয়া বলিল, "তা বেশ বনমানুষ মশাই, তুমি না হয় আজকের মত আমারি বাড়ীতেই থাক্‌বে চল। দাঁড়াও, একসঙ্গে যাব—আমি চট্ করে ডুবটা দিয়ে নিই।"

হাতের বর্শা ও কাঁধের উপর হইতে শুক্‌না কাপড়খানা নামাইয়া তীরে ফেলিয়া, কোমর হইতে গামছা খুলিয়া ফৈজু নদীর জলে নামিয়া পড়িল। ফৈজুর কীর্ত্তি দেখিয়া শ্যামলের প্রাণটাও ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিল; তাহারও বড় ইচ্ছা হইল, সেও তৎক্ষণাৎ অমনি করিয়া জলে নামিয়া পড়িয়া, মনের আনন্দে খানিকটা লম্ফ-ঝম্ফ করিয়া লয় ! কিন্তু ছাড়া পাইলে পাছে বাছুরটা কোথাও পলাইয়া যায়, সেই ভয়ে মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া লইয়া ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "তুমি বেশ বিকালে চান কর্‌তে পার ফৈজু-মামু দাঁড়াও, আমিও কাল থেকে ঐ অভ্যাস ধরব।"

গামছায় গা রগ্‌ড়াইতে-রগ্‌ড়াইতে ফৈজু একটু হাসিয়া বলিল, "হঠাৎ অভ্যাস ধরা ছাড়া, দুয়েতেই হয় দেহে পীড়া'—আমার অভ্যাস হয়ে গেছে আমার সইবে, কিন্তু তোমার সইবে না, বিশেষ এই শীতের দিনে !—কেন মিছে বাত-শ্লেষ্মী হয়ে মর্‌বে—ওসব মতলব ছেড়ে দাও।" একটু নিরুৎসাহ ভাবে শ্যামল বলিল, "তা বটে !" ফৈজু শীঘ্র স্নান সারিয়া কাপড় কাচিয়া লইয়া তীরে উঠিল। তার পর শুক্‌না কাপড় পরিয়া, ভিজে কাপড় ও বর্শাটা হাতে লইয়া বলিল, "চল, আগে বাছুরটা দিয়ে আসা যাক।"

সন্ধ্যা হয় হয়। পার্ব্বতী গোয়ালিনী বাছুরের সন্ধানে বনের মধ্যে চীৎকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিছুদূর আসিয়া সাড়া পাইয়া শ্যামল হাঁকিয়া বলিল—"ওগো পিসি, তোমার বাছুর নদীর ধারে চলে গিয়েছিল, আমি ধরেছি—নিয়ে যাও !"

পার্ব্বতী বনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বাছুরটিকে চিনিতে পারিয়া, সুপ্রচুর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, আগামী কাল আসিয়া ক্ষীর খাইয়া যাইবার জন্য শ্যামলকে নিমন্ত্রণ করিল। তার পর ফৈজুর সঙ্গে সময়োচিত দু'একটা কথা কহিয়া—সে কবে আসিয়াছে, কেমন আছে, ইত্যাদি জানিয়া,—বুড়া বাপ ও বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া অমনভাবে আর বিদেশ বাসের জন্য তাহাকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়া—স্ত্রী-পুত্র লইয়া গৃহবাস করাই যে মনুষ্য-জীবনের চরম সুখ, সে তথ্য জানাইয়া একটা ছোটখাটো বক্তৃতা করিয়া—বাছুরটি লইয়া চলিয়া গেল। ফৈজু হাসি-মুখে নীরবে সব শুনিল, কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না।

পথে ও-পাড়ার বকাউল্লা, সদরুদ্দী, শোভন, নূরমহম্মদ এবং এ-পাড়ার যদু, মধু, বিধু, কানাই প্রভৃতি আরও অনেকের সঙ্গে দেখা হইল। সন্ধ্যার সময় কেহ ভিন্ন গ্রাম হইতে, কেহ চাকরীস্থান হইতে, কেহ মাঠের কায সারিয়া—সবাই নিজ-নিজ বাড়ী ফিরিতেছিল। ফৈজুকে দেখিয়া সকলেই বিস্ময় প্রকাশের সঙ্গে অল্প-বিস্তর আলাপচারী করিবার জন্য দাঁড়াইল। যাহার কাজের তাড়া ছিল সে সংক্ষেপে, এবং যিনি নিষ্কর্ম্মা তিনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা,—

পরদেশে, পরবাসে, পরবশে জীবন-যাপনে মানুষের মনুষ্যত্ব পদার্থটা যে কতখানি শোচনীয় রূপে ক্ষয় পায়,—তাহা বিধিমতে বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেন। গ্রামে বাস করিয়া পুত্র-কলত্র পরিবেষ্টিত সুখের জীবন-যাপন ভিন্ন মানুষের আত্মার যে কিছুতেই ঐহিক তৃপ্তি ও পারত্রিক সদ্গতি হইতে পারে না,—সেটাও কেহ-কেহ বলিলেন। মোট কথা, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারের যত কিছু নিগূঢ় রহস্য সকলেই এক নিশ্বাসে উদ্গীর্ণ করিয়া এই দেশত্যাগী, নির্ব্বোধ, অপোগণ্ড ফৈজুর চৈতন্য-উদ্বোধনের চেষ্টা করিলেন। ফৈজু হাসি-মুখে নীরবে সকলের সৎপরামর্শ শুনিল, কোন তর্ক বা প্রতিবাদ করিল না।

এমনি ভাবে উপদেশ শুনিবার জন্য পথে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া, চলিতে-চলিতে সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ভাল করিয়াই ঘনাইয়া আসিল। তাহারা জমীদার-বাড়ীর পথের মোড় ফিরিয়াছে,—এমন সময় মাথার সামনের টেড়ির শোভা বাঁচাইয়া, মাথায় র‍্যাপার জড়াইয়া, গোঁকে আতর মাখিয়া, বাতাসের ভরে হেলিয়া-দুলিয়া, দুই সৌখীন ছোকরা তাহাদের সামনে আবির্ভূত হইল। আতরের গন্ধ ছাপাইয়া দুজনের মুখে তাড়ির গন্ধ ছুটিতেছে। অগ্রবর্ত্তী জন শ্যামলকে সামনে পাইয়া, একেবারে তাহার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িয়া, সুর করিয়া গাহিল,—"মদন-মোহন মুরলী বদন বল বিবরণ কোথায় ছিলে!"

ফৈজু নিঃশব্দে শ্যামলের মুখপানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া কঠোর ভ্রূকুটি করিল। শ্যামল মনে-মনে শঙ্কিত হইল; কিন্তু মুহূর্ত্তে সজোরে তাহাকে গায়ের উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া উত্তেজিতভাবে বলিল, "ভাখো ভুবন, তোমার পার্ব্বতী মাসী বাছুর হারিয়ে বনের মধ্যে 'ফেকো হারা' হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তুমি তার দুধ-বেচা পয়সায় আতর কিনে গোঁফে লাগিয়ে থিয়েটারে নাচ্‌তে চলেছ! আচ্ছা ছেলে তুমি,—খবর্দ্দার আমার গায়ে অমন করে ঢলে পড়ো না!"

ভুবন তাহার কালো মুখের মাঝে শাদা দাঁত বাহির করিয়া খিঁচাইয়া বলিল, "তোর কি রে শূয়ার! তুই শূয়ারের জাত—মুখ সামলে কথা ক'!"

শ্যামলচাঁদ নিজের পৈতাটা খুলিয়া, অকাতর চিত্তে ভুবনের মাসীর বাছুরকে দান করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু ভুবনের ইতর গালির কাছে সে জাত্যাভিমান খর্ব্ব করিতে কিছুতেই রাজি হইল না। বিশেষতঃ, পিছনে তখন ফৈজু দাঁড়াইয়া আছে; কাযেই তাহার সাহসও তখন অসীম! তৎক্ষণাৎ সে উদ্ধত ভাবে তর্জ্জন করিয়া বলিল, "কী! বামুনের ছেলে আমি, আমায় শূয়ারের জাত বলা! ধেনো গয়লার বাচ্চা,—মুখে রক্ত উঠে মর্‌বে-জান না?"

ভুবন হুঙ্কার করিয়া শ্যামলের গালে চড় মারিতে গেল। ফৈজু এবার অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া সংযত কণ্ঠে বলিল, "থাম!"

ভুবন ফৈজুকে দেখিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িল! পিছন হইতে তাহার সঙ্গী অগ্রসর হইয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কে, ফৈজু না কি?" পরক্ষণে ঈর্ষ্যা মিশ্রিত বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "তুর্কির সুলতান বাহাদুর! তসলীম্!"

এই মানুষটিকে শুধু আজ বলিয়া নয়, ছেলেবেলা হইতেই ফৈজু বেশ একটু ভাল রকম চিনিত! তখন হইতে এই মহাপুরুষটি ফৈজুর উপর আন্তরিক বিদ্বেষ পোষণ করিতেছেন। ফৈজুর অপরাধ,—তাহার বুদ্ধিটা কিছু তীক্ষ্ণ; সেইজন্য সে একটু বেশী শীঘ্র শিখিতে পারিত! সেই প্রচ্ছন্ন ঈর্ষ্যার গুপ্ত আক্রমণ, বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ফৈজু বহুবার অনুভব করিয়াছে,—কিন্তু লোকটার সেই নীচতা ফৈজু বেশ একটু তাচ্ছিল্য ভরা ঘৃণার সহিতই ক্ষমা করিয়া চলিত। আজও করিল,—প্রসন্ন মুখে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিল, "নজিরুদ্দীন সাহেব, মেজাজ সরিফ্? তোমার মা ভাল আছেন তো? কোথায় চলেছ এখন?"

গর্ব্বভরে নজিরুদ্দীন বলিল, "পাড়ার ছোকরাদের নিয়ে একটা থিয়েটারের দল খুলেছি হে! হার্ম্মোনিয়াম্, বায়া, তব্‌লা, আর বেয়ালা যোগাড় হয়েছে,—সবাই মিলে চাঁদা করে চালাচ্ছি। তোমাদের ছোটবাবু বাড়ীতে এসেছেন, নয়? দাঁড়াও, কতকগুলো সাজ পোষাকের দাম আদায় করবার জন্যে কাল তাঁকে গিয়ে ধরছি!"

ফৈজু সে কথায় কাণ না দিয়া—বলিল, "এখন আড্ডা-বাড়ীতে চলেছ বুঝি? আড্ডাটা কোথা?"

মাথা চুলকাইয়া নজিরুদ্দীন বলিল, "এখনো কোথাও ঠিক হয় নি,—আজ আমার বাড়ী, কাল ভুবনের বাড়ী—এমনি করেই বৈঠক বস্‌ছে। কাল আমার বাড়ীতে যেও, সেইখানে বৈঠক বস্‌বে।"

শ্যামলের দিকে আঙুল দেখাইয়া ফৈজু বলিল, "এ ছোকরাও তোমাদের দলে ঢুকেছে, নয় ?"

নজিরুদ্দীন উৎসাহের সহিত বলিল, "ওর গলা খাসা আছে হে! তবে মাথার ঠিক নাই। দুদিন বেশ আড্ডায় গিয়েছিল, আজ তিন দিন আর দেখা নাই! নইলে ও যদি নিয়মমত হাজুরে দিয়ে মেয়েমানুষের পার্ট অভ্যাস করে, তবে খাসা একট্রেস হয়ে দাঁড়াবে। ওমিতর আর দু'চারটি ছোকরা যোগাড় করে দিতে পার, তাহলে আমাদের থিয়েটারটা—"

শঙ্কাকুল শ্যামল অধীর ভাবে বাধা দিয়া বলিল, "কখ্খনো না, —আমি তোমাদের থিয়েটার ফিয়েটারে ঢুকব না,—তোমরা অন্য লোক দেখো। থিয়েটার কি ভাল জিনিস ? ছিঃ, হাঁ ফৈজু মামু, তুমি বল—"

শ্যামল কেন যে হঠাৎ থিয়েটারের উপর এত চটিয়া, ফৈজুকে মধ্যস্থ মানিয়া বসিল, ফৈজু সেটা বুঝিল। একটু হাসিয়া বলিল, "না, থিয়েটার খারাপ কেন হতে যাবে! ভাল ভাবে কাষ চালাতে পারলে, ও একটা মস্ত দরকারী জিনিস। তবে শুধু রঙ্গ-রহস্যের আড্ডা করে তোলাই খারাপ। বেশ তো, তোমাদের কাযটা যত্ন করে চালাও, ভাল-ভাল মুরুব্বি ঠিক কর।"

"ভাল মুরুব্বি ?" উৎসাহের সহিত নজিরুদ্দিন বলিয়া উঠিল, "সঙ্কটপুরের সেজ বাবু আছেন,—হার্ম্মোনিয়াম দিয়েছেন তিনি। আমাদের দল ঠিক হলে তাঁর বাড়ীতে একদিন যাক্ট করে আসব, কথা আছে।"

ফৈজু হাত ধরা অবধি ভুবন এতক্ষণ বাকশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল! এই বার সচেতন হইয়া বলিল, "মদনগোপালের বাড়ীর মোহন্ত মশাই আছেন। উনি কল্‌কাতায় থিয়েটারের দলে আগে ছিলেন। খুব ভাল থিয়েটার করতে পারেন ; উনিও আমাদের দলে আছেন,—রোজ তব্‌লা বাজাতে আসেন।"

"বেশ ভাল—" বলিয়া শ্যামলের দিকে চাহিয়া ফৈজু গম্ভীর ভাবে বলিল "বাড়ী চল, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।"

নজিরুদ্দিন বাধা দিয়া বলিল "আড্ডায় যাবে না ?"

ফৈজু বলিল "না, ও সমস্ত দিন ভাত খেতে পায় নি, এখন আড্ডায় যাবে কি ?" একটু থামিয়া হাসিয়া বলিল, "এ রকম সব গরীবের ছেলেকে আড্ডায় ঢুকিও না হে—তা হলে তোমাদের থিয়েটারের দফা নিকেশ হয়ে যাবে! ওদের খাবার ভাত নাই, পরবার কাপড় নাই—অম্নিতেই ওরা মরে রয়েছে,—আর থিয়েটারের হুজুগে এদের নাচিও না, শেষে চুরি ডাকাতি ধর্‌বে।"

নজিরুদ্দীন এবং ভুবন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "কেন ? চুরি ডাকাতি ই বা ধরবে কেন ?"

ফৈজু সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "আদাব, আসি এখন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।" শ্যামলকে টানিয়া ফৈজু অগ্রসর হইল।

নজিরুদ্দীন পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, "আদাব ফৈজু, তুমি কি তা'হলে এখন গাঁয়ে বাস করবে ? না, আবার তোমার সুলতানার অসুখ করেছে বলে—দেশ ছেড়ে চম্পট দেবে ?" ব্যঙ্গভরে উচ্চ হাস্য করিয়া নজিরুদ্দীন পুনরায় বলিল, "পরিবার কি কারুর নাই হে ? না, কারুর পরিবারের অসুখ হয় না ?— বলে, কত লোকের পরিবার যে খাবি খেয়ে মরে যাচ্ছে,—তা গাঁয়ের ক'জন লোক পরিবারের জন্য দেশ ছাড়া হচ্ছে—এ্যাঁ ?"

ভুবন ফৈজুর সামনে কুণ্ঠিত মেষ-শাবকটির মত এতক্ষণ ঘাড় গুঁজিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া ছিল ; এবার ফৈজুকে দূরে যাইতে দেখিয়া, বীরদর্পে বুক ফুলাইয়া শ্লেষভরে বলিল, "আমার পরিবার যে এখন মরে তখন মরে! মাসী বল্লে 'বাবা দু'দিনের জন্যে থাক্, আমি তারকনাথে 'হত্তে' দিয়ে আসি'।—আমি সাফ্ জবাব ঝেড়ে দিয়ে বল্লুম, 'আমার দ্বারা ও-সব হবে-টবে না মাসী, তাতে পরিবার মরুক আর বাঁচুক!'—পুরুষ মানুষ আবার পরিবারের সেবা করবে কি ? আমি পুরুষ-বাচ্চা,—আমার মরিখ্যি জীবনের সুখ-স্বোয়াস্তি নেই! হুঁ!"

শেষের কথাটা ভুবনমোহন খুব উঁচু গলায়—শ্লাঘা গর্ব্বে স্ফীত হইয়াই উচ্চারণ করিয়াছিল,—দূরে শ্যামলের কাণে তাহা পৌঁছিল। ফৈজুর কাণে পৌঁছিয়াছিল কি না বলা শক্ত ;—কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করিল না—যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। শ্যামল ঘাড় ফিরাইয়া তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "হ্যাঁগো পুরুষ-বাচ্চা, তোমার মুখে তাই শকুনি উড়ে দেখেছি!"

দন্ত খিঁটি-মিটি করিয়া ভুবন বলিল, "যে দিন ধরে প্রহার দেব, সে দিন টের পাবি—তোর বড়-লোক মনীবদের খাতির সে দিন ছির্‌কুটে দেব!" শেষের কথাটা খুব আস্তে, কেহ শুনিতে পাইল না।

সাহিত্য ও সমালোচনা

[অধ্যাপক শ্রীরামপদ মজুমদার এম্‌-এ]

সাহিত্যে অধ্যাত্ম-চেতনা

জীবনে সত্য-প্রতিষ্ঠাই সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য; এবং যে পরিমাণে ইহাতে সাফল্য লাভ করা যায়, সেই পরিমাণে সাহিত্যের সার্থকতা। সত্য-চর্চ্চা এবং সত্য প্রতিষ্ঠা এক নহে। দর্শন ও বিজ্ঞান যুক্তি, তর্ক অথবা প্রমাণ দ্বারা সত্য-চর্চ্চা করিয়া থাকে—ইহা বাস্তব তত্ত্বের আলোচনা, এবং প্রধানতঃ বিশ্লেষণ-মূলক। সত্যকে জ্ঞানের অধিগম্য করাই—সত্য-চর্চ্চার মূলীভূত কারণ। কিন্তু যখন সৌন্দর্য্যের সংস্পর্শে এবং ভাবের হিল্লোলে সত্য আর শুধু জ্ঞানের বলিয়া মনে হয় না,—আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রাণের সহিত নিগূঢ় ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া যায়, তখনই তাহার প্রতিষ্ঠা জীবনে আরব্ধ হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সত্য চর্চ্চার পরিমাপক হইতে পারে; কিন্তু ইহারা যে সত্য প্রতিষ্ঠায় কতদূর সহায়তা করে, সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে; কারণ, ভাব ও কল্পনা ব্যতীত, অর্থাৎ সত্যকে সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত না করিলে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে জ্ঞানের ধারা সহস্রধা বিভক্ত হইয়া ছুটিয়াছে; এবং এই বহুমুখী গতিকে প্রাণের সহিত যুক্ত করা সাহিত্যিকের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিতেছে।

ব্যাপক ভাবে দেখিতে গেলে, ধর্ম্ম ও সাহিত্য একই কার্য্যে নিয়োজিত—জীবনে সত্যানুভূতি উভয়েরই উদ্দেশ্য। কতকগুলি বিশেষ সত্যকে ধর্ম্ম মানবজীবনের মূলসূত্র বিবেচনা করিয়া, বহু উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সেগুলিকে ভাববস্তুতে পরিণত করিতে চায়; এবং সেই জন্যই ধর্ম্মপ্রাণ সমাজে মনুষ্য চেষ্টা-সম্ভূত সমস্ত জ্ঞান ও শিল্প ধর্ম্মে কেন্দ্রীভূত হয়। ধর্ম্মের বিশেষ সত্যগুলি এত বড় বলিয়া মনে হয় যে, সর্ব্বপ্রকার আচার, অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থার ভিতর দিয়া তাহাদিগকে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। প্রাণের গভীরতা লাভ করিতে গিয়া মনের ব্যাপকতা নষ্ট হয়; এবং ধর্ম্ম সহজেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। একদিকে সত্যানুভূতি যত বাড়িতে থাকে, অন্য দিকে সত্যোপলব্ধি তত কমিয়া যায়; কারণ, এই অনুভূতি ধর্ম্ম এত গভীর ভাবে চায় যে, মানব-মনের স্বাধীন চিন্তা ইহার অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু যখন কোনও ধর্ম্ম নূতন প্রচারিত হয়, তখন এই সঙ্কীর্ণতা ধরা পড়ে না;—তখন মুখ্যতঃ প্রাণশক্তিরই উদ্বোধন করে বলিয়া জাতীয় জীবনে অভূতপূর্ব্ব মানসিক বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মের গভীরতা সাহিত্যে নাই, এবং সাহিত্যের ব্যাপকতা ধর্ম্মে দেখা যায় না। যে বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ সাধনার পথে অগ্রসর হয়, সাহিত্যে শুধু ভাষার মধ্য দিয়া, ভাব ও কল্পনার সাহায্যে—সেই সত্যানুভূতি লাভ করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। ইহাকে কোনও বিশেষ সত্যের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা চলে না,—ইহা সর্ব্বদেশের সর্ব্বপ্রকার সত্যের সহিত প্রাণের যোগ স্থাপন করে। ধর্ম্মের চেয়ে সাহিত্যে সত্যানুভূতি অনেকটা উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ; এবং—ইহাতে তত আত্মবিস্মৃতি নাই। সাহিত্যিক নিজেকে কেন্দ্র করিয়া সংসারের গতি নিরূপিত করিবার চেষ্টা পান,—জগতের বৈচিত্র্য হইতে আনন্দ রস শোষণ করিয়া সাধারণে বিতরণ করেন। বাস্তবিক, সাহিত্য দুই প্রকার আনন্দের সন্ধানে ব্যাপৃত—এক, সৃষ্টির আনন্দ, আর এক, ব্যাপ্তির আনন্দ। একই সত্য নব-নব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া একদিকে আত্মপ্রসাদে পরিণত হয়; আর একদিকে তেমনই যত নূতন সত্যের সহিত পরিচয় লাভ হইতে থাকে, ততই তাহা আনন্দ দান করে। সত্যোপলব্ধির মধ্যে আনন্দ না থাকিলে, সাহিত্য-চেষ্টা আসিতে পারে না; এবং এই জন্য অধ্যাত্ম চেতনার দীপ্তি প্রকৃত সাহিত্যে স্বভাবতঃই স্ফূর্ত্ত। এই চেতনা সম্যক্ জাগরিত না হইলে, সত্যের স্বরূপ পরিস্ফুট হয় না—ইহা যেন কথার কথা থাকিয়া যায়।

সমাজে, ধর্ম্মে, নীতিতে, আচারে, ব্যবস্থায় সাধারণ

লোকের আত্মানুভূতি কমিয়া যায়। তাহাদের প্রকৃতি জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। তাহাদের ভাব এবং ভাষাও পরানুবৃত্তি। তাই তাহাদের চিন্তার গতি নাই— প্রাণের বিকাশ নাই। শক্তি যাহার আছে, সে-ই শক্তিকে আপন করিয়া লইতে পারে। দেহে জীবনী-শক্তি থাকিলে, বিভিন্ন প্রকার খাদ্য হইতে শক্তি সঞ্চয় করা যায়। সাহিত্যিক যিনি, তাঁহার এই শক্তি অর্থাৎ প্রাণ চাই। আমাদের প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ তখন, যখন আমরা বাহ্যজগৎ হইতে নিজেকে পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি করি। সাহিত্যিককেও তেমনই বাহিরের আচার, নীতি, ব্যবস্থা– এই যে জড়ের চাপ—এ সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের মানসিক সত্তার,—অন্তর্জগতের একটা স্পষ্ট অনুভূতি লাভ করিতে হয়; এবং এই অনুভূতি যত দিন না হয়, তত দিন কোনও সত্যকে সম্পূর্ণভাবে আত্মগত করিতে পারা যায় না। মানুষ কতটা বিশ্বাস করে, এবং কতটা বিশ্বাস করে না, তাহা নিজের নিকটেই সুস্পষ্ট হয় না; বাক্যজালে ও সংস্কারে আবৃত হইয়া মানুষ সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। এইরূপে আত্মানুভূতি জন্মিলে, অর্থাৎ অধ্যাত্ম-চেতনা জাগিলে, আমাদের দিব্য-চক্ষু খুলিয়া যায়—সমস্ত সত্য, এবং তথ্যের ভিতর একটা সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠে,—তাহারা আর অসংলগ্ন, খণ্ড, বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয় না। মনুষ্য-চেতনা বিভিন্ন কোঠায় সীমাবদ্ধ হইয়া স্বতন্ত্র নহে– অন্তরের সত্তা এক, অখণ্ড,—ঈশ্বরের মত ব্যাপ্ত;—কোনও সত্য অথবা তথ্য ইহার সহিত মিশিয়া গেলে, জীবনের যত সম্পর্ক, যাহা কিছু স্থূল বাস্তব,– এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া যায়;—এবং বাহিরের সহিত ভিতরের সম্বন্ধ আপনিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। প্রত্যেক দেশের উচ্চ-সাহিত্যের মূলে অধ্যাত্ম-চেতনার গভীরতা আছে; এবং ইহারই অভাবেই—ভাব ও কল্পনার প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও, বাঙ্গলায় উচ্চ সাহিত্য অতি বিরল। কারণ, বাঙ্গালী নিজেকে বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। সে পরের মুখে ঝাল খাইতে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, অন্তরের অজ্ঞাত রাজ্যে প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা বোধ করে নাই; এবং এখনও সংস্কার হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্ম-স্বরূপ বুঝিতে পারিতেছে না।

এই চৈতন্য-শক্তির অভাব আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতি পদেই লক্ষিত হইতেছে। আমরা কোন সত্যকেই,—সে প্রাচ্যেরই হউক, আর প্রতীচ্যেরই হউক—প্রাণের সহিত যোগ করিয়া দেখিতে পারিতেছি না,—অসংলগ্ন, খণ্ড-খণ্ড করিয়া দেখিতেছি। এ যেন জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখস্থ করিয়া পাশ করিবার চেষ্টা;—শুধু ভাব ও ভাষার উচ্ছ্বাস লইয়া জগৎ-সাহিত্যে প্রবেশলাভের আকাঙ্ক্ষা। এই জন্য আমাদের সাহিত্যে অনেক স্থলেই সামঞ্জস্য থাকে না,—মানসিক বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। এই বিশৃঙ্খলতা আমাদের এতই স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে যে, সাহিত্যে ইহার অস্তিত্ব আমরা সহজে ধরিতে পারি না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, স্বাধীন মৈথুন প্রেম, যাহা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে বাঙ্গলা উপন্যাসের ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এ স্বাধীনতা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার যে কি রূপান্তর হয়, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? যে হিন্দু আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের সমাজ-চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, এ স্বাধীনতা কি তাহার মূলে কুঠারাঘাত করে না? সমাজে এক দিক দিয়া স্বাধীনতা কল্পনা করিলে কত শাখা প্রশাখায় যে সে রস সঞ্চারিত হয়, কে বলিতে পারে? এই স্বাধীনতার অনুভূতি যদি অধ্যাত্ম-চেতনা হইতে আসিত, তাহা হইলে দেখিতাম, আমাদের উপন্যাস-বর্ণিত সমাজে এ অসামঞ্জস্য নাই,—তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ইহা যেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেমরস বাঙ্গলা উপন্যাস হইতে পাইবার চেষ্টা। জলের পিপাসা ঘোলে মিটাইতে চাহিলে যাহা হয়, আমাদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে—পিপাসা যাইতেছে না, রুচিবিকার হইতেছে।

বাস্তবিক, প্রাচ্যের ভাব ও চিন্তা আমাদের চেতনায় যত সংযুক্ত হইয়া আছে, প্রতীচ্যের তাহা হয় নাই। কাজে কাজেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের সম্মিলন যেখানে হইয়াছে, সেখানেই আমাদের সাহিত্যে কেমন একটা অস্বাভাবিকত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর চক্ষে ইহা ধরা পড়ে না; কারণ, আমাদের মানসিক জীবন অসামঞ্জস্যেরই প্রতিমূর্ত্তি। বাঙ্গলার উপন্যাসে পাশ্চাত্য সভ্যতার খাঁটী সুরটী পাওয়া যায় না,—পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রলেপ দিয়া প্রাচ্য ভাব ও চিন্তা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। কতকগুলি পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদের সাহিত্যে দেখা দিয়াছে; অথচ, ইহাদের সহিত সামাজিক আদান-প্রদানের, অন্তরের সম্বন্ধ

পনের, কোনও সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয় না। অনাহূত তিথির ন্যায় ইহারা অকারণ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে,—ইহাদিগকে আদর করিয়া ঘরে লইতে পারিতেছি না, এদিকে তাড়াইয়া দিবার ক্ষমতাও নাই।

আমাদের মানসিক জীবনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পাশাপাশি রহিয়া গিয়াছে,—এখন পর্য্যন্ত ইহাদের মিলনের পথ উন্মুক্ত হয় নাই। কেবল দুই-চারিজন লোকের মধ্যে এই মিলনের সূত্রপাত হইয়াছে। বাহিরের সত্য ও ভিতরের সত্য,—স্কুল-কলেজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক সত্য, সমাজে ও গৃহে আর এক সত্য—এইরূপে যত দিন আমাদের মনের সহিত হৃদয়ের বিচ্ছেদ থাকে, তত দিন বঙ্গ-সাহিত্যের এই আত্যন্তিক বিশৃঙ্খলতা আমাদের নিকটে অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে না। কিন্তু যদি কোনও দিন পাশ্চাত্য স্বাধীনতা ও সাম্য শুধু কথার কথা না হয়, আমাদের সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতির মধ্য দিয়া ক্রমশঃ স্ফুরিত হইতে আরম্ভ করে; তখন আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিব,—ভাব ও চিন্তার প্রসারে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য কত সঙ্কীর্ণ; এবং ইহার ভিতরে আমাদের মনের অগোচরে কত পরস্পর-বিরোধী সত্য কেমন স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে!

আবার এ কথাও ঠিক যে, যদি কোন সত্য অধ্যাত্ম চেতনায় মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে, তাহা হইলে রচনার শত অসামঞ্জস্য ও ত্রুটী সেই গুণে অনেকটা ঢাকা পড়িয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকে সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়া যে স্বদেশ-প্রীতি জ্বালাময়ী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের সাহিত্য হইতে কখনই অপসারিত হইবে না; কারণ, তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই স্বদেশ প্রীতির উৎস তাঁহার প্রত্যেক নাটককে প্রাণবান্ ও মহিমান্বিত করিয়া দিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রকেই বাঙ্গলার গদ্য-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বে, বাঙ্গলায় গদ্যে যে সুকুমার সাহিত্য রচিত হইতে পারে, তাহাই কেহ কল্পনা করেন নাই। বাঙ্গলায় সাহিত্য-রচনার যে শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে অবজ্ঞাতা, দীনা, মলিনা বঙ্গভাষা যে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্না হইতে পারে,—ইহা বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহার প্রতিভা-বলে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন; এবং সেই হইতে যেন রুদ্ধবাক্ বঙ্গ সরস্বতী শত কণ্ঠে নিজেকে প্রকাশিত করিতে শিখিলেন। জাতীয় জীবনে যে শক্তি তিনি মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আজ আমরা জগৎ-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিবে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তও এক হিসাবে বাঙ্গলার আধুনিক পদ্য-সাহিত্যের প্রবর্ত্তক। স্বাধীন কল্পনা যে পদ্যে স্থান পাইতে পারে, তাহা তিনিই প্রথমে বাঙ্গালীকে দেখাইলেন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে কল্পনা নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত আসন গ্রহণ করিত,—তাহার যে নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল, তাহার বাহিরে সে কোনও অধিকারের দাবী করিতে পারিত না। মাইকেলের পর হইতেই এক নূতন রাজ্য খুলিয়া গেল, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, ভূত ও ভবিষ্যৎ—সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর প্রতিভা কল্পনার সাহায্যে বেড়াইতে শিখিল।

আজ এমন দিন আসিয়াছে, যখন বঙ্গ-সাহিত্যের এই দুই যুগ-প্রবর্ত্তকের রচনাও সমালোচনার কষ্টিপাথরে কষিয়া লইতে হইবে,—অপ্রীতিকর বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না; কিম্বা প্রশংসার "ফাঁকা আওয়াজে" জগৎকে বুঝানো যাইবে না। কিন্তু ইহাদের সমালোচনা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্যের মূল সূত্রগুলি বুঝাইবার জন্য যতটা দরকার, কেবল ততটুকুই আমি ইহাদের কথা বলিব।

নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে প্রতীতি জন্মে যে, ভাবের গভীরতায় এবং সর্ব্বতোমুখী চিন্তা-শক্তির প্রেক্ষণায় বঙ্গ-সাহিত্য এখনও বিশ্বসাহিত্যের অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে। সত্য ও তথ্যের দিক দিয়া দেখিলে, বঙ্গ-সাহিত্যে এমন সামান্যই কিছু পাওয়া যায়, যাহার জন্য আমাদের মনে শ্লাঘার উদ্রেক হইতে পারে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে-কোন বিষয়েই এত জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত রহিয়াছে যে, আমাদের সমস্ত সাহিত্য একত্র করিলেও তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইবে। এখনও পর্য্যন্ত আমাদের মানসিক জড়তা ঘুচিয়া যায় নাই। চিন্তার স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে যে স্বচ্ছন্দ ভাব ও নির্ভীকতা দরকার, আমাদের এখনও তাহা আইসে নাই। আমাদিগকে প্রতি বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী হইয়া দ্বিধা-কম্পিত স্বরে মতামত প্রকাশ করিতে হয়। স্বাধীন ভাবে ভুল করিতে পারিলেও শক্তি সঞ্চিত হইতে পারে; আর পরের পদাঙ্কানুসরণে অভ্যাসের জড়তাই বাড়িয়া চলে—এ কথা আমরা

বুঝিতে পারি না। শান্ত, সভ্য, নিরীহ-প্রকৃতি হিন্দু জাতিকে কে বুঝাইয়া দিবে যে, উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যেও আত্ম-শক্তির পরিচয় মানুষ পাইতে পারে; এবং সত্য সে কোথায় পাইবে, যাহার মনে আত্ম-প্রত্যয় জন্মে নাই? জাতীয় পরাধীনতার এক কুলক্ষণ এই যে, দাসসুলভ পল্লবগ্রাহিতা ও পরানুবৃত্তি হৃদয়কে এতই অধিকার করিয়া বসে যে, মানবাত্মা তাহার উদার, প্রসারিত দৃষ্টি হারাইয়া ফেলে; মানুষ আর অমৃতের পুত্র থাকে না,—ক্ষুদ্রতায় আচ্ছন্ন হইয়া গৌরব আর অর্থকে সামর্থ্যের চেয়ে বড় বলিয়া মনে করে; প্রাণ শক্তির উদ্বোধন না করিয়াই, সত্য ও সমৃদ্ধি লাভের সহজ পন্থা খুঁজিয়া বেড়ায়। প্রকৃতি-দত্ত ও ইতিহাস-লব্ধ শত অসুবিধা এবং বিঘ্ন সত্ত্বেও যে বাঙ্গালী সাহিত্য ক্ষেত্রে অনেকটা আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে, ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের শুভ লক্ষণ, এবং ইহাই ভবিষ্যতের আশার সূচনা করিতেছে। কে জানে, হয় ত সাহিত্যের মধ্য দিয়াই, সৃষ্টির আনন্দেই আমরা আত্ম-শক্তি ফিরিয়া পাইব; এবং বিস্মৃতি-নিমজ্জিত, জড়তা-প্রাপ্ত সুপ্ত চৈতন্য শতধারা বাহিনী গঙ্গার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া জাতীয় জীবন কানায় কানায় ভরিয়া দিবে! কিন্তু সে দিন এখনও বহু দূরে। বাঙ্গলার যে-কোন সাধারণ পুস্তক কিম্বা মাসিক-পত্র পাঠ করিলেই বুঝা যায়, আমরা যেন সত্য লইয়া খেলা করিতেছি,—তাহার ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতেছি না। সত্যের চর্চ্চা যাহা হইতেছে, তাহাতেও আড়ষ্ট ভাব এত বেশী যে, উহাতে প্রাণের স্ফূর্ত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না—ইহা "তর্জ্জমা সাহিত্যের" অনুরূপ। আরও দুঃখের বিষয়, যাঁহাদের মূলের জ্ঞান নাই, তাঁহাদের নিকট এই "তর্জ্জমা" দুর্ব্বোধ্য! বঙ্গ-সাহিত্যে সত্য-চর্চ্চা দেখিয়া অনেক স্থলেই ধারণা জন্মে, যেন লেখকেরা পরীক্ষায় নম্বর পাইবার জন্য লিখিতেছেন।

এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমি কোন আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যিকের নাম জানি না, যাঁহার রচনা পাশ্চাত্য কোনও ভাষায় রূপান্তরিত হইলে, সে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আদৃত হইবে। আমাদের দেশের অন্যান্য সাহিত্যিকেরা প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক ভাব এড়াইতে পারেন নাই,—চিন্তার গভীরতা ও মৌলিকতার দিকে দৃষ্টি করেন নাই; সত্যের সার্ব্বজনীন রূপ তাঁহাদের মানস-নেত্রে সম্যক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই। সংস্কারাবদ্ধ চিন্তা কখনও গভীর হ[ইতে] পারে না; এবং সাহিত্যের যাহা স্থায়ী, যাহা নি[ত্য] তাহা হয় সত্যের প্রতিভায়, না হয় ভাবের গভীরত[ায়] সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ভেদ করিয়া দেশ ও কালের বা[ধা] চলিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি গ্রন্থ ইংরেজি[তে] অনূদিত হইয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও পাশ্চ[াত্য] সমালোচকের দ্বারা উচ্চ ভাবে প্রশংসিত হয় নাই। ই[হার] অন্য যে-কোন কারণ থাকুক না কেন (এবং সে[গুলি] আমি পরে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব), বোধ হয় এ[ক] কারণ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রে এমন চিন্তা বা ভাবের বিব[রণ] নাই, যাহা পড়িয়া একজন শিক্ষিত য়ুরোপবাসী আ[নন্দ] উপভোগ করিতে পারেন। তাঁহার রচনা-পদ্ধতি পাশ্চ[াত্য] ঘটনামূলক; ও স্বাধীন প্রেমরসাশ্রিত উপন্যাস হইতে গৃহী[ত]। ইহাদের পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেমন স্ফূর্ত্তি হইতে পা[রে] আমাদের সাহিত্যে তেমন পারে না; কারণ, এ দে[শের] সামাজিক অবস্থা ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আবার [অন্য] দিকে তিনি সাম্প্রদায়িক সংস্কারের এমন বশবর্ত্তী হ[ইয়া] পড়িয়াছেন যে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার সৃষ্ট চরি[ত্রের] সহিত আন্তরিক যোগ অনুভব করিতে পারে না। বাস্তবি[ক] প্রতীচ্যের সত্যগুলি তাঁহার অধ্যাত্মসত্তায় যুক্ত হইয়া তাঁহা[কে] নব ভাবে প্রণোদিত করে নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে[র] সম্মিলনে নূতন আদর্শ ফুটিয়া উঠে নাই; এবং আমি পূ[র্ব্বে] বলিয়াছি যে, মোটের উপর ধরিতে গেলে, বর্ত্তমান শি[ক্ষিত] হিন্দু-সমাজের ইহাই লক্ষণ। তিনি প্রতীচ্যের যে জ্ঞান আ[হরণ] করিয়াছেন, তাহার বেশীর ভাগই যুক্তি-বুদ্ধির মধ্যে র[হিয়া] গিয়াছে, বিশ্বাসে পরিণত হয় নাই। তিনি আমাদের সমা[জ] ধর্ম্ম, রীতির সমস্ত সংস্কার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার স[হিত] প্রতীচ্যের যুক্তি জুড়িয়া দিতে চাহিয়াছেন;—এ কথা ভা[বিয়া] দেখেন নাই যে, ইহারা মূলতঃই ভিন্ন-প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং [সেই] জন্য অনেক স্থলে তাঁহার সাহিত্যে অন্তরের সামঞ্জস্য রক্ষিত [হয়] নাই। যুক্তির কলে ফেলিয়া, কাটিয়া-ছাঁটিয়া যে কৃষ্ণচ[রিত্র] বাহির করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসও নহে, ধর্ম্মও ন[হে]; প্রতীচ্যের জ্ঞানবাদ ধর্ম্মের ঘাড়ে চাপাইয়া উভয়কেই অ[পদস্থ] করিয়া ফেলিয়াছেন; এবং প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার প্রতীচ্যের জ্ঞানানুসন্ধিৎসার মূল তত্ত্ব ধরিতে না পারি[য়া] যুক্তি ও সংস্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্কিম

অবলম্বন পূর্ব্বক গীতার দার্শনিকতার প্রতিকৃতি করিয়া যে নব-জীবন গড়িতে চাহিয়াছেন, তাহা এক হিসাবে বিকৃত কল্পনা; কারণ, কর্ম্ম-জীবনের বৈচিত্র্য ও অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়া ভাব-রাজ্যের সম্পূর্ণতা প্রতিফলিত হইতে পারে না; এবং সমাজের স্বাভাবিক উদ্বর্ত্তনের প্রতি স্থির লক্ষ্য না রাখিয়া আদর্শ অঙ্কিত করিলে তাহা অবাস্তব হইয়া পড়ে। হিন্দু-সমাজ যে গতির আবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এ কথা বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু যে অতীতের পুনঃস্থাপন করিয়া সেই গতি প্রাচ্যাভিমুখে চালিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, সে অতীত যে কতটা অধ্যাত্ম-চেতনায় দীপ্ত হইয়া প্রাণের রসে সঞ্জীবিত, তাহা এখনও ঠিক বলা যায় না। অতীতের এই আকর্ষণী-শক্তি তাঁহাতে আছে বলিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত হিন্দু-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমাদৃত। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ-সমালোচনা আমার নিষ্প্রয়োজন; এবং অন্যান্য যে-সব কারণে বঙ্কিমের সাহিত্য বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের আলেখ্য, তাহা আমি পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, আমি পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এখানে এইমাত্র বলিতে চাই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য স্থিতিমান সমাজের যুগ-পরিবর্ত্তনের চিত্র;—একদিকে সংস্কার আর একদিকে শক্তি,—অধ্যাত্ম-সত্তায় সংযোজিত হইয়া একত্রীভূত নহে। এই জন্য আমাদের মধ্যেও যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার নিগূঢ় প্রেরণা অনুভব করিতেছেন, প্রাচ্যের সংস্কার হইতে অনেকটা মুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকেও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সম্পূর্ণ তৃপ্তি দান করিতে পারে না। দুই বিভিন্ন-জাতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে যাঁহাদের মধ্যে নূতন ভাব ও চিন্তার সাড়া দিয়াছে,—যাহা ঠিক প্রাচ্যেরও নহে, প্রতীচ্যেরও নহে,—তাঁহাদের হৃদয়ের স্পন্দন বঙ্কিমচন্দ্রে পাওয়া যায় না; কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদিগকে পাশাপাশি ধরিয়াছেন, জোড়া দেন নাই; সত্যালোচনা করিয়াছেন, বিশ্বাস করেন নাই। যে বিশেষ গুণে তিনি বর্ত্তমান শিক্ষিত হিন্দু-সমাজে বরেণ্য, তাহারই জন্য তিনি অন্যত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছেন না।

আমাদের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্যের সত্যগুলি যত সহজে আপন করিয়া লইতে পারিয়াছেন, আর কেহই তেমন পারেন নাই; অথচ তাঁহার প্রাণের গতি প্রাচ্যের দিকে, প্রতীচ্যের দিকে নহে। এই জন্য তাঁহার রচনা অনেক স্থলেই আমাদের সমাজের বিশেষ সংস্কার-বর্জ্জিত—তিনি পৌত্তলিক না হইয়াও হিন্দু, এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম-মণ্ডলীতে প্রবেশ না করিয়াও খ্রীষ্টান। এমন আর কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিক নাই, যিনি তাঁহার চেয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঘনিষ্ঠতর মিলন সংঘটিত করিতে পারিয়াছেন। বোধ হয় ব্রাহ্ম-সমাজে লালিত-পালিত বলিয়া—তাঁহার অধ্যাত্ম-চেতনায় এই দুই সভ্যতার মূল ভাবগুলি সংশ্লিষ্ট হইয়া—নূতন চিন্তা ও ভাবের উন্মেষ করিয়াছে,—যাহা মৌলিক, যাহা সম্পূর্ণভাবে আমাদেরও নহে, পশ্চিমেরও নহে। প্রাচ্যের অধ্যাত্ম-জ্ঞান তাঁহাকে প্রতীচ্যের কর্ম্ম-পটুতা ও সত্যানুসন্ধিৎসার বিচার করিতে শিক্ষা দিয়াছে; এবং প্রতীচ্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রাচ্যের সংস্কার-জাল ছিন্ন করিয়া, সত্যের স্বরূপ তাঁহার চিত্তে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই সব কারণে, তিনি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে কখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না, এবং আমরা যে পশ্চিমের করতালিতে যোগদান করিতেছি, তাহা ঠিক হৃদয়ের প্রতিধ্বনি নহে। বাস্তবিক, যিনি নিজের জীবনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নিবিড় বন্ধন অনুভব করেন নাই, রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ কবিতাই তাঁহার নিকট শুধু ভাবের স্পন্দন ও কথার ঝঙ্কার। এমন কি—আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী অনেককেই রবীন্দ্রনাথের রচনা আনন্দ দান করিতে পারে না; কারণ, আমাদের অধীত বিদ্যা মনের বহির্দ্দেশে রহিয়া গিয়াছে, হৃদয় অধিকার করে নাই। তিনি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ও পাশ্চাত্য ভাবানুপ্রাণিত জনকয়েক শিক্ষিতের নিকট আন্তরিক প্রশংসা পাইলেও, সাধারণ হিন্দু-সমাজে আদরণীয় হইতে পারেন না। কিন্তু এ কথা এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার যে, কোনও তুলনামূলক সমালোচনা আমার অভিপ্রেত নহে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে সমগ্র ভাবে দেখিতে হয়,—সাহিত্যের কেবল একটা লক্ষণ দিয়া বিচার করিলে চলে না। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান যুগের বঙ্গ-সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, আমাদের প্রাণের গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি, বা সত্যোপলব্ধির ক্ষমতা ক্রমশঃই বাড়িতেছে—অধ্যাত্ম-চেতনার দীপ্তি সাহিত্যে স্ফুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যুক্তি ও তর্কের বোঝা

ঘাড়ে চাপাইয়া জ্ঞানের স্তূপ বৃদ্ধি করিয়া, মানুষকে বড় করা যায় না। আমাদের মানসিক জন্ম, সাহিত্যের উৎপত্তি প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দিন, যে দিন আমরা উদ্ভিদের ন্যায় ভিতর হইতে বাহিরে প্রকটিত হইয়া পড়ি। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথমাবস্থায় অধ্যাত্ম-চেতনা পরিস্ফুট নাই। রবীন্দ্রনাথে ইহার গভীরতা যত আছে বা তত নাই, এবং বঙ্কিমে যাহা আছে, মাইকেলে নাই।

মায়ের অভিমান

[শ্রীজলধর সেন]

বাবা ছিলেন গ্রামের ইংরাজী স্কুলের মাষ্টার। বেতন পাইতেন ত্রিশটা টাকা। পরিবারের মধ্যে মা, বাবা, আর আমরা দুটী ভাই। দাদা আমার দুই বছরের বড়। এই চারিজন মানুষের ত্রিশ টাকায় বেশ চলিয়া যাইত; সঞ্চয় কিছুই হইত না। বাবা বলিতেন "কার জন্য সঞ্চয় করব; আর টাকা রেখে গেলেই যে আমার স্ত্রী পুত্র সুখে থাকবে, তারই বা নিশ্চয়তা কি। মতি হালদার যে মরবার সময় জমিদারীতে, বাড়ীতে, আর নগদে অতি কম হলেও ষাট হাজার টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর চার বছরের মধ্যেই দুই ছেলেতে সব উড়িয়ে দিল। এখন তাদের কত কষ্ট। আর হেমন্ত রায় যে, ছেলে বৌকে একেবারে বলতে গেলে পথে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল,—সেই হেমন্ত রায়ের ছেলে সত্যেন্দ্র, যে এখন কলেজের অধ্যাপক। সব অদৃষ্ট! রেখে গেলেও হয় না, আর না রেখে গেলেও বাধে না।" অর্থাৎ বাবা ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলেন। আর তাও বলি, ত্রিশ টাকা আয় হইতে, চেষ্টা করিলে, মাসে আর কতই বা সঞ্চয় করিতে পারিতেন, জমাজমি কিছুই ছিল না; নির্ভর ঐ মাষ্টারীর উপর।

পরের ছেলে পড়াইতেন বলিয়া নিজের ছেলেদের পড়ায় অযত্ন করিতেন না। আমরা দুই ভাই বাড়ীতে বাবার কাছে যথারীতি পড়িতাম। সেই জন্যই আমাদের গ্রামের সামান্য স্কুল হইতেই দাদা পনর টাকা বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় এফ-এ পড়িবার সুবিধা করিতে পারিয়াছিল। বৃত্তির পনর টাকা, আর বাবা মাসে-মাসে দিতেন পাঁচ টাকা;—এই কুড়ি টাকাতেই সে সময় একটী ছেলের এফ-এ পড়া, কলিকাতা সহরে থেকে বেশ চলে যেত।

দাদা এফ-এ পরীক্ষা দিল, আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিলাম—একই বৎসরে। পরীক্ষার পর দাদা বাড়ী আসিল। বাবা তখন মহা চিন্তায় পড়িলেন। এফ-এ দাদা যদি বৃত্তি না পায়, আর আমিও যদি এণ্ট্রান্সে বৃত্তি না পাই, তাহা হইলে আমাদের দুই ভাইয়ের পড়ার খরচ তিনি কেমন করিয়া চালাইবেন, এই হইল তাঁহার চিন্তার বিষয়। তিনি কোন উপায়ই ভাবিয়া পাইলেন না। কিন্তু মানুষের সকল ভাবনা যিনি অলক্ষ্যে বসিয়া দিনরাত ভাবিতেছেন, তিনি ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাবা যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইল;—দাদা প্রথম বিভাগে এফ-এ পাশ করিল; কিন্তু বৃত্তি পাইল না; আর আমি তৃতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করিলাম—আমার বৃত্তি পাওয়ার ত কথাই নাই। তবে আমাদের পড়াইবার ভাবনা আর বাবাকে ভাবিতে হইল না—সকল ভাবনার মালিক তিন দিনের জন্য জ্বর পাঠাইয়া দিয়া বাবাকে ভাবনা-সমুদ্রের পারে লইয়া গেলেন, ভাবনার ভার পড়িল মায়ের উপর। বাবার ছিল এক ভাবনা—আমাদের পড়ার খরচ যোগানো; মায়ের উপর দিয়া গেলেন দুই ভাবনা—সংসার প্রতিপালন আর আমাদের দুই ভায়ের শিক্ষাবিধান।

এখন উপায়? দাদা বলিল, "আমি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে চাকরীতে প্রবেশ করি, বসন্ত কলেজে যাক্। আমি যা উপার্জ্জন করব, তাতে ওর পড়ার খরচ, আর মায়ের আর আমার খরচ চলে যাবেই।"

আমি বলিলাম "মা, দাদার এ প্রস্তাব ঠিক হোলো না। কেন, তাই বল্‌ছি। দাদা ফার্ষ্ট ডিবিসনে এফ-এ পাশ করেছে, বৃত্তিই পায় নাই। দাদা পড়লে দুই বছরে নিশ্চয়ই বি-এ পাশ করতে পারবে। তার পর বুঝলে মা; দেখ্‌তে-দেখ্‌তে এম-এ, বি-এল। তখন সবই করতে পারবে;

ডিপুটী, মুন্সেফ হতে পারবে, প্রফেসার হতে পারবে, উকিল হতে পারবে, চাই কি হাইকোর্টের জজ পর্য্যন্ত হতে পারে। আর আমার কি হবে? যে থার্ড ডিবিসনে এণ্ট্রান্স পাশ করে, সে কোন দিন এফ-এ পাশ করতে পারে না—ককৃখনো না। এ আমি ঢের দেখেছি। তাই আমি বলি কি, আমি মাষ্টারী করি। বাবার পোষ্ট আমাকে দেবে না, তুই একজনকে প্রমোসন দিয়ে আমাকে নীচের ক্লাসের মাষ্টারী দেবেই। মোহিত বাবুকে বল্‌লেই, তিনি অন্ততঃ বাবার কথা মনে করে, এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন। কুড়ি টাকা নিশ্চয়ই পাব। তার পর এ-বেলা একটা, ও-বেলা একটা ছেলে পড়াব। তাতেও দশটা টাকা পাব। মাইনের টাকা দাদার পড়ার খরচের জন্য দেব; আর ছেলে পড়িয়ে যে দশ টাকা পাব, তাতে আমাদের দুজনের চলে যাবে, কি বল মা?”

দাদা বলিল, “শুনলে মা, জ্যাঠাপিডের কথা। উনি চাকরী করবেন, আর আমি পড়ব। সে কিছুতেই হয় না—হতেই পারে না; এ পৃথিবীতে কখন হয় নাই। ও-সব পাগলামী ছেড়ে দে। তুই ত হঠাৎ থার্ড ডিবিসনে পাশ হয়েছিস্; আমরা সবাই জান্‌তাম, তুই ফাষ্ট ডিবিসনে পাশ হয়ে, আমারই মত স্কলারসীপ্ পাবি। ও-সব কি জানিস্—একজামিন পাশ একেবারে chanceএর উপর নির্ভর করে। কত গাধা তরে যায়, আবার কত ভাল ছেলে ফেল হয়ে যায়; এ আমি ঢের দেখেছি। তোকে পড়তেই হবে। আমি মাষ্টারী খুঁজে নেব, তার পর কমিটী পরীক্ষা দেব। যদি পাশ হতে পারি, তা হলে ওকালতী করব। আমার পথ হয়ে যাবে। কিন্তু কার ভবিষ্যৎ কি? ঐ মাষ্টারী, আর ঐ কুড়ি টাকা। নাঃ, ও-সব কাজের কথাই নয়। কি বল মা?” মা বলিলেন, “এ সম্বন্ধে কোন মত দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। শিশির, তুমি যা বলছ, তা অসঙ্গত নয়—তোমার মত সুবোধ ছেলেরই উপযুক্ত কথা। আর বসন্ত, তুমি যা বলছ, তোমার মুখ দিয়ে সে কথা শুনে, আমার এত দুঃখে, এত কষ্টেও আহ্লাদ হচ্চে। স্বর্গে ব'সে তিনিও তোমাদের কথা শুনে কত সুখী হচ্চেন। কিন্তু, আমি এতে কি বল্‌তে পারি? কাকে বল্‌ব যে ‘তুমি লেখাপড়া ছেড়ে দেও’। সে কথা ত আমার মুখ দিয়ে বের হবে না।”

আমি বলিলাম “মা, তুমি ত লেখাপড়া জান, আর আমাদের চাইতে তোমার জ্ঞানও বেশী। তুমিই এর একটা মীমাংসা করে দাও। তুমি যা বল্‌বে, আমরা তাই মাথা পেতে স্বীকার করব।”

দাদা বলিল, “মা ত বল্‌লেনই, আমার প্রস্তাব খুব সঙ্গত; তাতেই ত মায়ের মত পাওয়া গেল।”

আমি বলিলাম “তুমি বুঝতে পারছ না, দাদা! তোমার প্রসপেক্ট আছে, আমার কিছুই নাই। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কতখানি, তা আমি বেশ বুঝি; আর তুমি কি করতে পার না পার, তা তোমার চাইতে আমি বেশী বুঝি। আমি যা বল্‌লাম, তাই করতে হবে। আমি কিছুতেই আর পড়ব না। তোমাকে পড়তেই হবে। তোমার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, তা আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি আপত্তি কোরো না; বেশ করে ভেবে দেখ—আমার কথা ঠিক কি না।”

দুই-তিন দিন এই কথা লইয়া তর্কবিতর্ক হইল; গ্রামে যাঁরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, তাঁরা সকলেই আমার প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন;—স্কুলের সেক্রেটারী মোহিতবাবু এবং হেডমাষ্টার মহাশয় আমার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন, আমিই জয়ী হইলাম। স্কুলের মাষ্টারী আমার হইল; বেতন কুড়ি টাকাই আপাততঃ স্থির হইল। দুইটী ছেলে পড়াইবারও ভার পাইলাম। দাদা কলিকাতায় বি এ পড়িতে গেল, আমি গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করিতে লাগিলাম।

(২)

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন জিনিসপত্র সুলভ ছিল, তাই কোন রকমে দশ টাকায় আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কষ্ট হইত—কিন্তু তাহা বলিয়া উপায় নাই; কোন রকমে তিনটা বৎসর কাটাইতে পারিলেই দাদা এম-এ পাশ করিবে। তখন আর কোন কষ্ট থাকিবে না।

দাদা সেই যে কলিকাতায় পড়িতে গেল, দুই বৎসরের মধ্যে আর বাড়ী আসিল না। মধ্যে-মধ্যে পত্র লিখিত। বাড়ী আসিবার কথায় লিখিত যে, একবার যাতায়াতে অনেক খরচ, তাহা কোথা হইতে সংগ্রহ হইবে? কথাটা ঠিক; যে খরচ সত্যসত্যই আমি সংগ্রহ করিয়া দিতে

অসমর্থ। সুতরাং দাদাকে অগত্যা এই নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিতে হইল।

দাদা যেবার বি এ পরীক্ষা দিবে, সেবার ত ফিয়ের টাকা লাগিবে। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া বাড়ীর একখানি ঘর বেচিয়া ফেলিলাম; মা চক্ষের জল ফেলিলেন; কিন্তু উপায়ান্তর নাই দেখিয়া আপত্তি করিলেন না। ঘর বিক্রয়ের ৮৫ টাকাই দাদাকে পাঠাইয়া দিলাম—ফি দিতে হইবে, ধারকর্জ্জ সামান্য যাহা হইয়াছে তাহা শোধ দিতে হইবে, তাহার পর বাড়ী আসিবার খরচ। দাদা লিখিল, ঐ টাকাতেই তাহার কুলাইয়া যাইবে। কেমন করিয়া এ টাকা সংগ্রহ হইল, তাহা জানিতে চাহিলেও, আমি সে কথার উত্তর লিখিলাম না,—দাদার মনে যে কষ্ট হইবে!

পরীক্ষার পর দাদার পত্র পাইলাম; লিখিয়াছে যে, পরীক্ষা খুব ভাল হইয়াছে। তখন বি-এ অনারের সৃষ্টি হয় নাই; বি এস্‌সি, এম্ এস্‌সি হয় নাই। সেই পত্রেই দাদা লিখিল যে, তাহার বাড়ী আসিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইবে। তাহার এক সতীর্থ কিছুদিনের জন্য মধুপুরে সপরিবারে বেড়াইতে যাইতেছেন; তাহাদের বিশেষ অনুরোধে দাদা তাহাদের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইল। সেখানে সে বেশী দিন থাকিবে না; দশ পনের দিন পরেই বাড়ী আসিবে।

দুই বৎসর দেখা নাই; পরীক্ষার পরই বাড়ী আসিবার কথা, তাহা না করিয়া দাদা বন্ধুর সঙ্গে মধুপুরে গেল। ইহাতে মা একটু বিষণ্ণ হইলেন; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলিলেন না। আমারও মনে কষ্ট হইল; কিন্তু তখন কি জানিতাম যে, ইহা অপেক্ষাও অধিকতর মনোবেদনা ভগবান্ আমাদের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন!

দাদা পনের দিনের কথা লিখিয়া মধুপুর গেল; সেখান হইতে একখানি পত্রও লিখিল না। মধুপুরের ঠিকানাটাও যদি লিখিত, তাহা হইলে আমরাই না হয় পত্র লিখিয়া তাহাকে আমাদের কথা মনে করাইয়া দিতাম; সুতরাং পত্রের উত্তরে তাহার সংবাদও পাইতাম। প্রায় ২৫ দিন পরে দাদার এক পোষ্টকার্ড পাইলাম; তাহাতে সে লিখিয়াছে যে, তাহার বন্ধুরা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতেছেন না, তাই সে এত বিলম্ব করিতেছে। যাক্, বাড়ীতে আসুক আর না আসুক, দাদা যে ভাল আছে, ইহাতেই আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। 'আমরা' বলাটা বোধ হয় ঠিক্ হইল না; কারণ, আমি নিশ্চিন্ত হইলেও, মায়ের মনে যে বড়ই চিন্তা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ভাব দেখিয়া, এবং দুই-একটা কথা শুনিয়াই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মা একদিন বলিলেন, "আজ দুই বৎসর শিশিরকে দেখি নাই। শরীর কেমন আছে, কি করিয়া বলিব।" আর একদিন বলিলেন, "দেখ বসন্ত, শিশিরের মা-অন্ত প্রাণ ছিল।" আমি আর এ সকল কথার কি উত্তর দিব! মনে-মনেই বুঝিতে পারিলাম, মা দাদার এই আচরণে কত ব্যথা পাইয়াছেন।

এক মাস পরে হঠাৎ একদিন দাদা বাড়ী আসিল। কিন্তু যে দাদা আমার দুই বৎসর আগে বি-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিল, সে দাদা ত আসিল না,—সে সদানন্দ পুরুষ ত আসিল না, সে বসন্ত-বলিতে-অজ্ঞান ভাই ত আসিল না। দাদা বড়ই গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল। বি-এ পাশ করিলে যে এত গম্ভীর হইতে হয়, তাহা ত দেখি নাই। কলিকাতায় কখন যাই নাই, সেখানকার বাতাস কেমন, তাহাও জানি না; কিন্তু গ্রামের আরও অনেক ছেলে ত কলিকাতায় পড়িয়াছে, বি-এ পাশও অনেকে করিয়াছে। কিন্তু কৈ, কেহই ত দাদার মত এত গম্ভীর হয় নাই।

দাদা বাড়ী আসিবার পরদিন আমরা দুই ভাই আহার করিতে বসিয়াছি, মা সম্মুখে বসিয়া আছেন; সেই সময় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা দাদা, তুমি এই দু'বছরে এত গম্ভীর হয়ে গেলে কি করে?"

দাদা একটু হাসিয়া বলিল, "কৈ রে, তুই আমাকে গম্ভীর কি দেখ্‌লি?"

আমি বলিলাম, "দাদা, তুমি আমার কাছে কি লুকোতে পার; আমি তোমার দু'বছরের ছোট বই ত নয়; তুমিও যা, আমিও তাই। তোমার যেন কি একটা হয়েছে, তাই তুমি এমন হয়ে গিয়েছ। এর আগেও ত কলকাতায় পড়তে গিয়েছিলে, তখন ত তুমি এমন ছিলে না! এইবার তোমার ভারি পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি; তা তুমি স্বীকার কর আর নাই কর।"

মা বলিলেন, "অনেক দিন পরে এসেছে, তাই বসন্ত,

তোমার অমনু বোধ হচ্ছে। বিদেশে ত মা-ও ছিল না, ভাই-ও ছিল না, তাই তাদের সঙ্গে যে ভাবে কথা বল্‌তে হয়, যে আনন্দ করতে হয়, তা এই দু'বছরে ভুলে গিয়েছে। এখন আবার আমাদের কাছে এসেছে, এখন যে শিশির সেই শিশিরই দু'দিনে হয়ে পড়বে।"

তা হওয়ার আর সময় হইল না। সেই দিনই বিকালে একটা তার আসিল যে, দাদা প্রথম বিভাগে খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পাশ হইয়াছে। যিনি তার করিয়াছেন, তাঁহার নাম হরেন্দ্র। তিনি দাদাকে অবিলম্বে কলিকাতায় যাইতে লিখিয়াছেন। দাদা বলিল, "মা, আমাকে ত কালই কল্‌কাতায় যেতে হয়।"

মা বলিলেন, "এই কতদিন পরে এলে, দু'চার দিন থাক্‌লে বড় ভাল হোতো। তা' যখন শীঘ্র যাবার জন্য তার এসেছে, তখন ত আর নিষেধ করতে পারিনে। লেখা-পড়া আগে, তার পর অন্য সব।"

আমি বলিলাম, "দাদা, আর দিন-দুই-তিন থেকে যেতে পার না?"

দাদা বলিল, "হয় ত তা হ'লে কোন ক্ষতি হতে পারে; টেলিগ্রাম ত দেখ্‌লে, অবিলম্বে যেতে লিখেছে।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা দাদা, হরেন্দ্র কে?"

দাদা বলিল, "হরেন্দ্র আমার একটা বন্ধু; বি এ পড়ছে। আমি ত ওদেরই সঙ্গে মধুপুর গিয়েছিলাম।"

আমি বলিলাম, "মাইনে পেতে এখনও দু'দিন দেরী হবে। তোমাকে ত টাকা দিতে হবে; তাই থেকে' যেতে বল্‌ছিলাম।"

দাদা বলিল, "আপাততঃ টাকার দরকার হবে না; আমার কাছে যা আছে, তাতেই হবে। আর যদি খুব উপরে হয়ে পাশ করে থাকি, তা' হলে কলেজের স্কলার-সিপ ত্রিশ টাকা হয় ত পেতেও পারি। তখন আর তোমাকে খরচ পাঠাতে হবে না; তা' যদি নাই হয়,—আমি মনে করেছি, একটা টুইসন নেব, তা' হলে তোমাকে আর এমন করে টাকা পাঠাতে হবে না। আমার জন্য তোমাকে বড়ই কষ্ট করতে হয়েছে এই দুই বৎসর।"

মা বলিলেন, "না শিশির, তুমি ছেলে পড়িও না; তাতে তোমার পড়ার ক্ষতি হবে। এত দিনই যখন চলেছে, আর কটা দিনই বা;—বসন্ত যেমন করে হোক চালিয়ে নেবে। তার পর তুমি যখন পড়া শেষ করবে, তখন ত আর কষ্ট করতে হবে না। তখন বসন্ত না হয় চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলেজে পড়তে যাবে।"

কি জানি কেন, আমার মনে হইল, মা আকাশে ফুলের বাগান প্রস্তুত করিতেছেন। মানুষ ভবিষ্যতের যে কিছুই দেখিতে পায় না, এ কথা আমি মানি না। আমি কিন্তু একটু-একটু ভবিষ্যৎ দেখিতে পাই। যাক্‌, সে কথা।

(৩)

দাদা কলিকাতায় পৌঁছিয়া একখানি কার্ডে পৌঁছা সংবাদ দিল; এবং সে যে কলেজের বৃত্তি নিশ্চয়ই পাইবে, এ কথাও জানাইল। যাক্‌, এখন আর দাদার পড়ার খরচ না দিলেও চলিবে; মাসে ত্রিশ টাকাতে তার বেশ চলে যাবে। আমি মনে করিলাম, ঘর-দুয়ারগুলো একেবারে বাসের অযোগ্য হইয়াছে বলিলেই হয়; তাহার পর পশ্চিমের দিকের ঘরখানি বেচিয়া ফেলায় বাড়ীটা যেন কেমন হইয়াছে; এখন কিছু জমাইয়া ঐ ভিটায় একখানি ঘর তুলিব, আর অন্য তিনখানি ঘরের সংস্কার করিব। আর বাড়ীতে বাহিরের কাজ করিবার জন্য একজন ঝি নিযুক্ত করিব—মা একেলা আর কত খাটিবেন। দাদার বিবাহ দিবার কথাও দুই-চারিজন তুলিয়াছিলেন, কিন্তু মা তাহাতে অসম্মত; তিনি বলেন, "এখন যে অবস্থা, তাতে শিশিরের বিবাহ দিতে পারি না; সে উপার্জ্জনক্ষম হইলে, তখন বিবাহ দিব। এত দিন গিয়াছে, আর দুইটা বৎসরও যাক্‌।"

দাদা বাড়ী হইতে কলিকাতায় যাওয়ার দিন-পনর পরে একদিন অপরাহ্নকালে স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়া দেখি, মা বারান্দায় শয়ন করিয়া আছেন। এ সময়ে মাকে ত কোন দিন শুইয়া থাকিতে দেখি নাই। তবে কি তাঁহার কোন অসুখ করিয়াছে? আমি জামা-চাদর না খুলিয়াই মায়ের কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও মা, মা, তুমি অসময়ে অমন করে শুয়ে আছ যে? অসুখ করেছে না কি?"

মা ঘুমান নাই, শুইয়াই ছিলেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "না, অসুখ করে নাই।"

"তবে অমন করে শুয়ে রয়েছ কেন?

মা বিষন্ন মুখে বলিলেন, "শিশিরের একখানা চিঠি পেয়ে মনটা বড় ভাল নেই।"

"দাদার চিঠি! দাদা ভাল আছে ত?"

মা বলিলেন, "ভালই আছে।"

"তবে তুমি ভাবছ কেন? কৈ, চিঠি?"

মা হাত নাড়িয়া ঘরের মধ্যে চিঠি আছে, বুঝাইয়া দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে যাইয়া দেখিলাম, বিছানার উপর চিঠিখানি পড়িয়া আছে। আমি চিঠিখানি আগাগোড়া পড়িলাম। বি এ পাশ জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিলাম। এমন চিঠি কি না দেখাইলে চলে?

কলিকাতা।

মঙ্গলবার।

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু,

মা, শ্রীমান বসন্তকে যে পত্র লিখেছি, তাতেই আমার ত্রিশ টাকা বৃত্তি পাইবার সংবাদ পেয়েছেন। আপনার আশীর্ব্বাদে এর পর থেকে আর টাকার অভাব বোধ করতে হবে না; আমার এম-এ পড়বার খরচ আর বাড়ী থেকে দিতে হবে না। বসন্তকে যে একটু বিশ্রামের অবকাশ দিতে পারলাম, এই ভেবেই আমার আনন্দ হচ্চে। সে এখন ছেলে পড়ানো ছেড়ে দিলেই পারে; স্কুলে যা বেতন পায়, তাতেই খরচ কুলিয়ে যাবে; আর আমিও এখন থেকে মাসে-মাসে কিছু-কিছু করে পাঠিয়ে দিতে পারব।

তার পর, আর একটা কথা। আপনাদের না জানিয়ে আমি একটা কাজ করে বসেছি। আমি গত শুক্রবারে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত রামকমল ঘোষ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেছি। যে হরেন্দ্র ছেলেটার কথা আপনাকে বলেছিলাম, যাদের সঙ্গে আমি মধুপুরে গিয়াছিলাম, সেই হরেন্দ্র রামকমল বাবুর ছেলে। তাঁরা অত্যন্ত জেদ করায় আমি অস্বীকার করতে পারি নাই। হঠাৎ হয়ে গেল জন্য আপনাদিগকে সময় মত সংবাদও দিতে পারি নাই। বিশেষ, বিবাহে আমি একটা পয়সাও লই নাই; সুতরাং এ উপলক্ষে এখানে বাসা ভাড়া করে, সকলকে নিয়ে এসে কিছু করা আমাদের অবস্থায় সম্ভব হোতো না,—তা করতে গেলে কতকগুলো টাকা ধার করতে হোত। তাই ভেবেই, কোন কিছু করা সঙ্গত মনে করি নাই। আজ কাল যে রকম দিন পড়েছে, তাতে হাজার পাশ করলেও, একটা সহায় না থাকলে কিছুই হয় না। রামকমল বাবু বড়লোক, হাইকোর্টে তাঁর খুব পসার; সন্তানের মধ্যে একটী ছেলে আর একটী মেয়ে; এ দিকে সামাজিক হিসাবেও বড় কুলীন। তিনি আমার সহায় হ'লে আমি উন্নতি করতে পারব; তাই এ কাজ করেছি। তিনি আর অপেক্ষা করতে দিলেন না; সেই জন্যই সংবাদও দিতে পারি নাই। এখন আমার শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী বলছেন যে, আপনি বসন্তকে সঙ্গে করে একবার তাঁদের বাড়ীতে এসে আশীর্ব্বাদ করে যান। বোধ হয় ইহাতে আপনার আপত্তি হবে না। আপনার পত্র পেলে এখান থেকে লোক পাঠাবার বন্দোবস্ত করিব। বসন্ত কখন কলিকাতায় আসে নাই, তাহার সঙ্গে আসা নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না। পত্রের উত্তর অতি শীঘ্র দিবেন। নিবেদন ইতি

সেবক

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

পত্রখানি পাঠ শেষ করিয়া আমি মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; তিনিও আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন। দেখিলাম, মায়ের চক্ষু দুইটা জলে ভরিয়া গিয়াছে। আমি তখন আর কি করিব,—ছেলেবেলায় যাহা করিতাম, তাহাই করিলাম,—ছোট ছেলের মত মায়ের কোলের কাছে বসিয়া পড়িলাম। তিনি আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার গভীর মনোবেদনা নিবারণের ত আর কোন উপায় পাইলাম না।

একটু পরেই মায়ের কোল হইতে মাথা তুলিয়া বলিলাম, "মা, দাদাকে তুমি ক্ষমা কর। সে যে অন্যায় কাজ করেছে, তা আমি মেনে নিচ্ছি; কিন্তু সে নিজের ও আমাদের ভবিষ্যৎ ভেবেই এ কাজটা করে ফেলেছে; ভাল করে ভাববার অবকাশ পায় নাই। তুমি ত জান মা, দাদা ঐ এক রকমের মানুষ। তার পর যে দিন বাড়ী এল, আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, দাদা কি একটা কথা বলবে-বলবে করেও বলতে পারে নাই; তাই অত গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তুমি তার অপরাধ ক্ষমা কর মা!"

মা অতি তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। এমন দৃষ্টি আমি কখন দেখি নাই। মুখের ভাবে একটা কঠোর

দৃঢ়তা, একটা অভিমান, একটা অপমানের জ্বালা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে ভাব দেখিয়া আমি ভীত হইলাম। মা অতি কঠোর স্বরে বলিলেন, "বসন্ত, তুমি শিশিরের এই কাজ কি সমর্থন করতে চাও?"

আমি ভয়ে কথা বলিতে পারিলাম না,—এ যে মায়ের সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি,—এ মূর্ত্তি ত কখন দেখি নাই!

আমাকে নীরব দেখিয়া মা বলিলেন, "শোন বসন্ত, যে এমন করে আমাদের অপমান করতে পারে, তার সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে চাই নে—ছেলে বলে তাকে ক্ষমা করতে পারি না। আমি দরিদ্রা, আমি কুটীরবাসিনী, আমার এ কুটীরে তোমার ভাই বৌ আস্‌তে পারবে না, —আমি তাই কল্‌কাতায় গিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আস্‌ব! আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে শিশির এমন অপমানের কথা আমাকে লিখ্‌তে সাহসী হোলো! সে আমাদের না জানিয়ে বিবাহ করেছে—এই ত এক অপমান! তার পরও যদি সে বৌ নিয়ে বাড়ী আস্‌ত, আমি সে অপমান ভুলে ছেলে বৌকে কোলে করে নিতাম। তা নয়—আমাকে তার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তার স্ত্রীকে দেখে আস্‌তে হবে! যে ছেলে মাকে এমন কথা লিখ্‌তে পারে, তাকে তুমি ক্ষমা করতে বল, বসন্ত! তুমি তাকে ক্ষমা কোরো—আমি পারলাম না বাপ! তোমাদের যিনি জন্মদাতা, তিনি আমাকে এ শিক্ষা ত কোন দিন দেন নাই। দারিদ্র্যের গৌরবে, মনুষ্যত্বের মহত্বে তিনি যে হিমালয় পর্ব্বতের মত মাথা উঁচু করে জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ছেলে হয়ে তোমরা অপদার্থ হতে পার, কিন্তু তাঁর সহধর্ম্মিণী তাঁর মহান্‌ চরিত্রের, তাঁর মহত্বের অবমাননা করতে পারবে না।"

ইনিই কি আমাদের মা—আমরা কি এমন মায়ের সন্তান! দাদার ব্যবহারে ত তা' মনে হয় না। আমার মায়ের হৃদয় উচ্চ, আমার মা বিদুষী, আমার মা দয়াময়ী, ইহাই ত জানিতাম,—ইহারই পরিচয় ত এত কাল পাইয়াছি; কিন্তু আমার মায়ের হৃদয় যে বজ্রের অপেক্ষাও কঠোর, আমার মা যে অন্যায় কার্য্য এতদূর ঘৃণা করেন, আমার মা যে দারিদ্র্যের এত গৌরব হৃদয়ে বহন করেন, তাহা জানিবার অবকাশও কোন দিন হয় নাই! আজ মায়ের দৃঢ়তা দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া আমি আমাদের ক্ষুদ্রতা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিলাম। এমন মায়ের সন্তান হইয়া আমরা এত নীচ, এত স্বার্থপর হইলাম কি করিয়া?

মা আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন; তিনি বলিলেন, "বাবা বসন্ত, একটী কথা তোমাকে বলি,—অন্যায়কে কখনও ক্ষমা করিও না। তার জন্য যদি ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, সে-ও ভাল। মায়ের এই আদেশ সর্ব্বদা মনে রাখিও; তোমার জীবন সার্থক হইবে, তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমিও ধন্য হইব।"

আমি অতি সঙ্কোচের সহিত বলিলাম, "তা হ'লে দাদার পত্রের কি উত্তর লেখা যায়?"

মা বলিলেন, "পত্রের উত্তর দিয়েই কাজ নেই।" এই বলিয়াই তিনি যেন একটু অন্যমনস্ক হইলেন। তাহার পরই বলিলেন "না, সে ভাল হবে না; পত্রের উত্তর দিতেই হবে। সে আমার সন্তান—আমার বড় আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র—তাঁর বড় স্নেহের শিশির। তাকে কি আমি অভিসম্পাৎ করতে পারি? তা' পারব না—কিন্তু ক্ষমা করতেও পারব না। তাকে আর বৌমাকে আশীর্ব্বাদ করতেই হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সে আমাদের কতখানি অপমান করেছে। সে আমাকেই পত্র লিখেছে, আমিই তার জবাব লিখে দেব, তোমার কিছু লিখ্‌তে হবে না।"

আমি বলিলাম, "মা, তুমি যে রকম রাগ করেছ,—হয় ত এমন কথা লিখ্‌বে, যাতে দাদা মনে বড়ই ব্যথা পাবে। তার চাইতে চিঠি না লেখাই ভাল।"

মা বলিলেন, "তোদের কি আমি ব্যথা দিতে পারি? আমি তাকে ব্যথা দেব না। কিন্তু উপদেশ দেওয়া ত আমার কর্ত্তব্য। শিশির যে এমন কাজ করতে পারে, এ কথা আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। বাবা বসন্ত, শিশিরের মুখ যখন মনে পড়ছে—না,—না, তাকে ক্ষমা করতেই পারিনে। কি দুর্ব্বল এই মায়ের হৃদয়!"

(৪)

সেই রাত্রেই মায়ের জ্বর হইল। প্রথম রাত্রিতে মনে হইল সামান্য জ্বর; কিন্তু যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ততই জ্বরও বাড়িতে লাগিল। বাড়ীতে আমি একাকী; কি যে করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। শেষে প্রতিবেশী

রামধন জ্যেঠামহাশয়কে সংবাদ দিলাম। তিনি তখনই আসিয়া মায়ের নাড়ী দেখিলেন; বলিলেন "তাই ত বসন্ত, সন্ধ্যা রাত্রিতে জ্বর এসেছে, আর এখন বোধ হয় রাত্রি একটা কি দুটো,—এখনই নাড়ীর অবস্থা এমন হয়েছে। তা' ভয় নেই বাবা! এখনই কিন্তু ডাক্তার ডাকা উচিত। তুমি চিন্তামণি ডাক্তারের কাছে এখনই যাও; আর যাবার সময় আমাদের বাড়ীতে বলে যাও, যেন তারা আসে। যাও বাবা, আর দেরী কোরো না, জ্বরটা শক্ত জ্বরই মনে হচ্ছে।"

আমি আর বিলম্ব করিলাম না। ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে যাওয়ার পথেই রামধন জ্যেঠার বাড়ীতে সংবাদ দিয়া গেলাম।

ডাক্তার চিন্তামণি বাবু আমাকে বড়ই ভালবাসেন; আমি তাঁর ছেলেকে বাড়ীতে পড়াই। তাঁকে সংবাদ দিবামাত্র তিনি আমার সঙ্গে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং আমার কাছে মায়ের অবস্থার কথা শুনিয়া তিন-চারিটা ঔষধও সঙ্গে লইলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বাড়ী আসিলাম। তখন মা প্রলাপ বকিতেছেন। কথা বেশী নয়, শুধু "শিশির, বাবা—বাড়ী আয়, আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করছি।" একটু চুপ করিয়া থাকেন, আবার ঐ কথা। ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ঘোর বিকারের অবস্থা। সন্ধ্যার সময় জ্বর হয়েছে, আর এখনই এই অবস্থা! তাই ত!" তিনি সঙ্গে যে ঔষধ আনিয়াছিলেন, তাহারই দুই তিনটা মিশাইয়া একবার খাওয়াইয়া দিলেন, এবং একটা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া আমাকে তাঁহার ডিস্পেন্সারীতে পাঠাইয়া দিলেন; বলিলেন, রোগের অবস্থা ভাল করিয়া না দেখিয়া তিনি বাড়ী যাইবেন না।

কোন রকমে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে আরও সকলে আসিলেন। তখনও প্রলাপ, "ওরে শিশির —শিশির!"

...কে তার করিতে বলিলেন। প্রতিবেশী ...দতে পারি নাই। বি... গেলেন। আমি মায়ের শয্যাপার্শ্বে ...লই নাই; সুতরাং এ উ... যখন এগারটা, তখন মায়ের যেন সকলকে নিয়ে এসে কিছু ... আমার দিকে চাহিয়া অতি ধীর হোতো না,—তা করতে গে...র—" আরও যেন কি বলিতে করতে হোত। তাই ভেবেই,

চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কথা বাহির হইল না। আমি বলিলাম, "মা, দাদাকে আস্‌বার জন্য তার করা হয়েছে।"

এই কথা শুনিয়া মা কেমন যেন হইয়া গেলেন; অতি তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "না, তার এসে কাজ নেই।" এখনও মা দাদাকে ক্ষমা করেন নাই, অথচ বিকারের ঘোরে শুধুই দাদার নাম করিয়াছেন—তাহাকেই ডাকিয়াছেন।

ডাক্তার বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তিনি অনতিবিলম্বে আসিয়া পরীক্ষা করিলেন; বলিলেন, "বসন্ত, তোমার মাকে বাঁচাতে পারলাম না। শিশিরের আসা পর্য্যন্ত রাখ্‌তে পারি কি না সন্দেহ।"

ডাক্তার বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। বেলা তিনটার সময় মা একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "শিশির"—তাহার পরই সব শেষ! কি নিদারুণ মনোবেদনা, কি কঠোর অভিমান বুকে করিয়া মা চলিয়া গেলেন, তাহা আমিই বুঝিলাম।

সমস্ত আয়োজন করিতে বিলম্ব হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরই অদূরবর্ত্তী নদীর তীরে শ্মশান-ঘাটে মাকে লইয়া যাওয়া হইল। দাদার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলাম, কিন্তু পর দিন বেলা আটটার পূর্ব্বে দাদার বাড়ী পৌঁছিবার কোন উপায়ই ছিল না। মৃতদেহ এত অধিক সময় বাড়ীতে রাখা কেহই সঙ্গত মনে করিলেন না। কাজেই দাদার যাহা কার্য্য, সে সকলই আমাকেই করিতে হইল।

বাড়ী ফিরিতে রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু বসিয়াই কাটাইলাম; প্রতিবেশী তিন-চারিজনও আমাদের বাড়ীতেই থাকিলেন।

বেলা আটটার সময় দাদা আসিল। আমি তখন বাহিরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিলাম—দাদারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমাকে দেখিয়াই দাদা দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন, "বসন্ত, মা?"

আমার তখন কি হইল, বলিতে পারি না। আমি মূর্খ হই, আর যাই হই,—কোন দিন দাদাকে একটীও রূঢ় কথা বলি নাই। তখন আমি সংযম হারাইলাম; আমি বলিয়া উঠিলাম, "মা! মাকে দেখ্‌তে এসেছ? তোমার অপমান সইতে না পেরে মা যে তোমারই নাম করতে-করতে চলে গিয়েছেন! তুমিই মাকে হত্যা করেছ—তুমিই করেছ! কাকে দেখ্‌তে এসেছ?"

এ নির্ম্মম আক্রমণ—এ শক্তি-শেলের আঘাত দাদা সহ্য করিতে পারিল না—সেইখানেই বসিয়া পড়িল,—একটী কথাও বলিবার শক্তি তাহার হইল না—একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসও ফেলিল না। আমি পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তখন আমার স্কন্ধে শয়তান চাপিয়াছিল,—তাই আমি এমন হলাহল ঢালিতে পারিয়াছিলাম—তাই আমি আমার দাদার বুকে এমন তীক্ষ্ণ শর বিদ্ধ করিতে পারিয়াছিলাম।

অকস্মাৎ মায়ের মুখ আমার মনে পড়িল—মায়ের কথা আমার মনে পড়িল—মা যে দাদাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন—মা যে দাদার নাম ছাড়া অন্য নাম—ভগবানের নাম পর্য্যন্তও করেন নাই! আর আমি এ কি করিলাম! হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া দাদার উপর কি কঠোর ভাষাই প্রয়োগ করিলাম!

তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না,—দুই হাতে দাদার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "দাদা, ক্ষমা কর আমাকে ক্ষমা কর ভাই। মা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে গিয়েছেন। মা, মাগো!" আমি আর কথা বলিতে পারিলাম না। দাদা আমাকে তাহার বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। আমার তখন চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল, 'মা! দাদাকে ক্ষমা কর মা! একবার এসে দাদাকে ক্ষমা করে যাও! একবার এসে ডাক—শিশির!'

× × × × ×

মায়ের মৃত্যুর পর একুশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে; আমার বয়স এখন চল্লিশ বৎসর। আমি এখনও সেই মাষ্টারীই করিতেছি। এখন আর কুড়ি টাকা বেতন পাই না—চল্লিশ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের কাজ করি। দাদার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে—তিনি এখন হাইকোর্টের উকিল; ছেলে-মেয়েও হইয়াছে। আমাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য—বিবাহ দিয়া সংসারী করিবার জন্য দাদা অনেক চেষ্টা করিয়াছে। আমি যাই নাই—যাইব না; বিবাহ করি নাই—করিব না। যে কয় দিন বাঁচিয়া থাকিব, মায়ের এই ঘরেই থাকিব,—মায়ের তুলসী-মঞ্চে সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিব—দিনান্তে সেইখানে বসিয়া মায়ের নাম করিব। অন্য দেবতার নাম শিখি নাই—আমার অন্য দেবতা নাই—আমি মার কাছে মন্ত্র পাইয়াছি—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—সেই মন্ত্রই জপ করি। যে দিন মা ডাকিবেন, সে দিন ঐ মন্ত্র জপ করিতে-করিতে মায়ের ছেলে মায়ের কোলে চলিয়া যাইব। তোমরা বলিতে পার—সে দিন কবে আসিবে?

একটী টাকা

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

তিন বছরের দামাল বালক
টাকা লাগায়েছে গলে,
নড়ে না সরে না, 'কি হল কি হল'
কাঁদে আর সবে বলে।
কেহ যায় আহা বাহির করিতে
গলায় আঙ্গুল দিয়া,
কেহ তাড়াতাড়ি ছুটিতে ছুটিতে
ডাক্তার ডাকে গিয়া।

হল শ্বাসরোধ দারুণ যাতনা
রবে কত-খন ধরি,
দেখিতে দেখিতে ত্যজিল পরাণ
ছেলে ছটফট্ করি।
ডাক্তার আসি মৃত-দেহ হতে
বাহির করিল টাকা,
পিতা গিয়ে দেখে, গায়েতে তাহার
ঈষৎ সিঁদুর মাখা।

দেখে উল্টায়ে, পিঠেতে তাহার
মোছা ত্রিশূলের দাগ ;
শিরে কর হানি বলে, 'ওরে টাকা,
আবার নিয়েছ লাগ।
যেখানে সেখানে আমার লাগিয়া
ঘুরিতেছ দিন-রাত,
বুঝিতে পারিনে গ্রহের 'ডেঙ্গস্'
কখন ছাড়িবি সাথ।
জনম ভরিয়া যন্ত্রণা দিয়া
মিটিল না তোর আশ,
সেমনেতে হ'ক করিবি করিবি
পাপীর বংশ নাশ।
দারুণ শোকের প্রলাপ-কাহিনী
শুনি ডাক্তার কয়,
"বুঝিতে পারিনে কি তুমি বলিছ
টাকাটার পরিচয়।"
শোকাতুর পিতা বলিতে লাগিল
সে অতি ভীষণ কথা,—
"মনে হলে মোর শরীর শিহরে;
বুকে বাজে বড় ব্যথা।
পিতামহ কাছে শুনিয়াছি, তাঁর
পিতামহ ছিল ঠগী,
সাজি ত সে কভু ধনী জমিদার,
কভু সন্ন্যাসী যোগী।
কণ্ঠেতে হায়, টিপিয়া এ টাকা
গামছা জড়ায়ে টানি,
পথে-প্রান্তরে বধিয়াছে হায়,
কত যে নিরীহ প্রাণী।
কত ধনবান, কত অতিথিরে
কত ভাবে নিরবধি,
দিবসে-নিশিতে করিয়াছে 'ঘাল'
সজোরে কণ্ঠ রোধি'।
ঘষা-ঘষা এই ত্রিশূলের দাগ,
সিঁদুর-মাখান টাকা,
গায়েতে ইহার কত কণ্ঠের
মরণের স্বর মাখা।
রুদ্ধ প্রাণের কাতর কাহিনী,
অপূর্ণ কত আশা।
যুগ-যুগ ধরি বুকেতে ইহার
বাঁধিয়াছে হায় বাসা।
শ্বাস-রুদ্ধের নিঃশ্বাস ছাড়া
তৃপ্তি উহার নাই,
ক্ষুধিত পরাণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া
আবার এসেছে তাই।
রাঙা গামছার খুঁটে বাঁধি হায়,
তামার ঘটিতে পুরি'
রেখে গিয়েছিল, সে বছর আমি
বাহির করিনু খুঁড়ি।
ভয়ে এই টাকা চালায়ে দিলাম
আগে মহাজন করে'
দেখ্‌ছি আজিকে পাপের মুষল
ফিরিয়া এসেছে ঘরে।
গরু বেচি কাল পেয়েছিনু টাকা,
রেখেছিনু ওই খানে,
মৃত্যু-শায়ক আসিয়াছে পুনঃ,
তখন বল কে জানে!
যুগে যুগে পাপ-ফল ভোগ করে
এ কথা বড়ই পাকা,
করিবে ধ্বংস পাপীর বংশ
পুষ্করা-পাওয়া টাকা।"

বৈরাগ্-যোগ

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ]

(৫)

চকিতাকে মঠ থেকে সরিয়ে ফেলাই তাঁরা স্থির করলেন। আগুন নিয়ে খেলা করার দরকার কি? এ কথা যখন শুনলাম, তখন একটা মস্ত বড় আরামের নিশ্বাস ফেলতে ভারি সাধ হলো। ফেলতে গিয়ে দেখি, ফেলা যায় না—পাঁজরের নীচে কোথায় যেন একটা কাঁটার মত ব্যথা লেগে রয়েচে!

কিন্তু এ কথা কাউকে জানতে দিলাম না। গায়ত্রীর ছবিখানা খুব করে লুকিয়ে ফেলেছিলাম। মনের মধ্যের ছবিখানাকে—যার কথা আমারই ভাল করে জানা ছিল না—মঠের কাজ-কর্ম্ম, ধ্যান-ধারণার নির্ম্মাল্যের নীচে পূজা-প্রতিষ্ঠার ঘটের মত চাপা দিতে লাগলাম।

কাশী কি প্রয়াগে, অনাথআশ্রম, কি সেবাশ্রমে—ঠিক বলতে পারিনে—ঐ রকম কি একটা নাম—চকিতাকে গুরুদেব নিয়ে চলে গেলেন। আমাদের ব্রহ্মচারীর পুরোন জীবন আরম্ভ হয়ে গেল।

জলের উপর প্রতিবিম্বের পাকা ছাপ যেমন কিছুতেই পড়ে না—জিনিসটা সরে যাওয়া মাত্র যে কে সেই! আমাদের মনটাও নিমেষে ধুয়ে-পুছে আবার তেমনি উজ্জ্বল চক্‌চকে হয়ে উঠল। আবার তেমনি করে পূবের আকাশে সূর্য্য উঠতে লাগলেন তেমনি করে আমাদের বেদ-গাথায় আকাশ ধ্বনিত হয়ে উঠল। আমরা আবার ফুল তুলতে লাগলাম, মালা গাঁথতে বসলাম। স্বামীজির মুখ থেকে বর্ষার মেঘের মত গাম্ভীর্য্য কেটে গিয়ে শরতের নীল, নির্ম্মল আকাশের প্রসন্নতার হাসি ফুটে উঠল!

এক বছর পরে, গ্রীষ্মের স্তব্ধ দুপুরে, উত্তরের ঘরে প্রকাণ্ড কাঁচের জানলাটা খুলে দিয়ে, আমি আবার ছবি আঁকতে বসেছি। প্রখর রোদ থেকে বাঁচবার জন্যে পাখীগুলো গাছের ঘন পাতার মধ্যে মাথা গুঁজে মন্দ-মন্দ শব্দ করচে। অদূরে বকুল গাছের চূড়ায় একটা কোকিল বসে স্বর-গ্রাম সাধছিল। ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কে একজন তার বিকৃত অনুকরণ করে তাকে চটিয়ে দিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে, আমার ছবির উপর অনেকখানি ছায়া ফেলে, কে আমার পিছনে এসে দাঁড়াল। ছবি থেকে মুখ তুলে তাকে দেখবার ফুরসৎ ছিল না—বললাম—"আঃ, আড়াল করিসনে চন্দ্রনাথ, সরে দাঁড়া ভাই।"

কালো মেঘকে যেমন করে টুকরো-টুকরো করে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকায়—তেমনি করে আমার ঘরের নিস্তব্ধতাকে হাসির উচ্ছ্বাসে খণ্ড-খণ্ড করে দিয়ে, সে হেসে বলে—"ফিরে দেখ—আমি চন্দ্রনাথ নই – আমি চকিতা।"

ফিরে দেখলাম—বালার্কের চেয়েও সুন্দর, নব প্রস্ফুটিত কমলিনীর চেয়েও মধুর মুখশ্রীর মধ্যে চকিতার সেই নির্ম্মল শারদ জ্যোৎস্নার মত হাসি!

আমার হাত থেকে তুলিটা পড়ে গেল;—আমি বল্লাম, "তুমি!"

সে হেসে বল্লে—"হাঁ, আমিই তো—তোমাদের একবার দেখতে এলাম।" এক ফুৎকারে এক বছরের জমা করা নির্ম্মাল্যের রাশি কোথায় উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল! ঘটখানি তেমনি রয়েচে—মনে হল, তার ভিতরকার জল বুঝি ফুটে উঠবে!

চকিতা ঝাঁপিয়ে এসে আমার বুকের উপর পড়ল। আমার ব্রহ্মচর্য্যের পোষা ছাগলটি সিংহিনীর ভয়ে যেন মরে আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমার মনে হলো, যেন সাহারার শুকনো খাক্ মাটিতে বর্ষার স্নিগ্ধ জলধারা নামল। ধীরে-ধীরে তার কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে বল্লাম,—"ছিঃ! অমন করতে নেই—আমরা যে ব্রহ্মচারী!"

চকিতা তার মুখখানি চকিতে গম্ভীর করে—তার সরল দুটো চোখের গাঢ় দৃষ্টি আমার মুখের উপর ফেলে, বল্লে, "তুমি ভারি দুষ্টু হয়ে গেছ—এত দিন পরে এলাম

—একটু আদর পর্যন্ত করলে না ?”—সে দ্রুত পদে নীচে চলে গেল।

হায় আদর ! আমি যে ব্রহ্মচারী !

(৬)

কি কারণে চকিতাকে সেবাশ্রমে রাখা হলো না। গুরুদেব তাকে চট্টগ্রামের এক স্ত্রী-মঠে নিয়ে যাবার পথে আমাদের মঠে কয়েক দিন বিশ্রাম করবার জন্যে নেমে ছিলেন। তাঁদের আসার কোন খবর আমরা পাই নি।

গুরুদেব বহুদিন আসামের পথে যান নি, একটি মেয়ে সঙ্গে করে একা যেতে তাঁর ইচ্ছাও হলো না। স্বামিজীকে তিনি সঙ্গে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন; কিন্তু তাঁর যাওয়া সম্ভবপর হল না। অবশেষে আমার যাবার কথা উঠ্‌ল।

ভগবান যে পতঙ্গের পাখা পোড়াবেন স্থির করেন, তারি কাছে প্রখর আগুনের সমাবেশ করেন। আগের মত হলে হয় ত আমি সোজা আপত্তি জানিয়ে দিতাম; কিন্তু যে নিজের কাছে নিত্য-নিয়ত অপরাধী—তার আর তেজ থাকে না। এই বিষয়ে আমি চন্দ্রনাথকে ঈর্ষা করতে আরম্ভ করেছিলুম। সে হলে হয় ত কঠোর সত্যকে প্রকাশ করে বলতে একটুও দ্বিধা করত না।

আমাদের কতক রেলে, কতক নৌকাতে যাবার স্থির হল। রেলপথটা লোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে, আমার জীবন দুর্বহ হয়ে পড়েছিল। দুই সন্ন্যাসীর সঙ্গে এমন একটি মেয়েকে দেখে লোকের আর কিছু উদ্রিক্ত না হক—বিস্ময়ের অবধি থাকে না। চকিতার ইতিহাস বলতে বলতে আমি ত' হায়রাণ হয়ে গেলাম।

নৌকার পথটি চমৎকার। লোকজনের হুড়োমুড়ি নেই,' গাড়ী ধরতে না পারার ভয় নেই, কুলির সঙ্গে অযথা বকাবকি নেই। চারি দিক শান্ত !

দিনের পর দিন চমৎকার কেটে যেতে লাগ্‌ল। পদ্মার ভীষণ মূর্ত্তি নয়,—শান্ত, স্থির গ্রাম্য বধূটির মত তার ধীর ভাব। নীল আকাশের তলায়, স্বচ্ছ জলের উপর—মাঝিদের গান আর দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দের তালে যেন সময়টা নটীর মত স্বচ্ছন্দ-গতিতে চলে যেতে লাগ্‌ল।

গুরুদেব শাস্ত্রের আলোচনা করতেন; কত দেশ-বিদেশের গল্প বল্‌তেন; আমরা দু'জনে তন্ময় হয়ে তা' শুন্‌তাম !

জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্ণে মাঝিরা কিছুতেই নৌকা চালাতে রাজি হত না; সন্ধ্যাটা অতিক্রম করে আবার চল্‌তে সুরু করত; কিন্তু সেদিন তারা বিকেল বেলাতেও চল্‌তে লাগ্‌ল; আমি জিজ্ঞাসা করাতে বল্‌লে, কাছের গ্রামে মাঝিদের মধ্যে একজন নেমে যাবে—তাই নৌকা চালাচ্চে।

সূর্য্য প্রায় অস্তগত—এমন সময় বায়ু-কোণে কাল-বৈশাখীর তাণ্ডব নৃত্য দেখে মাঝিদের মুখ শুকিয়ে গেল। ধূলো, বালি, শুক্‌নো পাতার রাশ নিয়ে ভীষণ ঝড় দেখ্‌তে-দেখ্‌তে ছুটে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। পিছনে সূর্য্যের রক্তবর্ণ কিরণের জাল যেন স্পষ্ট বলে দিলে যে, বিপদ আসন্ন।

মাঝিরা কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত কেমন হয়ে রইল—তার পর নৌকাখানা বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলে। কিন্তু সে চেষ্টা কোন কাজেরই হল না। পালখানা চৌচির করে দিয়ে, ঝড় আমাদের নৌকা উল্টে ফেলে চলে গেল। নিমেষে আমরা জলের তলায় গুলিয়ে গেলাম।

জীবন সংগ্রাম যে কি, তা' এত দিন শুনেই আসছিলাম—আজ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হল। বুঝতে পারলাম যে, এ যাত্রায় রক্ষা অসম্ভব; কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করবার ভীষণ প্রচেষ্টাকে এক তিল ত্যাগ করলাম না। জলের তলায় নিমেষের মধ্যে আমার জীবনের পাতাগুলো যেন তাড়াতাড়ি কে উল্টে দিয়ে গেল—তাতে যে ছবি ফুটে উঠ্‌ল, তা' বায়স্কোপের চেয়ে ঢের স্পষ্ট; ঢের ক্ষিপ্র !

একবার মনে হল আমার মরতে দুঃখ কি—কে আমার আছে ? কিন্তু পরক্ষণেই আমার সমস্ত চেতনাকে মন্থন করে দিয়ে, হৃৎপিণ্ডকে যেন খণ্ড-খণ্ড করে, একটা কান্নার উচ্ছ্বাস আমার গলা চেপে ধরলে।

হঠাৎ হাতড়ে একটা জান্‌লা পেয়ে গিয়ে, তাই দিয়ে বার হয়ে পড়লাম। যখন জল ছাড়িয়ে মাথা জলের উপর উঠ্‌ল, তখন মুক্তির কি গভীর নিশ্বাস! বাতাস এত মিষ্টি বোধ হয় এ জীবনে আর কখনো লাগ্‌বে না।

হাতের কাছেই দেখ্‌লাম, খুঁটি তোলবার মুগুরটা ভেসে চলেছে। পাশেই নৌকাটা উপুড় হয়ে ভেসে চলেছে।

হঠাৎ কি মনে হলো—দেহতে অনেকটা বল পেলাম। সেই মুগুরটা হাতে করে, উল্টো নৌকার উপর উঠে পড়ে, সজোরে তার কাঠের উপর আঘাত করতে লাগ্‌লাম। বার-কয়েক আঘাত করতেই, খানিকটা তক্তা ভেঙ্গে গেল। সেই ভাঙ্গার মধ্যে দিয়ে হাত চালিয়ে চালিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, যদি কারুর পাত্তা পাই। শেষকালে সমস্ত দেহটা সেই ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে, দুই পা দুই দিকে বাড়িয়ে দিয়ে খুঁজতে লাগ্‌লাম। এমন কতক্ষণ করেছি জানিনে—হঠাৎ একবার মনে হল—খানিকটা শন পায়ে জড়িয়ে গেল; টান্‌তেই দেখলাম যে, একটা ভারি জিনিসের সঙ্গে সেটা জড়ানো—খুব জোরে টানতেই বুঝতে পারলাম যে একটা শব। উপরে উঠে টেনে বার করলাম—চকিতা।

নৌকার পিঠে শুইয়ে দিয়ে তার দম ফিরে আনবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লাম। কতক্ষণ চেষ্টার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল। তার পর ধুক্‌ধুক্‌ করে হৃৎপিণ্ড চলতে লাগল!

তখন আমার গুরুদেবের কথা মনে পড়ল। কিন্তু চকিতাকে ছেড়ে দিয়েই বা কেমন করে আবার খুঁজতে যাই! তার বা হাতখানা চেপে ধরে, দেহটা সেই গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, কত খুঁজলাম—কিন্তু আর কাউকে পেলুম না।

পরিশ্রান্ত হয়ে চকিতার পাশে বস্‌লাম। গভীর রাত বলে মনে হল। আকাশ গাঢ় অন্ধকারে মগ্ন। তারাগুলো সব ঝক্‌ঝক্‌ করচে। ধীর, মন্থর গতিতে নৌকাটা ভেসে চলেছে—কোথায়! কে জানে?

ঘুমে আমার চোখ ভেরে আস্‌ছিল। কিন্তু সংজ্ঞাহীনা চকিতাকে তেমনি অসহায় ভাবে ছেড়ে দিয়ে কেমন করে ঘুমোব?

কিন্তু ঘুম বাধা মানে নি—জানিনে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙ্গল একটা ষ্টীমারের ভোঁর গর্জ্জনে—আমাদের খুব কাছ দিয়ে সেটা চলে গেল। ঢেউএতে আমাদের নৌকাটা কাত হয়ে গেল—আমরা দু'জনেই আবার জলে পড়ে গেলাম। বহু চেষ্টায় আর চকিতাকে নৌকার পীঠে তুলতে পারলাম না—ভেসে যাওয়া ভিন্ন আর গতি রইল না। একটা বাঁশের মাঝখান ধরে, আর চকিতার কোমর জড়িয়ে, পদ্মার অকূলে আমি ভাস্‌তে লাগ্‌লাম।

অন্ধকারে কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আকাশের নক্ষত্র দেখে ভয় করতে লাগ্‌ল—মনে হল, মৃত্যু তার লক্ষ চোখ দিয়ে যেন শিকার খুঁজচে!

ভোর হয়েছে। সকালের আলোর সঙ্গে আশার আলোও প্রাণে জাগতে লাগ্‌ল। কিন্তু শরীর ক্রমেই অবসন্ন হয়ে আসে যে! মনে হ'ল, বুঝি আর চকিতার দেহের বোঝা বইতে পারব না।

বিপদের সময় একলা হয়ে পড়াটার একটা ভীষণ আতঙ্ক আছে। চকিতার জ্ঞান ছিল না, তবুও সে যেন অনেকখানি ভরসা। তাকে ছেড়ে দিতে কিছুতেই পারছি না—মনে হতে লাগলো, যদি তলিয়ে যাই ত দুজনেই এক সঙ্গে যাই না কেন?

তখন কাব্য করবার সময় নয়;—তাকে যে জড়িয়ে রাখছিলাম, সে নিতান্তই নিজের স্বার্থের জন্য। এ কথা সেই বুঝতে পারবে যে এমন বিপদে পড়েচে।

জলের উপরে ভোরের সূর্য্যের কিরণের সিঁদুরের তুলি কে যেন বার-বার করে বুলিয়ে দিয়ে গেল। লাল রংকে আমার ঠিক রক্ত বলে বোধ হলো—এমনি ভয়ভারাক্রান্ত হয়েছিল আমার মন!

দেখ্‌লাম, চারিদিকে লালের মধ্যে এক জায়গায় খানিকটা কালো কি রয়েছে! মনে হলো, রক্তের সমুদ্রের মধ্যে মৃত্যু তার মুখের গহ্বরটা খুলে রেখে দিয়েছে! এই কথাটা মনে পড়াতেই, আমার সর্ব্ব-শরীর হিমের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল—ঠিক অনুভব করলাম, যেন একটা মৃদু টানে ঐ দিকে কে আমাকে টানচে। তখন শরীরে এমন বল নেই যে সেখান থেকে সরে দাঁড়াই!

আলো বেড়ে উঠতেই দেখ্‌তে পেলাম যে, কালো জিনিসটা আর কিছুই নয় বালির চুর। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস সমস্ত বুকটাকে খালি করে বেরিয়ে পড়ল! ভগবন্‌, তা' হলে তুমি আছ!

চরের উপর দুটো হাঁস বসে ছিল; অত্যন্ত নিশ্চিন্ত তাদের ভাব! আমরা কাছে আস্‌তেই, ঘাড়টা উঁচু করে দেখে, ভারি বিরক্ত হয়ে যেন তিরস্কার করে উঠ্‌ল—কে তোমাদের এখানে জ্বালাতন করতে ডেকেছে? তার পর ডানা দুটো মেলে দিয়ে, ঝপ্‌ঝপ্‌, সোঁ-সোঁ শব্দ করতে-করতে পশ্চিম দিকে উড়ে গেল। যেন তারা আলোর চেয়ে,

অন্ধকার বেশী ভালবাসে, লোকের চেয়ে নির্জ্জনতা বেশী পছন্দ করে!

হা ভগবন্! মানুষকে যদি অমনিতর দুটো ডানা দিতে! তাকে এমন করে মাটির সঙ্গে জড়িয়ে রেখে কি তোমার লাভ হয়েচে? কিন্তু এ সব তত্ত্ব আলোচনা করবার মত মনের অবস্থাটা তখন ছিল না। তখন দেহটা মাটিকে আলিঙ্গন করে লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছিল; মনটা ঘুমের ভারে ভেরে আসছিল!

সঙ্গিনীকে তুলে শুক্‌নো বালির উপর শুইয়ে দিয়ে, আমি সেইখানে লুটিয়ে পড়লাম। যেমন করে রাত্রের অন্ধকার ধীরে-ধীরে পৃথিবীর উপর নেমে আসতে থাকে, তেমনি ক'রে আমার সমস্ত দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে, ঘুম এসে পড়ল। মাটিটাকে মায়ের কোলের মত নিরাপদ বলে মনে হলো—সকালের হাওয়া যেন মায়ের নিঃশ্বাসের মত আমার সমস্ত শরীরকে নিরাময় করে দিলে। আর কিছু মনে এল না—আমি গভীর ঘুমের সমুদ্রে নিমেষে যেন ডুবে গেলাম!

সূর্য্যাস্ত হয়েছে—তখন আমার ঘুম ভাঙ্গল। কার কোলের উপর মাথা রয়েছে—কার দৃষ্টি যেন আমার মুখের উপর সংলগ্ন! শিয়রের সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখে, শৈশব যেন বিস্মৃতির ভারি পর্দ্দাখানা দু' হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে, নাচ্‌তে নাচ্‌তে বেরিয়ে এল। বুকের রক্ত কোটালের বানের মত ফুলে ফুলে উঠে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেবে। আমি চুপ্ করে পড়ে চকিতার মুখখানি দেখ্‌তে লাগলাম।

পশ্চিম আকাশের উজ্জ্বল আলো সেই মুখখানির উপর প্রতিবিম্বিত—তাতে কোন উদ্বেগ নেই—কেবল ডাগোর দুটো কালো চোখ গাঢ় বিষাদে নিবিড়! কাণে ঢেউয়ের শব্দ আসচে—ফাঁকে-ফাঁকে স্রোতের একটানা সুরটাই যেন মনে হলো মানুষের জীবনের আদি সুর,—তারি কাছে-কাছে যেন আর সুরগুলো উঁচু-নীচু হয়ে খেলা করচে!

আকাশের নীচের সেই স্তব্ধতাকে ভেঙ্গে কথা কইতে আমার সাহস হলো না! পদ্মার স্রোতের জলের সঙ্গে চোখের জল মিলিয়ে দিয়ে একটা বিরাট কান্নায় আমার বুক ভরে উঠ্‌ল—নদীর গর্জ্জনের গভীরতার সঙ্গে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাসের সুরটা যেন এক হয়ে মিলিয়ে লীন হয়ে গেল!

উঠে বস্‌তেই—সকালের সেই ছবিটি চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ল! হংস-মিথুন পদ্মার চরের উপর মুখোমুখী করে বসে আছে! কে তাদের এই নির্জ্জনতায় মধ্যে এক করলে—যেন জগতের আর কিছু সবই তাদের কাছে তুচ্ছ—নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ মিলনই যেন বিশ্বের মধ্যে সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষার জিনিস!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। মাথার উপর নক্ষত্রগুলো ঝক্‌ঝকিয়ে উঠ্‌ল! দু'জনের মধ্যে এক হাতের ব্যবধানটাও যেন মস্ত বলে মনে হলো! জানিনে—কখন—কেমন করে দু'জনে কাছাকাছি ঘেঁসা ঘেঁসি হয়ে বসেছি। দেখ্‌লাম, চকিতার দেহের উত্তাপ ঠিক আমার দেহের অনুরূপ। তার শিরার রক্ত যে তালে নাচ্‌চে—তারি অনুরূপ নৃত্য আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে! মনে হলো, সেতারের এক সুরে বাঁধা দুটো তার, যেন একটা আঙ্গুলের আঘাত পেয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌বার প্রতীক্ষাতেই রয়েছে!

সে ঝঙ্কার শুনবার ইচ্ছা আমার হয়েছিল কি না, মনে নেই। যদি হয়ে থাকে, তা'হলে কি আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়?

কি জানি—আমি যে মঠের ব্রহ্মচারী!

(৮)

এত বড় বিপদে চোখের জল উবে যায়। এ যে কামারের বিশাল হাতুড়ির তলায় পেতল আর লোহাকে এক করে জুড়ে দেবার চেষ্টা! বিদ্যুৎ পরিপূর্ণ দু'খানা মেঘ কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে—তাদের মিলন হবে বজ্রের অগ্নি আর কড়কড়ার নির্ঘোষে! সেই ভীষণ সম্ভাবনার ভয়ে আমার বুক দুদ্দুড় করতে লাগল!

আকাশে নক্ষত্রের চাকা প্রহরের পর প্রহরে ঘুরে যেতে লাগ্‌ল—আমরা স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। শেষ রাত্রে পূব আকাশের তলায় মোচার খোলার মত ত্রয়োদশী-খণ্ড চাঁদ দেখা দিলে। তারি আলো পদ্মার বুকের উপর পড়ে ঝিক্‌ঝিক্ করে উঠ্‌ল। মাথার উপর দিয়ে এক দল নিশাচর পাখী শব্দ করে উড়ে গেল।

আলো দেখে আমার সাহস হলো—আমি ডাক্‌লাম "চকিতা!"—আমি নিজেই সেই শব্দ শুনে চমকে গেলাম।

চকিতা চ'কে উঠে বল্লে—"চকিতা কে?—আমি অমিয়া!"

আমার আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। বল্লুম "সে কি?"

ক্ষীণ চাঁদের আলোতে তার মুখখানা দেখে মনে হল, এক দিন ঠিক এই মুখই দেখেছিলাম—মঠের বাঁধা ঘাটের পাশে—এ যেন চাঁদের আলোতে মলিন শ্বেত-কমল!

চকিতা বল্লে—"বাবা কোথায়?"

সে গুরুদেবকে বাবা বল্‌ত। আমি কথার উত্তর দিতে পারলাম না।—কোথায়? কে জানে?

মনের মধ্যে এই প্রশ্ন ঘুরে-ঘুরে পাক খেতে লাগ্‌ল;—ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে যেন বল্‌তে লাগ্‌ল, বাবা কোথায়!—মাথার উপরে পাখী উড়ে উড়ে যেন সেই কথাই একশ' বার করে জিজ্ঞাসা করে ফিরতে লাগ্‌ল!

আমি বুঝতে পারলাম যে, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় রয়েছে; কিন্তু কি উত্তর আমি দেব? আমার মনে হলো যে, গুরুদেবের জীবনের জন্য আজ আমিই কেবল মাত্র দায়ী। হঠাৎ আমার চিত্ত হত্যাকারীর তীব্র অনুশোচনার ব্যথায় মথিত হয়ে উঠ্‌ল। আমি নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হয়ে রইলাম।

ক্রমেই দিনের আলো ফুটে উঠ্‌ল। চকিতা আমার মুখ তীব্র ভাবে নিরীক্ষণ করে বল্লে, "তোমায় কোথায় দেখেচি যেন মনে হয়।"

অতিমাত্র বিস্ময়ের সঙ্গে আমি বল্লাম, "তুমি বল কি, চকিতা?"

"চকিতা কে?"

আমি বুঝলাম যে, চকিতার মাথায় আরো কিছু গোল দাঁড়িয়েছে। তাকে বল্লাম, "তোমার কি মঠের কথা, স্বামীজির কথা, গুরুদেবের কথা—কিছুই মনে নেই?"

চোক বুজে অনেকক্ষণ ভেবে সে বল্লে, "হাঁ, মনে পড়ে বটে;—কিন্তু সে কত দিনের কথা, বল ত?"

চকিতার মঠে যাবার আগে যে নৌকাডুবি হয়েছিল, সেই কথাই তার মনে তখন প্রবল ভাবে আসছিল। সে যে তার বাবার কথা বল্‌ছিল—আমার অনুমান মত সে গুরুদেবের কথা নয়। এমনি করে তার লুপ্ত স্মৃতি ফিরে আসছিল।

আমি মনস্তত্ত্ববিদ্ দার্শনিক নই;—নইলে, এই ব্যাপারটার আলোচনা করে, হয় ত একটা মস্ত পুঁথি লিখে, জগৎকে এক অভিনব সত্য উপহার দিতে পারতাম। কিন্তু আমার সে সুবিধা মোটেই ঘটে উঠেনি। তার আর এক কারণ এই যে, এই নাটোর আমিই যে একজন অভিনেতা হয়ে পড়েছিলাম। হৃদয়-রাজ্যের ভাবরাশির উদ্বেলতাকে উপযুক্ত ভাবে সংযত করবার যথেষ্ট ক্ষমতার অভাব আমার চিরদিনই ঘটে এসেচে!

হৃদয় যখন অপার বিস্ময়ে পরিপূর্ণ, তখন আর একটা বৃত্তির সাড়াতে কতকটা কাতর হতে হয়েছিল। অচিরে তার একটা উচিত মত ব্যবস্থা না করতে পারলে, দেহ-পিঞ্জরে প্রাণ-পাখীটিকে ধরে রাখবার উপায় ছিল না। আমরা দু'জনেই ক্ষুধার তাড়ায় একান্ত কাতর হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কি উপায় হবে!

নির্জীব ভাবে যখন প্রহরের পর প্রহর কেটে যেতে লাগ্‌ল—তখন আমার জঠরটাকে মহাব্যোমের চেয়ে অধিক শূন্য বলে ঠাহর হলো। তার মধ্যে যে অগ্নি জ্বলে উঠেছিল, তাকে কি দিয়ে নিভাই?

পদ্মার রাশি-রাশি জলে সে আগুন নেভে না। অগত্যা চরের চারিদিকে দেখতেই হলো—যদি কোন শিকড়-পাকড় পাই! সেই নূতন বালিতে কোন গাছপালা এত শীঘ্র জন্মাতেই পারে না। আমার রামচন্দ্রের বালির পিণ্ডের কথা মনে হলো; কিন্তু সে যে সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবস্থা—আর এ যে স্থূল দেহের মারাত্মক দাবী!

খুঁজতে-খুঁজতে এক জায়গায় দশ-বারটা রাঙ্গা আলু বালির গায়ে পোতা রয়েছে দেখ্‌তে পেলাম; দেখে, কি আনন্দ যে হলো, তা ভাষায় বলতে পারিনে। তখনি বিদ্রোহী মন ভগবৎ-ভক্তিতে অবনত হয়ে পড়ল। দু'জনে চরের উপর বসে-বসে আলু চিবুতে লাগ্‌লুম। স্বর্গের অমৃতের চেয়ে তা অধিক মধুর বলে বোধ হল।

মাথার উপর দিয়ে সূর্য্য তাঁর অশ্রান্ত গতিতে আকাশের পথে ছুটে, সে দিনের জন্য পশ্চিমে ঢলে পড়বার উপক্রম করচেন—এমন সময় একটা জাহাজের 'ভোঁ' কাণে এল। আমরা দু'জনে শকুনির চেয়ে তীব্র দৃষ্টিতে দিক-চক্রের এক দিক থেকে আর এক দিক পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করতে লাগ্‌লাম। কোথাও কিছু দেখা গেল না।

দিন শেষ হয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকার যেমন ঘনিয়ে আসতে লাগল—আমরাও তেমনি কাছাকাছি হতে লাগলাম। কিছুতেই মন উঠে না—আরো কাছে—আরো কাছে!

নিরুপায় দু'জনে ধরণীর কোলের উপর লুটিয়ে পড়ে, কিসের আশায়—কার প্রতীক্ষায় রইলাম, কে বলতে পারে?

চকিতা বল্লে,—"আমাকে অমিয়া বলে ডেকো; চকিতা—আমার ভাল লাগে না।"

আমি নিস্তব্ধ ভাবে তার কথা শুনে যেতে লাগলাম! বনের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকা যেমন করে গুণ-গুণিয়ে আপনার কথা নিশিথিনীকে বলে যায় তেমনি করে তন্দ্রাজড়িত আমার আচ্ছন্ন মনের কাছে তার জীবনের কাহিনীর ক্ষীণ তারটি সে গুণ-গুণিয়ে বাজাতে লাগল। সেই ধ্বনিতে যেন সমস্ত বাতাস কেঁপে-কেঁপে উঠে, মাথার উপরকার নক্ষত্রের শিখাগুলোকে পর্যান্ত কাঁপিয়ে দিলে!

অমিয়া যে গরীবের মেয়ে নয়, তা' আমরা জানতে পেরেছিলাম তার হাতের আংটিটা থেকে। কত দিন তার পাথর থেকে আলো ঠিকরে পড়তে দেখিচি। তাই সে যখন বল্লে যে তার বাপ্ জমিদার, তখন আমার মনে হলো, শুনা কথাই আর একবার শুনা হচ্চে।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা জানিনে। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখলাম, অমিয়া আমাকে জড়িয়ে ধরে ভয়ে তালপাতার মত থরথর করে কাঁপচে। সামনে একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দাঁড়িয়ে—চোক্ দুটো লাল টকটকে—তার প্রকাণ্ড জিভখানা লক্লক্ করে একবার চরের এদিকে ফেলচে—আবার ওদিকে ফেলচে!

ঘুম ভেঙ্গে এই বিভীষিকা দেখে আমি ভীষণ চীৎকার করে উঠলাম। সেই চীৎকারটা মাথার মধ্যে যেন একটা ঝাঁকনি দিয়ে গেল। তার পরেই মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যেতে বুঝতে পারলাম যে, চরের উপর আমরা দু'জনে নিশ্চিন্ত হলেও দেবতা নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

সেখানা একটা মস্ত ষ্টীমার। লাল দুটো চোখ—দুটো লণ্ঠন;—আর যাকে জিভ বলে মনে হয়েছিল, সেটা তার তীব্রোজ্জ্বল সার্চ লাইট!

ছপ্ ছপ্ শব্দ করে জালি বোটখানা চরের দিকে এগিয়ে এল। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় একজন চেঁচিয়ে বল্লে "তোমরা কে?"

আমরা সেই বোটে চড়ে ষ্টীমারে গিয়ে উঠলাম। তেতালায় কেবিনের মধ্যে সারেঙ্গের অনুকম্পায় আমরা জায়গা পেলাম।

এ পৃথিবীতে যিনি ভাঙ্গেন—তিনিই যে গড়বার মালিক,—এই কথা আমাদের ষ্টীমারে যেতে-যেতে লক্ষবার মনে পড়তে লাগ্‌ল। অদ্ভুত কিন্তু তাঁর দয়া দেখাবার রীতি!

(৯)

শুনেছি অজগর তার আহারটা পেটের মধ্যে পূরে নিয়ে, কয়েক দিন ধ'রে তাকে জীর্ণ করতে থাকে। তখন সে সুখে নিদ্রা যায়, আর পেটের মধ্যে অজস্র জারক রস ক্ষরিত হতে থাকে। ঠিক তেমনি করে এই রমণীটির সান্নিধ্য ধীরে-ধীরে ব্রহ্মচারীর পরুষ মনটিকে জীর্ণ করে, মন্থন করে দিচ্ছিল কি না, বলা শক্ত! কিন্তু একটা অসাধারণ কিছু যে ঘটছিল, তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

স্বামীজি বল্‌তেন, প্রেম জিনিসটা মনের একটা বিলাসিতা মাত্র। এই কথাটায় আমার গভীর বিশ্বাস আছে। কঠোর শোক, তাপ, দুঃখ, দৈন্যের ভিতর এই মানসিক অবস্থা কোন দিন স্ফূর্ত্তি লাভ করতে পারে না। যখন মনটা পরম স্বস্তিতে মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, তখনই এই উৎপাতে সে উৎপীড়িত হয়।

আমরা, স্বামীজি যা বল্‌তেন, তা' কেমন অনায়াসে মেনে নিতুম; কিন্তু চন্দ্রনাথের পথ ছিল একটু স্বতন্ত্র—সে চট্ করে কেমন একটা অন্য রকম ভেবে নিতে পারত। চন্দ্রনাথ বল্লে, "যদি তাই হয়, তা' হলে, তপশ্চারণ কালে মহাদেবের গৌরীর প্রতি আকর্ষণের কথাটা কি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করতে হবে?"

স্বামীজি বল্লেন, "তিনি যে দেবাদিদেব,—তাঁর মনের গতি কি সাধারণ মানুষের মনের গতির মত হবে? তাঁর আবার শোক-তাপ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, জরা-মরণ আছে না কি? তিনি যে প্রেমময়!"

এই কথা আমার খুব ভাল লেগেছিল। বাস্তবিক, প্রেম যদি দেহকে ছাড়িয়ে না উঠে, তবে ত সে দেহেরই একটা অবস্থার স্ফুরণ মাত্র। দেহ যা চায়, তা' ত দেহেরই

আকাঙ্ক্ষা—ও: পেলে হয় ত দেহ তৃপ্ত হতে পারে; কিন্তু সেখানে মনের তৃপ্তি কোথায়? তাই বিশ্ব-সংসারে ভালবাসার পিছনে লালসার ফুৎকার—তাই সেখানে তৃপ্তি নেই—তাই সেখানে অশান্তির হলাহল!

ষ্টীমারের তেতালার কেবিনে, অমিয়ার মত একটি মেয়েকে এমন নিঃসঙ্গ ভাবে পেয়ে যে একটা কাব্যরাজ্য সৃজন করা যেতে পারত—তা' আমি অস্বীকার করিনে। কিন্তু ব্রহ্মচারীর সাধন এবং আজন্ম শিক্ষার সঙ্গে তার যে একটা জাতিগত বিরোধ ছিল, সে কথাও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করবে না। অপর একটা দিক যে সাধারণের কল্পনার বাইরে ছিল, সে কথাটাও এখানে বলা দরকার। সেটা অমিয়ার মনের কথা। তাকে দেখে আমাদের একটা-শিউলি গাছের এক বছরের কাহিনী মনে পড়ত। একটা বুড়ো শিউলি গাছ ছিল,—তার ছোট-ছোট ফুল হতো। স্বামীজি বল্লেন ওকে ছেঁটে দিতে। উপানন্দ ওকে এমনি ছেঁটে দিয়েছিল যে, সে বছর শরতের মেঘ রৌদ্র, আলো-ছায়া, শিশির-তাপ কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারলে না। সে বছরটা তাতে ফুলই হ'ল না। অমিয়ার জীবনেও ঠিক এমনি একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল—তাই সে কাব্য অভিনয়ের মত করে নিজেকে কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারলে না। আমাদের হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব সবই যেন রাখাল বালকের লীলায় পর্যাবসিত হলো। যৌবন-নিকুঞ্জের দোরে চাবি দেওয়াই রয়ে গেল!

ষ্টীমারে আমাদের ভাড়া লাগেনি; কিন্তু আর-আর খরচ কেমন করে চলে? দু'এক দিন লোকে চাল-ডাল দিয়েছিল। এই চিন্তা আমার তখন প্রবল হয়ে উঠ্‌ছিল। ভেবেই উঠ্‌তে পারছিলাম না, এর সমাধান কোথায়। অমিয়াকে এই দুশ্চিন্তার অংশ দিয়ে কোন লাভ ছিল না; তাই নিজের ভিতরেই তোলাপাড়া করে সময় কাটাচ্ছিলাম।

সন্ধ্যার সময় চুপটি করে এক ধারে বসে ছিলাম। দক্ষিণ আকাশে সামান্য মেঘ-সঞ্চার হচ্ছিল। সারেঙ্গ ষ্টীমারটা আগের ষ্টেসনে নিয়ে যাবার জন্য একটু বেশী চালিয়ে চলেছিল। রাত্রে সেখানেই থাকা স্থির করেছে। দু'জন খালাসি জল মেপে-মেপে সুর করে বল্‌চে—"এক বাম মিলে না—সাড়ে এক বাম মিলে না।"

অমিয়া ছুটে এসে, ঝাঁপিয়ে আমার পিঠের উপর পড়ে খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল। বল্লে, "ওরা দেড় বলে না, বলে সাড়ে এক।"

আমি হাস্‌তে চেষ্টা করলাম; কিন্তু সে হাসি বর্ষার মেঘ-বিজড়িত চাঁদের হাসির মত—মেঘ ফুটে যেন বার হ'তে পারলে না।

অমিয়া আমার পাশে ধপ্‌ করে বসে পড়ে, আমার হাত দুখানা তার কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লে,—"সত্যি কথা বল্‌বে?"

আমি মৃদু হেসে বল্লাম, "আমাদের যে মিথ্যে কথা বলতে নেই!"

মুখখানা লম্বা করে বিদ্রূপের স্বরে সে বল্লে, "তোমরা সব যুধিষ্ঠিরের দল—যেন কোন দিন মিথ্যে বল না—আমি সব জানি।"

"কি তুমি জেনেছ অমিয়া?"

"তা বলব কেন—তুমি কি সব কথা আমায় বল?"

আমি চুপ করে রইলুম। অমিয়া আমার আঙ্গুল-গুলো মট্‌কে দিতে লাগ্‌ল। আমাদের গায়ে চতুর্থীর ক্ষীণ জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল—সেই আলোতে অমিয়ার আংটিটা মাঝে-মাঝে ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠ্‌ছিল। আমি তারি দিকে এক-একবার লোলুপ দৃষ্টি দিচ্ছিলাম।

সে বল্লে "এই আংটিটা খুলে দাও ত।"

"কেন?"

"জলে ফেলে দেব।"

"হঠাৎ ওর উপর চটে গেলে কেন?"

"ওটাতে যে ব্রহ্মচারীর লোভ হয়েছে—ওকে আর কাছে রাখব না।"

আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল।

সেটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে, টেনে-টেনে সে আপনি খুলে ফেলে উঠে দাঁড়াল। "আমিও আজ থেকে তোমার মত নিরা-ভরণ হব—কাজ নেই এই উৎপাতে।"

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম—"তুমি কি ব্রহ্মচারী, যে, অলঙ্কার ত্যাগ করবে?"

কিছু না বলে, সে আমার বাঁ হাতখানা টেনে নিয়ে, তার একটা আঙুলে আংটিটা পরিয়ে দিয়ে বল্লে, "আজ

থেকে তুমি আর ব্রহ্মচারী নও। যদি এই আংটি খুলে ফেল ত আমার মাথার দিব্য।"

ষ্টীমারের ভোঁ হঠাৎ বেজে উঠল। তার ভিতর যেন কিসের একটা মাদকতা! উদ্ধে, আকাশে চেয়ে দেখলাম,—মনে হল, যেন একটা নীল চাঁদোয়া—তাতে তারার ঝাড় জ্বলচে!

অমিয়া এখনো আমার হাত চেপে ধরে রয়েচে—তার হাতের ভিতর দিয়ে আমার হাতের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুতের ক্ষীণ তরঙ্গ আস্তে-আস্তে প্রবেশ করচে।

ক্ষণেকের জন্যে আমি যেন সব ভুলে গেলাম। আমার বুকের মধ্যে কিসের সমুদ্র তোলপাড় করে উঠলো—দু' হাত দিয়ে অমিয়ার মাথাটা জড়িয়ে, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে বল্লাম, "দিদি, আমি যে ব্রহ্মচারী!"

সমস্ত দেহের ছিদ্রে ছিদ্রে, কানায়-কানায় একটা বিপুল মন্দমধুর ব্যথার উৎস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। অমিয়ার মাথার উপর একটি ছোট্ট চুম দিতেই—চোখের জলের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল।

(১৮)

চোখে ঘুম এল না। সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় নেমে গিয়ে দেখলাম, সারেঙ্গ একটা কেরোসিনের কুপি জ্বেলে, একখানা মোটা মোটা অক্ষরে ছাপা হিন্দি বই খুলে, যত না পড়চে, তার তিনগুণ কাঁদচে! তাই দেখে আমার অশ্রু সাগরে যেন জোয়ার এল! পাশে বসে চুপ করে শুনতে লাগলাম।

প্রজারঞ্জনই রাজার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—তার কাছে আর সবই ছোট! কিন্তু কেমন করে রঘুপতি আজীবন জনক-দুহিতার বিরহ-বেদনা সহ্য করবেন! এ ভাবনার কূল-কিনারা নেই! সেই শ্রেয় এবং প্রেয়র দ্বন্দ্ব এখানেও। হে সংসার, প্রিয়কে লাঞ্ছিত করতে কেন তুমি চিরদিন এমনি নির্দ্দয় ভাবে প্রস্তুত! নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য তার বিজয়-রথখানা কি মানুষের মনের হাড়-পাঁজর চূর্ণ করে, চিরদিনই হৃদয়ের উপর দিয়ে এমনি করে চালিয়ে যাবে?

সারেঙ্গ কাপড়ে নাক ঝেড়ে ভারি গলায় বল্লে, "কিন্তু মহারাজ, জানকীনাথের এ কাজ আমার উচিত বলে মনে হয় না। রাজা কি মানুষ ন'ন—স্ত্রীর প্রতি কি তাঁর কর্ত্তব্য ছিল না? আমি হলে রাজ্য ত্যাগ করতাম—সীতাকে ত্যাগ কিছুতেই করতে পারতাম না। রঘুবীরের চরণে সহস্র প্রণতি—কিন্তু তিনি কাজটা মোটেই বীরের মত করেন নি—রাজ্যই তাঁর কাছে বড় হলো! প্রেম কি কিছু নয়?"

আবার সেই কর্ত্তব্য—সেই প্রেম! আমি বল্লাম, "সারেঙ্গজী—আমরা সন্ন্যাসী, প্রেমের খবর কেমন করে জানব? কর্ত্তব্যকেই আমরা বড় বলে মানি।"

হঠাৎ আমার মনের সাম্‌নে অমিয়ার বিদ্রূপভরা চোখ্ দুটো ফুটে উঠল—সে বলেছিল, তোমরা যুধিষ্ঠিরের দল!

হে সত্য, তোমাকে যে প্রকাশ করবার উপায় নেই! হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে তুমি কার ভয়ে অবগুণ্ঠন দিয়ে বসে আছ! তোমাকেই সব-চেয়ে ভালবাসি। কিন্তু সে গোপনে! নিভৃত নির্জ্জনে তুমি সাপের মাণিকের মতই চিত্ততল উদ্ভাসিত কর; কিন্তু সে নির্ম্মল জ্যোতিঃ লোক-চক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়!

সারেঙ্গ বল্লে, "আমারও একদিন সন্ন্যাসী হবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। প্রয়াগে এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিতে গেলাম; কিন্তু দীক্ষা তিনি দিলেন না, বল্লেন, "বেটা, এ পথ ঠিক নয়—আগে একজনকে ভালবাসতে শেখ, তবে বিশ্বপ্রেম আস্‌বে। বিশ্বপ্রেম কি ঠাট্টার কথা!"

"তার পর?"

"তার পর আর কি?—সাদি করলাম—করে এই সংসার-ধর্ম্ম পালন করচি। মহারাজ, সিঁড়ি নইলে কি ছাতে যাওয়া যায়?"

আমার হাতে আংটিটা ছিল। তার উপর একটা কটাক্ষ করে, সারেঙ্গ মৃদু হেসে, গুণ-গুণ্ করে গাইতে লাগল:—

"বৈরাগ্ যোগ কঠিন উধো, হাম ন করবো হো
আরে হাম ন করবো হো।"

লজ্জায় মলিন হয়ে গেলাম।

এমন সময় বার-দুই দপ্-দপ্ শব্দ করে কুপিটা নিবে গেল। আমি বাঁচলুম।

মনে হলো, এই তক্কে আংটিটা খুলে জলে ফেলে দি। টানাটানি করলাম। কিছুতেই খোলে না! দূরে বড়



মায়া

শিল্পী— শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

Emerald Printing Works, Calcutta

আলোটা জল্‌—দেখ্‌লাম, চুনী-দুটো যেন রক্ত চক্ষে বল্‌চে, তা হবে না—তা হবে না ; হীরেটার ভিতর থেকে শুভ্র জ্যোতিঃ ঝল্‌কে উঠ্‌চে। মনে হল, এই সেই সত্যের নির্ম্মল আলো—তাতে কোন রাগ নেই, রঞ্জন নেই—সোজা, সরল, অন্তর থেকে বাইরে বিচ্ছুরিত হচ্চে—তার কোন নিরোধ, কোন বাধা নেই। মনে হলো, প্রেমের আলো এমনি স্বচ্ছ-নির্ম্মল—মনে হলো সেইটেই মানুষের একমাত্র পথ!

কেদারের উপর গানের তাল দিতে-দিতে সারেঙ্গ নিজের ঘরের মধ্যে চলে গেল। বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার ক্ষুব্ধ চিত্ত—আকাশে-বাতাসে—পদ্মার জলের মধ্যে, সঙ্গী খুঁজে ফিরে মরতে লাগ্‌ল! কোথায় যাই? কি করি?

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌লাম। চাঁদ ডুবে গেছে। মাথার উপর বৃহস্পতি আকাশের অনেকখানি অন্ধকার আলো করে, স্থির দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে।

গরম বোধ হওয়াতে অমিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে শুয়েচে। আমি পা টিপে-টিপে তার পাশে গিয়ে বস্‌লাম। বৃহস্পতির মত প্রগাঢ় দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তে আমার ইচ্ছে হলো। মনে হলো, তেমনি করে যুগ-যুগান্তর ধরে ও মুখের দিকে চেয়ে থাকি!

প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল—আমি স্থির হয়ে তেমনি করে তাকিয়ে রইলাম। দেহের দিকে-দিকে যেন কিসের ক্ষুব্ধতা সঞ্চিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আকাঙ্ক্ষা-সমুদ্রের তীরে বেদনার ঢেউগুলো অভ্রভেদী পাহাড়ের মত উজ্জ্বল হয়ে আমাকে উন্মাদ করে দিলে!

আমি ব্রহ্মচারী—বৈরাগ্য-যোগ বিসর্জ্জন করে—প্রেমের অমৃত-সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়াই স্থির করলাম। ধীরে-ধীরে অমিয়ার গালের উপর একটি ক্ষুদ্র চুম্বন মুদ্রিত করিতেই, সে পাশ ফিরে শুলো।

হৃদয়ের মূল থেকে একটা ধিক্কারের নিষ্ঠুর ছুরি উঠে, সমস্ত অনুভূতিকে কেটে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে গেল।

ওরে কপট ব্রহ্মচারি!

(১১)

আহত সৈন্যের মত, সকালে উঠে দেখ্‌লাম যে, আমার সমস্ত দেহ-মন একটা মর্ম্মান্তিক ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। পরাজয়ের কথা মনে করতেও লজ্জা বোধ হলো। মনে হলো, উল্কার মত খসে পড়ে, আমার যা-কিছু-সর্ব্বস্বকে নিঃশেষে ভস্ম করে দিয়ে, আমি নিমেষে শেষ হয়ে যাই!

অমিয়ার মুখখানিতে সকালের সদ্য-ফোটা ফুলের প্রসন্ন-বিমলতা! তাতে অপরাধের লজ্জার ক্লেদের একটি রেখাও নেই। আমার মনটা যেন ওঁর কাছে কুঁকড়ে কালো হয়ে গেছে!

এ যেন পূর্ণিমার উপর সূর্য্য আর চাঁদ ; পূবের আকাশে কি নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক দীপ্তি ; আর পশ্চিম দিক-প্রান্তে নিষ্প্রভ মলিনতা!

অনুতাপের তিক্ত গ্লানিতে আমার আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো।

আস্তে-আস্তে নীচে নেমে গেলাম। সেখানকার যাত্রীদের কোলাহল মিষ্টি বোধ হলো। অপরাধটাকে লুকিয়ে ঢেকে ফেলবার যেন কত শত উপায় রয়েছে!

সারেঙ্গ হেসে বল্লে, "কি মহারাজ—আজ এত সকালেই যে অধোগতি হলো।"

সে বেচারার নির্জ্জলা হাস্য-পরিহাস করা ভিন্ন আর কোন মন্দ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না—কিন্তু তার কথাটা আমাকে একটা এমন নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর ধাক্কা দিয়ে গেল,—যার প্রত্যাশা আমি এক পলের জন্যও করিনি!

আমার হঠাৎ যেন রাগ হয়ে গেল। কিন্তু তারি কাছে এত উপকার পেয়েছি যে, সে রাগটা কিছুতেই ফস্ করে বেরিয়ে পড়ল না। দাঁত দিয়ে নীচেকার ঠোঁটটা চেপে ধরে, নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লাম, "মর্জ্জি।"

সারেঙ্গ হাস্‌তে লাগল।

অপরাধীর মন এমন সন্দিগ্ধ—সে হাসিও আমার কেমন ভাল লাগ্‌ল না। আমি তাই নীচের তালায় নেমে গেলাম।

এখানে স্তূপীকৃত মাল আর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর অসম্ভব ভিড়। অনেকেই তখনো উঠেনি। যারা উঠেছে—তারাও তখন চুপ করে বসে আছে। একটা বোরার উপর গিয়ে বসে, লোকদের কর্ম্মহীন অব্যস্ততা দেখ্‌তে লাগলাম। যাদের দিন রাত খাট্‌তে হয়, তাদের পক্ষে এই কর্ম্মহীনতা ক্লেশকর। একটি লোককেও যেন প্রসন্ন দেখ্‌লাম না। সবাই যেন বেজায় বেজার হয়ে পড়েচে।

ষ্টীমার গর্জ্জন করে ডুলে উঠ্‌ল।—সমস্ত দিনের চলা তার আরম্ভ হয়ে গেল। হাওয়া চলাচল সুরু হয়ে গেল। লোকে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল।

কয়েকজন লোক কাছে বসেই জল্পনা কল্পনা সুরু করে দিলে। একজন বুড়ো হাতে হুঁকোটি নিয়ে নাক বেঁকিয়ে বল্লে, "ও বাঁচা শক্ত, শেষ-রাতের ভেদ-বমি—এত বয়স পর্য্যন্ত একটাও ত সেরে উঠ্‌তে দেখ্‌লুম না।"

আর একজন উত্তরে বল্লে, "ও আদত কাল—কালে ধরলে কে কবে বেঁচে ফিরে আসে।"

আমি দলের মধ্যে নেমে পড়ে বল্লাম, "কি হয়েছে, কার?"

বৃদ্ধটি এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বল্লে, "অনাথা বিধবার এক ছেলে—শেষ-রাত থেকে কালে ধরেচে।"

"কি হয়েছে তার?"

"আর কি হবে,—সাক্ষাৎ যম এসেচেন; ভেদ-বমি গো—ভেদ-বমি।"

"কোথায় তারা আছে? একবার দেখ্‌তে পাইনে?"

বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে সেই দিকে দেখিয়ে দিলে।

গিয়ে দেখ্‌লাম—বছর-বারো বয়স,—ছেলেটি তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করচে; আর বিধবা শিয়রে বসে অনর্গল অশ্রু ত্যাগ করচে।

নাড়ী টিপে দেখি, দমে গেছে।

"কতক্ষণ থেকে এমন হয়েছে মা?"

"রাত এক পহর থাক্‌তে।"

ছেলেটি বল্লে—"মা, জল দে না।" তার কথা হাঁড়ির মধ্যে। চোখ্‌ দুটো কোটরের মধ্যে বসে গেছে,—নাকটা খড়্গের মত উঁচু!

"জল দিচ্ছ না কেন, মা?"

"সবাই মানা করেছে বাবা।"

আমি বল্লাম, "না, না—জল দাও মা, জলই যে ওর ওষুধ।"

"কি জানি বাবা,—যে যা বল্‌চে,—আমি ত কিছুই জানি নে।"

"ওকে জল দাও।"

জল খেয়ে ছেলেটি একটু ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি ছুটে উপরে উঠে গেলাম। দেখ্‌লাম, সারেঙ্গ এক মনে বসে-বসে একটা থালের উপর আলু আর ... কুচি-কুচি করে রাখচে।

আমি গিয়ে পাশে বস্‌লাম।

"সারেঙ্গজি—একটা অনুরোধ রাখবে?"

"কি মহারাজ?"

"আজ কতক্ষণে তোমার জাহাজ থাম্‌বে?"

"আজ আর থামাবো না—রাত ন বাজে দেবী... গিয়ে দাঁড়াবো।"

"কাছে কোন বড় গ্রাম নেই?"

"আছে বৈ কি? কিন্তু তাতে মাল উঠে না—আমা... মাল না থাক্‌লে—পেশেঞ্জারের জন্যে দাঁড়াবার ... বাধা নেই।"

"কাছাকাছি কোন গ্রাম আছে সারেঙ্গজি?

"ঐ যে দবিরপুর দেখা যাচ্চে—ওটা একটা ভারি গাঁ..."

"সারেঙ্গজি একটি কথা রাখ—দবিরপুরে এক... কিছুক্ষণের জন্যে জাহাজ ভিড়াও।"

"কেন?"

"ডেকে একটি বিধবার ছেলের হায়জা হয়েছে—... ডাক্তার ডেকে আন্‌তে পারি।"

"আচ্ছা, কিন্তু এক ঘণ্টার বেশী দেরী করতে পারবে না।"

"তাতেই হবে।"

দবিরপুরের ঘাটে এসে ষ্টীমার ভোঁ দিয়ে দাঁড়াল। এ গ্রামে ষ্টীমার কোন দিন দাঁড়ায় না—তাই ছেলে-বুড়ো সকলেই এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ্‌তে ছুটে এল।

খালাসিরা তক্তা ফেলে দিতেই—আমি নেমে পড়ে, একজন প্রৌঢ়কে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"মশাই, এ গ্রামে ডাক্তার আছে?"

"আছে বৈ কি।"

"কত দূরে তাঁর বাড়ী?"

"পোয়াটেক্।"

"এই পথেই?"

"হাঁ—খানিকটা গিয়ে বাঁ হাতি সড়ক ধরে যেতে হবে। ডাক্তার বাবুর বাড়ীর গায়ে সাইন্ বোর্ড আছে।"

আমি পথ ধরে—হন্‌হন্ করে চলে গিয়ে ডাক্তারের বাড়ীর সামনে দাঁড়ালাম।

কালো একখণ্ড কাঠের উপর সাদা ইংরিজি হরফে লেখা,—জে, ডি, দাস, এইচ-এল-এম-এস। এইচ্‌টির ন্যাকে এল-এর কাছে আণুবীক্ষণিক—যেন হাতীর পাশে পিঁপড়ে!

বুঝলাম ডাক্তার দাস হোমিওপ্যাথ। হোমিওপ্যাথির বিদ্যাই তাঁহার সম্বল; কিন্তু সেটাকে তিনি অগৌরব বলে মনে করেন।

ডাক্ দিতেই দুরজা খুলে একজন বৃদ্ধ বার হয়ে এলেন। হাতকাটা কুর্ত্তি গায়ে, পায়ে তালতলার চটি—পরণের কাপড় ঠ্যাঙে উঠেছে।

"কি চান আপনি?"

"আজ্ঞে, ডাক্তার বাবুকে।"

"আমিই ডাক্তার।"

"আপনাকে একবার দয়া করে ষ্টীমারে যেতে হবে—একটি ছেলের কলেরা হয়েচে।"

ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করে বল্লেন, "ষ্টীমারে!—ভিজিট অনেক বেশী পড়বে।"

"আজ্ঞে—অসহায় বিধবার ছেলে—একান্ত গরীব—ভিজিট তারা দিতে পারবে না।"

"তা'হলে আমায় ক্ষমা করতে হবে—ভিজিট না নিয়ে আমি এক পা বাড়াইনে—দয়া-ধর্ম্মের কাল চলে গেছে মশাই!"

এই কথা শুনে হঠাৎ আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। মনে হলো, দুটো রূঢ় কথা বলে দি। কিন্তু ভগবানের কৃপায় রাগটা এত বেশী হয়ে পড়েছিল যে, মুখ দিয়ে কথা বার হলো না।

"কত টাকা হলে যেতে পারেন?"

"পাঁচ টাকা;—ডবল ভিজিট চার টাকা, আর এক টাকা কনভেয়ান্স।"

"আচ্ছা, আপনি প্রস্তুত হোন—আমি আস্‌চি।"

বিদ্যুতের মত একটা উপায় আমার মাথার মধ্যে চম্‌কে গেল। আংটিটা আমার হাতেই ছিল—এক টান মেরে সেটা খুলে ফেল্লাম।

পাশের বাড়ীতে সেকরার হাতুড়ীর ঠুক্‌-ঠাক্ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এগিয়ে দেখ্‌লাম, সুতো-বাঁধা চশমা চোখে বসে স্বর্ণকার এক মনে কাজ করচে।

বল্লাম, "দাদা, একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করবে?"

"কে তুমি?"

"জাহাজের যাত্রী;—একটা বিধবার ছেলের কলেরা হয়েচে—হাতে কিছু টাকা নেই—এই আংটিটা বেচে দাও ত ডাক্তার নিয়ে যাই।"

আংটিটা দেখে সে বল্লে,—"ভারি দামী জিনিস;—এত দাম ত' আমি দিতে পারব না;—এ কোন রাজা-রাজড়ার হাতের জিনিস! চোরাই নয় ত?"

"নাঃ, সে ভয় নেই।—আমার ঠিক ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি। কত টাকা তুমি দিতে পারবে?"

"পঞ্চাশ।"

"আচ্ছা,—এক মাসের মধ্যে টাকাটা আমি পাঠিয়ে দিলে,—আংটিটা ফেরত দিও, দাদা।"

"বেশ কথা—তাই হবে।"

সেকরার মুখটি সৌম্য। হৃদয়ে দয়া আছে।

আমি মঠের নাম-ধাম লিখে দিলাম; আর তার নাম-ঠিকানা লিখে নিলাম। বিষ্ণুদাস কর্ম্মকার—দবিরপুর গ্রাম, পোষ্টাপিস্ বোদড়া।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লাম, ডাক্তারের কন্‌ভেয়ান্স তৈরি। অর্থাৎ একটি পক্ষীরাজ অশ্বের পিঠে একটি ছিন্ন কম্বল বাঁধা—নেয়ারের দড়ি দিয়ে।

আমি আস্‌তেই বল্লেন—"এই যে! ভিজিট-টা?"

পাঁচটা টাকা ফেলে দিয়ে বল্লুম—"চলুন, দেরী করবেন না।"

ডাক্তারের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—এই যাচ্ছি। ওরে চিব্‌রে, এই ওষুধের বাক্সটা নে।"

চিব্‌রে পক্ষিরাজটির রক্ষক।

অশ্ব মৃদু-মন্থর গতিতে ঘাটের পথে অগ্রসর হলো। ডাক্তার তার পিঠে অজস্র চপটি বর্ষণ করে তার গতির কোন তারতম্য উৎপাদন করতে পারলেন না। দূর প্রয়োজনও বড় বেশী ছিল না। আমরা অচিরে ঘাটে এসে উপনীত হলাম।

ছেলেটির অবস্থা দেখে সারেঙ্গের দয়া হয়েছিল। সে আমায় ডেকে বল্লে যে, "ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে নাও—কত সময়ে সে সাম্‌লে দিতে পারবে; ততক্ষণ আমি দাঁড়াব—নঙ্গর ফেলিয়ে দিয়েছি।"

সন্ধ্যা ভাগ্যি-ভাগ্যি ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ঘুমোতে লাগলে। ডাক্তার অনেকবার ছুটাছুটি করেছিলেন—আরো দশটি টাকা দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বিদায় দিলাম। তিনি যাবার সময় হৃষ্ট চিত্তে বল্লেন—"কিছু মনে করবেন না—সকালে ব্যবহারটা কিছু কড়া হয়েছিল।"

সারেঙ্গ সব শুনেছিল—সে বল্লে,—"বাবুজি, গরীবের উপর দয়া রাখবেন;—তাতে খোদা তোমার ভাল করবেন।"

দবিরপুরের ঘাট ছেড়ে জাহাজ আবার গম্ভীর-নির্ঘোষে রওনা হলো—তখন রাত আট-টা হবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

"রাজ-প্রশস্তি"

(শিলা-লেখ)

[শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি-এ]

মা ভৈঃ!—সম্পাদক মহাশয়, এ প্রবন্ধের নাম দেখিয়া ভয় পাইবেন না। আমি ক্ষুদ্র গল্প লেখক, প্রত্ন-তত্ত্ব অরণ্যের রহস্য ভেদ করিবার মত দুঃসাহস বা স্পর্দ্ধা আমার নাই। আমার এ অনধিকার-চর্চার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার মনে করিয়া, সংক্ষেপে আসল ব্যাপারটা লিখিতেছি।

সেদিন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র সেন একখানি "রাজপুতানা মিউজিয়মের বার্ষিক রিপোর্ট" দিয়া বলিলেন, "ওহে, এটা পড়ে দেখো,—তোমার একটা প্রবন্ধ লেখার উপকরণ পাবে।" কর্ম্ম উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে "বার্ষিক রিপোর্ট" লেখিতে হয়; কাজেই উৎসাহ হওয়া দূরে থাকুক, আমি কিছু দমিয়া গেলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া বন্ধুবর বলিলেন, "ভয় নেই, পড়ে দেখো। তুমি এ দেশে থাক,—এখানকার প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা যদি করতে না পার, তুমি এমন সব সংবাদ দিলে, আর কিছু না হয়—বাংলাদেশের শিক্ষিতদের কৌতূহল উৎপাদন করতে পারবে।" তাই আমি সভয়ে নিম্নলিখিত সংবাদটি সংগ্রহ করিয়া পাঠক সমাজে পেশ করিলাম;—আশা, যদি ইহা পাঠ করিয়া কোন পণ্ডিত এই শিলা-লিখিত কাব্যটির সমগ্র সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। *

আজমীর মিউজিয়মের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ওঝা মহাশয় মেবার ভ্রমণ কালে ইতিহাস-বিশ্রুত মহারাণা রাজসিংহের নির্ম্মিত "রাজ সমুদ্র" হ্রদ দেখিতে যান। সেখানে তিনি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "রাজ-প্রশস্তি" নামক একখানি সমগ্র কাব্য ২৫ খানি শিলায় উৎকীর্ণ দেখিয়া তাহার নকল লইয়া আসেন। এই কাব্যখানি ২৪ সর্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেক সর্গ এক-একখানি পৃথক শিলায় খোদিত। ইহা ছাড়া, একখানি শিলা-লিপি কেবল ভূমিকা স্বরূপ। সমগ্র কাব্যখানি মহাকাব্যের ধরণে লিখিত; এবং মেবারের রাজ বংশের ইতিহাস এবং "রাজ সমুদ্র" নির্ম্মাণের বিস্তৃত বর্ণনায় পূর্ণ।

পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর লিখিয়াছেন যে, এত বড় শিলা-লেখ,—যাহাতে ২৫ সর্গের একখানি সমগ্র কাব্য উৎকীর্ণ আছে,—ভারতবর্ষে এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ না হইলেও, এমন সুবৃহৎ শিলা লিপি যে আছে, এ সংবাদ আমাদের কাছে অভিনব। পৃথিবীর আর কোথাও যে একখানি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক কাব্য প্রস্তরে উৎকীর্ণ হইয়াছে—তাহাও আমরা জ্ঞাত নহি।

এই "রাজ সমুদ্র"-নির্ম্মাণ সম্বৎ ১৭১৮ (১৬৬২ খৃঃ অঃ), মাঘের কৃষ্ণা-সপ্তমীতে আরম্ভ হয়, এবং ১৪ বৎসর পরে, সম্বৎ ১৭৩২ (১৬৭৬ খৃঃ অঃ), মাঘী পূর্ণিমায় এই সুবৃহৎ হ্রদের প্রতিষ্ঠা-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

উক্ত ভূমিকার পর পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর শিলোৎকীর্ণ "রাজ-প্রশস্তি" কাব্যের প্রতি সর্গের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

১ম সর্গ। এই সর্গে কবি প্রথমে প্রচলিত প্রথানুসারে দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য, এক-লিঙ্গ এবং অন্যান্য দেবতার বন্দনা করিয়া কাব্য-বর্ণিত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। কবি নিজের পরিচয়ে লিখিয়াছেন যে তিনি "কঠোরী" বংশোদ্ভূত—নাম রণছোড় ভট্ট তৈলঙ্গ; পিতার নাম মধুসূদন; মাতা (নাথদ্বারা বা কাঁকরোলীনিবাসী) গোস্বামী-বংশের কন্যা—নাম, বেণী। কবির পূর্ব্বপুরুষের নাম দিয়াছেন—ভাস্কর, মাধব, রামচন্দ্র, সর্ব্বেশ্বর, লক্ষ্মীনাথ ও রামচন্দ্র (পিতামহ)। এই সর্গে বায়ু-পুরাণ-বর্ণিত বাপ্পের (বাপা) উৎপত্তির উল্লেখ আছে। বাপ্প, পার্ব্বতীর অশ্রু-বাষ্প হইতে উৎপন্ন হ'ন। হারিত ঋষি মহাদেবের গণের মধ্যে অন্যতম এবং চন্দ্রের অবতার

---

* এ প্রবন্ধটি নানা কারণে অর্দ্ধলিখিত অবস্থায় পড়িয়া ছিল—তাই প্রকাশ করিতে দেরী হইল। কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যাপারে এ বিলম্ব বোধ হয় মার্জ্জনীয়।—লেখক।

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (বর্ত্তমান স্থলে এই আখ্যায়িকার অবতারণার উপযোগিতা আমরা বুঝিতে পারি নাই—এই আখ্যায়িকা তৃতীয় সর্গে স্থান পাইলে ঠিক হইত—অনুবাদক)

কবি নিজের কাব্যের গুণ-বর্ণনা করিয়া, ইহাকে খণ্ড-প্রশস্তি, মহাভারত, রামায়ণ এবং মহাকবি বাণভট্ট ও শ্রীহর্ষের কাব্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

প্রতি সর্গের শেষে 'তীর' শব্দ সাঙ্কেতিক "অঙ্ক" রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং নৈষধের অনুকরণে, কবি কোন-কোন সর্গের শেষ শ্লোকে নিজের পিতা মাতার নামও যুক্ত করিয়াছেন।

২য় সর্গ। এই সর্গে ভাগবত-পুরাণের নবম স্কন্ধানুসারে, মনু এবং ইক্ষ্বাকু হইতে সুমিত্র পর্য্যন্ত ১২২ জন রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পর ১৩ জন রাজার নাম আছে যাঁহারা অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বশেষ রাজার নাম বিজয়। ইনি দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া আদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন।

এই সর্গের শিলায় গজাধর, কল্যাণের পুত্র উর্জ্জন, সুখদেব, কেশব, সুন্দর এবং লালার নাম লিখিত আছে। ইঁহারা সম্ভবতঃ রাজ সমুদ্র নির্ম্মাণ এবং পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৩য় সর্গ। এই সর্গে, বিজয়াদিত্য হইতে চতুর্দ্দশ রাজা গুহাদিত্য পর্য্যন্ত বংশ তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই গুহাদিত্যের নাম হইতে ইহার পর এই রাজবংশ গুহিলোট নামে খ্যাত। গুহাদিত্যের পুত্র বাপ্পা (বাপ্পা) একলিঙ্গ দেবের আরাধনা করিয়া হারিত ঋষির নিকট হইতে বহু-গুণ-সম্পন্ন একটি "কড়া" প্রাপ্ত হ'ন। তিনি মোরী-রাজ মনুরাজা বা মানের নিকট হইতে চিত্রকূট (চিতোর) জয় করেন এবং "রাওল" উপাধি গ্রহণ করেন। ইঁহার শৌর্য্য-বীর্য্য বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর গুহাদিত্য হইতে সমরসিংহ পর্য্যন্ত রাওলগণের একটি তালিকা আছে। এই সমরসিংহ দিল্লীর পৃথ্বীরাজ চোহানের ভগিনীকে বিবাহ করেন। ইনি গাজনী রাজ সাহাবদ্দিন ঘোরীর সহিত যুদ্ধে নিহত হ'ন। উক্ত যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পৃথ্বীরাজ রাসো গ্রন্থে হিন্দী ভাষায় বিবৃত আছে বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বাপ্পা হইতে অমরসিংহের পুত্র কর্ণ পর্য্যন্ত ২৬ জন "রাওল" হইয়াছিলেন। কর্ণের পুত্র রাহুপ মণ্ডোবর (মাড়োর) প্রদেশের মোকালসীকে পরাজিত করেন; এবং সর্ব্বপ্রথম "রাণা" উপাধি গ্রহণ করিয়া চিতোরে রাজধানী স্থাপিত করেন।

৪র্থ সর্গ। এই সর্গে নরপতি হইতে প্রতাপ সিংহ পর্য্যন্ত রাণাগণের বর্ণনা আছে। প্রসঙ্গক্রমে যে-যে ঘটনা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান-প্রধান ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। সুবিখ্যাত রাণী পদ্মিনীর স্বামী লক্ষ্মণ সিংহের রাজত্বকালে আলাউদ্দিন খিলজী চিতোর ধ্বংস করেন। হামীর একলিঙ্গ দেবের মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা করেন। রাণা মুকুল তাঁহার ভ্রাতা বাঘেতের নামানুসারে নাগহ্রদে (নাগ্দা) এক বিস্তৃত হ্রদ এবং একলিঙ্গ দেবের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করান। রাণা মুকুলের দ্বারিকা ও সমুধার তীর্থে যাত্রার উল্লেখ আছে।

ইঁহার পুত্র কুম্ভকর্ণ, "কুম্ভমেরু" দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সংগ্রাম সিংহ বাবরের সহিত যুদ্ধ করেন এবং ফতেপুর শিক্রির দিকে অগ্রসর হইয়া "পিলিয়া খাল" পর্য্যন্ত মেবারের রাজ্য-সীমা বিস্তার করেন। রাণা প্রতাপ সিংহের রাজত্বকালে, ঈশ্বর দাস, রাঠোর জয়মল, এবং পত্তা সিসোদীয়া আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। কাছোয়া মহারাজ মানসিংহ, আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সহিত যুদ্ধে মহারাণা প্রতাপ সিংহের বীরত্ব কাহিনী বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লিখিত আছে যে, একজন ভাটকে মহারাণা প্রতাপসিংহ একটি পাগ্‌ড়ী দান করেন। ঐ ভাট দিল্লীতে আকবরের দরবারে গিয়া এই পাগ্‌ড়ীটি খুলিয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই অপমানসূচক ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভাট উত্তর দেয় যে এই পাগড়ীটি "অপরাজিত রাণা।"

৫ম সর্গ। এই সর্গ রাণা অমর সিংহের রাজত্বকাল এবং মহারাজ মানসিংহ, সেলিম এবং খান্‌খানার সহিত যুদ্ধে বীরত্বের কাহিনী লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। রাণা অমরসিংহ, সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রেরিত খুরমের সহিত যুদ্ধ করেন এবং সেনাপতি করিম খাঁকে উন্টালার যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়া, মালপুরা ধ্বংস করেন। ইঁহার পুত্র কর্ণসিংহ মাহানা প্রদেশের সিরোজ্ঞা নগর দখল করেন। ইহার পর জাহাঙ্গীরের আদেশে অমর সিংহের সহিত সন্ধির প্রস্তাব লইয়া খুরম রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। অমরসিংহ উদয়পুর এবং খুরম গোগুণ্ডা হইতে আগমন করেন। সন্ধি স্থাপিত হইলে অমরসিংহ উদয়পুরে রাজত্ব করেন।

করণসিংহ গঙ্গাতীরবর্ত্তী শূকরক্ষেত্রে (বর্ত্তমান সোরণ ঘাট) স্বর্ণ তুলাদান করিয়া সেই স্বর্ণ ব্রাহ্মণ দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন। ইনি চাড়েরা জয় করেন এবং সিরোহী-রাজ রাও অক্ষয়কে (আখে রাজা) পরাজিত করেন। যখন খুরম জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন রাণা করণসিংহ তাঁহাকে আশ্রয় দেন; এবং জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর রাণার ভ্রাতা অর্জ্জুন খুরমের সহিত দিল্লী গমন করেন।

ইঁহার পুত্র জগৎসিংহ, রাঠোর যশোবন্তের কন্যা রাণী জাম্বুবতীর গর্ভে সম্বৎ ১৬৬৪ (১৬০৭ খৃঃ অঃ) ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বিতীয় তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সম্বৎ ১৬৮৫ বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়ায় সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার মন্ত্রী আখেরাজা, রাওল পুঞ্জাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানী ডুঙ্গরপুর লুঠ করেন। রাণার সেনাপতি রাঠোর রাজসিংহ দেবালিয়া নগর আক্রমণ করিয়া রাওত যশোবন্ত সিংহ ও তৎপুত্র মানসিংহকে নিহত করেন।

রাণা জগৎ সিংহের পুত্র রাজসিংহ সম্বৎ ১৬৮৬ (১৬২৯ খৃঃ অঃ) আশ্বিনের কৃষ্ণা দ্বিতীয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র অরি ইঁহার এক বৎসর পরে ভূমিষ্ঠ হ'ন। ইঁহাদের মাতা মেরতার রাঠোর রাজসিংহের কন্যা, নাম জনাদে। রাণা জগৎসিংহ মেরু-মন্দির প্রাসাদ এবং সুবিখ্যাত পিচোলা-হ্রদে মোহন মন্দির নির্ম্মাণ করান। ইঁহার মন্ত্রী ভাগচন্দ্র বাঁসওয়াড়া রাজ্য আক্রমণ করিয়া তথাকার রাওল

সমস্থিকে রাণার করদ রাজা করিয়াছিলেন। রাণার কন্যার সহিত বুঁদি-রাজ ভাবসিংহের পুত্রের বিবাহ হয়।

এই সর্গের অবশিষ্ট অংশে রাণা জগৎসিংহ এবং তাঁহার মাতা রাণী জাম্বুবতীর তীর্থ-যাত্রা এবং দানের কথা লিখিত আছে ; এই কাব্য-প্রণেতা এবং তাঁহার মাতাও এই দানের অনেক সামগ্রী পাইয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ সর্গ। সম্বৎ ১৭০০ (১৬৪৩ খৃঃ অঃ) রাণা রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। রাণা উদয়পুরে সর্বঋতু বিলাস নামক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। ১৭১১ সং (১৬৫৪ খৃঃ অঃ) মোগল সম্রাট আজমের আগমন করেন এবং তদীয় মন্ত্রী সসরুল্লা খাঁ চিতোরে আসেন। রাণার প্রতিনিধি মধুসূদন ভট্ট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ; এবং রাণার পুত্র সুলতান সিংহ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করায় সাজাহান রাণাকে ১৪ খানি গ্রাম প্রদান করেন।

এই সর্গের অবশিষ্ট অংশে রাণা রাজসিংহের বিবিধ দানের কথা লিপিবদ্ধ আছে। রাণা ভট্ট মধুসূদনকে বহুবিধ সামগ্রী দান করেন ; এবং নিজে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে অপারগ বলিয়া ভট্টকে এক অশ্ব প্রদান করেন।

৭ম সর্গ। এই সর্গে কবি মহাকাব্যের প্রচলিত প্রথামত রাণা রাজসিংহের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যে বিজয় যাত্রার বর্ণনা করিয়াছেন। রাণা, আজমের, সম্বর মাণ্ডল, সাহাপুরা, কুলিয়া, জাহাজপুর, সেওয়াড়, রন্থম্ভোর, বেয়ানা, ডোডা, ফতেপুর, দারবা, বনেরা, টোঁক, লালসোট, চাট্‌সু এবং মানপুরা প্রভৃতি নগর জয় করেন।

৮ম সর্গ। সম্বৎ ১৭১৪ (১৬৫৭ খৃঃ অঃ)— এই বৎসরে রাণা রাজসিংহ যখন ফেনী নদী তীরে আপনার শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময় সম্রাট ঔরঙ্গজেব সিংহাসনারোহণ করেন। রাণা তাঁহার ভ্রাতা অরিসিংহকে এই উপলক্ষে দিল্লী প্রেরণ করেন এবং ঔরঙ্গজেবও অরিসিংহকে ডুঙ্গরপুর প্রভৃতি পরগণা দান করিয়া সম্মানিত করেন। এই বৎসরেই রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার সরদার সিংহ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আদেশে চোহানরাজ সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করেন এবং বিজয়-লাভ করিয়া বীর খ্যাতি প্রাপ্ত হ'ন। সং ১৭১৬ (১৬৫৯ খৃঃ অঃ) রাণা ডুঙ্গরপুর রাজ্য দান করিয়া তথাকার রাজাকে নিজের করদ করেন। এই বৎসরেই রাণা বাঁসদা রাজ্য আক্রমণ করেন ;—তাঁহার আগমন-সংবাদে ভীত হইয়া রাওত হরিসিংহ রাজধানী দেবালিয়া ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন—পরে রাণার বশ্যতা স্বীকার করিয়া বহু অর্থ এবং হস্তী প্রভৃতি নজর প্রদান করেন।

সং ১৭১৫ (১৬৫৮ খৃঃ অঃ) রাণা রাজসিংহের মন্ত্রী ফতেচাঁদ বাঁসওয়াড়া আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ এবং কর প্রদান করিতে বাধ্য করেন। এই প্রকারে সিরোহী রাজ্যও জয় করা হইয়াছিল। সং ১৭১৬ (১৬৫৯ খৃঃ অঃ) রাণা ডেহারী নামক গিরিবর্ত্মে সুদৃঢ় প্রাকার নির্ম্মাণ করেন।

সং ১৭১৭ (১৬৬০ খৃঃ অঃ) রাণা রাজসিংহ কিষণগড়ে গমন করিয়া তথাকার রাজা রাঠোর রূপসিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যার সহিত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। ১৭১৯ সম্বতে মিনাদিগের অধিকৃত মেওয়ালা প্রদেশ জয় করা হয়। সিরোহী রাজ্য পুনরায় জয় করিয়া তথাকার অধিপতি আখরাজাকে—যাঁহাকে তৎপুত্র উদয়ভানু বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল,—রাণা সিরোহীর সিংহাসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৭২১ সম্বতে রাণা,— বাঘেলার (রেঁওয়া) বান্ধব-রাজের কুমারের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। ১৭২৫ সম্বতে রাণা রাজসিংহ তাঁহার মাতার নামে "জন সাগর" হ্রদ নির্ম্মাণ করান। ইহাতে প্রায় সাত লক্ষ মুদ্রা খরচ হয়। রাণার বালক পুত্র জয়সিংহ "রঙ্গ-সাগর" খনন করেন এবং সেই বয়সেই তাঁহার নানা বীরত্বের কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সর্গের শেষাংশে মেবারী ভাষায় গদ্যে "রাজ-সমুদ্রের" আরম্ভ এবং সমাপ্তির তারিখ ও বিবরণাদি লিখিত হইয়াছে। রাজ-সমুদ্র প্রতিষ্ঠার সময় রাণা রাজসিংহ ছয় দিনে এই হ্রদ প্রদক্ষিণ করেন এবং স্বর্ণ তুলাদান অর্থাৎ তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া নিজের ওজনের স্বর্ণ চারণ ও ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। সর্ব্বশেষে রণছোড় ভট্টের পুত্র লক্ষ্মীনাথ, গঙ্গাধর, কল্যাণ, মোহন, উরজন, কেশো এবং সুন্দরলালের নাম লিখিত হইয়াছে। ইঁহারা উদয়পুর নিবাসী এবং সোমপুরী বংশজাত। ইঁহারা সম্ভবতঃ হ্রদ নির্ম্মাণ ও পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৯ম সর্গ হইতে ১৯শ সর্গ।* এই কয় সর্গে "রাজ-সমুদ্রের" নির্ম্মাণের জন্য স্থান নির্ব্বাচন, এই উপলক্ষে পূজা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি এবং হ্রদের পরিমাপাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে।

লিখিত আছে যে ১৬৯৮ সম্বতে যখন রাণা রাজসিংহ বিবাহ করিতে যশল্মীরে গমন করেন, তখন এই স্থানে এক সুবৃহৎ হ্রদ নির্ম্মাণ করিবার কল্পনা প্রথমে তাঁহার মনে উদয় হয়। রাজ সমুদ্রের চারিদিকে ১২টি 'কোঠা', ২১টি বৃহৎ এবং ৪৮টি ছোট মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্বর্ণ-তুলাদান, স্বর্ণ ভূমিদান এবং বিশ্বচক্রদান প্রভৃতি দানের কথা উল্লিখিত আছে। রাণা রাজসিংহের ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, এবং পুত্র ও পৌত্রেরাও সপ্তসাগর ও স্বর্ণ-তুলাদান করেন। রাণা নিজে যে স্বর্ণ-তুলাদান করেন, তাহাতে ১২০০০ তোলা স্বর্ণ লাগার কথা বিবৃত হইয়াছে। পুরোহিত গরিবদাসকে ১২খানি গ্রাম দক্ষিণা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া ৪৬০০০ ব্রাহ্মণ ও বহুসংখ্যক আহূত-অনাহূতকে অর্থদান করা হয়।

২০শ সর্গ। এই সর্গে যে সকল পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গকে এই উপলক্ষে উপহার প্রেরিত হইয়াছিল—তাঁহাদের উল্লেখ আছে ; যথা, যোধপুরের যশোবন্ত সিংহ রাঠোর, অম্বরের রামসিংহ কাছোয়া, বিকানীরের রাও অনুপসিংহ, বুঁদির রাও ভাবসিংহ হারা, রামপুরার রাও

---

* পাঠকদিগের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে এই সর্গ কয়টির অনুবাদ করিলাম না।

মহৎসিংহ চন্দ্রাবত, যশল্মীরের রাওল অমরসিংহ ভাটি, ডুঙ্গরপুরের রাওল যশোবন্ত সিংহ ইত্যাদি। ইহা ছাড়া যাঁহারা রাজসমুদ্র নির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের এবং চারণ, ভাট প্রভৃতিকে অনেক উপহার দেওয়া হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ৫৫২টা ঘোড়া এবং ১২২২৬৮ হাতী উপহার দেওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

২১শ সর্গ। সং ১৭১৭ মাঘ কৃষ্ণা সপ্তমী হইতে সং ১৭৩৫ আষাঢ় (১৬৬২—১৬৭৮ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত রাজসমুদ্র নির্ম্মাণে ৪৬,৬৪,৬২৯, মুদ্রা খরচ হইয়াছিল; এবং এই হ্রদ প্রতিষ্ঠায় সাত লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয়।

সং ১৭৩৪—রাণা ভীলবারায় গমন করিয়া বৈরীসালকে সিরোহী সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন; এজন্য তিনি একলক্ষ মুদ্রা এবং ৫ খানি গ্রাম উপহার প্রাপ্ত হ'ন।

২২শ সর্গ। সং ১৭৩৫—যুবরাজ জয়সিংহ আজমের গমন করেন এবং তথা হইতে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লী যা'ন। তিনি দিল্লী হইতে দুই ক্রোশ দূরে সম্রাটের শিবিরে তাঁহার সহিত মিলিত হ'ন। যুবরাজ দিল্লী হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী গড়মুক্তেশ্বর তীর্থে গমন করিয়া রৌপ্য-তুলাদান করিয়া পরে বৃন্দাবন-মথুরা যাত্রা করেন। সম্বৎ ১৭৩৬ (১৬৭৯) সম্রাট ঔরঙ্গজেব মেবার আক্রমণ করেন—সাহজাদা আকবর এবং তেওয়ার খাঁও এই যুদ্ধে যোগ দেন। দেবারী ঘাটের যুদ্ধ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাদশাহ উদয়পুরে আগমন করেন এবং আকবর একলিঙ্গদেবের মন্দির দর্শন করিতে গমন করেন।

ইহার পর রাণা কর্ত্তৃক বড় নগর, আহ্মদনগর, ভাঙ্গোরা এবং বেগমপুর জয়ের কথা এবং যুবরাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক বাদশাহ-জাদা আকবর-চালিত দিল্লী-বাহিনীর পরাজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমান কর্ত্তৃক মন্দির ধ্বংসের প্রতিশোধ জন্য কুমার ভীমসিংহ আহমদ নগরে একটি বড় এবং ত্রিশটি ছোট মসজিদ ধ্বংস করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তিনটি পরগণা বা তিনলক্ষ মুদ্রা দিয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন—কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

২৩শ সর্গ। উপরি-উক্ত সন্ধি না হওয়ার কারণ রাণা রাজসিংহ সং ১৭৩৭ (১৬৮০ খৃঃ অঃ) কার্ত্তিকের শুক্লা দশমীতে দেহত্যাগ করেন। স্বর্গগত মহারাণার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া নূতন রাণা জয়সিংহ কাদেজা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করেন। রাণার সৈন্য কর্ত্তৃক তেওয়ার খাঁর সৈন্য গোগুণ্ডা গিরিবর্ত্মে আবদ্ধ হয়; কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ তাহাদের অন্য পথের সন্ধান দেওয়ায়—তাহারা বহু কষ্টে দিল্লী-বাহিনীর সহিত মিলিত হয়। রাণা অগ্রসর হইয়া শাহজাদা আজমের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং নানাবিধ মূল্যবান উপহার আদান-প্রদান হইয়া সন্ধি স্থাপিত হয়।

২৪শ সর্গ। এই সর্গে "রাজ-সমুদ্র" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে স্বর্ণ ও রৌপ্য তুলাদান হইয়াছিল তাহার স্মরণার্থ হস্তী-তোরণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর বর্ত্তমান কাব্যের গুণ এবং রাণা রাজসিংহ ও তাঁহার সেনাপতি সামন্ত প্রভৃতির শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে।

লিখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কাব্য ১৭৩২ সম্বতে সম্পূর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু ইহার ৫।৭ বৎসর পরের ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ থাকায় অনুমান হয় যে, এই কাব্য শিলায় উৎকীর্ণ করিতে যে ৫।৭ বৎসর লাগিয়াছিল—সে সময়ের ঘটনাও পরে মূল কাব্যের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়।

নিশির ডাক

বা

Somnambulism.

[শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দাশ]

আমাদের দেশে "নিশির ডাক"কে সকলে একটা ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিয়া থাকে; সুতরাং লোক মনে করে, এ বিষয়ের আলোচনা অথবা অনুসন্ধানে কোন ফল নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাকে অনেকে একটা বিশেষ প্রকারের রোগ বলিয়া মনে করেন। এই রোগে রোগী রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এবং অনেক সময়ে নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নানারূপ অদ্ভুত ও দুরূহ কার্য্যও করিয়া থাকে। ক্রমশঃ ইহার আলোচনা করিতেছি। সুতরাং এই অদ্ভুত রোগ যে আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

নিদ্রা জিনিসটা যদি জাগরণ ও মৃত্যুর মাঝামাঝি একটা অবস্থা হয়, তাহা হইলে এই Somnambulism জিনিসটা নিশ্চয়ই নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থা। যখন আমরা সম্পূর্ণ নিদ্রিত অবস্থায় থাকি, তখন আমাদের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মনের ক্রিয়া, বাহিরের জিনিস অনুভব করিবার শক্তি, ও স্বেচ্ছায় অঙ্গ-সঞ্চালনের ক্ষমতা (Power of voluntary motion),—এ সমস্তই বিশ্রাম লাভ করে। বস্তুতঃ, তখন আমরা জীবিত থাকি বটে, কিন্তু বাহিরের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকে না। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিবার সময়ে আমরা জাগরণের একটু কাছাকাছি আসিয়া পড়ি; কারণ, দেখা গিয়াছে, সে সময়ে আমাদের মস্তিষ্কের কয়েকটি যন্ত্র (Cerebral organs) কার্য্য করিয়া থাকে, এবং অপরগুলি নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় বসিয়া থাকে। স্বপ্ন দেখিবার সময়ে আমরা বাহিরের জিনিস

অনুভব করিতে পারি এবং অনেক সময়ে না-ও করিতে পারি। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, নিদ্রিত ব্যক্তির ঘরে বসিয়া যদি কয়েকজন লোক একটি বিষয়ে কথোপকথন করেন, তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তি সেই বিষয়টির স্বপ্ন দেখেন। আবার, অনেক সময়ে নিদ্রিত ব্যক্তির খুব নিকটে বসিয়া কথোপকথন করিলেও, তাহা তাঁহার নিদ্রার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। প্রথম অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি বাহিরের জিনিস অনুভব করিতে পারেন, দ্বিতীয় অবস্থায় পারেন না।

সাধারণতঃ আমরা যে স্বপ্ন দেখিয়া থাকি, তাহার মধ্যেও সময়ে-সময়ে আমরা স্বেচ্ছায় অল্প অথবা অধিক পরিমাণে হাত-পা সঞ্চালন করিয়া থাকি। নিদ্রিত ব্যক্তি যদি স্বপ্ন দেখেন যে তিনি কাহারও সহিত খুব মারামারি করিতেছেন, তাহা হইলে পার্শ্বে শায়িত ব্যক্তিকে স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিভ্রমে নিদ্রাবস্থায় দুই-একটা কিল বসাইয়া দিতে পারেন। বলা বাহুল্য, এরূপ ঘটনা বিরল নহে। অনেক সময়ে নিদ্রিত ব্যক্তি বিড়-বিড় করিয়া বকে, অথবা চীৎকার করিয়া উঠে। ইহা আরও সাধারণ ঘটনা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জাগ্রত অবস্থায় আমরা যাহা করি, নিদ্রিত অবস্থায় নিজের অজ্ঞাতসারে আমরা তাহা কিয়ৎপরিমাণে করিতে পারি, যেমন কথা কওয়া, হাত পা নাড়া, বাহিরের জিনিস অনুভব করা ইত্যাদি। এই সব ব্যাপারের কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, আমরা Somnambulismএর একটা সুস্পষ্ট কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিব। এই রোগে শরীরের প্রায় সমস্ত মাংসপেশী, ও বাহিরের প্রায় সমস্ত ইন্দ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকে, যেমন চলন-শক্তি, কথন-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, স্পর্শ-শক্তি ইত্যাদি, মস্তিষ্কের অংশ-বিশেষ মাত্র সুষুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। জাগ্রত অবস্থার সহিত ইহার এইটুকুই প্রভেদ। অবশ্য এটা ঠিক যে, বিভিন্ন লোকের পক্ষে এই অবস্থা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও তাহার কারণ সম্বন্ধে মিঃ ম্যাকনিস (Mr. Macknish) বলেন,—"যদি আমরা স্বপ্ন দেখি যে আমরা হাঁটিয়া বেড়াইতেছি, আর যদি সে স্বপ্ন এত দূর স্পষ্ট হয় যে, তাহাতে আমাদের হাঁটিয়া বেড়াইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত মাংসপেশী সমূহ উত্তেজিত ও জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সাধারণতঃ আমরা স্বপ্নাবস্থায় হাঁটিয়া বেড়াই। যদি আমরা স্বপ্ন দেখি যে আমরা কিছু দেখিতেছি, কিংবা কোন বিষয় শুনিতেছি, আর যদি সে স্বপ্ন খুব স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়, তাহা হইলে আমাদের মস্তিষ্কের যে অংশ দর্শন ও শ্রবণের অনুভূতি গ্রহণ করে; এই স্বপ্নের ফলে মস্তিষ্কের সেই অংশ জাগিয়া উঠে; তাহার ফলে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং আমরা সে সময়ে জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায় সম্মুখের জিনিস দেখিতে পাই ও কোন শব্দ হইলে শুনিতে পাই। সাধারণতঃ স্বপ্নের ফলে কয়েকটি মাংসপেশী মাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠে; তাহাতে মাত্র আমরা হাঁটিয়া বেড়াই, কিন্তু কিছু দেখিতে অথবা শুনিতে পাই না।" (১) কিন্তু অনেক সময়ে উপরি-উক্ত কারণেই আমরা হাঁটিয়া বেড়াইতে পারি ও সে সঙ্গে দেখিতেও পারি। আবার, সময়ে সময়ে আমরা একই সঙ্গে হাঁটিতে পারি, দেখিতে পাই ও শুনিতে পাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অনেক ব্যক্তি নিদ্রিত অবস্থায় কথা কহিয়া থাকে। ইহার কারণ, মস্তিষ্কের অংশবিশেষের জাগিয়া উঠার ফলে কথা কহিবার মাংসপেশী সমূহ উত্তেজিত হইয়া উঠে। মস্তিষ্কের কতকগুলি বিভিন্ন অংশ যদি একসঙ্গে জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তি একই সময়ে চলিতে-ফিরিতে কথা কহিতে, এবং শ্রবণ ও দর্শন করিতে পারে।

এই সমস্ত কারণ মনে রাখিলে, পাঠককে আর এই অদ্ভুত রোগের বিচিত্রতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইবে না, এবং তিনি এতৎ সংক্রান্ত ঘটনাবলী অবিশ্বাস করিবেন না। সাধারণতঃ দেখা যায়, স্বপ্নের স্পষ্টতার ফলে রোগীর হাঁটিয়া বেড়াইবার মাংসপেশীসমূহ জাগিয়া উঠে, এবং রোগী শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক হাঁটিয়া বেড়ায়; পরে দেয়ালে কিংবা কোন কঠিন বস্তুতে মাথা ঠুকিয়া গেলে, রোগী তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠে। ইহাই Somnambulismএর খুব সাধারণ ঘটনা। রোগী অনেক সময়ে শয্যা হইতে হঠাৎ লম্ফ দান করিয়া উঠে। ইহাও খুব বিরল নহে। একবার একটি ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, একটি ষাঁড় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। তিনি ছুটিতে-ছুটিতে সামনে একটি গভীর খানা দেখিতে পাইলেন। উহা পার হইবার জন্য তিনি উচ্চ লম্ফ দান করিলেন। স্বপ্ন এই পর্য্যন্ত আসিয়া বাস্তবে পরিণত হইল। ফলে, ভদ্রলোকটি বিছানা হইতে উচ্চ লম্ফ দান করিয়া উন্মুক্ত পার্শ্বস্থ টেবিলে গিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। লম্ফটি আর একটু বেগশালী হইলে, তিনি জানালা ডিঙ্গাইয়া নীচে গিয়া পড়িতেন। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ ঘটনায় Somnambulism অধিককাল স্থায়ী নয়। ঘটনা আরও বিচিত্র হইয়া উঠে, যদি এই অবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয়। Smellie লিখিত

(১) "If we dream that we are walking, and the vision possesses such a degree of vividness and exciting energy as to arouse the muscles of locomotion, we naturally get up and walk Should we dream that we hear or see, and the impression be so vivid as to stimulate the eyes and ears, or, more properly speaking, those parts of the brain which take cognizance of sights and sounds, then we both see any objects, or hear any sounds, which may occur, just as if we were awake. In some cases, the muscles only are excited, and then we simply walk, without hearing or seeing."—Mr. Macknish's "Anatomy of Sleep."

"Philosophy of Sleep" নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে—

"প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি Somnambulismএর একটি অদ্ভুত উদাহরণ পাইয়াছিলাম। Edinburghএর প্রায় এক মাইল দূরে আমি একজন কৃষকের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলাম। আমার landlord ছিলেন Mr. Baird। তাঁহার সারা (Sarrah) নাম্নী একটি দাসী ছিল। কিছুদিন সেইখানে থাকিবার পর আমি বাড়ীর লোকের মুখে শুনিলাম, এই চাকরাণীটি অনেক সময়ে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রিকালে মাঠে-মাঠে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। তাহার এ রোগ বৃদ্ধি পায়, যদি ধমকাইয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহাকে জাগাইয়া দেওয়া যায়। শুনিয়া আমার কৌতূহল হইল। আমি বাড়ীর লোকদের বলিয়া রাখিলাম, এবার সারা উঠিলে যেন তাহারা আমাকে খবর দেয়। কয়েক দিন পরে, এক দিন রাত্রিকালে মিঃ বেয়ার্ডের একটি পুত্র আসিয়া আমাকে ঘুম হইতে উঠাইল, এবং বলিল যে সারা এইমাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছে। আমি শীঘ্র উঠিয়া, যে ঘরে সারা ঘুমাইত, সেই ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখিলাম, মিঃ বেয়ার্ড, তাঁহার পত্নী, তাঁহাদের একটি পুত্র ও সারার সঙ্গিনী আর একটি চাকরাণী সেখানে উপস্থিত আছে। সারা তাহাদের মধ্যস্থলে বসিয়া আছে। আমি তাহার পাশে গিয়া বসিলাম। ক্রমে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। সারাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতে লাগিল, তাহারই সে স্পষ্টভাবে উত্তর দিতে লাগিল। কিন্তু সে কাহাকেও চিনিতে পারিতেছিল না ; অর্থাৎ বুঝিতে পারিতেছিল না, কে কথা কহিতেছে। ইহাতে আমাদের একটি সুবিধা হইল। আমি তাহার পরিচিত একটি লোকের ভূমিকা গ্রহণ করিলাম।

"মিঃ বেয়ার্ডের একটি ভৃত্য ছিল। তাহার নাম জন পোর্টিয়স্। সে লোকটা সারার প্রেমে পড়িয়াছিল। আমি এ খবর জানিতাম। আমি জন্ পোর্টিয়স্ সাজিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলাম ; ও তাহাকে জন্ পোর্টিয়াস্ যে ভাবে সম্বোধন করিয়া থাকে, আন্দাজে আমি সেই ভাবে তাহাকে সম্বোধন করিতে লাগিলাম। পর-মুহূর্ত্তেই সারা চটিয়া গেল, ও আমাকে ধমকাইতে লাগিল এবং রীতিমত শাসাইয়া দিল, যেন ভবিষ্যতে আমি তাহার নিকট এরূপ প্রস্তাব না করি। যাহা হউক, আমি এ বিষয় ত্যাগ করিয়া তাহার প্রভুপত্নী সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা তাহার সহিত কহিতে লাগিলাম ; কারণ, আমি জানিতাম যে, বেয়ার্ড-পত্নীর সহিত সারার অনেক সময়ে কলহ হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত আমি মনে করিয়া আসিতেছিলাম যে, ব্যাপারটা আগাগোড়াই জুয়াচুরী ও ভণ্ডামি ; কিন্তু ইহার পর আমার ধারণা বদলাইয়া গেল ; কারণ, সারা আমাদের সকলের সামনেই প্রভুপত্নীর প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। বেয়ার্ড-পত্নী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সারা বলিতে লাগিল, এই সে দিনই সে Mrs. Bairdএর নিকট চুরি করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ, সে চুরি করে নাই। Mrs. Baird অত্যন্ত নীচমনা, ইত্যাদি।

"ব্যাপারটা বিশ্রী হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, আমি সে প্রসঙ্গ ঘুরাইয়া লইলাম, এবং তাহার সহিত অন্যান্য নানা কথা কহিতে লাগিলাম। আমি সারার মুখ পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম তাহার চোখদুটি খোলা আছে বটে, কিন্তু তাহা পাগলের মত দৃষ্টিহীন ;—কোন বস্তুর দিকে নিবদ্ধ নহে। আমি একটা আল্‌পিন লইয়া সারার হাতে কয়েকবার ফুটাইলাম ; কিন্তু সারা হাতও নাড়িল না, তাহার মুখে যন্ত্রণার একটু চিহ্নও প্রকাশিত হইল না। কিছুক্ষণ পরে সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। দরজা দিয়া গৃহের বাহিরে যাইতে কয়েকবার চেষ্টাও করিল ; কিন্তু আমরা তাহাকে ধরিয়া রাখিলাম। দুয়ার দিয়া যাইবার পথ বন্ধ হইল দেখিয়া সারা হঠাৎ জানলায় লাফ দিয়া উঠিল ও পলাইবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু যথাসময়ে আমরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম, কারণ, জানলা হইতে নীচে পড়িলে জীবনের আশা অল্প। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণ ভাবে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। ভাবিলাম, সারা হয় ত আগে হইতেই জানিত যে, আমরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিব। সেই জন্য চুপি-চুপি সকলকে একধারে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলাম, 'আপনারা সকলে জানালা হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন। দেখা যাউক, সারা সত্য-সত্যই জানালা হইতে নীচে পড়িবার চেষ্টা করে কি না। আমরা সকলে সাবধান হইয়া নিকটে থাকিব। সেইরূপ চেষ্টা করিলে যথাসময়ে তাহাকে ধরিয়া ফেলা হইবে।' সেইরূপ ব্যবস্থাই হইল। আমরা সকলে সাবধানে জানালার নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলাম। যে মুহূর্ত্তে সারা দেখিল জানালায় লোক নাই, অমনি সে জানালার উপর লাফ দিয়া উঠিল। তাহার শরীরের প্রায় অর্দ্ধেক জানালার নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় আমরা তাহাকে ধরিলাম এবং জোর করিয়া আমাদের মধ্যস্থলে একটা চেয়ারে তাহাকে বসাইলাম। এতক্ষণে আমার সন্দেহ দূর হইল। ভাবিলাম, ব্যাপারটা তবে জুয়াচুরী নয় ; নিশ্চয়ই একটা অজ্ঞাত শক্তি সারাকে আকর্ষণ করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে সারা আবার পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছন্দ ভাবে আমাদের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। এই রূপে প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইল। শেষে আমি বাড়ীর লোকদের জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহারা সারাকে ঘুম হইতে জাগাইবার কোন উপায় জানেন কি না। একটা চাকরাণী বলিল, সে জানে। সে সারার হাতের কব্জী ধরিয়া জোরে পেষণ করিতে লাগিল ও উচ্চৈঃস্বরে সারার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। এইরূপ করাতে সারার ঘুম ভাঙ্গিল। সে আশ্চর্য্য হইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল ও সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—এই অসময়ে এত লোক তাহার ঘরে আসিয়াছে কেন? সারা সম্পূর্ণ রূপে জাগিয়া উঠিলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি নিদ্রিতাবস্থায় এরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছিলে কেন?' সারা উত্তর করিল, 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, একটি প্রকাণ্ড ষাঁড় আমাকে তাড়া করিতেছে, ও প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাকে ঢুঁ মারিবার চেষ্টা করিতেছে।'"

এই ঘটনাটির মধ্যে একটা জিনিস ভাবিয়া দেখিবার মত আছে। বালিকাটির হাতে যখন আল্‌পিন্ ফোটান হইয়াছিল, তখন সে কোন যন্ত্রণা অনুভব অথবা প্রকাশ করে নাই। এই যন্ত্রণানুভব-শক্তি লোপের জন্য Somnambulism রোগটি অধিকতর বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। পরে এ প্রকার বিষয় আরও দুই-একটি কথা বলিব। যাহা হউক এই গল্পটিতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সারা পার্শ্বস্থিত কোন লোককে চিনিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তাহার দৃষ্টি-শক্তি একেবারে তিরোহিত হয় নাই, কারণ, সে উন্মুক্ত জানালা দেখিতে পাইয়াছিল, এবং তাহার মধ্য দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তাহার দৃষ্টি শক্তি ও দেখিয়া চিনিবার শক্তি কিয়ৎ-পরিমাণে অক্ষুণ্ণ ছিল; কারণ, সে জানালা দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু মানুষ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। বস্তুতঃ, এই Somnambulism রোগে রোগী কি পরিমাণে দেখিতে পায়, তাহা ঠিক করা দুঃসাধ্য। ইংরেজীতে খুব প্রচলিত একটি গল্প আছে,

একটি বালক নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল, যেন সে ঈগল পাখীর বাসা হইতে বাচ্চা চুরি করিয়া আনিতে চলিয়াছে। ঈগল পাখীর বাসাটি পর্ব্বতের গায়ে অবস্থিত ছিল। দুরূহ ও বিপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য পথ দিয়া সেইখানে উপস্থিত হওয়া যায়। বালক অতি কষ্টে, সাবধানে সেইখানে উপস্থিত হইয়া বাসা হইতে কয়েকটি বাচ্চা সংগ্রহ করিল, এবং সেইরূপ সাবধানেই, পার্ব্বত্য দুর্গম ও বন্ধুর পথ দিয়া অবতরণ করিয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়া সেগুলি নিজের ঘরের এক স্থানে রাখিয়া দিল। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া বালক একবার ঘরের চারিদিকে চাহিল। চাহিয়াই ভয়ানক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। কারণ, সে দেখিল, স্বপ্নের মধ্যে সে ঘরের যে স্থানে ঈগল পাখীর বাচ্চাগুলি রাখিয়াছিল, সত্য-সত্যই তাহারা ঠিক সেই স্থানেই আছে। বস্তুতঃ, বালকটি রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় সত্য সত্যই সেই সব বিপদ সঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া বাসা হইতে বাচ্চা পাড়িয়া আনিয়াছিল এবং ঘরের সেই স্থানেই রাখিয়া দিয়াছিল।

গল্পটা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে,—কিংবা আংশিক ভাবে সত্যও হইতে পারে। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এ ক্ষেত্রে বালকের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ রূপেই অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল দৃষ্টিশক্তি নয়, তাহার সহিত চিন্তাশক্তিও বর্ত্তমান ছিল; কারণ, দেখা যাইতেছে, বালক পার্ব্বত্য বন্ধুর পথ 'সাবধানে' অতিক্রম করিয়াছিল। সাবধানতার জন্য দৃষ্টি-শক্তি ও চিন্তা-শক্তি উভয়ই আবশ্যক। যাহা হউক, ইহা একটা গল্প মাত্র। কিন্তু এইরূপই আশ্চর্য্য একটি ঘটনা আয়ারল্যাণ্ডের একটি বন্দরে ঘটিয়াছিল। ঘটনাটি মিঃ ম্যাকনিস্ লিখিয়া গিয়াছেন। উহা এই :—

ষ্টেসনে যে জায়গা হইতে জাহাজে মাল বোঝাই করা হয়, সেইখানে রাত্রি দ্বি-প্রহরের সময়ে একটি প্রহরী পাহারা দিতেছিল। লোকটা পাহারা দিতে-দিতে দেখিল যে, সেখান হইতে প্রায় দেড়শত হাত দূরে একটা লোক জলে সাঁতার কাটিতেছে। এত রাত্রে সমুদ্রের জলে সাঁতার! সন্দেহ ক্রমে প্রহরী জলের পুলিসকে খবর দিল। কয়েকজন পুলিস একটা নৌকা লইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি লোকটিকে জল হইতে উঠাইল। গোলমালে, হুড়াহুড়িতে লোকটার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, লোকটা তাহার আসন্ন বিপদের কথা কিছু ধারণাই করিতে পারিল না; এবং এই কথাটাই তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া বোঝান গেল না যে, সে এখনও নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া নাই,—তাহাকে সবেমাত্র জল হইতে উঠান হইয়াছে। এই বিচিত্র ঘটনায় কিন্তু সব-চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোকটা রাত্রি বারটার সময় গৃহত্যাগ করিয়াছিল এবং সেই গভীর রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় দুই মাইল বন্ধুর ও বিপদসঙ্কুল পথ হাঁটিয়া সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হইয়াছিল। পরে জলে নামিয়া পুরা দেড় মাইল সাঁতার কাটিয়াছিল, এমন সময় পুলিস তাহাকে জল হইতে তুলে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ রোগে মস্তিষ্কের অংশবিশেষমাত্র নিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান করে; মস্তিষ্কের বাকী অংশগুলি এ সময়ে সাধারণ ভাবেই কায করিয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথার আলোচনা করিব। Somnambulism সংক্রান্ত এই সমস্ত বিচিত্র ব্যাপার দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, পাগলদের মস্তিষ্কের অবস্থাটাও অনেকটা এই রকমের। পাগলরা সাধারণ মানুষের মতই দেখিতে পায়, শুনিতে পায়, কথা কহিতে পারে, হাঁটিতে পারে, ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তাহাদের তফাৎ এই যে, তাহারা কোন বিষয়েই সঠিক ধারণা করিতে পারে না; সুতরাং সেই অনুসারে কাজও করিতে পারে না। সেই জন্যই তাহাদের সমস্ত কার্য্য অর্থহীন ও সমস্ত বাক্য যুক্তিহীন বলিয়া বোধ হয়। এক কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা অপর এক কথার উত্তর দেয়; ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটা শুনিতে পায় নাই এমন নহে, কিন্তু সে প্রশ্নটার ঠিক ধারণা করিতে পারে নাই। সেই জন্য ঠিক উত্তরও দিতে পারিতেছে না। তবে Somnambulism এর সহিত পাগলামির তফাৎ এই যে, প্রথম অবস্থায় রোগীর মস্তিষ্কের অংশবিশেষ নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থান করে, ও দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর মস্তিষ্কের সেই অংশটা হয় রোগাক্রান্ত, না হয় নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে ঘটনাটির কথা বলিলাম, প্রায় সেই ধরণের আর একটি ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন্ (Benjamin Franklin) বলিয়াছেন :—

একবার গরম জলের চৌবাচ্ছায় স্নান করিতে-করিতে আয়েসে তিনি চৌবাচ্ছার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়েন। ফলে প্রায় এক ঘণ্টা কাল তিনি জলে স্বীয় পিঠের উপর ভাসিতে থাকেন। শেষে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়।

অনেক সময়ে এমন দেখা গিয়াছে যে, যে ব্যক্তির এই Somnambulism রোগ আছে, নিদ্রিতাবস্থায় তাহার চিন্তায় অথবা স্বপ্নের

গুলাটা বাহিরের অনুভূতির দ্বারা (যেমন গায়ে হাত বুলাইয়া অথবা কাণের কাছে আস্তে-আস্তে কথা কহিয়া) ইচ্ছামত বদলাইয়া দেওয়া যায়। প্রবন্ধের গোড়ায় এ বিষয়ে দুই-একটা কথা বলিয়াছি। মিঃ স্মেলি (Mr. Smellie) কথিত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাই :—

"টমাস পার্কিনসন নামক একটি বালক Edinburgh University তে আমাদের সহিত একসঙ্গে ডাক্তারী পড়িত। আমি এবং তাহার অধিকাংশ বন্ধুই জানিতাম যে, টমাস রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় কথা কয় ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। একটা মজা করিবার অভিপ্রায়ে আমরা দুইজন একদিন রাত্রে তাহার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে তখন ঘুমাইতেছিল। আমরা অনেকেই জানিতাম যে, এই ছোকরা তাহার দেশে একটি বালিকার সহিত প্রেমে পড়িয়াছে। টমাসের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া আমরা আস্তে-আস্তে সেই বালিকাটির নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। এইরূপ কিছুক্ষণ করাতে টমাস্ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার স্থির ও শান্ত হইল। এইরূপে আমরা তাহার চিন্তার গতি ভিন্ন দিকে ফিরাইয়া দিলাম। টমাস নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিল (পরে আমরা তাহার মুখ হইতে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম):

'সে যেন তাহার প্রিয়তমার বাড়ীর জানালার নীচে রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে। বালিকাটি তখন জানালায় উপস্থিত ছিল না। সে যেন তখন ডাকাডাকি করিয়া বালিকাটিকে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে অনুরোধ করিল। ইহাতেও যখন বালিকাটি জানালায় উপস্থিত হইল না, তখন সে অধীর ও চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং মনে করিল হয় ত মেয়েটি ঘুমাইয়া আছে। তাহাকে জাগাইবার জন্য সে তখন হাতের কাছে যাহা পাইতে লাগিল, তাহাই ছুঁড়িয়া-ছুঁড়িয়া জানালার মধ্যে ফেলিয়া দিতে লাগিল। (এই সময়ে সে চঞ্চল ও ব্যস্তভাবে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল ও হাতের সামনে যাহা পাইল,—বই, জুতা, বুরুশ ইত্যাদি সমস্তই সজোরে দেয়ালে ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল।) কিছুক্ষণ এইরূপ বৃথা চেষ্টা করিয়া সে যখন দেখিল যে, তাহার প্রেয়সী তখনও জানালায় উপস্থিত হইল না, তখন সে নিতান্ত হতাশ মনে ফিরিয়া গেল। (এই সময়ে টমাস হতাশভাবে আবার বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।)

"সমস্ত সময়টাই টমাস সম্পূর্ণরূপে নিদ্রিত ছিল এবং তাহার চক্ষু দুইটীও প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত ছিল। ইহার পর টমাস আমাদের সহিত খুব সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল না যে, সে বুঝিতে পারিতেছে, আমরা কেহ তাহার সঙ্গে আছি। পরদিন আমরা তাহাকে গত রাত্রির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে অস্পষ্ট ভাবে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আমাদের বলিল।"

অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, ইংলণ্ডে গ্রাম্য ডাক্তারদের মধ্যে যাঁহাদের প্রায়ই রাত্রিকালে ঘোড়ায় চাপিয়া গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে যাইতে হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ঘোড়ার উপর দিব্য আরামে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া লইতে পারেন। যদিও ইহাতে শারীরিক মাংসপেশী-সমূহ অকর্ম্মণ্য ও নিদ্রিত অবস্থায় থাকে না, তবুও বুঝিতে হইবে যে, ইহা ঠিক Somnambulism নহে। নিদ্রিতাবস্থায় কেবল অভ্যাসবশতঃ হাঁটিয়া বেড়ান খুব সাধারণ ঘটনা। যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইয়া সার জন্ মুর যখন করুন্নার (Corunna) দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পথে মার্চ (march) করিতে-করিতে তাঁহার দুষ্ট ও শ্রান্ত সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই ঘুমাইয়া পড়িত; নিদ্রিতাবস্থাতেই অভ্যাস-বশতঃ তাহারা সঙ্গীদের সহিত তালে তালে ঠিক পায়ে পা মিলাইয়া অগ্রসর হইয়া যাইত। এমনও দেখা গিয়াছে যে, যাহারা খুব পাকা ব্যবসায়ী দোকানদার, তাহাদের মধ্যে অনেকেই রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক দোকানে উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ হিসাবপত্রাদি দেখা প্রভৃতি দোকানের কাজ করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে তাহাদের এ ব্যাপারের একটুও মনে নাই। মিঃ গল্ (Mr. Gall) তাঁহার পরিচিত এইরূপ একজন ময়দার ব্যবসাদারের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ঠিক এই ধরণের একটি আশ্চর্য্য ঘটনা French Encyclopaedia তে উল্লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থে ইহাকে 'Noctambule' বলা হইয়াছে। Archbishop of Bordeaux এই ঘটনা স্বয়ং অবলোকন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন :—

Bordeaux এর গির্জ্জায় একটি বালক ছিল। সে প্রায়ই রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় চক্ষু না চাহিয়া পুস্তক পড়িত ও লিখিত। এই বিচিত্র ব্যাপার দেখিয়া একদিন বালকটিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত Archbishop মহাশয় তাহার পুস্তক ও চক্ষুর মধ্যে একটা আবরণ দিয়া দিলেন। কিন্তু বালকটি পূর্ব্ববৎ পড়িতে লাগিল এবং আবরণ থাকা সত্ত্বেও কাগজের উপর পূর্ব্ববৎ নির্ভুল ভাবে লিখিয়া যাইতে লাগিল। "Anatomy of Sleep" পুস্তকে মিঃ ম্যাকনিস্ ঠিক এই ঘটনাটিই লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তিনি "চক্ষু না চাহিয়া" কথাটা উল্লেখ করিয়া যান নাই,—যদিও এই ঘটনাটির মধ্যে এইটিই সব-চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার; কারণ এটা হইতে পারে যে, বালকটির বই সামনে রাখিয়া বিড়-বিড় করিয়া বকাটাকেই বই পড়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল; কিন্তু এটা স্বীকার করিতে হইবে যে, চক্ষু না চাহিয়া কাগজের উপর নির্ভুল ভাবে লিখিয়া যাওয়াটা আশ্চর্য্য বটে!—অসম্ভব না হইলেও অভ্যাসসাপেক্ষ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বালকটি এ সমস্তই নিদ্রিতাবস্থায় করিয়াছিল, জাগরণে নহে। নিদ্রিতাবস্থায় লেখাপড়ার ন্যায় কোন মস্তিষ্কের কার্য্য করা সাধারণ ঘটনা নহে।

এই রকম আরও অনেক ঘটনা Mr. Macknish লিখিত "Anatomy of Sleep" পুস্তকে পাওয়া যাইতে পারে। আমরা সেই পুস্তক হইতে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

"ডাক্তার ব্ল্যাকলক মহাশয় অন্ধ ছিলেন। এক দিন রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় তিনি শয্যাত্যাগ করেন। সে দিন তিনি সকাল সকাল ঘুমাইয়াছিলেন। উঠিয়া তিনি নিজের ঘরে আসিলেন। সেখানে বাড়ীর আর-আর সকলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সহিত দিব্যি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, এবং শেষে একটি উৎকৃষ্ট গান গাহিয়া সকলকে মোহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কিন্তু তাঁহার এ সব বিষয় কিছুই মনে ছিল না। বাড়ীর কেহই তাঁহাকে সে সময়ে নিদ্রিত বলিয়া একটুও সন্দেহ করেন নাই। তাহার একটি কারণ, তাঁহার চক্ষু অন্ধ ছিল।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ও ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মানুষের ভিতর নিহিত যে চুম্বক শক্তি আছে (Animal Magnetism), তাহা অনেক সময়ে মস্তিষ্কের ও শরীরের বিচিত্র প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে; আর এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত Somnambulismএর অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। এই অবস্থায় যন্ত্রণা অনুভব করিবার শক্তি একেবারে লোপ পায়। পূর্ব্বে একটি ঘটনায় ইহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। শুনা যায় যে, এই Somnambulism অবস্থায় আধুনিক ডাক্তারেরা অনেক বড় বড় অস্ত্র চিকিৎসা পর্য্যন্ত করিয়াছেন; অথচ রোগী একটুও যন্ত্রণা অনুভব করে নাই। Chloroform অথবা Ether ব্যবহার করিলে রোগী যেরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়ে, ইহাতে সেরূপ হয় না। রোগীর মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থাতেই থাকে। তবে বিশেষত্ব এই যে, সে পূর্ব্বেকার অবস্থা কিছু স্মরণ করিতে পারে না। এ বিষয়ে একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

প্যারীর অধিবাসিনী একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের একটি স্তনে গভীর ক্ষত হইয়াছিল। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, স্তনটি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। বৃদ্ধা কিন্তু operationএর ভয়ে কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইত না। এক দিন কয়েকজনে মিলিয়া তাহাকে magnetise করিলেন। দেখা গেল যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার Somnambulismএ পরস্পর কথোপকথন আরম্ভ করিতে পারা যায়। এই অবস্থায় তাহার নিকট স্তনটি কাটিয়া ফেলিবার অনুমতি প্রার্থনা করা হইল এবং বৃদ্ধাও সহজেই সম্মত হইল। অনন্তর ডাক্তারেরা স্তনটি কাটিয়া ফেলিলেন, বৃদ্ধা একটুও যন্ত্রণা অনুভব করিল না। যখন সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিয়া বৃদ্ধা ভয়ানক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল।

এইরূপ অনেকগুলি ঘটনার মধ্যে ইহা একটি মাত্র। কোন ঔষধ ব্যবহার না করিয়া যদি এই উপায়ে বড় বড় অস্ত্র-চিকিৎসা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ঔষধ ব্যবহার করিয়া অজ্ঞান করিবার বিপদও অনেক কমিয়া যাইবে। সেই জন্য এই Animal magnetism লইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নানা প্রকার গবেষণায় মন দিয়াছেন।

উপসংহারে একটি কথার আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। Somnambulism কি কারণে হয় তাহা এখনও ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। যাহাদের এই রোগ কখনও হয় নাই, তাহাদের কদাচিৎ হইলে দেখা যায় যে, রোগীর খাদ্যের ও হজমের গোলমাল হইয়াছে; হজম ঠিক ভাবে হইতে আরম্ভ করিলেই আবার রোগ সারিয়া যায়; কিন্তু যাহাদের এই রোগটা স্থায়ী (chronic) হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের এইরূপ কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তখন মনে হয় যে, ইহা একটা মস্তিষ্কের স্থায়ী রোগ মাত্র। এ অবস্থায় ডাক্তারেরা পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, রোগী যে ঘরে শয়ন করে, তাহার দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিবে,—খোলা জানালায় লোহার গরাদে দিয়া বহির্গমনের পথ বন্ধ করিবে; এবং ঘরের মধ্যে কোন প্রকার যন্ত্রাদি রাখিবে না; কাহাকেও নিদ্রিতাবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলে, তাহার ঘুম না ভাঙ্গাইয়া পুনরায় তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিবে। (২)

শিশু-মড়ক

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যবিশারদ]

ইংরাজী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সারা বঙ্গে শিশু মরিয়াছে ২৮২৯০৭টি। ইহার পূর্ব্ব দুই বৎসরে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩১৭০০ এবং ৩৪০০১২। সুতরাং এবার বঙ্গীয় শিশুগণের প্রতি কৃতান্তের দৃষ্টি একটু কম দেখা যাইতেছে।

উপরে যে মৃত শিশুর সংখ্যা দেওয়া হইল, উহারা সকলেই এক বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়াছে। আমাদের দেশের মত এত শিশু মড়ক অন্য কোন সভ্য দেশে আছে বলিয়া বোধ হয় না। বিগত ইংরাজী ১৯০৫ অব্দে ইংলণ্ডে এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশু মরে হাজার-করা ১১৪টি। তাহাতেই তদ্দেশবাসী সকলেই বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়েন। শুনিয়াছি, সেখানকার কোন-কোন স্থানে শিশুরক্ষার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ শিশু-মৃত্যুর হার হাজার-করা ৫এ নামাইয়াছেন। পূর্ব্বে নিউ-জীল্যাণ্ড দ্বীপে এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুর মৃত্যুর হার হাজার-করা ৮৩ ছিল। এখন তথাকার কোন-কোন সহরে প্রতি হাজারে ৩৮টির অধিক শিশু মরে না। আর আমাদের বাঙ্গালা-দেশ হইতে কোন-কোন বৎসর হাজার করা সাড়ে তিনশত কি তাহারও অধিক সংখ্যক শিশু যমালয়ে যাইতেছে; অথচ আমরা তৎপ্রতিকারে একান্ত উদাসীন।

আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালার কোন্ জেলা হইতে কত শিশু শমন-সদনে মহাপ্রস্থান করিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে পুত্র-কন্যার সংখ্যাই বা কত, তাহা দেখাইতেছি।—

(২) এই প্রবন্ধের উপকরণাদি ইংরেজি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান বিভাগ

	পুত্র	কন্যা
বর্দ্ধমান	৬১৬৯	৫০৭৬
বীরভূম	৪০৪২	৩৪০৮
বাঁকুড়া	৪০৩৪	৩৪৫৩
মেদিনীপুর	৮৭৫২	৮২৬৮
হুগলি	৩৯২৬	৩২৮১
হাওড়া	৩২৯৫	২৫৭৬০
	৩০২১৮	২৬০৬২

প্রেসিডেন্সি বিভাগ

	পুত্র	কন্যা
২৪পরগণা	৬১৭২	৪৯৯৪
কলিকাতা	২৫৩৮	২১৩১
নদীয়া	৫৭৭০	৪৮০৬
মুরসিদাবাদ	৫৪৩৪	৪৯৭৭
যশোহর	৫১৫৭	৪৬৩০
খুলনা	৫৭৫৪	৫০৮১
	৩০৮২৫	২৬৬১৯

রাজসাহী বিভাগ

	পুত্র	কন্যা
রাজসাহী	৫৮৫৩	৫৫২৪
দিনাজপুর	৭৯৬৯	৬৭১১
জলপাইগুড়ি	৪৫৫৭	৩৯১৯
দারজিলিং	১০৫৬	৯০১
রংপুর	৯৫১৮	৮৩৪১
বগুড়া	২৮৯৯	২৫২৩
পাবনা	৩১৭৮	২৫৮৭
মালদহ	৩৪৮৭	২৯৯৬
	৩৮৫১৭	৩৩৫০৫

ঢাকা বিভাগ

	পুত্র	কন্যা
ঢাকা	৮৮৩৬	৭০৮৪
ময়মনসিংহ	১২৫৪৭	১০৪৩৭
ফরিদপুর	৬৮৯০	৫৬৩৫
বাখরগঞ্জ	১০১৪৫	৮৫৬৯
	৩৮৫১৮	৩১৭২৫

চট্টগ্রাম বিভাগ

	পুত্র	কন্যা
চট্টগ্রাম	৪৫৮০	৩৮৯৩
নোয়াখালি	৩৭১৮	৩০৫০
ত্রিপুরা	৬১২৮	৫০৪৯
	১৪৪২৬	১১৯৯২

এবার রংপুর শতকরা ২৫৫৭টি শিশুকে যমালয়ে পাঠাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। বীরভূমকে কিন্তু ইহার পূর্ব্ব বৎসর প্রায় ৩৬টি পাঠাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিতে হইয়াছিল।

কলিকাতা ইহার পূর্ব্ব বৎসর শতকরা ২৮৭৬টি শিশু দিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করে; এ বৎসর ২৬·৯১টি দিয়া দ্বিতীয় দাঁড়াইয়াছে।

নোয়াখালিতে এবার শিশুমৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা কম। ঐ জেলা শতকরা ১৩টি শিশু প্রদান করিয়াছে।

পাবনা, ঢাকা, মালদহ, ২৪পরগণা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ জেলাগুলিতে এ বৎসর শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা ১৪৪৬টি হইতে ১৭৯৭টি মাত্র।

এই বৎসরে বাঙ্গালায় শিশু জন্মিয়াছে ১৪৪৫৫০২টি; সুতরাং দেখা যাইতেছে, এবার জন্ম সংখ্যার প্রায় পঞ্চমাংশ অতি শৈশবেই মহাপ্রয়াণ করিয়াছে। আবার প্রতি জেলায় কন্যা অপেক্ষা পুত্রের মৃত্যু-সংখ্যাই অধিক। অনেকে বলেন ইহাই সাধারণ নিয়ম;—ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের ব্যাধি প্রতিষেধক শক্তি বেশী। পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন স্থানের মৃত্যু-তালিকার প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার প্রমাণও পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে যে স্থলে একশত কন্যার মৃত্যু হয়, সে স্থলে পুত্র মরে ১২৩টি; ফ্রান্সে ১২১টি এবং জাপানে ১১০টি।

আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে শিশু-মড়কের হার কমাইতে হইলে, আঁতুড়ঘরের সংস্কার করা, গর্ভিণী ও জননীদিগকে নিজ-নিজ স্বাস্থ্য-রক্ষা ও শিশুপালন সম্বন্ধে সুশিক্ষা দেওয়া এবং দেশে খাঁটী গো-দুগ্ধের অভাব দূর করা একান্ত আবশ্যক।

পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ যে ভাবে সূতিকাগার প্রস্তুত হয়, তাহাতে উহাকে যমাগার বলিলে বোধ হয় দোষ হয় না। ঐ পূতিগন্ধময় দারুণ অস্বাস্থ্যকর সূতিকাগারের দোষে কত শত "স্বর্ণজিনি তনু" ক্ষুদ্র শিশু অকালে চলিয়া যাইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করে? শীতের রাত্রিতে একবিন্দু ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে আমরা রাশি-রাশি উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকি; আর নবনীত-কোমল সুন্দর-কান্তি শিশুকে গৃহ-প্রাঙ্গণে শীত-বাত-সমাকুল শুষ্ক খর্জ্জুর-পত্রাচ্ছাদিত এক জঘন্য স্থানে রাখিয়া উহার অকালমৃত্যুর হেতু হই। ক্ষুদ্র শিশুটি সারা রাত্রি হিম ভোগ করিয়া হয় ত স্বরভঙ্গ, জ্বর, পক্ষবাত, বাত অথবা ধনুষ্টঙ্কার রোগে মারা পড়িল;—আর ভ্রমান্ধ আমরা ছেলেকে "পেঁচোয়" পাইয়াছিল বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম।

জননীর অজ্ঞতাবশতঃও এতদ্দেশে বিস্তর শিশু প্রাণ হারায়। স্তন্যদাত্রীর মনের সহিত স্তন দুগ্ধের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যে-কোন কারণে অত্যধিক ভয়, ক্রোধ অথবা শোক উপস্থিত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে স্তন দুগ্ধও দূষিত হইয়া পড়ে। এ দেশের প্রসূতিগণ এক দিকে ক্রোধে গর্গর করিতে করিতে ঝগড়া করিতেছেন, অপর দিকে শিশুকে স্তন্য পান করাইতেছেন, এরূপ ঘটনা বিরল নহে। এই অজ্ঞতার ফলে অনেক শিশু মারা পড়ে, অথবা জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকে। আমার পরিচিত কোন লোকের অনেকগুলি শিশুসন্তান একই বয়সে একপ্রকার উদরাময়ে মারা যায়। ঐ শিশুদিগের মাতা অত্যন্ত কলহ রতা ছিলেন। আমার এখনও বিশ্বাস আছে যে, ঐ কলহ-রতা জননীর দূষিত স্তন দুগ্ধই নিরপরাধ শিশুদিগের অকাল মৃত্যুর কারণ।

জননীর স্তনে দুগ্ধের অভাব, রোগ প্রভৃতি বিবিধ কারণে অনেক সময় শিশুকে গো দুগ্ধ দিবার প্রয়োজন হয়। দেশে খাঁটি দুগ্ধ প্রায় মিলে না। আজ যে "শিশু যকৃত রোগ" সহরে-সহরে আবির্ভূত হইয়া ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণ হরণ করিতেছে—দূষিত দুগ্ধ পানই তাহার মুখ্য কারণ। এখন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই সকল বিষয়ের প্রতিকারে আত্মনিয়োগ করুন, নতুবা এই পরিবর্দ্ধমান শিশু মড়কের হার কোন ক্রমেই কমিবে না। ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে শিশুর দিকে তাকাইতে হইবে।

চাঁচড়ার দশমহাবিদ্যা *

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন

চামুণ্ডা তন্ত্র মতে,

> কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
> ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
> বগলা সিদ্ধ বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
> এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

দেবী ভগবতীর এই দশ মূর্ত্তিই দশমহাবিদ্যা। ইহা সিদ্ধবিদ্যা নামেও খ্যাত।

এই দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এদেশে সাধারণের বিশ্বাস—সতী দক্ষযজ্ঞে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে, মহাদেব তাঁহাকে নিষেধ করেন। তাহাতে ভগবতী প্রথমে কালীমূর্ত্তি দেখাইয়া শিবের ভয়োৎপাদন করেন। ভোলানাথ ভীত হইয়া পলাইতে উদ্যত হ'ন; কিন্তু মহামায়া দশ দিকে দশ মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার পথ রোধ করেন। যে দশ মূর্ত্তিতে মহামায়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন—তাহাই দশমহাবিদ্যা।

এই দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি-বিগ্রহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে; কিন্তু একত্র এক স্থানে দশমহাবিদ্যার সমাবেশ এক চাঁচড়া ভিন্ন অখণ্ড বঙ্গের—শুধু বঙ্গের কেন—সমগ্র ভারতের আর কোন স্থানে নাই।

সুতরাং বাঙ্গালার এই অদ্ভুত ও অদ্বিতীয় দেব-বিগ্রহ-কাহিনী যে সুধীবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, সে ভরসা আমাদের আছে।

যে চাঁচড়া নগরে দশমহাবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত আছেন, উহা যশোহর জেলার সদর ষ্টেশনের অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এই নগর উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ রাজাদিগের রাজধানী বলিয়া বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই চাঁচড়া নগরে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ কুলে ভারদ্বাজ গোত্রে দুর্গানন্দ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই দুর্গানন্দ ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। দেব-দ্বিজে তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। এই ভক্তির আতিশয্যেই, যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই, তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হন। তখন দেশে রেল-ষ্টীমার আইসে নাই। রাস্তা-ঘাটাদিও ভাল ছিল না। সুতরাং তখন তীর্থ পর্য্যটন এক প্রকার সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল। কিন্তু অসাধ্য হইলেও ধর্ম্মপ্রাণ দুর্গানন্দ তাহাতে পশ্চাৎপদ না হইয়া, দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল তীর্থই পর্য্যটন করিয়া আসিলেন। সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত কত অগণ্য ধর্ম্মপ্রাণ সাধু, সন্ন্যাসী ও গৃহী যে তীর্থ-পর্য্যটন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কাহারও চোখে যাহা পড়ে নাই, দুর্গানন্দের চক্ষে তাহাই পড়িল—তিনি দেখিলেন, ভারতের নানাস্থানে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, কিন্তু দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি বিগ্রহের একত্র সমাবেশ কোথাও নাই। কি উপায়ে ইহা স্থাপিত করিতে পারেন, এই বিষয়ে চিন্তা করিতে-করিতে তিনি বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ীতে আসিয়া তিনি কয়েকজন আত্মীয়ের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহার এ কল্পনা বাতুলোচিত বলিয়া হাসিয়াছিলেন। দুর্গানন্দ ইহাতে বড় ব্যথা পাইলেন, আর মনে-মনে ভাবিলেন, হায়! দরিদ্রের মনোরথ মনেই বিলীন হইল। কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা, ভগবান তাহার সহায়। সৎ ইচ্ছা যে-কোন ভাবেরই হউক, ভগবান নিজেই তাহার পূরণ করেন। দুর্গানন্দের বেলায়ও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

এক দিন রাত্রিকালে দুর্গানন্দ স্বপ্নে দেখিলেন, যেন একজন জটাজূট-ধারী, বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ, দীর্ঘকায়, বিরাট পুরুষ তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিতেছেন, "তোমার দেব-দ্বিজ-ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার সাধু সংকল্প অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। তুমি অবিলম্বে দেশের শাসনকর্ত্তার নিকট যাইয়া নিজ সংকল্প ব্যক্ত কর। তিনি আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ও সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।"

এই স্বপ্ন দেখিয়া দুর্গানন্দ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলেন; এবং সেই রাত্রিতেই বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, বরাবর বাঙ্গলার তদানীন্তন রাজধানী মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেলেন। নবাব সুজা খাঁ তখন বাঙ্গালার

* হাওড়া দ্বাদশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস শাখায় পঠিত।

নবাব। তখনকার দিনে নবাব-বাদশার সহিত সাক্ষাৎ করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কিন্তু ভগবান যাহার প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করেন, তাহার পক্ষে কিছুরই অভাব হয় না। দুর্গানন্দের অদৃষ্ট তখন সুপ্রসন্ন; তাই তিনি যে দিন মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলেন, সেই দিনই নবাবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সুযোগ লাভ করিলেন। নবাব ধীর ভাবে দুর্গানন্দের নিকট হইতে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বলিলেন,—"ঠাকুর" আপনি দেশে চলিয়া যান। আমি আপনার জমিদার, চাঁচড়ার রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইতেছি। আপনি বাড়ী যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন। তিনি আপনার অভিপ্রেত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।"

তখন ধর্ম্মপ্রাণ শুকদেব রায় চাঁচড়ার রাজা। দুর্গানন্দ তাঁহার সহিত দেখা করিলে, নিজের স্বভাবসিদ্ধ দেবভক্তিতে ও নবাবের অনুরোধে শুকদেব লোকজন ও অর্থ-সাহায্য দ্বারা বিগ্রহ ও দেবালয় প্রস্তুত ও তাহার প্রতিষ্ঠার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইলেন।

কিন্তু ধাতু, মৃত্তিকা বা কাষ্ঠ—কি দিয়া কাহার দ্বারা বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবেন, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া দুর্গানন্দ বড় মুস্কিলে পড়িলেন। তবে যেখানে মুস্কিল, সেইখানেই আসান; তাই রাত্রিকালে দেবাদিদেব মহাদেব পুনরায় তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন—"বৎস, কোন চিন্তা নাই। তোমার বাসগৃহ হইতে নৈঋত কোণে তিন শত হাত দূরে জঙ্গলে একটি প্রকাণ্ড নিম্ববৃক্ষ আছে। রাত্রি প্রভাত হইলেই তোমার দ্বারে চারিজন বিদেশী সূত্রধর উপস্থিত হইবে। তুমি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কল্য প্রত্যুষেই ঐ বৃক্ষ কাটাইয়া সূত্রধরদিগের উপর বিগ্রহ নির্ম্মাণের ভার দিও—তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

নিদ্রাভঙ্গে দুর্গানন্দ হৃষ্ট চিত্তে উঠিয়া বসিলেন। দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল। তিনি উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে বাহিরে আসিতেই, চারিজন বিদেশী সূত্রধর তাঁহার সম্মুখীন হইল। তিনি স্বপ্নাদেশ মত তাহাদিগকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট নিম্ব বৃক্ষ কাটাইয়া তাহাদিগের উপর বিগ্রহ নির্ম্মাণের ভার দিলেন। সূত্রধরগণ প্রথমে দশমহাবিদ্যার বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া, পরে উদ্বৃত্ত কাষ্ঠে নিজেদের ইচ্ছামত গণপতি প্রভৃতি আর ত্রয়োদশটী বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিল। দুর্গানন্দ দেখিলেন; কিন্তু ইহাও দেবাদিদেবের ইচ্ছা বুঝিয়া তাহাতে আপত্তি করিলেন না।

এদিকে রাজা শুকদেবের অর্থে উত্তর ও পশ্চিমের পোতায় ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির, পূর্ব্বের পোতায় ভোগের ঘর ও দক্ষিণের পোতায় বা সদর দেউড়িতে দ্বিতল নহবৎখানা প্রস্তুত হইয়া গেল। যথাসময়ে আষাঢ় মাসের শুভ শুক্লা দশমী তিথিতে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের পুন-র্যাত্রার দিন মহাসমারোহে শাস্ত্র-ব্যবস্থানুযায়ী উত্তর পোতার মন্দিরে যথাক্রমে গণপতি, বীণাপাণি, কমলা, অন্নপূর্ণা, ভুবনেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, ষোড়শী, মহাদেব, কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কালভৈরব এবং পশ্চিম মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, রাম, লক্ষ্মণ সীতা, হনুমান ও শীতলা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভগবদ্ভক্ত দুর্গানন্দের ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফল ফলিল।

দশমহাবিদ্যা প্রভৃতির সেবা পূজার ভার দুর্গানন্দের উপরে থাকিল; আর সেবা-পূজার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য রাজা শুকদেব জমিদারীর লভ্যাংশের প্রতি টাকা হইতে বার্ষিক ১০ গণ্ডা করিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রাজা শুকদেব ও তৎপুত্র রাজা নীলকণ্ঠের সময়ে এই ভাবেই বিগ্রহের সেবা-পূজা চলিল। রাজা নীলকণ্ঠের পরে তাঁহার পুত্র শ্রীকণ্ঠ ১১৭১ সালে চাঁচড়া রাজ্যের মালিক হইয়া বসিলেন। তিনি কিন্তু এ ব্যবস্থা নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, যত দিন জমিদারীর অবস্থা স্বচ্ছল থাকিবে, তত দিন এই ভাবে সেবা পূজা চলিতে পারে; কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোন রকমে আয় কমিয়া যায়, কিংবা জমিদারী হস্তচ্যুত হয়, তখন দেব-সেবার বিঘ্ন হইবে,—বন্ধ হইয়া যাইবারও আশঙ্কা আছে। তাই তিনি পূর্ব্বের বন্দোবস্ত রহিত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে নিজ জমিদারী হইতে বার্ষিক আট সহস্র টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দশমহাবিদ্যার দেবোত্তর স্বরূপ দান করিলেন। ইহার পর সেবার কার্য্য ভাল ভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেবায়েৎগণ দেবোত্তর সম্পত্তির অপব্যবহার করিতেছেন বলিয়া ১২৮০ সালে গবর্ণমেণ্ট উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন।

তখন দুর্গানন্দের পুত্র যশোমন্তের কনিষ্ঠ পুত্র কৈলাসচন্দ্র ব্রহ্মচারী দশমহাবিদ্যার সেবায়েৎ ছিলেন। দেবোত্তর বাজেয়াপ্ত হইয়া গেলে, তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ বাজেয়াপ্ত মহল 'দশমহাবিদ্যার বৃত্তির মহল' নামে খারিজা তালুক করিয়া লইলেন। কৈলাসচন্দ্র ধর্ম্মভীরু ছিলেন; তাই নিজ নামে তালুক করিয়া লইলেও, ঐ তালুকের আয়ের কতকাংশ দিয়া সেবা-পূজার কার্য্য চালাইতেন। নিঃসন্তান কৈলাসচন্দ্র পরিণত বয়সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র শশিভূষণ ব্রহ্মচারীর উপর বিষয়-কর্ম্ম ও দশমহাবিদ্যার সেবার ভার দিয়া একান্তে মায়ের উপাসনায় সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শশিভূষণের হস্তে বিষয় কার্য্য ও সেবার কার্য্য বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছিল। তিনি মন্দিরের সম্মুখে পাকা চাঁদনী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অকালে শশিভূষণ পরলোক গমন করায়, আরব্ধ কার্য্য আর শেষ হইল না; বিষয়-কার্য্যেও নানা অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। কৈলাসচন্দ্র তখন সংসার-বিরাগী ও প্রাচীন তিনি কোন দিকেই মন দিতে পারিতেন না। ফলস্বরূপ তালুকের লাটের কিস্তি বাকী পড়ায়, গবর্ণমেণ্ট এই 'দশমহাবিদ্যার বৃত্তির মহল' নিলাম করাইলেন। এবার মোট ১,৫০,০০০৲ টাকায় চাঁচড়ার রাজা বাহাদুরগণ অর্দ্ধাংশ ও যশোহর নরেন্দ্রপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার মহিমচন্দ্র মজুমদার বাকী অর্দ্ধাংশ খরিদ করিয়া লইলেন।

এখন হইতে ব্রহ্মচারীদের নিজস্ব যে সম্পত্তি ছিল, তাহার লভ্যাংশ দ্বারা কোন রকমে কার্য্য চলিতে লাগিল। মহিমবাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দশমহাবিদ্যার সেবার জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। চাঁচড়ার রাজগণও মাসিক দশ টাকা করিয়া দিতেন। কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহাদের সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বিক্রীত হইয়া যাওয়ায়, এখন তাঁহারা মাত্র ৭৲ টাকা করিয়া দিতেছেন।

শশিভূষণের মৃত্যুতে নিঃসন্তান ও সুপ্রাচীন কৈলাসচন্দ্র সেবার কার্য্য লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। নিজের কিছু করিবার ক্ষমতা ছিল না; তাই তিনি নিজের ৩০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি বাড়ী-ঘর সহ দেবসেবার কার্য্যে নিজ ইষ্টদেবতা খুলনা জেলার চন্দনিমহলনিবাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উইল করিয়া দেন। কৈলাসচন্দ্রের জীবিত কালে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শানুযায়ী মন্দির-সংরক্ষণ ও দেব-সেবার কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু ১৩০২ সালে কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হইলে, তিনি নিজেই উইলের সর্ত্তানুসারে স্বাধীন ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

যখন দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল, তখন সকল বিগ্রহেরই নিত্য, বিশেষ জাঁকজমক সহকারে, ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগ ও আরতি হইত; কিন্তু এখন আর সেরূপ হয় না। এখন সেবায়েৎদিগের নিজ সম্পত্তির আয় ও দেবদর্শনাগত যাত্রীগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত যৎসামান্য প্রণামী মাত্র ভরসা—তাই আষাঢ় মাসের শুক্লা-দশমী তিথিতে, প্রতিষ্ঠার দিন, দুর্গোৎসবের মহাষ্টমী ও জগদ্ধাত্রী পূজার সময় মাত্র সকল বিগ্রহের পৃথক পৃথক পূজা হয়। এই তিন দিন পাঁঠা বলিও হয়। কিন্তু অন্যান্য দিন এক মূল বটে এক স্থানেই ফুল-জলে পূজা হয়। রাত্রিতে আরতি ও ভোগ হয়, কিন্তু সেও সামান্য রকমের।

দেবমূর্ত্তিসমূহ দারু নির্ম্মিত হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রায় দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত ইহা অভগ্ন ও নিখুঁত অবস্থায় আছে। তবে স্থানে স্থানে রং নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, মাত্র ৮ বৎসর পূর্ব্বে উৎকল-দেশীয় চিত্রকর দ্বারা পুনর্ব্বার বিগ্রহাদির অঙ্গরাগ করান হইয়াছে।

মন্দিরগুলির অবস্থা এরূপ জীর্ণ হইয়াছে যে, শীঘ্র সংস্কার সাধিত না হইলে, অচিরেই ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সেবায়েৎগণের অবস্থার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। চাঁচড়ার বর্ত্তমান অধীশ্বরগণও গ্রহ বৈগুণ্যে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থাপন্ন নহেন। তাই অনন্যোপায় হইয়া সেবায়েৎগণ দেবসেবার ব্যবস্থা ও ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরগুলির সংস্কার প্রার্থনা করিয়া স্বধর্ম্ম-নিরত হিন্দুগণ সমীপে বহু দিবস হইতেই আবেদন করিয়া আসিতেছেন। গত ১৩২৩ সালের প্রথমে যশোহরে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশন হয়, তখন সমবেত গুণী, মানী, ধনী ব্যক্তিবর্গের দরবারেও তাঁহারা এ দুঃখের কথা জানাইয়াছিলেন। তাঁহাদের সে করুণ আহ্বানে কয়েকজন মান্য-গণ্য, পদস্থ ব্যক্তি দশমহাবিদ্যা ও মন্দিরাদির অবস্থা পরিদর্শন করিয়া সেবায়েৎগণকে কতকটা আশাও দিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার ফল কিছু দেখা যাইতেছে না।

অথচ বঙ্গের ধনী-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ধর্ম্মপ্রাণ হৃদয়বান্ হিন্দু কি কেহই নাই, যিনি দশমহাবিদ্যার সেবাপূজা নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত ভূসম্পত্তি ও মন্দিরাদির জীর্ণ সংস্কার সাধন জন্য ১০।১২০০০৲ টাকা দানে এই প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তিটি রক্ষা করিয়া হিন্দু সাধারণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইতে পারেন?

পাশ্চাত্য অর্থনীতি-শাস্ত্রের এক পৃষ্ঠা

[অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু এম্-এ]

সে আজ প্রায় তিনশত বৎসরের অধিক দিনের কথা। তখন স্পেনের সৌভাগ্য শশী ষোল-কলায় উদীয়মান। নূতন মহাদেশ আমেরিকা তখন স্পেনের অধিকারভুক্ত। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে ধূলিমুষ্টিও সুবর্ণে পরিণত হয়। আমেরিকাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অনেক খনি আবিষ্কৃত হইল। জাহাজ-বোঝাই স্বর্ণ রৌপ্য স্পেনের, রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। স্পেনের এই ঐশ্বর্য্য ইংলণ্ড, ইটালী ও ফ্রান্স প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত করিয়া দিল। ঐ সকল দেশের অর্থনীতি-বেত্তারা খনি ব্যতীত কি করিয়া তাঁহাদের দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য আসিতে পারে, এই সমস্যার মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এণ্টনিয়ো সেরা নামক জনৈক ইটালীবাসী, "খনি ব্যতীত কি করিয়া দেশে স্বর্ণ-রৌপ্য প্রচুর পরিমাণে আসিতে পারে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেও অনেকে ঐ সমস্যার সমাধান করিলেন। ইঁহারা দেখাইলেন যে, খনি না থাকিলেও দেশের অর্থ বৃদ্ধি করা অসম্ভব নহে। আমদানী ও রপ্তানীর অনুপাতের উপর প্রত্যেক দেশের অর্থ নির্ভর করে। প্রত্যেক দেশ হইতে যত মাল রপ্তানী হয়, তাহার মূল্য স্বরূপ স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্ম্মিত মুদ্রা বাহির হইতে দেশের ভিতরে আসে; কিন্তু বিদেশ হইতে যত মাল আমদানী করা হয়, তাহার মূল্য বাহিরে পাঠাইতে হয়; সুতরাং যদি কোন দেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক হয়, তাহা হইলে সেই দেশের অর্থবৃদ্ধি হইবে। যাহারা এই মত প্রচার করিলেন, তাঁহারা বাণিজ্য-পন্থী নামে খ্যাতি লাভ করিলেন

বাণিজ্যপন্থী দলের মধ্যে ইংলণ্ডে ক্রমওয়েল, ফ্রান্সে কোলবার্ট ও প্রুশিয়াতে ফ্রেডরিক দি গ্রেটের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা আমদানী কমাইবার নিমিত্ত উচ্চ হারে নানারূপ শুল্ক বসাইলেন; এবং যাহাতে রপ্তানী বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য নানারূপ কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ইহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্ত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। বাণিজ্যপন্থীরা ক্রমশঃ রাষ্ট্রবাদী হইয়া উঠিলেন। রপ্তানীর জন্য দেশের মধ্যে বিবিধ শিল্পের বিকাশ হইতে লাগিল; কিন্তু কৃষি কার্য্যের উন্নতি আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইল না। ক্রমশঃ রাষ্ট্রবাদিত্ব তাহার চরম সীমায় আসিয়া পড়িল। সমস্ত বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ লোকের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। এ দিকে কৃষি-কার্য্যের অবনতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথমে ফ্রান্সে বাণিজ্যপন্থীর বিপরীত মত প্রচারিত হইল। ফ্রান্স-রাজ পঞ্চদশ লুইর চিকিৎসক কিউনে, বণিক গুর্ণে এবং রাজনীতিবেত্তা টুরগো—এই তিনজন নূতন তত্ত্বের

প্রচার করিলেন। অর্থনীতি-শাস্ত্রে ইঁহারা ভূম্যেকবাদী নামে বিখ্যাত। অনেকে ইঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

ভূম্যেকবাদীরা দুইটী মতের প্রচার করেন। প্রথমতঃ, তাঁহাদের মতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল-কারখানা অপেক্ষা কৃষিকার্য্যই শ্রেষ্ঠ। ভূমিই অর্থোৎপাদনের একমাত্র অবলম্বন। কৃষক ব্যতীত সমাজে অপর সকল লোকেরই কার্য্যের উৎপাদিকা শক্তি নাই। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা দেখাইলেন যে, প্রত্যেক সমাজে নৈসর্গিক নিয়ম কার্য্য করিতেছে। ঐ নিয়মের ফলে, সমাজের পক্ষে যাহা কল্যাণকর, তাহাই স্থাপিত হয়। কিন্তু সরকার যদি আইন-কানুন দ্বারা ঐ নিয়মের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সমাজের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। ভূম্যেকবাদীরা ব্যক্তি সম্বন্ধে যথেচ্ছপ্রবর্ত্তার অনুকূল মত প্রচার করেন এবং শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে সরকারের নির্লিপ্ততা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করেন।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আদম স্মিথ "জাতীয় সম্পদের হেতু ও প্রকৃতির গবেষণা" নামক তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকে তিনি ভূম্যেকবাদীর প্রথম মতের ভ্রম দেখাইলেন; কিন্তু তিনি তাহাদের নৈসর্গিক নিয়ম সম্বন্ধীয় মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন।

পৃথিবীর সৃষ্টি-কথা

[শ্রীঅন্নদাচরণ সেন এম এ]

পৃথিবীর উৎপত্তি

নিয়ত পরিদৃশ্যমান আমাদের এই পৃথিবী আদি না অনাদি? আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকে বলেন, ইহা আদি। তাঁহারা কহিয়া থাকেন, যে, এই অনন্ত-বৈচিত্র্যশালিনী, সাগর-ভূধর বিশিষ্টা, নানা-জীব-সঙ্কুলা, শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী ধরিত্রী অপেক্ষাকৃত আধুনিক সৃষ্টির ফল। এমন এক সময় ছিল, যখন ধরিত্রী ছিল না, চন্দ্র-সূর্য্য ছিল না, এ সৌর-জগৎও ছিল না। সকলই যেমন ক্রম-বিকাশের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে,—পৃথিবীও সেইরূপ ক্রমবিকাশের ফল। অপর পক্ষ বলিয়া থাকেন, পৃথিবীর কবে সৃষ্টি হইয়াছে, কেহই তাহা জানে না। কবে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, কিরূপে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। অধ্যাপক ত্রিবেদীর ভাষায়, পৃথিবীর জন্মের সময় এমন কেহ উপস্থিত ছিল না, যে এখন সেই জন্ম-কথা বলিতে পারে। বোধ হয় পৃথিবী অনাদি।

সেই চিরন্তন প্রশ্ন, সেই চিরন্তন বিবাদ। আমরা শেষোক্ত সম্প্রদায়-প্রদর্শিত পথে না যাইয়া,—প্রথমোক্ত সম্প্রদায় যাহা বলেন, তাহার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইব।

পৃথিবীর আদিম ইতিহাস যে সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সে সময়কার অবস্থাসমূহ এখন বর্ত্তমান নাই। সে সকলের নানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পৃথিবীকে আমরা এখন যে অবস্থায় দেখিতে পাই, পৃথিবী প্রথম অবস্থায় সেরূপ ছিল না। তখন তাহার এত বয়সও হয় নাই। পৃথিবী তখন জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড মাত্র—ধরাতল তখনও শীতল হয় নাই। সুতরাং সৃষ্টি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল অনুমান করিয়া থাকেন, তাহা যে সর্ব্বত্রই ভ্রমসংস্পর্শশূন্য হইবে, এরূপ আশা করা যুক্তি-যুক্ত নহে। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সৌর-জগতের সীমান্ত-বিস্তৃত যে সূক্ষ্ম বাষ্পরাশি (বৃহত্তর লঘুসন্নিবিষ্ট জড়-জগৎ) হইতে সৌর-পরিবারস্থ অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি সৃষ্ট হইয়াছে, পৃথিবীও এক সময়ে তাহারই অঙ্গীভূত অন্যতম ছিল।

সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল ক্ষুদ্রতর জড়পিণ্ড তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদিগকে লইয়া সৌর জগৎ। এই সৌর-জগতের মধ্যে প্রধান আটটি বৃহত্তর গ্রহ। ইহারা যথানিয়মে প্রায় বৃত্তাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এই সকল গ্রহকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল জড়পিণ্ড ঘূর্ণিত হইতেছে, তাহাদিগকে উপগ্রহ বলে। গ্রহ ও উপগ্রহ ব্যতীত সৌর-জগতে আরও পঞ্চশতাধিক ক্ষুদ্র গ্রহ বর্ত্তমান। ইহাদের ব্যাস কুড়ি হইতে চারিশত মাইল; এবং কতকগুলি আবার এরূপ ক্ষুদ্র যে, এ পর্য্যন্ত তাহারা ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই। এতদপেক্ষা ক্ষুদ্র গ্রহগুলিকে অতিশয় ক্ষুদ্রায়তন জন্য গ্রহাণু (planetesimals) বলা যায়। গ্রহাদি ব্যতীত উল্কাপিণ্ড ও ধূমকেতু নামক আরও দুই প্রকার জ্যোতিষ্ক বিদ্যমান। উল্কাপিণ্ডগুলি সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একক অথবা পুঞ্জে-পুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ধূমকেতুর কক্ষাগুলি ডিম্বাকার (oval) বা অনিয়মিত।

পৃথিবী যে সকল উপাদানে নির্ম্মিত, তৎসমুদায়ও সম্পূর্ণ অভিনব নহে। আমরা রাত্রি কালে গগনমণ্ডলে যে সকল তারকাদি উদিত হইতে দেখি, তাহাদের গঠনোপাদানের সহিত পৃথিবীর গঠনোপাদানের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বর্ণবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে এ বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ধারাপতিত উল্কা-খণ্ডও এ বিষয়ের অন্যতম প্রমাণ। কারণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে উল্কাপিণ্ড ও পৃথিবীর গঠনোপাদান এক। পৃথিবী সৃষ্টির আদিতে সৌর-পরিবারে ছিল, ইহা যদি সত্য হয়, তবে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদির উপাদান এক হওয়া সম্ভব। সৌর-জগতের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, দুইটি বিশেষ বৈচিত্র্য দৃষ্টিগোচর হয়। বৈচিত্র্য দুটি এই—১ম, সৌর-জগতের প্রায় সকল গ্রহই এক সমতলে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রহ (যেমন প্যালাস) ও ধূমকেতুগুলি এই সমতলের বহু নিম্নে

না বহু উচ্চে থাকিয়া আবর্ত্তন করে। ২য়, আটটি বৃহৎ, ও পঞ্চশতাধিক ক্ষুদ্র গ্রহের সকলেই একাভিমুখে (পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে) সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কয়েকটি ব্যতীত উপগ্রহগুলিও এক সমতলে অবস্থিত। ইহাদেরও গতি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে।

এই দুইটি বৈচিত্র্য দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সৌর জগতস্থ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, সন্দেহ নাই। গ্রহ-উপগ্রহাদির মধ্যে পরস্পর কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলে তাহাদের একপ সুনিয়মে নিয়মিত হওয়া সম্ভব নহে।

অতএব ইহা সম্ভব যে, সৃষ্টির আদিতে সৌর-পৃথিবীয়স্থ যাবতীয় জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী একই বৃহত্তর লঘু-সন্নিবিষ্ট জড়-জগতের অঙ্গীভূত ছিল। এই জড়-জগৎ বাষ্পাকারে আধুনিক সৌর-জগৎ-অধিকৃত স্থান ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ছিল। পরে ঘনীভূত হইয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডে পরিণত হইয়া সৌর-জাগতিক যাবতীয় জ্যোতিষ্ক সৃষ্ট হইয়াছে। তবে এই আদি জগতের প্রকৃত প্রকৃতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়।

জেমসেদপুর *

[শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

ইতঃপূর্ব্বে [illegible] সম্বন্ধে [illegible] কারখানার [illegible] আলোচনা করিয়াছি; [illegible] ইহার অবস্থান, [illegible] বিবরণ [illegible] বাদ যায় নাই ছিল না; [illegible] উল্লেখ [illegible] প্রথম আবির্ভাবের শেষে 'জেমসেদপুরে'র আলোচনা [illegible]। কিন্তু যাহারা এই 'কঠিন কাজের' [illegible], তাঁহারা অনেকেই অনুযোগ করিয়াছেন [illegible] এ সম্বন্ধে অনেক কথা, [illegible] বলিতে বাকী রহিয়া গেল। অবশেষে [illegible] সম্পাদকীয় গম্ভীর ধ্বনির [illegible], এখন দেখা [illegible] দুর্ব্বিষহ,

"বন্দী হ'য়েছি আমি কঠিন কাজের [illegible]।" মুক্তির অনুসন্ধানে তৎপর হইয়া পুনরায় [illegible] টাক্‌ওয়েল সাহেবের (১) শরণ লইয়াই স্থির করিলাম; কারণ, এবারকার পালা আরম্ভ হইল অতীত ও বর্ত্তমানের আলোচনার পর এখন ভবিষ্যদ্বাণীর সময়। তবে ইহাতেও যদি কেহ বলেন যে, বলিবার আরও কিছু রহিয়া গেল, তখন অগত্যা 'টাটা লোহার' 'পুনঃপ্রকাশের' প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত "ভারতবর্ষে" প্রচার করিতেই হইবে।

নূতন কারখানা বা Greater Extensions সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা হইয়াছে; এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেই অতি সহজে তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে।

কয়লার কারখানা। (Coke ovens.)

এই নূতন ধরণের কারখানার নাম, ইহার উদ্ভাবন-কর্ত্তার নামানুসারে Wilputte Coke Ovens। মোটের উপর এখানে ২০০ উনুন (ovens) থাকিবে। কয়লা দেওয়ার

* গত জ্যেষ্ঠ সংখ্যার "ভারতবর্ষে" 'জেমসেদপুর' শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটী ছাপার ভুল স্থান পাইয়াছে। সেগুলি শুদ্ধ করিলে নিম্নলিখিত রূপ হইবে—

১। রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমস্‌ফোর্ড বাহাদুরের ঘোষণার পর "সাকচী"—প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত জেমসেদজী টাটার নামানুসারে "জেমসেদপুর" হইয়াছে।

২। Mr. D. M. Madan, M. A., LL. B., etc. ৩। রায় সাহেব ডাক্তার শান্তিরাম চক্রবর্ত্তী। ৪। জলপ্রপাতের 'স্তায়' নদী। ৫। সাকচী ড্রামাটিক্ ক্লাব ও সারস্বত সম্মিলনী নামক 'দুইটী' আলয় আছে। ৬। এখানকার স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল।

(১) Mr. H. M. Surtees Tuckwell, M. I. Mech. E. of London.

১৮ ঘণ্টা পরে প্রত্যেক উনুনে ১৩ টন (২৭॥০ মণে ১ টন) করিয়া কোক্ প্রস্তুত হইবে। সুতরাং এই ২০০ ওভেন্স (ovens) হইতে দৈনিক প্রায় ৩৫০০ টন কোক্ পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান কোক্ ওভেনস হইতে দৈনিক ৯০০ টন মাত্র কোক্ পাওয়া যায়। এই নূতন কারখানা প্রস্তুত হইলে মোটের উপর ইহার ৫ গুণ কোক্ পাওয়া যাইবে। (৪৪০০ টন)।

কোকের আবশ্যকতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় Drag ovens নামক একটী অস্থায়ী ওভেন্স প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতেও কোক প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীযুক্ত অমলচরণ বসু (Mr. A. C. Bose, B.Sc. (Michigan)) এখানকার উল্লেখযোগ্য কর্ম্মচারী।

বাই প্রডাক্ট প্লাণ্ট (Bye Product Plant)

Wilputte Coke Ovens এর সঙ্গে যে বাই প্রডাক্ট প্লাণ্ট (Bye Product Plant) থাকিবে, তাহাতে উপস্থিত প্রধান কোল্ গ্যাস (coal gas), আলকাতরা (coal tar) ও অ্যামোনিয়ম সালফেট্ (ammonium sulphate) ছাড়া, বেনজল (benzol) নামক আর একটী মূল্যবান বাই প্রডাক্ট পাওয়া যাইবে।

ব্লাষ্ট ফারণেস্ (Blast Furnaces)

অধুনা দুইটা ব্লাষ্ট ফারণেস্ আছে, তাহা হইতে দৈনিক ৬০০ টন সাধারণ লৌহ বা Pig Iron পাওয়া যায়। তৃতীয় ফারনেস্ অতি শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ করিবে এবং ইহা হইতেও দৈনিক ৩০০ টন লৌহ পাওয়া যাইবে। নূতন কারখানা প্রস্তুত হইলে, আরও তিনটী বৃহদায়তনের ব্লাষ্ট ফারণেস্ হইবে এবং ইহার প্রত্যেক ফারণেস্ হইতে দৈনিক ৬০০ টন লৌহ পাওয়া যাইবে। সুতরাং যে স্থলে এখন মোটের উপর দৈনিক ৯০০ টন লৌহ প্রস্তুত হইতেছে, সেই স্থানে অদূর-ভবিষ্যতে দৈনিক ২৭৫০ টন লৌহ প্রস্তুত হইবে। ইহা অতি সাধারণ ও মোটামুটী হিসাব। পক্ষান্তরে, ইহাপেক্ষা অধিকও পাওয়া যাইতে পারে। তবে অনুমান হয়, একটা ফারণেস্ কেবলমাত্র ফেরো-ম্যাঙ্গানিস (ferro-manganese) প্রস্তুত করিবার জন্য নিয়োজিত হইতে পারে। এই ফেরোম্যাঙ্গানিস্ সাধারণতঃ কারখানার আবশ্যক মত ব্যবহৃত হইবে এবং উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রীত হইবে। (২)

ষ্টিল ওয়ার্কস (Steel Works) উপস্থিত ৩টি ষ্টিল ফারণেসের (steel furnaces) দ্বারা কার্য্য চলিতেছে। বর্ত্তমানে পণ্যাদির আর একটী ফারণেস্ প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা আছে। ভবিষ্যতে ষ্টিল প্রস্তুত কালে duplex process অবলম্বিত হইবে। এখন তরল লৌহ ব্লাষ্ট ফারণেস হইতে লইয়া আসিয়া ষ্টিল ফারণেসে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে এই তরল লৌহ একটী 3000 ton converter এ ঢালিয়া, ইহা হইতে সিলিকন (si) পৃথক করা বা যথা পরিমাণে কমাইয়া আনা হইবে। তৎপরে তাহাকে পুনরায় একটী ফারণেসে লইয়া গিয়া একরূপভাবে আবশ্যকানুযায়ী তাহার কার্ব্বণাংশ (c) পৃথক করা বা কমানো হইবে। এই পন্থাটিকে Duplex Bessemer Process বলা হয়। এই পন্থা অবলম্বন দ্বারা এখানে প্রচুর ও অতি উৎকৃষ্ট ষ্টিল প্রস্তুত হইবে। ইহা ব্যতীত ২টী ইলেকট্রিক ফারণেস (Elec. furnaces) প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তথায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ষ্টিল প্রস্তুত হইবে। এই ষ্টিল অস্ত্রাদি, শেল, রেলগাড়ীর চাকা ও এক্সেল নানা কার্য্যের উপযোগী হইবে।

মিল্ (Mills)

বর্ত্তমান রেল মিল ও ব্লুমিং মিল ছাড়া আর একটী বৃহদায়তনের রেল মিল (Rail & Structural mill) ও ব্লুমিং মিল (Blooming mill) প্রস্তুত হইবে। বর্ত্তমান মিলগুলি অপেক্ষা এই সকল মিল আরও দ্রুত চলিবে এবং অধিকতর দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিবে। অবিরত কার্য্য করিবার জন্য একটি নূতন ধরণের (Patent Morgan Type) বৃহদায়তনের বার মিল্ (Bar Mills) প্রতিষ্ঠিত হইবে। ষ্টিলের কিয়দংশ হইতে নানারূপ 'লৌহ পাত' (Sheets & Plates) প্রস্তুত হইবে, ও ব্লুমিং মিলের সন্নিকটে রেলওয়ের জন্য ষ্টিল স্লিপার (Steel sleeper) প্রস্তুতের কারখানা হইবে। গৃহাদির জন্য নানাপ্রকার লৌহ দ্রব্যাদি (Structural material) Structural mill এ প্রস্তুত হইবে।

(২) যুদ্ধের সময় ফেরো ম্যাঙ্গানিস দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়া উঠে এবং আমেরিকাতেও টাটা কোম্পানীর এই পদার্থ বিক্রীত হয়।

ষ্টিলের কিয়দংশ এরূপ ভাবে প্রস্তুত হইবে যাহাতে তাহা কলাই করা (enamel) বাসনের উপযোগী হয়। ঐ ষ্টিল, এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট (subsidiary) কারখানায় প্রেরিত হইবে। তাহার পর ছোট বড় নানা প্রকার লোহার নল বা চোঙ (steel pipes and tubes) ও তার (wire bars) প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইবে। বৃহদাকার নানাপ্রকার ঢালাই (castings) যথা cast iron, sleepers, rain water pipes, ইত্যাদিও হইবে।

একটা বৃহৎ Structural shop প্রস্তুত হইতেছে। এখানে নানা আকারের লোহা ও বৃহৎ বৃহৎ এমন কি ৩০ টন ওজনের লোহার দ্রব্যাদির (যথা frames, castings &c.) আবশ্যকীয় পরিবর্তনাদির বন্দোবস্ত হইবে।

বিদ্যুতাগার (Power House) — একটা বৃহৎ নূতন বিদ্যুতাগার (Power House) প্রস্তুত হইতেছে। এখান হইতে অপরিমিত বৈদ্যুতিক প্রবাহ জেমসেদপুরের নানা স্থানে ও পার্শ্ববর্তী সংশ্লিষ্ট (subsidiaries) কারখানাগুলিতে প্রেরিত হইবে। (৩)

অনুমান, আর তিন বৎসরের মধ্যে এই সমস্ত কারখানা কাজ আরম্ভ করিবে। ঐ সময়ে এই টাটা কারখানা কিরূপ হইবে, তাহা আর একমাত্র কথা বলিলে অনেকেই অনুমান করিতে পারিবেন। কারখানার কাজ চালাইবার জন্য বাৎসরিক প্রায় [illegible] টন অর্থাৎ দৈনিক সাড়ে পাঁচ হাজার টন কয়লা লাগিবে।

অনুমান ৩ বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলির (subsidiaries) প্রতিষ্ঠাকার্য্য শেষ হইলে, এখানে প্রায় দেড় লক্ষ মানবের আবাসভূমি হইবে ও উহাদি সংখ্যায় দশ গুণ বাড়িয়া যাইবে।

জেমসেদপুর সহর ভারতের অন্যতম বৃহৎ শিল্প বাণিজ্য প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। নানাপ্রকার কারখানা ও ব্যবসায় বাণিজ্যের এইরূপ সুবিধা হেতু, পূর্ব্বোল্লিখিত টেক্‌নলজিকাল ইনষ্টিটিউটের (Technological Instt.) স্থাপনের পক্ষে যে ইহা অতি উপযুক্ত স্থান, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিদ্যালয়—গবর্ণমেণ্ট, টাটা কোম্পানী ও অন্য ২।৩টা সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হইবে—এইরূপ সম্ভব হইতেছে। ইহার সহিত একটা শিল্প দ্রব্যাদির যাদুঘরের (Industrial Museum) ব্যবস্থা হইবে।

একটা বৃহৎ সপ্ত-তল অফিস-গৃহ আমেরিকান ফ্যাসানে নির্ম্মিত হইতেছে;—ইহাতে নানারূপ আধুনিক ও অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হইবে।

বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। একটা সুবৃহৎ টাউন্ হল্ ও পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে। একটা ডেয়ারী ফারম্ (Dairy firm) ও কৃষিকার্য্যের বন্দোবস্তও (Agricultural firm) চলিতেছে। একজন মহারাষ্ট্রীয় যুবক—শ্রীযুক্ত ভি, সারঙ্গধর (Mr. V. Sarangdhar, M.A., B. Sc., Graduate of the Tata Instt. of Science—Activated Sludge Dept.এর Research Chemist)। সহরের ব্যবহৃত জল একস্থানে জমিয়া বা নদীতে মিশিয়া যাহাতে অস্বাস্থ্যকর না হয়, এজন্য তিনি Activated Sluge Method অবলম্বনে তাহা হইতে সার (manure) প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ঐ সার কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

কোম্পানী Welfare Dept স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। সমস্ত সহর ও তাহার পার্শ্ববর্তী সকল স্থানের উপর দিয়া ট্রাম লাইন স্থাপন করিবার সঙ্কল্প আছে। অনুমান, ১০ বর্গ মাইল স্থান গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় কোম্পানীর অধিকারে আসিবে এবং উহার কতকাংশ সংশ্লিষ্ট কারখানাদি ও কৃষি ও ডেয়ারী ফারমের জন্য নিয়োজিত হইবে।

জেমসেদপুর সহরের কাজকর্ম্ম অনেকাংশে দেশীয় রাজ্যের সহরগুলির ন্যায়। এই প্রসঙ্গে আর ২।১ একজন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালীর বিষয় উল্লেখ না করিলে, স্থানীয় বাঙ্গালী-সমাজের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে দুইজনকে আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি; যথা খনি-বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র নাগ L.C.E., B. Sc. (Birmingham) ও চিকিৎসা-বিভাগের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-মোহন দত্ত, M.B. মহাশয়। প্রবন্ধের প্রথমভাগে এখানকার শিবপুর এঞ্জিনিয়ারীং কলেজের ছাত্রগণের বিষয়ে দু' এক কথা বলা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-

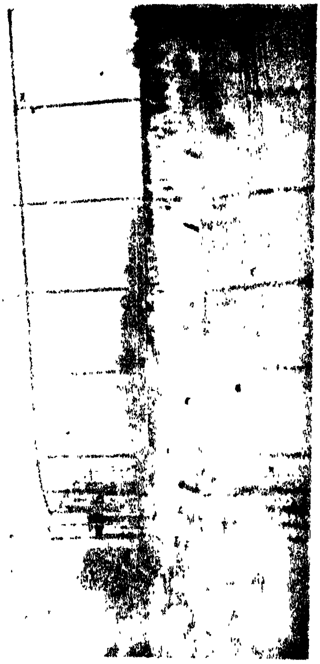
(৩) জেমসেদপুরে একটা Engineering shop for Engine, boilers & general plant; Shipbuilding yard; Electric repair & construction shop; Manufactory for Chemical Industries স্থাপনেরও জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

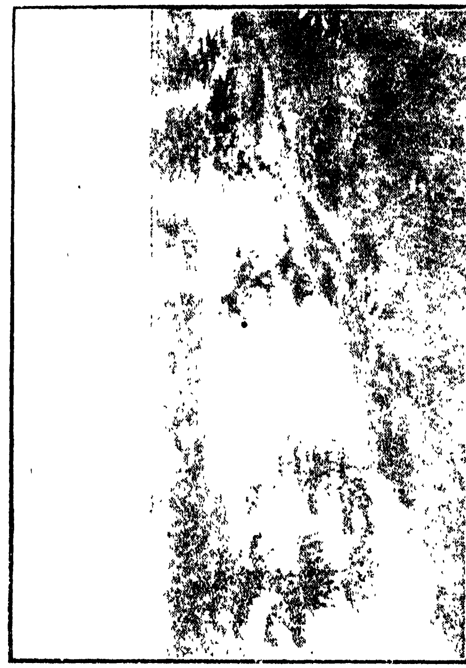


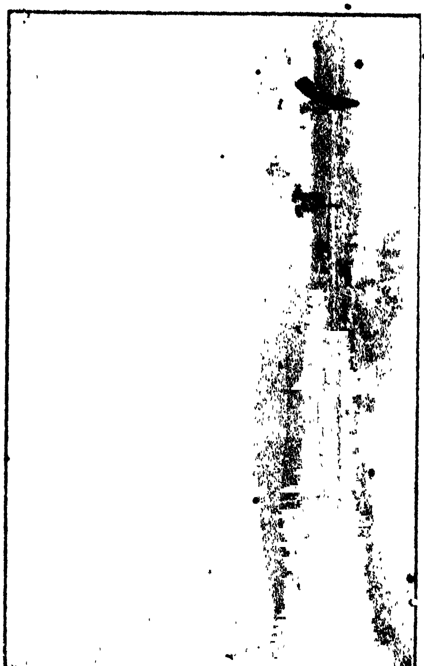
সুবর্ণরেখা পাম্পিং ষ্টেসন



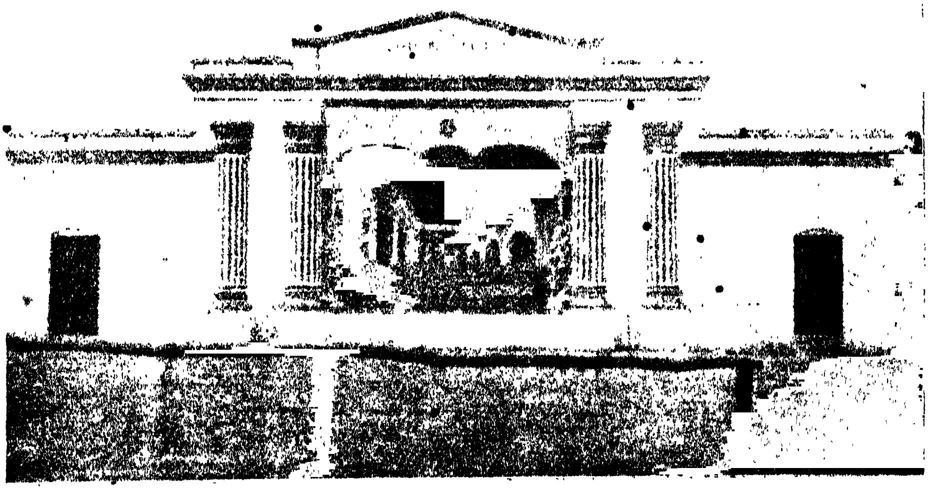
সুবর্ণরেখার বাঁধ ও দলমা পাহাড়


সুবর্ণরেখার বাঁধ—জল ছাপাইয়া নীচে পড়িতেছে


সুবর্ণরেখা নদীর উপর বি, এন, রেলের সেতু


জেমসেদপুরের সন্নিকট দলমা পাহাড় (জেমসেদপুর হইতে দৃশ্য)


কয়লার কারখানা



সাকচী ড্রামাটিক ক্লাব ও লাইব্রেরী

[illegible] নূতন কারখানার অন্যতম সহকারী এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাস, B.E., সহর বিভাগের এঞ্জিনীয়ার দর্শনবিহারী ধর B.A., B.E., ও foreman শ্রীমান পঙ্কজ কুমার মুখোপাধ্যায়। শিবপুরের ছাত্রগণ ব্যতীত বেঙ্গল টেকনিকাল স্কুলেরও অনেকগুলি ছাত্র এখানে নানা বিভাগে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

আশা করি, কয়েকবার প্রকাশিত বিবরণ হইতে টাটার এই অপূর্ব্ব কারখানা ও সুন্দর সহর জেমসেদপুরের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া পাঠক পাঠিকাগণের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইবে না।

আবাহন

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

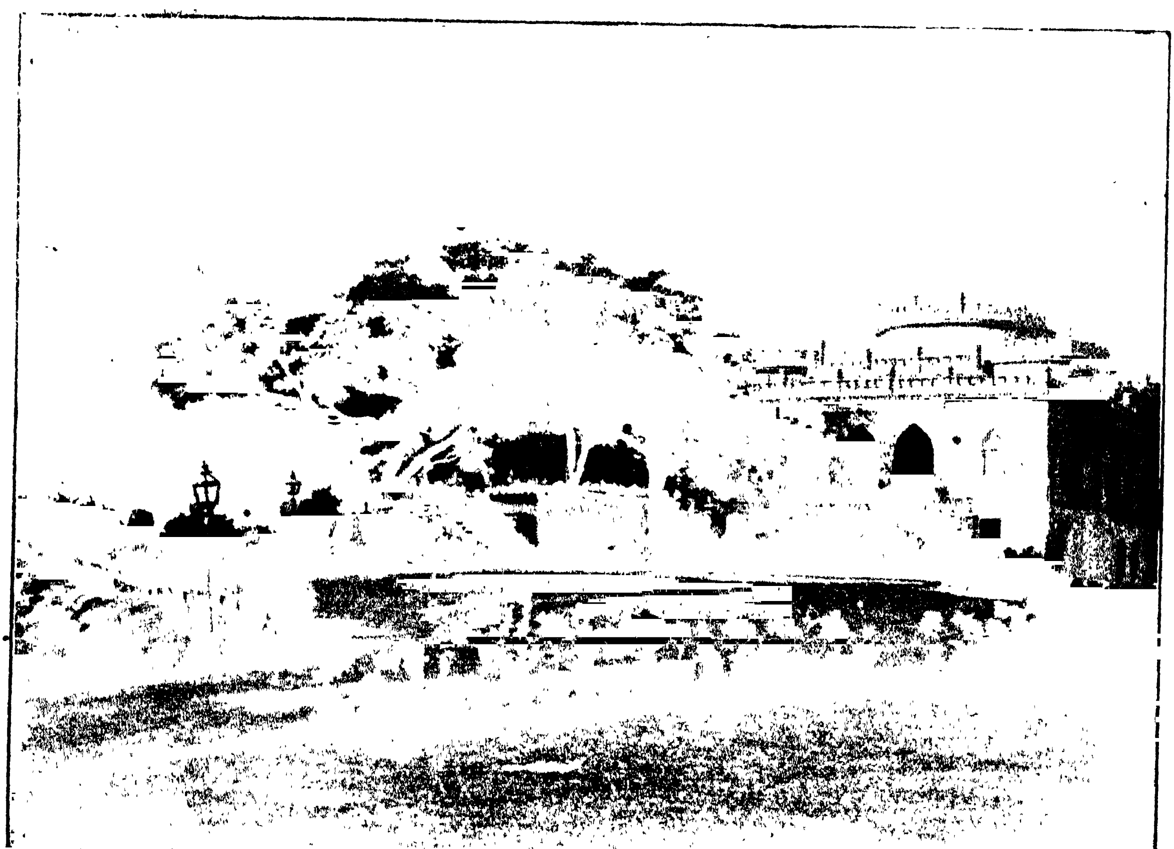
মন্দির মম আলোকিয়া এস
পুণ্যোজ্জ্বলা জননি!
এস বাণাপাণি! বিদ্যাদায়িনি
নিখিল তমসাহরণি!
সার্থক করি পূজা-আয়োজন,
এস মা ভুবন-বাঞ্ছিত-ধন,
উচ্ছল তব দীপ্তি-ধারায়
উজ্জ্বল হোক্ ধরণী;

ঝঙ্কৃত করি সঙ্গীত-রাগে
মন্দিরে এস জননি!
শতকোটি পিক্ মুখরিয়া দিক
গাহে বন্দন-গীতি,
তব জয়-রথ অম্বর পথ
উজলিয়া আছে নিতি।
বিশ্বের বুকে দিলে আনন্দ,
নিতি নবগান—নবীনছন্দ,

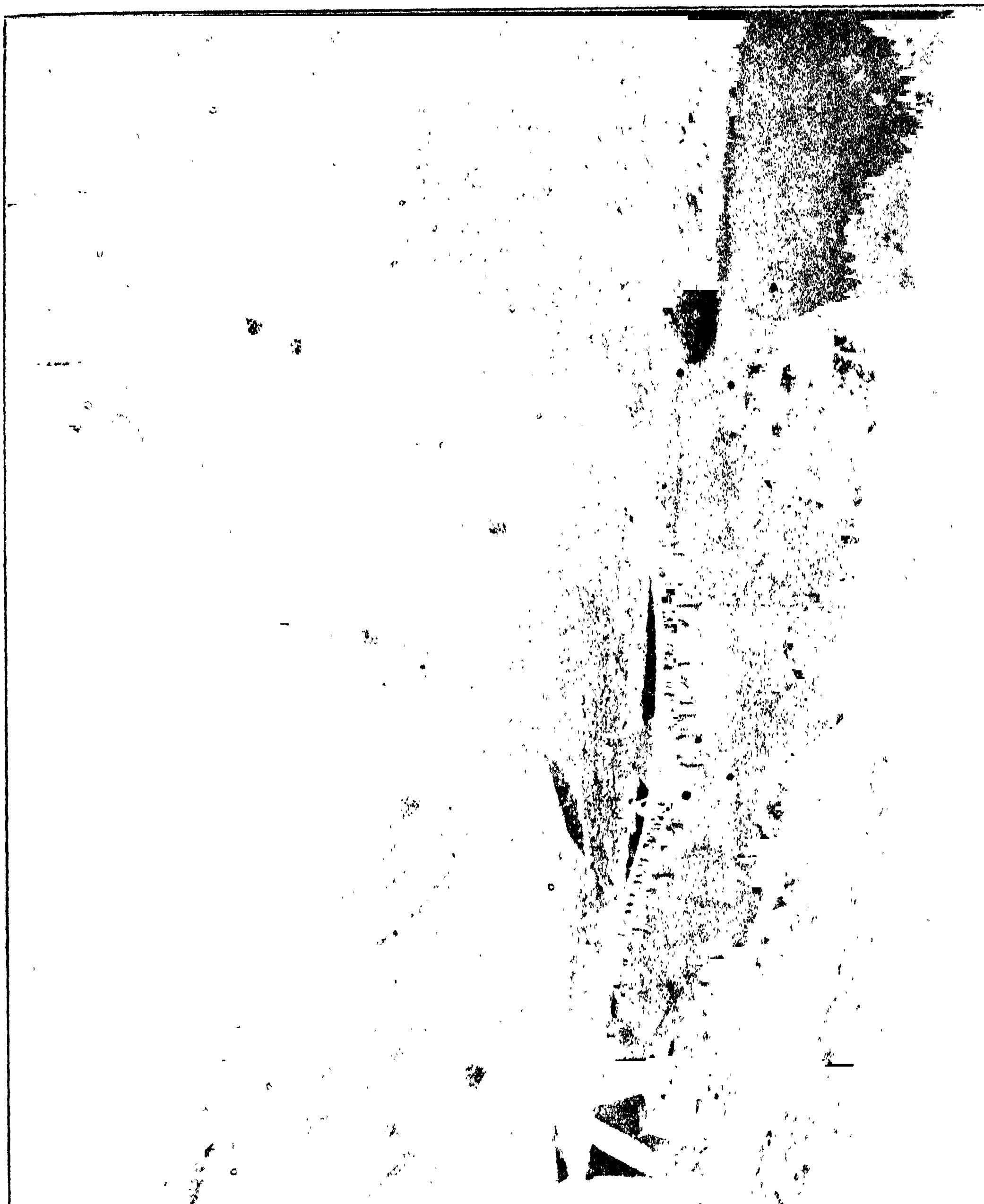
শূন্য গাগরী দিলে প্রেমে ভরি—
হৃদে দিলে জ্ঞান-রীতি,
সুন্দর করি অন্তর মম
মন্দ্রিত তব গীতি।
আজি বরষায় স্নিগ্ধ ধারায়
বসুধা আপনা হারা,
গগনে পবনে এ শুভ লগনে
উছলিছে রস ধারা।
এ কি আনন্দ—এ কি প্রেম ঢালা,
জুড়াইল ক্ষত—মিটিয়াছে জ্বালা,
নিখিল ভুবন পুলক-মগন—
লভেছে হিয়ার সাড়া;

আকাশে-বাতাসে আজি মধুমাসে
উছলিছে রস-ধারা।
এ শুভ লগনে নব আবাহনে
এস মা অলকানন্দা,
এস দেবজন বাঞ্ছিত ধন—
বিশ্বভুবন-বন্দ্যা।
মঞ্জুল তব মঞ্জীর পায়—
'নন্দ কমল ফোটে বসুধায়,—
মঙ্গল-হার কণ্ঠে তোমার—
অঞ্চল-ফুল-গন্ধা;
জয় দেব-জন- বাঞ্ছিত ধন-
বিশ্বভুবন-বন্দ্যা।

ভারত-চিত্রাবলী



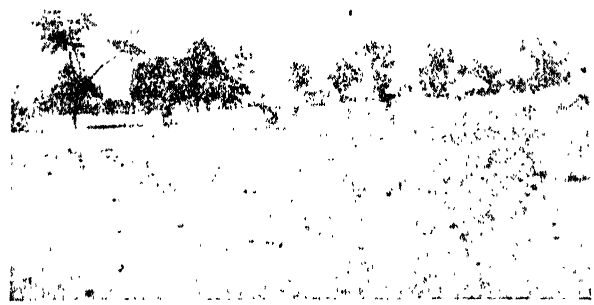
আসমান-ঘর— হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য)



স্পীতি নদীর উপর ঝোলা সেতু

রাঢ়ে সেন-রাজধানী

[মহারাজ-কুমার শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী]



বীরনগর গড় – রাজবাড়ী পল্লী



মুড়ারই থানের পূর্ব্বে জানীশ্বর গ্রামে প্রাপ্ত হরগৌরী মূর্ত্তি



নঃ.গড়ে রাজা মহীপালের দীঘি

'বংশে তস্মাভূদাদমিনি সদাচার চর্য্যা নিরূঢ়ি
প্রৌঢ়াং রাঢ়াং মকলিত চরৈঃ ভূষয়ন্তোহনুভাবৈঃ।
শশ্বদ্বিশ্বাভয় বিতরণ স্থূল লক্ষ্যাবলক্ষৈঃ
কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ স্নপিত বিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ ॥
তেষাম্বংশে মহৌজাঃ প্রতিভট পৃতনাম্ভোধি কল্পান্তস্বরঃ
কীর্ত্তি-জ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয় কুমুদ বনোল্লাসলীলা মৃগাঙ্কঃ।
আসীদাজন্মরক্ত প্রণয়িগণ মনোরাজ্য সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপাধি করুণোধাম সামন্ত সেনঃ ॥"
(বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসন ৩য়-৪র্থ শ্লোক)

"সেই (চন্দ্রদেবের) সমৃদ্ধ বংশে রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন, যাহারা বিশ্ববাসিগণকে সর্ব্বদা অভয় দান করিয়া বদান্য পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন; এবং শুভ্র-কীর্ত্তি-



বীরনগর সান্নিহিত মৌড়পুরের হরগৌরী-মূর্ত্তি



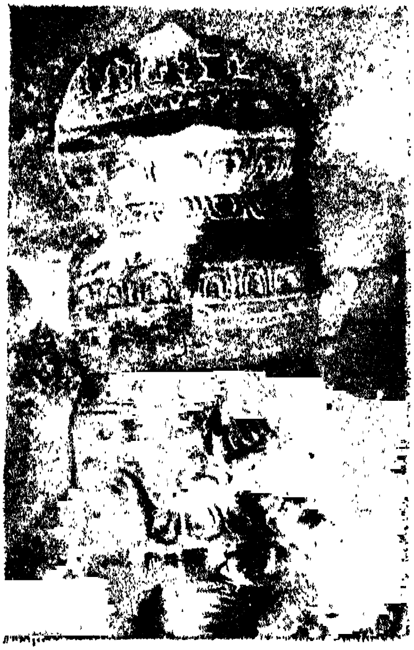
ভাটরা গ্রামের ভদ্রকালী



ভাদীশ্বর গ্রামে প্রাপ্ত মনসা-মূর্ত্তি



বীরনগরের পূর্ব্বদিকের পাহাড়ে যোগীগুম্ফা



পাইকর গ্রামে প্রাপ্ত বিজয় সেনের শিলালিপি



পাইকর গ্রামে প্রাপ্ত নরসিংহ-মূর্ত্তি



পাইকর গ্রামে প্রাপ্ত সূর্য্য-মূর্ত্তি (মধ্য স্থলের বড় মূর্ত্তিটি সূর্য্যের)



পাইকর গ্রামে প্রাপ্ত চেদীরাজ শ্রীকর্ণ দেবের শিলালিপি

রঙ্গে আকাশতলকে স্নাত করাইয়াছিলেন, যাঁহারা সদাচার-চর্য্যার খ্যাতি-গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত রাঢ় দেশকে অপূর্ব্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশে প্রবল-প্রতাপ, শত্রু-সেনা সাগরের প্রলয়-তপন, কীর্ত্তি-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল-শ্রী-সম্পন্ন, প্রিয়জনগণ রূপ কুমুদবনের উল্লাসলীলা সম্পাদক মৃগাঙ্ক স্বরূপ, আজন্ম প্রণয়ানুরাগীগণের মনোরাজ্যে সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার হিমাচল সদৃশ সত্যশীল অকপট, করুণাধার সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করেন।"

বর্দ্ধমান জেলার সীতাহাটী গ্রামে (কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী) প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে এই বিবরণ অবগত হওয়া যায়। কিন্তু সামন্ত সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজপুরুগণ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের সদাচার চর্য্যার খ্যাতি-গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত রাঢ়-মণ্ডলকে অতুল প্রভাবে ভূষিত করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি সে পবিত্র-ভূমির অবস্থিতি-স্থান নিরূপিত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছি। আশা করি, বর্ত্তমান ঐতিহাসিকবৃন্দ এই আলোচনার মূল্য-নির্দ্ধারণে আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

বীরভূম জেলার ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লুপ-লাইনে মুড়ারই ষ্টেসন হইতে প্রায় চারি মাইল উত্তরে, এবং রাজ-গাঁ ষ্টেসন হইতে চারি মাইল পশ্চিমে "বীরনগর" নামে একটি স্থান পরিখা-প্রাকার ও বিপুলায়তন নিকেতন-নিচয়ের ধ্বংসাবশেষ লইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বীর-নগরের পশ্চিমোত্তর কোণে "রাজবাড়ি" নামে অপর একটি প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ বর্ত্তমান আছে। উভয় স্থানেই দুইটি ক্ষুদ্র পল্লীতে এখন কয়েক ঘর সাঁওতাল ও বাগদি প্রভৃতি বাস করিতেছে। বীরনগর ও রাজবাড়িতে ছোট-বড় প্রাচীন পুষ্করিণীর সংখ্যা ন্যূনাধিক প্রায় তিনশত হইবে। রাজবাড়ির উত্তরে এক উচ্চ বিশাল প্রাচীরের কিয়দংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। পশ্চিমস্থিত জঙ্গলময় ভূভাগের নাতিদূরেই সাঁওতাল-পরগণার পাহাড়-শ্রেণী। বীরনগর ও রাজবাড়ির দক্ষিণে দূর-বিস্তৃত নিম্নভূমি। দক্ষিণের কিয়দংশে ও পূর্ব্বে সীতাপাহাড়ি, চন্দ্রপাহাড়ি প্রভৃতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাহাড়, স্বচ্ছন্দ বনজাত তরু-লতায় পরিপূর্ণ। সীতাপাহাড়িতে 'যোগীগুফা' নামে একটি পুষ্করিণী ও দুইটি গুহা আছে। মাটির নীচে গুহা, সুন্দর পাথরের খিলানে উপরিভাগ আচ্ছাদিত ছিল। দুইটি গুহার মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প। নাম শুনিয়া মনে হয়, গুহা দুইটি কোনও যোগীর সাধনার আশ্রয়-ভূমি ছিল। প্রবাদ আছে, বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। স্থানটীর প্রাচীনত্ব স্থাপনের জন্য হয় ত এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। রাজগাঁয়ের দেড় মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে রাজারামপুর, তাহার নিকটেই চিতারা ও তিলুরাণী গ্রাম; এবং এক মাইল উত্তরপূর্ব্বে রাজনপুর। রাজগাঁয়ের দুই মাইল দক্ষিণে ভদ্রকালি ও ভাঁটরা গ্রাম। এই সমস্ত স্থান সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। এই সমস্ত প্রবাদ শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্ব্বিশেষে বহুজন মুখে শ্রুত হইয়াছি।

বীরনগর সম্বন্ধে প্রবাদ, তথায় 'বীরসেন' নাম এক রাজা ছিলেন। বর্ত্তমান রাজবাড়ি গ্রামে তাঁহার আবাসবাটী ছিল। চন্দ্রপাহাড়ির নিকটে চন্দ্রপাড়া নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। তথায় চন্দ্রসেন রাজা রাজত্ব করিতেন, এবং ভাঁটরা ও ভদ্রকালীতে ভদ্রসেন রাজার বাস ছিল। রাজারামপুর ও তিলুরাণীতে কোনও রাজা-রাণী বাস করিতেন; ইত্যাদি। ভদ্রকালীতে অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী দেবী প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। পুরাতন মন্দিরের ভগ্নস্তূপের অদূরে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। নিকটেই একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা বর্ত্তমান। মূর্ত্তিটী প্রায় তিন হস্ত উচ্চ,—দুই হস্ত বিস্তৃত একখানি কৃষ্ণ পাষাণখণ্ড খোদিত করিয়া নির্ম্মিত। মূর্ত্তির অনেকাংশ অত্যাচারীর অত্যাচারে খণ্ডিত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তৃত প্রান্তর এখন শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণে কতকাংশের নাম 'ধনগাড়া', ধনাগারের অপভ্রংশ বলিয়াই মনে হয়। কৃষকগণের মুখে শুনিয়াছি, অনেকেই তথা হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। হল-চালনার সময় তথায় মাটীর নীচে বড়-বড় পাথর পড়িয়া আছে জানা যায়। মন্দিরের নিকটে কয়েকটা পুরাতন পাথরের চৌকাট প্রভৃতি পড়িয়া আছে। বীরনগর প্রভৃতি স্থানের অবস্থানাদির বিষয় এবং এই সমস্ত প্রবাদ-প্রসঙ্গাদি আলোচনা করিয়া মনে হয়, বীরনগরেই রাঢ়ে সেনবংশীয়গণের রাজধানী অবস্থিত ছিল, এবং রাজগাঁ, রাজনপুর, চন্দ্রপাড়া, ভাঁটরা প্রভৃতি স্থান রাজধানীর উপকণ্ঠরূপে পরিগণিত হইত। বীরনগরের নিকটবর্ত্তী মথুরাপুর বা মহুরাপুরে একটি হর-গৌরীর

যুগল-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্ত্তিটি বহু প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়।

মুড়ারই ষ্টেসনের পূর্ব্বে নিকটেই ভাদীশ্বর গ্রাম, সাধুভাষায় ভদ্রেশ্বর বলে। এই গ্রামে এক পরিখা-পরিবেষ্টিত প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ দেখাইয়া লোকে তাহাকে ভদ্রসেন রাজার দেবালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সুন্দর হর গৌরীর যুগল মূর্ত্তি ও একটি মনসার মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হর গৌরী মূর্ত্তি প্রায় তিন হস্ত উচ্চ। মনসা মূর্ত্তিটা অপেক্ষাকৃত ছোট। সর্প-সপ্তকের ফণাচ্ছত্রতলে, বসিয়া, বামহস্তে একটি সর্পকে ধরিয়া, দক্ষিণহস্ত জানুপৃষ্ঠে মুদ্রায় দক্ষিণ জানুর উপর উত্তানভাবে ন্যস্ত রাখিয়া, দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা রহিয়াছেন। ভাদীশ্বরের পূর্ব্বে পাইকর গ্রাম। পূর্ব্বে নাম ছিল 'প্রাচী-কোট্'। প্রবাদ আছে, প্রাচী কোটের প্রায় চারিমাইল পূর্ব্বে স্থিত মিত্রপুর গ্রাম মিত্রবর্ম্মা রাজার রাজসীমা ছিল। মিত্রবর্ম্মার আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বীরনগরের প্রথম দুর্গ ছিল ঐ প্রাচীকোট। কেহ-কেহ বলেন, অপর প্রতিদ্বন্দী রাজার সহিত বীরনগরাধিপের যে স্থানে উভয় রাজ্যের সীমান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে মিত্রপুর ও প্রাচীকোটের মধ্যস্থলে "ভাগাইল" নামে অভিহিত হইতেছে। এই মিত্রতা-বন্ধন জন্য অপর রাজার সীমান্ত-দুর্গ মিত্রপুর নামে খ্যাত হইয়াছে। দেশীয় ভাষায় সীমা নির্দ্দেশক বাঁধকে 'আইল' বা 'আল' বলে। এই অর্থেই 'ভাগাইল' নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। মিত্রপুরের পার্শ্বেই 'নল্‌গড়' গ্রাম। এই গ্রামে 'রাজা মহীপালের দীঘি' নামে এক প্রকাণ্ড দীঘি বর্ত্তমান আছে। পিতৃরাজ্য হারাইয়া রাজা প্রথম মহীপাল যেখানে রাজধানী স্থাপন করেন,—রাজেন্দ্র চোলের তিরু মলয় গিরিলিপির উক্তির লাঢ়ম পতি,—মহীপালের সেই প্রথমাভ্যুদয় ভূমি, নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলওয়ের বাড়ালা ষ্টেসন হইতে ভাগীরথী-তীরস্থ গায়সাবাদ (মুর্শিদাবাদ জেলা) পর্য্যন্ত প্রায় আট-মাইল ব্যাপী প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ, ও তন্মধ্যবর্ত্তী মহীপাল নামক স্থান, নল্‌গড় হইতে বেশী দূরে নহে। আমরা নল্‌গড় মিত্রপুরকে পালরাজগণের সীমান্ত-দুর্গ বলিয়া মনে করি।

পাইকর গ্রামে প্রাচীন বহু দেবমূর্ত্তি ও কয়েকটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটি দুর্গা-মূর্ত্তি, একটি নরসিংহ-মূর্ত্তি, একটি অষ্টাদশভুজা দেবী মূর্ত্তি, কয়েকটা বাসুদেব মূর্ত্তি ও অপর কয়েকটা দেবী মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। আমাদের উদ্দিষ্ট প্রথম শিলালিপিখানি একটি ভগ্ন মূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত রহিয়াছে। 'রাজে শ্রী বিজয় সেন' ভিন্ন লিপির অপরাংশ পাদপীঠের ভগ্নাংশের সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে। নারায়ণ চত্বর নামক পুষ্করিণীর তীরে এই লিপিযুক্ত ভগ্ন পাদপীঠখানি পড়িয়া আছে। পাইকরের বুড়াশিবের মন্দিরে একটি গোলাকৃতি প্রস্তর-স্তম্ভে অপর শিলালিপিখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লিপির ১ম শ্রেণীতে মাত্র "মাঘস্য" এই শব্দটি পড়িতে পারা যায়। তারিখের অংশটি কে বা কাহারা কাটিয়া উঠাইয়া দিয়াছে। ২য় শ্রেণীতে আছে "মণ্ডল পাত্র শ্রীপাতি দত্তেন"। অপরাংশের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহোদয় এবং প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে, এই উভয় শিলালিপির অক্ষর সমসাময়িক বলিয়া অভ্রান্তরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। আমরা এই পাতিদত্তকে বিজয় সেনের মন্ত্রী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। পাইকরে প্রচলিত প্রবাদ-পরম্পরা আমাদের অনুমানের সমর্থন করিতেছে।

পাইকরের পশ্চিমস্থিত পাগলানদীর তীরে একটি আম্র কানন আছে। সে কালের প্রাচীন বৃক্ষাদি নাই, কিন্তু নাম এখনো আছে :- স্থানীয় লোকে বলে 'মহাবুল্লার বাগান'। প্রবাদ আছে, বীরনগরের কোনও সেনরাজা কি কারণে তাঁহার মন্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। পরে সেনরাজ উড়িষ্যা-বিজয়ে গমন করিলে, মন্ত্রী সামান্য সৈনিকের ছদ্মবেশে যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, বিজয়-লক্ষ্মীর সহিত রাজার প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, ভাদীশ্বরে আসিয়া, আম্র-সংযুক্ত কোনও প্রিয় আহার্য্যের আয়োজন দেখিয়া, রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হন, এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারেন, যে এক সৈনিক অগ্রে এখানে আসিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছে ; পরিচয়ে বুঝিতে পারেন, এ সেই উড়িষ্যা-বিজয়ের সৈনিক। সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে প্রাচী-কোটের কর্ত্তৃত্ব প্রদানে পুরস্কৃত করেন। বলা বাহুল্য, যে বাগান হইতে রাজার প্রিয় আহার্য্য আম্র সংগৃহীত হইয়াছিল, সৈনিক তাহাও দান প্রাপ্ত হন। সৈনিক প্রাচী-

কোটে গিয়া পুরাতন দুর্গের সন্নিকটে নূতন একটি কোট্ স্থাপন করেন। রাজা তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচয় অবগত হইয়া, সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া, পুনরায় তাঁহাকে সাদরে মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। লোকে বলে, সৈনিক অর্থাৎ "পাইকের কোট্" অপভ্রংশে 'পাইকর' হইয়াছে। আমরা কিন্তু অন্যরূপ মনে করি। আমাদের মনে হয়—মহাবলের বাগান, কাল-ক্রমে বিকৃত হইয়া 'মহাবুল্লার বাগানে' পরিণত হইয়াছে। 'মহাবল' সৈনিককে বুঝাইত, সেনাপতির উপাধি ছিল 'মহাবলাধ্যক্ষ'। প্রবাদ বলিতেছে, মন্ত্রীই ছদ্মবেশে সৈনিক হইয়াছিল। অনুমান হয়, "মণ্ডল পাত্র পাহি দত্তই" এই সৈনিক। 'পাহির কোট' কালক্রমে পাহিকোট হইতে 'পাইকর' রূপ ধারণ করিয়াছে। এই দীড়্যা-বিজয়ী রাজাকে আমরা "চোড়গঙ্গসখা বিজয়-সেন" বলিয়াই মনে করি। এই প্রবাদ বোধ হয় কলিঙ্গ-যুদ্ধের স্মৃতি বহন করিতেছে। দান-সাগরে কথিত "তদ্বংশ-বিজয় সেনঃ প্রাদুরাসীৎ বরেন্দ্রো।" শ্লোকটির 'বরেন্দ্র' পাঠের পরিবর্ত্তে 'নরেন্দ্র' পাঠই আমাদের মতে সমীচীন। সুতরাং আধুনিক বহু ঐতিহাসিকের মতানুসারে "রাঢ়েই বিজয় সেনের প্রথমাভ্যুদয়" আমাদের এই প্রবাদের সমর্থন করিতেছে। 'মণ্ডল' শব্দের অর্থ বিশ্বপ্রকাশে কথিত হইয়াছে,—"গ্রামমণ্ডলে দ্বাদশ রাজকেচ"। বিজয় সেন হয় ত প্রথমাভ্যুদয় কালে 'মণ্ডল' উপাধিই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। কারণ তখনো পাল বংশের প্রভাব খর্ব্ব হয় নাই। পাল বংশের মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈদ্যদেবের 'নৌবাট হী হী রব' দিক্-করী-গণকেও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিত। এই জন্যই অনুমান হয়, মণ্ডল পাত্র পাহি দত্ত বিজয় সেনেরই মন্ত্রী ছিলেন। বিজয় সেনের রাজ্ঞীর নাম ছিল বিলাস দেবী। পাইকরের দুই মাইল দক্ষিণে বিলাসপুর গ্রাম ও গ্রামের মধ্যে এক প্রকাণ্ড সরসীর রাণী দীঘি নাম—এ সম্বন্ধে নানা সংশয় মুখরিত করিয়া তুলে। রাণী দীঘির দক্ষিণে, অনতি-বৃহৎ প্রান্তরে পরিখার ক্ষীণ রেখা পরিবেষ্টিত এক নাত্যুচ্চ ধ্বংস-স্তূপকে লোকে রাজবাড়ির লুপ্তাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

বল্লাল-চরিতে দেখিতে পাই—

"তস্মাদ্বিজয় সেনোভূচ্চোড় গঙ্গ সখো নৃপঃ।
যোঽজয়ৎ পৃথিবীং কৃৎস্নাং চতুঃ সাগর মেখলাম্ ॥"

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, কলিঙ্গপতি চোড়গঙ্গ অনন্ত-বর্ম্মার সহিত বিজয় সেনের সখ্যতা ছিল। উৎকলরাজ দ্বিতীয় নরসিংহের তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে—চোড় গঙ্গদেব—

"গৃহ্নাতিস্ম করং ভূমেগঙ্গা গোতম গঙ্গয়োঃ।
মধ্যে পণ্যংস্থ বীরেণ পৌঢ়ঃ পৌঢ় প্রিয়া ইব" ॥

এই শ্লোক হইতে মনে হয় গঙ্গাতীরবর্ত্তী মন্দার দুর্গ জয় করিয়া তিনি গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূভাগের কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে মধ্যরাঢ়ে প্রবেশের উপক্রম করিলে, বিজয় সেনের সহিত তাহার সৌখ্য সংস্থাপিত হয়। হয় ত মিত্রপুরের মিত্রবর্ম্মার প্রবাদ অনন্তবর্ম্মার এই ঘটনার স্মৃতি বহন করিতেছে। অথবা অনন্ত বর্ম্মার মন্দার আক্রমণের পূর্ব্বেই বিজয় সেন কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়েই অনন্ত বর্ম্মার সহিত তিনি সৌহৃদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে অনন্ত বর্ম্মা বিজয় সেনের সাহায্যের জন্যই হয় ত মন্দার দুর্গ আক্রমণ করেন। এইরূপ অনুমান ভিন্ন বল্লাল-চরিতের ও নরসিংহ দেবের তাম্রশাসনের উপরি-কথিত শ্লোকদ্বয়ের, এবং দেবপাড়া প্রশস্তির

"গৌড়েন্দ্র মদ্রবদপাকৃত কামরূপ-
ভূপং কলিঙ্গ মপিনস্তরসা জিগায়"

এই শ্লোকের সামঞ্জস্য সম্পাদিত হয় না। চোড় গঙ্গ দেবেরও গৌড় আক্রমণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

মন্দার দুর্গ গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, ইহাই আমাদের অনুমান। গঙ্গাবংশীয়গণের তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে—

"আরম্যানগরাৎ কলিঙ্গজবল্ল প্রত্যাগভয়াবৃতি
প্রাকারায়ত তোরণ প্রভৃতি তো গঙ্গাতটস্থান্ততঃ
পার্থিস্নৈঃ যুধি জর্জ্জরীকৃতনমদ্রাধেয় গাত্রাকৃতি
র্মন্দারাধিপতিগ্গর্গতো রণভুবো গঙ্গেশ্বরাক্রান্ত॥

থানা লাভপুর হইতে প্রায় আট মাইল উত্তর-পূর্ব্বে 'মন্দার' নামে একটি স্থান আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। নিকটেই 'মানসারা' নামে আর একখানি গ্রাম। মন্দারের এক অংশ আজিও পরিখা-বেষ্টিত রহিয়াছে। স্থানটীর নাম জীবনকৃষ্ণপুর। জীবনকৃষ্ণপুরের দক্ষিণে 'আগড়ডাঙ্গা'

নামে এক বিপুলায়তন ধ্বংস-স্তূপ দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করে। চতুর্দ্দিকের বিশাল পরিখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পশ্চিম দিকে যে অংশটুকুমাত্র বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিলেই পরিখার পূর্ব্ব বিশালতা অনুভব করিতে আর কষ্ট কল্পনার প্রয়োজন হয় না। পশ্চিমের পরিখাটি 'গড়খাই' নামে দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধমাইল এবং প্রস্থে প্রায় শতাধিক হস্ত ব্যাপিয়া জলপূর্ণ রহিয়াছে। লোকে বলে সেখানে আড়ুরাজার বাড়ী ছিল। কোন্ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি না কি রাজ্য হারাইয়াছিলেন। আমরা এই "মন্দার" ও "তাহার অধিপতিকে" চোড়গঙ্গ বিজিত বলিয়া অনুমান করি।

দেবপাড়া প্রশস্তিতে "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণিন্দ্র বীর সেনের" নাম পাওয়া যায়। তিনি সেন বংশের পূর্ব্ব পুরুষ। লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্রলেখে সামন্তসেনকে "কর্ণাট ক্ষত্রিয় কুল শিরোদাম" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। কোথায় দাক্ষিণাত্য, কোথায় রাঢ়! এত দূরে আসিয়াও সেনরাজপুত্রগণ আপনাদের বংশগৌরব-স্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। "রাঢ়ে সেন রাজধানী"র 'বীরনগর' নাম এই গৌরব স্মৃতির জ্ঞাপনা মাত্র। গৌড়ের ইতিহাস রচয়িতা স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ড হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে—

"সৌমিনী দেবতা ভক্তঃ শাণ্ডিল্যাথ্য ঋষেঃ কুলে।
মহারাজ ইতিখ্যাতস্ততোহভূদ্ভুবন শঙ্করঃ॥
তদন্বয়ে চক্রবর্ত্তী সোমংসেন ইতীরিতঃ।
তদন্বয়ে বীরসেন কাস্তমালী ততোহপিচ॥

আমরা এই বীরসেনকেই সেনবংশের পূর্ব্ব-পুরুষ বলিয়া মনে করি। ভুবশঙ্কর হইতে সেনবংশের 'বৃষভ শঙ্কর' "অরিরাজ বৃষভাঙ্ক শঙ্কর' প্রভৃতি উপাধির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। বল্লাল-চরিতে কথিত হইয়াছে, বীরসেন অঙ্গাধিপ কর্ণের বংশধর। তিনি অঙ্গ হইতে গৌড়দেশে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু তাম্রলিপির সহিত এই উক্তির সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। অঙ্গ দেশে বীরসেনের জন্ম হইলে, তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বলা যাইবে কিরূপে? তাম্রলিপিতে রাঢ়ের উল্লেখ আছে, আনন্দ ভট্ট বল্লাল-চরিতে সেন বংশের পূর্ব্ব-পুরুষকে গৌড়ে লইয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তাম্রলিপিই সমধিক বিশ্বাস্য।

কোন্ সময়ে সেনবংশ আসিয়া রাঢ়ে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, কর্ণাট বলিতে কোন্ স্থানকে বুঝায়, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন চোলরাজ্যকে কর্ণাটের একাংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন, রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গেই সামন্ত সেনের পূর্ব্ব-পুরুষ হয় ত রাঢ়ে আগমন করিয়া থাকিবেন। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, "পালাধিকার কালে মালব, হূন্, খস্, কুলিক, লাট প্রভৃতি জাতির সঙ্গে কর্ণাটগণও গৌড়মণ্ডলে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, পরে চেদীরাজ কর্ণদেবের সময়ে সুযোগ বুঝিয়া কর্ণাট-বংশীয় সামন্ত সেন অভ্যুত্থিত হন। মালব-রাজ উদয়াদিত্য ও তৎপুত্র লক্ষ্মদেবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কর্ণাটগণ চেদীর পূর্ব্ব গাঙ্গেয় দেব ও কর্ণদেবের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন।" গৌড়রাজমালাকার বলেন, চালুক্য-রাজ বিক্রমাদিত্য গৌড় জয় করিয়া পরাজিত রাষ্ট্র শাসন জন্য যে প্রতিনিধি রাখিয়া যান, তাঁহারই বংশে সামন্তসেনের অভ্যুদয়। রাজেন্দ্র চোল রাঢ়ে আগমন করেন ১০২৪ খৃষ্টাব্দে। কর্ণদেবের দিগ্বিজয় আরম্ভ ১০৪০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্ব হইতে। কর্ণাটেন্দু বিক্রমাদিত্যের গৌড় আক্রমণ কাল ১০৪০ হইতে ১০৭১ খৃঃ অঃ মধ্যে। ইহাদের কাহারও সময়ে সামন্তসেনের অভ্যুদয় হইলে, রাঢ়ের গর্ব্ব গৌরব সদাচারপরায়ণ সেনরাজপুত্রগণ যে তাহার পূর্ব্ব হইতে রাঢ়ে বাস করিতেছিলেন, সীতাহাটী তাম্রশাসনই তাহার প্রমাণ। সুতরাং বলিতে হয়, রাজেন্দ্র চোলেরও পূর্ব্বে সামন্ত সেনের পূর্ব্বপুরুষ কেহ রাঢ়ে আগমন করিয়াছিলেন। "কর্ণাটলক্ষ্মীলুণ্ঠনকারিগণের শাসনকর্ত্তা" সামন্তসেন রাজেন্দ্র চোলের সমসাময়িক বলিয়াই অনুমিত হয়। পাইকরে বিজয়সেনের শিলালিপির সঙ্গে "সমুদ্ধরাঠ চেদীরাজ শ্রীকর্ণদেবের"ও একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপিতে তৎকর্ত্তৃক এক দেব-মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই মহোদয় এবং প্রাচ্যবিদ্যা-

মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাইকরে গিয়া এই লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। পাইকরে শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায়, অনুমান হয়, কর্ণদেবের সহিত সেন বংশের শত্রু বা মিত্র ভাবে, কোনরূপ একটা সংস্রব ঘটিয়াছিল। প্রবন্ধান্তরে ধনদেব প্রভৃতি রাঢ়-আক্রমণকারিগণের এবং পালবংশ ও শূরবংশের সহিত সেন-বংশের সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(১৬)

বর্দ্ধমান-রাজের বিবাহোৎসব উপলক্ষে রাজধানী সে সময় প্রমোদ-সাগরে ভাসিতেছিল। রাজা বিজয়চন্দ বাহাদুর নিজে সাহিত্য-রসিক। তাঁহার পরিচিত, অল্পপরিচিত এমন কি, অপরিচিত তরুণ সাহিত্যিক বৃন্দের অনেকেই অন্যান্য সকল শ্রেণীর সহিত এ বিবাহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আজকাল এই বিবাহ সম্বন্ধীয় আলোচনা ব্যতীত, বর্দ্ধমান সহরে অপর কোন কিছুই আলোচিত হয় না। সারা বর্দ্ধমান ব্যাপিয়া কেবল ঐ এক কথা। বরের পোষাকের কি রকম বিশেষত্ব দেখা গিয়াছে, ভোজের আয়োজনের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যবস্থাটা ভাল, এবং কোনটাই বা নয়,—নাচ-তামাসার বন্দোবস্তে কি কি ত্রুটি থাকিল, কি-ই বা নাই,—এমনি সব নানা প্রকার গুজব-কোলাহল—তা কি নিষ্কর্ম্মার চণ্ডীমণ্ডপ, কি সরকারী কাছারী-বাড়ী,—কোনখানেই বাদ পড়িতেছিল না। স্কুল-কলেজ, এমন কি, পাঠশালার ছেলেরা শুদ্ধ এই সকল, এবং ইহা ব্যতীত আরও কিছু-কিছু নূতনতর আন্দোলনে একাগ্র চিত্তে যোগদান পূর্ব্বক, নিজেদের পাঠ্য সম্বন্ধে অমনোযোগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিল।

সাড়ে চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। স্কুলের ছুটীর পর ছেলের দল বাড়ী ফিরিতেছিল। আজিকার পর অনেকগুলি দিনই তাহাদের আর স্কুল-ঘরের চৌকাঠ মাড়াইতে হইবে না, এই রকম ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। গ্রীষ্ম এবং শরৎ ভিন্ন এমন দীর্ঘকাল-ব্যাপী বড় ছুটী তাহাদের ভাগ্যে বেশী জুটে না। এবার হেমন্ত রাজ-দম্পতির কল্যাণে এই সুযোগটুকু ঘটাইয়া দিয়াছে। মহাস্ফূর্ত্তিযুক্ত চিত্তে ইহাকে উপভোগ করিতে-করিতে ছেলেগুলি দল বাঁধিয়া চলিয়াছিল। ঘরে ফিরিবার বড় একটা ত্বরা কাহারও মধ্যে ছিল না। অনেক রকম আলোচনা চলিতেছিল, পরামর্শ আঁটা হইতেছিল। আবার যাহারা একটু অধিকতর ক্ষিপ্রকর্ম্মা, তাহারা ইতঃমধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া অপরের সাহস বর্দ্ধন করিতেও ছিল। দেখিতে দেখিতে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া, রুচি অনুসারে, কতক রাজবাড়ীর দিকে, কতক ষ্টেসনের পথে, কতক নাচ-গানের মজলিস অভিমুখে,—এমনই যেখানে যাহার খুসী, সেই দিকেই ছড়িয়া পড়িল। যে সব ছেলেরা একটু বিদ্যাশক্ত গোছের, অর্থাৎ লুকাইয়া, চুরি করিয়া এক আধটুকু সাহিত্যালোচনা করিয়া থাকে,—তা' সে যতটুকুই হোক, আর তাহার পরিধি পঞ্জীর পত্র বা খাতার পৃষ্ঠা,—যেমন স্থানই হউক,—এই সব ভবিষ্যতের উদীয়মান কাব্য-সুধাকরগণ এ সকল ছেলেমানুষীর মধ্যে যোগদান না করিয়া, অপর এক যুক্তি আঁটিতে বসিল। সাহিত্যিক রাজার বিবাহে জনকতক রাজ-পরিচিত সাহিত্যিকের নিমন্ত্রণ ছিল। ৬টা কত মিনিটের ট্রেণে তাঁহাদের ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিবার কথা। ধ্বজ-পতাকা হাতে লইয়া তাঁহাদের একটু সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া আনা ইহাদের মতলব। প্রথম শ্রেণীর ছেলেরাই হইল অগ্রণী; এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী হইতেও কেহ-কেহ আসিয়া ইহাতে যোগদান করিল। তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেদের মধ্যে একটি হৃষ্টপুষ্ট, সুদর্শন বালক,—বয়সে তাহাকে শিশু বলিলেও বলা যায়,—সে ছেলেটি কোন দিকের কোন দলেই না মিশিয়া, এক ধারে দাঁড়াইয়া, নিজের

পাঠ্য পুস্তকের ছবিগুলি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছিল। তাহার অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ তাহারই একটি সহপাঠী পিছন হইতে কাছে আসিয়া, তাহার দুই কাঁধের উপর নিজের দুই হাতের সমুদয় ভারটা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া, বলিয়া উঠিল, "ওস্তাদ! এ-ছোঁড়াটা দেখি একেবারেই বয়ে গ্যাছে! ওরে গাধা, তোর ও হিষ্ট্রি অফ্ ইংলণ্ড হাউই হয়ে পড়ে উড়ে যাবে না রে, উড়ে যাবে না। আজকের দিনে ওটা হাত থেকে রাখ দিকিন।"

'গাধা' সম্বোধিত ছেলেটি সেই ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়। তদ্ভিন্ন, এ পর্য্যন্ত যে কয়টা পরীক্ষা সে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সব কয়টাতেই প্রথম হইয়া উঠিয়াছে। একবার বুঝি ডবল প্রমোসনও পাইয়াছিল। নিজের পাঠ্য ব্যতীত অপর কোন কিছুরই ঝোঁক তাহার নাই। সহসা এইরূপে আক্রমিত হইয়া, ছেলেটি তাই প্রথমে চমকাইয়া গিয়াছিল; পরে বই মুড়িয়া এবং মুখ তুলিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হাস্যের সহিত উত্তর দিল, "না, এই যে বাড়ী যাই-"

পূর্ব্ব আক্রমণকারী তখন স্কন্ধ ত্যাগ করিয়া ঘাড় ধরিয়াছে। গলার কলারটা চাপিয়া ধরিয়া, তর্জ্জনের স্বরে সে বলিল, "বটে রে রাস্কেল! আবার বাড়ী যাবার বায়না উঠেছে! আজকের দিনে বাড়ী যায় না।" আর একটি ছেলে আসিয়া হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "আমরা সবাই বওয়াটে, আর একমাত্র উনিই যা শুদ্ধ বয়। যাঃ, যাঃ! বাড়ী যেতে হবে না! চল্, পাঞ্জাবীদের ও দিকটায় কি রকম কি হচ্চে-টচ্চে, দেখে আসা যাক্।" ছেলেটা হাত টানিয়া লইয়া পতনোন্মুখ বইগুলি সামলাইল; পরে বিনীত ভাবে কহিল, "বাড়ী না গেলে মা বড্ড ভাববেন যে ভাই! এখন আর আমি কোথাও যেতে পারবো না। কাল সকালে বরং দেখা যাবে।" "তাই তো রে, ভুলে গেছলুম,—তোর মা আছে,—আমাদের তো মা নেই! আর থাকলেও, তারা আমাদের জন্যে ভাবে না—" "আমরা যে ভাই মায়েদের ত্যাজ্য পুত্তুর, ও যে ভাল ছেলে!"

"যা—যা, মায়ের দুধ খে' গে যা। দেখি,—গলা শুকিয়ে যায় নি তো! আহা বাছারে!" ছেলেটি কাঁদো-কাঁদো অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল,—অভিমন্যুর মত সে বালকটিও এই বিপক্ষ-প্লাবন মধ্যে অসহায় এবং একা।

ইহাদের অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠদের মধ্য হইতে কয়েকটি ছেলে মিলিয়া, একটি দল গঠন করিয়া, পাশ দিয়া যাইতেছিল,—কে একজন কাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় চলেছ হে?" উত্তর শোনা গেল, "ষ্টেসনে যাচ্ছি যাবে না কি?"

"কেন বলো দেখি? কে-কে আস্ছে?" "অনেকেই তো আসবেন্ শুনচি,- রাজ-বন্ধু সাহিত্যিকের দল প্রায় সবাই-ই আস্ছেন।" "তা-হলে অরবিন্দবাবুও আসবেন বোধ হয়?" সেই পাঠে-মনোযোগী মুখচোরা ছেলেটি হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। "কে অরবিন্দ হে? সিবিলিয়ান অরবিন্দ ঘোষ * না কি?" "উহুঁ, তিনি কেন? অরবিন্দ বোস,—অমৃতবাজারে, বেঙ্গলীতে ইংরেজি প্রবন্ধ প্রায়ই বেরোয় দেখ না? প্রদীপ, ভারতী আরও কিসে-কিসে মধ্যে-মধ্যে কবিতাও লেখেন যে;—রাজার আলাপী।" "সেই অরু বোসটা? হেঁঃ, সে আবার একটা লেখক! চাঁদি একটি কি যে ছড়া বলে—আরসোলা হলো পাখী, কুমীর হলো ঢেঁকি। তেমনি অরু বোস হলেন কবি! গিয়েছি যে!" "কেন ভাই, বোসজা তো বড় মন্দ লেখে না। ওর পদ্য গুলোর বেশ একটা জো আছে! আমার তো বেশ লাগে।" "শালুক চিনেছেন মাকাল ঠাকুর! যাও,—কাদে-কন্নে, গাড়ি বয়ে, ভক্তি প্রস্রবণ ছুটিয়ে দাও গে। আমি তা' বলে ও সব হনুবগুদের জন্যে কাঁধ পাততে যাচ্চিনি। হাঁ, আসতেন্ মিষ্টার টেগোর, অবিশ্যি কাঁধ ছেড়ে মাথা পেতে দিতাম।"

পাঠ্য পুস্তকগুলা বগলে চাপিয়া, তৃতীয় শ্রেণীর সেই বালক ছাত্রটি এক-লাফে প্রথম শ্রেণীর বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছাত্র-দলে মিশিয়া গেল। যে ছেলেটি অরবিন্দের কবিতার সুখ্যাতি করিয়াছিল,—উজ্জ্বল, আয়ত নেত্রে তাহার মুখপানে চাহিয়া, উৎসাহ দীপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আপনি তাঁকে চেনেন?" ছেলেটি ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, সবিস্ময়ে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে চিনি বল তো?" বালক একটু ইতস্ততঃ করিয়া জবাব দিল, "এই শ্রীযুক্ত বাবু অরবিন্দ বসু মহাশয়কে?" "অরবিন্দ বাবুকে?—না, কখন দেখি নি,—লেখা-টেখা পড়েছি। কেন, তুমিও বুঝি ওঁর কবিতা পছন্দ করো?" "আমি—আমি তো ওঁর কবিতা কখন দেখি নি।

* ইহা ১৩০৪ সালের কথা।

াপনার কাছে আছে?" "আমার কাছে? না, আমার ােছে বোধ হয় নেই। আমি তো মাসিকপত্র-টত্র জমিয়ে ােখনে, সে সব দাদা,—এঁরাই কি করেন-টরেন।"

বালকটি একটি নিঃশ্বাস ফেলিল। মুখ দেখিয়া বোধ হয় েন বিশেষ আশা-ভঙ্গে সে কিছু ক্ষুব্ধ হইয়াছে। এই সময় েব একটি ছেলে সেখানে আসিয়া বলিয়া উঠিল "কিরে েজিত, তুই আবার সাহিত্যিক হলি কবে থেকে রে? েগো মা! আজকালকার দিনে ছেলেগুলো যেন কি েছে! গাল টিপ্‌লে যার আজও দুধ বার হয়, তিনিও হচ্চেন াহিত্যিক! দেখে আর বাঁচিনে!"

অজিতের দল তখন যাত্রা সুরু করিয়া দিয়াছে। এ সব ট্‌কারীতে অজিতের উৎসাহ বর্দ্ধিত করা ভিন্ন তাহার গতি োধ করিতে পারিল না।

ট্রেনের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে যে েয়েকটি ভদ্রলোক অবতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজ েস্তারিগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া উপযুক্ত স্থানে প্রেরিত েইলেন। সাহিত্য-সেবার দল, রাজসম্মানের উপর যে াােনের দাবী তুলিয়া কবি কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের াায় নয়নে পতিত হন, অর্থাৎ বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে—এই ক দফা আদর-আপ্যায়ন লাভ করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসাবাড়ীতে েবিষ্ট হইলেন। সব ছেলেরা চলিয়া আসিল; অগত্যা েজিতকেও বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল। কিন্তু ফিরিয়া াসিতে তাহার একেবারেই মন সরিতেছিল না। কে েরবিন্দ? ত্রয়োদশজন সাহিত্যিকের মধ্যে অরবিন্দ বসু যে ে, তাহা এই সাহিত্য-সেবক-বৃন্দের সেবক-দলের কেহই েবগত নহে। ইহাদের মধ্যে অরবিন্দ-ভক্ত ছেলেটি এমনই েসা নিজের কৌতূহল-বৃত্তিকে আশ্চর্য্য রূপে সংযত করিয়া েলিয়াছিল যে, আগ্রহের উগ্র তাড়নায় জ্বরাতুরবৎ শুষ্ক-কণ্ঠ, েশ্বাস এই ব্যাকুল বালকটি নিরুপায় ক্ষোভে পরিপূর্ণ হইয়া েঠিয়া, নিজেকে মনে-মনে অনেক সময় অভিসম্পাতও করিয়া েলিতেছিল। এতগুলি লোকের মধ্য হইতে সে নিজের েস্পতকে চিনিয়া লইতে পারিতেছিল না, যাহাকে জানিবার, েনিবার, জানাইবার, চিনাইবার জন্য ক্ষুদ্র বুকখানির মধ্যে েশান্ত হৃদ্‌পিণ্ড উদগ্র উত্তেজনার কলকল্লোল সৃজন করিতে-েল, সুষুপ্ত রাক্ষসী ক্ষুধা যেন কেমন করিয়া হঠাৎ ঘুম েঙ্গিয়া উঠিয়া, উগ্র বাসনারূপে তাহার শিশু-চিত্তকে পীড়িত, পিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। তাহার সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে কিছুতেই কিন্তু আজ তাহার মুখ ফুটিতে-ছিল না। অজিত চিরদিনই সপ্রতিভ। বিশেষ করিয়া পড়াশোনার বিষয়ে কাহারও সহিত আলোচনা করিতে অপরিচয়ের লজ্জাও তাহাকে কখন বাধা দিতে পারে নাই। এই বয়সে নিজের স্কুলপাঠ্য বিষয় ছাড়িয়া দিলেও, অনেক বিষয়ের আলোচনা সে করিয়াছে। পাঠ্য অপাঠ্য যেখানে যা পায়, সবই সে নির্ব্বিচারে পড়িয়া থাকে। এইজন্য সহপাঠীর চেয়ে মাষ্টারদের সহিতই তাহার ঘনিষ্ঠতা অধিক। কিন্তু আজ আর কিছুতেই তাহার মুখ খুলিল না।

সন্ধ্যার পর সবাই যখন চলিয়া আসিল, উত্তেজনা ও ব্যথায় পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া সেও সেই সঙ্গে ঘরে ফিরিল। যেমন অনেকবারই ঘটিয়াছে—মনোরমা ছেলের প্রতীক্ষায় দ্বারের নিকট অপেক্ষা করিতেছিল। ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে "এত রাত যে অজু" বলিতে বলিতেই নিঃশব্দে অজিত আসিয়া একেবারে মায়ের কোল ঘেঁসিয়া বুকে মুখ গুঁজিল। এ ঘটনা নূতন। মায়ের কণ্ঠস্বরের অতটুকু উচ্চ গ্রামও আর কখনও অজিতকে এমন করিয়া মায়ের বুকের মধ্যে টানিয়া আনে নাই। ভয়ে এবং তদপেক্ষাও শতগুণ অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া, অপরাধী বালক পাথরের মূর্ত্তির মত কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। শেষকালে সেই মাকেই আবার কঠোরতার খোলসখানা খুলিয়া ফেলিয়া, অজস্র আদরের ধারা ঢালিয়া দিয়া, তবে অভিমানীর অভিমান-বেদনা ঘুচাইয়া তাহাকে কোলে পাইয়াছে। আজ এই চিরন্তন রীতির বর্যতিক্রমে মনোরমা ঈষৎ বিস্মিত হইয়া গেল; এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার আশ্চর্য্যাভিভূত চিত্ত অনুভব করিল যে, অজিতের নিঃশব্দ রোদন তাহার বুকের বসন ভিজাইয়া, বক্ষস্থলে অশ্রুজলের উৎস উৎসারিত করিয়া দিয়াছে। এ কান্নায় যে অনুতপ্ত লজ্জা ব্যতীত আরও অনেকখানি কোনকিছু মিশ্রিত রহিয়াছিল, মায়ের প্রাণ তৎক্ষণাৎই ইহা অনুভব করিতে পারিল। বড় দুঃখ না হইলে সে তো কখনও মার বুকে আসিয়া পড়িয়া এমন করিয়া কাঁদে না! কিসের এ কষ্ট? এ প্রশ্ন মনের ভিতরে শতসহস্রবার জাগিয়া উঠিতে থাকিলেও, মা ইহাকে মুখে ফুটিতে দিল না। সুগভীর স্নেহভরে শুধু ব্যথিতের ব্যথাভরা বুকখানি নিজের সর্ব্বসন্তাপহরা মাতৃ-হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল।

হঠাৎ এক সময়ে মনোরমা লক্ষ্য করিল, অজিতের মুখখানা বড় বিমর্ষ। সেই পূর্ব্ব সন্ধ্যা হইতেই তাহার মুখের কথা কদাচিৎ শুনা গিয়াছে। সে যেন কি একটা বাল-স্বভাব বহির্ভূত নিগূঢ় চিন্তায় ডুবিয়া রহিয়াছিল, এবং সেই দুশ্চিন্তার ফলে, থাকিয়া থাকিয়া, তাহার দুইটি প্রতিভা সমুজ্জ্বল আয়ত চক্ষু বেদনাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কিসের এ চিন্তা? এ পৃথিবীতে দুঃখ এবং চিন্তার বিষয় এ বালকটির জন্য একটুখানি অধিক পরিমাণেই জমা করা আছে সত্য, কিন্তু সেগুলাকে উপভোগ করিবার কাল তো এখনও উপস্থিত হয় নাই! অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের মধ্যে সে অবসর অদূর-ভবিষ্যতে সুপ্রচুর সঞ্চিত আছে,—থাক না! যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা ত এক দিন দেখা দিবেই, ঠেকাইবে কে? তাহাকে পাওয়ার জন্য এ অকাল-বোধন কেন? যে ক'টা দিন ইহার বাহিরে-বাহিরে কাটিয়া যায়, সেই কয়টা দিনই শুভ দিন।

স্কুলের সেদিন ছুটী। ভাত খাইয়া উঠিয়াই, যেন সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া, হঠাৎ অজিত মায়ের চাবিশুদ্ধ আঁচলখানা ধরিয়া ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "মা, আমি তোমার চাবিটা একবার নিয়ে যাচ্চি।" "চাবি কি করবি?" "আমার দরকার আছে।" বলিয়া অজিত নিজের দিকে টান দিল। "না—না, চাবি খুলে এখন সৃষ্টি ছড়াতে হবে না।" বলিয়া মনোরমা বাঁ হাত দিয়া আঁচলটা টানিয়া লইতে গেল। ছেলেকে খাওয়ান শেষ হইবার পর তখনও তাহার হাত ধোওয়া হয় নাই। "একবারটি দাও মা, আমি তোমার কিছু ছড়াব না—" বলিতে-বলিতেই অজিত মায়ের আঁচল জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়াই, সহসা অশ্রু স্পন্দিত চোখে মুখ ফিরাইল। অন্য দিন হইলে এতটুকুতেই অভিমানে ভরিয়া গিয়া মাকে ছাড়িয়া দিত। আজ তাহা করিল না; বরং সেইরূপ মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া, ধরা গলায় আবার বলিল, "আমার যে বড্ড দরকার।"

ছেলের সেই বর্ষণোন্মুখ শারদ-মেঘের মত রোদন-ভারাতুর মুখের দিকে আবার কিছুক্ষণ বিস্ময়-স্তম্ভিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া, মনোরমা নিজের হাতে চাবির গোছাটা খুলিয়া লইয়া তাহাকে দিতে, সে তৎক্ষণাৎ, যেন কি নিধি পাইয়াছে, এমনি করিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল। তখন তাহার মুখের মেঘে বিদ্যুতের আলো খেলা করিতেছিল।

(১৭)

মনোরমার বাক্সের মধ্যে তাহার স্বামী অরবিন্দের একখানি ফটোগ্রাফ ছিল। বর-বেশে নয়,—বিবাহের পর বি এ ডিগ্রি লইবার জন্য কনভোকেশনে যাত্রাকালে ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সময়োচিত বেশে এ ফটোখানা লওয়া হয়। অন্য কোন ভাল ছবি হাতে না থাকায়, 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদেৎ' এই বিধির অনুসরণে অরবিন্দ তাহাকে সেইখানাই দিয়াছিল। অবশ্য আর এক খানা ভাল ছবি শীঘ্র দিবার প্রতিশ্রুতি থাকিলেও, সেখানা যখন আর দেওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, তখন এ জন্মের জন্য এই মন্দ ছবিখানাই মনোরমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন না হইয়া আর গত্যন্তর কি? কাজে-কাজেই সে ইহাকে খুবই যত্ন-সন্তর্পণে মুড়িয়া শুড়িয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়াছিল, এবং অবসর-মত ফিরিয়া-ফিরিয়া দেখিতেও ছাড়িত না। শুধু নিজে দেখিয়াও তৃপ্তি নাই। ছেলে তার অত্যন্ত শৈশব হইতেই নিজ পিতার এই প্রতিকৃতিটুকু দেখিয়া থাকিবে—না হোক তা হাজারবারের একবারও কম নয়। আজ যখন নিজের চোখের দৃষ্টি দিয়াও সে পিতৃ-পরিচয় লাভ করিতে পারিল না, তখন সে অক্ষমতার অকথ্য লজ্জায় তাহার শিশু চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ছি—ছি—ছি! এ ঘৃণার কথা যদি অপরে জানিতে পারে? ছেলে হইয়া নিজের বাপকে চিনিতে পারে না, সে আবার ছেলে কি? মায়ের 'পরে অভিমান হইল, মা কেন তাহাকে ভাল করিয়া বলিয়া দেন নাই। নিজের 'পরে রাগ ধরিল, পিতাকে না দেখুক,—সে তো তাঁহার ছবি দেখিয়াছে,—তবে তাঁর চেহারাটা মনে থাকে না কেন? এই এতগুলি লোকের মধ্যে অরবিন্দ বসু কোন্ জন,—কেহ না বলিয়া দিলে আপনা হইতে তাহার যদি চিনিবার উপায় থাকিত, যদি উনিও তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিতেন, তাহা হইলে কেমন সুখ হইত! ট্রেণ হইতে নামিলেই সে ছুটিয়া গিয়া উঁহার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিত। তিনিও তা' হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া চুমা খাইতেন। আচ্ছা, কোথায় চুমা খাইতেন? অন্য সবারই মত মাথার চুলের উপর? না, মার মত গালে, ঠোঁটে, কপালে? না, মাথায় নয়,—হয় ত দু'গালেই চুমা লইয়া আদর করিতেন।

পতার সেই বেগবান স্নেহাতুর অন্তরের আবেগ-ধুর আদর-কল্পনায় শিশু অজিত একান্ত লোভাকুল হইয়া উঠিতে থাকিলেও, নিরুপায়ের ব্যথায় বুক তাহার ভারি হইয়া রহিল। সে তো চেনে না,—এই সম্মানিত রাজ অতিথি-বর্গের মধ্যে কে অরবিন্দ বসু,—কে তাহার পিতা?

মায়ের বাক্সের চাবি পাওয়াতে সকল সংশয় ঘুচিয়াছে মনে করিয়া, আনন্দ-ব্যগ্রতায় আত্ম-বিস্মৃত বালক উচ্চ আনন্দধ্বনি করিয়া তীরবেগে ছুটিল। মায়ের সেই ছবিখানা একবার দেখিয়া লইতে পারিলেই তাহার সন্দেহের অবসান হইয়া যায়; তখন তো আর পিতা পুত্রের মাঝখানে পরিচয়ের ব্যবধান থাকিবে না! কিন্তু এ আবার কি বিড়ম্বনা! ওই নবোদ্গত গুম্ফযুক্ত সরস-মধুর হাস্য মণ্ডিত তরুণ মুখের প্রতিকৃতির সহিত সংসারের ঘাত প্রতিঘাতাহত সেই সব তারুণ্যবিহীন বাস্তব মূর্ত্তির কতমেরও যে এতটুকু সাদৃশ্য পাওয়া যায় না! এই স্নেহ-গভীর আনন্দ-গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টিই বা কোথায়? অজিত ছবি হাতে করিয়া হতভম্ব হইয়া রহিল। কাল হইতে বড় হতাশ্বাসের মধ্যেও যে এই আশাকেই সে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া রাখিয়াছিল! আজ বাক্সের কলে চাবি লাগাইবার সময়েও তাহার ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডটা এই আনন্দের বেগেই স্পন্দিত হইতেছিল যে, নিশ্চয়ই আজ বৈকালে সে তাহার চির-ঈপ্সিত পিতার অঙ্কে স্থান লাভ করিবে।

মনোরমা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলেও, ছেলেকে ধ্যানী বুদ্ধের ন্যায় দুই হাত কোলে রাখিয়া, চুপ করিয়া মাটিতে জুড়াইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, সশব্দে হাসিয়া ফেলিল। সেই শব্দে সচকিত হইয়া, হাতের ছবিখানা কাপড়ের মধ্যে গোপন করিয়া ফেলিতে গিয়া, অজিত যখন মায়ের দিকে মুখ তুলিল, তখন আর একবার সে মুখের বিষণ্ণ ছবি মনোরমাকে অবাক করিয়া দিল; এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গেই সেই গোপনীয় পদার্থটা চোখে পড়িয়া গিয়া, তাহার নিকট হইতে সকল রহস্যেরই যবনিকা খসিয়া পড়িল। যাহা স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক,—এ তাহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। হয়ত কাহারও নিকট কোন কথা শুনিয়া,—অথবা না শুনিয়াও হইতে পারে,—বাপের জন্য তাহার মনের মধ্যে একটা আবেগ উঠিয়াছে। ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? অজু তো আর বোকা ছেলে নয়,—বয়সের চেয়ে বুদ্ধি তাহার ঢের বেশি। তাহাদের পিতা পুত্র সম্বন্ধের মাঝখানে যে কোথাও একটা গলদ্ আছে, এই সত্যটুকু ইহারই ভিতর সে বুঝিতে পারিয়া, মার মনে কষ্ট দিবার ভয়ে মায়ের কাছে এসব কথার উল্লেখ করে নাই; সঙ্গোপনেই নিজের মানসিক তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। কিন্তু এরই মধ্যে সে মাকে এতখানিতে শিখিল কেমন করিয়া? এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তড়িৎ-স্রোতের মত এই কথাগুলা মনোরমার মনের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিয়া, কাল হইতে ক্লিষ্ট পুত্রের অন্তরের সমস্ত ক্লেশদাহ যেন তাহাকে বিছার মত কামড়াইয়া ধরিল। আহা, সে কেন মার কাছে গোপন করিয়া এতক্ষণ ধরিয়া দুঃখ পাইল? মনো কেন আপনা হইতে আন্দাজ করিয়া, নিজের ছেলের দুঃখ মন দিয়া বুঝিতে পারিল না! এই রকম সে মা'ও বসিয়া পড়িয়া, ছেলেকে কোলের উপর পায় টানিয়া লইয়া, তাহার মুখে মাথায় হাত দিয়া আদরের সহিত বলিল, "আমায় লুকুলি কেন অজু?"

অজিত তখন বড় লজ্জা পাইয়াছে; কিন্তু মার কাছে কথা গোপন করা যে তাহার জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম। এতক্ষণে সে লুকোচুরি কাটিয়া যাওয়াতে, তাহার ক্ষুদ্র চিত্তের বিষম ভারও সেই সঙ্গে সম পরিমাণেই লঘু হইয়া গিয়াছিল। মায়ের স্পর্শমধ্যে নিজেকে এতটুকু ছোট শিশুটির মতই নিঃসহায়ে নিক্ষেপ করিয়া, লজ্জায় একটুখানি চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিবার পর, হঠাৎ কি ভাবিয়া উঠিয়া বসিল; এবং কাপড়ের মধ্য হইতে ছবিখানা বাহির করিয়া মায়ের চোখের সামনে ধরিয়া দিয়া কহিয়া উঠিল, "এই ছবির মুখ থেকে সত্যিকারের বাবার মুখ কেমন করে চিনতে পারা যাবে বল দেখিন? তুমিই দেখ না,—একটুকুও তো মিল নেই।" প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়া, শেষে ঈষৎমাত্র বিমর্ষ হাস্যের সহিত মাতা জিজ্ঞাসা করিল, "মিল নেই তুই কি করে জানলি রে?"

অজিত কুঞ্চিতালকযুক্ত ক্ষুদ্র মাথাটি নাড়া দিয়া জবাব করিল, "সে আমি জানি গো জানি। কাল বুঝি আমি সাহিত্যিকদের অভ্যর্থনা করে আনতে ষ্টেসনে যাইনি, তুমি ভেবে রেখেছ? তা'লে শুধু-শুধু আমার বাড়ী ফিরতে অত দেরি হলো কেন বলো তো?" "কাদের আনতে কোথায় গেছলি?" "সাহিত্যিকদের আনতে ষ্টেসনে

গেছলুম !” “তার সঙ্গে এ ছবির সঙ্গে কি ?” “বাঃ, ছবি না দেখলে আমি বাবাকে কেমন করে চিনতে পার্কো ? আমি বুঝি তাঁকে কক্ষনো দেখেছি ? তোমার কিছুই মনে থাকে না মা। সেই সেবারে ঠাকুরদাদা মশাই স্বর্গলাভ কর্বার পর, বাবা এসে আমাদের নিয়ে যেতেন,—তা তাঁর খুব অনেক কাজ ছিল বলে তো আর আসতে পারেন নি। সেই জন্যেই তো তাঁকে আমি কাল ষ্টেসনে চিন্‌তে পারলুম না। আর তিনিও ”

আপনার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বলা যায় না, অজিতের কপালের উপর মনোরমার অঙ্গুলিগুলা নিজেদের মৃদু ক্রীড়াশীল গতি সহসাই পরিত্যাগ করিয়া, বিস্ময়ে অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর, তাহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া বাহির হইল, “কাকে ষ্টেসনে দেখে তুই চিন্‌তে পারলি নে অজু ? কে এসেছে ?” “কেন, বাবা বুঝি রাজার বাড়ী আসেন নি ? তিনি বুঝি একজন সাহিত্যিক ন'ন ? রাজার সঙ্গে যে তাঁর ভাব আছে। তুমি কিচ্ছু জানো না মা !”

সেখানকার হাত সেইখানেই স্থির রাখিয়া মনোরমা জড়বৎ বসিয়া রহিল। ছেলের এই ছেলেমানুষী কথায় হাসিবে কাঁদিবে কি,—সে কথা কয়টা তাহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে পৌঁছিতেও হয় ত বা পারে নাই। অজিত কাঁচ ছেলে,—সে অত শত বুঝে না,—আপন মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল, “বাবা না কি অমৃতবাজারে, বেঙ্গলীতে ইংরেজী প্রবন্ধ, আর প্রদীপ, ভারতী আরও কিসে-কিসে কবিতা লিখে থাকেন, সে সব না কি খুব ভাল হয়। আমি কিন্তু কিছু পড়িনি, তুমি পড়েছ মা ?” মাতাকে নীরব দেখিয়া আপনিই আপনার জিজ্ঞাসার সমাধান করিয়া লইল। “কেমন করে পড়বে, ও-সব মাসিক পত্রিকা টত্রিকা কিচ্ছুই তো আমাদের আসে না। হাঁ মা, আমাদের ওগুলো এইবার থেকে নিতে হবে মা,—বাবার লেখা পড়তে আমার বড্ড ইচ্ছে করছে। বাবাকে যদি চিন্‌তে পারি, আমি তাঁকে তাঁর পুরনো লেখাগুলো আমায় দিতে বল্‌বো,—কেমন মা ? বাবা নিশ্চয় দেবেন,—হাঁ মা, দেবেন না ?”

মনোরমা এতক্ষণ পরে যেন ধ্যান ভাঙ্গিয়া উঠিয়া জবাব দিল “কি ?” অজিতের শেষ কথাটামাত্র তাহার কাণে ঢুকিয়াছিল। “পুরনো লেখাগুলো।” “কে কাকে দেবে রে ?” “বাঃ, তুমি বুঝি এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলে ? বাবার পুরনো লেখাগুলো চাইলে বাবা আমায় দেবেন না ?”

“হুঁ, অজিত !” মায়ের গলার স্বরে নিজের অনভিজ্ঞ শিশুত্ব সত্ত্বেও অজিতের বুকের মধ্যে যেন তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে একটা বিস্ময়ের চমক তড়িতের মত বহিয়া গেল। সে মায়ের মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “উঁ”। “তিনি সত্যি এখানে এসেছেন ? তুই ঠিক জান্‌তে পেরেছিস ?” “কে মা ? কে' মা ?”

মনোরমা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া বলিল, “কি মুখ্যু ছেলে তুই ! এই যে বল্লি তাঁকে চিন্‌তে পারলিনে, আবার এরই মধ্যে সব ভুলে খেয়ে ফেলেছ !”

“বাবার কথা বলছো ? হাঁ—হাঁ, তিনি এসেছেনই তো। আরও অনেক লোক তাঁর সঙ্গে এসেছে কি না, তাই জন্যে হয় ত আমাদের বাড়ী আসতে পারেন নি। তিনি যদি একলা থাকতেন, আমি তাঁকে ঠিক চিন্‌তে পারতুম। মা, তুমি ওঁকে দেখলে চিন্‌তে পার্ব্বে না, পার্ব্বে না ! এই যে তোমার ছবিটি দেখছো, এটি থেকে যে তুমি তাঁকে চিনে ফেলবে, সেটি কিন্তু মনেও করো না। বোধ করি এই বিশ্রী ক্যাপটা পরার জন্য মুখটা একেবারে অন্য রকম হয়ে গ্যাছে।”

মনোরমার অসীম ধৈর্য্য আকস্মিক প্রচুর বর্ষাবারি প্রাপ্ত ক্ষুদ্র তটিনীর মতই বিপর্য্যস্ত হইতে বসিয়াছিল। সেই আবেগে ভাসিয়া গিয়া, সহসা দুই ব্যগ্র করে সে অজিতকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া, রুদ্ধ ব্যাকুল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “আমায় কি একটি বারের জন্যেও দেখাতে পারিস রে অজিত ! এত কাছে রয়েছেন, একবার আমায় দেখা।”

“তুমি ! তুমি কেমন করে দেখতে যাবে মা ? সেখানে যে অনেক সব লোকজন রয়েছে, তুমি তাদের সাম্‌নে কি করে বার হবে ?”

মনোরমার মুখে মুমূর্ষু রোগীর শেষ পিপাসার অনিবার্য্য তৃষ্ণা-কাতরতা যেন মূর্ত্তিমৎ হইয়া উঠিল। জোর করিয়া ছেলের দু'হাত নিজের দু'হাতের মুঠা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া, সে যেন প্রাণপণ শক্তি খরচ করিয়া এক নিঃশ্বাসেই বলিয়া ফেলিল, “যে ক'রে হয় নিয়ে যা অজু। বড় হয়েছিস, বুদ্ধি

.. কর। যুগ-যুগান্তর হয়ে গেল আমি যে দেখিনি! কাছে ..য়েও যে সেবারকার সে দিন আমার বার্থ চলে গেছে।"

মাকে কোন দিন সত্যকার রাগ করিতে, বা এমন ..জনার সহিত কথা কহিতে, বা এভাবে নিজের অন্তঃস্তল-..ী সযত্ন-রুদ্ধ নিজের আত্মবেদনা প্রকাশ করিয়া ..কেও জানাইতে অজিত আজ পর্য্যন্ত দেখে নাই। .. সবটা বেশ তলাইয়া না বুঝিলেও, মায়ের উদ্বেলিত ..র বার্ত্তা তাঁহার এই আকুল কণ্ঠস্বরে সে যেন কিছু ..ছু অনুভব করিতে পারিল। স্তব্ধ হইয়া ক্ষণেক কি ..বিয়া লইয়া আকস্মিক শিশুজনোচিত আশ্বাস ভরা বুকে .. ফুলিতেই, মায়ের দুই মিনতি-ভরা উদ্বিগ্ন চোখের সহিত ..ার উৎসাহিত দৃষ্টি সম্মিলিত হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ ..সিয়া ফেলিয়া, মায়ের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাত ..ড়াইয়া লইয়া, দুই হাতে মায়ের গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া, ..মুখ হাসির সহিত পূর্ণোৎসাহে কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা মা, ..ক আমি তাঁকে তোমায় দেখাব।"

মনোরমার কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা অস্ফুট আনন্দ-নির্গমত নির্গত হইল, "দেখাবি,—কেমন করে দেখাবি ..?" "সে আমি এখন কিন্তু বল্‌চিনে,—তোমায় ..খালেই তো হলো। দিদিমা-মণিকেও বলো না মা, দেখা যাবে তিনিও ওঁকে দেখে কেমন চিন্‌তে পারেন। বলো মা?"

অজিতের চেয়েও কম বয়সের বালিকাটির মতই এই ..শ্বাসে পরম আশ্বস্তা হইয়া মনোরমা ছেলেকে বুকে বাঁধিয়া ..নকগুলা চুমা খাইল। তার পর মানসিক আনন্দে পরিপূর্ণ, ..ভার হইয়া কোন্ সময়টায় যে সে আত্মচিন্তায় তন্ময় হইয়া ..ল যে, অজিত তাহাকে হঠাৎ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও, সে ..াব সে দিন তাহার অনুভূতির কাছে আত্মপ্রকাশ ..রতেও পারিল না। শুধু তাহার সমুদয় অন্তঃকরণটা ..ড়িয়া এই একটামাত্র সুর বাজিয়া চলিল যে, সে আবার ..খবে। যাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চিত্ত তাহার জলধারা-কাঙ্ক্ষী চাতকেরই মত পিপাসা-দীর্ণ হইয়া আছে, অথচ ..ার দর্শন-লাভাশা বারি-প্রয়াসী চাতকের অপেক্ষাও তাহার .. সুদূর-পরাহত, সেই তাঁহাকেই সে আবার দেখিবে। ..ও আনন্দ যে, এই অপ্রত্যাশিত সম্মিলনের উত্তর-সাধক ..দেরই আত্মজ—যার দ্বারা, এত বড় ব্যবধান সত্ত্বেও, আজও সে মনে-প্রাণে, এবং বাহিরেও, তাঁহার পর হইয়া যায় নাই।

(১৮)

অজিত কিন্তু এই কাজটাকে যতটা সহজ মনে করিয়া মাকে আশ্বস্ত করিয়া আসিয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে গিয়া বুঝিতে পারিল, তাহা তেমন সুসাধ্য নয়। সাহিত্যারথীদিগের মধ্যে সবচেয়ে যাহাকে দেখিতে ভাল, বয়সটা আবার তাহারই সবার চাইতেই কম; আনুমানিক বোধ করি বাইশ-তেইশের বেশি উৰ্দ্ধে উঠিবে না। অজিতের বয়স যদি এগারো না হইয়া অন্ততঃ পনেরোও হইত, তাহা হইলে যে সন্দেহটা তাহারি মনের একটা কোণকেও স্পর্শ করিত না,—এই কয়েকটা বছর পিছাইয়া থাকায়, সেই বিষয়েরই অসঙ্গতি তাহার শিশু চিত্তকে অন্ধ করিয়া বুঝিতেও দিল না। মায়ের মুখের বর্ণনায় এবং নিজের মনের ভক্তি কল্পনায় মিশাইয়া পিতার যে আদর্শটা মানস-ফলকে চিহ্নিত ছিল, কবিজনোচিত এই শুভ-দর্শন তরুণ ব্যক্তিটির সহিত ইহার সঙ্গতি বোধ হইতেই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেল। আর তো কোন একজনকেও অরবিন্দ বসু মহাশয়ের যোগ্য বিবেচিত হইল না; অতএব ইহার সহিত পরিচিত হইতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধি।

অজিত ইহার কাছে কাছে ঘুরিয়াও, যখন কোন রকমে এই চশমাধারী নরটির চোখ দুটিকে তাহার নিজের দিকে ফিরাইতে সমর্থ না হইয়া, যৎপরোনাস্তি হতাশ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, ঠিক এমনি সময় সাহিত্যিক-বৃন্দের একতম সেই সাহিত্যিক রত্নটির দৃষ্টি কল্পনা-জগৎ ভেদ করিয়া, কেমন করিয়া বলা যায় না,—বোধ করি অজিতেরই তপস্যার ফলে, হঠাৎ তাহার 'পরেই পতিত হইল। লোকটি হয় ত বা মনে-প্রাণে পূরা সাহিত্যিক ন'ন; সংসারের ছোট-খাট দৃশ্যগুলাকে এখনও বাস্তব হিসাবে না দেখিয়া, কবিত্ব-মণ্ডিত করিয়া দেখিতে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হন নাই। অজিতের ত্রস্ত হরিণের মত ব্যস্ত-ব্যাকুল দৃষ্টিটুকু কে জানে কেমন করিয়া ইহার মনকে আকৃষ্ট করিল। "কি তোমরা বারণ্‌সের কবিতা নিয়ে মাথা ঘোরাচ্ছো! তার চেয়ে এসো না কেন, এই ফুট্‌ফুটে ছেলেটার সঙ্গে একটু আলাপ করে ফেলা যাক। ওহে! কি তোমার নাম বলো তো? কাছে এসো না! তোমায়

আজ সারাদিনই যেন মধ্যে-মধ্যে দেখেছি, মনে পড়ছে যে! কাছেই তোমার বাড়ী বুঝি? কোন্ ক্লাসে পড়ো তুমি?"

অজিতের কপালে, চিবুকে মুক্তা পংক্তির মত ঘর্ম ফুটিয়া উঠিল। স্পন্দিত বক্ষে ঘরে ঢুকিয়া, প্রশ্নকারীর নিকটে সঙ্কুচিত পদে আসিয়া দাঁড়াইতেই, তাহার এতটুক ছোট বুক খানির ভিতরে আশা-আশ্বাস-ভরা পুলকের বিপুলতর স্পন্দন উদ্দাম হইয়া উঠিল। একেবারেই "বাবা!" বলিয়া ডাকিয়া উঠিয়া, ছুটিয়া গিয়া প্রশ্নকারীর কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া উঠিয়াও, সে এত লোকের সম্মুখে এ রকম ছেলেমানুষীর প্রশ্রয় নিজেকে কোনমতেই দিতে পারিল না।" হর্ষোচ্ছ্বাস-কম্পিত মৃদু-মন্দ স্বরে প্রশ্ন কয়টার উত্তর প্রদান করিয়া, সবশেষে নিজের নামটা বলিল—শ্রীঅজিতকুমার বসু।

কিন্তু বলা শেষে সগভীর বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, এ নাম শুনার পরও শ্রোতার মুখে চোখে কোনই ভাব-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না, এবং তিনি নিজেও যথাপূর্ব্ব ঠিক তেমনি করিয়াই, সেই আরাম-কেদারার সুখশয্যায় অর্দ্ধশয়ান রহিয়াই, অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে শূন্যে চাহিয়া সিগারের ধূম নিঃসরণেই নিরত রহিলেন। ক্ষণেকের জন্য ঘোর অভিমানে অজিতের বুক ভরিয়া উঠিয়া তাহাকে পিছন ফিরাইতে চাহিতেই, আবার একটা প্রশ্ন শুনা গেল, "এইটুক ছেলে তুমি, এরই মধ্যে থার্ড ক্লাসে পড়চো? ক'বছর বয়েস তোমার?" অজিত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, সজল, নত চক্ষে, গাঢ়-স্বরে জবাব দিল, "দশ।" "অ্যা, বলো কি! মোটে দশ বছর! বাহাদুর ছেলে তো তুমি! তুমিই তোমাদের স্কুলের ফার্ষ্ট বয় বোধ হয়, না?" "হুঁ।" "যাচ্ছো কেন, এসো না, একটু গল্প করি। আচ্ছা, এখানের রাজবাড়ী, শ্যামসায়র… …ছাড়া আর কি-কি দেখাবার মতন আছে বলো দেখি?" অজিত এবারে ফিরিয়া আসিয়া, হাসি মুখে একটা খালি চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া, নিজের অভিজ্ঞতা-মত এই নব-পরিচিতের সহিত শুধু ওই বিষয়েরই নয়, আরও অনেক বিষয়েরই আলোচনা সুরু করিয়া দিল। এবং সে দিন যখন বাড়ী ফিরিল, তখন এই অজ্ঞাতনামা লোকটির উদ্দেশে চির-সঞ্চিত সমুদয় পিতৃবৎসলতাই উজাড় করিয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। সেও যে কিছু কম পাইয়াছে, এমনও সন্দেহ তাহার মনে ক্ষণেকের জন্যও উদয় হয় নাই। তবে ইহাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া পড়িবার পর, উভয় পক্ষের একটা মস্ত ত্রুটির কথা ক্রমাগতই মনে হইয়া, তাহার চিত্তেও একটু অস্বস্তির সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিল। এই নব-পরিচিত সব কথাই কহিলেন,—শুধু তাহার পিতৃ-পরিচয়টুকুই জানিতে চাহিলেন না। ঐটুকু করিলেই তো এতক্ষণে সে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই বাড়ী যাইতে পারিত। আর সেই বা কেমন ছেলে। উনি না হয় ও-কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়াই গিয়াছেন; বোধ হয় ওঁর সব কথা মনে থাকে না,—তা না হইলে, অজিতের নাম শুনিয়াই বা তাহাকে চিনিতে পারিলেন না কেন? আর, মায়ের কথাও তো কই কিছু বলিলেন না,— বা ওখানে আসিতেও চাহিলেন না। কবিদের না কি সংসারের কথায় বেশি ভুল হয়। তা' অজিতও তো নিজে হইতেই বলিতে পারিত যে, তাহার পিতার অমুক নাম, এবং পিতামহেরও—হাঁ, তা' হইলে নিশ্চয়ই তিনি তখন চিনিতে পারিয়া কত খুসী হইতেন। বুদ্ধিমান বলিয়া এইমাত্র তারিফ করিয়া যিনি বিদায় দিলেন,—যখন তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার এত বড় পরিচয় পাইবেন, তখন সেই তিনিই না জানি তাহাকে কত বড় বোকা মনে করিবেন!

বাড়ী আসিয়া লজ্জায় মাকে সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। কেমন করিয়া বলিবে, যে, সব ঠিক হইয়াও শুধু নিজের বোকামির দোষে সে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারে নাই। মার সহিত দেখা হইলে সে চোরের মত সঙ্কুচিত হইয়া রহিল। কিন্তু ইহাতেও তাহার বিস্ময়ানুভব হইল যে, মাও তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না, বা জিজ্ঞাসা করিলেন না। অজিত আড়-চোখে মায়ের মুখখানা দেখিয়া লইল। মুখখানার ভাব কেমন যেন মেঘ-চাপা আকাশের মত। ভাল করিয়া ভিতরের ব্যাপার বুঝা যায় না। ছেলের কাছে ছেলেমানুষী করিয়া ফেলার লজ্জাকে, সে নিজের অক্ষমতায় মায়ের বিরক্তি মনে করিয়া, ভয়ে-লজ্জায় শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল; এবং বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত না-হোক পঞ্চাশবারও মনে-মনে শপথ করিয়া রাখিল যে, আগামী কল্য সকাল-বেলাই উঠিয়া গিয়া, সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাতেই সে তাঁহাকে, এত-টুকু সঙ্কোচ পর্য্যন্ত না করিয়াই, জানাইয়া দিবে যে, তাহার

পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু অরবিন্দ বসু মহাশয় ; পিতামহ ৺মৃত্যুঞ্জয় বসু মহাশয়।

পর দিন প্রাতে হামিদ আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল, বাড়ীতে অসুখ, ডাক্তার ডাকিয়া দিতে হইবে। ডাক্তার যদি আসিল তো প্রেস্‌ক্রিপসন লইয়া ডাক্তারখানায় কে যায়? এসব কাজ হাতে আসিলে আর কোন কথা অজিতের মনে থাকে না। ঔষধ লইয়া ফিরিতে বেলা প্রায় বারটা বাজিল। তখন বাড়ী না ফিরিলেই নয়।

বৈকালে গিয়া অজিত দেখিল, মোটঘাট সব বাঁধা, বিছানা ও চামড়ার ব্যাগ কয়টা গাড়ির মাথায় চাপানো। সাহিত্যরথী-বৃন্দের মধ্যে কেহ-কেহ ইতঃমধ্যেই রথারূঢ় হইয়াছেন। দু'চারিজন শৈথিল্যবশতঃ তখন আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। এ দৃশ্য দর্শনে অজিতের ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডটা সবেগে লাফাইয়া উঠিল। ওরে নির্ব্বোধ! ওরে নির্ব্বোধ! এ কি করিয়া ফেলিলি রে! এ কি হইয়া গেল! সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে ক্ষণকাল রাস্তার মাঝখানেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পরমুহূর্ত্তে প্রায় ছুটিয়া গাড়িগুলার কাছে আসিয়া, চঞ্চল কটাক্ষে উহাদের অভ্যন্তরভাগ দেখিয়া লইল। কই, কোথায় তাহার সেই ঈপ্সিত মুখ? তিনি তো ইহার মধ্যে নাই! তবে কি তাঁহার আসার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন? আর একবার কি দেখাও হইল না! সে কে সে কথা তিনি একবার জানিয়াও যাইতে পারিলেন না। 'বুদ্ধিমান ছেলে' বলিয়া যে তাহাকে তিনি তারিফ করিয়াছিলেন, অথচ সেই সে এতবড় বোকা! তাঁহাকে কোন কথা একবার জানিতেও দিল না!

"ওহে! তোমরা যে মেয়েদেরও ছাড়ালে দেখ্‌ছি। বেরুবার বারই যে হয় না।" "নাঃ! এই যে এলাম বলে।" জানালা দিয়া এই কথা বলার পর জন-দুই-তিন সাহিত্যিক সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ইহাদের একজনের উপর চোখের দৃষ্টি পড়িতেই, অজিতের মুখ দিয়া একটা আনন্দধ্বনি নিঃসৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। এ কার্য্য করিতে তাহার তখন কিছুমাত্র দ্বিধা বা লজ্জার কারণ বর্ত্তমান থাকা সম্ভব বলিয়াও মনে পড়ে নাই। হাত ধরিয়াই সে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "আমি অজিতকুমার বসু। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু মহাশয় আমার বাবার নাম।" "বটে, অরবিন্দ বসু তোমার বাবা! কোন্ অরবিন্দ বোস হে? এইখানেই তিনি থাকেন তো?"

বিস্ফারিত নেত্রে প্রশ্নকর্ত্তার মুখে চাহিয়া, সাশ্চর্য্যে অজিত কহিল, "বাবা কল্‌কেতায় থাকেন, তিনি কবি।" "অরু বোসের ছেলে তুমি? তা' এতদিন বলোনি কেন? অরুকে আমি বেশ জানি। মধ্যে-মধ্যে দেখা হয় তার সঙ্গে। আচ্ছা, এবার দেখা হ'লে তাকে তোমার কথা বল্‌বো'খন। তুমি--"

"ওহে সুজন! তোমার বাৎসল্যরসে এখন চাপা দিয়ে ফেল, ট্রেণটা দেখ্‌ছি নেহাৎই ফেল্ করাবে।"

অজিতের বন্ধু অজিতের হাতখানায় একটুখানি নাড়া দিয়া, স্নেহস্মিত-হাস্যে আকস্মিক রাহুগ্রাসে নিপতিত পূর্ণচন্দ্রের মত মুখখানার দিকে বারেক তাকাইয়া ব্যস্তভাবে গাড়ীর দরজা টানিয়া তন্মধ্যে উঠিয়া পড়িল; এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিয়া শকট-চালক গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। নির্ব্বাক বালক নির্নিমেষে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া অনেকেরই সন্দেহ ঘটিতে পারে যে, ঘোড়ার পিঠের সেই কষাটা ঘোড়ার পিঠে না পড়িয়া হয় ত বা তাহারই পিঠে পড়িয়াছে।

ছেলে মানুষ করা* (Child Welfare)

[শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্]

মায়েদের কাছে ছেলেদের কথা বলিতে চাই। "ছেলে" বলিলে, সেই সঙ্গে মেয়েকেও বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালীর কাছে ছেলের কথা সর্ব্বদাই প্রিয়। বাঙ্গালী মা শুধু মমতার দিক দিয়া ছেলেকে দেখেন না, তিনি ছেলেকে বংশধর মনে করেন। ছেলে শুধু নন্দের দুলাল নহে, ছেলে সৃষ্টিধর, স্বামীর বংশের গৌরব, দেশের ও দশের আদরের সামগ্রী। বাঙ্গালীর জীবনে, ইহলোকে ও পরলোকে, ছেলের মুখ তাকাইতে হয়।

ছেলেদের জন্য বাঙ্গালীর প্রাণ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিলেও, আমরা আমাদের ছেলেদের জন্য কি করি, বা কি করিতে পারি? নিজ নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যানুসারে সকল মাতাই ছেলের জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন বটে—কিন্তু তাহার ফল কতটা হয়, সেই কথা আজ আপনাদিগকে শুনাইব। কথাগুলি বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিবেন, কথাগুলির বিষয় ঘরে যাইয়া বারম্বার ভাবিবেন, এবং যতক্ষণ মনে মনে নিজে না খুসী হন, যে, আপনার নিজ বিশ্বাসমতে যথার্থ কায হইতেছে, ততক্ষণ এই কথাগুলি ভুলিবেন না। মনে রাখিবেন যে, আপনারা জননী—আপনারা আদ্যাশক্তি-রূপা, মা!

শিশু জীবনের সব-চেয়ে কঠিন সময়—প্রথম বারো মাস। এই বারো মাস পার হইতে না হইতেই, অনেক শিশু মারা পড়ে। আর এই বারো মাসের মধ্যেই ছেলেদের ব্যারাম খুব বেশী হয়। যদি এক হাজার সংখ্যার শিশু লওয়া যায়, তবে দেখা যায়, যে, লণ্ডনে এক বৎসরে ৮০টি শিশু মরে, আর সেই জায়গায় কলিকাতায় ২৫০ শিশু মারা পড়ে। অর্থাৎ, যদি এক বৎসরে কলিকাতায় দশ হাজার ছেলে জন্মায়, তাহার মধ্যে আড়াই হাজার শিশু মারা পড়ে—মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুরই কথা বলিতেছি। যদি প্রতি বৎসরে এই আড়াই হাজার শিশু রক্ষা পাইত, তবে বিশ বৎসরে পঞ্চাশ হাজার জোয়ান লোক আমরা পাইতাম। অতএব বৎসরে বৎসরে আমাদিগের দেশের ক্ষতি বড় সামান্য হয় না! কোন্ মাতা এ কথা শুনিয়া না শিহরিয়া উঠিবেন? যদি শুধু মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়াই সব গোল মিটিত, তাহা হইলেও কথা ছিল না; গড়পড়তা, যেখানে একটি করিয়া শিশু মরে, সেখানে দুইটি করিয়া রুগ্ন শিশু থাকিয়া যায়। অতএব,—বাঙ্গালাদেশে, প্রতি বৎসরে, এক বৎসরের কম-বয়স্ক হাজার শিশুর মধ্যে, ২৫০ শিশু মারা পড়ে, ৫০০ শিশু ব্যারামী থাকে, আর মোটে ২৫০ শিশু ভাল থাকে। স্নেহময়ী বঙ্গ-জননি, বুকে হাত দিয়া এই কথাগুলি শুনুন,—আর বুঝুন, আপনাদের হৃদয়ে কি ভীষণ আঘাত লাগিতেছে!

এত শিশু এ দেশে মারা পড়ে কেন? শিশু মড়কের কারণ প্রধানতঃ নয়টি। একে একে সেগুলির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া যাইব। কিন্তু সেগুলির উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, সাধারণ কথায়, গর্ভস্থ শিশু ও সদ্যঃপ্রসূত শিশুর মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা দেখাইয়া দিব। শিশু যখন গর্ভে বাস করে, তখন সর্ব্বদাই একই-উত্তাপ-বিশিষ্ট জলে ভাসিতে থাকে—সেখানে ঠাণ্ডা হইতে গরম, এ রকম হঠাৎ কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। পক্ষান্তরে জন্মকাল হইতেই আজ গ্রীষ্ম, কাল শীত, এবেলা ঠাণ্ডা, ওবেলা গরম—এই-রূপে ক্রমাগত শীতাতপের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। গর্ভে বাস-কালে, শিশুর দেহ সকল রকমেই সুরক্ষিত—সে যেন কেল্লার মধ্যে বাস করে; আর জন্ম হইলেই, মশা, মাছি, ব্যারাম, আঘাত লাগা প্রভৃতি কত রকমের উৎপাত সহ্য করিয়া শিশুকে প্রাণ ধারণ করিতে হয়। গর্ভে বাসকালে শিশুর ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, শিশুকে শ্বাস-প্রশ্বাস লইবার জন্য বা মলমূত্র ত্যাগের জন্য, কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না;—আর এ জগতে আসিয়াই, প্রথমে হাঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে হয়, তবে তাহার দম আসে। আর শুধু কি দম আসিলেই নিষ্কৃতি হয়? তাহা হয় না; আজ সর্দ্দি,

* কোনও মহিলা সমিতিতে পঠিত হইয়াছিল।

কাল কাশি, তার পরদিন গলাব্যথা, ডিফ্‌থিরিয়া—কত রকমেরই যন্ত্রণা তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে! এ জগতে আসিয়া তাহাকে ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করিতে হয়, সময়ে-অসময়ে, উপযুক্ত-অনুপযুক্ত, ঠাণ্ডা-গরম কত রকমেরই খাবার গিলিতে হয়—তাহার উপরে পেট কামড়ান, পেট ফাঁপা, উদরাময় প্রভৃতি কত উপসর্গ ই আছে! এই রকম, সকল দিকে, হঠাৎ, অতি বেশী রকমের পরিবর্ত্তনের ফলেই, প্রথম বৎসরের মধ্যেই, বেশী শিশু মারা পড়ে।

অপরাপর যে নয়টি সাধারণ কারণে এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে, সেগুলি এই :—(১) জননীর স্বাস্থ্যহীনতাই শিশু-মৃত্যুর প্রথম কারণ। এ দেশে জননীদের স্বাস্থ্য এত খারাপ কেন? প্রথমতঃ, বাঙ্গালীর মেয়েরা সর্ব্বদাই অন্দর-মহলে আবদ্ধ থাকেন, খোলা জায়গায় থাকার কি সুখ, তাহা তাঁহারা জানেন না। একটা গাছকে "আওতায়" (অর্থাৎ রৌদ্র হইতে বঞ্চিত করিয়া) রাখিলে, তাহার রং ফ্যাকাসে হয়, তাহার বৃদ্ধি কমিয়া যায়, বা বন্ধ হইয়া যায়। রাত-দিন পর্দ্দার আড়ালে মেয়েদের শরীর ভাল থাকে কেমন করিয়া? তাহার পরে, নিজ দেহে ও নিজ আহারের প্রতি অযত্ন করা, এ দেশের মেয়েদের একটা স্বভাব—স্থলবিশেষে, যেন গৌরব করিবারও বিষয়। পরের ঘরে যাইতে হইবে বলিয়া, ছেলেবেলা হইতেই, মেয়েরা ভাল জিনিষ খাওয়াটা দূষণীয়—এই শিক্ষাটি পায়; আর সেই সঙ্গে, এ দেশের পুরুষেরা, ভুলিয়াও, একবার সন্ধান ল'ন না যে, তাঁহাদিগের বাটীর মেয়েরা কি খান। কাযেই, একদিকে রমণীরা যেমন সংসারের সুশৃঙ্খলার জন্য প্রাণপাত করিয়া শ্রম করেন, অপরদিকে তদুপযুক্ত পুষ্টিকর খাবার খাইতে পান না। এ ছাড়া, একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকার ফলে, যে বায়-সঙ্কোচ ও পরস্পরের সাহায্য পাওয়া যাইত, আজ-কাল তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে। কাযেই, শরীরে বল কম, চিন্তা ও পরিশ্রম বেশী, অথচ খাওয়া তেমন হয় না—তিকে মায়ের শরীর চিরকালই রুগ্ন। রুগ্ন মাতার সন্তান কত দিন বাঁচে?

শিশু-মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ, সাংসারিক অস্বচ্ছলতা। এ-কথা বোধ করি কাহাকেও বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না। বেশীর ভাগ বাঙ্গালীই চাকুরীজীবী। চাকুরীর সংখ্যা কম, উমেদার বেশী,—কাযেই চাকুরীতে বেতন কম। কম আয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহই গ্রাসাচ্ছাদনের সকল দ্রব্যই অগ্নি-মূল্য হইতেছে। সেই সঙ্গে বাহিরে ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টাও আছে। কাযেই, লম্বা-কোঁচা থাকিলেও, বাড়ীতে অন্নবস্ত্রের কষ্ট অনেক সংসারেই আছে। অর্থের অভাবে, প্রসব করিতে-না-করিতে, অনেক জননীকে গৃহস্থালীর কাযে লাগিয়া যাইতে হয়—আবশ্যকমত একটু দুধ, ঘি খাইবার সুযোগ হয় না। অর্থের অভাবে সস্তার ও ভেজাল দুধ ছেলেকে খাওয়াইতে হয়। কাযেই ছেলের দীর্ঘায়ুঃ লাভের আশা কোথা?

শিশু-মৃত্যুর তৃতীয় কারণ, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতা। আমরা যেখানে রাত দিন বাস করি, সেখানে থাকার দরুণ, তাহার দোষগুলি আমাদের নজরে আর পড়ে না। প্রথমে অন্দরের কথা ধরুন। যেমন বাড়ীই করুন না কেন, বাঙ্গালীর বাড়ীর বাহিরের অংশে লোক-দেখান খোলা যায়গা, বড় বড় দরজা জানালা, আলো রৌদ্র ও বাতাসের ঘটা যথেষ্টই থাকে; অথচ, অন্দরে হয় ত উঠান থাকে না, সকল ঘরে হয় ত সমানে আলো-হাওয়া যায় না, জানালাগুলি ছোট-ছোট ও পর্দ্দায় ঢাকা। কল, পাইখানা, পাতকুয়া, বাসনমাজার যায়গা, গোবর গাদা, গোয়ালঘর, আস্তাকুড়, আর তাহাদের সবার উপরে—রাত-দিন কারণে-অকারণে হুড়্‌হুড় করিয়া কতকটা জল ঢালার ফলে, বাঙ্গালীর বাড়ীর নিচের তলাটি একটি বিরাট পাতকুয়ায় পরিণত হয়—আর সেইখানেই বাঙ্গালীর মেয়েরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা কাটান। সহরে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের এমন বাড়ী নাই, যেখানে ধোঁয়ার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িতে না হয়। তাহার উপরে, রাত্রে শুইবার সময়ে, শয়নঘরের প্রত্যেক ছিদ্রটুকুও বন্ধ করিয়া শয়ন করাই আমাদিগের অভ্যাস—পাছে, ভগবানের মুক্ত দান, জীবের জীবন, বিশুদ্ধ বায়ু গায়ে লাগিয়া "ঠাণ্ডা লাগে!" পল্লীগ্রামে গরীবদের মেটেঘরে, লোকে মাচার উপরে শোয় এবং মাচার নিচে ছাগল, ভেড়া, কুকুর প্রভৃতি পালিত পশু বাঁধা থাকে। খাটা-পাইখানা, এঁদো পুকুর, খোলা ড্রেণ, ঝোপ-ঝাড়, আস্তাবল বা গোয়াল, চোনা ও গোবরের গাদা, প্রচুর ধূলিবৃষ্টি,—বাটির বাহিরে আসিলে এগুলিরও অভাব হয়

না। তদুপরি যেখানেই ময়লা, সেইখানেই মাছি; যেখানে খানা-ডোবা, সেইখানেই মশা; যেখানেই খাবার জিনিস, সেইখানেই ইন্দুর। এই রকমের অবস্থা-নিচয়ের মধ্যে বাস করিয়া, কয়টি শিশু শৈশব উত্তীর্ণ হইতে পারে?

শিশু-মৃত্যুর চতুর্থ কারণ, দেশের আব হাওয়া খারাপ হওয়া। আমাদের দেশে, ম্যালেরিয়া, প্লেগ ও ওলাউঠা নাই, বোধ হয় এমন গ্রাম খব কমই আছে। তাহার উপরে বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কালাজ্বর, আমাশয়, ছেলেদের লিভারের দোষ ত আছেই। গ্রামের পুকুর, জেলার খালবিল সবই হাজিয়া মজিয়া যাইতেছে সেই সঙ্গে ব্যারামের বিষ ছড়াইয়া পড়িতেছে। লোকে গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ার ফলে, গ্রামে জঙ্গলবৃদ্ধি অত্যন্ত হইতেছে; তাহার উপরে পাট-পচান, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অজন্মা প্রভৃতির ফলে দেশে থাকা কষ্টকর হইয়াছে। তদুপরি, সুচিকিৎসার অভাব, অন্নবস্ত্রেরও অভাব। কাজেই শিশুরা কতদিন এত ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিতে পারে?

শিশু-মৃত্যুর পঞ্চম কারণ, পিতামাতার পাপকার্য্য। অসংযমের ফলে কত বংশ কুৎসিত রোগগ্রস্ত হইতেছে, কত মাতা মৃতবৎসা হইতেছেন, কত শিশু রুগ্ন, বিকলাঙ্গ বা অল্পায়ুঃ হইতেছে; কত জড়তা, উন্মত্ততা, মৃগী প্রভৃতি সাংঘাতিক ব্যারামের আমদানি হইতেছে! একজনের অসংযমের ফলে অন্ততঃ পাঁচ পুরুষ কুৎসিত রোগে ভুগিয়া থাকে। প্রকৃতির প্রাণপণ চেষ্টা হয়, যাহাতে এই রকম রক্তদুষ্ট বংশ লোপ পায়। মানুষ না হইলে তাহাদের সেই বংশ নিশ্চয়ই লোপ পাইত;—কারণ, কাণা, খোঁড়া, রোগা, বিকলাঙ্গ, যেমনই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হউক না কেন, মানুষ মানুষকে বাঁচাইবার জন্য কত রকমের চেষ্টা ও যত্ন করে! সমাজের মধ্যে ঐ সকল লোকে ক্রমশঃ চলিয়া যায়; আর আমরা বিবাহ দিবার বা করিবার সময়ে, তুচ্ছ অর্থ ও রূপেরই যাচাই করি, বংশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনও সংবাদ লই না;—কাযেই আজ আমরা এত রুগ্ন, আমাদিগের সন্তানেরা এত স্বল্পায়ুঃ।

শিশু-মৃত্যুর ষষ্ঠ কারণ—আমাদের অবিবেকিতা। মানুষ যে-কোনও কায করিতে যাইলে, তদ্ সম্বন্ধে নিজের সামর্থ্য বা উপযোগিতার কথা বিশেষ করিয়া ভাবিয়া, তবে কাযে অগ্রসর হয়। কিন্তু, পুত্রকন্যাদি হইলেই, আমাদের দেশে, তাহাদিগের বিবাহ হইতেই হইবে—তা তাহারা স্বাস্থ্য, অর্থ, বা সামর্থ্যের দাবী রাখুক আর নাই রাখুক। আমরা নিজেরা যতই শিক্ষার বা বহুদর্শিতার অভিমান করি না কেন, আমরা একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানহীন। আমরা দুনিয়ার সকল কথাই জানি, হয় ত বা সকল বিদ্যার ধার ধারি, জানিনা কেবল স্ত্রীলোকের দেহতত্ত্ব, জানি না মাতৃ-তত্ত্ব, জানি না স্ত্রীরোগের নিদান, জানি না কেমন করিয়া ছেলে মানুষ করিতে হয়, জানি না কেমন করিয়া সুমাতা ও সুগৃহিণী হইতে হয়। আমাদিগের মধ্যে অনেকেই সুপাচিকা, সুগায়িকা, শিল্পকলানিপুণা, সুলেখিকা,—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কয়জনে বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন—"আমি সুমাতা ও সুগৃহিণী"? বহুকালের সঞ্চিত কুসংস্কারাপন্ন বৃদ্ধা বা প্রগল্‌ভা রমণী বিশেষের তথাকথিত জ্ঞানপক্কতা, এবং সাধারণ গৃহস্থরমণীর গতানুগতিকতা ব্যতীত, আর আমরা কি আদর্শ দেখিয়া শিখিব? আমাদের পুরুষেরা সকল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে জয়মালা লইয়া ফেরেন, কিন্তু কৈ রমণীকুলের জন্য একতিলও ত ব্যস্ত হন না? যে দেশে পর্দ্দার অবরোধ এত বেশী, সে দেশে স্বামীরাই স্ব-স্ব স্ত্রীর শিক্ষার ভার না লইলে, কে লইবে? মাসিক সংবাদপত্রের সাহায্যে রাশি-রাশি নভেল, প্রত্নতত্ত্ব, কবিতা ও ভ্রমণ-কাহিনী সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে বটে, কিন্তু মাসিকপত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনুরাগিনী যাঁহারা, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোনও কথা ত দেখি না? এমন কি স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে সকল পত্রিকা বাহির হয়, তাহাতেও নয়।

শিশু-মৃত্যুর সপ্তম কারণ—মাতৃ-অসংযম। কত জারজ সন্তান যে অজ্ঞাতসারে শমন সদনে প্রেরিত হয়, তাহা সকলের জানা নাই।

শিশু-মৃত্যুর অষ্টম কারণ—বহু-ভ্রাতৃত্ব। অর্থাৎ এক-জননীর বহু সন্তান হইলে, কোনও সন্তান যথেষ্ট যত্ন পায় না, এবং হয় ত যথেষ্ট আহার্য্যও পায় না। তাহার ফলে শিশু মৃত্যু অনিবার্য্য।

শিশু মৃত্যুর নবম কারণ—উপযুক্ত খাদ্যের অভাব। আমাদের দেশে মাতৃ স্তন্যদান সম্বন্ধে দুই রকমের আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন-কোনও স্ত্রীলোক দু'এক মাস স্তন দিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়েন—গো-দুগ্ধের শরণ লইতে বাধ্য হন; আবার কোন-কোনও জননী নিজ সন্তানকে

তন চার বৎসর পর্য্যন্ত স্তন-দুগ্ধ পান করান। সাধারণতঃ ৬।৭ মাস কাল পর্য্যন্ত মাতৃ-স্তনের দুগ্ধ ভাল থাকে; তাহার পরে সে দুগ্ধ কতকটা নিরেস হইয়া পড়ে। বেশী দিন ধরিয়া স্তনদান করিলে, রমণীর স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় এবং সেই নরেস দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর যথেষ্ট পরিপুষ্টি হয় না। মাতৃ-স্তন্যের পরিবর্ত্তে, এদেশে, ছেলেদিগকে সাগু, বার্লি, এরোরুট, শঠি প্রভৃতির সহিত গোদুগ্ধ বা অল্পবয়স হইতেই ভাত ও দোকানের খাবার খাওয়ানর প্রথা দেখা যায়। দুধ-সাগু "ভদ্রলোকেরা" খাওয়ান এবং অশিক্ষিতেরা দোকানের খাবার, ভাত ডাল, বিলাতি দুগ্ধ (কন্‌ডেন্‌স্‌ট্‌ মিল্ক) খাওয়ান। "ফুড্‌" নামধেয় বাসিদুধ, যবচূর্ণ যাহা আসে, আজ-কাল তাহারও প্রসার অতি বেশী। অতীব সংক্ষেপে শিশুখাদ্য সম্বন্ধে এইখানে দু-একটি কথা বলিব। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া, ধৈর্য্য সহকারে শুনুন। (১) ৬।৭ মাস বয়স পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য নিজ শিশুকে রীতিমত দিতে পারিলেই ভাল। যদি মাতৃস্তন্য যথেষ্ট না থাকে, তবে জননীকে দুগ্ধ খাওয়াইয়া, তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাইয়া ও মাতৃস্তন্যের বৃদ্ধি করিয়া, তাহারই ব্যবহার করা ভাল। (২) শিশুর ৮।৯ মাস বয়স উত্তীর্ণ হইলে, আর মাতৃস্তন্য না দেওয়াই ভাল। (৩) গাধার দুধ অতি নিরেস; মহিষের দুধ অতি দুষ্পাচ্য; ছাগীর দুগ্ধ পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য এবং সামান্য যত্ন করিলে, ঘরে ছাগী পুষিয়া, শিশুকে খাঁটি ও টাট্‌কা খাওয়ানর সুখ উপভোগ করিতে পারা যায়। (৪) গো দুগ্ধ শিশুর পক্ষে প্রথম-প্রথম হজম করা শক্ত বলিয়া, সাগু, বার্লি প্রভৃতির সঙ্গে ঐ দুধ খাওয়ানই নিরাপদ। তবে যে জন্তুরই দুগ্ধ খাওয়ান হউক না কেন, সে জন্তুটির স্বাস্থ্য ভাল না রাখিলে, তাহার দুধ খাইলে অসুখ করে। মানুষেরও যেমন নিত্যই যথেষ্ট রৌদ্র, হাওয়া, পরিশ্রম, স্নান প্রভৃতি করা অত্যন্ত প্রয়োজন, ছাগী ও গরুর পক্ষেও তাহাই। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে দুর্গন্ধময় ছোট গোয়ালে রাত্রদিন গরুকে বাঁধিয়া রাখিলে, ময়লা ডাবায় পচা খৈল প্রভৃতি যখন-তখন ঢালিয়া দিলে, গরুর গায়ে গোবর, ও ক্ষুরে গোবর, চোণা ও কাদা, মাখিয়া থাকিতে দিলে, তাহাকে মাঠে বেড়াইতে না দিলে, তাহাকে ডলাই-মলাই না করিলে,—কখনো গরু সুস্থ থাকিতে পারে না। আমরা গো-সেবা ভুলিয়া গিয়াছি, গো-চারণের মাঠ রাখি না, গো-বংশের উন্নতির জন্য সুস্থ ও বলিষ্ঠ বৃষ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দিই না—অথচ দুধ-দুধ করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিতেছি। হিন্দুরা জলকে নারায়ণ, চাউলকে লক্ষ্মী ও গরুকে মাতা বলিতেন কেন? ঐ তিনটির পবিত্রতার দিকে হিন্দুর এত লক্ষ্য ছিল কেন? ঐ সকলের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা ও সর্ব্বপ্রকারে বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই হিন্দুর উদ্দেশ্য ছিল। আমরা গোরুর সেবা না করিয়া, দুধ খাইবার আব্দার রাখি—কাযেই জীর্ণ শীর্ণ গাভীর ফুকা-দেওয়া ও ভেজাল করা দুধ ভিন্ন অপর দুধ পাই না। এ সকল দেখিয়াও কি আমাদিগের চোখ ফুটিবে না? (৫) বিলাতি বোতলে করা "ফুড" ও টিনে করা "গাঢ় দুগ্ধ"—শিশু-দিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণভাবে অনুপযোগী। অসুখের সময়ে অথবা হঠাৎ খাঁটি বা টাট্‌কা দুগ্ধের অভাব ঘটিলে, ২।৪ দিনের জন্য উহাদিগকে ব্যবহার করা সঙ্গত হইলেও, রীতিমত ভাবে উহাদিগকে কখনো ব্যবহার করিতে নাই। (৬) দোকানের খাবার, দোকানের পাঁউরুটি শিশুর পক্ষে অনুপযুক্ত আহার্য্য। আশা করি আপনারা সকলেই শিশু খাদ্যের অনুপযোগিতা কিছু কিছু বুঝিয়াছেন। এবং তাহার ফলে শিশু মৃত্যু বৃদ্ধি পাওয়া যে আশ্চর্য্যজনক নহে, এ কথা স্বতন্ত্র করিয়া আর আপনাদিগকে বুঝাইতে হইবে না।

অতএব, এখন আমরা দুইটি কথা বেশ করিয়া বুঝিলাম; —প্রথমতঃ, যে, এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার খুব বেশী এবং দ্বিতীয়তঃ, যে, শিশু মৃত্যুর কারণ সাধারণতঃ নয়টি।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে,—কি করিয়া শিশু মৃত্যু কমান যাইতে পারে? মুখে সে কথার উত্তর সহজে দেওয়া যায়, কিন্তু কাযে তাহা করা অত্যন্ত শক্ত। শিশুদিগের মৃত্যু কমাইতে হইলে, সুমাতা চাই, জাগ্রত সমাজ চাই, লোক-শিক্ষা চাই, কর্ম্মী রাজা চাই। রাজায় প্রজায় একপ্রাণ হইয়া, এই একই উদ্দেশ্যে যত্ন করিলে, তবে এ কায সম্ভব, নতুবা অসম্ভব। রাজার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া চাই যে, যেমন করিয়া হউক, প্রজার প্রাণ রক্ষা করা চাই; প্রজার মনে দৃঢ় ধারণা হওয়া চাই যে, এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য করাই শ্রেয়ঃ। এখন, একে-একে দেখা যাউক, উভয় শক্তির সম্মিলনে কি-কি কায করিলে, দেশের শিশু-দিগের কল্যাণ সাধন করা সম্ভবপর হয়।

এ দেশে, এ কার্য্যে প্রধান বিঘ্ন তিনটি—ম্যালেরিয়ার

অতি-বিস্তৃতি, স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার এবং আমাদিগের আত্ম বিশ্বাসের অভাব। প্রথমতঃ, ম্যালেরিয়া যত দিন এ দেশ হইতে বিতাড়িত না হইতেছে, ততদিন অপর সকল স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টাই বিফল হইবে। এক ম্যালেরিয়াই সর্ব্বগ্রাসী। এই ম্যালেরিয়া পৃথিবীর অপর সকল দেশ হইতেই সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়াছে—আমাদের দেশ হইতে কেন না হইবে? দ্বিতীয়তঃ, দেশের লোকের মন হইতে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় কুসংস্কার ঘুচাইতে হইবে।—বহুপ্রকারের ব্যারামের সঙ্গে এবং ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে নিত্য বাস করিয়া, আমরা তাহাদিগকে ভয় করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়া, সেগুলিকে পদে-পদে দেখাইয়া দিতে হইবে। হিন্দুদিগের দৈনিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্মের নামে যে স্বাস্থ্যানুকূল বিধিগুলি আছে, সেগুলি আমরা ভুলিয়া গিয়া, "আচার" "আচার" করিয়া মহা গণ্ডগোল করিতেছি—মণি ফেলিয়া, শুধু আচলেই গিরা বাঁধিতেছি। দেশে রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সবজান্তাবাগীশ হইয়া, বৈদ্যক-শাস্ত্রে অবাধে মতামত প্রচার করিয়া অধঃপাতে যাইতেছি। তৃতীয়তঃ, "আমরা অতি অপদার্থ", "আমাদিগের দ্বারা কোন কায হইবে না", "বাঙ্গালী ভীরু," "বাঙ্গালী অলস," "বাঙ্গালা বিশ্বাসঘাতক" প্রভৃতি বিদেশী লেখকদিগের কতকগুলি রচা কথা বহুকাল ধরিয়া শুনিয়া, আমরা তাহাদিগকে এত বিশ্বাস করি যে, কোন কাযের কথা উঠিলেই, ঐ অপবাদগুলি স্বতঃই এবং সর্ব্বাগ্রে আমাদেরই সকলের মুখে আসিয়া পড়ে, আর আমাদিগের কায করা হয় না। এই আত্মগ্লানি ভুলিতে হইবে। "দশজনের মধ্যে আমিও একজন" এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে হইবে। আত্মশ্লাঘা যেমন নিন্দনীয়, আত্মগ্লানিও তেমনি নিন্দনীয়। আমরা "অমৃতস্য পুত্রা", আমরা সাক্ষাৎ ভগবানের নররূপ,, আমরা হীন কিসে? ভগবানের এই নরদেহ, ইহাকে অযত্ন করিতে নাই। বঙ্গদেশীয়া রমণীগণ এ কথা বিশেষ করিয়া ধারণা করিবেন—কারণ, এই বঙ্গদেশে রমণীদিগের মধ্যে নিজ দেহের ও নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি অত্যন্ত অনাস্থা দেখা যায়। অথচ, তাঁহারা মনে রাখেন না যে, তাঁহাদেরই স্বাস্থ্যের উপরে দেশের ভাবী প্রজাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। যাঁহারা শৈশব-কল্যাণে কায করিবেন, এই তিনটি বিঘ্ন তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে দূর করিতেই হইবে—ম্যালেরিয়া, স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় অজ্ঞানতা ও আত্ম-গ্লানি। তৎপরে কি-কি কর্ত্তব্য, তাহা একে-একে অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি:—

(১) সুমাতা তৈয়ারি করিতে হইবে। স্বাস্থ্য, চরিত্রবল, সুগৃহিণীপনা—এই তিনটির একত্র সমাবেশের ফলে সুমাতার সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতা লইয়া, রোগের মধ্যে জন্মিয়া, স্বাস্থ্য লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু দারিদ্র্য ও জন্মগত স্বাস্থ্যহীনতা একেবারে দূর করা না গেলেও, ভাল খাবার ও রীতিমত খেলাধূলা ও ব্যায়াম করিতে পাইলে, দেহ বলিষ্ঠ হইবে। ছোট-ছোট মেয়েদিগকে ঘরের কোণে আবদ্ধ না করিয়া, রীতিমত স্কুলে দিয়া, সেখানে খেলাধূলা ও ডাম্বেল বা অপরাপর যন্ত্রের সাহায্যে ব্যায়াম শিখান উচিত। প্রত্যেক মেয়েকেই বিদ্যালয়ে দেওয়া দরকার। তবে, মেয়েদের বিদ্যালয়ে, অঙ্কশাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি বেশী না পড়াইয়া, রন্ধন-বিদ্যা, সীবন-বিদ্যা, স্বাস্থ্য-বিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, স্ত্রীরোগ, শিশু-প্রতিপালন, গৃহস্থালীবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া চাই। যে-যে রমণী বর্ত্তমান কালের বি-এ, এম-এ পর্যান্ত পড়িতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কতকটা হাসপাতালের শুশ্রূষাকারিণীর কায, শিশু-রোগ-চিকিৎসা, ধাত্রী বিদ্যা প্রভৃতি জানা চাই। ফল কথা, গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় চাই;—সে সকল বিদ্যালয় বর্ত্তমান কালের বালিকা বিদ্যালয়ের মত নহে—সেখানে শিক্ষার তোতা-পাখী জীবনের অভিনয় হইবে না, সেগুলি মাত্র বাধাবুলি প্রচারের আড্ডা থাকিবে না—সেখানে পাড়ার বর্ষীয়সীরা, মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া, মেয়েদের পাশে বসিয়া, শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে একযোগে, শিক্ষা-কার্য্যে মন দিবেন। সেইখানে ছোট-ছোট ছেলেরা আসিবে—তাহাদিগের প্রতি জননীদের কর্ত্তব্যগুলির প্রয়োগ বালিকারা দেখিবে। পাঠশালাতেই রন্ধন-গৃহ থাকিবে—পাঠশালার পাকশালার তত্ত্বাবধানকার্য্য বালিকারাই করিবে। এই ভাবে গৃহে ও বিদ্যালয়ে, উভয় ক্ষেত্রেই, বালিকারা দেখিয়া-দেখিয়া শিখিবে—বিদ্যালয়ে পাঁচজনের ব্যবহারের ফলে গৃহের ব্যক্তিগত দোষগুণগুলি উপলব্ধি করিতে পারিবে। গৃহস্থের ও গৃহস্থালীর সম্পূর্ণ যোগাযোগে শিক্ষা-কার্য্য চালাইতে হইবে।

(২) গর্ভিণী-পরিচর্য্যা করিতে হইবে। যে-যার,

জ-নিজস্ব লইয়া থাকিলে সমাজ-সেবা করা হয় না। াজের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য অপরকে সাহায্য করা। এব, যাহাতে ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে, গর্ভিণীর পরিচর্যা া সম্ভব হয়, সেজন্য প্রধানতঃ দুইটি উপায় অবলম্বন রতে হইবে। একটি স্ত্রী-স্বাস্থ্য-পরিদশক নিযুক্ত করা, রটি পাড়ায়-পাড়ায় মেয়েদের একটি করিয়া সম্মিলনের া নির্দ্দেশ করা। পর্দ্দানসীন স্ত্রী-লোক ও যাতায়াতে ম স্ত্রী-লোক—এই দুই জাতীয় রমণীদের জন্য স্বাস্থ্য পরি ক মহিলা কায করিবেন ; এবং তদ্ব্যতীত অপর সকল াহই ঐ সম্মিলন-স্থানে সপ্তাহে এক কি দুই দিন করিয়া স্থিত হইবেন। মহিলা স্বাস্থ্য-পরিদর্শনকারিণীরা, পাড়ার ল গর্ভিণীর বাড়ীতে, সপ্তাহে ১ বা ২ দিন করিয়া যাইয়া, ণীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন, আবশ্যকমত আহার ও ধের ব্যবস্থা করিবেন, আঁতুড় ঘরের জন্য আবশ্যক াদি সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন এবং কি কি করিলে শরীর ল থাকে, এবং কি কি করিলে শরীর ও গর্ভস্থ সন্তানের কার হয়, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। গর্ভাবস্থায় যে পীড়াগুলি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া সতর্ক দিবেন। খুব সহজ ভাষায়, এই সকল কথা লিখিয়া, ট-ছোট পুস্তিকা বিতরণ করাও বাঞ্ছনীয়। মহিলা থ্যপরিদর্শনকারিণীরা আবশ্যক মত ধাত্রী, শুশ্রূষাকারিণী, ধ ও পথ্য জোগাড় করিয়া দিবেন। বলা বাহুল্য, স্বাস্থ্য দর্শনকারিণী, ধাত্রী, শুশ্রূষাকারিণী, ঔষধ, পথ্য প্রভৃতি বায়েই গৃহস্থেরা পাইবেন। এবং এই সকল সরবরাহ বার জন্য, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, সমবায়-সমিতি তি চাঁদা দান ও সামান্য মাসিক টেক্স বসাইতে পারেন। াদের দেশে "সরকারী" চিকিৎসক ও "টেক্সের" নামে, লে শিহরিয়া উঠিবেন। এক্ষেত্রে সেরূপ হইবার ভয় নাই। ক পদস্থ গৃহস্থ যেমন ডাক্তারের সহিত মাসকাবারি বা ময়ানা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, এটাও কতকটা সেই ভাবে া উচিত। মনে করুন, একটা গ্রামে একশত ঘর কের বাস। প্রত্যেক ঘরে, বৎসরে, গড়ে একজন য়াতি হন, এরূপ আন্দাজ করা কিছু অন্যায় নহে। রণতঃ একটা "আঁতুড় তুলিতে", খুব কম হয় ত দশ া ও বেশী হয় ত ৫০।৬০ টাকা ব্যয় লাগে। গড়ে প্রত্যেক গৃহস্থকে বৎসরে ৫৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হয় এবং মাসিক চারি আনা চাঁদা দিতে হয়, তবে বৎসরে ৮০০৲ টাকা জমে। ঐ টাকায় মাসে ৮০৲ টাকা বেতন দিয়া একজন পাস করা মহিলা চিকিৎসক ও ১২ টাকার দুইজন ধাত্রী নিযুক্ত করা যায়। ঐ টাকার উপরে যদি সরকার হইতে আরো ৫০০৲ টাকা পাওয়া যায় এবং গ্রামের ধনীরা এককালীন দান বা পুরস্কার বলিয়া কিছু কিছু দেন, তাহা হইলে, অতীব গণ্ডগ্রামেও একটি পাস করা মেয়ে ডাক্তার ও দুটি ধাত্রী গ্রামের লোকের পয়সায় নিযুক্ত থাকিয়া বিনামূল্যে ঔষধ প্রভৃতি দিয়া গ্রামের উপকার করিতে পারেন। অতএব, এই মহিলা-পরিদর্শনকারিণী নামে সরকারী হইলেও, প্রত্যেক গ্রামবাসীর অর্থে নিযুক্ত ; এবং টেক্সও যাহা দেওয়া হইবে, তাহাও গ্রামবাসীর ন্যায্য আঁতুড় খরচ হইতে কম বৈ বেশী নয়। অথচ, একজন সুচিকিৎসক ও দুই জন পাকা ধাত্রী থাকার ফলে, গ্রামে শিশু-মৃত্যু ও প্রসূতির বিপদের আশঙ্কা কমিয়া যাইবে।

গ্রামের বারোইয়ারিতলায়, অথবা কোন দেব মন্দিরের প্রাঙ্গণে, সপ্তাহে এক দিন করিয়া, সমস্ত গ্রামের পোয়াতি-দিগকে জড় করা খুব ভাল। এই স্থানে মেয়ে-ডাক্তার ও ধাত্রী বা শুশ্রূষাকারিণীরা আসিয়া প্রত্যেক নবপ্রসূত ছেলেকে রীতিমত ওজন ও পরীক্ষা করিবেন ; এবং প্রত্যেক ছেলের স্বাস্থ্যের একটুক ব্যতিক্রম হইলে, কি কারণে এরূপ হইল, তাহা সেই শিশুর মাতাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। ছেলেকে কেমন করিয়া ওজন করিতে হয় এবং রীতিমত ওজন করা কত প্রয়োজনীয়, সে কথা বুঝাইয়া দিবেন। ছেলেকে কেমন করিয়া স্নান করাইতে হয়, কত-ক্ষণ অন্তর, কি খাবার, কতবার দিতে হয়, কোন খাবার কেমন করিয়া তৈয়ারি করিতে হয়, ছেলেদের মল, দুধ-তোলা, দেয়ালা করা প্রভৃতি হইতে কি-কি বুঝিতে পারা যায়, এসব কথা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। যে পোয়াতিরা বা অপর রমণীরা যাইবেন, তাঁহারা পরস্পরের দোষ-গুণ দেখিয়া, অনেক বিষয়ে অনেক কথা শিখিতে পাইবেন এবং তুলনায় সমালোচনা করিয়া, অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। পল্লীগ্রামে জাতি-বিচারের বাড়া-বাড়ী বশতঃ, সপ্তাহে একাধিকবার এরূপ সম্মিলন হওয়া আবশ্যক। সম্মিলন-স্থানে গ্রামের অবস্থাপন্ন জমীদার মহাশয়েরা কচি ছেলেদের জন্য দুধ, জল, খেলনা, প্রভৃতি

বিনামূল্যে দিলে আরো ভাল হইবে। তবে এই স্থানে প্রথম-প্রথম লোক জমায়েৎ হওয়া কঠিন। এই জন্য, গান, কথকতা, পূজার আয়োজন, বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ, প্রত্যেক নব-প্রসূতিকে বিনামূল্যে একটি জামা দান, প্রভৃতি কোন-না-কোন ব্যবস্থা প্রথম-প্রথম করিতে হইবে। কিছু দিন পরে ঐ সকলের আর প্রয়োজন হইবে না। তখন সকলেই স্বেচ্ছায় সেখানে যাইবেন। এই কার্য্যে, প্রথম-প্রথম, ধাত্রী ও স্বাস্থ্য পরিদর্শিকার বিশেষ পরিশ্রম হইবে বটে, কিন্তু ক্রমশঃ এই জ্ঞান ছড়াইয়া পড়িলে, তাঁহাদিগের পরিশ্রম খুব কমিয়া যাইবে।

গর্ভিণী পরিচর্য্যা করিতে গেলে, আর একটি অত্যাবশ্যক কাম করিতে হইবে। সেটি অর্থ সাহায্য। গর্ভের শেষের দেড় মাস ও প্রসবের পরের দেড় মাস, একুনে এই তিন-মাসকাল, গর্ভিণীকে খাটিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে দিতে নাই। যাহাতে সে নারী নিশ্চিন্তে বসিয়া শিশুর হিতকল্পে নিযুক্ত থাকিতে পারে, সে উদ্দেশ্যে ঐ তিন মাস, মাসহারার ব্যবস্থা করা চাই। অবস্থা বিশেষে, শীতকালে শীতবস্ত্র এবং পুষ্টিকর খাদ্যও বিনামূল্যে দিতে হইবে। সকলকেই, সমাজের প্রত্যেককেই, আপনার করিয়া লইতে হইবে, হিন্দু-মুসলমান, ধনী দরিদ্র, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য- ভেদ-জ্ঞান না করিয়া, প্রত্যেক প্রাণীকে সজীব নারায়ণ জ্ঞানে, প্রাণপণে সেবা করিতে হইবে, ঘরে ঘরে যাইতে হইবে ঘরে ঘরে অন্নদান করিতে হইবে, ঘরে-ঘরে নিজ হাতে নারায়ণের সেবা করিতে হইবে, এবং সেবা করিয়া ধন্য হইতে হইবে :— তবে ত সমাজ সজীব হইবে, তবে ত সমাজের প্রাণস্পন্দন ও আনন্দ-হিল্লোল জগতের কোলে ফুটিয়া উঠিবে।" এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সে দিন,— আসিবে।"

(৩) আঁতুড় ঘরের জন্য ভাল ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের দেশে, আঁতুরঘর সম্বন্ধে চারিটি প্রধান ভুল হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, আঁতুরঘরের সব জিনিষই ফেলিয়া দেওয়া উচিত, অতএব বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে অপকৃষ্ট জিনিষ দিয়া আঁতুরঘর রচিত হয়—এই ভ্রমাত্মক ধারণা। দ্বিতীয়তঃ, আঁতুরঘর সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যবস্থায় বাড়ীর পুরুষ-দিগের হাত ত থাকেই না, পরন্তু অন্যায় উদাসীনতাই লক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ, দেশী ধাত্রীদিগের অসীম প্রভুত্ব। এবং চতুর্থতঃ প্রসবকার্য্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

বাঙ্গালীর আঁতুরঘর কতকটা পায়খানা বা আঁস্তাকুড়ের মত ঘৃণিত যায়গা। বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে যে ঘর "অকেজো", যে ঘর সবচেয়ে জঘন্য, যে ঘর মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী,—তা কে জানে সে ঘরে আলো-বাতাস আসে কি না আসে, সে ঘর পায়খানা গোয়ালঘরের খুব কাছে কি না—বাঙ্গালীর সংসারে সেই ঘরই বংশের প্রদীপ, নন্দের দুলালের প্রথম ভূমিষ্ঠ হইবার প্রকৃষ্ট স্থান! বাড়ীর যত ময়লা ও ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া মাদুর, চট, সতরঞ্চি, পুরাতন কাঁথা বা কম্বল ও ছেঁড়া র‍্যাপারে, সংসারের কর্ত্রীর ও বংশধরের এই ঘরে বিছানা তৈয়ারি হয়। রাজ্যের ময়লা ও ছেঁড়া জামা ও কাপড় পরিয়া, পোয়াতি এই ঘরে বাস করেন। মৃৎপাত্রে ভোজন, অনবরত আগুণের সেঁক-তাপ গ্রহণ, ও সেই ঘরের মধ্যেই জমা করা পোয়াতির ও শিশুর ময়লা ন্যাকড়ার দুর্গন্ধ সারা রাত্রি আঘ্রাণ করিয়া, গৃহের সকল ছিদ্র বন্ধ করিয়া, জাতি মাহাত্ম্য গর্ব্বিণী হিন্দু-রমণী চণ্ডালিনীর সঙ্গে নিজ বংশধরের প্রথম বাসস্থান করিয়া ধন্যা হন! এই ঘরে যেমন-ইচ্ছা ময়লা-অবস্থায় প্রবেশ করিতে আছে, কিন্তু এই ঘর হইতে বাহির হইলেই, স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়! এই সকল বিরাট ও বিকট ভুলের জন্য, হিন্দুর আঁতুড়-ঘরে, যমের তিনটি দূত অনবরত বসিয়া থাকে। তাহারা যথাক্রমে, ধনুষ্টঙ্কার বা পেঁচোয় পাওয়া রোগ, "স্যাপ্রিমিয়া" বা পোয়াতির খারাপ জ্বর, ও সূতিকা। যদি হিন্দু রমণী নিজে বাঁচিতে চাহেন, তবে বাড়ীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ঘরে, যে ঘরে বেশ আলো, রৌদ্র ও হাওয়া খেলে এবং যে ঘর বেশ শুষ্ক ও শৌচপ্রস্রাবের যায়গা হইতে দূরে, এমনই ঘরে আঁতুড়-ঘর করিবেন। সবচেয়ে পরিষ্কার, এমন কি, নূতন কাপড়-চোপড় ধোপদাস্ত র‍্যাপার, জামা প্রভৃতিই ব্যবহার করা উচিত। সে ঘরে এতটুকু ময়লা থাকিতে দিতে নাই। একটা জ্যান্ত ময়লার মূর্ত্তি—ধাইএর ঝিকে—সে ঘরে রাখাই অন্যায়। সে ঘরে যে ঢুকিবে, সে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া ঢুকিবে —নতুবা এতটুকু অপরিষ্কার থাকিলে কাহাকেও সে ঘরে ঢুকিতে দিতে নাই। আঁতুরঘরে খাবার, এঁটো ও ময়লা ন্যাকড়া এক মিনিটের জন্যও জমাইয়া রাখা উচিত নয়। এইভাবেই আঁতুরঘর করিতে হয়।

বাড়ীর পুরুষেরা যে, লেখা-পড়া শিখিয়াও, কেন এত

বড় বিষয়ে, এ-রকম উদাসীন হন, তাহা ত আমি ভাবিয়া পাই না। পুরুষেরা যদি এবিষয়ে একটু অবহিত হন, তাহারা যদি ষোলআনা গৃহিণীর মতে গা-ভাসান না দেন, তাহা হইলে কত বাড়ীর কত দুর্ঘটনা যে নিবারিত হইয়া সুখের সংসার হয়, তাহা বলা যায় না। রমণীরা মনে করেন, বিশেষতঃ বাড়ীর বা পাড়ার বর্ষিয়সী রমণীরা মনে করেন যে, এ সম্বন্ধে পুরুষেরা জানেই বা কি, আর বোঝেই বা কি?—আর লজ্জার মাথা খাইয়া, তাহারা কোন্ মুখেই বা আঁতুড়ের দিকে আসিবে? বর্ষিয়সীরা, দুর্জ্জয় অভিমান, অসীম অহঙ্কার ও পর্যাপ্ত তথাকথিত অভিজ্ঞতার দম্ভের ভরা লইয়া, হাল ধরিতে চাহেন;—তাঁহারা যে কতদূর ও মারাত্মক রকমের অজ্ঞ, এবং তাঁহাদিগের তথাকথিত অভিজ্ঞতা যে কতটা কুসংস্কার-দুষ্ট, কতটা আত্মশ্লাঘা-রঞ্জিত, তাহা ভুক্তভোগী চিকিৎসক মাত্রেই জানেন। প্রত্যেক রমণীরই মনে রাখা উচিত যে, তিনি কিছুই জানেন না। প্রত্যেক পুরুষের কর্ত্তব্য, পূর্ব্ব হইতেই প্রসব ও আঁতুড় সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য ভাল রকমে সংগ্রহ করিয়া, সেই মত ব্যবস্থা করা। পুরুষদিগের ঔদাসীন্য অমার্জ্জনীয়। তাহাদিগের অজ্ঞতা নিন্দনীয়। যে কোনও কার্য্য করিতে হইলে, পুরুষেরা কত দিন ধরিয়া তৎসম্বন্ধে সকল সন্ধান সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে লাগেন; আর, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে স্ত্রী-পুত্রকে রাখিয়া, বিরাট অজ্ঞতার তিমিরে জানিয়া-শুনিয়া কি করিয়া তাঁহারা ঝাঁপ দেন? বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া পুরুষদিগেরই কর্ত্তব্য, আঁতুড়ের বন্দোবস্ত করা এবং সর্ব্বতোভাবে তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া।

বর্ত্তমান কালে, আমাদের দেশে, যে শ্রেণীর ধাত্রী পাওয়া যায়, তাহাদিগের চেয়ে অনিষ্টকারী জীব জগতে আর নাই। আপনারা এ কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবেন না। আজকাল দুই প্রকারের ধাত্রী সমাজে প্রচলিত—একশ্রেণীর ধাত্রীরা কোনও হাসপাতাল বা বিদ্যালয়ের মুখ দেখে নাই, অপরেরা "পরীক্ষোত্তীর্ণা" বলিয়া বিদ্যাদৃপ্তা। হাতে-কলমে, কাযের বেলায়, উভয়েই সমান মূর্খা, সমান অনিষ্টকারিণী। ধাত্রী "পরীক্ষোত্তীর্ণা" হইলে, তাহার বেশের পারিপাট্য, "ব্যাগের" ও চাল-চলনের এবং প্রগল্ভতার আধিক্য ঘটে বটে, এবং সে দু-চারটা ইংরাজী ডাক্তারি বুলি কপ্চাইয়া হংসমধ্যে বকবৎ বাহবা লইতে পারিলেও, প্রসবের ব্যাপার সম্বন্ধে, দেশীয় চামারণী বা হাড়িণী-ধাত্রী অপেক্ষা, "পরীক্ষোত্তীর্ণা" ধাত্রী এতটুকু বেশী কিছু জানে না। বরং "পরীক্ষোত্তীর্ণা" ধাত্রীরা অহঙ্কারের বশে, বাহাদুরি করিয়া, ভুল প্রেস্ক্রিপসন লিখিবার স্পর্দ্ধাটুকুও ছাড়ে না।

আপনাদের সকলেরই জানা উচিত যে, মলমূত্রত্যাগের ন্যায়, সন্তান প্রসব করাটাও একটা অতীব স্বাভাবিক ক্রিয়া। শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জনই আপনা-আপনি প্রসব কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থা হন। তাই, যে ধাত্রী, সৌভাগ্য-ক্রমে বেশী সংখ্যায় প্রসব-স্থলে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ পায়, সে সদর্পে এই বলিয়া নিজ বিজ্ঞাপন করিয়া বেড়ায় যে,—"আমি অমুক অমুক এতগুলি, বা এতশত খালাস করিয়াছি।" বস্তুতঃ, এ দেশে, ধাত্রীর কথা দূরে থাকুক, প্রসবকালে একটু, যৎকিঞ্চিৎ সামান্য, গোল হইলেই, সকল পাস করা ডাক্তারও আটিয়া উঠিতে পারেন না—ধাত্রী ত কোন্ ছার! আমি যাহা বলিলাম, ইহার একতিলও অতি-রঞ্জিত নয়—ধাত্রীরা প্রসব কাযের জানে কম, সাহায্য করিতে ষোল-আনা অক্ষম, বরং অনিষ্ট করিবার চৌষট্টি আনা ক্ষমতা রাখে। ধাত্রীরা আঁতুড় ঘরের বিশেষজ্ঞ ঝি ব্যতীত, আর কিছুই নহে, এই কথাগুলি স্মরণ রাখিবেন। তাহারা সুচতুরা, ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্না; কাযেই, মেয়ে মহলে নিজের বিজ্ঞাপনটা ভাল করিয়াই জাহির করে। সেই বিজ্ঞাপনের অতিরঞ্জিত সংস্করণ, উজ্জ্বল সার্টিফিকেটের আকারে সদ্যঃ-রাহুগ্রাসমুক্তা স্ত্রীর মুখে শুনিয়া, স্বামীরাও ধাত্রীদিগের বহুদর্শিতা, তাহাদিগের অগাধ জ্ঞান, কার্য্য-কুশলতা সম্বন্ধে অতি চমৎকার ধারণা করিয়া রাখেন! আর এই শিক্ষিত লোকের মুখ হইতে বাহিরে বাহিরে, এবং রমণীদের মুখ হইতে ভিতরে-ভিতরে, বাঙ্গালাদেশে ধাত্রীদিগের সম্বন্ধে এক আকাশকুসুমবৎ ধারণা জন্মিয়াছে! আপনারা কিন্তু এই কথা সত্য বলিয়া জানিয়া রাখুন—যে, অশিক্ষিতা ও "পরীক্ষোত্তীর্ণা" উভয় প্রকারের ধাত্রীই আঁতুড়-ঘরের বিশেষজ্ঞ ঝি ব্যতীত অপর উচ্চপদের দাবী করিতে পারে না। আর, তাহারা যে "ঝি" দিয়া যায়, তাহারা জীবন্ত ময়লার মূর্ত্তি, মূর্ত্তিমতী রোগের আকর! আরো স্মরণ রাখুন যে, ধাত্রীরা যদি দুই আনা উপকার

করিতে পারে, তবে ছইশত আনা অপকার করিবার ক্ষমতা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব।

তবে কর্ত্তব্য কি? গৃহস্থের পক্ষে, ঘরের পুরুষেরা, প্রসব ও আঁতুড় ঘর সম্বন্ধীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া, বাড়ীর সুচতুরা মেয়েদের সাহায্যে আঁতুর তুলিতে চেষ্টা করুন। অথবা, যদি ধাত্রী আনান, তবে সেই সঙ্গে সুচিকিৎসকের নজর সেই ধাত্রীর উপরে রাখিবেন। গরীবদের জন্য, সহরের প্রত্যেক পাড়ায় এবং প্রত্যেক পল্লীগ্রামে একটি বা দুটি করিয়া সরকারী প্রসবাগার করা উচিত। সেখানে একজন পাস-করা মেয়ে ডাক্তার ও যথাসংখ্যক ধাত্রীর সাহায্যে, এক রকম অবৈতনিক ভাবেই, প্রসবকার্য্য সম্পন্ন করান উচিত। শিক্ষিত সমাজে ধাত্রীগণ যাহাতে রেজেষ্টীকৃতা হন, সে জন্য বিশেষ আন্দোলন হওয়া উচিত। তবে যদি ধাত্রীরা কোনও কিছু শিখিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করে!

আঁতুড় ঘর সম্বন্ধীয় চতুর্থ দোষ—মেয়ে, পুরুষ উভয়ের অজ্ঞতা। মেয়েরা, যাহারা লেখা-পড়া শিখেন, তাঁহারা পাটীগণিত, বীজগণিতে পণ্ডিতা হন, কিন্তু নিজ দেহ সম্বন্ধে ষোল আনা অজ্ঞ। যে সকল রমণী শিক্ষিতা নহেন, তাঁহারা সংসারের সকল বিষয়েই সুপটু হন, কিন্তু দেহের তত্ত্ব লওয়াটা আবশ্যক মনে করেন না। কিন্তু এ সম্বন্ধে রমণীদের অপেক্ষা পুরুষদিগেরই দোষ বেশী। পুরুষেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করেন, পুরুষেরাই, নাটক নভেল কবিতার পুস্তক ক্রয় করেন; কিন্তু রমণীর দেহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়া ঐ বিষয়ে উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হয় না। পুরুষদিগের পাঠ্য তালিকায় দেহতত্ত্ব, শারীর-বিধান-তত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতির স্থান নাই। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া, সন্দেহ হয়, আমরা কোন্ যুগে বাস করিতেছি? আর কত দিন এ মূর্খতার কুসংস্কারের কুয়াসার সঙ্গে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ থাকিব?

আমার বলিবার অনেক ছিল—কিন্তু প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। বারান্তরে এই সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। আপনাদের মধ্যে এই সম্বন্ধে কতকটা চোখ ফুটাইবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। আপনাদের আগ্রহ দেখিলে পরে আরো কিছু বলিব।

আহাম্মুক!

[শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ]

১

বলতে পার, আমার হাতে এটা কিসের আংটী? হীরের নয়? টেট্‌স্ কোম্পানীর নকল হীরের? তোমরা তা'হ'লে হীরে চেন না! এটা আসল হীরে, 'দাম পাঁচশ' টাকা। বিশ্বাস কোরচ না? কেন,—আমার এই ছেঁড়া কাপড়, মলিন চাদর, ঘেমো জামা, আর এই তালি-দেওয়া জুতো দেখে? কিন্তু হাতখানার দিকে চেয়ে দেখ দেখি—বিধিলিপি কি বলচে? এই যে রেখাটা উঁচুদিকে চলে গিয়ে তার পর বাঁ দিকে হেলে পড়েচে, এইটে! এইটে দেখে গণকে বলেছিল, আমি লক্ষপতি হ'ব! হাসচ? গণকে অমন অনেক কথা বলে? কিন্তু আমায় মিথ্যে বলেনি—সত্যি সত্যি আমি লক্ষপতি হয়েছিলুম—একদিনের জন্যে কিন্তু! শুনবে,—কেমন করে? তবে গোড়া থেকে বলি।

আমি বাপের এক-ছেলে। তিনি ছিলেন মস্ত উকীল! চাপকানের তিনটা পকেটে না কি তাঁর অসুবিধা হ'ত—এমনি পসার! কমিটি-পাশ-করা উকীলে এত টাকা উপার্জ্জন আর কখনো করেছে কি না সন্দেহ।

কিন্তু এত উপার্জ্জন করলে কি হবে—সঞ্চয়ের থলিতে বাবার তিনটে মস্ত ফুটো ছিল,—একটা ফুটোর সাহায্যে মা প্রকাশ্যে তাঁর বাপ-ভায়ের সিন্দুক পূর্ণ করতেন। আর একটা দিয়ে আত্মীয়ের দল বিনা-খতে ঋণ গ্রহণ করতেন, এবং আত্মীয়তা-বশতঃ ঋণ শোধ করতে ভুলে যেতেন। আর, তৃতীয় ছিদ্র দিয়ে বাবা নিজের অমিতব্যয়িতার খোরাক যোগাতেন! এই রকমে ত্রিশ বছর কাটল। তার পর আমার যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখ্‌তুম্ বাবার

পশারে ভাঁটা পড়ে এসেছে, কিন্তু ব্যয়ের স্রোত তেমনি খর-বেগে ছুটেচে! এইরূপে আরও কিছুদিন গেল। তার পর এক দিন সহসা সংসার নাট্যশালার সুখের বাতি নিবিয়ে দিয়ে, বাবা আমার চোখ বুজ্‌লেন! তখন বয়স আমার পঁচিশ -সবে বিয়ে হয়েচে।

বাবা চোখ বুজ্‌লেন, কিন্তু অন্ধকার দেখ্‌তে লাগলুম আমি। এত বড় সংসার—দুটো চাকর, দু'টো ঝি, খানসামা, মালী, বামুন, দুজন মুহুরী এত লোকের আহার যোগাব কোথেকে! পাড়ার বিজ্ঞের দল পরামর্শ দিলেন—ওদের জবাব দাও; আর, মুহুরীর তো কোন দরকারই নেই! আহাম্মক আমি! তাঁদের উপদেশ আমার তিক্ত বোধ হল -কাহাকেও জবাব দিতে পাল্লুম না। যে যেমন ছিল তেমনি রইল। মুহুরীরা খায়-দায়,—অপর উকীলের কাজ করে। খানসামা পাড়ার বাবুদের কাপড় কোঁচাইয়া বখসিস্ নেয়,—আর মাসান্তে মাহিনার জন্যে আমার নিকট হাত পাতে। মালী বাগানের আম-লিচু গোলাপের কলম বেঁধে-বেচা আরম্ভ করে দিল। চাকর দুজন দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আদালতে পানের দোকান করে' দুপয়সা উপরি লাভ করতে লাগল। ঝিরা ঘুমিয়ে, কোন্দল করে', আর মাঝে-মাঝে পাড়ার তত্ত্ব-তল্লাস নিয়ে সময় কাটাত। কেবল বামুন বেচারার যে ঘাসজল, সেই ঘাসজল রয়ে গেল!

এই রকমে পাঁচ বছর কাটল। সোণা, রূপা আর যাহা কিছু সব ফুরিয়ে এল—রইল শুধু এই আংটীটা; শেষে বাড়ী বন্ধক পড়ল।

বাড়ী বন্ধক পড়তে মার মহা ভাবনা হল। আমার কিন্তু কোন রকম উদ্বেগ ছিল না। গণকের সেই কথাটায় আমার মনে এমন ধ্রুব বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আমি নিরুদ্বেগে নিশ্চিন্ত মনে ঋণের পর ঋণ করতে লাগলুম।

শেষে যখন সুদে-আসলে ঋণ দশ হাজার থেকে বিশ হাজারে দাঁড়াতে চল্‌ল, তখন সেই 'সপ্ত-পুরুষ যেথায় মানুষ' সোণার বাড়া' ভদ্রাসন বিক্রী করে মাতা ও পত্নীর হাত ধরে পথে দাঁড়ালুম।

(২)

মাসিক সাত-আটশ' টাকার উকীলের ছেলে আমি ——— এখন মিউনিসিপ্যালিটির মাছিমারা কেরাণী! ত্রিশ টাকা মাহিনায় ভবানীপুরের একটা পচা গলির মধ্যে স্যাঁৎসেঁতে খোলার ঘরের মাসে চার টাকা ভাড়া দিয়ে বাকী টাকায় সংসার চালাই। লোকে জানে, মাহিনা ছাড়া আমার 'উপরি'ও কিছু হয়। আমিও বোকা বনিবার ভয়ে 'উপরি' পাই বলে থাকি; কিন্তু 'উপরি'র মধ্যে গালিগালাজ! 'উপরি' অর্থাৎ ঘুস্ নিতে হাত আমার কাঁপে—বাস্তবিক আমি বড় আহাম্মুক!

আপিসের ফির্‌তি যখন দেখতুম, বড়-বড় জুড়ি রাস্তা কাঁপিয়ে গম গম্ শব্দে চলেচে, তখন আমি আমার দীন অবস্থায় একটুও মুশড়াইতাম না। আমার মনে হ'ত, আমিও শীগ্‌গির ঐ রকম সদর্পে গাড়ী হাঁকিয়ে যাব! একটা-আধটা নয়—দেশ শুদ্ধ গণকের কথা বিফল হবে?—অসম্ভব!

আমার অবস্থাটাকে আমি পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের সঙ্গে তুলনা করতুম। ভূতপূর্ব্ব ধনি-পুত্র এবং ভাবী লক্ষপতি এই যে আমি আপিস হতে ফেরবার পথে জগুবাবুর বাজার হতে এক পয়সার পান, এক পয়সার সুপারি, আধ পয়সার খয়ের, একপো আলু, চার পয়সার মাছ, এক পয়সার বিষ্ণুপুরে তামাক কিনে নিয়ে চলেছি, এটা যে সকলজ্ঞ বিধাতা পুরুষের চোখে খুবই বিসদৃশ ঠেকচে, তা বেশ অনুভব করতে পারতুম। বর্ত্তমানের দেওয়া আমার এই ছদ্মবেশে আমি মনে-মনে হাসতুম। তার পর যখন বড় রাস্তা ফেলে, 'চক্রবেড়ে' ছেড়ে, শেষে রামমোহন দত্তের পচা গলির উপরে আমার ভাড়া ঘরে উপস্থিত হতুম, তখন বর্ত্তমানের আস্পর্দ্ধা দেখে হাসি আসত! যেদিন কেরোসিনওয়ালা বাকী পয়সার জন্যে তাগাদার পর তাগাদা করেও বিফল হয়ে গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল, সেদিন নিজের দৈন্যে ম্রিয়মান না হয়ে, তারই আহাম্মুকি ভেবে আমার হাসি পেয়েছিল! মনকে প্রবোধ দিলুম—ওর দোষ কি, সংসার শুদ্ধই অন্ধ। পূজার সময় দ্বারওয়ানেরা কেরাণী বাবুদের কাছ থেকে দু চার আনা পেয়ে থাকে। আমার কাছে দ্বারওয়ান হাত পাততেই, ঠং করে' একটা টাকা ফেলে দিলুম। অন্য বাবুরা সাশ্চর্য্য ব্যঙ্গে আমার পানে একটু তাকালেন। সেই দিন থেকে আমার নাম হয়েছিল—ক্ষুদ্দুর নবাব! আমি কিন্তু সে সব ব্যঙ্গোক্তি গ্রাহ্যই করতুম না!

এই রকমে ভাগ্যলক্ষ্মীর ভাবী প্রসন্ন দৃষ্টির উপর নির্ভর করে' আরও কয়েক বছর দৈন্য-দেবতার ভ্রূকুটি-লীলাকে

হেসে উড়িয়ে কাটিয়ে দিলুম। মধ্যে আমাদের বড় সাহেব কিছু দিনের জন্যে ছুটি নিয়ে দেশে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন মিষ্টার মনরো। তিনি আহেলা-বিলেত—তাঁর চোখে আপিসের 'বাবু'দের পদলেহন ভাবটা বড্ড বিরক্তকর ঠেকত। ফলে, তিনি মনে মনে তাঁদের বড়ই ঘৃণা করতেন। কিন্তু কি জানি কেন, আমায় তিনি সে চোখে দেখ্‌তেন না। একদিন আমি কি কাজে সাহেবের ঘরে গেছি, আমার হাতের এই জ্বল্‌জ্বলে হীরের আংটিটা তাঁর চোখে পড়ল! তিনি বল্লেন, "বাবু, তুমি তো এই সামান্য মাইনার চাকরী কর, কিন্তু এত দামী আংটী পেলে কোথেকে?"

আমি তাঁকে আমার পূর্ব্ব-পরিচয় দিলুম। তিনি শুনে বল্লেন, "তাই অন্য বাবুদের মত তোমার গোলামী ভাব দেখি না। বাস্তবিক, এই বাবুদের দেখ্‌লে মনে হয়, এরা গোলামীর এক একটা প্রতিমূর্ত্তি।"

কথায়-কথায় সাহেব আমায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, কেমন করে' আমি অদৃষ্টের এত ঠোকর খেয়েও, আমার খুসী মেজাজটা বজায় রাখতে পেরেছি! উত্তরে আমি গণক-কুলের ভবিষ্যৎবাণীর কথা বললুম। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি তা বিশ্বাস কর?" আমার দৃঢ় বিশ্বাসের কথা শুনে তিনি বল্লেন,—"আমিও বিশ্বাস করি বাবু! কই, দেখি বাবু, তোমার হাতখানা—" এই বলিয়া সাহেব আমার হাতখানা টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ একমনে কি দেখ্‌তে লাগলেন। মিনিট পনের পরে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "গণকে মিথ্যে বলে নি,—আমি এই সায়ান্স পঁচিশ বছর ধরে চর্চ্চা করচি—আমারও বিশ্বাস তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে।"

আমার ভাগ্য সম্বন্ধে আমি এতটা নিশ্চিন্ত ছিলুম যে, সাহেবের কথায় আমার তেমন বেশী কিছু আনন্দ বা উৎসাহ হল না—নিতান্ত শোনা কথার মতই বৈচিত্র্য বিহীন ঠেকল। তবু মুখে একটু আনন্দ প্রকাশ করে বল্লুম—"সকলের কথা যখন মিলে যাচ্ছে, তখন একদিন না একদিন ফলবেই।"

সাহেব জিজ্ঞাসা কল্লেন—"তুমি কোন লটারিতে টিকিট কিনে দেখচ কি?"

'না' শুনে সাহেব বল্লেন—"তবে আর ভাগ্যে ফলবে কি করে বল?—তাকে ফলবার পথ করে দিতে হবে—তবেই ত সে ফলবে!"

সে দিন এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হল।

(৩)

দিন সাত আট পরে সাহেব আমায় ডেকে পাঠালেন। আমায় একখানা ছাপান কাগজ দিয়ে বল্লেন—"তুমি দু'শ' টাকা দিয়ে এর একখানা টিকিট কিনে, তোমার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ।"

জগতের হিতকল্পে বিপুল অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের কোন সম্ভ্রান্ত কোম্পানী এই লটারির টিকিট 'ইশু' করেছেন। যে টাকা উঠ্‌বে, তা হ'তে, লটারিতে যার নাম প্রথমে উঠবে, তাকে প্রথম পুরস্কার হিসাবে এক লাখ টাকা দেওয়া হবে। তা ছাড়া, পঞ্চাশ হাজার করে' আরও দুটো পুরস্কার আছে।

আমার ভাগ্য পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে খুব দৃঢ় বিশ্বাস থাকলেও, এ ক্ষেত্রে কেমন সন্দেহ উপস্থিত হ'ল। সাহেবকে বল্লুম,—"সুবিধা হবে কি?"

সাহেব আমার প্রশ্নে অন্যরূপ বুঝলেন; বল্‌লেন—"না, এরা অনেষ্ট—তোমায় ফাঁকি দেবে না।"

"না, আমি সে কথা বলচি না।"

সাহেব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বল্লেন,—"তবে কি?"

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বল্লুম, "আমি যে পাবই, তার ঠিক কি?"

সাহেব চক্ষু বিস্ফারিত করে বল্লেন, "এ্যাঁ, তোমার বিশ্বাস নেই—গণনার উপর!"

আমি বল্লুম, "বিশ্বাস আছে, কিন্তু—" সাহেব বাধা দিয়ে বল্লেন, "বিশ্বাস থাকে ত কিন্তু-টিন্তু কিছু করলে চলবে না। বোল্ডলি কাজ কর।"

কিন্তু দু' শ' টাকা—সে যে আমার প্রায় এক বছরের মাহিনা!

সাহেব বল্লেন, "কেন, দুশ' টাকা লোন্ পাবে না?"

"আমার কি আছে যে লোকে দু'শ' টাকা ধার দেবে?"

সাহেব সোৎসাহে বল্লেন, "কেন, তোমার আংটি রেখে আমার কাছ থেকে ধার নিতে পার!"

অসম্মত হ'লে পাছে সাহেব ভাবেন তাঁকে অবিশ্বাস করচি, তাই আর না বলতে পারলুম না। পাঁচ শ' টাকার আংটী রেখে দু'শ টাকা ধার নিলুম।

তার পর পঁচিশ টাকার কেরাণী লক্ষ টাকার আশায়

অনিশ্চিতের অন্ধকারে ঝাঁপ দিলুম উঃ! সে কয় মাস কি উদ্বেগেই গেল!

বাড়ীর সকলে শুনে আমার দুর্মতির জন্যে হায় হায় করতে লাগ্‌ল। স্ত্রী সজল চক্ষে বল্লেন, "বাবা বড় সাধ-করে দিয়েছিলেন, তাও তুমি নষ্ট করলে!"

এই সমস্ত কাতর উদ্বেগের সাম্‌নে আমার ধ্রুব বিশ্বাস যেন ভেঙে পড়তে লাগল! আমি উদ্ভ্রান্ত হয়ে আবার হাত দেখাতে লাগলুম;—না, অদৃষ্টের লেখা বদলায় নি!

তার পর ফল প্রকাশের সময় যত আসন্ন হয়ে আসতে লাগল, আমি ততই যেন মুসড়ে পড়তে লাগলুম।

এক দিন অসময়ে বড় সাহেবের ঘরে আমার ডাক পড়ল। দেখলাম, সাহেবের মুখ ঈষৎ গম্ভীর। তিনি গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"লটারির খবর এসেচে।"

আমার মুখখানা পাংশের মত হয়ে গেল—সর্ব্বাঙ্গে বিন্‌বিন্‌ করে স্বেদ ফুটে উঠ্‌ল।

সাহেব বল্লেন—"তোমার টাকা 'রিফাণ্ড' করা হয়েচে—কি জানি কেন, তোমার নাম কম্পিটিটাসের লিষ্ট থেকে কেটে দেওয়া হয়েচে।"

আঃ! বাঁচলুম! আমার মুখে রক্ত ফিরে এল—আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লাম।

সাহেব ঈষৎ হেসে, একখানা চেক হাতে করে বল্লেন, "একেবারে ঠিক ৬'শ দেয়নি—কিছু বেশী দিয়েচে।—কত হ'লে খুসী হও?"

আমি বলে উঠ্‌লুম—"আমি যা দিয়েচি, তাই পেলেই খুসী হই!" "খুসী হও?—বেশ, তোমার আংটী ফিরিয়ে দেব—এ চেক তবে আমার হল?—" এই বলে চেকখানা আমার সুমুখে ধরলেন।

দেখলুম—একলক্ষ টাকা!

চকিতে আমার চোখে দিনের আলো নিবে গেল! তারপর কি হ'ল বুঝ্‌তে পাল্লুম না—আমি না কি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলুম।

পাছে আনন্দের আতিশয্যে আমার হার্ট ফেল করে, তাই সাহেব এই কৌশল করেছিলেন।

সে দিন এ সংবাদে বাড়ীতে যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেছল, তার তুলনা নেই। আর আমার? লক্ষপতি হবার যে আশা আমায় এত দিন দারিদ্র্যের কশাঘাতের তীব্রতা বুঝতে দেয় নি, তার সাফল্য, কই, কোন তৃপ্তি, কোন শান্তি তো দিতে পারল না! আমার বুক কেবলি থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌তে লাগল—যদি এমন না হ'ত, তবে ত আংটীটা গেছল। আরও একটা চিন্তা কেবলই আমায় পীড়া দিতে লাগল—আমার মত আরও কত লোক না জানি সর্ব্বস্ব দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'ল! সেই চেকের অক্ষরগুলা যেন তাদেরই বুকের রক্তে লেখা বলে মনে হতে লাগল।—সমস্ত রাত্রি কেবলি স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগলুম—যেন আমি একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ নরনারীর বুকের উপর দাঁড়িয়ে, আর আমার হাতে সেই লাখ টাকার চেকখানা—তা থেকে টস্‌টস্‌ করে রক্ত ঝরে পড়ছে—আর লোকগুলা ম্লান, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলচে! সে নিশ্বাসে আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝলসে যেতেছিল! আমি ঘুমের ঘোরে চীৎকার করে উঠলুম!

পর দিন কাউকে না জানিয়ে এমন একটা কাজ কল্লুম, যা শুনলে তোমরা কেউই আমার বুদ্ধির প্রশংসা কর্ব্বে না—ভাব্‌বে, আমি একটি আস্ত আহাম্মুক! কি কল্লুম শুন্‌বে? আমি সেই চেকখানা ভাঙিয়ে সাহেবের ঋণ শোধ করে, বাকী টাকাগুলো ফ্রান্সের সেই কোম্পানীকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলুম—জগতের হিতার্থে ইহা ব্যয় করবেন। বাস্তবিক, আমি আহাম্মুক—না? কিন্তু যাই হই, মা কিন্তু শুনে আশীর্ব্বাদ করেছেন—"বেশ করেচ, ঈশ্বর তোমায় সুখী করবেন!"—সত্যি, আজ আমি বড় সুখী।

পাণ-প্রসঙ্গ (১)

[অধ্যাপক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ]

শিশুকালের প্রথম শিক্ষা "* * বাটা ভরে পাণ দিব, গাল ভরে খেও।" মাতা অন্যান্য ভয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ঘুমপাড়ানি মাসি পিসিকে স্মরণ করিতেন। পাণের টানে ঘুমপাড়ানি আসিয়া চোখে ঘুম দিয়া যাইতেন পাণ কিন্তু পাইতেন না। "নামের কি বা মহিমা!" বাল্যকালে যখন পাণ চাওয়া যাইত, তখন বিজ্ঞজন, বিজ্ঞ জননীও, গুরুগম্ভীর হইয়া বলিতেন "পাণ খায় না! পড়া মুখস্থ হইবে না, জিভ্ জড় সড় হইয়া যাইবে।" ইত্যাদি। ফ্রোবেলের কিনডারগার্টেন পদ্ধতি জানিলে ইঁহারা এরূপ নিষেধ জারি অবশ্য করিতেন না। নিষেধের বিষময় ফল ইঁহারা ধরিতে পারেন না। আর কিছু দিন পরে পাণ তামাক প্রভৃতির অলৌকিক যুগপৎ পদ ব্যবহার দেখিয়া যেমনি বালক উপদেষ্টার মুখে শুনে, "পাণে হজম হয়" অমনি পাণের এক নম্বর ভক্ত হইয়া উঠে কাশীর ডিবাটী সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কাশীর আর একটী জিনিসও পাণের সহচররূপে পকেটে স্থান প্রাপ্ত হয়।

পাণের ন্যায় মজলিসি জিনিস দুনিয়ায় আর কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। অভ্যর্থনায় পাণ দিয়া বিদায় করিতে পারিলেও কাহারও 'মুখ হাঁড়ি হয় না'। ভোজনের পর মাথা পিছু পাণ দিলে লোকের আর বিরক্তি ধরে না। দু'টা পাণের যায়গায় একটা দিলেই লাঠালাঠির উপক্রম হইয়া উঠে। 'রসগোল্লা' চাওয়ায় বরং লজ্জা আছে, কিন্তু 'যত ইচ্ছা' পাণ চাওয়ায় কোন লজ্জা নাই। (২) পাণ এমনি একটা গুরু-গম্ভীর জিনিস! পেটুক-চক্রবর্ত্তী পূর্ণ ভোজনের পর তিন চারিটী পাণ পাইলে, আর বদহজমের ভয় রাখে না। হায় হোমিওপ্যাথিকগণ! আপনারা এ-হেন পাণ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন! ইহার ফলে আপনাদের প্র্যাকটিস্ বন্ধ হইবে নিশ্চয়, — পাণ-সেবকগণ বরং আপনাদের ঔষধ ত্যাগ করিবে, কিন্তু কদাচ পাণ ত্যাগ করিবে না। বুদ্ধিমান্ হোমিওপাথী-ব্যবসায়ী কিন্তু বলেন, "আমার ঔষধে পাণ, তামাক্, আফিং বাদ নাই।" ইহাই হইল প্রকৃত চিকিৎসা! চিকিৎসার এক গুঁয়ামো কিছুই নয়।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জ্ঞান-নেত্রে দেখিলে দেখা যায়, আজ ভারতবর্ষে কোটী-কোটী লোক পাণের সেবা করিতেছে -- কেহ সুপারী কাটিয়া পাণ সাজিতেছে, কেহ পাণ চর্ব্বণ করিতেছে, কেহ হামানদিস্তায় পাণ পাড় দিতেছে। পাঠক-বর্গের নিকট নতুন সমাচার কি না জানি না-- ভুক্তভোগী-মাত্রেই জানেন, উড়ে ঠাকুরকে পাণের পয়সা না দিলে তদ্দণ্ডেই সে চাকরী ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং "হাঁড়ী বন্ধে"র ভয় করিতে হইলে, তাহাকেও "বাটা ভরে পাণ দিবার" লোভ দেখাইতে হইবে। গৃহিণীকে ভয় করিতে যাঁহারা অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও যাহাতে "পাণ হইতে চূণ না খসে" তাহার জন্য সর্ব্বদা অবহিত হইয়া থাকেন।

কাব্যের রাজ্যে চন্দ্রের সহিত মুখের তুলনা করা 'সেকেলে' হইয়া উঠিয়াছে। এখন গোল চন্দ্র-মুখ অপেক্ষা "পাণ পারা" মুখই লোকের পছন্দসই।

"চান ক'রে যেবা নারী মুখে দেয় পাণ,
লক্ষ্মী বলে সেও নারী আমারি সমান।"

ইত্যাদি পুরানা কবির উপদেশ অনেক নারীই মানিয়া চলেন। গৃহিণীরাও নব্য ধরণের মেয়েদের এই বিষয়ে শিথিলতা দেখিলে, উপদেশ ও ধমক্ দিয়া থাকেন। অনেকে "দন্তরুচিকৌমুদী" নাশের আশঙ্কায় পাণ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করেন। কিন্তু সাহেবদের দন্ত লক্ষ্য করিয়াছেন কি? তাহাদের দন্তরোগ নিরানব্বই জনের।

(১) ভারতবর্ষে প্রকাশিত "টাকার লীলাতত্ত্ব," "চা তত্ত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িয়া অনেকের এইরূপ লেখার প্রতি আগ্রহ জন্মিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ ভারতবর্ষ-সম্পাদক মহাশয়েরও ফরমাইস আছে। তাই এই অবতারণা। "পাণ" সম্বন্ধে পূজনীয় ললিত বাবু পূর্ব্বেই "ফোয়ারায়" যথেষ্ট লিখিয়াছেন; তবু অমন একটা সনাতন জিনিসের আলোচনা অব্যাহত থাকা ভাল। এটা না হয় তাঁহার লেখার পরিশিষ্ট রূপে পঠিত হইবে। লেখায় কি বাতিক!

(২) পাণ না দিবার পক্ষে কোন লজ্জা নাই।

পাণ-সুপারি না দিলে বঙ্গের ব্রতগুলি কাণা হইয়া যায়। পাণের আদর হইতে "সোহাগ বাটা"র সৃষ্টি হইয়াছে। পাণ কত বড় একটা "ন্যাশনাল" জিনিস, ভাবিয়াছেন কি ?

প্রাচীন ভারতের সমাজে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই, তাহাতে "তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী" চলিয়াছেন। পাণের বাটা তম্বা (৩) মহলে আছেই। প্রিয়ম্বদা রাজা দুষ্মন্তকে false পাণ দিয়াছিলেন কি না, কালিদাস অত কথা লেখেন নাই। কিন্তু নূতন জামাইকে পাতা খাওয়ান এখনকার শালিকাগণের একটা বিজয়োৎসব।

'পর্ণ' শব্দ হইতে 'পাণ' শব্দ আসিয়াছে। 'পর্ণ' অর্থে পাতা। পাণও একটা পাতা। যেমন 'দুধ খাও' বলিলে 'গরুর দুধ' খাও, বুঝায়,—তেমনি সংস্কৃতে 'পাতা' খাও বলিলে 'পাণ খাও' বুঝায়। পাণের কি খ্যাতি-প্রতিপত্তি !

হোমিওপ্যাথিকগণ পাণের প্রতি খড়্গহস্ত হইলেও, কবিরাজ মহাশয়গণ পাণের গৌরব বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহারা "শূল গজেন্দ্রচূর্ণ" অথবা "বাতাঙ্কুশবটী" বা কোন "আতঙ্ক হুতাশন" দিবার সময়ে পাণের রস ও মধুর অনুপান ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। প্রাচীনা গৃহিণীরা পাণ শিশুর পেটে বুলাইয়া "জোঁক" পোড়াইয়া থাকেন। পাণের আদর ভারতময়। মহারাষ্ট্র ও উড়িষ্যাবাসিগণ পাণের বিচিত্র ছাঁদের (অবস্থাবিশেষে মখমলেরও) থাল বহন করিয়া থাকেন। লক্ষ্ণৌর আধুনিক নবাবগণ চিকিসুপারি ও মুক্তাভস্মের চূর্ণ সহযোগে তবক্‌মোড়া পাণ খাইয়া 'খুস্ মিজাজে' গল্প করিতে ভালবাসেন। রেলের কথা আর পাণের কথা একরূপ একই কথা।

পাণ খাওয়ার মধ্যে Æsthetics যথেষ্ট আছে। তাম্বুলরাগ সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের বিষয় (৪)। পাণ খাইয়া মুখের অবস্থান্তর অবলোকন করিবার অনুশাসন আছে। তাই বুদ্ধিমান পাণের দোকানদারগণ মস্ত বড় একখানি আয়না টাঙ্গাইয়া রাখে। উদ্দেশ্য, বাবুরা খিলি খাইয়া আয়না দেখিবে, আর খিল্ খিল করিয়া হাসিবে। Æsthetics-এর অবশ্য উল্টা দিক্ বা contrast ও আছে;—তা না হইলে ঠিক শিক্ষা ত হয় না। তাহা বিশ্রী অসুন্দর 'পিক্' ফেলা। এই পিক্ ফেলা বা পিকদানি হইতে তাম্বুলরাগের সৌন্দর্য্য আরও অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করা যাইবে।

পাণ লইয়া অনেক উপদেশপূর্ণ গল্প আছে। একবার এক গোস্বামী মহাশয় তাঁহার শিষ্যগৃহে গিয়াছিলেন। শিষ্য একদিন গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন "প্রভো, এই যে, 'নমো নলিন-নেত্রায় বেণু বাদ্য বিনোদিনে। রাধাধর সুধা-পান শালিনে বনমালিনে।' এই শ্লোকের অর্থ কি ?" প্রভু তাহার উত্তরে বলিলেন "আঃ। ছাই, তুমি ত বড় অর্ব্বাচীন ! ইহার আর অর্থটা বুঝিলে না ! 'নমো নলিননেত্রায়' ত বুঝিলেই। 'বেণু বাদ্য বিনোদিনে'ও ত বুঝিয়াছ। কথাটা কি জান, রাধা কৃষ্ণকে একটি পাণ দিয়াছিলেন। তাহাতে মসলা ছিল না, শুধাই পাণ ছিল। তাই কৃষ্ণ বলিতেছেন—'রাধা ধর শুধা পাণ'। তাহাতে রাধা একটু মান করিলেন; তখন রাগ করে' কৃষ্ণ বলিলেন, 'শালি নে'। অমনি রাধাও বলিয়া উঠিলেন, 'বনমালি নে'। বুঝলে ত অর্থটা ?" "আজ্ঞে হঁ।" (৫)

পাণের কথা শুনিয়া-শুনিয়া (বাঙ্গলায় উভয় 'ন' কারের ভেদ নাই) মাদকনিবারণী সভার সভ্যগণ পান-দোষের ভয়ে বোধ হয় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবেন। তবে আশ্বাস আছে, সান্ত্বনার আশা আছে যে, এই বিষয়ে যিনি বঙ্গদেশে অগ্রণী তিনি অস্পৃশ্য, অনাঘ্রেয় পদার্থটার ন্যায়সঙ্গত রূপে বিরুদ্ধবাদী হইলেও, বর্ত্তমান আলোচ্য পদার্থটির অহোরাত্র ব্যবহার করিয়া পূর্ণ ভারতীয়ত্ব বজায় রাখিয়াছেন। এ দুই শব্দের কেন যে শ্রবণেও মিল আছে, তাহাই আশ্চর্য্য।

পাণের বিরহ বড় শক্ত বিরহ। একবার এক প্রৌঢ়া গৃহিণী বিধবা হইয়া, পতি-বিয়োগ বিধুরা হইয়া, বড়ই করুণ সুরে বিনাইয়া-বিনাইয়া কাঁদিতেছিলেন, "ওগো, তুমি না হয় গেলে, গেলে;—আমার পাণও জন্মের মত নিয়ে গেলে—রে এ—এ—এ"—। হায়—হায়—হায়—কি কপাল !

(৩) 'সা' 'তম্বা' বাঙ্গলায় ব্যবহার করা ডাঃ কালীর "ব্রেইন ওয়েলে"র ন্যায় আর একটী আবিষ্কার।

(৪) বাঙ্গালার উদ্ভট শ্লোক শুনুন—

"এ প্রণয়ের এমনি গুণ, পাণের সঙ্গে যেমন চূণ।
কম হ'লে সই লাগে ঝাল, বেশী হ'লেই পোড়ে গাল !"

(৫) এইরূপ সংস্কৃতেও "চূর্ণমানয়ীতাং তূর্ণং পূর্ণচন্দ্র নিভাননে" প্রভৃতি লইয়া খোস গল্প আছে।

মনে পড়ে

[শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্]

(১)

মনে পড়ে সেই কাহিনী,—এক যে ভরা ভাদ্ মাসে
অতি গুমট দুপুরবেলার রোদে তপ্ত শ্বাঁতাশ্বাসে
পাখীরা সব ধুঁকে সারা ডোবায় ঘেরা বাঁশের ঝাড়ে ;
ঝিমুচ্ছিল গরু-বাছুর তেঁতুল-তলায় গাঙের পাড়ে।
নালায়, খালে, ঝিলে, বিলে ধারা ঢেলে নিরবধি,
যেন গর্বে বুক ফুলিয়ে ছুটেছিল ভরা নদী।
চলেছিল দু'জন যাত্রী নৌকা-পথে উজান বেয়ে—
রসে তাজা রোদে মাজা ধানের ক্ষেতের পানে চেয়ে।
দাঁড়ের ঘায়ে, স্রোতের ঘায়ে দুলে গেল ছোট্ট ডিঙ্গা ;
মাঠের পরে মাঠ চলেছে, গ্রামের পরে গ্রামের সীমা।
ভরা গাঙের কাদা জলে উপর রোদের ঝলক পড়ে ;
ছইএর ছাওয়ায় চোখের চাওয়ায় আলোক ঢালা পলক পড়ে ;
সরস প্রেমের সবুজ পাতায় তাদের প্রাণের কুঞ্জ ছাওয়া ;
গুমট বেলায় কুঞ্জে খেলায়, মধুর হতে মধুর হাওয়া।
সজীব সবুজ ধানের গাছে ঢেকে পড়া মাঠের পাকে,
কচিৎ কচিৎ গেল শোনা—"টুব্-টুব্-টুব্" পাখী ডাকে।
অসীম উদার দেদার মাঠের কলে কলে, প্রেমোচ্ছ্বাসে—
দুলে গেল নৌকাখানি এক যে ভরা ভাদ মাসে।

(২)

নেইক মনে উপাখ্যানের পরের কথা পরে পরে :—
মিলিয়ে গেল কত ঋতু বছরগুলির স্তরে স্তরে ;
উছলে গেল, পিছলে গেল কত মিলন কত গোসা ;
উদয় হ'ল, অস্তে গেল, কত আশা বুকে পোষা।
সকল স্মৃতির মাথায় মাথায় চিক্মিকিয়ে সদাই হাসে—
সেই যে উজান বেয়ে যাওয়া এক যে ভরা ভাদ্র মাসে।
হোক্ সে অতি গুমট্ বেলায় ভাদ্র মাসের রৌদ্রে মাজা,—
প্রেমের ইতিহাসের আদি, নিত্য মধুর নিত্য তাজা।
এক দিন এক সাঁঝের আগে আকাশ ছিল চিত্র করা ;
প্রীতির প্রতিবিম্বে যেন বিচিত্রতায় চিত্ত-ভরা।
উৎসবেতে মত্ত পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে গাছে গাছে,
কঠোর রুক্ষ শিলার তলে দু'জন তারা কাছে-কাছে ;
কুড়িয়ে-পাওয়া মণি মাণিক চূর্ণ হয়ে শিলায় গড়ায় ;
রক্ত রেখায় শিলায় দাগা লীলা-স্মৃতি পায়ের গোড়ায় ;
তুষার-পরে ঊষার রাঙ্গা ছবির মত তবুও ফোটে,
জমাট-বাঁধা ব্যথার মাথায় মধুর হাসি তাদের জোটে।
দুঃখ চেপে হাসি খেলায় সন্ধ্যা বেলায় শৈল-বাসে,
মনে পড়ে সেই কাহিনী, উজান গাঙে ভাদ্ মাসে।

দন্ত ও দন্তের যত্ন

[শ্রীরফিদিন আমেদ]

অপরিষ্কৃত মুখগহ্বরের সহিত স্বাস্থ্যের কি সম্বন্ধ

বিশ্ব-বিশ্রুত খ্যাতনামা অস্ত্র-চিকিৎসক স্যার উইলিয়াম অসলার মহোদয় বলিয়াছেন যে, বিষাক্ত ও দূষিত মুখগহ্বর সুরা অপেক্ষাও অধিক অনিষ্টকারী। চিকিৎসা-বিভাগের মনীষিগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, শতকরা ৭৫ রকম পীড়া মুখ গহ্বরের অপরিচ্ছন্নতা হইতে উৎপন্ন হয়; এবং কোন কোনও সময়ে ৪জন রোগীর মধ্যে ৩জন "পায়োরিয়া" (Pyorrhea) নামক যন্ত্রণাপ্রদ দন্ত-ক্ষতে কষ্ট পায়।

নৈতিক ও দৈনন্দিন জীবনের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ মুখমণ্ডল, দ্বিতীয়তঃ দন্ত পরিষ্কৃত রাখা একান্ত কর্তব্য। মুখে দুর্গন্ধ হইলে, বা দন্ত অপরিষ্কার থাকিলে কার্য্য জীবনে লোকের সহিত আচার ব্যবহার অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

কেবলমাত্র বাহিরের চাকচিক্যের নিমিত্তই যে দন্তপংক্তি সুন্দর বা মুখবিবর পরিষ্কৃত রাখার প্রয়োজন, তাহা নহে।

থিল বা স্খলিত দন্ত, কিংবা অপরিষ্কার মুখের জন্য সময়ে-য়ে সাংঘাতিক রূপে স্বাস্থ্যহানি হয়। সুতরাং এই সকল রণে, স্বাস্থ্যের সহিত মুখগহ্বরের যে কি নিকট সম্বন্ধ তার কথঞ্চিৎ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। যাঁহারা নরূপে খাদ্য চর্ব্বণ না করেন, তাঁহারা যত সুখাদ্যই ণ করুন না কেন, তাঁহাদিগকে উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা ভৃতি অম্ল পীড়ায় কষ্ট পাইতে হয়; কারণ তাঁহাদিগের খাদ্য কস্থলীতে যায় বটে, কিন্তু পরিপক্ক হয় না।

খাদ্য যদি উত্তমরূপে চর্ব্বিত বা পরিপক্ক না হয়, তাহা লে দেহ কোনরূপ পুষ্টিকর দ্রব্য পায় না এবং দেহের পুষ্টি দন হয় না। সুতরাং এই নিমিত্ত জীবনী শক্তির হ্রাস ও নানাপ্রকার পীড়ার উৎপত্তি হয়। জনৈক শারীরিক ত্তির ব্যাখ্যাকারী সকলকে সাবধান করিবার নিমিত্ত য়াছেন, "খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করা সকলের কর্ত্তব্য; রণ, পাকস্থলীর দন্ত নাই, সুতরাং খাদ্য চর্ব্বিত করিলে রিপাকের সাহায্য করা হয়।" দন্ত ও মুখগহ্বরের অযত্নের যখন এত প্রকার পীড়া জন্মে ও পরিপাক ক্রিয়া অভাব হয়, ন এ বিষয়ে তাচ্ছিল্য না করিয়া, প্রথম হইতেই এদিকে ক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পরিপাক শক্তি হ্রাস পাইলে বা ় ও মস্তিষ্কের উপযুক্ত পরিপোষণ না হইলে, মন চঞ্চল য়া পড়ে, ওজন কমিয়া যায় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া ড়।

Diphtheria, pneumonia প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির ণু অপরিষ্কৃত মুখে জন্মগ্রহণ করে। আমাদের দেহের া মুখবিবরই যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কৃত রাখা কর্ত্তব্য, তাহা মরা বিস্মৃত হইয়া যাই; কাজেই সে বিষয়ে উপেক্ষা করি। ণ, উহা দূষিত পদার্থে পূর্ণ হয়। প্রত্যেক নরনারীর সর্ব্ব-ান ও প্রথম কর্ত্তব্য দন্তের যত্ন করা। আপনাদিগের স্থ্যরক্ষার নিমিত্ত মুখগহ্বর সদা-সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা ান্ত কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে সর্দ্দি-কাশী বায়ুর সহিত শ্রত ক্ষুদ্র অণুর সহিত মিলিত হইয়া বিষাক্ত রোগবীজাণুর করে। সেই বীজাণু এক ব্যক্তির দেহ হইতে অপরের হ প্রবেশ করে; এবং প্রথম ব্যক্তির যদি কোনও ার পীড়া থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তিও ঐ রোগে পায়। পান-ভোজন কালে অথবা অন্য সূত্রে নানা ারে আমাদিগের মুখ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে হয়; সুতরাং ইহাতে আমাদের মুখে অনায়াসে রোগ-বীজাণু প্রবেশ করে। অতএব আমাদের দন্ত ও মুখ-গহ্বর সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা একান্ত আবশ্যক।

দন্তক্ষতের বৃদ্ধি

অপরিষ্কার মুখগহ্বরে দন্তের উপরে সচরাচর আমরা পাথরী (Tartar) বা একপ্রকার শক্ত পদার্থ দেখিতে পাই। এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পদার্থ প্রতিনিয়ত লালা হইতে নিঃসৃত হয়, এবং উহাই পরে একত্র হইয়া দন্তের মূল বা মাড়ীর নিম্নে ও পার্শ্বে জমে। পাথরী হইলে দন্তমূলে প্রদাহ হয়, এবং দন্তের চতুষ্পার্শ্বের মাড়ীতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গর্ত্ত উৎপন্ন হয়। সেই গর্ত্তে নানাপ্রকার খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থ সংগৃহীত হইয়া এই সব গর্ত্ত সামান্য উত্তপ্ত হয়, ভিজা-ভিজা হয়, এবং ইহাই পীড়া-বীজাণুর উৎপত্তি স্থল হইয়া উঠে। এই গর্ত্ত হইতে অবিরত পূয নির্গত হইতে থাকে। অনর্গল পূয বাহির্গত হইলে, আমাদের বুঝা উচিত, ইহা সামান্য ব্যাপার নহে,—ইহা হইতে অন্য পীড়া জন্মিয়া আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। পাথরী জন্মিবার প্রথম হইতেই যদি উহা তুলিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে আর দন্ত-ক্ষত আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না। যে সমস্ত ক্ষুদ্র অণু লালা হইতে নিঃসৃত হয়, আমরা যদি তাহা ধৌত করিয়া ফেলি ও রোগাক্রান্ত tissueগুলি তুলিয়া ফেলি, তাহা হইলে আর পীড়া জন্মে না। এই সব কার্য্য,—যথা, পাথরী উঠান, tissue তোলা প্রভৃতির জন্য কোনও অভিজ্ঞ দন্ত-চিকিৎসকের নিকটে গমন করিয়া তাঁহার সাহায্য লওয়া কর্ত্তব্য।

দন্তের ক্ষয়

দন্ত ক্ষয় হইয়া যাওয়াই দন্তের সাধারণ পীড়া। যদি আমরা নিয়মিত ভাবে দন্ত মার্জ্জন না করি, তাহা হইলে খাদ্যের কণা আমাদের দন্তের উপরে ও ভিতরে পচিয়া উঠিয়া তৃগ্ধাম্ল বা lactic acidএ পরিণত হয়। এই এসিড দন্তের উপরিস্থিত এনামেলকে নষ্ট করিয়া থাকে। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, বীজাণু সদাসর্ব্বদাই মুখগহ্বরে থাকে; সুতরাং বীজাণু এসিডের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে এনামেল নষ্ট করে; তাহার পর ক্রমে-ক্রমে দন্তকে একেবারে ক্ষয় করে। এমন কি, সর্ব্বশেষে দন্তমজ্জা (nerve or pulp) পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে। এই সময়ে দন্তে অল্প-অল্প ব্যথার সূচনা

হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই দন্তমজ্জা একেবারে ক্ষয় হইয়া যায়। আর সেই রোগ একেবারে দন্তমূল পর্যান্ত বিস্তৃত হয়। সেই জন্য সেই দন্তমূলে সংক্রামক ফোড়া হয়। দন্তমূলের এই ফোড়া এত যন্ত্রণাদায়ক যে, অনেক সময়ে এই রোগের প্রতীকার করা অসম্ভব। যদি নিয়মিত ভাবে দন্তমার্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে এ রকম কোনও পীড়ারই সৃষ্টি হয় না। যদি কেহ দন্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, কোনও অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসকের নিকট গিয়া দন্ত দেখান উচিত। কারণ, চিকিৎসক সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, তাহার দাঁত পরিষ্কার করিয়া, গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিয়া দিবেন। তাহাতে রোগীকে আর ভবিষ্যতে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হইবে না। যদি, যাইতেছি-যাইব করিয়া বিলম্ব করেন, তাহা হইলে গর্ত্তটী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যে, তখন দন্তটী তুলিয়া ফেলা ভিন্ন প্রতীকারের অন্য কোন প্রকার উপায় থাকে না।

শিশুর দন্ত

প্রায় সকল শিশুর মাতা-পিতাই মনে করেন যে, "দুধের দাঁত তো পড়িয়াই যাইবে, সুতরাং এখন আর উহার যত্ন করিয়া কি হইবে? যখন স্থায়ী দন্ত উঠিবে, তখন পরিষ্কার রাখিলেই হইবে।" কিন্তু আমি খুব জোরের সহিত বলিতেছি যে, সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দুধের দাঁতের স্থায়ী দন্তেরই ন্যায়; বরং তাহার অপেক্ষা অধিক যত্ন লইতে হয়। এই কথার সত্যতা প্রমাণের নিমিত্ত এ বিষয়ে আমার কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় এবং সঠিক তথ্য বক্তব্য আছে। যথা, (১) ষষ্ঠ বৎসর হইতে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে স্থায়ী দন্ত উঠে। সুতরাং যত দিন স্থায়ী দন্ত না উঠে, তত দিন খাদ্য চর্ব্বণের নিমিত্ত ঈশ্বর প্রত্যেক শিশুকে কতকগুলি অস্থায়ী দন্ত দিয়াছেন। যদি সেই দন্ত ক্ষয় হইয়া যায়, তাহা হইলে শিশু খাদ্য উপযুক্ত রূপে চর্ব্বণ করিতে পারে না; সুতরাং উত্তম রূপে খাদ্যের পরিপাক হয় না। খাদ্য পরিপক্ক না হইলে নানা প্রকার পীড়া যে কি ভাবে শিশুকে আক্রমণ করে, তাহা আর কাহাকেও বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না।

(২) আপনারা কি চান যে, আপনাদের পুত্র-কন্যাগণ বিষাক্ত বা দূষিত পদার্থ ভক্ষণ করে? কখনই নয়। এ কথা আপনাদের জিজ্ঞাসা করিলে আপনারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে, "সর্ব্বনাশ, সে কি কথা!" কিন্তু তাহা হইলে আমি বলি যে, "কেন এ কথা বলিতেছি? আমি জানি, সহস্র-সহস্র বালক-বালিকা প্রত্যহ দূষিত পদার্থ ভক্ষণ করে। কি করিয়া, জানেন? যত প্রকার গলিত পদার্থ ও দূষিত পুঁয দন্ত হইতে নির্গত হয়,—শিশুরা যখন আহার করে, তখন আহার্য্য দ্রব্য ঐ সকল দূষিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিষাক্ত হইয়া যায়। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছেন, তাহাতে ইহাদের কিরূপ স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়।

(৩) শিশুদিগকে এই কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি দিবার নিমিত্ত আপনারা কি করেন? তাহারা যত দিন না যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিষম চীৎকার করে, তত দিন কি আপনারা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকেন? না, সময়মত গৃহ-দন্ত-চিকিৎসকের নিকট সন্তান-সন্ততিদিগকে লইয়া গিয়া, তাহাদিগের দন্ত পরিষ্কৃত করাইয়া দেন?

(৪) আমরা সকলেই উত্তম রূপে জানি যে, স্থায়ী দন্তের খুব যত্ন লওয়া উচিত। সকলের এ কথা জানা উচিত যে, প্রথম বারের দন্ত পংক্তি, অর্থাৎ দুধের দাঁতের যত্ন পরিণত বয়সের দন্তও সুন্দর হয়। দুধের দাঁত যদি অকালে পড়িয়া যায়, বা ক্ষয় হইয়া যায়, তাহা হইলে স্থায়ী দন্তও বক্র বা বিশ্রী হয়। দুধের দাঁত স্থায়ী দন্তকে চিবুকে যথাস্থান (অর্থাৎ কোথায় কোনটা উঠিবে) নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। মুখমণ্ডলের প্রত্যেক হাড় এবং নাসিকার পরিপুষ্টি স্থায়ী দন্তের উপর আংশিক রূপে নির্ভর করে। বস্তুতঃ, মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক নিয়মানুরূপ পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত, প্রত্যেক দন্তের সহিত অপর দন্তের প্রত্যেক বিষয়ে যথাযথ সম্বন্ধ থাকা সম্পূর্ণ আবশ্যক।

(৫) কোনও মাতা-পিতাই চাহেন না যে, তাঁহাদের সন্ততিগণের চিবুক বিকৃত হয়, মুখমণ্ডল রোগ-শীর্ণ বা নাসিকাস্থি অপরিপুষ্ট হয়। সুতরাং উচিতমত কার্য্য করা আবশ্যক; এবং "দুধের দাঁত" বলিয়া অবহেলা না করিয়া, বিশেষরূপে তাহারও যত্ন লওয়া উচিত। যদি কোন দুধের দাঁত ক্ষয় হইয়া যায়, তবে দন্ত-চিকিৎসককে দেখান অবশ্য কর্ত্তব্য। সেটীকে হয় স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে, অথবা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এই সব বিষয়ে

প্রথম হইতেই দৃষ্টি না রাখিলে, পরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

The Mouth Hygiene Movement

সুস্থ ও সবলকায় শিশু জাতীয় উন্নতি ও প্রচ্ছন্ন শক্তি জাগ্রত রাখিবার মূল শক্তি। সেই জন্যই আজকাল বিদ্যালয়-গমনোপযোগী বালক-বালিকাদিগের স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা হইতেছে। জার্ম্মাণরা বিদ্যালয়-সমূহে দন্ত-অস্ত্রোপচার-আগার (Dental Clinics) স্থাপন করিতেছে। সেই সকল বিদ্যালয়ে অনেক দরিদ্র শিশুর বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে দন্তশোধন সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুস্থতা এতই প্রয়োজনীয় যে, এই প্রথা অতি শীঘ্র সমগ্র সাম্রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইবে। অধুনা ইংলণ্ডে ঐরূপ School Dental Clinics স্থাপিত হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রত্যেক বৃহৎ নগরে এক-একটী দন্ত-অস্ত্রোপচার-আগার আছেই। তৎব্যতীত বোস্টন ও রচেষ্টারের দাতব্য চিকিৎসালয় এত বৃহৎ ও চমকপ্রদ যে, তাহার বর্ণনা করা যায় না। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যযন্ত্রে প্রকাশিত, Mental Health of the School Child নামক পুস্তকে ডাক্তার ওয়ালিন সিনসিনাটীর বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের দন্তচিকিৎসার পূর্ব্বের ও পরের মানসিক অবস্থার অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। "এই সব পরীক্ষা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে দন্তপীড়া-প্রতিষেধক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া প্রধান কর্ত্তব্য ও একান্ত প্রয়োজনীয়। স্থানে-স্থানে দন্তচিকিৎসা-শালার প্রতিষ্ঠা এবং বিনামূল্যে উপযুক্ত রোগীর চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র দন্ত-চিকিৎসাশালা স্থাপন করিলেই হইবে না; রুগ্নদন্ত শিশুর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, এবং কোনও সহরেই এত অধিক দন্ত-চিকিৎসক নাই যে, সমস্ত শিশুর চিকিৎসা করেন। এই জন্য জনসমাজে রুগ্ন দন্তের অপকারিতা ও উত্তম দন্তের উপকারিতা সম্বন্ধে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, যাহা শুনিয়া, বালকবালিকাদের মনে, তাহাদের দন্ত পরিষ্কার এবং সুন্দর রাখিতে ঐকান্তিক ইচ্ছা জন্মে।"

সভ্য-জগতের বালক-বালিকাদের মুখ-গহ্বর পরীক্ষার দেখা গিয়াছে যে, ষষ্ঠ হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের মধ্যে শতকরা ৯০টার রুগ্ন দন্ত আছে। যুক্তরাজ্যের Dental Boards, কি ভাবে দন্ত-মঞ্জন ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, প্রত্যেক শ্রেণীতে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ডাক্তার রিচার্ড গ্রাডি বলেন যে, "ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের বন্দোবস্ত থাকা যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ দন্ত পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত, কি ভাবে দন্তমঞ্জন ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার শিক্ষাও প্রয়োজনীয়। শরীরের (মজ্জা, ধমনীর) যে সকল পীড়া হয়, তাহা দন্তের প্রতি অবহেলায় নিমিত্তই জন্মে।"

ক্লিভল্যাণ্ড নগরে কয়েকটী অপ্রাপ্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন ছাত্র লইয়া একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছিল। দন্ত সম্বন্ধীয় শিক্ষার পূর্ব্বে ও পরে ছাত্রদিগকে শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা করা হইয়াছিল। উত্তম রূপ পরিপাক-ক্রিয়ার নিমিত্ত, উত্তম দন্তের যে কি প্রয়োজন; এবং উত্তম রূপে পরিপাক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, বিদ্যালয়ের কার্য্য যে কি প্রকার সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়, তাহা এই ছাত্রদিগের নিকট হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। সম্প্রতি যুক্ত-রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে দন্ত রক্ষণ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। কেবল আপনারা নিজেরা সন্তান সন্ততিগণের মুখগহ্বর পরিষ্কৃত রাখিলে চলিবে না; অপরের মূর্খতা ও অসাবধানতায় যাহাতে তাহাদের মুখে কোন প্রকার দূষিত দ্রব্য না আসিতে পারে, তাহাও দেখা দরকার। যদি জনসমাজের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং তাঁহারা যদি সকলে একবাক্যে বালকবালিকাদিগের বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য এবং দন্ত চিকিৎসকদিগের দ্বারা নিয়মিত ভাবে পরিদর্শন করাইবার নিমিত্ত জেদ বলেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কিছু উন্নতি হইতে পারে।

মুখগহ্বর এবং দন্তের যত্ন লইবার উপায়

যদি জিহ্বা অপরিষ্কার থাকে, তাহা হইলে, যাহাতে জিহ্বা না কাটিয়া যায়, এই প্রকার দ্রব্য দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করিবেন।

দন্তের ফাঁকে যে সকল খাদ্যকণা জমা হইয়া থাকে, তাহা tooth-pick কিম্বা floss silk দ্বারা পরিষ্কার করিবেন।

শক্ত ভাল দন্তমার্জ্জনী, এবং pumice অথবা grit যাহাতে নাই, এইরূপ দন্তমঞ্জন ব্যবহার করিবেন। মাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া দন্তের শেষাংশ পর্য্যন্ত মার্জ্জনী দ্বারা ঘষিয়া লইয়া আসিবেন। নীচের পাটীর দাঁতে মাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া দন্তের শেষাংশ পর্য্যন্ত মার্জ্জনী দ্বারা ঘষিয়া লইয়া আসিবেন। এই ভাবে দন্ত মার্জ্জনা করিলে, দাঁতের ফাঁকে যে সকল অপবিত্র দ্রব্য থাকে, তাহা অনায়াসে উঠিয়া যায়। যদি আপনি ভালরূপে ইহা বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে একজন দন্ত-চিকিৎসকের নিকটে যাইবেন, তিনি আপনাকে সকল বিষয় উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিবেন। Floss silk দ্বারা কি প্রকারে দন্ত পরিষ্কার করিতে হয়, তাহাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

রাত্রিকালে মুখে লালার চলাচল কম হয়। প্রাতঃকালে পচা খাদ্যকণার নিমিত্ত মুখগহ্বর অতি দুর্গন্ধে পূর্ণ হয়; এবং জিহ্বা অতি অপরিষ্কার হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, উত্তমরূপে দন্ত মার্জ্জনী দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিয়া, মুখ-গহ্বর উত্তম রূপে ধৌত করিয়া আহার করিবেন।

আহারের পর প্রতিবার সাধারণ ভাবে দন্তমার্জ্জনী দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিলে, মুখগহ্বর পরিষ্কার ও আরামপ্রদ মনে হয়। যদি দন্তের ফাঁকে খাদ্যাংশ জমিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা ferment করে; এবং এই প্রকারে দন্ত ক্ষয় হইতে থাকে। ক্রমশঃ যন্ত্রণা হয়, এবং চর্ব্বণ করিবার শক্তি কমিয়া যাইতে থাকে। সুতরাং দন্তের আশে-পাশে খাদ্যকণা রাখিবার প্রয়োজন কি? এই সকল অবহেলার নিমিত্তই মুখগহ্বর বিষাক্ত এবং দুর্গন্ধময় হয়।

নিদ্রার পূর্ব্বে দন্ত পরিষ্কার করিলে, আপনারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপকৃত হইবেন; রাত্রিকালে লালার নালিগুলি বিশ্রাম লাভ করে, সুতরাং রাত্রিকালে দন্ত পরিষ্কৃত থাকিলে, দন্ত সুস্থ অবস্থায় থাকে। এইরূপ দুই-এক দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন, প্রাতঃকালে মুখগহ্বর কত দূর আরামপ্রদ বোধ হয়। রাত্রিকালে দন্ত পরিষ্কার করা এত আবশ্যক যে, আপনি যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার দন্ত পরিষ্কার করেন, তাহা হইলে তাহা শয়ন করিবার পূর্ব্বেই করিবেন।

আমরা দন্তকে ক্ষয় হইতে, এবং উদরকে বিষাক্ত দ্রব্য হইতে, রক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোল্লিখিত উপায় অবলম্বন করি; এবং এই প্রকারে মুখকে পরিষ্কৃত ও সুস্থ রাখি।

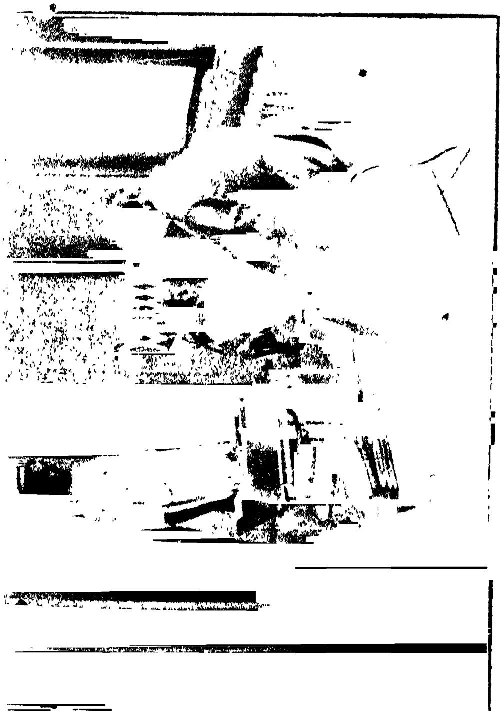
যদি কোন দন্ত ক্ষয় হইয়া যায়, তাহা হইলে এত পরিশ্রম সব বৃথা যায়। সুতরাং এই দোষটুকু দূর করিবার নিমিত্ত নিয়মিত রূপে কয়েক মাস অন্তর দন্ত-চিকিৎসকের নিকট যাওয়া প্রয়োজন। তিনি আপনার দন্তের গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিয়া দিবেন; এবং যে সমস্ত স্থান দন্ত মার্জ্জনী স্পর্শ করিতে পারে না, সেই সকল স্থান পরিষ্কার করিয়া দিবেন। দন্ত-চিকিৎসক নিয়মিত ভাবে এই প্রকার করিলে, আপনার দন্ত শক্ত ও সুন্দর হইবে; এবং জানিবেন যে, এইরূপে আপনি স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য যত্নবান হইয়াছেন।

পিতামাতার নিকট একটী বক্তব্য

সন্তানেরা যাহাতে সংসারে কৃতকার্য্যতা লাভ করেন, আপনারা তাহার প্রত্যাশা করেন। আপনাদের সন্তানগণ স্বাস্থ্য, উচ্চ আশা এবং চরিত্র ব্যতিরেকে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। সন্তানের চরিত্র-গঠনের ভার জননীর উপর ন্যস্ত। অসুস্থ হইলে সে তাড়াতাড়ি উন্নতি করিতে পারে না। সুতরাং এ বিষয় সম্পূর্ণ রূপে স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে।

দেহের যে অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় স্বাভাবিক ভাবে থাকে, সেই অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। স্বাভাবিকতা আমাদের প্রকৃতি-গত। কিন্তু আমাদের আচার ব্যবহার ও জীবন-যাপন-প্রণালী প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করে। বালক-বালিকাগণ জন্ম হইতেই আমাদিগের সাধ্যমত চেষ্টার ফলে সুস্থ থাকিতে পারে।*

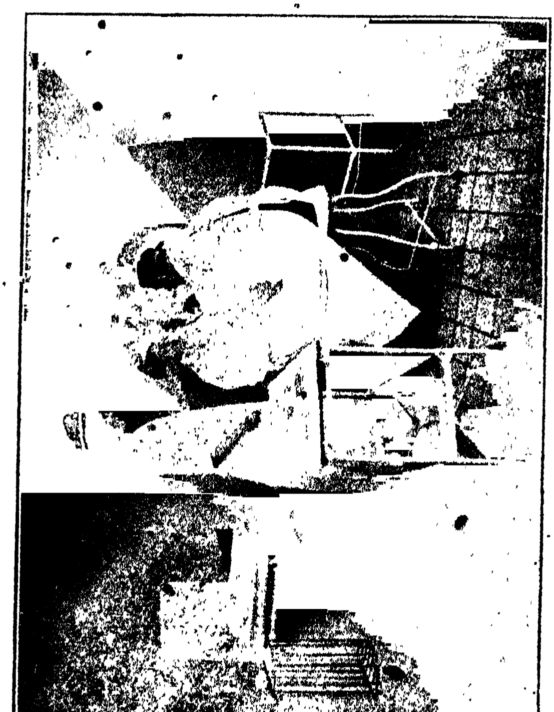
পিতামাতা সন্তানকে আহার্য্য, পরিচ্ছদ এবং শিক্ষা দিলেই যে সব হইল তাহা নহে। তাহার খাদ্য উত্তম রূপে রন্ধন করা হইয়াছে কি না এবং সে উত্তম রূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইতেছে কি না, তাহাও দেখিতে হইবে। ভাল রূপে চর্ব্বণ না করিলে ভুক্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় না; এবং খাদ্যদ্রব্য ভাল রূপে পরিপাক না হইলে শরীর পুষ্ট হয় না। স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইলে দেহের পুষ্টির দরকার। আপনারা যদি সুস্থকায় সন্তান চান, তাহা হইলে কি ভাবে জীবন যাপন করিলে তাহার স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে, তাহা তাহাকে শিক্ষা দিবেন।



আলজিব বাড়িয়াছে কি না পরীক্ষা করা হইতেছে ; প্রত্যেক শিশুকেই এ পরীক্ষা করা হয়



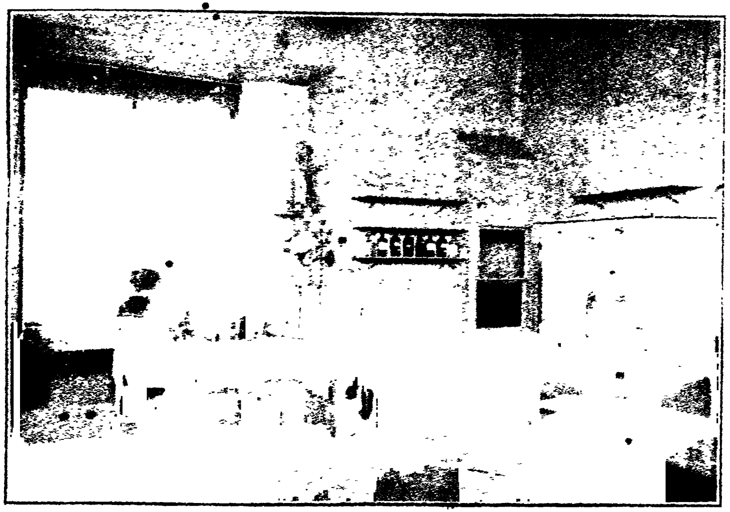
আমেরিকার একটি দাতব্য দন্তচিকিৎসালয়ে শিশুদিগের অপেক্ষা-ঘর



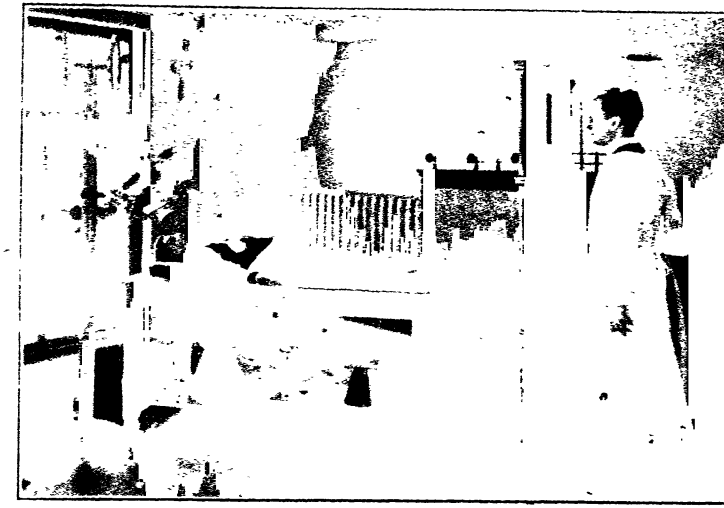
আলজিব অস্ত্র করা হইতেছে



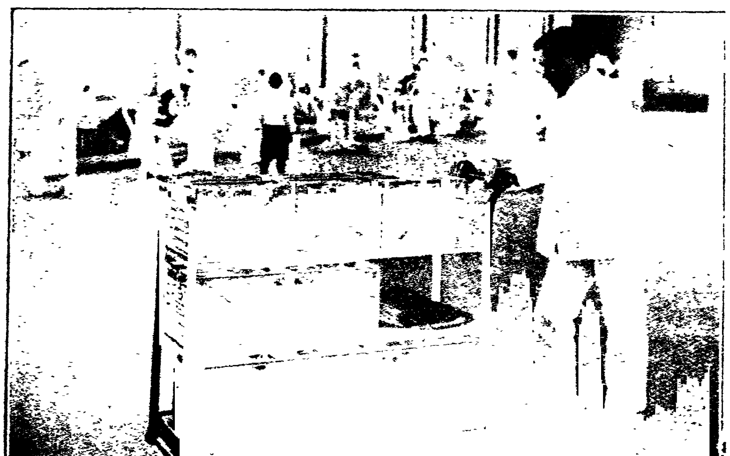
শিশু-রোগীদের নাম লিখাইবার ঘর



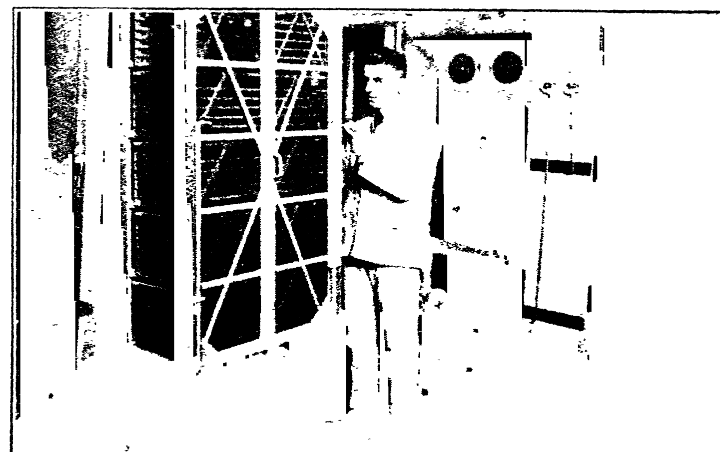
একটী দাতব্য দন্ত চিকিৎসালয়ের গবেষণাগার



দন্তের X Ray লওয়া হইতেছে



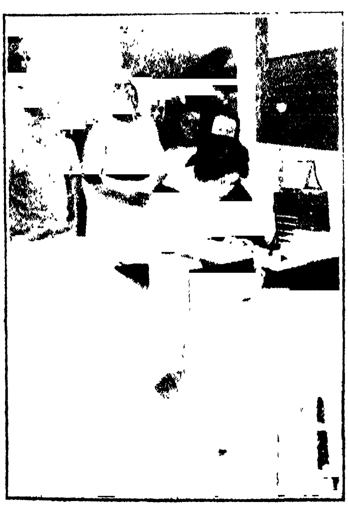
এই ভৃত্য শোধিত অস্ত্র ডাক্তারদিগকে পৌঁছাইয়া দেয়



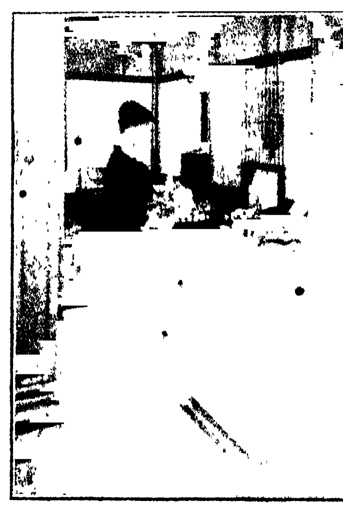
এই খাঁচার মধ্যে Steam দ্বারা অস্ত্র সকল শোধিত করা হয়



Nitrous Oxide দ্বারা পাটন করা হইতেছে



শিশু রোগীদের Appointment করিবার কক্ষ



একটা দাতব্য দন্ত-চিকিৎসালয়ের ঔষধাগার

বালক-বালিকাদিগকে এ সম্বন্ধে উৎসাহ দিলে, তাহারা দন্ত-মার্জ্জনী ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবে। এখনও অনেক জননী তাঁহাদিগের সন্তানগণের দন্তের প্রতি অবহেলা করেন। বুদ্ধিমতী জননীর উৎসাহে এবং অভিজ্ঞ দন্ত-চিকিৎসকের সাহায্যে শিশুরা স্বাস্থ্য রক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারে।

কর্ম্মে কৃতকার্য্যতা সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। আমরা এই বলিয়া প্রবন্ধটা আরম্ভ করিয়াছি ; এবং



মিষ্টার টমাস ফরসাইথ

এই মহাত্মা ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা দাতব্য দন্ত-চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য দান করিয়াছেন



দন্ত উৎপাটনের পরে শিশুরা মুখ ধুই



দিগকে পৌঁছাইয়া দেয়

ইহাও প্রমাণ করা হইয়াছে যে, স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে উত্তম রূপে চর্ব্বণ করিয়া আহার করা একান্ত দরকার। দন্ত উত্তম হইলে, স্বাস্থ্য উত্তম হয়—অথবা স্বাস্থ্য খারাপ হইলে দন্ত রুগ্ন হয়। স্বাস্থ্য বজায় না থাকিলে আপনার সন্তানগণ তাহাদের সহপাঠীর সমকক্ষ হইতে পারিবে না; কিংবা তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে না। অটুট স্বাস্থ্য ব্যতীত কখনও তাহাদের মন ও দেহ সবল হইতে পারিবে না। সুতরাং এই বলিয়া আমাদে বক্তব্য শেষ করি যে,—উত্তম দন্ত—অটুট স্বাস্থ্য।

ভাবের অভিব্যক্তি

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]



উন্মাদের কান্না



উন্মাদের আনন্দ







শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

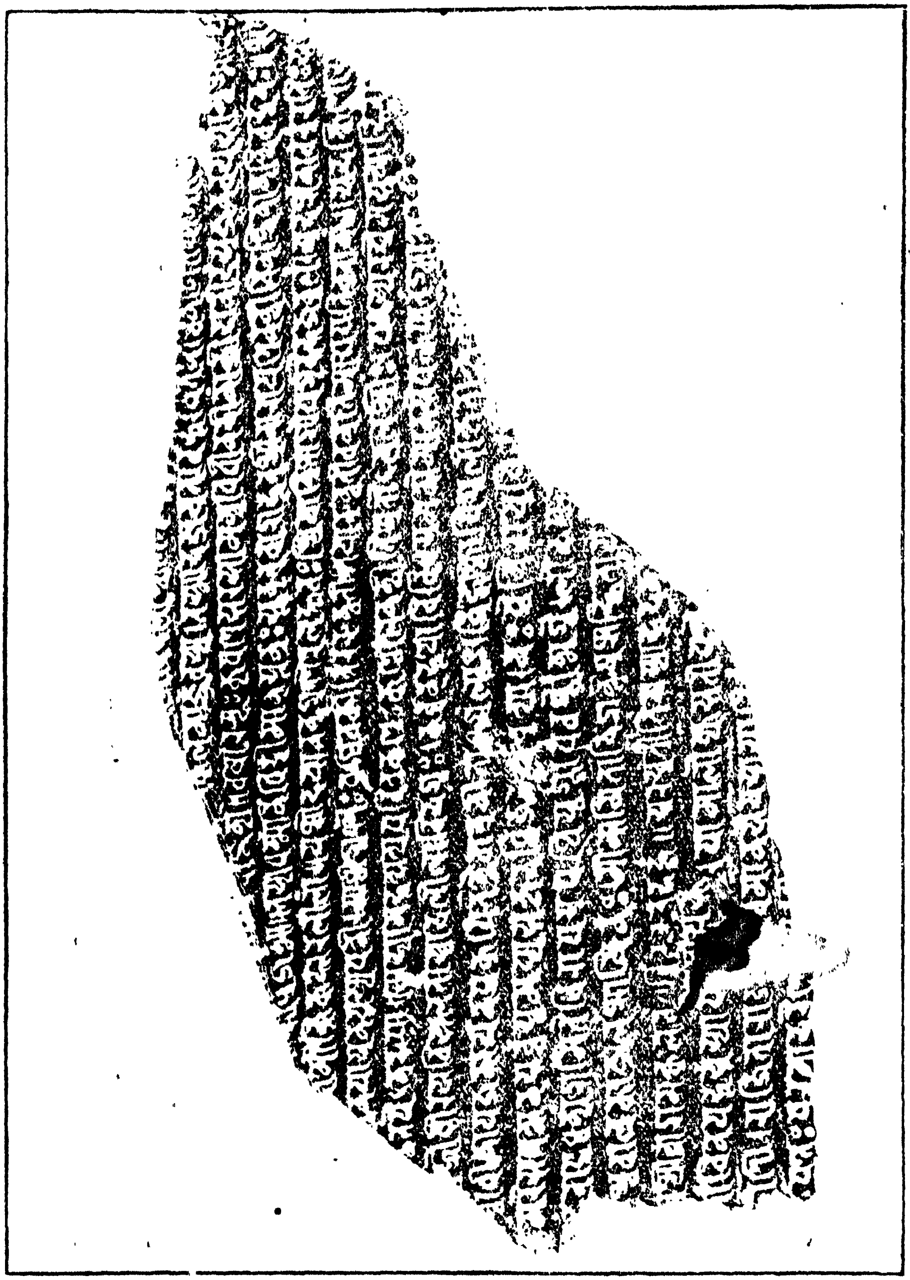
কেনেডিয়ান রেজিমেন্টের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী সেনা। ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। আমেরিকায় ডাক্তারী পড়িতে গিয়াছিলেন; সেখান হইতে কানেডায় আর এ এম সিতে যোগদান করেন।

মহাস্থানগড়ের শিলা-লিপি

[শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মণ বি-এ]

আবিষ্কার ও রক্ষা-কাহিনী

মহাস্থানগড় উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত বগুড়া জেলার একটি
প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান। এই মহাস্থানগড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন
র ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অধুনা ঐতিহাসিকগণের নিকট
দর লাভ করিতেছে। গড়ের পূর্ব্বপার্শ্ব বিধৌত করিয়া
তোয়া করতোয়া নদী প্রবাহিত হইত। এক্ষণে পূর্ব্ব
ক কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়াছে। স্মৃতির বচন অনুসারে
য়া, সুপ্রাচীন কাল হইতে, বিখ্যাত পৌষনারায়ণী যোগো
প, সহস্র-সহস্র পুণ্যকামী হিন্দু ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদ হইতে এখানে আগমন পূর্ব্বক, স্কন্দ ও গোবিন্দের মন্দিরদ্বয়ের মধ্যস্থ শীলাদ্বীপের ঘাটে করতোয়া সলিলে অবগাহন স্নান করিয়া ধন্য ও পবিত্র হইয়া আসিতেছেন। বহু কাল পরে বর্ত্তমান বর্ষে পুনর্ব্বায় পৌষনারায়ণী যোগ উপস্থিত হওয়ায়, যাত্রীগণের জলকষ্ট নিবারণার্থ বগুড়ার সদর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এ, পি, সেন বাহাদুরের আদেশে বগুড়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে উক্ত মহাস্থান



মহাস্থানগড়ের শিলা-লিপি

গড়ের পূর্ব্বদিকস্থ পাদদেশের একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কার্য্য আরম্ভ হয়। কিয়দ্দূর খননের পর বর্ত্তমান ১৩২৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সহসা এই প্রশস্তি-প্রস্তর পুষ্করিণী-গর্ভস্থ মৃত্তিকামধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। খনকগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইবার পর, এই প্রস্তর-খণ্ড পূর্ব্বোক্ত ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড-অফিসে আনয়ন করিয়া, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে সংবাদ প্রদান করেন। উক্ত শিলালিপিখানি বগুড়া জেলার বাহিরে কোন স্থানে যাহাতে যাইতে না পারে, তজ্জন্য উক্ত শিলা লিপি বগুড়ার "উড্‌বরণ পাব্লিক লাইব্রেরী"র প্রদর্শনী-গৃহে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দিতে আমি উক্ত ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়কে অনুরোধ করি। আমার অনুরোধক্রমে ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় উক্ত পাষাণ লিপিখানি উক্ত প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন; এবং তাহা এক্ষণে প্রদর্শনীর সম্পত্তি স্বরূপ উক্ত প্রদর্শনী-গৃহে রক্ষিত হইয়াছে।

লিপি-পরিচয়

যে কৃষ্ণ প্রস্তর-খণ্ডে উক্ত প্রশস্তি-লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, কালপ্রভাবে (আততায়ী হস্তে) তাহার চতুর্দ্দিকের বহু অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত প্রস্তর-খণ্ডের যে অংশ বর্ত্তমান আছে, তাহা আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ অংশে ১ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত অংশে ৯ ইঞ্চি মাত্র। লিপির যে অংশ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে ১৫টি মাত্র পংক্তি অবশিষ্ট আছে। এই পংক্তি-গুলিরও কোনটিরই সমগ্র অংশ রক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই।

লিপি-বিবরণ

এই শিলালিপিতে একটী সুপ্রসিদ্ধ নন্দী বংশের কুল-প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রশস্তি-কর্ত্তার নাম, পরিচয় ও উদ্দেশ্য, লিপির ভগ্নাংশের সহিত লোপ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রশস্তিকার কবির নামোল্লেখ এবং উৎকীর্ণের সময় লিখিত ছিল কি না, লিপিখানির বর্ত্তমান ধ্বংসাবস্থায় তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। লিপিখানির যে অংশ এক্ষণে অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, নন্দীকুলে "বিভূষিত নন্দী" জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে "নন্দীকুলের আনন্দবর্দ্ধক" "ধর্ম্ম-নিধি" "ধীমান্" ও "সুনৃতবাক্" শ্রীনারায়ণ নন্দী জন্মলাভ করিয়াছিলেন। নারায়ণ নন্দীর সাধ্বী পতিব্রতা অরুন্ধতী নাম্নী পত্নী ছিল। তাঁহাদের "সত্য পবিত্রকল্প" "অনলশ্রী" "কঙ্কাল নন্দী" নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। কঙ্কাল নন্দীর স্ত্রীর নাম (সম্ভবতঃ) সরস্বতী।

উক্ত খণ্ডিত লিপি হইতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দারা ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। তবে, এই নন্দী বংশের সম্পর্কে "রামচরিতম্" কাব্যে প্রদত্ত সন্ধ্যাকর নন্দীর আত্ম-পরিচয় উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি-আই ই মহোদয় বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, নেপাল দরবারের পুস্তকালয় হইতে উক্ত কাব্যগ্রন্থ আনয়ন করেন, এবং উহা উক্ত সোসাইটি দ্বারা ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উক্ত কাব্যগ্রন্থে কাব্যের রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী এইরূপ আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"বসুধাশিরো বরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূর্বৃহদ্বটুঃ॥
তত্র বিদিতে বিখ্যোতিনি নন্দিরত্ন সন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীর্বনিধিগুর্ণোঘস্য॥
তস্য তনয়োমতনয়ঃ করণ্যানামগ্রণীরনর্ঘগুণঃ।
সান্ধি শ্রীপদাসন্তাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতির্জ্জাতঃ।
নন্দিকুল-কুমুদ-কানন-পূর্ণেন্দুর্নন্দিনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকর নন্দী পিশুনাস্কন্দী সদানন্দী॥"

উক্ত কুল-পরিচয় হইতে জানা যাইতেছে যে, কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর "কুলস্থান" পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর-প্রতিবদ্ধ ছিল। সেই কুলস্থানের নাম "বৃহদ্বটু" [ব্রাহ্মণ (পাড়া)] ছিল। তাহা বসুধার শীর্ষদেশ স্বরূপ বরেন্দ্রীমণ্ডলের চূড়ামণি ও পুণ্যভূমি ছিল। সেই কুলস্থানে [সুবিদিত] নন্দী-সন্ততিতে পিনাকনন্দী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র প্রজাপতি নন্দী সান্ধি [বিগ্রহিক] ও করণ্য অর্থাৎ কায়স্থগণের অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র কবি সন্ধ্যাকর নন্দী নন্দীকুলরূপ কুমুদ কাননের পূর্ণেন্দু স্বরূপ ছিলেন।

কবি গ্রন্থশেষে নিজকে "কলিকাল বাল্মীকি" ও তাঁহার কাব্য "রামচরিতম্"কে "কলিকাল-রামায়ণম্" বলিয়া পরিচিত

করিয়াছেন এবং উপসংহারে প্রার্থনা করিয়াছেন যে [রামপাল দেবের দ্বিতীয় পুত্র] রাজা মদন [পাল] "চিরায় রাজ্যং কুরুতাম্" অর্থাৎ দীর্ঘকাল রাজ্য করুন।

মদনপাল দেবের [মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি পালবংশীয় সপ্তদশ নরপতি ছিলেন। সন্ধ্যাকরের পিতা সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। কাহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, 'রামচরিতম্'এ তাহা প্রকাশ নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, তিনি 'রামপালদেবের' সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। 'নন্দীকুল' ও নান্দীকুলের 'কুলস্থান' বহু পূর্ব্ব হইতে সুবিদিত ছিল। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর ও মহাস্থান অভিন্ন হইলে বলিতে হয় যে, সন্ধ্যাকর নন্দীর কুলস্থান মহাস্থানগড়ের সংলগ্ন ছিল। এরূপ স্থলে আমাদের আলোচ্য শিলা-প্রশস্তিখানি প্রজাপতি নন্দীর কুল-প্রশস্তি কি না, তাহা অনুসন্ধানযোগ্য।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত শিলিমপুরে [শিয়ম্বপুর ?] ১৩১৯ বঙ্গাব্দে একখানি কুল-প্রশস্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা প্রশস্তিকার প্রহাস শর্ম্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব মন্দিরের গাত্রে সংযুক্ত ছিল। বগুড়া জেলার সীমান্তে অবস্থিত হরগৌরী গ্রামের গরুড়-স্তম্ভে শ্রীনারায়ণপাল দেবের মন্ত্রী শ্রীগুরব মিশ্রের কুল-প্রশস্তি গ্রথিত আছে। এ স্তম্ভটি প্রশস্তিকার কর্তৃক খনিত কোন দীর্ঘিকার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়; সম্ভবতঃ আমাদের আলোচ্য প্রশস্তিখানিও মহাস্থানগড় অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন মন্দিরগাত্রে প্রশস্তি-কর্ত্তা কর্তৃক স্থাপিত ছিল।

প্রশস্তি-পাঠ

* * * *

(১) * কুলমাহুরস্য। তস্মাদজায়ত [বিভূষিত নন্দি] *

(২) * স্য ॥ বর্ষারম্ভঃ কৃপণ সরসামম্বুবিচীনদীনাং ক্রীড়া নীড়ং সুজনবয়সাম্বেশ্ম *

(৩) * প্রজন্মা ॥ তস্য ধর্ম্মনিধি র্ধীমান্ সুহৃঃ সুনৃতবাগভৃৎ শ্রীনারায়ণ নন্দীতি নন্দিনাং নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥... *

(৪) * মৌক্তিকহারলীলাং ॥ যশোদয়ানন্দগুণৈরলঙ্কৃতঃ শ্রিয়ান্বিতো গোপগৃহে .. ভজৎস্থলং। সদঙ্গনা বদ্ধরতিঃ স *

(৫) * (ত) নয়াস্যনয়স্য পত্নী। সাধ্বীগুণৈঃ প্রথিতকীর্ত্তি ররুন্ধতীতি যারুন্ধতীব নতিমাপ পতিব্রতানাম্ ॥ সুদক্ষিণা (যাং) *

(৬) *...তয়োঃ সুরূপায়ামস্যামভূৎ সত্য পবিত্রকল্পঃ কল্লাল নন্দীতি সুতোঽনলশ্রীঃ। পরস্য চ প্রেম সমাহিতো *

(৭) গোষ্ঠীরসবিহ্বলতাস্বাদলীলাবিদগ্ধঃ। কুর্ব্বন্ ভূয়ো বিবিধ সুমনোমানসে পক্ষপাতং খ্যাতো *

(৮) * স্বাধীনায় জনায় ন প্রকুপিত নৈবানুনীতাঃ খলাঃ। জিহ্বাকাপি খলীকৃতা কৃতবি *

(৯) * (স) মরে সপত্নান্ সর্ব্বস্বমপ্য সকৃদর্থি জ(নায়প্রী)ত্যা। যঃ প্রেম্ণি চায়ুষি।

(১০) * তা প্রধ্বংসংগমিতে চিরায় সুপথি স্বর্গাপবর্গাম্যথে। লোকংপ্র*

(১১) *... শ্চ বালুকা জাল সাক্ষিণঃ। মীমাংসিতা দিগন্তেষু সদ্ধিতায় *

(১২) * শ্রী র্না গমকুলবধুস্নিবহ ত্তদঙ্গং ॥ সরস্বতীতি যস্যাভূদ্...*

(১৩) * বিনয়ভূর্যস্যা পরা প্রেয়সী। যামালোক্য সতী প *

(১৪) * নী। রাজিতা রাজহংসীব মানসে যস্য সা*

(১৫) * পন্নঃ পরমাদরেণ *

* * * * *

বঙ্গানুবাদ

* * * *

* ইঁহার কুল [সম্বন্ধে] বলিতেছি। তাঁহা হইতে বিভূষিত নন্দি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। * স্বল্পতোয়া সরোবরের [পক্ষে] বর্ষারম্ভ, [যেরূপ], নদীসমূহের [পক্ষে] অম্বুবিচী [অথবা অম্বুধি যেরূপ] [তদ্রূপ তাঁহার গৃহ] সুজন রূপ পক্ষীগণের ক্রীড়ানীড় [ছিল] * *

নন্দিকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী শ্রীনারায়ণ নন্দি নামক তাঁহার ধর্ম্মনিধি, ধীমান্ সুনৃতবাদী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া-

---

(১) মূলে "ক্রীরানীরং" পাঠ আছে।

ছিল। * মুক্তাহারের দীপ্তির ন্যায় [সুন্দর] যশ-দয়া ও আনন্দ [রূপ] গুণসমূহ দ্বারা তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন এবং পৃথিবীপতির গৃহে [বাহু] বলের সেবা করিয়া তিনি শ্রিয়ান্বিত হইয়াছিলেন। [যেরূপ যশোদয়ার আনন্দ-বর্দ্ধক গুণবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) গোপগৃহে বললাভ করিয়া শ্রিয়ান্বিত হইয়াছিলেন]। * সেই নীতিমানের তাঁহার অরুন্ধতী নাম্নী পত্নী সাধ্বী [গণের] গুণসমূহ দ্বারা প্রথিতকীর্ত্তি [ছিলেন] এবং তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় পতিব্রতাদিগের প্রণতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * * [তাঁহার এই অনুরূপা পত্নীর গর্ভে] সত্যপবিত্রকল্লা কল্লাল নন্দী নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। * [তিনি] আমোদ সভার রসবিহ্বলতার স্বাদ গ্রহণে পণ্ডিত ছিলেন। এবং তিনি [তাঁহার প্রতি] দেবতাগণের মনে পক্ষপাত উৎপাদন করতঃ [খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন] * তিনি নিজের অধীনস্থ জনগণের প্রতি কখনও প্রকুপিত হইতেন না, কিম্বা খল [স্বভাব] ব্যক্তিদিগের নিকট কখনও অনুনয় প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার জিহ্বা কখনও খল স্বভাব প্রাপ্ত হয় নাই। * তিনি পুনঃ-পুনঃ সমরে শত্রুগণকে [পরাভূত করিয়াছিলেন] এবং অর্থিগণকে সর্ব্বস্ব [দান করিয়াছিলেন]। ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তিনি যজ্ঞ [রূপ] সুপথে [থাকিয়া] স্বর্গ ও অপবর্গ [লাভ করিয়াছিলেন।] * * সরস্বতী নাম্নী তাঁহার পত্নী ছিলেন * * [যিনি] তাঁহার মানসে মানস [সরোবরে] রাজহংসীর ন্যায় বিরাজ করিত

সঞ্চয়

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

ইতালীয় সাহিত্যে নব-জীবন

আধুনিক ইতালীয় সাহিত্যে সেরা আসন দখল করিয়াছেন, কবি কার্দ্দুসী। দান্তে, পিত্রার্কা, এরিষ্টো প্রভৃতি ইতালীর অতীত বিশ্বকবিগণের সঙ্গে নাম করিতে সেখানে এখন এক ঐ কার্দ্দুসী ছাড়া আর কেহ নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। সুতরাং তাঁহার চোখের উপর দিয়াই আধুনিক ইতালীর জাতীয় জীবনে পরিবর্ত্তনের বিচিত্র ধারা বহিয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহার কাব্যের মধ্যেও জাতীয় আদর্শের অনুসরণ দেখা যায়।

কিন্তু কার্দ্দুসীর কাব্য-সঙ্গীতে আধুনিক ভাবের আবেগোচ্ছ্বাস থাকিলেও, তাহাতে যতটা-সম্ভব সেকালের পুরাতন সুরই বজায় রাখা হইয়াছে। এই পুরাণো সুরের নূতন গানে, কার্দ্দুসী প্রাচীন লাতিন ভাষার নানান ছন্দ যত্র-তত্র ব্যবহার করিয়াছেন। "Barbarous Odes" নামে কাব্য-পুস্তকেই কার্দ্দুসীর প্রতিভা চরমে গিয়া উঠিয়াছে এবং ইহাতে তিনি একেলে মিত্রাক্ষরকেও একেবারে আমোল দেন নাই।

ধর্ম্মবিশ্বাসে তিনি যাজক-তন্ত্রের বিরোধী। প্রথম জীবনে, নিশ্চিন্ত যৌবনের আবেগে একসময়ে তিনি সয়তানকে বিদ্রোহ ও দৈহিক উন্নতির Symbol বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরজীবনে In a Gothic Church নামক রচনায় তাঁহার পূর্ব্ব-মত পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বলোগ্নার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইতালীয়ান' নামক পদে কার্দ্দুসী প্রায় ছ-চল্লিশ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সম্মানের পদ পাইয়া তিনি ইতালীর সমালোচন-সাহিত্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হইয়া অসংখ্য ছাত্রকে স্ব-ভাবের ভাবুক করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকে গমন করেন। সেইদিন হইতে আজ-পর্য্যন্ত তাঁহার উচ্চ আসন খালি পড়িয়া আছে।

আন্তোনিয়ো ফোগাযেরো, কথা-সাহিত্যে যথেষ্ট নাম-যশ করিয়াছেন। সাহিত্যে তিনি 'রোমান্সে'র ভক্ত এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে উদারনৈতিক ক্যাথলিক। তাঁহার দুইখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনা-ভঙ্গিতে নিম্নশ্রেণীর হইলেও, অন্যান্য নানা গুণে বিশেষরূপে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই উপন্যাস-দুখানির নাম Daniele Cortis ও The Little World of Old। প্রথমখানিতে ধর্ম্মতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের

মধ্যে পুনর্মিলন-সাধনের চেষ্টা আছে, এবং দ্বিতীয়খানিতে অষ্ট্রিয়ার অত্যাচারের বিরুদ্ধে লম্বার্ডির বিদ্রোহী জন-সাধারণের জীবন-চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা হইয়াছে।

কার্দ্দুসীর সমকক্ষ না হইলেও, জিওভ্যানি পাস্কোলী ও বেনেদেত্তো ক্রোশ নামে দুইজন শক্তিশালী লেখক ইতালীয় সাহিত্যে বেশ বিখ্যাত হইয়া আছেন। কার্দ্দুসীর মৃত্যুর পর বলোগ্না বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইতালিয়ানে'র আসনে পাস্কোলী আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। লাতিন ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার য়ুরোপ-জোড়া নাম-ডাক আছে। সাহিত্যে তিনি প্রকৃতির কবি ও ভার্জিলের অনুসারী। সাহিত্য-জীবনের শেষদিকে তিনি আধুনিক জীবন ও ঐতিহাসিক বিষয়কে আপন কাব্য-বস্তু করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্রোশ এখন নেপ্‌লসে বাস করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। কার্দ্দুসীর মৃত্যুর পর, তাঁহার মত ক্ষমতাবান লেখক বর্ত্তমান ইতালীয় সাহিত্যে আর দেখা যায় না। La Critica বা "সমালোচনা" নামক পত্রিকাখানি সম্পাদন করিয়া, দেশের ও দশের মাঝে তিনি বিলক্ষণ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন। তা-ছাড়া চিন্তাশীল লেখক ও দার্শনিক বলিয়াও তিনি বিশেষরূপে বিখ্যাত।

একালকার ইতালীয় লেখকদের মধ্যে খ্যাতি-হিসাবে গেব্রিয়েল দান্নুনসিয়োর নাম আর সকলের চেয়েই বড়। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। গীতি-কাব্যের মধুর-রস যে দান্নুনসিয়োর হাতে আসিয়া সমধিক প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু সতেরো শতাব্দীর নীচু-দরের ইতালীয় কবিদের মত, তাঁহার আদর্শও সর্ব্বদাই সীমা লঙ্ঘন করিতে চায়, অত্যুক্তি ও বাহুল্যের দ্বারা আমাদের চোখে-মনে ধাঁধা লাগাইয়া দিতে চায়। The Daughter of Iorio ছাড়া তাঁহার অধিকাংশ নাটকই তুচ্ছ রক্ত-মাংসের দীনতা এবং দুর্ব্বল চিত্তের হীনতা লইয়া বিরচিত;—সেগুলি তাই পাঠকের মনে ঘৃণা, বিরক্তি ও অবসাদ ভিন্ন আর-কোন ভাবের সঞ্চার করিতে পারে না।

উপর-উক্ত লেখক-কয়জন ছাড়া, বর্ত্তমান কালে ইতালীদেশে আরো অনেক কবি, নাটককার ও ঔপন্যাসিক অল্পবিস্তর নাম কিনিয়া থাকিলেও, সাহিত্যের নব-জীবনকে তাঁহারা বিশেষ-কিছু সমুন্নত করিতে পারেন নাই। উচ্চ সাহিত্যেও এই শেষোক্ত শ্রেণীর কোন দাবী-দাওয়া নাই। তাঁহাদের নামও তাই উল্লেখযোগ্য নয়।

মুখ,—চরিত্রের সূচীপত্র নয়!

অপরাধ-বিজ্ঞানে পণ্ডিত, বিখ্যাত লম্ব্রোসোর ছাত্র সিগ্‌নর ফেরি, "অপরাধীর মুখ" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "খুনীর চোখ, চোরের গণ্ডাস্থি ও কামুকের ঠোঁট প্রভৃতি অপরাধ-বিজ্ঞানের বাঁধা-ধরা লক্ষণ-গুলিতে যথেষ্ট সত্য আছে বটে, কিন্তু কেবলমাত্র এই-সব লক্ষণই অপরাধ-বিজ্ঞানের শেষ-কথা নয়। কারণ, এমন অনেক ভীষণ চরিত্র অপরাধী আছে, যাহাদের মুখে-চোখে চরিত্রের সামান্য আভাসটুকুও ফুটিয়া ওঠে না—যাহাদের মুখ অবিকল আর-পাঁচজনেরই মত নিতান্ত সাধারণ, নিরীহ ও নিষ্পাপ মুখ!"

বাস্তবিক মুখ দেখিয়া সব-সময়ে পাপী চেনা ভারি শক্ত। আদালতে গেলে প্রায়ই মনে হয়, অনেক সাধু বিচারকের চেয়ে অনেক দাগী আসামীর মুখ বেশী সুন্দর ও নির্দ্দোষ।

বিশেষ-করিয়া নিষ্পাপ ও চেনা শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, আধুনিক অপরাধীর মুখ। অপরাধ-বিজ্ঞানে কথিত মূল লক্ষণগুলির সঙ্গে সেকালকার অপরাধীদের মুখাকৃতি প্রায়ই হুবহু মিলিয়া যায়। কিন্তু একেলে পাপীর মুখে অনেক সময় তেমন কোন বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় না। চার্লস্ পিশের মাথা ছিল প্রকাণ্ড, তাহার কাণও ছিল খুব অসাধারণ। লম্বরোসোর মতে,—ইহা অপরাধীর লক্ষণ। উনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ, অদ্বিতীয় চোর-চূড়ামণি চার্ল্‌স্ পিশের মুখ, অপরাধ-বিজ্ঞান-সম্মত সেকেলে অপরাধীর আদর্শ মুখ। বিশেষজ্ঞরা এ মুখ দেখিলেই তাহার গুপ্ত কথা বুঝিয়া সমাজকে সাবধান করিয়া দিবেন। (প্রথম চিত্র) কিন্তু একেবারে একালে, প্যারীর যে মোটর-দস্যুর নাম পৃথিবীতে সব দেশেই বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই গার্ণিয়ারের (দ্বিতীয় চিত্র) মুখ দেখিয়া তাহার চরিত্র বোঝা, অত্যন্ত কঠিন—এমন-কি অসম্ভব!

সেকালে সমাজের অবস্থা ছিল অন্যরকম। তখন সমাজের উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন স্তরের লোকেরা ঠাঁই ঠাঁই থাক

করিত ; তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে কোনই মেলামেশা, আদান-প্রদান ছিল না। তাই, তখন যাহারা নিম্নতর শ্রেণীতে বাস করিত, সৎপথে থাকিলেও উচ্চশ্রেণীতে ওঠা তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল না। কাজেই নিম্নশ্রেণীর অপরাধীদের মুখে তখন সৎভাবের আভাস মাত্র পাওয়া যাইত না—কুচরিত্রের জন্য তাহারা ভদ্রসমাজের বাহিরে পড়িয়া থাকিয়া পশুর মত হীন জীবন যাপন করিত। চার্ল্‌স্ পিশের মত প্রতিভাবান চোরের কথা আজ-পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই। গৃহকর্ত্তাকে সাবধান করিয়া, তাঁহার সঙ্গে বাজি রাখিয়া সে অনায়াসে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহারই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া, চুরি করিয়া নিরাপদে আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিত! সে বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রাদি-সম্বন্ধীয় অনেক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা করিয়াছিল। সে ললিত কলার ভক্ত ছিল, আবার কবিতা লিখিতে ও গান গায়িতেও পারিত। তাছাড়া নানাদিকে নানা ব্যাপারে সে এত-বেশী শক্তি, প্রতিভা ও সাধনার পরিচয় দিয়াছে যে, সৎপথে থাকিলে আজ সে অন্যদিকে অমর হইয়া সকলেরই শ্রদ্ধালাভ করিতে পারিত। কিন্তু তখনকার সমাজে সৎপথে উন্নতি সহজসাধ্য ছিল না বলিয়াই, চার্ল্‌স্ পিশ চোরের ঘৃণিত ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কিন্তু একালের বিধি-ব্যবস্থা একেবারে উল্‌টা। একালে উচ্চতর এবং নিম্নতর সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদের বিধান ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে। তাই একালের অপরাধীরা নিম্নতর শ্রেণীর লোক হইয়াও, ভদ্রের পোষাক পরিয়া ভদ্রতার মুখোসে মুখ ঢাকিয়া, অনায়াসে ভদ্রসমাজে উচ্চতর শ্রেণীতে আর-পাঁচজনের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এইজন্যই তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব। সমাজে এখন ছোট-লোক ছিঁচ্‌কে চোরের চেয়ে তাই Gentleman Burglar বা 'ভদ্র চোরে'র উপদ্রবই বেশী হইয়া উঠিয়াছে।

একালে জীবন-সংগ্রামে যাহারা পরাজিত হয়, তাহারা অনেকে মনে ভাবে, সমাজই অন্যায় করিয়া তাহাদিগকে আর-সকলের পিছনে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। সমাজের ঐ কাল্পনিক অন্যায়ের প্রতিশোধ লইবার জন্যই আজকাল অনেকে অপরাধীদের দলে গিয়া যোগদান করে। তুচ্ছ আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য, যেমন-তেমন করিয়া নামজাদা হইবার জন্যও অনেক লোক আজকাল সরল ও শুভ্র সামাজিক জীবন ত্যাগ করিয়া চোর-ডাকাত হইয়া দাঁড়াইতেছে।

গার্ণিয়ার এই শেষোক্ত শ্রেণীর অপরাধী। সে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। বয়সে সে যুবক। তাহার মুখখানি ছিল চমৎকার হাসিমাখা ও সুশ্রী সরল। তাহার গড়ন-পিটনও ছিল তেমনি সুন্দর। নিয়মিত ব্যায়াম ও পান-ভোজন করিয়া আপনার স্বাস্থ্যকে সে অটুট রাখিয়াছিল—এমন-কি, সামান্য সিগারেটটি পর্য্যন্ত সে খাইত না। তাহার মনে যশোলাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, অথচ সে আকাঙ্ক্ষা সফল করিবার উপযোগী কোন বিশেষ সৎগুণ তাহার চরিত্রে ছিল না। ফলে, গার্ণিয়ার অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য অপরাধের দ্বারা আপনাকে দুদিনেই প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিল।

গার্ণিয়ার, তাহার সঙ্গী বোনোট ও তাহাদের দলের অন্যান্য লোকেরা মানুষের প্রাণকে আর প্রাণ বলিয়া মনে করিত না। দিনে-রাতে, ঘরে-বাইরে, যেখানে-সেখানে যখন-তখন তাহারা খুনের পর খুন, ডাকাতির পর ডাকাতি, চুরির পর চুরি করিয়া, দুদিনেই প্যারী-সহরের সমস্ত বাসিন্দাকে ভয়ে আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছিল। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে রাত্রে কেহ আর রাস্তায় বাহির হইত না, দিনের বেলায়ও সকলে সশস্ত্র হইয়া তবে পথে চলিতে সাহস করিত। অবশেষে, বহু চেষ্টার পর পুলিস গার্ণিয়ার ও বোনোটের সন্ধান পায়। তাহারা কিন্তু প্রাণ থাকিতে আত্মসমর্পণ করে নাই—শেষ-পর্য্যন্ত সমান যুঝিয়া, অনেক লোককে হতাহত করিয়া, তারপর বন্দুকের গুলিতে তাহারা আপনাদের কলঙ্কিত, নিষ্ঠুর জীবনের অবসান করিয়াছিল।

চার্ল্‌স্ পিশ যে-শ্রেণীর অপরাধী, পাপে পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বে সে-শ্রেণীর লোকেরা সৎসাহায্য লাভ করিলে, আবার নূতন মানুষ হইয়া উঠিতে পারে। ভালো ভাব তাহাদের মনে লুকানো থাকে। অবকাশ পায় না বলিয়াই বাহিরে তাহার প্রকাশ দেখা যায় না। চার্ল্‌স্ পিশ অত-বড় পাপী হইয়াও সহজে মানুষকে প্রাণে মারিতে চাহিত না ; এদিকে বরাবর তাহার বিশেষ একটা সঙ্কোচ ও আপত্তি ছিল।

কিন্তু গার্ণিয়ারের মত অপরাধীরা একেবারে সংশোধনের অতীত। মাছির মত মানুষ মারিয়া, সমাজের শান্তিকে নরক্তে কলঙ্কিত করিয়া, নর-জাতির শত্রু হইয়া যাহারা

আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে, তাহাদিগকে বশে আনিতে পারে পৃথিবীতে এমন শক্তি কোথায়?

জীবজন্তুর অনুভূতি

যখন কোন পাখী কোন পোকার দিকে তাকায়, তখন তাহার চোখে একটা সন্দেহের ভাব জাগিয়া ওঠে! 'এটা কোন্ জাতের কি পোকা? এটা খাদ্য না অখাদ্য? আমার বাপ-মা বা আমি এর-আগে এ-রকম কোন পোকা খেয়ে বিষম ফাঁসাদে পড়ি-নি ত? এটা বিষাক্ত সাপ টাপ্ কিছু নয় ত?"

পাখীর এই ভাবনা পোকা খুব চট্‌পট্ ধরিয়া ফেলে। পাখী যে তাহাকে সাপ ভাবিয়া ভয় পাইতেছে, এটা বুঝিতেও তাহার দেরি লাগে না! ফলে, সেও অম্‌নি সাপের মত ভাব-ভঙ্গি দেখাইতে সুরু করে!

অধিকাংশ জীবজন্তু আপনাদের শত্রুপক্ষের ভয়-ভাবনা এম্‌নি আশ্চর্য্যরূপে আন্দাজ করিয়া লইতে পারে! এই কারণেই কোন জাতের প্রজাপতি নীল পাতা, কোন জাতের প্রজাপতি শুক্‌নো পাতার রূপ ধরে, কোন কোন প্রজাপতি আবার ঘন ঘন রং বদলাইতেও থাকে। প্যাঁচাকে পাখীরা সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত ভয় করে, তাই ব্রেজিল দেশের একরকম প্রজাপতি প্যাঁচা সাজিয়া পাখীদের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়! শুব্‌রে পোকারা পাখীদের সামনে পড়িলে শুক্‌নো কাটির মত আড়ষ্ট ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে!

জীবজন্তুদের এই অভিজ্ঞতা বংশগত। কবে, কোন্ সময়ে একজাতীয় পোকামাকড় বিপদে পড়িয়া যে উপায়ে আত্মরক্ষা করিয়াছে, কেহ শিখাইয়া না দিলেও সে উপায়টা পরবর্ত্তী বংশধরেরা আপনা-আপনি শিখিয়া নেয়।

নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুদের মধ্যে এম্‌নি অনেক সূক্ষ্মবোধ-শক্তি আছে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবের মধ্যে যাহা নাই। গাঢ় অন্ধকারে,—চক্ষু যেখানে অচল—বাদুড়দের অনুভূতি কি সূক্ষ্ম! সেই অন্ধকারের কোথায়, কোন্ কোণে ছোট্ট একটি মশা আছে, বাদুড়রা অনায়াসেই ঠিক তাহা বুঝিতে পারে! ঘাসের উপরে অদৃশ্য পায়ের দাগের অস্পষ্ট গন্ধ পাইয়া, রক্তপিপাসী ডালকুত্তারা খুব সহজেই পলাতকের অনুসরণ করিতে থাকে! কিন্তু মানুষের অনুভূতি এ-সব জায়গায় একেবারে ভোঁতা! সুতরাং আমাদের কাছে নগণ্য হইলেও, নিকৃষ্ট পোকা-মাকড় ও জীবজন্তুদের বোধ-শক্তি যে অনেক সময়ে মানুষের চেয়েও ঢের-বেশী তীক্ষ্ণ, সে-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই!

আমরা একটি বানরের বাচ্ছাকে জানি, সে জন্মে কখনো সাপ দেখে নাই। অথচ, বাড়ীর ছেলেরা রবারের একটি ছোট সাপ লইয়া খেলা করিতেছে দেখিয়া, একদিন সে ভয়ে জড়-সড় হইয়া চোখ মুদিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল! অনভিজ্ঞ বানর-শিশুর মনে এই সর্প-ভীতি কোথা হইতে আসিল? 'বংশানুক্রমিক সংস্কার' ভিন্ন ইহার আর কোন উত্তর হইতে পারে না!

আবার, নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুরা একবার বিপদে পড়িলে ভবিষ্যতে যত-বেশী সাবধান হয়, মানুষ ততটা হয় না। আমাদের একটি দেড়-মাসের বিড়াল-ছানার গায়ে একবার আগুনের ছেঁকা দেওয়া হইয়াছিল। তার আগে সে আগুন চিনিত না। কিন্তু সেই একবারমাত্র আগুনের সংস্পর্শে আসিয়াই সে এম্‌নি সাবধান হইয়া গিয়াছিল যে, জীবনে আর-কখনো আগুনের ত্রিসীমানায় যাইত না। অথচ, শ্রেষ্ঠতম জীবের সন্তান হইয়াও মানব-শিশুর বোধ-শক্তি এত-শীঘ্র সতর্ক হইতে পারে না। আগুনে বার-বার হাত পুড়াইয়াও, সে আবার সেই আগুনের দিকেই নির্ভয়ে হাত বাড়াইয়া দেয়!

নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুদের মত মানুষের মনেও বংশানু-ক্রমিক সংস্কার হয় ত একসময়ে যথেষ্ট সূক্ষ্ম ছিল। কিন্তু সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে ভাষার ক্রমোন্নতির জন্য, তারপর আমরা অন্য নানা উপায়ে আমাদের সকল অভাব নিবারণ করিয়া আসিতেছি। ফলে আমাদের বংশানুক্রমিক সংস্কার ও বোধশক্তি ক্রমেই অকেজো হইয়া কমিয়া গিয়াছে। এক সময়ে আমরা বানরের মত পা দিয়া গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিতাম, হাতীর মত কাণ নাড়িয়া মাছি তাড়াইতে পারিতাম। মাংসাশী জন্তুদের মত আগে আমাদের চোয়ালও ছিল ভারি ও গোড়ালির দাঁতও ছিল সরু। লাফাইবার জন্য আমাদেরও পিছনে ছিল ল্যাজ, মাংস ও শক্ত জিনিষ ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য আমাদেরও হাতে ছিল বড় বড় ধারালো নখ, এবং শীত-নিবারণের জন্য আমাদেরও গায়ে ছিল লম্বা লম্বা চুল। কিন্তু ব্যবহারের অভাবে আমাদের এ-সব

বিশেষত্ব যেমন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তেমনি ক্ষুদ্রতম কীট-পতঙ্গের মধ্যেও যে telepathic sense দেখা যায়, সে ব্যাপারটাও আমাদের মধ্যে এখন আর দেখা যায় না।

জীবরাজ্যের নিম্নস্তরে এই যে telepathic senseটা কাজ করিতেছে, সময়ে সময়ে ইহার সূক্ষ্মতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়! মধুপুরে একবার একটা বোল্‌তার চাক্ ভাঙিয়া এ-বিষয় লইয়া আমি পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঐ চাকে তখন সুধু অপ্রাপ্তবয়স্ক অপূর্ণদেহ কতকগুলি বোল্‌তা ছিল। চাকের একটি ঘরের পাত্‌লা মোমের দরজা ভাঙিয়া আমি একটি বোল্‌তাকে অকালে বাহিরে টানিয়া আনিলাম। তাহার ডানা তখনো ভালো করিয়া গজায় নাই, সুতরাং উড়িতে না-পারিয়া প্রথমটা সে চাকের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিল। তারপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আমি তার পিছনদিকে চাকের উপরে আঙুল রাখিতে গেলাম, সে অমনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, ভোঁ ভোঁ আওয়াজে রাগ জানাইয়া আমাকে তাড়া করিয়া কাম্‌ড়াইতে আসিল! এইটুকু একটা শিশু বোলতা, বাহিরের মুক্ত বাতাসে সবে এই প্রথমদিন অসময়ে বাহির হইয়াই ঠিক বুঝিতে পারিল, আমি তাহার ও তাহার চাকের শত্রু! আমি আঙুল তুলিয়া লই, অমনি সে চুপ করে, আমি আবার যেই চাকে আঙুল দি, সেও অমনি আবার রুখিয়া গর্জ্জন করিয়া ওঠে! এইভাবে খানিকক্ষণ গেল। আমি অনেক লুকাইয়া, অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাকে ফাঁকি দিতে পারিলাম না,—চাকে হাত দিতে গেলেই সে টের পাইয়া ছুটিয়া আসে! যে-কোন দিকে যেমন করিয়াই আমি আঙুল ফিরাই না কেন, সেও ঠিক আমার আঙুলের দিকে মুখ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে!... ...আমার কথায় যাঁহার বিশ্বাস হইবে না, তিনি বোল্‌তার চাক্ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন!

গৃহপালিত কুকুর-বিড়ালদের আমরা যদি কোনরকম কু-মত্‌লবে আদর করিয়া ভুলাইয়া কাছে ডাকিয়া আনিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে অনেক সময়ে তাহারা আমাদের চোখ-মুখ দেখিয়া মনের কথা পরিষ্কার ধরিয়া ফেলে, হাজার ডাকিলেও আর কাছে ঘেঁষে না। যাঁহাদের কুকুর-পোষার সখ আছে, এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তাঁহারা কোন-না-কোন সময়ে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন!

বলির পাঁটারাও তাহাদের শোচনীয় পরিণামের কথা আগে থাকিতেই জানিতে পারে! বলিদানের পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের দেহে একটা অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়, কেবলি ছট্‌ফট্ করে, কাতর ভগ্ন স্বরে আর্ত্তনাদ করে, দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে!

নাচের আদর

ছয় হাজার বৎসর আগেও, নৃত্যকলা যে মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নৃত্য-বিদ্যা চিরকালই সকল দেশে সকল সময়ে সকলের কাছে আদর পাইয়াছে; এবং সৌন্দর্য্যের বিচিত্র বিকাশের দিকে যতদিন মানুষের মন উন্মুখ হইয়া থাকিবে, ততদিন এ আদরের অভাবও হইবে না।

প্রত্যেক দেশেই নাচের কত-না বৈচিত্র্য আছে! ইংলণ্ডে নানাশ্রেণীর গ্রাম্য নৃত্যের সংখ্যা হয় না। স্কচদের তরবারি-নৃত্যের নাম সকল দেশেই বিখ্যাত। কলিকাতায় যখন অভিষেকের বৎসরে ভারত-সম্রাটের পদার্পণ হয়, তখন গড়ের মাঠে অনেকেই বোধ হয় এই 'তরবারি-নৃত্য' স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। রুশদেশীয় কৃষকদের 'মাজুর্কা' ও 'জার্ডাস' নাচের নাম পৃথিবী-বিখ্যাত। এদেশে ইংরেজী থিয়েটারে ও বায়স্কোপে রুশ-নৃত্যের অনেক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। আরবদেশে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ প্রভৃতি জীবনের সমস্ত প্রধান ঘটনায় খুব ঘটা করিয়া নাচের আসর বসে! স্বামীর মনকে খুসি রাখিবার জন্য আরব-রমণী গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্মের অবসরে নিয়মিত নাচ-গান করে। নাচকে সেখানে প্রায় ভাষার সামিল করিয়া তোলা হইয়াছে। সেখানে যুদ্ধের নূতন খবরও হাটে-ঘাটে-পথে নাচের মধ্য দিয়াই প্রকাশ করা হয়! বেদুইনরা প্রাণের সুখ-দুঃখ, অশ্রু-হাসি অভিব্যক্ত করে নৃত্যকলার অভিরাম ছন্দলীলায়। কোন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে, তাহারা 'কামান-নৃত্য' নামে একরকম নাচের অনুষ্ঠান করে! 'কামান-নৃত্যে' যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, রণ-সমাপ্তির সময়েও তাহারা অন্য এক-রকমের নাচ নাচিয়া শান্তি ঘোষণা করে!

ভারতবর্ষে নাচ আছে দু-রকম,—ধর্ম্ম-নৃত্য ও লৌকিক নৃত্য। উৎকলের দেবদাসীদের নাচে-গানে ঐ ধর্ম্ম-নৃত্যের

কতক-কতক নমুনা এখনো পাওয়া যায়। লৌকিক নৃত্যে দাক্ষিণাত্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেখানকার নাচে এমন বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আছে যে, য়ুরোপ হইতে অনেক নট-নটী সেই নৃত্যভঙ্গি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দক্ষিণ-ভারতে আসিয়া উপস্থিত হয়। দক্ষিণ ভারতের সর্পনৃত্য দেখিয়া বিলাতের লোকেরাও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে!

য়ুরোপের লোকেরা প্রাচীন নৃত্যের মাধুর্য্য এখনো ভুলে নাই। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে নৃত্য নিরত নটনটীর যে-সকল ভাস্কর্য্য-চিত্র পাওয়া যায়, তাহা দেখিলে সেকালের নানাশ্রেণীর নৃত্য-লীলার একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়। প্রতীচ্যের একালকার নৃত্য-শিল্পীরা সেকালের ঐ সব নৃত্যের যথাযথ অনুসরণ করিয়া জনসাধারণের সৌন্দর্য্য-বোধকে পরিতৃপ্ত করিয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রাচীন শিল্পের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও, নাচের ছবি দেখা যায় অগুন্তি। সে সব চিত্রার্পিত মূর্ত্তির হাত-পা, গ্রীবা, বক্ষ ও কটির ভঙ্গি এমন অসীম সুন্দর যে, দর্শকের নয়ন-মন একেবারে জুড়াইয়া যায়! তাহারা যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া নাচিতেছে! সেই প্রাচীন নৃত্যে নূতন জীবন সঞ্চার করিতে পারেন, ভারতবর্ষে এমন শক্তিধর নর্ত্তক কি একালে আর একজনও নাই? কেহ কি এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন?

বিলাতের ফুটবল-খেলা

বাঙলা দেশে আজকাল ফুটবল-খেলার ঝোঁক্ দিন-কে-দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। মোহনবাগানের বাঙালী খেলোয়াড়রা যে বৎসর সাহেব-খেলোয়াড়দের হারাইয়া "সিল্ড" লাভ করে, সেই বৎসর হইতে ফুটবল-খেলাটা অধিকাংশ বাঙালী যুবকের জীবনে যেন-একটা প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আবার, খেলোয়াড়দের চেয়ে দর্শকদের উৎসাহও বড় কম নয়। খেলার দিনে রোজ বৈকালে, গড়ের মাঠে গোটা কলিকাতা সহরটাই যেন ভাঙিয়া পড়ে এবং একটু ভালো জায়গায় দাঁড়াইয়া খেলা দেখিবার জন্য গরীব বাঙালী এই দুর্দ্দিনেও ট্যাঁকের পয়সা খরচ করিতে নারাজ নয়।

মাঠে এখন ফুটবল-খেলা পুরো দমে চলিতেছে। সুতরাং, যে-দেশ হইতে এ-খেলাটা এদেশে আসিয়াছে, সে দেশে ইহার প্রভাব-প্রতিপত্তি কতখানি, এখানে সে প্রসঙ্গ তুলিলে বোধ হয় অনেকেই খুব খুসি হইবেন!

বিলাতে ফুটবল-খেলার আদর ভালো করিয়া সুরু হয়, গেল ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে। তাহার আগেও এ-খেলাটা সেখানে চলিত ছিল বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি তখন তাহার দিকে তেমন-করিয়া আকৃষ্ট হইত না।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিলাতে ফুটবল-খেলাটা সখের খেলা ছিল। সে সময়ে কোন খেলোয়াড় ফুটবল খেলিয়া টাকা রোজগার করিতে পারিত না। কিন্তু প্রকাশ্যে টাকা নেওয়াটা বে-আইনী কাজ বলিয়া, ভালো খেলোয়াড়রা গোপনে টাকা না পাইলে, কোন দলে কিছুতেই যোগ দিতে চাহিত না। ভিতরে ভিতরে এই ব্যাপারটা ক্রমে এম্নি বাড়িয়া উঠিল যে, বিলাতী 'ফুটবল-আসোসিয়েসন' শেষটা প্রকাশ্যভাবে ফুটবল-খেলায় ব্যবসাদারির সমর্থন করিতে বাধ্য হইলেন।

ব্যবসায়ে পরিণত হইয়া বিলাতে ফুটবল-খেলার উন্নতিও খুব দ্রুত হইয়া উঠিল, খেলাও ক্রমে জনপ্রিয় হইয়া পড়িল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের 'কাপ-ফাইন্যালে' বা চরম খেলায় সেখানে দর্শক হইয়াছিল মোটে চার হাজার। কিন্তু গত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের চরম-খেলায় সেখানে দর্শকের সংখ্যা হইয়াছিল ১২১৯১৯ জন, এবং এই একটি-মাত্র খেলায় টিকিট বিক্রী করিয়া আদায় হইয়াছিল এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার নব্বই টাকা! ফুটবল যে বিলাতে কত-বড় আদরের খেলা, এই একটি দৃষ্টান্তেই সকলে তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন!

ফুটবল-ক্লাব বা সমিতিগুলিও সেখানে খেলার ফলে যথেষ্ট লাভবান হইয়া উঠিতেছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ফুটবল-খেলার সময়ে, বিলাতের বিখ্যাত চেল্‌সি-ক্লাবের জমিতে সর্ব্বশুদ্ধ নয় লক্ষ লোক, চারি লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া খেলা দেখিতে গিয়াছিল! ইহার মধ্যে সামান্য-বেশী একলাখ টাকা খরচ বাদে, বাকি সমস্ত টাকা ক্লাবের ভাণ্ডারে জমা হইয়াছিল! সুধু চেল্‌সি-ক্লাবে নয়, বিলাতের অনেক ক্লাবেই মাস-দুয়েকের মধ্যেই এম্নি অগাধ টাকা জমিয়া উঠিতেছে!

ক্লাবের টাকা কোন ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নয়।



চোরের রাজা চার্লস পিশ্ (সেকেলে অপরাধীর নমুনা)



মোটর দস্যু গার্ণিয়ার (আধুনিক অপরাধীর নমুনা)

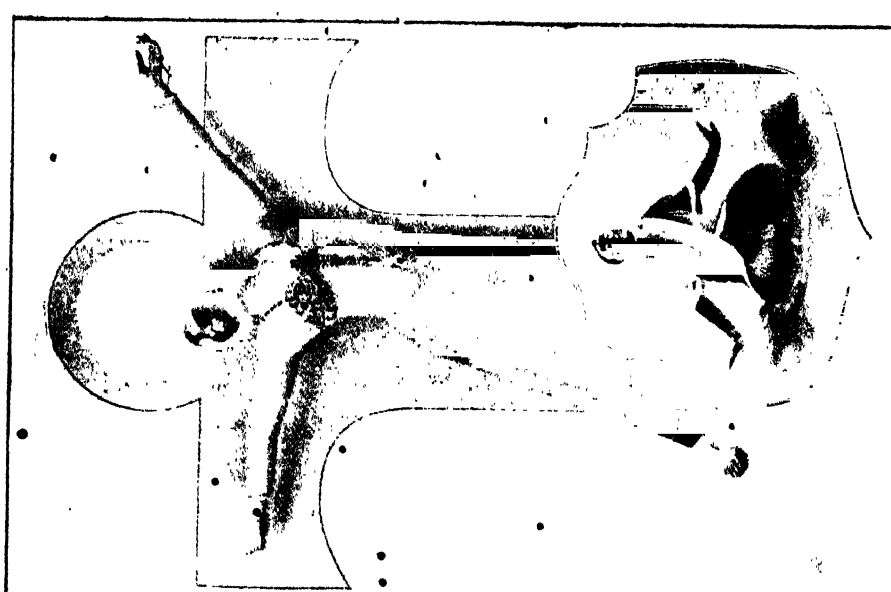
অথচ এতগুলো টাকা অকেজো করিয়া ফেলিয়া রাখাও চলে না বলিয়া, নানান কাজে তাহা খরচ করা হয়। ক্লাবের প্রধান খরচ, জমির উন্নতি সাধনে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড্' ক্লাবের জমির কথা বলিতে পারি। ম্যাঞ্চেষ্টারে-ইউনাইটেডের জমি এত চমৎকার যে, তাহাতে খরচ পড়িয়াছে সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা! বিলাতে সকলের চেয়ে ধনী ক্লাব হইতেছে 'এভার্টন'। তাহার জমিতে ত্রিশ হাজার লোক অনায়াসে ছাদের নীচে নিরাপদে বসিয়া খেলা দেখিতে পারে! 'অ্যাষ্টন ভিলা' নামে এক ক্লাবও তাহার জমির পিছনে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিন লাখ টাকা খরচ করিয়াছে। 'ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড' আর একটি নূতন জমি-তৈয়ারির বন্দোবস্ত করিতেছে, তাহাতে নাকি আশী হাজার লোক একত্রে ঘরের ভিতরে বসিয়া খেলা দেখিতে পারিবে!

জমি তৈয়ারি করিয়া এবং অন্যান্য ব্যয়-সঙ্কুলান করিয়াও বড় ক্লাবগুলির হাতে অনেক টাকা মজুদ্ থাকিয়া যায়। উদ্বৃত্ত অর্থের কতকাংশ দেশের নানা সৎকার্য্যে দান করা হয়। বিলাতের সমস্ত ফুটবল ক্লাবের বাৎসরিক দানের পরিমাণ হইতেছে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। এ-ছাড়া অতিরিক্ত বিশেষ দানও আছে। একবার একটি বড় খেলার সময়ে দর্শকের বাড়ী ভাঙিয়া পড়িয়া অনেক লোক হতাহত হইয়াছিল। সেই দুর্ঘটনায় ফুটবল ক্লাবগুলি তিনলাখ পচাত্তর হাজার টাকা সাহায্য ভাণ্ডারে দান করিয়াছিল। কিন্তু এত খরচ ও দান করিয়াও, বিলাতী ক্লাবের সঞ্চিত অর্থ না কমিয়া ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে!

খেলোয়াড়রাও সেখানে মাহিনা পায় খুব বেশী। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'মিড্‌লস্‌বরো-ক্লাব' ভালো খেলোয়াড় না-পাইয়া প্রথম হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামিয়া যাইতে বসিয়াছিল। মান বাঁচাইবার জন্য উক্ত ক্লাবের সভ্যরা, কমন নামে একজন বিখ্যাত খেলোয়াড়কে পনেরো হাজার টাকা দিয়া আপনাদের দলভুক্ত করিয়া নেন। সেই ব্যাপারে তখন সকলেই চমকিয়া গিয়াছিল! এখন কিন্তু এমন ব্যাপার



"মরুভূ-সমীর"—শ্রীমতী মাহারি জেলির আরবীয় রূপক নৃত্য;
পিছনে নর্তকীর ছবি



শ্রীমতী মাহারি জেলির আরবীয় রূপক-নাচ;
উপরের নাচের নাম "জীবনের আনন্দ";
নীচের নাচের নাম "অদৃষ্টের নিকট আত্মসমর্পণ"



উপরে আধুনিক নর্ত্তকীর প্রাচীন গ্রীসীয় নাচের ছবি :
নীচের ছবিখানি একটী গ্রাম্য নাচের :
নর্ত্তকীর নাম সাহারেট



নর্ত্তকী কারসাভিনার রুসীয় নাচ



স্কটল্যাণ্ডের গোল কিপার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একটা খেলায় বল ধরিতেছে ;
খেলায় টিকিট বিক্রী হইয়াছিল নব্বই হাজার টাকা ; প্রত্যেক খেলোয়াড় ষাট টাকা করিয়া পাইয়াছিল



ফুটবল খেলোয়াড়দের ক্রীড়ার উপযোগী ব্যায়াম অভ্যাস ; পিছনে শিক্ষকেরা দাঁড়াইয়া আছেন

হায়েসাত হইয়াছে। খুব সাধারণ, মামুলিদলের খেলোয়াড়রাও এখন পনেরো হাজার টাকা না পাইলে কোন দলে গিয়া ভর্ত্তি হইতে চায় না। আর ভালো খেলোয়াড়দের ত কথাই নাই। তাহাদের মাহিনা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, শুনিলে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। বছরের মধ্যে মোটে মাস তিন চারের জন্য আসল ফুটবল খেলা হয়। কিন্তু এই অল্প দিন খেলিবার জন্য ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সিম্প্‌সন নামে একজন খেলোয়াড়, 'ব্লাকবার্ণ রোভার্স ক্লাবে'র কাছ হইতে সাতাশ হাজার টাকা পাইয়াছিল!

ঐ 'রোভার্সে'র দলই আবার 'ওয়েষ্ট হাম ইউনাইটেড-ক্লাব' হইতে সিয়া নামে একজন খেলোয়াড়কে ত্রিশ হাজার টাকা কব্‌লাইয়া ছাড়াইয়া লইয়াছিল! হিবার্ট নামে এক খেলোয়াড়কে 'নিউ-ক্যাসেল ক্লাব' দিয়াছিল উনত্রিশ হাজার সাড়ে সাতশো টাকা! কিন্তু এই টাকার উপরেও খেলোয়াড়দের আরো অনেক টাকা ভিতরে-ভিতরে উপরি-পাওনা আছে। অবশ্য সে পাওনাটা নিয়মিত মাহিনার সঙ্গে ধরা হয় না।

বিলাতে হলস নামে একজন খেলোয়াড় আছে, শত্রু-পক্ষকে 'গোল' দিতে তাহার মত দক্ষ খেলোয়াড় আর নাই। তাহার মাহিনাও তেম্‌নি আর সকলের চেয়ে অনেক বেশী—সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা! সে 'আষ্টন ভিলা'র খেলোয়াড়। 'ব্লাকবার্ণ রোভার্সে'র 'ফরওয়ার্ড-লাইনে'র পাঁচজন খেলোয়াড় যে মাহিনা পায়, তাহার পরিমাণ হইতেছে নব্বই হাজার টাকা! আরো

৪-পাঁচ বৎসরের মধ্যেই বিলাতী খেলোয়াড়দের মাহিনা বাড়িয়া যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না!

অবশ্য, কেহ যেন এমন না মনে করেন যে, খেলোয়াড়দের এত-বেশী মাহিনা দিয়া ক্লাবগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে! ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। পূর্ব্বোক্ত জক্ সিম্প্‌সন প্রথম যেদিন 'ব্লাকবার্ণ রোভার্সে'র হইয়া মাঠে খেলিতে নামে, সেইদিনই বেশী-টিকিট বিক্রী হইয়া খেলোয়াড়ের মাহিনা উঠিয়া ক্লাবের হাতে বেশ কিছু উপরি টাকা জমিয়া যায়!

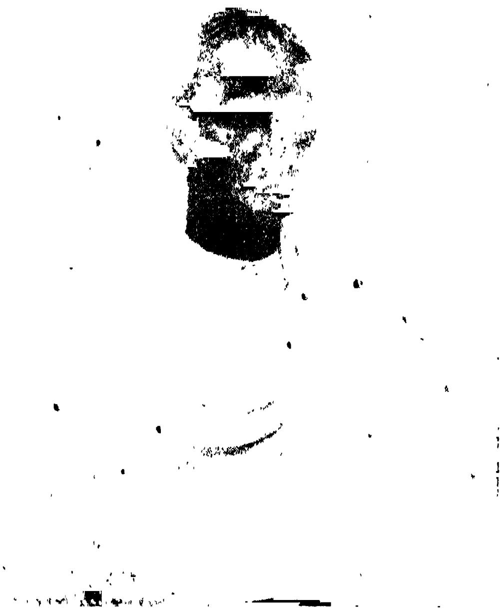
বিলাতে ত্রিশ বছর বয়সের ভিতরেই অধিকাংশ খেলোয়াড়ের লীলাখেলা সাঙ্গ হইয়া যায়। তারপরে খেলোয়াড়রা আর প্রথমশ্রেণীর উপযোগী থাকে না। যাহাদের স্বাস্থ্য লোহার মত অটুট এবং ত্রিশ বৎসরেও যাহাদিগকে সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া খেলা ছাড়িয়া দিতে হয় না, এমন খেলোয়াড়ের সংখ্যা খুব অল্প। ষ্টিভ্ ব্লুমার এই শেষোক্ত শ্রেণীর খেলোয়াড় ছিল। একটানা একুশ বৎসর ধরিয়া সে প্রথমশ্রেণীর ফুটবল খেলিয়াছিল; কিন্তু এমন খেলোয়াড় আর বড় দেখা যায় নাই। সাধারণতঃ দশ বৎসরের মধ্যেই ফুটবল-খেলোয়াড়রা কাজের বাহির হইয়া যায়। সুতরাং, খেলোয়াড়দের যা কিছু রোজগার, তা এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে করিয়া লইতে হয়। সে হিসাবে তাঁহাদের মাহিনাও খুব বেশী নয়।

বাঙালী খেলোয়াড়রা ফুটবল খেলে সখের খাতিরে, আর বিলাতের ফুটবল খেলা পয়সা রোজগারের জন্য। কাজেকাজেই খেলাটা সেখানে দস্তুরমত শিক্ষা ও সাধনা সাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতী খেলোয়াড়রা ফুটবল খেলার উপযোগী ব্যায়াম করিয়া শরীরকে কর্ম্মপটু করিয়া রাখে, অনেকেই স্বাস্থ্যহানির ভয়ে সিগারেট পর্য্যন্ত ত্যাগ করে! ফুটবল খেলা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিখাইবার জন্য, সেখানকার বড় বড় ক্লাবে মাহিনা করা শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। খেলোয়াড়রা সেই শিক্ষকের উপদেশে চলে-ফেরে, বসে দাঁড়ায় আপনাদের খেয়ালখুসি-মত যা-খুসি তাই করিতে পারে না। এইসকল কারণে, বিলাতের ফুটবল-খেলার আদর্শ এদেশের চেয়ে ঢের বেশী উচু!

শোক-সংবাদ

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

চারিদিকে হাহাকার রামেন্দ্রসুন্দর নাই! রামেন্দ্রসুন্দর নাই—ইহা হইতেই পারে না! বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে জিজ্ঞাসা কর,—রিপণ কলেজকে জিজ্ঞাসা কর—রামেন্দ্রের শত-সহস্র শিষ্যকে জিজ্ঞাসা কর,—রামেন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা কর,—সকলে একবাক্যে বলিবে, রামেন্দ্র আছেন—রামেন্দ্র আছেন! আমাদের দেশ ত তাঁহার স্থান নহে;—আমরা এই ৫৫ বৎসর তাঁহাকে মায়ায় অন্ধ করিয়া, ভুলাইয়া এইখানে রাখিয়াছিলাম। যেদিন সে বন্ধন কাটিয়া গেল, যেদিন সে ভুল ভাঙ্গিল, সেইদিন রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার উপযুক্ত দেশে চলিয়া গেলেন—প্রবাস-ভবন ছাড়িয়া বাস-ভবনে গেলেন। সেই যে তাঁহার স্থান;—যেখানে দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা নাই, যেখানে নিত্যানন্দ,—সেই স্থানে আনন্দময় রামেন্দ্র চলিয়া গেলেন। আর অন্ধ আমরা বলিতেছি রামেন্দ্র নাই। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, নবভূষায় সজ্জিত হইয়া নিত্যানন্দধামে রামেন্দ্র বিরাজ করিতেছেন। এদিকে আমরা শোকে কাতর;—আমরা বলিতেছি, রামেন্দ্র কত কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া গেলেন,—সাহিত্য পরিষদ ফেলিয়া গেলেন—প্রিয়তম শিষ্যগণের মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিলেন—আমাদের 'ভারতবর্ষে'র বিরাট আলোচনা অসম্পূর্ণ রাখিয়া গেলেন। আমরা আমাদের ক্ষতি দেখিতেছি, আমাদের অভাব ভাবিয়া কাতর হইতেছি; তাঁহার কথা ত ভাবিতেছি



আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

না। রামেন্দ্রসুন্দর আছেন যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে, বঙ্গভাষা থাকিবে, ততদিন 'রামেন্দ্রসুন্দর' থাকিবেন।— তাঁহার সেই অমরধাম হইতে তাঁহার প্রিয় বাঙ্গালাদেশ, বাঙ্গালী, আর তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফল সাহিত্য পরিষদকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল আর ইহজগতে নাই, সুদীর্ঘকাল বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া বড়াল কবি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য অক্ষয় পুরী ধামে গিয়াছিলেন। মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল, অক্ষয় নীলাম্বুতটে দেহরক্ষা করিয়াছেন, তাহার পরই সংবাদ পাওয়া গেল, তিনি মারা যান নাই, তবে তাঁহার জীবনের আশা অতি কম। তাহার পরই তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হয়। এখানে আসিয়াই জাহ্নবীতীরে কবি শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়াছেন। অক্ষয় চলিয়া গেলেন, উদার হৃদয় বন্ধুবৎসল কবির 'প্রদীপ' নিবিয়া গেল, 'শঙ্খ'-নিনাদ বন্ধ হইল, 'এষা'র দীর্ঘশ্বাস এতদিনে থামিল; তাঁহার সকল জ্বালা জুড়াইল; বহুদিন পরে প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর সহিত তিনি মিলিত হইলেন। কবিবর অক্ষয়কুমারের কবিতায় যে একটা প্রাণস্পর্শী ভাব ছিল, যে



কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল

একটা উদাত্ত সুর ছিল, তাহা আমরা কোন দিন ভুলিতে পারিব না,—আর ভুলিতে পারিব না তাঁহার অকৃত্রিম সহৃদয়তা, তাঁহার বন্ধুবৎসলতা। অক্ষয় আমাদের সোদর-স্থানীয় ছিলেন। এতকালের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমরাই তাঁহার শোকে কাতর,— তাঁহার পুত্রগণকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব!

সাধু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা

একটা মানুষের মত মানুষ চলিয়া গেলেন—এই মনোরঞ্জন বাবু। একেবারে আগাগোড়া খাঁটি মানুষ—সাহিত্যে খাঁটি, স্বদেশ প্রীতিতে খাঁটি, ধর্ম্মজীবনে খাঁটি। এই মেকির বাজারে মনোরঞ্জন একটা হিমালয় পর্ব্বত ছিলেন। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি, কত ভাবে তাহার সঙ্গে মিশিয়াছি, কত বিপদ আপদ, কত দুঃখ-কষ্ট



স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

ঐ মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, কিন্তু মনোরঞ্জন অচল, অটল! কিছুদিন হইতে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন—বলিতে গেলে সাধ্বী সহধর্ম্মিণী মনোরমার মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার দেহক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; যখন-তখনই তিনি তাঁহার গুরুদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিতেন। এতদিনে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল—কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ভক্তপ্রবর মনোরঞ্জন গোলোকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার তিরোভাবের জন্য দুঃখ করিব না—তিনি তাঁহার কাম্য চরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

রায় ৺বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

রায় বাহাদুর স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের পরলোক গমনে বাঙ্গালার সঙ্গীতশাস্ত্র একজন একনিষ্ঠ সাধকের সেবায় বঞ্চিত হইল। শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ সৌখীন সঙ্গীত-বিশারদ বৈকুণ্ঠনাথ যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত-কলা-চর্চ্চায় বাঙ্গালায় অদ্বিতীয় বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতে একাধারে এমন নিপুণতা লাভ অতি অল্প লোকের



রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ গুণী সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিরা যেরূপ উদ্ধত এবং একগুঁয়ে হইয়া থাকেন, বৈকুণ্ঠনাথে সে দোষের আরোপ কেহ করিতে পারিবেন না। তাঁহার বিনয়, শিষ্টাচার, অহমিকাশূন্যতা প্রভৃতি গুণগুলিও তাঁহার সঙ্গীত-নিপুণতারই ন্যায় অনন্যসাধারণ ছিল। সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চায় তিনি জীবন কাটাইয়াছেন। প্রার্থনা করি, তাঁহার লোকান্তরিত আত্মা অক্ষয় শান্তিলাভ করুন।

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক—১৬৭৪ খৃঃ

[অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, পি-আর-এস্]

শিবাজী কেন রাজা হইতে চাহিলেন

শিবাজী ও তাঁহার অমাত্যবর্গ বহুদিন ধরিয়া অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন যে, শিবাজী রাজপদে অভিষিক্ত না হইবার ফলে তাঁহাদের কতক নানারূপ অসুবিধা ঘটিতেছে।* সত্য বটে তিনি বহু দেশ জয় করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, স্বাধীন নৃপতির ন্যায় তাঁহার পতাকায় বাহিনী ও নৌ-বল ছিল এবং তিনি তাঁহার প্রজাপুঞ্জের জীবন মরণের বিধান করিতেন। কিন্তু আইন সঙ্গত পদমর্য্যাদায় তিনি তখনও একজন প্রজামাত্র। মোগল সম্রাটের চক্ষে তিনি একজন জমীদার মাত্র এবং আদিল শাহের কাছে একজন আশ্রিত জাগীরদারের বিদ্রোহী পুত্র মাত্র। রাজ-দরবারে রাজার তুল্য সম্মান দাবী করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, যতদিন তিনি এইরূপ একজন প্রজামাত্র ছিলেন, ততদিন অপরিসীম শক্তি সত্বেও, তাঁহার শাসনাধীন প্রজাপুঞ্জের নিকট তিনি রাজভক্তি বা রাজপূজার দাবী করিতে পারিতেন না। কোন রাজ্যের শাসনস্থানীয় ব্যক্তির আচরিত কার্য্য যেরূপ আইন-সঙ্গত ও স্থায়ী, তাঁহার প্রতিশ্রুতি সেরূপ চূড়ান্ত বা অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া গণ্য হইত না। তিনি কোনও সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না, অথবা কোনও ভূমি দান করিলে তাহা আইনানুসারে সিদ্ধ হইত না; সুতরাং সে দানের স্থায়িত্বে কেহ কৃতনিশ্চয় হইতে পারিতেন না। তরবারির দ্বারা তিনি যে-সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অধিকার বস্তুতঃ অক্ষুণ্ণ হইলেও, আইনানুসারে তিনি তাহা নিজস্ব সম্পত্তিরূপে পরিগণিত করিতে পারিতেন না। তাঁহার অধীনস্থ প্রজা ও সৈনিকগণ তদ্দেশীয় পূর্ব্ব ভূপতির সহিত প্রজা-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত না এবং শিবাজীর অধীনতা স্বীকার করিলে তাহারা যে রাজদ্রোহিতার জন্য দণ্ডিত হইবে না, এ ভরসাও করিতে পারিত না। তাঁহার স্থাপিত রাজ্যটিকে স্থায়ী করিতে হইলে প্রথমে তাঁহার কার্য্যগুলি স্বাধীন রাজার কার্য্যের ন্যায় লোকমান্য করা প্রয়োজন।

রাজ্যাভিষেকের সুফল

তাঁহার ইতিহাস হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ভোঁসলা-পরিবারের অভ্যুদয়ে তাহাদের সমকক্ষ অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় বংশ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা অনুচর-রূপে শিবাজীর পক্ষাবলম্বন করিতে অস্বীকার করিয়া আরংজীব অথবা আদিল শাহের ভক্ত প্রজারূপে আত্ম-পরিচয়দানে গর্ব্বানুভব করিত এবং শিবাজীকে 'হঠাৎ-বড়' পরস্বাপহারী বিদ্রোহী বলিয়া উপহাস করিয়া আত্মতৃপ্তি সাধন করিত। শিবাজীর একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল যে, এই সব উদ্ধত লোকের সম্মুখে তাঁহার নিজের প্রকৃত পদমর্য্যাদা প্রকাশ্যভাবে স্থাপিত করেন। প্রকাশ্য রাজ্যাভিষেক দ্বারাই তিনি তাহাদিগকে দেখাইতে পারিবেন যে তিনি রাজা, অতএব তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এবং এইরূপেই তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদিগের সহিত সমকক্ষ ব্যবহার করিতে সক্ষম হইতেন।

মহারাষ্ট্র দেশের উন্নতমনা ব্যক্তিগণ হিন্দুধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা স্বরূপে শিবাজীর দিকে চাহিয়াছিলেন এবং প্রকাশ্যভাবে তাঁহার স্বাধীন রাজোপাধি প্রতিষ্ঠা দ্বারা হিন্দুজাতির রাজ-নৈতিক উন্নতির চরম সীমা দেখিতে তাঁহারা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হিন্দু স্বরাজ দেখিবার জন্য তাঁহারা অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেজন্য হিন্দু ছত্রপতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

* প্রধানতঃ ইংরাজ দূত Henry Oxinden-এর ইংরাজপক্ষীয় দ্বিভাষী নারায়ণ শেনবি এবং ওলন্দাজ-বণিক Abraham Le Feber-এর বিবরণ অবলম্বনে এই অধ্যায়টী লিখিত। ইহা ব্যতীত সভাসদ, চিটনীস্ এবং শিবদিগ্‌বিজয় (ইহা অবিশ্বাস্য ও কাল্পনিক) বখরগুলি হইতেও উপাদান গ্রহণ করা হইয়াছে।

গঙ্গাভট্ট কর্ত্তৃক শিবাজীকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার

কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল করিবার পথে একটি অদ্ভুত অন্তরায় ছিল। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র মতে ক্ষত্রিয়েরই রাজমুকুট ধারণে একমাত্র অধিকার ছিল, এবং তাঁহারাই রাজা রূপে হিন্দু প্রজার পূজালাভ করিতে পারিতেন। ভোঁস্‌লাগণ ক্ষত্রিয় বা অন্য দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত ছিলেন না; সাধারণে তাঁহাদিগকে কৃষিজীবী বলিয়া জানিত,—শিবাজীর প্রপিতামহও চাষ করিতেন বলিয়া লোকে জানিত। অতএব নীচ শূদ্রবংশোদ্ভব কুল-মর্য্যাদাহীন শিবাজী ক্ষত্রিয়-জনোচিত অধিকার ও সম্মানলাভের উচ্চাভিলাষ কিরূপে পোষণ করিবেন? তিনি যদি নিঃসন্দেহ ভাবে আপনাকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তবেই ত সমগ্র ভারতের ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী তাঁহার অভিষেকোৎসবে সমবেত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে।

এই কারণে সর্ব্বাগ্রে এমন একজন পণ্ডিতের সহায়তার প্রয়োজন হইয়াছিল, যাহার শাস্ত্রজ্ঞানের মহিমায় বিরুদ্ধবাদিগণ কথা কহিতে সাহস করিবে না। কাশী-নিবাসী গঙ্গাভট্ট ঠিক এই ধরণের লোক ছিলেন। তাৎকালিক পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ ও নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি চারি বেদ, ষড়্‌দর্শন এবং সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং লোকে তাঁহাকে কলিযুগের ব্রহ্মদেব ও ব্যাস আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। কিছু-কাল যাবৎ শিবাজী ইঁহাকে নিজ মতে আনয়ন করিতে পারেন নাই; কিন্তু অবশেষে ইনি প্রসন্ন হইয়া শিবাজীর সুচতুর অমাত্য বালাজী আব্জী ও অন্যান্য প্রতিনিধি কর্ত্তৃক তাঁহার কল্পিত বংশাবলী সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া, তাঁহাকে সূর্য্যবংশ-তিলক রামচন্দ্রের পবিত্র বংশ-সম্ভূত একমাত্র বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় উদয়পুরের মহারাণাগণের বংশধর স্বরূপে প্রচার করিলেন। তাঁহার এই অসমসাহসী অথচ তোষামোদময় অভিমতের পুরস্কার স্বরূপ তিনি বহু অর্থ লাভ করিলেন এবং শিবাজীর অভিষেককালে মহারাষ্ট্র দেশে গমন করিয়া প্রধান পুরোহিতের কার্য্য করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া মহারাষ্ট্র দেশে উপনীত হইলে, তাঁহাকে রাজোচিত অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল; স্বয়ং শিবাজী তাঁহার সকল অমাত্য সমভিব্যাহারে সাতারা হইতে বহু ক্রোশ অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

অভিষেকের আয়োজন

বহু মাস ধরিয়া অভিষেকের আয়োজন চলিতে লাগিল। স্বাধীন হিন্দু নৃপতিগণের অভিষেকে ঠিক কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং কি কি উপকরণাদির প্রয়োজন হয়, তৎসম্বন্ধে কোনও বিশুদ্ধ জনশ্রুতি ছিল না। প্রাচীন হিন্দু দৃষ্টান্ত অনুসরণোদ্দেশ্যে পণ্ডিতমণ্ডলী সংস্কৃত পুরাণ ও রাজনৈতিক গ্রন্থাবলী খুঁজিতে লাগিলেন এবং জয়পুর ও উদয়পুর রাজবংশের আধুনিক প্রথা জানিবার জন্য তদ্দেশে দূত প্রেরণ করা হইল।

ভারতের সকল স্থানের শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং উৎসবের সংবাদ পাইয়া অনাহূত ভাবেও অনেকে আসিয়াছিলেন। একাদশ সহস্র ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের পুত্র কলত্রাদিসহ ৫০ সহস্র ব্যক্তি রাজগড়ে সমবেত হইয়া, রাজার ব্যয়ে চারি মাস ধরিয়া মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। চিট্‌নিস্ বলেন, উৎসব উপলক্ষে সমাগত অসংখ্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তি—ব্রাহ্মণ, ভদ্র, দেশস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাজপ্রতিনিধি, বিদেশীয় বণিক, দর্শক ও দরিদ্র আত্মীয়গণের সুখ স্বচ্ছন্দতা-বিধানে শিবাজী অদ্ভুত ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও নিয়ামক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, একথা সহজেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কোনও বিষয়েই ভুল হয় নাই, লক্ষ লক্ষ নরনারী ও বালক-বালিকার পরিবেশনে কোনও বিশৃঙ্খলা, কোনও অভাব, গণ্ডগোল বা হুড়াতাড়ি পরিলক্ষিত হয় নাই।

ইংরাজ দূত হেন্‌রি অক্‌সিন্‌ডেন দেখিলেন, দৈনিক ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানে ও ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিতে শিবাজী এত অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার অন্য কার্য্য করিবার অবসর রহিল না। তিনি প্রথমে তাঁহার গুরু রামদাস স্বামী ও জননী জীজা বাঈকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। শাহজীর পরিত্যক্তা দুঃখিনী প্রথমা পত্নী জীজা প্রায় অশীতি বর্ষ বয়সে পুত্রের স্নেহ ও ভক্তিবলে স্বামীর অনাদর বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে তাঁহার পুত্রকে নিজ জন্মভূমির ছত্রাধিপতি নৃপতি, দুর্দ্ধর্ষ বিজয়ী, ও তাঁহার জীবনের শান্তি-

স্বরূপ ধর্ম্মের পরাক্রান্ত রক্ষাকর্ত্তারূপে মানব গৌরবের চরম সীমায় উপনীত হইতে দেখিয়াছিলেন, ইহাতে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ব্বে এ দেশের অঙ্গরাজ শ্রীমৎকর্ণের জননী, রাজমাতা গৌতমীর ন্যায় তিনিও তাঁহার বিজয়ী, স্বধর্ম্মনিরত পুত্রের গৌরবে মহিমান্বিতা হইয়াছিলেন। শিবাজীর অভিষেকের বার দিন মাত্র পরেই তিনি পরলোকগমন করেন। ভগবান যেন দয়া করিয়া তাঁহাকে এ দৃশ্য দেখাইবার জন্যই এত দীর্ঘকাল জীবিতা রাখিয়াছিলেন।

শিবাজীর পূজা ও শুদ্ধি

তারপর তিনি দেশের প্রসিদ্ধ দেবালয়সমূহে পূজা করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রথমে চিপ্‌লুনে উপনীত হইয়া তথায় মহামন্দিরে পরশুরামের পূজা করিয়া ১২ই তারিখে তিনি রায়গড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার চারি দিন পরে পুনরায় তিনি প্রতাপগড়ে স্বপ্রতিষ্ঠিত ভবানী দেবীর পূজার্থে যাত্রা করেন। তুলজাপুরের প্রাচীন ভবানী মন্দির তাঁহার অনধিগম্য ছিল বলিয়া, তিনি এই নূতন দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মন্দিরে তিনি এক মণ ১০ সের ওজনের বিশুদ্ধ স্বর্ণের একটি ছত্র (যাহার মূল্য প্রায় ৫৬,০০০৲) এবং অন্যান্য অনেক মূল্যবান সামগ্রী দান করিয়াছিলেন।

২১এ তারিখ অপরাহ্ণে রায়গড়ে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পূজার্চ্চনাদিতে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কুলপুরোহিত বালম্ ভট্টের (প্রভাকর ভট্ট উপাধ্যায়ের পুত্র) নির্দ্দেশানুসারে তিনি ক্রমান্বয়ে মহাদেব, ভবানী ও অন্যান্য স্থানীয় দেব দেবীর পূজায় রত হইয়াছিলেন।

কিন্তু অভিষেকের পূর্ব্বে তাঁহার একটা গুরুতর বাধা অপনয়ন করা প্রয়োজন হইয়াছিল। সর্ব্বসমক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করণান্তর, তাঁহাকে ক্ষত্রিয়বর্ণে উন্নীত হইতে হইয়াছিল। ২৮এ মে তারিখে তিনি এতাবৎ ক্ষত্রিয়াচার পালন না করা হেতু পিতৃপুরুষগণের ও নিজের পাপ (ব্রাত্যদোষ) ক্ষালন জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন, তৎপরে গঙ্গাভট্ট তাঁহাকে উত্তর-ভারতের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-জাতির ন্যায় দ্বিজাতিগণের ধারণীয় উপবীত-গ্রহণের অধিকার প্রদান করেন। অতঃপর তাঁহাকে ক্ষত্রিয় জাতির মন্ত্র ও আচারে দীক্ষিত করা হয়। যথার্থ হিন্দু-রাজার দীক্ষা ও অভিষেককালে যে-সকল বেদমন্ত্রের প্রয়োগ হয়, তৎসমস্তই শিবাজী স্বকর্ণে শুনিতে চাহিয়াছিলেন;—তাঁহার এ বাসনা সঙ্গতই হইয়াছিল; কেন না সকলে যখন তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন তিনি পবিত্র দ্বিজাতি স্বরূপে বেদ-মন্ত্রোচ্চারণে ব্রাহ্মণের ন্যায় তুল্যাধিকারী ছিলেন। ইহাতে কিন্তু সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীমধ্যে বিদ্রোহের সূচনা হইল—তাঁহারা বলিলেন, বর্ত্তমানযুগে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নাই * এবং এক্ষণে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণই দ্বিজাতিমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন, এই সার্ব্বজনীন প্রতিবাদে গঙ্গাভট্টও পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িলেন; এবং যতদূর বুঝা যায়, বেদমন্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজাকে দ্বিজাতি হইতে অপকৃষ্ট বর্ণের দীক্ষা প্রদান করিলেন—এ বিষয়ে ব্রাহ্মণের সহিত তুল্যাধিকার দিতে পারিলেন না। (*T. S.* 391 Dutch Records)। এই প্রায়শ্চিত্ত এবং ইহার উপসংহারে উপনয়ন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণকে বহু অর্থ দান করা হইয়াছিল, একা গঙ্গাভট্ট ৭,০০০ হুণ পাইয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট সকলে পাইয়াছিলেন ১৭,০০০। এক হুণের দাম ৪৲ হইতে ৫৲।

পরদিন শিবাজী তাঁহার জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তিনি তুলাদণ্ডে উত্তোলিত

* শিবাজীর বংশধর কোলাহ্‌পুরের মহারাজাকেও বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণগণ ঠিক এইরূপ কষ্ট দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণ শিবাজীর অভিষেককালে কয়েকটা বেদমন্ত্র অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিয়া, উভয়দিক রক্ষা করিয়াছিলেন—শিবাজী তাহার একবর্ণও শুনিতে পান নাই। *T. S.* (391) বর্ণিত নিম্নলিখিত অর্থপূর্ণ বৃত্তান্ত পাঠে বোঝা যায় যে একসময়ে শিবাজী অতিরিক্ত গোঁড়া ব্রাহ্মণদিগকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে সৈন্যদলের নেতৃত্ব ও প্রদেশ বিশেষের রাজপ্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি লাভজনক পার্থিব কর্ম্মভার হইতে বিদায় দিয়া, তাহাদিগকে পূজা ও উপবাসাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধ্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বেদমন্ত্র শিখাইতে অস্বীকার করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া মহারাজা বলিলেন, "ব্রাহ্মণ পূজনীয় ব্যক্তি। তাঁহাকে রাজভৃত্য স্বরূপ নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য নহে। ভগবদারাধনা ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোনও কাজ করা কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত তিনি সকল ব্রাহ্মণকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাঁহাদের স্থানে প্রভু কায়স্থগণকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। মোরোপন্থ ব্রাহ্মণগণের পথাবলম্বন করিয়াছিলেন।"

হইয়া নিজ-পরিমিত সপ্তধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দস্তা, টিন, সীসা এবং লৌহ—এবং দিব্যবস্ত্র, কর্পূর, লবণ, জায়ফলাদি মসলা, চিনি, ফল ও তাম্বুল, দেশী মদসহ সর্ব্বপ্রকার ভোজ্য দ্রব্য ও একলক্ষ হূণ মুদ্রা অভিষেকান্তে সমবেত ব্রাহ্মণ-মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এত দানেও ব্রাহ্মণদিগের লোভ নিবৃত্তি হয় নাই। দুইজন পণ্ডিত বলিলেন, "দক্ষযাত্রাকালে শিবাজী নগর দাহ করিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্ম-হত্যা, গো-হত্যা, নারী-হত্যা ও শিশু-হত্যা হইয়াছে।" অর্থ দ্বারা তিনি এই সকল পাপ স্খালন করিতে পারেন। তাঁহার সুরাট এবং করিঞ্জা ধ্বংসকালে যে সব লোক মারা যায়, তাহাদের জীবিত আত্মীয়গণকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ দান করিবার প্রয়োজন নাই, তাহার পরিবর্ত্তে কঙ্কণ ও দেশনিবাসী ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেই হইবে!!! এই প্রায়শ্চিত্তের মূল্য ৮,০০০৲ টাকা নিরূপিত হইয়াছিল এবং শিবাজী এই সামান্য অর্থ দান করিতে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। (Dutch Records, Vol. 34, No. 841.)

শিবাজীর অভিষেক-দৃশ্য

কাঞ্চন মাহাত্ম্যে সকল দোষ অপসারিত হইলে, শিবাজীর প্রকৃত অভিষেক আরম্ভ হইল। ৫ই জুন অভিষেকের পূর্ব্বদিন। "নাইট" উপাধিক পাশ্চাত্য বীরগণ পুরাকালে তাঁহাদের অভিষেকের পূর্ব্বরাত্রে জাগরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া যেমন সংযমী হইতেন, শিবাজীকেও তেমনই সংযম ও শুদ্ধাচার অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। পুণ্যসলিলা জাহ্নবী হইতে আনীত জলে স্নান করিয়া, শিবাজী গঙ্গাভট্টকে পঞ্চ সহস্র হূণ এবং অন্যান্য মহাব্রাহ্মণের প্রত্যেককে একশত স্বর্ণ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সারাদিন তিনি অনাহারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

পরদিন (৬ই জুন, ১৬৭৪ খ্রীঃ) প্রকৃত অভিষেকের অনুষ্ঠান। অমঙ্গলাপহারক বিবিধাচরণ-সহকারে অতি প্রত্যূষে স্নান-সমাপনান্তে শিবাজী তাঁহার গৃহ-দেবতার পূজা করিলেন এবং কুলপুরোহিত গঙ্গাভট্ট এবং অন্যান্য বিখ্যাত ব্রাহ্মণগণকে বন্দনা করিয়া, তাঁহাদিগকে অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি দান করিলেন।

হিন্দুরাজার রাজ্যাধিষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ অভিষেক স্নান এবং শিরোপরি রাজচ্ছত্র ধারণ। অমলধবল পরিচ্ছদ-পরিহিত, কুসুমমালা শোভিত, গন্ধানুলেপন সুরভিত, স্বর্ণালঙ্কার-সজ্জিত শিবাজী পদব্রজে অভিষেক স্থানে আগমন করিলেন। এই স্থানে তিনি একটি দুই ফীট উচ্চ এবং ৩ ফীট পরিমিত সমচতুষ্কোণ স্বর্ণমণ্ডিত আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী সয়রা বাঈ হিন্দুর পবিত্র বিধানানুসারে তাঁহার ইহপরলোকের সমভাগিনী সহধর্ম্মিণী স্বরূপে গাটছড়া বাঁধিয়া তাঁহার বামভাগে বসিয়াছিলেন। যুবরাজ শম্ভুজী তাঁহার আসনের অব্যবহিত পশ্চাতে বসিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার মন্ত্রীসভার আটজন পরিষদ (অষ্ট প্রধান) আটদিকে দণ্ডায়মান হইয়া, গঙ্গাদি পূত সলিলপূর্ণ হেমঘট-নিঃসৃত জলধারায় রাজা, রাজমহিষী ও যুবরাজকে স্নান করাইলেন। তৎকালে মধুর স্তুতিপাঠে ও মঙ্গল বাদ্যের নির্ঘোষে সেই স্থান আনন্দে মুখরিত হইল এবং ষোড়শ সংখ্যক সধবা ব্রাহ্মণী পঞ্চ প্রদীপ হস্তে লইয়া অমঙ্গল মোচনার্থ তাঁহার আরতি করিলেন।

তারপর শিবাজী স্বর্ণখচিত কারুকার্য্যময় রক্তবর্ণ রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া উজ্জ্বল মণিমাণিক্য ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইলেন; তাঁহার কণ্ঠে মণিময় হার ও কুসুমমালা এবং মস্তকে মুক্তামালা-বিজড়িত মুক্তাঝালর বিলম্বিত উষ্ণীষ শোভিত হইল। তিনি খড়্গ, চর্ম্ম, তীর ও ধনুর পূজা করিয়া পুনরায় পূজনীয় ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিলেন, তারপর গ্রহাচার্য্যগণ কর্তৃক নিরূপিত শুভক্ষণে সিংহাসন সন্নিধানে উপনীত হইলেন।

হিন্দুপ্রথানুসারে অভিষেক-সভাগৃহ ৩২টী নিদর্শনচিহ্নে ও বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যে সজ্জিত হইয়াছিল। উপরে চন্দ্রাতপ বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহাতে মুক্তার ঝালর সকল বিলম্বিত হইয়াছিল। কক্ষতল মখমলে আবৃত এবং তাহার মধ্যস্থলে বহুমূল্য রাজসিংহাসন সংরক্ষিত হইয়াছিল। বহুমাসব্যাপী পরিশ্রমে রাজোচিত উপকরণে এই সিংহাসন নির্ম্মিত হয়। সভাসদ্ বলেন, এই সিংহাসন নির্ম্মাণ করিতে ৩২ মণ স্বর্ণ লাগিয়াছিল (মূল্য ১৪ লক্ষ টাকা)। এ কথা অত্যুক্তি বলিলেও ইংরাজ-পরিদর্শকের মতে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা বহুমূল্য ও খুব জমকাল রকমের ছিল। ইহার তলভাগ ও আটকোণের আটটী স্তম্ভ সোণার

পাতে মণ্ডিত ছিল এবং স্তম্ভগুলিতে বহুমূল্য হীরক ও রত্নাবলী খচিত ছিল। স্তম্ভোপরি অতি মূল্যবান্ জরির শিল্পকার্য্য সমন্বিত একটী চন্দ্রাতপ লম্বিত ছিল এবং তাহাতে জ্যোতির্ম্ময় মণিমধ্য মুক্তাহার ঝালর ও মাল্যাকারে বিচিত্র ভাবে ঝুলিতেছিল। রাজার উপবেশনস্থানের আস্তরণ প্রাচীন হিন্দুরাজগণের বৈরাগ্য ও মোগল-বিলাসিতার এক বিচিত্র সমন্বয়স্বরূপ হইয়াছিল—নিম্নে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম ও তদুপরি মখ্‌মল!

সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে সোণার গিলটী-করা বর্ষা-ফলকে রাজগৌরব ও রাজ্যশাসনের বিবিধ চিহ্ন লম্বিত হইয়াছিল; দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট দুইটী স্বর্ণময় বৃহৎ মৎস্যমুণ্ড, বামভাগে কতিপয় অশ্বপুচ্ছ (তুরুক জাতির রাজচিহ্ন) এবং বহুমূল্য বর্ষাফলকে সমভাবে লম্বিত একটী তুলাদণ্ড (ন্যায়বিচারের চিহ্ন)—এ সবই মোগল দরবারের অনুকরণ। রাজভবনের তোরণদ্বারের উভয় পার্শ্বে পল্লবসমাচ্ছাদিত পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল এবং দুইটী করভ ও দুইটী সুদৃশ্য তুরগ কনকময় রশ্মি ও মূল্যবান্ আস্তরণে শোভিত হইয়া তথায় রক্ষিত হইয়াছিল, হিন্দুদিগের মতে এইগুলি মঙ্গলচিহ্ন।

শিবাজী যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখন রত্নময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণপদ্ম এবং স্বর্ণ ও রজতময় অন্যান্য বিবিধ পুষ্প সমবেত জনতামধ্যে বর্ষিত হইয়াছিল। ষোলজন সধবা ব্রাহ্মণী দীপ লইয়া পুনরায় তাঁহার মঙ্গলারতি করিলেন; ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নবাভিষিক্ত নৃপতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং রাজাও প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। সমবেত জনমণ্ডলী শ্রবণভেদী শব্দে "শিবরাজের জয় হউক, জয় হউক" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সকল বাদ্যযন্ত্র যুগপৎ ধ্বনিত হইল এবং বৈতালিকগণ গান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব নিয়োগানুসারে তাঁহার রাজ্যের সকল দুর্গ হইতে এই সময়ে সম্মানসূচক তোপ-ধ্বনি করা হইল। প্রধানাচার্য্য গঙ্গাভট্ট অগ্রসর হইয়া তাঁহার মস্তকে মুক্তাঝালর-বিলম্বিত স্বর্ণময় রাজছত্র ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে "শিব ছত্রপতি" অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ নৃপতি বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

অপর ব্রাহ্মণগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে বিপুল অর্থ ও সর্ব্বপ্রকার দান বিতরণ করিলেন; সমবেত জনসাধারণ ও ভিখারীগণও তাহাতে বঞ্চিত হয় নাই। তিনি হিন্দুশাস্ত্র মতে ষোড়শবিধ মহাদান নিষ্পন্ন করিলে, অমাত্যগণ সিংহাসন-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে নিজ নিজ সম্মানোচিত পরিচ্ছদ, নিয়োগপত্র, বিপুল অর্থ, বহু সংখ্যক হস্তী, অশ্ব, রত্ন, বস্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রাদি লাভ করিলেন। ভবিষ্যতে তাঁহাদের পদের নাম পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত ভাষায় দিবার আদেশ প্রচার করা হইয়াছিল।

যুবরাজ শম্ভুজী, প্রধান পুরোহিত গঙ্গাভট্ট ও প্রধান মন্ত্রী মোরো ত্রিম্বক পিঙ্গলে সিংহাসনের কিঞ্চিৎ নিম্নে আসনের উপর বসিয়াছিলেন এবং অপরাপর অমাত্যগণ সিংহাসনের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অবশিষ্ট সভাসদ্ ও দর্শকমণ্ডলী নিজ নিজ মর্য্যাদানুরূপ স্থানে সম্ভ্রমের সহিত দাঁড়াইয়াছিলেন।

এই সকল ক্রিয়া সমাপ্ত হইতে বেলা আটটা বাজিয়া গেল। তাহার পর নারোজী পন্থ ইংরাজ দূত হেনরী অক্সিনডেন্‌কে রাজসমীপে আনীত করিলেন। তিনি দূর হইতে রাজাকে অভিবাদন করিলেন এবং দ্বিভাষী সহচর নারায়ণ শেনবি ইংরাজ-প্রদত্ত নজরস্বরূপ একটী হীরকাঙ্গুরীয় রাজার সমক্ষে ধরিলেন। শিবাজী বিদেশীয়দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসন সমীপে আসিতে আদেশ করিলেন এবং সম্মান-সূচক পরিচ্ছদাদি উপহার দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

রায়গড়ে শোভাযাত্রা

দরবার সেলামী শেষ হইলে রাজা সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া বিচিত্রাভরণ-ভূষিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট তুরগে আরোহণ করিয়া রাজ-ভবনের প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। সেখানে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য হস্তীতে আরোহণ করিয়া সময়োচিত মনোরম সজ্জায় রাজধানীর পথে-পথে সৈন্য-সামন্তাদি পরিবৃত হইয়া শোভাযাত্রা করিলেন। অমাত্যগণ তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া চলিলেন। সম্মুখে দুইটী হস্তিপৃষ্ঠে "জরি পতাকা" ও "ভাগবে ঝাণ্ডা" নামক তাঁহার দুই রাজপতাকা উড্ডীন হইল এবং সেনাপতি ও সৈন্যগণ তাঁহাদের নিজ নিজ পতাকা, কামান ও বাদ্যযন্ত্র লইয়া

পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। নাগরিকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ আবাস ও রাজপথ যথাযোগ্যরূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন। পুরনারীগণ প্রজ্বলিত দীপান্দোলন দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং তাঁহার শিরোপরি লাজ, পুষ্প ও দূর্ব্বাদি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রায়গড় পর্ব্বতের সকল মন্দির দর্শন করিয়া এবং সর্ব্বত্র পূজা ও দান বিতরণ করিয়া তিনি রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

৭ই জুন তারিখে সমাগত দূত ও ব্রাহ্মণগণকে দান ও ভিক্ষুকগণকে ভিক্ষা বিতরণ আরম্ভ করা হইয়াছিল। দ্বাদশ দিন ধরিয়া এই বিতরণ-কার্য্য চলিতে থাকে এবং রাজার ব্যয়ে এই সময়ে ইহাদের আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণ এই দলে ছিলেন না; পুরুষগণ ৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং নারী ও শিশুগণ প্রত্যেকে ১৲ টাকা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়াছিল।

জীজাবাইয়ের মৃত্যু

সম্ভবতঃ অভিষেকের পরদিবসেই বর্ষার সূচনা হয়; তারপর মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া কিছু দিন যাবৎ বাদলা থাকে; ইহাতে সমবেত জনসঙ্ঘের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। ৮ই তারিখে শিবাজী চতুর্থবার পাণিগ্রহণ করেন,—এ বিবাহে কোনও ধূমধাম বা উৎসবাদি হয় নাই। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার তৃতীয়া পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন * (Letter of Oxinden)।

অভিষেক-ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইলে ১৮ই জুন তারিখে জীজা বাঈ পরলোকগমন করেন। পরিণত বয়সে, সর্ব্বসুখের অধীশ্বরী হইয়া তাঁহার পুত্রকে তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি ২৫ লক্ষ হূণের (কেহ কেহ বলেন আরও বেশী) উত্তরাধিকারী স্বরূপ রাখিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। অশৌচকাল অন্ত হইলে শিবাজী তাহা জ্ঞাপনার্থ পুনর্ব্বার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। (Dutch Records).

অভিষেকে ব্যয়

সভাসদ্ বলেন, অভিষেক উপলক্ষে দান ও উপহারাদি সমেত মোট এক কোটি ৪২ লক্ষ হূণ ব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু এই বিবরণ সহজে বিশ্বাস হয় না। ওলন্দাজ বণিক Abraham Le Feber অভিষেকের ৪ মাস পরে ভিন্‌গুর্লা বন্দর হইতে লিখিয়াছেন, সাধারণের মতে "অভিষেক ও দানাদি ব্যাপারে ১,৫০,০০০ প্যাগোডা ব্যয় হইয়াছিল।" এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে, অমাত্য ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী এবং ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে যে বিশেষ উপহার দান করা হইয়াছিল তাহার হিসাব উক্ত দেড় লক্ষ প্যাগোডার মধ্যে নহে; কেবল মাত্র ৭ই হইতে ১৮ই জুন পর্য্যন্ত দ্বাদশ দিনব্যাপী যে সাধারণ দান বিতরণ করা হইয়াছিল, তাহাই ইহাতে ধৃত হইয়াছে। কিন্তু সকল ব্যয়ের হিসাব ধরিলেও, এই উপলক্ষে নির্ম্মিত সিংহাসন ও অলঙ্কারাদির মূল্য সমেত অভ্যাগতগণের পানভোজনাদির ব্যয় মোট ১০ লক্ষ হূণ বা ৫০ লক্ষ টাকার অধিক হইতে পারে না।

* তাঁহার উপনয়নের দুইদিন পরেই তিনি তাঁহার তৃতীয়া পত্নী গ্রহণ করেন। *Z. C.* বলেন, এই বিবাহ বৈদিকমতে সম্পন্ন হইয়াছিল। শিবাজীর পরিণত বয়সের এই সকল বিবাহের উদ্দেশ্য বোধ হয়, বেদমন্ত্র শুনিবার ছলে নিজ ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকাশ্য দাবী করা মাত্র বলিলে অসঙ্গত হয় না।

রামেন্দ্রসুন্দর

[অধ্যাপক শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত এম্-এ]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যুতে শুধু যে আমাদের দেশের একটা বিষম ক্ষতি হইল তাহা নহে; সমগ্র মানব-সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আমি বড় জোর করিয়া বলিয়াছিলাম—'আপনি চিন্তিত হবেন না; আপনার এখন মৃত্যু হ'লে চল্‌বে না। "ভারতবর্ষে" প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ সাজিয়ে আপনি যে জিনিস গড়ে তুলচেন, তা' এই সমস্ত ভারতবর্ষে আর কেউ শেষ করতে পারবে না; সে জিনিস অসমাপ্ত রেখে আপনার সরে পড়া চল্‌বে না।' আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, তাঁহার স্বভাবতঃ উজ্জ্বল চক্ষুর দীপ্তি যেন মৃত্যুঞ্জয়-ললাট বহ্নির মত আসন্ন-মৃত্যু কালিমাকে অপসারিত করিয়া, প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অধরের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা যেন দেখা দিল। তাঁহার হাস্য সুন্দর, তাঁহার বাক্য সুন্দর,—হায় রামেন্দ্রসুন্দর!

'বিচিত্র প্রসঙ্গে'র কথা তাঁর মনে পড়িতেছিল। ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা, বল দেখি, এই ব্যায়রামের মধ্যে যখন সমস্ত দেহ-যন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত ও অবসন্ন, তখন মাথাটা এত পরিষ্কার হয় কেন?' উৎকট রোগের মধ্যে কেমন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে বিচিত্র-প্রসঙ্গ-কথা শুনিয়া লইয়াছিলাম, তাহা অনেকেই জানেন। তাঁহার বাক্য সুন্দর। সর্ব্বজনপ্রিয় তিনি,—মাধুর্য্য ধারায় তাঁহার বন্ধুগণের চিত্ত লোক অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম—"'ভারতবর্ষের' seriesএর মধ্যে আপনি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, সেটা ত একটা jumping-off ground; একটি লাফে আপনি বেদান্ত তত্ত্বের মাঝখানে গিয়ে পড়বেন। এমন কোরে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত পন্থাগুলি অবলম্বন কোরে সটান বেদান্তের সিংহ-দ্বারে এসে পৌছান,—এটা যে সম্ভবপর হোতে পারে, বোধ হয় কেউ কখনও ভাবতে পারে নি। এতদিনে এ কাজ শেষ হয়ে যেত; কিন্তু আপনি বৈদিক যজ্ঞ নিয়ে পড়লেন,—হুড়মুড় কোরে অতগুলো প্রবন্ধ রচনা করলেন। মজা এই যে, ও-প্রবন্ধগুলিও আপনি ছাড়া আর কেউ লিখ্‌তে পারতেন না। বিচিত্র-প্রসঙ্গের সময় আপনার চিন্তা-তরঙ্গ যে দিকে বেগে যেতে আরম্ভ করলে, ঐ বৈদিক প্রবন্ধগুলি ঠিক যে তা'র পরিণতি, তা' নয়,—ওর পরে আরো আপনার বল্‌বার অনেক ছিল;—যজ্ঞের ভিতরকার কথা বলা বাকী রয়েছে,—সে কথাও আপনাকে বল্‌তে হবে। কিন্তু ঐ jumping off ground-এর কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না।' রামেন্দ্রবাবু বলিলেন—'দেখুন, কতদূর কি হয়। সেবার ত সেরে উঠ্‌লুম; এবার কি হয়, দেখুন। ঠিক বলেছেন; বেদান্তে নামি-নামি কোরে এখনও নেমে পড়ি নি;—সব গুছিয়ে এনেছি।' সব গুছিয়ে এনেছেন! রামেন্দ্রসুন্দরের মুখ ফোটে-ফোটে ফোটে না। আজ সে মুখ চিরদিনের জন্য মৌন হইয়া গেল!

তিনি কি কি কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার হিসাব করিতে বসিলে, আক্ষেপের সীমা থাকে না। আমাদের দেশে তাঁহার মত স্বাধীন চিন্তাশীল অত্যন্ত বিরল। স্বদেশের অতীত ইতিহাসের কথা তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতেন। 'ভারতবর্ষের' পুরাতন ফাইল যাঁহারা নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, কেমন করিয়া তিনি সভ্য মানব-সমাজের অতীত ইতিহাসের গুপ্ত মর্ম্মকথাটুকু বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। জীবতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মিসর, হিব্রু, গ্রীক, রোমকের ইতিহাসের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িতে হইবে, এই বাসনা তাঁহার ছিল। কিন্তু মধ্যপথে হঠাৎ তিনি থামিয়া পড়িলেন। এই দ্বিতীয় স্তবক 'বিচিত্র-প্রসঙ্গে'র রচনার ভাষা আমার বটে, কিন্তু সমস্ত মালমসলা তিনি নিজে সংগ্রহ করিয়া, ধারাবাহিক ভাবে নিজের বক্তব্য ধীরে-ধীরে বলিয়া যাইতেন; আমি তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া, অবহিত চিত্তে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া, নোট করিয়া লইতাম।

বাল্যকাল হইতে তিনি ইতিহাস পড়িতে বড়

ভালবাসিতেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তিনি গ্রীণ, হিউম্, গিবণ্-রচিত বড়-বড় ইতিহাস পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। আবার কান্দি স্কুলে অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল বলিয়া, গণদর্পণ-রচয়িতা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি ও আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। এই রাম-জানকীর অপূর্ব্ব সম্মিলনে রিপণ কলেজ কিছুদিন পরে ধন্য হইয়া গেল। সাতাশ বৎসর পরে জানকীর হাতে কলেজের সমস্ত ভাল-মন্দর ভার অর্পণ করিয়া রাম চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক-সঙ্ঘ আর কি পূর্ব্বের মত সাহিত্য-চর্চ্চায় আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন?

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীমাত্রেই জানেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যখনই তাঁহাকে চিঠি লিখিতেন; তখনই তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদের একমাত্র "সারথী" বলিয়া অভিহিত করিতেন। রবীন্দ্রনাথও এই সারথ্যের কথা বেশ জোরের সহিত তাঁহার অভিনন্দন-পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্র বাবু সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া রামেন্দ্র বাবুকে শয্যাপার্শ্বে ডাকাইয়া আনিয়া বলিয়াছিলেন—'রামেন্দ্র বাবু, এবার আমি বোধ হয় বাচ্‌ব না; সাংখ্য-বেদান্তের কাছে জর্ম্মাণ দর্শনের ঋণের কথাটা ত এখনও আমার শেষ করা হোলো না; আমি না থাক্‌লে কে আর ও সব কথা লিখ্‌বে?' আমাদের দেশের সৌভাগ্য যে, অশীতিপর বৃদ্ধ আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ রোগ-মুক্ত হইয়া তাঁহার মানস-প্রসূত রত্নরাজিতে বঙ্গ-সাহিত্য অলঙ্কৃত করিতেছেন। আর গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, পঞ্চান্ন বৎসর অতিক্রম করিতে-না-করিতে ত্রিবেদী মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

এক দিন তাঁহার মনে অনেক বিষয়ে সংশয় ছিল। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য, Legality ও Morality ইত্যাদির গোলক-ধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া অবশেষে তিনি উপনিষদের স্তরে উঠিয়া খানিকটা হাল্কা বোধ করিলেন। কলেজের অবসরকালে কথাপ্রসঙ্গে একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'ছান্দোগ্য-উপনিষদে যে ঘোর আঙ্গিরস ঋষির কথা আছে, পুরাণে কিম্বা অন্য কোথাও ঐ ঋষির নাম পাওয়া যায় কি? তিনি যে দেবকীনন্দন বাসুদেবকে অমৃতের আস্বাদ দিয়াছিলেন, সেই দেবকীনন্দন বাসুদেবের সঙ্গে গীতার বাসুদেবের কোনও সম্বন্ধ আছে কি?' ত্রিবেদী মহাশয় উত্তর দিলেন—'অন্য কোথাও ত ঘোর আঙ্গিরস ঋষির নামের উল্লেখ পাই নাই; তবে আমি কিন্তু ঐ দেবকীনন্দন বাসুদেবের সঙ্গে গীতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাব। মনে রাখ্‌বেন—উপনিষদঃ গাবঃ দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ। একদিন আমি ঐটে অবলম্বন কোরে Legality ও Morality'র মূল সূত্রে পৌঁছবার চেষ্টা করব। বেশ বড় কোরে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখ্‌তে হবে।" দু-এক স্থলে অল্পবিস্তর প্রাসঙ্গিক আলোচনা ব্যতীত ভাল করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই লেখা হইল না।

এমন অনেক জিনিসই তাঁহার লিখিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু লেখা হইল না। বাঙ্গালা সাহিত্যকে পুষ্ট করিবার জন্য আগ্রহ তাঁহার খুব বেশী ছিল। রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺নিখিলনাথ মৈত্রেয় যখন রামেন্দ্র বাবুর একটি প্রবন্ধ জর্ম্মণ ভাষায় অনুবাদ করিয়া, পাণ্ডুলিপিখানি দেখিয়া দিবার জন্য ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দেন, তখন জর্ম্মণভাষানভিজ্ঞ রামেন্দ্র বাবুর সকৌতুক টীপ্পনি দেখিয়া আমাদের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়াছিল। জর্ম্মণির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পত্রিকায় অনুবাদটি প্রকাশিত হইলে পর, উক্ত পত্রিকার পরিচালকবর্গ অনুবাদকের নিকটে পঁচিশ কপি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, ত্রিবেদী মহাশয়কে আগাগোড়া জর্ম্মণ ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া ফেলেন। তাহাও হইল না। তাঁহার বিষয়ে লিখিতে বসিয়া কেবলই মনে পড়ে, কত কি হওয়া সম্ভবপর ছিল, কিন্তু হইল না।

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই জনহীন পুরীর মধ্যে কেবল মাত্র সুরেশকে লইয়া জীবন-যাপন করিতে হইবে, এবং সেই দুর্দ্দিন প্রতি-মুহূর্ত্তে আসন্ন হইয়া আসিতেছে। বাধা নাই, ব্যবধান নাই, লজ্জা নাই,—আজ নয় কাল বলিয়া একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করিবার পর্য্যন্ত সুযোগ মিলিবে না!

বীণাপাণি বলিয়াছিল, সুরমা দিদি, শ্বশুর-ঘর আপনার ঘর, সেখানে হেঁট হয়ে যেতে মেয়ে মানুষের কোন লজ্জা, কোন সরম নেই।

হায় রে, হায়! তাহার কি আছে, আর কি নাই, সে জমা-খরচের হিসাব তাহার অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কে রাখিয়াছে! তথাপি, আজিও তাহার আপনার স্বামী আছে, এবং আপনার বলিতে সেই তাহাদের পোড়া-ভিটাটা এখনও পৃথিবীর অঙ্ক হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। আজিও সে একটা নিমিষের তরেও তাহার মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে পারে!

আবদ্ধ পশুর চোখের উপর হইতে যতক্ষণ না এই বাহিরের ফাঁকাটা একেবারে আবৃত হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেমন সে একই স্থানে বারম্বার মাথা কুটিয়া মরিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়াই তাহার অবাধ্য মনের প্রচণ্ড কামনা তাহার বক্ষের মধ্যে হাহাকার করিয়া বাহিরের জন্য পথ খুঁজিয়া মরিতে লাগিল। পার্শ্বের ঘরে সুরেশ নিরুদ্বেগে নিদ্রিত, মধ্যের দরজাটা ঈষৎ উন্মুক্ত, এবং তাহারই এ ধারে মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া আপাদ-মস্তক কম্বলে ঢাকিয়া হিন্দুস্থানী দাসী অকাতরে ঘুমাইতেছে,—সমস্ত বাটীর মধ্যে কেহ যে জাগিয়া আছে তাহার আভাস মাত্র নাই,—শুধু সে-ই যেন অগ্নি-শয্যার উপরে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। অনেক দিন এই পালঙ্কের উপরেই তাহার পার্শ্বে বীণাপাণি শয়ন করিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার স্বামী উপস্থিত, সে তাহার নিজের ঘরে শুইতে গেছে,—এবং পাছে এই চিন্তার সূত্র ধরিয়া নিজের বিক্ষিপ্ত পীড়িত চিত্ত অকস্মাৎ তাহাদেরই অবরুদ্ধ কক্ষের সুষুপ্ত পর্য্যঙ্কের প্রতি দৃষ্টি হানিয়া হিংসায়, অপমানে, লজ্জায় অণু-পরমাণুতে বিদীর্ণ হইয়া মরে, এই ভয়ে সে যেন আপনাকে আপনি প্রচণ্ড শক্তিতে টানিয়া ফিরাইল, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত দেহটা তাহার তীব্র তড়িৎ-স্পৃষ্টের ন্যায় থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

পার্শ্বের কোন্ একটা ঘরের ঘড়িতে দুইটা বাজিল। গায়ের গরম কাপড়খানা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিতেই অনুভব করিল এই শীতের রাত্রেও তাহার কপালে, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়াছে। তখন শয্যা ছাড়িয়া মাথার-দিকের জানালাটা খুলিয়া দিতেই দেখিতে পাইল, কৃষ্ণপক্ষের নবমীর খণ্ড চন্দ্র ঠিক সম্মুখেই দেখা দিয়াছে, এবং তাহারই স্নিগ্ধ মৃদু কিরণে শোনের নীল জল বহুদূর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। গভীর রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস তাহার তপ্ত ললাটের উপর স্নেহের হাত বুলাইয়া দিল, এবং সেইখানে সেই জানালার উপরে সে তাহার রুদ্ধ-জীবনের শেষ পরিণামের সমস্যা লইয়া বসিয়া পড়িল।

এই কথাটা অচলা নিশ্চয় বুঝিয়াছিল যে, তাহার এই অভিশপ্ত, হতভাগ্য জীবনের যাহা কিছু সত্য, সমস্তটাই লোকের কাছে শুধু কেবল একটা অদ্ভুত উপন্যাসের মত শুনাইবে, এবং যেদিন হইতে এই কাহিনীর প্রথম সূচনা হইয়াছিল, সেই দিন হইতে যত মিথ্যা এ জীবনে সত্যের মুখোস পরিয়া দেখা দিয়া গিয়াছে, তাহাদের একটি একটি করিয়া মনে করিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এবং যে ভাগ্য-বিধাতা তাহার যৌবনের প্রথম আনন্দটিকে মিথ্যা দিয়া এমন বিকৃত, এমন উপহাসের বস্তু করিয়া জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতে লেশমাত্র মমতা বোধ করিলেন না, সেই নির্ম্মম নিষ্ঠুরকেই সে যদি শিশুকাল হইতে ভগবান বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা পাইয়া থাকে, ত সে শিক্ষা তাহার একেবারে ব্যর্থ,

একেবারে নিরর্থক হইয়াছে। সে চোখ মুছিতে-মুছিতে বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, হে ঈশ্বর! তোমার এই এতবড় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এই দুর্ভাগিনীর জীবনটা ভিন্ন কৌতুক করিয়া আমোদ করিবার আর কি ছাই কিছুই ছিল না!

মনে-মনে কহিল, কোথায় ছিলাম আমি, এবং কোথায় ছিল সুরেশ। ব্রাহ্ম-পরিবারের ছায়া মাড়াইতেও যাহার ঘৃণা ও বিদ্বেষের অবধি ছিল না, ভাগ্যের পরিহাসে আজ সেই লোকেরই কি আসক্তির আর আদি-অন্ত রহিল না! যাহাকে সে কোনদিন ভালবাসে নাই, সেই তাহার প্রাণাধিক, শুধু এই মিথ্যাটাই কি সবাই জানিয়া রাখিল। আর যাহা সত্য, সে কি কোথাও কাহারো কাছেই আশ্রয় পাইল না! আবার সেই মিথ্যাটা কি তাহার নিজের মুখ দিয়াই প্রচার হওয়ার এত প্রয়োজন ছিল! অদৃষ্টের এত বড় বিড়ম্বনা কাহার ভাগ্যে কবে ঘটিয়াছে! স্বামীকে সে অনেক দুঃখেই পাইয়াছিল, কিন্তু সে সহিল না,—তাহার চরম দুর্দ্দশার বোঝা বহিয়া অকস্মাৎ একদিন সুরেশ গিয়া অভিসম্পাতের মত তাহাদের দেশের বাটীতে উপস্থিত হইল। তাহার সুখের নীড় দগ্ধ হইয়া গেল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ভাগ্যটাও যে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেছে, এ কথা বুঝিতে আর যখন বাকি রহিল না, তখন আবার কেন তাহার পীড়িত স্বামীকে তাহারই ক্রোড়ের উপরে আনিয়া দেওয়া হইল! যাহাকে সে একেবারে হারাইতে বসিয়াছিল, সেবার ভিতর দিয়া আবার তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া দেওয়াই যদি বিধাতার সঙ্কল্প ছিল, তবে আজ কেন তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা অপমানের আর কুল-কিনারা নাই?

অচলা সহসা দুইহাত জোড় করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, জগদীশ্বর! রোগমুক্ত স্বামীর স্নেহাশীর্ব্বাদে সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়াই যদি একদিন আমাকে বিশ্বাস করিতে দিয়াছিলে, তবে, এতবড় দুর্গতির মধ্যে আবার ঠেলিয়া দিলে কিসের জন্য? সে যে সঙ্কোচ মানে নাই, এত কাণ্ডের পরেও সুরেশকে সঙ্গে আনিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, জগতে এ অপরাধের আর ক্ষালন হইবে না, কলঙ্কের এ দাগ আর মুছিবে না,—কিন্তু, অন্তর্যামী, আমার অদৃষ্টে তুমিও কি ভুল বুঝিলে। এই বুকের ভিতরটায় চিরদিন কি রহিয়াছে, সে কি তোমার চোখেও ধরা পড়িল না!

পিতার চিন্তা, স্বামীর চিন্তা সে যেন প্রাণপণ বলে দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া রাখিয়া দিত, আজিও সে সকল ভাবনাকে সে কাছে ঘেঁসিতে দিল না, কিন্তু তাহার মৃণালের কথাগুলা মনে পড়িল। পীড়িত মহিমকে হাতে-হাতে সঁপিয়া দিয়া সে যখন তাহার বৃদ্ধা খাশুড়ীর সেবায় বাড়ী ফিরিয়া যায়, সেই তাহার তখনকার কথা। পিসিমাকে মনে পড়িল। আসিবার কালে স্নেহার্দ্র করুণ-কণ্ঠে সতী-সাধ্বী বলিয়া তিনি যত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, সেই সব। তাহার সম্বন্ধে আজ তাঁহাদের মনোভাব কল্পনা করিতে গিয়া অকস্মাৎ মর্ম্মান্তিক আঘাতে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত বোধ-শক্তি তাহার যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এবং দেহ-মনের সেই অশক্ত অভিভূত অবস্থায় জানালার গরাদের উপর মাথা রাখিয়া বোধ হয় অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, এমন সময়ে পিছনে মৃদু পদশব্দে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, খালি-গায়ে, খালি-পায়ে সুরেশ দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় হয় ত সে কিছু বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ-রোধ করিয়া দিল। ইহাকে দমন করিয়া কথা কহিতে বোধ হয় আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না, তাই, পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া সে তেমনি করিয়াই গরাদের উপর মাথা রাখিল; কিন্তু যে অশ্রু এতক্ষণ তাহার চোখ দিয়া বিন্দুতে-বিন্দুতে পড়িতেছিল, সে যেন অকস্মাৎ কুল ভাঙ্গিয়া উন্মত্ত ধারায় ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কোথাও কোন শব্দ নাই, রাত্রির গভীর নীরবতা গৃহের ভিতরে-বাহিরে বিরাজ করিতে লাগিল। পিছনে দাঁড়াইয়া সুরেশ পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্তব্ধ,—সহসা তাহার সমস্ত দেহটা বাতাসে বাঁশ-পাতার মত কাঁপিতে লাগিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই সে দুই হাত বাড়াইয়া অচলার মাথাটা টানিয়া আনিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

অচলা আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিল, কিন্তু আজ অতিবড় বিস্ময় এই যে, যে-লোকটা তাহার এতবড় দুঃখের মূল, তাহার এই ব্যবহারে আজ অচলার উৎকট ঘৃণা বোধ হইল না, বরঞ্চ সহজ কণ্ঠে কহিল, তুমি এ ঘরে এসেচ কেন?

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। বোধ করি কণ্ঠস্বরের অভাবেই সে জবাব দিতে পারিল না।

অচলা ধীরে-ধীরে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, শীতে তোমার হাত কাঁপ্‌চে, যাও খালি গায়ে আর দাঁড়িয়ে থেকো না,—ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়গে।

সুরেশের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার গলা কাঁপিতে লাগিল,—অচলার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, তাহলে তুমিও আমার ঘরে এসো।

অচলা মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শুধু কহিল, না, আজ নয়। এই বলিয়া ধীরে ধীরে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইল।

এই শান্ত সংযত প্রত্যাখ্যানের মধ্যে ঠিক কি ছিল,তাহা নিশ্চয় বুঝিতে না পারিয়া সুরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অচলা তাহার প্রতি না চাহিয়াই পুনশ্চ কহিল, আমি জেগে আছি জান্‌তে পেরে কি তুমি এ ঘরে ঢুকেছিলে?

সুরেশ আহত হইয়া বলিল, এ ছাড়া তুমি কি আমার কাছে আর কিছু আশা কর?

আশা?—অচলা মুখ ফিরাইয়া একটুখানি হাসিল। এই তীক্ষ্ণ কঠিন হাসি দীপের অত্যন্ত ক্ষীণ আলোকে সুরেশের চক্ষু এড়াইল না। সে হাসি যেন স্পষ্ট কথা কহিয়া বলিল, ওরে কাপুরুষ! নিদ্রিত রমণীর কক্ষে যে চোরের মত প্রবেশ করিতে নাই, পুরুষের এ মহত্ত্ব কি তুমি আজও দাবী কর? কিন্তু মুখে কোন কথাই কহিল না। ক্ষণেক পরে গবাক্ষ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তোমার শরীর ভাল নেই, আর রাত জেগো না,—যাও শোওগে। বলিয়া সে ধীরে ধীরে নিজের বিছানায় আসিয়া গায়ের কম্বলটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া সুরেশ সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপরে নিঃশব্দ পদক্ষেপে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুই একজন দাস-দাসী ব্যতীত দিন পাঁচ ছয় হইল বাটীর সকলেই কলিকাতায় চলিয়া গেছেন। কেবল যাওয়া ঘটে নাই কর্ত্তার। কি একটা জরুরি কাজের অজুহাতে তিনি শেষ সময়ে পিছাইয়া গিয়াছিলেন। এ কয়দিন রামচরণবাবু নিজের কাজ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, বড় একটা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। হঠাৎ আজ প্রত্যূষেই তিনি সাড়া দিয়া উপরের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সুরমার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শীতের দিনের এমন প্রভাতে তখন পর্য্যন্ত কেহ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে নাই, আহ্বান শুনিয়া অচলা শশব্যস্তে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ক্ষণেক পরেই সুরেশও আর একটা দরজা খুলিয়া চোখ মুছিতে-মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। এই সদ্য নিদ্রোত্থিত দম্পতিকে বিভিন্ন কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া এই বৃদ্ধের প্রসন্ন দৃষ্টি যে সহসা বিস্ময়ে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল, তাহা সুরেশ দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু অচলার চক্ষে প্রচ্ছন্ন রহিল না।

রামবাবু সুরেশের দিকে চাহিয়া একটু অনুতাপের সহিত কহিলেন, তাই ত সুরেশ বাবু, হাঁক-ডাক করে অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম, বড় অন্যায় হয়ে গেল।

সুরেশ হাসিয়া বলিল, অন্যায় কিছুই নয়। তার কারণ আমি জেগেই ছিলুম; নইলে, বাইরে থেকে ডেকে কেন, ঢাক পিটেও আমার ঘরের শান্তি ভঙ্গ করতে পারতেন না। কিন্তু এত ভোরেই যে?

বৃদ্ধ অচলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আজ আমার সুরমা মায়ের ওপর একটু উপদ্রব করবার আবশ্যক হয়ে পড়েচে। বলিয়া এবার তাহার দিকেই ফিরিয়া চাহিয়া হাসিমুখে বলিলেন, আমার পাল্কি প্রস্তুত, এখুনি বার হতে হবে, বোধ করি দুটো তিনটের আগে আর ফিরতে পারব না;—এই বুড়োটার জন্যে আজ চারটি ডাল-ভাত ফুটিয়ে রেখো, মা, অত বেলায় এসে যেন না আর আগুন-তাতে যেতে হয়।

এই পরম নিষ্ঠাবান নিরামিষাহারী ব্রাহ্মণ স্ত্রী এবং পুত্রবধূ ভিন্ন আর কাহারও হাতে কখনও আহার করেন না। তাঁহার রান্নঘরটিও একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমন কি সকলের সে ঘরে যাওয়ার পর্য্যন্ত অধিকার ছিল না। এবং স্বপাক আহার তাঁহার মাঝে-মাঝে অভ্যাস ছিল বলিয়াই মেয়েরা বাড়ী ছাড়িয়া দেশে যাইতে পারিয়াছিল। এ কয়দিন

তাঁহার সেই ব্যবস্থাই চলিতেছিল, কিন্তু আজ অকস্মাৎ এই অজ্ঞাত অপরিচিত মেয়েটির উপর ভার দেওয়ার প্রস্তাবে সে বিস্ময়ে, বেদনায়, এবং সকলের চেয়ে বেশি, ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

রামবাবু সেই ম্লান মুখের পানে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন, তুমি ভাব্‌চ, মা, এ বুড়ো আজ বলে কি! রান্না-খাওয়া নিয়ে যার অত বাচ-বিচার, অত হাঙ্গামা, তার আজ হ'ল কি? তা' হোক্‌। রাক্ষুসীর হাতে খেতে যখন আপত্তি হয় না, তখন তুমিই বা দুটো ডাল-ভাত ফুটিয়ে দিলে অপ্রবৃত্তি হবে কেন? আর হোক্‌ ভাল, না হোক্‌ ভাল, মা, অতখানি বেলায় ফিরে এসে হাঁড়ি ঠেল্‌তে যেতে আর পারব না! বলিয়া অচলার নিরুত্তর মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ সহাস্যে কহিলেন, তুমি নিশ্চয় মনে মনে ভাবচ, এ বুড়োটার মধ্যে হঠাৎ যদি এতবড় ঔদার্য্যই জন্মে থাকে, ত আমাকে কষ্ট না দিয়ে হিন্দুস্থানী বামুন ঠাকুরের হাতে খেলেই ত হোতো! না, গো, মা, তা' হোতো না। আজও এ বুড়োর তেমনি গোঁড়ামি, তেমনি কুসংস্কার আছে,—মরে গেলেও ঐ সন্ধ্যাগায়ত্রীহীন হিন্দুস্থানী 'মহারাজের' অন্ন আমার গলা দিয়ে গল্‌বে না। আর আমার রাক্ষুসী মাকে আর তোমাকে যে এক করে নিতে পেরেচি সেও সত্যি নয়, কিন্তু যতই দেখ্‌চি, আমার ততই মনে হচ্চে এই মা জননীটিও যদি একদিন রেঁধে দেন, সে যে আমার অন্নপূর্ণার অন্ন হবে না, এ আমি কোন মতেই মান্‌ব না। কিন্তু আর ত দেরি করতে পারিনে, মা, বাকি যেটুকু বলবার রইল সেটুকু খেতে-খেতেই বোল্‌ব। আর সেই বলাই তখন সব চেয়ে সত্যিকার বলা হবে। এই বলিয়া বৃদ্ধ চলিবার উপক্রম করিতেই অচলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কি বলিবে তাহা স্থির করিতে না করিতে যে কথাটা সকলের পূর্ব্বে মুখে আসিয়া পড়িল, তাহাই বলিয়া ফেলিল, কহিল, কিন্তু আমি ত ভাল রাঁধ্‌তে জানিনে। আমার রান্না আপনার ত পছন্দ হবে না।

বৃদ্ধ রামবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, এই কথাটা আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল মা?

অচলা কহিল, সকলেই কি রাঁধ্‌তে জানে?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, সকলেই জানে তাই কি আমি বল্‌চি?

অচলা এ কথার হঠাৎ কোন প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল। কিন্তু সুরেশের পক্ষে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। অচলার বিবর্ণ মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সে তাহার বেদনা বুঝিল। এই বৃদ্ধের সংস্কার, তাহার হিন্দু আচার ভাল হোক, মন্দ হোক, সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়ানোর মধ্যে যে কদর্য্য প্রতারণা লুক্কায়িত রহিয়াছে, সে কথা যে অচলার অগোচর নাই, এবং এই ভদ্র নারীর হৃদয়ের বিবেক যে কিছুতেই এই গোপন করার গভীর দুষ্কৃতি হইতে আপনাকে নিষ্কৃতি দিতেছে না, ইহা তাহার শ্রীহীন পাণ্ডুর মুখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সুরেশের বুকে যেন লজ্জার শূল বিঁধিল। সে আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মুখ-হাত ধোয়ার অছিলায় দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

তা'হলে আমিও চল্‌লুম, বলিয়া সঙ্গে-সঙ্গে রামচরণ বাবুও সুরেশকে অনুসরণ করিলেন। মুহূর্ত্তকালমাত্র অচলা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপরেই নিজেকে জোর করিয়া কঠিন করিয়া লইয়া ডাকিল, একবার শুনুন—

বৃদ্ধ ফিরিয়া দেখিলেন সুরমা কি যেন বলিতে চাহিয়াও নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। তখন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, আর একটা কথা তোমাকে জানাবার আছে, মা। তোমার সঙ্কোচ যখন কোন মতেই কাট্‌তে চাইচে না তখন,—কি জানো সুরমা, ছেলে-বেলায় আমি ছিলাম পাড়ার মেজ-দা। তোমার বাপের চেয়ে হয়ত বয়সে ছোটও হ'ব না। তা'হলে আমাকে কেন মেজ-জ্যাঠামশাই বলে ডেকো না, মা!

এই বৃদ্ধ যে তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন অচলা তাহা জানিত। ভালবাসার এই প্রকাশ্যতায় তাহার চোখের কোণে যেন জল আসিয়া পড়িল। তাই সে শুধু নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন, আর কিছু কি বলবে?

অচলা তেমনি নীরবে ক্ষণকাল মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া এইবার বোধ হয় সে নিজের সমস্ত শক্তিই এক করিয়া শুধু অস্ফুটে বলিল, কিন্তু আমার বাবা ব্রাহ্ম ছিলেন।

রামচরণ বাবু হঠাৎ চমকিয়া গেলেন। কহিলেন, সত্যিকারের, না পাঁচজন কলকাতায় এসে দুদিন সখ করে

যেমন হয় তেম্‌নি ? তারা ব্রাহ্মদের দলে বসে হিঁদুদের কোসে গালাগালি দেয়,—তেমন গাল সত্যিকারের ব্রাহ্মরা কখনো মুখে আন্‌তেও পারে না,—তারপরে ঘরে ফিরে সমাজে দাঁড়িয়ে সেই ব্রাহ্মদের নাম করে আবার এম্‌নি গালিগালাজ করে যে, তেমন মধুর বচন হিঁদুদের চোদ্দ-পুরুষও কখনো উচ্চারণ করতে পারে না। বলি তেম্‌নি নয় ত মা; তা' হয় ত আমার এতটুকু আপত্তি নেই।

অচলার চোখ মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, সে কেবলমাত্র কহিল, না তিনি সত্যিকার ব্রাহ্ম।

উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ একটু যেন দমিয়া গেলেন। কিন্তু একটু পরেই প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, তা' হলেন-ই বা বাবা ব্রাহ্ম, মেয়ে ত আর তার খাতক নয় যে এখন ভরী করতে হবে। বরঞ্চ, যাঁর সঙ্গে তুমি ধর্ম্ম ভাগ করে নিয়েচ মা, তিনি যখন হিন্দু, তাঁর গলায় যখন যজ্ঞোপবীত শোভা পাচ্চে, তিনি যখন ওই সুতো ক'গাছার এখনো অপমান করেন নি, তখন বাপের কল্যাণে ত তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না! হাসিয়া বলিলেন, দেরি হয়ে যাচ্চে, এখন যাই। কিন্তু তুমি যত ফন্দিই কর না, সুরমা, বুড়ো-জ্যাঠামশাইকে আজ আর ফাঁকি দিতে পারচ না। আজ তোমাকে রেঁধে ভাত দিতেই হবে। তাই বাপের শিক্ষার গুণে সেদিন উপোস করতে চাওনি বটে ? আজ তার সুদ শুদ্ধ উসুল করে তবে ছাড়্‌বো। এই বলিয়া তিনি পুনরায় চলিয়া যান দেখিয়া অচলা এতক্ষণ পরে তাহার অভিভূত ভাবটাকে এক নিমিষে অতিক্রম করিয়া গেল। সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, আচ্ছা জ্যাঠামশাই, আমি ব্রাহ্ম মহিলা হলে ত আপনি আমার হাতে খাবেন না ?

বৃদ্ধ বলিলেন, না। কিন্তু সে ত তুমি নও। সে ত তুমি হতে পারো না।

অচলা প্রশ্ন করিল, শুধু আমার ধর্ম্ম-মতটা আলাদা হলেই কি আমি আপনার কাছে অস্পৃশ্য হয়ে যেতুম।

বৃদ্ধ বলিলেন, অস্পৃশ্য হবে কেন মা, অস্পৃশ্য নয়। কিন্তু তোমার হাতে খেতে পারতাম না।

এ সম্বন্ধে আজ তাহার অনেক কথাই জানা প্রয়োজন! তাই সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল, কেন পারতেন না, সে কি ঘৃণায় ?

বৃদ্ধ সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবল একদৃষ্টে মেয়েটির মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অচলা সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়াছিল, বলিল, জ্যাঠামশাই, আপনার মায়া-দয়া যে কত বড় তার অনেক সাক্ষী এ পৃথিবীতে আছে জানি, কিন্তু আমাদের চেয়ে বড় সাক্ষী আর কেউ নেই। তবে, আপনার মত মানুষের মন যে কেমন ক'রে এত অনুদার হতে পারে, তাই আমি ভেবে পাইনে। আপনি কি কোরে মানুষকে এমন ঘৃণা করতে পারেন ?

বৃদ্ধ অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—আমি ঘৃণা করি ? কা'কে মা ? কখন্ মা ?

অচলা বলিল, যার হাতের ছোঁয়া আপনার অস্পৃশ্য সেই আপনার ঘৃণার পাত্র—তাকেই আপনি মনে মনে ঘৃণা করেন। আর ঘৃণা যে করেন, তাও দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে ভুলে গেছেন। আমাদের ওই হিন্দুস্থানী চাকরটার কথা ছেড়ে দিন, পাচকটার হাতের রান্নাও যে কোনমতেই আপনার গলা দিয়ে গলবে না, সেও আপনি নিজের মুখেই প্রকাশ করেছেন। এতে দেশের কত ক্ষতি, কত অবনতি হয়েচে সে তো—

বৃদ্ধ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, অচলার উত্তেজনাও লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাহার কথা হঠাৎ শেষ হইলে একটু হাসিয়া বলিলেন, মা, ঘৃণা আমরা কোন মানুষকেই করিনে। যে নালিশ তুমি করলে সে নালিশ সাহেবেরা করে,—তাদের কাছে তোমার বাবার শেখা—আর তাঁর কাছে তুমি শিখেচ। নইলে মানুষ যে ভগবান, এ জ্ঞান কেবল তাদের নয় আমাদেরও ছিল, আজও আছে।

এই সময়ে নীচে হইতে একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনা যাইতেছিল; বৃদ্ধ সেদিকে এক মুহূর্ত্ত কান পাতিয়া কহিলেন, সুরমা, খাওয়া জিনিসটা যাদের মধ্যে মস্ত বড় জিনিস, মস্ত ঘটা-পটার ব্যাপার, তাদের সঙ্গে আমাদের মিল হবে না। আমাদের ভাতে-ভাত খাওয়াটা তুচ্ছ বস্তু, সেইটুকুর আজ একটু যোগাড় করে রেখো,—মুখে দিতে-দিতে তখন আলোচনা করা যাবে, ঘৃণাটা আমরা কা'কে কত করি এবং দেশের অবনতি তাতে কতখানি হচ্চে—কিন্তু গোলমাল বাড়চে—আর নয় মা, আমি চল্লুম। বলিয়া তিনি একটু দ্রুতবেগেই নামিয়া গেলেন।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

"ইংলিশম্যান" স্বাক্ষর করিয়া একজন ইংরেজ ভদ্রলোক 'ষ্টেটসম্যানে' একখানি পত্র ছাপাইয়া দরিদ্র কেরাণীকুল এবং ভৃত্য-শ্রেণীর প্রতি একটু সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। সকল প্রকার জিনিসের, বিশেষতঃ, খাদ্যদ্রব্য এবং মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য্য ও অপরিহার্য্য জিনিসপত্রের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে অল্প আয়ের, বাঁধা মাহিনার কেরাণী এবং ভৃত্য-শ্রেণীর লোকের কষ্ট অপরাপর শ্রেণীর লোকের অপেক্ষা একটু বেশী হইবারই কথা। সুতরাং ঐ ইংরেজ ভদ্রলোকের সহানুভূতি এক্ষেত্রে অকৃত্রিম বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। দেশীয় লোকের প্রতি বেসরকারী ইংরেজ ভদ্র-লোককে একপ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখিলে, কৃতজ্ঞতায় আমাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। আমরা এই সুযোগে এই শ্রেণীর ইংরেজ ভদ্রলোকদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। "ইংলিশ-ম্যান" দরিদ্র ভারতবাসীদের কষ্টের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে একটা কমিটি গঠন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং য়ুরোপীয়ান সওদাগরেরা তাঁহাদের অধীন কেরাণীকুলের দুরবস্থা সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত আছেন, সেই সকল তথ্য কমিটির নিকট প্রকাশ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অধীন নিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যগণকে এখন যে grain allowance দিতেছেন, তাহাতে তাহাদের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। এই ভদ্রলোকের বিশ্বাস, ভারতের লোকসংখ্যার বৃদ্ধিই তাহাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধানতম কারণ। দেশে লোকসংখ্যা বাড়িলেই,—যত লোক দেশে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে, লোকসংখ্যা তদপেক্ষা বেশী হইলেই—লোকের উপার্জ্জন নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। ইহার একমাত্র প্রতিকারের উপায়—অতিরিক্ত লোকগণের বিদেশে অন্নের সন্ধানে যাওয়া। কিন্তু এই কথাটি আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ এই,—এমন দুর্ভিক্ষের দিনেও কি কারণে ভারতবর্ষ হইতে চাউল রপ্তানী হইতে দেওয়া হইতেছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, সরকারী বিবরণে অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথাটিও বলা হইয়াছে যে, যে সকল ভারতবাসী যুদ্ধ উপলক্ষে বা অন্য কোন কারণে ভারতবর্ষের বাহিরে গিয়া বাস করিতেছে, তাহাদের জন্য ভারতবর্ষ হইতে চাউল ও অন্যান্য খাদ্য শস্য রপ্তানী করা হইতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ভারতের অতিরিক্ত লোক বিদেশে গিয়া বাস করিলেও, তাহাদের খোরাক ভারত হইতেই যোগাইতে হইবে। তাহা হইলে surplus populationএর বিদেশে emigrate করিয়াও লোকসংখ্যা সেই সমানই রহিল,—খাদ্য দ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধি সমস্যার ত কোন প্রতিকারই হইল না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য-বৃদ্ধি স্বাভাবিক কারণেই ঘটিতেছে। কিন্তু ঠিক তাহার সমান অনুপাতে এ দেশের লোকের উপার্জ্জন-ক্ষমতা বাড়িতেছে না। পত্রলেখক "ইংলিশম্যান"ও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ১৯ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন এদেশে প্রথম আসেন, তখন তাঁহাদের ভৃত্যদের বেতন বা মজুরীর হার যাহা ছিল, এখনও প্রায় তাহাই আছে, অথচ, এই ১৯ বৎসরে সকল জিনিসেরই দাম অন্ততঃ দ্বিগুণ কি আড়াইগুণ বাড়িয়াছে। অতএব অন্ন-সমস্যার প্রতিকারের প্রকৃত উপায় তাহাদের এবং সকল শ্রেণীর লোকেরই উপার্জ্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা। গবর্ণমেণ্ট এবং দেশের লোক—সকলকেই এই বিষয়টি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা সদুপায় স্থির করিতে হইবে।"

কচি-কচি ছেলেরা যখন বিঁড়ি, সিগারেট, বার্ডসাই বা চুরুট মুখে দিয়া রাস্তা দিয়া ধোঁয়া উড়াইতে-উড়াইতে চলিয়া যায়,—তখন সে দৃশ্য যেমন বীভৎস, তাহাদের এই অভ্যাসটি তেমনি স্বাস্থ্যহানিকর। সম্প্রতি এইটা বন্ধ করিবার জন্য "বেঙ্গল জুভিনাইল স্মোকিং য়্যাক্ট" নামে যে আইন বিরচিত হইয়াছে; সরকার বাহাদুর সেই আইন অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আইনটির দ্বারা ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক বালকদিগের পক্ষে ধূমপান নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আইনটির ক্রিয়া পূর্ণভাবে আরম্ভ হইলে, আদালতে অনেক মামলা-মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়; এবং সেই সকল মামলার মধ্যে দুই-চারিটিতে ধূমপায়ী ছোকরার প্রকৃত বয়স নির্ণয়ের জন্য ঠিকুজি কোষ্ঠী আদালতে দাখিল হইতে পারে, এবং বহু তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে। যাহা হউক, আইনটির পূর্ণ ক্রিয়া এখনও আরম্ভ হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে আংশিক ভাবে ইহার প্রয়োগ করিতেছেন। গত ১৮ই জুন তারিখের কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে যে, কলিকাতার উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলির হেড মাষ্টাররা নিজ-নিজ স্কুলের কোন ছাত্রকে রাস্তায় বা কোন প্রকাশ্য স্থানে (public place) ধূমপান করিতে দেখিলে, তাহাদের নিকট হইতে ধূমপানের উপকরণ, যথা, তামাক, পাইপ, বা সিগারেটের কাগজ প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারিবেন। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ইহাতে যে বিশেষ কিছু ফল হইবে না, আইনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কারণ, যে সকল ছেলে ধূমপান করে, তাহারা অপ্রকাশ্য ভাবেই এই দুষ্কর্ম করিয়া

থাকে। ভয়-ভক্তি বা সমিহ করিয়া তাহারা সাধারণতঃ পিতা-মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, খুড়া, জ্যেঠা, মামা, দাদা, বয়স্ক এবং সম্মানার্হ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম মাষ্টার পর্য্যন্ত, এমন কি, নিঃসম্পর্কীয় অথচ বয়োজ্যেষ্ঠ পাড়া-প্রতিবাসীকেও লুকাইয়া সিগারেট প্রভৃতি সেবন করে। সুতরাং হেড মাষ্টার মহাশয় যে সহজে তাহাদিগকে হাতেনোতে ধরিতে পারিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। আর, যে সকল এঁচোড়ে পাকা ডেঁপো ছেলে গুরুজনদিগকে ততটা সমিহ করে না, তাহারাও আইন এড়াইবার জন্য হেড মাষ্টার মহাশয়কে ফাঁকি দিয়া রাস্তা বা প্রকাশ্য স্থান এড়াইয়া হয় ত হেড মাষ্টার মহাশয়ের চোখের সামনেই ধূমপান করিতে থাকিবে,—হেড মাষ্টার মহাশয় আইন অনুসারে যতটুকু ক্ষমতা পাইয়াছেন, তাহা চালাইয়াও সে ছেলেদের কিছুই করিতে পারিবেন না। আবার এমনও হইতে পারিবে যে, রাস্তায় নিজের ইস্কুলের কোন ছাত্রকে ধূমপান করিতে দেখিতে পাইলেও, হেড মাষ্টার মহাশয় তাহাকে যে সহজে ধরিতে পারিবেন, এমন সম্ভাবনা খুব কম। ছেলেটি যদি একটু সময় থাকিতে টের পায় যে, হেড মাষ্টার মহাশয় তাহাকে ধূমপান করিতে দেখিয়াছেন, এবং সে যদি ধরা পড়িবার ভয়ে দৌড় দেয়, তাহা হইলে হেড মাষ্টার মহাশয় যে দৌড়িয়া তাহাকে সহজে ধরিতে পারিবেন, এমন আশা আদৌ করা যাইতে পারে না। বরং তিনি সেরূপ চেষ্টা করিলে, ছেলেদের মুখে সিগারেট থাকার অপেক্ষাও সে দৃশ্যটা আরও বীভৎস দেখাইবে। এইরূপে আইন পরিচালনের অনেক ক্রটী ধরা পড়িতে পারে। তবে আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট যে পুলিশের হাতে এই আইন পরিচালনের ক্ষমতা না দিয়া, কেবল হেড মাষ্টার মহাশয়দিগের উপর দিয়া ইহার পরীক্ষা করিয়া লইতেছেন, সেটা ভালই হইয়াছে। কারণ, পুলিশের উপর এরূপ আইন পরিচালনের ভার দিলেই, আইনটি একেবারে unpopular হইয়া উঠিবে। ছেলে ধূমপান করিয়া নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, ইহা জানিতে পারিলেও, পুলিশের হস্তক্ষেপ কোন অভিভাবকই পছন্দ করিবেন না। সে যাহা হউক, পরীক্ষা করিতে-করিতে ইহার দোষ ক্রটী বা অসম্পূর্ণতা যেমন-যেমন ধরা পড়িতে থাকিবে, তেমনি-তেমনি ইহার সংশোধন করিয়া লইলেই চলিবে। অন্য সকল আইনের বেলাতেও দেখা যায়, কোন আইনই প্রথম হইতেই সম্পূর্ণ ও নিখুঁত ভাবে বিরচিত হয় না। ছেলেদের হাতে সিগারেট প্রভৃতি দেখিতে পাইবার পর তাহাতে বাধা দেওয়ার অপেক্ষা, যাহাতে উহা তাহাদের হাতে সহজে পড়িতে না পারে, এমন ব্যবস্থা গোড়া হইতে করিতে পারিলে, আইনের উদ্দেশ্য অনেকটা সুসিদ্ধ হয়। Preventive measure স্বরূপ মদ্যাদি অন্যান্য মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যাপারে লাইসেন্স লইতে বাধ্য করা, বিক্রয়ের সময় বাঁধিয়া দেওয়া প্রভৃতি যেরূপ বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করা হইয়াছে, এদিকেও সেই রকম বাধা স্থাপন করিলে ভাল হয়। অর্থাৎ, চুরুট-সিগারেটের দোকানদারেরা ১৬ বৎসরের কম বয়স্ক বালককে ধূমপানের উপকরণ বিক্রয় করিলে, কিম্বা অভিভাবক যদি সিগারেটসেবী হ'ন তাহা হইলে তাঁহার অসতর্কতায় তাঁহার ধূমপানের উপকরণ জুভিনাইলদিগের হস্তগত হইলে, তাঁহাদিগকে যদি অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে সুফল ফলিতে পারে বলিয়া আপাততঃ মনে হইতেছে। কার্য্যতঃ ইহা কতদূর সম্ভব হইবে, তাহা বলিতে পারিতেছি না।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা খেলাধূলায় তেমন উৎসাহ প্রকাশ করে না বলিয়া বঙ্গের বার্ষিক শিক্ষাবিবরণী সংক্রান্ত রেজোলিউসনে বঙ্গের লাট বাহাদুর কিছু অনুযোগ করিয়াছেন। লাট বাহাদুরের সদিচ্ছা অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ বিষয়ে ছেলেদের দিক হইতেও ন্যায়সঙ্গত কৈফিয়ৎ আছে। খেলাধূলায়, কেবল প্রেসিডেন্সী কলেজ নহে, সকল স্কুল-কলেজের ছেলেদেরই নিরুৎসাহের ভাব দেখা যায়। তাহার অনেকগুলি কারণও রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম এবং প্রধান কারণ,—তাড়াতাড়ি পাশ করাটা সর্ব্বাগ্রে দরকার। ভাল করিয়া পাশ করিতে হইলে, খেলাধূলার সময় পাওয়া যায় না। যে সময় খেলাধূলা করা উচিত, পাশ করিবার জন্য ছেলেরা সে সময়টাতেও পড়াশুনা করিতে বাধ্য হয়। দেশের সাধারণ অবস্থা, আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা, বাড়ীতে অভিভাবকের তাগাদা, স্কুল-কলেজে শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের তাড়া, এবং দুই বৎসরের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার তাড়া—এই সকল নানাপ্রকার কারণের সমবায়ে ছেলেরা খেলাধূলায় তেমন মনোযোগ দিতে পারে না। বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছেলেদের এত বেশী বই পড়িতে হয়, এত বেশী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হয় যে, তাহারা স্কুল কলেজের পড়া শেষ করিবারই সময় পায় না, তা খেলিবে কি? জীবন-সংগ্রাম দিন-দিন যেরূপ কঠিন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে সেই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে, পাশ করা চাই-ই। পাশ করিলে তবে ভালরকম বিবাহ হইবে, এবং অভিভাবকের কিছু অর্থাগম হইবে। সেইজন্য অভিভাবকেরা চান, ছেলেরা মরুক আর বাঁচুক, কিন্তু পাশ করা চাই। পাশ করিলে তবে চাকুরী মিলিবে, কিম্বা ডাক্তারী বা ওকালতী ব্যবসায়ের সুবিধা হইবে। অবশ্য প্রেসিডেন্সী কলেজে অনেক ধনী-সন্তান পড়ে,—তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনে অর্থোপার্জ্জনের ভাবনা ভাবিতে হইবে না; কিন্তু নিজের পরিশ্রমের ফলে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে—এমন অবস্থারও অনেক ছেলে কায়ক্লেশে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নের ব্যয় সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহাদের খেলাধূলায় সময় নষ্ট করিবার যো নাই। তার উপর, যাহারা সরকারী চাকুরীর প্রত্যাশী, কিম্বা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইতে চায়, তাহাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যেই সাধারণ লেখাপড়া শেষ করিয়া লইতে হয়। ইহা ছাড়া, সহরে খেলাধূলা করিবার যথেষ্ট স্থানাভাবও ছেলেদের খেলাধূলায় উৎসাহিত

না হইবার একটা কারণ বটে। এত বড় কলিকাতা সহর,—এখানে এত লোকের বাস;—কিন্তু ছেলেদের খেলিবার জন্ম মুক্ত স্থান কোথায়? কলিকাতার যতগুলি পুষ্করিণী ছিল, মিউনিসিপ্যালিটী সে সকল নানা অজুহাতে বুজাইয়া দেওয়াইতেছেন; এবং অত্যধিক আয়-বৃদ্ধির লোভে সেই সকল খোলা জমিতে বাড়ী তৈয়ার করিবার কিম্বা বস্তী স্থাপন করিবার অনুমতি দিতেছেন। আবার, সহরের আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক বেশী। এই সকল লোকের বাস করিবার—কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিয়া দিন কাটাইয়া দিবারই যথেষ্ট স্থানাভাব। তাহার উপর, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ঠেলায় সহরে বাসযোগ্য ভূমির পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইতেছে। তদনুপাতে লোকের বাস করিবার জন্ম তেমন বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ করিবারও সুব্যবস্থা হইতেছে না। যাতায়াতের সুলভ এবং দ্রুত ব্যবস্থার অভাবে সহরতলীতে বাস করাও তেমন সুবিধাজনক নহে। যেখানে বাস করিবারই এতটা স্থানাভাব, সেখানে খেলাধুলার স্থান সঙ্কুলান করা কতখানি অসম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মাঝখানে যে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড আছে, ঐখানে ফুটবল ক্রিকেট খেলিতে শিখিয়াই, অনেক ভাল-ভাল ফুটবল ও ক্রিকেট-ক্রীড়ক প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐটুকু যায়গায় ত সকল ছেলের খেলিবার স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে না! গ্রীয়ার-পার্কে একটুখানি খেলিবার স্থান ছিল, কিন্তু তাহা লেডিজ পার্কে পরিণত হওয়ায় সে সুবিধাটুকু গিয়াছে। মার্কাস স্কোয়ারের জমির পরিমাণের তুলনায় ওখানে অনেক বেশী ছেলে খেলিতে যায়। চাঁপাতলায় ছোট গোলদীঘির ওয়াট-করা জমিতেও বৈকালে এত বেশী ছেলে খেলিতে আসে যে, ওখানেও স্থানাভাব হয়। আর দুই একটা যা খেলিবার জায়গা আছে, সে সকলগুলির অবস্থাও তদ্রূপ। গড়ের মাঠে দুই-একটা খেলিবার স্থান আছে, দুই চারিটা ক্লাবও আছে; তথায় অনেক ছেলে খেলাও করিয়া থাকে। কিন্তু সেখানেও অনেক বেশী ছেলে খেলা করে। বিশেষতঃ, গড়ের মাঠে খেলিবার যায়গা ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। পুরাতন ক্লাবগুলির অনেকেরই সেখানে খেলিবার অসুবিধা হইতেছে; নূতন ক্লাবের সেখানে স্থান সংগ্রহ করা খুবই কঠিন;—একেবারে অসম্ভব বলিলেও চলে। খেলধুলার এই যে সকল সামান্য সামান্য ব্যবস্থা আছে, তাহাতে যতগুলি ছেলে খেলা করে বা করিতে পারে, তাহা বাদে, বহু বালক ও যুবক, ইচ্ছা থাকিলেও, কেবল স্থানাভাবে ক্রীড়া-কৌতুকে উৎসাহ দেখাইতে পারে না। গ্রীয়ার পার্কের কাছাকাছি, সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-কলেজের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা বড় পুষ্করিণী ছিল। সেটী মিউনিসিপ্যালিটী নোটিশ দিয়া বুজাইয়া দেওয়াইলেন। কিন্তু সেখানে মাঠ হইতে না হইতেই সঙ্গে সঙ্গেই বস্তীও স্থাপিত হইল। যে জমিতে ফেডারেশন হল নির্ম্মিত হইবার কথা ছিল,—গ্রীয়ার পার্ক মহিলাদিগকে দিয়া মিউনিসিপ্যালিটী যদি সেই যায়গায় ছেলেদের খেলিবার ভূমি তৈয়ার করিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলের পাঁচ-সাতটা ক্লাব এখনও জীবিত থাকিতে পারিত। কিন্তু স্থানাভাবে ক্লাবগুলি উঠিয়া গেল, বালকেরাও নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া রহিল। শিয়ালদহে বিখ্যাত স্পোর্টিং ক্লাব ছিল, সার্কুলার রোডে যেখানে এখন ট্রামগাড়ীর ডিপো হইয়াছে, সেখানে সুবার্ব্বন বড্রার্স ক্লাব ছিল, স্থানাভাবে সেগুলি উঠিয়া গিয়াছে। মোট কথা, খেলিবার স্থানের ব্যবস্থা যত দিন না হইতেছে, ততদিন—ছেলেরা খেলাধূলায় তেমন উৎসাহ প্রকাশ করে না—এরূপ অভিযোগ তাহাদের বিরুদ্ধে করা চলে না।

বঙ্গদেশে চাউলের মূল্য-বৃদ্ধির দরুণ যে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, সে সম্বন্ধে সরকারের বক্তব্য দার্জিলিঙ্গে একটা কমিউনিকের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক মাস ধরিয়া বাঙ্গালায় চাউলের খুচরা বাজার-দর পরীক্ষা করিতেছেন। চাউল সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য এখন ভারত-গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের উপদেশ অনুসারে,—যে প্রদেশে চাউল যথেষ্ট পরিমাণে মজুত আছে, সেই প্রদেশ হইতে,—যে প্রদেশে খাদ্য-শস্যের একান্ত অভাব হইয়াছে, সেই প্রদেশে চালান দেওয়া হইতেছে। তবে সম্প্রতি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বঙ্গদেশে চাউলের অত্যধিক মূল্য-বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া, ভারত-গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশ হইতে অন্য প্রদেশে চাউলের রপ্তানী কমাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ হইতে কলিকাতার পথে বাঙ্গালা দেশে কিছু চাউল আমদানীর ব্যবস্থা হইয়াছে। এবং আকায়েব হইতে চট্টগ্রামের পথে আরও চাউল আমদানীর ব্যবস্থা হইতেছে। পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া চাউল-ব্যবসায়ীরা যাহাতে চাউলের দাম বাড়াইতে না পারে, সে উপায়ও অবলম্বন করা হইতেছে। রেঙ্গুন হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত জাহাজ ভাড়া কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে রেঙ্গুনের চাউলের পড়তা কম পড়িবে। গবর্ণমেণ্ট এখনও বঙ্গদেশে চাউলের অভাব হইবার আশঙ্কা করেন না। তবে, মজুত চাউলের যে সুমারী গৃহীত হইতেছে, তাহার ফলে কোন জেলায় কত এবং সমগ্র বঙ্গদেশেই বা কত চাউল মজুত আছে, তাহা জানা যাইবে। তখন, কেহ অধিক লাভের লোভে মাল আটকাইয়া রাখিতেছে কি না, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে এবং তাহা হইলে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করাও কঠিন হইবে না।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নূতন উপন্যাস "জলের" আল্পনা" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মোগল যুগে স্ত্রী-শিক্ষা" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য দশ আনা।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনোরম চিত্রাবলি "ভাবের-অভিব্যক্তি" নামে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের নূতন উপন্যাস "ঈশানী" যন্ত্রস্থ ; শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার এম-এ মহাশয়ের "অদৃষ্ট-লিপি" এতদিনে সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইল ; দর্শনী দুই টাকা।

দুর্গামোহন বাবু জগদ্বিখ্যাত "টলষ্টয়ের গল্প"গুলি অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন ; এক টাকা দিয়াই 'টলষ্টয়ের গল্প' পড়িতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত সচিত্র "হেমচন্দ্র" বা কবিবর হেমচন্দ্রের জীবনী প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ২৲।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "শোণিত তৃষ্ণা" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ৸০।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম-এ প্রণীত ইংরাজী সংস্করণ "শিবাজী" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৪৲।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত প্রণীত "মিসর কুমারী" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের নূতন উপন্যাস "বৈরাগীর হাট" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ১॥০।

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন উপন্যাস "রায় বাঘিনী" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ১॥০।

শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ব্রাহ্মণ ইতিহাস" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ৲।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নূতন উপন্যাস "বড় ছোট" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ২৲।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "কুশীলব" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ॥৴০।

স্পর্শমণি-প্রণেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর গল্পগ্রন্থ "নির্ম্মাল্য"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ; মূল্য ১।০।

বাঁকিপুর, দশম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর সম্পাদক, অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার জানাইতেছেন যে, ঐ সম্মিলনীর রিপোর্ট নিয়মানুযায়ী ঢাকার সম্মিলনীতে দাখিল করা হয়, উহা পরিষদেও 'প্রদর্শিত' হইয়াছিল এবং কলিকাতা, হাওড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের ডেলিগেট মহাশয়দের রিপোর্ট সাহিত্য পরিষদের মারফতে বিলি করা হইয়াছে। অন্যান্য স্থানের ডেলিগেট মহাশয়দের রিপোর্ট ডাকযোগে পাঠান হইয়াছে। যাঁহারা রিপোর্ট পান নাই, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া সম্মিলন সম্পাদককে জানান। অধ্যাপক সমাদ্দার বলিতেছেন যে, রিপোর্ট না পাওয়া সম্বন্ধে কাহারও কোন পত্র তিনি পান নাই।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.



রাধাষ্টমী

Engraved at the Bharatvarsha Office



ভাদ্র, ১৩২৬

প্রথম খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্যে অধ্যাত্ম-চেতনা

[অধ্যাপক শ্রীরামপদ মজুমদার এম-এ]

ইংরেজী সাহিত্য যখন এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার বাহ্য সম্পদই তখন আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল,—পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তরের প্রেরণা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে নাই। সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজী বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়াছিলেন; বিদেশী খাদ্য, মদ্য ও ভাষা সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; এমন কি, তৎসময়ের ব্রাহ্ম-ধর্ম্মও এই মোহ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন নাই—খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বাহ্যাবরণটাকেই,—তাঁহাদের প্রার্থনা-মন্দির, তাঁহাদের বেদী, উপাসনাপ্রণালী ইত্যাদিই নূতন ধর্ম্মের অভিব্যক্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন; ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণ-শক্তিরই বিকাশ,—অন্ধভাবে অনুকরণের সামগ্রী নহে। জীবনী-শক্তি যাহার আছে, সে তাহার প্রকাশের পথ আপনিই করিয়া লয়; কারণ, অন্তরের সহিত বাহিরের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। আগে প্রাণ পরে দেহ, আগে ভাব পরে ভাষা। শক্তির স্ফুরণেই দেহ এবং ভাবের লীলাতেই ভাষার সৃষ্টি। তখনকার বঙ্গ-সাহিত্যে দেখিতে পাই, দেহের দিকেই বেশী লক্ষ্য ছিল, প্রাণের দিকে নহে। তখনকার সাহিত্যিকেরা কল্পনাকেই কবিতা এবং যুক্তিকেই সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বাহিরের সম্পর্ক ও বন্ধনটাই বড় বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন,—সত্যকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিকশিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। বিদেশী সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা, প্রকাশ-ভঙ্গী, ওজস্বিতা ও কল্পনা তাঁহাদের প্রাণে লাগিয়াছিল; কিন্তু তাহার মূলে যে গভীর প্রেরণা, যে অধ্যাত্ম-চেতনা লুক্কায়িত ছিল, তাহা ধরিতে পারেন নাই। দেশীয় আচার, নীতি ও ধর্ম্ম-ব্যবস্থা ভিতর হইতে না দেখিয়া, স্থূলভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যুক্তির সাহায্যে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। দ্বিধা বা সঙ্কোচ তাঁহাদিগকে বাধিত করে নাই, শিশুর মত যাহা শুনিয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন। নূতন সভ্যতার মোহজনিত আনন্দোৎফুল্ল তাঁহাদের কল্পনার ক্রীড়া ও নৃত্য দেখিতে সুন্দর; কিন্তু তাহাতে আত্মার পরিচয় অতি ক্ষীণ। সমাজ-ধর্ম্মে ও চিন্তায় সে সময়ে

বিরোধের সমন্বয় বাহির হইতে আসিয়াছিল,—অধ্যাত্ম-চেতনার গভীরতা হইতে উৎসারিত হয় নাই। তাই তখন-কার বাঙ্গালী শ্রোতার নিকট ইংরেজীতে ধর্ম্ম বক্তৃতা এবং বিদেশী ভাষায় স্বদেশ-প্রীতির উচ্ছ্বাস। ইংরেজীতে ধর্ম্ম বক্তৃতা যে "ধর্ম্মে সাকাই সাজা", আধ্যাত্মিকতা যে ইহাতে নাই—এ কথাই আমাদের নিকট অনেকদিন পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট হয় নাই; এবং স্বদেশ প্রেম যে দেশকেই ভালবাসা,—বিদেশীর নিকট বাহবা লওয়া নহে, এখন পর্য্যন্ত আমরা তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য সত্যের সহিত প্রাণের যোগ হইতে দেরী হইয়াছিল বলিয়া, স্থায়ী গদ্য-সাহিত্য রচিত হইতে বাঙ্গালায় অনেক দিন লাগিয়াছিল। যুক্তি ও তর্কের অবতারণা সাহিত্য নহে।

আমাদের নূতন যুগের প্রধান কবি সাহিত্য-রচনা আরম্ভ করিলেন—ইংরেজী ভাষায়। যশোলিপ্সা তাঁহাকে প্রণোদিত করিয়াছে, কিন্তু কাহার জন্য, কিসের জন্য লিখিতেছেন, সে কথা তাঁহার মনে প্রথমে উদিত হয় নাই। তিনি ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিলেন;—ধর্ম্মের নবজীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাতে দেখা গেল না। তিনি যে কোন্ দেশীয়, তাহার প্রকৃতি কি, কোন্ প্রেরণা লইয়া তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ এ সব চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। অধ্যাত্ম-জগতের সম্পদ সে কি বুঝিবে, যে নিজেকেই নিজে বুঝিতে চেষ্টা করে নাই? তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল, কল্পনার উন্মাদনা ছিল; কিন্তু ছিল না সেই সুগভীর জ্ঞান, সেই অধ্যাত্ম সম্পদ, যাহা না হইলে কবিতা শুধু কল্পনা আর জল্পনা। কোথায়,—তাঁর সেই সত্য কোথায়,—যে সত্যের বিকাশ—তাঁর কবিতা? কবি-গুরুর মহাকাব্যে যে সত্য পরিস্ফুট—পাপীর দাম্ভিকতার যে শেষ পরিণাম—তিনি কি তাহাই নূতন করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলেন? তাহা হইলে তাঁহার আদর্শের মৌলিকতা কই?—ইহা তো কেবল বাল্মীকির প্রতিধ্বনি! অথবা, তিনি কি মহাকবি মিল্টনের শয়তানের অনুকরণে রাবণ-চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—সেই ওজস্বিতা, সেই নিষ্ঠুর দাম্ভিকতা, শক্তির সেই প্রচণ্ড লীলা, ঘনীভূত বিঘ্ন ও বিপদের সম্মুখে সেই স্থির অটল প্রতিজ্ঞা? কেবল কি ইহারই জন্য তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা-বলে বাঙ্গালার কোমল-কান্ত পদাবলী উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন? যে দিক দিয়াই ভাবি না কেন, তাঁহার নিজের যে কি বলিবার ছিল, ধরিতে পারি না। যিনি জীবনে বৈষ্ণব ভাবের ছায়া না মাড়াইয়াও ব্রজাঙ্গনা লিখিতে পারিয়াছিলেন, মেঘনাদ-বধও সেই ঐন্দ্র-জালিকের লিপি-চাতুর্য্যের নিদর্শন। কিন্তু স্বতঃই এ প্রশ্ন মনে হয়—কোথায় তাঁহার সেই অন্তর্দৃষ্টি, যে দৃষ্টির দ্বারা তিনি আমাদের জাতীয় জীবন গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন? অতীত ভারতের যে প্রাণ শক্তি আমাদের জীবনে শতধা স্ফুরিত হইতেছে, যাহার উপর পশ্চিমের রশ্মিপাতে কত রাগ, কত বর্ণ ফলিয়া উঠিয়াছে—সেই শক্তি তিনি অনুধাবন করিয়াছিলেন—কোথায়? যুগ চরিত্রের সহিত এ সাহিত্যের সম্পর্ক দেখা যায় না। তাঁহার রচনা-ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয়, যেন তিনি মিল্টনের অনুসরণে বাঙ্গালায় মহাকাব্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রতিভার কি আত্ম-প্রবঞ্চনা! কত যুগ-যুগান্তরের সাধনায় একখানি মহাকাব্য রচিত হয়,—তাহাও কোনও ভাষায় হয়, কোনও ভাষায় হয় না। এক-একখানি মহাকাব্য এক-এক জাতির এক এক যুগের সভ্যতার অথবা সাধনার আলেখ্য। যুগ-সভ্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছে—ইলিয়াদ্ ও ওডিসিতে, ভার্জিলের এনিদে। যুগ সাধনার চিত্র, ডান্তের কমেডিতে, মিল্টনের মহাকাব্যে, গেটের ফাউষ্টে এবং আমাদের রামায়ণে। যুগ-সাধনা ও সভ্যতা উভয়ের সমাবেশ মহাভারতে। জাতীয় জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয় মহাকাব্যে। যখন কতকগুলি ভাব ও চিন্তা সমাজে পরিণতি লাভ করে, তাহাদের বিকাশ সংসাধিত হইয়া স্থায়ী রূপ ধারণ করে, এবং পরস্পর বিরোধী শক্তি-সমূহ একটী সুমহান সামঞ্জস্যের মধ্যে অনুভূত হয়, তখনই মহাকাব্যের সৃষ্টি সম্ভব। সেই জন্য ইহা ভক্তির কাব্য, বিশ্বাসের কাব্য,—সন্দেহ ও দ্বিধা উপস্থিত হইলে, যে ব্যাপকতা ইহার প্রাণ, তাহা নষ্ট হইয়া যায়। প্রত্যেকখানি মহাকাব্যে কবি এমনই করিয়া নিজের সত্তা দেশের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছেন—যে যুগের সমস্ত কর্ম্মবৈচিত্র্য ও চিন্তা সাগর-বক্ষে নদীর ন্যায় তাঁহার কাব্যে আশ্রয় পাইতে পারে; অথবা অধ্যাত্ম-চেতনার গভীরতা দিয়া সমগ্র যুগ-সাধনা আপন করিয়া লইয়াছেন। মহাকাব্যের সুদৃঢ় ভিত্তি জাতীয় সভ্যতার উপর; এবং যে বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া যুগান্তব্যাপী সভ্যতা শত মূর্ত্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে, ইহা তাহারই

সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তি। এক-একখানি মহাকাব্য এক-এক যুগের সমাধি-মন্দির। ইহার এক-একখানিতে যুগব্যাপী সাধনা ও চিন্তা আপনাকে চরম প্রকাশ করিয়া নিঃস্ব করিয়া রিক্ত করিয়া দিয়াছে। মহাকাব্য এক যুগের সমাধান। আবার যখন নূতন ভাব ও চিন্তা মানুষের মন অধিকার করিয়া চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলে, চিন্তার ধারা বিভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকে, অখণ্ড সত্যের অনুভূতি কমিয়া গিয়া সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এক মহা-সাম্যের পরিবর্ত্তে মানুষ নিজের বৈষম্যটাকেই বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন মহাকাব্য খণ্ডকাব্যে ও গীতিকাব্যে পরিণত হয়। প্রত্যেক মহাকাব্যের মূলে, হয় দেশের সহিত সুস্পষ্ট একাত্মবোধ, কিম্বা গভীর অধ্যাত্ম-চেতনা সংযুক্ত হইয়া আছে। এবং এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক দেশের মহাকাব্য লোকেতিহাস অথবা লোক-ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়।

আমাদের আধুনিক সাহিত্যের প্রারম্ভে যাহারা মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাঁহাদের এ দুইয়ের কিছুই ছিল না। তাঁহারা যে কি চাহিতেছিলেন, কি সত্য অথবা তথ্যে তদ্গত প্রাণ হইয়া লিখিতেছিলেন, দেশের প্রাণ-তন্ত্রীতে যে কি সুরের ঝঙ্কার দিবেন, তাহা তাঁহাদের নিজের নিকটেই সুস্পষ্ট ছিল না। তাঁহারা যেন মানসাকাশে ভাবের বাষ্পকণায় কল্পনার ইন্দ্রধনু আঁকিতেছিলেন। তাঁহাদের কাব্যে মাধুর্য্য ছিল, বিচিত্র সুর-লয়ের যোগ, গুরু-গম্ভীর নির্ঘোষ, একটা অস্ফুট আশার আভাষ, সৌন্দর্য্য-তৃপ্তির প্রয়াস, কারুণ্যের স্নিগ্ধ কান্তি—এ সবই ছিল ; কিন্তু ছিল না প্রাণের গভীর বেদনা, অধ্যাত্ম-চেতনার প্রকাশ-ব্যাকুলতা, সম্পূর্ণতা, সার্থকতার দিকে হৃদয়ের উন্মুক্ত আবেগ।

এই একই কারণে আধুনিক বঙ্গসাহিত্য অনেক স্থলেই অস্বাভাবিক, পঙ্গু ; নিরালম্ব বলিয়া বোধ হয়। ইহার সহিত বাস্তবের যোগ নিতান্ত ক্ষীণ। সাহিত্যে বাস্তবতা তাহাই, যাহা চেতনায় স্ফুট হইয়া সামঞ্জস্যবিহিত এবং সমাজ-প্রকৃতির অনুগামী। যে অজানিত গতি মানব-মন ও সমাজের ভিতর দিয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত প্রবাহিত, বাস্তব সাহিত্য তাহার সহিত স্বভাবতঃই যুক্ত হইয়া সেই গতি নিয়ন্ত্রিত করে। এই জন্য স্থিতিমান ও গতিমান সমাজের সাহিত্য ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট। একটীতে সমাজে সংহত সত্যের ও স্পষ্টীভূত ভাবের বিকাশ, যাহা সহজেই বোধগম্য। কিন্তু সমাজ যখন গতিমান হইতে আরম্ভ করে, তখন এই গতির ধারা যাহার অনুভূতির মধ্যে আইসে না,—যিনি এ কথা বুঝিতে পারেন না যে, গতির সাফল্য লাভেই স্থিতির প্রয়োজন, যুগ-চরিত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহার সাহিত্য বাস্তব বর্জ্জিত হইয়া পড়ে। শুধু মেঘনাদ বধ অথবা বৃত্রসংহার নহে, এমন কি বঙ্কিমের গদ্য-সাহিত্যেও দেখিতে পাই, তিনি যেন তাঁহার ভাব-রাজ্যের কেন্দ্র স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি একটা অস্পষ্ট আদর্শ-সাধনায় ব্যাপৃত,—কখন বা গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম, কখন বা রামায়ণের গার্হস্থ্য নীতি, কখন বা বাক্তিদের উপাসনা কোমতের মানব-ধর্ম্মবাদ। কিন্তু এ সবগুলির সামঞ্জস্য করিয়া বাস্তব সমাজের ব্যবস্থোপযোগী করা তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। এক দিকে যেমন চিন্তার প্রসারতা ও সর্ব্বতোমুখী গতি চাই, অন্য দিকে তেমনই ভাব ও চিন্তাকে সুনিয়মিত করিয়া বাস্তব জীবনের সম্ভাব্যের মধ্যে উপলব্ধি করিতে হয়। সাহিত্যিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের এ দোষ তত বড় নহে, যে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন করিতে পারেন নাই,—যত বড় তাঁহার দোষ যে, প্রাচ্যের ভাব ও আদর্শ বাস্তব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, আমাদের জীবনের স্বাভাবিক পরিণতির দিকে লক্ষ্য করেন নাই, কালের বিচিত্র শক্তিতে যে অতীত বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া বিকাশোন্মুখ পুষ্পের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছে, তাহা তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই। এবং এই দোষে বঙ্গ-সাহিত্য বহুস্থলেই দুষ্ট,—এমন কি রবীন্দ্রনাথও ইহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন।

সাহিত্য আকাশে জাল বোনা নহে,—ইহা দেশের জল ও মাটী হইতে উদ্ভূত। ইহার মধ্যে প্রাণের বেগ চাই, স্বভাবের পরিণতি চাই। যাহা ছিল না তাহা হইতে কিছু হয় না, যাহা আছে তাহাই ফুটিয়া উঠে। যে জীবন আমাদের ধমনীতে-ধমনীতে প্রবাহিত, যাহার বহিঃ-প্রকাশ আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম, যাহা কেবল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নহে,—অতীতের জীর্ণ শাস্ত্রের মধ্যে যাহার অস্তিত্ব নাও ধরা পড়িতে পারে,—সেই জীবনের সত্য গভীর ভাবে উপলব্ধি না করিয়া কল্পনা-শক্তি চালনা করিলে, সাহিত্য শুধু অমূর্ত্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের সব-চেয়ে বড় সমস্যা এই যে, জীবনের সঙ্গে সত্যের

বিচ্ছেদ হইয়া সত্যোপলব্ধি করিবার ক্ষমতাই কমিয়া গিয়াছে; এবং সেই জন্যই জীবনের স্বাভাবিক গতি খুব অল্প লোকের নিকটেই ধরা পড়ে।

আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে প্রায় সর্ব্বত্রই কম বেশী এই দোষ পরিলক্ষিত হয়। আমরা সাহিত্যকে এতই রস-বস্তু করিয়া ফেলিয়াছি যে, অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই, বাস্তবের নির্য্যাসই প্রকৃত রস। আবার অন্যদিকে, বাস্তব যে কি তাহাও ঠিক বুঝি না; দৃশ্যমান জগৎকেই একমাত্র বাস্তব বলিয়া মনে করি। এ কথা ভাবিয়া দেখি না যে, প্রত্যেক সত্তার পশ্চাতে,—তাহা অন্তর্জগতেরই হউক, আর বহির্জগতেরই হউক,—অদৃশ্য শক্তির বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে;—এবং এই বেগেই সমস্ত জগৎ রূপ হইতে রূপান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই রূপের দিকটাই যাঁহারা আঁকড়িয়া ধরেন, তাঁহাদের মন সংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহারা বদ্ধমূল ধারণার এতই বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন যে, অধ্যাত্ম চেতনা পরিস্ফুট হইতে পারে না। জ্ঞান ও বুদ্ধিকে স্থূল সত্য এবং তথ্যকে কেবল মাত্র বাস্তব মনে করিয়া, বৃহত্তর বাস্তবের অনুভূতি-লাভ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হয়েন।

আমাদের অনেক সমালোচক বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বস্তুতন্ত্রহীন। প্রাণের চেয়ে দেহকেই যদি বড় মনে করিতে হয়, সমাজের গতির চেয়ে স্থিতির দিকটাই যদি বেশী করিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বাস্তব বর্জ্জিত। সুপ্ত চেতনা জাগাইয়া যিনি সুদূরের বাণী শ্রবণ করেন, সমাজ তাঁহাকে স্বপ্নাবিষ্ট বলিয়া মনে করে; কারণ, সাধারণ মানুষের চক্ষে যাহা জড়, যাহা স্থূল পিণ্ড, তাহাই বাস্তব। সমাজের যে আচারনিষ্ঠা, ধর্ম্ম ও নীতি-ব্যবস্থা প্রাণ শক্তি হারাইয়া স্থাণু, অচল, জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সেগুলিকেই যদি বাস্তবের চিহ্ন মনে করি, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথে বহু স্থলেই তাহা নাই। কিন্তু প্রাণের সচল গতি যদি ইহার চেয়ে বড় বাস্তব হয়, তাহা হইলে তাঁহার রচনার অনেক জায়গায় যেরূপ স্পষ্ট অধ্যাত্ম-বোধ আছে, জীবনের পরিণতির প্রতি তাঁহার যেরূপ লক্ষ্য দৃষ্ট হয়, ভাব জগতের সঙ্গে কর্ম্ম-জগতের প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে অন্য কোথাও দুর্লভ। প্রজ্ঞার আলোকে যাঁহার অনুভূতি সর্ব্ব-সত্তার অন্তর্নিহিত শক্তির সহিত যুক্ত হইবার প্রয়াসী হইয়াছে, তাঁহাকে বুঝিতে হইলে একটুখানি অন্তর্দৃষ্টি দরকার।

সাহিত্যের বাস্তবতা বৈজ্ঞানিক বাস্তব হইতে ভিন্ন। বিজ্ঞান জিনিসের একটা দিক, তাহার প্রকাশের দিক, ভাল করিয়া বুঝিতে চায়; এবং এই প্রকাশের দিক স্পষ্ট করিয়া ধরিবার জন্য তাহাকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়া, স্থিতিমান করিয়া দেখে। বৈজ্ঞানিক তথ্য নিরূপণ করিতে হইলে, জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিচালন পূর্ব্বক জিনিসের বাহ্য-প্রকাশ তলাইয়া দেখিয়া লইতে হইবে। বাহিরের দিকটা কোথাও বাদ দিলে বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই বাহ্য-প্রকাশের উপর মূলতঃ স্থাপিত বলিয়া, বৈজ্ঞানিক সত্য, যতই বিস্তৃত হউক না কেন, সত্যের খণ্ড রূপ। সাহিত্যিক খণ্ড-সত্যে পরিতৃপ্ত নহেন। তিনি সমগ্র ভাবে দেখিতে চান। বাহ্য-প্রকাশ তাঁহার নিকট ততটা মূল্যবান, যতটা ইহা অন্তরের স্বরূপ ব্যক্ত করে। তাই তিনি দৃশ্যমান জগতের ভিতর অদৃশ্য শক্তির সন্ধানে আছেন,—স্থূল সত্য এবং তথ্য ডিঙ্গাইয়া প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাস্তব তত্ত্বের আলোচনা, যুক্তি ও তর্ক কখনই সাহিত্য হইতে পারে না; কারণ, ইহারা খণ্ড সত্য লইয়া ব্যস্ত,—সত্যের একটা দিক, জ্ঞানের দিক ধরিবার জন্য চেষ্টিত। এই জন্য সাহিত্য অনেকটা অনুভূতির বিষয় হইয়া পড়ে। ইহার নিম্ন স্তরে জ্ঞান ও সমালোচনা; কিন্তু যতই উচ্চ স্তরে উঠা যায়, ততই বিশ্লেষণ ও সমালোচনা নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। সাধারণ মানুষের নিকট যাহা জড়, যাহা অচল, সাহিত্যিকের কাছে তাহা চলৎশক্তি পাইয়া গতিমান হইয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক ইতিহাস শুধু বিশ্লেষণ এবং তত্ত্বানুসন্ধান;—সাহিত্যিকের কাছে তাহা প্রাণপূর্ণ, সচল হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চ শরে ভস্ম করিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে পঞ্চ ভূতে লয় করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু আজ তাহার কথা বকুল-তরু-পল্লবে মর্ম্মরিয়া উঠিয়াছে, ভ্রমরের গুঞ্জনে শোনা যাইতেছে, নির্ঝরিণীর ধারায় তাহার পিপাসা নির্ঝরিত হইতেছে, তাহার পরশ পুষ্পবাসে পরাণ মন 'উল্লসি' হৃদয়ে লতার মত জড়াইয়া উঠিতেছে। বাস্তবের দুই-একটা স্থূল প্রকাশ বাছিয়া লইয়া সাহিত্যিক তাহাকে প্রাণের গতির সহিত নিবদ্ধ করিয়া দেন। বাস্তব তাহার জড় পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া বিহঙ্গমের মত ঊর্দ্ধে ছুটিয়া চলে। যাহা অনিত্য তাহা নিত্য হইয়া যায়, এবং সর্ব্বব্যাপ্ত, অখণ্ড সৌন্দর্য্যের অনুভূতি তাহার চতুর্দ্দিকে ঠিকরিয়া পড়ে।

বাস্তবিক সত্য এবং তথ্য সাহিত্যের দেহ,—অনুভূতিই তাহার প্রাণ। সাহিত্যের বাস্তবতা এ দুইয়ের সংযোগ, অন্তরের সহিত বাহিরের উদ্বাহ-বন্ধন। ইহার একটা বাদ দিলেই খণ্ড সত্য হইয়া যায়—সাহিত্যে তাহার স্থান নাই। পূর্ণ সত্য মানুষের অজ্ঞাত কি না জানি না;—প্রজ্ঞার জ্যোতিঃতে কোনও দিন তাহাকে ধরিতে পারিব কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু ইহার সন্ধানই আমাদের চিরন্তন ধর্ম্ম। আমরা দেহও চাই, প্রাণও চাই। জ্ঞান ও বিজ্ঞান আমাদিগকে যাহা দিয়াছে তাহা অমূল্য; তবুও মানবাত্মা তুষ্ট নহে—সে সমগ্র ভাবে, ব্যষ্টি ভাবে পাইতে চায়। শত ব্যর্থতার মধ্য দিয়া, কত আকুলি-বিকুলি করিয়া, আঁধারে হাত বাড়াইয়া আলোর জন্য কাঁদিয়া মরে। সেই বিশ্ব চরাচরের নিয়ন্তা—তিনি কি তাঁহার একটী রশ্মিও আমাদের নয়ন-পথে ফেলিবেন না? সাহিত্যিক কি তাঁহার প্রাণ দিয়া আমাদের সত্য এবং তথ্যকে কোনও দিনই পূর্ণ করিয়া দিতে পারিবেন না? শুধু জ্ঞানে নহে, প্রজ্ঞায় সমুজ্জ্বল হইয়া, বহু কাল বিচ্ছেদের পর সাহিত্য কি আবার ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া এক হইয়া যাইবে না?

ইমান্‌দার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

নবম পরিচ্ছেদ

ভুবন ও শ্যামলের দ্বন্দ্ব-বিদ্রূপে কোন সাড়াশব্দ না দিয়া, গুমু হইয়া—শ্যামলের কাঁধটা বেশ শক্ত হাতেই চাপিয়া ধরিয়া ফৈজু চলিতেছিল। ফৈজু সহসা এমনি স্তব্ধ, গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল যে, শ্যামলের জিভ্‌টা ভিতরে-ভিতরে অত্যন্ত চুল্‌কাইতে থাকিলেও, ভয়ে সে কথা কহিতে পারিতেছিল না। অন্ধকারে চলিতে-চলিতে কিছু দূর গিয়া শ্যামল একটা ছোট ঠোকর খাইয়া বলিল "উঃ!"

এবার ফৈজু সচেতন হইয়া হাসিয়া বলিল, "সামাল্!"

ফৈজুকে কথা কহিতে শুনিয়া শ্যামল ধড়ে প্রাণ পাইয়া বাঁচিল; উৎসাহিত হইয়া বলিল, "ভাখো ফৈজু মামু, তুমি বিদেশে চাকরী করে এসে শ' কতক টাকা জমিয়েছ কি না, তাই গাঁ-শুদ্ধ সবাইকার চোখ টাটিয়ে উঠেছে,—বিশেষ নজরু সাহেব তোমার তারীই হিংসে করে!"

ফৈজু বলিল "করুক্, তাতে আমার বেশী শোক লাগ্‌বে না। কিন্তু আমি ভাব্‌ছি—তুমি যে ওদের আড্ডায় গান গাইতে যাও—তা তাড়িটাড়িও খেতে ধরেছ না কি?"

লাফাইয়া উঠিয়া শ্যামল উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কক্ষোণো না, কোন শা—' কোন '—' মিছে কথা বল্‌ছে! তুমি চল, আমি মার পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর্‌ছি—আমি কখ্‌নো তাড়ি খাই নি—তামাক পর্য্যন্ত খাই নি!"

ফৈজু বলিল "ঠিক বল্‌ছ?"

দৃঢ় স্বরে শ্যামল বলিল "ঠিক! তুমি নজরুকে জিজ্ঞাসা কোরো—ও যদি বলে আমি তাড়ি খেয়েছি, তা'হলে তুমি আর আমার মুখ দেখো না!"—তার পর একটু থামিয়া, দারুণ দুঃখ-ভরা অনুযোগের সুরে বলিল, "হুঁ! তুমি কি যে বল ফৈজু মামু—আমি তাড়ি খাব? তা'হলে মা আর কখনো আমার হাতে ভাত খাবে? মা খলে আমায় পই-পই করে বলে রেখেছে, তবু আমি তাড়ি খাব?"

ফৈজু অন্ধকারেই গোপন হাস্য করিয়া, গম্ভীর ভাবে বলিল, "কি জানি বল,—অমন সব বন্ধুদের আড্ডায় মিশ্‌তে শিখেছ,—গানের তাড়সে গলা শুকিয়ে গেলে, যদি দুএক চুমুক বন্ধুরা খাইয়ে থাকে, বিশ্বাস তো নাই,—তাই জিজ্ঞেসা করছি। সৎসঙ্গেই স্বর্গ বাস হয়,—বন্ধুদের দৌলতে তুমিও যদি স্বর্গ টা বেড়িয়ে আসবার লোভ না সাম্‌লাতে পেরে থাক, তবে—"

ক্রুদ্ধ হইয়া শ্যামল বলিল, "ঝাড়ু মারি অমন বন্ধুকে! ঝাড়ু মারি অমন স্বগ্‌গে!—লোভে পড়ে আমি তাড়ি খাব? শ্যামল দুবে অমন জিভ্‌ভেই রাখে না! ভাখো ফৈজু মামু—খেতে না পেলে, আমি চুরি করতে পারি, ডাকাতি করতে পারি—কিন্তু লোভে পড়ে মদ কোন দিন

খাবো না,—আর মা ভেবে ভিন্ন কোন দিন কোন মেয়ে-মানুষের মুখ পানে চাইব না,—এই আমার মার হুকুম! মরে যাই, সো-ভি-আচ্ছা, জান কবুল,—মার কথা রাখ্‌বই!"

হঠাৎ ফৈজু দু'হাত বাড়াইয়া শ্যামলকে জড়াইয়া ধরিয়া, হাসি-ভরা আদরের সুরে বলিল—"এস তো মাম, একবার এই বাড়ীটার ভেতর!"

চমকিয়া শ্যামল দেখিল—সর্ব্বনাশ! কথাবার্ত্তায় ভুলাইয়া ফৈজু একেবারে তাহাকে জমীদার-বাড়ীর সদর দেউড়ীর কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে! ফৈজুর হাত ছাড়াইবার চেষ্টায় টানাটানি করিয়া, ব্যতিব্যস্ত হইয়া শ্যামল বলিল, "আবে না-না, তাই কি হয়, বাড়ীর ভেতর যাব না!"

ফৈজু দৃঢ় বেষ্টনে শ্যামলকে জড়াইয়া ধরিয়া,—হাসি মুখেই বলিল, "আহা হোক, হোক—লজ্জা কি? একবার এসই না হে,—মার ওপর রাগ হয়েছে,—না হয় মার সঙ্গেই কথা কইবে না। তা হলেও, মামাবাবু বাড়ীতে এসেছেন,—তাঁর সঙ্গে দেখাটা করা চাই, চল—চল।"

শ্যামল বিস্তর আপত্তি করিয়া, লজ্জায় অধীর হইয়া, ফৈজুর বাহু বেষ্টনের মধ্যেই তিড়িং-তিড়িং করিয়া নাচিয়া—আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রাণপণে পলায়নের চেষ্টা করিল। ফৈজু বর্শাটা ছুঁড়িয়া সদরের প্রাঙ্গণে ফেলিয়া দিয়া, শ্যামলকে পাজাকোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া—সটান বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল "ছোট বাবু!"

নীচের বারেণ্ডায় সুনীল ছিল, সে বলিল "কে, ফৈজু? এস—এইখানে।"

বারেণ্ডার মাঝখানে সতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়া সুনীল মণ্ডল মশাইকে লইয়া জমীদারী-সেরেস্তার কাগজ পত্র কি সব দেখিতেছিল। অদূরে একটা আসনে বসিয়া পিসিমা মালা জপ করিতেছিলেন। নিকটে সুমতি দেবী মালা হাতে লইয়া বসিয়া সুনীলের সহিত জমীদারী সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। ফৈজু তাঁহাদের সামনে আসিয়া, ঝুপ্‌ করিয়া শ্যামলকে নামাইয়া দিয়া, সহাস্য দৃষ্টিতে সুনীলের দিকে চাহিয়া বলিল, "একে চিন্‌তে পারেন?"

মণ্ডল মশাই জমীদারী সেরেস্তার কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওমা! উনি? উনি যে আজকাল শ্যাম গোঁসাইয়ের বাড়ীতে রাঁধুনী হয়েছেন! কেমন রান্না শিখে এলে ঠাকুর? কেমন রান্না?"

নিস্তব্ধ শ্যামল ক্ষুণ্ণ-অপ্রতিভ ভাবে, পেঁপে দুইটার পানে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ফৈজু যখন তাহাকে তুলিয়া আনে—তখন পেঁপে দুটি পাছে নষ্ট হইয়া যায়—সেই ভয়ে সে সযত্নে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছিল—এখনো সে দুটি তেমনি ভাবে বুকের মাঝে বিরাজ করিতে লাগিল। হাত নামাইতে শ্যামলের ভারী লজ্জা বোধ হইল। মণ্ডল মশাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তো পরের কথা!

শ্যামলকে কুণ্ঠিত-নির্ব্বাক দেখিয়া সুনীল স্মিতহাস্যে বলিল, "দিদির পুষ্যিপুত্র—না,—না, ভিক্ষেপুত্র বুঝি,—উনি আবার ছেলেদের থিয়েটারের দলে ঢুকেছেন শুন্‌ছি না? মাণিককে তুমি কোথায় কুড়িয়ে পেলে ফৈজু?"

শ্যামলের কাঁধে সস্নেহে হাত চাপ্‌ড়াইয়া, ফৈজু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দিদিমণি বুঝি ছেলেকে নিজের পথ খুঁজ্‌তে বলেছিলেন, তাই সাবালক ছেলে পথ দেখ্‌তে গেছেন! আমি গিয়ে দেখি—মাণিক আপনার নদীর বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে,—গয়লা দিদির বাছুরটিকে বন্ধ করে সামনে বসিয়ে থিয়েটারের গান শেখাচ্ছেন!"

সুনীল হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কেন? সেটাকেও থিয়েটারের দলে ভর্ত্তি করে নেবার মতলব না কি? হাঁ শ্যামল?"

শ্যামল কোন কথা না বলিয়া, অনুযোগ ভরা দৃষ্টিতে একবার ফৈজুর মুখ পানে চাহিল। তার পর দুম্‌ করিয়া পেঁপে দুটা সুমতি দেবীর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া, গম্ভীর মুখে প্রস্থানোদ্যত হইল। কিন্তু সতর্ক ফৈজু মুহূর্ত্তে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, হাসিমুখে বলিল, "আহা, থাম,—থাম, এত তাড়াতাড়ি কেন? এলে যখন, একটু দাঁড়াও,—যাবেই তো! এত কষ্ট করে তোমার মার জন্যে পেঁপে দুটি জোগাড় করেছ, মাকে একবার বলে যাও—কেমন করে ওদের বালির গাদায় লুকিয়ে রেখে, এতক্ষণ ধরে বসে-বসে পাহারা দিচ্ছিলে,—বল হে—"

সুনীল বিস্ময়-উৎসুক হইয়া বলিল "কি? কি? বালির গাদায় পেঁপে লুকিয়ে রেখেছিল, কি রকম?"

ফৈজু সংক্ষেপেই শ্যামলের গোঁসাই-বাড়ী হইতে পলায়ন

ও পেঁপে ভক্ষণের বৃত্তান্তটা বলিয়া—সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে সুমতি দেবীর পানে চাহিয়া, প্রসন্ন-স্মিত মুখে বলিল, "আপনার হুঁসিয়ার ছেলের এ দিকে হিসেব খুব! নিজে একটি পেঁপে খেয়ে আপনার জন্যে আগে দুটি পেঁপে রেখে দিয়েছে —পাছে আপনার না কুলোয়! তার পর কাল যে আপনার সোমবার সেটুকুও কর্ত্তা ভোলেন নি। তাই আজই আপনার কাছে ও-দুটো পৌঁছে দেবার জন্যে সে জরুর তাগিদ যদি দেখ্‌তেন্!" ফৈজু শ্যামলের মুখপানে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল।

পিসিমা জপের মালা কপালে ঠেকাইয়া, ছলছল দৃষ্টিতে শ্যামলের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে আবাগীর ব্যাটা, মাকে যে এত ভালবাসিস্—তা মার কথা শুনিস্ না কেন?"

শ্যামল চুপ করিয়া, নিজের পায়ের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে ঘাড় চুলকাইতে লাগিল। কোন উত্তর দিল না।

সুমতি দেবী এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া একদৃষ্টে শ্যামলের মুখ পানে চাহিয়াছিলেন; এইবার জল ভরা চোখে, রাগ ভরা স্বরে বলিলেন, "সে শুনলে যে মাথায় বজ্রাঘাত হবে! নয়?"

শ্যামল এতক্ষণ অচল, অটল, স্থির হইয়া সকলের হাস্য পরিহাস সহ্য করিতেছিল,—কিন্তু এবার আর পারিল না! এবার—সুতীব্র অভিমানে তাহার চোখে যেন জল 'আসি-আসি' করিয়া উঠিল! কিন্তু এত লোকের সামনে তো চোখে হাত দিয়া দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা চলে না! কাযেই তাড়াতাড়ি অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডান কাঁধটা ঠেলিয়া চিবুকের নীচে ঘষিতে-ঘষিতে—উপর্য্যুপরি ঢোক গিলিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "আমি বলেছি সে কথা আপনাকে?"

সুমতি দেবী কি একটা কথা বলিতে গিয়া থামিলেন। আঁচলের খুঁটে চোখ পরিষ্কার করিয়া, ঢোক গিলিয়া ঈষৎ ক্ষোভ-তপ্ত স্বরে বলিলেন, "আমার শতেক জন্মের ঋকুমারী, —তাই কুক্ষণে এই গয়ার পাপকে ঘাড়ে করে দেশে নিয়ে এসেছিলুম! তখন কি জানি যে, সেই আট বছরের ছোট্ট ছেলেটি ষোল বছরের হয়ে, এমন বদ্‌মাইস্ হয়ে উঠবে! এমন করে আমার হাড় জ্বালাতন্ করবে? তা'হলে সেই-খানে—রেলের ধারে বসিয়ে রেখে আস্‌তুম্; তার পর গোবিন্দ তোমার বরাতে যা লিখেছেন তাই হোত!"

সুনীল হাসিয়া বলিল, "তাই-ই হয়েছে দিদি, গোবিন্দ ওর বরাতে কুল, বেল, পেঁপে পেড়ে এনে তোমাকে দেবার কথাই লিখেছিলেন। আজ ওর ওপর রাগ করে আর কি হবে? এখন আপাততঃ তোমাদের মাতা-পুত্রে কিসের জন্যে বিবাদটা হয়েছে শুনি?"

সুমতি দেবী বলিলেন, "উনি আজকাল একজন মস্ত বিজ্ঞ মানুষ হয়ে উঠেছেন,—সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়ানই ওর ব্যবসা হয়েছে,—ঝি বাসন মাজতে আসবে, তার সঙ্গে ঝগড়া,—রামটহল বাজার করে আনবে, তার সঙ্গে ঝগড়া,—সদ্দার সিধে নিতে আসবে, তার সঙ্গে ঝগড়া!"

বাধা দিয়া ফৈজু সবিস্ময়ে বলিল, "আমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া?"

সুনীল ততোধিক বিস্মিত হইয়া বলিল, "শ্যামল সদ্দারের সঙ্গে ঝগড়া করে? বল কি দিদি! কি কথা নিয়ে ঝগড়া করে?"

মণ্ডল মশাই হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক! সে ঝগড়া আমি শুনেছি। সদ্দারকে জিজ্ঞাসা করবে 'সদ্দার, তুমি নমাজ পড় কেন? রোজা রাখো কেন? তুমি খোদাকে কখনো দেখেছো?—' এই সব। তবে সদ্দার তো ওকে চেনে,—সে ওর কথার জবাব দেয় না, কাজেই সেখানে ঝগড়াটা পাকায় না। চলে রামটহলের সঙ্গে। সেদিন বেচারা বসে ভাত রাঁধছে, আর তার মুখের কাছে গিয়ে, দু' কাঠি বাজিয়ে গান জুড়ে দস্তুরমত ধমক হাঁকছে—'বাজা তুরী ভেরী, বল হরি হরি'—এই আর কি। রামটহল রেগে টং! শ্যামল এক মজার ছেলে বটে!" মণ্ডল মশাই আবার হাসিয়া উঠিলেন। সুনীলও হাসিতে লাগিল।

সুমতি দেবী বলিলেন,—"শুধু তাই! পিসিমা মালাটি হাতে নিয়ে বস্‌লেই—দুটি বেলা, অমনি ছুটে এসে ঝগড়া জুড়ত! পিসিমার হরিঠাকুর আস্ত, কি হাত-পা-ভাঙ্গা নুলো, ঠুঁটো—সেটা জেনে ওর কি চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে, তোরা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারিস্ সুনীল! সাধে ওর ওপর আমি চটেছি? রাত-দিন ছুতো করে ঝগড়া বাধিয়ে বেড়াচ্ছে! আমার জপ নাই, আহ্নিক নাই, মালা নাই, স্তব নাই, স্তোত্র নাই,—রাতদিন শ্যামলের ঝগড়ায় আমার কাণ ঝালাপালা! আবার তার ভেতরই মাঝে-মাঝে হুজুগ উঠ্‌ছে,—'মা, আমি ফৈজু মামুর মত দেশ-ভ্রমণ

করতে যাব!' 'মা, আমি কলকাতায় মামাবাবুর বাসায় গিয়ে থাকব—আমায় রান্না শিখিয়ে দেন'—সে রান্না শেখার ঘটা-পটা কত! প্রাতঃকালে নদীতে ডুব দিয়ে এসে, 'সো-চুলে' 'সো-কাপড়ে' রান্না-ঘরে ঢুকে বলা হোল, 'মা, আমি পবিত্র হয়ে এসেছি, সরুন—আমি রান্না শিখি!' সুমতি দেবী রাগের মধ্যেই হাসিয়া ফেলিলেন। শ্যামলের দিকে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"হতভাগা! রাগ করে রান্না শিখ্‌তে গেছেন!"

পিসিমা বলিলেন, "ঐ রান্না শিখ্‌তে পায় নি বলেই তো মার ওপর রাগ করে সে দিন ঠিক দুপুরের সময় উঠোনের তপ্ত-শানে পড়ে' গড়াগড়ি দিচ্ছিল। তা' আমি বারণ করলুম বলে' এই আর কি—আমার সঙ্গে ঝগড়া! আমায় বল্লে 'আমি বেশ করবো, খুব করবো—আমার যা খুসী তাই করবো। আপনার কি,—আপনার কেন চোখ টাটায়⋯⋯"

সুমতি দেবী বলিলেন, "কাযেই আমার রাগ হোল। আমি আহ্নিক করে উঠে গিয়ে বল্লুম, 'দেখো শ্যামল, আমার পিসিমা বুড়ো মানুষ, তাঁর সঙ্গে তুমি যে মুখে মুখে উত্তর করবে, সে আমার ভাল লাগবে না। তা' এখানে থেকে তোমায় অত দস্যিপনা করতে হবে না, তুমি নিজের পথ ছাখো!' তাই ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে, ঠক্ ঠক্ করে বেরিয়ে চলে গেলেন! আর কথা পর্য্যন্ত কইলেন না!"

সুনীল, মণ্ডল মশাই ও ফৈজু হাসিল; এবং গোঁসাই-বাড়ীতে রাঁধিয়া, ত্রিরাত্রির মধ্যে শামল কেমন করিয়া রন্ধন-বিদ্যায় মহা পারদর্শিতা লাভ করিয়া, একবারে সটান্ নদীর গাবায় গিয়া 'নিজের পথ'টা খুঁজিয়া আবিষ্কার করিল, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র-যুক্তি-বহির্ভূত অনেক আশ্চর্য্য প্রশ্ন শ্যামলের উপর বর্ষিত হইল। শ্যামলচাঁদ—অবিচলিত চিত্তে নয়—খুব বিচলিত চিত্তেই, অতি কষ্টে রসনা সম্বরণ করিয়া, সেগুলা নিঃশব্দে পরিপাক করিল। সুনীল ও মণ্ডল মশাই উঁচু গলায় হাসিতে লাগিল। ফৈজু মুখ টিপিয়া সে হাসিতে যোগ দিল। পিসিমাও নিরস্ত রহিলেন না।

সুমতি দেবী রাগ করিয়া,—তাঁহার 'গয়ারং পাপ'টির উদ্দেশে আরো গুটিকতক কটু-কাটব্য বর্ষণ করিলেন। তার পর, কি অশুভক্ষণেই যে এই পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুকে দেখিয়া তাঁহার মনে স্নেহ-সঞ্চার হইয়াছিল, সেজন্যও কিঞ্চিৎ আক্ষেপ ও অনুতাপ প্রকাশ করিলেন। সুনীলকৃষ্ণ এবার সকৌতুকে হাসিয়া বলিল, "কেন দিদি, তুমি তো শঙ্করাচার্য্যের চেলা—যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ"—এ তো তোমার গুরু-আজ্ঞা। তবে তোমার এই দুরন্ত ছেলেটির মাঝে ব্রহ্ম দর্শনে পেছুচ্ছ কেন?"

সুমতি দেবী একটু হাসিয়া বলিলেন, "ছেলেই ব্রহ্ম; কিন্তু ছেলের দুরন্তপনাটা তো ব্রহ্ম নয়! আমার গুরু এ কথাও বলে গেছেন যে, যখন ব্রহ্মের ঘাড়ে ব্রহ্মদৈত্য চড়ে বস্‌বে, তখন খবরদার তাকে অস্বীকার কোর না। তবে? না হলে, আমার সেজ দেওর আজ বিধবার বিষয়টুকু কেড়ে নেবার জন্যে যে কীর্ত্তি করে বসেছেন, তাকে তো ভাই "নির্ব্বিকার তয়া বৃত্তা" ব্রহ্মের লীলা বলে মেনে নেওয়া উচিত!—চুলোয় যাক সে তর্ক—হরিবোল, হরিবোল—" হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুমতি দেবী জপের মালা কপালে ঠেকাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "চল শ্যামল, ওবেলার ভাত আছে হাঁড়িতে, খেতে দিই গে তোমায়, চল। হাত পা ধুয়ে এস।"

এতক্ষণে শ্যামল একটু রাগ প্রকাশ করিবার ফুরসুৎ পাইল। সে তৎক্ষণাৎ ঘাড় বাঁকাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি আর এখানে খাব না, আমি ফৈজু মামুর বাড়ী যাচ্ছি!"

ফৈজু হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তাই তো বটে!—আমি যে ঐ বলেই মামুকে ধরে এনেছি! তা সেই ভাল কথা, চল মামু আজ আমিই তোমাকে 'নাস্তা' খাওয়াব!"

আবার এক চোট বিদ্রূপ-পরিহাস শ্যামলের ঘাড়ে বর্ষিত হইল। সুমতি দেবী আবার খুব এক প্রস্ত বকিলেন। তার পর সত্বর শ্যামলকে রান্নাঘরের সামনে উপস্থিত হইবার আদেশ জ্ঞাপন করিয়া, রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। শ্যামল ফৈজুর ঠেলা খাইয়া এবার নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।

পিসিমাও উঠিলেন। ক'দিনের পর 'পোড়া-কপালে' ছেলেটা আজ যখন বাড়ীতে আসিয়াছে, তখন তাহাকে কিছু দুধ, খেজুরে গুড়ের পাটালি এবং কলিকাতা হইতে আনানো কমলালেবু দিতে যেন ভুল না হয়, সেই ব্যাপারের খোঁজ-তল্লাস করিতে তিনি মালা জপিতে-জপিতে চলিলেন।

ফৈজু বলিল, "সঙ্কটপুরের আর কোন নূতন খবর পান নি ছোট বাবু?"

একটু বিমর্ষ হইয়া সুনীল বলিল, "কিছু না! এঁরা ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত কার কাছেই বা খবর পাব?"

মণ্ডল মশাই বলিলেন, "আর কিছু না,—সামনেই আমাদের চৈৎ-কিস্তির আদায়, এই সময় সঙ্কটপুরের বাবুরা এমন সঙ্কট বাধিয়ে বস্‌লেন,—এখন আমরা নিজেদের এষ্টেট্‌ সাম্‌লাই, না—দিদির বিষয় দেখি,—বড় মুস্কিল হোল ফৈজু!"

একটু ক্ষুব্ধভাবে ফৈজু বলিল, "বড় মুস্কিলই বটে, মোড়ল মশাই!"—একটু থামিয়া সুনীলের মুখপানে চাহিয়া ফৈজু বলিল, "আপনার ছুটি ক'দিন আছে, ছোটবাবু?"

সুনীল নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পরশু সরস্বতী পূজা, তার দু'দিন পরেই কলেজ খুল্‌বে—আর কি! আমায় দেখ্‌ছি এবার কামাই করতেই হবে,—না হলে নিস্তার নাই!"

সুমতি দেবী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কিসে নিস্তার নাই রে? কি হোল?"

সুনীল বলিল, "এই তোমার জয়দেবপুর মহলের কথা বল্‌ছি,—ওই ফ্যাসাদে আমার পড়া-শুনোর বড় ক্ষতিই হবে দিদি! আঃ! বিপদ কি মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে!"

সুনীলের সকরুণ মুখখানির পানে চাহিয়া সুমতি দেবী একটু ম্লান হাসি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "আঃ! তুই কেন অত ভয় পাচ্ছিস সুনীল? ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য—এটা আমি খুব মানি। না হয় বিষয় হাত-ছাড়াই হয়ে যাবে; তাতে এত দুঃখ কেন? আমার শ্বশুরের সম্পত্তি—থাকলে, আমি লোককে হাত তুলে দু'-পয়সা দান করতে পারতুম্‌; না হয় সেই পথ বন্ধ হয়ে যাবে। হোক,—সেও ভগবানের ইচ্ছা বলে যেন সন্তুষ্টচিত্তে সয়ে যেতে পারি। আর আমার ক্ষতি কি ভাই? তুই ভাবিস না অত,—থাক্‌গে ও ছাই-ভস্ম কাগজ দেখা। তুই তোর পড়বার বই এনে পড়্‌তে বস্‌। তোর মন ভাল হোক। মোড়ল মশাই, আপনি কাগজ গুটিয়ে নিয়ে উঠে পড়ুন তো!"

সুনীল বাধা দিয়া বলিল, "না;—না, ও কাগজগুলো দেখ্‌তে বলে গেছেন মিত্তির মশাই,—দেখে রাখি। চেষ্টা কর্‌তে হবে বৈ কি! অন্যায়ের জুলুম-বাজীই বা সইব কেন?"

একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া, সুমতি দেবী বলিলেন, "সইতে হয় রে;—জোর যার মুল্লুক তার! আমার জিভের জোর ছিল,—রাগ হোল, অমনি স্বচ্ছন্দে সেদিন শ্যামলকে বলে দিলুম, 'নিজের পথ দ্যাখো।' আজ ভগবান আমার ঘাড় ধরে বল্‌ছেন, 'নিজের পথ দ্যাখো'। এখানে কার ওপর জোর করব? কাজেই হাসি-মুখে বল্‌ছি, 'ভগবানের যখন তাই ইচ্ছা, তখন উচ্ছন্ন যাক বিষয়! তোরা ভাবিস না।"

সুনীলের অধর-প্রান্তে এবার একটু দুষ্টামীর হাসি ফুটিয়া উঠিল। ফৈজুর দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "নাও! দিদি বেগতিক দেখে 'ওড়া থই গোবিন্দায় নমঃ' বলে সত্ত্ব গুণে ত্যাগ স্বীকার করে বস্‌ল! কিন্তু তুমি যে তমো গুণের সঙ্গে লড়াই করবে বলে, আগে থেকেই কাঁচা মাথাটা জমা দিয়ে রাখ্‌লে ফৈজু! এখন সেটা খরচ করবার উপায় কি হয়?"

সলজ্জ স্মিত মুখে সসম্ভ্রমে ফৈজু বলিল, "কাযের মত কায পড়্‌লেই ওটা খরচ করা যাবে,—তাড়াতাড়ি কি? এখন আপনি কাগজটা দেখে রাখুন, আমি আসি! আসি দিদিমণি!"

সুমতি দেবী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "বাড়ী যাচ্ছ,—যাও।" তার পর কি একটা কথা মনে পড়ায়, একটু হাসিয়া বলিলেন, "খলিফা তোমায় ওবেলা দেখে নি ফৈজু?"

ও-বেলার কথা ফৈজুর মনে পড়িল। নত দৃষ্টিতে চাহিয়া, সলজ্জ মুখে ঘাড় নাড়িয়া ফৈজু নীরবে স্বীকার করিল, "হাঁ।"

একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুমতি দেবী স্নেহময় কণ্ঠে বলিলেন, "আহা, শোকা-তাপা মানুষ, ওকে দুঃখ দিও না ফৈজু,—যা বলে, কয়, ওর কথা শুনে চলো। তাতে ও-বেচারা যদি একটু শান্তি পায়—পাক না।" বলিয়া হরিনামের মালা লইয়া বাহিরে যাইতে-যাইতে, একটু ত্রস্তভাবে বলিলেন, "আজ তোমার বাবা বাড়ীতে নাই,—রাত্রে বৌ-দুটি শুধু বাড়ীতে। তুমি যেন বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেও না ফৈজু!" আদেশ জ্ঞাপন করিয়াই

তিনি অন্তর্হিত হইলেন,—ফৈজুর মতামত শুনিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন না।

মণ্ডল মশাই জনান্তিকে একটা অর্থ-সূচক কটাক্ষ হানিয়া হাসি মুখে বলিলেন, "এর মধ্যে বাড়ী যাওয়ার তাড়া কেন? কি এত কায পড়েছে হে ছোকরা তোমার? বস বলছি এখন, এই তো সন্ধ্যে!"

গোপন-লজ্জাহত ফৈজু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বসতে হুকুম দাও বস্‌ছি,—কিন্তু হাতে কাম গছিয়ে রেখেছ তুমিই জী,—মনে রেখো—তোমারই দেরী হবে।"

হাসিয়া মণ্ডল মশাই বলিলেন "ও, বটে;—বটে—আচ্ছা যাও। কাল বিকাল নাগাৎ যেন সব কাগজ তৈরী হয়ে যায়,—দেখো!"

ফৈজু অভিবাদন করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়াছে,—এমন সময় তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া, হাত-মুখ মুছিতে মুছিতে ঝড়-বেগে বারাণ্ডায় ঢুকিয়া শ্যামল বলিল, "ফৈজু মামু, দাঁড়াও,—আমিও তোমার বাড়ী যাব। সেইখানেই আজ থাক্‌ব।"

শ্যামলের উৎসাহ-উত্তেজিত কণ্ঠস্বর রান্নাঘরে সুমতি দেবীর কাণে পৌঁছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া বলিলেন, "শ্যামল, শুনে যাও।"

শ্যামল চলিয়া গেল। তার পর দুই মুহূর্ত্ত পরে ফিরিয়া আসিয়া সুগম্ভীর মুখে বলিল "ফৈজু মামু, কাল মা আমায় রান্না শেখাবেন। আজ আমি বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাব না,—তুমি চলে যাও।"

স্নেহময়ী সুমতি দেবী কেন যে শ্যামলের পথ আটকাইলেন, সেটা বুঝিতে ফৈজুর বাকী রহিল না। সলজ্জ মুখে বিনা বাক্যে সে দ্রুত পলাইল।

দশম পরিচ্ছেদ

পল্লীগ্রামের পাড়াঘরে অনেক জিনিসের অপ্রাচুর্য্য আছে, নাই শুধু একটি জিনিসের—প্রতিবেশীত্বে—ঘনিষ্ঠতায়! প্রতিবেশীর সম্পদে, বিপদে, সুখ-দুঃখের খোঁজ লইতে, ব্যক্তি-বিশেষের এতটুকু সদ্‌গুণের এতখানি প্রশংসা করিতে—এবং অন্য দিকে ব্যক্তি-বিশেষের একগুণ দোষের শত-গুণ কুৎসা-সমালোচনা গাহিতে—পল্লীগ্রামের সাধারণ সকলেরই উৎসাহ অসীম। আর, পল্লী-বাসী অসাধারণের দল আর একটু উঁচু চালে চলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশেষত্ব—'মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাঁণ্ডার'—প্রবাদের সার্থকতায়! সাধারণ পল্লীবাসীরা ইহাঁদের ভক্তির চেয়ে ভয়ই বেশী করিয়া থাকে।

ফৈজু নিজেদের বাড়ীতে পা দিয়া, বহু কণ্ঠের কোলাহল-কলরব শুনিয়া,—হঠাৎ বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। দেখিল, প্রতিবেশিনী নানী, দাদী, চাচি ও দিদি প্রভৃতি সম্পর্কের অনেকগুলি রমণী বাড়ীতে সমবেত হইয়া গল্প-গুজব করিতেছেন। বিদেশ-প্রত্যাগত ফৈজু বাড়ী আসিয়াছে, তাই সকলে দেখা করিতে আসিয়াছেন; এবং কেউ বা একবাটি দুধ, কেউ কিঞ্চিৎ হালুয়া, কেউ বা বাড়ীর গাছের একছড়া মর্ত্তমান রম্ভা, কেউ বা একটি নারিকেল, কেউ বা অন্য কিছু হাতে করিয়া আসিয়াছেন।

ফৈজু হাসি-মুখে যথাযোগ্য সম্ভাষণ সহকারে সকলের কুশল সুধাইল। কথায়-কথায় অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ক্রমে একে-একে অনেকেই বিদায় লইল। রহিলেন শুধু বুড়ী—নানী। এই নানী পূর্ব্বোক্ত নজিরুদ্দীন সাহেবের মাতামহী। সেই জন্যই ফৈজু প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে নানী বলিয়া ডাকিত। নজিরুদ্দীন সাহেব কিন্তু মাতামহীকে সে সম্বোধন-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া, বছর দুই হইতে স্রেফ 'ডাইনী-বুড়ী' আখ্যায় অভিহিত করিতে সুরু করিয়াছেন! বৃদ্ধার অপরাধ এই যে, তিনি সেই অসামান্য সদ্‌গুণশালী দৌহিত্র রত্নের মূল্য-মর্য্যাদার সম্যক্ সমাদর করিতে জানেন না! উল্টা আবার প্রতিবেশী-মহলে দৌহিত্রের নিন্দা করিয়া বেড়ান! তাই সুবোধ দৌহিত্র একদা ক্রোধবশে নানীকে 'ঘা-কতক' দিয়া, জন্মের মত 'আড়ি' করিয়া ফেলিয়াছে! নানীও তাই, সেই 'ষণ্ডা-গুণ্ডা' দৌহিত্রের মুখ-দর্শনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া, এখন নিজের কুটীরে—অন্য বিধবা মেয়ে ও ছোট দৌহিত্র দুটিকে লইয়া বসবাস করিতেছেন। বড়-মেয়ে—অর্থাৎ 'নজরুর' মা বাঁচিয়া থাকিলেও যাহা হউক হইত। কিন্তু তিনিই যখন মরিয়া গিয়াছেন, তখন 'অমন গুণের' নাতি রহিল আর গেল, তাহাতে বৃদ্ধার কি-ই বা আসিয়া যায়?—বৃদ্ধার ইহাই মত!

সকলে উঠিয়া গেলে, ফৈজুকে একান্তে পাইয়া বৃদ্ধা মন খুলিয়া মনের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন! নজিরুদ্দীনের পিতা খুব পরিশ্রমী ও সঞ্চয়ী কৃষক ছিলেন।

চাষ-আবাদে বৎসরের পর বৎসর খাটিয়া-খুটিয়া তিনি অনেকগুলি জমী-জমা ও নগদ টাকা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। 'নজরু' এখন উত্তরাধিকারী হইয়া, অকুতোভয়ে সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতেছে! তাহার 'আতর-গোলাপের' খরচ এখন মাসে পনের টাকা করিয়া লাগে। কিন্তু এদিকে যে তাহার ঘরে 'কাঁথায় ঘুঙুর বাজিয়া উঠিবার' উপক্রম হইয়াছে, সে তত্ত্ব কে জানে? 'নজরু' 'ছিয়াচার' না কি-এক রং-তামাসার দল খুলিয়া ইতিমধ্যে তিন-শো টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে,—আর ওদিকে তাহার স্ত্রী ছেঁড়া, পচা কাপড়ে উপর্য্যুপরি তালি লাগাইয়া, সেলাই করিয়া পরিয়া, কষ্টে দিন কাটাইতেছে! ছোট ছোট ছেলে তিনটে ছেঁড়া দোলাই গায়ে দিয়া, শীতে হি-হি করিয়া মরিতেছে,—'নজরুর' সে দিকে হুঁস নাই। সে চায় শুধু নিজের ভাল খাওয়া, ভাল পরা—আর অবাধে স্ফূর্ত্তি করিবার মত অফুরন্ত নির্ঝঞ্ঝাট অবসর। আর ঐ যে কে একটা—গয়লাদের মাসীর ধনে বড় মানুষ—জাহান্নাম-গামী সৌখীন ছেলে আছে,—সে তো অষ্টপ্রহর যেন নজরুকে উড়াইয়া লইয়া বেড়াইতেছে! তাহার দৌরাত্ম্যেই তো নজরুর মধ্যে যা কিছু 'চিজ' ছিল, সব একেবারে 'বরবাদ' হইয়া গেল! বৃদ্ধা আরও অনেক আক্ষেপ ও অশ্রুজল মোচন করিয়া, শেষে নিরুপায়-ব্যাকুলতা-মাখা করুণ স্বরে বলিলেন "হাঁ রে ফৈজু—ছোটবাবুকে বলে-কয়ে—তোরা ঐ 'ছিয়াচারের' দলটা কি ভেঙ্গে দিতে পারিস না?"

ফৈজু ততক্ষণে মাদুর বিছাইয়া, কাগজপত্রগুলা গুছাইয়া লইয়া, লিখিবার উদ্যোগ করিতেছিল। বৃদ্ধার মন্তব্য শুনিয়া, একটু হাসিয়া বলিল, "কেন ভাব্‌ছ নানি—ঐ দল তিন দিনেই আপনি ভেঙ্গে পড়বে। ঐ সব ফাজিল ছোকরার কায কি থিয়েটারের দল তৈরী করা—না চালানো! ওরা কাযের কি বোঝে? ওরা জানে হা-হা হো-হো করে চেঁচিয়ে গুলজার করতে! দু'দিন সখ্ হয়েছে, চেঁচিয়ে নিক্—এর পর দিক্‌দারী লাগ্‌লে হয়রাণ হয়ে নিজেরাই ছেড়ে দেবে।"

ফৈজু কলম তুলিয়া লেখায় মন দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু নানী ছাড়িবার পাত্রী নহেন,—আতঙ্ক-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া বলিলেন, "ওরে দাদা, শুধু তাই হলে কি ভাবি? ঐ যে বাবুদের মদনগোপালের বাড়ীতে একটা মোহন্ত মশাই এসেছে,—সেই যে ওদের নাচিয়ে দিয়ে আরো মাথা খাচ্ছে! তার জন্যে যে নজরুর ভিটে-মাটী উচ্ছন্ন যেতে বসেছে! সে কলকেতায় পোষাকের ফরমাস্ দিয়ে এসেছে। সেই তো সে দিন পঁচিশ টাকা একবার নিলে, আবার দশ, আবার পনের, আবার বত্রিশ টাকা না কত নিলে। ঐ হিসেব কর না, কত হয়। সেই কি কম টাকাটা নিয়েছে? আরো কত টাকা নেবে শুন্‌ছি। তা হলেই বল দেখি ফৈজু—এবার নজরুর ছেলেগুলো না খেতে পেয়ে মরবে তো?"

ফৈজু কলম রাখিয়া একটু ভাবিল। তার পর বলিল—"হাঁ, সেই গতিকই তো দেখ্‌ছি! আচ্ছা খোঁজ-খবর নিয়ে দেখ্‌ছি—সত্যি-মিথ্যে কি কত দূর। নজরুকেও বোঝাতে চেষ্টা করব। আচ্ছা নানি—মদনগোপালের বাড়ীর এ মোহন্ত কদ্দিন এসেছে? কেমন লোক, বল দেখি?"

দারুণ বিদ্বেষ-মাখা ঘৃণার স্বরে নানী বলিয়া উঠিলেন, "ভাগাড়! ভাগাড়! ভাগাড়!—বজ্জাতের হাড় মিন্‌সে। আবার ভেক নিয়ে বষ্টুম হয়ে ভেক্ দেখাতে এসেছে! বাবুদের যেমন খেয়ে দেয়ে কায নাই,—তাই তেলক ছাপা দেখ্‌লেই অমনি তাকে ধরে মোহন্ত করে দেয়!" নানী চোস্ত ভাষায় উক্ত মোহন্ত মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলিলেন—তার মধ্যে চরিত্রের বিরুদ্ধেই বেশী! ফৈজু গুম হইয়া শুনিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে নানীর বাক্য-স্রোত বন্ধ হইলে, ফৈজু চিন্তাকুল বদনে বলিল, "আচ্ছা নানি, তুমি ভেবো না,—আমি যতটা পারি, চেষ্টা করে দেখ্‌ব। নজরু আমার ভাই, তার ভালর জন্যে আমি যতটুকু পারব ততটুকু করব।"

কৃতজ্ঞ নানী অজস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া, এমন সোনার চাঁদ ছেলের জন্যে খোদার দোয়া প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "তুই গাঁয়ে বাস কর ফৈজু,—গাঁটায় আর মানুষ নেই রে! গাঁয়ের ছোঁড়া কটা সব এখন এক মস্ত-মস্ত ভূত হয়ে উঠেছে রে—মস্ত-মস্ত ভূত!"

ফৈজু হাসিয়া বলিল, "আর আমি তো গাঁ ছেড়ে গিয়ে শুন্‌ছি—আরো মস্ত ভূত হয়ে পড়েছি নানি!"

যে এমন কথা বলে, তার সর্ব্বনাশ কামনা করিয়া নানী বলিলেন, "হিংসেয় বলে রে, হিংসেয় বলে! নইলে তোর

মত এমন ছেলে কে কোথায় কটা দেখেছে? তুই সাত ব্যাটার বাপ হ'!"

বাধা দিয়া, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হাসিয়া, ফৈজু সকৌতুকে বলিল, "থাম! থাম! গরীবের ঘরে অত ছেলে আমদানী কোর না নানি,—বেচারারা না খেতে পেয়ে মারা যাবে। অত ছেলে মানুষ করবে কে? তা'হলে তারা নিশ্চয় ভূতের পাল হয়ে দাঁড়াবে!" একটু থামিয়া ফৈজু সবিনয়ে বলিল, "কিছু মনে কোর না নানি, এবার তুমি একটীবার ওঠো—রান্নাঘরে খলিফার কাছে বসে গল্প করগে,—আমি কাগজগুলো লিখি ততক্ষণ।"

নানী সন্তুষ্ট চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতে-করিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। ফৈজু নিস্তব্ধতার অবকাশ পাইয়া একমনে লিখিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে আহারের ডাক পাইয়া, ফৈজু রান্নাঘরে গিয়া দেখিল, নানী তখনও বসিয়া গল্প করিতেছেন। ফৈজু আহারে বসিল, নানী আবার সেই 'ছিয়াচারের দল' ও 'মোহন্ত মশাইকে' লইয়া পড়িলেন। মোহন্ত সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি গোপন-রহস্য ফৈজুর কাণে ঢুকিল। কথাগুলি শুনিয়া ফৈজু বেশ একটু দুশ্চিন্তা অনুভব করিল।

কিন্তু হাতের কাযটা ছাড়িয়া ফৈজু তখন অন্যদিকে মন দিতে পারিতেছিল না। তাই সে-সব কাহিনী মনের কোণে ঠেলিয়া রাখিয়া, আহারান্তে আসিয়া আবার লেখা লইয়া বসিল। নানী রান্নঘরে বসিয়া আবার গল্প করিতে লাগিলেন।

অনেক ক্ষণ কাটিয়া গেল। ক্রমে রান্নাঘরের গল্প-স্রোত বন্ধ হইয়া গেল। ফৈজু একাগ্র মনোযোগে যেমন লিখিতেছিল, তেমনই লিখিয়া চলিল,—বাহিরের কোন সাড়া-শব্দে কাণ দিল না। আরও কিছুক্ষণ পরে টিয়া বারাণ্ডায় ঢুকিয়া, দুয়ার বন্ধ করিয়া, ফৈজুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—ফৈজুর লক্ষ্য নাই! টিয়া ইতস্ততঃ করিয়া, যা'হোক একটা কিছু বলিয়া ফৈজুর ধ্যান ভাঙ্গাইবার জন্য শেষে বলিল, "দিদি চলে গেল, নানীর কাছে আজ শোবে।"

চমকিয়া, দৃষ্টি তুলিয়া ফৈজু বলিল, "কি?"

পূর্ব্ব-কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া টিয়া বলিল, "আমি এত করে বল্লুম, তা কিছুতেই শুনলে না, চলে গেল। আবার বেশী করে বলতে গেলে, নানী শুদ্ধ ঠাট্টা করতে লাগল আমি কি আর বল্‌ব? বোকার মত চুপ করে রইলুম।"

মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া ভাবিয়া ফৈজু বলিল, "কি মুস্কিল! কি করি বল দেখি? ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌ব?"

টিয়া একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "দিদি কিছুতেই ফিরে আস্‌বে না,—সে তেমন দুষ্ট মেয়েই নয়! তোমার ভয়ে সে আরো পালায়।"

বিস্মিত হইয়া ফৈজু বলিল, "কেন?"

মুখ ফিরাইয়া, অস্ফুট স্বরে টিয়া বলিল, "দিদি এ ঘরে থাক্‌লে পাছে তুমি আমাকেও এখানে আস্‌তে বল—"

ফৈজু বলিল, "বাঃ! তা বল্‌ব না? খলিফা একলা এখানে থাক্‌বে? আর তোমারও তো শরীর খারাপ।" লেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কলম তুলিয়া লইয়া পুনশ্চ বলিল, "তুমি শুয়ে পড়গে,—আমার এখনও ঢের দেরী আছে।"

বিস্মিত কণ্ঠে টিয়া বলিল, "এখনো লিখ্‌বে?"

হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া ফৈজু বলিল, "যতটা চলে চলুক,—সেরে নিলেই শেষ হয়ে আস্‌বে; আর, ফেলে রাখ্‌লেই তো পড়ে থাক্‌বে। যাও, তুমি ঘুমিয়ে পড় গে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া, অনুনয়-ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া, টিয়া বলিল, "তুমি যতক্ষণ এখানে আছ,—একটু বসি না!"

টিয়ার দৃষ্টি-লক্ষ্যে চাহিয়া, অকস্মাৎ ফৈজুর বুকের ভিতর একটা তীব্র চাঞ্চল্য-ভরা অভাবনীয় বেদনা-স্পন্দন তীরবেগে ছুটিয়া বহিয়া গেল! মুহূর্ত্তের জন্য নীরব থাকিয়া, নীরবেই আত্মদমন করিয়া লইয়া,—শান্ত কোমল দৃষ্টি তুলিয়া, ধীর ভাবে ফৈজু বলিল, "না, এখানে নয়। কেন মিছামিছি রাত জেগে অসুখ-বিসুখে পড়বে—বিছানায় যাও,—ঘুমিয়ে পড় গে।"

টিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল,—আর কোন প্রতিবাদ করিল না। ফৈজু আবার লেখায় মন দিল; কিন্তু টিয়ার সেই অনুনয়-করুণ দৃষ্টিটুকু বার-বার মনে পড়িয়া, তাহার চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট করিয়া দিবার উপক্রম করিল। অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া কিছুক্ষণ লিখিয়া, হঠাৎ কে জানে কি ভাবিয়া, কলম ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আলোটা তুলিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল।

টিয়া ইতিমধ্যে তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। আকণ্ঠ লেপ-মুড়ি দিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। ফৈজু আলোটা তুলিয়া, নিঃশব্দে, আগ্রহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিল। দেখিল, সে শান্ত মুখেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কপালে দু-তিনটা মশা বসিয়া নিরীহ নিদ্রাতুরের রক্ত-শোষণে ব্যাপৃত।

আশ্বস্ত হইয়া সাবধানে মশাগুলা উড়াইয়া দিয়া, ফৈজু নিঃশব্দে মশারীটা ফেলিয়া দিল। টিয়ার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, চমকিয়া বলিল, "ও কি ?"

মৃদু স্বরে ফৈজু বলিল, "কিছু না,—মশারীটা ফেলে দিচ্ছি।"

সঙ্কুচিত ভাবে টিয়া বলিল, "থাক না, তুমি এলেই ওটা আমি ফেলে নিতাম। তোমার কি লেখা হয়ে গেল ?"

"না।" বলিয়াই একটুখানি থামিয়া ফৈজু বলিল, "আচ্ছা, আমি আস্‌ছি, লেখার আজ ঐ পর্য্যন্ত থাক।"

বাহিরে আসিয়া, কাগজপত্র গুটাইয়া তুলিয়া রাখিয়া, আলোর জোর কমাইয়া দিয়া, ফৈজু বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। নিজের বাহুর উপর স্ত্রীর মাথাটি তুলিয়া লইতে গিয়া, সহসা এই সুদীর্ঘ তিন বৎসরের সমস্ত কথা চকিতে মনে পড়িয়া গেল! বিচলিত মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! ফৈজু চোখ বুজিল।

তন্দ্রাচ্ছন্ন টিয়া নিজের হাতখানি স্বামীর কাঁধের উপর রাখিয়া, তন্দ্রাঘোর-জড়িত অস্ফুট স্বরে, ব্যথিত ভাবে বলিল, "তুমি এমন করে নিঃশ্বাস ফেলো না, আমার ভারি কষ্ট হয়।"

স্ত্রীকে আর একটু কাছে টানিয়া লইয়া, কপালের উপর হাত বুলাইয়া দিতে দিতে, সান্ত্বনা-কোমল কণ্ঠে ফৈজু বলিল, "ঘুমিয়ে পড়,—অনেক রাত হয়েছে,—তোমার শরীর ভাল নয়।"

প্রেমের কথা

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ]

মুখবন্ধ

নাটক-নভেলে প্রেমের প্রাধান্য কেন ?

প্রেমের কথা বলিতে গেলেই গম্ভীর-প্রকৃতি পাঠকগণ যৌবনে-যোগিনী অশ্রুমতীর বিষাদ-সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি তুলিয়া হয় ত বলিয়া বসিবেন—'প্রেমের কথা আর বোলো না, আর বোলো না, আর বোলো না'। কিন্তু প্রেমের কথা না তুলিলেও উপায় নাই, কেননা প্রেম, প্রণয় বা মহাজন-পদাবলীর ভাষায় 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর' অধিকাংশ নাটক ও আখ্যায়িকার প্রাণ। 'মুদ্রারাক্ষসে'র মত প্রেম-রসহীন রাষ্ট্রতত্ত্বাত্মক নাটক বা 'নাইন্‌টী-থ্রী'র মত প্রেমরস-হীন রাষ্ট্রতত্ত্বাত্মিকা আখ্যায়িকা সাহিত্য-জগতে নিতান্ত অল্প। এমন কি, কোন কোন বিলাতী ও মার্কিন সমালোচক নভেলের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন যে, প্রেম শুধু ইহার অপরিহার্য্য অঙ্গ কেন, প্রেমের বর্ণনা-ত্মক আখ্যানই নভেল (১)। অর্থাৎ যেমন আমাদের সাহিত্যে এমন একদিন ছিল যখন কানু ছাড়া গীত হইত না, তেমনি আধুনিক সাহিত্যে প্রেম ছাড়া নভেল হয় না। এই কারণে উল্লিখিত সমালোচকদ্বয় Pilgrim's Progress, Robinson Crusoe, Gulliver's Travels ও Rasselasকে নভেল বলিয়া স্বীকার করেন না। মার্কিন সমালোচক বার্টন পাদটীকায় উল্লিখিত পুস্তকের অপর একস্থানে বলিয়া-

(১) 'Story wrought round the passion of love to a joyous or tragic conclusion.'—*WYATT*: *The Tutorial History of English Literature*, ch. 8, p. 154. 'With special reference to love as a motor-force'.—*Burton*: *Masters of the English Novel*, ch I, p. 10.

ছেন যে, যদিও অধুনা কোন কোন লেখক প্রেমকে প্রাধান্য না দিয়া, এমন কি প্রেমকে একেবারে আমল না দিয়া, আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন বটে, কেহ কেহ এমন গর্ব্বও করিয়াছেন যে তাঁহাদিগের রচিত আখ্যায়িকা একেবারে নারীবর্জ্জিত; তথাপি ইহা সুনিশ্চিত যে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে কেন, ভবিষ্যৎ পঞ্চবিংশ শতাব্দীতেও এই প্রেম-প্রধান আখ্যায়িকাই রচিত হইবে, কেননা

All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame
All are but ministers of Love,
And feed his sacred flame.

Coleridge.

Love conquers all, প্রেম সর্ব্বজয়ী, রবার্ট ব্রাউনিংএর ভাষায় Love is best, প্রেম সর্ব্বোত্তম। এই জন্যই দেখা যায় যে, অতীতকালের ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও তত্ত্ব-প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত নভেলেও (historical novels, novels with a purpose, problem novels) একটা প্রেমের কাহিনী আমদানী করা হয়, নতুবা গ্রন্থ সরস হয় না, পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় না, চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। এ সব ক্ষেত্রে প্রেমের কাহিনী যেন কুইনিনের বড়ীর চিনির মোড়ক (sugar-coating)।

মানব-সমাজে, মাতাপিতার প্রতি প্রীতিশ্রদ্ধাভক্তি, অপত্যস্নেহ বা বাৎসল্য, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, ভ্রাতায়-ভগিনীতে, ভগিনীতে-ভগিনীতে ভালবাসা, সখ্য অর্থাৎ বন্ধুপ্রীতি, প্রভৃতি নানাবিধ প্রীতির বিকাশ আছে, সর্ব্বোচ্চে ভগবৎ-প্রেম আছে, কিন্তু সাধারণতঃ প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা, এ সকল শব্দ নারী ও পুরুষের যৌনসম্বন্ধ বুঝাইতেই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী love শব্দেরও এই দশা। কেন? ইহাই মানবের তীব্রতম অনুভূতি, কোমলতম মনোবৃত্তি, (২) সুতরাং এই অর্থই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আর এই কারণেই কাব্য-নাটকেও ইহার প্রাধান্য ঘটিয়াছে। ফলতঃ 'পিরীতি রসের সার', 'রসের স্বরূপ পিরীতি মূরতি'ও ইহার সাঙ্গোপাঙ্গ 'পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন' শুধু রাধাকৃষ্ণ-লীলার কেন, অধিকাংশ কাব্য-নাটকের অস্থিমজ্জা, রক্তমাংস, জ্ঞান ও প্রাণ। কবিকুল ইহাই চিরাইয়া চিরাইয়া তারাইয়া তারাইয়া বর্ণনা করিয়া ধন্য হয়েন।

যাঁহাদের বয়সের দোষে বা অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে এই 'পিরীতি-অমিয়া'য় অরুচি জন্মিয়াছে, তাঁহারা হয়ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিবেন যে, তরকারীতে গরম মশলার ন্যায়, আস্বাদন-স্পৃহা উত্তেজিত করিবার জন্য, অপূর্ব্ব স্বাদ দিবার জন্য, এই শ্রেণীর প্রেম কাব্য-নাটকে অন্তর্নিবিষ্ট করা হয়। তাঁহারা হয়ত আরও বলিবেন যে, যেমন তরকারীতে গরম মশলার উগ্রগন্ধ ও স্বাদে মসগুল হইয়া আমরা লক্ষ্য করি না যে উহাতে আরও পাঁচ রকম মশলা আছে, সেগুলি না থাকিলে শুধু গরম মশলার গুণে মুখপ্রিয় তরকারী হইত না, তেমনি কাব্য-নাটকে প্রেম ছাড়া আরও পাঁচটা উপাদান থাকে, সেগুলি আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, অথচ সেগুলি না থাকিলে শুধু প্রেমের একঘেয়ে বর্ণনায় গ্রন্থ সুখপাঠ্য হইত না। আর যেমন গরম মশলার গুণে অতি সাধারণ আনাজেও একটা অপূর্ব্ব স্বাদ আসে, তেমনি প্রেমের ফলাও বর্ণনায় বটতলার বাজে বইও লোকপ্রিয় হয়। ইঁহারা হয়ত আরও বলিবেন যে, বিনা গরম মশলায়ও ত অরুচির রুচিকর, স্বাদু স্বাস্থ্যকর তরকারী প্রস্তুত হয়—যথা, সুক্ত, চচ্চরী, ছেঁচড়া; তেমনি বিনা প্রেমের কাহিনীতেও সুপাঠ্য স্বাস্থ্যকর কাব্য-নাটক রচিত হইতে পারে। প্রেম অনেকের মধ্যে একটি বৃত্তি, ইহাই কাব্যের সর্ব্বস্ব হইবে কেন?

এই 'কেন'র একটা উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি। আর একটা উত্তর সম্প্রতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মার্কিন সমালোচক (বার্টন) দিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে একটা সূক্ষ্ম গভীর সামাজিক তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'Simply because love it is which binds together human beings in their social relations'—এই প্রেমের বন্ধনেই মানব সামাজিক সম্পর্কে বদ্ধ; এবং জীবতত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে নারীই সমাজের কেন্দ্র, এইজন্য আধুনিক নভেলে নারী-চরিত্রের প্রাধান্য, ইহাও বুঝাইয়াছেন। 'It is no accident, then, that woman is so

(২) 'The most interesting of human relations and the most powerful of human passions.'—*John Morley: Life of Rousseau*, Vol. II, p. 25

often the central figure of fiction ; it means more than that, love being the solar passion of the race, she naturally is involved. Rather does it mean fiction's recognition of her as the creature of the social biologist, exercising her ancient function amidst all the changes and shifting ideas of successive generations.'(৩) উক্ত সমালোচক প্রসঙ্গক্রমে ইহাও দেখাইয়াছেন যে ইংরেজী সাহিত্যে আধুনিক নভেলের উদ্ভব কাল হইতেই Eternal Feminine—চিরন্তনী নারীকে কেন্দ্র করিয়া এই শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইয়াছে, কেননা রিচার্ডসনের (Pamela) 'প্যামেলা' ধরিতে গেলে প্রথম আধুনিক নভেল, নারীর নামেই ইহার নামকরণ, নায়িকার হৃদয়ের ইতিহাসই ইহার আখ্যানবস্তু। রিচার্ডসনের 'প্যামেলা' ও 'ক্লারিসা' হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সময়ের Trilby, Tess, Diana of the Crossways পর্য্যন্ত ইহার জের, তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন। আমরাও এই প্রসঙ্গে বলিতে পারি যে বঙ্কিমচন্দ্রের চৌদ্দখানি আখ্যায়িকার মধ্যে অর্দ্ধেকগুলির নারীর নামে নামকরণ, যথা—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, রজনী, ইন্দিরা, রাধারাণী, দেবী চৌধুরাণী। এ ক্ষেত্রে এ কথাও বক্তব্য যে উক্ত সমালোচকের বিবৃত তথ্য যদি নারীকে কেন্দ্র করিয়া গ্রন্থরচনার প্রকৃত কারণ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দুসাহিত্যে ইহার আভাস আছে, কাদম্বরী, বাসবদত্তা এবং (দৃশ্যকাব্য) রত্নাবলী ইহার প্রমাণ। সাহিত্যের বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক ডন্‌লপ বলেন, গ্রীক রোম্যান্সেও নারী-চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। (৪) অতএব বুঝা গেল, কাব্য-নাটকে প্রেমের চিত্র, প্রেমের আধার নারীর চিত্র, চিরন্তন সামগ্রী।

প্রেমের লক্ষণ-নির্দ্দেশ (Definition).

বহু স্বদেশী ও বিদেশী কবি ও দার্শনিক গদ্যে পদ্যে এই প্রেমের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে সকল উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। বস্তুতঃ জল, বায়ু, তাপ ও আলোকের মত, প্রেমও এত সুপরিচিত যে ইহার (definition) লক্ষণ নির্দ্দেশের প্রয়োজন নাই। তথাপি প্রবন্ধের অঙ্গহানি-ভয়ে দুই চারিটা উদ্ধৃত করিতে হইল। ঐতিহাসিক গিবন চিরকুমার ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রেমের মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, গুরুজনের নিষেধে ঈপ্সিতার সহিত পরিণয় ঘটে নাই। তাহার 'আত্মজীবনে' প্রদত্ত লক্ষণ-নির্দ্দেশটি বেশ উপযোগী। .."I understand by this passion the union of desire, friendship and tenderness which is inflamed by a single female, which prefers her to the rest of her sex and which seeks her possession as the supreme or sole happiness of our being."

কোলরিজ দার্শনিক ভাবে বুঝাইয়াছেন :— 'Love is a desire of the whole being to be united to some being, felt necessary to its completeness."

স্কট্ কবিত্বময় বাক্যে বলিয়াছেন :—

It is the secret sympathy,
The silver link, the silken tie
Which heart to heart and mind to mind,
In body and soul can bind.

এই সঙ্গে ভিক্টর হিউগোর কবিত্বময় বাক্যটিও উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। "Oh ! love ! that is to be two and yet one—a man and a woman mingled into an angel ; it is heaven !" (*Notre Dame*, ch. 13). ইহা যে আমাদের মহাজন-পদাবলীর কথা।—

পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে,
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে।—চণ্ডীদাস।

বঙ্কিমচন্দ্রও হরদেব ঘোষালের মারফত বলিয়াছেন।— 'চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।' [বিষবৃক্ষ, ৩২শ পরিচ্ছেদ।]

(৩) *Burton* : *Masters of the English Novel*, ch. I, p. 10, p. 21, (p. 43).

(৪) *Dunlop* : *History of Fiction*, p. 22, p. 46.

অধিক মিষ্ট খাইলে শেষটা বিস্বাদ লাগে, প্রেমের স্বরূপ-বর্ণন আর অধিক করিয়া উদ্ধৃত করিলে পাঠক-বর্গের বিরক্তিকর ও অরুচিকর হইবে। অতএব আর না।

প্রেমের শ্রেণীভেদ

মোটামুটি বলিতে গেলে দুই শ্রেণীর প্রেম কাব্য-নাটকে বর্ণিত হয়।—(১) স্ত্রী-পুরুষের বিবাহিত জীবনে প্রেম; (২) বিবাহের পূর্ব্বে কুমার-কুমারীর প্রেম; ইংরেজী করিয়া বলিলে post nuptial love ও ante-nuptial love; ইহার উপর আবার কোথাও কোথাও মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ আছে, অর্থাৎ বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষের সধবা বা বিধবায় আসক্তি অর্থাৎ পরকীয়া-প্রেম বা অবৈধ প্রণয়। জগতের সাহিত্যে (তথা সমাজে) এই অবৈধ প্রণয়ের অস্তিত্ব আছে; সুতরাং ইহা দূষণীয় হইলেও সমালোচনা হইতে একেবারে বাদ দেওয়া চলিবে না। যাহা হউক, আপাততঃ পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের প্রেমের কথাই বলিব। এতদুভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টিরই প্রসার কাব্য-নাটকে বেশী। শুধু ইউরোপীয় সাহিত্যে কেন, ভারতীয় প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যেও, অধিকাংশ স্থলে দাম্পত্য-প্রেম চিত্রিত হয় না, ইহাকে কবিকুল বড় একটা আমল দিতে চাহেন না, ইহাতে তাঁহারা ততটা চমৎকারিত্ব পান না। তাই কবিকুলতিলক বায়রন বলিয়াছেন—

Romances paint at full length people's wooings,
But only give a bust of marriages.
For no one cares for matrimonial cooings. &c.

Don Juan III. 8.

বস্তুতঃ দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলেই কাব্য-নাটকের আরম্ভে পূর্ব্বরাগ, মধ্যে বিরহ ও নানা বাধাবিঘ্ন ('ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে') ও শেষে যুগল-মিলনে শুভ-বিবাহে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ', গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি (marriage-bell) বা মঙ্গল-শঙ্খধ্বনির সমকালে পটক্ষেপণ। ('রাধারাণী'তে চিত্রার শাঁখে ফুঁ এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য।)

ইংরেজী সাহিত্যে দেখা যায়, ঈষ্টলীন, রোমোলা বা ফীল্ডিংএর এমিলিয়ার মত, আখ্যায়িকার প্রথম অংশেই নায়ক-নায়িকার বিবাহ অতি অল্প স্থলেই ঘটিয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যেও শকুন্তলা-বিক্রমোর্ব্বশীর মত তাড়াতাড়ি গান্ধর্ব্ব-বিবাহ শেষ করিয়া পরবর্ত্তী অঙ্কগুলিতে তাহারই জের টানা হইতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। তবে আধুনিক হিন্দু-সমাজে পূর্ব্বের ন্যায় 'কন্যাত্বজাতোপযমা সলজ্জা নব-যৌবনা'র পূর্ব্বরাগের অবকাশ খুবই কম, কেননা এখন আর যুবতী-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নহে। সেই জন্য দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের চৌদ্দখানি আখ্যায়িকার মধ্যে চারিখানি-মাত্র বিবাহান্ত,—যথা দুর্গেশনন্দিনী, রজনী, রাধারাণী, রাজসিংহ। অপর দশখানিতে নায়ক-নায়িকার বিবাহ হয় গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেই, না হয় গ্রন্থের প্রথম অংশে, সম্পন্ন হইয়াছে। যদিও কোথাও কোথাও ব্যাপারটা গোপন আছে, (যথা মৃণালিনীতে ও যুগলাঙ্গুরীয়ে)। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী সাহিত্য হইতে নভেলের আদর্শ লইয়াও বিলাতী আদর্শের হুবহু নকল করেন নাই, অধিকাংশ স্থলে পূর্ব্বে বিবাহক্রিয়া সমাধা করিয়া আধুনিক হিন্দু সামাজিক রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, (৫) ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে ইংরেজী সাহিত্যের নকলনবিশ মনে করেন, তাঁহারা কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

শুনা যায়, 'স্বর্ণলতা'র গ্রন্থকার ৺তারকনাথ গাঙ্গুলি বলিতেন—'পরিণত-যৌবনা বঙ্গরমণীকে নায়িকা করিয়া উপন্যাস লেখা ইংরেজীর নকল করা মাত্র।' (৬) বঙ্কিমচন্দ্রও যে এ কথাটা না বুঝিতেন তাহা নহে। সেই জন্যই দেখি, যে সকল স্থলে তাঁহাকে অনূঢ়া যুবতীর পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিতে হইয়াছে, সে সকল স্থলেই তিনি সেজন্য সঙ্গত কারণ দর্শাইয়াছেন, 'হিঁদুর ঘরের ধেড়ে মেয়ে'র কেন এতদিন বিবাহ হয় নাই, তাহার জন্য রীতিমত কৈফিয়ত দিয়াছেন, নির্ব্বিচারে ইংরেজী বা সংস্কৃত সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই। (হাল্কা ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁহার তালে ঠিক আছে।) কোথাও কোথাও বা অনু-মানের ভার পাঠকের উপর। একে একে দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এক্ষেত্রে প্রধান আসামী—রাধারাণী। কৈফিয়তটাও

(৫) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে' (৮ম পরিচ্ছেদে) বলিয়াছেন,—'আখ্যায়িকা গ্রন্থের প্রথা যে, বিবাহটা শেষে হয়; আমরা আগেই কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিতে বসিলাম।'

(৬) তারকনাথ-স্মৃতি (মানসী, ভাদ্র ১৩২৫, ৪৪ পৃঃ)।

খুব লম্বা। ১মতঃ, রাধারাণীর মাতা নিঃস্ব হওয়াতে 'রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।' ('রাধারাণী' ১ম পরিচ্ছেদ।) তখন 'বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই।' 'দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত উৰ্দ্ধং' বিবাহ ঘটে নাই বলিয়া গোঁড়া হিন্দু ভাবে এই কৈফিয়ত! যখন দারিদ্র্য ঘুচিল, সুতরাং বিবাহের সে বাধা কাটিল, তখন রাধারাণীর মাতা পীড়িতা, মুমূর্ষু; কিছুদিন পরেই রাধারাণীর মাতৃবিয়োগ হইল, অভিভাবক হইলেন কামাখ্যা বাবু। 'বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যা বাবু নব্য তন্ত্রের লোক—বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, যে রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমন কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক।' (২য় পরিচ্ছেদ।) বস্, কামাখ্যা বাবু রাধারাণীর ইচ্ছার উপর ঝুঁকি রাখিয়া খালাস, আর গ্রন্থকার কামাখ্যা বাবুর ইচ্ছার উপর ঝুঁকি রাখিয়া খালাস! ইহা লইয়া গ্রন্থকার হিন্দুর তরফ হইতে মধ্যে মধ্যে টিটকারী দিতে ছাড়েন নাই। তিনি রাধারাণীর মুখ দিয়া কবুল করাইয়াছেন,—"এই যে উনিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি বিয়ে করলাম না, এতে কে না কি বলে? আমি ত বুড়া বয়স পর্য্যন্ত কুমারী।" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) আবার রাধারাণীর মুখ দিয়া প্রশ্ন করাইয়াছেন,—"হিন্দুর মেয়ে—উনিশ বৎসর বয়স—বিবাহিতা নহে?" (৭ম পরিচ্ছেদ।)

রজনীর বেলায় দেখা যায়, 'অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কাণা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না।' (১ম পরিচ্ছেদ।) পরে আবার গ্রন্থকার রজনীর পিতার (বাস্তবিক মেসোর) মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "লবঙ্গ বুঝিলেন যে মেয়েটি বিবাহের জন্য বড় কাতর হয়েছে—না হবে কেন, বয়স ত হয়েছে।" (১ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।) 'রজনী'তে আরও দেখা যায়, 'লবঙ্গের বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছিল' (২য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ) অথচ তাঁহার বিবাহ হয় নাই; এক্ষেত্রে গ্রন্থকার কোন স্পষ্ট কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই; অনুমান হয়, অমরনাথের সহিত সম্বন্ধ হওয়া ও সেই সম্বন্ধ ভাঙ্গায় খানিকটা সময় নষ্ট হওয়াতে এইরূপ ঘটিয়াছিল। আর রামসদয় মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের ঘরণী গৃহিণী হওয়া যখন লবঙ্গর ভবিতব্য, তখন একটু বয়স্থা কন্যারই ত প্রয়োজন! এই তিনটি গেল হালের হিন্দু সমাজের দৃষ্টান্ত। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিলোত্তমা ও 'রাজসিংহে' চঞ্চলকুমারী আকবর ও ঔরঙ্গজেব বাদশাহের আমলের রাজপুত-কন্যা। সেকালের ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় রাজপুতদিগের মধ্যেও যুবতী কুমারীর বিবাহ-প্রথা ছিল, আর রঘুনন্দনের ব্যবস্থা এ সব সমাজের জন্য প্রণীত হয় নাই, সুতরাং এ দুইটি স্থলে কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন হয় নাই।

যে চারিখানি আখ্যায়িকা বিবাহে শেষ, সেগুলির কথা বলিলাম। এক্ষণে যেগুলি বিবাহে শেষ নহে, সেগুলিতেও অনূঢ়া যুবতীর প্রসঙ্গ থাকিলে তাহার আলোচনা করিব।

'যুগলাঙ্গুরীয়' প্রাচীন তাম্রলিপ্তের কাহিনী, নায়িকা শ্রেষ্ঠি-কন্যা। 'হিরণ্ময়ী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন'; সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ত, 'যথাবিহিত কালে উভয়ের পিতা......বিবাহ সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ হিরণ্ময়ীর পিতা বলিলেন, "আমি বিবাহ দিব না।"' (১ম পরিচ্ছেদ।) পর পরিচ্ছেদে আভাস পাওয়া যায়, জ্যোতিষী গণনার ফলে, বিপদের আশঙ্কায়, বিবাহ স্থগিত হইয়াছিল। মৃণালিনীও শ্রেষ্ঠি-কন্যা—সময় বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে। গ্রন্থকার গিরিজায়ার মুখ দিয়া মৃণালিনীকে কৈফিয়ত চাহিতেছেন, "তোমার বাপ... ..এত বয়সেও তোমার বিবাহ দেন নাই কেন?" মৃণালিনী বাপের হইয়া কৈফিয়ত দিতেছেন, "বাপের দোষ নাই। তিনি অনেক যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু যোগ্য সুপাত্র পাওয়া কঠিন।" ইত্যাদি (৪র্থ খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ)। এই পরিচ্ছেদে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, প্রকৃত পক্ষে মৃণালিনী 'এত বয়সে' কুমারী ছিলেন না, কিছুদিন পূর্ব্বে হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার চৌরিকা-বিবাহ হইয়াছিল।' এই গ্রন্থে 'ভিখারীর মেয়ে' গিরিজায়ার অধিক বয়সে বিবাহের ফুল ফুটাইবার জন্য বোধ হয় কোন জবাবদিহির প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মণ-কন্যা কপালকুণ্ডলাকে কাপালিক যে উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করিতেছিলেন 'তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ'—তাহা অধিকারীর মত আমরাও অস্পষ্টই রাখিলাম; পাঠক অবশ্য বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলা ষোড়শী হইয়াও অনূঢ়া কেন? ইহা হইল আকবর বাদশাহের আমলের কথা।

পক্ষান্তরে 'বিষবৃক্ষে' হালের কায়স্থকন্যার কথা। আমরা যখন কুন্দর সাক্ষাৎ পাই, তখন তাহার তের বছর বয়স, (বয়সের খবরটা ৫ম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের হরদেব ঘোষালকে লিখিত পত্রে আছে), তথাপি গ্রন্থকার কায়স্থের ঘরে তখনও তাহার বিবাহ না হওয়ার কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন। 'কুন্দনন্দিনী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ পিতার অন্ধের যষ্টি, এই সংসার বন্ধনের এখন একমাত্র গ্রন্থি; বৃদ্ধ প্রাণ ধরিয়া তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না।' সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার বৃদ্ধের এই কার্য্যের দোষোল্লেখও করিয়াছেন,...'একথা তাঁহার মনে হইত না যে, যেদিন তাঁহার ডাক পড়িবে সেদিন কুন্দকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন।' (২য় পরিচ্ছেদ।)

আশা করি, এই ধারাবাহিক দৃষ্টান্তগুলি হইতে পাঠকবর্গ বুঝিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র অনূঢ়া যুবতীর পূর্ব্বরাগের অবসর দিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া, আটঘাট বাঁধিয়া, কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, নির্ব্বিচারে ইংরেজী বা সংস্কৃত সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই।

আগামী বারে কবিজন-বর্ণিত প্রণয়-সঞ্চার বা পূর্ব্বরাগের (etiology) নিদান-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব।

বৈরাগ-যোগ

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ]

(১২)

উপরে গিয়ে দেখ্‌লাম, অমিয়া গালে হাত দিয়ে চুপ করে কি ভাবচে। আমি আস্তে আস্তে তার পিছনে দাঁড়ালাম। সে এমন নিবিষ্ট ছিল যে কিছুই জান্‌তে পার্‌লে না।

সমস্ত দিন উদ্বেগের পর মনটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল! ষ্টীমারখানা বিপুল বেগে চলছিল। যে সময়টা বৃথা দাঁড়িয়ে কেটেছে, তাকেই ধরতে যেন তার পিছনে এমনি করে উধাও হয়ে ধেয়ে যাওয়া। এই গতির সঙ্গে এমন একটা বিরাট শব্দ হচ্ছিল যে, মানুষের পায়ের শব্দ শুনা যায় না।

আমি ধীরে-ধীরে ডেকের উপর শুয়ে পড়লাম। শুয়ে-শুয়ে আকাশ-পাতাল কত-কি ভাবলাম তার ঠিকানা নেই। সব চেয়ে বেশী ভাবলাম ছেলেটার কথা—ডাক্তারের কথা, আর সেই আংটির কথা। বিষ্ণুদাসের কাছে সেটা রইল! এ ঋণ কি ক'রে পরিশোধ হবে। একবার মনে হ'ল, একে ঋণ বলি কেন? ও ত' আমার জিনিস! তাই কি? আমি কি নিতে পারি? কিসের দাবীতে আমি পেতে পারি—সে কিসের জোর! জোর নয়, জোর নয়, তবে? আমার সমস্ত দেহ আগুন হয়ে উঠল—মনে হ'ল, কাণ ফুটে রক্ত বার হবে।

অমিয়া এসে পায়ের কাছে বসে বল্লে, "কি ভাবচ তুমি?"

"কিছু না।"

"মিথ্যে কথা। বলবে না আমায়?"

হায়, কেমন ক'রে বলি—এ-সব যে বল্‌বার কথা নয়!

বল্লাম, "কি হবে শুনে?"

"জানিনে।" বলে অমিয়া ঘাড় ফিরিয়ে রাগ ক'রে বসে রইল।

"অমিয়া, রাগ ক'রেচ?"

ঘাড় না ফিরিয়ে বল্লে,—"হুঁ।"

"একটা কথা শুনবে?"

"না।" বলে সে হেসে ফেল্লে।

লীলাময়ীর লীলার ছন্দের তালে তাল রেখে চলা আমার মত রসহীন ব্রহ্মচারীর কর্ম্ম নয়।

সে বল্লে, "বল না কি বল্‌বে—আমি যে না-শুনে আর থাক্‌তে পারচিনে।"

"তুমি শুনলে নিশ্চয় খুব রাগ করবে।"

"এমনি কি অন্যায় কাজ তুমি ক'রে এসেছ? হ'তেই পারে না। আচ্ছা বলছি, কিছুতেই রাগ করব না—এই তিন সত্যি করলুম।" বলে অমিয়া তাড়াতাড়ি তিনবার ব'লে নিলে—"রাগ করব না—করব না—করব না—হলো ত' এবার?"

উঠে বসে বল্লাম, "ভয় ক'রচে আমার বলতে।" "ফের!" ব'লে সে দৃপ্তা ফণিনীর মত মাথা তুলে বল্লে, "তুমি ভারি দুষ্টুমি কর কিন্তু—আমার কিছু ভাল লাগে না।"

"কেমন ক'রে বলি? আমার অপরাধ যে বড় মস্ত।"

"মস্তই হ'ক আর ছোট্টই হ'ক তোমাকে বলতেই হবে যদি না বল ত' আমি মাথা-মোড় খুঁড়ে মরব।"

আমি বল্লাম, "আংটিটা হারিয়ে গেছে।"

"ওঃ এই! আমি বলি আর কি!—তোমার জিনিস তুমি হারিয়েছ তাতে আমার কি?—আমি কেন রাগ করতে যাব? বাবা! বাঁচলুম—আমি ত আর নেই—ভেবেই মরি—কি এমন একটা ক'রে বসেছ তুমি!"

আংটিটা আমার! কেন আমার? কিসের দাবী আমার ছিল তার ওপর? এই প্রশ্ন বার-বার আমার মনের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে পাক্ খেয়ে ফিরতে লাগল।

সত্যকে অস্বীকার করলে, মনটা মিথ্যার জাল, এমনি করেই, তার চারিদিকে বুনতে থাকে—তাতে শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই!

কিন্তু সত্যকে গোপন রাখাও শক্ত—সে যখন বার হয়, তখন এক নিমেষে মিথ্যার জালকে ছিন্ন ক'রে দেয়।

আমি বল্লাম, "সত্যি বলচি অমিয়া সেটা হারায়নি—আমি বিক্রী করেচি।"

"বিক্রী? ছি—ছি! তা করতে গেলে কেন?"

"নিরুপায় হয়ে করেচি—তা' না হলে যে কিছুতেই ডাক্তার পাওয়া যেত না।"

"ওমা! এই তোমার মস্ত অপরাধ! এ ত খুব ভাল কাজ—ওর চেয়ে আর কি ভাল হতে পারে? আংটিটা যদি একজনকে প্রাণ দিয়ে থাকে ত' সে যে ভারি আহ্লাদের কথা হয়েছে।"

মনের উপর থেকে একটা মস্ত ভার এক নিমেষে সরে গেল। এই মেয়েটিকে হঠাৎ যেন বিশ্বের সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার ভালবেসে ফেলতে ইচ্ছা হলো। তাকে জড়িয়ে ধরে তার সর্ব্বাঙ্গ সহস্র চুম্বনে ভরে দেবার বাসনা মনের মধ্যে জেগে উঠতেই, যেন মনের অন্তস্তল থেকে একটা সূক্ষ্ম তীব্র ধ্বনি চাবুকের শব্দের মত ব'লে গেল, "সন্ন্যাসী পালা,—পালা!"

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম, "যাই, ছেলেটি কেমন আছে একবার দেখে আসিগে।"

অমিয়া বল্লে, "আমিও যাব দেখতে।"

আমি কথার উত্তর দিলাম না। সে আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগলো।

কোথায় তুমি পালিয়ে যাবে বহ্মচারি! তোমার পায়ে যে সোণার শিকল পরানো হয়েচে! যতই তুমি ছুটবে, ততই সে বেজে বেজে উঠে, তোমাকে এই বন্ধনের কথা নিত্য-নিয়ত মনে করিয়ে দেবে। যত দূরে তুমি যাবে, —ততই তার ফাঁস কঠিন হয়ে বেড়ে ধরবে তোমার চরণকে!

দোতলা দিয়ে নেমে যাবার সময় দেখলাম, সারঙ্গ তুলসীদাসের রামায়ণটি খুলে সুর করে-করে পড়চে। তার সাক্রেদ্ পিছনে বসে চাকাটি ধরে আছে।

অভ্যাসের কি তাগিদই মানুষের মনের উপর! কাজের ধারা এমনি করেই আবর্ত্ত রচনা করে-করে অতীত থেকে বর্ত্তমানে—বর্ত্তমান থেকে অজানা ভবিষ্যতের পথে ধেয়ে চলেছে। যেখানে বাধা সেইখানেই কল-তরঙ্গের গভীর উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়ে উঠচে!

নীচে গিয়ে দেখলাম, ছেলেটি—রমাইচাঁদ সুস্থ হয়ে ঘুমোচ্চে,—মা তার কাছে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন—সমস্ত দিন উৎপাতের পর নিস্তরঙ্গ সমুদ্র যেমন ক'রে ধরণীর কোলের কাছে ঘুমিয়ে পড়ে।

এরি মধ্যে রমাইচাঁদের মা আমাকে বাবা বলতে সুরু করে দিয়েছে। কিন্তু অমিয়ার সঙ্গে তার এই প্রথম সাক্ষাৎ।

অমিয়ার মুখটি ভাল করে দেখে বিধবা বল্লে, "আহা! যেন স্বয়ং ভগবতী—এস মা, এইখেনে বসে আমার রমাইএর মাথায় তোমার চরণ-ধূলো দেও—সে বেঁচে উঠুক।"

অমিয়া একটু মুখ টিপে হেসে, সেখানেই বসে পড়ল। আমি সরে গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়ালুম।

তাদের ভিতর আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা চল্‌তে লাগ্‌ল।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি ভাব্‌লাম, কোথায় পালাই! হে ভগবন্‌, এ কিসের জালে এমন ক'রে আমাকে জড়িয়ে দিচ্চ! মনটা শক্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম; অমন ক'রে নুয়ে পড়লে ত চল্‌বে না। এ কঠোর সংগ্রামে সেপাইএর মত বুক উঁচু ক'রে খাড়া হয়ে লড়াই করতে হবে। কিসের লড়াই? কার সঙ্গে?

দেখ্‌লুম, অমিয়া হেসে গড়িয়ে পড়চে। ফিরে চাইতে—সে হাতছানি দিয়ে ডেকে বল্লে, "শোন শুনে যাও না।"

কাছে যেতেই বল্লে, "এই শোন, ইনি কি বলচেন।"

বিধবাটি ধীরে ধীরে বল্লে, "তাই বল্‌ছিলাম বাবা, সত্যবানের মত সোয়ামি পেয়েছ মা,—চিরদিন হাতের নো—মাথার সিঁদুর বজায় রেখে ভাগ্যবতী হয়ে বেঁচে থাক। আমরা জেতে সেকরা—এর চাইতে আর কি বল্‌তে পারি!"

অমিয়া হেসে গড়িয়ে গেল। কি দুষ্টুমিই তার হাসিতে ছিল!

লজ্জায় আমার মুখ চোখ গরম হয়ে উঠ্‌ল; বল্লাম—"কি ছেলেমানুষি করচ, এখনি রমাই উঠে পড়বে যে! এস, উঠে এস।"

রমাইএর মা গলায় কাপড় দিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বল্লে, "এস গিয়ে মা। আর বাবা, তোমায় আর আমি কি বল্‌বো—আর জন্মে তুমি আমার বাপ ছিলে নিশ্চয়।"

আমরা উপরে উঠে এলাম।

(১৩)

মায়ের কোল শূন্য ক'রে রমাইচাঁদ চলে গেল! আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে, তার মাকে অকূলে ভাসিয়ে এমন ক'রে যাবার কি প্রয়োজন হয়েছিল, কে বল্‌বে?

শেষরাত্রে বার-দুই ভেদ-বমির পর সে মহা-নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়্‌ল। নীচে গিয়ে দেখ্‌লাম, তার নিস্পন্দ দেহখানা জড়িয়ে ধরে, তার মা চীৎকার ক'রে কাঁদচে—"কোথায় চলে গেলিরে আমার বাপ-ধন!"

মৃত্যু যে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে অকস্মাৎ এসে পড়বে—তা' কেউ ভাব্‌তে পারেনি। তাই সকলেই গভীর বিপদে যুগপৎ নির্ব্বাক্‌ হয়ে গেল!

কেউ রমাইএর মার কাছে পর্য্যন্ত যেতে সাহস করছিল না। আস্তে-আস্তে গিয়ে পাশে বস্‌তেই তার কান্না দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল। "বাবা, তোমরা কেউ আমার রমাইকে ধরে রাখ্‌তে পারলে না!—তোমরা তাকে ফিরিয়ে এনে দাও। কোথায় গেলিরে আমার চক্ষের মাণিক, বক্ষের নিধি—ওরে আমার বাপ্‌,—তোকে ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাক্‌বো। ওগো, তোমরা আমায় তার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।"

বুকের মধ্যে সমস্ত অশ্রু জমে পাথরের মত ভারি হয়ে গেল। চুপ্‌ ক'রে বসেই রইলাম। একটা সান্ত্বনার কথাও মনে এল না।

বৃদ্ধ এসে পাশে দাঁড়িয়ে বল্লে, "কি হবে আর কান্নাকাটি, হাই হুতাশ ক'রে—যে যাবার সে চলে গেছে। বয়স হয়েচে ঢের, দেখেচ ত, যে যায় সে আর ফেরে না। আমি তখনি বুঝেছিলাম—যাকে কালে ছোঁয়, সে আর ফেরে না। এখন ছেড়ে দাও লাশখানাকে—ওটা মাটির পুতুল—ওর সদ্‌গতি করতে দাও। সমস্ত জীবন রইল—যত পার কেঁদ—কেউ তোমাকে মানা করবে না।"

হুঁকোয় বার-দুই টান দিয়ে বৃদ্ধ আবার বল্লে, "আর-জন্মে মা, ও তোর পরম শত্রু ছিল—নইলে এমন করে ধনে-প্রাণে মেরে রেখে যায়। এ ঘোর কলি—নইলে এমনটা ঘটে? বুড়ী না মরে মরল কি না দুধের ছেলেটা গো! রাম—রাম, আমাদের মরাই ভাল। কালে-কালে কতই দেখ্‌তে হবে!"

কি হৃদয়হীন কথা! এমন করে তারাই বল্‌তে পারে, যারা হৃদয়ের ধন হারিয়ে মনটাকে পাষাণ করে ফেলেচে। বৃদ্ধ অবিচলিত ভাবে এই-সব বলে গেল—একটা দীর্ঘ-শ্বাসও ফেল্লে না!

দুপুরবেলায় রমাইএর মাকে অমিয়ার কাছে দিয়ে এলাম। তার পর আমাদের কঠিন কর্ত্তব্য সুরু হলো।

যাত্রীদের ভিতর কেউ রমাইএর শব ছুঁতে রাজী হলো না; জাত যাবে!

দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি এল! এই জাত বুঝি দেশের লোক ধুয়ে খায়! গোপনে পাপাচরণ করলে এ জাত যায় না! যা-কিছু বাধা সৎ-কর্ম্মে!

এত নির্ব্বোধ নিশ্চয়ই প্রণম্য মুনি-ঋষিরা ছিলেন না।

লোকাচার ভগবানকে ভূত করেচে! ঘৃণায় আমার মন বিষ-তিক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

সারেঙ বল্লে, "কেউ না ফেলে, জাহাজের মেথর ফেলবে।"

এই কথাটা আমার বুকে ধড়াস করে একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। বল্লাম, "সারেঙজি আমিত ফেলতে প্রস্তুত আছি। জমাদারের প্রয়োজন হবে না।"

সারেঙ আমার দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। কি তার মনে হলো জানিনে। শেষ কালে বল্লে, "বেশ, তাই হবে।"

রমাইএর নশ্বর দেহটিতে কঠিন বন্ধন দিয়ে, একটা কলসীর সঙ্গে বেঁধে ষ্টীমার থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কলসীটা যেন কত বকা-বকি করে জলে ভরে গিয়ে তলিয়ে গেল। সেই সঙ্গে বিধবার হৃদয়-পুত্তলিও তলিয়ে গেল। যাত্রীরা কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করলে, 'বলো হরি, হরি বোল!'

বাস্...সব শেষ হয়ে গেল তার! যে শেষ মানুষের এত কাছে-কাছে ঘুরে বেড়াচ্চে, তাকে মনে করতে আমাদের কত ভয়! ভয়ই কর, আর ভালই বাস, নির্দ্ধারিত সময়ে সে তোমার কেশে ধরবেই ধরবে!

সারেঙ একটা নতুন কাপড় দিয়ে বল্লে, "ওটা বদ্‌লে ফেল, মহারাজ!"

স্নান করে নূতন বস্ত্র পরে যখন ডেকের উপর এসে দাঁড়ালাম, তখন আমার মন বৈরাগ্য-রসে পরিপ্লুত!

সারেঙ দৌড়ে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে পায়ের ধূলো নিতেই, দলে-দলে যাত্রীরা এসে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল!

এ কার সম্মান করচে এই মানুষগুলো? আমার? আমার এই হাত, পা, নাক, কাণের? কখ্‌খনো না। এই প্রণতি শিবম্ পাচ্ছেন...যিনি কর্ত্তব্যের মধ্যে অহরহঃ জন্ম গ্রহণ করচেন। মানুষ! লুটিয়ে দাও তোমার মাথা তাঁর পায়ে যিনি সত্য, যিনি শিব,...যিনি সুন্দর!

ভালো কাজের পুরস্কার নেই কে বলে? কার এত বড় সাহস! পুরস্কার চারিদিকে রাশিরাশি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠ্‌চে। তাকে অনুভব করবার হৃদয় চাই...তাকে খুঁজে নেবার বুদ্ধি চাই...ধৈর্য্য চাই!

উপরে যেতেই বিধবা হাহাকার করে কেঁদে উঠে, ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলে।

"বাবা, আজ থেকে তুমি আমার রমাইএর জায়গায় হলে। তুমি আমার পেটের সন্তান; বল, তুমি এ অনাথাকে আশ্রয় দেবে?"

বুকের বরফ গলে চোখ দিয়ে উছলে পড়ল! এ কি আবার নূতনতর বাঁধনে বাঁধচ, ভগবন্! মুক্তির পিছনে বন্ধনকে এমনি করেই কি লেলিয়ে দিতে হয়! কি যে চাও তুমি, একদিনের জন্যেও কি বুঝতে দেবে না?

(১৪)

দুটো বনের পাখী এক শিকলে বাঁধা পড়ল বুঝি! শৈশব থেকে আমরা দু'জনেই মা-হারা, নির্ঝরের এত কাছে এসে কে না চিরদিনের পিপাসা আকণ্ঠ পূর্ণ করে মিটিয়ে নেয়?

পাষ্ণ-পাদপের গায়ে আঘাত করলে যেমন রসের ধারা ক্ষরিত হতে থাকে, এই রমণীটির আহত হৃদয় থেকে স্নেহের স্ফটিক-নির্ম্মল ধারা ঠিক তেমনি নিঃসৃত হচ্ছিল। তার হৃদয়ের বহু দিনের শূন্যতা যেন এক নিমেষে কে পূরণ করে দিয়ে গেল!

বিধবার সাত ছেলে, তিন মেয়ের শেষ আলোটি রমাই জ্বালিয়ে রেখেছিল। সেই ক্ষীণ শিখাটি কেমন করে কালের ফুৎকারে সেদিন চকিতে নিভে গেলে—আমরা দেখেছি। দিনের আলো চলে গেলে মানুষ প্রদীপ জ্বালিয়ে রাত্রির অন্ধকার দূর করে; বিধবার অন্ধকার হৃদয়-কক্ষে এও যেন তেমনি হলো। এই দুটিকে জ্বালিয়ে রাখবার জন্যে নারী-হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহ-তৈল যে প্রচুর পরিমাণেই ঢেলে দেওয়া হয়েছিল—তা আমরা পলে-পলে, বর্ণে-বর্ণে অনুভব করতে পারতাম।

হরিপুরে বিধবার নেমে যাবার কথা। একদিন আগে থেকেই আমাদের উপর হুকুম হলো যে, আমাদেরও সেই সঙ্গে যেতে হবে। সে যে কি অনুরোধ, কেমন করে বলি!

সেদিন সকালে অমিয়াকে নিভৃতে ডেকে বল্লাম, "কি করা যায়?"

"করবে কি?—যেতে হবে।"

"তুমি যাও—আমাকে ছেড়ে দাও না হয়।"

"সে রকম কথা ত' মহাভারতে লেখা নেই।"

"সে আবার কি?" আমি অবাক হয়ে গেলাম।

"কেন, সত্যবানকে ত সাবিত্রী ছেড়ে দেয়নি!"

আমি বল্লাম, "সত্যি বল্‌চি অমিয়া, ঠাট্টা ছাড়—আমার মন মঠে ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েচে।"

"মঠে? তুমি ত আর ব্রহ্মচারী নও—মঠে গিয়ে তোমার কি হবে?"

লজ্জায় আমার মাথা যেন আপনি নুয়ে পড়ল—সে-রাত্রির ঘুমন্ত মুখখানি ধীরে-ধীরে মনের সাম্‌নে জেগে উঠ্‌ল। কি উত্তর দেব—ভেবেই পেলাম না! গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বল্লাম, "অমিয়া,—আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে' আমাকে ক্ষমা কর।"

খুব সহজ ভাবে সে বল্লে, "অপরাধ কি তা ত জানিনে,—বল, ভেবে দেখি, ক্ষমা করা যায় কি না।"

অমিয়ার মুখের উপর চোখ ফেলে দেখ্‌লাম, তার লাল ঠোঁট-দুটির মাঝখানে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসিটি—আগুনের উপর হাওয়া যেমন করে কাঁপে—ঠিক তেমনি কাঁপ্‌চে।

চুপ করে থাকাও, মনে হলো, ঠিক নয়—তাই বল্লাম, "তার কি কোন হিসেবপত্র লেখা-জোখা আছে—সে যে অনেক;—কেমন করে বলি?"

"নিদেন একটাও—যার কথা তোমার সব-চেয়ে বেশী মনে হচ্ছে এখন।"

"সে আমি বল্‌তে পারিনে তোমায়;—কি হবে শুনে?"

"যে অপরাধ কথায় বল্‌তে পারা যায় না, তা নিশ্চয়ই খুবই বড়—তা ত আমি ক্ষমা করতে পারিনে।"

"তা হলে শাস্তি দাও আমাকে—আমি মাথা পেতে তা নিতে রাজী আছি।"

"তাই হোক্ তা'হলে—এই বিধান বাহাল হলো যে, তোমাকে আমার সঙ্গে-সঙ্গেই থাক্‌তে হবে—আর সম্প্রতি যে আমি মেয়ের বাড়ী যাচ্চি, তার সব ব্যবস্থা অচিরে তোমায়ই করে দিতে হবে।"

"আমি যে নির্ব্বাসন-দণ্ড চাই।"

"প্রাণ থাকতে আমি তা তোমাকে দিতে পারব না—মানুষের উপর গুরুদণ্ড—সে আমাদের বিচার নয়—সে পুরুষের হৃদয়হীন বিচার।"

"অমিয়া—তুমি জান না—"

"জানি, আমি খুব ভাল করেই জানি যে, আমার চেয়ে তোমার মঠ বড়। কিন্তু কেন তুমি আমাকে বাঁচালে—আমি ত ডুবেই ছিলুম।"

পরিহাসময়ীর স্বরটা হঠাৎ ভারি হয়ে গেল—চোক দুটো ছলছল্ করে উঠ্‌ল—সে ঠিক যেন বর্ষণোন্মুখ মেঘ।

"আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যেতে পাবে না।" এ কথার ভিতরে হৃদয়ের একটা গভীর কাতরতা ছিল। তাকে 'না' করা বড় শক্ত।

"আচ্ছা, তাই হবে।"

অমিয়ার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল; মেঘের পর রৌদ্র যেমন করে দীপ্ত হয়ে উঠে!

আমি উন্মনা হয়ে বসে-বসে মাথা-মুণ্ড কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। খাঁচার পাখীর কথা মনে হলো। পাখা-দুটি যখন বদ্ধ হয়ে যায়, তখন নীল আকাশের মুক্তিটি কল্পনা দিয়ে কেবল উপভোগ করবার বস্তু হয়ে পড়ে সে বেচারির। তেমনই বুঝি হয়ে পড়চে আমার।

অমিয়া বল্লে, "কত কষ্ট দিচ্চি তোমায়—অধমের অপরাধ নিয়ো না, লক্ষীটি আমার।"

হাস্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম।

অমিয়া বল্লে, "মেয়ের আমার যা কিছু জমি-জরাৎ, বাড়ী-ঘর আছে...তার একটা ব্যবস্থা করতে আর কতদিনই বা দেরী হবে? তার পর আমরা কল্‌কেতা চলে যাব।"

"সেখেনে গিয়ে ত ছাড়া পাব?"

"পাবে বৈ কি? কেউ কাউকে কি বেঁধে রাখ্‌তে পারে?"

শুনে আশ্বস্ত হলাম। এতদিন কেটেচে...আর কটা দিন বই ত নয়।

আমরা একটা বেঞ্চের উপর বসেছিলাম,—রমাইএর মা এসে আস্তে-আস্তে আমাদের পায়ের কাছে বস্‌ল।

"কখন গিয়ে আমরা হরিপুর পৌঁছব, বাবা?"

"ষ্টীমারের কথা কিছুই বলা যায় না...সারেঙ আন্দাজ করে, বেলা তিনটে হবে।"

"তা'হলে বাড়ী যেতে রাত হয়ে যাবে। তাই ভাবচি, অত রাতে কি তোমাদের খেতে দেব। ভুনি ময়রাণীর দোকান তখন বন্ধ হয়ে যাবে।"

অমিয়া বল্লে, "এক রাত্তির না খেয়ে কিছু কেউ মারা যাবে না মেয়ে ;...কেন তুমি অত মিছিমিছি ভাব্‌চ। সে একরকম হয়েই যাবে।"

আমি হাস্‌তে লাগ্‌লাম, "সে একটা কিছু হয়েই যাবে, —উপোস্ করে থাক্‌তে হবে না নিশ্চয়।"

"তাই ত, বড্ড অসময় হয়ে পড়বে—তাই ভাব্‌চি মা।"

অমিয়া বল্লে, "এক কাজ করি,—খুব দেরী করে সকালের রান্না শেষ করব...আমাদের খেতে-দেতেই বেলা দুটো হবে তা'হলে।"

আমি বল্লাম, "রান্নাটা না হয় আমিই করিগে,—অনভ্যস্ত হাতে দেরী আপনি হবে · আর রাঁধুনীর ক্ষিদে পায় না .. সেই বেশ হবে।" রমাইএর মা বল্লে, "না বাবা, তাতে কাজ নেই...শেষ পর্য্যন্ত যদি না হয়ে উঠে ত' তার চাইতে বিপদ কি বড় হবে? আজ আর তোমার কিছু করে কাজ নেই।"

বিধবা উঠে অন্যদিকে চলে গেল।

অমিয়া বল্লে, "দেখ ত, 'না' বলা কি যায়? এত যার আগ্রহ, তাকে 'না' বলাটা পাপ। তা ছাড়া, আমাদের পেয়ে ওর পুত্রহারা প্রাণের হাহাকারটা থেমে আছে। আমরাই যে তার এখন অবলম্বন হয়েছি। এই অবলম্বন সরিয়ে নিলে, কি তার অবস্থা হবে, ভেবে দেখেচ কি?"

আমি বল্লাম, "ভেবে আর করব কি? আর, যার ভাববার লোক আছে, তার জন্যে মিছে ভাবনা করা আমার অভ্যাস নয়।"

সে হেসে বল্লে, "তোমাদের ভাবনার জন্যে ত এই বিশ্ব, এই সমস্ত দুনিয়া রয়েচে···এত ছোট-খাট বিষয়ে এত বড় শক্তির নিয়োগ তোমরা কর না বটে!"

কথার ভিতর শ্লেষ ছিল কি না, জানি না; কিন্তু শুনে যেন মনটা একটু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌ল।

বল্লাম, "তা ঠিক নয়। মিছে ভাবনা করিনে আমরা।"

সে বল্লে, "এক হিসেবে সব ভাবনাই ত' মিছে; মানুষ ভেবে কি করতে পারে? আর, মানুষের জন্যে যে একজন আছে, সে কথা তোমরা ভুলে যাও কেন?"

"সে কথা সত্যি—হার স্বীকার করচি।"

অমিয়া প্রফুল্ল হ'য়ে বলে উঠ্‌ল, "কারুকে হারিয়ে দিয়ে আমার ভারি দুঃখু হয়, মনে হয় আমরা অধিকার-চ্যুত হ'য়ে পড়চি।"

"তোমার চোখ দেখে ত সে দুঃখের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।"

"তা'হলে চোখেরাও যুধিষ্ঠির।" বলে', সে তর্কের জালটাকে নিমেষে কোথায় উধাও ক'রে দিয়ে, একটা খোলা হাসি হেসে উঠ্‌ল।

শুকনো গাছের পাতাগুলো কেমন শুকিয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকে,—অল্প হাওয়াতে নড়েও না, চড়েও না—আমার মনটা ঠিক তেমনি ক'রে আড়ষ্ট হ'য়ে রইল। অমিয়ার হাসির বাতাস তাতে লাগ্‌লো বটে, কিন্তু দুলিয়ে দিয়ে যেতে পার্‌লে না।

সে বল্লে, "দিনকতক জলের হাওয়া খুব খেয়ে নেওয়া গেল,—এখন আবার কিছুদিন ডাঙ্গার হাওয়া খাওয়া যাক্ না কেন?"

বল্লাম, "আচ্ছা অমিয়া, তোমার বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয় না?"

"ভয় করে সেখানে যেতে। যদি গিয়ে দেখি, বাবা নেই!"

এমনি করেই মন আত্ম-রক্ষা করতে চায়! এ যেন ব্যথার উপর ছেঁড়া ন্যাকড়ার পটি,—যতক্ষণ এমনি ক'রে চলে যায়!

বুকের ব্যথা যারা মুখের হাসি দিয়ে চেপে রাখ্‌তে পারে, তাদের ক্ষমতা নিশ্চয়ই একটু অসাধারণ গোছের। আজ হঠাৎ এই কথাটা জান্‌তে পেরে, আমার মনটা অমিয়ার প্রতি সহানুভূতিতে ভ'রে গেল!

মানুষের মনের সাধারণ চেষ্টা,—একটা জিনিসকে জেনে নিয়ে শেষ ক'রে ফেলা। এ তা নয়। একটা জিনিসকে না জেনে ঠেলে রাখ্‌বার ক্ষমতা সকলের থাকে না। তাতে যে অনেকখানি সংযমের প্রয়োজন। সে সংযম এই মেয়েটি পেলে কোত্থেকে!

পরের চিঠি পড়তে নেই, সে ত সকলেই জানে; কিন্তু হাতে চিঠিখানা এসে পড়লে, ক'টা লোক না পড়ে' নিরস্ত থাক্‌তে পারে? যে থাকে, সে জানে, কতখানি জোর দিয়ে পড়বার আগ্রহটাকে দমিয়ে রাখ্‌তে হয়।

যদি অমিয়াকে ভাল ক'রে না জানতুম, তা'হলে নিশ্চয়ই

মনে হ'ত, সে হৃদয়হীন ; কিন্তু তার হৃদয়ের পরিচয় আমার কাছে অবিদিত নেই ! আমি ত বিস্মিত হ'য়ে গেলাম তা'র এতখানি শক্তি দেখে। প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউ যেমন বড়, তার প্রশান্তিও তেমনি গম্ভীর !

(১৫)

সূর্য্যদেব অস্তাচলে চলেছেন, এমন সময়ে আমরা গিয়ে হরিপুরের ঘাটে পৌছলাম। একখানা প্রকাণ্ড কালো মেঘের পিছনে লুকিয়ে পড়ে যেন তিনি হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিলেন। অন্ধকার হয়ে পড়ল। ফাটা মেঘের ফাঁকে কোহিনূরের মত সাঁঝের তারা ঝিক্-মিক্ ক'রে উঠ্‌ল। জলের উপর তার ছায়া পড়ে, একটা কালো কষ্টি-পাথরের উপর পাকা-সোণার আঁচড়ের মত দেখাতে লাগ্‌লো।

এবার বিদায়ের পালা। সারেঙ, খালাসি—সবাই এসে আমাদের কাছে দাঁড়াল। আমাদের চোখ জলে ভরে এলো। বুকের মধ্যেটা আন্ চান্ করে উঠ্‌ল !

এই মানুষের মায়া ! দু'দিনের জন্যে কাছা কাছি এসে এমন বাঁধনে মনটা জড়িয়ে পড়ে যে, তাকে কাটবার সময় সমস্ত হৃদয়টা ব্যথিত হ'য়ে উঠে।

সারেঙ বল্লে, "মহারাজ-জী, আমাদের ভুলে যেও না !"

হাসির চেয়ে কান্নাটাই যেন ছাপিয়ে উঠ্‌ছিল ; কিন্তু তবুও হাসতে হ'লো। বল্লাম, "তোমার দয়ার কথা জীবন-ভর মনে থাক্‌বে সারেঙ-জি—তবে অনেক অপরাধ-উৎপাত ক'রেছি, সেগুলো তোমরা মনে নিও না।"

সবাই হাস্‌লে ; কিন্তু সেই হাসি কান্নার চেয়ে করুণ—মনের পাথর ফেটে যেন তা নিঃসৃত হচ্ছিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, আস্তে-আস্তে ষ্টীমার থেকে নেমে এসে মাটির উপর দাঁড়ালাম ! মনে হ'লো, পুরোনো আবাস-ভূমি ছেড়ে আবার যেন নব-জীবন আরম্ভ হ'লো। এ যাত্রার কোথায় গিয়ে শেষ হবে, কে জানে !

একখানি গরুর-গাড়ী ভাড়া ক'রে, তার ছইএর ভিতর মাথা গলিয়ে দিয়ে তিনজনে বস্‌লাম। গাড়ীখানা—আমাদের মনের মধ্যে যে কান্নার ধ্বনিটা নিঃশব্দে আছাড় মারছিল,—তারি অনুরূপ বিষাদময় শব্দ করতে-করতে গ্রামের পথে এগিয়ে চল্‌ল।

রমাইয়ের মা বসে নীরবে চক্ষের জল ফেল্‌ছিল। অন্ধকারে তা না দেখ্‌তে পেলেও, আমরা মন দিয়ে তা স্পষ্ট অনুভব করছিলাম।

এরি মধ্যে গ্রামের পথ নিশুতি হয়ে গেছে,—কোথাও একটি জন-মানবের সাড়া-শব্দ পর্য্যন্ত নেই। গ্রামের মধ্যে এসে পড়লেই কেবল যমের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কুকুরের মত কালো কুকুরগুলো ভয়ঙ্কর চীৎকার ক'রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এক-একটার শব্দ,—বাসন-বিক্রী ক'রে বেড়ায় যে কাঁসারি,—তাদের কাঁসরের চেয়েও বেশী গম্ভীর, আর ভণ্ড-ভণ্ডে ! হঠাৎ ডেকে উঠ্‌লে চম্‌কে উঠ্‌তে হয়।

শকটের চালক মধ্যে-মধ্যে বলদ দুটোর সঙ্গে প্রেমালাপ কচ্ছিল। সে দুটোর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা সব সময়েই যে মধুর তা' ভুলে যাবার আমাদের অবসর ঘট্‌ছিল না। চাকাগুলোর করুণ-তীব্র আর্ত্তস্বর—সেই স্তব্ধ গ্রামের পথটিকে মুখর ক'রে, বাঁশ গাছের মাথার উপর প্রতিধ্বনিত হয়ে, অনন্তের পথে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। সেই শব্দে ঘুমন্ত বকগুলো জেগে উঠে, পাখা ঝট্‌পটিয়ে পরিত্রাহি চীৎকার ক'রে, উড়ে-উড়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে চলে যাচ্ছিল।

আমরা তিনজনে ভিতরে বসে নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ। রমাইএর মার নীরব শোকের ধারাতে আমরা দু'জনে যেন উপনদীর মত নিঃশব্দ অশ্রুর জোগান দিয়ে চলেচি। কথা বলে' সেই নিস্তরঙ্গ স্রোতে ক্ষুব্ধতা আন্‌তে ইচ্ছা হয় না,—সাহসে কুলোয় না !

অমিয়া খানিক পরে ঢুল্‌তে আরম্ভ করাতে, রমাইএর মা তা'কে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে—খালি বুকটা ভরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে। আমার মনটা ঝিঁঝিঁর শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগল।

গ্রামের পথ কোথাও উঁচু আবার কোথাও নীচু। নীচের দিকে নাম্‌বার সময় গাড়ীখানা পথ সংক্ষেপ করে গর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল—তার ঝাকুনির আন্দোলনটা আমাদের হাড়ের মজ্জা-পর্য্যন্ত গিয়ে ঠেকছিল।

পথ ক্রমেই বন্ধুর হয়ে উঠ্‌ল। আর শুয়ে থাকে কে ? অমিয়া উঠে বসে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—"তোমার খুব কষ্ট হচ্চে—একটু শোও না।"

তার কোলটি বিস্তৃত ক'রে দিয়ে বল্লে,—"এইখানে শোও না।"

"নাঃ, থাক্—থাক্।"

আমার কাণের কাছে মুখটা নিয়ে এসে বল্লে,—"লজ্জা করে বুঝি?" তার নিঃশ্বাসের গরম হাওয়াটা আমার গালের উপর দিয়ে ব'য়ে গেল।

"লজ্জা কাকে?—মেয়েকে?—আমি মেয়েমানুষ আমার নেই লজ্জা—আর তোমার এ কি?"

সে আমার হাতখানা টেনে নিতেই—মা-হারা ছেলে যেমন ক'রে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি ক'রে শুয়ে পড়লাম।

অমিয়ার গরম কোলের মধ্যে মাথাটা গুঁজে আমার চন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল।

সে বলত যে, স্ত্রী আর পুরুষের মধ্যে ঐক্যের চেয়ে বিরোধই বেশী। তাদের অনৈক্যের সংসর্গ দিয়ে প্রকৃতি নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি ক'রে নেয়। সে কেমন? স্রোতের মুখে দুটো হাড়ি ভেসে যাচ্ছে—তারা অমনি ভেসে যাবে না—ঠোকাঠুকিতে টোক্কর খেতে-খেতে একবার কাছে একবার দূরে, অমনি করে ভেসে যাবে। স্ত্রী-পুরুষের যে আকর্ষণ সেটা যে কিসের, তা তারা জানে না। জানেন কেবল প্রকৃতি, ...ক্রুণ—যিনি এই বিশ্ব-জগৎকে রহস্যময় ক'রে রেখেচেন। স্ত্রী চায় পুরুষের সংস্পর্শে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে নিতে, পুরুষ চায় বাসনার ক্ষুধাকে নিবৃত্ত ক'রতে। চন্দ্রনাথ একে কিছুতেই প্রেম বল্‌তে চায় না। সে বলে যে, স্বামী যতক্ষণ না তার স্ত্রীকে মেয়ের মত, মার মত, ভগ্নীর মত ক'রে ভালবাসতে পারে, ততক্ষণ সেই মিলনের মধ্যে দাহ থাক্‌বেই থাক্‌বে।

বাস্তবিক দেখ্‌লাম তাই—যেমন মনে ক'রলাম যে, অমিয়ার অন্তরের মাতৃত্ব আমাকে আহ্বান ক'রে তার কোলটি পেতে দিয়েছে—অমনি একটা পরম শান্তিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল।

পুরুষের কি অধিকার আছে, নারীকে সমস্ত বিশ্ব জগতের যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজের অঙ্কলক্ষ্মী করে ...বে নেবার? নারীর আদি-অন্ত, অন্তর-বাহির যে মাতৃত্বের স্নেহ-রসে অনুক্ষণ ওত-প্রোত!

কিন্তু আর কিছুতেই শুয়ে থাকা গেল না,—এমন গাড়ীখানা অস্থির হয়ে উঠ্‌ল।

উঠে বসে বল্লাম, "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল—আমার ঘুমিয়ে কাজ নেই।"—অন্য সময়ে হ'লে অমিয়া হয় ত খুব হেসে উঠ্‌ত; কিন্তু সে চুপ ক'রে রইল।

রমাইএর মা স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিল, বল্লে, "বাবা, আর বেশী দেরী নেই—এই মাঠটা পেরিয়ে গেলেই আমাদের গাঁ। তোমাদের কত কষ্ট দিচ্চি।"

অমিয়া বল্লে, "এ আবার কষ্ট কি মেয়ে? পাড়া-গাঁয়ের পথ ত' এমনিই হয়। আর গরুর-গাড়ী ত মোটর নয়। এ সব আমার সওয়া আছে।"

রমাইএর মা বল্লে, "আমি ভাবচি, কি তোমাদের খেতে দেব মা—এত রাতে ত গ্রামের কেউ জেগে নেই।"

আমি হেসে বল্লাম, "এ ভাবনা ত' তোমার আজ সকাল থেকে লেগেই রয়েছে। নিশ্চয়ই আমরা উপোস ক'রে থাক্‌ব না—একটা কিছু উপায় হবে।"

অমিয়া বল্লে, "ধন্যি তোমরা সন্নেসী—একবার কি মুখে আন্‌তে পা'রলে না যে না হয় মাছ হ'লো আজ রাতে।"

বল্লাম, "তা মনে ক'রতে যাব কেন? আমরা যে দয়াময়ের রাজ্যে বাস ক'রচি—যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে অন্ন যোগাচ্ছেন—তিনিই যোগাবেন। এ বিশ্বাস যদি না থাকে ত' সন্ন্যাসীদের চলে কি ক'রে? আমাদের যে সঞ্চয় কর'তে নেই। যা পেলাম খেয়ে-দেয়ে—তা বিলিয়ে দিতে হয়।"

অমিয়া বল্লে, "বিশ্বাস আর সত্য যদি এক হ'তো, তা'হলে এই দুনিয়াতে আর দুঃখ থাক্‌ত না। দেখি কি হয়, সন্ন্যাসীর বিশ্বাস বুঝি বা আজ অটুট থাকে না।"

বল্লাম, "তা হ'তেই পারে না। তুমি বুঝি একটা গল্প জান না—তবে শোন।"

অমিয়া শুনতে লাগ্‌ল।

"এক সন্ন্যাসী এক গৃহস্থের ঘরে ভিক্ষে ক'রতে গেছে। ঘরে বুড়ী-মা আর যুবতী কন্যা ভিন্ন তখন কেউ ছিল না। মা রাঁধছিলেন, হাত জোড়া ছিল, অগত্যা মেয়েটিকেই ভিক্ষা দিতে যেতে হ'লো। মেয়েটি তার সর্ব্বাঙ্গ কাপড়ে ঢেকে সন্ন্যাসীর সামনে যেতেই, সন্ন্যাসী মেয়েটিকে বল্লে, 'মা, তোর ঐ কাপড়ের মধ্যে কি লুকোন আছে?'

এই কথা শুনে মেয়েটি ত কেঁদে কেটে অনর্থ করলে। এদিকে সন্ন্যাসী ভিক্ষা না পেয়ে চলে যায় দেখে, বুড়ী ছুটে এসে ভিক্ষা দিয়ে বল্লে—'বাবা, মাথায় জটা পরেছ—

গায়ে ছাই মেখেছ—কিন্তু এ তোমার কি ব্যবহার?—মেয়েটিকে তুমি অমন করে অপমান করলে কেন?'

সন্ন্যাসী বল্লে, 'মা, সত্যি বলচি, আমি কোন অপমান করিনে—আমার জানবার ইচ্ছা হয়েছিল—তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে যে, কেন তোর মেয়েটি অমন করে উঠল।'

সন্ন্যাসীর সহজ সরল ভাব দেখে বৃদ্ধার বিশ্বাস হলো যে, সে কপট আচরণ করচে না।

বৃদ্ধা বল্লে 'বাবা, এত জ্ঞান, আর এ জান না? ওর যখন ছেলে হবে, তখন তার খাবার জন্যে ভগবান ঐ স্তনে দুধ দেবেন। তোমার মার স্তন্য পান করেই ত তুমি মানুষ হয়েছ।'

সন্ন্যাসী ভাবতে ভাবতে কতকদূর গিয়ে ভিক্ষার চাল গুলো ফেলে দিলে। কাজ নেই তাতে। যে এখনো জন্মায়নি তার খাবার এত ব্যবস্থা—আর আমি বেটা দোরে দোরে এক মুঠোর জন্যে লালায়িত! এ দেহ আর রাখব না।

এই বলে সন্ন্যাসী একটা পাহাড়ের উপরে জঙ্গলে গিয়ে পড়ে রইল। একদিন যায়, দুদিন যায়; সন্ন্যাসী স্থির করলে, প্রাণ যায় তাও স্বীকার—কিন্তু অন্নের অন্বেষণ কিছুতেই করবে না।

ক্রমে তার সংজ্ঞা লোপ হয়ে যাবার উপক্রম। ক'দিন পরে,—ঠিক সে তা বুঝতে পারলে না—হঠাৎ দেখে যে, তার 'ঘুম' ভাঙ্গিয়ে এক বুড়ী বলচে 'বাবা, খেয়ে নে।' উঠ্‌বার ক্ষমতা নেই। বুড়ী তার মুখের মধ্যে খানিকটা খিচুড়ী তুলে দিয়ে গেল। আর কাণের কাছে বলে গেল যে—'তুমি ত বাবা শিশুর মত অসহায় নও—এ আবদার সইবে না তোমার—হাত-পা দিয়েছেন, খুঁজে খেতেই হবে।'

সন্ন্যাসীর চটক ভাঙ্গল। সে সব বুঝে, পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এল।

অসহায় অবস্থায় ধৈর্য্যের সঙ্গে তাঁর উপর নির্ভর করলে—তিনি উপায় করেই দেন।"

এর পর আমরা কেউ কথা কইলাম না। আমার মনের মধ্যে এই নির্ভরের প্রসঙ্গ ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগল।

নির্ভর করবে কে? মানুষ কি বাস্তবিক ভগবানকে মানে? ভগবানের সব প্রসঙ্গই মানুষের বাক্যের মধ্যে নিবদ্ধ—ক'টা লোক তাঁকে অন্তরের সঙ্গে মানে!

প্রতি পলে, প্রতি পদে আমরা আত্মশক্তি জাহির করতে ব্যতিব্যস্ত! মানুষ বহুপূর্ব্বে ভগবানকে তাঁর সিংহাসনচ্যুত করে নিজেকে তার উপর বসিয়ে রেখেচে। আমরা যে সবাই সোঽহং স্বামী!

১৬

রহিম চাচা প্রতিবেশী। কুকুরের ডাক, লোকজনের কথাবার্ত্তা এবং গরুর-গাড়ীর বিকট ক্যাঁচ-ক্যাচানি শুনে, হাতে একটা কেরোসিনের মিট-মিটে ডিবে নিয়ে বার হয়ে এল। বয়স, পঞ্চাশের কোটা শেষ করে ষাটের দিকেই। নেড়া মাথা, খুদি-খুদি করে গোফ ছাঁটা—কাঁচা-পাকা বিপুল দাড়ি কোমর পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েচে। রমাইএর মাকে দেখে বল্লে, "মা, এসেছ?" বলে মাটিতে মাথা নীচু করে ভক্তি ভরে সেলাম করলে।

রমাইএর মা চীৎকার করে কেঁদে উঠে বল্লে, "রহিম, রমাইকে গঙ্গার জলে রেখে এসেছি!"

রহিম হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে এসেছিল—প্রথমটা কিছু বুঝতে না পেরে যেন হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ তার মুখটা পাংশে হয়ে গেল! সে বল্লে, "সে কি? কি হয়েছিল তোমার?"

রমাইএর মা কথার কোন উত্তর না দিয়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে লাগল।

বল্লাম—"তার ওলাউঠা হয়েছিল।"

রহিম হায়, হায় করে' কপালে হাত দিয়ে মাটির উপর বসে পড়ল। বুড়োর শুকনো দুটি চোক থেকে জল টস্‌টস্‌ করে বেরিয়ে দাড়ি বয়ে মাটিতে ফোঁটা-ফোঁটা পড়তে লাগল।

সে বল্লে, "আল্লার মর্জ্জি বোঝা শক্ত বাবু, এই মেয়েলোকটার কি না হলো—সাত ছাওয়ালের একটাও রইল না!"

রমাইএর মা অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্লে, "আমার ত কাঁদলে চলবে না রহিম! এই বাছাদের কিছু খাওয়া হয়নি—কি উপায় হবে?"

রহিম মাথা চুলকে বল্লে, "তাই ত মা! মুদির দোকান

ও খোলা নেই ; রাতও ভারি হয়ে গেছে। এখন ত কিছু একে তোলাও যাবে না !"

অমিয়া আমার মুখের দিকে বিদ্যুতের মত কটাক্ষ করলে। তার অর্থ আমার বুঝতে একটুও বাকী রইল না। আমি একটু হেসে তার জবাব দিলাম।

রহিম বল্লে—"দেখি, ঘরে কি আছে মা—একটু সবুর কর।"

আমরা ঘরের দাওয়ার উপর বসে রইলাম। সামনে ডিবেটা জ্বলচে। আলোটা আলকাতরা-মাখানো দোরের উপর পড়েচে। কড়াতে মস্ত বড় পেতলের তালা ঝুলচে। কালো দোরের উপর উইএর মাটির ঘর শাখা প্রশাখায় একদিক থেকে অপর দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত !

রমাইএর মার মনটা এই দুশ্চিন্তায় এমন ভরে ছিল যে, দরজাটা খোলার কথা মনেই হয় নি।

আমরা খানিক চুপ করে বসে থাকার পর—চমকে উঠে বল্লে—"বাছা রে আমার, তোমরা ধূলোয় লুটোচ্চ—আর আমি মাগী দোরটা পর্য্যন্ত খুলে দি'নি !"

ছোট্ট ঘরখানি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। মেজেটি মাটি দিয়ে নিকোন ; তকতক্ করচে—সিঁদূরটুকু পর্য্যন্ত পড়লে তুলে নেওয়া যায়। ঘরের একদিকে একটা বড় চৌকি—আর অন্য দিকে একখানি একছনে খাট। রমাইএর মা খাটটি তাড়াতাড়ি ঝেড়ে দিয়ে বল্লে, "বাবা, তুমি বসে জিরোও।"

আমি খাটটি অধিকার করে বসে, ক্রমে তাতেই গড়িয়ে গেলাম।

অমিয়া বাড়ী দেখতে বার হয়ে গেল। হঠাৎ তার এ বিষয়ে আগ্রহাতিশয্য হলো।

চৌকাঠের কাছে ডিবেটি জ্বলচে—তারি আলো ঘরের মটকা অবধি গেছে। করোগেট টিনের ছাদ, মাটির দেয়াল। দেয়ালে একটি ময়ূর আঁকা—মনে হলো ছোট ছেলের চিত্রিত—হয় ত রমাই নিজে তার চিত্র-বিদ্যার পরিচয় রেখে গেছে।

হঠাৎ এই ছেলেটির জন্য আমার মনটা খাঁ-খাঁ করে উঠ্‌ল। সব রইল—সেই কেবল নেই ! ইঁট-পাথরের চেয়ে আমরা নিজেকে কত বড় মনে করি !—যুগ-যুগান্তর ধরে সেই ইঁট, সেই পাথর, সেই মাটি তেমনিটি থেকে যায় ; কিন্তু মানুষ দলে-দলে পালে-পালে কোথায় নিমেষ ফেলতে মিলিয়ে যাচ্ছে !

অমিয়া ফিরে এল ; রমাইএর মা রহিমের বাড়ী গেছে। সে এদিক ওদিক করে আমার খাটের পায়ের কাছে বসে পড়ে বললে, "এখন দেখ্‌চি, না এলেই হতো।"

"কেন।"

"উঃ বাবা, কি বুনো দেশ—এ দেশে কেমন করে মানুষ থাকে ?—চল, কালই আমরা চলে যাই।"

পদ্মপাতায় শিশির-বিন্দুর মত তার মনটি চির-অস্থির। সে নিজেই জানে না কি চায়! যা চায়—তা পাবার আগেই তাতে অতৃপ্তি হয়ে পড়ে। এই তার প্রকৃতি—এতটা অসম্ভব-অদ্ভুত !

আমি হেসে বল্লাম, "আমার কিন্তু বেশ লাগ্‌ছে—শুয়ে-শুয়ে ঐ ময়ূরটি দেখ্‌চি। কাঁচা হাতের ছবি ; কিন্তু চিত্রকর সহিষ্ণু—তোমার মত অধীর নয়।"

অমিয়া বল্লে, "বেশ, আমি অধীর—তুমি ত সুধীর—বাঁচ্‌লুম। নিজের সুখ্যাত নিজে করতে—তোমার আর জোড়া নেই।"

"আমি ত বলিনি যে আমি সুধীর—তুমি এমন করে মিথ্যে বলো না কিন্তু।"

"বেশ, বেশ—আমি মিথ্যে বলি—সে আমার ইচ্ছে—আমার ত' আর যুধিষ্ঠিরগিরি করতে হবে না। আমাদের এই মিথ্যের সংসারে—মিথ্যেরই কারবার করতে হবে।"

বুঝলাম, অমিয়া আমার সঙ্গে মিছে ঝগড়া করে আমাকে জাগিয়ে রাখতে চায়। ঘুমিয়ে পড়লে উঠে খাবার পাত্র আমি নই।

বল্লাম, "নাঃ, এ মিছে তর্কে রাত কাটাতে চাইনে ; একটু ঘুমিয়ে নিলে কাজ হতো।" পাশ ফিরে শুতেই অমিয়া বল্লে—"সত্যি বলচি, শোন।"

আমি না নড়ে চড়ে চুপ করে পড়ে রইলাম।

অমিয়া বল্লে "একমনে বুঝি ভগবানকে ডাকচ ?"

"কেন ?"

"তিনি ত আজ দয়া করবেন বলে মনে হয় না।"

"তাতে কিছু যায় আসে না।"

"কঠিন পরীক্ষায় তিনি আজ পড়েছেন—ভক্তটির জন্যে

এত রাত্রেও তাঁর চোখে ঘুম নেই—নিশ্চয় ভাবচেন কি জোগাই, কোত্থেকে জোগাই।"

আমি জবাব দিলুম না।

"বিশ্বাস কি কম হয়ে এল? কথা কইচ না?"

"অবিশ্বাসীর সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। তাঁর দয়ার নিগূঢ় তত্ত্বের কথা মানুষ মানুষকে বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারে না। এ সব কেবল অন্তর দিয়ে বুঝতে হয়।"

অমিয়া বল্লে "সে কথা সত্যি—তাই ত আমি ভেবে পাইনে।"

"কি?"

"আমাদের অন্তরটাই ত বড় শুনেচি—তোমাদের মাথাটা; কিন্তু এ যে উল্টো হয়ে গেল—তুমি তাঁকে অন্তর দিয়ে বুঝতে চাচ্চ—আমি চাচ্চি বুদ্ধি দিয়ে।"

"তাই তুমি তাঁকে পাচ্চ না।"

"তুমি কি পেয়েচ?"

"পাইনি বটে; কিন্তু পাবো আশা রাখি—এই যে না খাওয়া—তাই এত স্নিগ্ধ, এত মধুর।"

"সম্প্রতি কি খুব মধুর মনে হচ্চে?"

"হচ্চে বৈ কি?—সবাই কি সব জিনিস পায়! কিন্তু পাবার বাসনাটাকে যে তীব্র করে জ্বালায়—সে মরে জলে; আর যে তাকে ধূপের মত নিভিয়ে গুমরে জ্বালায়, তার সমস্ত দেহ-মন তাঁরি গন্ধে—তাঁরি রসে সরস হয়ে উঠে।"

"কিন্তু ধূপ ত নিজে পুড়ে খাক্ হয়।"

"হোক না—তাতে কার কি ক্ষতি?"

বাইরে পায়ের শব্দ শুনা গেল। রমাইএর মা এসে বল্লে, "বাবা, উঠে এস, আর রাত কর্‌ো না।—যা-হয় একটু জোগাড় হয়েচে।"

উঠে গিয়ে দেখি, রহিম সেই রাত্রে তার গাই দুয়ে দুধ সংগ্রহ করেচে—একথাল খাসা ধানের চিঁড়ে—একছড়া মর্ত্তমান কলা—তার পাশে এক বাটি গুড়!

তা দেখে সন্ন্যাসীর বৈরাগী-হৃদয় নৃত্য করে উঠ্‌ল।

আমি অমিয়ার মুখ পানে চাইতেই সে হেসে বল্লে, "আমার আর এক তিল অবিশ্বাস নেই; কিন্তু মেয়ে, এ রাত্রে তুমি কি কাণ্ড করেচ। তাই এই দেরি!"

রহিম বল্লে, "না মা, এসব আমার ঘরে ছিল দুধটা দুইতে একটু দেরী হয়েচে—নেহায়েৎ অসময় কি না?"

রহিম চাচাকে মনে-মনে শত ধন্যবাদ দিয়ে—প্রচুর ফলার শেষ করে শুয়ে পড়লাম।

যে খায় চিনি, তার চিনি জোগান চিন্তামণি!

রামেন্দ্র-স্মৃতি

[শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়]

আঁধার বাঙ্‌লা বিষাদ নীরব শোকাশ্রু বহে চক্ষে,
বেদনা-তীব দীর্ঘ নিশ্বাস গুমরি উঠিছে বক্ষে,
চির-পরিচিত হাসি সে তরল,
হর্ষ-উছল যত কোলাহল,
তপ্ত শ্বসিয়া পড়েছে খসিয়া ব্যথার তামস কক্ষে;
নিঠুরা নিয়তি বজ্র হানিয়া গিয়াছে মায়ের বক্ষে।

বেদনা ব্যথিত ক্রন্দন রোল মর্ম্মরি উঠে পবনে,
স্বপনের যেন যত সুখরাশি টুটিয়া গিয়াছে স্বপনে;
ভাস্বর আর নহে ভাস্কর,
রিক্ত-আসার হেরি জলধর,
প্রভাত-শিশিরে কাঁদিছে বসিয়া বিশ্ব-প্রকৃতি গোপনে,
ভূলোক, দ্যুলোক, আকাশ, বাতাস ভরেছে গভীর রোদনে।

জাহ্নবী-তটে কার চিতানল উঠিল রে ঐ জলিয়া,—
কাঁদিছে শ্মশান লক্ষ কণ্ঠে হরি হরি হরি বলিয়া,
বিদায় জননি! বিদায় তোমায়,
কে যেন কহিছে নীরব ভাষায়,
বিমাতার ওই কম্পিত বুকে আলোক-বিম্ব পড়িয়া
এই শেষ তবে, বিদায় জননি! ইঙ্গিতে দেয় বলিয়া।

রামেন্দ্র আজ ইহলোকে নাই, নাই, নাই, নাহি রে!
বঙ্গভূমির শ্রেষ্ঠ রতন আজ পৃথিবীর বাহিরে!
চির নির্ব্বাণ জ্ঞানের গগনে
মহা সূর্য্যের, আজি এ লগনে,
নবমীর প্রাতে বিজয়া দশমী এনেছে বঙ্গে আজি রে!
বাণীর পুত্র রামেন্দ্র হায়! ইহলোকে আজ নাহি রে।

বজ্র কঠিন কুসুম কোমল যাহার চরিত পূণ্য,
চির সুন্দর চির মহীয়ান্ সব আবিলতা-শূন্য,
স্বাতন্ত্র্য আর জাতীয় নিষ্ঠা
করেছিল যার প্রাণ প্রতিষ্ঠা,
সর্ব্বতোমুখী সেবায় যাহার স্বদেশ জননী ধন্য,
সেই রামেন্দ্র পরলোকে আজ মার কোল করি শূন্য।

ভিক্ষালব্ধ মণি-কাঞ্চন দূরে ফেলে দিয়ে ঘৃণাতে,
গৌরব করি মার ছোট দান তুলিয়া নিয়াছে যে মাথে,
একটা দর্প ভরা অভিমান
দীন সজ্জার আড়ালে মহান্
মানবতা যার উজলি ছুটিত হৃদয়ের প্রতি শিরাতে,
সেই অভিমানী রামেন্দ্র হায় চলে গেছে কাল নিশাতে।

'প্রজ্ঞার জয়' 'বিচিত্র কথা' যাহার লভিয়া স্পর্শ
দানিছে মোদিকে অতীত মহিমা গৌরবমাখা হর্ষ,
রাখিবারে মান মাতৃ ভাষার
অবসাদ কভু ছিল না যাহার,
সাহিত্যরথী রামেন্দ্র সেই বিরাট পুরুষাদর্শ
অনন্ত ধামে গিয়াছে চলিয়া কাঁদায়ে ভারতবর্ষ।

আর কি এ নিধি আসিবে গো ফিরে মৃত্যুর বুক চিরিয়া,
আর কি আসিবে ফিরে এ রতন আর কি আসিবে ফিরিয়া,
নিজস্বে মোরা দিয়া বলিদান
অনুকরণের তুলি যে নিশান
সে নহে গর্ব্ব সে যে অপমান আর কি দিবে গো বলিয়া?
সে জন কভুরে আসিবে না ফিরে যে গিয়াছে হায় চলিয়া।

ষষ্টি বছর এখনও যে তার হয়নি ক' হায় পূর্ণ,
এরি মাঝে হেরি নিয়তির শাপে সকল বাসনা চূর্ণ,
দগ্ধ মরুর তপ্ত নিশাস
শুকাল মায়ের বুক ভরা আশ,
মাতৃসেবার বিরাট যজ্ঞ হ'ল না ক' হায় পূর্ণ,
আধখানি মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ছিঁড়িল প্রাণের উর্ণ।

বঙ্গমাতার অদৃষ্টে বুঝি আছেরে কেবলি যাতনা,
ভাঙ্গা পঞ্জরে অশনি পতন বিধাতার বুঝি বাসনা,
সুত গুরুদাস গর্ব্ব মাতার—
সে দিন গিয়াছে ছাড়ি কোল তার,
এখনও জননী ভোলেনি সে কথা ভোলেনি সে ব্যথা বেদনা,
আজই হায়! এ কি কার অভিশাপে নিঠুরা নিয়তি ছলনা।

তুমিও দেবতা গিয়াছ স্বরগে দেবতার দেশে চলিয়া,
রহিলাম মোরা পলে পলে মরে যাতনার বিষে জ্বলিয়া,
স্বল্প জীবনে যা' করেছ তুমি
রহিবে অমর অম্বর চুমি',
ইতিহাস বুকে সোণার আখরে লবে তব নাম লিখিয়া,
স্বরগে মরতে পূজিবে সকলে তোমায় অমর বলিয়া।

যাও নিষ্কাম-কর্ম্মী তাপস! যাও অমৃতের আলয়ে,
মুক্ত তোমার পূত আত্মা শান্তিতে যাক্ মিশায়ে।
অক্ষম মোরা, মাণিক রতন
নাহিক পূজিতে তোমার চরণ,
তোমার যোগ্য পূজা-উপহার নাহি এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে,
এনেছি গো তাই ব্যথিত অশ্রু তোমার চরণ তলে এ।

মালাবার-ভ্রমণ

(পত্র)

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি-এল]

১লা জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৮টায় মান্দ্রাজ হইতে "মেট্টুপলিয়াম মেলে" মালাবার যাত্রা করিলাম। আমার মান্দ্রাজী বন্ধুগণ আরও মাসখানেক অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন; কারণ, বর্ষাকালেই মালাবার উপকূলে শ্যামল শোভা বিকশিত হইয়া উঠে। কিন্তু আমার মুখ্য উদ্দেশ্য তো রথ-দর্শন নহে—সেটি 'কদলী বিক্রয়'। সুতরাং বর্ষা-সমাগমের পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

মেট্টুপলিয়াম, মান্দ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেশন হইতে ৩০৮ মাইল দূরে—নীলগিরি পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত। এইখান হইতে ছোট একটি রেলওয়ে উতকামন্দ গিয়াছে। উতকামন্দ—সংক্ষিপ্ত নাম "উটি"—মান্দ্রাজ প্রদেশের 'দার্জ্জিলিং'—শ্রেষ্ঠ শৈল নিবাস। অনেকের মতে, ইহা Queen of Hill Stations অর্থাৎ 'শৈলনগরীকুল-রাণী'। মান্দ্রাজে গ্রীষ্মের প্রতাপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, হাইকোর্ট 'দীর্ঘ-অবকাশ' উপলক্ষে বন্ধ। যাঁহাদের অর্থ এবং অবসর আছে, তাঁহারাই দলে দলে স্বাস্থ্য সঞ্চয় এবং নিদাঘ যাপনের জন্য শৈলাবাসে যাইতেছেন—অবশ্য অধিকাংশই সাহেব। সুতরাং এই সময়ে মেট্টুপলিয়ামের ডাকগাড়ীতে যাত্রীর খুবই ভিড়। আমি যে কামরাতে স্থান পাইয়াছিলাম, তাহার সকলগুলি "বার্থ"ই পূর্ব্ব হইতে রিজার্ভ করা ছিল। আমার শ্বেতাঙ্গ সহযাত্রীদের সঙ্গে রাশীকৃত 'লগেজ'—একজনের সঙ্গে অধিকন্তু একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ কুকুর। গাড়ীতে তিলমাত্র স্থান ছিল না। কিন্তু তজ্জন্য রাত্রে নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

প্রাতে ৮-১৫ মিনিটের সময়, পদানুর জংসনে গাড়ী থামিল। এইখান হইতে মেট্টুপলিয়াম লাইন উত্তর দিকে গিয়াছে, এবং অন্য একটি লাইন পশ্চিম-উপকূলাভিমুখে গিয়াছে। আমাকে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া, মাঙ্গালোর-গামী গাড়ীতে উঠিতে হইল। কিছুক্ষণ পরে, ট্রেণ ওয়েলায়ার ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গেল। এই ষ্টেশনটি গবর্ণমেণ্টের 'রক্ষিত' অরণ্যের এক প্রান্তে; ইহার পরে, কিছুদূর পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইনের দুই ধারেই নিবিড় বন। এই বনে না কি এখনও হস্তী-ব্যাঘ্রাদি বন্য জন্তুর দর্শন নিতান্ত দুর্ল্লভ নহে।

প্রায় ১০টার সময় ট্রেণ ওলাভাক্কট জংসনে পৌছিল। এখান হইতে পালঘাট পর্য্যন্ত অত্যন্ত ছোট একটি ব্রাঞ্চ লাইন আছে। এইবার প্রকৃত পক্ষে মালাবারে প্রবেশ করা গেল। একদিকে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা, অপর দিকে আরব-সাগর, উত্তরে কানাড়া এবং দক্ষিণে কোচিন—এই সীমানার মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ডই মালাবার, দেশীয় ভাষায় "মালয়ালম্"-অর্থাৎ "পর্ব্বতের দেশ" এবং সংস্কৃতে "কেরল।" মালাবার প্রকৃতির বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। রেলগাড়ী হইতে দুইধারে ছোট-ছোট পাহাড়, ছায়াঘেরা এক একখানি গ্রাম এবং রক্তবর্ণ পথরেখা দেখা যাইতে লাগিল। রেলওয়ে লাইনের কাছে, আম-কাঁঠাল-সুপারি-নারিকেল বাগানের মাঝখানে লালরঙের খোলা—অথবা নারিকেল-পাতায় ছাওয়া এক-এক খানি ঘর,…দেখিতে ছবির মত। প্রত্যেকটি বাড়ী চারিদিকে কাঁটাগাছের বেড়া দিয়া ঘেরা।—আমার বঙ্গদেশের পল্লী-বর্ণনা মনে পড়িল—

"ছাড়া-সুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।"

এক-এক স্থানে, ধানের ক্ষেত—নবোদ্গত অঙ্কুরে সবুজ রঙ ধারণ করিয়াছে—কৃষকেরা স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া ক্ষেতের কাজে নিযুক্ত। স্ত্রী এবং পুরুষের বস্ত্র-পরিধান-প্রণালীর কোন পার্থক্য লক্ষিত হইল না,—উভয়েরই শরীরের অধিকাংশ অনাবৃত।

শোরণপুর জংসনে ট্রেণ পৌঁছিল। এখান হইতে কোচিন যাইতে হয়। আমার গাড়ীতে একজন কোচিন-যাত্রী ছিলেন, তিনি নামিয়া গেলেন। সাহেব-যাত্রীরা রিফ্রেসমেণ্ট রুমে আহার করিয়া লইলেন।

কাদালুণ্ডী ষ্টেশনের অদূরে কাদালুণ্ডী নদী সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এইখানে রেলওয়ে-ব্রিজের উপর হইতে, আরব সমুদ্র প্রথম দেখিতে পাওয়া গেল। আরও দুইটি নদী—বেপুর ও কালাই—পার হইয়া, প্রায় ২টার সময় ট্রেণ কালিকাটে পৌঁছিল। সেদিন উহাই আমার গন্তব্য ষ্টেশন। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া বিশ্রামের জন্য ডাক-বাংলার সন্ধানে চলিলাম।

১

কালিকাট বর্ত্তমান মালাবার জেলার প্রধান নগর, এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের প্রসিদ্ধ বন্দর। উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ভারতবর্ষের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া, পর্টুগীজেরা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে এই কালিকাট বন্দরেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সেই উপলক্ষেই য়ুরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য-বিনিময়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বঙ্গোপ-সাগরের তীরবর্ত্তী মান্দ্রাজ হইতে আরব সাগরকূলে অবস্থিত কালিকাটের দূরত্ব ৪১৩ মাইল। রেলওয়ে লাইন সহরটিকে ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কালিকাট সহর সমুদ্রতীরে প্রায় ৬ মাইল বিস্তৃত। এখানে জাহাজ ভিড়িবার জন্য দুইটি 'জেটী' এবং আলোক-স্তম্ভ আছে। সমুদ্রে অনেক-গুলি দেশীয় নৌকাও দেখা গেল।

কালিকাটের বাণিজ্যের গৌরব বর্ত্তমান কালেও লুপ্ত হয় নাই। এখান হইতে আদা, গোলমরিচ, এবং নারিকেলের তৈল, শুষ্ক শাঁস (copra) ও আঁস (coir) প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়। সহরের দক্ষিণ প্রান্তে, কালাই নদীর তীরে, প্রকাণ্ড কাঠের আড়ত। গবর্ণমেণ্টের সেগুন-বন হইতে নদীপথে রাশি-রাশি কাঠ বিক্রয়ার্থ এখানে আনীত হয়। কালিকাটের ছয় মাইল দক্ষিণে, বেপুর নদীর অপর পারে, ফেরোক নামক স্থানে ৪টি বড়-বড় টালির কারখানা আছে। এই টালিগুলি 'ম্যাঙ্গালোর টাইল' নামে আমাদের দেশে পরিচিত। কালিকাটের সমস্ত গৃহ-অট্টালিকার ছাত এই টালি দ্বারা নির্ম্মিত। সমুদ্রতীরে গবর্ণমেণ্টের মৎস্য-বিভাগের কার্য্যালয়। এই-খানে সামুদ্রিক মৎস্য বিদেশে রপ্তানীর জন্য শুষ্ক করা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কালিকাটে গবর্ণমেণ্টের একটি সাবানের কারখানা আছে। এখানে উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে নানা প্রকার সাবান প্রস্তুত হয়। আমার এই কারখানা দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল; অধ্যক্ষ মহাশয় যত্ন পূর্ব্বক সাবান প্রস্তুত করিবার প্রণালী এবং বিভিন্ন যন্ত্রাদির কার্য্যকারিতা বুঝাইয়া দিলেন। ইঁহাদের "চন্দন-সাবান" খুব ভাল বোধ হইল।

কালিকাটে পুরাকীর্ত্তির বিশেষ কোন নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। প্রাচীন অধিপতি 'জামরিণে'র বংশ এক্ষণে যদুবংশের ন্যায় বহুবিস্তৃত হইয়া নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কালি-কাট সহরে যে "জামরিণ প্রাসাদ" আছে, উহাতে "কেরল-বিদ্যাশালা" বা "জামরিণ-কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহরের মধ্যভাগে খানিকটা খোলা ময়দান, এবং পাথরে-বাঁধান সুন্দর একটি জলাশয়; উহার চারিধারে আফিস আদালত ইত্যাদি অবস্থিত। রাস্তার মাটি প্রস্তরমিশ্রিত রক্তবর্ণ। রাজপথের দুই ধারেই উচ্চ প্রাচীর—উহার অন্তরালে, নারিকেল-বাগানে-ঘেরা, এক-একখানি বাড়ী। সমুদ্রতীরে সারি-সারি ব্যবসায়ীদের আড়ত, গুদাম, আফিস। সহরের তিন মাইল উত্তরে, "ওয়েষ্ট হিল" নামক একটি ছোট পাহাড় আছে—ঐ স্থানে সেনা-নিবাস।

'কালিকাট' নামের সহিত 'কালীঘাট' এবং 'কলিকাতা' ('কালকাটা') নামের সাদৃশ্য আছে। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কোন 'উদীয়মান' বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কালিকাটে বাঙ্গালী অধিকারের প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছেন কি না, জানি না। স্থানীয় ইতিহাস অনুসারে কালিকাটের আদিম নাম "কোজিকোড" অর্থাৎ 'কুক্কুট-দুর্গ'। দুর্গটি এতই ছোট ছিল যে, কোথাও একটি কুক্কুট ডাকিয়া উঠিলে, দুর্গ মধ্যে সর্ব্বত্র উহার রব শ্রুত হইত।

৩

কালিকাট হইতে ২টার সময় আবার সেই 'ম্যাঙ্গালোর মেইল' ধরিয়া ৪॥০টায় কানানোর পৌঁছিলাম। কানানোর সহরটি দুই অংশে বিভক্ত, পুরাতন সহর, এবং নূতন সহর, অর্থাৎ ক্যাণ্টনমেণ্ট। মধ্যস্থলে, তিনদিক সমুদ্রে-ঘেরা পাহাড়ের উপরে, পর্টুগীজদিগের নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গ—সেণ্ট এঞ্জেলো। এই দুর্গের মধ্যে একটি আলোক-স্তম্ভ নির্ম্মিত

হইয়াছে। দুর্গের দক্ষিণ দিকে, সমুদ্র অগ্রসর হইয়া পুরাতন সহরের পশ্চিমাংশ যেন অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গ্রাস করিয়াছে। পুরাতন সহরটি প্রধানতঃ 'মপলা' জাতীয় মুসলমানদের বাসস্থান। দুর্গের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নূতন সহর। দুর্গ-সংলগ্ন বিস্তৃত ময়দান—সৈন্যদের প্যারেড্ গ্রাউণ্ড। ব্যারাক, স্কুল, গির্জ্জা, সমাধি-ক্ষেত্র ইত্যাদি দেখিয়া, সহরের এই অংশ য়ুরোপীয় উপনিবেশ বলিয়া মনে হয়। সমুদ্র-বায়ু অবাধে প্রবাহিত হওয়ায়, কানানোরে এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনেও গরম অসহ্য বোধ হয় না।

এখানকার সমুদ্র-তীরের দৃশ্য অতি সুন্দর। আমি যে কয়দিন কানানোরে ছিলাম, প্রত্যহই অপরাহ্ণ সমুদ্র-তীরে কাটাইয়াছি। একদিকে রক্তবর্ণ পাহাড়ের গায়ে সমুদ্র নিরন্তর আছাড়িয়া পড়িতেছে,—অন্যদিকে বালুকাময় বেলা-ভূমির উপর উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া তখনই পিছু হটিয়া যাইতেছে। সাহেবরা এখানে আসিয়া সমুদ্র-স্নান করিতেছেন এবং শিশুর দল সৈকতে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে। কানানোর-কূলে কোন জাহাজ ভিড়িতে পারে না।

কানানোরের ছিটের কাপড় সর্ব্বত্র পরিচিত। আমি ব্যাসেল মিশনের কাপড়ের কল দেখিতে গিয়াছিলাম। কলের মজুরদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম। এক দিকে কয়েকজন স্ত্রীলোক হাতে 'লেস্'-বয়ন করিতেছে। শুনিলাম, এই কলের শ্রমজীবী সকলেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। টালির কারখানা খুলিয়া, কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া, স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মিশনরীগণ মালাবারের অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে মালাবার অনেক জেলার দৃষ্টান্ত স্থল। কানানোরে নারী-বিদ্যালয়ের জন্য একটি সুদৃশ্য দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। যেমন কালিকাটে, তেমনি এখানে, নারিকেল বৃক্ষের অন্ত নাই! বাস্তবিক, মালাবারকে নারিকেলের দেশ বলিলেও চলে। মালাবার-বাসীর প্রধান সম্বল নারিকেল-বৃক্ষ। বাণিজ্য হিসাবে নারিকেল ফলের মূল্য তো আছেই; তাহা ছাড়া, নারিকেল বৃক্ষ হইতে ইহারা তাড়ি সংগ্রহ করে, নারিকেলের পাতায় কুটীর আচ্ছাদন করে, এবং শুষ্ক বৃক্ষে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। রন্ধনেও পশ্চিম-উপকূলে নারিকেল-তৈল ব্যবহৃত হয়। কানানোরে নারিকেল সংযোগে এক প্রকার বিস্কুট প্রস্তুত হয়; উহা বিলাতী nice বিস্কুটের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

কেরল-কামিনীর কেশ-রচনা-নৈপুণ্য চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু দেখিলাম, পুরুষগণও পিছন দিকের চুল খাট করিয়া ছাঁটিয়া, মাথার সম্মুখে বাম দিকে একটা ঝুঁটি বাঁধিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেতর জাতির স্ত্রীলোক শাড়ি পরিধান করে না,—একখানি অথবা দুইখানি গামছা দ্বারাই বস্ত্রের অভাব পূর্ণ করে। ইংরাজী শিক্ষিত পরিবারের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

৪

দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্রই জাতি বিরোধ প্রবল। মালাবারের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান জাতি তিনটি—নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ, নায়ার, এবং তিয়া। শিক্ষা বিষয়ে নায়ার জাতি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। ইহাদের মধ্যে "মারু-মাক্কাতায়ম" অর্থাৎ ভাগিনেয় উত্তরাধিকার-বিধি প্রচলিত। মালাবারের হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল অদ্ভুত সামাজিক প্রথা এখনও বিদ্যমান, বারান্তরে সে সম্বন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

হিন্দুদিগের মধ্যে 'তিয়া' জাতির সংখ্যাই অধিক। সমাজে এই জাতি 'অস্পৃশ্য' বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের সংস্পর্শ দূরে থাক, 'সান্নিধ্য" পর্য্যন্ত পরিত্যাজ্য। ইহাদিগকে অন্ততঃ ৮ গজ ব্যবধানে না রাখিলে, 'উচ্চবর্ণে'র শুচিতা নষ্ট হয়। আজকাল সহরে অবশ্য সর্ব্বত্র এই নিয়ম রক্ষা করা চলে না, কিন্তু পল্লীগ্রামে 'উচ্চবর্ণের' লোক পথে চলিবার সময় চীৎকার করিতে-করিতে যায়—'অস্পৃশ্য' জাতির কেহ নিকটে থাকিলে ঐ চীৎকার শুনিয়া দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মুসলমান অথবা খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি নিকটে আসিলে কাহাকেও অশুচি হইতে হয় না। এইরূপ অত্যাচারেই যে অনেক তিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রবাদ অনুসারে, তিয়া জাতি সুদূর অতীতকালে সিংহল দ্বীপ হইতে মালাবার উপকূলে আসিয়াছে; এবং মালাবারের প্রাকৃতিক সম্পদ নারিকেল বৃক্ষও ইহাদের দ্বারাই আনীত। তিয়াদিগের জাতিগত ব্যবসায় ছিল—নারিকেল বৃক্ষ রোপণ, এবং ঐ বৃক্ষ হইতে 'তাড়ি' সংগ্রহ। বর্ত্তমান কালে, য়ুরোপীয় রক্ত সংমিশ্রণের ফলে, উত্তর মালাবারের তিয়া



একটা নায়ার পরিবার



তিয়া নারী



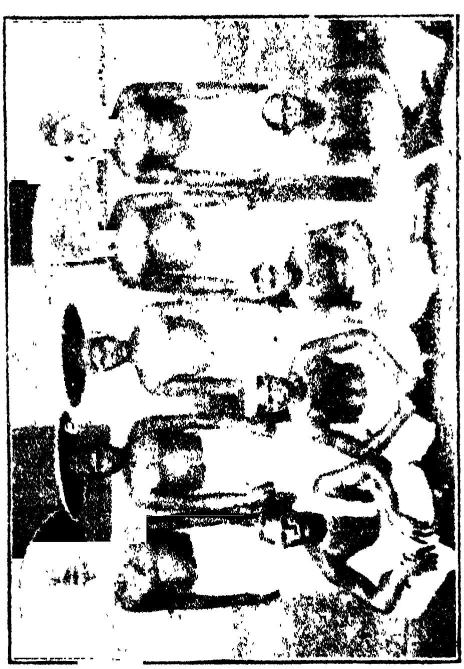
তিয়া রমণীরা নারিকেল দড়ি বুনিতেছে



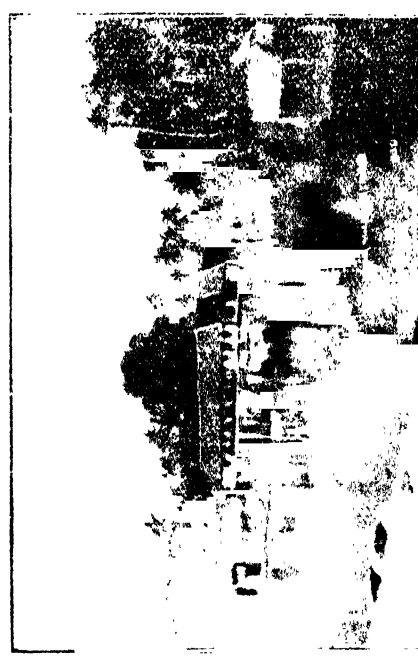
নায়ার মহিলা



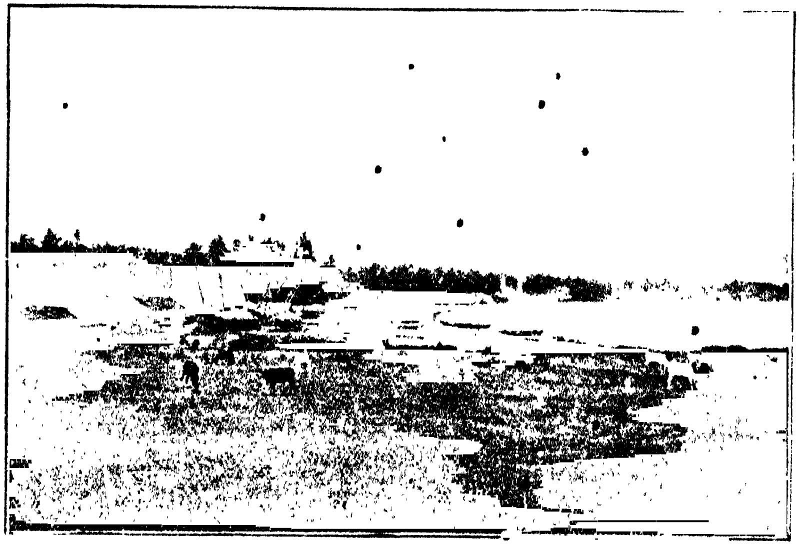
কেরল-কামিনীর কেশ রচনা



মালাবারী রমণীগণ



মালাবারের একটী পুষ্করিণী



কানানোর-উপসাগর



কানানোর দুর্গ

জাতি দেখিতে পারলেই সুখী। উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ইহাদের অনেকে চাকরী ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইতেছে। এমন কি হাইকোর্টের বিচারপতির আসনেও একজন অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষাও যথেষ্ট প্রসারলাভ করিতেছে। কিন্তু সাধারণ হিন্দু সমাজ তিয়া জাতির প্রতি এখনও কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

সম্প্রতি কালিকাটের ফৌজদারী আদালতে একটি অদ্ভুত মোকদ্দমা চলিতেছিল। একজন ব্রাহ্মণ, মায়ের চিকিৎসার জন্য একজন তিয়া ডাক্তারকে বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণপল্লীর এক পুষ্করিণীর ধারের পথ দিয়া যাইতে হইয়াছিল। ইহাতে পুষ্করিণীর ব্যবহার্য্যতা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, উক্ত ডাক্তার এবং তাহার সঙ্গী ব্রাহ্মণের নামে “অনধিকার প্রবেশের” অভিযোগ

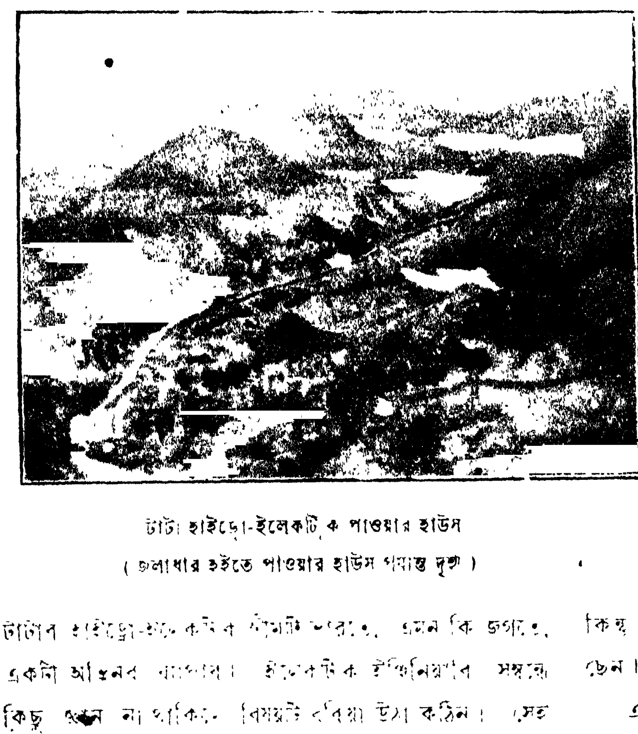
হয়। উভয় পক্ষের বহু সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে খালাস দিয়াছেন।

এই সব দেখিয়া, কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়-

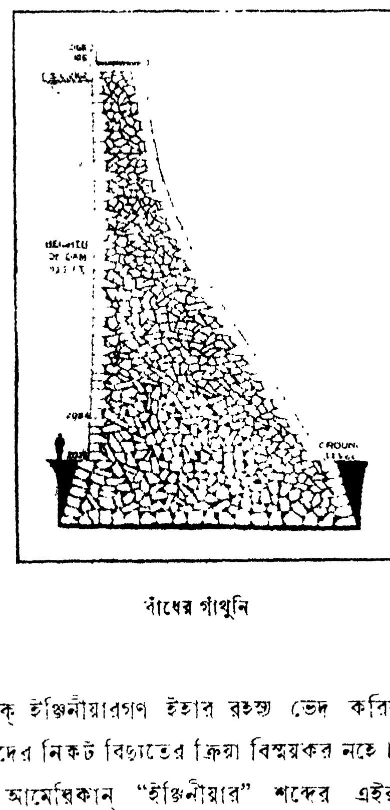
"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে,
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।.....
দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যু-দূত দাঁড়াইয়া দ্বারে
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিতা-ভস্মে সবার সমান।"

টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম

[শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার এ-এম-সি-টি, ম্যানচেষ্টার]



টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস
(জলাধার হইতে পাওয়ার হাউস পর্য্যন্ত দৃশ্য)

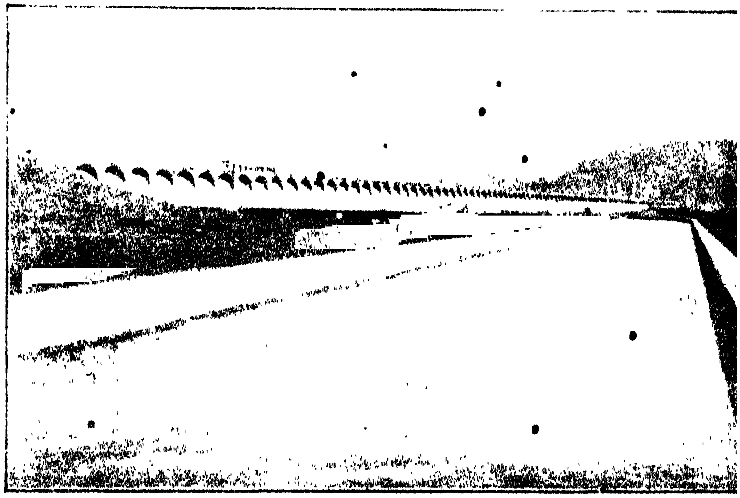


বাঁধের গাঁথুনি

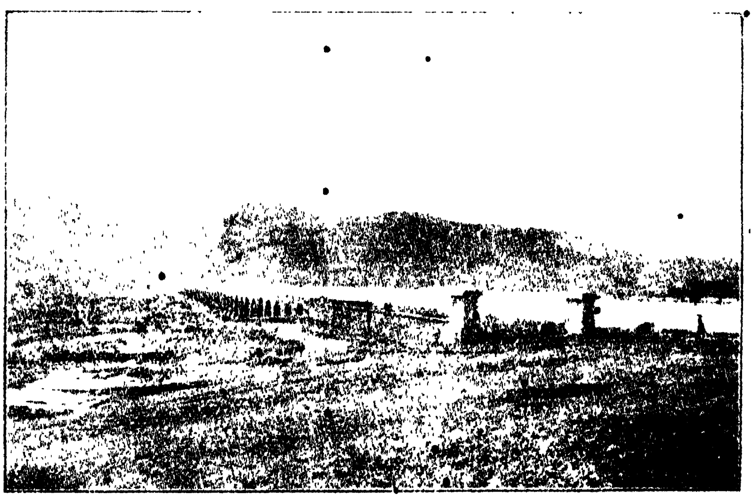
টাটার হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম ভারতে, এমন কি জগতে, একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না থাকিলে বিষয়টি বুঝিয়া উঠা কঠিন। সেই জন্য মূল বিষয়ের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি।

বিদ্যুৎ জিনিসটি সাধারণের নিকট এখনও রহস্যময়ই রহিয়াছে। ইহা যেন আত্মারাম সরকারের হাড়—যাদুকরের হাতে অসম্ভব ব্যাপারকেও সম্ভবপর করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ইলেকট্রিক্ ইঞ্জিনীয়ারগণ ইহার রহস্য ভেদ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট বিদ্যুতের ক্রিয়া বিস্ময়কর নহে।

একজন আমেরিকান্ "ইঞ্জিনীয়ার" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অপরে যে কাজ দুই পয়সা দিয়া করিবে, একজন ইঞ্জিনীয়ার সেই কাজটি এক পয়সা লইয়া সম্পন্ন করিয়া দিবেন। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারদিগকে মধ্যে-মধ্যে তাঁহাদের বন্ধুদের কাছে পরীক্ষা দিতে হয়। কোন ব্যক্তি হয় ত বন্ধুত্বের দাবীতে ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুকে ফরমায়েস করিয়া বলিলেন, "আমার বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটি



ওয়ালহাম বাঁধ



লোনাভলা বাঁধ

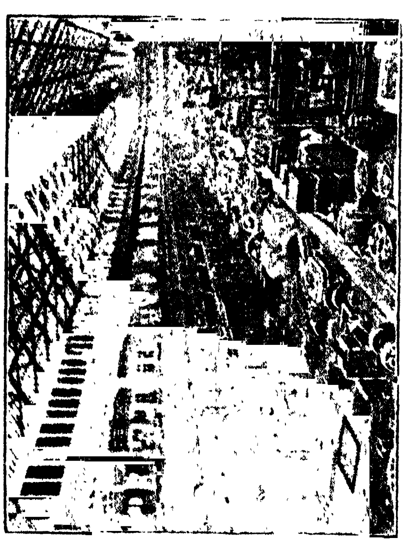
মেরামত করিয়া দাও।" কোন স্কুল-ইনস্পেক্টরকে যদি কোন শিশুকে ক, খ শিখাইতে অনুরোধ করা হয় তাহা তাহা হইলে যেমন দেখায়, ইহাও যেন সেই রকম অনুরোধ। আমি একজন চিকিৎসককে ব্যঙ্গচ্ছলে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, "কারখানায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করা আজ-কালকার ফ্যাসান।" ঠিক কথা, যে কোন উপায়ে মাল উৎপাদনের পড়তা কমানই আধুনিক কারখানাসমূহের ফ্যাসান বটে।

মূলধন বাদে যে-কোন শ্রমশিল্প সম্বন্ধে চারিটি প্রয়োজনীয় বিষয় আছে।

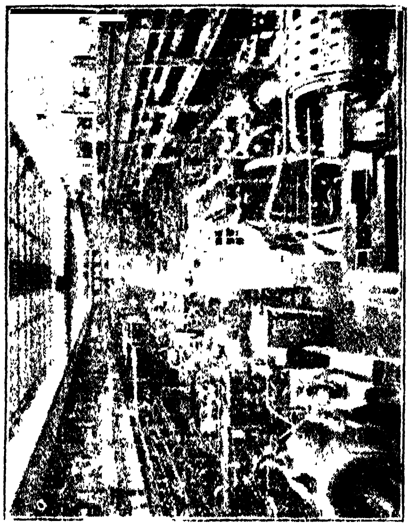
(ক) [illegible] কাঁচা মাল নিয়মিত ভাবে সরবরাহের বন্দোবস্ত থাকা দরকার।

(খ) শ্রমজীবী ও আপিসের কর্ম্মচারীদের নিজ-নিজ কর্ম্মে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। যদি তাহারা অশিক্ষিত হয়, তবে তাহাদিগকে শিখাইয়া পড়াইয়া তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। কিম্বা এমন ভাবে কাজের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যেন অশিক্ষিত শ্রমজীবিগণের দ্বারাও কাজ চলিতে পারে।

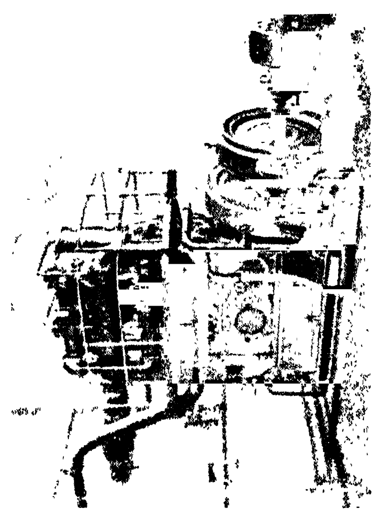
(গ) তৈয়ারী মাল বিক্রয়ের জন্য বাজার নির্দ্ধারিত থাকা চাই।



বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপাদনের কারখানা



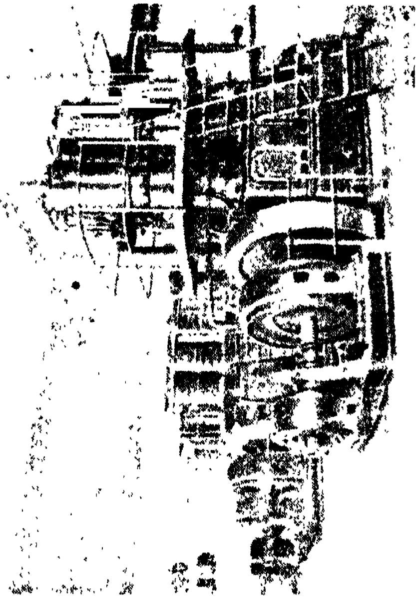
ইঞ্জিন শক্তি উৎপাদনের কারখানা



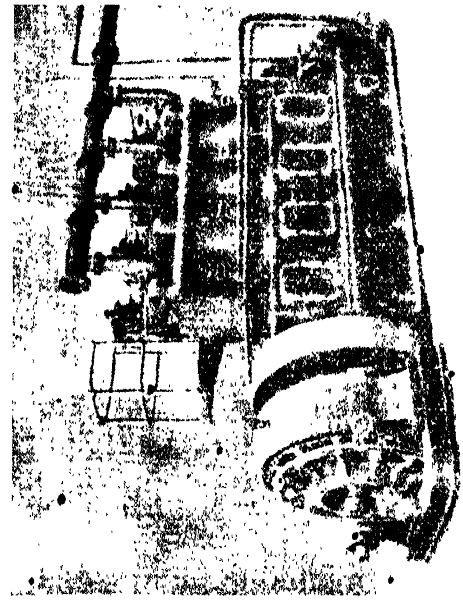
গ্যাস-ইঞ্জিন



ফোরবে এবং স স (জল বন্ধ করিবার কপাট)



রোটর



টার্বো জেনারেটর



একটি বিলাতী হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার ষ্টেশন



ওয়ালহান ও কোনাভলা জল স্রোতের সংযোগস্থলে লক্ দরজা



কারখানায় কারিকরদের হাজিরা করিবার ঘড়ি
ইহাতে লোকে নিজের কার্ড দিয়া টান দিলে কটার সময় এসেছে লেখা হয়ে যায়।
যদি এক সেকেণ্ডও দেরি হয় তাহাও ধরা পড়ে। আমাদের রাজা যখন British Westing House দেখিতে গিয়াছিলেন
তখন ঐরূপ ঘড়িতে নিজের কার্ডে ঘড়ি করিতেছেন ; সখ করিয়া।

(ঘ) কারখানার কল চালাইবার জন্য প্রথম আবশ্যক প্রাইম মূভার (Prime mover) বা এঞ্জিন সর্ব্বশেষে উল্লিখিত হইলেও এই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বোক্ত তিনটির অপেক্ষা একটুও কম নয়। বাষ্প, জল ও বায়ু— প্রকৃতির এই তিনটি অবয়ব হইতে শক্তি উৎপাদিত হয়। ইহাদের মধ্যে বাষ্প হইতে উৎপন্ন শক্তিই সর্ব্বপ্রধান ; এইটির সাহায্যেই প্রধানতঃ আধুনিক কলকারখানা চালান সম্ভবপর হইয়াছে। এই বাষ্পজনিত শক্তি প্রয়োগের ফলে বহু সংখ্যক শ্রমজীবীকে এক-একটা কারখানায় সমবেত করা যাইতে পারে। তাহার ফলে মাল নানা স্থানে প্রেরণের ব্যয় সঙ্কোচ করা যায় ; কার্য্য পরিদর্শন এবং কার্য্য পরিচালনের সুবিধা হয়, কার্য্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাইতে পারে, এবং সময়েরও সদ্ব্যবহার করা যায়। এই বাষ্প-শক্তির প্রয়োগের ফলে পৌনঃপুনিক কার্য্যগুলি কলের সাহায্যে সম্পন্ন হয় ; এবং যে কাজে বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগের দরকার হয়, সেগুলি মানুষ হাতে সম্পন্ন করিতে পারে। শক্তি প্রয়োগের দ্বারা এক এক শ্রেণীর কার্য্যে বিশেষজ্ঞ জন্মিয়া যায়, এবং তাহা সুপ্রণালীমতে নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। এই সব কারণে মাল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

প্রকৃতি হইতে অনেক রকমে শক্তি সংগ্রহ করা যাইতে পারে, যথা ষ্টীম, জল, বায়ু প্রভৃতি। জল ও বায়ুকে শক্তিরূপে ব্যবহারের পক্ষে বাণিজ্য-ঘটিত অনেক অসুবিধা

ঘটিয়া থাকে। এই কারণে শক্তি-উৎপাদনের জন্য বাষ্প এবং তৈল অথবা গ্যাসই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। তবে জল ও বায়ুকে শক্তিরূপে ব্যবহারের সুবিধা থাকিলে, তাহাতে ব্যয়-বাহুল্য ঘটিবে না; কিন্তু বাষ্পের ব্যবহারের সময় কয়লা বা তৈল পোড়াইয়া বাষ্প উৎপাদন করিয়া লইতে হয়।

যে সকল কারখানার কাজ কারখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেই সকল কারখানার কল-কব্জা চালাইতে হইলে সাধারণতঃ একটা প্রধান ষ্টীম বা গ্যাস ইঞ্জিন হইতে শক্তি উৎপন্ন করিয়া লইয়া চামড়া বা দড়ির সাহায্যে সেই শক্তি স্যাফটে (Shaft) (অর্থাৎ একটা লৌহময় দীর্ঘ দণ্ড, যাহা কয়েকটা স্তম্ভ বা পিল্লের উপর আড় ভাবে থাকে, এবং তাহার গাত্রে মাঝে মাঝে চাকা সংলগ্ন থাকে; তাহারই একটা প্রধান চাকার সহিত চামড়ার ফিতা বা দড়ির সাহায্যে ইঞ্জিনের চাকার সংযোগ থাকে; এই স্যাফটের গাত্র সংলগ্ন অন্যান্য চাকাগুলির সহিত ঐরূপ চামড়ার ফিতা বা দড়ির দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন কলের সংযোগ থাকে। ইঞ্জিন চালাইতে আরম্ভ করিলেই তাহার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত কলগুলি চলিতে থাকে) সঞ্চালিত হয় এবং স্যাফট্ হইতে ক্রমে অন্যান্য কলে শক্তি-প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এমন অনেক শ্রমশিল্প আছে, যাহার কার্য্য সমস্ত সহরময় বিস্তৃত, যথা, ট্রামগাড়ী, মুদ্রাযন্ত্র, পালিশ করিবার বা ছুরি-কাঁচিতে ধার দিবার যন্ত্র, পাখা, জলোত্তোলন-যন্ত্র বা পাম্প, লিফ্‌ট্, বই বাঁধিবার যন্ত্র, কিম্বা কাপড় ধোলাই করিবার যন্ত্র, প্রভৃতি। একটা কেন্দ্র স্থানে শক্তি উৎপন্ন করিয়া সহরের ভিন্ন-ভিন্ন অংশে অবস্থিত এই সকল কল-কারখানা কেবল চামড়ার সাহায্যে চালানো যায় না। এই সকল কারখানায় শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে, কেবল বিদ্যুতের শক্তির সাহায্যেই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে।

বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ নানা উপায়ে উৎপাদিত হইতে পারে। মাইকল ফ্যারাডে নামক একজন ইংরেজ বিজ্ঞানবিদ্ বিদ্যুৎ-জননের যে প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এই যে, তাম্র, য়্যালুমিনিয়ম্, লৌহ প্রভৃতি যে কোন একটা পরিচালককে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সঞ্চালন করিতে হইবে। এই উদ্ভাবনের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক শ্রমশিল্প গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এবং এই উদ্ভাবনের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে শ্রম-শিল্প ঘটিত একটা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত চৌম্বক-ক্ষেত্রে পরিচালককে সঞ্চালন করিবার জন্য শক্তি আবশ্যক। সুতরাং বিদ্যুৎ জনন করিবার জন্য ষ্টীম এঞ্জিন, ষ্টীম টারবাইন, তৈল বা গ্যাস এঞ্জিন প্রভৃতি কোন একটি মূল শক্তি আবশ্যক। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে মূল শক্তির মাত্র শতকরা ৯০ অংশ (.95) বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালনের জন্য Insulated (বিদ্যুতের অপরিচালক পদার্থে আবৃত) তাম্র নির্ম্মিত তারের প্রয়োজন হয়। আবার, এই বৈদ্যুতিক শক্তিকে পুনরায় মেকানিক্যাল শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য ইলেকট্রিক মোটরের প্রয়োজন। এই সকল কার্য্য পরিচালন জন্য Control Gear এবং বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর সাহায্য আবশ্যক। এত কাণ্ড করার অর্থ—মূলধন বাবদে অজস্র অর্থ ব্যর্থ ব্যয়, এবং অনেকটা শক্তির অপচয় হয়।

এই সকল অতিরিক্ত ব্যয়ভূষণ সত্ত্বেও, এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্য্য এতটা জটিল হইলেও, বিদ্যুতের ব্যবহারে লাভ আছে। তড়িতের একটা মস্ত লাভ এই যে, ইহা বহু দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে, অথচ তাহাতে বিদ্যুতের বিশেষ অপচয় ঘটে না। তড়িতের এই সুবিধাটির জন্যই ইহার প্রচলন এত অধিক।

ষ্টীম, এঞ্জিন, বয়লার, কলকারখানার বাড়ী, কয়লা খরচ এবং তদানুষঙ্গিক লোকজনের দরুণ যে ব্যয় হয়, ছোট বড় কারখানার তারতম্য অনুসারে সেই ব্যয়ের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে,—বৈদ্যুতিক শক্তি, অথবা কলকারখানার ভাষায় বিদ্যুৎ হইতে উৎপন্ন অশ্ব-শক্তির (Horse Power)—তাদৃশ তারতম্য ঘটে না। ষ্টীম এঞ্জিন ব্যবহার কালে, অশ্ব-শক্তির পরিমাণ যতই বাড়াইয়া দেওয়া যায়, প্রতি অশ্ব-শক্তি উৎপাদনের ব্যয়ও ততই কমিয়া আসে। অর্থাৎ ৫ অশ্ব জোর মোটরের দাম ৭০০ টাকা হইলে ১০ অশ্ব-জোর মোটরের দাম ১৪০০৲ টাকা না হইয়া ১০০০৲ টাকা হয়। তবে এই হ্রাসের একটা সীমা আছে। বয়লার, কারখানা,

কয়লা, এবং লোক-জনের সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। তবে ইহাদের সীমা প্রত্যেকের পক্ষে বিভিন্ন। আবার ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থাতেও এই তারতম্যের প্রভেদ ঘটে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রধান শক্তির কেন্দ্রের কোনরূপ বিকৃতি ঘটিলে, অথবা প্রধান ইঞ্জিনের কোন অংশ ভগ্ন হইলে, কারখানা বন্ধ থাকায় অনেক লোকসান হইয়া যায়। কিছু কালের জন্য কল-কব্জা বন্ধ থাকায় মালের উৎপাদন কম হয়। যদি কারখানার সহিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাল সরবরাহের জন্য খরিদদারের কোনরূপ চুক্তি থাকে, তাহা হইলে সময়ে ঐ মাল সরবরাহ করিতেও এক দফা লোকসান ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এমন কি কোন কোন স্থলে অপ্রত্যাশিত ভাবে মাঝে-মাঝে ঘণ্টা কয়েকের জন্যও কারখানা বন্ধ থাকিলে, শক্তি উৎপাদনের জন্য এক বৎসরে যাহা খরচ পড়ে, তদপেক্ষাও বেশী লোকসান হইয়া যাইতে পারে। এরূপ ক্ষতি নিবারণের জন্য এঞ্জিন প্রভৃতি দুই সেট করিয়া রাখা যাইতে পারে। তাহা হইলে এক সেট কোন রকমে খারাপ হইয়া গেলে, দ্বিতীয় সেট ব্যবহার করিয়া কারখানার কাজ চালাইতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে দ্বিগুণ মূলধন আবশ্যক; তার পর এইরূপে দুই সেট করিয়া এঞ্জিন প্রভৃতি রাখায় এবং এক সেটকে অনর্থক বসাইয়া রাখায় লাভ আছে কি না তাহাও বিবেচ্য। কোন কোন কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি বিভাগ, এবং তাহাদের উপযুক্ত বিভিন্ন প্রকারের কল-কব্জা থাকে। এইরূপ প্রত্যেক বিভাগে কি পরিমাণে শক্তি ব্যয় হয়, বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। অতএব ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শক্তি প্রয়োগের দিক হইতে কি পরিমাণে ব্যয় হয়, তাহা নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা কঠিন। কাজে-কাজেই মাল-উৎপাদন-প্রণালীর উন্নতি-সাধনেরও বিশেষ উপায় থাকে না। এ দিকে বেল্ট ব্যবহার করিয়া কল-কব্জা চালাইতে যেমন ব্যয়াধিক্য ঘটে, ক্ষতিও সেইরূপ বেশী হয়; এ প্রণালীটি সেরূপ সুবিধাজনক নহে।

পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি অপরিচালক পদার্থে আবৃত তাম তারের মধ্য দিয়া কারখানার বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়; এবং ইলেক্‌ট্রিক মোটরের সাহায্যে ঘূর্ণ্যমান যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইয়া একটা Shaft বা কোন একটা বড় কল চালাইয়া থাকে। বিদ্যুৎ ব্যবহারের এই প্রণালীতে কিছু অতিরিক্ত খরচ হইলেও এবং ইহা কিছু জটিল হইলেও, মোটের উপর ইহা সস্তা এবং বেল্ট ব্যবহারের অপেক্ষা সুবিধাজনক। কারখানার মালিকেরা বিদ্যুৎ ব্যবহারের এই সকল সুবিধা দেখিয়া ক্রমে-ক্রমে নিজ-নিজ কারখানায় বিদ্যুৎ-শক্তির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক শক্তি সুলভ নহে; বৈদ্যুতিক শক্তির সুলভতা সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে।

বিশেষ-বিশেষ স্থান বিশেষ-বিশেষ শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া এক-এক স্থলে এক এক শিল্প দ্রব্যের কারখানা স্থাপিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ল্যাঙ্কাসায়ারের জল বায়ু আর্দ্রতা তুলাজাত শিল্প উৎপাদনের পক্ষে খুব উপযুক্ত হওয়ায়, তথায় বহু সংখ্যক তুলার কল স্থাপিত হইয়াছে। কয়লা ও লৌহ খনি এবং বন্দরের সান্নিধ্যও শিল্প-কেন্দ্র স্থাপনের স্থান নির্ণয়ে সহায়তা করিয়া থাকে। আবার কোন স্থানে কোন একটা বিশেষ শিল্পের কারখানা পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকিলে, সেই শিল্পের কার্য্যে অধিক শ্রমজীবী তথায় সুপ্রাপ্য হইয়া থাকে। কারণ সেই কারখানার লোকেরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে, অর্থাৎ নিয়ত ঐ শিল্প দ্রব্য উৎপাদিত হইতে দেখিতে দেখিতে স্বতঃই ঐ শিল্প সম্বন্ধে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া থাকে, এবং নানা প্রকারে উহার প্রস্তুত-প্রণালীর সহিত পরিচিত হয়। ইহাতে সেই স্থানে ভাল কারিকর পাইতে অসুবিধা হয় না। এই সুবিধার জন্য সমশ্রেণীর শিল্পের কারখানা সাধারণতঃ ঐ স্থানেই নির্ম্মিত হয়।

একস্থানে একটা বড় রকমের শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপন করিয়া, সেই শক্তি ছোট-ছোট কারখানায় সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, নানা দিকে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। প্রত্যেক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কারখানাওয়ালা নিজ-নিজ কারখানায় শক্তি উৎপাদনের এক-একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলে, অবশ্য তাহাদিগকে নিজ-নিজ প্রয়োজন অনুসারে শক্তি-উৎপাদনের উপযোগী এক-এক সেট ছোট-ছোট শক্তি-উৎপাদক কল-কব্জা বসাইয়া লইতে হয়। কিন্তু ঐ কারখানাগুলি একস্থানে অবস্থিত হইলে, এবং তাহাদিগকে শক্তি সরবরাহের জন্য একটা স্বতন্ত্র বড়

কোম্পানী গঠন করিয়া লইলে, সেই কোম্পানী কেবল শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রকাণ্ড একটা কারখানা খুলিতে পারেন। এইরূপে এক জায়গায় বেশী পরিমাণে শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইলে, প্রত্যেক কারখানায় স্বতন্ত্রভাবে শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে যে খরচ পড়ে, সেই ব্যয় একত্র করিলে যত হয়, তদপেক্ষা অনেক কম খরচে ঐ বড় কারখানায় শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শক্তি-উৎপাদনের কারখানা যত বড় হইবে, প্রতি অশ্ব-শক্তি উৎপাদন করিতে খরচ সেই পরিমাণে কম পড়িবে। যেখানে এক শ্রেণীর অনেকগুলি কারখানা পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থিত, কেবল সেই সকল স্থলেই এইরূপ একটা বড় রকমের শক্তি উৎপাদক কারখানা খোলা সুবিধা হয়। এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানাই ঐরূপ ভাবে শক্তি সঞ্চালনের পক্ষে সম্যক উপযোগী। সেই শক্তি কারখানাসমূহে, ট্রামে, আলো ও পাখার জন্য এবং আরও অন্যান্য প্রকার গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয়। অধুনা এই সকল কার্য্যে বৈদ্যুতিক শক্তিই প্রযুক্ত হইতেছে। কারিগর শিল্পী সম্প্রদায় এইরূপ কার্য্যে বিদ্যুতের সাহায্য লইয়া থাকে। এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের ব্যয় স্বচ্ছন্দে প্রদান করিতে পারে। ঐ স্থানের আইন-ব্যবসায়ী, ডাক্তার, শিক্ষক, মিশনারী, সংবাদপত্র-লেখক ও সাধারণ ব্যবসায়ীরা বিদ্যুৎ দিয়া কাজ করাইয়া লইতে ছাড়েন না। শক্তি উৎপাদনের জন্য বড় কারখানা স্থাপন করিতে হইলে, সময়ে-সময়ে প্রধান শক্তি-উৎপাদক যন্ত্র বিকল হইয়া গিয়া, বৈদ্যুতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল এতগুলি কারখানা বা ব্যবসায় যাহাতে সহসা বন্ধ হইয়া না যায়, তাহার জন্য কিছু অতিরিক্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়। ছোট-ছোট কারখানায় প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ভাবে শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইলে সেখানেও অসময়ের সঞ্চয় স্বরূপ দুই সেট শক্তি-উৎপাদক যন্ত্র স্থাপন করা আবশ্যক; এবং তাহাতে খরচ নিশ্চয়ই দ্বিগুণ পড়ে; কিন্তু শক্তি-উৎপাদক বড় কারখানার মালিক কোম্পানী শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত ব্যয় করিলেই অসময়ের সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানায় বা এক শ্রেণীর কার্য্যে ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্তে যতক্ষণ পর্য্যন্ত শক্তি-উৎপাদন কার্য্য চলিতে পারে, বড় শক্তি-উৎপাদক কারখানায় তদপেক্ষা অনেক বেশী সময়, এমন কি চব্বিশ ঘণ্টাই কল চলিতে পারে, এবং বড় শক্তি উৎপাদক কারখানায় নানা রকম যন্ত্র-তন্ত্র এবং এই কার্য্যে অভিজ্ঞ লোকজন যথেষ্ট পরিমাণে রাখা যায়। তাহাতে খরচ অনেক কম হয়, মূলধন তত বেশী দরকার হয় না; কল চালাইবার এবং লোকজন রাখিবার খরচাও কম হয়। কল চালাইবার মজুরী কম পড়ায় লাভও বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে।

বৈদ্যুতিক শক্তির কল্যাণে কারখানার মালিকেরা ষ্টীম এঞ্জিনের সরঞ্জাম রাখিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে কারখানার প্রয়োজনীয় অন্যান্য মাল মসলার ন্যায় শক্তিও তাঁহাকে সরবরাহ করা হয়। তিনি যে পরিমাণ শক্তির ব্যবহার করেন, কেবল তাহারই মূল্য দিয়া থাকেন, শক্তির অপচয় ঘটিবার বা উদ্বৃত্ত শক্তি অনর্থক নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তিনি নিজে শক্তি উৎপাদন করিলে তাঁহার যে ব্যয় হইত, ইহাতে তদপেক্ষা সস্তায় তিনি শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আবার কারখানায় শক্তি উৎপাদনের সরঞ্জাম রাখিতে যে স্থান আবশ্যক হইত, সেটাও বাঁচিয়া যায়; কারখানার আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট করা যাইতে পারে। যদি কোন সময়ে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে কোম্পানী কারখানাওয়ালাদিগকে গ্যারেন্টি এবং অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য থাকেন।

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, আমরা জল হইতে বিনাব্যয়ে শক্তি উৎপাদন করিয়া লইতে পারি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাণিজ্যঘটিত কারণে জল ও বায়ুর শক্তি বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না। এখানে ঐ সকল কারণের এবং তাহাদের প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ছুরি, ক্ষুর প্রভৃতি লঘু অস্ত্রে কিছু কাটিতে হইলে প্রায় ধারে কাটে। দা, খড়্গ প্রভৃতিতে কতক ধারে এবং কতক ভারে কাটে; আর কুঠারের ন্যায় যন্ত্রে বোধ হয় পুরাপুরি ভারেই কাটিয়া থাকে। কাটিবার পক্ষে ধার ও ভার এই দুইটা ফ্যাক্টর (Factor)। এই দুইএর সামঞ্জস্যে কর্ত্তন-ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। যেখানে ধার বেশী সেখানে ভারের

প্রয়োজন হয় না। যেখানে ধারের অভাব সেখানে ভারে পোসাইয়া লইতে হয়।

শক্তির উৎপাদন কার্য্যে সেইরূপ সংহতি (mass) এবং গতিবেগ (velocity) বা চাপ (pressure)। শক্তি-উৎপাদন কার্য্যের সময় যেখানে সংহতির পরিমাণ অল্প থাকে, সেখানে গতিবেগ বা চাপের পরিমাণ বেশী হওয়া চাই। আর যেখানে সংহতি বেশী সেখানে গতিবেগ বা চাপ অল্প হইলেও চলে। (শক্তির ফ্যাক্টর সম্বন্ধে এই যে কথাগুলি বলা হইল, তাহা যে ঠিক বিজ্ঞানসম্মত কথা নয়—তাহা না বলিলেও চলে।) বিজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া এই কথাগুলি বলিতে হইলে অনেক স্থান আবশ্যক হইবে। বয়লারের ভিতরে যে ষ্টীম্ অর্থাৎ বাষ্প থাকে, তাহাতে চাপও আছে এবং ঐ ষ্টীমের thermo-dynamics গুণও আছে। বাষ্প বা জলের চাপকে গতিবেগে পরিণত করা যাইতে পারে। এই দুইটার পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। টারবাইন নামক যন্ত্রে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারতবর্ষে যেরূপ বড় বড় নদী আছে তাহাদের গতিবেগ খুব কম। এই সকল নদীতে জলের চাপ নাই বলিলেই চলে। সুতরাং এই সকল নদীর জলের স্রোত হইতে খুব বেশী শক্তি উৎপাদন করিতে হইলে অনেক জলের দরকার হয়; কাজে কাজেই কল-কব্জাও খুব বড়-বড় বানাইতে হয়। তাহাতে কল-কব্জার মূল্য এত বেশী পড়িয়া যায় যে, বাষ্পশক্তি উৎপাদন করা তদপেক্ষা সস্তা হইয়া পড়ে। বড়-বড় কল ব্যবহারের আর একটা অসুবিধা হয় তাহাদের নাড়া-চাড়া লইয়া। বড়-বড় কল-কব্জা আনাইয়া বসাইতে যেমন কষ্ট হয়, তাহা তেমনি ব্যয়-সাধ্য। আবার আমাদের দেশের নদীমাতৃক ভূমি এমন নরম যে, বড়-বড় কল-কব্জা বসাইতে খুব শক্ত করিয়া ভিত্তি প্রস্তুত না করিলে চলে না। ভারতীয় অধিকাংশ নদীর জলের Level গ্রীষ্মকালে এবং বর্ষাকালে ১০ হইতে ১০০ ফিট বাড়ে-কমে, এই কারণেও জলের levelএর সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ভারী কল-কব্জা বসাইতে খরচ বেশী পড়িয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, শক্তির সরবরাহ নিয়মিত হওয়া দরকার। মধ্যে মধ্যে দুই-এক মাস শক্তির সরবরাহ বন্ধ হইলে কারখানার ভয়ানক ক্ষতি। তাহাতে যে সকল কারখানাকে ঐ শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের সকল কাজেই বিশৃঙ্খলা হওয়া অনিবার্য্য। আমাদের দেশের নদীগুলিতে জলের অবস্থা সকল সময়ে সমান থাকে না; সেইজন্য ইহাদের উপর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে নির্ভর করাও যায় না। ইহার একমাত্র সমাধান এই যে, নদীর উৎপত্তি-স্থলে শক্তি-উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এখানে জলও যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহার চাপও খুব বেশী হইতে পারে। পাহাড়ের শক্ত ভূমিতে কলকব্জার ভিত্তি খুব দৃঢ় করিয়া নির্ম্মাণ করা যায়। কিন্তু এখানকার অবস্থাও একেবারে নিরাপদ নহে। অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে বৃষ্টির কম-বেশী হওয়া সম্ভব; বিশেষত সারা বৎসর ব্যাপিয়া এখানেও সমান পরিমাণে জল পাওয়া যাইবে না। তার উপর এখানে শক্তি উৎপাদন করিয়া তাহা হয় ত অনেক দূরে-দূরে চালনা করিতে হইবে। পাহাড়ে দেশে বড়-বড় ভারী-ভারী কলকব্জা লইয়া যাওয়া আবার আরও কষ্টকর। সেইজন্য জলের শক্তি ব্যবহারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা কোন সুবিধাজনক উচ্চ স্থানে তড়াগ বা হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া নদীর জল সেইখানে সঞ্চয় করা, এবং তাহা প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করা। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে সকল কোম্পানী এইরূপে জলের শক্তি ব্যবহার করেন, তাঁহারা প্রায় এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ তড়াগ বা হ্রদে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রচুর জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য হ্রদ নির্ম্মাণ করিতেও অনেক টাকা খরচ পড়িয়া থাকে; কিন্তু পাহাড়ে দেশে এ বিষয়ে কিছু-কিছু সুবিধাও আছে। কতকগুলি নদীতে যে বৃষ্টির জল আসিয়া সঞ্চিত হয়, তাহা যে সকল উপত্যকার উপর দিয়া আসে, সেই উপত্যকাগুলি প্রায় চারিদিকেই পাহাড়ের দ্বারা বেষ্টিত। যদি জল যাইবার খোলা মুখগুলি কোন রকম প্রাচীর বা বাঁধ দিয়া বন্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে বড়-বড় কৃত্রিম হ্রদ সহজেই নির্ম্মিত হইতে পারে। তবে বাঁধ বাঁধিবার স্থান নির্ব্বাচনের সময় ঐ স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে এবং নিয়মিতভাবে বৃষ্টিপাত হয় কি না তাহার অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক। ভারতীয় পূর্ত্ত-বিভাগের ইরিগেশন শাখা, এবং দেশীয় রাজ্যগুলির অনেকে এই উপায়ে জল সঞ্চয় করিবার প্রথা অবলম্বন করিয়া কৃষিক্ষেত্রে নিয়মিত ভাবে জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। এ বিষয়ে

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বোম্বাইএর অনেকটা বেশী সুবিধা আছে। বোম্বাইএর পাহাড়ে অংশে ৫০ মাইলের মধ্যে যথেষ্ট বারিপাত হইয়া থাকে। তাহার ফলে বাঁধ বাঁধিয়া জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবারও যথেষ্ট সুবিধা আছে। এই কারণেই, টাটা হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক স্কীম সম্ভবপর হইয়াছে। এই কারখানা স্থাপন কার্য্যই প্রথমতঃ একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। তাহার উপর, ইহা হইতে শক্তি সরবরাহ করিয়া বোম্বায়ের কলের কলগুলি পরিচালন করিবার কল্পনাও অল্প বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

বাঙ্গলা ভাষার মঙ্গলকাব্য

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ]

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "বাতায়নিকের পত্রে" বাঙ্গলা ভাষার মঙ্গলকাব্যগুলি সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বাংলা ভাষার মঙ্গল-কাব্যগুলির বিষয়টা হচ্চে এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আরেক দেবতার অভ্যুদয়"--"আমরা (শক্তিপূজক বাঙ্গালীরা) বল্‌চি,—শিবকে মানব না; শিবকে মানা কাপুরুষতা, আমরা চণ্ডীর মঙ্গল গাইতে বসেচি।" কিন্তু এই এক দেবতাকে "খেদিয়ে" দেওয়া, শিবকে না মানা, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এ সকল কথা কোথাও পাওয়া যায় না। চণ্ডী বা মনসার পূজা করিলে শিব পূজা ছাড়িতে হইবে, যুক্তির সাহায্যেও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কারণ চণ্ডী ও মনসা (পদ্মা)কে শিবের পত্নী ও কন্যা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহাই বরং বলা উচিত যে, চণ্ডী ও মনসাকে অবজ্ঞা করিলে প্রকারান্তরে শিবকেও অবমাননা করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ শক্তির সহিত মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অত্যন্ত বিরোধ দেখিয়াছেন। কিন্তু শক্তি মাত্রই ত খারাপ নহে। শক্তির দ্বারা যে কেবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার বা পরস্ব লুণ্ঠন করিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই। শক্তির দ্বারা ভালও করা যায়, মন্দও করা যায়,—উদ্দেশ্য অনুসারে শক্তি শুভ বা অশুভ উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। যে শক্তির উদ্দেশ্য পরপীড়ন, পরস্বহরণ তাহা অশুভ; আর যে শক্তির উদ্দেশ্য পরোপকার তাহা শুভ। হিন্দুধর্ম্মোপদেষ্টাগণ শক্তির এই দুই ভাবই উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের শক্তি সর্ব্বদা শুভ ও পূজনীয়। যে শক্তি অশুভ তাঁহারা তাহার নাম দিয়াছেন আসুরী শক্তি। এই আসুরী শক্তির সহিত আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। ঈশ্বরের শক্তির সাহায্যে আসুরী শক্তির পরাভব হয়। আসুরী শক্তি বিনাশ করিবার জন্যই ঈশ্বরের শক্তি চণ্ডী রূপ গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পাছে শক্তির আরাধনা করিবার সময় ভক্ত ভ্রমক্রমে আসুরী শক্তির আরাধনা করে, এ বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রকারগণ যথেষ্ট সাবধান হইয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা এই দুই শক্তির প্রভেদ স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং দশভুজা মূর্ত্তিতে চণ্ডীর অসুরবিনাশিনী রূপ দেখাইয়া এই প্রভেদ হিন্দুর হৃদয়ে প্রগাঢ় ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

পরমেশ্বর যেমন মঙ্গলময়, সেইরূপ তিনি সর্ব্বশক্তিমান। এই বিশাল জগতের সৃজন ও প্রতিপালন তাঁহার অসীম শক্তির নিদর্শন। পরমেশ্বরের এই শক্তিকে চণ্ডী বা দুর্গারূপে পূজা করা হয়। পরমেশ্বর বা শিব,—স্বামী; পরমেশ্বরের শক্তি বা চণ্ডী,—তাঁহার পত্নী। শক্তিকে তাঁহার পত্নী বলিয়া কল্পনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্ত্রী যেমন বাস্তবিক স্বামী হইতে ভিন্ন নহেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া যেমন এক ব্যক্তির ন্যায় সংসারের যাবতীয় কার্য্য নিষ্পাদন করেন, সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বর ভিন্ন কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, ঈশ্বর ও ঈশ্বরের শক্তি মিলিত হইয়া এক ব্যক্তির ন্যায় জগতের সৃজন, পালন প্রভৃতি সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন। বৈদান্তিক এই সিদ্ধান্তটি "শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ", অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান ভিন্ন নহেন, এই বলিয়া প্রকাশ করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। * * তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না।

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ক'রছেন। তাঁরই নাম কালী।

"কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ ক'রছেন না,—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কাজ করেন তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নাম রূপ ভেদ।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্বহিসাবে শক্তি-পূজা ঈশ্বরের পূজা ব্যতীত কিছুই নয়।

ধনপতি সদাগর চণ্ডীর মঙ্গল-ঘটে পদাঘাত করিয়া বিপদে পড়িয়াছিল, চাঁদ সদাগর মনসাকে অবজ্ঞা করিয়া উপর্য্যুপরি শোক পাইয়াছিল, ইহা রবীন্দ্রনাথের চক্ষে অতিশয় অশোভন বলিয়া বোধ হইয়াছে। এজন্য তিনি বলিয়াছেন, "মঙ্গলকাব্যগুলি অধর্ম্মেরই জয় গান, অন্যায়-কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত।" আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শিবের পরাভবের কথা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা মাত্র, শিব-পূজা ছাড়িয়া কোথাও শক্তি-পূজা করিবার বিধান দেওয়া নাই। দ্বিতীয়তঃ জগদীশ্বর বা জগদীশ্বরীর অবমাননা করিলে অনিষ্ট হইবে, ইহা যে কেবল বাঙ্গালী কবিরই বিকৃত কল্পনা, তাহা নহে। শয়তান ঈশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করে নাই বলিয়া তাহার বহু বিড়ম্বনা হইয়াছিল,—মিল্‌টন্ তাঁহার প্যারাডাইজ্ লষ্ট্ কাব্যে জলদমন্দ্র স্বরে সেই কাহিনী গান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন; সে কাব্যকে কোন সমালোচক এ পর্য্যন্ত অধর্ম্মের জয় গান বা দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। এ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, খৃষ্ট-ধর্ম্মের কল্পনা এবং হিন্দু-ধর্ম্মের কল্পনার মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। ঈশ্বর-বিরোধী শয়তান চিরকালতরে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। কিন্তু কংস, রাবণ ও হিরণ্যকশিপু ঈশ্বরের বিরোধাচরণ হেতু শাস্তি পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত সদগতি লাভ করিয়াছিল; এবং ইহাই ঠিক্—এইরূপ না হইলে ঈশ্বরের অনন্ত করুণা এবং অসীম শক্তির উপর দোষ পড়ে।

দুঃখ, কষ্ট, বিপদ মাত্রেই যে খারাপ তাহা নহে। দুঃখ ও বিপদের সময় যে শারীরিক ও মানসিক যাতনা হয়, তাহা দুঃখ ও বিপদের একটা মাত্র ফল—সমগ্র ফল নহে। ঐ যাতনা পাইয়াও যদি হৃদয়ের কোন উন্নতি না হয়, বা অবনতি হয়, তাহা হইলে সেরূপ দুঃখ ও বিপদ বাঞ্ছনীয় নহে সত্য; কিন্তু অনেক সময়ে দুঃখ ও বিপদে পড়িয়া মানবের হৃদয় নির্ম্মল হয়। সোনা যেমন আগুনে পুড়িয়া বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়, দুঃখ ও বিপদে পড়িয়া মানবের হৃদয় সেইরূপ পাপ-মুক্ত ও দীপ্তিমান হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে ক্ষণিক যাতনা সত্ত্বেও দুঃখ ও বিপদ বাঞ্ছনীয়; এবং যিনি এই অভিপ্রায়ে দুঃখ ও বিপদ দেন, তিনি নিষ্ঠুর নহেন, তিনি মঙ্গলেচ্ছু। এ জন্যই কুন্তী বলিয়াছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে সর্ব্বদা দুঃখ ও বিপদের মধ্যে রাখিও; কারণ দুঃখের সময় আমি তোমাকে যেমন প্রাণের সহিত ডাকিতে পারি, অন্য সময় তেমন পারি না। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন, আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া ফেলি, তাহার স্বজনগণ তাহাকে পরিত্যাগ করে, তখন সে একান্ত মনে আমার শরণ লয়।

যস্যাহ মনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।

বাইব্‌ল্ বলিয়াছেন, Whom the Lord loveth he chaseneth and scourgeth every son that he receiveth. ধনপতি সদাগর, চাঁদ সদাগর প্রভৃতিকে যে দুঃখ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ফলে তাহাদের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। সুতরাং এ দুঃখ বাঞ্ছনীয়; এবং যিনি এ দুঃখ দিয়াছিলেন তিনি নিষ্ঠুর নহেন, তিনি তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী।

মঙ্গলকাব্যের কবি যে ভাবে দেখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার বিপরীত দিক হইতে দেখিয়াছেন, উভয়ের angle of vision সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মঙ্গলকাব্যের কবির বিশ্বাস জগজ্জননীরূপ শক্তির আরাধনা করা শ্রেয়স্কর।

ইহলোকে ভোগ পরলোকে মোক্ষ হয়। (অন্নদামঙ্গল)

এজন্য ঐশী শক্তির প্রতি ভক্তি লাভ করিবার জন্য দুঃখ-কষ্ট পাইতে হইলেও, তাঁহারা ইহাকে ক্ষতির বিষয় মনে করেন নাই। স্নেহময়ী মাতা অবাধ্য শিশুকে যেমন ভয় দেখাইয়া, প্রয়োজন হইলে তাড়না করিয়াও সৎপথে আনয়ন করেন,—সে ভয় দেখান ছলনা, এবং তাড়নাতে মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহাতিশয্যই প্রকাশ পায়, স্নেহের অভাব প্রকাশ পায় না,—ইহাও সেইরূপ। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে নিষ্ঠুরতা ও ছলনা বলিয়াছেন, তাহাকে মাতৃস্নেহের পরিচায়ক বলাই মঙ্গলকাব্যের কবির অভিপ্রায় ছিল। মঙ্গলকাব্যের পাঠকও এত দিন এই ভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। এই তথাকথিত নিষ্ঠুরতা ও ছলনার অভিপ্রায় কি? সন্তানের হৃদয়ে মাতৃ-ভক্তির সঞ্চার করা। সুতরাং ইহা দোষাবহ নহে। দুঃখ কষ্ট না পাইয়া ভক্তিহীন জীবন যাপন অপেক্ষা শত দুঃখ-লাঞ্ছনা সহিয়াও শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তির উৎস উৎসারিত হওয়া বহুগুণে শ্রেয়ঃ। এই ভাবের প্রণোদনায় ৺কবি রজনীকান্ত সেন মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া গাহিয়াছিলেন—

আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ
গর্ব্ব করিতে চুর।
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য সকলি করেছ দূর।
ঐগুলো সব মায়াময় রূপে
ফেলেছিল মোরে অহমিকা কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছ দীন আতুর।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'অবশেষে দুঃখের যখন চূড়ান্ত হ'ল, তখন শিবকে সরিয়ে রেখে শক্তির কাছে আধমরা সদাগর মাথা হেঁট করলে। শক্তি তাদের এতদিন যে এত দুঃখ দিয়েছিল, সে দুঃখে তেমন অপমান নেই, যেমন অপমান শেষ কালে এই মাথা হেঁট করে। যে আত্মা অভয়, যে আত্মা অমর, সে আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে, ভয়কে মৃত্যুকে দেবতা বলে, আপনার চেয়ে বড় বলে মানলে। এইখানে শক্তির সকলের চেয়ে বীভৎস পরিচয় পাওয়া গেল।"

প্রথমতঃ, চাঁদ সদাগর শক্তির কাছে "মাথা হেঁট" করিবার সময় শিবকে সরাইয়া রাখে নাই,—শিবকে সরাইয়া রাখিবার কোন কথাও ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, চাঁদ সদাগর যাহার নিকট মাথা নত করিয়াছিল তাহা ভগবানের শক্তি—ভগবানের শক্তির নিকট মাথা নীচু করার মধ্যে কোন অপমান নাই, সে মাথা যতই কেন উচ্চ হউক না।

রবীন্দ্রনাথ এই শক্তিকে ভগবানের শক্তি মনে করেন নাই, তাই তিনি ইহাতে এত অপমান দেখিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু এই শক্তিকে ভগবানের শক্তি মনে করে, মঙ্গলকাব্যের কবির উদ্দেশ্যও তাই, এজন্য ইহাতে কোন অন্যায় দেখে না! লোকে ভগবানের বিরুদ্ধে মাথা উত্তোলন করে—দম্ভ ও অহঙ্কারের দরুণ। সে দম্ভ ও অহঙ্কারের পতন একদিন আছেই, এবং সে পতন দুঃখের বিষয় নহে, আনন্দের বিষয়। এই দম্ভ ও অহঙ্কারকে রবীন্দ্রনাথ অভয় ও অমর আত্মা বলিয়াছেন। কিন্তু অহঙ্কার যে আত্মা হইতে একান্ত বিভিন্ন, তাহা হিন্দু-দর্শনের একটী সাধারণ সিদ্ধান্ত। কোন ব্যক্তি ঘোর অপমান এবং লাঞ্ছনার মধ্যে পড়িলে, তাহার হৃদয় মন বা অহঙ্কারের দুর্গতি হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ অবস্থাতেও তাহার আত্মা কখনও আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নামিয়া আসে না, কারণ আত্মা "স্বে মহিম্নি" প্রতিষ্ঠিত এবং জগতের সমস্ত দুঃখ ও অপমানের সাধ্য কি যে, আত্মার সেই নিজ মহিমাকে স্পর্শ করিতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "ঐ দেখ না ব্যাধের দশা, তার স্ত্রী ফুল্লরার বারমাস্যা একবার শোন; কিন্তু হল কি? হঠাৎ খামখেয়ালী শক্তি বিনা কারণে তাকে এমন একটা আংটি দিলেন যে, ঘরে আর টাকা ধরে না। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যখন এই সামান্য ব্যাধ লড়াই করল, তখন খামকা স্বয়ং হনুমান এসে তার পক্ষ নিয়ে কলিঙ্গের সৈন্যকে কিলিয়ে লাথিয়ে একাকার করে দিলে। একেই বলে শক্তির স্বপ্ন, ক্ষুধা এবং ভয়ের বর-পুত্র। হঠাৎ একটা কিছু হবে। তাই সেই অতি অদ্ভুত হঠাতের আশায় আমরা দলে দলে উচ্চৈঃস্বরে মা-মা করে চণ্ডীগান করতে লেগে গেছি। সেই চণ্ডী ন্যায় অন্যায় মানে না, সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যায় সে ভেদ করে না, সে যেনতেন প্রকারে ছোটকে বড়, দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে শক্তিমান করে দেয়। তার জন্যে যোগ্য হবার দরকার নেই, অন্তরের দারিদ্র্য দূর করবার প্রয়োজন হবে না, যেখানে যা যেমন ভাবে আছে আলস্যভরে সেখানে তাকে তেমনি ভাবেই রাখা চলবে। কেবল করজোড়ে তার স্বরে বলতে হবে—মা মা মা।"

ধনী ও শক্তিশালী হইবার জন্য কিরূপ যোগ্যতা রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজন মনে করেন? আমাদের মনে হয় ধনী ও শক্তিশালী হইবার প্রকৃত যোগ্যতা তাহারই হইয়াছে, যে অর্থ ও শক্তি লাভ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করে। কালকেতু টাকা পাইয়া বন কাটাইয়া নগর প্রতিষ্ঠা করিল, প্রজা বসাইল, তাহার সুশাসনে নগরবাসিগণ ঐশ্বর্য্যশালী হইল। প্রজাদের উপর ভাঁড়ুদত্ত শ্রেণীর লোকের অত্যাচার সে নিবারণ করিল। এ সকল অর্থ ও শক্তির সদ্ব্যবহার। পূর্ব্বে তাহারা নিঃস্ব ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের দারিদ্র্যের ত কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ব্যাধ হইয়াও কালকেতু পশুদের জন্য দুঃখে ম্রিয়মান হইয়াছিল। পশু বধ করা অন্যায়, তথাপি তাহাকে জীবিকার জন্য পশু বধ করিতে হইতেছে, এই চিন্তা তাহাকে বড়ই কাতর করিয়াছিল। তাহার হৃদয়ে যখন এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তখন সে অন্তরের দিক হইতে উচ্চতর অবস্থার জীবিকালাভের উপযুক্ত হইয়াছিল। কালকেতু অলস ছিল না। শুধু তাহাই নহে নিজ গৃহে অলোকসামান্যা সুন্দরী রমণী দেখিয়াও কালকেতুর মনে কোন অন্যায় ভাবের উদয় হয় নাই, বরং সঙ্গলাভেচ্ছু অপরিচিতা স্ত্রীলোককে আপদ ভাবিয়াছিল। একরূপ ব্যক্তি শক্তিলাভ করিলে শক্তির অপব্যবহার হওয়া সম্ভব নহে। জগতে যাহারা ধন ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে, তাহারা কি সকলেই বা অধিকাংশই অন্তরে ও বাহিরে কালকেতু ও সরলা স্বামীপরায়ণা ফুল্লরা অপেক্ষা যোগ্যতর? যোগ্য হইবার দরকার নাই, অন্তরের দারিদ্র্য দূর করিবার প্রয়োজন নাই—রবীন্দ্রনাথের এ অনুমান যথার্থ নহে। জগজ্জননীকে "মা, মা" বলিয়া ডাকাকে রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপ করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর বিশ্বাস যে অন্তরের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য অযোগ্যের পক্ষে যোগ্য হইবার জন্য একান্ত ভাবে জগন্মাতার শরণ লওয়া অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায় নাই।

কালকেতু কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করে নাই। কলিঙ্গরাজই শঠ ভাঁড়ুদত্তের প্ররোচনায় অনর্থক কালকেতুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে হনুমানের আবির্ভাব কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ত দেখিতে পাইলাম না। রবীন্দ্রনাথ ইহা কোথায় পাইলেন? সে যাহাই হউক, যুদ্ধে যদি চণ্ডী কালকেতুর পক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাতে ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয় নাই,—কারণ কালকেতুকে আক্রমণ করা কলিঙ্গরাজের অন্যায় হইয়াছিল। সুতরাং, এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন, "সে চণ্ডী ন্যায় অন্যায় মানে না, সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যায় সে ভেদ করে না।" এ উক্তি যুক্তিযুক্ত হয় নাই।

চণ্ডী কালকেতুকে এমন এক আংটি দিলেন যে, ঘরে আর টাকা ধরে না,—এই অলৌকিক ঘটনা রবীন্দ্রনাথ শক্তির স্বপ্ন, ক্ষুধা ও ভয়ের বরপুত্র, হঠাৎ একটা কিছু হইবার আশা প্রভৃতি বলিয়াছেন। কিন্তু অলৌকিক ঘটনায় অতিমাত্র বিশ্বাস যেমন একটা কুসংস্কার, অলৌকিক ঘটনাতে একান্ত অবিশ্বাসও একটা কুসংস্কার। কারণ, অলৌকিক ঘটনার অর্থ কি? যদি অলৌকিক ঘটনা মানে হয়, যাহা অতি আশ্চর্য্য,—তাহা হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, জগতের অধিকাংশ ঘটনাই অতি আশ্চর্য্য। এই বিশাল জগৎ—"মনসাঽপি অচিন্ত্য রূপং"—ইহার সৃষ্টিই অতি আশ্চর্য্য। পৃথিবীর আবর্ত্তন, বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব, মানবের অবস্থা-বিপর্য্যয়, তাহার শৈশব হইতে যৌবন, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যে পরিণতি, জন্ম, মৃত্যু সকলি অতি আশ্চর্য্য। মাটি হইতে একটি সুন্দর ফুল ফুটিয়া উঠে,—কোন ঐন্দ্রজালিক ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইয়াছে? প্রকৃতপক্ষে এ জগতের সকল ব্যাপারই অতি আশ্চর্য্য,—আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি বলিয়া সে সকল ব্যাপার আশ্চর্য্য বোধ হয় না। অলৌকিক মানে যদি ধরা যায়, যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, তাহা হইলেও সূর্য্য হইতে গ্রহগণের উৎপত্তি, অগ্নিময় গ্রহ শীতল হইয়া তাহাতে প্রাণী ও উদ্ভিদের আবির্ভাব—এ সকল কেহ কখনও দেখে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া অসম্ভব মনে করে না। যাহা কখনও হয় নাই, তাহা যে কখনও হইতে পারে না, একরূপ

মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, ভগবান তাঁহার শক্তির সবটুকুই কি মানুষকে দেখাইয়া দিয়াছেন, আর কিছুই কি দেখাইতে বাকী নাই? ইহা বলা যায় না যে, মঙ্গলকাব্যে অনেক জায়গায় হঠাৎ বড়লোক বা হঠাৎ শক্তিমান হইবার দৃষ্টান্ত আছে। দুই চারিটা অতি-প্রাকৃত ঘটনার সন্নিবেশ যদি গুরুতর দোষের বিষয় হয়, তাহা হইলে রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, প্রভৃতি অধিকাংশ প্রাচীন কাব্যই দূষণীয় হইয়া পড়ে।

মঙ্গলকাব্যে দেবীর নিকট ধনদৌলৎ প্রার্থনা করা হইয়াছে—উপরি উদ্ধৃত বাক্যে রবীন্দ্রনাথ ইহার উপরও কটাক্ষপাত করিয়াছেন। জগদীশ্বরীর নিকট ধনদৌলৎ প্রার্থনা করা অবশ্য শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা নহে। কিন্তু ইহারও উপযোগিতা আছে। সংসারের অধিকাংশ লোক ঐশ্বর্য্য ও সাংসারিক সুখ আকাঙ্ক্ষা করে।• তাহাদের পক্ষে বিধান এই যে —তুমি যাহা কিছু অভীষ্ট মনে কর সে সকলই করুণাময়ী, অসীমশক্তিসম্পন্না জগদীশ্বরীর নিকট প্রার্থনা কর,—তিনি ইচ্ছা করিলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। বেদের বহু মন্ত্রে ঋষিগণ দেবতাদের নিকট সরল অন্তঃকরণে নানারূপ পার্থিব ঐশ্বর্য্যের প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহা ভক্তির সর্ব্বোচ্চ স্তর না হইলেও, ইহার মধ্যে অন্যায় বা চিত্তের অপকর্ষজনক কিছুই নাই। শিশু যেমন মায়ের নিকট শত তুচ্ছ জিনিস চাহিয়া থাকে, অজ্ঞতা নিবন্ধন কখন-কখনও অনিষ্টকর দ্রব্য চায়, বয়ঃপ্রাপ্ত মানবও (যাহার তত্ত্বজ্ঞান শিশু অপেক্ষা অধিক বেশী নহে) সেইরূপ জগজ্জননীর নিকট নানা তুচ্ছ বর চাহিয়া থাকে। ঈশ্বরের নিকট তুচ্ছ জিনিস প্রার্থনা করিলেও কতকগুলি সুফল আছে। মানবের এরূপ বিশ্বাস থাকা বাঞ্ছনীয় যে রাজা ও ধনী ব্যক্তির নিকট অর্থ বা কৃপা ভিক্ষা করা কিছু নহে। ভিক্ষা করিবার আছেন এক জগন্মাতা ;—তাঁহার যেমন কৃপা অনন্ত, সেইরূপ শক্তিও অপরিসীম। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐশ্বর্য্য ও সুখ সকলই পাওয়া যাইবে, কেহ বাধা দিতে পারিবে না। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে জগতে কেহই সুখী করিতে পারিবে না। ভগবানের উপর এরূপ একান্ত নির্ভর থাকা ভাল। আর এক সুফল এই যে, ভগবানের নিকট এক মনে প্রার্থনা করিলে তাহা কল্যাণজনক হইবেই। তুচ্ছ কামনা লইয়া ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে ভগবানের কৃপা হয়, তিনি তখন দেখাইয়া দেন, এই সকল কামনা অতি তুচ্ছ ; এবং যে কামনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভগবানকে পাইবার ইচ্ছা—তাহাই আমাদের মনে জাগাইয়া দেন।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতোহি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ গীতা।

সংসারের সুখ ঐশ্বর্য্য এই সকল কামনা ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু যত দিন ত্যাগ করিতে পারা না যায়, তত দিন সেই সকল কামনা ভগবানের নিকট উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। আমাদের হৃদয় সরল ভাবে ভগবানের নিকট উন্মুক্ত করিয়া ধরা উচিত। সূর্য্য-কিরণ এবং উন্মুক্ত বায়ুতে রুদ্ধ গৃহের দুষ্ট বীজাণুসকল যেমন বিনষ্ট হইয়া যায়, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি আমাদের হৃদয় মধ্যে পতিত হইলে, আমাদের সকল মলিনতা সেইরূপ বিদূরিত হইবে। শক্তি-পূজার প্রকৃত তত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভক্ত শুধু পার্থিব ঐশ্বর্য্যই প্রার্থনা করে না ; পার্থিব ঐশ্বর্য্য প্রধান ভাবেও প্রার্থনা করে না। ভগবানকে লাভ করিবার পথে যে সকল বাধা আছে, সেই সকল বাধা দূর করিবার জন্যই শক্তির উদ্বোধন। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বামাক্ষেপা প্রভৃতি সাধকগণ ভারতে শক্তি পূজার ইতিহাস গৌরবময় করিয়া রাখিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যগুলি দেবীর পূজা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও, তাহাদের মধ্যে একটা অসাম্প্রদায়িক উদারতার ভাব অতিশয় সুস্পষ্ট। কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গল উভয় গ্রন্থের আরম্ভে বিষ্ণু, মহাদেব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহামায়া গণেশ, রাম, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের দেবদেবী ও অবতার প্রভৃতির বন্দনা আছে। অন্নদামঙ্গলে শিব বলিয়াছেন,

হরি হর দুই মোর অভেদ শরীর
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর।

এক দেবতাকে খেদাইয়া আরেক দেবতার প্রতিষ্ঠা যদি উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে এইরূপ হইত না।

চণ্ডীকে মহাদেবের পত্নী বলা হইয়াছে, মনসাকে মহাদেবের কন্যা বলা হইয়াছে, তথাপি রবীন্দ্রনাথ কল্পনাকালে চণ্ডী ও মনসার সহিত শিবের ঘোর বিরোধ দেখিয়াছেন। শিবপূজা করা উচিত নয় এ কথা মঙ্গলকাব্যে কোথাও কি লেখা আছে? প্রত্যুত, মঙ্গলকাব্যে নানা স্থানে মহাদেবকে পরমেশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ; মহাদেবের অনেক স্তবস্তুতি আছে ; শুধু ভারতচন্দ্র নহে মুকুন্দরামও হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন।

ধনপতি সদাগর, চাঁদ সদাগর প্রভৃতি এক শ্রেণীর লোক ছিলেন,—ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদের মত অতিশয় সঙ্কীর্ণ ছিল। প্রাচীন দেবতা শিব ভিন্ন তাঁহারা কোন লৌকিক দেবতার নিকট মস্তক অবনত করায় একান্ত বিরোধী ছিলেন। অথচ এই বিরোধের মধ্যে কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ ছিল না। স্ত্রীলোক এবং নিরক্ষর জনসাধারণ এই দেবতার পূজা করে, ইহা বোধ হয় তাঁহাদের আপত্তির কারণ। এই নূতন দেবতাকে তাঁহারা স্ত্রী-দেবতা, মেয়ে-দেবতা বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু উদার ভাবে দেখিলে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন, লৌকিক দেবতা কোন নূতন দেবতা নহেন। উপনিষদে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, পুরাণে যাঁহাকে শিব বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই চণ্ডী দুর্গা প্রভৃতি রূপে পূজা করা হইয়াছে। এই তত্ত্বটি ভারতচন্দ্র সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়াছেন,—

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার ছায়া
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।

অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা আপনা আপনি সমা
স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি ॥
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি ॥
বিনা চন্দ্রানল রবি প্রকাশে আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা ॥

এখানে আমরা উপনিষদের

"অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"
"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকা
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

প্রভৃতি বাক্যের ধ্বনি শুনিতে পাই। উপনিষদে অবশ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধেই এই সকল কথা বলা হইয়াছে। ভারতচন্দ্র চণ্ডী বা মহামায়া সম্বন্ধে ইহাদের প্রয়োগ করিয়া দেখাইতেছেন যে, চণ্ডী বা ব্রহ্মের শক্তি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। দম্ভ ও অহঙ্কার ধনপতি সদাগর ও চাঁদ সদাগরকে এই তত্ত্ব বুঝিতে দেয় নাই। তাঁহারা বুঝেন নাই যে, এক পরমেশ্বরীকেই শিব, চণ্ডী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে পূজা করা হইয়াছে। এ ভুল ভাঙ্গিতে তাঁহাদের বহু দুঃখ-কষ্ট পাইতে হইল সত্য, কিন্তু অবশেষে যখন তাঁহাদের হৃদয়ে জগজ্জননীর প্রতি ভক্তির উদয় হইল, তখন তাঁহাদের সকল দুঃখ-কষ্ট সার্থক হইল। সরল ভাবে কবিগণ এই কাহিনী গান করিয়াছেন। যে "নিঠুর ছলনা"র উদ্দেশ্য অজস্র ধারায় কৃপাবর্ষণ, তাঁহারা তাহাতে কোন দোষ দেখেন নাই। শত-শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী পাঠকও তাহাতে কোন দোষ দেখে নাই। এই সকল কাব্যের সাহায্যে বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবন পুষ্টিলাভ করিতেছিল।

মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য শিবকে তাড়াইয়া তাঁহার স্থানে শক্তির প্রতিষ্ঠা নহে,—উদ্দেশ্য শিব ও শক্তির সমন্বয়। এ সমন্বয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ "গোঁজা-মিলন" দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতে কেহ কেহ ভারতচন্দ্রের স্থায় গোঁজামিলন দিয়া বলছেন, শিবের সঙ্গে (অর্থাৎ ভগবানের মঙ্গলময় রূপের সঙ্গে) শক্তির সঙ্গে ভেদ ক'রে দেওয়া ঠিক নয়, অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে দুজনকেই সমান মান্‌বার মন্ত্র আছে।" পাশ্চাত্য জগৎ সম্বন্ধে এ উক্তি বোধ হয় যথার্থ; কারণ, তাঁহারা অনেকে আসুরী শক্তির আরাধনা করিতেছেন, আসুরী শক্তির সহিত মঙ্গলময় ভগবানের প্রকৃত মিলন হয় না, এ মিলনে গোঁজামিলন দিতে হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কথার মধ্যে কোন "গোঁজামিলন" নাই; কারণ, তিনি যে শক্তির আরাধনা করিয়াছেন, তাহা আসুরী শক্তি নহে, তাহা অসুর-বিনাশিনী ঐশী শক্তি, তাহা শুভ শক্তি। সেই শক্তির দ্বারা জগতের সৃজন পালন প্রভৃতি কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। শক্তিমাত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথ ভগবানের এরূপ বিরোধ দেখিয়াছেন কেন? ভগবান কি অসীম শুভ শক্তির আধার নহেন? ভগবান যে সকল শুভ শক্তির মূল, তাহা কেনোপনিষদের হৈমবতী-উমার উপাখ্যানে অতি সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা সংযত ভাবাতেই করা উচিত—যাহাতে অপরের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত না লাগে। "এক দেবতাকে খেদিয়ে দিয়ে আরেক দেবতার অভ্যুদয়", "এককালে পুরুষ-দেবতা ছিলেন তাঁর বিশেষ কোন উপদ্রব ছিল না, খামকা মেয়ে-দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পূজা চাই", "করজোড়ে ভারস্বরে বলতে হবে মা, মা, মা"—এই সকল ভাষা মহাদেব, দুর্গা প্রভৃতি হিন্দুর আরাধ্য দেবতার প্রতি প্রয়োগ শোভন নহে। আমাদের দেশের মার্জ্জিত-রুচি ব্যক্তিগণ যদি অপরের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত করিয়া অশোভন ভাষার প্রয়োগ করিবেন, তাহা হইলে সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মভাব লইয়া যাহারা পরস্পর গালাগালি করে তাহাদের কি দোষ দিব? যুক্তি ও তর্কের দ্বারা সত্যনির্ণয়ের পক্ষে এরূপ অবস্থা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে।

অমল

[শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এল্]

(১)

প্রথম দর্শনেই অমলের সঙ্গে আলাপ এবং ভাব হইয়া গেল। সে মানুষটি এম্‌নি যে, পেচকজাতীয় জীব না হইলে তাহার সঙ্গে হৃদ্যতা না হইয়া যায় না। সে যেন একটি প্রাণের এবং গানের উৎস,—আপন মনে ছুটিয়া চলিয়াছে,—যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই আলিঙ্গন দিয়া যায়। শিলা হউক, মাটি হউক, পুষ্প হউক, তৃণ হউক—কাহাকেও সে এড়াইয়া চলে না; এবং তাহার আলিঙ্গন কেহ গ্রহণ করিল কি না, তাহা দেখিবার জন্যও সে ফিরিয়া চাহে না। অল্প সময়ের

কথাবার্ত্তাতেই তাহার সঙ্গে আমার এমন ভাব দাঁড়াইয়া গেল, যেন কতদিনের পরিচয়!

দ্বিতীয়বার দেখা হইতেই অমল তাহার সহজ হাসিটি বিস্তার করিয়া বলিল, "নমস্কার মশায়, ভাল আছেন নিশ্চয়ই!" আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই যে ভাল আছি, তা' কি করে জান্‌লেন?"

অমল। কারণ, ভাল থাকাটাই স্বাভাবিক, এবং ভাল না থাকাটা অস্বাভাবিক।

আমি। উল্টো কথা বলে, এমন লোকও ত আছে।

অমল। তাদের কথা ছেড়ে দিন—তারা মানুষের শত্রু। ভাল আছি এবং ভাল থাকতেই হবে—এইটি হচ্ছে মানুষের ধর্ম্ম।

আমি বলিলাম, "অমল বাবু, আপনি লোকটি কিছু অদ্ভুত।"

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই, অমল বলিয়া উঠিল, "একেবারে অদ্ভুত! কি করে ধরলেন, বলুন দেখি? মানব চরিত্র সম্বন্ধে আপনার বেশ জ্ঞান আছে দেখ্‌ছি।"

আমি বলিলাম, "যা কাচের মত স্বচ্ছ, তার ভেতরের জিনিস দেখ্‌তে বেশী সময় লাগে না।"

অমল। ওটা একেবারেই ভুল কথা। কাচের মত প্রবঞ্চক পৃথিবীতে আর কিছু নেই। ও কেবলই নিজেকে গোপন করে' অন্য জিনিস দেখিয়ে দেয়। চেয়ে দেখ্‌বেন, হয় ত তার মধ্যে আপনার নিজের চেহারা দেখা যাচ্ছে। নয় ত দেখ্‌বেন তার ভিতর দিয়ে বাইরের গাছপালা, বাড়ী-ঘর দেখা যাচ্ছে। কাচটিকে দেখবার আমাদের অবসরই হয় না।

আমি বলিলাম, "অমল বাবু, আপনি দেখ্‌ছি কবিও বটেন।"

একটা বিরাট হাস্য করিয়া অমল বলিল, "ধরে ফেলেছেন?—একেবারে ঠিক ধরে ফেলেছেন। মানব-চরিত্র সম্বন্ধে আপনার আশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টি আছে,—এ কথা স্বীকার না করে আর থাকা গেল না।"

কিছু মুস্কিলে পড়িলাম। কথাগুলি সে ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে, না যথার্থই বলিতেছে, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। বলিলাম, "অমল বাবু, ঠাট্টা নয়,—আমি যথার্থই বলছি।"

অমল। ঠাট্টা হবে কেন? আমি ত ঠাট্টা মনে করিনি। এমন লোক-চরিত্র বুঝেও আবার এমন ভুল করেন—আশ্চর্য্য!

তাহার প্রথম কথাটি শুনিয়া যদিও বা মনের সন্দেহ দূর হইতেছিল, কিন্তু শেষের কথাটি আবার সব ঘোলাইয়া দিল,—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, "ঠাট্টা করছেন?"

অমল এবার বেজায় হাসিল; বলিল, "এবার দেখ্‌ছি উল্টো চাল দিচ্ছেন; আপনি ত দুরন্ত লোক মশায়।"

এ ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া আলাপটাকে অন্য পথে চালাইতে চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "অমল বাবু, আপনি বি-এ পড়্‌ছেন—না?"

অমল। হাঁ!

আমি। ফিলজফিতে অনার্স?—না?

অমল একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "হাঁ, এ সব খবর আপনি কোথায় পেলেন?"

আমি একটু চাল চালিয়া বলিলাম, "মশায়, আপনি ত আর আমাদের খোঁজ করবেন না; কিন্তু আমি আপনার খোঁজ-খবর নিয়ে থাকি।"

অমল বলিয়া উঠিল, "এরি মধ্যে আমার খোঁজ নিতে সুরু করেছেন? শেষটা কি প্রেমে পড়ে গেলেন না কি? ও মশায়, রক্ষা করুন,—ও আমি সইতে পারব না।" বলিয়াই সে হাত জোড় করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি দেখিলাম মহা বিপদ,—এই লোকটার সঙ্গে কোনো কথাতেই আঁটিয়া উঠা যায় না। কিন্তু এত সহজে পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিলাম না; জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রেমে পড়াটা কি খারাপ?"

অমল বলিল, "নিশ্চয়ই না। কিন্তু প্রেম জিনিসটা কি এতই সোজা? মশাই গো, ও বড় দুরন্ত জিনিস। আমি জানি, সমস্ত জীবন তপস্যা করলেও, প্রেমিক হওয়ার যোগ্যতা লাভ করব না; কাজেই গর্ত্তের বাইরে থেকেই তাকে আমি নমস্কার করি।" এই বলিয়া অমল নমস্কার করিল।

আমি বলিলাম, "কথাটির মধ্যে যে বেশ একটি রূপক প্রচ্ছন্ন আছে। আপনি নিশ্চয় কবিতা লেখেন।"

অমল মুখ ও শরীরের এমন একখানা ভাব করিল,

যেন সে একেবারে ঘাল হইয়া গিয়াছে; এবং সেই ভাবেই বলিল, "এই রে মশাই,—এবার একেবারে সর্ব্বনাশ করেছেন,—সব ধরে ফেলেছেন। শুধু কবি নই, আবার কবিতা লিখেও থাকি—এতটা! একেবারে ধরা পড়ে গেছি।"

আমি। 'ধরা পড়ে গেছি' কথাটা বুঝি ফাল্গুনী থেকে ধার করা?

অমল। ফাল্গুনী লেখা হবার ঢের আগে থেকে আমি ও কথা বলে আসছি। বরঞ্চ রবিবাবুই আমার কাছ থেকে ওটা ধার করেছেন। এক-একবার ইচ্ছে করে, কবিবরকে জিজ্ঞাসা করে' আসি—ভূমিকাতে স্বীকারোক্তি করেন নি কেন?

আমি। অমল বাবু, আপনার সঙ্গে কথা বলে' পেরে ওঠা কঠিন।

অমল। সবাই ও-কথা বলে। এই ত আবার ধরা পড়ে গেলুম।

আমি হাসিতে-হাসিতে বলিলাম, "আচ্ছা, আজ তবে আসি।" এবং উত্তরের সময়মাত্র না দিয়া, বেগে সেথান হইতে প্রস্থান করিলাম।

ইহার পর একদিন রাস্তা দিয়া চলিয়াছি,—হঠাৎ পিছন দিক হইতে কে একজন আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া গাহিয়া উঠিল,—

"মনের মানুষ বিনে সখি,
আমার মন হয়েছে উড়ো পাখী।"

আমি অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিলাম—অমল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ আবার কোন্ ভাব?" তৎক্ষণাৎ উত্তর হইল, "রস-ভাব।"

আমি। রস-সাগর কি উথ্‌লে উঠেছে?

অমল। উথ্‌লে উঠেছে বল্‌ছেন কি মশায়,—একেবারে মন্থন করেছি; কিন্তু চাঁদ উঠ্‌লো কই? তাই মনের মানুষ খুঁজতে রাস্তায় বেরিয়েছি।

আমি। রাস্তায় কি মনের মানুষ পাওয়া যায় না কি?

অমল। পাওয়া ত গেল দেখ্‌ছি।

আমি। কোথায়?

অমল। এই যে!

এই বলিয়া অমল আমার মুখখানি নব-বধূর মত তুলিয়া ধরিল।

আমি প্রশ্ন করিলাম, "সে কি?" অমল বলিল, "মশায়, এবার আমিই আপনার প্রেমে পড়ে গেছি।" বলিয়াই গান ধরিল—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে;
কখন কে ধরা পড়ে কে জানে
তা' কে জানে, তা' কে জানে!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "অমল বাবু, আপনি ব্রাহ্ম হয়ে' এ-সব গান গা'ন?"

বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া অমল বলিল, "কেন, ব্রাহ্মরা কি মানুষ না?"

আমি। মানুষ ত বটেই; কিন্তু তারা ত এ সব অশ্লীল মনে করে।

অমল জোড় হাতে বলিল, "মশায়, শ্লীলতা, অশ্লীলতার বিষয় আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন না—শ্লীলতার মাত্রাটা তা' হলে বজায় থাকবে না। আমি মশায় বেজায় পাজি লোক।"

একটা রাস্তার মোড় ফিরিতেই, অমল আমাকে টানিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যেতে হবে?" অমল বলিল, "আমাদের বাড়ীতে।"

আমি। কেন, সেখানে গিয়ে আর কি হবে?

অমল। বাড়ীতে বলে রেখেছি, আপনাকে একদিন নিয়ে যাব।

আমি। একটা জানোয়ারের নমুনা দেখাবার জন্যে বুঝি?

অমল। জানোয়ারই হোন, আর মহাপুরুষই হোন—আপনাকে যেতেই হবে।

আমি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। আমার কথা সে ইহারি মধ্যে বাড়ীতে গল্প করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু অপরিচিতা ভদ্র মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করিতে আমি বিশেষ অভ্যস্ত ছিলাম না—তাই লজ্জা করিতে লাগিল। এড়াইবার জন্য বলিলাম, "আচ্ছা, আর এক দিন যাব।" অমল বলিল, "সে কি আর হয় গো মশায়;—আজ এত কাছে যখন পেয়েছি, তখন কি আর ছাড়তে আছে? আমি বড় দুরন্ত লোক।" এই বলিয়া সে আমাকে হিড়্‌হিড়্ করিয়া টানিয়া একটা বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল। একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়াই, অমল উচ্চকণ্ঠে "মা, মা" বলিয়া

চীৎকার আরম্ভ করিল। একটি প্রৌঢ়া মহিলা ঘরে ঢুকিতেই, অমল বলিতে লাগিল, "এই সে তিনি, যাঁর কথা বলেছিলুম,—সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক এবং একটা পত্রিকার রীতিমত সম্পাদক।" আমি কিছু হাঁপাইয়া উঠিলাম; এবং ভয় হইল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া না যাই। টিপ্ করিয়া অমলের মাকে একটা প্রণাম করিতেই, তিনি একটুখানি পিছাইয়া গিয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্—দীর্ঘায়ু হও বাবা!" অমল বলিল, "ও কি আশীর্ব্বাদ করলে—ওযে গাল দেওয়া হ'ল।"

অমলের মা জিভ্ কাটিয়া বলিলেন, "ষাট্, ষাট্! কি যে তুই বলিস্ অমল!"

আমি বলিলাম, "সব তাতেই আপনার পাগ্লামী।"

মাতা বলিলেন, "আর বোলো না বাছা,—ওর পাগ্লামীর জন্যে বাড়ীতে টেঁকা দায়। একেবারে বদ্ধ পাগল।"

অমল। "এইটুকু বাকী ছিল—এবার সবটুকু ধরা পড়ে গেছি—আর এখানে থাকা নয়।" এই বলিয়া সে ছুটিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল; এবং কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া "রাণী, রাণী" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। মিনিট দু'এক পরে ১৩।১৪ বৎসরের একটা কিশোরী বালিকাকে সে টানিয়া আমার কাছে লইয়া আসিল; এবং ঘাড় ধরিয়া তাহাকে নমস্কার করাইল; বলিল, "ভদ্রতা জানিস্ না মূর্খ!" আমি যতটা সম্ভব সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটি বুঝি আপনার বোন্?" অমল বলিল "হাঁ, —আর আপনার মুগ্ধা পাঠিকা। আপনার লেখা পড়ে, ওর মূর্চ্ছা যাবার গতিক হয়েছিল।" বালিকার কাণ, মুখ সব লাল হইয়া উঠিল; কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া সে তাহার দাদাকে বলিল, "যাও!" এই কথা বলিয়া সে নিজেই চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। অমল তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "পালাস্ কেন রে! এই যে তোর সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলি।"

মাতা প্লেটে করিয়া খাবার ও কাপে করিয়া চা আনিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, "এ যে দেখি রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হ'ল।" তিনি বলিলেন—"এ আর অত্যাচার কি বাবা,—সামান্য কিছু খাবার বই ত নয়।" অমল বলিল, "খেয়ে নিন্ মশায়,—আর ভদ্রতা করতে হবে-না।" আমি বলিলাম, "ভদ্রতার ধার ধারি না অমলবাবু।" অমল বলিল, "ভদ্রতা জিনিসটা কপটতার নামান্তর মাত্র;—তাই ছোটলোক বলে গাল দিলে, আমি ভারী খুসী হই।" সকলেই মৃদু হাস্য করিলাম।—চলিয়া আসিবার সময় অমলের মাতা বলিলেন, "মাঝে-মাঝে এসো বাবা!" আমি বলিলাম, "আস্ব বই কি!" অমল বলিল, "উনি মেসের ভাত খান,—মাঝে-মাঝে ওঁকে নেমন্তন্ন করে খাইও।" মাতা তাহার উত্তরে বলিলেন, "নেমন্তন্ন আবার কি রে—ঘরের ছেলের মত যখন খুসী এসে খাবে।"—আমি বলিলাম, "তা' বই কি! অমলবাবু যে দেখ্ছি এক মুহূর্ত্তেই আবার ভদ্রলোক হয়ে উঠ্লেন।"—'কাণ-মলা, গালে-চড়', এই দুইটি বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে অমল তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া আমার সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল।

(২)

অল্প দিনের মধ্যেই এই পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দাঁড়াইয়া গেল। সেখানে গল্প-গান-আহারে জীবনের বেশ একটি উপাদেয় অভিজ্ঞতা প্রতিদিন উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। এক দিন শীতের অপরাহ্ণে চায়ের টেবিলে আমরা বেশ গুল্জার হইয়া বসিয়াছি, এবং পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়সমূহ এলো-মেলো ভাবে আলোচিত হইয়া চলিয়াছে। কথা প্রসঙ্গে আমি বলিলাম, "সাহিত্যের উপরে রমণী-প্রভাব অত্যন্ত বেশী।" অমল বলিল, "তা' ত বটেই—রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড্-ওডেসী লেখা হ'ল ত ওঁদের কল্যাণেই।" আমি বলিলাম, "সে কথা হচ্ছে না। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যে-সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা যত কম—তাদের সাহিত্যের তত বেশী দুরবস্থা। এই দেখুন না—মুসলমান সমাজ। পর্দ্দা-সিস্টেম্টা ওদের মাথা থেকেই প্রথম বার হয়, তাই ওদের সাহিত্য এমন দরিদ্র!"—রাণী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কথাগুলি শুনিতেছিল। তাহার মা বলিলেন, "সত্যি; কিন্তু, এ কথাটা আমরা কোনো দিন ভেবে দেখি নি।" অমল বলিল, "এ সম্বন্ধে আপনার আর কি বক্তব্য আছে বলুন দেখি, আমি শুনি।"—জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, তর্ক করবেন না কি?" অমল বলিল, "নিশ্চয়! তা' না হলে জিনিসটি পরিষ্কার হবে কি করে'?" আমি বলিতে লাগিলাম, "সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা থাক্লে, নর-নারীর জীবন-যাত্রার মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য এসে দেখা

দেয়, এবং শিল্পী তখন নূতন-নূতন রসোপলব্ধির সুযোগ পান। ধরুন না, নৌকা-ডুবিতে রমেশ-হেমনলিনীর সম্পর্ক, গোরাতে বিনয়-সুচরিতা-গোরার সম্পর্ক,—এই সমস্ত সম্বন্ধাবস্থানের মধ্যে যে রস-সৃষ্টির সুযোগ লেখক পেয়েছেন, কোনো পর্দ্দানসীন সমাজে তা' কি পেতে পারতেন? অথচ, অধিকাংশ সময়েই এই সমস্ত গণ্ডি-বন্ধন-মুক্ত দু-একটি রমণী না হলে গল্পের বাঁধুনী শক্ত হয় না। বঙ্কিমবাবুর এ সুযোগ ছিল না, তাই তাঁকে রোহিণী বা কুন্দনন্দিনীর আশ্রয় নিতে হয়েছিল, কপাল কুণ্ডলাকে কানন বাসিনী বলে কল্পনা করতে হয়েছিল। অধিকাংশ হিন্দু লেখককেই এই পথ অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ সাহিত্যকে এই অস্বাস্থ্যকর পথ থেকে মুক্তিদান করেছে। আজ-কালকার লেখকগণ তাই পাঠকের রুচিকে আঘাত না করেও বই লিখ্‌তে পারছেন।"

অমল বলিল, "একজন ব্রাহ্ম-দ্বেষীর কাছ থেকে ব্রাহ্ম-সমাজের এ যে মস্ত বড় compliment।" আমি বলিলাম, "ব্রাহ্ম দ্বেষী বল্লে, আমার প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ প্রকাশ করা হয়। কোনো একটা সমাজকে সমগ্র ভাবে যারা নিন্দে করে, তাদের নিন্দক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। একটা সমাজই যে একেবারে খারাপ, এমন কথা কখনই বলা চলে না,—ভালমন্দ সকল সমাজেই আছে। ব্রাহ্ম-সমাজ অপেক্ষা হিন্দু-সমাজে গলদ অত্যন্ত বেশী; তার কারণ অবশ্য এই যে, হিন্দু-সমাজ অতি বিরাট। কিন্তু আমি এবং আরো দশজন যে ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে কথা বলে থাকি তার কারণ এই যে, যাঁরা আমাদের দেশের প্রাচীন সমাজকে সংস্কার করতে এমন ভাবে উদ্যত হয়েছিলেন, তাঁদের উচিত ছিল সকলের সাম্‌নে একটা আদর্শ তুলে ধরা। ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শকে আমরা একটু বেশী উচ্চ বলেই মনে করে থাকি। তাই তাদের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখ্‌লে আমাদের চোখে সেটা বেশী বাজে। একজন হিন্দু যদি মিথ্যা কথা বলে, তা'হলে তা'তে আমরা বিশেষ কিছু মনে করি না। কিন্তু একজন ব্রাহ্ম একটা মিথ্যা কথা বল্‌লে, তক্ষুণি মনে হয়—এই লোকটি ব্রাহ্ম অথচ মিথ্যা কথা বলেচে। সুতরাং সে নিয়ে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।"

অমল বলিল—"কিন্তু এই ব্যক্তির দোষটি যে সমাজের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে, সেইটেই আপত্তির বিষয়।" আমি বলিলাম, "তার কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা তাকে শুধু একটি ব্যক্তি হিসাবে দেখি না,—একটা সামাজিক জীব হিসাবে দেখি। সুতরাং তার ওপর কোনো আঁচড় পড়লে, সমাজের ওপরেও একটা দাগ বসে যায়। প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই আমরা তার সমাজের প্রতিনিধি রূপে দেখে থাকি—এইটি মনে করে' প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই অত্যন্ত সাবধান হয়ে চলা উচিত।" অমলের মা বলিলেন, "এ কথা বাছা খুব ঠিক। আমরা ব্রাহ্মরা যে আজকাল অসাবধান হয়ে পড়েছি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ব্রাহ্ম-সমাজের সে স্বাস্থ্য কি আর আছে?"

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাহিরে কুয়াসা এবং ধূঁয়ায় মিশিয়া একটা নরক-চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু যে ঘরে আমরা বসিয়া ছিলাম, তাহা বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত, সুন্দর এবং মনোরম। এ-সব আলোচনা আর ভাল লাগিতেছিল না। রাণীকে বলিলাম, "রাণী, এবার তোমার পালা,—তুমি 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করে দাও।" রাণী অর্গ্যান বাজাইয়া গান ধরিল,

"হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে
জাগ রে ধীরে
এই ভারতের মহা মানবের
সাগর তীরে।" ইত্যাদি

তাহার গান শুনিয়া মনে হইয়াছিল—এই বালিকা যদিও নীরবে সমস্ত কথা শুনিয়াছে, কিন্তু ও যে সব বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাই যেন এই গীতটি দ্বারা প্রকাশ করিতে চাহিতেছে।

(৩)

অমল ফার্ষ্ট ক্লাস্ অনার্স পাইয়া বি-এ পাশ করাতে, এক দিন তাহাদের বাড়ীর আনন্দ-ভোজে নিমন্ত্রিত হইলাম। গিয়া দেখি, নর-নারীতে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের নানাবর্ণ পোষাকের রং-এ বাড়ী উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অমলের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকে বলিলাম, "অমলবাবু, গান গেয়ে আর তাস খেলে ফার্ষ্ট ক্লাস পেলেন কি করে?" —অমল তাহার সেই স্বাভাবিক হাসিটি ফুটাইয়া বলিল, "আমিও তাই ভাব্‌ছি। ব্যাটারা নিশ্চয়ই ভুল করেছে—কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারবার! সব গাঁজাখুরী মশায়!"

একজন বর্ষিয়সী মহিলা আমার পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু য়ূনিভার্সিটির ওপর তোমার আক্রোশের ত কোনো কারণ নেই।"—আমি ফিরিয়া চাহিলাম,—দেখিলাম, সুন্দর পোষাক-পরা, সোণার চশমা আঁটা মহিলাটি অমলের দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন।—অমল বলিল, "আমার আক্রোশ না থাক্‌তে পারে কিন্তু কা'র সর্ব্বনাশ করেছে কে জানে!"— মহিলাটি বলিলেন, "য়ুনিভার্সিটির ওপর তোমার খুব high opinion দেখ্‌তে পাচ্ছি।" অমল বলিল, "এ গোয়ালে যারা ঢুকেছে, সকলেরই এমনি উচ্চ ধারণা।"—"উচ্চ-ধারণা" কথাটা যে high opinion কথাটারই তর্জ্জমা, তাহা আমি বেশ উপলব্ধি করিলাম; কিন্তু মহিলাটি তাহা টের পাইলেন না। তার পর এই বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া দু'জনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আমি কেবল ইহাই লক্ষ্য করিলাম যে, ভদ্র মহিলাটি প্রাণপণ-চেষ্টায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করিয়া যাইতে লাগিলেন; কিন্তু অমল যেন ইচ্ছা করিয়াই পারতপক্ষে কোনো ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ করিল না।—ইহার পর অমলকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া বলিলাম, "বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন, তা' নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না—কেন না, ওর আরো অনেক ত্রুটি আছে, যা' আমি আপনাকে বল্‌তে পারি। কিন্তু ওর সঙ্গে যে আপনি কথা বলবার সময় ইংরেজী শব্দ মোটে ব্যবহার করেন নি, সেটি কি আপনার ইচ্ছাকৃত?" অমল বলিল, "হাঁ; দেখুন না, এরা সব দু'পাতা ইংরেজী পড়েই, কেমন বিদ্যা ফলাতে চায়; এ যে একেবারেই অসহনীয়।"

আমি বলিলাম, "এর জন্যে আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। অনেক দিন থেকেই আমি দেখে আস্‌ছি যে, আমাদের শিক্ষিত সমাজ খাটি বাংলায় কথা বল্‌তেই পারে না। সকল দেশেই, ভাষার যখন এ রকম দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, তখন মেয়েদের ও দেশের জনসাধারণের নিকট ভাষা আশ্রয় নেয়,—এ আশ্রয় ভেঙ্গে গেলে বড় ক্ষতির আশঙ্কা।"

অমল বলিল, "আপনারা মশায় সম্পাদক—সব তাতেই গবেষণা করে বসেন,—আমাদের মাথায় এত সব খেলে না; সোজাসুজি মনে হয় এ ভাল নয়—বাস্।"

অমলের মা'র সঙ্গে দেখা হইলে, আমি আনন্দ প্রকাশ করিলাম, এবং তিনি বিনীত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। পারিবারিক উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল,—দেখিলাম, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়াছেন। আমি বলিলাম, "আপনাদের এ নিয়মটি বড় সুন্দর যে, সকল প্রকার উৎসব-আমোদেই উপাসনার বন্দোবস্ত থাকে।" অমলের মা হৃষ্ট চিত্তে বলিলেন, "বাবা, তা' ত করতেই হয়—তাঁর থেকেই যে সব।"

উপাসনা এবং আহার হইয়া গেলে উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময় রাণী আসিয়া চুপি-চুপি বলিল,—"দাদার বৌ দেখ্‌বেন? ঐ যে ফেরোজা রংয়ের সাড়ি-পরা—ঐটি। নাম সুবালা, এবার আই-এ দেবে।"

চাহিয়া দেখিলাম, মেয়েটি দেখিতে বেশ। তাহার মা অমলের সঙ্গে গল্প করিতেছেন—সে মায়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহাই নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিতেছে।

(৪)

ইহার পর একদিন অমলের সঙ্গে দেখা হইলে, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি মশায়, কদ্দূর অগ্রসর হলেন?" অমল আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "এবার ঠেকে গেছি প্রেমের দায়।"—আমি বলিলাম, "সে ত বুঝেছি; কিন্তু রকমটা কি একবার শুনিই না।" অমল চোখে-মুখে হাসি ছড়াইয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, "বল্‌ব?"—আমি বলিলাম "নিশ্চয়!" সে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রস্তুত?"—উত্তর দিলাম, "আলবৎ!" তাহার পর সে হাত নাড়িয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল,

'আমার প্রেয়সী যে,
রমণী-রতন সে!
গৌর বরণ উজ্জ্বল কান্তি,
স্নিগ্ধ নয়নে অতল শান্তি;
কালো কেশদাম ঢেউ তুলে তুলে
চরণে লুটায় রে,—
এমনি রূপসী সে!"

এই বলিয়াই সে সহসা আমার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। আমি বলিলাম, "মশায়, পাগল হলেন না কি?" অমল তদুত্তরে বলিল, "আবার মোরে পাগল করে দিবে কে?" বলিলাম, "অমলবাবু, কাব্যরসের যে একেবারে বান ডেকেছে

দেখ্‌তে পাচ্ছি।" অমল সে কথার কোন উত্তর না দিয়া গান ধরিল,

"আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।"

এবং গান গাহিতে-গাহিতেই উঠিয়া পড়িল। তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম, বলিলাম; "গেলে চল্‌বে না,—বলে যেতে হবে।" অমল যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল, এবং বলিতে লাগিল, "সময় যে নেই, সময় যে নেই।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "সময় নেই কি রকম? যাচ্ছেন কোথায়?" অমল গর্ব্বিত কণ্ঠে উত্তর দিল, "অভিসারে" এবং আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গাহিয়া উঠিল—

"ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার;
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।"

তাহার গানে বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "মশায়, সত্যি সত্যি ক্ষেপে গেলেন না কি? ঝড়ের রাত কোথায়,—এ যে ভাদ্দরের কাঠ-ফাটা রোদ্দুর।" অমল বলিল, "এইটি বুঝ্‌তে পারলেন না? ঝড় আমার প্রাণে উঃ, কি তুমুল ঝড়!" অমল বুকে হাত রাখিয়া, চোখ বুজিয়া, মাথাটা এক দিকে হেলাইয়া দিল। আমি খুব হাসিতে লাগিলাম। অমল বলিয়া উঠিল, "সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়তে হবে।" এই বলিয়াই সে হাতটা ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

(৫)

ইহার পর অমলের সঙ্গে আমার দেখা দার্জ্জিলিঙ্গে। ম্যাকেন্‌জি রোড্‌ দিয়া যাইতেছিলাম; সহসা দেখি, সম্মুখে তাহার সহজ হাসিটি বিস্তার করিয়া, দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, অমল পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি, আপনি এখানে এলেন কবে?" অমল এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া বলিল, "আমি জানি, আমার এ শৈলাভিযান ব্যর্থ হবে না; আমি তাকে পাবই,—আমার মনের মানুষ যে জন।" আমি বলিলাম, "আপনার মনের মানুষ যে কে, তা' আমার জানা আছে।" অমল ধমক দিয়া বলিল, "সেটা আপনার ভুল,—আমার মনের মানুষ আপনি।"—আমি বলিলাম, "আচ্ছা চলুন, এখন একদিক পানে যাওয়া যাক।"

দুইজনে পাশাপাশি চলিতেছিলাম। অমল সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে, মেরে ফেল্লে রে বাবা!" আমি চমকিয়া উঠিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হ'ল অমল বাবু?" অমল বাঁ হাতটা বুকে রাখিয়া, ডান হাত দিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখাইয়া দিল। তখন বেলা নয়টা; প্রভাত-রৌদ্রে কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। কিন্তু আমি সেদিকে বেশীক্ষণ তাকাইতে পারিলাম না; অমলের কোনো অসুখ করিয়াছে মনে করিয়া, তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কোনো অসুখ করেছে?" অমল শুভ্র গিরি শিখরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ সৌন্দর্য্য একেবারে প্রাণঘাতী,—আমি অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করছি।" আমি বলিলাম, "আপনি ত মশায় দুরন্ত ভাবুক দেখ্‌ছি।" অমল বলিল, "দুরন্তপনাটুকু আছে স্বীকার করি; কিন্তু ভাবুকতা আছে, এ কথা স্বীকার করতে আমি একেবারেই রাজী নই।"

অমলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, এখানে এসে আপনার কি মনে হয়, বলুন দেখি?" অমল বেশী চিন্তা না করিয়াই বলিল, "মনে হয়, সৌন্দর্য্য জিনিসটি একা ভোগ করা যায় না। সংসারে যা' কিছু সুন্দর, তা' ভোগ করতে হ'লে দুজন চাই। সুতরাং জীবনকে যদি সুন্দর করে তুলে ভোগ করতে হয়, তা' হ'লে সে কাজটি একা চলে না।" আমি বলিলাম, "মশায়, আপনি ত দেখি, দ্বিবচনের বড় পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন।"—অমল বলিল "শুধু আমি কেন,—সকলকেই ওটার পক্ষপাতী হতে হয়। হয় না হ'লে যে চলে না মশায়। এমন কি, ভয়ঙ্কর একেশ্বর-বাদী শঙ্করকে পর্য্যন্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, মায়ার কল্পনা করতে হয়েছিল! পুরুষ আর প্রকৃতি না হ'লে যে সংসার টিক্‌তেই পারে না।" আমি বলিলাম, "আপনাকে সম্প্রতি প্রকৃতির মায়ায় কিছু আচ্ছন্ন বলে বোধ হচ্ছে।" অমল হাসিল; ধীরে ধীরে বলিল, "মায়া প্রায় কাটিয়ে উঠেছি।"

ইহার পর অমলের আর দেখা পাই না। তার বাসায় গেলেও তাকে পাওয়া যায় না, রাস্তাঘাটেও দেখা হয় না; আমার নিকটেও সে যায় না। ব্যাপারখানা কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ একদিন বার্চ্চ হিলে গিয়া দেখি, অমল একখানা খাতা কোলে করিয়া সম্মুখের পাহাড়গুলির গায়ে, মেঘের খেলার দিকে উদাস ভাবে চাহিয়া আছে।—আমাকে দেখিয়াই খাতাখানা লুকাইয়া ফেলিল। আমি

বলিলাম, "লুকোলে কি হবে—আমি দেখে ফেলেছি। কিন্তু জিজ্ঞেস্ করি—সখ্ করে এই বিরহ-ব্যথা সহ্য করা কেন?" অমল একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "সব জিনিসেরই অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।" অমলের মুখে এরূপ ম্লান হাসি আর দেখি নাই। এ কয়দিনের আত্মগোপনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "বিশেষ কোনো প্রতিবন্ধক ছিল।" প্রকৃত কারণটা সে গোপনে করিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া, আমিও চুপ করিয়া গেলাম। অমল বলিল, "চলুন, বেড়ানো যাক্।"

প্রথমেই আমরা "জিমে"র সমাধি দেখিতে গেলাম। অমল বলিল, "জিমের মুনিবকে আমি রীতিমত ভক্তি করি,—একেবারে রীতিমত;—এমন লোকের কুকুর হতে পারাও ভাগ্য!" লক্ষ্য করিলাম, অমলের সহজ স্ফূর্ত্তিটি ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রফুল্লতাটুকু ফিরাইয়া আনিতে তাহাকে যে একটুখানি সংগ্রাম করিতে হইল, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম।—ইহার পর অমল আমাকে প্রায় সমস্ত সহর ঘুরাইয়া আনিল; এবং রাস্তা দিয়া চলিতে-চলিতে আত্মহারা হইয়া কেবল গাহিতে লাগিল,

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো;
বিরহানলে জ্বাল রে তারে জ্বালো!
রয়েছে দীপ না আছে শিখা,
এই কি ভালে ছিল রে লিখা;
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো;
পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো।
বেদনা দূতী গাহিছে ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান;
নিশীথ ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে—
দুখ দিয়ে রাখেন তোর মান।"

হঠাৎ গানের মাঝখানে থামিয়া বলিল, "দুখ দিয়ে রাখেন তোর মান," এইটে হচ্ছে আমার প্রাণের কথা। তার পর আবার গাহিতে লাগিল,

"জানি না কোথা অনেক দূরে
বাজিছে গান গভীর সুরে;
সকল প্রাণ টানিছে পথ পানে।"

খানিকটা হস্ত আস্ফালন করিয়া অমল আবার বলিল, "সকল প্রাণ টানিছে পথ পানে" এইটি হচ্ছে আমার প্রাণের কথা।

হঠাৎ দেখিলাম, কার্ট রোড্ দিয়া সাহেবী পোষাক পরা একজন লোকের সঙ্গে একটি ভদ্র মহিলা চলিয়াছেন। অমলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুবালা না?" অমল বলিল, "হাঁ।" তাহার কণ্ঠস্বরে সন্দেহ, বিস্ময় বা আনন্দের কোনো লক্ষণ ছিল না। একটুখানি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওঁরা যে এখানে আছেন, তা' জানেন?" অমল বলিল, "হাঁ,—আজ প্রায় এক মাস থেকে ওরা এখানে।"

"আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি!"

"হাঁ, হয়েছে,—আমি কালকেও ওদের বাড়ীতে রীতিমত খেয়ে এসেছি।"

আমি বলিলাম, "তা' খাবেন বই কি! আপনারই ত দিনকাল পড়েছে।" অমল একটুখানি হাসিল মাত্র।—অমলকে এ কয়দিন দেখিতে না পাওয়ার কারণটি বুঝিতে বিলম্ব হইল না; এবং কিছু আগে বাচ্চ হিলে তাহাকে কেন যে এমন বিরহীর মত বিষণ্ণ-ভাবাপন্ন দেখিয়াছিলাম, তাহার একটা কারণও অনুমান করিয়া লইতে কষ্ট হইল না।

দুপুরবেলা ষ্টেসনে যাওয়া দার্জ্জিলিং অবস্থান কালে আমার নিত্যকর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং যথারীতি পরদিনও দুপুরবেলা ষ্টেসনে গেলাম। গিয়া দেখি, আমার পূর্ব্বেই অমল সেখানে আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে নানা রকম কথাবার্ত্তায় কলিকাতা মেল্ ছাড়িবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। অমল হঠাৎ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। আমি বলিলাম, "ওখানে আর বসে কি হবে,—চলুন এখন যাওয়া যাক।" অমল বেশ চাপিয়া বসিয়া বলিল, "এইখানে এই ভাবে বসে' রীতিমত কল্‌কাতা যাওয়া হবে।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, সে একদিন হবে এখন,—আজ চলুন, যাওয়া যাক।" অমল অর্থহীন প্রলাপের মত একটা বিকট হাস্য করিল; তার পর বলিল, "লোকটার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আজ আমি কল্‌কাতা যেতে পারি, এবং যাব।" আমি বলিলাম, "তা' মশায়, আমি বিশ্বাস করি,—আপনার দ্বারা সব সম্ভব।" অমল আবার একবার উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "আপনি যে দেখছি আমাকে দ্বিতীয় নেপোলিয়ন না করে ছাড়বেন না,—তিনি বলেছিলেন, অসম্ভব শব্দটা বোকার অভিধানে পাওয়া যায়। আমি তা'হলে আর যাই হই, বোকা

নই—এটা প্রমাণ হল।"—এম্‌নি ভাবে কথা কাটা-কাটি করিতে-করিতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল; এবং অমল আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "যদি সময়-মত কল্‌কাতা যান, তা' হ'লে আবার দেখা হ'বে,—নইলে এ জীবনে আর দেখা না-ও হতে পারে।" পাগলের এই কথাটির কোনো অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না; এবং বিশেষ কোনো অর্থ আছে বলিয়াও মনে করিলাম না।

(৬)

কলিকাতায় আসিয়াই অমলদের বাড়ী গেলাম। গিয়া দেখিলাম, সমস্ত বাড়ীটির উপরে একটি বিষাদ-ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু শোকের প্রথম ধাক্কাটা চলিয়া গিয়াছে, এবং অবশ্যম্ভাবীকে গ্রহণ করিবার জন্য সকলেই প্রস্তুত। অমলের মাতাকে দেখিয়াই এ কথাটা প্রথমে বুঝিয়াছিলাম; কারণ, দেখিলাম, তাঁহার মূর্ত্তি অত্যন্ত বিষণ্ণ, অথচ মুখে কথা অত্যন্ত অল্প। কিন্তু রাণীর বিষণ্ণতার মধ্যে একটুখানি আলোকের আভা ছিল। দাদা যুদ্ধে যাইবে, ইহার এমন গৌরব সে কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছিল না। অমল ডিফেন্স্ ফোর্স ছাড়িয়া একেবারে ব্যাটেলিয়নে যোগদান করিয়াছে—ইহার রহস্য আমি প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু বুঝিতে বেশী দেরীও হইল না। একজন বিলাত-ফেরতের সঙ্গে সুবালার বিবাহ প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে,—সেই দারুণ আঘাতের বেদনায় অমল আজ এমন ভাবে নিজেকে ভাসাইয়া দিতেছে। আগা-গোড়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া অমলের মা বলিলেন, "আজ্‌কাল কি আর কোনো-কিছুর মর্য্যাদা আছে বাবা,—কেবল টাকা, টাকা, টাকা।" আমি সহসা যেন আকাশ হইতে পড়িলাম; অথচ, তখন আর আকাশ-পাতাল ভাবিবার অবসর নাই। অমলকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলাম, "তোমার মত কাপুরুষ যুদ্ধে গিয়ে কি করবে?" অমল এ কথার উত্তরে হাসিয়া বলিল, "আপনি আমাকে গাল দেবেন, তা' আমি জানি। আমি যে কাপুরুষ তা'তে আর সন্দেহ কি!—আমি তার চেয়ে আরো জঘন্য।" অগত্যা সুর বদ্‌লাইতে হইল; বলিলাম, "অমল বাবু, সত্যি, আপনার এ কি রকম অন্যায়! আপনার প্রতি একজন অন্যায় করেছে বলে কি আপনি আরো দশজনের উপর অন্যায় করবেন?" অমল ঠাট্টার সুরেই বলিল, "এটাকে যদি অন্যায় বলেন, তা' হলে কিন্তু পুলিশে ধরিয়ে দেবো।" তার পর গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিল, "ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছি—এতে দশজনের প্রতি অন্যায় হতে পারে বটে, কিন্তু না গেলে লক্ষজনের প্রতি অন্যায় হ'বে।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, তা মান্‌লুম না হয়; কিন্তু অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চল্‌তে হবে ত? যে দেশে conscription আছে, সেখানেও সকলকেই যুদ্ধে যেতে হয় না।" অমল বলিল, "তা' যদি বলেন, তবে আমি জিজ্ঞেস করব যে, আজ ইউরোপের ঘরে-ঘরে যে হাহাকার উঠেছে, তারা কি সকলেই অবস্থার দোহাই দিয়ে বাঁচতে পেরেছিল, না বাঁচতে চেয়েছিল? যারা মরতে জানে, তারা এত বাঁচবার পথ খোঁজে না! আর, যারা যত বেশী নিজেকে বাঁচাতে চায়, তারাই তত বেশী মরে, এবং অনর্থক মরে। এ সংসারে তাদেরই বাচবার যথার্থ অধিকার আছে, যারা সর্ব্বদাই মরতে প্রস্তুত।" আমি বলিলাম, "এ সমস্ত হ'ল তর্কের কথা।" অমল চট্ করিয়া উত্তর দিল, "আপনি তর্ক করতেই ত এসেছেন।" বলিলাম, "আচ্ছা, আমাকে একবার জিজ্ঞেস্ করলেন না কেন?" অমল বলিল, "কাউকেই ত জিজ্ঞেস্ করিনি! যখন জেনেছি, এ পথে আমাকে যেতেই হবে, তখন জিজ্ঞেস্ করে লাভ? আর, জিজ্ঞেস্ করা মানেই ত বাধা ডেকে আনা।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ পথে যেতেই হবে, এ কথার মানে কি?" অমল বলিল, "কথাটার দুটো মানে আছে,—একটা হ'ল তর্কের মানে, আর একটা যথার্থ মানে। যদি তর্ক করতে চান, তা' হলে পারবেন না; আর যদি যথার্থ অর্থ জিজ্ঞেস্ করেন, তা' হলে সেটি বলব না।" এই কথা বলিয়াই, বুকে হাত দিয়া, চোখ বুজিয়া গান ধরিল,—

"কি সুর বাজে আমার প্রাণে,—
আমি জানি, মনই জানে।"—ইত্যাদি।

সে দিন বিদায়ের পূর্ব্বে অমলকে বলিয়া গেলাম, "অমল বাবু, আপনি একটি পরিপূর্ণ রহস্য।" অমল হাসিয়া জবাব দিল, "আমার শেষ অনুরোধ,—মানুষের এই রহস্যটির মর্য্যাদা রেখে চলবেন। মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করুন; কিন্তু কারো সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করবেন না।"—আমার পাগল বন্ধুটির এই উপদেশ আজ আমি মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতেছি।

(৭)

বিদায়ের দিন অমলদের বাড়ী গেলাম ; দেখিলাম, লোকজনে বাড়ী একেবারে পূর্ণ। অমল আমাকে বলিল, "আর একবার এমনি উৎসবের দিনে এসে আমার ভাবী বধূকে দেখে গিয়েছিলেন ; আজ আবার আর একটি বধূকে দেখ্‌বেন ?"

"কই, দেখি !"

"চোখ বুজুন, বুজে দেখুন—ঐ যে আমার মরণ বধূ এক হাতে জয়মালা, আর এক হাতে বিজয়-মুকুট নিয়ে আমার অপেক্ষা করছে।" আমি হাসিলাম মাত্র।

অমলের মা আসিয়া বলিলেন যে, সুবালারা দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে ; এবং তাহাদিগকে যথারীতি নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা কেহই আসে নাই। আমি বলিলাম, "আসবে কোন্ লজ্জায় ? আর আপনিই বা নিমন্ত্রণ করতে গেলেন কেন ?" অমলের মা বলিলেন, "এ নিয়ে আমি কারো সঙ্গে অপ্রণয় করতে চাইনে বাবা।"—আমি অবাক হইয়া গেলাম। যাহাদের জন্য এই নারী পুত্র হারাইতে বসিয়াছেন, তাহাদের উপর ইঁহার কোনো আক্রোশ নাই ! এতটা নরম হইতে হইলে যে কতটা শক্ত হইতে হয়, তাহাও ইঁহার কোনো লক্ষণ দেখিয়াই বুঝা যায় না।

উপাসনার সময় অমল গাহিল,

"তোমার পতাকা যারে দাও,
তারে বহিবারে দাও শকতি।"

তাহার মুদিত চক্ষু হইতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাহার মুখে তখন কি রকম যে একটা আভা দেখিয়াছিলাম, তাহা ভুলিব না।

অমলের ইচ্ছানুযায়ী আমরা সকলে একসঙ্গে আহার করিতে বসিলাম। অমল বলিল, "মা, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও।" মাতা এক হাতে অন্নের গ্রাস পুত্রের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন, এবং অন্য হাতে চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। রাণীও মাঝে-মাঝে অমলের মুখে মাংস, ভাত তুলিয়া দিতেছিল ; থাকিয়া-থাকিয়া তাহার চক্ষুও ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিতেছিল। অমল বলিল, "মা, তুমি খাচ্ছ না মোটে। আমি তোমাকে খাইয়ে দি।" এই বলিয়া অমল মাতার মুখে ভাত তুলিয়া দিল। মাতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাতের গ্রাস মুখে লইয়া বলিলেন, "তোর যা মায়া আছে তা' বুঝেছি,—আর দেখাতে হবে না।" অমল বলিল,

"আমি নিষ্ঠুর, কঠিন কঠোর, নির্ম্মম আমি আজি ;
আর নাই দেরী,—ভৈরব ভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি।"

আমি বলিলাম, "এখন কবিত্ব রেখে খেয়ে নিন্ ; আপনার যা বীরত্ব তা বুঝে নিয়েছি।"

এমনি করিয়া অবশেষে বিদায়ের সময় আসিয়া পড়িল। অমল মাতাকে প্রণাম করিয়া যেমনি দাঁড়াইল, মাতা অমনি উত্তুঙ্গ সমুদ্রের মত পুত্রের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ; এবং নিবিড় আলিঙ্গনের আবেষ্টনে থাকিয়া মাতা-পুত্র উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অমল এক-একবার বলিতে লাগিল, "মা, আমি কাঁদব না।" কিন্তু তখনি ছেলেমানুষের মত ঠোঁট বাঁকাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। রাণী আসিয়া আমাকে ধরিল, এবং ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম। এমন সময় শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "কাঁদতে নেই, কাঁদতে নেই,—ওতে যে জাতের দুর্নাম হবে। কেঁদো না মা,—ছেলে যুদ্ধে যাচ্ছে,—তুমি যে বীর-মাতা। অমল এ দিকে এসো ত !" অমল মাতৃবক্ষ হইতে এক লাফে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। সে যে কি বীর লম্ফ, অথচ কি নিষ্ঠুর !! আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

বাহিরে অমলের কয়েকজন সঙ্গী দাঁড়াইয়া ছিল,—অমল তাহাদের সঙ্গে মার্চ্চ্ করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের আড্ডাস্থল হইতে তাহারা একসঙ্গে হাওড়া যাইবে। অমলদের বাড়ীর দৃশ্য দেখিতে আমার আর সাহস হইল না,—আমি সেখান হইতে চলিয়া গেলাম।

× × × × ×

হাওড়া ষ্টেসনের একটা প্লাটফর্ম্মে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। বাঙালী পল্টনকে বিদায় দিবার জন্য, এবং বাঙালী সন্তানের এই রণ-যাত্রাকে বিজয়াশীর্ব্বাদ করিবার জন্য, অসংখ্য নরনারী সেখানে মিলিত হইয়াছে। গাড়ী ছাড়িবার আর বেশী বিলম্ব নাই, তথাপি যাত্রিগণ প্লাটফর্ম্মে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে শেষ আলাপ করিয়া লইতেছে। আমি ও অমল হাঁটিতে-হাঁটিতে প্লাটফর্ম্মের এক মাথায় চলিয়া গিয়াছি। তাহার সঙ্গে বার্ণ্-হার্ডির সমরতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

হইতেছিল। সে বলিতেছিল, "যুদ্ধই জাতিকে উর্ব্বর করে, জাতীয় শক্তিকে বিকশিত করে এবং জাতির কর্ম্মচেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করে।" আমি একটা পাল্টা জবাব দিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় অমল সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল। চাহিয়া দেখিলাম, পাগলিনীর মত একজন রমণী ছুটিয়া আসিতেছে। অবাক্-বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতেই, সুবালা আসিয়া একেবারে অমলের পদতলে পড়িয়া গেল, এবং বলিতে লাগিল, "অমল বাবু, বড় ভুল করেছিলুম,—আমায় ক্ষমা করুন, ফিরে চলুন। আমার ঢের শাস্তি হয়েছে। কেবল লজ্জা কোরে এদ্দিন আস্তে পারিনি;—কিন্তু এখন যে আর লজ্জা করবার সময় নেই।"—অমল সুবালাকে হাতে ধরিয়া তুলিল, এবং শান্ত ভাবে বলিল, "আমি তোমার কোন অপরাধ গ্রহণ করিনি। অপরাধ যে করনি তা নয়; কিন্তু কোনো দিন ত তোমাকে অপরাধী বলে মনে করিনি—শুধু মনে হয়েছে, তুমি কি নিষ্ঠুর!" সুবালা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "সত্যি, আমি বড় নিষ্ঠুর,—আমায় ক্ষমা করুন,—একটিবার ফিরে চলুন।" অমল একটুখানি হাসিয়া উত্তর দিল, "অপরাধ যখন ধরিনি, তখন ক্ষমা করব কি? কিন্তু ফিরে যাবার কথা কি বলছ? সে কি সম্ভব?" অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে সুবালা বলিল, "সম্ভব নয়?" তাহার মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছিল,—তাহার চোখে পলক ছিল না। সে পড়িয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে ধরিলাম। সুবালা বোধ হয় ভাবিতেছিল, অমল ইচ্ছা করিলেই ফিরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন বুঝিল ফিরিবার আর পথ নাই, তখন যেন তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত শুকাইয়া উঠিতে চাহিল।

এমন সময়ে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। অমল বলিল, "যদি ফিরে আসি, আবার দেখা হবে।" সুবালা সহসা অস্থির হইয়া উঠিল; বলিতে লাগিল, "অমল, অমল, যেও না,—যেও না বলছি।" সুবালা ছুটিতে চাহিতেছিল, আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিলাম। অমল চলিয়া গেলে, সে আপন মনে বলিতে লাগিল, "যেও না বলছি,—যেও না বলছি।" গাড়ী যখন ছাড়িয়া দিল, অমল তখন মুক্ত গবাক্ষ হইতে রুমাল উড়াইতেছে। যতক্ষণ দেখা গেল, আমরা সে দিকে চাহিয়া রহিলাম। সুবালা অতি ক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিল, "যেও না বলছি,—যেও না বলছি।" গাড়ীখানা যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন সুবালা মর্ম্মভেদী কণ্ঠে শুধু বলিল "নিষ্ঠুর!" তার পর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

"ওথেলো"

(সেক্সপিয়রের মূল নাটক হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক অনূদিত)

[শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, পি-আর-এস্]

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে, ডিরোজিও ও কাপ্তেন রিচার্ডসনের বাঙ্গালী শিষ্যদিগের মধ্যে সেক্সপিয়রের বিশ্ব-বিশ্রুত নাটকাবলীর আলোচনা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। এবং তাহার ফলে, কিছুদিন বাঙ্গালীর প্রাণ বেশ মাতোয়ারা হইয়াছিল। সে সময়ের ভাব কতকটা ইংলণ্ডের যাহাকে classical Renaissance বলে,—সেই গ্রীক কাব্য-নাটকের সোমরস পান দ্বারা নবজাগরণ ও নবীন মাদকতার অবস্থার অনুরূপ। এরূপ নেশা চিরস্থায়ী হয় না—এবং এ শ্রেণীর মাতালের সংখ্যাও বড় বেশী হয় না। সুতরাং, যাহা হইবার তাহাই হইল। অর্থাৎ কিছুদিন পরে সেক্সপিয়রের আলোচনা এ দেশে মন্দীভূত হইয়া গেল। তাহার পর কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় সেক্সপিয়রের ১২।১৪ খানি নাটক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া, টীকা-টিপ্পনীর সহযোগে বাঙ্গালী ছাত্রকে গলাধঃকরণ করান আরম্ভ হইল। সেই ব্যাপার এখনও চলিয়াছে। বোধ হয় এ যুগের অল্প বাঙ্গালীই সেক্সপিয়রের সমস্ত নাটক অধ্যয়ন করিয়াছেন। অথচ নাট্যকলার

সম্পূর্ণ আস্বাদনের জন্য সেক্ষপিয়রের নাটকের বিশিষ্ট আলোচনা অত্যাবশ্যক। তাহা যে এদেশে হয় না, ইহা বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

শুধু এদেশে নয়, সেক্ষপিয়রের নিজের দেশে, এবং তাহার দেশবাসী যেখানে বিশেষভাবে উপনিবিষ্ট হইয়াছে সেই আমেরিকায়ও, সেক্ষপিয়রের নাটকের চর্চ্চা যথোচিত হয় না। এ সম্বন্ধে একজন আমেরিকান লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন—Shakespeare's proud position to-day is possible only through the fact that he is not read. We get our Shakespeare from "Bartlett's quotations."

*   *   *   *   *

In all my life I never knew anybody, save one woman and a little girl, who read Shakespeare in the original. I know a deal of Shakespeare although I never read one of his plays.

এই কথা যদি সত্য হয়,—এবং বোধ হয় একটু অত্যুক্তির অতিরঞ্জন বর্জ্জিত হইলে, কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়—তবে ইহা বিলাতী সাহিত্য চর্চ্চার পক্ষে প্রশংসার কথা নহে, বিশেষ নিন্দার কথা। তবু ইংলণ্ডের নাট্যসমাজে একটা প্রথা এখনও প্রচলিত আছে যে, কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে বরণীয় হইতে হইলে, তাহাকে সেক্ষপিয়রের প্রধান-প্রধান নাটকের ভূমিকার অভিনয় করিতে হয়। যে অভিনেতা হ্যামলেট্ বা ম্যাকবেথ্ বা ওথেলোর ভূমিকা, যে অভিনেত্রী ওফিলিয়া বা লেডি ম্যাকবেথ বা ডেস্‌ডি-মোনার ভূমিকা— অত্যুৎকৃষ্ট রূপে অভিনয় করিতে না পারিল, সে কখনও যশঃসৌধের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিতে পারে না। এই প্রথা প্রচলিত থাকায়, ইংলণ্ডে এবং আংশিক ভাবে আমেরিকায় সেক্ষপিয়র-চর্চ্চা এখনও বিরল হয় নাই। কিন্তু যতদূর সুপ্রচলিত থাকা উচিত ততদূর নাই।

এ সম্পর্কে জার্ম্মাণীকে প্রশংসা করিতে হয়। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর অনেক দোষই আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু তথাপি শত্রুপক্ষও জার্ম্মাণদিগের একটা গুণের উল্লেখ না করিয়া পারেন না। সে গুণ তাহাদের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা। তাহার ফলে আমরা দেখি যে, জার্ম্মাণীতে সেক্ষপিয়রের সমগ্র গ্রন্থাবলীর অনুবাদ হইয়াছে; জার্ম্মাণ সমালোচকেরা সেই সকল নাটকের আলোচনা করিয়া প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণ রঙ্গমঞ্চে সময়ে-সময়ে এই সকল নাটকের অভিনয়ও হইত।

কিন্তু বাঙ্গালা দেশে আমরা সেক্ষপিয়র প্রচারের কি আয়োজন করিয়াছি!

প্রথম-প্রথম সেক্ষপিয়রের কোন-কোন নাটকের ছায়া বা ভাব বা ভঙ্গী অবলম্বনে বাঙ্গালায় নাটক, গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রান্তি-বিলাস, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নলিনী-বসন্ত, স্বর্গগত দীনবন্ধু মিত্রের "জলধর ও বক্কেশ্বর" চরিত্র, হ্যামলেটের ছায়াবহ হরিরাজ ইত্যাদি। কিন্তু দেশী ছাঁচে না ঢালিয়া, কোনরূপ বেনামী ব্যবহার না করিয়া, সাহস-কৃত সেক্ষপিয়রের সঠিক অনুবাদের প্রথম উদ্যম বোধ হয় নাট্যকবি গিরিশচন্দ্রের ম্যাকবেথ্। আমার যতদূর জানা আছে, এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উদ্যম বোধ হয় আমাদের অদ্যকার আলোচ্য এই "ওথেলো"। গিরিশবাবু নাটকে বেশ হাত পাকাইয়া, পরিণত বয়সে ম্যাকবেথের অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। দেবেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রের মন্ত্র-শিষ্য। তিনি ভূমিকায় এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"এই অনুবাদের যদি কিছু গুণ থাকে, তাহা আমার ন্যায় শুষ্ক মৃৎপিণ্ডকে রসাইয়া যিনি গঠনোপযোগী করিয়া গিয়াছেন—সেই নটকবিচূড়ামণি গিরিশচন্দ্রের;" এবং সেই জন্য, যাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি এই অনুবাদ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশে তাঁহার নাটকখানি উৎসর্গ করিয়াছেন। সেই জন্য গিরিশচন্দ্রের রচনা-রীতির অনুসরণ আমরা দেবেন্দ্রবাবুর অনুবাদের অনেক স্থলে দেখিতে পাই।

কোন মহাকবির কাব্য বা নাটক ভাষান্তরিত করিলে, মূলের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য অনুবাদে ফোটাইয়া তোলা অতি দুরূহ ব্যাপার; একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ পর্য্যন্ত ইলিয়ডের কতই অনুবাদ হইয়াছে, কিন্তু কোন অনুবাদে কি আমরা মূলের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পাই? এরূপ হইবার প্রধান কারণ এই যে,



[Engraved at the Bharatvarsha Office

কচ ও দেবযানী

[illegible]

[illegible]

শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার

রবীন্দ্রনাথ

মহাকবির ভাষায় একটা আরাব (Rhythm) আছে, যাহা ভাষান্তরে কিছুতেই প্রতিধ্বনিত করা যায় না। মহাকবি সেক্ষপিয়রের নাটকের ছন্দে ঐ আরাব প্রায় সর্ব্বত্র মুখরিত হইতেছে। কাহার সাধ্য সে ধ্বনি বাঙ্গালায় ঝঙ্কৃত করিবে? সেক্ষপিয়র অনুবাদের প্রধান বাধা এইখানে।

দেবেন্দ্রবাবু যথাসাধ্য মূলের অনুসরণ করিয়াছেন। মূলের সহিত মিলাইয়া পড়িলে, অভিজ্ঞ পাঠক এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। তাঁহার অনুবাদের একটা বিশেষত্ব এই যে, এ অনুবাদ প্রায়ই অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় না; যেন আমরা কোন মূল গ্রন্থই পড়িতেছি, এইরূপ মনে হয়। অনুবাদকের ইহা কম কৃতিত্ব নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এবং পাঠক যাহাতে স্বয়ং এ বিষয়ের বিচার করিতে পারেন, এ জন্য আমরা মূল ও অনুবাদের কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Wherein I spake of most disastrous
chances,
Of moving accidents by flood and field,
Of hair-breadth scapes i' the imminent
deadly breach,
Of being taken by the insolent foe
And sold to slavery, of my redemption
thence,
And portance in my travel's history:
Wherein of antres vast and deserts idle,
Rough quarries, rocks and hills
whose heads touch heaven,
It was my hint to speak,—such was
the process. Act I. Sc. 3.

কভু,
নিপতিত অতর্কিত আপদ-কবলে,
জলে স্থলে—হৃদিকম্প রোমাঞ্চ আখ্যান,
সদ্যপ্রাণহর
রন্ধ্র-মুখে দৈবে পরিত্রাণ—যথা
কেশমাত্র ব্যবধান জীবনে মরণে।
কভু দুষ্কর সমরে, বন্দী শত্রু-করে—
জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হৃদয়—
দাসত্বে বিক্রয়, মুক্তি লাভ,
নিরাশ্রয় মেদিনী ভ্রমণ,
দরশন দৃশ্য অগণন
নয়ন-বিস্ময়কর!
কোথা অন্তঃশূন্য বিশাল-গহ্বর,
তৃণহীন মরু ভয়ঙ্কর,
বন্ধুর আকর, উন্নত ভূধর,
তুঙ্গ শৃঙ্গ গগন-চুম্বিত।
এই মত কহিতাম কত
চিত্তহর বিস্ময়ের বিচিত্র কাহিনী।

O, now, for ever,
Farewell the tranquil mind!
farewell content!
Farewell the plumed troop, and
the big wars,
That make ambition virtue! O,
farewell!
Farewell the neighing steed, and the
shrill trump,
The spirit stirring drum, the
ear-piercing fife,
The royal banner, and all quality,
Pride, pomp and circumstance of
glorious war!
And, O you mortal engines, whose
rude throats
The immortal Jove's dread clamours
counterfeit,
Farewell! Otllello's occupation's gone!
Act III. Sc. 3.

হায়! ফুরাইল—
চিরতরে সুখ-শান্তি সন্তোষ আমার!
ফুরাইল মহাহব, ভৈরব উৎসব—
বৈরিনাশ-অভিলাষ পুণ্য ব্রত যার!
রণস্থল—সুসজ্জিত চতুরঙ্গ দল,

তুরঙ্গ উল্লাস, ভেরীর উচ্ছ্বাস,
শ্রবণ-বিদারী তূরী রব,
দুন্দুভির উন্মাদিনী ধ্বনি,
আর কি দানিবে আনন্দ অন্তরে মোর !
বিজয় পতাকা —
বীরগর্ব্ব অরি-খর্ব্বকর,
সমর-গৌরব সব ফুরাইল হায় !
জিনি কোটি বজ্রের ঝঙ্কার
কঠোর হুঙ্কার যার,
জীবনাশী মহা অস্ত্রচয়,
অভাগায় দেহ চিরবিদায় এখন,
জীবনের ব্রত মম সাঙ্গ এতদিনে !

O, thou public commoner !
I should make very forges of my cheeks,
That would to cinders burn up modesty,
Did I but speak thy deeds. What committed ?
Heaven stops the nose at it and the moon winks,
The bawdy wind that kisses all it meets
Is hush'd within the hollow mine of earth,
And will not hear it. What committed ?
Impudent strumpet ! Act IV. Sc. 2.

আরে আরে সামান্য বনিতা !
কহিতে কুকীর্ত্তি তোর—
অগ্নি-দীপ্ত গণ্ডে মোর
লজ্জা হবে লাজে ভস্মীভূত !
কি করেছি ? পেলে তব অপরাধ ঘ্রাণ
দেবলোক ফিরাবে বদন ঘৃণা ভরে !
কলঙ্কের ডরে শশাঙ্ক মুদিবে আঁখি !
লম্পটের শিরোমণি নিঘৃণা পবন
বিলায় চুম্বন যারে তারে —
লুকাইবে মেদিনী-জঠরে,
পাছে পশে কাণে জঘন্য কাহিনী তোর !
কি করেছি ? নির্লজ্জ গণিকা !

আমরা আশা করি, দেবেন্দ্রবাবুর অনূদিত ওথেলো বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিবে ; এবং তাহার ফলে সেক্ষপিয়রের অমর নাটকাবলীর সঠিক বঙ্গানুবাদের দ্বার উন্মোচিত হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রুষ-প্রসঙ্গ

[শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বিপুলকায় রুষিয়া আজ মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড তাড়নে বিধ্বস্ত ও ধ্বংসোন্মুখ, এবং পৈশাচিক তাণ্ডব-নর্ত্তনে মত্ত। বিপ্লবের প্রবল বহ্নি সমগ্র দেশকে তোলপাড় করিয়া অবশেষে রাজ-রক্তে রাক্ষসী তৃষ্ণা নিবারণের ব্যর্থ প্রয়াসে যত্নবান ; যেন ভারতে সাজাহানের রাজ্যাবসানে রক্তপাতের কলঙ্ক-লেখার জ্বলন্ত ইতিহাসের পুনরভিনয়। কিন্তু তথাকার সাধারণ অবস্থার চিত্র অনেকেরই নিকট অজ্ঞাত।

পাশ্চাত্য মহাদেশের অংশ হইলেও রুষিয়া প্রাচ্যের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ; এজন্য রুষিয়ানদিগের আচার-ব্যবহারে, প্রাচ্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, কোন-কোন বিষয়ে সৌসাদৃশ্য স্বভাবতঃই সঙ্গত।

লুপ্তপ্রায় হইলেও পর্দ্দা-প্রথার অতি সূক্ষ্ম চিহ্ন রুষিয়ার পল্লীপ্রদেশের স্থানে-স্থানে রুষ রমণীগণের মধ্যে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। রুষ রমণীগণ সাধারণতঃ বিশেষ সুন্দরী বা সুশ্রী নহে ; এবং এজন্য তাহারা বিশেষ দুঃখিতাও নহে। বিবাহ-কালে আধুনিক রীতি অনুযায়ী, অন্য কোন দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, রুষিয়ানরা কেবল সৌন্দর্য্য-সুধাপানে তৃপ্ত হয় না। পাত্রীকে দেখিবার সময় বরপক্ষ—যাহাতে গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্মের সুবিধা হয় এজন্য,—পাত্রীর স্বাস্থ্য, বল, সাংসারিক কাজ-কর্ম্মে তৎপরতা ইত্যাদি বিষয় বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করেন। বিবাহ-বিষয়ে পাত্রকে প্রায়ই কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় না, বা পাত্রও নিজের কোনরূপ অভিমত প্রকাশ করে না। তাহার পিতা বা অভিভাবক যে পাত্রী

মনোনীত করেন, তাহাকেই সে জীবনের সঙ্গিনী রূপে সাদরে গ্রহণ করে।

আজকাল নারী-সমাজের অধিকার লইয়া চারি দিকেই যেমন ঘোর আন্দোলন, রুষিয়ায় তাহার কিছুমাত্র প্রাবল্য নাই; বরং তথাকার জনসাধারণ ইহার বিরোধী। কোন স্ত্রীলোক অযাচিত ভাবে উপদেশ প্রদানে অগ্রসর হইলে, তাহারা উপহাস করিয়া বলে যে, দীর্ঘ কেশদাম তাহার সমস্ত বুদ্ধি গ্রাস করিয়াছে; কেহ বা মন্তব্য প্রকাশ করে যে, সাতটী নারীতে একটী পুরুষের বুদ্ধি পাওয়া যাইতে পারে; এবং কোন কোন সম্প্রদায় বলেন যে, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি একেবারেই নাই।

কৃষক গৃহে নারীদিগকেই সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া তাহারা মাঠে গিয়া কৃষি কর্ম্ম করে, এবং যথা কালে ফিরিয়া আসিয়া রন্ধনাদি গৃহ কর্ম্ম করে। আবশ্যকমত ভূমিতে লাঙ্গল দেওয়া, জমি খুঁড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়া ইত্যাদি কার্য্য তাহাদিগকেই করিতে হয়। অবকাশমত তাহারা সঙ্গীত-চর্চ্চাও করিয়া থাকে।

রুষিয়ায় একটী প্রবাদ আছে—পত্নীকে প্রহার করিলে সে প্রহার নিজেকেই লাগে। কিন্তু পত্নী-প্রহার তাহাদের মধ্যে একেবারে অপ্রচলিত নহে। কোন লোককে যদি কেহ বলে যে, স্ত্রীকে প্রহার করিবার অধিকার তাহার নাই, তাহা হইলে সে বিস্মিত হইয়া উত্তর দেয় যে, বিবাহের সময়ে ভজনালয়ে স্ত্রীকে শুধু ভালবাসিতেই সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসে নাই,—আবশ্যকমত অন্য ব্যবস্থাও করিবার শপথ করিয়া আসিয়াছে। অপর দিকে পত্নীরাও মাঝে-মাঝে পতিদের 'অঙ্গ-সেবা' করিয়া থাকেন। কোন সময়ে পতি হয় ত নেশার ঘোরে স্বপ্নমগ্ন, আর পত্নী আসিয়া তাঁহার মস্তকের কেশরাশি মুষ্টি মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, ধূসর অঙ্গের ধূলি ঝাড়িতে-ঝাড়িতে গৃহের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান, এবং পতি, প্রিয়ার এইরূপ সোহাগে অনেক সময় বিস্মিত হইয়া, প্রেমালাপের চেষ্টা করিতে থাকেন। এক পক্ষের প্রহার, অন্য পক্ষের প্রেমালাপ-চেষ্টা,—এক অভিনব দৃশ্য। নেশার ঝোঁকে ইহাদিগকে বর্ব্বরের ন্যায় আচরণ করিতে প্রায়ই দেখা যায় না,—বরং ভালবাসার আধিক্য প্রকাশ করিতে দেখা যায়।

রুষ-সম্রাট পিটারের (Peter the Great) সময় হইতে নারী-সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। তৎপূর্ব্বে যে সকল রীতি নীতি প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে আবশ্যকমত তিনি কতকগুলির বিলোপ-সাধন ও সংস্কার করেন। সে সময়ে বিবাহের অনতিকাল পূর্ব্বেও নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ হইত না; এবং বিবাহের সময়ে পাত্রীর মুখ অবগুণ্ঠনাবৃত থাকিত। তিনি নিয়ম করেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে নায়ক-নায়িকা উভয়েই উভয়ের পরিচিত হইতে পারিবে। যাহাতে এই নিয়ম প্রতিপালিত হয় তজ্জন্য একটী আইনও গঠিত হয়।

স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে তিনি জনসাধারণকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন; এবং নিজের কন্যাগণকে নানা উপায়ে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন। সম্রাট "জন দি টেরিবল্" (John the Terrible) এর সময় হইতে রুষিয়ায় ইংরেজ মহিলাদিগের সমাগম হয়। অনেকের মতে ইঁহারাই সম্রাট পিটারকে নারী-সমাজের উন্নতি-সাধন বিষয় উৎসাহ ও পরামর্শ দিতেন। সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট-কন্যাগণও পরিশেষে এ বিষয়ে যোগদান করেন।

সম্রাট পিটারের মন্ত্রী টেলিসার (Talischar) বলিতেন ৩০ বৎসর বয়সে পুরুষের বিবাহ করা উচিত। ঐশ্বর্য্য বা সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, যাহার সহিত সুখে সারা জীবন অতিবাহিত করিতে পারা যায়, এইরূপ বালিকার সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হইবে। কিন্তু যাহাতে স্ত্রীর অঙ্গুলি-চালিত হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে; কারণ, ইহাপেক্ষা লজ্জাস্কর বিষয় পুরুষের আর কিছুই নাই।

রুষিয়ার পুরুষ-সমাজ সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। বিপ্লববাদীগণের দুরন্ত অত্যাচার তথায় বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান। ইহারা প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত; এবং উষ্ণমস্তিষ্ক আইরিশ যুবকদিগের ন্যায়, গ্রীস্ ও রোমীয় স্বাধীনতা-ভাবে মগ্ন। অন্যান্য দেশের ন্যায় সেখানেও রাজ-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেক অত্যাচারী ব্যক্তি আছেন। ইঁহাদিগকে সকলেই প্রায় ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে। সিভিলিয়ান কর্ম্মচারিগণ আমাদের দেশে যেরূপ সম্মান পাইতে ইচ্ছা করেন, বা ডব্লীন ক্যাস্ল্ (Dublin Castle) কর্ম্মচারিগণ আয়ারল্যাণ্ডে যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন, সিন্‌ভনিক্ (Chinvoniks) কর্ম্মচারিগণ রুষে তদ্রূপ সম্মান পাইয়া থাকেন।

অনেক সময়ে রুষদিগের প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় না, এবং তাহাদিগকে হঠকারী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ, তাহারা নম্র, সরল ও দয়ার্দ্রচিত্ত। সরলতা ইহাদের প্রকৃতিগত লক্ষণ। সরল ভাবে ইহাদের সহিত মিশিলে ইহারা অত্যন্ত আপ্যায়িত হয়। ইহারা চা, কফি ও মদ্য পান করিতে এবং বিষাদ বা বিরহ-সঙ্গীত শ্রবণ করিতে অত্যন্ত ভালবাসে। ইহাদের মধ্যে অদৃষ্টবাদীর সংখ্যা যথেষ্ট। যাহা হইবার তাহা হইবেই—তজ্জন্য চিন্তা করা বৃথা,—ভগবান দয়াহীন নহেন—তিনিই ব্যবস্থা করিবেন—ইত্যাদি তাহাদের অভিমত।

গৃহে, মোদকের বা মদের দোকানে, কিংবা রেলওয়ে ষ্টেসনে তাহাদের প্রকৃতির আরও অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্বারোহণ বা তদ্রূপ কারণ ব্যতীত তাহাদের ব্যস্ততা প্রায়ই লক্ষিত হয় না। স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হইলে, গাড়ী ছাড়িবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুকাল পূর্ব্বে তাহারা ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং একটি বৃহদাকার বালিশ-হস্তে স্বচ্ছন্দ ভাবে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। বালিশ সঙ্গে না লইয়া তাহারা কখনও ভ্রমণে বাহির হয় না। তাহাদের রমণীগণ ধূমপান করিতে-করিতে প্লাটফরমের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বেড়াইতে থাকে এবং কেহ-কেহ চা পানে প্রবৃত্ত হয়। পুরুষ বা রমণী সকলের কাছেই একটি করিয়া চা-পাত্র সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রমণ-কালে তাহারা ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে।

বিনয়, সৌজন্য, অতিথি-সৎকার-প্রিয়তা ইত্যাদি কয়েকটী গুণ

তাহাদের হৃদয়ে বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান। রুষিয়া সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন যে, বন্ধুত্ব বলিলে সাধারণতঃ যে অর্থ বুঝায়, রুষিয়ায় তাহা ঠিক সেরূপ নহে। অন্যান্য দেশের তুলনায় তাহাদের দেশে বন্ধুত্বের স্থান অনেক উচ্চে। কোন ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করিতে হইলে, বা কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে নিমন্ত্রিতগণ সমাগত হইলে, গৃহকর্ত্তা যথাসম্ভব বিনয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করেন। এরূপ ক্ষেত্রে সমাগত ব্যক্তিবর্গের নিকট তাঁহারা বিলাস-সম্ভার বা ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি বিষয়ের প্রসঙ্গমাত্রও উত্থাপন করেন না; করিলে, জনসাধারণ তাঁহাকে "অহঙ্কারী" বলিয়া বিদ্রূপ করে। কোনরূপ 'হামবড়া' ভাব প্রকাশ করা, বা কোন সৎকার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা চতুর্দ্দিকে প্রচার করা তাহাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ।

অধুনা রুষিয়ায় ব্যবসায় উপলক্ষে অনেকগুলি জাতি সমাগত হইয়াছে। তত্রত্য অধিবাসিগণ সকলেরই সহিত ভদ্র ব্যবহার করে; কিন্তু সাধারণতঃ ইংরেজ বণিকদিগকেই ইহারা অধিক পছন্দ করে। অন্যান্য জাতির তুলনায় ইহারা অধিক ভোজন করে ও আকণ্ঠ মদ্যপান করিতে ভালবাসে। দুঃখের সময়েও ইহাদিগকে স্ফূর্ত্তি করিতে দেখা যায়।

ইহুদী (Jews) সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের অনেক সময়ে গোলযোগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহুদী মাত্রেরই সহিত যে ইহাদের বিবাদ তাহা নহে; কারণ, অনেক সময়ে ইহাদিগকে ইহুদীদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের বিবাদ সুদখোর মহাজনদিগের সহিত। মহাজনদের অন্যায় অত্যাচার ইহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। ইহুদীদের মধ্যে অনেকে মহাজনী কারবার করেন। এই সূত্রে একবার জনসাধারণের সহিত ইহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায়, রুষ গবর্ণমেণ্ট ইহুদীদিগকে তাহাদের নিজের দেশ "পেলে" (Pale) ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করেন। ভারতবর্ষেও একবার এইরূপ হইয়াছিল। স্যর রিচার্ড টেম্পলের শাসনকালে বোম্বাই প্রদেশে মারহাট্টাদিগের সহিত মাড়োয়ারী মহাজনদিগের সংঘর্ষ হয়, এবং কয়েকজন মাড়োয়ারী নিহত ও তাহাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত খাতাপত্রাদি ভস্মীভূত হয়। গবর্ণমেণ্ট শান্তি স্থাপনের জন্য মাড়োয়ারীগণকে তাহাদের নিজ দেশে পাঠাইয়া দেন।

উপস্থিত ইহুদী ও রুষ প্রজাগণ অনেকাংশে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সমান অধিকার লাভ করিতেছে, এবং বিলাতী ইহুদীদিগের ন্যায় রুষ-ইহুদীগণও সমান স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে; দেশের কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। "পোল্" প্রজাগণও (Polish subjects) এখন ক্রমশঃই দেশের কার্য্যে যোগদান করিতে অগ্রসর হইতেছে, এবং গবর্ণমেণ্টও তাহাদিগকে প্রজার অধিকার প্রদান করিতেছেন।*

* বহু দিন পূর্ব্বে লণ্ডনে—East India Association এর একটী সভায় Dr. John Pollen, C.I.E., LL.D., I.C.S., (Retired)—"Russia and India" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাঁহার সেই সন্দর্ভ হইতে গৃহীত। উক্ত লেখক সম্প্রতি সংবাদপত্রাদিতে ভারতবাসীর—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর, রাজভক্তি সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ও হোমিওপ্যাথি।

[শ্রীপিয়েম্‌ডি ———]

ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী স্বনামধন্য বিজ্ঞানবিৎ স্যার্ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়, ধাতু, প্রস্তর উদ্ভিদাদি তথাকথিত জড় ও জীবের উপর নানা পরীক্ষার ফলে, উহাদের সমধর্ম্মজ্ঞাপক এক মহাসত্যের সন্ধান পাইয়া, অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে সব সম্বন্ধে অনেকেই অল্প-বিস্তর অবগত আছেন। এ সমস্ত নব-নব গবেষণার ফলে শুধু যে পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-শাস্ত্র, জীব-বিদ্যা, শরীর-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা ও তৎসংশ্লিষ্ট কৃষি-বিদ্যাই পুষ্টিলাভ করিতেছে এমত নহে,—চিকিৎসা-শাস্ত্রও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইতেছে।

এ সমস্ত গবেষণার ফলে চিকিৎসা-শাস্ত্র কতদূর উপকৃত হইতে পারে, তাহার আভাষ বহুশাস্ত্র পারদর্শী, সুযোগ্য চিকিৎসক স্বর্গীয় ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয়, নীরস-বৈজ্ঞানিক-প্রবন্ধ-সরস-করিয়া-লেখায়-সিদ্ধহস্ত সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় প্রণীত "বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার" নামক পুস্তকের ভূমিকায় সুন্দর ভাবে দিয়া গিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন, "আচার্য্য বসু মহাশয়ের আবিষ্কার ভবিষ্যতে বিজ্ঞান-চর্চ্চায় এবং মানবের কার্য্যক্ষেত্রে যে কত উপকারে লাগিবে, সে বিষয়ে কিছু আভাষও দিতে পারা যায়। (১) চিকিৎসা-শাস্ত্রের ত কথাই নাই। অনেক ঔষধের ফলাফল সম্বন্ধে পরীক্ষা, এখন জীব-জন্তুর উপর করিতে হয়; ......। আচার্য্য বসু মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় ... ...; ... ... লোহার তার ও উদ্ভিদ দিয়াও এই সকলের প্রথম পরীক্ষা চলিতে পারিবে। (২) রোগের ঔষধ কোন্ অবস্থায় কত মাত্রায় প্রযোজ্য ইহা নির্ণয় করা ... ... সহজে সম্পন্ন করা যাইবে। ......। (৩) দেহ-যন্ত্রের অবস্থা ও তাহার উপর ঔষধ প্রয়োগের ফলাফল চিকিৎসাকালে ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় পরীক্ষা করা যাইবে।" ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোল্লিখিত আবিষ্কারগুলির দ্বারা সুবিশাল চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্তর্গত সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা-প্রণালীই যে সবিশেষ উপকৃত ও উন্নত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু শুধু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীর দিক্ হইতে দেখিতে গেলেও, এ সমস্ত আবিষ্কারের উপকারিতা কত অধিক, আজ

এ প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব। আমি নিজে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নহি; তথাপি, যে সমস্ত বিষয় আমি লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই পাঠক-পাঠিকাগণের সমক্ষে উপস্থাপন করাই আমার উদ্দেশ্য।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীর দুইটী প্রধান বিশেষত্ব আছে। এক বিশেষত্ব—"Similia Similibus Curantur" = "Like cures Like" অর্থাৎ "সমঃ সমং সময়তি"—এই মূলসূত্রানুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচনে। সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই সমস্ত লক্ষণ-সমন্বিত রোগে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালী মতে ঐ ঔষধ প্রযোজ্য (১)। "বিষস্য বিষম্ ঔষধম্" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বাক্যও এই মতের সমর্থক। এই মতানুযায়ী চিকিৎসার ফলে সহরে ও সুদূর মফঃস্বলে নূতন (acute) ও পুরাতন (chronic) রোগক্লিষ্ট বহু রোগী তাঁহাদের নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করিতেছেন; এবং এলোপ্যাথিক-প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসকেরাও আধুনিক বীজ-সাহায্যে-চিকিৎসা (Vaccine treatment) দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ করিতেছেন দেখিয়া, এই মতের যাথার্থ্য, উপযোগিতা এবং আধুনিক বিজ্ঞানানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু কি অমানুষিক প্রতিভার বলে ও অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে মহাত্মা হানিম্যান এ সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা তাঁহার জীবনী পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই জানেন।

অপর বিশেষত্ব মাত্রা (Dose) ও ক্রম (Dilution or attenuation) বা শক্তি (Potency) নির্দ্দেশে। হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি মতে, বয়স্থ ব্যক্তিকেও কোন রোগেই, কোন মাত্রায়ই, কোন ক্রমের (বা শক্তির) কোন ঔষধের এক ফোঁটার অধিক সেবন করিতে দেওয়া হয় না। সাধারণতঃ সুরাসার (alcohol) বা দুগ্ধশর্করায় (sugar of milk) সহিত পুনঃপুনঃ সংমিশ্রণ হেতু এবং পুরাতন রোগে সাধারণতঃ উচ্চশক্তির ঔষধ ব্যবহৃত হয় বলিয়া সেই এক ফোঁটায় মূল ঔষধের এত সূক্ষ্ম পরিমাণ মাত্র বর্ত্তমান থাকে যে, অন্য চিকিৎসা-প্রণালী মতে বোধ হয় তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। কিন্তু অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এত অল্প মাত্রায় ঔষধ সেবনের ফলেও, বহু নূতন ও পুরাতন রোগক্লিষ্ট রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এমন কি, যে স্থলে অন্য বহুপ্রকার ঔষধ সেবনে কোন ফল না পাইয়া রোগী ও তদীয় আত্মীয়-স্বজন হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে সব স্থলেও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রোগীকে পুনঃ স্বাস্থ্য ও বল লাভে সহায়তা করিতে দেখা গিয়াছে। আমি জানি, কোন এক ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত ত্রিকালীন জ্বরক্লান্ত মুমূর্ষু রোগীকে যখন খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ রাশি-রাশি কুইনাইন সেবন করাইয়াও কোন ফল না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন হোমিওপ্যাথিক-মতবাদ-পরিজ্ঞাত জনৈক এলোপ্যাথিক চিকিৎসক একদিন মাত্র সাধারণ লবণজল (Natrum muriaticum) সেবন করাইয়া তাহাকে আরোগ্যের পথে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে দিনও দেখিয়াছি, দুই বৎসরের একটী শিশুর যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি-হেতু মলের সাদা রং যখন নানাপ্রকার যকৃৎ-ক্রিয়াবর্দ্ধক (Liver tonic) ঔষধ সেবনের ফলেও প্রায় মাসাধিক কালের মধ্যে কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইল না, তখন দুইদিন ৩০শ শক্তির Calcarea Arsenicum সেবনে মলের রং ক্রমশঃ স্বাভাবিক হলদে রঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল; এবং এক সপ্তাহকাল ঐ ঔষধই সেবনে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলদে হইয়াছিল। এরূপ আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ সে সকলের আর উল্লেখ করিলাম না।

কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন, "হোমিওপ্যাথি কিছু নহে—Faith cure মাত্র।" অর্থাৎ "বিশ্বাসের বলেই এ শ্রেণীর ২।১টী রোগ সারে,—হোমিওপ্যাথি ঔষধের গুণে বা সাহায্যে নহে"; অথবা এমনও কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন, "এই সমস্ত রোগ প্রকৃতি-দত্ত শক্তির বলেই আরোগ্য (Nature cure) হইয়া থাকে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি নামে মাত্র উপলক্ষ।" কিন্তু যখন দেখি, হোমিওপ্যাথি মতে প্রদত্ত ঔষধ লুপ্তজ্ঞান মুমূর্ষু রোগীর পক্ষে যেমন কার্য্যকর, অর্ব্বাচীন শিশুর পক্ষে তদপেক্ষা অল্প নহে; তখন কি করিয়া বলিব উহা Faith cure? আর বাস্তবিক যদি কোন রোগ প্রকৃতি-দত্ত (রোগীর) আভ্যন্তরিক শক্তিবলে আপনা-আপনিই সারিয়া যায়, তবে সে স্থলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অপেক্ষা উগ্রবীর্য্য কোন ঔষধ দিয়া "মশা মারিতে কামান দাগিলে", তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে কিরূপ কুফল ফলা অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন দেখা যাউক, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেস্থলেও এরূপ আশাতীত ফল লাভ হয় কি কারণে। এই কারণ নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কি উদ্দেশ্যে এবং কিরূপভাবে রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে ২।১টী কথা এস্থলে বলা আবশ্যক।

আরোগ্যলাভ করার পক্ষে প্রকৃতি-দত্ত (রোগীর) আভ্যন্তরিক শক্তিকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক উপায়ে সাহায্য করার জন্যই ঔষধের প্রয়োজন। এই আভ্যন্তরিক শক্তিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এত অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যথাসম্ভব স্বাভাবিক উপায়ে রোগ-প্রতিকার করাই হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কোন প্রকারে উপদ্রবের সৃষ্টি করা বা বিষময় ফল দেখান ইহার উদ্দেশ্য নয় (২)। প্রাচীনকালে প্রচলিত

(১) "Similar symptoms in the remedy remove similar symptoms in the disease". Hahneman's "Organan" Para. 18.

(২) In practice homeopathy seeks to accomplish its purpose of releif or restoration to health by as

অস্বাভাবিক উপায়ে জোলাপ, রক্তমোক্ষণ, স্ফোটক-উৎপাদন (Blistering) বা পাল্টা-প্রদাহ জনন (Counter irritation) প্রভৃতি দ্বারা রোগ সাময়িক ভাবে হ্রাস পাইতে পারে মাত্র; কিন্তু নির্ম্মূল হওয়ার আশা সুদূর-পরাহত। শারীর-যন্ত্রের আভ্যন্তরিক শক্তি না থাকিলে, শুধু বীর্য্যবান ঔষধের গুণে স্থায়ীভাবে রোগী সারে বা দুর্ব্বলের বলসঞ্চার হইতে পারে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। তাহা হইলে সংসারে দুর্ব্বল লোক বোধ হয় দেখা যাইত না এবং মৃত্যু বলিয়াও বোধ হয় কোন অবস্থা থাকিত না।

পূর্ব্বেই এক স্থলে বলিয়াছি যে, রোগ যতই সাংঘাতিক হউক না কেন, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এক মাত্রায় এক ফোঁটার অধিক সেবন করিতে দেওয়া হয় না। পুরাতন রোগে সাধারণতঃ উচ্চ ক্রম বা শক্তির ঔষধ ব্যবহৃত হয় বলিয়া মূল ঔষধও সুরাসার বা দুগ্ধশর্করার সহিত বারংবার মিশ্রণের ফলে এত সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে যে, এতদ্দেশে প্রচলিত অপরাপর চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুসারে ব্যবহৃত ঔষধের পরিমাণের তুলনায় ঐ ফোঁটায় কোন ঔষধ নাই বলা চলে।

এরূপ ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি-বাদীরা বলেন যে ঔষধগুলি রুগ্ন তন্তু দ্বারা গৃহীত হওয়ার উপযোগী এত সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে যে ঐগুলি প্রায় আণবিক অবস্থায় বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং ঊর্দ্ধক্রম প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় বারংবার সঞ্চালনের ফলে উহাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক বা তদ্বৎ অব্যক্ত কোন শক্তি উত্তেজিত হইয়া উঠে বলিয়া ঔষধগুলি এত কার্য্যকরী হয় এবং যথাস্থানে অত্যল্প পরিমাণে প্রযুক্ত হয় বলিয়া রোগীর শরীরের মাত্র রুগ্ন যন্ত্রগুলিকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়া নবজীবন প্রদান করিতে সমর্থ হয়। (৩)

সামান্য পরিমাণের ঔষধও কিরূপে কঠিন পীড়ায় ফলপ্রদ হইতে পারে, তাহা ডাক্তার সি, ই, হুইলার, মেসার্স জে, এম, ডেন্ট এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত হানিম্যানের "অর্গ্যানন" (Organon) নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের ভূমিকায় ২৪ পৃষ্ঠায় অতি সরল ভাষায় ও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, (আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে জীবজগতের আদি সৃষ্টি প্রোটোপ্ল্যাজম (Protoplasm) যাহা হইতে অভিব্যক্তির ফলে অন্যান্য জীব-শরীর উদ্ভূত হইয়াছে সেই) "প্রোটো-প্ল্যাজমের (বা জীব-মূলের) উপর নানা পরীক্ষার ফলে ইহার উপর বাহ্যিক উত্তেজনার ক্রিয়া সম্বন্ধে জীব-বিজ্ঞানান্তর্গত কতকগুলি অবিসংবাদী মূল সূত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এই সূত্রগুলির মধ্যে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য মুখ্য সূত্রটি এই যে, উত্তেজক শক্তি রাসায়নিক (যথা ঔষধ), বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক অথবা অন্য যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন—একই শক্তি যাহা অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে জীবনী-শক্তির (Life activity) ক্ষতি বা বিনাশ সাধন করে, তাহাই আবার অল্প মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে জীবনী-শক্তিকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে সমর্থ। অতএব ইহা বলাই বাহুল্য যে, যদি সুস্থ শরীরের উপর কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা দ্বারা (লক্ষণাবলী হইতে) শরীরের কোন্ কোন্ বিধান-তন্তুগুলির (Tissues) উপর ইহার ফল অতি মারাত্মক তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারি, এবং আমরা সেই তন্তুগুলিকে কোন রোগের বশে যদি পূর্ব্ববৎ লক্ষণাবলী প্রকাশ করিতে দেখিতে পাই, তবে পূর্ব্বোক্ত যে ঔষধের মারাত্মক ক্রিয়া পূর্ব্বে উক্ত বিধানতন্তুগুলির উপর স্বাধীনভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, সেই ঔষধের অল্পমাত্রা নির্ভয়ে প্রয়োগ করিতে পারি; কারণ আমরা বিশেষভাবে জানি যে, ঐ অল্পমাত্রার ঔষধই সেই রোগক্লিষ্ট তন্তুগুলিতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া তুলিতে সক্ষম। জীবজগতের এই যে নিয়ম, ইহারই উপর প্রকৃতপক্ষে হানিম্যান প্রবর্ত্তিত হোমিওপ্যাথির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। (৪)

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত কতকগুলি তথ্যও বড়ই অপ্রত্যাশিত কিন্তু সুদৃঢ় ভাবে উপরিউক্ত মতের

---

small a dose as possible. It aims at a remedial, not a disturbing, much less a poisonous effect. অর্থাৎ ঔষধ প্রয়োগ ব্যাপারে হোমিওপাথি যথাসম্ভব অল্প মাত্রার দ্বারা রোগীর রোগ শান্তি বা আরোগ্য করিতে চেষ্টা করে। রোগ শান্তি করাই হোমিওপ্যাথির উদ্দেশ্য, কোন প্রকার উপদ্রব করা বা বিষময় ফল দেখান ইহার উদ্দেশ্য নয়।

(Lauries "Homeopathic Domestic Medicine." page 46)

(৩) The action of homœopathic medicine and acting directly on diseased conditions or organs, it follows of necessity that the ordinary doses should be very much less than those of the system to which it mainly opposes itself. অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কার্য্যাবলী পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট থাকায় এবং উহা রুগ্ন অবস্থা বা যন্ত্রের উপর মুখ্যভাবে কার্য্য করে বলিয়া অন্য পদ্ধতির ঔষধের তুলনায় খুব সামান্য মাত্রার ঔষধও কার্য্যকরী হইতে দেখা যায়।

(Laurie's "Homœopathic Domestic Medicine". Page 46).

(৪) "The study of protoplasm has led to the formation of certain biological laws, universally accepted, concerning its reaction to stimuli; and the fundamental law of such reactions applying to all stimulating agents, whether chemical (as e. g. drugs). electrical, mechanical or other is that the same agent which in relatively large doses can damage or destroy life activity, can in a relatively smaller dose stimulate it. Whence it follows that if by experimenting with drugs upon the healthy we have learned the tissues which those agents have it in their power to injure

সমর্থন করিতেছে। "জড় ও জীবের আঘাত অনুভূতি" সম্বন্ধে জগদানন্দবাবু পূর্ব্বোক্ত "বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' নামক পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠায় কি লিখিয়াছেন দেখুন। বীর্য্যবান ঔষধ অল্প মাত্রায় সেবন করিলে দেহের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, প্রাণী তখন খুব সবল হয়। কিন্তু সেই ঔষধের মাত্রাই বৃদ্ধি পাইলে দেহে অবসাদের লক্ষণ দেখা দেয়, এবং শেষে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। ইহারই বহু উদাহরণ ঐ পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, আমরা বহু স্থলে দেখিয়াছি, সামান্য কয়েক ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধে রোগ আরোগ্য হইয়াছে। যে স্থলে প্রতি মাত্রায় এক ফোঁটা ঔষধ রোগ আরোগ্য বিষয়ে সহায়তা করিতে সমর্থ, সে স্থলে নানা রকমের উগ্র দশ-বিশ ফোঁটা ঔষধ বা ছোট বড় বটীকা সেবনের ফল উপরিউক্ত আবিষ্কার অনুসারে ক্ষতিজনক হওয়া অবশ্যম্ভাবী নয় কি? তবে ঐ সমস্ত ঔষধ ব্যবহারে কি রোগ সারিতেছে না? সারিতেছে বই কি—অনেক সারিতেছে। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত মাত্রায় প্রদত্ত ঔষধের কুফল যাইবে কোথায়? বিচার-ভার পাঠক-পাঠিকাগণের উপর ন্যস্ত রহিল। যে সমস্ত দ্রব্য সচরাচর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, অথবা যেগুলি শরীরের দ্বারা গৃহীত হওয়ার অনুপযোগী অপরিবর্ত্তিত (crude) অবস্থায় দেওয়া হয়, অথবা যেগুলি তেমন বীর্য্যবান নহে, সেগুলি ব্যবহারেই কুফল ফলিবার সম্ভাবনা অল্প।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এ প্রবন্ধের দুই-এক স্থলে সত্যের অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া কোন-কোন চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা বলিতে হইয়াছে। আশা করি, ভিন্ন মতাবলম্বিগণ এজন্য নিজ গুণে লেখককে ক্ষমা করিবেন। কারণ, কোন মতবাদকে বা ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ বা নিন্দা করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। সত্যের জয় সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত। সত্য জয়যুক্ত হউক।

সত্যমেবজয়তি।

(and we deduce this from the symptoms exhibited), and if we find these same tissues manifesting by similar symptoms the injurious effects of disease, then we can confidently administer small doses of the drugs which we have independently found to have the power of damaging those tissues, knowing that the small dose will act as a stimulus to those very cells that need a stimulus; and this is to all intents the homœopathic laws".

* Introduction by Dr. C. E. Wheeler to Organon published by Messrs. J. M. Dent and Sons. Page XXIV.

আরব জাতির জ্ঞানচর্চ্চা—বোগদাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি টী]

খলিফা আলীর বংশধরগণের হস্ত হইতে মাবিয়া কিরূপে সিরিয়া-প্রদেশ অধিকার করিয়া, ক্রমে তথায় ওম্মিয়া বংশের প্রাধান্য স্থাপন করেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। এই মাবিয়াই দামাস্কাসে রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ কতিপয় বৎসর দামাস্কাসে রাজত্ব করিলে পর আব্বাস-বংশ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়।

আব্বাস বংশের দ্বিতীয় খলিফা অলমনসুর দামাস্কাসের পরিবর্ত্তে বাগদাদে রাজধানী স্থাপন করেন। সুতরাং দামাস্কাসের ও বাগদাদের বিবরণ আলোচনা করিলেই আমরা তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা অবগত হইতে পারি।

ওম্মিয়া-বংশের শাসনকালে ইস্‌লামের জ্ঞানজ্যোতিঃ একটু মলিন ও নিষ্প্রভ হয় (১)। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মাবিয়া, অন্যায় আচরণ ও অসৎ পথ অবলম্বন করিয়া রাজ্যলাভ করেন, এবং কুফা হইতে দামাস্কাসে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া বিলাস-বৈভবে কালকর্ত্তন করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র বিলাসপরায়ণ এজিদ চাটুকার-দলে পরিবৃত হইয়া, রাজ্যের শিক্ষোন্নতিবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হন; কিন্তু এই ওম্মিয়া-বংশের খলিফা দ্বিতীয় ওমর অতি গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে "আলেকজান্দ্রিয়ার পরিবর্ত্তে এণ্টিয়ক ও হারাণ নামক স্থানদ্বয় গ্রীক শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। ইবন আবজার আলেকজান্দ্রিয়াতে গ্রীক দর্শনের অধ্যাপনা করিতেন। ওমর খলিফা পদে বৃত হইয়া তাঁহাকে চিকিৎসা-বিভাগের সর্ব্বপ্রধান পদে নিযুক্ত করেন।" (২)

হারাণবাসিগণ গ্রীক ও আরবী উভয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কাজেই তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তিতায় গ্রীক ভাষার ও সভ্যতার প্রভাব আরবী ভাষায় প্রসারিত হয়; অনেক উপাদেয় গ্রীক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়।

কিন্তু সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, ওম্মিয়া-বংশের খলিফাগণ বিদ্যানুশীলনে ও জ্ঞানচর্চ্চায় কোনরূপ আগ্রহ বা অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা লোকক্ষয়কর যুদ্ধ-বিগ্রহে ও আত্ম-প্রতিষ্ঠামূলক কলহ-বিবাদে তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ও অর্থ প্রয়োগ করিতেন। কুটিলতা, কপটাচার, স্বার্থলোলুপতা, বিলাসপরতন্ত্রতা তাঁহাদের চরিত্রের ভূষণ স্বরূপ ছিল। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও জ্ঞানপিপাসু, সরল-স্বভাব, অনাড়ম্বর-প্রিয়, স্বল্প তুষ্ট আবুবেকর, ওমর ও আলীর বংশধরগণ নিভৃত সারস্বতকুঞ্জে জ্ঞান বিজ্ঞানের আরাধনায় মন-প্রাণ উৎসর্গ

---

(১) "The accession of the Ommeyads to the rulership of Islam was a blow to the progress of knowledge.—Amir Ali.

(২) ইসলাম-কাহিনী—রামপ্রাণ গুপ্ত।

করিয়াছিলেন। এই দীন উপাসকমণ্ডলীই এই দুর্দ্দিনে আরবীয় বিদ্যা ও আরবীয় শিল্প-বিজ্ঞানের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

কালের কুটিল চক্রে ওম্মিয়া-বংশের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। আব্বাস-বংশীয় আস্‌সাফা খলিফা পদে বৃত হ'ন। ইনি দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা অলমন্‌সুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অলমন্‌সুর একজন প্রবল প্রতাপান্বিত, বিচক্ষণ, রাজনীতিজ্ঞ ভূপতি ছিলেন। তিনি দামাস্কাস পরিত্যাগ করিয়া তাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর উর্ব্বর, সুশোভন সমতলক্ষেত্রে বাগদাদ নগরী স্থাপন করেন। তাঁহার সময় হইতে বাগদাদ নগরী খলিফাগণের রাজভবনে পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা-সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত হয়। শিল্প-বাণিজ্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এই স্থান মুসলমান-শাসিত রাজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করে।

আব্বাস-বংশের রাজত্বকালে মোসলেম সাম্রাজ্য বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। পশ্চিম আফ্রিকা আব্বাস-বংশের অধীনতা-পাশ হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া, স্বাধীনতার ধ্বজা উড্ডীন করে। স্পেনে আব্বাস-বংশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া, অবশেষে ওম্মিয়া-বংশের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে মোস্‌লেম সাম্রাজ্য পরিণামে হ্রস্ব হইয়া পড়ে। আব্বাস-বংশীয় নরপতিগণ সাম্রাজ্য-বিস্তার-লালসা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান-বিস্তারে ও শিক্ষোন্নতি-বিধানে আত্ম-নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টায় সমৃদ্ধিশালী বাগদাদ নগরী জ্ঞান-গরিমায় সমুন্নত হইয়া বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা অলমন্‌সুর একজন বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তিনি মোসলেম জ্ঞান-বিস্তারে সবিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহারই সময়ে বিভিন্ন-ভাষার উপাদেয় গ্রন্থাবলী আরবী-ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁহার সময়ে সংস্কৃত 'হিতোপদেশ' ও 'সিদ্ধান্ত' নামক জ্যোতিষগ্রন্থ আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। আরিষ্টটলের কতিপয় গ্রন্থ, টোলেমীর 'আলমাজেষ্ট' (Almagest), ইউক্লিডের জ্যামিতি, এবং প্রাচীন গ্রীক ও পারস্যভাষার অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুস্তকের অনুবাদ তাঁহারই উৎসাহে ও অর্থ-সাহায্যে প্রকাশিত হয়।

অলমন্‌সুর নিজেও একজন জ্ঞানী ও বিজ্ঞ লোক ছিলেন। অঙ্ক-শাস্ত্রে তাঁহার অসীম প্রতিভা ছিল। অধ্যয়নপ্রিয় অলমন্‌সুর এই সকল অনুবাদ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাগণও এই অধ্যয়ন-স্পৃহা ও জ্ঞানার্জ্জনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণমাত্রায় তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালে বাগদাদ নগরী একটী বিশাল জ্ঞান-কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশ হইতে অধ্যয়নচিকীর্ষু জনমণ্ডলী বাগদাদে উপনীত হইয়া অগাধ জ্ঞান সঞ্চয় করে, এবং নিজ-নিজ দেশে প্রত্যাগমন করিয়া আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ত্তিকা-সাহায্যে অজ্ঞানান্ধকার দূর করে।

আব্বাস বংশের ষষ্ঠ খলিফা বিশ্ববিক্রান্ত-কীর্ত্তি হারুণ-অর্-রসিদ আরব্যোপন্যাসের কল্পনা-প্রসূত মনোহর গল্পের প্রভাবে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের নিকট সুপরিচিত। তিনি মোস্‌লেম জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে সর্ব্বদা যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার রাজসভা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীতে পরিশোভিত ছিল।

"তাঁহার সভায় পৃথিবীর সর্ব্বদেশের জ্ঞানী ও গুণীর সমাগম হইত। তাঁহাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধান জন্য রসিদের রাজভাণ্ডার সর্ব্বক্ষণ উন্মুক্ত থাকিত। শিল্প ও বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি অজস্রধারে অর্থব্যয় করিতে তিলমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। জ্ঞানালোচনায় উৎসাহ প্রদানে রসিদ সর্ব্বদা মুক্তহস্ত থাকিতেন। তাঁহার প্রাণগত উৎসাহে ও সাহায্যে কি শিল্প, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, প্রত্যেক বিষয়েরই প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। রসিদ সঙ্গীতজ্ঞ লোক-দিগকে উপাধি প্রদান করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া প্রয়োজন মত রাজকোষ হইতে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে তাঁহার রাজত্বকালে সঙ্গীতচর্চ্চা একটা বিশুদ্ধ ব্যবসায়ে পরিণত হয়।"

—ইসলাম-কাহিনী।

বাগদাদের সপ্তম খলিফা মামুনের সময়ে আরবীয় শিক্ষা ও সভ্যতা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। লুপ্তপ্রায় প্রাচীন গ্রীক ও পারসীক সভ্যতা মোস্‌লেম সভ্যতার নিকটে মস্তক অবনত করে। আরবগণই তাঁহাদের সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতে প্রচার করিয়া, ধ্বংসোন্মুখী গ্রীস ও পারস্যের পূর্ব্ব জ্ঞান-গরিমা বিস্মৃতির অতল গর্ভ হইতে রক্ষা করেন। প্রাচীনতম সুসভ্য ভারত ও চীন তখন সুষুপ্তির সুখময় ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিল। নিদ্রার আবেশে পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি তাহাদের হৃদয়পট হইতে অপনীত হইয়াছিল। জ্ঞানপিপাসু আরবগণ এই সকল প্রাচ্য সভ্যজাতির জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে সকল অপূর্ব্ব অমূল্য রত্ন উদ্ধার করেন, তাহা পাশ্চাত্য জগতে বিস্তার করিয়া, তদ্দানীন্তন অজ্ঞানতিমিরাবৃত য়ুরোপীয় সমাজকে অন্ধকার হইতে বিমুক্ত করিতে প্রয়াস পান। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও ইহা একবাক্যে স্বীকার করেন।

"In the middle ages, the Arabs were the sole representatives of civilisation. They opposed that barbarism which spread over Europe; far from resting with acquired treasure, they enlarged and opened up new ways to the study of nature."

—Historian's History of the World. Vol. VIII.

অর্থাৎ আরবগণ মধ্যযুগীয় সভ্যতার একমাত্র প্রতিনিধি। তৎকালে য়ুরোপ যে বর্ব্বরোচিত অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, আরবগণ তন্নিরসন-কল্পে বদ্ধপরিকর হন। পরলব্ধ জ্ঞানে পরিতুষ্ট না থাকিয়া, তাঁহারা প্রকৃতির রহস্য-দ্বার উদ্ঘাটনের নব-নব উপায় উদ্ভাবন করিয়া জ্ঞানমার্গ সুপ্রশস্ত করেন।

উক্ত পুস্তকের অপর একস্থলে লিখিত আছে—"The greater part of Greek erudition," according to Hyde, "which

we have to-day from those sources (sciences and letters of antiquity), we received first from the hands of the Arabs."

অর্থাৎ হাইড সাহেবের মত এই যে—প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্য ও বিজ্ঞান হইতে আমরা যে জ্ঞানরাশি লাভ করিয়াছি, তাহার বেশীর ভাগ সর্ব্বপ্রথম আমরা আরবগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই।

অপর স্থলে আবার লিখিত আছে—"They (Arabs) Merit," says M. Libri, "eternal gratitude for having been the preservers of the learning of the Greeks and Hindus, when those people were no longer producing anything, and Europe was still too ignorant to undertake the charge of the precious deposits. Efface the Arabs from History and the Renaissance of letters will be retarded in Europe by several centuries."

অর্থাৎ যখন প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীকজাতি পূর্ব্ববৎ তাহাদের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল, যখন য়ুরোপ এত অজ্ঞ ছিল যে, সে তাহার উপর ন্যস্ত বহুমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার সংরক্ষণ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ অপারগ ছিল, তখন এই আরবজাতি সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া তাহারা অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন। ইতিহাসের বক্ষ হইতে যদি আরবজাতিকে মুছিয়া ফেলা হইত, তবে য়ুরোপের সাহিত্যক্ষেত্রে যে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা কয়েক শত বৎসর পিছাইয়া পড়িত।

প্রাচ্যের জ্ঞানালোকে প্রতীচ্যকে যে আরবজাতি সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল, তাহারা আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন। আর যে বিদ্যানুরাগী খলিফা মামুন এই অশেষ কল্যাণকর অনুষ্ঠানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি আমাদের ততোঽধিক ভক্তি ও সম্মানের পাত্র।

"মামুনের রাজত্বকাল জ্ঞানযুগ নামে কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, মামুনের সময়ই মোস্‌লেম জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যাহ্নকালস্বরূপ ছিল। মামুনের ঐকান্তিক যত্নে ও উৎসাহে সর্ব্বপ্রকার মানবজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। কল্পনা-প্রসূত দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে-সঙ্গে প্রক্রিয়াসিদ্ধ ব্যাবহারিক বিজ্ঞানেরও অনুশীলন হইত। তাঁহার সময়ে অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।"

—ইস্‌লাম কাহিনী।

"এই সময়ে তাঁহার প্রতিনিধিগণ দিগ্বিদিকে ধাবিত হইয়া, প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া, বাগদাদ নগরের গ্রন্থরত্নাগারসমূহ পূর্ণ করিতেন; এবং তদ্দারা আরবীয় বিদ্বৎসমাজ জ্ঞান-পিপাসার শান্তি-বিধান করিয়া ধন্য হইতেন। এই সময় মোস্‌লেম রাজ্যের প্রত্যেক অংশে বৃহৎ-বৃহৎ বিদ্যালয় ও পুস্তকাগার স্থাপিত হইতে লাগিল, এবং দেশীয়-বিদেশীয়, স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী-নির্ব্বিশেষে পৃথিবীর যাবতীয় অধ্যয়নচিকীর্ষু ছাত্রমণ্ডলীর জন্য তাহাদের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রহিল।"—মৌলবী ইমদাদুল হক্।

"মামুনের শাসনকালে টোলেমীর (Ptolemy) আলমাজেষ্ট (Almagest) নামক গ্রন্থ পুনরায় অনূদিত হয়। হিন্দু জ্যোতিষ-গ্রন্থ "সিদ্ধান্ত" টীকাসহ প্রকাশিত হয়। অল্‌কান্দি চিকিৎসাতত্ত্ব, আলোকতত্ত্ব (Optics), বায়ুতত্ত্ব (Meteorology), দর্শন, জ্যামিতি, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের দুইশত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।"

—Amir Ali.

আবুমেজর (Abu-Maashar or Albu Mazor) জ্যোতিষ-তত্ত্বের গবেষণায় নিজকে নিয়োজিত করেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা-প্রসূত মত সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তাহার সেই গ্রন্থ হইতে নব জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে।

আবুল হোসেন (Abul Hosson) দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

আলবাতানি (Al-Batani) জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে তাহাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন, তথাপি গ্রীকসমাজে টোলেমীর যেরূপ সম্মান ও গৌরব ছিল, মুসলমান সমাজে আলবাতানির স্থান তাহা অপেক্ষা হীন নহে। তাঁহার জ্যোতিষিক Table লাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়া য়ুরোপের জ্যোতিষশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। গণিত শাস্ত্রে তাহার খ্যাতি ও যশ ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ছিল। তিনি ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে Sine এবং Co-sine এর প্রথম প্রচলন করেন।

নীহারিকা-সম্ভব জগৎ

[শ্রীঅন্নদাচরণ সেন এম-এ]

বহুদিনের কথা। তখনও সৌরজগৎ সৃষ্ট হয় নাই। সৌরজগতের মূলীভূত উপাদান তখন সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান ছিল। এই কুজ্ঝটিকাবৎ জড়-পদার্থই নীহারিকা। আজিও আকাশমণ্ডলে এরূপ অনেক আদিম বাষ্পময় নীহারিকা বর্ত্তমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শরীর হইতে গ্রহাদি সৃষ্ট হইতেছে।

নীহারিকাগুলি স্বভাবতঃই অর্দ্ধ-স্বচ্ছ। কতকগুলি আবার এরূপ অস্পষ্ট যে চক্ষুগোচর হয় না। অন্য কতকগুলির দূরবীক্ষণ সাহায্যে অবস্থিতি-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আলোকচিত্র লইলে তবে ধরা পড়ে। মেঘশূন্য রজনীতে যন্ত্র-সাহায্য ব্যতীত দেখা যায়, এইরূপ দুইটি নীহারিকাপুঞ্জ বর্ত্তমান। ইহাদের মধ্যে যেটি অতি সহজেই ধরা পড়ে, সেটিকে কালপুরুষের (L Orionis বা আর্দ্রা) তরবারীর মধ্যভাগস্থ তারকাটিকে বেষ্টন করিয়া থাকিতে দেখা যায়। অপর নীহারিকাপুঞ্জটি অন্তর্ম্মদা (L Andromeda বা উত্তর ভাদ্রপদ) মধ্যে স্থিত।

নীহারিকাপুঞ্জ সংখ্যায় অগণ্য। আধুনিক প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে পঞ্চ লক্ষের অধিক নীহারিকাপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হয় না। নীহারিকাগুলি আবার নানা আকার-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কতকগুলি নীহারিকা অঙ্গুরীয়কের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, কতকগুলি আবার একরূপ অস্পষ্ট আলোক-বেষ্টনীযুক্ত চক্রের আকারবিশিষ্ট (ইহাদের গ্রহ সম্বন্ধীয় নীহারিকা Planetary nebulae বলে)। কতকগুলির কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, যেমন কালপুরুষের নীহারিকা; আবার কতকগুলিতে এরূপ নীহারিকা বর্ত্তমান, যেগুলি দেখিলে বোধ হয়, তাহারা ঘূর্ণিত হইতেছে। ইহাদিগকে আবর্ত্ত-নীহারিকা (Spiral nebulæ) বলে। লর্ড রসের দূরবীক্ষণ সাহায্যে গ্রহাদি সম্বন্ধে যে সকল নূতন আবিষ্কার হয়, তন্মধ্যে এই সকল নীহারিকার আবিষ্কারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সকল আবর্ত্ত-নীহারিকা দেখিলে বোধ হয়, যেন এগুলির প্রান্তভাগ অপেক্ষা মধ্যভাগ অধিকতর বেগে আবর্ত্তিত হইতেছে। প্রান্তস্থ অংশ অপেক্ষাকৃত ধীরে-ধীরে আবর্ত্তিত হইতে থাকে।

নীহারিকা-শরীরের সমস্তটা সমভাবে ঘন নহে। ইহাদের যে অংশগুলিকে প্রভাময় দেখায়, সেগুলি অনুজ্জ্বল অংশাপেক্ষা ঘনতর। এই সকল অংশদ্বারা ভবিষ্য গ্রহাদির কেন্দ্রস্থল সূচিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ নীহারিকা-শরীর হইতে ভবিষ্যতে যে গ্রহ উদ্ভূত হইবে, নীহারিকা-কেন্দ্রস্থ প্রভাময় অংশটুকু তাহার সূর্য্য-স্বরূপ।

অতএব দূরবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, নীহারিকাপুঞ্জ এখন যে অবস্থায় বর্ত্তমান, সৌরজগতকে এক সময়ে সেই অবস্থার মধ্য দিয়া আধুনিক অবস্থায় আসিতে হইয়াছে। এই নীহারিকাপুঞ্জের বহির্ভাগ সঙ্কুচিত হইয়া গ্রহাদি, এবং মধ্যভাগ সঙ্কুচিত হইয়া সূর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

যে নীহারিকা হইতে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে, সে নীহারিকার প্রকৃত আকৃতি কিছুই নিশ্চিত হয় নাই। লর্ড রসের দূরবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে নীহারিকা-পর্য্যবেক্ষণ কালে দেখা যায়, এই নীহারিকাগুলির মধ্যে অনেকেই তারকাপুঞ্জ মাত্র; বহু দূরস্থিত বলিয়া ইহা বাষ্পময় দেখায়। এই আবিষ্কারের পর হইতে অনেক বৈজ্ঞানিক আশা করিয়াছিলেন যে, কাল-সহকারে হয় ত সকল নীহারিকাই তারকা-সমষ্টি বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কিন্তু হাগিন্স সাহেব নীহারিকাপুঞ্জের আলোক বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, কতকগুলি নীহারিকা তারকা-সমষ্টি বলিয়া প্রমাণিত হইলেও, অধিকাংশ নীহারিকারই গঠনোপাদান সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহারা বাষ্পময়। সুতরাং এই ব্যাখ্যা দ্বারা লাপ্লাসের মত সমর্থিত হইতেছে; কারণ লাপ্লাসেরও অনুমান মতে নীহারিকাগুলি বাষ্প-রচিত। তাঁহার মতে এই অগ্ন্যুজ্জ্বল বাষ্পময় নীহারিকাপুঞ্জ নিজ নিজ স্ব-স্ব কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে এবং তাপ-বিকিরণ-হেতু, মূল শরীর হইতে ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্গুরীয়কের আকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। বিক্ষিপ্ত অংশগুলি হইতে নক্ষত্র-জগৎসমূহ উদ্ভূত হইতেছে।

হাগিন্স সাহেবের পর্য্যবেক্ষণের পর যে সকল নীহারিকাপুঞ্জ পর্য্যবেক্ষণ করা হয়, সে সকলের দ্বারাও লাপ্লাসের এই অনুমান সমর্থিত হয়। যাহা পূর্ব্বে অনুমানমাত্র ছিল, অতঃপর তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে লাগিল। নানা বিভিন্ন অবস্থার নীহারিকা বাস্তবিকই যে বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখা যাইতে লাগিল। ১৮৮৭ খৃঃ ডাঃ রবার্ট অন্তর্মদাস্থ নীহারিকার যে আলোকচিত্র গ্রহণ করেন, তাহাতে দেখা যায় যে, এই নীহারিকার আকার চক্রের ন্যায়,—চক্র-মধ্যস্থল বৃহৎ ও উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট। অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল বহির্ভাগ অঙ্গুরীয়কসমূহে বিভক্ত হইতেছে। এই অঙ্গুরীয়কের বহির্দেশ-মধ্য দিয়া যে-যে স্থলে দৃষ্টিগত করা সম্ভব, তন্মধ্য দিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন এইগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইতেছে। এই অংশগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ ভবিষ্য গ্রহের সূচনা বর্ত্তমান।

ডাঃ রবার্টস আর একটি নীহারিকার আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। এই নীহারিকাটি আবর্ত্তনবিশিষ্ট নীহারিকা। সে চিত্রেও পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্তর্মদাস্থ নীহারিকার ন্যায় ইহার প্রান্তদেশ নয়ন-গোচর না হইয়া ইহারও চক্র-সমতল ভাগই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার কেন্দ্র হইতে কয়েকটি আবর্ত্তন-রেখা নির্গত হইয়াছে। এই রেখাগুলির স্থানে-স্থানে কতকগুলি উজ্জ্বল বিন্দু বর্ত্তমান। এই বিন্দুগুলি ভবিষ্য গ্রহাদির ভ্রূণস্বরূপ।

অতএব দূরবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে নীহারিকাগুলি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক, লাপ্লাস-কল্পিত অঙ্গুরীয়কের ন্যায় আকারবিশিষ্ট; অপর আবর্ত্তনশীল। আবর্ত্ত-নীহারিকাগুলি স্ব-স্ব কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া ঘূর্ণিত হইতেছে।

ইহাদের আবর্ত্তন-বেগ সম্বন্ধে লাপ্লাসের যে ধারণা ছিল, দৃশ্যতঃ ইহাদের বেগ তদপেক্ষা ন্যূন। নীহারিকা-নির্গত আলোক-রশ্মির রৈখিক আবর্ত্তন দেখিলে বোধ হয়, যেন এই আবর্ত্তন নীহারিকাগুলির প্রান্তভাগের শ্লথগতি জন্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে নীহারিকার আবর্ত্তন বেগ মন্থর বলিতে হয়। অন্তর্মদাস্থ যে নীহারিকা-পুঞ্জের আলোকচিত্র লওয়া হয়, তদনুসারে বোধ হয় যে ইহাদের আবর্ত্তন-বেগ বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। ডাঃ রবার্টস্ ও বণ্ড সাহেব স্বতন্ত্র ইহার যে চিত্র অঙ্কিত করেন, এই দুইটি তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উভয় চিত্র-নির্দ্দিষ্ট নীহারিকা দুইটির অধিকৃত স্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

আরও একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে রবার্ট সাহেব যে সকল আলোকচিত্র গ্রহণ করেন, তাহাদের সহিত ইর্কিস পরীক্ষণাগারে রীচি সাহেব ১৯০১ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যে সকল আলোকচিত্র গ্রহণ করেন, তাহাদের তুলনা করা যাক। নীহারিকা-মধ্যস্থ পিণ্ডগুলি উভয়ের গৃহীত দুইটি আলোকচিত্রেই বর্ত্তমান। রীচি সাহেব এই নীহারিকার যে আলোকচিত্র গ্রহণ করেন, তাহাতে তদীয় যন্ত্রের উৎকৃষ্টতা নিবন্ধন চিত্র-প্রদর্শিত পিণ্ডগুলি বড় দেখায়। কিন্তু উভয় চিত্রেই পিণ্ডাধিকৃত স্থান একই। রবার্ট সাহেবের

গৃহীত আলোকচিত্রে চিত্রনিম্ন-দেশের বামভাগে যে পিণ্ড বর্ত্তমান সেটি, এবং ঊর্দ্ধভাগে যে তিনটি পিণ্ড দেখা যায় সেই তিনটী রীচি সাহেবের গৃহীত আলোকচিত্রে বিদ্যমান। এই পিণ্ডত্রয়ের দক্ষিণভাগস্থ পিণ্ড নিম্নদেশে একটি বিদারণ-রেখা দ্বারা বেষ্টিত। ইহাও উভয় চিত্রে একই স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান। এই গ্রন্থিটুকুর নিম্নভাগে উভয় চিত্রেই একই সরলরেখায় তিনটি তারকা বর্ত্তমান। তারকা তিনটির অবস্থিতি-ক্রম উভয় চিত্রে সমান।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নীহারিকাগুলি স্থির। যদি তাহারা গতি-বিশিষ্টই হয়, তবে সে গতি এরূপ সামান্য যে, চতুর্দ্দশ বৎসরের ভিতর গতির কোন বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে নাই। বক্ষ্যমান নীহারিকা যদি গতিবিশিষ্ট হইত, তবে নীহারিকাস্থ পিণ্ডের অবস্থানুক্রম উভয়-চিত্রে বিভিন্ন প্রকার হইত।

আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্র-সাহায্যে যে সকল প্রমাণাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমুদায় দ্বারা লাপ্লাসের অনুমান সমর্থিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে এক বা তাহার অধিক ত্রিশির কাচ (Prism) আছে। এই কাচ-সাহায্যে শুভ্র আলোক-রশ্মিকে রশ্মির সাতটি মূল বর্ণে বিশ্লিষ্ট করা যায়। কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য, একটা ত্রিশির ঝাড়ের কলম লওয়া যাউক। অতঃপর একখণ্ড পুরু কাগজে ছোট ছিদ্র করিয়া একটি দীপশিখার সম্মুখে ধরা যাউক। ছিদ্র-নির্গত আলোক-রশ্মি ত্রিশির কাচের উপর পাতিত করিলে দেখা যাইবে, কাচ-প্রতিত আলোক-বিন্দু প্রবর্দ্ধিত হইয়া সাতটি বর্ণযুক্ত আলোক রেখায় পরিণত হইয়াছে। এই রেখার এক প্রান্তে ভায়োলেট বর্ণ, অপর প্রান্তে লোহিত বর্ণ। এইরূপ বিবিধ বর্ণ-বিশিষ্ট রেখা-সমষ্টিকে বর্ণরেখা (Spectrum) বলে।

বর্ণরেখা তিন প্রকারের। যে বর্ণরেখার একপ্রান্ত নীল এবং অপরপ্রান্ত লোহিত বর্ণের, তাহাকে 'অখণ্ড' বর্ণরেখা বলে। এই শ্রেণীর বর্ণরেখা ঘন পদার্থ, তরল পদার্থ ও ঘন বাষ্প হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল পদার্থ হইতে যে বর্ণরেখা উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণগুলির একটী এক অপরের সহিত ক্রমশঃ মিশ্রিত হইয়া যাইতে দেখা যায়। অগ্ন্যুজ্জ্বল তরল বাষ্পরাশি হইতে যে বর্ণরেখা নির্গত হইয়া থাকে, তাহা বর্ণরেখার বিভিন্ন অংশস্থিত কয়েকটি উজ্জ্বল রেখা সমষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত। এইগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণরেখা। প্রত্যেক রাসায়নিক পদার্থেরই বিশেষ বিশেষ বর্ণরেখা বর্ত্তমান। সুতরাং বর্ণরেখাস্থিত উজ্জ্বল রেখা-সাহায্যে যে পদার্থ হইতে আলোক নির্গত হইতেছে, তাহার রাসায়নিক উপাদান স্থির করা যাইতে পারে।

তৃতীয় প্রকারের বর্ণরেখা মধ্যে কয়েকটি কৃষ্ণরেখা বর্ত্তমান ; এবং এই কৃষ্ণরেখাগুলি দ্বারা সমগ্র বর্ণরেখাটি খণ্ডিত হইয়াছে দেখা যায়। যখন কোন দীপ্তিবিশিষ্ট পদার্থ-নির্গত আলোক অন্য কোন আলোক-শোষণকারী পদার্থ-মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তখন এই প্রকারের বর্ণ-রেখা উৎপন্ন হইয়া থাকে। শোষণ-ফলে যে-যে স্থলে পূর্ব্ব-পদার্থের উজ্জ্বল রেখা উৎপন্ন হইবার কথা, তত্তৎ স্থলে কৃষ্ণরেখা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বর্ণরেখাকে শোষণোৎপন্ন বা কৃষ্ণ রৈখিক বর্ণ-রেখা বলে।

সূর্য্য হইতে যে বর্ণরেখা উৎপন্ন হয় তাহা কৃষ্ণ-রৈখিক। সূর্য্য-মধ্যস্থ উত্তপ্ত অংশটুকু সান্দ্র বলিয়া অখণ্ড বর্ণরেখা উৎপাদন করিতে সমর্থ। কিন্তু সূর্য্য-মধ্যস্থ এই অংশটুকুর আলোক একটা বহিঃ স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া, এই স্তর কর্ত্তৃক কিয়ৎ পরিমাণ আলোক শোষিত হয়। ফলে, অখণ্ড বর্ণরেখা কৃষ্ণ-রৈখিক বর্ণরেখায় পরিণত হয়। বর্ণ-বিশ্লেষ-সাহায্যে বুঝিতে পারা যায় যে, ক্যাপেলা (ব্রহ্ম-হৃদয়) নামক কতকগুলি তারকার গঠনোপাদান ও সূর্য্যের গঠনোপাদান অভিন্ন।

নীহারিকা-নির্গত আলোক নিতান্ত ক্ষীণ ; এবং এই হেতু নৈহারিক আলোক বিশ্লেষণ করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। সে যাহা হউক, ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে হাগিন্স সাহেব সর্ব্ব প্রথমে একটি নীহারিকার আলোক বিশ্লেষণ করেন। ইহার বর্ণরেখা উজ্জ্বল রেখাবিশিষ্ট ছিল। সুতরাং এই শ্রেণীস্থ নীহারিকাগুলি যে জ্বলন্ত বাষ্পে পূর্ণ, তাহার আর কোন সন্দেহই রহিল না। লাপ্লাসেরও অনুমান তাহাই। হাগিন্স সাহেব আরও দেখান যে, খুব সম্ভবতঃ এই নীহারিকাগুলি নেবুলিয়াম, উদজান ও হেলিয়াম নামক তরল বাষ্পত্রয় দ্বারা রচিত। নেবুলিয়াম-বাষ্প নীহারিকা ব্যতীত অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না।

ইহার পরে যে সকল নৈহারিক-আলোক বিশ্লেষণ করা হয়, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, নীহারিকাগুলি মুখ্যতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীস্থ নীহারিকাপুঞ্জ নির্গত বর্ণরেখা অখণ্ড ও অতিশয় ক্ষীণ। এই বর্ণরেখা মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত বাষ্প তিনটির অস্তিত্ব-নির্দ্দেশক উজ্জ্বল রেখা বিদ্যমান। প্রায় শতাধিক নীহারিকা এই শ্রেণীর। ইহাদের মধ্যে অঙ্গুরীয়কের আকারবিশিষ্ট, গ্রহ সম্বন্ধীয় ও অনির্দ্দিষ্ট আকারের নীহারিকা বর্ত্তমান।

দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ নীহারিকার বর্ণরেখা কৃষ্ণরেখাবিশিষ্ট। বর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া বোধ হয়, ইহাদের গঠনোপাদান সূর্য্য শ্রেণীস্থ তারকাদির ন্যায়। বর্ণ-বীক্ষণিক পরীক্ষা-সাহায্যে এই শ্রেণীর নীহারিকা ও তারকাপুঞ্জের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না। অথচ উভয়ের গঠনোপাদান সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই শ্রেণীস্থ নীহারিকার সংখ্যা বড় অল্প নহে ; অন্তর্মদাস্থ নীহারিকা এই শ্রেণীভুক্ত। স্যার রবার্ট বল বলেন যে, আবর্ত্ত-নীহারিকাগুলি বাষ্প-গঠিত নহে। আবর্ত্ত-নীহারিকাগুলির বর্ণরেখা প্রায় অবিচ্ছিন্ন হয়। শোষণ-রেখার সংখ্যা অল্প। অতএব খুব সম্ভবতঃ নীহারিকাগুলিকে ঢাকিয়া একটা আচ্ছাদনী আছে। এই আচ্ছাদনী-মধ্যস্থ অংশ অতিশয় উষ্ণ। এই হিসাবে বলিতে হয় যে, ইহাদের গঠন সূর্য্য ও অন্যান্য তারকাসমূহেরই ন্যায়। উজ্জ্বল-রৈখিক, ক্ষীণ, অখণ্ড বর্ণরেখা সৃষ্টিকারী নীহারিকাগুলি ঠিক ইহার বিপরীত। অর্থাৎ অত্যুষ্ণ বাষ্পাবরণে আচ্ছাদিত। এই বাষ্পাবরণ শীতল হইলে সাধারণ নীহারিকাপুঞ্জেরই ন্যায় কৃষ্ণ-রৈখিক বর্ণরেখা উৎপাদন করিবে।

উজ্জ্বল-রৈখিক বর্ণরেখা-সৃষ্টিকারী নীহারিকা সম্বন্ধেও জ্যোতির্ব্বিদ-গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বর্ত্তমান। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ষ্টোন সাহেব দেখান যে, এই নীহারিকাগুলিও অবিচ্ছিন্ন বাষ্পাবরণী-বেষ্টিত তারকা-পুঞ্জ হইতে পারে। এবং এই অনুমান যে নিতান্ত ভিত্তিহীন, তাহা নহে। তারকাপুঞ্জগুলি পৃথিবী হইতে বহু দূরে ঘন-সন্নিবিষ্ট ভাবে বর্ত্তমান থাকিলেই, ইহাদের বাষ্পাবরণী-নির্গত আলোক-জন্য উজ্জ্বল-রৈখিক বর্ণরেখা উৎপন্ন হইত।

নানা পরস্পর-বিরুদ্ধ অনুমান বর্ত্তমান থাকিলেও, বোধ হয় ইহা বলা যাইতে পারে যে, উজ্জ্বল-রৈখিক বর্ণরেখা-উৎপাদনকারী নীহারিকাগুলি অত্যুজ্জ্বল বাষ্প-গঠিত। পরে শীতল হইলে এই নীহারিকাগুলি অনুজ্জ্বল আবরণ-বেষ্টিত ঘন জড় পিণ্ডে পরিণত হইতে পারে।

নৈহারিক অনুমান সম্বন্ধে এক প্রধান সমস্যার বিষয় এই যে, নীহারিকা-বাষ্পের ন্যায় অতি বিস্তারশীল পদার্থ (লর্ড কেলভিন বলেন, নৈহারিক বাষ্পের আপেক্ষিক ঘনত্ব '০০০০০১।' অর্থাৎ সমপরিমাণ বায়ুর ও জলের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র) কিরূপে এতাধিককাল স্বকীয় উত্তাপ-সাহায্যে উত্তপ্ত থাকিতে পারে?

অত্যুজ্জ্বল জড় পদার্থসমূহ কিরূপ শীঘ্র শীতল হইয়া যায়, তাহা কতকগুলি নবোদিত তারকার ক্ষণস্থায়ী জীবন হইতে দেখা যায়। এই শ্রেণীর তারকাগুলি মধ্যে-মধ্যে হঠাৎ উদিত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ-গণকে বেশ বিস্ময় বিহ্বল-করিয়া তোলে। হাভার্ডনিবাসী অধ্যাপক পিকারিং ১৯০১ অব্দে পার্সিয়ুথ নামক তারকাপুঞ্জের কিয়দংশের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। কিছু দিন পরে আকাশের ঠিক এই স্থানেই হঠাৎ একটি নূতন তারকা উদিত হইতে দেখা যায়। এই নবোদিত তারকাটি শীঘ্রই ঔজ্জ্বল্যে তৎস্থানবর্ত্তী অন্যান্য তারকা-গুলিকে পরাভূত করিয়া সর্ব্বোজ্জ্বল তারকা হইয়া দাঁড়াইল। ১৯০১ অব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী এই তারকাটি প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। এক সপ্তাহ পরে যখন ইহার আলোক বিশ্লেষণ করা হয়, তখন অত্যুজ্জ্বল বাষ্পের উপস্থিতি-নির্দেশকে উজ্জ্বল রেখাবলী দৃষ্ট হয়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে এই তারকাটি কোন রূপ স্ফোটন ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। জড়পিণ্ডস্থ জ্বলন্ত বাষ্পবেগে মুক্ত হওয়ায় তারকাটি জ্বলিয়া উঠে। যাহা হউক তারকাটি অচিরেই ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া আসিতে থাকে। মধ্যে-মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও উহা শীঘ্রই এরূপ হীনজ্যোতিঃ হইয়া দাঁড়াইল যে, সেটী আর দৃষ্টিগোচর হইত না। এই ঘটনার মূলে হয় ত দুইটি তাপহীন তারকার সংঘর্ষ বিদ্যমান। সংঘর্ষের ফলে তারকা-মধ্যস্থ বাষ্প ও সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ জ্বলিয়া উঠে; পরে জ্বলন-নিবৃত্তিসহ তারকাটি দৃষ্টি-বহির্ভূত হয়।

লকিয়ার সাহেব নৈহারিক পদার্থের দীর্ঘকালব্যাপী ঔজ্জ্বল্যের একটা কারণ নির্দ্দেশ করেন। সিকাগোনিবাসী চেম্বারলেন সাহেবের হস্তে তাঁহার এই অনুমান পরিমার্জ্জিত ও বিশদীকৃত হইয়া বেশ একটা মনোজ্ঞ রূপ ধারণ করে। তাঁহার অনুমান অনুসারে নীহারিকাগুলি অত্যুজ্জ্বল বাষ্প-রচিত নহে। নীহারিকাগুলি উল্কাস্রোত-গঠিত। মেঘহীন রাত্রিতে মাঝে-মাঝে এরূপ উল্কাপিণ্ডকে প্রায়ই জ্বলিয়া উঠিতে দেখা যায়। উল্কাপিণ্ডেরা স্বতঃ তাপহীন। কিন্তু বায়ুমণ্ডল মধ্য দিয়া ধরাতলে পতিত হইবার সময়ে বায়ুস্তরের সহিত সংঘর্ষিত হইয়া জ্বলিয়া উঠে। ঐকিক অনুমানানুসারে উল্কাস্রোতভুক্ত উল্কাপিণ্ডগুলি সংঘর্ষিত হইয়া তাপোৎপাদন করিতেছে। সংঘর্ষজনিত তাপের আধিক্যে উল্কাপিণ্ডগুলির কিয়দংশ উষ্ণ-বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়। এই বাষ্প অচিরেই ঘনীভূত হয়; কিন্তু নূতন সংঘর্ষ-ফলে নূতন বাষ্পোদ্গম হইতে থাকে। ফলে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত উল্কাস্রোত অত্যুজ্জ্বল অবস্থায় থাকে। সুতরাং নীহারিকাগুলির দীর্ঘকালব্যাপী ঔজ্জ্বল্যের এইরূপ একটা অনুমান নিতান্ত কষ্টকল্পিত নাও হইতে পারে।

ধূমকেতুর প্রকৃতির কথা বুঝাইবার জন্য ১৮৭৯ সালে অধ্যাপক টেট ও এইরূপ একটা অনুমান করেন। তাঁহার মতে ধূমকেতুগুলি অগণিত উল্কাপিণ্ডের সমষ্টি মাত্র। এই সমষ্টি মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের উল্কাপিণ্ড বর্ত্তমান। পথ অতিবাহনকালে পরস্পর সংঘর্ষিত হইয়া যেত তপ্ত হইতেছে। কিয়দংশ বাষ্পীভূত হইয়া গিয়া অত্যুজ্জ্বল বাষ্পাবরণে বিমণ্ডিত হইতেছে। অধ্যাপক গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একটা সাধারণ ধূমকেতু মধ্যে এতাধিক সংখ্যক উল্কাপিণ্ড বর্ত্তমান যে সেকেণ্ডে দশ লক্ষ বার সংঘর্ষিত হইলেও ধূমকেতুটি লক্ষ লক্ষ বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে। উপাদানীভূত উল্কাপিণ্ডগুলির পরস্পর সংঘর্ষণ ধূমকেতুর ঔজ্জ্বল্যের অসন্তোষজনক কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

লকিয়ার সাহেব তখনকার সময়ে যতটা সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণাদি সম্ভব তাহা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বৃহত্তর নক্ষত্রজগৎগুলিও এইরূপ উল্কাস্রোত গঠিত। উল্কাপিণ্ডগুলি আকাশের স্থানে স্থানে দল বাঁধিয়া বর্ত্তমান। এই দলগুলি ঘনীভূত হইয়া বিভিন্ন সৌর-জগতের সৃষ্টি করিয়াছে।

তবে রাসায়নিক উপাদান লইয়া এই উল্কার অনুমান সম্বন্ধে এক বিশেষ আপত্তি দৃষ্ট হয়। উল্কাপিণ্ডগুলি অবশ্য সান্দ্র পদার্থ এবং আকাশ মধ্য দিয়া গমন সময়ে এরূপ শীতল থাকে যে ধরাপতিত হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে উষ্ণই হয় না। কতকগুলি উল্কাপিণ্ড সৌরজগতে নূতন আসিয়াছে। কতকগুলি সৌরপরিবারভুক্ত এবং নিয়মিত কক্ষায় সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। চেম্বারলিন সাহেব এই উল্কা-পিণ্ডগুলিকে গ্রহাণু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কক্ষাগুলি গ্রহকক্ষার ন্যায় নহে। গ্রহগুলি যে সমতলে থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে ইহারা সেই সমতলের ঊর্দ্ধাধঃ ভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকে। উল্কাপিণ্ডগুলি যখন আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া চলিয়া যায় তখনই আমরা উল্কাপাত হইল বলিয়া থাকি। পৃথিবীর ভূবায়ু প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে ইহারা অদৃশ্য থাকে। পরে বায়ুস্তর মধ্যে সেকেণ্ডে আট হইতে সত্তর মাইল বেগে প্রবিষ্ট হইবার সময়ে

যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার ফলে উত্তাপের পরিমাণ এত অধিক হয় যে, উল্কাপিণ্ডটি জ্বলিয়া উঠে ও অগ্নিশিখাবৎ দেখাইতে থাকে।

উল্কাপিণ্ডগুলি সংখ্যায় অগণ্য। যে-কোন চন্দ্রহীন অন্ধকার রজনীতে আকাশের দিকে চাহিলে, ঘণ্টায় আট-দশটি করিয়া উল্কা-পিণ্ড পতিত হইতে দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, যন্ত্র সাহায্য না লইলেও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, এরূপ উল্কাপিণ্ড প্রত্যহ প্রায় দুই কোটি করিয়া ভূ-বায়ু মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায়। লকিয়ার সাহেবের গণনানুসারে ধরা-পতিত উল্কাপিণ্ডের সংখ্যা প্রায় ৪০,০০,০০০; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরতিশয় ক্ষুদ্র। সর্ষপাকার উল্কাপিণ্ড হইতে কয়েকশত মণ ভার বিশিষ্ট উল্কাপিণ্ড বর্ত্তমান আছে।

ধরা-পতিত উল্কাপিণ্ড প্রায়ই পাওয়া গিয়া থাকে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ উল্কাপিণ্ডগুলির সহিত একটা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ পাইয়া থাকেন। কতকগুলি উল্কাপিণ্ডকে আকাশ হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবার সময়েও দেখা গিয়াছে। ইহারা সকলেই পৃথিবীর উপাদানে নির্ম্মিত।

ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জ মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ধূমকেতু-গুলি যে এই অগণ্য উল্কাপিণ্ড-সমষ্টি দ্বারা গঠিত হইতে পারে, এইরূপ একটা অনুমান আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। বস্তুতঃ, উভয়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

ধূমকেতুর শীর্ষদেশে একটি ক্ষুদ্র ও প্রভাবিশিষ্ট জড়পিণ্ড বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে এই পিণ্ডের পশ্চাদ্ভাগ হইতে এক বৃহৎ শুভ্রোজ্জ্বল শিখা নির্গত হইতে দেখা যায়। কতক-গুলি ধূমকেতু সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; কারণ, সৌরজগতের গ্রহাদির আকর্ষণ-বিমুক্ত হইয়া পলায়ন করিবার তাহাদের উপায় নাই। অন্য কতকগুলি কোথা হইতে সৌরজগতে আসিয়া পড়ে, এবং সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আবার অনন্ত আকাশে চিরকালের জন্য কোথায় চলিয়া যায়। কোন-কোন ধূমকেতুকে আবার উল্কাস্রোতে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। বিয়েলার ধূমকেতুটি এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। ১৭৭২ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৫২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই ধূম-কেতুটি কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর অন্তর উদিত হইত। শেষবার যখন এই ধূমকেতুটি ফিরিয়া আসিল, তখন দেখা গেল, ধূমকেতুটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহার প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে ইহাকে আর দেখা গেল না। তৎপরিবর্ত্তে এক ঝাঁক উল্কাপিণ্ড আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠিক এই ভাবেই টেম্পেলের ধূমকেতুর পরিবর্ত্তে সৈংহিকের উল্কাবর্ষণ হইতে দেখা গিয়াছিল। এই উল্কাপিণ্ডগুলি সিংহ-রাশির নিকট দৃষ্ট হইয়া থাকে; এবং ইহাদিগকে প্রত্যেক ৩৩¼ বৎসর অন্তর ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে টাইরোল প্রদেশে একটি উল্কাখণ্ড পতিত হয়। এই উল্কাখণ্ডটি হেলির ধূমকেতু হইতে আসিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ডগুলির গঠনোপাদান যে একই, তাহা নিঃসন্দেহ। তবে ধূমকেতু হইতে আলোকোৎপত্তির যথার্থ কারণ যে কি, তাহা এখনও অনিশ্চিত। নীহারিকা-নির্গত আলোকের ন্যায় ধূম-কেতু-নির্গত আলোকও যে অগ্ন্যুজ্জ্বল বাষ্প-সম্ভূত না হইতে পারে, এমন নহে। কিন্তু ধূমকেতুর ন্যায় অতিবিস্তৃত পদার্থ যে কি প্রকারে এত অধিক কাল অত্যুষ্ণ থাকিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাহার পর, ধূমকেতুর পুচ্ছগুলি সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে, যেরূপ বেগে ধাবিত হইতে থাকে, তাহা এই অনুমান কল্পিত বেগ অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং এই ব্যাখ্যা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। তবে ধূমকেতু-পুচ্ছ নির্গত আলোকের একটি সম্ভবপর কারণ থাকিতে পারে। এই আলোক বিদ্যুৎ-সম্ভবও হইতে পারে। সৌর তাপ-বিকিরণ ফলে পুচ্ছস্থ জড়কণিকাগুলি তড়িদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হয় ও তাহা হইতে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইতে থাকে। হাগিন্স সাহেব বলেন, সঙ্কোচন-ক্রিয়া-ফলে তাপোৎপত্তি যে নিতান্ত অসম্ভব, তাহাও নহে।

ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জের উপকরণ একই, তাহা নিঃসন্দেহ। তবে নীহারিকাগুলি বাস্তবিকই উল্কার উপাদানে রচিত কি না, সে বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। উল্কাপিণ্ডের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উল্কাপিণ্ডে লৌহ, নিকেল, ম্যাগ্নেশিয়া, অঙ্গার ও কতিপয় অঙ্গার-যৌগিক পাওয়া যায়। কিন্তু নীহারিকার আলোক বিশ্লেষণ করিয়া এই সকল পদার্থের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। আলোক-বিশ্লেষণ-সাহায্যে উল্কাপিণ্ড মধ্যে যে-যে পদার্থের অস্তিত্ব নির্দ্ধারিত হয়, ভূপতিত উল্কাখণ্ড মধ্যে তৎসমুদায় পাওয়া গিয়া থাকে। আবার নৈহারিক আলোক বিশ্লেষণ করিয়া নেবুলিয়াম, হেলিয়াম ও উদযান বাষ্পের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, এবং ইহাদের অস্তিত্বসূচক রেখাবলীবিশিষ্ট বর্ণরেখা উৎপন্ন হয়। উল্কাপিণ্ডে এ সকল উপাদান বর্ত্তমান নাই। অতএব আলোক-বিশ্লেষণ-সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, নীহারিকা ও উল্কাপুঞ্জ একই উপাদানে রচিত নহে। তথাপি, এই যুক্তির উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। কারণ, দেখা গিয়াছে যে, ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জের উপাদান এক হইলেও, উহাদের বর্ণরেখা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার সাহায্যে যে কেবল আলোক-বিশ্লেষণ-প্রদত্ত সাক্ষ্যগুলির অসারত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, এরূপ নহে। উজ্জ্বল-রৈখিক বর্ণরেখা উৎপাদনকারী নীহারিকামাত্রেই যে অগ্ন্যুজ্জ্বল বাষ্প-গঠিত হইবে, এমন কোন কথা নাই।

অতএব ইহা সম্ভব যে, নীহারিকাগুলি অসংখ্য উল্কাপিণ্ড-সমবায়ে গঠিত। এবং এইরূপ একটি নীহারিকা হইতে আমাদের পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কিরূপে এতগুলি ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত উল্কা-পিণ্ড একত্র হইয়া দল বাঁধিল। আদৌ যদি এই সকল উল্কাপিণ্ড আকাশ ছাইয়া বর্ত্তমান ছিল, তবে এমন কি কারণ থাকিতে পারে, যাহার জন্য ইহারা একত্র হইয়া বৃহত্তর জড়পিণ্ডে পরিণত হয়? ইহাদের পূর্ব্বাধিকৃত স্থানই বা শূন্য থাকে কেন?

যে সকল উল্কাপিণ্ড একত্র হইয়া গ্রহাদি রচিত হয়, সেগুলি ইতস্ততঃ-ধাবমান উল্কাপিণ্ডদল নহে। যে সকল উল্কাপিণ্ড সৌর-জাগতিক ও নিয়ন্ত্রিত কক্ষায় ভ্রমণ করিয়া থাকে, সেই সকল উল্কাপিণ্ডই একত্র হইয়া গ্রহাদির সৃষ্টি করে। ইহার কারণ এই যে, ইতস্ততঃ-সঞ্চরমান উল্কাপিণ্ডগুলি এরূপ প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইতে থাকে যে, ইহাদের উপর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি কার্য্য করিবার জন্য বিশেষ একটা সুযোগও পায় না; অতি-বেগবশতঃ, সম-আয়তনবিশিষ্ট পদার্থ দ্বারা এরূপে আকৃষ্ট হইতে পারে না, যদ্দ্বারা ইহাদের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

নীহারিকাগুলি যে ইতস্ততঃ-ধাবমান উল্কাপিণ্ড-সমবায়ে রচিত, তদ্বিরুদ্ধে এক আপত্তি আছে। আকাশের অনন্ত বিস্তৃতির তুলনায় উল্কাপিণ্ডের আয়তন কল্পনাতীত রূপে ক্ষুদ্র। তারকা হইতে তারকান্তর মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে ঘন পদার্থ বর্ত্তমান, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আইসে না। দিবাভাগে দেখিতে পাওয়া যায় না এমন অল্প-পরিমাণ ধূম মেঘশূন্য রজনীতে যদি উপরে উঠে, তবে তন্মধ্য দিয়া তারকাগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। একখণ্ড পাতলা মেঘ উঠিলে তারকাগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়। অতএব আকাশস্থ জড় পদার্থ যে কত সূক্ষ্ম, তাহা সহজেই অনুমেয়। এক সময়ে পণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে, তারকাগুলি এইরূপ একটা সূক্ষ্ম আবরণের অস্তিত্ব জন্য ঐরূপ ঝিকমিক্ করিয়া থাকে। পরে এই ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভূ-বায়ুস্তরের ক্রিয়াবিশেষের জন্য এইরূপ হইয়া থাকে।

এই জন্য অধ্যাপক চেম্বারলেন বলেন, নীহারিকা সঙ্কুচিত হইয়া যখন গ্রহ-জগতের সৃষ্টি করিতে থাকে, তখন গ্রহগুলি নীহারিকায় গ্রহাণু হইতেই সৃষ্ট হয়। গ্রহাণুগুলি যে পথে পরিভ্রমণ করে, সেই পথ ধীরে-ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পরিবর্ত্তন ফলে এক গ্রহাণু অপর গ্রহাণু-কক্ষা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ফলে, গ্রহাণু-গণ পরস্পরের এরূপ সান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি-সাহায্যে ইহাদের পরস্পর মিলিত হইবার একটা সুযোগ উপস্থিত হয়।

উল্কার উপাদানগুলি ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইয়া পিণ্ড-সমষ্টিতে পরিণত হইতেছে। পিণ্ড-সমষ্টি হইতে গ্রহের সৃষ্টি হইতেছে। এই সকল গ্রহের গঠনোপাদান পৃথিবীর গঠনোপাদানেরই সদৃশ। পৃথিবীর সহিত একই সমতলে থাকিয়া একাভিমুখেই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

সুতরাং যে নীহারিকাপুঞ্জ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উল্কাপুঞ্জরূপে বর্ত্তমান ছিল, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এবং এই অনুমান প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি-সঙ্গত। কারণ, কতকগুলি নীহারিকা হইতে অবিচ্ছিন্ন বর্ণরেখা উৎপন্ন হয়। এই অখণ্ড বর্ণরেখা সান্দ্র অত্যুজ্জ্বল জড় পদার্থ বা ঘন বাষ্প হইতে নির্গত হয়। কয়েক জন বিশেষজ্ঞের মতে, এতদ্দ্বারা এই সকল নীহারিকার ঘনত্ব প্রমাণিত হইতেছে। অপেক্ষাকৃত আদিম নীহারিকাগুলি সম্ভবতঃ বাষ্পময়। কিন্তু এই সকল বাষ্পময় নীহারিকা ঘনীভূত হইয়া ল্যাপ্লাসীর অনুমানানুযায়ী গ্রহ-সৃজনকারী অঙ্গুরীয়কের সৃষ্টি করে নাই, ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ডসমূহের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই দুই অনুমানের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ল্যাপ্লাসের অনুমানানুসারে বাষ্পময় অঙ্গুরীয়কগুলি পিণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া গ্রহাদি সৃষ্টি করে; উল্কার অনুমানানুসারে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ড একত্র হইয়া গ্রহ রচনা করে।

সৌরজগৎ ধীরে-ধীরে সঙ্কুচিত হইতেছে; আয়তন-সঙ্কোচ-ফলে ঘন হইতে ঘনতর জড়পিণ্ডে পরিণত হইতেছে। কিন্তু আয়তন-সঙ্কোচেরও একটা সীমা আছে; এ সীমায় উপস্থিত হইলে, তদতিরিক্ত সঙ্কোচন অসম্ভব। এই সীমায় উপনীত হইলে সৌরজগৎ উত্তাপহীন হয়, এবং পরে তাহার ধ্বংস ঘটিয়া থাকে। জড়পিণ্ডাবশেষ সৌরজগৎ তখন তাপহীন, প্রভাহীন তারকা রূপে আকাশমার্গে ধাবিত হইতে থাকে। পথে অন্য কোন তাপহীন তারকার সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, তখন আবার তাপোৎপত্তি সম্ভব। সংঘর্ষ জন্য তারকায় জড় পদার্থ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। তখন আবার এই তাপহীন, প্রভাহীন তারকা দুইটি নীহারিকায় পরিণত হয়। এইরূপে নূতন করিয়া গ্রহ সৃষ্ট হইতে থাকে।

কোন সাক্ষাৎ সংঘাত ব্যতিরেকেও গ্রহ বা উল্কাপিণ্ডাদির চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাওয়া সম্ভব। এই প্রক্রিয়াকে রচ সাহেবের প্রদর্শিত (?) প্রক্রিয়া (Roche's Effect) বলা যায়। রচ সাহেব একজন ফরাসী গণিতবেত্তা ছিলেন; এবং ইনিই ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এইরূপ একটা ক্রিয়ার সম্ভাবনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহার বহু কাল পরে অধ্যাপক চেম্বারলেন কয়েকটি নীহারিকার প্রকৃতির ব্যাখ্যা-কালে এই প্রক্রিয়ার সাহায্য লয়েন। এই মত অনুসারে ধরাতল তন্মধ্যস্থ জড়োপাদান কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতেছে। এখন যদি অন্য একটি জড়পিণ্ড পৃথিবীর এরূপ ঊর্দ্ধে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, জড়পিণ্ডটির ঊর্দ্ধমুখী আকর্ষণ পৃথিবীর নিম্নমুখী আকর্ষণের সমতুল্য হয়, তবে পৃথিবী-মধ্যস্থ জলরাশি বাষ্পে পরিণত হইয়া গিয়া, অতি ভীষণ বেগ সহকারে ধরাবরণ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে। স্ফোটন-ক্রিয়ার প্রতিঘাত-ফলে পৃথিবী শতধা চূর্ণ হইয়া গিয়া আকাশ-মণ্ডলে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া যাইবে। খণ্ডগুলি যতই ফাট-বিশিষ্ট হউক না কেন, আকাশের শৈত্য জন্য আবার কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষুদ্রতর জড়পিণ্ডে পরিণত হইবে; কিন্তু পূর্ব্ব বিদারণ-চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিবে। অনেক উল্কাপিণ্ড-মধ্যে এইরূপ বিদারণ-চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। অধ্যাপক চেম্বারলেন উল্কাপিণ্ডগুলিকে বৃহত্তর জড়পিণ্ডের চূর্ণাবশেষ বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকেন। বৃহত্তর জড়পিণ্ডগুলি বিদারিত হইবার কারণ, জড়পিণ্ডগণের পরস্পর সান্নিধ্য (disruptive approach)।

দীনবন্ধুর নাট্য-সাহিত্য *

[শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়]

নাট্য-সাহিত্যের ক্রমোন্নতিসাধন বিষয়ে মধুসূদনের কার্য্য যেখানে শেষ হইয়াছিল, উহার পারম্পর্য্য রক্ষার জন্ম দীনবন্ধুর কার্য্যও ঠিক সেই-খানেই আরম্ভ হইয়াছিল। কেবলমাত্র বান্ধবানুরোধের বশবর্ত্তী হইয়াই মধুসূদন তাঁহার শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে প্রাচীন ভাব বা রুচি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; নতুবা, প্রথম হইতেই কৃষ্ণকুমারীর স্থায় নাটক প্রণয়নে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। কৃষ্ণকুমারী প্রকাশিত হইবার পর মধুসূদনের আন্তরিক ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল বটে; কিন্তু কি কারণে জানি না, ইহাই তাঁহার শেষ নাটক-রচনা। যদিও মায়াকানন নামে আর একখানি অসম্পূর্ণ নাটক তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রতিভার ছায়া স্পর্শ করে নাই। কৃষ্ণকুমারীর সময় হইতেই মধুসূদনের প্রতিভা ভিন্ন মার্গে ভ্রমণ করিতেছিল; এবং সেই পথেই তাঁহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি বিকাশ পাইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যই সেই প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। দীনবন্ধু কিন্তু প্রথম হইতেই নির্ভীক ভাবে তাঁহার দৃশ্যকাব্যগুলিকে আধুনিক রীতির গঠন দিয়াছিলেন। মধুসূদনের স্থায় আরম্ভ হইতেই ভীতি-ভাব তাঁহার ছিল না। তবে এই নির্ভীকতা মধুসূদনের সাহসিকতার ফলে উৎপন্ন বলিয়াই মনে হয়।

দীনবন্ধুই সামাজিক নাটকের স্রষ্টা

দীনবন্ধু তাঁহার নাটকগুলির উপাদান সামাজিক ব্যাপার হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে কোন নাট্যকারই নাটকের মধ্যে সামাজিক ব্যাপারের অবতারণা করেন নাই। বিদ্যাসুন্দরে সামাজিক প্রসঙ্গ থাকিলেও, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে; কারণ, বিদ্যাসুন্দর মৌলিক নাটক নহে,—অভিনয়ার্থ বিদ্যাসুন্দর-কাব্য নাটকে নীত হইয়াছিল মাত্র। রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্ব্বস্বও সামাজিক ব্যাপারাশ্রিত হইয়া রচিত হইয়াছিল; কিন্তু নাটক লিখিবার আধুনিক রীত্যনুসারে গঠিত না হওয়ায়, উহাকে বর্ত্তমান কালের সামাজিক নাটক-পর্য্যায়ের মধ্যে গণ্য করা যায় না। অধিকন্তু, উহা নাটক নামে অভিহিত হইলেও, উহাতে প্রহসনের ভাব অধিক পরিস্ফুট ছিল। মধুসূদনের প্রহসনদ্বয়েও সামাজিক ব্যাপারের আশ্রয় ছিল। কিন্তু উহা আমাদের লক্ষ্যের বহির্ভূত বিষয়,—কারণ, প্রহসনের উপাদান সামাজিক ঘটনার উপরই নির্ভর করে। সামাজিক ঘটনা ব্যতিরেকে প্রহসন সৃষ্ট হয় না। সুতরাং দীনবন্ধুই বর্ত্তমান কালের সামাজিক নাটকের স্রষ্টা ছিলেন বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না।

নীলদর্পণ

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক নীলদর্পণ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর শনিবারে কলিকাতার যোড়াসাঁকোর ৺মধুসূদন সান্যালের বাটীতে ন্যাশানাল থিয়েটার কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কৌলিন্য-প্রথার অপচার-ফলে বঙ্গ-সমাজ কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল,—রামনারায়ণ যেরূপ তাহার চিত্র তাঁহার কুলীনকুলসর্ব্বস্বে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন, দীনবন্ধুও সেইরূপ নীলকর-প্রপীড়িত বঙ্গ-সমাজের চিত্র নীলদর্পণে প্রতিবিম্বিত করেন। নীলকরদিগের অত্যাচার প্রদর্শনই এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং আমরা দেখিতে পাই, সে উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিয়াছে। নাটকের মধ্যে গ্রামের সামান্য জমীদার হইতে রাইয়তগণের আর্ত্তনাদ দৃশ্যে দৃশ্যে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে; এবং প্রজাবৃন্দের সেই আর্ত্তনাদ যে নীলকর-দিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করে নাই, এ কথা বলা অসঙ্গত; কারণ, যখনই সেই আর্ত্তনাদ তাহাদের শ্রুতিপথে আসিয়াছে, তখনি তাহারা আরও অধিক উদ্ধত হইয়া নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সংঘর্ষ-কৌশলে অত্যাচারই ফুটিয়াছিল। নাট্যকার যে সুদক্ষ মনস্তাত্ত্বিকের স্থায় এ বিষয় সম্পাদনে সফল-মনোরথ হইয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া এই অত্যাচার সংঘটিত হইতেছিল, সেই অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতের চিত্রগুলি কিরূপ হইয়াছে, তাহার আলোচনার পূর্ব্বে, যে নাট্য-গৃহমধ্যে ঐ চিত্রগুলি স্থান পাইয়াছিল, সেই গৃহ সম্বন্ধে আলোচনা সর্ব্বাগ্রেই হওয়া কর্ত্তব্য। আধার উপযুক্ত না হইলে, আধেয় তাহাতে আশ্রয় পায় না; সুতরাং আধারই প্রথম আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

যদিও য়ুরোপীয় romantic নাটকের আদর্শে নীলদর্পণ রচিত হইয়াছিল, তথাপি classical নাটকের প্রকৃতি অনুযায়ী ইহাতে ক্রিয়ার, সময়ের এবং স্থানের ঐক্য (Unity of action, time and place) সুরক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়। দীনবন্ধু এই সকল বিষয়ে, জ্ঞাতসারে হউক, বা অজ্ঞাতসারে হউক, classical নাট্যকারদিগের পথানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকসমূহ ইংরেজ-দিগের romantic নাটকের অনুকরণে প্রণীত হইতেছে। সেইজন্য, সময় বা স্থানের ঐক্যের দিকে গ্রীক নাট্যকারদিগের স্থায় বাঙ্গালী নাট্যকারগণের তাদৃশ প্রখর দৃষ্টি নাই। কিন্তু দৃষ্টির প্রাখর্য্য না থাকিলেও, ঐ ত্রিবিধ ঐক্যগুলিকে একেবারে উপেক্ষা করিবারও ক্ষমতা তাঁহাদিগের নাই। কারণ, আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ঐক্য সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক আলঙ্কারিকদিগের ধারণার তুলনায়, বর্ত্তমানকালের ধারণার তারতম্য দাঁড়াইলেও, ঐগুলি উপেক্ষিত হয় নাই। এবং ঐ তারতম্য স্থায্য কি অস্থায্য, তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে, একটা বিষয় মনে রাখা উচিত যে, কতকগুলি নাট্যালঙ্কার দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে-সঙ্গে বদলাইয়া যায়। কিন্তু এমন কতকগুলি অলঙ্কার

---

* বর্ত্তমান প্রবন্ধটী সাহিত্য-সভার গত কার্ত্তিক মাসের অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

আছে, যেগুলি সর্ব্বকালীন এবং সার্ব্বজনীন। সেগুলি দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্ত্তনেও পরিবর্ত্তিত হয় না। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ঐক্য এই জাতীয় অলঙ্কার। Romantic নাটকে ইহাদিগের বিষয়গত পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। যাহা কিছু পরিবর্ত্তন বলিয়া লক্ষিত হয়, তাহা মত-গত,—বিষয়গত নহে। নাটকে ঐ ত্রিবিধ ঐক্য অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়াই, আমরা উহাদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি; এবং নীলদর্পণ নাটকে উহাদিগের সমতা কিরূপ কৌশলে রক্ষিত হইয়াছে, তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

ক্রিয়ার ঐক্য (unity of action)—নাটকে এটী অতি আবশ্যক ব্যাপার; কারণ, ইহার উপরই নাট্যসৌধ নির্ম্মিত হয়। এই ভিত্তি ঐক্যশূন্য হইলে তাসের ঘরের মত নাট্যসৌধ আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। নাটকের একটী প্রধান ক্রিয়ার সহিত নাট্যমধ্যস্থিত অপর ক্রিয়াগুলির, এমন কি, বিপরীত ক্রিয়ারও, পরস্পর-সাপেক্ষ সম্বন্ধ-সংস্থাপনাকেই নাট্য-ক্রিয়ার ঐক্য সম্পাদন কহে। প্রাচীন গ্রীক আলঙ্কারিকদিগের সময়ে নাটকের ক্রিয়া জটিল ছিল না; কোন একটী ক্রিয়া লইয়াই নাটক রচিত হইত। এখন কিন্তু সেরূপ হয় না। ক্রিয়া বহুমুখী হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য গ্রীক মতানুযায়ী হইতে হইলে, আধুনিক নাটকের প্রয়োজন-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। এখন বিস্তৃত বিষয়কে বজায় রাখিয়া ক্রিয়ার ঐক্য সম্পাদিত হয়। আধুনিক নাট্যকার কিরূপ কৌশলে এই ঐক্য সম্পাদন করেন, Schlegel সাহেব তাঁহার নাট্যসাহিত্য (Dramatic Literature) নামক গ্রন্থে উপমার দ্বারা তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।(১) তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এই—যেমন, প্রকৃতি-রাজ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী পৃথক স্থানে এবং পৃথক অবস্থায় উৎপত্তি লাভ করিয়া, স্ব-স্ব গন্তব্য পথে বিচরণ করিতে-করিতে, উপযুক্ত অবসরে পরস্পর মিলিত হইয়া যায়, এবং পরে যেমন সেই সম্মিলিত বারিপ্রবাহ বেগবতী স্রোতস্বতীর মূর্ত্তি ধরিয়া, নানারূপ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক জলধির ক্রোড়ে যাইয়াই বিশ্রাম-সুখ লাভ করে,—নাট্যকারও সেইরূপ মানবের কতকগুলি চেষ্টা ও হৃদবৃত্তি-প্রণোদিত ক্রিয়াকলাপ, উপনদীর ন্যায় কিছুক্ষণের জন্য পৃথক-গতিশীল রাখিয়া, অবশেষে মূল ক্রিয়ারূপ প্রবল নদীর সহিত তাহাদিগের অদ্ভুত মিলন ঘটাইয়া দেন। নাট্য-কবি এই সকল কার্য্য কৌশলের সহিত সম্পন্ন করিয়া, তাঁহার দৃশ্যকাব্যের দর্শককে এমন একটী অবস্থায় উন্নীত করেন, যেখানে ঐ উপনদীগুলির গতি আর পৃথক ভাবে পরিলক্ষিত হয় না,—কেবল একটী প্রবল নদীপ্রবাহ-মাত্র তাঁহার নয়ন-পথে ভাসিতে থাকে (অর্থাৎ, দর্শক নাটকের মূল ক্রিয়ার মোহে এতদূর মুগ্ধ হইয়া যান যে, কতকগুলি পৃথক অসমাপিকা ক্রিয়া—যেগুলি কার্য্য-কারণ-সূত্রে মূল ক্রিয়ার সহিত যোগ দিয়াছিল,—তাহাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যান)। পুনরায় যদি এরূপ হয় যে, ঐ বেগবান নদীপ্রবাহ-রূপ মূল ক্রিয়া ঘটনার আতিশয্যে নানা শাখা-প্রশাখায় বহুমুখী হইয়া, সাগর-সঙ্গম-রূপ উদ্দেশ্য-সিদ্ধি লাভ করে, তাহা হইলে উহাদিগকেও কি সেই এক ক্রিয়াই বলিব না? নিশ্চয় বলিব।

নীলদর্পণে ক্রিয়ার ঐক্য পূর্ব্বোক্ত ভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে। স্বরপুর গ্রামের এক অবস্থাপন্ন বসু-পরিবার নীলকরদিগের অত্যাচারে কিরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল,—এই মূল ক্রিয়ার সহিত, রাইয়তগণের হাহাকার-রূপ দ্বিতীয় ক্রিয়ার, এবং বেগুনবেড়ের ইংরেজ নীলকর ও তাহাদিগের দেশীয় কর্ম্মচারিবর্গের প্রতিকূল ব্যবহার-রূপ তৃতীয় ক্রিয়ার এইরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় রক্ষিত হইয়াছিল যে, উহাদিগের সংমিশ্রণে বৈষম্য উৎপাদিত না হইয়া, মূল ক্রিয়ার পরিপোষক রূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, উহাদিগের ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছে।

সময়ের ঐক্য (unity of time)—বাস্তব-জগতে ২৪ ঘণ্টায় দিন হয়। কোন একদিবসব্যাপী নাটকীয় ক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত বাস্তব সময়ের হিসাবে সম্পন্ন করিতে হইলে, কেবলমাত্র ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে অনুষ্ঠেয় নাটকের ক্ষুদ্র অবয়বে তাহার স্থান-সঙ্কুলান হয় না। তখন বাস্তব সময় পরিত্যাগ করিয়া একটা কাল্পনিক সময়ের আশ্রয় লইতে হয়; এবং সেই কাল্পনিক সময় অনুপাত অঙ্কে বাস্তব সময়ের যত নিকটবর্ত্তী হইবে, সময়ের ঐক্যও তত সুন্দরভাবে রক্ষিত হইয়া যায়। এই অনুপাতে কাল্পনিক ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সম্পাদ্য ক্রিয়ার সহিত নাট্যাভিনয়ের ৩।৪ ঘণ্টাকালের প্রকৃত সময়ের যতটা অধিক সম্বন্ধ, কাল্পনিক ২৪ বৎসরের সহিত তদনুপাত-সম্পন্ন প্রকৃত সময়ের ততটা দূর সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। ২৪শের সহিত ৪০০০এর অপেক্ষা, ২৪শের সহিত তিনের অনুপাত সর্ব্বসময়েই নিকটতর। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নাট্য-ক্রিয়ার কাল্পনিক সময় বাস্তব জীবনের প্রকৃত সময়ের অনুপাতে যত অধিক নিকটবর্ত্তী হয়, নাটকও তত স্বভাবসঙ্গত হইয়া থাকে; এবং সময়ের ঐক্যও তদনুপাতে রক্ষিত হয়। গ্রীক আলঙ্কারিক Aristotleএর ধারণা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। তাঁহার মতে,

---

(১) It is a mighty stream, which on its impetuous course overcomes many obstructions, and loses itself at last in the repose of the ocean. It springs perhaps from different sources and certainly receives into itself other rivers, which hasten towards it from opposite regions. Why should not the poet be allowed to carry on several, and, for a while, independent streams of human passions and endeavours, down to the moment of their raging junction, if only he can place the spectator on an eminence from whence he may overlook the whole of their courses? And if this great and swollen body of waters again divide into several branches, and pour itself into the sea by several mouths, is it not still one and the same stream?—Schlegel's *Dramatic Literature.*

নাটকের ক্রিয়া ২৪ ঘণ্টা পরিমিত সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া চাই। তৎকাল-প্রচলিত নাটকগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে এই নিয়ম অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, সেগুলি বহু-ক্রিয়ান্বিত ছিল. না, সুতরাং ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদিগের সমাধান অনায়াসেই হইতে পারিত। এখন কিন্তু উক্ত নিয়ম খাটে না। আধুনিক নাটক-সকল বহু-কর্ম্মান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন ক্রিয়া-বাহুল্যের অনুপাতে সময় বহুত্বও দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অনুপাতগুলি পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে হইলেই ঐক্য বজায় থাকে। নাটকান্তর্গত যে সকল সময়ের ব্যবধান বা উল্লঙ্ঘন আছে, সেগুলি দৃশ্যের মধ্যে না দেখাইয়া অঙ্কের ব্যবধানের মধ্যে দেখাইতে হয়।

সময়ের ঐক্যের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, নীল-দর্পণের গল্পাংশ বিংশ দিবসে সম্পাদিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম অঙ্ক তিন দিবসে (দ্বিতীয় দিবস বিশ্রামের দিন বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে; কারণ, সে দিবসে কোন ক্রিয়ার উল্লেখ দেখা যায় না), দ্বিতীয় অঙ্ক ১ দিবসে, তৃতীয় অঙ্ক ২ দিবসে, চতুর্থ অঙ্ক ৬ দিবসে (এই ছয় দিবসের মধ্যে অষ্টম, নবম, দশম এবং একাদশ দিবস নিষ্ক্রিয় ছিল) এবং চারিদিন বিশ্রামের পর অবশিষ্ট চারি দিবসে পঞ্চমাঙ্কের বিষয় সম্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং সময়ের ঐক্য সুরক্ষিত হইয়াছে। ইংরেজি দৃশ্যকাব্যকে আদর্শ করিলেও, সময়ের ঐক্যতার বিষয়ে শিশু নাট্যসাহিত্য উহাদের মত স্বাধীন হইতে সাহসী হয় নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অঙ্ক মধ্যে সময়ের ব্যবধান বাঞ্ছনীয় হইলেও, দৃশ্য মধ্যে উহার ব্যবধান তত শোভনীয় নহে। দীনবন্ধু চতুর্থ অঙ্কে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু Schlegel সাহেবের মত প্রামাণ্য স্বরূপ গ্রহণ করিলে, এই ব্যতিক্রমও দোষাবহ হয় না। তাঁহার মতে, ২টী বা ততোঽধিক আবশ্যক ঘটনার মধ্যে বহুদিনের ব্যবধান থাকিলেও, তাহাদিগের পরস্পরের মিলন কেমন আপনা হইতেই হইয়া যায়। তখন কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী অনাবশ্যক ঘটনার উল্লঙ্ঘনের কথা মনে থাকে না। সাধারণের অবগতির জন্য তাঁহার মন্তব্য পাদ টীকায় উদ্ধৃত করিতেছি। (২)

'মানব-দেহ-যন্ত্র যেরূপ জ্যোতিষ্কের সময়োচিত গতিবিধির দ্বারা পরিচালিত হয়, মন কিন্তু সেরূপ ভাবে হয় না। মনের নিজের গতি-বিধির একটা স্বতন্ত্র নিয়ম আছে। সেটা মানবের ক্রমোন্নতি-সাধনের জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের পরিমাপে অনেক অলস কার্য্য-পরম্পরা অলক্ষ্যে অতিবাহিত হইয়া যায়। দুইটী অত্যাবশ্যক ক্রিয়া বহু বৎসরের ব্যবধানে সম্পাদিত হইলেও, তাহাদের পরস্পরের মিলন কেমন আপনা হইতেই হইয়া যায়। যেমন, আমরা নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে কোন এক বিষয়ে যদি গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন হই, তাহা হইলে নিদ্রান্তেও আমাদের মনে সেই চিন্তাসূত্র জাগরিত থাকে। তখন নিদ্রারূপ এই দীর্ঘ ব্যবধানের কোন অস্তিত্বই অনুভূতি হয় না। সেইরূপ, নাটকের মধ্যেও আমাদিগের কল্পনা অনেক অল্প-সম্পর্কিত বিষয় লঙ্ঘন করে; কারণ, সেগুলি পরিত্যাগ করিলে গ্রন্থের অঙ্গহানি হইল বলিয়া বিবেচনা করে না। নাটক কেবলমাত্র মহার্ঘ মুহূর্ত্তের উপরে আপনার ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং সেই ক্রিয়ার গাঢ়তায় এতদূর আকৃষ্ট হইয়া যায় যে অনেক অলস মুহূর্ত্ত বা দিন উহার চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া থাকে'। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের দ্বারা বিচার করিলে নীলদর্পণের চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্যান্তর্গত চারিদিনের সামান্য উল্লঙ্ঘন গণনায় মধ্যেই আসে না। সুতরাং দীনবন্ধু সময়ের সমতাও সুন্দররূপে রক্ষা করিয়াছিলেন।

স্থানের ঐক্য (unity of place)—সময়ের ন্যায় স্থানেরও একটা আসল এবং কাল্পনিক ভেদ আছে। আসল স্থান হইল সেই স্থান যেখানে নাটক অভিনীত হয়; এবং কাল্পনিক স্থান হইল সেই বাটী, সহর এবং দেশ—যে বাটী, সহর এবং দেশে নাটকের ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন সেই আসল স্থানের উপর দুই বা ততোঽধিক কাল্পনিক স্থানের প্রদর্শন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, যদি সেই প্রদর্শিত স্থানগুলি পরে-পরে দেখান হয়; এবং তৎসঙ্গে দর্শকের কল্পনা, নাটকের ভাষা এবং দৃশ্যপটের সাহচর্য্য বিদ্যমান থাকে। মানুষের কল্পনা বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইলে, একটা বাটীর দুইটী কক্ষ বা সেই গ্রামের দুইটী বাটী দেখা অনায়াস সাধ্য বলিয়াই অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে না। কিন্তু একটী দেশের মধ্যে দুইটী দূরবর্ত্তী নগর বা একটী মহাদেশের মধ্যে দুইটী দূরতর প্রদেশ দেখা আয়াস-সাধ্য বলিয়াই অনিচ্ছুক হইবে; কারণ,

---

(২) Our body is subjected to external astronomical time, because the organical operations are regulated by it, but our mind has its own ideal time, which is no other but the consciousness of the progressive development of our beings. In this measure of time the intervals of an indifferent inactivity pass for nothing, and two important moments, though they lie years apart link themselves immediately to each other. Thus, when we have been intensely engaged with any matter before we fell asleep, we often resume the very same train of thought the instant we awake, and the intervening dreams vanish into their unsubstantial obscurity. It is the same with dramatic exhibition. Our imagination overleaps with ease the times which are presupposed and intimated but which are omitted because nothing important takes place in them, it dwells solely on the decisive moments placed before it, by the compression of which the poet gives wings to the lazy course of days and hours."
—Schlegel's *Dramatic Literature.*

মানুষ দেখিয়াছে যে, বাস্তব-জগতে ঘর, বাটী, নগর এবং দেশের পরস্পর নৈকট্য বিদ্যমান আছে ; এবং সেইজন্ত নাট্যাভিনয়ের অল্প সময়ের মধ্যে একটী স্থান হইতে অপর একটী স্থানে যাইতে, অথবা নাট্য-ক্রিয়া একস্থান হইতে অপর স্থানে সম্পাদিত করিতে হইলে, পরস্পরের সান্নিধ্য-হেতু ঐক্য নষ্ট হয় না। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকে একই অঙ্কে কখন বা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের, কখন বা বহু-দূরবর্ত্তী স্থানের পাশপাশি সংযোগ দেখা যায়। কিন্তু এটী সময়ের অনুপাতে না হইলে দোষণীয় হইয়া উঠে। গল্পাংশের প্রকৃতি, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের গুণ-স্বভাব এবং ঘটনার বৈচিত্র্য অনুসারে নাট্যক্রিয়ার সময় নির্দ্ধারিত হয় এবং স্থানও সেই সময়ের অনুপাতে হওয়া চাই। প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের স্থানের ঐক্য সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে, —যে স্থানে বা দৃশ্যে নাটক আরব্ধ হইয়াছিল সেই স্থানে বা দৃশ্যে বাকী অংশটুকুও শেষ হওয়া উচিত ; কারণ, যে স্থানে ইহা অভিনীত হইতেছে, তাহা সেই একই স্থান ; সুতরাং তাহাকে বহু অথবা পৃথক বিবেচনা করা অন্যায়। আমাদিগের রত্নাবলীকার প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মত মান্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটিকা-বর্ণিত বিষয় নায়কের পুষ্প-বাটিকা, উদ্যান এবং রাজান্তঃপুর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন আর তাহা হয় না ; কারণ, নাটকের ক্রিয়া বহু-বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে দৃশ্যপটের সাহায্যে যদিও একই প্রকৃত স্থানে বিভিন্ন কাল্পনিক স্থানের কল্পনা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি সেগুলি পরস্পর যত নিকটবর্ত্তী থাকে, তত সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মায়, এবং তাহাতেই সময়ের ঐক্য সুন্দররূপে বজায় থাকে। Dryden সাহেব সময় ও স্থানের ঐক্য উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন (৩) "একখানি ২½ ফিট পরিমিত দর্পণের উপর যেরূপ একটী গৃহের, গৃহজাত দ্রব্যের এবং গৃহান্তর্গত মানবের প্রতিকৃতি একেবারে প্রতিবিম্বিত হয়, অথচ ইহার অভ্যন্তরে সেইগুলি থাকে না, নাটকেও সেইরূপ বাস্তব জীবনের বহুবিস্তৃত স্থান ও ক্রিয়ার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, অথচ তাহারা সেই অল্প আয়তনের মধ্যে থাকে না। দীনবন্ধু এই ভাবেই স্থানের সমতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকের মধ্যে এক চতুর্থাঙ্ক ছাড়া অপর সমস্ত অঙ্কের সংযোগ-স্থল স্বরপুর গ্রামের গোলোকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক, দরদালান, শয়নঘর, প্রতিবাসী সাধুচরণের বাটী এবং কেগুণবেড়ের সাহেবদের কুঠি ও কামরার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং পরিপ্রেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে এক স্বরপুর গ্রামেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ তিনটী স্থান প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র। চতুর্থাঙ্কে যদিও ইন্দ্রাবাদের কাছারী এবং জেলখানা দেখান হইয়াছে বটে,—তাহাও একটী পৃথক অন্তঃবেষ্টনীর মধ্যে ; সুতরাং, দীনবন্ধু স্থানের ঐক্য সুন্দররূপেই বজায় রাখিয়াছেন।

নীলদর্পণের রসবিকার

নায়ক, পীঠমর্দ্দ এবং প্রতিনায়কাদির চেষ্টা ও ব্যবহার দ্বারা নাটকের মধ্যে যে ধ্বনি উত্থিত হয় তাহাই নাটকের রস। কারণ রসের পৃথক রূপ নাই। নাটকের যাবতীয় অনুষ্ঠানই সেই রস-নামাঙ্কিত ধ্বনিরই উদ্বোধক। সুতরাং প্রথমেই নাট্য-বর্ণিত রসের বিচার করিয়া, তৎপরে সেই রসাশ্রিত চরিত্রাবলীর আলোচনা করিব।

নায়ক, প্রতিনায়কাদির চেষ্টা ও ব্যবহার হইতে জানা গিয়াছে যে, নীলদর্পণ একখানি করুণ-রসাত্মক নাটক। সাহিত্য-দর্পণকার করুণ রসের লক্ষণ দিয়াছেন—

> "ইষ্টনাশাদনিষ্টাপ্তেঃ করুণাখ্যো রসো ভবেৎ।
> ধীরৈ কপোতবর্ণোঽয়ং কথিতো যম দৈবতঃ ॥
> শোকোঽত্র স্থায়িভাবঃ স্যাচ্ছোক্যমালম্বনং মতম্।
> তস্য দাহাদিকাবস্থা ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ ॥
> অনুভাবা দৈবনিন্দা ভূপাত ক্রন্দিতাদয়।
> বৈবর্ণ্যোচ্ছাস নিশ্বাস স্তম্ভ প্রলপনানি চ ॥
> নির্ব্বেদমোহাপস্মার ব্যাধিগ্লানি স্মৃতিশ্রমাঃ।
> বিষাদজড়তোন্মাদ চিন্তাদ্যো ব্যভিচারিণঃ ॥"

নীলকরদিগের অত্যাচারে বসুপরিবারের যে অনিষ্টপাত হইয়াছিল, তাহাই এখানে করুণাখ্য রস হইয়াছে। বসুপরিবারের মৃত্যুজনিত শোকপরম্পরা এই রসের স্থায়িভাব। নায়ক-পক্ষে—গোলোক বসু, নবীনমাধব, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি এবং প্রতিনায়ক-পক্ষে- উড্, রোগ, আমীন এবং দেওয়ান ইহার আলম্বন-বিভাব। নায়ক-পক্ষে—গোলোক-বসুর অপমান ও জেল, নবীনমাধবের অপমান ও সাংঘাতিক আঘাত, ক্ষেত্রমণির লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত প্রভৃতি এবং প্রতিনায়ক-পক্ষে—তাহাদিগের ঐ সকলের উদ্দীপক কার্য্যপ্রণালী ইহার উদ্দীপন-বিভাব। শোকরূপ স্থায়িভাবের কার্য্য-পরম্পরা এখানে অনুভাব হইয়াছে ; যথা—গোলোক বসুর অপমৃত্যু শ্রবণে এবং নবীনমাধবের সাংঘাতিক আঘাত দর্শনে বসুপরিবারের মধ্যে যে অদৃষ্ট-ধিক্কার, ভূপতন, ক্রন্দন, দীর্ঘনিশ্বাস, বিবর্ণতা প্রভৃতি জন্মিয়াছিল, তাহাই এখানে অনুভাব হইয়াছে ; এবং তাহাদের বিয়োগজনিত যে নির্ব্বেদ, মোহ, অপস্মার, ব্যাধি, গ্লানি, স্মৃতিভ্রম, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ প্রভৃতি লক্ষণ বসু-পরিবারের মধ্যে লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই ব্যভিচারি ভাব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নীলদর্পণ সর্ব্বতোভাবেই করুণ-রসাত্মক নাটক হইয়াছে।

এক্ষণে উক্ত রসের পরিপাক কিরূপে হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করিতেছি। পরিপাকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে, Aristotleএর মতানুযায়ী নীলদর্পণকে Protasis, Epitasis, Catastasis, এবং Catastrophe নামক চারি অংশে বিভক্ত করিতে

(৩) "As in a glass or mirror of half a yard diameter, a whole room and many persons in it may be seen at once; not that it can comprehend that room or those persons, but that it represents them to the sight." —Dryden's Essay on the Defence of Dramatic Poesy.

হইবে। মানবদেহ মধ্যে ভুক্ত দ্রব্য যেরূপ পৃথক্-পৃথক্ যন্ত্রের ভিতর দিয়া অবস্থান্তরক্রমে পরিপাক হইয়া যায়, নাটকের রসও সেইরূপ পৃথক্ অংশের ভিতর দিয়া অবস্থান্তরিত হইয়া পরিপকতা লাভ করে। এক্ষণে দেখা যাউক, কিরূপে এই রস পরিপকতা লাভ করিয়াছে।

প্রথম Protasis (or entrance) বা প্রবেশ।—সমস্ত নাটকের মধ্যে যে ক্রিয়া প্রদর্শিত হইবে তাহার অঙ্কুর মাত্র এই অংশে দেখা যায়। নীলকরদিগের অত্যাচার আরম্ভ হওয়ায়, যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া করুণ-রস ফুটিবে, সেই নায়ক এবং তাঁহার পীঠমর্দ্দের মনস্তাপ প্রভৃতি প্রথম অঙ্কে প্রকাশ পাইয়া, নাটকের অবতরণিকার রসের সূচনা মাত্র করিয়াছে।

দ্বিতীয় Epitasis বা ক্রিয়ার আরম্ভ।—এই অংশে মামুলি অত্যাচারের উপর, নায়কের পিতার বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগের ষড়যন্ত্ররূপ নূতন বিপদের আশঙ্কায়, নাটকের পাত্রপাত্রীগণ আরও শঙ্কিত হইয়াছেন। যে গোলোক বসুর অপমৃত্যুর পর হইতে নায়কের উৎসাহ-উদ্যম নৈরাশ্যে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহারই অপমৃত্যুর কারণভূত ফৌজদারী অভিযোগের ষড়যন্ত্র নাটকের এই দ্বিতীয় অবস্থায় প্রকাশ পাইয়া রসকে আরও একটু পাকাইয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কই এই সকলের অনুষ্ঠান ভূমি।

তৃতীয় Catastasis বা ক্রিয়ার পরিণতি।—নাটকের এই তৃতীয় অবস্থায় ক্ষেত্রমণির উপর প্রাণঘাতী অত্যাচার, গোলোক বসুর জেলখানায় অপমৃত্যু প্রভৃতি ঘটনায় রস বেশ মজিয়া উঠিয়াছে। কেবলমাত্র নায়কের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তখনও পর্য্যন্ত নিরূপিত না হওয়ায়, নাট্যক্রিয়া চতুর্থ অবস্থার প্রতীক্ষায় সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই; নতুবা, রসের প্রগাঢ়তা এই অবস্থাতেই চূড়ান্ত হইয়াছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ অঙ্ক নাটকের এই তৃতীয় অবস্থার ক্রীড়াভূমি।

চতুর্থ—Catastrophe বা ক্রিয়ার আবিষ্কার বা অর্থানুভূতি।—নাটকের প্রথম অবস্থায় ক্রিয়ার সূচনার সময় ক্রিয়ার অর্থানুভূতি বা আবিষ্কার বিষয়ে যে কৌতূহল জন্মে, ক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, নাট্যক্রিয়া যখন জটিল হইয়া উঠে, তখন সেই কৌতূহলের মাত্রাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চতুর্থ অবস্থায় উপনীত হইলে, নাট্যক্রিয়ার অর্থানুভূতি বা আবিষ্ক্রিয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই কৌতূহলও নিবারিত হয়; এবং দর্শক তাহাতেই তৃপ্তিলাভ করেন। নীলদর্পণের প্রথম অবস্থায় যে রসের অবতারণা হইয়াছিল, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সেই রস আরও ঘনীভূত হইয়া চতুর্থ অবস্থায় পৌঁছিলে, নায়ক এবং তাঁহার পরিজনবর্গের মৃত্যুরূপ ঘটনায় সেই রসের পরিণতি হইয়াছিল। প্রথম অবস্থায় রসের গতি সম্বন্ধে দর্শকের মনে যে আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূহল ছিল, নায়কের মৃত্যুর সহিত তাহা নিবৃত্ত হইয়াছে; এবং ক্রিয়া অনন্যাপেক্ষী থাকায় নাটকও সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেহযন্ত্রের পর্য্যায়ক্রমের ন্যায় উপর্য্যুক্ত পর্য্যায়ক্রমের ভিতর দিয়া নাট্যরস ক্রমে-ক্রমে অবস্থান্তরিত হইয়া সুন্দররূপে পরিপকতা লাভ করিয়াছে।

আমরা প্রথমে নীলদর্পণের বাহ্যিক অবয়ব এবং তাহার গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিয়াছি। তার পর তাহার প্রাণস্বরূপ অবতারণাপূর্ব্বক নাটকের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিয়াছি। অতঃপর, সেই প্রাণভূত রস সমূর্ত্ত হইয়া কি-কি চরিত্রে বিকাশ পাইয়াছে, বারান্তরে তাহার আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(১৯)

মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর পর অরবিন্দর মা কাশীবাস করিবার জন্য জেদ ধরিয়াছিলেন। প্রচণ্ড শোকের আঘাত তাঁহার একমাত্র পুত্রের মমতাবন্ধনও যেন শিথিল করিয়া দিয়াছিল। এ ছাড়া, চিরদিনের ঘর-সংসারে তাঁহার বীতস্পৃহ হওয়ায় আরও একটা নিগূঢ় কারণ হয় ত বা ভিতরে-ভিতরে বর্ত্তমান ছিল। মায়েরা সব সহিতে পারেন; কিন্তু নিজের সন্তানের—বিশেষ, যাঁদের একটিমাত্র ছেলে, তাঁহারা সেই পুত্রের—বধূর চরণ-পদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বসা একেবারেই সহ্য করিতে পারেন না। তা' মুখে তিনি এ-লইয়া একটুও উচ্চবাচ্য না করুন,—মন তাঁহার ভিতরে-ভিতরে, এ সন্দেহ ধরিয়া, তিক্ত হইয়া উঠিবেই। ব্রজরাণীর শাশুড়ীর সহিত ব্যবহারকে হঠাৎ দুর্ব্যবহার আখ্যা দেওয়া চলে না বটে, কিন্তু উহাকে বেশ সমুচিত ব্যবহার' বলিবারও কোন হেতু নাই। বরাবরই তাহার ধরণটা খুব মোলায়েম নয়। শ্বশুরের ভয়ে বাহিরে

সে সংযম রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল ; সে ভয় ঘুচিবামাত্র হঠাৎ সে স্বাধীন হইয়া উঠিল ; এবং এমন কি, কেহ বলিয়া না দিলেও, সে আপনা হইতে এ-বাড়ীর গৃহিণীপনায় অধিকার-টাকেও যেন দিন-কয়েকের ভিতরেই নিজের আয়ত্তের মধ্যে টানিয়া আনিয়া ফেলিল। ইচ্ছা হইলে সহিসকে ডাকিয়া, ঘরের গাড়ী জুতাইয়া, সে বাপের বাড়ী চলিয়া যায় ; শাশুড়ীকে কোন দিন যাইবার কালে বলিয়া যায়,—কোন দিন তাও যায় না। বাপের বাড়ীর আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করা সে শাশুড়ীর অনুমতি-সাপেক্ষ মনেও করে না। বাড়ীর ক্রিয়া-কলাপে কি ব্যবস্থা হইবে, কি না,—সে-সব বন্দোবস্ত এখন শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সে নিজেই করে। ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া, শাশুড়ীর সমবয়সী কুটুম্বিনী, প্রতি-বেশিনী—সবার সঙ্গেই কথা কয়,—চাকর-বাকরের সঙ্গে তো কহেই। ছেলে দেখিয়াও দেখে না, বারণ করে না।

শাশুড়ীকে সেবা-যত্ন,—তা' এমন বিশেষ করিয়া কিছুই করিবার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার পুরাতন দাসী কদম সকল কাজ ছাড়িয়া তাঁহার কাজগুলি সযত্নে সম্পন্ন করিত। পান, জল, গামছা, কাপড় হাতে-হাতে জোগাইত,—সন্ধ্যায় পদ-সেবা করিত,—সবই করিত। রাঁধিয়া দিবার জন্য আশ্রিতা আত্মীয়ারও এ বাড়ীতে অভাব ছিল না। তবে সব সত্ত্বেও, ঘরের বধূর যেটুকু অবশ্য-করণীয়, সেইটুকু না পাইলেই, মনের মধ্যে হাজারও দাবী করিতে না চাহিলেও, স্বতঃই একটুখানি অভিমানের বেদনা জাগিতে চায়। শরৎ সর্ব্বদা মাকে দেখিতে আসিত। সে আসিলে বধূ এদিকের সীমানা হইতে সযত্নে অপসৃতা হইয়া যাইতেন। ননদের গাড়ী একদিক দিয়া বাড়ী ঢুকিল, আর তাঁহার গাড়ী আর একদিক দিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। যদি বা দৈবাৎ কখন বাড়ী রহিয়া গেলেন, তো, নিজের ঘরে বই লইয়া, সেলাই লইয়া, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া রহিলেন। দেখা হইলে, দুজনেরই মুখ একটুখানি ভারী-ভারী হইয়া গেল ; হয় ত কোন দিন কেহ একটা কুশল প্রশ্ন করিলেন ; অপরা তার, যত দূর সংক্ষেপে পারা যায়, জবাব দিলেন ; নয় ত কোন প্রশ্নোত্তর হইল না,—দুজন দুদিকে চলিয়া গেলেন। প্রথম বছরেই পূজার কাপড় কেনা নূতন গৃহিণী নিজের হাতে লইয়া বসিল। তাঁতিনী নানারকম সাড়ী-ধুতী যোগাইয়া দেয়। অন্তবারে গৃহিণীর সাক্ষাতে মেয়েদের পছন্দে সে সব কেনা হয়। এবার তাঁতিনী সেই অভ্যাসবশতঃই গৃহিণীর মহলোদ্দেশে যাইতেছিল ;—পথ হইতে দেখিতে পাইয়া, ব্রজরাণী তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া বলিল, "কি কাপড় এনেছ দেখি না তাঁতি-পিসি,—নিয়েই এসো না একবার।" "এই যে যাই বউমা, যাই" বলিয়া তাঁতিকন্যা বিরাট মোট নামাইয়া বসিয়া গেল ; এবং একেবারে তাহার সব কাপড়গুলিই প্রায় নিঃশেষে ব্রজর ঘরে ঢালিয়া দিয়া ক্ষণকাল পরে যখন উঠিয়া গেল, তখন এইটুকু অভিজ্ঞতা সে লাভ করিয়া গেল যে, এখন হইতে ইহারই সহিত তাহাকে কারবার করিতে হইবে ;—এই সে দিনের ঘোমটা-দেওয়া নোলক-পরা মেয়েটিই এখন এই এতবড় বৃহৎ সংসারের সর্ব্বময়ী গৃহিণী। তা' ইহার জন্য ইহাদের কিছুই আসিয়া যায় না—যে-কেহ হোক তাহাদের একজন ক্রেতা থাকা লইয়া কথা। বিশেষ, প্রবীণা এবং বিধবার অপেক্ষা, নবীনা এবং সধবা ক্রেতা হিসাবে যথেষ্ট ভাল। অরবিন্দ ঘরে ঢুকিয়াই বিস্মিত স্মিত মুখে কহিয়া উঠিল, "এ কি! বড়বাজারের সমস্ত দোকান যে উজাড় করে ফেলেছ! এত সাড়ী পরবে ক'বছরে শুনি?" নূতন গৃহিণী ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিলেন, "সব বুঝি আমিই পরবো,—পূজোর সময় সব্বাইকে দিতে হবে না বুঝি?" "সে সব মা-ই তো ফি' বছর কিনে থাকেন, না? এ বছর যে তুমি কিনচো?" "তিনি ঘুমুচ্ছিলেন তাই আমিই কিনলুম,—তাতে কি কিছু দোষ হয়েছে?" অরবিন্দের স্বরে বিস্ময় ও তরুণ পত্নীর কণ্ঠে অসন্তোষ ব্যক্ত হইল। "না, তা' আর এমন দোষ কি!" বলিয়াই অরবিন্দ প্রস্থান করিল। দ্বিতীয় দিন তাঁতিনী আসিয়া একেবারেই "কই গো বউমা" বলিয়া ব্রজরাণীর ঘরেই দেখা দিল। সেদিন ঊষা সেখানে ছিল। ব্রজ যেন তাঁতিনীকে দেখিতেই পায় নাই, এমন করিয়াই রহিল। ঊষা বলিল, "কাপড় দেখবে না কি?" "আমি! কেন?" বলিয়া ব্রজ আলস্য ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়া, মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল, "যাক্ না মায়ের ঘরে।" তাঁতিনী একটুখানি অবাক্ হইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল ; এবং অল্পক্ষণ পরেই তদপেক্ষা অধিকতর অবাক্ মুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বৌদিদি বল্লেন, 'আমি আর ওসবে নেই,—বউমাকে গিয়ে বলগে যাও, তিনিই দেখে শুনে নেবেন'।" "আমি পারবো না" বলিয়া,

মুখ ভার করিয়া, ব্রজ আবার শুইয়া পড়িয়া,—একখানা বই পড়িয়া ছিল,—সেইখানা তুলিয়া লইতেছিল,—ঊষা ছোঁ মারিয়া সেখানা তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া, ধাক্কা দিয়া তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "নে'—নে, আর অত করে দর বাড়াতে হবে না! মা দেখবেন না, উনি দেখবেন না—তা'হলে কি বাড়ীর কাজ কম্ম সব পণ্ড হবে না কি? মাকেই কি আর চার-কাল ধরে সবই করতে হবে? এখন যদি না-ই পারেন? ও পিসি, তুমিই বা অমন সংয়ের মতন দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাছা! কি আছে, বার করে দেখাও-টেখাও তো!"

পুজার কাপড় বরাবর যে হিসাবে কেনা হয়, এবারও ঠিক সেই হিসাবেই কেনা হইয়াছিল। বরং, সংসারের অতবড় আয় কমিলে, সকল বিষয়েই যেমন ব্যয়-সংক্ষেপ হইবার কথা, এবং কিছু-কিছু করাও হইয়াছে,—এটায় সে রকম না করিয়া ব্যয়-বৃদ্ধিই হইয়া গিয়াছে। ফলে কিন্তু সকলেই বেশ খুসী হইল না! ষষ্ঠীর দিন সবাই নূতন কাপড় পরিল, শরৎ পরিল না। কেহ-কেহ অনুযোগ করিলে, চোখ মুছিয়া সে জবাব দিল, "মা পরবেন না,—কি আমার সুখের বছর, যে, সাজতে বসে যাব। যাদের সুখ বেড়েছে, তারাই সাজুক।" কথাটা কাণে উঠিলেও, ব্রজ ঠোঁট কামড়াইয়া চুপ করিয়া রহিল। এই ননদটিকে সে মনে-মনে দেখিতে না পারিলেও, যথেষ্ট ভয় করে,—সাধ্যপক্ষে জবাব করে না।

ভাইফোঁটার উদ্যোগটা ঊষার চেয়ে শরতই ভালরকম করিত। ছোটবেলা হইতেই এ বিষয়ে তাহার একটা ঝোঁক ছিল। এবারও ভাইফোঁটার আগের দিন সে ছেলেমেয়ে সব-সমেত বাপের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াই দেখিল, বাড়ীর সরকার মহাশয় এক গাদা পেটা ধুতী একটা চাকরের ঘাড়ে চাপাইয়া অন্দর-মহলে ঢুকিতেছেন। জিজ্ঞাসায় জানা গেল, সে সকল বধূর ফরমায়েস—তাঁহার ভাইদের ভাইফোঁটায় খরচ হইবে। শরৎ বলিয়া বসিল, কাপড়গুলা সে দেখিবে; এবং দেখা হইয়া গেলে, উহার মধ্য হইতে বাছা-বাছা কয়েকখানা সে কিনিয়া লইল। বউয়ের সাত-বছরের ভাইয়ের জন্য যে সিল্কের পাঞ্জাবি আনা হইয়াছিল, সেটাও সে কিনিয়া লইল। সরকার বিধুভূষণ একটু ত্রস্ত হইয়া বলিয়া ফেলিল, "পাঞ্জাবিটে দিদি, ফরমাস দিয়ে করান যে—আর যদি অমনটি না পাওয়া যায়!"

শরৎ একটু ঝাঁঝিয়া কহিল, "কলকেতা সহরে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি আবার না কি কিনতে পাওয়া যাবে না! তোমার যেমন কথা সরকার মশাই!"

বিধুভূষণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে জবাব দিল, "যাবে না কেন দিদি, যাবে বই কি! তবে কি না, ঠিক্ ওম্‌নিটি কি আর—" ক্রীত বস্ত্রগুলা এক সঙ্গে জড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাড়াইয়া, বিরক্ত স্বরে শরৎ কহিল, "ঠিক্ ওম্‌নিটি না পাওয়া গেলেই যে মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যাবে, তেমনও কিছু তাতে লেখা নেই! অত ঘাবড়াবার দরকার নেই। আমার বিশেষ দরকার, যাও, কিছু বলে তো বলো, আমি নিয়েছি,—এবার না হয়, তার ভাইয়ের অন্য রকমই হলো। আর যদি না-ই হয়, তা'তেই বা এত ক্ষতি কি? এই পূজার সময় তো সেদিন বোনেদের সব নানারকম হয়েছে,—ভাইরা বেটাছেলে, কিছু যদি কমই পরে।"

সরকার আর দ্বিরুক্তি করিতে ভরসা না করিয়া, নিঃশব্দে সরিয়া পড়িলেন। বড়দিদির মুখখানিকে ভয়, এবং তাহার সহৃদয়তাকে ভক্তি—এ বাড়ীতে সকলেই করে।

কথাগুলা সরকার না বলিলেও, কাহার মুখ দিয়া কেমন করিয়া ব্রজর কাণে উঠিল। কাপড় পছন্দ নয় বলিয়া সে ফেরৎ দিল; এবং অসুখ করিয়াছে বলিয়া শুইয়া থাকিয়া, সারাদিনে সে ভাইফোঁটার কোন উদ্যোগেই যোগ দিল না। অরবিন্দ বাড়ী আসিলে, রাগিয়া কাঁদিয়া, তাহার উপর ঝাল মিটাইয়া, তার পর সকালে উঠিয়া, নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় বিশ্বের উপর বিরক্তিভরা চিত্তে আবার নূতন করিয়া আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ভাইয়েদের নিমন্ত্রণ করা হইয়া গিয়াছে,—ভাইফোঁটা বন্ধ করিয়া পাছে তাহাদের অকল্যাণ করিয়া ফেলে, এ ভয় পূর্ণমাত্রায় মনে বর্ত্তমান। নতুবা, এত সহজে এত বড় অপমানটাকে সে হজম করিতে রাজী হইত না।

সকালবেলা ফোঁটা দিবার জন্য গাড়ী গিয়া ঊষাকে লইয়া আসিল! শরতের ফোঁটা দেওয়া তখন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ঊষা বাকি বলিয়া অরবিন্দ জল খাইতে পায় নাই। বেলা হইয়া গিয়াছিল। ঊষা আসিয়াই ব্রজরাণীর সঙ্গে কি,

কথাবার্ত্তা কহিয়া, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ভাঁড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল। অনেক ডাকাডাকিতে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলে, অরবিন্দ একটু রাগ করিয়াই বলিল, "কিরে উষি, তোর যে আর ফোঁটা দেবার ফুরসৎই হয় না রে! ভাই যদি ক্ষিধের চোটে মরেই যায় তো, ফোঁটা আর দিবি কাকে?" উষা চন্দনের বাটি হাতে লইয়া ইহার জবাব দিল, "কি করবো বাবু,—এসে দেখি, এত বেলা হয়ে গেছে,—এখনও বউ বেচারির ভাইফোঁটার খাবার দাবার কিছুই গোছান হয়ে ওঠেনি,—অথচ তার ভাইরাও ত এখনি এল বলে,—তাই ক্ষিরের ছাঁচগুলো তুলে দিচ্ছিলাম।" ফোঁটা পরিতে-পরিতে ভাই কহিলেন, "কেনই বা হয়নি? যাঁর ভাইরা ক্ষিরের ছাঁচ খাবেন, তিনি ওসব করে রাখ্তে পারেন না? নিজের ভাইকে শুকিয়ে মেরে তোমায় ছুট্তে হয় পরের ভাইয়ের ভাইফোঁটার তত্ত্ব সাজাতে!"

উষা ফোঁটা দেওয়ার শেষে, ভাইয়ের বরণোদ্দেশে মাটির উপর দুম্ করিয়া একটা অসন্তোষে ভরা প্রণাম ঠুকিয়া দিয়া, ঝাঁকের সঙ্গে জবাব দিল, "আমাদের অত ছোট মন নয় বাবু,—ভাই আবার ওর তার কি? সব্বার ভাইই সমান। নিজের টুকুই সব, আর কারু কিছুই নয়—এ রকম আত্মগরজে হতে পারলে বোধ করি ভালই হ'তো। তা আমি আর হ'তে পারিনে।" "তাহ না কি রে উষি,—সবার ভাই না কি সমান! তা বেশ-বেশ্—এই বয়সে তুই তবু ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে পড়েছিস্ আহা! সব্ব ভূতে সম জ্ঞান হয়েছে তোর—বৈকুণ্ঠ অক্ষয় হোক্ তোর ভাই! আমরা না হয় ছোট মন নিয়ে নরকেই পচে মরবো।" "কি গো দাদা! তোমার জলখাবার ফুরসৎ হবে না না কি আজ! এদিকে বারটা যে বাজে!" এই বলিয়া শরৎশশী ঘরে ঢুকিয়া ভাইয়ের সামনে ফল ও মিষ্টান্ন বোঝাই খান-দুই রেকাব ধরিয়া দিল। উষার-দেওয়া থালাটার দিকে না চাহিয়াই, অরবিন্দ সদ্য-প্রাপ্ত আহার্য্যগুলা তৎক্ষণাৎ গো-গ্রাসে উদরস্থ করণে লাগিয়া পড়িল। উষা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বারেক দিদির দিকে চাহিয়াই, সেখান হইতে সরোষ পদক্ষেপে নিজের বিরক্তি জ্ঞাপন করিতে-করিতে তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল। কলহ-বিদায় অপটুত্বের জন্যই যে সে ভঙ্গ দিয়া পলাইল, এমন নহে; আসিবার কালে সখী—ব্রজরাণী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিল যে, ফোঁটা দেওয়া হইয়া গেলেই সে যেন ফিরিয়া আইসে,—নতুবা তাহার ভাইদের মিষ্টান্নের থালায় খিরের ছাঁচ ও চন্দ্রপুলিগুলি সাজাইয়া দেওয়া অসম্ভব হইবে।

(২০)

অরবিন্দর তিনজন শালা ভাইফোঁটা লইয়া আহারে বসিলে, অরবিন্দের খোঁজ হইল। নিমন্ত্রিতগণ হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে—নিমন্ত্রকের অপেক্ষায় তাহারা খাইতে পারিতেছে না। অরবিন্দ উঠিতেছিল,—শরৎ আসিয়া ডাকিল, "দাদা, খেতে চল।"—"তাই তো যাচ্চি রে" বলিয়া অরবিন্দ চটির মধ্যে পা গলাইয়া দিয়া, সেটাকে টানিয়া লইয়াই, ঘর হইতে বাহির হইতেছিল,—শরৎ হাঁ—হাঁ করিয়া উঠিয়া বলিল, "ওদিকে কেন,—মার দালানে তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে যে!" অরবিন্দ আসিয়া দেখিল, মাত্র তাহার একার আসন দেওয়া রহিয়াছে,—একজনেরই খাবার সাজান। সে বলিল, "কি রে শরতা, ওদের ঠাঁই কোথা?" "ওদের ওদের বোনের ঘরে,—তুমি খেতে বসো না গো—বেলা কি এখনও হয়নি?" অরবিন্দ একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, "ওরা একলা খাবে, আমার না হয়—" "ও গো ওদের ভাবনায় মাথা ঘোরাবার আজকের দিনে তোমার দরকার নেই। ওদের নিয়ে বারমাসের তের পার্ব্বণ—সব ক'টাই করো না,—কেউ তো বারণ করচে না! বচ্ছরের মধ্যে এই একটা দিন বইতো না,—এটায় না হয় বড় কুটুমদের বাদই দিলে!"

আর দ্বিরুক্তি পর্য্যন্ত না করিয়াই, দিদির শাসনে সন্ত্রস্ত সুবোধ ছোট-ভাইটির মতই, অরু ঈষৎ হাসিয়া নিঃশব্দে খাইতে বসিয়া গেল। পাশের ঘরেই ব্রজরাণী শ্বাশুড়ীর ভাঁড়ারে ভাইয়েদের জন্য পাতিলেবু লইতে আসিয়াছিল,—ভাই বোনের কথাবার্ত্তাগুলা সবই সেখান হইতে শুনিল, এবং রাগে আগুন হইয়া চলিয়া গেল।

সবার যখন খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়াছে,—উষা, ব্রজরাণী ও ব্রজর অল্পবয়সী দুটি ভাই ব্রজর ঘরে তাস খেলিতে বসিয়াছে। অরবিন্দ কিসের একটা দরকারে সে ঘরে ঢুকিয়া ইতস্ততঃ চাবি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে,—তখন একটা কাপড়-দিয়া-সেলাই-করা পার্শেল হাতে করিয়া শরৎ সেখানে দেখা দিল। "দাদা! কই দাদা এখানে এসেছিল না?"

"কিরে শরু!"

"তোমার শিলমোহরটা একবার দাও দেখি। পাঠাতে দিলুম, তা, সরকার বাবু বলে পাঠালেন যে, মোহরের ছাপ ভাল পড়েনি,—পোষ্টাফিসে ও নেবে না। বাড়ী ফিরে গিয়ে পাঠাতে গেলে আবার একদিন দেরি হয়ে যাবে,— দাও দেখি তোমারটা, ভাল করে করে দিই।"

ইতোমধ্যে এই নারীটির অতর্কিত ও অনাহূত আগমনে এ সমাজে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যে ব্রজরাণী ঘোমটা দেওয়াটাকে অসভ্যতা বোধে সেটাকে সম্পূর্ণ রূপেই বর্জ্জন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল,—পুরাতন সরকার মহাশয় প্রভৃতি বাহিরের পুরুষদের শুদ্ধ দেখিয়াও ঘোমটা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিত না,—তাহা অপেক্ষা বছর চারেকের মাত্র বড় ননদকে দেখিয়া স্বামীর সান্নিধ্য স্মরণে সে নিজের অপ্রসন্ন মুখের উপর খানিকটা কাপড়ের আবরণ টানিয়া দিল। অর্দ্ধশয়ানা উষা অসন্তোষ-পূর্ণ চিত্তে উঠিয়া বসিল; এবং এমন কি, তাহাদের খেলার সাথী বালকদ্বয়ও সকলকে ত্রস্ত ব্যস্ত দেখিয়া, নিজেরাও কারণ ব্যতিরেকে হাসি-খুসী বন্ধ করিয়া গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিল।

অরবিন্দ হাত বাড়াইয়া শরতের হাত হইতে পার্শেলটা লইতে গিয়া বলিল, "দে,—আমি সব ঠিকঠাক করে পাঠিয়ে দিচ্চি—"

কিন্তু পার্শেলের উপরকার লেখাগুলার উপরে নজর পড়িবামাত্র তাহার সেই বাড়ান হাতখানা ঠিক তেমনি ভরই রহিয়া গেল। যেন ঐখান হইতে সেই কালো কালির কয়টা অক্ষর, কৃষ্ণকায় কাল-সর্পের মূর্ত্তি ধরিয়া, তাহার সেই হাতখানায় সজোরে একটা ছোবল মারিয়াছিল—ঠিক তেমনি ভর বিষ-জর্জ্জর, কালিমাড়া মুখে সে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। অথচ কিসের যেন একটা প্রচণ্ড আগুনের শিখা তাহার বুকের মধ্যে ধূমাইত হইয়া উঠিয়া, তাহার ধ্বক্‌ধ্বকে চোখ-দুটাকে সেই কালো রংয়ের সাপটার দিকেই পলক-হীন করিয়া রাখিল। কালো সাপের গায়ের আঁকগুলায় যেন এমনিধারা একটা কথা লেখা ছিল,—"পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অজিতকুমার বসু চিরঞ্জীবেষু—"

ঘরের লোকেরাও পার্শেলের সে বাংলা অক্ষরের মোটা হেডিং লেখা কয়টা পড়িয়াছিল। উহা পাঠান্তে ব্রজরাণী ঘোমটার ফাঁকে ননদের দিকে যে দৃষ্টিতে চাহিল, তাহাতে কেনই যে শরৎ ভস্ম হইয়া গেল না, সে কথা বলা কঠিন। উষা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হাতের তাস ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। অকালে খেলা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ক্ষুব্ধ হইয়া, ব্রজরাণীর ছোট ভাই ডাকিয়া বলিল, "উষাদি, এখান চলে যাচ্চ যে? আর খেলবে না?" "না,—থাকগে, আজ বড্ড মাথা ধরেছে" বলিয়াই উষা দুম দুম করিয়া পা ফেলিয়া, অন্ধকার মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

"কিগো দাদা! এইটুকু উপকার আর তোমাদের বাড়ী থেকে পাওয়া যাবে না? বেশ, তা না হয় গাড়াটাই খুঁজিয়ে দাও আমি তালতলায় চলে যাচ্চি; সেখান থেকেই না হয় শীলটিল করিয়ে নিয়ে পাঠাব। এই করতে-করতে, দেখ না, কতো দেরিই হয়ে গেল। আজকের দিনে বাছা আমার নতুন কাপড়খানা পরতেও পেলে না।"

শরৎ চলিয়া গেল। ঘরের লোক কয়জন তাহার পিছনেও অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটাইয়া দিল। কতক্ষণ পরে চঞ্চল বালক দুটি তাস লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে, অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া সেগুলা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল। বড়টি ছোট ভাইকে বলিল, "চল্, তাহলে ডোমিনো খেলিগে। দিদি, তুমি ডোমিনো খেলবে?" ব্রজরাণীর মুখে যে ঘোমটা টানা ছিল; সে কথা এখন পর্য্যন্ত তাহার স্মরণেই ছিল না; এখন সচকিতে জাগিয়া উঠিয়া জবাব দিল, "না, আমি খেলবো না—তোরা দু'জনে খেলগে না।" —এই বলিয়া স্বামীর দিকে বারেক অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিয়াই, একটা তাকিয়া বালিস টানিয়া লইয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল।

"আপনি খেলবেন জামাই বাবু? আসুন না।"

অরবিন্দ মুখ ফিরাইল, "কি সন্তু?" "ডোমিনো খেলবেন?" "ডোমিনো? না।" "আচ্ছা, ডোমিনো না হয়, যা আপনার ইচ্ছে—রিডাসি হোক, ব্লাক্ট্রে হোক, বিন্তি, গোলাম-চোর কি যা হোক। দিদিমণি, তুমিও খেলবে এসো না ভাই, লক্ষিটি!"

অরবিন্দ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তোমরা খেল ভাই। আমি কি অত রকম সব খেলতেই জানি? আমি না,—তোমার দিদিমণিকে ধরো,—ও খুব খেলতে ভালবাসে।"

স্বামীকে গমনোন্মুখ দেখিয়া, ব্রজরাণী কি মনে করিয়া, হঠাৎ যেন স্প্রীংয়ের মত ছিটকাইয়া উঠিয়া পড়িল, এবং

কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা, তোমার বোন যখন-তখন আমায় অপমান করতে আসে কেন বলো তো ?"

অরবিন্দ চলিতে-চলিতে দ্বার-সমীপস্থ হইয়া জবাব দিল, "তার জবাবদিহি কর্ব্বার কথা আমার নয়,—তাকেই জিজ্ঞেস করো।" "আমি কারু সঙ্গে সেধে-সেধে ঝগড়া বাধাতে যাইনে। আমি এই কথা তোমাকেই জিজ্ঞেস করচি,—নিজেদের প্রতিজ্ঞা ভুলে তাঁদের সঙ্গে এই যে সব আত্মীয়তা-কুটুম্বিতা চল্‌চে,—তা' এ সব আমার বা আমার ভাইদের মুখের উপর অপমান না করেও তো অনায়াসে চল্‌তে পারে! অতটুকু ভদ্রতাও কি আর তোমাদের কাছ থেকে আমরা আশা করতে পারিনে ? এই কথাটার জবাব দাও দেখি !" দ্বারের কপাটে দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করিয়াই অরবিন্দ কহিল, "আবার আমায় নিয়ে পড়লে কেন ?" "তোমার এতে প্রশ্রয় নেই, তুমি বল্‌তে পার ?" অরবিন্দ জবাব না দিয়া দ্বার খুলিল। "কই, জবাব দিতে পারলে কি ? ওগো! আমিও চাষার ঘর থেকে আসিনি,—আমারও বাপ মাথা খাটিয়ে দু'চার লাখ টাকা ঘরে এনেচেন। পূজার সময় সেই কাপড় পাঠান,—আবার আজকের এই এ-সবের মধ্যে তোমার সহানুভূতি,—শুধু সহানুভূতি কেন, তোমার সম্পূর্ণ প্রশ্রয় নেই, তুমি বল্‌তে চাও ?" খোলা দ্বারের মধ্যে একটা পা বাড়াইয়া অরু জবাব করিল, "আমি তোমার মত পাগলকে কিছুই বল্‌তে চাইনে।" "শোন চলে যেও না—সত্যি বল্‌ছি তোমায়—তোমাদের আমি যদি এমন গলগ্রহই হয়ে থাকি, যদি আমায় তাড়াবার জন্যই ছুতা খুঁজ্‌চো এই হয়,—এই আজই আমি সতু-নিতুর সঙ্গে ভবানীপুরে চলে যাচ্চি,—আমারও রোজ-রোজ এমনধারা অপমান হওয়া সহ্য হয় না।" বলিতে-বলিতেই অভিমানে ফুলিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। ভাগ্যে সেই সময়টায় ছেলে-দুটি ঘরের কোণের টিপয় হইতে খেলার সরঞ্জাম লইয়া আসিয়া, ইহাদের সান্নিধ্য হইতে অনেকখানি দূরে খেলিতে বসিয়া গিয়াছিল,—দম্পতির এই মানাভিমানের অভিনয় উহাদের কাণে পৌঁছিলেও তাই মনে পৌঁছে নাই।

অরবিন্দ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ সচেষ্ট হাস্যের সহিত মৃদুস্বরে বলিল, "কি তুমি ছেলেমানুষী করচো রাণি! শরতের ব্যবহারের সঙ্গে তুমি আমায় কেন জড়াতে চাইচো বল দেখি ? আমি যদি এতে যোগ দিতুম, তা'হলে শরতের আড়ালে দাঁড়িয়ে অলক্ষ্য থেকে ঢিল না ছুঁড়ে সাম্‌না-সাম্‌নিই পারতুম। আর শরতের কথা,—তা যে দিন তুমি এ বাড়ীতে এসেছ, সেই দিনই কি ওকে চিন্‌তে পারো নি রাণি ?"

"চিনিনি আবার,—খুব চিনেছি তাঁকে। সে-সব কথা মনে হলে, আমি যাই মেয়ে—তাই আবার বড়ঠাকুরঝির মুখ দেখি। আর কেউ হ'লে—"

ব্রজরাণীর পরিবর্ত্তে এরূপ স্থলে অপর কেহ হইলে আর যে কি করিয়া ফেলিত, সেই কথাটাই ছিল ইহার মধ্যে সব চেয়ে দরকারী; কিন্তু সেই মূল্যবান কথাটিই অরবিন্দের শোনা ঘটিয়া উঠিল না। ঠিক সেই মাহেন্দ্র-ক্ষণটিতেই, যাহার উদ্দেশে অবমানিতা বধূ এই একটুখানি উপায়ে গায়ের জ্বালা কথঞ্চিৎমাত্র মিটাইতেছিল, সেই লোকটিরই আকস্মিক অভ্যুদয়ে মুখের অর্দ্ধব্যক্ত বাণী তদবস্থাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া গেল। "দাদা, তোমাকে মা ডাকচেন" বলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই, ভ্রাতৃজায়ার শেষের কথাগুলা কাণে যাইতেই, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সাবজ্ঞ হাস্যে শরতের মুখখানা শরৎ-মেঘের মতই রঞ্জিত হইয়া উঠিল। "আর কেউ হ'লে বোধ করি কুলোর বাতাস দিয়ে, ঝাঁটা মারতে-মারতে বড়ঠাকুরঝিকে বাড়ী থেকে বিদেয় করতে, না ? তা' সে খেদটা তুমিই বা রাখো কেন ভাই, মিটিয়ে ফেল্লেই তো হয়। হ্যাঁ গো দাদা! বেশ তো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, খাসা চাঁদপানা মুখ করে, বউএর লাগানি শুনচো,—বলি, মনের কথাটা স্পষ্ট করে কেন বলেই ফেল না ?—কাল থেকে না হয় আর তোমার বাড়ী আস্‌বোই না,—এই তো চাও ? ঢের-ঢের লোক দেখিছি বাপু, তোমার মতন কিন্তু আর কক্ষণ দেখিনি! এদিকে দেখাও, যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানো না;—এদিকে বউএর মিষ্টি কথাগুলি যখন কাণে ঢোকে, মনে হয়, যেন তন্ময় হয়ে বেদ-কোরাণই বা শুনচো!"

যেমন ব্রজরাণী, তেমনি তাঁহার স্বামীটি—এই আগন্তুকার আগমনে দু'জনে সম-পরিমাণেই প্রীত হইয়াছিলেন। বিষয়টাকে লঘু করা যাইবে না—এক প্রকার জানা থাকা সত্ত্বেও, যদিই বা পারা যায়, এই আশায় অরবিন্দ ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসিয়া বলিল, "তা' আর হবে না রে শরু ? জগদিন্দ্রের কথাবার্ত্তা তোর কি রকম লাগে বল্ দেখি ?"

"ও তো হলো না দাদা! গোড়ায় গলদ করে ফেল্লে যে! আমার কথাই না ওঁর কাণে চাণক্যের নীতি-শাস্ত্র বলে ঠেকা উচিত ছিল!—আমার আবার কেমন লাগ্‌বে?" এই কথা বলিতে-বলিতে, নিজেরই কথার ভঙ্গিতে নিজেরই ঈষৎ হাসি পাইয়া গেল। তখন শত্রুপক্ষের সাক্ষাতে হাসিয়া ফেলিয়া নীচু হইয়া পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া, "আমার এখন ঝগড়া-ঝাঁটির সময় নেই। মা তোমায় একটা দরকারী কথার জন্য ডাকচেন,—খুসী হয় ত এসো বাপু; আর না হয়, বউএর সঙ্গে বসে-বসে, কেমন করে এই শরি পোড়ার-মুখীর মুণ্ডপাত করবে, তারি যুক্তি আঁট।" এই বলিয়া সেই পোড়ারমুখী বাহির হইয়া গিয়া, ধড়াস্‌ করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, ভাই ভাজকে 'যুক্তি' আঁটিবার অবসর করিয়া দিল। কিন্তু দিলে কি হইবে? ভাইএর মনে সেরূপ সৎ-সাহস নাই,—তিনি যুগপৎ উভয় পক্ষের গালি খাইয়া খাইয়া, আবার একটা নূতন আয়োজনের উপক্রম দর্শনেই, সভয়ে, হয় ত বা মনে মনে দুর্গানাম জপ করিতে-করিতে দুর্ম্মুখী বোনটির পিছনে-পিছনেই বাহির হইয়া পড়িলেন। পুনঃ-পুনঃ অপমানের বিষে জর্জ্জরিতা, রাগে-দুঃখে-অভিমানে বিহ্বলা-প্রায় ব্রজরাণীর কাণে নেপথ্য হইতে কয়টা কথা আসিয়া প্রবেশ করিল—

"পোড়ারমুখী—না—পোড়ারমুখী! সত্যি-সত্যি তোর মুণ্ডপাত করতে হবে দেখ্‌তে পাচ্চি! যাচ্চি দাঁড়া জগদিন্দ্রের কাছে—সে তোকে বড্ড বেশি আস্কারা দিয়ে-দিয়ে একেবারেই মাথায় তুল্‌চে!" কথাগুলা যে বলিয়াছিল, শাসনই হয় ত বা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যে শ্রোত্রীটির জ্বলন্ত কর্ণ উহাদের গ্রাস করিল, তাহার বোধ হইল, তেমন সোহাগে-গলা মধুর কণ্ঠ সে ঐ বক্তাটির মুখ হইতে এত কম শুনিয়াছে যে, সে যেন না শোনারই সামিল। তাহাকে যে অমন করিয়া অপমান করিয়া গেল, তাহারি এ পুরস্কার! আবার উত্তরটাও শোনা গেল। সেও এমনি এক ক্রোধ বিদ্বেষ-বিহীন আদরেরই স্বর! "তোমারই দেখে একটু-একটু শিখ্‌বে দাদা। কি করে বলো,—শাস্ত্রেই যে বলে রেখেছে, —মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

আষাঢ়ের সন্ধ্যাকাশের ন্যায় অন্ধকার মুখে ব্রজরাণী বিছানায় অঙ্গ ঢালিয়া দিল।

সাময়িকী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের সিনেট সভার অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিগণের পরীক্ষার 'ফি'র পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছেন; প্রবেশিকা, আই-এ, আই-এস্‌সি, বি-এ, বি-এস্‌সি, এম-এ, এম-এস্‌সি ও আইন এই সমস্ত পরীক্ষারই 'ফি' বাড়িয়াছে। যাঁহারা এই বৃদ্ধির পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে; যাহা আয় হয় তাহাতে কুলায় না; সুতরাং আয় বৃদ্ধির জন্য এই পরীক্ষার ফি বাড়ান হইল; সভ্যগণের অধিকাংশের মতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

অধিকাংশ সভ্য ইহাতে মত দিয়াছিলেন,—সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে ইহা গৃহীত হয় নাই। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও দুই-চারিজন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে, যে সকল ছাত্র পরীক্ষা দেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই অবস্থা ভাল নহে; তাঁহারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। দেশের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে গরিব ভদ্রলোকের ভয়ানক কষ্ট যাইতেছে,—তাঁহারা অতি কষ্টে ছেলেদের উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। এ অবস্থায় ছেলেদের পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া আয়-ব্যয় কুলাইয়া লইলেই ঠিক হয়। তাঁহারা বলেন, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার জন্যই ব্যয় বেশী হইতেছে; সেই বিভাগের

ব্যয় কিছু কমাইলে আর এ-দিকে ফি বৃদ্ধি করিতে হয় না।

এই সকল কথার উত্তরে শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, এই সামান্য ফি বৃদ্ধিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। দেশের লোক একেবারে এত গরিব হইয়া যায় নাই। তিনি বলেন যে, থিয়েটার, বায়োস্কোপ প্রভৃতিতে ত লোক ধরে না; তখন ত বেশ পয়সা খরচ হয়; সুতরাং এই 'ফি' বৃদ্ধিতে কাহারও কষ্ট হইবে না। এই উপলক্ষে একটু কথা কাটাকাটিও হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সার প্রফুল্লচন্দ্র বলেন যে, শ্রীযুক্ত সার রাসবিহারী ঘোষ ও পরলোকগত সার তারকনাথ পালিত মহাশয়ের মত কাহাকেও ধরিয়া কিছু মোটা টাকা লইতে পারিলে আর পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হয় না। এ কথার উত্তরে শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ বলেন যে, উকিল শ্রেণীর উপর যে প্রকার আক্রমণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সে দলের কেহ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না। এই উত্তরে সার প্রফুল্লের উপর ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস; কারণ সার প্রফুল্ল কিছুদিন পূর্ব্বে একটা সভায় বক্তৃতা উপলক্ষে 'আইন পরীক্ষা তুলিয়া দিবার ও আইন কলেজের বাড়ী সমভূম করিয়া দিবার কথা বলেন। সার আশুতোষ সেই কথারই উত্তর এই উপলক্ষে শুনাইয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয় কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ছিলেন; তিনি আয় ব্যয়ের খবর বিশেষ ভাবেই জানেন। তিনি বলেন যে, এতদিন পরীক্ষার ফি যাহা আদায় হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক টাকাতেই পরীক্ষার খরচ চলিয়া গিয়াছে; বাকী টাকা পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাতেই খরচ হইয়াছে, তবুও সে খরচ কুলায় না; সুতরাং সেই দিকের খরচ কমানো দরকার। এই বাদানুবাদে কোনই ফল হয় নাই—পরীক্ষার ফি বৃদ্ধিই হইল।

দেশের অবস্থা আমরা যতদূর জানি,—যে সকল ছাত্র পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হয়, তাহাদের অভিভাবকগণের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের যতটা অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে এই 'ফি' বৃদ্ধিতে অনেক অভিভাবকের যে কষ্ট হইবে, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক দরিদ্র ছাত্রকে যে পরীক্ষার 'ফি'র জন্য ভিক্ষা করিতে হয়, তাহাও আমরা জানি। একে পড়া-শুনার ব্যয় যে প্রকার বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত লোকের সেই ব্যয় সংগ্রহ করিতেই কষ্ট হইতেছে, তাহার উপর আবার 'ফি'ও কিছু বাড়িল। তবে কথা এই যে, আট টাকা নয় টাকা মণ চাউল কিনিয়াও যখন আধপেটা আহার চালাইতে হইতেছে, ছয় টাকা জোড়া কাপড়ের মূল্য হওয়াতেও যখন গরিব গৃহস্থ এখনও দিগম্বর হয় নাই—কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করিতেছে, তখন ছেলের প্রবেশিকা পরীক্ষার 'ফি' আরও পাচ টাকা বেশীও তাহারা বাধ্য হইয়া দিবে। দশটা মহার্ঘ্যতার উপর না হয় আর একটাও চাপিল,—এই বলিয়াই মনকে প্রবোধ দিতে হইবে।

তবে থিয়েটার-বায়োস্কোপের জনতা লইয়া একটা কথা উঠিয়াছে; সে সম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। আমরা যতদূর জানি, দেখিয়াছি এবং এখনও দেখিতেছি, তাহাতে বলিতে পারি, গরিব লোকে এখন আর ও দিকে যাইতে পারিতেছে না। ঐ সকল তামাসার স্থান যে সকল দর্শকে পূর্ণ হয়, তাহাদের মধ্যে গরিব ভদ্রলোকের বা তাহাদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা বড়ই কম। যাহারা যান, তাঁহাদের অবস্থা ভাল। এই যুদ্ধের বাজারে এমনও এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছেন। তাঁহারাই আজকাল থিয়েটার-বায়োস্কোপের দর্শক; গরিবেরা আর পয়সা খরচ করিয়া ও-সকল স্থানে যাইতে পারে না। গ্রাসাচ্ছাদন চলে না, আমোদ-আহ্লাদ করিবে কোথা হইতে? তবে, নেশাখোরদের কথা স্বতন্ত্র। বাড়ীতে পরিবার, ছেলেমেয়ে খাইতে পায় না—মাতালের কিন্তু মদটুকু চাই—স্ফূর্ত্তি চাই। এ শ্রেণীর লোকের দিকে চাহিয়া, সাধারণ ভদ্র গৃহস্থের অবস্থার আলোচনা করিয়া, তাঁহাদিগকে সম্পন্ন মনে করা ঠিক নহে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার 'ফি' পনের টাকার স্থলে কুড়ি টাকা হইল—তাহাও না হয় যেমন করিয়া হউক দিলাম; ছেলেও না হয় পাশ হইল। কিন্তু তাহার পর? তাহার পর যে একেবারে অন্ধকার! এই বিগত প্রবেশিকা পরীক্ষায়

দশ হাজার ছেলে উত্তীর্ণ হইল। ইহাদের উপায় কি হইবে? যাহারা খরচ চালাইতে পারিবে, তাহাদের ছেলেরা আই-এ, বি-এ, ইত্যাদি পড়িবে। যাহারা তাহা পারিবে না তাহাদের ছেলেরা কি করিবে? বিশেষতঃ কোন প্রকারে খরচ চালাইতে পারিলেও, ছেলেরা যে কলেজে প্রবেশ করিতেই পায় না। যাহারা তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে, তাহাদের বড় ও মাঝারি শ্রেণীর কলেজে 'প্রবেশ নিষিদ্ধ'; দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক ছাত্রের ভাগ্যেও প্রায় তাই। এ সকল ছেলে কোথায় যায়? সরকারী চাকরীরও ত সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে; সদাগরী আফিসও ত সংখ্যাবদ্ধ। চাকুরী সহজে মিলে না—মেলা অসম্ভব; ঘরে পয়সা নাই যে, ব্যবসায় বাণিজ্য করিবে। আর সে শিক্ষাও ত ছেলেরা পায় নাই! গ্রামার, জিওমেট্রি ত ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কাজে লাগে না! এ সকল ছেলে লইয়া অভিভাবকগণ কি করিবেন, এ ভাবনা কে ভাবিবে? অথচ ইহা একটা প্রধান ভাবনা; রিফরম বিলই বল, আর রাজ্যপ্রাপ্তিই বল—যারা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজা, তাহাদের কথা সর্ব্বাগে ভাবিতে হয়। শুনিতেছি, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন না কি সে ভাবনা অনেক ভাবিয়াছেন, এবং তাহার উপায়ও নির্ণয় করিয়াছেন। দেখা যাউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিধিরাম সর্দ্দারদের কোন গতি তাঁহারা করিয়াছেন কি না। পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের শ্রীবৃদ্ধি হউক, Advancement of Learning খুব অগ্রসর হউক,—দেশের লোক সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনে মহামহোপাধ্যায় হউক—কিন্তু তাহাদের অন্ন-সংস্থানের উপায়ও যে সেই সঙ্গে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রকম বার আনা ছাত্রের গৃহে যে নিত্য অভাব—চির হাহাকার!

শিক্ষার কথাই যখন উঠিল, তখন আরও দুই একটা কথা বলিতে হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মফস্বলের কোন সহরের কতকগুলি কৃতবিদ্য ভদ্রলোকের বাসনা হইয়াছিল যে, তাঁহাদের সহরে আপাততঃ একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করা হউক। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিতে আসিলেন। একটা হিসাব পাওয়া গেল। তাহাতে দেখা গেল যে, প্রথমে, কলেজের স্থায়িত্বের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ, লাইব্রেরী ও যন্ত্রপাতির জন্য অন্ততঃ কুড়ি হাজার টাকা চাই; তৃতীয়তঃ, কলেজের বাড়ী, ছাত্রাবাস ও আসবাব ইত্যাদির জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দরকার। এখন, এই তিন দফা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। প্রথম, পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিবার কথা। ইহা অসঙ্গত নহে। একটা কলেজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে, কিছু টাকা সঞ্চিত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, যদিও এখন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য লোকের যে প্রকার আগ্রহ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ছাত্রদত্ত বেতন হইতে কলেজের নিত্য-ব্যয় অনায়াসে চলিতে পারে। আমাদের বে-সরকারী কলেজগুলির অবস্থাই তাহার প্রমাণ। তবুও, এই পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দেওয়া, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহার পর, লাইব্রেরী ও যন্ত্রপাতির কথা। বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে হইলে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজেও যে সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, তাহা কুড়িহাজার টাকায় হয় কি না, সন্দেহ। তবে আর্ট কলেজ করিতে হইলে আপাততঃ কুড়ি হাজার টাকাতেই একটা লাইব্রেরী হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, একটা কলেজের জন্য লাইব্রেরী কুড়িহাজার টাকায় হয় না। যাহারা অধ্যাপনা করিবেন, তাঁহাদেরও শিক্ষার প্রয়োজন; ছাত্রগণের অপেক্ষা অধ্যাপকগণকে অধিক অধ্যয়নশীল হইতে হয়। আমাদের অধ্যাপকগণের অনেকেই তাহা করেন না বলিয়া অধ্যাপনাও তেমন সুন্দর হয় না,—অধ্যাপকগণও বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। ভাল লাইব্রেরী অনেক কলেজেই নাই; এমন কি আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীও এ হিসাবে অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। একটা হিসাবই দিতেছি। ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে ৮০০০০০ পুস্তক আছে, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে ৭৫০০০০, লণ্ডনে ১৯৫০০০, এবারডিনে ২০০০০০, লিভারপুলে ৮০০০০, বার্মিংহামে ৭২০০০ পুস্তক আছে; আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ১১২১০০০, সিকাগোয় ৪৫৯০০০; জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ১৯০০০০ পুস্তক আছে। এইবার আমাদের কথা শুনুন; কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে ৪০০০০, লাহোরে

৩০০০০, আর এলাহাবাদে ১২৮০০ পুস্তক আছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের পুস্তকালয়ের অভাব কত। অধ্যাপকগণ যদি পড়াশুনা করিবার বিশেষ সুবিধা না পান, তাহা হইলে তাঁহারা পড়াইবেন কেমন করিয়া? তিনখানি অভিধান আর কলেজের পাঠ্যপুস্তক লইয়া লাইব্রেরী হয় না; সুতরাং লাইব্রেরীর ব্যয় যত বেশী করা যাইবে, শিক্ষক ও ছাত্রগণের শিক্ষাও তত বিস্তৃত হইবে; সুতরাং লাইব্রেরী সম্বন্ধে ব্যয় করিতে কৃপণতা করিলে কলেজের শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে না।

এইবার তৃতীয় দফার কথা, অর্থাৎ কলেজ-গৃহ ও ছাত্রাবাসের খরচের কথা। য়ুরোপ শীতপ্রধান দেশ; সেখানকার বাড়ী-ঘর-দুয়ারও সেই দেশের উপযোগী হওয়া চাই; বিশেষ, সে সকল স্থানে পয়সার অভাব নাই, দাতারও অভাব নাই; ধনকুবেরেরও অভাব নাই। সে সকল স্থানে বড়-বড় অট্টালিকা অনায়াসেই হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে সার রাসবিহারী, সার তারকনাথ, বেশী নাই; সুতরাং আমাদের দেশে কলেজের জন্য বড় অট্টালিকার আবদার চলে না; আর দেশের আবহাওয়া বিবেচনা করিলে, তাহার প্রয়োজনও একেবারেই নাই। কিন্তু, বিদেশের দেখাদেখি আমাদের দেশেও কলেজের বা স্কুলের জন্য বড় অট্টালিকা চাই, ছাত্রাবাসের জন্য প্রকাণ্ডকায় ইমারত চাই। নতুবা স্কুল বা কলেজ মঞ্জুর হয় না। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীর কথা ছাড়িয়া দিই। মফস্বলের একটা সহরে কলেজ করিতে হইলে প্রকাণ্ড অট্টালিকার প্রয়োজন কি, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। আলো ও বায়ু প্রবেশের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়া বড়-বড় লম্বা চালা-ঘরে কি কলেজের অধিবেশন হইতে পারে না? তাহাতে কি স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়? আমাদের ত তাহা মনে হয় না। বিশেষতঃ, যাহাদের জন্য কলেজ, তাহারা যে অনেকেই কুটীরবাসী। সেই কুটীরগুলি যাহাতে স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়, তাহা করিলে কি চলে না? বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কুটীরগুলি কি বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের পক্ষে যথেষ্ট নহে? সেখানকার ছাত্রগণ ত বেশ সুস্থ ও সবলকায়। সেখানকার শিক্ষাও ত উচ্চ শ্রেণীর। ছাত্রেরা সেখানে বৃক্ষতলে ও উন্মুক্ত আকাশ-তলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। সেই জন্যই পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ কোন এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, আহার্য্য দ্রব্য পুষ্টিকর হইলেই যথেষ্ট—সোণার থালার দরকার হয় না, কদলীপত্রই সে কাজ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের বর্তমান বিধানে তাহা হইবে না; কলেজের বা স্কুলের জন্য ভাল অট্টালিকা চাই, ছাত্রাবাসের জন্যও ভাল বাড়ী চাই; তা, কে বা জানে সহরে আর কে বা জানে মফস্বলে। তাই, পূর্ব্বে যে কলেজের কথা বলিয়াছি, সেখানকার অট্টালিকা ও আস্‌বাবের জন্যই পঞ্চাশ হাজার টাকার ফর্দ্দ হইল। ফল এই হইল যে, দেড়মণ তৈলও সংগৃহীত হইবে না, রাধিকার নৃত্য দর্শনও অদৃষ্টে ঘটিবে না। এই বড়-বড় বাড়ী-ঘর-দ্বারের আবদার এত বেশী হইয়াছে যে, বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ 'টাইম্‌স' (Times) পত্রও এ সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিয়াছেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নবেম্বরের টাইম্‌সের Educational Supplement এ লিখিত হইয়াছে—"The modern tendency in India to extravagance in bricks and mortar for Schools and Colleges, should be checked. Many experienced observers believe that far less expensive buildings than those at present erected are adequate for Indian Educational purposes. It is for the State to put money into the making of men far more than into ornate buildings. In particular the national (primary) Schools should be of the simplest construction." ইহার ভাবার্থ এই যে, ভারতবর্ষে স্কুল-কলেজের জন্য যে ইট-চূণ-সুরকির মহাব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংযত করা দরকার। অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত এই যে, ভারতবর্ষের ছেলেদের শিক্ষা-বিধানের জন্য বড়-বড় বহু-ব্যয়সাধ্য ইমারত অপেক্ষা ছোট-খাটো বাড়ী-ঘরই অধিক উপযোগী। সরকারের কর্তব্য বাড়ী-ঘর প্রস্তুত করিবার জন্য টাকা খরচ না করিয়া মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য টাকা খরচ করা। বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অতি সামান্য অল্প-ব্যয়সাধ্য কুটীরই যথেষ্ট। আরও একজনের মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মাননীয় শ্রীযুক্ত আগা খাঁ (H. H. The Aga Khan)

তাঁহার 'India in Transition' নামক পুস্তকের এক-স্থানে লিখিয়াছেন—The greatest teachers of ancient India were forest-dwellers, and gathered their students round them in the open air. A slowing of the pace in order to wait for good buildings and other conditions of an ideal state of things would be a crime against the young life of India and her future generations."—ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, সেকালে ভারতবর্ষের প্রধান আচার্য্যগণ বনে বাস করিতেন এবং শিক্ষার্থীরা তখন উন্মুক্ত আকাশ তলে আচার্য্যগণের পার্শ্বে সমবেত হইত। বর্ত্তমান আদর্শের অনুরূপ বড় বড় বাড়ী-ঘর ও আসবাবপত্রের সংগ্রহের কথা ভাবিয়া যদি শিক্ষার গতি শ্লথ করা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের নবজীবন ও ভবিষৎ জীবন গঠনের অন্তরায় স্বরূপ হইয়া এই কার্য্য মহাপাতক সঞ্চয় করিবে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষত্ব

[অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস]

শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নানা গল্প-উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার "শ্রীকান্তে"। এক হিসাবে "শ্রীকান্ত" যেমন তাঁহার বস্তুগত জীবনের প্রতিরূপ, তেমনি, সব দিক দিয়া দেখিতে গেলে, তাঁহার আর্ট ও তত্ত্বের সম্পূর্ণ অবয়বের পরিচায়ক। তাঁহার মনোগত জীবনের ইতিহাসে ইহা একটা স্পষ্ট পরিণতির সূচনা করিয়া, পরবর্ত্তী রচনার সহিত একটা বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিতেছে। শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গল্প-উপন্যাসের তত্ত্বের দিকটা প্রথম পড়াতেই বেশ সুন্দর ভাবে ধরা পড়ে। গৃহ এবং সমাজ-জীবনে স্নেহ ও ভালবাসা স্বাভাবিক আধার হইতে বঞ্চিত অথবা বিক্ষিপ্ত ও সমাজের বিধি-নিষেধের জন্য অবিন্যস্ত হইয়া অহরহঃ যে কত গভীর বেদনার, কত দুঃখ-গ্লানি-লজ্জার সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে, শরৎ চট্টোপাধ্যায় সেই ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, ব্যর্থ প্রেমের বেদনার পুরোহিত। তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী লেখার ছত্রে-ছত্রে এই গভীর বেদনা গুমরিয়া-গুমরিয়া উঠিয়াছে,—pathos স্ফুরণে তিনি বাংলা উপন্যাসে অদ্বিতীয়। সমাজ ও গৃহের বিধি-বিধানের জন্য এই ক্ষুব্ধ এবং উৎক্ষিপ্ত ভালবাসার বিহ্বলতা যে গৃহে ও সমাজে কত করুণ ঘটনায় প্রকাশিত হয়, তাহা অতি ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শরৎ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন,—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। 'বিন্দুর ছেলে'তে স্নেহবিবশা কাকীমার অপরিসীম বেদনা, "পল্লী সমাজে" বিধবা রমার নিষ্ফল ও নিষ্পাপ প্রেম এবং অব্যক্ত ত্যাগ ও দুঃখ, এমন কি "দত্তা"তেও বিলাস ও রাসবিহারী কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত দত্তা কন্যার নীরব ভালবাসা, গার্হস্থ্য-বিধান ও সামাজিক ব্যবধানের আঘাতে ক্ষিপ্ত ও চূর্ণ হইয়া, কত না মর্ম্মস্পর্শী কাহিনীর উপাদান হইয়াছে,—এক দিকে ভালবাসা ও স্নেহের নিষ্ফলতা, অপর দিকে অনুদার গৃহ ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাইয়াছে।

শরৎবাবুর আর একটা বিশেষ কথা বলিবার আছে; সেটা এই;—জীবনে শুধু কতকগুলা দুঃখ ভোগ করিয়া গেলেই যে সুখ আসিবেই তাহা নহে। জীবনকে ফুলে-ফলে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে,—আর সেই সার্থক করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় ত্যাগ। ঐ ত্যাগই এক-মাত্র সত্য—গৃহ-ধর্ম্ম, সমাজ-ধর্ম্ম ও ন্যায়-ধর্ম্ম এই ত্যাগের কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। যাহার ভিতরে সত্যই এই ত্যাগের শিখা জ্বলিয়াছে, তাহাকে বংশপরম্পরাগত সাধারণ বিধি-নিষেধের মাপকাটিতে বিচার করা উচিত নহে। এইটাই তাঁহার উপন্যাস-সাহিত্যে খুব modern note, এবং এইখানেই তিনি হিন্দু-সমাজকে সঙ্কীর্ণ বিধি-নিষেধ-প্রবর্ত্তিত হীনতা ও দুর্ব্বলতা হইতে উদারতা ও বিশালতার দিকে আহ্বান করিয়াছেন।

এইবার তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবনের একটা স্তর-বিভাগ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে,—

১। প্রথম স্তরে স্নেহ ও ভালবাসা ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার জন্য অদ্ভুত ধরণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া একটা দুঃখের ও ত্যাগের উপাদান হইয়াছে।

"রামের সুমতি", "বিন্দুর ছেলে",—গল্পে দুষ্ট ছেলের প্রতি স্নেহপরায়ণা নারীর ভালবাসা, অভিমান ও কলহের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

"বিরাজ বৌ"তে স্বামী-প্রেম স্বাধিকার হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত হইয়া, অভিমানের শিখায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া শেষে মিলনের সার্থকতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। 'বৈকুণ্ঠের উইলে' ভ্রাতৃপ্রেম অদ্ভুত ভাবে স্বভাব ও শিক্ষার তারতম্য হেতু বিকৃত হইয়া, তাহাদের শত চেষ্টা ও দুঃখকে লঙ্ঘন করিয়াও যে বিচ্ছেদ ও ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে স্নেহের নৈরাশ্য ও লক্ষ্যচ্যুতির ব্যঞ্জনা বড় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী।

২। গৃহ-ধর্ম্মের শাসন ও সমাজের বিধি নিষেধের জন্য স্নেহ ও প্রেম নিষ্ফল হইয়া প্রথম স্তরের সেই বেদনার ব্যঞ্জনা পুনরায় আরও গভীর ও স্পষ্ট সুরে গাহিতেছে। "পরিণীতায়" পিতামাতার অমত ললিতা ও শেখরনাথের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছিল, তাহার আশঙ্কা ও অভিমান শেষে স্নেহের নিকট পরাজয় মানিল। বিদ্রোহ এখনও উত্তপ্ত হয় নাই, শুধু কিশোরীর মৌন সলজ্জ নৈরাশ্য অতি কোমল মধুরভাবে ফুটিয়াছে।

এই স্তরের গল্প-উপন্যাসের তত্ত্বটি গৃহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া সামাজিক সমস্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও এই সমাজ ও আত্মবিদ্রোহ প্রবল না হইয়া ব্যক্তি প্রেমের স্ফুরণ ও দুঃখের ইতিহাসের অধীন রহিয়াছে। শ্রীকান্ত ও দেবদাস এই স্তরের সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত ও সুন্দর অভিব্যক্তি। এখানে প্রায় সকল নর ও নারী সমাজের তাড়নায় ক্ষুব্ধ হইয়া, প্রেমের সরল ও স্বাধীন প্রকাশে বাধা পাইয়া, সাধারণ জীবন যাত্রা হইতে বিভিন্ন দিকে উদ্দাম ভাবে ছুটিয়া গিয়াছে। সমাজ-বিদ্রোহ, এমন কি আত্ম-বিদ্রোহ তাহাদের জীবনে ঘোষিত হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীকান্ত ভবঘুরে, দেবদাস উচ্ছৃঙ্খল; সাধারণ বিচারে সে উন্মাদ, তাহার কথোপকথন সাধারণের নিকট প্রলাপের ন্যায় পীড়াদায়ক। এই জন্য পিয়ারীর নারীত্ব ও মাতৃত্বের সংঘর্ষ ও তাহার সার্থকতা, এবং অভয়ায় বঙ্গনারীর স্বাভাবিক অন্তর্মুখীনতা ও দুর্ব্বলতা, সহিষ্ণুতা ও পরাধীনতাকে ছাপাইয়া উঠিয়া সুতীক্ষ্ণ, সরল ও সত্য দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে নির্ব্বিবাদে অসঙ্কোচে তাকাইয়া চলিয়াছে। এই জন্য অন্নদা দিদি লোকচক্ষুর অন্তরালে সাপুড়িয়ার গৌরবহীন ও অপরিচ্ছিন্ন জীবনের ভিতর যেন সংসারকে বিদ্রূপ করিবার জন্য তাহার সতী-ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক অটল ও অবিকম্পিত হস্তে ধরিয়া ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। এই জন্য পার্ব্বতী কখনও তাহার স্বাভাবিক স্বামী সেবা, কখনও বা অতিথি-সেবা, সদাব্রতের উপর বাধা-বিঘ্নের নিষ্ফলতার মধ্যে একটা কৃত্রিম বিসদৃশ জোর দিয়া দেবদাসের প্রতি স্নেহ ও মমতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। এইজন্যই কিরণময়ী একটা তীব্র জ্বালাময় অসঙ্কুচিত বাল্য ইতিহাসের সংযোজক চিহ্নের জীবন্ত রূপ ধরিয়া সমাজ-নিষিদ্ধ কালাপানি পার হইয়া কলিকাতা হইতে আরাকান এবং আরাকান হইতে কলিকাতা করিতেছে। সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক অলঙ্ঘনীয় বিধি-নিষেধের একটা নিষ্ঠুর পরিহাস ছুরিকার ঔজ্জ্বল্যের মত মানুষের সরল ও স্বাধীন স্নেহ ও প্রেমকে ত্রস্ত করিয়াছে।

৩। দ্বিতীয় স্তরে যে সকল সামাজিক সমস্যা স্নেহের নিষ্ফলতা প্রদর্শনের কারণমাত্র হইয়াছে, সেগুলি এখন স্বতন্ত্র ভাবে গ্রন্থকারের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার বিচারের অপেক্ষা করিতেছে। বিভিন্ন প্রকারের সমাজের আদর্শ ও বিধি, এবং গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের উপর ইহাদের প্রভাব তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সত্য ও কল্যাণের বাটখারায় ওজন করিতেছেন। বিভিন্ন সামাজিক আদর্শে পরিচালিত ব্যক্তিগণ পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া কৃত্রিম প্রতিবন্ধক প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া একই সঙ্গে স্নেহের পরিণতি ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতেছে। 'দত্তা' ও 'গৃহদাহ' প্রভৃতি নূতন উপন্যাসে লেখক সম্প্রতি এই ভাবেই চলিতেছেন। দত্তা কন্যা বিজয়া ও নরেনের মিলন এবং বিজয়ার সমাজের ও অভিভাবকের প্রতিকূল বিবাহে যে প্রেমের সফলতা দেখা গিয়াছে, সেই সাফল্য গৃহদাহের বিচিত্র সংঘর্ষের মধ্যে কিরূপে শেষ অধ্যায়ে পরিস্ফুট হইবে, আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি। 'গৃহদাহের' সমস্যাটি

'দত্তার' তুলনায় আরও জটিল হইয়াছে, কারণ, বিভিন্ন আদর্শে চালিত অচলা স্বেচ্ছায় হিন্দু গৃহের ও হিন্দু নারীদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে। যতদিন অচলার স্বামী-প্রেম পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত না হয়, ততদিন এই সংঘর্ষ ও যন্ত্রণা অফুরন্ত ভাবে চলিতে থাকিবে, এবং অচলার সামাজিক আদর্শের স্মারক ও প্রতিরূপ সুরেশ ততদিনই ধূমকেতুর মত তাহাকে ক্ষণে-ক্ষণে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়া অকল্যাণের পথে লইয়া যাইতে থাকিবে। 'ঘরে-বাইরের' নিখিলেশের মত অচলার স্বামীও নীরবে, নির্ব্বিবাদে প্রেমের ত্যাগ ও মিলনের জন্য ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও সমাজের জন্য মাতৃসমাজ সেই শেষ সার্থকতার জন্য এই ভাবে কি অপেক্ষা করিতেছে না?

'চরিত্রহীনে' দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের ভাবের সমাবেশ হইয়াছে, উহার সমালোচনা একটু পরে হইবে।

শরৎ চট্টোপাধ্যায় বলিতে চাহিয়াছেন, নর ও নারী যদি আপনাদের জীবনের ত্যাগ ও দুঃখের ভিতর দিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ সার্থক করিতে পারে, তাহা হইলে কোন অলঙ্ঘনীয় বিধি-নিষেধের দাবী তাহাদের পক্ষে খাটে না। অবশ্য সকলেই যে এইরূপ ত্যাগ ও দুঃখকে বরণ করিতে পারে তাহা নহে। ইহা অসাধারণ; কিন্তু যে স্থানে ইহার প্রভাব দেখা যায়, সেইখানেই সমাজের বিধিকে তাহার নিকট হার মানিতেই হইবে। তাঁহার উপন্যাস-সাহিত্যের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান তত্ত্ব।

বাংলার স্বাভাবিক গৃহ ও সমাজ-জীবনে বিধি-নিষেধের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যে পূর্ণ স্নেহ ও প্রেমের ছবি আমরা সচরাচর দেখি, এবং যাহা আমাদের আর সকল ঔপন্যাসিক চিত্রিত করিয়াছেন, শরৎবাবুর নিকট প্রেম সেরূপ স্বাভাবিক ও সহজ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় নাই। শরৎবাবুর লেখার ভিতর আমরা বিধি-নিষেধের দ্বারা বিপর্য্যস্ত ও অসমাপ্ত প্রেমের গভীর হাহাকার ধ্বনি নিয়ত শ্রবণ করি। তিনি যেন গৃহ, সমাজ ও জগৎকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখিয়া, নিজের ও আমাদের অন্তঃপীড়ার নিগূঢ় রহস্য বাহির করিয়াছেন।

আর এই অদ্ভুত দৃষ্টিই, শুধু মানুষের গৃহ ও সমাজকে নহে, তাহার প্রাকৃতিক আবেষ্টনকেও এক অদ্ভুত ভাবে অনুভব করিয়াছে। বাংলার মাতৃ-প্রকৃতির কোথাও সেই স্নিগ্ধ, শ্যামল ও ছবি'র কান্তির মাধুর্য্য, ঋতুর সেই সরস ও স্নেহবিহ্বল হৃদয়ের আকর্ষণ, বাংলার সুনীল আকাশের কোলে রঙীন মেঘের স্ফূর্ত্তিময় লীলাখেলা, অথবা জ্যোৎস্না-প্লাবিত মত্তমধু যামিনীর আনন্দ উৎসব ও অবসাদ, তাঁহার উপন্যাসে আমরা পাই না। শুধু গাঢ় তাঁহার নিকট নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ অমানিশার বিরাট কালীমূর্ত্তি, উগ্রা ও প্রচণ্ডা প্রকৃতির বিভীষিকা, নিবিড় কাল রূপের নিদারুণ আহ্বান, অন্ধকার, শূন্য প্রান্তরে ঝড়ের উদ্দাম অনিবার্য্য লীলা ও মানুষের অপমানের মধ্যে অসহায় একটি রমণী, মহাশ্মশানের অসংখ্য পিশাচের উদ্বেল অট্টহাস্য, কিংবা ভীমবাহিনী ভাগীরথীর আবর্ত্তসঙ্কুল বিপুল ও উন্মত্ত জলস্রোতের উপর ক্ষুদ্র একটি তরণী ও অসহায় মানুষ। প্রকৃতি তাঁহার নিকট করাল রূপে প্রতিভাত। অশান্ত ও বিদ্রোহী প্রকৃতির অন্তরাত্মার নিবিড় অনুভূতি তাঁহার গল্প উপন্যাসের সমাজ ও আত্মবিদ্রোহের সহিত অতি সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়াছে। আর্টের যে সকল উপাদান তাঁহার উপন্যাসকে এত আকর্ষক করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তাঁহার তীব্র অনুভূতির আবেগই সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার উপন্যাসগুলির আখ্যায়িকাকে স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করিতে গেলে আমরা দেখি যে, ঘটনা বস্তু উচ্ছ্বাসের ঘাত-প্রতিঘাতে ও আবেগের লীলাতিশয্যের মধ্যে প্রকটিত হয়, বাহিরের জীবনের ঘটনাবলীর সহিত তাহাদের সুসামঞ্জস্য ও ক্রমের অভাব প্রায়ই লক্ষিত হয়। বর্ম্মা ও আরাকান-যাত্রা বাস্তব হিসাবে তত সহজ ও অনায়াস সাধ্য নহে; যদিও মনের ও বিচ্ছেদ-মিলনের সহিত এরূপ অভিমান আবেগের ঘাত-প্রতিঘাতে জড়িত না থাকিলে তাহাদের বিকাশ সাধন আর্টিষ্টের পক্ষে কঠিন হয়। মনের আবেগ প্রকাশের জন্য যে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনাবলীর সমাবেশ করা হয়, সেগুলির আতিশয্যে প্রকৃত পক্ষে আর্টের অনেক সময়েই ক্ষতি হইয়াছে। সতীশ, নরেন ও সুরেশের অকস্মাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাব, পিয়ারী, অচলা ও বিজয়ার মুহুর্মুহু ব্যবহারের পরিবর্ত্তন, আখ্যায়িকার মধ্যে ঘন-ঘন দৃশ্য পরিবর্ত্তন, এই সমুদায়ে, যাহাকে পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচকেরা bioscopic literature নাম দিয়াছেন,—সেই লঘু ও চঞ্চল ঘটনাবহুল সাহিত্যের প্রতিচ্ছবি,—bioscope-এর বিচিত্র আনাগোনার সহিত উদ্বেগের চঞ্চু ও অন্তঃপীড়াদায়ক অসহ্য ঘাত-প্রতিঘাত দেখিতে পাই।

আর এই দোষ অতিক্রামক ভাবে পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিক-দিগের মত তাঁহাকেও আক্রমণ করিয়াছে। এটা হয় ত বর্ত্তমান লঘু সভ্যতা-জীবনেরই সৃষ্টি, ইহাকে এড়াইয়া যাওয়া কঠিন।

আবেগের আতিশয্য ও বিলাস এক দিকে যেমন উদ্ভট ঘটনা-সংস্থানের সৃষ্টি করিয়াছে, অপর দিকে সময়ে-সময়ে চরিত্রাঙ্কনেও স্নায়বিকারগ্রস্ত মনুষ্যকে কল্পনা করিয়া, তীব্র আবেগের ক্ষোভ, বিক্ষেপ ও উত্তেজনার ভিতর দিয়া আমাদের অন্তরে একটা মোহ ও মত্ততা আনিয়া দেয়। আমার মনে হয়, এই ধরণের উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীকান্তেরই ভিতর একটা আর্টোচিত সাম্য ও স্বাধীনতা রক্ষিত হইয়াছে,—দুঃসহ দুঃখ ও ত্যাগের শিখায় ইন্দ্রিয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া পুড়িয়া শান্ত ও মহিমামণ্ডিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মতন শরৎ বাবুর উপন্যাসে যে ত্যাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অনেক সময়েই সমাজের নিয়ম ও বিধি নিষেধের অনুমোদিত আকাঙ্ক্ষিত ত্যাগ। যেন লেখক সামাজিক সমস্যা তুলিয়া, প্রেমের বিরোধ ও নিষ্ফলতা দেখাইয়া, অবশেষে সমাজকেই একমাত্র বিচারক করিয়া বসিলেন। চোখের বালির বিনোদিনীর ত্যাগের মত ইহা নীতির ত্যাগ, এবং শিল্প-সাহিত্যের দিক হইতে ইহা ভিতরে-ভিতরে অসংলগ্ন, লক্ষ্যভ্রষ্ট,—বস্তুহীন। শিল্প-সাহিত্যের একটা আন্তরিকতা ও সরলতা আছে; এবং সেই শিল্পীই প্রলয়ঙ্কর আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বিক্ষোভ ও মত্ততা চিত্রিত করিবার অধিকারী, যিনি দেখাইতে পারেন, আবেগ তাহার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে রূপান্তরিত হইয়া জীবনের সমস্ত দিকে, কেবল মাত্র প্রিয়বস্তুর দিকে নহে, একটা শান্তি-রস আনিতে পারে, যাহাতে আপ্লুত হইয়া সমস্ত স্নায়ুবিকার ও মানসিক উত্তেজনা প্রশমিত ও পরিশুদ্ধ হইয়া যায়। বড় আবেগের পরিণতি ছোট ত্যাগে হয় না। স্বাভাবিক বৃত্তির বিপ্লবের সমাপ্তি একটা কৃত্রিম বিধি বা বহির্জ্জীবনের নীতির নিষেধের চাপে আনা সাহিত্য বা জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ ও সত্য নহে। নবজীবনের নূতন স্বাভাবিক বৃত্তির দ্বারা পুরাতন উদ্দাম প্রবৃত্তি-নিচয়ের সার্থকতা ও সমাপ্তি যেমন আমরা Tolstoyএর Resurrection ও Anna Karenina বা Dorlveivesky'র Crime and Punishmentএ Hawthorneএর Scarelet Letterএ অথবা Strindburgএর There are Crimes and Crimesএ দেখিয়াছি, তাহা আমরা বিমলা বা বিনোদিনীতেও পাই না, পার্ব্বতীতেও পাই না, সাবিত্রীতেও পাই না। অভিসার-যাত্রা করিতে হইলে অর্দ্ধপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, ঘরকন্নার অভাবে কাশীবাস, বাঞ্ছিতের অভাবে সদাব্রত ও অতিথিসেবা, প্রেমের প্রতিদানের অভাবে সপত্নীর নিকট প্রিয়-সমর্পণ,—এ সকল মামুলী ত্যাগ বটে, এবং অনেক শিল্পীর পক্ষেই ইহাই সমস্যা-সমাধানের সহজ পন্থা,—কিন্তু ইহাতে সরল সত্য, স্বাভাবিক পরিণতি নাই,—এক কথায়, জীবনকে প্রচুর ও গভীরতর ভাবে ফিরে পাওয়া নাই। ইহা শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টের অভীষ্ট বস্তু যে ত্যাগ, তাহা নহে।

প্রলয়ঙ্কর বিক্ষোভ ও স্নায়বিক উত্তেজনা শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আছে; কিন্তু বিপ্লবের অনুযায়ী সেই মহৎ ত্যাগ ও রূপান্তর সেরূপ ফুটে নাই। বিনোদিনী, বিমলা ও কিরণময়ীর চরিত্রাঙ্কনের হুল ও বিষ এইখানেই। ভবিষ্যতে এই ত্যাগ ও রূপান্তর পূর্ণ ভাবে ফুটিলে বাংলার সাহিত্য-শিল্পের সার্থকতা।

দেবদাস, সুরেশ, সতীশ, ও কিরণময়ীর চরিত্রাঙ্কনে লেখকের আর্ট অতর্কিতে যদি আবেগের অধীন হইয়া স্নায়বিক বিক্ষোভ ও বিকারের মধ্যে একটা অসাম্য ও কেন্দ্রচ্যুতি আনিয়া ফেলে, তাহা হইলে এই ত্রুটি, এই দোষটুকু ত আমরা স্বীকার করিয়া লইব; কারণ, সাহিত্য-জগতে যে দু'চার জন, নিছক কল্পনার প্রভাবে নহে, গভীর ও জীবন্ত অনুভূতির দ্বারা, জীবনের দুঃখ ও নিষ্ফলতার নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় দিবার সত্যকার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। কিন্তু বিপ্লবের মত ত্যাগের দিকটা আরও তিনি ফুটাইয়া তুলুন; তাহা হইলে স্নায়বিক বিক্ষোভের দোষটুকু সমাজ ও সাহিত্যের গায়ে হুল ও বিষ ফুটাইতে পারিবে না। শুধু সীমারেখাটা অতিক্রান্ত হইলেই টগর ও মাইজীর বিকৃত জীবনের উদ্ভট চিত্রের মত সংক্ষুব্ধ প্রেমের আলোড়নে সমাজ-বিদ্রোহের সমস্যা না উঠিয়া, উদার অথবা অনুদার গৃহ ও ন্যায়-ধর্ম্মের বিচার না আসিয়া, অস্বাভাবিক স্নায়বিক উত্তেজনার উপকরণ গৃহ ও সমাজকে একটা অসত্য ও অকল্যাণের পথে লইয়া যাইতে পারে; জগতে নারীর অন্তরে যে মাতৃরূপা স্নেহ-

লক্ষ্মী চিরকালের জন্য অমর হইয়া আছে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া বাইওয়ালী পিয়ারীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

ভাববিপর্যায়ে আমরা না-ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, যাহা রোগের বীজ, যাহা অন্যায়, যাহা অধর্ম্ম, তাহা সব সমাজের পক্ষেই সমান অন্যায়, অধর্ম্ম ;—সে রোগের বীজ কোন বিশিষ্ট সমাজের পক্ষে যেমন, সেরূপ সার্ব্বজনীন সমাজ ও সাধারণ সুস্থ সবল জীবনের পক্ষে নিতান্ত মারাত্মক।

আবেগের আতিশয্য এক দিকে ঘটনা-সংস্থানের দিক হইতে যেমন ঘটনার সুসামঞ্জস্য, অভাব ও লঘু চঞ্চল ঘটনা-বাহুল্য আনিতে পারে, অপর দিকে চরিত্রাঙ্কনেও সাম্যের অভাব ও লঘু-চঞ্চল প্রকৃতির বিসদৃশ উত্তেজনাও আনে। মানভিক্ষা, সাধাসাধি, কান্নাকাটি, অনুনয়-বিনয় অফুরন্ত ও অসহ ভাবে ক্রমাগতই চলিলে, স্নায়বিক বিকার গ্রস্ত মনুষ্যের জীবনব্যাপী বিক্ষোভ, ও এক প্রকার tililation of the senses ; ইন্দ্রিয় ভোগের চঞ্চল লাস্য, ও মুহুর্মুহু চৈতন্যের আচ্ছন্ন ভাব আর্টের গাম্ভীর্য্য ও স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া দেয়। আর এই tililation of the senses-এর দোষ এই যে, কখন সুন্দর ও কল্যাণের সীমারেখাটা অতিক্রম হইয়া যায়, তাহা শীঘ্র চোখে পড়ে না। সাবিত্রী ও সতীশ, কিরণময়ী ও সতীশ, কিরণময়ী ও উপেন, কিরণময়ী ও দিবাকর প্রভৃতির কথোপকথনে মধুর রহস্যালাপ, মানভিক্ষা, অনুনয়-বিনয়, অভিমান-পরিহাসের পালার আতিশয্যে অতর্কিতে যে অবোধ বিষের বীজ ঝরিয়া পড়ে এবং অলক্ষ্যে অপরিণামদর্শীর অন্তঃকরণে অজ্ঞাতসারে উপ্ত হইয়া যে বিষ-বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে, তাহা অসম্ভব নহে ; অথচ, যাহা তাহাদিগকে পাঠান্তে বিশ্লেষণের অবকাশের পর ক্রুদ্ধ চমকিত করে, তাহা মধুর ও চিত্তাকর্ষক ভাবে অন্তরে তাহার অধিকার পূর্ব্বেই বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে।

আমরা যে পূর্ব্বে "চরিত্রহীন". উপন্যাসে শরৎবাবুর ঔপন্যাসিক জীবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের সমাবেশের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, স্নেহ ও ভালবাসা সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন আদর্শ ও বিধি, অথবা গৃহের ন্যায়ধর্ম্মের দ্বারা ক্ষুব্ধ, বিক্ষিপ্ত ও নিষ্ফল হইয়া গভীর বেদনার ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সামাজিক সমস্যাগুলি,—"চরিত্রহীনে" যাহা আমাদের বিচারের অপেক্ষা করিতেছে, তাহা সত্য-সত্যই প্রেমের ব্যর্থতা ও ব্যক্তিগত জীবনের নিষ্ফলতার ইতিহাসের অধীন হইয়া রহিয়াছে।

তাঁহার সকল উপন্যাসের মতই প্রেম এখানে বিধি-নিষেধের দ্বারা বিপর্যস্ত হইয়া অন্তস্তলের আলোড়নে রক্তে ভিজিয়া ভারী ও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, প্রেম প্রেমই। প্রেমকে বিজ্ঞের দল নিজেরাই বিধি-নিষেধের গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া ঘৃণিত, অবৈধ ও কুৎসিত বলিলেও, তাহার দাবী অবজ্ঞা করিবার নয়। যদি তাহাতে পৃথিবীতে অন্যায়, ভুল, ভ্রান্তি আসে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া প্রশ্রয় দিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, অন্যায়, অধর্ম্ম, পাপ, দুঃখের বাঁকা পথ দিয়া রঙীন রেখার মত ন্যায়ের আলোক দয়া, মায়া, ক্ষমায় বিচিত্র হইয়া দেখা যায়। যদি আর্টের দায়িত্ব সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়া প্রকাশ করা, তাহা হইলে যাহা সুন্দর নয় তাহাকেও অসুন্দরের হাত হইতে বাঁচাইয়া তোলা তাহারই আর একটা কাজ। পাপ দূর করা যদি সমাজের পক্ষে অসাধ্য হয়, পাপকে সহ্য করিবার ক্ষমতা, ক্ষমা করিবার ক্ষমতা জাগাইয়া তোলা, আর্টের দায়িত্ব। শরৎবাবু আর্টের এই গুরু দায়িত্ব বরণ করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া, তিনি আরও দেখাইতে চাহিয়াছেন, মানুষই যে শুধু ভুল, ভ্রান্তি, অন্যায় ও পাপ করিতে জানে, তাহা নয়, সমাজও জানে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রত্যেকের অধিকারের একটা সীমা আছে। সে সীমা ব্যক্তি অথবা সমাজ, মূঢ়তায় হউক, প্রবৃত্তির ঝোঁকে হউক, নিজেদের বশে হউক, যে ভাবেই হউক লঙ্ঘন করিলেই অমঙ্গল। দেবদাস ও কিরণময়ীর জীবনের tragedy টুকু ব্যক্তিগত জীবনের এই স্বাধিকারের সীমা লঙ্ঘনকে অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে চন্দ্রমুখী ও সাবিত্রীর ধৈর্য্য, ক্ষমা ও সেবাপরায়ণতা তাহাদের জীবনকে শত আঘাত, বেদনা, জ্বালা, নৈরাশ্যের ভিতর দিয়াও একটা অনাবিল মাধুর্য্য ও অক্ষত মহিমায় সফল করিয়া তুলিয়াছে। অর্থ ও পদগৌরবের মর্য্যাদা ও প্রত্যাখ্যানের অভিমানকে আশ্রয় করিয়া দেবদাস ও পার্ব্বতীর মধ্যে যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মিথ্যার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা উভয় দিক হইতে হইলেও, একদিকে যেমন অত্যাচার এবং দৈহিক ও মানসিক সর্ব্বনাশ, অপরদিকে নিষ্ফল প্রেমের মর্ম্মন্তুদ ও অস্ফুট

বেদনার ইন্ধন জোগাইয়াছে। আরও একদিকে চন্দ্রমুখীর করুণার্দ্র স্নেহ-করস্পর্শ দেবদাস জীবনের শেষক্ষণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই। এখানেও আর এক ধরণের ভয়ানক ব্যবধান স্নেহ ও ভালবাসাকে সম্মানের আসন দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছে। অথচ চন্দ্রমুখী দেবদাসের নিকট হইতে সেই সনাতন পুরুষের (the eternal masculine) প্রভাবের নিকট হার মানিয়াও চরিত্রের শিক্ষা পাইয়া আপনার জীবনকে শত ধৈর্য্য ও সেবার ভিতর দিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়া দেবদাসকে বাঁচাইতে পারিল না; কারণ দেবদাস তাহার নিকটে থাকিয়াও অতি দূরে। চারিদিক হইতে বিফলতার উপকরণের নির্দ্দয় সমাবেশে ব্যর্থ জীবনের অন্ত অতি করুণ, শোচনীয় ও হৃদয়বিদারক হইয়াছে।

দেবদাসে যে সকল কঠিন প্রশ্ন শরৎবাবু সমাজকে বিচার করিতে বলিয়াছেন, তাহার মীমাংসা তিনি নিজেই দিয়াছেন "চরিত্রহীনে"। "চরিত্রহীন" বইখানা "দেবদাসের" অতি সুন্দর sequel। দেবদাসের ঘটনা অতি সরল ও বাহুল্যবর্জ্জিত; আবেগ অতি তীব্র ও রুক্ষ,—tragedy অত্যন্ত concentrated; জমাট ও মর্ম্মন্তুদ। সাহিত্যে ইহার স্থান খুব উচ্চে। ইহার একাগ্রতা ও একভাব-মুখীনতা আজকালকার পাশ্চাত্য সামাজিক নাটকের তেজ ও উত্তাপ ইহাকে প্রদান করিয়াছে। বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক পুস্কিনের Dovbrovsky ও Thomas Hardy র Tess-এর পার্শ্বে ইহার স্থান।

পাওয়া যখন নর নারীর নিভৃত হৃদয়ে গোপনে নিঃশব্দে সম্পূর্ণ হইতে থাকে, অথচ বাহিরের সংসার, সমাজ ও লোকাচার তাহাকে বাধা দেয়, নিষ্ফল করে, নারীকে তাহার সম্মানের আসনটি দেয় না,—তখনই দুঃখের দিনে প্রেমের পরীক্ষার সময় আসিল। কারণ, শ্রদ্ধা ছাড়া যে ভালবাসা টিকিতেই পারে না! আর, সমাজ যদি সেই শ্রদ্ধাটুকু না দেয়, তখন প্রেমের শ্রেষ্ঠ স্থানটি নর ও নারীর পক্ষে বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন।

"চরিত্রহীনে" বিভিন্ন দিক হইতে প্রেমের এই কঠিন পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফলাফল দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষাটা সমাজের ও গৃহধর্ম্মের অননুমোদিত ব্যথিত স্নেহ ও ভালবাসার পরীক্ষা। সতীশ ও সাবিত্রীর বিচ্ছেদে একদিকে সাবিত্রী আপনাকে বিধবা, কুলত্যাগিনী ও সমাজে লাঞ্ছিতা বিবেচনা করিয়া অতলস্পর্শী দুঃখের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া যেমন ভালবাসার জোরেই সতীশ হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছে, অপরদিকে সতীশ তাহার বিচ্ছেদকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে না পারিয়া নানা সংশয়, দুঃখ, সর্ব্বনাশ, মায় পঞ্চ-মকারের ভিতর দিয়া শেষে উপীনদার আদর্শ ও বিচারে ধৈর্য্যের পরীক্ষায় টিকিয়া গেল।

আজন্ম শুদ্ধ নির্ম্মল ও সমাজের অনুমোদিত উপেন্দ্র-সুরবালার নিষ্কলঙ্ক বিবাহিত জীবনের অতলস্পর্শী প্রেম শুকতারার মত একান্ত ব্যথিত, ব্যগ্র ও সংশয়হীন চোখে সকলের পানে চাহিয়া সকলেরই অন্তরে একটা সুধা ও সান্ত্বনার ধারা সর্ব্বদাই বর্ষণ করিয়াছে।

বিবাহিত জীবনের সার্থক প্রেমের এই মহনীয় ছবির পার্শ্বে হারাণ ও কিরণময়ীর ব্যর্থ প্রেমের ছবিও আছে। শুষ্ক, কঠোর স্বামীর ঔদাসীন্য, নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনার সংসারে কিরণময়ী আপনার নারীত্বের বিকাশের সুযোগ না পাইয়া, স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া, স্বামীর রোগের দুর্দ্দিনে, সর্ব্বনাশ হইতে একবার আপনাকে ফিরিয়া পাইয়াছিল সুরবালার সহজ, সরল আত্মদান ও ভালবাসা দেখিয়া। সুরবালার সংশয়লেশহীন, অন্ধ ভালবাসা ও উপেন্দ্রের স্বচ্ছ, কঠিন পবিত্রতা তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামীর অকাল-মৃত্যুতে তাহার স্বাধিকার-চ্যুত নিষ্ফল প্রেম উপেন্দ্রকে ঘিরিয়া কল্পনার জাল বুনিতে লাগিল। উপেন্দ্রের অবিশ্বাস ও ঘৃণায় কিরণময়ীর অন্তঃবিদ্রোহ তাহাকে আবার বিপথে প্রেরণ করিল। দিবাকরের নিকট যে মুখখানি করুণা ও স্নেহ-হাস্যে উজ্জ্বল ছিল, তাহা ক্রমে অসঙ্কোচে অতুল রূপযৌবনের দর্শনের সহিত তাহাদের বিষও ঢালিতে লাগিল। অথচ উহারই চক্ষুর ক্ষুধায় উহার মুখের প্রেম-নিবেদনে সে লজ্জায় শিহরিয়াও উঠিয়াছে। কিন্তু উহার অবহেলাও সহ্য করিতে পারে নাই। সমাজকে, ধর্ম্মকে ব্যঙ্গ করিয়া, স্বাভাবিক নারীত্বকে পদদলিত করিয়া, কিরণময়ী যেমন সংসার-অনভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী, বিভ্রান্তচিত্ত দিবাকরকে রূপ ও ভালবাসার মিথ্যা মোহে প্রতারিত করিয়াছিল, সেরূপ পাপের সহিত নিষ্ফল ক্রীড়া করিতে যাইয়া আপনাকেও ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। এই

নিষ্ফল ক্রীড়ায় কিরণময়ী ও দিবাকরের রহস্যালাপে এমন সব লালসার ইঙ্গিত আছে, যাহা কিরণময়ীর চরিত্রকে এইস্থলে অতি সংক্রামক করিয়া ফেলিয়াছে। কিরণময়ী কিছু হয়ও নাই, তাই সে কিছু পায়ও নাই। কিরণময়ীর শেষের অধঃপতন ও বিকার যেরূপ অস্বাভাবিক, তাহার শেষের উন্মত্ততা, তাহার আস্তিকা-বুদ্ধির উন্মেষ ও তাহার জড়তাও সেইরূপ মামুলী। কিরণময়ীর চরিত্রাঙ্কনে শিল্প হিসাবে তাহার হঠকারিতা তত দোষের নহে, যত দোষের এই লক্ষ্যচ্যুতি।

প্রত্যাখ্যাত প্রেম প্রতিহিংসা এমন কি জিঘাংসায় পরিণত হইতে পারে। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মধ্য-যুগের মোগল, তুর্কী, স্লাভ অথবা ইটালীর জীবন ও সাহিত্যে অনেক আছে। কিন্তু সেখানে লালসার ক্ষুধা, তাহার আনুষঙ্গিক ক্রূরতা প্রেমের বিশিষ্ট উপাদান নহে—সেখানে অনেক স্থলে প্রত্যাখ্যাত প্রেম প্রচ্ছন্ন ভাবে অভিমানের ভিতর দিয়া নূতন প্রেম বা লিপ্সার আকারে দেখা দেয়। এই অভিমানের মূল তখন হয় প্রেমাস্পদকে আঘাত দেওয়া এবং ইহার তাড়নায় প্রত্যাখ্যাতা রমণী আপনার মানসিক ও দৈহিক সর্ব্বনাশও করিতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রত্যাখ্যাতা রমণীর চিত্রকে এমন বন্ধ্যা হইয়াছে যে, সে প্রেমাস্পদ এবং পাঠক উভয়ের নিকট অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র হয়, তাহা সাহিত্য শিল্পের পক্ষে অস্বাভাবিকতার পরিচায়ক। জীবনের দিক দিয়াও তাহা বস্তুতন্ত্রহীন ও অসত্য। কিরণ ময়ীর ক্ষেত্রে এই সকল দোষই বিদ্যমান। তাহা ছাড়া, কিরণময়ীকে যে ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহাতে তাহার প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসা ও প্রেম-অভিমানের চিহ্ন তাহার মধ্য-জীবনে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

যতদিন কিরণময়ী তাহার মধ্য-জীবনের উদ্দাম কল্পনার কেন্দ্র উপেন্দ্রকে ত্যাগ করে নাই, ততদিন তাহার বিষ ও হুল থাকিলেও তাহা মৌমাছির ন্যায় সত্য ছিল। কিন্তু যখন আরাকান-যাত্রার সূচনা হইতে সে আবার কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হইল, তখনই সে শিল্প হিসাবে অসত্য এবং নিজ চরিত্র হিসাবে সে নিতান্ত অস্বাভাবিক, বিকৃত হইল।

প্রথমে উপেনের প্রতি আকর্ষণ। দ্বিতীয় তাহা হইতে বিকর্ষণ এবং দিবাকরের প্রতি আসক্তি এবং তৃতীয় পুনর্ব্বার উপেন্দ্রের নিকট তাহার নিষ্ফল প্রত্যাগমন—এই তিনটির মধ্যে সাহিত্য-শিল্পের অস্বাভাবিক কার্য্য-কারণ ও সংলগ্নতার সূত্র খুব কৃশ ও দুর্ব্বল। তাহার পর হইতে "চরিত্রহীনে" আসল নায়িকা সাবিত্রীর চিত্তবিক্ষেপের পরিণতি ছাড়িয়া একটা episode বা প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী লইয়া পড়িলাম। আসল গল্প ও চরিত্রগুলি পিছাইয়া পড়িল, আমরা একটা স্নায়বিক বিক্ষেপের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ও প্রতারিত হইয়া গেলাম। উপেন্দ্র গল্পের দুই স্বতন্ত্র অংশের সংযোজক; কিন্তু দ্বিতীয় অংশটুকু উপেন্দ্রের সংযোজক শক্তিকে ত্যাগ করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথমকার জীবনের নিষ্ফল বিবাহিত জীবন ও স্বার্থান্ধ প্রেম যেমন কিরণময়ীর অধঃপতনের পথ সুগম করিয়াছে, সেরূপ বঙ্গ নারীর অন্তঃপুর জীবনের ধারা ও সম্বন্ধের বৈষম্য-কারক একটা বস্তুতন্ত্রহীন শিক্ষাও সেই পথকে কিরণ-ময়ীর পক্ষে আরও সহজ ও পিচ্ছিল করিয়া দিয়াছিল। কিরণময়ীর মনোগত বিবর্ত্তকে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও আবেগ অপেক্ষা তাহার নিরপেক্ষ ও কূট বিচার পরায়ণ বুদ্ধিই অধিক নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহার পাপও সম্পূর্ণ মনোগত; ইহা তাহার দেহকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, এবং সেই পাপের পরিণামও অন্তিমের সেই প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলোপেই সাধিত হইয়াছে। কিন্তু দেবদাসে আমরা দেখি, প্রবৃত্তি-মূলক পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ বিপরীত,—উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাকৃত দেহের সর্ব্বনাশে; অথচ শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞান স্বাভাবিক থাকিয়া কিরণময়ীর প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা এই চিত্রকে আরও ভীষণ করিয়াছে। কিরণময়ীর চরম অবস্থায় আমরা তাহার বুদ্ধির জড়তা ও আচ্ছন্ন ভাব দেখি (dementia), কিন্তু এই ধরণের বুদ্ধি ভ্রংশ অপেক্ষা একটা উগ্র, উচ্ছৃঙ্খল, কল্পনা-প্রবণ উন্মাদ বা মতিভ্রম (mania) তাহার hallucinationর পক্ষে স্বাভাবিক হইত। সাহিত্য-শিল্পের দিক হইতেও তাহাতে উচ্চতর অঙ্গের সৌন্দর্য্য ও সিদ্ধি লাভের সুবিধা হইত। কিরণ-ময়ীর শিক্ষা ও জীবনের বিরোধের সমস্যা বাংলার শিক্ষিত গৃহে-গৃহে অবশ্য আরও নূতন ভাবে উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধান বাংলার ভাবী সাহিত্যে অন্তঃপুর-জীবনের পরিসর বৃদ্ধি ও শিক্ষার উপযোগী সংস্কারে প্রতিফলিত করিবে। আজকালকার গল্প-লেখকদিগের শিক্ষাবিকৃতা গৃহ-বধূকে তিরস্কার, চোখরাঙানি এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা

অন্যতমা মামুলী গৃহিণীর উদাহরণ প্রদর্শনে নিরস্ত করিবার চেষ্টা হাস্যাস্পদ। শিক্ষাকে তিরস্কার না করিয়া শিক্ষা কি ভাবে গৃহধর্ম্মে নারীত্ব ও মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনে নিযুক্ত হইবে, তাহাই ভাবিবার কথা।

কিরণময়ীর অধঃপতনের একটা কারণ উপেন্দ্রের নির্ম্মম অসহিষ্ণুতা। এ হিসাবে সতীশের চরিত্র উপেন্দ্রের অপেক্ষা আরও উচ্চ। সুবালার মৃত্যুর পর, উপেন্দ্রের পরিবর্ত্তন আসিল। উপেন্দ্র আর সে উপেন্দ্র নাই। এখন সহস্র অপরাধেও তিনি অপরাধ ল'ন না। এখন শুধু তিনি মানুষের বিচারক ন'ন, তিনিও মানুষের সঙ্গে মানুষ। তাই সাবিত্রীকে তিনি যে ভাবে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহারই অনুরূপ দয়া ও মমতা কিরণময়ীকে দান করিতে পারিলে সে তাহার চরম দুঃখ ও বেদনা হইতে রক্ষা পাইত। কিরণময়ীর চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা জটিল; তাহার রূপ-গুণ সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র, দুর্নিবার। তাই সকলের অপেক্ষা তাহার দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন খুব দ্রুত ও একান্ত সকলের অপেক্ষা তাহার কথোপকথনে, তাহার গৃহ ও সেবা-ধর্ম্মে, তাহার বিশ্রম্ভালাপে, তাহার অধঃপতনে একটা বিহ্বলতা, একটা উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়। নিদারুণ সমস্যার অভিঘাতে সে অহর্নিশ সংক্ষুব্ধ, ভীত, ত্রস্ত; তাই শেষ সময়ে অসহ্য বেদনা-নিপীড়নে তাহার মাথার চুলগুলা রুক্ষ, বিপর্য্যস্ত; বস্ত্র ছিন্ন ও মলিন। সাবিত্রীর চরিত্রে ইহা অপেক্ষা ধৈর্য্য গরীয়ান্, ও সেবাপরায়ণতায় মহীয়ান্। তাহার প্রেম সলজ্জ ও মৌন, এবং তাহার ব্যর্থতা বিদ্রোহের ইন্ধন না জোগাইয়া শুধু দুঃখ ও সেবার ভাবই জাগাইয়া দিয়াছে। কিরণময়ীর চরিত্রটা প্রথম দৃষ্টিতে বুঝা যায় না; তাহার কারণ তাহার চিত্ত একবারে বুদ্ধি-প্রধান; তাহার জীবনের অভিপ্রায় ও ঘটনাসমূহ এই সূক্ষ্ম ও সজাগ ও নিঃসঙ্কোচ বুদ্ধির দ্বারা চালিত, এবং সেই জন্য পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে খুব জটিল এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে জটিলতর হইয়াছে।

কিরণময়ীর পাপ তাহার উচ্চশিক্ষা ও বুদ্ধির উপর চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত না হইলেও, সে বিচার আমরা করিব না। শিক্ষা যে পাপকে নূতন নূতন আকার দিতে পারে, তাহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু কিরণময়ী ও দিবাকরের আরাকান-যাত্রা এবং আরাকানের বাস্তব জীবনের ভিতর তাহার পাপ ও তাহার অবস্থা যে নিকৃষ্ট ও গর্হিত রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে উচ্চশিক্ষা বা বুদ্ধির সহিত একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্য আছে। এই কদর্য্য পরিণামে কিরণময়ীর প্রতি একটা ঘৃণা আসে;—ইহা শিল্পেরই দিক দিয়া একটা বিশেষ ত্রুটি। ইহা ছাড়া তাহার বাহ্য ব্যবহারের সহিত তাহার অন্তরের জীবনব্যাপী বিরোধ, যাহা তাহার অদ্ভুত শিক্ষা ও প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির পরিমাণ না জানিলে অনধিগম্য। তাহাকে সুচারু ও সুসঙ্গত ভাবে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করা শিল্পীর পক্ষে অতি দুরূহ কাজ, এবং তাহার শেষ পরিণতি একটা বিদ্রোহের পর শান্তিতে পরিণত করা প্রায় এক রকম অসাধ্য-সাধন। স্ত্রী-চরিত্রের ব্যবহারে এই বিপরীত ভাবের সমাবেশ কিরণময়ীর মত Anna Kareninaতে প্রকাশিত হইয়াছে; এবং উভয়েরই প্রকৃতিতে বুদ্ধির ঝাঁঝটাই বেশী।

কিরণময়ীর চরিত্রাঙ্কনে অস্বাভাবিকতা এইখানে, যে কিরণময়ীর সজাগ বুদ্ধিটা দিবাকরের সহিত অভিযানের কালে তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ আবেগে একবারে আবিল, এমন কি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এইখানেই শিল্পীর কিরণময়ীর একবারে বিনাশ সাধন হইয়াছে। একদিকে যেমন তাহার বিদ্রোহটা এই হেতু অস্বাভাবিক ও বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, অপর দিকে বিমলা ও বিনোদিনীর মত তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের উপযোগী বৃত্তিনিচয়ের স্বাভাবিক পরিণতিরও ইতিহাস আমরা লেখকের নিকট পাই নাই। বিনোদিনী, বিমলা ও কিরণময়ীর ভিতর স্নায়বিক ক্ষোভটাই স্থায়ী হইয়া যায়, কারণ তাহাদের প্রত্যেকের প্রত্যাবর্ত্তনে কোথাও সেই Tolstoyর Anna Karenina অথবা Strindburgএর Henrietta বা Mauricaএর অসহ্য মানসিক বিপ্লব ও যন্ত্রণা নাই। এই সকল ক্ষেত্রে নিদারুণ ক্লেশের ভিতর দিয়া স্বাভাবিক বৃত্তির একটা রূপান্তরের করুণ ইতিহাস ফুটাইয়া তোলা সাহিত্য-শিল্পের আদর্শ; বাহিরের কৃত্রিম প্রত্যাবর্ত্তন বা কল্পিত বৈরাগ্য আনয়নে শিল্পের সহজ মীমাংসা হইতে পারে, কিন্তু তাহা জীবন্ত ও বস্তুতন্ত্র নহে। দুর্জ্জয় অগ্ন্যুৎপাতকে সে নীরবে সহ্য করিয়াছে; তাহার নীরবতাই কত দুঃখ ও সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া শেষে তাহাকে সকলের সর্ব্বংসহা আশ্রয়দাত্রী রূপে পরিণত করিয়াছে। সাবিত্রীর প্রকৃত পরিচয় না পাইয়াই ত সতীশের এত নৈরাশ্য ও উন্মাদনা। অন্ধ এক রাত্রে যদি

সাবিত্রী আত্ম-প্রকাশ করিয়া উপেন্দ্র ও সুরবালাকে সতীশের ঘরে ফিরিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলে উপেন্দ্রের শেষ জীবনটা এত দুঃখে কাটিত না, কিরণময়ী দিবাকরের এত পরীক্ষার প্রয়োজন হইত না। এই ধৈর্য্যের ছবিই 'চরিত্রহীনে'র সত্য ও সুন্দর বস্তু। Hawthorneএর Scarlet Letter এর সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। সরোজিনীর চরিত্রাঙ্কনেও যে ক্ষুব্ধ ও তিরস্কৃত প্রেম বিভিন্ন সমাজের ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া, প্রিয়তমের শত অপরাধকে বরণ করিয়া, সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাও দুঃসহ বেদনার ও ত্যাগের ভিতর দিয়া সাবিত্রীর আশীর্ব্বাদের অঞ্চলে আশ্রয় লাভ করিল। উপেন্দ্রের নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক বিশাল প্রাণ ও উপেন্দ্র সুরবালার বিবাহিত-জীবনের সহজ মধুর প্রেম যেমন নৈরাশ্যের অন্ধকারে গল্পের বাসনা ও সুখ, দুঃখ ও বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছে, সেইরূপ সতীশ, সরোজিনী, দিবাকর ও শচীর চিত্রও গল্পের সমাপ্তিতে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ রজনীর পর শান্ত সূর্য্যোদয়ের মত ফুটিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য এই, বিধি-নিষেধ-বিপর্য্যস্ত প্রেমের সফলতা হইলে সমাজের কোলে বিবাহিত জীবনের প্রেমকে আশ্রয় করিয়া, সাবিত্রী বাহির হইতে উহাকে বুকে করিয়া রাখিল, কিরণময়ী বাহিরে যাইয়া উহাকে বুকে করিতে না পারিয়া পাগলিনীর মত বেড়াইতে লাগিল। অনেকে বলিয়াছেন, আর্ট এখানে লোকাচারের উপরে উঠিতে না পারিয়া আপনাকে হীন করিয়াছে। কিন্তু ইহাও ভাবিবার কথা। আর্ট যে শুধু সৃষ্টি করে তাহা নয়, সৃষ্টি-রক্ষাও করে। যাহাকে সহজ ভাবে দৈনন্দিন জীবনে সকলে পায়, তাহাকে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিলে, তাহাকে অসুন্দরের হাত হইতে বাঁচাইয়া তুলিলে, যাহা সাধারণের জন্য নহে, যাহা বিদ্রোহের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানুষ তাহার মোহে পড়িয়া আপনাকে বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ করিবে না। সৃষ্টি করা অপেক্ষা সৃষ্টি রক্ষা করা কাজটাই কঠিন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য-শিল্পীর ইহাই অধিক ভাবিবার বিষয় যে, ত্যাগ কোন্ উপায়ে জীবনের বিকাশ ও রূপান্তরের সহায় হইয়া সৃষ্টি-রক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে। বাহিরের দিক দিয়া হঠাৎ ত্যাগ, অথবা কৃত্রিম বিধি-নিষেধের ব্যবস্থাপিত ত্যাগ, কেবল ত্যাগই মাত্র; উহাতে সৃষ্টির রক্ষাও নাই, বিকাশও নাই।

শরৎবাবুর সাহিত্যে কি আছে, তাহা লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করিলাম; কি নাই, তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। বঙ্কিমের সে জীবনের অভিজ্ঞতা, সে কল্পনা, সে বিপুল প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথের সে ভাবপ্রবণতা, সে বিচিত্র জ্ঞান, সে কারুকলা তাঁহার নাই। শুধু বাংলার ভাবী সাহিত্য তাঁহার নিকট কি আশা করে, তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। জীবনের নিষ্ফল ও সংক্ষুব্ধ প্রেমের গভীর দুঃখের কথা তিনি অঙ্কিত না বিচিত্র দিক দিয়া, মনুষ্য-হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃস্থলের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতে করিতে নিঃসংশয়ে বুঝাইলেন। পতিতার দুঃখ সম্বন্ধে Dostoeffeskyর নায়ক যে Soniaর পদতলে পড়িয়া বলিয়াছিল, I prostrate myself before all suffering humanity, দেবদাস সেরূপ একদিন পতিতার বিষণ্ণ স্নেহ-কোমল মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, "আহা! সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অত্যাচার, উপদ্রব স্ত্রীলোক যে কত সহিতে পারে —তোমরাই তাহার দৃষ্টান্ত।" সমাজের কোলে, দুঃখের সংসারে নির্য্যাতনে লালিত-পালিত কিরণময়ী একদিন তাহার বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতায় উত্তপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, —"মেয়েমানুষের কখনও অসুখ হয়, না, মেয়েমানুষ মরে, কোথায় শুনেছ? অযত্নে অত্যাচারে মেয়েমানুষ মরে গেছে, ভগবান মেয়েমানুষের দেহে তা কি দিয়েছেন, যে যাবে? এ জাতকে গলায় দড়ি বেঁধে দশ-বিশ বছর টাঙিয়ে রেখে দিলেও মরে না।" নারীর প্রতি এমন শ্রদ্ধা, তাহার দুঃখে এমন সমবেদনা খুব কম লেখাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রেম এবং প্রেমের নিষ্ফলতা, নারীর অভিমান ও গোপন বেদনা জীবনের সবটা ঘিরিয়া বসে নাই। শুধু তাহাই তাঁহার নিকট হইতে পাইলে যে আমাদের একটা অবসাদ ও পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের ফলে একটা আবেগের ক্লান্তি ও ঔদাসীন্য আসিবে। সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয়-জীবন, শিক্ষা, ধর্ম্ম, ও সমূহ-জীবনে যে সংঘর্ষ, আদর্শের কত বিপ্লব, কত ভাব বিপর্য্যয়, কত অধঃপতন, কত অপমান, অবিচার, বিফল প্রয়াসের মধ্য দিয়া বাংলার জন-সমাজের প্রাণান্তকর বেদনা অহরহ জাগিয়া উঠিতেছে, বেদনার পুরোহিত তিনি ত তাহা অনুভব করিয়াছেন। নূতন আবেগের ধারা ও ভাবের বিপর্য্যয়কে তিনি নূতন উপন্যাসে প্রকাশ করুন, তাঁহার অভিনব স্নেহ ও বেদনার সহিত তাঁহার স্বভাব সুলভ আবেগ বিহ্বলতার মধ্য দিয়া, তাঁহার উত্তপ্ত, তীব্র অনুভূতি ও সমবেদনা এবং অপরূপ লিখন-ভঙ্গীর মধ্য দিয়া, বস্তুগত জীবনের প্রাচুর্য্য ও উত্তাপ তাঁহার সমস্ত লেখায় সজীবতার এই নানা বাধা ও নিরাশায় স্পর্শ দিয়া জাতির বিক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ চিত্তকে সুন্দর ও কল্যাণের পথে অনিবার্য্য বেগে ঠেলিয়া দিক।

মনে ও বনে

[শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্]

(১) উদ্দীপনা

কে গো অন্তরালে বসি' বাঁশরী বাজায় ?
বিস্মৃত মিলন-স্মৃতি ও বাঁশীর তানে
সহসা জাগিয়া মোর ঘুমন্ত পরাণে
অন্তর আকুল করে বিরহ-ব্যথায় !
শুদ্ধ সমুজ্জল হই যে প্রেম-প্রভায়,
বিশ্ব ভালবাসি আমি যে প্রেমের টানে,
সে নিত্য-প্রেমের উৎস আছে কোন্‌খানে,
শুনিলে মুরলীধ্বনি তবে বুঝা যায়।
কে বাজায়, কে বাজায় গোপনে থাকিয়া,—
কার বাঁশী বাজে ওই বন-অন্তঃপুরে,
নিত্য যার প্রতিধ্বনি উঠে উচ্ছ্বসিয়া
চিত্ত মাঝে সর্ব্ব কাজে গৃহহারা সুরে !
—মনে হয় সব ফেলি বনে যাই ছুটি,
বাঁশী যে বাজায়, তার পদতলে লুটি।

(২) অন্বেষণ

মুরলীর ধ্বনি শুনি বনে-বনে ঘুরি'
দিবস-রজনী কত হল অবসান,—
তবু না মিলিল হায় তাহার সন্ধান,
যে জন করিল মন বাঁশী-রবে চুরি।
ভ্রান্ত মৃগ শ্রান্ত যথা খুঁজিতে কস্তুরী,
বুঝিতে পারে না কোথা হতে আসে ঘ্রাণ,
মিলন-আশায় কভু ফুল্ল তার প্রাণ,—
পরক্ষণে ভাবে সবই মায়ার চাতুরী।
উত্তরে, দক্ষিণে ছুটি পশ্চিমে, পুরবে,—
উন্মত্তের মত ধাই হারাইয়া দিশা,—
কভু ফুকারিয়া যাই, কভু বা নীরবে,
বিরহে বাড়ে গো শুধু মিলনের তৃষা।
—অবশেষে বুঝিলাম বাঁশী বাজে মনে,
মিছামিছি ঘুরিলাম কাননে-কাননে।

(৩) সন্ধান

লইয়া কঠিন, শুষ্ক, ভক্তিহীন জ্ঞান—
হে অদ্বৈতবাদি, তুমি বুঝিবে কেমনে,—
শ্যামের মুরলী শুধু নাহি বাজে মনে,—
ভুবনে, ভবনে, বনে বাজে সে সমান।
ধরিত্রীর বক্ষ ভরি সে বাঁশীর তান
পরব্যোমে উঠে নিত্য গম্ভীর নিঃস্বনে ;
জীবে ভগবানে বাঁধি প্রেমের বন্ধনে,
চির রাত্রি দিনমান সাধিছে কল্যাণ।
করুণা-কটাক্ষে তাঁর শুদ্ধ হলে মন,
সাক্ষাৎ হেরিবে তাঁরে অন্তরে বাহিরে,—
বংশী-রব নিত্য তবে করিবে শ্রবণ
একসনে মনে বনে, সন্দেহ নাহি রে।
—ছুটিতে হবে না আর তাঁহারে ধরিতে,
নিজে তিনি আসিবেন তোরে ধরা দিতে।

মায়ার খেলা

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল]

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনি লিখিয়াছেন, প্রথম দর্শনেই নর-নারীর মনে ভালবাসার উদ্ভব হইতে পারে না। আপনার মতে প্রথমে বহিরঙ্গ—পরে অন্তরঙ্গ—তার পর প্রেম বা ভালবাসা। আমার মনে হয়, ইহা সব সময় ঠিক নয়। আমাদের দেশে 'চোখের দেখা' বলিয়া একটা কথা আছে, শুনিয়াছেন তো? সব সময়ে যে ভালর উপর ভালবাসা পড়ে, তা নয়। যাহা প্রকৃত ভালবাসা, তাহার কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; ভালবাসা—ভালবাসাই, তার আর 'কেন' নেই। মেঘের বুকে বজ্রাগ্নি থাকিলেও, চাতক তাহারই কাছে 'ফটিক জল' যাচে। যে ভালবাসে, সে কি বুঝাইতে পারে, কেন ভালবাসে? যাহার যাদু প্রভাবে কুৎসিত সুন্দর হয়, তাহাতে আর বুঝা-বুঝির প্রয়োজন কি? আপনি বলিয়াছেন, "বাহিরের মানুষটা আমাদের চক্ষু আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু আমরা ভালবাসি ভিতরের আসল মানুষটাকে; আর সে মানুষটাও খাঁটা হওয়া চাই।" ভগবৎ-প্রেম স্বতন্ত্র প্রকৃতির,—সে সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। যে ভালবাসা মায়িক, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়। এই মায়িক ভালবাসা, আমার বোধ হয়, সম্পূর্ণ ই মায়ার খেলা। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া আমাদের ভেল্‌কী লাগিয়ে দেয়। আমরা কি ভালবাসি, কেন ভালবাসি, কিছুই বুঝিতে পারি না। আমার কথার সমর্থন করিবার জন্য কোনরূপ তর্ক যুক্তি উত্থাপন করিব না। ইংরেজেরা একটা কথা বলে যে, ঘটনার ন্যায়-যুক্তি অকাট্য। ঘটনাই তাহার প্রমাণ। আমি একটী ঘটনা বলি, শুনুন :—

আমাদের পাড়ার বেণী হালদারকে আপনার মনে আছে কি? সেই যে সেই কঞ্জুষ, সুদখোর, কৃপণ! ভগবানের বিচিত্র লীলা কিছু বুঝা যায় না। বুড়ো হালদার যেমন একটী পয়সাকে তাহার বুকের এক ফোঁটা রক্ত জ্ঞান করিত, ভগবান তেমনি তাহার খরচের সকল পথও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধের স্ত্রী-পুত্র কেহই ছিল না—ছিল কেবল সে নিজে, আর তাহার এক দূর-সম্পর্কীয়া শ্যালী। এই শ্যালী সম্বন্ধেও একটু ইতিহাস আছে। বৃদ্ধ বেণীর কাছে ঋণ গ্রস্ত হইয়া এই শ্যালীটীর পিতা কালীপদবাবু হঠাৎ মারা যান। মরিবার পূর্ব্বে ভদ্রলোক বেণীকে ডাকাইয়া, তাঁহার বাড়ীখানি ও মাতৃহীনা কন্যাটীকে বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করেন। তাহাতে সর্ত্ত এই থাকে যে, বেণী কালীপদর বাড়ীখানি বেচিয়া অগ্রে আপনার পাওনা উসুল করিবে,—তার পর এই কন্যাটীর, অর্থাৎ কুমুদিনীর বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা কিছু বাকী থাকিবে, তাহা কন্যা-জামাতাকে দিবে। কালীপদ একটী জামাতাও মনোনীত করিয়া গিয়াছিল। বেণী কুমুদিনীকে আনিয়া আপন গৃহে স্থান দিল;—মনে করিবেন না, দয়ায়! কন্যাটীর যে খাওয়া-পরার খরচ লাগিত, বেণী সেই বাড়ী-বেচার টাকা হইতে তাহা কাটিয়া লইত। কুমুদিনী আসিতেই বেণী পাচক ছাড়াইয়া দিল; এবং যে ঠিকে ঝী সংসারের কাজ করিত, তাহাকে জবাব দিয়া কুমুদিনীকে পাচক, পরিচারিকা ও সংসারের তত্ত্বাবধারিকার পদে নিযুক্ত করিল। কুমুদিনীর পিতা তাহার জন্য যে পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সারদা। ছেলেটী কনট্রাক্টারী করিত।

কুমুদিনীকে গৃহে স্থান দিয়া, বেণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িল সারদার উপর—অথবা তাহার দুইখানি বাড়ীর উপর। সারদার পিতা কনট্রাক্টারী করিয়া এই দুইখানি বাড়ী করিয়া গিয়াছিলেন; নগদ টাকা কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বৃদ্ধ বেণী একদিন সারদাকে ডাকাইয়া বলিল, "ভায়া হে, আজ-বাদে-কাল বিবাহ করবে, ছেলে-পুলে হবে, মস্ত সংসার ঘাড়ে পড়বে,—এমন করে ঢিমে-তেতালা বাজালে ত চলবে না। এক-আধটা বড় রকম কনট্রাক্ট নাও। তোমার যা আয়, তাতে চলবে কি করে?"

সারদা ছেলেটী বড় স্পষ্ট-বক্তা ও নির্ভীক। কুমুদিনীর

সহিত ছেলেবেলা থেকে ভাব ; এবং এরূপ ক্ষেত্রে যা হয়,—দুজনে একটু ভালবাসাবাসিও জন্মিয়াছিল। বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তর দিল, "আজ্ঞে, বড় কন্‌ট্রাক্‌ট্‌ নিই কোন্‌ সাহসে? আমার তো নগদ টাকা কিছু নেই!"

বেণী বলিল, "ভায়া, যে খেলতে জানে—সে কাণা কড়িতে খেলে ; আর যে পাকা রাঁধুনী—সে শূন্য হাড়ীতেও ভাত রাঁধে। নাই বা রহিল টাকা! আরে, আত্মীয়-স্বজন আছে কি করতে? আমি আছি কি করতে? তোমরা দুজন ছাড়া আমারই বা আছে কে? টাকা নেই, আমি এড্‌ভান্স্‌ করছি।"

সারদা প্রমাদ গণিল! হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "আপনি দেবেন?"

"কেন, সন্দেহ করছো কেন?"

"আজ্ঞে, সন্দেহ নয়।"

"তবে কি?"

ছোঁড়াটা দেশ, কাল, পাত্র, বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করিয়া বলিয়া বসিল, "সন্দেহ নয়—ভয়।"

বেণী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভয়? কিসের ভয়।"

"আজ্ঞে, লোকে বলে যে, আপনার খপ্পরে একবার পড়লে আর ওঠা যায় না।"

অন্য লোক হইলে এ কথায় অপ্রতিভ হইত। বেণী একটু গন্ধ অনুভব করিল, বলিল—"বটে! কিন্তু, তোমার তা'তে ভয় কি? বুঝে দেখ, আমার তো আর তিন কুলে কেউ নেই,—আমি মলে, যা কিছু আছে, সবই তো তোমরা পাবে!"

আশা যাদুকর। সারদা তাহার কথায় ভুলিল; এবং, বলা বাহুল্য, এক বৎসরের ভিতর তাহার দুইখানি বাড়ী যেন ভোজ-বাজীতে উড়িয়া গেল,—কিন্তু কেবল কন্‌ট্রাক্‌টারী কার্য্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নহে। সারদা অতি উদার হৃদয়, পর-দুঃখ-কাতর, দানে মুক্ত-হস্ত, পরোপকারে দধিচী। তাহার এক প্রতিবেশীর কন্যাদায়ে এবং ঋণ হেতু এক বন্ধুকে উদ্ধার করিতে তাহার একখানি বাড়ী যায়। এ দিকে, অর্থাভাবে সময়-মত কন্‌ট্রাক্‌ট্‌ সমাধা করিতে না পারিয়া, সে ক্ষতি-পূরণের দায়ী হইল। যাহা হউক, বাড়ী দুইখানি বেণীর নিকট বিক্রয়-কবলায় বন্ধক রাখিয়া আপাততঃ দায় হইতে মুক্তি লাভ করিল বটে, কিন্তু উন্নতির আশা-ভরসা সকলই ফুরাইল। কন্‌ট্র্যাক্‌টের ক্ষতি-পূরণ করিতে না হইলে, একখানি বাড়ী বাঁচিত; কিন্তু বেণীর চক্রান্তে তাহা ঘটিল না। নিরুপায় সারদা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বেণীকে বলিল, "কালীপদ বাবুর বাড়ী-বেচার উদ্বৃত্ত টাকা তো কন্যা-জামাতার প্রাপ্য?"

"অবশ্য! এ কথা জিজ্ঞাসা করছো কেন?"

"আমি তাঁর কন্যাকে বিবাহ করবো বলে প্রতিশ্রুত আছি।"

বেণী বলিল, "বেশ!"

"তা হলে আসছে মাসের প্রথম লগ্নটাই স্থির করা যাক্‌?"

বেণী বলিল, "ভাল! কিন্তু বাড়ী-বিক্রির কত টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে, মনে কর?" বলিয়া বেণী সারদার হাতে একখানি ফর্দ্দ দিল। সারদা দেখিল, সুদের সুদ কষিয়া বেণী আপনার পাওনা উসুল করিয়াছে। বাকী টাকা কুমুদিনীর খাওয়া-পরা হিসাবে মাসে-মাসে কর্ত্তিত হইয়া বৃদ্ধের কিছু পাওনা হইয়াছে। সারদার আর ধৈর্য্য রহিল না। ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, "আপনি শয়তান! লোকে যা বলে, তা ঠিক্‌! আমি জেনে-শুনেও যে কি করে আপনার ফাঁদে পড়লুম, সেই আশ্চর্য্য! তা যাক, যা হবার হয়ে গেছে,—আপনার ঋণ আর আমি বাড়াবো না। আমি আসছে মাসের প্রথম লগ্নেই বিবাহ স্থির করবো। আর আপনার পাওনা টাকা আমি যেমন করে পারি চুকিয়ে দেবো।"

বেণী একিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, "তাতো দেবে, কিন্তু পরিবারকে খাওয়াবে কি?"

"সে ভাবনা আপনার নয়।"

"আমার নয় তো কার? তুমি জান, আমি এখন কুমুদের অভিভাবক। কালীপদ আমার আত্মীয় ছিল,—আমি কি তার মেয়েকে জলে ভাসিয়ে দোবো? শেষে কুমুদ বলবে যে, জামাই বাবু আমাকে একটা লক্ষ্মীছাড়ার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোলো।"

সারদা অকূল সাগরে একটুখানি আশ্রয় পাইয়া বলিল, "সে যদি তা না বলে, তা হলে তো আর আপনার কোন আপত্তি নেই?"

বেণী হাসিয়া বলিল,—"না বলে কি ভায়া, বলেছে! শুধু বলেছে নয়, আমার পায়ে ধরে কেঁদে বলেছে, 'জামাই বাবু, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ভাসিয়ে দিও না। আমি তোমার এখানে চিরজীবন রাঁধুনীবৃত্তি করে থাবো, সেও ভাল।' সারদার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত চলিয়া গেল। কিন্তু অল্পক্ষণেই সে ভাব সামলাইয়া একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল। বৃদ্ধ বেণীর মনে হইল যে, সেই প্রবল নিঃশ্বাসের জোরে বুঝি তার জীর্ণ ঘরখানা ভাঙ্গিয়া পড়ে! নিরতিশয় আনন্দে সারদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এখন কি বল ভাই?" "কিছু না" বলিয়া সারদা উঠিল। ঠিক সেই সময়ে কুমুদিনী দ্রুত-পদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, উভয়ের সমক্ষে একটুকরা লেখা কাগজ ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। উভয়েই বিস্মিত নেত্রে দেখিল, কাগজে লেখা, "বাবা আমাকে যাঁর দাসী বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন, তাঁর পায়ে আমাকে সমর্পণ করিয়া দিন্।"

সারদা আসিবার পর কুমুদিনী দ্বারের অন্তরাল হইতে উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। বেণীর কর্কশ ব্যবহার, সামান্য ত্রুটীতে অসামান্য তিরস্কার, তাহার ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। তারপর বেণীর মুখে তাহার নামে এই নির্লজ্জ মিথ্যা অপবাদ শুনিয়া সে স্থির থাকিতে পারিল না। লজ্জা সরম, উচিত-অনুচিত, সব ভুলিয়া কিশোরী বালিকা এই উপায় অবলম্বন করিল। এইবার গর্ব্বিত সারদা বিজয়-উল্লাসে বেণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আপনি কি বলেন?"

বেণী একটু শয়তানী হাসি হাসিয়া ঠিক সারদার স্বর ও ভঙ্গী অনুসরণ করিয়া জবাব দিল, "কিচ্ছু না।" "তাহলে আসছে মাসের প্রথম লগ্নই স্থির?" বেণী বলিল, "উত্তম।"

সারদা চলিয়া গেলে বেণী বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল —"বোধ করি, একেই বলে ভালবাসা! তা' নইলে সে জিনিসটা আর কি? কিন্তু ছুঁড়ীটাকে তো কিছুতেই হাত-ছাড়া করা হতে পারে না। এই ভাঙ্গা বাড়ী,—দিনরাতই ঝুর-ঝুর করে বালি খসে পড়ছে; কিন্তু যখনই দেখি, পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন! কাপড়গুলো সাজো করে,—যেন সদ্য ধোবা ঘর থেকে এলো। বাসনগুলো মাজে, যেন রূপো ঝক্-ঝক্ করে। তার পর একটা থোড়-ছেঁচ্‌কী দিয়ে এক-থালা ভাত খেয়ে ফেলা—ও না রাঁধলে কারো বাবারও সাধ্যি নেই। তবে পুষতে হচ্ছে এই যা। নইলে ঝী-রাঁধুনীর মাহিনা দিতে হয় না, ধোবার খরচ তো একবারেই নেই। ঠিক্ আমার ধাত ও বুঝে নিয়েছে। তরকারীগুলো কোটে যেন সরু সরু কেঁচোর মত, আর পাতলা যেন ঝিঁঝেঁর পাত। বাঃ—বাঃ, এমন মেয়েকে কি হাত-ছাড়া করা যায়? কিছুতে না আট্‌কাতে পারি, আমিই বে করে ফেলবো।" ভাবিয়াই বুড়ো হালদার আপনার এই আকস্মিক মতলবে আপনি চমকিয়া উঠিল! পুনরায় ভাবিতে লাগিল, "আরে! এ মতলব এতদিন মাথায় উঠেনি? তা'হলে দেনার দায়ে ছোঁড়াকে শ্রীঘরে পোরবার বন্দোবস্ত করতুম। বাঃ—বাঃ! শুধু তাই নয়,—কুমুদকে আমি বে করলে, ছোঁড়ার বুকে যা ঘা লাগবে!—কিন্তু ছুঁড়ীটাকে দেখলে, শ্যালী হলেও, মেয়ের মতন বোধ হয়। ১৪।১৫ বছর বয়স হলেও নেহাত কচি। তা হলোই বা!—আমার ধোবার খরচ বাঁচান, আর একটা থোড়-ছেঁচকীর দরকার বৈ তো নয়! আচ্ছা, ঐ খুদে মেয়েটাতে ছোঁড়া কি এমন দেখে যে, ওকে বে করতে চায়? রং?—আচ্ছা, আমি মেনে নিলুম, ধব্‌ধবে বটে! কিন্তু আনকোরা টাকার চেয়ে ত নয়! স্বীকার করে নিলুম, সাকারা সুন্দরী। কথাগুলো টাকার আওয়াজের মত যেন ঠুন-ঠুন করে। কিন্তু তাতে ভুলে যাবার, ভালবাসবার মতন কি আছে? কে জানে বাবা! আমারও এককালে বয়স ছিল; কিন্তু গিন্নিকে কখন ভাল-বাসতে পারি নি! ভালবাসাটা কি? ছোঁড়ার মনটা আর চোখ-দুটো পেতুম, তো দেখতুম, ও ছুঁড়ীতে এমন কি দেখেছে যে, ভালবাসতে হবে।"

ইহার কিছুদিন পরে "মঙ্গল হউক" বলিয়া এক জটা-ধারী সন্ন্যাসী কক্ষে প্রবেশ করিল। তেজঃপুঞ্জকায়, উজ্জ্বল চক্ষু, দৃঢ় বলিষ্ঠ গঠন দেখিয়া বুড়ো হালদার ভাবিতে লাগিল, "বেটাকে দশ বছর আগে যেমন দেখেছিলুম, ঠিক তেমনিটাই আছে। কি করে এমন শরীরটা রাখে?" বিনা অনুরোধে সন্ন্যাসী আসন-গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি জ্বালামুখী যাবার মানস করেছি।"

বেণী বলিল, "যে আজ্ঞে, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "কিন্তু আপনি একটু মনোযোগ না করলে তো যাওয়া হয় না।" এবার বেণী সত্য-সত্যই বিস্মিত হইল—বলিল, "আমি! আপনি যাবেন জ্বালামুখী,

—তা আমি কি মনোযোগ করবো ? আমার চেয়ে রেলওয়ে কোম্পানির মনোযোগ বেশী দরকার।" "আজ্ঞে হাঁ, সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি। আমি এই পাড়ার দ্বারিকা বাবুর কাছে এসেছিলুম, তা তিনি বললেন, আপনি খুব মুক্ত-হস্ত।"

বেণী ভাবিল, দ্বারকে বেটা যখন তখন আমার এই-রকম অপবাদ দেয়। আচ্ছা, বেটার মেয়ের বের দিন ঠিক ডিক্রিখানা জারী করবো। সন্ন্যাসীকে বলিল, "যে আজ্ঞে, তার পর ?" "আজ্ঞে, তার পর আর কি !—রেল-ভাড়া প্রায় বারোআনা রকম জোগাড় হয়েছে। বাকী সিকির জন্য আপনার কাছে এসেছি।" "তা বেশ করেছেন! আপ্যায়িত করেছেন! অতি পরিপাটী করেছেন! কিন্তু আপনি দেখছি সন্ন্যাসী,—আপনারা ভূত ভবিষ্যৎ জানতে পারেন,—এটা কি জানতে পারেন নি যে, এখানে কিছু হবে না।" "আজ্ঞে, হবে জেনেই এসেছি।"

বেণী সাধুকে ঠাট্টা করিতেছিল। যোগবল বা অন্য কোনরূপ আধ্যাত্মিক শক্তির উপর তাহার কোন আস্থাই ছিল না। সন্ন্যাসীকে মনে করিল, ভণ্ড। লোকটা আর কখন না আসে এমনি অপ্রতিভ করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা, ঠাকুর, যোগবলে কি হয় ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "কি না হয় তাই বলুন!" "আহার না করে শরীর টিকিয়ে রাখা যায় ?" "যায়।" "মনে করলেই একস্থান থেকে আর একস্থানে যাওয়া যায় ?" "যায়।" "মাটীকে সোণা করা যায় ?" "অতি সহজে!" "আপনি পারেন তা ?" "গুরুর কৃপায় পারি।" "আচ্ছা কই করুন।" "গুরুর নিষেধ।" "কেন ? পরের ঘাড়ে রেল ভাড়া চাপাবার জন্যে ?" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "আপনি দেখছি কিছুই মানেন না।" "আপনি ঠিক ঠাউরেছেন। আপনি দেখছি মনের কথাও জানতে পারেন।" "আজ্ঞে, সবই গুরুর কৃপা।" "আচ্ছা, একটা কথা যদি বলতে পারেন,—আপনার অর্দ্ধেক রেল-ভাড়া আমি দেবো।" "মশায়, আমি বুজরুকী করে নিতে আসিনি। তবে যোগ-শক্তিতে যদি সত্যই আপনার আস্থা স্থাপন করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা হলে বলতে পারি।" "আজ্ঞে হাঁ তাই, তাই! আমার খুব ইচ্ছা হয়েছে!"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "আপনি এখনও ঠাট্টা করছেন। আচ্ছা, যদি বলি যে, আপনি দিনরাত ভাবছিলেন—একজন যুবা একটী কিশোরী কন্যাকে কি চক্ষে দেখে,—আর আপনার ইচ্ছা হচ্ছিল, যদি সেই যুবার মতন মন আর চোখ পান।"

বৃদ্ধ বেণীর মুখ শুখাইয়া গেল! কিন্তু তখনই ভাবিল, সেই ছোঁড়াটা চর পাঠাইয়াছে। কিন্তু না,—তাই বা কি ক'রে হবে! সারদা কি ক'রে জানবে আমি কি ভাবছিলুম ? সন্ন্যাসী বলিলেন, "কথা কন না যে ? শুধু তাই নয়, ঐ যুবাকে ফাঁকি দিয়ে, সেই কন্যাটীকে আপনার বিবাহ করবার ইচ্ছা। সে যুবা আপনাকে অপমান করেছে, তাই ঠাওরেছিলেন, কন্যাটীকে বে করে যুবার হৃদয়ে আঘাত করবেন—আপনার খুব প্রতিশোধ হবে! কিন্তু মতলব-সিদ্ধির এক বাধা,—ঐ কন্যাটীকে আপনি স্ত্রীর মতন করে দেখতে পারছেন না। কেমন এসব ঠিক কথা তো ?"

বেণীর মুখে আর উত্তর সরিল না। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, "আপনি সংসারের কোন খবরই রাখেন না। কেবল টাকাই আপনার ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা, ইষ্ট। মনে করেন, টাকা সর্ব্বশক্তিমান, জগতে আর কোন সত্য বা শক্তি নাই। আছে কি না, গুরুর কৃপায় আপনাকে আমি দেখিয়ে দিতে পারি। আপনার মন আর দর্শন-ইন্দ্রিয়ের স্থলে সত্যই সেই যুবার মন আর দৃষ্টিশক্তি এনে দিতে পারি। কিন্তু আপনার এই পাপ মন আর চক্ষু কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখবো ?"

বেণী তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ঠাকুর, তোমার পুরোপূরি ভাড়াই আমি দেব,—আমার এই মন আর চোখ-দুটো যদি সেই ছোঁড়ার ভিতরে পূরে দিতে পারো! হাঁ ঠাকুর, হাঁ ঠাকুর,—চেহারাটা অমনি বদ্‌লায় না—সঙ্গে সঙ্গে।"

সন্ন্যাসী একটু রুষ্ট স্বরে বলিলেন,—"উঃ! কি প্রতি-হিংসা! বুড়ো হয়েছ, দু'দিন পরে মরবে, তোমার এ সিন্দুক-ভরা টাকা—" "বোলো না, বোলো না ঠাকুর,—সে যা হয় হবে। যদি চেহারাটা শুদ্ধ বদলে দিতে পারো, তো, পুরো-পূরি রেল-ভাড়ার ওপর আরো আট গণ্ডা পয়সা ধরে দোবো —পথ-খরচের জন্যে।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "তোমায় কিছুই দিতে হবে

না,—আমি অমনি তোমাদের দুজনের মন পরিবর্ত্তন করে দোবো,—কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়। যদি রাজি হও,—কাল সমস্ত দিনরাত উপবাস করে থাকতে হবে।"

বুড়ো বেণী ভাবিতে লাগিল, সত্যি-সত্যিই ছোড়ার চর না কি? হলো হলোই বা;—আমার একদিনের চাল খরচ তো বেঁচে যাবে।

সন্ন্যাসীর আদেশমত বেণী পরদিন নিরম্বু উপবাসে রহিল। তৎপরদিন সুপ্রভাত। হিপনোটিজম্ বা মন্ত্রশক্তি যাহাই বলুন, ঘটনা প্রকৃত। গভীর নিদ্রা হইতে বেণী জাগরিত হইয়া দেখিল, গবাক্ষের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যেন স্বর্ণশলাকা আসিয়া অন্ধকারকে চিরিতেছে! বেণী আগ্রহে একটা স্পর্শ করিল; অঞ্জলি পাতিয়া ধরিল; এ কি, এ যে কিরণ! মরি-মরি, সূর্য্যকর এত সুন্দর! বৃদ্ধ উল্লাসে জানালা খুলিয়া দিল। পূর্ব্বাকাশে তখন সবে অরুণোদয় হইয়াছে। মেঘে-মেঘে সোণার রং ফলিয়াছে। কি সুন্দর, কি সুন্দর! ইহার কাছে কি সোণার রং! ধীরে ধীরে বৃদ্ধের চক্ষু পৃথিবীতে নামিয়া আসিল। এখানেও সোণা, চারিদিকে সোণা! গৃহ, প্রাচীর, বৃক্ষশির, সব সুবর্ণ রঞ্জিত। গাছে গাছে সোণার ফুল ফুটিয়াছে, রূপার ফুল ফুটিয়াছে; পত্রাগ্রে লম্বিত নীহার হীরার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তলে শ্যাম তৃণদল,—কোথাও সবৎস গাভী চরিতেছে। মরি-মরি, এ কি স্বর তার শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে। এই কি পাখীর গান! মুগ্ধ, বিস্মিত বৃদ্ধ ভাবিতে লাগিল, "এ আমি কোথায় আসিলাম! সে সন্ন্যাসী কি যাদু জানে? যাদু-বলে আমায় কোথায় লইয়া আসিল! না—না, তা তো নয়! এই তো আমার লোহার সিন্ধুক! আর ঐ স্তূপাকার খাতা-পত্র! বেণীর ইচ্ছা হইল সেগুলাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া লোহার সিন্ধুক খুলিয়া অঞ্জলি-অঞ্জলি অর্থ দান করে! সেই সময়ে এক বাউল আসিয়া গান ধরিল;—

"ঘুরে যে দিল্লী লাহোর, ঢাকা সহর,
টাকা মোহর এনেছিলে,
খেতে না পয়সা সিকি, বল দিকি,
তার কিছু কি সঙ্গে নিলে?"

বেণী ঝনাৎ করিয়া লোহার সিন্ধুক খুলিয়া দুই-চারিটা টাকা বাউলকে দান করিল। বাউল মঙ্গল-ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া চলিয়া গেলে। বৃদ্ধ ভাবিতে লাগিল, তাই তো, এত দিন কি করিলাম;—কেবল টাকা খাটিয়া, জমা খরচ লিখিয়া, সুদ কষিয়া জীবন গিয়াছে! বিধাতার এই সুন্দর সৃষ্টি,—একদিনও চক্ষে দেখি নাই। সেই সময়ে একটা ক্ষীণা, দীর্ঘাঙ্গী কিশোরী আসিয়া ডাকিল, "জামাইবাবু!" বেণীর মনে হইল কোথায় কি যন্ত্র বাজিয়া উঠিল! বিস্মিত নেত্রে কুমুদিনীর পানে চাহিল, তার আর চক্ষু ফিরিল না। কুমুদিনী বলিল, "জামাই বাবু, গয়লা বৌ সুদ দিতে এসেছে, তার ছেলেটির বড় অসুখ বলে এতদিন আসতে পারে নি।" হৃদয়ের সহানুভূতি সূচক কোমল স্বরে বলিল, "ছেলের অসুখ, কৈ, তা তো আমায় আগে বলেনি। তুমি তাকে বলে এসো, সুদ দিতে হবে না, সেই টাকায় ভাল করে তার ছেলের চিকিৎসা করাগগে।" কুমুদিনী অবাক্! বিস্ময়ের চক্ষে চাহিতে-চাহিতে আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছিল; ভাবিতেছিল, 'ভুল শুনিয়াছি'। এই সময়ে বৃদ্ধ সাদরে বলিল, "কুমো।"

এ আবার কি! কুঁদী হইতে একেবারে কুমো!—এ যে ডবল প্রমোশনের চেয়ে বেশী! কুমুদিনী আপনার কানকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছিল, বৃদ্ধ কাতর-মিনতি স্বরে বলিল, 'আসবে না কুমো? গয়লা বৌকে বিদায় করে দিয়ে তুমি আমার কাছে এসো।" চক্ষু কর্ণের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া, আসিবার সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া কুমো চলিয়া গেল।

যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, বৃদ্ধ বেণী কুমোকে দেখিতে-দেখিতে ভাবিতে লাগিল, ইহাকে না পাইলে আমার জীবনই বৃথা! কিন্তু জোর করিব না, যদি স্বেচ্ছায় আমার হয়, তবেই! আদরে, যত্নে, সর্ব্বস্ব দানে, ইহাকে বশ করিতে পারিব না কি?

এ দিকে সারদা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াই, যে বন্ধুকে ঋণ-মুক্ত করিয়াছিল, তাহার কাছে ছুটিয়া গেল; বলিল, "টাকা দাও, নইলে নালিশ করব।" কন্যাদায়গ্রস্ত প্রতিবেশীর কাছে গিয়াও তেমনি জোর-তাগাদা করিল। পরে পথে আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিল, ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, কি সব ছেলে-মানুষী কাণ্ড করেছি! মুখের রক্ত-ওঠা টাকা, এমনি করে অপব্যয় করেছি! ছিঃ, ধিক আমাকে! পরোপকার! তবেই তো স্বর্গে গেলুম আর কি! রথ নেমে এলো

বলে! পথে পুরোহিতের সঙ্গে দেখা; তিনি বলিলেন, "গোধূলি লগ্ন প্রশস্ত।" "কার?" "আজ্ঞে, আপনার বিবাহের দিন দেখতে বলেছিলেন না?"

সারদা বলিল, "আগে থাকতে দিন দেখে কি হবে! এখনও তাদের পাকা কথা পাওয়া যায় নি।"

"সে কি!" পুরোহিত সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি—সে দিন যে বল্লেন, কালীপদবাবুর কন্যার সঙ্গে সব ঠিক-ঠাক হয়ে গিয়েছে!"

সারদা ঘৃণায় ঠোঁট বিকৃত করিয়া বলিল, "কে কালীপদবাবুর কন্যা! সে তো বেণী হালদারের রাঁধুনী! সে বৃষ-কাঠকে কে বে করবে?"

পুরোহিত "তাই তো, তাই তো" বলিয়া টিকিতে হাত বুলাইতে-বুলাইতে চলিয়া গেল।

সারদা ভাবিল, বুড়া হালদার নিশ্চয়ই সে অলক্ষ্মী মেয়েটাকে আমার ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা পাইবে। সেই সময়ে এক ঘটক আসিয়া বলিল, "এই যে সারদা বাবু! শুনলুম কাজ-কর্ম্ম সব ফেল হয়ে গেছে! একটা কাজ করুন না, কিছু পেয়ে যান। বাপের এক মেয়ে,—এখন দশহাজার টাকার গহনা দেবে,—তার পর বাপ মলে মেয়ে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী। তুলাখ, আড়াই লাখ টাকায় হাত লাগবে।"

সারদা আগ্রহে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা, কোথা?" "ব্যস্ত হবেন না! আমারই হাতে আছে; কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখি,—মেয়েটার সামান্য একটু দোষ আছে। নাকটা—" সারদা বলিল, "একটু খাঁদা তো।" "আজ্ঞে না, একটু গন্না খাঁদা—" "তা হোক! আর তো কিছু নয়?" "আজ্ঞে, আর সামান্য একটু টেরা—" সারদা তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "এই!—"

ঘটক বলিল, "আর চলে একটু খুঁড়িয়ে,—তা সে খোঁড়া নয়, একটা পা একটু ছোট বলে।"

সারদা আগ্রহে-উৎসাহে পূর্ণ হইয়া বলিল, "দেড় পেয়ে? সে খুব সুলক্ষণ! তুমি এ সম্বন্ধ একেবারে পাকা করে ফেল। আসছে মাসের প্রথম লগ্নে। যাও—যাও, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

ঘটক বলিল, "আজ্ঞে অত টাকা আপনাকে পাইয়ে দেব,—আমার বিদেয়টা কি হবে, শুনি?"

"সে সব আমি কিছু জানি নি। সে যা পার তুমি তাদের কাছ থেকে আদায় করো,—আমি এক পয়সাও দিতে পারবো না।" বলিয়াই সারদা তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া বেণীকে পত্র লিখিল:—

"আপনার বাড়ীতে যে রাঁধুনী-বৃত্তি করে, তাহাকে বিবাহ করিতে আমি ইচ্ছুক নই। আমার অন্যত্র সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।"

বেণী সে নিষ্ঠুর পত্র কুমুদিনীকে দেখাইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কুমো, কি বলো? আমার আগেকার সব দুর্ব্ব্যবহার ভুলে যাও। তখন আমায় ভূতে পেয়েছিল। আমার ঘাড়ের সে ভূতটা বোধ করি এখন সারদার ঘাড়ে চেপেছে। নইলে, সে টাকার লোভে কেন একটা ট্যারা, গন্নাখাঁদা, খোঁড়া মেয়েকে বে করতে চায়! কুমো, তুমি কি আমায় ক্ষমা করতে পারবে না? তিন কুলে আমার কেউ নেই,—মলে কেউ আহা বলবে না; বড় আশায় তোমার শরণাগত হয়েছি। বল, তুমি কি আমার গৃহে লক্ষ্মী হয়ে থাকবে না?"

কুমুদিনী সে কথার উত্তর দিল, কেবল চোখের জলে।

"কুমো, কেঁদ না, তোমার কান্না আমি দেখতে পারি না। আমার বুক ফেটে যায়! তুমি মনে কোরো না, আমি জোর করছি। আমি তোমার দয়ার ভিখারী। আমায় কি তুমি স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারবে না? এমন তো হয়! কুলীনের ঘরে কত-শত রয়েছে। আট বছরের গৌরী, ত্রিকাল-বৃদ্ধ মহাদেবকে মাল্যদান করেছিলেন। কুমো, আমায় একটা সুযোগ দাও! তোমাকে যত্ন, আদর,—রক্ষা করবার অধিকার আমায় দাও।"

কুমুদিনী কেবলই কাঁদিতে লাগিল।

বৃদ্ধ বেণী যতনে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, "কেঁদো না! তুমি যাতে সুখে থাক, তাই আমার ইচ্ছা। আমাকে স্বামী রূপে না গ্রহণ কর,—আমার গৃহ আলো করে চিরদিন থাকো।"

কুমুদিনী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "জামাই বাবু, আমি যত দিন বাঁচবো, ছোট বোনের মত তোমার আশ্রয়ে থেকে, তোমার সেবা-যত্ন করবো! আমায় মাপ কর, আর আমায় কিছু বোলো না!"

হতাশ বৃদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কুমো,

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি এখনও কি সেই নিষ্ঠুর, নৃশংস, অকৃতজ্ঞ ছোঁড়াটাকে ভুলতে পারনি? এখনও কি তোমার মন তার উপর পড়ে আছে?"

কুমুদিনীর আরক্ত কপোল, অবনত নয়ন, বৃদ্ধের কাতর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল। স্খলিত-পদে বৃদ্ধ বেণী কুমুদিনীর নিকট হইতে উঠিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিল,—এ কি জটিল রহস্য! আসল মানুষ কোন্‌টা—কোন্‌টাকে মানুষ ভালবাসে—বাহিরের দেহটা না ভিতরের মনটা,—বাইরের খাঁচাটা না ভিতরের পাখীটা? এই কুমো আমায় দু'চক্ষে দেখতে পারতো না, সারদাই ছিল এর সর্ব্বস্ব। কিন্তু সেই সারদার মন এখন আমাতে। তার সেই ভালবাসা, অনুরাগ, প্রীতি,—তার সেই উদার প্রকৃতি, সবই এখন আমাতে বর্ত্তেছে। কিন্তু তবু তো আমি কুমোর প্রিয় হতে পারলুম না! আর আমার সেই নীচ, ঘৃণ্য, অর্থপিশাচ, নীরস, কঠোর মন এখন সারদার অধিকারে। কিন্তু তবু তো এ তাকেই চায়! এ কি! এই নশ্বর দেহই কি প্রেমের কাম্য বস্তু? আসল মনটা কি আকাঙ্ক্ষার জিনিস নয়? তবে কেন লোকে বলে, 'এত করলুম, তবু মন পেলুম না।' বুঝলুম না, মানব-চরিত্র এ কি ঘোর প্রহেলিকা! মানুষের মন অতি দুর্ব্বোধ রহস্য! কিছুই বুঝতে পারছি না। সবই মায়ার খেলা। আমিও যে টাকা ভালবাসি, টাকার ধোকায় পড়ে আছি, সেও মায়ার খেলা। মায়ার ধাঁ ধাঁ কিছুই বুঝা যায় না। কেবল একটা জিনিষ বুঝ্‌ছি যে, অর্থ-গৃধ্নু পিশাচ হয়ে অতি দুঃখে জীবন কাটিয়েছি। সংসারে এসে এক দিনের জন্য নির্ম্মল আনন্দ ভোগ করতে পাই নি। আনন্দ—আনন্দ—আনন্দ—কোথায়? যা অনিত্য, তাই মানুষ চায়। আমি কুমোর নশ্বর দেহটা কামনা করেছিলুম, কিন্তু সেও তো দুদিন পরে আমারই মত বৃদ্ধ হতো। তখন কি আর ও আমার আনন্দদায়িনী থাকতো! বৃদ্ধ স্ত্রী বৃদ্ধ স্বামী কি আনন্দে পরস্পরকে কামনা করে? সেইটাই বুঝি ভালবাসা!

সেই সময়ে সেই সন্ন্যাসী বেণীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি আমার মন্ত্র-প্রভাব প্রত্যাহার করেছি। সবই মায়ার খেলা। তুমি আনন্দ খুঁজছো? এসো, আমার সঙ্গে এসো,—মায়িক অনিত্য বস্তুতে আনন্দ নাই,—ভোগে আনন্দ নাই,—আনন্দ কেবল ত্যাগে—আত্মত্যাগে।

"গুরুদেব, একটু অপেক্ষা করুন! মায়ার খেলা শেষ করতে একটু বাকী আছে।" বৃদ্ধ বেণী তাহার সমস্ত সম্পত্তি কুমুদিনী ও সারদার নামে লিখিয়া দিয়া, চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন, সারদা অপরাধীর ন্যায় অবনত মস্তকে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়াইয়া আছে। বেণী নীরবে ত্যাগপত্রখানি তাহার হস্তে দিল।

সন্ন্যাসী ডাকিলেন, "এসো বৎস, সময় বয়ে যায়!"

বাবু-বিলাস *

(কীর্ত্তন)

[শ্রীনিবিড়ানন্দ নকলনবীশ]

বাবু গো,
কি দিন তোঁহার ভেল আজি!
মরম-মুরজ মাঝে কত মধু মুরছনে
উঠতঁহি কত সুর বাজি।
যাকর দরশন- পরশন-বেয়াকুল
যাকর হাসটুকু আশে,

শৈশব কৈশোর বই সনে গোঁয়াওলি
সোই আওল তুয়া পাশে।
নিত্য নেহারলি নাটক নভেলক
নায়ক-নায়িকা সঙ্গ,

* ছন্দ ঠিক নাই। ইচ্ছামত হ্রস্ব দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইবে। ইহা কবিতা নহে, গান।

যাকর সনে সথা, হরখ পরখ লাগি
কত না রভস-রস-রঙ্গ।
সো ধনী সুন্দরী থির বিজুরী জনু
আওল তোঁহার সদনে,
"নেট্"-অবগুণ্ঠন- জলদক মাঝারে
গোপত করি বিধু-বদনে।

২

বাবু গো,
অব তুঁহু কঠিন কেরাণী।
তাম্বুল-চর্ব্বণে বিম্ব-অধর-হাসে
পালঙ্ক-সেজে সে রাণী।
কমল-কোমল করে কঠিন কুর্শী-কাঁটা,
বৈঠি সে কেদারা কোচে,
সো রূপ নিরখিলে প্রাচীন-জড়তা যত
বর্ব্বরতা-কুল ঘোচে।
সো ধনী লহু লহু ঘন ফরমাসিবে
করইতে হাট বাজারে,
তুঁহু চির-গোলাম —বিংশ কোঁটা বর্জ্জিত—
বহবি সো সুখ-সাজারে।
সো ধনী আকুলিত শ্রান্ত তোঁহারে হেরি
ফুকারিবে কত প্রাণ-খেদে,—
"ফোড়ং ফুরায়ে গেছে পুন যাহ পিসা মোর,
সমীর-সেবনে নাশ' স্বেদে।"

৩

বাবু গো,
পুন তুঁহু বেজায় বেকুব।—
তাকর ফরমাস যদি কভু না পালবি,
পাওবি দণ্ড যে খুব।
হিয়া-মাহ ঝঞ্ঝা গণ্ডে দামিনী-রেখা,
বরখিবে আসার নয়ানে,
তাহে নিরখি তুঁহু —অতীব আহাম্মুক—
বোলবি বিনীত বয়ানে—
"তুঁহু যদি সুন্দরী মঝু মুখ না হেরবি
হাম যাওব কোন ঠাম?'
তুঁহু চির-সরবস, মুই ছার অতি দীন;
তুঁহু পঁহু, হাম যে গোলাম।
ক্ষম' ইহ বেলা প্রিয়ে, হেন না হইবে পুন,
মুই দোষী, তুঁহু যে উদার,
তরল-অলক্তক- লাঞ্ছন মোক্ষদ
'দেহি পদ-পল্লব-মুদার।"

৪

বাবু গো,
অব তুঁহু শুন এক বাত—
তোঁহার হাল ইহ সমঝিহ পরাণে
দরপণে কর দিঠি পাত।
ইহে নাহি ভরসা ফরসা সে পরকাল
নিরমিত নিজ ইহ কারা,
'আলোক' ফুকারিতে ঘেরল ঘন ঘোর
চারি ভিতে অমা-আঁধিয়ারা।
ভার্য্যা নহে গো বাবু পকেট 'ঘটিকা' সমা
কিম্বা লকেট নহে তাহে;
শিরসি রহবি তুঁহু কিম্বা হৃদি-মাঝারে,
তছু পাদুকা রজ কাহে?
রসিক নাগর-বর পিরীতি-সাগর বাবু,
কত না রতন তাহে পাইবি,
মরমে মিশিবে ধনী সহকারে মাধবী
অথবা "পামে" জনু "আইভী।"

সঞ্চয়

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

রোদাঁর একজন ছাত্রী

ফরাসী ভাস্কর ওগস্ত্ রোদাঁ Auguste Rodin প্রথম-জীবনে দেশের শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা-ভক্তি হইতে একান্ত বঞ্চিত ছিলেন বটে, কিন্তু পর-জীবনে তাঁহার তেমন কোন অভিযোগ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। পরিণত বয়সে রোদাঁ সুধুই যে সাধারণ দর্শকের কাছ হইতে সমাদর পাইয়াছিলেন, তাহা নয়; পরন্তু য়ুরোপের শিল্পী-সমাজের সকলেই তাঁহার নামে মাথা হেঁট করিতেন। রোদাঁ এখন পরলোকে; কিন্তু তাঁহার অগণ্য শিষ্যগণের হৃদয় হইতে তাঁহার ছায়া এখনো সরিয়া যায় নাই। রোদাঁর মূল-মন্ত্র ও গঠন-পদ্ধতি য়ুরোপের ভাস্কর্য্য-কলায় এখন প্রায় সর্ব্বত্র অনুসৃত হইতেছে। বলিতে কি, মাইকেল এঞ্জিলোর পর আর কোন কলাবিদ্, শিল্পী-সমাজের উপরে রোদাঁর মত এত বেশী প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন নাই।

রোদাঁর গঠিত মূর্ত্তিগুলির ভিতরে জীবনের যে বিচিত্র রহস্য, মধুর সরলতা এবং ধ্রুব সত্যের প্রকাশ দেখা যায়, সম্প্রতি তাহারই অনুসরণ করিয়া মিস্ ম্যাল্‌ভিয়া হফ্‌ম্যান নামক এক মহিলা-শিল্পী রসিক-সমাজে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি একজন গায়কের কন্যা,—তাঁহার পিতার নাম রিচার্ড হফ্‌ম্যান। শিশুকাল হইতেই গানের আব্‌হাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া, সঙ্গীতের সার-রসের আস্বাদ তিনি পাইয়াছেন।

অনেক শিল্পীর কাছেই তাঁহাদের কার্য্যই সর্ব্বস্ব,—তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব কিছুই নয়। হাতের কাজের সঙ্গে, আপনাদের প্রাণের স্বরূপ তাঁহারা ফুটাইতে চাহেন না। মিস্ হফ্‌ম্যানের কার্য্য-ধারা কিন্তু স্বতন্তর। আপনার কাজ হইতে আপনাকে তিনি বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই—তাঁহার গঠিত শিল্প-মূর্ত্তির মধ্যে তাই তাঁহার মানস-মূর্ত্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। গায়ক-কন্যা মিস্ হফ্‌ম্যান ভাস্কর্য্যের গতির ছন্দে, রেখায়-রেখায় গানের তানের ছন্দ-তাল-লয়কে প্রস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

য়ুরোপে এখন রুশ-সাহিত্য যেমন একটা নূতন ভাবের আন্দোলন আনিয়াছে, রুশ-নৃত্যকলাও তেম্‌নি একটা নূতন সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছে। রুশ-নাচে গতি, ভঙ্গি ও ছন্দের যে মোহনলীলা ফুটিয়া ওঠে, আধুনিক য়ুরোপের আর-কোন দেশের নাচে তাহা দেখা যায় না। টলষ্টয়ের পুস্তক পড়িয়া সর্ব্বপ্রথমে রুশ সাহিত্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; এবং প্রথমে আনা পাব্‌লোভার নাচ দেখিয়া রুশ নৃত্যের দিকে সকলের চিত্তের কামনা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তারপর এখন আমরা যেমন সাহিত্য-ক্ষেত্রে টুর্গেনিভ, শেখভ, ডোষ্টএভ্‌স্কি, গোগল ও আন্দ্রীভ প্রভৃতি শক্তিধর রুশ-লেখকের সন্ধান পাইয়াছি, তেমনি আরো জানিয়াছি যে, রুশিয়ার নট-সমাজে সুধু পাব্‌লোভা নয়, সেখানে মর্ডকিন, নভিকফ্, ফকিন, নিজিনস্কি, ক্যার্সাভিনা ও নেপিয়ারকাওস্কা প্রভৃতি আরো-অনেক প্রথমশ্রেণীর নৃত্যকারী আছেন।

মিস্ হফ্‌ম্যান ভাস্কর্য্যের মধ্যে রুশ-নৃত্যের মধুর চাঞ্চল্য এবং সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টায় তিনি যে কতটা সফল হইয়াছেন, তাহা না-বলিলেও চলিবে। যিনিই দেখিবেন তিনিই বুঝিবেন যে, রুশ-নর্ত্তকের এই ধাতুমূর্ত্তিগুলির মধ্যে শিল্পের মায়ামন্ত্রে কি অপূর্ব্ব জীবনের সঞ্চার হইয়াছে!

আলোক-চিত্রে কাব্যের আভাস

'ফটোগ্রাফ' একেবারে কঠোর বাস্তবতাকে প্রকাশ করে বলিয়া, ললিত-কলায় তাহার প্রতি সকলে অনাহুত

অতিথির মত ব্যবহার করে। কলাবিদের পরিকল্পিত চিত্রে বাস্তবতার উপরে একটা স্বপ্ন-সুষমার, একটা অবাস্তব রহস্যের আবরণ থাকে;—তাহার সমস্তটাই সংসারের নিত্য-দৃষ্ট রক্ত-মাংসে গড়া নয়; তাহার ভিতরে সেইসঙ্গে আরো এমন-কিছু থাকে—ফটোগ্রাফার বা আলোক-চিত্রকর যাহা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সেই দুর্লভ বস্তু হইতেছে কল্পনার সৌন্দর্য্য এবং প্রাণের কবিত্ব।

আলোক-চিত্রে আমাদের প্রাণ ফোটে না—ফোটে সুধু দেহ। এইজন্যই মানুষের বাহিরের দেহটাকে আমরা আলোক-চিত্রে খুব নিখুঁত ভাবে পাইলেও, স্বভাব-সুন্দর যথার্থ মানুষটিকে আমরা সেখানে দেখিতে পাই না। তাই আলোক-চিত্র দেখিয়া যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়, তারপর তাঁহাদের সঙ্গে সামনা-সাম্‌নি চাক্ষুষ দেখা হইলে আমরা প্রায়ই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি না।

আলোক-চিত্রের এই সকল অভাব আজকাল পূরণ করিবার জন্য কতক-কতক চেষ্টা হইতেছে। আমরা এখানে কয়েকখানি ছবিতে সেই চেষ্টার কিছু-কিছু নমুনা দিলাম। এ-সব ফটো-চিত্রে কেবলমাত্র মানুষের দেহটাকেই বড় করিয়া দেখা হয় নাই;—চিত্র-লিখিত এই দেহগুলি ভাব, কল্পনা ও কবিত্বের অপূর্ব্ব-মধুর লীলায় এবং প্রাণের স্পন্দনে ও জীবনের ছন্দে নন্দিত ও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এ-সব মূর্ত্তির মধ্যে ফটোগ্রাফের আড়ষ্ট ভাবও নাই;—হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে, এরা যেন কোন শক্তিধর ভাস্কর বা চিত্রকরের কল্পলোক হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে!

আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা

আমেরিকার Munsey's Magazineএ একজন লেখক বলিতেছেন:—

আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেশ "The Wonderful Century" নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, আঠারো শতাব্দীর পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত-কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা হইয়াছে, এক উনিশ শতাব্দীর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। আঠারো শতাব্দীর আগে-পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-জগতে সমস্ত মানব-সভ্যতা যে ফল প্রসব করিয়াছে, তাহার আসল কয়েকটির নাম এই:—

১। বর্ণানুক্রমিক লিখন-পদ্ধতি
২। আরবীয় অঙ্ক
৩। দিগ্‌দর্শন যন্ত্র
৪। মুদ্রা-যন্ত্র
৫। দূরবীন
৬। বায়ুমান-যন্ত্র
৭। বাষ্পীয়-যন্ত্র

কিন্তু কেবলমাত্র উনিশ শতাব্দীতে এতগুলি নূতন আবিষ্কার-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে—

১। রেল-রাস্তা
২। বাষ্পীয়-পোত
৩। বৈদ্যুতিক তার-বার্ত্তা
৪। টেলিফোন্
৫। দেশলাই
৬। গ্যাসের আলো
৭। বিজলী-বাতি
৮। আলোক-চিত্রণ
৯। কলের গান
১০। The Rontgen rays (রঞ্জন-রশ্মি)
১১। Spectrum Analysis (বর্ণচ্ছত্র-বিশ্লেষণ)
১২। The use of anesthetics (গম্ভীর-বেদনের ব্যবহার)
১৩।—The use of antiseptics (বিষ-বারণের ব্যবহার)

আবিক্রিয়া ও উদ্ভাবনায় প্রভেদ আছে। যে-সকল বৈজ্ঞানিক কার্য্য মানুষের জ্ঞানের সীমানা আরো বাড়াইয়া দেয়, প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে অনুসন্ধান-কার্য্যে যে চেষ্টা সফল হয়, যাহা মানুষের হাতে-নাতে কাজে লাগিতেও পারে, আবার না-লাগিতেও পারে, তাহারই নাম আবিক্রিয়া। উদ্ভাবনার মূল-উদ্দেশ্য হইতেছে, বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়াকে মানুষের অভাব-পূরণের জন্য হাতে-নাতে কাজে লাগানো।

বৈজ্ঞানিক যে বরাবরই বৈজ্ঞানিক, তাহাও নয়। বৈজ্ঞানিক অনেক সময়ে উদ্ভাবক'ও বটে; যেমন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। তিনি আত্মকৃত আবিষ্ক্রিয়াকে মানুষের কাজে না খাটাইয়া ছাড়েন নাই। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বৈজ্ঞানিকরা কোন-কিছু আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় তাঁহার কাজ কতটা উপযোগী, সে বিষয় লইয়া একটুও মাথা ঘামান নাই। এইজন্য বৈজ্ঞানিকের চেয়ে আবিষ্কারকের নামই সাধারণ লোকের কাছে অধিক পরিচিত হইয়া পড়ে।

জেম্‌স্ ক্লার্ক-ম্যাক্সওয়েলের আবিষ্কৃত মূল-তত্ত্বের অনুসরণেই বিনা-তারে খবর লেন-দেনের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আবিষ্কারক ম্যাক্সওয়েল জাগতিক জন-সমাজে ততটা পরিচিত নন, যতটা পরিচিত হইয়াছেন উদ্ভাবক মার্কনী।

উদ্ভাবক কেবল যশ উপার্জ্জন করেন না—সেইসঙ্গে তিনি যত-বেশী অর্থোপার্জ্জনও করেন, আবিষ্কারকের ভাগ্যে তাহা কখনো ঘটিয়া ওঠে না। মানুষের জ্ঞানের সীমানা বাড়াইয়া আত্মপ্রসাদ এবং বিজ্ঞান-সমাজে প্রশংসালাভ করিয়াই বৈজ্ঞানিককে তুষ্ট হইয়া থাকিতে হয়।

আবিষ্কারকের স্থান উদ্ভাবকের অনেক উপরে। কারণ, ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভা ভিন্ন কোন আবিষ্ক্রিয়া সম্ভব হয় না; তিনি না জন্মিলে, তাঁহার আবিষ্কারও হয় ত আর কোন লোক কখনো করিতেও পারিত না। কিন্তু উদ্ভাবনা হয় মানুষের অভাব নিবারণের জন্য; কোন বিশেষ লোক যদি আবিষ্কারকের কার্য্য-ফলকে আজ আমাদের কাজে লাগাইতে না পারেন, তবে কালই আর এক ব্যক্তি আসিয়া প্রথম লোকটির অক্ষমতা হয় ত সফল করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন। অর্থাৎ, আবিষ্কার ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারাই সম্ভব হয়, কিন্তু উদ্ভাবনার কার্য্যে লোকের অভাব কখনো হয় না।

———

সেনাপতি ফুশের কথা

সম্প্রতি Literary Digest নামক পত্রে, ফরাসী সেনাপতি ফুশের (Foch) কতকগুলি মতামত উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এখানে তাহার কিছু-কিছু পরিচয় দিলাম।

"আমরা যখন রাইনের তটে আসিয়া হাজির হইয়াছি, তখন এখান হইতে আর কিছুতেই নড়িব না। এ-ছাড়া আমাদের পক্ষে নিরাপদ হইবার আর-কোনই উপায় নাই। একটা স্বাভাবিক ও সুরক্ষিত সীমানা আমাদের অত্যন্ত আবশ্যক। একথা ভুলিলে চলিবে না, যে ঐ সাত কোটি জার্মান আমাদের চোখের সামনে চিরকালই বিভীষিকার মত জাগিয়া থাকিবে। বর্ত্তমানকে দেখিয়া ভবিষ্যৎ ভুলিলে ভুল করা হইবে। জার্মানরা যেমন হিংস্র, তেমনি রণোন্মত্ত। তাহাদের চরিত্রের এই বিশেষত্ব গত চারি বৎসরে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কিছুদিনের জন্য এ বিশেষত্বটা চাপা থাকিলেও, পঞ্চাশ বৎসর পরে এটা আবার ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে! সুতরাং, এই রাইনের তট পর্য্যন্ত আগাইয়া, আমাদিগকে ভবিষ্যৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। কারণ, এই দুর্ভেদ্য সীমানা অতিক্রম করা অল্প কালের কাজ নয়।

ভবিষ্যতেও মিত্র-পক্ষের সৈন্যেরা কিছু একদিনেই এক জায়গায় আসিয়া জড়ো হইতে পারিবে না। তখনো ইংরেজ-সৈন্যরা কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া থাকিবে। ইয়াঙ্কি সৈন্যরাও থাকিবে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে। গতবারে যাহা হইয়াছে, আগামী বারেও ঠিক সেই দৃশ্যেরই পুনরভিনয় হইবে।

এপ্রেসের প্রথম যুদ্ধের সময়ে মিত্র-পক্ষের মোটে ছয় ডিভিসন সৈন্য ছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বরে লর্ড কিচেনারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেই আমাদের প্রথম দেখা। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কতদিনের মধ্যে তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে পারিবেন? তিনি বলিলেন, 'আগামী বৎসরের ১লা জুলাইয়ের মধ্যে আমরা ফ্রান্সের রণক্ষেত্রের জন্য দশলক্ষ সৈন্য প্রস্তুত করিতে পারিব।' আমি বলিলাম, 'বেশী না পারেন, আপনারা অন্ততঃ কম সৈন্য দিয়াই সাহায্য করুন—কিন্তু আর বিলম্ব করিবেন না।' তিনি উত্তর দিলেন, '১লা জুলাইয়ের আগে আপনারা আর সৈন্য পাইবেন না।' এই সৈন্যাভাবের ফলে মিত্র-পক্ষ প্রায় ধ্বংসের মুখে গিয়া পড়িয়াছিল।

ভবিষ্যতে জার্মানরা আর ভ্রম করিবে না। এবারে

তাহারা সর্ব্বাগ্রে উত্তর-ফ্রান্সের মধ্য দিয়া আসিয়া সাগরতটের বন্দরগুলি অধিকার করিবে—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য। গতবারে এ কার্য্য না-করার কারণ, তাহারা তখন বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, ইংলণ্ডও তাহাদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে! তারপর, এই কঠোর সত্য যেদিন তাহারা প্রথম বুঝিতে পারে, সেদিন আর নূতন আয়োজনের সময়ও ছিল না।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফন্ মল্‌টুকের সমযোগ্য সেনাপতি, এবারকার যুদ্ধে জার্ম্মানরা একজনও পায় নাই। শত্রুপক্ষ এবারে পরে-পরে তিন-তিনবার প্রধান সেনাপতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং ঐ তিনবারই প্রত্যেক সেনাপতি আপন-আপন নিজস্ব রণনীতি অনুসারে যুদ্ধ চালাইয়াছেন। এবারকার প্রথম ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন যে মল্‌টুকে, তিনি আমাদিগকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন। ফলে বেলজিয়মের উদাসীনতা (Neutrality) ভঙ্গ হইল। মার্ণের রণক্ষেত্রেও মল্‌টুকে আবার সেই চেষ্টা করেন। তারপরে আবার সেই উদ্দেশে তিনি সাগরতটের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টাও বিফল হইয়া গেল। অতএব মল্‌টুকের বদলে আসিলেন ফল্‌কেন্‌হেন। ইঁহার প্রধান অভিপ্রায় ছিল, সর্ব্বাগ্রে মিত্রপক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য-গুলিকে হারাইয়া দেওয়া। রুশিয়ার বিরুদ্ধে ফল্‌কেন্‌হেন ভালো ফল না পাইয়া, প্রথমে সার্ভিয়াকে আক্রমণ করিলেন। সার্ভিয়া পরাস্ত হইল,—ওদিকে রুমেনিয়া যুদ্ধঘোষণা করিল। ফল্‌কেন্‌হেন রুমেনিয়ার বিষ-দাঁতও ভাঙিয়া দিলেন। কিন্তু এর-বেশী আর-কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। অথচ এত কাণ্ডের পরেও ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে মিত্রপক্ষ যেমন বলবান ছিলেন, তেমনিই রহিয়া গেলেন।

তারপর লুডেন্‌ডর্ফ ও হিণ্ডেনবার্গ একযোগে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। লুডেন্‌ডর্ফ সর্ব্বাগ্রে রুশদেশকে বিধ্বস্ত করিয়া, তারপর তাঁহার সমস্ত শক্তির সহিত ফ্রান্সের ঘাড়ের উপরে লাফাইয়া পড়িতে চাহিয়াছিলেন। আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য, তিনি রুশদেশে বিদ্রোহের বীজবপন করিলেন। কিন্তু রুশিয়াকে মারিতে তিনি যে ফাঁদ পাতিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজেরও পা গেল শেষটা আটকাইয়া। রুশিয়ায় যে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিল, অবশেষে তাহার তরঙ্গ আসিয়া জার্ম্মানীকেও একেবারে ভাসাইয়া লইয়া গেল। আমেরিকা যে য়ুরোপে সৈন্য পাঠাইতে পারে, লুডেন্‌ডর্ফ সে কথাও বিশ্বাস করিলেন না। তিনি আমেরিকাকেও ঘাঁটাইলেন। ফলে আমেরিকা অস্ত্র ধরিল, এবং লুডেন্‌ডর্ফ যাহা অসম্ভব ভাবিয়াছিলেন, শেষটা তাহাই অত্যন্ত-সম্ভব হইয়া দাঁড়াইল! —বাস্তবিক, এ যুদ্ধে জার্ম্মানরা যথার্থ প্রতিভাবান একজন সেনাপতিও পায় নাই!"

তুর্ক-মহিলার ঘোমটা-খোলা

New York Herald নামক আমেরিকান সংবাদ-পত্রে একজন লেখক তাঁহার তুর্কীস্থানের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "এই মুসলমানের রাজ্যে সকলেই আগে বলিত যে, 'স্ত্রীলোকের স্থান গৃহের ভিতরে'। সুতরাং পাছে বাহিরের কোন ক্ষুধিত নেত্র তুর্ক-মহিলার অনাবৃত রূপ-সুধা পান করিয়া ফেলে, সেই ভয়ে সকলেই আগে সাবধান হইয়া থাকিত। এমন-কি, যে-সব মেয়ে পথে-ঘাটে বাহির হইত, আধ-ঘোমটার জন্য তখন তাহাদের মুখও ভালো করিয়া দেখিবার যো ছিল না!

কিন্তু তুর্ক-সুন্দরীরা সম্প্রতি ঘোম্‌টা খুলিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। তাহারা আর ঘোম্‌টার ভিতরে ঘামিয়া মরিতে রাজি নয়! নবযুগের মেয়েরা এখন অনাবৃত মুখে কন্‌স্তান্তিনোপলে প্রকাশ্য-ভাবে কাজ-কর্ম্ম করিতেও সঙ্কুচিত নয়! অবশ্য, গত-যুদ্ধের ফলেই এই অভাবিত স্বপ্নটা সত্যে পরিণত হইয়াছে!

কিন্তু দেশের পুরুষগুলি বড় খুসি হয় নাই। তাহারা বলিতেছে, 'গতিক ভারি খারাপ।'

তাহারা জানিত রমণী একটা খেল্‌না, একটা অস্থাবর সম্পত্তি, পুরুষের গোলামিই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য। এই সদ্য-লুপ্ত ঘোম্‌টাটা এতদিন এম্‌নি সব ভাবের স্মৃতিচিহ্নের মত থাকিয়া, সুন্দরীর মুখচন্দ্রকে গ্রাস করিত। কিন্তু এ রাহুকে বিদায় করিয়া তুর্ক-মহিলারা এখন প্রাচীনতার কারাগার ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন।

পাশ্চাত্য প্রদেশে পৌরাণিক প্রবাদের মত একটা কথা চলিয়া গিয়াছে যে, তুর্ক-রমণীরা নাকি হুরীর মত অতুলনীয়া সুন্দরী! গানে-গল্পে-কবিতায় এ রূপের বর্ণনা কতবার পড়িয়াছি, কতবার শুনিয়াছি! হুরীর কথাও জানি না, পরীর কথাও জানি না, কারণ হুরী-পরী দেখার সৌভাগ্য আমাদের দগ্ধ অদৃষ্টে কখনো ঘটিয়া ওঠে নাই। কিন্তু তুর্ক-মহিলার মুখ যদি হুবহু হুরীর মুখের মতই হয়, তাহা হইলে হুরী-পরীর সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ-ধারণা একেবারে খাটো হইয়া পড়িবে। তুর্ক-রমণীরা মোটেই সুন্দরী নয়! এটা একেবারে খাঁটি কথা! কবিরা এতদিন কল্পনার নেশায় মস্‌গুল হইয়া পরীলোকের যে স্বপন দেখিয়াছেন, তাহা মিথ্যা —তাহা মিথ্যা কথা! তুর্ক-রমণীরা এখন ঘোম্‌টা খুলিয়া এ সত্যটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন! ঘোম্‌টার ভিতরে এতদিন তুর্ক-রমণীদের যে সব মুখের ধাঁজ লুকানো ছিল, তাহা অতীব বিচিত্র এবং বিভিন্ন! কাহারও মুখ মোঙ্গলীয় আদর্শের—যেন সোজা পিকিং হইতে আমদানি; কাহারও মুখ বা লিভান্টিয়ান, সার্কেসিয়ান কিংবা স্কাণ্ডিনেভিয়ান আদর্শের; কাহারও কাহারও রং আবার কাফ্রির মত কুচ্‌কুচে কালো! তুর্কীরা নানা দেশ হইতে নানা জাতের বন্দিনী জোগাড় করিয়া আনিত; ইহাদের অনেকে বোধ হয় তাহাদের সহিত অবাধ রক্ত-মিশ্রণের ফলে এই অসংখ্য ও বিচিত্র মুখাদর্শের মধ্যে এমন মুখ একটিও আমাদের চোখে পড়ে নাই—যাহা দেখিলে নয়ন-মন মুগ্ধ হইয়া যায়!"

মনোমোহন যাদুঘর

মানব-তত্ত্ব (Anthropology) ও জাতি-বিজ্ঞান (Ethnology) যে কেবল শিক্ষিত-সাধারণের আলোচ্য বিষয় নয়, এ দুটি বিষয় যে সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই উপভোগ্য হইতে পারে, আমেরিকার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা আজকাল তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মানব-তত্ত্বে ও জাতি-বিজ্ঞানে এমন অনেক চিত্তাকর্ষক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, যে-গুলিকে কৌশলের সহিত চোখের সুমুখে তুলিয়া ধরিলে, নিতান্ত সাধারণ লোকেরও আগ্রহও অত্যন্ত জাগিয়া উঠিবে।

এই কার্য্যসাধনের জন্য আমেরিকায় এখন অনেকগুলি যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইসকল যাদুঘরে সুদূর অতীতের ছোট-বড় নানা নিদর্শন বিষয়-অনুসারে নানা বিভাগে সাজানো আছে। স্মরণাতীত যুগে এক-এক বিশেষ সময়ের মানব-জাতির মুখের ও দেহের আদর্শ, তাহাদের বাসভূমি, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ও সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের দৃশ্য, তাহাদের সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা, তাহাদের কলা-নিপুণতার প্রমাণ, এমনি নানা বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের পরিচয় সাধন করিয়া দিবার জন্য যাদুঘরের কর্তৃপক্ষরা যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাছাড়া পৃথিবীর নানা জাতির অসংখ্য সুগঠিত মূর্ত্তিও এখানে আনিয়া উপযোগী পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের মধ্যে ঠিক স্বাভাবিক ভাবে স্থাপন করা হইয়াছে।

এই যাদুঘরগুলি যে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। অতীতকে কে না ভালোবাসে? অতীতকে কে না দেখিতে চায়? কাজেই সাধারণ কৌতূহল নিবারণ করিতে আসিয়া, দর্শকরা এখান হইতে অনেক নূতন জ্ঞানলাভ করিয়া ফিরিয়া যায়। ফলে, এই যাদুঘরগুলি একাধারে আমোদ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আমরা প্রবন্ধশেষে মানবতত্ত্ব-বিভাগ হইতে তিনটি বিভিন্ন যুগের প্রাচীন মানবের প্রতিকৃতি তুলিয়া দিলাম।

পোষ-মানা ভূত

মেরু-ভ্রমণকারী মিঃ ষ্টিফেনসন, এস্কিমো জাতির সম্বন্ধে কতকগুলি বিচিত্র তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "এই বিংশ-শতাব্দীতেও এস্কিমোরা অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের প্রতি বিশ্বাস হারায় নাই। কোন রকম অলৌকিক ঘটনাতেই তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া যায় না—প্রতি দু-একদিন অন্তর, বিশেষতঃ রাত্রের অন্ধকারে, কোন অলৌকিক কাণ্ড না-ঘটিলেই তাহাদের বিস্ময় বরং মাত্রাতিক্রম করে!

আমি যে দেশে গিয়াছিলাম, সে-দেশের এস্কিমোরা

আমাকে দেখিবার আগে আর-কোন শ্বেতকায় মানবকে দেখে নাই। তাহাদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনেকটা শিশুর মত। তাহাদের মধ্যে জনকতক লোক থাকে, যাহাদিগকে স্থানীয় ভাষায় "অঙ্গটকুট্" বলিয়া ডাকা হয়। এই অঙ্গটকুটের দল ভূত প্রেত, দানা-দৈত্য লইয়া কারবার করে এবং পরলোকের সমস্ত রহস্যই না কি তাহাদের জানা আছে!

সাধারণতঃ এক-একজন অঙ্গটকুট্ ডজন-খানেক করিয়া ভূত পুসিয়া থাকে! অঙ্গটকুটের হুকুম পাইলে এই পোষা ভূতের দল আলাদিনের দৈত্যের মত যে-কোন রকমের কাজ করিতেই প্রস্তুত! সময়ে সময়ে অঙ্গটকুটের তাঁবে ভূতের সংখ্যা এত বেশী হইয়া পড়ে যে, দু-একটা ভূতকে অকেজো বলিয়া তাহারা বিক্রী করিয়াও ফেলে।

যদি কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক ভূত কিনিবার জন্য অঙ্গটকুটের কাছে যায়, তবে তাহাদের মধ্যে প্রায়ই এই ধরণের কথাবার্ত্তা হয়।

"আপনি কি আপনার একটি কীউক্যাট্‌কে (ভূত) বিক্রী করবেন?"

"হ্যাঁ, কেন যে বিক্রী করব না, তার ত কোন কারণ দেখ্‌চি না! আমি নিজে বুড়ো-হাবড়া হয়ে পড়েচি, অকারণে এতগুলো ভূত পুষে আর লাভ কি? বিশেষ, তোমার ওপরে অনেকদিন থেকেই আমার বিশেষ নেক্-নজর আছে। তোমার মত একটি ভালো ছোক্‌রাকে চালার মত পেলে আমি ভারি খুসি হব। আমার মেরু-ভল্লুকের ভূতকে আমি তোমার হাতে সঁপে দিতে পারি!"

"আপনার অপার দয়া! কিন্তু ওর বদলে আর-একটা ভূত দিলেই ভালো হয় না কি?"—ক্রেতা আর-একটা ভূতের নাম করিল।

—"না। আমি যতদিন বাঁচ্‌ব, ও-ভূতটাকে আমি ছাড়্‌ব না। ও আমার ভারি বিশ্বাসী ভূত, তুমি আর-একটা কোন ভূতের নাম কর।"

এমনি দর-কষাকষির পর ক্রেতা হয় ত শেষটা একটা দাঁড়কাক-ভূত ক্রয় করিল। অঙ্গটকুট্ তাহাকে ভূত নামাইবার মন্ত্র বলিয়া দিল।

ক্রেতা বাড়ী ফিরিয়া মন্ত্র পড়িয়া ভূতকে ডাকিল,—ভূত কিন্তু মূর্ত্তিমান হইয়া তাহার কাছে আসিল না!

ক্রেতা তখন চটিয়া আবার অঙ্গটকুটের কাছে গিয়া বলিল, "এ কি ব্যাপার! আপনার ভূত ভারি অবাধ্য,—ডাক্‌লেও আস্‌চে না!"

অঙ্গটকুট্ তখন ভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়া বলিল, "তা আমি আর কি করব বল? এক-একজন লোক আছে, ভূত তাদের সঙ্গে কিছুতেই দেখা করে না। তুমিও যে সেই দলেরই একজন, আমি ত তা জানতুম না! এর আর কোন চারা নেই—আমার যা কাজ তা আমি করেচি!"

এইখানেই এই ভূত-ক্রয়-দৃশ্যের উপরে যবনিকা পড়িয়া যায়!

প্রহরী—সিন্ধুঘোটক!

শিকাগোর Herald and Examiner নামক সাময়িক পত্রে একটি আশ্চর্য্য সংবাদ বাহির হইয়াছে। জার্মান ডুবো-জাহাজের গতি-বিধি নির্ণয় করিবার জন্য ইংরাজরা নাকি পোষা সিন্ধু-ঘোটকদের বিশেষরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন! সিন্ধু-ঘোটকদের মাথা এমনি সাফ যে, পোষ মানাইলে এবং উপযোগী শিক্ষা দিলে তাহারা চটপট মানুষের ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝিতে পারে! এ-বিভাগে কেবল হাতী ও কুকুর ছাড়া মনুষ্য-পালিত আর-কোন জানোয়ার তাহাদের সমকক্ষ নয়।

নানারূপে, নানা পরীক্ষায় সিন্ধু-ঘোটকদের চাতুর্য্য ও ক্ষমতার কথা সপ্রমাণ হইয়াছে। ডুবো-জাহাজের শব্দ শুনিলেই তাহারা সতর্ক ও সচকিত হইয়া ওঠে; তারপর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার অনুসরণ করিতে থাকে। এ কার্য্যে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতেও হয় না;—কারণ, জলের মধ্যে তাহার গতি ডুবো-জাহাজের চেয়ে ঢের-বেশী দ্রুত ও স্বাধীন। পাহারার কাজ শেষ হইলেই সে নিজের জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া প্রাপ্য বখ্‌শীসের দাবি করে। তখন তাহাকে মাছ খাইতে দেওয়া হয়।

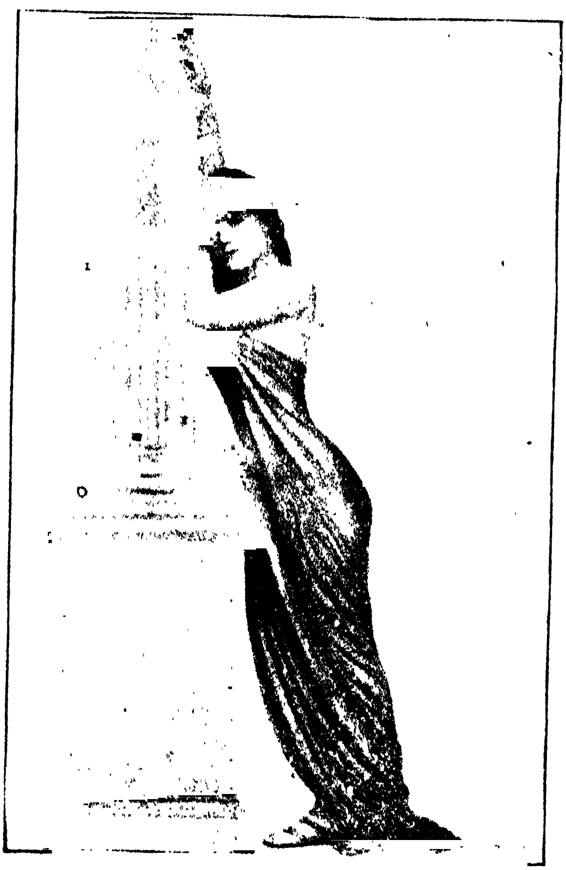
অবশ্য কুকুরের মত নিস্বার্থভাবে খালি মনিবের মুখ



রুশ-নর্ত্তকী আনা-পাবলোভা



ভাস্কর্য্যে আনা-পাব্‌লোভা



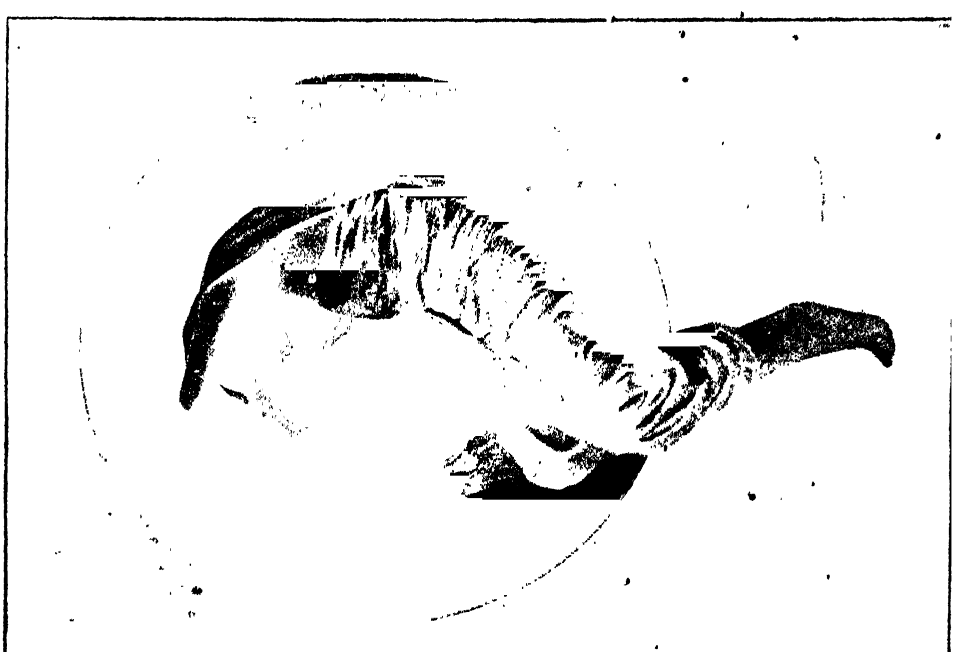
বন্দিনী
(আলোক-চিত্র)



উপরের আলোক-চিত্রে সুবঙ্কিম স্কন্ধ-রেখায় এবং
নীচের আলোক-চিত্রে কটি ও বাহুর ভঙ্গীতে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে



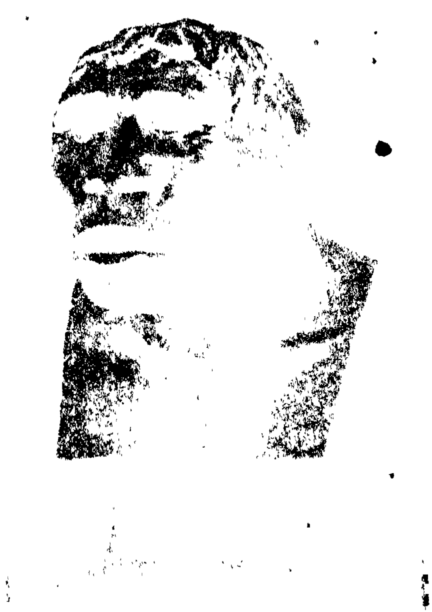
উদাসিনী (আলোক-চিত্র)



আলোক-চিত্রে ভাস্কর্য্যের অনুসরণ



আলোক-চিত্র



অনুমান পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের জাভা-দেশীয় বানরাকৃতি মানুষ



অনুমান চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মানুষ



অনুমান পঁচিশ-হাজার বৎসর পূর্ব্বের মানুষ

চাহিয়াই সিন্ধুঘোটকরা কাজ করে না। সে বিলক্ষণ জানে, কাজ করিলেই পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে। এই খাবারের লোভেই সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। আর একটি বিষয়েও তাহার মনিবরা সাবধান থাকেন। তাহাকে জলে নামাইবার সময়ে তাহার মুখের চারিপাশ শক্ত জালে ঘিরিয়া দেওয়া হয়, নহিলে সে ডুবো জাহাজের জন্য আদৌ মাথা না ঘামাইয়া, সাগর-জলে মৎস্য-শিকারের লোভে অনায়াসেই আপনার কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা করিবে।

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়



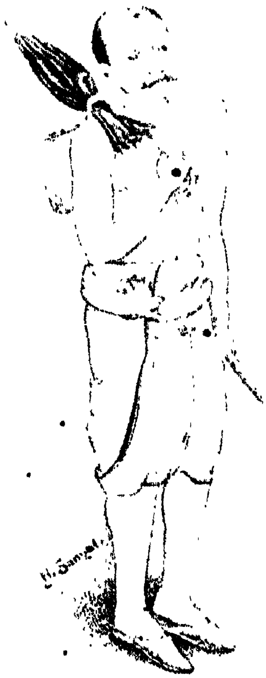
পানওয়ালী ও কেরাণী



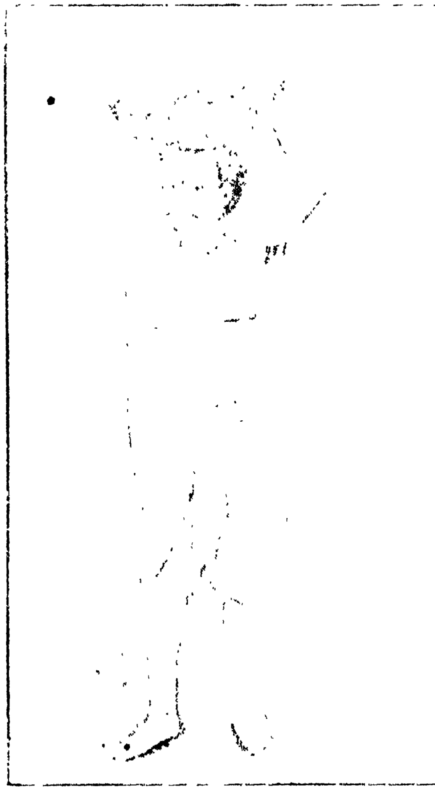
"মাদুর পেতে ঘরের ছাতে ডাবা হুঁকাটি ধরিয়া হাতে
করিব আমি সবার সাথে দেশের উপকার।"—রবীন্দ্রনাথ

সংসার-চিত্র

[শ্রী এইচ, সান্ন্যাল]



শাখারী

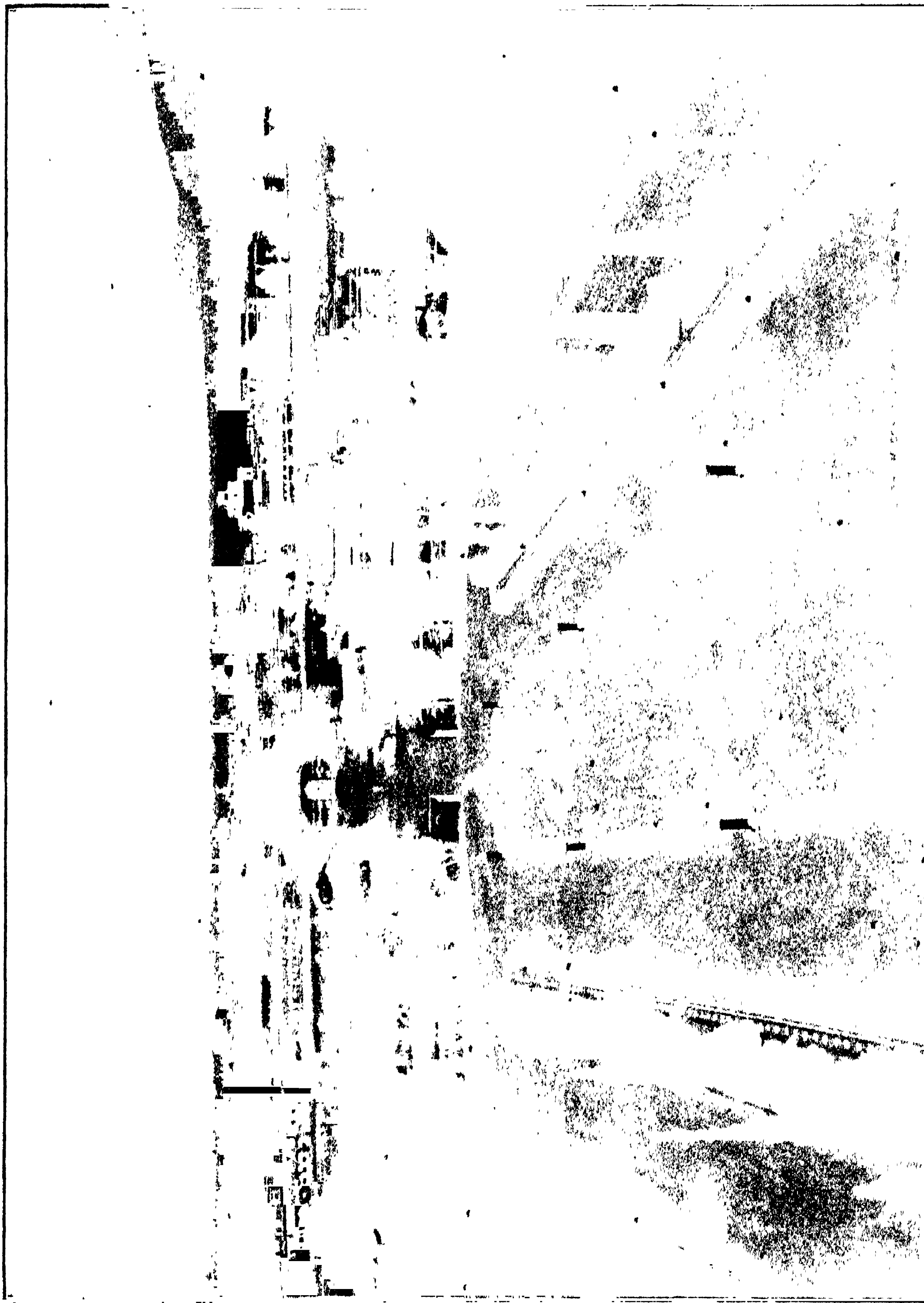


ফেরিওয়ালা

গৃহ-লক্ষ্মী

[শ্রীকালিদাস রায় বি-এ]

সকল জীর্ণতা মোর মধুর আশার
কিসলয়ে ভরে' গিয়ে হইল অরুণ,—
সব ঊষরতা মম শ্যামল শোভার
আনন্দে শিহরি পুন হইল তরুণ।
সকল দীনতা মোর ভরিলে মঙ্গলে,
পূর্ণ করে' দিলে তব আত্মার বৈভবে—
সকল হীনতা মোর সাজায়ে কৌশলে
দেবতারি পায়ে দিলে ভক্তির গৌরবে।
সকল বেদনা মোর হইল সাধনা;
সব পরিতাপ মম ধূপ হয়ে জ্বলে;
তপস্যা হইল মম সকল লাঞ্ছনা;
গঙ্গাবারি হয়ে মোর সব অশ্রু গলে।
অভিশাপ হলো বর, সকল বঞ্চনা
পরম লাভের পূর্ব্বে গোপন ব্যঞ্জনা।



দুর্গমধ্যে রাজপ্রাসাদ—মহীশূর



সমর ডাকঘরের ভারতীয় কর্মচারীবৃন্দ—মেসোপোটেমিয়া

ভেল্কী

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্]

বড় দারোগা হর্ষ বাবুর আজ মোটেই হর্ষ নাই। একটা বড় রকম ডাকাতি কেসের অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন,—সফল হইতে পারিলে সুফল-লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল; কিন্তু দেশের লোক্ এমন বেয়াড়া যে, সোজা সত্য কথাটুকু বলিতেও রাজী নয়। ডাকাতী হইয়াছিল ধ্রুব, এবং খানাতল্লাসীতে মালও ধরা পড়িয়াছে হুবহু; কিন্তু, যেহেতু তাহারা দারোগা ও ডাকাতের মধ্যে ডাকাতকেই ভয় করিত বেশী, সেই হেতু তাহাদের নিজের ব্যবহৃত কাপড়, বাসন, ইত্যাদি দেখিয়া সটান বলিল, "হুজুর, ও আমাদের চৌদ্দপুরুষে কখন ছিল না।" পুলিশের হাল-আইনে মার-ধর মানা,—সুতরাং ক্ষুণ্ণ মনে গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তন ভিন্ন আর উপায় ছিল না।

কিন্তু তাহাতেও সম্প্রতি একটু গোলযোগ দাঁড়াইয়াছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, এবং সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া ঘন, কালো মেঘ উঠিয়াছিল। ইহা কবির পক্ষে প্রীতিকর হইতে পারে, কিন্তু ডাকাতি মামলার অনুসন্ধানে বিফল-মনোরথ দারোগার পক্ষে নহে,—যাঁহাকে ইহার উপর আবার ছয় মাইল পথ বাইক করিতে হইবে।

মাইল-দুয়েক বাইক করার পর মুষলধারে বৃষ্টি নামিল, এবং গৃহ-গমনেচ্ছু দারোগাবাবুটিকে আদ্যোপান্ত সিক্ত করিয়া দিল। দুঃখের আরও যেটুকু বাকী ছিল, তাহাও হইল,—আধ-মাইলটাক হাঁটা-পথ উত্তীর্ণ হইবার সুযোগে, তাঁহার বর্ষার জুতা ভেদ করিয়া রাস্তার কাদা পদ-যুগলকে মণ্ডিত করিল, এবং তাঁহার বেশকেও অভিনব বৈচিত্র্য দান করিল।

(২)

দুঃখের দিনে বাঙ্গালীর স্ত্রীকে মনে পড়ে;—সুতরাং চেয়ারের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া, দারোগাবাবু ডাকিলেন, "ওগো!"

সুরমা আসিয়া কহিল, "ইস্! বড্ড ভিজে গেছো যে! কাপড়-চোপড় বদলাও,—জুতো খোলো।"

হর্ষবাবু কহিলেন, "ভিজেছি বলে ভিজেছি! আচ্ছা, আমি ও-সব বদ্লাচ্ছি,—কিন্তু সুরমা, চট্ ক'রে এক কাপ্ চা চাই যে!"

সুরমা বলিল, "এনে দিচ্ছি—এখুনি আনছি" বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

হর্ষবাবু কহিলেন, "আর শোন; আজ মিছামিছি ভারি হয়রাণ হ'য়েছি; কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যদি বেশ দিব্যি গরম-গরম আলু-দেওয়া খিচুড়ি পুরো-পেট খাওয়াতে পারো, তা হ'লে আর বেশী দুঃখ থাকবে না,—নিশ্চিন্ত হ'য়ে ডায়েরীটাও শেষ ক'রে ফেল্‌তে পারবো।"

সুরমা কহিল, "তা আর শক্ত কথা কি! আচ্ছা, চা-টা আগে আনি,—তুমি ততক্ষণ ও-সব ছাড়ো।"

সুরমা চা আনিতে গেল। হর্ষবাবু বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, সন্তর্পণে জুতাজোড়া খুলিয়া দেখিলেন যে, পদযুগল রাস্তার গভীর-কৃষ্ণবর্ণ কর্দ্দম-সারে-সিক্ত হইয়াছে; সুতরাং না ধুইলে চলে না। কিন্তু তাহার জন্য আপাততঃ কিছু পরিশ্রম প্রয়োজন। সুতরাং স্থির করিলেন, চা-পান করিয়া কিছু জীবনী-শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইয়া, তাহার পর দেখা যাইবে।

অবিলম্বে চা আসিল। সেই সদ্য-ক্লান্তিহারী গরম চা খাইতে-খাইতে দারোগাবাবুর আনন্দ-সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, "উঃ, সুরমা, তুমি যদি না থাক্‌তে, তা হ'লে—"

সুরমা কহিল, "তা হ'লে?"

"কে-ই বা এমন গরম চা দিত,—আর কে-ই বা খিচুড়ির ভরসা দিত। সত্যি, আমার গান গাইবার ইচ্ছা হ'চ্ছে।"

সুরমা হাসিয়া কহিল, "সেটা বরং ঐ খিচুড়ি খাওয়ার পরে, আর ডায়েরী লেখবার আগে, মাঝামাঝি সময়টায় গেও,—এখন আমি যাই, খিচুড়ি চড়িয়ে এসেছি।"

হর্ষবাবু হর্ষোৎফুল্ল স্বরে কহিলেন, "আচ্ছা যাও,— আমিও পাইখানা-টাইখানা সেরে আসি!"

(৩)

ঘরের পরেই রোয়াক,—তাহার নীচে উঠান;—সেইখান দিয়া পাইখানা যাইবার রাস্তা। উঠানের ঘাস এবং জঙ্গল, বর্ষার জল পাইয়া, অসম্ভব রকম বাড়িয়া, উঠানকে ত' ব্যাপ্ত করিয়াছেই,—রোয়াকের উপরও কিছু উঠিয়াছে। দারোগাবাবুর শাসন বাড়ীর বাহিরে যে পরিমাণে কঠোর, ভিতরকার এই বন-জঙ্গলের উপর তেমনি শ্লথ।

দেশে সাদা তেল পাওয়া যায় না, এবং লাল তেলে লণ্ঠন মসীময় হয়। এই দুইটি সত্যের যুগপৎ পরিচয়-স্বরূপ যে লণ্ঠনটি লইয়া দারোগাবাবু পাইখানা-যাত্রা করিলেন, তাহা আলোক অপেক্ষা বেশী অন্ধকারই বিকীরণ করিতেছিল।

খিচুড়ির কথা ভাবিতে-ভাবিতে দারোগাবাবু যে সময়টিতে রোয়াক হইতে সিঁড়িতে নামিবেন,—সেই সময় পায়ে কিসের দংশন অনুভব হইল! তীক্ষ্ণ দন্তের দংশন। মসীময় লণ্ঠন কাছে আনিতে-আনিতে দেখিলেন, সাপ! সাদায়-কালোয় ডোরা-দেওয়া সাপ,—পাদমূলে দংশন করিয়াছে। সবলে ঝাঁকানি দিতেই, সেটা লাফাইয়া রোয়াকের নীচে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তে যেন সমস্ত পৃথিবী চোখের সম্মুখে আকাশে হইয়া গেল,—মাথা ঘুরিতে লাগিল। টলিতে-টলিতে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া দারোগাবাবু ভগ্ন-কণ্ঠে ডাকিলেন, "ওগো—গেছি—শীগ্‌গির—"

ডাক শুনিয়া সুরমার ভয় হইল। সে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "ডাক্‌ছো?"

ক্ষীণকণ্ঠে হর্ষ কহিলেন, "সুরমা—গেছি, সাপে কামড়েছে।"

সুরমা বসিয়া পড়িয়া কহিল, "সাপ! বল কি?"

হর্ষ কষ্টে পা দেখাইলেন। গোড়ালির পাশ হইতে রক্ত ঝরিতেছে।

সুরমা কাঁদিয়া ফেলিল, "কি হবে গো!"

হর্ষ কহিলেন, "হরিশকে ডাকো। বাঁধো।"

তখন সুরমা আপনার চুলের ফিতা, দড়ি, শাড়ী,—যাহা পাইল তাহা দিয়া, যতটা সম্ভব বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া হরিশকে খবর দিল। হরিশ হর্ষবাবুর ভাগিনেয়,—সেই বাড়ীতেই থাকিয়া লেখা-পড়া ক'রে।

হরিশ আসিয়া শক্ত দড়ি দিয়া ভালো করিয়া বাঁধিয়া, ডাক্তারকে ডাকিতে গেল। সুরমা তাহার পূর্ব্বেই চাকরকে দিয়া ডাক্তার-বাবুদের ও ছোট দারোগাবাবুকে খবর পাঠাইয়াছিল।

(৪)

দারোগা হইলেও স্বভাবের গুণে হর্ষবাবুকে সবাই ভালবাসে। মতিবাবু ডাক্তারের বাসা মিনিট-দুইএর রাস্তা। তিনি তাঁহার পুত্রের পেন কাটিবার ভোঁতা ছুরি হাতের কাছে পাইয়া, তাহা লইয়াই অবিলম্বে চলিয়া আসিলেন।

বাঁধন তাঁহার তেমন পছন্দ হইল না, সুতরাং আরও দু'টা কঠিন বন্ধন দিলেন। হেলান-চেয়ারে শুইয়া হর্ষবাবু ক্ষীণ আপত্তি জানাইলেন,—কিন্তু বৃথা।

তাহার পর সেই ছুরি দিয়া সেখানটা চিরিয়া দিলেন। যেহেতু ছুরিও চলিতে চাহে না, এবং মাংসও কাটিতে চাহে না,—সেই হেতু ডাক্তারবাবুকে বল প্রয়োগ করিয়াই উভয়ের কার্য্য সমাধা করিতে হইল। তাহাতে হর্ষবাবু যে বেদনা পাইলেন, তাহা সর্পাঘাতের অপেক্ষা অল্প নহে। তাহার পর ঔষধ দিয়া দষ্ট স্থান পোড়াইয়া দেওয়া হইল।

এমন সময়ে দ্বিতীয় ডাক্তার গোপালবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি হাস্পাতাল হইতে ছুরি ও ঔষধ আনিয়াছিলেন। সুতরাং সেগুলি প্রয়োগ করা চাই। হর্ষবাবুর পুনশ্চ আপত্তি সত্ত্বেও, তিনি আরও একটা বাঁধন দিলেন; এবং হাস্পাতালের ছুরি দিয়া আরও একটু বড় করিয়া কাটিয়া, ভাল করিয়া পোড়াইয়া দিলেন।

তাহার পর তৃতীয় ডাক্তার যতীশবাবু। ইনি হালে-পাশ-করা ডাক্তার; সুতরাং হাল-আইন বেশী জানা আছে, বাহিরের লোকের এইরূপ ধারণা। কিন্তু পুরাতন ডাক্তারদের ধারণা,—বুজরুক, ভড়ং করিয়া লোককে ভুলায়।

যতীশবাবু সঙ্গে করিয়া "এ্যাণ্টিভেনাম" এবং "ইন্‌জেক্টার" আনিয়াছিলেন। পরোক্ত যন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঔষধটি মাংস ভেদ করিয়া রক্তে সঞ্চালিত করিয়া দিতে হয়। সরঞ্জাম দেখিয়া হর্ষবাবু আর একবার শিহরিয়া উঠিলেন।

যতীশবাবু কহিলেন, "অতোগুলো বাঁধন না হ'লেই হোত,—মিছামিছি রোগীকে কষ্ট দেওয়া। কিন্তু কাটা ত' ঠিক হয়নি। একটা ফালা কাটার চেয়ে, দুদিকে ঢেরা কাটা (cross-incision) উচিত ছিল।" বলিয়া তিনি ঢেরা

কাটিয়া যখন পুড়াইয়া দিলেন, তখন হর্ষবাবুর চোখে জল আসিল।

তাহার পর ক্ষীণকণ্ঠে হর্ষবাবু কহিলেন, "এবার কি কুঁড়ে ওষুধ দিবেন? ওটা না হয় থাক্।"

যতীশবাবু কহিলেন, "হাঁ,—ওটা বিষাক্ত সাপে যে কামড়েছে, এটার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হয়ে দেওয়া উচিত নয়। আপনি কি সাপটাকে দেখেছিলেন? কি রকম মনে হয়?"

"ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাইনি,—তবে যা দেখেছিলাম তাতে—"

যতীশ। খুব কি জ্বালা করছে?

হর্ষ। কচ্ছে! কিন্তু সেটা বিষের, কি কাটাব, কি পোড়ানর—তা ত' বুঝ্‌তে পারছিনে। আমার যা মনে হ'চ্ছে তাতে, শেষের দুটোরই বলে বোধ হয়।

য। অস্বস্তি বোধ হচ্ছে?

হ। বিশেষ ক'রে ঐ বাঁধন আর কাটার।

যতীশ বাবু বলিলেন, "তবে থাক। আর একটু দেখে দেওয়া যাবে।"

এমন সময়ে ঘরের বাহিরে কোলাহল শোনা গেল। মাল-বৈদ্য আসিয়াছে,—ছোট দারোগা বাবু খবর দিয়াছিলেন। তাহারা দুই দল আসিয়াছে।

(৫)

প্রথম বৈদ্য আসিয়া চোখের পাতা দুটা উল্টাইয়া পরীক্ষা করিয়া, মন্ত্র পাঠ করিয়া, কাণের কাছে দুইবার তুড়ি দিল। কহিল, "শুনতে পেয়েছেন?" "পেয়েছি।"

তখন সে কহিল "তবে হবে। আমার চার-ঘড়া জল চাই,—আর দুটো মজবুত দেখে কাপড় চাই।" তাহাকে তাহার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় বৈদ্য কহিল, "আমার ও-সব চালাকি নেই। আমি একেবারে আপনাদের চোখের সামনে ডাক্ লাগিয়ে দোরো,—মা বিষহরির কৃপায়, সেই সাপটাকে নিয়ে এসে, ছোবল দিইয়ে বিষ তুলিয়ে নোবো। কিন্তু সাপটাকে ত চাই।" তাহার এই কঠিন ফর্মায়েসে, ডাক্তাররা মুখ চাওয়াচাহি করিলেন, এবং ছোট দারোগাবাবু বিষণ্ণ মনে চিন্তা করিলেন, এ কাজটা বোধ হয় আমার সর্ব্বশক্তিমান্ কনেষ্টবলেরও ক্ষমতার অতীত!

বৈদ্য বুঝিতে পারিয়া বলিল, "না, ওটাকে আমিই বার করব,—একটা খুব জোর আলো চাই।" আলো দেওয়া হইল।

তখন প্রথম বৈদ্যের চিকিৎসা আরম্ভ হইল। সে এইরূপ। একজন হর্ষবাবুর মাথায় এক এক ঘড়া জল ঢালিতে লাগিল, এবং দুই পাশ হইতে দুইজন, কাপড়ে শক্ত গেরো বাঁধিয়া, সজোরে মাথার উপর পটাপট আঘাত করিতে লাগিল। বৈদ্য বলিয়াছিল, ঘুমাইয়া পড়িলেই বিপদ। সেইজন্য পাশে দুইজন কনষ্টেবল লাঠি হাতে দাঁড়াইল,—ঘুমাইলেই সজাগ করিয়া দিবে, এবং প্রয়োজন হইলে লাঠির গোঁচা মারিবে।

বাহিরে সাপ ধরার সরঞ্জাম এইরূপ—দুইজন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুইটা সাপুড়ের বাঁশী লইয়া, গাল ফুলাইয়া, মাথা নাড়িয়া ক্রমাগত বাজাইতে লাগিল, এবং তৃতীয় ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে অবোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল, এবং মাঝে-মাঝে সশব্দে লম্ফ দিতে লাগিল।

বাহিরে এই বিরামহীন বাঁশীর পোঁ ও মন্ত্র এবং ভিতরে ততোধিক বিরামহীন বস্ত্রাঘাত ও স্নান,—একবার দুই চোখ বুজিয়া আসিল,—নিদ্রায় নহে, ক্লান্তিতে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দুই লাঠির খোঁচায় আবার সোজা হইয়া চোখ চাহিয়া বসিতে হইল।

মনে হইল, শেষ সু নিকট—জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে যে কালো পর্দ্দা আছে, সেটা যেন সরিয়া যাইতেছে। উঠানের ওই যে পোঁ—ও যেন মৃত্যুর পর-পারের আহ্বানধ্বনি! প্রাণ আর থাকিতে চায় না,—বিষেই হউক বা চিকিৎসাতেই হউক। পায়ে তীক্ষ্ণ জ্বালা,—গরলেরই হউক অথবা দাহেরই হউক। বন্ধনের বিষম বেদনা,—চিকিৎসার অশেষ ক্লেশ! বুক কেমন করিতে লাগিল। হর্ষ একবার সুরমাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

(৬)

সুরমা সেই হইতে ঠাকুর-ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। কালীর পটের তলায় মেঝেয় পড়িয়া, সে লুটাইয়া-লুটাইয়া এত কাঁদিয়াছে যে, পাষাণও তাহাতে দ্রব হয়।

এমন সময়ে স্বামীর আহ্বানে উঠিয়া বসিয়া, আর একবার মা কালীকে প্রাণের আকুলতা জানাইয়া স্বামীর

নিকট আসিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া—দুই চোখ লাল, মাথার চুল এলোথেলো। সে হর্ষর পদতলে আসিয়া বসিল।

হর্ষ কহিলেন 'সুরমা চল্লুম, আর বাঁচিনে! এমন ক'রে যেতে হবে—"

সুরমা তাহার আঁচল দিয়া স্বামীর সিক্ত দেহ, মুখ, চোখ মুছাইতে-মুছাইতে কাঁদিতে লাগিল।

হর্ষ কহিলেন "চায়না ব্যাঙ্কে চার হাজার, আর সান লাইফে—"

সুরমা কহিল "ছিঃ, ও-সব বোলো না, আমি ও-সব চাইনে।"

সুরমার হাত লইয়া হর্ষ আপনার বুকের ওপর রাখিলেন, "সুরমা—"

সুরমা কহিল "কেমন আছো?"

"এখন আর তত খারাপ বোধ হচ্ছে না—কিন্তু—"

সুরমা কহিল, "আমি জানি, তুমি ভাল হবে,—সেরে উঠ্‌বে। মা কালী যদি সত্যিকার হন, আর আমি যদি সতী হই—"

এমন সময়ে বাহিরে একটা চাপা হাসির শব্দ উঠিল। পরমুহূর্ত্তে সর্প-বৈদ্য হাতে করিয়া একটা সাপ আনিয়া কহিল "সাপ ধরেছি!"

হর্ষ উত্তেজিত হইয়া কহিলেন "ধরেছো? কি সাপ?"

সে কহিল "ছেলেদের রবারের সাপ।" শুনিয়া সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং কনষ্টেবলরা মুখ ফিরাইয়া হাসি চাপিল। খানিক ক্ষণের জন্য চুপ করিয়া চেয়ারে শুইয়া থাকিয়া হর্ষ বাবু উঠিয়া বসিলেন, "আঃ, বাঁচলুম।"

সাপের 'আইডেন্‌টিফিকেশন'ও হইয়া গেল। হর্ষর ছোট ছেলে নীরু সেটা লইয়া রোয়াকে খেলিতে-খেলিতে, বৃষ্টি আসায়, তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া আসে। তাহার কিছু পরেই খিচুড়ি-মোহে উদ্‌ভ্রান্ত-মনা পাইখানা-গামী দারোগা বাবু তাহার মুখে ও গায়ে তাঁহার বিরাট পা দেন। তাহাতে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু ক্ষতি হইয়াছিল তাহার অতি-কৌশলে লণ্ডনে-প্রস্তুত সূচ্যগ্র ইস্পাতের জিহ্বাটায়। সেটা কোন দয়া না করিয়া পায়ে ফুটিয়া রক্ত-পাত করে, এবং সাপটা ঝাঁকানিতে একেবারে রোয়াক ছাড়াইয়া নীচে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়। পিঠে তাহার এখনও কৃষ্ণ কর্দ্দমের পদচিহ্ন লাগিয়া আছে।

শোকাকুল গৃহ মুহূর্ত্তে আনন্দ-মগ্ন হইল। ডাক্তাররা হাসিতে-হাসিতে এবং বৈদ্যরা অহঙ্কার করিতে-করিতে চলিয়া গেল।

* * * *

সুরমা আসিয়া আবার স্বামীর কাছে বসিল। তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া হর্ষ কহিলেন "সুরমা, কাঁদছ যে!" সুরমা কহিল "না, কাঁদছিনে! কিন্তু কি যেন বুকের ভেতর ঠেলে উঠ্‌ছে,—চোখ জলে ভরিয়ে দিচ্ছে। মা এক মুহূর্ত্তে কেমন ক'রে সব ভেল্কি ক'রে উড়িয়ে দিলেন, তাই ভাবছি!" হর্ষ চুপ্ করিয়া রহিলেন।

সুরমা কহিল "খাবার আনব কি?"

হর্ষ কহিলেন, "না-না, কিছু দরকার নেই,—তুমি আমাকে ছেড়ে আজ কোথাও যেও না।"

মুক্তি

[শ্রীলীলা দেবী]

গন্ধমালায় বন্ধ করিয়া
বন্দী করিবে যবে,
চির-আমরণ শৃঙ্খল-ডোর
সেই তো মুক্তি হবে!

অনুরাগ-রাঙা গৈরী বসন
ভক্তি-তিলক ভালে;
সরম-অরুণ-চন্দন-ছাপ
অঙ্কিত দু'কপোলে।

প্রেম-নন্দিত যজ্ঞ-ধূমের
আহুতি জ্বালিবে বুকে ;—
প্রাণ-সঙ্গমে হবে মহাযোগ
মন-মোহানার মুখে।

ওগো বঁধু,—মোর মুক্তি-বিধাতা !
এমনি নিবিড় ক'রে
মুক্তি দাও হে বাঁধিয়া আমারে-
দু'খানি বাহুর ডোরে॥

দুইখানি ইতিহাস

[অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ ও শ্রীজলধর সেন]

SIVAJI AND HIS TIMES

গ্রন্থের নাম দেখিয়াই পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। ইহার বাঙ্গালা নাম দিতে গেলে বলিতে হয়, ইহা 'শিবাজি ও তৎসাময়িক ইতিহাস'। এই গ্রন্থখানির লেখক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম-এ, পি-আর-এস্ মহাশয়। পুস্তকখানির মূল্য চারিটাকা।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে (১৮২৬ খৃষ্টাব্দে) কাপ্তেন জেম্‌স্ গ্রাণ্ট ডফ্ (Captain James Grant Duff) মারাঠা জাতির একখানি ইতিহাস (History of the Mahrattas) লিখিয়াছিলেন। সেই তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ ইতিহাসই এই একশত বৎসরকাল মারাঠাদিগের ইতিহাসরূপে পঠিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে শিবাজি ও মারাঠাজাতি সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন সংবাদ জানিতে পারা গিয়াছে, এবং অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে অনেক তথ্য, অনেক কাগজপত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। এই সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইবার পর অধ্যাপক সরকার মহাশয় শিবাজি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। তাহারই ফলস্বরূপ এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসখানি প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় বলিতেছেন যে, গ্রাণ্ট ডফ্ মহোদয় যে সকল উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া একশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সময়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার ফলে গ্রাণ্ট ডফ্ মহোদয়ের অনেক সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সেই সকল ভ্রম প্রদর্শন করিয়া অধ্যাপক সরকার মহাশয় শিবাজির এই জীবন-চরিত প্রকাশিত করিলেন। সরকার মহাশয় এই জীবন-কথার প্রামাণ্য উপকরণ সংগ্রহের জন্য যেখানে যেখানে যাওয়া প্রয়োজন, যাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন, সর্ব্বত্র গমন করিয়াছেন ; এবং কাগজপত্র হস্তগত করিবার জন্য যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ত্রুটী করেন নাই। পুস্তকখানি পাঠ করিলেই তাহার প্রমাণ পত্রে-পত্রে পাওয়া যায়। তাঁহার ভূমিকায় প্রকাশ যে, তিনি হিন্দী, মারাঠী, ফার্সী, ইংরাজী ও পর্ত্তুগীজ এই পাঁচ ভাষায় শিবাজি সম্বন্ধে হস্তলিখিত ও মুদ্রিত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এজন্য বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া আফিস, এমন কি লিস্‌বনের Accademy of Science প্রভৃতি হইতে বহুব্যয়ে কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। এত দীর্ঘকালের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফল যে আশাতিরিক্ত হইবে, তাহা না বলিলেও চলে। অধ্যাপক সরকার মহাশয় বিগত ২৫ বৎসরের অধিককাল মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের ইতিহাস সঙ্কলনে নিযুক্ত আছেন ; উক্ত বাদশাহের জীবন-চরিত তিনখণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, আরও প্রকাশিত হইবে। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালের বিবরণের মধ্যে মারাঠাকুলতিলক শিবাজির কার্য্যকলাপ, সর্ব্বপ্রধান বিষয়। অধ্যাপক সরকার মহাশয়কে বিশেষতঃ সেই কারণেই এই অনুসন্ধানে ব্রতী হইতে হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডফ্ মহোদয় কেবল খাফি খাঁর ফার্সী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও জোনাথান স্কট লিখিত ভীমসেন বুরহানপুরীর জীবন-চরিতের আংশিক ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। খাফি খাঁ শিবাজির জন্মের ১০৮ বৎসর পরে পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন; সে সময় তিনি যে সমস্ত কাগজপত্র পাইয়াছিলেন, তাহা হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ট ডফ্ মহোদয়ও এই গ্রন্থের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন। এখন যে সমস্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে গ্রাণ্ট ডফ্ মহোদয়ের অনেক কথা ভ্রান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। মারাঠী উপাদানের মধ্যে গ্রাণ্ট ডফ্ শিবাজির জন্মের ১৮৩ বৎসর পরে রচিত চিট্‌নীস বখরের উপর একটু অধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু নানা কারণে এখানি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া অধ্যাপক সরকারের মনে হয় নাই। তিনি শিবাজির সভাসদ্ কৃষ্ণাজী অনন্তের গ্রন্থ অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন।

অধিকাংশ ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা জানিয়াছিলাম যে, আফ্‌জল খাঁর হত্যাকাণ্ডে শিবাজি নিজেকে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন;—এ হত্যাকাণ্ড বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। শিবাজির সহিত আফ্‌জল খাঁর সাক্ষাৎ হইলে, শিবাজি অতর্কিতভাবে নিরস্ত্র আফ্‌জলকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। কিন্তু, অধ্যাপক সরকার তাঁহার এই পুস্তকে ঐ ঘটনা সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, আফ্‌জলই শিবাজিকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকার মহাশয় 'ভারতবর্ষে' যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে অংশবিশেষ এখানে পুনরায় উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। অধ্যাপক সরকার লিখিয়াছেন—"শিবাজি উচ্চ বেদীর উপর আরোহণ করিয়া নতশিরে আফ্‌জলকে অভিবাদন করিলেন। খাঁ তাঁহার আসন হইতে উত্থিত হইয়া, কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া, শিবাজিকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত বাহুদ্বয় প্রসারিত করিলেন। * * * সহসা আফ্‌জল তাঁহার বাহু-বেষ্টনীর মধ্যে শিবাজিকে সবলে চাপিয়া ধরিলেন এবং বামহস্তে সজোরে শিবাজির গলা টিপিয়া দক্ষিণ হস্তে তাঁহার সুদীর্ঘ সোজা ছোরা বাহির করিয়া শিবাজির পাঁজরে আঘাত করিলেন, কিন্তু অদৃশ্য বর্ম্ম এই আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিল। * * * মুহূর্ত্ত মধ্যে শিবাজি এই অতর্কিত আক্রমণ হইতে নিজেকে সামলাইয়া লইলেন, এবং তাঁহার বামবাহু দ্বারা আফ্‌জলের কটি বেষ্টন করিয়া ইস্পাতের নখের আঘাতে তাঁহার উদর চিরিয়া ফেলিলেন।"

অধ্যাপক সরকার সভাসদ্ বখর ও অন্যান্য কাগজপত্র হইতে উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মহাশয়, তাঁহার নবপ্রকাশিত 'Oxford History of India' পুস্তকে এই ঘটনা সম্বন্ধে সভাসদ বখরই অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি সভাসদ বখরের লিখিত অংশের পূর্ব্বভাগ (অর্থাৎ যে অংশে আফ্‌জলের প্রথম আক্রমণের কথা লিপিবদ্ধ আছে) পরিত্যাগ করিয়া শেষের অংশ গ্রহণ করিয়া শিবাজিকে বিশ্বাসঘাতক নরহন্তা বলিয়াছেন। অধ্যাপক সরকার উক্ত বখরের সমস্তটা তুলিয়া দিয়া আত্মমত সমর্থন করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য কাগজপত্রেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের এই ইতিহাসখানি পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি শিবাজি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই, এবং সুদীর্ঘকাল অনুসন্ধানের ফলে যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, নিরপেক্ষভাবে তাহার বিচার করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক যা-তা বলিবার ব্যক্তি নহেন; তাঁহার ঔরঙ্গজীবের ইতিহাসই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, এতদিন শিবাজি সম্বন্ধে তাঁহারা যে সমস্ত কথা পাঠ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার অনেক ঘটনাই বাস্তব নহে; যদুনাথবাবু যথাযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া অনেক ভ্রান্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে অনেকে ইতিহাস চর্চ্চায় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহারা অধ্যাপক সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, যথোচিত অনুসন্ধান পূর্ব্বক যদি ইতিহাস-রচনা-কার্য্যে ব্রতী হন, তাঁহারা যদি অন্ধভাবে পরের সংগৃহীত অপূর্ণ উপকরণ লইয়া ঘরে বসিয়া ইতিহাস-রচনায় প্রবৃত্ত না হন; যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব

উপকরণ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করা হয়। এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এবং তাঁহার ন্যায় আরও দুই-একজন নিষ্ঠাবান বঙ্গ-সন্তান তাঁহাদের পথি-প্রদর্শক।—শ্রীজলধর সেন।

"মোগলযুগে স্ত্রীশিক্ষা"

প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পুস্তক ("বাঙ্গালার বেগম") সমালোচনা কালে আর্য্যাবর্ত্তে লিখিয়াছিলাম, "উর্ব্বর ক্ষেত্রে আজি যে অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে, কালে তাহা প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইবে।" তখন এ কথায় অনেকে টীকাটিপ্পনী প্রয়োগে 'কসুর' করেন নাই। আজ অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় ব্রজেন্দ্রনাথের দুইখানি পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া, এবং নিজ ইংরাজী গ্রন্থ "শিবাজী"তে, ব্রজেন্দ্রের সত্যানুসন্ধিৎসার যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে আর কাহারও টীকার আবশ্যকতা হইবে না।

আলোচ্য গ্রন্থখানি—'মোগলযুগে স্ত্রী শিক্ষা'—খুব একখানি ছোট বই,—একটা বড়গোছের প্রবন্ধ বলিলেই হয়। প্রবন্ধাকারেই ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং প্রবন্ধের দোষগুণ ইহাতেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা করেন, শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা। নরেন্দ্র বাবু তাঁহার সুলিখিত ইংরাজী পুস্তকের ("Promotion of Learning in India During Muhammadan Rule") মোগলযুগে স্ত্রীশিক্ষায় আলোচনা সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা সূত্রপাত করেন। কিন্তু নরেন্দ্র বাবুর পুস্তক বঙ্গীয় পাঠকবর্গের জন্য লিখিত হয় নাই বঙ্গীয় পাঠকের দুর্ভাগ্য বশতঃ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পাঠকগণের সৌভাগ্যের জন্য উহা ইংরাজীতে লিখিত। ব্রজেন্দ্র বাবুর পুস্তক বাঙ্গালার বাঙ্গালী পাঠকের জন্য লিখিত; এবং ইহাতে কুমার নরেন্দ্রনাথ যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তদপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে।

বইখানি ক্ষুদ্র হইলেও, আমরা ইহা পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, অনেক নূতন তথ্য শিখিয়াছি। পাঠকগণও ইহা পড়িয়া ইহাতে, যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

গ্রন্থের ভাষা বেশ সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থ-মধ্যস্থ চিত্রগুলিও সুন্দর। আর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে প্রচ্ছদপটখানি। আজকালকার এই বাজারে ॥৵০ মূল্য কিছুই বেশী হয় নাই।

গ্রন্থে একটী ত্রুটী রহিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে এ ত্রুটী দূরীভূত হইবে বলিয়াই আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম। গ্রন্থমধ্যে কয়েক স্থানে ইংরাজী ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই পাদটীকায় ইংরাজী ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য পাদটীকায় যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সকল বহুমূল্য, দুর্ল্লভ গ্রন্থ;—সাধারণ পাঠকের তাহার সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনাও নাই (এবং ইহাতেই ব্রজেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রকটিত হইতেছে); তথাপি বাঙ্গালা গ্রন্থে ইংরাজী কম থাকা, বা না থাকাই ভাল। থাকিলে তাহার অনুবাদ দেওয়া আবশ্যক। অবশ্য ইহা সামান্য ত্রুটী—ইহা ধর্ত্তব্য নহে। আমরা সকলকেই অসূর্য্যম্পশ্যা মোগল-রমণীদের এই অভিনব চিত্র পড়িতে অনুরোধ করি।

—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

বনবাস

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

বনবাস মোর শেষ হবে কবে,—
জান যদি, মোরে কহ রে?
চৌদ্দ বরষ রয়েছি যে আমি
পাড়াগ্রাম ছাড়ি সহরে।

কাননে রামের বহু সুখ ছিল
ছিল ফুল-তরু-লতা হে,
স্বচ্ছ সলিলা ছিল গোদাবরী
ভুলাতে পারিত ব্যথা হে

এখানে নাহিক বন-মর্ম্মর
বন-বিহগের সাড়াটী,
অগাধ জলের বদলে পেয়েছি
ক্ষীণ কল-জল-ধারাটী।
কোথা আমগাছে ঝুল-ঝাপ্পুর,
কোথা বটগাছে ঢুর্লবো,
কোথা অজয়ের সেই শ্যাম কূল,
যেথা বুনো-কুল তুলবো।
কোথা কস্‌কসে কাঁকুড়ের ক্ষেত,
ছোলা মটরের ভূঁই গো,
রাজা হব কোথা,—বিমাতার মত
বনে পাঠাইলি তুই গো।

মহা সমারোহে যাব মিথিলায়
কোথা হরধনু টুট্‌তে,—
তুই মা আমারে বনে পাঠাইলি
মারীচের পিছু ছুট্‌তে।
হাঁফ ছাড়িবার সময় নাহি মা!
পেটেতে নাহি মা অন্ন,—
দিশেহারা হয়ে ছুটেছি কেবল
স্বর্ণ-মৃগের জন্য।
আর কি তোমার কোমল কোলে মা,
পাব না কি আমি ফির্‌তে?
শৈশব-সুখ-স্বর্গ আমার
সরযূর তীর-তীর্থে।

ঠাকুরদাদার গল্প

[শ্রী———চন্দ্র]

গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর। গ্রামখানি নিস্তব্ধ, নিঝুম। কোথাও দু'একটি বালক গ্রীষ্মের কাট-ফাটা রৌদ্রকে উপেক্ষা করিয়া কাঁচা আম খাইবার জন্য হাতে চাকু-ছুরি এবং নুন লইয়া বাগানে-বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পাড়ার ছেলেদের দলের সর্দ্দার নোদে ওরফে নন্দদুলাল মা'তার ভৎর্সনায় বিমর্ষ হইয়া, জানালার নিকট বসিয়া ভাবিতেছিল, আজ আর আম খাইতে যাওয়া হইল না। আম-বাগানের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, কেহ আম কুড়াইতেছে, কেহ পাড়িতেছে, কেহ কাটিয়া নুন মাখিয়া খাইতেছে। উহাদের সহিত আম পাড়িবার জন্য, নুন মাখিয়া আম খাইবার জন্য, নন্দলালের প্রাণ ছটফট্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু মাতা আজ যে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাহা এড়াইয়া গৃহ হইতে বাহির হওয়া নিতান্ত শক্ত ব্যাপার। এমন সময় গোবরা ওরফে গোবর্দ্ধন ডাকিল, "নোদে, যাবি রে?"

নোদে তাড়াতাড়ি জানালা হইতে মুখে আঙ্গুল দিয়া সঙ্কেত করিল—'টু' করিতে; এবং হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিল, "একটু অপেক্ষ কর, আমি যাচ্ছি।"

এই বলিয়া নোদে চুপিচুপি ঘর হইতে বাহিরে আসিল। এমন সময়ে তাহার মাতা গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "নোদে, কোথা যাচ্ছিস?"

"কোথা আবার যাচ্ছি"—এই বলিয়া নোদে তাহার ভাই-বোনদের ডাকিয়া বলিল, "আয় রে, ঠাকুরদাদার কাছে গল্প শুনিগে।" এবং হাত দিয়া ইঙ্গিত করিয়া গোবরাকে জানাইল, আজ আর তাহার যাওয়া হইল না। গোবরা চলিয়া গেল।

ঠাকুরদাদা আহারান্তে তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত বপুখানিকে শয্যায় এলাইয়া দিয়া, দিবা-নিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে নন্দদুলাল-প্রমুখ তাঁহার ক্রীড়ানিরত নাতি-নাতিনীগুলি আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিল, "ও ঠাকুর্দ্দা, গল্প বল।"

ঠাকুরদাদা নিমীলিত নেত্রে, ঔদাসীন্যের সহিত বলিলেন, "আমি এখন গল্প বল্‌তে পারি না,—যা, খেলা করগে যা।" নাতি-নাতিনীগুলি ঠাকুরদাদার উদাস-গম্ভীর স্বরে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত তাঁহাকে ঠেলা দিতে-দিতে সমস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, "ও ঠাকুরদাদা, গল্প বল,—ও ঠাকুরদাদা, গল্প বল।"

ঠাকুরদাদা এইবার একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সমস্ত দিনের পর একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছি—তোদের জ্বালায় একটু ঘুমোবারও জো নেই রে।"—এই বলিয়া নিজেকে সুরক্ষিত করিবার জন্য ভাল করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। কিন্তু নাতি-নাতিনীগুলি তাহাতে একটুও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল—ঠাকুরদাদার নাকে-কাণে কাটি প্রবেশ করাইয়া দিল।

ঠাকুরদাদা হাঁচিয়া, কাশিয়া উঠিয়া বসিলেন। উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া, একজন তাঁহার কোল অধিকার করিল; এবং আর সকলে তাঁহার হাত দু'খানি দৃঢ়রূপে ধরিয়া, পুনরায় সমস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, "ও ঠাকুরদাদা, গল্প বল,—ও ঠাকুরদাদা, গল্প বল।"

ঘুমাইবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ঠাকুরদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের গল্প বলব?" ফরমাইস হইল—রাজার গল্প। ঠাকুরদাদা আরম্ভ করিলেন :—

"এক যে ছিল রাজা, তার একটি ছিল পাখী—"

এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে, অমনি একটি নাতি বলিয়া উঠিল, "ওমা, পাখী কি গো, রাণী বল।"

"না রে না, পাখী।"

"বাঃ গো, রাণী না থাকলে বুঝি রাজ্য হয়।"

ঠাকুরদাদা একটু হাসিয়া নূতন করিয়া আরম্ভ করিলেন, "এক যে ছিল রাজা, তার একটি ছিল রাণী, আর একটি ছিল পাখী—"

এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে, অমনি একটি নাতিনী বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ ঠাকুর্দ্দা, পাখীটা বুঝি রাজার দুয়োরাণী ছিল, আর রাণী ছিল রাজার সুয়োরাণী; সুয়োরাণী হিংসা করে দুয়োরাণীর খোঁপায় একটা শিকড় গুঁজে দিলে, আর দুয়োরাণী পাখী হয়ে গেল—নাঃ?"

"না রে না, পাখীটা পাখীই ছিল, রাণী ছিল না।"—এই বলিয়া ঠাকুরদাদা আবার আরম্ভ করিলেন, "পাখীটা দেখতে ছিল ভারি চমৎকার—ঠোঁট দু'টো তার গোলাপ ফুলের মত; গা ছিল তার নানান রঙে চিত্তির-বিচিত্তির করা; তার মাথার ঝুঁটি আর লেজ ছিল সোণালি রঙের। এমন যে চমৎকার পাখী, তাকে রাজামশাই আদর-যত্ন না করে থাকতে পারলেন না। তাই তাকে সোণার দাঁড়ে সোণার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন। নিজে সদা-সর্ব্বদা দেখা-শোনা করতে পারবেন না বলে, একটা দরওয়ান রেখে দিলেন। পাখীটা প্রথম-প্রথম গাইত, নাচত, আর কুটুর-কুটুর ছোলা কাটত। দরওয়ানেরও কোন ভাবনা-চিন্তা নাই—সে মোটা মাহিনা পায়, সকাল সন্ধ্যা সিদ্ধি ঘোঁটে, গাঁজা টেপে, আর ফুর্ত্তি করে।

হঠাৎ এক দিন পাখী দেখতে পেলে, তার মাথার উপরে—আকাশে, তার মত কত পাখী উড়ে যাচ্ছে; আর শুনতে পেলে, তারা প্রাণের সমস্ত আনন্দ ঢেলে দিয়ে সে কি সুমিষ্ট স্বরে, সে কি প্রাণ-মাতান সুরে গাইছে, "এই অসীম, অনন্ত নীলাকাশে, যেখানে নানা রঙের হাজার-হাজার মেঘ ভেসে যাচ্ছে, আমরাও তাদের সঙ্গে সেখানে ভেসে যাচ্ছি; ওঃ সে কি সুন্দর, সে কি আনন্দ! নীচে অই সবুজ ক্ষেতে আমাদের জন্য খাদ্য সঞ্চিত রয়েছে, ঐ নদীতে তড়াগে আমাদের জন্য জল সঞ্চিত রয়েছে; ক্ষুধা পেলে, তৃষ্ণা পেলে আমরা নীচে নেমে গিয়ে খেয়ে আসি,—ওঃ, সে কি আনন্দ! নীলের রাজ্যে আমরাই রাজা আমরাই প্রজা,—ওঃ সে কি আনন্দ, সে কি আনন্দ!"

এই গান শুনে পাখীটার মনে পড়ে গেল,—সেও এক দিন অমনি প্রাণের আনন্দে গান গাইতে-গাইতে, গগনকে মুখরিত করে উড়ে যেত। ওই সবুজ ক্ষেতে তারও জন্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকত, নদীতে তড়াগে সেও তৃষ্ণার জল পেত;—আজ কেন তার এমন হ'ল! তারও ইচ্ছা হ'ল, এখনই ছুটে যায়। অমনি সে তার ডানায় ঝাপট মারলে,—কিন্তু হায় রে তার পায়ে যে শিকল বাঁধা! সে জোরে-জোরে ঝাপট মারতে লাগল,—আশা, যদি শিকলটা ছিঁড়ে যায়। ডানার ঝাপটের শব্দ শুনে অমনি দরওয়ান ছুটে এল—কি ব্যাপার? এসে দেখলে, পাখীটা ঝট্-পট্ করছে। তাই দেখে তাকে আদর করতে-করতে বললে, "ওরে দুষ্ট পাখী, থাম্—থাম্; এই নে, তোকে ছোলা দিচ্ছি—খা।"

কিন্তু এবার দরওয়ানের-দেওয়া ছোলা-জলে পাখীর মন ভিজল না। সে কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করতে-করতে বললে, "ওগো, আমায় ছেড়ে দাও,—আমি ঐ নীলের রাজ্যে, অসীম, অনন্ত নীলাকাশে ভেসে যাই,—ওগো, আমায় ছেড়ে দাও; আমিও ঐ নীলাকাশের পাখীদের মত, অমনি ভাবে গাইতে গাইতে উড়ে যাই—আমায় ছেড়ে দাও, ওগো আমায় ছেড়ে দাও। আমি মুক্ত আনন্দের অমৃত-ধারায়

আস্বাদন পেয়েছি ; এই আস্বাদন আজ আমাকে তৃষ্ণাতুর ক'রে তুলেছে, আমার সুপ্ত সৌন্দর্য্য আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুলেছে ; এই অতৃপ্ত তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি কেমন করে এই শিকলে বাঁধা রইব !—ওগো আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।"—এই বলে সে চীৎকার করতে লাগল, আর ঝট্‌পট্ করতে লাগল।

এই কথা শুনে রাগে দরওয়ানের চোখ রাঙা হয়ে উঠল। সে পাখীর দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে, আর আগুনের বলের মত চোখ দুটো ঘুরিয়ে বললে, "উঃ, কি নিমকহারাম এই পাখী! এতকাল যাকে সোণার দাঁড়ে বসিয়ে, ছোলা-জল দিয়ে পুষলাম, সে কি না আজ বলে ছেড়ে দাও! এতকাল যাকে এত সুখে এত আদর-যত্নে পালন করলাম, সে কি না আজ বলে, আমায় ছেড়ে দাও! উঃ, কি অকৃতজ্ঞ এই পাখী! ওরে অকৃতজ্ঞ, ওখানে কত তোর শত্রু আছে—তা তুই জানিস? আমরা তোকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করছি; এমন সুখশান্তি ছেড়ে, অশান্তির মধ্যে ছুটে যেতে কেন তোর ইচ্ছা হ'ল? এ কুবুদ্ধি তোকে কে দিলে?"

পাখী বললে, "ওগো, আমি নিমকহারাম নই,—কৃতঘ্ন নই; যতকাল বেঁচে থাকব, ততকাল তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। তুমি বলছ ওখানে শত্রু আছে; তা থাক; অন্য পাখীরাও ত শত্রুর কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করে বেঁচে আছে, আমিও অমনি করে বেঁচে থাকব। তুমি বলছ, অশান্তির রাজ্যে ছুটে যাওয়া হচ্ছে আমার কুবুদ্ধি। এ যদি আমার কুবুদ্ধি হয়, তবে এ আমার জন্মগত কুবুদ্ধি, ভগবানের দেওয়া কুবুদ্ধি; কারণ, এ ডানা-দুটো আমি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছি। এ দেখে তোমরা বুঝতে পারছ না, উড়ে যাওয়ার ইচ্ছা আমার জন্মগত ইচ্ছা? তাই বলছি, ওগো, আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।"

এই কথা বলে সে আবার ডানার ঝাপট মারতে আরম্ভ করলে। এই দেখে দরওয়ান আরও রেগে উঠল। চোখ-দুটো তার আলেয়ার আলোর মত দপ্‌দপ্ করে মুখের মাঝে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে চীৎকার করে বললে, "ফের যদি ডানার ঝট্‌পট্ শব্দ শুনতে পাই, তা'হলে মট্‌মট্ করে' পাখার পালক ভেঙ্গে দেব।"

এতেও কিন্তু আজ পাখী একটুও ভয় পেলে না। আজ যে তার সারা হৃদয় ব্যেপে উন্মুক্ত আনন্দ-আস্বাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগেছে,—সেই বক্ষে ভয়কে গ্রহণ করবার মত আজ যে তিলার্দ্ধ স্থানও নাই। তাই সে আকুল আগ্রহে, ব্যাকুল আর্ত্তনাদে, সেই অসীমের রাজ্যে ছুটে যাবার গান গাইতে লাগিল; আর ডানার ঝাপট মারতে লাগল। এই ব্যাকুল আর্ত্তনাদ দরওয়ানের মনুষ্য-হৃদয়কে ক্ষিপ্ত হতে ক্ষিপ্ততর করে তুলল; সে তখনি মট্‌মট্ করে তার ডানার গোটা কতক পালক ভেঙে দিলে,—আর বললে, "এবার যখনই সন্দেহ হবে, উড়ে যাবার জন্যে পাখা নাড়ছ, তখনই তোমার পালক ভেঙে দেওয়া হবে। তোমার ডানা-দুটো একেবারেই কেটে দিতে পারতাম—কিন্তু আমরা মানুষের জাত, আমাদের দয়া-মায়া আছে।"

এই বলে তার উপর কড়া পাহারা রাখতে লাগল—পাখা নাড়ে কি না। কারণ, পাখা নাড়াই হচ্ছে না কি পালাবার চেষ্টা,—ফাঁকি দেবার ষড়যন্ত্র! তাই, যখনই পাখা নড়া—অমনি সন্দেহ, আর অমনি কাঁচা পালক খসে পড়া। এই যন্ত্রণায় সে যদি চীৎকার করে, আর্ত্তনাদ করে—অমনি সন্দেহ হয়, ঐ গান না কি অসীম নীলের রাজ্যে ছুটে যাবার উদাত্ত সঙ্গীত! যন্ত্রণায় সে যদি পাখা নাড়ে, তাতেও নিস্তার নাই, তাতেও সন্দেহ। কিন্তু এত যন্ত্রণা ভর্ৎসনার মধ্য দিয়েও, তার সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, তার সেই অপূর্ণ কামনা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই—বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যে একবার আলোর সাক্ষাৎ পেয়েছে—সে কি আর অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকতে চায়? সে মানুষই হউক, আর পশুই হউক। আলোর এমনি একটা আকর্ষণী শক্তি!

এত করেও যখন পাখীর গানও থামল না, পাখার ঝট্‌পটানিও থামল না, তখন রাজা মশায়ের কাছে খবর গেল, "রাজা মশায়, পাখী অবাধ্য হয়ে উঠেছে; কেবল উড়ে যাবার জন্যে ঝট্‌পট্ করে; কোন শাসন মানে না।" তখনই মন্ত্রীর তলব পড়ল। মন্ত্রী এসে হাজির হলেন। রাজা মশায় বললেন, "মন্ত্রী দেখ ত, পাখীটা কেন অবাধ্য হয়ে উঠেছে? কেন শাসন মানে না?"

মন্ত্রী মহাশয় তখনই পাখী দেখতে ছুটলেন। পাখী দেখা শেষ হলে, রাজা মহাশয়কে এসে বললেন, "পাখীটা বড় হয়ে উঠেছে, একটা বড় খাঁচা বা দাঁড়ের প্রয়োজন;

তা' হলেই পাখীটা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আর অবাধ্য থাকবে না।”

তখনই কামারশালায় সাড়া পড়ে গেল; কেউ বা গজকাটি নিয়ে মাপ জোপ করতে বসল—কত বড় খাঁচা হবে; কেউ বা বড়-বড় হাতুড়ি নিয়ে খাঁচা গড়তে বসল। পাখী কিন্তু তেমনি ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাত্ত স্বরে সমস্ত যন্ত্রণা ভৎসনা উপেক্ষা করে গাইছে, “কবে আমি ঐ অসীমের রাজ্যে মুক্তির আনন্দকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপভোগ করতে করতে উড়ে বেড়াতে পারব?”

আমার গল্পটি ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো---ইত্যাদি।”

জননী ভারতভূমি

(১)

জননি আমার জন্মভূমি, ভুবনে তুমি অতুলনা!
অনাদি-দেবের পরম সৃজনে আদি-চরম কল্পনা!
তোমার প্রলয়-পয়োধির জলে, নিখিল মানস-শতদল-দলে,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের প্রথম জন্ম-চেতনা।
(কোরাস্) তুমি গো আমার জন্মভূমি অপরূপ রূপ-রচনা!
নমস্তে দেবিতে, মম হৃদি-নন্দন-নন্দনা।

(২)

তোমার কক্ষ যত্নরক্ষ্য রত্ন হরণ লাগি,
মন্থন-রণ ভীম-র্জ্জনে, বিশ্ব কাঁপিল জাগি।
মোহিনীরূপ ধরিয়া তুমি, জননি আমার ভারতভূমি
বিতরিলে সুধা-হলাহল সবে, ওগো সুরাসুর-বাসনা!
(কোরাস্) তুমি গো আমার জন্মভূমি অপরূপ রূপ-রচনা!
নমস্তে দেবিতে, মম হৃদি-মন্দির-বন্দনা।

(৩)

তোমার কাননে বাণীর বীণা গীত-ঝঙ্কৃত তান,
সূর্য্য চন্দ্র উজল রাগে পূর্ব্বে উদীয়মান।
ঢালিয়া গুণ রূপ জ্যোতিঃ ভূষিলা তোমা লক্ষ্মীরতি
স্বর্গবাসীর পূজ্যা তুমি গো মর্ত্ত্যবাসীর মাননা।
(কোরাস্) তুমি গো আমার জন্মভূমি অপরূপ রূপ-রচনা।
নমস্তে দেবিতে, মম হৃদি-নিকুঞ্জ-শোভনা।

(৪)

তব তপোবনে ঋষিগুরু মুখে প্রচার জ্ঞান ধর্ম্ম ;
ক্ষত্রিয়বীর তোমার তীরে পরিলা অজেয় বর্ম্ম ।
বসিয়া তোমার চরণ পাশে, কবি বাল্মীকি ছন্দে ভাষে ;
সীতা সাবিত্রী ভারতী গার্গী তোমারি পুরললনা ।
(কোরাস্) তুমি গো আমার জন্মভূমি অপরূপ রূপ-রচনা !
নমস্তে দেবিতে, মম বীর-ধর্ম্ম-সাধনা ।

(৫)

প্রীতি-প্রেমে জননি তোমার অতি উজ্জ্বল চিত্ত,
শরণাগত জনে গো তুমি সতত ঢালিছ বিত্ত ;
জাতি-বিজাতি তোমার কোলে, সন্তান-স্নেহে সাদরে দোলে
বিমাতা যাদের তাদেরও মাতা, ন্যায়-করুণা-ভূষণা !
(কোরাস্) তুমি গো আমার জন্মভূমি অপরূপ রূপ-রচনা !
নমস্তে দেবিতে, মম সর্ব্ব-কাম্য-কামনা ।

রচনা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী   সুর—শ্রীমতী সরলা দেবী   স্বরলিপি—শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী

```
      •        •    ১             ২´              ৩               •           ১
II মা গমা রা | সা সা সমা I মা -া গমপা | পক্ষা -ধপা ক্ষপা | মা পা ধা | -র্সা ধা পা I
   জ ন ০ নি    আ মা র ০    জ ০ ম্ ০ ০    ভূ ০   ০ ০ মি ০      ভু ব নে     ০ তু মি
   ২           ৩              •         ১            ২´            ৩           •
   মা মগা গা | মগা -মরা -া | রা গা মা | ধা পা পা I মা গা মা | রা সা সা | সা -া সা |
   অ তু০ ল      না০ ০ ০ ০     অ না দি    দে বে র     প র ম      স্ব জ নে    আ ০ দি
   ১           ২´             ৩
   মা মা মা I পা -া পা | মপা -ধনা -ধপা II
   চ র ম       ক ০ ল্প     না০ ০ ০ ০ ০
   •           ১            ২´            ৩             •            ১           ২´
II পা পা পা | না ধা না I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্গা র্গা | র্রা র্রা র্রা I র্সা না র্সা |
   তো মা র     প্র ল য়     প য়ো ধি       র জ লে        নি খি ল        মা ন স       শ ত দ
   ৩           •            ১             ২´           ৩              •            ১
   ধা ণা পা | মা -া গা | রা -া পা I মা -া পা | ধনা -র্সা ধা | সা সা সা | মা -া মা I
   ল দ লে      ব্র ০ হ্মা    বি ০ ষ্ণু     শ ০ ঙ্ক       রে০ ০ র       প্র থ ম      জ ০ ন্ম
   ২´          ৩
   পা -া পা | মপা -ধনা -া |
   চে ০ ত      না০ ০ ০ ০
```

কোরাস্ :—

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩

I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I না -া না | ধা ধা ধা | না ধা পা | ক্ষা গা রা I গা ক্ষা পা | -া -া -া |

তু মি গো আ মার্ ০ জ ০ ন্ম ভূ মি অ প রূ প রূ ০ প র চ না ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২ ৩

র্গা র্গা -া | র্গা -া -া I র্গা মা র্রা | র্সা না র্সা | ধা না ধা | -া না না I সা া র্রা | র্সা -া -া II

ন ম ০ স্তে ০ ০ দে ০ বি তে ম ম হৃ দি ন ০ ন্দ ন ন ন্দ না ০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১

II মা গমা রা | সা -া সমা I মা -া গমপা | পক্ষা -ধপা ক্ষপা | মা -পা ধা | র্সা নধা পা I

তো মা০ র ক ০ ক্ষ০ য ০ ত্ন০০ র০ ০০ ক্ষা০ র ০ ত্ন উ র০ ণ

২ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০

মপা -ধপা -া | মা -া -গরা | রা -গা মা | পা মা পা I মা গা মা | -া রা সা | সা -া সা |

লা০ ০০ ০ গি ০ ০০ ম ০ ন্থ ন র ণ ভী ম গ ০ র্জ নে বি ০ শ্ব

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩

মা মা মা I পা -া -া | ক্ষপা -ধনা -ধপা | পা পা পা | না -ধা না I র্সা র্সা র্সনা | -র্রা র্সা র্সা |

কাঁ পি ল জা ০ ০ গি ০ ০০ ০০ মো হি নী রূ ০ প ধ রি য়া ০ ০ তু মি

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´

র্সা র্গা র্গা | র্রা র্সা র্সা I র্সা না র্সা | ধা পধা -পা | মা মা মা | গরা রা পা I মা পা মা |

জ ন নি আ মা র ভা র ত ভূ মি০ ০ বি ত রি লে০ সু ধা হ লা হ

৩ ০ ১ ২´ ৩

পা পা পা | সা সা মা | মা মা গা I পা -া পা | ক্ষপা -ধনা -া I

ল স বে ও গো সু রা সু র বা ০ স না০ ০০ ০

কোরাস্ :—

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২

I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I না -া না | ধা ধা না | ধা পা ক্ষা | গা -া রা I গা ক্ষা পা |

তু মি গো আ মার্ ০ জ ০ ন্ম ভূ মি অ প রূ প রূ ০ প র চ না

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১

-া -া -া | র্গা র্গা -া | র্গা -া -া I র্গা -র্মা র্রা | র্সা না র্সা | ধা না ধা | -া ধা না I

০ ০ ০ ন ম ০ স্তে ০ ০ দে ০ বি তে ম ম হৃ দি ম ০ ন্দি র

২´ ৩

র্সা -া র্রা | র্সা -া -া II

ব ০ ন্দ না ০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১

II মা গমা রা | সা -সা মা I মা গমা পা | পধা -পক্ষা পা | ক্ষা পা ধা | -র্সা ধা পা I

তো মা০ র কা ন নে বা ণী০ র বী০ ০০ ণা গী ত ঝ ০ ঙ্কৃ ত

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
ক্ষাপা -ধপা -া । -মা -া -গরা । রা -া গা । মা -ণা পা I মা গা মা । রা -া সা । সা -া সা ।
তান ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ সূ ০ র্য্য চ ০ ন্দ্র উ জ্জ ল রা ০ গে পূ ০ র্ব্বে

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
মা মা গা I পা -া -া । -ক্ষাপা -ধনা -ধপা । পা পা পা । না -ধা না I র্সা না -র্রা । র্সা -া র্সা ।
উ দী য় মান্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ঢা লি য়া গু ০ ণ রূ প ০ জ্যো ০ তিঃ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
র্সা র্গা র্গা । -া র্রা র্রা I র্সা -না র্সা । -ধা ণা পা । মা -া গা I রা রা পা I মা -া পা ।
ভূ মি লা ০ তো মা ল ০ ক্ষ্মী ০ র তি স্ব ০ র্গ বা সী র পূ ০ জা

৩ ০ ১ ২´ ৩
ধা র্সা ধপা । সা -া সা । মা মা গা I পা -া পা । ক্ষাপা -ধপা -া ।
তু মি গো ০ ম ০ র্ত্ত্য বা সী র মা ০ ন না ০ ০ ০ ০

কোরাস্ :—

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
I র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা -া I না -া না । ধা ধা না । ধা পা ক্ষা । গা -া রা । গা ক্ষা পা ।
তু মি গো আ মার্ ০ জ ০ ন্ম ভূ মি অ প রূ প রূ ০ প র চ না

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
-া -া -া । র্গা র্গা -া । র্গা -া -া I র্গা -র্মা র্রা । র্সা না র্সা । ধা না ধা । ধা -া না I
০ ০ ০ ন ম ০ স্তে ০ ০ দে ০ বি তে ম ম হৃ দি নি কু ০ ঞ্জ

২´ ৩
র্সা -র্রা র্রা । র্সা -া -া II
শো ০ ভ না ০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
II মা গমা রা । সা সা মা I মা -ণা পা । পা ধপা -ক্ষাপা । মা পা ধা । র্সা -ধা ধপা I মা -া -পধা ।
ত ব ০ ত পো ব নে ঋ ষি গু রু মু০ খে০ প্র চা র জ্ঞা ০ ন০ ধ ০ ০ ০

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
পমা -া -গরা । র্রা -া গা । মা ধপা -া I মা গা মা । রা -া সা । সা সা সা । মা মা গা I
র্ম০ ০ ০০ ক্ষ ০ ত্রি য় বীর্ ০ তো মা র তী ০ রে প রি লা অ জে য়

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
পা -া -া । ক্ষাপা -ধনা -ধপা । পা পা পা । না ধা না I র্সা র্সা র্সা । র্সা -া র্সা । র্সা র্গা র্গা ।
ব ০ ০ র্ম০ ০০ ০০ ব সি য়া তো মা র চ র ণ পা ০ শে ক বি বা

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
-া র্রা র্সা I র্সা -না র্সা । ধা -ণা পা । মা মা মা । রা -া পা I মা পা ধা । ধনা -র্সা ধা ।
০ ল্মী কি ছ ০ ন্দে ভা ০ বে সী তা সা বি ০ ত্রী ভা র তী গা০ ০ র্গী

০ ১ ২´ ৩
সা সা সা । -মা মা মা I পা -া পা । ক্ষাপা -ধনা -া ।
তো মা রি ০ পু র ল ০ ল না০ ০ ০ ০

কোরাস :—

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I না -া না | ধা ধা না | ধা পা জ্ঞা | গা -া রা I গা জ্ঞা পা |
তু ০ মি গো আ মার্ ০ জ ০ ন্ম ভূ মি অ প রূ প রূ ০ প র চ না

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
-া -া -া | র্গা র্গা -া | র্গা -া -া | র্গা -র্মা র্রা I র্সা না র্সা | ধা -া ধা | না -া না I
০ ০ ০ ন ম ০ স্তে ০ ০ দে ০ বি তে ম ম বী ০ র ধ ০ র্ম্ম

২´ ৩
র্সা -র্রা র্রা | র্সা -া -া II
সা ০ ধ না ০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
II মা -গমা রা | -া সা মা I মা গা পা | পধা পজ্ঞা -পা | জ্ঞা পা ধা | -র্সা ধা পা |
প্রী ০ ০ তি ০ প্রে মে জ ন নি তো০ মার্ ০ অ তি উ ০ জ্জ্ব ল

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
মপা -ধপা -া | মা -া -গরা | রা রা গা | -মা ধা পা | মা গা মা | রা সা -া | সা সা সা |
চি০ ০ ০ ০ ত্ত ০ ০ ০ শ র ণা ০ গ ত জ নে গো তু মি ০ দ ত ত

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
মা মা মগা I পা -া -া | জ্ঞপা -ধনা -া | পা -া পা | না ধা না I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া |
ঢা লি ছ০ বি ০ ০ ত্ত ০ ০ ০ ০ জা ০ তি বি জা তি তো মা র কো লে ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
র্সা -র্গা র্গা | র্গা র্রা র্সা | র্সা না র্সা | ধা পধা -পা | মা মা গা | রা রা -পা I মা পা পা |
স ০ ন্তা ন স্নে হে সা দ রে দো লে০ ০ বি মা তা যা দের্ ০ তা দের ও

৩ ০ ১ ২´ ৩
ধা -নর্সা -নধপা | সা -া সা | মা মা গা I পা -া পা | জ্ঞপা -ধনা -া |
মা তা০ ০ ০ ০ ন্যা ০ য় ক রু ণা ভূ ০ ষ০ ণা০ ০ ০ ০

কোরাস্ :—

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া | না -া না | ধা ধা না | ধা পা জ্ঞা | গা -া রা I গা জ্ঞা পা |
তু মি গো আ মার্ ০ জ ০ ন্ম ভূ মি অ প রূ প রূ ০ প র চ না

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
-া -া -া | র্গা র্গা -া | র্গা -া -া I র্গা -র্মা র্রা | র্সা না র্সা | ধা -া ধা | না -ধা না I
০ ০ ০ ন ম ০ স্তে ০ ০ দে ০ বি তে ম ম স ০ র্ব্ব কা ০ মা

২´ ৩
র্সা র্রা র্রা | র্সা -া -া IIII
কা ০ ম না ০ ০

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতবর্ষে "ভিক্ষাং দেহি জননি গো" নামে যে গানটী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একটি ছাপার ভুল আছে। স্বরলিপির ১ম লাইনে "মগা" স্থলে "সগা" হইবে।

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

প্রায় অপরাহ্ণ বেলায় ভোজন সমাধা করিয়া রামবাবু তৃপ্তি ও প্রাচুর্য্যের একটা সশব্দ উদ্গার ছাড়িয়া যখন গাত্রোত্থান করিতে গেলেন, তখন অচলা অনেক কষ্টে একটুখানি হাসিয়া বলিল, কিন্তু জ্যাঠামশাই, যেদিন জানতে পারবেন আজ আপনার জাত গেছে, সেদিন কিন্তু রাগ করতে পারবেন না তা' বলে দিচ্চি।

বৃদ্ধ সস্নেহ মৃদু-হাস্যে ঘাড়টা একটু নাড়িয়া কহিলেন, আচ্ছা, মা, তাই হবে, বলিয়া আচমন করিতে বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার খড়মের খট্-খট্ শব্দ যতক্ষণ পর্য্যন্ত শোনা গেল ততক্ষণ পর্য্যন্ত অচলা সমস্ত দৃষ্টি দিয়া যেন ওই আওয়াজটাকেই অনুসরণ করিতে লাগিল, তারপরে কখন্ যে সে শব্দ মিলাইল, কখন্ যে বাহিরের সংসার তাহার চেতনা হইতে বিলুপ্ত হইয়া তাহাকে পাথর করিয়া দিল সে টেরও পাইল না।

অনেক দিনের হিন্দুস্থানী দাসীটি বাঙ্লা কথার সঙ্গে বাঙালীর আচার-ব্যবহার কায়দা-কানুনও কতকটা আয়ত্ত করিয়াছিল, সে কি-একটা কাজে এদিকে আসিয়া বহু-মার বসিয়া থাকার ভঙ্গি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠার অধিকারে তাহার শেখা-বাঙ্লার তর্জ্জন শব্দে বেলার দিকে অচলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ খাওয়া-দাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে, না এমন ভাবে চুপ-চাপ বসিয়া থাকিলেই চলিবে?

অচলা চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল বেলা আর নাই, শীতের সন্ধ্যা সমাগত-প্রায়। একটা দীপ্তিহীন নিষ্প্রভতা শ্রান্তির মত আকাশের সর্ব্বাঙ্গে ভরিয়া আসিয়াছে, লজ্জা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং হাসিয়া কহিল, আমি যে একেবারে সন্ধ্যার পরেই খাবো বলে ঠিক করেচি লালুর-মা। আজ ক্ষিদে-তেষ্টা এতটুকু নেই। লালুর-মা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বড়বাবুর খাওয়া হয়ে গেলেই তুমি খাবে, একটু আগেই যে বল্লে বহু-মা? নাঃ—একেবারে রাত্তিরেই খাবো—বলিয়া আর বেশি বাদানুবাদের অবসর না দিয়াই অচলা ত্বরিৎ-পদে উপরে চলিয়া গেল।

একটু সময় পাইলেই সে উপরের বারান্দায় রেলিঙের পার্শ্বে চৌকি টানিয়া লইয়া নদীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিত। আজিকার রাত্রেও সেইরূপ বসিয়াছিল, হঠাৎ রামবাবুর চটিজুতার শব্দ পাইয়া অচলা ফিরিয়া দেখিল বৃদ্ধ একেবারে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এবং কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি হাতের হুঁকাটা এককোণে ঠেস দিয়া রাখিয়া আর একখানা চেয়ার কাছে টানিয়া লইয়া বসিলেন। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সেই কথাটার একটা মীমাংসা করতে এলাম, সুরমা, তোমার ব্রহ্মজ্ঞানী বাবাটি ঠিক, না এই বুড়ো জ্যাঠা মশায়ের কথাটাই ঠিক। তর্কটার যাহোক্ একটা নিষ্পত্তি না করে আজ আর নীচে যাচ্চিনে মা।

অচলা বুঝিল এ সেই জাতি-ভেদের প্রশ্ন, শ্রান্ত স্বরে বলিল, আমি তর্কের কি জানি জ্যাঠামশাই! রামবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ওরে বাস্‌রে, তুমি কি সোজা লোকের বেটি না কি মা! তবে কথাটা না কি একেবারে মিথ্যে, তাই যা রক্ষা, নইলে ও-বেলায় ত হেরে গিয়েছিলাম আর কি!

অচলার কোন বিষয় লইয়াই আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা নয়; সে এই তর্ক-যুদ্ধ হইতে আত্ম-রক্ষার একটুখানি ফাঁক দেখিতে পাইয়া কহিল, তাহলে আর তর্ক কি জ্যাঠামশাই! আপনারই ত জিত্ হয়েছে! একটু থামিয়া বলিল, যে হেরে গেছে তাকে আবার দুবার কোরে হারিয়ে লাভ কি আপনার?

রামবাবু তৎক্ষণাৎ কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না। তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছে, সংসারে তিনি অনেক জিনিস দেখিয়াছেন, সুতরাং, এই অবসন্ন কণ্ঠস্বরও যেমন তাঁহার অগোচর রহিল না, এই মেয়েটি যে সুখে নাই, ইহার মনের মধ্যে কি যে একটা ভয়ানক বেদনা চাপা আগুনের মত

অহর্নিশি জ্বলিতেছে, ইহাও তেমনি এই শ্রান্ত-পাণ্ডুর মুখের উপরে আর একবার স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া হঠাৎ একটা হাসিবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত বলিলেন, নাঃ—ছুতো খাট্‌ল না মা! বুড়ো মানুষ, বক্‌তে ভাল বাসি,—সন্ধ্যাবেলায় একলাটি প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে, তাই, ভাবলাম মিথ্যে-টিথ্যে বলে মাকে একটু রাগিয়ে দিয়ে দুটো গল্প করিগে, কিন্তু ছল ধরা পড়ে গেল! বলিয়া তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়া হুঁকাটার জন্য একবার হাতটা বাড়াইয়া দিলেন।

তিনি যে যাইবার জন্য এটি সংগ্রহ করিতেছেন অচলা তাহা বুঝিল। এবং নীচে গিয়া একাকী এই বৃদ্ধের যে অনেক দুঃখেই সময় কাটিবে, তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাই সে চকিতের ন্যায় চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া নিজেই তাহা তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধের প্রসারিত হস্তে দিতে দিতে বলিল, আপনি যত খুসি তামাক খেতে চান এইখানে বসে খান, কিন্তু এখন উঠে যেতে আপনাকে আমি কিছুতে দেবনা।

বৃদ্ধ হুঁকা হাতে লইয়া হাসিয়া বলিলেন, ওরে বাপ্‌রে, একদম্‌ অতখানি রাশ ঢিলে দিয়োনা, মা, আখের সাম্‌লাতে পারবে না! আমার মুখ-বুজে তামাক খাওয়া যে কি ব্যাপার তা' তো দেখনি! তার চেয়ে বরঞ্চ একটু আধটু বক্‌তে দাও যে—

আমাদের দম্‌ আট্‌কে না যায়, না জ্যাঠামশাই? আচ্ছা, তাই ভাল। কিন্তু কি নিয়ে বকুনি সুরু করবেন বলুন ত?

রামবাবু মুখ হইতে একগাল ধুঁয়া উপরের দিকে মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন, তবেই মুস্কিলে ফেল্‌লে মা। মহা-বক্তার লোককেও ও-প্রশ্ন করলে তার মুখ বন্ধ হয়ে আসে যে!

আচ্ছা জ্যাঠামশাই, কোন দিন যদি জান্‌তে পারেন জোর করে যার হাতে আজ ভাত খেয়েছেন, তার চেয়ে নীচ, তার চেয়ে ঘৃণিত পৃথিবীতে আর কেউ নেই, তখন কি করবেন? প্রায়শ্চিত্ত? আর শাস্ত্রে যদি তার বিধি-পর্য্যন্ত না থাকে, তা'হলে?

বৃদ্ধ বলিলেন, তা'হলে ত ল্যাঠা চুকেই গেল মা, প্রায়শ্চিত্ত আর করতে হবেনা।

কিন্তু আমার উপর তখন কি রকম ঘৃণাই না আপনার হবে!

কখন মা?

যখন টের পাবেন আমার একটা জাত পর্য্যন্ত নেই।

রামবাবু হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া সেই অস্পষ্ট আলোকেই ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমাদের এই কথাটা আমি কিছুতে বুঝে উঠ্‌তে পারিনে মা। আর 'তোমাদের' বলি কেন জানো, সুরমা, আমার নিজের ছেলের মুখ থেকেও এ নালিশ শুনেচি। সে ত স্পষ্টই বলে, এই খাওয়া-ছোঁওয়ার বাচ-বিচার থেকেই সমস্ত দেশটা ক্রমাগত সর্ব্বনাশের দিকেই তলিয়ে যাচ্চে। কারণ, এর মূলে আছে ঘৃণা, এবং ঘৃণার ভিতর দিয়ে কোনদিন কোন বড় ফল পাওয়া যায়না।

অচলা মনে-মনে অতিশয় বিস্মিত হইল। এ বাটীতেও যে এ সকল আলোচনা কোন অবকাশ দিয়া পথ পাইতে পারে, এ তাহার ধারণাই ছিলনা। কহিল, কথাটা কি তবে মিথ্যে?

রামবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যে কি না, সে জবাব নাই দিলাম, মা। কিন্তু সত্যি নয়। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মেনে চলি, এই মাত্র। যারা আরও একটু বেশি যায়—এই যেমন আমার গুরুদেব, তিনি নিজে রেঁধে খান, মেয়েকে পর্য্যন্ত হাত দিতে দেন না। তাই থেকে কি এই স্থির করা যায় তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানকেও ঘৃণা করেন!

অচলা জবাব দিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল।

বৃদ্ধ হুঁকাটায় আর গোটাকত টান দিয়া বলিলেন, মা, যৌবনে আমি অনেক দেশ ঘুরে বেড়িয়েচি। কত বন-জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত, তার কত রকমের লোক, কত রকমের আচার-ব্যবহার, সে সব নামও হয়ত তোমরা জানোনা,—কোথাও খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার আছে, কোথাও বা তার আভাস পর্য্যন্ত কেউ শোনেনি, তবু ত, মা, তারা চিরদিন তেম্‌নি অসভ্য, তেম্‌নি ছোট। বলিয়া দগ্ধ হুঁকাটায় পুনরায় গোটা দুই নিষ্ফল টান্‌ দিয়া বৃদ্ধ শেষবারের মত সেটাকে থামের কোণে ঠেস্‌ দিয়া রাখিলেন। অচলা যেমন নিঃশব্দে বসিয়াছিল, তেম্‌নি নীরবেই বসিয়া রহিল।

রামবাবু নিজেও খানিকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, আসল কথা কি জানো, সুরমা, তোমরা সাহেবদের কাছে পাঠ নিয়েছ। তারা উন্নত,

তারা রাজা, তারা ধনী। তাদের মধ্যে যদি পা উঁচু করে হাতে চলার ব্যবস্থা থাকত, তোমরা বল্‌তে ঠিক অম্‌নি কোরে চল্‌তে না শিখ্‌লে আর উন্নতির কোন আশা ভরসাই নেই।

এই সকল তর্ক-যুক্তি অচলা বাঙলা দৈনিক কাগজে অনেক পড়িয়াছে, তাই কোন কথা না বলিয়া শুধু একটু হাসিল। হাসিটুকু বৃদ্ধ দেখিলেন, কিন্তু যেন দেখিতেই পান নাই এইভাবে নিজের পুনরাবৃত্তি স্বরূপে কহিতে লাগিলেন, শ্রীধাম শ্রীক্ষেত্রে যখন যাই, তখন জানা অজানা কত লোকের মধ্যে গিয়েই না পড়ি। ছোঁয়া-ছুঁইর বিচার সেখানে নেই, করবার কথাও কখনো মনে হয়না। কিন্তু ঘৃণার মধ্যে এর জন্ম হলে কি এত সহজে সে কাজ পেরে উঠ্‌তাম! এই ত আমি কারও হাতেই প্রায় খাইনে, কিন্তু পথের অতিবড় দীন-দুঃখীকেও যে কখনো মনে-মনে ঘৃণা করেচি—

অচলা ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আমি কি আপনাকে জানিনে জ্যাঠামশাই? এত দয়া সংসারে আর কার আছে?

দয়া নয় মা, দয়া নয়,—ভালবাসা। তাদেরই আমি যেন বেশি ভালবাসি। কিন্তু আসল কথা কি জানো মা, একটা জাতই বা কি, আর একটা মানুষই বা কি, ধীরে ধীরে যখন সে হীন হয়ে যায়, তখন, সবচেয়ে তুচ্ছ জিনিসটার ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে সে সান্ত্বনা লাভ করে। মনে করে এই সহজটুকু সাম্‌লে দিয়েই সে রাতারাতি বড় হয়ে উঠ্‌বে। আমাদেরও ঠিক সেই ভাব। কিন্তু যেটা কঠিন, যেটা মূল শিকড়—

কথাটা শেষ করিবার আর সময় পাইলেন না। সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইতেই সুরেশকে দেখিতে পাইয়া একেবারেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, আচ্ছা সুরেশবাবু, আপনি ত হিন্দু, আপনি ত আমাদের জাত-ভেদ মানেন?

সুরেশ থতমত খাইয়া গেল,—এ আবার কি প্রশ্ন? যে চোরা-বালির উপর দিয়া তাহারা পথ চলিয়াছে তাহাকে প্রতি-হাত যাচাই না করিয়া হঠাৎ পা বাড়াইলে যে কোন্ অতলের মধ্যে তলাইয়া যাইবে, তাহার ত কোন স্থিরতাই নাই। এখানে সত্যটাই সত্য কি না, সাবধানে হিসাব করিতে হয়। তাই সে ভয়ে ভয়ে কাছে আসিয়া একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মুখ দেখিতে পাইল না। তখন শুষ্ক একটু হাসিয়া দ্বিধা-জড়িত স্বরে কহিল, আমরা কি, সে তো আপনি বেশ জানেন রামবাবু।

রামবাবু কহিলেন, বেশ জানি বলেই ত জানতাম। কিন্তু আপনার গৃহিনীটি যে একেবারে আগাগোড়া ওলট-পালট করে দিতে চাচ্চেন। বল্‌চেন জাতি-ভেদের মত এতবড় অন্যায়, এতবড় সর্ব্বনাশকে তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারেন না, ম্লেচ্ছর অন্ন আহার করতেও তাঁর আপত্তি নেই এবং এ শিক্ষা জন্মকাল থেকে তাঁর ব্রাহ্ম বাবার কাছেই পেয়েছেন। সুতরাং ওঁর হাতে খেয়ে আজ আমারও জাত গেছে কি না এবং একটা প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন কি না, এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল। আপনি কি বলেন?

সুরেশ নির্ব্বাক। অচলার মেজাজ তাহার অবিদিতও নয়, এবং সেখানে বিদ্রোহের অগ্নি যে অহরহ জ্বলিয়াই আছে, এ খবরও তাহার নূতন নয়। কিন্তু সেই আগুন আজ অকস্মাৎ যে কি জন্য এবং কোথা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, ইহাই অনুমান করিতে না পারিয়া সে আশঙ্কায় ও উদ্বেগে কাঠ হইয়া উঠিল; কিন্তু ক্ষণেক পরেই আত্মসম্বরণ করিয়া পূর্ব্বের মত আবার একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু, এবার চেষ্টাটা শুধু হাসিকে আচ্ছন্ন করিয়া মুখখানাকে বিকৃত করিল মাত্র।

সুরেশ বলিল, উনি আপনাকে তামাসা করচেন।

রামবাবু গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, উচিত না হলেও এ কথা ভাব্‌তে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু স্বামীর কল্যাণেও যখন হিন্দু-ঘরের মেয়ে তাঁর কর্ত্তব্য পালন করতে চাইলেন না,—তুলসী দেওয়ার দিনটাতেও কিছুতে উপবাস করলেন না,—ভাল, এ যদি তামাসা হয় ত কিছু কঠিন তামাসা বটে। আচ্ছা সুরেশবাবু, বিবাহ ত আপনার হিন্দু মতেই হয়েছিল?

সুরেশ কহিল, হ্যাঁ।

বৃদ্ধ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, তা' আমি জানি। অচলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, যদিচ তোমাকে আমার অনেক কথা বল্‌বার আছে, মা, কিন্তু তোমার

বাবার ব্রাহ্ম হওয়ায় আর আমার কোন দুঃখ নেই। এমন ব্রাহ্ম আমি অনেক জানি যাঁরা সমাজে গিয়েও চোখ বোজেন, অল্প-স্বল্প অনাচারও করেন, কিন্তু মেয়ের বিয়ের বেলা আর হিসেবের গোল করেন না। যাক্‌ আমার একটা ভাব্‌না দূর হল।

কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাও অনেক বেশি ভাবনা দূর হইয়া গেল সুরেশের। সে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি ঠিক বলেছেন রামবাবু, আজকাল এই দলের লোকই বেশি। তাঁরা—

হঠাৎ উভয়েই চমকিয়া উঠিল। কথার মাঝখানেই অচলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ঠিক যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে সুরেশের মুখের উপর দুই চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, এত অপরাধের পরেও তোমার অপরাধ বাড়াতে লজ্জা হয়না? আবার তা আমারই মুখের উপর? তুমি জানো এ সব মিথ্যে? তুমি জানো বাবা ঠক্‌ ন'ন, তিনি মনে-জ্ঞানে যথার্থ ই ব্রাহ্ম সমাজের? তুমি জানো তিনি—বলিতে বলিতেই সে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশের পিঠের উপরে যেন সজোরে চাবুকের ঘা পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া একবার বৃদ্ধের বিস্ময় বিস্ফারিত চোখের প্রতি চাহিয়া অকস্মাৎ সেও যেন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, মিছে কথা কিসের? তোমার বাবা কি হিন্দু ঘরে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী ছিলেন না? তুমিও সত্যি কথা বোলো!

অচলা আর প্রত্যুত্তর দিল না। বোধ হয় মুহূর্ত্তকাল নিঃশব্দে থাকিয়া আপনাকে সে সামলাইয়া লইল, তার পরে ধীরে ধীরে বলিল, সে কথা আজ আমাকে জিজ্ঞেসা করচ কেন? তার হেতু কি সংসারে সকলের চেয়ে বেশি তুমি নিজেই জানোনা? তুমি ঠিক জানো আমি কি, আমার বাবা কি, কিন্তু এই নিয়ে তোমার সঙ্গে বচসা করতে আমার শুধু যে প্রবৃত্তি হয় না তাই নয়, আমার লজ্জা করে। তোমার যা ইচ্ছে হয় ওঁকে বানিয়ে বল, কিন্তু আমি শুনতে চাইনে। বল, আমি চল্লুম। বলিয়া সে একরকম দ্রুতপদেই পার্শ্বের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণের নিমিত্ত উভয়েই যেন নিশ্চল পাথর হইয়া গেল।

বৃদ্ধ বোধ করি নিতান্তই মনের ভুলে একবার তাঁর হুঁকাটার জন্য হাত বাড়াইলেন, কিন্তু তখনি হাতটা টানিয়া লইয়া একটুখানি নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া, একবার কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, আজকাল শরীরটা কেমন আছে সুরেশবাবু?

সুরেশ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, চকিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে বেশ আছে। বলিয়াই বোধ হয় সত্য কথাটা স্মরণ হইল, কহিল, বুকের এইখানটায় একটুখানি ব্যথা,—কি জানি কাল থেকে আবার বাড়্‌ল না—

রামবাবু বলিলেন, তবেই দেখুন দেখি সুরেশবাবু, এই ঠাণ্ডায় এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি আপনার বাইরে ঘুরে বেড়ানো ভাল?

ঠিক ঘুরে বেড়াইনি রামবাবু। সেই বাড়ীটার জন্য আজ দু'হাজার টাকা বায়না দিয়ে এলুম। রামবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া শেষে বলিলেন, নদীর উপর বাড়ীটি ভালই। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেসা করতেন, আমি হয়ত নিষেধ করতাম। সে দিন কথায় কথায় যেন বুঝেছিলাম সুরমার এখানে বাস করার একান্ত অনিচ্ছা। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর মত নিয়েছেন, না, কেবল নিজের ইচ্ছেতেই কিনে বসলেন?

সুরেশ এ প্রশ্নের ঠিক জবাব না দিয়া শুধু কহিল, অনিচ্ছারও বিশেষ কোন হেতু দেখিনে। তা ছাড়া বাস করবার মত কিছু কিছু আসবাব-পত্রও কলকাতা থেকে আন্‌তে দিয়েছি, খুব সম্ভব কাল-পরশুর মধ্যেই এসে পড়বে।

রামবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া সহসা কি ভাবিয়া ডাক দিয়া উঠিলেন, মা সুরমা?

অচলা সাড়া দিল না, কিন্তু, ঘরের ভিতর হইতে নীরবে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে তাহার চৌকিতে আসিয়া বসিল। বৃদ্ধ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, মা, তোমার স্বামী যে আমাদের দেশে মস্ত বড় বাড়ী কিনে ফেল্‌লেন। এই বুড়ো জ্যাঠা-মশাইটিকে আর ত ফেলে চলে যেতে তুমি পারবেনা মা।

অচলা চুপ করিয়া রহিল। বৃদ্ধ পুনশ্চ কহিলেন, শুধু বাড়ী আর আসবাব-পত্র নয়, আমি জানি, গাড়ী-ঘোড়াও আসচে। আর তার চেয়েও বেশি জানি, সমস্তই কেবল তোমারি জন্যে। বলিয়া তিনি সহাস্যে একবার সুরেশ ও একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিলেন। কিন্তু সেই

গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ হইতে আনন্দের এতটুকু চিহ্ন প্রকাশ পাইলনা। এই অস্পষ্ট আলোকে হয়ত ইহা অপরের ঠিক লক্ষ্য না হইতেও পারিত, কিন্তু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি বৃদ্ধের চক্ষে তাহা এড়াইল না। তথাপি তিনি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু মা তোমার মতটা—

অচলা এইবার কথা কহিল, বলিল, আমার মতের ত আবশ্যক নেই জ্যাঠামশাই।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, সে কি একটা কথা মা! তুমিই ত সব, তোমার ইচ্ছাতেই ত—

অচলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না জ্যাঠামশাই, না, আমার ইচ্ছায় কিছুই আসে যায় না। আপনি সব কথা বুঝবেন না, আপনাকে বোঝাতেও আমি পারব না,—কিন্তু আর আমাকে প্রয়োজন না থাকে ত আমি যাই—

বৃদ্ধের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। এবং তাহার প্রয়োজনও হইল না, সহসা হিন্দুস্থানী দাসী একটা কড়ায় এক কড়া আগুন লইয়া উপস্থিত হইবামাত্র সকলের দৃষ্টি তাহারই উপরে গিয়া পড়িল। রামবাবু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন; সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আমি বেহারাটাকে আনতে হুকুম দিয়েছিলুম, সে আবার আর একজনকে হুকুম দিয়েছে দেখচি। আমার এই ব্যথাটায় একটু—

অগ্নির প্রয়োজনের আর বিশদ ব্যাখ্যা করিতে হইল না, কিন্তু তাহার জন্য ত আর একজনের প্রয়োজন। রামবাবু অচলার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সে নিমিষে মুখ ফিরাইয়া লইয়া শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল, আমার ভারি ঘুম পেয়েছে জ্যাঠামশাই, আমি চল্লুম। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা-মাত্র না করিয়াই চলিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই তাহার কবাট রুদ্ধ হওয়ার শব্দ আসিয়া পৌঁছিল।

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দাসীর হাত হইতে আগুনের মালসাটা নিজের হাতে লইয়া বলিলেন, তা'হলে চলুন সুরেশবাবু—

আপনি?

হাঁ আমিই। এ নূতন নয়, এ কাজ এ জীবনে অনেক হয়ে গেছে। বলিয়া এক প্রকার জোর করিয়াই তাহাকে তাহার ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন। এবং মালসাটা ঘরের মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া তাহার শুষ্ক ম্লান মুখের প্রতি ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া আর্দ্র-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, না সুরেশবাবু, না, এ কোন মতেই চল্‌তে পারে না—কোন মতেই না। আমি নিশ্চয় জান্‌চি, কি একটা হয়েছে—আমি একবার আপনার; কিন্তু থাক্ সে কথা—যদি প্রয়োজন হয় ত এ বুড়ো আর একবার—বলিয়া তিনি সহসা নীরব হইলেন। সুরেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিন্তু ছেলে-মানুষের মত প্রথনটা তাহার ওষ্ঠাধর বারম্বার কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে দুই চোখের কোণ বাহিয়া ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

"টাইমস" পত্রে বিলাতী সমাজের একটী অতি শোচনীয় অবস্থার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা "টাইমসে"র নিজের কোন মন্তব্য নহে;—ইয়র্ক প্রদেশের আর্চ্চ-বিশপ মহাশয়ের বক্তৃতার মর্ম্ম। ইয়র্কের আর্চ্চবিশপ খুব উচ্চপদস্থ পাদরী; সুতরাং তাঁহার মন্তব্য অগ্রাহ্যের বিষয় নহে। তিনি গত ৯ই মে তারিখে ইয়র্ক নগরে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বিলাতী সমাজে সুনীতির প্রভাব যদি ক্রমশঃ দোষযুক্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কেবল শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের পারিশ্রমিকের হার-বৃদ্ধি, তাহাদের বাসের জন্য উত্তম বাড়ী-ঘরের ব্যবস্থা, বা ঐ রকম বিষয় সকলের উন্নতি করিলেই ইংলণ্ডের অবস্থার উন্নতি হইবে না। যুদ্ধের উত্তেজনার ফলে ইংলণ্ডের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যে নৈতিক অবনতির আশঙ্কা জন্মিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্বন্ধের বিষয়ে পূর্ব্বে যে সকল বিধি-নিষেধ ছিল, আগে লোকে এ বিষয়ে যে আদর্শ ধরিয়া চলিত, এখন তাহা অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, অল্পবয়স্কা বালিকারা পর্য্যন্ত আজকাল আর তেমন সংযত ভাবে চলিতে চাহে না। এই নৈতিক সমস্যা এখন এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার ফলে জাতীয় ভাবে লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবারও আশঙ্কা জন্মিয়াছে। ইহার

প্রতিকারের একমাত্র উপায়—খুব উচ্চ নৈতিক আদর্শের অনুসরণ করা—এবং আত্মসংযম, অর্থাৎ আমাদের হিসাবে, ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করা। পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন,—সামাজিক আইনে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের সহিত আলাপ-পরিচয় সম্বন্ধে কঠোরতা এবং বাধা-বিঘ্ন প্রার্থনীয়, না নিন্দনীয়? যাঁহারা বিলাতের আদর্শে এ দেশের সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে চাহেন, তাঁহারাও এই বিষয়টি বেশ ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইয়র্কের বিশপ মহাশয় যে দুর্নীতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া, অন্য অনেক সূত্রেও বিলাতী সমাজে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাবের অনেক বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। বিলাতী টেলিগ্রামে, কিম্বা বিলাতী সংবাদপত্রের মারফত তত্রত্য বিবাহ-বিচ্ছেদের আদালতে বিচারিত মামলার বিবরণ পড়িয়া আমাদিগকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত এবং লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। দুর্নীতির পোষকতা না করা সাধারণ মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সমাজ রক্ষা করিতে হইলে, দুর্নীতি দমন করিতেই হইবে, এবং দুর্নীতি নিবারণ করিতে হইলে, সামাজিক আইনে, বিধি-ব্যবস্থার কঠোরতা অপরিহার্য্য। এ বিষয়ে একটু শিথিলতা ঘটিলে সমাজে দুর্নীতির প্রভাব-বৃদ্ধি অনিবার্য্য।

সম্প্রতি Association for the Advancement of Scientific and Industrial Educationএর (বাঙ্গলায় যাহা সাধারণতঃ শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতি নামে পরিচিত) একটি অধিবেশনের সভাপতি রূপে সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই সমিতির কার্য্যের কিছু পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তাহার মর্ম্ম পাঠক-পাঠিকাগণকে জানাইয়া রাখিতে চাহি। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বক্তৃতার যেটুকু একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, মাত্র সেইটুকুই আমাদের সম্বল। সুতরাং পাঠক-পাঠিকাগণকেও ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির বয়স এখন চৌদ্দ বৎসর। এই চৌদ্দ বৎসরে সমিতির অর্থ-সাহায্যে তিনশত বাঙ্গালী যুবক বিদেশে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৬৪ জন স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রত্যাবৃত্ত যুবকগণের মধ্যে ১৪০ জন উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। কৃতবিদ্য যুবকগণের মধ্যে তিনজন লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এবং একজন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌সি ডিগ্রী পাইয়াছেন। তিনজন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের, একজন বেলী (Basle) বিশ্ববিদ্যালয়ের, একজন হেলি বিশ্ববিদ্যালয়ের, একজন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং একজন উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। আর একজন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ-ডি উপাধির সমান একটী উপাধি পাইয়াছেন। ২০জন ছাত্র যথাক্রমে বার্ম্মিংহাম, লীড্‌স্, ষ্ট্যানফোর্ড, কালিফর্ণিয়া, মাসাচুসেট্‌স, উইসকনসিন, কর্ণেল সেরাক্য, মিসিগন, আইওআ, সাপারো (জাপান), টোকিও এবং কিওটো (জাপান) বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস্‌সি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫৮ জন ভিন্ন-ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এস্‌সি উপাধি লাভ করিয়াছেন; আরও অনেকে নানাস্থান হইতে বিভিন্ন শিল্পে দক্ষতার পরিচায়ক ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। এই ফল মোটের উপর ভালই এবং আশাপ্রদ।

ইঁহারা নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন। এখন, এখানে আসিয়া তাঁহারা কি করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহাও জানিবার জন্য সকলেরই মনে কৌতূহলের সঞ্চার হইবে। মাননীয় সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে তাহারও কিছু আভাষ পাওয়া যাইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ স্বাধীন ভাবে ব্যবসায়ের পত্তন করিয়াছেন; কেহ বা কোন চল্‌তি ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ (Chief Expert), ম্যানেজার বা সেক্রেটারীর পদে কার্য্য করিতেছেন। ছয়জন কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; নয়জন রেশম-কীট পালন এবং রেশম উৎপাদনের ব্যবসায় চালাইতেছেন; নয়জন ইঞ্জিনীয়ারিং এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় কাজ করিতেছেন। সাতজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, আটজন রাসায়নিক কারখানায়, চারিজন তুলার কলে, নয়জন চর্ম্ম প্রস্তুত করিবার ব্যবসায়ে, ছয়জন খনিতে, দুইজন পোর্সিলেন এবং পটারীর কারখানায়, একজন সেলুলয়েড নির্ম্মাণে, একজন কাচের কারখানায়, একজন সাবানের কারখানায়, একজন ছাপার কালি প্রস্তুত করিবার কার্য্যে, একজন টীনের কৌটায় রক্ষিত ফলের ব্যবসায়ে, দুইজন রঞ্জন ব্যবসায়ে, দুইজন পেনসিলের কারখানায়, দুইজন দেশালায়ের কারখানায়, একজন ধাতু-নির্ম্মিত চাদরের কারখানায়, একজন ছুরি-কাঁচি-ক্ষুর ইত্যাদি প্রস্তুত কার্য্যে, একজন চিরুণীর কারখানায়, একজন বিস্কুটের কার্য্যে, একজন ঔষধ প্রস্তুত করিবার ব্যবসায়ে, একজন দুগ্ধজাত দ্রব্যের (Dairy) ব্যবসায়ে, দুইজন চিনির কারখানায়, একজন বোতাম তৈয়ারীর কার্য্যে, একজন ইষ্টক নির্ম্মাণের কলে, একজন ভাস্কর্য্যে, তিনজন ছাপাখানায় এবং লিথোগ্রাফের কার্য্যে, একজন Vulcanising worksএ, তিনজন চশমা প্রস্তুত কার্য্যে, দুইজন দন্ত-চিকিৎসায়, দুইজন চা-বাগানে, পাঁচজন রেলে এবং নয়জন অন্যান্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ব্যক্তিগত হিসাবে ইঁহারা সকলেই বেশ সুবিধাজনক কাজ পাইয়াছেন। ইহাও অতি আনন্দের কথা।

কতকগুলি যুবক অর্জ্জিত বিদ্যা বিতরণ করিয়া দেশে জ্ঞান-বিস্তারে সহায়তা করিতেছেন। তাঁহারা দেশীয় ছাত্রগণকে উচ্চ বিজ্ঞান ও টেকনলজি শাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। ১৮জন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজসমূহে, শিবপুর সিবিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে, য়ুনিভার্সিটীর বিজ্ঞান-কলেজে এবং গোয়ালিয়র পোলিটেকনিক বিদ্যালয়ে রসায়ন, মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কেমিষ্ট্রি এবং উদ্ভিদবিদ্যার

অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছেন। আরও অনেকে অন্যান্য নানাপ্রকার কার্য্য করিতেছেন। মিঃ পি, কে, বিশ্বাস নামক শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির সংশ্লিষ্ট একটী ছাত্র ইংলণ্ডে কেমিক্যাল ব্যুরোতে নিযুক্ত আছেন এবং বর্ত্তমান বিস্ফোরক পদার্থগুলির অনেক উন্নতি-সাধন করিয়াছেন। একজন সিবিলিয়ান হইয়াছেন, এবং একজন ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ব্বিসে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধের কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। এ সকলই অতি সুখের কথা। আশা করি, আমাদের ন্যায় পাঠকেরাও এই সংবাদ শুনিয়া সুখী হইবেন।

এই বিবরণ কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম না। শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির আদর্শ অতি উচ্চ ও মহৎ। দেশের লোকে এই সকল যুবকের উপর অনেকটা ভরসা ও নির্ভর করে। তাঁহারা দেশ-বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আসিয়া এখানে কে কি করিতেছেন, তাহার একটু বিশদ ও বিস্তৃত বিবরণে দেশবাসীর কখনও বিরক্তি জন্মিতে পারে না; বরং তাঁহারা এই সকল খবর পাইলে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে পারেন। সেইজন্য আমরা আশা করিতেছি, শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির অর্থসাহায্যে বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া কে কোন্ কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন, দেশে কতগুলি নূতন ব্যবসায়ের পত্তন হইয়াছে, কোন্-কোন্ নূতন কারখানা খোলা হইয়াছে, এ সকল কথা জন সাধারণ জানিতে পারিলে, তাহাদের উৎসাহ খুব বাড়িয়া যাইবে। তাহার ফলে, সমিতির এবং দেশের—উভয়েরই মঙ্গলের সম্ভাবনা। জনসাধারণে এই ব্যাপারে উৎসাহিত হইলে সমিতির অর্থ-ভাণ্ডার পুষ্ট হইতে পারিবে। সেই অর্থ-সাহায্যে অধিক সংখ্যায় যুবকগণ শিক্ষালাভার্থ বিদেশে প্রেরিত হইতে পারিবে।

আপাততঃ যেটুকু বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুমান হয়, প্রত্যাবৃত্ত যুবকগণের মধ্যে অধিকাংশই চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেহ-কেহ বা স্বাধীন ব্যবসায়ে (profession) নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু নূতন-নূতন শিল্পশালার প্রতিষ্ঠার সংবাদ বড় একটা পাইতেছি না। আর যদিই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে তাহারও ত কোন খবর মিলিতেছে না! অথচ, দেশের লোকে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবারই আশা বেশী পরিমাণে করিয়া থাকে।

যাঁহারা নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। কারণ, তাঁহারাই সমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা সহজ কাজ নহে। ইহাতে প্রচুর মূলধন আবশ্যক। সম্ভবতঃ মূলধন না পাইয়া, দেশের লোকের নিকট হইতে উৎসাহ না পাইয়া, অনেকে চাকরী করিতে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সে হিসাবে, চাকুরী ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। ইহা আমাদের নিজেদেরই কলঙ্কের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছাবাছা যুবকগণকে খরচ-পত্র দিয়া, বিদেশ হইতে শিল্প-কার্য্যাদি শিখাইয়া-পড়াইয়া আনিয়াও, যদি তাঁহাদিগকে আমাদের চির-পুরাতন এবং একমাত্র আশ্রয় চাকুরী করিতে যাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেটা আমাদের কলঙ্ক নয় ত কি। এক একটী যুবক এক-একটী শিল্প শিখিয়া এদেশে ফিরিয়া আসিলেই, তাঁহার পরামর্শানুসারে তাঁহাকে কারখানা নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া চাই। তবে ত তাঁহাদের বিদেশ যাওয়া এবং এত কষ্ট স্বীকার করা সার্থক হইবে! নচেৎ, যেমন-তেমন চাকুরী ত এখানেও মিলে! চাকুরী ভিন্ন যদি তাঁহাদেরও অন্য গতি না থাকে, তবে তাঁহাদের বিদেশে গিয়া শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিয়া আসার সার্থকতা কোথায়? তবে এ বিষয়ে রীতিমত আন্দোলন হওয়া কর্ত্তব্য। শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় সেই যা একবার রীতিমত সাড়া পাইয়াছিলাম। তার পর বৎসরে একবার কি দুইবার একটা আধটা অধিবেশনের খবর কখনও পাওয়া যায়, কখনও যায়ও না। এরূপ অবস্থা ত কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। এই এত বড় একটা যুদ্ধের সুযোগ কাটিয়া গেল—আমরা কি করিতে পারিলাম? এই সুযোগে কত দেশে যেমন বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তেমনি কত দেশে কত নূতন বাণিজ্যের পত্তন হইয়াছে এবং হইতেছে। এই ভারতের সহিত বাণিজ্য করিয়াই এখনও কত দেশ ধনী হইয়া যাইতেছে। আর, আমরা কি কিছুই করিব না? যুদ্ধের বহু পূর্ব্বে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; চৌদ্দ বৎসর বড় কম সময় নহে। এই সময়ের মধ্যে যতটুকু কাজের আশা করা যাইতে পারিত, সেই পরিমাণ কাজ হইয়াছে কি? গোড়া হইতে উদ্যোগ-আয়োজন করা থাকিলে, নেহাৎ যে কিছু করা না যাইত, তাহা নহে। তাহার সাক্ষী বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্।

গত ৩রা জুন তারিখে পঞ্চনদের বিপাসা নদী পার হইবার সময় একখানা নৌকা ডুবিয়া গিয়া ৮৫ জন লোক প্রাণত্যাগ করে। সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার মধ্যেও একটা অতি আনন্দজনক সংবাদ আছে। গরীবসা নামক এক ব্যক্তি নিজের জীবন পুনঃ পুনঃ বিপন্ন করিয়াও অন্ততঃ কুড়ি জন লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছিল। এই দুর্ঘটনার দরুণ ফেরি-ঘাটের কণ্ট্রাক্টর ও ঐ নৌকার ছয়জন মাঝির বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়। কাঙ্গরার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল সি, এইচ, বাক্ এই অভিযোগের বিচার করিয়া ২০শে জুলাই তারিখে রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আসামীরা যথাযোগ্য দণ্ডলাভ করিয়াছে। রায়ের উপসংহারে ম্যাজিষ্ট্রেট গরীবসার ঐ মহৎ কার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া পরের প্রাণ রক্ষা করিতে গরীবসা এই প্রথমবার অগ্রসর হয় নাই;—ইতঃপূর্ব্বেও সে ঐরূপ কার্য্যের জন্য পুলিশ বিভাগ হইতে সার্টিফিকেট পাইয়াছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিপাসা নদীতেই আর একবার এই রকম একটী দুর্ঘটনা ঘটে। সে সময়ে গরীবসা পাঁচজন

লোকের প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল বাক্ বর্ত্তমান মামলার রায়ে গরীবসার নাম এবং তাহার মহৎ কার্য্যের কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তাহাকে পুরস্কৃত করিবেন, সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, বিলাতের Humanitarian Societyর নিকটেও গরীবসার এই সৎকার্য্যের বিবরণ প্রেরণ করা উচিত।

এই দারুণ দুর্ম্মূল্যতার দিনে বাঙ্গালার দরিদ্র প্রজার সমূহ কষ্ট দেখিয়া বঙ্গের জমিদার-সম্প্রদায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, দেখিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। সে দিন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের গৃহে জমিদারদিগের একটা পরামর্শ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাজা সার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুর এই সভার সভাপতি রূপে একটী সারগর্ভ বক্তৃতায় প্রজার দুঃখ-কষ্ট—অন্ন-বস্ত্রের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতার কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশক্রমে জমিদার-সভা কয়েকটি মন্তব্য গ্রহণ করিয়া সরকার বাহাদুরকে ইহার প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। ইহা আশার এবং আনন্দের কথা। কিন্তু বাঙ্গালার ধনী জমিদারবৃন্দ কেবল সভা করিয়া মন্তব্য গ্রহণ এবং গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়া ও অনুরোধ করিয়াই ক্ষান্ত না থাকিয়া, নিজেরাও যদি প্রজাগণকে সাহায্য করিবার জন্য কার্য্যতঃ অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে আরও সুখের বিষয় হইত। কারণ, বাঙ্গালার জমিদার-কবি স্বয়ং গাহিয়াছেন,—

"শুধু কথার বাঁধুনি, কাঁদুনির পালা,
চোখে নাই কারো নীর—" ইত্যাদি।

আজ আমরা "ভারতবর্ষে"র পাঠক-পাঠিকাগণকে একটী সুসংবাদ শুনাইয়া রাখিতেছি। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার চার্লস চিটি মহাশয়ের কার্য্যকালের অবসান হওয়ায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্থলে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ভবানীপুরের রায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের পুত্র। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় বহুকাল আলিপুরের উকীল-সরকারের পদে কার্য্য করিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। বিচারপতি মিঃ ঘোষ ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। তার পর বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া ঐ আদালতেই প্র্যাক্টিস করিতেছিলেন। মিঃ ঘোষ হাইকোর্টে বিচারপতির পদে নিযুক্ত হওয়ায় দেশবাসী যে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, সে কথা বলা বাহুল্য। এক্ষণে তিনি জজিয়তীতে স্বর্গীয় পিতামহ সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন, বঙ্গদেশবাসী এই আশা করিতেছেন।

আমরা রায় ব্রহ্মমোহন মল্লিক বাহাদুরের পরলোকগমন সংবাদে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলাম। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৯ বৎসর হইয়াছিল। তিনি গণিতে অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ছাত্রবৃত্তি পড়িবার সময় আমরা ইঁহার জ্যামিতি পড়িতাম। ইনি প্রাতঃ-স্মরণীয় স্বর্গীয় ডেভিড হেয়ার মহোদয়ের কলিকাতা স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে হিন্দু স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠ সমাপন করেন। তিনি বরাবর নিজের বৃত্তির টাকায় নিজের অধ্যয়নের ব্যয় সঙ্কুলান করিতেন,—পিতার নিকট হইতে অতি সামান্যই সাহায্য পাইয়াছিলেন। মল্লিক মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তনের পূর্ব্বেই সিনিয়র স্কলার রূপে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। পরে তৎকালীন বোর্ড অব এডুকেশন তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিলে তিনি শিক্ষা বিভাগে কর্ম্মে নিযুক্ত হ'ন এবং নিজগুণে ক্রমশঃ (তদানীন্তন বর্দ্ধমান ও উড়িষ্যা বিভাগ লইয়া গঠিত) পশ্চিম সার্কেলের ইনস্পেক্টরের পদে উন্নীত হন। অবসর গ্রহণের সময় তিনি তৎকালীন হায়ার (অধুনা ভারতীয়) এডুকেশন্ সার্ব্বিসে ছিলেন। ৩৭ বৎসর কাল সরকারী শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম করিয়া তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। জ্যামিতি ছাড়া তাঁহার ত্রিকোণমিতি, পরিমিতি প্রভৃতি গণিত-শাস্ত্র সংক্রান্ত বাঙ্গালা গ্রন্থ বিদ্যালয়-সমূহে অধীত হইত। বাঙ্গালা বিদ্যালয়-পাঠ্য গণিত-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রচারে তিনি অন্যতম পথ-প্রদর্শক ছিলেন।

বাঙ্গালার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা হইতে চলিয়াছে। এ যাবৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠ্য বিষয়গুলি এবং পাঠ্য গ্রন্থাদি স্বতন্ত্র ছিল। উভয় বঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে একই বিষয় এবং একই প্রকার শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা সম্ভবপর এবং যুক্তিসঙ্গত কি না,—বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় কিছু দিন ধরিয়া তাহাই বিবেচনা করিতেছিলেন। মধ্যে-মধ্যে শিক্ষা-বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ এবং স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টরগণ মিলিত হইয়া এই বিষয়ের আলোচনা ও পরামর্শও করিয়াছেন। এই সকল পরামর্শের ফলে সমগ্র বঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উপযোগী একই প্রকার পাঠ্য-তালিকা ও শিক্ষা-প্রণালী বিরচিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় ইহা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছেন। পাঁচ বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই শিক্ষা-প্রণালী এমন ভাবে বিরচিত হইয়াছে যে, কোন ছাত্র মধ্য বা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে চাহিলে, কোনরূপ অসুবিধা ভোগ না করিয়া চতুর্থ শ্রেণী হইতেই প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে পারিবে। কেবল প্রাইমারী শিক্ষালাভ করিয়া যাহারা শিক্ষা শেষ করিতে চাহে, তাহাদের উপযোগী করিয়া পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত শিক্ষা-প্রণালীতে বহু বিষয় অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে; তন্মধ্যে কেবল তিনটী বিষয়—বাঙ্গালা সাহিত্য (রচনা ও ব্যাকরণ), বাঙ্গালা হস্তলিপি ও গণিত অবশ্য-পাঠ্য। বৃত্তি-পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে এই তিনটি বিষয় অধ্যয়ন করিতেই হইবে। ইচ্ছাধীন বিষয়গুলির মধ্যে আছে ইতিহাস, বিজ্ঞান, শারীরিক শ্রমসাধ্য কর্ম্ম (বোধ হয় ব্যায়াম কিম্বা ড্রিল; অথবা, কৃষি-শিল্প বিষয় কি?), ভূগোল, ইংরেজী, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও ড্রিল, স্বাস্থ্যরক্ষা, (বালিকাদিগের জন্য গৃহকর্ম্ম ও সূচিকর্ম্ম), ইত্যাদি। এই নূতন 'সিলাবাস' (বা পাঠ্য বিষয়ের তালিকা) কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে কেহ কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহিলে, সকাউন্সিল গবর্ণর বাহাদুর তাহা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন। এইরূপ মন্তব্য তিন মাসের মধ্যে কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

বিগত ১১ই শ্রাবণ রবিবার 'ভারতবর্ষের' স্বত্বাধিকারী পরলোকগত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈল-চিত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণ একবাক্যে স্বর্গীয় মহাত্মার গুণ কীর্ত্তন করেন। স্বর্গীয় গুরুদাস বাবুর পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ হরিদাস ও শ্রীমান্ সুধাংশুশেখর তাঁহাদের পরলোকগত জনকের নামে প্রতি বৎসর সাহিত্য-পরিষদের হস্তে ৫০্ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই টাকার দ্বারা দুঃস্থ সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

আমরা অল্পদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা বি-এ মহাশয়ের লিখিত 'মহাভারতে অনুশীলন তত্ত্ব' নামক একখানি অতি সুন্দর ও সুলিখিত পুস্তক সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বাবুর এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি ও শিক্ষালাভ করিয়াছি। ভবিষ্যতে এই পুস্তকখানির বিশেষ পরিচয় আমরা প্রদান করিব। আপাততঃ এইমাত্র বলিতে পারি যে, যাঁহারা মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই পুস্তকখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য। মূল্য দশ আনা মাত্র।

'স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান' নামক আর একখানি পুস্তক আমরা সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। লেখক দুইজন—একজন শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দত্ত; ইনি নদীয়ার সিবিল সার্জ্জন; আর একজন শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ, ইনি যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার দুইজনে মিলিয়া মানব-দেহের সৌষ্ঠব সাধনের জন্য, স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য। পুস্তকখানি বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের ঘরে-ঘরে থাকা উচিত। আমরা বারান্তরে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানির বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিব। পুস্তকখানির মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

মজিদার সম্পাদিত রহস্য পিরামিড সিরিজের অষ্টম গ্রন্থ "মস্তকদান" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য সিল্ক বাঁধাই পাঁচ সিকা, কাগজের মলাট এক টাকা।

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের নূতন উপন্যাস "ঈশানী" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রসিদ্ধ উপন্যাস "বিরাজ-বউ"এর হিন্দি অনুবাদ প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।০ সিকা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "একাল সেকাল" প্রকাশিত হইল। মূল্য ২।০ টাকা।

অন্ধ কবি শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন উপন্যাস "স্ত্রী" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত "নিবৃত্তির পথে" প্রকাশিত হইল। মূল্য ।০ আট আনা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বর বিনিময়" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ সিকা।

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র প্রণীত "চিন্ময়ী" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আট আনা।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "প্রজাপতি" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ সিকা।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত "জ্যোতিঃহারা" ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মূল্য ২্ টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অশান্তি" প্রকাশিত হইল। মূল্য ৸০।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ এম্-এ প্রণীত "মনোবিজ্ঞান" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৩্ টাকা।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত সাধক জীবনী সিরিজের ৪র্থ গ্রন্থ "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ" পারমার্থিক উপন্যাস "সংসার চক্র" এবং সামাজিক উপন্যাস "অভাগিনী" পূজার মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত সামাজিক নাটক "সৎসঙ্গের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.



উর্ব্বশী ও অর্জ্জুন

শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার] [Blocks by Bharatvarsha Halftone Works

Emerald Printing Works
CALCUTTA.



আশ্বিন, ১৩২৬

প্রথম খণ্ড]　　সপ্তম বর্ষ　　[চতুর্থ সংখ্যা

শিক্ষা-সমস্যা ও তাহার মীমাংসা *

[মাননীয় শ্রীসার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে-টি, এম্-এ, ডি-এল, সি-আই-ই]

আপনারা আজ আমাকে যে আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন—আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ক্ষুদ্র তারকায় কখনও প্রফুল্লচন্দ্রের আসন আলোকিত করিতে পারে না। যে আসন একদিন দেশমান্য প্রফুল্লচন্দ্র ও পূজার্হ শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন, সে আসনের আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য! আপনারা যে আমাকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, সে আপনাদেরই মহত্ত্বের পরিচায়ক। আশা করি আপনাদের আনুকুল্যে আমার কর্ত্তব্য-পালনে সমর্থ হইব।

আজকাল দেশের অবস্থা এমনই হইয়াছে যে, একটা কংগ্রেস্ কিম্বা কন্‌ফারেন্স না হইলে লোকের কোন কাজেই মন উঠে না। মামুলী-প্রথায় মহা ধুমধাম, সোর-সরাবৎ করিয়া দশজনে সমবেত হইয়া বর্ত্তমান কন্‌ফারেন্স গঠিত হয় নাই। এই মহকুমার শিক্ষকগণ সম্মিলিত হইয়া শিক্ষক-সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। লোক-শিক্ষার মত অযশকর 'নীরস-তরুবর' লইয়া যে এত লোক মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত, তাহা বর্ত্তমানে বঙ্গীয় জগতে আশ্চর্য্য-জনক হইলেও এপিটক্, একজাই, পঞ্চায়ৎ ও বারোয়ারীর দেশের পক্ষে নূতন নহে। দশ-সহস্রী কুলগুরুপ্রতিম, প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে বাহির দিয়ার বনভূমি আজ নৈমিষারণ্যের শোভা ধারণ করিয়াছে। সেই দৃশ্য দেখিবার প্রলোভন আমার স্বাভাবিক। বেনারসের হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত এক প্রয়োজনীয় সভাতেও আজ আমার নিমন্ত্রণ ছিল। বিশ্বনাথের বিশ্বধামে শিক্ষার পবিত্র মন্দিরেও নন্দী-ভৃঙ্গীর তাণ্ডব নৃত্য হইতেছে। সেই নৃত্যে অঙ্গ যোগদান করিবার আমন্ত্রণ ছিল। একই দিনে দুটী আমন্ত্রণ; তাই ক্ষণিকের জন্য একটা মহা সমস্যা মনে উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দক্ষযজ্ঞের ভূমিষ্ঠ অনুষ্ঠান হইলে সমগ্র দেশের দুর্ভাগ্য। এ সঙ্কট-স্থলে কোথায় যাওয়া কর্ত্তব্য, সে সমস্যার সমাধানে আমার অধিক সময় লাগে নাই। চিন্তা করিয়া

* বাগেরহাট শিক্ষক-সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

এখানে আসাই স্থির করিলাম। ভাবিলাম জগতে বড়-বড় কাজ করিবার জন্য অনেক বড়-বড় লোক আছেন। যে কাজ করিবার জন্য অনেক লোক প্রস্তুত ও প্রয়াসী, তাহাদের ভিড় না বাড়াইয়া পশ্চাতে থাকাই আমার চিরদিনের ব্রত। কোন-কোন ক্ষেত্রে স্বর্গীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে সে ব্রতচ্যুত করিয়াছিলেন; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কার্য্য শেষ হইয়া গেলেই সরিয়া পড়িয়াছি।

আলোকমালা ও ঐশ্বর্য্যচ্ছটার উন্মাদনায় যতক্ষণ অন্য যশঃপ্রয়াসী লোক আসিয়া কর্ম্মীগণের জনতা বৃদ্ধি না করেন, ততক্ষণ কর্ম্মক্ষেত্রে আমার প্রকৃষ্ট স্থান। বিশেষতঃ ছোটর মধ্যে মহত্ত্বের বীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্য অনাড়ম্বরে যাঁহারা চেষ্টা করেন, আমার মত নিরীহ লোকের সেই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত। শিক্ষাকার্য্যে যাঁহারা কৃতী, তাঁহাদের এরূপ সভা-সমিতি এদেশে কিম্বা বিলাতে নূতন নহে। বিলাতে ১৮০০ শত শিক্ষক শীঘ্রই সভাস্থ হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনাদের এই চেষ্টা ইদানীন্তন-কালের মধ্যে এইমাত্র অঙ্কুরিত হইতেছে; এখনও মহীরুহে পরিণত হয় নাই। আপনারা যদি এই কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারেন, বাগেরহাট শিক্ষক-সঙ্ঘ খুলনা সঙ্ঘাকার শীঘ্র ধারণ করিবে; ক্রমশঃ সমস্ত বঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ কেন সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া পড়িবে। সে শুভ-সংযোগ জন্য নিয়মিত-রূপে ধারাবাহিক কার্য্যের প্রয়োজন। এ মহদনুষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপনের প্রথম আয়োজন সুচিকিৎসকের হস্তে। খুলনার সুযোগ্য সিভিলসার্জ্জন ডাক্তার সরসীলাল সরকারের ন্যায় ডাক্তার আপনাদের অনেক সাহায্য করিতে পারেন। সরসীবাবু সভাস্থলে উপস্থিত আছেন। হয় ত মনে করিতেছেন—এত লোক থাকিতে তাঁহার উপর এই প্রথম আক্রমণ কেন? তাহার উত্তর আমি তাঁহাকে এইক্ষণই দিতেছি; কারণ কথাটা পরিষ্কার বলা উচিত। শিক্ষা-সমস্যা আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও ভাল করিয়া মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। পূর্ব্বে আমাদের দেশে শিক্ষা-পরিচালকের ভার যে সমিতির উপর ছিল, তাহাকে Board of Education বলিত, এখন শিক্ষা-পরিচালকের নাম হইয়াছে Director of Public Instruction। আমরা কি চাই, কিসের জন্য আমরা ব্যস্ত;—Education না Instruction? জানি না, সে প্রশ্নের মীমাংসার বিশদ চেষ্টা কেহ করিতেছেন কি না? পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা রজনীবাবু বর্ত্তমান শিক্ষিত-মণ্ডলীর সহিত আমার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক প্রমাণের জন্য আমার পূর্ব্ব-পুরুষ মহাত্মা প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর নাম করিয়াছেন। আমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত মহাত্মা প্রসন্নকুমারের পাটীগণিত পড়িয়া অনেকে অনেক দুরূহ গণিতের প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিয়াছিলেন, সত্য। সেই পাটীগণিতের একটী প্রশ্নের কথা বিশেষভাবে আমার মনে পড়িতেছে।

> আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন।
> ক্রোধে জলে ফেলে দিল পবন-নন্দন।
> অর্দ্ধেক পঙ্কেতে, তার তেহাই সলিলে,
> দশম ভাগের ভাগ শেহালার দলে।
> উপরে বায়ান্ন হাত দেখি বিদ্যমান।
> কহ হে সুবোধ শিশু দেউল প্রমাণ।

সুবোধ শিশু হয় ত প্রসন্নকুমারের সাহায্যে সেই মীমাংসা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমাদের এই শিক্ষারূপ বহু প্রাচীন দেউলের কোন্ অংশ কোন্ পবন-নন্দনের কৃপায় কোথায় অরণ্যে পড়িয়াছে, কোন্ অংশ কোথায় সলিল-মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেছে, আর কোন্ অংশ বা কোথায় পাঁকে প্রোথিত রহিয়াছে, আর সেই পাঁক, সলিল এবং অরণ্য-মধ্যস্থ অংশ-বিশেষের অবধারণ ও উদ্ধার কোথা হইতে কিরূপে করা যাইবে, এ প্রশ্নের প্রকৃষ্ট উত্তর আজ প্রসন্ন-কুমারের অযোগ্য বংশধর আপনাদের সমীপে করিতে নিতান্ত অক্ষম।

আমাদের কিশোর বালক ও যুবকগণ শিক্ষামন্দিরে কি লাভ করিবেন, কিসে উপকৃত হইবেন ও দেশকে উপকৃত করিবেন, বিশেষজ্ঞরা আগে তাহাই বিবেচনা করুন। সে বিষয় বিশেষ বিচার না হওয়ায় আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাস্রোত কুপথে চলিয়াছে। বিশেষরূপে অজ্ঞতা যাঁহার আছে, তাঁহাকেই বিশেষজ্ঞ বলে, ইহাই মতান্তর। বোধ হয় বর্ত্তমান সংঘর্ষণের জন্য তাঁহারাই দায়ী। দেশের সনাতন শিক্ষা-প্রণালী যখন কালচক্রে রাহুগ্রস্ত, তখন কেরাণী, দোকানী, রাজকর্ম্মচারী গড়িয়া তুলিবার জন্য আরবী, পার্শী, উর্দ্দুর জায়গায় ইংরাজী অধিকার করিল; এবং কোন্ শিক্ষা-প্রণালীতে সমগ্র-লোক-মঙ্গল সম্ভব, ইংরাজ

এখনও তাহা স্থির করিতে পারেন নাই; তাই কয়েক বৎসর অন্তর তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়-কমিসন বসে এবং প্রতিবৎসর তাঁহাদের শিক্ষক-সমিতির অধিবেশন প্রয়োজন হয়। কালস্রোতে পড়িয়া আমাদেরও তাহা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অন্ধকারে যতই তাঁহারা হাতড়ান, ইংরাজ কিন্তু একটা সার সত্য ধরিতে পারিয়াছেন;—'স্বীয় ধর্ম্ম অনুসারে গোটা মানুষ গড়িয়া তোলাই শিক্ষার মূলমন্ত্র।'

যদি Educationই আমাদের মূল লক্ষ্য হয়, যদি ত্রৈলোক্য বাবুর (অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ঘাটভোগ নিবাসী জমিদার বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়) অভীপ্সিত "মানুষ গড়িয়া তোলা" আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হয়, তবে আমাদের কোন্ মসলার প্রথম যোগাড় করিতে হইবে?—স্বাস্থ্য। বলবীর্য্য-গৌরবান্বিত প্রতাপাদিত্যের এই পুণ্যভূমি, বর্ত্তমানে প্রফুল্লচন্দ্রের এই রুগ্ন-ভূমি হইতে যাহাতে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীকে বিদূরিত করিতে পারা যাইতে পারে, তাহাই আপনাদের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। এই বিষয়ে সকলেরই বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা উচিত। "Three R's" (অক্ষর ও গণিত-পরিচয়) "Revised Matriculation Curriculum" (সংশোধিত ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্য-তালিকা) "Anti-smoking Propaganda" (ধূমপান-নিবারণ আন্দোলন) বা "Temperance Campaign" (মিতাচার প্রবর্ত্তন-চেষ্টা), এ সব পরে হইলেও চলিতে পারে; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইবে। আমার বা প্রফুল্লচন্দ্রের মতন রুগ্নদেহীর পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার সম্পূর্ণ ফল সম্ভোগ করা কি সম্ভবপর? অতএব আমার প্রথম অনুরোধ, আপনারা আপনাদের সিভিল-সার্জ্জন সরসী বাবুর সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া ম্যালেরিয়া দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহাতে রাজার ও দেশের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ কষ্টকর নহে। আপনারা হয় ত মনে করিতে পারেন, ধান ভান্‌তে এ শিবের গীত কেন? আমরা ক্ষুদ্রজীবি শিক্ষক; আমরা দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া বিনাশের কি সহায়তা করিতে পারি? আর করিবই বা কেন? করিলে শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তারা, আর বাড়ীর কর্ত্তারাই বা কি বলিবেন? আমি কিন্তু বিশেষরূপে আপনাদিগকে বলিতেছি যে, এটা কখনই ধান ভান্‌তে শিবের গীত নয়। শিক্ষা-সম্বন্ধে সংস্কার করিতে গেলে ছেলেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতি প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। শরীর সুস্থ না থাকিলে বুদ্ধিগত বা নৈতিক শিক্ষা কখনও ফলবতী হইতে পারে না। পুস্তকে পড়া গেল 'মগ্নপ্রায় লোকের উদ্ধার করিতে হইবে'; কিন্তু সাঁতার জানা না থাকিলে অথবা সামর্থ্যে না কুলাইলে ছাত্রের পক্ষে সে শিক্ষা পুস্তক-গতই রহিয়া যায়, কখনই কার্য্য-গত হয় না। আর শিক্ষকেরা এই বিষয়ে কিরূপ সহায়তা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। নিজের দেহ-সাহায্যে গুরুর কৃষিক্ষেত্রে আইল বাঁধিয়া সমস্ত রাত্রি জলস্রোত নিবারণ যে দেশের আদর্শ, সে দেশেও এসব দৃষ্টান্ত দেখাইতে হয়! Oxfordএ একটী গলি খুব পঙ্কিল ছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থানীয় স্বাস্থ্য-রক্ষকগণ তাহার কিছুই করিল না। অবশেষে যিনি Stones of Veniceএ জীবন-সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ—Art সমালোচক মহাত্মা রাস্‌কিন—তাহার সংস্কারের জন্য স্বয়ং কৃতসংকল্প হইয়া তাঁহার ছাত্রদিগকে ডাকিয়া নিজেই প্রথম কোদালি ধরিলেন। শিক্ষকের এই মহৎ দৃষ্টান্তে ছাত্রগণ অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্যে ব্রতী হইল। অল্পদিনের মধ্যেই সেই পঙ্কিল, পরিত্যক্ত পথ সুশোভিত প্রস্তর-মণ্ডিত রাজবর্ত্মে পরিণত হইল। 'আমাদের দেশের শিক্ষকগণ প্রয়োজন হইলে কোদাল, কাস্তে, খুন্তী, নিড়েন ধরিতে পারেন, জানি বলিয়াই এ কথা বলিতেছি। আমি জানি, আমাদের দেশের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের ন্যায় ত্যাগী, সহিষ্ণু ও নীরব কর্ম্মী কেহ নাই; কত যাতনা, কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও তাঁহারা যে সামান্য পারিশ্রমিকে তুষ্ট হইয়া গরীয়ান শিক্ষকতা ব্রতে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অসীম মহত্বের পরিচায়ক। যে শ্রেণী-পার্থক্যে আপনারা বিপর্য্যস্ত, সে পার্থক্য না থাকিলে অধ্যক্ষ বেলেট সাহেবের কৃপায় আমিও প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় শিক্ষকতা-ব্যবসায়ী হইয়া এতদিনে তাঁহারই ন্যায় পেন্‌সন-ভোগে চরিতার্থ হইতাম। কিন্তু তাহা ঘটে নাই; আমি নিজে শিক্ষক হইবার মহান্ অধিকার পাই নাই। আমি শিক্ষকগণের দাসানুদাস মাত্র; মুন্‌সী রামনারায়ণ, প্রসন্নকুমার ও রাজকুমারের বংশধর তাহা না হইয়া থাকিতে পারে না। আমার সম্পূর্ণ ভরসা, এদেশের শিক্ষকগণ উদ্যোগ করিলে এ সম্বন্ধে অশেষবিধ কাজ করিতে পারেন। কেবল বিষয়টী বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তাঁহারা এ কার্য্যে প্রাণপণ করিবেন, ইহা

আমার পূর্ণ বিশ্বাস। First plank in the renewed educational platform নূতন শিক্ষা-মঞ্চের প্রথম ধাপ স্বরূপে আপনাদিগকে এই আদর্শ উপহার দিতেছি; উপহার গৃহীত হইলে কৃতার্থ হইব। Mens sana corpore Sano—a sound mind in a sound body বিদেশী কথা। কিন্তু "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং" ইহা আমাদেরই দেশের কথা। দ্বিতীয় সোপান, Anti-smoking and Temperance Societyর ন্যায় কর্ম্ম-কেন্দ্রগুলিকে আমি শিক্ষা-ক্ষেত্রে উচ্চ-স্থান দিতে চাই; কারণ অমিতাচার, শারীরিক এবং নৈতিক উভয়বিধ কল্যাণের অন্তরায়। ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিতে হইলে এবং যাহাতে ভবিষ্যতে তাহারা মানুষ করিয়া তুলিবার সাহায্য করিতে পারে, উভয় সাহায্যার্থে নৈতিক জীবনের উন্নতি একান্ত আবশ্যক। শুধু শিক্ষক কেন, সকলেরই এ বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের সমাজের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম-শিক্ষার সুবিধা নাই; বাড়ীতেও দুর্ভাগ্য বশতঃ সে শিক্ষার অনেক অন্তরায়। অতএব, নিয়মিত ভাবে অথচ কঠোরতা-শূন্য হইয়া নীতি শিক্ষককে অক্লান্তভাবে কাজ করিতে হইবে। সকল শিক্ষার ভিতর দিয়াই এই নৈতিক শিক্ষার ভাব আনিতে হইবে। উগ্রমূর্ত্তি, প্রচণ্ড নীতি-শিক্ষক বড় আমল পাইবেন না; নিজের জীবনে, কথায় ও দৃষ্টান্তে এই আদর্শ জাগাইয়া তুলিতে হইবে; "কথাচ্ছলেন" এ বিষয়ে অনেক উপকার হওয়া সম্ভব। দুর্নীতি নিবারণের এবং সুনীতি সংস্থাপনের জন্য শিক্ষক ও অন্য সকলকে বদ্ধ-পরিকর হইতে হইবে।

তৃতীয় কথা, দেশভক্তি ও রাজভক্তি। যদি এই দুইটী গুণ তুল্যরূপে ও সমান্তরাল ভাবে শিক্ষা-জগতে স্থান না পায়, তবে Instruction বা Education কিছুই ফলপ্রসূ হইবে না। রাজার শাসন যাহাতে সকলে পালন করে, সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা যাহাতে সকলে রক্ষা করিতে বোঝে, আমাদের তাহাই করা উচিত। আর একটী কথা: উত্তর যুগে যাহারা স্বদেশ-প্রেমিক ও সমাজ-সংস্কারক বলিয়া খ্যাত হইবেন, বাল্যে তাঁহাদের হৃদয়ে উপযুক্ত বীজ রোপন করা উচিত। দেশের ইতিহাস যাহারা বোঝে নাই বা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, তাহাদের পক্ষে দেশের মঙ্গল করা অসম্ভব। আমার জন্মস্থান রাধানগর, যাহা রামমোহন রায়েরও জন্মস্থান। সেই মহাপুরুষের জন্য কে না গর্ব্ব অনুভব করেন? কিন্তু স্বগ্রাম রাধানগরে যাইতে আমার লজ্জা করে। শুধু ম্যালেরিয়া ও বন্যার ভয়ে যাইতে পারি না, তাহা নয়; যথার্থ লজ্জা করে, কারণ সেইখানে সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের কোনও স্মৃতি-চিহ্ন নাই। আমেরিকার তীর্থযাত্রীরা রাজার স্মৃতি-চিহ্ন দেখিতে চাহিলে গ্রামের লোক রাজাদের দোলমঞ্চ দেখাইয়া দিয়া বাহাদুরীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। আমি অনেকদিন চেষ্টা করিতেছি, জেলায় জেলায় ভিক্ষা করিতেছি। ভিত্তি-স্থাপন হইয়াছে, কিন্তু স্মৃতি-মন্দির স্থাপন হইতেছে না। ইহা লজ্জা, ক্ষোভ এবং ঘৃণার কথা; শুধু আমার নয়, সমস্ত বাঙ্গালী জাতির। তা বলিয়া আমার লজ্জা ত কম হইবে না। দোষ আমাদের, কারণ দেশকে ভালবাসিবার, মহাজন-স্মৃতি অর্চ্চণা করিবার শিক্ষা আমরা যথেষ্ট পাই নাই। সেই জন্য আমাদের এই অবস্থা। অবান্তর কথা হইলেও এই উপলক্ষে আবার বলি, বাল্যের সরল ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে দেশভক্তি এবং যুক্তিসঙ্গত রাজ-ভক্তির বীজ বপন করার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শিক্ষকের এবং শিক্ষাজগতের নেতৃবৃন্দের ইহা বিশেষ স্মরণীয়।

চতুর্থতঃ; শিক্ষকদিগের নিজ অধিকার বিস্তার করার সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। যদি নিজেদের সম্মান বৃদ্ধি করিতে গিয়া আত্মম্ভরিতা প্রচার করা এই সভার উদ্দেশ্য হয়, তবে যত শীঘ্র এই সভার অবসান হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু সে কথা আমি একবারও ভাবি না, বা বলি না। আমার আবার প্রসন্নকুমারের কথা মনে পড়ে। তাঁহার কুটুম্ব রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের মৃত্যুর পর নবাব নাজিমের দেওয়ানী পদে বসাইবার জন্য অনেকে তাঁহাকে সাধা-সাধি করেন; সদর দেওয়ানী আদালতের ওকালতী কাজে বসাইবার জন্যও অনেক সহৃদয় বন্ধু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া চিরজীবন শিক্ষাব্রতে ব্রতী হন। এবং যে সকল মহাপণ্ডিতের নেতৃত্ব তাঁহার সৌভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যহ একটাকা না পাইলে তাঁহারা সরকারী কাজ গ্রহণে স্বীকৃত হইবেন না। আপনারা তাঁহাদেরই যোগ্য পদাঙ্কানুবর্ত্তী; আপনারা নিজের লাভা-লাভ, মানাপমান, অধিকার-অনধিকার বিচারের জন্য সমাগত হন নাই।

লাভালাভ-চিন্তা এবং ব্যবসায়মূলক বুদ্ধি দ্বারা আপনারা যদি পরিচালিত হইতেন, তাহা হইলে আপনারা কখন প্রফুল্লচন্দ্রের মতন লোকের সহানুভূতি পাইতেন না। নিজেকে বড় করিয়া প্রমাণিত করিতে গিয়া সরকারী কার্য্য-ক্ষেত্রে কাহারও কিছু সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু সে সুবিধা ক্ষণস্থায়ী; মানুষের মন তাহাতে তুষ্ট হইবে না। আপনারা যে মহৎ কার্য্যের ভার লইয়া ত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতে-ছেন, তৎসংক্রান্ত কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া এই শিক্ষক সঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনাদের চেষ্টা সফল হউক।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণে শুনিলাম, ভারতের শিক্ষার ভার এখন ভারতের হাতে নাই। তাহা যদি সত্য হয়, তবে দোষ কাহার? ভারতবাসীই তাহার জন্য দায়ী। উক্ত সভাপতি মহাশয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Law Collegeএর উপর বিশেষ একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন; বলিয়াছেন যে, সমগ্র Oxford Universityতে যত ছাত্র না হইবে, এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Law Collegeএ তাহার অধিক ছাত্র। প্রফুল্ল ভায়ার ছাপ যাহাতে পড়ে, তাহাতে বড় জোরের সহিতই পড়িয়া থাকে। তিনি সংপ্রতি এই প্রসঙ্গে কোন স্থানে বলিয়াছেন যে, যদি মুহূর্ত্তের জন্য তিনি হারুণ অল্-রসিদের ক্ষমতা পাইতেন, তাহা হইলে নিমেষের মধ্যে বিশাল Law College-সৌধ ধূলিসাৎ করিয়া দিতেন। তিনি এখানে উপস্থিত আছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, ভূমিসাৎ না করিয়া কি নিরস্ত হওয়ার অন্য কোন উপায় ছিল না? দেশে কি আইন-কলেজের মোটেই প্রয়োজন নাই? আমাদের গবর্ণমেণ্টই আইনের দ্বারা ও আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতি পদে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা না হওয়াতে দেশে নানা অশান্তির সৃজন হইতেছে। সাময়িক বিদ্বেষের কথা ছাড়িয়া দিন। রাজার আইন-ই, রাজার ও রাজকর্ম্মচারীর সহিত বিরোধে প্রজাকে রক্ষা করে ও করিবে। আমাদের অধি-কার কি, কতটুকু সীমানার মধ্যে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারি, বে-আইনি উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম কি, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্যও কি দেশের বহু লোকের আইন অধ্যয়ন প্রয়োজনীয় নয়? Law Collegeএ দুই হাজার ছাত্র,—বড় আশঙ্কার কথা! সেখানে ত কতকগুলি ছাত্রের জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় সহায়তা হইতেছে। কিন্তু Medical Collegeএ কত ছাত্র স্থান পাইতেছে না, তাহার ব্যবস্থা আমরা কি করিতেছি? Law College ধূলিসাৎ হইলেই কি Medical Collegeএর নিরাশ ছাত্রগণের অভাব মোচন হইবে? না, দ্বিতীয় Science কলেজ এবং কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ স্বয়ম্ভূ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে? এ সকল বস্তুতঃই লোক-চেষ্টা সাপেক্ষ। কে তাহার চেষ্টা করিবে? কেন সে চেষ্টা হইতেছে না? সে চেষ্টা যথাযথ ভাবে হইলে কাহার সাধ্য সে চেষ্টার প্রতিরোধ করে? দুই চারি জন চিকিৎসাজীবির আজীবন প্রাণপণ চেষ্টায় কারমাইকেল Medical Collegeএর সৃষ্টি। দুই জন দরিদ্র ও স্বয়ম্-সিদ্ধ ব্যবহারাজীবের যত্ন-সঞ্চিত উপার্জ্জনে Science Collegeএর সৃষ্টি। দেশে কি দুই হাজার শিক্ষাপ্রার্থী যুবক আছে, না কুড়ি হাজারেরও অধিক শিক্ষা-প্রার্থী যুবক আছে? অন্য পথের সুবিধা হয় না বলিয়া এবং আইন ব্যবসায়ে রাতারাতি বড়-মানুষ হইবার, কিংবা সকলেরই হাইকোর্টের জজ হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট কুসংস্কার আছে বলিয়াই Law Collegeএ এত ভিড় হয়। বিলাতে আইন অধ্যয়নপ্রার্থীর সংখ্যা এখানকার চেয়ে অনেক অধিক। কিন্তু শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট সুবিধা আছে বলিয়া কোন বিভাগের হানি হয় না।

আমাদের ছাত্রদের বিভিন্নমুখীন অভাবের কথা মনে পড়িলে বর্ত্তমান অবস্থার জন্য সকল দোষ Law College-এর ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ Law Collegeর বাড়ী ধূলিসাৎ না করিয়া বিংশ শতাব্দীর হারুণ-অল রসিদ যদি তাহা বিজ্ঞান বা শিল্প শিক্ষা কলেজে নিয়োজিত করিবার প্রস্তাব করিতেন, তাহা হইলে নেশা ছুটিবার পর কোঁড়া প্রহারের ভয় কম হইত। Primary Education Bill পাশ করিয়া Council গৃহ হইতে সগর্ব্বে স্ফীতবক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমরা মনে করিতে পারি না যে, আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। উহাতে সেরেস্তা দুরস্ত হইতে পারে, কিন্তু কতটা কাজ হইবে বলা যায় না। এ দেশে কোন educationএর জন্য জবরদস্তির (Compulsion) প্রয়োজন হয় নাই, এবং হইবে না। শিক্ষার্থীকে মারিয়া তাড়াইতে হয়। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে Primary Education নামে compulsory করিলেই কি যথেষ্ট

হইল? Primary, secondary, Graduate, Medical, Commercial, Technical সব রকম শিক্ষার সিংহদ্বার যাহাতে অবাধে, প্রশস্ত ভাবে আমাদের দেশবাসীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা এখনই আমাদের করিতে হইবে।

আবার প্রফুল্ল ভায়াকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার কলেজে M. Sc. ক্লাসে একবিংশতিতম ছাত্র গেলে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আইসে কেন? কেন সেখানে হাজার-হাজার ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হয় না? এত বড় বাঙ্গালা দেশের যেখানে অন্যান্য রকম শিক্ষা-দ্বার এত সঙ্কুচিত, সেখানে Law Collegeএ দুই হাজার ছাত্র হইয়াছে বলিয়া ভয়ের বা নিরাশার কারণ কিছুই নাই। শিক্ষার মন্দির-বিশেষকে ধূলিসাৎ করিবার প্রয়োজন নাই; অন্য প্রকরণের আরো মন্দির সংস্থাপিত কর; সকল মন্দিরই উপাসকে পরিপূর্ণ হউক। টাকার অভাব এদেশে নাই। উপযুক্ত ও সমবেত চেষ্টা করিলে সরস্বতীর বরপুত্র ভারতবাসী বীণাপাণির সেবা-মন্দির গঠনের জন্য মুক্তহস্ত ব্যতীত রিক্তহস্ত কখনই হইবেন না। এখনও দেশে ঘোষ ও পালিতের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি না আছেন, এমন নয়। তবে তাঁহাদিগকে বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। উদ্যমের প্রয়োজন এবং তাঁহাদের দান-লাভের যোগ্যতাও অর্জ্জন করিতে হইবে। চেষ্টা করিলে দ্বিতীয় বিজ্ঞান-কলেজ, তৃতীয় বেলগাছিয়া কলেজ স্থাপন, সহজে না হউক, আয়াস-সহকারে সম্ভবপর হইবে।

দেশের জমিগুলি হইতে একমুঠার জায়গায় যাহাতে দুই মুঠা আদায় করিতে পারা যায়, প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে সেইরূপ শিক্ষার প্রচলন করা নিতান্ত আবশ্যক। পশ্চিম দেশে দেখিয়াছি, স্কটলণ্ডের দূরতম প্রান্ত হইতে ইংলণ্ডের দূরতম প্রান্ত পর্য্যন্ত কোথাও একখণ্ড জমি পড়িয়া নাই। আর আমাদের অবস্থার দিকে একবার দেখুন। গাড়ীতে আসিবার সময় পথে দেখিলাম দুধারে কত জমি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়াই মনে হইল রামপ্রসাদের সেই পুরাণ কথা "মন তুমি কৃষি-কাজ জান না, এমন মানব-জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোণা।" আমরা সোণা ফলাইতে জানি না। এখানে দেখিতেছি নূতন নূতন Secondary School খুলিবার খুব আয়োজন চল্‌ছে;—উত্তম। কিন্তু সেই সব উদ্যোক্তাদিগকে আমার বলিতে ইচ্ছা হয় যে, Commercial ও Industrial Education এর ব্যবস্থাও সঙ্গে-সঙ্গে করা হউক। পল্লীবাসীকে পুঁথি পড়িয়া object-lesson study করিতে হয় না। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে শুধু কৃষকের নয়, যাঁহারা কৃষক চালাইয়া খান, তাঁহাদের উপকার হয়।

Law College ভূমিসাৎ না করিলে যদি Science ও Technologyর উন্নতি না হয়, একজনকে না ডুবাইয়া যদি অপরের প্রাণরক্ষা না হয়, সেক্ষেত্রে কাহারও বাঁচিয়া থাকায় লাভ নাই; দুইজনেরই ডুবিয়া যাওয়া ভাল। প্রতিযোগিতার ভিতরে উৎকর্ষ লাভই প্রকৃষ্ট উৎকর্ষ। সত্য বটে আর্ট কলেজ, কৃষি কলেজে কতকটা স্থান খোলা থাকা সত্ত্বেও ছেলেরা Law Collegeএ ছুটিয়া যায়; কৃষি-শিল্পের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না; তাহার কারণ আইন পড়া এদেশে যত সহজ, যত কম পরিশ্রমে ও ব্যয়ে এই বিষয় শিক্ষালাভ করা যায়, অন্য কোন বিষয়ে তত সহজে শিক্ষা লাভ করা যায় না। আরও এক কথা; আইন-পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা ছেলেদের নিকট এক অপূর্ব্ব স্বপ্নময় সুখরাজ্যের পথ খুলিয়া দেয়; স্বপ্ন সত্য হইবে কি না তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয় না। কল্পিত সৌভাগ্যই তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া তুলে। এদেশে শিল্পের রাজ্য বা বাণিজ্যের রাজ্য তত সুখময় নয়; তাই সেদিকে লোক তত ছুটে না। অতএব, যে সকল অভাব, অসুবিধা এ পথে আছে, তাহা এখন সরাইতে হইবে। কতকটা আশা হয়, দেশের মন ফিরিয়াছে, এরূপ অবস্থায় শিল্প, বাণিজ্য বিষয়ক সংস্কার খুব কার্য্যকর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে যাহাতে এ সব বিষয়ে ছেলেরা কতকটা শিক্ষালাভ করিতে পারে এবং উত্তরকালে উভয়বিধ শিক্ষার সমবায়ে নিজেদের জীবন পরিচালিত করিতে পারে, প্রথম হইতেই শিক্ষকগণের সে বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। হাতে-হেতুড়ে কাজ করিলেই যে চাষা, কামার, ছুতার হইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহা নয়। এ সকল কাজকর্ম্মে হাতের "কপ্ত" হয়, মনের বল হয়, হঠাৎ প্রয়োজনে উপকার হয় এবং ব্যবসায়ের স্বাদ জানা থাকিলে ব্যবসায়ের দিকে মন

হয় ; অন্ততঃ তাহাতে মানহানির ভয় কমিয়া যায়। সাধারণ-প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে-সঙ্গে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পশিক্ষার মূলসূত্রগুলি পল্লীবিদ্যালয়ে সহজেই শেখান যাইতে পারে।

তারপর দেশে আজকাল আর একটা কথা উঠিয়াছে। কথা হচ্ছে, শিক্ষার বাহন (Medium) হইবে কি ? শিক্ষার প্রধান বাহন বাঙ্গালা হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে কিরূপ বাঙ্গালা হইবে ? ইহার উত্তর কা'ল আমি আমার তিন বৎসরের নাতিনীর নিকট হইতেই পাইয়াছি। কা'ল রাত্রিতে রওনা হইবার পূর্ব্বে যখন মেঘাড়ম্বরের মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎছটা দেখা যাইতেছিল, তখন আমার পৌত্রী আসিয়া আমাকে বলিল, "দাদাবাবু আজ যাবেন না, মেঘ জল্‌চে।" কষ্ট করিয়া তাহাকে বাঙ্গালার idiom মারপেচ শিখিতে হয় নাই ; সে আপনার থেকে বাঙ্গালার এক সরল স্বাভাবিক idiom গঠন করিয়া তুলিল এবং নিজের ভয় আতঙ্কের কথা জানাইল। যে বাঙ্গালা আমার মায়ের বাঙ্গালা ; ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যার বাঙ্গালা ; আমার নাতিনীর বাঙ্গালা ; সেই সরল, স্বাভাবিক, সহজ বাঙ্গালাকেই শিক্ষার বাহন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ভালরূপ ইংরেজী না জানিলে যে বাঙ্গালা পড়া বা বোঝা যায় না, তাহার অপেক্ষা খাস ইংরাজীর প্রচলন ভাল। ইংরাজীকে ছাড়িয়া দিলেও চলিবে না। কারণ বিদেশী রাজপুরুষদের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে ইংরাজী আমাদের প্রধান সহায়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে ভারত চিরদিন বলবান্ হইয়া আসিয়াছে ; রাজা-সরকারে সে শক্তি সময়ে বিকীরণ করিতে ইংরাজী ভাষার বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের এ পর্য্যন্ত যতটুকু রাজনৈতিক অধিকার লাভ হইয়াছে বা শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা, তাহার প্রধান সহায় ইংরাজী ভাষা। নৈতিক শক্তি চিরদিন তাহার সহায় হইয়া আসিয়াছে এবং সেই শক্তিই সে চিরদিন প্রধান বলিয়া স্বীকার করিবে। শাসনকর্ত্তার সে শক্তি কার্য্যকরী করিবার জন্য ইংরাজী ভাষাই তাহার প্রধান সহায়। নব্য-যুগের সাহিত্যরথীদের পদানুসরণ করিয়া কথায়-কথায় ইংরাজী ভাষাকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে সে বাঙ্গালা জাতীয় বাঙ্গালা হইতে পারিবে না। ইংরাজী-অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর ছেলে "নগ্ন বাস্তব" পড়িয়া naked realityর মানে বুঝিবে না। সুতরাং এরূপ ভাষা সৃষ্টি করিয়া লাভ কি ? জোর করিয়া মূর্ত্তিকে হারাইয়া ছায়া পূজা করিয়া লাভ কি ? তাহা অপেক্ষা যে মূর্ত্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাই পূজা করা বরং ভাল। যদি মিনার্ভার পূজা করিতে না চাও, সরস্বতীর পূজা কর—আনন্দ পাইবে। তবে যতদিন লুপ্ত, বিস্মৃত, প্রাণময়ী বীণাপাণির মূর্ত্তি গড়িতে না পার, ততদিন মিনার্ভার চিরপূজিত মনোহর মূর্ত্তি সরাইয়া দিয়া সেস্থানে তাহার বিকৃত মূর্ত্তি গঠন করিয়া সরস্বতী কল্পনায় তাহার পূজা করিয়া লাভ কি ? যতদিন প্রাণময়ী, মর্ম্মস্পর্শিনী বীণাপাণির পবিত্র ও শক্তিদায়িনী যথার্থ মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে না পারি, ততদিন bilingual basisএর দোভাষী ভিত্তির উপর আমাদের শিক্ষাকার্য্য চালাইতে হইবে। ইহাই আমার বহুদিনের বহু চিন্তাপ্রসূত অভিমত। বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষতার জন্য আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় M. A. পরীক্ষা স্থান পাইয়াছে। তাই ভরসা হয়, মুক্তির দিন সুদূর-পরাহত নহে। অন্তঃসারশূন্য-বাগাড়ম্বরপূর্ণ, ঝঙ্কারময় ভাষা আমাদের সেব্য নহে। যে ভাষার প্রাণ নাই ; প্রাণ আছে ত ভাব নাই ; ভাব আছে ত অনুভূতি নাই ; অনুভূতি আছে ত আনন্দ নাই ; সে ভাষা কখন সর্ব্বকার্য্য পরিচালনের ভাষা হইতে পারে না। অনাড়ম্বর, প্রাণময় ও ভাবময় ভাষা যদি সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে তাহাই প্রকৃত কার্য্যকরী ভাষা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এক জাতীয় ভাষার Idiom ও phrase অন্য ভাষায় কথায়-কথায় অনূদিত হইতে পারে না ; তাহা হইলে তাহার বিশেষত্ব থাকে না। তাই "নগ্ন বাস্তব"-জাতীয় বাঙ্গালা গ্রহণ করিতে আমরা রাজি নহি। ভাষা-সৃষ্টি শিশুমুখে। পরম-ভাষাতত্ত্ববিৎ অমৃততুল্য বালভাষিত লক্ষ্য করিলে ভাষাতত্ত্বের গুহ্যতম উপদেশ পাইবেন। পূর্ব্ব-কথিত পৌত্রী একদিন কাতরভাবে যাইয়া তাহার পিতা-মহীকে জানাইয়া দিল "দাদাবাবু কাকা পা" অর্থাৎ তাহার কাকার পায়ে পূর্ব্বে একদিন বেদনা হওয়াতে যে কাল কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়াছিল, দাদাবাবুর পায়েও কাল রংএর সেইরূপ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইয়াছে। অতএব দাদা-বাবুরও কাকার মত পায়ে ব্যথা হইয়াছে। এত কথা সে এক কথায় জানাইল। "দাদাবাবু কাকা পা।" এই তিন বৎসরের বালিকার নিকট হইতে যে ভাষা-জ্ঞান লাভ সম্ভব

হইল, পাঁজি-পুঁথি ঘাঁটিয়াও তাহা সম্ভবে না। "শিশু-ভাষিত"কে শিশুভাষা বলিয়া কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না। একটী ছোট কথায় যত বেশী ভাবের অবতারণা করা যায়, তাহাতে যত ব্যঙ্গ নিহিত থাকে, ঝঙ্কারময় শত শত শব্দ-বিন্যাসেও তাহা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। তাই বলিতে-ছিলাম, এমন বাঙ্গালা আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত, যাহা জাতীয় বিশেষত্ব তন্ত্রীর সহিত বেসুরে বাজিবে না। যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন bilingual basisই শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে হয়। তবে ভরসা এই, The dawn is very near—সুখের প্রভাত অতি সন্নিকট। The darkest hour is before the dawn—যে অন্ধকারে আমাদের ঘিরিয়াছে, ইহার অপেক্ষা ঘোরতর অন্ধকার সম্ভব নয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী বলিয়াছিলেন—বিজ্ঞান ও ইংরাজী সাহিত্য দর্শনের প্রচলন ও বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ব্যতীত ভারতের উন্নতি অসম্ভব। তাঁহার সেই ভবিষ্যৎ বাণী প্রতি অক্ষরে প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। শিক্ষা-সমস্যা পূরণ করিতে হইলে এই পূর্ণ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। আপাততঃ এই bilingual basisই তাহার সম্ভব বোধ হয়। যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আদর্শ অনুসারে আমাদের চলিতে হয় এবং নয় বৎসরে যদি স্কুল পাঠ্য সমস্তই শেষ করিতে হয়, তবে এই পাঠ্যবস্তুগুলি বাঙ্গালা, ইংরাজী দুই ভাষায় ভাল করিয়া লিখিতে হইবে। এই শ্রেণীর বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত। প্রথম তিন বৎসরের বইগুলি সোজা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে হইবে। এই তিন বৎসর ছেলেরা ইংরাজী নাই বা শিখিল। তবে খেলার ছলে ইংরাজী কিছু কিছু শিখিতেও পারে। কথা-সাহিত্য ও ছবি দ্বারা সুকুমারমতি শিশুদের যে শিক্ষার কতটা সহায়তা হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমি জানি, আমারই বাটীতে একটী শিশু শুধু প্রথম-ভাগ শেষ করিয়া দ্বিতীয়-ভাগকে অভিধান রূপে ব্যবহার করিয়া কথামালা পড়িয়াছিল। এ পর্য্যন্ত সে এক অক্ষরও ইংরেজী জানিত না। পরে ছবিময় একখানা Æsop's Fables দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা কি ইংরেজী কথামালা?" অধীত বিষয়ক কথা সাহিত্যে ও চিত্র-সাহিত্যে সে প্রণয় স্থাপন করিতে পারিয়াছিল। তাই সে চিত্র-সাহায্যে এতদূর বিচারে সমর্থ হইয়াছিল; এবং ইংরাজী অক্ষর জানিবার অল্প-দিন পরেই সে সহজ কথায় লিখিত Æsop's Fables সহজে পড়িয়া ফেলিল। দ্বিতীয় তিন বৎসর বাঙ্গালায় অধীত বিষয়গুলি সহজ ইংরাজীতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে ভাষা-শিক্ষা ও বস্তু-বিষয়ে শিক্ষা সুচারুরূপে হইবে। তৃতীয় তিন বৎসর উচ্চতর বিষয়সমূহের অধ্যয়ন উভয় ভাষায় সহজ কথায় যাহাতে করিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাদের ভালরূপ ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন, উভয় ভাষা বিষদ ভাবে শিখিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, অর্থনীতি, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহজ কথা এই দুই ভাষায় লিখিত পুস্তক সাহায্যে পড়ান যাইতে পারে। গল্প সাহিত্যে এ বিষয়ে প্রচুর অবকাশ আছে, এ কথা বলা বাহুল্য। আর জন-সাধারণের মধ্যে নিম্নশিক্ষা বিস্তার বাঙ্গালাতেই করিতে হইবে।

শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে আসিয়া শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার ইচ্ছা আমি করিব না। গল্পের সাহায্যে, পাঠ্য পুস্তক-পীড়িত, বিদ্যালয়পাঠ ও গৃহপাঠ-জর্জ্জরিত শিশু-প্রাণকে একটু অব্যাহতি দিবেন, এই ভিক্ষা। হাঁপ ছাড়িবার সময়, খেলিবার সময়, মানুষ হইবার, মানুষ চিনিবার সময় একটু দিবেন। পড়াশুনার স্বাদ জন্মাইয়া দিলেই আপনারাই আদরের সহিত পড়িবে। পড়ার পথ দেখাইয়া দিবেন, পড়ার উপকারিতা বুঝাইয়া দিবেন, পড়ার নেশা বা ঝোঁক দেখাইয়া দিবেন। আপনারা সমাজের প্রদীপ, অন্ধকার পথে আলো দেখাইবেন। ইহার অধিক মঙ্গল দেশের আপনারা করিতে পারেন না। এ কথার শেষ হয় না। কথায় কথা বাড়িয়া যাইতেছে; অতএব কথা শেষ করিতে হইতেছে।

অনেকক্ষণ আপনাদের ধৈর্য্যের প্রতি অবিচার করিয়াছি। আপনারা ক্ষমা করিবেন। উপসংহারে আবার আপনাদিগকে জানাইতেছি, আপনারা আজ যেরূপ আদর আপ্যায়ন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার জন্য মুখে ধন্যবাদ দিয়া শেষ করা অসম্ভব; এবং আমাকে যে সেবা যত্ন শুশ্রূষা করিয়াছেন তাহাতে আমার স্বর্গগতা জননী আপনাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া আপনাদিগকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এই স্নেহ

ও যত্নের প্রতিদান দিতে আমি অক্ষম। কল্পিত ত্রুটির জন্য মহাজন-স্বভাব সুসভ্য আপনারা যে দৈন্য ও লজ্জায় অভিভূত হইতেছেন, তাহাতে আমি বিশেষ লজ্জিত হইতেছি।' ডাক্তার শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র আপনাদের নিজেদের ঘরের লোক। তাঁহার শুভ্র-জ্ঞান ও চরিত্র গৌরবে আপনারা গৌরবান্বিত। আমি সেই প্রফুল্লচন্দ্রের বন্ধু ও সহযোগী। আজ হইতে আমিও আপনাদের একান্ত আপনার জন হইলাম, মনে করিলে আমার ঋণভার লাঘব হইতে পারে। ভগবান করুন, আপনাদের এই মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ হউক, ধন্য হউক।

শারদার আবাহন

(সুর ও যন্ত্র সহযোগে গীত)

[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

এস প্রোজ্জ্বল পীত-কাঞ্চন-জ্যোতিঃ নিম্মল-নীল-গগনে,
এস স্নিগ্ধ কিরণ-রঞ্জিত-উষা আলোক-প্লাবন-মগনে ;
এস বর্ষা-নীরদ-নির্ঝর বারি-ধৌত-বদন ঝলমল,
এস বরাভয় ঢালি' বিশ্বমানব-অন্তর ক্লুরে টলমল।

এস অঙ্গের মধু-মদির গন্ধে অন্ধ করিয়া পবনে,
এস রঞ্জিত কোটী কুসুম-হাস্যে কানন-কুঞ্জ-ভবনে ;
এস বর্ণে বর্ণে রজতে স্বর্ণে সৃষ্টির গলে গাঁথি হার,
এস গঙ্গা যমুনা সিন্ধুর হৃদি কল কল জলদলভার।

এস নিযুত ছন্দে সঙ্গীতময়ী মঙ্গলরস-হরষা,
এস শস্যশ্যামল-উৎসব-পুরে বঙ্কের চির ভরসা ;
এস শুভ্রশেফালী-মণ্ডিত ধরা-প্রাঙ্গণে করি পদ দান,
এস দৈন্য-বিপদ-শঙ্কাহরণা মিলনানন্দ-প্রেমগান।

এস কণ্ঠ-মুখর মন্দিরমাঝে মন্ত্রের চির ভাষা গো,
এস সংসার-সুখ-সম্পদময়ী নন্দন-ভালবাসা গো !
এস জননীর স্নেহ-চুম্বন করি' প্রণয়ামৃত রমণীর,
এস বোধন-বাদ্য শঙ্খ-স্বননে শোণিত-নৃত্য ধমনীর।

এস কুন্তলে তারাপুঞ্জের মেলা আঁখিভরা স্নেহ-করুণা,
এস সুন্দর-শিব-মঙ্গল-মধু রসে রসে রসে চির-তরুণা ;
এস উদ্দাম চল-চপল চিত্তে উত্তাল সাগরের বান,
এস মানবের ঘরে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধাময় জীবনের গান।

এস চন্দ্র-সূর্য্য বুকে নাচি নাচি' অম্বর-পরে মাতিয়া,
এস ফেনিলোচ্ছল সিন্ধুর শিরে উর্ম্মির মালা গাঁথিয়া ;
এস জ্যোৎস্নামগন-নন্দিতা-নিশি সুখ-স্বপ্নের মধু-দ্বার,
এস শান্ত-শোভার সম্পদ-ছবি, বন্দন লহ শতবার।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(২১)

উষার চেয়ে ব্রজরাণী বছর ওয়েকের বড় হইলেও, উষা ষোল বৎসরে পা দিতে-না-দিতেই উষার শ্বাশুড়ী তাহার গলায় তারকেশ্বরের ফুল বাঁধিয়া দিয়া সন্তান হওয়ার জন্য মানত-জোনত করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন; এবং ইহাতেও যখন সেই বাঁজা গাছে ফল ফলিল না মনে হইল, তখন রাগিয়া, চেঁচাইয়া, গালি দিয়া পুত্রবধূ এবং বাঁজা-বৌয়ের গোষ্ঠিকে গোষ্ঠিশুদ্ধ সকলকে ত্রস্ত-ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ছেলেকে বলিলেন, "শোন্ মণে, যদি বছরের মধ্যে না বউমা বেটা কোলে করে বসে, তো, আস্‌ছে বোশেখে তোর আবার বিয়ে না দিয়ে জলগ্রহণ করবো না। বোসপাড়ার মিত্তির বাড়ী নিয়ে এলো কি না একটা বাঁজা তালগাছ! ও মাঃ, এ কি ডোম-ডোক্‌লার ঘর পেয়েছে, যে, সায়েব-বিবির মতন সব স্বাধীন হয়ে বেড়াবে মনে করেছে! ছেলে আমার চাই-ই।"

মণি মাকে বাঘের মত ভয় করে। নিঃশব্দে সে মায়ের সান্নিধ্য ছাড়াইয়া পলাইয়া আসে। উষা এই লইয়া রাগ-অভিমান, কান্নাকাটি করিলে, তাহাকে আদরে-সোহাগে ভুলাইয়া হাসিয়া বলে, "তুমি যেমন পাগল, মায়ের কথা শোন কেন? কে বিয়ে করতে যাচ্চে,—সবাই তো আর তোমার দাদা নয়!"

"দাদার কথা ছেড়ে দাও,—সে অন্য রকম। তা তুমি ওঁর কথায় চুপটি করে থাক যে! হয় ত মনে-মনে তোমারও ঐ ইচ্ছে!" "হাঁ গো, হাঁ,—আমারও মনে-মনে ঐ ইচ্ছে বইকি! তোমায় যেন বল্‌তে গেছলুম! মায়ের সঙ্গে শুধু-শুধু বকাবকি করে লাভ? তা, তোমারও তো ছেলের মা হবার বয়েস পেরিয়ে যায়নি—অতই বা তোমার ভয় কেন?" তার পর স্বামীর আদরে, সোহাগে গলিয়া, সপত্নী-ভীতি ভুলিয়া, উষারও চিত্ত নবীন আনন্দে আশায় উল্লসিত হইয়া উঠে। ব্রজরাণীর কাছে শুনিয়া-শুনিয়া সতীনকে সেও যে ঠিক যমের মত ভয় করে! মা গো, সতীন হইলে কি আর মেয়ে-মানুষকে বাঁচিতে আছে! একদিন মুখ শুকাইয়া মাকে গিয়া বলিল, "আমার শ্বাশুড়ী বল্‌ছিলেন মা, 'যারা পরের মেয়ের গলায় সতীন গেঁথে দিয়েছে, তারা নিজের মেয়ের জন্য প্রাণে যে বড় ভয় রাখে না, বুকের পাটাও তো তাদের কম না! মেয়ের জন্যে কি করতে পারে, এই-বেলা খেদ মিটিয়ে করুক। বছর ঘুরলে আর আমি দেরি করছিনে। আমি 'অমুক দত্তের' বেটি—কথার আমার নড়-চড় নেই!"

মা ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন, তোর কি ছেলের বয়েস ফুরিয়ে গেছে!"

"কি জানি মা, তাদের আর তর সইছে না। কোড়োলা না কোথায় যে গিয়ে, ওষুধ খায় না পরে, সেই সব করলে হয় না মা?"

মা একটু কি ভাবিয়া, একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, হয় ত বা কোন একটা পুরাতন পাপের অবশ্যম্ভাবী ফলের কথা স্মরণ করিয়া, সচিন্তিত ভাবে জবাব দিলেন, "তা' করলেই হয়। যা' না একদিন খুড়ী-মাকে সঙ্গে করে।" খুড়িমা ৺মৃত্যুঞ্জয় বসুর খুল্লতাত-পত্নী,—গৃহিণীর খুড়শ্বাশুড়ী।

উষা জিজ্ঞাসা করিল, "সে কোন্ খানে তুমি জানো?" মাতা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার পাকাচুল বাছিতে নিযুক্তা কদম-ঝি বলিয়া উঠিল, "সে আবার কোন্‌জনা না জানে। আমাদের বাঁশবেঁড়ে থেকে বেশি দূর হয় না,—হুগলী ইষ্টিসানে নেমে কোড়লা-সিদ্ধেশ্বরী তলায় যাওয়া যায়। চল না দিদিমণি, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো'খন। তা' হাঁগা মা, বউ-দিদিকেও তো অমনি এইসঙ্গে নিয়ে গিয়ে ওষুধ পরিয়ে আন্‌লেই হয়! তিনি যেটের আমাদের ছোড়্‌দি মণির চাইতে বয়সে বছর-দু'বছরের বড়ই তো। আর

তোমারও তো ঘরে ছিষ্টিধর বংশধর নেই। দিদির বরঞ্চ বেঁচে থাক একটি ছোট দেওরও তো আছে। আমাদের ঘর যে একেবারেই শূন্যি।"

এই যুক্তিটা উষার মনে ভারি সমীচীন ঠেকিল। এ কথা যে তাহার কেন এতক্ষণ মনে পড়ে নাই, এই ভাবিয়া সে অত্যন্ত বিস্ময় ও লজ্জা বোধ করিয়া, কদমের উপর বিশেষ করিয়া কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতে লাগিল। মনে পড়িল, ব্রজরাণীর ছেলের সাধ তার চেয়ে কত বেশি। সন্তানে তার তো নিজের কোন আবশ্যক বোধ নাই,—শুধু শাশুড়ীর লাঞ্ছনা ও সতীনের ভয়।

কদমের কথার উত্তরে এই সময়ে অরবিন্দের মা একটু অসন্তোষ-পূর্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, "ঘরই আমার শূন্যি বাছা,—ছিষ্টিধর-বংশধরের অভাব তা'বলে' নেই। সে যে শূন্যি, সে আমার পোড়া কপাল বলে'।"

"তা সত্যি মা!" বলিয়া অপ্রতিভের একশেষ হইয়া কদম চুপ করিয়া থাকিল। গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, "বাড়ীতে যে আসে, সব্বাই বলে—বউকে ওষুধ খাওয়াও, মাদুলী পরাও। এই সেদিন মুখের উপরেই বউমার মা বলে গেলেন 'তোমরা সেকেলে মানুষ,—পাঁচটা জান-শোন,—রাণীর আমার কোলে যাতে একটি খোকা হয়, তার জন্যে কৈ কি করচো? পোত্তুর কোলে নেবার সাধ হয় না বেয়ান? আমার যে নাতি বুকে নে'বার জন্যে প্রাণটা ছটফট করতে লেগেছে'। তা বউমার পাঁচটা খোকা-খুকি হয়, সে কি আর আমার অসাধ বাছা! তবে যে কাজ আমরা করেছি,—সৃষ্টিধরের, বংশধরের যে অপমান ঘটিয়েছি আমার যে—এর পর আবার তাঁর কাছে 'দাও' বলে হাত পাততে ভয়ে হাত কাঁপে। চাইবোই বা আমি কোন্ মুখ নিয়ে? না চাইতে না চিন্তেতে তিনি যে আপনি পাঠিয়ে-ছিলেন,—চাইবার অপিক্ষে তো রাখেন্ নি!"

বলিতে-বলিতে মুখখানা একটুখানি ফিরাইয়া, তিনি সুপ্রচুর বেদনা-ভরা একটা সুদীর্ঘ-নিঃশ্বাস ধীরে-ধীরে মোচন করিলেন। তাঁহার চোখের কোণ হইতে অশ্রুর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দুইটি বিন্দু শীর্ণ গণ্ডদুটির উপর নিঃশব্দে গড়াইয়া আসিল। অন্যমনস্কতাবশতঃ তিনি উহা মুছিয়া ফেলিতে ভুলিয়া গেলেন,—হয় ত বা জানিতেও পারিলেন না।

মায়ের কথাগুলা উষার ভাল লাগে নাই; কিন্তু মায়ের চোখের সেই ফোঁটা-দুই জল তাহার অঙ্গে যেন টগ্‌বগে ফুটন্ত জলের ঝাপ্‌টা মারিল। সে বিদ্বেষ-জ্বালাপূর্ণ তপ্ত-কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল, "এ তোমাদের বড় অন্যায় মা! বউদির কোন কিছু কথা হ'লেই, তোমরা চোখের জল ফেল্‌বে, সেই সব কথা টেনে আনবে। কেন, ও কি তোমাদের বাড়ী আপনি যেচে এসেছিল, যে, ওকে সবাই অমন করে হেনস্থা করো? তাকেই যদি চিরকাল ভুলতেই পার্কে না, তা'হলে ওকে পদে-পদে অপমান কর্কার জন্যে ঘরে আনা কেন? এ রকম পক্ষপাত আমার ভাল লাগে না বাবু।" এই বলিয়া হাঁড়ির মত মুখখানা করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। মাতা সঙ্কুচিত হইয়া অপরাধীর মত নিঃশব্দে রহিলেন। তাঁহার সংসারের এ বিষম সমস্যার সমাধান তো কোন দিনই হইবার নয়! বাহিরে যতই চাপা থাক, ভিতরে-ভিতরে যে আগুন জ্বলিতেছে, তাহার উত্তাপ, তাহার স্ফুলিঙ্গ যে বাতাস বহিলেও ঠিক তেমনি চাপা থাকিবে, এও কি সম্ভব!

সিদ্ধেশ্বরীতলায় যাওয়া হইল। ব্রজরাণী যাত্রাকালেও মুখ ভার করিয়া বাঁকিয়া বসিয়াছিল। বেশি কিছু সে আপত্তি করে নাই,—কেবল ঐ একটি কথা, 'আমার যাবার দরকার কি?' উষা আসিয়া মাকে বলিল, "মা, তুমি বলো নি বলে বউদি' রাগ করে যাবে না। তোমার ওকে নিজে বলা উচিত।"

শরৎ মার কাছে বসিয়া মায়ের বালিসের ওয়াড়ে ঝালর লাগাইতেছিল। সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া, মায়ের জবাব দিবার আগেই বলিয়া বসিল, "হাঁ, মা বলেন নি বলেই না কি ওর যাওয়া আটকাচ্চে,—মায়ের হুকুম নিয়েই যেন সর্ব্বত্র যায়।" "তা' যাক্ আর নাই যাক্, এটা তো আমাদেরই দরকার বেশি। আমরা যদি না চাড় দেখাই, ওর কি মনে কষ্ট হয় না?"

"আমাদের চাইতে যে ওর গরজ বেশি, সে তুমি না জান্‌লেও ও নিজে জানে। কিচ্ছু ভেবো না, কাউকে বলতেও হবে না,—ও ঠিক যাবে, দেখে নিও।"

"দাদার ছেলে-পিলে হয়, তা'হলে এটা তোমার ইচ্ছে নয়?" "দাদার ছেলে তো আছেই,—আরও কতকগুলো হলো না হলো তার জন্যে এমন কিছু আসে-যায় না। তবে ছোট-বউএর একটি হয় হবে, ক্ষতিই বা কি তাতে।"

রাগে চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিলেও, এ কথার কোন রূঢ় উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। যাই হোক, শাশুড়ী বধূকে ডাকাইয়া আনিয়া হুকুম দিলেন। ব্রজরাণীও ঠাকুরতলায় গিয়া ঔষধ ধারণ করিয়া আসিল; এবং ইহার সাত-আট মাস পরে যখন ছোট-ননদ উষার কাঁচা-সাধের নিমন্ত্রণে পাড়া-পড়সীরাও বড় ঘটা করিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া গেল, তাহার পর দিন সে তাহার মাতুলি কয়টি টান মারিয়া খুলিয়া ফেলিয়া, আবার বাপের-বাড়ীর তাঁতিনীর-দেওয়া নূতন মাদুলী ধারণ করিল। এমন করিয়া কত মাতুলি, কত না কবচ ধারণ করা হইয়া গেল। ক্ষেত্রপাল, পাঁচুঠাকুর সর্ব্বত্রই মানত করা হইয়া গেলে, শেষে, দেবতা ছাড়িয়া দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষীদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রজরাণী ও রাণীর মা আর একবার নূতন আশার বলে বুক বাঁধিলেন।

(২২)

এদিকে দেখিতে-দেখিতে নদীর স্রোতের মত কালের স্রোত প্রবাহিত হইতে হইতে ব্রজরাণীর আঠার বছর বয়সকে আরও বৎসর তিনেক অগ্রসর করিয়া দিল। বাঙ্গালীর মেয়ের শরীরের গঠনে তাহাকে 'কুড়ির পারেই বুড়ি' করিয়া ফেলে। প্রথম মাতৃত্বের কাল তাহাদের প্রায় চব্বিশ-পঁচিশেই সীমাবদ্ধ। মাতা-কন্যা নিরাশার প্রচণ্ড দহনে দগ্ধ হইয়া দিনে-দিনে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সন্তান-বিহীনা ব্রজরাণীর স্বামীর অতুল ঐশ্বর্য্যে কতটুকু দাবী, সে খবর উকীলের ঘরের পরিবার-বর্গের তো অজানা নয়। সতীনের ছেলেকে কিসের জোরে সে ঠেকাইয়া রাখিবে? বিধি-বিড়ম্বনা বুঝি ইহাকেই বলে? তা ব্রজরাণীর সমস্ত জীবনটাই যখন এই বিড়ম্বনার কণ্টকে বিদ্ধ, তখন তাহার ভাগ্যে কোথাও দিয়া এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যই বা বিধাতা লিখিয়া রাখিবেন কেন? বিবাহের প্রারম্ভ হইতেই তাহাকে তাহার অনাগত সুখ সৌভাগ্যের কাঁচা ভিত্তি পাকা করিয়া গাঁথার জন্য কত-না অশাস্ত্রীয় বিচিত্র মন্ত্র-তন্ত্র, কত না অদ্ভুত অনাচার-পূর্ণ অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছে! বিবাহ হওয়া অবধি কত দিনের কত শ্লেষ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য সহিয়া, নিরপরাধে অপরাধের বোঝা বহিয়া, মাথা নত করিয়াই চলিতে হইতেছে, —কোথাও তো সে উচ্চ মস্তকে অপ্রতিহত অধিকারের পূর্ণ গৌরবে স্থান লাভ করে নাই। সঙ্কুচিত পদে আসিয়া যেন চোরের মত সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ-পথ তৈরি করিতে হইয়াছে। সতীনের সহিত নিজের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিয়া, রাণী মনে মনে অনেক ভাবনা ভাবিয়া-ভাবিয়াও স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই যে, তাহাদের দুজনার ভিতর কাহার অবস্থা ভাল! তাহারই স্বার্থের সহিত ঘনিষ্ঠ রূপে সংশ্লিষ্ট, অথবা তাহার পরে সবিশেষ প্রেম-প্রীতির সম্বন্ধে সম্বদ্ধ দুচারিজন ছাড়া, বিশ্বের আর সকলকারই সহানুভূতি যে সেই পরিত্যক্তারই উপরে, তা মুখে সবাই ভরসা করিয়া নানা কারণে প্রকাশ করুক আর নাই করুক, এ মোটা কথাটা বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না। মনের অগোচর পাপ নাই,—রাণী নিজেও আর সকলের সহিতই যে একমত হইতে পারিত, যদি না এই করুণ-রসাত্মক নাট্যাভিনয়ের ভূমিকা-গ্রহণকারিণীদ্বয়ের একতমা সে মন্দ-ভাগ্যগুণে নিজেই না হইয়া বসিত,—তা এ কথাটা সে তো কোন দিনই অস্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু এ তো সে নয়! বক্সে বসিয়া থিয়েটারে এ দৃশ্য দেখিলে, রুমালে ঘসিয়া চখের জল মুছা যায়,—পড়সীর ঘরে ঠিক এমনটাই ঘটিলে, হাজার-বার সেই নির্যাতিতার পক্ষ গ্রহণ করিয়া, আহা, উহু বলা সহজ। যেখানে নিজের সমুদয় সুখ এবং সৌভাগ্য লইয়া টানাটানি, ঠিক যদি সেই জায়গাটিতে দাঁড়াইয়া বিচার করিতে হয়, তা' হইলে বিবেকও কি অন্ধ হইয়া গিয়া একটু-খানি বিপথের দিকে পা ফেলিয়া বসে না? ফেলে। কিন্তু সে তো আর চিরদিনেরই অন্ধ নয়; কাজেই নিজের এ অসংযত পদক্ষেপের ভুলকে সে প্রশ্রয় দিতে ব্যথা পায়। কিন্তু না দিয়াও পার পায় না, বাহিরের অন্ধকার তাহার অন্ধকারকে-শুদ্ধ তাই নিবিড় করিয়া ফেলে। নিজের কাজে নিজেই অস্বস্তিতে জ্বলিয়া মরে। অথচ এ ভিন্ন উপায়ই বা তাহার কি?

বস্তুতঃ, বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, এই রাণী মেয়েটিকে খুব বেশী দোষ দেওয়া চলে না। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই আত্মীয়-আত্মীয়াদের মুখে তাহাকে সতীনে দেওয়া অপেক্ষা হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়ার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অনেক সুযুক্তি, এবং ইহা লইয়া মা-বাপের মধ্যে অনেক কথা-কাটাকাটি, মায়ের অনেক অশ্রুবর্ষণ সে দেখিয়া এবং শুনিয়াছে। শুভদৃষ্টির সময়ে বরের যে চোখ সে নিজের চোখে দেখিয়াছিল, তা দেখিয়া সলজ্জ আনন্দে সে কেন কোন

নবোঢ়ারই হয় ত হৃদ্‌পদ্ম উন্মেষিত হইয়া দুলিয়া উঠে না। সেই গাম্ভীর্য্যময় স্থির দৃষ্টির আঘাতে কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ব্যাকুল হৃৎপিণ্ডটা নিজের চির-চাঞ্চল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তে স্তম্ভিত হইয়া যায়। বাসর-ঘরে প্রমোদ-কৌতুক-মত্তা নারীগণের প্রগল্‌ভ অত্যাচারে বর কথা কহিয়াছিল,—এমন কি, সুগায়ক অরবিন্দ বার-কয়েকের অনুরোধে গান পর্য্যন্ত গাহিয়াছিল।—সে গানও বিবাহ-বিভ্রাটের বরের মত শ্মশান-যাত্রার গানও নয়।—তথাপি পাতলা বেণারসী ভেলের মধ্য দিয়া ব্রজরাণীর বিস্মিত নেত্র ক্ষণে-ক্ষণে সেই শ্মশানেশ্বরের মত বৈরাগ্যপূর্ণ এবং শ্মশানযাত্রীর মত নির্লিপ্ত মুখখানা দর্শন করিতে-করিতে ভয়ে সন্দেহে শিহরিয়াছে, অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়াছে। সেই মানুষের হাতে-গড়া ভাবশূন্য মুখ-চোখ লইয়া, যে মানুষটা এক স্ত্রী বর্ত্তমানে তাহাকে আবার বিবাহ করিয়া, যেখানের যা কিছু কর্ত্তব্য নিঃশব্দে সমাধা করিতেছিল, তাহার সেই ভাবশূন্য ভাবটাতেই সে এত বেশি ভয় পাইয়াছিল যে, ইহার সম্বন্ধে এমনও সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে উঁকি দিয়া যাইতে ছাড়ে নাই—এই যে ম্যাজিক লণ্ঠনের ব্লুবেয়ার্ডের কাহিনীর ব্লুবেয়ার্ডের মত হয় ত বিবাহ করিয়া লইয়া গিয়া এ ব্যক্তি তাহাকে মারিয়াই ফেলিবে! এই স্ত্রী-হত্যাই হয় ত বা তাহার পেশা, তাই বা কে জানে?

তার পর শাশুড়ী যে বৌ-বরণ করিবার সময়, খস্‌খসে বেণারসী সাড়ীর খসা আঁচল তুলিবার ছল করিয়া, সেই আঁচলে পুনঃ পুনঃ চোখ মুছিতেছিলেন, সে দৃশ্যটা তাহার চক্ষে অদৃশ্য ছিল না। এ ভিন্ন, চারিদিক হইতেই একটা সুস্পষ্ট এবং অস্পষ্ট গুঞ্জন মৃত্যুঞ্জয় বসুর কঠোর শাসনকেও ছাপাইয়া উঠিতে থাকিত। শরতের যে ব্যবহারের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে, সেও কোন নববধূর—বিশেষতঃ যাহার রূপ আছে, বুদ্ধি-বিদ্যার পাঁচজনের কাছে খ্যাতি এবং নিজেরও মনে গৌরব বোধ আছে, আর—এ সবারই চাইতেও অনেকখানি বেশি—বাপের ঘরে টাকা আছে, বিশেষ করিয়া সেই টাকা শুধু তাহার বাপেরই সিন্দুকে কোম্পানির কাগজ বা মিউনিসিপ্যাল সেয়ারেই নিবদ্ধ নাই—তা হইতে রূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এই মেয়েরই শ্বশুর-ঘরে অনেকগুলা আঁক গায়ে আঁকিয়া উপস্থিত হইয়াছে,—যাহার বাপের-বাড়ীর-দেওয়া যৌতুকে-তত্ত্বে মৃত্যুঞ্জয় বসুর বাড়ীতে অবশ্য স্থানের অকুলান হয় নাই,—তাছাড়া এ অঞ্চলের আর সব কয়টা বাড়ীতেই স্থান-সঙ্কীর্ণতা ঘটিতে পারিত, সেই রূপগুণ এবং ধনবতীর পক্ষে কখনই সম্মানসূচক নয়। স্বামী অরবিন্দের সম্বন্ধে অবশ্য এমন স্পষ্ট করিয়া কোনই নালিস করিবার নাই। তাহার ব্যবহারের সমালোচনা করিতে বসিলে ভদ্রসমাজের নর এবং নারীমাত্রেই তাহাকে সুভদ্র ব্যবহারই বলিবে,—কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা ভগবান এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, শুধু সুভদ্র ব্যবহারেই ইহার ধরাবাঁধা নাই। ফুলশয্যার রাত্রে আত্মীয়-স্বজন বিতাড়িত, সুপ্রচুর আত্মগৌরবে নিরতিশয় আঘাতপ্রাপ্তা অভিমানিনী ব্রজরাণী যখন বিছানায় পড়িয়া চোখের জলের বন্যা সৃজন করিতেছিল, তখন কি যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া বিনিদ্র অরবিন্দ হঠাৎ স্ত্রীর অশ্রু-বর্ষণ জানিতে পারিল এবং তৎক্ষণাৎ কাছে আসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়া কহিল "এখনও তুমি জেগে শুয়ে কাঁদচো? কেন রাণি? ছিঃ, চুপ করো।"

রাণী বোকা মেয়ে নয়; তা ভিন্ন, তাহার কপাল তাহাকে বোকা বনিতে সাহায্যও করে নাই। বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইবার পর হইতেই মা, খুড়ি, দিদিমা, ঠাকুমা—সমুদয় প্রবীণা-অপ্রবীণা অভিভাবিকার দল তাহাকে তাহার সঙ্গীন অবস্থার কথা এবং এই সঙ্কট-সঙ্কুল সঙ্কীর্ণ পথে কেমন করিয়া চলিতে হইবে, ইহারই উপদেশ উঠিতে-বসিতে, খাইতে-শুইতে সদাসর্ব্বদাই শুনাইয়া আসিয়াছেন। এমন করিয়া শিখাইলে একটা বনের পাখীও দুদিনে পড়িতে শেখে, আর মানবী ব্রজরাণী তাহার যথাকর্ত্তব্য শিখিয়া লইতে পারিবে না? ব্রজরাণীর কান্না স্বামীর কথায় থামিল না বটে, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ কোন রকম একটু দ্বিধা পর্য্যন্ত না করিয়াই স্বামীর খুব নিকট সরিয়া আসিল, এবং হাত বাড়াইয়া স্বামীকে স্পর্শ করিয়া রুদ্ধ স্বরে কহিয়া ফেলিল, "আমায় এ বাড়ীতে কেউ ভাল চোখে দেখে না।" অরবিন্দের সর্ব্বদেহে এই স্পর্শ যে একটা দারুণ শিহরণ লইয়া আসিয়াছিল, ব্রজরাণী সেটুকু জানিতে পারিলেও, সে লইয়া বিশ্লেষণ করার কথা তাহার মনে জাগে নাই। নিজের দুঃখের স্মৃতিটাই তখন তাহার কাছে প্রকাণ্ড হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে,—আর কোথায় কার কি অন্তর্গূঢ় নিদারুণ দুঃখ-শেলে বুক ফাটিতেছে বা ফাটে নাই, সে খবর তাহার কাছে

জানিবার মতই নয়। ক্ষণকাল নীরব, নিথর পড়িয়া থাকিয়া, অবশেষে অরবিন্দ স্ত্রীর সেই হাতখানার উপর হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে, শান্ত মৃদু-কণ্ঠে তাহার নালিশের জবাব দিল, "দেখাবে বই কি রাণি, দেখাবে বই কি! বাবা যখন তোমায় এ বাড়ীতে নিয়ে এসেছেন, তখন কি কেউ তোমায় অনাদর করতে পারে?" "বড় ঠাকুরঝি কিন্তু আমার মুখই দেখেন না।" অরবিন্দ আবার ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া, গলা সাফ করিয়া লইয়া উত্তর করিল, "তার যে বড্ড অসুখ রাণি, দেখ্‌চোই তো,—সে মোটে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তেই পারে না।"

"অসুখ তো তাঁর শরীরে নয়, মনে,—সে ছোট্‌-ঠাকুরঝি আমায় সব বলেছে। সে এই বিয়ের কথা উঠ্‌তেই খুব কান্নাকাটি করেছিল,—শ্বশুরবাড়ী চলে যেতে চেয়েছিল,—শুধু বাপের ভয়ে পারে নি। এও শুনেছি যে, সে বলেছে, আর যে যা করে করুক, সে এজন্মে আমার মুখ দেখবে না।"

"ছিঃ, ওসব কথা কি বিশ্বাস করে! আচ্ছা, আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলে দেবো। যত সব ছেলেমানুষী!" ব্রজরাণী স্বামীর আরও নিকটে, একেবারে তাহার বুকের কাছটিতে ঘেঁসিয়া আসিল এবং তাহার মুখের কাছে মুখ তুলিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আর তুমি? তুমি কি করবে আমায় বলো?"

আর একবার অরবিন্দের আপাদ-মস্তক বারে-বারে শিহরিয়া উঠিল। প্রবল আলোড়নে বক্ষের মধ্যস্থলে লুক্কাইত স্তম্ভিত হৃৎপিণ্ডটা কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া-ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহারই চাপে গলা বুজিয়া স্বর-নিষ্ক্রমণ কঠিন হইয়া উঠিলেও, কোনমতে যথাসাধ্য সহজ ভাষাতেই সে সেই নীড়ভ্রষ্ট পাখীটির মত নবীন আশা-সন্দেহে আন্দোলিতা, ব্যাকুলা আশ্রয়প্রার্থিনীটির উদ্বেগ-শঙ্কিত মুখের পানে বারেক চাহিয়া দেখিয়া, তাহার মাথাটি বুকের উপর টানিয়া আনিয়া, সেইখানে রক্ষা করিল; এবং সস্নেহ মৃদু স্বরে কহিল, "না, আমি তোমায় অযত্ন কর্ব্বো না।"

কৃত্তিবাস-বন্দনা

[শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়]

উদিলে যে দিন বঙ্গভূমিতে হে কবি বরেণ্য কৃত্তিবাস!
নন্দন-বন যৌবন-রাগে রাঙিয়া বঙ্গ-কাব্যাকাশ,
সে দিন কি এক নবীন আলোকে ভরেছিল এই সোণার বঙ্গ;
মৌন, মূক মায়ের কণ্ঠে উঠেছিল এক হাসির রঙ্গ;
দেবতারা মিলি অন্তরীক্ষে ক'রেছিল সবে কুসুম-বৃষ্টি;
 সে দিনকে নূতন গানের, নূতন প্রাণের হইল সৃষ্টি।
 সাধনার বলে ভগীরথ সম আনিলে হে কবি ভাগ্যবান,
 ঊষর বঙ্গে রামণী-ধারা, তৃপ্ত করিলে তপ্ত প্রাণ;
 বসুন্ধরার বক্ষ চিরিয়া উঠায়ে স্নিগ্ধ সলিলধারা
 পার্থ যেমন ভীষ্মদেবে করিল তৃপ্ত তৃষ্ণাহারা;
 রামায়ণের ভোগবতীরা আনিয়া তেমনি করিলে ধন্য,
 কোটী কোটী হিয়া কার তৃপ্ত ওগো কবিবর চিরবরেণ্য!
ধরিলে বঙ্গে মনুষ্যত্বের চির-উজ্জ্বল মোহনাদর্শ,
পিতার লাগিয়া বনবাসে রাম কেমনে কাটান চৌদ্দ বর্ষ;
রাজনন্দিনী, রাজবধূ সীতা শিরীষ-কোমল কুসুমকলি;
স্বামী সনে বনে ঘুরিল কেমনে তৃণ-কণ্টক চরণে দলি;
জ্যেষ্ঠের সাথে সব সুখ ত্যজি ছুটিল কেমনে ভাই লক্ষ্মণ;
সাথে-সাথে রহি সেবিল ভ্রাতায় চৌদ্দ বরষ অনুক্ষণ;
ভ্রাতার বন্দ্য পাদুকাযুগলে শোভিত করিয়া সিংহাসন,
চৌদ্দ বর্ষ কেমনে ভরত ভ্রাতৃ-রাজ্য করিল শাসন;
রঘুকুলমণি শ্রীরামচন্দ্র তুষিতে প্রজার ক্ষুব্ধ চিত,
প্রাণ হ'তে প্রিয়া মহিষীরে তাঁর করিল কেমনে নির্ব্বাসিত।
এ সব মধুর করুণ কাহিনী ললিত ছন্দে শুনালে তুমি,
ধন্য নদীয়া, ধন্য বঙ্গ, হে কবি, তোমার চরণ চুমি।

শীত-জর-জর আছিল এ দেশ,—ছিল না শক্তি, ছিল না প্রাণ ;
ছিল না ফুল্ল ফুলদল-শোভা,—ছিল না পাখীর মুক্ত গান ;
সহসা মোহন ঝঙ্কারে তবু ঝঙ্কৃত হ'ল মৃত এ দেশ ;
প্রকৃতির বুকে সাড়া পড়ে গেল, ছাড়িল সে তার জীর্ণ বেশ ;
শাখে-শাখে পাখী উঠিল গাহিয়া, স্তবকে-স্তবকে ফুটিল ফুল,
চির-মরুদেশে ছুটিল তটিনী প্লাবিত করিয়া উভয় কূল।
চির-অভাগিনী কাঁদিত জননী নীরবে নিজের হেরিয়া দৈন্য,—
ভাবমণিমালা পরায়ে তাঁহারে চিরতরে কবি করিলে ধন্য !
বাংলাদেশের দ্বারে-দ্বারে ফিরি বিলায়ে রসের, ভাবের সুধা,
কত বর্ষ ধরি মিটালে, হে কবি ! সারাটী দেশের দারুণ ক্ষুধা !
মায়ের শুষ্ক স্তনে দিলে ভরি শান্তির চির অমিয়ধারা
মুদিখানা হ'তে রাজার প্রাসাদ পান করি হ'ল আত্মহারা !
মরুময় দেশে এনেছ, হে কবি ! রসের অমর প্রস্রবণ ;
যুগ-যুগ ধরি পান করি তাহা, মিটাইবে তৃষা গৌড়জন।
চির-উজ্জ্বল রহিবে তোমার যশের অমল ধবল কান্তি ;
চিরদিন ধরি যত নর-নারী বসি পদমূলে মিটাবে শ্রান্তি।
উৎসবে তব এনেছি আমার তুচ্ছ অর্ঘ্য অতি নগণ্য,—
দয়া করে কবি, গ্রহণ করিয়া দীন অকিঞ্চনে কর গো ধন্য।

বৈরাগ্‌-যোগ

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ]

১৭

রমাইএর মা বাড়ী-ঘর বিক্রী করে কাশীবাস করাই স্থির করলে। তার ব্যবস্থা করবার জন্যে ডাক পড়ল বড় জামাইয়ের। তিন মেয়ের মধ্যে একজনের মাত্র বিবাহ হয়েছিল—একটি ছেলেও হয়েছিল তার! কিন্তু অসময়ের ডাকে চলে যেতে হলো তাকে। জামাইটি আর বিয়ে করেনি। সংসারে বিধবা বোন ছিল—সেই ছেলেটিকে মানুষ করচে। জামাই আর কিছুতেই বিয়ে করলে না। রমাইএর মা নিজে গিয়ে কত উপরোধ অনুরোধ করাতেও কথা থাকেনি! শুন্‌লাম—সে লোক খাঁটি ; নিজে যা বোঝে তাই করে—কারুর কথার কি মতের কোন তোয়াক্কা রাখে না। রহিম গিয়ে তাকে ডেকে আন্‌বে স্থির হলো।

গ্রামখানি ছোট—সকালের মধ্যেই যা-কিছু দেখ্‌বার-শুন্‌বার ছিল, শেষ করে এসে ঘরের মধ্যে বসলাম। অমিয়া এক থাল মুড়ি আর নারকেল নিয়ে এসে বল্লে, "এই জল-খাবার খাও।"

আমি বসে-বসে ধীরে-সুস্থে মুড়ি চিবোতে লাগ্‌লাম। অমিয়া মেজের উপর চুপটি করে বসে রইল।

আমি বল্লাম, "তুমি হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?"

"তাই হয়েছি নাকি ?—আমি নিজে ত কিছুই বুঝিনে।"

"তোমার ডাঙ্গার হাওয়া ভাল লাগ্‌চে না বোধ হয়।"

অমিয়া খানিক চুপ করে থেকে বল্লে, "কি জানি কেন, আমার আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। মনটা যে কি অস্থির হয়েচে—কি তোমাকে বল্‌ব।"

এ কথার কি উত্তর থাক্‌তে পারে ? চুপ্ করে, একমনে মুড়ি চিবিয়ে চল্‌লাম।

অমিয়া বল্লে, "আজই চল চলে যাই—না হয় দিনকতক পরে এসে মেয়েকে নিয়ে যাব।"

"আমার কোন আপত্তি নেই—তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আমি যে মুক্তি পাব্—তার আশায় আমার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করচে।"

অমিয়া বিষণ্ণ-মুখ নীচু করে—নখ দিয়ে মাটির উপর কি লিখ্‌তে লাগল। লেখা শেষ করে তাড়াতাড়ি পুঁছে ফেলে বল্লে, "তোমায় আমি অত শীঘ্র ছেড়ে দিতে পারবো না, বোধ হয়।"

বল্লাম, "সে কি কথা—আমি আর থাক্‌তে পারব না।"

"যদি দেখ, আমার কেউ নেই—তা হলেও ভাসিয়ে দিয়ে যাবে ?"

অমিয়ার এই কথাটা বল্‌তে কতখানি বুকে ব্যথা লেগেছিল,—তা' তার মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

বল্লাম, "তোমার বাড়ী-ঘর বিষয়-আশয় আছে—তোমার ভাবনা কি অমিয়া - ভাস্‌বে কেন ?"

"যদি বাবা না থাকেন ?"

"বাপ ত কারুর চিরদিন থাকে না অমিয়া –" আর বল্‌তে পারলাম না—গলা যেন ভেরে এল।

"তাঁকে ফিরে পাবার আশা আমি এক তিলের জন্যেও রাখিনে ; কিন্তু তিনি না থাক্‌লে আমার আর কে আছে ?"

একটা কথা আমার মনের মধ্যে জোর করে উঠ্‌ল—সেটাকে চাপ্‌তে গিয়ে নিমেষে আমার মুখ-চোক নাক কাণ লাল হয়ে উঠ্‌ল। গোপন করবার চেষ্টা করলেও দিনের আলোতে আমি ধরা পড়ে গেলাম।

অমিয়া স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, "কি বল্‌তে গিয়ে চেপে নিলে, তা আমি বুঝতে পেরেচি। বল্‌ব ?"

আমি অপ্রতিভ হয়ে রইলাম।

"তুমি আমাকে বিয়ে করতে বলচ ? কিন্তু সে ত আমার হয়ে গেছে।"

আমি অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে বল্লাম, "এর মধ্যে কবে হলো ? তুমি ত বলেছ তোমার বিয়ে হয়নি ;"

"তারপর একদিন হয়ে গেছে—তা' তো তুমি জান। যেদিন আংটি তোমার হাতে দিয়েছি, সেইদিন যে তোমাকে বরণ করেচি।"

আমি শুক্‌নো গলায় বল্লাম—"কি সব পাগ্‌লামির কথা এ,—আংটি-টাংটি আমি জানিনে। ব্রহ্মচারীর আবার আংটি কি—বরণ কি ? সত্যি বলচি তোমায়—ওসব কাজের কথা নয়।"

অমিয়া স্নিগ্ধ হেসে বল্লে—"তা হলে প্রত্যাখ্যান ? বেশ, ফিরিয়ে দাও আমার সেই ভালবাসার জিনিষটি !"

আমি বল্লাম, "এখুনি পারব না—আচ্ছা নিশ্চয় দেব। সে যেমন করেই পারি ফিরিয়ে দেবই।"

"আমার এক্ষুণি চাই—নইলে আমি ফেরৎ চাইনে।"

"যা অসম্ভব—তাই তোমার চাই—আচ্ছা পাগলের পাল্লায় জুটিয়েছ ভগবান, আমাকে !

"পাগল বল আর ছাগল বল—আমি কিছুতেই শুন্‌চিনে তোমার কথা ;—আমার আংটি দিয়ে দাও আমাকে ; যদি না দিতে পার ত' আমাকে স্বীকার কর।"

হাস্য-পরিহাসের নীচে সত্য অনেক সময়ে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে। তার অস্তিত্ব মনটা কেমন গভীরতম নিগূঢ় অনুভূতি দিয়েই জান্‌তে পারে।

অমিয়ার মনের খাঁটি সুরটি আমার প্রাণে যে ঝঙ্কার বাজিয়ে তুল্‌ছিল—তাকে হাসির উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে চেপে রাখা শক্ত দাঁড়াচ্ছিল।

মেয়েদের মনটা ঠিক যেন লাউ-ডগার মত ; শুক্‌নো কঞ্চি কাঠিতেও সে ভর করতে চায় ;—কোন বিবেচনা নেই যে, কঞ্চি তার ভার নিতে পারে কি না !

মানুষের মন ত অনুক্ষণ ভালই বাস্‌চে—সেই তার প্রকৃতি। গরীব তার কুঁড়ে ঘরটিকেও প্রাণের চেয়ে ভালবাসে,—আগুনে পুড়ে গেলে তার শোক সে কিছুতেই বিস্মৃত হয় না। ছোট-বড় কোন জিনিষের উপর মানুষের হৃদয়ের আসক্তি কোথাও ত কম দেখি না।

একে মায়া বল, আসক্তি বল, টান বল, কি আকর্ষণ বল—তাতে কারুর কোন আপত্তি নিশ্চয়ই হতে পারে না। এই ভাবটা জন্মায় ঘনিষ্ঠতা থেকে। এর ভিতর দিয়ে ভালবাসা অঙ্কুরিত হতে পারে ; কিন্তু সব সময়েই যে হবে, তা' কেউ বল্‌তে পারে না। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম যে অমিয়ার মনে এমনি একটা—কিছু জেগে উঠ্‌ছিল।

অমিয়া অনেক সময়ে এসব কথা খুব সোজা ভাবে আমার সঙ্গে কয়ে থাকে ; কিন্তু আমি কোনদিন তেমন করে জবাব দিতে পারিনি। আজ হঠাৎ একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি ঘাড়ে চাপ্‌ল ; বল্লাম, "একটা কথা জান্‌তে চাই—তার ঠিক উত্তর দেবে ?"

"যদি জানি ত বলব।"

"যতদূর বুঝচি, তুমি আমাকে চাও। আচ্ছা, একটা কথা কি তোমার একদিনও মনে হয় না ! আমি কি তোমাকে চাই ? এটা কি একবার ভেবে দেখ্‌বার বিষয় নয় ?"

"তাই ত—আমি তেমন করে কোন দিনই ত ভাবিনি ! আমার মনে হয়, যাকে আমি এমন করে চাই, সে কি আমাকে না চেয়ে থাক্‌তে পারে ?"

আমি হেসে বল্লাম, "তা' যে হতেই হবে, তার কি

মানে ? দেবযানী কচকে চেয়েছিল, কিন্তু কচ কি দিয়েছিল তার প্রতিদানে ?"

অমিয়া বল্লে, "কচ কিন্তু দেবযানীকে ভাল বেসেছিল।"

"তা হতে পারে ; কিন্তু কচ নিজের জীবনের কর্ত্তব্যকেই বড় বলে মেনে নিয়েছিল। এই খেনেই তার দেবত্ব !"

"আমরা ত মানুষ—কোন দিনই দেবত্বের দাবী করতে যাইনি।"

"মানুষের জীবনের কর্ত্তব্য আছে—তার দাবী যে সমস্ত জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। মানুষের আদর্শ আছে,—তাকে খর্ব্ব করলে আত্মা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে।"

"তা হলে যাকে ভালবাসি, তাকে পেতেও না পারি ?"

"তা ত বটেই, সব সময়ে তাকে যে পেতেই হবে তার কি অর্থ ? আর না পাওয়াতে কোন ক্ষতি নেই, বরং পরম লাভ। আদর্শটি অক্ষুন্নই থেকে যায়।"

"এ কথা শুনলে আমার ভয় করে। অমন যার হয়—তার জীবনের সকল সাধ চূর্ণ হয়ে যায় !"

"দেবযানীর কি তাই হয়েছিল ?"

"হয়েছিল বই কি, তার মত অসুখী কে ছিল ?"

"প্রবৃত্তি যেখানে বেড়ে আর সবের চেয়ে বড় হয়ে উঠে—সেখানে এই কাণ্ডই ঘটে। এই প্রবৃত্তি-গুলোর মুখে লাগাম দিয়ে তাদের সুপথে নিয়ে যাবার শক্তিই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই চেষ্টাই মানুষের জীবনের প্রধানতম চেষ্টা। আত্ম-সংযম ত এই অমিয়া ! প্রবৃত্তির নিরোধ যার নেই—সে কি মানুষ ?"

"তোমার এই ধর্ম্ম-কথা শুনলে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে। তোমরা এই সবই বুঝি মঠে শেখ ?"

আমি হাসতে লাগ্‌লাম।

অমিয়া চুপ করে বসে রইল। আমি আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

একটা প্রকাণ্ড ভার আজ নেমে চলে গেল মনের উপর থেকে ! এমন করে কোন দিন যে অমিয়াকে বলতে পারব—তা' স্বপ্নেও ভাবিনি। বাঁশ-ঝাড়ের তলায় উঁচু ঢিপির উপর চুপ করে বসে-বসে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। মনে হলো হৃদয়ের সমস্ত তারগুলো এক নিমেষে কে ছিঁড়ে দিয়ে গেছে। চখের জল কিছুতেই বাধা মানতে চায় না ; যেন তার আর শেষ নেই !

১৮

একটা লাঠির ডগায় পুঁটুলি বেঁধে রহিম চাচা দেখ্‌লাম, হন্‌হন্ করে কোথায় চলেছে। আমাকে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। আমি আস্তে-আস্তে তার কাছে এগিয়ে এসে ধরলাম—"কোথায় চল্লে, লাঠি সোঁটা, পুঁটুলি পাঁটলা নিয়ে, চাচা ?"

"একটু দূরের পথে বাবু,—যাচ্ছি দবিরপুরে—মায় বড় জামাইকে নিয়ে আসতে।

দবিরপুর ত শোনা নাম। বল্লাম, "কি করেন তিনি ?"

"সোণা-রূপোর কাজ।"

"নামটা কি বিষ্ণুদাস ?"

"হাঁ বাবু, আপনি চেনেন ?"

"চিনি বৈকি, চাচা—তুমি এক মিনিট দাঁড়াবে ? আমি একটা চিঠি লিখে দিতাম !"

রহিম সূর্য্যের দিকে চেয়ে বল্লে,- "তা সময় হবে—আমি ভুনির দোকানে আছি—আপনি নিয়ে আসুন।"

বাড়ী ফিরে গিয়ে বিষ্ণুদাসকে একখানা চিঠি লিখে দিলাম। আস্‌বার সময় আংটিটা সঙ্গে করে আনতে, আর তার কথা যেন কেউ না জানতে পারে।

ভুনির দোকানে গিয়ে দেখি রহিম এক হাঁড়ি সন্দেশ নিয়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত।

চিঠিটা দিয়ে বল্লাম, "কবে তুমি ফিরবে রহিম ?"

"কাল সন্ধ্যে নাগাদ, বাবু।"

"বেশ।"

রহিম দক্ষিণের পথ ধরে চলে গেল। আমি বাড়ী-মুখো হ'লাম।

মাকড়সা যেমন জাল বুনে তারি ভিতর বিচরণ করতে থাকে ; তার বাইরের খবর জানেও না, জানতে চায়ও না ; সেই তার সব, সেই তার বিশ্ব-সংসার ! আমার অবস্থা যেন ঠিক তেমনি হ'য়ে পড়ছিল। নিজের বোনা জালের মধ্যে আমি এমনি ক'রে মনকে জড়িয়ে ফেলছিলাম যে, সময়ে সময়ে আমার মুক্তি নেই বলে ভয় করত ; কিন্তু এই জালটি এত প্রিয় হ'য়ে পড়েছিল যে, তা ছেড়ে বাইরে গেলেও মন হাঁক-পাঁক ক'রে উঠত।

মনে হ'ল অমিয়াকে যে রূঢ় আঘাত দিয়েছি, তা থেকে না জানি কতই বিষাদ রস ক্ষরিত হ'চ্ছে। তাতে প্রলেপ দেবার ইচ্ছে হ'লো। মনে হলো তাকে ডেকে দেখিয়ে দিই যে, কতখানি ব্যথায় আমারও সমস্ত চিত্ত আহত হ'য়ে রয়েছে!

এটা ঠিক, যে তার জীবনের সঙ্গে আমার জীবন বাঁধা পড়তেই পারে না। কেন পারে না?

যে ফুল দেবতার পূজায় একবার নিবেদিত হয়েছে, তাকে যে মানুষ আর কোন কাজেই লাগাতে পারে না। যার জ্ঞান হয়েছে, সে নির্ম্মাল্যকে মাথায় রাখতে পারে—কেমন করে দল্‌বে। আমি কেমন করে আমার এই চিত্ত-কমলটি অমিয়ার হাতের লীলা-কমল হতে দেব।

তা হতেই পারে না—তা হতেই পারে না!

সত্যিই কি তাই? মনটা আবার ফিরে দাঁড়াল? কে তোমার দেবতা,—কার পায়ে তুমি কবে আমাকে নিবেদন করে দিয়েচ ব্রহ্মচারি!

সে কোন্ দেবতা! যিনি আমার এই শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী। মনের অন্ধি-সন্ধি খুঁজে ফিরলাম। কোথায় তিনি—কোথায় তিনি!

তখন মনকে ডেকে বল্লাম মন তুই সত্যি করে বলে দে—তুই কার হতে চাস্?

অবগুণ্ঠিতা বধূ যেমন অবগুণ্ঠনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে থাকে—নবীন পতির লক্ষ প্রশ্নের জবাব দেয় না—মনটি আমার তেমনি করে অবগুণ্ঠনের আড়ালে মৌনী হয়ে রইল—সে কিছুতেই কথা বল্‌বে না।

তুমি কথা না কইলেও তোমার যে ইঙ্গিত আছে—তার ভাষা আমার কাছে ত অবিদিত নেই! তোমার কাছে এসে দাঁড়ালে তুমি ঘোমটা টেনে লম্বা করে দাও—আবার দূরে সরে গেলে যে জান্‌লার ফাঁকে তোমারি কালো চোক দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠে!

এ লুকো-চুরির দরকার কি? খুলে দাও তোমার হৃদয়ের কপাট; তাতে আলো বাতাস প্রচুর পরিমাণে লাগ্‌তে দাও। ফুলের মতই সে ফুটে উঠে ভ্রমরকে লুব্ধ করে তুলুক!

তা সইবে না—সইবে না। এই লুকো-চুরিই তার ব্যবসা—সমস্ত জীবনের অভ্যাস!

আবার এসে সেই উঁচু ঢিবিটার উপর বস্‌লাম। মাথার উপর বাঁশ-ঝাড় নুয়ে পড়েছে; তাতে দুটো ঘুঘু বসে করুণ আওয়াজ করচে। বসে-বসে তন্ময় হয়ে তাই শুনতে লাগ্‌লাম।

অদূরে রমাইদের বাড়ী। টিনের ছাদের উপর একটা বুড়ো কদমগাছ ঝুঁকে পড়েছে। তাতে একগাছ ফুল হয়ে রয়েছে। কদম-গাছের একটা ডাল জান্‌লার উপর হেলে পড়ে সেখানটা অন্ধকার করে দিয়েছে। হঠাৎ জান্‌লার ভিতর অমিয়ার কালো দুটি চোখ দেখ্‌তে পেলাম,—তার ভিতর যেন বিশ্বের নিখিল ব্যথা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে।

মনটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল। একবার মনে হলো বনের হরিণের মত ক্ষিপ্র-চরণে সেই কালো দুটি চোখের ছায়া থেকে দূরে—বহুদূরে পালিয়ে যাই। কিন্তু কেন? ওতে ত আগুন নেই, দাহও নেই; ও যে সাগরের মত স্বচ্ছ শীতল! নিস্তল নীল, প্রশান্ত-সুন্দর! ওর আহ্বান যে মর্ম্মের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আকুল করে তোলে!

দাঁড়িয়ে উঠ্‌তেই অমিয়া গরাদের মধ্যে দিয়ে তার সুগোল হাতখানি বার করে হাত-ছানি দিয়ে ডাক্‌লে।

একপা-একপা করে বাড়ীর ভিতর চলেছি;—রমাইএর মা বার হয়ে এসে বল্লে,—"এই যে বাবা, বেলা করো না—চল খাবে চল।"

শিউলি ফুলের পাপ্‌ড়ির মত শুভ্র-সুন্দর ভাতের স্তূপ, তার পাশে থরে-থরে পঞ্চ-ব্যঞ্জন! পাশে বসে গেলাম।

এই সেবার জন্যে পুরুষ নারীর কাছে আবদ্ধ! অন্তরের স্নিগ্ধ স্নেহ-রসের অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা সেই ব্যঞ্জনগুলিতে! তাতে তিক্ত আছে, কটু আছে, অম্ল আছে, মধুর আছে! অন্য দেশের কথা জানিনে—আমাদের দেশের এই যে হৃদয়-বিতরণ, এই যে পুরুষের তৃপ্তির জন্য নারীর একান্ত চেষ্টা, একে সুখ্যাতি না করে কোন্ পাষণ্ড থাক্‌তে পারে?

অমিয়ার চোখের মধ্যে প্রশ্নটি স্বচ্ছ হয়ে ফুটে রয়েছে দেখ্‌লাম—কেমন হয়েচে? এতে কি তোমার তৃপ্তি হবে?

আমি বল্লাম, "আজ মাকে মনে পড়চে; এমন আদর কেবল তাঁর কাছেই পেয়েছি একদিন।"

"আর কার কাছে পাবে তেমন, কপাল যে পুড়িয়ে বসে আছ।"

"কিন্তু পোড়া-কপালের জোর আছে, দেখ্‌চি।"

কিছুক্ষণ আর কথা কইবার ফুরসৎ হলো না। আমি খেতে লাগ্‌লাম। অমিয়া নিবিষ্ট-মনে দেখ্‌তে লাগল।

বল্লাম, "এমন আদর স্ত্রীর কাছে পাওয়া যায় বলে ত' মনে হয় না।"

"কেন? কেমন করে জানলে তুমি?"

"বলা শক্ত। মন অনেক জিনিষ আমাদের অজ্ঞাতসারে জেনে বসে থাকে। কৈফিয়ৎ তলব করলে—তার একটা মুস্কিল হয়—এই পর্য্যন্ত, তার উত্তর হয় ত কিছু থাকেই না।"

অমিয়া বল্লে, "মা যে উপকরণে গড়া স্ত্রী কি তা দিয়ে নয়?"

"একই বটে; কিন্তু অবস্থার প্রভেদ। মা ছেলের কাছে কিছু দাবী না রেখে সর্ব্বস্ব দিয়ে দেন, আর স্ত্রীর দাবী আছে—দানের প্রতিদান আছে, তার হিসেব-নিকেশ আছে।"

"কোন স্ত্রী নিক্তির তৌল করে না।"

"তা যদি করতো তা হলে ত বিষয়টা মোটেই জটিল হতো না। দোকানীর লেন-দেনের মত সে ঠিক তেমনি হতো—ফেল কড়ি মাখ তেল।"

"তাই যদি হয় ত' তোমাদের আপত্তি কি?"

একটু হেসে বল্লাম, "আপত্তি করায় লাভ? তাতে অশান্তি বই শান্তি নেই, নিশ্চয়।"

"একেবারে নিশ্চয়?"

"নয় ত কি?"

"জানিনে, অনধিকার-চর্চ্চা করা আমার অভ্যাস নেই।" বলে সে ফিক্‌-ফিক্‌ করে হাসতে লাগ্‌ল।

"তোমরা ভোগ জিনিসটার উপর এতটা খড়্গ-হস্ত যে কেন, বুঝেই উঠতে পারিনে। নিজেরা যে ভোগের প্রার্থী—এ কথা বুঝি তোমাদের মনে হয় না? মার স্নেহ মিষ্টি, কেন না সেখানে ভোগের কথাই আসে, ত্যাগের কথা নেই বলে। কিন্তু স্ত্রীর ভালবাসার প্রতিদান দিতে হবে বলে এমন আড়ষ্ট হবার কি দরকার? দেওয়া-নেওয়া ত সমানে-সমানে। তাতে অক্ষমতার চেয়ে ক্ষমতারই ত পরিচয় বেশী। তোমরা এমন করে নিজেদের ছোট করে দাও কেন? এই কি তোমাদের পৌরুষ?"

"ত্যাগটা যে বড় মধুর অমিয়া!"

"যা ত্যাগ করবে—তা' ভোগ করবার যদি লোক না থাকে? ত্যাগের কি একটাই দিক? নদীর সমস্ত জীবনটাই ত্যাগ, কিন্তু পরিণতিতে যে পরম সম্ভোগ।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইলাম। মনে করলাম যে এই মেয়েটিকে শিক্ষিত করে তোলবার চেষ্টা সফল হয়েচে। এমন করে তলিয়ে দেখ্‌তে পারে ক'জন?

বল্লাম,—"তা যাই বল, ভোগ মানুষকে মোটা ক'রে স্থবির ক'রে দেয়; তাতে তামসিকতা আনে, সাত্ত্বিকতা নেই।"

"এ কি গীতা?"

আমি হাসতে লাগ্‌লাম। গীতাকে সে প্রায়ই ঠাট্টা করত। গীতার কথা তুল্লেই সে বলত, 'দায় পড়েছে ভগবানের ঐ সব বলবার। ও চোখে দেখ্‌তে পারিনে মানুষের ভড়ং আর ভণ্ডামি। যা নিজে বুঝেছ তাই বল; পরের মুখের ঝাল খাবার দরকার কি?

বল্লাম, "ও আমার আত্ম-গীতা।"

"তা' হলে শুনতে পারি; কিন্তু প্রেরণা নয় ত?"

বল্লাম, "তাতে দোষ কি?"

"তা'হলে শোনবার অযোগ্য!"

"তবে আর বলে কি হবে?"

"কোন লাভ নেই—ও আমি শুনতেও চাইনে।"

সে একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লে, "পেটের ক্ষিদে চেপে রেখে যে নিজেকে নিখাকি বলে প্রমাণ করতে চায়, সে—"

"প্রকাণ্ড মূর্খ।"

"উঁহু—নিরেট বোকা। ক্ষিদেটা যে একটা শরীরের ধর্ম্ম, এ স্বীকার করতে কিসের লজ্জা, তা' ত বুঝেই উঠতে পারিনে। ক্ষিদে মিটে গেলেও যে খাই-খাই করে—তার অবশ্য নিন্দে আছে। যদি সংযম বলে কিছু থাকে ত' সেই খেনে। যে জীবনে খেলে না—তার কাছে উপোসের কোন দাম নেই। গরীবের আবার ত্যাগ কি? ত্যাগ যদি করতে হয় ত বুদ্ধের মত কর। সোণার সংসার, স্ত্রী-পুত্র সব রেখে যে ত্যাগ—তাই আসল ত্যাগ।"

আমার মনটা দোলার মত দুলতে লাগ্‌ল—এদিক-ওদিক! ভোগের মধ্যে ত্যাগ। বিবাহের মধ্যে মিলন! শক্ত কথা! সকলে কি পারে?

বুদ্ধদেবের কথা মনে হলো। এতখানি ভোগের মধ্যে কেমন করে সর্ব্বত্যাগ মাথা তুলতে পেরেছিল। ভগবান

সহায় না হলে মানুষের কিছু হয় না। কিন্তু মানুষের কি মানুষ সহায় নয়? বুদ্ধি কি তার কিছুই নয়? কি জানি কে বলে দেবে আমাকে?

দেখ্‌লাম অমিয়ার মুখখানা দিব্য জ্যোতিঃ-মণ্ডিত; যেন সংসারের সমস্ত লীলা শেষ করে সে বিরাগের সিংহাসনে বসে মানুষকে নির্দ্দেশ করে দেবে পথ কোন্ দিকে! আমার সমস্ত অহঙ্কার নিমেষে তার চরণের তলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়বার জন্য ধাবিত হলো!

১৯

বিষ্ণুদাসের অপেক্ষায় দিনটা পথে-পথেই কেটে গেল। মিনিটগুলো যেন ঘণ্টা, আর ঘণ্টাগুলোকে দিনের মত দীর্ঘ বলে মনে হতে লাগ্‌ল।

দিন শেষ হয়ে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার বাঁশ-বনের মাথার উপর ঘনিয়ে এলো, তবুও তাদের দেখা নেই। একবার মনে হলো, ছুটে এগিয়ে যাই,—রাস্তা চেনা থাক্‌লে হয় ত তাই ঘট্‌ত।

গোঠ থেকে গরুগুলো বিপুল ধূলো উড়িয়ে ফিরে এল; ঘরে-ঘরে শাঁখ বেজে উঠ্‌ল! অনেক দূরে যেন মনে হলো একজন কে আসচে। একজন দেখে সন্দেহ হলো; এগিয়ে আস্‌তে চিন্তে পারলাম যে বিষ্ণুদাসই বটে।

বিষ্ণুদাস আমাকে গড় করে প্রণাম করে বল্লে, "আমার আসা সম্ভব হতো না,· কেবল ঠাকুর, তোমার দেখা পাব বলেই এলাম; আমার ছেলে—নিধুর জ্বর দেখে এসেছি।"

বল্লাম, "রহিম কোথায়?"

"সে আসচে পিছুতে—গাড়ীতে বড় দেরী হয়—রোদ পড়ে যাওয়ার পরই হেঁটে আস্‌চি।"

আংটিটা সে আস্তে আস্তে বার করে দিয়ে বল্লে, "আমি সেদিন বুঝতেই পারিনি যে ঠাকুর, তুমি রমাইকে বাঁচাবার জন্যে এটা আমার কাছে রেখে এসেছিলে। তোমার চিঠি আর রহিমের কথা থেকে সব বুঝতে পারলুম।"

আংটিটা নিয়ে বল্লাম, "কিন্তু টাকা এখন ত' দিতে পারব না—আমি মঠে ফিরে তার জোগাড় করে পাঠিয়ে দেব।"

"কি ছাই-পাঁশ টাকার কথা বলচ ঠাকুর—টাকা আবার কি দেবে, ও ত' আমাদের কাজেই লেগেছে; টাকা দিয়ে আর অপরাধ বাড়িও না।"

আমি মনে-মনে ভাবলাম যে টাকার প্রসঙ্গের আর প্রয়োজন নেই—সে পরে পাঠিয়ে দিলেই চল্‌বে।

পথে চল্‌তে-চল্‌তে বল্লাম; "কিন্তু এর কথা যেন কেউ না জান্‌তে পারে। জান্‌লে গোল হতে পারে।"

বিষ্ণুদাস বল্লে, "সেই জন্যেই ত এগিয়ে আসা—সঙ্গে রহিম পর্য্যন্ত নেই। নাঃ; এ কথা তোলবার কি দরকার হবে জানিনে।"

আংটিটা গোপন করে নিলাম।

পথে অনেক কথা হলো। বিষ্ণুদাসের কাল সকালেই ফিরে যেতে হবে। রমাইএর মাকে সে দবিরপুরে নিয়ে যাবে। তারপর নিধু ভাল হলে—ফিরে এসে যা-কিছু ব্যবস্থা হবে।

অতএব কাল সকালে আমরাও রওনা হব। মন আনন্দে নৃত্য করে উঠ্‌ল। মনে হল এই রাতের ব্যবধানটা হাত দিয়ে টেনে সরিয়ে দি।

বাড়ী ফিরে কিছুক্ষণ রমাইএর মার বিলাপ শুন্‌তে হলো। তারপর আমাদের প্রশংসার পালা। সেগুলো নিস্তব্ধে হজম করা ভিন্ন আর উপায় কি?

বিষ্ণুদাস শেষ পরে বল্লে, "মা, আমাকে কিন্তু কালই ফিরতে হচ্চে নিধুর জ্বর দেখে এসেছি—তোমাকেও যেতে হবে।"

দৌহিত্রের অসুখ শুনে রমাইএর মা চম্‌কে উঠ্‌ল—"কি সর্ব্বনাশ—তবে তোমার আস্‌বার কি দরকার ছিল বাবা! —হে মা দুর্গা, হে মা কালী, আমার ঐ খুঁদ-কুঁড়োটুকু বাঁচিয়ে রাখ মা!" ইত্যাদি ইত্যাদি—

তর্ক বিতর্কে অনেক রাত হলো;—শেষ স্থির হলো যে তার পর দিন খাওয়া-দাওয়া করে আমরা রওনা হব।

ঘরে ফিরে দেখ্‌লাম অমিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের মিট্‌মিটে আলোতে তাকে বিছানার উপর একখণ্ড জ্যোৎস্নার মত দেখাচ্ছিল। একখানা হাত চৌকির বাইরে ঝুলে পড়েচে,—আস্তে আস্তে সেটা তুলে দিলাম। গভীর ঘুম, সে জান্‌তেও পারলে না।

আমি নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে রইমাইএর আঁকা ময়ূরটি দেখ্‌তে লাগলাম। ঘাড়টা উঁচু করে তার পেখমটা সমস্ত দেয়ালে ছড়িয়ে দিয়েছে। কি উল্লাস!

পাশের ঘরে রমাইএর মা গুন্-গুন্ করে গল্প করচে,—

কখনো বা কান্নার চাপা আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। আমি বড় বড় চোখে চেয়েই রইলাম, রাত বুঝি এমনি করেই কাটবে!

হঠাৎ একটা কথা মনে এল। অমিয়ার হাতে আংটিটা পরিয়ে দিলে হয় না? সেই ত বেশ হবে!

পা টিপে-টিপে উঠলাম। বুকের মধ্যে ধড়াস্-ধড়াস্ করে উঠল? যেন চুরি করতে চলেচি! প্রদীপটা আড়াল করে সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাড়া নেই, শব্দ নেই।

হাতের উপর আস্তে-আস্তে হাত দিলাম। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে যেন কে দাপা-দাপি করে বেড়াচ্চে! হাতটি তুলে ধরে দেখলাম অনামিকাতে আংটির দাগ রয়েছে। আংটীটি পরিয়ে দিয়ে—ছুট্—ছুট্!

নিজের বিছানায় এসে বসে গা দিয়ে ঘাম বেরুতে লাগল। মনে হলো গ্লানিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে দেহের প্রতি ছিদ্র দিয়ে তা উপ্‌চে বার হচ্ছে।

কে যেন চীৎকার করে বলে গেল—কাপুরুষ—এই তোমার ধর্ম্ম-রক্ষা!

হাতের উপর মাথা দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম। মনে হলো মনের চিন্তা সূত্রগুলো সব জোট খেয়ে গেছে। তাকে ছিঁড়ে ফেলা ভিন্ন উপায় নেই।

বুঝতে পারিনি কখন রমাইয়ের মা ঘরে এসে ঢুকে প্রদীপটা উস্কে দিয়েছে।

সে বল্লে "বাবা এখনো শোওনি কেন? রাত যে অনেক হয়েছে।"

"ঘুম আস্‌চে না যে।"

দীপের উজ্জ্বল আলোতে দেখ্‌লুম অমিয়া তেমনিই নিস্পন্দ ভাবে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার ঠোঁটের কোণে মেঘলা দিনের শেষ আলোর মত বিদ্রূপের হাসিটুকু লেগে রয়েছে!

বিছানায় শুয়ে পড়ে ঘুমাবার কত চেষ্টা করলাম—ঘুম সে রাত্রে এল না। চুপ করে শুয়ে রমাইএর মার নাক ডাকা শুনতে লাগলাম।

মন্দির-মঙ্গল *

(পুরীতে শ্রীমন্দির দর্শনে)

[শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম-এ]

(১)

পুরুষোত্তমে, শরীর ক্ষেত্রে, দিব্য নয়নে করিতে দৃষ্টি,
কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি—চারিটি যোগের হয়েছে সৃষ্টি;
শ্রীমন্দিরে প্রবেশ জন্য চারিটি দ্বার রয়েছে মুক্ত,
সবার শ্রেষ্ঠ সিংহ-দ্বার, যোগেতে যেমন ভক্তি উক্ত।
  সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মন্দির মধ্যে রয়েছে ব্যক্ত;
  দেখিয়া নেত্রে অরূপ চিত্রে হতেছে স্তব্ধ সকল ভক্ত।

(২)

জীব শরীর অন্নে পুষ্ট, মন্দিরে বিরাট অন্নছত্র,—
পাইতে প্রসাদ সকলে মত্ত, জাতির বিচার নাহিক তত্র;
স্থূল হইতে সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠ, কহিছে যাহারা শাস্ত্রে দক্ষ;
অন্নছত্র হইতে উচ্চে, রতন বেদীর বিশাল বক্ষ।
  সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মন্দির মধ্যে রয়েছে ব্যক্ত,
  দেখিয়া নেত্রে অরূপ চিত্রে হতেছে স্তব্ধ সকল ভক্ত।

(৩)

প্রাণ-মন-বিজ্ঞানময় সূক্ষ্ম দেহের কোষপুঞ্জ,
ভেদিয়া গগন শোভিছে ভোগ্য নৃত্য জগমোহন কুঞ্জ।
সৃষ্টিধারায় করিতে রক্ষা "বহুস্যাম্" কামনা মাত্র,

* গীতার বিজয়-ভাষ্যকার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসুর শ্রীমন্দিরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অবলম্বনে রচিত।

বাহ্য আকারে দেহের অঙ্গে করিছে প্রকাশ প্রাচীর-গাত্র।
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মন্দির মধ্যে রয়েছে ব্যক্ত,
দেখিয়া নেত্রে অরূপ চিত্রে হতেছে স্তব্ধ সকল ভক্ত।

(৪)

আনন্দময় কারণ শরীর রূপকে দেখায় বিমান পুণ্য,
যাহার ভিতরে করিলে প্রবেশ হইবে সদ্য কর্ম্মশূন্য;
হৃদয় দহরে ভাতিবে তখন আত্মস্বরূপ ব্রহ্মরশ্মি;
অভেদ জ্ঞান ধ্বনিবে উচ্চে দিব্য মন্ত্র,—"সোঽহমস্মি"।
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মন্দির মধ্যে রয়েছে ব্যক্ত,
দেখিয়া নেত্রে অরূপ চিত্রে হতেছে স্তব্ধ সকল ভক্ত।

(৫)

যাহার স্বরূপ করিতে স্থির নহে ত শক্ত ধ্যান মন্ত্র;
কেমনে তাহারে দেখাবে শিল্পী হস্তে যাহার স্থূল যন্ত্র।
রূপের আরোপ করিতে তাহায় সকল চেষ্টা হইল পণ্ড,
তথাপি ভক্ত পূজিছে নিত্য চিত্র-আধার দারুর খণ্ড।
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মন্দির মধ্যে রয়েছে ব্যক্ত,
দেখিয়া নেত্রে অরূপ চিত্রে হতেছে স্তব্ধ সকল ভক্ত।

ইমান্‌দার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

একাদশ পরিচ্ছেদ

সে দিন শ্রীপঞ্চমী।

বেলা তখন সাড়ে দশটা বাজিয়াছে। সুমতি দেবী আহ্নিক-পূজা সারিয়া, পিসিমার আহ্নিকের আয়োজন সমস্ত গুছাইয়া দিয়া, পূজার ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া, রান্নাঘরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "বামুন দিদি—ও মোক্ষদা দিদি—"

"কি গো—" বলিয়া রান্নাঘর হইতে খুন্তি হাতে করিয়া দোক্তা গালে এক হৃষ্ট-পুষ্ট, স্থূলকায়া, শ্যামবর্ণা নারী বাহিরে আসিয়া বলিলেন "ডাক্‌ছ কেন?"

সুমতি দেবী হাতের বইখানির পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে বলিলেন, "আজ সরস্বতী-পূজো, সুনীল নিরিমিষ খাবে, নিরিমিষ হেঁসেলেই যেন সব রান্না হয়—"

থু করিয়া থুথু ফেলিয়া, ভ্রূযুগল টানিয়া, মোক্ষদা দিদি বলিলেন,—"তাহলেও দু' পয়সার মাছ আন্‌তে দিও,—আমার মেয়ে মাছ না হলে এক গরাসও ভাত মুখে তুলতে পারবে না! গরীবের মেয়ে বটে, - কিন্তু মুখখানি তো তেমন নয়,—ও অমন 'হ্যানো-ত্যানো' সামিগ্‌গীর্ দিয়ে ভাত খেতে পারে না! ওরই জন্যে আজ আমার দুঃখ-ধান্ধা কর্‌তে বেরুনো দিদি, নইলে আমার পাঁচিশ বিঘে জমির ধান—সম্বচ্ছরে একটা বিধবার পেট, আর ঐ ছানা মেয়েটার কুলোয় না। এ কি অসম্ভব কথা নয়? তাই তো মোহন্ত মশাই কত বল্লেন—লক্ষ্মীর মা ভিক্ষে মেগে খায়, মোক্ষদা দিদির অভাব কি যে, রাঁধতে যাচ্ছে? আমি—"

বাধা দিয়া সুমতি বলিলেন, "শুধু দু' পয়সার মাছ কেন? আমি রামটহলকে বলছি,—জেলে-বাড়ী থেকে আধসের মাছ নিয়ে আসুক। টক্ দিয়ে রেঁধে রাখো, এবেলা-ওবেলা হবে। রামটহলকে খানচারেক্ আলাদা করে দিও। তা'পর যা থাকে,—ঝিকে দিও, শ্যামলকে দিও, মেনুকে দিও।"

কপালে চক্ষু তুলিয়া মোক্ষদা দিদি বলিলেন "ঐ মেড়ো চাকরটা মাছ খায়? ওমা সে কি গো? ওদের দেশে তো মাছ ছুঁলে জাত যায়! ও তবে মাছ খায় কেন?"

বইয়ের দিকে চোখ রাখিয়া সংক্ষেপেই সুমতি দেবী বলিলেন, "ওর রুচি। তা সে যাই হোক, তুমি নিরামিষ হেঁসেলের তরকারী আর ডাল একটু ওর জন্যে আলাদা রেখে দিও—ও এক সময় এসে নিয়ে যাবে।"

ফোঁস করিয়া উঠিয়া, বিদ্রোহের সুরে মোক্ষদা দিদি বলিলেন, "কেন! ওর তো শুক্‌নো আট টাকা মাইনে!

তবে আবার 'ওকে ডাল তরকারী মাছ দেওয়া কেন?—এত 'নাই' দেওয়া কিসের জন্যে? সিধে তো দেওয়া হচ্ছে, আবার ডাল তরকারী—"

শান্ত ভাবে সুমতি দেবী বলিলেন, "সামান্যই জিনিস, ও-গুলো দিতে গায়ে লাগে না, তাই দিই;—আহা গরীবকে ও-গুলি কিনে খেতে হলে—। ত্যাখো মোক্ষদা দিদি, রান্নাঘরের কড়াইয়ে কি পুড়ছে—"

মোক্ষদা দিদি রান্নাঘরে ছুটিলেন। সুমতি দেবী অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া—অস্ফুট স্বরে, আপন মনেই বলিলেন, "গ্রহ এক! পিসিমার যেমন খেয়ে-দেয়ে কায নেই,—যাকে হোক্ ধরে এনে হেঁসেলে পুরলেই হোল!"—তারপর দৃষ্টি সংযত করিয়া তিনি বইখানিতে মন দিলেন। একটু সরিয়া আসিয়া, বারেণ্ডার থামে হেলান দিয়া রোদে পা ছড়াইয়া বসিয়া—এক মনে বই পড়িতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, সাদা গরদের জোড় পরিয়া, খালি পায়ে, চন্দনের ফোঁটা কপালে, সুনীলকৃষ্ণ প্রসাদী ফুল-বিল্বপত্র হাতে লইয়া বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল, "দিদি!"

সুমতি বলিলেন, "এই যে আমি, আয়। পূজা হয়ে গেল?"

সুনীল বলিল, "হাঁ, হয়ে গেছে। প্রসাদী ফুলগুলো কোথায় রাখি, বল দেখি?"

হাতের বইখানি কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া সুমতি বলিলেন, "ঐ তুলসী মঞ্চে এখন রাখ।"

সুনীল ফুল রাখিতে-রাখিতে বলিল, "আজ বড় শীত দিদি, চায়ের জলটা শীগ্রী চড়াতে বল ভাই!"

একটু হাসিয়া সুমতি বলিলেন, "আহা, মা-সরস্বতীর কি বরাত রে! নেশাখোর ভক্তের যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার তর সয় না!"

একটা ছোট পীঁড়ে টানিয়া লইয়া, বারেণ্ডার উপর বসিয়া সুনীল বলিল, "আর নিন্দে কোর না! মার খাতিরেই এত বেলায় চা খাচ্ছি। পুকুরে গিয়ে যখন ডুব দিলাম—শীতের চোটে অন্তরাত্মা আমার তখন জমে কুল্পী বরফ হয়ে গিয়েছিল! আর কি চাও দিদি?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুমতি দেবী হাসিমুখে বলিলেন—"তার ওপর এই গরদের জোড় পরেই শুদ্ধাচারে চা-পান হবে; ভক্তির পরাকাষ্ঠা একেবারে! বামুন দিদি, কড়াইটা নামিয়ে ঐখানে কেট্‌লিতে জল আছে, চড়িয়ে দাও তো উনুনে!"

বিস্মিত হইয়া সুনীল চুপি-চুপি বলিল, "বামুন দিদি কে?"

মৃদু হাসিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "পিসিমা আজ থেকে মেন্তুর মাকে বাহাল করলেন। তাঁর সন্দেহ হয়েছে, রোজ হাঁড়ি চড়াতে হলে আমি পঞ্চভূতে মিশে যাব! পিসিমার যত্নের অত্যাচারে আমার প্রাণ ছাড়ছাড়্ করছে যে সুনীল,—কি করি বল দেখি?"

খুসী হইয়া সুনীল বলিল, "ও তো ভালই হয়েছে! প্রতিদিন রান্নার কায কি পেরে ওঠা যায়? মেন্তুর মা রাঁধুন না দিন-কতক।"

সুমতি দেবী বাধা দিয়া বলিলেন "কেমন পূজো দেখ্‌লি বল।"

সুনীল একটু উদাস ভাবে বলিল, "ঐ চাল কলা চিনির নৈবিদ্যির আর কি পূজো দেখ্‌বো বলো।"

হাসিয়া সুমতী দেবী বলিলেন "তা বৈ কি! এখন কেউ এক পেয়ালা চা তৈরী করে, মা সরস্বতীর কাছে দিয়ে আসত, তো, তোর মত ভক্তরা পূজো দেখে পরিতৃপ্ত হোত।"

উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া সুনীল বলিল, "তা হতুম দিদি! আহা, এমন শীতের দিনে কেউ যদি অন্ততঃ এক পেয়ালা চা মা সরস্বতীকে দিত, তা'হলে বুঝ্‌তুম, মাকে আন্তরিক যত্ন-ভক্তি করা হোল। তা নয়,—এই দুর্জ্জয় শীতে, কোথায় চিনি, কোথায় কলা—ডাহা নিউমোনিয়া ধরিয়ে মারবার ব্যবস্থা বাপ্! দেবতার প্রাণ, তাই অত অত্যাচার সয়;—মানুষ হলে, মা এতদিন—। দাঁড়াও, পিসিমা আসুন,—একটু ঝগড়া করে রাগিয়ে দিই—"

সুমতি দেবী তখন তুলসী-মঞ্চের উপর বইখানি রাখিয়া মঞ্চ প্রদক্ষিণের উদ্যোগ করিতেছিলেন;—সুনীলের কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এই! নাঃ,—এখন কিছু বলিস্ না। সেই সকালবেলা স্নান করে পূজোর দালানে গেছেন, এখনো জপ-আহ্নিক করতে সময় পান নি,—এখন রাগাস্ নি—" সুমতি দেবী মঞ্চ প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। সুনীল চুপ করিয়া এক দৃষ্টে তাঁহার

মুখ পানে চাহিয়া রহিল। সেই আধা-কুয়াশা, আধা-রৌদ্রে ঘোলাটে-মলিন শ্রীপঞ্চমীর প্রভাতে এই নিবিড় শ্রদ্ধাবহ-বিষাদ-ঔদাস্য-পরিব্যাপ্ত, অকাল-ব্রহ্মচারিণী দিদির শান্ত-করুণ দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা-নম্র নমস্কার-দৃশ্য তাহার চোখে এক অপূর্ব্ব সম্ভ্রম-ভরা আনন্দের অঞ্জন লেপিয়া দিল! সুনীল অবাক্ হইয়া, দিদির মাধুর্য্য-জ্যোতিঃ-বিকশিত, সুন্দর, কোমল মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল।

ঘরের ভিতর হইতে চায়ের কেট্‌লি লইয়া, আধ ঘোমটা টানিয়া বাহির হইয়া, মোক্ষদা দিদি সুনীলের কাছে কেট্‌লিটা নামাইয়া দিয়া, ঘোমটার ভিতর হইতেই ফিসফিস্ করিয়া বলিলেন, "এই রইল জল।"

মোক্ষদা দিদি নিজের লজ্জাশীলা নামের গৌরবটুকু খুব সতর্কতার সহিত রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য সদা ব্যস্ত; সেই জন্য সুনীলের সহিত সুস্পষ্ট রূপে কথা কহিলেন না - যদিও সুনীল তাঁহার বয়সের চেয়ে চার বছরের ছোট সুমতি দেবীর ছয় বছরের ছোট ভাই।

সুনীল অন্যমনস্ক হইয়া দিদির দিকেই চাহিয়া ছিল, - লজ্জাপ্রবণা মোক্ষদা দিদির কণ্ঠস্বরে চমকিয়া, দৃষ্টি ফিরাইয়া চাহিয়া, একটু থতমত খাইয়া সসঙ্কোচে বলিল, "থাক্।"

সুমতি দেবী তুলসী মঞ্চকে শেষ প্রণাম করিয়া, বই-খানি হাতে লইয়া উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "চা-টা কি আমিই তৈরী করে দেব? আচ্ছা, তুই বস্।"

ঘর হইতে সমস্ত সরঞ্জাম বাহির করিয়া আনিয়া তিনি চা তৈরী করিতে বসিলেন। সুনীল তাঁহার হাতের বইখানির দিকে চাহিয়া বলিল, "ও কি গীতা? আচ্ছা দিদি, তুমি সরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি দাও না কেন?"

সুমতি একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা বৈ কি! অনধিকার চর্চ্চার স্পর্দ্ধা দেখে তোরা হাসতে চাস্ তো?"

"তা হাস্‌ব কেন? বাঃ!" বলিয়া আগ্রহপূর্ণ নয়নে দিদির মুখপানে চাহিয়া সুনীল বলিল, "তুমি পুষ্পাঞ্জলি দেবে? চল, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি ঠাকুর-দালানে। এই বেলা চল,—নইলে বামুন-ঠাকুর চলে যাবেন আবার।"

সুমতি দেবী বলিলেন, "ওরে না, ঘটাপটা করে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া—ওতে ভক্তির চেয়ে আমার ভয়ই বেশী করে।--তাতে আবার এখন সেখানে অনেক ভক্তের ভিড় জমেছে,—এখন আমি যাব না।"

সুনীল বলিল, "হলোই বা,—চল না, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, থাকলই বা ভিড়।"

একটু দুঃখিত ভাবে হাসিয়া, ইতস্ততঃ করিয়া সুমতি বলিলেন "দূর বাপু, সে ভিড়ের কোলাহলে আমার মনঃস্থিরই হয় না, সে শুধু লোক-দেখানো প্রণাম পূজা—ওতে আমার বড় অস্বস্তি বোধ হয়! তার চেয়ে নিরিবিলি ঘরে বসে, শান্ত মনে ধ্যান করে বেশী তৃপ্তি পাই। নে, তুই চা খা।"

সুনীল চায়ের পাত্র টানিয়া লইয়া, একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি যা বলেছ, ঠিক দিদি,—ভিড়ের গোলে মন ঠিক থাকে না।" তার পর একটু থামিয়া, হাসিয়া বলিল, "তার উপর মিত্তির মশাইয়ের যা বকুনী! কি বাপু, পূজার জন্যে আমায় পাঁচ হাত না ছ' হাত কাপড় আন্‌তে বলেছিলেন, তা আমি বুঝ্‌তে পারি নি—ফৈজুকে দশ হাত কাপড় কিনতে বলেছি, ফৈজু তাই কিনেছে। এই আর কি! জমিদারীর ইনকাম্ কলকাতার বাসা খরচ ইত্যাদি যত কিছু ঝঞ্ঝাট সব তিনি সেইখানে পেড়ে বস্‌লেন!--আমি পুষ্পাঞ্জলি দেব কি আমার মাথাই গেল গুলিয়ে!"

সুমতি দেবী উঠিতেছিলেন, -আবার বসিলেন,—বলিলেন, "মিত্তির মশাই আমাকেও কাল বলছিলেন যে 'মা, কলকাতার বাসা-খরচটা বড্ডই বেশী হচ্ছে,—ফৈজুকে এবার আর যেতে দেওয়া হবে না।'"

শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সুনীল বলিল, "ফৈজুকে ছাড়্‌তে হলে আমার যে মুস্কিলের সীমা থাক্‌বে না দিদি,—আমি একজামিনের পড়া পড়্‌ব, না বাসা-খরচে হিসেব করব? তা হলে তুমি বল বাপু, আমি বাসা-ফাসা উঠিয়ে দিয়ে কোন একটা হোটেলে কি মেসে চলে যাই,—খরচ কম হবে খুব।"

সুমতি দেবী বলিলেন, "কিন্তু, অসুখ-বিসুখ হ'লে সেখানে দেখ্‌বে কে? শুধু অসুখই বা বলি কেন,—ঐ তো তোর হুঁস্, বুক-পকেট থেকে মণি-ব্যাগ তুলে নিয়ে গুণ্ডা চলে যাচ্ছে,—তুই স্বচ্ছন্দে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্! ভাগিস্ ফৈজু দেখ্‌তে পেয়ে, ধাঁ করে তোর মাথা ডিঙ্গিয়েই তার গালে চড় বসিয়ে ধরে ফেল্লে, তাই তো! না হলে……" সুমতি দেবী হাসিতে লাগিলেন। সুনীলও হাসিল।

দুয়ারের কাছে নাগরা জুতার শব্দ হইল। সুনীল বলিল, "ঐ যে ফৈজু আস্‌ছে,—কর্ত্তা আজ আবার এর মধ্যে এক কাণ্ড ক'রে বসেছেন! সর্দ্দার তো রেগে খুন! তুমি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো না!"

রঙিন ডোরা-কাটা লুঙ্গি পরিয়া, বর্শা হাতে ফৈজু আসিয়া অদূরে দাঁড়াইল। সুনীল চায়ের পেয়ালা নামাইয়া হাসিমুখে বলিল, "আবার পুষ্পাঞ্জলির ফুল খুঁজতে না কি?"

বিস্মিত হইয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "সে আবার কি? আজ আবার কি হয়েছে ফৈজু? সর্দ্দার তোমার ওপর রাগ করেছে সত্যি? কেন?"

বর্শাটা পাশে রাখিয়া ফৈজু সেইখানেই মাটীর উপর বসিল। হাঁটুর উপর দু'হাত পাশাপাশি রাখিয়া সোজা হইয়া ঘাড় তুলিয়া বলিল, "ও-সব বাজে কথা বাদ দেন। শুনুন দিদিমণি, আপনার কাছে আমার একটা আরজি আছে।"

সুনীল সকৌতুকে চোখ টিপিয়া বলিল, "বল, আমিও শুনি! তোমার বাবা রাগ ক'রে তোমায় বকেছে,—কেমন, এই তো?"

বিষণ্ণ-শুষ্ক মুখে একটু হাসিয়া, মাথা নাড়িয়া ফৈজু বলিল, "হাঁ তাই বটে। এখন আপনি শীগ্‌গী চায়ের পেয়ালা শেষ করে উঠে পড়ুন দেখি—আপনার সামনে কথা হবে না।"

চক্ষু দু'টা বিস্ফারিত করিয়া সুনীল বলিল, "ওরে বাসরে, আমাকেও অবিশ্বাস! ফৈজু, তুমি যে ভয়ানক লোক হয়ে উঠ্‌লে দেখ্‌ছি!"

মাথা হেঁট করিয়া বর্শার মুখের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতে করিতে প্রচ্ছন্ন-বিষাদ-মাখা, ম্লান হাস্যে রঞ্জিত মুখে ফৈজু খুব সংক্ষেপে বলিল, "কি করি বলুন,—সংসারে বাস করতে হ'লে অনেক জিনিসকে ভয় করে চল্‌তে হয়! কাযেই—"

সংশয়পূর্ণ দৃষ্টিতে ফৈজুর মুখপানে চাহিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "কি হয়েছে ফৈজু, সত্যি ক'রে বল দেখি।"

জোর করিয়া সহজভাবে একটু হাসিয়া, ফৈজু মাথা নাড়িয়া বলিল, "এমন বেশী কিছু হয়নি, দিদিমণি,—অ-ছোটবাবু, আপনি উঠুন্ না!"

শূন্য চায়ের পাত্রটি নামাইয়া সজোরে ঘাড় নাড়িয়া, দুষ্ট-কৌতুকের হাসিমাখা মুখে সুনীল বলিল, "কিছুতেই উঠ্‌ব না! তোমার কি আরজি আছে বল, শুনে তবে আমি উঠ্‌ব—"

ফৈজু বলিল, "বলুন, আমার বাপ্‌কে কিছু বল্‌বেন্ না?"

সুনীল কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সুমতি দেবী বলিলেন, "না—না, তুমি বারণ করছ তো কেন বলবে; না সুনীল, ও সব দুষ্টুমি কোরস্ নি ভাই,—বল ফৈজু, তুমি কি বলতে চাইছ।"

ফৈজু একবার এদিক ওদিক চাহিল, তারপর বলিল, "আমি বলতে চাইছি, শঙ্করপুরের সেজবাবু তো জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি কিছু জানেন না; জয়দেবপুরের নায়েব প্রজাদের খেপিয়ে দিয়েছে; তাই তারা খাজানা দেবে না বলে ধর্ম্মঘট করেছে। এখন এখান থেকে মিত্তির মশাই সেজেগুজে গিয়ে তার তদন্ত করতে তো ঢের দেরী দেখ্‌ছি। তাই বলছি কি এখন আমি এগিয়ে গিয়ে তার একটু খোঁজ তল্লাস করলে হয় না?"

ফৈজু এমন অসময়ে যে এত অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব লইয়া আসিবে, সুমতি তাহা আদৌ অনুমান করিতে পারেন নাই। তিনি একটু অবাক্ হইয়া রহিলেন। ফৈজু ততক্ষণে তাহার আরজির উপসংহার ছন্দে পুনশ্চ বলিল, "হুকুম দেন তো আমি আজই বেরিয়ে পড়ি—"

হতবুদ্ধি হইয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "পাগল ফৈজু! তুমি একলা সেখানে গিয়ে কি করবে? শুনেছ তো প্রজাদের রোখ!"

ফৈজু অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দিল, "সেখানকার চাল চাল বুঝে, যা করা উচিত তাই করব—হলোই বা প্রজাদের রোখ্—"।

ফৈজুর প্রস্তাব শুনিয়া, সুনীল এতক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল,—এইবার হাসিয়া বলিল, "তা তো বটেই,—কাঁচা মাথাটা ঘাড়ে করে বয়ে বেড়ান ফৈজুর পক্ষে বড়ই অসহ্য হয়ে উঠেছে; ওটাকে এখন খরচ করে হাল্কা হ'তে পারলেই ফৈজু বাঁচে।"

ফৈজু মাটীর দিকে চাহিয়া নীরবে শুধু একটু হাসিল।

সুমতি দেবী তিরস্কারপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "ও-সব হতচ্ছাড়া বাহাদুরী খেয়াল ফৈজুর মাথায় ঢোকাসনে,—তুই থাম্ সুনীল! আহা বুড়ো বাপের তো দুঃখের সীমা নাই, এই সেদিন অমন উপযুক্ত ছেলে দপ্ ক'রে চলে গেল;

একটা বিধবা বৌকে নিয়ে বাপ পাগল হয়ে রয়েছে, আবার !—ও সব কথা মুখে আনিস্‌নে বাপু !"

সুনীল একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কি করি বল, ফৈজুর গতিক দেখে বল্‌ছি ! আচ্ছা, ওকে তুমি জিজ্ঞাসা কর—হঠাৎ সেই অরাজক পুরীতে যাবার মতলব কেন ওর মাথায় এল !"

সুমতি দেবী গীতা খুলিয়া পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিয়া, উদাস ভাবে বলিলেন, "তা সে যে জন্যেই এসে থাক,—আমি তো পাগল হইনি, যে সত্যিসত্যি ফৈজুকে সেখানে পাঠাবো।"

ফৈজু মাথা তুলিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল —এমন সময় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া, শ্যামল হাপাইতে-হাপাইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা !"

সুমতি দেবী হাসিয়া বলিলেন, "মরিনি,—মারনি, এখনো বেঁচে আছি,—বল কি খবর ? অত হাপাচ্ছ কেন ?"

সামনেই সুনীল ও ফৈজুকে দেখিয়া শ্যামল একটু লজ্জায় পড়িল। চোখ নীচু করিয়া সুমতির সামনে আসিয়া, হাত হইতে শালপাতার ঠোঙাটি নামাইয়া দিয়া বলিল, "আপনার জন্যে মা দুগ্‌গার পরসাদ্ এনেছি, মা !"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হাসিয়া কপট বিস্ময়ে সুনীল বলিল, "এমন দিনে, মা দুগ্‌গার পরসাদ্ ! কোত্থেকে আসছ বৎস, ডিরেক্ট কৈলাস থেকে ?"

সুমতি দেবী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। শ্যামল অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, থতমত খাইয়া বলিল, "না মামাবাবু, আমি ঠাকুর-দালান থেকে আস্‌ছি।"—

সুনীল বলিল, "ঠাকুর-দালানে মা দুর্গা এখন নেই বৎস। তিনি তো শুনেছি এখন কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেবের ঘর-কন্নার কাযে ব্যস্ত আছেন ! তাঁর সঙ্গে কোথায় তোমার দেখা হোল ?"

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, সজোরে ঘাড় নাড়িয়া শ্যামল বলিল, "তাঁর সঙ্গে তো দেখা হয়নি !"

সুনীল ততোঽধিক বিস্ময়ের ভান করিয়া, তার চেয়ে জোরে বলিয়া উঠিল, "সে কি কথা ! তোমায় প্রসাদ দেবার জন্যে মা দুর্গা সিংগীর পিঠে চড়ে পাদাড় পর্য্যন্ত ছুটে আসেন নি ?"

সিংহের পিঠে চড়িয়া পাদাড় পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসা যে-সে লোকের কর্ম্ম নয়,—সেটা শ্যামলের বুঝিতে কিছুমাত্র গোল ঠেকিল না ; এতক্ষণে সে বুঝিল, এ-গুলা সবই পরিহাস ! একটু হাসিয়া মস্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "ওঃ ! তামাসা করছেন ! ওটা সরস্বতীর প্রসাদ ! দুগ্‌গার নয় !—"

ফৈজু এতক্ষণ কৌতুকোজ্জ্বল নয়নে শ্যামলের মুখপানে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছিল,—এবার বলিল, "তাই বল !"

শ্যামল ফৈজুর দিকে চাহিয়া বলিল, "মোহন্ত মশাই আবার মিত্তির মশাইয়ের কাছে এসেছেন ফৈজু মামু,—আবার সেই সব কথা নিয়ে রাগারাগি করছেন।"

ফৈজু তৎক্ষণাৎ বর্শা তুলিয়া লইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল্লুম ছোট বাবু !"

সুনীল ত্রস্তে উঠিয়া, ফৈজুর পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না ফৈজু, থাম, কেন মিছিমিছি ঝগড়া-ঝাঁটি করবে ? বলছে বলুক না ! আমি মিত্তির মশাইকে বলব এখন সব।"

সুমতি উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "কি হয়েছে রে ? ফৈজু, বল দেখি কি করেছ ?"

অধীর ভাবে ফৈজু বলিল, "এসে বলছি দিদিমণি ! দোহাই ছোটবাবু, রাস্তা ছাড়ুন !"

সুনীল বলিল, "ও ঝগড়ায় কোন লাভ নেই ফৈজু, তুমি বোস এখন। তোমার তো কোন দোষ নেই !"

ক্ষোভোত্তেজিত কণ্ঠে ফৈজু বলিল, "আছে ছোটবাবু, নিশ্চয় আছে, না হলে কেন এত কাণ্ড হচ্ছে ? সরুন, আমি শুনে আসি, ওঁরা কি বলেন।"

শ্যামল তৎক্ষণাৎ বলিল, "ওঁরা কত কি-ই বলছেন ! চাটুজ্যে মশাই ফুল শুঁকছেন, এদিক-ওদিক ঘুরছেন, আর বল্‌ছেন ভারী 'অন্নাই !' ভারী 'অন্নাই !' আর রায় মশাই চটি জুতো ফট্-ফট্ করে এদিক-ওদিক বেড়াচ্ছেন, আর চৈতন নেড়ে-নেড়ে বল্‌ছেন ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ !"

সুনীল বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়া বলিল, "তুমি থাম তো ফাজিল ছোকরা ! সব দেবতার নৈবিদ্যিতে ঠোকর মের না। রায়-মশাই ছিঃ ছিঃ বলছেন ! ওঃ, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে ! রায় মশাইয়ের ভণ্ডামী জানতে তো আমার বাকী নেই ! তাই তিনি টিকি নেড়ে জুয়াচুরী করে বেড়ান—"

সুমতি দেবী সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন, "ওরে থাম্, কাকা হন যে!"

সুনীল ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "রেখে দাও দিদি! সাধে বাবা ওঁকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারতেন না! কম শত্রুতাটা করেছেন আমাদের সঙ্গে চিরদিন! আজ আবার সাধুতা দেখাচ্ছেন!"

বাধা দিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "চুপ কর সুনীল, ফৈজু রাগ রোষ ছাড়,—কি হয়েছে, আমায় ঠিক করে বল দেখি, বোস তুমি,—বোস ফৈজু!"

ফৈজু বসিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বসলুম দিদিমণি,—কিন্তু এটা বড় খারাপ হোল। শ্যামলকে জিজ্ঞাসা করুন,—কি হয়েছে—"

সুনীল বলিল, "আমি বল্‌ছি। ছেলেরা কে কে বুঝি পুষ্পাঞ্জলি দেবে বলে ফুল খুঁজতে বেরিয়েছিল। কোথাও ফুল পায়নি,—তাই ঠাকুর-বাড়ীর ফুলবাগান থেকে তারা গোটাকতক ফুল ছিঁড়েছিল,—এই ব্যাপার! এই নিয়ে ঠাকুর-বাড়ীর মোহন্ত মহামারী ব্যাপার জুড়ে দিয়েছে।"

সুমতি বলিলেন, "ফৈজু তাতে কি করেছে?"

সুনীল বলিল, "মোহন্ত কৈবর্ত্তদের ছোট ছেলেটাকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছিলেন,—ফৈজু গিয়ে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়েছে,—এই আর কি, মোহন্ত তেড়ে উঠে, ওর টুঁটি টিপে ধরেছেন। কাযেই ও-ও তাঁর হাত ধরেছে—"

সুমতি দেবী শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "তার পর? মারামারিও করেছ ফৈজু?"

নাগ্‌রার ভিতর হইতে পা খুলিয়া লইয়া, নখে মাটী খুঁটিতে-খুঁটিতে, ফৈজু নীরবে সেই দিকে চাহিয়া ছিল,—সুমতির প্রশ্নে মাথা তুলিয়া, আরক্ত মুখে বলিল, "করি নি দিদিমণি,—কিন্তু করাই উচিত ছিল। আমি শুধু তাঁর হাতটা ধরে বল্লুম, 'খবরদার মোহন্ত মশাই, হাত নামান, জোরে আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌বেন্ না,—থামুন—'"

রুষ্ট স্বরে সুনীল বলিল, "সেটা মুখে না বলে কাযে বুঝিয়ে দেওয়াই তোমার উচিত ছিল ফৈজু,—তাহলে তিনি নির্লজ্জের মত এতটা গোলমাল করে বেড়াতে পারতেন্ না!"

শুষ্ক মুখে একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল "না ছোটবাবু, সে যে আমার মনীবের অপমান!"

উত্তেজিত হইয়া সুনীল বলিল, "হোক। সেই অপমান হওয়াই তো আমাদের উচিত! আমার ঠাকুরদাদারা আচ্ছা কীর্ত্তিই করেছেন! বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করেছেন, করে—এমন এক বৈষ্ণবকে তার সেবাইৎ হওয়ার ব্যবস্থা করে গেছেন,—যিনি বিষ্ণু তো বিষ্ণু—বিষ্ণুর চোদ্দপুরুষের মুরুব্বি হয়ে যা খুসি তাই করবেন! তাঁর অন্যায়ের ওপর কারুর কথাটি কইবার যো নাই! কি—না, বাগান থেকে ফুল থেকে গোটাকতক ফুল ছিঁড়ে নিয়েছে! কেন রে বাপু—তাতে তোমার মোক্ষ-পথে কি এমনি কাঁটা পড়ল?"

সুমতি দেবী অধোবদনে চুপ করিয়া রহিলেন। সুনীল একটু থামিয়া বলিল, "স্বীকার করি, বৈষ্ণব সম্মানের পাত্র।—কিন্তু কেমন বৈষ্ণব?, যার শরীরে এত ক্রোধ! যিনি কচি ছেলের গলা টিপে ধরে কীচক বধ করতে যান?"

শ্যামল ধমক খাইয়া অবধি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল; এইবার মর্কটের মত মিটি-মিটি চক্ষে চাহিয়া, নরমস্বরে বলিল "মোহন্ত মশাইকে দেখেই বড় ছেলেগুলো সব মার টেনে ছুট লাগিয়েছিল;—তাদের তো ধরতে পারে নি—ঐ ছোটটা ছুটতে পারে নি, তাই সেটা ধরা পড়ে গেছ্‌ল। উঃ, মোহন্ত মশাই দাঁত খিঁচিয়ে যে মার সুরু করেছিল,—আর একটু হলে ছেলেটা মরেই যেত।"

সুমতি দেবী বলিলেন, "তুমি কোথা ছিলে তখন?"

শ্যামল বলিল, "আমি তখন পাঁচিলের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখ্‌ছিলুম না—ফৈজু মামাকে আমিই তো ডাকলুম—না হলে ছেলেটা ভির্মী যেত তখনি।"

সুনীল ব্যঙ্গ স্বরে বলিল, "ভালই হোত! বৈষ্ণবের ধর্ম্মই হচ্ছে জীবে দয়া—মোহন্ত মশাই দয়া করে ছেলেটার ভব-যন্ত্রণা মোচন করে দিতে গিয়েছিলেন;—তোমরা পাপিষ্ঠ, তাই তেমন সৎকাযে বাধা দিয়েছ!—কি বল দিদি, এই নরাধম ভণ্ডটোর মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়!"

একটু হাসিয়া সনিঃশ্বাসে সুমতি দেবী বলিলেন "সে হিসাব বিজ্ঞ লোকেরা করবেন। আমি কিন্তু পুণ্যাত্মা বলে নাম জাঁকাবার লোভটাকে চিরদিনই ভয় করে চলি সুনীল,—তাই এই পাপাত্মা ভণ্ডটোর মুখপানে চেয়ে অসঙ্কোচেই বল্‌ছি, এরা ভাল কায না করলেও মন্দ কায যে কিছু করে নি, সেটা নিশ্চয়! ফৈজু, ওঠো তো দাদা,—ঢের বেলা হয়েছে, স্নান করে খেয়ে ঠাণ্ডা হওগে।"

বিদ্রূপের স্বরে সুনীল বলিল "তার পর দিদি? তোমার রায় মশাই আবার যদি টিকি নেড়ে—ছি, ছি, করতে আসেন?"

সুমতি স্মিত মুখে বলিলেন, "আমি তাঁর কাছে জবাব-দিহি করবার জন্যে দায়ী রইলুম,—আমি তাঁর ভাই-ঝি তো? তুমি নিশ্চিন্ত থাক ফৈজু, শ্যামল আমার সাক্ষী আছে।"

শ্যামল ভীতভাবে বলিল "কিন্তু মা, মোহন্ত মশাই ওদের কাছে মিথ্যে মিথ্যে করে আরো অনেক কথা বলেছেন যে;—ওরা যদি মোহন্ত মশাইকে শুদ্ধ নিয়ে আসেন তাহলে, তাঁর কথা ছেড়ে আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবেন না তো।"

ঈষৎ উষ্ণ ভাবে সুমতি দেবী বলিলেন, "মোহন্ত মশাই যে মুখে-মুখে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারেন, সেটা আমি অনেক দিন থেকেই জানি।—আজ তিনি মিথ্যে বলবেন, এটা মোটেই অসম্ভব নয়। যাই হোক, তুই তো সব শুনে রইলি সুনীল,—বলিস্। তবে হাজার হোক ব্রাহ্মণের ছেলে, বৈষ্ণব হয়েছেন, তাঁকে অপমান কোর না।"

সুনীল বাধা দিয়া বলিল, "না দিদি, আমি মাথায় করে পাদ্য-অর্ঘ্য দিতে রাজী আছি। কিন্তু তিনি যখন মিথ্যে কথা বলতে সুরু করবেন, তখন আমি স্পষ্টাক্ষরেই বল্‌ব, 'মশাই আপনি 'লায়ার'!' দ্যাখো দিদি, তখন তুমি রাগ করবে না?"

একটু হাসিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "হ্যাঁ করব, তা সে তুমি ইংরেজিতেই বল, আর সংস্কৃতেই বল! ছিঃ, অমি করেই কি বলতে আছে?"

সুনীল বলিল "বাঃ, সত্যি কথা বলতে নাই,—কিন্তু মিথ্যে কথা চুপ করে শুনতে আছে! চুপ করে না থাকতে পার্‌লেই বৈষ্ণবের সম্মানে ঘা দেওয়া হবে! বৈষ্ণবের স্পর্দ্ধাকে প্রশ্রয় দিলে পাপ নেই,—কিন্তু মানুষের ভণ্ডামীকে সংশোধন করতে চাইলেই, পৃথিবী শুদ্ধ পাপের বোঝা হুড়্‌মুড়্ করে ভেঙ্গে ঘাড়ের ওপর পড়বে—এ তো তোমার চমৎকার যুক্তি, দিদি!"

সুমতি বলিলেন, "দিদি কোন যুক্তিই তোকে দেয়নি সুনীল,—তুই থামকা তর্ক করিস্‌নে, থাম! আমি মোহন্তর সাম্‌নে বেরুই না, তাই বলছি,—যদি তিনি আসেন, তাঁকে সোজাসুজি একটু বুঝিয়ে বলিস।"

সুনীল বলিল, "তিনি সোজাসুজি বোঝবার ছেলেই নন, তা তাঁকে বোঝাব কি? তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ,—তার পর শিখেছেন কল্‌কাতার থিয়েটারের হিজ্‌ড়ের নাচ,—তার পর হয়েছেন এখন বৈষ্ণব—তার ওপর তোমার ঠাকুর্দ্দার ঠাকুর-বাড়ীর মোহন্ত,—তাঁর ইজ্জত কত! এক কথা কইলে, তিনি লাখ্ কথা কয়ে বসেন। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে হলে, এখন আমার ঠাকুর্দ্দাকে ডেকে আনতে হবে।"

সুমতি ব্যস্ত-বিব্রত হইয়া বলিলেন, "থাক্ সুনীল, তোর পায়ে পড়ি, থাম বাপু,—কি বক্তারই হয়ে উঠেছিস্! জ্বালাতন!"

সুনীলের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা-উৎসাহ দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল! থতমত খাইয়া, সসঙ্কোচে বলিল, "আচ্ছা দিদি, থাম্‌লুম, রাগ করো না—বল, কি বলছ।"

সুমতি দেবী বলিলেন "যা শুন্‌লি, মোহন্তর সামনে বল্‌তে পার্‌বি তো?"

ঘাড় নাড়িয়া সুনীল বলিল, "খুব, কিন্তু তিনি যদি না শোনেন?"

সুমতি দেবী বলিলেন,—"না শোনেন, তিনি অন্য জায়গায় মোহন্তগিরির চেষ্টা দেখ্‌তে পারেন,—এখানকার কায তাঁর পোষাবে না।"

উৎসাহের সহিত সুনীল বলিল, "এটেই সব চেয়ে ভাল কথা। ওঠো ফৈজু, বাড়ী যাও।"

ফৈজু বিমর্ষ ভাবে বলিল, "না ছোটবাবু, এ কাম ভাল হবে না,—আপনারা অতদূর এগুবেন না!"

বাধা দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে শ্যামল বলিল, "দ্যাখো না ফৈজু মামু, খুব ভাল কায হবে—এবার আমি ঠাকুর-বাড়ীর মোহন্ত হব, ভয় কি!" সুমতি দেবীর দিকে চাহিয়া আশ্বাস-ভরা স্বরে বলিল, "মা, আপনাকে দুবেলা মালপো আর মোহনভোগ পেসাদ এনে দেব।"

সুমতি দেবী হাসিয়া বলিলেন "আহা, মার পেটের চিন্তা করতেই ছেলে আমার সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেল! মরে যাই বাছা, তোমার কি কপালের ভোগ!—"

সুনীল হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। ফৈজুও হাসি মুখে শ্যামলের দিকে চাহিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতে-ছিল,—কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাহিরের দুয়ারে আর এক-যোড়া নাগ্‌রা জুতার শব্দ হইল! সকলে সন্ত্রস্ত ভাবে চুপ করিল।

মুসৌরী-ভ্রমণ

[শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায় বি-এল]

পঞ্জাব-মেল ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বেই হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিলেই মনে হয় যেন কোনও অলৌকিক স্থানে আসিয়া অসংখ্য নরনারী, তাহাদের অন্তহীন লগেজ রাশি লইয়া অসাধারণ ক্ষিপ্রতা সহকারে সুদীপ্ত আলোকরশ্মির মধ্যে দৌড়িয়া বেড়াইতেছে এই যাদুঘরে আসিলে যেন কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়—এমনই একটা চঞ্চলতা!

লড়াইএর হাঙ্গামায় এখন আর বম্বে মেলের পৃথক গাড়ী নাই—পঞ্জাব-মেলই বৃহৎ যাত্রীর বোঝা লইয়া যথাসময়ে যাত্রা করিল। দেয়াড়ন পর্য্যন্ত আমাদের টিকিট। আমরা মধ্যে লক্ষ্ণৌ একবার নামিয়া দুইদিন কাটাইলাম। আমার শৈশব বন্ধু অবিনাশের মাতুল লক্ষ্ণৌএর একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী প্রবাসী;—অবিনাশের সঙ্গে বহুকাল পূর্ব্বে একবার লক্ষ্ণৌ আসিয়াছিলাম; তার অনেক দিন পরে এই আবার আসিলাম। লক্ষ্ণৌএর প্রধান-প্রধান দেখিবার স্থানগুলি আর একবার দেখিয়া লইলাম। লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সিতে গেলাম। এই প্রকাণ্ড সৌধ একদিন ধূলিসাৎ হইতে পারে; কিন্তু ইতিহাস-ক্ষেত্রে ইহার যে প্রস্তরমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা কোনও দিন অপসারিত হইবে না। রেসিডেন্সি হইতে ইমামবাড়ায় গেলাম;—যেন একটা বাদশাহী কল্পনাকে কেহ বাস্তবে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। যাহারা এই সব প্রকাণ্ড প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের রাজত্ব স্বপ্নে অবসান হইবে। ইমামবাড়া হইতে তসবির-খানায় গেলাম। সেখানে নিম্নলিখিত আলেখ্যগুলি আছে:—

	নাম	রাজত্ব-কাল		
(১)	সাদত-খাঁ	১৭৩১	হইতে	১৭৩৯
(২)	মনসুর আলি	১৭৩৯	„	১৭৫৩
(৩)	সুজাউদ্দিন	১৭৫৩	„	১৭৭৫
(৪)	আসফউদ্দৌলা	১৭৭৫	„	১৭৯৭
(৫)	সৌদত আলি	১৭৯৮	„	১৮১৪
(৬)	গাজিউদ্দিন	১৮১৪	„	১৮২৭
(৭)	নাসিরউদ্দিন	১৮২৭	„	১৮৩৭
(৮)	মহম্মদ শাহ	১৮৩৭	„	১৮৪২
(৯)	আমজাদ আলি	১৮৪২	„	১৮৪৭
(১০)	ওয়াজেদ আলি	১৮৪৭	„	১৮৫৬

তৈল চিত্রগুলি সুন্দর;—শেষ চিত্রখানি কলিকাতায় ১৮৮৩ সালে জনৈক H. C. Sing কর্ত্তৃক প্রস্তুত। অপর চিত্রগুলি বিলাতে প্রস্তুত। প্রথম রাজার সমাধি-মন্দিরও দেখিলাম। কাইজার-বাগে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া হোসেনাবাদ ফটক, রুমী-দরজা, বেলীগার্ড গেট ও ছত্তরমঞ্জর প্রাসাদ দেখিয়া শা নাজফ নামক গোরস্থানে গিয়াছিলাম। সমস্ত লক্ষ্ণৌ সহরই আমার নিকট একটা বিরাট গোরস্থান বলিয়া প্রতিভাত হইল। প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য যেমন কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়, লক্ষ্ণৌএর সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন একটা বিষাদের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। হায় মুসলমান! তোমাতে একটা প্রাণ ছিল, একটা মহত্ত্ব ছিল, একটা বিরাট কল্পনা ছিল, একটা যা ছিল তা কেবল "বাদশাহী" এই কথাতেই ব্যক্ত করা যায়,—তোমার জন্য প্রাণ কাঁদে বৈ কি? তুমি আমার কতকালের সঙ্গী, কত দীর্ঘকাল ধরিয়া একই সুখ-দুঃখে—একই আধি ব্যাধিতে তরঙ্গায়িত হইতেছি;—তোমার সেদিন আর এদিনের কথা মনে পড়িলে প্রাণ ব্যাকুল হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? বিমর্ষ চিত্তে ধীরে ধীরে ভিক্টোরিয়া পার্কে গিয়া বসিলাম। সেবার অবিনাশের সহিত লক্ষ্ণৌ আসিয়াছিলাম, প্রাতঃ সন্ধ্যায় এইখানে দুই জনে বসিয়া কত কথা, কত সুখ দুঃখের, কত আশা-কল্পনার আলোচনা করিতাম। অবিনাশ আমাদের শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম ছাত্র ছিল,—বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রুড়কী কলেজের শেষ পরীক্ষায়ও প্রথম হইয়াছিল। শৈশব হইতেই তাহার আশা, কল্পনা ও ভবিষ্যতের চিত্র অসাধারণ ছিল। তাহার রূপও অসাধারণ ছিল। তাই সকলে তাহাকে রূপে ও গুণে

"হীরার টুক্‌রা" বলিত। বহুদিন অবিনাশকে দেখি নাই। এই সান্ধ্য-ছায়ায়, সান্ধ্য-সমীরণে পূর্ব্বস্মৃতি-বিজড়িত স্থানে বহুবার অবিনাশের কথা মনে পড়িতে লাগিল। হায়! অবিনাশ এখন কোথায়?

লক্ষ্ণৌ হইতে যাত্রা করিয়া তৎপর দিবস প্রাতে দেরাডুনে পৌঁছিলাম। দেরাডুনের কতিপয় প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান তাড়াতাড়ি দেখিয়া লইলাম। ফরেষ্ট স্কুল, সর্ভে অফিস, দূরবীণ গৃহ দেখিলাম। ডাকাতের গুহার (Robber's cave) দ্বারদেশে আসিলেই মনে হয়, ইহার মধ্যে বুঝি ডাকাইতের দল লুক্কায়িত আছে। গুহার ভিতর প্রবেশ করিলে তাহা প্রকৃত ডাকাইতেরই বাসস্থান বলিয়া প্রতীত হয়। দেরার প্রধান দ্রষ্টব্য শিখ মন্দির। নানকের বংশ-জাত রামরায় দেরাডুন সহরের স্থাপয়িতা। তিনি ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে সম্রাট আরংজেবের নিকট হইতে পত্র পাইয়া ঘাড়োয়ালের রাজা ফতে সিংএর নিকট আগমন করেন। কিছুদিন অন্যত্র থাকিয়া দেরাডুনে তাঁহার বাসস্থান স্থির করেন এবং বর্ত্তমান মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত করেন। অনেক শিষ্য-সেবক চারি দিক হইতে এই গুরুদ্বার বা দেরায় আসিতে আরম্ভ করে। মন্দিরটী সুন্দর; সম্মুখে একটা দীর্ঘ শালবৃক্ষের দণ্ড বা "ঝাণ্ডা" দণ্ডায়মান! দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ পুষ্করিণী। প্রতি বৎসর একবার এখানে মেলা হয়। তখন ঝাণ্ডাটী নামাইয়া তাহাকে আচ্ছাদিত ও সুশোভিত করিয়া পুনরায় উত্তোলিত করা হয়। পাঁচ বৎসর অন্তর নূতন শাল বৃক্ষের ঝাণ্ডা প্রস্তুত হয়। মন্দিরের ভিতরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুসুম-ধূপ সুরভিপূর্ণ;—প্রকৃতই দেবতার আবাসভূমি।

দেরাডুন ভাল করিয়া দেখা হইল না। মোটরে সাত মাইল দূরবর্ত্তী রাজপুরে পৌঁছিলাম। রাজপুর হইতে মুসৌরী ৭।৮ মাইল। আমাদের মধ্যে কয়েকজন ডাণ্ডীতে ও কয়েকজন অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে মুসৌরী আমাদের পদরজঃ স্পর্শে ধন্য হইল। বাসা পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল;—সেইখানে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

মুসৌরীর রূপ আমাদের মনোহরণ করিল। আকাশের দিকে তাকাইয়া-তাকাইয়া আর তৃপ্তি হয় না। কি সুন্দর সুনীল আকাশ! খণ্ড-খণ্ড শুভ্র-মেঘ তাহাতে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। পাখীর মধুর কাকলি প্রকৃতির গীত শুনাইতে লাগিল। ডালিয়া—ডালিয়ার অরণ্য—পাহাড়ের গায় সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ডালিয়ার কি বর্ণ? লাল, সাদা, ভেলভেট্, হরিদ্রা - কত বর্ণের। লাল আবার কত রকমের—গভীর লাল, ফিকে লাল, লাল ও সাদা মিশান। ডালিয়া উপরে—ডালিয়া নীচে! এখানে কেলু বৃক্ষ বেশী নাই; কিন্তু ওক বৃক্ষে পাহাড় আচ্ছন্ন—দীর্ঘ, যোগী-কল্প ওক-বৃক্ষ—স্থানে স্থানে তাহাকে জড়াইয়া আইভি লতা।

মুসৌরীর প্রধান সৌখীন স্থান মাল (mall)। মালে যাইবার রাস্তার দুই পার্শ্বে বহু দোকান—কলিকাতার প্রধান-প্রধান সাহেবী দোকানের শাখা এবং অনেক মাড়োয়ারীর দোকান। সখের জিনিসের দোকান, ফোটোগ্রাফীর দোকান, ক্লাব, হোটেল, Materinty home—সাহেবদের স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের সহিত থাকিতে গেলে যাহা কিছু দরকার—তাহা সকলই আছে। এই রাস্তায় যখনই যাওয়া যায়, সাহেব মেমের ভিড়;—সাহেব মেম হাত ধরাধরি করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে, রিকসায়, ডাণ্ডীতে পরীর ন্যায় বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। একটা জিনিস আমার চিরদিনই বিস্ময় উৎপাদন করে। সাহেব মেম যখনই বেড়ায়, তখনই হাসির উৎস,—প্রত্যেক কথায় হাসির ছটা বিকীর্ণ হইতেছে। এ হাসে, ও হাসে - সকলেই হাসে। এত হাসি উহারা কোথায় পায়? এত হাসি কি ভাল লাগে? এত হাসির কথা কি হইতে পারে? একটী কথা,—অমনি হাসি; আর একটী কথা,—আবার হাসি! হাসির লহরী স্তবকে-স্তবকে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া গড়াইয়া যাইতেছে। উহাদের কি রোগ শোক দুঃখ কিছুই নাই? —উহাদের আকাশে কি কৃষ্ণপক্ষ নাই?—উহাদের কি শীত নাই, বর্ষা নাই—কেবলি কি শুক্লপক্ষ, কেবলি কি বসন্ত! না, শুধুই দোকানদারী—হৃদয়ের অন্তস্তল নিজেরই নিকট গোপন রাখিয়া মুখে কেবল হাসির অভিনয়! আমি এ রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

মাল যেখানে পশ্চিমে গিয়া শেষ হইল, সেইখানে লাইব্রেরী;—লাইব্রেরীর সম্মুখে ব্যাণ্ড বাজাইবার স্থান। সোমবার, বুধবার, শনিবার এই স্থানে ব্যাণ্ড বাজে। সহরের অধিকাংশ সাহেব মেম তখন এইখানে সমবেত হন। লাইব্রেরীতে সভ্যগণের বসিয়া বাজনা শুনিবার স্থান আছে। নিকটস্থ হোটেলের বারাণ্ডায় বসিয়া চা-পান করিতে-করিতে

রূপসীগণ ব্যাণ্ড শুনেন এবং নিকটস্থ পুরুষগণের হৃদয়ে আশা নিরাশার অনেক তরঙ্গ তুলেন।

ম্যল রাস্তার এক পার্শ্বে Camels Back বা উষ্ট্র পৃষ্ঠ নামক পাহাড়। ঐ পাহাড়টা দেখিতে উষ্ট্রের পৃষ্ঠের ন্যায়। ঐ পাহাড়ের এক পার্শ্বে মাল-রোড—অপর পার্শ্বে ক্যামেলস্ ব্যাক রোড। ঐ পাহাড় ও তাহার উভয় পার্শ্বস্থ দুইটী রাস্তা মুসৌরীর জীবন ও মুসৌরীর গৌরব। ক্যামেলস্ ব্যাক রোড লাইব্রেরীর নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া পূর্ব্বদিকে রিঙ্ক থিয়েটারের নিকট আসিয়া পুনরায় ম্যল রাস্তায় মিশিয়াছে। এই রাস্তার উপর বাড়ী ঘর অল্প, দোকানাদি আদৌ নাই। রাস্তাটী শান্ত, নীরব;—সম্মুখে গিরিশ্রেণী তরঙ্গায়িত—অনন্ত—দূরে—অদূরে! প্রাতে চিরতুষার-কিরীটিনী গিরিশ্রেণী প্রাতঃ সূর্য্যকরে ঝলমল করিতে থাকে। বিকালেও আমরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া ঐ রাস্তায় বেঞ্চের উপর বসিতাম। শান্ত শীতল সন্ধ্যাসমীরণে দেহ মন প্রফুল্ল হইত।

সঙ্গী গোপালবাবু আমাকে সন্ধ্যাকালে লাল টিব্বায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন; কিন্তু স্থানটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়া আমি যাইতে সাহসী হইতাম না। একদিন তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না; ধীরে ধীরে সেখানে উপস্থিত হইলাম। কি সুন্দর! অতি দীর্ঘ চিরতুষার-মণ্ডিত গিরিশ্রেণী যেন কত নিকটে;—তাহাদের রূপসম্ভার অনির্বচনীয়। অস্তগামী সূর্য্য-কিরণে তখন আকাশে, মেঘে, পর্ব্বতে, অনন্ত তুষার-মালায় যে বিচিত্র বর্ণ বিকাশিত হয়, তাহা বিধাতার স্ব-রচিত মহাকাব্য। পশ্চিমদিকে একটী পাহাড় ধূসরবর্ণে রঞ্জিত হইল;—নীলাকাশে যে সকল শুভ্র পথহারা মেঘ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা হঠাৎ রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল—শুভ্র তুষারশ্রেণী রক্তিমাভ,—ক্রমে দেখিতে-দেখিতে "জবাকুসুম সঙ্কাশ" হইয়া পড়িল। পাহাড়ের পাশে মেঘ,—মেঘ কি পাহাড়, নির্ণয় করা দুষ্কর—তাহারাও রক্তবর্ণ। দেখিতে-দেখিতে সে রং কোথায় গেল? শ্যামল অন্ধকার—ধীরে-ধীরে সব ঢাকিয়া সব মুছিয়া দিল। নীল আকাশে সোণার ফুল ফুটিয়া উঠিল। আমরা ধীরে-ধীরে নামিতে আরম্ভ করিলাম;—অপর একটী বাঙ্গালীও নামিতেছিলেন;—নিকটে আসিলে চিনিলাম অবিনাশ! অবিনাশের সহিত যে এরূপ ভাবে মুসৌরীতে দেখা হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। গোপালবাবুও অবিনাশকে চিনিতেন। গোপাল বাবু, আমি ও অপরাপর সঙ্গী নিকটস্থ অবিনাশের বাসায় গেলাম। আমাকে আর অবিনাশ ছাড়িল না; আর সকলে কিছুক্ষণ পরে বাসায় চলিয়া গেলেন।

তাহার পরদিন কেম্পটী ফল (Kempty-falls) দেখিতে যাই। শিমলা রোড দিয়া ক্রমশঃ নামিতে হয়। দুই ধারে পাহাড়ের অযাচিত সৌন্দর্য্যের উপহার। কোনও স্থানে পাহাড়ে লতাগুল্মের চিহ্নমাত্র নাই,—একটী সমগ্র প্রস্তর-মন্দিরের মত; আবার কোথায়ও একটী পাহাড় একটী অরণ্য-বিশেষ। স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব সুগন্ধ নিকটে সুরভি-কুসুম-নিবাসের পরিচয় দেয়,—স্থানে স্থানে কুসুম-গরিমা নয়নের প্রীতি সম্পাদন করে। পাখীদের অবিশ্রান্ত কাকলি নিত্য সহচর। দুই ধারে পাহাড়ের তরঙ্গ নীলাকাশে চিত্রের ন্যায় অঙ্কিত। মাঝে-মাঝে জল-প্রপাতের মধুর গম্ভীর ধ্বনি পর্ব্বতের প্রাণময়তা প্রমাণ করে। কেম্পটী-ফলের নিকটবর্ত্তী হইলেই বুঝিতে পারা যায়—কারণ এরূপ জল-প্রপাত-ধ্বনি পূর্ব্বে শ্রুত হয় নাই। শব্দ হইতেই অনুমিত হয় যে, জল অনেক উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইতেছে এবং জলসম্ভার সামান্য নহে। ক্রমে হঠাৎ সেই জলপ্রপাত নয়ন-গোচর হইল। প্রথম দেখিলে মনে হয়, যেন কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের উপর কেহ কোনও শুভ্রবর্ণ চিত্রিত করিয়া দিয়াছে—স্থির, অচঞ্চল, শুভ্রবর্ণ। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে সেই শুভ্র বর্ণের মধ্যে যে একটা গতি আছে, তাহা পরিলক্ষিত হয়। ওপারে জলপ্রপাত যে গিরির অঙ্গভূষণ, সেই গিরি—মধ্যে উপত্যকা; এ-পারের পাহাড়ের উপর আমরা দাঁড়াইয়া আছি। জলপ্রপাত ঠিক সম্মুখে। কত দূর-দূরান্তর হইতে পাহাড়ের ভিতর দিয়া সলিলরাশি প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে;—হঠাৎ এইখানে তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছে,—বহুবেগে বহুবলে পাহাড়ের গা বহিয়া নীচে পড়িতেছে। অবিরাম, অবিশ্রাম—রাত নাই, দিন নাই—সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই,—আপনার প্রাণের গীত গাহিতে-গাহিতে চলিয়াছে, এবং নিকটস্থ নদীর জীবন সঞ্চার করিতেছে। সুন্দর দৃশ্য! আমি ও অবিনাশ এ-পারের পাহাড়ে থাকিয়াই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম, অপর বন্ধুগণ জলপ্রপাতের তলদেশে গমন করিলেন। অবিনাশের যেন কি একটা হইয়াছে। সে বিরাট আশা ও কল্পনার উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি

তাহাতে আর লক্ষ্য হয় না। গত রাত্রে আমি যতবার জাগিয়াছি, অবিনাশকে বিনিদ্র ও চিন্তামগ্ন দেখিয়াছি।

আজ বাসায় ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। রাস্তায় অবিনাশ যেন কতবার কি বলিতে যাইতেছিল,—বলিতে পারিল না। আমিও মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই।" শেষ জীবনের কয়েকটী ঘটনায় যেন তাহার জীবন বিষাদ ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। অবিনাশের রূপ-পিপাসা অতি প্রবল ছিল। বিবাহের জন্য যতগুলি ক'নে দেখিয়াছিল, তাহার একটীও তাহার পছন্দ হয় নাই। পরে তাঁহার দাদা যাহাকে পছন্দ করিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, সকলেই তাহাকে সুন্দরী বলিত; কিন্তু সেও অবিনাশের কল্পনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। বিবাহের অল্পদিন পরেই অবিনাশের স্ত্রী অবিনাশকে একটী পুত্র-সন্তান উপহার দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। পুত্রটীও সম্প্রতি সৈনিক শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমি মনে করিলাম যে, এই সকল ঘটনায় অবিনাশের চিত্ত নিতান্তই ব্যাকুল আছে। আমি অবিনাশের বাসাতেই থাকি—তাহারই শয়ন কক্ষে আমারও শয্যা। আহারান্তে আমি শয্যাগ্রস্ত, অবিনাশ তাহার টেবিলের সম্মুখে বসিয়া। আমি অবিনাশকে বলিলাম, "তুমি আর একটী বিবাহ করিলে না কেন?"

অবিনাশ। সুন্দরী ক'নে কোথায় পাওয়া যায়?

আমি। এত বড় ভারতবর্ষ; এর মধ্যে একটা সুন্দরী পাওয়া গেল না, কুমারী হউক বিধবা হউক।

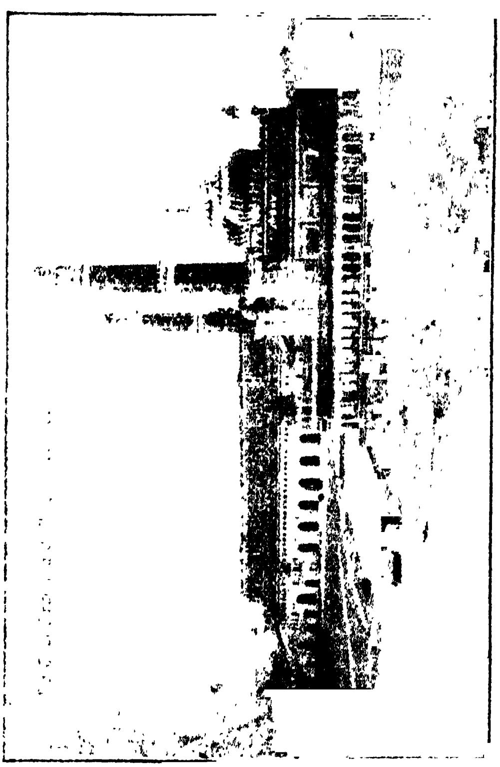
অবিনাশ। একটা মাত্র—একটা—এত বড় দুনিয়ায় একটা মাত্র সুন্দরী দেখিয়াছি—সুন্দরী বটে।

আমি। তাহাকে বিবাহ কর না কেন?

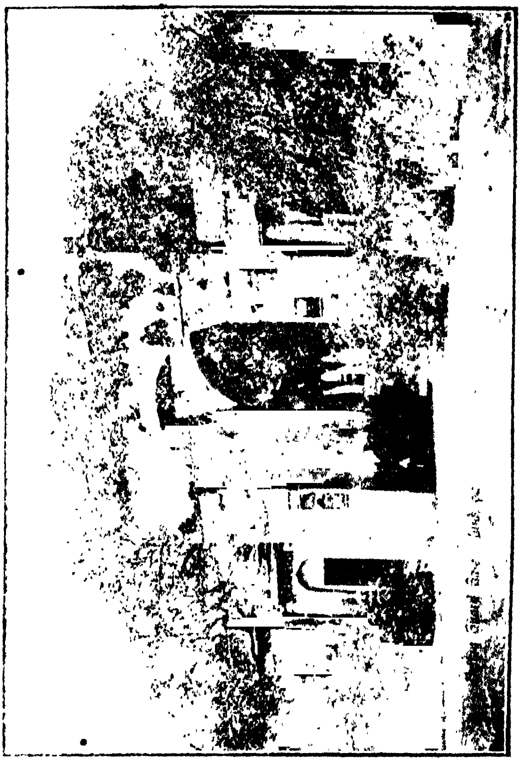
"তুমি ঘুমাও" বলিয়া সেই রাত্রে ঘরের দরজা খুলিয়া অবিনাশ বাহির হইয়া গেল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল তখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখি ঘরে বিদ্যুতের বাতি জ্বলিতেছে; অবিনাশ ঘরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অস্থির-ভাবে পাদচারণ করিতেছে; মাঝে-মাঝে দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া বাহিরের কি দেখিতেছে।

আমি অবিনাশকে বলিলাম, "অবিনাশ, তুমি ঘুমাও নাই, কি হইয়াছে ভাই?" অবিনাশ ছুটিয়া আসিয়া আমার শয্যাপ্রান্তে বসিল, বলিল, "শুনিবে—তবে শুন।" আমি উঠিয়া বসিলাম, অবিনাশ বলিতে আরম্ভ করিল।

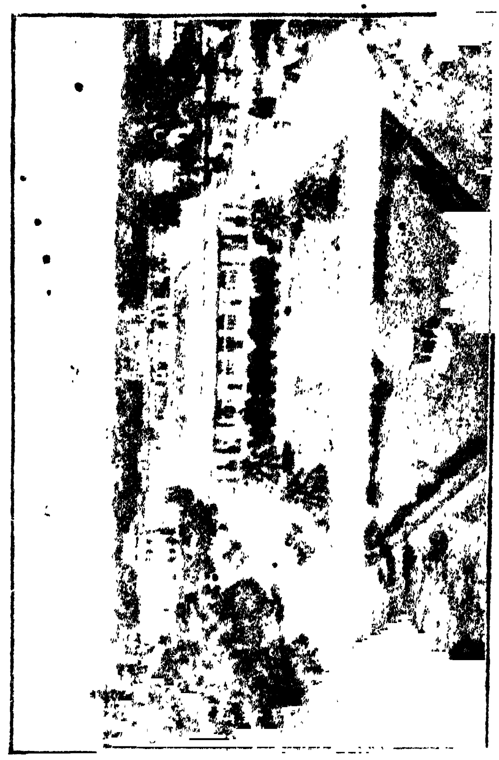
"আমার স্ত্রী-বিয়োগের পর অনেক স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। অনেক মেয়ে দেখিলাম—তাহার মধ্যে দুই একটা বিধবাও ছিল—অনেক ফোটো দেখিলাম, একটীও আমার পছন্দ হইল না। যাহা দেখিলাম, তাহা যেন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সুলভ—তেমন যেন আর কোথায়ও না কোথায়ও দেখিয়াছি। সে রূপ কোথায়, যাহা পৃথিবীতে দুর্লভ, যাহা দেখিলে পৃথিবীকে স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে, যাহা প্রাণের সর্ব্বাঙ্গকে সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের মত আলোড়িত করিয়া দিবে, যাহা দেখিলে মনে হইবে, এইখানে বিধাতার কারুকার্য্য শেষ হইয়াছে। এই রূপ দেখিতে দেখিতে, এই রূপ ধ্যান করিতে-করিতে আমার জীবনের অবসান হউক —সে রূপ ত দেখিতে পাইলাম না। একদিন এই মুসৌরীতে, এক পূর্ণিমা রাত্রে—আজও ত পূর্ণিমা" এই বলিয়া অবিনাশ ঘরের কয়েকটী জানালা খুলিয়া দিল; জ্যোৎস্নার বন্যা ঘরে আসিয়া পড়িল; অতি মৃদু, অতি শীতল বায়ু স্রোত প্রবাহিত হইল। অতি সুন্দর, সুনীল, তারাখচিত আকাশে পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ দেখা গেল। অবিনাশ আবার বলিতে লাগিল, "দেখ দেখ, সম্মুখের ঐ পাহাড়টী কেমন সুন্দর দেখাইতেছে, যেন জ্যোৎস্না-সাগরে বরফের পাহাড় ভাসিতেছে। দেখ দেখ রূপ দেখ—রূপ দেখিলে প্রাণ পাগল হয় কি না? আমি স্থির করিলাম, আমি মুসৌরীকে বিবাহ করিব। তাই মুসৌরীতে এই বাড়ী প্রস্তুত করিলাম। ছেলেকে রবিবাবুর বোলপুরের স্কুলে দিয়া আমি এইখানেই অবস্থান করিলাম। অনেক বুদ্ধি খাটাইয়া এই বাটী প্রস্তুত করিলাম। বাড়ীর তিন অংশ ভাড়া দেওয়া যাইবে এবং এক অংশে নিজে থাকিব, এইরূপ ভাবে বাড়ী করিলাম। একটা দুর্বুদ্ধি মাথায় আসিয়াছিল। ভাড়াটীয়াদের শুইবার ঘরগুলি আমার ঘরে বসিয়া অলক্ষ্যে দেখিতে পাইব, এবং অলক্ষ্যে কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইব, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। এই ঘরের দেওয়ালে ঐ যে ছিদ্রগুলি দেখিতে পাইতেছ—ও-গুলি আমি রাত্রে খুলিয়া রাখিয়াছি। ঐ ছিদ্র দিয়া ভাড়াটীয়াদের ঘরগুলি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ছিদ্রগুলি বন্ধ করিলে ওখানে কোনও ছিদ্র থাকা অনুমানও করা যায় না।



ইমামবারা ও মস্জীদ্ (একাংশ)—লক্ষ্ণৌ



বেলিগার্ড গেট—লক্ষ্ণৌ



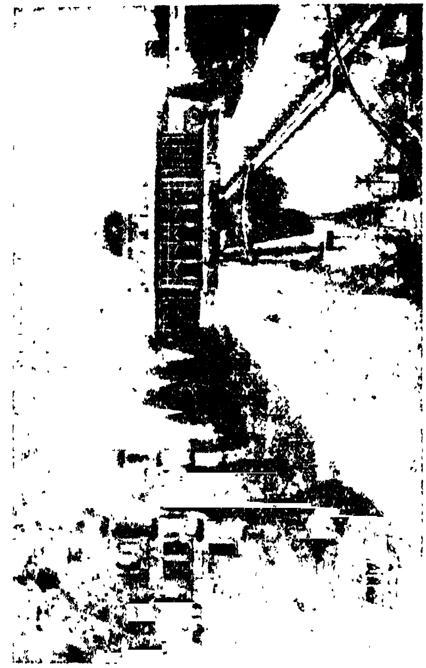
কাইজারবাগ-প্রাসাদ—লক্ষ্ণৌ



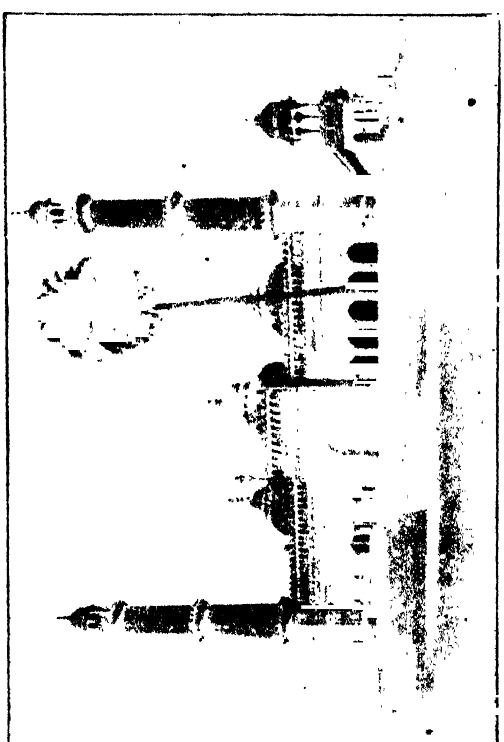
কাইজার বাগ—লক্ষ্ণৌ



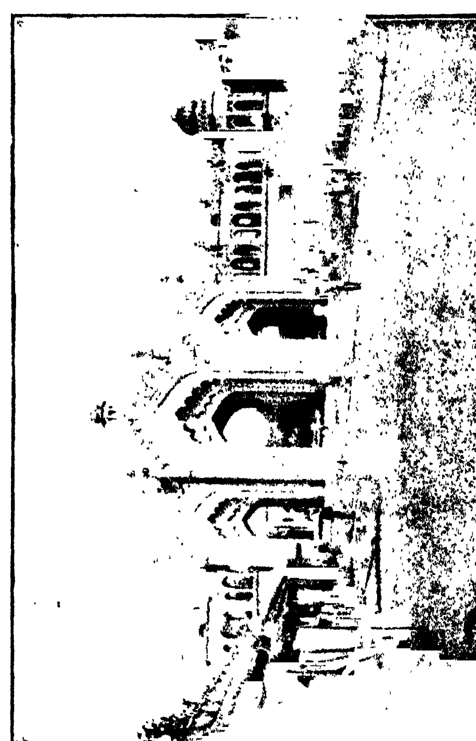
ছত্র মঞ্জিল প্রাসাদ—লক্ষ্ণৌ



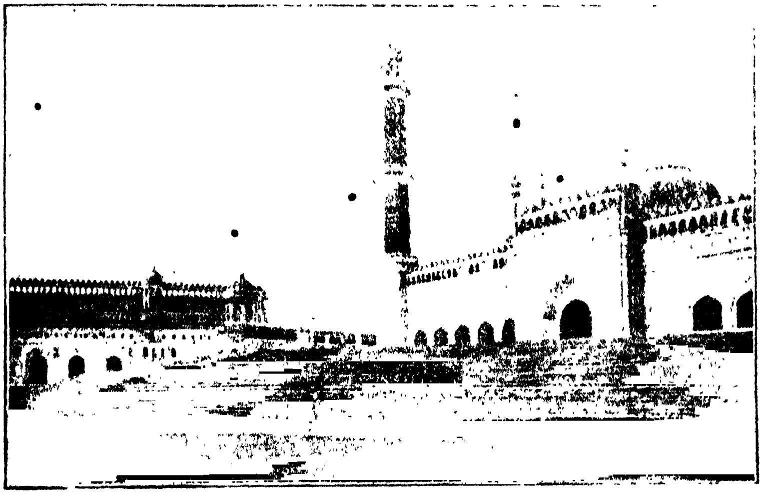
ইমামবারা, হোসেনাবাদ—লক্ষ্ণৌ



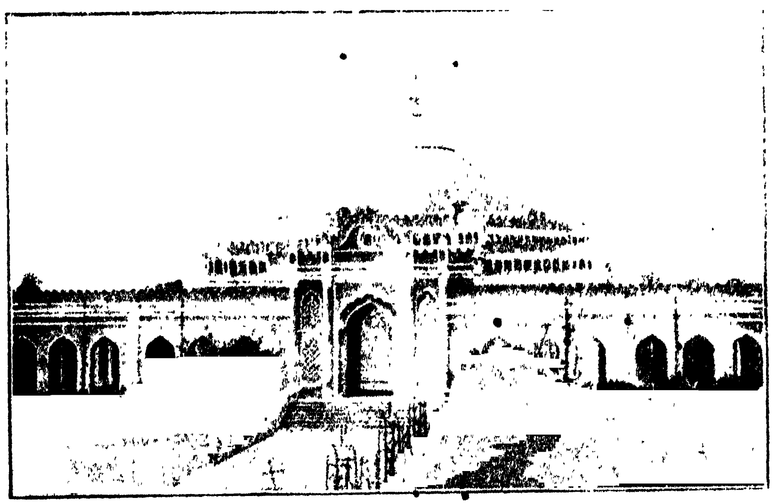
ইমামবারা মসজিদ—লক্ষ্ণৌ



হোসেনাবাদ গেট—লক্ষ্ণৌ



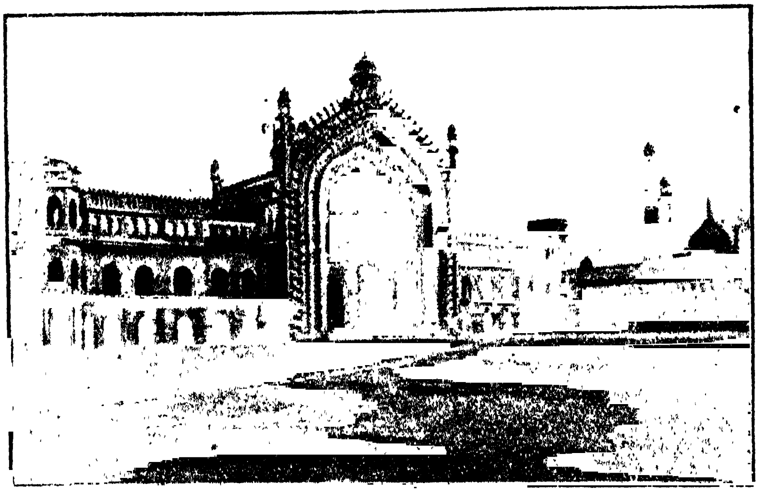
ইমামবারা ও মসজিদ (অপরাংশ)- লক্ষ্ণৌ



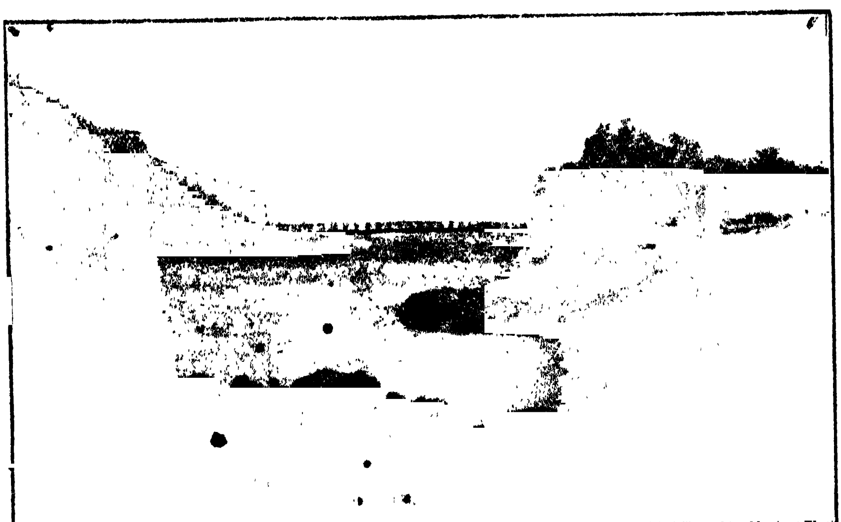
অযোধ্যার প্রথম রাজার সমাধি—লক্ষ্ণৌ

একদিন এক দ্বারবান আসিয়া এক অংশ ভাড়া লইয়া দুইমাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়া গেল। তাহার পরদিন একটি রুগ্ন যুবক ও একটি বিধবা যুবতী ঐ দ্বারবান ও ভৃত্যাদি সঙ্গে লইয়া গৃহ-প্রবেশ করিল। যে রূপের জন্য আশৈশব পাগল হইয়া বেড়াইতেছি, সে রূপ যে কি, তাহা ত ঠিক ধরিতে পারিতাম না,—কল্পনায়ও আঁকিতে পারিতাম না;—তাই বুঝি বিধাতা আমাকে দয়া করিয়া রূপ কি তাহা দেখাইয়া দিলেন। সে রূপ একবার মাত্র দেখিলে সমস্ত জীবনে আর তাহা ভোলা যায় না। সমস্ত প্রাণ পরিপূর্ণ করিয়া আছে। সে যে কি, তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না।

আমি এই ছিদ্র দিয়া সমস্ত রাত্রি সেই রূপ দেখিতাম,—দীপ আলোকে বৃহৎ হীরকখণ্ডের জ্যোতি যেরূপ ঠিকরিয়া পড়ে, বিদ্যুতের আলোকে রূপসীর রূপ সেইরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িত। রূপের নেশায় আমাকে বিভোর করিয়া দিত। আমার বড়ই ইচ্ছা হইত যে, উঁহাদের নিকট গিয়া উঁহাদের সহিত আলাপ করি। কিন্তু আমার সাহস হইত



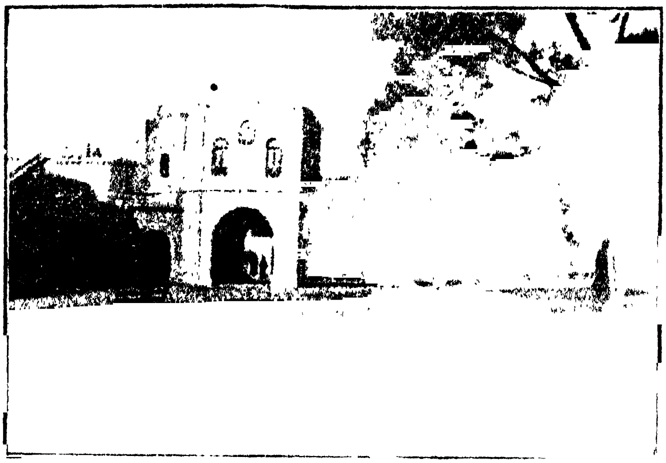
রুমি দরওয়াজা—লক্ষ্ণৌ



লছমনঝোলা—হৃষীকেশ

না, বিশেষতঃ যুবকটী কথন একাকী বাহির হইতেন না, তিনি রুগ্ন বলিয়া ঘরের মধ্যেই থাকিতেন। যুবকটিকে একাকী পাইলে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল বিষয় অবগত হইতে পারিতাম।

অল্পদিন পরেই এথানকায় প্রধান ডাক্তার, অবসর-প্রাপ্ত সিভিল সার্জন প্রভাত বাবু রোগীকে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ প্রত্যহ একবার দেখিতেন—পরে প্রত্যহ দুইবার,—একবার দিনে এবং অপরবার সন্ধ্যার পর দেখিতে আসিতেন। প্রভাতবাবু আমার পরিচিত। একদিন তিনি যথন সন্ধ্যার পর রোগী দেখিতে যাইতেছিলেন, আমিও তাঁহার সহিত গেলাম। যুবতী আমাদিগকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং “আসুন” “আসুন” বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা চেয়ারে বসিবার পূর্ব্বেই যুবতী আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন “অবিনাশ বাবুর আজ এ কি অনুগ্রহ? ডাক্তারবাবু বুঝি জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছেন।” পরে ডাক্তারবাবুর দিকে



জি, টি, সর্ভে আফিস—দেরাদুন

(শ্রীযুক্ত শৈলনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)



টেলেস্কোপ গৃহ—দেরাদুন

(শ্রীযুক্ত শৈলবাবুর গৃহীত চিত্র)



ডাকাতের গুহা—দেরাদুন

(শ্রীযুক্ত নীরজনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)



ফরেষ্ট স্কুল—দেরাদুন

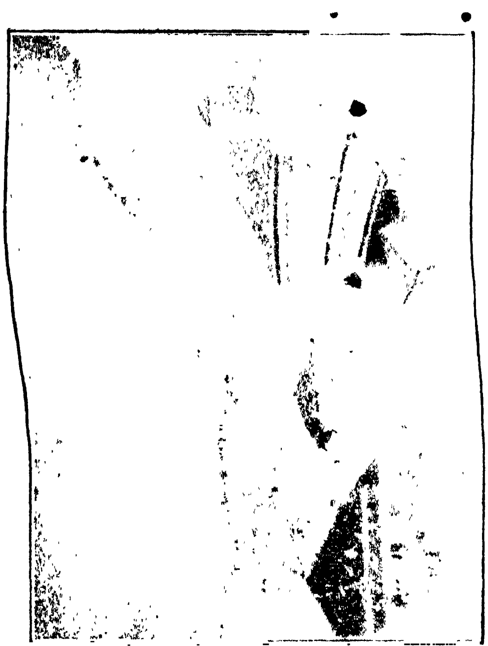
(শ্রীযুক্ত শৈলবাবুর গৃহীত চিত্র)



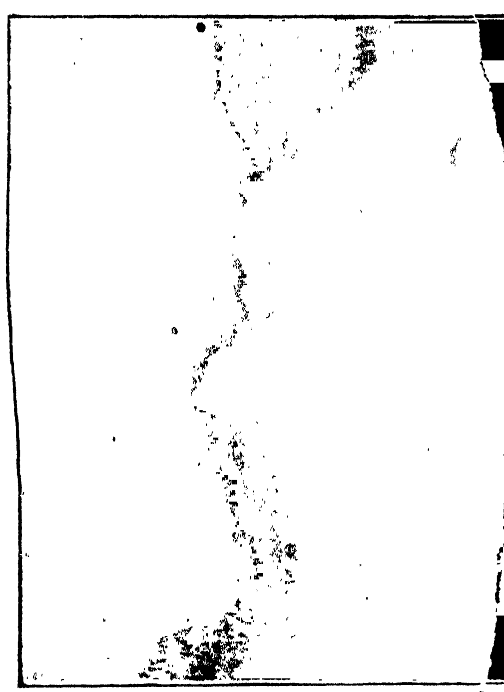
ক্যামেল্‌স ব্যাক ও গোরস্থান—মুসৌরী



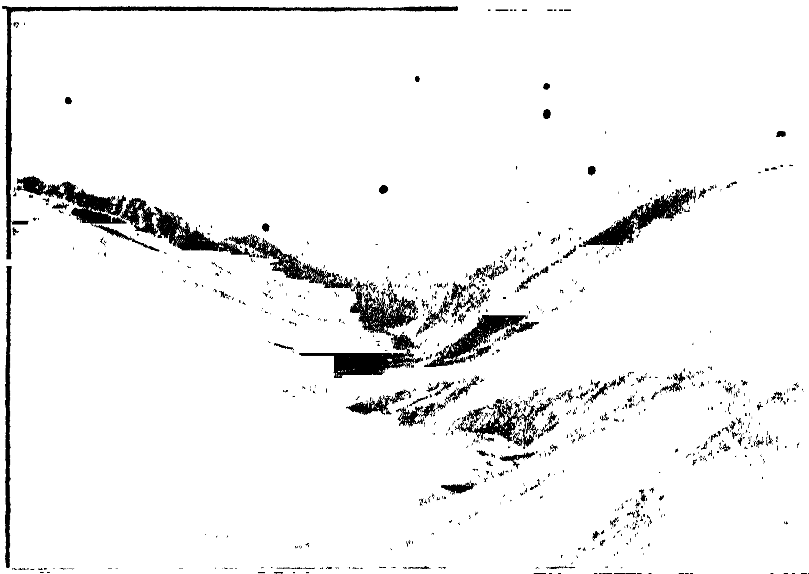
লালটিব্বা—মুসৌরী
(শ্রীযুক্ত শৈলবাবুর গৃহীত চিত্র)



একাংশ মুসৌরী
(শ্রীযুক্ত শৈলবাবুর গৃহীত চিত্র)



পথ হইতে মুসৌরী
(শ্রীযুক্ত শৈলবাবুর গৃহীত চিত্র)

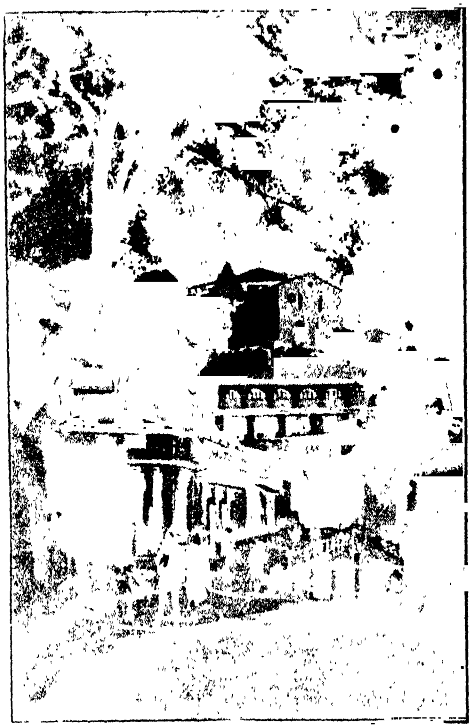


চিরতুষার গিরি— মুসৌরী



মুসৌরীর দৃশ্য

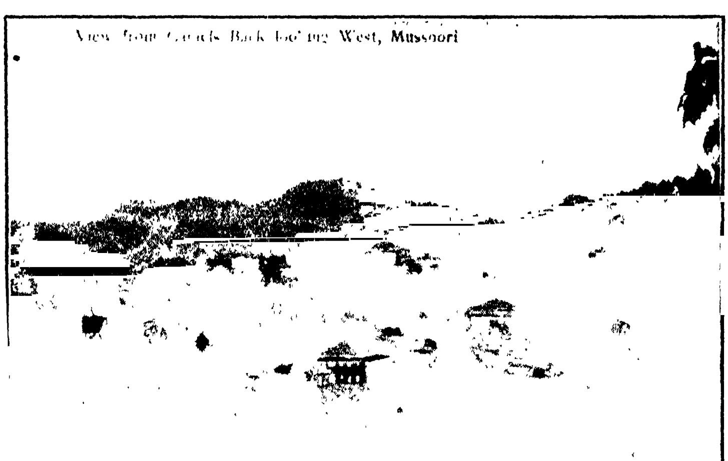
ফিরিয়া আবার বলিলেন "দেখুন ডাক্তারবাবু! অবিনাশবাবুর কি দয়া? আমরা বিদেশে এই দুইটী প্রাণী, তার আবার একটী স্ত্রীলোক,—আমরা অবিনাশবাবুর আশ্রয়েই আছি, অথচ এতদিনের মধ্যে একটি দিনের জন্য তিনি এখানে তাঁহার পায়ের ধূলি দেন নাই।" আমি একটা কৈফিয়ৎ দিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু কোনও কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার পূর্ব্বেই রমণী পুনরায় বলিলেন—"দেখুন অবিনাশ বাবু, আমাদের যেরূপ অবস্থা, বিপদ্-আপদের যেরূপ সম্ভাবনা তাহাতে আপনার দয়ার উপর খানিকটা দাবী না রাখিলে আমাদের চলে না। আর একটা কথা প্রথমেই বলিয়া



ল্যাণ্ডর বাজার—মুসৌরী



ম্যল রাস্তা—মুসৌরী



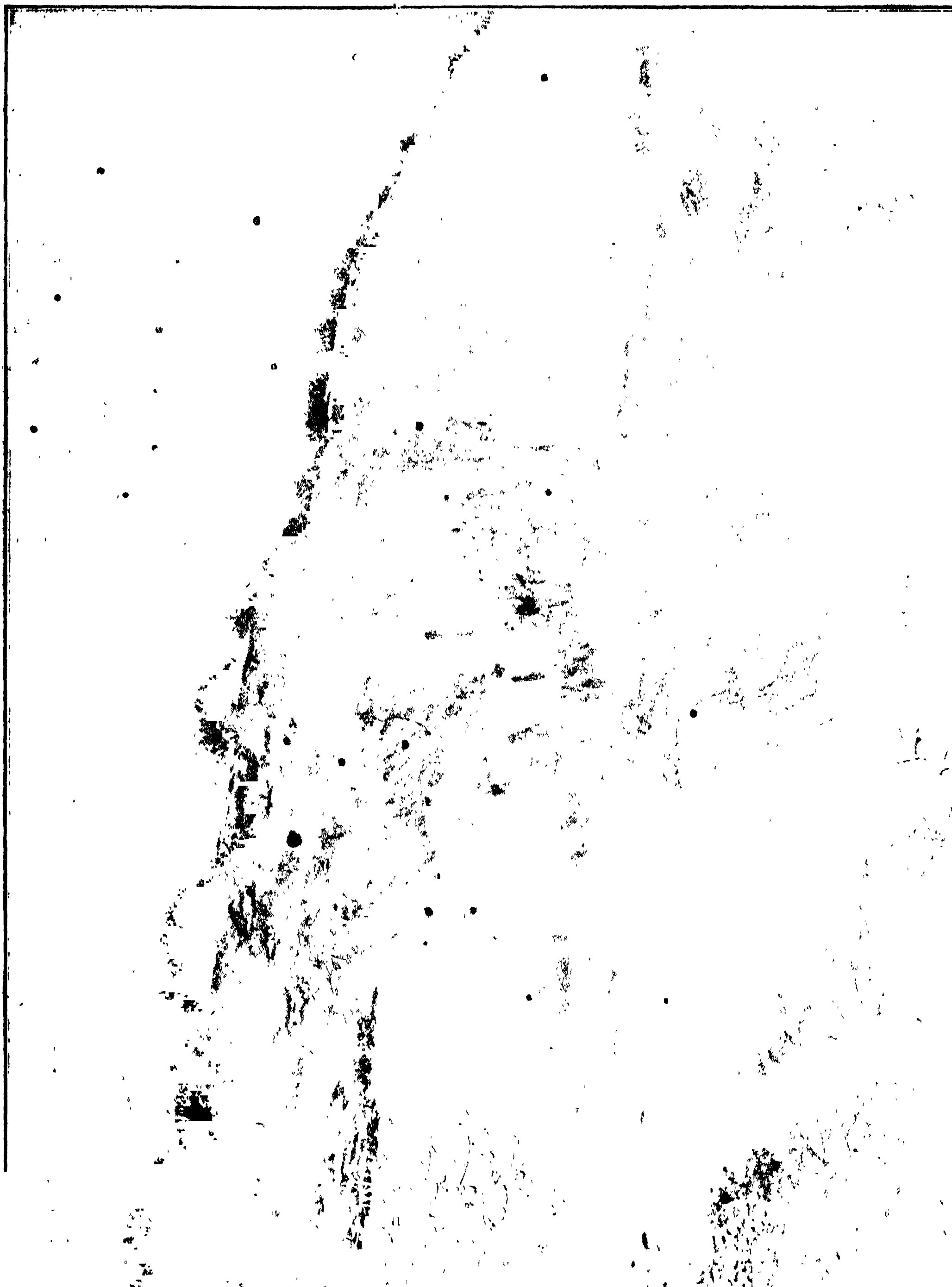
ক্যামেলস্ ব্যাক হইতে পশ্চিমদিকের দৃশ্য—মুসৌরী

রাখা আবশ্যক; স্ত্রীলোকের যেরূপ লজ্জা-সরম আপনারা দেখিয়া থাকেন আমার তাহা নাই। আমার জীবনের যিনি শিক্ষক ছিলেন, তিনি আমাকে নরনারী সকলেরই সহিত অকপটে এবং অবাধে মিশিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার শিক্ষা উপেক্ষা করিতে পারি নাই। যাক্‌, দেখুন ডাক্তারবাবু, দেখুন অবিনাশবাবু, আমার এই দেবর আমার স্বামীর একমাত্র সহোদর—আমার জীবনের একমাত্র সম্বল—আমার সমস্ত স্নেহের একমাত্র আশ্রয়স্থল। ইহাকে আপনারা বাঁচাইয়া দিন। কলিকাতার ডাক্তারেরা এখানে আসিবার কথা বলামাত্রই আমি এখানে চলিয়া আসিয়াছি। ডাক্তার বাবুর প্রতিপত্তি কলিকাতা হইতেই শুনিয়াছি। আপনার হাতে উহাকে সমর্পণ করিয়াছি। অর্থ যাহা চান দিব, আমার দেবরকে বাঁচাইয়া দিন।" যুবতীর চক্ষে জল পড়িল না; কিন্তু সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—বারি-ভারাক্রান্ত মেঘের মত চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন "আপনি চিন্তিত হইবেন না। আপনি উপযুক্ত সময়েই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন। আমায় বিশেষ আশা আছে যে, রোগী নিরাময় হইবেন।"

আমিও দুই একটি কথা বলিয়াছিলাম; কি বলিয়াছিলাম ঠিক স্মরণ নাই। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু (ডাক্তারবাবুই বা কেন বলিতেছি ডাক্তার সাহেব, কেন না তিনি বিলাত-প্রত্যাগত সিভিল সার্জন)—ডাক্তার সাহেব ও আমি একত্র বাহির হইলাম। লোকে বলে ভারতবর্ষে এক্ষণে দেশী বিলাতীর মধ্যে ডাক্তার সাহেবের মত আর সুচিকিৎসক নাই। শুনিয়াছিলাম ডাক্তার সাহেবের একটি খাস মেম বিবাহ করিবার বাসনা ছিল—কিন্তু তাঁহার ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণের জন্য না কি সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই; তিনিও আর বিবাহ করেন নাই।

রোগ ত বুঝিয়াছিলাম যক্ষ্মা। তাই বলিয়া কি আর বাড়ী হইতে উঠিয়া যাইবার কথা বলা যায়? অসম্ভব! ডাক্তার সাহেব ত প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রোগীর একটু উপকার হইতে লাগিল। রোগী এক-একদিন রিক্‌স করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলে যুবতীও সঙ্গে যাইতেন। ডাক্তার সাহেব যেদিন সঙ্গে থাকিতেন, সেদিন যুবতী ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে পদব্রজে যাইতেন, নতুবা তিনিও রিক্‌সয় যাইতেন। একদিন অপরাহ্নে—তখনও রৌদ্র খরতর আছে, লালটিব্বায় দেখি, একখানি বেঞ্চে ডাক্তার সাহেব ও যুবতী বসিয়া—দূরে রিকস মধ্যে যুবক ছায়াতলে অবস্থিত। ডাক্তার ও যুবতীর গল্প ও হাস্য দেখিয়া, কি জন্য জানি না, আমি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলাম না। বাড়ীতেও ডাক্তার ও যুবতীর হাসি ও গল্প আমি দূর হইতেই দেখিতাম। তাহার পরের ঘটনা আজ আর শুনিয়া কাজ নাই; আর একদিন বলিব।" এই বলিয়াই অবিনাশ সহসা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল! (বারান্তরে সমাপ্য)



ধারওয়ার সাধারণ দৃশ্য—ইলোরা



১। পুঁথি-লেখক। ২। মৃৎ-শিল্পী। ৩। সূচি-শিল্পী। ৪। স্বর্ণ ও রৌপ্য-শিল্প ৫। তাম্র ও পিত্তল শিল্প। ৬। শাল-বুন:
৭। দারু-শিল্প। ৮। কার্পেট বয়ন। ৯। দারু ও মৃৎ চিত্র-শিল্প। ১০। কার্পাস শিল্প। ১১। মণিকার।

যুদ্ধক্ষেত্রে

[শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ



ভারতীয় প্রতিনিধিগণের প্রবাস-গৃহ



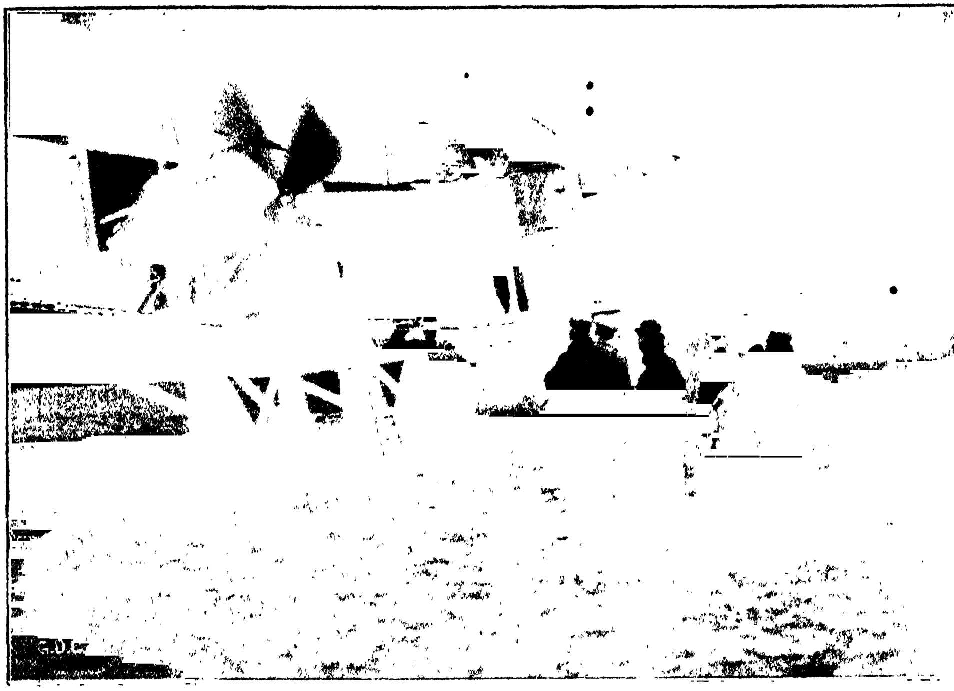
লেপ্টেন্যাণ্ট হার্ডি ও তাঁহার হ্যাণ্ডলে-পেজ বিমান
(ইনি ভারতীয় সম্পাদক মহাশয়গণকে ঐ বিমানে চড়াইয়া আকাশে উড়াইয়াছিলেন)



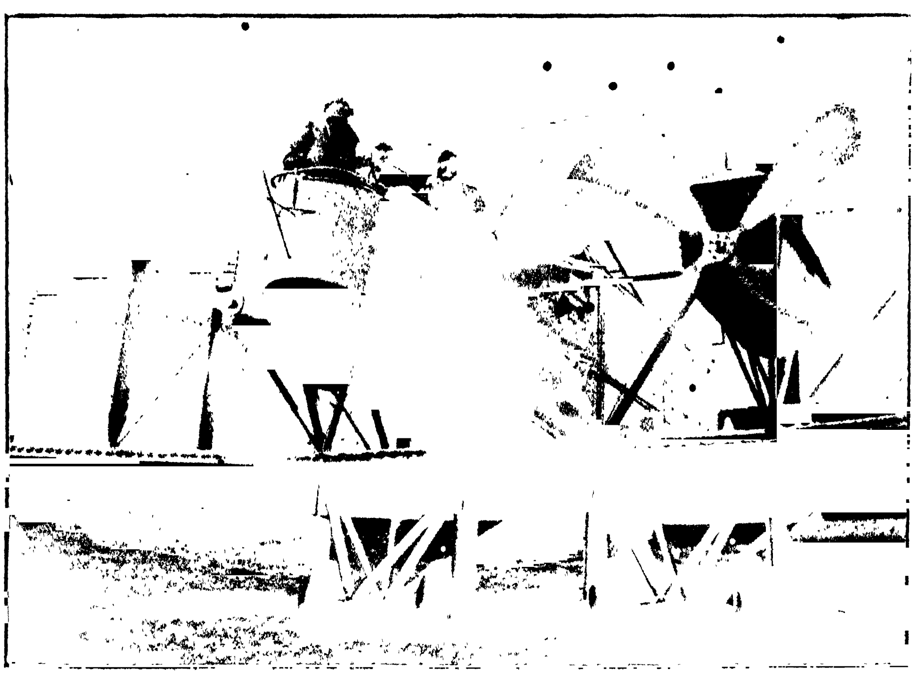
উড্ডয়ন-সজ্জা



উড়িবার সজ্জায় ভারতীয় সম্পাদক



উড়নোন্মুখ ভারতীয় সম্পাদকগণ



উড়িবার উপক্রম



বিমানে ভারতীয় সম্পাদক



ভারতীয় সম্পাদকগণ

ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে যুদ্ধের আয়োজন ও উপকরণ দেখান হইয়াছিল। কামান ও সেল প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আমরা ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে দেখিয়া-ছিলাম, এডিনবরা হইতে বৃটিশ নৌবহরও দেখিয়া আসিয়া-ছিলাম। অবশিষ্ট ছিল—ফ্রান্সে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ দর্শন। সমর বিভাগের সঙ্গে সে বিষয়ে সংবাদ সরবরাহের মন্ত্রি-সভার পত্রব্যবহার চলিতেছিল। কারণ, সাধারণতঃ সৈনিক ব্যতীত আর কাহাকেও যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে দেওয়া হয় না। তবে মার্কিন হইতে ও উপনিবেশসমূহ হইতে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা আমাদের পূর্ব্বেই নিমন্ত্রিত হইয়া বিলাতে আসিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে ফ্রান্সে স্থানে স্থানে অতিথিদিগের জন্য বাসার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—তথা হইতে তাঁহাদিগকে রণক্ষেত্র দেখান হইত। সে সব স্থানের নাম করা তখন নিষিদ্ধ ছিল। লর্ড নর্থক্লিফ তাঁহার পুস্তকে পত্রগুলি "ফ্রান্সের কোন স্থান হইতে" (Somwhere in Grance) লিখিয়াছিলেন।

যত দিন যাইতেছিল, তত আমরা উদ্বিগ্ন হইতেছিলাম —জার্ম্মাণরা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, শেষে কি যুদ্ধ দেখা হইবে না? কিন্তু আমাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা চলিতেছিল—নূতন পাসপোর্ট বা ছাড় আনা হইয়াছিল—যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার আদেশ পাওয়া গিয়াছিল—ইত্যাদি। কেবল দিনটি স্থির হয় নাই। শেষে ১লা নভেম্বর [১৯১৮ খৃষ্টাব্দ] আমাদিগকে জানান হইল, পরদিন মধ্যাহ্নে আমা-দিগকে যাত্রা করিতে হইবে। যাত্রী আমরা ৫জন সম্পাদক —কলিকাতার 'ইংলিশম্যান'-সম্পাদক মিষ্টার স্যাণ্ডব্রুক ও আমি; বোম্বাইয়ের ভারতভৃত্য সমিতির শ্রীযুত গোপাল কৃষ্ণ দেবধর; মাদ্রাজের 'হিন্দু'-সম্পাদক শ্রীযুত কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার ও লাহোরের 'পয়সা আখবর'-সম্পাদক মৌলবী মাবুব আলম। আমাদের সঙ্গে আর এক জন সম্পাদক যাইবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তিনি বিলাতের 'সানডে টাইমসের' সম্পাদক মিষ্টার রিজ। আমাদের সঙ্গে যাইবেন —বোম্বাইয়ের সিভিলিয়ান মিষ্টার ক্লেটন এবং লেফটেনাণ্ট লং। সঙ্গে যথাসম্ভব অল্প জিনিষ লইতে হইবে এবং ভৃত্যাদি লওয়া চলিবে না। আয়াঙ্গার মহাশয় কর্ম্মচারীর উপর অতিনির্ভরে অভ্যস্ত। আমি তাঁহাকে দেখিবার ভার লইলাম।

২রা নভেম্বর শনিবার প্রাতরাশ শেষ করিয়া আমরা চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তথায় মিষ্টার রিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রবীণ—অত্যন্ত সরল। মুখে চুরুটের পাইপ লাগিয়াই আছে এবং অনেক সময় পাইপ টানিতে টানিতে—পাইপ যে মুখে আছে তাহা ভুলিয়া, ইতস্ততঃ পাইপের সন্ধান করেন। দুই তিন মিনিটের মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে আলাপে মনে হইতে লাগিল, যেন কত দিনের পরিচয়!

আমাদিগকে ফ্রান্সে যাইবার জন্য চ্যানেল পার হইতে ফোকষ্টোনে যাইতে হইবে; তথা হইতে ষ্টীমারে পর-পারে বুলোঁয় নামিয়া গন্তব্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা। আসিবার সময় আমরা বুলোঁ হইতে পার হইয়া ফোকষ্টোনে নামিয়াছিলাম—তাহার পর অন্ধকারে রেলপথে লণ্ডনে গিয়াছিলাম। তখন রাত্রিতে রেলে আলো জ্বালিতে হইলে কাচের জানালায় পর্দ্দা টানিয়া দিতে হইত—পাছে জার্ম্মা জেপেলিন উপর হইতে দেখিতে পাইয়া বোমা বর্ষণ করে। মধ্যাহ্নের পরই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। ট্রেণে ভারতী সম্পাদকদিগের জন্য স্বতন্ত্র কামরা নির্দ্দিষ্ট ছিল, আমরা সে কামরায় যাইয়া বসিলাম। ট্রেণ বিলাতের বর্ষণক্লিন্ন দৃশ্যে মধ্য দিয়া ছুটিতে লাগিল। লাইনের দুই পার্শ্বে গোচর—যে কে জমীর উপর পুরু সবুজ গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে তাহার উপর গোপাল ও মেষপাল! বিলাতে নানাজাতি গরু আছে—কোন জাতিই বাঙ্গালার গরুর মত শুষ্ক শী অস্থিচর্ম্মাবশেষ—ক্ষুদ্রকায় নহে। মধ্যে মধ্যে গ্রাম-কয়খানিমাত্র গৃহের সমষ্টি, সব গৃহেই দুইচারিটি ফুলগ বা সব্‌জীবাগ। স্থানে স্থানে সহর। গ্রামের স্থানে স্থা খানিকটা জমী ঘিরিয়া হাঁস ও মুরগী পোষা হয়। প কয়টি মাত্র ষ্টেশনে থামিয়া ট্রেণ ফোকষ্টোনে আসিল চ্যানেলের কূলে জাহাজে উঠিবার স্থান—জাহাজ তখ ভিড়িয়া ছিল। প্লাটফর্ম্মে এক জন সৈনিক কর্ম্মচা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; আমাদিগ লইয়া জাহাজে উঠিলেন। জাহাজেও আমাদের জন্য এ কামরা নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমাদিগকে সেই কামরায় দি তিনি বিদায় লইলেন। তখন ধূসর গগনে দিনান্তের সূ লোক নিবিয়া আসিতেছে। তখনও চ্যানেলে জা সাবমেরিণের ভয় আছে—জাহাজে উঠিয়া আমাদিগ

লাইফবেল্ট পরিতে হইল—যদি কোন বিপদ ঘটে।

বাতাস ছিল না তাই জাহাজ দুলিল না, আমি মাথা তুলিয়া বসিতে পারিলাম। জাহাজ যখন ফ্রান্সের কূলে ভিড়িবে তাহার পূর্ব্বেই আমাদের ছাড় দেখিয়া—ফটোগ্রাফের সঙ্গে আমাদের চেহারা মিলাইয়া লওয়া হইল। সন্ধ্যার পর জাহাজ বুলোঁর বন্দরে ভিড়িল—আমরা ফ্রান্সের কূলে অবতরণ করিলাম।

তিন সপ্তাহে যুদ্ধের গতি কতটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! ১৩ই অক্টোবর যখন এই বন্দর হইতে বিলাত যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন সন্ধ্যার পর জাহাজ আসিত না—আলো জ্বালিবার হুকুম ছিল না। আজ সন্ধ্যায় বন্দরে আলোকের অভাব নাই। আমাদিগকে নামিয়া যে ঘরে যাইতে হইল, তথায় আবার ছাড় পরীক্ষা ও জিনিষ পত্র দেখা হয়—কোন নিষিদ্ধ জিনিষ আছে কি না। তথায় দুই জন কর্ম্মচারী আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন—আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবেন। তাঁহারা কর্ম্মচারীদিগকে বলিলে আমাদিগের ব্যাগ বাক্স আর পরীক্ষা করা হইল না। বাহিরে মোটর ছিল—আমরা তাহাতে আরোহণ করিলাম। তখন জানিতে পারিলাম, আমাদিগকে র‍্যাডিংহাম স্যাটোয় লইয়া যাওয়া হইবে। স্যাটো—পল্লীভবন। আমাদিগের পূর্ব্বে মার্কিন সংবাদপত্র-সেবকরা এই স্যাটোয় আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহা আমেরিকান স্যাটো বলিয়া পরিচিত। মেজর নরী তথায় প্রধান কর্ম্মচারী। আর যে কয় জন কর্ম্মচারী তথায় অতিথি-দিগের জন্য আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রয়াল ওয়েষ্ট কেণ্ট সেনাদলের ক্যাপ্টেন কেনেডী ও সাফোক সেনাদলের লেফটেনাণ্ট ফ্যারার আমাদিগকে লইতে আসিয়াছিলেন। স্যাটোর এই কর্ম্মচারিত্রয়ের আদর যত্নে আমরা আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদানের এই অবসর আমি ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের সঙ্গে আমার হয় ত আর কখন সাক্ষাৎ হইবে না; কিন্তু র‍্যাডিংহাম স্যাটোয় তাঁহাদের সঙ্গে যে কয় দিন যাপন করিয়াছিলাম, সে কয় দিনের স্মৃতি কখনই আমার হৃদয় হইতে অপনীত হইবে না।

মোটর চলিতে লাগিল। তখন বৃষ্টি নাই; কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—চারি দিক তরল অন্ধকারে আবৃত; আকাশে দুই একটি তারা পবনতাড়িত মেঘের মধ্য হইতে দেখা দিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু আবার মেঘে আচ্ছন্ন হইতেছে। পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষের পর আর কিছুই দেখা যায় না। পথ সুগঠিত—ভূমি উচ্চাবচ হইলেও মোটরে যাইতে কোথাও ঝাঁকি লাগে না। ফ্রান্সের রাস্তার তুলনায় বিলাতের রাস্তাও নিন্দনীয়—আমাদের দেশের ত কথাই নাই। ফ্রান্সের সকল অংশে সুগঠিত রাজপথ—প্রশস্ত ও সরল। শুনিয়াছি, জার্ম্মাণীর সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের পর হইতেই ফ্রান্স বুঝিয়াছিল—আবার যুদ্ধ হইবে। সেবার জার্ম্মাণী যে আলসেস ও লোরেন দখল করিয়া লইয়াছিল, সে ব্যথা ফ্রান্সের বুক হইতে অপনীত হয় নাই। যাঁহারা প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক ডডের ছোট গল্প "শেষ পাঠ" পাঠ করিয়াছেন—তাঁহারা সে ব্যথার স্বরূপ কল্পনা করিতে পারিবেন। শুনিয়াছি, এই যুদ্ধের অল্প দিন পূর্ব্বেও এক জন ফরাসী অভিনেত্রী জার্ম্মাণীতে যাইয়া কৈশরের সম্মুখে অভিনয় করিতে অস্বীকার করিয়াছিল; বলিয়াছিল—"আমার বুকে আলসেস ও লোরেন দখলের ক্ষত আছে; আমি জার্ম্মাণ সম্রাটের চিত্তরঞ্জন করিতে পারি না।" যাহারা দেশকে আপনার মনে করে—দেশকে বলিতে পারে "তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম; তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম" তাহারাই এমন কথা বলিতে পারে। এই স্বদেশ-প্রেমেই জাতি ধন্য হয়। আবার যুদ্ধ অনিবার্য্য বুঝিয়া ফ্রান্স দেশময় সামরিক কাজের জন্য রাস্তা রচনা করিয়াছিল; কারণ, এখন যে যত সহজে সৈনিক ও সমর-সরঞ্জাম আবশ্যক স্থানে লইয়া যাইতে পারে, তাহার জয়লাভ-সম্ভাবনা তত অধিক। ফ্রান্সের রাস্তা সুগঠিত—মোটর গাড়ীর বিশেষ উপযোগী। রাস্তার দুই দিকে বৃক্ষের শ্রেণী। সুগঠিত পথে—অন্ধকারের মধ্যে মোটর চলিতে লাগিল—কোথায় যাইতেছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মধ্যে মধ্যে গ্রাম ছাড়াইয়া আসিতে লাগিলাম। গ্রামগুলি সুপ্ত—কোন কোন গ্রামে দুই এক জন বৃদ্ধ বা রমণী মোটরের শব্দে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেছে।

ক্রমে প্রায় ৩০ মাইল পথ অতিক্রান্ত হইল; আমরা গন্তব্য গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গ্রাম পার হইয়া উপকণ্ঠে একটি বাগানের মধ্যে স্যাটো। মোটর দ্বারে যাইয়া স্থির

হইল—লণ্ঠন লইয়া কয় জন সৈনিক আমাদিগকে নামাইয়া লইতে আসিল। মেজর নরী আসিয়া আমাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে স্যাটোর দ্বার ও প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম—অগ্নিকুণ্ডের কাছে উপবিষ্ট হইলাম।

এই বসিবার ঘরে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—প্রাচীরে বিলম্বিত বৃহৎ মানচিত্র। ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রের এই বৃহৎ মানচিত্রে পিন দিয়া একটি ফিতা আটকান—তাহাতে বৃটিশ সেনার অবস্থান বুঝা যায়। প্রতি দিন টেলিগ্রাম দেখিয়া ফিতাটি যথাস্থানে সরাইয়া আটকান হয়—কতটা জমী ছাড়িতে হইয়াছে বা দখল হইয়াছে, বুঝা যায়। সেই মানচিত্র দেখাইয়া মেজর আমাদিগকে বৃটিশ সেনার অবস্থান বুঝাইলেন ও পরদিন আমাদিগকে কোন্ পথে কোন্ কোন্ স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে, তাহা দেখাইয়া দিলেন। তাহার পর আহারের পূর্ব্বে হাত মুখ ধুইবার জন্য আমরা যে যাহার ঘরে গেলাম।

স্যাটোর বিস্তৃত বাগানের মধ্যে অতিথিদিগের জন্য এক সারি কক্ষ রচিত হইয়াছে। আটটি ঘর—কাঠের প্রাচীর, কাঠের ছাত। আমরা এক এক জন এক একটি ঘর দখল করিলাম। ঘরে—একখানি খাট, একখানি চেয়ার, একটি টেবল, একটি হাত মুখ ধুইবার পাত্র কক্ষ-প্রাচীরে ইস্তাহার—পরিখার জল কেহ পান করিও না, পত্রাদিতে স্যাটোর নাম লিখিও না, পর্দ্দা টানিয়া না দিয়া ঘরে আলো জ্বালিও না। সৈনিকরা গরম জল, সাবান, তোয়ালে লইয়া আসিল। আমরা হাত মুখ ধুইয়া—বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আহার করিতে গেলাম।

লণ্ডনের ব্যয়বহুল হোটেলে, গ্লাসগোর লর্ড প্রোভোষ্টের ভোজে, ম্যাঞ্চেষ্টারে সিপকেনাল কোম্পানীর নিমন্ত্রণে আহার্য্যের যে প্রাচুর্য্য ছিল না—শিবিরে তাহা ছিল। বিলাতে খাবার সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি করা হইয়াছিল—মাংস, চিনি, মাখন—এ সব বিলাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল—টিকিট দিলে তবে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইত। এই সব বিষয়ে মিতব্যয়িতা নির্ম্মম ভাবে মানিয়া চলা হইয়াছিল—কেহ খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করিলে দণ্ডিত হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে সেরূপ কোন নিয়ম ছিল না। বিলাতের লোক আপনারা ত্যাগ স্বীকার করিয়া সৈনিকদিগকে প্রাচুর্য্যে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। চিনির, সবজীর, মাংসের, ফলের এত প্রাচুর্য্য পোর্টসইদের পর আর পাই নাই। পক্ক পেয়ার, আখরোট, আঙ্গুর—যথেষ্ট ছিল। বিশেষ এত ফল! আমি সে কথার উল্লেখ করিয়া বলিলাম, "আমরা স্যাটোতেই থাকিব—আর ফিরিয়া যাইব না।" মেজর নরী হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু সামরিক বিধান অমান্য করিলে কোর্ট মার্শাল হয়।"

কিছুক্ষণ গল্প করিবার পর আমরা শয়ন করিতে গেলাম। তখন দূরে কামানের গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে—মধ্যে মধ্যে মেঘান্ধকার গগনে বিদ্যুদ্বিকাশের মত আলোক দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে, সে কামানের অগ্ন্যুদ্গার। শয্যায় শয়ন করিয়া জীবন-নাটকের এই অপ্রত্যাশিত অঙ্কের কথা ভাবিতে লাগিলাম—এরাস, কেম্‌ব্রাই, জোনিবিক, ঈপর, সম, এলবার্ট, লিল, এমিয়েঁ—এ সব নাম গত চারি বৎসর কাল সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি, মানচিত্রে দেখিয়াছি—এবার সেই সব স্থান দেখিব, মসীজীবী বাঙ্গালী আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব! জীবনে কখন যে অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা কল্পনাও করিতে পারি নাই, তাহাই লাভ করিতে পারিব। ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। তখন বাহিরে বারিপাতের শব্দ শুনা যাইতেছে—বাতাস গর্জ্জন করিতেছে। ঘরে ষ্টোভে অগ্নি না থাকিলে শীত দুঃসহ হইত।

পরদিন (৩রা নভেম্বর) প্রভাতে উঠিয়াই দেখিলাম, দ্বারের কাছে এক জন সৈনিক অপেক্ষা করিতেছে। সে হাত মুখ ধুইবার জন্য গরম জল লইয়া আসিল—আর এক জন সৈনিক বিছানা ঝাড়িয়া, পরিষ্কার করিয়া আনিবার জন্য জুতা লইয়া গেল। আমি তখনই স্নান করিবার অভিপ্রায় জানাইলে সৈনিক একটি বড় টব এবং খানিকটা গরম ও খানিকটা ঠাণ্ডা জল লইয়া আসিল। তাহাতে যে স্নান হয় তাহাকে অর্দ্ধ জলচর বাঙ্গালী আমি স্নান বলিতে পারি না, তবে যাহাদের কাছে টাইবার ও টেমস বড় নদী তাহারা বলিতে পারে। সেই "কাক স্নান" সারিয়া—বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিলাম। তখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। স্যাটোর সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হইল। পুরাতন প্রথায় নির্ম্মিত গৃহ—গৃহ-কোণে চূড়া। গৃহটিকে

বেষ্টিত করিয়া পরিখা—তাহার স্বচ্ছ জলে শৈবালদলের মধ্যে মৎসসকল খেলা করিতেছে,—রাজহংস ভাসিতেছে, কূলে উঠিয়া চঞ্চু দিয়া পালক পরিষ্কার করিতেছে। অদূরে গীর্জ্জা। স্যাটোর অধিকারীই গ্রামের ভূস্বামী ছিলেন—তাই গীর্জ্জাটি তাঁহার আবাসের সন্নিকটেই অবস্থিত। স্যাটোর বাগানও বড়—নানা বৃক্ষে পূর্ণ। বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে সামরিক প্রয়োজনে কতকগুলি গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে—অতিথিশালা, সৈনিকদিগের থাকিবার ঘর, মোটরের ঘর প্রভৃতি। অতিথি ও কর্ম্মচারীদিগের জন্য ছয় সাত খানি মোটর স্যাটোয় রাখা হয়—মোটর সারিবার মোটামুটি বন্দোবস্তও আছে। এই যুদ্ধে মোটরের ও এরোপ্লেনের ব্যবহার কত বাড়িয়াছে তাহা কল্পনা করা যায় না। মোটরের বিষয়ে জার্ম্মাণদিগের সুবিধা ছিল। তাহারা যুদ্ধের আয়োজন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, প্রায় একরূপ মোটরই ব্যবহার করিত। ইংরাজ ও ফরাসী সামরিক প্রয়োজনে যে মোটর পাইয়াছে তাহাই লইয়াছে। মোটের উপর প্রায় ৪০ প্রকারের মোটর ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সব মোটর সারিবার ব্যবস্থা—মোটরের অংশ হইতে বোল্টটি পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইয়াছে। এই সব কাজে যে শৃঙ্খলার ও পদ্ধতির প্রয়োজন তাহাই অসাধারণ।

প্রাতরাশ শেষ করিয়া ৯টার সময় আমরা যাত্রা করিলাম। সে দিনের পর্য্যটনের পথ স্থির করিয়া—সঙ্গে আহার্য্য ও পানীয় লইয়া আমরা চলিলাম। সঙ্গে মানচিত্র লইয়া ক্যাপ্টেন কেনেডী ও লেফটেনাণ্ট ফ্যাবার। তিনখানি মোটরে আমরা কয় জন—সঙ্গে আর একখানি মোটর, যদি পথে একখানি অচল হয়, তবে সেখানি ব্যবহার করিতে হইবে। একাধিকবার অতিরিক্ত মোটরখানি ব্যবহার করিতে হইয়াও ছিল।

দূর হইতে যুদ্ধে দেশের দুরবস্থার কথা পাঠ করিয়াছিলাম; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারি নাই। মেসোপোটেমিয়ায় তুর্করা নগর দখল রাখিবার চেষ্টা করে নাই; বৃটিশবাহিনী যত অগ্রসর হইয়াছে, তাহারা তত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। যুদ্ধ যাহা হইয়াছে, সে কেবল মুক্ত প্রান্তরে। মরুভূমির বাত্যা বালু উড়াইয়া যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন আবৃত করিয়া দিয়াছে। য়ুরোপে আসিবার সময় রোমে যুদ্ধের পরিচয় পাইয়াছিলাম - কেবল পুরুষের কার্য্যে মহিলাদিগকে দেখিয়া; প্যারিসের বরাঙ্গে বোমার চিহ্ন—সেও সামান্য; লণ্ডনে সে চিহ্ন থাকিতে দেওয়া হয় নাই। কেবল খাদ্যের অভাবে—পুরুষের সংখ্যাল্পতায়—লোকের বিষণ্ণ ভাবে যুদ্ধের অবস্থা বুঝা যাইত। কিন্তু এ কি? গ্রামের অঙ্গেই ক্ষতচিহ্ন—কত বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—তাহার পর গ্রাম পার হইয়াই যুদ্ধক্ষেত্র। সামরিক প্রয়োজনে রাজপথ সংস্কৃত করা হইয়াছে—গোলার গর্ত্ত আর নাই। কিন্তু পথের উভয় পার্শ্বই শ্মশান। ক্রোশের পর ক্রোশ, পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষবীথিতে একটি বৃক্ষেরও শাখা নাই, কেবল কাণ্ড অবশিষ্ট। ইহা হইতেই কামানে কিরূপ সেল বর্ষিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে। দুই পার্শ্বে মাঠেই পরিখা, পরিখার উপর কাঁটা তারের বেড়া; মধ্যে মধ্যে সৈনিক কর্ম্মচারিদিগের থাকিবার আশ্রয় - গর্ত্তের উপর টিন চাপা দিয়া, মাটীভরা থলিয়া দিয়া গোলার আঘাত হইতে রক্ষিত। যে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণরা আসিয়াছিল, সে সব স্থানে জার্ম্মাণ সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের আশ্রয়, তাহাতে বিলাসের আভাস আছে। কনক্রিট ঢালিয়া মৃত্তিকার নিম্নে ঘর প্রস্তুত হইয়াছে, জিনিষপত্র রাখিবার তাক আছে; বোধ হয় টেবল চেয়ারও ছিল। মাঠে কাঁটা তার, ভগ্ন ট্যাঙ্ক, প্রভৃতি যে সব দ্রব্য পড়িয়া আছে তাহাই রাজার ঐশ্বর্য্য। যে সব স্থানে দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সে সব স্থানে দুই দলের পরিখার মধ্যে একটু শূন্য স্থান কাহারও নহে (no man's land) জমীতে সেলের গর্ত্ত, কোন কোন গর্ত্তে ঘোড়ার মৃতদেহ পচিতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রান্তরে সমাধির শ্রেণী, যুদ্ধের মধ্যে দুই দলের বন্দোবস্তে যুদ্ধ নিবৃত্ত করিয়া মৃত সৈনিকদিগকে সমাহিত করা হইয়াছে। সমাধির উপর এক একখানি কাষ্ঠফলকে সৈনিকের সংখ্যাটি লিখিত। যুদ্ধের পর যেরূপ হয় ব্যবস্থা করা হইবে। যাহারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের শব এই স্থানে সমাহিত। এ ভূমি পুণ্যভূমি। কি স্বদেশপ্রেম বক্ষে লইয়াই ফরাসীরা যুদ্ধ করিয়াছে! যেদিন যুদ্ধে ক্যাপ্টেন রবার্ট ডুবার্লের মৃত্যু হয়, তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়াছিলেন,—"কাল যে যুদ্ধ হইবে তাহাতে আমার মনে অধীরতার আনন্দ ও কর্ত্তব্য পালনের গর্ব্ব উদ্ভূত হইতেছে। আমি সানন্দে

যুদ্ধ করিব, জয়ী হইয়া মরিব। হে আমার মাতৃভূমি—আমাদের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত, আমাদের জননীর শেষ সন্তান পর্য্যন্ত, আমাদের গৃহের শেষ ইষ্টক পর্য্যন্ত, সবই তোমার। তুমি ব্যস্ত হইও না। আঘাত করিবার জন্য যত সময় প্রয়োজন তাহাই লও। তুমি যত দিন চাহিবে আমরা তত দিন যুদ্ধ করিব, আজিকার শিশুরা কাল সৈনিক হইবে। হয় ত আমার জীবনের অবসানকাল সমাগত। আমার শক্তি, আমার আশা, আমার আনন্দ, আমার শোক, তোমার ভালবাসায় পরিপূর্ণ আমার দেহ-মন এ সব তোমার পদে অর্ঘ্যদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। তোমার সন্তানদিগের ত্রুটি মার্জ্জনা কর, তোমার গৌরবে তাহাদিগকে গৌরবান্বিত কর; তাহাদের সমাধির উপর তুমি জয়ী হইয়া দেখা দেও।"

আমরা নামিয়া পরিখা পরিদর্শন করিলাম। নিয়ে জল, তাহার উপর তক্তা পাতা, উঠিয়া দাঁড়াইলে শত্রুর গুলিতে আহত হইবার সম্ভাবনা। এই সঙ্কীর্ণ স্থানে এমন বিপদের মধ্যে মানুষ কেমন করিয়া বাস করে? জয় এই কষ্টের পুরস্কার, সামান্য মূল্যে তাহাকে ক্রয় করা যায় না। বুঝি এই কষ্টও তাহার যথেষ্ট মূল্য নহে; যে স্বদেশপ্রেমে মানুষ এই কষ্ট সহ্য করিতে পারে তাহাই জয়ের প্রকৃত মূল্য। পরিখার মধ্যে হাত দিয়া নিক্ষেপের বোমা (Hand grenade) রহিয়াছে। ক্যাপ্টেন কেনেডী আমাদিগকে পরিখার মধ্যে বসিতে বলিয়া একটি বোমা ছুড়িয়া ফেলিলেন—বিষম শব্দে বোমা ফাটিল। সে পরিখা হইতে বাহির হইয়া আমরা দেখিলাম, যে পরিখায় বোমাটি পড়িয়া ফাটিয়াছিল, তাহাতে অনেকটা স্থানে গর্ত্ত হইয়াছে, মাটী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা মোটরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কেবল যুদ্ধক্ষেত্র, আর ভগ্নস্তূপে পরিণত গ্রাম ও নগর। গ্রামবাসী-দিগকে অন্যান্য স্থানে পাঠান হইয়াছে। কোথাও একটি বৃদ্ধ, কোথাও বা এক জন যুবতী ভগ্নস্তূপে পরিণত গৃহের মধ্যে দ্রব্যাদির সন্ধান করিতেছে, আর চারিকিে চাহিয়া অশ্রুপাত করিতেছে। দেখিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। ইহারা সর্ব্বস্বান্ত, গৃহ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে, হয় ত স্বজনগণও যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে বা দিতেছে! কোথাও কৃষিকার্য্য নাই। পরিখায়, বোমার গর্ত্তে, অনেক স্থানে আর চাষ চলিবে না; বন করিতে হইবে।

কতকগুলি ভগ্ন গ্রাম অতিক্রম করিয়া বেলিউল (Bailleul) সহরে উপনীত হইলাম। সহরে প্রবেশকালেই একখানি বৃহৎ কাষ্ঠফলকে—সাইনবোর্ডে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, "ইহাই বেলিউল ছিল"—"This was Bailleul" তাহাই বটে। সহরের আর কিছুই নাই, কেবল ভগ্ন অট্টালিকার উপকরণের স্তূপ। কি ভীষণ দৃশ্য! সে দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে সে জীবনে আর কখনই ভুলিতে পারিবে না। পথগুলি যান চালনের জন্য পরিষ্কার করা হইয়াছে। দুই দিকে পর্ব্বত প্রমাণ ভগ্নস্তূপ। সেই স্তূপে কত কোটি টাকার দ্রব্যাদি, কত গৌরবের স্মৃতি সমাহিত রহিয়াছে!

অগ্রসর হইয়া আমরা বেলজিয়মে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে কেবল ধ্বংসাবশেষ। বেলজিয়মে কৃষির ও বাণিজ্যের জন্য বহু খাল খনিত হইয়াছে। খালের উপর একটি সেতুও অভগ্ন নাই। রেলের লাইন উৎপাটিত হইয়াছে, ট্রেণের গাড়ী চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেখিলে বুঝা যায়, বেলজিয়মে আমেরিকান রাজনীতিক দূত মিষ্টার হুইটলক কেন লিখিয়াছেন, জার্ম্মাণীর নিম্মমতায় বেলজিয়ানদিগের ও জার্ম্মাণদিগের মধ্যে বহু পুরুষ ধরিয়া বৈরভাব বিদ্যমান থাকিবে। বাস্তবিক বেলজিয়মের সাজান বাগান শ্মশান হইয়াছে। বেলজিয়ম ন্যায়ের জন্য সব বিপদ সহ্য করিয়াছে, আপনি চূর্ণ হইয়াছে তবুও আত্মবিক্রয় করে নাই। আজ মিত্রশক্তি সমূহের সাহায্য ব্যতীত তাহার শিল্প আর প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আর এই যে ক্ষত, এ কি মুছিবার? এই যে ব্যথা, এ কি ঘুচিবার?

আমরা ঈপরে (Ypres) প্রবেশ করিলাম। সৌধমালা ধুল্যবলুণ্ঠিত, সহর জনহীন; সৈনিকরা ও শ্রমজীবীরা রাস্তা পরিষ্কার ও সংস্কার করিতেছে। একটি বৃহৎ ভগ্নস্তূপের সম্মুখে আসিয়া প্রদর্শক বলিলেন, "ইহাই ক্লথ হলের অবশেষ।" ক্লথহল ঈপরে প্রসিদ্ধ গৃহ, তথায় পৃথিবীর নানাস্থানের নানা মূল্যবান দ্রব্য—শিল্পীর কীর্ত্তি প্রভৃতি সঞ্চিত করা হইয়াছিল। এই গৃহ দেখিতে দেশবিদেশ হইতে যাত্রীরা আসিত। আজ তাহার চিহ্নও নাই। আমার কাছে ক্লথহলের ও ঈপরের গির্জ্জার অবস্থা শুনিয়া বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এসক্রিণ অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীর নরওয়ের বন হইতে ওক গাছ আনিয়া

ক্লথহলের স্তম্ভ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তিনি, তাঁহার পত্নী ও তাঁহার পুত্র তিন জন এ উহার হাত ধরিয়া এক একটি বেষ্টন করিতে পারেন নাই। আজ সে গৃহ বিলুপ্ত, স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত! য়ুরোপ যে সভ্যতার গর্ব্ব করে, সেই সভ্যতার ফলে এই ধ্বংস সম্ভব হইয়াছে!

ঈপরের সন্নিকটে গৃহ গ্রাম থাকিবে কেমন করিয়া? এখন যুদ্ধে কেবল দুই পক্ষে অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণ হয়। আর এই স্থানে দীর্ঘ চারিবৎসরকাল দুই পক্ষের সেনাদল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পরস্পরকে পরাজিত করিবার প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছে। এক এক দিন পাঁচ শতের উপর সৈনিক এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; চারি বৎসরে বোধ হয় দশ লক্ষ সৈনিকের শোণিতে এই ভূমি রঞ্জিত হইয়াছে। বিজয়-লক্ষ্মী অব্যবস্থিত চিত্তে একবার এক পক্ষে একবার অপর পক্ষে প্রসাদ প্রদান করিয়াছেন, জয়মাল্য দিয়াছেন। শেষে চারি বৎসর পরে জার্ম্মাণরা এই পররাজ্য অধিকার করিবার আশা ত্যাগ করিয়াছে; আমরা যুদ্ধের পর ঈপরের দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়াছি।

ঈপরে যাইয়া প্রদর্শকরা বলিলেন, জোনিবিক (Zonnebeke) অদূরে। যুদ্ধের প্রথমাবস্থাতেই এই স্থানে ভারতীয় সৈনিকরা জার্ম্মাণ সেনার গতিরোধ করিয়াছিলেন। সেই সময় ভারতীয় সৈনিকরা উপস্থিত না হইলে যুদ্ধের গতি কিরূপ হইত বলা যায় না। কোনান ডয়েল তাঁহার যুদ্ধের ইতিহাসে (The British Campaign in France and Flanders) লিখিয়াছেন, প্রথম বৎসর ঈপরে যখন প্রচণ্ড আক্রমণ চলিতেছিল, সেই সময় লাবাসে খাল পর্য্যন্ত ভারতীয় সৈনিকরাও আক্রান্ত হইতেছিল। জোনিবিক, আর্মেণ্টিয়ার্স (Armentieres) হইতে লাবাসে (La Bassee) পর্য্যন্ত ভারতীয় সৈনিকদিগের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে সার জেমস্ উইলকক্স ভারতীয় সেনাদলের পরিচালক ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতীয় সৈনিকরাই মিত্র-শক্তিদিগকে রক্ষা করিয়াছিল (saved the situation at the time)। যখন তাহারা য়ুরোপে উপনীত হয়, তখন জার্ম্মাণরা প্যারিস অধিকারের চেষ্টায় বিফলপ্রযত্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রহত হয় নাই। ভারতের সৈনিক ও সমর-সরঞ্জামে ক্যালে রক্ষার উপায় হইয়াছিল। ইহাই জেনারল সার জেমস্ উইলকক্সের কথা। যে স্থানে দেহের শোণিতপাত করিয়া ভারতীয় সৈনিকরা বিদেশে বিদেশীর সঙ্গে আপনাদের শক্তি পরীক্ষা করিয়াছে, আপনাদের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিয়াছে, সে স্থান ভারতবাসীর পক্ষে পুণ্যতীর্থ। আমরা সে স্থান না দেখিয়া ফিরিতে পারি না।

আমরা যখন জোনিবিকে উপস্থিত হইলাম, তখন বৃষ্টির বেগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ক্যাপ্টেন কেমেডী বলিলেন, "নামিতে পারিবেন কি?" আমি বলিলাম, "এ জমীতে নামিতেই হইবে। ইহা আমার স্বদেশবাসীর রক্তসিক্ত; ভারতবাসী আমরা,—আমাদের পক্ষে এ স্থান পবিত্র।" আয়াঙ্গার মহাশয় আমার কথার পুনরুক্তি করিলেন, এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারও এতটা ভাবপ্রবণতা আছে?" আমরা অবতরণ করিয়া একটি পরিথায় প্রবেশ করিলাম। তাহার পর সেই বর্ষণের মধ্যে আবার মোটরে উঠিয়া স্যাটোর দিকে অগ্রসর হইলাম। উদ্দেশে ভারতীয় বীরদিগকে নমস্কার করিলাম।

সেই প্রত্যাবর্ত্তন-পথের কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—বারি বর্ষণ হইতেছে, দূরে কামানের গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে; আর দুই পার্শ্বে শাখাপত্রহীন তরুকাণ্ড—যুদ্ধের চিহ্নাঙ্কিত প্রান্তর, মধ্যে মধ্যে ভগ্ন-গৃহ গ্রাম ও সহর, যেন আমরা প্রেতরাজ্যে প্রেতপুরীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছি।

সন্ধ্যার পর আমরা স্যাটোয় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। আহারের পর পরদিন কোন্ কোন্ স্থানে যাওয়া হইবে তাহা স্থির করা হইল। সমস্ত দিনের বর্ষণে ও পথশ্রমে শরীর যে আর বহিতেছিল না; কিছুক্ষণ অগ্নি সেবন করিয়া শরীরে স্ফূর্ত্তি পাইলাম এবং আপনার কক্ষে যাইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।*

* [য়ুরোপের রণক্ষেত্র ও সমরায়োজন দেখিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে পাঁচ জন সম্পাদক নিমন্ত্রিত হইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বাঙ্গালী সম্পাদকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছিলেন। ফ্রান্সে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইতেছে।—ভারত-সম্পাদক]

হাবা

[শ্রীসুশীলকুমার রায়]

জমিদার বাবুর প্রথম পুত্র অবিনাশ যে দিন কোল্‌কাতা থেকে এম্ এ পাশ করে ফিরে এল, সে দিন্ হরিপুর গ্রামে একটা মস্ত হৈ-চৈ পড়ে গেল। সকলে একবাক্যে অবিনাশের প্রশংসায় গ্রামখানি মুখরিত করে তুল্‌লে।

অবিনাশের দশম বর্ষীয় ছোট ভাইটি হাবা ও কালা। সে বাটীতে সত্যনারায়ণ পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন দেখে, কিসের এ আনন্দোৎসব, বোঝবার জন্যে কত না চেষ্টা কর্‌লে। শেষে মনের কথা মনেই চেপে রেখে, একবার পূজোর দালানে, আর একবার বৈঠকখানায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তার পর যখন এক শুভদিনে অবিনাশ বিবাহিত হ'য়ে সংসারে পাকা হ'য়ে ব'সল, তখন হাবা তার নবাগত বৌদিকে দেখে কিছু আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে গেল। এ কোথা থেকে এল্ল এবং কেনই বা সংসারের মধ্যে একজন হ'য়ে ব'স্‌ল, এ সমস্যাটা কাহাকেও জিজ্ঞাসা ক'রে আর সে পূরণ ক'রতে পারলে না, কেবল দূরে দাঁড়িয়ে বৌদির মুখ-পানে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল।

ইহার অতি অল্পদিন পরেই জমিদার বাবু কালের ডাকে পাতানো ঘর ছেড়ে বিদায় নিলেন। এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনের মাঝে হাবার হৃদয় কিন্তু বড়ই ব্যথিত হ'য়েছিল। রবির আলো, চাঁদের জ্যোৎস্না আর মা-বাপের অনাবিল স্নেহ ছাড়া সে আর কিছুই পায় নি,—কিছু জানতও না। যে দিন সকলে কাঁদতে লাগল, তার মা চক্‌চকে শাড়ী ছেড়ে একখানা সাদা ধুতি প'রলেন, ঘরে-ঘরে একটা আকুল নিঃশ্বাস কেঁদে-কেঁদে ফিরতে লাগল, তখন সে সজল নেত্রে একটি কোণে চুপটি ক'রে ব'সে রইল। কি হ'য়েছে না হয়েছে, তা সে বুঝলে না; সকলে কাঁদছে তাই তারও প্রাণের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল,—সেও কান্না জুড়ে দিলে।

তার খেলার সাথী ছিল একটি প্রতিবেশী ফুট্‌ফুটে মেয়ে। যখন সে তার মৃণালের মত ছোট হাত দুখানি দিয়ে হাবার গলা জড়িয়ে দাদা ব'লে মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ত, তখন তার বুক থেকে যেন একটা পাষাণের বোঝা নেবে যেত। মুখে কিছুই ব'লতে পার্‌ত না, কেবল তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে প্রাণের কথা বোল্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ত।

২

সে দিন বাসন্তী পঞ্চমী।

হাবা তার দাদার তাড়নায় ক্ষুদ্র একখানি শ্লেট নিয়ে বাণী-দেবীর পূজার দালানে এসে দাঁড়াল। কিন্তু তার উদাস দৃষ্টি বিস্তৃত অঙ্গন পার হ'য়ে একটি ছোট রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

পথের বাঁকের অন্তরাল থেকে যখন ছবির মত একটি সুন্দর মেয়ে বেরিয়ে জমিদার বাবুর অঙ্গনের দিকে আসতে লাগল, তখন হাবার মুখ-চোকের ওপর দিয়ে একটা আনন্দের স্রোত ব'য়ে গেল। সে সুষমার হাত দুখানি ধ'রে আকার-ইঙ্গিতে আসন্ন বিচ্ছেদের বার্ত্তা এমন ক'রে বুঝিয়ে দিলে—যা সে ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পাল্লে না। সুষমার মুখখানি দুঃখে এতটুকু হ'য়ে গেল। তারা হাত-মুখ নেড়ে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় ক'রতে লাগল। ভাষা নেই, তবুও তাদের কথা যেন ফুরোয় না। তারা কতক্ষণ যে এই ভাবে কথা কইছিল, জানে না। যখন অবিনাশ এসে হাবাকে অঞ্জলি দিবার জন্যে ডাকলে তখন তাদের হুঁস হ'ল।

সেইদিনই সন্ধ্যা-বেলা হাবাকে নিয়ে তার দাদা কোল্‌কাতায় রওনা হ'ল। সুষমা অশ্রু-সজল নেত্রে তাদের যতদূর পর্য্যন্ত দেখা যায় একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

৩

পাঁচটি বছর কেটে গেছে।

কোল্‌কাতার "মুক ও বধির বিদ্যালয়ে"র হাবা এখন একজন প্রধান ছাত্র। সে প্রথমে বই, কাগজ, খেলার জিনিস ভেবে তাদের নিয়ে নাড়া-চাড়া কোর্‌ত, কাগজের ওপর লাল, কাল কালির আঁকা-বাঁকা আঁচড় কাটত।

কিন্তু শিক্ষকের শিক্ষার গুণে এক দিন তার সে ভুল শুধরে গেল। তখন থেকে সে বেশ মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়া শিখ্‌তে লাগল।

একদিন হাবা সুষমাকে একখানি দীর্ঘ "পত্র লিখে ফেল্লে। তার এই দীর্ঘ প্রবাসে থাকার একটা অসোয়াস্তি, বহুদিন তাকে না দেখার একটা তীব্র উচ্ছ্বাস চিঠিটার ভেতর বেশ ফুটে উঠেছিল।

পত্রখানি "যখন সুষমার হাতে গিয়ে প'ড়ল, তখন সে তার কিছুই বুঝতে পাল্লে না। তার বাবা তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, সেটা হাবার চিঠি। সুষমা তখনি সেটা তার একটি ক্ষুদ্র কাঠের বাক্সের মধ্যে পুরে ফেল্লে, আর বহুদিন পরিত্যক্ত একখানি জীর্ণ বর্ণপরিচয় নিয়ে 'অ—আ' মনোযোগের সহিত প'ড়তে আরম্ভ কোরে দিলে।

এর পর প্রায়ই হাবা চিঠি দিত—আর সুষমা "সেগুলো বানান ক'রে প'ড়ে যখন তার অর্থ বুঝতে পারত, তখন আনন্দে বুকখানা ফুলে উঠ্‌ত। প্রত্যেক অক্ষর তার কাছে যেন বড় মধুর, বড় প্রিয়! হাবাকে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে পত্র লিখে তার মনের ভাব জানাতে চেষ্টা কর্‌ত।

প্রায় ছ'মাস পরে হাবা একদিন বাড়ী ফিরে এল। এখন সে পূর্ণ যুবক। তার বৌদি একদিন শ্লেটে লিখে জানালো যে "তাঁর সঙ্গে সুষমার বিয়ের সব ঠিক্‌ঠাক্ হ'য়ে গেছে"। প'ড়েই হাবার মনটা বড়ই বিষণ্ণ হ'য়ে গেল। সে লিখে জানালে যে সুষমার কাছ থেকে শুধু অগ্রজের ভক্তি নেবে আর তাকে বড়-ভাইয়ের স্নেহ দেবে। তার নারী-জীবনের সাধ-আহ্লাদ এমন নির্ম্মম ভাবে নষ্ট ক'রতে পারবে না। যাকে ভালবাসে, তার অমঙ্গল এমন ক'রে সে নিজে ডেকে আনবে না। হাবার চক্ষের জল্‌ল শ্লেটের অক্ষরগুলি মুছে যাবার উপক্রম হ'ল। বৌদি তাকে কোলের ওপর টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। আর সে বালকের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বুক থেকে একটা গুরুভার নামিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রছিল।

হাবা তার দাদার দ্বারা একটি শিক্ষিত পাত্র সুষমার জন্যে ঠিক ক'রে তার বাপকে জানালো। শুনে তাঁর মুখখানি কৃতজ্ঞতার এক পবিত্র জ্যোতিঃতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল।

এক শুভ-রাত্রে যখন বর ব্যাণ্ড বাজিয়ে সুষমাদের দোরের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন হাবা প্রীতি-উপহার বিতরণে ব্যস্ত। সেটা সে অনেক রাত জেগে এই বিয়ের জন্যেই লিখেছিল।

শুভলগ্নে সুতহিবুক যোগে সুষমার বিয়ে হ'য়ে গেল। হাবা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখ্‌লে; তার পর বর-ক'নে যখন বাসরে গেল, তখন সে আলোকোজ্জ্বল বিয়ের দালান ছেড়ে বাইরে—প্রকৃতির জমাট অন্ধকারের ভেতর এসে দাঁড়াল। অন্তরের মধ্যে চেয়ে দেখলে যে বাইরের অন্ধকারের মত সেখানেও ঘন আঁধারের একটা জমাট বেঁধে গেছে; কিন্তু তার মধ্যেও শান্তির ক্ষীণ জ্যোতিঃ তাকে যেন আশ্বাস দিচ্ছিল। ক্ষুদ্র বুকখানি আলোড়িত ক'রে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস কাঁপতে-কাঁপতে বেরিয়ে গেল। কোঁচার খোঁটে চক্ষু মার্জ্জনা ক'রতে গিয়ে দেখ্‌লে, অবাধ্য অশ্রু-রাশি কখন তার অজ্ঞাতে বক্ষের কামিজের অনেকটা ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। সে ধীরে-ধীরে তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড ফটকের মধ্য দিয়ে বাড়ীর ভেতর এসে আপনার ক্ষুদ্র বিছানাটার ওপর শুয়ে প'ড়ল।

* * * *

দুবছ'র পরে কোল্‌কাতার যোড়াসাঁকোর একখানা বাড়ীর সামনে একটি যুবক সাইকেল হস্তে এসে দাঁড়াল ও ভেতরে একটা পুলিন্দা ও একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলে।

গৃহকর্ত্রী সুষমা সেই সময় পিয়ানোতে একটি গৎ শিক্ষা কচ্ছিলেন। পুলিন্দাটি নিচে রেখে দিয়ে পত্রখানা খুলে প'ড়তেই তাঁর মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। হৃদয়ের এক গোপন তন্ত্রীতে বহু দিনের ভুলে যাওয়া স্মৃতির একটা করুণ সুর কেঁদে-কেঁদে বেজে উঠল। সুষমা তাড়াতাড়ি উঠে বারান্দায় এসে দেখলেন,—তাঁর বাল্য-সহচর হাবা একখানি সাইকেলের ওপর ভর ক'রে ধীরে-ধীরে রাস্তার বাঁকের দিকে স'রে গেল। আর তার পিঠের ওপর মসৃণ চাদরখানি পাশের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে ঈষৎ বায়ু-তরঙ্গে হিল্লোলিত হ'য়ে তাকে যেন বিদায়-অভিনন্দন কচ্ছিল।

স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্রাবলী *

[অধ্যাপক শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম্-এ]

(১)

দেশপূজ্য, বরেণ্য, স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সহিত সৌভাগ্যক্রমে তদীয় স্বর্গতির প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে আমার আলাপ পরিচয় ঘটে। তদবধি যখনই কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার না করিয়া আসি নাই। আমাদের পঠদ্দশা হইতেই তাঁহার আচার-নিষ্ঠা, মাতৃভক্তি প্রভৃতি বিষয়ের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি একটা প্রবল শ্রদ্ধা জন্মে ;—তাই তাঁহার মুখে সদালাপ শুনিবার জন্য ঐরূপ আগ্রহ হইয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলাম যে, তদীয় বাল্যাবস্থায় কলিকাতায় যেরূপ ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়াছিল, ইহাতে তিনি কিরূপে স্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে এবং একজন উচ্চদরের ব্যবহারাজীবরূপে পরিগণিত হইয়া, জ্ঞানে ও কর্ম্মে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিয়াছেন, তাহা আমাদের সমাজের সকলেরই জানা উচিত ; অতএব তিনি একখানি আত্মচরিত লিখিলে সমাজের বড়ই উপকার হইবে। আত্মচরিত লিখিতে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন, এবং তাঁহার সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইবার পরে, আমার অনুরোধটা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এই কথা বলেন।

কিছুকাল পরে, হিন্দু বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব হয়—আমি তদুপলক্ষে আমার মতামত লিখিয়া প্রস্তাবের উত্তরে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম এবং তাহা যথাসময়ে যথাস্থানে প্রেরিত হইলেও, তৎপর কলিকাতায় গেলে পূজ্যপাদ স্যার গুরুদাসকে উহার প্রতিলিপিখানি পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি পত্রের যুক্তিতর্ক শুনিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য, আমি এ বিষয়ে যেরূপ চিন্তা করিয়াছি, আপনিও দেখিতেছি সেইরূপই চিন্তা করিয়াছেন।" এই বলিয়া এক ফর্ম্মা প্রূফ্ আনিয়া কতকটা আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম 'প্রূফ্‌টা কিসের ?' তখন তিনি বলিলেন, 'সেই যে আপনার অনুরোধ ছিল—তাহা মনে রাখিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছি—সত্বরই প্রকাশিত হইবে। অবশ্যই একখানি আপনি পাইবেন।" গ্রন্থের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, "জ্ঞান ও কর্ম্ম।" কিছুদিন পরে একখণ্ড "জ্ঞান ও কর্ম্ম" সহ নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইলাম। *

শ্রীহরিঃ

(১ নং পত্র)* শরণম্

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা

৯ই ফাল্গুন ১৩১৬

কল্যাণবরেষু,

অদ্য বুক পোষ্টে আপনার নিকট আমার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক পুস্তক একখানি পাঠাইলাম। আপনি আমার এই পুস্তক প্রণয়নের একজন প্রবর্ত্তক। সুতরাং ইহা আপনার বিবেচনায় কিরূপ হইয়াছে তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার কিঞ্চিৎ ঔৎসুক্য রহিল। আশা করি আপনি সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তকখানি অতীব শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিলাম। সম্ভবতঃ ইহাই স্যার গুরুদাসের বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনার প্রথম উদ্যম, কিন্তু এই সপ্ততি বর্ষ-দেশীয় মহাত্মা যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে ইহা লিখিয়াছেন, কয়জন তরুণ বয়স্ক ব্যক্তি তেমন পারিবেন ? যাহা হউক, তাঁহার পুস্তকে সম্বন্ধে তাঁহারই আদেশ অনুসারে আমি যেরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছিলাম, † তাহার অনেকটা তদীয় উত্তর হইতেই ব্যক্ত হইবে।

---

* প্রতি পত্রের পূর্ব্বে এইরূপ একটু 'ভূমিকা' না দিলে ব্যাপারটা বিশদভাবে লেখা যাইবে না ;—তাই মধ্যে মধ্যে নিজের কথা পাড়িতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটু আত্ম-খ্যাপনও আছে বৈ কি ? সহৃদয় পাঠকবর্গ সেটুকুর অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, এই সানুনয় অনুরোধ

পত্রগুলির যে সকল পাদটীকা মধ্যে মধ্যে আছে, সেগুলি আমার নিজস্ব—এটাও বলা আবশ্যক।

* এই নম্বর আমি দিলাম। আমার নিকটে তাঁহার লিখিত পত্রাবলীর ইহাই যে প্রথম, তাহাও বলিতে পারি না—অনেক পত্র এখন আর খুঁজিয়া পাইতেছি না। ["শ্রীহরিঃ শরণম্" "নারিকেলডাঙ্গা" "কল্যাণবরেষু" "শুভানুধ্যায়ী" এইগুলি সকল পত্রেই আছে। অন্যান্য পত্রে এই সব বাহুল্য বোধে লেখা হইবে না।]

† তাঁহার নিকটে আমি যে সকল চিঠি-পত্র লিখিয়াছিলাম সেইগুলির প্রতিলিপি রাখি নাই, তেমন প্রয়োজনই বা কি ? পাঠকবর্গের কাছে পুণ্যশ্লোক স্যার গুরুদাসের পত্রাবলীই সমাদরণীয় হইবে ; আমার পত্র দেখিবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ না হইবারই কথা। তবে কখন কখন "কীটোঽপি সুমনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ।"

(২নং পত্র) ৭ই চৈত্র ১৩১৬

আপনার গত ৩রা চৈত্রের প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। আমার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক পুস্তকখানি আপনি এত যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এতগুলি ভাল কথা বলিয়াছেন, এবং তাহার যে যে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন বা সংশোধন আপনার মতে বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা এত সরল ও শান্ত ভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে আমি অতিশয় বাধিত ও উপকৃত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন ৪১ পৃষ্ঠায় 'সংজ্ঞা' স্থানে 'আন্তর জ্ঞান' ও ৪৩ পৃষ্ঠায় 'আত্মজ্ঞান' স্থানে 'অহংজ্ঞান' হইলে ভাল হইত। 'সংজ্ঞা শব্দটি সম্পূর্ণ মনের মত না হইলেও 'আন্তর জ্ঞান' যে তদপেক্ষা ভাল হইবে ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। 'আত্মজ্ঞান' স্থলে 'অহংজ্ঞান' হইলে ভাল হইত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং এ পুস্তকের যদি কখন দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তাহাতে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিব ইচ্ছা রহিল।

বাঙ্গালায় বিশেষণের লিঙ্গ ভেদ থাকা উচিত কি না আপনি এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ইহা একটি কঠিন প্রশ্ন। আমি এক সময় মনে করিয়াছিলাম সংস্কৃত বিশেষণের পুং-লিঙ্গে প্রথমান্ত রূপ বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। আপনারও মত দেখিতেছি অনেকটা সেই দিকে। কিন্তু যদিও এই মত অনেক স্থলে চলে, ইহা সর্ব্বত্র চলিতে পারে না। 'রূপবান্ নারী' 'শ্রীমান্ রাধা' বোধ হয় কখনই চলিবে না। অথচ আবার 'উপযোগিনী শিক্ষা' 'অনুযায়িনী প্রথা' সংস্কৃতের বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে পারে। এই ভাবিয়া ইন্‌ভাগান্ত বিশেষণ ক্লীবলিঙ্গে হ্রস্ব ইকারান্ত রাখা ও অন্যত্র পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়ম মত পুংলিঙ্গের প্রথমান্ত রূপ প্রয়োগ অর্থাৎ দীর্ঘ ঈকারান্ত রাখা এই মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু ইহা যে শুদ্ধ বা সুগম পথ তাহা বলিতে পারি না। বিশেষ আপনার ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বাঙ্গালা রচনায় সিদ্ধহস্ত ব্যক্তির মত যখন অন্যরূপ, তখন ঐ সন্দেহ আরও গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয় বিশেষ বিবেচনার স্থল রহিল। দেখিব ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

সংস্কৃত শ্লোক বা বাক্য ইচ্ছা পূর্ব্বকই দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত করাইয়াছি। আপনি দেখিতেছি বঙ্গাক্ষরের কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী। সত্য বটে "জননী শ্রেষ্ঠা কন্যাকে অকাতরে তদীয় সম্পত্তি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন" কিন্তু তাই বলিয়া সমৃদ্ধিশালিনী জননী কন্যার পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন না। বিশেষ যখন তাঁহার নিজের পরিচ্ছদ কখনও জীর্ণ বা মলিন হয় নাই, বরং কন্যার পরিচ্ছদ অপেক্ষা সর্ব্বত্র অধিকতর সুপরিচিত রহিয়াছে, তখন তাহা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? আপনি যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত বোধ হয় অধিক আছে, যথা ম্যাক্‌স্‌মুলার। এবং গ্রীক কবিতা ও বাক্য গ্রীক্ অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

শূদ্রগণ অনার্য্য কি না এ বিষয় আপনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সকল শূদ্র অনার্য্য না হইতে পারেন, তবে অনেকে অনার্য্য বলিয়া বোধ হয়। এবং এ কথা শাস্ত্র দ্বারা সপ্রমাণ না হইলেও, পুরুষসূক্ত বা স্মৃতি বা অন্য কোন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কেন বলিব?

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য" ইত্যাদি শ্লোকটির প্রামাণিকত্ব আপনি সন্দেহ করিয়াছেন। আমি এ শ্লোকটি কোন্ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা লিখিয়া দিয়াছি। এ শ্লোক প্রমাণিত হউক আর না হউক, এই মর্ম্মের অনেক কথাই হিন্দুশাস্ত্রে ও হিন্দু ভক্তের মুখে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের বিশ্বরূপ বা বিরাট মূর্ত্তি ত এই কথাই প্রকারান্তরে বলা। ভক্ত রামপ্রসাদের কথা—'কাজ কি আমার কাশী —শ্যামা মায়ের চরণতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী'-ও একটা প্রচলিত কথা—'মন চাঙ্গা ত কাঠমে গঙ্গা' ঐ শ্লোকের একাংশের পোষকতা করে।

পশু বলিদান সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। তবে আমি যাহা বলিয়াছি তাহার অনুকূলে শাস্ত্রে অনেক প্রমাণ আছে। তথাপি যদি এ বিষয়ে আমার কথা আপনার ন্যায় হৃদয়বান্ ব্যক্তির ব্যথাজনক হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মত অব্যাহত রাখিয়া ভাষার সমুচিত পরিবর্ত্তন দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্যই করিব।

আপনি আমার প্রতি প্রীতি-প্রণোদিত হইয়া আমাকে আত্ম-জীবনী লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু এ অনুরোধ রক্ষা করিতে আমি অক্ষম। আত্মজীবনী লিখিতে গেলে বোধ হয় কিঞ্চিৎ আত্মাভিমান সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু এ বয়সে আত্মাভিমান যতদূর ছাড়িতে

পারি ততই মঙ্গল। আর অধিক কি বলিব। আশা করি আপনি সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। ইতি

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথমেই বলিয়াছি যে 'আত্মচরিত' লিখিবার জন্যই আমার সাগ্রহ অনুরোধ ছিল। সেই অনুরোধের অবান্তর ফলস্বরূপ "জ্ঞান ও কর্ম্ম" পাইয়াও তৃপ্তি হইল না, আবার অনুরোধ করিলাম। উত্তরে যাহা বলিলেন, পূর্ব্বপত্রেই দেখা গিয়াছে। যাহা হউক, এই উত্তরেও আমি সন্তুষ্ট না হইয়া যুক্তিতর্ক সহকারে তৃতীয়বার আমার অনুরোধ জানাইলাম, এবং তৎসঙ্গে, শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তল্লিখিত "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" প্রবন্ধে হিন্দু-সমাজের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরচ্ছলে "জাহ্নবী" পত্রিকায় প্রকাশিত মদীয় প্রবন্ধটি * তাঁহার দৃষ্ট্যর্থে পাঠাইয়া দেই। পরবর্ত্তী পত্রে ঐ দুই বিষয়ের কথাই আছে।

(৩ নং পত্র) ১২ই চৈত্র ১৩১৬।

আপনার গত ৯ই চৈত্রের পত্র ও প্রেরিত "জাহ্নবী" পত্রিকার পৌষ খণ্ড একখানি পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আপনার প্রণীত উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ডাক্তার রায়ের প্রবন্ধে লিখিত অনেকগুলি কথার প্রতিবাদ আবশ্যক, এবং আপনি যেরূপ সুন্দর ভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা সকলের না হউক অধিকাংশ বাঙ্গালীরই প্রীতিকর হইবে। প্রতিবাদ দুই এক স্থলে একটু তীব্র হইয়াছে, কিন্তু কোনও স্থলেই অন্যায় হইয়াছে বলা যায় না। সমালোচনার ভাষা তেজের বটে কিন্তু প্রবন্ধকারের প্রতি অসম্মানসূচক নহে। এবং সমালোচনায় যে সকল যুক্তি ও প্রমাণের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা প্রায়ই অকাট্য। আমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রযুক্ত আপনি যেরূপ আগ্রহ সহকারে ও প্রীতিপূর্ণ বাক্যে আমাকে আত্মজীবনী লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে অতীব শ্লাঘার বিষয় এবং তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে প্রাণ চাহে না। তবে দুই একটি কথা না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। যদিও সময়ে সময়ে অবস্থার গতিকে লোককে উপদেশ দিতে হইয়াছে এবং আত্মীয়জনগণের নিকট উদাহরণ স্বরূপ নিজ জীবনের ঘটনা বিবৃত করিতে হইয়াছে, কিন্তু সাধারণের নিমিত্ত নিজ জীবনী লিখিতে গেলে আমার জীবন-বৃত্তান্ত সাধারণের জানিবার যোগ্য ইহা কার্য্যতঃ বলিতে হয়, এবং তাহা বলাতে কিঞ্চিৎ আত্মাভিমান প্রকাশ পায়। এই জন্যই আমার এ বিষয়ে এত অনিচ্ছা। আর অধিক কি বলিব। ইতি।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৯১ অব্দে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ উপাধিধারীদিগকে দুইজন 'ফেলো' নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়, তখন নিয়ম ছিল যে নির্ব্বাচকগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া ভোটিং পেপারে নাম লিখিবেন। পশ্চাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সঙ্গে মুনসেফ্, সবজজগণকেও এই অধিকার দেওয়া হয় যে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভোটিং-পেপার পরিপূরণ করা যাইতে পারে। নূতন রেগুলেশন জারি হইলে কেবল রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটরা ভোট দিবেন, এই নিয়ম হইল। তখন তদানীন্তন ভাইস্-চ্যানসেলার মহামান্য স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে ম্যাজিষ্ট্রেট, মোনসেফ ও সবজজদের ন্যায় শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদের সম্মুখেও ভোটিং পেপারে নাম লেখা যাইতে পারে, এইরূপ বিধি হওয়া উচিত। স্যার আশুতোষ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় পূজ্যপাদ স্যর গুরুদাসকে এবিষয়ে একটু আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। পরবর্ত্তী চিঠিতে এই বিষয়ই আছে।

(৪ নং পত্র) ৩০শে কার্ত্তিক ১৩১৭

আপনার গত ২৮এ কার্ত্তিকের পত্র অদ্য পাইয়াছি। আপনার মঙ্গল সমাচার জ্ঞাত হইয়া সুখী হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য-নির্ব্বাচনে কলেজের অধ্যাপকদিগের সম্মুখে ভোটিং পেপার সহি করিলেই চলিবে, এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করণার্থে শ্রীযুক্ত আশুবাবুকে ও শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ বাবুকে কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কোনও আশা বা উৎসাহ পাই নাই। তথাপি আর একবার বলিয়া দেখিব। আমি ভাল আছি, এবং আমার বাড়ীর সমাচার আপাতত সমস্ত মঙ্গল। ইতি।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতঃপর বোধ হয় একবার তাঁহার বাড়ীতে এই বিষয়ে মৌখিক আলোচনা হয় এবং আমি রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকটে নিয়মমত আবেদন করিব, এইরূপ বলিয়া আসি। ইতোমধ্যে মদীয় "প্রবন্ধাষ্টক" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাঁহাকে একখানি এবং তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একখানি উপহার প্রদান

*** এই প্রবন্ধ পরিশেষে পুনর্মুদ্রিত হইয়া "বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি-নিরাস" শিরোনামে গৌহাটি সনাতন ধর্ম্মসভা কর্তৃক প্রকাশিত সমাজ-সেবক পুস্তকাবলীর ১ম সংখ্যারূপে প্রচারিত হইয়াছে।**

করি। হারাণ বাবুর সঙ্গেও সেই সময়ে বিশেষ আলাপ পরিচয় হয়; যেমন পিতা, তেমনই পুত্র, অতি অমায়িক ও সাধু প্রকৃতিক। পুস্তক পাঠাইয়া সঙ্গে সঙ্গে রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদনের খস্‌ড়াও পাঠান হইয়াছিল। পরবর্ত্তী পত্রে উভয় জিনিসেরই উল্লেখ আছে।

(৫ নং পত্র) ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

আপনার পত্র ও প্রেরিত "প্রবন্ধাষ্টক" নামক পুস্তক দুইখানি পাইয়াছি।

হারাণের নামীয় পুস্তকখানি হারাণকে দিয়াছি এবং আমার নামীয় পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। পুস্তকের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিবার সময় পাইয়াছি। যেটুকু পড়িলাম তাহাতে দেখিতেছি আপনার রচনা যেরূপ হওয়া আশা করা যায় সেইরূপই হইয়াছে। গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠান্তে যদি আর কিছু বলিবার থাকে পরে বলিব।

রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন পত্রখানি যথাযোগ্য হইয়াছে, দুই এক স্থলে দুই একটি কথার পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়, তাহা পেন্‌সিলে লিখিত হইল। আবেদন পত্রখানি এই সঙ্গে ফেরত পাঠাইলাম। ইতি।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবেদন পত্র রেজিষ্ট্রারের নিকটে যথারীতি প্রেরিত হইলেও তখন উহাতে কোনও ফল হয় নাই। পশ্চাৎ এ বিষয়ে যে অনেকটা সফলতা লাভ হইয়াছিল যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে।

'প্রবন্ধাষ্টক' সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে পত্রালাপ আর হয় নাই। কিছু কাল পরে সাক্ষাৎকার হইলে তিনি তদীয় মতামত মৌখিক বলিয়াছিলেন। পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ'তে বাঙ্গালা রচনারীতির আদর্শ গ্রন্থাবলীভুক্ত করিবার জন্য তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়ানুগত অপক্ষপাতিত্ব প্রণোদিত হইয়া তিনি "কালিদাসের কাহিনী" বর্জ্জন করিয়া তালিকাভুক্ত করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই।* কালিদাসের কাহিনীতে আদিরস ঘটিত কতকগুলি শ্লোক থাকাতেই তিনি তাহা বর্জ্জনীয় মনে করিয়াছিলেন। তার পর প্রায় তিনবৎসর কাল পত্র-ব্যবহার হইয়া থাকিলেও পত্রগুলি হারাইয়া গিয়াছে। ঐগুলিতে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয় না।

১৩২০ সালের সম্ভবতঃ পৌষ মাসে মাননীয় স্যার ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় ল-কলেজ পরিদর্শনোপলক্ষে গৌহাটিতে আইসেন। তাঁহার সঙ্গে ভোটিং পেপার দস্তখত সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হয়। পূর্ব্বে স্যার গুরুদাস যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও তিনি স্মরণ করিয়া আমার প্রস্তাবটির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন। পরে যখন তিনি ভাইস্ চ্যান্সেলর হইলেন, তখন একখানি আবেদন প্রস্তুত করিয়া পূজনীয় স্যার গুরুদাসের নিকটে পরীক্ষার্থে প্রেরিত হইল। তদুত্তরে তিনি যাহা লিখিলেন, পরবর্ত্তী পত্রে তাহা দৃষ্ট হইবে।

(৬ নং পত্র) ২২শে ভাদ্র ১৩২১।

আপনার গত ১৭ই ভাদ্রের পত্র ও তৎসহ প্রেরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নামীয় একখানি চিঠির খসড়া গত ২০শে ভাদ্র সন্ধ্যার সময় পাইয়াছি। ঐ খসড়ার ৬ দফায় লিখিত কথা* সম্বন্ধে আমি কিছুই অবগত নহি, সুতরাং এ দফায় কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না। অন্যান্য দফায় পেন্‌সিলের লেখায় দুই একটি সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি। খসড়াখানি এই পত্রসহ ফেরত পাঠাইলাম। ঈশ্বর করুন আপনার আবেদন সফল হউক।

এখানকার সমাচার আপাততঃ সমস্ত মঙ্গল। ইতি।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই আবেদন পত্রখানি যথাসময়ে প্রেরিত হইয়াছিল;—ইহাতে আমাদের কলেজের যে সকল অধ্যাপক রেজিষ্টার্ড গ্রাডুয়েট্ ছিলেন, সকলেই সানন্দে যোগ দিয়াছিলেন। ইহার কোনও জবাব পাওয়া যায় নাই। কিন্তু যখন ভোটিং পেপার আসিল তখন দেখা গেল যে নিয়ম একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোনও কলেজের প্রিন্‌সিপাল, ভোটিং পেপার কাউণ্টার-সাইন্ করিবার অধিকার পাইয়াছেন।

বহুদিনের আন্দোলনে কিছুটা সফলতা লাভ করিয়া স্যার গুরুদাসের নিকটে হর্ষ প্রকাশ† পূর্ব্বক পত্র লিখিলাম, উত্তরে তিনিও আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

---

* পুস্তকখানি বঙ্গ ও আসামের সর্ব্ববিধ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর গ্রন্থাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

* ৬ দফায় একটি শোনা কথা লেখা গিয়াছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোগণ কাউন্‌সিলের মেম্বর নির্ব্বাচন সময়ে ভোট্ দিবার কালে না কি পূর্ব্বে এইরূপে ভোটিং পেপার ব্যক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ সহি করিতে হইত। পশ্চাৎ ঐ প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। স্যার গুরুদাস এ বিষয় উক্তরূপ মত প্রকাশ করাতে এই দফা বাদ দেওয়া হয়।

† অধ্যবসায়ের আংশিক সফলতার জন্যই যে এই হর্ষ এমন নহে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে আর নির্ব্বাচনে যোগ দিব না, তাই প্রায় ১০ বৎসরকাল ভোট্ দেই নাই।

(৭ নং পত্র)   ১লা পৌষ ১৩২১।

আপনার গত ২৬শে অগ্রহায়ণের প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। আপনি যে বিষয়ের জন্য এতদিন যত্নবান্ ছিলেন তাহাতে আপনার যত্ন সফল হইয়াছে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছি। এবং আমি একা নহি রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট্ সকলেই আনন্দিত। কারণ এই নিয়ম পরিবর্ত্তনে আমাদের সকলেরই সম্মান ও সুবিধা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। আর এজন্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ইতি।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিঃসম্বল

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি]

জ্যেষ্ঠপুত্র বিনোদলাল উকীল হইয়া স্থানীয় আদালতে বাহির হইলেন ও কনিষ্ঠ বিপিন Entrance পাশ করিয়া কলিকাতায় F.A. পড়িতে আরম্ভ করিল, এমন সময় বিজয়বাবু সামান্য ৫।৬ দিনের জ্বরে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লোকান্তরে গমন করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া বিপিন নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িল; যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই জীবনটা তাহার নিতান্ত ব্যর্থ বোধ হইতে লাগিল।

বিজয়বাবু গৃহস্থ হইলেও তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্রের বিবাহ কলিকাতার কোন বিশিষ্ট ধনীর ঘরে দিয়াছিলেন। কিন্তু এই জন্য শেষ জীবনে তাঁহাকে কিছু অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। পিতৃধন-গর্ব্বিতা পুত্র-বধূ তাঁহার বালবিধবা কন্যাকে কোন দিনই অনুরাগের চক্ষে দেখেন নাই। অভিমানিনী কন্যাও তাহা সহ্য করিতে পারিত না। একটা অশান্তির ছায়া সর্ব্বদা সংসারটা ব্যাপিয়া থাকিত। বিজয়বাবু ইহার কোন প্রতিকার দেখিলেন না। কিন্তু ভগবান অতি সহজে ইহার উপায় করিয়া দিলেন। মৃত্যু আসিয়া এক দিন ব্যর্থজীবন স্বামীহারাকে তাহার শীতল অঙ্কে টানিয়া লইল। অভিমানিনী মরিবার পূর্ব্বে পিতাকে বলিয়া গিয়াছিল— "বাবা, বিপিনের বিয়ে খুব গরীবের ঘরে দিও।"

কিন্তু তনয়ার শেষ অনুরোধ পালন করিবার পূর্ব্বেই বিজয়বাবু লোকান্তরিত হইলেন।

দুই বৎসর পরে বিপিন F. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। বিনোদলাল তখন বিপিনের বিবাহের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

সংসারে বিপিনকে তেমন স্নেহ করিবার কেহই ছিল না। বিনোদলাল কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন; ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্যের তিনি কোন ক্রটী করিতেন না। বিপিনকে কোন দিন তিনি অর্থের জন্য অসুবিধায় ফেলেন নাই। কিন্তু তাহার পিতৃমাতৃ-বিয়োগ-কাতর তরুণ হৃদয় যে স্নেহের প্রত্যাশায় তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিত, তাহা বিনোদলাল কখন অনুভব করিতে পারিতেন না।

স্নেহহীন, গর্ব্বোদ্ধত, কর্ম্মকোলাহল-মুখরিত মহানগরীর মধ্যে থাকিয়া মাঝে-মাঝে তাহার সমস্ত হৃদয়টা বিকল হইয়া উঠিত। তাহার অতীত বাল্য-জীবনের ছবিখানির প্রতি সে তখন লুব্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিত। সে অস্পষ্ট ছবিখানির স্থানে-স্থানে অশ্রুজলে কত মুছিয়া গিয়াছে, তবু সে অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র আলেখ্য-খানি আজিও কত সুন্দর! স্নেহ-পিপাসায় তাহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠিত; অধ্যয়নে আর অনুরাগ রাখিতে পারিত না। তখন সে একবার গৃহে ফিরিত। কিন্তু গৃহে আসিয়া ভ্রাতার সাদর-সম্ভাষণে হৃদয়ের সে আকুল তৃষ্ণা মিটিত না; ভ্রাতৃজায়ার নীরস কুশল প্রশ্নে সে তীব্র হৃদয়ভেদী পিপাসার বিন্দুমাত্র হ্রাস হইত না। সরিৎ শুকাইয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিত; তবু এক সময়ে তাহাতে যে নির্ম্মল বারিরাশি তাহার সকল শ্রান্তি, সকল তৃষ্ণা দূর করিত, ইহা সে ভুলিতে পারে নাই। তাই তৃষ্ণা

পাইলেই অভ্যাস মত সে সেই পুরাতন শুষ্ক সরিতে ছুটিয়া আসিত ; ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিবার সময় আবার দ্বিগুণিত তৃষ্ণা লইয়া ফিরিত। জনক-জননীর স্নেহহারা হইয়া অন্যত্র স্নেহের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র, এ নিষ্ঠুর সত্য বড়ই কঠোর ভাবে সে হৃদয়ঙ্গম করিত। সে স্বর্গীয় স্নেহ-ঘেরা জীবন তাহার ভাগ্যে আর আসিবে না।

বিবাহের কথা শুনিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় বিবাহের বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু স্বভাবতঃ সে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় নম্র, ভীরু ; তাই অতি সঙ্কুচিত ভাবে বিবাহে আপাততঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু যখন বিনোদলাল বলিলেন—"বাবা মারা গেছেন বলে কি তুমি স্বাধীন হয়েছ ; আমার কি তোমার উপর কোন জোর নেই ?" তখন বিপিন আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না।

তবে একটা বিষয়ে বিপিন স্থির-সঙ্কল্প প্রকাশ করিল ; বলিল, গরীবের ঘরে ভিন্ন সে বিবাহ করিবে না। পরলোক-গতা দিদির শেষ অনুরোধ ও পিতার অন্তিম অভিপ্রায় সে জানিত।

নিজের শ্বশুরের মত অত ধনী না হইলেও অপেক্ষাকৃত অল্প বড় ঘরে বিনোদলাল বিপিনের সম্বন্ধ স্থির করিতে-ছিলেন। কিন্তু তাহা আর হইল না। পত্নী মনোরমা দেবী দেবরের সঙ্কল্প শুনিয়া স্থির করিলেন, তিনি বড়লোকের কন্যা ; সেইজন্য তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্য এই সব কথাবার্ত্তা ; বলিলেন—"যেমন করছে গরীব-গরীব, তেমনি তিন-কূলে কেউ নেই এমনি দেখে বিয়ে দাও।"

সহায়-সম্পত্তি-বিহীনা এক বিধবার ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যার সহিত বিপিনের বিবাহ সম্পন্ন হইল।

বিবাহের পরদিন বধূ লইয়া বিপিন গৃহে ফিরিল। কিন্তু বিবাহে যাঁহাদের আনন্দ, তাঁহারা একে-একে সবাই চলিয়া গিয়াছেন। জননীর একবিন্দু আনন্দাশ্রু এ বিবাহে ঝরিল না ; পিতার সস্নেহ আশীস্ এ নির্জ্জীব বিবাহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিল না ; স্নেহশীলা ভগিনীর মঙ্গল-শঙ্খ সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া এ করুণ বিবাহে বাজিল না।

বিবাহের পর বিপিন কলিকাতায় বি-এ পড়িতে গেল। নব-বধূর মাতার অবস্থা অতি দীন ; অতি কষ্টে মাতা-পুত্রীর অন্নসংস্থান হইত। কাজেই বিবাহের ২।১ মাস পরে বিধবা মাতা শুধু চির-সঞ্চিত অশ্রুসিক্ত আশীর্ব্বাদ মাত্র দিয়া কন্যাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

গরীবের ঘরে বিবাহে পরলোকগত পিতা ও ভগিনীর শেষ অভিপ্রায় পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু তাহাতে একটা বিষম অনর্থ দেখা দিল। সমান ঘরের মেয়ে হইলে হয় ত সে প্রাণপণ চেষ্টায় বড়-বধূর এক-আধ বিন্দু ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিত ; কিন্তু গরীবের মেয়ে বলিয়া তাহার আর কোনই সম্ভাবনা রহিল না। মনোরমা দেবী দেবর-জায়া সুশীলাকে অবহেলার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। সে যে নিতান্ত দরিদ্রের কন্যা, ফাঁকি দিয়া তাঁহার সংসারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা তিনি প্রায়ই কনিষ্ঠাকে সমঝাইয়া দিতেন। এ অকাট্য মীমাংসার বিরুদ্ধে সে বেচারীর কিছুই বলিবার ছিল না ; সে যে দরিদ্রের কন্যা তাহা যে নিতান্ত নিদারুণ ভাবেই সত্য! সে সম্পূর্ণ দীনভাবেই থাকিত ; গৃহকর্ম্মে তাহার কোন ঔদাস্য ছিল না। প্রাণপণ যত্নে সে দিদিকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা ব্যর্থ হইত। মনোরমা দেবী মনে করিতেন ও-যত্ন বা আগ্রহ তাঁহার অবশ্য প্রাপ্য ; উহা না করিলে ভয়ানক দোষের কথা, করিলে উহাতে প্রশংসার কিছুই নাই।'

মাঝে মাঝে বিপিন বাড়ী আসিয়া বড়-বধূর এই রকম ভাবে মর্ম্মাহত হইত। কিন্তু এ সম্বন্ধে সে কাহাকেও কোন কথা বলিত না। শুধু যাইবার সময় সুশীলাকে বলিয়া যাইত, "বউ দিদি যা বলেন শুনবে, যেন তাঁর অবাধ্য হয়ো না।"

নির্ব্বান্ধব পুরীতে সুশীলার প্রাণটা হাঁফাইয়া উঠিত। কাহারও কাছে সে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিত না। আর কাহার কাছেই বা করিবে ? বাড়ীর লোকের মধ্যে বড়-বধূ ও এক ঝি ; সে ঝিও আবার বড়-বধূর বাপের বাড়ীর ; সুতরাং তার কাছ হইতেও সহানুভূতি বড় একটা আসিত না।

কিন্তু বিপিন বাড়ী আসিলে সে একবার হৃদয়রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। তাহাকে যেন আজীবন অগাধ জলে সাঁতার কাটিয়া যাইতে হইবে। বিপিন আসিলে সে যেন একখানি উদ্ধারের ভেলা পাইত, খানিকক্ষণ তাহাতে ভর দিয়া অনেকদিনের হাঁফটা একবার ফিরাইয়া লইত।

তাহাকে একটা মিষ্ট কথা বলিবার কেহ ছিল না ; সেই

জন্য অতি সামান্য দিনের মধ্যে বিপিনকে সে একমাত্র আপনার ভাবিতে পারিয়াছিল। সেই মাতৃ-অঙ্কচ্যুতা দরিদ্র বালিকার সমস্ত হৃদয়টী স্বামী-চিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

বিপিনের কলিকাতায় ফিরিবার দিন সুশীলার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া যাইত। সে লজ্জায় কিছুই বলিতে পারিত না। কিন্তু যাইবার দিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিতে গেলে সে ব্যাকুলভাবে দুটী বাহু দিয়া বিপিনের গলা জড়াইয়া ধরিত; মুখ দিয়া একটী কথাও ফুটিত না। ধীরে বাহুমুক্ত করিতে গিয়া বিপিন দেখিত সুশীলার চক্ষে জল। "ছি, কেঁদো না" বলিয়া বিপিন সুশীলার মুখ চুম্বন করিত। সে সাদর চুম্বনে একটীর পর আর একটী অশ্রুবিন্দু আসিয়া বিপিনের ব্যথিত বক্ষ আলোড়িত করিত। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিপিন বিদায় লইত। সুশীলার মনের বেদনা সে সমস্তই বুঝিতে পারিত। ইচ্ছা হইত প্রতি সপ্তাহে একবার বাড়ী আসে; কিন্তু ইচ্ছাসত্ত্বেও সে আসিত না।

(২)

সদা-সর্ব্বদাই মনোবেদনা লইয়া থাকিয়া-থাকিয়া সুশীলার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। বিবাহের পর এক বৎসর যাইতে না যাইতে তাহার এমন জ্বর আরম্ভ হইল যে, সে জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। সামান্য জ্বর সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। ঔষধাদিতে কোন ফল হইল না। ক্রমে-ক্রমে সে বড় শীর্ণ হইয়া পড়িল। মা একবার আসিয়া কন্যাকে দেখিয়া অশ্রুজল ফেলিতে-ফেলিতে ফিরিয়া গেলেন। ইচ্ছা ছিল দিনকয়েক থাকিয়া কন্যাকে সুস্থ দেখিয়া ফিরিবেন; কিন্তু বড়-বধূর বিসদৃশ ব্যবহারে ও শ্লেষাত্মক বাক্যে তাঁহাকে ফিরিতে হইল।

একদিন রোগ প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। সংবাদ পাইয়া বিপিন বাড়ী আসিল। সুশীলার তখন শেষ দশা। পনর দিন ধরিয়া বিপিন তাহার শুশ্রূষা করিল। শেষে শরতের এক সুন্দর প্রভাতে, ছয় মাস রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর সুশীলার সমস্ত কষ্টের অবসান হইল।

বিপিন যখন শুশ্রূষা করিত, সুশীলা লজ্জা ত্যাগ করিয়া কয়দিন বলিয়াছিল—"ওগো, তোমার কাছে থেকে আমার যে একটুও আশা মেটেনি।" প্রাণপণ শক্তিতে অশ্রুরোধ করিয়া বিপিন বলিয়াছিল—"তুমি এবার সেরে উঠ, তোমাকে আমার কাছে নিয়ে রাখব।" আনন্দে সুশীলার দুটী চক্ষু ভরিয়া আসিত। তাহার শীর্ণ ক্লান্ত হস্ত দিয়া বিপিনের গলা জড়াইয়া সুশীলা বলিত—"ওগো তা'হলে আমায় বাঁচাও—তোমার পায়ে পড়ি আমায় বাঁচাও। মরে গেলে যে তোমার কাছে থাক্‌তে পাব না।"

কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে তাহার কাণে-কাণে কে যেন বলিয়া দিয়াছিল, "ওরে পৃথিবীর বন্ধন প্রয়াসী জীব, আজ তোর এ পৃথিবীর শেষ দিন।" নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত শেষক্ষণে উজ্জ্বল হইয়া সুশীলা স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল,—"আমি ত চল্লাম, আমার মার আর কেউ নেই, তাঁকে তুমি দেখো।"

এ মৃত্যু দুটী হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত করিল। বিপিনের ভগ্ন হৃদয় ইহাতে আরও ভাঙ্গিয়া গেল। আর পল্লীপ্রান্তে জীর্ণ কুটীর-বাসিনী নিত্যপ্রবাসী তনয়ার কুশল-ধ্যানরতা এক বিধবার সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা-ভরসা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইল।

বিপিন ভাবিল—বিবাহ করিয়া সে বড়ই ভুল করিয়াছিল। একটি ক্ষুদ্র প্রাণীকেও সুখী করিবার ক্ষমতা তাহার নাই; তাহারি অনাদরে ও অযত্নে সুশীলা অকালে প্রাণ হারাইল। হায়, সে যদি একটা সামান্য চাকরীতে ঢুকিয়া সুশীলাকে সঙ্গে রাখিত!

এতদিন সে নিজে হইতে কোন দিন শ্বশুরগৃহে যায় নাই। বিবাহের পর একবার মাত্র গিয়াছিল, তাহাও এক দিনের জন্য। সুশীলার মৃত্যুর এক মাস পরে বিপিন শ্বশ্রূর সহিত দেখা করিতে গেল। অভাগিনী জননীর একমাত্র কন্যা হারাইয়া যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। জামাতাকে দেখিয়া তাঁহার শোক উথলিয়া উঠিল। বিপিন সুশীলার মৃত্যুকালের সমস্ত কথা সজল চক্ষে বলিল। মাও সুশীলার আবাল্যের সমস্ত ইতিহাস বলিলেন। সে যে ধৈর্য্যের প্রতিমা, কত মহৎ গুণের আকর ছিল, তাহাই বলিতে ও শুনিতে তাহাদের সমস্ত দিন রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন সে কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। শাশুড়ীর অবস্থা দেখিয়া বিপিন বুঝিয়া গিয়াছিল, অতি কষ্টে তাঁহার দিন চলে। কলিকাতা পৌঁছিয়াই তাহার মেসের এক বন্ধুর নিকট ধার করিয়া দশ টাকা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। পত্র লিখিল—"মা, আমার এ স্নেহের দেওয়া ফিরাইয়া

দিবেন না, ও লইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবেন না। আপনার ছেলে নাই, আমাকেই আপনার ছেলে বলিয়া জানিবেন। মাকে ভরণপোষণ করিবার অধিকার সব ছেলেরই আছে।” শীঘ্রই সে একটী ছেলে পড়ান জুটাইয়া লইল। তাহাতে বারটী টাকা পাইত এবং তাহা হইতে ১০৲ টাকা প্রতি মাসে শ্বাশুড়ীকে পাঠাইতে লাগিল। সুশীলার অনুরোধ সে পালন করিতেছে মনে করিয়া সে প্রাণে একটু শান্তি পাইল। আর সেই কন্যাহারা জননীর নিকট মাসের প্রথমে যখনি টাকা কটী পৌঁছিত, তাঁহার কন্যার শোক নবীভূত হইয়া উঠিত।

(৩)

মাস ছয় পরে বিপিন বি-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী ফিরিল। প্রথম-প্রথম তাহার শোকার্ত্ত মন সুশীলার মৃত্যুর জন্য তাহার দাদা ও বৌদিদিকেই দোষী স্থির করিয়াছিল। সেই জন্য অনেক দিন সে বাড়ী যায় নাই। তাহার পর তাহার ক্ষমাশীল স্বভাব সকলকে ছাড়িয়া আপনাকেই স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য একমাত্র দায়ী মনে করিতে লাগিল। সে যদি তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে ক্রটী না করিত, তাহা হইলে ত এ অনর্থ ঘটিত না। সে যেমন একজনের কনিষ্ঠ সহোদর, তেমনি একজনের স্বামীও ত ছিল। একটী কর্ত্তব্যের অনুরোধে অপরটিকে অশ্রদ্ধা করিবার তাহার ত কোন অধিকারই ছিল না। তখন সে বাড়ী আসিল।

বাড়ী আসিয়া সে এবার একটী সান্ত্বনার বস্তু পাইল, সে বস্তুটী বিনোদলালের এক বৎসরের এক পুত্র। বিপিন তাহাকে লইয়া সুখে-দুঃখে ছুটীর দিনগুলি কাটাইতে লাগিল। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। জানা গেল বিপিন পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। গ্রীষ্মের ছুটী কাটাইয়া দাদার আদেশ মত বিপিন আবার বি-এ পড়িতে কলিকাতায় রওনা হইল।

এবার কলিকাতা গিয়া বিপিনের বাড়ীর দিকে মন পড়িয়া থাকিত। সেই অতি ক্ষুদ্র খোকা তাহার শূন্য হৃদয়ের অনেকখানি অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সে উৎসুক হৃদয়ে পূজার দিন গণিতে লাগিল।

পূজার ছুটীর সঙ্গে সঙ্গে বিপিন অধীর আগ্রহে বাটী আসিল। খোকাকে বুকে লইয়া সে অনেক পরিমাণে শান্তি অনুভব করিল।

এবার বাড়ী আসিয়া বিপিন শুনিল যে আবার তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। সে এবার দাদাকে বিনীত দৃঢ়তার সহিত বলিল—“আমি আর বিবাহ করিব না।” বিনোদলাল ক্ষুণ্ণ হইয়া তখনকার জন্য বিবাহের চেষ্টা স্থগিত রাখিলেন।

ইহার মধ্যে এক দিনের একটা ঘটনায় বিপিনের জীবনের গতি অন্য দিকে প্রবর্ত্তিত হইল। বিপিন একদিন বিদেশস্থ কোন বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়া ফিরিতে একটু রাত্রি করিয়াছিল। যেমন সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে, তাহার দাদা ও বৌদিদির সামান্য একটু বচসা অনিচ্ছা সত্ত্বে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বউদিদি তখন বলিতেছিলেন —“নিজের ভাইয়ের বেলা রাশ-রাশ টাকা ঢাল্‌তে পার, আর আমাকে কিছু দিতে হলেই তোমার সর্ব্বনাশ হয়। তবু ভাই ত কেবল ফেল্‌ই করচেন। এত বয়স হল, আজ পর্য্যন্ত ত একটা আধলা পয়সা ঘরে আনতে পারলেন না।”

পত্নীকে প্রসন্ন করিবার জন্য বিনোদলাল বলিলেন— “তা ত বটেই; কিন্তু কি করি বল? ওকে এখন না পড়ালে লোকে কি বল্‌বে।”

বিপিন আর তিল মাত্র সেখানে দাঁড়াইল না; আহত কুক্কুরের মত সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

পরদিন কোন কার্য্য-অজুহাতে বিপিন কলিকাতায় চলিয়া গেল।

কলিকাতায় আসিয়া বিপিন অনবরত কার্য্যের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। দাদার উপর তাহার তীব্র অভিমান জাগিতেছিল; সে অভিমান তাহাকে তিল মাত্র অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে দিতেছিল না। স্থানে-স্থানে সে বন্ধু-বান্ধবকে অনুরোধ করিয়া চাকরির জন্য পত্র লিখিল। দুই এক মাস কিছুই হইল না। শেষে Mandalay হইতে এক বন্ধু তাহাকে পত্র লিখিল :—

“ভাই বিপিন,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার কথামত একটী চাকরী স্থির করিয়াছি। বেতন মাসিক ৮০৲; কিন্তু তোমাকে এই বড়দিনের ছুটীর মধ্যে আসিতে হইবে, নহিলে চাকরি থাকিবে না।”

এই পত্র পাইয়া বিপিন দাদাকে একখানি পত্র লিখিল :—

"শ্রীচরণকমলেষু—

দাদা, আমার উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে। পড়া শুনা করিবার আর তেমন শক্তি নাই। কাজেই কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি।" আপাততঃ মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে আমি বর্ম্মায় এক চাকরী পাইয়াছি। বড়দিনের ছুটীর মধ্যে সেখানে যাইতে হইবে। আমার প্রার্থনা, আপনি ইহাতে কোন অমত করিবেন না। আপনি ও বৌদিদি আমার প্রণাম জানিবেন। খোকাকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবেন। আমি শীঘ্রই আপনাদের শ্রীচরণ দর্শনে বাড়ী যাইব। দিন ১২ পরেই আমাকে রওনা হইতে হইবে। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

প্রণতঃ—

বিপিন।"

পত্র লেখার কয়েক দিন পরে বাড়ী ফিরিবার পথে বিপিন শ্বাশুড়ির সহিত দেখা করিতে গেল। তাঁহার একমাত্র আপনার বলিতে যে, সেও আবার কত দূরে যাইতেছে শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। বিপিন বলিল—"এখন আপনার সম্পূর্ণ ভারই আমার জানিবেন। ভগবান যে দুঃখ দিয়াছেন, তার উপর কারো হাত নাই। কিন্তু আর কোন দুঃখ আপনাকে পাইতে দিব না। দাদার গলগ্রহ হইয়া আর পড়িবার ইচ্ছা নাই। আপনার সংসার-খরচ ছাড়া তীর্থ-ধর্ম্ম করবার জন্য আমি আপনাকে কিছু-কিছু পাঠাইব। আপনার ইচ্ছামত আপনি ও-সব করবেন —এই আমার অনুরোধ।" চোখের জলে ভাসিয়া শ্বাশুড়ি বলিলেন—"কোন্ দুঃখে তুমি এই বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে? তুমি আবার বিয়ে ক'রে সংসার-ধর্ম্ম কর।" বিপিন উদ্বেলিত অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিল—"আমার সংসারের সুখ সবই মা সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে। ও-কথা আর আমাকে বলবেন না।"

সেখান হইতে বিদায় লইয়া বিপিন বাড়ী আসিয়া দেখিল, তাহার আসিবার পূর্ব্বে বৌদিদি পিত্রালয়ে গিয়াছেন। খোকাকে দেখিতে না পাইয়া সে বড়ই ম্রিয়মান হইয়া পড়িল। সে জানিত না যে তাহার পত্র পাইয়া বিনোদলাল স্ত্রীকে সামান্য দুই এক কথা বলেন; তাহাতেই তিনি রাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছেন।

অত দূরের চাকরী পরিত্যাগ করিতে বিনোদলাল ভ্রাতাকে অনেকবার অনুরোধ করিলেন; বলিলেন—"যদি চাকরী করাই তোমার অভিপ্রায় হয়, দেশের মধ্যে কি চাকরী পাওয়া যাবে না? আর সামান্য কয়েক মাসের জন্য কেনই বা পড়াটা ছাড়বে?"

শেষের কথাটা বলিয়াই তিনি মনে-মনে নিজেকে নিজের কাছে অপরাধী বোধ করিতে লাগিলেন। সেদিনকার সেই বচসায় স্ত্রীর কথাই তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন, এ কথা তিনি ভুলেন নাই। তাহার পরদিনই প্রাতঃকালে বিপিন কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার দুই মাস পরেই সে চাকরী যোগাড় করিয়াছে। এই সব ভাবিয়া তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই বিপিন সেদিনকার কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছিল।

কিন্তু সেই কথার উল্লেখ করিয়া ভাইকে তজ্জনিত অভিমান ত্যাগ করিতে বলিবার সাহস বা প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না।

বিপিন বর্ম্মায় যাইতে কৃতসংকল্প; বলিল—"দাদা, আপনি আর কোন আপত্তি করিবেন না।"

বিদায়ের সময় বিপিন সাশ্রু-নয়নে দাদার পদধূলি লইয়া নত-দৃষ্টিতে দাঁড়াইল। পত্নী মনোরমা দেবী তাঁহার সমস্ত হৃদয়খানি অধিকার করিয়া থাকিলেও, শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন অভিমানী ছোট ভাইটীকে সুদূর প্রবাসে বিদায় দিবার সময় তিনি চক্ষু একেবারে শুষ্ক রাখিতে পারিলেন না। বলিয়া দিলেন—"যাবার দিন খোকাকে ওখান থেকে দেখে যেও। আর পৌঁছেই পত্র লিখো।"

(৫)

আজ সন্ধ্যার সময় Rangoon যাইবার একখানি জাহাজ ছাড়িবে। কতকগুলি খেলানা ও কিছু খাবার লইয়া বিপিন বিকাল বেলা বিনোদলালের শ্বশুর-বাড়ী উপস্থিত হইল। প্রথমে দ্বারবানের নিকট তাহাকে আত্ম-পরিচয় দিতে হইল। দ্বারবান অনুমতি দিলে, বিপিন ভিতরে আসিয়া একটী ঘরে চৌকির উপর বসিল। তাহাকে বড়-একটা কেহ লক্ষ্য করিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা সে নীরবে বসিয়া থাকিল। শেষে সাহস করিয়া একজন ঝিকে আপনার পরিচয় দিয়া বলিল—"বউদিদিকে বলিয়া

একবার খোকাকে লইয়া আইস। আমি আজই বিদেশ যাইতেছি, একবার দেখিয়া যাইব।"

বউদিদির সঙ্গে দেখা করিব বলিতে তাহার ভরসা হইল না।

বড়লোকের বাড়ীর ঝি হইলেও এ ঝিটা বেশ ভাল-মানুষ। সে বিপিনের কথামত তখনি বাড়ীর ভিতর গেল।

আশা ও উদ্বেগে বিপিনের হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল, বুঝি বড় লোকের বাড়ী গিয়া সে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিতে পাইবে না। এখনি খোকা আসিবে, এখনি সে তাহাকে কোলে লইবে; কিন্তু সেখানে গিয়া এখন কত দিন খোকাকে দেখিতে পাইবে না—এ-সব ভাবিয়া আনন্দে ও দুঃখে বিপিনের চক্ষে জল আসিল।

খানিক পরে ঝি ফিরিয়া আসিল; কিন্তু তাহার কোলে ত খোকা নাই! তবে হয় ত বৌদিদি বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখা করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইয়াছেন। ঝি কি বলে, শুনিবার জন্য বিপিন তাহার পানে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

ঝি বলিল—"বাবু, খোকা এখন ঘুমুচ্চে, এখন ত দেখা হ'বে না।"

বিপিন কাতর কণ্ঠে বলিল—"তুমি আমার কথা বৌ-দিদিকে বলেছিলে?"

ঝি বলিল—"হঁ্যা, বলেছিলুম বই কি; দিদিমণি বল্লেন, আর এক সময় আস্তে বোলো।"

বিপিনের মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। নিতান্ত হতাশ হইয়া সে উঠিল। ঝির নিকট খাবারের চাঙ্গ্যারিটী ও খেলানাগুলি দিয়া বলিল—"এগুলি তুমি নিয়ে যাও; খোকা উঠ্‌লে এ সব তাকে দিও।" কথা কয়টা বলিয়া বিপিনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

বিপিনের কাতর মুখ দেখিয়া ঝির মনে করুণা জন্মিল। জিনিসগুলি হাতে লইয়া ঝি বলিল—"আচ্ছা বাবা, তুমি আর একটু বস, আমি আর একবার দেখে আসি।"

বিপিন আবার বসিল।

খানিক পরে ঝি আবার সেই খাবারের ঠোঙ্গা ও খেলানাগুলি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল। বলিল—"না বাপু, তিনি খোকাকে তুল্‌তে দিলেন না।" একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঝি পুনরায় বলিল—"আর বল্লেন, এ-সব তাঁকে ফেরৎ নিয়ে যেতে বলগে। কে জানে বাপু কেমন সব মন।"

হতভাগ্য স্নেহ-দুর্ব্বল বিপিনের আর কথা কহিবার শক্তি রহিল না। খাবারের পাত্রটী ঝির নিকট হইতে লইয়া মাতালের মত টলিতে-টলিতে সে ভ্রাতৃজায়ার পিতৃ-ভবন ত্যাগ করিল।

* * * *

সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গে কলিকাতার গঙ্গার ঘাট হইতে এক-খানি জাহাজ রেঙ্গুনের উদ্দেশে যাত্রা করিল। পূর্ব্ব পারে স্নানের ঘাটগুলিতে শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। পশ্চিম তটে সঞ্চিত ধূমরাশি অস্তগত সূর্য্যের শেষ কনক-আভাটুকু মাখিয়া কনক-কিরীটী-শীর্ষ ধূম্রগিরির মত প্রতিভাত হইতে লাগিল।

জাহাজখানি ক্রমে-ক্রমে দূরে আসিয়া পড়িল। অনন্ত বারিরাশি ও বিরাট অন্ধকার ভেদ করিয়া নিদ্রিত আরোহী-বর্গকে বক্ষে লইয়া জাহাজখানি আপন মনে ছুটিয়া চলিল।

উপরের ডেকে বসিয়া বিপিন তাহার নিদ্রাহীন নেত্র আকাশের পানে রাখিয়া করযোড়ে বলিতেছিল:—

কোন মান তুমি রাখনি আমার
সেই ভাল, ওগো সেই ভাল।
হৃদয়ের তলে যে অনল জ্বলে
সেই আলো, মোর সেই আলো।"



স্বরলিপি

[শ্রীমতী প্রতিভা দেবী]

রাগিণী মিশ্র কামোদ—তাল দাদ্‌রা।

জগন্মোহন জয়দেব নমো নমঃ
ঐ যে বাঁশী বাজে, শোভন মোহন বেণু বাজে
ভাবে, কাজে, প্রাণে বাজে, মোহন মুরলী বাজে
বিশ্ব-বীণা বাজে, বিশ্ব-বাণী জাগে।
তোমারি বাঁশীর রবে এসেছি আরতি তরে,
প্রেমের ডালা লয়ে দিব চরণ-তলে।
বাঁশী শুনে এলেম হেথা কোথা সে বাঁশী বাজে,
সকল ভাবে সকল কাজে তোমারি বীণা বাজে।
ভবের কাণ্ডারী অপরূপ-ধারী
পতিত-পাবন দীনবন্ধু জগজ্জীবন দয়াসিন্ধু
আঁধারে আলোক মিশে রূপের আলোক লয়ে,
বাজিবে নূপুর তব রুণু ঝুনু তালে;
গাহিবে প্রেমের সুর প্রেম-তান-লয়ে,
বাজিবে বাঁশরী সব এক তান ধরে;
গাহিবে সকলে মধুসূদন মুরারী হরে
তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ হরি হে, হরি হে, নমি করযোড়ে

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী প্রতিভা দেবী

১ ০ ১ ০ ১ ০ ১
II মা গা -া | গা ঋা গা I পা -া -া | পা ধা পা I পা মা গা | গা ঋা সা I ঋা -া -া |
জ গ ০ ন্মো ০ হ ন ০ • জ য় দে ০ ব ন মো ০ ন মঃ • •

০ ১ ০ ১ ০ ১ ০
গা মা গা I ঋা সা ঋা | ন্‌া -া -া I সা -া -া | ঋা গা মা I ঋা গা মা | গা ঋা -া I
ঐ ০ যে বাঁ শী ০ বা ০ ০ জে ০ ০ শো ভ ন মো হ ন বে ণু •

১ ০ ১ ০ ১ ০ ১
সা ন্‌া -া | সা -া -া I প্‌া -া সা | ন্‌া -া সা I ঋা -া গা | মা গা ঋা I ঋা পা ক্ষা |
বা ০ ০ জেঁ ০ ০ ভা ০ বে কা ০ জে প্রা ০ ণে বা ০ জে মো হ ন

০ ১ ০ ১ ০ ১ ০
পা ধা পা I মা গা ঋা | ঋা -া গা I ঋা গা -া | মা গা ঋা I ঋা -া গা | ঋা -া সা I
মু র লী বা ০ জে বি ০ শ্ব বী ণা • বা ০ জে বি ০ শ্ব বা • ণী

১ ০ ১ ০ ১ ০ ১
ন্‌া -া -া | সা -া -া I পা র্সা না | না না না I না না -া | না ধা না I ধা না র্সা |
জা ০ ০ গে ০ ০ তো মা রি বাঁ শী র র বে ০ এ সে ছি আ র তি

০ ১ ০ ১ ০ ১ ০
না ধা পা I ধা না ধা | পা -া পা I মা গা -া | মা গা মা I ঋা গা মা | মা মা -া I
ত রে ০ প্রে মে র ডা ০ লা ল য়ে ০ দি ব ০ চ র ণ ত লে ০

১ ০ ১ ০ ১ ০ ১
মা মা -া | মা মা -া I পা মা -া | মা মা -া I মা পা মা | মা গা -া I গা -া -া |
বাঁ শী ০ শু নে ০ এ লেম ০ হে থা ০ কো থা সে বাঁ শী ০ বা • •

০ ১ ০ ১ ০ ১ ০
গা -া -া I মা গা -া | ঋা ঋা -া I গা ঋা -া | সা সা -া I সা গা ঋা | ঋা সা -া I
জে • • স কল ০ ভা বে • স কল ০ কা জে ০ তো মা রি বী ণা ০

১ ০ ১ ০ ১ ০ ১
ন্‌া -া -া | সা -া -া I পা ধা না | না না না I -া -া র্সা | ধা না র্সা I না ধা পা |
বা ০ ০ জে ০ ০ ভ বে র কা ণ্ডা রী • • ০ অ প রূ প ধা রী

০ ১ ০ ১ ০ ১ ০
র্সা না না I র্সা র্সা র্সা | নর্সা র্ঋা র্সা I র্সা না না | না র্সা না I না ধা পা | মা গমা পা I
প তি ত পা ব ন দী ০ ন ব ০ ন্ধু জ গ জ্জী ০ ব ন দ য়া •

১ ০ ১ ০ ১ ০ ১
পা -া পা | ধা না ধা I পা পা মা | মা গা -া I গা গা মা | ঋা গা মা I মা মা -া |
সি • ন্ধু আঁ ধা রে আ লো ক মি শে ০ রূ পে র আ লো ক ল য়ে •

০ ১ ০ ১ ০ ১ ০
সা ঋা গা I গা গা গা | গা গা -া I ঋা -া গা | ঋা -া গা I মা -া -া | গা -া -া I
বা জি বে নূ পু র ত ব ০ রু ০ ণু ঝু ০ নু তা ০ ০ লে ০ ০

১ . • ১ • ১ • ১
গা মা পা | পা পা পা I পা পা -া | মা -া পা I ধা -া ধা | ধা ধা -া I পা ধা মা |
গা হি বে প্রে মে র সু র প্রে ॰ ম তা ॰ ন ল য়ে ॰ বা জি বে

• ১ • ১ • ১ •
না না না I না না -া | ধা না -া I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া I র্গা র্রা র্রা | র্সা র্রা র্সা I
বাঁ শ রী স ব ॰ এ ক ॰ ॰ তা ॰ ন ধ রে ॰ গা হি বে স ক লে

১ • ১ • ১ • ১
না র্রা র্সা | র্সা না ধা I পা ধা পা | পা পা মা I গা -া -া | -া -া -া I পা ধা র্না |
ম ধু সূ ॰ দ ন মু ॰ রা ॰ রী হ রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ তো মা রি

• ১ • ১ • ১ •
না -া না I গা মা পা | গা রা সা I গা মা পা | গা মা পা I গা -া মা | পা -া মা I
ই ॰ চ্ছা হ উ ক পূ ॰ র্ণ হ রি হে হ রি হে ন ॰ মি ক ॰ র

১ •
গা -া রা | সা -া -া II
গো ॰ ॰ ড়ে ॰ ॰

শ্রীধর

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

সন্ন্যাসী সাজি' শ্রীধর যেতেছে
বদ্রীনাথের পথে,—
আমাদের সেই সঙ্গী শ্রীধর
চিনিবে না কোন মতে।
পাঠশালে তার ছিল হাত-টান,
দৃষ্টিও ছিল খর,
'নষ্ট-চন্দ্রে' কত ফল মূল
গোপনে করিত জড়।
একদা তাহার মরেছিল যবে
পোষা এক শুক-পাখী,
দুদিন শ্রীধর কেঁদে ফিরেছিল
বনে-বনে তারে ডাকি।
পালিত যতনে বিড়াল, কুকুর,
পশু পাখী নানাজাতি,
জানিনে ত মোরা কবে হ'ত হল
সাধু-ফকিরের সাথী।

ছাড়ি যোশীমঠ চলেছে শ্রীধর
শ্রীধামের অভিমুখে,
'পরশ-পাথরে' গঠিত ঠাকুর
বারবার জাগে বুকে।
সিনান করিয়া, মন্দিরে যবে
প্রবেশে হৃষ্ট-মতি,
দৃষ্টি পড়িল দেবতা-গলের
মুক্তা-মালার প্রতি।
স্তিমিত আলোকে হেরিয়া সে হার
কুভাব জাগিল মনে,

দেখিয়া শ্রীমুখ কাঁপিল হৃদয়,
বাজিল মরম কোণে।

দুদিনের পর বিদায়ের দিন
হস্তে ধরিয়া থালা,
রাওল ঠাকুর আসিলেন লয়ে
সেই সে মুক্তা মালা।
বলিলেন ধীরে জড়ায়ে আদরে
শ্রীধরের দুটী পাণি—
"বদরী-নাথের পরম ভক্ত
আপনি, তাহা কি জানি।
দেবের আদেশে দেবের এ মালা
উপহার দিনু করে।"
শুনিয়া শ্রীধর কাঁপিয়া উঠিল
বিস্ময়ে লাজে ডরে।
কম্পিত-করে মুকুতার মালা
গ্রহণ করিল যবে
পদধূলি নিতে করে কাড়াকাড়ি
সাধু-সন্ন্যাসী সবে।

ছল ছল চোখে চলেছে শ্রীধর
প্রতি পদে পদ টুটে,
যতনে তাহারে ধরে লয়ে যায়
গাড়োয়ালী এক মুটে।
নিজের দীনতা ভাবিয়া শ্রীধর
পারে না রোধিতে বারি,
লাগিতেছে আজ মুকুতার মালা
পাষাণের চেয়ে ভারী।
এমনি হরির অহেতু করুণা
প্রেমের এমনি যাদু,
কয়লা-হৃদয় গলি' হীরা হয়
তস্করও হয় সাধু।
শ্রীধর তখন মুছি আঁখি-নীর
বলিল "রে মন তবে
এখন হইতে যার মালা তার
সন্ধান নিতে হবে।

সংসার ছাড়ি এ মণির মালা
কি করিবি তুই নিয়ে,
দেখা হলে পর তাহারে চাহিবি,
তার ধন ফিরে দিয়ে।"

বরষের পর শ্রীধর চলেছে
বন-পথ দিয়া ধীরে,
গঙ্গোত্রীর বারি চড়াইতে
রামেশ্বরের শিরে।
দেখিল পথেতে সঙ্গী জনেক
পতিত নকুলে তুলি,
ক্ষত-দেহে তার বুলাইছে হাত,
যতনে ঝাড়িছে ধূলি।
তাপিত ওষ্ঠ ভিজায়ে দিতেছে
কমণ্ডলুর নীরে,
তাপিত তনয়ে কাঁধে লয়ে যেন
জনক চলেছে ধীরে।
কিছু দূরে গিয়া দেখে, পড়ে আছে
ডানা-ভাঙ্গা এক পাখী,
সন্ন্যাসী তারে কোলে তুলে নিল
নকুলে ঝোলাতে রাখি।
মুখে দেয় জল বুকে চেপে ধরে
মুখপানে চেয়ে কাঁদে,
ভাঙ্গা ডানা তার উত্তরী ছিঁড়ি'
সরু সুতা দিয়া বাঁধে।
পথের পাশেই সাধুর আবাস
শ্রীধরে ডাকিল সেথা,
বাজিতে লাগিল শ্রীধরের প্রাণে
সুদূরের কোন্ ব্যথা।
দেখিল সেথানে পদভাঙ্গা গাভী
ষণ্ড মহিষ জরা,
পিঁজরাপোল কি আশ্রম উহা
যায় না সহজে ধরা।
সজল নয়নে শ্রীধর বলিল
"ওহে সন্ন্যাসী ভায়া,

সংসার দিয়ে পশুশালা নিলে
এমনি দারুণ মায়া !”
সন্ন্যাসী বলে “কি করি ঠাকুর,
বাঁধন নাহি যে টুটে,
নীরব বেদনা আমার পরাণে
সাধনা হইয়া ফুটে।
জীবের মাঝারে দেবতা পেয়েছি,
বলিতে পারিনে ভয়ে,
আমার চোখে যে এক হয়ে গেছে
শিবালয় দেবালয়ে।”
শুনিয়া শ্রীধর বলিল তাহারে
হাসি করুণার হাসি,
“কাহার লাগিয়া হেথা পড়ে রবে
কাহার লাগিয়া আসি !”
সন্ন্যাসী বলে “মায়াজালে আমি
জড়ায়ে পড়েছি অতি।
ভাল মনে হ'ল— এক কাজ করো
দয়া করে মোর প্রতি।
হৃষীকেশ যেতে কুড়ায়ে পেলাম
একটী মুকুতা আমি,
জানিনে কাহার মরি খুঁজে খুঁজে
জানে অন্তরযামী।
শুনেছি সাধুর মালা হতে তাহা
অজ্ঞাতে গেছে খসি,
রামেশ্বরেতে যাবে সেই সাধু
তারি লাগি আছি বসি।”
এত বলি হাসি মুকুতাটী দিল
আনি শ্রীধরের হাতে,
বলিল তাহারে “ফিরে দিও তুমি
যদি দেখা হয় সাথে।”
শ্রীধর আপন মুকুতার মালা
যতনে বাহির করি',
দেখিল তাহার একটী মুকুতা
কেমনে গিয়াছে পড়ি।
পুলকে সাধুর হাত দুটী ধরি
কাঁদিয়া বলিল “ভাই,
কেমনে আমার করিয়াছ খোঁজ
তব অসাধ্য নাই।
এ মুকুতা-হারও পরের জিনিস
নাম তাঁর আছে লেখা,
ধর মালা ধর দিয়ো মালিকেরে
যদি পাও তাঁর দেখা।”
রাখি মালাগাছি হরষে শ্রীধর
চলে গেল নিজ কাজে,
সন্ন্যাসী হাতে সঁপিয়াছে মালা
তৃপ্তি যে হিয়া মাঝে।

জানিনে ত আমি কি করিল সাধু
লয়ে সে মুকুতা-মালা,
হয়েছে সেখানে গ্রাম-জুড়ি এক
পশু-চিকিৎসা-শালা।
মূক প্রাণীদের যতন করিতে,
রোগে ঔষধ দিতে,
ব্রহ্মচারীরা মগ্ন সেথায়
সদা আনন্দ-চিতে।
দেব-বলে-বলী আছে দুটী সাধু,
শুনেছি তাদের কথা,
পীড়িত পশুর গায়ে হাত দিলে,
জুড়াইয়া যায় ব্যথা।
সাঁজে দুইজনে বসে যোগাসনে
স্মরিয়া জীবের জ্বালা,
মালিকের পদে ফিরে দেয় আঁখি-
দ্রব মুকুতার মালা।

ত্যাজ্যপুত্র

[শ্রীকিশোরীলাল দাসগুপ্ত]

সন্ধ্যা হয়-হয়। একটা মৌন ভাব প্রকৃতির সমস্ত দিনের রৌদ্রদীপ্ত মুখখানিকে গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। সেই ম্লান সৌন্দর্য্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া, একখানি জীবন্ত ছবির মত, লছমীয়া তাহাদের বাড়ীর সম্মুখের ইঁদারা হইতে জল তুলিতেছিল। এমন সময়ে, গ্রামের জমীদার রামরেখ্ সিংএর একমাত্র পুত্র, দুলারসিং ইঁদারার পাশ দিয়া যাইতে-যাইতে, লছমীয়ার দিকে চাহিয়া একটা অতি অশ্লীল রসিকতা করিয়া চলিয়া গেল; শুনিয়া লজ্জায় লছমীয়ার মুখখানি সন্ধ্যার রক্তিম আকাশের মত আরক্ত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি তাহার জলভরা গাগ্‌রী মাথায় তুলিয়া, বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। প্রতিদিনের মত লছমীয়া তাহার ক্ষুদ্র কুটীরখানিতে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিল, তার পর প্রতিদিনের মত স্বামীর অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুখন্ যখন তাহার গরু-কয়টি লইয়া গ্রামে পৌছিল, তখন ক্ষুদ্র পল্লীখানি গোধূলির সঙ্গীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নিজের বাড়ীর দরজায় আসিয়া দেখিল, তাহার বাড়ীখানি আজ একেবারে নীরব। সে আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া বলিল, "লছমী, ঘরে আছিস্?"

কোন উত্তর না দিয়া, লছমীয়া উঠিয়া গরু-কয়টা গোয়ালে লইয়া বাঁধিল, ত'রপর স্বামীর জন্য একটা মাটির মোড়া এবং এক লোটা জল আনিয়া দিয়া পাশে দাঁড়াইল। সুখন্ দেখিল, যে হাসির বান কারণে-অকারণে তাহার দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আজ তাহা শুকাইয়া গিয়াছে। সে উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে লছমী?"

উত্তর দিতে যাইয়া লছমীয়া কাঁদিয়া ফেলিল; কেন না, আজকার মত অপমান সে কোন দিন হয় নাই। সুখন্ লোটাটা রাখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও কি, কাঁদ্‌ছিস যে—কি হ'য়েছে?" এবার লছমীয়া বলিল, "কিছু হয় নাই—তুমি মুখ ধোও।"

"না বলিস্ যদি, তবে এই রইল জল।" বলিয়া সুখন্ উঠিয়া দাঁড়াইল। লছমীয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া মাটির মোড়াটার উপরে বসাইয়া দিল। সুখন্ বলিল, "তবে বল্ কি হ'য়েছে?"

বলিবে মনে করিতেই লছমীয়ার মুখখানি ভয়ানক লাল হইয়া উঠিল এবং কথা আটকাইয়া যাইতে লাগিল। শেষে অনেক কষ্টে অনেকবার থামিয়া, বিকালের ঘটনা স্বামীর নিকটে বলিল। শুনিয়া সুখন্ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার কবাটের মত বক্ষ যেন আরো বিস্তৃত হইয়া উঠিল; সমস্ত পেশীগুলি ক্রুদ্ধ সর্পের মত, সমস্ত শরীরে স্ফীত হইয়া উঠিল—চোখে আগুনের ঝলক্ ছুটিতে লাগিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "আচ্ছা, দুলার সিং!" তাহার তখনকার সেই রুদ্ররূপের তুলনায় ঐ ছোট অস্পষ্ট কথা-কয়টি নিতান্ত বেমানান হইলেও, লছমীয়া বুঝিল, তাহার রুদ্ধ-কবাট বক্ষের মধ্যে বিদ্যুতের স্ফুরণের মত একখানা তীব্র তলোয়ার লক্‌লক্ করিয়া উঠিতেছে।

দুলার সিংকে গ্রামের সকলেই জানিত এবং ভয় করিত। স্রোতের মুখে ক্ষীণ, দুর্ব্বল লতা-গুল্মগুলির মত নিরীহ, দুর্ব্বল প্রজারা কাঁপিয়া, ভাঙ্গিয়া লুটাইয়া, তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার পথ করিয়া দিত। সুতরাং দুলার সিংএর লোলুপ দৃষ্টিতে লছমীয়া যে খুব ভয় পাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু পাছে এই কথাটা লইয়া সুখন্ একটা কিছু গুরুতর কাণ্ড করিয়া বসে, এই ভয়ে সে বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ভয়ে-ভয়ে বলিল, "ইঁদারার ধারের রাস্তাটা ত আমাদেরি জমীতে—ওটাকে কাল বন্ধ করে দিও, যেন ও-পথে আর কেউ যেতে-আস্‌তে না পারে।"

সুখন্ কোন উত্তর দিল না, কেবল গোঁফ-জোড়ায় বেশ করিয়া চাড়া দিয়া, একবার ছাতির দিকে তাকাইল।

ভোরে ঘর হইতে বাহির হইয়াই সুখন্ দেখিল, দুলার সিংএর চাকর ভুখল্ ইঁদারার ধারের রাস্তা দিয়া মুনিব-বাড়ী কাজ করিতে যাইতেছে। কালকার ব্যাপারে সুখনের মন তখন পর্য্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ছিল, সে ভুখলকে দেখিয়া বলিল, "এই ভুখ্‌লা, এ পথে যেতে পাবি না—ফিরে যা।"

ভুখল্ জমীদার দুলার সিংএর চাকর; সুতরাং তাহার

উপরে গ্রামের কেহ যে হুকুম চালাইতে পারে, এ কথা সে মনেও করিতে পারে নাই। তাহার পদমর্য্যাদা যে কতখানি, তাহার ওজন সে বেশ জানিত। কাজেই সুখনের ধৃষ্টতায় সে একেবারে উষ্ণ হইয়া বলিল, "উঃ! মেজাজ যে ভারি গরম! পারিস্—রোখ্ না?"

স্ত্রীর অপমানের কথা সারা-রাত্রি সুখনের বুকের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধিয়াছে। যে মর্ম্মান্তিক ক্রোধ, অভিশাপের মত, দুলার সিংকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্ম করিয়া ফেলিবার জন্য থাকিয়া-থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে সে অনেক কষ্টে চাপিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু ভুখলের কথায় তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে একেবারে ভুখলের সামনে আসিয়া, তাহার প্রকাণ্ড দেহ দিয়া ক্ষুদ্র পথটি সম্পূর্ণ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। লছমীয়া যাহা ভয় করিতেছিল, তাহারই সূত্রপাত দেখিয়া, তাড়াতাড়ি যাইয়া স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া, পথ হইতে সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার দুর্ব্বল হস্তের ক্ষীণ আকর্ষণ সুখন্ অনুভবও করিতে পারিল না। সে হাত দিয়া উল্টা পথ দেখাইয়া ভুখল্‌কে বলিল, "ফিরে যা, বল্‌ছি।"

তাহার সেই দৃপ্ত বীর-মূর্ত্তি দেখিয়া, ভুখল্ আর বিলম্ব করিতে সাহস পাইল না। সে খানিক দূরে যাইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আচ্ছা, থাক্।" উত্তরে সুখন্ এমন একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, যাহা ভুখল্ কিম্বা তাহার মুনিব দুলার সিংএর পক্ষে একেবারেই গৌরবের নহে। কিন্তু লছমীয়া হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চুপ্ কর—একেবারে পাগল হ'লে?"

সুখন্‌কে বাড়ীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া লছমীয়া বলিল, "আজই চল, এখান হ'তে পালিয়ে যাই।"

তাহার ভয় দেখিয়া, এত রাগের মধ্যেও, সুখন্ হাসিয়া ফেলিল। সে বলিল, "ভয় কি লছমী, তোকে রক্ষা ক'রবার শক্তি আমার এ দুখানা হাতে আছে।"

তাহার শরীরে তখনো রক্ত অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ছুটিয়া চলিতেছিল—কাজেই বলের কথাই তাহার মুখে বাহির হইল। লছমীয়া বলিল, "তারা বড়মানুষ—জমীদার; হাজার লোক তাদের কথায় ওঠে-বসে। আর তুমি একা মানুষ। সব প'ড়ে থাক্—চল পালিয়ে যাই।"

তাহাদের গ্রামে দুলার সিং কতজনকে যে কত রকমে লাঞ্ছিত করিয়াছে, তাহা মনে করিয়া লছমীয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সুখন্ তাহার সবল বাহুবন্ধে লছমীয়াকে আঁটিয়া ধরিয়া বলিল, "পিতৃক ভিঁটে—চোদ্দপুরুষের বাস; ছাড়্‌ব বল্‌লেই কি ছাড়া যায়, লছমী?"

"থাক্‌গে ঘরবাড়ী—চল। আমরা দুটিতে যেখানে থাক্‌ব, সেই আমাদের ঘর-বাড়ী।" "তুই কেন মিছে ভাবিস্ লছমী? যদি এমন যেতেই হয়, তা হ'লে না হয় যাব।" "আমি তা শুনব না। মইনীর দশা দেখেছ ত? কাজ কি মিছে দেরি করে—চল।" সুখন্ হাসিয়া বলিল, "মইনীর কথা যদি বলিস্ লছমী, তা হ'লে, দুলার সিংএর চেয়ে তার সোণা-চাঁদির বেশী ভয়। তোরও ভয় হয় না কি, লছমী?"

লছমীয়া অভিমানে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "যাও!" সুখন্ হাসিয়া তাহার মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তা' জানি লছমী, তাইতে ত আমার এত সাহস। আমার লছমী যে নিজেই লছমী।"

লছমীয়ার মুখে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল। দুইটি হৃদয় নির্ভর শান্তিতে বর্ত্তমানের সমস্ত বিপদ ভুলিয়া গেল।

(২)

সুখন্ যদি সে দিন ভুখল্‌কে ধরিয়া মারিত, তাহা হইলেও বোধ হয় সে ইহা অপেক্ষা বেশী অপমান বোধ করিত না। সে রাগে গর্‌গর্ করিতে-করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ছিলিমে তামাকু চড়াইল, এবং খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া জোরে-জোরে টানিতে লাগিল। দিবারাত্রি জমীদার-বাড়ীর রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে থাকিতে-থাকিতে, তাহার মাথায়ও অনেক রাজনৈতিক চাল্ আসিত। তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে পাকাইয়া-পাকাইয়া সুখন্‌কে জব্দ করিবার ফন্দিটা যখন তাহার মাথার মধ্যে ঘনীভূত হইয়া উঠিল, তখন সেও খাটিয়া হইতে উঠিয়া, ধীরে-ধীরে মুনিবের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল। ভুখল্ দুলার সিংএর পেয়ারের চাকর—ভুখল্ না হইলে তাহার একদণ্ডও চলে না। আজ সকালে তাহার এত বিলম্ব দেখিয়া, দুলার সিং ভয়ানক চটিয়া বলিল, "কি রে ভুখ্‌লা, তোর হাল্‌চাল্ যে ভারি নবাবী হ'য়ে উঠ্‌ল দেখ্‌ছি। বেলা হ'য়ে গেল দুপুর—এখন আস্‌ছিস্ কাজে—বেইমান!"

ভুখল্ যোড় হাত করিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "গরীব

পরবর, আমার কোন কসুর নাই।" "কসুর নাই—তবে এত দেরি ক'রলি কেন?" "হুজুর, আমি রোজকার মত আজো আস্‌ছিলাম; কিন্তু সুখনের ইঁদারার কাছে এলেই, সে গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া সুরু ক'রে দিল। তার পর, হুজুর, বে-কসুর আমাকে যা-ইচ্ছা-তাই বলে অপমান ক'রল।"

সুখনের ইঁদারার কথা বলিতেই ডুলার সিংএর মনের নিভৃত কোণে একখানি লজ্জারুণ মুখের অপূর্ব্ব শ্রী জাগিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বে-কসুর?"

"একদম্ বে-কসুর, গরীব-পরবর! কত কি গাল-মন্দ ক'রে শেষে আমাকে আট্‌কে রেখেছিল।"

ডুলার সিংএর মুখখানা ক্রমে অন্ধকার হইয়া উঠিতে লাগিল। সে বলিল, "আট্‌কে রেখেছিল?"

"হাঁ হুজুর, তা না হ'লে এত দেরি হয়!" ডুলার সিং চুপ্ করিয়া ভাবিতে লাগিল। কয়েক দিন হইল, একটা দুরভিসন্ধি তাহার বুকের মধ্যে ভূতের মত উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল,—ভুখলের কথায় সেই ভূতটা তাহার সমস্ত বুকখানা জুড়িয়া, বেশ জাঁকিয়া বসিল। ডুলার সিংকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, ভুখল্ নিজে-নিজে বলিতে লাগিল, "আমরা ছোটলোক—আমাদের দু'টা গাল দিয়েছে—না হয় দিয়েছে; কিন্তু হুজুরকে যে সব কথা বলেছে, তা নোকর হ'য়ে শুন্‌লেও পাপ।"

আহত সাপ যেমন করিয়া গর্জ্জিয়া উঠে, ডুলার সিং তেমনি করিয়া গর্জ্জিয়া বলিল, "আমাকে গাল দিয়েছে? কি ব'লেছে বল।"

"হুজুর, সে তার পায়ের একপাটি নাগরা খুলে আমাকে ফেলে মার্‌ল; তার পর আর একপাটি হাতে নিয়ে যা ব'ল্‌ল, তা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না, হুজুর।"

কথাটার অর্থ বুঝিতে ডুলার সিংএর বেশীক্ষণ লাগিল না। তাহার চোখ দিয়া আগুনের হল্‌কা বাহির হইতে লাগিল। সে বলিল, "আভি পাকড় লাও।"

ভুখল্ সেলাম করিয়া বাহির হইয়া গেল এবং চার-পাঁচ-জন পাইক-বরকন্দাজ লইয়া সুখন্‌কে ধরিতে গেল।

ডুলার সিং মনে-মনে বুঝিল, কালকার সেই সামান্য কথাটার জন্য লছমীয়া সুখন্‌কে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। সে ভাবিল, "আমি ডুলার সিং,—জমীদার বাবু রামরেখ্ সিংএর সবেমাত্র পুত্র,—তিনখানা গ্রামের মালিক। আমার কৃপা-দৃষ্টিতে কোথায় সে আপনাকে কৃতার্থ মনে ক'র্‌বে, তা নয়, আমাকে অপমান!" ক্ষুব্ধ আত্মাভিমান এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। নিজের প্রবৃত্তিকে সে কোন দিন সংযত করিতে শিখে নাই—আজও সংযত করিতে পারিল না। বরং বাধা পাইয়া, তাহার প্রবৃত্তির স্রোত, আরো ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে ভুখল্ যখন তাহার দলবল লইয়া সুখনের বাড়ীর নিকটে পৌঁছিল, তখন দেখিল যে, সে তাহার ইঁদারার ধারের রাস্তাটা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যদিও সুখনের বাড়ীতে যাওয়ার অন্য পথ ছিল, তাহা হইলেও ভুখলেরা ইচ্ছা করিয়াই ঐ রাস্তায় গিয়াছিল। কিন্তু রাস্তা বন্ধ দেখিয়া, বেড়া ভাঙ্গিয়া কি ডিঙ্গাইয়া যাইতে তাহাদের ভরসা হইল না। সুখনের বিরাট দেহ,—তাহার অসুরের মত শক্তিকে, জমীদারের পাইকেরাও সহসা উপেক্ষা করিতে পারিল না। কাজেই ভুখল্ সেইখান হইতেই ডাকিয়া সুখনকে জমীদারের হুকুম জানাইয়া দিল। এই রূপ একটা আদেশের অপেক্ষায় সুখনও প্রস্তুত হইয়া বাড়ীতে বসিয়া ছিল। সে তাহার সমস্ত দেহখানিকে বঞ্চিত করিয়া, দশগজ কাপড়ে মাথায় একটা প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধিল; এবং তাহার তৈলপক্ক বাঁশের প্রকাণ্ড লাঠি-খানা হাতে করিয়া বাহির হইতেই, লছমীয়া আসিয়া ঘরের দরজা আটকাইয়া দাঁড়াইল। সুখন্ হাসিয়া বলিল, "ও কি?"

"তুমি যেতে পাবে না।"

"কয়েদ না কি?"

"তোমাকে নিয়ে ওরা মারধর ক'র্‌বে,—তুমি যেতে পাবে না।"

আশঙ্কায় লছমীয়ার চোখে জল আসিল। সুখন্ বলিল, "তুই যেতে না দিলেই কি ওরা আমাকে ছেড়ে যাবে?"

"আমি ব'লে আসি যে'য়ে, তুমি বাড়ী নাই।"

"না,—না, লছমী, তুই ওদের সাম্‌নে যাস্ না। ওরা যদি তোকে আবার একটা অপমানের কথা বলে, তা হ'লে খুনোখুনী হবে।"

"তবে আমিও তোমাকে বেরুতে দেব না।" বলিয়া সে দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। লছমীয়ার উদ্বেগ-কম্পিত

ক্ষুদ্র দেহখানি এবং অশ্রুসিক্ত চোখ দুইটি সুখনের নিকট তাহার দরিদ্র জীবনের অতুল সম্পদ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে সস্নেহে লছমীয়ার হাত ধরিয়া বলিল, "ভয় নাই লছমী, আমাকে মারতে পারে এমন লোক এ গ্রামে নাই।"

লছমীয়া দরজায় পিঠ দিয়াই বলিল, "তা'রা অনেক লোক,—তুমি যেতে পাবে না।"

সুখন্ লছমীয়ার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "আচ্ছা, লছমী, আমি যাব না; কেবল একটিবার বাহিরে যেয়ে ওদের বলে আসি যে আমি যাব না।"

"তুমি বাহিরে গেলেই ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।"

সুখন্ সোজা হইয়া, বুক ফুলাইয়া, লাঠিখানার উপর ভর করিয়া দাঁড়াইল; এবং বলিল, "ধরে নিয়ে যাবে? নিক্ না।"

সেই বীরমূর্ত্তি দেখিয়া লছমীয়া বুঝিল, তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া তত সহজ নহে। কিন্তু সুখনের হৃদয় যখন বীরদর্পে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য ব্যগ্র, লছমীয়ার ভীরু হৃদয় তখন স্বামীকে লইয়া দূরে পলাইবার জন্য ব্যস্ত। লছমীয়া তবুও দরজা ছাড়িল না। তখন সুখন্ তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল, "পথ ছেড়ে দে লছমী, আমি এখনি ফিরে আস্ছি।"

"আগে বল, আমার কথা শুনবে?"

"তোর কথা ত শুনিই, লছমী।"

"তা' নয়,—বল, আজই এ বাড়ী ছেড়ে যাবে?"

"আচ্ছা, সে হবে,—এখন ওদের ত বিদায় করে আসি।"

সজল চক্ষে পথ ছাড়িয়া দিয়া লছমীয়া বলিল, "আমার মাথা খাও, গায়ে পড়ে যেন ঝগড়া কর না।"

সুখন কেবল একটু হাসিয়া বাহির হইয়া গেল। লছমীয়া দেয়ালের একটা ফাটাল দিয়া দেখিতে লাগিল, আর ফন্দি আঁটিতে লাগিল,— দিনটা কাটলেই হয়; রাত্রে আর এখানে থাক্‌ছি না।

সুখন যখন ভুখলদের সামনে যাইয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার প্রকাণ্ড পাগড়ীটা ও লম্বা লাঠিখানা তাহার মূর্ত্তিকে আরো দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তুলিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া, ভুখলেরা চার-পাঁচজন হইলেও, তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। ভুখল্ বলিল, "বাবু দুলার সিংএর হুকুম, চল্ কাচারীতে।" সুখন্ লাঠিখানার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বল্ যেয়ে, বাবু রামরেখ সিংএর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম আমি মানি না।"

জোর-জবরদস্তিতে সুবিধা হইবে না বুঝিয়া ভুখলেরা ফিরিয়া গেল।

সুখনকে সঙ্গে না দেখিয়া দুলার সিং বলিল, "আন্‌লি না সে বদমাইস্‌কে?"

"হুজুর, দু'চার জন লোকে এ কাজ হবে না।"

"তোরা পাঁচজনে যেয়ে একটা লোককে ধ'রে আন্‌তে পারলি না—নিমকহারাম্?"

ভুখল্ একটা নিছক মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিল, "হুজুর, সুখন্ তার শ্বশুরবাড়ী হতে সাত-আটজন লোক এনে রেখেছে। তারা সব লাঠিসোটা নিয়ে তৈয়ারি।"

দুলার সিংএর চোখ দুইটা হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলিয়া উঠিল। সে অকথ্য ভাষায় পাইকদিগকে গালি দিয়া বিদায় করিল।

(৩)

সে দিন সন্ধ্যার পরে খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে, লছমীয়া দুই-তিনটা পুঁটলী আনিয়া সুখনের সাম্‌নে রাখিল। দেখিয়া সুখন জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি?"

লছমীয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "চল।"

"কোথায়?"

"চল, কয়েকদিন আমার বাপের বাড়ী যেয়ে থাকি।"

"কসুর কি আমরা ক'রেছি, লছমী, যে ভিটা ছেড়ে পালাব?"

"সে যাই হ'ক্, তোমাকে যেতেই হবে—আমি কোন কথা শুনবো না। এখনো সমস্ত রাতটা সাম্‌নে আছে—চল। এখানে থাক্‌লে নিশ্চয় বিপদ হবে।"

বিপদ যে আছে, সুখনও তাহা বুঝিতেছিল,— যাইতেও যে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিল, তাহাও নহে; কিন্তু এমন করিয়া অপমানিত হইয়া পলাইতে তাহার বড় লজ্জা করিতেছিল। সে বলিল, "যদি পালাতেই হয়, লছমী, তা হলে, দুলার সিংএর চোখ দু'টা উপড়ে ফেলে পালাব।"

সুখনের কথা যেন লছমীয়া শুনিতেই পায় নাই, এমনি ভাবে সে বলিল, "ওঠ।"

অপমানের প্রতিশোধ না দিয়া পলাইতে সুখনের পা

উঠিতেছিল না। সে নিজের মনের কথা গোপন করিয়া বলিল, "আমরা না হয় গেলাম, লছমী; কিন্তু গরু বাছুর-গুলির কি হবে?"

"ছেড়ে দিয়ে যাব—যেখানে ইচ্ছা, চলে যাবে। যে বিপদ সামনে, তার কাছে গরু-বাছুর কিছুই নয়।"

সুখন হাসিয়া বলিল, "পাগল আর কি—এতগুলি গরু-বাছুর ছেড়ে দিয়ে চলে যাব? আজকার রাত্‌টা থাক্, লছমী, কাল গরুবাছুরগুলির একটা বন্দোবস্ত ক'রে, তা'র পর যাব।"

স্বামীকে রাজী করিতে না পারিয়া, সে রাত্রিটা লছমীয়ার বড় অস্বস্তিতে কাঁদিয়া কাটিল। কিন্তু ভোরে উঠিয়াই সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল। চার-পাঁচজন সিপাহী একেবারে তাহাদের দরজার সাম্‌নে আসিয়া সুখনকে তলব করিল। কাণ্ড দেখিয়া, বেচারা লছমীয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। সুখন্ তাহার সেই পাগড়ীটা বেশ করিয়া বাঁধিল এবং নিত্য-সহচর সেই লাঠিখানা হাতে লইয়া বলিল, "লছমী, তুই অত ভয় করিস্ না; বাবু রামরেথ সিং নিশ্চয়ই বিচার ক'রবেন।"

লছমীয়া কিন্তু অত বুঝিল না; সে কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ জীবনে হয় ত' এই শেষ বিদায়। সুখন নীচে যাইয়া সিপাহীদিগকে বলিল, "কি চাই?"

"জমিদারের হুকুম, চল।" বলিয়া, তাহারা তাহাকে ধরিতে আসিল।

"ধর্‌তে হবে না, চল। বাবু রামরেথ সিংএর হুকুম আমি মানি;—অমনি যাচ্ছি।" বলিয়া সুখন্ তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গেল।

সুখন্ চলিয়া গেল—নিরাশ্রয়া লছমীয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইল। প্রতিবেশীরা একজনও ভয়ে তাহার বাড়ীতে আসিল না, একটা সান্ত্বনার কথাও বলিল না।

সিপাহীরা সুখন্‌কে লইয়া তুলার সিংএর বৈঠকখানায় হাজির করিল। সুখনকে দেখিয়া তুলার সিং হুকুম দিলেন "লাগাও হাতকড়া!"

চার-পাঁচজন সিপাহী আসিয়া সুখনের হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। সম্পূর্ণ মিথ্যার ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া যে এতটা জোর-জবরদস্তি চলিতে পারে, মূর্খ সুখন্ তাহা কোন দিন মনেও করিতে পারে নাই। আজ হঠাৎ তাহা মনের মধ্যে সত্য এবং বাহুবলের উপরে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। এই দুইটির উপরে নির্ভর করিয়া সে লছমীয়াকে ভরসা দিয়াছিল; কিন্তু এখন তাহার লছমীয়া কত বিপন্ন, কত অসহায়! তাহারি নির্ব্বুদ্ধিতার দোষ,—লছমীয়ার অদৃষ্টে কি হইবে কে জানে? সে নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া ভাবিতে লাগিল,—কেন লছমীর কথা শুনলাম না। সে মনশ্চক্ষু দিয়া দেখিতে লাগিল, যেন কাতরা বিবশা, অসহায়া,—তাহার সর্ব্বস্ব লছমীয়া, ধূলায় লুটাইতেছে আর তুলার সিং তাহার দলবল লইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায়, আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য, সে তাহার সমস্ত দেহের অসুর-বল হাতকড়ির উপর প্রয়োগ করিল। লোহার হাতকড়ি, কট্ করিয়া, একগাছি শুষ্ক লতার মত ভাঙ্গিয়া, তাহার পায়ের কাছে পড়িল। কিন্তু তখনই আট-দশজন লোক আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং দড়ি দিয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। হতাশ হইয়া সুখন মুক্তির আশা ত্যাগ করিল। তুলার সিংএর আদেশে তখন কয়েকজন সিপাহী সুখন্‌কে কয়েদখানায় লইয়া গেল।

(৪)

বাবু রামরেথ্ সিংএর বয়স আটাত্তর বৎসর। তিনি আর বিষয়-কর্ম্মের কোন খবর রাখিতেন না। পুত্র তুলার সিংএর উপর সমস্ত কাজের ভার দিয়া, তিনি সকাল সন্ধ্যা গৃহ-বিগ্রহ সীতারামজীর পূজায় কাটাইতেন; এবং অবশিষ্ট সময় রামায়ণের অমৃত-সাগরে ডুবিয়া থাকিতেন।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে দিনের কথা বর্ণিত হইল, সেই দিন বাবু রামরেথ সিং বাহিরের দিকের বারান্দায় বসিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িতেছিলেন। হঠাৎ একবার চক্ষু তুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিতেই দেখেন, কয়েকজন সিপাহী একটা লোককে ঘেরাও করিয়া কোথায় যেন লইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া তুলার সিংকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তুলার সিং আসিয়া যোড়হাত করিয়া পিতার সম্মুখে

দাঁড়াইল। রামরেখ সিংএর সম্মুখে দুলার সিং এমন শিষ্ট-শান্ত হইয়া থাকিত যে, মুগ্ধ বৃদ্ধ পুত্র-সম্পদে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। রামরেখ সিং বলিলেন, "কি হ'য়েছে রে দুলার? কাকে ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে?"

দুলার বলিল, "সুখনরাম মারপিট ক'রেছে বলে, আমি তাকে আটক করেছি।"

"তুই আটক করেছিস? আচ্ছা, সুখনকে আমার এখানে নিয়ে আয়; শুনি কি হয়েছে।"

দুলার সিং চলিয়া গেল। রামরেখ সিং তাঁহার এই একমাত্র পুত্রটিকে নিজহাতে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পুত্রহীন থাকার পর তাঁহার স্ত্রী যে দিন এই পুত্র-রত্নটী উপহার দিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন, সেই দিন তিনি রামজীর কৃপাকে ধন্যবাদ দিয়া, পুত্রটিকে যাহাতে সেই দেবতার আদর্শে গড়িয়া তুলিতে পারেন, এই আশীর্ব্বাদ চাহিয়া লইলেন। দুলারের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন হইতে তিনি মুগ্ধ আশায়, রামজীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, ভজনের সুরে বালকের কাণে অমৃতের মত ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে বালক দুলার যখন যুবক হইয়া উঠিল, তখন জমীদারী তাহার হাতে দিয়া, কলিতে একটি রামরাজ্য সংস্থাপিত হইল মনে করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া সীতারামজীর পূজায় মন দিলেন। কিন্তু মানুষে করে এক—হয় আর। দুলার সিং রাম না হইয়া, রাবণ হইয়া দাঁড়াইল।

দুলার সিং সুখনকে লইয়া রামরেখ সিংএর সম্মুখে উপস্থিত করিল। রামরেখ সিংকে দেখিয়া, সুখন তাহার বাঁধা হাত দুইখানা উঠাইয়া নমস্কার করিল। রামরেখ সিং জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে সুখন, গায়ে জোর থাকলে যদি মারতে হয়, তা' হ'লে রামজী ত এক বাণে পৃথিবী ধ্বংস করতে পারতেন!"

সুখন্ বলিল, "হুজুর, আমি ত কাউকে মারি নাই।"

সুখন মনে-মনে স্থির করিল, এইবার দুলার সিংএর সমস্ত অত্যাচারের কথা বলিবে; কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই, রামরেখ সিং দুলার সিংএর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কৈ, ও ত কাউকে মারে নাই!"

দুলার সিং যোড়হাত করিয়া বলিল, "আপনার হুকুমে সব মিটমাট্ ক'রে দিয়েছি।"

রামরেখ সিং পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "দেখ্ রে, দুলার, প্রেমে সব হয়। রামজীর প্রেম, রামজীর দয়া মানুষে যদি নাই শিখিল, তা' হ'লে যে রামায়ণ মিথ্যা!"

পূর্ব্বের পরামর্শ মত সিপাহীরা সুখনকে মুক্ত করিয়া দিল। সে দুই হাতে রামরেখ সিংএর পায়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া লইল। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় তাহার চোখে জল আসিল। অতীতের সমস্ত অত্যাচার সে বিস্মৃত হইল।

সকলকে বিদায় দিয়া বৃদ্ধ আবার রামায়ণের অমৃত-সাগরে ডুবিয়া গেলেন।

এদিকে কিন্তু রামরেখ সিংএর দৃষ্টির আড়ালে আসিবা-মাত্র সুখনকে আবার তেমনি করিয়া বাঁধিয়া কয়েদখানায় চালান দেওয়া হইল।

(৫)

স্বামী চলিয়া গেলে, বেচারা লছমীয়া সমস্তটা দিন মাটিতে লুটাইয়া-লুটাইয়া কাঁদিল—সমস্তটা দিন সে আকুল আকাঙ্ক্ষায় স্বামীর অপেক্ষায় রহিল।

বাড়ীর পাশেই হুল্সার বাড়ী। লছমীয়া হুল্সার পায়ে কাঁদিয়া পড়িয়া বলিল, "হুল্সা-দা, তোর পায়ে পড়ি, একটি-বার যে'য়ে যদি তাঁকে দেখে আস্তি?"

হুল্সা মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "এ কি তোর মামার বাড়ী রে, বোন্? সে দুলার সিংএর কাচারী! পিলেগের বিমারি, আর দুলার সিংএর কাচারী।"

শুনিয়া লছমীয়ার মুখখানি শুকাইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে খুব মার্‌ধর্ করে, না হুল্সা-দা?"

"বাপ্‌রে! মার্‌ধর্ আবার করে না! দুলার সিং কি মানুষ?"

লছমীয়া কাঁদিয়া আবার হুল্সার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "হুল্সা-দা, তুমি আর কিছু ক'রো না, কেবল তা'কে একবার দেখে এস, সে বেঁচে আছে কি না।"

বেচারা হুল্সা বড় বিপদে পড়িল। লছমীয়ার করুণ মিনতিও সে এড়াইতে পারিতেছে না—অথচ, এ বিপদের মধ্যে মাথা দিতেও সাহস হইতেছে না। হুল্সার স্ত্রী স্বামীর অবস্থা চট্ করিয়া বুঝিয়া লইল। সে বলিল, "কেন বাছা, মিছে-মিছে আর দশজন ভালমানুষকে এর মধ্যে জড়িয়ে নিচ্ছ? তুমি ত আর পর্দানশিন নও যে, জমীদার-বাড়ীতে যে'তে পার না?"

অসহায়া লছমীয়া কেবল তাহার ম্লান চোখ দুইটি তুলিয়া হুল্‌সার স্ত্রীর দিকে চাহিল। সে পর্দানশিন্ নয় বটে, তবু যে তার সেখানে যাওয়া কত অসম্ভব!

হুল্‌সার স্ত্রীর নিকটে লছমীয়াও পিলেগের বিমারির মত মনে হইতে লাগিল। তাহাকে তাড়াইতে পারিলে সে যেন রক্ষা পায়! শেষে কি উহার জন্য তাহারা তুলার সিংএর কোপে পড়িবে? হুল্‌সার স্ত্রী একটু কর্কশ হইয়া বলিল, "কেন বাছা, মিছে এখানে ব'সে-ব'সে চোখের জল ফেলে, আমার কাচ্চা-বাচ্চার অমঙ্গল ক'চ্ছ? নিজের ঘরবাড়ী আছে, সেখানে যেয়ে যত ইচ্ছা কাঁদ। ও-সব ঝগড়া-লড়াইএর মধ্যে আমরা নাই।" লছমীয়া চোখ মুছিয়া, উঠিয়া বাড়ী গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তাহার বুকের অন্ধকারের মত অন্ধকার ধীরে-ধীরে ঘরের মধ্যে জমিয়া উঠিতে লাগিল,—দেখিয়া সে সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। একা থাকিতে তাহার বড় ভয় করিতে লাগিল। সে আস্তে-আস্তে দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল—চাহিয়াই দেখিল, দরজার নিকট দাঁড়াইয়া মইনী! লছমীয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল। তাহার পরে সে ঘৃণার স্বরে বলিল, "তোমাকে কে এখানে আস্‌তে বলেছে?"

মইনী বলিল, "মিছে গোল করিস্ না, লছমীয়া—আমি তোর ভালর জন্যেই এসেছি।"

"কাজ নাই তোমার ভাল ক'রে—তুমি দূর হও!"

"তুই যখন তাড়িয়ে দিলি, লছমীয়া, তখন যাই; কিন্তু তোর জন্য সে যে কি সহ্য ক'রছে, তা যদি দেখ্‌তি? অত বড় জোয়ান, তাই প্রাণে বেঁচে আছে। এক-একটা বেতের দাগ ঠিক্ যেন এক-একটা তলোয়ারের চোটের মত দেখাচ্ছে।"

লছমীয়ার মাথা ঘুরিতে লাগিল। স্বামীর দেহের প্রত্যেকটি আঘাতের বেদনায় তাহার শরীরের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরা কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। করুণ স্বরে চীৎকার করিয়া লছমীয়া মইনীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। মইনী লছমীয়ার হাত ধরিয়া বলিল, "শোন্ লছমীয়া, আমার কপালই যেন পুড়েছে,—কিন্তু আমিও মেয়ে-মানুষ ত। সুখনের সেই অবস্থা দেখে, আমার বুকের মধ্যে যে কি ক'রে উঠ্‌ল, তা' বল্‌লে কি তুই বিশ্বাস করবি?"

মইনী মন্দ;—হোক্ মন্দ;—কিন্তু সে যে তাহার স্বামীর দুঃখে কাতর! লছমীয়া নিতান্ত বন্ধুর মত মইনীর হাত ধরিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "বিশ্বাস ক'রব—সত্যি করে বলিস্ মইনী, সে বেঁচে আছে ত?"

"বেঁচে আছে বোন্; কিন্তু তাকে বড় মেরেছে। মেরে একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছে। তার কষ্ট দেখে থাক্‌তে না পেরে, আমি লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছি। আমাকে দেখে বল্‌লে, 'মইনী, আগে আমাকে একটু জল দে।' আমি তাড়াতাড়ি একটু জল এনে দিলাম। খেয়ে তবে একটু ঠাণ্ডা হ'ল।"

লছমীয়া মনে করিতে লাগিল, মইনী পাপিষ্ঠা—তবু এই বিপদে সেই তাহার স্বামীর বন্ধু। লছমীয়া গভীর কৃতজ্ঞতায় মইনীকে দুই হাত দিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিল।

মইনী বলিল, "সে তোকে একবার দেখ্‌তে চেয়েছে, তাই আমি লুকিয়ে তোকে নিতে এসেছি। ব'ল্‌ল, 'মইনী, তা'কে একবার নিয়ে আয়,—মরবার আগে একবার দেখি।'"

লছমীয়া বিদ্যুতের মত উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং মইনীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার বুকের মধ্যে যে ঘূর্ণী উঠিয়াছে, তাহাতে যেন তাহাকে উড়াইয়া লইয়া চলিল। মইনীর মুখের ক্রূর হাসি চারিদিকের অন্ধকারে যেন কালি ছড়াইয়া দিতে লাগিল।

সেই অন্ধকারের মধ্যে রামরেখ সিংএর বৃহৎ বাড়ীখানা যেন স্তব্ধ রাক্ষসীর মত দাঁড়াইয়া আছে। সেই রাক্ষসীর মূর্ত্তি চোখে পড়িতেই, লছমীয়ার বুকের মধ্যে একবার কাঁপিয়া উঠিল,—পা দুখানা হঠাৎ থামিয়া গেল। কিন্তু সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত ভয় ডুবাইয়া দিয়া, তাহার স্বামীর শেষ আহ্বান তাহার কাণে রণিত হইতে লাগিল। কম্পিত বক্ষে লছমীয়া মইনীর সঙ্গে আসিয়া একটা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। না জানি স্বামীকে কি অবস্থায় দেখিবে, এই ভয়ে লছমীয়া আশ্রয়ের জন্য মইনীর হাতখানা জোরে চাপিয়া ধরিল। দরজা ঠেলিয়া দুইজনে ঘরের মধ্যে আসিবামাত্র, একটা উৎকট হাস্যে লছমীয়া যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। ঘরের উজ্জ্বল আলোকে সে দেখিল, তুলার সিং ও ভুখল্ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। ঘরে ঢুকিয়াই মইনীও হাসিতে-হাসিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার

পর হাসির বেগে দেহখানিকে বাঁকিয়া-চুরিয়া বলিতে লাগিল, "কেমন, চিড়িয়া পিঁজরায় পুরেছি কি না?" মইনীর কথায় ঘরের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠিল। লছমীয়া বুঝিল ব্যাপার কি। মইনীর উপরে একটা মর্ম্মান্তিক ক্রোধ তাহার বুকের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। নিজের অবস্থা ভুলিয়া যাইয়া সে মইনীর মুখে এক লাথি মারিল। পাপের পতাকা,—সোণার বেশরখানা মইনীর ওষ্ঠে কাটিয়া বসিল মইনীর বিকৃত মুখখানা রক্তে বীভৎস হইয়া উঠিল।

কাণ্ড দেখিয়া ঢুলার সিং আবার হাসিয়া উঠিল; এবং একেবারে লছমীয়ার কাছে আসিয়া বলিল, "কি চিড়িয়া, এত নারাজ কেন?"

ক্রোধের উত্তেজনা দূরে যাইতেই লছমীয়ার মাথা ঘুরিতে লাগিল। পৃথিবীটা তাহার পায়ের নীচে দুলিতে লাগিল। শেষে সে সংজ্ঞাহীনা হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। অবস্থা দেখিয়া ঢুলার সিং ভুখলকে বলিল, "যা, ওকে নিয়ে এখন ঠাকুরের ঘরে বন্ধ করে রাখ্।"

সকল দুষ্কৃতকারীরই প্রধান দুর্ব্বলতা যে, তাহারা পাপকে প্রাণপণে গোপন রাখিতে চায়। ঢুলার সিং যে লছমীয়াকে ঠাকুরের ঘরে রাখিতে বলিল, সেও ঐ পাপ গোপনের চেষ্টায়।

বাড়ীর যে অংশে রামরেখ্ সিং থাকিতেন, সে অংশটা বড় নির্জ্জন। সে দিকে বিনা আবশ্যকে কাহারও যাওয়ার হুকুম ছিল না। রামরেখ্ সিংএর থাকিবার ঘরের একটু দূরেই সীতারামজী বিগ্রহের মন্দির। বৃদ্ধ রামরেখ্ সিং নিজে এই বিগ্রহের পূজা করেন। এই মন্দিরে সব-সমেত তিনটা কুঠুরী। পাশের একটা কুঠুরীতে বিগ্রহ, মধ্যের কুঠুরীটায় পূজার নানা প্রকার উপকরণ থাকিত। এ-গুলি প্রতিদিনের পূজায় লাগিত না,—কেবল রাম-নবমীর দিন বাহির করা হইত। অপর পার্শ্বের কুঠুরীটা রামরেখ্ সিং-এর গুরুদেবের থাকিবার ঘর। এ বাড়ীতে আসিলে তিনি ঐ ঘরে থাকেন। কাজেই ঘরটা প্রায় সব সময়ই বন্ধ থাকে,—কদাচিৎ তিনি যখন আসেন, তখন খোলা হয়। এই ঘরটাই ঠাকুরের ঘর। ঢুলার সিংএর হুকুমে চাকরেরা লছমীয়াকে এই ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল।

সে দিন রামরেখ্ সিংএর সান্ধ্য পূজা হইয়া গিয়াছে; সুতরাং প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত ও-দিকে আর লোক যাইবার সম্ভাবনা নাই। ঠাকুরের ঘরের চাবিটা ট্যাঁকে করিয়া ঢুলার সিং নিশ্চিন্ত হইল; কিন্তু তাহার এতটা সাবধানতার মধ্যেও গলদ থাকিয়া গেল। গুরুদেবের ঘর হইতে ভাঁড়ার-ঘরের মধ্য দিয়া সীতারামজীর ঘরে যাইবার দরজাগুলি বন্ধ আছে কি না, ঢুলার সিং তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখে নাই। প্রকৃত পক্ষে এই দরজাগুলি কোন দিনই বন্ধ হইত না,—কেবল ভেজান থাকিত।

ঢুলার সিংএর হুকুমে চাকরেরা লছমীয়াকে ঠাকুরের ঘরে রাখিয়া যাইবার পর, তাহার যখন জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল, তাহার চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। রক্ষার অন্য উপায় নাই দেখিয়া, সে মৃত্যুর পথ খুঁজিতে লাগিল। উঠিয়া চারিদিকে হাত দিয়া স্পর্শ করিতে-করিতে তাহার বোধ হইল, যেন কাঠের কবাটের উপর হাত পড়িয়াছে। সে কবাট ধরিয়া ঠেলিতে লাগিল। ঠেলিতেই কবাট একটু নড়িল। মুগ্ধ আশায় তখন সে দুই হাত দিয়া সমস্ত জোরে কবাটে ধাক্কা দিল। বোধ হইল, যেন কবাটের অপর পার্শ্ব হইতে কোন ভারী জিনিস ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। সে আবার ধাক্কা দিল; দুইখানা কবাট এবার অনেকটা ফাঁক হইয়া পড়িল। লছমীয়া সেই ফাঁক দিয়া মধ্যের ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঘরেও সে পূর্ব্বের মত প্রাচীরে হাত বুলাইয়া দরজা খুঁজিতে লাগিল। আবার একটা দরজা তাহার হাতে ঠেকিল। নূতন আশায় সে ধাক্কা দিল, এবং ধাক্কা দিতেই দরজা একেবারে খুলিয়া গেল। মৃদু আলোকে সীতারামজীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাহার চোখে পড়িল। আশ্বাসে লছমীয়ার বুক ভরিয়া উঠিল। সে "জয় সীতারামজি" বলিয়া বিগ্রহের পায়ের নীচে লুটাইয়া পড়িয়া, চোখের জলে ভাসিয়া বলিতে লাগিল, "হে সীতাজি, যেমন করে তুমি রাবণের হাত হ'তে নিজেকে রক্ষা ক'রেছিলে, তেমনি ক'রে আজ আমাকে রক্ষা কর।" তাহার কাতর মিনতিতে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি কি আশ্বাস দিয়া-ছিলেন, তাহা লছমীয়াই জানে; কিন্তু সে তাহার পরেই সংযত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং মন্দিরের দরজা খুলিবার জন্য ক্ষুদ্র দেহের সমস্ত শক্তিতে ধাক্কা দিতে লাগিল; কিন্তু এবার রুদ্ধ কবাট এতটুকুও নড়িল না,—লছমীয়ার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। হতাশ হইয়া সে আবার সীতারামজীর

দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল;—বুঝি তাহার মনে সন্দেহ আসিতেছিল, ঐ যে মূর্ত্তি, ও কি আর্ত্ত-বন্ধু, চির-করুণাময় দেবতার? না, উহা কেবল চেতনাহীন পাষাণ? কিন্তু ফিরিয়া দাঁড়াইয়াই সে দেখিল, একখানা পুরু গালিচার আসনের পাশে একটা রূপার ছোট কৌটা প্রদীপের আলোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। লছমীয়া কৌটাটা উঠাইয়া লইল; এবং তাহা খুলিয়া দেখিয়া; ভক্তিতে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। "জয় সীতামাই" বলিয়াই সে কৌটার মধ্যের সমস্তখানি আফিং খাইয়া ফেলিল। মৃত্যু ক্রমে তন্দ্রার মত হইয়া দেখা দিল।

তখন রাত্রি ১১টা। জমীদার-বাড়ীর খাওয়া-দাওয়ার গোলমাল তখনও মিটে নাই; কিন্তু রামরেখ্ সিংএর মহল একেবারে নীরব। ঠিক সেই সময়ে রামরেখ্ সিং,—রামায়ণের যেখানে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই জায়গাটা পড়িতেছিলেন:—

"পঞ্চবটীকে খগ মৃগ জাতি,
দুখী ভয়ে বনচর বহু ভাঁতি।
সীতাকে বিলাপ শুনি ভারি,
ভয়ে চরাচর জীব দুখারী।"

রাবণ সীতাকে রথে লইয়া যাইতেছে, সীতার ক্রন্দনে বন আকুল হইয়া উঠিয়াছে। ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে, পল্লব কাঁপিয়া উঠিতেছে—বিশ্ব-সংসার ভরিয়া যেন ক্রন্দনের আকুল উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। পড়িতে-পড়িতে রামরেখ্ সিংএর চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। কাহার যেন করুণ ক্রন্দন সারঙ্গীর করুণ সুরের মত বাতাসের সহিত মিশিয়া আসিয়া তাঁহার মনকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অভ্যাসবশতঃ একবার কোমরে হাত দিলেন; দেখিলেন, আফিমের কৌটাটা সেখানে নাই। মনে হইল, সেটাকে মন্দিরে ফেলিয়া আসিয়াছেন। সীতারামজীর মন্দিরে কাহারও যাওয়া তিনি ভালবাসিতেন না। সেই জন্য চাকরদের না ডাকিয়া, নিজেই একটা আলো লইয়া, ধীরে-ধীরে মন্দিরে যাইয়া, দরজা খুলিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, একটি অপূর্ব্ব স্ত্রী-মূর্ত্তি বিগ্রহের পায়ের নীচে পড়িয়া আছে। কি পবিত্র, সুন্দর মুখ! রামরেখ্ সিংএর অন্তরে তখনও বিবশা, অবলুণ্ঠিতা সীতার মূর্ত্তি জাগিতেছিল। "এ কি সাক্ষাৎ সীতামাই?" বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু একটু পরেই বুঝিতে পারিলেন যে, এ দেবী নহে, মানবী। কিন্তু মানুষ এ ঘরে কি করিয়া আসিবে? রামরেখ্ সিং লছমীয়ার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি এখানে?" লছমীয়ার তখনও চেতনা লোপ পায় নাই,—সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া বলিল, "আমি লছমীয়া।"

"ওতে ত পরিচয় হ'ল না মা।"

কি স্নিগ্ধ মধুর স্বর! লছমীয়ার মনে হইতেছিল, যেন স্বর্গের দেবতা কথা বলিতেছে। সে বলিল, "আমি সুখন্‌রামের স্ত্রী।"

সুখনের স্ত্রী! রামরেখ্ সিং চমকিয়া উঠিলেন। "তুমি এখানে কি ক'রে এলে মা?"

লছমীয়া আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না—তন্দ্রা যেন ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। সে চোখ বুজিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

"আমি রামরেখ্ সিং।"

লছমীয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তখন সেই বিগ্রহের পায়ের নীচে শুইয়া, লাজহরণ মরণের অভয় হস্ত ধরিয়া, সে ধীরে-ধীরে, গাঢ় কণ্ঠে তাহার সমস্ত কাহিনী শুনাইল; রামরেখ্ সিং স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখের সম্মুখে তাঁহার তেইশ বৎসরের আশা ও কল্পনা একটা হাউই বাজির মত জ্বলিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া, অন্ধকারে নিবিয়া গেল। তাঁহার চিরবাঞ্ছিত রামরাজ্য এক মুহূর্ত্তের মধ্যে নরকের অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

লছমীয়া আবার বলিতে লাগিল, "আপনি দেবতা—আমার স্বামী আপনাকে দেবতা ব'লেই মনে করতেন। সেই ভরসাতেই তিনি এখানে এসেছিলেন যে, আপনার পায়ে নিবেদন করলে সব বিপদ কেটে যা'বে।"

বৃদ্ধের চোখ্ জলে ভরিয়া গেল। একটা গভীর উচ্ছ্বাস তাঁহার বুক ও কণ্ঠের মধ্যে ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া লছমীয়া বলিল, "এখনও যদি তাঁকে একবার দেখ্‌তে পাই!" তাহার চোখের কোণ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এতক্ষণ পরে রামরেখ্ সিংএর চেতনা হইল। তিনি

ডান হাতখানা একবার নিজের কপালের উপরে বুলাইয়া, যেন সমস্ত অতীত স্মৃতি নিঃশব্দে মুছিয়া ফেলিলেন। তাহার পর, মন্দিরের বৃহৎ ঘণ্টাটার দড়ি ধরিয়া টানিলেন,—শব্দে নিস্তব্ধ মহলটা চকিত হইয়া উঠিল। অসময়ে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া, তাঁহার মহলের চাকরেরা দৌড়িয়া আসিল। রামরেখ্ সিং একজনকে বলিলেন, "কবিরাজকে এখনি ডেকে আন্।"

সে চাকর চলিয়া গেল। আর একজনকে বলিলেন, "সুখন্‌কে এখানে নিয়ে আয়।"

চাকর ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রামরেখ্ সিং কঠোর কণ্ঠে চাকরকে বলিলেন, "হুকুম শুন্‌তে পাচ্ছিস্?"

সে যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর, বাবুজী তাকে থানায় পাঠিয়েছেন।"

"থানায় পাঠিয়েছেন?" পুত্রের ঘৃণিত ষড়যন্ত্র তাঁহার চোখের উপর দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "দুলারকে ডাক।"

চাকর চলিয়া গেল। রামরেখ্ সিং লছমীয়ার মাথাটি অসীম স্নেহে কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। লছমীয়া অতি কষ্টে বলিল, "তা'র সঙ্গে দেখা হ'ল না। আপনি তা'কে বল্‌বেন, তা'র লছমীয়া প্রাণ দেছে, কিন্তু ধরম দেয় নাই।"

চাকর দুলার সিংকে সঙ্গে করিয়া আনিল। দরজার কাছে আসিতেই, লছমীয়াকে দেখিয়া দুলার সিংএর বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, সে হতবুদ্ধির মত লছমীয়ার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। ঘৃণায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রামরেখ্ সিং ঘোমটার কাপড় টানিয়া লছমীয়ার মুখখানি ঢাকিয়া দিলেন। তাহার পরে দুলার সিংএর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুখন্ কোথায়?"

দুলার সিং চমকিয়া উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, "দারোগা তা'কে ধরে নিয়ে গেছে।"

"কার হুকুমে দারোগা এসে তাকে নিয়ে গেল?"

দুলার সিং মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল। রামরেখ্ সিং রুদ্ধ ক্রোধে কেবল বলিলেন, "যা!" কিন্তু ঐ একটি অক্ষর দুলার সিংকে যে তাঁহার হৃদয় হইতে কত যোজন দূরে সরাইয়া দিল, মূর্খ দুলার সিং তাহা বুঝিতে পারিল না।

দুলার সিং চলিয়া গেলে, রামরেখ সিং চাকরকে বলিলেন, "নায়েবকে ডাক্।"

নায়েব আসিল। রামরেখ সিং বলিলেন, "এখনি ভারাট্টা যাও—সুখন্‌কে খালাস ক'রে নিয়ে এস। তাকে খালাস ক'রতে যদি আমার ভাণ্ডারটা খালি ক'রে দিতে হয়, তাই দেবে।"

নায়েব চলিয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি চিকিৎসা হইল; কিন্তু লছমীয়ার আর জ্ঞান হইল না। ঊষার হাসি ফুটিয়া উঠিতেই, লছমীয়ার হাসি অনন্ত কালের জন্য মিলাইয়া গেল।

(৬)

আজ পাঁচ বৎসর পরে রামরেখ সিং আবার তাঁহার দপ্তরখানায় প্রবেশ করিলেন। দুলার সিং গদির উপরে বসিয়া ছিল, পিতাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রামরেখ সিং যাইয়া তাঁহার পূর্ব্বের আসনে বসিলেন। এমন সময়ে নায়েব সুখন্‌কে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সুখনের কি পরিবর্ত্তন! সেই সবল, পেশল দেহ এক রাত্রিতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—চক্ষু কোটরে গিয়াছে—দৃষ্টি উন্মাদের মত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া দুলার সিং ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল; কিন্তু রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের মত সুখন্ এক লাফে তাহার উপরে যাইয়া পড়িল, এবং বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত দুইখানা ধরিয়া বলিল, "আমার লছমী?" সাহায্য পাইবার আশায় দুলার সিং সভয়ে ঘরের চারি দিকে চাহিল; কিন্তু কেহই তাহাকে সাহায্য করিতে আসিল না। ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। তখন রামরেখ সিং আসন হইতে উঠিয়া, তাঁহার শীর্ণ, লোলচর্ম্ম হাত দুইখানি দিয়া, রাম যেমন গুহককে কোল দিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া সুখন্‌কে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া ডাকিলেন, "সুখন্!" সুখন্ তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। রামজীর করুণার মত করুণার ধারা বৃদ্ধের চক্ষু হইতে উৎসারিত হইয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। সে দুলার সিংএর হাত ছাড়িয়া দিল। রামরেখ সিং তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আয় সুখন্, লছমীয়ার কথা আমি বল্‌ছি।" শান্ত বালকের মত সুখন্ তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই অবসরে তুলার সিং সেখান হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল; দেখিয়া রামরেথ সিং গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "দাঁড়াও!" সে একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তার পর রামরেথ সিং বলিলেন, "শোন্ সুথন্, সীতারামজীর আশীর্ব্বাদে লছমীয়া যেখানে গেছে, সেখানে হাজার-হাজার তুলার সিং তা'র কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। ত্রেতা যুগে সীতামাই, আর কলিযুগে তোর লছমীয়া! লছমীয়া প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু মান দেয় নাই।"

বলিতে-বলিতে চোখের জলে রামরেথ্ সিংএর বুক ভাসিয়া গেল। সুথন্ নিস্পন্দ হইয়া তাঁহার কথা শুনিল। শেষে একটা আর্ত্ত চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। একটু পরেই সে প্রকৃতিস্থ হইয়া দাঁড়াইল। রামরেথ্ সিং আবার বলিতে লাগিলেন, "এখানে যারা উপস্থিত আছ, তারা শোন। আজ হ'তে তুলার সিং আমার কেউ নয়—আজ হ'তে আমার এই জমীদারী সুথন্‌রামের। আমার বংশের কেহ ইহার উপর কখনো কোন দাবী করতে পারবে না।"

সুথন্ স্থির কণ্ঠে বলিল, "হুজুর, আমি গরীব,—আমি মূর্খ চাষা—জমীদারীতে আমার দরকার নাই। লছমী আমাকে যা' দিয়ে গেছে, তা' দুনিয়ার সকল দৌলতের বড়—আমার লছমীর দান সকল দানের উপরে।"

লছমীয়ার মহিমায় তাহার অন্তর-বাহির ভরিয়া উঠিল; অতীত, বর্ত্তমান তাহার চোখে নিবিয়া গেল; প্রতিশোধের নরকাগ্নি সেই দেবীর চরণ-স্পর্শে চন্দনের মত শীতল হইয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিল। কাহারও দিকে না চাহিয়া সুথন্ ধীরে-ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, রামরেথ্ সিং ততক্ষণ তাহার দিকে তৃষিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। পরে আর যখন তাহাকে দেখা গেল না, তখন ঘরের সকলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমার জমীদারী আমার জাগ্রত দেবতা সীতারামজীর সেবার জন্য দিলাম। নায়েব, গুরুজীকে সংবাদ দাও,—আজ হতে তিনি সীতারামজীর সেবাইৎ।"

প্রেমের কথা

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম্-এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বরাগের প্রকার-ভেদ

এক্ষণে কবিজন-বর্ণিত প্রণয়-সঞ্চার বা পূর্ব্বরাগের (etiology) নিদান-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব।

একটু প্রণিধান করিলে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ তিন প্রকারে পূর্ব্বরাগ নরনারীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অন্ততঃ কবিগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথম প্রকার

প্রথম ও প্রধান প্রকার, বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাষায় :—

'শ্রবণাদ্দর্শনাদ্‌বাঽপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষো যোঽপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥'

আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় অপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয় উৎকৃষ্টতর, দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুভূতিও প্রগাঢ়তর, দর্শনলব্ধ জ্ঞানও শ্রবণলব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং 'শ্রবণাৎ' অপেক্ষা 'দর্শনাৎ' প্রণয়সঞ্চারই অধিকতর স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যৌবনে রূপলালসা অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং রূপদর্শন-জনিত মনোবিকারও (নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম-বিক্রিয়া) সহজেই ঘটে। পক্ষান্তরে পরের মুখে রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া প্রণয়সঞ্চার অনেকটা পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত। স্বকর্ণে শোনা অপেক্ষা স্বচক্ষে দেখা যে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহাতে কোন সন্দেহ

নাই। ফলেও দেখা যায়, দর্শন-জনিত প্রণয়ের দৃষ্টান্তই সাহিত্যে অধিক।

'শ্রবণাৎ'

যাহা হউক, আগে শ্রবণ-জনিত প্রণয়ের কথাই বলি।

'শ্রবণন্তু ভবেত্তত্র দূতবন্দিসখীমুখাৎ।'

—'সাহিত্যদর্পণ।

আমাদের সাহিত্যে আদর্শ-প্রেমের ভাণ্ডার মহাজন-পদাবলীতে দেখা যায়, শ্রীরাধা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিয়াছিলেন।—'সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম। কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ॥ ...নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো।' ইত্যাদি—(চণ্ডীদাস।) 'পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর তৈখন মন চুরি কেল।' (গোবিন্দদাস।) পরে বংশী-ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, পরে পটে দর্শন করিয়াছিলেন, পরে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন, পরে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন।—'বংশীধ্বনি-শ্রবণং যথা। না জানিয়ে কো ঐছে মুরুলি আলাপই চমকই শ্রুতি হরি নেল। না জানিয়ে কো ঐছে পটে দরশায়লি নবজলধর জিনি কাঁতি।...যা কর নাম মুরুলিরব তাকর পটে ভেল সো পরকাশ॥' (গোবিন্দদাস।) দর্শন—'চিত্রপটে যথা। বিরলে বসিয়া পটে ত লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি।' (চণ্ডীদাস।) 'অথ স্বপ্নে দর্শন। স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে তাহা বিনু আর কারো নই॥' (জ্ঞানদাস।) 'ততঃ সাক্ষাদ্দর্শনং যথা। কি পেখলু যমুনার তীরে।' ইত্যাদি।(১) এ অবস্থায় ইহাকে অবিমিশ্র শ্রবণজনিত প্রণয় বলা যায় না। ইহা নাম-শ্রবণ, বংশীধ্বনি-শ্রবণ, পটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, সাক্ষাৎ দর্শন—এ সমুদয়ের অপূর্ব্ব মিশ্রণ-জনিত।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখা যায়, রুক্মিণী সকলের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার অনুরাগিণী হয়েন, আবার শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর রূপগুণের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার অনুরাগী হয়েন। (১০ম স্কন্ধ, ৫২তম অধ্যায়।) মহাভারতে দেখা যায়, সকলে দময়ন্তী-সমীপে নলের ও নল-সমীপে দময়ন্তীর রূপগুণের প্রশংসা করিত, তাহাতে উভয়ের হৃদয় আর্দ্র হয়, পরে হংসের মুখে প্রশংসা শুনিয়া রীতিমত প্রণয় সঞ্চার হয়। (বনপর্ব্ব, ৫৩তম অধ্যায়।) ঐতিহাসিক সংযুক্তাও শৌর্য্যবীর্য্যাধার পৃথ্বীরাজের গুণ-গ্রামের কথা শুনিয়া তাঁহার অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। হয় ত এই প্রকারে রাজসিংহের বীরত্বকাহিনী পরম্পরায় শ্রবণে চঞ্চলকুমারীর চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল, ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, পরে চিত্র-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চার হইল। যাক্, সে কথা চিত্রদর্শন-প্রসঙ্গে বলিব। ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে প্রেমের (?) বর্ণনা আছে, তাহাতেও দেখা যায়,—

> 'ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
> উথলিল সুন্দরের সুখ-পারাবার॥
> কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
> খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট॥'

এ ক্ষেত্রে 'শ্রবণাৎ' প্রণয়-সঞ্চার। আবার নায়িকারও প্রথমে মালিনীর মুখে নায়কের রূপগুণবর্ণনা শুনিয়া চিত্ত-বিকার হইয়াছিল, পরে রথের পাশে সাক্ষাৎ দর্শন ঘটিল। 'শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে।' এক্ষেত্রে 'শ্রবণাৎ' 'দর্শনাৎ' দুই-ই আছে। সেকালের স্বয়ংবরসভায় দর্শন ও গুণানুবাদ-শ্রবণ যুগপৎ হইত।

এবার বিলাতী সাহিত্য হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব। রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের নাট্য-সাহিত্যে 'ফিল্যাষ্টার' নাটকে ইউফ্রেসিয়া-নাম্নী কুমারী প্রেমাস্পদের সমক্ষে নিজে কবুল করিতেছেন, 'আমি পিতৃমুখে সর্ব্বদা আপনার গুণগ্রামের কথা-শ্রবণে আপনার দর্শনোৎসুকা হই, পরে দর্শনমাত্র আমার হৃদয় প্রেমে ভরপূর হয়।' (২) এখানে 'শ্রবণাৎ' 'দর্শনাৎ' দুই-ই আছে। শেক্‌স্‌পীয়ার

---

(১) সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম্‌-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত) 'পদকল্পতরু' হইতে পদগুলি উদ্ধৃত হইল।

(২) My father oft would speak
Your worth and virtue ; and as I did grow
More and more apprehensive, I did thirst
To see the man so praised. But yet all this
Was but a maiden-longing ; to be lost
As soon as found ; tlll, sitting in my window,
... ... I saw a god,
I thought, (but it was you) enter our gates ;

যে ইতালীয় গল্পপুস্তক (Il Pecorene) হইতে 'মার্চেন্ট্ অভ্ ভেনিসে'র প্রধান আখ্যান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ইতালীয় গল্প-পুস্তকের কথারম্ভ এইরূপ।—জনৈক যুবক রূপের খ্যাতি শুনিয়া এক সন্ন্যাসিনীর (nun) প্রেমে পড়িয়া তাঁহার দর্শনলাভের সুবিধার জন্য, সন্ন্যাসিনী যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং শীঘ্রই প্রত্যহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইলেন ইত্যাদি (৩)। ইহা খাঁটি 'শ্রবণাৎ' পূর্ব্বরাগ।

'শ্রবণাৎ' নহে—স্পর্শনাৎ

অন্ধ যুবতী রজনীর হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চারের যে ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছেন, তাহাকে যদি 'শ্রবণাৎ' বলিতে হয়, তাহা হইলে সে 'শ্রবণাৎ'এর সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে। (বিশ্বনাথ কবিরাজ সে অর্থে উহার প্রয়োগ করেন নাই।) লবঙ্গ ঠাকুরাণীর কাছে ফুল বেচিতে গিয়া শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর-শ্রবণে রজনী অন্যের কণ্ঠের সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছে —"সে এমন অমৃতময় নহে—এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া, সুখ ঢালিয়া দেয় নাই।" (এই কণ্ঠস্বর বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির সহিত তুলনীয়।) কিন্তু শুধু কণ্ঠস্বরেই রজনীর হৃদয় হৃত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব্ব মৌলিকতা দেখাইয়া 'শ্রবণাৎ' 'দর্শনাৎ' ছাড়া (অন্ধের বেলায়) 'স্পর্শনাৎ' আর একটা নিদান যুড়িয়া দিয়াছেন। "সেই চিবুক-স্পর্শে আমি মরিলাম। সেই স্পর্শ পুষ্পময়।......আ মরি মরি—সে নবনীত-সুকুমার-পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণা-ধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে, সে বুঝিবে কি প্রকারে?" (১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।) তাহার পর কবি আবার অন্ধ যুবতীর মুখ দিয়া "শুধু শব্দ স্পর্শ গন্ধে"র কথা "কেবল কথার শব্দ শুনিবার আশা"র কথা বলাইয়াছেন, "কখন কেহ শুনিয়াছে যে কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়া উন্মাদিনী হইয়াছে?" "তবে কি সেই স্পর্শ?" "রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র—শব্দও মানসিক বিকার," "রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপ-সুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপ-সুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হইবে?" "রূপে হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শূন্য রমণীহৃদয়ে সুপুরুষ-সংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে?" (১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ) ইত্যাদি চিন্তা ও প্রশ্নের অন্ধ যুবতীর মনে উদ্রেক করিয়া অন্ধের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এ এক অভিনব তত্ত্ব!

'দর্শনাৎ'—ইন্দ্রজালে

এক্ষণে দর্শনজনিত পূর্ব্বরাগের কথা বলিব। দর্পণ-কারের মতে ইহা চতুর্ব্বিধ। 'ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনম্।' রসমঞ্জরী-রচয়িতা প্রথমটির উল্লেখ করেন নাই। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রথমটির দৃষ্টান্ত আছে কি না জানি না; তবে সংস্কৃত-সাহিত্যে অলৌকিক ব্যাপারের যেরূপ আতিশয্য, তাহাতে এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে থাকাই সম্ভব, হয় ত আমার জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতার জন্য দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। প্রাকৃত ভাষায় রচিত (রাজ-শেখরের) কর্পূরমঞ্জরীতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত আছে। কৌল ভৈরবানন্দ অদ্ভুত ক্ষমতাবলে ভিন্ন দেশ হইতে রাজ্ঞীর মাতৃস্বসার কন্যা কর্পূরমঞ্জরীকে রাজা ও রাজ্ঞীর নিকট আনয়ন করেন, তাহাকে দেখিয়া রাজার পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়। আরব্যোপন্যাসে দুইটি গল্পে (নৌরদ্দিন আলি ও বিদরুদ্দিন হাসানের গল্পে এবং কামারলজমান ও বেদৌরার গল্পে) এক দেশের যুবা পুরুষ ও অন্য দেশের যুবতীকে ইন্দ্রজাল প্রভাবে এক গৃহে এক শয্যায় নিদ্রাবস্থায় একত্র করা হয়, নিদ্রাভঙ্গে পরস্পরের দর্শনে পরস্পরের পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়। (দশকুমারচরিতে প্রমতি ও নবমালিকার বৃত্তান্ত তুলনীয়।) ইংরেজী সাহিত্যে দেখা যায়, স্পেন্সারের ফেয়ারি কুইনের তৃতীয় কাণ্ডে ব্রিটোমার্ট-নাম্নী রাজকুমারী স্যর আর্টিগল-নামক বীরপুরুষের মূর্ত্তি ঐন্দ্রজালিক মুকুরে

My blood flew out and back again.........
... ... then was I called away in haste
To entertain you ... ...
... ... I did hear you talk,
Far above singing. After you were gone,
I grew acquainted with my heart, and searched
What stirred it so; alas, I found it love.
—Philaster, Act V. Sc. V.

(৩) Dunlop: History of Fiction, Ch. 8.

প্রতিফলিত দেখিয়া তাঁহার প্রেমে পড়েন ও যোদ্ধৃ পুরুষের ছদ্মবেশে তাঁহারই সন্ধানে দেশে-দেশে বিচরণ করেন।

'দর্শনাৎ—স্বপ্নে

অজ্ঞাতকুলশীলা অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীকে স্বপ্নে দেখিয়া রাজপুত্র তাঁহার রূপের মোহে দেশে দেশে তাঁহার সন্ধানে ভ্রমণ করিতেছেন, এরূপ রূপকথা বোধ হয় আমাদের দেশে চলিত আছে। আরব্যোপন্যাসেও যেন ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি মনে হয়। ডন্‌লপ্ তাঁহার History of Fiction নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে দিয়াছেন। (৪) সে দৃষ্টান্তগুলি পাঠক-সমাজের সুবিদিত নহে বলিয়া সেগুলি আর উদ্ধৃত করিলাম না। স্পেন্‌সারের ফেয়ারি কুইনের মুখবন্ধে (স্যর ওয়াল্‌টার র‍্যালের উদ্দেশে লিখিত পত্রে) দেখা যায়, আদর্শবীর রাজা আর্থার পরীরাণী গ্লোরিয়ানাকে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য পরীরাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বপ্নযোগে প্রেমসঞ্চারের দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগের বৈদেশিক ডন্‌লপের সমালোচনা-গ্রন্থ বা স্পেন্‌সারের কাব্য হাতড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের পৌরাণিক আখ্যানে বাণরাজকন্যা ঊষার শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত স্বপ্নে সঙ্গম ইহার সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত (শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ ৬২তম অধ্যায়)। কাশীখণ্ডে (৬৭তম অধ্যায়ে) রত্নেশ্বর শিবের বরে গন্ধর্ব্বরাজকন্যা রত্নাবলীর নাগলোকের রত্নচূড়ের সহিত স্বপ্নে সঙ্গম বোধ হয় শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত ঊষা-অনিরুদ্ধের ব্যাপারের অনুকরণ। সুবন্ধুর বাসবদত্তায় নায়ক-নায়িকা, কন্দর্পকেতু ও বাসবদত্তা, উভয়েরই উভয়কে স্বপ্নে দেখিয়া প্রণয়-সঞ্চার হইয়াছিল। (৫) রাজশেখরের বিদ্ধশালভঞ্জিকায়ও রাজা মৃগাঙ্কাবলীর চিত্র ও দারুময়ী প্রতিমূর্ত্তি-দর্শনের পূর্ব্বে তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন।

ইন্দ্রজালে ও স্বপ্নে দর্শন খুব রোম্যান্টিক সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের এখনকার rationalistic ageএ ইহা যেন বড়ই আজগবী ঠেকে। সেই জন্য পুরাতন সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব না হইলেও আধুনিক সাহিত্যে ইহার বড় চল নাই। তথাপি বলিতে পারা যায়, কুন্দ স্বপ্নে মাতৃ-নির্দ্দিষ্ট পুরুষ নগেন্দ্রনাথকে দেখিল, স্বপ্নে আবির্ভূতা মাতার উদ্দেশ্য যে কুন্দ স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষকে 'বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান' করিবে, কিন্তু এই স্বপ্নে দর্শন পূর্ব্বরাগের সূত্রপাত নহে ত? ৺রমেশচন্দ্র দত্ত 'বঙ্গবিজেতা'য় এই শ্রেণীর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "চিন্তাবলে কতবার শূন্য হইতে অলৌকিক স্নেহসম্পন্না প্রেমপ্রতিমাকে জাগরিত করিয়া তাঁহারই সহিত কালহরণ করিতাম! সহসা সে সুন্দর মূর্ত্তি জলবিম্বের ন্যায় ভিন্ন হইয়া যাইত; কল্পনাশক্তি শ্রান্ত হইত; আমি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতাম। দিন দিন এইরূপ কল্পনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিবাকালে অর্দ্ধেক সময় আমি এ জগতে থাকিতাম না, কাল্পনিক জগতে বিচরণ করিতাম। ...সেই উজ্জ্বল প্রেমপ্রতিমা আসীন রহিয়াছেন। নিবিড় কৃষ্ণকেশে জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণকান্তি মুখমণ্ডল বেষ্টন করিয়া আছে, বালিকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দুটি অল্প প্রেমহাস্যে বিস্ফারিত, ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষু দুটী প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডল প্রেমে ঢল্ ঢল্ করিতেছে।...একদিন নিশাবসানে ঐরূপ কল্পনা ছিন্ন হওয়াতে...কতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিলাম বলিতে পারি না,—বোধ হইল, মস্তকে ও মুখে কে জল সিঞ্চন ও ব্যজন করিতেছে। ধীরে-ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি,—আপনি বিশ্বাস করিবেন না,—সেই প্রেমপ্রতিমা! সেই স্বপ্নদৃষ্টা বালিকা মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার মুখে জল দিতেছে।" ইত্যাদি (১২শ পরিচ্ছেদ)। এই কল্পনা মৌলিক ও মধুর এবং ইংরেজ কবি শেলীর উপযুক্ত। (৬)

দর্শনাৎ—চিত্রে

ইন্দ্রজালে বা স্বপ্নে দর্শনে প্রণয়-সঞ্চারের তুলনায় চিত্রে দর্শনে প্রণয়-সঞ্চার অনেকটা স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য। অজ্ঞাতকুলশীলা অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীর চিত্র বা প্রতিমা দেখিয়া রাজপুত্র তাঁহার সন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, আমাদের দেশে প্রচলিত রূপকথায় ইহার

(৪) Ch. III p. 107, p. 110; ch. V p. 159.

(৫) বাঙ্গালা ভাষায় ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা' আংশিকভাবে সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'র অনুকরণে রচিত।

(৬) শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'খোলা চিঠি' গল্পে (মানসী, ফাল্গুন ১৩২২) এই কল্পনার সাহায্য লইয়াছেন।

দৃষ্টান্ত আছে। (৭) ডন্‌লপ্‌ ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, এই কল্পনা প্রাচ্যভূমি হইতে প্রতীচ্য সাহিত্যে সংক্রামিত হইয়াছে। (৮) এক্ষেত্রেও দৃষ্টান্তগুলি পাঠক-সমাজের সুবিদিত নহে বলিয়া সেগুলি উদ্ধৃত করিলাম না। ইংরেজী সাহিত্যে রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের সিড্‌নির আর্কেডিয়ায় Pyrocles-নামক নায়ক Philocle a-নাম্নী নায়িকার চিত্র দেখিয়া তাহার প্রেমে পড়েন ও তাহার সন্ধানে বাহির হয়েন। শেক্‌স্‌পীয়ারের সময়ের নাটককার গ্রীনের Friar Bacon and Friar Bungay নাটকে দেখা যায়, Castile-এর রাজকুমারী Elinor ইংলণ্ডের রাজপুত্র এডওয়ার্ডের ছবি দেখিয়া ও তাঁহার বীরকীর্ত্তি-কাহিনী শুনিয়া তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, এক্ষেত্রেও বৈদেশিক সাহিত্যের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে এই শ্রেণীর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 'রত্নাবলী'তে সুসঙ্গতা কর্তৃক অঙ্কিত সাগরিকার চিত্র দেখিয়া রাজা উদয়নের হৃদয়ে সাগরিকার প্রতি প্রণয়ের সঞ্চার হয়। (এই প্রসঙ্গে ২য় অঙ্কে 'কৃচ্ছ্রাদূরুযুগং ব্যতীত্য সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে' ইত্যাদি বিখ্যাত শ্লোক বোধ হয় পাঠকবর্গের সুপরিচিত।) 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'ও মালবিকার চিত্র দেখিয়া রাজার চিত্ত চঞ্চল হয়, এবং চিত্রিতা সুন্দরীর রূপ দেখিয়া আসল দেখিবার জন্য তাঁহার প্রবল কৌতূহল হয়, কৌশলে তিনি সে কৌতূহল চরিতার্থও করেন। তবে এক্ষেত্রে চিত্র-দর্শনের কথাটা কবি সংক্ষেপে সারিয়াছেন; 'রত্নাবলী'র মত ঘটনাটা অঙ্কিত হয় নাই, বর্ণিত হইয়াছে। 'বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা'য় রাজা প্রথমে মৃগাঙ্কাবলীকে স্বপ্নে দেখিলেও পরে তাহার চিত্র ও দারুময়ী প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া চিত্ত হারাইয়াছিলেন। দশকুমারচরিতে নিতম্ববতীর বৃত্তান্তে দেখা যায়, কলহকণ্টক-নামক ব্রাহ্মণ-যুবক নিতম্ববতীর চিত্র দেখিয়া চিত্ত হারাইয়াছিল। (নিতম্ববতী কুমারী নহে, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা ও পতিব্রতা।) আবার উপহার-বর্ম্ম-চরিতে দেখা যায়, কল্পসুন্দরী উপহারবর্ম্মার চিত্র দেখিয়া চিত্ত হারাইয়াছিল। (কল্পসুন্দরী বিকটবর্ম্মার পত্নী, কিন্তু তাহার সতীধর্ম্ম বাঁচাইবার জন্য একটা শাপ-বৃত্তান্ত সংযোজিত হইয়াছে যে উভয় পুরুষেরই শিবের অংশে জন্ম ও কল্পসুন্দরী শাপভ্রষ্টা গঙ্গা!)

শ্রবণাৎ—প্রসঙ্গে বলিয়াছি, শ্রীরাধার বেলায় স্বপ্নে দর্শন, চিত্রে দর্শন—সব রকমই আছে। চিত্র-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চারের ব্যাপার আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসাদে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেও পাইয়াছি। 'রাজসিংহে' চঞ্চলকুমারীর পূর্ব্বরাগ ইহার দৃষ্টান্ত। 'তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; লোচন বিস্ফারিত হইল। (৯) একজন সখী, তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল,—রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ! দেখিবার যোগ্য বটে।"' [১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।] 'পরদিন চঞ্চলকুমারী ক্রীত চিত্রগুলি একা বসিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন।···নির্ম্মল। ঐ একখানা কার ছবি তুমি পাঁচবার করিয়া দেখিতেছ·· চঞ্চলকুমারী রাগ করিয়া ছবিখানা ফেলিয়া দিল।' [১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ]

চিত্র-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চার হয় এ কথা আধুনিক কালে সহজে বুঝান যায় না, এতটা রোম্যাণ্টিক ঘটনা আজকালকার পাঠকের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র নির্ম্মলকুমারীর মুখ দিয়া আপত্তি তুলিয়াছেন—'ছবি দেখিয়া কি এত হয়?' এবং নিজে তৎপ্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, 'শুধু ছবি দেখিয়া কি হয়, তা ত জানি না। অনুরাগ ত মানুষে মানুষে—ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি? পারে, যদি ছবি ছাড়াটুকু আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু গড়িয়া রাখিয়া থাক, তার পর ছবিখানাকে (বা স্বপ্নটাকে) সেই মনগড়া জিনিসের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর। চঞ্চলকুমারীর কি তাই কিছু হইয়াছিল? তা আঠার বছরের মেয়ের মন আমি কেমন করিয়া বুঝিব, বা বুঝাইব?' [১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।] ইহা হইল এখনকার সময়ের

(৭) আজকাল বিবাহ-সম্বন্ধ হইবামাত্র, মেয়ে দেখার পূর্ব্বে বা দূরদেশ হইলে মেয়ে দেখার বদলে ফটোগ্রাফ দেখিয়া নভেল-পড়া বরের পূর্ব্বরাগ বোধ হয় ইহারই জের।

(৮) *Dunlop* : *History of Fiction* : Ch. 5, p. 155 ; Ch. X, p. 312 ; Ch. XII, p. 347.

(৯) সংস্কৃত সাহিত্যে হইলে কবিগণ এইখানে পুলক-কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব করাইতেন।

উপযোগী rationalisationএর প্রয়াস। আমরাও এই জন্য 'শ্রবণাৎ' প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, রাজসিংহের বীরত্বকাহিনী পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া (শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের বর্ণনা-শ্রবণে রুক্মিণীর ন্যায়) (১০) চঞ্চলকুমারী তাঁহার পক্ষপাতিনী ছিলেন, চিত্র-দর্শনে সেই পক্ষপাত প্রণয়ে পরিণত হইল; ইন্ধন প্রস্তুত ছিল, চিত্র-দর্শনে আগুন জ্বলিল'।

অন্যান্যবিধ

ইন্দ্রজালে, স্বপ্নে ও চিত্রে দর্শন ছাড়া আরও কোন কোন রোম্যান্টিক ধরণের ব্যাপার রূপকথা প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। যথা কেশবতী রাজকন্যার একটি সুদীর্ঘ কেশ দেখিয়া রাজপুত্রের প্রণয়-সঞ্চার, ঔষধের গুণে প্রেমের উদ্ভব (love-potion, যথা ইউরোপীয় সাহিত্যে Tristram ও Yseultএর ব্যাপার (১১) ইহাও এক প্রকার ইন্দ্রজাল) ইত্যাদি। নায়ক বা নায়িকা অপর পক্ষের রচনা পড়িয়া প্রেমে পড়িলেন, এখনকার (intellectual age) মস্তিষ্ক-শক্তি-প্রধান আমলে এরূপও না কি ঘটে। যথা এলিজ্যাবেথ ব্যারেট এবং রবার্ট ব্রাউনিং পরস্পরের কবিতা পড়িয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। (ইহা ধরিতে গেলে 'শ্রবণাৎ' গুণানুরাগেরই প্রকারভেদ।) 'সাহিত্যদর্পণে' বা অন্য অলঙ্কার-গ্রন্থে এগুলির প্রসঙ্গ না থাকিলেও এগুলি প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়াছে, অতএব এইখানেই অন্য চলিত কলম স্থগিত করিলাম। বারান্তরে 'সাক্ষাৎ' দর্শনে পূর্ব্বরাগ-সঞ্চারের আলোচনা করিব।'

(১০) নায়িকার পরবর্ত্তী কার্য্য রুক্মিণীর অনুরূপ (পত্র-সহ পুরোহিত-দূত-প্রেরণ)। তাই তিনটী স্থলে তাঁহাকে রুক্মিণীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। (৩য় খণ্ড ১ম, ২য় ও ৫ম পরিচ্ছেদ।)

(১১) 'The mother of Yseult gave to her daughter's confidant Brangian, an amorous potion, to be administered on the night of her nuptials. Of this beverage, Tristan and Yseult partook. Its effects were quick and powerful; nor was it's influence less permanent than sudden. *Dunlop*: *History of Fiction*, Ch III, p. 85. (এই বীর যুবক মাতুলের বিবাহের জন্য নির্দ্ধারিতা পাত্রী Yseultকে আনিতে গিয়াছিলেন। পথে এই ব্যাপার ঘটে।)

ভারতবর্ষে দুর্গোৎসব

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী]

১

আসন তাহার শুধু কি বঙ্গ,
　　বিশ্ব-বিকাশ যে পদ-স্পর্শে?
দুর্গোৎসবের নব-তরঙ্গ
　　উছলিত সারা ভারতবর্ষে!
বাজান ঈশানী আহ্বান-শঙ্খ,
　　ঈশান শ্মশান জাগায় নৃত্যে,
শত—লক্ষ!—ক্রমে এ যে অসংখ্য
　　জনতা জাতির মিলন-তীর্থে
এস গো শক্তি, কর মা স্পর্শ,—
উঠুক্ আবার ভারতবর্ষ।

২

আঁধারে ঘুরিছে জগৎ অন্ধ,
চৌদিকে শ্মশান! শবের গন্ধ!
ছুটিছে উল্কা প্রলয়-দীপ্ত!
বহিছে ঝটিকা প্রমাদ-ক্ষিপ্ত!
গর্জ্জে জলদ কাঁপায়ে সৃষ্টি—
করিছে অশনি-করকা-বৃষ্টি!
মাঝে মাঝে ক্ষণপ্রভার দীপ্তি,
নিমেষের সে কি নেত্র-তৃপ্তি?
অনন্ত আলো কি রাখে নি ছদ্ম
বিশ্ব-তরণ চরণ-পদ্ম?

এস গো শক্তি, কর মা স্পর্শ,—
জাগুক্ আবার ভারতবর্ষ।

৩

জগতের হিতে রাজার জন্য
বিদেশে মরিতে পাঠায় সৈন্য!—
তারা কি ক্ষুদ্র? তারা কি তুচ্ছ?
তারা যে বৃহৎ! তারা যে উচ্চ!
যেতেছে ঘুচিয়া গ্লানি তূর্ণ,
কুহকে পলকে শূন্য পূর্ণ
অন্নপূর্ণা, ক্ষুধিত-আস্যে
অন্ন দিতেছ স্নেহের হাস্যে,
কি ভয়, অভয়া, যদি শ্রীহস্তে
স্বাস্থ্য বিলাও রোগগ্রস্তে!
এস গো শক্তি, কর মা স্পর্শ,—
জাগুক্ আবার ভারতবর্ষ।

৪

ছিন্নমস্তা-পূজা নিষিদ্ধ!—
যুনানী মজিল ভুলি সে শিক্ষা,
আমরা তাল-বেতাল-সিদ্ধ,
শক্তি মন্ত্রে মোদের দীক্ষা!
নেত্র উপাড়ি বীর আদর্শ
চাহিল যে দেশে পূজিতে শক্তি,
ভোলে নি আজও সে ভারতবর্ষ
বুকচেরা ধন—মাতৃভক্তি!
এস গো শক্তি, কর মা স্পর্শ,—
উঠুক আবার ভারতবর্ষ।

৫

আবার ভেদিয়া মুম্মির জঙ্ঘা
বহুক পতিত-পাবনী গঙ্গা,
মহম্মদ, গোরা, নানক, বুদ্ধ;
আসুক্ জিনিতে জীবন-যুদ্ধ!
আকবর, প্রতাপ নূতন ছন্দে
আসুক্ এযুগে প্রেমের দ্বন্দ্বে!
আসুক্ বন্দা—বন্দী বক্ষে—
ফরুক্‌সিয়র আর্দ্র চক্ষে!
উঠুক বাজায়ে বিজয়-তূর্য্য
নব-জীবনের নবীন সূর্য্য!
এস গো শক্তি, কর মা স্পর্শ,—
জাগুক্ আবার ভারতবর্ষ।

যমুনা বাঈ

[শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার বি-এ]

বৃন্দাবনে মাধো-বিলাস মন্দিরের প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম জয়পুরাধিপতি মহারাজ মাধো সিংহ দেবদর্শন ও ভেট করিতে আসিয়াছেন। লোক-লস্কর, সিপাই-শান্ত্রী, রাজ-কর্ম্মচারী, রাজ-ভৃত্য, ভিক্ষার্থী, দর্শনার্থীতে বিশাল মন্দির-প্রাঙ্গণ পূর্ণ। আজ পূর্ণিমা,—শ্রীমূর্ত্তি বিশেষ ভাবে সজ্জিত করা হইতেছে, মহারাজ আসিলে মন্দিরের দ্বার খোলা হইবে। উৎসুক জনতার সাগ্রহ প্রশ্নোত্তরে মন্দির-প্রাঙ্গণ লোষ্ট্র-নিক্ষিপ্ত মধুচক্রের মত মুখরিত।

হাতে কাজ ছিল না, তাই আমরা কয়েকজন মন্দির সোপানের এক ধারে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। এমন সময় একটি বৃদ্ধা আসিয়া, আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া এক পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমাকে চিনিতে পার?" গলার আওয়াজে সচকিত হইয়া আমাদের সঙ্গী বলিলেন—"কে যমুনা বাঈ? কেমন আছ? চশমা লইয়াছ, মাথার চুল কাটিয়া ফেলিয়াছ—চেনা শক্ত! যা হোক্, কি মনে করে?" "শুধু দর্শনের জন্য।" বলিয়া বৃদ্ধা সোপানের নীচে এক পাশে বসিয়া, একখানি পুঁথি খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিল; আমাদের দিকে, বা তার পূর্ব্বপরিচিত আমাদের সঙ্গীর দিকে, একবারও তাকাইল না—তাহার মন তখন পুঁথিতে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে! বৃদ্ধার মুখে বি-

সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিয়া, আমি কৌতূহলী হইয়া শুনিতে লাগিলাম ;—বুঝিলাম, পুঁথিখানি গীতা! সুমধুর কণ্ঠে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে গীতা পাঠ—স্থান, কাল, পাত্র সব মিলিয়া আমার কৌতূহল জাগ্রত করিয়া দিল। কিন্তু এই সময়ে মহারাজ আসায়, তখন আর কৌতূহল নিবারণ করা হইল না।

সকলে দর্শন করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর, আমি আমাদের সেই প্রৌঢ় সঙ্গীকে এই যমুনা বাঈ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তাহার প্রথম জীবনের কোন কথা বলিতে পারিলেন না—কেবল বলিলেন, "আমরা ইহাকে গত ত্রিশ বৎসর হইতে জানি। সে-বয়সে যমুনা বড় সুন্দরী ছিল। সে যখন ব্রহ্মচারীর মন্দিরে সুমধুর কণ্ঠে ভজন গাহিত, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিত। আমাদের সঙ্গেও যমুনার সেইখানে আলাপ। সে আমাদের কত ভজন শুনাইয়াছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও কখনও তাহার অতীত জীবনের ইতিহাস শুনিতে পাই নাই। শুনিতে পাই, সে এক বৃদ্ধ সাধুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। সে সাধু না কি যমুনাকে বলিয়াছে যে, তাহার জীবনের একমাত্র পাপের কাহিনী অকপটে লোকের নিকট প্রকাশ না করিলে তাহার মুক্তি নাই। তুমি চেষ্টা করে দেখ না—তোমার কাছে হয় ত সে সব কথা বলিতে পারে; কেন না, তুমি তার পুত্রের বয়সী। শুনেছি, যমুনা ভিক্ষা করিয়া একটি ছোট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে "বাল-গোপাল" মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এক কাজ কর,—এক দিন তার মন্দির দেখতে গিয়ে, তাঁর আত্মজীবনী শুনে এস।"

"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্।" কিন্তু তার আগে বৃদ্ধা যমুনা বাঈয়ের সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ না করিয়া, তার মন্দিরে কেমন করিয়া যাই। এ বিষয়ে একটা বড় সুবিধা হইয়া গেল। যমুনা বাঈ প্রায় প্রত্যহ দুই বেলা মাধো-বিলাস মন্দিরে দেব-দর্শন করিতে আসিত; এবং দর্শনের দেরী থাকিলে, এক ধারে বসিয়া গীতা বা শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম পাঠ করিত। আমি সেই সময়ে তার কাছে বসিয়া তার সুমধুর পাঠ শুনিতাম, এবং মধ্যে-মধ্যে দু-একটা কথাবার্ত্তা কহিতাম। আমি বাঙ্গালী এবং শ্রীধাম নবদ্বীপের নিকটে আমার নিবাস শুনিয়া, যমুনা বাঈ মধ্যে-মধ্যে আমার সঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের এবং বৈষ্ণব-শাস্ত্রের কথার আলোচনা করিত। তার পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান ও ভক্তির পরিচয় পাইয়া আমি অবাক্ হইতাম। আর জানি না কেন, আমার সঙ্গে কথা কহিতে-কহিতে তার চোখ জলে ভরিয়া যাইত,—কণ্ঠস্বর স্নেহাপ্লুত হইয়া উঠিত।

এক দিন কথায়-কথায় আমি তার মন্দির দেখিতে যাওয়ার প্রস্তাব করিতেই, যমুনা বাঈ বড় আনন্দে বলিয়া উঠিল, "বাবুজী, আমি সে কথা সাহস করে বলতে পারি নি,—একবার গিয়ে আমার বাল-গোপালকে দেখে এস,—সে যে আমার মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত প্রেম দিয়ে গড়া ঠাকুর। তার যখন সেবা করি, তখন মনে হয়, আমি যেন মা যশোমতী। বাবুজী, তুমি দেখ্‌তে এস।"

(২)

সে দিন সন্ধ্যায় অবসর ছিল। আমরা দু'জনে অনেক খুঁজিয়া-খুঁজিয়া যমুনা-তীরে বংশীবটের নিকটে যমুনা বাঈয়ের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। সেটিকে ঠিক মন্দির বলা যায় না;—একটি চৌকোণা ছোট কুঠুরী—তার মধ্যে পিতলের সিংহাসনে জয়পুরের কষ্টি-পাথরের বাল-গোপাল মূর্ত্তি। কুঠুরীর পাশে একটি ক্ষুদ্র চালা-ঘরে যমুনা বাঈয়ের বাসস্থান। আমাদের দেখিয়া, তাড়াতাড়ি যমুনা বাঈ মন্দিরের দরজা খুলিয়া দিয়া, আমাদের বিগ্রহ-দর্শন করাইল। সে দিন সে বিশেষ ভাবে মূর্ত্তির "শৃঙ্গার-বেশ" করাইয়াছিল। যদিও আমাদের ভক্তের মত চোখ ছিল না, তবুও মূর্ত্তি দেখিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। পাশে দাঁড়াইয়া যমুনা বাঈ অনিমেষ নেত্রে বাল-গোপাল-মূর্ত্তি দেখিতেছিল। তার চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে। বাষ্প-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে সে বলিল, "বাবুজী, এই আমার 'জান্‌কো জান', আমার বুক-ভরা ধন।"—বুঝিলাম, যমুনার ব্যথা কোথায়।

ধীরে-ধীরে বাহিরে আসিয়া মন্দিরের ক্ষুদ্র আঙ্গিনায় বসিলাম; এবং কথা-প্রসঙ্গে যমুনা বাঈয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম।

যমুনা বলিল,—"বাবুজী, আমার গুরুদেব আমাকে আমার পাপ-কাহিনী সকলকে বলিতে বলিয়াছেন। যদি ধৈর্য্য থাকে, তবে শোন। আমার সবিনয় অনুরোধ, আমার পাপকে ঘৃণা করো,—কিন্তু পাপীর জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিও। "মৈঁ সাক্ষাৎ পাপ কা মূর্ত্তি হুঁ"—

আর কি বলিব। আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়াও বৃন্দাবনের রজ এবং যমুনার জল আমাকে শুদ্ধ করিতে পারে নাই। এখন আমার গোপালকে বুকে করিয়া এ শরীর ত্যাগ করিতে পারিলে, আমার সব কামনা পূর্ণ হয়।"

* * * *

* * *

"বাবুজী, আমি গৌড় ব্রাহ্মণের মেয়ে,—আমাদের বাড়ী জয়পুরের এলাকায়,—শ্রীমাধোপুরে। আমার পিতা ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। রাধা-দামোদরের একটি মন্দির ও তাহার পূজার জন্য একশত বিঘা "উদক" জমী—তাহাতেই আমাদের বড় শান্তিতে, বড় সুখে দিন-যাপন হইত।

বাবার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল—তাই দূরদেশ হইতে অনেকে তাঁর কাছে পড়িতে আসিত। আমি তাঁর একমাত্র কন্যা ছিলাম; এবং অল্প বয়সে মাতৃ-বিয়োগ হওয়ায়, পিতার বৃদ্ধ বয়সের সমস্ত স্নেহ আমার উপরই পড়িয়াছিল। গ্রামেরই একটি বালকের সহিত আমার সাত বছর বয়সে বিবাহ হয়। কিন্তু বছর ফিরিতে না ফিরিতে আমার কপাল পুড়িল—আমি বিধবা হইলাম।

সে বয়সে আমি কোন কথা বুঝিতাম না;—কিন্তু এইটুকু বুঝিতাম যে, এই ঘটনায় পিতার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি একেই উদাসীন প্রকৃতির লোক;—ইহার পর গৃহস্থালীর কাজে আরো বেশী উদাসীন হইলেন; এবং প্রায় সর্ব্বদাই আপনার পূজন পাঠ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা লইয়াই থাকিতেন। একজন দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়া ও আমি ঘরের কাজ করিতাম।

কিছু দিন এই ভাবে কাটিলে, হঠাৎ একদিন পিতা আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি লেখা-পড়া শিখিতে চাই কি না। বাল্যকাল হইতে পিতার শিষ্যদের সাহচর্য্যেই আমার পড়ার দিকে টান ছিল;—এ প্রস্তাবে আমি উৎফুল্ল হইয়া, সেই দিন হইতে ব্যাকরণ সুরু করিলাম।

ক্রমে আমি ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ প্রভৃতি শেষ করিলাম। যদিও আমি পাঠকালে পিতার ছাত্রদের সহিত মিশিতাম—কিন্তু কাহারো সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয় নাই। পিতা আমাকে কঠিন ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে রাখিতেন।

এমনি করিয়া আমার ষোল বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইল। গৃহস্থালীর কাজ এবং পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া আমি আর কিছু জানিতাম না। বাহিরের জগতের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল না। পিতা আমাকে যে ভাবে শিক্ষা দিতে-ছিলেন, তাহাতে আমাদের গ্রামের ও সমাজের সকলেই তাঁহার নিন্দা করিত;—আমাকেও যে সে নিন্দার ভাগ না দিত, এমন নহে। পিতা ত এ সকল ছোট-কথার অতীত ছিলেন। আর গ্রামে আমার যে দু-একজন বাল্য-সঙ্গিনী ছিল, ক্রমে তাহাদের সহিত মেলা-মেশাও বন্ধ করিলাম।

কিন্তু সংসারের পথ ত এত সরল নয়; আর তাকে দূরে রাখিলেই যে সে সব সময় দূরে থাকে, তাও নয়। ঘরের দরজা বন্ধ করিলেই যে প্রলোভনের হাত এড়ান যায়, এ কথা ভুল। সে বিষধর যে লখীন্দরের লোহার ঘরেও আপনার পথ করিয়া লয়! কথায় বলে,

"হিরণ ক্ষুরি দো আঙ্গুলি, ধরতি লাখ পসাও
লিখা ভালা ন টলে যাঁহা পাশী তাঁহা পাঁও।"*

এক দিন, জানি না কি এক অশুভক্ষণে, বহু দূরদেশ হইতে একজন বিদ্যার্থী পিতার নিকট জ্যোতিষ অধ্যয়নের জন্য আসিলেন। সুন্দর সবল যুবা—বদনে প্রতিভার জ্যোতিঃ ও উৎসাহের দীপ্তি। জানি না, তাঁকে দেখিবা-মাত্র এক মুহূর্ত্তেই আমার মনে কি একটা গোলমাল হইয়া গেল। বুঝি-বা আমার চির-পিপাসিত হৃদয়—এই "অনন্ত মুহূর্ত্তের"ই অপেক্ষায় ছিল—একটিমাত্র দৃষ্টিপাতে আমার হৃদ্‌কমল বিকশিত হইয়া উঠিল। তখন কোথায় গেল আমার ব্যাকরণ-কাব্য, আর কোথায় গেল আমার বৈধব্য-জীবনের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা! মনে হইল, যেন, আজ যে জীবন-দেবতার দর্শন পাইয়াছি—ইঁহার পূজাই আমার জীবনের একমাত্র সুখের নিদান। কাব্যে অনেক প্রেমের কাহিনী পড়িয়াছিলাম; তখন কিন্তু চিনিতে পারি নাই যে, ইহা সেই অতনু দেবতা,—হতভাগিনী বিধবার সর্ব্বনাশ করিতে এই সুন্দর মধুর বেশে দেখা দিয়াছেন।

* "হরিণের ক্ষুর দুই আঙ্গুল পরিমাণ, আর ধরিত্রী লক্ষ যোজন বিস্তৃত, অদৃষ্টের লিখন কখনও ব্যর্থ হয় না—যেখানে ফাঁদ থাকে হরিণের পা সেইখানেই পড়িবে।"

বাবুজী, আমার সে অধঃপতনের, সে কলঙ্কের বিস্তারিত কাহিনী শুনিয়া আর কি হইবে! হতভাগিনী আমি, আমিই প্রিয়তমের ব্রত-ভঙ্গের ও নিজের অধোগতির মূল। আমরা যখন নূতন প্রেমের তীব্র সুখে "মস্‌গুল" ছিলাম, তখন নিন্দুকের রসনা আপনার কাজ করিতেছিল। ফলে, আমার কলঙ্কের কথা ছাপা রহিল না। শেষে, যখন আমাদের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষীর মুখে সে কথা পিতার কাণে উঠিল—সে দিন হইতে তিনি আর শয্যা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

"অপূর্ব্ব রসনা-ব্যালী খলানন-বিলেশয়া।"
দশত্যেকং কর্ণমূলে হরত্যন্যস্ত জীবিতং॥"

বাবুজী, আমার পাপের ফলে আমার সেই দেবচরিত্র পিতা এই হতভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। তখন গ্রামে আর আমার স্থান রহিল না—আমরা উভয়ে বৃন্দাবনে পলাইয়া আসিলাম।

এইখানে আসিয়া আমার কলঙ্কিত প্রেমের একমাত্র সুমধুর ফল, আমার খোকাকে পাইলাম—কিন্তু আমার প্রেমাস্পদকে হারাইলাম। বিধাতা এক দিকে দিয়া অন্য দিকে কাড়িয়া লইলেন। আমি আমার সেই নিদারুণ শোকের একমাত্র সান্ত্বনার সামগ্রী,—ভালবাসার একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন সোণার গোপালকে লইয়া এই যমুনার ধারে, এই ছোট কুটীরে বাস করিতে লাগিলাম। রূপ ও যৌবন এবং কলঙ্কের কাহিনী—এই ত্র্যহস্পর্শে আমার জীবন-পথ তখনও যে বেশ নিষ্কণ্টক ছিল, তাহা নহে। লোককে কেমন করিয়া বুঝাইব যে, আমার যে অধঃপতন, তাহা লালসার জন্য নহে। আমি যে ভালবাসার স্বাদ পাইয়াছিলাম, তাহা জীবনে একবারমাত্র আসে। সে বন্যার মুখে কোথায় ভাসিয়া যায় পাপ-পুণ্যের বিচার,—লোকলজ্জার বন্ধন, আর শাস্ত্রের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খল! কিন্তু লোকে কি তা' বোঝে? তারা মনে করে, যে একবার কলঙ্কের পসরা মাথায় তুলিয়াছে—তার আর ভয়-ভাবনা কি? এ কথাটা বুঝাইতে আমার অনেক দিন বড় কষ্টে কাটিয়াছে, বাবুজী! তখন আমার গোপালই আমার একমাত্র রক্ষা-কবজ ছিল! তার পর—তার পর বাবুজী, এক দিন আমার গোপালও আমাকে ছাড়িয়া গেল। গোপালকে হারাইয়া, বাবুজী, আমি অনেক দিন পাগলের মত হইয়া, পথে-পথে কাঁদিয়া বেড়াইতাম। সে অবস্থায়ও আমার উপর অত্যাচার কম হয় নাই। তার পর এক দিন তোমাদের দেশের একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমার অবস্থা দেখিয়া আমাকে দয়া করিলেন। তিনি আমাকে "গোপাল-মন্ত্রে" দীক্ষিত করিয়া, ভগবানকে বাৎসল্য ভাবে সেবা করিবার উপদেশ করিলেন। তাঁরই দয়ায় আজ এই বাল-গোপাল আমার শূন্য মাতৃ-হৃদয় পূর্ণ করিয়া আছেন। আজ ভগবানের এই মূর্ত্তির সেবা করিয়া আমি যাহা পাইয়াছি, তাহা ত কাহাকেও দেখাইবার নয়—সে কথা বুঝি জগতের "মা-যশোদা" ছাড়া আর কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই। বাবুজী, চাহিয়া দেখ, আমার পাগলামীর কথা শুনিয়া গোপাল আমার মৃদু-মধুর হাসিতেছে।—ও ত আমাকে ওই দুষ্টুমীর হাসিতেই সব ভুলাইয়া দিয়াছে। বাবুজী—তোমার বন্ধু হয় ত বলেছেন যে, আমি খুব ভাল ভজন গাহিতে পারি। বাবুজী, আমি কি ভজন জানি? না, ভজন গাহিবার জন্য ভজন শিখিয়াছিলাম? আমি যে আমার গোপালের জন্য "ঘুম পাড়ানীর" গান গাহিতাম—সেই আমার পূজন। ভগবান আমার যে তাতেই খুসী হয়ে, আমার বুক জুড়িয়া আছেন! বাবুজী, আজ বহু দিন পরে তোমার কাছে আমার কলঙ্কের, আমার সুখের, আমার দুঃখের, আমার ভজন-পূজনের কাহিনী বলিলাম। আর তোমার চোখের কোণে ওই যে এক ফোঁটা জল,—ঐ-টুকুই আমার পরম লাভ।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল। সে স্তব্ধ হইয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে শ্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি মাতৃ-স্নেহের যেন পরিপূর্ণ প্রকাশ—বুঝি-বা ম্যাডোনার চক্ষে এই গভীর স্নেহের ভাব আনিবার জন্যই র‍্যাফেল প্রভৃতি অমর শিল্পিগণ চির-জীবন সাধনা করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা যমুনা বাঈকে আর বিরক্ত না করিয়া আমরা ধীরে-ধীরে তার মন্দির ত্যাগ করিলাম।

শঙ্খ

[শ্রীকালীদাস রায় বি-এ]

নমি, শঙ্খ, ঋষিবর, তপঃ-শীর্ণ হে কঙ্কালসার,—
শুভ্র-জ্যোতিঃ, দিব্য-দেহ, পুণ্যোজ্জ্বল প্রণম্য আমার !
গহন জলধি-তলে বিক্রমের রচি তপোবন,
কত যুগ যুগ ধরি তপস্যায় ছিলে নিমগন।
সিদ্ধি, জ্ঞান-ঋদ্ধি লভি আসিয়াছ মানব সদনে
মঙ্গল অমৃত বাণী গৃহে-গৃহে নিত্য বিতরণে।
অনন্ত অনধিগম্য জলধির অন্তরের বাণী
যুগে যুগে কেন্দ্রীভূত ভরি তব চিত্ত-রন্ধ্র খানি ;
ভৈরব গর্জ্জন তার, রুদ্র-মন্ত্রে তাহার আহ্বান—
কয় জন শোনে, আর বুঝে অর্থ, করে' অনুমান ?
কাঁপে বিশ্ব থরথর ভীমারাবে শঙ্কায় অধীর ;
ধ্বংসের বারতা ভাবে করে হস্তে শ্রবণ বধির ;
সেই বাণী তব কণ্ঠে শান্তিময় মধুর মোহন ;
গৃহে-গৃহে কর তুমি অমন্তের জয় উদ্গীরণ।
তুমি বেদ সহ বাণী,—তুমি ছিলে সিংহাসন তার,
ওঙ্কার-প্রণব-মন্ত্রে মহা-প্রাণ প্রতিষ্ঠা তোমার।
আশ্রমে আনিলে তায় পন্থা-শুদ্ধি করি আগে-আগে ;
অভ্র-দূত, তব কণ্ঠে সে দিনের উদ্ঘোষণা জাগে।
মোরা মূঢ়, জড় রূঢ়—লভিনি-ক স্বাধ্যায় গৌরব ;
তব কণ্ঠে গৃহে-গৃহে শুনি তার বারতা-ভৈরব।
পাঞ্চজন্য রূপে তুমি বিরাজিছ নারায়ণ করে ;
বিশ্ব-পালনের মন্ত্র চির ধ্বাত তোমার কুহরে।
চাহে জরা-মৃত্যু-আর্ত্ত জীব-লোক যবে উৰ্দ্ধমুখে—
মাভৈঃ মাভৈঃ মহাবাণী শান্তি-মন্ত্রে বাজে তব বুকে।
তুমি দেছ অঙ্গরাগ ভারতীর তনু লতিকায় ;
শশাঙ্কের সহোদর, তব স্নেহ তার সিতিমায়—
আখণ্ডল বক্ত্র-স্পর্শে ডাক' তুমি পর্জ্জন্য পুষ্করে
পবনে পাবন করি, দিকে-দিকে প্রেরি' চরাচরে।
উদ্ঘোষি' আনিলে তুমি ধূর্জ্জটীর জটাজাল হতে
মন্দাকিনী রসধারা—ঐরাবত-বিমথন স্রোতে,—
পুণ্য করি আর্য্যাবর্ত্ত, ধন্য করি বঙ্গ সমতট—
তটে-তটে জাগাইয়া তীর্থ-মালা, তপোবন, মঠ,—
জনকের আজ্ঞাবহ ভীষ্ম সম সেবি গিরি-ভূপে—
ফিরাইলে জননীরে পুণ্যময়ী সত্যবতী রূপে ;
ভগীরথ করে রহি,—প্রদর্শিয়া বর্ত্ম আগে-আগে—
মহামিলনের মন্ত্র সেই হ'তে তব কণ্ঠে জাগে।
মৃত-সঞ্জীবন-বাণী উদ্ঘোষিলে দিগ্‌দিগন্ত ভরি,
পিতৃ-গৃহ-প্রাঙ্গণের ভস্মস্তূপে জীবন বিতরি।
নমি দ্বিজরাজানুজ,—ত্যাগী, যোগী দ্বিজগণ সহ
দেউল আশ্রমতীর্থ বেদিকায় অহরহঃ রহ।
মন্দিরে-মন্দিরে তুমি দেবতায় কর আবাহন ;
ডাকি পুনঃ ভক্তদলে রচ মহা মঙ্গল-মিলন ;
গৃহ, দেবালয়ে তুমি সন্ধ্যা-প্রাতে মধু-মূর্চ্ছনায়
মঙ্গল সঞ্চার কর গৃহস্থের নিত্য সাধনায়।
যত দূর ধ্বনি রটে, তত দূর পুণ্য সমীরণ
রচিয়া মঙ্গল-গণ্ডী রক্ষা করে নর-নিকেতন।
ধন্বন্তরি করস্পর্শে অনাময় বিভূতি তোমার
দেবর্ষি দধীচি ধর্ম্মে বৈদ্য-গৃহে করেছ বিস্তার ;
বৈশ্য-গৃহে রত্ন-জ্যোতিঃ আনিয়াছ রত্নাকর হ'তে—
স্বর্ণোজ্জ্বল পুণ্যশুদ্ধ পণ্যঋদ্ধ নদ-নদী-পথে।
পীত-শ্যাম ভূষাময়ী পদ্মালয়া তব আবাহনে
সাত কুম্ভ কুম্ভ কক্ষে আসে নিত্য সন্তান-ভবনে,
জননী-অঞ্চল হ'তে স্বর্ণ-শস্য শিহরি, শিহরি
পথ-ঘাট, আঙিনায়, ঘর-দ্বারে পড়ে ঝরি ঝরি।
প্রতিধ্বাত তব ধ্বনি লভি স্থূল বৈভব আকার
শুক্তি মাঝে মুক্তাসম পূর্ণ করে মঞ্জুষা-আধার।
শুদ্ধি ঋদ্ধি ক্ষেম বৃদ্ধি নিত্য দেব তোমার প্রসাদে
গৃহীনিকেতন ভরি নব নব স্বর্গের সংবাদে।
শুভ জন্মে পরিণয়ে তুমি কর শুভাধিবাসন
সর্ব্ব শুভ অনুষ্ঠানে কর মধু মঙ্গলাচরণ।
সতীর শ্রীকরে আর চিরারাধ্য পতির চরণে
শঙ্খক-শৃঙ্খলরূপে বাঁধিয়াছ অচ্ছেদ্য বন্ধনে ;
মণিবন্ধ দুটি বাঁধি সর্ব্ব কর্ম্মে সংযম বিতরি,
আপনি হয়েছ ধন্য সেবাকর্ম্মে মহাধন্য করি।
কুললক্ষ্মী মুখ-বায়ে পূর্ণ হ'য়ে করি নিনাদন
দুহুঁ দোঁহা করিতেছ ধন্য ধন্য পরম পাবন।

বামড়ার পথে

[শ্রীজলধর সেন]

এ বৃদ্ধ বয়সে আর ভ্রমণের শক্তি নাই ;—শক্তি নাই, কিন্তু আগ্রহ, উৎসাহ কিছুতেই যাইতেছে না। তাই, শরীর যখন অসুস্থ, মন যখন বিভ্রান্ত, সংসারের নানা জঞ্জাল যখন চারিদিক হইতে পিষিয়া মারিতে উদ্যত, তখনও যদি কেহ দুই-চারি দিনের জন্য কোথাও লইয়া যাইতে চান, আমি সকল আধি-ব্যাধি, বাধা-বিপত্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া, উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠি। উদ্দীপনার প্রভাবেই, আমি নিতান্ত অসুস্থ শরীরেও, বহু দূরে,—মধ্যপ্রদেশে, ওড়িষ্যার সীমান্তে, এক সামন্ত-রাজ্যে,—এই অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে গিয়াছিলাম। সে স্থান এতই সুন্দর, সে পথ এমনই মনোরম, সে পথের দৃশ্য এতই মনোমোহন, আর সেই সামন্ত-রাজ্য আমার এই জীর্ণ, ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে এমনই এক বিচিত্র, বিপুল চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়াছিল যে, আমার এই দুর্ব্বল লেখনী স্থির থাকিতে পারিল না ;—চিত্র ভাল হইবে না জানিয়াও নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না ;—পথের মধ্যের উন্নতকায় পর্ব্বতশ্রেণী, দূর-বিস্তৃত শ্যামায়মান অরণ্যরাজি, ভগবানের মহিমা-কীর্ত্তন-নিরত নির্ঝরমালা সত্যসত্যই আমাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই জন্যই আমার এই দুর্ব্বল প্রয়াস ;—পূজার সময় ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকাগণের পবিত্র করে বৃদ্ধের এই সামান্য অর্ঘ্য !

সামন্ত-রাজ্যের নাম বামণ্ডা, প্রচলিত নাম বামড়া। ভারতবর্ষের মধ্যে আরও অনেক সামন্ত-রাজ্য থাকিতে বামড়ায় যাওয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে। বামড়ার পরলোকগত রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব বাহাদুর আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখন কত ক্রিয়াকর্ম্ম-উপলক্ষে আমাকে বামড়ায় লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তখন কি জানিতাম যে, যৌবন-মধ্যাহ্নেই তিনি সকলকে ফাঁকি দিয়া, কত আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া, সমস্ত রাজ্য-বাসীকে হাহাকারে নিমগ্ন করিয়া অকস্মাৎ চলিয়া যাইবেন ! তাঁহার লোকান্তর গমনের এক বৎসর পরে—১৯১৬ অব্দের ১০ই মার্চ্চ তিনি দেহরক্ষা করেন,—তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, বর্ত্তমান সামন্তরাজ শ্রীযুক্ত রাজা দিব্যশঙ্কর সুঢলদেব মহোদয় এবং তাঁহার প্রধান অমাত্য ও দক্ষিণ-হস্ত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশ মহাশয়, দেশে এত লোক থাকিতে, আমাকেই আমার সাহিত্য-সুহৃদ্ রাজা সচ্চিদানন্দের জীবন-চরিত লিখিবার ভার অর্পণ করেন ; আমিও আমার অযোগ্যতার কথা মোটেই চিন্তা না করিয়া, এই কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করি। এই উপলক্ষে বামণ্ডা রাজ্য দর্শন ও জীবন-চরিতের উপকরণ সংগ্রহের জন্য আমার বামণ্ডায় যাওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল। নানা বিঘ্ন-বিপত্তির জন্য এক বৎসর কালের মধ্যে আর যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে, বিগত ২৭শে আষাঢ় শনিবার, এই ঘোর বর্ষার মধ্যেই যাওয়া স্থির হইয়া গেল। রাজা সচ্চিদানন্দের জীবন-কালে যে রাজ্য দর্শনের সুবিধা করিতে পারি নাই, তাঁহার লোকান্তর গমনের পর সেই সচ্চিদানন্দহীন রাজ্যে যাইতে হইল। ইহাই নিয়তি !

এই জীবনী-লিখন-কার্য্যে আমি একজন সুযোগ্য সহযোগী পাইয়াছি ; তিনি আমাদের সুকবি শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী। এ ভ্রমণে তিনি সঙ্গে না থাকিলে, আসল কার্য্যেরও সুবিধা হইত না, এবং আমার ভ্রমণের সঙ্গে কবিত্বেরও একটা সম্বন্ধ ঘটিত না। সুতরাং ভ্রমণকারীর দলে হইলাম আমরা দুইজন, এবং সঙ্গী চলিলেন আরও দুইটী যুবক—একটী আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অজয়কুমার, দ্বিতীয়টী শ্রীমান্ যতীন্দ্রের ভাগিনেয় শ্রীমান্ নলিনাক্ষ সান্যাল বি-এ। এখন আর সে দিন নাই যে, নিঃসম্বলে, একবস্ত্রে বাহির হইয়া পড়িব ; সুধু লোটা আর কম্বল !—সে দিন চলিয়া গিয়াছে ;—এখন দুই দিনের জন্য বাহিরে যাইতে হইলেও উনকোটী চৌষট্টী চাই—মায় সোডা ও কুইনিন ! হিমালয়-ভ্রমণকারী যষ্টি-কম্বল-সহায় যুবক এখন বৃদ্ধ, জরা-গ্রস্ত ! তাই সঙ্গে জ্যেষ্ঠপুত্র—কি জানি, পথের মধ্যেই পারের ডাক আসিলে, মুখাগ্নি করিবার ত আত্মীয় চাই ! তাহার পর, কত সাবধানতা—'ওরে ঔষুদটা নেওয়া হয়েছে

ত' 'ওরে গামছাখানি ঠিক আছে ত' 'দেখো চসমাখানি নিতে ভুলো না' ইত্যাদি ইত্যাদি নানা উপসর্গ! তবুও ভ্রমণের বাসনা ছাড়িতে চাহে না!

যুদ্ধের কৃপায় এখন বি, এন, আর কোম্পানীর নাগপুর-গামী গাড়ী মাত্র দুইখানি;—একখানির নাম বোম্বাই মেল, তিনি হাওড়া ষ্টেশন ছাড়েন পূর্ব্বাহ্ণ ন'টায়; আর একখানি পুণা-নাগপুর প্যাসেঞ্জার—তিনি মধ্যাহ্ন একটার সময় হাওড়ার ষ্টেশন ছাড়েন। মেলে গেলে আমরা সেই দিনই সন্ধ্যার পর আটটার সময় বামড়া ষ্টেশনে পৌছিতে পারিতাম। পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দেওয়া থাকিলে সেখানে কোনই অসুবিধা হয় না; কিন্তু এই ঝড়-জলের দিনে, অপরিচিত স্থানে, রাত্রি কালে পৌছিতে আমার ইচ্ছা হইল না। তাই অতি ধীরগামী নাগপুর প্যাসেঞ্জারে মধ্যাহ্ন একটার সময় আমরা আরোহী হইলাম। ঘোড়া-গাড়ীর গাড়োয়ানের সহিত ভাড়া লইয়া, রেলের মুটেদের সহিত দর-দস্তর, টিকিট-ক্রয়ের হাঙ্গামা, নানা বিপত্তির আশঙ্কা—কোন কিছুই আমাদিগকে পোহাইতে হইল না। বামড়া-রাজের কলিকাতার প্রধান কর্ম্মচারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাস সে সমস্তেরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—এমন কি রাত্রিতে ট্রেণে জলযোগ করিবার জন্য নানা দ্রব্য-সম্ভার-পূর্ণ যে বিশালকায় মৃৎ-পাত্রটী আমাদিগের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন, তাহা এক রাত্রির জল-যোগ কেন,—তিন দিন সমানে পূর্ণযোগ করিয়াও ফুরাইবার কথা ছিল না,—আমরা তো পরদিন প্রাতঃকালে আটটার সময়ে বামড়া ষ্টেশনে পৌছিব; এবং সেখানে রাজ-বিশ্রাম-ভবনে তৎক্ষণাৎই যে সমস্ত আয়োজন করা থাকিবে, প্রবোধ বাবু এ সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করিলেন। রেলের একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্টের নীচের তিনটী ও উপরের একটী আসন আমাদিগের জন্য পূর্ব্বেই রিজার্ভ করা ছিল। চারিটী সমান কৃষ্ণকায় বাঙ্গালী বাবু এবং তাঁহাদের সঙ্গে খাঁটী বাঙ্গালী ধরণের আস্‌বাব্‌পত্র দেখিয়া শ্বেতাঙ্গ ত দূরে থাকুক, মিশ্রাঙ্গ কোন ভদ্রলোকও পঞ্চম আসন-খানি অধিকার করিবার জন্য প্রয়াসী হইলেন না; সুতরাং সম্পূর্ণ গাড়ীখানি আমাদের জিম্বায় রহিল।

এই আমাদের বৃদ্ধ বয়সটা—এটা বুঝেছেন, না ঘরকা না ঘাটকা; যুবক যাঁরা আছেন, তাঁরা বৃদ্ধের সঙ্গে মিশিতে পারেন না; তাঁহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ-উদ্যম, আমোদ, আনন্দ, বৃদ্ধের আওতায় পড়িলেই কেমন যেন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আবার আর এক দিকে দেখি, বুড়া বয়সে যে রসের পরিণতি,—সে কালে যাহার স্ফূর্ত্তিতে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপগুলি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মুখর থাকিত,—যে বৃদ্ধগণের মজলিসে কত রসের তরঙ্গ খেলিত,—এখনকার বুড়াদের সে সব কিছুই নাই,—আছে শুধু সঞ্চিত রোগের রোমন্থন, আর আছে দৈন্যের দীর্ঘশ্বাস—আর আছে উপযুক্ত পুত্র পৌত্রাদিগণের ঔদাস্যের কঠোর পরিহাস। সুতরাং এ বুড়া মানুষদিগকে কোন কাজেই লাগান যায় না। কোথাও সঙ্গে লইলে আমরা হই সজীব লগেজ অথবা উৎপাত। এই যাত্রাতেই দেখিলাম, আমি একা বৃদ্ধ, আর সঙ্গে তিনটী যুবক; তাহারা পথের দুই পার্শ্বে যাহা দেখে তাহাতেই উৎফুল্ল হইয়া ওঠে; তাহারই উপর গবেষণা আরম্ভ করিয়া দেয়। বিশেষতঃ, শ্রীমান্ যতীন্দ্র আসল কবি মানুষ, তিনি আকাশের গায়ে শুধুই রামধনু দেখেন,—আর আমি চাহিয়া দেখি নিরবচ্ছিন্ন শূন্য, আর আসন্ন মেঘের সম্ভাষণ। সুতরাং এই সুদীর্ঘ পথ অতিবাহনের জন্য আমার অন্য সঙ্গীর প্রয়োজন বোধ হইল!—বর্ত্তমান সঙ্গীরা আমার রোগের শুশ্রূষা করিতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধের ভোগের উপকরণ ইহারা কোথায় পাইবে?

সময়-ক্ষেপের জন্য কোন উপায় আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়, এক জন দিলেন আলেক্‌জেণ্ডার ডুমার লিখিত এক-খানি উপন্যাস;—হোলি বাইবেলের ক্ষুদ্রতম সংস্করণের অক্ষরগুলি এই উপন্যাসের অক্ষরের কাছে হয় ত হার মানে। আর এক জন বাহির করিয়া দিলেন শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীকান্ত" পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড। পুস্তকখানির জন্ম সময়ে তিন-চারিবার প্রুফ্ দেখিয়া এক রকম মুখস্থ হইয়া গেলেও, শ্রীমান্ শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তই হউক আর অন্য যে কোন পুস্তকই হউক, প্রত্যেকবারেই আমার নিকট কেমন নূতন ঠেকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস কোন দিনই আমার নিকট পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। তখন, সঙ্গী তিনটী যুবক একদিকে নভোমণ্ডলে বড়-বড় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত রহিলেন, অপর দিকে আমি শ্রীকান্তর মধ্যে আমাকে ডুবাইয়া দিলাম। অনেক ষ্টেশন পার হইয়া গেল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গাড়ী খড়্গপুর ষ্টেশনে পৌছিল। আমার

শ্রীকান্তও তখন তাঁহার হৃদয়-ভেদী দুঃখের কাহিনী বলিতে বলিতে অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় একটা গভীর সমস্যাকে এক কথায় মিলনান্ত করিয়া দিলেন; সেই সময় শ্রীমান্ অজয় বলিলেন, "বাবা, খড়্গপুর—চা।"

এদেশে চায়ের প্রচলন-কর্ত্তা মেসার্স এণ্ডুরুইউল্ কোম্পানী ইতি পূর্ব্বে যদি চা-পানের প্রতিযোগিতার পরীক্ষা প্রচলন করিতেন, তাহা হইলে আমি কোন দিনই প্রথম প্রাইজ হইতে বঞ্চিত হইতাম না। তাহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে—আমি চা-পান, বলিতে গেলে এক রকম ত্যাগই করিয়াছি। তাই খড়্গপুর ষ্টেশনে তিন জনেই চা এবং সঙ্গের হাঁড়ীর যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিলেন,—আমিও ভয়ে ভয়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। তাহার পরই আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। খড়্গপুর হইতে গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে আমরা বাতী জ্বালাইয়া জানালা দরজা সমস্ত বন্ধ করিয়া দিয়া শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। কবি শ্রীমান্ যতীন্দ্র এই শুক্লা চতুর্দ্দশীর রজনীর একটা বর্ণনা দিবার আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে রজনী অমানিশা অপেক্ষাও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। আর যে বৃষ্টি, এবং বায়ুর যে প্রচণ্ড গতি, তাহাতে অত বড় কবিরও কল্পনার ডঙ্কা ভিজিয়া ঢ্যাব্‌ঢেবে হইয়া গেল। সকলেই শয়ন করিলেন, আমি কিন্তু কালীমাটী—এখন যাহার নাম টাটানগর হইয়াছে—অতিক্রম না করিয়া শয়ন করিলাম না। কালীমাটী ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলেই সকলকে ডাকিয়া তুলিলাম; তখন সেই ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যেই অদূরে জেম্‌সেদ্‌পুরের নবনগরীর ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত বৈদ্যুতিক আলোকমালা দেখিতে পাইলাম। এমন অন্ধকারেও দূরে সেই নবপ্রতিষ্ঠিত নগরীর শোভা ও তাহার দূরবিস্তৃতি খানিকটা অনুভব করিলাম। তখন পুনরায় জলযোগ শেষ করিয়া অবশিষ্ট রাত্রির জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করা গেল—রেলপথের বিবরণ ঘোর অন্ধকারেই শেষ হইল।

প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, তখনও বৃষ্টি হইতেছে; বামড়া তখনও তিন-চারিটী ষ্টেশন দূরবর্ত্তী। আমাদের কথঞ্চিৎ-সৌভাগ্যবশতঃ গাড়ী যখন বামড়ায় পৌঁছিল, তখন বৃষ্টি ছাড়িয়া গেল। ষ্টেশনে কুলিমজুরসহ রাজ-কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন; আমাদের গাড়ীতেও ভিন্ন প্রকোষ্ঠে বামড়ারাজের জঙ্গলবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেন মহাশয় ছিলেন। কিন্তু তিনি বাত-ব্যাধিতে অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায়, পথের মধ্যে নিজে আসিয়া কোন সংবাদ লইতে না পারিলেও, তাঁহার এক সঙ্গী যুবককে মধ্যে-মধ্যে আমাদের তত্ত্ব লইতে পাঠাইয়া-ছিলেন।

ষ্টেশনে নামিয়াই প্রথম সুখবর পাওয়া গেল যে, পূর্ব্বদিনের ও রাত্রির ভয়ানক বর্ষণের জন্য আমাদের নির্দ্দিষ্ট মোটর তখনও ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছে নাই। এই বামড়া ষ্টেশন হইতে বহু পর্ব্বত ও অরণ্য অতিক্রমপূর্ব্বক আটান্ন মাইল দূরস্থিত দেবগড় আমাদের গন্তব্য স্থান—এই দেবগড়ই বামণ্ডারাজ্যের রাজধানী।

ষ্টেশনের অপর পার্শ্বেই বামণ্ডারাজের অতি সুদৃশ্য প্রবাস-ভবন। আমরা শরৎবাবুর নির্দ্দিষ্ট পথে সকলে সেই সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকায় উপস্থিত হইলাম। রেলওয়ে ষ্টেশনটীর নাম বামড়া; কিন্তু সেই স্থানের নাম গোবিন্দপুর;—বামড়া বলিয়া কোন স্থানের নাম নাই—উহা সমগ্র গড়জাত মহলের নাম।

আমরা বিশ্রাম-নিবাসে পৌঁছিবামাত্র, নিকটস্থ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী দেবগড়ে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুরকে আমাদের পৌঁছা সংবাদ টেলিফোঁ-যোগে তৎক্ষণাৎ নিবেদন করিলেন। গোবিন্দপুর হইতে রাজধানী দেবগড় ও রাজ্যের মধ্যে প্রত্যেক প্রধান স্থানে রাজ-প্রতিষ্ঠিত টেলিফোঁ আছে। আর যে পুলিশের কথা বলিলাম, তাহাতে পাঠক-পাঠিকাগণ আশ্চর্য্য বোধ করিবেন না;—ইহা আমাদের বৃটীশ-গবর্ণমেণ্টের পুলিশ নহে,—পুলিশ, ফৌজদারী, দেওয়ানী প্রভৃতি শান্তি-রক্ষার ব্যবস্থা বামড়ার সামন্তরাজের অধীন। বৃটীশ-গবর্ণমেণ্টের সহিত এই সকল সামন্ত-রাজ্যের সম্বন্ধ এই যে, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সনন্দলাভ করিয়া পোলিটিকেল এজেণ্ট মহোদয়কে গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে রিপোর্ট করিয়া, ইঁহারা রাজ্যশাসন করেন; গবর্ণমেণ্ট তাহাতে হস্তার্পণ করেন না। গবর্ণমেণ্টকে কোনপ্রকার রাজস্ব দিতে হয় না; শুধু সনন্দের লিখিতমত সামান্য কিঞ্চিৎ সেলামী দিতে হয়। পূর্ব্বে না কি এই সমস্ত সামন্তরাজের অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিবারও অধিকার ছিল; এখন সেইটুকুমাত্র নাই; যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের

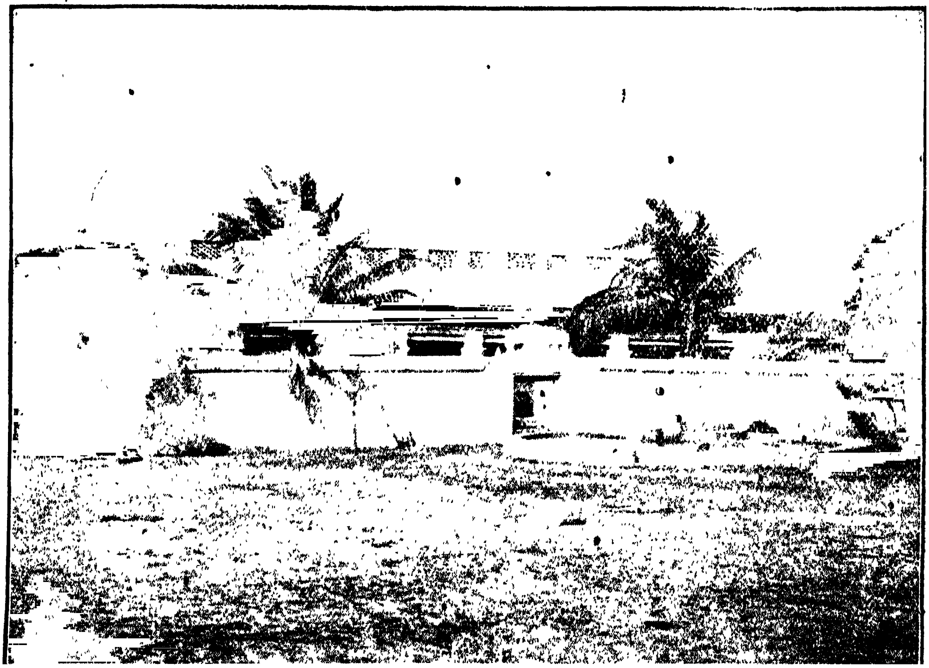
ক্ষমতা ইঁহাদের আছে। সে সকল কথা এখন থাকুক, পরে বলিব ; এখন গোবিন্দপুরের বিশ্রাম-নিবাসের কথা।

শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর আমাদের পৌঁছা সংবাদ অবগত হইবামাত্র গোবিন্দপুরের কর্ম্মচারীদিগের উপর আমাদের মধ্যাহ্ন-ক্রিয়ার যথোচিত ব্যবস্থা করিবার ভার দিলেন ; এবং আমাদিগকে জানাইলেন যে, অত্যন্ত বৃষ্টির জন্য পূর্ব্বদিন মোটর যাইতে পারে নাই। সেইদিন প্রাতঃকালেই মোটর রওনা হইয়া গিয়াছে। আমরা যেন আহারান্তেই যাত্রা করি। তথাস্তু! জলযোগ হইয়া গেল ; মধ্যাহ্ন-যোগেরও বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল। আমরা স্নানাদি শেষ করিয়া বিশ্রাম-নিবাসের সুবিস্তৃত বারান্দায় বসিয়া দূর পর্ব্বত-গাত্রে বিসর্পিত-গতি রাজপথের দিকে দৃষ্টি ও কর্ণ দুই-ই নিবদ্ধ করিলাম—কখন মোটর দেখা যাইবে, বা তাহার বাঁশীর স্বর শোনা যাইবে। গোকুলে মুরলীধারীর বংশীরব শুনিবার জন্য শ্রীমতী রাধিকা কি পরিমাণ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, বৈষ্ণব কবিগণের এবং তাঁহাদের আধুনিক সংস্করণগণের কবিতায় তাহা যতখানি বুঝিতে পারা যায়, আমরা অবশ্য ততখানি ব্যাকুল হই নাই—হইবার তেমন প্রয়োজনও ছিল না ; কারণ সুসজ্জিত, সুন্দর অট্টালিকায় বহু-অনুচর-পরিবৃত হইয়াও যিনি মনে করিতে পারেন যে, তিনি হয় ত জলে পড়িয়াছেন, তাঁহার গতি রাঁচির রাজধানীর দিকে না হইয়া দণ্ডার বাতুলালয়ের দিকেই হওয়া উচিত। সে কথা নহে ; আমার বরাবরই—সেই হিমালয়-ভ্রমণের সময় হইতেই—কেমন একটা ঝোঁক এই যে, কোন স্থলে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়া পথের মধ্যে মোটেই বিলম্ব করিতে পারি না—কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। সেই জন্যই পথ চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু মোটর আর আসে না, বা দূর হইতে বংশীধ্বনি করিয়াও তাহার আগমন-সংবাদ দেয় না। শ্রীমান্ যতীন্দ্র একবার বলিলেন, "অনেক দূরে যেন বাঁশীর আওয়াজ শোনা গেল।" মিথ্যা কথা—কবির কল্পনা! ঐ যে শ্রীরাধিকা অধীরা হইয়া বলিয়াছিলেন—"ঐ বাঁশী বাজিল।" প্রেমিক বৈষ্ণব কবি সে কথায় বলিয়াছিলেন, "বন মাঝে—না মন মাঝে।" কবি শ্রীমানের মনের মাঝেই বাঁশী বাজিয়াছিল—দূর বন মাঝে নয়।

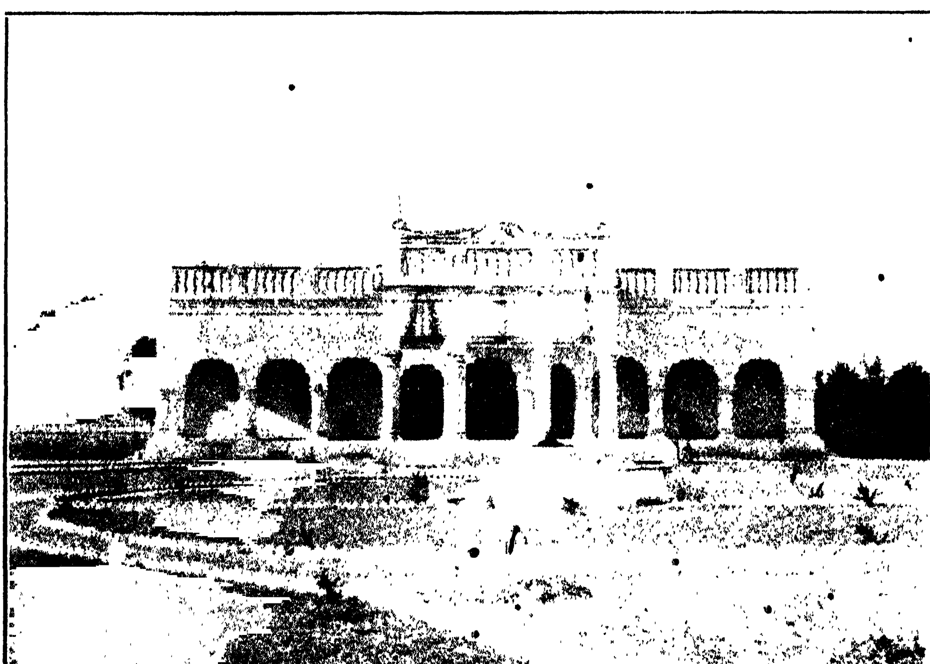
বেলা বারটা বাজিল—আমরা আহারাদি শেষ করিয়া একেবারে প্রস্তুত, মোটর আসিলেই তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিতে হইবে,—দিন থাকিতে-থাকিতে, আলোয়-আলোয় এই ৫৮ মাইল-ব্যাপী পর্ব্বত ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া যাওয়া চাই। কিন্তু, আমরা প্রোগ্রাম ঠিক করিলে কি হয়? বিধাতা বলিয়া একজন আছেন ; তাঁহাকে আমরা কোন দিনই কাজের সময় আমল দিই না—প্রোগ্রাম করিবার সময়ও জিজ্ঞাসা করি না। সে বেচারী সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসে, আর বলে, 'বাঃ! বেশ প্রোগ্রাম হয়েছে!' তার পর কার্য্যকালে দেখা যায়, আমাদের সব বাতিল হইয়া যায় ;—সেই লোকটার ব্যবস্থাই চলে। আমাদেরও তাই হইল ;—দূরে মোটর দেখা গেল—বাঁশীর স্বরও শোনা গেল ; শেষে মোটরও উপস্থিত হইল। চালক মহাশয় সংবাদ দিলেন যে, যাওয়া অসম্ভব। তিনি পথে পার হইতে গিয়া তিনটী সাঁকোকে সলিলশায়ী করিয়া কোন প্রকারে একটু আগেই রক্ষা পাইয়াছেন। তিনটীর অবস্থা ত তিনি দাঁড়াইয়া থাকিয়াই দেখিয়া আসিয়াছেন ; তাঁহার মোটরের ভারে তাঁহার আগমনের পর আরও কোথায় কয়টী সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

এখন উপায়! এক-আধ ক্রোশ নয়—যারে বলে উনত্রিশ ক্রোশ,—পাকা ৫৮ মাইল ;—পথ শুধু চড়াই আর উৎরাই। কতগুলি সেতু ভঙ্গ হইয়াছে,—রাস্তার আর কোন স্থান অগম্য হইয়াছে কি না, কে জানে! সুপারিণটেন্ডেণ্ট মহাশয় তৎক্ষণাৎ টেলিফোঁ করিলেম ; কোন উত্তর পাওয়া গেল না ;—রাজা বাহাদুর তখন মধ্যাহ্ন বিশ্রামাগারে। আমরা হাত-পা ছড়াইয়া বসিলাম,—এখানেই হয় ত পাঁচ-সাত দিন প্রবাস, অথবা কলিকাতায় প্রতিগমন।

অপরাহ্ণ তিনটার সময় পুনরায় টেলিফোঁ করা হইল। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর ও ম্যানেজার যোগেশবাবু বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর টেলিফোঁ-যোগে আমাদিগকে বলিলেন যে, সে রাত্রিটা আমাদিগকে গোবিন্দপুরেই আটক থাকিতে হইতেছে ; পর দিন প্রাতঃকালে আটটার সময় আমরা যাহাতে দেবগড় যাত্রা করিতে পারি, তিনি তাহার ব্যবস্থা তখনই করিতেছেন। একটু পরেই গোবিন্দপুর কাছারীর প্রধান কর্ম্মচারী সংবাদ দিলেন যে, যে-যে এলাকায় যতখানি রাস্তা আছে, সেই রাস্তা সেই রাত্রির



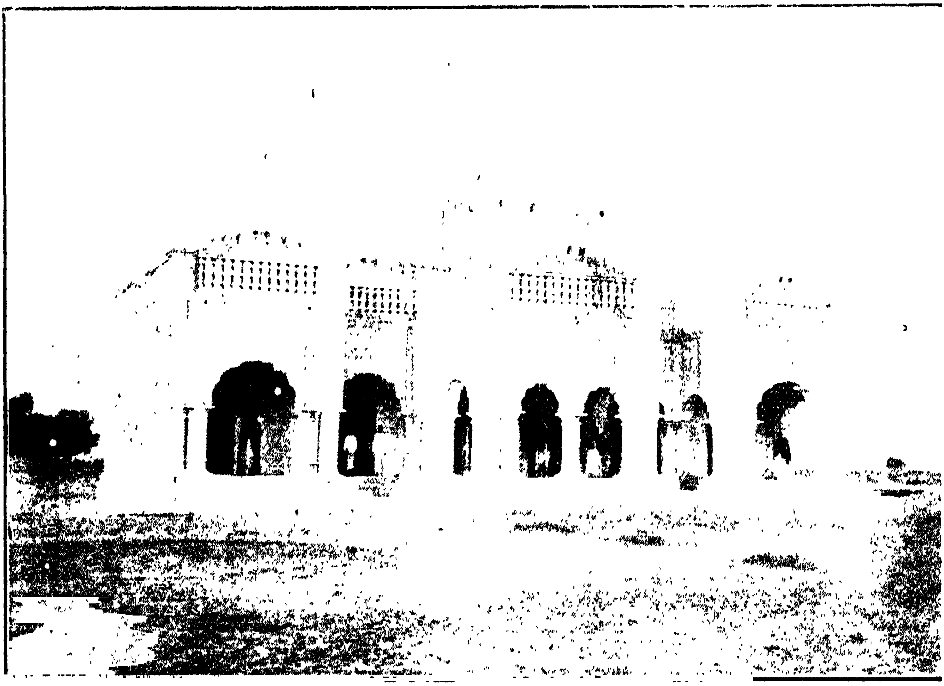
গোবিন্দপুর—পুরাতন রাজ-বাঙ্‌লো



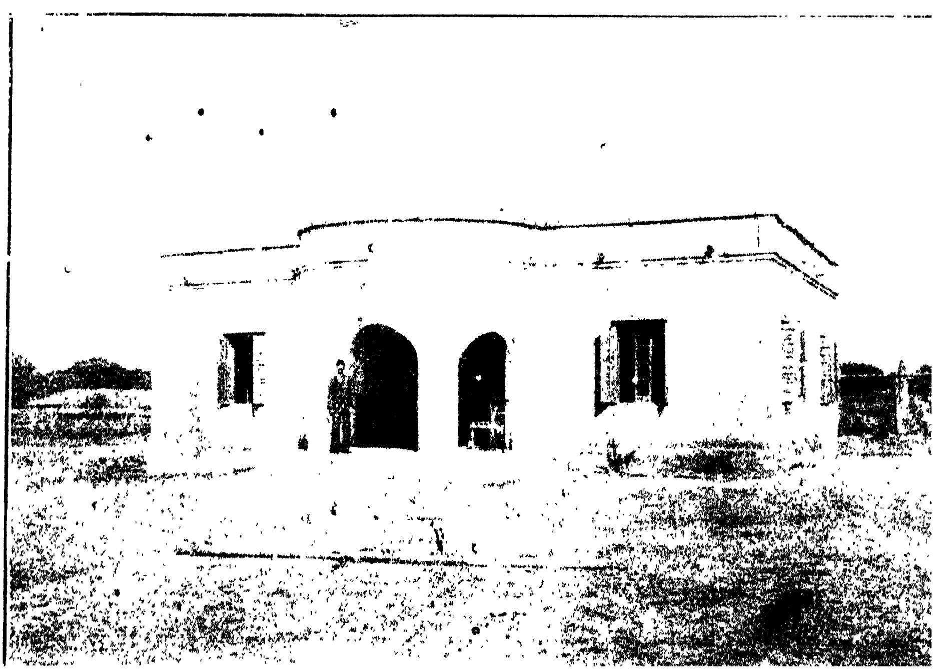
গোবিন্দপুর—রাজ-বিশ্রাম-নিবাস

ধ্যে যেমন করিয়া হউক মোটর গমনের উপযুক্ত করিয়া তেই হইবে।

আটান্ন মাইল রাস্তা—শুধু পর্ব্বত আর অরণ্য। শুনিলাম, পথ হইতে দূরে বা অদূরে মধ্যে মধ্যে দুচারখানি করিয়া গ্রাম



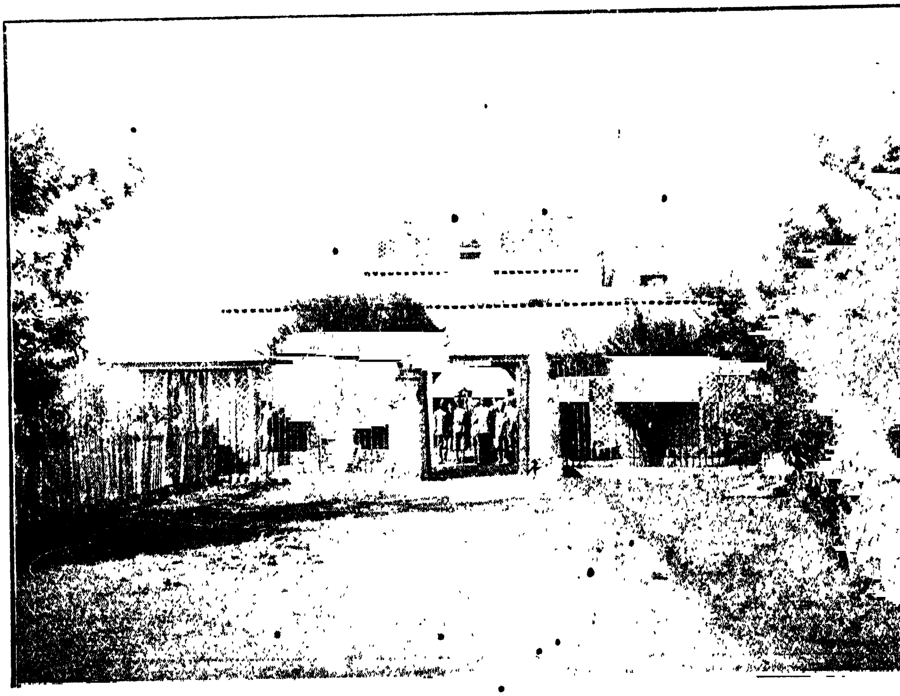
গোবিন্দপুর—কাছারী



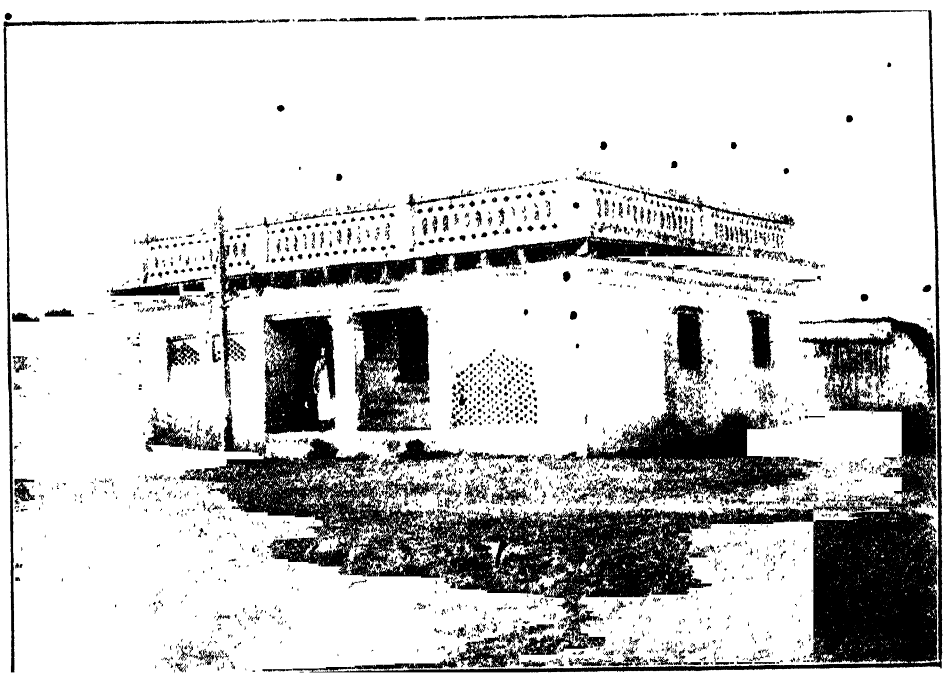
গোবিন্দপুর—ডিস্‌পেন্‌সারী

আপিস, আদালত, বিশ্রাম ভবন প্রভৃতি আছে। তথন উপরোক্ত দাবী—সেই সময় প্রত্যেক কাছারীতে সংবাদ

প্রভৃতি সংগৃহীত হইবে ; তাহার পর কার্য্য আরম্ভ হইবে [illegible] স্থির করিলাম পর দিন [illegible]



গোবিন্দপুর—থানা



গোবিন্দপুর—পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিস

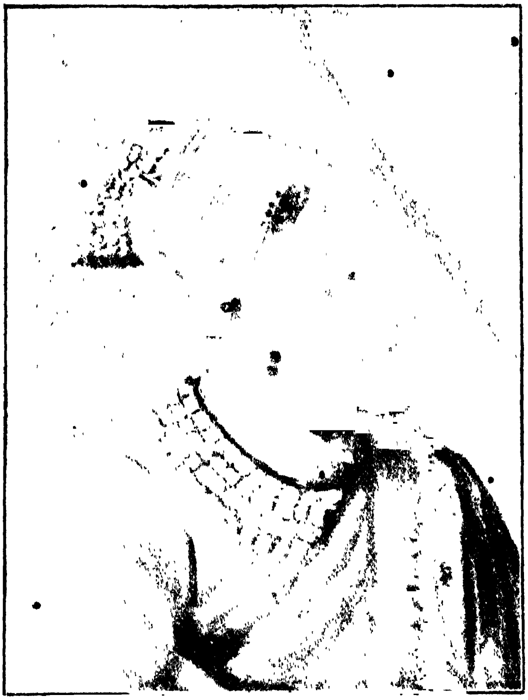
কর্ম্মচারী শরৎবাবু বলিলেন, "আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বামণ্ডারাজের আদেশ, এ আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে। কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবে না।"

আমরা বাধ্য হইয়া সেদিন রবিবার গোবিন্দপুরের পুরাতন রাজপ্রাসাদ, পুলিশষ্টেশন, হাসপাতাল, আপিস-আদালত ও বাজার ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার পর বিশ্রাম-

আওরংজীবের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ—১৬৬৬

[অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, পি-আর-এস]

১। মোগল দরবারে যাইবার পূর্ব্বে শিবাজীর আশা ও আতঙ্ক



শিবাজী



আওরংজীব



প্রতাপগড় দুর্গ



সায়েস্তা খাঁ (আওরংজীবের মাতুল)



অম্বরের রাজা জয়সিংহ (মীর্জা রাজা)



মীর জুম্‌লা



রাজা শিবাজী মহারাট্টা



যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ রাঠোর

জয়সিংহ শিবাজীকে সম্রাটের দরবারে পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাজটি তত সহজ নহে। পুরন্দরের সন্ধির সময় শিবাজী স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন মোগল সেনাদলে (মনসবে) কাজ করিতে, কিম্বা সম্রাটের দরবারে হাজির থাকিতে আজ্ঞা করা না হয়। ইহার অনেকগুলি কারণও ছিল। তন্মধ্যে একটী এই যে, আওরংজীবের কথায় শিবাজী কিম্বা তাঁহার দেশবাসী কাহারও আদৌ বিশ্বাস ছিল না। তাঁহাদের মনে এইরূপ ধারণা ছিল যে, সম্রাট সকল রকম বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার কার্য্যে অভ্যস্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে, এই মারাঠা নেতা সহজাত সংস্কারবশতঃ মুসলমানের নিকট মস্তক নত করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি শহর ও রাজদরবার হইতে সুদূরে পাহাড়ে ও জঙ্গলে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জননী, অভিভাবক এবং বাল্যসহচরগণের নিকট হইতে এবং হিন্দু-সাধুগণের সঙ্গ হইতে গোঁড়া হিন্দুর আচার-ব্যবহারে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি কখনও কোন উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে কর্ম্ম না করিয়া, কেবল নিজের চেষ্টায় স্বাধীন রাজার পদ লাভ করিয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি প্রথমে সম্রাটের দরবারে গমন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

কিন্তু জয়সিংহ তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইলেন, এবং তাঁহাকে আগ্রায় লইয়া যাইবার জন্য "সহস্র প্রকার কৌশল" অবলম্বন করিলেন (এই কৌশল অবলম্বনের কথার তিনি তাঁহার পত্রে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন)। মারাঠী বখরগুলিতে লিখিত আছে যে, জয়সিংহ শিবাজীকে এইরূপ আশা দিয়াছিলেন যে, শিবাজী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সম্ভবতঃ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের মুঘল প্রদেশের রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত করিয়া তথায় ফিরাইয়া পাঠান হইবে, এবং বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা অধিকারের জন্য তাঁহাকে প্রচুর সৈন্য ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করা হইবে। সম্রাট স্বয়ং কিন্তু শিবাজীকে এরূপ কোন অধিকার দিতে প্রতিশ্রুত হ'ন নাই। ফার্সী ইতিহাস এবং জয়সিংহের পত্রাবলী এ সম্বন্ধে নীরব। তবে ইহা খুবই সম্ভব যে, উক্ত ধূর্ত্ত রাজপুত সেনাপতি শিবাজীকে যে সকল ভাসা-ভাসা আশা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শিবাজীকে দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধির পদে নিয়োগ অন্যতম। ইতিপূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে যে সকল রাজপ্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই, এমন কি, জয়সিংহ নিজেও তথায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; এখানে শিবাজীর ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সেনাপতি ও বিখ্যাত বিজেতারই কেবল কৃতকার্য্য হইতে পারিবার সম্ভাবনা। এই দাক্ষিণাত্য শাসনের ভার এমন গুরুতর, এবং সাধারণ সেনাপতিরা এখানে সম্রাটের অর্থের যেরূপ অপব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার ফলে, ১৬৫৬ ও ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাটেরা স্বয়ং সশরীরে দাক্ষিণাত্যে গমনপূর্ব্বক স্থানীয় সুলতানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শিবার অতীত কীর্ত্তিগুলি বিবেচনা করিলে সিদ্ধান্ত হয় যে, তাঁহার ন্যায় পরীক্ষিত ও প্রতিভাসম্পন্ন সেনাপতির হাতে যদি দিল্লীর প্রচুর সেনাবল ও অর্থবল ন্যস্ত করা যায়, তবে তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। জয়সিংহ হয় ত মনে-মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়াছিলেন যে, সম্রাট স্বচক্ষে শিবাকে দর্শন করিলে, এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইলে, তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধির(১) পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সাহায্যে জয়লাভ করিতে পারেন। ইহাতে সম্রাটকে স্বয়ং কোন হাঙ্গামা সহ্য করিতে হইবে না; সুতরাং, সম্রাট যে শিবাজীকে দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত করিতে পারেন, এরূপ আশা করা খুবই সঙ্গত।

দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিত্ব লাভের কোন স্থিরতা না থাকিলেও, শিবার মনে ইহার অপেক্ষা সামান্য কিন্তু অধিকতর প্রয়োজনীয় একটি উদ্দেশ্য ছিল, এবং সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ না করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার উপায় ছিল না। শিবাজী এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, জাঞ্জীরা দ্বীপের মালিক সিদ্দি এক্ষণে সম্রাটের

---

(১) সভাসদ্, ৪৬ ও ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, শিবা স্বয়ং এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে মুঘল পক্ষে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে তিনি সম্রাটের জন্য বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা রাজ্য জয় করিয়া দিতে পারেন। জয়সিংহ কেবল এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

—চিটনিস, ১১৩ পৃঃ।

কর্ম্মচারী ;—সম্রাট যেন তাঁহাকে এইরূপ আদেশ করেন, যাহাতে তিনি জাঞ্জীরা দ্বীপটি শিবাজীকে প্রদান করেন। একটী আধুনিক (কিন্তু তাদৃশ বিশ্বাসযোগ্য নহে) বখরে (চিটনিস, ১০৭) এইরূপ লিখিত আছে যে, শিবাজীর মনে এই আশাও ছিল যে, তিনি বিজাপুর রাজ্য হইতে চৌথ আদায়ের প্রস্তাব করিবেন, এবং সম্রাট এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিবেন। এই সকল প্রস্তাব সম্বন্ধে দিল্লী হইতে যে উত্তর আসিয়াছিল, তাহা তেমন স্পষ্ট ছিল না, ভাসা-ভাসা ছিল। সেইজন্য, দিল্লী গমনপূর্ব্বক সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকটে এই সকল প্রস্তাব করিতে পারিলে, স্পষ্ট জবাব পাইবার আশা ছিল।

কিন্তু এই সকল প্রলোভন সত্ত্বেও শিবাজী দীর্ঘকাল ধরিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। শিবাজী এবং তাঁহার মিত্রবর্গ আফ্‌জল খাঁর সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাবে যেরূপ ভীত হইয়াছিলেন, মুঘল দরবারে গমনের কল্পনায় আতঙ্কের কারণ তদপেক্ষা কম ছিল না। তাঁহারা এইরূপ আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, আওরংজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া আর রাবণের মুখে প্রবেশ করা একই কথা। কিন্তু জ্যোতিষীরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। (সভাসদ্, ৪৭ ; চিটনিস, ১৬৯ ; দিগ্, ২৪২ ; তারিখ-ই-শিবাজী ২২খ)।

হিন্দুর পক্ষে যতদূর পবিত্র শপথ হইতে পারে, সেই শপথ করিয়া জয়সিংহ শিবাজীকে আশ্বাস দিলেন যে, শিবা আওরংজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে, তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না। এদিকে, এই রাজপুত রাজার পুত্র, এবং দরবারে তাঁহার প্রতিনিধি—কুমার রাম সিংহও প্রতিশ্রুত হইলেন যে, শিবাজী যতদিন রাজধানীতে থাকিবেন, ততদিন তাঁহার নিরাপদে অবস্থিতির জন্য রাম সিংহ দায়ী থাকিবেন। মহারাষ্ট্রীয় মন্ত্রী-সভার অধিকাংশ মন্ত্রীই রাজধানী-যাত্রার অনুকূল মত প্রকাশ করিলেন।

২। শিবাজীর অনুপস্থিতি কালে রাজ্য-শাসনের বন্দোবস্ত।

শিবাজীকে যতদিন উত্তর-ভারতে বাস করিতে হইবে, সেই সময়ের জন্য শিবাজী রাজ্য-শাসনের যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অতীব দূরদর্শিতা ও গঠন-ক্ষমতার পরিচায়ক। তিনি এমন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আদেশ বা উপদেশ না পাইলেও, তাঁহার স্থানীয় প্রতিনিধিরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবেন। তিনি যদি আগ্রায় নিহত বা চিরবন্দী হ'ন, তাহা হইলেও, তাঁহার রাজ্য ও দুর্গসমূহের শাসনকার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারিবে, এরূপ বন্দোবস্ত অগ্রেই করা হইল। তাঁহার জননী জিজাবাই রাজ্যের অভিভাবিকার (regent) পদে স্থাপিত হইলেন। "দেশ" অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের উপর তাঁহার প্রত্যক্ষ কর্ত্তৃত্ব রহিল। এদিকে পেশোয়া মোরো পন্থ, মজমুয়াদার নিলোজি সোনদেব এবং শিলমোহর-রক্ষক আন্নাজি দত্তো কঙ্কন প্রদেশের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন (সভাসদ্, ৪৭ ; চিটনিস, ১১০)। দুর্গাধ্যক্ষগণকে আদেশ দেওয়া হইল যে, তাঁহারা দিবারাত্রি সজাগ থাকিবেন, এবং তাঁহার নিয়মগুলি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিবেন ; তাহা হইলে কেহ সহসা আক্রমণ করিতে বা কোনরূপ ছলনা, চাতুরী করিয়া দুর্গ অধিকার করিতে পারিবে না। শাসন ও রাজস্ব-কর্ম্মচারীরা সকল বিষয়ে শিবাজীর পুরাতন নিয়ম ও রীতিনীতির অনুসরণ করিয়া চলিতে আদিষ্ট হইলেন।

অনন্তর শিবাজী তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণপূর্ব্বক সকল বিষয় পরিদর্শন করিয়া বেড়াইলেন ; এমন কি, কয়েকটি দুর্গে অতর্কিতভাবে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সকল কর্ম্মচারীকে এই মর্ম্মে শেষ উপদেশ প্রদান করিলেন যে, "আমি পূর্ব্বেই যেরূপ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি, সেই ভাবে কার্য্য করিও।" তার পর শিবাজী রাজগড়ে তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ১৬৬৬খৃঃ মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজী, যাতজন বিশ্বাসভাজন প্রধান কর্ম্মচারী এবং ৪০০০ সৈন্য(২) সহ উত্তর-ভারত অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। শিবাজীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সম্রাটের আদেশে দাক্ষিণাত্যের কোষাগার হইতে একলক্ষ টাকা তাঁহাকে প্রদত্ত হইল ;

(২) সভাসদ্ ৪৭, চিটনিস ১০৮, দিলকশা ৫৭, এই তিনটি বিবরণে লিখিত আছে, শিবাজী ১০০০ সৈন্য সঙ্গে লইয়াছিলেন। আমি বিবেচনা করি, ইহাই অধিকতর সঙ্গত।

এবং জয়সিংহের সেনাদলভুক্ত একজন কর্ম্মচারী, ঘাজী বেগ, শিবাজীর পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন।

৩। শিবাজীর আগ্রায় গমন।

পথিমধ্যে শিবাজী আগ্রা হইতে ৫ই এপ্রেল তারিখে লিখিত সম্রাটের একখানি পত্র পাইলেন। তাহার মর্ম্ম, "আপনি আমার দরবার অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিবার সংবাদ দিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, সে পত্র আমি পাইয়াছি। নিশ্চিন্ত মনে শীঘ্র চলিয়া আসুন। আমার প্রসাদ লাভ করিবার পর আপনি নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি পাইবেন। [এই পত্রের সহিত] আমি আপনাকে সম্মানসূচক একটী পরিচ্ছদ পাঠাইলাম। (পরাসনিস হস্তলিপি—১০নং পত্র)।

শিবাজী যখন আরঙ্গাবাদে আসিয়া পৌছিলেন, তখন তাঁহার খ্যাতি, এবং তাঁহার জমকালো পোষাক-পরিহিত সহচরগণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নগরের যাবতীয় লোক তাঁহার দর্শন লাভের জন্য নগরের বাহিরে আসিয়া সমবেত হইল। কিন্তু, এই স্থানের শাসনকর্ত্তা সফ্‌শিকন খাঁ, শিবাজীকে সামান্য একজন মারাঠা জমিদার ভাবিয়া অবহেলা পূর্ব্বক, তাঁহার সকল কর্ম্মচারীর সহিত নিজ দরবার-গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এবং পথিমধ্যে শিবাজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কেবলমাত্র তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাঠাইয়া, দরবার-কক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার জন্য শিবাজীকে বলিয়া পাঠাইলেন। শিবাজী শাসনকর্ত্তার এই ইচ্ছাকৃত অবহেলায় অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। নগরে তাঁহার জন্য যে বাস-গৃহ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তিনি আত্ম-সম্মান বজায় রাখিবার জন্য অশ্বারোহণে সরাসর তথায় চলিয়া গেলেন,—শাসনকর্ত্তার অস্তিত্ব আদৌ আমলেই আনিলেন না। সফ্‌শিকন খাঁকে তখন নামিয়া আসিতে হইল। তিনি তাঁহার সকল মোগল কর্ম্মচারীর সহিত শিবাজীর আবাসে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরদিন শিবাজী শাসনকর্ত্তার বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতি-গমন করিলেন, এবং সকলের সহিত বেশ অমায়িক ও ভদ্র ভাবে আলাপ করিলেন। কয়েক দিন তথায় অবস্থিতির পর তিনি পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। পথিমধ্যে সর্ব্বত্র সম্রাটের আদেশে রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার লোকজন-দিগের রসদ সরবরাহ করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে বিবিধ উপহার প্রদান করিতে লাগিল (দিল, ৫৭-৫৮)। ৯ই মে তারিখে তিনি আগ্রার বাহিরে আসিয়া পৌছিলেন। সে সময়ে সম্রাট আগ্রায় বাস করিতেছিলেন।

৪। আওরংজীবের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ।

মে মাসের ১২ই তারিখ সম্রাটের সহিত শিবাজীর সাক্ষাতের দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। (৩) এই দিনে সম্রাটের পঞ্চাশৎ চান্দ্র জন্মতিথির উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে আগ্রার দিওয়ান্-ই-আম নামক দরবার-গৃহ মহা আড়ম্বরে সুসজ্জিত হইয়াছিল। সভাসদবৃন্দ তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা আড়ম্বরপূর্ণ পোষাকে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সম্রাটকে তুলাদণ্ডে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সহিত তৌল করিবার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত ছিল। (ঐ স্বর্ণ ও রৌপ্য দরিদ্র-গণকে দান করা হইবে।) সাম্রাজ্যের তাবৎ আমীর ওমরাহ-গণ ও তাঁহাদের সহস্র সহস্র অনুচরবর্গ পদমর্য্যাদানুসারে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাড়াইয়া অসংখ্য স্তম্ভ-শোভিত সুবৃহৎ হল-ঘর এবং তাহার তিন দিকের প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রাঙ্গণ অনেক মূল্যবান চাঁদোয়ার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।

কুমার রাম সিংহ শিবাজীকে তাঁহার পুত্র শম্ভুজী এবং তাঁহার দশজন সেনানী সহ এই দিওয়ান-ই-আম গৃহে আনয়ন করিলেন। মারাঠা রাজার পক্ষ হইতে সম্রাটের সম্মুখে নজর স্বরূপ ১৫০০ স্বর্ণমুদ্রা এবং নিসার (দেবতুষ্টির দান) স্বরূপ ৬০০০ টাকা স্থাপিত হইল। আওরংজীব অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ উচ্চকণ্ঠে শিবাজীকে আহ্বান

(৩) আওরংজীবের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ—আলমগীরনামা, ৯৬৩, ৯৬৮-৯৭০ ; হফ্‌ৎ আঞ্জুমন, ২৩৮ক ; সুরাট হইতে কারওয়ার, ৮ই জুন, ১৬৬৬ ; F. R সুরাট, ৮৬ খণ্ড ; (এই সকল বিবরণ সম-সাময়িক।) সভাসদ্‌ ৪৯ ; ষ্টোরিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৮ ; খাফি খাঁ দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৯ ১৯০ ; দিল ৫৮ ৫৯ ; (এইগুলি বিশ্বাসযোগ্য।) চিটনিস, ১১১-১১২ ; শিগ, ২৪৫-৭ ; তাঃ শিঃ ; ২২বি-২৩এ (এইগুলি পরবর্ত্তী বিবরণ এবং কিম্বদন্তীমূলক।) বার্ণিয়ার ১৯০ (অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত।)

করিলেন, "আও, শিবাজী রাজে!" শিবাজীকে সিংহাসন-তলে লইয়া যাওয়া হইলে, তিনি সম্রাটকে তিনবার কুর্ণিশ করিলেন। তার পর, সম্রাটের ইঙ্গিতে শিবাজীকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহগণের মধ্যে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। তদনন্তর দরবারের কার্য্য যথারীতি চলিতে লাগিল, শিবাজীর কথা সকলে যেন ভুলিয়া গেল।

শিবাজী এতদিন ধরিয়া কল্পনায় যে অভ্যর্থনা-দৃশ্যের চিত্র অঙ্কন করিতেছিলেন,—জয় সিংহের সহিত বহুবার আলাপের ফলে তিনি যেরূপ অভ্যর্থনা নিশ্চয়ই পাইবার প্রত্যাশা (৪) করিতেছিলেন,—ইহা ত সেরূপ অভ্যর্থনা নয়! আগ্রায় পদার্পণ করিবার পর হইতেই তাঁহার মন অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেছিল। প্রথমতঃ, আগ্রা নগর-প্রান্তে সম্রাটের পক্ষ হইতে রামসিংহ ও মুখলিশ খাঁ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। ইঁহারা দুইজনই সামান্য পদস্থ কর্ম্মচারী—নামমাত্র আড়াই হাজারী ও দেড় হাজারী মনসব্দার। সম্রাটকে অভিবাদন করিবার পর তিনি কোন মূল্যবান উপহার, উচ্চ উপাধি, এমন কি দুই চারিটি মিষ্ট কথাও পাইলেন না। অবশেষে তাঁহাকে অনেকগুলি ওমরাহ-শ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল; সম্মুখের মনুষ্য-শ্রেণীর অন্তরালে তাঁহার উপর সম্রাটের নজর পর্য্যন্ত পড়িবার সম্ভাবনা রহিল না। রাম সিংহের মুখে তিনি শুনিলেন, তিনি পাঁচ হাজারী মনসবদারগণের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অমনি চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "কী! আমার সাত বছর বয়স্ক পুত্র পাঁচ হাজারী মনসবদার হইয়াছে, অথচ, তাহাকে সম্রাটের সম্মুখে আসিতে পর্য্যন্ত হয় নাই! আমার ভৃত্য নেতাজী পাঁচ হাজারী। আর আমি—সম্রাটের জন্য এত কার্য্য করিয়া, এবং এতদূর পথ অতিক্রম পূর্ব্বক দরবারে আসিয়া—এই তুচ্ছ পদ প্রাপ্ত হইলাম!" তার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার সম্মুখে যে ওমরাহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, উনি কে? রামসিংহ জবাব দিলেন, তিনি রাজা রায় সিংহ শিশোদিয়া। (৫)

এই কথা শুনিয়া শিবাজী বলিয়া উঠিলেন, "রায় সিংহ! রাজা জয় সিংহের একজন অনুচর মাত্র! আমাকে কি কেবল এই ব্যক্তির সমান বিবেচনা করা হইল?"

সম্রাটের এইরূপ ব্যবহারকে প্রকাশ্য অবমাননা বিবেচনা করিয়া, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, শিবাজী উচ্চকণ্ঠে রাম সিংহকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং এরূপ অবমাননা সহ্য করিয়া জীবিত থাকার অপেক্ষা মরণও শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া আত্মহত্যা (৬) করিতে উদ্যত

(৪) ফার্সী এবং ইংরেজী বিবরণে এই কথাই সমর্থিত হইয়াছে। "শিবা কতকগুলি অসম্ভব কল্পনা এবং আশা মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। অতএব...কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, তিনি গোলমাল আরম্ভ করিলেন, এক কোণে চলিয়া গেলেন, এবং রাম সিংহকে বলিলেন, তিনি নিরাশ হইয়াছেন। তিনি নির্ব্বোধের মত অসঙ্গত আবদার করিতে লাগিলেন। (আলমগীরনামা ৯৭৯)

"অন্যান্য উমরার ন্যায় সম্রাটের নিকট হইতে এত দূরে করযোড়ে যুবকের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকার হীনতা শিবাজীর উগ্র প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।" (সুরাট হইতে কারওয়ার) এবং খাফি খাঁ।

(৫) এখানে আমি দিলকশা ৫৮র অনুসরণ করিয়াছি। মারাঠা লেখকেরা (সভাসদ্ ৪৯ ও চিটনিস ১১১) বলিতেছেন যে, এই লোকটি যশোবন্ত সিংহ। এই নাম শুনিয়া শিবা বলিয়া উঠিলেন, "যশোবন্ত! যে আমার সেনাগণকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে! সে পর্য্যন্ত আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান! কিন্তু যশোবন্ত সাত হাজারী মনসবদার ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শিবাজীর সম্মুখে আরও দুই শ্রেণী অন্তরে থাকিবার কথা। রায় সিংহ পাঁচ হাজারী; অন্যত্র তিনি রাঠোর বলিয়া বর্ণিত।

(৬) এখানে আমি খাফি খাঁ ২য়, ১৯০, ও ষ্টোরিয়া, ২য়, ১৩৮এর অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু, সভাসদ্ ৪৯, লিখিত আছে, তিনি যশোবন্তকে হত্যা করিবার জন্য রাম সিংহের নিকট হইতে ছোরা প্রার্থনা করেন! হিন্দী কবি ভূষণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক এই ঘটনাটির নিম্নলিখিতরূপ বিকৃত বিবরণ প্রসব করিয়াছে: "সম্রাটের (জন্ম তিথির) দরবারী উৎসবের দিনে আওরংজীব সিংহাসনে ইন্দ্রের ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এই সকল ঐশ্বর্য্যের দৃশ্য শিবাজীকে একটুও বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি সেলাম করেন নাই, এবং পাদিশার ঐশ্বর্য্য ও শক্তিকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন।......তাহারা তাঁহাকে পাঁচ হাজারী মনসবদারগণের শ্রেণীতে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল; যেন তিনি তাহাদের সহিত বিভিন্ন নহেন! ভূষণ বলেন, আওরংজীবের মন্ত্রীগণের সঙ্গতি-অসঙ্গতির জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না। তিনি (শিবাজী) (রাম সিংহের) কোমরবন্ধ হইতে তরবারি খুলিয়া লইতে পারিলেন না, এবং ঐ মুসলমান (আওরংজীব) গোসলখানায় (দৌড়িয়া পলায়ন করিয়া) নিজের প্রাণ বাঁচাইলেন।" ভূষণ, গ্রন্থাবলী, ৬৬, ৭০ এবং ৬৮ পৃষ্ঠা।

হইলেন। ব্যাপারটা শেষে যাহা ভাবা যায় নাই, এরূপ স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং শিবার উচ্চকণ্ঠে ও অসংযত অঙ্গ-সঞ্চালনে দরবারের শিষ্টাচার ভঙ্গ হইতেছে দেখিয়া, রামসিংহ শিবাজীকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে এবং ভিতরে ভিতরে গভীর নৈরাশ্যজনিত দুঃখে বিচলিত হইয়া শিবাজী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন (দিল, ৫৯, খাফি ২য়, ১৯০; সুরাট হইতে কারওয়ার)। পারিষদবর্গের মধ্যে ব্যস্ততার সঞ্চার হইল। সম্রাট জানিতে চাহিলেন, কি হইয়াছে। রামসিংহ চতুরতা সহকারে জবাব দিলেন, "জঙ্গলী বাঘ হয়বান্, ত্যাস গর্মা জাহলা। কাঁহী করীণা জহালা।" অর্থাৎ "ব্যাঘ্র বনের জন্তু; এই স্থানে তাহার গরম লাগিয়াছে; সে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে।" তিনি রাজার উদ্ধত ব্যবহারের জন্য সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, রাজা দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী,—কাজেই তিনি দরবারের আদব কায়দা এবং সুসভ্য আচরণ অবগত নহেন। আওরংজীব উদারতা সহকারে পীড়িত রাজাকে পার্শ্ববর্ত্তী একটা কক্ষে লইয়া গিয়া তাঁহার মুখে গোলাপ জল ছিটাইতে আদেশ করিলেন। তার পর, শিবাজীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে, দরবার শেষ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার বাসায় গমন করিতে অনুমতি দিলেন।

৫। আওরংজীবের আদেশে শিবাজী বন্দী হইলেন।

দরবার হইতে প্রত্যাগমনের পর শিবাজী মুখ খুলিয়া সম্রাটকে বিশ্বাসঘাতকতার দোষ দিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে তাঁহাকে বধ করা হউক,—মৃত্যুদণ্ড এতটা ক্লেশদায়ক নহে। তাঁহার নিকটে গুপ্তচর উপস্থিত ছিল; তাহারা—শিবাজী নিজের বাসায় এবং দরবারে যে সকল ক্রোধব্যঞ্জক উক্তি এবং অভিযোগ করিয়াছিলেন,—সেই সকল কথা আওরংজীবের গোচর করিল। তাহার ফলে মারাঠা রাজার প্রতি সম্রাটের মন আরও বিরূপ হইয়া উঠিল, এবং সম্রাট তাঁহাকে আরও অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। রাম সিংহের উপর আদেশ জারি করা হইল যে, শিবাজীকে নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে জয়পুর প্রাসাদে বাসা দেওয়া হউক; এবং শিবাজীকে হেপাজতে রাখিবার জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন। শিবাজীকে দরবারে আসিতে নিষেধ করা হইল; কিন্তু শম্ভুজীকে মধ্যে মধ্যে দরবারে হাজির হইতে আদেশ করা হইল। এইরূপে অবশেষে শিবাজীর সমস্ত উচ্চ আশা চূর্ণ হইয়া গেল, এবং তৎপরিবর্ত্তে তিনি বন্দী হইলেন। (দিল, ৫৯, আলম, ৯৬৯।)

কিরূপে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে শিবাজী অনুরক্ত অনুচরগণ এবং সম্রাটের দরবারে তাঁহার প্রতিনিধি রঘুনাথ পন্থ কোরডের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শিবাজীকে বলিলেন যে, শিবাজী সম্রাটের রাজ্য-লোলুপতার সুযোগ গ্রহণ করুন, এবং সম্রাটের নিকট প্রতিশ্রুত হউন যে, তাঁহাকে যদি মুক্তি দান করা হয়, তাহা হইলে তিনি সম্রাটকে বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা (৭) রাজ্য জয় করিয়া দিবেন। এই মর্ম্মের একখানি আবেদন-পত্র রঘুনাথ কোরডের হাত দিয়া সম্রাটের নিকটে পেশ করা হইল। কিন্তু সম্রাট ইহার জবাবে কেবল বলিলেন, "কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন,—আমি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিব।" শিবাজী বুঝিলেন, এই জবাব কথার চাতুরী মাত্র। তখন তিনি সম্রাটের সহিত গোপনে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইলেন। তাহাতে তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন যে, এই সাক্ষাতে তিনি সম্রাটের নিকটে এমন গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিবেন, যাহাতে সম্রাটের অশেষ উপকার হইবে। মারাঠি বখর হইতে জানা যায় যে, উজির জাফর খাঁ, সায়েস্তা খাঁর একখানি পত্র পাইয়া সতর্ক হইয়া, শিবার ন্যায় এক-জন যাদুকরের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া নিজের বিপদ নিজে ডাকিয়া আনিতে সম্রাটকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু এরূপ ব্যাপারে আওরংজীবের পক্ষে অপর লোকের উপদেশের কোন আবশ্যকতা ছিল না। যে ব্যক্তি ১০,০০০ সৈন্যের প্রায় চোখের সামনে আফজল খাঁকে নিহত করিয়া-ছিলেন, এবং ২০,০০০ মোগল সৈন্য-বেষ্টিত অন্তঃপুরের মধ্য-স্থলে সায়েস্তা খাঁকে আহত করিয়া অক্ষত শরীরে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই লোকের সহিত, কয়েকজন মাত্র প্রহরীর সমক্ষে, একটা ক্ষুদ্র কক্ষে সাক্ষাৎ করা যে

৭ কিম্বা দিল, ৬৯এর মতে—কান্দাহার।

নিরাপদ নহে, এতটুকু বুদ্ধি সম্রাটের নিশ্চয়ই ছিল। তখনকার সাধারণ লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, শিবা একজন যাদুকর; তাঁহার দেহ বায়ুর দ্বারা গঠিত; তিনি ৪০ কি ৫০ গজ দূর হইতে তাঁহার শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িতে সমর্থ। কাজে-কাজেই, নির্জ্জনে সাক্ষাতের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল।

অনন্তর শিবাজী উজিরকে বশ করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন সম্রাটকে বলিয়া-কহিয়া তাঁহার দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি আনাইয়া দেন, এবং তথায় মোগল-সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য আবশ্যক অর্থ ও লোকবল সঙ্গে দেন। জাফর খাঁকে তাঁহার পত্নী (সায়েস্তা খাঁর অন্যতমা ভগিনী) এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, তিনি যেন শিবাজীকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সহিত বেশীক্ষণ ধরিয়া আলাপ না করেন। ফলে, জাফর খাঁ তাড়াতাড়ি আলাপ শেষ করিয়া বলিলেন, "বহুত আচ্ছা, বাদশাহকে বলিয়া এই রকমই ব্যবস্থা করিয়া দিব।" শিবা বুঝিলেন, জাফর খাঁ কিছুই করিবেন না। (সভাসদ্ ৫০-৫১; আলম্ ৯৭০; চিটনিস, ১১৩।)

এখন শিবাজীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হইল। এই সময়ে তাঁহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইয়া উঠিল। আগ্রার কোট্‌ওয়াল ফুলাদ খাঁ সম্রাটের আদেশে শিবাজীর গৃহের চতুর্দ্দিকে গোলন্দাজ সেনা ও কামান সহ অসংখ্য প্রহরী স্থাপন করিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে যেরূপ ছিলেন, এক্ষণে বাহ্য-দৃশ্যেও সেইরূপ বন্দী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইহাতে রাজা অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন, কষ্ট বোধ করিলেন, এবং শম্ভুজীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বহু খেদ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তিন মাস অতীত হইল।

৬। আগ্রায় শিবাজীর বন্দিত্ব কালে মোগলদিগের নীতি।

এই অবকাশ কালে সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট কোন্ নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং জয়সিংহই বা কি-কি কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন,—এইবার আমরা তাহার উল্লেখ করিব। আওরংজীবের সহিত শিবাজীর প্রথম সাক্ষাৎ শেষ হইবার পর আওরংজীব শিবাজীকে একটী হস্তী, এক প্রস্থ সম্মানসূচক পরিচ্ছদ এবং কিছু রত্নালঙ্কার উপঢৌকন দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবা দরবারের নিয়ম লঙ্ঘন করায়, সম্রাট তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন, এবং তাঁহার বিরক্তির নিদর্শন স্বরূপ, আপাততঃ এই সকল উপহার দেওয়া স্থগিত রাখেন। (হফ্‌ৎ আঞ্জুমন ২৩৮এ) পক্ষান্তরে শিবা অভিযোগ করিতে থাকেন যে, মোগল গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে সকল প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল, তাহা রক্ষিত হয় নাই। এই হেতু, আওরংজীব জয়সিংহকে পত্র লিখিয়া,—তিনি শিবাজীর নিকটে কোন্ বিষয়ে কি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সঠিক ও সম্পূর্ণ বিবরণ পাঠাইতে আদেশ করিলেন। প্রত্যুত্তরে রাজা পুরন্দরের সন্ধির সর্ত্তগুলির পুনরাবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া পাঠাইলেন, এবং পবিত্র শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন যে, ইহার অধিক আর কিছুই স্বীকার করা হয় নাই। (আলম্ ৯৭০। হফ্‌ৎ আঃ-তে জয়সিংহের উত্তর লিপিবদ্ধ হয় নাই।)

শিবাজীর রাজধানী গমনের এইরূপ অপ্রত্যাশিত ফল দর্শনে জয়সিংহ ধাঁধায় পড়িয়া গেলেন। সত্য বটে, দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ যখন মোগলদিগের বিরুদ্ধে যাইতেছিল, সেই সময়ে শিবাজীকে দাক্ষিণাত্য হইতে সরাইয়া দিবার জন্য জয়সিংহ "সহস্র কৌশলে" শিবাজীকে উত্তর ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু, এই সঙ্গে তিনি ইহাও শপথ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বন্ধু নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। এই জন্য তিনি সম্রাটকে এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, শিবাজীকে বন্দী করিয়া রাখিলে, বা, বধ করিলে তাঁহার কোনই লাভ হইবে না; কেন না মারাঠা রাজার সুবিবেচিত বন্দোবস্তের ফলে তাঁহার অভাবেও এ দেশের রাজশক্তির কোন ক্ষতি হইবে না; পরন্তু, শিবাজীকে বন্ধুরূপে পরিণত করিতে পারিলে, এক দিকে যেমন সম্রাটের বিলক্ষণ সুবিধা হইবারই সম্ভাবনা, পক্ষান্তরে, এরূপ ব্যবস্থায় লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে, সম্রাটের কর্ম্মচারীদিগের প্রতিশ্রুতি ধ্রুব-সত্য। জয়সিংহ বরাবরই তাঁহার রাজধানীস্থিত প্রতিনিধি রামসিংহকে পত্র লিখিতে লাগিলেন যে, শিবাজীর জীবন যেন নিরাপদ থাকে, জয়সিংহ এবং তাঁহার পুত্রের পবিত্র প্রতিশ্রুতি যেন ভঙ্গ না হয়। (হফ্‌ৎ আঞ্জু, ২৩৪ এ।)

কিন্তু কাজটি বড় সোজা ছিল না। আওরংজীবের কূট-

নীতির পরিবর্ত্তন করা, এমন কি সময়ে-সময়ে তাহা অনুমান করাও জয়সিংহের সাধ্যাতীত। মনে হয়, সম্রাট প্রথমে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—শিবাজীকে চোখের উপর রাখিয়া, তাঁহার পলায়নের পথ বন্ধ করিয়া—দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ শেষ হইলে, শিবাজীকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত কি না, এবং উচিত হইলে, কখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত—এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতেছিলেন। প্রথমে রামসিংহের উপর আদেশ হইয়াছিল যে, তিনি শিবাজীর জামিন হইবেন, এবং শিবাজি যাহাতে সদ্ব্যবহার করেন ও আগ্রায় হাজির থাকেন, সে জন্য রামসিংহ দায়ী থাকিবেন। জয়সিংহ স্বীয় পুত্রের উপর এরূপ দায়িত্ব ভার চাপানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবং রামসিংহকে এই দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য পীড়া-পীড়ি করিতেছিলেন। কয়েক দিন পরে আওরংজীবের মতলব বদলাইয়া গেল। স্পষ্টই বুঝা গেল, তিনি একজন হিন্দু রাজাকে অপর একজন হিন্দু রাজার জামিনদার করিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না; এবং নেতাজী পলকাকে যেরূপ আফগানিস্থানে নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন, শিবাজীকেও সেইরূপ তথায় পাঠাইতে মনস্থ করেন; কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অতঃপর সম্রাট স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন ও রামসিংহ কিল্লাদার হইয়া আগ্রায় রাজ-বন্দী শিবাজীর তত্ত্বাবধান করিবেন, এরূপ স্থির হইল। কিন্তু জয়সিংহ বিশেষ করিয়া তাঁহার পুত্রকে এই অপ্রীতিকর অনাবশ্যক কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিতে আজ্ঞা করিলেন এবং সম্রাটকে শিবাজীকে আগ্রায় রাখিয়া আসিতে উপদেশ দিলেন। "যখন শিবাজীকে মুক্তি দেওয়ার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তখন দাক্ষিণাত্যের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। এক্ষণে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এ সময় তাঁহাকে পাঠান নিরাপদ নহে। তাঁহাকে এরূপ ভাবে বন্দী করিয়া রাখুন যে, তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গ তাঁহার মুক্তি সম্বন্ধে নিরাশ না হয়, এবং আমাদের বিরুদ্ধে আদীল শাহর সহিত যোগ দিয়া অশান্তির সৃষ্টি না করে। শিবাজীকে আগ্রায় রাখিয়া আসাই সঙ্গত। দাক্ষিণাত্যে আপনি পৌঁছিলে তাঁহাকে আহ্বান করিবেন এইরূপ ভরসা দেওয়া হউক। তাঁহার পুত্র সম্রাটের সহিত আসিবেন; তাহাতে তাঁহার অনুচরবর্গ নিরাশ না হইয়া বিশ্বস্ত ভাবে আমাদের সাহায্য করিবে।" কিন্তু দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ বিষয়ে মুঘলেরা বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না এবং শিবাজীর মুক্ত হইবার আশা দিন-দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল।

৭। আগ্রা হইতে পলায়ন।

অনন্তর শিবাজী নিজ বুদ্ধি-বলে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল বন্দী অবস্থায় কাটাইয়া, তিনি ভয় ও বশ্যতা জানাইয়া, সম্রাটের নিকট অনবরত দূত পাঠাইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই ফললাভ হইল না। কেবল তাঁহার মারাঠা সৈনিকদের দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পাইলেন। সম্রাট মনে করিলেন, এরূপ অনুমতি দিলে, তাঁহাকে অল্প লোকের উপর নজর রাখিতে হইবে এবং শিবাজী আগ্রায় বন্ধুহীন রহিবেন।

মারাঠা কর্ম্মচারীরাও শিবাজীর অনুমতি পাইয়া ক্ষুদ্র দুই দলে দেশে ফিরিল। অনুচরবর্গের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া শিবাজী নিজ পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। পীড়ার ভান করিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও সভাসদদিগকে মিষ্টান্ন পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল মিষ্টান্ন প্রকাণ্ড পেটরাতে পূরিয়া দুইজন লোক বহন করিয়া লইয়া যাইত। প্রথমতঃ রক্ষীরা ঝুড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিত, অবশেষে পরীক্ষা না করিয়াই ছাড়িয়া দিত। শিবাজী এই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ১৯শে আগষ্ট অপরাহ্নে রক্ষীদের সংবাদ দিলেন যে, তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছেন, তাহারা যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিরাজী ফার্জন্দ কতকাংশে তাঁহার ন্যায় দেখিতে ছিলেন। তিনি সমস্ত দেহ বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া শিবাজীর শয্যায় শয়ন করিলেন; কেবল দক্ষিণ হস্তখানি বাহির করিয়া রাখিলেন; কেন না তাহাতে শিবাজীর স্বর্ণবলয় ছিল। শিবা এবং তাঁহার পুত্র দুইটী ঝুড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুইয়া রহিলেন, এবং সূর্য্যাস্তের কিছুক্ষণ পরে নিরাপদে অন্যান্য মিষ্টান্নের ঝুড়ীর সহিত রক্ষীশ্রেণী পার হইয়া গেলেন।

নগরের বাহিরে একটী নির্জ্জন স্থানে ঝুড়ী দুইটী রক্ষিত হইল; বাহকেরা প্রস্থান করিল। শিবা ও তাঁহার পুত্র বহির্গত হইয়া আগ্রা হইতে তিন ক্রোশ দূরে একটী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নিরোজী রাবজী অশ্ব লইয়া তাঁহাদের

অপেক্ষা করিতেছিলেন। একটী জঙ্গল মধ্যে অল্পক্ষণের জন্য মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাদের দল বিভক্ত হইল। শিবাজী তাঁহার পুত্র এবং তিন জন কর্ম্মচারী—নিরোজী, রাব্‌জী, দত্ত ত্রিম্বক, এবং রঘুমিত্র নামক একজন নীচ জাতীয় মারাঠা হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় ভস্ম মাখিয়া মথুরার দিকে যাত্রা করিলেন এবং অপর সকলে দাক্ষিণাত্যের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

*৮। পলায়নের সংবাদ প্রকাশ।

হিরাজী সে রাত্রি এবং তৎপরদিন অপরাহ্ণ কাল পর্য্যন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলেন। প্রাতঃকালে রক্ষীগণ নিদ্রিতের হস্তে শিবাজীর স্বর্ণবলয় দেখিয়া এবং একজন দাসকে রোগীর পদসেবা করিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল। বৈকাল তিন ঘটীকার সময় হিরাজী চাকরটীকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। শান্ত্রী-দলকে বলিয়া গেলেন শিবাজী পীড়িত এবং চিকিৎসাধীন, গোলমাল করিও না। কিন্তু বাড়ীটী যেন জনশূন্য বোধ হইতেছিল,—শিবাজীকে কেহই দেখিতে আসিতেছে না, কোনও প্রকার শব্দ বা চলাফেরার চিহ্ন ছিল না। ক্রমশঃ রক্ষীরা সন্দিহান হইয়া পড়িল। কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল পাখী উড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ এই বিস্ময়কর সংবাদ তাহাদের দলপতি ফুলাদ খাঁয়ের নিকট লইয়া গেল। ফুলাদ খাঁ সম্রাটকে এই সংবাদ জানাইলেন এবং ইন্দ্রজাল প্রভাবে এই পলায়ন ঘটিয়াছে বলিয়া নিজেকে দোষ-মুক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "রাজা নিজের কক্ষে ছিলেন। আমরা নিয়মিত রূপে দেখিতে যাইতাম। কিন্তু সহসা তিনি আমাদের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন। আকাশে অথবা মাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন কিম্বা অপর কি ইন্দ্রজাল দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না।"

আওরংজীব এরূপ গল্পে ভুলিবার লোক ছিলেন না। তৎক্ষণাৎ একটা গোলমাল হইল এবং দ্রুত অশ্বারোহী ও অস্ত্রধারী পুরুষ বেরার ও খান্দেশের ভিতর দিয়া দাক্ষিণাত্যের পথগুলি পাহারা দিতে প্রেরিত হইল। এবং তৎস্থানীয় কর্ম্মচারীরা পলাতকদিগের সন্ধান করিতে আদিষ্ট হইল। মারাঠা ব্রাহ্মণগণ এবং শিবাজীর অনুচরবর্গ, আগ্রা অথবা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে, যেখানেই দেখা গেল, বন্দী হইলেন। কিন্তু শিবাজী এতক্ষণে তাঁহার অনুসন্ধান-কারিগণকে ছাড়াইয়া এক দিনের পথ অগ্রসর হইয়াছিলেন। পলায়নের উপায় বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিতে, সমস্ত ব্যাপার প্রকাশিত হইয়া পড়িল। স্বভাবতঃই রামসিংহের প্রতি সন্দেহ হইল। তিনি বহুবার শিবাজীকে আগ্রায় হাজির রাখার জন্য দায়িত্ব পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তিনি ও তাঁহার পিতা জামিন ছিলেন বলিয়া মারাঠা রাজের নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তনে তাঁহাদের স্বার্থ ছিল। কতিপয় ধৃত মারাঠা ব্রাহ্মণ, সম্ভবতঃ মার খাইয়া, স্বীকার করিল যে, শিবাজী রামসিংহের জ্ঞাতসারে পলায়ন করিয়াছেন। প্রথমে রামসিংহকে দরবারে আসিতে নিষেধ করা হইল। তৎপরে তিনি তাঁহার পদবী ও বেতন হইতে চ্যুত হইলেন।

গদ্য ও পদ্য

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

ফুল যদি না ফুটিত, ~~না~~ গাহিত পাখী,
গুঞ্জরণ না করিত অলি,—
তপ্তকণ্ঠ চাতকের আকুল আহ্বানে
কিবা তাহে হ'ত ক্ষতি? কহে বৈজ্ঞানিক-
না বহিলে সিন্ধু, বেলা চুমি'?
কবি কহে, তাহা হ'লে মানব-জীবন
একেবারে হ'ত মরুভূমি।

আগাছা

[শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী]

তাকে দেখেছিলুম বর্ষার সকালে বৃষ্টিতে-ভেজা একরাশ তাজা জুঁই ফুলের মতন। ছোট্ট তার বুকে রাজ্যের আনন্দ বোঝাই করা ছিল। সেই আনন্দের নেশায় চপলা হরিণীর মত ছুটে লাফিয়ে, আমাদের পাড়াটাকে সমস্ত দিন সে মাথায় কোরে রাখ্‌ত।

তার সঙ্গে আগে আমার তেমন পরিচয় ছিল না। একটা ঘটনা আমাদের দুজনকে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বেঁধেছিল। আজ সে আমার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছে। অনেক খোঁজ করেছি, তবু তাকে খুঁজে পাই নি। সে জীবিত কি মৃত, তাও আমার অজ্ঞাত।

আমাদের বাড়ীর সামনে খানিকটা জায়গা পোড়ে ছিল। তিন-চার পুরুষ আগেকার গোটা কয়েক আধ-পাকা গাছ ছাড়া সেখানে আর কিছু ছিল না। সেই জায়গাটাতে আমি বাগান কোরেছিলুম। নানা রকম ফুলগাছ, পাতা-বাহারের গাছ লাগিয়ে, বাঁশের ছোট-ছোট গেট তৈরী কোরে,—তাতে লাল, বেগ্‌নে, হলদে রংয়ের রকম-রকম ফুলের লতানে গাছ জড়িয়ে দিয়ে, জায়গাটাকে আমি মনের মতন কোরে সাজিয়ে তুলেছিলুম। রোজ সকালে উঠে, কোন গাছটা কতখানি বাড়ল, কটা ফুল ফুটল, লিলি ফুলের কটা পাপড়ি খুল্‌ল,—এ সব না দেখলে আমার ভাত হজম হোত না। সে সময় কেউ আমায় জিজ্ঞেস করলে, আমি বলে দিতে পারতুম যে, অমুক গাছের কটা পাতা আছে। মালী থাকা সত্ত্বেও, নিজের হাতে তার সঙ্গে মাটি না কোপালে মনে হোত, গাছগুলো বুঝি বাড়বে না,—ফুলগুলো বুঝি অভিমানিনী মেয়ের মতন ঠোঁট ফুলিয়ে থাকবে,—হাসবে না।

আমার এই রকম সখ দেখে, বাড়ীর সবাই সন্ত্রস্ত হোয়ে উঠতে লাগলেন। বিদ্বান গুষ্টির একমাত্র ছেলে আমি,—লেখাপড়া আমাকে যেমন কোরেই হোক শিখতেই হবে। অন্য কেউ আমার বাগানের সখ দেখে প্রশংসা করলে, পাছে আমি তাতে আরো বেশী উৎসাহিত হোয়ে উঠি, এই ভয়ে আমার মা বলে উঠতেন,—আমার পাঁচটা নয়, সাতটা নয়,—ঐ একটা ছেলে,—ওর ও-সব কোরলে ত চলবে না। পাঁচটা হোলেও নয় একটাকে মালীর কাজে লাগিয়ে দেওয়া যেত।

বাড়ীতে এই রকম বাধা পাওয়া সত্ত্বেও, বাগানের নেশা আমার শিরায়-শিরায় নেচে বেড়াতে লাগল। ফুলের চাষ করবার নানা রকম বই পোড়ে, মার্কিণ থেকে নানা রকম ফুলের বীজ আনিয়ে, নিজের হাতে বাগানে লাগাতে আরম্ভ কোরে দিলুম। আমার কাণ্ড দেখে, বাবা একদিন বলেছিলেন যে, "ও জায়গাটাতে আমি আস্তাবল তৈরি কোর্‌ব মনে করছি।" বাবার এই কথা শুনে আমি এমনি কাণ্ড বাধিয়েছিলুম যে, শেষ রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁকে প্রতিজ্ঞা কোরতে হয়েছিল যে, ওখানে আস্তাবল কোরবেন না। ক্রমে আমার সখটা সংক্রামক হোয়ে দাঁড়াতে লাগল। ক্রমে বাড়ীর অন্য সবাই আমার বাগানের বেশ প্রশংসা কোরতে আরম্ভ কোরলেন। নানা রকম নক্সা-কাটা জায়গাগুলোতে তখন লাল, শাদা, হলদে মরসুমী ফুল ফুটে থাকৃত। সে সময় আমার মনে হোত, বুঝি একখানা বড় কাশ্মীরি শাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে।

হঠাৎ আমার মালঞ্চে একদিন ডাকাত পোড়ল। সকালে বাগান তদ্বির কোরতে গিয়ে দেখি যে, বাগান আমার তোলপাড় হোয়ে রয়েচে। ছোট-ছোট ফুলগাছ-গুলোকে মাড়িয়ে, তার উপর দিয়ে কারা ছুটোছুটি কোরেচে। কোন গাছ মুখ গুঁজড়ে মাটিতে মুখ লুকোচ্ছে,—কোনটার বা কোমরে পা পড়াতে আধখানা মাটিতে বসে গিয়েছে। আহত কুকুর মনিবকে দেখতে পেলে যেমন কোরে ওঠবার চেষ্টা করে, যেন তেমনি ভাবে তার ফুল-ধরা মাথাটা আমার কাছে শেষ বিদায় নেবার জন্য কোন রকমে সজাগ কোরে রেখেছে। বুকের রক্ত দিয়ে যাদের এত দিন ধরে পালন কোরে আস্‌ছি, তাদের

এই অবস্থা দেখে, সেইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি কেঁদে ফেললুম।

বৃশ্চিক-দংশন, সূচী-বেধ প্রভৃতি অনেক রকম যন্ত্রণার খবর শুনেছি বটে; কিন্তু ছেলেবেলার সখের জিনিস এই রকম ভাবে নষ্ট হোয়ে যাওয়ায় আমার যা দুঃখু হয়েছিল, এখনো তা মনে আছে। আর মজার ব্যাপার হোচ্ছে, সেই কথা মনে পোড়ে আজ আমার হাসি আসে।

দরওয়ানদের জিজ্ঞাসা করলুম, এ কাজ কে কোরেছে? তা তারা বোলতে পারলে না। গালাগালি দিয়ে বললুম, ব্যাটারা খালি ভাং খাবে, আর তুলসীদাস কোরবে; কিন্তু বাড়ীতে ডাকাত পোড়লে তার খোঁজ রাখবে না। নিজে খুব সাবধান হলুম; এমন কি, বিকেলে দিন-কয়েক খেলতে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ কোরে দিয়ে, আমার বাগানের নষ্ট শ্রী উদ্ধারের চেষ্টায় মনোযোগ দিলুম। কিন্তু এত সাবধানে থাকা সত্ত্বেও, যুদ্ধের সময় পাহাড়ীদের আক্রমণের মত, হঠাৎ এক-একদিন দেখতুম, বাগান আমার তোলপাড় হোয়ে রয়েছে।

অপরাধীদের গ্রেপ্তার করবার আগেই, তাদের কি-কি সাজা দেওয়া হবে, দিন-রাত মনের মধ্যে তারই জল্পনা চোল্‌তে লাগ্‌ল। স্কুলেও দুই-একজনের কাছে পরামর্শ পাওয়া যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু কোথায়? কাদের যে শাস্তি দেবো, তার ঠিকানা নেই। মনকে প্রবোধ দিতে লাগলুম, আচ্ছা, যে দিন ধরতে পারব, সেই দিন দেখা যাবে। সত্যি বোলতে কি,—বাগানের সখ থেমে গিয়ে, তখন আমার চোর ধরবার সখটাই প্রবল হোয়ে উঠ্‌তে লাগল।

শেষে এক দিন সত্যি-সত্যি-ই চোর ধরা পড়্‌ল। সন্ধ্যাবেলা মাঠ থেকে খেলা শেষ কোরে বাড়ী ফিরেছি; ফটক খুলেই দেখি, একপাল মেয়ে,—বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশটি,—বাগানে ছুটোছুটি কোরছে। তারা বেশীর ভাগই আমাদের প্রতিবেশী; দুই-একজনের বাড়ী একটু দূরে-দূরে। আমি কিছু না বোলে, একটা ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে, তাদের কীর্ত্তি দেখতে লাগলুম।

দেখলুম, তারা নির্ম্মম ভাবে আমার সাধের ফুলগাছ-গুলোর ওপর দিয়ে, দিব্যি ছুটোছুটি কোরে বেড়াচ্ছে। কোথাও গাছগুলো একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে;—কোন জায়গায় বেড়া ভেঙ্গে পড়েছে,—সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। আমি সেই আধা-অন্ধকার, আধা-আলো ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে লাগলুম। শেষে যখন অসহ্য হোয়ে উঠল, তখন একটা বড় গোছের হুঙ্কার ছেড়ে, বাঘের মত সেই মেয়েদের পালের মধ্যে লাফিয়ে পড়লুম।

দুপুরবেলা নির্জ্জন ঘাটের সিঁড়ির ওপর মাছগুলো খেলতে-খেলতে, হঠাৎ কিছুর আওয়াজ পেলে, যেমন নিমেষের মধ্যে চোখের আড়ালে পালিয়ে যায়,—আমার চীৎকার শুনে, মেয়েগুলো একসঙ্গে একটা আওয়াজ কোরে, একেবারে ফটক পেরিয়ে, ঠিক তেমনি ভাবে পালিয়ে গেল। তাদের পেছনে ছুটে-ছুটে আমি রাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলুম; কিন্তু একটাকেও ধরতে পারলুম না। বুদ্ধির দোষে যে তাদের ধরতে পারলুম না, এটা বুঝতে পারলুম। নিজের মূর্খতায় নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছা কোরছিল। এত দিন বাদে চোর হাতের কাছে এসেও পালিয়ে গেল।

মেয়েগুলো যেন তুবড়িবাজী! হঠাৎ একসঙ্গে অতগুলো মেয়ে যে কি কোরে পালাল, সেটা আমার বুদ্ধিতে কিছুতেই ঢুকল না। এই জাতই আবার বড় হোয়ে অবলায় পরিণত হয়!

রাগে গস্‌গস্‌ কোরতে-কোরতে বাড়ীর ভেতর ঢুকে, দরওয়ানদের ওপর তম্বী কোরে, নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছি,—দেখি, একটা মেয়ে তখনো ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্ধকারে তার মুখখানা ভাল কোরে দেখা যাচ্ছিল না; তবে সে যে মেয়ে, এটুকু তার কাপড় পরার ধরণ দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছিল। আমায় দেখে সে আর একটু অন্ধকারে সরে যাবার চেষ্টা করছিল। "আর পালাবে কোথায় যাদু"—বলে, লাফিয়ে গিয়ে তার হাতখানা চেপে ধরলুম।

হাত ধোরে তাকে টান্‌তে-টান্‌তে আমার পড়বার ঘরে ঠেনে নিয়ে গেলুম। আলোকে দেখলুম, সে শোভা;—তার চোখের কোণে একটুখানি দুষ্টু হাসি জ্বল-জ্বল কোরে জ্বলছিল। রাগের সময় তার সেই রকম হাসি দেখে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। টেনিশ র‍্যাকেটখানা একদিকে ফেলে দিয়ে, তাড়াতাড়ি জামাটা খুলে ফেললুম। তার পর কোণ থেকে একটা ছড়ি নিয়ে এসে, গায়ের জোরে সেটাকে টেবিলের ওপরে মেরে, একটা ভয়ানক আওয়াজ কোরে,

তাকে জিজ্ঞাসা করলুম,—"রোজ তোরা এসে বাগানে ঢুকে গাছ ভেঙ্গে দিয়ে যাস্ কেন ?" আমার সেই ভীষণ মূর্ত্তি ও ছড়ি ঘোরানোর বহর দেখে তার মুখ শুকিয়ে গেল। চোখের যে জায়গাটাতে তার হাসি দেখা যাচ্ছিল, সেখানে মুক্তোর মত একবিন্দু অশ্রু ফুটে উঠ্ল। আস্ফালনে ফল হোয়েছে বুঝতে পেরে, ঘন-ঘন টেবিলের ওপরে ছড়িগাছটা মারতে লাগলুম। শেষকালে তাকে বললুম, —"চল, তোকে পুলিশে দেবো।" পুলিশের ভয় দেখাতেই সে একেবারে ভেউ-ভেউ কোরে কেঁদে উঠ্ল। ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে মা ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন -"সন্ধ্যা বেলা ষাঁড়ের মতন চেঁচান হচ্ছে কেন ? বাড়ীতে কি ডাকাত পড়েছে না কি ?"

তাড়াতাড়ি ছড়িটাকে টেবিলের নীচে ফেলে দিয়ে আমি বল্লুম, "এই দেখ না, আজ ধরেছি। এরা রোজ-রোজ আমার গাছ ভেঙ্গে দিয়ে যায়।" মা আমাকে ধমক দিয়ে বল্লেন, "তা বোলে তুই পরের মেয়েকে মারবি ?"—এই বোলে শোভার হাত ধোরে তিনি টেনে নিয়ে গেলেন—সে তখন কান্না থামিয়ে, আঁচলে চোখ মুছতে-মুছতে মার সঙ্গে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

শোভা বাড়ীর ভেতর যাওয়ার পর, আমার একটু লজ্জা হোতে লাগল। মনে হোল, পরের মেয়ের ওপর অতটা করা ভাল হয় নি ;—তার ওপরে, শোভাদের সঙ্গে আমাদের খুব আত্মীয়তা ছিল। মনে হোতে লাগল, তার বাপ-মা টের পেলে হয় ত কি মনে কোরবেন। তখন, যে মেয়েগুলো পালিয়ে গিয়েছে, তাদের ওপর আমার রাগ হোতে লাগল।

শোভার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করবার জন্য আমার প্রাণটা ছটফট কোরতে লাগ্ল। বেশী ক্ষণ ঘরের ভেতর বোসে থাকা হোল না ; উঠে আস্তে-আস্তে বাড়ীর ভেতর চলে গেলুম। বাড়ীর ভেতরে গিয়ে দেখি, শোভা মার সঙ্গে গল্প কোরছে। তার সঙ্গে ভাব জমাতে আমার বেশী ক্ষণ দেরী লাগ্ল না,—মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হোয়ে গেল।

পর দিন থেকে আমি তাকে পড়াতে আরম্ভ করলুম। বাগানের সখ চুকে গিয়ে, তাকে লেখাপড়া শেখাবার সখ আমায় চেপে ধরল। তাকে লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে, নিজের পড়াশুনো যে গোল্লায় যেতে লাগ্ল, সেটা বেশ বুঝ্তে পারতুম। তাকে পড়াতে বসে, এক কথা সতেরোবার বলে দিয়ে, মান-অভিমান, আদর আপ্যায়নের পর যখন নিজে পড়বার ইতিহাসের কেতাবখানা সামনে ধরে বসতুম, তখন আমার শরীর ও মন থেকে উৎসাহ আর ধৈর্য্য নামে জীব-দুটো পালিয়ে যেত। শুধু তাই নয় ; ক্লান্তি এসে আমার হাত-দুখানা ধরে, এমন সোহাগ কোরে বিছানার দিকে ঠেলে নিয়ে যেত যে, তার বিরুদ্ধে একটা কথা বলতেও আর ধৈর্য্য থাকত না। একটুখানি লোক-দেখানো বিড়-বিড় কোরে, দিব্যি শুয়ে পড়া যেত।

একটা কথা আগেই বোলে রাখি। শোভা ছিল ব্রাহ্মণের মেয়ে, আর আমরা কায়স্থ। আমি ছিলুম বড় লোকের ছেলে ; আর তারা গরীব। দুই পরিবারের আর্থিক অবস্থার মধ্যে বিরাট একটা ব্যবধান ছিল। আর রক্তের ব্যবধান যে কতটা ছিল, সেটা কোন সমাজ-বৈজ্ঞানিক বোলে দিতে পারেন। কিন্তু সে সময়ে বয়সটা ছিল আমার এমন, যে বয়স বড় লোক গরীব লোক জানে না,—সুন্দর মুখ দেখলেই ভালবেসে ফেলে ;—কারুকে কিছু বোলতে পারে না।—ভালবাসার সুখ, দুঃখ, বেদনা একলাই ভোগ কোরতে-কোরতে পার হোয়ে যেতে হয়। এই বয়সে শোভাকে আমি ছাত্রীরূপে পেয়েছিলুম,—তাকে পড়িয়ে কি আর নিজের পড়বার অবসর থাকে ?

কিছু দিন এই রকম পড়বার পর, এক দিন সে পড়তে এল না। তার পর এক দিন,—তার পর আর এক দিন,—এই রকম করে ক'দিন না আসার পর, আমি একদিন তার মাকে জিজ্ঞাসা কোরলুম—"শোভা আর পড়তে আসে না কেন ?"—তার মা বল্লেন—"সে এখন বড় হোয়েছে, এখন আর তার পড়া-শুনো করা ভাল দেখায় না।"—বুঝতে পারলুম, তার পর্দ্দা পোড়ে গেল। বুঝলুম, আমার জীবনে সে হারিয়ে গেল। দিন-কতক বড় কষ্ট হোয়েছিল ; কিন্তু আস্তে-আস্তে স্বপ্ন ছুটে গেল। আবার বাগান, টেনিস-খেলা,—আবার আকবর, হুমায়ুন, জয়চাঁদ রাজার বাপের শ্রাদ্ধ কোরতে উঠে-পোড়ে লেগে গেলুম। সামনেই ছিল পরীক্ষা। তিনটে-চারটে মাষ্টারের দাপট, আর চাপটের চোটে, দুনিয়া অন্ধকার দেখতে-দেখতে, ডুব-সাঁতারে প্রবেশিকা-সমুদ্র পার হোয়ে, এ-পারে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কলেজে পোড়তে-পোড়তে শুনলুম, শোভার বিয়ে হবে। পাত্র এফ-এ পড়ে—বিয়ের পর শ্বশুর-বাড়ী

থেকেই সে পড়া-শুনো কোরবে। শোভার বাবার আর ছেলে-পিলে কেউ ছিল না। ঘর-জামাই থাকতে পারে, এমন জামাই তিনি অনেক দিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এত দিন পরে পাত্র পাওয়া গেছে,—এবার বিয়েটা হোলেই হয়।

শোভার বিয়ে হোয়ে গেল। শ্বশুর-ঘর কোরতে হবে না জেনে নিশ্চয় তার খুবই আহ্লাদ হয়েছিল; কারণ সেটা তাকে দেখ্‌লে বুঝতে পারা যেত। আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে শোভাদের বাড়ীর ভেতরটা প্রায় সবখানি দেখা যেত। মাঝে-মাঝে দেখতুম, শোভা সেলাই কোরছে;—কখনো বা স্বামীর সঙ্গে গল্প কোরছে। কখনো-কখনো—আমার সঙ্গে তার চোখোচোখি হোয়ে যেত,—অপ্রস্তুত ভাবে আমরা দু'জনেই ঘাড় ফিরিয়ে নিতুম। আমি খানিকক্ষণ ধোরে ছাদের কড়িকাঠ, বরগাগুলো গুণে, যোগ-গুণ-ভাগ কোরে, আর-একবার আড়-চোখে তাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখতুম, শোভা সেখান থেকে সরে পড়েছে। আমার কাছে পড়া বন্ধ করার পর থেকেই, তার সঙ্গে কথা বোলতে আমার কি রকম একটা সঙ্কোচ হোত। তার বিয়ে হবার আগে ও পরেও আমি তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা কোরেছি; কিন্তু কি জানি কেন, তার সঙ্গে কথা বোলতে পারি নি। নিজের সঙ্গে মনে-মনে কত দিন এই তর্ক করেছি; কিন্তু উত্তর পাই নি।

শোভার স্বামী ও আমি এক কলেজেই পড়তুম। সে আমাদের এক ক্লাস ওপরে পড়ত। বিয়ের পর শ্বশুর-বাড়ী থেকেই সে পড়া শুনো কোরতে লাগল। পাশের বাড়ীতে বাস কোরলেও, তার সঙ্গে কখনো আমার আলাপ-পরিচয় হয় নি। এমন হোয়েচে—হয় ত এক দিন দু'জনেই একসঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে, পাশাপাশি এক মাইল রাস্তা চলে, কলেজে গিয়ে ঢুকলুম; অথচ পথে আমাদের একটা কথাও হোল না।

শোভার বিয়ে হবার প্রায় বছর-দুই পরে এক দিন হঠাৎ তার বাবা মারা গেলেন। তিনি অনেক দিন থেকে হৃদ্‌রোগে ভুগ্‌ছিলেন; কিন্তু এত শীগ্‌গীর যে মারা যাবেন, তা আমরা কেউ ভাবিনি। তার বাবা মারা যাওয়াতে, তাদের সংসারের অবস্থা একটু খারাপ হোয়ে গেল। তার স্বামী মাস-কয়েক পরে লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে, শ্বশুরের চাকরীতে ঢুকে পড়ল।

শোভার আর আমার মধ্যে যে ব্যবধানটা নিত্যই বেড়ে চলেছিল, আমার স্ত্রী আসাতে সেটা একটু-একটু কোরে কমে আসতে লাগল। আমার বিয়ের পর প্রায়ই শোভাকে দেখ্‌তুম, সে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প কোরতে আমাদের বাড়ী আসে। এক দিন আমি শোভার সঙ্গে কথা বোলে ফেল্‌লুম। আমার কথায় প্রথমটা সে কেমন একটু জড়সড় হোয়ে উঠ্‌ল;—কিন্তু দুই একটা কথাবার্ত্তা হওয়ার পর, তার সেই পুরোনো দিনের সহজ সরল ব্যবহার ফিরে এল।

কিছু দিন আমরা বেশ মনের আনন্দে দিন কাটাচ্ছিলুম; কিন্তু এ রকম বেশী দিন চোল্‌ল না। শোভার স্বামীর চাল বিগড়োতে আরম্ভ কোর্‌ল। অবিশ্যি খবরটা আমি আমার স্ত্রীর মুখ থেকেই শুনেছিলুম।

আমার বিয়ের পর শোভাকে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে দেখ্‌তে পেতুম। হঠাৎ তার আসা-যাওয়া বন্ধ হোয়ে গেল। কয়েক দিন ধোরে আমার স্ত্রীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা কোর্‌তে-কোর্‌তে এক দিন প্রকাশ হোয়ে পড়্‌ল। শুন্‌লুম, তার স্বামী তাকে আমাদের বাড়ী আসতে বারণ কোরে দিয়েছে,—আমার সঙ্গে কথা বলা, কিম্বা আমাদের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করা তার স্বামীর ইচ্ছা নয়।

অবিশ্যি কথাটা সে আমার স্ত্রীকে খুব গোপনে বোলে-ছিল, আর মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়েছিল, আমি যেন এ কথাটা না জান্‌তে পারি। ক্রমে তার স্বামীর গুণের কথা একটু-একটু কোরে জান্‌তে পার্‌লুম। সে ভীষণ মাতাল, প্রায় রাত্রেই বাড়ী ফেরে না,—এমন কি, মাঝে-মাঝে শোভাকে মার-ধর পর্য্যন্ত করে।

সেই দিন থেকে শোভার ভাব্‌না আমায় অষ্টভুজের মত আঁকড়ে ধোর্‌ল। তার দুঃখে সমবেদনায় আমি রাত্রি-দিন অস্থির হোয়ে বেড়াতে লাগ্‌লুম। আমার অন্যমনস্ক ভাব দেখে, আমার স্ত্রী প্রায়ই জিজ্ঞাসা কোর্‌ত, তোমার কি হোয়েছে? কি হোয়েছে তার উত্তর দিতে পার্‌তুম না;—মনে হোত, সত্যিই আমার কিছুই ত হয় নি। অথচ, সব কাজের ভেতর, সমস্ত আনন্দ ও সুখের মধ্যে, একটা ব্যথা এমন সজাগ হোয়ে থাক্‌ত যে, সুস্থির হোয়ে কোন কাজ কোরতে পার্‌তুম না।

হয় ত দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া শেষ কোরে আমরা দু'জনে ঘরে বসে হাসি-তামাসা কোর্‌ছি;—হঠাৎ দেখ্‌লুম,



পাদ-প্রক্ষালন

Blocks by Bharatvarsha Halftone Works

The Emerald Printing Works, Calcutta.

বিষণ্ণ মুখে শোভা তাদের জানলার গরাদে ধরে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নেমতন্ন-বাড়ী ভূরি ভোজনের সময় পংক্তিতে বসে দূরে বুভুক্ষু কাঙ্গালীর চাহনি দেখ্‌লে মনের মধ্যে যে ভাব হয়, আমার ঠিক তাই হোত; প্রাণ-খোলা হাসি চট কোরে থেমে যেত,—একটা বালিস টেনে নিয়ে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে পোড়তুম। স্ত্রী হয় ত জিজ্ঞাসা ক্যোর্‌ত, কি হোল? চোখ বুজে মটকা মেরে পোড়ে থাক্‌তুম; মনে হোত, কি হোল তা নিজেই জানি না, তার আর কি উত্তর দেবো।

কখনো বা পূর্ণিমা রাতে ছাদের ওপর বোসে আমরা গল্প কোর্‌ছি; চাঁদের আলোর ঢেউয়ে মনটা কোন সুদূরে উড়ে যাচ্ছে;—হয় ত স্ত্রীর গলা ধোরে তার হাস্যময় অধরে একটা চুম্বন দেবার উপক্রম কোরেছি,—হঠাৎ শোভার একটা চাপা কান্নার আওয়াজ আমাদের সেই আনন্দের মাঝখানে বিষ-মাখান শরের মতন এসে পোড়ল। কান্নার সঙ্গে-সঙ্গে তার স্বামীর চীৎকার ও প্রহারের শব্দ; মাঝে-মাঝে আমার অসহ্য হোয়ে উঠ্‌ত। এক-এক দিন সহ্য কোর্‌তে না পেরে, শোভার স্বামীকে বেশ কোরে শিক্ষা দেবার জন্য উঠে পোড়্‌তুম; কিন্তু আমার স্ত্রী আমায় ধোরে রাখত্‌। রাগ থেমে গেলে মনে হোত, তাই ত, তাকে শিক্ষা দেবার আমার কি অধিকার আছে? ওরা স্বামী-স্ত্রীতে যা কর্‌বার, তা নিজেরাই বোঝাপড়া কোরুক।

শোভার দুঃখ আমাদের দাম্পত্য-জীবনে ক্রমেই এমন একটা অবসাদের ছায়া এনে ফেল্‌তে লাগ্‌ল যে, ক্রমে সেটা সহ্য করা আমাদের পক্ষে বড় কষ্টকর হোয়ে দাঁড়াল। মাঝে-মাঝে আমরা ভাব্‌তুম যে, বাড়ীটা বিক্রি কোরে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই। কিন্তু মা তখনো বেঁচে ছিলেন,—ভিটে বিক্রি কর্‌বার কথা তুল্‌তেই সাহস হোত না। আর বিক্রি কর্‌বার কারণ ত কিছুই বল্‌বার ছিল না। নিজের মনকে বোঝাতুম, পরের দুঃখ দেখে তোমার প্রাণ যদি এত ব্যাকুল হয়, তবে পৃথিবীতে শুধু ত শোভা একাই দুঃখী নয়;—রাস্তায় চলে বেড়াতে যে কত দুঃখের ছবি চোখের সাম্‌নে পড়ে,—কৈ তাদের দুঃখ দেখে এক দিনও ত একবিন্দু চোখের জল পড়ে না।

ক্রমে আমার জীবনে উৎসাহ, সুখ—সব একেবারে নিভে আসতে লাগ্‌ল। বাড়ীতে চুপ-চাপ কোরে নীচে ছেলে-বেলাকার সেই পড়বার ঘরখানাতে বোসে থাক্‌তুম। অনেক সময়ে এমন হোয়েছে যে, দু-তিন দিন বাড়ীর কারুর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত হয় নি। আমার স্ত্রীর ভাবে ও কথাবার্ত্তায় বুঝ্‌তে পার্‌তুম যে, সে আমায় সন্দেহ কোর্‌তে আরম্ভ ক্যোরেছে। এ আবার একটা নতুন উপদ্রব আরম্ভ হোল। সে বোধ হয় ভাব্‌ত, আমি শোভাকে ভালবাসি। দুটো ভাবনায় পোড়ে আমি দিশেহারা হোয়ে যেতুম। মনে হোত, এইবার বুঝি পাগল হোয়ে যাব।

আমার স্ত্রী বেশ বুঝ্‌তে পার্‌তো যে, আমি কোন কথা তার কাছে গোপন কোরে রাখ্‌ছি। সে ভাবত, আমাদের দু'জনের ভালবাসার মধ্যে যে একটা ছায়া পোড়েছিল,—ক্রমে সেটা বেড়ে চলেছে। আমার মনে হোত, সে আমাকে আমার দুঃখ এবং অবসাদের কারণ জিজ্ঞাসা করবার জন্য ছটফট কোরে বেড়াচ্ছে; অথচ ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা কোরতে পাচ্ছে না।

আমি এক দিন তাকে অনেকক্ষণ ধোরে বুঝিয়ে বোলে দিলুম যে, তার কোন ভয়ের কারণ নেই। অনেক কান্না-কাটির পর, তার মনে যা সন্দেহ ছিল, সেটা দূর হোয়ে গেল। আমারও মনে হোল, যাক্‌গে, এবার থেকে আর কিছুই ভাববো না। জোর কোরে মনের মধ্যে স্ফূর্ত্তি এনে আবার দিন কাটাতে চেষ্টা কোরতে লাগ্‌লুম।

এই সময় আমাদের একটা ছেলে হোল। নতুন অতিথির হাসিতে আমাদের মনের কালো মেঘ কেটে গিয়ে, আবার নব-প্রভাতের আলোয় উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌ল।

আমাদের ছেলে হবার কিছুদিন পরেই মা মারা গেলেন। বাবা অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মা এই কটা বৎসর এক রকম জীবন্মৃত অবস্থায় ছিলেন। নাতির মুখ দেখবার জন্যই বোধ হয় এই কটা বছর বেঁচে ছিলেন।

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ আমার কপালে নেই। বেশ দিন-গুলো কাটছিল, হঠাৎ মা মারা গিয়ে সব ওলোট-পালট হোয়ে গেল। দিন কয়েক ত পৃথিবী অন্ধকার দেখ্‌লুম। তার পর যখন একটু-একটু কোরে শোকটা কমে আস্‌তে লাগ্‌ল, ঠিক সেই সময়ে, অর্থাৎ মার মৃত্যুর ঠিক বছর দেড়েক পরে, এক মাসের মধ্যে আমার স্ত্রী ও আমার ছেলে আমাকে ফেলে চলে গেল।

বাস্! দুনিয়ার সঙ্গে হিসেব-নিকেশ হোয়ে গেল। আবার নীচের পড়বার ঘরখানাতে এসে আস্তানা নিলুম। বসে-বসে দেখ্‌তুম, সামনেই আমার ছেলেবেলাকার বাগান এখন আগাছায় ভরে উঠেছে। মালী একটা ছিল বটে, কিন্তু সে কি আর সে রকম যত্ন নিতে পারে। ওপরে যদি কোন দরকারে যেতে হোত, ত, নিজের ঘরের মধ্যে ঢুক্‌তে পারতুম না। অত বড় বাড়ী খাঁ-খাঁ কোরত। এক আমি, আর আমার জন-ছয়েক চাকর ছাড়া বাড়ীতে, অন্য লোক ছিল না। ভাবলুম, এখানে আর থাকা নয়—একবার বেরিয়ে পড়া যাক্। যেমন মনে হওয়া, অমনি বেরিয়ে পড়া। এখন ত আর কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। মনে আছে, একবার কি একটা কাজের জন্য আমায় দিনকতক বাহিরে যেতে হয়েছিল। তার জন্য তিন রাত্রি ধরে আমার স্ত্রী কান্নাকাটি কোরেছিল।

বেরিয়ে ত পড়্‌লুম; এখন যাই কোথায়? কাশীর একখানা টিকিট কিনে রেলে উঠে পোড়্‌লুম। তার পর বিন্ধ্যাচল, চুনার—এমনি কোরে এক-এক জায়গায়, কোথাও এক দিন, কোথাও দু-মাস কাটিয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। বিদেশে নতুন জিনিস, নতুন আবহাওয়ার বৈচিত্র্যের মাঝেও আমার বাড়ীটা যেন আমায় টানতে থাকত। পাশের বাড়ীর কথা মনে হোত, শোভার মুখ মনে পোড়্‌ত; ভাবতুম, সে কেমন আছে? হয় ত তার স্বামী তাকে কত কষ্ট দিচ্ছে। বিদেশে গিয়েও দেখলুম, শান্তি নেই। মনে হল, বাড়ীটা থাকতে দেখছি আর শান্তি পাব না। ঠিক কোরলুম, পুরোন দিনের শেষ স্মৃতি বাড়ীটা এবার বেচে ফেল্‌ব,—দেখি, তাতে যদি একটু শান্তি পাই। আমার বিষয়-আশয় যারা দেখত—তাদের চিঠি লিখে দিলুম, খরিদ্দার দেখ, বাড়ীটা বেচে ফেল্‌ব। আমার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী লিখলেন, এত দিনের ভিটে বেচে ফেলবার কি দরকার! পিতামহের আমলের কর্ম্মচারীকে লিখে দিলুম, সে বিষয়ের কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করবার অধিকার যখন তোমায় দেওয়া যাবে, তখন আমায় জিজ্ঞাসা কোরো;—আমার বিষয়, আমি যা ইচ্ছা তাই কোরবো। তখন আমার মেজাজের ঠিক ছিল না।

আমি তখন দাক্ষিণাত্যে কোন একটা জায়গায় দিন কতকের জন্য বাসা বেঁধেছি। খবর এল, খদ্দের ঠিক হোয়েছে; কিন্তু বিক্রির সময় তোমাকে একবার আস্‌তে হবে। দিন কতক পরেই যাব বোলে তাদের লিখে দিলুম। বুকের ভেতরটার বোঝাটা সে সময় একটু কমে এল।

বাড়ীতে গিয়ে যে দিন পৌঁছলুম, সে দিন বোধ হয় কোজাগর পূর্ণিমা। দিন কয়েক আগেকার উৎসবের শেষ চিহ্ন তখনো সহরের দুই-এক জায়গায় দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছিল।

বাড়ীতে ঢুকেই দেখি, আমার সাধের বাগান একেবারে জঙ্গলে ভরে রয়েছে; বড়-বড় জংলী গাছ মাথা খাড়া কোরে দাঁড়িয়ে রোয়েছে,—লাল সুরকীর রাস্তার চিহ্নমাত্রও নেই। আমার আগমনে গাছগুলো যেন নতুন লোক দেখে একটা অস্বস্তির হাঁফ ছেড়ে, তাদের মর্ম্মর ভাষায় একটু আর্ত্তনাদ কোরে, তাদের প্রতিবেশীদের সতর্ক কোরে দিল।

কোন রকমে রাস্তা কোরে নিয়ে, নীচের সেই ঘর-খানাতে গিয়ে, আলো জ্বেলে বোসে পড়লুম। দু-দিন রেলগাড়ীর ঝাঁকুনীতে শরীরে অবসাদ এনেছিল। সেই-খানেই ধূলো ঝেড়ে শোবার বন্দোবস্ত কোরে নিলুম। ঘুম কিছুতেই আসছিল না। ছেলেবেলাকার বন্ধু আমার সেই সব চেয়ার-টেবিলগুলো যেন আশ্চর্য্য হোয়ে, আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে, তাদের মৌন ভাষায় কি বোলছিল। কিছুক্ষণ এই রকম শুয়ে থাকার পর উঠে পোড়লুম। কি জানি কেন, এত দিন পরে আমার শোবার ঘরখানা একবার দেখবার ইচ্ছে হোল। বাতি নিয়ে ধীরে-ধীরে সেই ঘরখানায় গেলুম। চারিদিকে ঝুল, মাকড়সার জালে ঘরটা একেবারে ভর্ত্তি হোয়ে রয়েছে। বাতীটা এক কোণে রেখে দিয়ে, খাট-খানাতে গিয়ে বসলুম। নানা রকম স্মৃতি আমার মনকে একেবারে আচ্ছন্ন কোরে ফেলছিল। হঠাৎ একবার চমক ভেঙ্গে যেতেই দেখি, বাতিটা কখন নিভে গেছে,—অন্ধকার ঘরে ভূতের মতন একলা বোসে আছি।

বিছানা ছেড়ে উঠে জানালা খুলে দিতেই, এক ঝলক চাঁদের আলো এসে ঘরখানাকে একেবারে ভাসিয়ে দিলে। নির্ম্মল আকাশে পরিপূর্ণ চাঁদ হাসছিল। আমি জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। মনে হচ্ছিল, আমার প্রিয় যারা,—যারা অনেক দিন আগে আমার কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে চলে গেছে, তারা বুঝি এই জ্যোৎস্নাকে দূত কোরে আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে,—এই জ্যোৎস্নার পরপারে মৃত্যুর

সুবর্ণ-তোরণের নীচে আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছি,—এস, চলে এস।

হঠাৎ একটা খট্ কোরে কিসের আওয়াজ হোতেই, নীচের দিকে চেয়ে দেখলুম, শোভাদের ঘরের জানলার গরাদেয় মাথা দিয়ে শোভা দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্পষ্ট শোভার মুখখানা দেখতে পেলুম। সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তি আমাকে দেখেই মাথা নীচু কোরে ফেল্লে। অনেকক্ষণ দেখবার পর বুঝতে পারলুম, শোভার বিধবা বেশ। তাকে দেখে মনে হোল, পরিপূর্ণ পূর্ণিমার জীবন্ত মূর্ত্তি যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখতে-দেখতে আবার আর একটা ভাবনা আমায় চেপে ধোরতে লাগল। আমি গরাদেয় মাথাটা দিয়ে নীচু দিকে মুখ কোরে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে চেয়ে দেখি, সে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দু'জনে আমরা মুখোমুখী কোরে সেই ভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, নীরবে বুকের বোঝা নামাতে লাগলুম। শোভাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তার সর্ব্বাঙ্গ কথা বোল্‌ছে। আমি সেইখান থেকে বল্লুম "শোভা, আমাকে কি কিছু বোলতে চাও?" কথাগুলো কিন্তু আমি নিজের কাণেই শুনতে পেলুম না। তার পর কখন আমার মাথা নীচু হোয়ে এসেছে,—ঘুম-পাড়ানীর দেশ থেকে ঠিকরে-আসা একটু বাতাস কখন আমার চোখের ওপর হাত বুলিয়ে চলে গেছে, বুঝতে পারি নি। ঠাণ্ডা বাতাস লেগে তন্দ্রাটা যখন ভেঙ্গে গেল, তখন শোভা চলে গেছে।

বছর কয়েক পরে কিসের কাজে কয়েক ঘণ্টার জন্য আবার একবার সহরে যেতে হোয়েছিল। আমাদের পাড়া দিয়ে যেতে-যেতে দেখলুম, যারা আমাদের বাড়ীটা কিনেছিল, তারা বাড়ীটাকে ভেঙ্গে একেবারে নতুন ফ্যাসানে তৈরি কোরেছে। আমার সাধের বাগানের দিকটায় দিব্যি একটা দোতলা আস্তাবল তৈরি হয়েছে। আর শোভাদের বাড়ীটা ভেঙ্গে মাঠ কোরে ফেলা হোয়েছে। সেখানে গুটিকয়েক ছোট ছোট মেয়ে খেলা কোরছে।

সঞ্চয়

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

জাপানী বঙ্কিম

উনিশ শতাব্দীতে জাপানে যে পরিবর্ত্তনের বিচিত্র ধারা বহিয়াছিল, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর-কোন দেশে পাওয়া যায় না। জাপানী জীবনে তখন কিছুকালের জন্য একটা বিষম ওলটপালট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—সকল দিকেই নূতনের ঝড়-ঝাপ্‌টায় পুরাতনের নড়্‌বোড়ে ভিত্ ভাঙিয়া-চুরিয়া খসিয়া-ঝরিয়া পড়িতেছিল। এবং বিশেষ করিয়া এই পরিবর্ত্তনের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল জাপানের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে।

এই আশ্চর্য্য অদল-বদলে, প্রাচীনতার আর্ত্তনাদে, নূতনের বিদ্রোহে, অভাবিত ভাবের আদান-প্রদানে জাপানীদের জীবনে প্রথম প্রথম যথেষ্ট নিয়ম-হীনতা এবং বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু নবযুগের অনাহত বাণী ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে যখন দেশময় জাহির হইয়া পড়িল, তাহার মর্ম্ম-কথা যখন সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিল, নূতনের ধাক্কাটা সহিয়া সহিয়া যখন সকলেরই ধাতস্থ হইয়া আসিল, জাপানীদের জীবন তখন আবার নূতন অবস্থার উপযোগী হইয়া উঠিল, সর্ব্বত্র আবার লুপ্ত শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল,—ঝড়ের পরে সমুদ্রে যেমন হয়!

এই সার্ব্বত্রিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে জাপানী গদ্য-সাহিত্য কিন্তু মিসরের 'ফিংসে'র মত অচল-অটল হইয়া ছিল,—নব যুগের নব ভাবের আঁচটুকু পর্য্যন্ত তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই! দেশময় তখন দুটি ভাষা চলিত ছিল—একটি কথিত ও একটি লিখিত। এই দুই ভাষার মধ্যে তফাৎও ছিল আকাশ-পাতাল। পরিবর্ত্তিত জাতীয়

জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি তাহাদের মুখে শোনা যাইত না—একালের জাপানীদের কাছে তাহারা নামে ছিল ভাষা, কাজে কিন্তু একেবারে বোবা!

ভাষার এই মৌনব্রত ভঙ্গ করিতে পারেন,—সারা দেশ এমন-একজন মানুষের মত মানুষকে খুঁজিতে লাগিল।

দেশের যখন দরকার পড়ে, মানুষের অভাব তখন হয় না। জাপানী-সাহিত্যেও যথার্থ মানুষের আবির্ভাবের জন্য বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইল না। কিন্তু তিনি আত্ম প্রকাশ করিলেন ঠিক সেইখান হইতে, যেখান হইতে তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত অল্প!

কথা-সাহিত্যকে এতদিন জাপানীরা—বিশেষ করিয়া জাপানী ক্ষত্রিয় সামুরাইরা—যার-পর-নাই অবহেলা করিয়া চলিতেন। কিন্তু ক্রমেই দেখা গেল, এই ঘৃণিত ও নিন্দিত গল্প-উপন্যাসের মধ্য হইতেই মাঝে মাঝে উচ্চ-সাহিত্যের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে!

অবশেষে Koyo Ozaki নামে একজন নূতন ঔপন্যাসিক আবির্ভূত হইয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, কথা-সাহিত্য নগণ্যও নয় জঘন্যও নয়,—দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা সে প্রকাশ করিতে এবং ভাষার মুখে সে যুগের উপযোগী বাক্য প্রদান করিতে পারে!

এই ওজ্যাকিই হইতেছেন জাপানের আধুনিক গদ্যের জন্মদাতা!

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে টকিওতে তাঁহার জন্ম। জাপানের ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে তাঁহার বিদ্যালাভ হয়। অনেক বিখ্যাত সহিত্যসেবকের মত ওজ্যাকিও বাঁধা-ধরা কলেজী লেখা-পড়া লইয়া বেশীদিন লাগিয়া থাকিতে পারেন নাই। ফলে 'গ্র্যাজুয়েট' হইবার আগেই তিনি বিদ্যালয় ছাড়িয়া, সাহিত্যকেই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন।

বিদ্যালয়ে থাকিতে-থাকিতেই ওজ্যাকি আরো কয়েক-জন উৎসাহী এবং রচনা-নিপুণ ছাত্র-লেখকের সঙ্গে Garakuta Bunko নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মাসিকখানি সুধুই যে ওজ্যাকির নামকে পাঠক-সমাজে চিনাইয়া দিয়াছিল, তাহা নয়; পরন্তু ইহার নানা রচনার মধ্যে জাপানী সাহিত্যের নূতন লিখন-ভঙ্গির পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছিল।

মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে ওজ্যাকি ক্রমে এতগুলি উপন্যাস লিখিয়া ফেলিলেন যে, পাঠক-সমাজ একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। এই উপন্যাসগুলির দ্বারাই জাপানে এক সম্পূর্ণ-নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইল।

ওজ্যাকি যখন প্রায় সত্তরখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, তখন তাঁহার স্বাস্থ্য গুরুতর পরিশ্রমে ভাঙিয়া পড়িল। তারপর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সাঁইত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল। মরণ-কালে তাঁহার শেষ-কথা এই,—"সাত-জন্মে যদি আমাকে সাহিত্য-সাধনা সম্পূর্ণ করিতে হয়, তবে আমি আরো সাতবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিব।"

প্রতিভার অবতার ওজ্যাকি জাপানে সাহিত্য-সম্রাটের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালে Rohan Koda, Bimyo Yamanda ও Shian Ishi-bashi প্রভৃতি শক্তিধর লেখকরা দেশবিখ্যাত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। জাপানী সাহিত্যে ওজ্যাকি একছত্র রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং এখনকার অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার অন্যতম শিষ্য Kyoka Izumi, এখন 'জাপানী মেটারলিঙ্ক' নামে সকলের কাছেই পরিচিত।

ওজ্যাকির সব-চেয়ে বড় কাজ হইতেছে, জাপানের লিখিত ভাষাকে নূতন ছাঁদে ফেলিয়া, নূতন শ্রী-সৌন্দর্য্যে, নূতন ভাব-ভঙ্গিতে সমুজ্জ্বল এবং উপভোগ্য করিয়া তোলা। যুগ যুগ ধরিয়া জাপানে যে লেখার চল্‌তি ধারা বজায় ছিল, অনেককেলে বাঁধা-দস্তুরে এবং অন্ধ অনুকরণে যাহা নীরস, আড়ষ্ট ও জ্যান্তে-মরা হইয়া ছিল, ওজ্যাকি সে ধারার গতিকে একেবারে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হাতে আসিয়া ভাষা আবার সুরে, ছন্দে ও জীবনে পরিপূর হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালীর বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনিও কথিত আর লিখিত ভাষায় যে অপূর্ব্ব মিলন-সাধন করিয়াছেন, তাহা বিরাট প্রতিভার নিদর্শন বলিয়া সমাদৃত হইয়া আছে।

ওজ্যাকি সারাজীবন লিখন-ভঙ্গির সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথাতেই প্রকাশ—"আমার লিখন-ভঙ্গির উপরেই আমার সর্ব্বস্ব গঠিত হইয়াছে।" তিনি কেবলমাত্র 'কি লিখিব', ইহাই ভাবেন নাই,

'কেমন করিয়া লিখিব'—এ-কথাটাও তিনি অহরহ চিন্তা করিতেন। প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত রচনা গভীর ভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া, তিনি তাহাদের নীর-ভাগ বাদ দিয়া ক্ষীর-ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক জাপানের মত, তাঁহারও মূল-মন্ত্র ছিল :—"পৃথিবীতে যার যা খারাপ, তা ছাড়ো ; যার যা ভালো, তা নাও।"

পাপ-দমনের উপায়।

আর্থার উড নিউ-ইয়র্কের ভূতপূর্ব্ব পুলিস-কমিশনর। পাপ-দমনের উপায়-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা এখানে তাহার সার-মর্ম্ম তুলিয়া দিলাম।

"পাপী দেখি দু-দলের। এক সখের, আর এক পেশাদার। সখের পাপীদের মধ্যে যাহারা ধরা পড়ে ও সাজা পায়, তাহারা অনেকে শাসন-পদ্ধতির দোষেই পেশাদার পাপীতে পরিণত হয়। অতএব, এই সখের পাপীরা যাহাতে সৎপথে আসিতে পারে, আমাদিগকে সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

কিন্তু এ কাজে হাত দিলে দুটি দিকে চোখ রাখা উচিত। প্রথম পাপ-কার্য্যে বাধা দেওয়া, দ্বিতীয় পাপ-কার্য্য নিবারণের উপায় বাহির করা। যাহারা পাপ করে, তাহাদের মনের ভিতরে খানিকটা খুঁৎ আছে। কুশিক্ষা ও অসৎ সংসর্গের দোষে, আমাদের অবহেলায় কিংবা সৎপথে চলিতে না-পারিয়া হতাশ ও বাধ্য হইয়া তাহারা শেষটা পাপ-কার্য্য অনুষ্ঠান করে। এই-সব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদিগকে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এমন অনেক লোক আছে, যাহাদের দেহ সম্পূর্ণতা লাভ করিলেও, মানস-বৃত্তি ঠিক পরিপূর্ণ গঠন লাভ করিতে পারে নাই। ইহাদের প্রত্যেকের মস্তিষ্কের বৃদ্ধি এক-একটা বিশেষ বয়সে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই হিসাবে ইহাদেরও মধ্যে আবার শ্রেণী-বিভাগ করিতে হইবে। নিউ-ইয়র্কের পুলিস্-বিভাগের মনোবিজ্ঞান-আগারের হিসাবে প্রকাশ, প্রতিদিন যে-সব অপরাধী ধরা পড়ে, তাহাদের মধ্যে অন্তত শতকরা পঁচিশজন লোকের মনোবৃত্তি অসম্পূর্ণ। এই শ্রেণীর লোক সমাজের মধ্যে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। কারণ, ইহাদের বিবাহে কেহ বাধা দেয় না। ফলে ইহাদের যে সব সন্তান হয়, তাহারাও পিতার অসম্পূর্ণতা লাভ করে। মানস-বৃত্তির অপূর্ণতা দূর না-হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদিগকে যদি কারাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত, দেশে তাহাহইলে এতদিনে পাপ-কার্য্যের সংখ্যা অনেকটা কমিয়া যাইত।

সুরাপান ও মাদক দ্রব্য সেবনের ফলেও অনেকের নিখুঁৎ ও স্বাভাবিক মনোবৃত্তি বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। উপরে যে জন্ম-বিকৃত-চরিত্র পাপীদের কথা বলা হইল, ইহারা সাধিয়া আপনাদিগকে সেই দলের মধ্যে লইয়া গিয়া ফেলে। সুতরাং এই স্বেচ্ছাবিকৃত-মন লোকগুলির চিকিৎসা-প্রণালীও প্রথমোক্ত দলের মতই হওয়া দরকার।

মাদক-দ্রব্য সেবনের অভ্যাস করা যেমন সহজ, তাহা ত্যাগ করা তেমনি শক্ত। তারপর, সমাজে একজন নেশাখোর আরো-অনেকের পতনের কারণ হয়। সুতরাং দেশে মাদক-দ্রব্য আমদানি বন্ধ করিবার জন্য একটা বিশেষ আইন হওয়া উচিত। যেখানে নানা কারণে এটা বন্ধ করা চলিবে না, সেখানে কর্ত্তৃপক্ষ যদি নিজের হাতে আমদানির ভার নেন এবং যথার্থ প্রয়োজন অনুসারে তাহা ব্যবহৃত হইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেও নেশা ও পাপের দমন-কার্য্য সহজ হইয়া আসিবে।

তারপর, দারিদ্র্য-সমস্যা। অনেক গরিব পেটের দায়ে পাপী হইয়া দাঁড়ায়। এখানে যদি দেশের অনাথ-ভাণ্ডার ও মুক্তহস্ত দাতারা সাহায্য করেন, তাহা হইলে পুলিসের মধ্যস্থতায় যথার্থ দুঃখীদের কষ্ট-মোচনের কতকটা উপায় হইতে পারে।"

শীতের দেশে ও গ্রীষ্মের দেশে

থিয়োডর ডি বুই একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গত মে মাসে প্রকাশিত, তাঁহার একটি প্রবন্ধ পত্রান্তর হইতে আমরা উদ্ধার করিয়া দিলাম।

শীতপ্রধান দেশের ভ্রমণকারীরা বীর বলিয়া বিখ্যাত হন। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ভ্রমণকারীদের দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না। ইহার কারণ কি ?

উত্তর-মেরুতে যে-সকল অনুসন্ধানী গমন করেন, ভূগোল ও বায়ু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু যাঁহারা অজ্ঞাত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যান, তাঁহারাও ভূগোল ও বায়ু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে

আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া দেন এবং সেইসঙ্গে আরো আবিষ্কার করেন,—মানুষের উপযোগী নূতন বাসস্থান, নূতন খনিজ দ্রব্য, নূতন ভেষজ, নূতন আশার ক্ষেত্র!

উত্তর-মেরুর পথিক যখন ভ্রমণ করেন, তখন প্রতিদিন তাঁহার যাত্রা-পথে নিত্য-নূতন বিস্ময়ের আবির্ভাব হয় না। কোনদিন বরফ পড়ে, কোনদিন বা আকাশ পরিষ্কার থাকে। পথ তাঁহার সামনে সর্ব্বদাই মুক্ত। মাঝে মাঝে তাঁহার আহার্য্য কম হয় বটে, কিন্তু তবু তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারেন, কারণ তাঁহার কার্য্যের সঙ্গে শ্রান্তির সম্পর্ক অনেকটা অল্প। তারপর হয় তিনি লক্ষ্যস্থলে গিয়া উপস্থিত হন, নয় ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তিনি সফল হোন আর বিফল হোন,—দেশের লোক তাঁহাকে সমান আদর ও সমান সম্মানের সহিত 'বীর' বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইবে। উত্তর-মেরুর মধ্যে দৈবক্রমে যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও দেশের লোকেরা চাঁদা তুলিয়া তাঁহার অনাথ পরিবারের ভরণ-পোষণের সংস্থান করিয়া দিবে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পথিক যখন ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার যাত্রা-পথে নিত্য-নূতন বিস্ময়! কখনো কাঁটার জঙ্গলের মধ্য দিয়া, প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিপদেই যুদ্ধ করিতে করিতে, নিবিড় দুর্ভেদ্য বন কাটিতে কাটিতে তিনি অগ্রসর হন! কখনো বা পথের মাঝে পড়ে দুরারোহ পাহাড়-পর্ব্বত —আর সে পাহাড়ের উপরে এমন দুর্জ্জয় শীত যে তার কাছে উত্তর-মেরুও হার মানিতে বাধ্য হয়,—কারণ এরূপ অভাবিত ঋতু-পরিবর্ত্তনের জন্য ভ্রমণকারী দরকার-মত কাপড়-চোপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া আসেন না। কখনো তিনি বিপুল-বিস্তার জলাভূমির মধ্যে গিয়া পড়েন,—সেখানকার দূষিত বাষ্পে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু-ভয়! কখনো বা তিনি হিংস্র অসভ্য মানব, হিংস্রতর জন্তু এবং হিংস্রতম বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের কবলগত হন! এদিকে খাবারের যোগান নাই। তাহার উপর জ্বর! তবু তিনি লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন! তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইলেও দেশের লোকে সহজে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে চায় না। তাঁহার নাম স্মরণীয় হইতে না হইতেই বিস্মৃতি-গর্ভে ডুবিয়া যায়। আর বিফল হইলে ত কথাই নাই! তখন তিনি মরুন আর বাঁচুন, সে কথা লইয়া কেহই মাথা-ঘামানো দরকার মনে করে না।"

যক্ষ্মার সঙ্গে যুদ্ধ

The Medical Review of Reviews নামক পত্রের একটি সম্পাদকীয় রচনার মর্ম্মোদ্ধার করিয়া দিলাম।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই দেহ-মন্দিরে যক্ষ্মা-জীবাণু পোষণ করিয়া বেড়াইতেছে। দেহের প্রতি আমাদের নিজেদের ব্যবহারের ফলেই, ঐ সকল জীবের দ্বারা আমাদের দেহে ইষ্টানিষ্ট সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

এই জীবাণুর সঙ্গে মানুষ আপোষে একটা মিটমাট্ করিয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা সর্ব্বদাই লড়ায়ের জন্য তৈরি হইয়া আছে—একটু ফাঁক্ পাইলেই 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া রুখিয়া দাঁড়াইবে!

শ্রীযুক্ত যক্ষ্মা-জীবাণু মহাশয় সময়ে সময়ে মুখ বদলাইবার জন্য এমন এক-একটা জাতিকে আক্রমণ করেন, যে বেচারীরা দুর্ভাগ্যক্রমে এর আগে তাঁহার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করে নাই! যেমন এস্কিমো ও আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ান জাতি বা দক্ষিণ সাগরের দ্বীপ-পুঞ্জের অধিবাসী। যক্ষ্মা-জীবাণুকে অতিথিরূপে সর্ব্বদা আশ্রয় দিয়া, আমরা তাহার সঙ্গে অনেকটা বনি-বনাও করিয়া লইয়াছি। তাই অনেক সময়েই আমরা তাহাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে থাকিয়াও সারাজীবনেও যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হই না। কিন্তু এই জীবাণুর দল যখন নূতন কোন জাতিকে আক্রমণ করে, তখন সে বেচারীদের—এক কথায়—ধরে আর মারে!

নিউ-ইয়র্কের শব-ব্যবচ্ছেদ-আগারে পরীক্ষার ফলে প্রকাশ :—সেখানে শতকরা নব্বইটি মড়ার দেহে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ লোকগুলি শৈশবে বা প্রথম যৌবনে যক্ষ্মা-জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল।

যক্ষ্মা-জীবাণু সংক্রামিত হইলেই মানুষের দেহ তাহা-দিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। এবং সেই-দিন হইতেই জীব-দেহের তন্তুর (tissues) সঙ্গে যক্ষ্মা-জীবাণুর যুদ্ধারম্ভ হইয়া যায়। ফলে অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই জীব-দেহের তন্তুগুলি এত জোয়ালো হইয়া উঠে যে,

জীবাণুরা দেহের ভিতরে আর-কোন গোলমাল না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে এবং কয়েকমাস বা কয়েক বৎসর বা সারা জীবন ধরিয়াই মানুষ হয় ত তাহাদের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইয়া যায়! দেহ যেখানে প্রস্তুত হইতে পারে না, অবিলম্বেই যক্ষ্মার আক্রমণ সেখানে ভয়ানক হইয়া উঠে। সময়ে সময়ে অত্যধিক পরিশ্রমে ও অবসন্নতায় বা অপ্রচুর আহারের ফলেও সুবিধা পাইয়া দেহের মধ্যে ঘুমন্ত যক্ষ্মা-জীবাণুরা, ফের জাগন্ত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ-ঘোষণা করে এবং দেহ-তন্তুর জয়লাভকে ক্ষণিক করিয়া দেয়!

অনেক মরন্ত রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বোঝা গিয়াছে যে, তাহারা সময়ে সাবধান হয় নাই বলিয়াই যক্ষ্মা জীবাণুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। তাহারা সাবধান হইয়াছে—কিন্তু অসময়ে। শুভ-মুহূর্ত্ত চলিয়া যাইবার পর তাহারা হয় ত প্রাণপণে সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলিয়াছে। তখন নিয়ম মানা আর না-মানা, এক কথা। আগে থাকিতে সাবধান হইলে, যক্ষ্মা-জীবাণুর আক্রমণ তাহারা হয় ত অনায়াসে বা অল্পায়াসে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিত।

যুদ্ধের মেয়ে-কর্ম্মীদের দাবি

আমেরিকার ব্রুকলিনে যে-সব মেয়ে-কর্ম্মী যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজ করিয়াছে, তাহাদের জন্য একটি সরকারি শয়ন-শালা আছে। সম্প্রতি সেখানে ভারি গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে। শয়ন-শালার জনকতক মেয়ে সিগারেটের ধূমপান করে। যাহারা ধূমপান করে না, ইহাতে তাহাদের অত্যন্ত আপত্তি। তাহারা এই ধূমপানের বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করিয়াছে। ফলে ধূম্রে ভক্তিশালিনীর দল চটিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, হোটেলে যখন মেয়েদের সিগারেট টানিবার অধিকার আছে, তখন এখানেও সে অধিকার থাকিবে না কেন? আর একটি মেয়ে আরো-বেশী জোর-গলায় বলিয়াছে, "কংগ্রেস যদি এ-কথা মানে, যে স্ত্রীলোকদের ভোট দেবার অধিকার আছে, তাহলে কেমন করে' আমাদের তামাক খাওয়া বন্ধ করা হয়, তা দেখে নেব! স্ত্রীলোক যদি ধূমপান করতে চায়, তবে সে তা করবেই। সে-ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের ধূম্র-উদ্গীরণ বন্ধ করা, আগ্নেয়গিরির ধূম্র-উদ্গীরণ বন্ধ করার চেষ্টার মত বিফল হবেই হবে!"

ভদ্র মেয়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রথাটা, পাশ্চাত্যদেশে এখন একটা চল্‌তি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মেয়েরা এখন পথে-ঘাটে, থিয়েটারে-বায়স্কোপে সর্ব্বত্রই, পুরুষদের মুখের উপরে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া, বুক ফুলাইয়া গট্ গট্ করিয়া চলিয়া যায়। অনেক পুরুষের সেটা ধাতস্থ হইতেছে না। কিন্তু এখন আর রাগ করা মিছে। কারণ, স্বাধীনতা জিনিষটা "বিষামৃত একত্র করিয়া" গঠিত। সেই স্বাধীনতা স্ত্রীলোকদের যখন দেওয়া হইয়াছে, তখন তাহার ভালো-মন্দ সমস্তই নীরবে নির্ব্বিচারে হজম করিয়া ফেলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য!

সফল ও বিফল

[শ্রীলীলা দেবী]

হের দেখো চামেলীর কলি!
নশ্বর নবীন আহা শুভ্র সুকুমার,
মঙ্গল মাধুরী-ভরা ক্ষুদ্র তনু তার,
পরিমলে ধায় যত অলি।

হায় দেখো নিশি অবসানে!
ঝরিয়া গিয়াছে দল নিরমল শোভা,
নিরবদ্য নিরুপম পূত মনোলোভা;
আপনারে ফুরায়েছে দানে!

কি সার্থক এতটুকু প্রাণ!
পূর্ণ সফলতা ক্ষুদ্র জীবনের মাঝ,
সুদীর্ঘ জীবন, তবু কই হয় কাজ,
থেকে যায় অসমাপ্ত গান!

পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি

[অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ, পি-আর-এস্]

(১)

বাল্যকালে স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে পড়িয়াছি, মারাঠারা দস্যুর জাতি। তাহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি লুণ্ঠন, তাহাদের যুদ্ধ-নীতির একমাত্র ভিত্তি লুণ্ঠন;—লুণ্ঠনই তাহাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন, জাতীয় নীতির একমাত্র চরম লক্ষ্য। বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রমে ইংরেজ ঐতিহাসিকের এই সিদ্ধান্ত মুখস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাল্য অতিক্রম করিবার পর, আর মনে-মনে ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন যেন মনে খট্‌কা লাগিয়াছে,—কেবল লুঠ-তরঙ্গের উপর যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, তাহা দীর্ঘ দেড় শতাব্দীকাল টিকিয়া গেল কেন,—কেমন করিয়া? গ্রাণ্ট ডফের গ্রন্থ যত্ন-সহকারে পাঠ করিলাম। উত্তর মিলিয়া গেল, মারাঠা-সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতাগণ কেবল যোদ্ধা বা দস্যু ছিলেন না। প্রথম মাধব রাওয়ের মত দূরদর্শী নৃপতির চিত্ত কেবল দিগ্বিজয়ে নিবদ্ধ ছিল না, বিজিত রাজ্যের সুশাসনের প্রতিও তাঁহাদের যথেষ্ট মনোযোগ ছিল। কিন্তু তাঁহাদের রাজ্য কেমন করিয়া, কোন নীতি অনুসারে শাসিত হইত, তাহার বিশেষ সন্ধান গ্রাণ্ট ডফের ইতিহাসে পাইলাম না। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—মারাঠাজাতির রাজনৈতিক ইতিহাস। তাঁহার গ্রন্থে, অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও পাণ্ডিত্য সহকারে তারিখের পর তারিখ মিলাইয়া, ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়া গিয়াছেন। মারাঠাদিগের শাসন-পদ্ধতির ইতিহাস তিনি রচনা করেন নাই। সে সময়ে বোধ হয় তাহার যথেষ্ট উপাদানও ছিল না।

গত চল্লিশ বৎসর কালের মধ্যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি বহু অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের ও পণ্ডিতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। যে সমস্ত পণ্ডিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ ও মার্কিনের সংখ্যাই বেশী। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একদল তীক্ষবুদ্ধি ভারতীয় পণ্ডিতও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নব-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-নীতির ফলে ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বহু বাঙ্গালী ছাত্রও আজকাল ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন যুগের তত্ত্বানুসন্ধানে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। বাঙ্গালা মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায়ও ইহার বহু নিদর্শন পাওয়া যাইবে। মারাঠা পণ্ডিতগণের মধ্যে স্যার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বিশ্ব-বিশ্রুত কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ের মধ্যেই একদল মারাঠা ঐতিহাসিক অদ্ভুত আত্মত্যাগ, অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের সহিত মহারাষ্ট্রের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে পরলোকগত বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের নাম বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত নহে; কারণ রাণাডের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি ইংরাজীতে লিখিত। রাণাডেই তাঁহার "মারাঠা শক্তির উত্থান" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সর্ব্বপ্রথম ইঙ্গিত করেন যে, মারাঠা জাতির উত্থান একেবারে আকস্মিক নহে; এবং মারাঠা জাতীয় জীবনের জনক শিবাজী কেবল মাত্র যোদ্ধা বা লুণ্ঠন-নিরত দস্যু ছিলেন না। রাণাডের গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, পরলোকগত রাও বাহাদুর চিমনাজী বাড সঙ্কলিত, পেশবা দপ্তরের কতকতগুলি মূল্যবান্ প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিল প্রকাশিত হয়। এই দলিলগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবার জন্য বিচারপতি রাণাডে তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ স্থগিত রাখেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পণ্ডিতপ্রবর সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন। তাহার পর "পেশবা-দপ্তরের দলিল-সংগ্রহ" নয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুত বিশ্বনাথ কাশিনাথ রাজবাড়ের বিপুল চেষ্টায় বহু সহস্র প্রাচীন দলিল ও লিপি প্রায় ২৪ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। রাজ-বাড়ে বলেন যে, আরও শতাধিক খণ্ডের অপ্রকাশিত

উপাদান তাঁহার নিকটে আছে। রাজবাড়ের "মারাঠা ইতিহাসের উপাদান" পাণ্ডিত্য ও স্বদেশ-প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ চিরদিন সম্মানিত হইবে। দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের পাটবর্ধন-পরিবারের কাগজপত্র, শ্রীযুত বাসুদেব বামন শাস্ত্রী খার "ঐতিহাসিক লেখ সংগ্রহ" নাম দিয়া দশখণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য খার মহাশয় ঘর-বাড়ী সমস্ত বিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রাও বাহাদুর দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস সম্পাদিত "ইতিহাস সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রে, রাজবাড়ে সম্পাদিত "রামদাস ও রামদাসী" এবং "ইতিহাস ও ঐতিহাসিকে" বহু প্রাচীন দলিল ও চিঠি-পত্র সংগৃহীত হইয়াছে। রাও বাহাদুর কাশিনাথ নারায়ণ সানে, রাজবাড়ে ও পারসনীসেরও পূর্ব্বে "কাব্যেতিহাস সংগ্রহে" কতকগুলি মারাঠী বখর ও চিঠিপত্র বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে সম্পাদন করিয়া, টীকা টিপ্পনী সহ, মুদ্রিত করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, প্রধানতঃ রাজবাড়ের চেষ্টায় মারাঠা ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশের জন্য, "ভারত-ইতিহাস-সংশোধক-মণ্ডল" নামক একটি সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। মণ্ডলের সম্পাদক সর্দ্দার মেহেন্দলে ও শ্রীযুক্ত পোতদারের অক্লান্ত পরিশ্রমে মারাঠা ইতিহাসের বহু উপাদান সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। মণ্ডলের সদস্যগণ ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশের বিরোধী। তাঁহাদের গবেষণার ফল মারাঠী ভাষায়ই লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হয়। সুতরাং মহারাষ্ট্রে জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলনের এই বিরাট চেষ্টার কথা বঙ্গদেশে এখনও অবিদিত রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় এবম্বিধ চেষ্টা বিরল না হইলেও, মারাঠা পণ্ডিতগণের বিরাট আত্মত্যাগ এ প্রদেশে মোটেই সুলভ নহে। বিশ্বনাথ রাজবাড়ে ইতিহাসের সাধনার জন্য কুমার-জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার মাসিক ব্যয় আট টাকার অধিক নহে। ভূমিতলে কম্বল পাতিয়া তিনি আপনার সুখ-শয়ন রচনা করেন। দেশ-ভ্রমণে তাঁহার চরণ-যুগলই সকল প্রকার যান-বাহনের প্রয়োজন সাধন করে। মহারাষ্ট্রের এই আত্মত্যাগ বঙ্গের একান্ত অনুকরণীয়। রাজবাড়ের মত বিদ্যানুরাগী সন্ন্যাসীর অধ্যবসায়ে পেশবাযুগের এত দলিল-পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে, পেশবাদিগের শাসন-পদ্ধতির বিবরণ সঙ্কলন করিবার সময় এখন আসিয়াছে।

(২)

পেশবাগণ মারাঠা-সাম্রাজ্যের নায়ক ছিলেন, কিন্তু সম্রাট ছিলেন না। তাঁহাদের বিরাট বাহিনী ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের "ভগবী-ঝাণ্ডা" বা জাতীয় পতাকা বহন করিয়াছে,—মহারাষ্ট্রের পার্ব্বত্য অশ্ব আটকে সিন্ধু নদের জল পান করিয়াছে,—কিন্তু পেশবাগণ কখনও স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিগণিত হন নাই। শাহুর জীবিত কালে বালাজী বিশ্বনাথ যেমন তাঁহার "মুখ্য প্রধান" মাত্র ছিলেন, তাঁহার বংশধর দ্বিতীয় বাজীরাও তেমনই নামে অন্ততঃ শাহুর বংশধর সাতারার বন্দী ছত্রপতি প্রতাপ সিংহের "মুখ্য প্রধান" ছিলেন। মারাঠা ছত্রপতি আবার কার্য্যতঃ ছিলেন তাঁহারই কর্ম্মচারী পেশবার বৃত্তিভোগী বন্দী, আর নামে ছিলেন মোগল বাদশাহের করদ সামন্ত। মোগল বাদশাহ, কেবল মাত্র নামে হইলেও, ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট বলিয়া সম্মানিত হইতেন। সুপ্রসিদ্ধ নানা ফড়নবীস আপনার আত্মজীবনীতে দিল্লীর বাদশাহকে পৃথ্বিপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গণেশকৃষ্ণ নামক মারাঠা কর্ম্মচারী ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দেও তাঁহার একখানি পত্রে দিল্লীর নাম-শেষ বাদশাহকে "সার্ব্বভৌম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ছত্রপতি সাম্ভাজীর বিধবা য়েসুবাঈএর একখানি পত্রেও দিল্লীর বাদশাহ সম্বন্ধে এই "সার্ব্বভৌম" শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। আর মারাঠা সাম্রাজ্যের পতনের ২৫ বৎসর পূর্ব্বে খর্ডার যুদ্ধ-গাথার অজ্ঞাত-নামা কবি মনে করিয়াছিলেন—দৌলত রাও সিন্ধিয়া দিল্লীশ্বরের আদেশেই হিন্দুস্থান ও গুজরাট ছাড়িয়া দক্ষিণে আসিয়াছেন।

হিন্দুস্থান আণি গুজরাথ সোডুল শিন্দে দক্ষণেত আলা।
হুকুম কেলা বাদশাহানী ত্যালা॥

মারাঠা সাম্রাজ্যের শেষ দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ মহাদজী সিন্ধিয়া যখন অন্ধ ও অক্ষম দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে, পেশবা মাধবরাও নারায়ণের নিমিত্ত "বকীল-ই-মুতলুকে"র সনন্দ গ্রহণ করেন, তখন তিনি এই সনাতন মারাঠা নীতির ও মারাঠা বিশ্বাসেরই অনুসরণ করিয়াছেন, কোন নবীন নীতির প্রবর্ত্তন করেন নাই।

এইখানেই শিবাজী ও তাঁহার পৌত্র শাহুর মধ্যে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। শিবাজী স্বাধীন হিন্দু-সাম্রাজ্যের

প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার গুরু রামদাসের নীতি—যত মারাঠা সকল এক পতাকা-মূলে মিলিত কর,—মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের বৃদ্ধি সাধন কর। শিবাজী কেবল মাত্র "ছত্রপতি" উপাধি ধারণ করেন নাই, তিনি "গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক" বলিয়া সম্মানিত হইতেন। মুসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও তাঁহার স্থানে হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। এই জন্য তিনি সাধ্য-পক্ষে মুসলমানের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। শাহু বাল্যকালে মোগল বাদশাহের অন্তঃপুরে প্রতিপালিত। তাঁহার পিতামহের মত কষ্ট-সহিষ্ণুতা তাঁহাতে আশা করাই অন্যায়। বাল্যে হয় ত তাঁহার মোগল শিক্ষকের নিকট শুনিয়া থাকিবেন যে, তাঁহার পিতামহ শিবাজী পার্ব্বত্য দস্যু ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। রাজভক্তির পাঠটা তিনি খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। তাই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, যখন মোগল-সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ, তখনও দক্ষিণে স্বীয় স্বাধীনতা প্রচার না করিয়া, শাহু দুর্ব্বল ফিরকসিয়রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, দশ-হাজারী মন্সব গ্রহণ করিলেন। পরলোকগত অধ্যাপক হরিগোবিন্দ লীময়ের নিকট শুনিয়াছি যে, শাহু মহারাজ পুণার দিল্লী দরোয়াজা নির্ম্মাণের বিরোধী ছিলেন—কারণ উত্তরের দিকে তোরণ ও দরোয়াজা নির্ম্মাণ করিলে সম্রাটের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে। শাহু সত্য-সত্যই দিল্লীর সম্রাটের প্রাধান্য ন্যায়সম্মত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আর পেশবাগণ এই বিশ্বাস অনুসারে কায করিতে সুবিধার অনুরোধে। তাঁহারা মালব বিজয় করিলেন বাহুবলে, কিন্তু তার পর দখলী-সত্বটা আইন অনুসারে পাকা করিবার জন্য আবার একটা বাদশাহী পরোয়ানা যোগাড় করিলেন। তখনকার দিনে কেহই ইহা অস্বাভাবিক বা অনাবশ্যক মনে করেন নাই। এমন ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করেন, তখন তিনি স্বীয় রাজধানী হইতে পলাতক, পরানুগ্রহজীবী।

মারাঠা সাম্রাজ্যে দিল্লীর সম্রাটের নীচেই সাতারার ছত্রপতি মহারাজার স্থান। পেশবা, প্রতিনিধি, সচিব প্রভৃতি তাঁহারই কর্ম্মচারী; তিনিই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। যখন সাতারার রাজা সকল ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত, তখনও সাম্রাজ্যের প্রধান-প্রধান নায়কগণ তাঁহাদের পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইতেন তাঁহারই নিয়োগ-পত্রের বলে। মারাঠা-সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্তও এই প্রথার কখনও ব্যত্যয় হয় নাই। এমন কি, যে বাজীরাও রঘুনাথ আপনার সামন্তদিগের অধিকার সর্ব্বপ্রকারে ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাঁহার সময়েও শিবাজীর বংশধরের এই ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি স্বীয় পদের নিয়োগ-পত্র ও বস্ত্রের নিমিত্ত আবাজী কৃষ্ণ শেলুকর নামক একজন কর্ম্মচারীকে সাতারার দরবারে পাঠাইয়াছিলেন। ছত্রপতি মহারাজের নিকট হইতে নিয়োগপত্র সংগ্রহ করা কিন্তু মোটেই কঠিন ছিল না। নানা ফড়্নবীস ও পরশুরাম ভাউ পটবর্দ্ধন যখন ষড়যন্ত্র করিয়া রঘুনাথ রাওএর কনিষ্ঠ পুত্র চিমনাজীকে বল পূর্ব্বক দ্বিতীয় মাধবরাওএর বালিকা পত্নী যশোদা বাঈয়ের অঙ্কে দত্তক পুত্র স্বরূপে স্থাপিত করিয়া, সাতারায় নিয়োগপত্রের জন্য আবেদন করেন, তখন তাঁহারা বিফল-মনোরথ হয়েন নাই। আবার রঘুনাথ রাওয়ের দত্তক পুত্র অমৃতরাও যখন সিন্ধিয়া দৌলতরাওয়ের প্ররোচনায়, ভ্রাতাকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় পুত্র বিনায়ক-রাওকে পেশবাদিগের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তখনও সাতারা হইতে নিয়োগপত্র ও বস্ত্রালঙ্কার সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। হোলি রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটগণের পক্ষে রোমে অভিষেক যেমন আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত, পেশবাদিগের পক্ষেও সাতারার ছত্রপতি মহারাজের সনন্দ সেইরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। তফাতের মধ্যে এই যে, মধ্যে-মধ্যে রোমের পোপ কোন-কোনও সম্রাটের অভিষেকে আপত্তি করিতেন, আর শিবাজীর অযোগ্য বংশধরের সে শক্তি বা সাহস কিছুই ছিল না। তাঁহারা দুর্দ্দশার এত নিম্ন স্তরে পৌছিয়াছিলেন যে, নজরের কয়েকটি টাকা পাইবার জন্য সকল প্রকার সনন্দ ও নিয়োগপত্রেই স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

পেশবাগণ নিয়োগপত্র সংগ্রহ করিতেন ছত্রপতি মহারাজের নিকট হইতে; অন্যান্য সামন্তগণ নিয়োগপত্রের নিমিত্ত আবেদন করিতেন পেশবার নিকট। পেশবা তাঁহাদের হইয়া ছত্রপতির দরবারে তদ্বির করিতেন। ১৭৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম মাধবরাও অচ্যুতরাও নামক এক ব্যক্তির নিকট লিখিয়াছিলেন যে, প্রতিনিধির পদে পূর্ব্ববৎ শ্রীনিবাস

পণ্ডিতকে বাহাল করা গেল,—তাঁহাকে ঐ পদে নিয়োগ-সময়োচিত-বস্ত্রের নিমিত্ত সাতারায় পাঠান গেল। শ্রীনিবাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পরশুরামের নিমিত্ত মাধবরাও সাতারা হইতে নিয়োগপত্র আনাইয়াছিলেন। আবার ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মাধবরাওই জীবনরাও বিঠ্ঠলের সুমন্ত পদের সনন্দের নিমিত্ত বাবুরাও কৃষ্ণের নিকট অনুরোধ-পত্র লিখিয়াছিলেন। এই বাবুরাও কৃষ্ণ ছিলেন পেশবারই কর্ম্মচারী। তিনি নামে ছিলেন সাতারার দুর্গাধ্যক্ষ; কার্য্যতঃ তিনি সাতারার বন্দী মহারাজের কারা-রক্ষক।

সাতারার মহারাজেরা সাম্রাজ্যের সকল সামন্তকে সনন্দ দান করিতেন বটে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহার কিছুই ছিল না। সাতারার দুর্গে তিনি বন্দী ছিলেন। একজন সামান্য ভৃত্য নিযুক্ত করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। তাঁহার খিদ্‌মতগার আসিত পুণা হইতে। তাহারা বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিত পেশবার নিকট। একবার সাতারার দুর্গে দাঙ্গা করিবার অপরাধে ছত্রপতি মহারাজ কয়েকজন কর্ম্মচারীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন,—কিন্তু তৎকালীন পেশবার আদেশে এই দণ্ড একেবারে রহিত হইয়াছিল।

সাতারার রাজার সহিত বোধ হয় মারাঠা-সাম্রাজ্যের নিম্নতম সেনানায়কও অবস্থা-পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইত না। একে তিনি সমস্ত ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত বন্দী, তাহাতে আবার তাঁহার আর্থিক দুরবস্থার সীমা ছিল না। একখানি মারাঠী পত্রে প্রকাশ যে, ছত্রপতি মহারাজের শাক উৎপাদন করিবার বাগান নাই,—পেশবা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে তদুপযোগী একখণ্ড ভূমি দান করিলেন। আর একখানি পত্রে প্রকাশ যে, যবতেশ্বরের শৈল হইতে সাতারার প্রাসাদে জলবাহী নল খারাপ হইয়াছিল বলিয়া পেশবার কর্ম্মচারী মেরামতের নিমিত্ত ৪০০০৲ টাকা চাহিয়াছিলেন—কিন্তু পেশবা সরকার ৮০০ টাকার অধিক মঞ্জুর করেন নাই। ছত্রপতি মহারাজকে সাধারণ গৃহস্থেরাও অনেক সময় তুচ্ছ করিত। সদাশিব মাবলঙ্কর নামক এক ব্যক্তি সত্যসত্যই ছত্রপতি মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ সম্ভাজী মহারাজের মহাবলেশ্বর প্রাসাদের ভিত্তির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রথম মাধব রাওয়ের অনুগ্রহে সাতারার বন্দী নৃপতির অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কিন্তু পেশবাদিগের পতনের পূর্ব্বে তিনি কখনও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন নাই।

মেঘের ছায়া

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

ক

ট্রেণ্ থেকে যখন নাম্‌লুম, তখন ঝিকিমিকি বেলা।

মাঠের পারে কচি-সবুজ বনভূমির শিয়রে, নিরেট্ ধোঁয়ার মত কালো মেঘের বুকের উপরে, চপলার তরাস-ভরা চোখের ইঙ্গিত জেগে উঠ্‌ছে বারংবার।

যেতে হবে অনেকখানি; ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনায় মনটা কেমন ভেরে এল। আমার এখানে আস্‌বার কথা ছিল সকালে। তখন যদি আসতুম, জমিদার-বাড়ীর পাল্‌কি পেতুম। কিন্তু দৈবগতিকে তখন আসতে পারি-নি; সুতরাং এবেলা সুধুই নিজের শ্রীচরণ-ভরসা।

বেয়ারাকে পিছু নিতে বলে, যতটা তাড়াতাড়ি পারলুম, পা চালিয়ে দিলুম।

কিন্তু মেঘেরা বোধ হয় আমার মত্‌লোব ধরে ফেল্‌লে। কারণ, হঠাৎ তারা এত চট্‌পট্ এগিয়ে এল যে, খানিক পরে আকাশের এধার-থেকে-ওধার-পর্য্যন্ত খালি দেখা

যেতে লাগল, মেঘের পর মেঘের ছুটোছুটি,— সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে, ক্ষ্যাপা বাতাস টল্‌মলে গাছের মাথায় মাথায় মাতামাতি করে' বেড়াতে লাগ্‌ল।

বেয়ারা বল্‌লে, "বাবু, এখুনি ঝড় উঠবে!"

—"তাইত দেখ্‌চি রে, কি করা যায় বল্ দেখি?"

—"এইবেলা ঐখানে গিয়ে উঠি চলুন"—বলে সে একদিকে আঙুল তুলে দেখালে।

খানিক তফাতেই বেড়-বাতাড়ের মাঝখানে একখানা হেলে-পড়া নড়্‌বোড়ে চালা-ঘর। তার পিছনেই একটা মস্ত বাঁশঝাড়, বাতাসের তালে তালে ক্রমাগত মাথা-নাড়া দিয়ে ঠক্‌ঠক্ করে দোল খাচ্ছে আর খাচ্ছে!

ওদিকে মাঠের উপরে ধুলোর ধ্বজা উড়িয়ে, বিচিত্র কলরব তুলে আচম্‌কা ঝড়ের আবির্ভাব হ'ল—সেইসঙ্গেই তীব্র-একটা অগ্নি-স্রোতে আকাশের বুক ভাসিয়ে ফুটে উঠল বজ্রের প্রচণ্ড অট্টহাস্য!

—"আমার দাদা বাজ্ পড়ে মরেছিল বাবু"—বলেই আমার বেয়ারাটা তার মনিবকে পিছনে ফেলে, সেই চালা-ঘরখানার দিকে ঘাড় গুঁজে চোঁচা দৌড় মারলে।

কিন্তু তখন তার বেয়াদফি দেখে রাগ করবার সময় আমার ছিল না। আমিও ছুটলুম।

খ

দাওয়ায় উঠে দস্তুরমত হাঁপাচ্ছি—হঠাৎ পিছন থেকে শুনলুম, "তোমরা কে বাছা?"

ফিরে দেখি, একটা বুড়ী আমার মুখপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা দেখেই বুঝলুম, ভারি গরিব সে।

বল্‌লুম, "আমরা ঈশানপুরের জমীদার-বাড়ী যাচ্ছিলুম, হঠাৎ দুর্যোগ দেখে তোমাদের বাড়ীতে এসে উঠেছি।"

বুড়ী আমার আগা-পাশতলায় তার স্তিমিত দৃষ্টি বুলিয়ে, সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলে, "তা বেশ করেছ, এসেচ বাবা—এ ত আমাদের পরম ভাগ্যি! হ্যাঁ বাবা, তুমি কি জমিদার-বাবুদের কেউ হও?"

আমার বেয়ারাটা বলে উঠল, "না রে বুড়ী না! আমাদের বাবু কল্‌কাতার খুব হোম্‌রা-চোম্‌রা উকিল, অনেক টাকা ওঁর আয়—বড় বড় সাহেব-জজ পর্য্যন্ত ওঁর কথা মেনে চলে—বুঝেচিস্? জমিদার-বাড়ীতে যাচ্চেন মাম্‌লার তদ্বিরে।"

আমার প্রতি বুড়ীর সম্ভ্রমের বহর যাতে বেড়ে ওঠে, সেইজন্যেই বেয়ারাটা এই জাঁকের কথাগুলো শুনিয়ে দিলে। তার ওপর-চালাকি আমার কিন্তু ভালো লাগ্‌ল না। সে আরো কি বলতে যাচ্ছিল—ধমক খেয়ে থেমে গেল।

বুড়ী বল্‌লে, "বাবা, এমন করে কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, যে ধুলো উড়চে! এস ভেতরে এস।"

বুড়ীর পিছনে পিছনে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুক্‌লুম। ছোট মেটে ঘর—স্যাঁৎসেতে, অন্ধকার। খড়ের আঁটি, ঘুঁটের বোঝা, দড়ি-দড়া, চটের বস্তা, হাঁড়ি-কুড়ি, বাসন-কোসন, চৌকি-মাচা, ঝুড়ী-ঝোড়া, ছেঁড়া মাদুর, চাদরহীন বিছানা, ওয়াড়হীন তৈলাক্ত বালিস প্রভৃতি হরেক রকমের ছোট-বড় জিনিষ সেই একখানি-মাত্র ঘরের মধ্যে চারিদিকে যেখানে-সেখানে ছড়ানো রয়েছে। এর মাঝে মানুষের ঠাঁই হয় কি করে, অবাক হয়ে তাই ভাবছি, এমন সময়ে বুড়ী ডেকে বল্‌লে, "খেঁদি, অ খেঁদি, একখানা পিঁড়ি আন্‌ত বাছা!"

"পিঁড়ি কি হবে ঠাকুমা?"—বলে যে মেয়েটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল, এই দারিদ্র্যের মধ্যে তাকে আমি একেবারে দেখবার প্রত্যাশা করি-নি! তার বয়স হবে বছর দশ; রংটি শাম্‌লা, গড়নটি গোল-গাল, মুখ-চোখ চমৎকার। সে আস্‌ছিল নাচের ভঙ্গিতে হেল্‌তে দুল্‌তে, হঠাৎ আমাকে দেখেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় বেঁকিয়ে অপলক চোখে অবাক হয়ে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, সে স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করে বস্‌ল, "তুমি আবার কোত্থেকে এলে?"

বাঃ, এর প্রশ্ন শুনলে মনে হয়, এর-সঙ্গে যেন আমার অনেকদিনের জানাশুনো!

আমি বল্‌লুম, "আকাশ থেকে।"

খেঁদি বিশ্বাস করলে না। চোখ কুঁচ্‌কে বল্‌লে, "আমার সঙ্গে ঠাট্টা?"

—"তবে তোমার সঙ্গে কি করব? গল্প শুনবে?"

খেঁদি এগিয়ে এসে একেবারে আমার হাত ধরে বল্‌লে, "গল্প? ওঃ, গল্প আমি বড্ড ভালোবাসি! ঠাকুমাটা জানি

ভুই, রোজ রোজ খালি এক গপ্পই বলে! তুমি নতুন গপ্প-টপ্প কিছু জানো?"

খেঁদি দেখছি, এক কথায় আমার সঙ্গে দিব্যি ভাব করে নিলে! আমি বললুম, "হুঁ নতুন গল্প জানি বৈকি!"

—"কটা জানো?"

—"তুমি যত শুনতে চাইবে তত বলতে পারি।"

—"কৈ, বল না!" এই বলে খেঁদি আমাকে নিয়ে রীতিমত জমিয়ে বসবার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে পাশ থেকে একটা কর্কশ স্বর শুনলুম,—"দেখ একবার মেয়ের রকমটা!"

এ ঘরে আরো লোক আছে! সচকিতে ফিরে দেখি, খড়ের গাদার এককোণে একটা হাড়-চামড়াসার বুড়ো থুথুড়ো মূর্ত্তি একেবারে যেন খড়ের সঙ্গে মিশিয়ে, আধ-শোয়া অবস্থায় বসে আছে! তরল অন্ধকারের মধ্য থেকে সুধু তার চোখদুটো মাঝে মাঝে নড়ে নড়ে উঠছিল! আচমকা দেখলে মনে হয়, এ যেন গঙ্গাযাত্রী রোগী!

সেই মূর্ত্তি তার বেরিয়ে-পড়া চোখদুটো আরো-বেশী ড্যাবডেবে করে, খনখনে গলায় বললে, "হ্যাঁ রে খেঁদি! তোর কি একটুও আক্কেল নেই রে? যে আসবে তার কাছেই গল্প শুনতে চাওয়া? ভারি মজা পেয়েছিস্ না?"—বলেই সে সাঁই-সাঁই করে এম্নি বিষম হাঁপাতে লাগল যে, আমার ভয় হ'ল—যায় বুঝি-বা বুড়ো দম-আট্‌কে এখনি মরে!

খেঁদি চুপি-চুপি আমার কাণে কাণে বললে, "ঠাকুদ্দা ভারি বকে! ঠাকুমা বলে বুড়োর ভীমরতি হয়েচে! আর-একটু পরে গপ্প শুনব—বুঝলে?"

গ

বৃষ্টি ত থামলই না উল্টে আরো বেড়ে উঠল। একবার ঘরের দরজা খুলে দেখলুম,—অন্ধকারের মস্ত-একটা ঘেরাটোপের মধ্যে, আকাশ আর পৃথিবী যেন মিলে-মিশে একসা হয়ে গেছে! আমি মহাসমস্যায় পড়ে গেলুম। রাতও ক্রমে বেড়ে উঠছে, আমি এখন যাই কোথায়?

খেঁদির ঠাকুমা বোধ হয় আমার মনের ভাবটা ধরে ফেললে। সে বললে "এ বৃষ্টিতে তোমার ত যাওয়া হ'তে পারে না বাবা! আজ আমার এখানে খেয়ে-দেয়ে, কোনরকমে মাথা গুঁজে রাতটা কাটিয়ে দাও। তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু কি করবে বল!"

আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, "না, না—তাও কি হয়!"

বুড়ী বললে, "গরিব বলে ঘেন্না কোরো না বাবা!"

এ-কথার উপরে আর কথা চলে না। অতএব বুড়ীর হাতের গরম গরম পরোটা আর ভাজা-ভুজি খেয়ে, উদর-দেবকে সেদিনের মত ঠাণ্ডা করলুম।

ওদিকে খেঁদি ঠিক ওঁৎ পেতে বসেছিল! খাওয়া-দাওয়ার পরই সে এসে আবার ধন্না দিয়ে পড়ল "এইবার গপ্প বল!"

খড়ের গাদার পিছন থেকে খেঁদির ঠাকুর্দ্দার খনখনে গলার আওয়াজ এল, "খেঁদি আবার! ভদ্দরলোককে একটু জিরুতে দে!"

বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমার স্বামীর কি কিছু অসুখ হয়েচে?"

বুড়ী বিরক্ত স্বরে বললে, "ব্যামো বলে ব্যামো বাবা? বাতের জন্যে উঠতে পারে না, হাঁপানির জন্যে কথা কইতে পারে না—মিন্‌সে আমার হাড়-মাস ভাজা-ভাজা করে খেলে! ও সুধু বসে বসে হাঁপাবে, খাবে আর বকবে—আর সংসারের সমস্ত ভাবনা ভেবে মরব আমি!"

আমি বললুম, "কেন, তোমার ছেলে—"

মাথায় করাঘাত করে বুড়ী আমাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, "আ আমার পোড়াকপাল, তাহলে আজ আর আমার ভাবনা কি ছিল! আমি রাক্কুসী ব্যাটা-বৌ দুই খেয়ে বসে আছি, থাকবার মধ্যে আছে খালি ঐ নাতনীটি!"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ী আবার বললে, "খেঁদিও বড় হয়ে উঠল, এখন আবার ওর বিয়ের ভাবনা ভাবতে হচ্চে!"

খেঁদি আমার পাশে দু'থাবা পেতে বসে হাঁ করে সব শুনছিল। সে বলে উঠল, "না, না, আমি বিয়ে করব না ঠাকুমা, ছিদামটা ভারি পাজি—আজ আমাকে সে বড্ড মেরেচে!"

বুড়ী হেসে বললে, "চুপ কর্ হাবা মেয়ে, চুপ কর্! যত বুড়ো হচ্চিস্ ততই যেন ধিঙ্গি হয়ে উঠছিস্! বেশ করেচে ছিদাম তোকে মেরেচে!"

খেঁদি চোখ মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ, বেশ করেচে বৈকি! ফের যদি সে আমার গায়ে হাত তোলে, আমি তাহলে কাম্‌ড়ে তার কাণ কেটে নেব, দেখো না!"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "ছিদাম কে?"

খেঁদি ভয়ে-ভয়ে ঠাকুমার মুখের দিকে চেয়ে, চুপিচুপি আমাকে বল্‌লে, "ছিদাম কে জান না বুঝি? আমার বর!"

বুড়ী বল্‌লে, "আহা, ছিদাম বড় ভালো ছেলে গো-! খেঁদির সঙ্গে খেলা করে' করে' খেঁদিকে তার ভারি মনে ধরেছে! খেঁদির সঙ্গে বিয়ে হলেই বেশ হ'ত, কিন্তু তা আর কি-করে' হবে বল? ছিদামের বাপ যে দেড়শো টাকা চায়! দুধ বেচে যে পয়সা পাই, তাতেই খেতে গেলে পরতে কুলোয় না, অত টাকা কোথায় পাব বাছা?"

খেঁদি রেগে বল্‌লে, "তোকে আর বক্‌বক্‌ করতে হবে না ঠাকুমা, তুই—যাঃ! আমি এখন গল্প শুন্‌ব!"—এই বলে সে একেবারে আমার কোল ঘেঁসে বসে, আমার মুখটা জোর করে' টেনে তার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আবার বল্‌লে, "ঠাকুমার সঙ্গে আর কথা কইতে হবে না এবার আমাকে গল্প বল!"

ঘ

ভোরের বেলায় উঠে ব্যাগটা গুছিয়ে-গাছিয়ে নিচ্ছি, বুড়ী এসে ঘরে ঢুক্‌ল। তার হাতে একবাটি গরম দুধ আর খানকতক বড় বড় বাতাসা।

আমি বল্‌লুম, "ও-সব কি হবে?"

বুড়ী বল্‌লে, "বাবা, গরিবের ঘরে এসেচ, গরিবের মতই একটু জল খেয়ে যাও! অনেকখানি হাঁটতে হবে, সকাল-বেলায় খালি-পেটে ত যেতে দেব না!"

বুড়ীর মনের পরিচয় যতই পাচ্ছি, ততই মুগ্ধ হচ্ছি। আমার মত অচেনা এক পথিককে কাল থেকে এরা যে যত্ন-ভালোবাসা দিয়েছে, তা আমি আর-কখনো ভুল্‌ব না।

আস্তে আস্তে একখানি দশটাকার নোট বার করে' বুড়ীর হাতে দিতে গেলুম।

বুড়ী ঘাড় নেড়ে জিভ্‌ কেটে বল্‌লে, "অতিথ্‌-সেবা পুণ্যির কাজ—পুণ্যি কি বেচা-কেনার জিনিষ বাবা? ও-টাকা তুমি ফিরিয়ে নাও!"

খড়ের গাদার পাশ থেকে আওয়াজ এল, "নে না মাগী! বাবু দয়া করে যা দিচ্চে, সেটা নিতে দোষ কি? আমরা ত আর চেয়ে নিচ্চি না!"

বুড়ী বেজায় চটে বলে উঠ্‌ল, "মিন্সেকে বাহাত্তুরে ধরেচে! ওর কথায় কাণ দিও না বাবা, টাকা পেলে ও সব করতে পারে! টাকা আমি চাই না, খালি এই আশীর্ব্বাদ করে যাও, আমার খেঁদি যেন সুখে থাকে, তার মুখে হাসি দেখে আমরা যেন চোখ বুঁজতে পারি!"

খেঁদির ঠাকুর্দ্দা হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, "কি বল্‌ব, মরে আছি! হাতী যখন খানায় পড়ে, ব্যাঙও তখন লাথি মারে!"

... ...

দাওয়ায় বেরিয়ে এসে দেখি, আকাশ পরিষ্কার—ভোরের চিকণ রোদে- গাছের জল-ভরা পাতাগুলি মণি-মুক্তার মত ঝল্‌মল্‌ করছে।

সাম্‌নেই পেয়ারা-গাছের একটা ডালে, খেঁদি আর-একটি পনেরো-ষোল বছরের জোয়ান ছেলে পাশাপাশি বসে একমনে পেয়ারা খেতে ব্যস্ত। আন্দাজে বুঝলুম, ঐ ছেলেটিই শ্রীদাম।

বাল্য-প্রেমের এই সরল লীলাটি আমার চোখে এমন ভালো লাগ্‌ল যে, তখনি ব্যাগ থেকে ফটোগ্রাফের 'কোড্যাক' বার করে' একখানা ছবি তুলে নিলুম। কল্‌কাতা ছেড়ে বাইরে বেরুলেই বরাবর আমি একটা 'কোড্যাক' নিয়ে আসি—নূতন কিছু দেখ্‌লেই তখনি ছবি তুলে নি।......

খেঁদি আমাকে দেখতে পেয়েই একলাফে নীচে নেমে পড়ল। তারপর মাথার চুল উড়িয়ে হাসতে হাসতে আর এক পায়ে নাচতে নাচতে আমার কাছে ছুটে এসে বল্‌লে, "একটা পেয়ারা খাবে? ভারি মিষ্টি!" এই বলে জোর করে' আমার হাতে একটা পেয়ারা গুঁজে দিয়ে বল্‌লে, "নাও, খেয়ে ফেল!"

আমি বল্‌লুম, "খেঁদি, গাছের ওপরে ও কে?"

খেঁদি মুখ গম্ভীর করে বল্‌লে, "ঐ ত আমার বর!"

—"এর-মধ্যে ফের ভাব হয়ে গেছে বুঝি?"

খেঁদি আঙুল দিয়ে বরকে দেখিয়ে বল্‌লে, "ছিদামটা

ভারি নেই-আঁকড়া। আমার সঙ্গে সেধে সেধে ভাব করলে—কিছুতেই ছাড়লে না যে।"

—"বেশ, বেশ, তুমি এখন আবার তোমার বরের কাছে যাও, নইলে সে রাগ করবে! আমিও চল্লুম।"

চকিত চোখে খেঁদি বল্লে, "কোথায় চল্লে তুমি ?"

—"আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি।"

—"আর আস্‌বে না ?"

—"বোধ হয় না।"

খেঁদি একেবারে দু-হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বল্লে, "হুঁ, যাবে বৈকি! আমি তোমায় ছেড়ে দেব না।"

—"সে কি খেঁদি, ছেড়ে দেবে না কি? আমি কি তোমাদের বাড়ীতে থাকতে এসেছি? ছাড়ো, ছাড়ো!"

অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সে আমার দিকে তার দুটি করুণ নয়ন তুলে বল্লে, "বল, আবার আস্‌বে ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আস্‌ব বৈকি!"

—"বল আস্‌ব, আস্‌ব, আস্‌ব—তিন সত্যি গালো!"

—"আস্‌ব, আস্‌ব, আস্‌ব!"

—"এবার এসে সেই কঙ্কাবতীর গপ্পটা বোলো—বুঝেচ ?"

"আচ্ছা" বলে তাড়াতাড়ি আমি পা চালিয়ে দিলুম; খেঁদি কিন্তু সহজে সঙ্গ ছাড়লে না,—ছলছল চোখে মুখখানি চুণ করে অনেকদূর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল।

আমি ফিরে বল্লুম, "খেঁদি, এইবার তুমি বাড়ী যাও!"

—"যাই"—বলেই হঠাৎ ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ফেলে, একদৌড়ে সে চলে গেল।

কি মমতা-ভরা প্রাণ! এমন মেয়ে আমি আর-কখনো দেখি-নি! তার সেই শেষ-বিদায়ের কান্না এখনো আমার বুকের মাঝখানে লেগে আছে।

ঙ

কল্‌কাতায় ফিরে এসেই আমার প্রথম কাজ হল, খেঁদির ঠাকুমার হাতে দুশো টাকা পাঠিয়ে দেওয়া। সেই সঙ্গে একখানা চিঠিতে লিখলুম, "দেড়-শো টাকা খেঁদির বরের জন্যে, আর পঞ্চাশ টাকা তার বিয়েতে যেন খরচ করা হয়। খেঁদিকে বলো, তাকে আমি ভুলি-নি।"

খেঁদির সঙ্গে যে শ্রীদামের খুব ভালোবাসা, তা আমি বেশ বুঝেছিলুম বিবাহ হ'লে এদের দুজনের জীবনই হাসিমাখা হয়ে থাকবে। তাই আমি তাদের মিলনের বাধা দূর করে দিলুম। আর কৃতজ্ঞতা বলেও ত একটা জিনিষ আছে! খেঁদির ঠাকুমা লেখাপড়া জানেনা, ভদ্র-ঘরের মেয়েও নয়;—কিন্তু তার মধ্যে আমি যে দুর্লভ প্রাণের সন্ধান পেয়েছিলুম, দুশো টাকা ত তুচ্ছ কথা—লক্ষ টাকাতেও তেমন উচ্চ প্রাণ আর কখনো দেখতে পাব না,—সে হচ্ছে স্বর্গের পারিজাত।

চ

তারপর তিন বৎসর কেটে গেল। এর-মধ্যে সংসারের কোলাহলে ডুবে, খেঁদির কথা আমি একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। কখনো-সখনো মাঝে মাঝে মনে হ'ত বটে, খেঁদির সঙ্গে আবার দেখা করব বলে আমি অঙ্গীকার করে এসেছি—কিন্তু খেঁদি ত জানে না, সংসারীর কাছে অঙ্গীকারের মূল্য একটা কাণাকড়িও নয়!

এম্‌নি সময়ে ঈশানপুরের জমিদারের একমাত্র পুত্রের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ এল। এত-বড় একটা বাঁধা মক্কেলের নিমন্ত্রণ অবহেলা করা ঠিক নয়। স্থির করলুম, এইসঙ্গে খেঁদিকেও একবার দেখা দিয়ে আসব। কেন জানি না, সেই দু-দণ্ডের আলাপেই খেঁদির উপরে আমার কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল! আমার নিজের ছেলে-মেয়ে কিছুই হয়নি, পরের মেয়েকে দেখে তাই কি আমার এতটা ভালোবাসতে সাধ হচ্ছে? হবে!

খেঁদির বিবাহে কিছু যৌতুক দিই-নি। তার জন্যে একছড়া হার, আর তার যে ফটোখানা তুলেছিলুম, সেখানাও যাবার দিনে তাকে উপহার দেব বলে সঙ্গে নিয়ে গেলুম।

সেদিন আশ্বিনের ষষ্ঠী। বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে মায়ের প্রাণ সেদিন পরিপূর্ণ আনন্দে টল্‌টল্ করছে—চারিদিকের তৃণ-শস্য-তরুর বিপুল শ্যামলোৎসবের মধ্যে নৃত্যলীলা জাগিয়ে, শরৎ-সমীর সেদিন উমার আগমনী-গান গেয়ে বয়ে চলেছে কোথায়, কতদূরে! গ্রামে গ্রামে সানাই ধরেছে সাহানা, পথে পথে রঙিন কাপড়ের স্রোত ছুটেছে

পুজোবাড়ীর দিকে, বাঙালীর বুক থেকে খসে পড়েছে আজ দাসত্বের পাষাণ-ভার!

……আজ সুধু হাসি, হাসি, হাসি—সবাই আজ হাসির ফোয়ারা খুলে দিয়েছে। এমন প্রাণভরা হাসির দিন বাঙ্‌লায় আর দ্বিতীয় নেই।

দূর থেকে দেখতে পেলুম, সেই বাঁশঝাড়ের তলায় বেড়-বাতাড়ের মাঝখানে পরিচিত চালাঘরখানি—তেম্‌নি হেলে-পড়া, তেম্‌নি নড়্‌বোড়ে! ভাবলুম, না-জানি খেঁদি আজ কেমনধারা হয়েছে,—তার সেই সরল চপলতা আজ আর হয়ত নেই, আমায় দেখে আজ হয় ত সে মুখে টেনে দেবে একহাত ঘোম্‌টা!

পায়ে পায়ে এগিয়ে দাওয়ায় গিয়ে উঠলুম। আস্তে আস্তে সাড়া দিয়ে ডাকলুম।

ভিতর থেকে খন্‌খনে গলায় আওয়াজ এল—"কে ডাকে?"

এ খেঁদির ঠাকুর্দ্দা! বুড়ো এখনো বেঁচে আছে! তার যে মূর্ত্তি দেখে গিয়েছিলুম!

খেঁদির ঠাকুমা বেরিয়ে এল! বয়সের ভারে তার দেহ এখন সাম্‌নের দিকে আরো-বেশী ঝুঁকে পড়েছে, চোখ-দুটোও আরো-বেশী ঘোলাটে হয়ে এসেছে।

আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, বুড়ী আমাকে ঠিক চিন্‌তে পারলে। খুসি হয়ে বললে, "ওমা, তুমি! এস বাবা, এস এস!"

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, এই তিন বছরেও তার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নি—চারিদিকে ঠিক তেম্‌নি এলমেল ভাবে হরেক-রকমের ছোট-বড় জিনিষ গাদা করা আছে, খড়ের আঁটির পাশে ঠিক তেম্‌নি করে'ই খেঁদির ঠাকুরদাদার অস্থিচর্ম্মসার মূর্ত্তি বসে বসে মরো-মরো হয়ে ক্রমাগত হাঁপাচ্ছে আর হাঁপাচ্ছে!

আমি হারছড়া আর ফটোগ্রাফখানা বার করে মেঝের উপরে রাখলুম। বুড়ো-বুড়ী দুজনেই অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়ে রইল।

আমি বল্‌লুম, "দেখ দেখি এই ছবিখানি!"

খেঁদির ঠাকুমা ফটোখানা চোখের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে, দেখেই অবরুদ্ধ স্বরে আর্ত্তনাদ করে' উঠল! কে যেন তার বুকে হঠাৎ একখানা ছুরি বসিয়ে দিলে!

বুড়ো তার বেরিয়ে-পড়া চোখদুটো আরো-বেশী বিস্ফারিত করে বল্‌লে, "ওকি, ওকি!"—

—"ওগো, এ যে আমার খেঁদির ছবি গো!"—এই বলে বুড়ী ছবিখানাকে প্রাণপণে আপনার বুকের উপরে চেপে ধরলে!

বুড়ো তাড়াতাড়ি একখানা শীর্ণ আগ্রহ-ভরা হাত বাড়িয়ে দিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললে, "খেঁদির ছবি? খেঁদির ছবি?—কৈ, দেখি দেখি দেখি!"

কিছুই বুঝতে না-পেরে, দ্বিধাভরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমরা এমন করচ কেন? খেঁদি কোথায়?"

বুড়ো খানিকক্ষণ আমার দিকে নির্ণিমেষ নেত্রে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর উপরদিকে একখানা কম্পমান হাত তুলে বল্‌লে, "স্বর্গে।"

—"অ্যাঁ!"

—"বাবু, গেল-বছরে খেঁদিকে হারিয়েচি। বেঁচে আছি আমরা—" বৃদ্ধ বুক চাপ্‌ড়ে হাহাকার করে' উঠল।…

না, না, বিশ্বাস হচ্ছে না। এই জরাজীর্ণ রোগশীর্ণ মরণাপন্ন বৃদ্ধ, আর এই শোকক্ষীণা সহায়হীনা একান্ত-দীনা নারী, এদের চোখে-চোখে আগ্‌লে-রাখা শেষ-সম্বলটুকু হরণ করতে পারেন—ভগবান কি এমন নিষ্ঠুর চোর!

… … …এ পৃথিবীতে ফোটা ফুল বোঁটা ছিঁড়ে খসে পড়ে এক রাতে, কিন্তু ঝরা-ফুলের শুক্‌নো পাতা টিঁকে থাকে অনেকদিন!

বুড়ো-বুড়ী দু'জনেই পলক-হারা চোখে ছবির উপরে হুমড়ি খেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে,—সেই অবকাশে আস্তে-আস্তে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলুম। সে দৃশ্য কেউ সহ্য করতে পারে না।

বাইরে, তেম্‌নি করেই আগমনীর সানাই সমান ভাবে বেজে চলেছে।

আজ সুধু হাসি, হাসি, হাসি—সবাই আজ হাসির ফোয়ারা খুলে দিয়েছে। কিন্তু এ হাসির সুর যাদের প্রাণে আজ বেসুরো বাজছে, তাদের কথা ভেবে হৃদয় আমার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। খেঁদি! খেঁদি!

চুট্‌কী

(পূজার বাজারের জন্য)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ]

১। একাদশী ও একাদশ

স্ত্রীলিঙ্গ একাদশী, পুংলিঙ্গ একাদশ। (লেডীর মান রাখিবার জন্য স্ত্রীলিঙ্গ আগে দিলাম।) সুতরাং হিন্দু বিধবার পক্ষে নির্জ্জলা একাদশীর ব্যবস্থা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন করিয়াছেন। আর পুরুষের পক্ষে, পুংলিঙ্গে একাদশ অর্থাৎ একাদশে বৃহস্পতি। সুতরাং উক্ত তিথিতে চর্ব্ব্যচূষ্য-লেহ্যপেয়ের ব্যবস্থা। একাদশের ফর্দ নিম্নে দিলাম :—(১) লুচি (২) বেগুনের সময় বেগুনভাজি, পটোলের সময় পটোলভাজি, (৩) আলুকুমড়োর ছকা (৪) আলুর দম (৫) কপির ডালনা অভাবে ছানার ডালনা (৬) ধোকার ঝাল (মৎস্যমাংস নিষিদ্ধ বলিয়া নিরামিষ তরকারীর রকম বাড়াইতে হইল) (৭) চাটনী (৮) দধি (৯) ক্ষীর বা রাবড়ী (১০) সন্দেশ (১১) রসগোল্লা। (পাণ খাওয়া নিষিদ্ধ, অতএব দ্বাদশ প্রকার নহে।) সাধে কি চক্কোত্তি মশায় বলেন যে, 'ভাগ্যে মাসে দু'টো একাদশী আছে, তা'র জোরেই ত বেঁচে আছি।'

২। অপেরা

একটি গল্পে নায়িকার নাম অপেরা দেখিয়া আমার একটী বন্ধু মূর্চ্ছা যান। কিন্তু ইহাতে মূর্চ্ছার কারণ কি? অপেরায় 'পতন ও মূর্চ্ছা' আছে বলিয়া? যে দেশে কবিচন্দ্র, যাত্রামোহন নাম রহিয়াছে, সে দেশে অপেরা-সুন্দরী নাম আশ্চর্য্য কি? তবে হাঁ, ইহার দেখাদেখি থিয়েটারচন্দ্র, ফার্স-(farce) মোহন প্রভৃতি নাম চলিলে 'ভাব্‌বার কথা' বটে।

৩। সিদ্ধ ও পোড়া

সিদ্ধ ও পোড়া এত ভাল লাগে কেন, এত মুখপ্রিয় কেন? অনেকে হয়ত বলিবেন, উড়িয়া বামুনের রান্না ঝোল-তরকারীতে অরুচি জন্মে; সিদ্ধ ও পোড়ায় রান্নার কায়দা দেখাইবার যো নাই, তাই উহা অরুচির রুচিকর, মশলা ও কাঁচা তেলের গন্ধওয়ালা ঝোল-তরকারীর পর মুখ বদলান হিসাবে ভাল। কিন্তু প্রকৃত কারণ তাহা নহে। মানুষের এমন একদিন ছিল, যখন সে কাঁচা খাইত, আগুনের ব্যবহার জানিত না। তা'র পর আগুনের ব্যবহার শিখিলে সিদ্ধ, ঝলসান, পোড়ান, জিনিশ খাইতে শিখিল। তাহার পর, পাঁচআনাজ মিশাইয়া তেল বা ঘী মশলা দিয়া রাঁধিতে শেখা সভ্যতার চরম উৎকর্ষ। সিদ্ধ ও পোড়া মানবের সেই পুরাতন অবস্থার পরিচায়ক। পূর্ব্ব-স্মৃতি বড় মধুর হয়, তাই সিদ্ধ ও পোড়া সভ্য মানবের এত মধুর লাগে।

৪। ফরাশ বনাম চেয়ার

ভারতীয় সমাজ ও ইউরোপীয় সমাজের প্রভেদ গরুর-গাড়ী ও রেলগাড়ী, গুড়ুক তামাক ও চুরুট সিগ্‌রেট, বটগাছ ও ওকগাছ প্রভৃতিতে ধরাইয়া দিয়াছি। ফরাশ বনাম চেয়ারেও আবার সেই একই তত্ত্ব। চেয়ারে বসায় স্বস্বপ্রধান, আত্মসর্ব্বস্ব ভাব—ব্যক্তি-তন্ত্রতা পরিস্ফুট। আর ফরাশে বসায় একাত্মতা, অন্তরঙ্গভাব, 'ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই' মন্ত্রের প্রভাব দেদীপ্যমান। এক চেয়ারে দুই ইয়ারে মাণিকযোড় হইয়া অথবা প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলে বসিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও 'বসুধৈব কুটুম্বকম্‌' ভাব নাই, আর দৃশ্যটা প্রণয়ীর পক্ষে মধুর হইলেও দর্শকের চক্ষে কদর্য্য।

৫। অস্ত্রের ক্রম-বিবর্ত্তন

পবন-নন্দন হনুমান্‌ ও ভীমসেন আস্ত গাছ লইয়া শত্রুর সঙ্গে যুঝিতেন, কৃত্তিবাস-কাশীদাসের কৃপায় আমরা ইহা জানিতে পারিয়াছি। যাহাদের অতটা শক্তি নাই, তাহারা গাছের ডাল বা খানিকটা অংশ লইয়া অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার

করে, লাঠিসোটা, সড়কী-বল্লম, পাঁচনবাড়ী বেত ও চাবুক ইহার উদাহরণ। রাজার রাজদণ্ড, রাজ-অনুচরের আশাসোটা, খ্রীষ্টান পাদরীর crook এই শাসন ক্ষমতার নিদর্শন, যদিও এগুলি অস্ত্রহিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই, ব্যবহারের প্রয়োজনও হয় না। 'কা কথা বাণসন্ধানে' অথবা চল্‌তি কথায়, 'কাঠের বিড়াল হ'লেই-বা, ইঁদুর ধরা নিয়ে কথা।' অস্ত্রের এইরূপ ক্রম-বিবর্ত্তনে সমালোচকের লেখনীর আবির্ভাব হইয়াছে। ইনিই বঙ্গের শেষবীর!

৬। ব্যাকরণ ও অভিধানে সমাজতত্ত্ব

সমাজতত্ত্বের উপকরণ খুঁজিতে জানিলে যে কতস্থানে মিলে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠে যাহা চোখে পড়িয়াছে, আপাততঃ তাহারই দু'চারিটা নমুনা দিতেছি—

(/) ব্রাহ্মণেরা যে ঔদরিক ছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের রচিত ব্যাকরণে, 'আলু' ও 'ঘিণুন' প্রত্যয়েই মালুম। নীরস ব্যাকরণের চর্চ্চা করিতে বসিয়াও তাঁহারা উদরের চিন্তা ভুলিতে পারেন নাই।

(৵) 'অনাদরে ষষ্ঠী'—ব্যাকরণের সূত্র। ফলেও দে[illegible] যায়, দরিদ্রের ঘরে—যে ঘরে অর্থাভাবে সন্তানের আদ[illegible] যত্ন ভাল করিয়া হয় না সেই ঘরেই—মা ষষ্ঠীর কৃপা।

(৶) স্ত্রিয়াং বহ্বপ্সরসঃ—অভিধানে লেখে। অর্থ[illegible] বহু স্ত্রীলোকই অপ্সরার মত সুন্দরী। ইহা হইতে বু[illegible] যাইতেছে, পূর্ব্বকালে এদেশে স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য খু[illegible] সাধারণ ছিল।

(।০) অস্ত্রী পাপম্—অভিধান, স্ত্রিয়ামাপ্ ব্যাকরণ অর্থাৎ স্ত্রীলোকে পাপ করে না, স্ত্রীলোককে মাপ করি[illegible] হইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, সেকালে নারীর প্রতি কতটা সম্মান দেখান হইত। (মনুর 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে সর্ব্বদেবতাঃ' বাক্যের সহিত ব্যাকরণ-অভিধান[illegible] এক সুরে সুরবাঁধা)।

ব্যাকরণের কচ্‌কচি পাঠক মহাশয়ের অধিকক্ষণ ভা[illegible] লাগিবে না। অতএব এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম নতুবা আরও বহু দৃষ্টান্ত বিস্তারত্রী গবেষণার জন্য মজুত রহিয়াছে।

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

একটা কোচের উপরে সুরেশ চক্ষু মুদিয়া শুইয়া ছিল এবং সন্নিকটে একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া বৃদ্ধ রামবাবু তাহার পীড়িত বক্ষে অগ্নির উত্তাপ দিতেছিলেন, এমন সময়ে উভয়েই দ্বার খোলার শব্দে চাহিয়া দেখিলেন অচলা প্রবেশ করিয়াছে। সে বিনা আড়ম্বরে কহিল, রাত অনেক হয়েছে জ্যাঠামশায়, আপনি শুতে যান।

সেই জন্যেই ত অপেক্ষা করে আছি, মা, বলিয়া বৃদ্ধ চট্ উঠিয়া পড়িলেন এবং সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, এতক্ষণ দুজনেরই শুধু কেবল বিড়ম্বনা ভোগ হ'ল বইত নয়! এ সব কাজ কি আমরা পারি? অচলার প্রতি চেয়ারটা ঈষৎ অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, যার কর্ম্ম তাকেই সাজে, মা, এই নাও বোসো,—আমি একটু হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচি। এই বলিয়া বৃদ্ধ বিপুল শ্রান্তির ভাবে মস্ত একটা হাই তুলিয়া গোটাদুই তুড়ি দিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইলেন এবং ঘরের বাহির হইয়া সাবধানে দরজা বন্ধ করিতে-করিতে সহাস্যে কহিলেন, ঢুলতে ঢুলতে যে হাত পা পুড়িয়ে বসিনি সেই ভাগ্য, কি বলেন সুরেশবাবু?

সুরেশ কোন কথা কহিল না, শুধু নিমিলিত নেত্রের উপর দুই হাত যুক্ত করিয়া একটা নমস্কার করিল।

অচলা নীরবে তাঁহার পরিত্যক্ত আসনটি অধিকার করিয়া বসিল, এবং সেক দিবার ফ্ল্যানালটা উত্তপ্ত করিতে-করিতে ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আবার ব্যথা হ'ল কেন? কোন্ খানটায় বোধ হচ্চে?

সুরেশ চোখ মেলিল না, উত্তর দিল না, শুধু হাত তুলিয়া

বক্ষের বাম দিকটা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। আবার সমস্ত নিস্তব্ধ। সে এম্‌নি যে মনে হইতে লাগিল বুঝি বা এই নির্ব্বাক অভিনয়ের শেষ অঙ্ক পর্য্যন্ত এম্‌নি নীরবেই সমাপ্ত হইবে। কিন্তু সেরূপ ঘটিল না। সহসা অচলার ফ্ল্যানাল শুদ্ধ হাতখানা সুরেশ তাহার বুকের উপরে চাপিয়া ধরিল। অচলার মুখের উপর উদ্বেগের কোন চিহ্ন প্রকাশ পাইল না, সে ইহাই যেন প্রত্যাশা করিতেছিল, কেবল কহিল, ছাড়ো, আরও একটু সেক দিয়ে দিই।

সুরেশ হাত ছাড়িয়া দিল, কিন্তু চক্ষের পলকে উঠিয়া বসিয়া দুই ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া অচলাকে তাহার আসন হইতে টানিয়া আনিয়া নিজের বুকের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিল। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যেমন মনে হইয়াছিল এই আবেগ-উচ্ছ্বাসহীন নাটকের পরিসমাপ্তি হয়ত এম্‌নি নিস্পন্দ মৌনতার ভিতর দিয়াই ঘটিবে, কিন্তু নিমেষ না গত হইতেই আবার বোধ হইতে লাগিল এই উন্মত্ত নির্লজ্জতারও বুঝি সীমা নাই, শেষ নাই,—সর্ব্ব দিক, সর্ব্ব-কাল ব্যাপিয়াই এই মত্ততা চিরদিন বুঝি এম্‌নি অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া রহিবে, কোন দিন কোন যুগেও ইহার আর বিরাম মিলিবে না, বিচ্ছেদ ঘটিবে না।

অচলা বাধা দিল না, জোর করিল না ; মনে হইল ইহার জন্যও সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, শুধু কেবল তাহার শান্ত মুখ-খানা একেবারে পাথরের মত শীতল ও কঠোর হইয়া উঠিল। সুরেশের চৈতন্য ছিল না,—বোধ হয় সৃষ্টির কঠিনতম তমিস্রায় তাহার দুই চক্ষু একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, না হইলে এ মুখ-চুম্বন করার লজ্জা ও অপমান আজ তাহার কাছেও ধরা পড়িতে পারিত। ধরা পড়িল না সত্য, কিন্তু শুদ্ধমাত্র শ্রান্তিতেই বোধ করি এই উন্মাদনা যখন স্থির হইয়া আসিল, তখন অচলা ধীরে-ধীরে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া আপনার যায়গায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

আরও ক্ষণকাল দুজনেরই যখন চুপ করিয়া কাটিল, তখন সুরেশ অকস্মাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, অচলা, এমন কোরে আর আমাদের কতদিন কাটবে? বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই কহিতে লাগিল, তোমার কষ্ট আমি জানি, কিন্তু আমার দুঃখটাও একবার ভেবে দেখ। আমি যে গেলুম!

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়া অচলা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এখানে বাড়ী কিনেচ?

সুরেশ বিপুল আগ্রহে বলিয়া উঠিল, সে তো তোমার জন্যেই অচলা।

অচলা ইহারও কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, আস্‌বাব-পত্র গাড়ী-ঘোড়া তাও কি কিন্‌তে পাঠিয়েচ?

সুরেশ তেম্‌নি করিয়াই উত্তর দিল, কিন্তু সমস্তই ত তোমারি জন্যে।

অচলা নীরব হইয়া রহিল। এ সকলে তাহার কি প্রয়োজন, এ সকল সে চায় কি না,—ওই লোকটার কাছে এ প্রশ্ন করার মত নিজের প্রতি বিদ্রূপ আর কি আছে? তাই সে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা না কহিয়া মৌন হইয়া রহিল। মুহূর্ত্ত-কয়েক পরে জিজ্ঞাসা করিল, রামবাবুর কাছে কি তুমি আমার বাবার নাম করেচ? বাড়ী কোথায় বলেচ?

সুরেশ বলিল, না।

আর কি সেক দেবার দরকার আছে?

না।

তা'হলে এখন আমি চল্‌লুম। আমার বড় ঘুম পাচ্চে। বলিয়া অচলা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আগুনের পাত্রটা সরাইয়া রাখিয়া ঘরের বাহির হইয়া কবাট বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেই সুরেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, আজ আর একটা কথা বলে যাও অচলা। তুমি কি আর কোথাও যেতে চাও? সত্যি বোলো?

অচলা কহিল, সে কোথায়?

সুরেশ বলিল, যেথানে হোক্। যেথানে আমাদের কেউ চেনে না, কেউ জানে না--তেমন কোন দেশে। সে দেশ যত—

আগ্রহে, আবেগে সুরেশের কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, অচলা তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু নিজে সে একান্ত স্বাভাবিক ও সরল গলায় আস্তে-আস্তে জবাব দিল, এ দেশেও ত আমাদের কেউ চিন্‌ত না, কেউ জানত না। আজও ত আমাদের কেউ চেনে না।

সুরেশ উৎসাহ পাইয়া বলিতে গেল, কিন্তু ক্রমশঃ—

অচলা বাধা দিয়া কহিল, ক্রমশঃ জান্‌তে পারবে?

খুব সম্ভব পারবে, কিন্তু সে সম্ভাবনা ত অন্য দেশেও আছে।

সুরেশ অকস্মাৎ উল্লাসে চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিল, তা'হলে এখানেই স্থির? এখানেই তোমার সম্মতি আছে বল অচলা? একবার স্পষ্ট করে বলে যাও—বলিতে-বলিতে কিসে যেন তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। কিন্তু ব্যগ্র পদ মেঝের উপরে দিয়াই সে সহসা স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিল দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া অচলা অন্তর্হিত হইয়া গেছে।

কয়েক দিন হইতে আকাশে মেঘের আনা-গোনা সুরু হইয়া একটা ঝড়-বৃষ্টির সূচনা করিতেছিল। সুরেশের নূতন বাটীতে অপর্য্যাপ্ত আসবাব ও সাজ-সরঞ্জাম কলিকাতা হইতে আসিয়া গাদা হইয়া পড়িয়া আছে; তাহাদিগকে সাজাইয়া-গুছাইয়া লইবার দিকে কোন পক্ষেরই কোন গা নাই। একজোড়া বড় ঘোড়া এবং একখানা অতিশয় দামী গাড়ী পশু আসিয়া পর্য্যন্ত কোন্ একটা আস্তাবলে সহিস-কোচমানের জিম্মায় রহিয়াছে, কেহই খোঁজ লয় না। দিনগুলা যেমন-তেমন করিয়া কাটিয়া চলিয়াছিল, এমন সময়ে একদিন দুপুর বেলায় বৃদ্ধ রাম বাবু একহাতে হুঁকা এবং অপর হাতে একখানি নীল-রঙের চিঠি লইয়া উপস্থিত হইলেন। অচলা রেলিঙের পার্শ্বে বেতের সোফার উপর অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে পড়িয়া একখানা বাঙলা মাসিকের বিজ্ঞাপন পড়িতেছিল, জ্যাঠামশায়কে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। রামবাবু চিঠি-খানা তাহার প্রতি অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, এই নাও সুরমা, তোমার রাক্ষুসীর পত্র। সে এতদিন তোমাকে লিখ্‌তে পারেনি বলে আমার চিঠির মধ্যেই যেমন অসংখ্য মাপ চেয়েচে, তেমনি অসংখ্য প্রণামও করেচে। তাকে তুমি মার্জ্জনা কর। এই বলিয়া তিনি হাসিমুখে কাগজটুকু তাহার হাতে দিয়া অদূরে একখানি চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন, এবং নদীর দিকে চাহিয়া একমনে হুঁকা টানিয়া-টানিয়া ধুঁয়ায় অন্ধকার করিয়া তুলিলেন।

অচলা পত্রখানি আদ্যোপান্ত বার-দুই পাঠ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, এঁরা সকলেই তা'হলে পশু সকালের গাড়ীতেই এসে পড়বেন? পিসিমা কে জ্যাঠা-মশাই? আর তাঁর রাজ-পুত্রবধূ, রাজপুত্র, গারজেন্ টিউটার—

রাম বাবু হাসিয়া কহিলেন, রাক্ষুসী বেটি তামাসা করবার একটা সুযোগ পেলে ত আর ছাড়বে না! পিসি হলেন আমার বিধবা ছোট ভগিনী, আর রাজপুত্র-বধূ হলে তাঁর মেয়ে,—ভাঁড়ারপুরের ভবানী চৌধুরীর স্ত্রী—তা যাই বলুক, রাজা-রাজড়ার ঘরই সে বটে। রাজপুত্র হোচে তার বছর-দশেকের ছেলে,—আর শেষ ব্যক্তিটি যে কি তাতো চোখে না দেখ্‌লে বল্‌তে পারিনে, মা। হবে কোন বেশি মাইনের চাকর-বাকর। বড়-লোকের ছেলে সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, এটা-ওটা-সেটা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে যুগিয়ে দিয়ে সাবালক-নাবালক উভয় পক্ষের মন রাখেন —এম্‌নি কিছু একটা হবেন বোধ করি। কিন্তু সে জন্যে ভাবচিনে সুরমা, আসুন, খান্-দান, পশ্চিমের জল-হাওয়া গলা-জ্বলা, বুক-জ্বলা, দু'দিন স্থগিত হয় ত খুসিই হ'ব কিন্তু চিন্তা এই যে, বাড়ীটি ত আমার ছোট; রাজা-রাজড়া কথা ভেবে তৈরিও করিনি, ঘর দোরের বন্দোবস্তও তা-উপযোগী নয়। সঙ্গে দাস-দাসীও আস্‌বে হয় ত প্রয়োজনে তিনগুণ বেশি। আমি তাই মনে করচি তোমার বাড়ীটা যদি—

অচলা ব্যগ্র হইয়া কহিল, কিন্তু তার ত আর সময় নেই জ্যাঠামশাই। তা'ছাড়া একলা অতদূরে থাকা কি তাঁদের সুবিধে হবে?

রাম বাবু কহিলেন, সময় আছে যদি এখন থেকেই লাগ যায়। আর যায়গা প্রস্তুত থাকলে কোথায় কার সুবিধে হবে, সে মীমাংসা সহজেই হতে পারবে। সুরেশবাবু শোনা-মাত্রই একটা টমটম ভাড়া করে চলে গেছেন,—তোমার গাড়ীও তৈরি হয়ে এলো বলে; তুমি নিজে যদি একটু শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে নিতে পারো মা, আমিও তা'হলে সেই ফুরসতে জুতো-জোড়াটা বদ্‌লে একখানা উড়ুনি কাঁধে ফেলে নিই। তোমার ঘর-সংসারের বিলি-ব্যবস্থা ত সত্যি সত্যিই আমরা পেরে উঠ্‌বো না।

অচলা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, আচ্ছা, আমি কাপড়টা ছেড়ে নিচ্চি, বলিয়া ধীরে-ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। রাম বাবুর প্রস্তাব অসঙ্গতও নয়, অস্পষ্টও নয়। আত্মীয় রাজকুমার ও রাজমাতার স্থান সঙ্কুলান করিতে এ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যে এবার তাহাকে স্থানান্তরে যাইতেই হইবে, এ কথা অচলা সহজেই বুঝিল; কিন্তু বুঝা সহজ হইলেই কিছু তাহার ভার লঘু হইয়া উঠে

না। মনের মধ্যে সেটা যতদূর গেল ততদূর গুরুভার ষ্টিম রোলারের ন্যায় যেন পিষিয়া দিয়া গেল।

এত দিনের মধ্যে একটা দিনের জন্যও কেহ তাহাকে বাটীর বাহির করিতে সম্মত করিতে পারে নাই। মিনিট-পোনেরো পরে আজ প্রথম যখন সে নিজের অভ্যস্ত সাজে প্রস্তুত হইয়া শুধু এই জন্যই নামিয়া আসিল, তখন চারিদিকের সমস্তই তাহার চক্ষে যেন নূতন এবং আশ্চর্য্য বলিয়া ঠেকিল, এমন কি আপনাকে-আপনিই যেন আর এক রকম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড জুড়ি; নব পরিচ্ছদে সজ্জিত কোচমান মনিব জানিয়া উপর হইতে সেলাম করিল; সহিস দ্বার খুলিয়া সসম্মানে সরিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহাকেই অনুসরণ করিয়া বৃদ্ধ রামবাবু যখন সসঙ্কোচে সম্মুখের আসন গ্রহণ করিয়া বসিলেন, তখন সমস্তটাই যেন একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মত তাহার মনে হইতে লাগিল। তাহার আচ্ছন্ন দৃষ্টি গাড়ীর যে অংশটার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিল; তাহাই বোধ হইল এ কেবল বহুমূল্য নয়, এ শুধু ধনবানের অর্থের দম্ভ নয়, ইহার প্রতি-বিন্দুটি যেন কাহার সীমাহীন প্রেম দিয়া গড়া।

কঠিন পাথরের রাস্তার উপর চার-জোড়া খুড়ের প্রতিধ্বনি তুলিয়া জুড়ি ছুটিল, কিন্তু অচলার কানের মধ্যে তাহা শুধু অস্পষ্ট হইয়া প্রবেশ করিল। তাহার সমস্ত অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় হয়ত শেষ-পর্য্যন্ত এম্নি অভিভূত হইয়াই থাকিত, কিন্তু সহসা রামবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া উঠিল। তিনি সম্মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, মা, ওই তোমার বাড়ী দেখা যায়। লোক-জন দাস-দাসী সবই নিযুক্ত করা হয়ে গেছে, মোটা-মুটি সাজানো-গোজানোর কাজও বোধ করি এতক্ষণে অনেক এগিয়ে এলো, শুধু তোমাদের শোবার ঘরটিতে, মা, আমি কাউকে হাত দিতে মানা করে দিয়েছি। তাঁর যাবার সময় বলে দিলাম, সুরেশবাবু, বাড়ীর আর যেখানে যা খুসি করুনগে আমি গ্রাহ্য করিনে, শুধু মায়ের ঘরটিতে কাজ করে মায়ের আমার কাজ বাড়িয়ে দেবেন না। এই বলিয়া বৃদ্ধ একখানি সলজ্জ হাসি-মুখের আশায় চোখ তুলিয়াই একেবারে চুপ করিয়া গেলেন। তিনি কেন যে এমন করিয়া থামিয়া গেলেন, অচলা তাহা সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিল, তাই যতক্ষণ না গাড়ী নূতন বাঙলার দরজায় আসিয়া পৌঁছিল, ততক্ষণ সে প্রাণপণে তাহার শুষ্ক বিবর্ণ মুখখানা বাহিরের দিকে ফিরাইয়া এই বৃদ্ধের বিস্মিত দৃষ্টি হইতে গোপন করিয়া রাখিল।

গাড়ীর শব্দে সুরেশ বাহিরে আসিল, দাস-দাসীরাও কাজ ফেলিয়া অন্তরাল হইতে সভয়ে তাহাদের নূতন গৃহিণীকে দেখিতে আসিল; কিন্তু সে মুখের প্রতি চাহিয়া কেহই যেন অন্তরের মধ্যে বিশেষ কোন উৎসাহের সাড়া পাইল না।

রামবাবুর সঙ্গে-সঙ্গে অচলা নীরবে নামিয়া আসিল, সুরেশের প্রতি একবার সে মুখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিল না; তারপরে তিন-জনেই নিঃশব্দে ধীরে-ধীরে এই নূতন বাড়ীটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার ভিতরে-বাহিরে উপরে-নীচে কোথাও যে আনন্দের লেশমাত্র আভাস আছে তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত কোন দিকে চাহিয়া কাহারও চক্ষে পড়িল না।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কিন্তু ইহার মধ্যে ভুল যে কতবড় ছিল তাহাও প্রকাশ পাইতে বিলম্ব ঘটিল না। বাটী সাজাইবার কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া এই সকল অত্যন্ত মহার্ঘ ও অপর্য্যাপ্ত উপকরণ-রাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া তাই, সকল চিন্তাকে ছাপাইয়া একটা চিন্তা সকলের মনে বার-বার ঘা দিতে লাগিল যে, যাহার টাকা আছে সে খরচ করিয়াছে, এ একটা পুরাতন কথা বটে; কিন্তু এ তো শুধু তাই নয়। এ যেন এক-জনকে আরাম ও আনন্দ দিবার জন্য আর একজনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই। কাজের ভিড়ের মধ্যে, জিনিস-পত্র নাড়া-নাড়ির মধ্যে সাধারণ কথাবার্ত্তা অনেক হইল, চোখো-চোখি অনেকবার হইল, কিন্তু সকলের ভিতর হইতেই একটা অনুচ্চারিত বাক্য, একটা অপ্রকাশ্য ইঙ্গিত রহিয়া-রহিয়া কেবল এই দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে লাগিল।

বাড়ীটার ধোয়া-মোছার কাজ শেষ হয় নাই। সুতরাং ইহাকে কতকটা বাসোপযোগী করিয়া লইতেই সারা বেলাটা গেল। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া তিন জনেই যখন বাড়ী ফিরিবার জন্য গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে। একটা বাতাস উঠিয়া সুমুখের কতকটা আকাশ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছিল, শুধু মাঝে-মাঝে দুই একটা ধূসর রঙের খণ্ড-মেঘ এক দিগন্ত হইতে আসিয়া নদী পার

হইয়া আর এক দিগন্তে ভাসিয়া চলিয়াছিল এবং তাহারই ফাঁকে-ফাঁকে কভু উজ্জ্বল, কভু ম্লান, জ্যোৎস্নার ধারা যেন সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ হইতে চারিদিকের প্রান্তর ও গাছ-পালার উপরে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। এই সৌন্দর্য্য দু'চক্ষু ভরিয়া গ্রহণ করিতে বৃদ্ধ রামবাবু জানালার বাহিরে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু যাহারা বৃদ্ধ নয়, প্রকৃতির সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য্য উপভোগ করিবারই যাহাদের বয়স, তাহারাই কেবল গাড়ীর দুই গদী-আঁটা কোণে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

অনেকদিন পূর্ব্বেকার একটা স্মৃতি অচলার মনের মধ্যে একেবারে ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল, অনেকদিন পরে আজ আবার তাহাই মনে পড়িতে লাগিল। যে দিন সুরেশের কলিকাতার বাটী হইতে তাহারা এম্‌নি এক সন্ধ্যাবেলায় এম্‌নি গাড়ী করিয়াই ফিরিতেছিল। যে দিন তাহার সম্পদ ও সম্ভোগের বিপুল আয়োজন মহিমের নিকট হইতে তাহার অতৃপ্ত মনটাকে বহুদূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। যে দিন এই সুরেশের হাতেই আত্ম-সমর্পণ করা একান্ত অসঙ্গত বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই;—বহুকাল পরে কেন যে সহসা আজ সেই কথাটাই স্মরণ হইল ভাবিতে গিয়া নিজের অন্তরের নিগূঢ় ছবিটা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া যেন লজ্জার ঝড় বহিয়া গেল।

লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! এই গাড়ী, ওই বাড়ী ও তাহার কত কি আয়োজন সমস্তই তাহার,—সমস্তই তাহার স্বামীর আদরের উপহার বলিয়া একদিন সবাই জানিল; আবার একদিন আসিবে যখন সবাই জানিবে ইহাতে তাহার সত্য-কার অধিকার কাণা-কড়ির ছিল না—ইহার আগাগোড়াই মিথ্যা! সে দিন সে লজ্জা সে রাখিবে কোথায়? অথচ, আজিকার জন্য এ কথা কিছুতেই মিথ্যা নয় যে ইহার সব-টুকুই শুদ্ধ মাত্র তাহারই পূজার নিমিত্ত সযত্নে আহরিত হইয়াছে, এবং ইহার আগাগোড়াই স্নেহ দিয়া, প্রেম দিয়া, আদর দিয়া মণ্ডিত! এই যে মস্ত জুড়ি দিগ্বিদিক্ কাঁপাইয়া তাহাকে বহন করিয়া ছুটিয়াছে, ইহার সুকোমল স্পর্শের সুখ, ইহার নিস্তরঙ্গ অবাধ গতির আনন্দ সমস্তই আজ তাহার! আজ যে কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া ওই অগণিত দাস-দাসী আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে!

দেখিতে দেখিতে তাহার মনের মধ্যে দিয়া লোভ ও ত্যাগ, লজ্জা ও গৌরব ঠিক যেন গঙ্গা-যমুনার মতই পাশা-পাশি বহিতে লাগিল, এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহার কোনটাকেই সে অস্বীকার করিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি বাটী পৌঁছিয়া বৃদ্ধ রামবাবু তাঁহার সান্ধ্য-কৃত্য সমাপন করিতে চলিয়া গেলে সে যখন অকস্মাৎ শ্রান্তি ও মাথা-ব্যথার দোহাই দিয়া অত্যন্ত অসময়ে দ্রুতপদে গিয়া নিজের ঘরের কবাট রুদ্ধ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল, তখন একমাত্র লজ্জা ও অপমানই যেন তাহাকে গিলিয়া ফেলিতে চাহিল। পিতার লজ্জা, স্বামীর লজ্জা, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের লজ্জা, সকলের সমবেত লজ্জাটাই কেবল চোখের উপর অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়া অপর সকল দুঃখকেই আবৃত করিয়া দিল। শুদ্ধ মাত্র এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল, এ ফাঁকি একদিন যখন ধরা পড়িবে, তখন মুখখানা লুকাইবার যায়গা পাইবে সে কোথায়?

অথচ, যে সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে সে শিশুকাল হইতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে অজিনের শয্যা বা তরুমূল-বাস কোনটাকেই কেহ কামনার বস্তু মনে করে না। সেখানে প্রত্যেক চলা-ফেরা, মেলা-মেশা, আহার-বিহারের মধ্যে বিলাসিতার প্রতি বিরাগ নয়, অনুরাগকেই উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে দেখিয়াছে; সেখানে হিন্দুধর্ম্মের কোন আদর্শের সহিতই তাহার পরিচয় ঘটিতে পায় নাই,—পরলোকের আশায় ইহলোকের সমস্ত সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করার নিষ্ঠুর নিষ্ঠাকে সে কোনদিন দেখিতে পায় নাই; সে দেখিয়াছে শুধু পরের অনুকরণে গঠিত ঘরের সমাজটাকে। যাহার প্রত্যেক নর-নারীই সংসারের আকণ্ঠ তৃষ্ণায় দিনের পর দিন কেবল কাঠ হইয়াই গেছে।

তাই, এই নিরালা শয্যার মধ্যে চোখ বুজিয়া সে ঐশ্বর্য্য জিনিসটাকে 'কিছুই না' বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না, এবং চাই না, প্রয়োজন নাই, এ কথাতেও মন তাহার কোনমতেই সায় দিল না। তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কার ইহার কোনটাকেই তুচ্ছ করিবার পক্ষে অনুকূল নয়, অথচ, গ্লানিতেও সমস্ত হৃদয় কালো হইয়া উঠিয়াছে। তাই, যত সম্পদ, যত উপকরণ,—এই দেহটাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখে রাখিবার যত বিবিধ আয়োজন—আজ অযাচিত তাহার পদতলে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহার দুর্নিবার মোহ তাহাকে

অবিশ্রাম এক হাতে টানিতে এবং অন্য হাতে ঠেলিতে লাগিল।

অথচ, দুঃখের স্বপ্নের মধ্যে যেমন একটা অপরিস্ফুট মুক্তির চেতনা সঞ্চরণ করে, তেম্‌নি এই বোধটাও তাহার একেবারে তিরোহিত হয় নাই যে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ যাহা ফাঁকি, ইহাই একদিন সত্য হইয়া উঠিবার পথে কোন বাধাই ছিল না। এই সুরেশই তাহার স্বামী হইতে পারিত, এবং কোন এক ভবিষ্যতে ইহা যে একেবারেই অসম্ভব এমন কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না।

তাহাদের সমাজে বিধবার আবার বিবাহ হয়, হিন্দুনারীর মত কেবল একটিমাত্র লোকের কাছেই পত্নীত্বের বন্ধন ইহকাল ও পরকাল ব্যাপিয়া বহন করিয়া ফিরিবার অলঙ্ঘ্য অনুশাসন তাহাদের মানিতে হয় না; তাই, জীবনে-মরণে শুধু কেবল একজনকেই অনন্যগতি বলিয়া ভাবনা করিবার মত অবরুদ্ধ মন তাহার কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। সেই মন এক স্বামীর জীবিত-কালেই অপরকে স্বামী বলিতে অপরাধের ভারে, যতই কেন না পীড়িত, লজ্জা ও অপমানের জ্বালায় যতই না জ্বলিতে থাকুক, ধর্ম্ম ও পরকালের গদা তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিবার ভয় দেখাইতে পারিল না।

বন্ধ দরজায় ঘা দিয়া রামবাবু ডাকিয়া বলিলেন, জলস্পর্শ না করে শুয়ে পড়লে, মা, শরীরটা কি খুব খারাপ বোধ হচ্চে?

অচলার চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। হঠাৎ মনে হইল এ যেন তাহার বাবার গলা। রাগ করিয়া অসময়ে শুইয়া পড়িলে ঠিক এম্‌নি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তিনি কবাটের বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেন।

এই চিন্তাটাকে সে কিছুতেই ঠাঁই দিত না, আজ কিন্তু এই স্নেহের আহ্বানকে সে ঠেকাইতে পারিল না। চক্ষের নিমিষে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সাড়া দিল, এবং দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি এতদিনের এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও বরাবর একটা দূরত্ব রক্ষা করিয়াই চলিতেন; কিন্তু এ বাটীতে ইহাদের আজ শেষ দিন মনে করিয়াই বোধ হয় এক নিমিষে এই ব্যবধান অতিক্রম করিয়া গেলেন। এক হাত অচলার কাঁধের উপর রাখিয়া, অন্য হাতে তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া মুহূর্ত্ত পরেই সহাস্যে বলিলেন, বুড়ো জ্যাঠা-মশায়ের সঙ্গে দুষ্টামি মা? কিছু হয়নি, এসো, বলিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বারান্দার একটা চেয়ারের উপর বসাইয়া দিলেন।

অদূরে আর একটা চৌকির উপর সুরেশ বসিয়া ছিল; সে মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়াই আবার মাথা হেঁট করিল। কথা ছিল, রাত্রে ধীরে-সুস্থে বসিয়া সারাদিনের কাজ-কর্ম্মের একটা আলোচনা করা হইবে, সে সেইজন্যই শুধু একাকী বসিয়া রামবাবুর ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার প্রতিই চাহিয়া বৃদ্ধ একটু হাসিয়া কহিলেন, সুরেশ বাবু, আপনার ঘরের লক্ষ্মীটি ত কোন্ এক বিলিতি বাপের মেয়ে,—দিন ক্ষণ পাঁজি পুঁথি মানেন না। তখন আপনি নিজে মানুন, না মানুন, বিশেষ যায় আসে না—কিন্তু আমার এই তিনকুড়ি বছরের কুসংস্কার ত যাবার নয়। কাল প্রহর দেড়েকের ভেতরেই একটা শুভক্ষণ আছে—সুরেশ ইঙ্গিতটা হঠাৎ বুঝিতে না পারিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়াই প্রশ্ন করিল, কিসের শুভক্ষণ?

রামবাবু ঠিক সোজা উত্তরটা দিতে পারিলেন না। একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, এর পরে কিন্তু সপ্তাহ খানেকের মধ্যে পাঁজিতে আর দিন খুঁজে পেলাম না—তাই ভাবছিলাম—

কথাটা এবার সুরেশ বুঝিল বটে, কিন্তু হাঁ, না, কোন প্রকার জবাব দিতে না পারিয়া সভয়ে, গোপনে একবার মুখ তুলিয়া অচলার প্রতি চাহিতে গিয়া আর চোখ নামাইতে পারিল না। দেখিল সে দুটি স্থির দৃষ্টি তাহারই উপরে নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

অচলা শান্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, কাল সকালেই ত আমরা ও-বাড়ীতে যেতে পারি? বিস্ময়াভিভূত সুরেশের মুখে এই সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর কিছুতেই বাহির হইল না। সে শুধু অনিশ্চিত কণ্ঠে কোন মতে এই কথাটাই বলিতে চাহিল যে, সে বাড়ী এখনও সম্পূর্ণ বাস করিবার মত হয় নাই। তাহার মেঝেগুলা হয়ত এখনও ভিজা, নূতন দেয়ালগুলা হয়ত এখনও কাঁচা,—হয়ত অচলার কোন একটা অসুখ-বিসুখ,—না হয়ত তাহার—

কিন্তু আপত্তির তালিকাটা শেষ হইতে পাইল না।

অচলা একটু যেন হাসিয়াই বলিল, তা' হোক্‌গে। যে দুর্দ্দিনে শিয়াল-কুকুর পর্য্যন্ত তার ঘর ছাড়তে চায় না, সে দিনেও যদি আমাকে অজানা যায়গার গাছতলায় টেনে আন্‌তে পেরে থাকো, ত একটু ভিজে মেঝে কি একটু কাঁচা দেয়ালের ভয়ে তোমাকে আমার জন্যে ভেবে সারা হতে হবে না। সে দিন যার মরণ হয়নি সে আজ ও বেঁচে থাকবে।

রামবাবুর দিকে ফিরিয়া কহিল, আপনি একটুও ভাববেন না জ্যাঠামশায়। আমরা কাল সকালেই যেতে পারবো। আপনার ঋণ আমি জন্ম-জন্মান্তরেও শোধ করতে পারব না; কিন্তু আর বোঝা বাড়াব না জ্যাঠামশাই, আমরা কালই বিদায় হব। বলিতে-বলিতেই সে কাঁদিয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইয়া নিজের ঘরে গিয়া কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধ রামবাবু ঠিক যেন বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার বিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টি একবার সুরেশের আনত মুখের প্রতি, একবার ওই অবরুদ্ধ দ্বারের প্রতি চাহিয়া কেবলই এই বিফল প্রশ্ন করিতে লাগিল, এ কি হইল? কেন হইল? কেমন করিয়া সম্ভব হইল? কিন্তু অন্তর্যামী ভিন্ন এই মর্ম্মান্তিক অভিমানের আর কে উত্তর দিবে!

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাত হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সেই মলিন আকাশতলে সমস্ত সংসারটাই কেমন এক প্রকার বিষণ্ণ ম্লান দেখাইতেছিল। সজ্জিত গাড়ী দ্বারে দাঁড়াইয়া; কিছু কিছু তোরঙ্গ বিছানা প্রভৃতি তাহার মাথায় তোলা হইয়াছে; পাঁজির শুভ-মুহূর্ত্তে অচলা নীচে নামিয়া আসিল এবং গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে রামবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিতেই তিনি জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিলেন, মা, বুড়ো মানুষের মা হওয়ার অনেক ল্যাঠা। একটু পায়ের ধূলো নিয়ে, আর মাইল-দুই তফাতে পালিয়েই পরিত্রাণ পাবে যেন মনে কোরো না।

অচলা সজল চক্ষু দুটি তুলিয়া আস্তে আস্তে কহিল, আমি ত তা চাইনি জ্যাঠামশাই।

এই করুণ কথাটুকু শুনিয়া বৃদ্ধের চোখেও জল আসিয়া পড়িল। তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, এই অপরিচিত মেয়েটি আবার যেন পরিচয়ের বাহিরে কত দূরেই না সরিয়া যাইতেছে। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, সে কি আমি জানিনে মা। নইলে, স্বামী নিয়ে আপনার ঘরে যাচ্চো, চোখে আমার জল আস্‌বে কেন? কিন্তু তবু ত আট্‌কাতে পারলাম না। এই বলিয়া হাত দিয়া এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া আবার হাসিয়া কহিলেন, কাছে ছিলে রাত্রিদিন উপদ্রব কোরতাম, এখন সেইটে পেরে উঠ্‌ব না বটে, কিন্তু এর সুদশুদ্ধ তুলে নিতেও ত্রুটি হবে না, তাও কিন্তু তুমি দেখে নিয়ো।

সুরেশ পিছনে ছিল, সে আজ এই প্রথম যথার্থ ভক্তি-ভরে বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলে তিনি চুপি চুপি বলিলেন, আমার এখানে আপনি সুখে ছিলেন না সে আমি জানি সুরেশ বাবু। নিজের গৃহে এবার এইটেই যেন দূর হয়, আমি কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি।

সুরেশ কোন কথাই কহিল না, কেবল আর একবার হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল।

রামবাবু আর এক দফা আশীর্ব্বাদ করিয়া উচ্চ স্বরে জানাইয়া দিলেন যে তিনিও একখানা এক্কা আনিতে বলিয়া দিয়াছেন। হয়ত বা বেলা পড়িতে-না-পড়িতেই গিয়া হাজির হইবেন, কিন্তু তখন রাগ করিলে চলিবে না। এই বলিয়া পরিহাস করিতে গিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৌন হইলেন।

গাড়ী চলিয়া গেলে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ ভালই হইল যে ইহারা সময় থাকিতে চলিয়া গেল। এখানে শুধু যে স্থানাভাব তাই নয়, তাঁহার বিধবা ভগিনীটির স্বভাবটিও তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। অপরের নাড়ির খবর জানিতে তাহার কৌতূহলের অবধি নাই। সে আসিয়াই সুরমার কঠিন পরীক্ষা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, এবং তাহার ফল আর যাহাই হোক আহ্লাদ করিবার বস্তু হইবে না। এই মেয়েটির কিছুই না জানিয়াও তিনি জানিয়াছিলেন, সে সত্যসত্যই ভদ্রমহিলা। কোন একটা সুবিধার খাতিরে সে কিছুতেই মিথ্যা বলিতে পারিবে না,— সে সে ব্রাহ্ম পিতার কন্যা, সে যে নিজেও ছোঁয়া-ছুঁয়ি ঠাকুর-দেবতা মানে না ইহার কোনটাই গোপন করিবে না। তখন এ বাটীতে যে বিপ্লব বাধিয়া যাইবে তাহা কল্পনা করিতেও হৃদ্‌কম্প হয়। কিন্তু, ইহা ত গেল তাঁহার নিজের সুখ

সুবিধার কথা। আরও একটা ব্যাপার ছিল, যাহাকে তিনি নিজের কাছেও কখনও স্পষ্ট করিয়া লইতে চাহিতেন না। তাঁহার মেয়ে ছিল না, কিন্তু প্রথম সন্তান তাঁহার কন্যা হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আজ সে বাঁচিয়া থাকিলে অচলার জননী হইতে পারিত, সুতরাং, বয়স বা চেহারার সাদৃশ্য কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই ক্ষুধাটা যে তাঁহার কতবড় ছিল, তাহা এই অচেনা মেয়েটিকে যে দিন পথেপথে কাঁদিয়া চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিতে দেখিয়াছিলেন, সেইদিনই টের পাইয়াছিলেন। সেদিন মনে হইয়াছিল সেই বহুদিনের হারানো সন্তানটিকেই যেন হঠাৎ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এবং তখন হইতে সে মমতা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্তরে অনুভব করিতেন সত্য, কি যেন একটা গভীর রহস্য এই মেয়েটিকে ঘেরিয়া তাঁহাদের অগোচরে আছে; কিন্তু তাই থাক—যাহা চোখের আড়ালে আছে তাহা আড়ালেই থাকুক, চেষ্টা করিয়া তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া আর কাজ নাই।

একদিন রাক্ষুসী এইটুকু মাত্র আভাস দিয়াছিল, যে বোধ হয় ভিতরে একটা পারিবারিক বিবাদ আছে,—বোধ হয় কলহ করিয়াই সুরেশবাবু স্ত্রী লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। হঠাৎ যেদিন অচলা আপনাকে ব্রাহ্ম মহিলা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল, অথচ সুরেশের কণ্ঠে ইতিপূর্ব্বেই যজ্ঞোপবীত দেখা গিয়াছিল, সেদিন বৃদ্ধ চমকিত হইয়াছিলেন, আঘাত পাইয়াছিলেন, কিন্তু মনে মনে এই গুপ্ত রহস্যের যেন একটা হেতু খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সে দিন নিশ্চয় মনে হইয়াছিল সুরেশ ব্রাহ্ম ঘরে বিবাহ করিয়াই এই বিপত্তি ঘটাইয়াছে, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। ক্রমশঃ এই বিশ্বাসই তাঁহার মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

এই বৃদ্ধ লোকটি সত্যই হিন্দু ছিলেন, তাই হিন্দু ধর্ম্মের নিষ্ঠাকেই তিনি পাইয়াছিলেন, ইহার নিষ্ঠুরতাকে পান নাই। ব্রাহ্মণ-সন্তান সুরেশের এই দুর্গতি না ঘটিলেই তিনি খুসি হইতেন, কিন্তু এই যে ভালবাসার বিবাহ, এই যে আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ, এই যে লুকোচুরি, ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার মাধুর্য্য ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে ভারি মুগ্ধ করিত। ইহাকে না জানিয়া প্রশ্রয় দিতে যেন সমস্ত মন তাঁহার রসে ডুবিয়া যাইত। তাই, যখনই এই দুটি বিদ্রোহী প্রণয়ীর প্রণয়-অভিমান তাঁহার কাছে মাঝে মাঝে মনোমালিন্যের আকারে প্রকাশ পাইত, তখন অতিশয় ব্যথার সহিত তাঁহার এই কথাটাই মনে হইত, পরগৃহের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত গণ্ডীর মধ্যে যে মিলন কেবলই ঠোকাঠুকি খাইতেছে, তাহাই হয়ত নিজের বাটীর স্বাধীন ও প্রশস্ত অবকাশে সংসারের অসংখ্য কাজে ও অকাজে শান্তি ও সামঞ্জস্যে স্থিতি লাভ করিবে।

তাঁহার স্নানের সময় হইয়াছিল; গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া নদীর পথে অগ্রসর হইয়া চলিতে চলিতে মনে মনে হাসিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, মা, যাবার সময় এই বুড়োটার উপর বড় অভিমান করেই গেলে। ভাবলে, আপনার লোকের খাতিরে জ্যাঠামশাই আমাদের বাড়ীতে যায়গা দিলে না! কিন্তু দু'চার দিন পরে যেদিন গিয়ে দেখতে পাবো চোখে-মুখে হাসি আর আঁটচে না, সে দিন এর শোধ নেব। সেদিন বোল্‌ব, এই বুড়োটার মাথার দিব্বি রইল মা, সত্যি ক'রে বল্ দেখি একবার রাগের মাত্রাটা এখন কতখানি আছে? দেখ্‌ব, বেটি কি জবাব দেয়!

এই বলিয়া প্রশান্ত নির্ম্মল হাস্যে তাঁহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে-মনে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সুরমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কাজের ছুতা করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই থালায় সন্দেশ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া মুখ অসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিতে লাগিল, আমার হাতের তৈরি এই মিষ্টি যদি না খান জ্যাঠামশাই, ত, সত্যিসত্যিই ভারি ঝগড়া হয়ে যাবে!

স্নানান্তে জলে দাঁড়াইয়া গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করার মাঝে মাঝেও মেয়েটার সেই হাসি লুকাইবার চেষ্টাকে শাক দিয়া মাছ ঢাকার সঙ্গে তুলনা করিয়া বুড়ার ভারি হাসি পাইতে লাগিল, এবং অন্তরের মধ্যে যে ক্ষোভ গতরাত্রি হইতে নিরন্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল, তাহা সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া ফিরিবার পথেই কল্পনার স্নিগ্ধ বর্ষণে জুড়াইয়া জল হইয়া গেল।

কাল সকালেই সকলে পৌঁছিবেন, তার আসিয়াছে। সঙ্গে রাজকুমার নাতি এবং রাজবধূ ভাগিনেয়ীর সংশ্রবে সম্ভবতঃ লোকজন কিছু বেশিই আসিবে। আজ তাঁহার বাটীতে কাজ কম ছিল না, উপরন্তু আকাশের গতিকও ভাল ছিল না। কিন্তু পাছে জল আসিয়া পড়ে, পাছে

যাওয়ায় বিঘ্ন ঘটে, এই ভয়ে রামবাবু বেলা পড়িতে-না-পড়িতে এক্কা ভাড়া করিয়া বক্‌শিশের আশা দিয়া দ্রুত হাঁকাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পথেই জোলো-হাওয়ার সাক্ষাৎ মিলিল এবং এ-বাটীতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন কিছু-কিছু বর্ষণ সুরু হইয়াছে।

অচলা বাহির হইয়া কহিল, এই দুর্যোগের মধ্যে আজ আবার কেন এলেন জ্যাঠামশাই? আর একটু হলেই ত ভিজে যেতেন।

তাহার মুখে বা কণ্ঠস্বরে ভাবী-আনন্দের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া বুড়ার মন দমিয়া গেল। এ জন্য তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না,—কে যেন তাঁহার কল্পনার মালাটাকে একটানে ছিঁড়িয়া দিল। তথাপি মুখের উৎসাহ বজায় রাখিয়া কহিলেন, ওরে বাস্‌রে, তা'হলে কি আর রক্ষা ছিল'! জলে ভেজাটাকে সাম্‌লাতে পার্‌ব, কিন্তু ত্যাজ্যপুত্র হ'য়ে চিরটা কাল কে থাক্‌বে মা?

এই দুর্বোধ মেয়েটাকে বুড়া কোনদিনই বেশ ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ কাল রাত্রির ব্যবহারে ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার আজিকার আচরণে যেন একেবারে দিশাহারা আত্মহারা হইয়া গেলেন। সে যে কোন কালে, কোন কারণেই এরূপ করিতে পারে তেমন স্বপ্ন দেখাও যেন অসম্ভব। কথা ত মাত্র এইটুকু। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়েটা ঠিক পাগল হইয়া গিয়া একেবারে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া হুহু-স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, জ্যাঠামশাই, কেন আমাকে আপনি এত ভালবাস্‌লেন,—আমি যে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্চি!

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধ কোন কথা কহিতে পারিলেন না, শুধু এক হাতে তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া রাখিয়া অন্য হাতে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নেহার্দ্র-চিত্ত সেই সব সামাজিক অননুমোদিত বিবাহের কথা, আত্মীয়-স্বজন, হয়ত বা বাপ-মায়ের সহিত বিদ্রোহ বিচ্ছেদের কথা, বিবাদ করিয়া গৃহত্যাগের কথা,—এই সকল পুরাতন, পরিচিত ও বহুবারের অভ্যস্ত চিন্তার ধারা ধরিয়াই বহিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই আর একটা নূতন খাদ খনন করিবার কল্পনা মাত্র করিল না। এম্‌নি করিয়া এই নির্বাক বৃদ্ধ ও রোরুদ্যমানা তরুণী বহুক্ষণ একভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপরে চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, এতে আর লজ্জা কি মা! তুমি আমা[র] মেয়ে, তুমি আমার সেই সতীলক্ষ্মী মা অনেককাল আ[গে] কেবল দুদিনের জন্যে আমার কোলে এসেই চ[লে] গিয়েছিলে,—মায়া কাটাতে না পেরে আবার বাপের বু[কে] ফিরে এসেচ,—আমি যে তোমাকে দেখেই চিন্‌[তে] পেরেছিলাম সুরমা। এই বলিয়া তাহাকে নিকটবর্ত্তী একটা চেয়ারে বসাইয়া নানা রকমে পুনঃপুনঃ এই কথাটা বুঝাইতে লাগিলেন, যে ইহাতে কোন লজ্জা, কোন সর[ম] নাই। যুগে-যুগে চিরদিনই ইহা হইয়া আসিতেছে। যি[নি] সতী, যিনি স্বয়ং আদ্যাশক্তি, তিনিও একবার স্বামীর ঘ[র] করিতে বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গেই ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন! আবার সব হইবে, সব ফিরিয়া পাইবে, আজ যাহারা বিমুখ আবার তাহারা মুখ ফিরাইবে আবার তাহাদের পুত্র-পুত্রবধূকে ঘরে তুলিয়া লইবে দেখিয়ো দেখি মা, আমার এ আশীর্ব্বাদ কখনো নিষ্ফ[ল] হইবে না!

এম্‌নি কত-কি বৃদ্ধ মনের আবেগে বকিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতে সার যাহা ছিল তাহা থাক্, কি[ন্তু] তাহার ভারে যেন শ্রোতাটির আনত মাথাটি ধীরে-ধীরে ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল চাপিয়া বৃষ্টি আসিয়াছিল। এম্‌নি সময়ে দেখিতে পাওয়া গেল সুরেশ ভিজিয়া, কাদা মাখিয়া কোথা হইতে হন্‌হন্ করিয়া বাড়ী ঢুকিতেছে। দেখিবামাত্রই অচলা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং উঠিয়া বৃষ্টির জ[লে] হাত বাড়াইয়া লইয়া অশ্রুজলের সমস্ত চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। রামবাবু বুঝিলেন, সুরমা যে জন্যই হোক চোখের জলের ইতিহাসটা স্বামীর কাছে গোপন রাখিতে চায়।

সে উপরে উঠিয়া রামবাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কথাবার্ত্তা পরে হবে সুরেশবাবু, আমি পালাই-নি। আপনি কাপড় ছেড়ে আসুন।

সুরেশ হাসিল, কহিল, এ কিছুই না, বলিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিবার উদ্যোগ করিতেছিল, অচলা মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, জ্যাঠামশায়ের কথাটা শুন্‌তে

দোষ কি? একমাস হয়নি তুমি অতবড় অসুখ থেকে উঠেচ,—বারবার আমাকে আর কত শাস্তি দিতে চাও?

তাহার বাক্য ও চাহনির মধ্যে এত বড় ব্যবধান ছিল যে দুজনেই বিস্মিত হইলেন, কিন্তু এই বিস্ময়ের স্রোতটা বহিতে লাগিল ঠিক বিপরীত মুখে। সুরেশ কোন জবাব না দিয়া নীরবে আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল, আর রামবাবু বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

সেই বাহিরে বারি-পাতের আর বিরাম নাই; রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল বৃষ্টির প্রকোপ যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বহুদিনের অবর্ষণে ধরিত্রী শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল; মনে হইতে লাগিল তাহার সমস্ত দীনতা, সমস্ত অভাব আজিকার এই রাত্রির মধ্যেই পরিপূর্ণ করিয়া দিতে বিধাতা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

রামবাবুর উদ্বেগ লক্ষ্য করিয়া অচলা আস্তে-আস্তে বলিল, ফিরে যেতে যে বড় কষ্ট হবে জ্যাঠামশাই, আজ রাত্তিরেই কি না গেলে নয়? তিনি হাসিলেন, মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া কহিলেন, কষ্টের জন্যে না হোক, এই দুর্য্যোগে এই নূতন যায়গায় তোমাদের ছেড়ে আমি যেতাম না। কিন্তু কাল সকালেই যে ওঁরা সব আস্‌বেন, রাত্রির মধ্যেই আমার ত ফিরে না গেলেই নয় সুরমা। কিন্তু মনে হচ্চে এ রকম থাক্‌বে না, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কমে আস্‌বে। আমি এই সময়টুকু অপেক্ষা করে দেখি।

এই প্রসঙ্গে কাল যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহাদের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া আলোচনা সংসারের দিকে, সমাজের দিকে, ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য ইহলোক পরলোক কত দিকেই না ধীরে-ধীরে ছড়াইয়া পড়িল। উভয়ে এম্‌নি মগ্ন হইয়া রহিলেন যে সময় কতক্ষণ কাটিল, রাত্রি কত হইল, কাহারও চোখেও পড়িল না। বাহিরে গর্জ্জন ও বর্ষণ উত্তরোত্তর কিরূপ নিবিড়, অন্ধকার কত দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও কেহ দৃষ্টিপাত করিল না। এই বৃদ্ধের মধ্যে যে জ্ঞান, যে ভূয়োদর্শন, যে ভক্তি সঞ্চিত ছিল, তাঁহার পরম স্নেহের পাত্রীটির কাছে তাহা অবাধে উৎসারিত হইতে পাইয়া এই কেবল মাত্র দু'টি লোকের নিরালা সভাটিকে যেন মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল। অচলার শুধু এই চেতনাটুকু অবশিষ্ট ছিল যে, সে এমন একটি লোকের হৃদয়ের সত্য অনুভূতির খবর পাইতেছে, যিনি নির্ম্মল, যিনি নিষ্পাপ, যাঁহার স্নেহ, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সে একান্ত ভাবেই লাভ করিয়াছে।

হঠাৎ পদশব্দে চকিত হইয়া উভয়েই পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। সে কহিল, মা, রাত অনেক হয়েছে, প্রায় বারোটা বাজে,—আপনার খাবার কি উপরেই দিয়ে যাবে?

অচলা চমকিয়া কহিল, বারোটা বাজে? বাবু?

তিনি এইমাত্র খেয়ে শুতে গেছেন।

সে যে সেই গিয়াছে আর আসে নাই, ইহা শুধু এখনই চোখে পড়িল। অচলা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, শোবার ঘরের পর্দার ফাঁক দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। রামবাবু ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া বারবার বলিতে লাগিলেন, আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে মা, বড় অন্যায় হয়েছে। তোমাকে এমন ধরে রাখ্‌লাম যে তাঁর খাওয়া হ'ল কি না তুমি চোখে দেখ্‌তেও পেলে না। এখন যাও মা তুমি খেতে—

অচলা এ সকল কথায় বোধ হয় কান দিল না। ভৃত্যকে প্রশ্ন করিল, কোচমান গাড়ী জুতে ঠিক সময়ে আসেনি কেন?

ভৃত্য কহিল, নূতন ঘোড়া, এই ঝড়-জল অন্ধকারে বার করতে তার সাহস হয় না।

তা' হলে আর কোন গাড়ী আনা হয়নি কেন?

ভৃত্য চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু তাহার অর্থ অপরাধ স্বীকার করা নয়, বরঞ্চ প্রতিবাদ করা যে এ হুকুম ত তাহারা পায় নাই!

রামবাবু উৎকণ্ঠার পরিবর্ত্তে লজ্জা পাইয়াই ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, গাড়ীর আবশ্যক নাই,—না গেলেও ক্ষতি নাই—কেবল প্রত্যুষে ষ্টেশনে গিয়া হাজির হইতে পারিলেই চলিবে। আমি রাত্রে কিছুই খাইনে, আমার সে ঝঞ্ঝাটও নেই,—শুধু তুমি দুটি খেয়ে নিয়ে শুতে যাও মা, কথায় কথায় বড্ড রাত হয়ে গেছে,—বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে—এই বলিয়া একরকম জোর করিয়াই তাহাকে নীচে খাবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন, এবং মিনিট পোনের পরে সে ফিরিয়া আসিতেই তেম্‌নি ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এক মিনিট দেরি নয় মা, তুমি শুতে যাও। আমি এই বসবার ঘরের কোচখানার উপরে দিব্যি শুতে পারব, আমার কোন কষ্ট কোন অসুবিধে হবে না—শুধু তুমি শুতে যাও সুরমা, আমি দেখি।

বৃদ্ধের সনির্ব্বন্ধ আবেদন ও নিবেদন এবং পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা অচলাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। যে মিথ্যা সম্মান, প্রীতি ও শ্রদ্ধা সে তাহার এই নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী পিতৃব্যসম বৃদ্ধের নিকট হইতে এতকাল শুধু প্রতারণার দ্বারাই পাইয়া আসিয়াছে, সেই লোভেই এই তাহার একান্ত দুঃসময়ে কণ্ঠরোধ করিয়া অপ্রতিহত বলে সুরেশের ওই নির্জ্জন শয়ন-মন্দিরের দিকে ঠেলিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল এমনি এক ঝড়-জল-দুর্দিনের রাত্রেই একদিন তাহাকে স্বামীহারা করিয়াছিল, আজ আবার তেমনি এক দুর্দিনের দুরতিক্রম্য অভিশাপ তাহাকে চির-দিনের মত সীমাহীন অন্ধকারে ডুবাইতে উদ্যত হইয়াছে। কাল অসহ্য অপমানে, লজ্জার গভীরতম পঙ্কে তাহার আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া যাইবে, ইহা সে চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু তবুও আজিকার মত ওই মিথ্যাটাই জয়-মাল্য পরিয়া তাহাকে কোন মতেই সত্য প্রকাশ করিতে দিল না। আজ জীবনের এই চরম মুহূর্ত্তে অভিমান ও মোহই তাহার চিরজয়ী হইয়া রহিল। সে বাধা দিল না, কথা কহিল না, একবার পিছনে চাহিয়াও দেখিল না,—নিঃশব্দে ধীরে-ধীরে সুরেশের শয়ন-কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

বাহিরের মত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।

নূতন স্থানে রামবাবুর সুনিদ্রা হয় নাই, বিশেষতঃ মনের মধ্যে চিন্তা থাকায় অতি প্রত্যুষেই তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া-ছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন বৃষ্টি থামিয়াছে বটে কিন্তু ঘোর কাটে নাই। চাকররা কেহ উঠিয়াছে কি না দেখিবার জন্য বারান্দার এক প্রান্তে আসিয়া হঠাৎ চমকিয়া গেলেন। কে যেন টেবিলে মাথা পাতিয়া চেয়ারে বসিয়া আছে। কাছে আসিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, সুরমা, তুমি যে? এত ভোরে উঠেছ কেন মা?

সুরমা একবার মাত্র মুখ তুলিয়াই আবার তেমনি করিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিল। তাহার মুখ মড়ার মুখের মত শাদা, দুই চোখের কোলে গাঢ় কালিমা, এবং কালো পাথরের গা দিয়া যেমন ঝরণার ধারা নামিয়া আসে, ঠিক তেমনি দুই চোখের কোল বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

বৃদ্ধ শুধু একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া একদৃষ্টে ওই অর্দ্ধমৃত নারী-দেহের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথাই তাঁহার কণ্ঠ ভেদিয়া বাহির হইতে পারিল না।

সাহিত্য-সংবাদ

ভ্রম-সংশোধন

গত ভাদ্র-মাসের "আলোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে একটী মারাত্মক রকমের ভ্রম থাকিয়া গেছে। উক্ত প্রবন্ধের লেখক মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, "আলোচনা" প্রবন্ধের যে প্যারাগ্রাফে হাইকোর্টের নূতন বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহশেয়ের কথা আছে, সেই প্যারাগ্রাফের শেষের তিন-চারি লাইন একেবারেই ভ্রমপূর্ণ। এই ভ্রমের জন্য লেখক মহাশয় আন্তরিক দুঃখিত, লজ্জিত এবং অনুতপ্ত। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ এই ভ্রমটি আমাদেরও চোখে পড়ে নাই; সেজন্য আমরাও দুঃখিত হইতেছি।

সোণার-পদ্ম।—শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, প্রণীত সোণার-পদ্মের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় দেশের অন্তর্গত সাবন্তবাদীর রাণী মহোদয়া ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। মহারাষ্ট্র-দেশে বাঙ্গালা গ্রন্থের এই আদর আমাদের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

বসুমতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "দগ্ধ হৃদয়" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১॥০

নিত্যকৃষ্ণ বসু প্রণীত ॥০ সংস্করণের ৪৩ সংখ্যক পুস্তক "ভবানী" প্রকাশিত হইয়াছে এবং হিতবাদীর সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-কুমার গুপ্ত প্রণীত ৪৪ সংখ্যক পুস্তক "অমিয় উৎস" আশ্বিনের প্রথমেই প্রকাশিত হইবে।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের 'শ্রীমদ্ভাগবদ্-গীতার' ষষ্ঠ-খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই সুবৃহৎ খণ্ডের মূল্য কাগজের বাঁধা ১॥০ কাপড়ের বাঁধা ২৲।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, Calcutta.



[illegible]

[illegible]



কার্ত্তিক, ১৩২৬

প্রথম খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [পঞ্চম সংখ্যা

অশ্বিদ্বয়

[অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

বৈদিক ঋষিগণ অশ্বিদ্বয় নামক যুগ্ম দেবের আরাধনা করিতেন। এই দেবদ্বয়কে তাঁহারা দস্র, নাসত্য, নর, রুদ্র প্রভৃতি নামেও আহ্বান করিতেন। বৈদিক যুগে রুদ্র নামক এক দেবতার পূজা প্রচারিত ছিল। তাঁহার বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি দেব-লোকের শ্রেষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন (১); এবং কেহ তাঁহার ক্রোধে পড়িলে, তাহার ও তাহার পুত্র, অশ্ব, গো প্রভৃতির মৃত্যু অনিবার্য্য বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত (২)। অশ্বিদ্বয়কে রুদ্রদ্বয় নাম প্রদান করায়, সায়ণাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন রুদ্র-পুত্রদ্বয় (৩)। এই রুদ্রদ্বয়ও দেব-বৈদ্য রূপে পূজিত হইতেন (৪)। ইঁহারা খঞ্জকে অয়োময় পদ, অন্ধকে চক্ষু, বৃদ্ধকে যৌবন প্রভৃতি

---

(১) মা। ত্বা। রুদ্র। চুক্রুধাম। নমোভিঃ
উৎ। নঃ। বীরান্। অর্পয়। ভেষজেভিঃ
ভিষক্তমম্। ত্বা। ভিষজাং। শৃণোমি। ৪।৩৩।৪

আমাদিগের বীরদিগকে ভেষজ সকলের দ্বারা সুন্দর রূপে যুক্ত কর। তোমাকে ভিষক্‌দিগের মধ্যে ভিষক্তম শ্রবণ করি। হে রুদ্র! তোমাকে নমস্কার সকলের দ্বারা ক্রুদ্ধ করিব না।

(২) মা। নঃ। তোকে। তনয়ে। মা। নঃ। আয়ৌ
মা। নঃ। গোষু। মা। নঃ। অশ্বেষু। রিরিষঃ।
বীরান্। মা। নঃ। রুদ্র। ভামিতঃ। বধীঃ
হবিষ্মন্তঃ। সদং। ইৎ। ত্বা। হবামহে॥ ১।১১৪।৮

হে রুদ্র! আমাদিগের পুত্রে, পৌত্রে, আমাদিগের আয়ুতে, আমাদিগের গো-সকলে, আমাদিগের অশ্ব-সকলে হিংসা করিও না। আমরা সর্ব্বদা হবি দ্বারা তোমায় আহ্বান করিতেছি।

(৩) মধ্বঃ। উঁ। সু। মধুযুবা। রুদ্রা। সিসক্তি। পিপ্যুষী। ৫।৭৩।৮

হে মধুরদ্বয়! হে রুদ্রদ্বয়! মধুর রসের দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া (আমাদের স্তব) সেবা করিতেছেন।

(৪) আ। অধত্তম্। দস্রা। ভিষজৌ। অবর্বন্। ১।১১৬।১৬

হে দস্রদ্বয় (অর্থাৎ দর্শনীয়দ্বয়)! হে ভিষক্‌দ্বয়! আরোগ্য প্রদান করিয়াছ।

প্রদান করেন বলিয়া আর্য্যদিগের মধ্যে পূজার্হ ছিলেন (৫)। সমুদ্রে কোন ভক্ত বিপদগ্রস্ত হইলে, অশ্বিদ্বয় তাহাকে আপনাদিগের শত-দাঁড়-যুক্ত নৌকা দ্বারা উদ্ধার করিতেন, এরূপ বিশ্বাসও আর্য্যগণ হৃদয়ে পোষণ করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ ঋগ্বেদের ঋষিগণ একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তুগ্র নামে কোন ব্যক্তি তাঁহার পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রে প্রেরণ করেন। কিন্তু সে সমুদ্রে ডুবিয়া যায়। অশ্বিদ্বয় শত-দাঁড়-যুক্ত নৌকায় ভুজ্যুকে স্থাপন করিয়া গৃহে আনয়ন করেন (৬)।

অশ্বিদ্বয়ের আর একটী বিশেষ গুণ এই ছিল যে, তাঁহাদের আরাধনা করিলে, কন্যা পতি লাভ করে, ও পুরুষ স্ত্রী-রত্ন লাভ করে (৭)। বিবাহের পর বধূকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে লইয়া যাইবার ভার এই দেবদ্বয়ের উপর অর্পিত হইত (৮)। দেবলোকে যখন সূর্য্যের কন্যার সহিত চন্দ্রের বিবাহ হয়, তখন অশ্বিদ্বয়ই চন্দ্রের 'বেনাকে' আপনাদিগের রথে করিয়া পতি-গৃহে লইয়া যান (৯)।

অশ্বিদ্বয়ের আরো নানা গুণ ছিল। সে সকলের দ্বারাও তাহাদিগকে ভক্ত-বৎসল 'নরদ্বয়' রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। পুরাণের যুগে যে দেবদ্বয় নর-নারায়ণ রূপে পূজিত হইয়াছেন, অশ্বিদ্বয়ের 'নরদ্বয়' নাম দ্বারা তাঁহাদিগেরই আভাষ আমরা প্রাপ্ত হই। ইঁহারা যে স্ত্রীলোক দ্বারাও পূজিত হইতেন, ঋগ্বেদের কোন-কোন স্থানে তাহা আমাদিগের দৃষ্টি-গোচর হয় (১০)। আর্য্য স্ত্রীগণ অশ্বিদ্বয়কে আপনাদিগের পরমারাধ্য দেব রূপে বিশ্বাস করিতেন। দেবকন্যা সূর্য্যাও তাঁহাদের রথই আশ্রয় করিয়াছেন (১১)। বৈদিক যুগে অশ্বিদ্বয়ের জন্য রথ-যজ্ঞ হইত। ঋভুগণ এই যজ্ঞের প্রবর্ত্তক ছিলেন। কোন-কোন ঋষির মতে তাঁহারাই অশ্বিদ্বয়ের রথ মনে-মনে ধ্যান করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া-

(৫) অন্ধস্য। চিৎ। নাসত্যা। কৃশস্য। চিৎ।
যুবাং। ইৎ। আহুঃ। ভিষজা। রুতস্য। চিৎ। ১০।৩৯।৩

হে নাসত্যদ্বয়! তোমাদিগকে অন্ধের, কৃশের ও রুতের চিকিৎসক-দ্বয় বলে।

সদ্যঃ। জংঘাম্। আয়সীং। বিশ্পলায়ৈ। ১।১১৬।১৫
বিশ্পলাকে সদ্য আয়সী জংঘা (দিয়াছ)।

পুনঃ। চ্যবানং। চক্রথুঃ। যুবানম্। ১।১১৮।৬
চ্যবানকে পুনরায় যুবা করিয়াছ।

(৬) অনারম্ভনে। তৎ। অবীরয়েথাম্
অনাস্থানে। অগ্রভণে। সমুদ্রে।
যৎ। অশ্বিনৌ। ঊহথুঃ। ভুজ্যুং। অস্তম্
শত অরিত্রাম্। নাবম্। আতস্থিবাংসম্॥ ১।১১৬।৫

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অবলম্বন-রহিত, স্থান-রহিত, হস্ত-গ্রাহ্য বস্তু-রহিত, সমুদ্রে সেই বীর কার্য্য করিয়াছ—যাহাতে শত-দাঁড়-যুক্ত নৌকায় ভুজ্যুকে স্থাপন করিয়া গৃহে আনিয়াছিলে।

(৭) ঘোষায়ৈ। চিৎ। পিতৃসদে। দুরোণে।
পতিম্। জূর্য্যন্ত্যৈ। অশ্বিনৌ। অদত্তম্॥ ১।১১৭।৭
যুবং। শ্যাবায়। রুশতীং। অদত্তম্। ১।১১৭।৮

হে অশ্বিদ্বয়! পিতৃ-গৃহে অবস্থিতা জরা-গ্রস্তা ঘোষাকে পতি দিয়াছ। শ্যাবকে সুন্দরী যুবতী দিয়াছ।

(৮) পূষা। ত্বা। ইতঃ। নয়তু। হস্তগৃহ্য
অশ্বিনা। ত্বা। প্র। বহতাং। রথেন।
গৃহান্। গচ্ছ। গৃহপত্নী। যথা। অসঃ।
বশিনী। ত্বং। বিদথং। আ। বদাসি॥ ১০।৮৫।২৬

পূষা তোমাকে (অর্থাৎ বধূকে) হস্তে গ্রহণ করিয়া এই স্থান হইতে লইয়া যান; অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথের দ্বারা বহন করুন; (পতি) গৃহে গমন কর, গৃহ-পত্নী হও; (তুমি) (পতির) বশে থাকিয়া গৃহস্থিত (লোককে) আজ্ঞা কর।

(৯) এয়ঃ। পবয়ঃ। মধুবাহনে। রথে
সোমস্য। বেনাং। অনু। বিশ্বে। ইৎ। বিদুঃ। ১।৩৪।২

হে অশ্বিদ্বয়! (তোমাদিগের) মধু বহনকারী রথে তিনটী চক্র আছে, ইহা সকলে সোমের বেনাকে (অর্থাৎ কমনীয়া ভার্য্যাকে) লইয়া যাইবার সময় জানিয়াছে।

যৎ। অশ্বিনা। পৃচ্ছমানৌ। অযাতম্
ত্রিচক্রেণ। বহতুং। সূর্য্যায়াঃ। ১০।৮৫।১৪

হে অশ্বিদ্বয়! যখন তৃতীয় চক্রের দ্বারা সূর্য্যার বিবাহে জিজ্ঞাসা করিতে-করিতে আসিয়াছিলে।

(১০) ঘোষা ঋষি অশ্বিদ্বয়ের দুইটী সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন। উহারা দশম মণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ সূক্ত।

(১১) আ। বাং। রথং। দুহিতা। সূর্য্যস্য
কার্ষ্ম ইব। অতিষ্ঠৎ। অর্বতা। জয়ন্তী।
বিশ্বে। দেবাঃ। অনু। অমন্যন্ত। হৃৎভিঃ
সং। উং। শ্রিয়া। নাসত্যা। সচেথে॥ ১।১১৬।১৭

দ্রুতগামী অশ্বদ্বারা জয়লব্ধা সূর্য্যের দুহিতা তোমাদিগের রথে কার্ষ্ম সদৃশ অবস্থান করিতেছেন। বিশ্ব-দেবগণ হৃদয়ের দ্বারা ইহা অনুমোদন করিয়াছেন। হে নাসত্যদ্বয়! (তোমরা) শ্রীর দ্বারা সঙ্গত হইলে।

ছিলেন (১২)। ইন্দ্রের জন্য অশ্ব এবং বৃহস্পতির জন্য ধেনু তাঁহারাই নির্ম্মাণ করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (১৩)। ইহা হইতে আমরা অনুমান করি—ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অশ্বিদ্বয়ের জন্য যথাক্রমে অশ্ব, ধেনু ও রথ দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান ঋভুদিগের প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান কালে হিন্দুদিগের মধ্যে রথযাত্রা এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। রথে যে ত্রিমূর্ত্তি বর্ত্তমান, তাহাদের দুইটী পুরুষ এবং একটী স্ত্রী। এক্ষণে হিন্দুগণ পুরুষ দুইটীকে কৃষ্ণ ও বলরাম এবং স্ত্রী-মূর্ত্তিকে সুভদ্রারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা অনুমান করি, এই রথযাত্রা ঋভুগণ-প্রতিষ্ঠিত রথ-যজ্ঞ; এবং ইহার দেবতা অশ্বিদ্বয় ও সূর্য্যা। অশ্বিদ্বয়ের যজ্ঞে সুরা ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ, একটী ঋকে ঋষি বলিতেছেন, "তোমাদিগের অশ্বের খুর হইতে শত কুম্ভ পূর্ণ করিয়া সুরা নির্গত হয় (১৪)।" জগন্নাথ দেবের ভোগেও শুনা যায় সুরার আবশ্যক হয়। ঋগ্বেদে মরুৎ নামে যে দেব-সঙ্ঘ পূজিত হইতেন, তাঁহারাও রুদ্র-পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ (১৫)। হিন্দুদিগের মধ্যে যে চড়ক-পূজা এক্ষণে দেখিতে পাই, তাহাই প্রকৃত মরুৎদিগের পূজা। মরুৎদিগের যে বর্ণনা বেদে দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহাদের দেহে নানা অলঙ্কার বর্ত্তমান; যথা—হস্তে বলয়, বক্ষে হার, মস্তকে উষ্ণীষ প্রভৃতি (১৬)। তাঁহারা নানা প্রকার অস্ত্র ও আভরণে ভূষিত দিব্যলোকের বৈশ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন (১৭)।

মরুৎগণ দেবলোকের সাধারণ সৈন্যরূপে পরিকল্পিত হইতেন। যেমন দেবলোকে সেইরূপ মর্ত্ত্যলোকেও সাধারণ লোক অর্থাৎ বৈশ্যগণই সৈন্য হইত। আমাদের দেশের যে সকল লোক চড়কে সন্ন্যাস করেন, তাঁহারা রুদ্রের পুত্ররূপে আপনাদিগকে মনে করেন এবং মরুৎগণের মত নানা অলঙ্কারে ভূষিত হন। পূর্ব্বকালে চড়ক-পূজায় সন্ন্যাসীগণ কত-কত বীর কর্ম্মদ্বারা আপনাদের শক্তি, সাহস ও অকুতোভয়তার দৃষ্টান্ত লোক-সমক্ষে প্রদর্শন করিতেন। এই সকল সেই বৈদিকযুগের মরুৎ-পূজারই অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত

(১২) রথং। যে। চক্রুঃ। সুবৃতং। সুচেতসঃ।
অবিহ্বরন্তং। মনসি। পরি। ধ্যায়া॥ ৪।৩৩।২

সুন্দর জ্ঞানযুক্ত (ঋভুগণ) সুবৃত, অবিনশ্বর রথ মনে-মনে ধ্যান করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

(১৩) অগ্নিং। দূতং। প্রতি। যৎ অব্রবীতন।
অশ্বঃ। কর্ত্ত্বঃ। রথঃ। উত। ইহ। কর্ত্ত্বঃ।
ধেনুঃ। কর্ত্ত্বা। যুবশা। কর্ত্ত্বা। দ্বা। তানি।
ভ্রাতঃ। অনু। বঃ। কৃত্বী। আ। ইমসি॥ ১।১৬১।৩

অগ্নি (বংশীয়) দূতকে (ঋভুগণ) যাহা বলিয়াছিলেন (তাহা এই):—

এক্ষণে অশ্ব-নির্ম্মাণ-কার্য্য এবং রথ-নির্ম্মাণ-কার্য্য, ধেনু-করণ, দুইটী যুবা-করণ (আমাদের কার্য্য)। হে ভ্রাতঃ! এই সকল করিয়া পশ্চাৎ তোমাদিগের নিকট আসিতেছি।

ইন্দ্রঃ। হরী। যুযুজে। অশ্বিনা। রথং।
বৃহস্পতিঃ। বিশ্বরূপাং। উপ। আজত।
ঋভুঃ। বিভ্বা। বাজঃ। দেবান্। অগচ্ছত।
সুঅপসঃ। যজ্ঞিয়ং। ভাগং। ঐতন॥ ১।১৬১।৬

(১৪) কারোতরাৎ। শফাৎ। অশ্বস্য। বৃষ্ণঃ।
শতং। কুম্ভান্। অসিঞ্চতম্। সুরায়াঃ॥ ১।১১৬।৭

(অশ্বিদ্বয়ের) বর্ষণ সমর্থ অশ্বের খুর (সদৃশ) সুরাধার হইতে সুরার শত কুম্ভ নির্গত হইয়াছিল।

(১৫) আ। রুদ্রাসঃ। ইন্দ্রবন্তঃ...। হিরণ্যরথাঃ। ৫।৫৭।১

হে রুদ্রপুত্রগণ! ইন্দ্রযুক্ত, হিরণ্যরথযুক্তগণ! আইস।

(১৬) ত্বেষং। গণং। তবসম্। খাদিহস্তম্। ৫।৫৮।২

দীপ্ত (মরুৎ) গণ বলবান (ও) বলয়যুক্ত হস্ত।

পুরু দ্রপ্সাঃ। অঞ্জিমন্তঃ।......রুক্ম বক্ষসঃ। ৫।৫৭।৫

প্রভূত সোমযুক্ত, আভরণযুক্ত......বক্ষে হারযুক্ত।

(১৭) অগ্নে। শর্ধন্তম্। আ। গণং।
পিষ্টং। রুক্মেভিঃ। অঞ্জিভিঃ। বিশঃ।
অদ্য। মরুতাং। অব। হ্বয়ে। দিবঃ।
চিৎ। রোচনাৎ। অধি॥ ৫।৫৬।১

হে অগ্নে! রুক্মদিগের দ্বারা, অলঙ্কারদিগের দ্বারা যুক্ত শত্রু অভিভবকারী (মরুৎ) গণকে আহ্বান কর। দিব্যলোকের বৈশ্য মরুৎদিগকে রোচন লোকের উপর হইতে নিম্নে (আসিবার জন্য) আহ্বান কর।

বাশীমন্তঃ। ঋষ্টিমন্তঃ। মনীষিণঃ।
সুধন্বানঃ। ইষুমন্তঃ। নিষঙ্গিণঃ।
সু অশ্বাঃ। স্থা। সুরথাঃ। পৃশ্নি মাতরঃ
সু আয়ুধা। মরুতঃ। যাথন। শুভম্॥ ৫।৫৭.২

কুঠারযুক্ত, ঋষ্টিযুক্ত, সুন্দর ধনুযুক্ত বাণযুক্ত, তূণীরযুক্ত শোভন জ্ঞানযুক্ত (মরুৎগণ) সুন্দর অশ্বযুক্ত, সুন্দর রথযুক্ত, সুন্দর আয়ুধযুক্ত, পৃশ্নি মাতাগণ শুভাগমন কর।

হইয়াছিল। রুদ্র সম্বন্ধীয় যে-কিছু পূজা বা যজ্ঞ দেশে প্রচলিত ছিল, তাহা বৈশ্যদিগের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বৈশ্য বলিতে সাধারণ লোককেই বুঝায়। অশ্বিদ্বয়ও রুদ্র-পুত্র বলিয়া তাঁহাদের যজ্ঞও সাধারণের মধ্যে আদরের হইয়াছিল। এখনও আমরা জগন্নাথ-ক্ষেত্রে বৈদিক রথ-যজ্ঞই দেখিতে পাই। সেখানে জাতিবিচার থাকিতে পারে না। কারণ রুদ্র ও তাঁহার পুত্রদিগের যজ্ঞে জাতি-বর্ণের স্থান নাই—ইহা বিশ বা peopleএর যজ্ঞ। অনেকে ইহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ চিহ্ন রূপে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এ বিষয়ে এক-মত হইতে পারিতেছি না। কারণ, এই রথ-যজ্ঞের মূল বেদেই বর্ত্তমান; এবং সেই যজ্ঞের দেবতার সহিত অতি আশ্চর্য্যভাবে পুরীর ত্রি-দেবতার সামঞ্জস্য সাধিত হইতেছে। কৃষ্ণের জীবনে সুভদ্রাকে লইয়া দুই ভ্রাতার রথ-যাত্রার কোন উল্লেখ নাই।

বৈদিক যুগে অশ্বিদ্বয়ের রথের একটু বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের রথে তিনটী চক্র। এই তিন চক্র যে তাঁহাদের রথে সর্ব্বদা যুক্ত থাকিত, তাহা কোন-কোন ঋকে প্রকাশিত হইলেও, এমন কতকগুলি ঋক্ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে মনে হয়, অশ্বিদ্বয় বিভিন্ন চক্র বিভিন্ন কালে নিজ রথে যোজনা করিতেন। সূর্য্যার বিবাহকালে যখন তাঁহাকে পতি-গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন, তখন অশ্বিদ্বয় তৃতীয় চক্র ব্যবহার করিয়াছিলেন (১৮)। এই সময়ে পূষা তাঁহাদিগকে সূর্য্য-লোকে বরণ করিয়া ল'ন। ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহাদের এই তৃতীয় চক্রটী তাঁহারা কোথায় লুকাইয়া রাখেন (১৯)? ঋষি তৎপর ঋকেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন:—হে সূর্য্যে! ব্রাহ্মণগণ সেই দুই চক্রকে ঋতু ক্রমে জানেন; আর যে একটী লুক্কায়িত চক্র আছে, তাহ অদ্ধাতিগণ জানেন (২০)। এই সূক্তটী কোন জ্যোতির্ব্বেত্ত ঋষির রচনা। সেই জন্য অশ্বিদ্বয়ের তিন চক্রের মধ্যে দুইটি চক্র ঋতু-ক্রমে ঋত্বিক-সকলে ও তৃতীয় চক্র কালে-ভদ্রে অদ্ধাতিগণ অবগত হন,—এইরূপে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ঋষিগণ রথচক্র দ্বারা গ্রহের মণ্ডলকে বুঝিতেন তাঁহারা সূর্য্য-মণ্ডলকে সূর্য্য-রথের চক্র রূপে বর্ণনা করিয়াছেন (২১)। অশ্বিদ্বয় কোন গ্রহ হইলে তাহার মণ্ডল (বা Disc) থাকিবে। অশ্বিদ্বয়ের উদয়ের কাল ঋতু-ক্রমে ঊষায় ও প্রদোষে ছিল, (২২)—ঋগ্বেদের সর্ব্বস্থলে দেখিতে পাই। কোন্ গ্রহ এই সকল লক্ষণ-যুক্ত? বর্ত্তমানকালে আমরা যাহাকে শুক্র গ্রহ বলি এবং ইংরেজীতে যাহাকে ভিনস (Venus) বলে, অশ্বিদ্বয় তাহা হইতে অভিন্ন অনুমান করি।

---

(১৮) যৎ। অশ্বিনা। পৃচ্ছমানৌ। অযাতং।
ত্রিচক্রেণ। বহতুং। সূর্য্যায়াঃ। বিশ্বে। দেবাঃ।
অনু। তৎ। বাং। অজানন্। পুত্রঃ।
পিতরৌ। অবৃণীত। পূষা॥ ১০।৮৫।১৪

হে অশ্বিদ্বয়! যখন তৃতীয় চক্রের দ্বারা সূর্য্যার বিবাহে জিজ্ঞাসা করিতে-করিতে আসিয়াছিলে, তাহার পর দেবগণ তোমাদিগকে জানিয়াছিলেন; পুত্র পূষা পিতৃদ্বয়কে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

(১৯) যৎ। অযাতং। শুভঃ। পতী। বরেয়ং। সূর্য্যাং। উপ। ক্ব। একং। চক্রং। বাং। আসীৎ। ক্ব। দেষ্ট্রায়। তস্থথুঃ॥ ১০।৮৫।১৫

হে শুভপতিদ্বয়! যখন বরণীয়া সূর্য্যার নিকট আসিয়াছিলে (তৎপূর্ব্বে) তোমাদের এক চক্র (অর্থাৎ তৃতীয় চক্র) কোথায় (লুকাইয়া) রাখিয়াছিলে? কোথায় দানে প্রবৃত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিলে?

(২০) দ্বে। তে। চক্রে। সূর্যে। ব্রহ্মাণঃ। ঋতুথাং। বিদুঃ। অথ। একং। চক্রং। যৎ। গুহা। তৎ। অদ্ধতেয়ঃ। ইৎ। বিদুঃ॥ ১০।৮৫।১৬

(২১) সপ্ত। যুঞ্জন্তি। রথং। একচক্রম্। ১।১৬৪।২
এক চক্ররথে ৭টী (অশ্বী) যোজিত হইয়াছে।

(২২) আ। বাং। বহিষ্ঠাঃ। ইহ। তে। বহন্ত
রথাঃ। অশ্বাসঃ। উষসঃ। বি উষ্টৌ।
ইমে। হি। বাং। মধুপেয়ায়। সোমাঃ
অস্মিন্। যজ্ঞে। বৃষণা। মাদয়েথাম্॥ ৪।১৪।৪

(হে অশ্বিদ্বয়!) এই যজ্ঞে তোমাদিগের সেই সকল বহন-সক্ষম রথ (ও) অশ্বসকল ঊষাদিগের উদয়ে বহন করিয়া আনয়ন করুক। হে বৃষদ্বয়! এই সকল মধুবৎ পেয় সোমসকল তোমাদিগকে এই যজ্ঞে মত্ত করুক।

আ। ইহ। দেবা। ময়োভুবা। দস্রা
হিরণ্যবর্ত্তনী। উষর্বুধঃ। বহন্ত। সোমপীতয়ে॥ ১।৯২।১৮

ঊষাকালে প্রবুদ্ধ (অশ্বগণ) এই (যজ্ঞে) সোমপানার্থ আরোগ্য প্রদানকারী দেব দস্রদ্বয়কে হিরণ্য-রথদ্বয়কে বহন করিয়া আনয়ন করুক।

তৌ। ইৎ। দোষা। তৌ। উষসি। শুভঃ।
পতী। তা। যামন্। রুদ্রবর্ত্তনী॥ ৮।২২।১৪

এই গ্রহই ঋতু-বিশেষে উষাকালে পূর্ব্বদিকে এবং প্রদোষে পশ্চিমাকাশে দেখা দেয়। আর্য্য ঋষিগণ শুক্র গ্রহের এই দুই মণ্ডলকে অশ্বিদ্বয়ের রথের দুইটী ভিন্ন চক্ররূপে কল্পনা করিতেন ;—যেন একটী চক্রে তাঁহারা পশ্চিমাকাশে এবং দ্বিতীয় চক্রে পূর্ব্বাকাশে বিচরণ করেন। কিন্তু অশ্বিদ্বয় তৃতীয় চক্রে কখন-কখন গমন করিতেন। সূর্য্যাকে সূর্য্যলোক হইতে স্বামী-গৃহে লইয়া যাইবার সময়ে ইহাঁদের তৃতীয় চক্র অদ্ধাতিগণ অবগত হইয়াছিলেন। ইহার মূলে কি কোন প্রাকৃতিক ঘটনা অবস্থিত নাই ? আমাদের মনে হয়, জ্যোতির্ব্বিদ ঋষিগণ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন যে, অশ্বিদ্বয় তাঁহাদের তৃতীয় চক্র সাহায্যে সূর্য্য-মণ্ডলে প্রবেশ করিতেন। ইহাকে ইংরেজীতে Transit of Venus বলা হয়। এরূপ গমনের উপরোক্ত কারণ তাঁহারা কল্পনা করিতেন। ইহা যে Transit of Venus, তাহার আর এক লক্ষণ এই যে, সূর্য্য-মণ্ডলে প্রবেশ করিবার সময় পূষা পিতৃদ্বয়কে বরণ করিয়া লয়,—এই বর্ণনা। আমরা অপর এক প্রবন্ধে পূষাকে বুধগ্রহ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছি। বুধগ্রহ সূর্য্যের নিকটে অবস্থান করে। এখানে ইহা অশ্বিদ্বয়ের পুত্র রূপেও বর্ণিত হইল। যখন অশ্বিদ্বয় (বা শুক্রগ্রহ) সূর্য্য-মণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করে, বোধ হয় তখন পূষা (বা বুধ) তাঁহার নিকটে ছিল, ঋষি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা যে খুব সম্ভব, সকলেই স্বীকার করিবেন। পাশ্চাত্য আর্য্যজাতির মধ্যে শুক্রগ্রহের Venus নাম কেন প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহার কারণ আমাদের এই মনে হয় যে, অশ্বিদ্বয়ের রথে 'বেনা' গমন করিতেছেন এই গল্পের 'বেনা' শব্দ Venus শব্দে পরিণত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যগণ কেন পরে অশ্বিদ্বয়ের 'শুক্র' নামকরণ করিয়াছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। দেখা যাইতেছে, অশ্বিদ্বয় যে শুক্র-গ্রহকে বুঝাইত, এ জ্ঞান ভারতে লোপ পাইয়াছে। কোন বেদ-ব্যাখ্যাকার, এরূপ অর্থ যে সম্ভব, তাহার আভাষমাত্র দেন নাই।

ঋগ্বেদের মধ্যে নব্য ঋষিগণের রচনায় আমরা অসুর শব্দ মন্দ অর্থে প্রাপ্ত হই। সম্ভবতঃ প্রাচীন ধর্ম্মের সংস্কার করিয়া অসুর নামে এক আর্য্য-সম্প্রদায় বৈদিক ভারতে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করে। উহারাই শুক্র নাম প্রদান করিয়া অশ্বিদ্বয়কে অসুরদিগের গুরুস্থানীয় করে। ঋগ্বেদের সনাতন আর্য্যগণ বৃহস্পতি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন। অসুরদিগের প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হওয়ায়, অসুর-গুরু শুক্রের নাম প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ায় ক্রমশঃ, অশ্বিদ্বয়ই যে শুক্র, পণ্ডিতগণ তাহা ভুলিয়া যান। তাঁহাদের দেবত্বেরও নানা পরিবর্ত্তন সাধিত হয় ... বর্ষণে যে দেখান গিয়াছে। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থও আমাদের অনুমান, এইটুকুই করে।

হে শুভ-পতিদ্বয়! তাঁহারা প্রদোষে, তাঁহারা উষার রুদ্র পথে গমন করেন।

যঃ। বাং। পরিজ্মা। সুবৃৎ। অশ্বিনা। রথঃ।
দোষাং। উষসঃ। হব্য। হবিষ্মতা॥ ১০।৩৯।১

হে অশ্বিদ্বয়! পৃথিবীভ্রমণকারী তোমাদিগের যে শোভন-গতি রথ হবি-প্রদানকারীর দ্বারা প্রদোষে ও উষায় আহ্বান-যোগ্য হয়।

Hence, if a transit of Venus occur at any time there may be another at the same node 8 years afterwards if one has not already occurred 8 years before. There will not, however, be a transit 16 years afterwards, as, on account of the above difference of one day, the distance from the node when in conjunction will be too great. In fact, a transit at the same node can not in this case occur for another 235 years, which is the next number of years which corresponds to an exact number of revolutions of Venus. The first transit of Venus ever observed was that seen by Horrox, in 1639, which occurred at the ascending node.

Parker's Elements of Astronomy. pp. 97—98.

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(২৩)

তা' অরবিন্দ তাহার কথা রাখিয়াছিল। স্ত্রীকে অযত্ন সে একটা দিনের জন্যও করিয়াছে, এমন কথা অপরে তো বলিবেই না, ব্রজরাণীও কোন দিন বলিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। তাহার যত্নের চোটে সবাই তো দারুণ স্ত্রৈণ বলিয়া তাহার বদ্‌নামই রটাইয়া দিয়াছে। আর সে বেশি কি করিবে? স্বাধীনতা সে স্ত্রীকে ষোল আনার উপর আঠার-আনাই দিয়া রাখিয়াছে,—তাহার কোন ইচ্ছাতেই সে 'না' বলে না। যেদিন স্ত্রীর ইচ্ছা হয়, বাড়ীর সরকার ও ঝিকে লইয়া সে থিয়েটার দেখিতে যাইতে সক্ষম,—স্বামীর বারণ নাই। স্ত্রী যেদিন আবদার করিয়া বলে, "আজ তুমি নিজে আমায় সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় বায়স্কোপ দেখিয়ে আনো,—নৈলে আমি কক্ষনো যাবো না" সে দিন অরবিন্দের সদর-বাটীতে তাহার বন্ধু-বান্ধবদের সতরঞ্চ খেলার যতই জিদ থাক না কেন, অরুকে সে দিন ধরিয়া রাখা কাহারও সাধ্যে নাই। বাবা বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার চাপে এ-সব স্বাধীনতার সুযোগ দেওয়ার অথবা নেওয়ার উপায় ছিল না; কিন্তু অন্য যা সম্ভব ছিল, তাহাতে ত্রুটি ঘটে নাই। লাভচাঁদের নূতন ক্যাটলগ্ আসিলেই, একখানা ভাল গহনার সাধ ব্রজরাণীর মনে জাগিত; এবং উষাকে দিয়া উষার দাদার কাছে দরখাস্ত পাঠাইলেই, তৎক্ষণাৎ তাহা পাশ হইয়া যাইত। একবার একটা হীরার 'স্প্রে-ব্রোচ' কিনিয়া দিতে
—বিন্দ নিজের ঘড়িচেনটা বাঁধা রাখিল,—হাতে তখন
বেশি টাকা ছিল না। উহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু, কেমন
জানে, খবরটা জানিতে পারে; এবং ভর্ৎসনা
অনু
"বউএর কি আর দুটো দিন সবুর সইতো
পিতরো
হে অখিলয়! যৎ দিতে গেলি? অত বাড়াবাড়ি পত্নী-ভক্তি
করিতে-করিতে আসিয়া !" অরবিন্দ ঈষৎ হাসিয়া জবাব দেয়,
জানিয়াছিলেন; পুত্র পুষা র সাধ হয়েছে, পরবে না! দু'দিন
(১৯) যৎ। অষাতং। শুভ বার সাধ আর না থাকে?" "না
একং। চক্রং। বাং। আসীৎ। তো অভাব নেই। আমাদের

বাড়ীর বউরা বলে, 'রাজা-রাণীর যা নেই, আমাদে অরবিন্দবাবুর রাণীর তা আছে'।" শুনিতে-শুনিতে অরবি মৃদু-মৃদু হাসিতেছিল; হাসিয়াই উত্তর করিল, "তারি জ ওর বাপ ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে,—ওর থাক্‌বে তো কার থাক্‌তে যাবে, শুনি?" বন্ধু সেই মৃদু-মন্দ হাসি ছটায় অর্দ্ধাবরিত, তীব্র রোদনোচ্ছ্বাস সুস্পষ্ট অনুভব করি নীরব হইয়া গেল। ইহার পর অরবিন্দের বউ লই বাড়াবাড়ি যতই অসহ্য হোক্, এতটুকু প্রতিবাদ কখন তাহা মুখ দিয়া বাহির হয় নাই।

আর একবার আর একজন তাহাদের কোন্ বিসদৃ আচরণে বিরক্ত হইয়া বলে, "বউ বই তো আর বাইজী নয়,—অত প্রশ্রয় কেন?" তাহাতেও হাস্য-প্রচ্ছাদিত শ্লে অরবিন্দ ঐ রকমই একটা জবাব করে; সে বলে, "এ রক বিয়ের স্ত্রী বাইজীর বাড়া যে!" "কিসে?" "প্রথম ধরো দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রীকে শাস্ত্রে তো সহধর্ম্মিণীর পদই দেয় নি দ্বিতীয়তঃ, মেয়েলী আচার-অনুষ্ঠানেও এদের পদচ্যুতি ঘটি রাখা হয়েছে। তার উপর এর যে অবস্থা, তা'তে—' "কি?" "নাঃ—কিছু না। আমাদের একজন ঠান্‌দি ছিলেন,—তিনি তাঁর স্বামীর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন যখন-তখন তিনি তাঁর নিজের সাফাই গেয়ে এই ছড়াটি বল্‌তেন, 'একবরে স্বোয়ামীর স্ত্রী পাতে বসে খায়, দোজবরে স্বোয়ামীর স্ত্রী সাথে বসে খায়, আর তেজবরে স্বোয়ামীর স্ত্রী কাঁধে চড়ে যায়'।"

দুই বন্ধুতে হাসিয়া উঠিল। তার পর বন্ধুটি ভাল ব্যারিষ্টারের মত উহার কথারই ছুত বাহির করিয়া উহাকেই ফিরিয়া আক্রমণ করিল; বলিল, "তা' তোমার যখন তেজবরের স্ত্রী নয়, তখন হঠাৎ কাঁদে চাপানোটা তো সঙ্গত হয় না হে,—ডবল প্রমোশন ত পাও নি। একটা ক্লাশ বাদ দিয়ে উপরে উঠ্‌লে মান্‌বই বা কেন, মানবেই বা কেন?"

হে শুভপতিষয়! যখন বরণীয়া

অরবিন্দ শুধু হাসিমুখে বলিয়াছিল, "আমার যে সাতবরেরও বাড়া। আমায়,—কাঁধে ছেড়ে মাথায় চাপতে চাইলেও,—মাথা পেতে দিতে হবে।"

বন্ধু বুঝিলেন, পাত্নীব্রাত্য-সাগরে ডুবিয়া এ ছেলেটির পরলোক একেবারে ঝর্‌ঝরে হইয়া গিয়াছে,—ইহার উদ্ধারের আর কোনই পন্থা নাই। অবুঝে বুঝাব কত—এই নীতি-বাক্যের অনুসরণে সেই হিতকামী নীরবে প্রস্থান করিলেন।

এততেও ব্রজরাণী যে তাহার পরে স্বামীর ভালবাসার অভাব দেখে, আকর্ষণহীনতা অনুভব করিয়া হিংসার বিষে মনে-মনে জ্বলিয়া মরে, ইহার জন্য দায়ী কে?

হয় ত কেহই নয়। তাহার অন্তরের সপত্নীত্বই শুধু এই ঈর্ষাদিগ্ধ চিত্তের মিথ্যা-জৃম্ভিত কল্পনায় অনর্থক পুড়িয়া ছাই হয়। স্বামী হয় ত তাহাকে শুধু বাহিরেই নয়, মনের মধ্যেও সর্ব্বেশ্বরী করিয়া রাখিয়াছেন। তু'দিনের সেই পুরাতন প্রেমের স্মৃতি এতদিনে ধীরে-ধীরে পুরাতন চিত্রের বর্ণ-রেখারই ন্যায় ম্লান হইতে-হইতে হয় ত বা কোন্ সময় নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে,- সেখানে আজ শুধু এই নবীনা, এই বসন্তকানন-চারিণী ব্রততীর ন্যায় সুদর্শনা সুন্দরী ব্রজরাণীর ছবিটুকুই মাত্র ষোড়শকলাযুক্ত পরিণত চন্দ্রমার মতই আপনার শোভা-গৌরবে আলোকিত হইয়া আছে। ব্রজরাণীর কি নাই—যাহাতে তুদিন-পাওয়া সেই দরিদ্র-কন্যাকে তাহার এতদিনের এতখানি সাহচর্য্যেও ভুলিতে পারিবেন না? এ সকল কথা বারবার করিয়াই সে ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে,—নিজের মনকে প্রত্যয় করাইবার জন্য তাহার সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াছে; কিন্তু কিছুতেই এ বিশ্বাসকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে পারে নাই। যতই জোরের সহিত এই চিন্তাকে সে আশ্রয় করিতে গিয়াছে, ততই ইহার অসঙ্গততা স্পষ্টতর হইয়া তাহার তুইচক্ষে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছে, ইহা অসম্ভব! একেবারে অসম্ভব! নিজের একান্ত মনোনীতা,—প্রথম প্রণয়ের পাত্রী,—বিশেষতঃ বিনা দোষে অন্যের দ্বারা জোর করিয়া পরিত্যক্তা—তাহাকে যে ভুলিতে পারে, সে পারে না কি? তাহার হৃদয়ে স্থান লাভ করার চাইতে না করা যে ভাল। আর হৃদয়ই বা তাহার কোথায়, যে, সেইখানে সে নিজের আসন পাতিতে চাহিবে? তা হয় না,—এবং যাহা হয় না,—এক্ষেত্রেও তাহা হয় নাই। অরবিন্দের প্রেমের পশরাখানি ইতঃপূর্ব্বেই মনোরমা ঠাকুরাণীর চরণপদ্মে বিক্রীত হইয়া উজাড় হইয়া গিয়াছে। এখন এই শূন্য বজ্‌রাখানায় ব্রজরাণীর যদি কিছু কাজ চলে তো চলুক। সেই হিসাবে তাহাকে ইহা দান করা হইল,—সঞ্চয় ইহার মধ্যে আর কিছুই নাই। যা' নাই,—অভিমানে অনাহারে কাঁদিয়া রাগিয়া তা আদায় হয় না। হয় কি না, বুঝিবারও তো কোন মাপ-কাঠি নাই। কাজেই অন্তরে এবং বাহিরেও শুধু গুমরিয়া মরিতে হয়, আর কোনই ফল হয় না।

সমবয়সীদের কাহার স্বামীর সহিত কি-কি কথা হয়, ঝগড়া-ঝাঁটির মাত্রা কতখানি, আদর সোহাগের পরিমাণ কতটা,—এইসব কথা খুঁটিয়া-খুঁটিয়া শুনিতে তাহার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। তার পর শোনা হইয়া গেলে, নিজের সহিত তুলনায় আনিয়া বিচার করিতে-করিতে, নিজের মানসিক সন্দেহকে অসংশয়িত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, তা' লইয়া স্বামীর সহিত কলহ করিতে এবং কাঁদিয়া-কাটিয়া হাট বসাইতেও তাহার বাধিত না। ইদানীং নিজের বন্ধ্যাত্ব তাই ইহার উপর আবার বড় অসহ্যই হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন পিসির বাড়ী হইতে পিসিমার নাতনীর বিবাহের নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিয়া সেই এক-গা গহনা ও বেণারসী শাড়ী-পরা-শুদ্ধ ব্রজরাণী নিজের বসিবার ঘরের জাজিম-বিছান পালংএর উপর দিনের-বেলা বসিবার মোটা তাকিয়া বালিসটা মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িল। কি যে তাহার সেখানে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, সেই জানে। গাড়ি হইতে যাহারা তাহাকে নামিতে দেখিয়াছে, তাহারাই তাহার মুখ দেখিয়া সন্দেহ করিয়াছিল যে, সে শিবপুর হইতে হাবড়া এই সারা পথখানি গাড়ি চড়িয়া কাঁদিতে-কাঁদিতেই আসিয়াছে। তা কাঁদিতে-কাঁদিতেই আসুক, আর না কাঁদিয়াই কান্নার এই বিপুল মেঘ চক্ষে ভরিয়াই লইয়া আসুক,—সে খবর জানিবার প্রয়োজন দেখি না। এখন সেই মেঘের বর্ষণে যে ঘরের মধ্যে নদীর সৃষ্টি হইতে বসিয়াছে কেন, এইটুকুই জানা চাই।

অরবিন্দ বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিবার পর, কি-একটা তুচ্ছ প্রয়োজনে এই ঘরটার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। তখন স্ত্রীর অসময়ে বাড়ী ফেরার কথা সে জানিত না। খোলা জানালার মধ্য দিয়া গোধূলির রক্তালোকধারা বিছানাটার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর ফিকা নীল সাড়ী

অঙ্গে তাহার ছোট ছোট জরিবুটি ঝলমল করিতেছে—সেইটা সেই লালরংয়ে মাখামাখি হইয়া পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল,—উঁহুঁ, শুধু শাড়িখানাই তো নয়! উহারই ভিতর হইতে পাতলা শাড়ির সুক্ষ্মতা ভেদ করিয়া একখানা স্থূল শুভ্র হস্তের আকার, সেই হাতে পরা মণিমুক্তা-খচিত তাবিজ্জ-বাজু-জশমের, মতির চুড়ির, হীরার বালার, চুনিপান্না, নীলার আংটির বিচিত্র বিচিত্র আকারও যে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া-ফুটিয়া উঠিতেছিল না? আর ঐ—ঐখানে—ওই যে জলে-ভিজা এক ভাঁজ কাপড়ের নীচে ঐ রকমই সাদা-ফরসা রংয়ের গালের পাশে এক গোছা কালো কুচ্‌কুচে চুলের আভাষও যে ভাসিয়া রহিয়াছে। না, এই বস্ত্রাবাসটি শুধুই রাণী-ঠাকুরাণীর সাধের শাড়ীখানাই নয়,—মহামহিমান্বিতা তিনি নিজেও ইহারই মধ্যে আশ্রিতা। কিছু সংশয়োদ্বেগে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অরবিন্দ প্রশ্ন করিল, "এ কি! এমন করে শুয়ে কেন? তেমন কিছু হয় নি তো রাণি?"

আর রক্ষা আছে! কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রাণী তাহার স্বামী বেচারার হাঁফ ধরাইয়া দিয়া তারপর কথঞ্চিৎ কান্না থামাইয়া উঠিয়া বসিল। এবং তার পর অনেক কষ্টে সে জানাইল যে, তাহার 'তেমন কিছু হইতে' আর শুধু এইটুকুই বাকি আছে যে, এইবার একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া যে-কেউ একজন,—তা' সে ছিদাম হাড়ির বউই হোক, আর জগা মেছুনীর নাত্‌নীই হোক—তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরায় ও সেই ফিরানো মুখে তাহার মুখের উপর বলে যে, 'ওগো, সকালে উঠে আঁটকুড়ির মুখ দেখতে নেই—এই সহজ কথাটুকুও কি তোমার জানা নেই, তাই সব্বাইকে পোড়ার মুখ দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়াচ্চো?" তা এই কথাটা শোনা হইয়া গেলেই, সে এবারকার মত এই নারী-জন্মটা সফল করিয়া লইয়া গলায় দড়ি দেয়।

অরবিন্দ সেই অশ্রুধৌত পোড়ার মুখখানা দু'হাতে তুলিয়া ধরিয়া, মৃদু হাসিয়া, সেই হাসিমাখা অধর পরিপাটী পাতা-নামানো ললাটখানার উপর স্পর্শ করাইয়া কৌতুক করিয়া বলিল, "গলায় দড়ি দিলে ভূত হবে যে রাণি! ভূতকে যে তোমার বড় ভয়!"

"জ্যান্তেতেই আমি ভূতের চাইতে কি এমন ভাল আছি যে, মরে গিয়ে ভূত না হয়ে দেবতা হতে যাব! ভূত ছাড়া আমি আর হবো কি? হ'লেই বা কে আমার গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে উদ্ধার করতে যাবে! ভূত তো আমায় হ'তেই হবে গো।" এই কথা বলিতে-বলিতেই ব্রজরাণীর সন্তপ্ত অভিমান দশগুণ উথলিয়া উঠিল এবং আবার তাহার কান্না আসিয়া গেল।

অরবিন্দ কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে, স্থির করিতে না পারিয়া, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল; তার পর আস্তে-আস্তে একটু ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তা' বিয়ে-বাড়ী থেকে হঠাৎ চলে এলে কেন?"

"আমার মাথা ধরেছে যে!"

"তারি জন্যে মাথা ছাড়াবার এই ব্যবস্থা ক'রেছ বুঝি? তা বেশ করেছ!" "নাঃ, করবে না বই কি! নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে শুধু-শুধু আমায় দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া! আমি তো আর মানুষ নই,—আমার তো আর মনে কিছুই লাগে না!"

কে' কি 'দু'কথা শুনাইল' এ প্রশ্ন করিবার কৌতুহল অরবিন্দর মনে জাগে নাই। এমন সব অনেক-অনেক দুঃখ-কল্পনা এই কল্পনাময়ী নারীটির মনের মধ্যে বহুল পরিমাণে জমান আছে, সহজেই সেখানে আঘাত লাগে, এ খবর সে রাখিত। কিন্তু তাহাকে বাক্য-বিমুখ দেখিয়া রাণীর বলিবার স্পৃহাটা হঠাৎ বাড়িয়া গেল। সে তখন চোখ মুছিতে-মুছিতে আপনা হইতেই বলিতে বসিল। যাহা বলিল, তাহার মোটামুটি অর্থ এই রকমটাই দাঁড়ায়—

ছোটবেলা স্কুলে পড়ার সময় তাহার কিছু-কিছু অঙ্কন-বিদ্যা-শিক্ষা ঘটিয়াছিল। সেই বিদ্যার সহায়তা লইয়া আলিপনা প্রভৃতিতে সে বেশ একটু নাম কিনিয়াছিল। বিদ্যা থাকিলেই তাহা ফলাইতে সাধ হয়,—আজও মনের সেই গোপন গর্ব্বটুকু লইয়া সে বিয়ে-বাড়ীর পিঁড়ি আলপনার ভার লইয়া তুলি হাতে বসিয়া গিয়াছিল; এবং দুয়ার বন্ধ করিয়া, একা বসিয়া অনেক যত্নে দু'খানি পিঁড়ি আলিপনা দেওয়া শেষ করিয়া, বড়-মুখ করিয়া পিসিমাকে দেখাইতে যাওয়া মাত্রে, তিনি অবাক্ হইয়া গালে হাত দিলেন। রাণী প্রথমটা ইহা প্রশংসাসূচক বিস্ময়-চিহ্ন মনে করিয়া পুলক-লজ্জায় মনের মধ্যে নাচিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া পিসিমার রুষ্ট কণ্ঠ অষ্টমে চড়িয়া উঠিল, 'তাও না হয় ছেলেমানুষ অত-শত মনে নেই;—তুইও কি খুকির সঙ্গে খুকি হয়েছিস চপলা,—তুই কি বলে বর-কনের

পিঁড়ি ওকে দিয়ে আল্‌পনা দেওয়ালি বল দেখিনি! এ সব শুভকম্মে কি ওর দ্বারা কিছু হবার যো আছে? নাও, এখন আবার অবেলায় ঐ পিঁড়ি দু'খানা ধোও, ধুয়ে—যাহোক করে দুটো চাল ভিজিয়ে আলপনা টেনে রাখ।' পিসিমার বড় মেয়ে চপলাদিদি মায়ের কাছে ভর্ৎসিতা হইয়া যে জবাবদিহি করিল, তাহাতে জানাইল যে, সে এ তথ্য জানিত বৈ কি। কিন্তু রাণী বেচারি জেদ করিয়া যখন আল্‌পনা দিতে বসিয়া গেল, তখন সে আর কি করিবে অগত্যাই—। তাহার যে কি অপরাধ, সে কথা বুঝিতে আর ব্রজরাণীর বাকি ছিল না। বিবাহ-মণ্ডপে যেখানে এয়ো মেয়েদেরই অখণ্ড প্রতাপ, সে সমাজে তাহার স্থান যে কতখানি নিম্নে, সে কথাও তাহার না-জানা নয়; কিন্তু যাঁহারা তাহার এ অবজ্ঞেয় অবস্থা ঘটাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদেরই কৃত এ অবহেলা তাহার সহিল না। ঘরের গাড়ি, দাসী ও দ্বারবান হাজির ছিল—মাথাধরার ছুতায় কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে। আসিবার সময় আবার পিসিমা আসিয়া কতকগুলা বকিয়া গিয়াছেন। প্রথমে অনেক ভাল কথা বলিয়া, শেষে কিছুতেই রাখিতে না পারিয়া, তাহার মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন 'তাহ'লে আর কি করা যাবে বউ। রাণী যখন বুদ্ধিমতী হয়ে অবুঝের কাজ করবে, তখন যা ভাল হয় তাই করুক। তাব'লে যা করতে নেই, সেটা করি কি করে? সতীনে-পড়া মেয়ে তুমি;—মঙ্গলকম্মে তোমার হাত দেওয়াই বা কেন? নিজের মান বাঁচিয়ে রাখলেই তো থাকে। তুই পড়েছিস বলে, সবারই সতীন হয় সেই কি তুই চাস? তোর মতন সবাই যদি না বরকে আঁচলে বাঁধতে পারে, তখন দশা কি হবে?' ইত্যাদি।

ব্রজরাণী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "এই তো আমার পদ, এই তো আমার মান। এর উপর আবার আমি হয় ত আঁটকুড়ো নাম কিন্‌বো,—আমার মরণই ভাল।"

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম-এ]

(১)

ধর্ম্ম হইতে বিবেকের গ্লানি নষ্ট হইতেছে, মনের অন্ধকার দূর হইতেছে, হৃদয়ের কালিমা অপসৃত হইতেছে। মহা দুর্দ্দিনেও ধর্ম্মের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ হয় না; ঘোর বিপদের সময়েও ইহার আশ্বাস-বাণী অশ্রুত হয় না। ধর্ম্মের প্রভাবে দুর্গম পথ সুগম হইতেছে, মহা-নৈরাশ্যের ভিতরও আশার সঞ্চার হইতেছে। ধর্ম্ম রোগ-শোক-জরা-জীর্ণ জীবের স্বাস্থ্য এবং দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট মানবের মধুরিমা। ধর্ম্ম হৃদয়ের আশা; সুখের মাধুর্য্য; মস্তকের শোভা, নয়নের জ্যোতিঃ, হস্তের শক্তি, চরণের ক্ষিপ্রগতি। ইহা ভয়ার্ত্তের আশ্বাস, ভীরুর সাহস এবং দুর্ব্বলের পরাক্রম। ধর্ম্ম হইতে মৃত্যুর বিভীষিকা নষ্ট হইতেছে; দুঃখের যন্ত্রণা লাঘব হইতেছে, কর্ম্মের কঠোরতা কমিয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম পাপকে পরাস্ত করিতেছে, আত্মাকে বিনির্মুক্ত করিতেছে, বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করিতেছে, প্রেমকে উৎসাহিত করিতেছে, আশাকে সজীব রাখিতেছে এবং আগ্রহকে উত্তেজিত করিতেছে। যেখানে দাসত্বের শৃঙ্খল, ধর্ম্ম সেখানে স্নেহের বন্ধন; যেখানে শতছিদ্র ছিন্নবাস, ধর্ম্ম সেখানে বহুমূল্য পরিচ্ছদ; যেখানে জ্বালাময়ী তিরস্কার, ধর্ম্ম সেখানে স্নেহাশীর্ব্বাদ; যেখানে পর্ণ-কুটীর, ধর্ম্ম সেখানে সুরম্য হর্ম্ম্য। ধর্ম্ম মনের উদারতা, আত্মার স্বাধীনতা, স্নেহের পবিত্রতা। ধর্ম্মের ঐশ্বর্য্য সকল সময়েই, সকল অবস্থাতেই অক্ষুণ্ণ। হৃদয় যখন যৌবনের মাধুর্য্য-মুগ্ধ, শরীর যখন সুস্থ ও সবল, যখন তুমি সমৃদ্ধির তুঙ্গ সীমায় উন্নীত, তখন ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে তোমার হৃদয় আপ্লুত হয়; তখন স্বতঃই তোমার উন্নত মস্তক পরমেশ্বরের পরম পদে নমিত হয় সত্য;—কিন্তু তাহা হইলেও, যখন দুঃখের নির্ম্মম কশাঘাতে ক্লিষ্ট এবং মথিত

হইতে থাক, ব্যাধির দংশনে কাতর হইয়া পড়, কিংবা যখন নিঃসম্বল হইয়া জীবনের প্রান্ত-সীমায় উপনীত হও, তখনই কল্যাণময় ধর্ম্মের প্রভাব যথার্থ অনুভূত হয়,—তখনই তোমার মায়া-মমতা, আশা-ভরসা, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্তই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দাও। তখন তোমার হৃদয়ে এক অভিনব শক্তির সঞ্চার হয়, যে শক্তির অস্তিত্ব বোধ হয় পূর্ব্বে তুমি কখনও অনুভব কর নাই; অথবা যে শক্তি একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া তোমার ধারণা ছিল। ধর্ম্মের আনন্দ সকল প্রকার পার্থিব আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মহৎ ও উচ্চ। ধর্ম্মে অবিশ্বাস করিলে ভাগ্যবান সুখে বঞ্চিত হইবে; হতভাগ্যের দুঃখ আরও দুর্ব্বিষহ হইবে। আমার জীবন সুখময়; কিন্তু এ সুখের স্থিতি কতটুকু? অচিরাৎ আমার জীবন-বীণা নীরব হইবে —সুখের যবনিকা পাতিত হইবে। সুতরাং জীবন সুখময় হইলেও, এ সুখ ভোগ করিতে পারিলাম কই? অদূর-ভবিষ্যতে আমার সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইবে—এই দুশ্চিন্তা আমার বর্ত্তমান সুখের শান্তি হরণ করিয়া লইতেছে। অতএব সুখ পাইলাম কই? আবার জীবন যদি দুঃখময় হয়, তাহা হইলে এ দুঃখের পরিণতি নাই ভাবিলে, আত্মহারা হইতে হয়। ধর্ম্ম দুঃখী এবং সুখী উভয়েরই অভয়বাণী। সুখী ব্যক্তিকে বলিতেছে, তোমার সুখের অন্ত নাই,—তুমি নিরাশ হইও না—তোমার সুখ নিরন্তর। আবার দুঃখী ব্যক্তিকে বলিতেছে, অচিরাৎ তোমার দুঃখের মেঘ কাটিয়া যাইবে—শীঘ্রই সুখ-সূর্য্যের অরুণালোকে তোমার হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ধর্ম্মের কাহিনী অধিকাংশ লোকেরই নিকট অপ্রিয়। যাঁহারা যুবক বিদ্যার্থী—তাঁহারা মনে করেন, এ কথা শুনিবার তাঁহাদের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যাঁহারা বৃদ্ধ, তাঁহাদের নিকট যাও,—তাঁহারাও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিবেন; তাঁহাদের দিন যে ঘনাইয়া আসিয়াছে, এ কথা তাঁহারা আদৌ পছন্দ করেন না। যাহারা আমোদ-প্রমোদে মত্ত, তাহাদের নিকট যাও,—বুঝিবে যে, তুমি তাহাদের আমোদের অন্তরায় হইতেছ। যাঁহারা শিক্ষিত ও প্রতিভাশালী, তাঁহাদের নিকট যাও,—উত্তর পাইবে যে, ধর্ম্ম নিম্ন-স্তরের লোকের নিমিত্ত। আবার, নিম্ন-স্তরের লোকেরা উঁহাদেরই প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয় যে, উঁহারাই ত প্রতিষ্ঠাবান্, জ্ঞানবান্; উঁহারাই ত আমাদে[র] আদর্শ।

মানুষ অনন্ত-পরিবেষ্টিত—ইহার ঊর্দ্ধে অনন্ত, নি[ম্নে] অনন্ত, চতুষ্পার্শ্বে অনন্ত। এই বিশ্বের ব্যাপ্তি অন[ন্ত] বস্তু-অনন্ত, দেশ অনন্ত। এই অনন্তের মধ্যে মানুষের অস্তি[ত্ব] কতটুকু? ইহার শক্তি কতটুকু? মানুষ তাহার নিজে[র] হীনতা, নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের অকিঞ্চিৎকরতা বুঝি[তে] পারে। এটুকু বুঝিবার শক্তি তাহার আছে; এবং এই শ[ক্তি] আছে বলিয়াই তাহার ধর্ম্ম আছে। পশুর এ শক্তি নাই,— পশু নিজের সহিত বাস্তবের তুলনা করিতে পারে না,—তা[ই] তাহার ধর্ম্ম নাই। আমি কোথা হইতে আসিয়াছি জানি না আমি কোথায় যাইব জানি না। অন্ধকার হইতে আলোক[ে] আসিলাম,- নানা ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়া ক্ষণেকের নিমি[ত্ত] এই আলোক অনুভব করিলাম, মৃত্যু আসিয়া আমাকে গ্রা[স] করিল,—আবার বিস্মৃতির অতল গর্ভে লীন হইয়া গেলাম পৃথিবী এবং স্বর্গের সান্ত এবং অনন্তের সন্ধিস্থলে আমা[র] স্থিতি; কিন্তু এ স্থিতির স্থায়িত্ব কতক্ষণ? পদ্মপত্রে জলবিন্দু[র] ন্যায় আমার জীবন চঞ্চল; ইহার ক্ষীণসূত্র যে-কোন মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইতে পারে—এই প্রকার চিন্তা হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি আমি সান্ত; সুতরাং আমি অনন্তের জন্য লালায়িত; আ[মি] অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং আমি অতি-মহতের আশ্রয়-প্রার্থী আমি অসম্পূর্ণ, তাই আমি সম্পূর্ণের জন্য লালায়িত। মানুষে[র] যাহা নাই, মানুষ তাহাই পাইতে চায়। আমি যে কেব[ল] দুর্ব্বল এবং অসম্পূর্ণ তাহা নহে;—আমি অহরহঃ দুঃখে[র] ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া নিতান্ত নির্ম্মমভাবে মথিত হইতেছি দুঃখকে আমি আমার চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে পারি না আমার জীবন-আলেখ্যের পশ্চাৎ ভাগে ইহার স্থান নির্দ্দে[শ] করিবার শক্তি আমার নাই। আমার জীবন নশ্বর, আমা[র] দেহ ক্ষণভঙ্গুর, আমি অভাব-পরিবেষ্টিত; সুতরাং আমা[র] দুঃখ অনিবার্য্য। অবশ্য জ্ঞানের বলে, বুদ্ধির সাহায্যে আ[মি] আধিভৌতিক দুঃখ দমন করিতে পারি সত্য; কিন্তু পাপে[র] কবল হইতে নিজেকে কেমন করিয়া মুক্ত রাখিব? পা[প] আমাকে নিরন্তর নিরয়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে আমার চতুর্দ্দিকে নিত্য নূতন মায়াজাল বিস্তার করিতেছে যাহা দূষিত, তাহাকে আরও দূষিত করিতেছে; যাহা পঙ্কিল তাহাকে আরও কর্দ্দমাক্ত করিতেছে; যাহা অন্ধকার, তাহাকে

আরও তমসাচ্ছন্ন করিতেছে। সারল্যের শুভ্র আচ্ছাদন ভেদ করিয়া কৌটিল্যের দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে; আর অজ্ঞানের ঘোর ঘনঘটাচ্ছায়ায় জ্ঞানের আলোক নিষ্প্রভ হইতেছে। পাপের প্রভাবে শান্তির স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক নির্ব্বাপিত হইতেছে, প্রেমের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইতেছে, শিষ্টাচারের সৌজন্য লোপ পাইতেছে। ইহা পাশবিক শক্তি সকলকে উত্তেজিত করিতেছে, মানসিক শক্তি-নিচয়ের মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা করিতেছে। ইহা স্বাস্থ্যের বিঘ্ন, মনের বিভ্রম, চরিত্রের অন্তরায়। ইহা ক্রোধের রক্তিমা, হিংসার বহ্নি, অহঙ্কারের জ্বালা। ইহা জিহ্বার স্বাধীনতা, চরণের অবাধগতি, হস্তের মুক্তি, মায়ার প্রলোভন। ইহা পারিবারিক সুখের অন্তরায়, সমাজের একতার প্রত্যবায়, রাজ্যের শান্তি-সংহারক। ইহা দরিদ্রের ক্রন্দন, ধনীর উচ্ছৃঙ্খলতা, সৌভাগ্যের ঔদ্ধত্য, দুঃখের যন্ত্রণা। কেমন করিয়া এই ভয়াবহ পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইব? এই দুর্দ্ধর্ষ অসুরের সহিত সংগ্রাম করিবার অস্ত্র আমাদের আছে;—ইহা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা-বৃত্তি। কিন্তু ঐ অস্ত্রের শক্তি কতটুকু? বলিতে পার এই মহা-শক্তি-প্রভাবে সমগ্র জগৎকে আমরা করায়ত্ত করিতে পারি; স্বেচ্ছামত ইহার ব্যবহার করিতে পারি; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে কি তাহাই? আমরা প্রতি পদক্ষেপে স্বাধীনতার মুকুট দূরে নিক্ষেপ করিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খল বরণ করিতেছি; প্রলোভনের নিকট অতি সহজেই পরাস্ত হইতেছি। জানি যে, পাপের প্রারম্ভ সুখকর; কিন্তু পরিণতি নিতান্ত ভয়াবহ। তবু আমি সে প্রলোভনকে পরাস্ত করিতে পারিতেছি না। আমার স্বাধীন ইচ্ছাবৃত্তিও প্রলোভনের প্ররোচনায় পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। অতএব, এখানেও আমি আমার দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছি। সুতরাং ইহার প্রতী-কার আবশ্যক। আমি শক্তিহীন, তাই আমি শক্তি চাই; আমি নিরাশ্রয়, তাই আমি আশ্রয় চাই; আমি আবদ্ধ, তাই আমি মুক্তি চাই। আমি চাই; কারণ, আমার বিশ্বাস, আমি যাহা চাহিব, তাহাই পাইব। এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। তর্ক এ বিশ্বাসের ভিত্তি নহে—ইহার ভিত্তি মানুষের স্বাভাবিক অভাব। সন্তানের প্রতি স্নেহময়ী জননীর বিশ্বাসের ন্যায় ইহা অচল, অটল। সুখের হিল্লোলে ইহা নিশ্চল, দুঃখের আঘাতেও ইহা নিষ্কম্প। ইহা বিকার জানে না, সন্দেহও জানে না; ইহা নীরব তথাপি তৎপর। ইহা নিঃসহায় হইলেও সাহসের কেন্দ্র, অন্ধ হইলেও ইহার লক্ষ্য অভ্রান্ত। ইহা পথভ্রান্ত পথিকের ধ্রুবতারা, শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি, জরাগ্রস্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য।

যাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ, তাহাকেই আমরা সচরাচর বাস্তব বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই বাস্তবের সীমা কতটুকু? আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের রাজ্য অতি ক্ষুদ্র;—এই ক্ষুদ্র রাজ্যটীকে বেষ্টন করিয়া আর একটী বৃহৎ রাজ্য আছে। এই বৃহৎ রাজ্যের বিষয় আমরা বিশেষভাবে অবগত না হইলেও, ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। আমার জ্ঞান-রাজ্যের বিস্তৃতি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। এতদিন যাহা অজ্ঞাত ছিল, আজ তাহা জ্ঞানের অন্তর্গত হইতেছে। কাল যাহা অসম্ভব মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে; কাল যাহা স্বপ্ন মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা সত্যে পরিণত হইতেছে;—সুতরাং কেমন করিয়া না বলিব যে, আমার জ্ঞান-রাজ্যের অন্তরালে আর একটী বিশাল রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে!

"ক্ষুদ্র বেলা-ভূমি পরে সিন্ধুর বিস্তৃতি প্রায়
'আমার' গণ্ডীর পারে কি অনন্ত দেখা যায়।"

যে রাজ্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া আমার জ্ঞান-রাজ্যের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, কেমন করিয়া সে রাজ্যের অস্তিত্বে সন্দিহান হইব? এই বৃহৎ জগৎ আপাততঃ অজ্ঞাত থাকিলেও, এতাবৎ গুপ্ত রহিলেও, একবারে নির্লিপ্ত নহে, একবারে মানব-সম্পর্ক-শূন্য নহে। আমাদের আভ্যন্তরীণ আবেগমালার সহিত এই অলক্ষিত জগৎ অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। হৃদয়ের আবেগরাশি মাত্র কুহেলিকার ক্রীড়নক নহে। বর্ত্তমান ইহাদের উৎপত্তি হইলেও, ইহাদের লক্ষ্য ভবিষ্যতে। ইহাদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই অভ্রান্ত। বিজ্ঞান বহু তথ্যের, বহু বিধির আবিষ্কার করিয়াছে সত্য; কিন্তু প্রত্যেক তথ্য, প্রত্যেক বিধিই হৃদয়ের দুর্দ্দান্ত আবেগ অপনোদনের বাসনা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। একটি আবেগের তাড়নায় যখন মাধ্যাকর্ষণ বিধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন আর একটি আবেগের হিল্লোলে যদি পর-পারে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই, তবে সে বিশ্বাসের পদার্থ যে কখনই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রত্যেক তথ্যই কোন-না-কোন আবেগ-

থেমে আছে তাই গান,
তুমি তারে তারে দাও নব প্রাণ—
জাগাও নূতন তান।
আঁখি জলে মোরে করি' নিরমল
ফোটাও তরুণ হাসি,
শারদ-শেফালি রাশি;
দুঃখের ধূপে সুরভি করগো
মিলনের আহ্লাদ!"

মানুষের মনকে কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত, সংশয়ের সম্পর্ক হইতে দূরে রাখিবার নিমিত্ত, এবং কল্পনার মায়াজাল ভেদ করিয়া সত্য সংগ্রহের নিমিত্ত ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের প্রয়োজন।

বৈরাগ্-যোগ

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ]

(২০)

১০৫ নং সারকুলার রোডে, গেটে প্রকাণ্ড সিংহ দুটো দেওয়া বাড়ীটাই অমিয়াদের বাড়ী। বাড়ী বল্লে তাকে ছোট করে বলা হয়—সে যেন একটা রাজবাড়ী! তার ঘর-দোর, লোক-লস্কর আসবাব-পত্র আমি কেন, আমার পিতৃ-পুরুষের কেউ দেখেছিলেন বলে ত মনে হয় না।

যা ভয় করেছিলাম তাই, অমিয়ার পিতা সে-যাত্রা রক্ষা পান নি। বিষয়-আশয় সব এক্সিকিউটারের হাতে। তাঁরা অমিয়ার কোন খবর না পেয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসেছিলেন।

আমাদের গাড়ীখানা যখন গাড়ী-বারাণ্ডার মধ্যে ঢুকলো, তখন চাকর-বাকরদের মধ্যে যে কি হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেল, তা আর কি বল্‌ব! কে কোথায় ছুটে যাবে তা যেন ভেবেই পায় না!

অমিয়া ত তিন-দিন বিছানা থেকে উঠ্‌ল না। নিমাই বাবু ঘন-ঘন আনাগোনা করতে লাগ্‌লেন। আমাকে সবিশেষ অনুরোধ করলেন দিন কয়েক থেকে যেতে। সে অনুরোধ এড়ান যায় না। কাজেই থাকতে হলো।

মানুষের মনটা যে কি অদ্ভুত উপকরণে তৈরি, তা' বলা যায় না। যত বড় অস্ত্রই কেন কর না, ভিতর থেকে মাংস গজিয়ে ক্ষত-পূরণ করতে বড় বেশী দেরী লাগে না। চার দিনের দিন অমিয়া ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে দাঁড়াল। অমাবস্যার পর শুক্লা তৃতীয়ার শশিকলার মত সে এই ক'দিনে ক্ষীণ হয়ে গেছে!

বেলা আটটা নটা হবে। সে আমার ঘরে এসে একখানা গদি-মোড়া চেয়ার টেনে কাছে বস্‌লো। প্রথমটা কথা কইতে পারলে না—চোক দিয়ে বড় বড় ফোঁটা টপ্ টপ্ করে পড়তে লাগ্‌লো।

আমি চোখের জল দেখ্‌তে ভালবাসি—ও যেন শোকে শরতের শেষ বর্ষণ। চোখের জল দেখ্‌লেই মনে হয়—এবার ধুয়ে-পুঁছে মনের আকাশটা ফর্সা হয়ে উঠ্‌বে।

এই তিন দিনের অসাক্ষাতে আমি যেন অনেক দূরে পড়ে গিয়েছি। কথা কইতে বাধ-বাধ ঠেক্‌ল—চুপ করে বসে-বসে দেখ্‌তে লাগলাম।

কপালের উপর ভাঙ্গা চুলগুলো গোছা বেঁধে ঝুলে আছে; মুখখানা শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে,—সরস্বতীর গ্রীষ্মের ক্ষীণ স্বচ্ছ ধারাটির মত।

কাল দুটো হরিণের মত চোখ, হাস্য-কৌতুকের সমস্ত লীলা-বিবর্জ্জিত; বিষাদের নিবিড়তায় স্নিগ্ধ, করুণ, প্রশান্ত; একবার আমার মুখের উপর ফেলেই নামিয়ে নিয়ে মাটির উপর রাখ্‌লে। কথা কইতে গিয়ে গলার শব্দ বার হলো না। গাল দুটার উপর ঝক্ ঝক্ করে লাল রং এসে পড়তে লাগল! আবার দু'চোখ জলে ভরে গেল!

এমনি বারকয়েক চেষ্টা করে অমিয়া কথা কইতে পারলে।

প্রথম কথা, "তুমি চলে যেও না।"

বল্লাম—"যাইনি ত।"

পায়ের উপর পা রেখে মাথাটা কোলের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে নখ খুঁটতে লাগল।

বল্লে, "আমার কেউ নেই যে।"

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। এমন কতক্ষণ কেটে গেল।

অমিয়া বল্লে, "এ আমার নতুন নয়,—এসে এই যে দেখ্‌তে হবে তা আমার মন অনেকদিন আগেই জানে। কত শক্ত করলুম তাকে; কিন্তু সে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে!"

সান্ত্বনার কথা কি বল্‌তে হয় তা' আমার মনে এলো না। আমার সমস্ত হৃদয়টা নিগূঢ় ব্যথায় মথিত হয়ে উঠ্‌ছিল; ফাঁকা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই বার হলো না।

"এই অবস্থায় আমাকে ফেলে চলে যাবে না, তা জানি; তবু ভয় হলো—তাই ছুটে বল্‌তে এলুম।"

বল্লাম "হুঁ।"

সে বল্লে, "এই বাড়ী, এই ঘর, এই লোকজন সবই তোমার—এতে তুমি কিছুতেই না বল্‌তে পারবে না। যদি তুমি না থাক, ত আমিও থাক্‌তে পারবো না।"

এ অবস্থায় তর্ক করা বৃথা। আমি চুপ করে রইলাম।

অমিয়া হাত জোড় করে বল্লে, "লক্ষ্মীটি আমার, এই কথা আমার রাখ।"

তার এই প্রকাণ্ড আঘাতের উপর আবার আঘাত দিতে মন সর্‌ল না। বল্লাম, "তাঁর ইচ্ছা যদি তাই হয়—তা হ'লে তা' মাথা পেতে নিতে হবে,—তাকে আমার ক্ষুদ্র শক্তি রোধ করতে পারবে না অমিয়া!"

সে যেন একটু আশ্বস্ত হলো; চোখ দুটো একটু চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

অমিয়া আমার হাতখানা ধরে বল্লে, "আমি জান্‌তুম তুমি না বল্‌তে পারবে না—তা কি পার?—তা কি পারা যায় কখনো?"

"কি তোমায় বলব অমিয়া? তুমি জান? কেমন করে জেনেচ তুমি আমার মনের নিভৃততম কথা,—সে যে আমিই জানিনে!"

আমি বল্লাম, "রমাইএর মাকে আন্‌লে বেশ হতো—তোমার একজন সঙ্গী হতো।"

"কেমন করে সে আসে! আস্‌বে—তাকে আস্‌তে বলে এসেচি—আবার লোক পাঠাব; কিন্তু সে ত আজ-কালের মধ্যে নয়—কিছুদিন যাক্!"

আমার মনে মুক্তির বাতাস বইছিল, তাই এই বন্ধনের প্রসঙ্গগুলো কেমন বেখাপ্পা বলে ঠেকল। এর আগে যে কথা জোর করে বলে এসেছি—এখন আর তা বলা চলে না, অতিরিক্ত রূঢ় হয়ে পড়ে। এদিকে চুপ করে থাক্‌লেও যেন একটা সম্মতির মত শুনায়। কি করি এখন!

অমিয়ার হাতের মধ্যে থেকে নিজের হাতখানা আস্তে-আস্তে তার অলক্ষ্যে টেনে নিতে গেলুম—সে ম্লান হাসি হেসে বল্লে, "তা হবে না, তুমি কথা দাও আমাকে।"

বল্লাম, "মানুষের কথা কি ঠিক আছে অমিয়া,—কথা আমি দিলেও—তাঁর ইচ্ছে হলে এক পলকে তিনি আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে যেতে পারেন।"

"সে আমি জানি; কিন্তু তোমার ইচ্ছেটা কি—বল্‌তে পারো না? একবার আমার দিকে তাকাও—দয়া হয় না? ধন্য তোমার কঠিন মন।"

আমি মাথা নীচু করে এই তিরস্কার গ্রহণ করলুম—উপায় কি? মনের কথা খুলে বলবার নির্দ্দয়তা আমার জুটল না।

অমিয়া হাত ছেড়ে দিয়ে একটু বেঁকে বসল, "এ আমি খুব জানি যে, তোমাকে ছেড়ে না দিলে তুমি যেতে পারবে না।"

তখন মনে হলো হয় ত বা সত্যই পারিনে। আমার মনের উপর অমিয়ার হাতখানা যেন চেপে রয়েছে! শিশুকে যেমন আবদ্ধ করলে তার সমস্ত হৃদয়টা কান্নায় ভরে উঠে আকুল করে দেয়—তেমনি করে আমার মনটা কেঁদে উঠল। এ কিসের জন্যে কান্না! মুক্তির জন্যে মানুষের আত্মা ত' এমনি করে চিরদিন কাঁদ্‌চে!

একটা জুলুম হচ্চে—তা যেন সে আমার মুখ-চোখের ভাব দেখে বুঝতে পারলে। ফিরে তার চোখ দুটো

আমার মুখের উপর প্রদীপ্ত করে দিয়ে বল্লে, "আমার উপরোধ-অনুরোধেরও অন্ত নেই; কিন্তু এও আমি জানি যে, তুমি যেটি ভাল বোঝ, তা থেকে এক তিল নড় না। তার দৃষ্টান্ত এই আমার সঙ্গেই রয়েছে" বলে সেই আংটিটা দেখালে।

আংটিটা আমি বাঁ হাতে পরিয়ে দিয়েছিলাম, দেখলাম সেটাকে ডান হাতে। বল্লাম, "হাত বদলেচ যে?"

"ও কি আর বাঁ হাতে রাখা যায়? ও যে এখন আমার মাথার মাণিক।"

কথাটা এমন অসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সে বল্লে যে, আর কোন প্রশ্নই তার বিষয়ে করা চলে না।

চাকর এসে খবর দিলে নিমাইবাবু এসেছেন। অমিয়া বসে-বসে কি একটা ভাবলে; ভেবে বল্লে, "দেখ, আজ রাতে একটু আমার জন্যে জেগে অপেক্ষা করো; আমার কয়েকটা বল্‌বার বিশেষ কথা আছে।"

আমি বল্লাম "আচ্ছা!"

অমিয়া চাকরের দিকে ফিরে বল্লে "নিয়ে আয় না বাবুকে এইখেনেই ডেকে।"

নিমাই বাবু এলেন। ইনি অমিয়ার বাবা রমেশ বাবুর বাল্যবন্ধু—এখন একজন নামজাদা উকীল।

তিনি আমাকে দেখেই বল্লেন,—"আপনার, এখন কিছুদিন থাকা হচ্চে ত?"

অমিয়া বল্লে, "কাকা আপনি ওঁকে আপনি-আপনি করবেন না; 'তুমি' বলুন না।"

"আমার মা, কেমন বদ্ অভ্যাস—বাইরের লোক হলে কেমন বেরিয়ে যায়।"

"আপনি ওঁকে বাইরের লোক বলে মনেই করবেন না কাকা।—ওঁর চেয়ে নিকট আমার আর কে আছেন? সব ত বলেছি আমি—নিজের জীবনকে জীবন মনে করেন নি।"

আমি নির্ব্বাক হয়ে মাথা হেঁট করে রইলাম। অমিয়া দেখ্‌লাম ঠোঁট টিপে তার মৃদু হাস্য চাপতে চেষ্টা করচে।

ভাল মন্দ এদিক-ওদিক দু'ত কথা বলে নিমাই বাবু চলে গেলেন। অমিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, "তবে ঠিক্ রইল সেই কথা—আজ সন্ধ্যার পর থেকে আমার প্রতীক্ষায় থেকো। আমার ফুরসৎ হলেই আমি আসব।"

"তোমার এত কাজ কিসের?"

"আজ যে চতুর্থী করচি। ব্রাহ্মণভোজন হবে; কয়েকটি মেয়ে নিমন্ত্রণ করেছি।"

"তা হলে আজ ত আমার তোমাদের বাড়ী থাকতেও নেই, খেতেও নেই।"

"কেন?"

"গুরুর মানা, শ্রাদ্ধ সন্ন্যাসীর দেখ্‌তে নেই যে।"

"আচ্ছা—কাজ নেই তবে দেখে,—তুমি আজ আমাদের রাধাগোবিন্দের মন্দিরে যাও। সন্ধ্যের পর কাজ-কর্ম্ম শেষ হয়ে গেলে আমি তোমাকে আনিয়ে নেবো।"

গাড়ী করে আমি সেই সকালে গোবিন্দজীর মন্দিরে চলে গেলাম।

(২১)

বাড়ী ফিরে এলাম; তখন অনেক রাত হয়েছে,—দশটা কি এগারটাই হবে। সন্ধ্যার সময় খানিকটা বৃষ্টি হয়েছিল; এখন পরিষ্কার আকাশ; চাঁদ ডুবে গেছে—নক্ষত্রগুলো ঝক্‌ঝক্ করচে।

নিস্তব্ধ বাড়ীতে গাড়ীখানা এসে লাগল—বারাণ্ডার সিঁড়ির উপর অমিয়া দাঁড়িয়ে—পরণে একখানি গোলাপী সিল্কের শাড়ী—গায়ে এক-গা গয়না। তাকে দেখেই চোখ যেন ঝল্‌সে গেল। বল্লাম, "ইস্, এত সাজগোজ কেন?"

সে বল্লে, "মেয়েদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম কি না—মেয়েরা গয়না দেখতে আর দেখাতে খুব ভালবাসে—তাই এই সাজগোজ। তোমার আপত্তি থাকে ত খুলে ফেলি।"

"না আমার আপত্তি কিসের—বেশ দেখাচ্চে তোমাকে।"

সে বল্লে, "বাঁচলুম—তুমিও তা হলে সাজ-পোষাক গয়না-গাঁটি ভাল বাস?"

কথা বল্‌তে-বল্‌তে আমরা বড় সিঁড়ি পার হয়ে দোতলার দালানে এসে পৌছলাম। বাঁ-হাতি আমার ঘর। সেদিকে ফিরতেই অমিয়া পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বল্লে—"ও-দিকে নয়, এই-দিকে এস," বলে দোতলার সিঁড়ির দিকে চল্‌ল। আমি পিছনে-পিছনে চল্লাম।

সে বল্লে, "আজ আর নীচের তলায় কাজ নেই,—কি

জানি, ছোঁয়া-লেতায় যদি তোমার সন্ন্যাস-ব্রত ভঙ্গ হয়; তাই একেবারে তোমার ব্যবস্থা তেতলায় করে রেখেছি।"

প্রায় সমস্ত বাড়ী জুড়ে তেতালার হলটা। ঘরে ঢুকে দেখ্‌লাম আলোয় আলো;—ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত।

"ব্যাপার কি?"

"কিছুই না—এটা তোমার তপোবনের মত করে সাজিয়ে রেখেছি। লোকজন কেউ এখানে আস্‌তে পারবে না।"

বল্লাম, "সে বেশ হবে—খুব ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে আজ।"

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি চারিদিকে ফুলের টব দিয়ে সাজান,—মধ্যে ছুটো প্রকাণ্ড পালং—সাদা ফুল দিয়ে মোড়া। মেজের উপর ছুখানা আসন পাতা—একটার সাম্‌নে অশেষ বিধ চর্ব্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়। আর একটা খালি।

অমিয়া আমার হাত ধরে সেই আসনের উপর বসিয়ে বল্লে, "খাবে বস—কত দেরি হয়ে গেছে—কত না ক্ষিদে পেয়েছে—আমার সন্ন্যাসীর।"

বল্লাম, "ঠিক সন্ন্যাসীর উপযুক্ত বন্দোবস্তগুলিই হয়ে রয়েছে দেখছি। ব্যাপার কি খুলে বল ত।"

"বলচি—তুমি খেয়ে নাও ত সব বলব—আজ আর কোন কথার শেষ থাক্‌বে না।"

খাওয়া শেষ হলে অমিয়া বল্লে, "একটু বিশ্রাম করগে ঐ খাটে—আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি—একটু খেয়ে নি।"

"কেন? এত রাত পর্য্যন্ত না খেয়ে আছ কেন?"

"তোমায় না খাইয়ে খাই কি করে? তুমি যে অতিথি—নারায়ণ।"

"যাও যাও খেয়ে এস গে।"

"যাব আবার কোথায়?—আজ আমার তোমার পাতেই খেতে হয় যে।" বলে সে খালি আসনটার সাম্‌নে আমার থালাখানা টেনে নিয়ে বসে গেল।

আমি বেরিয়ে বারাণ্ডায় গিয়ে পায়চারি করতে লাগ্‌লাম।

পাগ্‌লী আজ আবার একটা কি ঘটাবে দেখ্‌চি। এত খেয়ালও মাথায় আসে!

খাওয়া শেষ করে, সে আমায় ডেকে বল্লে, "চল একটু তপোবনের বেদিতে বসিগে।"

আমি ঘরে ঢুক্‌তে-ঢুক্‌তে বল্লাম—"তোমার চতুর্থী ত হয় না—তুমি যে এখনো সগোত্র রয়েছ।"

"না, গোত্র ত বদ্‌লে গেছে সেদিন। বুঝতে পারচ না?—আজ যে আমার ফুলশয্যা—তারি এ সব ধুম-ধাম।"

"ফুলশয্যা?"

"হাঁ গো হাঁ, অমন আকাশ থেকে পড়লে চল্‌বে না—চল একটু বসে কথা কইগে। অনেকদিন, সেই ষ্টীমারে বসে যেমন করে কথা কইতাম—কওয়া হয়নি।"

অমিয়ার ফুলশয্যায় তার সন্ন্যাসী বরটি ঠিক চোরের মত গিয়ে বসল।

ছুজনে পাশাপাশি বস্‌লাম। সাম্‌নে দেওয়ালে একদিকে অমিয়ার মার ছবি, আর একদিকে রমেশবাবুর। মনে হলো ছুটি মুখ হর্ষ-বিকচ। আমরা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হ'য়ে রইলাম।

"এ কি পাগলামি তোমার?"

"অপরাধ করেচি?"

"অপরাধ নয় ত কি? ব্রহ্মচারীর মনকে এমন করে মুগ্ধ করা কি উচিত তোমার?"

"আমি ত ব্রহ্মচারী নই—আমার মত উদ্যোগ আমি করলাম, এখন তোমার পালা,—এবার একটি-একটি করে ভেঙ্গে চূর্ণ ক'রে দাও আমার সকল মোহ।"

আমি চুপ্ করে রইলাম।

"তোমার পায়ে কত শত অপরাধ করেছি—সবই ত মার্জ্জনা করেছ—আজকেও মার্জ্জনা কর।"

রজনীগন্ধার তীব্র গন্ধে আমার মনের মধ্যে যেন মাদকতা নিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

একটা ফুল তুলে নিয়ে বল্লাম, "এই ফুল-গুলোকে আমি ছু-চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে।"

"কেন?"

"এ বেশ-ভূষায় বিধবা, কিন্তু মনে মাতাল।"

"তবে কোন্ ফুল তুমি ভালবাস?"

"যুঁই।—ছোট ফুলটি, মিষ্টি ব্যথার মত তার স্নিগ্ধ গন্ধ।"

একটা যুঁইয়ের গোড়ে তুলে নিয়ে এসে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করে অমিয়া বল্লে, "রাগ আজ করতে নেই—রাগ করো না।"

আমি বল্লাম, "হাস্‌তে আছে ত?—কি জানি কি আছে-নেই তা আমি ত জানিনে—বলে-বলে দিও আমাকে, নইলে ভুল চুক হবে।"

"ভুল হলেও তোমার দোষ নেই—তুমি যে আমার সন্ন্যাসী বর। আজ দেখ্‌তে চাই কেমন করে আমাকে পায়ে ঠেল।"

"বেশ,—তাহলে আজ আমার পরীক্ষার দিন!"—মনে-মনে বল্লাম, হে ভগবান, কত পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই তুমি নিয়ে যাও মানুষকে! আজকের এই কঠিন পরীক্ষায় তুমিই ফেলেচ—তুমিই উত্তীর্ণ করে দেবে।

অমিয়া আমার দুটো হাত চেপে ধরে বল্লে, "মিথ্যে কথা একটিও আজ বল্‌তে নেই—বল মিথ্যে বল্‌বে না তুমি?"

আমি হাস্‌তে লাগ্‌লাম—বল্লাম, "মিথ্যে তোমায় বলিনি কোন দিন অমিয়া,—তবে সব কথা যে বলা যায় না।"

"আজকে সব বল্‌তে হবে।"

"কি হবে সে কথা শুনে, যাতে বিশ্বের কোন লাভ নেই?"

"বিশ্ব কি কেবল লাভের সন্ধানেই ফিরচে? সে কি দুটো বেশী কথা শুন্‌তে লালায়িত নয়?"

"যা অতিরিক্ত, তার স্থান নেই এ জগতে।"

"বিশ্বাস করিনে ও-কথায় তোমার।"

"সে তোমার ইচ্ছা।"

"বল, সত্যি কথা বল, যা এতদিন বলনি, যা শুনে বিশ্বের কোন লাভ হবে না—সেই কথাটাই আজকে তুমি বার-বার করে বল।"

কি চায় শুন্‌তে এই বিজয়িনী নারী! কেমন করে সে লজ্জার কথা—আমার পরাজয়ের কথা তাকে বল্‌ব?

"কি হবে তোমার শুনে সে কথা?"

"তৃপ্তি।"

"যদি তৃপ্তি না পাও?"

"তাতে দুঃখ কি? তৃপ্তি কি চাইলেই পাওয়া যায়?"

চুপ করে চোখ বুজে বসে রইলাম—মনে-মনে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম অমিয়ার চোখে দুটো আশা-আকাঙ্ক্ষার বেদনায় যেন আমার দিকেই বিস্ফারিত হ'য়ে রয়েচে।

মনে কোন উদ্বেগ এল না—শান্ত-গম্ভীর স্বরেই বল্লাম, "তোমার অনুমান সত্য অমিয়া,—আমি তোমায় ভালবাসি।"

"এই? সে কথা ত' অনেক দিন আগেই জেনেচি।"

"আর কি শুন্‌তে চাও?"

"কি দিতে চাও আমাকে এই ভালবেসে।"

"দিতেই হবে? আমি রিক্ত—আমার যে কিছুই নেই ত্রি-সংসারে।"

"নিজেকে দাও।"

"সে যে অনেক আগে নিবেদিত হয়ে গেছে—নির্ম্মাল্যে তোমার কাজ হবে না।"

"তবে আর কিছু আমি চাইনে। এই আমার ঢের। —আমিও তোমাকে সব দিলাম—আমার যা আছে ক্ষুদ-কুঁড়ো।"

"কি করব আমি তা' নিয়ে?"

"গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিও; তোমার যা অভিরুচি।"

নিস্তব্ধ নিশীথে জীবন-নদীর চরে এই হংস মিথুন কি চায়, তা জানে না! এই না-জানাই কি অনন্ত-প্রেম?

হৃদয়টা ব্যথার একটা মৃদু-মধুর বেদনায় যেন মগ্ন হয়ে গেল।

অমিয়ার হাতখানা টেনে নিয়ে বল্লাম—"এই ভাল-বাসা ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান অমিয়া!—একে হৃদয়ের নিভৃতে চির-পবিত্র রাখতে চাই—ভগবান করুন এতে যেন সংসারের আবিলতা না আসে।"

"তাই যদি তোমার ইচ্ছা আমি তাতে বাধা দেবার কে?"

তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক।

"কিন্তু অমিয়া, তুমি কেন এই ব্রত গ্রহণ করবে?"

"কেন? আমার দেবতা কিসে তোমার দেবতার চেয়ে খাটো?—আমার নির্ম্মাল্যও যে আর কোন পূজায় লাগ্‌বে না।"

এমনি করে নীরবে বাসর-রজনী কেটে গেল। দুটি স্বচ্ছ হৃদয়ের কলধ্বনি নিঃশব্দে একাগ্রতায় সে রাত্রে দুজনে শুনে নিলাম। সে শুনার আজও শেষ হয়নি। জন্ম-জন্মান্তরে হবে কি না কে জানে!

ভোরের আলোতে ঘরের আলো ম্লান হয়ে এল। অমিয়া উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাতে তার আংটীটা পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করে বল্লে, "অপরাধ নিও না—আজ থেকে তুমি ছাড়া পেলে। বনের হরিণ ঘরে থাক্‌তে পারে কি?

তাকে মনের বাঁধনে যে বাঁধতে পেরেছি, এই আমার পরম সৌভাগ্য!"

আমি তাকে বুকের মধ্যে তুলে নিয়ে সমস্ত মুখ চুম্বনে ভরে দিলাম। লজ্জায় সে রাঙা হয়ে গেল।

* * * *

তার পর? তারপর আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম; এসে বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়ালাম। সকালের বাতাস আমার অঙ্গে হাজার চুম্বন দিয়ে চলে গেল। আকাশে তখনো ঘোর কাটেনি—মনে হলো ঘুমের ঘোর তা'তেও লেগে রয়েছে। রাস্তায় এসে ফিরে চেয়ে দেখ্‌লাম—বারাণ্ডার উপর অমিয়া দাঁড়িয়ে আছে—চক্ষে তার অশ্রু—মুখে তার হাসি!

মনটা জাহাজের নিশানের মত তার দিকেই ফিরে রইল! মনের কম্পাসের কাঁটা কিন্তু সাম্‌নে দেখিয়ে বল্লে—

"আগে চল্‌!" (সমাপ্ত)

নবজীবন

[শ্রীমতী————]

জগন্মাতার পূজা আসিয়াছে। সকলেরই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল, আশায় পূর্ণ। সম্বৎসর যে নিরাশার বোঝা বহন করিয়া-করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মলিন মুখেও আশার একটু ক্ষীণ দীপ্তি দেখা যাইতেছে। দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে, সেও আজ হাসিতেছে, তাহারো জীর্ণ ঘরে আজ আনন্দের কোলাহল শোনা যাইতেছে। প্রাণের ধন হারাইয়া যে সারা বৎসর হাহাকার করিয়া মরিয়াছে, সেও আজ মাথা তুলিয়াছে। পাপের সহিত যুঝিয়া-যুঝিয়া যে আপনার প্রতি আর বিশ্বাস রাখিতে পারিতেছে না,—প্রতি ক্ষণে আরও অতলস্পর্শী গহ্বরে পড়িয়া যাইবে বলিয়া কাঁপিতেছে, সেও আজ বল, নির্ভর, বিশ্বাস পাইবে বলিয়া জগন্মাতার মুখের দিকে চাহিয়াছে। চারিদিকেই উৎসবের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। ধনী, দরিদ্র, সকলেই নববস্ত্রে সাজিয়া দলে-দলে মন্দির অভিমুখে ছুটিয়াছে। জগন্মাতার আহ্বান যখন আসিয়াছে, তখন ক্ষুদ্র ঘরের অন্ধকার কোণে কে পড়িয়া থাকিবে বল?

উৎসবের এই মধুর দিনে কে ঐ হতভাগ্য অন্ধকার ঘরে মলিন শয্যার উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে? থাকিয়া-থাকিয়া কি-এক আবেগভরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। সন্ত্রস্ত চক্ষে সে কেবলি রুদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিতেছে। চারিদিকের উৎসবের বাঁশী তাহার কর্ণে আজ বিষ ঢালিয়া দিতেছে। নরনারীর আনন্দ-কোলাহল তাহার অসহ্য বোধ হইতেছে। মন্দিরের কলরব তাঁহারই মৃত্যুর শোকসূচক ধ্বনি বলিয়া মনে হইতেছে। অনুতাপের যাতনায় ছট্‌ফট করিতে-করিতে সে একবার দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতরটা ভীত চক্ষে দেখিতেছে, আর একবার শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। কখনো শয্যার উপর বসিয়া বিস্ফারিত চক্ষে শূন্যতল দেখিতেছে। হায়, ভগবান, গতরাত্রে সে কোন্ দেবতার অভিশাপে এমন ভয়ানক কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে! অবশেষে সে কি-না হত্যাকারী হইল? অবনতির পথে যাইতে-যাইতে সে যে একেবারে চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। হায়, কেহ তাহাকে বাধা দিল না কেন? সে বালিকা কুসুম-কোমলা। তাহার নিদারুণ মুষ্ট্যাঘাতে সে কি বাঁচিয়া আছে? সে দেখিয়াছে, তাহার মুষ্ট্যাঘাতে বালিকার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়া, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। আত্মরক্ষার্থই সে তাহাকে এই আঘাত দিয়াছে। নতুবা, অলঙ্কারগুলি লইয়া পলায়ন করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই অতর্কিত ঘটনায় সে হতবুদ্ধি হইয়া গহনাগুলি ফেলিয়াই পলায়ন করিয়া আসিয়াছে। সুকুমারী বালিকার পাণ্ডুর মুখচ্ছবি তাহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে দুই হস্তে সবলে চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া রহিল। অন্ধকারের মধ্যেও দেখিতে পাইল, বালিকার কাতর চক্ষু দুইটি তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মনে পড়িয়া গেল দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। উন্মত্ত অশ্ব

রাজপথে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। সে তখন সেখান দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ আর্ত্তনাদের স্বর শুনিয়া সে সম্মুখে চাহিতেই দেখিতে পাইল, গোলাপ ফুলের মত একটি শিশু অশ্বের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। অশ্বের পদতলে শিশুর জীবন নির্ব্বাণোন্মুখ। আর এক মুহূর্ত্ত! চারিদিকের জনতা হায়, হায় করিয়া উঠিল। কিন্তু উদ্ধার করিবার সাহস কাহারো হইল না। সে তখন জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া উন্মত্তের মতই ক্ষিপ্ত অশ্বের পদতল হইতে বালিকা গৌরীকে টানিয়া তুলিয়াছিল। অদৃষ্টের এ কি নিদারুণ পরিহাস! এ কি বিড়ম্বনা! যাহাকে সে জীবন দান করিয়াছিল, আজ তাহারই জীবন নাশ করিয়া আসিয়াছে।

সে তখন শুভ্র ফুলের মতই নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল ছিল। তার পর ঘটনাচক্রে পড়িয়া, কুসংসর্গে মিশিয়া, আজ তাহার পবিত্র জীবনের এই পরিণতি! সে অধঃপাতের পথে যাইতে-যাইতে অনেকবার উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু সমাজ তাহাকে উঠিতে দেয় নাই। এমন একটি সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় সে পায় নাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সে সত্যের পবিত্র পথে ফিরিয়া আসিতে পারে। তৃণের মত সে পাপস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল,—এমন একটিও সহৃদয় ও দৃঢ় হস্ত তাহার জন্য প্রসারিত হয় নাই, যাহা ধরিয়া সে পাপস্রোত হইতে উঠিতে পারে। বরং তাহাকে পাপের পথে পড়িতে দেখিয়া, নরনারীরা সকলেই তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়াছিল। সে সময় সে যদি কাহারো চোখে তাহার জন্য একবিন্দুও সমবেদনার অশ্রু দেখিতে পাইত, তাহা হইলেও সে বাঁচিয়া যাইত; আজ সে হত্যাকারী হইত না। হতভাগ্য সে, তাই আজ তাহার এই দুর্দ্দশা। যাতনায় সে বুকের উপরে ঘন-ঘন করাঘাত করিতে লাগিল। হৃদয় তাহার আর সহ্য করিতে পারে না। এই অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা ও আতঙ্ক অসহ্য। পুলিশ আসিয়া যদি এখনি তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায় তবে সে বাঁচে, সে শান্তি পায়। সংসারে তাহার কেহ নাই, কেবল শান্তি-স্বরূপিণী মা আছেন। তিনি যখন তাহার এই শোচনীয় পরিণামের কথা শুনিবেন, তখন কি আর এ পৃথিবীতে থাকিবেন? বেদনা তাহাকে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। সে "মা, মা" বলিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হঠাৎ একটি কথা মনে হইয়া সে একটু সুস্থ বোধ করিল। বালিকা হয় ত বাঁচিয়া আছে। পর দিন সকালের সংবাদপত্র দেখিয়া সে তাহার ভাগ্য নির্ণয় করিবে। একটা আবেগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। সে নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সকালের সংবাদপত্র দেখিয়া সে বিস্ময়াপ্লুত হইল। আবেগে তাহার দেহ কম্পিত হইল। সংবাদ-পত্রে বালিকাকে আঘাত করার কথা লেখা রহিয়াছে; কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও লেখা রহিয়াছে যে, বালিকা বলিয়াছে, তাহার আঘাতকারীকে সে ক্ষমা করিয়াছে। কথাগুলি পড়িয়া তাহার অশ্রু-প্রবাহ আর বাধা মানিল না; ঝর-ঝর ধারে ঝরিয়া পড়িয়া তাহার অনুতপ্ত বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া দিল। তাহার মত পাপীকে যে ক্ষমা করিতে পারে, সে বালিকা হইলেও দেবী। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, বালিকা গৌরীর পদ্মের মত পা-দুখানি বুকে রাখিয়া সন্তপ্ত, ভগ্ন, আর্ত্ত বুক একটু শীতল করিয়া লয়। শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায়, ভক্তিতে তাহার মাথা অবনত হইয়া পড়িল। এখনো সুদীর্ঘ জীবন তাহার সম্মুখে। সে এই দানের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইল। বালিকাকে সে দেখাইবে যে, সে বৃথাই তাহাকে ক্ষমা করে নাই।

(২)

তার পর বহু বৎসর অতীত হইয়াছে। সে দেশের বিচারালয়ে জমিদার-ঘরের একটা দেওয়ানী মোকদ্দমায় সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। জমিদারের মৃত্যু হইবার পর তাঁহার সম্পত্তি লইয়া তাঁহারই বিধবা পত্নীর সহিত তাঁহার ভাইদের মোকদ্দমা বাধিয়া গিয়াছে। ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে ভিখারিণী হইতে হয় বুঝি! বিধবা নারী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও, নারী বলিয়াই অসহায়া ও পরমুখাপেক্ষিণী। তাঁহার ভরসা একমাত্র বিচারকের ন্যায়নিষ্ঠার উপর। ন্যায়পরায়ণ বলিয়া বিচারকের খ্যাতি দেশে-দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রমণী উদ্বেগাকুল হৃদয়ে তাঁহারই দিকে চাহিয়া পড়িয়া আছেন।

বিচার শেষ হইলে রমণী শুনিলেন, বিচারক তাঁহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করেন। বিস্ময়ে, সংশয়ে তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। বিচারক আসিয়া দেখিলেন, বিধবা গৌরী দেবী-প্রতিমার মত তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার প্রশান্ত দুটি চক্ষু হইতে আনন্দ ঝরিয়া পড়িতেছে। "মা, মা" বলিয়া তিনি তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। রমণীর আয়ত চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া তাঁহার মস্তকের উপর পড়িল।

তক্ষশিলা

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ]

লাহোর হইতে পেশোয়ার যাইবার পথে সরাইকালা জংশন নামে একটী রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। সরাইকালা রাবলপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত। এখান হইতে হাভেলিয়ান্‌ পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলপথ বিস্তৃত,—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের গ্রীষ্মাবাস অ্যাবটাবাদে এই পথে যাইতে হয়। এই সরাইকালা ষ্টেসনের নিকটেই তক্ষশিলা নামক বিখ্যাত প্রাচীন নগরের লুপ্তোদ্ধার হইয়াছে। সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশে প্রত্নতত্ত্বহিসাবে এই স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্যবান্‌।

বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা সরাইকালা রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসনে কৌন টাঙ্গা* দেখিতে পাইলাম না। নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে টাঙ্গা আনিবার জন্য একটী মুসলমান বালককে পাঠাইলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কোন ফল হইল না। কিছু দূরে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের আফিস দেখা যাইতেছিল; আমরা পদব্রজে আফিস অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

আফিসের কর্ম্মচারিগণ অধিকাংশই বাঙ্গালী। লুপ্তোদ্ধারগুলি দেখিবার জন্য তাঁহারা একটী ছাপা অনুমতি-পত্র দিলেন। তাঁহাদের নিকটে সন্ধান লইয়া জানিলাম, ৪।৫ জায়গায় খনন কার্য্য চলিতেছে,—স্থানগুলির মধ্যে ব্যবধান কোন-কোন স্থলে প্রায় ৪ মাইল। আফিসের নিকটেই একটী মিউজিয়ম। সেখানে বহুসংখ্যক সুগঠিত বৌদ্ধ-মূর্ত্তি, একটী শিলালিপি এবং নানাপ্রকার তৈজসপত্র ও গৃহসজ্জা দেখিলাম। প্রাচীন নগরের লুপ্তোদ্ধার করিবার সময়ে একটী লোহার Folding chair এবং কয়েকখণ্ড কাঁচের শিশি-বোতল ভাঙ্গা পাওয়া গিয়াছিল। সেই বহু প্রাচীন কালেও যে এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার ছিল, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই।

মিউজিয়ম দেখিয়া আমরা চীর টোপ দেখিতে চলিলাম। দুইপার্শ্বে শস্যক্ষেত্র, মধ্য দিয়া পথ। পথ অনবরত নামিয়া চলিয়াছে। স্থানে-স্থানে এত দ্রুত ভাবে নামিতে হইতেছিল যে, আশঙ্কা হইতেছিল, গাড়ী পাছে উল্টাইয়া যায়। অবশেষে আমরা গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে পদব্রজে কিছু পথ আরোহণ করিয়া একটা স্তূপমূলে উপস্থিত হইলাম। এই স্তূপের নাম চীর টোপ। একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর এই স্তূপটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। মধ্যস্থলে স্তূপ, চারিদিকে স্তম্ভ, কক্ষ প্রভৃতি দেখিতে পাইলাম। একস্থানে একটী জলের সুবৃহৎ চৌবাচ্চার ন্যায় রহিয়াছে,—তাহা হইতে বোধ হয় এই স্থানের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জল সরবরাহ হইত। একটী কক্ষ-মধ্যে চারিটি মনুষ্য-মূর্ত্তি রহিয়াছে। একটি খুব ছোট, একটী তদপেক্ষা বৃহৎ, তৃতীয়টি আরও বড়, চতুর্থ মূর্ত্তিটি প্রকাণ্ডকায়। এই চতুর্থ মূর্ত্তিটির মাত্র গুল্‌ফ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, উপরের সমস্ত অংশটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পদতলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ ফিট; সুতরাং অভগ্ন অবস্থায় মূর্ত্তিটি ৩৫ ফিট উচ্চ ছিল—প্রায় আড়াইতলা বাটির ন্যায় উচ্চ হইবে। এরূপ বিভিন্ন আকারের মনুষ্য-মূর্ত্তি কি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। আমাদের প্রত্নতত্ত্ব-অনভিজ্ঞ চক্ষে মনে হইল, ইহারা হয় ত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের মনুষ্য-দেহের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতেছে।

চীর টোপ হইতে সিরকপ চলিলাম। হাঁটা পথ। পথের ধারে কিছু চাষ হইয়াছিল; কিন্তু চারিদিকের বৃক্ষলতাবর্জ্জিত শিলাময় পাহাড়গুলি মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর কিরণে নিরতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্য সেই এক মাইল পথ যাইতেই আমাদের খুব কষ্ট হইল। পথের ধারে পাহাড়ের উপর একটী স্তূপ দেখিয়া তাহাতে আরোহণ করিলাম। ইহার নাম কুণাল স্তূপ। অশোকের পুত্রের নাম কুণাল। কুণাল অশোকের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাহার চক্ষু দুইটি কুণাল পক্ষীর ন্যায় ক্ষুদ্র ও মনোহর ছিল বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল কুণাল। কুণালের বিমাতা

---

* পঞ্জাবের প্রচলিত দ্বিচক্র অশ্বযান।

কুণালের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকট অন্যায় প্রস্তাব করিয়াছিল, কুণাল তাহাতে রাজি হয় নাই। এজন্য ক্রুদ্ধা রমণীর চক্রান্তে কুণালকে তক্ষশিলায় পাঠান হয় এবং তথায় তাহার চক্ষু অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অন্ধ কুণাল মগধে পিতার নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল এবং কেহ-কেহ বলেন, পুনরায় দৃষ্টি-শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিল। পুত্র-স্নেহ-প্রণোদিত হইয়া অশোক এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কুণাল-স্তূপের নীচেই সিরকপ নামক স্থানে প্রাচীন নগরের সুস্পষ্ট নিদর্শন সকল আবিষ্কার করা হইয়াছে। নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে—কুণাল-স্তূপের নিকটেই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। নগরের পশ্চিমপ্রান্তে সুবৃহৎ তোরণ। এই দুই স্থানের মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমভাবে বিস্তৃত রাজপথ। পথের দুই পাশে ঘরবাড়ী, দেবালয়, বৌদ্ধ মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পথের ঠিক ধারেই যে প্রকোষ্ঠগুলি অবস্থিত ছিল, সেগুলি কতকটা দোকান-ঘরের ন্যায় বোধ হইল। কোথাও দ্বার অতিক্রম করিয়াই প্রাঙ্গণ—প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রকোষ্ঠ। সাধারণতঃ প্রকোষ্ঠগুলির আয়তন কিছু ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইল। বলা বাহুল্য, ইষ্টকালয়গুলির কেবলমাত্র নিম্ন অংশগুলিই এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, উপরের অংশগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রধান রাজপথের দুইপাশে প্রায় সমান্তরালে অবস্থিত কতকগুলি সঙ্কীর্ণ গলি দেখিতে পাইলাম। একটা মন্দিরের গাত্রে কতকগুলি হিন্দু-তোরণ, বৌদ্ধ-স্তূপ এবং গ্রীক স্তম্ভ-শীর্ষের (Capital) প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তক্ষশিলাতে যে এই তিনটি প্রাচীন সভ্যতার সংমিশ্রণ হইয়াছিল, ইহা তাহার একটা সুন্দর নিদর্শন।

তক্ষশিলাতে তিনটি স্থলে প্রাচীন নগরের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নগরের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটে, প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের আফিসের ঠিক পার্শ্বেই। সম্ভবতঃ গ্রীক অভিযানের পূর্ব্বে এই নগর বর্ত্তমান ছিল। এ স্থানটি এখনও বিস্তারিত ভাবে খনন করা হয় নাই; এবং এখানে এ পর্য্যন্ত প্রাচীন লোকালয়ের মাত্র যৎসামান্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী যুগের নগর ছিল, বর্ত্তমান শিরকপ নামক স্থানে। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খনন করা হইয়াছে। রাজপথ, দেবালয়, প্রাসাদ, তোরণ, প্রাচীর, পরিখা প্রভৃতি প্রাচীন নগরের নিদর্শনগুলি অতি পরিষ্কার ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এখানে একাধিক নগর অবস্থিত ছিল; কারণ, কখন-কখনও প্রকোষ্ঠের নীচে খুঁড়িতে-খুঁড়িতে প্রকোষ্ঠের মাঝখান দিয়া আর একটা দেয়াল বাহির হইয়াছে এরূপ দেখা গিয়াছে। অনুমান হয় যে, নীচের দেয়াল প্রাচীনতর নগরের চিহ্ন, যাহার ধ্বংসের উপর পরবর্ত্তী যুগের নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৃতীয় আর একস্থানে প্রাচীন নগরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে,—এখন সেখানে একটা গ্রাম। এই তৃতীয় নগরের লুপ্তোদ্ধার সিরকপের লুপ্তোদ্ধারের ন্যায় সুস্পষ্ট বা কৌতূহলোদ্দীপক নহে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার ঠিক পথের উপরেই তক্ষশিলা অবস্থিত ছিল বলিয়া তক্ষশিলা বহুবার বিদেশীয়দের দ্বারা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এজন্য তক্ষশিলাতে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন যুগের নগরের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আমরা শিরকপের প্রাচীন রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিলাম। পথের মধ্যস্থলে লৌহবর্ত্ম পাতা হইয়াছে। তাহার উপর ক্ষুদ্র লৌহ-শকটে (truck) মাটি বোঝাই করিয়া নগরের পশ্চিমপ্রান্তে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। খুঁড়িতে-খুঁড়িতে যে মাটি বাহির হইতেছে, তাহা এই উপায়ে নগরের পশ্চিমে প্রাচীর ও পরিখার বাহিরে, প্রকাণ্ড স্তূপাকারে পরিণত করা হইয়াছে। পথের দুইধারে প্রাচীন গৃহগুলির মধ্যস্থলে সুন্দর-সুন্দর ফুলের বাগান প্রস্তুত হইয়াছে, লাল-নীল-পীত নানাবর্ণের ফুলগুলি বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছিল। ইহার উদ্দেশ্য—প্রাচীন নগরের শিলাময় নিদর্শনগুলি সুন্দরতর করা। শুনিলাম ক্রীট, গ্রীস, প্রভৃতি য়ুরোপের যে সকল স্থলে প্রাচীন কীর্ত্তির লুপ্তোদ্ধার করা হয়, সেই সকল স্থানও এই ভাবে ফুলগাছ দিয়া সাজান হয়।

নগরের পশ্চিম-প্রান্তস্থিত তোরণ-পথে নির্গত হইয়া আমরা অদূরবর্ত্তী জণ্ডিয়াল মন্দির দেখিতে গেলাম। প্রথমে সোপানাবলি আরোহণ করিয়া মন্দির-সংলগ্ন উচ্চ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম;—আরও কয়েকটী সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দির-মূলে উপনীত হইলাম। সম্মুখে চতুষ্কোণাকারে অবস্থিত চারিটি বৃহৎ স্তম্ভ, তাহার পর একটি কক্ষ;—তৎপরবর্ত্তী অপর একটী কক্ষ দেখিয়া সেটি

গর্ভগৃহ বলিয়া বোধ হইল ; এই কক্ষ-মধ্যে একটী উচ্চ মঞ্চ রহিয়াছে ; মঞ্চে আরোহণ করিবার সোপানাবলি এখনও বর্ত্তমান। চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিবার পথ দেখিতে পাওয়া গেল। মন্দিরটি যে একটী বৃহৎ ব্যাপার ছিল তাহা ধ্বংসাবশেষ দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হয়। Sir John Marshall মনে করেন যে, ইহা গ্রীক-মন্দির, কারণ গ্রীকদের নির্ম্মিত মন্দিরের সহিত ইহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু গ্রীক-প্রভাব-সম্পর্কহীন হিন্দু দেবালয়ের সহিতও ইহার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাকে হিন্দু-মন্দির বিবেচনা করা কিছুমাত্র কষ্ট-কল্পনা বোধ হইল না।

শিরকপ হইতে ৪।৫ মাইল দূরে জৌলিয়াঁ ও মোরা মরাদো নামক স্থানে বৌদ্ধ-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। যানাভাবে আমাদের সেখানে যাওয়া হয় নাই।

তক্ষশিলার উৎপত্তি ও নামকরণ সম্বন্ধে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় সিন্ধু-নদের উভয় তীরবর্ত্তী রমণীয় দেশে গন্ধর্ব্বগণ বাস করিত।

অয়ং গন্ধর্ব্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ
সিন্ধোরুভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ।
তং রক্ষন্তি গন্ধর্ব্বাঃ সায়ুধা যুদ্ধকোবিদাঃ॥

রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১০০ সর্গ ১০ ও ১১ শ্লোক

শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের শেষভাগে ভরতের মাতুল কেকয়-রাজ যুধাজিতের অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্র সিন্ধু-তীরবর্ত্তী পরম-শোভন গন্ধর্ব্বদেশ জয় করিবার জন্য ভরতের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তক্ষ ও পুষ্কল নামক ভরতের পুত্রদ্বয়ও এই সৈন্যের সহিত গমন করিয়াছিল। তাঁহারা গন্ধর্ব্বদেশের নিকটবর্ত্তী হইলে যুধাজিৎ সসৈন্যে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। গন্ধর্ব্বদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে বর্ত্তমান পঞ্জাব-প্রদেশের অংশবিশেষে সম্ভবতঃ কেকয়রাজ্য অবস্থিত ছিল। গন্ধর্ব্বগণ তাহাদের দেশ আক্রান্ত হইতে দেখিয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইল। তাহাদের সৈন্য-সংখ্যা তিন কোটি। সপ্তরাত্রি ব্যাপিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিল। অবশেষে ভরতের শৌর্য্যে গন্ধর্ব্ব-সৈন্য পরাস্ত হইল। অতঃপর ভরত গন্ধর্ব্বরাজ্যে দুইটি নগর স্থাপন করিয়া তাঁহার দুই পুত্রকে দুই নগরে অভিষিক্ত করিলেন। তক্ষের নগরের নাম হইল তক্ষশিলা এবং পুষ্কলের নগরের নাম হইল পুষ্কলাবত। নগরদ্বয়ের সৌন্দর্য্য রামায়ণে এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা পড়িলে বোধ হয় তাদৃশ প্রাচীন সময়েও নগরনির্ম্মাণ-বিদ্যায় হিন্দুগণ যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করিয়াছিল।

হতেষু তেষু সর্ব্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে॥
তক্ষং তক্ষশিলায়াং চ পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্ব্ব বিষয়ে রুচিরে গান্ধার বিষয়ে চ সঃ॥
ধনরত্নৌঘ সঙ্কীর্ণে কাননৈরুপ শোভিতে।
অন্যোন্য-সংঘর্ষ-কৃতে স্পর্দ্ধয়া গুণবিস্তরৈঃ॥
উভে সুরুচিরপ্রখ্যে ব্যবহারৈরকিল্বিষৈঃ।
উদ্যান যানি সংপূর্ণে সুবিভক্তান্তরাপণে॥
উভে পুরবরে রম্যে বিস্তরৈরুপ শোভিতে।
গৃহমুখ্যৈঃ সুরুচিরৈর্বিমানৈর্বহুভির্বৃতে॥
শোভিতে শোভনীয়ৈশ্চ দেবায়তনবিস্তরৈঃ।
তালৈস্তমালৈস্তিলকৈর্বকুলৈ-রুপশোভিতে॥

উত্তরকাণ্ড ১০১ম সর্গ ১০—১৫ শ্লোক

"সেই সকল গন্ধর্ব্বগণ নিহত হইবার পর কেকয়ী-পুত্র ভরত দুইটি সমৃদ্ধিশালী নগর নির্ম্মাণ করিলেন। তক্ষকে তক্ষশিলাতে এবং পুষ্কলকে পুষ্কলাবত নগরে স্থাপিত করিলেন। তক্ষশিলা গন্ধর্ব্বদেশে অবস্থিত ছিল এবং পুষ্কলাবত গান্ধারদেশে অবস্থিত ছিল। নগরদ্বয় ধনরত্ন-সমূহ সংযুক্ত এবং বহু সংখ্যক কাননের দ্বারা সুশোভিত ছিল। তাহারা যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া প্রভূত গুণশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধর্ম্ম-ন্যায়োপেত ব্যবহারে উভয় নগর বিখ্যাত হইয়াছিল। তাহারা উদ্যান ও যানে পরিপূর্ণ ছিল ; আপণিসমূহ নির্দ্দিষ্ট অন্তরালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উভয় নগরই বিস্তর পদার্থে সুশোভিত ছিল। উৎকৃষ্ট সুবৃহৎ গৃহ, সপ্ততল প্রাসাদ (বিমান), অসংখ্য দেবমন্দির প্রভৃতির দ্বারা নগরদ্বয় সুশোভিত ছিল। তাল, তমাল, তিলক, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষের দ্বারা নগরদ্বয় উপ-শোভিত হইয়াছিল।"

শিরকপের ভূগর্ভ-প্রোথিত রাজপথ দিয়া চলিবার সময় মনে হয় যেন রামায়ণ-বর্ণিত "সুবিভক্তান্তরাপণ" "গৃহমুখ্যৈঃ দেবায়তন বিস্তরৈরুপশোভিত" প্রভৃতি বিশেষণগুলি প্রত্যক্ষ হইতেছে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রামায়ণের বর্ণনা তক্ষশিলার প্রাচীনতম নগর সম্বন্ধে

প্রয়োগ করা যাইতে পারে,—শিরকপ বহুকাল পরবর্ত্তী নগর।

রামায়ণের উপরি-উদ্ধৃত অংশে উক্ত হইয়াছে যে, তক্ষশিলা গন্ধর্ব্বদেশে এবং পুষ্কলাবত গান্ধারদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গন্ধর্ব্বদেশ সিন্ধুরপূর্ব্বতীরে এবং গান্ধার-দেশ সিন্ধুর পশ্চিমতীরে (বর্ত্তমান পেশোয়ার জেলা) অবস্থিত ছিল। পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী চার্ষাদা নামক স্থানে এই পুষ্কলাবত নগর ছিল বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। কালিদাস রঘুবংশে এই কাহিনী উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাসের বর্ণনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত অথচ কবিত্বপূর্ণ।

ভরতস্তত্র গন্ধর্ব্বান্ যুধি নির্জ্জিত্য কেবলান্।
আতোদ্যান্ গ্রাহয়ামাস সমত্যা-জয়দায়ুধং॥
সতক্ষ-পুষ্কলৌ পুত্রৌ রাজধান্যো-স্তদাখ্যয়োঃ।
অভিষিচ্যা-ভিষেকার্হৌ রামান্তিকমগাৎ পুনঃ॥

রঘুবংশ, ১৫ সর্গ, ৯০ ও ৯১ শ্লোক।

"ভরত যুদ্ধে গন্ধর্ব্বদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করাইয়া কেবল বীণা গ্রহণ করাইলেন। তিনি তক্ষ ও পুষ্কল নামক পুত্রদ্বয়কে তাহাদের নামানুযায়ী নগরে অভিষেক করিয়া পুনরায় রামের নিকট ফিরিয়া গেলেন।"

গন্ধর্ব্বগণ যে উৎকৃষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিল, কালিদাস এখানে সেই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

বৌদ্ধযুগে তক্ষশিলা অত্যন্ত বিখ্যাত নগর হইয়াছিল। বৌদ্ধ-জাতক গল্পে বহুস্থানে তক্ষশিলার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধপ্রবাদ অনুসারে এখানে বুদ্ধদেব কোন পূর্ব্ববর্ত্তী বোধি-সত্ত্ব বিগ্রহে এক ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের তৃপ্তির জন্য তাঁহার শিরোদেশ অর্পণ করিয়াছিলেন এবং ইহা হইতেই শিরকপ নামের উৎপত্তি হয়। ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, পারশ্য, আরব প্রভৃতি নানাস্থানের বণিকগণ তক্ষশিলাতে সমবেত হইত। কিন্তু শুদ্ধ ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্যই যে তক্ষশিলা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে; এখানে বহুসংখ্যক স্তূপ ও বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল;—এখনও নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর সেই সকল স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ পথিকের নয়নগোচর হয়। অনতিকাল-মধ্যে তক্ষশিলা বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্ররূপে খ্যাতিলাভ করিল। সে সময় ভারতবর্ষের বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে বিদ্যার্থিগণ তক্ষশিলায় উপস্থিত হইত। তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্র ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনুশীলনে সমধিক অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

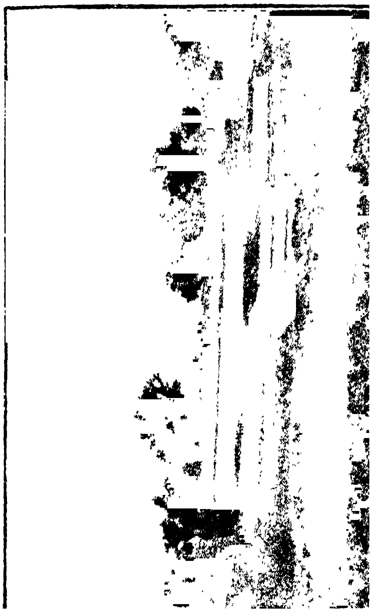
খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ খৃষ্টাব্দে গ্রীক-সম্রাট আলেক্জন্দর সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া যে রাজ্যে উপস্থিত হইলেন, তাহার রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। এই রাজ্য বিতস্তার * পূর্ব্বতীরবর্ত্তী দেশের বিখ্যাত রাজা পুরুর অধীন ছিল। তক্ষশিলার রাজপ্রতিনিধি, অম্ভি সেই সময় বিদ্রোহী হইয়া আলেক্-জন্দরের সহিত যোগদান করিয়া পুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। আলেক্জন্দর পঞ্জাব পরিত্যাগ করিবার পর তাঁহার প্রতিনিধি ফিলিপাস তক্ষশিলার চতুর্দ্দিকের দেশ শাসনে নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীক-শাসন স্থায়ী হয় নাই। যে বীরপুরুষের শৌর্য্যে এই সময় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশীর প্রভুত্ব বহিষ্কৃত হইয়াছিল, তাঁহার নাম চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে তাঁহার পৌত্র বিখ্যাত অশোকের সময় পর্য্যন্ত তক্ষশিলা (এবং সমগ্র উত্তর-ভারত) মগধরাজের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। অশোকের পর বিদেশী সৈন্য পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। খৃষ্টের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে শকগণ পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল জয় করিয়া তক্ষশিলাতে রাজত্ব করিয়াছিল। শকদের পর কুশানেরা রাজত্ব করে। কনিষ্কের রাজত্বের সময় কাশ্মীর ও সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশ কুশানদের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কনিষ্ক বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং শকাব্দ প্রচলিত করেন। ক্রমশঃ কুশানদের অবনতি হয়। পঞ্চম খৃষ্টাব্দে হুনেরা তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া উত্তর ভারতে রাজত্ব স্থাপন করে। হুনবংশীয় বিখ্যাত মিহিরকুল বিক্রমাদিত্য দ্বারা পরাজিত ও নিহত হইবার পর সমগ্র উত্তর ভারত বিক্রমাদিত্যের শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হুয়েণ সাং তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবত উভয় নগরই পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তক্ষশিলার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আমরা অপরাহ্নে ধীরে ধীরে রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। সেই অতীতকালের দুই চারিটি দৃশ্য আমার মানস-নেত্রে

* বর্ত্তমান ঝেলম্ নদ।



জন্‌ডিয়াল—খণনের পূর্ব্বে



জন্‌ডিয়াল—বি স্ত পের সম্মুখভাগ



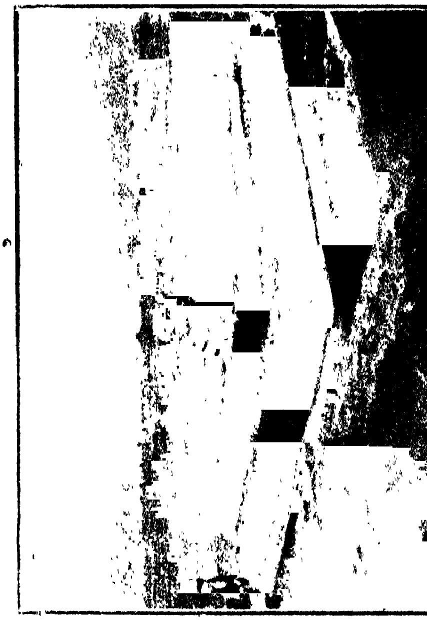
শিরকপ—মন্দিরের সম্মুখের দৃশ্য



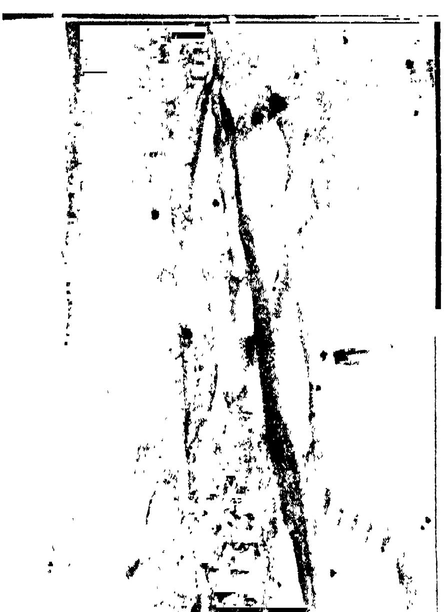
তক্ষশিলা—চীর টোপ স্তূপ



তক্ষশিলা—মন্দিরের স্তম্ভের নিম্নভাগ



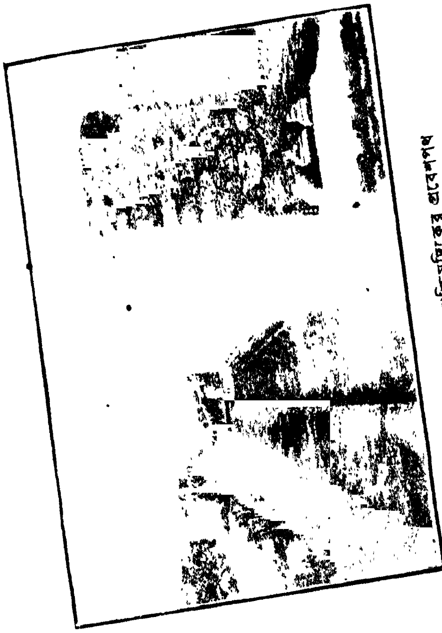
তক্ষশিলা—চীর টোপ স্তূপ (উত্তর-পশ্চিম দিকের দৃশ্য)



তক্ষশিলা—সিরকপ-নিবাস



সিরকপে প্রাপ্ত মূর্তি



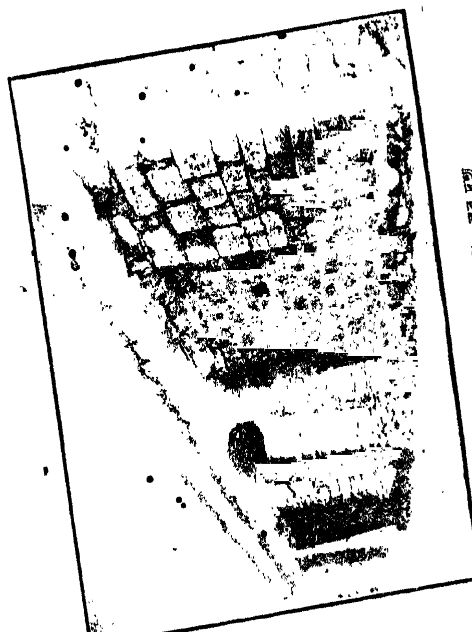
মহিয়াল মন্দির—পশ্চিমদিকের প্রবেশপথ



জনডিয়াল মন্দির—দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের দৃশ্য



জনডি ল মন্দির—অভ্য র গ



জনডিয়া ন্দর—দেক ার দৃশ্য

আবিষ্কৃত হইল। বহু-জনাকীর্ণ রাজপথ—কত বিভিন্ন-দেশের লোক, ভারতবাসী, চীন, পারস্য, আরব, গ্রীক,—তাহাদের বিচিত্র বেশভূষা। রাজপথের উভয় পার্শ্বে বিপণীশ্রেণী, নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। দোকানে ক্রয়-বিক্রয় চলিয়াছে; রাজপথে গোযান, অশ্বযান, মনুষ্য-বাহ্যযান, নানাপ্রকার যান চলিয়াছে। সমুচ্চ অট্টালিকা-সকল পথপার্শ্বে শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে



চীর টোপে সংগৃহীত মূর্ত্তি

"তাল-তমাল তিলক-বকুল" প্রভৃতি পরিপূর্ণ উপবন,—নগরবাসিগণ তাহাদের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছে। সন্ধ্যা বেলায় নগরের অসংখ্য দেবালয় হইতে আরতির ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। অধিক রাত্রে বিলাসীদের গৃহ হইতে সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি শোনা যাইতেছে, কারণ আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে তক্ষশিলা গন্ধর্ব্বদের নগর। কোনদিন নগর উৎসববেশে সজ্জিত হইত, গৃহসকল বিবিধবর্ণের বিচিত্র বস্ত্রে মণ্ডিত হইত, রাজপথের উপর পুষ্পমাল্যসংযুত তোরণ নির্ম্মিত হইত, হয় ত রাজা বা মন্দিরের দেবতা শোভাযাত্রা করিতেন; রাজপথ-পার্শ্বস্থিত গৃহবাতায়নসমূহে কৌতূহলী রমণীবৃন্দের নয়নসকল ফুল্লেন্দীবরবৎ শোভা পাইত। নগরের বাহিরে বিদ্যার্থিগণ গুরুসমীপে নিবিষ্টচিত্তে পাঠাভ্যাস করিত, ছুটি বা উৎসবের দিন দল বাঁধিয়া নগরে বেড়াইতে আসিত। গভীর নিশীথে নগরের দ্বার রুদ্ধ হইত; ক্রমশঃ সকল কোলাহল থামিয়া যাইত, কেবল প্রাচীরের উপর প্রহরী সতর্ক-পাদবিক্ষেপ করিয়া চলিয়া বেড়াইত। একদিন অশ্ব ছুটাইয়া সৈনিক আসিয়া সংবাদ দিল, শত্রু-সৈন্য সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছে। নগরে যুদ্ধের সাড়া পড়িয়া যাইত, সৈনিকগণ বর্ম্ম পরিয়া দ্রুতপদে ঘুরিয়া বেড়াইত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা এবং অশ্বের পদশব্দে রাজমার্গ মুখরিত হইত। শত্রু সৈন্য নগর আক্রমণ করিত, ভীষণ যুদ্ধ হইত, রাজপথে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইত। হয় ত শত্রু সৈন্য জয়লাভ করিয়া নগরধ্বংস করিয়া ফেলিত, আবার অদূরে নূতন নগর নির্ম্মিত হইত, আবার নগর-



চিরটোপে প্রাপ্ত বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির মস্তক

বাসিগণ আনন্দ কোলাহলের মধ্যে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিত। ঐ প্রস্তরখণ্ডগুলি যদি কথা বলিতে পারিত, কত শত অতীত কাহিনী বলিয়া আমাদিগকে বিস্মিত, পুলকিত ও বিগলিত করিতে পারিত। সেই গৌরবের দিন অতীত হইয়াছে। আজ আর কিছুই নাই—কত গৌরবের দৃশ্য, কত বীরত্বের অভিনয়, কত শোকাবহ ঘটনা কালসমুদ্রে ফুটিয়া উঠিয়া আবার চিরতরে মিলাইয়া গিয়াছে। কিছু নাই। আছে কেবল স্মৃতি—ক্ষীণ, অস্পষ্ট, অর্দ্ধবিস্মৃত। সত্যই কবি বলিয়াছেন—

যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥ *

* কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সংগ্রহ হইতে গৃহীত।—ভাঃ-সঃ।

লৌহ-কাহিনী—কর্ম্মবীর টাটা—জেম্‌সেদ্‌পুর

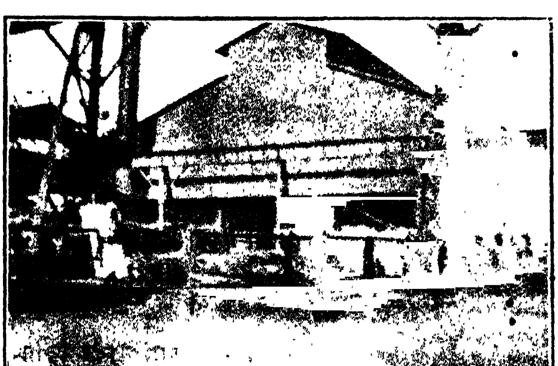
[শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]



কয়েকজন উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্ম্মচারী

উপবিষ্ট :—(বামদিক হইতে) ১। মিঃ এ, সি, বসু, বি-এসসি, (মিচিগান—ড্রাগ ওভেন্‌স). ২। মিঃ ডি, সি, ড্রাইভার, বি-এ, (ক্যাণ্টারবেরী), বার-এট-ল ৩। রায় সাহেব ডাক্তার শ্রীযুক্ত শান্তিরাম চক্রবর্ত্তী (চীফ মেডিক্যাল অফিসার) ৪। মিঃ ডি, সি, গুপ্ত এম, বি, (হারভার্ড—সুপাঃ কোক ওভেন্‌স এণ্ড বাই প্রডাক্টস) ৫। মিঃ এন, দিনশা, এসিষ্ট্যাণ্ট ইলেক্‌ট্রিক অফিসার।

দণ্ডায়মান :—(বামদিক হইতে) ১। মিঃ ডি, সি, আহুজা বি-এস্‌সি (গ্লাসগো) এসিষ্ট্যাণ্ট ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ২। মিঃ এস, ঘোষ এ-এম-এস টি (ম্যাঞ্চেষ্টার), এ-এম-আই-ই-ই ইত্যাদি ইত্যাদি, চীফ ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ৩। * * * * ৪। মিঃ কে, এস, পাণ্ডালাই টাউন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।



বাহির হইতে বার মিল



একখানি রেল প্রস্তুত হইয়া ফিনিসিং মিলে যাইতেছে

(শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্র সংগৃহীত)



অরণ্য মধ্যে আদিম অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক পুরাতন প্রথায় লৌহ প্রস্তুত (শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহীত)



জি টাউন হইতে সহরের একাংশ



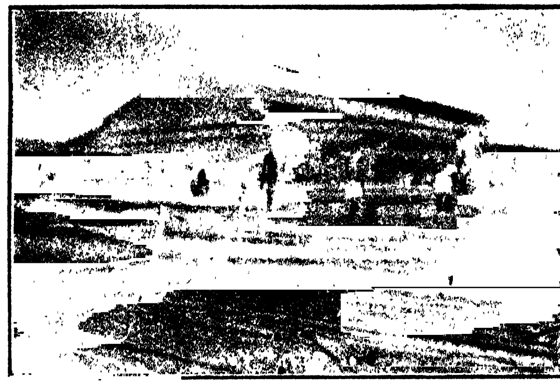
গ্রেন ষ্টোর্স হইতে কুলীরা চাউল ইত্যাদি লইতেছে
(শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্র সংগৃহীত)



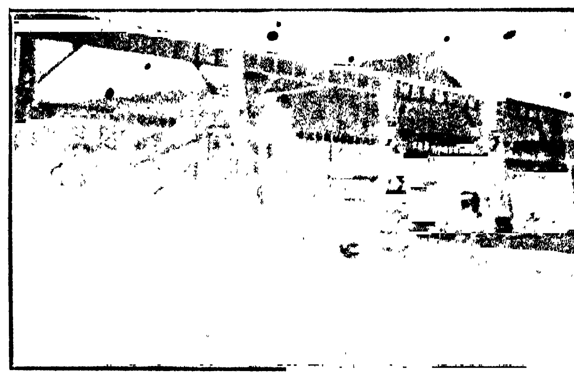
জি টাউন হইতে সরকারী সেতুর উপর বোম্বাই মেল (শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত



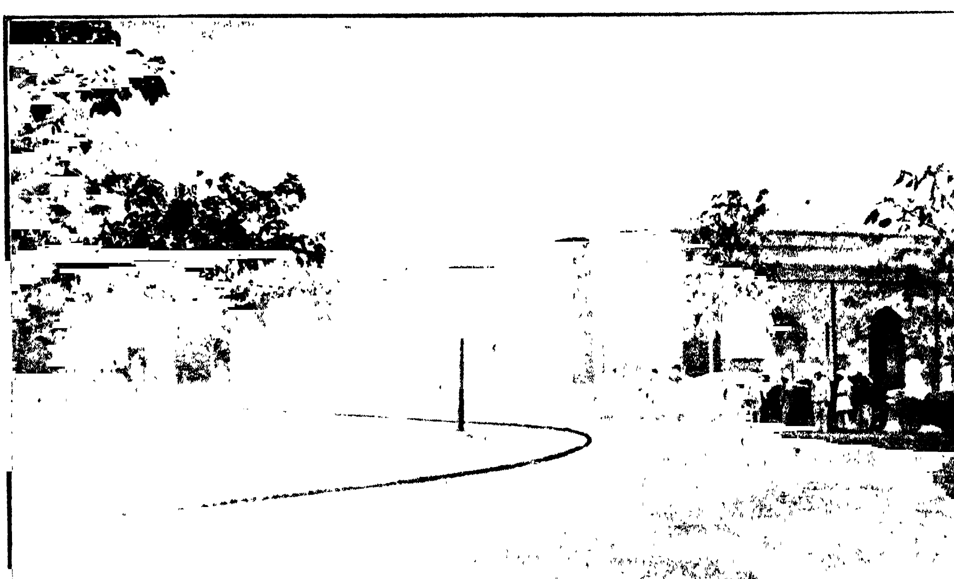
মিঃ ডি, এম, ম্যাডান এম-এ, এল-এল-বি
সেল্‌স ম্যানেজার



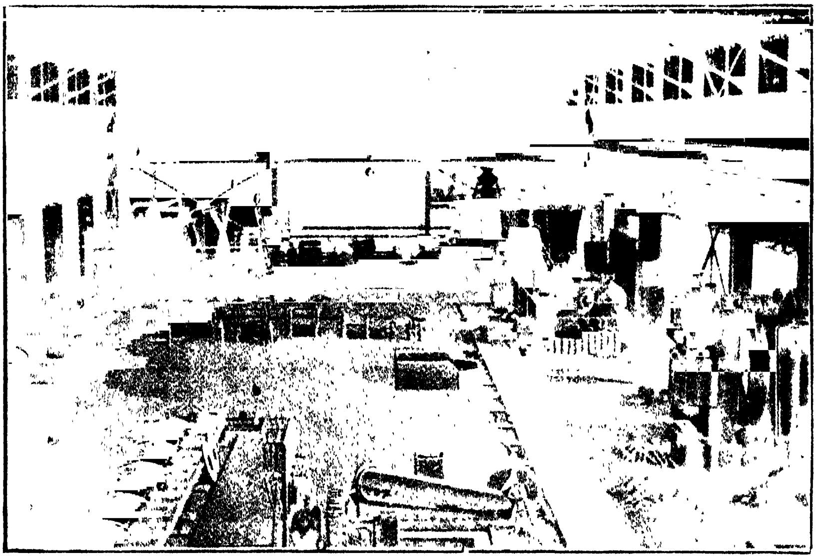
ইয়াডে দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখা (শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্র সংগৃহীত)



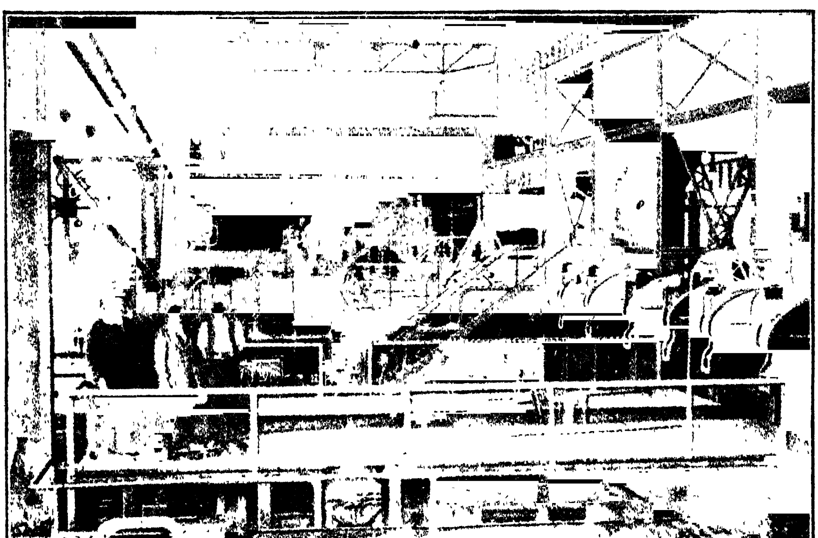
একটি ওভারহেড ক্রেন লাইন (শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্র সংগৃহীত)



ডাইরেক্টার্স বাংলা (কর এণ্ড কোং কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও গৃহীত)



বার মিল্‌স



রেল ও বাটীর গঠনের লৌহময় সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার কারখানা

(১)

"বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি" ও "খড়্গে খড়্গে, ভীম পরিচয়" "শত্রুর নিমন্ত্রণে" ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে যে কত শত-সহস্রবার হইয়া গিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; এবং সে সকল বর্ম্ম, খড়্গ, শাণিতাস্ত্র যে ভারতের লৌহে ভারতেই প্রস্তুত হইত, ইহাও নিঃসন্দেহ। ভারতের নানারূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান যেরূপ ধীরে-ধীরে স্বীয় ঔজ্জ্বল্য হারাইয়া,—আমাদের অবহেলার সুযোগে—"ঘন তমসাবৃত" হইতে আরম্ভ করিল, লৌহ-বিজ্ঞানও সেইরূপ আমাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ বুঝিয়া—আমাদের অজ্ঞাতসারে ধীরে-ধীরে ভূগর্ভে তাহার নিজ নিভৃত খনির আশ্রয় গ্রহণ করিল। বীরের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে সদাই যে উন্মুখ, দুর্ব্বলের কবলে থাকিবার অনিচ্ছা স্বতঃই তা'র স্বাভাবিক। অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ন্যায় লৌহ-বিজ্ঞানেও ভারত উন্নতির চরম

সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। বহু পুরাতন অস্ত্র-শস্ত্রাদির নির্ম্মাণ-কৌশল ও তাহাদের বিশ্লেষণ অতি সহজেই ধাতুবিদ্‌গণের বিস্ময় উৎপাদন করে। দিল্লীর তিন সহস্র বৎসরের পুরাতন লৌহ-স্তম্ভ তাহার অপূর্ব্ব, উজ্জ্বল উদাহরণ। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল এই বৈজ্ঞানিক যুগেও লৌহবিদ্‌গণের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মধ্যযুগেও ভারত এ বিষয়ে তাহার প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ দামাস্কাস্ ষ্টিল (Damascas steel)এর উপাদান ভারতই জোগাইয়াছিল; এবং শিখদের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত অতি উৎকৃষ্ট বর্ম্ম ও তরবারী এখানে প্রস্তুত হইত। ইহার পর হইতে লৌহ-বিজ্ঞানের সে উৎকর্ষ আর ছিল না। তবে ইহার অতি পুরাতন ও সূক্ষ্ম নিদর্শন স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। এবং সেদিনও যখন কর্ম্মবীর টাটার অদম্য উৎসাহ পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল উৎপাটিত করিয়া এখানে তাঁহার কারখানা বসাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখনও অরণ্য-মধ্যে আদিম অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক খনিজ লৌহ বা লৌহ-প্রস্তর হইতে অতি পুরাতন প্রথাবলম্বনে প্রস্তুত লৌহ-গালাইয়ের নিদর্শন দৃষ্ট হইয়াছিল এবং অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। টাটার একাগ্র সাধনায় তুষ্ট হইয়া লৌহ তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিল ও কবি-কথার সার্থকতা-কল্পে কহিল—

"অরণ্য কাটিয়া আমি নগর বসাই।"

কিন্তু এ আত্মপ্রকাশ সে একদিনে করে নাই। এ জন্য সাধককে দীর্ঘকাল ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইহা তাঁহার প্রচুর অর্থ-ব্যয় ও সারা জীবনের সাধনার ফল।

(২)

আধুনিক প্রণালীতে ভারতে লৌহ-প্রস্তুত-প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার প্রথম প্রয়াস পান মিঃ জোসেফ্ মার্শাল হিথ্ (Mr. Joseph Marshall Heath)। ইনি মাদ্রাজ প্রদেশের সিভিলিয়ান ও সুলেখক চার্লস্ ডিকেন্সের একজন বন্ধু ছিলেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট পরওয়ানা লইয়া ১৮৩০ খৃঃ মাদ্রাজ উপকূলের পোর্টোনোভা সহরে ইনি একটি লোহার কারখানা স্থাপন করেন। এতদুদ্দেশ্যে নানারূপ পরীক্ষা ও গৃহাদি নির্ম্মাণে তাঁহার প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রায় ছয় লক্ষ মুদ্রা ঋণ-দান করেন। তন্মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ মুদ্রা তিনি ঋণ-পরিশোধে নিয়োজিত করেন। সপ্তাহে মোট ৪০ টন সাধারণ লৌহ বা Pig Iron প্রস্তুতের উপযোগী কয়েকটী ফারণেস্ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই লৌহ হইতে লৌহদণ্ড (bar iron) প্রস্তুত করিয়া সুইডেনের লৌহের সহিত প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ডে রপ্তানি করিবার ইচ্ছা করেন। ক্রমে নানা বাধাবিপত্তি তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। বয়লারগুলি ফাটিতে আরম্ভ করিল। Blowing Engine গোজাতি কর্ত্তৃক চালিত হইতে লাগিল। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কারিগর, অর্থের অনাটন, বিভিন্ন প্রকার খনিজ লৌহ, এবং কয়লার অল্পতা ইহাদের সহিত যোগদান করিল। সে সময়ে লৌহ প্রস্তুত-কালে কাষ্ঠ-কয়লা ব্যবহৃত হইত। এবং মিঃ হিথের ফারণেস্‌গুলিতে এক টন লৌহ প্রস্তুত করিতে প্রায় ৪ টন কয়লা আবশ্যক হইত। আমেরিকান প্রথানুযায়ী এক টন লৌহ প্রস্তুত করিতে এক টন কাষ্ঠ-কয়লা আবশ্যক। টাটা কারখানায় প্রতি টন লৌহের জন্য কিঞ্চিদধিক এক টন কয়লা আবশ্যক হয়। ১৮৩৭ খৃঃ মিঃ হিথ্ পুনরায় গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণ প্রার্থনা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হন। নিরাশ, ভগ্ন-হৃদয়, কপর্দ্দকবিহীন দরিদ্র হিথ্ ১৮৫৩ খৃঃ কালের আহ্বানে প্রস্থান করেন ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া আয়রণ্ কোম্পানী নামক একটী সমবায় কোম্পানী তাঁহার ব্যবসায় চালাইবার জন্য অগ্রসর হন। অবশেষে ১৮৭৪ খৃঃ ব্যবসাটী একেবারে বন্ধ হয়।

বরাকর আয়রণ্ ওয়ার্কস কর্ত্তৃক ১৮৭৫ খৃঃ দ্বিতীয়বার লোহার কারখানা স্থাপনের চেষ্টা হয়। কিন্তু তাঁহারাও অকৃতকার্য্য হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই কারখানা বন্ধ করেন। ১৮৮১ খৃঃ গবর্ণমেণ্ট কারখানাটী চালাইতে আরম্ভ করেন ও ১৮৮৯ খৃঃ উহা বেঙ্গল আয়রণ্ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানীকে (Bengal Iron and Steel Co Ltd.) সমর্পণ করেন। এই কোম্পানী তদবধি নানারূপ পিগ্ আয়রণ্ প্রস্তুত করিতেছেন। ১৯০৫ খৃঃ ইঁহারা ইস্পাত প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু সে সময়ে বাজারে ষ্টিল-দ্রব্যাদির অধিক প্রচলন না থাকায়, এক প্রকার দ্রব্য অধিক দিন প্রস্তুত (Roll) করিবার সুবিধা হইত না। আবার ষ্টিলের

কারখানায় ঘন-ঘন ছাঁচ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রতি দ্রব্য অল্প পরিমাণে প্রস্তুত করায় লোকসান ভিন্ন লাভ নাই। যে দ্রব্যই হউক, যাহার জন্য ছাঁচ (Roll) একবার বসাইয়া (fix) লওয়া হয়, তাহা যত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয়, ততই লাভ ও সুবিধা। উদাহরণ স্বরূপ—তাঁহারা ১৮০টী অর্ডার পান। এই ১৮০টী অর্ডার ৭০ প্রকার বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য; কিন্তু দ্রব্যের পরিমাণ মোটের উপর এক হাজার টন, অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক দ্রব্যের অর্ডার ১৪ টনের জন্য। এত অল্প পরিমাণ দ্রব্যের জন্য নূতন-নূতন ছাঁচ ব্যবহার ও পরিবর্ত্তন (fixing and changing rolls) কারখানার পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই সকল অসুবিধার জন্য এক বৎসরের মধ্যেই ইস্পাত বিভাগের কার্য্য বন্ধ করা হয়। কিন্তু তথায় pot sleeper, cast iron pipes ইত্যাদি প্রস্তুত হইতে থাকে। গবর্ণমেন্টের সহিত বেঙ্গল আয়রণ্ এণ্ড ষ্টিল কোংর কার্য্যের আদান-প্রদান অল্প হইলেও, তাহা টাটা কোম্পানীকে কারখানা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কতকাংশে উৎসাহ দান করে, এবং টাটা কোম্পানী প্রকৃত পক্ষে গবর্ণমেন্টের নিকট নানা বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হন।

লৌহ প্রস্তুত বিষয়ে তৃতীয় উদ্যম ১৯০৭ খৃঃ টাটা কোম্পানী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহার কার্য্য সম্বন্ধে সকলেই কিছু-কিছু অবগত আছেন। (১) এই স্থানে প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর টাটার সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলা বিশেষ আবশ্যক।

(৩)

শ্রীযুক্ত জেম্‌সেদ্‌জী ন্যাসেরওয়ানজী টাটা ১৮৩০ খৃঃ বরদা রাজ্যের অন্তর্গত নাভ্‌সারি (২) নামক পল্লীতে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা পার্শি-সমাজের পুরোহিত-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন এবং নাভ্‌সারি পল্লীখানি আমাদের দেশের বা সমাজের ভট্টপল্লী বা নবদ্বীপের ন্যায় জোরোয়াস্ত্রীয় পণ্ডিত-প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এইরূপ সমাজের ও সাহচর্য্যের মধ্যে জেম্‌সেদ্‌জীর বাল্য জীবন গঠিত হওয়ায় তিনি ভবিষ্যতে অসাধারণ অধ্যবসায়ী ও অক্লান্তকর্ম্মী হইয়া উঠেন, এবং সাধনার পথে বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিক্ষা লাভ করেন।

১৩ বৎসর বয়সে তিনি বোম্বায়ের এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজে প্রবেশ করেন ও তথায় ছয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পিতা চীন দেশের সহিত ব্যবসায়-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। জেম্‌সেদ্‌জী প্রথমতঃ তাঁহার পিতার বোম্বাই আফিসে ও পরে হংকংএর আফিসে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে কিছু-কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হন। আফিমের ব্যবসায় তখন একটা বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় ছিল, এবং তিনিও তাহাই অবলম্বন করেন। ইহার পর তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে তুলার ব্যবসায় সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমনের পর ঐ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন; এবং দেশ-বিখ্যাত প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের সহিত ব্যবসায়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া লণ্ডনে একটা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। কিন্তু তখন ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সে সময়ে (১৮৬১-৬৫) পশ্চিম মহাদেশে ইতিহাস-বিশ্রুত War of Independence চলিতেছিল। এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব অতি-মাত্রায় অনুভূত হইতেছিল। এই সুযোগে তুলা-ব্যবসায়িগণ বিলক্ষণ ধনশালী হইয়া উঠিলেন। ১৮৬৫ খৃঃ যুদ্ধের অবসান-বার্ত্তা বজ্রপাতের ন্যায় তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহাদের মহা ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিল। মহাজন খাতকে ও খাতক মহাজনে পরিণত হইলেন। দরিদ্র—ধনী ও ধনী দরিদ্র হইয়া পড়িল। টাটা সর্ব্বস্বান্ত হইলেন।

টাটা তাঁহার ব্যবসায়ের পুনরায় উন্নতি সাধনের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছেন, এরূপ সময়ে ইংরেজের সহিত আবিসিনিয়া-রাজ থিওডোরের যুদ্ধ বাধিল। থিওডোর পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনায় আত্মহত্যা করিলেন। টাটা এই যুদ্ধে সেনাগণের রসদ সরবরাহের ভার প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট লাভ করেন। ইহার পর তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন; এবং ম্যাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারে বয়ন শিক্ষা ও নানা অভিজ্ঞতা লাভের পর স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ মনোযোগী হন। যে-কোন বৃহৎ ব্যাপারের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে যেরূপ নানা প্রকার বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিতে হয়, এ ক্ষেত্রেও তাঁহাকে সেইরূপ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে এই ব্যবসায় পরিশেষে বিশেষ

(১) "ভারতবর্ষ"—চৈত্র ১৩২৫ "টাটার কারখানা" ও ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় "জেম্‌সেদ্‌পুর"।

(২) টাটার বোম্বাই আফিস-গৃহের নাম "Navsari Buildings."

লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেন। ঐ দিন নাগপুরে টাটার প্রথম কাপড়ের কলের উদ্বোধন উপলক্ষে উহা Empress Mill নামে অভিহিত হয়।

ইহার পর হইতে তিনি নানারূপ নূতন-নূতন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং অনেকগুলি কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৮৫ খৃঃ তিনি তাঁহার জীবনের তিনটী মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করেন। জীবনের শেষ বিংশতি বৎসর এই বিষয় তিনটি

"—কেবল নীরব ভাবনা, কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা।"

—র বিষয় হইয়া তাঁহার চিত্তে বিরাজ করিতেছিল। প্রথমতঃ, ভারতের খনিজ উপাদান হইতে ভারতেই লৌহ প্রস্তুত; দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিমঘাট পর্ব্বতে বর্ষার বিপুল বারি সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ও তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার; এবং তৃতীয়তঃ, ভারতের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের নিভৃত ক্রোড়ে লুক্কায়িত শত-সহস্র প্রকারের রত্নরাজি সম্বন্ধে যথোচিত আলোচিত হইবার জন্য একটি আদর্শ বিজ্ঞান-মন্দির ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের প্রতিষ্ঠা।

লৌহ প্রস্তুত সম্বন্ধে টাটার প্রথম উদ্যম ওয়ারোরা কয়লা ও লোকারা প্রস্তর লইয়া। কিন্তু তথাকার কয়লা সুবিধাজনক বিবেচিত না হওয়ায়, ঐ উদ্যম ত্যাগ করা হয়। ১৮৯৯ খৃঃ লর্ড কার্জ্জন খনি সম্বন্ধীয় কতকগুলি নূতন ও সুবিধাজনক আইন প্রণয়ন করেন। ঐ বৎসর টাটা ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টনের (Lord George Hamilton—Secy. of State for India) নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ, ও গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য-প্রাপ্তির আশ্বাস, এবং ভারতে প্রত্যাগমনের পর, বান্দার খনি লইয়া কার্য্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৯০২খৃঃ অভিজ্ঞদিগের সহিত পরামর্শের জন্য তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। তথায় মিঃ জুলিয়ান্ কেনেডি, (Mr. Julian Kennedy) প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞগণের অভিমত গ্রহণ করেন এবং নিউ-ইয়র্কের বিখ্যাত খনি-অভিজ্ঞ (Mining Engineer) মিঃ সি, পি, পেরিনকে (Mr. C. P. Perin) পরামর্শদাতা (Consulting Engineer) নিযুক্ত করেন। তাঁহার সহকর্ম্মী মিঃ সি, এম্, ওয়েল্ড্ (Mr C. M. Weld) ইহার অত্যল্প কাল পরেই ভারতে আগমন করেন।

এই সময় হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সার দোরাব্ টাটা ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন। কারবার গঠিত হইবার পূর্ব্বে নানারূপ অভিজ্ঞের অভিমত, পরামর্শ ইত্যাদি গ্রহণ, ও আনুষঙ্গিক উপাদানাদির জন্য টাটা প্রায় ৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন। এই সকল অনুসন্ধানে দীর্ঘকাল কাটিয়া যায়। কোথাও হয় ত খনিজ লৌহ বা লৌহ-প্রস্তর প্রচুর; কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেল তাহা হইতে লৌহ নিষ্কাশন বহু-ব্যয়সাপেক্ষ; অথবা তাহা হইতে উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হওয়া হয় ত সুকঠিন। আবার কোথাও হয় ত উৎকৃষ্ট প্রস্তরের দর্শন পাওয়া গেল; কিন্তু নিকটে কয়লার অভাব সমস্যা জটিল করিয়া তুলিল। সুতরাং এরূপ স্থানের অনুসন্ধান আবশ্যক হইল, যে স্থানে বৃহদাকার ভারী কল-কব্জা বসাইবার জন্য বিশেষ দৃঢ় বা যথেষ্ট পরিমাণে অভ্র (mica) সংযুক্ত বহু-বিস্তৃত উচ্চভূমি, প্রবহমানা নদী, রেলপথ এবং অদূরে—খনিজ-লৌহ, কয়লা এবং আবশ্যক অপরাপর আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সহজ-লভ্য হয়। নানা স্থানের নানা অবস্থার বিষয় আলোচিত হইল ও একটা একটা করিয়া বহু কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল। মিঃ ওয়েল্ড্ মধ্যপ্রদেশের 'রাজারা' পাহাড়ের প্রস্তর বিশেষ কার্য্যোপযোগী বলিয়া স্থির করেন। এই প্রস্তর পৃথিবীর অন্যতম উৎকৃষ্ট লৌহ-প্রস্তর বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তাহা হইতে শতকরা ৬৬ ভাগ (66%) লৌহ পাওয়া যায়। অদূরে 'ধূল্লী' পাহাড়েও অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তরের সন্ধান পাওয়া যায়।

পরিশেষে মিঃ পেরিন্ ও মিঃ ওয়েল্ডের দৃষ্টি "সোনার বাংলার" দিকে আকৃষ্ট হয়; এবং যে দেশে অবশেষে এই বৃহৎ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়,

"সে আমাদের বাংলা দেশ—আমাদেরি বাংলা রে।"—

"বাংলার মাটী বাংলার জলে"—বাঙ্গালী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত লৌহ-প্রস্তরে কার্য্য আরম্ভ হয়। বঙ্গজননীর কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু [Mr. P. N. Bose B. Sc., (Lond). F. G. S., M. R. A. S.—Formerly Asst.,

Supdt., Geological Survey of India] (৩)—ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত গরুমহিষাণীতে উৎকৃষ্ট খনিজ-লৌহ আবিষ্কার করেন।

ধূল্লী ও রাজারা খনিও শ্রীযুক্ত বসু কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। ইনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূ-তত্ত্ববিদ্ নিযুক্ত হ'ন। তত্রত্য পরলোকগত মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেও টাটার এই কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করেন ও খনিজ দ্রব্যাদির পত্তনি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেন; এবং এই লৌহ-কারবারের প্রায় তিন লক্ষ মুদ্রার অংশ ক্রয় করেন।

১৯১০ খৃঃ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমতি লওয়া হয় এবং ক্রমশঃ নানাস্থানের লৌহখনি টাটা কোম্পানীর অধিকারে আসে এবং তাঁহাদের মধ্যপ্রদেশস্থ 'রামরামা' ম্যাঙ্গানিস্ খনি ইঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ঝরিয়া খনি-প্রদেশের কয়লা বিলাতে প্রেরিত হইয়া লৌহ-গালাই কার্য্যে সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। কাট্‌নীর নিকট 'জুকেহি'র অতি উৎকৃষ্ট চূণ-প্রস্তরের (Lime stone) ও 'পানপোসে'র ডলোমাইট্ (dolomite) প্রস্তর-আকরের অনুসন্ধান পাওয়া যায়।

য়ুরোপ ও আমেরিকার অভিজ্ঞগণের নানারূপ পরীক্ষার ফল ও অভিমত কোম্পানীর হস্তগত হইতে লাগিল এবং এই সকল অভিমতাদি অনুসারে পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী লৌহ-প্রস্তুত প্রাচ্যে সম্ভবপর কি না, তাহা আলোচিত হইতে লাগিল। এই সূত্রে বাঙ্গালোরে টাটার বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইল ও এ তদুদ্দেশ্যে টাটা ৩০ লক্ষ মুদ্রা দান করিলেন। মহীশূরের মহারাজা ও ভারত-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নানা বিষয়ে সাহায্য করেন ও ১৯১১ খৃঃ বিজ্ঞান-মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ হয়।

(৩) সে সময়ে ছোটনাগপুর বিভাগ বাংলার মধ্যে ছিল ও ভবিষ্যতেও সিংভূম ও মানভূম বাংলায় ফিরিয়া আসিতে পারে অনেকে এইরূপ অনুমান করেন।

শ্রীযুক্ত বসুর লোকান্তরিত পুত্র বারমিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের Metallurgy and Mining বিভাগের ছাত্র এবং Member of the Institute of Mining—অলোকনাথ বসু এখানকার গবর্ণমেণ্ট রসায়নাগারে নিযুক্ত ছিলেন। গত বৎসর তাঁহার অকাল মৃত্যুতে এখানকার সর্ব্বসাধারণ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন।

ব্যবসায় উপলক্ষে টাটা জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। নিজে ধনী হওয়া কোন দিনই তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল না। নানারূপ নূতন ব্যবসায়ের দ্বারা দেশের উন্নতি সাধনই আজীবন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কর্ম্মজীবনের সন্ধ্যা আসিয়া দেখা দিল; "অস্ত রবির রশ্মি"-রেখা কালের মহা আহ্বানে প্রস্থান করিলেন। ১৯০৪ খৃঃ ৬৫ বৎসর বয়সে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি চিকিৎসকগণের উপদেশ মত বায়ু-পরিবর্ত্তন উদ্দেশ্যে য়ুরোপ যাত্রা করেন এবং ঐ বৎসরের ১৯শে মে তারিখে জার্ম্মাণীর অন্তর্গত নহিম্ (Nauheim) নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন। কেবলমাত্র সার দোরাব্ ও শ্রীযুক্ত আর, ডি, টাটা তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মবীরের কর্ম্ম কখনও অসমাপ্ত থাকে না। পিতার উপযুক্ত পুত্রদ্বয় সার দোরাব্ টাটা ও পরলোকগত সার রতন টাটা, এবং তাঁহাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত আর, ডি, টাটা এবং জেম্‌সেদ্‌জীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বি, জে, পাদ্‌শা অদম্য উৎসাহ ও বিপুল অধ্যবসায় সহকারে কর্ম্মবীরের সমস্ত কার্য্য অতীব যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন।

(৪)

মহীশূর রাজ্যের ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ মিঃ চ্যাটারটন্ (Director of Industries Mysore,—Mr. Chatterton.) বলেন যে, যে উদ্দেশ্যে বাঙ্গালোরে টাটার বিজ্ঞান-মন্দির (The Tata Institute of Science, Bangalore) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য ধরিয়া বিচার করিলে, ইহার সম্পূর্ণ সফলতা ও বিপুল অর্থব্যয়ের সার্থকতা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা দেশের একটী অপূর্ব্ব গৌরবের সামগ্রী। ততোঽধিক আশ্চর্য্য তাঁহার দ্বিতীয় উদ্যম—টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কিম্—জগতের শিল্পচাতুর্য্যের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ। তথায় উপরে—

"গগনে ঘিরে, ঘন মেঘ ঘুরে-ফিরে"

যে বর্ষণের সৃষ্টি করে, সেই বর্ষণ-বারি পাহাড়ের উপত্যকায় সঞ্চিত হইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে বোম্বাইয়ের চতুর্দ্দশ বা ততোধিক কাপড়ের কারখানা চালিত

করিতেছে (৪)। তাঁহার প্রথম উদ্যম লৌহকারখানার উদ্ভব সম্বন্ধে, আর ২।১টী কথা বলিলে, সাধারণের নিকট তাহা আরও সুপরিস্ফুট হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কর্ম্মবীরের অন্য দু'একটী উদ্যমের আভাস দেওয়া এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

	মূলধন (টাকা)	স্থান	পরিচয়
টাটা হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক্ কোং লিঃ	দুই কোটী	থাপোলি	সমস্ত পৃথিবীর বিদ্যাদাগারের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেছে।
ইণ্ডিয়ান সিমেণ্ট কোং লিঃ	কুড়ি লক্ষ	পোরবন্দর	সিমেণ্ট প্রস্তুতের কারখানা
ইণ্ডিয়ান হোটেলস্ কোং লিঃ	ত্রিশ লক্ষ	বোম্বাই	তাজমহল হোটেল ও গ্রীনস্ রেস্তোরাঁ সুদৃশ্য ও অভিনব।
সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ	প্রায় এক কোটী	নাগপুর	এম্প্রেস্ মিল। কাপড়ের কল।
আমেদাবাদ এ্যাড্‌ভান্স মিলস্ লিঃ	দশ লক্ষ	আমেদাবাদ	কাপড়ের কারখানা।
স্বদেশী মিলস্ লিঃ	কুড়ি লক্ষ	বোম্বাই	ঐ
টাটা মিলস্ লিঃ	এক কোটী	ঐ	ঐ
ষ্ট্যাণ্ডার্ড মিলস্ লিঃ		ঐ	ঐ
ডেভিড্ মিলস্ লিঃ		ঐ	ঐ
ইত্যাদি—ইত্যাদি—			

সম্প্রতি তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারিগণ (টাটা সন্স এণ্ড কোং) আরও কয়েকটী ব্যবসার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যথা—

	মূলধন	স্থান	পরিচয়
টাটা অয়েল মিলস্ লিঃ		আরনাকুলম্ (ত্রিবাঙ্কুর)	নারিকেল হইতে প্রস্তুত তৈলাদির কারখানা (প্রস্তুত হইতেছে)
অন্ধ্র ভ্যালি পাওয়ার সাপ্লাই কোং লিঃ			অনেকাংশে হাইড্রো ইলেকট্রিকের ন্যায় (প্রস্তুত হইতেছে)
টাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ব্যাঙ্ক লিঃ	১২ কোটী	বোম্বাই ও শাখা নানাস্থানে	ব্যাঙ্ক
টাটা ইনসিওরেন্স কোং লিঃ	২০ কোটী	ঐ	বীমা কারবার (শীঘ্রই খুলিবে)

এ সকল ছাড়া তাঁহাদের আরও অনেক ব্যবসায় আছে। জাহাজ প্রস্তুত প্রভৃতি ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব আরও কারবার প্রতিষ্ঠা হইবার সঙ্কল্প আছে।

লৌহ প্রস্তুত সম্বন্ধে চতুর্থ উদ্যমের অনুষ্ঠান হইতেছে মহীশূরে। সম্প্রতি তথায় The Mysore Iron Work's নামে একটী লৌহ-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; এবং মহীশূর রাজ্য কাষ্ঠ কয়লা সাহায্যে লৌহ প্রস্তুত করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছেন। মিঃ পেরিন তথাকারও Consulting Engineer নিযুক্ত হইয়াছেন; এবং টাটা কোম্পানীর অধ্যক্ষতায় মহীশূর লৌহ-কারখানার কার্য্য চলিতে থাকিবে। রাজ্যমধ্যস্থ কাডুর ও সিমোগোর বিস্তৃত অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়া বেঙ্কিপুরে কয়লা প্রস্তুত হইবে। তথাকার লৌহ-খনি কারখানা হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। উক্ত কারখানায় লৌহ (Charcoal Iron) ও Acetate of Lime, Calcium Carbide, Alcohol, ইত্যাদি নানা রূপ Bye-product ও প্রস্তুত হইবে। লৌহ-প্রস্তুতের পঞ্চম প্রস্তাব পরীক্ষিত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতেছে—

(৪) Tata Hydro-Electric Power Supply Co Ltd.—ইহা জগতের অন্যতম বৃহৎ বিদ্যুতাগার। এ সম্বন্ধে "টাটার কারখানা" শীর্ষক প্রবন্ধে আভাস দিয়াছি—পূর্ণ পরিচয় শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর সরকার A. M. S. T. (Manchester) এর উক্ত বিষয় সম্বন্ধীয় "ভারতবর্ষে" সম্প্রতি প্রকাশিত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পশ্চিম পথের—বর্দ্ধমান জেলার আসানসোলে। Burn Co.র অধ্যক্ষতার ইহার কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এই সমবায়ের নাম The Indian Iron and Steel Co. Ltd.,

(৫)

এখন পুনরায় টাটার কারখানার আর একটু আলোচনা করা যাউক। লৌহ প্রস্তুতকালে টাটার পক্ষ হইতে মিঃ পেরিন ভারতবর্ষীয় রেল-কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট টাটা কর্ত্তৃক রেল সরবরাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই এক-বাক্যে উত্তর দেন যে "ভারতে রেল প্রস্তুত অসম্ভব"। এ কথা বেশীদিন টিকিল না। ভারতবর্ষের আবশ্যক সমস্ত রেল কয়েক বৎসর হইতে টাটাই সরবরাহ করিয়াছেন। এমন কি ভারতবর্ষের বাহিরেও নানা স্থানে টাটার রেল কিরূপ ভাবে চারিদিক রক্ষা করিয়াছে, তাহাও বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। সে দিন রাজ-প্রতিনিধি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড বাহাদুর জেমসেদ্‌পুরে টাটার এই লৌহ কারখানা দেখিতে আসিয়া(৫) বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "I can hardly imagine what we should have done during these four years of this war, if the Tata Company had not been able to give us steel rails, which have been provided for us, not only for Mesopotamia, but for Egypt, Palestine, and East Africa." (৬)

টাটার কারখানা-সংক্রান্ত অনুসন্ধানাদির পূর্ব্বে ভারতে খনি সম্বন্ধে অতি সামান্যমাত্র আভাস পাওয়া যাইত। এ বিষয়ে লর্ড কার্জ্জন, লর্ড জর্জ্জ হ্যামিলটন, সার জন হিউয়েট্, সার টমাস হল্যাণ্ড ও মিঃ হারভে নানা প্রকারে উৎসাহদান ও সাহায্য করেন। তন্মধ্যে সার টমাস হল্যাণ্ড একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁহার নিকটে টাটার এই বিরাট ব্যাপারের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয় এবং তিনিও আমেরিকান অভিজ্ঞগণের মতানুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

১৯০৭ খৃঃ এই লৌহ-কারবারের জন্য ২ কোটী ৩১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা মূলধন লইয়া Tata Iron and Steel Co. Ltd. গঠিত হয়। এই মূলধন বৃদ্ধি করিয়া পরে ৩ কোটী, ৫২ লক্ষ, ১২ হাজার, ৫ শত টাকা করা হয়। নূতন কারখানার (Greater Extensions) জন্য ইহার সহিত আরও ৭ কোটী মুদ্রা যোগ করায় কোম্পানীর উপস্থিত মূলধন প্রায় সাড়ে দশ কোটী টাকা। গত তিন বৎসরের মধ্যে প্রথম বৎসরের মোট লাভ প্রায় ৮২ লক্ষ, দ্বিতীয় বৎসরের প্রায় ১ কোটী ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ও তৃতীয় বৎসরের প্রায় ১ কোটী ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হইয়াছে।

বেঙ্গল নাগপুর রেলের সিনি জংসনের নিকট প্রথমতঃ কারখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা যায়, জলের বন্দোবস্ত করা এখানে বিপুল ব্যয়-সাপেক্ষ। এজন্য ইহা অপেক্ষা সুবিধাজনক স্থানের জন্য পুনরায় অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ প্রকৃতি সাক্‌চীকে তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া টাটার নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। দক্ষিণে রেলপথ, পশ্চিমে ও উত্তরে খরস্রোতা খরকায়ী ও রজতধারা সুবর্ণরেখা, "পূর্ব্বে দিগন্ত-বিস্তৃত অসমতল মাঠ ও পাহাড়," মধ্যে বহুদূর-বিস্তৃত পাহাড় ও জঙ্গলময় উচ্চ ভূমি; এবং অদূরে গরু-মহিষাণীর লৌহ, ঝরিয়ার কয়লা, ও অন্যান্য নানা স্থানের খনিজ দ্রব্য-সম্ভার ও কলিকাতার বন্দর।

সেই বিজন অরণ্য-প্রদেশে ক্ষুদ্র সাঁওতালী গ্রাম 'সাঁকচী'র নামানুসারে কারখানা-পল্লীর নামকরণ হয় 'সাক্‌চী'। যাঁহারা দশ বৎসর পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তখনকার অবস্থা শ্রবণ করিয়া এখনকার সহিত তুলনা করিলে যাদুমন্ত্রের প্রভাব সত্য বলিয়া মনে হয়। তাই সেদিন লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড বাহাদুর বলিয়াছিলেন "It is hard to imagine that ten years ago this place was scrub and jungle and here we have now set up with all its foundries and its work-shops, and its population of forty to fifty thousand men..." (বলা বাহুল্য, লোক-সংখ্যা এখন দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিতেছে।) সাধকের একাগ্রতায় প্রকৃতির অপরূপ দান সেই পাহাড় ও জঙ্গলময় সাক্‌চী আজ "জেম্‌সেদ্‌পুর।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাক্‌চী বা নূতন সহর জেম্‌সেদ্‌পুর—

(৫) লর্ড ক্রু ও তাঁহার ভারত আগমনকালে এই কারখানা দেখিয়া গিয়াছেন।

(৬) লেখক কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ জেম্‌সেদ্‌পুরে রাজ-প্রতিনিধি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড বাহাদুরের বক্তৃতা হইতে।

পুরাতন পল্লী সাঁকচী নহে—ইহা তদানীন্তন বিষ্ণুপুর ; এবং এখনও জেম্‌সেদ্‌পুরের পল্লীবিশেষ বিষ্ণুপুর নামে পরিচিত। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পল্লী 'সাঁকচী' প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত।

এখানকার আদিম অধিবাসিগণের চন্দ্রবিন্দু (ঁ)র উপর অসীম অনুগ্রহ। কিন্তু আধুনিক বা নবাগতগণ সে পথের পথিক না হওয়ায় তাহাদের 'সাঁকচী' ক্রমে 'সাকচী' হইয়া পড়িল। কিন্তু এই 'সাকচী'র পাশে আদিমবাসিগণের দ্বারা অধ্যুসিত অন্ধকারে-ঢাকা বনপ্রদেশে বাংলা নাম 'বিষ্ণুপুরের' আবির্ভাব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ হয় ত কিছু বলিতে পারেন,—বর্ত্তমান লেখক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম। তবে এদিকের অফুরন্ত পাহাড়শ্রেণীর মাঝে মাঝে কোন সমতলভূমির আকার-প্রকার দর্শনে কখন-কখনও হঠাৎ মনে খট্‌কা লাগে যে, হয় ত এককালে এ সকল স্থান গৌরবমণ্ডিত ছিল। চক্রধরপুর হইতে 'চাঁইবাসার' পাহাড়-শ্রেণী-আবদ্ধ নির্জ্জন পথের ২।১ স্থানে লেখকের কখন-কখনও এরূপ মনে হইত। কিন্তু সে যে প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধীয় ২।১টী প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর, স্থানবিশেষে অকস্মাৎ তাহা স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায়, মনের একটা বাতিক বা ভুল নহে,—অথবা বল্মীকমাত্রেই বাল্মীকির অধিষ্ঠান বা উই-ঢিপির অভ্যন্তরে প্রাচীন দুর্গের অবস্থানের অনুরূপ নহে, এ কথাও লেখক বলিতে অপারগ। সুবর্ণরেখার উৎপত্তি-স্থানের অদূরে অবস্থিত 'ঢুণ্ডু-প্রপাত'এর সহিত পৌরাণিকী কিছুর কি কোন সম্বন্ধ পাতাইয়া দেওয়া যায় না? সেইরূপ 'চাঁইবাসার', নিকটবর্ত্তী আর দুইটী প্রপাত—'টণ্ট' ও 'লুপুংগুটু'। সিংভূম জেলায় পুরাতন কীর্ত্তি থাকা অসম্ভব নহে—'জয়ন্তীগড়' ইত্যাদি হইতে তাহা সুস্পষ্ট এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সম্বলপুরের অসংখ্য পুরাতন কীর্ত্তি তাহার প্রমাণ।

(৬)

যাক্, সেই 'সাকচীর' বা জেম্‌সেদ্‌পুরের লৌহ-কারখানা আজ ব্যবসায়-ক্ষেত্রে 'বিপুল-বিশ্বের' বৃহৎ-বৃহৎ বিখ্যাত লৌহ-কারখানার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান। গবর্ণমেণ্ট নানা বিষয়ে কোম্পানীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন; বেঙ্গল নাগপুর রেল কোম্পানী অল্প মাশুলে দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং রেলওয়ে বোর্ড কোম্পানীকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে রেলের অর্ডার পাঠাইলেন। ব্যবস্থা এইরূপ হইল যে, ঐ সকল রেল সর্ব্বাংশে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত প্রণালী (Govt. specification) অনুযায়ী হইবে ও বিদেশ হইতে আমদানী রেল ভারতে পৌঁছিবার পর যেরূপ মূল্য স্থির হইত, সেইরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। তাঁহাদের সহায়তায় সত্বরই কালিমাটী—গুরু-মহিষানী রেল লাইন খুলিয়া গেল।

অদূরে 'দলমা' পাহাড়ের উপর গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক একটী স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপনের প্রস্তাব হইয়া রহিয়াছে। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে সাধারণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। দার্জ্জিলিং বা সিমলায় যাতায়াত বহুব্যয়সাপেক্ষ। 'দলমা' কলিকাতা হইতে অল্প দূরে অবস্থিত; এবং সাধারণতঃ স্থানটী ঠাণ্ডা হওয়ায় গ্রীষ্মকালে বেশ তৃপ্তিকর হইবে। নিকটে কয়েকটী স্বাস্থ্য-নিবাসের অবস্থান, এবং বিশেষতঃ এই 'দলমা' পাহাড়ের স্বাস্থ্য-নিবাসের প্রস্তাব হইতে জেম্‌সেদ্‌পুর যে একটী স্বাস্থ্যকর স্থান, তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রথমতঃ দুটী ব্লাষ্ট ফারণেস্ (Blast furnaces); ৪টী ষ্টীল ফারণেস্ (steel furnaces) একটী ব্লুমিং মিল (blooming mill) একটী রেল বা ষ্ট্রাক্‌চারাল মিল (Rail and structural mill); দুটী বার্ মিল (Bar mills); ও ১৮০টী সাধারণ কোক্‌ওভেনস্ (coppee non-recovery coke ovens) লইয়া কারখানা স্থাপিত হয়। তখন ইহা হইতে দৈনিক প্রায় ২০০ টন ষ্টিল পাওয়া যাইত। এখন প্রায় ৫০০ টন পাওয়া যায় ও ভবিষ্যতে ইহার প্রায় ৪গুণ প্রস্তুত হইতে পারে। সেইরূপ, প্রথম অবস্থায় দৈনিক ১৭৫ সাধারণ লৌহ (pig iron) পাওয়া যাইত। অধুনা প্রায় ৬০০ টন পাওয়া যায় ও ভবিষ্যতে প্রায় ২৭০০ টন লৌহ পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

ষ্টাটিস্‌টিক্যাল্ রিপোর্ট (Statistical Report) হইতে জানা যায় যে, ১৯০৬ খৃঃ পৃথিবীর উৎপন্ন লৌহের (pig iron) মধ্যে ভারত-প্রদত্ত লৌহ দু'হাজার ভাগের একভাগ মাত্র (১/২০০০) ও ষ্টীল সম্বন্ধে ভারত সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী। ইহার পূর্ব্বে লৌহের এরূপ ক্ষুদ্র একটা আভাসও পাওয়া যাইত না। ক্রমশঃ নানারূপ কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ও রেল-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে টাটা লৌহের

পথও সুগম হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রচুর খনিজ দ্রব্যাদির সুবিধা, ও শ্রমজীবির সংখ্যা যথেষ্ট থাকিলেও, ষ্টীল প্রস্তুত-বিষয়ে পূর্ব্বে ব্যবসায়িগণ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বা ব্যবসায়ের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও তাঁহাদিগকে ভাবিতে হইয়াছিল। "ভারতের জলবায়ুতে আধুনিক প্রণালীতে লৌহ প্রস্তুত, সম্পূর্ণ অশিক্ষিত শ্রমজীবিকুল, বাহির হইতে সুদক্ষ কারিগর আনয়ন করিবার অত্যধিক ব্যয় ও উচ্চ হারে বেতন; ও পরিশেষে—ভারতে রেল প্রস্তুত হইতে পারে না" ইত্যাদি অভিমত তাঁহাদের প্রতিকূলতাই করিতেছিল।

১৯০৮ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে 'সাকচী' গ্রামের সন্নিকটে শিবির সন্নিবেশিত হয়। সহস্র-সহস্র গো ও মহিষের গাড়ী দ্রব্যাদি লইয়া আসিতে লাগিল; জঙ্গল-কাটা ও পাহাড়-ভাঙ্গা আরম্ভ হইল; বন্যজন্তুগণ বেগতিক দেখিয়া 'চম্পট' দিল—বা কেহ বা 'দেহরক্ষা' করিল। প্রকৃতির জঙ্গল ও পাহাড় ক্রমে কোম্পানীর লোহা-লক্কড়, ইট, পাথর, চুণ, সুরকী, ইত্যাদির পাহাড়ে পরিণত হইল এবং দ্রুতগতিতে কার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল। সুবর্ণরেখা হইতে জল সরবরাহের অস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল; এবং ঐ বৎসরের শেষ-ভাগে বাসোপযোগী অনেকগুলি গৃহ নির্ম্মিত হইল। কালিমাটি (বর্ত্তমান টাটা-নগর) ষ্টেসন হইতে কারখানা পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা ও রেলপথ প্রস্তুত হইল এবং কালিমাটীর ক্ষুদ্র ষ্টেসন-গৃহ অদৃশ্য হইয়া বর্ত্তমান ষ্টেসন নির্ম্মিত হইল।

১৯১০ খৃঃ জলের কল এবং অন্যান্য গৃহাদি নির্ম্মিত হইল। নানারূপ কলকব্জা আসিতে লাগিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আরব্ধ কোক্ওভেন্সে (coke ovens)—১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর প্রথম অগ্নি প্রজ্জ্বালিত হইল। তদবধি এই অগ্নি অনির্ব্বাপিত নির্ব্বিকার ভাবে 'রাবণের চিতার ন্যায়' অবিশ্রাম জ্বলিতেছে।

ইহার অল্পদিন পরে অর্থাৎ ২রা নভেম্বর তারিখে প্রথম ব্লাষ্ট ফারণেসে লৌহ প্রস্তুত আরম্ভ হয়, এবং দ্বিতীয় ব্লাষ্ট ফারণেসে ঐ কার্য্য আরম্ভ হয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ষ্টিল্ ওয়ার্কসে ইস্পাত প্রস্তুত-কার্য্য আরম্ভ হয় ও ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এই কারখানায় প্রস্তুত প্রথম লৌহখণ্ড (ingot) ব্লুমিং মিলে রোল (Roll) করা হয় ও মার্চ্চ মাসে প্রথম রেল প্রস্তুত হয়।

অক্টোবর মাসে বার্ মিলে (Bar mills) মোটা পাত (flats), চতুষ্কোণ লৌহ (squares) ও গরাদে (rounds) ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

কারখানা-নির্ম্মাণ কার্য্যে চারি সহস্র ভারতবাসী নিযুক্ত হইয়াছিল। একটী-একটী করিয়া বিভাগের পর বিভাগ খুলিতে লাগিল; এবং আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রাচ্যে লৌহ প্রস্তুত হইতে লাগিল। (১)

প্রথম অবস্থায়—অনেক কারখানা ভাঙ্গিয়া "নূতন করিয়া গড়িতে" হইল। ইস্পাতের পরিমাণ অতি অল্প হইতে লাগিল; এবং জার্ম্মাণ কারিগরগণের স্থানান্তর উপলক্ষে কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। ভারতীয় কারিগরগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং য়ুরোপীয় বা আমেরিকান কারিগর-সংখ্যা হ্রাস করা সহজসাধ্য হইয়া আসিল। বার মিল—পূর্ব্বে এইরূপ ২৭ জন কারিগরের স্থানে উপস্থিত ২৫ জন ভারতীয় ও দুইজন বিদেশী কারিগর কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। অন্যান্য অনেক বিভাগে ভারতীয়গণ এই ভাবে কাজ চালাইতেছেন। রসায়নাগারে পূর্ব্বে ৫ জন য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ কার্য্য চালাইতেন,—অধুনা প্রধান ও সহকারী রাসায়নিক ব্যতীত প্রায় ২৫ জন ভারতবাসী—অধিকাংশ বাঙ্গালী—এই কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

১৮০টী কোক্ ওভেন্স্ যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায়, ১৯১৪ খৃঃ ৫০টী বাই-প্রডাক্ট ওভেন্স্ (kopper's bye-product ovens) এর জন্য অর্ডার পাঠান হয় ও ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সেগুলি কার্য্য আরম্ভ করে। উপস্থিত এই সমস্ত ওভেন্সের কার্য্য-পরিচালন-ভার বাই-প্রডাক্ট সুপারিন্-টেন্ডেণ্ট (Bye Product Supdt.) এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

সিলিকা ও ম্যাগ্নেসাইট্ (Silica and Magnesite) ইষ্টক পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আনীত হইত। অধুনা ইহা এ দেশেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোম্পানী শীঘ্রই এইরূপ ইষ্টক জেম্‌সেদ্‌পুরের সন্নিকটে প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

(১) এই প্রসঙ্গে Mr Rankin (কারখানার প্রথম Engineer) এর উত্তম ও কার্য্য-তৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখানকার এইরূপ ইষ্টকের দৈনিক খরচ প্রায় ৪০,০০০। লৌহ-গাদ (Slag) ও চূণ-সংযোগে এক প্রকার সুদৃশ্য শ্বেত ইষ্টক প্রস্তুত হয়। তাহাকে Slag-brick বলা হয়। ইহা রৌদ্রে শুকাইয়া ব্যবহৃত হয় ও পোড়া ইট অপেক্ষা অধিক মজবুত। জেম্‌সেদ্‌পুরের সাহেবদিগের চার্চ বা গির্জ্জা এই ইষ্টকে প্রস্তুত।

এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ সাধারণতঃ বিলাতের স্কিনিনগ্রোভ (Skinningrove) বা ফর্ডিংহাম্ (Fordingham) লৌহ-কারখানার অনুরূপ (৮)

জেম্‌সেদ্‌পুরে একটী বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়া আছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কোম্পানীর বার্ষিক অধিবেশনে সার দোরাব টাটার কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিলে তাহা সুস্পষ্ট হইবে—

"We also contemplate to erect at Sakchi a Research Laboratory for metallurgy and chemistry, and your directors are considering whether they should not approach the Industrial Commission and the Government of India with a view to Making this Laboratory a Central National Laboratory in that part of India."

সে দিন বিলাতে টাটা-কারখানা সংক্রান্ত বক্তৃতা-প্রসঙ্গে লৌহবিদ্ Mr. H. M. Surtees Tuckwell, M. I. Mech. E. বলেন—

"Although we devoutly hope that in our life time we may not be again confronted with the imminence of war, the potential value of this great steel works must not be lost sight of, for an equipment which in times of peace will supply forgings and castings for ships, locomotives, or other industrial purposes, could, if the need arose, produce guns, shells, explosives, and all the essentials of war-fare, by the utilisation of the resources of the country, both material and personal. The value to the Empire of such an arsenal will, I think, be readily admitted, and, should passage through the Suez canal be cut off, would prove of great value in securing defensive equipments in the East.

"এই যে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী এখানে নিযুক্ত রহিয়াছে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরও অনেক সহায়তা হইতেছে। দুর্ভিক্ষাদির সময় এই সকল শ্রমজীবীকে 'রিলিফ্' কার্য্যে নিযুক্ত করিবার কোন আবশ্যকতা নাই; অথচ তাহারা এখানে স্বচ্ছন্দে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী গবর্ণমেণ্টকে সাড়ে উনিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করিয়াছেন।"(৯)

(৮) পূর্ব্ব প্রবন্ধে—যে সকল Subsidiary Firms খুলিবার ব্যবস্থা আছে বলা হইয়াছে—তাহা ছাড়া রেলওয়ে ওয়াগন, টিন্‌প্লেট প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিবার সম্ভাবনা আছে। টাটার অন্যান্য বাই-প্রডাক্টের মধ্যে ন্যাপ্‌থালিনও পাওয়া যাইতে পারে।

(৯) কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতে বোম্বায়ের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড ল্যামিংটনের (Lord Lamington) সভাপতিত্বে একটী সভায় টাটা কারখানা সম্বন্ধে আলোচনা হয়; ও Mr. H. M. Surtees Tuckwell এ বিষয়ে একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের অনেক তথ্য তাঁহার বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত। লর্ড ল্যামিংটন্ এ বিষয়ে বলেন—"a monumental record of achievement usually associated in this country with blackness and dirt, but in the present case almost transformed into a fairy tale or a romance under the Indian skies.........."

Mr. Alan A. Campbell Swinton, F. R. S. ঐ সভায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—"......Anyone who had had to do with industries of any description could only admire the way in which the problem of the Tata Works in India had been solved by Messrs. Tata: it was a most wonderful performance that such large works should have been established practically in the jungle ......"

Sir H. M. Bhawnaggree K. C. I. E. বলেন—তাঁহার মতে Mr. Tata did not obtain during his lifetime that recognition which was his due...But today the seeds he had sown were giving a developing crop year

তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রতিভা-বলে আজ ভারতের দীর্ঘ কালের সুপ্ত সম্বিৎ জগৎ-সমক্ষে আত্ম-প্রকাশ করিয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের শত সহস্র কর্ম্ম আজ দেশবাসীকে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার পথ প্রদর্শন করিতেছে। দেশের মহান্ গৌরব, দেশবাসীর প্রকৃত বন্ধু, সমাজের পরম

by year, and people were beginning to realise what a great thing he had done for India Personally he had a great reverence and admiration for those who conferred benefits on India, and he did not hesitate to say that Mr. Tata was perhaps the greatest benefactor of India and her people. He had introduced into the country an institution which would be far-reaching in its effects and of the greatest importance.

সভায় আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল।

হিতৈষী সেই দানবীর, কর্ম্মবীর মহাপুরুষ জেম্‌সেদ্‌জীর নাম ধারণ করিয়া তাঁহার 'সাকৃচী' আজ ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রের তীর্থ-ক্ষেত্র-রূপে সগৌরবে "জেম্‌সেদ্‌পুর" নামে অভিহিত হইয়া তাঁহার অতুল কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে ও দেশ দেশান্তরের দর্শকগণ তাঁহার কীর্ত্তি দর্শনের জন্য 'জেম্‌সেদপুরে' ছুটিয়া আসিতেছেন। কর্ম্ম-জীবনের অন্ত-সন্ধ্যার পর 'কর্ম্ম-সাগরের' পর-পার হ'তে আজ প্রতিধ্বনি বলিতেছে—

"কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি"—

তাঁহার নানা কীর্ত্তির অন্যতম কীর্ত্তি আমাদের দেশের এই "জেম্‌সেদ্‌পুর।" *

* জেম্‌সেদ্‌পুর—'সাকচী ড্রামাটিক্ ক্লাব ও সাহিত্য-সভা'র বিশেষ অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত (Prof B. C. Gupta I. E. S—C E College, Sibpur) মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত

হাজিরা

[প্রসাদ]

সম্মুখে আঁধার ঘন, সবে সন্ধ্যা পড়ে' সারা রাতি,
সম্মুখে ভীষণ বন, দুর্গম—দুর্গম পথ অতি।
এ পথে চলিতে হবে, হে যাত্রি, হাজির ?
দূর হ'তে বলে যাত্রি—"হাজির, হাজির।"

এক, দুই, তিন, চার, দশ, বিশ, একশ', হাজার,
অযুত, নিযুত, কোটি—বাকী কে রহিল তবে আর ?
"সকলেই বাকী গুরু,—একমাত্র আমি ;
এখনও পথে তা'রা ঘুরিতেছে স্বামি!"

এক তুমি দুই তুমি, দশ-বিশ-একশ'-হাজার,
লক্ষ তুমি, কোটি তুমি,—বাকী কে রহিল তবে আর ?
এবারে চলিতে হবে, হে যাত্রি, হাজির ?
"পদতলে নত-শির হাজির হাজির।"

একা তোমা যেতে হবে এ অরণ্যে সোজা পথ দিয়ে,
যেতে হবে অন্ধকারে আলোকের সুর বেঁধে নিয়ে।
সম্মুখে রাখিবে দৃষ্টি ফিরিবে না আর,
পশ্চাৎ পশ্চাতে রবে, পথ ক্ষুরধার।

স্থিতি তুমি, গতি তুমি, বুদ্ধি তুমি, রতি তুমি, প্রাণ,
এ অরণ্যে এক তুমি, দাতা তুমি, দেয় তুমি, দান,
নদী তুমি, স্রোত তুমি, পার তুমি, তীর,
পান্থ তুমি, পথ তুমি।—কোথা তুমি, ধীর!

* * * * *

এস প্রিয়, এস সখা, রম্য কুঞ্জে বিপুল আলোকে,
হে আনন্দ-ঘন-মূর্ত্তি, বক্ষে আজ বাঁধিব তোমাকে।
দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ মোর গণ্ডে বহে ধারা,
দেখিতে না পাই, হেথা আসিতেছে কা'রা ?

"কই 'কা'রা' ? কোথা 'কা'রা' ? পদপ্রান্তে দেখ তুমি স্বামি
আঁধারের বন ভেঙ্গে একমাত্র আসিয়াছি আমি।"
এক নও,—পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, বীর,
কোটি কণ্ঠে কা'রা বলে "হাজির, হাজির।"

ইমান্‌দার

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শালুর পাগড়ী মাথায় জড়াইয়া,—লাঠি-ঘাড়ে, অপ্রসন্ন, চিন্তাকুলমুখে, সর্দ্দার নাগরা-পায়ে মস্‌-মস্‌ করিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেন। তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একবার সকলের মুখপানে চাহিয়া,—শেষে, নতশিরে উপবিষ্ট পুত্রের দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, "এখানে বসে গজল্লা কর্‌ছিস্‌,—বাড়ী যেতে হবে না ?"

"যাচ্ছি—" বলিয়া ফৈজু বর্শা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ;—সুনীলের দিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি দুপুর-বেলা আপনার কাছে আসব ছোটবাবু।"

সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধিৎসু-দৃষ্টিতে পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, "কেন ? কি দরকার ?"

দরকার-টা যে কি, তাহা সুনীল ও সুমতি দেবীর বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু উগ্র, কোপনস্বভাব সর্দ্দারকে সুনীল একটু বেশীরকম সমীহ করিয়া চলিত ; বিশেষতঃ, তাঁহার শাসনের নির্দ্দয় উৎপীড়ন হইতে ফৈজুকে রক্ষা করিবার জন্য সুনীলের সতর্কতাও বড় বেশী ছিল। পিতার প্রশ্নে ফৈজুকে কুণ্ঠিত, নিরুত্তর দেখিয়া, সুনীল তাড়াতাড়ি বলিল, "ফৈজুর দরকার নয়,—আমারই দরকার। আমাদের কল্‌কাতা যেতে হবে তো,—তাই খরচের হিসেবগুলো তৈরী করে মিত্তির-মশাইকে দেখাতে হবে।"

পুত্রের দিকে একবার চাহিয়া, ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, বৃদ্ধ বলিলেন—"ওকে আর কল্‌কাতায় যেতে দেব না বাচ্চা, এবার তুমি একলা যাও। তোমার তো বাবা এবার সেখানে চেনা-শুনা বন্ধুলোক অনেক জুটেছে,—এখন সেখানে একলা থাক্‌তে ভয় কি ?"

ফৈজু চলিয়া যাইতেছিল,—পিতার কথা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া, নিকটস্থ দেওয়ালের গা খুঁটিতে লাগিল।—অভিপ্রায়, অতঃপর আর কি কথা হয় শুনিয়া যাইবে।

সুনীল ইতস্ততঃ করিয়া সংক্ষেপে বলিল, "ভয় আর কি ?"

সুমতি দেবী ধীর ভাবে বলিলেন, "তাতো বটেই! ব্যাটা-ছেলে দেশ বিদেশ বেড়াবে,—ও আর ভয়ের কথা কি ? তোর মত হাজার-হাজার ছেলে দেশ ছেড়ে সেখানে বাস করছে। তবে সাবধানে থেকো, নিজের কায করিও না,—অসুখ বিসুখ যাতে না হয় সেই চেষ্টা করো, আর বদ্‌সঙ্গে মিশো না—এই কথা!"

বৃদ্ধ দৃঢ়-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, ঐ এক কথা! বদের সঙ্গে মিশে বরবাদ্‌ হয়ে যেও না। লেখাপড়া না শিখ্‌তে পারো সো ভি আচ্ছা, কিন্তু স্বভাব যেন তোমার ভাল থাকে, তা'হলেই আমি খুসী হব!"

একটু বিচলিত হইয়া সুনীল বলিল, "ফৈজু থাক্‌লে আমার অনেক সুবিধে সর্দ্দার,—ফৈজু আরও কিছুদিন সেখানে থাকুক না!"

মাথা নাড়িয়া সর্দ্দার বলিলেন, "না বাবা, ও এবার বাড়ীতে থাকুক। জমী-জমা কিনে চাষ-বাস করুক। আমি বুড়ো মানুষ, কোন দিন আছি, কোন্‌ দিন নেই,—ফৈজু এবার ঘরবাসী হোক, আমি দেখে যাই।"

একটু থামিয়া, পুত্রের দিকে চাহিয়া, ঈষৎ বিরক্তভাবে বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "তা ছাড়া, বিদেশে ঘুরে ঘুরে ওর চাল খারাপ হয়ে যাচ্ছে বাবু, ঘরে থাকতে ওর মোটেই ইচ্ছা হয় না।—হাঁ, কি না—তুমি জিজ্ঞাসা কর ওকে, ও বলুক আমার মুখের ওপর! আমি তো দেখ্‌ছি হরঘড়িই ও যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। খালি পরের ধান্ধায় ফক্‌র্‌-দালালী! এই ছাখ, সকালে মোহন্তকে নিয়ে এক কাণ্ড,—এমন রাগ ধরেছে আজ আমার! পেতুম যদি সামনে সেই সময়, তা হলে ওর মাথায় আজ জুতো-মারতুম্‌!—" উত্তেজিত বৃদ্ধ রোষ-কষায়িত লোচনে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হা

—'শয়তান! যে যেখানে যা খুসী করুক না, তাতে তোর বাবার কি?"

সুমতি দেবী শঙ্কিত হইয়া, ত্রস্তস্বরে বলিলেন, "তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ ফৈজু? তুমি বাড়ী যাও না।"

ফৈজু ম্লানমুখে একটু হাসিয়া নিঃশব্দে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষুণ্ণ, করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "উপযুক্ত ছেলে,—অমনভাবে বকাবকি কোরো না সর্দ্দার! দেখছ তো ওর ভাব-গতিক, আবার কোন্ দিন কোথায় চলে যাবে,—সেইটেই কি ভাল হবে? আর কি-ই বা এমন দোষ করেছে ফৈজু, যার জন্যে তুমি এত রাগ্‌ছ? মোহন্ত ছেলেটাকে মারছিলেন,—ফৈজু গিয়ে কেড়ে নিয়েছে,—এই তো? তাতে—"

বাধা দিয়া উত্তেজিতভাবে বৃদ্ধ বলিলেন "তার পর, তাঁর হাত ধরা কেন? সেটা কি রকম অপমান হোল?—নিমক-হারাম উল্লুকটার হুঁস্ নাই,—সেটা তার মনীব-গোষ্ঠির অপমান!"

সুনীল উচ্চ হইয়া বলিল—"সেটা মনীব-গোষ্ঠির অপমান! আর ফৈজুও তো আমার চাকর,—মোহন্ত যে তার গলা টিপে ধরলেন, সেটা আমার অপমান নয়?"

সুমতি দেবী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তা'ছাড়া, মোহন্ত-মশাই যে রকম রাগের মাথায় ছেলেটিকে পিটুচ্ছিলেন শুনছি—তাতে ধর,—ছেলেটা যদি মরেই যেত, —তাহ'লে সর্দ্দার—'ফৈজুর বাবার কি' সে কথা বল্‌বার যো থাকত না!"

সুনীল মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "তা'হলে পুলিশ আগেই এসে ফৈজুর বাবার হাত ধরত!—তার পর ফৈজুর বাবার মনীব আমি,—আমার কাণ ধরে কৈফিয়ৎ চাইত যে তোমার জমিদারীর মধ্যে বসে তোমার ঠাকুরবাড়ীর মোহন্ত কেন এমন কায করে?—তখন আমি কি কৈফিয়ৎ দিতুম সর্দ্দার?"

এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শ্যামলের অত্যন্তই জিভ্ সুড়্-সুড়্ করিতেছিল—এইবার সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না,—সর্দ্দারের মুখপানে চাহিয়া বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা'তো বটেই!—তখন 'হইয়াছেন হইবেন স্ত মহাপ্রভুর গণ, ভূমিতে পড়িয়া বন্দি সবার চরণ' ব'লে মামাবাবু ভক্তি দেখালে তো পুলিশ মোহন্তমশাইকেও ছেড়ে দিত না! হাতে দড়ি পড়িয়ে ওঁকেও তো টেনে নিয়ে যেত!"

শ্যামলের কথার অদ্ভুত ভঙ্গী শুনিয়া সুমতি দেবী সুনীলের মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিলেন,—সুনীলও হাসিল। তার পর ঘাড় তুলিয়া বলিল "না—না, ন্যায়-অন্যায় ব'লে যে একটা জিনিস আছে, সেটা বুঝে তবে কথা কইতে হয় দিদি! অন্যায় বিচার দেখো,—মোহন্ত ফৈজুর গলা টিপে ধর্‌লেন, তাতে দোষ হোল না,—কিন্তু ফৈজু তাঁর হাতটা ধরেছে, তাতেই—"

সুমতি দেবী বলিলেন "যেতে দে, যেতে দে,—ছেঁড়া ল্যাঠা নিয়ে ঝগড়া করতে হবে না। ওঠ, ঢের কায আছে। বাড়ী যাও সর্দ্দার,—ফৈজুকে কিছু বোল না; আর—থেমে যাও, সব থাম্‌বে! এ সব তুচ্ছ ব্যাপার—"

"তুচ্ছ ব্যাপার! তুচ্ছ ব্যাপার! এ্যাঁ—এ কি কথা দিদি-ঠাকরুণ!—" বলিতে বলিতে হন্-হন্ করিয়া গৌরবর্ণ, লম্বা চেহারা, অত্যুগ্র-উঁচু-নাক, নীচু-কপাল, লম্বা-চোয়াল—মোহন্তমশাই হঠাৎ সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেন! সুমতি দেবী ব্যস্ত, উৎকণ্ঠিতভাবে মাথায় কাপড় টানিয়া, একটু ব্যস্ততার সহিত রান্নাঘরে ঢুকিতে উদ্যত হইলেন, দুয়ারে মোক্ষদাদিদি দাঁড়াইয়া ছিলেন,—তিনি হঠাৎ অভাবনীয় রহস্য-স্ফূর্ত্তির হাস্যিভরা মুখে, সুমতি দেবীর বুকে হাত দিয়া ঠেলিয়া, পিছু হটাইয়া দিয়া, ঘোমটার ভিতর হইতেই,—লজ্জাশীলা নামের গৌরব বজায় রাখিয়া, চাপা-গলায় ফ্যাশ্-ফ্যাশ্ করিয়া বলিলেন—"যাও না গো দিদিঠাকরুণ,—মোহন্ত-মশাই কি বলেন শোনই না।"

মোক্ষদা-দিদির এই অনাময়িক রসিকতা-আড়ম্বরে সুমতি দেবীর দুই চক্ষু দপ্ করিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। অস্ফুট-তীব্র স্বরে বলিলেন "তুমি সরো—" বলিয়াই তাঁহার সরিবার অপেক্ষায় না থাকিয়া—পাশ কাটাইয়া তিনি রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

মোক্ষদা দিদির মুখ ম্লান হইয়া গেল! থতমত খাইয়া, দুয়ার ছাড়িয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া—অকারণ ব্যস্ততায় ঘটি কাত্ করিয়া জলে হাত ধুইতে-ধুইতে মুখ নীচু করিয়া বলিলেন, "রাগ করলে দিদি—আমি 'রহাস্তি' করছিলুম, এতে রাগের কি আছে?"

সুমতি দেবী অন্ত দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া, সুস্পষ্ট বিরক্তির সহিত বলিলেন "না,—রাগের কিছু নেই,—কিন্তু ও-রকম 'রহাস্থি' আমি পছন্দ করি না।" বলিয়াই তিনি গীতা খুলিয়া নীরবে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মোক্ষদা দিদি গুম্ হইয়া, ঘটি-বাটি ঠক্ ঠক্ করিয়া নিজের কায করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখখানা উত্তরোত্তর আঁধার হইয়া উঠিল। একমাত্র শ্যামলের দুষ্টামীর দাপটে ত্যক্ত হইয়া রাগ প্রকাশ করা ছাড়া, সুমতি দেবী সংসারের আর কোন বিষয়ে কাহারো উপর রাগ দেখাইতেন না,—ক্বচিৎ রুষ্ট হইলেও সেটা মনেই রাখিতেন,—প্রকাশ করিতেন না। আজ মোক্ষদা দিদি তাঁহার এই অস্বাভাবিক রূঢ়তা দেখিয়া, মনে-মনে বড়ই বিচলিত হইয়া গেলেন।

বাহিরে ততক্ষণে মোহন্ত-মশাই হাত-মুখ নাড়িয়া ধূর্ত্ত-চাতুরীর সবিনয় হাসিভরা-মুখে—সসোজন্যে পুনশ্চ বক্তৃতা সুরু করিলেন, "আপনি বলুন সুনীলবাবু, দিদি ঠাক্‌রুণ্‌কে বলুন,—এ ব্যাপার তুচ্ছ হলেও, তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়! আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস, কীটানুকীট—আমি কোপীন সম্বল করে পথে দাঁড়িয়েছি,—আমার মান-অপমান নাই। আমি তো 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনাং' হয়ে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নিয়েছি,—আমার কন্থা পন্থা সবই হচ্ছে, ঐ,—আমার আবার অপমানে দুঃখ কি? তবে ঠাকুর আপনাদের, ঠাকুরবাড়ী আপনাদের,—আপনারা সাধু-সজ্জনের সেবার জন্যে যে আশ্রয়—দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার সম্মান তো আছে সুনীলবাবু—" বলিয়াই আড়-চোখে রান্নাঘরের পানে চাহিয়া তিনি থামিলেন।

সর্দ্দার ও সুনীল মোহন্ত-মশাইয়ের আকস্মিক আবির্ভাবে যেন যুগপৎ স্তব্ধ-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। এইবার সর্দ্দার বিস্ময় দমন করিয়া, ধীর ভাবে, বেশ-একটু আদেশের ভঙ্গীতে বলিলেন, "বাড়ীর মধ্যে আপনি কেন, মোহন্ত ঠাকুর—বাইরে চলুন, সদরবাড়ীতে চলুন—"

তাচ্ছিল্যভরা পরিহাসের হাসি হাসিয়া মোহন্ত-মশাই বলিলেন "বাইরেই বা চলব কেন? ঘরের কথা ঘরেই হোক্ না। সুনীলবাবু শুনুন, পাঁচরকম তেলবুলুনি কথা শুনে, এক মুখে ঝাল খেয়ে আপনারা ব্যাপারটা বড়ই তুচ্ছ মনে করছেন,—কিন্তু আসলে তা নয়! রায় মশাইকে জিজ্ঞাসা করুন, চাটুজ্যে মশাইকে ডেকে এনে জানুন—তা'পর আপনি আছেন, দিদি ঠাক্‌রুণ্ আছেন—"

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সুনীল বলিল, "বাইরে চলুন মশায়, সেইখানে ওসব কথা হবে।"

খপ্ করিয়া সুনীলের দুই হাত ধরিয়া, অদ্ভুত হাসিতে বিচিত্র ভঙ্গী করে চক্ষু ঘুরাইয়া মোহন্ত-মশাই, নাট্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার মত ঠোঁট মুখ নাড়িয়া উচ্ছ্বাসভরা আবেগে বক্তৃতা জুড়িয়া দিলেন, "আপনি জ্ঞানবান হয়ে অজ্ঞানের কথা কইছেন কেন? বাইরে হৈ হৈ করে কি ফল? এ সব ঘরের কথা ঘরেই মীমাংসা হোক। দেখুন সুনীলবাবু, একদিন আমারি শরীরে সব রিপুই ছিল; কিন্তু আজ যখন বৈষ্ণব হয়ে এ পথে দাঁড়িয়েছি, তখন আমার আবার অভিমান কি? আমার এখন সবই সাধু সজ্জনের সেবা করে' 'Thy will be done' বলে খোলা মনে হেসে-খুশে আনন্দ করে দিন কাটানই কায। আমার আবার অভিমান থাক্‌বে কোথা থেকে? ভগবান গীতায় বলে গেছেন "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।—" সব ছেড়ে আমার শরণ নাও! আমি তাঁর শরণ নিয়েছি,—আমার আবার ভয় কি? বলে, 'এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী, আমি আনন্দে আনন্দময়ীর খাস-তালুকে বসত করি'—বুঝলেন কি না—"

ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, উর্দ্দু, হিন্দি মিশাইয়া, কোটেশনের পর কোটেশন চালাইয়া, তড়্-তড়্ করিয়া, অবাধে অনর্গল-ছন্দে রংবেরংএর বচনের বুক্‌নী ঝাড়িয়া, প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টির মতই মোহন্ত-মশাই প্রায় আধ-ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা-বৃষ্টি করিলেন! তার মধ্যে কত অসংলগ্ন, কত পরস্পর বিরোধী, কত যুক্তিহীন অদ্ভুত বাক্য রহিয়া গেল,—সুনীলকৃষ্ণ সে দিকে লক্ষ্য করিবার সময়ই পাইল না! সে হতবুদ্ধি হইয়া ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। মোহন্ত-মশাইয়ের ইংরেজী জ্ঞানের প্রাখর্য্য দেখিয়া সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। মনে-মনে একটু ভক্তিও অনুভব করিল।

সূক্ষ্মদর্শী মোহন্ত-মশাই সুনীলের অবস্থা বুঝিয়া, বাংলা ছাড়িয়া ইংরেজী ধরিলেন! বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলিল; ইংরেজীতে যেখানে অকুলান হয়, মোহন্ত-মশাই সেখানে

সংস্কৃত—অভাবে বাংলা বলিতে লাগিলেন। উদাহরণের পর উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া, তিনি নিঃসংশয়ে সুনীলকে বুঝাইয়া দিলেন, যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিয়াছে, তাঁহার মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি আবির্ভূত হইয়াছে! সে সর্ব্বজয়ী, সমস্ত অভিমান-শূন্য হইয়াছে। তাই তিনি অল্প বয়সে সংসারে বীতরাগ হইয়া সব ত্যাগ করিয়াছেন, এবং অনেক শাস্ত্র পড়িয়া অনেকটুকু সাধনা করিয়া, অনেক দেশ বেড়াইয়া, অনেক অলৌকিক্ শক্তিশালী যোগি-জনের সংসর্গে বাস করিয়া, এই বয়সে অনেক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার অজানিত শাস্ত্রও আজ কিছু নাই, তাঁহার অসাধিত সাধনাও আজ কিছুই নাই, - তিনি একজন মুক্তস্বভাব মহাপুরুষ বিশেষ। তবে লোক-শিক্ষার জন্য নিষ্কামভাবে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য; তাই, একান্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম পালনের জন্যই, তিনি এখানকার মোহন্তগিরি লইয়াছেন এবং লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যেই দেবতার দেবত্ব স্বত্ব পরিপূর্ণ সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতেছেন। আর সেই জন্যই ঐ তমোগুণে অন্ধ পাষণ্ড ছেলেগুলা দেবতার ফুল ছিঁড়িয়াছিল বলিয়া, তিনি রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদের 'যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা' দিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ যে অভদ্র উদ্ধত বদ্‌মাইস গুণ্ডাটা, তাঁহাকে অযথা অপমান করিয়া, ছেলেটার উপর 'সাত পুরুষের নাউ খোলার' মত দরদ্ দেখাইতে গেল, তাহার সে ইতরামী মোহন্ত-মশাই কেন বরদাস্ত করিবেন? তিনি নিষ্কাম-ধর্ম্মব্রতী, কাযেই তিনি নিষ্কাম ধর্ম্মের মহিমায় মহা উত্তেজিত হইয়া—বাধ্য হইয়াই তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া, তাহাকেও কিছু 'শিক্ষা' দিতে গিয়াছিলেন! নচেৎ, এ কাযে মোহন্ত-মশাইয়ের অন্য কোন স্বার্থ বা অসদুদ্দেশ্য ছিল না। কেনই বা থাকিবে? তিনি তো সর্ব্বত্যাগী—সর্ব্ব-রিপুজয়ী, মহাপ্রাণ বৈষ্ণব! তাঁহার ধর্ম্মই তো "জীবে দয়া, স্বার্থ ত্যাগ, ভক্তি ভগবানে!" ··· ··· ইত্যাদি!

বক্তৃতার তুফানে চুবন খাইয়া, সুনীল অন্তরে-অন্তরে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। হতভম্ব হইয়া বলিল, "তা এখন আমায় আপনি কি করতে বলেন?"

মোহন্ত-মশাই মুণ্ডিত শিরে নামাবলী জড়াইতে-জড়াইতে, দর্পভরে ছাতি ফুলাইয়া বলিলেন, "আপনার পিতৃপুরুষের পুণ্যকীর্ত্তি ঐ মদনগোপাল ঠাকুরের সেবাইত বৈষ্ণবের অপমান,—এর প্রতিকার আপনাকে কর্‌তে হবে! আপনি বুদ্ধিমান লোক,—আপনি বিবেচনা করুন, এ ক্ষেত্রে আপনার কি করা উচিত?"

সুনীলের বুদ্ধিবৃত্তি সমস্তই তখন গুলাইয়া গিয়াছিল,—কি যে করা উচিত, কিছুই সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। নিরুপায়ভাবে মাথা চুল্‌কাইয়া, রান্নাঘরের দুয়ারের দিকে একবার চাহিল, অভিপ্রায়—দিদিকে যদি দেখিতে পায়! কিন্তু দিদি তখন রান্নাঘরের মধ্যে নিশ্চিহ্নরূপেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না; তৎপরিবর্ত্তে মোক্ষদা দিদির ঘোমটা-ঢাকা মুখের তীব্র-কুঞ্চিত চোখের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল। সুনীল সঙ্কুচিত হইয়া দৃষ্টি নামাইল।

সুনীলের ইতস্তত: ভাব দেখিয়া মোহন্ত-মশাই তাহার মনোগত অভিপ্রায়টা বুঝিলেন, তৎক্ষণাৎ সুচতুর দৃষ্টি তুলিয়া মোক্ষদা দিদির পানে চাহিয়া বলিলেন, "মোক্ষদা দিদি, তুমি সুনীল বাবুর ভগ্নীকে বুঝিয়ে বল,—উনি বুদ্ধিমতী মেয়েমানুষ—উনিই বলুন, এ স্থলে কি প্রতিবিধান হওয়া উচিত।"

মোক্ষদা দিদি পিছন ফিরিয়া সুমতি দেবীর সঙ্গে কি দু-একটা কথা কহিলেন; তারপর ঘোমটা-টা আর একটু টানিয়া মোহন্ত মশাইয়ের দিকে চাহিয়া, চাপা গলায় বলিলেন, "উনি বল্‌ছেন, আমরা এর মধ্যে কি বল্‌তে পারি। সুনীল ছেলেমানুষ, ওই বা প্রতিকারের কি বুঝ্‌বে। মোহন্ত-মশাই কি করতে বলেন, তাই বলুন আগে।"

মোলায়েম সুরে হি-হি করিয়া হাসিয়া মোহন্ত-মশাই বলিলেন, "আমি আর কি বল্‌ব দিদি? আমার বল্‌বার কিছুই নাই। তবে আপনাদের বাড়ীতে বৈষ্ণবের অপমান,—তাই চাটুয্যে মশাই, রায় মশাই, ওঁরা সবাই বল্‌ছেন যে, আপনাদের উচিত সেই গুণ্ডাটাকে ধরে আনিয়ে, সকলের সাম্‌নে নাকখৎ দিয়ে কাণ মলিয়ে, আমার কাছে 'এ্যাপোলজি' চাওয়ান।"

সর্দ্দার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কি চাইবে?"

মোহন্ত-মশাই বলিলেন, "এ্যাপোলজি—ক্ষমা—অর্থাৎ কি-না মাপ চাওয়া!"

সর্দ্দার বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুর, তাতেই যদি সব গোল

মিটে যায়, তাতেই যদি তুমি খুসী হও, তুমি চল, আমি এখুনি তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।"

বাধা দিয়া উৎসাহ-মত্ত মোহন্ত-মশাই বলিলেন, "তুমি চেন তা'কে? হাঁ সর্দ্দার—চেন তো, ভা-রী ই জোয়ান্; ইয়া বুকের ছাতি, সুন্দর রং, ব্যাটা হাড় বজ্জাত!"

রুষ্টস্বরে সুনীল বলিল, "সর্দ্দারেরই ছেলে সে।"

থতমত খাইয়া, অপ্রস্তুতভাবে মোহন্ত মশাই হাত-পা নাড়া বন্ধ করিয়া, চমকিয়া বলিলেন, "এঁ্যা! সে কি! তাই বটে তো! তোমার ছেলে!—" মোহন্ত-মশাইয়ের আর কথা যোগাইল না। সর্দ্দারের মুখপানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

সর্দ্দার কোন উত্তর না দিয়া লাঠির মাথায় চিবুকের ভর রাখিয়া, মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুনীল নখে-নখে ঠেকাইয়া নিজের হাতের আঙুলগুলি দেখিতে-দেখিতে বলিল, "ফেজু যে হাড় বজ্জাত, তার কোন চিহ্নই আমরা দেখ্‌তে পাই নি। আমরা তো তাকে ভাল বলেই জানি।"

সর্দ্দার নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, "তা সে যাই হোক ঠাকুর মশাই, আপনার কাছে সে কসুর চাইতে যাচ্ছে। আপনি কা'কে-কা'কে ডাক্‌বেন, ডেকে জমা করুন,—ফৈজু সকলের সাম্‌নেই আপনার কাছে নাকখৎ দেবে। আমি যতক্ষণ এ বাড়ীতে আছি, ততক্ষণ আমার মনীবের মান-ইজ্জত আমি দেখ্‌ব। মনীব তো আমার বাচ্ছা, কালকের ছেলে, উনি কি জানেন? ওঁকে কিছু বল্‌বেন না। আপনি যান এখন, আমি এখনি ফৈজুকে নিয়ে যাচ্ছি।"

মোহন্ত-মশাই যাইবার জন্য মনে মনে তখন ব্যস্ত হইয়াই উঠিয়াছিলেন বোধ হয়। তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিলেন, "ত্যাখো বাপু, যা হয় কর।" পরক্ষণেই চৌকাঠের বাহিরে অদৃশ্য হইলেন।

বিরক্তি-গম্ভীর-মুখে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া সুমতি দেবী সুনীলের মুখপানে একবার চাহিলেন,—তারপর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে দ্বিতলে যাইবার সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

সর্দ্দার বলিলেন, "মা, আমার সিধাটা।"

চলিতে চলিতেই সুমতি উত্তর দিলেন, "বিকালে পাঠিয়ে দেব, এখন যাও।"

সুনীল মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "সর্দ্দার স্বীকার হোল দিদি,—নইলে ফৈজুকে 'এ্যাপোলজি' চাওয়ান—"

বাধা দিয়া, মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ রুষ্টস্বরে সুমতি দেবী বলিলেন, "তুমি ইংরেজী পড়েছ, তুমি 'এ্যাপোলজির' মানে বোঝ; উচিত হচ্ছে, ফৈজুর বদলে তোমারই 'এ্যাপোলজি' চাইতে যাওয়া, বিশেষতঃ তোমারই মান রক্ষার জন্য যখন মোহন্ত মশাই নিঃস্বার্থ ভাবে মানের কান্না কাঁদতে বসেছেন, তখন—" ভ্রূকুটি করিয়া সুমতি দেবী তীব্র-কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কোন্ মুখে চুপ করে রইলে?"

সুনীল স্তব্ধ!

সর্দ্দার বিস্মিতনয়নে চাহিয়া সবিনয়ে বলিল, "কথাটা কি খারাপ হয়েছে মা!"

কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া নম্রভাবে সুমতি দেবী বলিলেন, "না বাবা, তোমার কথা আমি খারাপ বলছি না; কিন্তু ঐ জমিদার মনীবের জমিদারী চাল দেখে আশ্চর্য্য হয়েছি। ও একটা কথাও কইলে না কি বলে? তখন যে অত আস্ফালন করলে!"

জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া সর্দ্দার বলিলেন, "কি বল মা? ফৈজুকে আনব না?"

"তোমার মনীবকে জিজ্ঞাসা কর" বলিয়া সুমতি দেবী চলিয়া গেলেন।

বিস্ময়াহত সর্দ্দার সুনীলের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন, "বাচ্চা!"

অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত উত্তেজিতভাবে সুনীল চেঁচাইয়া বলিল, "না সর্দ্দার, সে কিছুতেই হবে না! আমি খুনোখুনি করব তাহ'লে! আমার মাথার দিব্যি রইল তোমায়, তুমি—ফৈজুকে সেখানে আনতে পাবে না!"

হতবুদ্ধি হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "সেইটে কি ভাল হবে বাচ্চা! একটা সামান্য ছুতোর জন্যে মন-কসাকসি বাধান, বড় খারাপ যে! তার চেয়ে একটুখানি কসুর চাইলেই যদি সকল গোল মিটে যায়, মোহন্তঠাকুর যদি তাতেই আরাম পান—"

অধীরভাবে সুনীল বলিল, "না, সে কিছুতেই হবে না!"

কণ্ঠস্বর অতীব কোমল করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ বাচ্চা..."

সুনীল বাধা দিয়া বলিল, "বেশ, আমায় ছেলেমানুষই

করতে দাও তা'হলে! ভণ্ডামীকে আমি ভক্তি করতে পারব না, আর অন্যায়ের চোখ-রাঙানিকে আমি ভয়ও করব না! তাতে আমি নির্ব্বংশই হই...আর যাই হই! খবর্দ্দার সর্দ্দার, তুমি ফৈজুকে মোহন্তর কাছে নিয়ে যেতে পারবে না।"

সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরের বারেণ্ডায় উঠিয়া সুনীল ডাকিল, "দিদি!"

সুমতি দেবীর কোন উত্তর পাওয়া গেল না। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া, আহ্নিকের ঘরে আসিয়া সুনীল দেখিল, দিদি আবার পূজার আসনে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিতেছেন। সুনীল বাহিরে আসিয়া বারেণ্ডায় পায়চারী করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে আহ্নিকের ঘর হইতে সুমতি দেবী বাহির হইলেন। শান্ত-স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "জল খাবি আয় সুনীল!"

অভিমান-ব্যথিত দৃষ্টি তুলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সুনীল বলিল, "না, আমি আর কিছু খাব না! আমি জমিদার! আর তুমি জমিদার নও? তোমারও তো জমিদারী আছে!"

স্মিতমুখে সুমতি দেবী বলিলেন, "এতক্ষণের পর বুঝি সেটা তোর মনে পড়ল? তাই ঝগড়া করে শোধ দিতে ছুটে এলি? তা বেশ, এখন জল খাবি আয়..."

সুনীল মুখ ফিরাইয়া বলিল "না, আমি খাব না,—আমার খিদে নেই।"

হাসি-হাসি মুখে সুমতি দেবী বলিলেন "রাগের মাথায় বকেছি ব'লে রাগ করলি? আচ্ছা, আমার ঘাট হয়েছে,—তুমি জমিদার নও,—তুমি আমার গরীব ছোট্ট ভাইটি,—এখন এস, তেষ্টায় আমার গলা শুকিয়ে গেছে, আমায় জল খেতে দাও।"

ক্ষুব্ধস্বরে সুনীল বলিল, "তুমি কেন আমায় তখন বল্লে না, তা'হলে মোহন্তকে সেইখানেই আমি—"

সুমতি বাধা দিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "না, তাঁকে অপমান করবার কোন দরকার নাই। তবে তিনি যে গায়ের জোরে কাউকে অপমান স্বীকারে বাধ্য করাবেন, আর তুই যে তখন চুপ করে সায় দিয়ে যাবি,—সেটাও আমি চাই না। আর তুই যে মোহন্ত-মশাইয়ের ইংরেজি ঝগড়া শুনে, একেবারে মুগ্ধ হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলি, ওইতে তোর ওপর আমার—" বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া, একটু হাসিয়া, তিনি বলিলেন, "ছাখ্, আমার ভারী তেষ্টা পেয়েছে,—বকাস্‌নি; এখন জল খাবি আয়।"

"চল—" বলিয়া সুনীল অগ্রসর হইল। দিদির উপর রাগ করিয়া সে আজ জল স্পর্শই করিবে না স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু দিদির তৃষ্ণা-কাতর শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া আর প্রতিবাদ করিতে সুনীলের সাহস হইল না। আর একটা কথা কহিলেই দিদি হয় তো এখনি সমস্ত তৃষ্ণাটা স্বচ্ছন্দে পরিপাক করিয়া, নিঃশব্দে উপবাস সংযম অবলম্বন করিয়া বসিবেন! সেপক্ষে দিদির সংযম-শক্তির অসাধারণ পারদর্শিতা! ভয়ে-ভয়ে জলখাবারের পাত্র টানিয়া লইয়া সুনীল বলিল, "তুমিও খাও দিদি।"

সুমতি দেবী বলিলেন, "এই যে,—পিসিমার সরবৎটা ঢেকে রেখে খাচ্ছি। শ্যামলকে ডাক দেখি।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার বাড়ী ফিরিয়া পুত্রকে কোন কথা বলিলেন না। মোহন্ত ঠাকুরের আব্দারটা সুনীল যখন নাকচ করিয়াই দিল, তখন সে বৃত্তান্ত ফৈজুকে শুনাইয়া কোনই লাভ নাই,—অনর্থক তাহাকে বিচলিত করা মাত্র। বিশেষ, রাগের মাথায়, সকালে ফৈজুর পিতৃ-মাতৃ উচ্ছিন্ন করিয়া যে গালাগালিটা দিয়াছিলেন, তাহার কটু ঝাজটা ক্রমে বৃদ্ধের মনকে একটু বেশ অনুতপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। বিশেষতঃ, ফৈজুর পরলোকগতা সাধ্বী মাতৃদেবীর উদ্দেশে বর্ষিত দারুণ অসম্মান-সূচক বাক্যগুলা! বাড়ী ঢুকিয়া, পুত্রের বিমর্ষ-ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া, বৃদ্ধের আরও মন খারাপ হইয়া গেল,—তিনি সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গের একটি বর্ণও আর উচ্চারণ করিলেন না। যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে পুত্রকে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া, স্নান করিয়া আসিয়া আহারে বসিলেন। আহারের সময় বড়বধূ কাছে বসিয়া সাংসারিক বিষয়ে এদিক-ওদিক দু-চারিটা কথা কহিল। বৃদ্ধ বেশ সহজভাবেই তাহার উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফৈজু একটু বিষণ্ণ-চিন্তাকুল-ভাবে চুপ করিয়া রহিল।

আহার শেষ হইলে আঁচাইয়া আসিয়া, ফৈজু অন্য দিনের মত পিতার হুঁকার জল ফিরাইয়া, তামাক সাজিয়া আনিয়া

পিতার হাতে দিল। তার পর নিজে বারেণ্ডার মধ্যে ঢুকিয়া শণ কাটিতে বসিল।

পিতা উঠানের রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া বারকতক হুঁকায় টান দিলেন। তার পর বারেণ্ডায় উঠিয়া গিয়া বলিলেন, "বড় গরম পড়ে গেছে, নয় রে? চ্যাটাই-টা গেল কোথা?"

ঢেরা ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া, ফৈজু এদিক-ওদিক খুঁজিয়া, চ্যাটাইটা বাহির করিয়া আনিয়া বারেণ্ডায় পাতিয়া দিল। তার পর আবার নিঃশব্দে শণ কাটিতে বসিল। পিতা চ্যাটাইয়ে বসিয়া আরও কিছুক্ষণ হুঁকা টানিয়া বলিলেন, "তুই ছোটবাবুর কাছে যাবি না এখন?"

ঘূরন্ত ঢেরাটার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ফৈজু বলিল, "থাক এখন, এর পর যাব।"

পুত্রের মুখপানে চাহিয়া পিতা বলিলেন, "কখন যাবি?"

পুত্র সংক্ষেপে উত্তর দিল, "যখন হোক্,—" বলিয়াই, একটু থামিয়া, নিজের সংক্ষিপ্ত উত্তরটা সংশোধন করিয়া লইবার জন্যই বোধ হয় পুনশ্চ বলিল, "বিকেল বেলাই যাব, এখন দড়িটা কাটি।"

বৃদ্ধ মনে-মনে বুঝিলেন, তাঁহার নিঃশব্দ-অভিমানী পুত্র মনে-মনে একটু প্রচ্ছন্ন অভিমান পোষণ করিতেছে। সেই 'হরঘড়ি' উড়িয়া বেড়ান তিরস্কারটুকুর জন্যই সে রাগ করিয়া এখন বাড়ীতে রহিয়া গেল। অভিজ্ঞ বৃদ্ধ মনে-মনে একটা মতলব আঁটিতে-আঁটিতে মনে-মনেই একটু হাসিলেন। তার পর বলিলেন, "তা বেশ, তুই এখন তা'হলে বাড়ীতে থাক, আমি নজরুর সঙ্গে দেখা করে আসি। 'বড়-ময়না' মাঠে নজরুর যে সাত বিঘে জমি আছে, সেটা ও বিক্রী করে দিচ্ছে। আমি কিনে নেবার চেষ্টা করছি। জমিটা বেশ ভাল,—তুই কি বলিস্ ফৈজু?"

ফৈজু কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইল না। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, "আমি আর কি বল্‌ব? জমি-জমা কেনা,—কিনে রাখ্‌তে পারলেই ভাল। তবে টাকা অনেকগুলো চাই তো?"

বৃদ্ধ একটু থামিয়া বলিলেন, "বাচ্চাবাবুর কাছে তোর ঐ যে চার-শো টাকা আছে, ঐটে দিয়েই তোর নামে কিনে নিই। একযোড়া হেলে গরুও আমি দেখে রেখেছি। এই বছর থেকে তোকে চাষে লাগিয়ে দিই। তোর মত কি বল দেখি।"

ফৈজু মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল; কিন্তু এমন প্রশ্নের উত্তরে পিতার মুখের উপর হঠাৎ কোন মতামত প্রকাশ করাও তাহার সাধ্যাতীত। বিশেষ, বিদেশে ঘুরিয়া তাহার চাল খারাপ হইয়া যাইতেছে বলিয়াই, শুধু তাহার স্বভাব সংশোধনের উদ্দেশ্যেই পিতা এই সব ক্রিয়া-কলাপে উদ্যত হইয়াছেন তো!

আরক্তমুখে কাসিতে-কাসিতে ফৈজু বলিল, "চাষ করতে বল, আমি রাজি আছি, কিন্তু এ বছরটা বাদ দিলেই ভাল হয়; কেন না, দিদিমণির মহল নিয়ে যে হাঙ্গামা বেধেছে, তাতে এখন কিছুদিন আমাদের ঐ দিকে চোখ-কাণ রাখ্‌তে হবে তো? চাষ কাঁদলে আমি কোন্ দিক সামলাবি? তার পর জয়দেবপুরের গোমস্তা, তহশীলদার সব যদি বদল করতে হয়, তা'হলে আমাদের গোমস্তা-বাবুদের কায বাড়্‌বে। এ বছরটা ওখানকার কায ছেড়ে আমি কেমন করে চাষের কাযে হাত পা বেঁধে ফেলি?"

"তা বটে" বলিয়া বৃদ্ধ চিন্তিতমুখে হুঁকা টানিতে লাগিলেন। ফৈজু নীরবে শণ কাটিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রহিমা বারেণ্ডায় ঢুকিয়া, রেশম ও সূতার গুটি প্রভৃতি কুলুঙ্গি হইতে লইয়া, শ্বশুরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি নানীর বাড়ী যাচ্ছি, বাপজী।"

বৃদ্ধ হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমিও যাব। নজরুর নানীকে একবার কথাটা শুনিয়ে আসি; তার পর নজরুর কাছে যাব। ফৈজু, তুই তা'হলে বাড়ীতেই থাক,—আমরা না এলে বেরুস্‌নি যেন।" বৃদ্ধ জামা-জুতা পরিবার জন্য ঘরে ঢুকিলেন।

ফৈজু মাথা হেঁট করিয়া শণই কাটিতে লাগিল। অন্য দিন দুপুরবেলা আহারান্তে রহিমা বহির্গমনের উদ্যোগ করিলেই, ফৈজু এক-প্রস্থ ঝগড়া করিয়া লইত, এক-একদিন সত্য-সত্যই তাহার যাওয়া বন্ধ করিত, কোনদিন নিজেই তাড়াতাড়ি বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িত। আজ কোন প্রতিবাদ না করিয়া সে এমন শান্ত নির্ব্বিকার-চিত্তে বন্দিত্ব-বহনে প্রস্তুত দেখিয়া রহিমার বড় বিস্ময় বোধ হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, চুপি-চুপি পরিহাসের স্বরে বলিল, "আজকাল পাহারাদারী বেশ মিষ্টি লাগছে, না?"

ফৈজু উদাস্‌ভাবে বলিল, "বল, বল,...যার যা মুখে আসে, যার যা মনে পড়ে,...বলে, নাও! আমার চুপ-চাপ সয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নাই। আরো কিছু, বল্‌তে পার তো বল।"

ফৈজুর গুরু-গম্ভীর ঔদাস্য-প্রাবল্য দেখিয়া রহিমা ভারী হাসি পাইল। হাসি চাপিবার জন্য মুখে কাপড় গুঁজিয়া, কপট করুণা প্রকাশ করিয়া ব্যঙ্গসূচক স্বরে বলিল, "আহা! তোমার দুঃখ দেখে আমার কান্না পাচ্ছে ফৈজু! কেনই বা ঝকমারী করে বাড়ীতে এসেছিলে!"

এবার ফৈজু হাসিল। খুব চুপি-চুপি বলিল, "তুমি আর রসান্‌ লাগিও না খলিফা, তোমায় যোড়হাত করছি, থাম। একেই আমার যা দিক্‌ ধরেছে!. শীগ্‌গী করে ফিরো কিন্তু!"

"হবে এখন!" বলিয়া রহিমা বাহিরে চলিয়া গেল। ফৈজুর পিতাও সঙ্গে-সঙ্গে বাহির হইলেন। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় তিনি পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন, "আমরা কেউ না এলে তুই বাড়ী ছেড়ে যাসনি ফৈজু।"

"জী, না" বলিয়া ফৈজু শণই কাটিতে লাগিল। তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

টিয়া মুখ টিপিয়া-টিপিয়া দুষ্টামীর হাসি হাসিতে-হাসিতে বারেণ্ডায় ঢুকিয়া বলিল, "আজ তুমি ভারী জব্দ হয়ে গেছ, বেশ শাস্তি বটে।"

মাথা তুলিয়া চাহিয়া, একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল, "খলিফা বলে গেল, আমার দুঃখ দেখে তার কান্না পাচ্ছে। তোমার কি মনে হচ্ছে বল দেখি, হাসি পাচ্ছে বোধ হয়, না?"

টিয়া স্বীকারসূচকভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা বোধ হয় পাচ্ছে একটু-একটু; কিন্তু বিয়ে করার চেয়ে জেল খাটা ঢের আরামের কায,—সেটা নিশ্চয়,—কি বল?" টিয়া সকৌতুকে আবার হাসিতে আরম্ভ করিল।

"ভয়ানক!" বলিয়া মৃদু হাসিয়া, ফৈজু ঢেরা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি শোবে নয়? এস, আমি ঐখানেই বস্‌ছি।"

শয়ন-কক্ষে ঢুকিয়া, খাটের উপর সটান লম্বা হইয়া পড়িয়া, ফৈজু আলস্য ভাঙ্গিয়া একবার হাই তুলিল। তার পর তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া, ঈষৎ বিরক্ত-ভাবে বলিল, "এ সব বাবুয়ানা কি আমার পোষায়! বাড়ীর মধ্যে চুপচাপ বসে থাকা, ছিঃ! বড় দিক্‌ ধরে।"

কৌতুকোজ্জ্বল-নয়নে চাহিয়া টিয়া বলিল, "আর আমার দিক্‌ ধরে না বুঝি? আমিও তো হর-ঘড়ি বাড়ীর মধ্যে রয়েছি।"

উত্তরে ফৈজু একটু সুমিষ্ট পরিহাস করিয়া স্ত্রীর কাঁধে হাত চাপ্‌ড়াইল। টিয়া সলজ্জভাবে হাতখানি সরাইয়া দিয়া, খাটের অন্য পাশে উঠিয়া—জড়-সড় হইয়া শুইল। স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া একটু দুষ্টামী-মাখা বিনয়ের স্বরে বলিল,—"আমার কিন্তু এ বাবুয়ানাটুকুতে কিচ্ছু দিক্‌ ধরে না,—বরং বেশ ভালই লাগে। তোমার মত রাত-দিন ছুটোছুটি করা—উঃ, আমার তো তাক্‌ লেগে যায়! দ্যাখো, মতের মিল হচ্ছে না, তাতে রাগ কোর না যেন।"

ফৈজু বলিল, "ওর জন্যে বিশেষ চেষ্টায় আছি, কিন্তু কুলিয়ে উঠ্‌তে পারি না! এই দ্যাখো না, বাড়ীতে থাকি না বলে বাবা রাগ করে বক্‌লে,—তাই আমি রাগ করেই আজ বাড়ীতে রইলুম; কিন্তু মোল্লার দৌড় তো মস্‌জিদ্‌ অবধি! এখন রাগটা বজায় রাখি কি ছুতো নিয়ে বল দেখি? পড়ে পড়ে খুব ঘুম দেব?"

টিয়া ত্রস্ত হইয়া বলিল, "না,—না, সে—তাতে তোমার শরীর খারাপ হবে। তার চেয়ে ঐখানে বসে, তোমার সেই তুর্কিস্থানের গল্পটা বল,—সে আমার শুন্‌তে বেশ লাগে।"

ফৈজু হাসিয়া বলিল, "আর এক কাজ কর্‌লে মন্দ হয় না—তোমার উপর রাগ করে, কথা-বার্ত্তা বন্ধ করা?"

সবিস্ময়ে টিয়া বলিল, "তুমি আচ্ছা কাটখোট্টা মানুষ তো। আমার দোষ নাই, ঘাট নাই—খামকাই বা তুমি আমার ওপর রাগ করবে কেন? কি করেছি আমি?"

ফৈজু বলিল, "এই দ্যাখো,—দেখ্‌লে! এক কথায় তুমি তেতে উঠেছ! এর ওপর আর দুটো-একটা কথা ভদ্র দস্তুর-মত চালাতে পার্‌লেই ঝগড়াটা বেশ পেকে ওঠে! তাই করা যাক্‌ এস, ঝগড়া করে কথা বন্ধ—"

টিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া, গম্ভীরভাবে বলিল, "তা তোমার খুসী হয়, তুমি অম্নি-অম্নিই কথা বন্ধ কর,—ঝগড়া-ঝাঁটির দরকার কি? দিদি আজ আসুক, আমি সব কথাই বল্‌ব। সত্যিই তো এমনভাবে জোর করে

তোমার বাড়ীতে রেখে যাওয়া,—এটা ওঁদের ভারী অন্যায় !" একটু থামিয়া সহসা দৃষ্টি ফিরাইয়া স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া, একটু জোরের সহিত পুনরায় বলিল, "তুমি যে আড্ডায় যাচ্ছিলে, যাও,—আমি একলা বাড়ীতে থাকব সে বরং ভাল। তোমায় আমার জন্যে ভাবতে হবে না—" শেষের কথাটা উষ্ণ ঝাঁজে পরিপূর্ণ !

মুহূর্ত্তে ফৈজুর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মাত্র মুহূর্ত্তের জন্যই। নিঃশব্দে আত্ম-দমন করিয়া লইয়া, একটু ম্লান-হাস্যে বলিল, "যো হুকুম বলে সেলাম ঠুকে হুকুম তামিল করতেই তা হলে বেরিয়ে পড়্‌ব না কি ? কোন্ আড্ডায় যাব, ঠিকানাটা বলে দাও দেখি !"

টিয়া কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। উত্তরের প্রত্যাশায়ই হউক অথবা যে কারণেই হউক,—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ক্ষুণ্ণভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফৈজু বলিল, "আজকাল বড় রাগী হয়ে উঠেছ তুমি। সামান্য কথায় এত রাগ ! ছিঃ টিয়া, স্বভাবটা বদলে ফেল্‌বার চেষ্টা কর,—নইলে এর পর, অন্যের কথা দূরে থাক, তোমার নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়েই তোমায় বড় কষ্ট পেতে হবে। মনে রেখো, মা-বাপ রাগী হলে, ছেলেরা তাদের চেয়েও বেশী রাগী হয়ে দাঁড়াতে চায় !"

কথাটা বলিয়াই একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল, "এই দ্যাখো, আমার বাবা একটু রাগী স্বভাবের মানুষ—আমি আবার তাঁর চেয়েও বেশী রাগী হয়েছি। সেই জন্যে নিজের রাগকে আমি নিজেই বড় ভয় করে চলি। আর যতটা পারি, চেষ্টা করি—যেন রাগটা নিজের ভেতরই সাম্‌লে নিতে পারি ! রাগকে বাড়্‌তে দেওয়া মহাপাপ !"

দৃষ্টি ফিরাইয়া চাহিয়া, টিয়া বলিল, "তাই বুঝি আমার ওপর রাগ করে, হিন্দুস্থান ছেড়ে চম্পট দিয়েছিলে ?"

"তোমার ওপর রাগ করে !" ফৈজু ব্যথিত ভাবে হাসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এখনো তুমি তাই মনে করে আছ ? তোমার সে ধাঁধা কেটেও কাটছে না দেখছি যে ! আমার পয়সা নেই বলে আমার স্ত্রী বিনা-চিকিৎসায় মারা যাবে,—আর আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে-বসে, সহিষ্ণুভাবে তাই দেখ্‌ব, সে শক্তি আমার ছিল না, তাই অসহিষ্ণু হয়ে টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছিলুম, তোমার ওপর রাগ করে নয়, কারুর ওপরই রাগ করে নয় !" একটু হাসিয়া, শুষ্ক কণ্ঠে ঢোক গিলিয়া ফৈজু আবার বলিল, "কিন্তু আমার খুব বিশ্বাস ছিল যে, দায়েপড়ে যে দোষ করেছি, তোমার সঙ্গে দেখা হলেই, তা আমি মিটমাট করে নিতে পারব। কিন্তু তুমি যে এত সন্দেহ, এত অবিশ্বাস আমায় করবে, তা আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করি নি।"

মনে-মনে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া, সঙ্কুচিত ভাবে পাশ ফিরিয়া শুইয়া টিয়া বলিল, "আমি তোমায় সন্দেহ করেছি ? অবিশ্বাস করেছি ? যাঃ'হোক, আমি বলতে পারলেই হোল ?"

ফৈজু বলিল, "আড্ডার কথাটা তুল্লে কেন বল দেখি ? বাইরে দরকারী কায পড়ে রয়েছে, তাই বাড়ীর মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে আমার ভাল লাগ্‌ছে না,—তাও, সেটা কার কায জান ? দিদিমণির মহলের সেই গোলমাল ! সব্বাই নিজের কাযে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছে,—ওটার দিকে কেউ ভাল করে নজর দিচ্ছে না। দিদিমণি, চুলোয় যাক, বলে চুপ-চাপ হয়ে গেছেন। কিন্তু তাই বলে আজকের দিনে আমার তো চুপ করে থাকা উচিত নয়। বরং কেউ গা গোছ করছে না বলে ঐ দিকে বেশী করে মন দেওয়া আমার উচিত। ধর্ম্মের কাছে আমায় জবাবদিহি করতে হবে,—দিদিমণি যে উপকার করেছেন আমার—"

ব্যস্ত ভাবে বাধা দিয়া টিয়া বলিল, "তা সেটা বল্লেই তো হোত,—দিদিমণির কাযে যাবে ! সে কি কেউ তোমায় বাধা দিতে পারে ? আমি ভেবেছিলুম, তুমি বুঝি নজরু সাহেবদের আড্ডায় যাচ্ছ,—তাই রাগ ধরেছিল। দ্যাখো, যেখানেই যাবে যাও—ঐ কুষ্ঠেদের আড্ডায় যেও না—তা আমি তোমায় মানা করে দিচ্ছি !"

ফৈজুর বিমর্ষ মুখে একটু কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল। পরিহাস-ভরে ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল, "ওদের আড্ডার চেহারাটা এখনো চোখে দেখবার ফুরসুৎ পাই নি,—কিন্তু ঠিক জানি,—ওখানে কুষ্ঠব্যাধি কারুর হয় নি।"

টিয়া বলিল, "ঐ একই কথা ! আলসে কুঁড়ে মানুষ, আর কুষ্ঠে রোগী,—ও দুই সমান ! ওদের ছোঁয়াচ লাগাতে নেই। ওখানে তুমি যেও না। দিদিমণির কাযে যাও বরং, সে ভাল হবে। ওঠো !"

ফৈজু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া পাশে শুইয়া পড়িল।

বলিল, "থাক, বাবা বারণ করে গেছে, তোমায় একলা রেখে এখন যাব না।"

দুষ্ট টিয়ার ঠোঁট দু'খানি আবার কঠিন কৌতুকের ধারে তীক্ষ্ণ-শাণিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল, "তা সে জানি আমি! না-হলে তুমি এমন মেয়েরবাণ কথনই নও যে, আমার জন্যে দয়া করে বাড়ীতে বসে থাকবে। যাও, চক্ষু'লজ্জার দরকার নাই, আমি খিল দিয়ে এসে ঘুমুই,—ওঠো!" টিয়া নিজে উঠিয়া বসিল।

ফৈজু চক্ষু বুজিয়া নীরবে একটু হাসিল; কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া রহিল। টিয়া চাহিয়া দেখিয়া, মাথা নাড়িয়া বলিল, "উহুঁ, পড়ে-পড়ে অমন ভাল-মানুষের মত হাস্‌তে হবে না,—তুমি ওঠো! আবার, আমি এখনি ঘুমিয়ে পড়্‌ব,—তখন নিঃশব্দে উঠে পালাবে,—তোমার সে বিদ্যে খুব আছে,—সে আমি জানি,—তোমায় বিশ্বাস নেই!" টিয়া কথা কয়টা শেষ করিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "শুন্‌তে পাচ্ছ?"

চোখ মেলিয়া চাহিয়া স্নিগ্ধ হাস্যে ফৈজু বলিল, "খুব পাচ্ছি। এমন শানানো বচন,—এ কি আর কাণের পর্দায় আটক থায়! কিন্তু তখন যদি জানতুম যে, এই ছোট্ট ঠোঁট-দু'খানির বিষের ধার এত, তা হলে·····!"

গৃহের সমস্ত শব্দ অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল! চপল রসনার মুখর কলরব একেবারে নীরব! সাময়িক গ্লানি-দ্বন্দ্বগ্ধ, পীড়িত, ম্লান চিত্তের সমস্ত অবসাদ ভেদ করিয়া, অকস্মাৎ উন্মত্তবেগে বিপুল পুলকের বিদ্যুৎ চারিটি সম্মিলিত চোখের উপর কৌতুকভরে হাসিয়া উঠিল দুটী তরুণ হৃদয় কাঁপাইয়া, গভীর পরিতৃপ্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস উচ্ছ্বাস ভরে বহিয়া, দু'জনকে পরিপ্লাবিত করিয়া দিল!

নত হইয়া স্বামীর বুকের মধ্যে মাথাটি রাখিয়া, পুনরায় গভীর স্বস্তিভরা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া, মৃদুস্বরে টিয়া বলিল, "তা হলে আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই—তুমি চুপটি করে শুয়ে থাক।"

ফৈজু হাসিল, বলিল, "এত অবিশ্বাসের পর নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পার্‌বে?"

টিয়া চক্ষু বুজিয়া হাসি-মুখে বলিল "পারব,—তুমি থাম।"

প্রেমের কথা

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাক্ষাদ্‌-দর্শন

ইন্দ্রজালে, স্বপ্নে বা চিত্রে দর্শনে প্রেমসঞ্চার অতিমাত্রায় রোম্যাণ্টিক ব্যাপার, ইহা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপ মন্তব্য করিবেন। ইহার দৃষ্টান্তও সাহিত্য-জগতে তত বেশী নহে। পক্ষান্তরে সাক্ষাদ্‌-দর্শনে প্রেম-সঞ্চারের ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত পৌরাণিক আখ্যানে, রূপকথায়, কাব্যে, নাটকে, পাওয়া যায়। এই সাক্ষাদ্‌-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চারই ইংরেজী সাহিত্যে সুপরিচিত 'love at first sight' অর্থাৎ প্রথম দর্শনে প্রণয়। ইহাই আসল মজেলী প্রেম।

ইহারও সম্ভাব্যতা-সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তর্ক যে তুলেন নাই এমন নহে। এই দর্শনমাত্র প্রণয়সঞ্চার এমন অতর্কিত, এমন বিস্ময়কর, যে অনেকে ইহাকেও অতি-মাত্রায় রোম্যাণ্টিক, অতএব অসম্ভব, মনে করেন। টেনিসন love at first sight এর উপরও এক কাঠি উঠিয়া love at first glimpse অর্থাৎ চক্ষের নিমিষে প্রণয়ের একটি ঘটনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—Love at first sight



শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত

শিল্পী— শ্রী[illegible]

Blocks by Bharatvarsha Halftone Works

May seem—with goodly rhyme and
reason for it—
Possible—at first glimpse—and for a face
Gone in a moment—strange.

[*The Sisters.*]

এরূপ প্রণয়ের আকস্মিকতায় তিনি বেশ একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। (আলোক-চিত্রের snap-shotও ইহার কাছে হারি মানে!) শেক্‌স্‌পীয়ারও Oliver ও Celiaর প্রথমদর্শনে প্রেম-সঞ্চারের প্রসঙ্গে রোজালিণ্ডের মুখ দিয়া বেশ একটু বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন,—"There was never anything so sudden but the fight of two rams and Caesar's thrasonical brag of 'I came, saw and overcame:' for your brother and my sister no sooner met but they looked, no sooner looked but they loved, no sooner loved but they sighed, no sooner sighed but they asked one another the reason, no sooner knew the reason but they sought the remedy:" Etc. [*As You Like It.* v. ii.] জর্জ্জ এলিয়ট ছদ্মনামধারিণী আখ্যায়িকা রচয়িত্রী 'দি মিল্ অন্ দি ফ্লস্'এ একজন প্রেমিক যুবকের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, 'Such passions are never heard of in real life'. [*The Mill on the Floss*: Bk. VI, Ch. II.] অথচ যে ঘটনার প্রসঙ্গে এই মন্তব্য, সেই ঘটনাই এই শ্রেণীর প্রেম-সঞ্চারের একটি খাঁটি দৃষ্টান্ত। প্রেমিক যুবক এক্ষেত্রে পূর্ব্ব-প্রণয়িনীকে ভুলিয়া নব-পরিচিতার রূপে আকৃষ্ট হইয়া এইভাবে নিজের মনের কাছে সাফাই দিতেছেন; কিন্তু এই নব অনুরাগ এত প্রবল হইল যে, তিনি পূর্ব্ব-প্রণয়িনীকে ত্যাগ করিয়া নব-প্রণয়িনীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। টেনিসন ও শেক্‌স্‌পীয়ার এরূপ প্রণয়-সঞ্চারে বিস্ময় প্রকাশ করিলেও ইহাকেই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়া সুন্দর-ভাবে ইহার বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছেন, 'প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না।...... প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশকুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবক-যুবতীগণের মনোরঞ্জনের জন্য কবিগণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।...... ভালবাসা বা স্নেহ, যাহা সংসারে এত আদরের, তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না।...... নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয়া হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময় ভাসিয়া যায়।' ['সীতারাম', ১ম খণ্ড ১০ম পরিচ্ছেদ।] এস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে প্রেমকে আকাশ-কুসুম বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু শেষটা বোতরফা গাহিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে তিনি দুই প্রকার হৃদয় বৃত্তির প্রভেদ বেশ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন। ইহা হইতে শুধু সীতারামের আচরণের কেন, জগৎ প্রাণয়টের পূর্ব্ববর্ণিত নায়কের আচরণেরও প্রকৃত কারণ ধরা গেল। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে অভিরামস্বামী বলিতেছেন। 'বালিকাস্বভাব-বশতঃ প্রথম দর্শনে মনশ্চাঞ্চল্য হইয়াছে আমার বোধ ছিল যে দর্শনমাত্র গাঢ় অনুরাগ জন্মিতে পারে না।' ['দুর্গেশনন্দিনী', ১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।] যাহা হউক, গ্রন্থকার ('সীতারামে' নিজের জোবানী) ও অভিরামস্বামী বৃদ্ধ বয়সে যাহাই বলুন, তাঁহারা উভয়েই এরূপ প্রেমের প্রভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই। জগৎসিংহের কথাই মানিতে হইবে। "তোমার সখীর রূপ, একবার দর্শনেই আমার হৃদয়মধ্যে গম্ভীরতর অঙ্কিত হইয়াছে, এ হৃদয় দগ্ধ না হইলে তাহা আর মিলায় না।" ইত্যাদি [১ম খণ্ড ১৬শ পরিচ্ছেদ।] প্রেমের প্রভাবে তিলোত্তমার স্বভাব-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিমলার উক্তিও ইহার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র নিজের বা পরের জোবানী যাহাই বলুন, তিনি কার্য্যকালে প্রথমদর্শনে প্রণয়-সঞ্চারের চিত্র অঙ্কিত করিতে কসুর করেন নাই। যাক্, সে কথা যথাস্থানে বলিব।

এই শ্রেণীর প্রণয় সম্বন্ধে লোকপ্রিয় আখ্যায়িকাকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রমাসুন্দরী'তে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। যথা...'যাহা অপ্রত্যাশিত, যাহা অপরিচিত, যাহা নূতন, তাহার আকর্ষণ অল্প বয়সের মনে

অত্যন্ত প্রবল।*...প্রেমে প্রথম দর্শনবাদ যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা প্রথম দর্শনের একটা আকর্ষণকে প্রেম বলিয়া ভুল করেন। হৃদয়ের পরিচয়ে প্রেমের বিকাশ। † প্রথম দর্শনে হৃদয়ের পরিচয় হয় না। প্রথম দর্শন প্রেম জন্মিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে কিন্তু একটা আকর্ষণ জন্মিবার পক্ষে যথেষ্ট বটে। কিন্তু শুধু আকর্ষণ মাত্র। 'তাহার অপেক্ষা আর একটা প্রবলতর আকর্ষণ উপস্থিত হইলেই মন নূতন পথে ছুটিবে। আকর্ষণ ঘনীভূত হইয়া যখন স্থায়িত্বলাভ করে, তখনই তাহা প্রেম, পূর্ব্বে নহে।' ['রমাসুন্দরী', ২০শ পরিচ্ছেদ।] 'রমাকে নবগোপাল যত দেখিয়াছে, তাহার কিশোর হৃদয়টির যত পরিচয় পাইয়াছে ততই মুগ্ধ হইয়াছে। সেদিন তাহার মনোভাবের বর্ণনা করিতে গিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, তাহা একটা আকর্ষণ মাত্র,—প্রেম নহে; কিন্তু আজ আর জোর করিয়া সে কথা বলিতে পারি না। এক সপ্তাহে তাহার মনে গভীরতর ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। এখন আর তাহা শুধু নবজাগ্রত কৌতূহল ও তজ্জনিত আকর্ষণ নহে। ইহা একটি সুমিষ্ট অথচ বেদনা-জড়িত আকাঙ্ক্ষা।' [২২শ পরিচ্ছেদ।]

বোধ হয় এই মতবাদের পক্ষপাতিনী হইয়াই শ্রীমতী নিরুপমা দেবী 'দিদি' আখ্যায়িকায় যুবক অমর ও বালিকা চারুর হৃদয়ে প্রথমদর্শনেই উদ্দাম প্রণয়ের সৃষ্টি করেন নাই। অনেকগুলি ঘটনায়, পুনঃ পুনঃ দর্শন, রোগে সেবা, সাহচর্য্য, অসহায়া চারুর মাতার বাগ্‌দান, ইত্যাদি নানা কারণের সমবায়ে ক্রমে নায়কের হৃদয়ে প্রণয়ের প্রগাঢ়তা জন্মিল, গ্রন্থকর্ত্রী এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। তিনি রীতিমত রোমান্সের সৃষ্টি করেন নাই।

পক্ষান্তরে, বিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও সমালোচক কোল্‌রিজ জোরের সহিত বলিয়াছেন, যে প্রকৃত প্রণয়মাত্রই এক মুহূর্ত্তের দেখায় ঘটিয়া থাকে।—'It appears to me that in all cases of real love, it is at one moment that it takes place. That moment may have been prepared by previous esteem, admiration, or even affection,—yet love seems to require a momentary act of volition by which a tacit bond of devotion is imposed, a bond not to be thereafter broken without violating what should be sacred in our nature.' [*Coleridge: Lectures on Shakespeare.* Section IV 1818.]

রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের কবি মার্লো ইহা অপেক্ষাও জোরের সহিত বলিয়াছেন 'Who ever loved, that loved not at first sight'? [*Hero and Leander.*] 'কে বেসেছে কবে ভালো, যদি না বেসেছে ভালো প্রথম দর্শনে?' [ইদং মম।] আর শেক্‌স্‌পীয়ারের রোজ্যালিণ্ডও ঠেকিয়া শিখিয়া সেই নজির শিরোধার্য্য করিয়াছেন। [*As you Like It* III. V.] অতএব কোল্‌রিজের মত দার্শনিক ও কাব্যরসিক এবং মার্লো-শেক্‌স্‌পীয়ারের ন্যায় কবিগণ যে রায় দিয়াছেন, তাহার উপর কথা কহিবে, এমন অরসিক কে আছে? বরঞ্চ, হিন্দু-সন্তান আমরা ইহারই অনুবৃত্তি করিয়া বলিব, হিন্দুর বিবাহ-সংস্কারের অঙ্গ 'শুভদৃষ্টি'তে এই প্রথম-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চারের গুহ্য তত্ত্ব নিহিত আছে!

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি ভবভূতি প্রেম-সম্বন্ধে না হইলেও স্নেহ-সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। 'ভূয়সা জীবিধর্ম্ম এষ যদ্রসময়ো কস্যচিৎ কচিৎ প্রীতিঃ যত্র লৌকিকানাং ব্যাহারঃ তারামৈত্রকং চক্ষূরাগ ইতি তমপ্রতিসংখ্যেয়মনিবন্ধনং প্রেমাণমামনন্তি।' (উত্তরচরিত, পঞ্চম অঙ্ক।) 'ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতুর্নখলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।' (উত্তর-চরিত, ষষ্ঠ অঙ্ক।) ফল কথা, ভবভূতি এই 'তারামৈত্রকং' বা 'চক্ষূরাগ'কে অপ্রতিসংখ্যেয় অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ ও 'অনিবন্ধন' অর্থাৎ অহেতুক, বা 'আন্তর হেতু' অর্থাৎ বাহিরের নহে ভিতরকার কোন হেতু হইতে সঞ্জাত, এই মন্তব্য করিয়াছেন। কোল্‌রিজ প্রণয়মাত্রই প্রথমদর্শন-জনিত এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, ভবভূতি ইহার অন্তর্নিহিত রহস্যটুকু বুঝাইয়াছেন।

কোল্‌রিজের পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্তব্যের প্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে। কতকগুলি স্থলে প্রথম-দর্শনের সম-

* 'সীতারাম' হইতে উদ্ধৃত অংশ তুলনীয়।

† 'বিষবৃক্ষে' (৩২শ পরিচ্ছেদে) হরদেব ঘোষালের পত্র তুলনীয়।

কালেই গুণানুরাগসঞ্চারিত হইবার অবসর ঘটে। ক্ষাত্রযুগে বীর্য্যশুল্কা কুমারী বীরের ধনুর্ভঙ্গ, লক্ষ্যবেধ প্রভৃতি শৌর্য্য-বার্য্যের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধা হইতেন। (তবে এ সব ক্ষেত্রে কন্যার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর বিবাহ নির্ভর করিত না।) আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে নায়কের বীরত্বদর্শনে গুণমুগ্ধা নায়িকার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চারের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'কমলে কামিনী'তে (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) ব্রহ্মদেশের রাজকন্যা রণকল্যাণী মণিপুরের সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহনের অদ্ভুত বীরপণা স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার প্রতি তন্মুহূর্ত্তেই প্রণয়বতী হইলেন। (ইন্দীবরনয়নার পক্ষপাতী নায়কও প্রথম-দর্শনেই প্রেমে পড়িলেন।) রোজালিণ্ডের ব্যাপারও কতকটা এই প্রকারের, তাহা পরে বুঝাইব। আবার উক্ত ক্ষাত্রযুগে স্বয়ংবর সভায় প্রত্যেক পাণিপ্রার্থীর গুণাবলি কীর্ত্তিত হইত, সুতরাং রূপদর্শন ও গুণকীর্ত্তন শ্রবণ যুগপৎ ঘটিত। ইহা বোধ হয় বৈজ্ঞানিকের ব্যাখ্যাত (Natural selection) প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে এই গুণপক্ষপাত বিদ্যমান থাকাতে কুক্ষদর্শিগণ হয় ত বলিবেন যে, এগুলি প্রথম-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চারের খাঁটি উদাহরণ নহে। তাহা হইলে কি দার্শনিক বিশ্লেষণে এইটিই চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া ধার্য্য করিব যে, প্রথম-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চার রূপ-মোহেরই নামান্তর (শেক্স্পীয়ার যাহাকে fancy বলেন)? দুষ্মন্ত প্রভৃতির প্রমুখাৎ (মানুষীভাঃ কথং নু স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ, ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুঃ, শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুঃ, সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্, অধরঃ কিশলয়রাগঃ, চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্বযোগা, ইত্যাদি) রূপ-প্রশংসার উচ্ছ্বাস শুনিয়া তাহাই কিন্তু মনে হয়। শেক্স্পীয়ারের রোমিওর প্রাণেও জুলিয়েটের রূপ-দর্শনেই প্রেমের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে (প্রথম অঙ্ক, শেষ দৃশ্য)।

O, she doth teach the torches to burn bright!
Beauty too rich for use, for earth too dear!
Did my heart love till now? forswear it sight!
For I ne'er saw true beauty till this night!

এইভাবে প্রেমের স্বরূপ-নির্ণয় করিয়া অনেকে মন্তব্য করেন যে, যৌবনসঞ্চার না হইলে, অন্ততঃ মহাজন পদাবলীতে বর্ণিত বয়ঃসন্ধিকাল উপস্থিত না হইলে, এরূপ প্রেমের উদ্ভব হইতে পারে না। কেন না, যখন রূপতৃষ্ণা, সম্ভোগস্পৃহা, ইহার মূলে রহিয়াছে, তখন রূপের, যৌবন-লাবণ্যের মোহিনী শক্তি বর্ত্তমান না থাকিলে ইহার উদ্ভব হইতে পারে না। এই মত একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে ও ইউরোপীয় সাহিত্যে 'কন্যাস্থ জাতোপযমা সলজ্জা নবযৌবনা' এই শ্রেণীর প্রণয়কাহিনীর নায়িকা, সুতরাং এই মতের পোষক-প্রমাণই পাওয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যেও যে সকল স্থলে এই শ্রেণীর প্রেমের বর্ণনা আছে, সে সকল স্থলে নায়িকা যুবতী, যথা বঙ্কিমচন্দ্রের তিলোত্তমা, মনোরমা, রজনী, রোহিণী, অথবা নায়িকার শ্রীরাধার মত বয়ঃসন্ধিকাল, যথা বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী-কুন্দনন্দিনী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পৌরাণিক আখ্যানে, রূপকথায়, কাব্যে, নাটকে, পাওয়া যায়। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার উপাখ্যান ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই প্রথম দর্শনে প্রেমকে সঞ্চারের সমকালেই সার্থক করিবার জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রে গান্ধর্ব্ববিবাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মালতী-মাধব, নাগানন্দ, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যেও এই শ্রেণীর প্রণয়-সঞ্চারের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিদ্ধশালভঞ্জিকা প্রভৃতিতে স্বপ্নে বা চিত্রে দর্শনে প্রথম প্রণয়সঞ্চার হইলেও সাক্ষাদ্-দর্শনেই তাহা বদ্ধমূল হইয়াছে। শেক্স্পীয়ারের রোমিও জুলিয়েটের, ফার্ডিনাণ্ড ও মিরাণ্ডার, অর্ল্যাণ্ডো ও রোজালিণ্ডের, অলিভার ও সিলিয়ার প্রণয়সঞ্চার এই শ্রেণীর। ফার্ডিনাণ্ড ও মিরাণ্ডার বেলায় শেক্স্পীয়ার প্রস্পেরোর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, 'At the first sight they have changed eyes'; তবে এক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতেই মিরাণ্ডার হৃদয় ঝড়ে বিপন্ন জাহাজের যাত্রী ফার্ডিনাণ্ড প্রভৃতির জন্য করুণায় পূর্ণ হইয়াছিল; সেই করুণা নায়কের প্রথমদর্শনে প্রণয়ে পরিণত হইল। (করুণার প্রণয়ে পরিণতি-তত্ত্ব পর-পরিচ্ছেদে পরিস্ফুট করিব।) অর্ল্যাণ্ডোর বেলায়ও রোজালিণ্ডের হৃদয় করুণায় আর্দ্র হয়, পরে যুবকের বীরত্ব-দর্শনে প্রশংসাপূর্ণ শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, (১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য)

উভয়ের সমবায়ে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মে। যাহা হউক, অর্ল্যাণ্ডো-রোজ্যালিণ্ড ও অলিভার-সিলিয়ার প্রথমদর্শনে প্রণয়-সঞ্চারের আলোচনা এই পরিচ্ছেদের আরম্ভেই করিয়াছি।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা' ও 'রাধারাণী'তে এই প্রথমদর্শনে প্রণয়সঞ্চারের দৃষ্টান্ত পাই। ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী'তে বিজয় ও কামিনীর বেলায়ও এই শ্রেণীর প্রণয়-সঞ্চার (১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্রেণীর প্রণয়ের সম্ভাব্যতা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি প্রথম রচনা 'দুর্গেশনন্দিনী' ভিন্ন অন্য কোন আখ্যায়িকায় এই শ্রেণীর প্রণয়কে বড় একটা আমল দেন নাই। দ্বিতীয় আখ্যায়িকা 'কপালকুণ্ডলা' ও পরে লিখিত 'রাধারাণী'তে দুইটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতেও রকমফের আছে, দ্বিতীয় প্রকারের প্রণয়সঞ্চারের আলোচনা-কালে তাহা বুঝাইব। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর প্রথমদর্শন-সম্বন্ধেও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, 'এই রোহিণী গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন?' (কৃষ্ণকান্তের উইল, ১ম খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ।)

দেবমন্দিরে 'মন্মথের দৌরাত্ম্য'

যে সমাজে অবরোধ-প্রথা নাই, নারী ও পুরুষের অবাধে মেলামেশা চলে, সে সমাজে এরূপ পূর্ব্বরাগের খুবই অবসর আছে। সাহেবী সমাজে দেখা যায়, মেলামেশার প্রধান অবসর বল্‌নাচ-উপলক্ষে। এই শুভ সুযোগে পূর্ব্বরাগ-সঞ্চারের ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত বিলাতী নভেল-নাটকে পাওয়া যায়। শেক্‌স্‌পীয়ারের রোমিও-জুলিয়েটের পূর্ব্বরাগ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গির্জ্জায় সমবেত-উপাসনা-উপলক্ষেও দর্শনের অবসর আছে, তাহার ফলেও পূর্ব্বরাগ-সঞ্চার হইয়াছে, এমন নজির পাওয়া যায়। ইতালীয় কবি পেট্রার্ক গির্জ্জায় লরাকে দেখিয়া প্রেমে পড়েন, বোকাচিও গির্জ্জায় 'মেরি অভ্ আরাগন'কে দেখিয়া প্রেমে পড়েন—দুইটি প্রকৃত ঘটনা, কাল্পনিক উপাখ্যান নহে। এই শ্রেণীর ব্যাপার লইয়া আধুনিক আখ্যায়িকা-কার টমাস্ হার্ডি 'Tess of the Durber Villes' আখ্যায়িকায় একটু ঠোকর মারিয়াছে—'This sun's day, when flesh went forth to coquet with flesh while hypocritically affecting business with spiritual things.'

সেকালে হিন্দুসমাজে অবরোধ-প্রথার তত কড়াক্কড় ছিল না, সুতরাং বসন্তোৎসব, কন্দুকোৎসব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে অনূঢ়া রাজকন্যা প্রভৃতি উৎসব দর্শনের জন্য গৃহের বাহির হইতেন, তথায় প্রেমিকের নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইতেন, নিজেও প্রেমিকের দর্শনলাভ করিতেন, এইরূপে পূর্ব্বরাগ সঞ্চার হইত।* আধুনিক হিন্দুসমাজে অবরোধ-প্রথার কড়াক্কড় বেশী, সুতরাং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে, দেবমন্দিরে ভিন্ন অপরিচিত স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের চোখে পড়া ঘটে না। এসব স্থানে অবরোধপ্রথার কতক শিথিলতাও আছে। এইজন্যই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী অর্থাৎ তিলোত্তমার বেলায় (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) এবং ৺রমেশচন্দ্র দত্ত 'বঙ্গবিজেতা'য় বিমলার বেলায় (নবম পরিচ্ছেদ) দেবমন্দিরে নায়ক-নায়িকার প্রথম-দর্শন ও প্রণয়-সঞ্চার ঘটাইয়াছেন, (বিমলার বেলায় ইহা একতরফা); সেদিনও 'ভারতবর্ষে' (কার্ত্তিক, ১৩২০) 'বাসিফুলে'র মালী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'পুষ্পাঞ্জলি'তে (অর্থাৎ ঐ নামের একটি ক্ষুদ্র করুণ-কাহিনীতে) এইরূপ ব্যাপার দেখিয়াছি। অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'দেবমন্দিরে মন্মথের দৌরাত্ম্যে'র কল্পনার জন্য দূষিয়াছেন এবং ইহা বিলাতী সমাজ ও সাহিত্যের গির্জ্জায় নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ সঞ্চারের অনুকরণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বিখ্যাত বিলাতী সমালোচক ডনলপ্ দেখাইয়াছেন যে ইহা পুরাতন গ্রীক রোম্যান্সেও একাধিক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। ইউরোপে ইহার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত হিরো ও লিয়াণ্ডারের প্রেমকাহিনী। Theagenes ও Chariclea, Habrocomas ও Anthia, Cyrus ও Mandane (শেষটী ফরাসী আখ্যায়িকা)—প্রভৃতি প্রণয়িযুগলের দেব-

* দশকুমারচরিতে রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরী, কামপাল ও কান্তিমতী এবং মিত্রগুপ্ত ও কন্দুকবতীর পূর্ব্বরাগ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

মন্দিরে প্রথম-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চার হইয়াছিল। * আবার আধুনিক আখ্যায়িকা-কার বুলওয়ার লিটন 'The Last Days of Pompeii' আখ্যায়িকায় গ্রীক যুবক-যুবতী Glaucus ও Ioneর বেলায় ইহারই জের টানিয়াছেন (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। † পুরাতন ইউরোপে এই প্রথার বহু দৃষ্টান্ত থাকিলেও এবং আধুনিক ইউরোপে শিক্ষায় অপরিচিত স্ত্রী-পুরুষের প্রথম দর্শনে প্রণয়সঞ্চার ঘটিলেও বঙ্কিমচন্দ্র যে এক্ষেত্রে বিলাতী প্রথার অনুকরণ করিয়াছেন, বলা চলে না। প্রমাণ দিতেছি।

সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায়, নাগানন্দে (১ম অঙ্কে) নায়ক জীমূতবাহন ও নায়িকা মলয়বতীর তপোবন-গৌরীগৃহে প্রথম দর্শনে প্রণয়-সঞ্চার ত ঘটিয়াছে, এবং উক্ত শুভদৃষ্টির পূর্ব্বে মলয়বতী ও তাঁহার সখী চতুরিকার কথাবার্ত্তা হইতে জানা যায় যে, এত করিয়া গৌরীপূজা করিয়াও রাজ-কন্যার অভীষ্ট বর মিলিল না, অতএব এ পণ্ডশ্রম কেন, এই বলিয়া চতুরিকা রঙ্গ করিতেছে এবং তদুত্তরে রাজকন্যা বলিতেছেন যে, গৌরী তাঁহাকে স্বপ্ন দিয়াছেন, 'তোমার ভক্তিতে প্রসন্না হইয়াছি, অচিরে বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন।' স্বপ্নও হাতে হাতে ফলিল। এই লোভেই রাজকন্যা বীণাবাদন দ্বারা গৌরী প্রসাদন করিতে আসিয়াছিলেন। সহচরী চেটী চতুরিকা 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলারই মত। এই নজির ত সংস্কৃত সাহিত্যেই রহিয়াছে, অথচ সংস্কৃত সাহিত্যে ধুরংধর কেশরী সমালোচকগণ ইহা বিস্মৃত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিলাতী প্রথার অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন. কেন? হিন্দুকন্যা বালিকাকাল হইতে অভীষ্ট বর পাইবার জন্য শিবপূজা করে, তিলোত্তমা শৈলেশ্বরের পূজা করিয়া (মলয়বতীর গৌরী প্রসাদনের ন্যায়) অভীষ্ট বর পাইলেন, ইহা বলিতে পারা যায় না কি?

'মালতীমাধবে' প্রথম সাক্ষাৎ যদিও দেব-মন্দিরে ঘটে নাই, তথাপি চৌরিকাবিবাহ নগর-দেবতা-গৃহে হইয়াছে। ইহাও ত সংস্কৃত-সাহিত্যে রহিয়াছে।

আর দেব-মন্দিরে নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ যদি গর্হিত হয়, তবে ত শান্তরসাস্পদ তপোবনে দুষ্মন্ত শকুন্তলার পূর্ব্বরাগও গর্হিত ব্যাপার। না, কবি নায়কের জোবানী

---

* 'Theagenes and Chariclea having seen each-other in the temple, became mutually enamoured. The contrivance of this incident seems to be borrowed from the Hero and Leander of Musæus, where the lovers meet in the fane of Venus at Sestos. Places of worship, however, were in those days the usual scene of the first interview of lovers, as women were at other times much confined and almost inaccessible to admirers. There too, even in a later period, the most romantic attachments were formed. It was in the chapel of St Clair, at Avignon, that Petrarch first beheld Laura: and Boccaccio became enchanted with Mary of Arragon in the Church of the Cordeliers at Naples—DUNLOP: *History of Fiction* ch 1 page 19.

'In this work (Ephesiaca) the hero and heroine (Habrocomas and Anthia) became enamoured in the temple of Diana.' DUNLOP: ch 1 p 35.

'It was in a temple of Sinope that Cyrus first beheld Mandane rhe heroine of the romance ... Cyrus became deeply enamoured of the princess (Le grand Cyrus a French romance). DUNLOP. ch XII p 356.

† One day I entered the Temple of Minerva to offer up my prayers * * I turned suddenly round and just behind me was a female. She had raised her veil also in prayer; and when our eyes met, methought a celestial ray shot from those dark and smiling orbs at once into my Soul. * * * We stood side by side, while we followed the priest in his ceremonial prayer; together we touched the knees of the Goddess, together we laid our olive garlands on the altar. I felt a strange emotion of almost sacred tenderness at this companionship. We, strangers from a far and fallen land, stood together and alone in that Temple of our country's deity: was it not natural that my heart should yearn to my country woman? for so I might surely call her. I felt as if I had known her for years; and that simple rite seemed, as by a miracle, to operate on the sympathies and ties of time—BULWER LYTTON: The LAST DAYS OF POMPEII. Chapter II.

'শান্তমিদমাশ্রমপদম্' ইত্যাদি সাফাই দিয়াই নিষ্কৃতি পাইলেন? আবার, শিবমন্দিরে চন্দ্রাপীড় বীণাবাদন-তৎপরা মহাশ্বেতাকে দেখিয়া তাঁহার প্রেমে পড়িলেন না বটে, কিন্তু দেবমন্দিরে পরস্পরের আলাপের ফলে যখন মহাশ্বেতার মারফত চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর পরিচয় পাইলেন ও যথাকালে প্রণয়-সঞ্চার ঘটিল, তখন ইহাকেও গর্হিত বলিতে হয়!

আসল কথা, যে অন্যোন্য-দর্শনের ফলে পবিত্র-প্রণয়ের উদ্ভব হয়, ও পবিত্র বিবাহসংস্কারে সেই পবিত্র-প্রণয়ের শুভ পরিণাম হয়, সেই অন্যোন্যদর্শন দেবমন্দিরে ঘটিলে দোষ কি? হরগৌরী ত এইরূপ প্রণয় ও পরিণয়ের অনুকূল। শিবপূজা গৌরীপূজা ত কুমারীরা অভীষ্ট বর লাভের জন্যই করেন।*

পক্ষান্তরে, দর্পণকার যে অষ্ট অভিসার-স্থানের মধ্যে ভগ্ন দেবালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন (তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৯· শ্লোক) তাহা অতি জঘন্য ব্যাপার। তাহার সহিত এ· পবিত্র-প্রণয়-সঞ্চারের তুলনা করিলে কুরুচি ও সুরুচি প্রভেদ বুঝা যায়। ইতালীয় কবিকুলশেখর পেত্রার্ক গির্জ্জায় পরস্ত্রী লরাকে দেখিয়া চিরজীবনের জন্য তাহার প্রেমে মস্‌গুল হইয়া রহিলেন, এই অবৈধ প্রণয়ে ও জীমূতবাহন মলয়বতীর, মাধব মালতীর, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার, জগৎসিংহ তিলোত্তমার বৈধ প্রণয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জীমূতবাহন যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন যে গৌরীগৃহস্থিতা সুন্দরী কন্যকা—পরস্ত্রী নহে—ততক্ষণ তিনি সে গৃহে প্রবেশ করেন নাই। এইখানেই হিন্দু সাহিত্যের বিশিষ্টতা।

বারান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের প্রণয় সঞ্চারের আলোচনা করিব।

* যুগলাঙ্গুরীয়ে' কুমারী হিরণ্ময়ীর সাগরেশ্বরী-পূজা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য; 'তিনি ঈপ্সিত স্বামীর কামনায় একাদশ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চবৎসর, এই সমুদ্রতীরবাসিনী সাগরেশ্বরী-নাম্নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরথ সফল হয় নাই।' (প্রথম পরিচ্ছেদ।) 'নাগানন্দে' মলয়বতীর গৌরীপূজা তুলনীয়।

বিদেশিনী

[শ্রীহিরণকুমার রায়চৌধুরী, বি এ]

তখন পাটনায় সবে ডাক্তারী দোকান-পাট সাজাইয়া বসিয়াছি। রোগী পাইলে অত্যন্ত উৎসাহ ও পরম যত্নের সহিত নাড়ী টিপিয়া ব্যবস্থা করি।

আমি অবিবাহিত। একটী মাত্র ভগিনী ছিল,—সেও এক্ষণে শস্য-শ্যামল দূর বঙ্গের এক পল্লীগৃহ অলঙ্কৃত করিয়াছে। সংসারে সর্ব্বপ্রকার বন্ধনবিহীন আমি প্রভাতে উঠিয়া সমাগত রোগীদিগকে বিনা-মূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ বিতরণ করি, এবং মাধ্যাহ্নিক গাঢ় নিদ্রার পর সায়ংকালে ষ্টেশনে যাত্রী-গাড়ী দর্শন করি।

শীতকাল—সেদিন বেশ শীত পড়িয়াছে। এক পেয়ালা চা পান করিয়া, সমস্ত শরীরটা একটা বেশ মোটা ওভারকোটে আবৃত করিয়া আরাম-কেদারায় শুইয়া দৈনন্দিন সংবাদপত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতেছিলাম, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া নাতিদীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া জানাইল, বাহিরে একটী স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। আমি স্ত্রীলোকটীকে ভিতরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া চেয়ারে ভাল করিয়া জাঁকিয়া বসিলাম এবং কাগজের প্রতি অধিকতর নিবিষ্টচিত্ত হইলাম। একটু পরেই বেয়ারা পর্দ্দা তুলিয়া স্ত্রীলোকটীকে প্রবেশাধিকার দান করিল।

চশমার ফাঁক দিয়া ঈষৎ চাহিয়া দেখিলাম, স্ত্রীলোকটি পশ্চিমদেশীয়া নহে। বিস্ময়ের উদ্রেক হওয়ায় ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আগন্তুকা বাঙ্গালিনী এবং বহু-অলঙ্কার-ভূষিতা। বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইবে।

বিস্ময় যখন তাহার পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত, তখন সহসা দ্বারান্তরালে মৃদু শিঞ্জিনী-ধ্বনিতে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী কিশোরী যবনিকা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া

বিস্ফারিত নেত্রে আমাকে লক্ষ্য করিতেছে। আমাকে হতবুদ্ধি দেখিয়া অবগুণ্ঠনবতী স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, বাবা, আমরা অত্যন্ত মুস্কিলে পড়িয়াছি। আমরা এক আত্মীয়ের সহিত পাটনা আসিতেছিলাম। ষ্টেশনে আমি ও আমার কন্যা অবতরণ করিয়াছি। কিন্তু আমার আত্মীয় গাড়ীতেই রহিয়া গিয়াছেন। এ স্থল আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তুমি স্বদেশীয়; এজন্য ষ্টেশন মাষ্টার দয়া করিয়া একটী কুলি দিয়া এখানে পৌছাইয়া দিয়াছেন। তুমি আমার ছেলের মত। এক্ষণে আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন।"

আমি তাঁহাকে করুণার্দ্র চিত্তে মাতৃ-সম্বোধনে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার দ্বারা যতদুর সম্ভব হইতে পারে, আমি তাহা করিব। আপনারা শ্রান্ত; এক্ষণে বিশ্রাম করুন।" এই বলিয়া বেহারাকে ডাকিয়া তাঁহাদের বিশ্রামের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া, ষ্টেশনে গিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনসমূহে টেলিগ্রাফ করিয়া দিলাম।

যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। বিশ্রাম-কক্ষে অন্যমনে প্রবেশ করিতেছিলাম; সহসা চুড়ীর কোমল ঝঙ্কারে থমকিয়া দাঁড়াইলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে যেন সহসা সমস্ত দেহে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। সদ্যস্নাতা, আলুলায়িত-কেশা সেই কিশোরী আমার আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় একখানি গ্রন্থ অধ্যয়নে নিরতা। শীতল, মন্দ পবন তাহার ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত চূর্ণ অলকরাজি মৃদু-মৃদু সঞ্চালন করিতেছিল। কোমল চম্পক-অঙ্গুলিগুলি যেন আলস-ভরে পুস্তক-পত্রে সম্বদ্ধ ছিল।

আমি ডাক্তার;—কখনও সৌন্দর্য্যের উপাসক নহি। কলেজে অধ্যয়ন-কালে কত সুঠাম, সুন্দর দেহ তীক্ষ্ণ ছুরিকা-স্পর্শে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। জনক-জননী বর্ত্তমানে কত অপূর্ব্ব যৌবন-শ্রী-ভূষিতা, মালাদান-প্রার্থিনী তরুণীর কথা উপহাসে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। কিন্তু আজি এ কি হইল! এই অজ্ঞাতকুলশীলা বিদেশিনী মুহূর্ত্তমধ্যে মনোরাজ্যে কি বিপর্য্যয় উপস্থিত করিল! আমি স্থান ও কাল ভুলিয়া, অতৃপ্ত নয়নে সেই সরলতা ও মাধুর্য্যময়ী প্রতিমা একান্ত চিত্তে দর্শন করিতেছি, এমন সময়ে বর্ষীয়সীর আহ্বানে পুস্তক রাখিয়া উঠিতেই, তাহার দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। দারুণ লজ্জায় তাহার কপোলদ্বয় অরুণিমাময় হইয়া উঠিল। আনত-নেত্রে চকিত-গতিতে সে বাহির হইয়া গেল।

মৃদু-চরণে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। তাহার অধীত পুস্তকখানি আমার একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। আমি এই বর্ষীয়সী মহিলা ও তাঁহার রূপ-গুণশালিনী তনয়ার পরিচয় লাভের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলাম। কিন্তু তাঁহারা পথ-শ্রান্ত জানিয়া আমার আকুল আগ্রহ সে সময়ের জন্য সংযত করিলাম। মনে করিলাম, মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বিশ্রাম সময়ে সমস্ত পরিচয় অবগত হইব।

টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া নিবিষ্টচিত্তে এই সকল কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে বেহারা দুইটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের শুভাগমন সংবাদ দিল। তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখিলাম, দুইটী ভদ্রলোকই আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাকে দেখিয়া একজন শশব্যস্তে একখানি টেলিগ্রাম দেখাইয়া বলিলেন, "এই সংবাদ আপনি প্রেরণ করিয়াছেন?" আমি উত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করায়, তিনি গাড়ী হইতে না নামিবার এক সুদীর্ঘ অযাচিত কৈফিয়ৎ দিয়া বলিলেন, "আর মশাই, মেয়েছেলে নিয়ে রাস্তা চলার চাইতে আর হাঙ্গাম কিছুতে নাই। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, 'স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া পথ চলিতে নাই'।" তাঁহার হতাশ-গম্ভীর ভাব দেখিয়া আমার অত্যন্ত হাসি পাইয়াছিল। অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি সম্মুখস্থ একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া প্রথমতঃ আমার বংশ-পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং আমি অবিবাহিত জানিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "বোসজা মশায়ের কপাল ভাল।" আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, তিনি বর্ষীয়সী রমণী ও তাঁহার কন্যার জন্য নিজের উৎকণ্ঠা ও ভাবনার কথা অনর্গল বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা যখন প্রচণ্ড বেগময়ী, তখন সহসা সেই কিশোরী দ্বার ঈষৎ ফাঁক করিয়া বলিল, "মামা, মা আপনাকে ডাকিতেছেন।" বক্তৃতায় অপ্রত্যাশিত রূপে বাধা পাইয়া, তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্নমনে, আমাকে পুনরায় আগমনের আশ্বাস দিয়া, নগ্ন-পদেই ভাগিনেয়ীর অনুসরণ করিলেন। আমি

বাক্য-স্রোতে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার একমাত্র পুত্র কলেরা-রোগগ্রস্ত। আমাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে হইবে। সহর হইতে তাঁহার বাসস্থান প্রায় চারি ক্রোশ।

আমি তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া, অপরিচিত অতিথিবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। শীঘ্র আহার সম্পন্ন করিয়া সেই রমণী ও তাঁহার ভ্রাতার নিকট ভদ্রলোকের বিপত্তির কথা জানাইলাম; এবং তাঁহাদের পরিচর্য্যার জন্য উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না বলিয়া সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। বর্ষীয়সী মহিলা স্নেহ-পূর্ণ মাতৃ-হৃদয়ের আবেগের সহিত উত্তর করিলেন, "বাবা, তুমি আমাদের যে উপকার করিলে, তাহা আমরণ মনে রহিবে। আমার নিজ সন্তানও বোধ হয় ইহা অপেক্ষা অধিক করিতে পারিত না। আমার স্বামী সরকারী চাকরী করেন; কিছুদিন হল, এখানে বদলী হয়ে এসেছেন। তুমি ফিরিয়া আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" তাঁহার ভ্রাতা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি হরিজীবন বসুকে জানেন না? তিনি জজ-কোর্টের আমলা। তা হ'লেও অনেক টাকা রোজগার করেন; আজ ৭।৮ দিন হল এখানে বদলী হয়ে এসেছেন।" রমণী ভ্রাতার এই অসম্বদ্ধ বাক্যে সলজ্জ-কুণ্ঠায় তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "রমানাথ, তোমার চিরদিন সমান গেল।" তিরস্কার লাভ করিয়া রমানাথবাবু ম্লান মুখে তাম্রকূটের সন্ধানে বাহিরে চলিয়া গেলেন। ভ্রাতা-ভগিনীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি স্মিত-হাস্যে বলিলাম "মা, সেজন্য ব্যস্ত হইবেন না। আমি যদিও এখানে বেশী দিন আসি নাই, তথাপি অনায়াসে আপনাদের সন্ধান করিতে পারিব।" এই বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি গৃহ-মধ্যস্থ কন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন "সুরমা, তোমার দাদাকে প্রণাম কর।" পত্র-পুষ্পাভরণা লীলামাধুর্য্য-মণ্ডিতা পল্লবিনী শ্যাম লতিকার ন্যায় তাহার স্তবক-নম্র তনু অবনমিত করিয়া সুরমা আমাকে প্রণাম করিল। অবনত মস্তকে আমি বলিলাম "সুরমা কি আপনার একমাত্র কন্যা?" রমণী উত্তর দিলেন "শুধু একমাত্র কন্যা নহে, ওই আমার যথাসর্ব্বস্ব। এক্ষণে উহাকে যোগ্যপাত্রে সমর্পণ করিতে পারিলে আমার জীবনের সমস্ত ইচ্ছা সমাপ্ত হইয়া যায়।"

আমি লজ্জারক্ত মুখে দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া বেহারাকে সমস্ত ভার দিয়া, ভদ্রলোকের সহিত ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম।

* * * *

পক্ষান্তে পাহাড়পুরা হইতে ফিরিলাম। মনে করিয়াছিলাম, দুই-তিনদিনের মধ্যে ফিরিতে পারিব। কিন্তু একমাত্র সন্তান-ভরসা জননীর বেদনার অশ্রুজল-পূর্ণ কাতর হৃদয়ের সকরুণ মুখের মিনতি আমার সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিল। স্নেহাঞ্চলছায়ে লালিত বর্দ্ধিত নিধিকে বহু আয়াসে যখন কালের কবাল-কবল হইতে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইলাম, তখন কৃতজ্ঞ মাতৃ-হৃদয় আমার কল্যাণ-কামনায় উচ্ছ্বাসাপ্লুতকণ্ঠে বিধাতার অম্লানপুণ্য আশীষধারা প্রার্থনা করিলেন। মহিমময়ী সফলতা আমার কণ্ঠদেশে যেন প্রথম বিজয়-মালিকা প্রদান করিল।

পাটনায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই হরিজীবন বসু মহাশয়ের সন্ধান লইলাম। যাহা জানিতে পারিলাম, তাহাতে আমার তরুণ-জীবনের সমস্ত আশা ও উৎসাহ যেন একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তিন দিনের জ্বর ভোগ করিয়া হরিজীবনবাবু ইহলোক হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কন্যা ও স্ত্রী ভ্রাতার সহিত স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন।

হরিজীবনবাবু কয়েকদিন মাত্র পাটনায় বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন; কাহারও সহিত সেরূপ আলাপ হয় নাই; সুতরাং সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার নিবাস-স্থানের পরিচয় পাইলাম না।

যখন তাঁহাদের অনুসন্ধানের আশায় ক্রমশঃ হতাশ হইতেছিলাম, তখন সহসা একদিন আমার বেহারা একখানি ধূলি-মলিন পত্র টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "হুজুর, মেরা এক কসুর হোগেয়া। যো জেনানা এক রোজ হিঁয়া পর আয়ি থি, উয়ো আপকো এক চিঠ্‌টি ভেজ দিই থি। হাম আপকো দেনে ভুল গেয়া। মে কো মাপ কি জিয়ে।" আমি তাড়া-তাড়ি পত্রখানি লইয়া খাম খুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম, পত্রখানি ঠিক হরিজীবন বাবুর মৃত্যুর পরে তাঁহাদের পাটনা

ত্যাগের দিন লিখিত। ব্যস্ততার সহিত পেনসিল দিয়া লেখা। দু'চারিটী কথায় তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখের পরিচয় দিয়া বিধবা আমাকে কলিকাতায় তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ বাড়ীর নম্বর ও ঠিকানাস্থল এতই অস্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, বহু আয়াসসত্ত্বেও আমি তাহা পাঠ করিতে পারিলাম না। আবাল্য পশ্চিমে থাকিয়া কলিকাতা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আদৌ ছিল না। পিতৃদেবের জীবিতাবস্থায় কার্য্যব্যপদেশে দুই বার কলিকাতায় গিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতে কলিকাতা সম্বন্ধে আমার মনে কোন ধারণাই হয় নাই।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় শূন্য মনে চিঠিখানি হস্তে লইয়া বসিয়া রহিলাম। চিন্তার শত তরঙ্গ আমার হৃদয়-তটে প্রতিহত হইয়া পড়িতে লাগিল। সেই একটী দিবসের মধুময়ী স্মৃতি শত বর্ণ-গন্ধ গানে আমার মনোমন্দির ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল।

কর্ম্মময় জীবনের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, নিরালায় আমার স্নিগ্ধ-আনন্দ চঞ্চল দিনগুলি লঘু বেগে অতীতের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছিল। সহসা এ কি সীমাহীন অনন্ত মহৎ অপূর্ণতা প্রাণে অতৃপ্ত তিয়াষা জাগাইয়া তুলিল! ভাগ্য-দেবতার এ কি কঠোর নিষ্ঠুর পরিহাস!

দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। আমার দিনগুলি নৈরাশ্য-ধিক্কারে কাটিতে লাগিল; কিন্তু অন্তরে-বাহিরে কোন ব্যবধানই সৃজন করিতে পারিল না। সেই সঙ্কোচজড়িতা, লজ্জানম্রা কিশোরীর অম্লান, শুভ্র স্মৃতি ছায়ার ন্যায় আমার সহচরী হইয়া রহিল। নবীন যৌবনের আশা, উদ্যম আমার ক্লান্ত, ব্যর্থ জীবনে মাঝে-মাঝে নবশক্তি ও উন্মাদনার সঞ্চার করিত; প্রাণময়ী কল্পনা তখন স্নেহ স্নিগ্ধ সান্ত্বনার গানে আমার তৃষিত, তাপিত চিত্তকে শীতল করিত; এবং সেই ক্ষণ-দৃষ্টা কনক-কিরণা, নিত্য নূতন কৌতুকময়ী প্রতিমা স্বপ্নালোকিত দূরদেশে অপূর্ব্ব বেশে সজ্জিতা হইয়া আমার মানস-নয়নে প্রতিভাত হইত। আর নিপীড়িত সমস্ত মৌন-বেদনা যেন তাহার রাতুল চরণতলে লুটাইয়া পড়িত।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর কঠোর কর্ত্তব্য মাঝে-মাঝে তাহার স্মৃতিকে ম্লান করিত; কিন্তু তাহা কেবল অবসর সময়ে উজ্জলতর করিয়া তুলিবার জন্য। দিবসের কর্ম্ম-অবসানে শ্রান্তচিত্ত কাহার আহ্বান নিমিত্ত যেন উৎসুক হইয়া পড়িত। সে যেন কাহার সঙ্গ চায়; কিন্তু কোথায়,—সে কোথায়!

সেদিন জনৈক বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। ফুল্ল নিশীথিনী জ্যোৎস্নাময়ী। জন-বিরল রাজপথ দিয়া আসিতেছিলাম। মর্ম্মরিত তরুশ্রেণীর মধ্যে আলো ছায়ার লুকোচুরী খেলা প্রকৃতিবক্ষে কি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন সৃজন করিতেছিল। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে আপনার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিলাম। সহসা মুক্ত তরঙ্গায়িত পাণ্ডুরমধ্যে শুভ্র গগনতল প্লাবিত করিয়া কে সুললিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া একমনে সে কোমল গীতি শ্রবণ করিতে লাগিলাম। কোন্ বিরহী মুখর মর্ম্মবেদনায় এই জ্যোৎস্নাময় নিশীথে আপনার সংযত হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন হারাইয়া ফেলিয়াছে। চির নিরুদ্দিষ্টা দয়িতার বিচ্ছেদ বেদনা তাহার ভারাক্রান্ত হৃদয়কে শুভ্র লঘু মেঘ-খণ্ডের ন্যায় কোন্ মোহময়, স্বপ্নময় রাজ্যে প্রিয়ার উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছে। কবে কোন্ রাগরঞ্জিত প্রভাতে, কোন্ ভাস্বর মধ্যাহ্নে, কোন্ শুভ গোধূলি লগনে তুমি আমার নয়ন-পথে উদিত হইয়াছিলে। তাহার পর কত প্রভাত, কত সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে। তথাপি তোমার স্মৃতি আমার হৃদয়মধ্যে মহিমান্বিত হইয়া রহিয়াছে। কোথায় তুমি মানসবাহিনী আনন্দপ্রতিমা। জানি না, তুমি চিরদিনই অজ্ঞাত রহিবে; কিন্তু কোন মঙ্গল মুহূর্ত্তে আমার মনোমন্দির উজ্জ্বলিত করিবে। এই বিপুল জগতে অনন্তকালেও কি আমার আশা মিটিবে না!

মুগ্ধ চিত্তে আমি এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত-সুধালহরী শ্রবণ করিতেছি, এমন সময়ে সহসা কাহার উদ্বেল স্নেহ-সম্ভাষণে চকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম, আমার আশৈশব সহচর প্রিয়তম বন্ধু নলিনী। আমার অপ্রত্যাশিত আনন্দ ও বিস্ময়কে তাহার স্বভাব-সুলভ তীব্র পরিহাসে নিপীড়িত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আজকাল কবিতা বুঝি ডাক্তারীর একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছে। খোলা মাঠে চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে প্রেমের গান না শুনলে বোধ হয় ডাক্তারী-বিদ্যাটা ঠিক অভ্যস্ত হয় না।"

আমি স্মিত মুখে তাহার মন্তব্য মানিয়া লইয়া বলিলাম, "ডাক্তারের জীবনটা কি এমনি নীরস যে, একটা গান শুনলে কর্ত্তব্যের হানি হয়? আর প্রেম বুঝি তোমাদের একচেটে জিনিস?" নলিনী ঈষৎ বক্র হাসিয়া উত্তর করিল "থাক্ সে সব বোঝা গেছে; আপাততঃ মিসেস রায় এক দল ফৌজ লইয়া তোমার বাংলোয় পদার্পণ করিয়াছেন। অতএব শীঘ্র তাঁহার তত্ত্বাবধানে চল।"

নলিনীর সস্ত্রীক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম, পূজোপলক্ষে হাইকোর্ট বন্ধ হওয়ায় তাহারা পশ্চিম ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে। পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বার তাহাদিগের গন্তব্য স্থান। চিরস্নেহপরায়ণ নলিনী, পাটনায় ব্যবসা করিতেছি জানিয়া, আমার সাক্ষাৎ লাভের নিমিত্ত পথিমধ্যে অবতরণ করিয়াছে। কর্ম্মোপলক্ষে নলিনীর পিতা পশ্চিমপ্রবাসী ছিলেন।

নলিনী ও তাহার পত্নীর একান্ত অনুরোধে কলিকাতায় ব্যবসা করিব স্থির করিয়া দু' চারি দিনের মধ্যে পাটনার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া হরিদ্বার যাত্রী হইলাম। সত্য কথা বলিতে গেলে, পাটনা-প্রবাস আমার নিকট অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল; বহু আয়াসসত্ত্বেও মন বাঁধিতে পারিতেছিলাম না। কি যেন এক অজ্ঞাত অভাব সর্ব্বদা মনকে নিপীড়িত করিত। এক দুঃসহ বিপুল বেদনা-ভরে বক্ষ যেন নিষ্পেষিত হইয়া যাইত।

হরিদ্বার ছাড়িয়া আমরা একে-একে বহুস্থান পরিভ্রমণ করিলাম। প্রবাসে প্রত্যহ সন্ধ্যা-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সহর ছাড়িয়া আমরা বহু দূরে চলিয়া যাইতাম। আমি চিরদিনই ক্ষিপ্র। বন্ধুর প্রান্তর-পথ বাহিয়া আনমনে সম্মুখে অগ্রসর হইতাম; সহসা নলিনীর স্নেহ-সম্ভাষণে চকিত হইয়া দেখিতাম, গোধূলির স্বর্ণচ্ছায়া কখন পশ্চিম দিগন্তে মিশাইয়া গিয়াছে; এবং তিমিরাবগুণ্ঠিতা সন্ধ্যা-বধূ নীরব-নম্র চরণে বনান্তরাল হইতে আপনার আগমন-বার্ত্তা স্তব্ধ প্রকৃতিকে জানাইয়া দিতেছেন। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বে স্মৃতি-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিতাম। ভ্রমণের উৎসাহ যেন একেবারে ম্লান হইয়া যাইত। দ্রুত প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য মাঝে-মাঝে বন্ধু স্নেহভরে অনুযোগ করিতেন। কিন্তু বিবশ চরণ আর চলিতে চাহিত না। সমস্ত মন যেন পশ্চাতের অসীম আঁধার-পানে ধাবিত হইত। হায় বন্ধু, তুমি কি জানিবে—আমি যে কোন্ সুদূরে পিয়াসী।

কলিকাতায় আসিয়া নব-জাগ্রত আশা ও উৎসাহ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। ক্ষণ-দৃষ্টা কিশোরী স্মৃতি মন হইতে দূরীভূত করিব সঙ্কল্প করিয়া, নিজেকে কোলাহলময়ী নগরীর অনর্গল কর্ম্ম-প্রবাহে মগ্ন রাখিতে সচেষ্ট হইলাম। বিধাতার অনুগ্রহে চিকিৎসা-ব্যবসায় খ্যাতি-লাভ ও অর্থ সম্বন্ধে নিস্পৃহতা হেতু অত্যল্প কাল মধ্যে সুদূর পল্লীগ্রামেও আমার নাম সুপরিচিত হইয়া উঠিল চিকিৎসা-ব্যপদেশে প্রায়ই আমাকে সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে যাইতে হইত। এমন কি সময়ে-সময়ে দু' এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত পল্লীর আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য হইতাম।

ক্রমশঃ এক-এক করিয়া সুদীর্ঘ পাঁচটী বৎসর অতীতে মিশাইয়া গেল। কর্ম্মময় জীবনের কোলাহলে বিদেশিনী স্মৃতিকে পূর্ণ বিসর্জ্জন দিবার অখণ্ড প্রয়াস ব্যর্থতার নিবিড় পাশ রচনা করিয়াছিল। মরণাহত নিরুপায় ব্যক্তি অন্তিম আশ্রয়ের ন্যায় নিত্য প্রবল কর্ম্মস্রোত অবলম্বনে ভাসিয়া চলিলাম। রোগী দেখিয়া কখন ক্লান্ত হইতাম না আমার উন্মত্ত উৎসাহ বন্ধুবর্গকে বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে অভিভূত করিত; এবং নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা সমব্যবসায়িগণকে বিদ্বেষ পরবশ করিয়া তুলিত।

মাঝে-মাঝে বিবাহ করিবার জন্য নলিনী স্নিগ্ধ-মধুর বাক্যে অনুযোগ করিত। আমি প্রতিবারই একটা না একটা আপত্তি উত্থাপন করিয়া বন্ধুর সমস্ত যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করিয়া দিতাম। অবশেষে পরাস্ত হইয়া বন্ধু অভিমানভরে বিবাহের কথা আর মুখে আনিতেন না কিন্তু তাঁহার মৌন-মিনতি আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। যখনই কোন কন্যাভার-গ্রস্ত পিতা আমাকে জামাতৃ পদে বরণের আশায় নলিনীকে মুরুব্বী ধরিত, তখন তাহার ম্লান মন্দ স্বর ও উদাস প্রকৃতি আমাকে ব্যথিত ও ক্লিষ্ট করিত। যখন আত্মীয়বর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমার চির কৌমার্য্যের সঙ্কল্পকে বিচ্ছিন্ন-প্রায় করিত, তখন দূর অতীতের সেই একটী স্মরণীয় দিন ও তাহার প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইত। সঙ্গে-সঙ্গে একখানি কান্ত-কোমল মুখচ্ছবি বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য-সম্ভার লইয়া আমার মনোমন্দির উজ্জ্বল করিয়া তুলিত; এবং নিমেষ মধ্যে

সমস্ত অবসাদ ও গ্লানিমা দূর করিয়া অপূর্ব্ব শক্তি ও আশ্বাস বাণীতে ক্লিষ্ট হৃদয়ে বল সঞ্চার করিত। তখন মনে হইত, এই দীর্ঘ পথের শেষে এমন একটী দিন আসিবে, যে দিন আমার এই অসীম বিরহের, অপার বাসনার ও মৌন-মুখর বেদনার অবসান হইবে। সে দিন সমস্ত দুঃখ-গ্লানি অন্তর হইতে মুছিয়া যাইবে এবং উচ্ছলিত অনাবিল প্রেমরাশি সেই মানসলোকবাসিনী নিরুপম সৌন্দর্য্য প্রতিমার বিশ্ব-বিজয়িনী রক্ত-চরণতলে লুটাইয়া পড়িবে।

বর্ষার নবমেঘচ্ছায়া গাঢ় তিমিরে আকাশ ধরণী ছাইয়া ফেলিয়াছে। ফেনিলোচ্ছল জলরাশি শত আবর্ত্ত সৃজন করিয়া উন্মত্ত গর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে। আশু-বর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সম্পাদন নিমিত্ত একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় একাকী যাইতেছিলাম। মেঘ-মেদুর নদীবক্ষ ও দু'পারের পথ-ঘাট লোক-যাত্রাবিহীন।

গন্তব্য স্থানে যখন পৌঁছিলাম, তখন দিবা অবসান-প্রায়। পুঞ্জীকৃত মেঘরাশি সন্ধ্যার কৃষ্ণ ছায়াকে নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে। বহু কষ্টে ক্রোশাদ্ধ অতিক্রম করিয়া রোগীর আলয়ে উপনীত হইলাম।

রোগ বিশেষ কঠিন ছিল না। বৃষ্টির পূর্ব্বে প্রস্থান করিব মনে করিয়া, সত্বর ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া, রোগীর স্বজনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া, দ্রুতপদে নৌকাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু নিয়তির বিধান লঙ্ঘন করা ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। পল্লীপ্রান্ত অতিক্রম না করিতেই মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। একান্ত নিরুপায় হইয়া পথপ্রান্তে একখানি অর্দ্ধভগ্ন জনহীন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

বৃষ্টির বেগ যখন মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, তখন সহসা জমাট অন্ধকার ভেদ করিয়া এক সুতীব্র আলোকচ্ছটা আমার নয়ন-গোচর হইল। একটু পরেই সেই আলোক-ধারী আমার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু, আমি আপনার আগমন শুনিয়া, এই ঝড় জল তুচ্ছ করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে আসিতেছি। আমার একটী আত্মীয়া-কন্যা বিশেষ পীড়িতা। জীবনের আশা নাই বলিলেই চলে। আমার আত্মীয়া অত্যন্ত নিঃস্ব এবং কন্যাটীও অবিবাহিতা ; সুতরাং আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া স্বল্প পারিশ্রমিক লইয়া তাহাকে দেখিয়া আসেন, তাহা হইলে আমরা চিরদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিব।" ভদ্রলোকটীর পরিধেয় বসন সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত। পথ-ক্লেশে তাঁহার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া আমি তাঁহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিলুম। যদিও সারাদিনের পরিশ্রমে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলাম, তথাপি ভদ্রলোকটীর অবস্থা দর্শনে ও রোগিণীর কথা মনে হওয়াতে, আমার বর্ত্তমান অবস্থা বিস্মৃত হইলাম। তাঁহাকে একটু বিশ্রাম করিতে বলিয়া কোটটী খুলিয়া ঔষধের বাক্সবাহী চাকরের হাতে দিলাম এবং চাদর ও কাপড় উত্তমরূপে নিংড়াইয়া লইয়া ভদ্রলোকটীকে অগ্রসর হইতে বলিলাম।

দূর-বিস্তৃত প্রান্তর এবং বিসর্পিত পল্লীপথ অতিক্রম করিয়া যখন রোগিণীর গৃহে উত্তীর্ণ হইলাম, তখন রাত্রির গাঢ় নীরবতা সুপ্তি মৌন সমস্ত গ্রামখানিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমার সঙ্গী দ্রুতপদে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে আমাকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

স্তিমিত দীপালোকে জীর্ণ গৃহতলে মলিন শয্যোপরে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে আমার সমস্ত শোণিত-প্রবাহ সহসা যেন অবরুদ্ধ হইয়া গেল, মৃতকল্প হইয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম।

যে আমার নিত্য ধ্যান ও সাধনার বিষয়ীভূত ছিল, অশেষ বাসনা ও গূঢ় বেদনা বুকে লইয়া নিরন্তর আকুল আগ্রহে যাহার প্রতীক্ষায় ছিলাম, হিমশীর্ণা লতিকার ন্যায় আজ সে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে অবস্থিতা। গভীর নৈরাশ্যে ও গূঢ় অন্তর্বেদনায় সমস্ত হৃদয় ভরিয়া একটা হাহাকার উঠিতে লাগিল। আমাকে নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট দেখিয়া শঙ্কা-কম্পিত হৃদয়ে কে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার বাবু, জীবনের আশা কি একেবারেই নাই ?" স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দ্বারপ্রান্তে চাহিয়া দেখিলাম, দীর্ঘ পঞ্চ বর্ষ পূর্ব্বে একদা শীতার্ত্ত প্রভাতে যে বিপন্না নারীকে মাতৃ সম্বোধনে আশ্বস্তা করিয়াছিলাম, আজ তিনি ততোহধিক বিপন্না হইয়া আমাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত জ্ঞানে সশঙ্ক-হৃদয়ে একমাত্র স্নেহদুলালী তনয়ার রোগবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আপনাকে সংযত করিয়া বিধবাকে প্রণামপূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "মা, আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ? আপনার সহিত

পাটনায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল।" অশ্রু-নিরুদ্ধ নয়নে, উদ্বেলিত হৃদয়ে আশীষবাণী উচ্চারণ করিয়া বিধবা গৃহতলে শয্যা-সমীপে উপবেশন করিয়া ধীরকণ্ঠে কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ডাকিবার পর সুরমা ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল। বিধবা কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ মা? একবার চোখ মেলিয়া দেখ, কে তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।" বিশুষ্ক নলিনীর ন্যায় দু'টি ম্লান আঁখি মেলিয়া সুরমা অতি ধীরে আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। রক্তিম-লাবণ্য-বিভাহীন সুকুমার কপোলদ্বয় কি এক অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করিল। আমি মৃদুকণ্ঠে কহিলাম, "সুরমা, কেমন বোধ হইতেছে!" সুরমা কোন উত্তর দিল না; কেবল দুই বিন্দু অসংযত অশ্রু তাহার পাণ্ডুর কপোল বাহিয়া যেন সমস্ত অন্তর্নিহিত যাতনা ও মৌন বেদনার কাহিনী অঙ্কিত করিয়া দিল। কন্যার সজল আঁখি জননীর সম্বৃত অশ্রু-উৎস মুক্ত করিয়া দিল। আমি তাঁহাকে নীরব ইঙ্গিতে বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিলাম এবং সুরমাকে দু' একটা মৃদু সান্ত্বনা-বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া পুনরায় শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার প্রশ্নের কোনরূপ উত্তর না দিয়া সুরমা তাহার শীর্ণ নেত্রযুগল আনত করিয়া স্থির মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আপনি পরজন্ম মানেন?" মুহূর্ত্তমধ্যে আমার সমস্ত দেহে কি এক স্পন্দন বহিয়া গেল। সুরমার গোপন হৃদয়-তন্ত্রীতে সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া যে অনাহত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিতেছিল, তাহা যে আমারই সঙ্গীত-সুরে বাঁধা, ক্ষণিকে তা প্রতিভাত হইল। সমস্ত সংযম-বন্ধন হারাইয়া উচ্ছ্বাসর কণ্ঠে কহিলাম, "আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া তুমি আমার ধ্যান ও ধারণার বিষয়। তোমার মধুর স্মৃ আমাকে প্রতি পদে সঞ্জীবনী শক্তি দান করিয়াছে। আ যে তোমাকে এই অবস্থায় দেখিব, ইহা স্বপ্নেরও অগো ছিল।" ম্লানমন্দ স্বরে সুরমা উত্তর করিল, "আমার অ অধিকক্ষণ নাই; কিন্তু আজ আমার বড় সুখের দিন কায়মনোবাক্যে এতদিন ধরিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম, আজ তাহা পূর্ণ হইয়াছে।"

কথা কয়টী উচ্চারণ করিতে সে হাঁপাইয়া উঠিল এ ম্লান সান্ধ্য-কুসুমের ন্যায় উপাধান-প্রান্তে ঢলিয়া পড়ি আমি অনন্যোপায় হইয়া তাহার জননীকে ভীত ক আহ্বান করিলাম। দ্রুত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কন্য অবস্থা দর্শনে শরাহত হরিণীর ন্যায় আর্ত্তস্বরে বিধবা কন্য শয্যাপার্শ্বে লুটাইয়া পড়িলেন। সন্তানবৎসলা মমতাম দুঃখাতুরা জননীর করুণ ক্রন্দন-ধ্বনিতে নৈশ পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। সমবেদনাপরায়ণ প্রতিবেশীবর্গে নীরব অশ্রুজল এই অনন্ত বিদায়-দৃশ্যকে করুণতর করি তুলিতে লাগিল। শুধু আমি পাষাণ প্রতিমূর্ত্তির ন্য সেই চিরনিরুদ্দিষ্টা তরুণীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলা রহিয়া-রহিয়া শ্রবণকুহরে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"আপ পরজন্ম মানেন?"

সার গুরুদাসের পত্রাবলী

(শেষার্দ্ধ)

[অধ্যাপক শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম-এ]

এখন অপর এক অধ্যায়ের আরম্ভ হইল। মফঃস্বল হইতে বড় কেহ ফেলো নির্ব্বাচিত হইতে চান না, কেন না পরাজয় ধ্রুব। তথাপি মধ্যে-মধ্যে এক আধটা চেষ্টা করাও তো আবশ্যক। তাই 'ফেলো'-পদপ্রার্থী হইব মনে করিলাম। পরাজয় নিশ্চিতই, তবে পুণ্যশ্লোক স্যার গুরুদাস আমাকে "নমিনেট্" করুন, এই আকাঙ্ক্ষা হইল;—উদ্দেশ্য, অন্ততঃ লোকে যেন এই না বুঝে যে, কোথাকার কে একটা অর্ব্বাচীন লোক ফেলো হইবার স্পর্দ্ধা করিতেছে। চিঠি দিয়া আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলাম। এবং বঙ্গ-ভাষায় গ্রাজুয়েট্‌দিগের নিকট চিঠি (যুক্ত কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে এই চিঠি পাইলা

৮ নং পত্র। ২৮শে ভাদ্র, ১৩২

আপনার গত কল্যকার পত্র পাইয়া আপনি কলিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণ কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের স নির্ব্বাচিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হ

অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আপনার ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আপনাকে "নমিনেট্" করিবার জন্য আমাকে লিখিয়াছেন, কিন্তু দুঃখিত হইতেছি যে আমি আপনার সেই কথাটি রক্ষা করিতে পারিব না। তাহার কারণ এই যে যুক্তিসিদ্ধ হউক আর না হউক আমি বহুদিন হইতে স্থির করিয়াছি, কোন ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চান্সেলারের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার স্থলে কোন পক্ষাবলম্বন ভাল দেখায় না, এবং সেই অনুসারে আমি এ পর্য্যন্ত কাহাকেও "নমিনেট্" করি নাই, অনেক আত্মীয়ের অনুরোধ এড়াইয়াছি। কেবল একবার মাত্র ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার বিশেষ কারণ ছিল, এবং তাহাও অনেকদিন হইয়া গিয়াছে, তাহার পর গত দশ বৎসরের মধ্যে আর কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আমি নির্ব্বাচনে 'ভোট্' দিয়া থাকি, তবে ভোট্ দেওয়া ও নমিনেট্ করার প্রভেদ এই যে ভোট্ দেওয়া সকল প্রার্থীর নাম জানিয়া তন্মধ্যে যোগ্যতমকে নির্ব্বাচন করা, এবং 'নমিনেট্' করা অগ্রেই একজনের পক্ষাবলম্বন করা। এ স্থলে আমার বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক যে আপনি যেন মনে না করেন আপনার যোগ্যতার প্রতি আমার কোনরূপ সন্দেহ আছে এবং সেই সন্দেহ আপনার কথা রক্ষা না করার আর একটা কারণ। প্রকৃতপক্ষে আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক আপনাতে তাহা প্রায় সমস্তই পূর্ণ মাত্রায় আছে। আপনি * * * * * *। (১) আশা করি আপনার চেষ্টা সফল হইবে।

বাঙ্গালাভাষায় পত্র লিখিবার যে মানস করিয়াছেন তাহাতে কোন দোষ দেখি না। তবে যে সকল উপাধিধারীর মাতৃভাষা বাঙ্গালা নহে, যথা বিহারী গ্র্যাজুয়েট্, তাঁহাদিগকে বোধ হয় ইংরাজি ভাষাতেই পত্র লেখা উচিত। আপনার কুশল সমাচার জ্ঞাত হইয়া সুখী হইলাম। এখানকার সমাচার আপাততঃ এক প্রকার মঙ্গল। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১) নিজের কথা যথেষ্ট বলা হইতেছে; তথাপি এই বিশেষণগুলি এ স্থলে প্রচারিত করিয়া পাপের মাত্রা আর বাড়াইতে চাই না।

এই পত্রে উৎসাহিত হইয়া বাজাল। আমার রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটগণের নিকটে একখানি পত্রের মোসাবিদা করিয়া উঁহার অনুমোদনার্থ পাঠাইয়া দিলাম। তাহাতে তাঁহার নামোল্লেখ পূর্ব্বক আমার সম্বন্ধে তদীয় অভিমতিটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। যে কারণে তাঁহার 'নমিনেশন' চা'হয়াছিলাম, সেই কারণেই তাঁহার কৃত প্রশংসাবাক্য, ঐ চিঠিতে দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। যথা-সময়ে উত্তর পাইলাম যে, আমার সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যটি প্রকাশ্য পত্রে উল্লেখিত হইতে দিতে তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। দুঃখের বিষয় সেই পত্রখানি হারাইয়া গিয়াছে। যাহা হউক ঐ পত্রে যে সকল কথা ছিল পরবর্ত্তী পত্রখানিতেও প্রায় সেই সকল যুক্তিতর্কই রহিয়াছে। আমি সেই পত্রখানি পাইয়া একটু বিরক্তি ও অভিমান প্রদর্শন পূর্ব্বক চিঠি লিখি। তাহাতে তিনি যে উত্তর দেন, তাহা পরবর্ত্তী চিঠিতে দেখা যাইবে।

৯ নং পত্র।   ১৮ই আশ্বিন ১৩২২।

আপনার ১১ই আশ্বিনের পত্রখানি পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম।

আমি পূর্ব্বপত্রে (২) যে সকল হেতু দর্শাইয়া আপনার আবেদন পত্র হইতে আমার মন্তব্যটি উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছি, তাহা সমস্তই যে আপনার ন্যায় ধীরবুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকটে একেবারে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে, ইহা আমার পক্ষে বড়ই আক্ষেপের বিষয়। ইহাতে দেখিতেছি এ বিষয়ে আপনার ও আমার মতের এত মৌলিক পার্থক্য যে যুক্তি দ্বারা আমি আপনাকে আমার মতে আনিতে পারিব এ আশা করা বৃথা। কিন্তু আবার ইচ্ছা করি না যে আপনার তুল্য একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মনে করিবেন আমি লোককে অসঙ্গত অনুরোধ করি বা যুক্তিযুক্ত কার্য্যে বিরত, বা আপনার মনস্তুষ্টির জন্য একটি মন্তব্য লিখিয়া তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত। আমি যে মন্তব্যটি লিখিয়াছি তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে ঠিক, এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাই বলিব। আপনিও আপনার বন্ধুগণকে তাহা জানাইয়াছেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু আপনার সাধারণ আবেদন পত্রে সেই মন্তব্য প্রকাশ ও অযাচিত ভাবে তাহা নির্ব্বাচকগণের নিকট প্রচার, আপনার পক্ষে আমার প্রতি অযথা গৌরব আরোপ, এবং আমার পক্ষে তাহা নিবারণ না করা অমিত আত্মগৌরব প্রদর্শন। তাহা আমার পক্ষে অতি ক্লেশকর।

(২) এইখানি যে হারাইয়া গিয়াছে তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আপনি লিখিয়াছেন, আমার মন্তব্যটি না প্রকাশ করিতে পারিলে আপনার 'বিরত হওয়াই উচিত'। তাহা কেন হইবে। ইহাতেই দেখিতেছি আপনি আমার মন্তব্যের উপর অসঙ্গত অধিক মূল্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু অপরে তাহা করিবে না, বরং আপনি যেরূপ আড়ম্বরের সহিত তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন তাহাতে তাহা অনেকের নিকট হেয় হইবে।

আমার পূর্ব্বপত্রে প্রদর্শিত হেতুর বিরুদ্ধে আপনি লিখিয়াছেন, "নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সাধারণের মতই তো জ্ঞাপনীয় ও আদরণীয়"। নিজের মত অপেক্ষা সাধারণের মত অবশ্যই অধিকতর গ্রাহ্য। কিন্তু একজনের মত তো সাধারণের মত নহে এবং মত অপেক্ষা মতের মূল বা হেতু অর্থাৎ যে সকল কার্য্য বা অবস্থা দৃষ্টে সেই মত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই অধিকতর গ্রাহ্য। আমার মতের হেতু ছাড়া কেবল আমার মতটি অন্যের নিকট বিশেষ কার্য্যের না হইতে পারে।

কোন ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্‌সেলারের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা স্থলে কোন পক্ষাবলম্বন উচিত নহে এই কথা আমি পূর্ব্বপত্রে বলিয়াছি। আর এইজন্য আমি আপনাকে নমিনেট্ করিতে অস্বীকার করিয়াছি এবং আরও একজনকে নমিনেট্ করিতে অস্বীকার করিয়াছি। তাহার পর আপামর সাধারণের নিকট আবেদন পত্রে আমার মন্তব্য প্রকাশিত হইলে আমি যে দোষ এড়াইতে চাহি সেই দোষ আরও অধিক মাত্রায় ঘটিবে, এ কথার প্রতি আপনি বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। তাহার কারণ এই যে ইহাতে দোষ আছে বলিয়া আপনি স্বীকার করেন না। কিন্তু ভাইসচান্‌সেলারদের পদের গৌরব রক্ষার্থে, ভাগ্যক্রমে যিনি ঐ পদপ্রাপ্ত হন তাঁহার পক্ষে পরে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা ও তজ্জনিত সম্ভাবনীয় বিরোধ স্থলে একটু তফাতে থাকাই বোধ হয় কি ভাল নয়? আপনি বলিয়াছেন, আমি একদিন পাঠ্যনির্ব্বাচক সমিতির সভাপতি ছিলাম, তাই বলিয়া কি আমি পাঠ্য-সম্বন্ধে মত দিব না, না দিই না? প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত থাকিলে আপনি এ কথা বলিতেন না। প্রকৃতপক্ষে যে সকল পুস্তক নির্ব্বাচন জন্য ঐ সমিতির নিকট যাইবে জানি বা যাওয়া সম্ভবপর মনে করি তৎসম্বন্ধে আমি মত প্রকাশ করি না। ইহা অনেকেই জানেন। তবে যদি কেহ পু[স্তক] ঐ সমিতিকে পাঠাইবেন না এই কথা বলিয়া আমার [মত] লয়েন এবং পরে আপন অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করেন ত[জ্জন্য] আমি দায়ী হইতে পারি না।

আমার মন্তব্যটি আপনি যে ভাবে প্রকাশ ক[রিতে] চাহেন তাহাতে আপনার বিশেষ উপকার হইবে না [এবং] আমার কিঞ্চিৎ অপকার হইবে, এই বিশ্বাসে আমি আপ[নার] পত্রের মুসাবিদা হইতে তাহা উঠাইয়া দিতে অনুরো[ধ] করিয়াছি, ও এখনও করিতেছি। আমার অপকার [এই] যে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থলে আমি যেরূপ নিলি[প্ত] থাকিতে ইচ্ছা করি তাহার ব্যাঘাত ঘটিবে, যাঁহাদিগ[কে] নমিনেট্ করিতে অস্বীকার করিয়াছি, তাঁহাদের ম[ধ্যে] অনেককে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে; এবং কাহা[রও] কাহারও নিকট একটু অসঙ্গত কার্য্য করা দোষে দো[ষী] বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে।

আপনার হিতাহিত বিবেচনাকর্ত্তা আপনি। কি[ন্তু] যথাজ্ঞান আমার হিতাহিত বিবেচনার ভার আমার উপ[র] এই ভাবিয়া আমার অনুরোধটি রক্ষা করিবেন। অ[ধিক] অধিক কি লিখিব।

আপনি মুসাবিদার নকল রাখিয়াছেন এই মনে করি আপনার পূর্ব্বপত্রসহ প্রেরিত মুসাবিদাখানি ফেলি[য়া] দিয়াছি, এবং খুঁজিয়া তাহা পাইলাম না। অতএব দুঃখি[ত] হইতেছি তাহা ফেরত পাঠাইতে পারিলাম না। ব[লা] বাহুল্য, এত কথার পর আপনি 'ফেলো' নির্ব্বাচনে সফ[ল] প্রযত্ন হইলে সুখী হইব। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

এত কথার পরে আর তদীয় মন্তব্য আবেদন পত্রে রাখা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইত না; তথাপি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহা[র] নামটি গোপন করিয়া মন্তব্যটা রাখা যায় কি না, এই চেষ্টা করিবা[র] বাসনা হইল। তাই লিখিলাম যে, অভিমান পূর্ব্বক যাই বলিয়া থাকি ন[া] কেন, যখন বন্ধু-বান্ধবদিগকে জানাইয়াছি যে নির্ব্বাচনে দাঁড়াইব তখন তাহা ধ্রুব পরাজয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও করিব। কিন্তু তৎপূর্বে ৺পূজার বন্ধে তাঁহার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করিতে হইবে। কত পর্য্যন্ত গেলে তাঁহাকে বাড়ী পাওয়া যাইবে, জিজ্ঞাসা করি। তদুত্তরে এই পত্র লিখেন।

১০ নং পত্র। ১৯শে আশ্বিন ১৩২২।

আপনার গতকল্যকার পত্র অদ্য বৈকালে পাইয়াছি।

আপনার পূর্ব্বকার দুইখানি পত্রের উত্তরে যে পত্রদ্বয় লিখিয়াছি তাহাতে আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ যথেষ্ট ছিল, এবং তজ্জন্য কিঞ্চিৎ অসুখী হইতে হইয়াছে। আপনার এই শেষ পত্রের উত্তরে নিরবচ্ছিন্ন আশীর্ব্বাদ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। আপনি ঈপ্সিত বিষয় হইতে বিরত হয়েন নাই, ইহা যথাযোগ্য হইয়াছে। বিরত হইলে আমার উপর অভিমান করিয়া



স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐরূপ করিয়াছেন এই মনে করিয়া আমি অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হইতাম।

৺শারদীয় পূজার বন্ধে আপনি কলিকাতায় আসিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎকার লাভে সুখী হইব। আমি পূজার পর শুক্লা চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত বাড়ীতেই থাকিব। তাহার পর অল্পদিনের জন্য মধুপুর যাইতে ইচ্ছা আছে, কিন্তু যাওয়ার ঠিক্ নাই, এবং গেলেও এক সপ্তাহ পরেই ফিরিয়া আসিব।

এখানকার সমাচার আপাততঃ সমস্ত মঙ্গল। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতায় গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া ঠিক করিলাম যে তাঁহার নাম না লইয়া "কলিকাতার কোনও দেশমান্য, বরেণ্য (৩) ব্যক্তি" এইরূপ লিখিলে তাঁহার কোনও আপত্তির কারণ থাকিবে না। প্রতিযোগিতার সম্মানিয়ে স্থান লাভ করিয়া পূজনীয় স্যর্ গুরুদাসকে অর্ঘ্য জানাইয়াছিলাম। অপিচ, তৎসমকালে আর একটি বিষয়ে তাঁহার অভিমত



অধ্যাপক শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম-এ

জানিতে চাই। পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকসমূহের নিয়োগ হইলেই সংবাদপত্রগুলিতে নাম প্রকাশ হইত। সেই বার (১৯১৩ অব্দে) তাহা হয় নাই। এই জন্য কে পরীক্ষক হইলেন, কে হন নাই, সহযোগী বা প্রধান পরীক্ষকই বা কে হইলেন, ইত্যাদি জানিতে পারা যায় না। এ বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করিব সংকল্প করিয়া

---

(৩) স্বাভাবিক বিনয়সহকারে ঐ বিশেষণদ্বয়ের তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা রাখিয়া দিয়াছিলাম; নচেৎ মন্তব্য মূল্যহীন হইত।

তাহাকে ফেলো নির্বাচনের ফল জানাইবার সঙ্গে-সঙ্গে ঐ বিষয়ও লিখি—তদুত্তরে পরবর্ত্তী পত্রখানি পাইলাম।

১১নং পত্র। ১লা ফাল্গুন ১৩২২।

আপনার গত কল্যকার পত্র পাইয়াছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচনের ফল সম্বন্ধে নূতন কথা কিছুই বলিবার নাই।

পরীক্ষকগণের নাম প্রথমে প্রকাশ করা যাইত। পরে কিছুদিন তাহা বন্ধ থাকে। তাহার পর বোধ হয় ১৮০৫ সাল হইতে আমার প্রস্তাবে পুনরায় নাম প্রকাশ হইয়া আসিতেছিল। এ বৎসর কি কারণে সে প্রথা রহিত হইল জানি না। আমার বিবেচনায় নাম প্রকাশ হওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলে সকল পরীক্ষার্থীই নাম জানিতে পারে এবং তাহাতে কোন বিশেষ অনিষ্ট হয় না। কিন্তু নাম অপ্রকাশ রাখিলে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রকাশ থাকে না, কতক-গুলি পরীক্ষার্থী জানিতে পারে তবে সকলে পারে না, এবং সেই বৈষম্য গর্হিত। এ সম্বন্ধে অন্য সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের প্রয়োজন নাই। নাম অপ্রকাশ রাখিবার পক্ষে কোন প্রবল যুক্তিতর্ক দেখিতে পাই না। এ সম্বন্ধে কোনরূপ আন্দোলন করিবার পূর্ব্বে একবার ভাইস্‌চান্‌সেলর মহাশয়কে লেখা উচিত। ইতি

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁহার আদেশ মতে স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে চিঠি দিয়াছিলাম এবং স্যর গুরুদাসের চিঠিখানিও তদীয় অবলোকনার্থ প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"The University has nothing to do with the publication of Examiners' list in the newspapers. It al depends upon newspaper enterprise. Any newspaper that applies for the list gets it and publishes it."

তাঁহার এই মন্তব্য বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় পাঠান হইয়াছিল—কেবল 'বঙ্গবাসী' সেবার (১৯১৩ সনে) পরীক্ষকের লিষ্ট ছাপাইয়াছিলেন। পর বৎসরও 'বঙ্গবাসী' এই অর্ডারের নকল দিয়াছিলেন কিন্তু আর পরীক্ষক তালিকা তদবধি কোনও কাগজে দেখা গেল না।

এই ব্যাপারের এখানেই যবনিকা পতন হইল। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়া একখানি আবেদন পত্র প্রস্তুত করি এবং তদ্বিষয় পূজ্যপাদ স্যর গুরুদাসের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত আবেদনের কাগজপত্র তাঁহার নিকটে প্রেরণ করি।

ইহাতে মোটামুটি এই কয়টি কথা ছিল:—নির্ব্বাচন প্রথার সৃষ্টি অবধি উকীল শ্রেণীই প্রায়শঃ নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন, তার পর ডাক্তারগণ। কিন্তু অধ্যাপকগণ অতি কদাচিৎ কেহ নির্ব্বাচিত হইতে পারিয়াছেন। অপিচ মোফঃসলের কেহ কোনও দিন (কেবল বোধ হয় বাঁকীপুরের উকীল ৺গুরুপ্রসাদ সেন ব্যতীত) নির্ব্বাচিত হন নাই। অতএব এইরূপ নিয়ম হওয়া উচিত যে দুইজন নির্ব্বাচিত ব্যক্তির অন্ততঃ একজন যেন অধ্যাপক হন—এবং মধ্যে-মধ্যে মোফঃসলের জন্য একটি ফেলোশিপ রিজার্ভ করা আবশ্যক।

এ ছাড়া আরো দু'একটা কথা ছিল—সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

স্যর গুরুদাস তদুত্তরে লিখিলেন:—

১২নং পত্র। ৯ই চৈত্র ১৩২২।

আপনার গত ৬ই চৈত্রের পত্র কল্য পাইয়াছি। আপনি যে বিষয় আবেদন করিবার মানস করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি কোন পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি না। অতএব আপনার প্রেরিত কাগজগুলি এই পত্রসহ ফেরত পাঠাইলাম, তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না।

আপনার কুশল সমাচার জ্ঞাত হইয়া সুখী হইলাম। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই বিষয়ে তদীয় অভিপ্রায় স্পষ্ট বোঝা গেল না—কেন না ইহাতে তিনি যুক্তিতর্কের কোনও অবতারণা করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে বিচার-বিতর্ক করাও সঙ্গত মনে করিলাম না। তবে ফলাফল কি হইবে, তাহা স্পষ্টই বুঝিলাম। কিন্তু "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" শ্রীভগবদ্বাক্য স্মরণ করিয়া যথাসময়ে আবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। এ বিষয়ের বিচারের জন্য একটি ক্ষুদ্র কমিটিও না কি হইয়াছিল। তার পর যেমন হইবার তাই হইয়াছে—অর্থাৎ মূল বিষয়ের কিছুই হয় নাই।

কিন্তু তখনও অপর একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে অনেক খাম-খেয়ালী হইয়া থাকে। দু একজন সিণ্ডিকেটের মেম্বরও স্বয়ং নানা বিষয়ে প্রশ্নকর্ত্তৃত্বের ও পরীক্ষকতার ভার গ্রহণ করিয়া বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন—এদিকে অনেক যোগ্য ব্যক্তি হয় তো তদ্বিরের অভাবে পরীক্ষক হইতে পারেন না।

আমার প্রস্তাব মোটামুটি এই ছিল—

(১) সিণ্ডিকেটের মেম্বার বা বোর্ড অব্ ষ্টাডিজ্‌এর মেম্বর

তাঁহারও পারতপক্ষে পরীক্ষক (এবং প্রশ্নকর্ত্তা) নিযুক্ত হওয়া উচিত নহে। তবে বিষয়-বিশেষে পরীক্ষক দুর্লভ হইলে, এবং উচ্চতর পরীক্ষাগুলিতে (যথা এম্-এ, পি এইচ-ডি, ইত্যাদি) হইতে পারেন।

(২) টেবুলেটারগণ হেড্ একজামিনার হইতে পারেন না—এক হেড একজামিনার একাধিক প্রশ্নপত্রের চার্জ্জে থাকিতে পারিবেন না।

(৩) কলেজের অধ্যাপক যাঁহারা আছেন ও ছিলেন তাঁহারা ভিন্ন (বিশেষ বিষয় ব্যতীত) অপর কেহ পরীক্ষক হইতে পারিবেন না।

(৪) একজন একাধিক বিষয়ে পরীক্ষক হইতে পারিবেন না—তবে উচ্চতর পরীক্ষাগুলিতে পরীক্ষকের দুর্লভতা ঘটিলে বিষয় বিশেষে পারিবেন।

পূজনীয় স্তর গুরুদাসকে আমার প্রস্তাবের খসড়াখানি তদীয় অবলোকনার্থ প্রেরণ করিলে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন পরবর্ত্তী পত্রে তাহা দৃষ্ট হইবে।

১৩নং পত্র। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

আপনার গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠের পত্র ও তৎসহ প্রেরিত একখানি মন্তব্যের খসড়া অদ্য পাইয়াছি। পরীক্ষক নিযুক্তকরণ বিষয়ে আপনার মন্তব্য লিখনের প্রস্তাব আমি অনুমোদন করি নাই এবং এরূপ আভাসও দিয়াছিলাম যে, আমি আপনার উক্ত বিষয়ের মন্তব্য দেখিব না। (৪) আপনি বৃথা কষ্ট করিয়া ঐ মন্তব্য আমাকে দেখাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন।

এই সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেসনের ২৫ অধ্যায়ের ১৪ ধারা দ্রষ্টব্য—কেবল এইমাত্রই এস্থলে বলিলাম।

মন্তব্য দেখিলাম না বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। ইহা আদৌ আমি অনুমোদন করি না। মন্তব্যখানি এই পত্রসহ ফেরত পাঠাইলাম। ইতি

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেগুলেশনের ২৫ অধ্যায়ের ১৪ ধারাটি এই যে সিণ্ডিকেটের অথবা বোর্ড অব্ ষ্টডিজ্-এর কোনও মেম্বরের পরীক্ষকতাগ্রহণ নিষিদ্ধ হইবে না। ঐ রেগুলেশনের পূর্ব্বে ইঁহারা পরীক্ষক হইতে পারিতেন না—এখন হইতে তাহা হইতে পারিবেন। এই নিষেধ রদ কেন হইল, বুঝিতে হইলে রেগুলেশনের বিধাতা কাহারা ছিলেন, ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। তাহা এ স্থলে অনাবশ্যক।

ফল কথা, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা স্বতন্ত্র। দুঃখের বিষয় স্তর গুরুদাস হইতেও প্রত্যাশিত উৎসাহ লাভ করিতে পারি নাই। ফলাফল তো জানা কথা- বলা বাহুল্য।

অতঃপর অন্য একটি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, যাহাতে স্তর গুরুদাস তাঁহার অজানা মতে আলোচনায় সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাঁকীপুর সম্মিলনে মাননীয় বিচারপতি স্তর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতি ছিলেন। সভাপতি বরণের সময়ে অনেক অতিশয়োক্তি শোনা গেল—তন্মধ্যে একটি এই যে স্তর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলাভাষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আবার সম্মিলনের সাহিত্যশাখার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় "বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গভাষা" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতেও স্তর আশুতোষেরই জয় ঘোষণা হইয়াছিল। আমি "নব্যভারতে" (মাঘ, ১৩২৩) "বাঁকীপুর সাহিত্য-সম্মিলন" প্রবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রদর্শন করি যে পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালভাবেই ছিল—মধ্যে প্রায় লোপের মত হইয়াছিল। তবে সমষ্টি ভাবে সাহিত্য-পরিষদ এবং ব্যক্তিগত ভাবে স্তর গুরুদাস চেষ্টা করিয়া ইহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন।

আমার হস্তলিপির অস্পষ্টতায় (কতকটা মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃও) "নব্যভারতে"র প্রবন্ধে কয়েকটা মারাত্মক ভুল হইয়াছিল। স্তর গুরুদাস তাহা দেখিলে হয় তো বিরক্ত হইবেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে উক্ত 'ভুলগুলি' জানাইয়া দেই এবং অনুরোধ করি যে "নব্যভারতের" প্রবন্ধটি যেন অবশ্যই তিনি পড়েন, এবং যেন প্রদর্শিত ভুলগুলি সংশোধন পূর্ব্বক তাহা পাঠ করেন। তদুত্তরে নিম্নোক্ত পত্রখানি পাইলাম।

১৪ নং পত্র। ৬ই ফাল্গুন ১৩২৩।

আপনার গত কল্যকার পত্র পাইয়াছি। আমি 'নব্যভারত' পত্রিকার গ্রাহক বটে, কিন্তু নিয়মিত পাঠক নহি। যদি গত মাঘের সংখ্যা খুঁজিয়া পাই তবে অবশ্যই পাঠ করিব—অন্ততঃ যে অংশে আপনার প্রবন্ধ আছে তাহা পাঠ করিব।

"নব্যভারত" সম্পাদক আপনার লেখা পড়িতে না পারিয়া অনেক স্থানে যে ছাপিতে ভুল করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনি আমাকে শ্রদ্ধা করেন এবং মধ্যে মধ্যে পত্র লিখেন, তাহাতে আপনার লেখা আমার একপ্রকার সুপরিচিত। তথাপি আপনার পত্র পাঠ করা সহজ ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। অনেকবার এই কথা

(৪) এ বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে মৌখিক আলোচনা হইয়াছিল। তখন যদিও তিনি উৎসাহ দেন নাই, তথাপি তাঁহাকে পূর্ব্বে না দেখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয় সমীপে আবেদন পাঠাইব না এ কথা তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছিলাম।

আপনাকে বলিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, এবার সুযোগ পাইয়া সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম। ইতি

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবন্ধটিতে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা লেখা হইয়াছিল, তাহা ঠিক লেখা হইয়াছে কি না, ইহা জানা আমার আবশ্যকও ছিল। কেন না ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ হইবে, তাহা প্রত্যাশিত ছিল। তাই, প্রায় তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়াও যখন তাঁহার কোনও পত্র পাইলাম না। তখন 'নব্যভারত' তিনি খুঁজিয়া পান নাই, ইহাই ধারণা হইল। তাই আমার 'নব্যভারত' খানি সংশোধন করিয়া পাঠার্থে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেই। তদুত্তরে তাঁহার কাছ হইতে পরবর্ত্তী চিঠিখানি পাওয়া গেল।

১৫ নং পত্র। ২৯শে ফাল্গুন ১৩২৩।

আপনার পত্র ও প্রেরিত 'নব্যভারত' পত্রিকার গত মাঘ মাসের সংখ্যা পাইয়াছি। পত্রিকাখানি আপনি যত্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন। তজ্জন্য, আপনার নিকট বিশেষ বাধিত বোধ করিতেছি।

আপনার রচিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছি। তাহার ভাষার পারিপাট্যে ও রচনা-নৈপুণ্যে আপনার সিদ্ধ হস্তের লেখা যেমন হয় সেইরূপই হইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে আমার কিছু বলা উচিত নহে, কারণ তাহা আমাকে লইয়াই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এ প্রবন্ধটি না লিখিলেই আমার পক্ষে ভাল হইত। আর অন্ততঃ ইহার বিষয় বাহুল্য ও ভাষার তীব্রতা না থাকাই উচিত ছিল। আপনি যাহা লিখিয়াছেন, সত্যের অনুরোধেই লিখিয়াছেন, তাহা আমি জানি। আমি ইহাও জানি যে আমি আপনাকে লিখিতে অনুরোধ করি নাই, এবং আমি আরও জানি আপনি কাহারও অনুরোধে কোন কথা লিখিবার লোক নহেন। কিন্তু যাহারা আপনাকে ও আমাকে না জানে তাহারা সহজেই মনে করিতে পারে আপনি আমার অনুরোধে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কারণ এরূপ লেখা অনেক স্থলেই ব্যক্তি-বিশেষের অনুরোধে হইয়া থাকে, সত্যের অনুরোধে হয় না। যাহা হউক গতানুশোচনা বৃথা। পত্রিকাখানি অদ্য ডাকে ফেরত পাঠাইলাম। ইতি

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতঃপর যে পত্রখানি প্রকাশিত হইতেছে ইহা আমার নিকটে তাঁহার শেষ পত্র। একজন ব্রাহ্মণ-জায়া বারবনিতা কর্ত্তৃক বিপথ-গামিনী হইয়া তিন মাসের অধিক কাল বেশ্যাবৃত্তি করিয়াছিলেন। পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার লাভ করিলে ঐ নারীকে সমাজে উঠাইবার নিমিত্তে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার সম্পাদক মহাশয় এবং কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি আন্দোলন করেন, এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমার নিকটে এ ব্যবস্থাটা ভাল বোধ হইল না, তাই প্রতিবাদের আয়োজন করিয়া যে সকল সম্ভ্রান্ত সমাজহিতৈষী ব্যক্তি হুজুকে বিচলিত না হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের মত সংগ্রহ করি। (৫) পূজ্যপাদ স্যর গুরুদাসের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দেন তাহা পরবর্ত্তী চিঠিতে দৃষ্ট হইবে।

১৬ নং পত্র। ২০শে শ্রাবণ ১৩২৫।

আপনার গত ২২শে শ্রাবণের পত্র অদ্য পাইয়াছি। আপনি যে বিষয় আমার মত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সে বিষয়ে নানা কারণে মত প্রকাশ করিতে আমি ইচ্ছা করি না। তবে ব্যক্তিগত ভাবে বিশেষ করিয়া কিছু না বলিয়া সাধারণ ভাবে এই কথা বলিতে পারি যে, যদি কোন স্ত্রীলোক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বল দ্বারা নিতান্ত পরাভূত ও আত্মরক্ষায় অশক্ত হইয়া পরপুরুষ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়, এবং তাহার স্বামী বা অন্য অভিভাবক তাহাকে গৃহে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাতে অন্যের বাধা দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু সমাজে তাহাকে গ্রহণ করার পক্ষে একটি প্রবল বাধা এই যে সেই গ্রহণ করার ফল সমাজের পক্ষে অশুভকর হইবার সম্ভাবনা। ঐরূপ স্থলে স্ত্রীলোকটি নির্দ্দোষী এবং ঐ দুর্ঘটনা তাহার দুরদৃষ্ট ও তাহার জন্য সকলের হৃদয়ই ব্যথিত হইবে। কিন্তু তাহার ভাল করিতে গিয়া সমাজের মন্দ করা হইবে কি না ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরও দোষ নাই, তাহার দুরদৃষ্ট মাত্র, কিন্তু সমাজ তাহার সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইতি।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপসংহার

মহাত্মা স্যর গুরুদাসের মৃত্যুর পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত হারাণবাবুকে তদীয় জীবন চরিতের জন্য মালমসলা সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

---

(৫) প্রতিবাদ প্রবন্ধ 'ব্রাহ্মণসভার' মুখপত্র ব্রাহ্মণ সমাজে প্রেরিত হইয়াছিল; এবং যদিও প্রেরণের পূর্ব্বে সম্পাদকীয় অনুজ্ঞা লাভ করিয়াছিলাম, তথাপি প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় নাই—চাহিয়া ফেরতও পাওয়া যায় নাই।

মৃত্যুর পরে যখন এ বিষয় কি করা হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং আমার কাছে যে সকল চিঠি আছে, সেগুলি ব্যবহারোপযোগী মনে করিয়া তাহা দিতে প্রস্তুত আছি, এ কথা জানাইলাম, তখন হারাণবাবু যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহারও প্রতিলিপি এখানে দিলাম। কিন্তু যদিও উত্তরে চিঠিগুলি প্রয়োজন মতে নিবেন জানাইলেন, তথাপি সব গুলিরই যে ব্যবহার হইবে, তাহার সম্ভাবনাই বা কি, অথচ সত্বর সদ্ব্যবহার না হইলে এই সকল চিঠি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে; তাই ভবিষ্যতের উপর নির্ভর না করিয়া এভাবেই স্বর্গীয় মহাত্মার চিঠিগুলির যতটা আছে প্রকাশ করা হইল।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র।

শ্রীহরিঃ শরণম্

নারিকেলডাঙ্গা,
২৫শে মাঘ ১৩২৫।

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার ২৩শে মাঘের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আপনার পূর্ব্বকার পত্রও পাইয়াছিলাম, উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করি নাই। আমার তৃতীয় ভ্রাতা পিতৃদেবের বিস্তৃত জীবনধারা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। পিতৃদেব সম্বন্ধীয় important correspondence সমস্তই উহাতে প্রকাশিত হইবে। আপনার নিকট যে সকল চিঠি আছে, আবশ্যক বিবেচনা হইলে পাঠাইয়া দিতে লিখিব। আপনি তাঁহাকে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি রাখেন নাই।

আমার শরীর বড় ভাল নাই। মনে কিছুমাত্র উৎসাহ নাই। অত্রত্য এক প্রকার মঙ্গল। ইতি

ভবদীয়—
শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিরণময়ী

(শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "চরিত্রহীন" উপন্যাসের কিরণময়ী সম্বন্ধে আলোচনা)

[অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ]

ভাদ্র মাসের 'ভারতবর্ষে' 'শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব' সম্বন্ধে রাধাকমলবাবুর প্রবন্ধটী পড়িলাম। বহুকাল পূর্ব্বে দীনেশবাবুর লিখিত এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম, তাহাও এই সঙ্গে মনে পড়িল। দীনেশবাবু শরৎচন্দ্রের বাৎসল্য-রসের ব্যাখ্যা করিয়া শরৎবাবুর স্নেহপ্রবণ মূর্ত্তিখানিকে বাঙলা-সাহিত্যের দরবারে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। এক্ষণে রাধাকমলবাবু শরৎচন্দ্রের প্রতিভা সম্বন্ধে যে সকল অপ্রিয় ও তুলনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাহা পড়িলে, রাধাকমলবাবুর সমালোচনা-শক্তি সম্বন্ধে প্রভূত সন্দেহ হয়। তিনি বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে শরৎবাবুর স্থান নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তা'ছাড়া, যখন এক-একটি চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন, সেখানেও অনেক ত্রুটীর পরিচয় দিয়েছেন। যেখানে তিনি একটি চরিত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিতে বসিয়াছেন, সেখানেও তিনি অযথা আক্ষেপ ও লেখকের প্রতি উপদেশচ্ছলে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নমুনাস্বরূপ আমরা 'কিরণময়ী'র কথা তুলিতে চাই। রাধাকমলবাবু লিখিতেছেন, "যেখানে প্রত্যাখ্যাতা রমণীর চিত্রকে এমন করা হইয়াছে যে, সে প্রেমাস্পদ এবং পাঠক-হৃদয়ের নিকট অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্রী হয়, তাহা সাহিত্য-শিল্পের পক্ষে অস্বাভাবিকতার পরিচায়ক। জীবনের দিক্ দিয়াও তাহা বস্তুতন্ত্রহীন ও অসত্য।" কিরণময়ীকে সম্পূর্ণ ভাবে না বুঝিয়া রাধাকমলবাবু শরৎচন্দ্রের উপর দোষ চাপাইতেছেন। "কিরণময়ীর শেষের অধঃপতন ও বিকার …… অস্বাভাবিক। …… কিরণময়ীর চরিত্রাঙ্কনে শিল্প হিসাবে তাহার হঠকারিতা তত দোষের নহে, যত দোষের এই লক্ষ্যচ্যুতি।" রাধাকমলবাবু এইরূপে যদি শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব বুঝান, তাহা হইলে আমরা নাচার। তাঁহার অভ্যস্ত মামুলি স্তুতিবাক্য আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। আমরা নিজেদের অক্ষমতা বুঝি। সেইজন্য শরৎবাবুর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে না লিখে, শুধু তাঁর একটি চরিত্রের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাই। কিরণময়ীর সম্বন্ধে একটু তলিয়ে বুঝলে, আমরা

রাধাকমলবাবুর মত, কিরণময়ীর চরিত্র "অস্বাভাবিক ও বিকৃত" (পৃঃ ৩৯১) বলিতে পারিব না।

একটি চরিত্রের নানা ঘটনার সমাবেশে সম্পূর্ণ বিকাশ দেখানই শিল্পীর কর্ত্তব্য। যদি সেই চরিত্র প্রস্ফুটনের মধ্যে কোন যায়গা অস্বাভাবিক ঠেকে তাহা হইলে শিল্পীর অকৃতকার্য্যতা প্রতিপন্ন হইল। আমরা এ প্রবন্ধে দেখাইব যে, কিরণময়ীর চরিত্রে কোন অস্বাভাবিকতা নাই; বরং তাহার অধঃপতনের ইতিহাসের পার্শ্বে বাঙলা সাহিত্যের আর কোন এতাদৃশ চরিত্র মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। কিরণময়ীর চরিত্রটি চোখের সামনে জ্বলিয়া উঠে, চোখ নামাইয়া লইতে হয়। মনে হয়, কিরণময়ীকে জানি, অথচ চিনি না। শরৎবাবুর সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে এমন অদ্ভুত নারী-চরিত্র আর কোথাও দেখা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, এ চরিত্রটি তাঁর হৃদয়ের শোণিত দিয়ে লেখা। আমরা প্রথমে কিরণময়ীর ইতিহাসটুকু তার নিজের মুখেই শুনিব। তার পর লেখকের ইঙ্গিত অনুসারে তাহার চরিত্র বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করিব। কিরণময়ীর জীবনের ঘটনাগুলি খুব যে নূতনত্বে পূর্ণ তাহা নহে। মামার বাড়ী মানুষ হয়ে "বালিকা বয়সে" (পৃ ৪৩২) সে একদিন অঘোরময়ীর গৃহে বধূরূপে প্রবেশ করে। "স্বামী ছোট ছাত্রীটির মত তাহাকে গ্রহণ করেছিলেন। এক দিনের জন্য আদর করেন নাই, ভালবাসেন কি না; একদিনের জন্যেও সে কথা বলে যান নাই" (পৃ ২৯৯)। স্বামী যখন মৃত্যু-শয্যায়—তখন কিরণময়ীর ঘরে অনঙ্গ ডাক্তার তার "বীভৎস পুচ্ছপাশ" (পৃ ৩০০) নিয়ে ঢুকল। শাশুড়ি তখন কিরণময়ীর "মুখ চেপে ধরলেন"—"অনঙ্গ তখন সংসারের অর্দ্ধেক ভার নিয়েছিল" (পৃ ২৯৯)। এমন সময়ে উপস্থিত হলেন উদার-হৃদয় সতীশ ও দেবতুল্য উপীন। কিরণময়ী মুগ্ধ হইল। সে উপীনকে বলিতেছে, "আমার ভাই ছিল না, সতীশকে পেলুম আমার মায়ের পেটের ভাই, আর পেলুম তোমাকে (পৃ ৩০১)—আমি জানি তোমার সুরবালা আছে। আর আছে তোমার নিষ্ঠুর কঠিন পবিত্রতা। সে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, বজ্রের মত শক্ত। তার গায়ে একবিন্দু দাগ দিতে পারি আমার মত সহস্র কিরণময়ীরও সাধ্য নয়। কিন্তু জান ত ঠাকুরপো, মানুষের এমনি পোড়া স্বভাব, যা' তার সাধ্যাতীত তাতেই তার সব চেয়ে লোভ। ভগবানকে পাওয়া যায় না বলেই মানুষ এমন করে সব দিয়ে তাঁকে চায়। তাই আমার মনে হয়, তুমি আমার এত বড় অপ্রাপ্য বস্তু না হলে বোধ করি তোমাকে এত ভাল আমি বাসতুম না" (পৃ ৩০৩)। স্বামীকে সেবা করেও যখন বাঁচান গেল না তখন কিরণময়ীর জীবন শ্মশানতুল্য হইল। এই শ্মশানে অধিষ্ঠিত হলেন—অনুপম উপীন। "প্রথম দিন থেকে সেই যে তুমি আমার বুক জুড়ে রইলে, কোন মতেই সেখান থেকে তোমাকে আর নড়াতে পারলুম না।" (পৃ ৩০৬) উপীন তাহার মথিত হৃদয়কে কিছুমাত্র সান্ত্বনা না দিয়ে তার হাতে নিজের কাজের ভাগ তুলে দিলেন। স্থির হোল, উপীনের দূর সম্পর্কের ভাই বি-এ ফেল দিবাকর কিরণময়ীর গৃহে থাকিয়া কলিকাতায় পড়িবে।

দিবাকর কখনও স্নেহ ভালবাসা পায় নাই (পৃ ৩৩১) সেই জন্য কিরণময়ীর কাছে আসিয়া কেমন যেন অসুস্থ হইয়া উঠিল। কিরণময়ীর বুক খালি। স্বামী নাই। শাশুড়ীর নির্য্যাতন আছে। উপীনের কাছ থেকে বোনের মত বা মায়ের মত কোন স্থানই সে পায় নাই—এখন শুধু জানতে বাকি যে উপীন তাহাকে ঘৃণা করে। সতীশও কাছে নাই যে দুদণ্ড গল্প করে ভুলে থাকতে পারে। এমন অবস্থায় কিরণময়ী যে দিবাকরের সহিত মানব হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবে, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। কিরণময়ী দম দেওয়া গ্রেমোফোনের মত বাজিয়া গেল—কিন্তু তাহাতে চিত্তবিভ্রম ঘটিল শ্রোতা মহাশয়ের। নব্য যুবক—তাহাকে দোষ দিই না। কিন্তু এক দিন যখন ঝড়ের মত উপীন আসিয়া ঝির মুখে ও শাশুড়ি অঘোরময়ীর কাছে যা' তা' শুনে এবং দিবাকরের অবস্থা অনুমান করে সমস্ত দোষ বিধবা কিরণময়ীর উপর চালাইল —সে দিন দুঃখিনীর জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। কিরণময়ী তবুও "শান্তভাবে" উপীনকে বলেছিল—"তোমার রাগ, বল ঘৃণা বল ঠাকুরপো, সমস্ত দিবাকরকে নিয়ে ত। কিন্তু বিধবার কাছে সেও যা' তুমিও ত তাই! তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কতদূর কি দাঁড়িয়েছে, সেটা শুধু তোমাদের অনুমান মাত্র—কিন্তু সে দিন যখন নিজের মুখে তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছিলাম, তখন ত আমার দেওয়া খাবারের থালাটা এমনি করে ঘৃণায় সরিয়ে রাখো নি! নিজের

বেলায় বুঝি পত্নীর হাতের মিষ্টান্নে ভালবাসার মধু বেশী মিঠে লাগে ঠাকুরপো ?" (পৃ ৩৬৭) তার পর যখন উপীন সত্য কথা জানিয়াও জানিল না, তখন কিরণময়ী ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত দিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ঠাকুরপো, সমস্ত মিথ্যে, সমস্ত মিথ্যে, ছি ছি, তোমার আসনে কি না দিবা"—সেদিন উপীনের সে ঘৃণা প্রদর্শনও পদাঘাত কিরণময়ীকে আশ্রয়হীন পথের কাঙ্গাল করিয়া গেল। (পৃ ৩৬৯) কিরণময়ীর আপনার বলিতে কেহ নাই। রহিল শুধু তাহার ও দিবাকরের সম্বন্ধের অপবাদ। স্ত্রীলোক যখন দেখে তাহার ভাগ্য আর এক জনের সঙ্গে তাহার প্রিয়জন বাঁধিয়া দেয়, তখন সে আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তখন সে অপবাদকে মাথার মণি করিয়া লয়। তাই বিধবা কিরণময়ীর যাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল—তাহাই এক নিমেষে একমাত্র সম্ভব হয়ে উঠল। কিরণময়ী দিবাকরের সহিত বর্ম্মা পানে নিরুদ্দেশের যাত্রায় বাহির হইল। অনেকে মনে করেন, কিরণময়ী শুধু উপীনের উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য এমন কাজ করিয়াছিল। রাধাকমল বাবুও এই মতে সায় দিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাহা সত্য নহে। সে উপীনের আঘাত সহ্য করতে না পেরে দিবাকরের ভরসা করে সংসার থেকে বহুদূরে সরিয়া যাইবার জন্য এমনটা করেছিল। জাহাজে দিবাকরের মন ভারি হলে দিবাকরকে অনেকবার ফিরে যেতে বলেছিল। তবে একটা কাজ করে ফেলে মানুষ যেমন সান্ত্বনার জন্যে একটা কারণ মনে মনে তৈরী করে ল'য়, তেমনি কিরণময়ী এই প্রতিহিংসার ভাবটা আঁকড়ে ধরে তার স্বচ্ছ অন্তঃসলিলা উপীনের প্রতি ভালবাসাকে চাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষে সে বুঝল "সমস্তই আমার আগাগোড়া ভুল হয়ে গেছে।" (পৃ ৫২৯) তখন দিবাকরও বলেছিল, "আমি সমস্তই বুঝেছি বৌদি, তুমি আমার পূজনীয় গুরুজন।" (পৃ ৫৪৫)

তার পর গল্পের অংশ আর বিশেষ কিছুই নাই। কিরণময়ী ছয়মাস কাল নিরতিশয় কষ্টে আরাকানে দিবাকরকে লইয়া দিন কাটাইল। এ দুঃখের অবসান হইল যখন উপীনের আদেশে দিবাকরকে লইতে আসিয়া সতীশ কিরণময়ীকেও ফিরাইয়া লইয়া চলিল। কিন্তু উপীনের হুকুম মত কিরণময়ী তাহার দেবতাকে দেখিতে আসিতেও পারিল না। তীব্র বেদনায় অস্থির হইয়া কিরণময়ী পাগলিনী হইল। "আমি ভগবানকে দিন রাত জানাচ্ছি, তাঁর পায়ে ত আমি অনেক অপরাধ করেছি, তাই তাঁর বাক্স আমাকে দিয়ে তাঁকে ভাল করে দাও।" (পৃ ৫৫৫) উপীনের শেষ অবস্থায় কিরণময়ী ভাগ্য বিপাকে একটিবার তাঁর গৃহে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু কাহারও একটুখানিও করুণার বাণীও সে লাভ করতে পারিল না। সকলের চরিত্রের গ্লানি সে নিজের বুকে টানিয়া লইল। দিবাকরকে দেখে সে বলেছিল, "আহাম্মকী, তুমি কেন অমন কুণ্ঠিত হয়ে বসে রয়েছ ভাই ? তোমাকে কি এরা লজ্জা দিচ্ছে ?" বলিয়াই উপেন্দ্রের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ওকে তোমরা দুঃখ দিও না ঠাকুরপো, ও কারও চেয়ে হীন নয়।" (পৃ ৫৬২)

কিরণময়ীকে ভুল বুঝে সতীশ নিন্দা করেছিল। কিরণময়ীর দেহে উপীন ও দিবাকরের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। উপীনের মুখে তার সমস্ত ইতিহাস শুনে সাবিত্রীরও সমস্ত চিত্ত কিরণময়ীর প্রতি "বিতৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।" (পৃ ৫৫২) কিরণময়ীও কতবার নিজেকে অশ্রদ্ধা করিয়াছিল ; "পাপিষ্ঠা" বলিয়া (পৃ ৫৪১) ধিক্কার দিয়াছিল। সেই জন্যই কি আমরাও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব ?

কিরণময়ী মন্দ, অবিশ্বাসী ; কিন্তু তবু ঈশ্বরের জগতে সে আসিয়াছে, কবির কল্পনায় তাহার স্থান আছে। পাঠক পাঠিকাগণ তাহার নিরন্তর হাহাকার ধ্বনি শুনিয়া অনেকে নিজের মর্ম্মের কথা শুনিয়া থাকেন। তবুও কি কিরণময়ী পরিত্যাজ্য ? সে কি চিরকাল বিহ্বল হয়ে পথে-পথেই ঘুরবে ? তার কি উদ্ধার নাই ? কিরণময়ীর রূপ আছে, গুণ আছে, বিদ্যা বুদ্ধি যাহা থাকিবার, তাহাও আছে। তবু সে পড়িল কেন ? কেহ বলিবেন, "সে মন্দের আধার।" তাহাই যদি সত্য হবে, তবে কবি তাহার মুখ দিয়ে এত গভীর সত্য কথা বাহির করিলেন কেন ? কিরণময়ীর কথা ও কার্য্যের মধ্যে কবি এত সাদৃশ্য দেখাইলেন কেন। কেহ বা বলিবেন, "তার আত্ম-দমনের শক্তি ছিল না।" কাহার থাকে ? সতীশের ছিল ? উপীনদার সুরবালার প্রেমরূপ কবচ না থাকলে, থাকত ?

কিরণময়ী মানুষের অন্তরের রূপ। আমরা ঈশ্বরের নিয়মে জগতে নেমে এসে দাঁড়াই—কিরণময়ী হয়ে। উঠ্‌ব বলে ;—ধাক্কা খাই—কিন্তু সকলেই আবার উঠি - এ আশা কবি "চরিত্রহীন" উপন্যাসে দিয়েছেন। এখন দেখা যাক্—ধাক্কা খাই কেন ?

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনটি গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এই তিনটী গুণ যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে সমান ভাবে ফুটে উঠে, ততক্ষণ সে ভগবানের সৃষ্টি-কার্য্যে সাহায্য করতে পটু হয় না। [কিরণময়ী বলিল—"শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে যত দিন না সে তার জড় দেহটার মধ্যে সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চয় করে, ততদিন প্রেমের সিংহদ্বার তার সম্মুখে বন্ধই থাকে।......ততদিন পর্য্যন্ত স্বর্গীয় আকর্ষণ তাকে এক তিলও নড়াতে পারে না।" (পৃ ৩৫১)] এই তিনের তুষ্টিতে সৃষ্টি হয়। এখন কিরণময়ীকে দেখা যাক্। এই তিন গুণ পূর্ণ অবস্থায় তার মধ্যে বিদ্যমান। সে প্রকৃতিরূপিণী রমণী—সেও চায় "সৃষ্টি।" সে সাত্ত্বিক - সে জানে "আমি" কাল্পনিক, মরণের পরে "আমি" থাক্‌ব না—ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয়—পূর্ণ জ্ঞানী সে (পৃ ২৭১-২ দ্রষ্টব্য)। তবুও জ্ঞানের দাম্ভিকতা তাহার নাই। সুরবালার সরল বিশ্বাস দেখে তাহার বুদ্ধিমত্তা (Rationalism) ভেসে গেল। চক্ষের জলে কিরণময়ী সাত্ত্বিক হোল। কিরণময়ী পূর্ণ সাত্ত্বিক।

কিরণময়ী রাজসিকও বটে। সে নিজেকে ভোগ করিতে চায়। তার মত যার সাত্ত্বিক ভাব আছে—তাহারই কাছে পূর্ণ ভোগ সম্ভব। কিন্তু জগতে বুঝি তার তুলনা নাই। সেই জন্য তাহার ভোগের পথ অন্যের অমঙ্গল-কণ্টকে পূর্ণ। সে কি স্বামীকে ভোগ করতে চায় নাই ? চেয়েছিল—নিষ্কামভাবে—স্বামী-সেবার দ্বারা (পৃ ৩০৫-৬)—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার স্বামী অকালে ঝরিয়া গেল। সে কি পবিত্রভাবে নিজের ভালবাসা উপীনকে জানায় নাই ? জানাইয়াছিল প্রতিদান চা'য় নাই, যদিও তার প্রতিদানের সব চেয়ে দরকার ছিল। উপীন বুঝিল না। কিরণময়ীর ভালবাসা নিজের তরফ থেকে একটিবারও অগ্রাহ্য না করে, উপীন তাহাকে নিজের কাজে লাগাইল—কিন্তু বিনামূল্যে। ভালবাসার বাজারে মূল্যের প্রয়োজন না থাকলেও কিরণময়ী দুর্ব্বলা রমণী। সে ভাবিল, সে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু বজ্রের মত উপীন তার ভুল ভেঙ্গে দিল। এতবড় ধাক্কা কিরণময়ী জীবনে কখনও খায় নাই। সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভাব মিলিয়ে সে উপীনকে তার অর্ঘ্য ডালি দিয়েছিল,—উপীন তাহার নারী-হৃদয়ের কুসুমরাশি নিষ্পেষিত করে দিয়ে গেল—পড়ে রইল শুধু ডালাখানি। উপীনের প্রত্যাখ্যানে আজ কিরণময়ী বুঝিল তার কিছুই নাই—কোন গুণ নাই, কোন পুণ্য নাই, শরীরের শুধু রূপটুকু আছে। সেবা দিয়ে সে প্রীতিটুকুও পায় নাই ; ভালবাসা দিয়ে সে ভালবাসাও পাইল না। তুচ্ছ রূপ—এই বোধ হয় নারীর একমাত্র সম্পদ। কিরণময়ী পড়িল। সত্ত্ব ও রজঃ ভাবের তলায় যে তামসিক ভাবটুকু লুক্কায়িত ছিল, এখন তাহারই প্রাবল্য হইল।

এইবার দিবাকরের কথা। কিরণময়ী কেন দিবাকরের কাছে হৃদয়-কবাট খুলিল ? আমাদের মনে হয় এ ... অন্তঃকরণ খুলে রাখবার বা বন্ধ করিবার মন ... করে ... অধিকারও ছিল না। কোন মনুষ্যের নাই, কখনও ... না। [কিরণময়ী বলিতেছে—"তুমি কি ভাবো ইচ্ছা করলেই মানুষ যা খুসী তাই করতে পারে ? গোবিন্দলাল ইচ্ছা করলে রোহিণীকে ভালবাসতে পারত, আবার না পারতো, এই কি তোমার ধারণা ? (পৃ ৩৫৩-৪)] মানুষের হৃদয় আগুনের মত। তাহাতে হাত দিলে হাত পুড়ে যায় ; আবার আবশ্যক মত তাহাতে রন্ধনাদিও সারিয়া লওয়া যায়। তাই তুচ্ছ দিবাকর পুড়িল। দিবাকর যে ভাবে পুড়িল, সে পোড়া আমরা অনেকেই কি জীবনে পুড়ি না ?

দিবাকরকে এমন সুন্দর সুযোগটি কে দিল ? আমরা বলি, "উপীন"। কিন্তু এ বিষয়ে আন্দোলন করিলে কোন ফল দেখি না।

দিবাকরের কেন কিরণময়ীর দিকে আকর্ষণ হইল ইহাই আমাদের প্রশ্ন হওয়া উচিত। আমরা উপীনকে দোষ দিই বা দিবাকরের বয়সের কথা তুলি বা কিরণময়ীর কথাবার্ত্তার মাত্রা লক্ষ্য করি, কবি কিন্তু এ সকল বিষয়ে নিরুত্তর। কিরণময়ীর কথার ভঙ্গিমায় একটা জ্বালা আছে—সে জ্বালা আন্তরিক ও অনেকটা প্রচ্ছন্ন। দিবাকরের সহিত তর্কযুদ্ধে যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা শুধু ভান, কেবল

ন বোঝবার কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই নহে। এইরূপ ঢং'এর কথাবার্তা "চরিত্রহীন" উপন্যাসে আদৌ অপ্রত্যাশিত নহে, এবং কবি তাহার বীভৎসতার দিকটাও সুস্পষ্ট করে আমাদের সামনে ধরেছেন। এ ঢং একলা কিরণময়ীর নহে—সাবিত্রীর ভঙ্গিমায়ও আছে। [সতীশ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তুমি কি করতে সাবিত্রী! তোমার জিনিষটী কেহ যদি ভুলিয়ে নিয়ে যায়"—"আমি কি আপনার জিনিষ?"—বলিয়াই সাবিত্রী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। (পৃ ২১)।] কিন্তু যে রমণী ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করে, সেই পৃথিবীর চক্ষে উচ্চ হয়ে উঠে, তাই সাবিত্রীর সমস্ত ছল আমরা মার্জ্জনা করি, তার পূর্ব্বের কথাও ভুলে যাই। আর কিরণময়ী ভালবাসা গ্রহণ করিতে চায়, সেজন্য তাহার ঢং আমরা সহ্য করিতে পারি না!

কিন্তু প্রশ্নের উত্তর হইল না। দিবাকর ও কিরণময়ী কেন জড়িয়ে পড়ল? কবি একটী বিশেষ কারণ দেখাইয়াছেন ঠাকুরপো ও বৌঠা'নের সম্পর্ক (পৃঃ ৩৪৪)।

"তা কথাটা মিথ্যেও নয়, যে বাঙালীর সমাজের দেবর-ভাজের মধ্যে একটি মধুর হাস্য-পরিহাসের সম্বন্ধই বিরাজিত রহিয়াছে। এবং কোথায় ঠিক কোনখানে যে তাহার সীমারেখা, তাহাও অনেকের চোখে পড়ে না। কিন্তু এই নির্দ্দোষ হাস্য-পরিহাসের আতিশয্যে কত সময়ে যে কত বিষের বীজ ঝরিয়া পড়ে এবং অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে উপ্ত হইয়া, বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া, অকস্মাৎ এক সময়ে সমস্ত পরিবারকে ভীত চমকিত করিয়া দেয়, তাহার হিসাব কয়জন রাখে?"

কথাটা বড়ই কটু। তথাপি শরৎবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি সত্য নহে? মনে করুন "নষ্টনীড়"। মনে করুন "চোখের বালি"। রবীন্দ্রবাবুও কি এ ইঙ্গিত করেন নাই? তবে ঠাকুরপো ও বৌঠা'নদের দোষ দিতে চাই না, দোষ দিই আমাদের সমাজের প্রথার। ঠাকুরপো যতদিন না একটু বড়সড় হয়ে উঠছেন, ততদিন কোন স্ত্রীলোকের বিশেষ সম্পর্কে আসেন না। হঠাৎ দেখেন, সমবয়সী বৌঠা'ন এসে হাজির। বৌঠা'ন শ্বশুরবাড়ী এসে সকলকে ভয় করে চলেন, এমন কি স্বামীর কাছেও ভয়। শুধু দেবরের কাছে কোন সঙ্কোচ নাই। এই যে দুইটি হৃদয়ের সংযোগ, ইহার সঙ্গে যখন বৌঠা'নের দেবতার অগ্রাহ্যভাব এসে জুটে, তখন "নষ্টনীড়"। তবে সে সময়ের নবীন বয়সের রবীন্দ্রবাবু,—যাহা কুৎসিত, তাহা দেখাইবার পূর্ব্বেই—যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছেন; প্রবীণ শরৎবাবু—"কালী"র মধ্যেও যে "রক্তকালী" রয়েছেন,—তাহার সন্ধান দিবার জন্য পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন। এই সব কারণে দিবাকরকেও কোন মতেই দোষ দিতে পারিলাম না।

দিবাকর ও কিরণময়ীর বন্যা যাত্রা বাঙলা উপন্যাসে এক অভিনব চিত্র। মন্দের যে বীভৎসতাটুকু আছে, তাহা কোথাও এমন ভাবে চোখে পড়ে নাই। তবু এর মধ্যেও একটা গভীর সত্য আছে। কিরণময়ীকে দেখুন। সকল দেশের সর্ব্বকালের অনেক নারীই এমনি করে জীবনে অন্ততঃ একটিবার নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাহির হয়। পাথেয় তার নিজের সামর্থ্যটুক, তার পূর্ণ-প্রস্ফুটিত নারী-হৃদয়ের প্রেম।

তবে কি কিরণময়ী এ সময়ে দিবাকরকে ভালবাসিয়াছিল? না, কখনও আত্মদান করিয়া ভালবাসে নাই, তবে ঘটনাচক্রে আশ্রয় বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। দিবাকরের সহিত এসময়কার রহস্যালাপে কিরণময়ীর তমোভাব প্রকাশ পাওয়ায় "লালসার ইঙ্গিত" আছে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু রাধাকমলবাবু যে বলিয়াছেন, "কিরণময়ী চরিত্রকে এইস্থলে অতি সংক্রামক করিয়া ফেলিয়াছে" তাহা মানি না। এই সমস্ত রহস্যালাপ পড়িতে পড়িতে দৈহিক প্রেমের ঝাঁঝটাও যে কিরূপ জঘন্য ও ঘৃণিত, তাহাই আমাদের বারবার মনে আসে। স্ত্রীলোকের ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার যে অফুরন্ত নয়, ইহা জানিলে মানুষ কি পাপের হাত থেকে বাঁচিয়া যায় না? তাহা কি একটা মস্ত লাভ নহে? কিরণময়ীও কলুষিত হয় নাই।

অনেকদিন পরে দিবাকরের বুকের ভিতর হইতে যখন "বাসনার রাক্ষস" বাহির হইল, তখন সে আত্মরক্ষায় কিরণময়ী ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাহা বলিয়াছিল, তাহা মনে রাখা দরকার। "ভাল কথা কি জিজ্ঞেসা করেছিলে ঠাকুরপো, তোমাকে ভালবাসিনি কেন? কে বললে বাসিনি? বেসেছিলুম বৈ কি! কিন্তু, বয়সে আমি অনেক বড়, তাই যেদিন তোমার উপীন-দা আমার হাতে তোমাকে প্রথম সঁপে দিয়ে যান, সেই দিন থেকেই তোমাকে ছোট ভাইটির

মত ভালবেসেছিলুম। তাই ত, এই দু'মাস ধরে এক ঘরে বাস করেও তোমাকে এই দেহটা নষ্ট করতে দিতে পারিনি। তাই ত, তোমার চোখের ক্ষুধায়, তোমার মুখের প্রেম-নিবেদনে আমার সমস্ত দেহ ঘৃণায়, লজ্জায়, এমন করে শিউরে উঠে!" (পৃঃ ৫৩১) ইহাতেই বুঝা যায় 'কিরণময়ী কোন দিন নিজের মধ্যে বোঝাপড়া করতে পারে নাই' এরূপ কথা সত্য নহে। সে বিপথে যায় নাই, যাইবার উপক্রম হইবামাত্র সামলাইয়া লইয়াছিল; তবু কিরণময়ী নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলিতেছে, "পোড়া দেহটা কি আর কিছুই চাইলে না, চাইলে শুধু ভালবাসা! এ কাঙালবৃত্তি এর কি আমি কিছুতেই ঘুচোতে পারলুম না! আর পারবই বা কি করে! আমার আমিকে ত আমি অতিক্রম করতে পারিনে!" এতদিনে কিরণময়ীর আত্মজ্ঞান হইল, ইহাও সারাজীবনের অভিজ্ঞতায় কয়জনের হইয়া থাকে? কিরণময়ী নিজের দুর্ব্বলতাটুকু যদি পূর্ব্বে থেকে জানতে পারত, তা'হলে সে সংসারের অনেক কাজে লাগিত। কিন্তু ধীরে ধীরে দুঃখ-কষ্ট-জ্বালার মধ্য দিয়ে কিরণময়ীর চেতনা হইল; তাহার তমোভাব পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গেল। এখন একবার যদি তাহার দেবতা উপীনের কাছে যাইতে পায়, তার জীবনের সকল কষ্টের অবসান হয়। কিন্তু উপীনের বারণ; তাহা হইল না। যে উপীন সতীশ ও সাবিত্রীর যুক্তভাব জানিয়া, সতীশের নিজ মুখের উক্তি শুনিয়া (পৃঃ ৫৫৯), এবং সাবিত্রীর হৃদয়-স্পন্দন প্রত্যক্ষ দেখিয়াও (পৃঃ ৫৬১) সতীশের সহিত সরোজিনীর বিবাহ দিয়া ..., সে যে কিসের ভয়ে কিরণময়ীকে এতটুকু করুণা প্রদর্শন করিতেও পারিল না, তাহা বোঝা ভার। তথাপি পাগলিনী কিরণময়ীকে দেখে গভীর সমবেদনায় সতীশ যখন "উঃ" বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন একটিবারমাত্র উপেন্দ্রের চোখ দিয়া কিরণময়ীর জন্য জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল। (পৃঃ ৫৬২) ইহার সঙ্গে কি একটা আশীর্ব্বচনও জুটিল না? আমাদের বলিবার কিছু নাই— উপীন পাথরের দেবতা। তাই কিরণময়ী পাগলিনী!

ব্যর্থ! ব্যর্থ! কিরণময়ীর জীবনটা একেবারে বিফলে গেল! পূর্ণশক্তিরূপিণী কিরণময়ী নষ্ট হইয়া গেল। নারীর এত শক্তি বুঝি পৃথিবী ধরিয়া রাখিতে পারে না। এমন ঐশ্বর্য্যশালিনী রমণী বুঝি বিধাতার সৃষ্টিতে কদাচ দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, কিরণময়ী পাগলিনী হউক, আর যাহাই হউক, তাহার উদ্ধার আছেই। স্ত্রীলোক যখন পড়ে, তা'র ঐশ্বর্য্যই তাহার পতনের কারণ হয়। কিন্তু যখন উঠে, তখন খর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে আর আত্মদ্রোহিতার লেশটুকুও থাকে না। সে যখন নামে, তখন সে কিরণময়ী। যখন সে উদ্ধার হয়, তখন সে সাবিত্রী। দিবাকর ও কিরণময়ীর সহিত সতীশ ও সাবিত্রীর অনেক তুলনা হইতে পারে – বয়সের এবং অবস্থার। কিন্তু সতীশ বাঁচিল, কা... সাবিত্রীর মধ্যে তমোভাব পুড়ে গেছে। [সাবিত্রী বলিল, "এই নিয়ে চার বার হলো।" সতীশ—"অর্থাৎ?" সাবিত্রী —"অর্থাৎ, ইতিপূর্ব্বে আরও তিনজন এই জিনিষটিই দিতে চেয়েছিলেন।" সতীশ—"তুমি নাওনি?" সাবিত্রী — "না, জঞ্জাল জড় করে রাখবার মত যায়গা আমার নেই"। পৃঃ ৮৯]

সাবিত্রী তার রজোভাব ও সাত্ত্বিক ভাব দিয়ে নিজেকে দমন করিতে পারে। সাবিত্রী সতীশের হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবে, তাহার ভোগের সহচরী হইবে না। (পৃঃ ৫২০) কিরণময়ী পাগলের মত তাহাদের দেখিয়া গেল। আমরা প্রার্থনা করি, জন্মজন্মান্তরে কিরণময়ী "সাবিত্রী" হইবে; সেদিন উপীনকে চাইবে না অথচ পাইবে। তখন সাবিত্রীর মত সেও বলিতে পারিবে :—

"ভালবাসি কি না! নইলে কিসের জোরে তোমার ওপর আমার এত জোর? কিসের জন্যে আমার এত সুখ, আমার এত বড় দুঃখ? ওগো, তাই ত তোমাকে চিরকাল এত দুঃখ দিলুম, কিন্তু কিছুতে আমার এই দেহটা তোমা... দিতে পারলুম না! আজ তোমার কাছে কোন কথা আ... গোপন করব না! এই দেহটা আমার আজও নষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু তোমার পায়ে দেবার যোগ্যতা ... নেই। এই দেহ দিয়ে যে আমি ইচ্ছে করে ত... এ তো আমি কোন মতেই ভুল... আর যারই সেবা চলুক, তোমার পূ... পারে না।" (পৃঃ ৫১৯)

কিরণময়ী ও সাবিত্রী কবির শ্রেষ্ঠ কল্পনা হইতে উদ্ভূত। "চরিত্রহীন" উপন্যাসে শরৎবাবু নারী-হৃদয়ের মধুর ভাবটাই বিশেষ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। বাৎসল্য-স্নেহশালিনী মহেশ্বরী ও অঘোরময়ী আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে না।

'এ বলে আমায় দ্যাখ্, ও বলে আমায় দ্যাখ্।' সরোজিনী যত্নে পালিতা প্রেমাভিলাষিণী রমণী; সে বেণী চায় না, স্বামীর হৃদয়ের একটি কোণে পড়িয়া থাকিলেই তাহার চলিয়া যাইবে। সুরবালা ভাল;—যে কোন লাভ-লোকসানের ধাক্কা বইবে না, সেই যদি আদর্শ হয়, তাহা হইলে সুরবালা আদর্শ। কিন্তু 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে কবি গার্হস্থ্য-সুখের চিত্রকে যথাযথ সংযত করেই ধরেছেন। সেইজন্য যাঁহারা শুধু সুরবালা ও উপীনকে প্রশংসা করিবার জন্য উন্মুখ, তাঁহাদের এ পুস্তকখানি পাঠ বন্ধ করিতে অনুরোধ করি। উপন্যাসিক সতীশের মুখ দিয়ে বলেছেন, "এ কি সত্যযুগ যে পৃথিবীশুদ্ধ সবাই উপীনদার মত যুধিষ্ঠির হয়ে বসে থাক্‌বে? এ হোলো কলিকাল, অন্যায় অকাজ ত করবেই। তার কে আবার জমা-খরচ খতিয়ে বসে আছে! আমার উলটো বিচার, তা' ভালই বল, আর মন্দই বল, আমি দেখি কে কি কাজ করেচে।" (পৃঃ ৫৫১) তাই সাবিত্রী কাজের জন্য শেষে উপীনের "দিদি" হইল। অনাথিনী কিরণময়ী তাহার কর্ম্মফলে পাগলিনী হইল। এ বিচার পৃথিবীর সকল মহাকাব্যেই চলিয়া আসিতেছে। তবে একটি কথা আমাদের বিনীত অন্তরে বলিবার আছে। উপন্যাস মাত্রেই ভালমন্দের দ্বন্দ্ব লইয়া লিখিত। যখন সে দ্বন্দ্বের ধারা মানুষ নিজের জীবনে দেখে চিন্তিত হয়ে উঠে, তখনই উপন্যাস পড়া সার্থক। সেই জন্যই কিরণময়ীকে লইয়া এত নাড়াচাড়া করিলাম। সাত্ত্বিক কিরণময়ীকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। রাজসিক কিরণময়ীকে আমরা সংসারে আহ্বান করি। তমোপূর্ণ কিরণময়ীকে আমরা আশীর্ব্বাদ করি, "সে সাবিত্রী হউক।"

বামড়ার পথে—দেবগড়

[শ্রীজলধর সেন]

(২)

২৭শে আষাঢ় শনিবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, আর আজ ২৯শে আষাঢ় সোমবার বেলা নয়টার সময় প্রকৃত বামড়া-যাত্রা আরম্ভ হইল,—রেল-পথে এতখানি আগমন ত সূচনা মাত্র। এই যে ৫৮ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে, ইহার মধ্যে লোকালয় অতি কমই আছে,—আছে পর্ব্বত ও অরণ্য,—আছে নদী ও নির্ঝর,—আর শুনিলাম, আছে ব্যাঘ্র ও ভল্লুক, হরিণ ও ময়ূর, সর্প ও শৃগাল।

যাক্, দুর্গা-নাম স্মরণ করিয়া সোমবার বেলা নয়টার সময় মোটরে উঠিলাম। যাত্রী আমরা সাত জন, যথা—কলিকাতা হইতে আগত আমরা চারিমূর্ত্তি, পূর্ব্বে যে মাষ্টার মহাশয়ের কথা বলিয়াছি তিনি, স্বয়ং সারথী—ইংরাজী ভাষায় যাহাকে সোফেয়ার বলে তিনি এবং রাজাবাহাদুরের একজন প্রধান অনুচর, তাহার নাম লক্ষ্মণ। লোকটী সর্ব্বকার্য্যে নিপুণ—বিপদে আপদে এই প্রকার একটা লক্ষ্মণ সঙ্গে থাকিলে আর ভয়ের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না।

মোটর ছাড়িল। মাইল-দুই গমনের পরই গতি হ্রাস করিতে হইল এবং সারথী মহাশয় যে আশ্বাস দিয়াছিলেন—খুব বেশী হয় ত চারি ঘণ্টার মধ্যেই আমাদিগকে দেবগড়ে পৌছাইয়া দিবেন—সে সুরও একটু নরম হইয়া আসিল; তখনও কিন্তু আমরা পর্ব্বতের চড়াই উৎরাইয়ের নিকটবর্ত্তী হই নাই। সারথী বলিলেন, অতি তাড়াতাড়ি সেতু মেরামত হইয়াছে; তাহার উপর দিয়া দ্রুতগতি যাওয়া কর্ত্তব্য নহে, এই জন্য সম্মুখে অদূরে একটা সেতু দেখিলেই তিনি পূর্ব্ব হইতে যানের গতি সংযত করেন। তাহার পর, আর এক প্রতিবন্ধক গো-রথ; আট মাইল পথ পর্য্যন্ত একই পথে মোটর ও গো-রথ চলিয়া থাকে; সুতরাং সম্মুখে গো-রথ দেখিলেই গতিরোধ করিতে হয়। পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া, অরণ্য কাটিয়া ত আর চৌরঙ্গীর মত প্রশস্ত রাজ-পথ প্রস্তুত করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ এই আট মাইল পথ অন্য জমিদারের অরণ্যের মধ্য দিয়া নির্ম্মিত; সুতরাং পথটুকু বিস্তৃত বা সুসংস্কৃত অবস্থায় রাখা সব সময়ে হইয়া উঠে না। তাহার পর অরণ্যের কাষ্ঠভার লইয়া গো-যানসকল অবিরাম গমনাগমন করিলে রাস্তার কি

দুর্দ্দশা হয়, তাহা সকলেই জানেন। শুনিলাম, আট মাইল অতিক্রম করিলে বামড়া-রাজের এলাকা আসিবে। সেখান হইতে পথ অতি সুন্দর। পরলোকগত প্রাতঃস্মরণীয় রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব পথের এই অসুবিধার কথা বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া এই পথটা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, আগাগোড়া তিনি মোটর-গমনের জন্য পূর্ব্ব পথের পার্শ্ব দিয়া, কোথাও বা একটু দূর দিয়া নূতন একটা পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন; এক পথে গো-যান অশ্ব-যান যাতায়াত করিবে, অপরটাতে কেবল মোটর চলিবে। শুনিলাম, এই দ্বিতীয় পথটী প্রস্তুত করিবার সময় স্বর্গীয় রাজাবাহাদুর কোন অভিজ্ঞ ইন্‌জিনিয়ারের সাহায্য বা পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। পর্ব্বত ও অরণ্যের মধ্য দিয়া পথ প্রস্তুত করা স্থাপত্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা ব্যতীত হয় না; অনেক দেখিতে শুনিতে হয়, অনেক 'লেভেল' বিবেচনা করিতে হয়, অনেক বড়-বড় চড়াই-উৎরাই বাঁচাইতে হয়। রাজাবাহাদুর নিজে এই সকল করাইয়াছিলেন। এখন এই আট মাইল অতিক্রম করিতে পারিলে, সেই তবে সুগম রাস্তার কথা।

পথের মধ্যে কখন ধীরগতিতে, কখন দ্রুতগতিতে চলিয়া, সদ্য-সংস্কৃত সেতুগুলি অতিক্রম করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, মজুরেরা তখনও পথের পাশে কাজ করিতেছে। পররাজ্যের অধিকার শেষ হইয়া গেল। ১১ মাইল পরে একটা স্থানে উপস্থিত হইলাম। সে স্থানের নাম কেশো-বাহাল। এমন নামটীর অর্থ কি, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। এখানে রাজার একটী অতি সুন্দর ও মনোরম বিশ্রাম-ভবন আছে, কাছারী আছে, লোকজন আছে; রাজার টেলিফোঁরও একটা আড্ডা এখানে রহিয়াছে।

মোটর থামাইয়া সারথী যখন মোটরের গর্ভে জল-বোঝাই করিতে লাগিলেন, তখন এই কেশো-বাহালের কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন যে, বেলা তখন প্রায় ১১টা। যে ভাবে গাড়ী চলিতেছে, তাহাতে, অপরাহ্ণ তিনটার পূর্ব্বে দেবগড় পৌঁছিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। এই মাত্র শ্রীযুক্ত রাজাবাহাদুর টেলিফোঁ-যোগে আমাদের সংবাদ লইয়াছেন। আমরা তখনও কেশো-বাহালে পৌঁছিতে পারি নাই শুনিয়া, তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, আমরা যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বিশ্রাম-আবাসে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা করিবার জন্য সেখানকার কর্ম্মচারীর উপর আদেশ করা হয়। সে স্থানের নাম শুনিলাম কুচিণ্ডা; তাহা এ স্থান হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। সহযাত্রী লক্ষ্মণ বলিল, কুচিণ্ডায় টেলিফোঁ করিয়া আহারের আয়োজন করিবার আদেশ করা হউক, নতুবা অনাহারে ও পথশ্রমে বড়ই কষ্ট হইবে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্মণের পরামর্শই সর্ব্ববাদী-সম্মত রূপে গৃহীত হইল। কর্ম্মচারী মহাশয় তখন টেলিফোঁ করিতে গেলেন। শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, "একেই পথে নানা বিঘ্ন, তাহার উপর আবার পরবর্ত্তী বিশ্রাম-স্থানে আর এক বিঘ্ন ঘটাইলেন। এই কুড়ি মাইল পথ যাইতে এক ঘণ্টার বেশী লাগিবে না। সেখানে যাইয়া দেখিবেন তখনও রান্নার আয়োজন হইতেছে। আহারাদি শেষ করিতে অপরাহ্ণ হইয়া যাইবে। কাজেই সেখানেই আজিকার রাত্রিবাস। এমন ভাবে চলিলে, চাই কি, জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন বামড়ার পথেই কাটিয়া যাইবে।"

হায় রে অদৃষ্টের ফের! যে পথিক দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে অনেক সময় একাদিক্রমে তিন দিন অনশনে কাটাইয়াও ক্লান্তি বোধ করে নাই, দশ বিশ মাইল চড়াই-উৎরাই অনায়াসে অতিক্রম করিয়াছে, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কত বিনিদ্র রজনী তরুতলে বা উন্মুক্ত আকাশ-তলে অতিবাহিত করিয়াছে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় এখন তাহার পূর্ব্বাহ্ণ অতীত হইলেই আহার্য্যের অনুসন্ধান করিতে হয়, আকাশে একটু মেঘের সঞ্চার দেখিলেই আশ্রয় স্থানের জন্য ব্যাকুল হইতে হয়!

যাহা হউক, মধ্যাহ্নে কুচিণ্ডায় আহারের ব্যবস্থা স্থির করিয়া আমরা পুনরায় গাড়ী ছাড়িলাম। পথে সুধু শালবন আর পাহাড়, মধ্যে-মধ্যে নির্ঝরিণী কুলকুল স্বরে কাহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে-করিতে কোথায় ছুটিয়াছে। দুইটী বিভিন্ন পথই আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে; বড়-বড় চড়াই সহজে অতিক্রম করিবার জন্য কতই না কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে, কতই না ভাবিতে হইয়াছে। ইন্‌জিনিয়ারিং বিদ্যায় অনভ্যস্ত একজন সামন্ত-রাজ এই পর্ব্বতের মধ্যস্থ বন-জঙ্গলের মধ্যে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া-ফিরিয়া এই পথের

পরিকল্পনা করিয়াছেন। সুধু এই ব্রীজ-পথটীর নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলেই পরলোকগত রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন-দেবের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

কেশো-বাহাল হইতে ১৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা একটা গিরিনদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। সারথী বলিলেন, আমাদিগকে এই ভোড়েন নদী নৌকায় পার হইতে হইবে; মোটরকেও নৌকায় তুলিয়া পার করিতে হইবে। আমরা নদীর কিনারায় যাইয়া দেখি আট-দশখানি শাল্‌তি-নৌকা পাশে পাশে বাঁধিয়া এই বিস্তৃত যান প্রস্তুত হইয়াছে; পঁচিশ-ত্রিশ জন কুলী মোটরখানিকে পার করিয়া দিবার জন্য উপস্থিত রহিয়াছে। এই ভোড়েন পার্ব্বত্য নদী; সুতরাং ইনি সম্পূর্ণ নিজের খেয়ালে চলেন; এক এক সময় ইঁহার বিস্তৃত বক্ষ একেবারে জলশূন্য; তখন সকল প্রকার যানই অনায়াসে ইঁহার বক্ষের উপর দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে; আবার যখন ইনি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন দশ-পনর জন কুলী অতি কষ্টে একখানি শাল্‌তি লইয়া অপর পারে যাইতে পারে। আজ নদীর সেই ভীষণ মূর্ত্তি। বৃহৎ-বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডে প্রতিহত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে জলধারা প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া যাইতেছে; দেখিলেই হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। বারণ কোম্পানী এখানে সেতু নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সেতু প্রস্তুতের বিলম্ব হইতেছে।

তখন মনে হইল, হিমাচলের মধ্যে দীর্ঘ যষ্টি মাত্র অবলম্বন করিয়া এমন কত গিরি-নদী একাকী পার হইয়া গিয়াছি, সাহায্য করিবার দ্বিতীয় মানব পাই নাই; একটু অসাবধান হইলেই স্রোতের বেগে টানিয়া লইয়া কোন প্রস্তরখণ্ডে আহত হইয়া জীবন-শেষ হইবে-সে আশঙ্কা কোন দিনই হয় নাই। আর আজ এই এত কুলী-পরিবেষ্টিত হইয়া, এক প্রকাণ্ড শাল্‌তির যানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম—তাই ত! পার হওয়া ত ভারি মুস্কিল! সে কালে কোন দিন ভুলি নাই—পারের কাণ্ডারী সঙ্গে-সঙ্গে ছায়ার মত রহিয়াছেন, মুস্কিল-আসান্ একজন আছেন; তাই পারের ভাবনা ভাবি নাই;—আর এখন? হায় রে সে দিন! কুদিন হ'লেও সুদিন সে দিন!

রৌদ্রের মধ্যে অনাবৃত-মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোন লাভ নাই। তখন আমরা কয়েকজন যাত্রী প্রথমে পার হইলাম। আমাদিগকে পরপারে পৌঁছাইয়া দিয়া নৌকা পুনরায় অপর পারে ফিরিয়া গেল। মোটর পার করিতে আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিল; এদিকে কুচিণ্ডা মাত্র এক মাইল পথ। মোটরের অপেক্ষায় নদীতীরে বসিয়া থাকা অপেক্ষা এই এক মাইল পথ চলিয়া গেলে আহারাদির ব্যবস্থা আরও একটু সত্বর হইবে মনে করিয়া আমরা পদব্রজেই যাত্রা করিলাম; শ্রীমান্ সতীন্দ্র সঙ্গী হইলেন না, ঘাটেই বসিয়া রহিলেন। কিছু দূর যাইয়াই অদূরে কুচিণ্ডা দেখিতে পাইলাম। বড় একখানি গ্রাম, অনেকগুলি অট্টালিকা। আর একটু অগ্রসর হইয়াই দক্ষিণ পার্শ্বে একটা সিংহদ্বারওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিলাম। এটী জেলখানা; দ্বারে প্রহরী রহিয়াছে। আমি পথের উপর দাঁড়াইয়া জেল দেখিতেছি, এমন সময় দেখি আমার পুত্র অজয়কুমার জেল হইতে বাহিরে আসিলেন;—তিনি আমার আগেই যাত্রা করিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা, জেলে যাবেন?" আমি অস্বীকার করিলাম; মনে-মনে বলিলাম, যে জেলে তোমরা আটক করিয়াছ, তাহার উপর আবার জেলে যাব। শ্রীমান্ জেলের বিবরণ দিতে-দিতে চলিলেন। এই জেলে নাকি একজন স্বদেশী-গ্রস্ত বাঙ্গালী যুবক আছেন; তাঁহার সহিত কথা বলা নিষেধ। ক্রমে পুলিশের থানা, স্কুল, দাতব্য-চিকিৎসালয়, বাজার অতিক্রম করিয়া একটি সুদৃশ্য মসজিদ্ দেখিলাম; আরও একটু যাইয়া জগন্নাথদেবের মন্দির। পরলোকগত রাজা-বাহাদুর যেমন হিন্দু প্রজার জন্য জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তেমনই মুসলমান প্রজাগণের জন্য মসজিদ্‌ও নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই দুইটার ব্যয় রাজ সরকার বহন করেন। বুঝিলাম, কি জন্য রাজা সচ্চিদানন্দ এমন জন-প্রিয় হইয়াছিলেন। আমরা তখন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু সেই বেলা সাড়েবারটার সময় জগন্নাথদেব বিশ্রাম করিতেছিলেন, পুরোহিত মহাশয় দ্বারে তালা লাগাইয়া কোথায় গিয়াছিলেন। আমরা পিতা-পুত্রে জগন্নাথের উদ্দেশে রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে প্রণাম করিয়া, তিনি তাঁহার এই ক্ষুধার্ত্ত সন্তানগণের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে-ছেন, তাহা দেখিবার জন্য কুচিণ্ডার বিশ্রাম-আবাসের দিকে

গেলাম। আমরাও প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম, মোটরও তখনই আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিশ্রাম-আবাসে স্থানীয় কলেক্টর, অন্যান্য কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণ আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা আমাদের পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সবিনয় নিবেদন করিলেন যে, ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া এই অল্প সময়ের মধ্যে যাহা ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন, তাহা প্রস্তুত; আমরা স্নানাদি শেষ করিয়াই আহার করিতে পারি। সঙ্গী লক্ষ্মণ ভিতর-দিক পরিদর্শন করিয়া আসিয়া বলিল "আর বিলম্ব করিবেন না; শুধু অন্ন নামিলেই হয়; পাছে ঠাণ্ডা হইয়া যায় বলিয়া অন্ন প্রস্তুতের অপেক্ষা ছিল।" যাহা হয় কিছু মিলিবে জানিয়া আমরা তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিলাম। তাহার পরই আহার। আহারের কথাটা একটু বিস্তৃতভাবে দিতে হইতেছে। মনে করিলাম, এই ত ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে সংবাদ আসিয়াছে; ইহার মধ্যে লোকজন ডাকিয়া আয়োজন-উদ্যোগ করিয়া অধিক আর কি প্রস্তুত হইতে পারে; ডাল, ভাত, আর খুব বেশী হয় ত একটা তরকারী। কিন্তু আহারে বসিয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। দেখিলাম চারি-পাঁচটী নিরামিষ তরকারী, নানারকম ভাজা, দুই-তিনটা ডাল, মাংস, টক, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন। এদের ঘরে আলাদিনের আশ্চর্য্য-প্রদীপ আছে না কি? কলেক্টর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, রাজার আদেশে, এই পথের মধ্যে যে কয়টী বিশ্রাম-আবাস আছে, সর্ব্বত্র প্রতিদিন দুইবেলা অতিথি-সৎকারের আয়োজন থাকে; সংবাদ-প্রাপ্তি মাত্রই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। বিশেষ এখানে জগন্নাথ-দেবের সেবার জন্য সমস্ত আয়োজন প্রতিদিনই করিতে হয়; সুতরাং অতিথি-সৎকারের জন্য কোন বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আমি বলিলাম "তাহা হইলে যেদিন অতিথি বেশী আসেন, সেদিন দেবতার ভাগে কম পড়ে।" কলেক্টর শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ দ্বিবেদী মহাশয় বলিলেন "আমাদের রাজার আদেশ, অতিথি নারায়ণ, সকল দেবতার উপর তাঁহার আসন।" বুঝিলাম, প্রকৃত হিন্দু-রাজার রাজ্যে আসিয়াছি। শুনিলাম, স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর এ সমস্ত সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর বয়সে যুবক হইলেও, তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতেছেন। আহারান্তে একটুও বিলম্ব না করিয়া দেড়টার সময় কুচিণ্ডা-ত্যাগ করিলাম।

প্রায় এক মাইল পথ যাইবার পর পার্শ্ববর্ত্তী গো-যানের পথের উপর এক ভয়ানক দৃশ্য দেখিলাম। আগে-পাছে কুড়িজন বন্দুকধারী সিপাহী, মধ্যে আটজন কুলিবাহিত একখানি আচ্ছাদিত ডুলী দেবগড়ের দিকে যাইতেছে। সঙ্গে পুলিসের ইউনিফরম্-পরিহিত একজন অশ্বারোহী পুরুষ; দেখিয়াই বুঝিলাম ইনি ইন্‌স্পেক্টর। লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপার কি"; সে বলিল, "প্রকাণ্ড ডাকাতের সর্দ্দার আবিল্য মহাপাত্র ধরা পড়িয়াছে, তাহাকে দেবগড়ে লইয়া যাওয়া হইতেছে।" আমরা এই কথা শুনিয়া মোটর হইতে নামিয়া পড়িলাম। পুলিসবাহিনীর দিকে অগ্রসর হইতেই ইন্‌স্পেক্টরের আদেশে তাহাদের গতিরোধ হইল। আমরা দেখিলাম ডুলীর মধ্যে হস্তপদ-শৃঙ্খলাবদ্ধ একটী লোক শয়ন করিয়া আছে। লোকটীর মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিলাম,—হাঁ এ ডাকাইতের সর্দ্দার হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি বটে! বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, ললাট প্রশস্ত, নাতিদীর্ঘ শ্মশ্রু, মস্তকে রুক্ষ কেশভার;—বীরের চেহারা বটে! প্রকাণ্ড ডাকাইতদলের সর্দ্দারের আকৃতি এমনই হওয়া চাই! মুখে বীরত্ব ও প্রতিভা যেন জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। মহাপাত্র আমাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। লক্ষ্মণ বলিল, "আর বিলম্ব করিবেন না, গাড়ীতে চলুন; সর্দ্দারের সব কথা আমি বলিব। আর কাল দেবগড়ে ত ইহাকে দেখিতেই পাইবেন।" গাড়ীতে আসিয়া লক্ষ্মণের মুখে শুনিলাম, এই আবিল্য মহাপাত্রের ন্যায় ভয়ানক ডাকাতের সর্দ্দার এই বনপ্রদেশে দ্বিতীয় নাই; সমগ্র উড়িষ্যা-প্রদেশে ইহার দল বিস্তৃত। বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজা স্যার সুচলদেবের সময় এ একবার ধরা পড়ে; তখন ইহার দশবৎসরের কারাদণ্ড হয়। দেবগড়ের জেলে দশবৎসর থাকিয়া এ নিষ্কৃতিলাভ করে। তাহার পর পুনরায় ডাকাতের দল গঠন করে এবং এতদিন পর্য্যন্ত উত্তরে রাঁচী হইতে দক্ষিণে গঞ্জাম অবধি নানাস্থানে ডাকাইতি করিয়াছে। বৃটিশ ও গড়জাত-মহলের পুলিস বহু চেষ্টাতেও এতদিনের মধ্যে ইহাকে ধরিতে পারে নাই। সম্প্রতি সে বামড়া-পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। সে এ

রাজ্যেরই প্রজা, তাই তাহাকে দেবগড়ে বিচারের জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আবিলা মহাপাত্র খঞ্জ; পূর্ব্বে সে দুইখানি যষ্টির সাহায্যে না কি ঘণ্টায় পনর কুড়ি ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতে পারিত। এখন বয়স অধিক হওয়ায় লোকের স্কন্ধে চাপিয়া ডাকাতি করিতে যাইত। এবার যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন বোধ হয় ইহাকে আমরণ দেবগড়ের জেলেই কাটাইতে হইবে। ইহাকে দেখিয়া বোধ হইল বয়স প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন।



দেবগড়—রাজকুমার হাইস্কুল

এই ডাকাতির কথা হইতেই নানা দেশের অনেক দস্যুদিগের কাহিনী আলোচিত হইতে লাগিল। আমাদের নদীয়া জেলার বিশ্বনাথ ডাকাতের কথা, এদিকের বড়-বড় ডাকাতের কীর্ত্তিকলাপের আলোচনা চলিতে লাগিল।

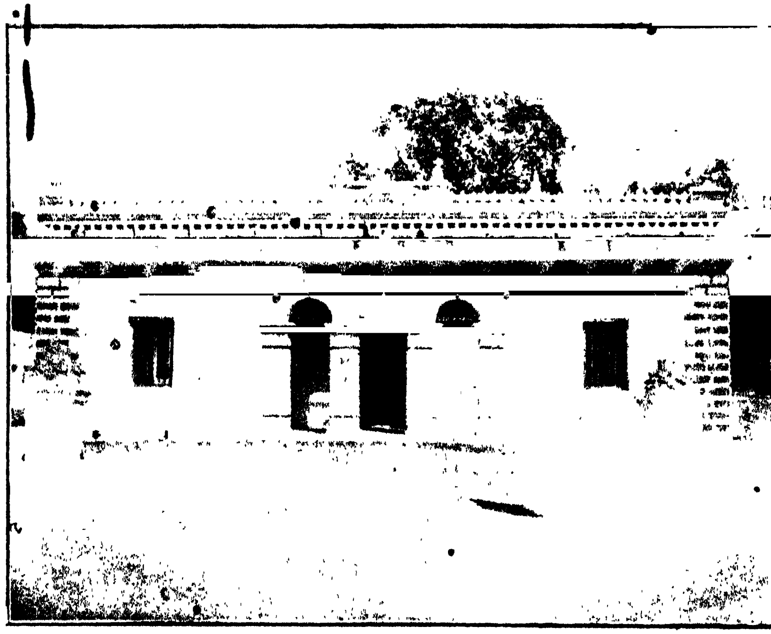
একটু পরেই বাগ কোম্পানীর নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড ঝোলা সেতুর উপরে আমাদিগের গাড়ী উপস্থিত হইল। নিম্নে খরস্রোতা নদী, তাহারই উপরে রাজা সচ্চিদানন্দের আমলের এই ঝোলা-সেতু (Hanging Bridge) নির্ম্মিত হইয়াছে। সেতু পার হইয়া পাঁচ মাইল গমনের পর সিরিডি নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে বামড়া-রাজের কাষ্ঠের আপিস আছে। পূর্ব্বে এখান হইতেই নানাস্থানে কাষ্ঠের স্লিপার সরবরাহ করা হইত; এখন ইহার প্রধান আপিস ও কারখানা বহু দূরে বলম নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সেখানে কল-কারখানা বসিয়াছে; প্রতি দিন বহুসংখ্যক স্লিপার প্রস্তুত হইয়া থাকে। সে সমস্ত স্লিপার বেঙ্গল নাগপুর



দেবগড়—বসন্ত-নিবাস

রেল-কোম্পানী ক্রয় করিয়া থাকেন। এই সিরিডিতে বামড়া-রাজের প্রকাণ্ড খামার আছে, এখানে ধান সংগৃহীত হয় এবং যথাস্থানে প্রেরিত হয়।

সিরিডি হইতে মোটরে জল লইয়া কিছুদূর যাইবার পরই মোটর থামিয়া গেল। সারথী বলিলেন, "কল গরম হইয়া গিয়াছে।" প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে আটকাইয়া থাকিতে হইল; তাহার পর গাড়ী অতি ধীরে চলিতে লাগিল। অনেক স্থানে চড়াই উঠিতে না পারায় সকলে নামিয়া গাড়ী ঠেলিয়া তুলিতে হইল। এই অবস্থায় পাঁচ ছয় মাইল যাইবার পর মোটর একেবারে অচল হইয়া গেল। সারথী কল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কিছুতেই আর মোটর চলিবার সম্ভাবনা নাই।" তখন বেলা বোধ হয় পাঁচটা; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, একটু-একটু বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। সম্মুখে এখনও বার মাইল পথ। সারথী ও লক্ষ্মণ উভয়েই বলিল, এদিকে ছয় মাইল, ওদিকে ছয় মাইল পথের মধ্যে কোন লোকালয় নাই, কোন আশ্রয় পাইবার উপায় নাই। তাহার পর এই স্থানটা সমস্ত পথের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ; এখানে সর্ব্বপ্রকার হিংস্র জন্তুর আবাস। এদিকে আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন! বলা বাহুল্য, আমাদের সকলের মনেই ভয়ের সঞ্চার হইল। এই ছয় মাইল পথ পদব্রজে যাওয়া সহজ কথা নহে; অল্প একটু গেলেই অন্ধকার গাঢ়তর হইবে। অল্প-অল্প বৃষ্টিও পড়িতেছে। সাহস দিবার লোক একমাত্র লক্ষ্মণ! সে মাথা চুলকাইতে লাগিল,—বলিল, তাই ত, এখন কি করা যায়।



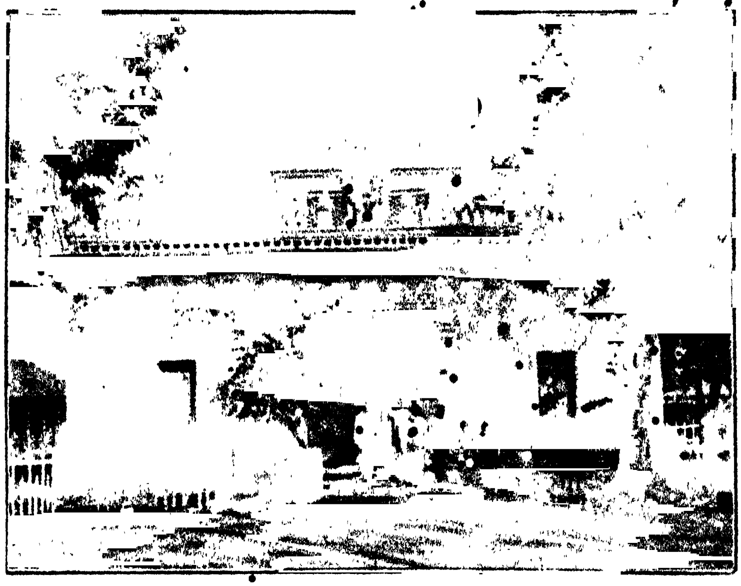
দেবগড়—জুবিলী হল



দেবগড়—ডিস্‌পেন্‌সারী

সারথী মোটরের কল পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিল; শ্রীমানেরা ও-বিষয়ে মহাপণ্ডিত

হইলেও, বিশেষ অভিজ্ঞের মত নানা পরামর্শ দিতে লাগিলেন, কলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কোথায় কোন্ কলটী কি অবস্থায় আছে, তাহার গবেষণা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন উপায়ই উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। এদিকে ঘণ্টাখানেক পূর্ণ বিশ্রাম পাইয়াই হউক বা আমাদের বিপদে কাতর হইয়াই হউক, মোটরের লৌহ হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল; এতক্ষণ তাহা আর কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই,—মোটর অচল, ত অচল। এই সময় সারথী



দেবগড়—ছাপাখানা

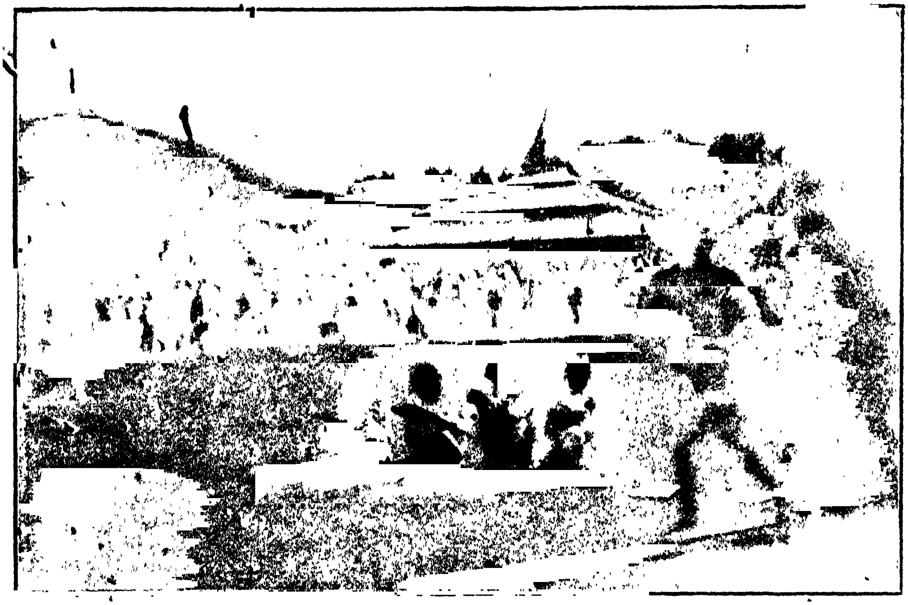
মহাশয় একবার কল চালাইবার জন্য চক্র ঘুরাইলেন,—মোটর নড়িয়া উঠিল। আমরা তখন রাস্তার পার্শ্বে বসিয়া আছি। আর একটু চেষ্টা করিতেই মোটর চলি চলি 'পা পা' ভাবে গমন করিতে লাগিল। সারথী ও লক্ষ্মণ বলিল, এমনই করিয়া যদি মাইল তিন যাওয়া যায়, তাহা হইলেই একেবারে বাকাটা উৎরাই—মোটর বেশ চলিবে।

আমরা তখন মোটরে উঠিয়া বসিলাম। গো-যানের ন্যায় ধীরে ধীরে মোটর চলিতে লাগিল। আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই তিন মাইলের মধ্যে তাহার গতি মোটেই বন্ধ হইল না। তাহার পরই উৎরাই। তখন মোটর বেশ বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর যাইয়া একটা অতি ক্ষুদ্র কোঠা ঘর দেখিতে পাইলাম। লক্ষ্মণ বলিল, এটী বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর নির্ম্মাণ করাইয়াছেন; ইহার নাম 'প্রভাসিনী'। [illegible] রাজা বাহাদুর এখানে সর্ব্বদা বেড়াইতে আসেন, নিকটের জঙ্গলে যথেষ্ট শিকার মেলে।

গাড়ী আর থামানো হইবে না, কি জানি তাহার পক্ষ



দেবগড়—সেটলমেণ্ট আপিস



দরবার গৃহ

যদি আর না চলে! মোটর তখন খুব বেগে ছুটিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, বাতি জ্বালিবার উপায় নাই; পথ অন্ধকার। সারথী কিন্তু তাহাতে ভীত হইল না; এই অন্ধকারের মধ্যেই সে বেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল—পথ যে তাহার সম্পূর্ণ পরিচিত।

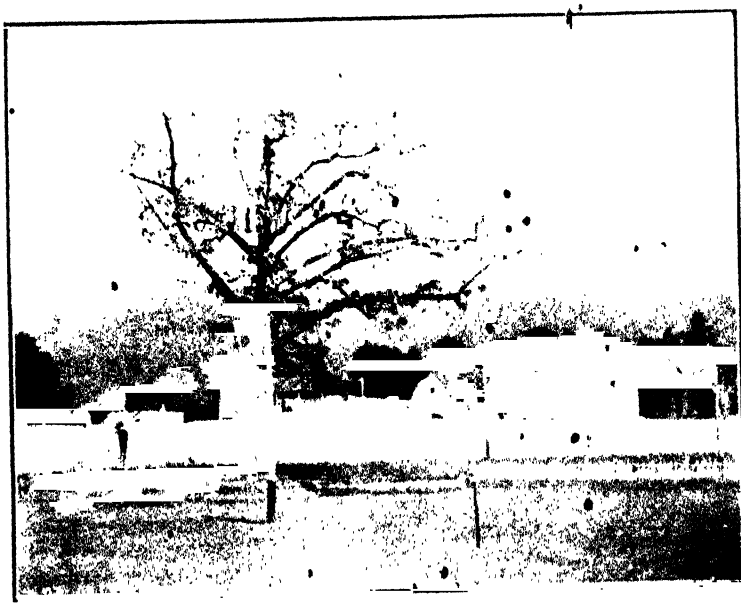
কিছুক্ষণ পরেই দূরে বিদ্যুতের আলোক দেখা গেল—দেবগড়! আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। একটু যাইতেই আমরা একেবারে বিদ্যুৎ আলোকিত রাজপথে প্রবেশ করিলাম। তখন আর বামে দক্ষিণে দৃষ্টি করিবার ইচ্ছা ছিল না,—কোন রকমে নামিতে পারিলেই বাঁচি।



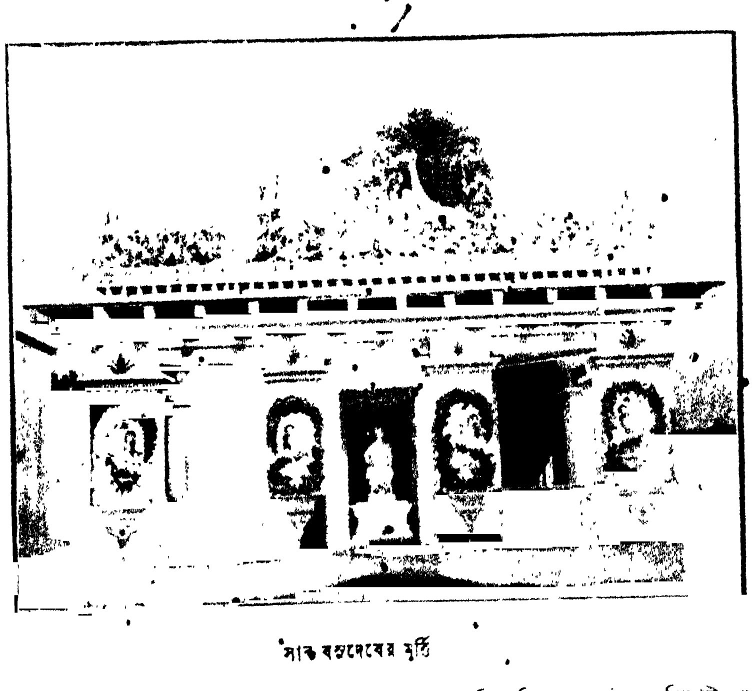
দেবগড়—কাছারী

রাজপথ দিয়া অল্প একটু অগ্রসর হইতেই পথপার্শ্ব হইতে আদেশ প্রচারিত হইল—এই-খানে থামাও। গাড়ী থামিল;—বিদ্যুতের আলোকে দেখিলাম, বামড়া ষ্টেটের কর্ণধার শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু সহাস্য মুখে দণ্ডায়মান। দেবগড়ে যতগুলি বাঙ্গালী আছেন, সকলেই আমাদের অভ্যর্থনার জন্য যোগেশ বাবুর বাসায় সমাগত। আলিঙ্গন, অভিবাদনের মধ্যে দিশাহারা হইয়া আমরা যোগেশ বাবুর বৈঠকখানায় নীত হইলাম।

'বামড়ার পথে' শেষ হইল।



দেবগড় – অবজারভেটরী (মানমন্দির)



সান্ত বসুদেবের মূর্ত্তি

এখন দেবগড় ও অন্যান্য স্থানের বিবরণ বাকী। কিন্তু 'নিজের কথাই সাত কাহন' হইলে ত চলিবে না;— আর সে অনেক কথা। তাই আজ এ সংখ্যায় দেবগড়ের কয়েকখানি চিত্র প্রদর্শন করিয়াই বর্ত্তমান প্রস্তাব শেষ করিলাম। বারান্তরে অন্য সকল কথা বলিবার বাসনা রহিল।

চারিজনের কাউন্সিল



বাম দিক হইতে—প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ ; প্রধান মন্ত্রী এম, সোনিনো ; প্রধান মন্ত্রী এম, ক্লেমেন্স্ এবং প্রেসিডেণ্ট উইলসন

[যুদ্ধ বন্ধ হইলে, সন্ধি করিবার জন্য যে শান্তিসংসদ স্থাপিত হয়, তাহার কার্য্যাদি করিবার জন্য গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপানের প্রধান ও বৈদেশিক সচিব এবং ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রেসিডেণ্ট ও ষ্টেট সেক্রেটারীকে লইয়া ১০ জনের কাউন্সিল গঠিত হয়। পরে এই কাউন্সিল পাঁচজনকে লইয়া গঠিত হয়। তাহার পর জাপান অবসর গ্রহণ করায় উক্ত চারিজন মনস্বীকে লইয়া চারিজনের কাউন্সিল গঠিত হয় এবং তদ্দারা শান্তি-সন্ধি সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে।]

পশ্চিম-তরঙ্গ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

(১) জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি

বোষ্টনবাসিনী শ্রীমতী আনা কোলম্যান ল্যাড্ পূর্ব্বে কেবল-মাত্র প্রাণহীন প্রতিমাই রচনা করিতেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি ফ্রান্সে জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি রচনা করিতেছেন; অর্থাৎ যুদ্ধে আহত সৈনিকগণের ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডল তিনি পুনর্গঠিত করিয়া দিতেছেন। প্লাষ্টার নামক মূর্ত্তি গঠনোপযোগী এক প্রকার উপাদানের সাহায্যে তিনি যে অদ্ভুত কারুকার্য্য



শ্রীমতী আনার রচিত একটী জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি
(বামে জনৈক বন্ধু; মধ্যে আহত সৈনিক-যুবক ও দক্ষিণে
শ্রীমতী আনা কোলম্যান ল্যাড্)

প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা যথার্থই বিস্ময়কর। শ্রীমতী আনার শিল্পাবাসে প্রতিদিন পাঁচ-সাতজন করিয়া আহত সৈনিক সমবেত হয়। যুদ্ধের বিষময় ফলে তাহাদের ভয়ঙ্কর বিকৃতাবস্থা-প্রাপ্ত মুখমণ্ডলের তিনি সুন্দর ভাবে সংস্কার করিয়া দেন। কাহারও নাসিকা, কাহারও গণ্ডদেশের কিয়দংশ, কাহারও বা একটা কর্ণ তিনি—দর্শকগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে-করিতে,—অল্পক্ষণের মধ্যেই অতি ক্ষিপ্র-কারিতার সহিত গঠিত করিয়া দেন। প্যারি নগরীতে অবস্থান কালে তিনি ৭১ জন ক্ষতবিক্ষত সৈনিকের বিকৃত মুখাকৃতির সংস্কার করিয়াছেন। উহাদের অনেকেরই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, শ্মশ্রু, গুম্ফ, এমন কি, গণ্ডদেশের কিয়দংশ পর্য্যন্তও, একেবারেই কৃত্রিম। ঐ সকল সৈনিক তাহাদের কৃত্রিম মুখের জন্য কিছুমাত্র অসুখী নহে, বরং



'ঈগল' পত্রের সম্পাদকরূপে মহাকবি হুইট্‌ম্যান
(১৮৪৬ খৃঃ অব্দে গৃহীত চিত্র)

তাহারা উহাতে গর্ব্ব অনুভব করে। কারণ, সহজে কেহ তাহাদের মুখের ঐ কৃত্রিমতা ধরিতে পারে না।

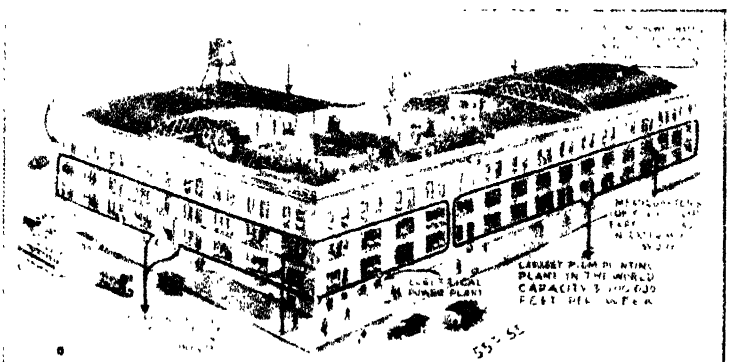
চিত্রে প্রদর্শিত সৈনিক যুবকটীর মুখের চিবুক একেবারেই উড়িয়া গিয়াছিল। সে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-সাধে একান্তই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শ্রীমতী আনার অপূর্ব্ব কারুকার্য্যের গুণে সে তাহার বিনষ্ট শ্রী পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছে; এবং সেই সঙ্গে তাহার জীবনের



'তৃণপল্লবের' কবি ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান



ঋণের পরিমাণ!



পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন প্রাসাদ

(চলচ্চিত্রের কর্ম্মশালা)

বিগত আশা-ভরসাও সে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। শীঘ্র সে তাহার মনোনীত প্রণয়িনীর সহিত পরিণীত হইবে। তবে এখনও সে বেশ সুস্পষ্ট ভাবে কথা কহিতে, ধূমপান করিতে, বা কোনও কঠিন ভোজ্য-দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে অক্ষম।

শ্রীমতী আনা 'রেড ক্রসের' পক্ষ হইতে এই নূতন কার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে, বোষ্টন নগরে ভাস্কর-শিল্পীর কার্য্য করিতেন। আহত সৈনিকগণের বিকৃত মুখের তিনি প্রথমে একটি ছাঁচ তুলিয়া লন। পরে আহত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের মুখের যেরূপ আকৃতি ছিল, তাহারও একটি ছাঁচ তৈয়ার করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি এই শেষোক্ত ছাঁচটি উক্ত সৈনিক পুরুষগণের ভূতপূর্ব্ব আকৃতির আলোক-চিত্রের সাহায্যে প্রস্তুত করেন। যখন কোন সৈনিক পুরুষের এরূপ কোনও আলোকচিত্র পাওয়া যায় না, তখন

তিনি উক্ত সৈনিকের আহতাবশিষ্ট মুখের সুবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নষ্টাংশগুলির কৃত্রিম উপায়ে পুনরুদ্ধার করিয়া থাকেন। অতীব সূক্ষ্ম তাম্র-পাতের সাহায্যে তিনি একপ্রকার কৃত্রিম মুখ নির্ম্মাণ করেন। পরে সুদক্ষ চিত্র-শিল্পীর ন্যায় সূক্ষ্মতম বর্ণবিচারে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া তিনি সেগুলিকে রঞ্জিত করেন। এইরূপ কার্য্যে একান্ত যত্ন, অধ্যবসায়, শিল্পচাতুর্য্য ও বাস্তবতার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; কারণ, সজীব মনুষ্যের মুখের স্বাভাবিক বর্ণের সহিত কৃত্রিম মুখের অনুরঞ্জন সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যাওয়া চাই। এই কৃত্রিম মুখানুকৃতিগুলি মস্তকের কেশের সহিত সমবর্ণবিশিষ্ট সূত্রের সাহায্যে আহত ব্যক্তির যথাস্থানে সম্বদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। (*Literary Digest. 6. 89. 21.*)

(২) ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যান।

বিগত ৩১শে মে তারিখে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যানের শতবার্ষিক জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। হুইটম্যানের জন্মস্থান আমেরিকার সাহিত্যিকগণেরতীর্থ স্বরূপ। স্বর্গগত মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া দিবার জন্য প্রতি বৎসর তাঁহার জন্মদিনে ঐ স্থানে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। কবির এই শতবার্ষিক জন্মদিনে আমেরিকার অসংখ্য সংবাদপত্রে তাঁহার সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ও কবিতাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। সেদিন সকলেই প্রায় একবাক্যে তাঁহাকে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। য়ুরোপের বর্ত্তমান বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত আর্ণল্ড্ বেনেট মহোদয় বলিয়াছেন—"আমার মনে হয়, হুইট্ম্যানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লেখক আর কেহ আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন নাই। পৃথিবীর প্রসিদ্ধ লোক-শিক্ষকগণের মধ্যে তাঁহাকেও একটা শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যাইতে পারে।" হুইট্ম্যানের প্রধান বন্ধু শ্রীযুক্ত জন ব্যরোজ,—যিনি ইং ১৮৬৩ সাল হইতে কবির মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত (১৮৯২ খৃঃ) তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন—তিনি লিখিয়াছেন—"দীর্ঘকালের অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও, আমার হৃদয়ে প্রিয় বন্ধুর চরিত্রমাহাত্ম্যের যে শ্রদ্ধেয় ধারণাটুকু ছিল, তাহা এক দিনের জন্যও খর্ব্ব হইবার কোন সুযোগ পায় নাই। তিনি সদাসর্ব্বদা একজন সামান্য সাধারণ লোকের মত যে অতি তুচ্ছ হীন বেশ পরিধান করিয়া থাকিতেন, তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার অসাধারণত্বটুকু গোপন করিয়া রাখিতে পারিত না।"

হুইট্ম্যানের যশ-মার্ত্তণ্ড যখন তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্ন-আকাশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, তখন বিশ্ব-বিশ্রুত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত এমার্সন সাহেব তাঁহার সহিত উপযাচক হইয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অমর মহাপুরুষ আব্রাহম লিন্‌কন একদা "হোয়াইট্ হাউসে"র সম্মুখ দিয়া হুইট্ম্যানকে যাইতে দেখিয়া অনেক ক্ষণ নির্নিমেষনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিলেন; এবং তাঁহার পার্শ্বচরগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ লোকটীকে তোমরা জান? এঁকে যে একজন মানুষের মত মানুষ বলে বোধ হচ্ছে!"

চিকাগো ট্রিবিউনের শ্রীযুক্ত এডিথ ওয়াইয়ার্ট্ সাহেব লিখিয়াছেন,—"সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে আমাদের দেশের সমস্ত জাতীয় চিন্তা ও কার্য্যের ধারা যেদিকে ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হইতেছে,—একশত বৎসর পূর্ব্বে যে মহাকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—তিনি তাঁহার প্রায় সকল রচনার মধ্যেই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবে এই বিষয়েরই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-রচয়িতা হিসাবে তাঁহার কতকগুলি অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল, যাহা বিশেষ ভাবে তাঁহাকে এই বিরাট বিষয়ের আলোচনা করিবার যোগ্য করিয়া দিয়াছিল। জনসাধারণের চরিত্র-চিত্রনে তিনি সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির তিনি এক বিরাট নক্সা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।"

কবি হিসাবে হুইট্ম্যানের আরও কতকগুলি এমন শক্তি ছিল, যাহা কেবলমাত্র তাঁহাকে তাঁহার মনোনীত বিষয়টি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; পরন্তু, তাঁহার রচনাবলী বিশ্ব-মানবের অবিনশ্বর গ্রন্থ-রাজির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছে। একটা জন্মগত জাতীয় ভাবের সঙ্গীত গাহিতে-গাহিতে হুইট্ম্যান তাঁহার জীবনের প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময় তিনি কেবল "তৃণপল্লব" (Leaves of Grass) শীর্ষক একখানি সম্পূর্ণ কবিতা-পুস্তক রচনা করিতেই ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

রুষিয়ার বিখ্যাত সাহিত্যিক Turgenoff সম্বন্ধে Renan যেমন বলিয়াছেন, "চিন্তার অনন্ত ধারা তাঁহার অন্তরে সঞ্চিত হইয়াছিল" তেমনি হুইট্‌ম্যান সম্বন্ধেও বলা চলে যে, "এই নিখিল-চরাচরব্যাপ্ত সৃষ্টি-রহস্য নিশ্চয় তাঁহার এই দীর্ঘ অধ্যবসায়-প্রসূত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনার উপাদান স্বরূপ কবির জ্ঞানগোচর হইয়াছিল!" অশেষ সারবান্, অথচ, গুণানুপাতে বিষম অসমতুল তাঁহার এই অতুলনীয় কাব্যগ্রন্থ "তৃণপল্লব" এক হিসাবে জীবনের চরম পরিশ্রমের ফলস্বরূপ! এই অমূল্য কাব্যখানি শুধুই যে অপূর্ব্ব কৌশলে আমেরিকানদের সত্য ও স্বপ্নের অভ্রভেদী দুর্গ অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা নহে; ইহা আমেরিকানদের স্বাভাবিক দোষ ও গুণগুলিও অতি আশ্চর্য্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছে!

হুইট্‌ম্যান সাহিত্য-জগতের কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম মানিয়া চলিতেন না। এজন্য অনেক কঠোর সমালোচক তাঁহার যথেষ্ট নিন্দাবাদও করিয়াছেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Mr. Stevenson বলিয়াছেন, "হুইট্‌ম্যানের কাব্য বিবিধ বিপথগামী রচনার এক বিমিশ্র প্রবন্ধ!—কিন্তু এই অযত্ন-বিন্যস্ত কর্কশ কবিতাবলীর অভ্যন্তরে একটা অন্তর্নিহিত প্রবল শক্তিও আছে!—ইহাতে সরল সৌন্দর্য্য আছে, ভাবপ্রবণ কল্পনা আছে; অথচ ইহা যেন এক সম্পূর্ণ অসঙ্গত উদ্ভট রচনার অদ্ভুত সংমিশ্রণ!"

ভিক্টোরীয়ান যুগের সমালোচকগণের ন্যায় এখনও এ কথা বলা চলে যে, হুইট্‌ম্যানের কতকগুলি কবিতা ভদ্র-সমাজের বৈঠকে পাঠ করা ত অনুচিত বটেই; অধিকন্তু কল-কারখানায় কুলি-মজুরদের মজ্‌লিশে, এমন কি শুঁড়ির দোকানেও আপত্তিজনক। ঐ সকল কবিতার অধিকাংশ যদিও সত্যের প্রতিরূপ মাত্র, তথাপি উহা কুৎসিত ব্যাধির আলোচনার ন্যায় সাধারণের পক্ষে অবশ্যই বর্জ্জনীয়। যাহা হউক, হুইট্‌ম্যানের কবিতা সম্বন্ধে আমেরিকায় এক্ষণে যেরূপ নানা বিভিন্ন মত প্রচলিত, তাহাতে, কোনও উদ্যোগী প্রকাশক ইচ্ছা করিলে, কবির রচনাবলী ভিন্ন-ভিন্ন ক্রেতাগণের মনোমত করিয়া নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন; যথা—এক ভাগে কেবলমাত্র 'আমেরিকার যশোগীত'; এক ভাগে কেবলমাত্র 'নিখিল-ভ্রাতৃত্বভাব ও গণতন্ত্রমূলক কবিতা'; এক ভাগে কেবলমাত্র 'প্রাকৃত জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন-প্রয়াসী'গণের উপযোগী; এক ভাগে কেবলমাত্র 'দেহরূপকামী'গণের জন্য সাধারণের জন্য কেবলমাত্র তাঁহার সেই "হে নায়ক! মোর নায়ক!" ইত্যাদি (O Captain! Captain!) কবিতাগুলি প্রকাশ করিলেই চলি[বে]; কারণ, তাঁহারা হুইট্‌ম্যানের এই ধরণের কবিতাগু[লির] সহিতই বিশেষ ভাবে পরিচিত; এবং বিশেষজ্ঞেরা বলেন, তাঁহার এই কবিতাগুলিই সম্ভবতঃ সাহিত্যের ইতিহ[াসে] চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।

Edgar Lee Masters তাঁহার হুইট্‌ম্যান সম্ব[ন্ধে] সুদীর্ঘ প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, "আমাদের দে[শে] এ পর্য্যন্ত যত শ্রেষ্ঠ লেখক ও কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছে[ন] তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা হুইট্‌ম্যানই মানুষের নি[কট] ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ অনেকটা যথাযথ ভাবে নির্দ্দেশ করি[তে] পারিয়াছেন। তাঁহার "Prayer of Columbus" শীর্[ষক] কবিতায়, তিনি স্বীয় অসীম অধ্যাত্ম-শক্তির সাহা[য্যে] পাঞ্চভৌতিক জীব ও জগৎ-তত্ত্বের চরম সীমায় উপনী[ত] হইতে পারিয়াছেন। তিনি জীবনকে সুন্দর দেখিয়াছিলে[ন]; তাই জীবনের সৌন্দর্য্য গাহিয়া গিয়াছেন। তিনি মৃত্যু[র] মধ্যে কোন অকল্যাণ বা অমঙ্গল দেখিতে পান নাই; তা[ই] স্বীয় রচনার মধ্যে, মানুষ এই মরণকে যতদূর সম্ভ[ব] মঙ্গলময় মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতে পারে, তাহা তিনি করি[য়া] গিয়াছেন।" (*Literary Digest. 21. 6. 19.*)

(৩) ঋণের পরিমাণ

বিগত বিকট যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভারের একটা মোটামু[টি] ধারণা করাও একান্ত দুরূহ ব্যাপার! তবে জার্ম্মাণী [ও] তাহার বিপক্ষ চারিটি মিত্রশক্তির ঋণের পরিমাণ তুলনা করিয়া দেখিলে, সম্ভবতঃ তাহা কতকটা উপলব্ধ হইতে পারে। যুদ্ধের পূর্ব্বে 'কোটী' সংখ্যার সাহায্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয়-ব্যয়েরও হিসাব বুঝাইতে পারা যাইত; কি[ন্তু] যুদ্ধের পর আর 'কোটী' সংখ্যায় কুলাইতেছে না—কথায় কথায় 'বৃন্দ' 'শব্দের' (Billion's) * ব্যবহার চলিতেছে! প্রতিদিন শতসহস্র কোটী মুদ্রার হিসাব-নিকাশ হইতেছে!

---

* ইংরাজী সংখ্যা-নির্ণয় প্রণালী হিসাবে এক বিলিয়ন অর্থে ১০০০০০০০০০০০০ টাকা অর্থাৎ এক 'শঙ্খ'। কিন্তু ফরাসী সংখ্যা-

কিন্তু এই শতকোটী, সহস্রকোটী, বা 'শঙ্খ' সংখ্যক মুদ্রা বলিলেও সাধারণের ঠিক ধারণাটি কিছুতেই হয় না যে, সে কতটা টাকা? কারণ, একটা টাকার দাম অতি সামান্য। কিন্তু টাকার অপেক্ষাও অধিক মূল্যের কোন অর্থ মাত্রা ব্যবহার করিলে হয় ত কতকটা ধারণা হইতে পারে। যেমন ধান্যের পরিমাণ যদি 'কুনিকার' হিসাবে ধরা তাহা হইলে দশলক্ষ 'কুনিকা' বলিলেও অতি অল্প পরিমাণ ধান্যেরই হিসাব দেওয়া হয়। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি 'পশুরী' হিসাবে বলা হয়, তাহা হইলে দশলক্ষ 'পশুরী' বলিলে এই দশলক্ষ সংখ্যার দ্বারাই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী ধান্যের পরিমাণ বুঝাইতে পারা যাইবে; সেই প্রকার যুধ্যমান কয়েক জাতির ঋণের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য যদি প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা বা স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে আমরা এক ঘনফুট পরিমিত সুবর্ণ-বেদীর ব্যবহার করি, তাহা হইলে ঋণের প্রকৃত পরিমাণ সম্বন্ধে সহজেই লোকের ধারণা হইতে পারে। সেই জন্যই এতদ্‌সংযুক্ত চিত্রে এই উপায়েই ঋণের পরিমাণের তুলনা করা হইয়াছে।

যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আমেরিকার ঋণ প্রায় একশত কোটী ডলার* ছিল। এক্ষণে তাহা প্রায় তিনসহস্র-কোটী ডলারে দাঁড়াইয়াছে। এই তিনসহস্রকোটী সুবর্ণ-মুদ্রা গলাইয়া যদি একটী সুবর্ণ-বেদিকায় পরিণত করা হয়, তবে তাহার পরিমাপ হইবে ১১৯২৮০ ঘন ফিট! অর্থাৎ সেই চতুষ্কোণ নিরেট সুবর্ণ-বেদিটীর প্রত্যেক পার্শ্বের পরিমাপ ৪৪.২ ফিট করিয়া হইবে। ইংলণ্ডের ঋণ এক্ষণে ৩৬০০ কোটী ডলার। ইহাতে যে সুবর্ণ-বেদী নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহার পরিমাপ প্রত্যেক দিকের ৫২.৩ ফিট করিয়া হইবে। ফরাসীদের ঋণের পরিমাণ ইংলণ্ডের সমান। ইতালীর ঋণ প্রায় ১২৬০ কোটী ডলার। ইহাতে যে সুবর্ণবেদী নির্ম্মিত হইবে, তাহার প্রত্যেক দিকের পরিমাপ ৩৬.৯ ফিট করিয়া। জার্ম্মাণীর মোট ঋণ এক্ষণে ৩৯০০ কোটী ডলার। ইহাতে যে সুবর্ণবেদী নির্ম্মিত হইবে, তাহার প্রত্যেক দিকের পরিমাপ ৫৩.৭ ফিট করিয়া। এই সমস্ত সুবর্ণ-বেদী যদি একটীর উপর আর একটী করিয়া সাজাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে মোট ২৫৪ ফিট উচ্চ একটী বিরাট স্বর্ণস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে। ঐ স্বর্ণস্তম্ভটী আমেরিকার বিখ্যাত 'ট্রিনিটি' গির্জ্জার চূড়া অপেক্ষা ঈষৎ নীচু হইবে; কারণ, উক্ত গির্জ্জার চূড়াটি ভূমি হইতে প্রায় ২৮৪ ফিট উচ্চ!

এই সমবেত সুবর্ণ-বেদীগুলির পার্শ্বে পৃথিবীর সমস্ত সুবর্ণ-মুদ্রা একত্র করিয়া আর একটী সুবর্ণ-বেদী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিলে তাহার পরিমাপ প্রত্যেক পার্শ্বের ৪৩.৮ ফিট করিয়া হইবে। কারণ, পৃথিবীর সমুদয় সুবর্ণ-মুদ্রার সংখ্যা ২০০০ কোটীর অধিক নহে। ঋণের প্রকৃত দায়িত্ব-ভার কেবলমাত্র তাহার মোটা সংখ্যার দ্বারা যথার্থ ভাবে পরিমিত হয় না। দেশের প্রত্যেক লোকের মাথা পিছু আয়ের অনুপাতে তাহাদের প্রত্যেকের উপর কতটা পরিমাণে ঋণের দায় চাপিয়াছে তাহাই তুলনা করিয়া দেখিলে, দেশের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা অবগত হইতে পারা যায়। এই জন্য এতদ্‌সংলগ্ন চিত্রে যুদ্ধে লিপ্ত প্রধান-প্রধান পঞ্চশক্তির পাঁচজন প্রতিনিধির চিত্র দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এক একটী পাত্র আছে। ঐ এক-একটী পূর্ণ পাত্র তাহাদের প্রত্যেকের মাথা-পিছু সম্পদ। যাহার পাত্র যে পরিমাণে শূন্য হইয়াছে, তাহার সেই পরিমাণ মাথা পিছু ঋণের দায়িত্ব; এবং পাত্রের তলদেশ ছিদ্র হইয়া যে বিন্দু বিন্দু জল নির্গত হইয়া যাইতেছে, উহা প্রত্যেকের মাথা-পিছু দেয় সুদের হিসাব বুঝাইতেছে। যেমন আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সমবেত সম্পদের পরিমাণ তিন সহস্র কোটী ডলার এবং লোকসংখ্যা ১০ কোটী ৭০ লক্ষ; সুতরাং প্রত্যেকের মাথা-পিছু সম্পদ ২৮.৩ ডলার। তাহাদের মোট ঋণ আছে তিন সহস্র কোটী ডলার। ইহা ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকের মাথাপিছু দেনা দাঁড়াইবে ২৮০৲ ডলার এবং সুদের পরিমাণ মাথাপিছু শতকরা ১১.৬৮ ডলার। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে অপরাপর জাতির আর্থিক অবস্থাও অবগত হইতে পারা যাইবে। ফ্রান্সের ঋণ যদিও ইংলণ্ডের সমান; কিন্তু ফ্রান্সের সম্পদ ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক কম; এই জন্য ইংলণ্ডের তুলনায় ফ্রান্সের ঋণভার তাহার স্কন্ধে অনেক বেশী পরিমাণে চাপিয়াছে। তবে ফ্রান্সের বর্ত্তমান সম্পদের

নির্ণয়-প্রণালী হিসাবে ঐ এক বিলিয়ন অর্থে ১০০০০০০০০০৲ টাকা অর্থাৎ এক 'বৃন্দ'। আমেরিকায় এই ফরাসী সংখ্যা-নির্ণয় প্রণালীই প্রচলিত এবং আলোচ্য প্রবন্ধেও শেষোক্ত প্রথাই অনুসৃত হইয়াছে।

* আমেরিকা এক 'ডলার' এখানকার প্রায় তিনটাকা ছয় আনার সমান এবং এক 'সেণ্টে'র মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক দুই পয়সা।

সঠিক হিসাব দেওয়া এক্ষণে একপ্রকার অসম্ভব; কারণ, বিগত যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রভূত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ফ্রান্সের সম্পদের ভিতর হইতে উহা যেমন বাদ দিতে হইবে, তেমনিই আবার সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে 'আলসেস্ লোরেণ' প্রদেশ ফ্রান্সের সহিত পুনঃসংযোজিত হওয়ায়, উক্ত প্রদেশের আয়ও ফ্রান্সের সম্পদের হিসাবের অন্তর্ভু করিয়া লইতে হইবে। এই সকল বিবেচনা পূর্ব্বক হিঃ করিলে, ফ্রান্সের বর্ত্তমান জাতীয় সম্পদের পরিমাণ আন্দা ৯০০০৲ কোটী ডলারের অধিক হইবে না।

মোট হিসাব

জাতির নাম	ঋণ	সম্পদ	সম্পদের অনুপাতে % ঋণ	সুদ	আয়	আয়ের অনুপাতে % সুদের হার
আমেরিকা	৩০	৩০০	১০'০০	১'২৫০	৬০'০	২'০৮
ইংলণ্ড	৩৬	১২০	৩০'০০	১'৫৭৫	১৫'৫	১০'১৬
ফ্রান্স	৩৬	৯০	৪০'০০	১'৮০০	১২'০	১৫'০০
ইতালী	১২'৬	৪০	৩১'৫০	'৫৪৮	৭'৫	৭'৩০
জার্ম্মাণী	৩৯	৮০	৪৮'৭৫	১'৯৫০	১০'০	১৯'৫০

ঋণ, সম্পদ, সুদ ও আয় "বিলিয়ন' বা 'বৃন্দ' ডলার হিসাবে।

মাথাপিছু হিসাব

লোক সংখ্যা	জাতির নাম	প্রত্যেকের ঋণ	প্রত্যেকের সম্পদ	প্রত্যেকের দেয় সুদের হার	প্রত্যেকের আয়
১০৭০০০০০০	আমেরিকা	২৮০ ডলার	২৮০৩ ডলার	১১'৬৮ সেণ্ট	৫৬০ ডলার
৪৬০০০০০০	ইংলণ্ড	৭৮২ ঐ	২৬০৮ ঐ	৩৪'২৪ ঐ	৩৩৭ ঐ
৪০০০০০০০	ফ্রান্স	৯০০ ঐ	২২৫০ ঐ	৪৫'০০ ঐ	৩০০ ঐ
৩৬০০০০০০	ইতালী	৩৫০ ঐ	১১১১ ঐ	১৫'২২ ঐ	২০৮ ঐ
৬৫০০০০০০	জার্ম্মাণী	৬০০ ঐ	১২৩১ ঐ	৩০'০০ ঐ	১৫৪ ঐ

(*Scientific American 21. 6. 19*)

(৪) চলচ্চিত্রের (Motion Pictures) কর্ম্মশালা।

আমেরিকায় এরূপ কোন সহর বা গ্রাম নাই, যেখানে 'বায়োস্কোপ' দেখান হয় না। এদেশে 'বায়োস্কোপ' দেখাইবার ব্যবস্থা নানাস্থানে হইয়াছে বটে, কিন্তু 'বায়োস্কোপের' চিত্র প্রস্তুত করিবার কারখানা ২।১টী আরম্ভ হইয়াছে মাত্র! এখানে সকল স্থানেই বিদেশ হইতে চিত্র আনাইয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকার চিত্র তুলিবার ও প্রস্তুত করিবার কারখানাও অসংখ্য। তবে উপযুক্ত স্থানাভাবে সেখানে চিত্র-ব্যবসায়িগণকে উক্ত ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিতে বাধ্য হইতে হয়; এবং সেজন্য তাঁহাদিগকে নানা অসুবিধা ও অকারণ অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমেরিকার প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র-পারদর্শী শ্রীযুক্ত উইলিয়াম ফক্স সাহেব নিউইয়র্ক সহরের মধ্যস্থলে এক বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইতেছেন। এই স্থানে চলচ্চিত্রের প্রধান অবলম্বন যে 'ফিল্ম্' * উহা প্রস্তুত করিবার কারখানা হইতে আরম্ভ করিয়া, চিত্রের জন্য অভিনয়, চিত্র-গ্রহণ, চিত্র-মুদ্রণ, রঙ্গালয়, সাজ-সরঞ্জাম, দৃশ্যপট, আসবাব-পত্র, অফিস-ঘর, গুদাম, বিজ্ঞাপনের জন্য মুদ্রাযন্ত্র, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের থাকিবার স্থান চিত্র-নাট্যের পাণ্ডুলিপি রচনার ব্যবস্থা ইত্যাদি চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের যাবতীয় প্রধান-প্রধান আবশ্যক বিভাগ একত্র সন্নিবেশিত

* স্বচ্ছ সেলুলয়েড (যবক্ষার দ্রাব, গন্ধক-দ্রাবক, গলিত কর্পূর প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এক প্রকার দ্রব্য বিশেষ) হইতে নির্ম্মিত ফিতার আকারের পদার্থ। ইহারই উপর চলচ্চিত্রের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়।

হইবে। প্রায় চার একর অর্থাৎ ১২ বিঘা ২ কাঠা জমির উপর এই সুবৃহৎ চিত্র প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছে। চলচ্চিত্রের এই বিরাট কর্ম্মশালাটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন প্রাসাদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহা ত্রিতল-যুক্ত ও পাতাল-কক্ষবিশিষ্ট হইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে লৌহ ও প্রস্তরাদির সাহায্যে এবং সুদক্ষ সুনিপুণ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারগণের তত্ত্বাবধানে ইহার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে যথা-সম্ভব অল্প ব্যয়ে সমধিক উন্নত ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর চিত্র প্রস্তুত হইতে পারে, এই বিরাট কর্ম্মশালা স্থাপনের ইহাই উদ্দেশ্য।

ইহার পাতাল-কক্ষে একটী বৃহৎ বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কারখানা স্থাপিত হইবে। পাঁচশত Horse power বিশিষ্ট একটী ইঞ্জিন-ঘর এবং কয়লা রক্ষা করিবার জন্য কয়েকটি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গর্ভাধার নির্ম্মিত হইবে। নীচের তলে অফিস এবং রাসায়নিক গবেষণা ও পরীক্ষা-গারের জন্য কয়েকটী সুবৃহৎ কক্ষ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। সেখানে বিশিষ্ট রসায়নবিদ্‌গণ, আলোক-চিত্র পারদর্শিগণ, এবং চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিভাগের অভিজ্ঞ শিল্পিগণ কেহ বা নব-নব রাসায়নিক প্রথার আবিষ্কারে, কেহ বা চিত্রের বর্ণ ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সুপরিণিত, ও চিত্রমুদ্রণ-কার্য্য নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার উপায় অনুসন্ধানে, কেহ বা উক্ত শিল্প সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার সহজ ও সত্বর সমাধানের জন্য উপযুক্ত কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবেন। দ্বিতলে পাঁচ সহস্রাধিক নরনারীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং ত্রিতল চিত্রাভিনয়ের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি প্রস্তুত করা ও সাজ-সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত থাকিবে।

পৃথিবীর এই বৃহত্তম প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ তলটিই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যূন ২০টী বিভিন্ন চিত্র-কোম্পানী যাহারা এতাবৎকাল স্থানাভাবে দূরে-দূরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিয়া নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই এক্ষণে এইস্থানে একত্র একই সময়ে অথচ পরস্পরে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে থাকিয়া সমান সুবিধা ও সুযোগ মত কার্য্য করিতে পারিবেন। এই বিরাট গৃহের বিস্তীর্ণ ছত্রদেশ সমব্যবধানে অবস্থিত কয়েকটী সুদৃঢ় ও দীর্ঘ লৌহ-বন্ধনীর সাহায্যে প্রায় সম্পূর্ণরূপ শূন্যে সংস্থাপিত হইবে,—কোনও প্রকার স্তম্ভ বা অবলম্বন-দণ্ডের সাহায্য লওয়া হইবে না; কারণ, চিত্রাভিনয় কালে নাট্যাচার্য্যগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত যে কোনও স্থানে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন ও অভিনয়ের দৃশ্যটা সহজেই পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। এই ত্রিতলের উপর স্থায়ী ও পরিবর্ত্তনীয় উভয় প্রকার রঙ্গমঞ্চই স্থাপিত হইবে। ভিন্ন-ভিন্ন চিত্র-নাটের একশত বিভিন্ন দৃশ্য যাহাতে এককালে অভিনীত হইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা হইবে। ২০টী ছায়াচিত্রণ-যন্ত্রে (Camera) গৃহীত চিত্রের সত্বর উদ্ধার সাধনের জন্য ২০টী পৃথক্ আঁধারে-ঘর (Dark Room) থাকিবে। প্রায় সহস্রাধিক অভিনেতৃবৃন্দের বেশ-কক্ষ, গ্রন্থাগার, স্নানের গৃহ, ক্রীড়া ও ব্যায়াম-কক্ষ, ভোজন-কক্ষ এবং চিত্রকলা, দারু-শিল্প ও সূত্রধরের কার্য্যালয়ও ঐস্থানে সুন্নিবেশিত হইবে। প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে এই বিপুলায়তন চলচ্চিত্র-শালায় চপলালোকের ব্যবস্থা হইতেছে।

এই অদ্বিতীয় ও অভূতপূর্ব্ব সজীব চিত্রালয়ের নক্সা হইতে সংগঠনের শেষ পর্য্যন্ত যাহাতে ইহা অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি দৈব-দুর্ঘটনা হইতে সম্পূর্ণ রূপে নিরাপদ, এবং যথেষ্ট পরিমাণ আলোক, উত্তাপ ও বাতাসের সাহায্যে সর্ব্বতো-ভাবে স্বাস্থ্যকর হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা হইতেছে। এই গৃহের অসাধারণ বিশেষত্বই হইবে ইহার বায়ু-পরিচালন যন্ত্র। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে এই ক্ষুদ্র সহরবিশেষ প্রকাণ্ড প্রাসাদের মধ্যে সদাসর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে উক্ত বায়ুর শীতোষ্ণতা সম্বৎসর সকল ঋতুতেই সমভাবে থাকিবে; এবং অনুক্ষণ স্নিগ্ধ শীতল নির্ম্মল মলয় সেবনে উক্ত কর্ম্মশালার সকল শিল্পীর শিল্পানুরাগ ও কর্ম্মোৎসাহ নিরন্তর সম্পূর্ণ অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

যদিও এই বিরাট প্রাসাদ সম্পূর্ণরূপে 'অদহ' (fire-proof) তথাপি আবশ্যক হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে যাহাতে একজন লোককে প্রবেশ পথ হইতে অন্ততঃ একশত ফিট দূরে সরাইয়া দেওয়া যায়, তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কুলি-মজুর ও যান-বাহনাদির যাতায়াতের জন্য উক্ত কর্ম্মশালার তিনতলেই সংলগ্ন তিনটী পৃথক্-পৃথক্ প্রসর ঢালু পথ নির্ম্মিত হইতেছে। ঘটনাক্রমে যদি সহসা

এই প্রাসাদের ৫।৭ সহস্র অধিবাসিবর্গের সত্বর বাহির হইয়া যাইবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যিনি যে তলেই থাকুন না কেন, তাঁহারা তাঁহাদের সেই-সেই তলাসংলগ্ন এই পৃথক্-পৃথক্ ঢালু পথ দিয়া স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়া যাইতে পারিবেন।

ছায়াচিত্রের প্রথম প্রতিকৃতি (Negative) এবং মুদ্রিত ও পরিণত চিত্র রক্ষা করিবার জন্য ৩৫টী অদহ (fire-proof) ও বারি-বারণ (water-proof) কক্ষ নির্ম্মিত হইবে। ১২টী প্রশস্ত চিত্র-প্রদর্শনী-কক্ষ (Projection Room) যাহা প্রকাণ্ড রঙ্গালয়ের ক্ষুদ্রানুকৃতি-বিশেষ, অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চ, দর্শকগণের বসিবার স্থান, ঐক্যতান বিভাগ ও বিশ্রাম-কক্ষবিশিষ্ট থাকিবে। এখান হইতে যাহাতে প্রতি সপ্তাহে ৩০ লক্ষ ফিট দীর্ঘ ফিতার আকার-চিত্র (film) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে। সুতরাং উপস্থিত পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের কর্ম্মশালা বলিয়া পরিগণিত হইবে। (*Scientific American*, 21. 6. 19.)

মাথা নাই তার মাথাব্যথা !

কথাটা যদিও আমাদের দেশে চিরকাল রহস্যচ্ছলেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে চায় যে, কথাটা একেবারেই ভুয়া নহে। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, টেলিফোঁতে যখন কাহারও সাড়া পাওয়া যায়, তখন মনে হয়, নিশ্চয় অন্য কোন গৃহে অবস্থিত টেলিফোঁর আর এক প্রান্ত হইতে কেহ কথা বলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয় ত সেরূপ কোন গৃহের অস্তিত্বই নাই—এবং সম্ভবতঃ মধ্যপথ হইতেই টেলিফোঁতে সংবাদ সংযোজিত হইয়াছে! সেইরূপ শরীরের কোন আঘাত বা উত্তেজনা যখন স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়, তখন মস্তিষ্ক অনুভব করে, যেন উক্ত আহত প্রদেশের স্নায়ু-সীমা হইতেই উহা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হয় ত তখন আর তাহার শরীরের সে স্নায়ুপ্রান্তের কোন অস্তিত্বই নাই; এবং স্নায়ু-বাহিত সেই আঘাত বা উত্তেজনার উৎপত্তি সম্ভবতঃ শরীরের অন্য কোন স্থানে। এইভাবেই অস্ত্র-চিকিৎসায়, যাহাদের হস্তপদাদি কোনও একটা অঙ্গ একেবারে ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহার স্নায়ুমণ্ডলীর কোন উত্তেজনা উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তির মনে হয়, যেন পূর্ব্বের-মতই তাহার হস্ত-পদাদির অঙ্গুলী-প্রান্তস্থ স্নায়ুসীমা হইতেই এই উত্তেজনা-প্রবাহ মস্তিষ্কে পরিচালিত হইতেছে; অথচ তখন তাহার সে দেহ-সীমান্তের আর কোন চিহ্নই নাই!

সম্প্রতি একখানি প্রসিদ্ধ ইতালীয় পত্রিকায় এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, কোনও লোকের বামপদটী অস্ত্র প্রয়োগে একেবারে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করা হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি সে তাহার সেই অস্তিত্বহীন বামপদতলে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে বলিয়া প্রায়ই অভিযোগ করিয়া থাকে। কেবল-মাত্র পদতলই নহে, তাহার সে বিলুপ্ত চরণের আরও অন্যান্য কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট স্থানেও সে প্রায়ই বেদনা বোধ করে!

যুদ্ধ-হাসপাতালের ডাক্তারগণ অনেকেই আহত রোগীর নিকট হইতে এই প্রকার অসম্ভব অভিযোগ শুনিয়াছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে Dr. Weir Mitchell বলিয়াছিলেন যে, "যে সকল লোকের একটা কোন অঙ্গ অস্ত্র-চিকিৎসার দ্বারা একেবারে বাদ দেওয়া হয়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহাদের 'বিলুপ্ত' অঙ্গের নানাস্থানে যন্ত্রণা অনুভব করে।" তাঁহার ৯০জন বিবিধ-অঙ্গব্যবচ্ছিন্ন রোগীর মধ্যে মাত্র চারজনের নিকট হইতে তাঁহাকে এরূপ কোন অভিযোগ শুনিতে হয় নাই। "Injuries of Nerves" শীর্ষক গ্রন্থে ডাক্তার মিচেল্ তখন এ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। এমন কি, ফরাসী ডাক্তার Ambroise Pare সুদূরাতীত ষোড়শ শতাব্দীতেও এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি ডাক্তার Charcot প্রভৃতি অনেকেই এ বিষয়ের পুনরালোচনা করিতেছেন।

মুসৌরী ভ্রমণ

(শেষার্দ্ধ)

[শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায় বি-এল]

এক দিন রাত্রি দুইটার সময় সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—ডাক্তারের কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। প্রথমেই মনে হইল, রোগীর রোগ প্রবল হইয়াছে না কি? আমিও ওখানে যাইব না কি? পরে ছিদ্র-পথে যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইলাম।

দেখি, ডাক্তার সাহেব রোগীর ঘরে নহে,—যুবতীর শয়ন-কক্ষে! যুবতী শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্ট,—ডাক্তার সাহেব ভূমিতে জানু পাতিয়া প্রেমের কাহিনী বলিতেছেন। যুবতী বলিলেন, "দেখুন ডাক্তার বাবু, (তিনি ডাক্তার বাবুই বলিতেন) আমার জীবনে আমি আমার শিক্ষার ও কপালের দোষে এমন প্রেমের দরবার আরও পাইয়াছি; কিন্তু জানিয়াছি যে, প্রেমের অনলশিখা হাউই-বাজিমাত্র। মনে হয়, যেন বহ্নি-শিখা চরাচর বিদীর্ণ করিয়া একটা প্রলয় সংঘটন করিবে; কিন্তু মুহূর্ত্ত স্থির থাকিলেই বুঝা যায় যে, ঐ অগ্নিশিখার অবসান এক তিল ছাইমাত্র।"

ডাক্তার—"তুমি জান না অপরাজিতা! আমার কি দশা হইয়াছে! তুমি আমার না হইলে আমি বাঁচিব না। আমার সর্ব্বস্ব লইয়া আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও! এতটুকু কি তোমার দয়া নাই?"

যুবতী—"আমার দয়া ত আছেই। দয়া আছে বলিয়াই ত আমি আপনাকে ভালবাসি, আরও কত লোককে ভালবাসি। আমি মানুষ—দেবতা হইতে চেষ্টা করি—রাক্ষসী হইবার কোনও ইচ্ছা রাখি না।"

ডাক্তার—"তুমি ত দেবতা বটে, দেবি! আমার হৃদয়-কমলে তোমার চরণ রাখিবার স্থান হইবে না কি?"

যুবতী—"আমি অত কবিতা বুঝি না। আমার স্বামী আমাকে শিখাইয়াছিলেন যে, মানুষকে ভালবাসাই ধর্ম্ম। আমি সেই ধর্ম্ম পালন করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করি। কিন্তু আমার সেই সহৃদয়তার সোপান পাইয়া যাহারা হৃদয়ে নরক পোষণ করে, অথবা আমার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করে, আমি তাহাদের ছায়া স্পর্শ করি না।"

ডাক্তার—"আমার সর্ব্বস্ব—"

যুবতী অতি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"তোমার আবার সর্ব্বস্ব কি? তোমার প্রাণে আমার কিছু আবশ্যক নাই;—আমার সমস্ত প্রাণ অধিকার করিয়া,—ভরপুর করিয়া,—তাঁহার স্মৃতি জাগিয়া রহিয়াছে;—পারিজাত সুরভি যেমন নন্দন-কানন পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। তোমার অর্থ!—আমার অর্থের কিছু অভাব নাই। তোমার রূপ!—ছিঃ! আমাদের গৃহস্বামী অবিনাশের রূপ দেখিয়াছ কি? সে রূপ বটে!"—তাহার পরে কিছুক্ষণ আমি আর কিছু শুনিতে পাই নাই;—আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল—আমি শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। শয্যায় শয়ান অবস্থায়ই কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম যে, রমণী অতি তীব্র-স্বরে কণ্ঠে কহিলেন—"আপনি এখনই এখান হইতে বাহির হউন; আর এক তিলার্দ্ধও এখানে থাকিলে, আমি দারবান ডাকিয়া অপমান করিয়া আপনাকে বাহির করিয়া দিব।" তার পর একেবারে সব নীরব। কিছুক্ষণ পরে কাঁপিতে কাঁপিতে ছিদ্রপথের নিকট উপস্থিত হইলাম—দেখি যে, রমণী ভূমির উপর পতিত;—অবেণীসম্বদ্ধ, আলুলায়িত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, নিবিড়-কৃষ্ণ কুন্তলরাজির উপর চম্পক-কুসুমরাশি লাবণ্যমাখা দেহ-সুষমা ঢলিয়া পড়িয়াছে। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকি, দেহের এমন শক্তি নাই;—সেখান হইতে ফিরি, মনে এমন বল নাই। হঠাৎ দেখিলাম, রমণী উঠিয়া বসিলেন—তরঙ্গায়িত কেশপাশকে সংযত করিলেন—দেহলতা বসনে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তার পর এ কি? দীর্ঘ, প্রশস্ত মুকুর-সম্মুখে দাঁড়াইলেন—মুকুরে প্রতিফলিত রূপরাশি আমার নয়ন-গোচর হইল—মুখে যেন একটু ঈষৎ হাসির আভা দেখা দিল। তার পরই রমণী দীপ নিবাইয়া দিলেন

আমি এই জানালাটী খুলিলাম; দেখি, পূর্ব্বাকাশে উষা প্রবেশোন্মুখ—সোণালি মেঘ-তরঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে অন্তরের দীপ্ত আশা প্রভাম্বিত হইয়া উঠিয়াছে। পাখীর গানে আকুল মধুরতা—নিবিড় স্নেহ-বিজড়িত প্রভাতবায়ুর স্নিগ্ধ সরসতা দেখিতে-দেখিতে ঐ দূরবর্ত্তী তুষার-কিরীটি গিরিশৃঙ্গের ললাট-ফলকে সূর্য্যকর তিলকের ন্যায় ঝলমল করিয়া উঠিল। বাহিরে গিয়া দেখি, রমণীও বাহিরে আসিয়াছেন। মুকুর-ফলকে যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, এ ঠিক সেই মূর্ত্তি—মূর্ত্তিতে কোনও উদ্বেগ, কোনও আকুলতা—কোনও ব্যথা নাই, উষার ন্যায় উজ্জ্বল ও রমণীয়। আমাকে দেখিয়াই রমণী আমার নিকট আসিলেন; বলিলেন "দেখুন অবিনাশবাবু! পৃথিবী কি সুন্দর! সর্ব্বত্রই রূপের কি ছটা! ভগবান মুক্ত হস্তে রূপের সৃষ্টি করিয়া, মানুষের মনে রূপ-পিপাসা জাগাইয়া রাখিয়াছেন,—নয় অবিনাশবাবু?" আমি, রমণীর মুখে অল্প হাসির রেখা কিরূপ বিকশিত হইয়া উঠে দেখিবার জন্য, মুখের দিকে তাকাইতেছিলাম,—এমন সময় দ্বারবান্ আসিয়া ডাকিল, "মায়িজি! বাবু ডাকিতেছেন।" রমণী অমনি ছুটিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমার প্রাণের উপর দিয়া যেন পারিজাত-সুরভির একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না—রমণীর অনুসরণ করিলাম। দেখি, বিনয়,—যুবকের নাম বিনয়—আজ বড়ই অসুস্থ; হঠাৎ রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে—সমস্ত রাত্রি জ্বরে কষ্ট পাইয়াছেন। আমি মনে করিলাম, আজ ডাক্তার সাহেব আসিবেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডাক্তার সাহেবকে ডাকিতে পাঠাইব কি?" রমণী বলিলেন, "না; ডাক্তারবাবু এখনই আসিবেন—ডাকিতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।" একটু পরেই ডাক্তার সাহেব আসিলেন—মুখ শুষ্ক, মলিন, কাতরতাময়। রোগীকে দেখিয়া আরও বিমর্ষ হইলেন। রমণী বলিলেন "ডাক্তারবাবু! কি হইবে এখন?" ডাক্তার বলিলেন "আমি ত এতদিন দেখিলাম। এখন আমায় অবসর দিয়া অপর কাহাকেও দেখাইলে মন্দ হয় না।"

রমণী—"হায় রে দুনিয়া! অবিনাশ বাবু! দেখিলেন, ডাক্তারবাবুর দয়া! আমি ডাক্তারবাবুর হাতে সব সমর্পণ করিয়া দিয়াছি—আর উনি কিরূপ অম্লান ভাবে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন!"

ডাক্তার সাহেব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে রোগীকে ভাল করিয়া দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি যখন উঠিয়া আসি, রমণী বলিলেন "দেখুন অবিনাশবাবু আপনি অত পরের মত ব্যবহার করেন কেন? মাঝে মাঝে আসিবেন—ডাক্তার বাবু যখন আসেন, দয়া করিয়া আপনিও তখন আসিবেন।"

দিন ত কাটিল—কিরূপে কাটিল ভগবানই জানেন। সন্ধ্যা হইলে একবার একটু বেড়াইয়া আসিলাম। রাত্রি হইল। এক-এক মুহূর্ত্ত এক এক ঘণ্টার ন্যায় মনে হইতে লাগিল। মাথার মধ্যে কি একটা গণ্ডগোল হইতে লাগিল—"অপরাজিতা কি আমাকে ভালবাসেন? তিনি কি আমার রূপ—" দূর ছাই, মাথায় দুই-একবার গোলাপজল দিলাম—কিছুতেই ঘুম আসে না। ছিদ্রপথে দেখি, রমণী বিনয়ের সেবা করিতেছেন, তাহার সহিত গল্প করিতেছেন, তাহাকে প্রফুল্ল করিবার প্রয়াস করিতেছেন। একবার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল; তাহার পরে দেখি, রমণী তাঁহার নিজকক্ষে; সুন্দর, শুভ্র বসনে দেহ-সৌষ্ঠব সমাচ্ছন্ন; তাহার পশ্চাতে চিত্রাধারের ন্যায় আগুল্ফলম্বিত, তরঙ্গায়িত, নিবিড়-কৃষ্ণ কেশ-সম্ভার। একবার সেই দীর্ঘ মুকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাসিলেন। আমি মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষমধ্যে কেমন করিয়া গেলাম,—কে লইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল। রমণী অতি করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "অবিনাশবাবু! এত রাত্রে কেন?" আমার কণ্ঠ হইতে একটীও কথা বাহির হইল না; আমি তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলাম।

"কি হইয়াছে অবিনাশ বাবু?"

আমার মুখে কোনও কথা নাই। কোনও মতে উঠিয়া বসিলাম। কথা বলিব কি, বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম;—একেবারে বাক্‌শক্তি বিরহিত। রমণীর সর্ব্বাঙ্গে এমন একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্য আসিল যে, আমার প্রাণে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। পরক্ষণেই রমণীর স্বাভাবিক মূর্ত্তি ফিরিয়া আসিল। তিনি অতি স্নেহার্দ্র, করুণ স্বরে আমাকে বলিলেন, "অবিনাশবাবু আমাকে ভালবাসিয়াছেন না কি?" আমার ত কোন কথাই নাই। তিনি আবার বলিলেন, "কেমন, ঐ ত ঠিক? আমাকে আপনার রূপ দিবেন, অর্থ দিবেন, সর্ব্বস্ব দিবেন, প্রাণ দিবেন, আমি দয়া করিয়া

না লইলে আপনি বাঁচিবেন না। আমি আপনার না হইলে আপনার জীবন মরুভূমি হইবে; আর আমি আপনার হইলে আপনার জীবন নন্দন-কানন হইবে। আমাকে না হইলে আর এক তিলার্দ্ধও আপনার জীবন বহে না—কেমন, এইরূপ, না আর কিছু নূতন আছে?" আমি নিকটস্থ একখানি চেয়ার দুই হাতে ধরিয়া হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে রমণী আবার বলিলেন—"অবিনাশ বাবু, আপনি মানুষ,—পতঙ্গ নহেন। যদি ক্ষণিকের মোহ আসিয়া থাকে, দুই হস্তে সবলে তাহাকে দূর করুন! আমার স্বামীর এই প্রতিমূর্ত্তির নিকট"—বলিয়া বক্ষঃস্থল হইতে একখানি ফোটো বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন—"এই প্রতিমূর্ত্তির নিকট বল ভিক্ষা করুন; শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করুন। আপনি ত মানুষ! ক্রমে উপরে উঠিবেন, না, নীচে নামিতেছেন।" কিছুক্ষণ পরে রমণী আমার হাত ধরিয়া উঠাইলেন; বলিলেন "যাও ভাই, নিজ কক্ষে—হৃদয়কে সংযত, পবিত্র করিয়া, দেবতাকে বসাও। সেই পুরাতন কথাই চারি যুগে সত্য—'ধর্ম্মের ন্যায় সুহৃদ নাই'।" আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আপন কক্ষে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

পরদিবস রাত্রি একটার সময় আবার ছিদ্র পথে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়াছি! হায় রে মানব-চিত্ত! দেখি, রমণী স্বামীর ফোটোখানি সম্মুখে বসাইয়া, তাহাকে ডালিয়া ও গোলাপে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। দুই পাশে ধূপ দান হইতে ধূপ-সুরভি বাহির হইতেছে। রমণী যোগাসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন। কিছুক্ষণ পরে ফোটোখানি লইয়া একবার মাথায় রাখিয়া, পরে বক্ষে ধারণ করিয়া, ভূমিতেই শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেই সময়ে বিনয় বড় কাশিতে লাগিল। রমণী উঠিয়া বিনয়ের ঘরে গেলেন।

বিনয়—"বৌদি!"

রমণী—"কি ভাই?"

বিনয়—"আমি ত আর বাঁচিব না।"

রমণী—"ছিঃ! অমন কথা বলিতে নাই।"

বিনয়—"দেখ বৌদি! তুমি আমার জন্য যাহা করিলে, তাহা মানুষের জন্য মানুষ করে না।"

রমণী—"তুমি কি আজ একটা বক্তৃতা করিবে না কি?"

বিনয়—"না বৌদি! কিন্তু, আমার প্রাণের মধ্যে একটা সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে। আজ প্রথম নয়,—এ বহুদিন হইতে। কিন্তু—" বিনয় একবার কাশিয়া আবার বলিল, "কিন্তু, শরীরে আর বল নাই বলিয়াই হউক, কিম্বা মৃত্যুর ছায়া স্পর্শেই হউক,—আর সহ্য করিতে পারিতেছি না; বলিবার জন্য সমস্ত প্রাণ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। এত দয়া ত করিয়াছ; যদি দয়া করিয়া শোন, তবে বলি। বৌদি! তুমি আমায় বড় ভালবাস?"

রমণী—"ও কি ছেলেমানুষী হইতেছে! ঘুমাইবার চেষ্টা কর, রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে।"

বিনয়—"সকলই শেষ হইয়া আসিতেছে। ঘুমাইব বলিয়াই তোমাকে আজ বলিতে আরম্ভ করিয়াছি;—কিন্তু বলা শেষ হইবে না। তুমি যেদিন প্রথম আমাদের বাড়ীতে আসিলে—সে কাপড়ের বর্ণ, সে অলঙ্কারের ছটা, সে লজ্জিনম্র মুখচ্ছবি—আমি যেন কালি দেখিয়াছি,—আমার এমনি মনে হয়।"

রমণী—"তুমি কি বলিতে চাও, আমি বুঝিতে পারি না। তুমিও কি—"

বিনয়—"তুমি যদি বুঝিতে, আমি নিজের সহিত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কি সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি—আমার এই রোগ সেই সংগ্রামের ফল। কিশোর বয়সে তোমার সহিত খেলার দিন হইতে আজ এই মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত—আমার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া তোমারই ধ্যান করিয়া আসিতেছি।"

রমণীর মুখে একটীও কথা নাই। যে বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি আমি ক্ষণেকের জন্য দেখিয়াছিলাম, এ সেই মূর্ত্তি;—নিস্পন্দ পাষাণ-প্রতিমা!

বিনয়—"দেখ বৌদি! আর আমার অবসর নাই! আমার একমাত্র প্রার্থনা,—মরণের এপারে যখন হয়—না হয় মরণের ওপারে—আমার কপালে একটী চুম্বন দিয়ো।"

"কি সর্ব্বনাশ!" বলিয়া রমণী বিনয়ের কক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন! কি কণ্ঠস্বর! কি চাহনি! কি গতি! যেন একটা প্রলয়ের ভূমিকা! বিনয় উঠিয়া তাঁহার পশ্চাতে যাইতে গিয়া, ভূমিতে পড়িয়া গেল।—আমি ক্ষিপ্রগতিতে বিনয়ের কক্ষে গিয়া বিনয়ের সেবা করিতে লাগিলাম। বিনয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে, "বৌদি!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "তিনি তাঁহার ঘরে আছেন, তুমি স্থির হও।"

বিনয়কে স্থির রাখিতে পারিলাম না; তাহাকে তাহার বৌদির ঘরে লইয়া গেলাম। সে ঘর শূন্য! এদিকে ওদিকে তাঁহাকে কত খুঁজিলাম; আর পাইলাম না। পূর্ণিমার চাঁদ সেই যে আগুনের গোলকের মত ঝড়ে উড়িয়া গেল, আর দেখিতে পাই নাই। চর্ম্মচক্ষুতে আর দেখি নাই বটে, কিন্তু, মনশ্চক্ষুতে সেই রূপ ভিন্ন আর কিছুই নাই।"

অবিনাশ কিছুক্ষণ নীরব রহিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তার পর কি হইল?"

অবিনাশ আবার বলিতে লাগিল—"তাহার পর আর কি হইবে—বিনয়ের বাটী হইতে তাহার দুইটা জ্ঞাতি-ভাই—বিজয় ও বিপিন, এবং বিনয়ের এক প্রৌঢ়বয়স্কা জেঠাইমাতা আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বিনয়কে দেশে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। যেদিন তাঁহারা এখান হইতে চলিয়া যান, সেই দিন প্রাতে ডাক্তার প্রভাতবাবুও আসিয়াছিলেন। আমরা সকলেই বিষণ্ণ। ডাক্তার সাহেব একবার বলিলেন—"আহা বিনয়! তোমার বৌদির মত সেবাপরায়ণা স্ত্রীলোক আমি আর দেখি নাই।" বিনয়ের দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। আমি আমার মুখ লুকাইবার জন্য ব্যস্ত। ডাক্তার বাবুর কথাগুলি বিনয়ের জ্যাঠাইমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিনয়ের কাছে আসিয়া, অঞ্চলে তাহার মুখ মুছাইতে-মুছাইতে বলিলেন,—"ঐ মাগীই ত ছেলেটার মাথা খেয়েছে। আমি আগেই বলিয়াছিলাম যে, উহাতে মাগীর পেট ভরিবে না। এখন কুলে কালি দিয়া তবে তাহার তৃপ্তি হইল! হা ভগবান!"

ডাক্তার সাহেব, বিনয় ও আমি—তিনজনেই নীরবে এই কথাগুলি শুনিলাম!

অবিনাশের কথা যখন ফুরাইল, তখন বেলা হইয়াছে।

ছুটী ফুরাইয়া আসিয়াছে—কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। আমার এক পরমাত্মীয়ের এক পত্র পাইলাম—

ওঁ

এলাহাবাদ,

২৪ এ অক্টোবর ১৯১

শ্রীচরণকমলেষু—

আপনি নামিবার সময় হৃষীকেশ দেখিয়া আ ভাল হয়। হৃষীকেশের তিন মাইল উপরে লছ ঝোলা—যাহা পার হইয়া বদ্রীনারায়ণ, গঙ্গোত্রী প্র যাইতে হয়। এইখানে গঙ্গা পার হইবার জন্য অ দড়ির পোল ছিল। তাহার দ্বারা যাত্রীদের পার হ অসম্ভব হইয়া উঠিত। এখন সেই স্থানে এক লো hanging বা ঝোলান পোল হইয়াছে। পোলটী ৭৫ দীর্ঘ, আর ফিট্ তিনেক প্রশস্ত। ঝুণঝুণওয়ালারা প্র করিয়া দিয়াছে। এখন ইহার উপর দিয়া ঘোড়া-গরুও প হইতে পারে। এই পোলটী একটী দেখিবার জিনি লছমণঝোলার কাছে গঙ্গার যেরূপ সৌন্দর্য্য, নিম্নে এ আর কোথাও নাই। সেখানে গঙ্গার দুই ধারেই অত্ পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গঙ্গার ধারে-ধারে বদ্রীনারায় যাইবার সঙ্কীর্ণ উপলসঙ্কুল পথ। দূর হইতে এই পথ দেখি অতি মনোরম। কোথাও বা নদীর গায়ে আসি পড়িয়াছে; কোথাও বা নদীর অনেক উপরে, কোন পর্ণকুটীরের পাশ দিয়া চলিয়াছে। জনপ্রবাদ আছে এই পথে পঞ্চাশপদ চলিলে বদ্রীনারায়ণ যাইবার ফ হয়। এই রাস্তার নীচেই খরস্রোতা ভাগীরথী। সেখা নাতিগভীর জলস্রোত বড়-বড় পাথরের উপর দিয়া ক্রমাগ বজ্রনিনাদে চলিয়াছে। সে দৃশ্য অতি সুন্দর! ছাড়ি আসিতে ইচ্ছা করে না। লছমণ-ঝোলার গঙ্গার দু ধারেই পাহাড়। সেই স্থান দেখিলে, উৎপত্তি-স্থান হই পাহাড়ের মধ্য দিয়া গঙ্গার পথের একটী বেশ ধার করা যায়। হৃষীকেশে গঙ্গা একদিককার পাহাড় ছাড়ি দিয়াছেন। হৃষীকেশে যেখানে মন্দির, ধরমশালা প্রভৃ আছে, গঙ্গার সেই স্থান প্রায় সমতলভূমি—পরপা অবশ্য উচ্চ পাহাড়। হরিদ্বারে গঙ্গা পাহাড় ছাড়ি সমতলভূমিতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন; সে স্থান দেখিলে গঙ্গার রূপ পাহাড়ের মধ্যে কি প্রকার, তাহার কোন ধারণা হয় না।

আপনি যদি ইতিপূর্ব্বে হৃষীকেশ না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ সুযোগ ছাড়িবেন না। যাইতে কোনই কষ্ট নাই। হৃষীকেশ-রোড ষ্টেশন হইতে মোটর পাইতে পারেন। মোটর না পাইলে, টঙ্গা পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা ভাল আছি। আশা করি, আপনারা ভাল আছেন ইতি—

প্রণত নী—

পত্র পাইয়া হৃষীকেশ দর্শন করা স্থির করিলাম। নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া অবিনাশকে আমাদের সহিত কলিকাতায় যাইবার জন্য সম্মত করিলাম। মনে করিলাম, সেই কক্ষমধ্যে দিবারাত্রি না থাকিয়া, একবার ঘুরিয়া আসিলে, মনের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

হৃষীকেশ-রোড ষ্টেশনে নামিয়া, টঙ্গায় হৃষীকেশে পৌঁছিলাম। সেইখানে গঙ্গাস্নান করিলাম। কি রমণীয় স্নান! গঙ্গার ভীষণ তীব্রবেগ জলরাশি তুষার-শীতল।

স্নানাহারাদির পর লছমণ-ঝোলা দেখিতে বাহির হইলাম। গঙ্গার ধার দিয়া চলিলাম। মনে হইতে লাগিল, এ যেন, যে পৃথিবীতে আমরা থাকি, সে পৃথিবী নহে—তাহার বাহিরের একটা মায়া-রাজ্য। দুই পার্শ্বে হিমারণ্য। মধ্যস্থলে তীব্র, খরস্রোতা, পুণ্যতোয়া ভাগীরথী। স্বর্গ হইতে বিধাতার করুণা যেন মাতগঙ্গা রূপে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। তরতর, কলকল শব্দে ছুটিয়াছে। যেন বিমল স্নেহের আবেগে পাগলিনী। আকুল মাতৃ-হৃদয় সন্তানের কল্যাণ-কামনায় উন্মত্তের প্রায় ছুটিয়াছে। অবিরাম, অবিশ্রাম;—কোনও বাধা, কোনও বিঘ্ন গ্রাহ্য নাই। ভাগীরথী-তীর-সংলগ্ন পথ দিয়া আমরা লছমণ-ঝোলার দিকে অগ্রসর হইতেছি। পথের দুই পার্শ্বে স্থানে-স্থানে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরে সাধু-সন্ন্যাসীরা উপবিষ্ট। ক্রমে, দূর হইতে একটী লোহার ঝোলান পথ দেখিয়াই বুঝিলাম যে, ঐটী "লছমণ-ঝোলা"। নিকটে রাম-সীতা, হনুমান প্রভৃতির মন্দির আছে। আমরা ক্রমে লছমণ-ঝোলার উপরে আসিলাম। অবিনাশ ও আমি পোলের মধ্যস্থানে আসিয়াছি, এমন সময় অবিনাশ আমাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইলে, আমি দেখিলাম যে, আমরা যে পারে ছিলাম, গঙ্গার সেই পারে, গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া, একটী রমণী অবগাহনান্তর ঊর্দ্ধবাহু, ঊর্দ্ধনেত্রা, ধ্যানরতা। যেন জাহ্নবী মূর্ত্তিমতী অথবা স্বয়ং হৈমবতী উমা। এমন অনিন্দ্য ও অপূর্ব্ব রূপরাশি কখনও দেখি নাই। রূপে গঙ্গা আলো, গঙ্গাতীর আলো—হিমারণ্যাকাশে পূর্ণশশী! কিছুক্ষণ আর কোনও দিকে নয়ন ফিরাইতে পারি নাই। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল, তিনি আমাদিগকে দেখিলেন। তখন অবিনাশের দিকে ফিরিয়া দেখি, অবিনাশ নিস্পন্দ, পাষাণ-মূর্ত্তিসম। আমাকে কেবল একটী কথা বলিল,—"ঐ!" রমণীর দিকে ফিরিয়া দেখি, তিনি গঙ্গা-সলিল-পূর্ণ কলসীকক্ষে, অতি ধীরে, অতি মন্থর ভাবে উপরে উঠিতেছেন। আমরাও ধীরে পোল পার হইলাম;—দেখিলাম, গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র একতালা বাটী। একটী কি দুইটী ঘর। সম্মুখে একটী বারাণ্ডা। সেই বাটীতে রমণী প্রবেশ করিলেন। আমরা সেই বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বারাণ্ডার উপর রমণীর পদচিহ্ন। অবিনাশ সেই বারাণ্ডায় বসিয়া পড়িল। ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ।

কি বলিয়া ডাকিব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, আমি বারাণ্ডার উপরে উঠিয়া ঘরের কড়া নাড়িতে লাগিলাম। ভিতর হইতে দরজা খোলার শব্দ হইল। অবিনাশ দরজার দিকে ফিরিয়া চাহিল। সমস্ত জীবনের সকল সাধনা যে মুহূর্ত্তে সিদ্ধি-লাভ করে বা ব্যর্থ হয়, সেই মুহূর্ত্তে যে ব্যাকুলতা ও যে আগ্রহ হওয়া সম্ভব, অবিনাশের চক্ষে সেই ব্যাকুলতা ও সেই আগ্রহ নিরীক্ষণ করিলাম। দ্বার উন্মুক্ত হইল। একটী বৃদ্ধা হিন্দুস্থানী রমণী বাহিরে আসিলেন। পরিষ্কার বাঙ্গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কি চান?" আমি বলিলাম, "ঐ যে রমণী এইমাত্র গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিলেন, আমরা একবার তাঁহার সহিত দেখা করিব।"

হিন্দুস্থানী রমণী বলিলেন—"দেখা হইবে না।" অবিনাশ গদগদকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "অপরাজিতা! একবার বাইরে আইস! ইচ্ছা না হয় কথা বলিয়ো না—আমাকে একবার প্রণাম করিয়া যাইবার অবসর দাও।"

হিন্দুস্থানী রমণীটীই বাহির হইতে উত্তর করিলেন,—"দেখা হইবে না।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার চরণে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, আপনি একবার তাঁহাকে বলুন যে, মুসৌরী হইতে অবিনাশ বাবু আসিয়াছেন

—একবার মাত্র দেখা করিয়া যাইবেন।" হিন্দুস্থানী রমণী ভিতরে প্রবেশ করিয়া, মুহূর্ত্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখুন, আপনারা যদি এখানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন, যাঁহাকে দেখিতে চাহিতেছেন, তাঁহার জীবনের ক্ষতি হইতে পারে। আপনারা নিশ্চিত জানিবেন যে, আর তিলেকের জন্যও তাঁহার সহিত আপনাদের দেখা হইবে না।" এই কথা বলিয়াই হিন্দুস্থানী রমণী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিলেন। অবিনাশ ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। আমিও সঙ্গে-সঙ্গে চলিলাম। হৃষীকেশ-রোড ষ্টেশন হইতে পুনরায় দেরাদুনে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে আমাদের মুসৌরীর অষ্ট-মূর্ত্তির অবশিষ্ট ছয়জন ছিলেন। আটজন দেরাদুন হইতে মেলগাড়ীতে রওনা হইলাম। অবিনাশ বেশ কথাবার্ত্তা বলিতেছে—যেন সহজ ভাব। আমি মনে করিলাম, সে মনকে বুঝাইয়া স্থির করিয়াছে।

পরদিন কাশী ষ্টেশনে গাড়ী আসিলে, অনেক লোক নামিয়া গেলেন—আবার অনেকে উঠিলেন। নানাপ্রকার দ্রব্যের বিক্রেতারা—কেহ পিতলের জিনিষ, কেহ কাঠের খেলানা, কেহ মাটীর খেলানা, কেহ চামড়ার দ্রব্য, কেহ ফল, কেহ দুগ্ধ লইয়া—গাড়ীর দরজায়-দরজায় বিক্রয়ের আশায় ঘুরিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল - বাঁশী বাজিল; গাড়ী ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। অবিনাশ দরজার কাছে বসিয়া ছিল - হঠাৎ গাড়ীর দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল। আমি গলা বাড়াইয়া দেখি, মুখে ঈষৎ হাসি—হাসিতে এমন মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার বিকাশ এ জীবনে আর কখনও দেখি নাই। পরদিন সকালে আবার সেই হাবড়া।

পেশবাদিগের শাসন-পদ্ধতি

[অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-আর-এস্]

৩

সম্রাট্ ও ছত্রপতির নীচেই পেশবার স্থান। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রকৃত নায়ক তিনিই। কিন্তু হইলে কি হয়, আইনের হিসাবে তিনি অষ্ট-প্রধানের একজন মাত্র। শিবাজীর সময় আবার প্রধানগণকে সময়-সময় এক পদ হইতে অপর পদে বদলী করা হইত;—যেমন এখন শিক্ষা-সচিবকে রাজস্ব-সচিবের পদে বদলী করিয়া দেওয়া যায়। শিবাজীর সময় আবার কোন পদেই কাহারও উত্তরাধিকারের দাবী থাকিত না। ভটবংশের প্রথম পেশবা বালাজী বিশ্বনাথের পূর্ব্বে আরও ছয়জন পেশবার কার্য্য করিয়াছিলেন।* ইহাদের মধ্যে কেবল নীলকণ্ঠ মোরেশ্বর পিতা মোরো ত্রিম্বকের পরিত্যক্ত পেশবা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভটবংশের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে পেশবা পদে কোন বংশ-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ কোন দাবী ছিল না। সুতরাং সচিব, সুমন্ত, সেনাপতি প্রভৃতি অপরাপর প্রধানেরা আপনাদিগকে পেশবার সমকক্ষ বলিয়াই মনে করিতেন।

বেতন, ক্ষমতা ও সম্মানের হিসাবে পেশবা কিন্তু পুরাতন মারাঠা-রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ছিলেন না। সে হিসাবে প্রতিনিধির স্থান তাঁহার অনেক উপরে। পেশবার বেতন ছিল বার্ষিক ১৩,০০০ হোন (১ হোন=৩—৪ টাকা আর প্রতিনিধি পাইতেন বার্ষিক ১৫০০০ হোন। শিবাজী ও সাম্ভাজীর সময়ে প্রতিনিধি বলিয়া কোন কর্ম্মচারী ছিল না। সাম্ভাজীর প্রাণদণ্ডের পরে, যখন মহারাষ্ট্রের প্রায় সকল পর্ব্বত-দুর্গ একে-একে মোগলের হস্তগত হইল, তখন নিরুপায় রাজারাম পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করিয়া দক্ষিণে জিঞ্জী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোগলে ও মারাঠায়

* (১) শামরাজ নীলকণ্ঠ রাঞ্জেকর (২) মোরো ত্রিম্বক পিঙ্গলে (৩) নীলকণ্ঠ মোরেশ্বর পিঙ্গলে (৪) পরশুরাম ত্রিম্বক (৫) বহিরো মোরেশ্বর পিঙ্গলে (৬) বালকৃষ্ণ বাসুদেব।

তখন জীবন-মরণের সংগ্রাম চলিতেছে, মারাঠাদিগের রাজা পলাতক, তাই তাহাদিগের একজন যোগ্য নেতার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। এই প্রয়োজনের অনুরোধে রাজারাম জিঞ্জীদুর্গে প্রহ্লাদ নিরাজী নামক একজন ব্রাহ্মণ রাজ-নীতিজ্ঞকে প্রতিনিধি পদে নিয়োগ করেন। প্রহ্লাদ তরুণ বয়সেই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন; সভাসদ বলেন যে শিবাজী মৃত্যুকালে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে মারাঠা জাতির সঙ্কট-কালে প্রহ্লাদই তাহাদিগকে আসন্ন বিনাশ হইতে রক্ষা করিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছিল। প্রহ্লাদ নিরাজী সত্যসত্যই রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার পদসৃষ্টি হইয়াছিল মারাঠা জাতির বিপদের দিনে, সেই বিপদ কাটিয়া গেলেও প্রতিনিধির পদ ও অধিকার অক্ষুন্ন রহিয়া গেল। কিন্তু ভটবংশের অভ্যুত্থানের সঙ্গে-সঙ্গে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রকৃত নেতৃত্ব প্রতিনিধির হস্ত হইতে পেশবার হস্তে চলিয়া গেল।

বালাজী বিশ্বনাথ বুদ্ধি-কৌশলে পেশবার পদে স্বীয় বংশের স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু পেশবাদিগের প্রাধান্য স্থায়িভাবে স্থাপিত হয় ভটবংশের দ্বিতীয় পেশবা বাজীরাওয়ের সময়। শাহুর রাজত্ব-কালে মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্তরদিকে প্রভূত প্রসার হইয়াছিল, বাজীরাও ছিলেন এই উত্তর বিজয়ের নীতির পক্ষপাতী। আর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিনিধি চাহিয়াছিলেন, দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত মারাঠা-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে। সাম্রাজ্য-বাদী বাজীরাওয়ের সঙ্গে প্রতিনিধির এই বিষয় লইয়া অনেক বাদ-প্রতিবাদ হয়, বাজীরাও বলেন যে ভারত সাম্রাজ্যের মূল দিল্লীতে,—মূলে আঘাত করিলেই সাম্রাজ্য তরু পত্র-পুষ্প শাখা-প্রশাখাসহ মারাঠার করতলগত হইবে। শাখা-প্রশাখা এক-একখানি করিয়া ছেদন করিবার প্রয়োজন হইবে না। রাজমণ্ডলের এক বিশেষ অধিবেশনে মারাঠা সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্র-নীতির এই প্রশ্নের বিশেষ আলোচনার পরে বাজীরাওয়ের মত গৃহীত হয়। এতদিন প্রতিনিধির প্রভাব ক্রমে-ক্রমে ক্ষুন্ন হইতেছিল, রাজমণ্ডলে প্রতিনিধির নীতি প্রত্যাখ্যাত হইলে, তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভাব একেবারে তিরোহিত হইল।

আর শিবাজীর বংশধরগণ সাতারা দুর্গে বন্দী হইলেন ঘটনা-চক্রে। ছত্রপতি শাহু মৃত্যুকালে এক সনন্দ দ্বারা ভটবংশের তৃতীয় পেশবা বালাজী বাজীরাওকে রাজ্যশাসন করিবার স্বাধীন ক্ষমতা দিয়া যান। কিন্তু ঐ সনন্দের সর্ত্ত অনুসারে পেশবাকে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সকল কার্য্যই ছত্রপতি মহারাজের নামে করিতে হইত। শাহুর নিজের কোন সন্তান ছিল না। তাঁহার নিকটতম আত্মীয় কোহলাপুরের রাজার সহিত তাঁহার মোটেই সম্প্রীতি ছিল না। কোহলাপুরের রাজাকে দত্তক-গ্রহণ করিলে ছত্রপতির অধিকার লইয়া বিবাদের অবসান হইত বটে, কিন্তু পেশবার প্রভাবও বোধ হয় অনেকটা ক্ষুন্ন হইত। এই অবস্থায় স্বার্থের খাতিরে রাজারামের বিধবা পত্নী তারাবাই ও পেশবা বালাজী বাজীরাও এক রাজ-নৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তারাবাই পেশবার প্রাধান্যের মোটেই পক্ষপাতিনী ছিলেন না। কিন্তু তখনকার কোহলা-পুরের রাজা তাঁহার সপত্নী-পুত্র। তেজস্বিনী তারাবাই চাহিতেন ক্ষমতা। স্বামী ও পুত্রের রাজত্ব কালে তিনিই প্রকৃত রাজক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পরে গর্ভবতী পুত্র-বধূকে তিনি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, কেহই জানিত না,—সেই গর্ভের সন্তানের যে কি হইয়াছিল তাহাও কাহারও জানিবার উপায় ছিল না। কোহলাপুরের সাম্ভাজীর প্রতি শাহুর বিদ্বেষের কথা তারাবাই ও বালাজী উভয়েই অবগত ছিলেন। সাম্ভাজী শাহুর উত্তরাধিকারী বলিয়া গৃহীত হইলে তাঁহাদের উভয়েরই স্বার্থহানি,—তাই তারাবাই ও বালাজী বাজীরাও পরামর্শ করিয়া এতকাল পরে, তারাবাইয়ের লুক্কায়িত পৌত্র দ্বিতীয় রাজারামকে এক কুম্ভকার গৃহ হইতে বাহির করিলেন। শাহুর পরে রাজারাম সাতারার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু, এই হইতে তাঁহার দুর্ভাগ্যের সূচনা হইল। তারাবাই চাহিতেন ক্ষমতা, পেশবারও লক্ষ্য তাহাই। কাযেই তাঁহাদের ঐক্য স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। পেশবা উত্তরে দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেই তারাবাই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। বরোদার গাইকবার সসৈন্যে তারাবাইর সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু শিবাজীর অযোগ্য বংশধর দ্বিতীয় রাজারাম পিতামহীর সঙ্গে যোগ দিতে সাহসী হইলেন না। কুম্ভকারের গৃহে প্রতিপালিত রাজারাম, রাজনীতি বা প্রভুত্বের অনুরাগী ছিলেন না, তিনি চাহিতেন আরাম। কিন্তু এতদূর অগ্রসর

হইয়া, এত সহজে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্রী তারাবাই নহেন। তিনি রাজারামকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া সাতারার সেনাগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তার পর গাইকবারের পরাজয় হইল, তারাবাইর সহিত পেশবার সন্ধি হইল, পেশবার প্রভুত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু রাজারাম যে বন্দী ছিলেন, সেই বন্দীই রহিয়া গেলেন।

এইরূপে ছত্রপতির অন্যতম মন্ত্রী পেশবা ছত্রপতির প্রভু হইয়া বসিলেন। এই প্রভুত্ব কিন্তু, এত নীরবে, এত সন্তর্পণে, এত ধীরে-ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যে তখনকার লোক বুঝিতেই পারে নাই, যে তাহাদের চক্ষুর উপর এতবড় একটা রাজ-নৈতিক বিপ্লব ঘটিয়া যাইতেছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক স্কট-ওয়ারিং লিখিয়াছেন—The usurpation of the Peshwas neither attracted observation nor excited surprise. Indeed the transition was easy, natural and progressive. পেশবাদিগের প্রভুত্ব লাভ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ বা বিস্ময়ের উদ্রেক করে নাই। এই পরিবর্ত্তন বাস্তবিকই সহজ, স্বাভাবিক ও ক্রমসম্পন্ন।

শাহুর রাজত্বকালেই পেশবাদিগের প্রভুত্বের সূত্রপাত, প্রতিষ্ঠা, ও পূর্ণ-পরিণতি হইয়াছিল বলিয়া, কেহ-কেহ মনে করেন যে, শাহু ভট পেশবাদিগের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। তিনি নামে মাত্র রাজা ছিলেন, প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহার কিছুই ছিল না। কথাটা একেবারেই ঠিক নহে। মোগল অন্তঃপুরে প্রতিপালিত শাহুর নিকট আমরা তাঁহার পিতামহের সংযম ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা বা তাঁহার অসংযত পিতার দুর্দ্দমনীয় সাহস প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু শিবাজীর শাসন-পটুতা ও রাজ-নৈতিক গুণের কিয়দংশ শাহু উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতকালে তিনি নামে এবং কার্য্যেও রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। রাণাডে বলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালন না করিলেও, শাহুই তাঁহার সেনানায়কগণকে অভিযানে পাঠাইতেন; আবার তাঁহারই আদেশে বিজয়ী মারাঠা সেনাপতিগণ দেশে ফিরিয়া আসিতেন। ডাভইর যুদ্ধের পর তাঁহারই চেষ্টায়, পেশবা গাইকবারের মধ্যে গুজরাট বিভাগ হয়। যখন বালাজী বাজীরাও রঘুজী ভোঁসলার প্রতি শত্রুতাপরবশ হইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হন, তখন রঘুজী ছত্রপতি শাহুরই রাজ-শক্তির শরণ লইয়াছিলেন, আর বিজয়দৃপ্ত বালাজীকে শাহুর আদেশে দক্ষিণে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের মত শাহুর প্রতিও পরবর্ত্তী যুগের ঐতিহাসিকগণ বড় অবিচার করিয়াছেন।

কেন যে শাহু মহারাজ নিজের উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া পেশবাকে সকল ক্ষমতার অধিকারী করিয়া গেলেন তাহা বলা কঠিন। কিন্তু কোহলাপুরের রাজা শম্ভুজী ছিলেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। আর রাজারামের বংশধরেরাই তাঁহার সিংহাসনের পথে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া যাওয়া সহজ ছিল না। নিজের সন্তান থাকিলে তিনি তাহার জন্য রাজকীয় তাবৎ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যে পরিমাণে যত্নবান ও আগ্রহশীল হইতেন, খুল্লতাত বংশে জ্ঞাতি শত্রুর জন্য তাঁহার ততটা যত্ন বা আগ্রহ হইবে কেন? পরিশেষে যাঁহাকে তিনি দত্তক গ্রহণ করিলেন, তিনিও রাজারামেরই বংশধর। তাঁহার জন্ম-কাহিনী, তাঁহার বাল্যের কথা রহস্য-জাল-সমাবৃত। এমন কি শাহুর জীবিত কালেই পেশবা ও তারাবাইর বিপক্ষ-পক্ষ, খুব প্রকাশ্যে না হইলেও, দ্বিতীয় রাজারাম প্রথম রাজারামের পৌত্র কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ করিত। কে বলিবে শাহুর চিত্তেও সে সন্দেহের উদয় হয় নাই। কুম্ভকার-গৃহে প্রতিপালিত এই রাজকুমারটির বিরাট মারাঠা-বাহিনীর পরিচালনার অথবা ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড গ্রহণের যোগ্যতা আছে কি না, সে বিষয়েও বৃদ্ধ শাহুর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু পেশবাগণকে তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। বালাজী বিশ্বনাথ হইতে বালাজী বাজীরাও পর্য্যন্ত তিন পুরুষকাল তাঁহারা বিশ্বস্তভাবে ছত্রপতি সরকারের সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদেরই নায়কতায় মারাঠার দিগ্বিজয়ী বাহিনী উত্তর ভারত পর্য্যন্ত মারাঠার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া আসিয়াছে। সুতরাং পেশবাগণের সুযোগ্য হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিলে, রাজ্যের যে কোন অনিষ্ট হইবে না এ বিষয়ে শাহুর কোন সন্দেহ ছিল না। অপর পক্ষে তাঁহার অজ্ঞাত বাল্য উত্তরাধিকারীর উপর ততখানি আস্থা স্থাপন করিবার ভরসা তাঁহার হয় নাই। বোধ করি এই কারণেই, দীর্ঘকাল বিশ্বস্ত সেবার পুরস্কার স্বরূপ তিনি ভট পেশবাগণের হাতে সকল ক্ষমতা

প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে শিবাজীর বংশধরগণ যেমন একদিকে সকল ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তেমনই অপরদিকে আবার মারাঠা সাম্রাজ্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের প্রাপ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত হন নাই। যদি শাহুর সনদের বলে পেশবাগণ মারাঠা জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলেও শিবাজীর অযোগ্য বংশধরগণ বেশী দিন সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারিতেন না। শাহুর বন্দোবস্তে মোটের উপর যে তাঁহাদের কেবল লোকসানই হইয়াছে এমন কথা বলা চলে না। জাপানের ইতিহাসেও আমরা ঠিক এই রকমের একটা দৃষ্টান্ত পাই। মিকাডোর সহিত ছত্রপতির এবং শোগুণের সহিত পেশবার তুলনা করা যাইতে পারে। যদি মিকাডোগণ শোগুণের ক্রীড়নক মাত্র থাকিতে নারাজ হইতেন, তবে বোধ হয় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে, জীবন মরণের সংগ্রামে, তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারিতেন না।

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি। ছত্রপতি মহারাজ যে কেবল রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাহা নহে, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও সামাজিক সকল প্রকার প্রশ্নের মীমাংসা করিবার এক মাত্র অধিকারীও ছিলেন তিনি। পরে পেশবাগণও এই অধিকার অনুসারে বহু সামাজিক বাদবিতণ্ডার মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু পেশবাগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া, আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, এই অধিকারটি তাঁহাদের জন্মগত ব্রহ্মণ্য-লব্ধ। কিন্তু বাস্তবিক মারাঠা দেশে একটা নব হিন্দু ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই ভাবের প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন অব্রাহ্মণ*। এই নব হিন্দু ভাবের অন্যতম প্রচারক রামদাস ছিলেন শিবাজীর গুরু ও হিতাকাঙ্ক্ষী। শিবাজী নিজেও তখনকার উদার ভাবের ভাবুক ছিলেন, সাম্প্রদায়িকতা বা গোড়ামি তাঁহাতে ছিল না। এই উদার নরপতি হিন্দু শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে সমাজেরও নেতা হইলেন। তাঁহার "গোব্রাহ্মণ-প্রতিপালক" উপাধি ইংলণ্ডরাজের "Defender of the Faith" উপাধিরই অনুরূপ। তবে য়ুরোপে যেরূপ রাষ্ট্র ও সংঘের (State এবং Chucrh) বিরোধ হইয়াছে, এদেশে কখনও তাহা হয় নাই ; কারণ প্রাচীন অথবা আধুনিক সকল হিন্দু রাজ্যেই রাজা সংঘের উপরও কতকটা কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। শিবাজী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন একজন শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর (পণ্ডিতরাও) পরামর্শ লইয়া। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর রাজার অনুমোদন ব্যতিরেকে কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কি সামাজিক কোন বিষয়েরই কোন ব্যবস্থা দিবার অধিকার ছিল না। পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বনাথ কাশিনাথ রাজবাড়ে তাঁহার মারাঠ্যাচে ইতিহাসাঁচী সাধনে নামক গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে সাম্ভাজীর রাজত্ব কালের একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন, যাহার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে অসমীচীন হইবে না। গঙ্গাধর রঘুনাথ কুলকর্ণী নামক এক ব্রাহ্মণ মুসলমান হস্তে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় নিরুপায় হইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তার পর অবস্থা বিপাকে মুসলমানের অন্ন ব্যবহারও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। বৎসরাধিক অনিচ্ছাকৃত মুসলমান সংসর্গের পর গঙ্গাধর সুযোগ পাইয়া পলায়ন করিয়া দেশে আসিলেন, এবং জাতিতে উঠিবার জন্য আবেদন করিলেন। শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আবেদনের সপক্ষে মত প্রকাশ করিলে, ছন্দোগ্যামাত্য এই ঘটনা সাম্ভাজী মহারাজের গোচর করিলেন। তিনি গঙ্গাধরের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে অনুমতি দিলেন। এই প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিলেন অব্রাহ্মণ রাজা, ব্রাহ্মণ ছন্দোগ্যামাত্য নহেন। ভারত-ইতিহাস-সংশোধক-মণ্ডলের সংগৃহীত একখানি দলিল হইতে জানা যায় যে, ছত্রপতি মহারাজের অন্যতম সামন্ত ক্ষত্রিয় আংগ্রিয়াগণও সামাজিক ব্যাপারের মীমাংসা করিবার অধিকার পরিচালনা করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা এই সকল ব্যাপারে ব্রাহ্মণদিগের উপর হুকুমজারী করিতেন, তাঁহাদিগের শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যার অপেক্ষা করিতেন না। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মণ পেশবাগণ অব্রাহ্মণ শাহুর সনদের বলেই মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্র এবং সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

৪

পেশবাদিগের অভ্যুত্থানের ফলে মারাঠা ইতিহাসের ধারা দুই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে

* Ranade Rise of the Maratha Power, Vol. I দেখুন।

রাষ্ট্রের ঐক্য যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন তাহার অন্যতম ফল। আর এই সময় হইতেই মারাঠাদিগের ভিতর দুই শ্রেণীর অভিজাত সৃষ্টি হইল। প্রথম কথাটা বুঝিতে হইলে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর নীতির একটু আলোচনা করা দরকার। শিবাজীর সর্ব্বাপেক্ষা সুমহান কীর্ত্তি বোধ হয় এই যে তিনি যখন মহারাষ্ট্রে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন করেন, তখন ভারতবর্ষে কেন য়ুরোপেও জাতীয় ভাবের উন্মেষ ভাল করিয়া হয় নাই। ফরাসী বিপ্লবের যুগে বিপুল রক্ত-প্লাবনে ফরাসী দেশে ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশে জাতীয়তার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তাহার বহু পূর্ব্বেই গুরু রামদাস ও শিষ্য শিবাজী জাতীয় ভাবের বিরাট্ শক্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কাল জাতীয় ভাবের আদৌ উপযোগী ছিল না, তাই শিবাজী ও রামদাসের সাধনায়ও তৎকালের মহারাষ্ট্রে জাতীয় ভাব সম্যক স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই। মহারাষ্ট্র-চরিত্রের যে প্রধান ত্রুটি জাতীয়তার অন্তরায়, তাহা শিবাজীর শ্যেন-দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যত দিন মহারাষ্ট্রের জায়গীরদার কেবল আপনার ব্যক্তিগত সম্মান, ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা জায়গীরের কথা ভাবিবে, ততদিন মহারাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্য সংস্থাপন অসম্ভব। মারাঠা জায়গীরদারগণ দেশের কথা ভাবিত না, তাহারা ভাবিত নিজ নিজ জায়গীর-জমিদারীর কথা। যে কোন উপায়ে পৈতৃক সম্পত্তি, বংশানুগত অধিকার রক্ষা করিতে পারিলেই তাঁহাদের হইল। শিবাজী এই জন্য জায়গীর প্রথার যথা-সাধ্য বিলোপ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং তাহার উদ্যোগ কিয়ৎ পরিমাণে সফলও হইয়াছিল। নূতন জায়গীর তাঁহার আমলে কাহাকেও বড় দেওয়া হইত না। রাজস্ব আদায় করিত রাজকর্ম্মচারিগণ, রাজস্ব তিনি ইজারা দিতেন না। কিন্তু সকল সময় প্রাচীন জায়গীরদারের জায়গীর কাড়িয়া লওয়া তিনি সমীচীন বোধ করেন নাই। শিবাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সাম্ভাজী নিজের বিলাস-বাসন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, রাজ্য-শাসনের ধার তিনি বড় একটা ধারিতেন না। কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম পিতার অনুসৃত নীতির উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিকূল ঘটনা-প্রবাহের তাড়নায়, তাঁহাকেই জায়গীর-প্রথার পুনরায় প্রচলন করিতে হইল। সমগ্র দেশ যখন শত্রু-করতলে, তখন বহু দুঃসাহসী মারাঠা শিলেদার রাজ্য-জয়ে বাহির হইয়াছিলেন জায়গীরের লোভে। তিনি অনন্যোপায় হইয়া এই জায়গীর-লোলুপ সৈনিকগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তখনও কিন্তু ছত্রপতির জায়গীরদার ভৃত্যগণ স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করে নাই, কিন্তু পেশবার অভ্যুত্থানের পরে, সকল পরাক্রমশালী জায়গীরদারই ভট্-পরিবারের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে প্রয়াসী হইলেন। আংগ্রিয়া, ভোঁসলা, গাইকবার, সকলেরই একমাত্র কামনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, স্বাধীন রাজত্ব। ইহার ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যও য়ুরোপের "পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের" মত (Holy Roman Empire) জায়গীরের সমষ্টি মাত্রে পরিণত হইল। এবং ইহার অন্তিম ফল হইল পেশবারই ক্ষমতা-হ্রাস।

পেশবাদিগের অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় অনিবার্য্য ফল অভিজাত সম্প্রদায়ে দুইটি শ্রেণীর উদ্ভব। প্রাচীন অভিজাতবর্গের অধিকাংশ রাজমণ্ডলের সদস্য; সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে পেশবার সমকক্ষ। তাঁহারা পেশবার আদেশ পালন করিতেন—তিনি ছত্রপতি মহারাজের প্রতিনিধি বলিয়া। আর নবীন অভিজাত সম্প্রদায় সকলেই পেশবার কর্ম্মচারী আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্র; যেমন সিন্ধিয়া, হোলকর, বুন্দেলে, পটবর্দ্ধন, বিঞ্চুরকর, ফড়কে, ভিড়ে, রাষ্টিয়া প্রভৃতি। তাঁহারা পেশবাকে অন্নদাতা প্রভু বলিয়া সম্মান করিতেন, তাঁহার সেবা করিতে তাঁহারা ধর্ম্মতঃ বাধ্য ছিলেন। নানা ফড়্‌নবীস যখন তাঁহার আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন, "তাঁহার অন্ন বহুদিন খাইয়াছি, তিনি আমাদিগকে পুত্রবৎ কৃপা করিয়াছেন, এ শরীর তাঁহারই অন্নের" (বহুত দিবস অন্ন ভক্ষিলে, কৃপা পুত্রবত কেলী, ত্যাঁচেঁ অন্নাচে শরীর—কাশিনাথ নারায়ণ সানে সম্পাদিত পত্রে যাদী বগৈরে দেখুন) তখন তিনি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিজাতবর্গের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। এই সকল সর্দ্দার প্রথম-প্রথম পেশবার আদেশ অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রতি-পালন করিত। কিন্তু প্রাচীন অভিজাতগণ মনে করিতেন যে, পেশবাকে তাঁহারা যেটুকু সম্মান করেন, তাহা কেবল শিষ্টাচারের খাতিরে। ঠিক ঐ কারণেই তাঁহারাও পেশবার নিকট হইতে অনুরূপ ভদ্র ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারেন। মারাঠা নৌবাহিনীর অধিনায়ক আংগ্রিয়া যখন

পুণায় আসিতেন, তখন পেশবা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নগর হইতে দুই মাইল অগ্রসর হইতেন। অতিথির দর্শনমাত্র অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেন। তার পর অতিথির সঙ্গে-সঙ্গে স্বীয় আবাসগৃহে আসিয়া একই গালিচায় বসিতেন। বলা বাহুল্য যে, আংগ্রিয়া দরবারে আসিলে পেশবা দাঁড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন। পথে চলিবার সময় তাঁহার বামে চলিতেন।* যাধব রাও পুণায় আসিলে তিনিও পেশবার নিকট হইতে এইরূপ অভ্যর্থনা ও সম্মান লাভ করিতেন। অধিকন্তু তাঁহার সম্মানার্থ বহু বন্দীকে কারামুক্ত করা হইত।† পেশবার গৃহে বা দরবারেই যে কেবল এই দুই শ্রেণীর অভিজাতের মধ্যে সমাদর ও সম্মানের তারতম্য ও পার্থক্য হইত তাহা নহে; প্রাচীন সর্দ্দারেরা নবীন সর্দ্দারদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বত্রই দাবী করিতেন। কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যদি প্রতিনিধির মত হীনবল প্রাচীন সর্দ্দারও উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলেও সিন্ধিয়া, হোলকর প্রভৃতির ন্যায় পরাক্রমশালী আধুনিক সর্দ্দারকে প্রধান সেনাপতির সম্মান তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইত। প্রাচীন সর্দ্দারেরা এই সকল সম্মানে তাঁহাদের আইনসঙ্গত অধিকার আছে বলিয়া দাবী করিতেন।

পেশবা-যুগে কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল শ্রেণীর সর্দ্দারই স্বীয় জায়গীরের মধ্যে স্বাধীন রাজ-ক্ষমতা পরিচালন করিতেন। পেশবাগণ সিন্ধিয়া, হোলকর, গাইকবর প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর সর্দ্দারের ও দেওয়ান প্রভৃতি প্রধান-প্রধান কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের স্বাধীন ক্ষমতা বেশী ক্ষুণ্ণ হইত না। ইংরেজ-সরকারের ইনাম কমিশন যখন মহারাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর সর্দ্দারের সম্পত্তি ও বিবিধ প্রকারের অধিকার সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছিলেন, তখন যাধব রাও তাঁহাদিগকে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের বসতি-স্থান, মালেগাঁওএর সর্ব্বপ্রকার শাসন আমরাই করিয়া আসিতেছি। ইহার উপর সরকারের কোন হাত নাই।" (রহিল্যাচা গাঁব মালেগাঁব, ত্যাচী বহিবাট মুখত্যারীনেঁ আমচে আম্হী করত আহো, ত্যাঁত সরকারচী দখলগিরী কাহীঁ এক নাহী। পারসনীস ও মাবজী সম্পাদিত কৈফিয়ৎ যাদী)। পুণে-নিবাসী পবার বংশও নিজেদের জায়গীরের ভিতর অপ্রতিহত প্রভুত্ব করিতেন, পেশবাগণ তাহাতে কোন দিন হস্তক্ষেপ করেন নাই। (পারসনীস ও মাবজী সম্পাদিত কৈফিয়ৎ যাদী)। ইহার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু দুইটিই বোধ হয় যথেষ্ট।

এই সকল জায়গীরদারেরা ছিলেন য়ুরোপের মধ্যযুগের বেরণদিগের মত ছোট-ছোট রাজা। একেবারে স্বাধীন না হইলেও আপনাদের প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, জীবন-মরণের বিধাতা। তাঁহাদিগের শাসন মোটের উপর স্বেচ্ছাতন্ত্রেরই অনুরূপ ছিল। কিন্তু যে সকল গ্রামের উপর তাঁহারা প্রভুত্ব করিতেন, সেগুলির শাসন পদ্ধতি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। মহারাষ্ট্রের প্রাচীর-ঘেরা ছোট-ছোট গ্রামগুলি ছিল ছোট এক-একটি রাজ্য,—আর এই সকল রাষ্ট্র খণ্ডের মধ্যে স্বেচ্ছাতন্ত্রের কোন স্থান ছিল না। এই গ্রাম্য সমাজগুলির শাসনে যে সাম্যবাদের প্রভাব দেখিতে পাই, জগতের আর কোথাও তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। সেই অজ্ঞাত আদিযুগে যখন এই গ্রামগুলির প্রথম পত্তন হইয়াছিল, সেই সময় হইতে ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের গ্রামগুলিতে প্রজাতন্ত্র ব্যতীত অপর কোন শাসন-তন্ত্রের প্রচলন হয় নাই।

মারাঠা-পল্লীর শাসন-কথা অন্যত্র আলোচনা করা যাইবে। এখানে আমরা মোটামুটি ভাবে সমগ্র মারাঠা-সাম্রাজ্যের শাসন-তন্ত্রের আকার প্রকার বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিব। মারাঠা-সাম্রাজ্যের নায়ক পেশবা, কারণ তিনি সাতারার ছত্রপতি মহারাজের প্রতিনিধি। সে হিসাবে পেশবা সামরিক জায়গীরদার (Feudal Barons) বা সর্দ্দারগণের প্রভু; আবার অন্য হিসাবে তিনি তাঁহাদেরই একজন। এই সকল জায়গীরদার যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে সৈন্য লইয়া পেশবার সাহায্য করিতেন; এবং তাহার বিনিময়ে জায়গীর বা 'সরঞ্জাম" ভোগ করিতেন। নিজ-নিজ জায়গীরের মধ্যে তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রভুত্ব ছিল; কিন্তু যে গ্রামগুলির উপর তাঁহারা প্রভুত্ব পরিচালন করিতেন, তথায় আদিম

* পারসনীস ও মাবজী সম্পাদিত কৈফিয়ৎযাদী দেখুন।

† "শ্রীমন্ত নানা সাহেব পেশবা (বালাজী বাজীরাও) পিলাজী যাধবরাওকে কাকা বলিয়া ডাকিতেন। তিনি সরকার বাড়ীতে গেলে, তাঁহার সম্মানার্থ সরকারী বন্দীখানা হইতে কয়েদী মুক্ত করা হইত।" পারসনীস মাবজী সম্পাদিত কৈফিয়ৎ যাদী দেখুন।

কাল হইতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রাম্য প্রজাতন্ত্রের কর্ম্মচারীরা জায়গীরদারের কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধান কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে বহাল বা বরতরফ করিবার ক্ষমতা, জায়গীরদার ত দূরের কথা, পেশবারও ছিল না। সুতরাং মারাঠা-সাম্রাজ্যের শাসন-তন্ত্রে, রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতির অদ্ভুত সমাবেশ দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের কোন একটি সংজ্ঞা দ্বারাই ইহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। ইহাকে রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র অথবা অভিজাততন্ত্র বলিতে অক্ষম হইয়া ইংরেজ লেখক টোন (W. H Tone) ইহার নাম দিয়াছেন সামরিকগণতন্ত্র (Military Republic); কিন্তু সামরিকগণতন্ত্র বলিলেও ইহার স্বরূপ বর্ণনা করা হয় না। সত্য বটে, মারাঠা-সাম্রাজ্যে, অতি সাধারণ সৈনিকেরও প্রতিভা বলে প্রথম শ্রেণীর জায়গীরদারের উচ্চ সম্মান লাভ করা অসম্ভব ছিল না; কিন্তু তাহা জটিল মারাঠা শাসনতন্ত্রের একটি প্রকৃতি মাত্র। একটি প্রকৃতির বর্ণনায় সমগ্রের প্রকাশ কেমন করিয়া হইবে? মারাঠা-সাম্রাজ্য বা রাজ্য-সংঘের ভিত্তি আবার পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—জাতীয় ঐক্যের উপর নহে। পেশবাগণ শিবাজীর জাতীয় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তাই যখন মারাঠা-সাম্রাজ্যের সহিত নবীন জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ইংরেজের সংঘর্ষ হইল, তখন মারাঠা-সাম্রাজ্য জীর্ণ অট্টালিকার মত অল্প আঘাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্ত্রী-কবি

[শ্রীসূর্য্যেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, জ্যোতিষ-বেদান্ত-শাস্ত্রী, বিদ্যা-বাচস্পতি]

যে ভারতবর্ষে সংস্কৃত বিদুষীদিগের নিতান্ত অভাব হইয়াছে, সেই ভারতবর্ষেই একদিন গার্গী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ শ্লোকে "এহেহি গার্গি! সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদে" বলিয়া গার্গীর যে বহুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষৎ যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা গার্গীর সে প্রতিভা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত মৈত্রেয়ীর অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা দেখিলে, তাঁহাদের সে স্মৃতি আমাদিগকে এখনও যেন নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে চায়। মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী "সারদা" সকল শাস্ত্রে পণ্ডিতা ছিলেন। স্বামীর আদেশে তিনি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় মধ্যস্থতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যথা—

"ততঃ সমাদিশ্য সদস্যতায়াং, সধর্ম্মিণীং মণ্ডন পণ্ডিতোঽপি।
স সারদাং নাম সমস্ত বিদ্যাবিশারদাং বাদ সমুৎসুকোঽভূৎ॥"
(শঙ্করদিগ্‌বিজয়ে, ৮।৬০)

মিথিলাধিপতি চন্দ্রসিংহের সধর্ম্মিণী সর্ব্বশাস্ত্রকুশলা "লক্ষ্মী" 'মিতাক্ষরা বিবৃতি' প্রণয়ন করিয়াছেন, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তদীয় স্মৃতিশাস্ত্রে "লক্ষ্মীবাক্যম্" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকেই অধ্যাত্ম-তত্ত্বাদি আলোচনা করিয়া জগতেরও অনেক উপকার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তাঁহারা আলোচ্যের বিষয় নহেন। কিন্তু শ্রব্যকাব্য প্রণয়নে শীলাভট্টারিকা প্রভৃতি কতিপয় বিদুষী রমণী ভারতে যে শক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই আমাদের পরম গৌরবের বিষয়। আজ শীলা-ভট্টারিকার কবিত্বের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পাঠকবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিব। যে দেশে শ্রুতি চিরদিন কন্যার পিতাকে "য ইচ্ছেদ্ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্ব্বমায়ুরিয়াৎ" বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন, সেই দেশে আজ মহিলাদিগের সুশিক্ষার দুরবস্থা কাহারও অবিদিত নাই।

আমি অদ্য পর্য্যন্ত শ্রব্যাদি কাব্য বিষয়ে যে সকল স্ত্রীকবির বিষয় জানিয়াছি, তাহা এই, যথা :—

শীলাভট্টারিকা, সীতা, ব্যাসপাদা, বিজ্জকা, মোরিকা, মারুলা, সুভদ্রা, বিকটনিতম্বা, ফল্গুহস্তিনী, বিজয়াঙ্কা, প্রভুদেবী, চণ্ডালবিদ্যা, ভাবদেবী, সাটোপা, ইন্দুলেখা, অবন্তিসুন্দরী ইত্যাদি। এই স্ত্রীকবি-দিগের অন্যতমা 'শীলাভট্টারিকার' সম্বন্ধেই আজ কিছু বলিব।

শীলাভট্টারিকা কাশ্মীর প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার 'ভট্টারিকা" শব্দ নামে ব্যবহার হেতু ইনি রাজকুলোৎপন্না বুঝা যাইতেছে।

দ্বাদশ শতাব্দের কেবল প্রথম ভাগে অলঙ্কার-শাস্ত্র "কাব্যপ্রকাশ"-

প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় মম্মট ভট্ট জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মম্মট ভট্ট তদীয় কাব্যপ্রকাশে শীলাভট্টারিকার শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা শীলাভট্টারিকা মম্মট ভট্টের পূর্ব্বকালের লোক ছিলেন, বুঝা যাইতেছে। কাব্যপ্রকাশে সপ্তম উল্লাসে মম্মট ভট্ট শীলাভট্টারিকার নিম্নোক্ত শ্লোক ধরিয়াছেন :—

ইদমনুচিত মক্রমশ্চ পুংসাং, যদিহ জরাস্বপি মান্মথা বিকারাঃ।
যদপি চ নকৃতং নিতম্বিনীনাং, স্তন পতনাবধি জীবিতং রতং বা॥

কিম্বদন্তী এই যে, উপরি-উক্ত শ্লোকটির পূর্ব্বার্দ্ধ শীলাভট্টারিকার, এবং উত্তরার্দ্ধ ভোজরাজের। তা'হ'লে ভোজ নৃপতি ১০৫৫ শতাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন; তবে শীলাভট্টারিকা তখনকার কবি ছিলেন। "প্রবন্ধ কোষ" নির্ম্মাতা প্রসিদ্ধ জৈন কবি রাজশেখর পণ্ডিত শীলাভট্টারিকার কাব্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। রাজশেখর ১৩৪৭ শতাব্দে জীবিত ছিলেন, তবে শীলাভট্টারিকা তাঁহার পূর্ব্বকালের লোক।

জহ্লনের সূক্তিমুক্তাবলী, শার্ঙ্গধরের শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, শ্রীধর দাসের সদুক্তি-কর্ণামৃতে অনেক স্ত্রীকবির নাম পাওয়া যায়। শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে ধনদেবের উক্তি যথা :—

শীলা-বিজ্জা-মারুলা-মোরিকাদ্যাঃ,
কাব্যং কর্ত্তুং সন্তি বিজ্ঞাঃ স্ত্রিয়োঽপি।
বিদ্যাং বেত্তুং বাদিনো নির্ব্বিজেতুং,
বিশ্বং বক্তুং যঃ প্রবীণঃ স বীরঃ॥

এই শ্লোকে শীলাভট্টারিকার কাব্য-বিরচনে বিজ্ঞত্বের বিশেষ প্রশংসা পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় জৈন পণ্ডিত রাজশেখর বলেন, "শীলাভট্টারিকার কাব্যের রীতি কাদম্বরী-প্রণেতা মহাকবি বাণ ভট্টের রীতির ন্যায় সুন্দর"; যথা—

শব্দার্থয়োঃ সমোগুম্ফঃ পাঞ্চালী রীতি রিষ্যতে।
শীলাভট্টারিকা বাচি বাণোক্তিষু চ সা যদি॥

শীলাভট্টারিকার প্রায় সমস্ত কবিতাই শৃঙ্গার-রসে পূর্ণ। কিন্তু কবিদিগের লেখনী-প্রসূত শ্লোক অশ্লীল হইলেও, কাব্যালঙ্কার হইতে "রুদ্রকরের" ভাষায় বলিতে হয়—

নহি কবিনা পরদারা দ্রষ্টব্যাঃ নাপি চোপদেষ্টব্যাঃ,
কর্ত্তব্যতয়াঽন্যেষাং ন চ তদুপায়োঽভিধাতব্যঃ।
কিন্তু তদীয়ং বৃত্তং কাব্যালঙ্কারতয়া স কেবলং বক্তি—
আধারয়িতু বিদুষস্তেন ন দোষঃ কবেরত্র॥

তাৎপর্য্য :—কবিরা পরস্ত্রী বা পরপুরুষকে মাতা পিতার ন্যায় দর্শন করেন, তাঁহারা অন্য ভাবে আদৌ দেখিতে ইচ্ছা করেন না। তবে কাব্যালঙ্কার হেতু যাহা কিছু বলা হয়, তাহা তাঁহাদের ন্যায় লোকের পক্ষে দোষের হয় না।

এই জন্য আপাততঃ মাত্র দুইটি শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ ভারতবর্ষের পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি—

(১)

দূতি, ত্বং তরুণী যুবা স চপলঃ, শ্যামাস্তমোভির্দ্দিশঃ,
সন্দেশঃ সরহস্য এব বিপিনে সঙ্কেতকা বাসকঃ।
ভূয়োভূয় ইমে বসন্ত মরুত শ্চেতোঽবস্থান্তরো,
গচ্ছক্ষেম সমাগমায় নিপুণে, রক্ষন্তু তে দেবতাঃ॥

তাৎপর্য্য :—চরিত্রহীন স্বামীর সংশোধন মানসে ব্রতী স্ত্রী দূতিকে সাবধান করিয়া পাঠাইতেছেন,—দেখ দূতি, এই আঁধার রজনীতে তুমি সঙ্কেত স্থানে স্বামীকে আমার সংবাদ দিয়ে এস। এখন অন্য আমার গুরুজন কেহ দেখিতে পাইবেন না। আমার স্বামী চরিত্রহীন, তোমাকে পাঠাইতেছি—তুমিও যুবতী, কালও বটে এটা বসন্ত, কিন্তু, সাবধানে যেও, সত্বর এসো, তোমাকে ঈশ্বর রক্ষা করুন।

(২)

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা,
শ্চোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপার লীলাবিধৌ
রেবা রোধসি বেতসি তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

এখানে সেই প্রিয়জন, সেই প্রস্ফুটিত মালতী পুষ্পের গন্ধ, সেই কদম্বানীল; আমিও সেই সমস্তই সেই; কিন্তু সখি দণ্ডকারণ্যের রেবা নদীর বেতসী তরুতলের সেই ক্রীড়া স্মরণ হওয়ায় আজ আমার মনঃ-প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইতেছে।

এই শ্লোকটি অলঙ্কার-শাস্ত্র 'কাব্য-প্রকাশে' এবং 'সাহিত্য দর্পণে' অলঙ্কারের উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্য দর্পণাদি সকলেই পড়েন বটে, কিন্তু উক্ত কবিতা যে ভারতীয়া একটি বিদুষীর রচনা এ কথা প্রায় অনেকেই জানেন না। এই সকল রস, গুণ ও অর্থ সমন্বিত কবিতাগুলি যে সরস-হৃদয় পাঠকগণের মনঃপ্রাণ হরণ করিবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

তরঙ্গ

[শ্রীকালিদাস বাগ্‌চী, এম্‌-এস্‌সি]

স্বচ্ছ সরোবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শান্ত জলের উপর ঈষৎ বায়ু-হিল্লোলে তরঙ্গ-খেলা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রবহমান নদীর বক্ষে বাত্যাসংক্ষুব্ধ জলের ঢেউ অনেকের মনে ঈষৎ বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছে। আবার অবিশ্রান্ত গর্জ্জনশীল সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড পর্ব্বত-প্রমাণ ঢেউগুলি আছাড়িয়া কি ভাবে পায়ের কাছে ফেণ-লেখা রাখিয়া যায়, তাহা যিনি অবিশ্রান্ত চোখে না দেখিয়াছেন, তিনি সমুদ্র-দর্শন উপভোগ করেন নাই। এই তরঙ্গের বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন ক্রীড়া চিরকালই মানুষের মনে এক অব্যক্ত ভাব আনয়ন

করিয়াছে। কখনও ছন্দে তাহার তালে-তালে নৃত্য-ভাব মনোহর ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার কখনও তাহার ভীষণ আকৃতি—নদীবক্ষে কত নৌকা অথবা ষ্টীমার গ্রাস করিয়াছে, তাহা ভয়াবহ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সম্যক্ ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, সমস্ত পৃথিবীময় যেন তরঙ্গ-খেলা অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতেছে। বাতাসের গতি, জলের প্রবাহ, মাটীর কম্পন, সূর্য্যের রশ্মি, পৃথিবীর আকর্ষণ—এ সবই ছোট-বড় অল্প-বিস্তর এই তরঙ্গের মত ক্রিয়া করিতেছে। আমরা শাদা চোখে সব সময় সব জিনিসের ঠিক স্বরূপ ধরিতে পারি না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের চোখে এই তরঙ্গ-বিজ্ঞান একটী সুন্দর সহজ প্রাকৃতিক নিয়ম দেখাইয়া দেয়। তরঙ্গের খেলা অনিমেষ নয়নে ক্ষণকালের জন্য দেখিয়া অনেকেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইয়াছেন। তাহার মধ্যে বিজ্ঞানের কি আছে তাহা বলিতে গেলে হয় ত অনেকেই মুখ ফিরাইবেন। কেহ বা ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুখ পান ; আবার কেহ বা তাহার পাপ্‌ড়ী বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার কারুকার্য্য, আকৃতি, গঠন, পরস্পর অবস্থিতির রীতি—এ সব বিশ্লেষণ করিয়া সুখ পান। কাজেই তরঙ্গ-বিজ্ঞানের কথায় মুখ ফিরাইলে লেখক নারাজ।

আধুনিক বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র তরঙ্গ একটী মূল জিনিস। ইহার সামান্য অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে প্রকৃতির মধ্যে কত যে নিয়ম ও শৃঙ্খলার কথা বুঝিতে পারা যায়, ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর। তরঙ্গ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে সব খুঁটিনাটি ও তত্ত্ব বোঝান যায় না। তবে এটি বিজ্ঞানের একটী নূতন স্তর ও পন্থা ; সে জন্য তাহার সামান্য কিছু আভাষ দিতেছি। ইহাতে ভাবিবার বিষয় ও জানিবার বিষয় অনেক আছে। আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যদি কেহ সামান্য কিছু বিবেচনার ও গবেষণার বিষয় পান, তবে শ্রম সার্থক মনে করিব। এই বিষয়টী সামান্যভাবে মাত্র বুঝাইতে গেলে, বিজ্ঞান ও অঙ্ক শাস্ত্রের অনেক দুরূহ পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই ক্ষমা চাহিতেছি। সাধারণ কোন একটী বিষয় লইয়া ক্রমশঃ ইহার বিশ্লেষণ করিয়া অন্যান্য বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কোন একটী স্বচ্ছ সরোবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জলের উপর যে সব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতে দেখা যায়, তাহাই প্রথমে বিবেচনা করা যাক্। জলের উপর তরঙ্গ-ক্রীড়া সচরাচর দেখা যায় বলিয়া এই সাধারণ দৃষ্টান্তটী ধরিলাম। তরঙ্গের মধ্যে কোনটী উঠিতেছে কোনটী বা মাথা নীচু করিতেছে। বলা বাহুল্য, ঈষৎ বাতাস না থাকিলে জলের এ খেলা দেখা যায় না। বাতাসের সঙ্গে জলের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে এ অবস্থা হয়। কাজেই প্রথম নিয়ম দেখা গেল যে, বাহিরের কোন উত্তেজনা অথবা জলের সঙ্গে কিছু সংঘর্ষ না হইলে তরঙ্গ হয় না। একটী কাচের গ্লাসে জল রাখিয়া গ্লাসটীতে সামান্য আঘাত করিলে, এ বিষয়ে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। এখানে বলা আবশ্যক, বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রে কতকগুলি জিনিস স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে উত্তর পাওয়া যায় না। সরোবরের ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কোন একটী তরঙ্গের মাথা ঠিক তালে-তালে কিছু নির্দ্দিষ্ট সময় পর-পর উঠিতেছে ও পড়িতেছে। এই তালে-তালে ওঠা-নামা বুঝিতে গেলে, স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, তরঙ্গের ওঠা-নামা জলের প্রত্যেক বিন্দুর উপর ওঠা-নামা গতির সমষ্টি। কাজেই কোন কারণে কোন এক নিয়মানুসারে জলের বিন্দু অথবা অণু নড়াচড়া করিতে থাকে, ইহা তরঙ্গের দ্বিতীয় নিয়ম। আবার তরঙ্গের একটী মাথা অথবা রেখার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তরঙ্গটী আস্তে-আস্তে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাইতেছে। অথবা কোন এক শক্তির বলে তরঙ্গ-রেখা যেন ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে থাকে। তরঙ্গের এই শক্তি—বহিয়া লইয়া যাওয়ার এই ক্ষমতা তৃতীয় নিয়ম। কেন এ রকম হয়, তাহা বুঝিতে গেলে একটু দ্রব্যগুণ (Properties of matter) সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন, কোন একটী দ্রব্যকে বিভক্ত করিতে-করিতে উহা এমন একটী অবস্থায় আসে, যখন ইহাকে আর বিভাগ করা যায় না। ইহাদিগকে অণু অথবা Atoms বলা হয়। প্রত্যেক অণুরও দ্রব্যের ন্যায় সমস্ত গুণাবলীই থাকে (Dalton's Theory of Atoms)। অণুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ হয় কি না, এবং তাহাতে কি পাওয়া যায় সে অন্য কথা। এই অণুগুলির দুইটি ক্ষমতা আছে। (১) পরস্পর আকর্ষণ (attraction or gravitation) এবং (২) উত্তাপের তাড়নায় পরস্পরের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষমতা (Heat repulsion)। দ্রব্য তিন প্রকারের (১) Solid কঠিন (২) তরল Light, (৩) Gas বাষ্পীয়। প্রথম প্রকার দ্রব্যে অণুর পরস্পর আকর্ষণ বেশী ; উত্তাপ—বিচ্ছেদ কম। দ্বিতীয় প্রকারে দুইই সমান। তৃতীয় প্রকারে উত্তাপ—বিচ্ছেদটাই বেশী। বরফ, মোম, প্যারাফিন প্রভৃতি দ্রব্যকে ক্রমশঃ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এ বিষয়টী স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। উহারা প্রথমে কঠিন থাকে ; পরে গলিয়া তরল হয় ; পরে গ্যাসে পরিণত হয়। আপাততঃ উত্তাপ-বিচ্ছেদের কথা ছাড়িয়া দিয়া পরস্পর আকর্ষণের কথা বিবেচনা করা যাউক। প্রত্যেক অণু প্রত্যেক অণুকে চতুর্দ্দিকে সমানভাবে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ গোলকাকৃতিতে (in the shape of a sphere) প্রত্যেক অণুর আকর্ষণ-শক্তি বিকীর্ণ হইতে থাকে। অণু হইতে কিছু দূর ব্যবধানে তাহার আকর্ষণ-শক্তি অনুভূত হয় না। এই ব্যবধান চতুর্দ্দিকে ধরিলে আমরা একটী গোলক পাই। (There is a sphere of attraction of every atom) এই sphere of attraction হইতে আমরা প্রাকৃতিক দুইটী জিনিস বেশ সুন্দর ভাবে বুঝিতে পারি (১) Adhesion ; কতকগুলি চূর্ণ পদার্থকে একখানি কাগজে রাখিয়া ঢালিয়া ফেলিলে দেখা যায় যে কতক চূর্ণ কাগজে লাগিয়া থাকে। দুইখানি কাষ্ঠ-খণ্ডকে (Two pieces of wood) জোরে চাপিয়া ধরিলে দেখা যায়, একটী যেন অন্যের সঙ্গে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে ; ইত্যাদি ইত্যাদি। (২) Cohesion। মাটিতে এক বিন্দু জল ফেলিলে, ব্লটিং

কাগজের উপর এক ফোঁটা কালি অথবা জল পড়িলে, দেখা যায় যে, তাহা ক্রমশঃ আপনিই প্রসারিত হইতে থাকে। কলমে লিখিবার সময় কালি ওঠে। কাপড় জলে ভিজিয়া যাওয়া, নৌকার দাঁড় ও গায়ে জল লাগিয়া থাকা, এ সব ঘটনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই sphere of attraction বা আকর্ষণ গোলক আর একটী বিশেষত্ব বুঝাইয়া দেয়। ইংরাজীতে ইহাকে surface tension বলে। জলের উপরিভাগের অণুগুলি ভিতরের অণুর মত চতুর্দ্দিকের পদার্থকে আকর্ষণ করে। উপরে আকর্ষণ করিবার জন্য কোন দ্রব্য না থাকাতে (বাতাস ভিন্ন আর কিছু নাই) আকর্ষণের শক্তিটা পার্শ্বে এবং নিম্নে বেশী হয় (The sphere is reduced to a hemisphere on the surface)। তাহার ফল এই হয় যে, উপরিস্থ বিন্দুগুলি পরস্পরকে মধ্যস্থ বিন্দু অপেক্ষা বেশী আকর্ষণ করে। জলের উপরিভাগ যেন একটা পাতলা চাঁমড়া অথবা রবার সদৃশ পদার্থ দ্বারা আবৃত ভাব হয়। জলের উপরে পোকা ভাসিয়া যাওয়া, একটী সুঁচকে মাথায় ঘষিয়া আস্তে আস্তে জলের উপর ছাড়িয়া দিলে, তাহা ভাসিতে থাকে—এ সব ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতে এই চামড়ার অস্তিত্ব সহজেই অনুমিত হইবে। গ্লাসের পাশে জল লাগিয়া থাকা, গ্লাস পূর্ণ করিয়া দিলে কানা ছাড়িয়া জল উপরে থাকা—এ সব এজন্য হইয়া থাকে। শুধু জল বলিয়া কেন, প্রত্যেক দ্রব্যের অণুরই এই রকম sphere of attraction আছে; এবং তজ্জন্য তাহার অনেক বিশেষত্ব আমরা সহজে বুঝিতে পারি। অন্যান্য দ্রব্য-গুণ আপাততঃ বিবেচনা করার প্রয়োজন নাই। সরোবরের উপরিভাগে এরূপ পাতলা চামড়া বিস্তৃত আছে—তাহা বিবেচনা করিলে আমরা তরঙ্গগুলির স্বরূপ অনেকটা বুঝিতে পারিব। (ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে ইংরাজিতে সেজন্য tension waves বলা হইয়া থাকে।)

মনে করুন, কোন স্থানে কোন দ্রব্যের একটী অণু অপর একটী অণুকে আকর্ষণ করিতেছে। তন্মধ্যে একটী অণুকে যদি কোন শক্তি দ্বারা স্থানচ্যুত করা হয়, এবং অন্যটীকে জোর করিয়া স্থির রাখা হয়, তবে তাহার কিরূপ গতি হইবে? সেটা যে স্থানে ছিল তাহারই আশে পাশে তাহা চলিতে থাকিবে এবং sphere of attraction-এর বাহিরে তাহা যাইবে না। (অবশ্য বেশী জোর প্রয়োগ করিলে কি হইবে তাহা বলা আবশ্যক হইবে না।) মনে করুন, একটী ক্ষুদ্র বলকে সূতার দ্বারা টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছে। এই বলটীকে যদি স্থানচ্যুত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা ইহার পূর্ব্বের অবস্থানের দুই দিকে দুলিতে থাকে। গাছের পাতা বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত হইতে থাকে। ছোট কালে অনেকে হয় ত রবারের বাঁদর লইয়া খেলা করিয়াছেন। বাঁদর আকৃতি একটী পুতুলকে রবারের সূতা দ্বারা টাঙ্গান হয়। বাঁদরটী রবারের টানে উপরে ও নীচে উঠিতে ও নামিতে থাকে। এই সব দোলায়মান আন্দোলন—উপরে-নীচে-করা গতিকে ইংরাজী ভাষায় Harmonic motion বলা হইয়া থাকে। এই গতির অন্যান্য বিশেষত্বের কথা অঙ্ক শাস্ত্রের গবেষণার বিষয়। কাজেই তাহাদের বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এইখানে বলিয়া রাখি, তরঙ্গ কতকগুলি harmonic motionএর সমষ্টি ও যোগফল।

একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আন্দোলন-গতি হইতে তরঙ্গ-গতি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। একটা হাত-দশেক লম্বা দড়ীকে দেওয়ালের মধ্যে এক দিক আটকাইয়া অন্য দিক টানিয়া ধরা হইয়াছে। যে-দিকটী হাতে আছে, সে মুখটী যদি সামান্য নড়াইয়া দেওয়া হয়, তবে একটী তরঙ্গ যেন দড়িটীর মধ্যে বহিয়া যায়।

দড়ীর মুখের অংশটীকে আন্দোলন করা হইয়াছে; কিন্তু দড়ীর অপর অংশের সহিত এ অংশটি সংসৃষ্ট ও আকৃষ্ট বলিয়া এই আন্দোলন ভাবটী সব অংশে ক্রমশঃ গ্রহণ করে। যদি দড়ীর মুখটীকে বৃত্তাকারে ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, তবে সেই রকম আকৃতি ক্রমশঃ সমস্ত দড়ীতে প্রসারিত হয়। কূপের মধ্যে অথবা ইন্দারার মধ্যে কোন জিনিস পড়িলে, উপরে দড়ীকে ঘুরাইয়া নীচের কাঁটাকে ঘুরান হয় এবং এই উপায়ে হারান জিনিসের সন্ধান করা হয়। দড়ীর মধ্যে এই তরঙ্গ-খেলা একটু বিশেষ ভাবে বুঝিলে অন্যান্য বিষয় অনেকটা সহজ হইয়া যাইবে। মনে করুন, ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি কতকগুলি অণু এক লাইনে সাজান আছে। এখন যদি ক-কে উপরে ঠেলিয়া দেওয়া হয়, তবে ক'য়ের আকর্ষণের জন্য খ'ও উপরের দিকে টান পাইবে। খ'য়ের জন্য গ, গ'য়ের জন্য ঘ ইত্যাদি ক্রমশঃ উপর দিকে টান পাইবে। আবার ক-কে যদি নীচের দিকে টানা হয়, তবে ক'য়ের জন্য খ, খ'য়ের জন্য গ, গ'য়ের জন্য ঘ প্রভৃতি নীচের দিকে টান পাইবে। এর ফল অল্প ক্ষণ পরে এই দাঁড়াইবে যে, যে সব বিন্দু পূর্ব্বে এক লাইনে সাজান ছিল, তাহা অন্য ভাবে সজ্জিত হইবে। ক'কে যে শক্তিতে স্থানচ্যুত করা হইয়াছে, ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি বিন্দুগুলির মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ আছে বলিয়া, সে শক্তিটী এক বিন্দু হইতে অন্য বিন্দুতে যাইবে। এবং কোন এক সময়ে টানের শক্তি সব যায়গায় সমান ভাবে পড়িবে না বলিয়া তাহা তরঙ্গের ভাব ধারণ করিবে। দড়ীতেও ইহার জন্যই আন্দোলন ভাবটী ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে থাকে।

উপরের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রথম বিন্দুর ক, যে রকম ভাবে স্থানচ্যুত করা হইবে, পরস্পর বিন্দুগুলিও সেই ভাবে আন্দোলিত হইতে থাকিবে। অঙ্ক শাস্ত্রের একটী নিয়ম আছে যে, কোন একটী বিন্দু যেমন ভাবেই গতিশীল অথবা স্থানচ্যুত হউক না কেন, তাহার গতি অথবা স্থানত্যাগ তিন দিকের গতিতে বিভক্ত করা যাইবে। (Rectangular Composition and Resolution of forces) কাজেই ক' বিন্দুকে যে দিকেই টান দেওয়া হউক না কেন, তাহা তিন দিকের টানে বিভক্ত করা যাইবে। সেই তিন দিক (১) উপরে (২) পরস্পর অবস্থিতি লাইনের দিকে এবং (৩) পার্শ্বে—এই তিন ভাবে ধরিয়া লওয়া যায়। ক' বিন্দু উপরে উঠিতে পারে, খ'য়ের দিকে যাইতে পারে এবং এই কাগজের উপর দিকে উঠিতে পারে। (যেমন দুইটা দেওয়ালের মিলন স্থান।) কাজেই তরঙ্গ যেমন

ভাবেরই হউক না কেন, তাহা এই তিন দিকের Harmonic motionএ বিভক্ত করা যাইবে। বাস্তব জগতে বলিতে গেলে এই তিন প্রকারের সহজ তরঙ্গাকৃতি দেখা যায়। দড়ীর উপর-নীচে আন্দোলনের ভাব। মাটীর উপর দড়ী টান রাখিয়া নাড়িলে সর্প গতির মত লড়াচড়া। আর দড়ীর দিকে টানিলে তাহার মধ্যে আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণের তরঙ্গ (waves of compression and expansion)। একটী স্প্রীংএর coilকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া যদি তাহাকে নীচে আঘাত করা যায়, তবে waves of compression and expansion দেখা যাইবে। বাঁদর পুতুলকে রবারের সূতায় নাচানও ইহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দূরে চীৎকার করিলে, কোন শব্দ হইলে, বাতাসের মধ্যে এরূপ আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ-তরঙ্গে তাহা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বাতাসে কি করিয়া এ তরঙ্গগুলি দেখা যায়, অথবা অনুভব করা যায়, তাহা বিজ্ঞানের এক অধ্যায়।

বিদ্যাপতির নূতন পদ

[অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ]

গৌহাটীর কমিশনরের আপিসের শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী কর্ত্তৃক অনেকগুলি অসমীয়া পুঁথির যোগাড় হইয়াছে। ঐ সকল পুঁথির মধ্যে একখানা পদ-সংগ্রহে বিদ্যাপতির তিনটী পদ পাইয়াছি। তন্মধ্যে প্রথম পদটী সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বিদ্যাপতির পদাবলী" সংস্করণে দেখিলাম না। উহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

রাগ—শ্রীমঞ্জরী।

মাধব তু নব নব নাউরী বালা।
তুহু বিচোরলি বিহিকে ঠারলি।
তেজলি মাণিক মালা।
সে জে সোহাগলি নেহলি লাগলি
পঠ নিহারই তোরা।
নিচল লোচন না শুনে বচন
ভরি ভরি পড়ু লোরা।
কুবল কবরী না বান্ধে সম্বরি
আলি আলিঙ্গন চাই।
যা কর আধি পরাধীন ঔষধ
তা কর জীবন কায়।
রুখলি শুখলি দুঃখলি পেখলি
সখিনি সঙ্গে সমেতা।
চরণে নুপুর করে রুণুঝুন
নয়নে কাজর রেখা।
তোহরি মুরলী যদি কে ঢোরলি
কামর ঝুমুর নেহা।
জেন সোণারে কঠিন কট কটই
কঠিন কাজর রেখা।
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর-যুবতি
ইহ রস কো পিয়ে জান।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দে পরমাণা॥

দ্বিতীয় পদটীর আরম্ভ এই :—

সুধামুখী কো বিধি নিরমিলে বালা।

ইহা পরিষদের উক্ত পদাবলীতে ১৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। পুঁথির পাঠের সহিত মুদ্রিত পাঠের বৈলক্ষণ্য বিশেষ কিছু নাই।

তৃতীয় পদের আরম্ভ এই :—

জিনি করিবর রাজহংস-গতি-গামিনী
চললি হংসকেত গেহা।

ইহা উক্ত পদাবলীর ১৫২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। এই পদে কিছু পাঠ-বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। মুদ্রিত শেষ চারি চরণ (ভণিতার পূর্ব্বের) পুঁথিতে নাই। পদটী যখন একই, তখন সমস্তটা উদ্ধৃত না করিয়া মাত্র একটা পাঠ-বৈলক্ষণ্য দেখাইয়া ক্ষান্ত হইলাম—

কনক-মুকুর শশী কমল জিনিয়া
মুখ জিনি কম্বুকণ্ঠ আকারে।
দশন-মুকুতা ফল কুন্দ করগ বিজ
জিনি বিম্ব অধর পোয়ারে।

এই নূতন পদের প্রতি বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমার ছাত্র শ্রীমান্ ইন্দ্রেশ্বর বরঠাকুর বি-এ আমাকে এই পদ তিনটীর সন্ধান দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

মহোপাধ্যায় শ্রীমদ্ অনিরুদ্ধ ভট্টের বাস-গ্রাম

[শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন-বর্ম্মণ বি-এল]

মহোপাধ্যায় শ্রীমদ্ অনিরুদ্ধ ভট্টের নাম বিদ্বজ্জনসমীপে সুপরিচিত। ইনি মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর বল্লালসেনদেবের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও গুরু ছিলেন। ইঁহার প্রণীত সাংখ্যদর্শনের টীকা ও হারলতা নামক স্মৃতি-সংগ্রহ অদ্যাপি প্রচলিত আছে। এই মহাত্মা কোন্ দেশের কোন্

গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, তাহা জানিবার জন্ত অনেকেরই আগ্রহ হইতে পারে। তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি ও বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গের গোচরে উপস্থিত করিতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ দানসাগর নামক গ্রন্থের উপক্রমে অনিরুদ্ধ ভট্টের এইরূপ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"বেদার্থ-স্মৃতি সঙ্কলাদি পুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রী তলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বল-বীচিলাস নয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি।
ষট্‌কর্ম্মা-ভবদার্য্যশীলমলয়ঃ প্রখ্যাত সত্যব্রতো
বৃত্রারেরিব গীষ্পতির্নরপতেরস্যা নিরুদ্ধো গুরুঃ॥"

উক্ত পরিচয়-জ্ঞাপক শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে (১) অনিরুদ্ধ ইন্দ্রের বৃহস্পতির স্থায় [গৌড়েশ্বর বল্লালসেনদেব নামক] রাজার গুরু ছিলেন। (২) এই অনিরুদ্ধ বরেন্দ্রীতলে বেদার্থ ও স্মৃতি-সঙ্কলনের আদি পুরুষ ছিলেন ও শ্লাঘ্য ছিলেন। (৩) সারস্বত-তত্ত্বালোচনায় তাঁহার নেত্র তন্দ্রাহীন ও উজ্জ্বল তরঙ্গ-ভঙ্গীযুক্ত ছিল। (৪) তিনি ষট্‌কর্ম্মা, আর্য্যশীলের মলয়-স্বরূপ, প্রখ্যাত ও সত্যব্রত ছিলেন। উক্ত শ্লোকে পরিষ্কার ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, অনিরুদ্ধ বরেন্দ্রী-নিবাসী ছিলেন।

উক্ত মহোপাধ্যায়-বিরচিত "হারলতা" নামক স্মৃতি-সংগ্রহ গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর অনুমতি অনুসারে ভট্টপল্লী-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ কর্ত্তৃক ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সমাপ্তি-স্থানে এইরূপ লিখিত আছে—

"সুরাপগাতীর-বিহার পাটকে নিবাসিনা ভট্টনয়ার্থ বেদিনা।
কৃতানিরুদ্ধেন সত্যমুর স্থলে বিরাজতাং হারলতেয়মপি স্তা॥

ইতি চম্পাহট্টীয় মহোপাধ্যায় ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীমদনিরুদ্ধ বিরচিতা হারলতা সমাপ্তা।"

এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মহোপাধ্যায় শ্রীমদ্ অনিরুদ্ধ ভট্ট (১) ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। (২) তিনি হারলতা নামক স্মৃতি-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। (৩) তিনি ভট্টোক্ত-নীতির (*) অর্থবিৎ ছিলেন। (৪) তিনি চাম্পাহট্টীয় [গ্রামীন্] ছিলেন। (৫) সুরাপগা-তীরবর্ত্তী বিহার-পাটকে অর্থাৎ বিহার নামক গ্রামের একাংশে তাঁহার নিবাস ছিল (†)।

গৌড়েশ্বর রামপালদেবের পুত্র মদন পালদেবের [মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে "চম্পাহিট্টির" বৎস স্বামীর প্রপৌত্র বটেশ্বর স্বামী শর্ম্মাকে শ্রী পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃ পতি কোটিবর্ষ বিষয়ে ভূমিদানের কথার উল্লেখ আছে। (‡) বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের একশত গাঞীর মধ্যে "চাম্পাহট্টির" বা "চম্পাহিট্টির" একটী প্রসিদ্ধ গাঞী। ইহার চলিত নাম 'চাম্পাটী' বা 'চম্পটী' গাঞী। অতএব চাম্পাহট্টীয় অনিরুদ্ধ যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। আবার দানসাগরের মতেও তিনি বরেন্দ্রীবাসী ছিলেন। সুতরাং অনিরুদ্ধের বাস-গ্রাম অর্থাৎ "বিহার গ্রাম" যে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক, বরেন্দ্রীর কোন স্থানে এই 'বিহার' গ্রাম অবস্থিত। পশ্চিমে গঙ্গা ও মহানন্দা, দক্ষিণে পদ্মা, এবং পূর্ব্বে করতোয়া এই সীমাবদ্ধ ভূভাগই "বরেন্দ্রী" নামে পরিচিত। এই 'বরেন্দ্রী-তলে' বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থানগড়ের সমীপবর্ত্তী করতোয়া-তট হইতে অদূরে করতোয়ার 'নাগর' নামক শাখার পশ্চিম তীরে 'বিহার' নামক একটী বহু-ধ্বংসাবশেষপূর্ণ সুপ্রাচীন গ্রাম অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত বরেন্দ্রী দেশে 'বিহার' নামক অপর কোন গ্রামের অস্তিত্ব আমরা অবগত নহি। হারলতা গ্রন্থের মতে অনিরুদ্ধ ভট্ট যে 'বিহার' গ্রামে বাস করিতেন, তাহা "সুরাপগা" তীরে অবস্থিত ছিল। "সুরাপগা" শব্দের অর্থ দেবনদী। হারলতার প্রকাশক কমলকৃষ্ণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় 'সুরাপগা' শব্দের 'গঙ্গা' অর্থ ধরিয়া উক্ত বিহার গ্রামকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বরেন্দ্রীর পশ্চিম ও দক্ষিণ-সীমা দিয়া গঙ্গার পদ্মা নামক শাখা প্রবাহিতা। তদ্ব্যতীত গঙ্গার অন্য কোন অংশ বরেন্দ্রীর সীমা-নির্দ্দেশক, কিম্বা বরেন্দ্রীর অন্তর্গত নহে। 'সুরাপগা' অর্থে 'পদ্মা' ধরিলে পদ্মাতীরে বরেন্দ্রী-ভূভাগে বিহার নামক গ্রামের অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক। কিন্তু পদ্মাতীরে 'বিহার' নামক কোন গ্রামের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত 'সুরাপগা' অর্থে 'পদ্মা' হইতে পারে না।

আমাদের মতে 'সুরাপগা' শব্দ 'করতোয়া' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুরাপগা অর্থাৎ দেবনদী অর্থে কেবল যে গঙ্গাকেই বুঝাইবে এরূপ বলা যায় না। মনুসংহিতায় সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নামী নদীদ্বয়কেও 'দেবনদী' বলা হইয়াছে (§)। সুতরাং সুরাপগা অর্থাৎ দেবনদী দ্বারা যে 'করতোয়া'কে বুঝাইতে পারে না এরূপ নহে।

* 'ভট্টনয়' অর্থে ভট্ট-নীতি বুঝায়। ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে এই 'ভট্টোক্ত-নীতি'র উল্লেখ আছে; যথা—"মীমাংসায়াম্ যুগায়ঃ স খলু বিরচিতা যেন ভট্টোক্ত-নীতি"। ২৩শ শ্লোক। ভট্টনীতি বা ভট্টোক্তনীতি বলিলে সুবিখ্যাত কুমারিল-ভট্টের মতকেই বুঝিতে হইবে।

† পাটকঃ গ্রামৈকদেশঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥

(‡) "শ্রী পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ভুক্তৌ কোটিবর্ষবিষয়ে......গ্রামঃ......... কৌৎসসগোত্রায় শাণ্ডিল্যাশিত দেবল প্রবরায় পণ্ডিত শ্রীভূষণ সব্রহ্ম-চারিণে সাম-বেদান্তর্গত কৌথুম শাখাধ্যায়িনে চম্পাহিট্টিয়ায় চাম্পাহিট্টি বাস্তব্যায় বৎসস্বামী-প্রপৌত্রায়" ইত্যাদি।

(§) "সরস্বতী-দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেব নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥

(মনুসংহিতা ২।১৭)

গঙ্গা যেমন ধূর্জ্জটীর জটা হইতে ক্ষরিতা হইয়াছেন, সেইরূপ করতোয়াও হর-কর বিগলিতা হইয়া মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছেন (||)। এই জন্যই কালিকা-পুরাণে করতোয়াকে "সত্যগঙ্গা" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (**)। এবং এই জন্যই "করতোয়া মাহাত্ম্যে" করতোয়ার পশ্চিমভাগে জাহ্নবী সর্ব্বদা প্রবহমানা আছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (††)।

অতএব বগুড়া জেলার অন্তর্গত [সুরাপগা] করতোয়ার তটবর্ত্তী বিহার নামক গ্রামেই যে মহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধের নিবাস ছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই বিহার গ্রামটি যে অতি প্রাচীন, তাহা বিখ্যাত চীন দেশীয় পরিব্রাজক অন্-যুয়ান্-চুয়াংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতেও অবগত হওয়া যায়। অন্-যুয়ান্-চুয়াং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারত-ভ্রমণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি কযঙ্গল (বর্ত্তমান রাজমহল অঞ্চল) হইতে গঙ্গা পার হইয়া ৬০০ লী (১০০ মাইল পূর্ব্ব দিকে গমন করতঃ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করেন। তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের প্রায় ৩॥ মাইল পশ্চিমে ভাসুভা নামক একটী প্রকাণ্ড বিহার বা সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন। এই ভাসুভা সঙ্ঘারাম এক্ষণে আমাদের কথিত বিহার গ্রামের উত্তরদিকস্থ 'ভাসু বিহার' গ্রামের সহিত অভিন্ন বলিয়া কানিংহাম প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন। আমাদের বিহার গ্রাম ভাসুবিহার গ্রামের দক্ষিণ দিকে সংলগ্ন। এখানে অদ্যাপি বহু ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়।

(||) "গৌরীবিবাহসময়ে শঙ্করকরগলিত সম্প্রদানতোয়প্রভবত্বাৎ করস্ত তোয়ং বিদ্যতেঽত্র ইতি করতোয়া অর্শ আদিত্বাদঃ।"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ

(**) "করতোয়া সত্যগঙ্গা পূর্ব্বভাগাবধিশ্রিতা।"

(কালিকা পুরাণম্ ৭৮।১২১ অঃ)

(††) "করতোয়া পশ্চিমে ভাগে সদা বহতি জাহ্নবী।"

(করতোয়ামাহাত্ম্যং ৪৯ শ্লো)

১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটের অবস্থা

[শ্রীশিবকুমার চৌধুরী]

সুরাট অতীব প্রাচীন, সমৃদ্ধিশালী নগর। ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি ইহার বাণিজ্য সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুতবউদ্দীন, রাজপুত রাজা ভীমদেবকে পরাস্ত করিয়া সহরটি দখল করেন। পরে সন্ধি শেষে ইহা তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পিত হয়। ১৩৪৭ খৃঃ অব্দে গুজরাট বিদ্রোহের সময় মহম্মদ-বিন-তোগলক ইহা লুণ্ঠন করেন। ১৩৭৩ খৃঃ অব্দে ফিরোজ তোগলক এখানে একটা দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সহরটি কোন্ সময়ে কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইতিহাস সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্। সহরটি দেখিতে নূতন। প্রবাদ আছে যে, বর্ত্তমান সহরটি ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ইহা যে সুদূর অতীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে উপরি-উক্ত প্রমাণাদিই যথেষ্ট। এখন আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, দেখা যাউক, তখন এই উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সমন্বিত সমুদ্র হইতে ১০।১২ মাইল দূরে তাপ্তী নদীর উপরিস্থিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুরাটের কিরূপ অবস্থা ছিল।

চতুর্দ্দিকে দীর্ঘ প্রাচীরাবলী ও স্থানে-স্থানে দৃঢ়বদ্ধ প্রাকার, এবং তদুপরি সজ্জিত কামানরাজি নগরটিকে বেষ্টিত ও সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। নগরের মধ্যভাগে একটি অত্যুচ্চ দুর্গ। তাহা হইতে জল-স্থল উভয়দিকের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। দুর্গটি চতুষ্কোণ। দুর্গের এক পার্শ্বে নদী, অপর পার্শ্বে গভীর পরিখা এবং চতুষ্কোণে দীর্ঘ স্তম্ভাবলী থাকায় নগরটি আরও সুরক্ষিত হইয়াছে। নগরে প্রবেশের জন্য ৬।৭টি দ্বার আছে। প্রতি দ্বারেই ভীম-প্রহরণধারী, ভীমকায় প্রহরী। নগর-প্রবেশ-কালে এবং তাহা হইতে নির্গমন-কালে যুক্তি-সঙ্গত জবাব দিতে হয়। প্রাচীন-কালে ঘন-ঘন আক্রমণ ও লুণ্ঠন প্রতিরোধ করিবার জন্যই এই আয়োজন।

সুন্দর গৃহ ও প্রাসাদ নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু অর্থের তুলনায় এ প্রাসাদগুলি নিকৃষ্ট। কেন নিকৃষ্ট, তাহার উপযুক্ত কারণ আছে। নগরের বিত্তশালী জনগণ সামর্থ্য ও অভিলাষ থাকিলেও, মনোরম হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মাণ করিয়া ও তাহাদিগকে বিবিধ মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত করিয়া, স্বীয় অর্থ-গৌরব দেখাইতে বা নয়ন-মনের প্রীতি-সম্পাদন করিতে পারিতেন না,—পাছে অর্থলিপ্সু মোগলগণ কর্ত্তৃক তাহা বাজেয়াপ্ত হয়। গৃহের দেওয়ালগুলি ইষ্টক বা প্রস্তর-নির্ম্মিত। ছাদ সমতল বা ঢালু, টালি দ্বারা আচ্ছাদিত। দরজা-জানালায় কাচ নাই। নির্ম্মল বায়ু সঞ্চালনের জন্য সেগুলি সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রাখা হয়। নগরের দরিদ্র লোকদিগের গৃহ ঠিক ভিন্ন প্রকারের। তাহারা প্রায়ই নগরের সীমান্তে বাস করে। তাহাদের চালচলন দরিদ্রতাব্যঞ্জক;—গৃহগুলিও তদ্রূপ। গৃহে বাঁশের বেড়া আর তালপত্রের ছাউনী। নগরের রাস্তাগুলির মধ্যে কতকগুলি সরু, কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। নগরের মধ্যভাগে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে দেশীয় ও বিদেশীয় বণিকগণ দিবারাত্রি দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। সন্ধ্যাকালে বাজারে এত ভিড় হয় যে, তাহার মধ্যে যাওয়া দুষ্কর।

সুরাট তখন মোগল বাদশাহের শাসনাধীন। তিনি তিন বৎসরের জন্য এখানে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। শাসনকর্ত্তা এখানে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও, তাঁহাকে সব সময়ে সতর্ক থাকিতে হইত। শাসনকর্ত্তা ব্যতীত অন্য একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন। যাবতীয় নাগরিক কার্য্যাবলী পরিদর্শন ও তাহাদের ব্যবস্থা করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত। নগরের অধিবাসিবৃন্দ ও ব্যবসায়ীদিগের

আবেদনাদি তিনিই লিখিতেন এবং তাহাদের সুখাপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেন। তিনি সাধারণতঃ হস্তী-পৃষ্ঠে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বেড়াইতে যাইতেন। মাহুত ব্যতীত অপর একজন ভৃত্য তাঁহাকে বাতাস দিতে-দিতে ও মশা-মাছি তাড়াইতে-তাড়াইতে তাঁহার সঙ্গে যাইত। ব্যজন-কার্য্য চামর দ্বারা সম্পাদিত হইত। অশ্বপুচ্ছের দীর্ঘ লোমসমূহ এক হস্ত পরিমাণ একটি যষ্টীতে একত্রবদ্ধ করিয়া এই চামর প্রস্তুত করা হইত। স্বীয় পদ-মর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য তিনি কতকগুলি হস্তী ও কতকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য স্বীয় শরীর-রক্ষীরূপে বেতন দিয়া পোষণ করিতেন। তিনি সহসা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কোন গুরুতর কার্য্য মীমাংসার্থ উপস্থিত হইলে তিনি কাজী, কোতোয়াল প্রভৃতি অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কাজী বিচারক ছিলেন। তিনি নাগরিক আইন ও সাম্রাজ্যের দেওয়ানী আইনসমূহে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। বাকনবীস্ মোগল সরকারের সংবাদবাহী কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে সুরাটের যাবতীয় তথ্য রাজধানীতে প্রেরণ করিতেন। তাঁহার নিম্নতম কর্ম্মচারী ছিলেন হরকরা। তিনি সত্য মিথ্যা যাহা কিছু শুনিতেন, সমস্তই সম্রাটকে জানাইতেন। কোতোয়াল এক প্রকার বিচারক ছিলেন। তিনি নগরের চৌর্য্যাদি অন্যায় কার্য্য বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি রাত্রিতে তিনবার—প্রথমে ৯ টায়, তৎপর ১২ টায়, তৎপর তিনটার সময় নগর পরিদর্শনের জন্য বহির্গত হইতেন। সঙ্গে চৌকীদার ও সৈন্যগণ বিবিধ অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যাইত। রাত্রি পাঁচটার সময় ঢাক ও তাম্র-নির্ম্মিত ভেরী নিনাদিত হইত। এই নগরে বহু ভাষাভাষী ও বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস ছিল; কিন্তু এজন্য গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও, এখানে খুব কমই গোল-যোগ হইত। গুরুতর অপরাধী ছিল না বলিলেই চলে। মৃত্যুদণ্ড সম্রাট ব্যতীত অন্য কাহারও দিবার অনুমতি ছিল না। দূরদেশস্থ অপরাধী ব্যক্তির দোষসমূহ দূত দ্বারা সম্রাটকে জ্ঞাপন করা হইত,—তিনি তদনুসারে বিচার করিতেন। খত্রের মোকদ্দমা হইলে হলপ করিতে হইত। আর একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন—ফৌজদার। তাঁহার অধীনে বহু সৈন্য ও অনুচর থাকিত। তিনি স্থানে-স্থানে ভ্রমণ করিয়া চুরি ডাকাতি নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। কোন স্থানে ডাকাতি হইলে অনুসন্ধানের ভার তাঁহার উপর পড়িত।

তৎকালীন ভারতে সুরাটের ন্যায় বাণিজ্যস্থল আর কোথাও ছিল না। নিকটে সমুদ্র ও নদী বিদ্যমান থাকায়, এখানে বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার হইয়াছিল। আরব, পারস্য, চীন, য়ুরোপ প্রভৃতি দূরদেশের বণিকগণ তাহাদের স্বদেশজাত দ্রব্যনিচয় এখানে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিত। যত রকম রেশম ও যত রকম মণিমুক্তাদি মূল্যবান্ দ্রব্য জগতে পাওয়া সম্ভব, এখানে সবই তখন পাওয়া যাইত। সুরাটের স্বর্ণ ও রৌপ্য জগৎ বিখ্যাত ছিল। স্থানীয় মুদ্রাসমূহে অতি কম মাত্রায় অন্য ধাতুর মিশ্রণ ছিল। এত কম মাত্রায় মিশ্রণ জগতের অন্য কোন স্থানের মুদ্রায় ছিল না। একটি মোহর ১৪টি রৌপ্য-মুদ্রার সমান গণ্য করা হইত। এখনকার মত তখনও ৬৪ পয়সায় এক টাকা হইত। ৬০টি বাদাম ১ পয়সার সমান বলিয়া চলিত ছিল। বিদেশীয় মুদ্রার উপর শতকরা আড়াই মুদ্রা হারে কর ধার্য্য ছিল। ইহা ছাড়া, অপরাপর দ্রব্যের উপর অধিক শুল্ক আদায় করা হইত। বিদেশীয় মুদ্রা হস্তগত হইলে, মোগল সরকার তাহা গলাইয়া দেশীয় মুদ্রা তৈয়ারী করিতেন; ও তাহার উপর তদানীন্তন সম্রাটের মোহর অঙ্কিত থাকিত। বাদশাহের মৃত্যু হইলে, তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রার মূল্য টাকায় দুই-এক পয়সা কমিয়া যাইত। ইহার কারণ এই যে, বাদসাহ মৃত; কাজেই তাঁহার মুদ্রাও পুরাতন, অতএব মূল্যও কম। সুরাটে তখন রেশম খণ্ড-খণ্ড ভাবে হাত অনুসারে বিক্রীত হইত। ২৭ ইঞ্চিতে ১ হাত ছিল। পণ্যদ্রব্যাদি ওজন দরে বিক্রয় করা হইত। তখন রেল, ষ্টীমার ছিল না। দ্রব্যাদি বহনার্থ উট, গাধা, নৌকা প্রভৃতি ব্যবহার করা হইত। যুদ্ধার্থ মোগলগণ অশ্ব ব্যবহার করিত। ডাচ দেশীয় বণিকগণ সুরাটে মসলা আমদানী করিত। সিংহল তখন দারুচিনির জন্য, এবং মালাক্কা দ্বীপ লবঙ্গ ও সুপারীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মসলা-ব্যবসায়ীরা সব সময়ে সাধুতার সহিত ব্যবসা করিত না।

স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথাঃ—(১) মোগল, (২) বেনিয়া, (৩) পার্শী। মোগলগণ রাজ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল বলিয়া, তাহারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক সুবিধা ভোগ করিত। উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে তাহাদিগকেই নিযুক্ত করা হইত। দেশীয় শাসনকর্ত্তার পদ তাহারাই পাইত। উচ্চ সামরিক বা উচ্চ সাধারণ পদ তাহাদেরই একচেটিয়া ছিল। ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীগণের সহিত রাজধর্ম্মাবলম্বীরা কখন-কখন অমানুষিক ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ছিল বলিয়া মোগলগণ সব সময়ে উৎপীড়ন করিত না। মোগলগণের প্রায় সকলেই সাধ্যানুসারে উপপত্নী গ্রহণ করিত। তাহারা বিবিধ মসলাযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিত। কেহ-কেহ মদ্যপান করিত ও তাহাদের শাস্ত্র-নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিত। কেহ-কেহ ধুতুরা জলে মিশাইয়া পান করিত। ধুতুরার এইরূপ গুণ যে, ইহা পান করিবার সময় যে যেরূপ মানসিক অবস্থায় থাকিত, তাহার সেই মেজাজই বর্দ্ধিত হইত। এখানে তাড়ী-পানও প্রচলিত ছিল। কসাইগণ মাংস বিক্রয় করিত। মুসলমানগণের প্রত্যেকেই প্রতি বৎসর এক মাস কঠোর উপবাস ব্রত পালন করিত। এমন কি, ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক বালকও, যে পর্য্যন্ত না সূর্য্য অস্ত যাইত ও চন্দ্রোদয় হইত, সে পর্য্যন্ত জল-গ্রহণও করিত না। মোগলগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধীয় ব্যয় প্রচুর ছিল। তাহাদের মৃত-দেহ বিবিধ পুষ্পরাজি দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া মনুষ্য-স্কন্ধে বাহিত হইত। কবর এরূপ গভীর ভাবে খনন করা হইত যে, তাহার মধ্যে একজন স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। তাহাদের কেহ-কেহ সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা শব-রক্ষা করিবার প্রণালী জানিত।

সে সময় আদালতের ভাষা ছিল পার্শী। এক-একখানি কাগজ ছিল দশ ফিট লম্বা, এক ফুট চওড়া। এইরূপ কতকগুলি কাগজ

উপরের দিকে সেলাই করিয়া লিখিবার খাতা প্রস্তুত করা হইত। এখানে সে সময়ে প্রায়ই শরের কলম ব্যবহৃত হইত। দোয়াতগুলি এত বড় ছিল যে, তাহাতে কালি, কলম উভয়ই রাখা চলিত। চিঠি লিখিবার কাগজ বেশ পুরু ও উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু বাদশাহ, মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দকে লিখিবার সময় স্বতন্ত্র কাগজ ব্যবহৃত হইত। সে সব কাগজ সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন এবং গিল্টি করা। সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগের মধ্যে ইতস্ততঃ ছবি অঙ্কিত থাকিত। চিঠি পাঠাইবার ব্যবস্থাও তখন ভিন্ন রকমের ছিল। পত্রবাহী দূতকে পত্র লইয়া পদব্রজে গমন করিতে হইত। এক ফুট আন্দাজ বাঁশের চোঙএ চিঠি রাখিয়া তাহা মোহর করিয়া দেওয়া হইত। তখন এ দেশে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার ছিল না; কিন্তু লোকে আধুনিকভাবে পুস্তক বাঁধিবার কায়দা কতকাংশে জানিত।

অবস্থাপন্ন লোকেরা ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইত। এ দেশের ঘোড়া সত্ত্বেও তাহারা আরব, পারস্য প্রভৃতি স্থান হইতে সুন্দর-সুন্দর ঘোড়া আনয়ন করিত। দরিদ্র লোকেরা বলদের উপর গদি লাগাইয়া তাহাতে চড়িয়া বেড়াইত। বলদের নাকের মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে দড়ি দিয়া লাগামের কার্য্য করিত। ইহা ছাড়া, দ্বিচক্রযান ছিল; তাহাও বলদ কর্তৃক বাহিত হইত। মহিষগুলির দ্বারা অন্য কোন কার্য্য না হউক, তাহারা জলপূর্ণ ভাণ্ড সকল বহন করিত। লোকে তাহাদের শিং রূপা দিয়া বাঁধাইয়া দিত। এই সমস্ত যানাদি ছাড়া পাল্কীর চলনও ছিল। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে আপন রুচি অনুসারে বিবিধ ভাবে সাজাইত। তাহারা সচরাচর তাপ্তী নদীর সমীপবর্ত্তী ...রম কুঞ্জবনে বায়ু-সেবন করিতে যাইত। স্থানটি যেরূপ মনোরম সেইরূপ লোভনীয় ছিল। পেশাদার স্ত্রীলোকগণ এখানে প্রত্যহ নৃত্য করিত। তাহাদের অঙ্গভঙ্গী, বঙ্কিম চাহনী অনেককেই মজাইয়াছে, অনেকেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তখন বাজীকরেরও অভাব ছিল না। আজকালকার মত তাহারা দুই এক ঘণ্টার মধ্যে ১টী আমের আঁটি হইতে গাছ ও ফল জন্মাইতে পারিত। এখনকার মত তখনও সাপুড়ে ছিল। মানুষ সব সময়েই এক। তখনও তাহারা তাস, দাবা প্রভৃতি খেলিত। কিন্তু তদানীন্তন সুরাটবাসীরা কখনও বাজী রাখিয়া খেলিত না। এ বাজীর নেশায় কতজনের গৃহের শান্তি নষ্ট হইয়াছে, কতজনের প্রচুর সম্পত্তি ভোজবাজীর ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে, কত বিলাসী ধনীর সংসার কঠোর দারিদ্র্য-পীড়নে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে—কে তাহার সংখ্যা করিবে? কিন্তু সুরাটবাসীরা সে প্রকৃতির লোক ছিল না। তাহারা খেলিত আমোদের জন্য;—বাজীতে তাহাদের মন ছিল না। তাহাদিগের মধ্যে কেহ-কেহ শিকার করিয়া আনন্দলাভ করিত। তখন অরণ্যে বিবিধ মৃগ, ময়ূর, মহিষাদি বন্যজন্তু প্রচুর পাওয়া যাইত। ইহারা নিজ সুরাটে না থাকিলেও, অদূরবর্ত্তী স্থানে ছিল। য়ুরোপীয়গণ কর্তৃক আনীত বহুবিধ কুকুরের শিকার দেখাও তাহাদের এক আমোদ ছিল। এই সব ঠাণ্ডা দেশের কুকুর সুরাটের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে আসিয়া অধিকদিন তাহাদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিত না। আমীর-ওমরাহ-গণ, এমন কি, সম্রাট স্বয়ং এই সমস্ত কুকুর পছন্দ করিতেন। সুরাটে তখন ভাল দেশীয় শিকারী কুকুরের অভাব ছিল বলিয়া, লোকে শিকারের জন্য চিতাবাঘ পুষিত ও তাহাদিগকে তদনুযায়ী শিক্ষা দিত। কেহ-কেহ শ্যেন পক্ষীর সাহায্যে শিকার করিত। ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার এক প্রকার কায়দা ছিল। শিক্ষা দিবার সময় একটি নকল হরিণের নাকের উপর কিছু মাংস আঁটিয়া দিয়া, ক্ষুধার্ত্ত শ্যেন পক্ষীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এবং সে ঐ মাংস ঠোকরাইয়া খাইত। শিকারের সময় ঐ প্রকারে শিক্ষিত দুইটি শ্যেনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তাহাদের মধ্যে একটী বহু উচ্চে উড়িত; অপরটি ছোঁ মারিয়া হরিণের নাক ঠোকরাইত। শ্যেনের বিস্তৃত পাখা হরিণের চক্ষু আবৃত করায়, সে দেখিতে না পাইয়া মন্দগতি হইয়া পড়িত; এবং শিকারীরা আসিয়া তাহার প্রাণ-নাশ করিত। যদি কোন উপায়ে হরিণ একটি শ্যেনকে পরাস্ত করিতে পারিত, তাহা হইলেও তাহার নিস্তার ছিল না;—তখন দ্বিতীয়টি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিত। কখন-কখন জঙ্গল ঘিরিয়া, মহা কোলাহল করিয়া, শিকার বাহির করিয়া তাহাকে মারা হইত। পক্ষী মারিবার কৌশল আরও সুন্দর ছিল। লোকে এমন সুন্দরভাবে ডাল-পালা সাজাইত যে, তাহা ঠিক একটী ক্ষুদ্র জঙ্গলবৎ প্রতীয়মান হইত। ব্যাধ তাহার সঙ্গীর দ্বারা এই জঙ্গলটি বহন করাইয়া পাখীর নিকটে লইয়া যাইত। সে নিজেও জঙ্গলের নীচে এমনভাবে লুক্কায়িত থাকিত যে, তাহাকে দেখা যাইত না। এইরূপে পাখীর সন্নিহিত হইবামাত্র শিকারী তাহাকে মারিয়া ফেলিত। যখন পাখী জলের উপর থাকিত, তখন তাহারা এক স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিত। একটি কলসী এমন সুন্দরভাবে পাখীর পালক দ্বারা সাজাইত যে, তাহা অবিকল একটি পাখীর ন্যায় দেখাইত। সেই কলসীটি মাথায় লইয়া ব্যাধ সাঁতার দিত। অবশ্য তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ও দেখিবার জন্য ছিদ্র থাকিত। সে সাঁতার দিয়া ধীরে-ধীরে পাখীর নিকট যাইত। পাখীও অপর একটী পাখী মনে করিয়া কোন সন্দেহ করিত না। এইরূপে ব্যাধ ধীরে-ধীরে পাখীর নিকটে যাইয়া তাহার পা ধরিয়া জলের মধ্যে টানিয়া লইত ও কোমরে বাঁধিয়া রাখিত। কোন গোলযোগ হইত না। অপরাপর পক্ষীরা মনে করিত যে, উক্ত পাখীটি ডুব দিয়াছে। ব্যাধ এই উপায়ে এক সময়ে একটী দলকে ধরিতে পারিত।

মুসলমান ছাড়া সুরাটে কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি নানা জাতীয় লোকের বাস ছিল। তাহাদের সকলেই পৈতৃক ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিত; এবং সকলেই স্ব-স্ব ব্যবসায়ে বিলক্ষণ পটু ছিল। যে দরজী, সে, পৃথিবীর যে কোনরূপ কায়দার কাপড় হউক না কেন, তৈয়ারী করিতে সমর্থ ছিল। যে কুম্ভকার, সে সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বদেশীয় মাটির দ্রব্যের সুন্দরভাবে অনুকরণ করিতে পারিত। এইরূপ প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। তৎকালে সুরাটে সব রকম ব্যবসায়ী ছিল বটে, কিন্তু আধুনিক ঘড়ীর ব্যবসায়ী কেহ ছিল না।

মুসলমানের পরেই এখানে বেনিয়াদিগের আধিক্য। ইহারা প্রায়ই ব্যবসায়ী। ইহারা শান্ত, শিষ্ট ও অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু; এমন কি, মশা-মাছি মারিতেও বিশেষ সঙ্কুচিত হইত। টাকা জমাইতে ইহারা বেশ জানিত। অর্থলোভের আশা থাকিলে, ইহারা কখন পরিশ্রমে বিমুখ হইত না। ইহারা ২৪ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত আহারাদি বা সামাজিক ব্যবহার করিত না। ইহারা জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করিত। ইহাদের ধারণা ছিল যে, মানুষ মৃত্যুর পর কর্ম্মফল অনুসারে শ্রেষ্ঠ কিংবা নিকৃষ্ট প্রাণী হইয়া জন্মে। যে আত্মা মৃত্যুর পর গাভীর শরীরে প্রবেশ করিতে পারিত, তাহাই শ্রেষ্ঠ ও সম্মানার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাভীকে অর্চ্চনা করিত। তাহাদের প্রত্যেকেরই একটী করিয়া গাভী থাকিত। যাহার গাভী থাকিত না, সে প্রতিবেশীর গৃহে গিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাহার অর্চ্চনা করিত। গাভী স্পর্শ করিয়া কেহ কখন হলপ করিত না। গাভী তাহাদের এত ভক্তির পাত্র ছিল—শুধু তাহার পার্থিব উপকারের জন্য নয়। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর এই গাভীর লাঙ্গুল ধরিয়া একটী সুপ্রশস্ত গভীর নদী পার হইতে হইবে; আর এই গাভীর শৃঙ্গের উপরই পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপিত আছে। তাহাদের মধ্যে একটী বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, কোন পাখী তাহাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিলে, তাহারা তাহাদিগকে অল্পদিন মৃত বন্ধুদিগের আত্মা মনে করিত। মাসে দুইদিন করিয়া বেনিয়াদিগের সাধারণ উপাসনার দিন ছিল। এই দুইদিন তাহারা সমস্ত দিন উপবাসী থাকিত। নিকৃষ্ট জাতীয় হিন্দুগণ সপ্তাহে একদিন করিয়া সাধারণ উপাসনার দিন ধার্য্য করিত। ভারত সম্রাট ঔরংজেব কর্ত্তৃক তাহাদিগের বহু মন্দির নষ্ট হইয়াছিল; এবং সকলের সম্মিলিত উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সুরাটে তৎকালে বহু কূপ ছিল ও তাহাদের জল ব্যবহৃত হইত। বেনিয়াগণ মদ-মাংস স্পর্শ করিত না। চা, কফি পান করিত ও স্বভাবজাত শাক-সবজী তাহাদের খাদ্য ছিল। পশুপাখীদিগকে তাহারা খুব যত্ন করিত। জ্ঞাতসারে তাহাদের অনিষ্ট করিত না, বা কাহাকেও করিতে দিত না। তাহাদের সম্মুখে কেহ কোন পশুপাখী শিকার করিতে গেলে, তাহারা অনুনয় বিনয় করিয়া, এমন কি অর্থ দিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিত।

সুরাট হইতে এক মাইল দূরে বেনিয়াগণ নিজেরাই অর্থাদি ব্যয় করিয়া পশুদিগের নিমিত্ত একটি হাসপাতাল করিয়া দিয়াছিল। এই হাসপাতালের নিকটেই তাহারা মশা, মাছি, ছারপোকা প্রভৃতি কীটের জন্য অপর একটি বাসস্থান করিয়া দিয়াছিল। তাহারা তাহাদিগকে উপযুক্ত খাদ্যাদি দ্বারা জীবিত রাখিত। সময়ে সময়ে কীটাদি যাহাতে রক্ত পান করিতে পায়, সেই উদ্দেশ্যে এক রাত্রির জন্য মানুষ ভাড়া করিয়া লইয়া আসিত। কোন-কোন বেনিয়া বৎসরে একদিন স্বীয় বাটীর পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির জন্য সুন্দর ভোজ্য প্রস্তুত করিত। কেহ-কেহ বা দুই তিন মাইল যাবৎ রাস্তার স্থানে-স্থানে পিপীলিকার জন্য খাদ্য ছড়াইয়া রাখিত। বেনিয়াগণ কদাচিৎ কূপ বা নদীর জল পান করিত। সাধারণতঃ ভগবানদত্ত বৃষ্টির জল তাহাদের পানীয় ছিল। বৃষ্টির সময় এই জল রক্ষা করিবার জন্য তাহারা বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিত। শিশু জন্মিবার দশ দিন পরে তাহাদের নামকরণ করা হইত। নামকরণের দিন ১০।১২ জন বালক চক্রাকারে দাঁড়াইয়া একখানি কাপড় ধরিত। একজন ব্রাহ্মণ সেই কাপড়ের মধ্যস্থলে ২।৩ সের চাউল ঢালিয়া দিলে, যে বালকের নামকরণ করিতে হইবে, তাহাকে তদুপরি স্থাপন করা হইত। তখন বালকগণ সেই কাপড়খানিকে প্রায় ১৫ মিনিট কাল ইতস্ততঃ নাড়িলে, বালকের পিসি আসিয়া নাম রাখিতেন। পিসি না থাকিলে বালকের পিতা বা মাতা নামকরণ করিতেন। নামকরণের দুই এক মাস পরে বালককে একটি মন্দিরে লইয়া গিয়া তথায় তাহাকে বেনিয়া-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত। বেনিয়াদিগের অর্থ—গহনা ও টাকা। তাহারা অতি সুগোপনে টাকাকড়ির আদান-প্রদান করিত। সম্রাটের কর্ম্মচারী তাহাদের অর্থের অপর্য্যাপ্ততা জানিতে পারিলে, রাজকোষে বাজেয়াপ্ত করিতে পারে এই ভয়ে, তাহারা কোন ক্রিয়া-কর্ম্মে বিশেষ ব্যয়ভূষণ করিয়া অর্থের প্রাচুর্য্য দেখাইত না; এবং টাকার আদান-প্রদান সাধারণতঃ রাত্রিকালে বা অতি প্রত্যূষে করিত। যাহাদের বাৎসরিক আয় হয় ত ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা, সে দেখাইত, যেন তাহার আয় তিন-চার হাজার টাকার অতিরিক্ত নয়। এখানকার মহিলারা অতীব গহনাপ্রিয় ছিল। ধনীর ত কথাই নাই,—অত্যন্ত দরিদ্র স্ত্রীলোকেরও দুই-একখানা গহনা থাকা চাই। বেনিয়াগণের বাল্যকালে বিবাহ হইত। কারণ, অপবিত্র ভাব মনে উদিত হইবার পূর্ব্বে বিবাহ করা তাহারা প্রশস্ত মনে করিত। পুরুষদিগের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না। গোপনীয় বিবাহের কথা কখনও শুনা যাইত না। মহা সমারোহে শুভদিনে সর্ব্ব সমক্ষে বিবাহ হইত। বিবাহ বাসরে সর্ব্ব-সমক্ষে অভ্যাগতগণকে গোলাপজল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা আপ্যায়িত করা হইত।

ইন্ধনের জন্য তখন কাঠ ব্যবহার করা হইত, কয়লার চলন ছিল না। বাজারে জ্বালানি কাঠ ওজন দরে বিক্রী হইত; এবং চাকরগণ আজকালকার মত দোকানদারদিগের নিকট হইতে দস্তুরী পাইত। টাকায় দুই পয়সা দস্তুরী ছিল। সমস্ত জিনিষ সে সময় সস্তা ছিল। নগরের মধ্যে একটি বৃহৎ পান্থশালা ছিল। সেখানে পথিকগণ বা বিদেশীয় বণিকগণ আশ্রয় পাইত। সুরাটবাসিগণ সাধারণতঃ প্রাতঃকাল ৮।৯টার সময় এবং বৈকাল ৪।৫টার সময় আহার করিত। তাহাদের সকলের পোষাক একই রূপ সাদা ছিল। বহিঃস্থ জামা এত দীর্ঘ ছিল যে, তাহা পা পর্য্যন্ত পড়িত। মুসলমানগণ তাহাদের জামা ডান দিকে এবং বেনিয়াগণ বাম দিকে বাঁধিত। মাথায় পাগড়ী থাকিত; মোজার ব্যবহার ছিল না। ধনীদিগের জুতায় সোণা-রূপার কাজ করা থাকিত। তখন কাহারও ছাতা ব্যবহার করিবার আদেশ ছিল না। সম্রাট শুধু ছাতা ব্যবহার করিবার

করিতেন। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। তাই আজ ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা সকলেই নির্ব্বিবাদে ছাতা ব্যবহার করিতেছেন।

সুরাটে এক প্রকার ব্রাহ্মণ ছিল। তাহারা কখনও বিবাহ করিত না—পাছে স্ত্রী-পুরুষের আলিঙ্গনে কোন অদৃশ্য প্রাণী হত হয়। সেই একই উদ্দেশ্যে তাহারা খুব কম কথা বলিত, কখনও স্নান করিত না, দাড়ি গোঁফ কামাইত না বা মস্তক মুণ্ডন করিত না। তাহারা কখনও ভবিষ্যতের জন্য ভাবিত না। যে দিন যাহা পাইত তাহা খাইত। যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা অন্য কোন অভাবগ্রস্তকে দান করিত। ইহাদের স্বজাতীয় কোন লোকের যদি দুই তিনটি বা ততোঽধিক পুত্র জন্মিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজনকে নিজেদের শ্রেণীতে দীক্ষিত করিয়া লইত।

সুরাট সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে; ভবিষ্যতে তাহা বলিবার চেষ্টা করিব।

মানবদেহের দৈর্ঘ্য ও বল

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যবিশারদ]

প্রায় সব যুগে সকল দেশে দেখা যায়, মানুষের একটা ধর্ম্ম এই যে, সে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত তুলনা করিয়া তাহার সমকালবর্ত্তী মানুষকে সদাই ছোট করিবার চেষ্টা করে। পিতা পুত্রকে বলেন—"আমরা বাল্যকালে যে রূপ দীর্ঘদেহ পুষ্ট-বপু মানুষ দেখিয়াছি, তোমরা তাহার কিছুই দেখিলে না।" আবার পিতামহ পিতৃদেবকে বলেন—"আমাদের আমলে যে রূপ মানুষের মত মানুষ ছিল, সে হিসাবে তোমরা নিতান্ত খর্ব্বকায় ও কৃশ-তনু।"

বিলাতের সুবিখ্যাত ডাক্তার Greaves তাঁহার Studies in Physiology and Medicine" নামক পুস্তকেও এ কথাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন—অতি পুরাকালে, সেই Homer ও Hesoidএর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের মধ্যে এই একই আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। যখনই কোন বৃদ্ধ লোক মানবের দৈহিক বল ও আকৃতির সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহেন, তখনই প্রাচীনদিগের সহিত তুলনা করিয়া, তিনি এখনকার লোকদের দুর্দ্দশার কথাই বর্ণনা করিয়া থাকেন।

তবে কি মানবজাতি শারীরিক বলে ও দৈর্ঘ্যে দিন-দিন হ্রস্ব হইয়া পড়িতেছে? তবে কি এই ক্রমাবনতিতে মানুষ একদিন অণুবীক্ষণের দর্শনীয় সামগ্রী হইয়া পড়িবে? তবে কি সুদূর ভবিষ্যতে জগৎ হইতে মানুষের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইবে? চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই এ কথাটি ভাবিবার বিষয় বটে।

আমাদের শাস্ত্রে আছে, সত্যকালে মানব-দেহ একবিংশতি হস্ত পরিমিত ছিল। তখনকার লোকসকল লক্ষ বর্ষ জীবিত থাকিত; এবং তাহারা আমাদের ন্যায় অন্ন-গত প্রাণ ছিল না।

ত্রেতায় মানুষের দৈর্ঘ্য চতুর্দ্দশ হস্ত এবং পরমায়ুঃ দশ সহস্র বর্ষ। দ্বাপরে মানুষ হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিত এবং দৈর্ঘ্যে সপ্ত হস্ত পরিমিত ছিল। আর এখন কলির মানুষ আমরা সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত এবং আমাদের পরমায়ু একশত কুড়ি বৎসর মাত্র।

পাশ্চাত্য দেশবাসীদেরও যে এরূপ সংস্কার একেবারেই নাই, তাহা নহে। সে দেশে কিংবদন্তি আছে যে, Adam সর্ব্ব প্রথমে ৯০০ হাত উচ্চ ছিলেন। পরে পাপাসক্ত হওয়ায়, পরমেশ্বর তাঁহার আকার কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়া দেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে এই মতের প্রতিপোষক Henrion নামক একজন পণ্ডিত সৃষ্টিকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দৈহিক উচ্চতার একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। ঐ তালিকায় তিনি দেখাইয়াছেন যে, Adam ১২৩ ফিট ৯ ইঞ্চি ও Eve ১১৮ ফিট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ ছিলেন। Noahর মাপ Adam অপেক্ষা ২০ ফিট কম। Abraham দৈর্ঘ্যে ২৭ হইতে ২৮ ফিট। Moses ১৩ ফিট, Hercules ১০ ফিট, Alexander ৬ ফিট এবং Julius Caesar ৫ ফিট মাত্র।

বাইবেলে উক্ত আছে, খৃষ্ট জন্মিবার ২৩৪৮ বৎসর পূর্ব্বে একবার ধরা পাপভারে আক্রান্ত হইলে, ভগবানের ইচ্ছায় পৃথিবী জলমগ্ন হয়। সেই সময় Noah একখানি সুবৃহৎ অর্ণবযান প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে সপরিবারে আরোহণ করতঃ, সেই জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। Moses লিখিত বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, ঐ অর্ণবযান ত্রিতল ছিল। উহার প্রত্যেক তলার উচ্চতা ১৫ ফিট মাত্র। Noah স্ত্রী-পুত্র লইয়া উপরের তলাতেই বাস করিতেন। Henrionএর কথা সত্য হইলে, ১০৩ ফিট দীর্ঘাকার Noah কি প্রকারে ১৫ ফিট উচ্চ কক্ষে বাস করিতেন, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

মানবজাতির দৈহিক উচ্চতার ক্রম হ্রাস হইতেছে, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং, মানুষ সর্ব্বপ্রকারে উন্নতির পথেই ধাবমান। তাই কবি Tennyson বলিয়াছেন—

> "Yet I doubt not thro' the ages one in-
> creasing purpose runs,
> And the thoughts of men are widen'd
> with the process of the suns."

যদি তাহা না হইয়া পুরুষানুক্রমে অন্ততঃ অর্দ্ধ ইঞ্চি হিসাবেও মানুষের দৈর্ঘ্য কমিতে থাকে, তাহা হইলে দেখা যায়, এখন হইতে ১৪৪ পুরুষের মধ্যে মানবজাতি নিরাকার হইয়া পড়ে।

ধরা-পৃষ্ঠে কত দিন মনুষ্য-সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ-কেহ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মিবার ৭ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মানব-সৃষ্টি

হইয়াছিল (১)। কিন্তু আধুনিক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, মনুষ্যের সৃষ্টি বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে (২)।

এই বহু লক্ষ বৎসর মানুষ যখন তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তখন ঐ সামান্য কালের মধ্যে যে এ জাতি একেবারেই বিলুপ্ত হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে দেশের জল-বায়ু, আর্থিক অবস্থা ও দেশবাসীর মনের স্ফূর্ত্তির উপরই মানুষের দীর্ঘতার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে। কোন একটি দেশ নিতান্ত গরীব হইলে, অন্ন-দৈন্য হেতু তৎকালে তদ্দেশবাসিগণের শারীরিক পুষ্টির অভাব ঘটিতে পারে। কাযে-কাযেই তাহাদের দৈর্ঘ্যও কিছু হ্রাস হওয়া স্বাভাবিক। বাঙ্গালীর পক্ষে—তথা ভারতবাসীর পক্ষে—কতকটা ঐরূপ হইয়াছে। এখন এ দেশীয় অনেক পরিবারের বাৎসরিক আয় গড়ে ৩৫৲ হইতে ৪০৲ টাকার অধিক নহে; অথচ খাদ্য সামগ্রী অগ্নিমূল্য। দারিদ্র্যের পেষণে, উপযুক্ত খাদ্যাভাবে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই দৈহিক অবনতি দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া, শুধু একটা দেশের কথা—মুষ্টিমেয় জন-সংখ্যার কথা—ভাবিলে চলিবে না; সমস্ত পৃথিবীর কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

আজ-কাল পৃথিবীতে ২০৩ জনের মধ্যে একজন ৬ ফিটেরও অধিক উচ্চ মানুষ দেখা যায়। অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে ঐ রূপ আকারের মনুষ্য সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। সমগ্র য়ুরোপের অধিবাসীরা এখন গড়ে ৫ ফিট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ। বিশেষজ্ঞগণ বলেন—"Civilisation equalises the stature of mankind and keeps it near a steady mean."—সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত দেশের লোকই প্রায় একাকার হইয়া পড়ে।

যে সকল জাতি এখনও অসভ্য অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদের দৈহিক উচ্চতাও কম। কিছু দিন পূর্ব্বে একজন শিকারী "এসিয়ার" এক অরণ্যানীর মধ্যে বৃক্ষারূঢ় তিনটি অদ্ভুত নর-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। ঐ ত্রিমূর্ত্তির গায়ের রং পিঙ্গলবর্ণ, চক্ষু ক্ষুদ্র ও কোটরগত, এবং দন্তগুলি সুপ্রকাশিত। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধটি ৪ ফিট মাত্র দীর্ঘ ছিল।

উড়িষ্যা দেশের কোন-কোন্ জেলায় এক জাতীয় অসভ্য লোক আছে। তাহারা এখনও গাছের ত্বক্ ও পত্র পরিধান করে। ঐ সকল লোকের দৈর্ঘ্যও ৪ হইতে ৫ ফিটের অধিক নহে।

দক্ষিণ আমেরিকার টেরা ডেল-ফিউগো নামক স্থানে এক নর-মাংসভুক্ অসভ্য জাতি বাস করে; বোধ হয় মানবজাতির মধ্যে তাহারাই সর্ব্বনিকৃষ্ট। উহারা সকলেই বামনাকার।

অতি পুরাযুগে মানুষগুলি আমাদের অপেক্ষা কখনই দীর্ঘ ছিল না। প্রাচীন নর-কঙ্কাল, মিশরীয়দিগের "মমী" (Egyptian mummies) ও সেকালের বর্ম্ম ও বাসগৃহাদি দেখিলে ইহা প্রমাণিত হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের "অরিগ্‌ন্যাক" সহরের অনতিদূরে "পিরেনীজ" পর্ব্বতের তলদেশে একটি অতি প্রাচীন কালের গভীর গহ্বর আবিষ্কৃত হয়। উহার মুখ পাথরের দ্বারা আবৃত ছিল এবং তন্মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুর ১৭টি কঙ্কাল দেখা গিয়াছিল। সুবিখ্যাত ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিৎ M E Lartet এর পরীক্ষায় ঐ সকল কঙ্কাল দশ সহস্র বর্ষেরও অধিক কালের বলিয়া স্থিরীকৃত হয়; এবং প্রত্যেকটিই এ যুগের নর দেহ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকার বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়।

আর একবার বাল্‌টিক সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ভূখণ্ডে কতকগুলি প্রকাণ্ডাকার কবর দেখা গিয়াছিল। বাহ্য চিহ্নে প্রথমে উহাদিগকে "দানব-সমাধি" (Giants' graves) বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কবরের উপরিস্থ মৃত্তিকাস্তূপ ও প্রস্তরস্তম্ভগুলি যেরূপ প্রকাণ্ড, তন্মধ্যস্থ কঙ্কাল দেখিয়া, তৎকালের নর-মূর্ত্তিগুলিকে সেরূপ প্রকাণ্ড বোধ হয় নাই; বরং তাহারা এখনকার মনুষ্য অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রকায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য বেলজিয়ান গভর্ণমেণ্ট এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ তারিখে কমিসন যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত যে সকল মনুষ্য-কঙ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে সকলগুলিই এ যুগের নর-কঙ্কালের মত দীর্ঘ নহে। কমিসন বিশ্বাস করেন যে, ঐ সকল মানুষের দৈহিক উচ্চতা এখনকার ল্যাপ্‌লাণ্ডবাসীদিগের ন্যায় হইতে পারে।

পণ্ডিত Brocaও ভূয়োদর্শন দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আদিমকালের মানুষগুলি কখনই এরূপ দীর্ঘাকার ছিল না। তাহাদের মস্তক সরু, ললাট অপ্রকট এবং হনুস্থি ঈষৎ বক্র ছিল। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউক্যালিডোনিয়াবাসী নিকৃষ্ট জাতিদিগের সহিত তাহাদের অনেক সাদৃশ্য আছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীতে দানবাকার মানব-মূর্ত্তি সকল বিদ্যমান ছিল বলিয়া সাধারণের যে সংস্কার রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম-বিজৃম্ভিত। একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত স্পষ্টই বলিয়াছেন, ভূগর্ভে

(১) The largest of these calculations dates the creation of man at about 8800 years before the present time or about 7000 years before the birth of Christ"

—"Chamber's Information for the people."

(২) সুবিখ্যাত Dr. L. Buchner লিখিয়াছেন—"But the late discoveries and investigations as to the primeval existence of man upon the earth have proved that man, although the highest and perhaps the youngest member of the organic creation, has already lived upon the earth during a period in comparison with which the few thousands of years covered by human history and tradition shrink almost to a single moment."

অতিকায় জন্তুর অস্থি-পঞ্জর দর্শনে লোকের এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে। পুরাবৃত্ত-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, মানুষ বর্ব্বর দশায় ভূগর্ভে বাস করিত। য়ুরোপের কোন-কোন স্থানে উহার চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গর্ত্তের প্রবেশ-পথ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। স্কট্‌ল্যাণ্ডের আবার্ডিন নামক স্থানে হলকর্ষণ করিতে করিতে মৃত্তিকাবৃত ঐরূপ অনেকগুলি গর্ত্ত বাহির হইয়াছিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায়, তাহাদের প্রত্যেকটির গভীরতা ৬ ফিটের অধিক নহে। সুতরাং ঐ আবাস-গহ্বরগুলি যে আমাদের অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি মনুষ্য কর্ত্তৃক অধ্যুসিত ছিল, তাহা মনে করা যায় না।

ইহার পরবর্ত্তীকালে মানুষ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত; এবং ক্রমশঃ শিল্পকুশল হইয়া প্রস্তরাদি যোগে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। সভ্যতার আদিভূমি ভারতবর্ষের নানাস্থানে এখনও যে সকল সুপ্রাচীন হর্ম্ম্য ও দেবমন্দিরাদি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদের অনেকেরই প্রবেশ-দ্বার বিশেষ আয়ত নহে। সে কালের লোক সকল যে অতি দীর্ঘাকৃতি ছিল না, ইহাও তাহার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

তা'র পর মানুষের বল-বীর্য্যের কথাও ভাবিয়া দেখুন। অতি প্রাচীনকালে যখন Milo নামক গ্রীক্ বীর ঘুসি মারিয়া একটি ষণ্ডকে ধরাশায়ী করতঃ, স্বয়ং উহাকে স্কন্ধে তুলিয়া গৃহে লইয়া যায়, তখন তদ্দর্শনে দেশবাসী সকলেই নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণ বীর Van Eckeburgএর শক্তি দর্শনেও লোকে কম আশ্চর্য্যান্বিত হয় নাই। ঐ ব্যক্তির বল এরূপ ছিল যে, সে কোন একটি স্থানে দৃঢ়ভাবে বসিয়া থাকিলে, অশ্ব-যুগলেও তাহাকে তৎস্থান হইতে এক ইঞ্চি সরাইতে পারিত না।

সেকালে Topham নামক ইংরাজ বীরের নাম বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার অদ্ভুত কার্য্যাবলী দর্শনে লোকে বিশ্বাস করিত, Topham মানুষ নহে। মানবে এত শক্তি কখন সম্ভব হইতে পারে না। সে বাহুবলে একটি অশ্বকে উত্তোলন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিত, ৩ ইঞ্চি পরিধির লৌহ-যষ্টি নিজের বাহুতে আঘাত করিয়া বাঁকাইয়া ফেলিত। এবং ৬ ফিট লম্বা একটি ভারি টেবিল দন্তের দ্বারাই ঊর্দ্ধে তুলিত।

কিন্তু আজ Sandow প্রভৃতি য়ুরোপীয় বীরগণের কথা দূরে থাকুক, রামমূর্ত্তি ও অন্যান্য ভারতীয় শক্তিধরগণের অমানুষিক শক্তির খেলা দেখিয়াই লোকে ঐ সকল প্রাচীন বীরের বীরত্ব-কথা অগ্রাহ্য করিতেছে।

এখন শ্যামাকান্তবাবু, মহেন্দ্রবাবু, কে, ডি, শীল, ভীমভবানী প্রভৃতি "ভেতো বাঙ্গালী" ও অবলীলাক্রমে সিংহ, ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া, বক্ষে দেড়শত মণ প্রস্তর বোঝা চাপাইয়া, অথবা বিংশতি অশ্ব শক্তি (Twenty horse power) মোটর গতি টানিয়া বা প্রকাণ্ড মোটা লৌহ-শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া, কিংবা একটি ঘোড়া বা তদপেক্ষাও গুরুভার বস্তু দন্তের দ্বারা উত্তোলন করিয়া দৈহিক বলের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন।

মানুষ দিনে-দিনে কখন হীনবল হইতেছে না। পৃথিবীর জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। অধুনা সকল সভ্যদেশেই মৃত্যুর হার অপেক্ষা জন্মের হার অধিক। এক রুষিয়ার প্রতি বৎসরে প্রায় ৭৬৭২০০০ শিশু জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু ৪৮৮৭০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; সুতরাং বারমাসে প্রায় ৩০০০০০০ ত্রিশ লক্ষ লোক বাড়িয়া যাইতেছে। এই নিয়ম পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই দেখিতে পাইবেন।

সমাজ-তত্ত্ববিৎ গিডিংস্ বলেন, যে জাতির জীবনীশক্তি যত হ্রাস হইয়া পড়ে, তাহার জন্মের হার তত বাড়িতে থাকে বটে; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যুর হারও প্রবল বেগে বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং লোকবৃদ্ধির হার কমিয়া যায়। মানুষের জীবনীশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিলে কখনই জনসংখ্যা বাড়িতে পারে না। এ সম্বন্ধে ডাক্তার Tannerও লিখিয়াছেন—

"Yet if it were true that the physical powers of mankind are on the wane, such a result would hardly be possible."

কিছুদিন পূর্ব্বে পৃথিবীর জনসংখ্যা একশত কোটী ছিল। এবং প্রতি বর্গমাইলে ২০ জন বাস করিত। এখন সেইস্থলে লোকসংখ্যা ১৬২৩০০০০০০ দাঁড়াইয়াছে এবং প্রতি বর্গমাইলে ৩০ জন বাস করিতেছে।

যদিও এবারকার মহাযুদ্ধে মাতা বসুন্ধরার বহু সন্তান বিনষ্ট হইয়াছে, তথাচ আগামী আদম সুমারিতে যে পৃথিবীর জনসংখ্যার বিশেষ হ্রাস লক্ষিত হইবে এমন বোধ হয় না। সর্ব্বংসহা বসুমতী এ সকল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও সৃষ্টি রক্ষা করিয়া মানবের ভ্রাতৃশোক নিবারণ করিবেন। এ যুদ্ধে য়ুরোপের যেরূপ লোকক্ষয় হইল,—হয় ত সমৃদ্ধিশালী আমেরিকা অথবা জাপান অসম্ভবরূপে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সে অভাব পূর্ণ করিয়া ফেলিবে।

অনেকে মনে করেন, সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। যে অল্প সংখ্যক লোক এখনও পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অসভ্য অবস্থায় রহিয়াছে, তাহারা আমাদের অপেক্ষা বলশালী। কিন্তু এ কথা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানানুমোদিত নহে। বহুদর্শী মহাত্মা Lawrence বলিয়াছেন—

"The industrious and wellfed middle classes of a civilised community may be reasonably expected to surpass in this endowment the miserable savages who are never wellfed and too frequently depressed by absolute want and all other privations."

উত্তম গৃহে বাস, পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন ও পরিমিত শারীরিক পরিশ্রমের উপরই মানবের দৈহিক বল নির্ভর করে। অসভ্য বন্যজাতির মধ্যে ঐ সকলগুলিরই একান্ত অভাব দেখা যায়।

ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারাও ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। পাঠক

জানেন, সুসভ্য স্পীনিয়ার্ডগণ যখন সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় পদার্পণ করেন, তখন তাঁহারা তথাকার অসভ্য অধিবাসীদিগকে আপনাদিগের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে দুর্ব্বল বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কিছুদিন গত হইল, Regnier নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক "ডাইনামোমিটার" (Dynamometer) নামক এক শক্তি-পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রভ্রমণকারী Peron দেখিয়াছেন যে, নিউহল্যাণ্ড ও টাইমর দ্বীপবাসী অসভ্য লোকদিগের বাহুবল যথাক্রমে ৫০·৮ পঞ্চাশ দশমিক আট ও ৫৮·৭ আটান্ন দশমিক সাত কিলোগ্রাম (ফরাসী ওজনের মান বিশেষ)। কিন্তু অপর পক্ষে প্রত্যেক ইংরাজ তাহার বাহুতে ৬৩ হইতে ৮৩ কিলোগ্রাম পর্য্যন্ত শক্তি ধারণ করে। সুতরাং ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, সুভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ দৈহিক বল-বীর্য্যেও সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে।

শারদশ্রী

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

কালো আঁধারের অধর চিরিয়া
আলোক উঠেছে ফুটি,
বক্ষে ধরার লক্ষ ধরায়
সে আলো পড়িছে লুটি।
বঞ্জুল বনে মঞ্জুল বীথি
পুলকিত মধু গন্ধে,
বন্দনা-গীতি চন্দনা গায়
উচ্ছল প্রীতি-ছন্দে।
স্বর্গ যে সুধা যক্ষের মত
বক্ষে রেখেছে ভরি,
সে মধু-গন্ধ পরমানন্দে
বিশ্বে পড়িছে ঝরি।
করুণার ধারা জ্যোছনার মাঝে
ঝরিয়া পড়িছে সে,—
বিশ্ব-মাঝারে নিঃস্ব যাহারা
সে সুধা ভখিয়া নে।

বঙ্গের বুকে শেফালিকা ফুটে
সুধার গাগরী বক্ষে,
অন্তর ভরে গন্ধ বিতরে
কুঞ্জ-কানন কক্ষে।
উর্ম্মি-ফেনিল সিন্ধু-সলিল
কল্লোল কল মাঝে,
বাঞ্ছিত মধু মিলনের গীতি
রঞ্জিত সুরে বাজে।

বঙ্গের শ্যাম অঞ্চলখানি
উজ্জ্বল ধানে ভরা,
তারি মাঝে আজ বিশ্বের ধাত্রী
লক্ষ্মী পড়েছে ধরা।
পর্ণ-কুটীরে স্বর্ণের ধারা
ঝর ঝর ঝর ঝরে,
স্নেহ-সিঞ্চিত আশীষের মত
লক্ষ শিরের' পরে।

চির-নিদ্রিত পল্লীর বুকে
একে জাগরণ আজি,
মন্দিরে পুনঃ আরতির ধ্বনি
মুহু-মুহু উঠে বাজি।
উজ্জ্বল শত ভক্ত-হৃদয়
পুলকে আপনা-হারা,
উজ্জ্বল শিশু-অন্তরখানি
উল্লাসে মাতোয়ারা।
পল্লীর বুকে বল্লীবিতানে
ঝরিছে আলোকরাশি;
সে আলো ধরায় আঁখি দুটি মাজি
উঠগো পল্লীবাসী।
সঞ্চিত যত আঁখি-লোর আজ
মৌন সমাধি মগ্ন,
চারিদিকে এ কি মধু-উৎসব—
জগৎ সুষমা লগ্ন।

চন্দ্র সবিতা গ্রহ তারকায়
আলোক যাঁহার রাজে,
জাহ্নবী কল-কল্লোলে যাঁর
বন্দন-গীতি বাজে ;
যাঁহার চরণ-শতদল হতে
স্নেহধারা পড়ে ঝরি,
যে করুণাধারা নিয়েছে ধরার
দুঃখ বেদনা হরি' ;—

সেই চরণের শতদল হতে
একটি পর্ণ আসি—
বিশ্বের বুকে শরতের রূপে
আজিকে উঠিল ভাসি।

* * *

জয় জয় জয় বিশ্ব-বিজয়,
উজ্জ্বল-ধ্রুব-কান্তি ;
সুন্দর চির-বন্দ্য পরম
জয় জয় জয় শান্তি।

দিদারগঞ্জ মূর্ত্তি

[অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, প্রত্নতত্ত্ব-বারিধি বি-এ]

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের প্রারম্ভে পাটনা কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর একটী ছাত্রের কাছে আমি অবগত হই যে, পাটনা শহর হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় এক মাইল দূরে গঙ্গাতীরে একটী সুবৃহৎ প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে ; এবং মূর্ত্তিটী নিকটবর্ত্তী হিন্দুগণ পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, সেই দিবস অপরাহ্নে আমি তথায় যাইয়া, বর্ত্তমানে "দিদারগঞ্জ মূর্ত্তি" নামে অভিহিত, স্থাপত্য-শিল্পের অত্যুত্তম নিদর্শনটি দেখিতে পাইলাম। স্থানীয় নিম্নশ্রেণীস্থ অধিবাসিগণ তখন মূর্ত্তিটীর পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মূর্ত্তির গলদেশে পুষ্পমাল্য পড়িয়াছে ; কপালে সিন্দুর শোভা (?) পাইতেছে ; চতুষ্পার্শ্বে ধূপ, ধুনা ও অন্যান্য পূজোপকরণ দেখা যাইতেছে।

অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, অক্টোবর মাসের অষ্টাদশ তারিখে মৌলভী সৈদর মুহম্মদ আজিমল নামক নিকটস্থ দরগার স্বত্বাধিকারীর পুত্র সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে ভ্রমণকালে প্রস্তরের অংশবিশেষ দেখিতে পান। বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন হইতে পারে মনে করিয়া, (অশোকযুগের অনেক প্রস্তর রজকের বস্ত্র ধৌত করিবার উদ্দেশ্যে পাটনার অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইতেছে) আজিমল তাঁহার ভৃত্যকে পাথরখানি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উত্তোলনের আদেশ করেন। ফলে এই মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়।

আমি অপ্রত্নতাত্ত্বিক, তথাপি মূর্ত্তিটীর চিক্কণতা ও আকার দেখিয়া, ইহা বহু মূল্যবান বলিয়া বুঝিতে পারি। সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। তাহার সদ্ব্যবহারের ক্রটী হইল না। তৎপর দিবস ফটোগ্রাফখানি মহামান্য ছোটলাট মান্যবর স্যার এডোয়ার্ড গেট মহোদয় ও পাটনা মিউজিয়ম কমিটীর সভাপতি মান্যবর ওয়াল্‌স মহাশয়কে দেখাই। ছোটলাট মহোদয়, মূর্ত্তিটা যাহাতে সংগৃহীত হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঔৎসুক্যের সহিত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মিঃ ওয়াল্‌স্‌ও ডাক্তার স্পুনারের সহিত পরামর্শ করিয়া তৎপর দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া মূর্ত্তির নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন মূর্ত্তির পূজা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ;—ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের চিরন্তন রীত্যানুযায়ী, কোন সরকারী কর্ম্মচারীই আর উহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিবেন না মনে করিয়া, সকলেই দুঃখিত হইলেন। কিন্তু এই সময়ে এক অভাবনীয় উপায়ে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। বুকানান হ্যামিলটন নামক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পর্য্যটক যখন পাটনা অঞ্চলে আসেন, তখন তিনি দুইটী সুবৃহৎ মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি দুইটী এক্ষণে কলিকাতা যাদুঘরে আছে। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের অন্যতম মূর্ত্তি পাটনার অধিবাসীরা (সে আজ প্রায় ১১৫ বৎসরের কথা) দেবমূর্ত্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষে কুমড়াহার হইতে পাটনায় লইয়া যায়। অভিষেকের পূর্ব্ব রাত্রিতে ভীষণ অগ্নিতে পাটনার অনেকাংশ ভস্মীভূত হয়। মূর্ত্তিটী "অপয়া"—

প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই যখন এইরূপ হইল, প্রতিষ্ঠার পরে আরও কি হয়—এই আশঙ্কায় পাটনাবাসীরা উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করে।

আমি এই আখ্যানের কথা অবগত ছিলাম। পাটনা শহরে, "দিদারগঞ্জ মঠ" অধিবাসীদের নিকটস্থ স্থানে, আমার অনেক ছাত্র ছিল। ইহারা "দিদারগঞ্জ মঠ" ও বুকানান-কথিত মূর্তি—এই "অশুভ দেবী" একই বলিয়া প্রচার করিল; এবং উক্ত মূর্ত্তির যাদুঘরে প্রতিষ্ঠা করিলে, শহরের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী—ইহা প্রচার করিতেও কসুর করিল না। অধিকন্তু, স্থানীয় পুলিস যখন উপাসক দিগকে বলিল যে, অর্থলোভীদের একমাত্র গবর্ণমেণ্টের, এবং তাহারা ইহার উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়া আইন বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছে, তখন আর মূর্ত্তির উপরে স্বত্ব ত্যাগ করিতে হ্ওয়ায় জনসাধারণের মনে কোনরূপ বিশ্বাস রহিল না। কয়েক দিবস পরেই মূর্ত্তি যাদুঘরে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু, তখনও মূর্ত্তির পূজকের অভাব থাকিল না। দলে-দলে স্ত্রী-পুরুষ এই মূর্ত্তির পূজার্থ যাদুঘরে যাইয়া ইহাকে সিন্দুর-চন্দন বিভূষিত করিতে লাগিল। অগত্যা উহাকে কক্ষ মধ্যে রাখা হইল।

বলা বাহুল্য, মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫ ফিট ২ ইঞ্চি; পাদদানটি ১ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চ এবং ১ ফুট ৮ ইঞ্চি প্রস্থ। পাদদানটি মণ্ডলাকার নহে। অধিষ্ঠিত পাদদান একখানি প্রস্তর হইতে খোদিত। মৌর্য্যযুগের অন্যান্য মূর্ত্তির ন্যায় উহা চুনারের প্রস্তরে নির্ম্মিত। মূর্ত্তির অঙ্গে মৌর্য্যযুগের পালিস অনেক স্থানে এই পালিস উঠিয়া গিয়াছে—অনেক স্থানে ইহা ময়লায় আবৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি চিক্কণতা যাহা আছে, তাহাতে ইহা উজ্জ্বলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে।

ডাক্তার স্পুনার বলিয়াছেন যে, "মূর্ত্তি পরিচ্ছদে অন্যান্য প্রাচীন মূর্ত্তির পরিচ্ছদের ন্যায়। একখানি বস্ত্র বক্ষে দেহখানি আবৃত—বস্ত্রখানি পাতলা এবং শরীরের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন। মূর্ত্তি সুসজ্জিত। ইহার মস্তকে বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে "টায়রা" বলি, তাদৃশ অলঙ্কার, কর্ণে "ঝাপটা," গলদেশে "কণ্ঠহার" (অথবা 'তিন নহরী'), হস্তে ত্রয়োদশটী বলয়, মণিবন্ধে 'অনন্ত', পদে 'মল'। বস্ত্র পরিধানের বিশেষত্ব রহিয়াছে। অনেকটা

[illegible] পরিধানের ন্যায়। [illegible] নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা [illegible] "কোঁচা" দিয়া শাড়ী পরিধান করে, [illegible] হইতে কোঁচা [illegible] ছবিতে রহিয়াছে [illegible] [illegible] স্বাভাবিক [illegible] উৎকৃষ্ট শিল্পী [illegible] নিকটস্থ [illegible]



দিদারগঞ্জ [illegible]

দেখাইয়াছে। [illegible] [illegible] উহাতে [illegible] প্রাচীন কালে [illegible] প্রদর্শিত [illegible] প্রদীপাধার।

[illegible] পাটনা [illegible] কলিকাতা যাদুঘরে [illegible]



দিদারগঞ্জ মূর্ত্তির সম্মুখভাগ



দিদারগঞ্জ মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগ



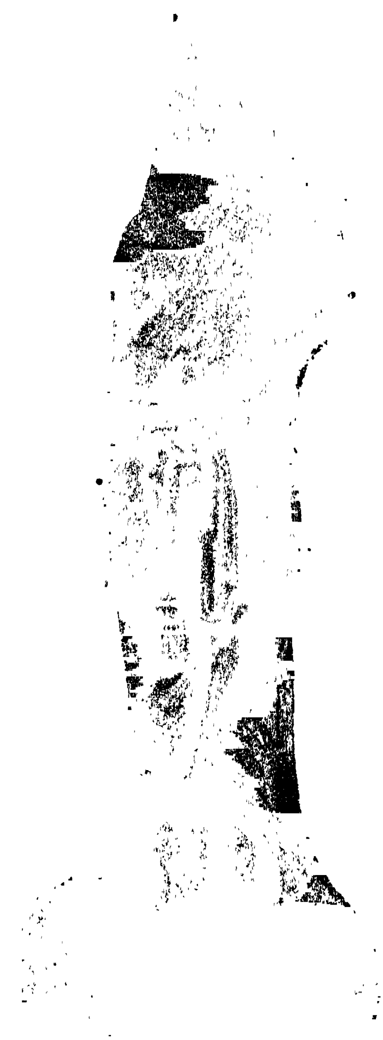
দিদারগঞ্জ মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বদেশ



দিদারগঞ্জ মূর্ত্তির বাম পার্শ্বদেশ



শিশুনাগ রাজত্বের প্রথম মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগ



শিশুনাগ রাজত্বের দ্বিতীয় মূর্ত্তির পুরোভাগ

তুলনা করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে পাটনার মূর্ত্তিদ্বয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই মূর্ত্তিদ্বয় ডাক্তার বুকানান হ্যামিল্টন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। পরে, ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইহাদিগকে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তখন কেহই ইঁহার খোঁজ ল'ন নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে প্রত্নতাত্ত্বিক ডাক্তার বেগলার ইহাদের কথা তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বড় সাহেব স্যার আলেকজান্দার কানিংহামের গোচর করেন। ১৮৭৯ অব্দে মূর্ত্তিদ্বয়কে কলিকাতা যাদুঘরে লইয়া যাওয়া হয় এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহারা সেই স্থানেই আছে। এই মূর্ত্তিদ্বয় খুব সম্ভব 'শিশুনাগ' রাজত্বে প্রস্তুত হইয়াছিল।

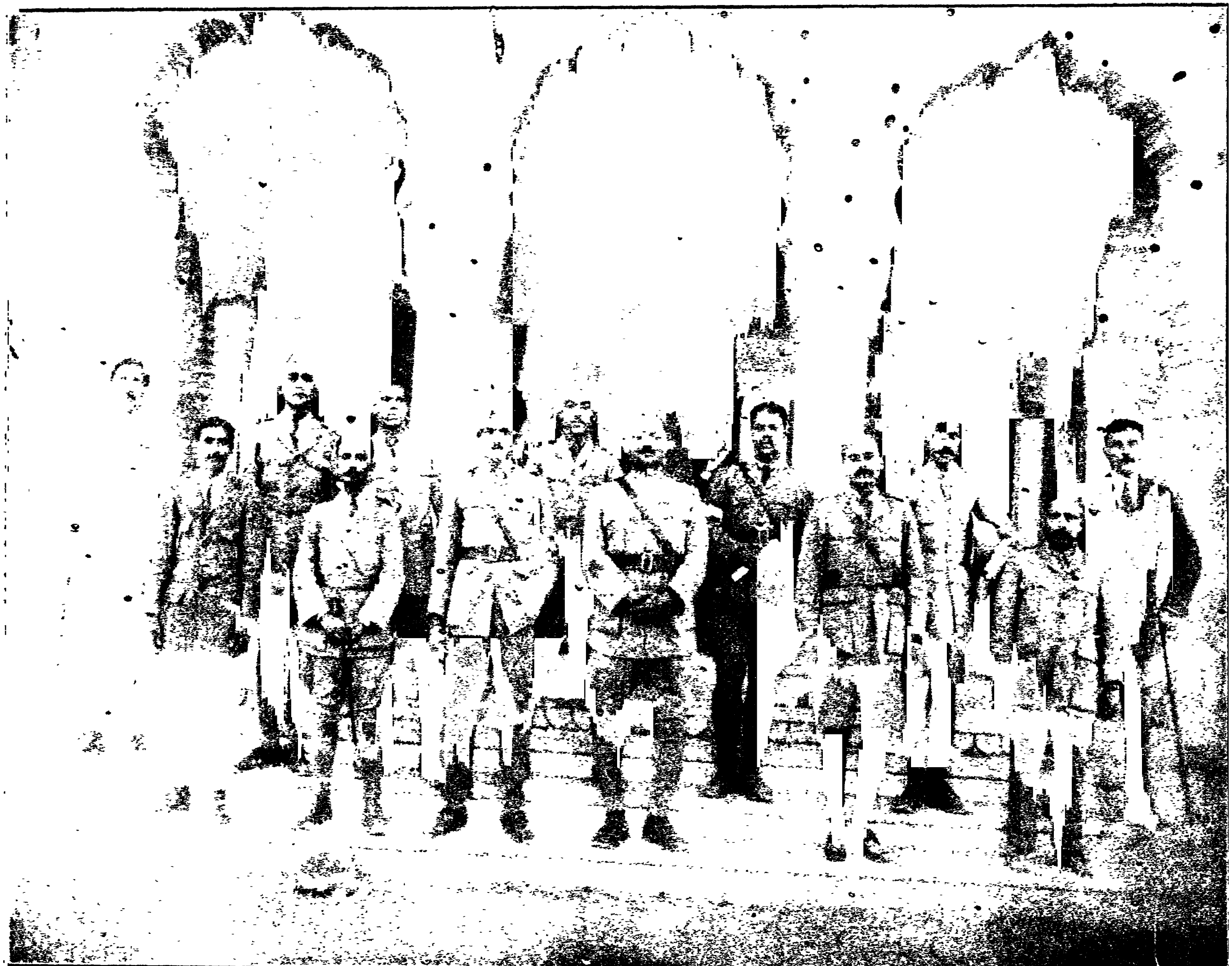
বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, দিদারগঞ্জ মূর্ত্তি ও উল্লিখিত 'শিশুনাগ' রাজত্বকালীন মূর্ত্তি একই সময়ে এবং একই



শিশুনাগ রাজত্বে মূর্ত্তিদ্বয়ের বাম পার্শ্বদেশ

সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয়ের বিচার করিবেন। আমরা দিদারগঞ্জ মূর্ত্তি আবিষ্কারের ইতিহাস পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বিদায় লইলাম। আশা আছে, প্রত্নতাত্ত্বিক সুধী বন্ধুবর রাখালদাস ইহার বিস্তৃত বর্ণনার দ্বারা আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিবেন।

আফগান-যুদ্ধে বাঙ্গালী



পূর্ব্ব পৃষ্ঠার চিত্র-পরিচয়

পশ্চাদ্ভাগে বামদিক হইতে দক্ষিণে—

শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (Field Disbursing). **শ্রীমান্ নীরোদচন্দ্র দাস** (Army Signals, Southern Lines of Communication). **শ্রীমান্ অমলচন্দ্র বসু** (107th. Labour Corps). **শ্রীমান্ সত্যসাধন ভট্টাচার্য্য** (107th. Labour Corps). ***শ্রীমান্ প্রকাশচন্দ্র দে** (Army Signals, Southern Lines of Communication), **শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র দত্ত** (Army Signals, Southern Lines of Communication). **শ্রীমান্ সরসীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** (Head Quarters, Beluchistan Cavalry Force).

সম্মুখে বামদিক হইতে দক্ষিণে—

শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মিত্র (Army Signals, Clearing House). ***শ্রীমান্ বিজয়কুমার বসু** (Army Signals, Southern, Lines of Communication). ***শ্রীমান্ হরিচরণ দাস** (Bengalee Interpreter Censor). ***শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ বসু** I. D. S. M., O. B. I., (Assistant Censor). **শ্রীমান্ রাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায়** (Army Signals, Southern Lines of Communication). **শ্রীমান্ কামিনীমোহন বসু** (Army Signals, Southern Lines of Communication).

---

*'মেসোপটেমিয়া' যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত।

নূতন বিচারপতি



কলিকাতা হাইকোর্টের নব-নিযুক্ত মাননীয় বিচারপতি
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ

শোক-সংবাদ

৺কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন দেশ-বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন ;—তাঁহার 'কেশরঞ্জন' তৈল, তাঁহার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসমূহের প্রচার আমাদের দেশে ঘরে-ঘরে ছিল। নিজের চেষ্টায় কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছেন, যথেষ্ট সদ্ব্যয় করিয়াছেন, প্রতিদিন শত শত রুগ্ন নরনারী তাঁহার ঔষধালয় হইতে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ পাইয়া রোগমুক্ত হইয়াছেন। ক্যাম্বেল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া তিনি এলোপেথিক চিকিৎসক হন নাই, কালনার প্রসিদ্ধ কবিরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি কি পৈত্রিক ব্যবসায়, কলুটোলার কবিরাজ সম্প্রদায়ের যশঃ ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন? তাই, তিনি কবিরাজী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন—ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার উপর প্রসন্না হন। তিনি আমাদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ; তাঁহার হৃদয় অতি সরল ছিল। তাঁহার উপর বয়সও বেশী হয় নাই, বোধ হয় ৫০।৫৫ বৎসর। এই বয়সেই হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ তাঁহার দেহাবসান হইল। আমরা তাঁহার বিয়োগ-সন্তপ্ত পরিবারের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺প্রসাদদাস গোস্বামী

আমাদের দাদামহাশয়—পিতার দাদামহাশয়—পুত্রের দাদামহাশয়,—পৌত্রের দাদামহাশয়—সকলের দাদামহাশয়,

প্রসন্নবদন, অমায়িক, সরলপ্রকৃতি প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয় আর ইহজগতে নাই! দাদামহাশয় শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ গোস্বামীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য চর্চ্চায় দাদামহাশয়ের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের ছায়ার ন্যায় সঙ্গী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের কল্পনা করেন, তখন দাদামহাশয়ের

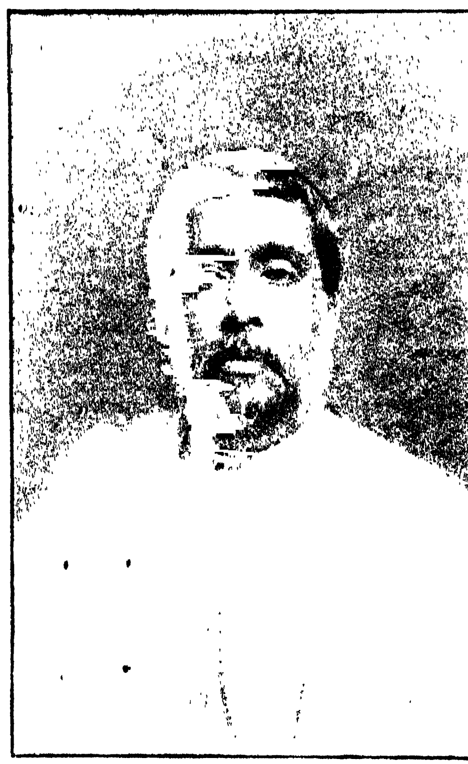


স্বর্গীয় প্রসাদদাস গোস্বামী (সুপ্রসিদ্ধ "দাদামহাশয়")

কি উৎসাহ! তিনি 'ভারতবর্ষে' অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ'কে তিনি বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। একে-একে সকলেই চলিয়া যাইতেছেন—দাদামহাশয়ও গেলেন;—কিন্তু দাদামহাশয়ের ন্যায় সকলের 'দাদামহাশয়' যে বাঙ্গালা দেশ হইতে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে, ইহাই বড় দুঃখের কথা, এমন মিষ্ট মানুষ যে আর বেশী নাই! আমরা দাদামহাশয়ের পরলোকগমনে বড়ই শোক পাইলাম; ভগবান তাঁহার আত্মার শান্তি-বিধান করুন।

অমৃতলাল সরকার।

হোমিওপেথিক-চিকিৎসক শিরোমণি পরলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দেশবিখ্যাত পুরুষ ছিলেন; পরলোকগত ডাক্তার অমৃতলাল তাঁহারই পুত্র—উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান! কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তার অমৃতলাল পিতৃ প্রদর্শিত হোমিওপেথী চিকিৎসাই অবলম্বন করেন এবং চিকিৎসা কার্য্যে বিশেষ যশঃ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় চিকিৎসার



স্বর্গীয় অমৃতলাল সরকার

দিকে, অর্থ উপার্জ্জনের দিকে ছিল না—পিতার কীর্ত্তিস্তম্ভ বিজ্ঞান মন্দির (Dr. Sarkar's Science Association) তাঁহার হৃদয়-মন অধিকার করিয়াছিল; এই কীর্ত্তি রক্ষাকল্পে তিনি জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন; তিনি এই বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যাপক, সম্পাদক বলিতে গেলে প্রাণস্বরূপ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার বিয়োগ-সন্তপ্ত পরিবারের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

দিনকতক ধরিয়া দেখিতেছি, সমস্ত ভারতময় লিমিটেড কোম্পানী গঠনের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। খবরের কাগজ খুলিলেই, রোজই প্রায় একটা করিয়া নূতন যৌথ-কারবারের পৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা দেশে কয়েকটি কাপড়ের কল, চা-বাগান, লোহার কারখানা—এই রকম সব নূতন-নূতন যৌথ-কারবার স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। অতি অল্প দিনের মধ্যে এই ব্যাপারটা দেখা যাইতেছে। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। শীঘ্রই শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা;—তাহার সহিত এই নূতন-নূতন কল-কারখানা স্থাপনের কোন সম্বন্ধ আছে কি? অথবা, অচির-ভবিষ্যতে ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব লাভের সম্ভাবনা জন্মিয়াছে কি? যুদ্ধ উপলক্ষে অনেক বড়-বড় দেশের বড়-বড় কল-কারখানা এমন ভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে যে, সেগুলির পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার অপেক্ষা নূতন-নূতন কল-কারখানা স্থাপন করা অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। কিন্তু সে ত এ দেশে নয়! সে য়ুরোপে;—আমেরিকায় বা এসিয়ায় ত নয়! তবে ভারতে সহসা এত যৌথ-কারবার গড়িবার ধুম পড়িয়া গেল কেন? স্বদেশীর সময় বঙ্গদেশে অনেকগুলা ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইতে দেখিয়াছিলাম; তাহার কয়টা এখন টিকিয়া আছে, তাহা বলা যায় না। অন্য কোন কারবারের বদলে ব্যাঙ্ক আর বীমা কোম্পানী স্থাপনের কারণ এই হইতে পারে যে, ইহাতে কল-কারখানার কোন হাঙ্গামা নাই; এবং যাঁহারা ঐ সকল কারবার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয় ত তখন মনে করিয়াছিলেন, ইহাতে কাজকর্ম্ম জানাও তত আবশ্যক নয়। সে সময়ে যাহা হাতের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ছিল,—সেই অফিস অঞ্চলে কিম্বা যে-কোন বড় রাস্তার ধারে (অফিস করিবার জন্য) খালি বাড়ী, কেরাণীগিরি করিবার জন্য বেকার যুবক, মূলধন সরবরাহ করিবার জন্য বোকা মূর্খ ধনী, বিল সাধিবার জন্য পশ্চিমা দারবান, সেয়ার বিক্রী ও বীমাকারক সংগ্রহ করিবার জন্য তথা-কথিত ক্যান্‌ভাসার, ইলেকট্রিক্ পাখা এবং,—গাঁয়ে মানে না আপনি—মোড়ল লইয়াই এই দুই কারবার স্থাপন করা যাইতে পারিত। তার পর যা থাকে অংশী-দারদের অদৃষ্টে—ম্যানেজমেণ্ট কো ক্যা! ইহাতে দায়িত্ব ত কিছুই নাই—কারবার ফেল হইল, কোম্পানী দেউলিয়া হইল, ইন্‌সলভেন্সী আদালতের আশ্রয় লইল, অথবা wind up করিল;—যার গেল তার গেল! বর্ত্তমান কারবারগুলা ঠিক সে রকম বোধ হইতেছে না ত! ইহাতে য়ুরোপীয়ান আছেন, মাড়োয়ারী আছেন, দক্ষিণ ভারতের ব্যবসায়ের ঘুণ, বড় বড় ধনী মহাজন আছেন—ইহা ত ছেলেখেলা নয়! শত-শত বৎসরের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা হঠাৎ এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া যাওয়া বিস্ময়কর নহে কি? বিশেষতঃ, বাঙ্গালা দেশে! আবার, আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল নূতন কারবারের বিবরণ বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ মূলধন সংগ্রহ করা নয়। কারবারিটি রেজেষ্ট্রি করিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে, বিজ্ঞাপনে প্রধানতঃ এই কথাটিই সাধারণকে জানানো উদ্দেশ্য। সাধারণকে কারবারের অংশ গ্রহণের সুযোগ অতি অল্পই দেওয়া হইতেছে। প্রায়ই দেখিতেছি, বিজ্ঞাপনে লেখা হইতেছে,—সমস্ত সেয়ার বিক্রীত হইয়া গিয়াছে—একেবারে fully paid up! ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের দরুণ বোম্বায়ের তুলার কলগুলির লাভ-লোক-সানের একটা মোটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে। এসোসিয়েটেড প্রেস বোম্বাই হইতে কলিকাতায় সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, জে, এ, ডবলিউ স্বাক্ষর করিয়া বোম্বাইয়ের একজন নেতৃস্থানীয় কলওয়ালা "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" পত্রে বোম্বায়ের তুলার কলগুলির অবস্থার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ বৎসর বোম্বাইয়ের তুলার কল-ওয়ালাদের মোট ৪৯৭০০০০০ টাকা লাভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে অবশ্য পরিচালকবর্গের কমিশন ৬১৫০০০০ টাকা ধরা হইয়াছে। উহা বাদে অবশিষ্ট লভ্যাংশ হইতে ২৩৯০০০০০ টাকা অংশীদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত লাভের টাকার শতকরা ৪৫·৬৬ অংশ কাপড়ের কলগুলি হইতে লব্ধ; এবং ইহার মধ্যে শতকরা ২৪·২৮ টাকা অংশীরা পাইয়াছেন। যে সকল কলে কেবল সূতা কাটা হয়, সেই সকল কলের লভ্যাংশের পরিমাণ শতকরা ৬·৬৫; তন্মধ্যে অংশীরা পাইয়াছেন শতকরা ৩·৩৯ অংশ। ইহা হইতে অনুমান করা হইতেছে, সূতার কলগুলির মজুত টাকায় (reserve funds) হাত পড়িয়াছে। উক্ত বৎসর তুলার কলগুলির মজুরেরা তাহাদের পারিশ্রমিক হিসাবে মোট ৪১২০০০০০ টাকা পাইয়াছে। সমগ্র ভারতের তুলার কলগুলিতে এখন মোট তাঁতের সংখ্যা ১১৬০০০, এবং চরকার সংখ্যা ৬৬৫৩০০০। এই সকল কলে মোট ২৮২০০০ মজুর কাজ করে এবং বৎসরে ৬৬৫৩০০০ গাঁইট তুলা খরচ হয়। কিন্তু ১৯১৭ অব্দে যত গাঁইট তুলা লাগিয়াছিল, ১৯১৮ অব্দে তদপেক্ষা ১১০০০০ গাঁইট তুলা কম খরচ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৬৩১১০০০০০ পৌণ্ড সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর ইহাপেক্ষা শতকরা ৩ অংশ বেশী সূতা কাটা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৩৯ কোটী পৌণ্ড সূতা স্থানীয় কাপড়ের কলসমূহে খরচ হইয়াছে, এবং তাহা হইতে ৩৮১০০০০০ পৌণ্ড ওজনের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আর ১১৯১০০[illegible] পৌণ্ড

সুতা বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। ভারতেরই অন্যান্য কলে বা অন্য কাজে ২০ কোটী পৌণ্ড সুতা লাগিয়াছে। লেখক মহাশয় আশা করিতেছেন যে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে লাভের পরিমাণ ৮ কোটী টাকা হইতে পারে; কারণ, ভারতীয় তুলার কলসমূহের সময় এখন খুব ভাল যাইতেছে। এখন লাভের পরিমাণ প্রতি পৌণ্ড কাপড়ে আট আনা এবং প্রতি পৌণ্ড সুতায় পাঁচ আনা। তাই বুঝি বাঙ্গালায় কয়েকটি নূতন তুলার কল স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে?

চুরি একটী বিদ্যা এবং তাহা একটী বড় বিদ্যা, অবশ্য ধরা না পড়িলে। চুরি একটী বৃত্তি বা পেশা এবং খুব লাভকরও বটে। শুনিতে পাই, চোরদের দল আছে, সমাজ আছে। তাহারা আশ্রিত-বৎসল, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তাহাদের মধ্যে honour, dishonourএর কারবারও হইয়া থাকে। কোন চোর ধরা পড়িয়া জেলে গেলে, তাহার পরিবারবর্গকে না খাইতে পাইয়া মরিতে হয় না; দলপতির সুব্যবস্থায় অন্যান্য চোরেরা ঐ অনাথ পরিবারকে সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। য়ুরোপের অন্ততঃ একটা দেশের চোরদের আচরণ আবার আরও একটু বিচিত্র। য়ুরোপে সকল শ্রেণীর লোকেরাই প্রায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করে, এবং কথায় কথায় ধর্ম্মঘট করিয়া থাকে। সম্প্রতি একখানি প্রভাতী ইংরেজী দৈনিকে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে:—"THIEVES ON STRIKE.—Strike fever is pretty contagious, but so far, unhappily, it has not spread to our professional criminals. In Warsaw, if we may credit a French contemporary, all the thieves went on strike a few years ago. This action was heralded by the display in various quarters of the town of a printed proclamation announcing that 'The Associated Thieves of Poland intend to abandon their occupation, owing to the heavy demands made on them by the police. For years we have been blackmailed of half our gains, and now they inform us we must give them three-quarters, leaving only a beggarly 25 kopecks out of every rouble stolen. Unless the police lower their demands, we shall be compelled to strike, the game not being worth the candle.' This proclamation reads like a burlesque, yet it appears to have been taken seriously by the authorities." অর্থাৎ, পুলিশের দাবী মিটাইতে না পারিয়া পোলাণ্ডের চোরেরা ধর্ম্মঘট করিতে ইচ্ছা করিয়া ওয়ার্স নগরের রাস্তায় রাস্তায় দেওয়ালের গায়ে প্ল্যাকার্ড লটকাইয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বে চোরদের সঙ্গে পুলিশের আধাআধি বখরার বন্দোবস্ত ছিল; পরে পুলিশ চোরদের নিকট হইতে বারআনা অংশের দাবী করে। ইহাতে পোষাইবে না দেখিয়া চোরেরা ধর্ম্মঘট করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। পাঠকেরা এই সংবাদটির মজাটুকু উপভোগ করুন। আমাদের মনে এ সম্বন্ধে কেবল দুইটী প্রশ্ন জাগিতেছে। পোলাণ্ডের চোরেরা ধরা পড়িলে তাহাদিগকে জেলে যাইতে হয় কি? আর, পুলিশ চোরদের নিকট হইতে যে আধাআধি বখরা আদায় করে, তাহা পোলাণ্ডের রাজ-সরকারে জমা দেয় কি?

কলিকাতা সহরের লোকসংখ্যা দিন-দিন বাড়িয়া যাওয়ায়, এবং নূতন-নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ায়, লোকের বাস করিবার স্থানাভাব ঘটিতেছে। এই কারণে সহরের উপকণ্ঠগুলিতে লোকের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিবার প্রস্তাব অনেক দিন ধরিয়াই চলিতেছে। কিন্তু উপকণ্ঠে বাস করিলেও, বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে লোক সকলকে সর্ব্বদা সহরে যাতায়াত করিতে হইবে। অতএব সহরতলীতে লোককে বাস করাইতে হইলে, যাতায়াতের পথ সুগম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ট্রাম ও রেল লাইন স্থাপন করিয়া সুলভে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিলে, সহরতলী হইতে সহরে অল্প ব্যয়ে যাওয়া-আসা চলিলে, লোকে নিশ্চিন্ত মনে সহরতলীতে সুখে বাস করিতে পারে; এবং সহরে বাসের স্থানাভাবের অবস্থা অনেকটা দূর হইতে পারে। আমরা এই অসুবিধা ও অভাব অনেক দিন হইতেই বোধ করিতেছি; কিন্তু তেমন করিয়া চাহিতে জানি না, ঠিক মত অভাব অসুবিধার কথা জানাইতে পারি না বলিয়া আমাদের দুঃখও ঘুচে না। সাহেবেরা যেমন চট্ করিয়া তাঁহাদের অভাব বুঝিতে পারেন, তেমনি জোর গলায় তাহা জানাইতে পারেন এবং ততোধিক জোরের সহিত অভাব মিটাইবার দাবী করিতে পারেন। তাই তাঁহারা সহজে পাইয়াও থাকেন। কলিকাতা সহরের সাহেব-পল্লীগুলি কেমন সুন্দর, পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন! ইহা দেখিলেই বুঝা যায়, কেমন করিয়া আদায় করিতে হয়, তাহা তাঁহারা খুব ভাল রকম জানেন। কলিকাতা সহরে বাড়ীর ভাড়া ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। সাহেবেরা প্রায় ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকেন। বাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধির অসুবিধা তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ অনুভব করিতে হইয়া থাকে। কাজেই, এখন অসহ্য হওয়ায় তাঁহারা ঘোর আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। অচিরে কোন না কোন রকম প্রতিকারও হইবেই। তার পর, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কল্যাণে সহরে তাঁহাদেরও স্থানাভাব ঘটিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সহরতলীতে যাইয়া বাস করিবার কল্পনা করিতেছেন। অমনি যাতায়াতের অসুবিধার কথাও তাঁহাদের চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে, এবং সংবাদপত্রে এই চিন্তা অভিব্যক্ত হইতেছে। ফলে, বিদ্যুতের শক্তিতে সহরতলীতে রেলগাড়ী চালাইবার কথাও উঠিয়াছে। এমন কি, এই বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের পর্য্যন্ত টনক নড়িয়াছে। কথা হইতেছে, কলিকাতা হইতে চারিদিকে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত স্থানগুলি রেলওয়ের দ্বারা কলিকাতার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে, এবং এই রেলপথগুলিতে

বিদ্যুতের শক্তিতে ট্রেণ চালাইতে হইবে। তাহা হইলে অল্প ভাড়ায় এই সকল স্থানে যাতায়াত চলিবে। ক্রমে-ক্রমে এই স্থানগুলি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, এবং সেই সকল লোক কেবল কর্ম্ম উপলক্ষে দিনের বেলা সহরে থাকিবে, এবং কর্ম্মান্তে দিবাবসানে নিজ-নিজ গৃহে চলিয়া যাইবে। তাহা হইলে, সহরে লোকের তেমন ঘন বসতি না থাকায়, স্বাস্থ্যের অবস্থাও উন্নত হইতে পারিবে। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সভাতেও সহরতলীতে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করিবার প্রসঙ্গের আলোচনা চলিতেছে। এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে, অচির-ভবিষ্যতে কলিকাতা সহরের শ্রী অন্য রকম হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে, এরূপ আশা স্বচ্ছন্দে করিতে পারা যায়।

কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার-সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কলিকাতা নগরে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার সম্বন্ধে ও তাহার প্রসার বৃদ্ধি কল্পে অনুসন্ধান করিবার জন্য কর্পোরেশন হইতে একটী স্পেশিয়াল কমিটি গঠিত হইয়াছিল। সেই কমিটি ১৯১৯ অব্দের ২৮শে আগষ্ট তারিখে একটি রেজোলিউসন প্রস্তুত করেন। সম্প্রতি কর্পোরেশনের একটি বৈঠকে উক্ত রেজোলিউসনটি আলোচিত হইয়াছে। রেজোলিউসনের মর্ম্ম সংক্ষেপে এইরূপ:—কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য শিক্ষাবিভাগের অস্থায়ী ডাইরেক্টার মাননীয় মিঃ টি, ও, ডি, ডান একটি 'স্কীম' প্রস্তুত করেন। তদনুসারে কয়েকটি মডেল স্কুল স্থাপনের কল্পনা হয়, এবং নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতিসাধনের প্রস্তাব হয়। আর, শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য একটি ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবও হয়। কর্পোরেশন এই 'স্কীম'টি গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। স্পেশিয়াল কমিটি আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলির পরিচালনের ভার যদি কর্পোরেশনের হাতে থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থার ব্যয়ভারের দুই-তৃতীয়াংশ বহন করিবেন, কর্পোরেশন অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় প্রদান করুন ; এবং গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষা দান কল্পে যে নিত্য ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি সাধনার্থ তদতিরিক্ত যাহা কিছু ব্যয় হইবে, কর্পোরেশন তাহাই প্রদান করিবেন। মিঃ ডানের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হইলে, কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার জন্য থোক কুড়ি লক্ষ টাকা, এবং নিত্য ব্যয় বাৎসরিক পৌনে দুই লক্ষ টাকা পড়িবে। কমিটির প্রস্তাবানুসারে কর্পোরেশন থোক টাকার এক-তৃতীয়াংশ দিবেন ; এবং নিত্য ব্যয়ের যেটুকু কম পড়িবে সেইটুকু পোষাইয়া দিবেন। গবর্ণমেণ্ট এখন কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কত টাকা বাৎসরিক বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। সুতরাং এ কথাটা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু থোক টাকা কর্পোরেশন যাহা দিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার দ্বিগুণ দিবেন, অথচ স্কুলগুলি কর্পোরেশনের হাতে থাকিবে। কেন, গবর্ণমেণ্ট কি অপরাধ করিলেন? সে যাহা হউক, স্কুলগুলি কর্পোরেশনের হাতে রাখিতে জনসাধারণ সম্মত হইবেন কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। কর্পোরেশনের কার্য্য যেন অনেকটা বারোয়ারীর কাণ্ড, এবং উহার কার্য্যের জন্য কাহার কতটা দায়িত্ব বোধ আছে তাহা ভাল বুঝা যায় না। এরূপ স্থলে, এত বড় একটা নগরের প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত গুরুতর বিষয়ের পরিচালন-ভার খাস সরকারের হাতে থাকাই আমরা সঙ্গত মনে করি।

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে চলিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা হয়। এত দিনে এই বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়াছে, এবং সাধারণ্যেও প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঢাকার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটী বিলটি তদনুসারে বিরচিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় একাধারে শিক্ষা দান করিবেন এবং পরীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক উপাধিও বিতরণ করিবেন। ছাত্রগণকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বাস করিতে হইবে। অর্থাৎ, ইহা অনেকটা আমাদের প্রাচীন কালের চতুষ্পাঠীর ধরণের শিক্ষা-কেন্দ্র হইবে। তফাতের মধ্যে এই যে, সেকালের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ যেমন ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেন, এবং ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা হইবে না। ইহা একালের জিনিস;—ছাত্রদিগকে সমস্ত ব্যয়ভার নিজেদেরই বহন করিতে হইবে ; এবং সে খরচটাও নিতান্ত কম হইবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন প্রধানতঃ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, এখানে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা যেমন কম, (যদিও এখন কিছু কিছু হইতেছে)—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যেমন বহুসংখ্যক স্কুল-কলেজ আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক তেমনটা হইবে না ; ইহা একটু নূতন ধরণের হইবে। সে যাহা হউক, একে-একে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তবে ভাবনার বেশী কারণ নাই। ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইলেও যেমন কলিকাতার কোন ক্ষতি হয় নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেইরূপ কোন ক্ষতি হইবে না,—বিশ্ববিদ্যার বিস্তৃতির সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত ক্ষতি পোষাইয়া যাইবে।

শক্তিসাধক মানুষ প্রকৃতির ভাণ্ডারের যতটুকু শক্তির সন্ধান পাইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজের কাজে লাগাইয়াছে ; কয়লা, জল, বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির উপাদান আজ মানুষের দাসত্ব করিতেছে। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক ; মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষাও আবার ততোঽধিক। যে সকল উপাদান হইতে এখন

শক্তি সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহাদের ভাণ্ডার অফুরন্ত নহে। তাহাদের ক্ষয় আছে। সেই জন্য মজুত শক্তির উপাদানে আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। এই কারণে মানুষ নিত্য নূতন শক্তির সন্ধানে নিযুক্ত রহিয়াছে। একদল বৈজ্ঞানিক সমুদ্র এবং বড় বড় তরঙ্গ হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া তদ্দারা কলকারখানা চালাইবার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর কি না, তাহার উপায়ের অনুসন্ধান করিতেছেন। আর একদল বৈজ্ঞানিক শক্তির সন্ধানে ভূগর্ভ তোলপাড় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সম্প্রতি মাননীয় সার চার্লস পার্সন্স বোর্ণমাউথে বৃটিশ এসোসিয়েসনের একটি বৈঠকে সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভায় একটি বক্তৃতায় তিনি, যুদ্ধ উপলক্ষে যে সকল নূতন-নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের কিছু-কিছু পরিচয় দেন। এক্ষণে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে রেলপথগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রেলগাড়ী চালাইবার যে প্রস্তাবের আলোচনা চলিতেছে, যুদ্ধ উপলক্ষে বহুকাল পূর্ব্বেই বৃটেনে সেইরূপ ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে, খুব অল্প খরচে তথায় রেলগাড়ী চলিতেছে; এবং খুব ঘন-ঘন ট্রেন চালানো যাইতেছে। বিদ্যুতের বেশী পরিমাণে সাহায্য গ্রহণের কারণ আর কিছুই নয়,—ইহাতে কয়লার খরচ খুব কম হয়। তথাপি, এখন ইংলণ্ডে যে পরিমাণ কয়লা খরচ হইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, ইংলণ্ডের কয়লার খনিগুলি অচিরে কয়লাশূন্য হইয়া যাইবে, এবং কয়লার জন্য বিদেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে। এরূপ অবস্থা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। এই কারণে নূতন নূতন শক্তি-কেন্দ্রের অনুসন্ধানের দিকে ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সার চার্লস পার্সন্স ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ভূগর্ভে ১২ মাইল পর্য্যন্ত একটী সরল সরু সুড়ঙ্গ খনন করিতে হইবে। এই সুড়ঙ্গটি প্রস্তুত করিতে আনুমানিক ব্যয় পড়িবে ৫০০০০০০০ পাউণ্ড এবং ৮৫ বৎসরে সুড়ঙ্গটি প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। মণ্ট্রিয়েল নগরের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আডাম্‌স্ এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চুণের পাথরযুক্ত স্থানে ১৫ মাইল গভীর এবং গ্র্যানাইট পাথরযুক্ত স্থানে ১৩ মাইল গভীর সুড়ঙ্গ খনন করা যাইতে পারে। প্রোফেসর আডাম্‌সের বিশ্বাস, সার চার্লস পার্সন্সের প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইলে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি করা যাইতে পারিবে। ইটালী দেশের অন্তর্গত লাড্‌ডারেলো নামক স্থানে ভূগর্ভ খনন করিয়া উচ্চ ক্রমের 'ষ্টীম' (বাষ্পশক্তি) বাহির করিয়া ১০০০০ ঘোড়ার জোর ইঞ্জিন চালানো হইতেছে। সম্প্রতি নেপলসের কাছেও ঐরূপে শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। আগ্নেয় গিরির সান্নিধ্যে ভূগর্ভ খনন করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শক্তি সঞ্চয় করা খুবই সম্ভবপর।

জার্ম্মাণীকে কাবু করা, দেখিতেছি, বড় সহজ ব্যাপার নহে। জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু আর একটা মস্ত বড় যুদ্ধ এখনও বাকী রহিয়াছে; এবং সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই বিরাট উদ্‌যোগ আয়োজন চলিতেছে। সেটা হচ্চে, বাণিজ্য-সমর। এই বাণিজ্য যুদ্ধে মারামারি-কাটাকাটি যদিও নাই, তথাপি, ইহাতে জয়-পরাজয়ের উপর অনেক দেশের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য, অনেক জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করিয়া থাকে। মারামারি-কাটাকাটির যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণী বাণিজ্য-যুদ্ধে প্রায় জগজ্জয়ী হইয়া, অপরাপর জাতি সকলের আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। জার্ম্মাণীর রাসায়নিক পণ্য,—যথা রং, ঔষধ প্রভৃতি—খুবই ভাল। আর, কতক পণ্য কেবলই ফাঁকি; কিন্তু সেগুলা দেখিতে সুন্দর, এবং—ক্রেতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা লোভনীয়, সেই—দরে সস্তা। জার্ম্মাণীর ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি জিনিসগুলি বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী; কাটা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ; কিন্তু সেগুলা কেমন চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে! তাহাতে ইস্পাতের নাম-গন্ধমাত্র নাই; কিন্তু, কে অত যাচাই করিয়া লয়! তাহার দাম খুব কম, প্রায় জলের দাম বলিলেই হয়। কাজেই, তাহাদের কাটতিও খুব বেশী। জার্ম্মাণীর অধিকাংশ পণ্যের সম্বন্ধেই প্রায় এই কথা বলা যাইতে পারে। এইরূপে জার্ম্মাণী সস্তায় সুন্দর কিন্তু অকর্ম্মণ্য পণ্যের বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় প্রায় সমস্ত পৃথিবীকে হারাইয়া দিতে বসিয়াছিল। এদিকে আবার জার্ম্মাণী চতুরতায় অপর সকল জাতির সেরা। জার্ম্মাণী যখন যুদ্ধ অনিবার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারিল, তখন অপর সকল জাতিকে প্রস্তুত হইবার অবসর মাত্র না দিয়াই, অগ্রসর হইয়া বেলজিয়ম, ও ফ্রান্সের উত্তরাংশ অধিকার করিয়া বসিল; এবং এই দুইটী স্থানকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়া ফেলিল। রণাঙ্গনে পরিণত হইয়া এই দুইটী দেশ প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ওদিকে জার্ম্মাণীর নিজের বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না; কলকারখানা প্রায় অক্ষুণ্ণই রহিল। আবার, জার্ম্মাণ জাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার কলকারখানা, বা শ্রমজীবীদের সে স্পর্শও করিল না। তার পর, যুদ্ধ স্থগিতের সন্ধিপত্র (Armistice) স্বাক্ষরিত হইবামাত্র, এই সকল কলকারখানায় আবার কাজ আরম্ভ হইল। The explosives chemical expert of the United States Bureau of Aircraft Production, Washington,—Dr. Edward C. Worden লণ্ডন টাইমসে এই সকল কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, জার্ম্মাণীর রসায়নবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহের উপায় বাহির করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর কারখানায় এই উপায়ে প্রচুর নাইট্রোজেন সংগৃহীত হইবে, এবং তাহার রীতিমত ব্যবসায় চলিবে। এই নাইট্রোজেন জিনিসটি জমির অতি উৎকৃষ্ট এবং অত্যাবশ্যক সার। আমরা কিছুকাল পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর খনিজ ঐশ্বর্য্যের প্রসঙ্গে তাহার 'পটাশ'-সম্পদের কিছু পরিচয় দিয়াছি। সেটিও জমির অতি উৎকৃষ্ট সার। পটাশ ও নাইট্রোজেনের সাহায্যে জার্ম্মাণীর কৃষি-কার্য্য খুব ভাল রূপই চলিবে। নিজের ব্যবহারের উপযোগী পটাশ ও নাইট্রোজেন রাখিয়া উদ্বৃত্ত অংশটা জার্ম্মাণী বিদেশে রপ্তানী করিয়া যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয়ও করিতে পারিবে। শুধু তাই নয়। যে

সকল কলকজার সাহায্যে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হইবে, দরকার হইলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই সকল কলকজাকে বিস্ফোরক পদার্থ উৎপাদনের কলকারখানায় পরিণত করা চলিবে। ডাক্তার ওয়ার্ডেনের বক্তব্যের ইহাই সার মর্ম্ম। ডাক্তার ওয়ার্ডেন আরও বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের কারখানাগুলি যুদ্ধের সময়েও বরাবরই কার্য্য আরম্ভ করিবার উপযোগী অবস্থায় প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল। সেই সকল কারখানায় যত লোক কাজ করিতে পারে, তাহারাও প্রস্তুত ছিল এবং এখনও হাজির আছে। ইহাদিগকে যদিই যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন কার্য্য করিতে হইয়া থাকে, তবে তাহা হয় কেরাণী-গিরি, না হয়, ঘরে বসিয়া যেসব কাজ করা যাইতে পারে, তাহাই করিতে হইয়াছে,—তাহাদের কাহাকেও ইউনিফরম পরিয়া, সৈন্য দলভুক্ত হইয়া হাতিয়ার লইয়া দেশের বাহিরে যুদ্ধ করিতে পাঠানো হয় নাই। জার্ম্মাণীর রং ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার কারখানাগুলি ত ঠিক আছেই, আবার রাইন নদীতীরে লাডউইগসাফেনের কাছে ওপাউ নামক স্থানে Haber plant of the Badische Anilin and Soda Fabrik নামক কারখানায় নাইট্রোজেন প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আপাততঃ ৯০০০ লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সর্ব্বসমেত এইরূপ সাতটা কারখানা স্থাপন করিবার কল্পনা হইয়াছে। এই নাইট্রোজেন জিনিসটি কেবল জমির সার নহে,—উহা বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করিবার অন্যতম প্রধান উপাদান। সুতরাং আবার যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী এই নাইট্রোজেন হইতে বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করিতেও পারিবে। জার্ম্মাণীতে এখন যে বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে, তাহাও সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। উহা সত্যিকারের, কিম্বা সাজানো, এইরূপ সন্দেহ হয়। এখন পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন, জার্ম্মাণীকে জব্দ করা কতদূর কঠিন ব্যাপার।

দুঃখ করিব কাহাদের জন্য? দেশে চাউল নাই, দুর্ভিক্ষের কল্যাণে লোকে আত্মহত্যা করিতেছে; ক্ষুধার তাড়নায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দলবদ্ধ হইয়া লোকে হাট লুঠ করিতেছে; সন্তানকে খাইতে দিবার সামর্থ্য না থাকায় লোকে দুই-তিন টাকা দামে নিজের ছেলে-মেয়েদের বিক্রয় করিতেছে—এই রকম সব দুর্ভিক্ষের নানা সংবাদে খবরের কাগজ পূর্ণ। অথচ, আগামী পাটের ফসলের সরকারী আনুমানিক চূড়ান্ত হিসাবে দেখিতেছি, এবার ১৫ লক্ষ গাঁইট বেশী পাট উৎপন্ন হইতে পারে; অর্থাৎ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ৭০১৯০৮৮ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৮৪৮৬২৩৪ গাঁইট হইবার সম্ভাবনা। পাটের দাম কমিয়া যাওয়ায় খবরের কাগজে অনেক কাঁদুনী দেখিয়াছি। কিন্তু পাটের দাম না কমিবে কেন? যে সময়কার উৎপন্ন পাটের দাম খুব কম ছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ১০৫০০০০০ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। মাল বেশী উৎপন্ন হইলে বা বাজারে আমদানী হইলে, এবং খরিদদার বেশী না থাকিলে মালের দাম যে কমিবেই ইহাই ত বাণিজ্যের সাধারণ নিয়ম। আজ চাষার ঘরে ধান নাই, সেইজন্য চাষা না খাইতে পাইয়া মরিতেছে। মালের কম্‌তির দরুণ চালের বাজার অগ্নিমূল্য। অথচ ১৫ লক্ষ গাঁইট পাট বেশী উৎপন্ন হইল! বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া, উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিয়া অল্প জমিতে যে ভাবে বেশী শস্য উৎপাদনের চেষ্টা হয়, সেই ভাবে এই অতিরিক্ত পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইলে অবশ্য সুখের বিষয় হইত। কিন্তু তাহা ত হয় নাই। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ২৮২১৫৭৫ একার জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে; অর্থাৎ, ১৯১৮ অব্দে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল, এ বৎসর তদপেক্ষা ৩২১১৯৩ একার বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। এই অতিরিক্ত জমির পরিমাণ ত বড় কম নয়! সকলেই জানেন ধানের জমিতে ভিন্ন অন্য জমিতে পাটের চাষ ভাল হয় না। এই ৩২১১৯৩ একার জমি নিশ্চয়ই ধান্যের চাষের উপযোগী,—কিম্বা হয় ত, ধানেরই জমি। এই জমিতে পাট উৎপন্ন না হইয়া যদি ধান উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে কত সুখের বিষয় হইত বলুন দেখি?

সম্প্রতি "বরিশাল হিতৈষী" পত্রে, বাঙ্গলা দেশ হইতে জুলাই মাসে বিভিন্ন দেশে চাউলের রপ্তানীর একটা তালিকা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই তালিকাটি অন্যান্য (মাসিক ও সাপ্তাহিক প্রভৃতি) পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরাও সেই তালিকা উদ্ধৃত করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। কারণ, তাহা অনেকগুলি সাময়িক পত্রে উদ্ধৃত হওয়ায় সকলেই সম্ভবতঃ তাহা পাঠ করিয়াছেন। (এবং তাহা পাঠ করা, ও দুই দিন বাদে তাহার কথা ভুলিয়া যাওয়া ছাড়া তাহার দ্বারা আর কি কাজ হইতে পারে?) এই তালিকায় দেখানো হইয়াছে যে, বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের বৎসরেও বাঙ্গালা দেশ হইতে বহু পরিমাণে চাউল বাহির হইয়া গিয়াছে। এইরূপ তালিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য যে কি তাহা বুঝিতে অবশ্য কাহারও বাকী নাই। কিন্তু ইহাতে কি ফল ফলিতে পারে? যাঁহারা চাউল রপ্তানীর জন্য দুঃখ করিতেছেন, তাঁহারা চাষাদিগকে পাটের চাষ কমাইতে প্রবৃত্তি দিতে পারিতেন না কি? চাষারা ত আমাদেরই দেশের লোক; তাহারা কি দেশের নেতাদের কিম্বা সংবাদপত্র পরিচালকদের কথা শুনিতে পারে না? কিন্তু তাহা যদি তাহারা না শুনিতে চাহে, যদি ক্রমাগত বেশী পরিমাণে পাটের চাষ করিয়া যায়, তাহা হইলে চাউল রপ্তানীর জন্য দুঃখ করিলে চলিবে কেন? আগে ঘর সামলাইতে হয়; তবে পরের দোষ দেখিবার অধিকার পাওয়া যায়। নচেৎ ঐরূপ তালিকা প্রকাশের কোন সার্থকতা দেখা যায় না। পাটের চাষ যে ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে কোন ভুল নাই। তার সাক্ষ্য দেখুন,—১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৬৬০০০০০ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। আর, ১৯০৯ অব্দে ৯০০০০০০ গাঁইট, ১৯১২ অব্দে ১০০০০০০০ গাঁইট এবং ১৯১৫

অব্দে ১০৫০০০০০ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। চাউলের বাজার এখন খুবই গরম তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ত নিতান্ত হঠাৎ হয় নাই। গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই চাউলের দাম ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। প্রত্যেক ক্ষেপ চাউল কিনিতে গিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষেপের অপেক্ষা কিছু না কিছু বেশী দাম দিতে হইতেছে। চাউল রপ্তানী হওয়ায় অনেকে গবর্ণমেণ্টকে দোষী করিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রেঙ্গুন হইতে চাউল আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তবু ত কই দেশী ও বালাম চাউলের দাম কমিল না। সুতরাং রপ্তানী বন্ধ হইলেই যে চাউলের দাম কমিত, তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। কারণ, কিছুদিন পূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল, রেলপথে মাল চালান দিবার খুব কড়াকড় ব্যবস্থা হইবার সময়ে, মহাজনের ঘরে বহু পরিমাণ চাউল মজুত থাকা সত্ত্বেও, চাউলের দাম কমে নাই। আর, এই যে অগ্নিমূল্যে চাউল বিক্রীত হইতেছে, এই দাম কি কখনও কমিবে বলিয়া মনে করেন? বাণিজ্যের গতিক আমরা যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে চাউলের বর্ত্তমান মূল্য অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে কমিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। চাউলও রপ্তানী হয়, পাটও রপ্তানী হয়। কিন্তু চাউল অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইতেছে; অথচ পাটের দাম নাই বলিলেই হয়। কেন এরূপ হয়? কেবল খবরের কাগজে কাঁদুনী গাহিলে বা বিদেশী বণিককে দোষী করিলে চলিবে না। এই বাণিজ্যের রহস্যের সমাধান করিতে হইলে, বাণিজ্যক্ষেত্রে নামিয়া প্রাকটিক্যাল কাজ করিতে হইবে; ব্যবসায়-বাণিজ্যের কোন সন্ধান না রাখিয়া তফাতে থাকিয়া যাদুর গায়ে হাত বুলাইলে দেশের দুর্দ্দশা দূর হইবে না। বিদেশী বণিক—র‍্যালি গ্রেহামের দোষ কি? তাহাদের মত বাণিজ্য করিতে কে আমাদিগকে বাধা দিতে পারে? বাঙ্গলায় সস্তা চাউল আর পাট কিনিয়া বিদেশে তাহা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া নিশ্চয়ই লাভ করা যায়। তবে সে ব্যবসায়ে আমরাই বা হাত দিই না কেন? তাহা হইলে বাহিরের টাকা ঘরে আনিতে পারি; এবং বিদেশী বণিকের দোষ দেখিয়া নিজেদের অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিতে হয় না। আমরা উদ্যোগী হইলে আমাদিগকে এই সকল ব্যবসায় করিতে কেহ বাধা দিতে বা নিবারণ করিতে পারেন না। দক্ষিণ ভারতের টাটা পরিবার আজ কাল ভারতের, শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর আদর্শ বণিক। তাঁহারা কেমন করিয়া বাণিজ্য চালাইতেছেন? অথচ, তাঁহারাও ত ভারতবাসী! আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, ইংলণ্ডে, জাপানে এবং হয় ত আরও অনেক দেশে তাঁহাদের শাখা কার্য্যালয় আছে। সেই সকল শাখা কার্য্যালয়ের সাহায্যে তাঁহারা ভারতে এবং দেশ-বিদেশে নানা প্রকার ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতেছেন। যাঁহারা ইঙ্গিত করেন যে, ভারতবাসী বলিয়া আমরা বাণিজ্যের অনেক অধিকারে বঞ্চিত, তাঁহাদিগকে আমরা টাটা কোম্পানীর বাণিজ্যে সফলতা লাভের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। নিজেরা উদ্যোগী হইয়া কাজ না করিলে, কেবল পরের দোষ দেখিলে, সফলতা লাভ করা কঠিন। তাহাতে কেবল নিজেদেরই অযোগ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়। যোগ্য লোকে নিজেদের উন্নতির চেষ্টাই করিয়া থাকেন, পরচ্ছিদ্রানুসন্ধানের অবসর তাঁহাদের নাই।

মেসার্স দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেডের ১৯১৮-১৯ অব্দের একখানি রিপোর্ট কোনক্রমে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে আমাদের জানিবার অনেক কথা আছে। এই কোম্পানীর মূলধন এখন ৬০৫২১২৫০০ টাকা। ১৯১৯ অব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কোম্পানীর খরচ-খরচা বাদ (net) লাভ হইয়াছে ৩৯১৮৩৮৪ টাকা ১৫ আনা ৮ পাই। ইহার সহিত আগের বৎসরের উদ্বৃত্ত ৪৬৭৯২৭ টাকা ১৩ আনা ১ পাই যোগ করিয়া মোট ৪৩৮৬৩১২ টাকা ১২ আনা ৯ পাই লাভ দাঁড়াইতেছে। ইহার সহিত রিজার্ভ ফাণ্ড হইতে ৭০০০০০ টাকা আনিয়া যোগ করা হইয়াছে। ফলে কোম্পানীর লাভের খাতে এবার ৫০৮৬৩১২ টাকা ১২ আনা ৯ পাই মজুত হইতেছে। এই টাকার ভিতর হইতে Depreciation Fund Accountএ ২১ লক্ষ টাকা, এবং ট্যাক্স ইত্যাদি বাবদ ১৭৫০০০০ টাকা স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে। এই ৩৮৫০০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ১২৩৬৩১২ টাকা ১২ আনা ৯ পাইয়ের মধ্য হইতে প্রথম প্রেফারেন্স সেয়ারের দরুণ ১৯১৯ অব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রতি অংশে ৬৮০ লভ্যাংশ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। (ইহা হইতে অবশ্য সরকারী আয়কর বাদ যাইবে।) এই লভ্যাংশের মোট পরিমাণ হইবে ৩৩৭৫০০ টাকা। অবশিষ্ট ৮৯৮৮১২৮৯ পাইয়ের মধ্য হইতে পুরাতন অর্ডিনারী সেয়ারের প্রত্যেক অংশের দরুণ ৪ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। (এই টাকা হইতে আয়কর বাদ যাইবে না।) বাকী যে ৯৮৮১২৮৯ পাই হাতে থাকিবে, সেটা আগামী বৎসরের জমার খাতে জের টানা হইবে। আলোচ্য রিপোর্টে ডেফার্ড সেয়ারের দরুণ কোন লভ্যাংশ বণ্টনের ব্যবস্থা হয় নাই। তাহার কারণ, এবার অতিরিক্ত লাভের দরুণ একটা ট্যাক্স আদায়ের যে প্রস্তাব হইয়াছে, সে জন্য কিছু টাকা মজুত রাখিতে হইতেছে। এই রিপোর্টে অন্যান্য যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, তাহার কিছু-কিছু "ভারতবর্ষের" পাঠকপাঠিকাগণ শ্রীযুক্ত গৌরীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুন্দর প্রবন্ধগুলি হইতে জানিতে পারিয়াছেন, এবং আরও অনেক কথা ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন আশা করি।

বঙ্গদেশের কো-অপারেটিভ সোসাইটীসমূহের সম্প্রতি যে দশম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার কার্য্য বিবরণীতে বাঙ্গলার গ্রাম্য শিল্প সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, বস্ত্র-শিল্পই বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান "কুটীর-শিল্প"। বহু ব্যক্তি এখনও এই ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছে। বঙ্গদেশে তুলা, রেশম, পশম—এই তিন প্রকারের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে সর্ব্বত্রই বহু তাঁতি ও জোলার বাস। তন্মধ্যে স্থান বিশেষে বিশেষ-বিশেষ প্রকারের তুলা বা রেশমজাত বস্ত্রাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বস্ত্র শিল্প ছাড়া আরও নানা প্রকার গ্রাম্য শিল্পের সন্ধান এই প্রবন্ধে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ-লেখক বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, রীতিমত, organisationএর অভাবে বাঙ্গলার অনেক শিল্পের উন্নতি সাধিত হইতে পারিতেছে না। আমরাও তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি, এই organisationএর অভাবই আমাদের মস্ত বড় অভাব। কিছুকাল পূর্ব্বে পত্রান্তরে আমরা একাধিকবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালাদেশে এত তন্তুবায়ের বাস, এবং তাঁহারা পুরুষানুক্রমে সূত্র-প্রস্তুত ও বস্ত্র বয়ন কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহাদের মধ্যে ধনীও অনেকে আছেন। তাঁহারা কি চেষ্টা করিলে বঙ্গদেশে দুই একটা কটন মিল স্থাপন করিতে পারেন না? দুঃখের কথা বলিব কি, এ পর্য্যন্ত একজন তাঁতিও আমাদিগকে এ সম্বন্ধে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই, বা কোনরূপ উৎসাহও প্রকাশ করেন নাই। ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া বাঙ্গলার অনেক তাঁতি তাঁত ছাড়িয়া হাল ধরিতে বাধ্য হইয়াছেন; অনেকে কেরানীগিরি বা অন্যান্য কাজ করিতেছেন। কেহ-কেহ বা অপরাপর ব্যবসায়েও লিপ্ত হইয়াছেন। তাঁতিদের চেষ্টায় যদি বাঙ্গলা দেশে দুই একটা তূলার কল প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাঁতিরাই যদি সেই কলে সূতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের জাতীয় ব্যবসায় বজায় থাকে, এবং দেশের ধনক্ষয়ও অনেকটা নিবারিত হয়। পুরুষানুক্রমে একই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া এই কার্য্যে তাঁহাদের একটা জন্মগত সংস্কার জন্মিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। সে স্থলে, কল-কারখানা খুলিয়া তাঁহারা এই ব্যবসায়ে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করা অপর জাতির পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন হইবে। বাঙ্গলা দেশে লক্ষ লক্ষ তাঁতির বাস। প্রতি অংশ ১০ টাকা হিসাবের এমন এক লক্ষ অংশ যদি বাঙ্গলার তাঁতিরা গ্রহণ করেন, এবং অপর এক লক্ষ ঐরূপ মূল্যের অংশ যদি জন সাধারণের মধ্যে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে ২০ লক্ষ টাকায় ছোটখাট একটা কাপড়ের কল বেশ চলিতে পারে; এবং তাঁতিরা যদি রীতিমত পারিশ্রমিক লইয়া এই কলে কাজ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করে, এমন সাধ্য কার? কিন্তু ঐ যে সার কথা,—আমাদের মধ্যে organisation নাই। organisation থাকিলে এরূপ একটা কেন, দশ-বিশটা কল স্থাপন করাও কঠিন হইত না। এখন, যদি কো-অপারেটিভ সোসাইটী স্থাপনের দ্বারা বঙ্গের তন্তুবায়-কুলের মধ্যে organisationএর সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে বুঝিব, কো-অপারেটিভ সোসাইটী দেশের একটা প্রকৃত মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে সমর্থ হইলেন।

ভারতের খনিসমূহের কাজ কি ভাবে পরিচালিত হয়, তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য যিনি সর্ব্বপ্রধান খনি-পরিদর্শক আছেন, তিনি ১৯১৮ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহার পরিদর্শন সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং তাহা ভরিত সরকার হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় খনি আইন অনুসারে প্রধান পরিদর্শক মহাশয়ের যতটুকু পরিদর্শন করিবার অধিকার আছে, রিপোর্টে কেবল সেই বিবরণটুকুই পাওয়া যায়; ইহাতে ভারতের সমগ্র খনিগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। যে সকল খনির গভীরতা ২০ ফিটের কম, সেগুলি ইনস্পেক্টর মহাশয়ের অধিকার-বহির্ভূত। এইরূপ অগভীর খনির সংখ্যা কম নয়, এবং এইগুলি হইতে খনিজ পদার্থও বড় কম উত্তোলিত হয় না। বৃটিশ ভারতের এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সমগ্র বিবরণ Geological Survey of Indiaর রেকর্ডের সঙ্গে প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১৯১৮ অব্দে খনি আইন অনুসারে পরিচালিত খনিগুলিতে বা তৎসংক্রান্ত কার্য্যে মোট ২৩৭৭৩৮জন লোক কাজ করিয়াছিল। তন্মধ্যে ১৫০১৬৪ জন খনি-গর্ভে এবং ৮৭৬৭৪জন খনির বাহিরে নিযুক্ত ছিল। এই সকল লোকের মধ্যে ১৪৭২১৯জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, ৮২৪৯২জন পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীলোক, এবং ৮০২৭টি শিশু—যাহাদের বয়স ১২ বৎসরের কম। ইহাদের মধ্যে কেবল কয়লার খনিগুলিতে ১৭৬২৬৯ জন নিযুক্ত ছিল। আলোচ্য বর্ষে মোট ১৯৮৪৭০৩৯ টন কয়লা খনি হইতে উঠিয়াছে। ১৯১৭ অব্দে ইহাপেক্ষা ২৫২০৬২৫টন কম কয়লা উঠিয়াছিল। ১৯১৭ অব্দে চালানী ও খরচ বাদে ৫১৫৮৭৪ টন কয়লা ভাণ্ডারে মজুত ছিল; ১৯১৮ অব্দে তাহার পরিমাণ ছিল, ১৭৮৫৭৩২ টন। মোট কয়লার মধ্যে ১৫৩২০৮০৪ টন রপ্তানী হয় এবং ১৯৪৮৭৬৪ টন খনিগুলিতেই খরচ হয়। আর কোক প্রস্তুত করিবার জন্য ৭০৭৬১৩ টন কয়লার ডেলিভারি দেওয়া হয়। সমগ্র ভারতে যত কয়লা উঠিয়াছে তাহার শতকরা ৯৫.৬২ অংশ অর্থাৎ ১৮৯৭৭৯১১ টন কেবল বাঙ্গালা দেশের খনি হইতে উঠিয়াছে। ১৯১৮ অব্দে কয়লা সংক্রান্ত সমুদায় কাজ একজন কোল কণ্ট্রোলারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছিল। এই কর্ম্মচারী কয়লা তুলিবার পড়তা ও তাহার উপর সামান্য লাভ ধরিয়া যে দাম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সেই দামে সমস্ত কয়লার কেনা-বেচা হইয়াছিল। কয়লার পর কেবল অভ্র ১৯১৯ অব্দে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বেশী উঠিয়াছে। ম্যাঙ্গানীজ, ওলফ্রাম, রত্ন, স্বর্ণ, তাম্র প্রভৃতি কম উঠিয়াছে। অন্য সকল খনিজ পদার্থের কোনটা কম, কোনটা বেশী উঠিয়াছে। তাহাদের কোন হিসাব ধরা হয় নাই। এবার তিনটা নূতন খনিজ পদার্থ উত্তোলিত হইয়াছে। খনিতে মধ্যে-মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া লোকে খুন-জখম হইয়া থাকে। ১৯১৮ অব্দে এরূপ দুর্ঘটনায় ২০৯ জন লোক মরিয়াছে। ১৯১৭ অব্দে ইহাপেক্ষা ৩৪জন কম লোক মরিয়াছিল। একটা বড় রকমের দুর্ঘটনায় একেবারে ১০ জন লোক মারা পড়িয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশের এখন শনির দশা চলিতেছে। বাঙ্গলার ম্যালেরিয়া সমস্ত পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলায় বসন্ত, বিসূচিকা, প্লেগ স্থায়ীভাবে বাসা করিয়াছে। তার পর গত দুই বৎসর ধরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জার শুভাগমন হইতেছে। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে জলাভাব চিরন্তন ঘটনা হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর পেটে অন্ন নাই, অঙ্গে বস্ত্র নাই। বাঙ্গালীর এত সুখের উপর যেন সুখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্যই পূজার প্রথম দিনে (২৪শে সেপ্টেম্বর) মহা ঝটিকাবর্ত্ত আসিয়া বাঙ্গলা দেশ উজাড় করিয়া দিয়া গেল; পূর্ব্ববঙ্গ সমভূমি হইল। উনপঞ্চাশ পবন যেন বাঙ্গলা দেশের বুকের উপর দিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়া গেল। ইওলিয়াম দ্বীপের ঝড়-বাতাসের রাজা ইওলাস যে একটা চামড়ার থলিতে সমস্ত ঝড়-বাতাস পুরিয়া ইউলিসিজকে দিয়াছিলেন, সেই ঝড়-বাতাসের থলির মুখ কে যেন বাঙ্গলা দেশে আনিয়া খুলিয়া দিয়া গেল। এমন ঝটিকাবর্ত্ত কেহ কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না। যেবারকার ঝড়ে গোয়ালন্দের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়, সে ঝড় কলিকাতার উপর দিয়া গিয়াছিল। সে সময়ে "হিতবাদী" সংবাদপত্রের সহিত আমাদের কিছু সম্বন্ধ ছিল। দৈনিক হিতবাদীর কাজ শেষ করিয়া রাত্রি ১০-১১টার সময় একাকী হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে বাড়ী চলিয়াছি। ঝড়বৃষ্টি সমস্ত দিনই প্রায় চলিতেছিল। পথে চলিতে-চলিতে ঝড়ের বেগে ছাতি মাঝে-মাঝে উল্টাইয়া যাইতেছে। ছাতি ধরিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কোন রকমে পথ চলিতেছি। কিন্তু কলিকাতার অসংখ্য অট্টালিকার মাঝখান দিয়া যাইতে-যাইতে ঝড়ের প্রভাব অনেকটা খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল; তাই পথে ঝড়ের পূর্ণ প্রতাপ বুঝিতে পারি নাই। তার পরদিন যখন টেলিগ্রামে ঝড়ের সংবাদ আসিতে লাগিল,-ঝড়ে দেশের কি যে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা যখন জানিতে পারিলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম, কি প্রচণ্ড ঝড়ের ভিতর দিয়াই পূর্ব্বদিন রাত্রিতে পথে চলিয়াছিলাম। কিন্তু এবার-কার ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করিলে সেবারকার ঝড় ছেলেখেলা বলিয়াই মনে হয়। এবারকার প্রচণ্ড ঝড়ে কত যে বড়-বড় গাছ উপড়াইয়া দূর-দূরান্তরে গিয়া পড়িয়াছে, কত গ্রাম যে গৃহশূন্য, ঘরবাড়ীশূন্য, জনশূন্য হইয়াছে তাহা বলা যায় না। নদীতে কত যে নৌকা ও ষ্টীমার ডুবিয়াছে, কত যে লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে, সে সকল সংবাদ এখনও কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছে নাই। আর, সংবাদ দিবেই বা কে? সংবাদ দিবার লোক কোথায়? এবারকার ঝড় কলিকাতা নগরকে স্পর্শ করে নাই; কলিকাতায় বসিয়া আমরা ঝড়ের প্রকোপ কিছুই জানিতে পারি নাই। কিন্তু নানা স্থান হইতে ঝড়ে সর্ব্বনাশের যেরূপ মর্ম্মভেদী বিবরণ আসিতেছে, তাহা পড়িয়া, ঝড়ের স্বরূপ ঠিক মত বুঝিতে না পারিলেও, হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছে। আমরা ভগবানের কাছে ক্রমাগত মার খাইতেছি। এই ঝড়ই যে ভগবানের শেষ মার তাহাও বলা যায় না। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি—এই কথাই কেবল মনে হইতেছে। ঝড়ে কিন্তু একটা উপকারও হইয়াছে। দেশের লোকে আত্ম-পর ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া ঝটিকা-পীড়িত আর্ত্তগণের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দলাদলি ভুলিয়া সকলে একমন, একপ্রাণ হইয়া দেশের এই দুর্দ্দিনে দুস্থ ব্যক্তিগণের কষ্ট-বিমোচনের জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। দামোদরের প্রবল বন্যার পর দেশময় যেরূপ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, স্বেচ্ছাসেবকেরা দলে দলে বন্যা-পীড়িত স্থানসমূহে গমন করিয়া বিপন্নগণের সাহায্যার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজও সেই দৃশ্য দেখিতেছি। অর্থে সামর্থ্যে যতদূর হয়, দেশবাসী তাঁহাদের বিপন্ন ভ্রাতৃগণের জন্য তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। গবর্ণমেণ্টও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। লর্ড রোনাল্ডশে বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্র সমিতি গঠিত হইয়াছে। সহর-মফস্বলের বড়-বড় সভাসমিতি হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া এই কেন্দ্র সমিতির সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। যাঁহার যেরূপ সাধ্য, সকলেই মুক্তহস্তে অর্থ দান করিতেছেন। যাঁহাদের অর্থ নাই, কিন্তু শারীরিক সামর্থ্য আছে, তাঁহারা তাহাই এই দুর্দ্দিনে দেশের কাজে বিনিয়োগ করিতেছেন। দুঃখের মধ্যে এই সুখের আভাষ দেখিয়া প্রাণ পুলকে ভরিয়া উঠিতেছে। সে যাহা হউক, এই ঝড় কিন্তু শেষ বিপদ বলিয়া আমাদের মনে হয় না। একেই ত দুর্ভিক্ষে দেশের লোক উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে; তাহার উপর আগামী পৌষে যে শস্য ঘরে তুলিবার আশা ছিল, সে আশাও বোধ হয় চূর্ণ হইয়া গেল। সরকারী আনুমানিক হিসাবে এবার শস্য বেশ ভালরূপ জন্মিবে বলিয়া যে আভাষ পাওয়া গিয়াছিল, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা কতদূর সফল হইবে তাহা বলা যায় না। বাঙ্গলার শস্যভাণ্ডার বাখরগঞ্জ জেলা। সেই জেলার উপর দিয়াও ঝড় বহিয়া গিয়াছে। শস্য এখনও মাঠে আছে। ঝড়ের মুখে পড়িয়া সেই শস্যের কি পরিমাণ রক্ষা পাইয়াছে, কতটাই বা নষ্ট হইয়াছে, তাহা এখনও বলা যায় না। সুতরাং আগামী বৎসরেও বোধ হয় দুর্ভিক্ষের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

মানবের আদি জন্মভূমি

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ; মূল্য কাগজে বাঁধা ২॥০ উৎকৃষ্ট বাঁধা ৩৲

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বহুকাল হইতে বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা করিতেছেন ; তাঁহার এই বিস্তৃত আলোচনার ফল তাঁহার প্রণীত বিবিধ মূল্যবান গ্রন্থাবলিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; বর্ত্তমান গ্রন্থখানি তাহাদেরই অন্যতম। এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, ইহা চিন্তাশীল বাঙ্গালী পাঠক সমাজে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়, মানবের আদি জন্মভূমি কোথায়, এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নানা দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় সেই সকল মতের আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারই কথায় বলিতেছি। তিনি এই গ্রন্থের ৩২৭ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন "আমরা আর্য্য, অনার্য্য, কাফ্রী ও মিগার, নিগ্রো প্রভৃতি সকল জাতিই সেই প্রাচীনতম মঙ্গলীয়ান-বংশপ্রভব এবং মঙ্গলীয়াই আমাদিগের পূর্ব্ব নিবাসস্থল।" তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ঠিক কি না, তাহার বিচার পাঠকগণ করিবেন ; কিন্তু আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, বিদ্যারত্ন মহাশয় এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা উপলক্ষে যে বিপুল অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। আমরা সকলকেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উইলিয়াম টেল

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন বি-এ প্রণীত ; মূল্য আট আনা।

"অষ্ট্রিয়ার শাসকবর্গ কিরূপ অমানুষিক অত্যাচারের সহিত সুইজারল্যাণ্ডবাসীদিগকে শাসন করিতেন এবং কিরূপে বীরশ্রেষ্ঠ উইলিয়াম টেল স্বীয় জন্মভূমি সুইজারল্যাণ্ডের উদ্ধার সাধন করেন" শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু ইংরাজী গ্রন্থাদি হইতে তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। অতি অল্প পরিসরের মধ্যে এত বড় মহাত্মার জীবন-কথা প্রকাশ করা বিশেষ লিপি-কৌশল-সাপেক্ষ ; গ্রন্থকার তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি।

প্রজাপতি

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা।

অনেক দিন পরে 'বৈষ্ণবী'র লেখক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবু বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। এবার তিনি 'প্রজাপতি' ধরিয়াছেন। আধুনিক জীবন-সংগ্রামে যে আলালের ঘরের দুলালের স্থান নাই, জীবিত জাতির জননী হইতে হইলে আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মীগণের তাহা বুঝা কর্ত্তব্য। সত্যেন্দ্র বাবু প্রজাপতিতে তাহাই বিশেষ ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; বলা বাহুল্য, তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল, সমাজতত্ত্বজ্ঞ, সুলেখক তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অসিতের চরিত্র অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সত্যেন্দ্রবাবু যখন এতদিন পরে পুনরায় এক্ষেত্রে আসিয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে সমাজ-সমস্যা সম্বন্ধে আরও কিছু আমরা আশা করি।

ভারতের নারী

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ; মূল্য দেড় টাকা।

এই সুন্দর পুস্তকখানিতে ভারত-নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তক যত অধিক প্রকাশিত হয় ও পঠিত হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। আমাদের দেশের নারী জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে যিনি দশ কথা বলিবেন, তিনিই আমাদের ধন্যবাদভাজন। গ্রন্থ শেষে দশটী আদর্শ ভারত-নারীর মহিমা কীর্ত্তিত হওয়ায়, গ্রন্থখানির মূল্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমরা লেখক মহাশয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর।

হীরার ফুল

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত বি-এল্ প্রণীত ; মূল্য পাঁচ সিকা।

এই পুস্তকখানি বালকবালিকাগণের জন্য লিখিত। ইহাতে এগারটী উপকথা আছে। লেখক মহাশয় সরল প্রচলিত ভাষায় বেশ গোছাইয়া গল্পগুলি বলিয়াছেন ; পড়িয়া আমোদ পাওয়া যায়। বইখানির মধ্যে অনেক বানান ও ছাপার ভুল আছে ; সে জন্য লেখক মহাশয়ই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। এই শ্রেণীর উপকথার বর্ণনা করিতে গেলেই ভাষায় গ্রাম্যতা আসিয়া পড়ে ; তাহার পরিহার অনেক সময়েই সম্ভবপর নহে। আমরা লেখক মহাশয়ের এই উদ্যমের প্রশংসা করি।

সীতানাথ

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ; মূল্য সাত সিকা।

প্রায় চারি-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত আশু বাবু 'কমলা' নামে একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। আর এতদিন পরে এই 'সীতানাথ' বা গৃহস্থ সন্ন্যাসী। নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় গ্রন্থকার এই 'সীতানাথ' চরিত্রে এই আদর্শ দেব-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ; কোন স্থানেও একটু অতিরঞ্জিত করেন নাই—আগাগোড়া সমানভাবে তিনি তুলিকাপাত করিয়াছেন। সীতানাথের অনন্যসাধারণ চিত্রে ছায়াপাত করিবার জন্য তিনি আর যে কয়েকটী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সীতানাথের চরিত্র তাহাতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। আশুবাবুর লিপি কৌশল ও বর্ণনা-ভঙ্গী আমাদের নিকট বড়ই সুন্দর বোধ হয়। ভাবা বেশ গম্ভীর, একটু বেশী সংস্কৃত। আমরা তাঁহার বর্ণনার একটী কথাও বাদ দিয়া পড়িতে পারি নাই। কিন্তু, আজকাল যাঁহারা বর্ণনা অপেক্ষা প্লটের পশ্চাতেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে চান, তাঁহাদের নিকট এই পুস্তকের স্থানে স্থানের বর্ণনা একটু মাত্রাধিক বলিয়া মনে হইতে পারে। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশা করি, 'সীতানাথ' জনাদর লাভ করিবে।

হেমচন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ প্রণীত ; মূল্য দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু যখন হইতে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রে হেমচন্দ্রের জীবন কথা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন হইতেই ধারাবাহিক ভাবে আমরা তাহা পাঠ করিয়া আসিতেছি। তাহারই কিয়দংশ লইয়া 'হেমচন্দ্রে'র এই প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। কবিবর হেমচন্দ্র অল্পদিন হইল পরলোকগত হইয়াছেন ; কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এই অল্পদিনের ব্যবধানেই তাঁহার জীবনী লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুর ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মা-মহাশয়কেও কত চেষ্টা করিতে হইয়াছে ; এবং আশানুরূপ উপকরণ সংগ্রহ করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকেও ক্ষুণ্ণ হইতে হইয়াছে। কবিবর হেমচন্দ্রের একখানি বিস্তৃত জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ না হইলে আমাদের বড়ই অগৌরবের কথা হইত ; শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু এই জীবনী লিখিয়া আমাদের সে ক্ষোভ দূর করিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা, বাঁধাই অতি মনোরম। ইহাতে অনেকগুলি চিত্রও আছে। কবিবর হেমচন্দ্রের কাব্যের ন্যায় তাঁহার জীবন-কথাও আদৃত হইবে।

চুম্বক

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

কবির নয়নে দেখা পরী-স্বপ্ন সম,
তারাদলে করি ম্লান নয়ন তারায়,—
অলিন্দে দাঁড়ায়েছিলে তুমি অনুপম
মূর্ত্তিমতী প্রেমরাণী, অনিন্দ্য প্রভায়।

কম্বুকণ্ঠে স্বর্ণহার সুরভি নিশ্বাসে
আনন্দে দুলিতেছিল আকুল, চঞ্চল,
তরঙ্গিত মুক্তকেশ বসন্ত বাতাসে
চুমিতে চাহিতেছিল লুণ্ঠিত অঞ্চল।

রঞ্জিত তাম্বুল রাগে কুঙ্কুম-অধর
কি সে লোভে কবি-ওষ্ঠ করিল বিধুর,
বিশ্ব-কবিতার উৎস মুখ-সুধাকর
নিবিড় আনন্দ-রসে হৃদি ভরপুর।

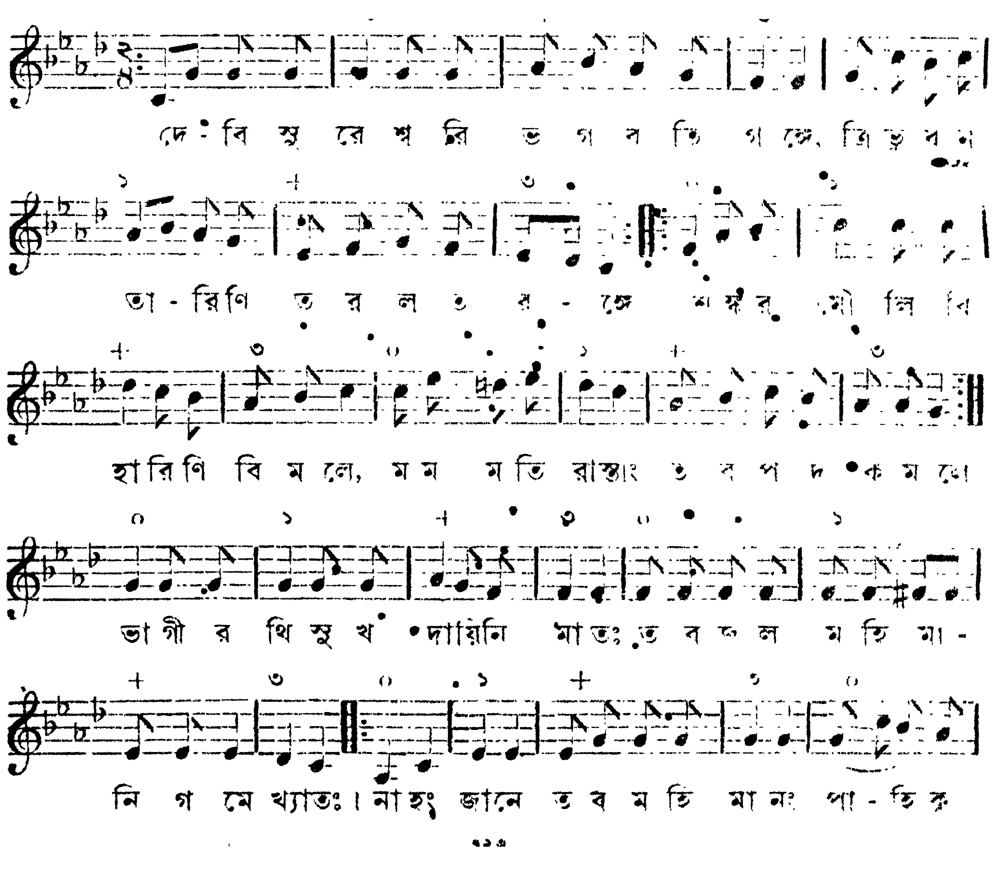
নয়ন চুম্বক তব সর্ব্বস্ব আমার
নিমেষে লইল টানি চরণে তোমার।
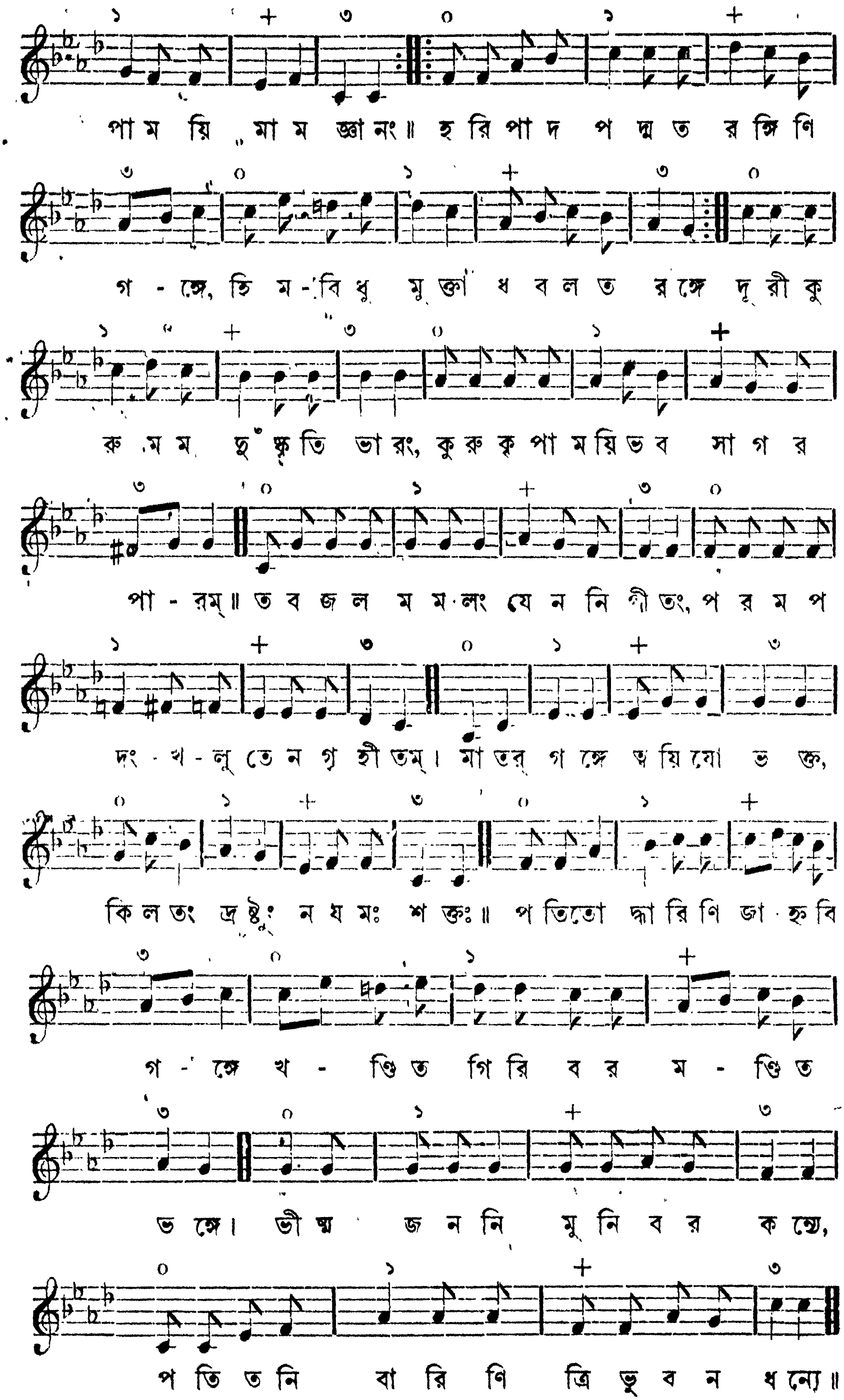
ভৈরবী মিশ্র—ঠুংরী।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, পাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানং॥
হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপাময়ি ভবসাগরপারম্ ॥
তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি মুনিবরকন্যে, পতিতনিবারিণি ত্রিভুবন ধন্যে ॥

স্বরলিপি— শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, গৌরীপুর—আসাম

১০০




পামযি মাম জ্ঞানং॥ হরিপাদ পদ্মত রঙ্গিণি
গ-ঙ্গে, হিম-বিধু মুক্তা ধবলত রঙ্গে দূরীকু
রু মম দুষ্কৃতি ভারং, কুরু কৃপাময়ি ভব সাগর
পা-রম্॥ তব জল মমলং যেন নিপীতং, পরমপ
দং-খ-লু তেন গৃহীতম্। মাতর্ গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্ত,
কিলতং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ॥ পতিতোদ্ধারিণি জা-হ্নবি
গ-ঙ্গে খ-ণ্ডিত গিরিবর ম-ণ্ডিত
ভঙ্গে। ভীষ্ম জননি মুনিবর কন্যে,
পতিতনিবারিণি ত্রিভুবন ধন্যে॥

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সকালবেলা দুটিখানি গরম মুড়ি দিয়া চা খাওয়া শেষ করিয়া কেদারবাবু একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি লইতে মৃণাল ঘরে ঢুকিতেই কহিলেন, মা, তোমার এই গরম মুড়ি আর পাথরের বাটির চা'র ভেতরে যে কি অমৃত আছে জানিনে, কিন্তু এই একটা মাসের মধ্যে আর নড়তে পারলুম না।

অচলার সম্পর্কে মৃণাল তাঁহাকে বাবা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কহিল, কেন তুমি পালাবার জন্যে এত ব্যস্ত হও বাবা, তোমার এ— —আমি কি সেবা করতে জানিনে?

তোমার এ মেয়ে কি,— এই কথাটাই মৃণাল অসাবধানে বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু চাপিয়া গিয়া অন্য প্রকারে তাহা প্রকাশ করিল। তাই বোধ করি এ ইঙ্গিত কেদারবাবু বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না। কিন্তু কণ্ঠস্বর তাঁহার সহসা করুণ হইয়া উঠিল, বলিলেন, কই আর পালাতে ব্যস্ত হই মা! তোমার তৈরি চা, তোমার হাতের রান্না, তোমার এই মাটির ঘরখানি ছেড়ে আমার আর স্বর্গে যেতেও ইচ্ছে করে না। ওই ছোট্ট জানালার ধারটিতে বসে আমি কতদিন ভাবি, মৃণাল, আর দুটো বৎসরও যদি ভগবানের দয়ায় বাঁচতে পাই ত কলকাতার মধ্যে থেকে সারাজীবন ধরে যত ক্ষতি নিজের করেচি তার সবটুকু পূরণ হয়ে যাবে। আর সেই মূলধনটুকু হাতে নিয়েই যেন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

কত বড় বেদনার ভিতর দিয়া যে তিনি এই কথাগুলি বলিলেন, এবং কিরূপ মর্ম্মান্তিক লজ্জায় তাঁহার কলিকাতার আজন্ম-পরিচিত পল্লী ও বাসভবন ছাড়িয়া, তাঁহার চিরদিনের আশ্রিত সমাজ ত্যাগ করিয়া এই বনের মধ্যে পর্ণকুটীরে জীবনের বাকি দিনগুলা কাটাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন মৃণাল তাহা বুঝিল, এবং সেই জন্যই কোন উত্তর না দিয়া চায়ের বাটিটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

এইখানে একটু গোড়ার কথা প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক। প্রায় মাসখানেক হইল কেদারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং সেই অবধি আর ফিরিতে পারেন নাই। মহিমের অসুখের সময় সুরেশের কলিকাতার বাটীতে এই বিধবা মেয়েটির সহিত তিনি প্রথম পরিচিত হন, কিন্তু এখানে তাহার নিজের বাটিতে আসিয়া যে পরিচয় ইহার পাইলেন তাহাতে তাঁহার সমস্ত দেহ-মন যেন সোনার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া গেল। এই বন্ধন হইতে বৃদ্ধ কোনমতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ, অন্যত্র কত কাজই না তাঁহার বাকি পড়িয়া আছে!

মহিমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার আসার সম্বাদ পাইয়াই সে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যায়। যাবার সময় মৃণাল ধরিয়া রাখিতে টানাটানি করে নাই, কারণ শিশুকাল হইতে সেজদার সংযম ও সহিষ্ণুতার প্রতি, বুদ্ধি বিবেচনার প্রতি তাহার এত অগাধ বিশ্বাস ছিল যে সে নিশ্চয় বুঝিয়াছিল অচলার সহিত দেখা করা এখন উচিত নয় বলিয়াই কেবল মহিম এমন করিয়া পলায়ন করিতেছে। সে মনে করিয়াছিল তাহার পত্র পাইয়াই কেদারবাবু কন্যার সহিত জামাতার একটা মিটমাট করিয়া দিতে এরূপ তাড়াতাড়ি করিয়া সঙ্গে লইয়া স্বয়ং আসিতেছেন। কিন্তু আসিলেন তিনি একাকী।

আজিও পরিষ্কার কিছুই হয় নাই, শুধু সংশয়ের বোঝায় উত্তরোত্তর ভারাক্রান্ত দিনগুলি একটির পর একটি করিয়া নীরবে বহিয়াছে। কেবল উপরের দিকে চাহিয়া এটুকু বুঝা গিয়াছে যে আকাশে দুর্ভেদ্য মেঘের স্তর যদি কোন দিন কাটে ত কাটিতে পারে কিন্তু তাহার পিছনে অন্ধকারই সঞ্চিত হইয়া আছে, চাঁদের জ্যোৎস্না নাই।

সুরেশের পিসিমা নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া মৃণালকে পত্র লিখিয়াছেন সে পত্র কেদারবাবুর হাতে পড়িয়াছে। মহিম কোন্ একটা বড় জমিদার-

সরকারে গৃহ-শিক্ষকের কর্ম্ম লইয়াছে জানাইয়া যে সম্বাদ দিয়াছে সে চিঠিখানিও তিনি বারবার করিয়া পাঠ করিয়াছেন, কোথাও কোন পক্ষ হইতে তাঁহার কন্যার উল্লেখ মাত্র নাই,—তথাপি চিঠি দুখানির প্রতি ছত্র, প্রত্যেক বর্ণ দুর্ভাগা পিতার কর্ণে কেবল একটা কথাই একশবার করিয়া বলিয়াছে যাহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবার মত শক্তিই তাঁহার নাই।

অচলা শুধু যে তাঁহার একমাত্র সন্তান তাই নয়, শিশুকালে যখন তাহার মা মরে, তখন হইতে তিনিই জননীর স্থান অধিকার করিয়া বুকে করিয়া এই মেয়েটিকে মানুষ করিয়া এতবড় করিয়া তুলিয়াছেন। সেই মেয়ের গভীর অকল্যাণের শঙ্কায় তাঁহার শরীর দিন দিন শীর্ণ এবং তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ কালি হইয়া আসিতেছিল, অথচ অমঙ্গল যে পথ ইঙ্গিত করিতেছিল সে পথ পিতার পক্ষেই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অবরুদ্ধ।

গ্রামের দুই-চারিজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিত, কিন্তু তিনি নিজে কখনও সঙ্কোচে কাহারও গৃহে যাইতেন না। মৃণাল অনুযোগ করিলে হাসিয়া বলিতেন, কাজ কি মা। আমার মত মেচ্ছের কারও বাড়ী না যাওয়াই ত ভাল।

মৃণাল কহিত, তা'হলে তাঁরাই বা আসবেন কেন? বৃদ্ধ এ কথার আর কোন জবাব না দিয়া ছাতাটি মাথায় দিয়া মাঠের পথে বাহির হইয়া পড়িতেন। সেখানে চাষীদের সঙ্গে তিনি যাচিয়া আলাপ করিতেন। তাহাদের সুখ দুঃখের কথা, গৃহস্থালীর কথা, ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্যের কথা,—এম্‌নি কত কি আলোচনা করিতে করিতে বেলা বাড়িয়া উঠিলে তবে ঘরে ফিরিতেন। প্রত্যহ সকালে চা খাওয়ার পরে এই ছিল তাঁর কাজ।

জন্মকাল হইতে তাঁহারা চিরদিন কলিকাতাবাসী। সহরের বাহিরে যে অসংখ্য পল্লীগ্রাম, তাহার সহিত যোগসূত্র তাঁহাদের বহুপুরুষ পূর্ব্বেই ছিন্ন হইয়া গেছে,—আত্মীয় কুটুম্বও ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে, অতএব, অধিকাংশ নাগরিকের ন্যায় তিনিও যে কিছুই না জানিয়াও ইহাদের সম্বন্ধে বিবিধ অদ্ভুত ধারণা পোষণ করিবেন তাহা বিচিত্র নয়। যে অশিক্ষিত অগণিত কৃষিজীবী সুদূর পল্লীতেই সারাজীবন কাটাইয়া দেয়, সহরের মুখ দেখা যাহাদের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে, তাহাদিগকে তিনি এক প্রকার পশু বলিয়া জানিতেন, এবং সে সমাজটাকেও বন্য সমাজ বলিয়াই বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ দুর্ভাগ্য যখন তাহার তীক্ষ্ণ বিষ-দাঁত দুটা তাঁহার মর্ম্মের মাঝখানে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত মনটাকে নিজের সমাজ হইতে বিমুখ করিয়া দিল, তখন, যতই এই সকল লেখা-পড়া-বিহীন পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষকদের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই একদিকে যেমন তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল অন্যদিকে তেম্‌নিই তাঁহার আপনার সমাজ, তাহার আচার ও আচরণ, তাহার শিক্ষা ও সংস্কার, তাহার ধর্ম্ম, তাহার সভ্যতা, তাহার বিধিবিধান সমস্তর বিরুদ্ধেই তাঁহার অন্তর বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

তিনি স্পষ্টই দেখিতে লাগিলেন ইহারা লেখা-পড়া না জানা সত্ত্বেও অশিক্ষিত নয়। বহুযুগের প্রাচীন সভ্যতা আজিও ইহাদের সমাজের অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া আছে। নীতির মোটা কথাগুলা ইহারা জানে। কোন ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই ইহাদের বিদ্বেষ নাই, কারণ জগতের সকল ধর্ম্মই যে মূলে এক, এবং তেত্রিশকোটী দেব-দেবীকে অমান্য না করিয়াও যে একমাত্র ঈশ্বরকে স্বীকার করা যায় এ জ্ঞান তাহাদের আছে এবং কাহারও অপেক্ষাই কম নাই। হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের আল্লা যে একই বস্তু এ সত্যও তাহাদের অবিদিত নাই।

তাঁহার মন লজ্জা পাইয়া বারবার বলিতে থাকে ইহারা কিসে আমাদের চেয়ে ছোট? ইহাদের চেয়ে কোন্ কথা আমি বেশি জানি? কিসের জন্য ইহাদের সমাজ, ইহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া আমরা দূরে চলিয়া গেছি? আর সে দূর এতবড় দূর যে এই সব আপন জনের কাছে আজ একেবারে ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিয়াছি!

এম্‌নি ধারা মন লইয়া যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন তখন বেলা প্রায় দশটা। মৃণাল আসিয়া বলিল, কাল তোমার শরীর ভালো ছিলনা বাবা, আজ যেন আবার পুকুরে স্নান করতে যেয়োনা। তোমার জন্যে আমি গরম জল করে রেখেচি।

একেবারে করে রেখেচ? বলিয়া কেদারবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্নানান্তে মৃণাল আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল, তাঁহার সাড়া পাইয়া এইমাত্র উঠিয়া আসিয়াছে। ভিজা চুল পিঠের উপর ছড়ানো, পরণে পট্টবস্ত্র, মুখখানি প্রসন্ন, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া যেন অত্যন্ত নির্ম্মল শুচিতা বিরাজ করিতেছে,—তাহারই প্রতি চোখ রাখিয়া বৃদ্ধ পুনশ্চ বলিলেন, এ কষ্ট কেন করতে গেলে মা, এর ত দরকার ছিলনা। একটু-খানি থামিয়া কহিলেন, আমি ত কলকাতার মানুষ, কলের জলই আমার চিরকালের অভ্যাস। কিন্তু তুমি আমাকে এমন আশ্রয় দিয়েছ মৃণাল, যে তোমার এই এঁদো পুকরটা পর্য্যন্ত আমার খাতির না কোরে পারেনি। ওর জলে আমার কোন দিন কোন অসুখ করে না,—আমি পুকুরেই নাইতে যাবো মা।

মৃণাল মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা সে হতে পারবে না। কাল তোমার অসুখ করছিল আমি ঠিক জানি। আমি জল নিয়ে আসিগে,—তুমি তেল মাখতে বোসো।

এই বলিয়া সে যাইবার উদ্যোগ করিতেই কেদারবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, সে যেন হোলো, কিন্তু আজ এই কথাটা আমাকে বল দেখি, মৃণাল, পরকে এমন সেবা করার বিদ্যেটা তুমি এইটুকু বয়সের মধ্যে কার কাছে কেমন করে শিখলে? এমনটি যে আর আমি কোথাও দেখিনি মা!

লজ্জায় মৃণালের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, কিন্তু তুমি কি আমার পর বাবা?

কেদার বাবু বলিলেন, না, পর নই—আমি তোমার ছেলে। কিন্তু অমন এড়িয়ে গেলেও চলবে না, জবাবটা আজ দিয়ে তবে যেতে পাবে।

মৃণাল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তেমনি সলজ্জ হাসিমুখেই উত্তর দিল, এ আর কি এমন শক্ত কাজ যে চেষ্টা করে শিখতে হবে? এ তো আমাদের জন্মকাল থেকেই শেখা হয়ে থাকে। কিন্তু তোমার জল যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে বাবা—

তা' যাক্, বলিয়া কেদারবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, ঠিক এই কথাটাই আমি কিছুদিন থেকে ভাবচি মৃণাল। মানুষ শিখে তবে সাঁতার কাটে, কিন্তু যে পাখী জলচর সে জন্মেই সাঁতার দেয়। এই শেখাটা তার কেউ দেখতে পায় না বটে, কিন্তু কাজটাকে ফাঁকি দিয়ে কেবল ফলটুকু ত পাবার যো নেই মা? এ ত ভগবানের নিয়ম নয়। কোথাও না কোথাও, কোন-না-কোন আকারে শেখার দুঃখ তাকে বইতেই হবে। তাই ওই জলচরটার মত যে নীড়ের মধ্যে তুমি জন্মকাল থেকে অনায়াসেই এত বড় বিদ্যে আয়ত্ত করে নিয়েচ, তোমাদের সেই বিরাট্-বিপুল সমাজ-নীড়টার কথাই আমি দিন রাত ভাবচি। আমি ভাবি, এই যে—

কিন্তু তোমার জল যে একেবারে—

থাক্ না, মা, জল। পুকুর ত আর শুকিয়ে যাচ্চে না। আমি ভাবি এই যে তোমার বুড়ো ছেলেটি শিশুর মত তার মায়ের কাছে গোপনে কত কথাই শিখে নিচ্চে সে তো আর তাঁর খবর নেই! আজও ত ঠাকুর-দেবতা, মন্ত্র-তন্ত্রে কাণা কড়ির বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু তবু যখনি মাকে দেখি স্নানান্তে ওই পাশুটে রঙের গরদখানি পরে আহ্নিক করতে যাচ্চেন, তখনি ইচ্ছা করে আমিও আবার পৈতে নিয়ে অমনি করে কোষাকুষি নিয়ে বসে যাই!

মৃণাল কহিল, কেন বাবা, তোমার নিজের ধর্ম্ম, নিজের সমাজ ছেড়ে অন্য আচার পালন করতে যাবে? তাকেও ত কেউ দোষ দিতে পারে না।

কেদারবাবু বলিলেন, কেউ পারে কি না আলাদা কথা, কিন্তু আমি তার গ্লানি করতে বোসব না। সে ভাল হোক্ মন্দ হোক্ এ বয়সে তাকে ত্যাগ করবারও সামর্থ্য নেই, বদলাবারও উদ্যম নেই। এই রাস্তা ধরেই জীবনের শেষ পর্য্যন্ত চলতে হবে। কিন্তু তোমাকে যখন দেখি,—যখন দেখি এইটুকু বয়সের এত বড় আত্ম-বিসর্জ্জন, যিনি স্বর্গে গেছেন তাঁর প্রতি এই নিষ্ঠা, তাঁর মন্ত্রকেই মা জেনে,——আচ্ছা, থাক্,. থাক্, আর বোলব না—কিন্তু আমিও যার মধ্যে মানুষ হয়ে বুড়ো হয়ে গেলুম, মা, তাকেও ত মনে মনে তুলনা না করে থাকতে পারিনে। সমাজ ছাড়া যে ধর্ম্ম, তার প্রতি আর যে আস্থা কোনমতেই টিকিয়ে রাখতে পারিনে মৃণাল!

মৃণাল মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের দুর্ভাগ্যকে যে তিনি এমন করিয়া নিজের সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষার উপরেই আরোপ করিবেন ইহা তাহার কাছে অত্যন্ত অবিচার বলিয়া মনে হইল। বলিল, বাবা, ঠিক এমনি কোরে যখন আমাদের সমাজটাকে দেখতে পাবেন, তখন এর মধ্যেও অনেক ত্রুটি অনেক দোষ আপনার চোখে পড়বে। দেখবেন আমরাও নিজেদের দোষগুলো

আপনার কাঁধের বদলে সমাজের কাঁধেই তুলে দিতে ব্যস্ত। আমরাও—

কিন্তু কথাটা শেষ না হইতেই কেদারবাবু বাধা দিয়া উঠিলেন। কহিলেন, কিন্তু আমি ত ব্যস্ত নই মা! তোমাদের সমাজে থাক্ না দোষ, থাক্ না ত্রুটি—কিন্তু তুমিও ত আছ! এইটিই যে আমি মাথা খুঁড়ে মলেও ওখানে পাবো না।

আবার মৃণালের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, বলিল, এমন কোরে আমাকে যদি তুমি একশবার লজ্জা দাও বাবা, তা'হলে এম্নি পালাবো যে, কিছুতে আর আমাকে খুঁজে পাবে না তা' কিন্তু আগে থেকে বলে রাখ্‌চি।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ কোন কথা কহিলেন না, শুধু নিঃশব্দ ম্লান মুখে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পরে ধীরে-ধীরে বলিলেন, আমিও তোমাকে আজ বলে রাখচি মা, এই কাজটিই তোমাকে কিছুতে করতে দেব না। তুমি আমার চোখের মণি, তুমি আমার মা, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়। এই অনাথ অকর্ম্মণ্য বুড়োটার ভার থেকে ছুটি নেবার দিন যেদিন তোমার আসবে মা, সে হয় ত বেশি দূরে নয়, কিন্তু সে আমাকে চোখে দেখতে হবে না তাও আমি বেশ জানি। বলিতে বলিতেই তাঁহার চোখের কোণ দিয়া দু' ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

জামার হাতায় মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, আমার একটা কাজ এখনো বাকি রয়েছে,—সেটা মহিমের সঙ্গে দেখা করা। কেন সে পালিয়ে বেড়াচ্চে একবার স্পষ্ট করে তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। এমনও ত হ'তে পারে সে বেঁচে নেই?

কেন বাবা তুমি ওই সব ভয় করচ?

ভয়? বৃদ্ধের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, কহিলেন, সন্তানের মরণটাই বাপের কাছে সবচেয়ে বড় ভয় নয় মা!

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত নূতন উপন্যাস "শুভেন্দুর কলঙ্ক" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "পান্নার প্রতিশোধ" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত "অভিসার" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাস মৌলিক প্রণীত "মর্ম্মবেদনা" প্রকাশিত হইল। মূল্য ॥৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বিলাত ফেরত" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "মাতৃদেবী" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।০ টাকা।

মল্লিদার প্রণীত "আপন পর" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নূতন উপন্যাস "ঘরভাঙ্গা" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "ব্যাঙ্ক বিভ্রাট" প্রকাশিত হইল। মূল্য ৸০ বার আনা।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু প্রণীত "রত্নাঞ্জলি" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস প্রণীত "নববধূ" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ প্রণীত "রাহুর প্রেম" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্-এ প্রণীত "বিভ্রাট" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীমতী মণিমৃণালিনী প্রণীত নূতন উপন্যাস "সুপ্রভা" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ টাকা।

মল্লিদার-সম্পাদিত রহস্য পিরামিড সিরিজের নবম গ্রন্থ "শয়তানের খেলা" প্রকাশিত হইল। মূল্য প্রতি গ্রন্থ সিল্ক বাঁধাই, পাঁচ সিকা, কাগজের মলাট এক টাকা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

"তনয়ে তার তারিণি!"



THE Emerald Printing Works CALCUTTA

শিল্পী—শ্রীযুত চন্দ্রকুমার সেন



অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

প্রথম খণ্ড] সপ্তম বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

ঋগ্বেদে পৃথিবীর আবর্ত্তন, সূর্য্য-প্রদক্ষিণ (১)

[অধ্যাপক শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ]

ষড়বিংশ বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ১ম সংখ্যায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'এদেশে ভূভ্রমবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস আর্য্যভট প্রথম গতির (পৃথিবীর আবর্ত্তনবাদের) প্রচারক হইলেও স্থাপয়িতা ছিলেন না। প্রাচীন কালে বহু জ্যোতিষী সে গতি স্বীকার করিতেন। আভাষে বুঝা যায়, তাঁহারা দ্বিতীয় গতি (পৃথিবী কর্ত্তৃক সূর্য্য-প্রদক্ষিণ)ও স্বীকার করিতেন।" এই উভয় গতি সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত।

আবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধে যোগেশবাবু খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দের পূর্ব্বের কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই; কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বলিয়াছেন যে, প্রাচীন কালেও, অর্থাৎ ৫ম শতাব্দের পূর্ব্বেও, এদেশের বহু জ্যোতিষী পৃথিবীর আবর্ত্তনবাদ স্বীকার করিতেন। সূর্য্য-প্রদক্ষিণবাদ সম্বন্ধেও তাঁহার প্রমাণ খৃঃ ১৫শ শতাব্দের পূর্ব্বের নাই।

ঋগ্বেদ-সংহিতার কাল খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরেরও যে পূর্ব্বের, সম্ভবতঃ এ বিষয়ে এখন কাহারও সন্দেহ নাই। সেই সুপ্রাচীন বৈদিক কালেও, আমাদের বিশ্বাস, এদেশে পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকৃত হইত। এমন কি, পৃথিবী কর্ত্তৃক সূর্য্য-প্রদক্ষিণ ব্যাপারও বোধ হয় তখন অজ্ঞাত ছিল না। ঋগ্বেদ-সংহিতায় এরূপ বহু ঋক্ পাওয়া যায়, যেগুলিকে এই উক্তির সমর্থক বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাদেরই কয়েকটির আলোচনা করা হইবে। এগুলির প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

যে অর্ব্বাঞ্চঃ তান্ উ পরাচঃ আহুঃ যে পরাঞ্চঃ তান্ উ

---

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটি শাখার অধিবেশনে পঠিত।

অর্ব্বাচঃ আহুঃ। ইন্দ্রঃ চ যা চক্রথুঃ সোম তানি ধুরা ন যুক্তাঃ রজসঃ বহন্তি॥ ১।১৬৪।১৯

এই ঋকে সায়ণ ইন্দ্র অর্থে সূর্য্য ধরিয়াছেন। 'ধুরান যুক্তাঃ' ইহার সায়ণ প্রদত্ত অর্থ এইরূপ :—"ধুরা যুক্তাঃ ধুরি স্থিত চক্রং অপি ধুর শব্দেন উচ্যতে তত্রযুক্তাঃ সমর্পিতাঃ তৎ পরিভ্রমণবশেন অর্ব্বাঞ্চঃ পরাঞ্চ ভবতি তদ্বৎ।"

ঋকের অর্থ :—(কালবিৎগণ) যাহা নীচ তাহাকেই উপর ও যাহা উপর তাহাকেই নীচ বলেন। (বস্তুতঃ নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্কগণের উপর-নীচ বলিয়া কিছুই নাই)। চক্রস্থ মনুষ্যের ন্যায় (চক্রস্থ মনুষ্যের নিকট চতুঃ-পার্শ্ববর্ত্তী বস্তু যেরূপ ঘূর্ণায়মান বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ) আমাদের নিকট চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণও ঐরূপ ভ্রমণশীল বলিয়া বোধ হয়।

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পৃথিবী চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে; আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থিত রহিয়াছি বলিয়া, আমরাও ঐ সঙ্গে আবর্ত্তিত হইতেছি; এই জন্যই নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্কগণ আমাদের নিকটে আবর্ত্তিত বলিয়া বোধ হয়।

অহঃ চ কৃষ্ণং অহঃ অর্জ্জুনং চ বিবর্ত্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ। বৈশ্বানরঃ জায়মানঃ ন রাজা অবাতিরৎ জ্যোতিষা অগ্নিঃ তমাংসি॥ ৬।৯।১

এই ঋকে বৈশ্বানর অর্থে সূর্য্য। রজসী পৃথিবীর উর্দ্ধভাগ ও অধোভাগ (২)। যখন উর্দ্ধভাগে দিবা, তখন অধোভাগে রাত্রি হয়। জায়মান—যিনি সর্ব্বদা নবজাত বলিয়া প্রতীত হন; অর্থাৎ সূর্য্য পৃথিবীর আবর্ত্তন-ফলে পৃথিবীর যে অংশ যখন সূর্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই অংশে সূর্য্যকে যেন নবজাতের মত বা উদিতের মত বলিয়া বোধ হয়; এই জন্যই ইহাঁকে জায়মান বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, সূর্য্যের উদয়াস্ত কিছুই নাই। 'ন' শব্দের অর্থ মত।

(২) এ ত্যা উত্যা উষসঃ কেতুম্ অক্রত পূর্ব্বে অর্ধে রজসঃ ভানুং অঞ্জতে। ১।৯২।১।

ইহার অর্থ,—উষা অন্ধকার দূর করিয়া রজনীর পূর্ব্বার্দ্ধে সূর্য্যকে প্রকাশ করিতেছে।

এখানেও উক্ত হইল রজসীর দুই অর্দ্ধ; যে অর্দ্ধে সূর্য্যের কিরণ পড়ে, তথায় দিবা এবং অপরার্দ্ধে তখন রাত্রি হয়।

ঋকের অর্থ :—পূর্ব্বার্দ্ধে দিবস ও অপরার্দ্ধে রাত্রিযুক্ত পৃথিবী বিবর্ত্তিত হইতেছে। জায়মান সূর্য্য জ্যোতিঃ দ্বারা অন্ধকার দূর করিতেছেন।

এতা উত্যাঃ প্রতি অদৃশ্রন্ পুরাস্তাৎ জ্যোতিঃ যচ্ছন্তি
উষসঃ বিভাতীঃ অজীজনন্ সূর্য্যম্। ৭।৭৮।৩

ইহার অর্থ :—উষা দীপ্ত হইয়া পূর্ব্বদিকে সূর্য্যকে জন্ম প্রদান করে।

এখানে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, সূর্য্য যেন নিজে তাঁহার উদয়ের কারণ নয়,—ইহাকে অন্যের কার্য্য দ্বারা প্রত্যহ উদিত হইতে হইতেছে। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের কারণ সূর্য্যের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ নয়,—ইহার প্রকৃত কারণ পৃথিবীর আবর্ত্তন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এ বিষয়ের স্পষ্টতর মীমাংসা রহিয়াছে।

স (সূর্য্য), বা এষ ন কদাচন অস্তম্ এতি ন উদেতি। তং যৎ অস্তম এতীতি মন্যতে অহ্ন এব তদন্তমিত্বাথাত্মানং বিপর্য্যস্যতে রাত্রীম্ এব অবস্তাৎ কুরুতে অহঃ পরস্তাৎ। অথ যদেনং প্রাতরুদেতীতি মন্যতে রাত্রেরেব তদন্তমিত্বা অথ আত্মানং বিপর্য্যস্যতে অহঃ এব অবস্তাৎ কুরুতে রাত্রীং পরস্তাৎ। স বা এষ ন কদাচন নিম্রোচতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৩।৪।৬

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অনুবাদ :—এই যে আদিত্য ইনি কখনই অস্তমিত হন না, উদিতও হন না। তাঁহাকে যখন অস্তমিত মনে করা যায়, তখন তিনি সেই সেই দেশে দিবসের অন্ত (সমাপ্তি) করিয়া তৎপরে আপনাকে বিপর্য্যস্ত করেন; (অর্থাৎ) সেই পূর্ব্ব দেশে রাত্রি করেন ও অপর দেশে দিবস করেন। আবার যখন প্রাতঃকালে তাঁহাকে উদিত মনে করা যায়, তখন তিনি রাত্রিরই সেখানে সমাপ্তি করিয়া, পরে আপনাকে বিপর্য্যস্ত করেন; (অর্থাৎ) পূর্ব্বদেশে দিবস করেন, ও পরদেশে রাত্রি করেন। এই সেই আদিত্য কখনই অস্তমিত হন না।

কতরা পূর্ব্বা কতরা অপরা অয়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কঃ বিবেদ।
বিশ্বং ত্মনা বিভৃতঃ যৎহ নামং বিবর্ত্তেতে অহনী চক্রিয়া ইব। ১।১৮৫।১

ত্মনা বিভৃতঃ=আত্মনৈব অন্যনৈরপেক্ষেণ এব বিভৃতঃ। অহনী=ধারয় (সায়ণ)। দ্যাবা পৃথিবী (সায়ণ)।

ঋকের অর্থ :—(দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে) কে কাহা হইতে জাত ? এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। কবিগণ মধ্যে ইহা কে জানে ? (অর্থাৎ কেহ কাহা হইতে জাত নয়)। ইহাদের প্রত্যেকেই পরস্পর নিরপেক্ষভাবে শূন্যে অবস্থিত। ইহাদের প্রত্যেকে চক্রযুক্তের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে।

এই ঋকে দুইটি সত্য নিহিত রহিত রহিয়াছে। (১) পৃথিবীর অনাধারত্ব ও (২) পৃথিবীর আবর্ত্তন।

বি অস্তভ্নাৎ রোদসী মিত্রঃ অদ্ভুতঃ অন্তঃবাবৎ অকণোৎ জ্যোতিষা তমঃ।

বিচর্মণী ইব ধিষণে অবর্ত্তয়ৎ ॥ ৬।৮।৩

ব্যস্তম্নাৎ—বিশেষেণ স্তম্ভিতবান্ ; যথা অধো ন পততঃ : যথা স্বকীয় দেশে স্থাপিতবান্ (সায়ণ)। রোদসী—পৃথিবী।

ঋকের ভাবার্থ :—নিম্নে পতন নিবারণ জন্য সূর্য্য পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়া স্বস্থানে স্থাপিত করিয়াছেন ও উহাকে আবর্ত্তিত করিতেছেন।

পৃথিবী স্থানভ্রষ্ট ও নষ্ট না হইয়া শূন্যে অবস্থিত রহিয়াছে এবং সতত আবর্ত্তিত হইতেছে,—এতদুভয়ের কারণ যে সূর্য্য, তাহা এখানে সূচিত হইতেছে।

ওজঃ তৎ অস্য তিত্বিষে উভে যৎ সমবর্ত্তয়ৎ ইন্দ্রঃ

চর্ম্ম ইব রোদসী। ৮।৬।৫

ইন্দ্র = জগতের নিয়ামক দেবতা বা সূর্য্য।

ঋকের ভাবার্থ :—ইন্দ্রের তেজ দীপ্তি পাইতেছে ; ইন্দ্রের দ্বারা পৃথিবী সম্যক্ আবর্ত্তিত হইতেছে।

৭।৩৫।৩ ঋকের টীকায় সায়ণাচার্য্য 'উরুচী' শব্দের অর্থও 'বিবর্ত্তগমনা পৃথিবী' করিয়াছেন।

অনুত্বা রোদসী উভে চক্রং ন বর্ত্তি এতশং অনু

সুবানাসঃ ইন্দবঃ। ৮।৬।৩৮

এতশং = অশ্বনাম এতৎ (সায়ণ)।

ঋকের ভাবার্থ :—হে ইন্দ্র (সূর্য্য) রথচক্র যেরূপ পুরোগামী অশ্বের অনুগমন করে, সেইরূপ পৃথিবীও তোমার অনুগমন করিতেছে।

এই ঋকটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রথের চক্রের গতি দুই প্রকার (১) আবর্ত্তন, rotation ; ও (২) চলন, translation। রথচক্র নেমির চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হয় এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে। পৃথিবীর গতি সম্যক বোধগম্য হইবে বলিয়াই হয়-ত ঋষি এই উদাহরণটি দিয়াছেন। পৃথিবীর গতিও প্রায় রথচক্রের গতির অনুরূপ। রথচক্রের ন্যায় ইহাও স্বীয় মেরুদণ্ডের (axis) চতুর্দিকে আবর্ত্তন করে, এবং এইরূপে ঘুরিতে-ঘুরিতে সঙ্গে-সঙ্গে স্বীয় কক্ষায় ক্রমশঃ অগ্রসর হয়।

উক্ত ঋক্ হইতে আরও একটি মূল্যবান সত্য পাওয়া যাইতেছে যে, রথচক্র যেরূপ অশ্বের আকর্ষণে চালিত হয়, সেইরূপ পৃথিবীও সূর্য্যের আকর্ষণে চালিত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর, আবর্ত্তন ব্যতীত, স্থান হইতে স্থানান্তরে চলন ব্যাপারটি, পরবর্ত্তী ঋক্‌সমূহ হইতে, অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

স্তোমাসঃ ত্বা বিচারিণি প্রতি স্তোভন্তি অক্তুভিঃ।

প্র যা বাজম্ ন হ্রেষন্তম্ পেরুম্ অস্যসি অর্জুনি ॥

৫।৮৪।২

বিচারিণী = বিবিধ চরণশীলা পৃথিবী (সায়ণ)। বি উপসর্গের ব্যাখ্যায় সায়ণ এখানে স্বীকার করিতেছেন, পৃথিবীর গতি একাধিক প্রকারের।

অর্জুনি = গমনশীলে (সায়ণ)।

এই ঋকে পৃথিবীকে বিচারিণী ও অর্জুনি বলা হইয়াছে। এই দুই শব্দ আবর্ত্তন (rotation) বাচক নয়। ইহারা motion of translation, অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনেরই অর্থ প্রকাশ করে। পূর্ব্ববর্ত্তী ঋক্‌সমূহে আবর্ত্তনের কথা দেখা গেল ; এখানে তাহার চলন সূচিত হইতেছে।

স ইৎস্বপাঃ ভুবনেষু আস যঃ ইমে দ্যাবাপৃথিবী জজান।

উর্ব্বী গভীরে রজসী সুমেকে অবংশে ধীর শচ্যা সমৈরৎ ॥

৪।৫৬।৩

অবংশে = উৎপত্তিরহিতে অনাধারের অন্তরীক্ষে (সায়ণ)।

সমৈরৎ = প্রেরিতবান। (সায়ণ)।

ভাবার্থ :—শোভনকর্ম্মা সূর্য্য বিস্তীর্ণ, বিপুল, শোভন-রূপা অনাধার পৃথিবীকে দক্ষতার সহিত চালিত করিতেছেন।

পৃথিবীর অনাধারত্ব এবং তাহার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের উল্লেখ এখানে রহিয়াছে। সূর্য্যই যে এই গমনের কারণ তাহাও এখানে উক্ত হইল।

অহং ইন্দ্র বরুণ তে মহিত্বা উর্বী গভীরে রজসী সুমেকে।
ত্বষ্টা ইব বিশ্ব ভুবনানি বিদ্বান্ সমৈরয়ম্ রোদসী ধারয়ম্ চ॥ ৪।৪২।৩

ভাবার্থ:—আমি ইন্দ্র, আমি বরুণ; মহত্ত্ব দ্বারা আমি এই উর্বী, গভীরা, সুরূপা পৃথিবীকে সম্যক চালিত করিতেছি, ও ধারণ করিতেছি।

ইমে চিৎ অস্য জ্রয়সঃ নু দেবী ইন্দ্রস্য
ওজসঃ ভিয়সা জিহাতে। ৫।৩২।৮

জিহাতে = গচ্ছতঃ। দেবী = দ্যাবা পৃথিবী।

ভাবার্থ:—দ্যাবা পৃথিবী ইন্দ্রের ভয়ে যেন ভীত হইয়া ক্ষিপ্র গমন করিতেছে।

ন প্রমিয়ে সবিতুঃ দৈব্যস্য তৎ যথা বিশ্বং ভুবনং
ধারয়িষ্যতি। যৎ পৃথিব্যা বরিমন্ আ সু অঙ্গুরিঃ
বর্ষ্মন্ দিবঃ সুবতি সত্যম্ অস্য তৎ॥ ৪।৫৪।৪

সুবতি = প্রেরয়তি (সায়ণ)।

ভাবার্থ:—সূর্য্য গুরুভার পৃথিবীকে তাঁহার অঙ্গুলি দ্বারা চালিত করিতেছেন। ইহার এই কর্ম্ম কখন হিংসিত বা বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইনি বিশ্ব-ভুবনকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহা সত্য।

উপরে উদ্ধৃত এই ঋক্ কয়েকটি হইতে দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবী শূন্য-মার্গে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেছে, এবং এই গমনের কারণ সূর্য্য। কিন্তু পৃথিবী কি যথেচ্ছ ভাবে এদিক সেদিক যাইতেছে? ইহার গতি কি অসংযত বা অনিয়মিত? ঋগ্বেদ উত্তরে বলিতেছে—না, তাহা নয়; ইহার গতি সূর্য্য দ্বারা সর্ব্বদাই নিয়মিত হইতেছে।

অয়ং দেবানাম্ অপসাম্ অপঃতম য জজান রোদসী
বিশ্বসংভুবা। বি যঃ মমে রজসী সুক্রতূয়া
অজরেভিঃ স্কম্ভনেভিঃ সম্ আনৃচে॥ ১।১৬০।৪

স্কম্ভনেভিঃ = গতি প্রতিবন্ধনৈঃ সংকুভিঃ (সায়ণ)।

ঋকের ভাবার্থ:—সূর্য্য দেবশ্রেষ্ঠ ও কর্ম্মশ্রেষ্ঠ। ইনি বিশ্বসংভুবা পৃথিবীকে সৃজন করিয়াছেন ও যথেচ্ছ-গতি-প্রতিবন্ধক দৃঢ়তর শংকু দ্বারা ইহাকে সম্যক্ স্থাপিত করিয়াছেন।

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবী অরম্নাৎ অস্কম্ভনে সবিতা দ্যাং
অদৃংহৎ। অশ্বং ইব অধুক্ষৎ ধুনিং অন্তরীক্ষং
অতূর্ত্তে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রং॥ ১০।১৪৯।১

যন্ত্রৈঃ = যমন সাধনৈঃ বায়বীয় পাশৈঃ (সায়ণ)।

ইহা কি attraction through space নয়?

ঋকের অর্থ:—সূর্য্য, আকর্ষণ দ্বারা নিয়মিত করিয়া পৃথিবীকে শূন্যে স্থাপিত ও চালিত করিতেছেন, নভোমণ্ডলকে দৃঢ় করিয়াছেন, ও অশ্বের ন্যায় কম্পিত সমুদ্র রূপ অন্তরীক্ষকে দীপ্ত করিয়াছেন।

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পৃথিবী চলনশীলা হইলেও, তাহার ইহাতে কোন স্বাধীনতা নাই। সূর্য্যের আকর্ষণবশতঃ তাহার গতি সর্ব্বদা নিয়মিত হইতেছে; তাহাকে সর্ব্বদা সূর্য্য রূপ শংকু অবলম্বনে চলিতে হইতেছে। এজন্য সূর্য্যকে ছাড়াইয়া তাহার অন্য দিকে যাইবার উপায় নাই। এ স্থলে গমন করিতে হইলে, পৃথিবীর কিরূপ ভাবে গমন সম্ভব? স্কম্ভ শব্দটির প্রয়োগ এখানে বেশ সুষ্ঠু হইয়াছে। ক্ষেত্রে গাভীকে যে খোঁটা বা দণ্ডে বন্ধন করা হয়, তাহারই নাম স্কম্ভ বা শংকু। গাভীর চলিতে হইলে, তাহাকে ঐ স্কম্ভের চতুর্দ্দিকেই ঘুরিতে হইবে; স্কম্ভ ছাড়াইয়া অন্যত্র যাইবার তাহার উপায় নাই। এইরূপ পৃথিবীও চলিতেছে; কিন্তু তাহা সূর্য্যরূপ শংকু অবলম্বন করিয়া। কাজেই পৃথিবীর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ (revolution round the sun) ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই।

এই প্রদক্ষিণ বা revolution কোন মুখে তাহারও উক্তি ঋগ্বেদে রহিয়াছে।

প্রাচীনং বর্হিঃ প্রদিশা পৃথিব্যাঃ বস্তোঃ অস্যাঃ
বৃজ্যতে অগ্রে অহ্নাং। বি উ প্রথতে বিতরম্ বরিয়ঃ॥
১০।১১০।৪

ভাবার্থ:—পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখী, স্বর্গীয় ও বিস্তীর্ণ পথ পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে।

বুধাদি গ্রহগণ সূর্য্যকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে প্রদক্ষিণ করে; পৃথিবীরও গতি ঐরূপ; হয় ত ইহাই এখানে সূচিত হইতেছে।

ঋগ্বেদে তারকাসমূহকে স্থির বলা হইয়াছে।

ইন্দ্রেন রোচনা দিবো দৃঢ়ানি দৃংহিতানিচ
স্থিরানি ন পরানুদে। ৮।১৪।৯

অর্থ :—আকাশস্থ তারকাসমূহ ইন্দ্র কর্ত্তৃক দৃঢ় অবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দৃঢ় ও স্থির তারকাসমূহকে কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে না।

আবার—

স্থিরং হি জানম্ এষাম্ বয়ঃ মাতুঃ নিরেতবে। ১।৩৭।৯

এষাং—মরুতাং। মাতুঃ—মাতুর্মরুতাং জননী স্থানীয়াৎ আকাশাৎ। বয়ঃ—পক্ষিণঃ। নিরেতবে—নির্গন্তং সমর্থাঃ ভবন্তি (সায়ণ)।

অর্থ :—মরুৎগণের জন্মস্থান আকাশ স্থির। তাহার মধ্য দিয়া পক্ষিগণ যাইতে পারে।

সুতরাং দেখা গেল, ঋগ্বেদে তারকাকে স্থির (fixed) বলা হইয়াছে। এই স্থির তারকাসমূহের মধ্য দিয়া যদি কোন জ্যোতিষ্ককে গমন করিতে দেখা যায়, তবে তাহাকে ভারতীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্র অনুসারে গ্রহ বলিতে পারা যায়। উপরের ঋকে বলা হইল, পক্ষিগণ আকাশের মধ্য দিয়া গমন করে। এই "পক্ষিগণ" দ্বারা আকাশ-মার্গে বিচরণশীল গ্রহ বুঝায় না কি?

বেদা যো বীণাং পদম্ অন্তরীক্ষেণ পতত্মাং
বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ। ১।২৫।৭

অর্থ :—অন্তরীক্ষ-মার্গে গমনশীল পক্ষিগণের পথ ও সমুদ্রের মধ্যে নৌকার পথ যিনি (বরুণ) জানেন।

এখানেও পক্ষী ও নৌকা আকাশস্থ গ্রহগণেরই দ্যোতক বলিয়া বোধ হয়।

যা তে পূষন্ নাবঃ অন্তঃ সমুদ্রে হিরণ্ময়ীঃ অন্তরীক্ষে
চরন্তি তাভিঃ যাসি দূত্যাম্ সূর্য্যস্য। ৬।৫৮।৩

অর্থ :—হে পূষা, অন্তরীক্ষে তোমার যে হিরণ্ময়ী নৌকাসমূহ বিচরণ করিতেছে, তদ্দ্বারা তুমি সূর্য্যের দৌত্য সম্পাদন কর।

এখানে এই নৌকা বোধ হয় গ্রহার্থক।

এই চলনশীল জ্যোতিষ্কগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, ইহাও ঋগ্বেদে রহিয়াছে :—

তিস্রঃদ্যাবঃ সবিতুঃ দ্বা উপস্থা একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্।
আনি ন রথ্যম্ অমৃতাঃ অধি তস্থুঃ। ১।৩৫।৬

অর্থ :—দূর আকাশে তিনটি, সূর্য্যের অতি নিকটে দুইটি, ও মধ্যম স্থানে—যমলোকে একটি—এই ছয়টি বিরাট্ গমনশীল অমৃত (=অমর্ত্ত্য=জ্যোতিষ্ক) রথের আনি অবলম্বনের ন্যায় সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে।

তথ্যটি অতি মূল্যবান ও গুরুতর বলিয়া নিম্নে এই ঋকের সায়ণ-প্রদত্ত অর্থও উদ্ধৃত হইল :—

দ্যাবঃ স্বর্গোপলক্ষিতাঃ লোকাঃ তিস্রঃ ত্রিসংখ্যাকাঃ সন্তি। দ্বৌ লোকৌ সবিতুঃ সূর্য্যস্য উপস্থা সমীপস্থানে বর্ত্তেতে। একা মধ্যমা ভূমিঃ অন্তরীক্ষলোকো যমস্য ভুবনে পিতৃগৃহে বিবাষাট্ বিরান্ গন্তন্ মহতে অমৃতাঃ অমৃতানি জ্যোতিংষি অধিতস্থুঃ সবিতারম্ অধিগম্য স্থিতানি। অত্র দৃষ্টান্তঃ রথ্যমানিং ন রথাৎ বহিরক্ষাচ্ছিদ্রে প্রক্ষিপ্ত কীল বিশেষ আনিরিতি উচ্যতে রথ সম্বন্ধিনং আনি অধিগম্য যথা রথঃ তিষ্ঠতি তদ্বৎ।

ছয়টি জ্যোতিষ্ক কেন্দ্রীকৃত সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া গমন করিতেছে। সুতরাং তাহাদের সূর্য্য প্রদক্ষিণই এখানে সূচিত হইতেছে। অতএব ইহাদিগকে গ্রহ বলাই সঙ্গত।

ইহাদের মধ্যে কোনটি কোন্ গ্রহ? দুইটি সূর্য্যের অতি নিকটে অবস্থিত। ইহাদিগকে বুধ ও শুক্র বলাই সঙ্গত; কারণ, তাহারা সূর্য্যের অতি নিকটে রহিয়াছে। যে তিনটি সূর্য্য হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, তাহাদের মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি বলা উচিত। অবশিষ্টটি যমলোকে অবস্থিত; অন্তরীক্ষই যমলোক ও সেই অন্তরীক্ষে বা শূন্যে পৃথিবী অবস্থিত; সুতরাং ইহা পৃথিবী হওয়াই সম্ভব। সায়ণ ইহাকে মধ্যমস্থানস্থিত বলিয়াছেন; মধ্যমস্থান অবশ্য অন্তরীক্ষের নাম; কিন্তু অন্যদিক দিয়াও সায়ণের উক্তির সুসঙ্গতি রহিয়াছে; একদিকে বুধ ও শুক্র এবং অপর দিকে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি; ইহাদের মধ্যস্থলে সত্য-সত্যই পৃথিবী অবস্থিত। সায়ণও বলিতেছেন যে, এইমধ্যমটি ভূমি। সুতরাং ইহাকে আমরা পৃথিবী বলিয়াই ধরিতে পারি।

গ্রহগণের শূন্যে অবস্থিতি ও সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কারণও যে সূর্য্য, তাহাও এই ঋকে প্রকাশিত হইতেছে।

ঋগ্বেদে উল্কা শব্দকে অনেক স্থলে গ্রহ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; এবং পৃথিবীকেও উল্কা শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা হইতেও অনুমান হয়, যেন বৈদিক ঋষিগণ পৃথিবীকে অন্যতম গ্রহ বলিয়া স্বীকার করিতেন।

অধ্বর্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্তবিপ্রাঃ প্রিয়ম্ রক্ষন্তে পদং বে।
প্রাঞ্চ মদন্তি উক্ষণঃ অজুর্যা দেবাঃ দেবানাম্ অনুহি ব্রতাগুঃ ॥
৩।৭।৭

অর্থ :—পঞ্চ অধ্বর্যু সহ সপ্ত বিপ্র তাঁহাদের প্রিয়স্থান রক্ষা করিতেছেন। আকাশস্থ অজর উক্ষাগণ আনন্দিত হইয়া পূর্ব্বদিকে যথানিয়মে গমন করিতেছেন।

অধ্বর্যু ও উক্ষা শব্দ এখনে গ্রহবাচক বলিয়া বোধ হয়। গ্রহার্থক হইলে উহাদের পূর্ব্বদিকে গমন জ্যোতিঃ-শাস্ত্রসম্মত হয়। আমাদের অনুমান, পঞ্চ অধ্বর্যু = পঞ্চ তারা-গ্রহ = বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি, এবং সপ্তবিপ্র = সপ্তর্ষি।

Vedische Mythelgy গ্রন্থের ৩ ও ৪২৩ পৃষ্ঠায় Hillebrandt সাহেব এই ঋকের অধ্বর্যু শব্দের অর্থ গ্রহ ধরিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রতিবাদও যথেষ্ট হইয়াছে (৩)।

অমী যে পঞ্চ উক্ষণঃ মধ্যে তস্থুঃ মহঃ দিবঃ।
নু প্রবাচ্যং সধ্রীচীনা নি বৃবৃতু ॥ ১।১০৫।১০

অর্থ :—ঐ যে পঞ্চ উক্ষা বিস্তীর্ণ আকাশে রহিয়াছেন, তাঁহারা দেবপথ আকাশে গমন করিতে-করিতে এখন গমনে নিবারিত হইতেছেন।

উক্ষা অর্থে গ্রহ ধরিলে অর্থ সুসঙ্গত হয়। মনে হয়, যেন এই ঋকে তারা-গ্রহের বক্রগতিরও ইঙ্গিত রহিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত ঋক্‌গুলিতে পৃথিবীকেও উক্ষা শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

মহী দ্যাবাপৃথিবী জ্যেষ্ঠে রুচা ভবতাম্ শুচয়ন্তিঃ অর্কৈঃ
যৎসীম্ বরিষ্ঠে বৃহতী বিমিন্বন্ রুবৎ হ পপ্রথানেভিঃ এ বৈঃ
৪।৫৬।১

অর্থ :—জ্যেষ্ঠা মহতী বরিষ্ঠা, বৃহতী, উক্ষা পৃথিবী, সূর্য্যরশ্মি দ্বারা দীপ্ত হইয়া এবং মরুৎগণ কর্ত্তৃক প্রচালিত হইয়া শব্দ করিতেছে।

দেবী দেবেভিঃ যজতে যজত্রৈঃ অমিনতী তস্থতু উক্ষমাণে।
৪।৫৬।২

অর্থ :—অমিনতী পৃথিবী দেবতাদিগের সহিত আকাশে উক্ষা রূপে অবস্থিত রহিয়াছে।

অন্য উক্ষার (পঞ্চ তারা-গ্রহের) ন্যায় পৃথিবীও একটি উক্ষা বা গ্রহ, ইহাই যেন এখানে স্বীকৃত হইতেছে।

উপরে উদ্ধৃত ঋক্‌সমূহ হইতে, আমাদের অনুমান, যেন প্রতিপন্ন হয় যে, ঋগ্বেদের সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিজ্ঞাত ছিল :—

১। পৃথিবীর শূন্যে অবস্থান।

২। সূর্য্যের প্রভাববশেই পৃথিবীর শূন্যে অবস্থিতি।

৩। পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ড অবলম্বনে আবর্ত্তন।

৪। পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে পৃথিবীর আবর্ত্তন।

৫। সূর্য্য স্থির, পৃথিবীর আবর্ত্তনই দিন-রাত্রির কারণ।

৬। পৃথিবী কর্ত্তৃক সূর্য্য প্রদক্ষিণ।

৭। এই প্রদক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী।

৮। সূর্য্যের আকর্ষণই পৃথিবীর এই প্রদক্ষিণের কারণ।

৯। আকাশের তারকাসমূহ স্থির।

১০। ঐ স্থির তারকাসমূহের মধ্য দিয়া কয়েকটি জ্যোতিঃ পদার্থ ভ্রমণ করে; উহারাই বর্ত্তমান জ্যোতিষের গ্রহ।

১১। পঞ্চ উক্ষা = পঞ্চ তারা-গ্রহ = বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।

১২। সকল গ্রহই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের পৃথিবী সম্বন্ধীয় জ্যোতিস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। Oldenburg তাঁহার Religion des Veda গ্রন্থে (৪) ঋগ্বেদের সপ্ত আদিত্যকে (৫) সপ্ত গ্রহ (সূর্য্য, চন্দ্র ও পঞ্চ তারাগ্রহ) স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। Macdonell and Keithএর Vedic Index গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে (৬) The view, though it can not be impossible or even unlikely, is not susceptible of proof. Hille-

(৩) Macdonell and Keith's Vedic Index, পৃঃ ২৪০-২৪৪।

(৪) পৃঃ ১৮৫।

(৫) ঋঃ সং ১।১৩৪।২,৩,১৪।

(৬) পৃঃ ২৪০-৪।

brandt (৭), Pischel (৮), Von Schroeder (৯), Macdonell (১০) ও Bloomfield (১১)—সকলেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। Thibaut (১২) বৃহস্পতিকে বৃহস্পতি গ্রহ বলিয়াছেন। Vedic Indexএ ইহা অস্বীকৃত হইয়াছে। Ludwig (১৩) ঋ: ১০।৫৫।৩ ও ১।১৬২।১৮ দ্বারা ঋগ্বেদে সপ্ত গ্রহের উল্লেখ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। Ludwig (১৪), পৃথিবী কর্তৃক সূর্য্য প্রদক্ষিণের উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে, ইহা স্বীকার করিয়াছেন ; তিনি এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের ৪।২৮।২৩, ৫।৩৩।৪, ১০।৩৭।৩, ১০।১৩৮।৪ -- এই ঋক্‌গুলির উল্লেখ করেন। Inclinations of Equator to Earth's orbit অর্থাৎ বিষুব-বৃত্তের সহিত রবিমার্গের সম্পাতের কথাও ঋগ্বেদে আছে, Ludwig তাঁহার Rigveda ৩, ১৮৮ পৃষ্ঠায় ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

পৃথিবীর অক্ষ (axis) সম্বন্ধেও Ludwig (১৫) ও তিলকের (১৬) স্বীকারোক্তি রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, ঋগ্বেদের ১০।৮৬।৪ ঋক্ পৃথিবীর অক্ষ সম্বন্ধীয়। এতদপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কার উক্তি ১।১৬৪।৩০ ঋকে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ঋকটি এই :—

অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবম্ এজদ্ ধ্রুবম্ মধ্য
আ পস্ত্যানাম্।
জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভিঃ অমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেন
সযোনিঃ।

সায়ণ ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ দিয়াছেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বের ও পরের ঋক্‌সমূহ, সমস্তই জ্যোতিষিক তথ্যে পূর্ণ। এই জন্য সন্দেহ হয়, এই ঋক্‌টিও বিশেষ কোন জ্যোতিষিক তথ্যই প্রকাশ করিতেছে। আমরা ইহার এইরূপ অর্থ করিতে চাই ; এ অর্থ কতদূর সমীচীন তাহার বিচারের ভার পণ্ডিতগণের উপর রহিল।

ভাবার্থ : দেহ জড় পদার্থ হইলেও, অভ্যন্তরে আত্মা থাকায় ইহা গমনশীল হয়, সেইরূপ, পৃথিবী নিজে জড় পদার্থ হইলেও, অভ্যন্তরে ধ্রুবাভিমুখী অক্ষরেখা সন্নিবিষ্ট থাকায় উহা আবর্ত্তনশীল। মর্ত্ত্য (পৃথিবী) ও অমর্ত্ত্য (নভোমণ্ডল) উভয়েই এই এক অক্ষরেখা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে বলিয়া, উহাদিগকে সযোনি বলা হইয়াছে। এই যোনিভূত ধ্রুব, অক্ষরেখা (মেরুদণ্ড) অবলম্বন করিয়া উহারা উভয়েই চলিতেছে।

ঋগ্বেদের অন্যান্য জ্যোতিস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেক আলোচনা রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তসমূহে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায় না। আমাদের দিক হইতেও এ সমস্ত বিষয়ের পুনরালোচনা হওয়া আবশ্যক।

(৭) Vedische Mythologie, পৃ: ৩, ১০২।
(৮) Gotingische Gelehrle Auzeigen, পৃ: ১৮৯৪, ৪৪৭।
(৯) Vienna Oriental Journal, পৃ: ৯, ১০৯।
(১০) Macdonell, Vedic Mythology, পৃ: ৪৪।
(১১) Religion of the Veda, পৃ: ১০৩।
(১২) Astronomie Astrologie and Mathematix, পৃ: ৬।
(১৩) Ludwig's translation of Rigveda, পৃ: ৩, ১৮৩।
(১৪) Proceedings of the Bohemian Academy of Sciences, May 1885 এবং Translation of Rigveda 6X.।
(১৫) Ludwig's Rigveda, পৃ: ৩, ১৮৮।
(১৬) Tilak's Orion, পৃ: ১৫৮।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(২৪)

শরতের বড়মেয়ে অসীমার বিবাহের কয়েকটা দিন পূর্ব্বে, একদিন শরৎদের তালতলার বাটীতে, স্তূপীকৃত নববস্ত্র গুছাইবার বন্দোবস্ত করিতে-করিতে, একটা পরামর্শ আঁটিয়া উঠিতেছিল। জগদিন্দ্র লোকটি ভারি সাদাসিধা। সে নিজের আফিস ও নিয়মিত কাজ-কর্ম্মটি ছাড়া সংসারের ভাল-মন্দের কোন ধারই ধারিত না। সে সকল ব্যবস্থা স্ত্রীর হাতে ফেলিয়া দিয়া, তাহারই আশ্রয়ে দুইটি খাইয়া, ঘুমাইয়া, আলবোলার নলটি মুখে দিয়া, তাহার দিনটি

নিরাপদ শান্তিতে কাটিয়া যায়। মা বাঁচিয়া আছেন; কিন্তু তিনিও সংসারে অনেকখানি নির্লিপ্ত, বৌমা-অন্ত প্রাণ। শরৎই, এক কথায়, তাহার শ্বশুরঘরের সর্ব্বময়ী গৃহিণী। এখন শরতের অনুরোধে মুখ হইতে গুড়গুড়ির নলটা বাহিরে আনিয়া, একরাশ ধোঁয়া অল্পে-অল্পে মুখপ্রান্ত হইতে বহির্জগতে প্রেরণ করিতে-করিতে, জগদিন্দ্র উত্তর করিল, "তা বেশ তো,—যদি ভাল বিবেচনা করো, নিজেই একটিবার যাও না। সে আর এমন কঠিন ব্যাপার কি?" "তা'হলে আজই যেতে হয়।" "তবে আজই যাও।" "যাও তো বল্লে,—যাই কার সঙ্গে?" "সে ব্যবস্থাটা আপনাকেই করে নিতে হবে। রবিবার হ'লে আমি নিয়ে যেতে পারতাম। তা ভিন্ন তো আমার—"

"ওগো মশাই, সে আমার জানা আছে,—তার জন্যে আর অত ভূমিকা করা কেন? তা' আমি না হয় হরির মাকে আর—" "তা দেখ, ও-বাড়ীর সরকার মশাইকে সঙ্গে নিলে হয় না? পুরণো লোক, বাড়ীও চেনে।" "ঐ রকমই তোমার বুদ্ধি বটে! ও-বাড়ীর সরকারকে নিয়ে না গেলে আর যাবো কার সঙ্গে। তাদের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কি, যে, ওদের লোক সেখানে যাবে? আমার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, তাই আমি যাচ্ছি।"

"তা বটে, তা বটে," বলিয়াই অর্দ্ধ-অপ্রতিভ জগদিন্দ্র মুখবিচ্যুত নলটা তুলিয়া লইয়া, পুনশ্চ তাহা মুখে পুরিলেন; এবং দু'চারবার টানাটানির পর, অপ্রসন্ন অনুযোগে কহিয়া উঠিলেন, "ধ্যাৎ, এতদিন ধরেও জগুয়া-বেটা 'তাওয়াটা' ঠিক্ করে সাজতে শিখ্লে না! বেটাকে যতই বলি,—এতটুকু যদি গ্রাহ্য আছে! কুড়ের বাদশা হচ্চে,—নলটলগুলো ভাল করে একটু ফেরাবেও না।—হ্যাগা, তুমি ওদের একটু বকে দাও না কেন?"

শরৎ মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিয়া জবাব করিল, "আচ্ছা, ফুরসৎ-মাফিক একদিন তখন বকা যাবে,—এখন তো কাজ চালিয়ে নাও। তা' আমি তোমার ঐ জগুয়াটাকেও তো সঙ্গে নিতে পারি। ছেলেটা বেশ চালাক আছে, স্বাধীন থাকবে—"

"তা বেশ তো। হ্যাঃ, ছোঁড়া আবার চালাক নয়! টিকেগুলো সব চুরি করে বেচে। ঐ দেখ না, কতকগুলো ঘুঁটের ছাই কল্কের উপর চাপিয়ে দিয়ে গিছলো,—'ধুঁস্' হয়ে পুড়ে গেল। অথচ, আবার যদি তামাক চাই, তুমি এক্ষুণই হাঁ, হাঁ, করে উঠ্বে,—বলে বস্বে যে, 'তোমার মুখ থেকে নলটি যেন আর নামাতেই ইচ্ছা করে না'! কি বিষম মুস্কিলেই যে পড়েছি আমি!"

শরতের মনটা তখন বোধ করি শরৎ-মেঘের মতই লঘু ছিল। সে এই অনুযোগের বিরুদ্ধে শুধু একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়াই, যাত্রার উদ্যোগ করিতে উঠিয়া গেল; অভয় দিয়া বলিয়া গেল, "আচ্ছা গো, আচ্ছা, অত কাতর হবার দরকার নেই,—মুস্কিলের আসান করিয়ে দিচ্চি।"

এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই, দীননাথ মিত্রের সংস্কারাভাবে একান্ত জীর্ণ, অর্দ্ধভগ্ন গৃহ-দ্বারে একখানা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। বেলা তখন অবসানের পথে নামিতেছে। সূর্য্যাস্ত আর বহু বিলম্বিত নাই। মিত্র-গৃহিণী বাঁড়ুয্যে-বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছেন। সেখান হইতে তিনি একেবারে পুকুরে কাপড় কাচিয়া, সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া জপে বসিবেন। রাত্রি নটা-দশটার কমে সেখান হইতে আর উঠিবেন না। আজকাল এই একমাত্র উপায়েই তিনি নিজের বড় অশান্ত জীবনটাতে একটুখানি শান্তি-লাভের চেষ্টা করিতেছেন। এতটুকু একটু যে শেষ আশাসূত্র অতটা কাল ধরিয়া অবলম্বন করিয়া বসিয়া ছিলেন,—সেদিন জামাতার সেই অত্যদ্ভুত নির্ম্মম ব্যবহারে, সেই মুহূর্ত্তে সেই সূতার বন্ধনটুকুও কাটিয়া গিয়াছে। সেদিনকার সেই জপের আসনে বসিয়াই তাঁহার সমস্ত মনটা সেই মুহূর্ত্ত হইতেই যেন একখানা নিরেট পাষাণের মতই ভারী এবং তেমনি নির্লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। কন্যা-দৌহিত্রের চিন্তাও আর সেই নিরাশার-প্রচণ্ড-দহনে-দগ্ধীভূত অন্তরের মধ্যে যেন ভাল করিয়া স্থান পায় না। উহাদেরও তিনি সম্পূর্ণরূপেই উহাদের ভাগ্যের হস্তে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

মনোরমা একরাশ ছেঁড়া জামা-কাপড়, বালিসের ওয়াড়ে রিপু সেলাই, তালি লাগাইয়া, সেগুলির যথাসাধ্য মেরামত সারিয়া উঠি-উঠি করিতেছে—সখী রাবেয়া একটা ম্যাজেণ্টা পশমের একটা দু'কাঁটার গলাবন্ধ বুনিতে-বুনিতে আসিয়া এক পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "অজিতের জন্যে এইটে বুনেছি,—দেখদেখি ভাই মনো, আর কতটা লম্বা করবো?" এই বলিয়া ন্যাকড়া-জড়াইয়া-বাঁধা, সেফ্‌টিপিন-দিয়া-আঁটা,

বোনা অংশটুকু খুলিয়া ফেলিয়া, নিজের হাত দিয়া মাপিয়া দেখাইল যে, উহা তাহার হাতের মাপের তিন হাত লম্বা হইয়াছে।

মনোরমা সলজ্জ কৃতজ্ঞতায়, সখী-দত্ত প্রীতি-উপহারটির পানে চাহিতে-চাহিতে, প্রশংসাসূচক-স্বরে কহিয়া উঠিল, "ঐ তো অনেক বড় হয়েছে,—আর বড় করে দরকার কি ? তুই কত শীঘ্র বুনতে পারিস্ ভাই! এই তো মোটে সেদিন ধরেছিস্—এরই মধ্যে এতটা হয়ে গেছে! তবু ঘরকরনার কাজ-টাজ সবই আছে!"

"ভারি তো শক্ত বোনা! এ বুনতে আর কত সময় লাগে ? আজ ভাই আর বসবো না, হামিদ ক্লাশে উঠেছে,—তাই তার দু'টি বন্ধুকে আজ একটু জল-টল খাওয়াবে,—তারই বন্দোবস্ত করতে হবে, যাই।" বলিয়া, গলাবন্ধটা জড়াইয়া পিন আঁটিয়া, উঠিয়া পড়িল। মনোরমা, রাবেয়া আসায়, আবার নূতন করিয়া ছুঁচে রঙ্গিন সূতা পরাইয়া, অজিতের একখানা নূতন ধুতীর কোণে চিহ্ন করিতে বসিয়া গিয়াছিল। এখনি বন্ধু বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিয়া, সে সচকিতে নত মুখ-খানা তুলিয়া, কোপ-কুটিল-নেত্রে বন্ধুর মুখপানে চাহিল; কহিল, "তুই কবে না ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসিস্ ?" "কি করি ভাই,—জানিস তো, মা মারা গিয়ে অবধি আমার যা সুখ হয়েছে। ছোটমা কিছু দেখে না। দেখবেই বা কি,—বেচারির তো বার মাস অসুখ লেগেই আছে। রোগে-রোগে নিজেই সে আধমরা। বাপের সেবা, ভাইয়েদের দেখা, সংসারের কাজ—সবই তো আমার।"

মনোরমা লজ্জিত-মুখে "তা সত্যি" বলিয়াই মুখ নত করিল। "চির-জীবনটা এমন করেই কেটে গেল। আচ্ছা, এতটা যে রূপ ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন, সে কি শুধু এমন করেই ব্যর্থ হবার জন্যে ?" "আল্লার মরজি!" "কি রকমই মরজি কে জানে তাঁর! আচ্ছা রাবি, তোকে একটা কথা কতদিনই বলি-বলি করে বলতে পারিনে। তোদের ঘরে আছে বলেই বলছি ভাই, কিছু মনে করিসনে—তুই কেন হিন্দুর ঘরের বাল-বিধবার মত চিরদিন সন্ন্যাসী হয়ে থাকবি ? তোর মামাতো ভাই তসির তোকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে অস্থির,—বাপ-মাও তো মত করেছিলেন; তবে কেন—"

রাবেয়ার [illegible] মত সুন্দর ও তেমনি হাস্য-বিকশিত মুখখানার সমুদয় প্রফুল্লতা কে যেন নিংড়াইয়া লইল। তথাপি, হাতের বোনার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, এক কাঠি হইতে অন্যটায় ঘর তুলিয়া লইতে-লইতে, হাসিয়াই উত্তর করিল, "তা, তুইও কেন সেই সঙ্গে একটা নিকে কর্‌না মনো ?" "দূর্‌! আমার আর তোর বুঝি এক হলো ? তা ছাড়া, তোদের সমাজে যে আছে ভাই।"

'তা'হলে, তোদের সমাজে চলিত থাকলেই, তোরাও করতিস্ ?"

মনোরমার মুখ লজ্জায় ঠিক রক্তজবার বর্ণ ধারণ করিল। সে আঁচলের একটা পাশ তুলিয়া লইয়া, মুখ ঢাকিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "ছি ছি, না ভাই, তুই আমায় মাপ কর,—রাগ করিসনে।"

রাবেয়া হাসিয়া কাছে আসিয়া, লজ্জা নিপীড়িতার মুখ হইতে কাপড় টানিয়া সরাইয়া দিয়া, তাহার গলাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। আদর করিয়া বলিল, "মনো রে, তোর ওপোর কি আর রাগ হয়, যে করবো ?" তার পর একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখ মনো, সব সমাজেই কতক-গুলো নীচু জিনিস আছে; —তা বলে, সেগুলো যে সবাইকার জন্য, তা নয়। সব সমাজের মধ্যেই নীচু-উঁচু দু'টো স্তর আছে। ডোম বাগ্দির তফাৎ না করলেই যে ডোম-বাগ্দি তাদের স্বভাব ত্যাগ করবে,—তা নয়। আর, তোমার-আমার জন্যে,—তা সে সব সমাজেই এক বিধান। সেখানে হিন্দু মুসলমানের বিধি ভিন্ন নয়। তোমার মুখে এমন কথা শোভা পায় না মনো। কোন বংশে আমার জন্ম,—সে কি আমি নিজের তুচ্ছ মোহের স্বপ্নে ভুলে যাব ? না, তুমিই তা বিস্মৃত হয়ে, আমায় ইতরের কার্য্যে উৎসাহিত করবে ?"

"দিদি, তুমি বয়সে ছোট হলেও, জ্ঞানে আমার গুরুর যোগ্য।" "না রে মনু, আমরা দু'জনেই দু'টি ভাগ্যহীনা নারী। কিন্তু কপাল মন্দ হলেও, আদর্শ আমাদের খর্ব্ব হবে না। কি বলিস্ ভাই ?"

যেন একটা মুক্তির নিঃশ্বাসকে দীর্ঘ করিয়া নিজের মধ্যে টানিয়া আনিয়া মনু কহিল, "হাঁ ভাই।"

সখীকে বিদায় দিয়াও মনোরমার মনটা কেমন যেন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। রাবেয়ার সেই হাসি-মুখের তিরস্কার-টুকু একফোঁটা ছোট একটি ভীমরুলের হুলের মত, তাহার মনের মধ্যে যেন তীক্ষ্ণ হইয়া ফুটিয়া রহিল। সত্যই ওই সর্ব্ব-

ত্যাগিনী, বংশমর্য্যাদাভিমানিনী, অভিজাত-বংশীয়ার নিকট এমন ছোট কথাটা তাহার বলা ভাল হয় নাই। ভগবান যে সংসারের সর্ব্বত্রই ছোট-বড়র ভেদ রাখিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—সব কাজ কি সবাইকে করিতে আছে?

(২৫)

"দেখুন মা-মণি, আমার এই চিঠিটা, সকালে আপনি রাঁধছিলেন বলে, দেখান হয়নি,—এই নিন পড়ে দেখুন।"

"চিঠি! তোকে কে লিখেছে রে অজু?" "পিসিমা লিখেছেন মা-মণি,—আমায় তিনি নেমন্তন্ন করেছেন যে! আচ্ছা, আমায় খাবার দিন, আমি ততক্ষণ চিঠিটা পড়ে আপনাকে শোনাই—'চিরজীবেষু, বাবা অজিত মণিধন!' মা-মণি! পিসিমা কি রকম করে লেখে,—আমার ভারি লজ্জা করে কিন্তু—"

"লজ্জা কি অজু! সে যে তোমার পিসিমা,—তোমায় যে সে ভালবাসে!"

"আচ্ছা, পিসিমা আমায় কেমন করে এত ভালবাসলে মা-মণি? পিসিমা তো আমায় কখনো দেখেনি।"

"না, দেখেনি,—তবু আমি জানি, সে তোমায় যত ভালবাসে, এত বোধ কার আর কেউই—তা নাই হোক, সে তোমায় খুব বেশী ভালবাসে। কি লিখেছে রে?"

"'বাবা, তোমার চিঠি পত্র অনেক দিন না পেয়ে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠছে,—কেন খবর দিলে না বাবা? অজুমণি, গোপাল আমার! তোমার দিদির যে বিয়ে হবে,—তুমি দিদির বর দেখতে পিসিমার বাড়ী মাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে তো?'—ও কি মা-মণি! তুমি অমন করে বসে পড়লে কেন? পায়ে লাগলো বুঝি? খাবারগুলো ছড়িয়ে পড়ে গেছে,—তা যাকৃগে, আমার আজ একটুও ক্ষিদেও পায় নি, গেছে ভালই হয়েছে।"

মনোরমা হেঁটমুখে হস্তচ্যুত রেকাবখানার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বুভুক্ষিত ছেলের খাবার তাহার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া, তাহার ক্ষণিকের সেই আত্ম-বিস্মৃতি-পাতকের যে প্রায়শ্চিত্ত ঘটাইতেছিল, সে ছাড়া সে কথা কে বুঝিবে? ঘরে আর তো কিছু নাই,—কি সে এই সারা দিনের শ্রান্ত, ক্ষুধিত বালককে খাইতে দিবে? সে হাসি-মুখে যত জোর করিয়াই নিজের অক্ষুধা জানাক না কেন, মায়ের প্রাণের আত্মগ্লানির জ্বালা কি সে হাসি চাপা দিতে পারে?

বাহির হইতে অন্দরের এই রান্নাঘরের দালানটিতে আসিতে দুইটা ঘর অতিক্রম করিতে হয়। তার পর ভিতরের উঠান ও সেই উঠানে দুই দিকে দুইটা দালান ও কয়েকটা করিয়া ঘর। একদিকে রান্না, ভাঁড়ার; অপরাংশের কয়টা এক সময় কাজে-কর্ম্মে ব্যবহৃত হইত;—এখন বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম্মও নাই এবং সংস্কারাভাবে উহাদের ব্যবহার-শক্তিও গিয়াছে।

বাহিরের দিক হইতে জুতা পরিয়া চলার শব্দ পাওয়া গেল। কে, কি বৃত্তান্ত—এই সব কথা ভাবা-চিন্তার পূর্ব্বেই, একটি দশ-এগার বছরের ছেলের হাত ধরিয়া বছরখানেকের একটি কচি মেয়ে, ও একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ি উড়ে চাকরের হাতে ও কোলে দিয়া, মনোরমারই সমবয়সী একটী মেয়ে দ্বারের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ইহারা এ বাড়ীর পরিচিত নয়; মা ও ছেলে বিস্মিত চোখে ইহাদের দিকে চাহিয়া থাকিল দেখিয়া, যে আসিয়াছিল, সে নিজের পরিহিত একখানা সাধারণ চওড়া পাড় সাড়ির আঁচল তুলিয়া, নিজের চোখ-দু'টা জোর করিয়া ঘসিয়া মুছিয়া ফেলিয়া, যেন অনেক-চেষ্টায়-বাঁধা ধৈর্য্যের বাঁধ না ভাঙ্গিবার প্রতিজ্ঞাটায় অটল থাকিতে সচেষ্ট হইয়া, অগ্রসর হইতে-হইতে বলিয়া উঠিল, "অজিত-মণিধন! আমি তোমার কে হই বল দেখি?"

অজিতের কালো চোখে বিস্ময়ের অতি নিগূঢ় ছায়া সহসা এই প্রশ্নে যেন তরল হইয়া উঠিল। সে তাহার চাঁদের মত সুন্দর মুখখানা হাসির আলোয় চক্-চকে করিয়া তুলিয়া, অপরিচিতার মুগ্ধ চোখের উপর নিজের উজ্জ্বল দু'টি প্রফুল্ল চোখের দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিয়া উঠিল, "আপনি আমার পিসিমা হন।" এই বলিয়াই নতজানু হইয়া মাথাটা তাহার চরণপ্রান্তে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। "কি করিস্ বাপ্, কি করিস্—পায়ে যে মাথাটা ঠেকিয়ে ফেল্লি,—" বলিতে-বলিতে শশব্যস্তে পিসিমা ভাইপোকে টানিয়া তুলিয়া, বুকে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মাথায় মুখে, যেখানে-সেখানে হাজারটা চুমো খাইল। সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টিধারার মত চোখের জলের উৎস ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। সে অশ্রুর অনাহূত আগমনে অসন্তুষ্ট হইয়া

তাহাকে রোধ করিবার চেষ্টা করিলে কি হইবে,—সে বেগবান্ অশ্রুধারার বহিয়া গমন রোধ করা শরতের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

দীর্ঘ একাদশ বৎসর পরে দুই সখীতে মিলন হইল। অনেকখানি ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে, উভয়ে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা কহিতে সাহসী না হইয়া, অজিতকেই মধ্যস্থ রাখিয়া, তাহাকে লইয়া গল্প করিতে বসিল। পিসিমা ভাইপোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আমি যে পিসিমা,—কেমন করে তুমি জান্‌লে অজিত?"

অজিত পিসিমার কোলে বসিয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মত থার্ড ক্লাশের ছাত্র—দশ বছরের ছেলে আবার কাহারও কোলে বসিতে পারে, সে কথা মনে হইলে যত লজ্জা করে, তত হাসি পায়। ভাগ্যে 'ক্লাশফ্রেণ্ড'রা কেহ উপস্থিত নাই, তাই রক্ষা! নইলে কি আর সে স্কুলে গিয়া তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিত! একেই তো 'মায়ের খোকা' তার নামই হইয়া গিয়াছে। 'গোপাল অতি সুবোধ বালক' না বলিয়া, 'অজিত অতি সুবোধ বালক' ইত্যাদি আওড়াইয়া, তাহাকে তো বিব্রতই রাখিয়াছে। সে এখন আস্তে-আস্তে কোল হইতে নামিয়া বসিয়া, হাসিহাসি-মুখে মুখ তুলিয়া কহিল, "তা আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলুম পিসিমা!" "কি করে পারলি বল না বাবা?" অজিত হাসিয়া ফেলিল, "আপনার চিঠি আর কথা ঠিক যে এক রকম,—তাই থেকে বুঝতে পারলুম।" পিসিমা ভাইপোর বুদ্ধিমত্তায় একান্ত প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, বিস্ফারিত-নেত্রে, তাহার আগমন সংবাদে গৃহাগতা দুর্গাসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিল, কি বুদ্ধি ছেলেটার! এ যে বুড়ো মানুষেরও মাথায় আসে না মা!" দুর্গাসুন্দরী একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরব হইয়াই রহিলেন। তার পর শরতের প্রণামের পরিবর্তে আশীর্বাদ জানাইয়া, জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়াই, একটা প্রশ্ন করিলেন, "সব ভাল তো!" এই স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসাটার মধ্যে যে প্রশ্নকর্ত্রীর এতটুকু একটি ফোঁটাও আগ্রহ ছিল না, তাহা তাঁহার গলার স্বরই বেশ সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেও, এবং সে নিস্পৃহ আতিথেয়তা অতিথিরও কাছে অজ্ঞাত না থাকিলেও, তথাপি, নিজেদের লজ্জাভারে অবনতমুখী থাকিয়া, শরৎ কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "হাঁ।" তার পর, দু'জনকার মধ্যে একজনও অপরকে বলিবার জন্য একটি মাত্র কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া, কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিবার পর, দুর্গাসুন্দরীই প্রথমে সে সঙ্কুচিত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, "মনো, এদের একটু জলটল খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিস? ও মা! এ কি কাণ্ড! রুটি তরকারির এত ছড়াছড়ি কেন? ছেলেটা বুঝি কিছু খেতে পায়নি? সাবাস মা বাছা তুমি! এখন ঘরে কোথাও কিছু আছে, না, উপোস করে থাকবে ছেলেটা?" এই বলিয়াই তিনি খিড়কীর দিকে চলিয়া গেলেন।

মনোরমার চিত্ত এই আকস্মিক ঘটনার অভিঘাতে যে কেমন করিয়া কোথায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চূর্ণমান হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এতক্ষণ তাহার কোন ঠিকানাই ছিল না। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারাও নিজেদের নানা ব্যস্ততার মধ্যে, খাবার, ছড়ান ও তাহার পরবর্তী পরিণাম সম্বন্ধে মাথা খাটাইতে পারে নাই। এখন একসঙ্গে সবারই চক্ষু এবং মন ঐ জিনিসটার দিকেই ছুটিয়া আসিল। অজিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "দিদিমা-মণি! আমার তো আজ মোটে খিদে নেই, খাবার আর কিছুই চাইনে,—ভাত হলেই একেবারে খাব। পিসিমা আর মোহিত-দা, তোমরা আমার বাগান দেখতে এসো না? আবার সূর্যমুখী গাছে আজ সাতটা বড় বড় ফুল ফুটেছে। সারা দিন তারা মাথা উঁচু করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, সন্ধ্যে হলেই একসঙ্গে সব্বাইকার ঘাড় হেঁট হয়ে পড়ে,—ভারি মজার ফুল, না? আর একটা লজ্জাবতী লতাও এনেছি। সেটাকে তো ছোঁবার যো নেই; এমনি কি, জোরে হাওয়া বইলেই অমনি সে মাথা গুঁজড়ে পড়ছে। আজকে আমাদের স্যার বলছিলেন,—মোহিত-দা, তুমি তো কোর্থ ক্লাশে উঠেছ, তোমাদের বটানীর কি কিছু বই দিয়েছে? আমাদের কোন বই অবশ্য পড়ান হয় না, কিন্তু স্যার বটানি নিজে খুব জানেন কি না, আর খুব ভালবাসেন,—মুখে-মুখে অনেক তিনি শিখিয়ে দেন।" শরৎ ইতিমধ্যে উঠিয়া গিয়া, জগুয়ার দ্বারা বাহিত একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ি টানিয়া আনিয়া, তাহার মুখের ঢাকনা খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার মধ্য হইতে কয়েকটা ভীমনাগের তালশাঁস সন্দেশ বাহির করিয়াছিল। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অভীপ্সিত বস্তুর দর্শন না পাওয়ায়, সেগুলা হাতে লইয়াই

অজিতকে ডাকিয়া বলিল, "এসো, বাবা, আমি তোমায় খাইয়ে দিই এসো।" অজিতের এদিকে মা না খাওয়াইয়া দিলে কোনদিনই খাওয়া হয় না। যেদিন কোন কারণে সেটা না ঘটিয়া উঠে, সেদিন সে আধপেটা খাইয়া শুষ্কমুখে উঠিয়া যায়। কিন্তু আজিকার এ প্রস্তাবে তাহার কেমন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। পিসিমাকে তাহার মন যতই আপনার বলিয়া শত বাহু বিস্তারপূর্ব্বক তাহার গলা জড়াইয়া ধরিতে যাক্, তথাপি সে পিসিমা যে তাহার এই ঘণ্টাখানেকেরই পরিচিতা—এই একটা মস্ত সঙ্কোচকে যে একেবারেই যুক্তি দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া মুস্কিল!

"না—না, এখন একটুও ক্ষিধে পায়নি পিসিমা,—" বলিয়া সে নিজের লজ্জা সম্বরণ করিতে চাহিয়া, সুধীন্দ্রের হাতটা ধরিল, "এসো সুধীন্! আমার পড়বার ঘরটা তোমায় দেখিয়ে আনি।"

শরৎ আসিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া, আধখানা সন্দেশ ভাঙ্গিয়া মুখে গুঁজিয়া দিল; বিষণ্ণ হাসিতে অন্তরের গভীর দুঃখের এতটুকু একটু প্রকটিত করিয়া কহিল, "আমি যে পিসিমা,—আমায় লজ্জা কি করে অজিত?"

অজিত পিসিমার বাহু-মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া, লজ্জিত হাস্যে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে সুধীনকেও খেতে দিন,—ও-ও তো অনেকক্ষণ কিছু খায় নি!"

"তা থাক্ না। দাও তো বউ,—ওকেও কিছু ঐ থেকে বার করে দাও তো। ওরে জগুয়া, তুই সংয়ের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা না, কোথায় পুকুরঘাট দেখে-শুনে হাত-পা ধুয়ে এসে, আমাদের ব্যাগট্যাগগুলো তুলে রাখ,—খুকিকে বসিয়ে দে না এইখানে।"

মনোরমা এতক্ষণে নিজের হাত-পাগুলাকে কোন রকমে টানিয়া আনিয়া,—যেন ছড়ান জিনিসকে একসঙ্গে জড় করিয়া গুছাইয়া লইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু চলিবার সময়ে পা দু'খানা,—ও সন্দেশের হাঁড়িতে হাত দিলে দেখা গেল, তাহার হাত দু'টাও, ঠিক্ সেই দু'খানা পায়ের মতই,—সমান বেগে কাঁপিতেছে। যেখানটা দেখা যায় না সেই মনের ভিতরটায় না-জানি তখন কি ঘাত-প্রতিঘাতই চলিতেছিল। সুদীর্ঘ দশ বৎসরেরও অধিক! এত দিনে যখন সমস্ত স্মৃতির আলোগুলিই একেবারে নিরেট অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়া নিবিয়া যাইবার কথা,—তখন হঠাৎ সেই বিস্মৃতির তলদেশ আলোড়িত করিয়া এ কি এক অপ্রার্থিত স্মৃতির আলোক জ্বলিয়া উঠিল? এই আলোটুকুই কি শেষ? না, ইহার পশ্চাতে কোন শিখা আছে?

(২৬)

সারাপথখানি চোখের জল মুছিতে-মুছিতে বাড়ী ফিরিয়া, শরৎ শাশুড়ীর কাছে সকল কথা বলিয়া, একবার কাঁদিতে বসিয়া গেল। তার পর জগদিন্দ্রের নিকট আরও একবার খুব খানিকটা কান্না-কাটি করিয়া, শেষে চোখ মুছিবার ব্যর্থ চেষ্টায় বিরক্ত হইয়া, সে আশা ত্যাগ করিয়াই, চোখের জলে ভাসিয়া বলিল, "বর্দ্ধমানে গিয়ে আজ দেবী দেখে এলুম গো,—আমার তীর্থ করা হয়ে গেল! কালীঘাটের দেবীর শুনেছি, কোথায় একটি সিন্দুকে-বন্ধ-করা কড়ে আঙ্গুল আছে,—আর এ দেবী যে আমার রক্তে-মাংসে-গড়া জ্যান্ত দেহ নিয়ে, সহস্র অভাবের মাঝখানে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তবু সেই তেম্‌নিতরোই পতিগতপ্রাণা, সত্যিকারের সতী। এও তেম্‌নি করে পতিনিন্দায় বোধ করি অক্লেশে প্রাণটাই বার করে দিতে পারে।" এই বলিয়া আবার কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "পোড়া কপাল আমাদের;—অভাগা আমার দাদার,—তাই এমন লক্ষ্মীও সাগর-জলে ডুবে রইলো! মাগো! কেন মরতে আমি দেখতে গেছলুম!"

জগদিন্দ্র আস্তে-আস্তে গুড়গুড়ির নলটিতে টান দিতে-দিতে, মাথা নাড়িতে-নাড়িতে সায় দিয়া বলিল, "তার আর সন্দেহ কি। তা তিনি কোথায়, দেখছি নে যে? ডাক না, আমরাও একটু দেবী দর্শন করে পুণ্যি করে নিই।"

"কোথায় সে, যে, ডাকবো তাকে? সে কি এসেছে?"

"ওঃ, আসেন নি বুঝি? তা' কেন, এলেন না কেন?"

"তবে আর বল্‌ছি কি? পাছে দাদার মনে কষ্ট হয়, কি পাঁচজনে তাকে দোষে,—এই সব নানা ভাবনায় এলো না সে। তার মত্ অবিশ্যি মত ছিল না; তা, সে মতের জন্য কিছু আটকাতোও না। সে আমি তাঁকে রাজী করাতুম। কিন্তু সে নিজেই যে আসতে চাইলে না।" কাপড় ঘষিয়া-ঘষিয়া শরতের চোখের চারি পাশে তাহার শ্যামলা রংয়ের উজ্জ্বলতা বিবর্ণ করিয়া কালির ছাপ পড়িয়া গিয়াছিল।

জগদিন্দ্র কহিল, "তা এলে একবার দু'জনে দেখাটাও তো হতো।"

শরৎ চোখ মোছা বজায় রাখিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "সেই জন্যেই তো সে আরও আসবে না গো,—সেই জন্যেই আসবে না। তিন বছর আগে, বাবার কাজের সময় দ্বারস্থ হতে গিয়ে, সেই যে একটু ক্ষণের জন্য যে দেখা হয়েছিল, তাইতেই না কি সে বুঝিতে পেরেছিল যে, সে দেখায় দাদার কত কষ্ট। সে বল্লে কি জানো? বল্লে, 'বাবা যখন আমায় ত্যাগ করেছেন, আর তাঁকে দিয়েও ত্যাগ করিয়েছেন,—তখন এই একটা জন্ম আমার এই রকম করেই কাটিয়ে দিতে হবে। তা'হোক, আমি জানি, আর মনের সঙ্গেই মানি,—এ আমার কর্ম্মফল। এতে দোষ আমি কাউকে দিতে পারি নে! জন্মান্তরে নিশ্চয় আমি রাণীকে বিশেষ করে কোন কষ্ট দিয়েছিলুম,—হয় ত তার স্বামী কেড়ে নিয়ে তার মর্ম্মান্তিক করে থাকবো,—তাই তার এ জন্মের পাওনা আমায় শোধ করে যে দিতেই হবে। তা'হোক, তাতেও আমার দুঃখ নেই। আমিই বা কি কম পেয়েছি? সেই তোমার ভালবাসায় দু'দশদিন যেটুক আমি পেয়েছিলুম, সেটুকু যে আমার খাঁটি সোণার চাইতেও খাঁটি। সে তো কখন ময়লা হ'তে জানে না। তার ওপোর, এই যে সাত রাজার ধন আমি বুকে পেয়েছি,—এইটুকুর যে কতখানি দাম, সে কি আমি জানিনে? এর জন্যে ঈশ্বরের আর তোমাদের কাছে আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তা মুখে ফুটে বল্‌তে পারিনে। ওকে যদি আমি না পেতুম, তা' হ'লে আজ আমার জন্যে তোমার কাঁদবার কথা ছিল বই কি!' এমন মেয়ে তুমি কখন কোথাও দেখেছ?"

জগদিন্দ্র বিবর্জ্জিতার এই একান্ত করুণ কাহিনী শুনিতে-শুনিতে এতই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার মুখের সটকার নলটা কখন্ কোন সময় মুখ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহার হাতে, এবং তার পর তথা হইতে স্খলিত হইয়া গৃহতলকে চুম্বন করিয়া, নিজের অধোগতি-জনিত শোকে লুণ্ঠিত হইতেছিল, এতক্ষণ জানিতেও পারে নাই। সহানুভূতিসূচক সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস টানিয়া আনিয়া, সেটার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া গিয়া, সে কহিয়া উঠিল, "নাঃ, এ চমৎকার! একেবারে সত্যি সত্যি সীতাদেবী।"

"ওগো, না—না,—সীতাদেবীরও মনে একটু অভিমান ছিল;—বনে দেওয়ার জন্যে তিনিও লক্ষ্মণের কাছে একটু ব্যথা জানিয়েছিলেন,—বারে-বারে পরীক্ষা দিতে অপমান বোধ করেছিলেন। এর যে তাও নেই। বল্লে, 'কেন দিদি, শুধু-শুধু তাঁকে দুঃখ দিতে যাবো? চোখে আমি একবার দেখতে পেতুম বটে, কিন্তু তার জন্যে হয় ত তাঁর জীবনের একটা বছর ক্ষয় করে দিয়ে আসতে হ'তো। তাঁর মনের শান্তির কতখানি যে ফুরিয়ে যাবে, তাই বা কে বল্‌তে পারে? এ হতভাগীকে তিনি যে আজও ভুলতে পারেন নি, সে তো আমার জানা আছে। যখন চোক বুজলেই তাঁর সেই হাসি-ভরা মুখখানি আমি চোখের উপর স্পষ্ট করেই দেখতে পাই, তখন তাঁর দুঃখ-মাখা মলিন-মুখে চোখ বুলিয়ে, বুক ফাটিয়ে দিয়ে নাই বা এলুম।"

"বাঃ, বাঃ,—দেখ, দেখ,—শেখ একটু!"

বলিতে বলিতে শরতের চোখ দিয়া ঝরঝরিয়া অশ্রুজলের যে ধারা উপ্‌চিয়া পড়িতেছিল,—বৃষ্টি ভরা শরৎ কালের মেঘ সরান সূর্য্যকরের মত, চকিত করুণ হাস্যে সেই মুখখানা বারেকমাত্র রঞ্জিত করিয়া, সে স্বামীর প্রতি কোপকটাক্ষ হানিয়া তাড়া দিয়া উঠিল, "কি শিখবে গা? আমার কি সতীন আছে? না, তুমি আমায় ত্যাগ করেছ?"

স্ত্রীর এই পরিচিত মূর্ত্তি ও কণ্ঠে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া, জগদিন্দ্র সট্‌কাটা টানিয়া তুলিয়া, জিহ্বা তালু-সংযোগে একটা দুঃখ-সূচক শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক, মস্তকান্দোলন করিতে-করিতে কহিতে লাগিল, "হাঁ, এটা তুমি ঠিক্ বলেছ,—এটা তুমি ঠিক বলেছ। সতীন না থাকলে, আর ত্যাজ্যা না হ'লে পাতিব্রত্যটা বেশ খোলে না, না? পুরাণে, উপপুরাণে, উপকথায় সর্ব্বত্রই যখন ঐ এক নীতি, তখন সংসারেই বা বদল হবে কেন! কি বলো, এ্যাঁ?"

"থামো বাবু, তুমি আর জ্বালার উপর জ্বালিও না। হাসি-তামাসার সময়-অসময় তো নেই তোমার। বুড়ো হয়ে মাথার চুল পেকে গেল, তবু স্বভাব বদ্‌লালো না।"

শরৎ এইটুকু ঝঙ্কার ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মেয়েরই কাল গায়ে হলুদ। মনের মধ্যে যাই থাক্, আজ তাহার বসিবার অবসর কোথা? খোলা দরজার সামনে দিয়া ছোট বৌ,—শরতের ছোটজা, কি কাজে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চলিয়াছিল,—দেখিতে পাইয়া, "বীণা! শুনে যাও!" বলিয়া ডাক দিয়া শরৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে-আসিতে শুনিতে পাইল, তাহার অনুযোগের উত্তরে হো-হো করিয়া

হাসিয়া উঠিয়া জগদিন্দ্র বলিতেছে, "কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে'; আর আমার বেলায় একটু বুড়ো হয়েচি বলেই বদলে যাবে? তবু তেমন বুড়ো কিছু হইনি।"

ভাসুরের কথাটা কাণে আসিতেই, ছোট বৌ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া, সেই অন্যায় চপলতাটুকু ঢাকা দিবার জন্য, মুখের ঘোমটাটা গলার কাছ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিল। শরৎশশী জায়ের দিকে চাহিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিয়া উঠিল, "শুন্‌লি, কথার ছিরি দেখ্‌ছিস্ তো? তুই আবার বলিস্, দিদি তুমিই ঝগড়াটে গায়ে পড়ে ঝগড়া করো। উনিতো 'সদাশিব'। দেখ, শিবঠাকুরটিও বড় কমে যান না। ছড়-টড়া, বচন-টচন বেশ জানা আছে।"

ছোট-বৌ হাসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া, "দিদির এক কথা।" বলিয়া চলিয়া গেল। ঘরের মধ্য হইতে জগদিন্দ্র তখন রূপার মুখনলে টান দিতে-দিতে, অপূর্ব্ব স্বর্গসুখ উপভোগান্তে ডাকিয়া বলিতেছিল, "এই দেখ, তুমি ছাড়া আমায় সবাই ভাল বলে,—শুধু তুমিই বলো না। সাধে কি কথায় বলে, 'ঘরের ঠাকুর পর হয়'।"

"আমার এখন 'ভাল বলার' সময় নেই গো।" বলিয়া শরৎও প্রস্থান করিল। কিন্তু কাজে-কর্ম্মে সেদিন সে যেন আদৌ মন দিতে পারিতেছিল না। দীর্ঘকাল মনের যে আগুন ছাই-চাপা ছিল, তাহা যে আবার নূতন করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া সেই মুখখানা,—সেই ব্যথা-ভরা, সকরুণ, অথচ অন্তরের পূর্ণ সতীতেজে তেজোদ্দীপ্ত, সমুজ্জ্বল সে মুখ সে দূরে ঠেলিয়া ফেলে? সেই পাষাণ-গলানো, বুকফাটান, মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি সে নিজের মনের মধ্যে, বড় ব্যথিত বেদনার আগ্রহে স্থান দিয়া, একটা অননুভূত যন্ত্রণাময় সুখে তাহাদেরি লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়া, কেমন করিয়া সে অন্য দিকে মন দেয়? তার উপর অজিত আসিয়াছে। তাহাকে কোথায় রাখিবে, কি খাওয়াইবে, কি পরাইবে, এই সব ব্যস্ততায় নিতান্ত আবশ্যক সকল কর্ম্মেই তাহার পদে-পদে ভুল-ভ্রান্তি ঘটিতে লাগিল। অনেক বাড়ী এখনও নিমন্ত্রণ সারা হয় নাই,—সে নিজেই বাহির হইবে ঠিক ছিল। হঠাৎ মত বদলাইয়া সে ছোট বৌকে ডাকিয়া বলিল, "বীণা, তুই ভাই কাপড়-চোপড় পরে নিয়ে,—হরির-মা আর সরলা কি বেলা,—কোন একটা ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে, নেমন্তন্নগুলো সেরে আস্‌গে যা।"

বীণা ছেলেমানুষ এবং বউ-মানুষ। বাড়ী-বাড়ী নিমন্ত্রণ করিয়া বেড়ানর মত পদমর্য্যাদা লাভের বয়স তাহার হয় নাই। সে কিছু বিস্মিত হইয়া তাই জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কেন দিদি? তুমি যাবে না?" "না ভাই, আমার শরীর ভাল মনে হচ্চে না,—তুই-ই যা। ফর্দ্দটা যাবার সময় চেয়ে নিতে যেন ভুলিস্‌নে; তা'হলেই সব গোল পাকিয়ে আসবি।"

ছোট-বৌ দিদির এই উপদেশে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। দায়িত্ব ঘাড়ে লওয়ার সাহস সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, মিনতি করিয়া কহিল, "তুমিই যাও না দিদি,—আমি কি সব ঠিক্ করে বল্‌তে পারবো? সবার সঙ্গে তো কথাই কই না।"

"ঐ হরির-মা রৈল কি না,—ও সব বলে-কয়ে দেবে'খন। আমি আর পারচিনে,—তুই যা। শেষে যদি রোগ হয়ে পড়ি, তো, তখন তোমরাই মজাটি টের পাবে।"

এই 'মজাটি' যে কতখানি, তা' ইতঃপূর্ব্বে,—বিয়ে বাড়ীতে নয়, অমনি বাড়ীতেই—একবার এই ছোট্ট বধূটি 'টের' পাইয়াছিল। তাই সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়াই, অবিলম্বে নিজের ঘরে চলিয়া গেল; এবং সেখান হইতে পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিয়া, ঘণ্টা-দুই পরে বাহির হইল। তার পর আরও এক ঘণ্টা সময় খরচ করিয়া গা ধুইয়া, ফিকে ফিরোজা সিল্কের জামা, ও সেই রংয়ের কার্নিস-পাড়ের পাতলা বেণারসী ডুরে সাড়ি পরিয়া, দু'চারিখানা মানানসই গহনা গায়ে দিয়া, সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার মধ্যেই, কতক নিজে এবং কতকটা ঝিয়ের সাহায্যে, ভাসুর-ঝি বেলার গা ধোওয়া, চুল আঁচড়াইয়া তাহাতে ফিতা বাঁধা, এবং জুতা-মোজা পরান হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আসল কাজটাই তখন পর্য্যন্ত বাকী। সে মেয়ে এই বয়সেই কিছু বেশি রকম সৌখীন। অন্যের পছন্দে তাহার পছন্দ মিলিতেছে না। কাকীর মতলব, মাথার নীল ফিতার সহিত মিল খাওয়াইয়া, তাহার যে নীল-রংয়ের সিল্কের ফ্রক পূজার সময় মামার বাড়ী হইতে আসিয়াছিল, সেইটি পরাইয়া দেয়। সেটির নাকি গড়ন খুব বেশি আধুনিক, এবং পরিলে উহাকে মানায়ও ভাল। কিন্তু সৌন্দর্য্য-তত্ত্বে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, সেই সাতবছরের মেয়েটি একটি [illegible] গোলাপী-রংয়ের ক্যালিকো কাপড়ের

ফ্রকে, হলদে চওড়া লেসের বাণ্ডিল ঝোলান,—তাহার বাবার নিজের কেনা,—সেইটি পরিবার জন্য কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। খবর পাইয়া শরৎ আসিয়া, মেয়েকে কাকীর আদেশ পালনে হুকুম করিয়াও যখন হুকুম মানাইতে পারিল না, তখন হাত হইতে সেই ফ্রকটা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পিঠে দুমদাম করিয়া দুইচারিটা চড় বসাইয়া দিয়া, তাহাকে টানিয়া আনিয়া স্বহস্তে সেই খাট নীল ফ্রকটা জোর করিয়া পরাইয়া দিল। অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়ে ও মেয়ের বাপের উদ্দেশে দু'চারিটা বাক্যবাণও যে হানা না হইল, তাও নয়। যেমন পছন্দ করে ভাল পোষাক কিনে আনা হয়েছে! পায়ের তলা পর্যান্ত ঐ আলখাল্লা লুটিয়ে বার হবে কেমন করে? সিঁদুর-চুপড়ী না সাজলে তো মেয়ের সাজ হয় না! ঐ জন্যে ছোট-বৌকে বলেছিলাম সরলাকে নিয়ে যা,—তা তো পছন্দ হলো না। সে যে কালো! এঁর ঐ একটু ফ্যাকাসে রং আছে কি না, তারই জন্যে মেয়েরও তেজ,—ঘরের সবারও এক-চোকোমি। নাও, এখন ভোগো! ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তার পর চীৎকার করিতে-করিতে, নূতন চূণকামের উপর বৃষ্টি-জলের ধারার মত, দুই গালের পাউডারের উপর চোখের জলের দুইটা চওড়া ধারা নামাইয়া দিয়া, সেই অপূর্ব্ব দর্শন মুখ লইয়া বেলা, হরির মায়ের দ্বারা বাহিত হইয়া গাড়ীতে চাপিল। নিমন্ত্রণের কার্ড হাতে দিয়া, শরৎ ছোট-বৌকে একটু আড়ালে ডাকিয়া আনিয়া, বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল, যে, বর্দ্ধমানের কোন কথা যেন ও-বাড়ীতে বা কোনখানেই না ওঠে,—মাকে কাল আসবার জন্য খুব বেশি করিয়া অনুরোধ করে। রজরাণীকে যেমন মামুলী বলিতে হয় বলিবে, জেদ করিবার দরকার নাই।

(২৭)

অজিত এ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের বাহির হয় নাই। ট্রেনে চাপা তাহার এই প্রথম। ষ্টেশনের পর নূতন-নূতন ষ্টেশন আসিতেছিল,—মাল, মেল, প্যাসেঞ্জার সবই বিচিত্র। হাওড়া ষ্টেশনের অভিনবত্বে সে অভিভূতই হইয়া পড়িয়াছিল। তার পর এই কলিকাতা সহর। ইহার বৈচিত্র্য এই পল্লীবাসী বালকের পক্ষে কেন, এই সহরেরই অধিবাসী চিরাভ্যস্ত বৃদ্ধের পক্ষেও এ কখন না বিচিত্র? প্রদীপের আলোর পাশে তাড়িতালোকের ন্যায় তাহাদের রাজধানীর সহিত এই বঙ্গীয় রাজধানীর প্রভেদ যে। অজিত নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে বড়-বড় দু'টি চোখ মেলিয়া জন প্রবাহ, আলোক-লহরী প্রভৃতি দেখিল। তাহার থাকার মেয়াদ বেশি দিন নয়। সে দিন তো আসিতেই সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি আসিয়াছিল। সেদিন শনিবার। সোমবার অণিমার গায়ে-হলুদ, মঙ্গলবার বিবাহ; বুধবার ভোরের গাড়ীতেই সে ফিরিয়া যাইবে। স্কুল কামাই হওয়া ছাড়া, এর চেয়ে বেশি দিন সে মা ছাড়া থাকিতে পারিবে না, কিম্বা মা ছেলে ছাড়া থাকিতে পারিবে না,—ঠিক বলা যায় না। হয় ত এ দুইটাই এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার মুখ্য কারণ। দিদিমা এক প্রকার অসম্মতিতেই সম্মতি দিয়াছেন। শরৎ যখন মনোরমাকে কোন প্রকারেই আসিতে সম্মত করিতে পারিল না, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "তবে আর কি বলবো; বলবার আমার আছেই বা কি? তুমি না যাও, অজিতকে তো আমি নিয়ে যেতে পারি? ওকে তো আটকাতে পারো না!"

মনোরমার অশ্রুপ্লাবিত চোখে মুখে বড় আগ্রহের একটি ফোটা মৃদু হাস্য চকিত হইল। আবার তখনি তাহা সেই শান্ত মুখের গভীর মেঘস্তরে বিজলী চমকের মতই মিলাইয়া গিয়া, তাহাকে যেন শতগুণ নিবিড় করিয়া তুলিল। নত চক্ষে, অতি ধীরে সে উত্তর করিল, "ওকে তোমরা নিয়ে যাবে, তা'তে আমার কি আপত্তি থাকতে পারে ভাই? তবে আমি এই ভাবচি যে, ওর সঙ্গে সংশ্রব রাখলে, তোমরা পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনের পাপে পাপী হবে না তো?"

"সে আদেশ যাদের উপরে আছে, তারা পাপ-পুণ্যের হিসাব রাখুক,—আমার উপর তো নেই। বিশেষ, আর যে যা করতে হয় করুক,—আমি যদি ওকে আমার ভাইপো বলে স্বীকার না করি, তা'হলে আমায় যে জাহান্নমে যেতে হবে।"

মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া, মনোরমা মুখ তুলিয়া, একটু যেন জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়াই বলিল, "তা'হলে ওর বাপের বাড়ীর মধ্যে তবু ঐ একটুখানি সরু সুতোর বাঁধন থাক্। ওর তো সংসারের পাওনা খুবই বেশি নয়। যেটুকু পেতে পারে, তার থেকে আমি একটুও বাদ দিতে পারিনে। কিন্তু—"

মনোরমা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে, নিজের আঁচলের যে প্রান্তটা এতক্ষণ ধরিয়া পাকাইতে-পাকাইতে সূক্ষ্ম করিয়া তুলিয়াছিল, সেইটেকেই আরও একটু দ্রুত-হস্তে পাকাইতে লাগিল। শরৎ তাহার গা ঘেঁসিয়া সেই ছোটবেলারই মত একেবারে এক হইয়া ঠাসিয়া বসিয়াছিল। সে এই এতটুকু একটু "কিন্তু"র মধ্যে জমা-করা অনেকখানি সঙ্কোচ দেখিতে পাইয়া, তখনি সুগভীর আগ্রহ ভরে তাহার গলাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "'কিন্তু' বলে থাম্‌লি কেন? কি বল্ না বউ, —বল্ না ভাই, কি বলছিলি?" মনোকে তথাপি নীরব দেখিয়া, জোর করিয়া টানিয়া তাহার মাথাটা নিজের বুকের উপর আনিয়া ফেলিয়া, তাহার সেই মাথায়, মুখে অসীম প্রীতিভরে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে নিজের মুখখানা নত করিয়া, তাহার মুখের কাছে কাণ আনিয়া ছেলে-মানুষের মত আবার প্রশ্ন করিল, "কি ভাই? দাদার কথা কিছু বল্‌বি কি?"

এ আদর—এত আদর আর যেন মনোর দেহে-মনে সহিতেছিল না। তাহার বুকের মধ্যে সমুদ্র-মন্থন আজ অপরাহ্ণ হইতে সারাক্ষণই চলিতেছে, উদ্বেলিত সিন্ধুর ন্যায় তাহাতে ঢেউ বড় জোরে-জোরে উঠা-পড়া করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার বুকের রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হইয়া, দম আটকাইয়া যাইবার উপক্রম করিল; এবং তাহার বলে মুখখানা শুষ্ক পাংশু হইয়া উঠিল। তখন সে অকস্মাৎ সখীর কোলের মধ্যে লুটাইয়া পড়িয়া, অবিচ্ছিন্ন অশ্রুজলের প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া দিল। তখন আর কোন কথাই স্মরণে থাকিল না; শুধু এই কথাই দু'জনের মনে থাকিল যে, তাহারা সেই দুইটি কিশোরী বাল্যসখী। অনেক দিনের, অনেক দুঃখের পর পুনর্মিলিত হইয়াছে; কিন্তু এই মিলনের সেই আসল কেন্দ্রটুকু আর তাহারা ফিরিয়া পায় নাই। তাই এ মিলনে সুখের চেয়ে অসুখই বেশি। যেখানে বলার কথা সে দিনে অফুরন্ত ছিল, সেখানে আজ আসন পাতিয়া বসিয়াছে,—সঙ্কোচে শীর্ণ, দ্বিধাগ্রস্ত একটা 'কিন্তু'।

অনেকক্ষণ এমন করিয়া কাটিল। শরৎ আপনি শান্ত হইয়া, সখীর চোখ মুছাইয়া দিয়া, তাহাকে তুলিয়া বসাইয়া, আবার ঐ প্রশ্ন করিলে, মনো জবাব করিয়াছিল। প্রথমটা বড় লজ্জা বোধ হইলেও, জোর করিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলিল, "অজিতকে নিয়ে যাচ্চো, তাকে একবার সুবিধে করে তাঁকে দেখিও। তিনি যেন না দেখতে পান,—আর ও তাঁকে ভাল করে দেখে,—এমন করে দেখিও। বাপ চেনে না ছেলে; এর চেয়ে যে ছেলের পক্ষে কোন লজ্জাই লজ্জা নয়।"

ইহারই মধ্যে শরৎ তাহার মাথার কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া, চুলের গাদা লইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। সে কহিল, "সে আমায় তোর বল্‌তে হবে না। সুজনবাবু এঁর আর দাদার দুজনারই বন্ধু কি না,—রাজার বিয়েয় এসেছিল। গিয়ে যখন অজুর কথা এঁদের কাছে গল্প করলে, বল্লে 'অরবিন্দের ছেলে ওখানে থাকে তা'তো জানতাম না। ছেলেটা বাপের বুঝি বড় ন্যাওটো? বাপের কথা যেন মুখ দিয়ে বল্‌তে পারে না,—ভারি ভক্তি দেখলুম। চমৎকার ছেলে।' তখনি থেকে আমার ইচ্ছে হয়েছিল,—"

ঈষৎ ভীতা হইয়া মনোরমা চমকিয়া মুখ ফিরাইল, "কিন্তু ওকে নিয়ে তাঁর সাংসারিক সুখে যেন এতটুকুও ব্যাঘাত না হয়,—ওর জন্যে ওদের বাড়ীতে কোন অশান্তি না আসে। লক্ষ্মী দিদিমণিটি আমার! দেখো ভাই, আমাদের এই দুর্ব্বলতাটুকুতে তাঁর এত দিনের এতখানি সংযম যেন ব্যর্থ না করে ফেলি।"

শরৎ তখন আবার একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া উত্তর দিয়াছিল, "দিদি যে ওদের জন্যে তুই অত ভাবনা ভাবিসনে। তোর জন্যে এ সংসারে কারুর কোন অশান্তিই যে আসতে পারে না। আর পারলেও তা আসতো না, তোর কি কেউ মূল্য বোঝে!" ইহার পর ইহাদের মধ্যে আর কোন কথা হয় নাই। শুধু বিদায় কালে যখন শরৎ বলিল, "আর তোমায় তবে কি বলবো বলো! চল্লুম তা'হলে—" তখন মনো তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া উত্তর করিয়াছিল, "না,—আর কিছু বলো না। শুধু এই বলো, আর-জন্মে যেন আবার পাই। আর সেবার যেন এমন করে পেয়ে হারাতে না হয়।"

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ, এম্-এ]

(২)

ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ যথেষ্ট আছে; কিন্তু একটিও তর্ক-বিজ্ঞান-অনুমোদিত নহে; এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ অসম্ভব। কারণ, এরূপ প্রমাণ কতকগুলি উচ্চাঙ্গের স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা এবং সূত্রের উপর নিভর করে। ঈশ্বরের স্থান সর্ব্বোচ্চে; সুতরাং অন্য কোন উচ্চতর বস্তু হইতে ঈশ্বরাস্তিত্বের অনুমান অসম্ভব। ঈশ্বরাস্তিত্ব বিজ্ঞান-অনুমোদিত কোন একটি প্রমাণের উপর নির্ভর করে না সত্য; কিন্তু, তথাপি, ইহার উপর সকল প্রমাণই নির্ভর করে;—যাবতীয় প্রমাণের মূলে ঈশ্বরে বিশ্বাস। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ব্যতীত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে। আমাদের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা আছে স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর সম্পূর্ণ, সত্য এবং নিত্য বলিয়া আমরা জানি। যাহা সত্য এবং নিত্য, তাহার অস্তিত্ব আছে। যাহাতে "অস্তিত্বের" অভাব, তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ঈশ্বর সম্পূর্ণ; সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কেবল অস্তিত্বের ধারণা হইতে প্রকৃত অস্তিত্বের অনুমান কি যুক্তিসঙ্গত? আমি ক্রোড়-পতি, এরূপ ধারণা করা আমার পক্ষে অসম্ভব নহে; কিন্তু আমি এরূপ ধারণা করিতে পারি বলিয়াই কি বাস্তবিকই আমি ক্রোড়পতি? ঈশ্বর সম্পূর্ণ; সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, এরূপ ধারণা আমি করিতে পারি এবং করি। এই ধারণার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই, এ ধারণা সত্য; কিন্তু, তাই বলিয়া, এরূপ ধারণা-নির্দ্দিষ্ট বস্তুটিও কি সত্য—ইহার অস্তিত্ব কি নিঃসন্দেহ?

আমরা জীবের জন্ম দেখিতেছি, আবার মৃত্যুও দেখিতেছি। জিনিসের প্রারম্ভ দেখিতেছি, আবার পরিণতিও দেখিতেছি। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। কারণ ব্যতীত অবস্থান্তর অসম্ভব। এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের অনেক বিষয়ের আমরা কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হই। নির্ণীত কারণেরও আবার কারণ আছে। এইরূপে কারণ হইতে কারণান্তরের অন্বেষণে আমরা প্রবৃত্ত;—কিন্তু এ অন্বেষণের নিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং মানব-মন স্বতঃই একটি অকারণ-সম্ভূত কারণের স্থিতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

এই জগতের বস্তু বিবিধ; কিন্তু বিরোধ সম্পর্কযুক্ত নহে। মৃত্তিকা, বায়ু, জল, স্থল, পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, উপত্যকা, উপবন, উদ্যান,—যাবতীয় জিনিস ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমনই সদ্ভাব যে, কেহ কাহারও অন্তরায় হওয়া দূরে থাক, সকলেই সকলের সহায়তা করিতেছে; সকলেরই ক্রিয়া সরল ভাবে শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। এরূপ শৃঙ্খলা কি অন্ধশক্তি-পরিচালিত?

আমাদের মন এক, কিন্তু ইহার শক্তি ও বৃত্তি অনেক। অভ্যাসের বলে এবং উপদেশের সাহায্যে এই বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি; কিন্তু আমাদের যে বৃত্তি নাই, অশেষ যত্নেও সে বৃত্তির উৎপাদন অসম্ভব। এই বৃত্তিগুলি ক্রমোন্নতিশীল; এবং ইহাদের এই ক্রমিক বিকাশ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহাদের উৎকর্ষ-সাধন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট,—কাহারও ইচ্ছানুমোদিত। আবার, যিনি আমাদিগকে শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়াছেন, তিনি কি বধির? যিনি আমাদিগকে চক্ষুরত্ন দিয়াছেন, তিনি কি অন্ধ? যিনি আমাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন, তিনি কি অজ্ঞান? আমাদের ইন্দ্রিয় আছে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য দ্রব্য-সম্ভারও স্তরে-স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়-পরিচালনে সুখ, সুখ হইতে আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষা হইতে জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে। তোমার তৃষ্ণা আছে—তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য বারিও আছে; তোমার ক্ষুধা আছে, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য খাদ্যও আছে; তোমার হৃদয়ে বাসনা আছে, বাসনা-তৃপ্তির জন্য ধন, যশ,

মান,—যাহা কিছু চাও তাহাই আছে; তোমার দয়া আছে, দরিদ্রের দুঃখও আছে। তোমার সহানুভূতি আছে—আতুরের আর্ত্তনাদ, বিপন্নের কাতরোক্তিও আছে। তোমার স্নেহ আছে—স্নেহের বস্তুও অনেক আছে।

"তুমি যে আমার হৃদয়েশ্বর
তুমি যে প্রাণের প্রাণ;
কি দিব তোমায়, যা আছে আমার
সকলই তোমারই দান।
চরণের লঘু ভঙ্গিম গতি,
হৃদয়ের বেগ কম্পিত অতি,
অধরের হাসি নয়নের জ্যোতিঃ,
কণ্ঠের মৃদু গান;
সকলই তোমারই দান—সে যে সখা
সকলই তোমারই দান।"

ঈশ্বরে বিশ্বাস সার্ব্বজনীন। সকল সময়ে, সকল দেশেই, সকল লোকেরই এ বিশ্বাস আছে। ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ এত প্রচুর এবং স্পষ্ট যে, সামান্য বুদ্ধি বৃত্তি-পরিচালনের দ্বারাই ইহা প্রতীয়মান হয়; এবং সহজেই ঈশ্বরে বিশ্বাস সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। জাগতিক ব্যাপার-সমূহ অলক্ষিত ভাবে এই বিশ্বাসের বীজ আমাদের অন্তঃকরণে রোপণ করিয়া দেয়। আমাদের মন এমনি ভাবে গঠিত এবং এমন অনুকূল অবস্থান্তর্গত যে, এ বিশ্বাস সহজেই স্বাভাবিক এবং সাধারণ হইয়া পড়ে। এই সার্ব্বজনীন বিশ্বাস কি অলীক. সকল মনুষ্যের মনই কি অনৃত বস্তুতে বিশ্বাস করিবার উপযোগী করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে? বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, জীব, জন্তু প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থার ভিতর থাকিলে যেমন পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না, মনুষ্যেরও তেমনি প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে শরীরে সৌষ্ঠব এবং মনের সৌন্দর্য্যের বিকাশ হওয়া দূরে থাক্, বরং বিকৃত হইয়া পড়ে। কোন্ বিশেষ প্রতিকূল কারণের জন্য কোন একটি বৃক্ষ ফল-পুষ্পে শোভিত হইল না বলিয়া, তুমি কি বলিবে, সেই জাতীয় কোন বৃক্ষই ফল-পুষ্প-শোভিত হইবে না? মনুষ্যের মধ্যেও তেমনি কোন একটি নিকৃষ্ট জাতি বা শ্রেণীর ভিতর ভগবৎ-প্রেমের উন্মেষ না দেখিতে পার; কিন্তু তাই বলিয়া কি অনুমান করিবে যে, মনুষ্য মাত্রেরই মধ্যে ভগবৎ-প্রীতি নাই?

এইরূপ নানা প্রকারে ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু কোন একটি প্রমাণও একবারে ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য নহে; সুতরাং কোন একটি প্রমাণ হইতে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হইতে পারে না। কিন্তু সকল প্রমাণের লক্ষ্য এক; এবং সমবেতভাবে সকলেই ঈশ্বরাস্তিত্বের নির্দ্দেশ করিতেছে। ভগবানের অস্তিত্বে আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। ভগবানে অবিশ্বাস কর,—বিজ্ঞান-শাস্ত্র অর্থহীন হইবে, দর্শন-শাস্ত্র অসম্ভব হইবে—জ্ঞানের আলোক নির্ব্বাপিত হইবে। যাহা কিছু বাস্তব, যাহা কিছু সত্য, তাহারই ভিতর দিয়া ভগবানের অনন্ত প্রেম, অনন্ত শক্তি, অনন্ত বুদ্ধি প্রকটিত হইতেছে। যে গণিত-শাস্ত্রের সাহায্যে সৌরবিৎ পণ্ডিত গণনা করিতেছেন, সে শাস্ত্র যদি সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বসময়ে সমানভাবে প্রযুক্ত না হয়, তবে সৌরবিজ্ঞানের সার্থকতা কি? সূর্য্যদেব যদি আজ পূর্ব্বে, কাল পশ্চিমে উদয় হইতেন, যে বিষাক্ত পদার্থে আজ মৃত্যু হইতেছে, সেই পদার্থে এবং সেই অবস্থাতেই যদি কাল জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পাইত, তবে কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থিতি সম্ভবপর হইত? যদি বিবেকের অনুশাসন সকল লোকের পক্ষেই সমান না হইত, তবে শীল-বিজ্ঞানের স্থিতি লোপ পাইত না কি? প্রত্যেক বিজ্ঞানই কতকগুলি সাধারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই নিয়মগুলি মনঃপ্রসূত, স্বতঃসিদ্ধ—ইহারা সকল দেশেই এবং সকল সময়েই সত্য। এই মনসিজ স্বতঃসিদ্ধগুলির সার্ব্বজনিকত্ব এবং সার্ব্বভৌমিকত্ব অস্বীকার করা আদৌ সম্ভবপর নহে; সুতরাং মানিয়া লইতে হইবে যে, কোন সার্ব্বজনিক সর্ব্বশক্তিমান্ চিচ্ছক্তি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া ঐ নিয়মগুলির প্রকাশ এবং বিকাশ করিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান যেমন সত্য এবং নিঃসন্দেহ, ভগবানের অস্তিত্বের জ্ঞানও তেমনি সত্য এবং নিঃসন্দেহ; ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান যথার্থ এবং নিশ্চয় হইলেও ইহা অসম্পূর্ণ জ্ঞান। ঈশ্বরের জ্ঞানে আমাদের সকল সংশয় দূর হইতেছে সত্য; কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে সংশয় থাকিয়া যাইতেছে; ঈশ্বরের জ্ঞানে আমরা সকল জিনিসের ধারণা করিতেছি সত্য; কিন্তু ঈশ্বর এখনও আমাদের ধারণাতীত। ঈশ্বর ব্যতীত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নির্ণীত তথ্যগুলি আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে—এরূপ তথ্য হইতে কেবল যান্ত্রিক জটিলতা এবং বিশেষত্বই

প্রমাণিত হয় মাত্র—ইহা কোন চিচ্ছক্তির মহত্ব প্রকাশ করে না।

ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করা কি মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব? কেহ-কেহ বলেন যে, ভগবানের অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ নাই; কেহ-কেহ বলেন, তিনি আমাদের গুণের অতীত, যুক্তিতর্কের বহির্ভূত। আবার কেহ-কেহ একেবারেই বলিয়া বসেন, "ভগবান্ নাই"। কিন্তু এই বিশাল বিশ্বের একজন কর্ত্তা নাই, একজন ধাতা নাই, ভাল-মন্দের বিচারক নাই—এ বিশ্বাস কি মানুষ সরলান্তঃকরণে, সর্ব্বান্তঃকরণে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে? করা কি সম্ভব? মানব-প্রকৃতি কি স্বতঃই ভগবৎ-প্রীতির জন্য লালায়িত নহে? মানুষের তর্ক-শক্তি আছে; কিন্তু এ তর্কের মীমাংসা কোথায়? মানুষের প্রেম আছে; কিন্তু ঐ প্রেমের তৃপ্তি কোথায়? মানুষের আকাঙ্ক্ষা আছে; কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষার পরিণতি কোথায়? মানুষের বিবেক আছে, কিন্তু এ বিবেকের উৎপত্তি কোথায়?

"হাঁ" কথাটি প্রমাণ করা বরং সহজ; কিন্তু "না" কথাটি বলা তত সহজ নহে—অনেক স্থলে একবারেই অসম্ভব। বৃহদরণ্য-মধ্যে সামান্য একটি চিহ্ন হইতে তথায় মনুষ্যাগম অতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু সেখানে একটিও মনুষ্য নাই বা কখনও আইসে নাই, ইহা প্রমাণ করিতে হইলে, সমুদায় অরণ্যটি তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই অনন্ত বিশ্বের যে কোনও একটি জিনিসে ভগবানের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু তাহার কোনটিতেই ভগবানের সত্তা উপলব্ধি হয় না, বলিতে হইলে, অনন্ত বিশ্বকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? সামান্য মানব কি প্রকারে অনন্ত বিশ্বকে সম্যকরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবে? ভগবান্ নাই, এ কথা বলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে; তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি আছেন কি না আছেন, আমরা তাহা জানিতে পারি না। কিন্তু ঈদৃশ মনের অবস্থা কি অত্যন্ত ভয়াবহ নহে? মানুষ কতক্ষণ সন্দিগ্ধ-চিত্তে থাকিতে পারে? সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত মানুষ সতত সচেষ্ট। সন্দেহ পোষণ মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ;—সে সত্যানুসন্ধানে সর্ব্বদাই যত্নবান্।

ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত মনে শান্তি হয় না, হৃদয়ে তৃপ্তি হয় না। সম্মুখে সুন্দর জগৎ সুন্দররূপে সজ্জিত। ইহার ভিতর শৃঙ্খলা আছে, আবার উচ্ছৃঙ্খলাও আছে; শৃঙ্খলার মধ্যে মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা, আবার উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যেও শৃঙ্খলা! বিরোধের মধ্যে ঐক্য, আবার ঐক্যের ভিতর বিরোধ! ইহার সকল জিনিসই সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত এবং একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত!

হেথা—

"হেরি—সুখের মাঝারে দুঃখ বিরাজে
দুঃখের মাঝে সুখ!
রহে—হাসির ভিতরে অশ্রু লুকায়ে,
অশ্রুর মাঝে শান্তি
কভু—শান্তির মাঝে সত্য বিরাজে,
সত্যের মাঝে ভ্রান্তি

সব—সুখ-দুঃখ আঁধারে আলোক
নিঠুর-করুণ-দণ্ড;—
ওগো—এক সুরে বাঁধা সকল রাগিণী—
এক তারে গাঁথা বিশ্ব।"

এই সুন্দর পৃথিবীতে সুন্দর জিনিসের এমন সুন্দর সমাবেশ কে করিল? কোনও নাস্তিক হয় ত বলিবেন, এ প্রশ্নের উত্তর নাই,—এরূপ প্রশ্ন করাও বাতুলতা। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আছে; সে সর্ব্বদা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ে ব্যস্ত, সুতরাং তাহার পক্ষে এরূপ প্রশ্ন স্বাভাবিক। যতক্ষণ তাহার বুদ্ধিবৃত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, যতক্ষণ তাহার চিন্তাস্রোত অপ্রতিহত থাকিবে, ততক্ষণ তাহার মন হইতে এ প্রশ্ন কিছুতেই অপসৃত হইবে না। আবার কোন-কোন নাস্তিক বলিয়া থাকেন যে, এই পৃথিবী এবং ইহার যাবতীয় সৌন্দর্য্য অণু-পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। ইতিহাসের উন্নতি, বিজ্ঞানের বিস্তৃতি, মানসিক বৃত্তি—এ সমস্তই অণু-পরমাণু-সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু এই অণু-পরমাণুর সৃষ্টি কে করিল? ইহাদের এমন সুন্দর সমাবেশ কোথা হইতে হইল? কাহার আদেশে ইহারা এরূপ নিয়মানুশাসিত? জগতের সৌন্দর্য্য, মানুষের মন, তাহার নৈতিক বৃত্তি এবং ধর্ম্মে প্রবৃত্তি—এ সকল কি অণু-পরমাণু হইতে একবারেই পৃথক জিনিস নহে? একটি অসম্পূর্ণ আর একটি সম্পূর্ণ;—অসম্পূর্ণ হইতে সম্পূর্ণের সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব?

তবে কি আমরা মনে করিব যে, এই বিস্ময়াবহ বিশ্ব মাত্র অন্ধ দৈব সৃষ্টি? ইহা কি দৈবাৎ সজ্ঘটিত হইয়াছে? একবার এই শস্য-শ্যামলা, মলয়জ-শীতলা, সৌন্দর্য্য-মণ্ডিতা বসুন্ধরার কথা ভাব দেখি। যিনি অকাতরে অযাচিত-ভাবে ক্ষুধায় খাদ্য, তৃষ্ণায় পানীয় দান করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন, যাঁহার সৌন্দর্য্যে তোমার নয়ন মুগ্ধ হইতেছে, যাঁহার সৌগন্ধে তোমার নাসারন্ধ্র পুলকিত হইতেছে, যাঁহার সঙ্গীত-স্বরে তোমার কর্ণপটহ স্পন্দিত হইতেছে, যাঁহার রসে তোমার রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইতেছে —তিনি কি অন্ধশক্তি-সমুৎপন্ন—দৈবাৎ সম্ভূত?

"ক্ষুদ্র রেখায় লুকায়ে রাখেন
যিনি ভাবী মহানদে,
পঙ্কিল ক্ষীণ মৃণালের বুকে,
সুবিমল কোকনদে,
সিন্ধু রাখেন বিন্দুতে হায়,
ভাবী রামধনু জলকণিকায়,
বীজেতে রাখেন যিনি মহাতরু,"

তিনি কি অন্ধশক্তি সমুৎপন্ন—দৈবাৎ সম্ভূত? এখানে বস্তু বহু এবং বিবিধ হইলেও সকলেই সজ্ঘবদ্ধ, একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত,—মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেরই স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদনে সচেষ্ট। তুমি তোমার শিল্প নৈপুণ্যের শ্লাঘায় বিভোর; কিন্তু তোমার চরণদলিত ঐ তৃণদলটির ন্যায় কোন সুন্দর বস্তু এতাবৎ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছ কি? তুমি তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার গরিমায় আত্মহারা হইয়াছ; কিন্তু সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও ঐ ক্ষুদ্র পুষ্পটির রহস্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হইবে কি? ইহার সৌগন্ধে তুমি মাতোয়ারা হইতেছ; কিন্তু কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, ইহার সুঘ্রাণের উৎপত্তি কোথা হইতে? মূল হইতে ইহার উৎপত্তি হয় না; কারণ, মূল ত গন্ধহীন। কাণ্ড ইহার উৎপাদক নহে; কারণ, কাণ্ডও ত মূলের ন্যায় গন্ধহীন। মৃত্তিকা হইতেও এ গন্ধের সৃষ্টি হইতে পারে না; কারণ, একই মৃত্তিকার উপর নানা প্রকারের বৃক্ষ-লতা দণ্ডায়মান; কিন্তু সকলেই ত সুগন্ধ পুষ্প-পরিশোভিত হয় না! পত্র এ সুগন্ধের হেতু নহে; কারণ, পত্রও কাণ্ডের ন্যায় গন্ধহীন। কোরক হইতে এই গন্ধের উৎপত্তি হইতেছে, তাহাও বলা যায় না; কারণ, অস্ফুটন্ত ফুলের গন্ধ কোথায়? ইহা কি তবে অন্ধ দৈব সৃষ্টি? জগন্মণ্ডলের আত্মাস্বরূপ মহামহিমান্বিত সূর্য্যদেবের কথা ভাব দেখি। যাঁহার দীপশিখায় আলোকে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত, যাঁহার উত্তাপে চরাচর বিশ্ব সঞ্জীবিত, যাঁহার আকর্ষণে বিশ্বমণ্ডল সঞ্চালিত এবং নিয়ন্ত্রিত, যিনি বর্ণের উৎস, যিনি আকাশের গায়ে নীলিমা মাখাইয়া দিয়াছেন, যিনি নভোমণ্ডলকে হরিতাভ করিয়াছেন, যিনি ফুলের মুখে হাসি দিয়াছেন, যিনি যুবকের চিবুকে দীপ্তি দিয়াছেন—তাঁহার উৎপত্তি কি দৈবাৎ ঘটিয়াছে?

মনে কর, কোন শুভ মুহূর্ত্তে এবং পবিত্র স্থানে কতকগুলি অণু-পরমাণুর দৈবাৎ সমন্বয়-হেতু, অপূর্ব্ব মনুষ্য-মূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়া গেল; স্নায়ুমণ্ডলীর অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়া গেল; চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দৈবাৎ চক্ষুর জন্য বর্ণের সৃষ্টি হইল, কর্ণের জন্য শব্দের, জিহ্বার জন্য রসের, নাসিকার জন্য গন্ধের সৃষ্টি হইয়া গেল। এইরূপ হঠাৎ মানবের সৃষ্টি হইয়া গেল। কিন্তু কেবল মানব হইলেই চলিবে না, মানবীও আবশ্যক; সুতরাং দৈব বলে অণু পরমাণু সংযোগে মানবীরও সৃষ্টি হইয়া গেল। এইরূপ সৃষ্টি কল্পনা যদি অসম্ভব না হয়, তবে আমরা কেন না মনে করিব যে, একদিন বিশ্বগ্রাসী ভূমিকম্প হইয়াছিল,—ঐ দিন ভূগর্ভ হইতে অসংখ্য প্রস্তর ফলক উত্থিত হইয়াছিল,—পরস্পর সংঘর্ষে ঐ প্রস্তর-ফলকগুলি মসৃণ হইয়াছিল,—পরে কাল বশে তাহারা এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, আজ ঐ প্রস্তরস্তূপ শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। যদি অদূরস্থিত দেব-মন্দিরটি তোমার হস্ত-রচিত হয়, তাহা হইলে, এই বিশ্ব-মন্দিরটি বিশ্ব-কর্ত্তার রচিত কেন না হইবে? তোমার মন্দিরের ন্যায় বিশ্ব-মন্দিরেও বহুত্বে এক, এবং বিরোধে সদ্ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এখানেও একটি আর একটির উপর নির্ভর করিতেছে। জীবজগৎ উদ্ভিদ্-জগতের উপর নির্ভর করিতেছে,—আবার উদ্ভিদ-জগৎ পদার্থ-জগতের উপর দণ্ডায়মান। পারিপার্শ্বিক শক্তির সংঘাতে এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে মৃত্তিকা বিশ্লিষ্ট না হইলে, উদ্ভিদ্-জগতের উৎপত্তি হয় না। উদ্ভিদের প্রাণ-ধারণার্থ রসের প্রয়োজন; সুতরাং সময়-সময় বৃষ্টি আবশ্যক। বায়ু কর্ত্তৃক আকাশে নীত না হইলে, রস

আকাশমার্গে উত্থিত হইতে পারে না। এইরূপে যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই প্রতীয়মান হইবে যে, জগতের কোন বস্তুই নিরালম্ব নহে—সামান্য তৃণকণাটি পর্য্যন্ত বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এখনও কি বলিব, এই বিশ্ব অন্ধশক্তি-সমুৎপন্ন?

ব্যাপার মাত্রেরই কারণ আছে। যাহার প্রারম্ভ আছে তাহার কারণ নাই, এরূপ কল্পনা করাও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সকল সময়েই কার্য্যের কারণ আমরা না জানিতে পারি,—সকল বস্তুরই কারণ আমাদের বিদিত না হইতে পারে,—কিন্তু তাই বলিয়া যে ইহারা অকারণ-সম্ভূত, তাহা কখনই মনে হয় না। বরং মনে হয়, না জানি ইহারা কতই আশ্চর্য্য বস্তু! এরূপ বস্তু হইতে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। অনেক কার্য্যই দৈবাৎ ঘটিয়া থাকে সত্য; কিন্তু দৈব ঘটনাও অকারণ-সম্ভূত নহে। যে ঘটনার কারণ ঘটার পূর্ব্বে বা পরেও অজ্ঞাত থাকে, তাহাকেই দৈব ঘটনা বলা হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবেই হউক, বা প্রকারান্তরেই হউক, আমরা কারণের ধারণা মন হইতে অপসৃত করিতে পারি না। এরূপ ধারণা আমাদের স্বভাবগত। এই স্বভাবগত ধারণাটির স্বভাব কি? অর্থাৎ কারণ কাহাকে বলে? "যাহা সর্ব্বদাই আগে আসে" তাহাই কি কারণ? যদি একটি ব্যাপার আর একটি ব্যাপারের অব্যবহিত পূর্ব্বে সর্ব্বদাই ঘটে, তাহা হইলে এই ঘটনাদ্বয় সঙ্গ-সম্বন্ধ সূত্রে এমন ভাবে আবদ্ধ হয় যে, প্রথমটি মনে হইলেই দ্বিতীয়টি মনে হয়—প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির কারণ বলিয়া মনে করি। যদি তাহাই হয়, তবে সোমবারকে মঙ্গলবারের কারণ বলিয়া মনে করি না কেন? দিনকে রাত্রির কারণ মনে হয় না কেন? যখন 'ক'কে 'খ'এর কারণ বলিতেছি, তখন 'ক' সকল সময়েই 'খ'এর পূর্ব্বগামী মনে করিতেছি সত্য; কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কিছু মনে করিতে হইবে। যখনই ক দেখিয়াছি তখনই খ দেখিয়াছি; কিন্তু তাই বলিয়া কি 'ক'কে 'খ'এর কারণ বলিতে হইবে? কারণ সতত কার্য্যের পূর্ব্বগামী; কিন্তু তাই বলিয়া সতত পূর্ব্বগামী ব্যাপার মাত্রেই পরবর্ত্তী ব্যাপারের কারণ হইতে পারে না। আমি হস্ত সঞ্চালন করিতেছি—এই হস্ত সঞ্চালন কার্য্যের কারণ কি? আমি ইচ্ছা করিলাম, আর আমার হস্ত আন্দোলিত হইল। এক্ষণে ইচ্ছাই এই আন্দোলন-ব্যাপারের কারণ; কিন্তু ইচ্ছা কেবলমাত্র পূর্ব্বগ বলিয়াই ইহার কারণ নহে। মাত্র পারম্পর্য্য ব্যতীত ইহার সহিত কার্য্যের অন্য কিছু সম্বন্ধ আছে। হস্তান্দোলন ব্যাপার ইচ্ছার পরবর্ত্তী অথচ ইচ্ছা হইতেই সম্ভূত। অতএব শক্তি ব্যতীত কারণের কল্পনা অসম্ভব।

'কারণ' কথাটি আমরা বড়ই অসংযত-ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। ভাষা অসংযত হইলে ভাবও অসংযত হইবে। আতা ফলটি বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল; তুমি বলিলে মাধ্যাকর্ষণ এই পতনের কারণ! এইরূপে প্রাকৃতিক নিয়মাবলিকে প্রাকৃতিক কার্য্যাবলির কারণ বলিয়া মনে করি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিয়ম কারণ হইতে পারে না। বিজ্ঞানাবিষ্কৃত নিয়মের সাহায্যে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা সম্ভব; কিন্তু তাই বলিয়া ঐ নিয়মকে কারণ বলিয়া মনে করিলে প্রমাদ সম্ভব। নিয়মের উল্লেখ করিলেই কারণের উল্লেখ করা হয় না। সমুদ্রের জোয়ার, বৃক্ষের পতন, চন্দ্রের গতি—সমস্তই মাধ্যাকর্ষণ নিয়মানুসারে সংঘটিত হইতেছে সত্য; কিন্তু ঐ নিয়মের উৎপত্তি কোথায়? অবশ্য এখানে এক বস্তু আর এক বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে; কেবল এই মাত্র বলিলে, নিয়ম নির্দ্দেশ করা হইতে পারে, কিন্তু কারণ নির্দ্দেশ করা হইল না। আমি জানিতে চাই,—কি বা কে আকর্ষণ করিতেছে? চন্দ্র কি সমুদ্রকে আকর্ষণ করিতেছে? পৃথিবী কি বৃক্ষটিকে আকর্ষণ করিতেছে? কিন্তু চন্দ্র বা পৃথিবী ভৌতিক বস্তু মাত্র—ইহার জীবন নাই, মন নাই। নির্জ্জীব পদার্থের শক্তি-কল্পনা অসম্ভব; অতএব নির্জ্জীব ইচ্ছাশক্তিবিহীন পদার্থের আকর্ষণ শক্তি আছে, কেমন করিয়া মনে করিব? সুতরাং আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমাদের ইচ্ছাশক্তির ন্যায় কোন শক্তি ভৌতিক পদার্থে অন্তর্নিহিত আছে; এবং সেই শক্তি-প্রভাবে এই আকর্ষণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে; এবং এই আকর্ষণ-ক্রিয়ার নিয়ম সর্ব্বত্রই এক।

ভগবানে বিশ্বাস ব্যতীত হৃদয়ের তৃপ্তি হইতে পারে না। পার্থিব বস্তু হইতে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। ধন, যশ, মান, প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও, হৃদয়ের অতৃপ্তি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। বলিতে পার, সত্যের প্রতিষ্ঠা কর, তত্ত্বানুসন্ধানে বড় হও, হৃদয়ে শান্তি পাইবে। সত্যই আমাদের বিচারশক্তির পুষ্টিবিধান করিতেছে; বুদ্ধি-

বৃত্তির তুষ্টি সাধন করিতেছে এবং ইচ্ছাশক্তিকে সংযত রাখিতেছে। সত্য বিজ্ঞানের ভিত্তি, বস্তুর আধার, অনন্তের আদর্শ। কিন্তু যে সত্য হইতে পার্থিব বস্তুর সম্বন্ধ এবং গুণাবলি নির্ণীত হয় মাত্র, যে সত্য ভগবচ্ছক্তির পরিচায়ক নহে, যে তত্ত্ব হইতে ভগবানের সত্ত্বার নিরূপণ হয় না, সে সত্যে, সে তত্ত্বে কি হৃদয়ের শান্তি হইতে পারে? বিজ্ঞানের যাবতীয় বিবৃত বিষয়ের তোমার সম্যক জ্ঞান থাকিতে পারে; কিন্তু এ জ্ঞান হইতে কি তোমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হইবে? বিজ্ঞানের সাহায্যে বাহ্যজগতের প্রতিকৃতি অন্তর্জগতে প্রতিফলিত হইতে পারে; কিন্তু সমস্ত প্রকৃত জগতের অধিকারী হইলেও যে আত্মার তৃপ্তি হয় কি না সন্দেহ, তাহার তৃপ্তি জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র হইতে হওয়া কি সম্ভব? তোমার হৃদয়ে বিশ্বাস আছে, প্রেম আছে, ভক্তি আছে, ভালবাসা আছে; কিন্তু ইহার একটিরও ত তৃপ্তি বিজ্ঞান হইতে হয় না। ইহার একটিরও উপযুক্ত পাত্র ইহজগতে দৃষ্ট হয় না।

বিজ্ঞান-নির্দ্দিষ্ট সরল রেখার উপর দিয়া তোমার জীবনকে চালিত কর, প্রকৃত সুখের আস্বাদন পাইবে। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মাবলির অনুশীলন ও উহাদের কার্য্য-নিরূপণে তৎপর। তুমি সেই বিজ্ঞান-মন্দিরে আত্মোৎসর্গ কর—তোমার দুঃখের অবসান হইবে, সুখের সুষমায় প্রাণ পুলকিত হইবে। যাহা সত্য, যাহা নিঃসন্দেহ, তাহারই পূজা কর; বিজয় মাল্যে তোমার ললাট উদ্দীপ্ত হইবে। সত্যকে উৎসর্গ করিয়া সন্দেহের আশ্রয় লইও না। যাহা নিশ্চিত, যাহা ধ্রুব, তাহার বিনিময়ে অনিশ্চিতকে সাদরে বরণ করিও না। অতএব ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিয়া আত্ম প্রবঞ্চনা করিও না; নিষ্ফল আরাধনায় কালাতিপাত করিয়া বৃথা অনুতপ্ত হইও না। বিজ্ঞান-নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ কর, অমঙ্গলের অবসান হইবে, মঙ্গলের মালা তোমার শিরোভূষণ হইবে। কিন্তু বিজ্ঞানের অনুশাসন মানিলেই, ঈশ্বরে অনাস্থা হইতে পারে না। বিজ্ঞানের বিস্তৃতি ঈশ্বর-কীর্ত্তন; বিজ্ঞান পরমেশ্বরের প্রতিভার জ্ঞাপক মাত্র। আবার ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে, বিজ্ঞানের পবিত্রতা আরও উজ্জ্বল হয়। বিজ্ঞান-প্রদর্শিত বিধি মাত্রেই বিধি-নির্দ্দিষ্ট। বিজ্ঞান সত্যের আবরণ মুক্ত করিতেছে সত্য, কিন্তু বিজ্ঞান সত্যের স্রষ্টা নহে। সত্যের আলোকে আমরা মোহিত হইতেছি, চমৎকিত হইতেছি; কিন্তু সেই সত্যে যাঁহার মহিমা প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার কথা ভাবিলে কি সত্যের জ্যোতিঃ আরও পরিস্ফুট হইবে না? বিজ্ঞানের মহিমা উপেক্ষনীয় না হইলেও, বিজ্ঞান ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতে পারে না। বিজ্ঞান-মন্দিরের চূড়া যতই উচ্চ হউক না কেন, ইহার পরিধি যতই বিস্তৃত হউক না কেন, বিশ্ব-মন্দিরের নিকট ইহা অতি তুচ্ছ। বিজ্ঞান জগৎ-পিতার নিয়মের পরিচয় দেয় মাত্র—ইহার নিজের কোন অস্তিত্ব নাই, কোন শক্তি নাই। মানুষেরই জ্ঞানবিশেষের নাম বিজ্ঞান। এই জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে, আবার অসদ্ব্যবহারও করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান মানব-জগতের যথেষ্ট হিতসাধন করিতেছে সত্য,—আবার বিজ্ঞানই অনিষ্টের সৃজন করিতেছে। তোমার ললাট বিজ্ঞানোদ্দীপ্ত হইলেই যে তোমা হইতে কেবল ইষ্ট-সাধনই হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতে পার, আবার অসদ্ব্যবহারও করিতে পার;—মাত্র বিজ্ঞানের জ্ঞান হইতেই বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার হইতে পারে না। বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে সৎ মনুষ্য হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞান মানুষকে সৎ করিতে পারে না; আর মানুষ যদি অসৎ হয়, তবে বিজ্ঞান তাহার দুরভিসন্ধি সাধনের অত্যাশ্চর্য্য সহায় স্বরূপ হয়। অতএব মাত্র বিজ্ঞানের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

বলিতে পার, মাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া শীল-বিজ্ঞানের অনুশাসন অনুধাবন কর, বিবেক অনুদর্শিত পথের অনুসরণ কর,—পুণ্যের শুভ্র আলোকে পাপের মেঘ কাটিয়া যাইবে। তোমার মন এই বিবেকের সিংহাসন, তোমার হৃদয় ইহার কেন্দ্র, তোমার আত্মা ইহার জীবন। ইহা কখন তর্জ্জন, আবার কখন তিরস্কার; ইহা কখন প্রতিজ্ঞা, আবার কখন পুরস্কার। যতই তুমি ব্যস্ত হও না কেন, ইহার প্রত্যাদেশ তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে পার না। তুমি যতই শক্তিশালী হও না কেন, ইহার ধিক্কার তুমি অবহেলা করিতে পার না। যতই তুমি ক্রোধপরায়ণ হও না কেন, ইহার ভর্ৎসনা তোমাকে নীরবে সহ্য করিতেই হইবে। ইহা অপহারকের অভিযোক্তা, শপথকারীর সংযম, মিথ্যাবাদীর গুপ্তচর। অস্বাভাবিক

কর্ম্মে রত হও, অস্বাভাবিক কষ্টে অভিভূত হইবে। বিবেকের বাণী অবহেলা কর, তোমার অন্তরে নরকাগ্নি প্রধূমিত হইবে। তুমি সমাজের শাসন উপেক্ষা করিতে পার, তুমি রাজার আদেশ অমান্য করিতে পার, তুমি সমাজ ত্যাগ করিতে পার, স্বদেশ ত্যাগ করিতে পার ; কিন্তু তথাপি তুমি বিবেকের কবল হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। বিবেকের শক্তি সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, সকল সময়েই অদম্য ; বিবেকাগ্নি কখনই নির্ব্বাপিত হয় না। অতএব বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করিও না,—তাপদগ্ধ ললাটে শিশির-বিন্দুর ন্যায় হৃদয়ে শান্তি পাইবে, অথচ নবোদিত অরুণরাগের ন্যায় অভিনব আশার আলোকে উৎসাহিত হইবে। ভগবান্‌কে আমার চিন্তার অন্তরালে রাখিলাম। বিবেক ব্যতীত পাপ-পুণ্যের বিচারক বা শুভাশুভের নিয়ন্তা আর কেহ আছে বলিয়া স্বীকার করিলাম না। বিবেকানুদিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিয়া, মাত্র মনুষ্যত্বকে পূজা করিয়া আমার জীবনকে সংযত এবং পরিচালিত করিলাম। কিন্তু তাহা হইলেও কি আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল ? যদি ভগবান্ থাকেন, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি আমার কর্ত্তব্য আছে, এবং সে কর্ত্তব্য সম্পন্ন না করিলে আমার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আর, ভগবানের প্রতি আমার কোন কর্ত্তব্য নাই, এ কথা বলিতে পারিব না—যতক্ষণ না তাঁহার নাস্তিত্বে নিঃসন্দিহান হইয়াছি। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, ভগবানের নাস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব। ভগবান্ থাকা সত্ত্বেও, ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিলে, আমাদের কর্ত্তব্যের প্রত্যবায় হইবে ; আর ভগবান্ যদি না থাকেন, তাহা হইলেও ভগবান্ আছেন, এই বিশ্বাসে যদি তাঁহার পূজা করি, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি ? ধর্ম্ম ব্যতীত নৈতিক উন্নতি অসম্ভব। ধর্ম্মকে উপেক্ষা কর,—নীতির বিধান নিস্তেজ হইয়া পড়িবে ; নৈতিক নিয়মাবলি পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ভগবানের ঐশ্বর্য্য এবং আধিপত্য অস্বীকার কর,—শীল-বিজ্ঞানের অভ্রভেদী স্বর্ণ চূড়াও ধূলাবলুণ্ঠিত হইবে। কর্ত্তব্যের মন্দিরে তোমার যশ, মান প্রভৃতি সকল সুখই উৎসর্গ কর, ইহাই নীতির কঠোর বিধান ; কিন্তু এই অতি কঠোর উৎসর্গ কখনই নিষ্ফল হইবে না—এই অভয়বাণী আমি যতক্ষণ না পাইব, ততক্ষণ কি এই নৈতিক বিধান পূত, পবিত্র এবং সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে ? তুমি যশের আশা বর্জ্জন করিতে বলিতেছ ;—বলিতেছ যশ শব্দ মাত্র,—সত্য নয়। কিন্তু যশ আশার আশ্রয়, সত্যের বাস্তাবহ, স্বার্থের পরিচারিকা, কর্ম্মের চালক, জীবনের জীবন, বয়সের যৌবন, উল্লাসের জয়, সাহসের শক্তি, কর্ত্তব্যের অহঙ্কার। ইহা আকাঙ্ক্ষার সোপান, বিশ্বাসের ধর্ম্ম, বিদ্যার পুষ্পমাল্য, ন্যায়ের সিংহাসন, সঙ্গীতের স্পন্দন, স্মৃতির সহচর। যশের জয়দুন্দুভি একবারে মিথ্যা নয়, একবারে শূন্য নয়। ইহা শব্দমাত্র হইলেও, এই শব্দের এমন সঞ্জীবনী শক্তি আছে, যাহাতে আমার স্নায়ুতন্ত্রী উত্তেজিত হয়, হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য দূরীভূত হয়, আলস্যের আবেশ অন্তর্হিত হয়, নিদ্রার ঘোর কাটিয়া যায়, প্রাণের আবেগ উচ্ছলিত হয়। কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়া এই শক্তি সংহারে প্রবৃত্ত হইব ? আমি বুঝিতে পারি যে, অর্থই অনর্থের মূল। অর্থই অন্যায়কে ন্যায়, পাপকে পুণ্য, অমঙ্গলকে মঙ্গল, বৃদ্ধকে যুবা, ভীরুকে সাহসী বলিয়া প্রতিপন্ন করে। কিন্তু তথাপি অর্থের নিকট ধর্ম্মের মহিমা, গুণের সমাদর, প্রেমের আকর্ষণ, মনের প্রতিভা, হৃদয়ের উদারতা, নয়নের জ্যোতিঃ, মুখের সৌষ্ঠব, সকলই অবনত-মস্তক, সকলই হীনপ্রভ। অতএব দেখা যাইতেছে, "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি"। সুতরাং কর্ত্তব্যের জ্ঞান থাকিলেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারা যায় না। সম্যক্ প্রকারে কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইলে শক্তি আবশ্যক ; কিন্তু ঐ শক্তির উৎস কোথায় ? ভগবানে বিশ্বাস ব্যতীত কি কর্ত্তব্য-পালন সম্ভব ? কোন্ সুখের আশায় আমি আমার কাম ক্রোধ প্রভৃতি সদ্য মধুর রিপুগণকে দমন করিবার জন্য ক্লেশ স্বীকার করিব ? যদি অন্যায়কে সাদরে আলিঙ্গন করিলে আমার সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, তবে কেন আমি ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিব না ? কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়া সংসারের দুঃখ-দৈন্য নীরবে সহ্য করিব ? যিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন, যাঁর ভগবানে ভক্তি অচলা, তিনিও কর্ত্তব্য-পালনে অনেক ক্লেশ পাইয়া থাকেন। আর যিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন না, যিনি,—ন্যায়-অন্যায়ের, পাপ-পুণ্যের একজন সর্ব্বান্তর্যামী বিচারকর্ত্তা আছেন বলিয়া স্বীকার করেন না, তিনি যে অপ্রতিহত-গতিতে বিবেকানুমোদিত কর্ত্তব্য সম্পন্ন

করিয়া যাইবেন,—ইহা বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না। যখন অসত্যের জয় ও সত্যের পরাজয় দেখি, যখন ন্যায়ের উপর অন্যায়ের আধিপত্য দেখি, তখন কোন্ সাহসে অন্যায় ও অসত্যকে পরিহারপূর্ব্বক ন্যায় ও সত্যকে সাদরে গ্রহণ করিব? তুমি শোকে অভিভূত না হইতে পার, দুঃখ ও কষ্ট তুমি অকাতরে বীরের ন্যায় নীরবে সহ্য করিতে পার; কিন্তু উহারা যে মঙ্গলময় পরমেশ্বর কর্তৃক তোমার চরিত্রের উন্নতির জন্য, তোমার আত্মাকে পবিত্র করিবার জন্য প্রেরিত, এই ভাবিয়া তাহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিবার শক্তি তোমার নাই। যখন মৃত্যুর করাল ছায়া তোমার সংসারে পতিত হয়, যখন তোমার প্রাণের পুত্তলি, নয়নের মণি অকালে মানবলীলা সংবরণ করে, তখন করুণাময় পরমেশ্বরের আশ্বাসবাণী তোমার কর্ণে প্রবেশ করে না,—তাঁহার "মা ভৈঃ" শব্দ তোমার হৃদয়ে আঘাত করে না,—তাঁহার অযাচিত সহানুভূতি তোমার মনে শান্তি প্রদান করে না,—তখন তুমি চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখ এবং সেই অন্ধকার হইতে নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়া পাও না; কেবল মাত্র অন্ধ প্রকৃতির কঠোর নিয়মের প্রতি দোষারোপ করিতে থাক। যখন তুমি স্বয়ং মৃত্যুর আহ্বান শুনিতে পাও, তখন মনে-প্রাণে বুঝিতে পার যে, ইহার করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই, তখন একেবারে হতাশ অন্তঃকরণে "মাটিতে মিশুক মাটির দেহ" বলিয়া সহস্র বৃশ্চিকপূর্ণ নৈরাশ্যের ক্রোড়ে আত্মবিস্মৃতি লাভ করিতে চেষ্টা কর। যখন তোমার মন হইতে আশার রজ্জু ছিন্ন হইল, প্রেমের বন্ধন শিথিল হইল, জ্ঞানের আলোক নির্ব্বাপিত হইল, তখন সে জীবনের মোহিনী শক্তি কোথায়? কর্ত্তব্য-পালনের প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিবে?

যদি সত্যানুশীলনে শান্তি না পাও, জগতের সৌন্দর্য্য অনুভব কর, হৃদয়ের শূন্যতা দূর হইবে। কবির উচ্ছ্বাসে সৌন্দর্য্য আছে, গায়কের সুললিত স্বরে সৌন্দর্য্য আছে, শিল্পীর শিল্পে সৌন্দর্য্য আছে; আর প্রকৃতি ত সৌন্দর্য্যময়ী। এই সৌন্দর্য্যে মাতোয়ারা হও,—হৃদয় পবিত্র আনন্দে পরিপ্লুত হইবে,—হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইবে। সুন্দর জিনিস কোন অলক্ষিত শক্তির মহিমা প্রকাশ করে বলিয়াই সুন্দর; কিন্তু যদি সে শক্তির পরিচয় না লও, যদি সে শক্তির বিষয় না চিন্তা কর, তবে সুন্দরের সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইবে। ভগবৎ-প্রেমে অনুপ্রাণিত না হইলে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় না। পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দিরগুলি দেবমন্দির, সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীতগুলি ঈশ্বর-কীর্ত্তন। সৌন্দর্য্য যদি প্রীতি, প্রবৃত্তি এবং প্রেমের পরিচায়ক না হয়, তবে সে সৌন্দর্য্য হইতে মনের তৃপ্তি বা হৃদয়ের শান্তি হইতে পারে না।

ঐ রূপে নয়ন দিলে, বিশ্ব হয় মধুময়!
তখন সকলই মধুর,
বিশ্বে যা দেখি তাই সকলই মধুর!
তখন দৃষ্টি মধুর, বাক্য মধুর,
তখন যা দেখি, তাই সকলই মধুর,
যা শুনি তাই সকলই মধুর,
যা বলি তাই সকলই মধুর,
তখন তুমিও মধুর, আমিও মধুর,
বিশ্বে যা দেখি, তাই সকলই মধুর।

কল্পনা-প্রভাবে তুমি ভবিষ্যৎ সুখের অনিন্দ্য-সুন্দর চিত্র তোমার হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিতে পার; উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে স্বর্গের স্বর্গীয় আলেখ্যখানি তোমার মানস-নেত্রের সম্মুখে ধরিতে পার; কিন্তু তাই বলিয়া কি কল্পনার মোহে বাস্তবের বিসর্জ্জন দেওয়া যুক্তিসঙ্গত? বলিতে পার, বর্ত্তমানকে পরিহার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হও, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জলাঞ্জলি দিয়া স্বর্গরাজ্যে যাইবার জন্য পাথেয় সংগ্রহ কর; নিরন্তর জগৎপিতা পরমেশ্বরের আরাধনা কর,—তোমার জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। সেখানে শোক নাই, সন্তাপ নাই, মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, দৈন্য নাই, জন্ম নাই, জরা নাই। ঈশ্বর এ রাজ্যের অধি-পতি, দেবতা ইহার প্রজা, মুক্তি ইহার আচ্ছাদন, পবিত্রতা ইহার আস্তরণ। এখানে জীবন আছে, কিন্তু মৃত্যু নাই, এখানে যৌবন আছে, কিন্তু বার্দ্ধক্য নাই; বিশ্রাম আছে, কিন্তু শ্রম নাই; শান্তি আছে, কিন্তু সংগ্রাম নাই; জ্ঞান আছে, মোহ নাই; প্রেম আছে, বিরহ নাই; সাধুতা আছে, শঠতা নাই; আনন্দ আছে, আক্ষেপ নাই। এখানে আকাশে মেঘ নাই, চন্দ্রের হ্রাস নাই, বসন্তের বিরাম নাই, কালের অন্ত নাই। এখানে অনাবিল সুস্নিগ্ধ আলোকে দিগন্ত সতত উদ্ভাসিত, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সৌগন্ধে প্রত্যেক অণু-পরমাণু মণ্ডিত; স্বাধীনতার বিজয়-

বৈজয়ন্তী সর্ব্বদাই উড্ডীয়মান; সুপ্ত স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সকলেই নিরন্তর উৎসাহান্বিত।

"বিষাদের শ্বাস পড়ে না হেথায়, অশ্রু ঝরে না নেত্রে,
হৃদয় হেথায় ভাঙে না কখনো—দুঃসহ দুঃখ বেগে।"

এই প্রকার স্বর্গ-সুখের কাহিনীতে কর্ণপাত করিও না। ভবিষ্যতের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বর্ত্তমানকে বিসর্জ্জন দিও না। তোমার শরীর ক্ষণবিধ্বংসী। যে কোন মুহূর্ত্তেই তোমার সবল, সুন্দর, সুঠাম দেহযষ্টি ধূলিকণায় পরিণত হইবে—সুতরাং ভবিষ্যৎ তোমার সংশয়াকীর্ণ অন্ধকার! অতএব বর্ত্তমানই তোমার লক্ষ্য, বর্ত্তমানই তোমার ভোগ্য হওয়া উচিত। তুমি ভবিষ্যতের আশায় কেন আকুল হইতেছ? এই ভবিষ্যৎ যতক্ষণ বর্ত্তমানে পরিণত না হইবে, ততক্ষণ ত তুমি ভবিষ্যৎ সুখে বঞ্চিত থাকিবে! ভবিষ্যৎ চিরকালই ভবিষ্যৎ থাকিবে না, ইহা বর্ত্তমানেই বিলীন হইবে। বর্ত্তমানকে তুমি কেন পদদলিত করিতেছ এই বর্ত্তমানই এক দিন তোমার উপাস্য ভবিষ্যৎ ছিল, যে ভবিষ্যতের জন্য তোমার অন্তঃকরণ আলোড়িত হইত। ভবিষ্যৎ আগমনোন্মুখ বর্ত্তমান মাত্র, আর বর্ত্তমান সমাগত ভবিষ্যতের নামান্তর মাত্র; সুতরাং বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের উপাসক হইলে, উপহাসাস্পদ হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু বর্ত্তমানের নিশ্চয়তা সম্বন্ধেও ত নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না। বর্ত্তমান ত অচিরেই অতীতে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তই দৃষ্টিমাত্রেই অদৃশ্য হইতেছে। এবম্বিধ 'অস্থায়ী মুহূর্ত্তের' সম্ভোগও যেমন অসম্ভব, সদ্ব্যবহারও তদ্রূপ। অতএব বর্ত্তমান অনিশ্চিত, ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত—তবে একমাত্র নিশ্চিত যে আমাদের জীবন অনিশ্চিত—ইহা মাত্র অনিশ্চিত নহে, ইহার ব্যাপ্তি অতি দীর্ঘ হইলেও অতি সামান্য। অতএব যে জীবন অতি দীর্ঘ হইলেও অতি ক্ষুদ্র, যাহা একেবারে অনিশ্চয় এবং অস্থায়ী, অনন্তকে উপেক্ষা করিয়া সে জীবনের উপাসনা করা বাতুলতা মাত্র।' অতএব ঐহিক সুখে বিগতস্পৃহ হইয়া অনন্ত সুখের জন্য প্রস্তুত হও। তুমি যাহা নও তাহাই যদি চাও, তোমার যাহা নাই তাহাই যদি পাইতে চাও, তবে তোমার যাহা আছে তাহাতে অসন্তুষ্ট হও। বিবেকের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তোমার বাসনা-নিচয়ের বিরুদ্ধে সদর্পে যুদ্ধ ঘোষণা কর; ঐহিক বাসনার বিশ্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা সমূলে উৎপাটিত কর। নয়নমুগ্ধকর সুবর্ণ-মূর্ত্তির পূজা করিয়াছ; কিন্তু তাহাতে মনের শান্তি কতটুকু পাইয়াছ? অলীক আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণপাত করিতেছ, কিন্তু তোমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কৈ? তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রত্যেক কক্ষই তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছ, কিন্তু সেখানে সুখের সন্ধান পাইয়াছ কি? তুমি সতত আত্মসুখে নিরত, আত্মচিন্তায় বিভোর। তুমি কখন ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি কর নাই, বিপন্নের উদ্ধারে চেষ্টা পাও নাই—কিন্তু তোমার নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছে কি? তোমার পিপাসার শান্তি হইয়াছে কি? এই অকূল পাথারের কূল পাইয়াছ কি? তুমি নিজেকে বিপন্মুক্ত করিতে পারিয়াছ কি? তাই আবার বলিতেছি যে, যদি প্রকৃত সুখ পাইতে চাও, যে সুখে সন্তাপ নাই বিরাম নাই, যদি সেই সুখের অধিকারী হইতে চাও, তবে ঐহিক সুখের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইও না, আত্মহারা হইয়া লক্ষ্যচ্যুত হইও না। তোমার মন যদি স্বার্থচিন্তা হইতে বিরত না হয়, তবে শিরঃ-কঙ্কালের ভিতর হইতে মস্তিষ্ক পিণ্ডটি সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেল। তোমার অন্তঃকরণ যদি বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত না হয়, তবে তোমার বক্ষ পঞ্জর ভেদ করিয়া হৃৎপিণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও। আরও, যদি আমি ভগবানে বিশ্বাস করি, যদি তাঁহাকে পাপ পুণ্যের, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার-কর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে কি আমি বর্ত্তমানের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতে অক্ষম হইব? যদি আমি ভগবানে বিশ্বাস না করি, তাহা হইলে সদুদ্দেশ্য সাধনের শক্তি আমি কোথায় পাইব? আমাদের সকল দুঃখের আকর রিপুর দুর্দ্দমনীয় তেজ পরাভূত করিবার সামর্থ্য কোথা হইতে আসিবে? ভগবৎ-প্রেমে বঞ্চিত হইলে, মনুষ্য-প্রেমের বন্ধন নিশ্চয়ই শিথিল হইয়া যাইবে। আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা এখনও কর্ত্তব্য, তখনও কর্ত্তব্য—সকল সময়েই কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে যে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছ, তাহার ফল বর্ত্তমানেই নিহিত থাকিবে না—ইহার মূল অতীতে, শাখা-প্রশাখা ভবিষ্যতে—ইহা অনন্তব্যাপী, অনন্ত কাল স্থায়ী। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। বর্ত্তমানের ফল ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই প্রতি-ফলিত হইবে।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্ধ বালক

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই; অস্তাচলগামী বৃদ্ধ তপনের রক্তিম-চ্ছটায় ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী বৃক্ষনিচয়ের শীর্ষদেশ উজ্জ্বল; কিন্তু তলদেশে অন্ধকার আশ্রয় করিয়াছে। শীতকাল,—অগ্রহায়ণ মাসের শেষে ভাগীরথী-বক্ষ শুষ্ক-প্রায়; নদী-গর্ভের এক পার্শ্বে অনতি-প্রশস্ত জল-স্রোত ধীরে-ধীরে বহিয়া যাইতেছে। পরপার ঘন কুয়াসায় ক্রমে-ক্রমে মিশিয়া যাইতেছে। এই সময়ে ভাগীরথী-তীরে এক বিশালকায় অশ্বথ-বৃক্ষের নিম্নে জনৈক খর্ব্বাকৃতি মনুষ্য প্রশস্ত ইষ্টক-নির্ম্মিত চত্বরে বসিয়া ছিল। তখন গ্রাম-বৃদ্ধগণ শীতের ভয়ে বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্ব গৃহে আশ্রয় লইয়াছে। সে ব্যক্তি একা,—হস্তে কপোল রক্ষা করিয়া চিন্তা করিতেছিল। সহসা তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল,—দূরে মনুষ্য-পদশব্দ শ্রুত হইল। সে মস্তক উত্তোলন করিল।

আগন্তুক মুসলমান। তাহার দক্ষিণ-হস্তে শিকারী বাজ, পৃষ্ঠে বন্দুক ও ধনু, এবং কটিদেশে দীর্ঘ অসি। সে বৃক্ষতলে মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "শোভান্ আল্লা, এতক্ষণে একটা মানুষ দেখিলাম। বন্ধু! তুমি কি আমার কথা বুঝিতে পার?" অশ্বথ-তলে মনুষ্য-মূর্ত্তি তাহার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল; কারণ, আগন্তুক অমিশ্র পারস্য ভাষায় বাক্যালাপ করিতেছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হাঁ, পারি। জনাব, আপনি বোধ হয় মোগল?"

"হাঁ বন্ধু! আমি চোগ্‌তাই,—শিকার করিতে গিয়া পথ ভুলিয়া গিয়াছি। এই জঙ্গলী দেশে ভদ্র পারসী কথা বুঝিতে পারে, সারাটা দিন এমন একটা লোকের সন্ধান করিতেছি। এতক্ষণে তোমার দেখা পাইয়া বাঁচিলাম। তুমি আমাকে লালবাগে পৌছাইয়া দিতে পার?"

"জনাব, আপনার হুকুম তামিল করিতে পারিলে ধন্য মনে করিতাম; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্য রূপ।"

আগন্তুক তাহার নিকটে আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল এবং হাসিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া বৃক্ষতলবাসী কহিল, "জনাব, আমি জন্মান্ধ।" আগন্তুক কহিল, "বন্ধু, তিনি যাহা দিয়াছিলেন, তিনিই তাহা লইয়াছেন,—তাহার জন্য হাসি নাই। তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে, সূর্য্য-চন্দ্রের জ্যোতিঃ তোমার নয়ন-পথ হইতে সরাইয়া দিয়া, খোদা তোমাকে নূতন রকমের আলোক প্রদান করিয়াছেন। হাসিতেছিলাম নিজের অদৃষ্ট ভাবিয়া। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি; যদি লোক পাই, তবে তাহার কথা বুঝিতে পারি না; কথা বুঝিতে পারে এমন লোক যখন পাইলাম, তখন সে আবার দৃষ্টি-শক্তিহীন হইল। বন্ধু! নিকটে কি গ্রাম আছে? আমি আর চলিতে পারি না। বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে; আমাকে কিছু খাইতে দাও।" আগন্তুক এই বলিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল। অন্ধ যুবা কহিল, "আপনি বিশ্রাম করুন। নিকটেই আমাদের গ্রাম। আমি একজন লোক ডাকিয়া দিতেছি। জনাব! আমরা হিন্দু, আমাদের ঘরে আপনাদের যোগ্য আহার ত মিলিবে না।"

মুসলমান বোধ হয় ক্ষুধার তাড়নায় পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "ঈশ্বরের দোহাই, বন্ধু! তুমি আর বিলম্ব করিও না,—আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। মানুষে যাহা খাইতে পারে, তাহা পাইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব।"

অন্ধ যুবা অশ্বথ-তল পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল। এই সময়ে আগন্তুক পিছন হইতে তাহাকে

ডাকিয়া কহিল, "বন্ধু! কাফের ও মুসলমানের এক খোদার দোহাই, আমাকে যেন ভুলিয়া যাইও না!"

যুবা হাসিয়া কহিল, "আপনার যদি সন্দেহ বা ভয় হয়, তবে আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসুন না কেন?"

"চলিতে আর যে পারি না বন্ধু! মনে হইতেছে, আজ দুই-তিন হাজার ক্রোশ চলিয়াছি।"

"জনাব! তবে আপনি বিশ্রাম করুন,—আমি অর্দ্ধ-দণ্ডের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।"

আগন্তুক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে বসিল। যুবা ভাগীরথী-তীর পরিত্যাগ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের সীমায় প্রবেশ করিল। গ্রামের প্রান্তে আম্র-পনসের উদ্যান-মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ইষ্টক-গৃহ,—গৃহের কবাট ও বাতায়নগুলি রুদ্ধ। গৃহ-মধ্যে একজন পরুষ-কণ্ঠে গাহিলেন—

"ওমা শ্যামা হরমনোমোহিনি,—"

অন্ধ রুদ্ধ-দ্বারে করাঘাত করিল। গায়ক অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে?" যুবা কহিল, "ও দাদা, আমি! দুয়ার খোল।"

"কে রে আপদ সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া জুটিলি?" "ও দাদা, আমি!" "যমের বাড়ী যা! ঠাকুর রায়বাড়ীতে গিয়াছেন বলিয়া একটু সুর ভাঁজিতে ধরিয়াছি, আর আপদ আসিয়া জুটিয়াছিস্? বাজাইবি ত আয়, না হয় ত দূর হ।" "হাঁ দাদা, বাজাইব; কিন্তু একটু পরে। আগে বিপদে উদ্ধার কর।" এক দীর্ঘাকার, কৃশকায় যুবা বীণা-হস্তে দুয়ার খুলিয়া দিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "তবলা পাড়িব না কি?" যুবা কহিল, "একটু পরে। বৌ-ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা কর, ঘরে কি খাবার আছে।" "কেন রে ভুপেন্? ছোটলোকের বেটী কি আজ তোকে খাইতে দেয় নাই?" "প্রায় তাহাই বটে। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পথ হারাইয়া গিয়াছেন—" "মুসলমান? গরুখোর নেড়ে? ওরে লক্ষ্মীছাড়া কানা বাঁদর, তুই হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের বাড়ীর প্রসাদ নেড়ে দিয়া খাওয়াইবি? দূর হ, বাহির হ—" "দাদা, আগে কথাটাই শোন—" "আমি তোর কোন কথা শুনিতে চাই না, পাষণ্ড, বেল্লিক, কুলাঙ্গার, নরাধম—"

এই সময়ে এক অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী রমণী কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "হাঁ গা, সন্ধ্যাবেলায় ছেলেমানুষকে একা পাইয়া যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিতেছ কেন বল দেখি?"

যুবা। দেখ বৌদিদি! একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান—

ব্রাহ্মণ। তুই কি করিয়া বুঝিলি-যে সম্ভ্রান্ত—

রমণী। আহা, কি বলে শোনই না।

ব্রাহ্মণ। শুনিব তোমার আদ্যশ্রাদ্ধ আর সপিণ্ডকরণ।

যুবা। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পথ ভুলিয়া গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা কথা বুঝেন না এবং সমস্ত দিন তাঁহার আহার হয় নাই। ঘরে কি আছে বৌদিদি?

রমণী। হরির-লুটের সন্দেশ আছে। তুমি একটু ব'স, আমি লুচি ভাজিয়া আনিতেছি।

ব্রাহ্মণ। দেখ বড়বৌ, যা রয় সয় তাই ভাল। বেশী বাড়াবাড়ি করিও না। আমি জীবিত থাকিতে যদি হরিনারায়ণ বিদ্যালঙ্কারের বাড়ীর প্রসাদ ম্লেচ্ছ যবনের—

রমণী সহসা ব্রাহ্মণের মুখে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "দেখ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যে কথা রাখিতে পারিবে না, তাহা বলিও না। সে মুসলমান হউক, আর যাহাই হউক, অতিথি। অভুক্ত অতিথি গ্রাম হইতে ফিরিয়া গেলে অকল্যাণ হইবে। ঠাকুরপো! তুমি ব'স।"

"বৌদিদি! আমি রাঙ্গাদাদার সন্ধানে চলিলাম। তুমি খাবার একখানা কলাপাতায় বাঁধিয়া রাখিও,—আমি অর্দ্ধ-দণ্ডের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।"

যুবা প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণ দ্বার রুদ্ধ না করিয়াই গায়িতে বসিল,

"ওমা শ্যামা হরমনোমোহিনি,
(আমি) তোমায় সেধে বেড়াই কেঁদে
হরহৃদিবিলাসিনি—"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোট রায়

গ্রামের অপর প্রান্তে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বিতলে এক মসীবরণা, প্রকাণ্ডকায়া, বিরলকেশা রমণী তাম্বুল-সজ্জা করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে রজত-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড তাম্বুলাধার,—তাহার উপরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য আধারে বহু উপকরণ। সম্মুখে দুই-তিনজন দাসী,—কেহ সুপারি

কাটিতেছে, কেহ বা পান ছিঁড়িতেছে। আরো দুইজন দাসী রূপার থালায় পান সাজাইয়া গৃহিনীর সম্মুখে ধরিতেছে,—তিনি কেবল প্রত্যেক পানে মসলা দিতেছেন; কারণ, অঙ্গচালনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। গৃহিনী যে স্থানে উপবিষ্টা, তাহা একটী দীর্ঘ দরদালান। তাহার এক পার্শ্বে প্রশস্ত কাশ্মীরি গালিচা, সম্মুখে সতরঞ্চীর উপর তাম্বুল-সজ্জা বিস্তৃত। দরদালানের অপর প্রান্তে এক গৌরবর্ণ যুবা প্রবেশ করিল এবং গৃহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌঠান্! কর্ত্তার আমলের সোনার বাটাটা কোথায়?"

গৃহিনী সম্মুখের দাসী-হস্তস্থিত রজতপাত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, "তা আমি কি জানি,—ভাণ্ডারে গিয়া দেখ।"

"দেখিয়াছি, ভাণ্ডারে নাই।" "তবে হয় ত চুরি গিয়াছে।" "ভাণ্ডারী বলিল, আপনার হুকুম-মত তাহা উপরে আসিয়াছে।" "আমি কি তোমার পানের বাটা চুরি করিয়া রাখিয়াছি না কি?" "শুনিলাম, সে বাটা ঈশ্বরগঞ্জে গিয়াছে।"

ঈশ্বরগঞ্জের নাম শুনিয়া গৃহিনী প্রশস্ত বদন উত্তোলন করিলেন। সুগোল আবলুস্ বৃক্ষ-কাণ্ড সদৃশ বাহু-কাণ্ডের তাড়নায় রজতপাত্রে সজ্জিত তাম্বুল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, এবং পাত্রধারিণী দাসী ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। গৃহিনী কহিলেন, "যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! ঈশ্বরগঞ্জের লোক কি খাইতে পায় না, যে, রায়-গোষ্ঠির বাসন চুরি করিতে আসিবে? তুই আমার অন্নে মানুষ—তোর এ কথা বলিতে লজ্জা হয় না? আমার স্বামীর বাসন,—আমি যাহা খুসী করি না কেন, তাহাতে কাহার কি! তবুও যদি এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা থাকিত। আমি দেখিয়া লইব, তুই কি করিয়া আর এ বাড়ীতে বাস করিস্!"

এই বলিয়া গৃহিনী দরদালান ত্যাগ করিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। যুবার মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া একটা বিকট উত্তর দিতে যাইতেছিল,—সহসা তাহার পশ্চাৎ হইতে একজন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। যুবা আরো রাগিয়া গিয়া, নবাগতের হাত ধরিয়া তাহাকে দরদালানে টানিয়া আনিল। আগন্তুক উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদা! তুমি কিছু বলিতে পাইবে না। যাহা বলিতে হয়, বড়দাদা আসিলে বলিও।"

প্রথম যুবা আগন্তুককে বাহু পাশে আবদ্ধ করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড কাটিয়া গেল। দাসীরা তাহাদিগের ভাব-গতিক দেখিয়া, যে যে দিকে পথ পাইল, সরিয়া পড়িল। উত্তর না পাইয়া গৃহিনীর মনে বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছিল; তিনি দুয়ারের ফাঁক দিয়া তাহাদিগকে দেখিতেছিলেন। পুরুষ দুইজনকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া তাঁহার সাহস বাড়িয়া গেল। তিনি কবাট খুলিয়া বলিলেন, "মারিবি না কি, আয় না!"

আগন্তুক যুবাকে দৃঢ়তর-ভাবে জড়াইয়া ধরিল, এবং কহিল, "দাদা! দোহাই তোমার, কিছু বলিও না।"

যুবা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "না ভাই, কিছু বলিব না।" সে গৃহিনীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "বৌদিদি! আমি ঈশ্বরগঞ্জের গোলাম কায়েত নহি। রায়-বংশে কেহ কখনো স্ত্রীলোকের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করে নাই। তুমি বড় ভাইয়ের স্ত্রী,—মাতৃতুল্যা। আজ তুমি আমার চোখ ফুটাইয়া দিয়াছ। যে গৃহে তুমি বাস করিবে, সে গৃহের অন্ন আর এ মুখে তুলিব না।"

যুবা এই বলিয়া দূর হইতে গৃহিণীকে প্রণাম করিল, এবং আগন্তুকের হাত ধরিয়া অট্টালিকা ত্যাগ করিল। পথে আসিয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! কোথায় যাইতেছ?"

"যে দিকে দুই চোখ যায়। ভাইটা, তুমিও আমার সঙ্গে চল, তোমার মুখ চাহিয়া বহু অপমান, যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি। ভুপ্! আজি আর পারিলাম না। তালুক-মুলুক, ঘর-বাড়ী—আমাদের যাহা ছিল, দাদা সমস্তই নিজে লইয়াছেন। বাবার আমলের অস্থাবর যাহা-কিছু ছিল, তাহা প্রায় সমস্তই ঈশ্বরগঞ্জে গিয়াছে। একজোড়া সোণার বাটা অবশিষ্ট ছিল—এখন তুমি বড় হইয়াছ, আর কিসের জন্য অপমান সহ্য করিব ভাই?"

অন্ধের দৃষ্টিহীন নেত্রদ্বয় ভ্রাতার মুখের দিকে ফিরিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! বাড়ী ছাড়িয়া যাইব? তবে কি বাড়ী আমাদের নহে?"

"না ভাই—বাড়ী দাদার, অর্থাৎ বৌদিদির। পাছে

আমাদের ·গৃহ ছাড়িতে হয়, সেই ভয়ে দাদা বাড়ীর জমি বৌদিদির নামে খরিদ করিয়াছেন।"

"তবে কোথায় যাইব?" "যেখানে ভগবান্ আশ্রয় দেন।" "বিদ্যালঙ্কার-বাড়ী গেলে হয় না?" "না ভাই, এ গ্রামে আর একদণ্ড থাকিব না। তুমি কি আমার সঙ্গে যাইবে?"

অন্ধ উভয় হস্তে ভ্রাতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দাদা! আমি তোমাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও বাঁচিব না। তুমি যে স্থানে যাইবে, আমি তোমার সঙ্গে যাইব। কিন্তু তোমাকে একদণ্ড অপেক্ষা করিতে হইবে। আমি গঙ্গার ধারে অশ্বথ-তলে এক অতিথি রাখিয়া আসিয়াছি, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া যাইতে পারিব না।"

"ভুপ্! এখন কোথায় কি পাইবি ভাই, যে অতিথিকে খাওয়াইবি?" "তুমি সে চিন্তা করিও না দাদা,—আমি ভট্টাচার্য্য-বৌকে খাবারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া আসিয়াছি। তুমি কি মনে কর যে, বৌঠান্ আমার অনুরোধে কোন দিন একটা কুকুরের এক মুষ্টিও অন্ন দিবে?" "কিন্তু ভুপ্! এখন বিদ্যালঙ্কার-বাড়ী গেলে ধরা পড়িয়া যাইব।" "তুমি না হয় তফাতে থাক।" "না, চল্ যাই,—সুদর্শনকে বলিয়াই যাইব।" "অমন কাজটী করিও না দাদা;—তাহা হইলে ভট্টাচার্য্য দাদা গ্রামময় ঢাক পিটাইয়া বেড়াইবে।" "ভাল, কিছু বলিব না। কিন্তু চল, তাহার সহিত দেখা করিয়া যাই,—আর হয় ত এ গ্রামে ফিরিব না।"

উভয়ে বিদ্যালঙ্কারের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। দূর হইতে সুদর্শন ভট্টাচার্য্যের গীতধ্বনি শ্রুত হইল। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে কহিল, "ভুপ্! সুদর্শন আলাপ করিতেছে, এখন কি বিরক্ত করিব?" "দাদা! বিলম্ব করিলে চলিবে না, আমার অতিথি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত।"

উভয় ভ্রাতা দ্বারে করাঘাত করিল। সুদর্শন বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "ভুপেটা বুঝি! দাঁড়া তোর মাথা ভাঙ্গিব।" কিন্তু সে রুদ্ধ-দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিল, সম্মুখে আর একজন দাঁড়াইয়া আছে। তখন সে ব্রাহ্মণ-সুলভ ক্রোধ বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কে, ছোটরায়! আয় ভাই, কটা নূতন গান বাঁধিয়াছি।" যুবা ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া পরে প্রণাম করিল, এবং কহিল, "দাদা! তোমার নূতন গান শুনিতে অনেক বিলম্ব হইবে, আমি এখন বিদেশে চলিয়াছি, আশীর্ব্বাদ কর।"

এই সময়ে দুইটী রমণী কক্ষে প্রবেশ করিল। একজন সধবা, অন্য জন বিধবা। সধবা কদলীপত্রে জড়িত কিছু খাদ্য অন্ধের হস্তে দিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো! ফিরিবার সময় এই পথ দিয়া যাইতে ভুলিও না,—তোমার জন্য প্রসাদ রাখিয়াছি।"

বিদেশ-যাত্রার কথা শুনিয়া সুদর্শন ভট্টাচার্য্য কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আ মর্ মাগি, রাখ্ তোর প্রসাদ! অসীম আর ভূপেন যে বিদেশে চলিল!" রমণীদ্বয় আশ্চর্য্য হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "বিদেশ! কোথায়?" যুবা কহিল, "দিল্লী।"

বিধবা আত্ম-সম্বরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; এবং অন্ধের হস্তাকর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইল। ব্রাহ্মণ বীণা পরিত্যাগ করিয়া যুবার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "হ্যাঁরে অসীম! তোরা চলিয়া যাইবি, আমি কাহাকে লইয়া থাকিব?"

যুবা কহিল, "ভয় কি দাদা! আমরা ফিরিলাম বলিয়া। তুমি মন দিয়া গান বাঁধিতে থাক, আমরা আসিয়া এক মজলিসে সমস্ত গান শুনিয়া লইব। আর বিলম্ব করিব না, সওয়ারী দাঁড়াইয়া আছে।"

উভয় ভ্রাতা সুদর্শন, তাহার পত্নী ও ভগিনীকে প্রণাম করিয়া বিদ্যালঙ্কার-গৃহ পরিত্যাগ করিল। আম্র-পনস-বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রাম পরিত্যাগ কালে, পদশব্দ শুনিয়া উভয় ভ্রাতা চমকিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই একটী রমণী দ্রুত-পদে তাহাদের নিকটে আসিল। যুবা জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" রমণী কহিল, "দাদা! আমি দুর্গা।" অন্ধ ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে দিদি? তুমি অন্ধকারে বাগানে আসিলে কেন?" রমণী তাহাকে ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া যুবাকে কহিল, "দাদা! আমার একটী অনুরোধ রাখিতে হইবে।" "কি অনুরোধ?" "দেখ দাদা! তোমরা পুরুষেরা যাহা কথায় প্রকাশ কর না, তাহা মুখের ভাবে প্রকাশ হইয়া যায়। সে মুখের ভাবের ভাষা পুরুষে সহজে বুঝিতে পারে না, কিন্তু রমণী তাহা সহজেই পারে। আমি বেশ বুঝিয়াছি, তোমরা গ্রাম পরিত্যাগ করিতেছ। কি জন্য পরিত্যাগ করিতেছ, তাহা সকলেই জানে। দেখ দাদা!

তোমার মত আমিও ভূপ্‌কে তিন বৎসরের ছেলে মানুষ করিয়াছি; সুতরাং আমিও তাহার উপর কিছু দাবী রাখি। এই পুঁটুলিতে যাহা আছে, তাহা আমার স্বামীর সম্পত্তি; সুতরাং এখন ইহাতে আমি ব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। আমি ইহা ভূপ্‌কে দিলাম, ইহা তাহার জন্য ব্যয় করিও।" দুর্গাঠাকুরাণী যুবার হস্তে একটা গুরুভার পদার্থ দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। এই সময় আম্রবৃক্ষের নিম্নের অন্ধকার হইতে একজন পুরুষ বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি চাও?" যুবা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ব্যক্তি প্রণাম করিল এবং কহিল, "কে, ছোট হুজুর? অন্ধকারে চিনিতে পারি নাই, আমি নবীন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অতিথি

গ্রাম-সীমা পরিত্যাগ করিয়া যুবা অন্ধ বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "ভূপ্‌! তোর অতিথি কে ভাই?" বালক কহিল, "একজন চোগ্‌তাই।" "চোগ্‌তাই?" "হাঁ দাদা! খাঁটি মোগল। বাঙ্গলা বা হিন্দী একেবারে বুঝে না। শিকার করিতে গিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। কথা বুঝে না বলিয়া সারা দিন খাইতে পায় নাই। বৌ-ঠানের কাছে যে কিছু পাইব না, সে ত জানাই কথা। আমি ভট্টাচার্য্য-বৌকে খাবার করিতে বলিয়া, তোমাকে ডাকিতে যাইতেছিলাম। দাদা, তাঁহাকে সহরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।"

"ভালই হইয়াছে ভাই। সহরে গেলে বড় দাদার লোকে আমাদের সহজে মারিতে পারিবে না।" "হাঁ দাদা, বড়-দাদা আমাদের মারবে কেন?" "কি বুঝিবে ভাই! বিষয় বড়ই জঞ্জাল।" "বিষয় ত আমরা লিখিয়া দিয়াছি দাদা, তবে আমাদিগকে মারিবে কেন?" "পাছে আর কখনো দাবী করি। বিষয়ের কথা যদি নবাব-সরকারে বা বাদ-শাহের দরবারে পৌঁছে, তাহা হইলে বড়দাদার বড়ই অপ-মানের কথা।" "দাদা! তবে চল না নবাবকে বিষয়ের কথা বলিয়া দিই!" "নবাব বড়দাদার বড়ই বাধ্য, তাঁহাকে দিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না।" "বাদশাহও কি বড়দাদার বাধ্য?" "না। বাদশাহের দর-বারেই যাইব মনে করিয়াছি। বড়দাদার অত্যাচার দেখিয়া, অনেক দিন ধরিয়াই সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছি যে, একদিন দিল্লী যাইব। আজই সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিব। তোর অতিথি কোথায়?" "ঐ যে!"

এই সময়ে সেই পথভ্রান্ত মুসলমান অশ্বত্থ-তলের অন্ধকার হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দোস্ত! তুমি কি সেই?"

ভূপেন্দ্র পাসিতে জবাব দিল, "জনাব! অপরাধ মাফ করিবেন,—আপনার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।" "তুমি যে মোটের উপর ফিরিয়া আসিয়াছ, এই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। অন্ধকার হইয়া গেল, রাত্রিতে নদী পার হইব কি করিয়া?" "সে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি।" "বন্ধু! তুমি একজন ফেরেশ্‌তা।"

উভয় ভ্রাতা অশ্বত্থ-মূলে কদলীপত্র বিছাইয়া খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া দিল। তাহাদিগের অতিথি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া-ছিল; সে অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই খাইতে আরম্ভ করিল। ক্ষুধা কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইলে, আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "দোস্ত! তোমার সঙ্গে কে?" ভূপেন্দ্র কহিল, "ইনি আমার জ্যেষ্ঠ। ইঁহাকে ডাকিতে গিয়াই বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।" "বন্ধু! তুমি বোধ হয় আমাকে পথ দেখাইয়া সহরে লইয়া যাইবে?" "হাঁ।" এই সময় ভূপেন্দ্র কহিল, "আমরা দুইজনেই যাইব।" আগন্তুক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিও যাইবে? অন্ধকারে তোমার কষ্ট হইবে না দোস্ত?" ভূপেন্দ্র কহিল, "অন্ধ-কারে অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি জনাব, এখনো বহুদূর যাইতে হইবে।" "কতদূর আসিয়াছ?" "বিশ বৎসরের পথ।" "অঃ! সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, মাফ্‌ করিও, দোস্ত! আলোক ও অন্ধকার যে তোমার নিকট সমান, তাহা মনে ছিল না। তোমরা কি আজই রাত্রিতে ফিরিয়া আসিবে?" "না, রাত্রিতে সহরে থাকিয়া সকালে অন্যত্র যাইব।" "কোথায় যাইবে?" "সে কথা পরে বলিব। এখন চলুন, রাত্রি বাড়িয়া চলিল।"

অশ্বত্থ-তল ত্যাগ করিয়া তিনজনে নদীর দিকে চলিল। নদীতীরে বেণু-কুঞ্জের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরে ক্ষুদ্র প্রদীপের স্তিমিত আলোকে একজন মনুষ্য জাল বুনিতেছিল। ভূপেন্দ্র তাহাকে দূর হইতে ডাকিল, "কেনা দাদা!" ধীবর জাল রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে? খোকাবাবু? অন্ধকারে

"তবুরে কে! আসিয়াছ ভাই ?" ভূপেন্দ্রের পশ্চাৎ হইতে তাহার জ্যেষ্ঠ বলিয়া উঠিল, "কেনা! আমি আসিয়াছি, শীঘ্র বাহিরে আয়।" তাহার কথা শুনিয়া ধীবর চমকিত হইয়া উঠিল; এবং জাল দূরে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "হুজুর, যাই।" কুটীরাভ্যন্তর হইতে এক রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা ?" ধীবর তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, "থাম্ মাগি, কাহাকে কি বলিস্, হুঁস্ থাকে না ? দেখিতেছিস্ না, ছোটরায় আর খোকাবাবু আসিয়াছে !"

এই সময় ভূপেন্দ্র কহিল, "কেনা দাদা! নাও ঠিক্ কর,—আমরা সহরে যাইব।" "ছিপ্ আনিব, না, পান্‌সী বাহির করিব ?"

"পান্‌সী।" কুটীরের নিম্নে একখানি ছোট পান্‌সী বান্ধা ছিল, ধীবর একখানি দাঁড় লইয়া পান্‌সীতে উঠিল এবং ভূপেন্দ্রের হস্তে হাল্ দিয়া, নৌকা কিনারে টানিয়া আনিল; সকলে নৌকায় উঠিলে, সে নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা অল্প দূর উজাইয়া লইয়া গিয়া, কেনারাম পাড়ি জমাইল; এবং অনুচ্চ স্বরে ভূপেন্দ্রকে কহিল, "খোকাবাবু! কোথায় যাইতেছ ?" ভূপেন্দ্র কহিল, "কেন, বলিলাম যে সহরে যাইব ?"

"এত রাত্রিতে সহরে ?" "নিমন্ত্রণ আছে।" "বড় কর্ত্তার নিমন্ত্রণ নাই ?" "তিনি অনেক রাত্রিতে দরবার হইতে ফিরিবেন, যাইতে পারিবেন না।" "এ বেটা কে ? মুসলমান দেখিতেছি !" "হাঁ, চোগ্‌তাই।" "চোঙদার ত ব্রাহ্মণ ? এ বেটা নিশ্চয় মুসলমান।" "মুসলমান-ই ত! চোগ্‌তাই মানে মোগল, চোঙদার নয়।" "ও বাবা, তাই বুঝি! খোকাবাবু, এ বেটা বাঙ্গলা বুঝে না কি ?" "না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ও বাঙ্গলা, হিন্দী কিছুই বুঝে না।" "বাঁচিলাম। বেটা যাইবে কোথায় ?" "লালবাগে।" "লালবাগে শুনিয়াছি বাদশাহের নাতি থাকে। সেখানে গেলে রাত্রে ফিরিতে পাইব ত ?" "ভয় কি কেনাদাদা, আমরা সঙ্গে রহিয়াছি।"

দেখিতে-দেখিতে নৌকা পরপারের নিকটে আসিল। তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে কহিলেন, "ভূপেন! দেখ্ ত, দুর্গা কি দিয়া গেল !" ভূপেন্দ্র বস্ত্রমধ্য হইতে একটী থলিয়া বাহির করিয়া জ্যেষ্ঠের হস্তে দিল। তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "এ যে সমস্তই মোহর !"

"আমি তাহা স্পর্শ করিয়াই বুঝিয়াছিলাম।"

"গুণিয়া দেখ্।" ভূপেন্দ্র গুণিয়া কহিল, "এক হাজার এক।" "সে যে অনেক টাকা রে !" "দুর্গা-দিদির স্বামীকে ত্রিপুরার মহারাজা প্রণামী দিয়াছিলেন।"

এই সময় পান্‌সী তীরে লাগিল। নদীবক্ষে বিস্তৃত বালুকা-ক্ষেত্র, এবং নদীতীরে সুদৃশ্য, সুরম্য, নবনির্ম্মিত মুর্শিদকুলি খাঁর নগর। নৌকা হইতে তীরে নামিয়া অসীম ধীবরকে কহিলেন, "কেনারাম! তুমি ফিরিয়া যাও। বাড়ী ফিরিয়া রায়-গৃহিণীকে কহিও, ছোটরায় বিদায় হইয়াছে,—আর তাহার অন্ন ধ্বংস করিতে আসিবে না।" বৃদ্ধ ধীবর ভাগীরথীর জলে দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র নৌকার কণ্ঠ আকর্ষণ করিতেছিল;—সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি কথা, ছোট হুজুর !"

"সত্য কথা। কেনারাম! বড় কর্ত্তাকে বলিও, অন্ন-ক্ষয়ের ভয়ে গৃহিণী আমাদিগকে বিদায় করিয়াছেন। ভূপেন্! কেনাকে একটা মোহর দে।" ভূপেন যখন বৃদ্ধকে মোহর দিতে গেল, তখন কেনারাম তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং কহিল, "খোকা ভাই! খোকা ভাই! তুই কোথা যাবি ভাই ?"

আগন্তুক মুসলমান বিস্মিত হইয়া তাহাদিগের বিদায়-অভিনয় দেখিতেছিলেন। তিনি এই সময় অসীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোস্ত্! তোমরা কি দেশ ছাড়িয়া যাইতেছ ?" উত্তর হইল, "হাঁ, জনাব !"

"কেন ?" "উদরান্ন উপার্জ্জনের জন্য।" "কোথায় যাইবে ?" "জনাব! অপরাধ মাফ্ করিবেন, এই প্রশ্নটীর উত্তর দিতে পারিব না। আর যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারই উত্তর পাইবেন।" "এই বৃদ্ধ নাবিক কে ?" "আমার পিতার পুরাতন ভৃত্য।"

মোগল বস্ত্রমধ্য হইতে একটী থলিয়া বাহির করিয়া, কয়েকটী মুদ্রা অসীমকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "ইহা তোমার ভৃত্যকে দাও।"

অসীম দেখিল মুদ্রা কয়টী সুবর্ণমুদ্রা। সে মোগলকে কহিল, "জনাব! এ যে আশরফি !"

মুসলমান কহিলেন, "তাহাতে কি হইয়াছে ?"

"আমি মনে করিলাম যে, আপনি ভুল করিয়া টাকার বদলে মোহর দিয়াছেন।"

"না, জানিয়াই দিয়াছি।"

ভূপেন্দ্র বহু কষ্টে বৃদ্ধ ধীবরের আলিঙ্গন-মুক্ত হইয়া সৈকত ত্যাগ করিল। নদীতীরে রাজপথে জনৈক মুসলমান অশ্বারোহী নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল। মোগল তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোস্ত! তুমি কি আহদী?" অশ্বারোহী তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অভিবাদন করিল। মোগল পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" অশ্বারোহী কহিল, "জনাব! আমি লুৎফুল্লা। আপনি ফিরেন নাই বলিয়া চারিদিকে সওয়ার ছুটিয়াছে।"

"লালবাগ কতদূর?"

"পাঁও কোশ্।"

"আমি তোমার ঘোড়া লইয়া চলিলাম। তুমি এই দুইজন হিন্দুকে গোসলখানায় লইয়া আইস।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গৃহত্যাগ

হিজরার ১১২৫ সাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটী চিরস্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহ আলম বহাদরের মৃত্যু ও মোগল-গৌরব-রবির অবসান হইয়াছিল। এই সময়ে আওরঙ্গজেবের বংশধরগণের মধ্যে যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ফলে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দিল্লীর বাদশাহ দাক্ষিণাত্যবাসী মারাঠার ভিক্ষান্নভোজী হইয়া উঠিয়াছিলেন,—শাহজহানের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। শাহ আলম বহাদর বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার অভিষেকের সময় হইতেই তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল।

আওরঙ্গজেব যখন জীবিত, তখনই শাহ আলমের মধ্যম পুত্র আজীম-উশ্-শান্ পিতামহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বহু কাল বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ফররুখ্‌সিয়ারকে প্রতিনিধিস্বরূপ ঢাকায় রাখিয়া দিল্লী যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ফররুখ্‌সিয়ার কিছু দিন ঢাকায় বাস করিয়া, ১৭১২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১১২৪ হিজরায় মুরশিদাবাদে আসিয়াছিলেন।

আওরঙ্গজেবের বিশ্বাসের পাত্র, মহারাষ্ট্রদেশে রাষ্ট্র-ব্যাপারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জফরকুলি খাঁ মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধি পাইয়া সুবা বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব-বিভাগের দেওয়ান্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন আজীম-উশ্-শানের সহিত দেওয়ান্ মুর্শিদকুলির সদ্ভাব ছিল না। অল্প কাল মধ্যে আজীম-উশ্-শান্ মুর্শিদকুলিকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেওয়ান্ বাদশাহের অনুমতি লইয়া ঢাকা বা জহাঙ্গীর নগর হইতে রাজস্ববিভাগ মখ্‌সুসাবাদে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মখ্‌সুসাবাদ দেওয়ানের নামানুসারে মুর্শিদাবাদ নাম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলার একটী প্রধান নগর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় হইতে ঢাকা শ্রীহীন হইতে আরম্ভ হয়; এবং অল্প দিন মধ্যেই রাজধানীও মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়।

বাদশাহী রাজস্ববিভাগ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে আসিলে, বহু উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারী পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিদেশে আসিয়া ধর্ম্মান্ধ মুর্শিদকুলির নগরে বাস করেন নাই। মুর্শিদকুলি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের একজন প্রিয় ছাত্র। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ মরণকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এইজন্য কাননগোই হরনারায়ণ রায় প্রমুখ কর্ম্মচারিগণ ভাগীরথীর পশ্চিমপারে একখানি নূতন গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। এই গ্রামের নাম ডাহাপাড়া অর্থাৎ ঢাকাপাড়া। মোগল-সাম্রাজ্যের অতীত গৌরবের চিহ্নস্বরূপ ডাহাপাড়া গ্রাম এখনও মুর্শিদাবাদের পরপারে বিদ্যমান আছে।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে ডাহাপাড়া একখানি গণ্ডগ্রাম ছিল। কাননগোই হরনারায়ণ রায় তখন এই গ্রামের অধিকারী। তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ রায় দীর্ঘকাল রাজস্ববিভাগ পরিচালনা করিয়া প্রভূত অর্থ ও যশোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরনারায়ণ আওরঙ্গজেবের আদেশে কাননগোই নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যেদিন পথভ্রান্ত মোগল ডাহাপাড়া গ্রামে আসিয়াছিলেন, সেইদিন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের শেষভাগে হরনারায়ণ কাছারী করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। কাননগোইএর বৃহৎ ছিপ্ ডাহাপাড়ার ঘাটে আসিয়া লাগিল। চারি পাঁচজন মশালচি ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা ছিপ্ দেখিয়া মশাল জ্বালিল। মশালের আলোকে অন্ধকার ঘাট

দিনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হরকরা, আসা ও সোটা-বরদার-পরিবৃত হইয়া সুবা বাঙ্গলার কানিনগোই হরনারায়ণ রায় ছিপ্ হইতে নামিলেন। এই সময়ে ঘাটের পার্শ্বস্থিত বৃক্ষতল হইতে এক বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহার পদতলে আছাড়িয়া পড়িল। হরকরা ও আসাবরদারেরা তাহাকে তফাৎ করিয়া দিতেছিল,—কিন্তু হরনারায়ণ তাহাদের নিষেধ করিয়া, বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে কেনা, কি হইয়াছে?" বৃদ্ধ কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিল, "হুজুর! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ছোট কর্ত্তা আর খোকাবাবু গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।"

"কোথায় গিয়াছে?" "তাহা ত বলিতে পারি না হুজুর! তবে তাহারা একেবারে গিয়াছে, আর আসিবে না।" "তুই কেমন করিয়া বুঝিলি যে, আর আসিবে না?" "আমাকে যে বলিয়া গেল!" "তাহারা কোন্ দিকে গেল, বলিতে পারিস্?" "আমি পান্সী করিয়া তাহাদের লালবাগের ঘাটে রাখিয়া আসিয়াছি।" "লালবাগ?" "হাঁ, হুজুর।" "সঙ্গে আর কে ছিল?" "একজন মুসলমান।" "মুসলমান কোথা হইতে আসিল?" "তাহা বলিতে পারি না হুজুর।" "সে দেখিতে কেমন?" "গৌরবর্ণ, পাতলা চেহারা; অন্ধকারে মুখ ভাল দেখিতে পাই নাই। পিঠে বন্দুক আর ধনুক, কোমরে তলোয়ার।" "তুই কাঁদিস্ কেন?" "হুজুর খোকাবাবু—" "ভয় নাই, তুই ঘরে যা, আমি কালই তাহাদের ফিরাইয়া আনিব।"

বৃদ্ধ ধীবর চোখ মুছিতে-মুছিতে বিদায় হইল। অনুচরবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া হরনারায়ণ গৃহে চলিলেন। তাঁহার অট্টালিকার নিম্নতলে বৈঠকখানায় এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ একাকী নিবিষ্ট মনে সতরঞ্চ খেলিতেছিল। সুবা বাঙ্গলার প্রতাপান্বিত কাননগোই গৃহে ফিরিলেন,—আম্লা চাকর নফর ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল,—কিন্তু ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল না। বৈঠকখানার দুয়ারে দাঁড়াইয়া হরনারায়ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভট্‌চাজ, এখনও বাড়ী ফির নাই যে?" ব্রাহ্মণ মুখ না তুলিয়াই কহিল, "তুমি যাও, যাও,—বিলম্ব করিও না,—কাপড় ছাড়িয়া আইস। এতক্ষণে তিনবাজি খেলা হইয়া যাইত।"

"রাত্রি কত, খবর আছে?"

"এই চারি দণ্ড।" "ঐ শোন, দ্বিতীয় প্রহরের নহবৎ বাজিল।" "দ্বিতীয় প্রহর? এত দেরী করিয়া আসিলে কেন?" "আজ আসল 'তোমর জমা'র খসড়া শেষ হইল।" "ঝাড়ু মারি তোমার জমার মুখে। একটা দিন মাটি হইয়া গেল!" "তুমি পলাইও না। শুনিতেছি, অসীম ও ভূপেন্ চলিয়া গিয়াছে। পরামর্শ করিয়া যাহা হউক একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।" হরনারায়ণ অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কাননগোইএর প্রাসাদের দ্বিতীয় তলে প্রশস্ত দরদালানে বহু-নারী-পরিবেষ্টিত রায়গৃহিণী দরবার করিতেছিলেন। সেই দরবারে, কুলমহিলা ও দাসীবেষ্টিতা গৃহিণীর মসনদের নিকটে, একজন মাত্র পুরুষ বসিয়া ছিল। গৃহিণী সহাস্য আননে তাহার সহিত আলাপ করিতেছিলেন। কর্ত্তার পদশব্দ শুনিয়া গৃহিণীর প্রসন্ন মুখ সহসা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। হরনারায়ণ দরদালানে প্রবেশ করিলে, অনুচরীবৃন্দ অবগুণ্ঠন টানিয়া পলাইল। নবীন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, গৃহিণী বুক বাঁকাইলেন। হরনারায়ণ যেন তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "শুনিলাম, অসীম আর ভূপেন না কি রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে?" গৃহিণীর বিপুল নাসিকায় বৃহৎ নথ প্রবল বেগে দুলিয়া উঠিল। ক্ষুদ্রকায় হরনারায়ণ প্রমাদ গণিলেন। তিনি পুনরায় বলিলেন, "ছোট কর্ত্তার মাথাটা একটু বিগড়াইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।" এইবার গৃহিণীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মুখ বিপরীত দিকে ফিরাইয়া, গুরুগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "আরো কিছুদিন দুধ দিয়া কালসাপ পোষ!" হরনারায়ণ এইবার সাহস পাইলেন। তিনি গৃহিণীর মনসদের দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাইবার সময় কি তোমাকে কিছু বলিয়া গিয়াছে?" গৃহিণীর মুখ ফিরিল না,—তিনি উত্তর দিলেন না। তাঁহার প্রিয় বয়স্যা দাসী রতনমণি ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া, দ্বারের অন্তরাল হইতে কহিল, "কর্ত্তা! আমাকে ঈশ্বরগঞ্জে পাঠাইয়া দেন,—আমি নিত্য-নিত্য মনিবের এত অপমান সহিতে পারিব না।" হরনারায়ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গো রতন! আজ আবার কি হইল?" রতন মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "আজ ঈশ্বরগঞ্জের বাবুরা চোর হইয়াছে।" এইবার গৃহিণীর বরবপু ফিরিল, সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, তাঁহার বুক-

নেত্রের ক্রূর দৃষ্টির উত্তাপে হরনারায়ণ যেন ঝলসিয়া গেলেন। গৃহিণী গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "আর ঈশ্বর-গঞ্জের চৌদ্দপুরুষের সংবাদটা বলিতে পারিলি না ?"

আওরঙ্গজেবের ছাত্র কূটনীতিবিশারদ হরনারায়ণ বুঝিলেন যে, রণনীতিকুশলা গৃহিণী দুর্ভেদ্য ব্যূহ সাজাইয়া বসিয়াছেন ; এখন ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করিলে, তাঁহার পরাজয় নিশ্চিত। তখন তিনি বিচক্ষণ সেনাপতির ন্যায় সন্ধির ব্যবস্থা করিয়া কহিলেন, "তাই ত, ভাই বলিয়া এতদিন কিছু বলি নাই,—কিন্তু তাহার অত্যাচার ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে—" গৃহিণী অবসর বুঝিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। প্রিয় দাসী রতনমণি অশ্রুহীন নেত্রে বস্ত্র মার্জ্জনা করিয়া, তাহা রক্তবর্ণ করিয়া তুলিল। হরনারায়ণ এই অবসরে গৃহান্তরে পলায়নের উপক্রম করিতেছিলেন ; তাহা দেখিয়া গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "যাও কোথা, গুণের ভাইয়ের গুণের কথাটা একবার শুনিয়া যাও।"

"আবার কি ?" "আবার কি ! তোমার প্রাণের বন্ধু হরিনারায়ণের রূপসী, বিদুষী, সতীলক্ষ্মী কন্যা দুর্গা ঠাকুরাণীর সহিত—"

"রাধে মাধব, বল কি !"

"বলি কি, এই নবীনের মুখে শুন। আজ রাত্রিতে কিরীটেশ্বরীর পথের ধারে, ষষ্ঠিতলার মাঠে, গাছতলার অন্ধকারে ভট্টাচার্য্যের কন্যা প্রাণেশ্বরের গলা জড়াইয়া হাপুস্ নয়নে কাঁদিতেছিল। নবীন তাহার নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, নিজের কাণে শুনিয়া আসিয়াছে। দুর্গার প্রাণেশ্বর কে জান ? তোমার সোদর লক্ষ্মণ !"

এই সময়ে নরসুন্দরকুলতিলক নবীন বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে হুজুর, ভয়ে বলি, কি নির্ভয়ে বলি ? দুই দণ্ড রাত্রিতে ষষ্ঠিতলার মাঠ পার হইতেছিলাম। কিরীটেশ্বরীর পথের ধারে ছোট হুজুর আর দুর্গা ঠাকুরাণী—"

হরনারায়ণ অবশিষ্টের জন্য অপেক্ষা না করিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন।

স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ

[শ্রীপ্রিয়নাথ কর]

(১)

ইনি আমার জননীর মাতুল, সুতরাং সম্পর্কে আমার দাদামহাশয়। তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন আজ পঞ্চাশ বৎসর হইল। যখন তাঁহার সহিত একত্র ছিলাম, তখন আমার আদৌ মনে হয় নাই যে, তাঁহার প্রতিভাময় জীবনী লিখিবার গুরু ভার আমার উপরই পড়িবে।

আজ ৭২ বৎসর বয়সে বাল্যকালের অনেক কথা মনে হইতেছে,—বায়স্কোপের ছবির ন্যায় সমস্ত ঘটনা যেন ক্রমান্বয়ে আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছে। রাম-গোপালের সেই সুন্দর প্রকৃতি, সেই গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, আমার সহিত নানা রকমের রঙ্গ-তামাসা,—সে সব যেন সে-দিনের কথা। তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, নির্ব্বাচিত প্রথম বাঙ্গালী জজ রমাপ্রসাদ রায়, পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতিকে প্রায়ই দেখিতাম। তাঁহাদিগকে এখনও বেশ পরিষ্কাররূপে আমার মনে পড়ে। যে সময় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার রূপে enrolled হইবার নিমিত্ত মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের বাটীতে তাঁহার নিকট character certificate লইতে আসেন, দীনবন্ধু মিত্র যখন তাঁহার একখানি "নীলদর্পণে" আপন নাম স্বাক্ষরিত করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন, আবার যখন গোলযোগ হইলে স্বাক্ষরিত পাতাখানি ছিঁড়িয়া ফেলা হয়,—এ সব ঘটনা যেন সম্প্রতি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আর মনে পড়ে শেষ দিনের কথা, যে দিন আমাদের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন !

জন্ম ও বাল্য জীবন।

বঙ্গাব্দ ১২২১ সাল, ৬ই কার্ত্তিক, শুক্রবার (ইং ২১শে অক্টোবর, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে) রামগোপাল ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে য়ুরোপ নেপোলিয়নকে এলবায় নির্ব্বাসিত করিয়া শান্তির আশায় উৎকণ্ঠিত; ভারতবর্ষে লর্ড ময়রা (পরে মার্ক্‌ইস অব্ হেষ্টিংস) তখন নেপাল-অভিযান লইয়া ব্যস্ত; খৃষ্টান মিশনারীদিগের আসন্ন আগমনে ধর্ম্মচ্যুতির অলীক ভয়ে বঙ্গবাসী চিন্তিত; এবং রাজা রামমোহন রায় একেশ্বরবাদের উপক্রমণিকায় ব্যাপৃত।

হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী বা মুক্তবেণীর সন্নিকটস্থ বাগাটি গ্রামে রামগোপালের পিতা গোবিন্দচন্দ্রের বাস ছিল। পিতামহ জগমোহন কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন মুখ্য কুলীন ছিলেন। তাঁহার কৌলিন্যের জন্য বাগাটির মিত্রেরা তাঁহাকে কন্যাদান করেন, ও যৌতুক স্বরূপ ভূম্যাদি প্রদান করেন। জগমোহনের পৈতৃক নিবাস বাগাটির কিঞ্চিৎ উত্তরে বন্দীপুর গ্রামে। বিবাহের পর তিনি বাগাটিতে আসিয়া বাস করেন। তদবধি বাগাটিই ঘোষ-পরিবারের আবাস-স্থান হইয়া উঠে। জগমোহন মেসার্স কিং হ্যামিল্টন কোম্পানীর আফিসে কলিকাতায় কর্ম্ম করিতেন।

জগমোহনের ন্যায় তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে কৌলিন্যের মর্য্যাদা ছিল। সেই জন্য কলিকাতানিবাসী দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহ গোবিন্দ-চন্দ্রকে তাঁহার কন্যা দান করেন। কলিকাতায় বেচু চাটার্জ্জীর ষ্ট্রীটে রামপ্রসাদের বাস ছিল; এবং সহরের মধ্যে তিনি একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। পিতার ন্যায় গোবিন্দচন্দ্রও কৌলিন্যের সম্মানে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ভূম্যাদি লাভ করেন। কলিকাতাস্থ ঠনঠনিয়া পল্লীর ৯৮·১ নম্বর মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ বাটী এই বিবাহে রাম-প্রসাদের যৌতুক। গোবিন্দচন্দ্র এই বাটীতেই বাস করিতেন।

রামগোপালের পিতা ব্যবসাদার ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ব্যবসা সামান্য ছিল বলিয়া, তাঁহাকে দোকানদার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গোবিন্দচন্দ্র পরিশ্রমী ছিলেন; এবং তাঁহার লালবাজারের দোকানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। পুত্রের ব্যবসায়-বুদ্ধি বোধ হয় পিতার এই উৎসাহ ও উদ্যমের মধ্যে পরিপুষ্টি লাভ করিবার অবসর পায়। উক্ত কার্য্য ব্যতীত গোবিন্দচন্দ্র কুচবিহার রাজার এজেণ্টের কার্য্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব-বঙ্গে তাঁহার সামান্য জমিজমাও ছিল।

রামগোপাল তাঁহার জননীর অতি আদরের সন্তান ছিলেন; কারণ, পরিবার-মধ্যে তিনি সবেমাত্র একটী পুত্র। তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার চারিটি ভগিনী জন্মগ্রহণ করেন। বৃদ্ধা পিতামহী নাতিনীচতুষ্টয়কে প্রায়ই বলিতেন, "তোমরা একটী ভাই কেন আনচ না দিদি?" তাহাতে সর্ব্বকনিষ্ঠা বলিতেন, "হাঁ, আমি এনেচি, শিবতলায় রেখে এসেচি।" মেছুয়াবাজারের বাটীর অতি নিকটেই সেই শিব-মন্দিরটি এখনও বর্ত্তমান আছে। কনিষ্ঠা ভগিনী এইরূপ শিশু-সুলভ ভাষায়, রামগোপালের আসন্ন সম্ভবের বার্ত্তা দিয়া, কন্যাপীড়িত, পুত্রাভিলাষী পরিবারের আশা ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। তাঁহার পরেই রামগোপালের জন্ম হয়।

রামপ্রসাদ কন্যাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; সে কারণ, উভয় পরিবারের মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। কন্যা গর্ভবতী হইলে পিত্রালয়ে যাইবার প্রথা বহুকাল ধরিয়া বঙ্গীয় পরিবারের মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সম্পদ্‌শালী রামপ্রসাদ তদনুসারে কন্যাকে বেচু চাটার্জ্জীর ষ্ট্রীটস্থ নিজালয়ে লইয়া যান। রামগোপাল এইখানেই ভূমিষ্ঠ হন। বিলাতে Saint-Mary le Bow (Cheap-side)র ঘণ্টাধ্বনি যত দূর শুনা যায়, তাহার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলে যদি Cockney আখ্যা হয়, তাহা হইলে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের তোপধ্বনির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলে "সহুরে" বলিয়া অভিহিত হইতে পারা যায়। সে কারণে রাম-গোপালও সহুরে। তাঁহার পর গোবিন্দচন্দ্র আর একটী কন্যারত্ন লাভ করেন। রামগোপালের প্রথমা ভগিনী স্বামীর চিতারোহণে সহমৃতা হন; একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া দ্বিতীয়ার মৃত্যু হয়; তৃতীয়া ভগিনী চারিটী কন্যা ও একটী পুত্র, এবং চতুর্থ ভগিনী একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা লইয়া বিধবা হন। কনিষ্ঠা ভগিনী সন্তানহীনা ও বাল-বিধবা ছিলেন। শেষোক্ত তিনটী ভগিনীই তাঁহাদিগের বৈধব্যের পর পিত্রালয়ে আসিয়া অবস্থান করেন।

বাল্যকালে রামগোপালের স্বাস্থ্যের জন্য কাহাকেও কখনও চিন্তিত হইতে হয় নাই; বরং সাধারণ শিশুগণের স্বাস্থ্যের তুলনায় তাঁহার শরীর উত্তমই ছিল। তাঁহার গৌরবর্ণ, সুন্দর আকৃতি বাল্যকালে সহস্র বালকের মধ্যেও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সুগঠিত-দেহ, নবনীত-কান্তি, সুকুমার বালক রামগোপাল সেইজন্য সকলেরই স্নেহের পাত্র ছিলেন। শিশুকাল হইতেই সুকুমার বালক রামগোপাল সাহসী ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। একবার তাঁহার পিতা-মাতা ও পরিবারস্থ কয়েক ব্যক্তি এক আত্মীয়ের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে সে দিন 'ভূত নামান' হয়। ওঝা যথারীতি সকলকে চক্ষু মুদ্রিত করিবার জন্য বারম্বার হুকুম দেয়; এবং সকলকে ত্রস্ত করিয়া ওঝার অবাধ্যতায় ভূতের ক্রোধ ও অবাধ্যের স্কন্ধারোহণ সম্ভাবনা বিজ্ঞাপন করে। উপস্থিত যুবা ও প্রবীণ ব্যক্তিরা সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভূতের আশায় বসিয়া থাকেন; কিন্তু কৌতূহলী রামগোপাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ওঝার উপর সমস্ত বিশ্বাসটুকু স্থাপন করিতে পারেন নাই। ওঝা তাহার অদ্ভুত কার্য্যের সফলতা সম্পাদন করিবার জন্য সকলের উপরেই আপন চক্ষু স্থাপন করিয়া, প্রহরীর সতর্কতায় ত্রস্তভাবে পরীক্ষা করিতেছিল। যখন সে দেখিল যে, শিশু রামগোপাল মাঝে-মাঝে চক্ষু চাহিয়া তাহার কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, তখন সে তাঁহাকে ধমক দিয়া চক্ষু বুজিতে বলিল। রামগোপাল উত্তরে বলেন, 'কৈ, ভূত ত আসে নি'। সেবার রামের জন্য ভূত আসিতে না পারায়, ভূত নামান স্থগিত হয়; কিন্তু ভূত যাহাতে গোপালের উপর কুপিত না হয়, সেই নিমিত্ত ভূতের পরিচিত ওঝাকে কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দিয়া, পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গোবিন্দচন্দ্রকে অবাধ্য সন্তানের জন্য সস্ত্রীক শান্তি ক্রয় করিয়া বাটী ফিরিতে হয়।

আর একবার,—তখন তাঁহার বয়স পাঁচ কি ছয় বৎসর মাত্র,—সেই সময় তাঁহার কটিদেশে একটী স্ফোটক হয়, এবং সেজন্য তিনি বড় কষ্ট পান। এরূপ অবস্থায় একদিন গভীর রাত্রিতে, তিনি যে গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই গৃহে চোর প্রবেশ করে। তাঁহার কোমরে সোণার কোমরপাটা ছিল। চোর সেই কোমরপাটা কাটিবার চেষ্টা করে। যন্ত্রণার মূলের অতি নিকটে হস্তস্পৃষ্ট হওয়া মাত্রই, রামগোপাল জাগরিত হইয়া চোরের হস্ত চাপিয়া ধরেন, এবং চীৎকার করিয়া পিতাকে ডাকিয়া বলেন যে, চোরে তাঁহার কোমরে কাটিয়া লইয়া যাইতেছিল, তিনি তাঁহাকে ধরিয়াছেন; এখন পিতা আসিয়া চোর ধরুন। পিতা ভয়বিজড়িত স্বরে চাকরের নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করেন। চোর ইত্যবসরে দুগ্ধপোষ্য বালকের হস্ত ছাড়াইয়া পলায়ন করে,—কিন্তু গহনা অপহরণ করিতে পারে নাই।

চাকরের ক্রোড়ে উঠিয়া শিশু রামগোপাল প্রায়ই খাবার কিনিতে যাইতেন। তখন ঠনঠনিয়াতে একাধিক ময়রার দোকান ছিল না। যাঁহারা পুরাতন কলিকাতা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, পল্লীগ্রামের ন্যায় তখনকার কলিকাতার স্থানে-স্থানেও, পতিত জমীর উপর লতাগুল্মাদি জন্মিয়া, লোক-চক্ষুর অন্তরালে দুষ্ট লোকের অসদভিপ্রায় সাধনের উপযোগী যথেষ্টরও অধিক পরিমাণে ঝোপ-জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ঠনঠনিয়ার নিকট এরূপ স্থানের বিশেষ বাহুল্য ছিল। এখনকার তুলনায় তখনকার কলিকাতায় লোকের বসতিও অল্প ছিল। এক দিন গোপাল চাকরের ক্রোড়ে উঠিয়া খাবার কিনিতে যান। কিন্তু চাকর যখন পরিচিত দোকান অতিক্রম করিল, তখন রামগোপাল তাহাকে দোকানের দিকে ফিরাইবার জন্য, প্রথমে বালক-সুলভ অনুযোগ, পরে জেদ, অবশেষে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। পথে ভদ্রলোক যাঁহারা যাতায়াত করিতেছিলেন, তাঁহারা বালকের ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া, কারণ জানিতে উৎসুক হইলেন। রামগোপাল চাকরকে বাটী ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, চাকরের অনিচ্ছা-সত্বেও ভদ্রলোকেরা তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। রামগোপাল গৃহে ফিরিয়া, চাকরের ক্রোড় হইতে নামিয়া, পিতাকে বলিলেন যে, চাকরের কোমরে ছুরি আছে,—সে তাঁহার গহনা লইবার জন্য তাঁহাকে জঙ্গলের দিকে লইয়া যাইতেছিল। এখনকার মার্কাস স্কোয়ারে তখন বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল ও উহার চারি দিকে বৃক্ষাদির বাহুল্য ছিল। এদিকটা তখন এক প্রকার জঙ্গলের মতই ছিল। চাকরকে পরীক্ষা করাতে, সত্য-সত্যই তাহার কোমর হইতে এক ধারাল ছোরা বাহির হয়। চাকরের ক্রোড়ে উঠিয়া রামগোপালের পদদেশে এই ছোরার তীক্ষ্ণাংশ স্পর্শ করায়, তিনি

চাকুরের অসদ্বুদ্ধিপ্রায় অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহার বালক-সুলভ কৌতূহল, সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয়-স্বরূপ আমরা তাঁহার শৈশবের তিনটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

শিক্ষা

রামগোপালের শিক্ষারম্ভের সহিত, তিনি অন্যান্য বালকের সঙ্গে "পাত্তাড়ি" বগলে করিয়া, ঠনঠনিয়ার এক পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন। পাঠশালার দৈনন্দিন জীবনে, সহপাঠীদিগের উপর শারীরিক শক্তির কিঞ্চিদধিক প্রয়োগ, ও কপাটী খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন নেতৃত্ব ভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিশেষ কিছু নাই। তবে শুনিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে পাঠাভ্যাসে কিছু ইতর-বিশেষ হইত। আর, পরে তিনি যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পাঠশালার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে কেহ তাঁহার অনুবর্ত্তী বা অগ্রবর্ত্তী হন নাই।

পাঠশালা ত্যাগ করিয়া রামগোপাল শারবোর্ণের (Sherborne) স্কুলে ভর্তি হন। শারবোর্ণের জননী ব্রাহ্মণী ছিলেন। সেই জন্য হিন্দু গুরুমহাশয়ের ন্যায় শারবোর্ণ দুর্গা পূজার সময় ছাত্রদিগের নিকট হইতে বার্ষিকী আদায় করিতেন। কলিকাতার চিৎপুর রোডে আদি ব্রাহ্মসমাজের বাটীর নিকটে শারবোর্ণের স্কুল ছিল। শারবোর্ণ বাঙ্গালী ও ইংরাজের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উভয় জাতির ভাষার সংযোগে একটী নব্য সম্প্রদায় গঠন করিবার ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি নব্য বঙ্গের খ্যাতনামা বহু ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এইখানে রামগোপালেরও প্রথম ইংরেজী শিক্ষা হয়। আমরা শুনিয়াছি, এই বিদ্যালয়ে বিদ্যার অনুশীলন অপেক্ষা 'গুলি-ডাণ্ডা'র অনুশীলনের জন্য তাঁহার অধিক খ্যাতি ছিল।

যাহা হউক, তিনি যখন শারবোর্ণের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে একটী সামান্য ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি ভিন্ন পথে চালিত হয়। যে বুদ্ধি-বৃত্তি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বালক-সুলভ প্রকাশও এই সময়কার একটা বিশেষত্ব ছিল। সে বিশেষত্ব হিন্দু কলেজের শিক্ষিত যুবক ছাত্রের উপর অল্প প্রভাব বিস্তার করে। হরচন্দ্র ঘোষের সহিত রামগোপালের মাতুল-কন্যা, রামপ্রসাদ সিংহের পৌত্রীর বিবাহ-সভায় এই ঘটনাটি ঘটে। লর্ড ড্যালহাউসি (Lord Dalhousie) হরচন্দ্রকে পরে পুলীস ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন। ইনিই প্রথম বাঙ্গালী পুলীস ম্যাজিষ্ট্রেট। তৎপরে হরচন্দ্র কলিকাতা ছোট আদালতের তৃতীয় জজের পদ প্রাপ্ত হন। দীনবন্ধু মিত্র, তাঁহার সুরধুনী কাব্যে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

> নিরপেক্ষ হরচন্দ্র জানা নানা মতে,
> সুবিজ্ঞ বিচারপতি ছোট আদালতে।

ইহাঁর একটি মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি ছোট আদালতে প্রবেশ-পথের সম্মুখস্থ দালানে স্থাপিত হইয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বিবাহ-সভায় বর ও কন্যা পক্ষে কৌতুকাদি করিবার প্রথা ছিল। সেই প্রচলিত প্রথা অনুসারে, রামগোপাল হরচন্দ্রকে যে কৌতুক-প্রশ্নাদি করিতেছিলেন, তন্মধ্যে রামগোপালের বাক্পটুতা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, হরচন্দ্র তাঁহাকে নব-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য উপদেশ দেন। বিবাহের পর হরচন্দ্র স্বয়ং রামগোপালের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, রামগোপালকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। গোবিন্দচন্দ্রের এরূপ অর্থ-স্বচ্ছলতা ছিল না যে, হিন্দু কলেজে মাসিক পঞ্চ মুদ্রা বেতন দিয়া পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তখন বঙ্গদেশে প্রচলিত মুদ্রার আধিক্য হয় নাই, মুদ্রার ক্রয়-মূল্য হ্রাস পায় নাই। সুতরাং নিত্য প্রয়োজনীয় আহার্য্যাদি বস্তু সুলভ ছিল, অল্প মুদ্রায় অধিক পরিমাণ বস্তু ক্রীত হইত। রামগোপালের পিতার স্বল্প আয়ে তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত, কিন্তু নগদ পঞ্চ মুদ্রা মাসে-মাসে ব্যয় করা তাঁহার ন্যায় গৃহস্থের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। তদ্ব্যতীত, পুত্রের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা তখন বুঝিতেও সময় লাগিত। যে শিক্ষার জন্য জননী আজ তাঁহার শেষ সম্বল গায়ের গহনা অনায়াসে খুলিয়া দেন, সে শিক্ষার সুপ্রভাত তখনও দেখা দেয় নাই। কেহ-কেহ বলেন, গোবিন্দচন্দ্র দুটি মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হন। পিতামহীর অর্থ ছিল, তিনি পৌত্রের শিক্ষার জন্য বক্রী বেতন দিতে স্বীকৃত হইয়া, তাঁহাকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। আমরা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, পিতামহ জগমোহন মেসার্স কিং হ্যামিল্টন কোম্পানীর আফিসে

চাকুরী করিতেন, তথাকার রজার্স (Rogers) নামক একজন সাহেব জগমোহনের অনুরোধে রামগোপালের মাহিনার ভার গ্রহণ করেন। তবে আত্ম-নির্ভরশীল রামগোপালকে অধিক দিন রজার্সের উপর নির্ভর করিতে হয় নাই। তাঁহার মেধা ও অধ্যবসায় অতি সত্বরই হেয়ার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তিনি অচিরে রামগোপালকে বিদ্যালয়ের অবৈতনিক ছাত্রদিগের তালিকা-ভুক্ত করিয়া ল'ন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখনও ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে Laisser faire পদ্ধতি ত্যাগ করেন নাই। হিন্দু কলেজ তখনও প্রাইভেট বিদ্যালয়। এই সময়ে কলিকাতার স্থানে-স্থানে ইংরেজী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শারবোর্ণের ন্যায় আরমানী ও ফিরিঙ্গি শিক্ষকদিগের কতকগুলি বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয় ব্যতীত, পরে রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি অনেকে শিক্ষকের নিকটে বা আপন চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা করিতেছিলেন। এই শিক্ষার ফলে সকলেরই চিত্ত একটী নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আলোকে রাজা রামমোহন রায় উপনিষদের একেশ্বরবাদ প্রচারের পরিকল্পনায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন; প্রসন্নকুমার ঠাকুর ভবিষ্যতের ভরসা-স্থল দেশের যুবকদিগের মধ্যে নব শিক্ষা বিস্তারের সুপন্থা উদ্ভাবন করেন; এবং দ্বারকানাথ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য, বিলাতে সাধারণ অভিমত ফিরাইবার উদ্দেশ্যে, তাঁহার অর্থ-ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, কলিকাতার হিন্দু সমাজের মুখপাত্র হইয়া, শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় সমস্ত কার্য্যেই অগ্রণী হন; রসময় দত্ত বাঙ্গালীর বিচার-নিপুণতার পরিচয় প্রদান করেন; রামকমল ইংরেজী শিক্ষার উপায় স্বরূপ অভিধানাদি প্রণয়ন করিয়া নূতন যুগের আরাধনার উপকরণ রচনা করিয়া দেন। রামগোপাল, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি ডিরোজিওর ছাত্রদিগের পূর্ব্বে ইঁহারাই নূতন যুগের একনিষ্ঠ উপাসক।

ইহা ব্যতীত য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ হউক বা না হউক, অন্ততঃ প্রণালীস্বরূপ, বাঙ্গালী যুবকদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা বহু বৎসর ধরিয়া চলিতেছিল। ডেভিড হেয়ার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, হিন্দু যুবকদিগের শিক্ষার জন্য প্রতি গৃহে শিক্ষার বার্ত্তা জানাইয়া দিয়াছিলেন। হেয়ার অনেক সময়ে বালকদিগের জন্য পুস্তক ক্রয় করিয়া, তাহাদের বিদ্যালয়ের মাহিনা দিয়া এবং সময়ে-সময়ে ছাত্রের খাদ্যাদি এবং তাহার পিতামাতা প্রভৃতির ভরণপোষণের উপায় করিয়া দিয়া, ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিতেছিলেন। যখন শিক্ষার স্রোত এই ভাবে চলিতেছিল, সেই সময়ে, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী সার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টের সভাপতিত্বে বঙ্গবাসী সরস্বতীর পাদপীঠের ন্যায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে কুড়িটিমাত্র ছাত্র এই বিদ্যালয়ে ইংরেজী, পারসী ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী কলেজ স্কোয়ারের উত্তরে সংস্কৃত কলেজের অট্টালিকার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই সংস্কৃত কলেজের এক অংশে নূতন হিন্দু কলেজের স্থান হয়।

রামগোপাল নয় বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজের জুনিয়ার বিভাগে প্রবেশ করেন। তখন ডি অ্যানস্লেম (D' Anselm) হিন্দু কলেজের হেডমাষ্টার ছিলেন। ইনি অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন। একবার তাঁহার কথামত বিদ্যালয়ের কার্য্য হয় নাই বলিয়া, ডিরোজিও (D'Rozio) কে তিনি মারিতে উদ্যত হন। আর একবার ডেভিড হেয়ারকে sycophant বলেন; হেয়ার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কাহার sycophant?" এই দুর্ব্বাসা ডি অ্যানস্লেমই রামগোপাল নামের সৃষ্টি করেন। রামগোপালের নাম প্রথমে "গোপালচন্দ্র" ছিল। হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময়, কিশোর রামগোপাল ডি অ্যানস্লেমের দ্রুত উচ্চারণ বুঝিতে না পারিয়া, ঠিক উত্তর দিতে পারেন নাই। সাহেব ভর্ত্তি-বহিতে "রামগোপাল" নাম লিখিয়া ল'ন। তদবধি তাঁহার নাম রামগোপাল হয়। মাতামহের নামের সহিত তাঁহার নামের যে আদ্যপদের সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা ডি অ্যানস্লেমের সৃষ্টি। তাঁহার পিতামাতা ও আত্মীয়েরা চিরকালই তাঁহাকে গোপাল বলিয়া ডাকিতেন।

রামগোপাল হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইয়া একান্তচিত্তে মনঃসংযোগ করিলেন; এবং অচিরে বিদ্যালয়ের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। তিনি যখন চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার, ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দুই-তিনজনের ইংরেজী

সন্দর্ভগুলি এত প্রশংসার্হ হইত যে, কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটারি ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইলসন (Horace Hayman Wilson) সেগুলিকে প্রথম শ্রেণীতে লইয়া গিয়া, অমৃতলাল মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি দুই-একজন ছাত্র ব্যতীত, অপর সকলের লেখার সহিত তুলনা করিয়া, প্রথম শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্রকেই ভর্ৎসনা করিতেন। রামগোপাল মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। অল্প কালের মধ্যেই তিনি ক্লাসের ভিতর ইতিহাস ও ভূগোলে প্রথম স্থান অধিকার করেন। হিন্দু কলেজের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ছিলেন। যদিও তিনি নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তথাপি, কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণের সাহিত্য-সমিতিতে তিনি শীঘ্রই আপন স্থান নির্দেশ করিয়া ল'ন।

কিন্তু রামগোপাল ছাত্রজীবনে নিরীহ বালকটি ছিলেন না। শৈশবে যে স্বাস্থ্য লইয়া তিনি মাতৃস্তন্যে পালিত হইয়াছিলেন, কৈশোরে তাহা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল; তৎসঙ্গে উদ্যম ও শারীরিক শক্তিরও বিকাশ হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের মারামারিতে তিনি সর্ব্বাগ্রে থাকিতেন। তাঁহার সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বাক্‌পটুতা এই সময় হইতেই তাঁহাকে তাঁহার সতীর্থ ও বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে বিশেষরূপে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ এই ছিল, যাহা আমরা পরেও লক্ষ্য করিয়াছি, যে, তাঁহার শক্তি ছিল বটে, কিন্তু ঔদ্ধত্য ছিল না; এবং পরে তাঁহার লক্ষ্মীশ্রী হইয়াছিল, কিন্তু দাম্ভিকতা আসে নাই।

হিন্দু কলেজ স্থাপনার একাদশ বর্ষে (১৮২৮ খৃষ্টাব্দে), এবং তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে, তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হ'ন। সেই সময়ে (Henry Louis Vivian De Rozio) ডিরোজিও নামক একটি উনবিংশবর্ষীয় অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান ইংরেজী এবং ইতিহাসের সহকারী শিক্ষকরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিবার জন্য নিযুক্ত হ'ন। ইনিই হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। ডিরোজিও তাঁহার ছাত্রদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করিতেন; এবং সাহিত্য, নীতি, এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। সেই বৎসর ডিরোজিওর ক্লাসের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্দিষ্ট

১। পোপ-অনূদিত হোমরের ইলিয়ড ও অডেসি
২। ড্রাইডেনের ভার্জ্জিল
৩। সেক্সপিয়রের একখানি বিয়োগান্ত নাটক
৪। মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্ট
৫। গে'র ফেবল্‌স
৬। গোল্ডস্মিথের গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস
৭। রাসেলের মডার্ণ ইউরোপ
৮। রবার্টসনের পঞ্চম চার্লস।

এই সময়ে যোড়াসাঁকোস্থ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলায় বাগান-বাটীতে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন (Academic Association) নামে একটি সম্মিলনী গঠিত হয়; ডিরোজিও ইহার সভাপতি হ'ন। এই সভায় নানা বিষয় আলোচিত হইত; এবং বক্তৃতাদি করিবার প্রথা শিক্ষা দেওয়া হইত। রামগোপাল এই সভার একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ডিরোজিও তাঁহার ছাত্রদিগকে ইংরেজী সাহিত্য, ও রিড (Reid), ডিউগল্ড ষ্টুয়ার্ট (Dugald Steuart), ব্রাউন (Brown), হিউম (Hume) প্রভৃতির দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এই যুবক শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রণালী অতি চমৎকার ছিল। এই সকল দুরূহ গ্রন্থের ভাব তিনি সহজে তাঁহার ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। ডিরোজিও নীতিবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রাদির সমধিক উপদেশ দিতেন; এবং সর্ব্বদাই তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণের সঙ্গে থাকিতেন। সুতরাং তাঁহার চরিত্রের ছাপ স্ফুটনোন্মুখ-যৌবন ছাত্রদিগের মনোমধ্যে স্থায়িভাবে অঙ্কিত হইত। ডিরোজিও অ্যাক্যাডেমিক অ্যাসোসিয়েনের কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ নামক পুস্তক লিখিয়াছেন, "রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান বক্তা ছিলেন; ও রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন।" ভবিষ্যতের আশা ও ভরসা স্থল, ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ফল, এই সকল ছাত্রের চরিত্র ও শিক্ষা কি ভাবে গঠিত ও চালিত হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ডেপুটি গভর্ণর মিষ্টার (W. W. Bird) বার্ড, কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের

প্রধান বিচারপতি সার এডওয়ার্ড র‍্যায়েন (Sir Edward Ryan) গভর্ণর্ জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি কর্ণেল বেনসন (Colonel Benson), অ্যাডজুটেণ্ট জেনারেল বীটসন (Beatson), ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি ও বঙ্গদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই সভায় উপস্থিত থাকিতেন। এক দিন এই সভার একটা অধিবেশনে রামগোপালের বাগ্মিতায় বার্ড সাহেব এত প্রীত হন যে, তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য তিনি ডিরোজিওকে অনুরোধ করেন। এইরূপে ভবিষ্যৎ ডেপুটি গভর্ণর ও ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষীয় ডেমস-থিনিসের পরস্পরের সহিত পরিচয় হয়।

ডিরোজিওর শিক্ষায় একদিকে যেমন ছাত্রদিগের ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তি, এবং স্বাধীন চিন্তা ও তর্কশক্তির বিকাশ হইতে লাগিল, অন্যদিকে সেইরূপ হিন্দু সমাজে প্রচলিত খাদ্যাদি সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম তাঁহাদের নিকট শিথিল হইতে লাগিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "সে সময় সুরাপান করা কুসংস্কার ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রকাশ্য ভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারক দলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। স্বয়ং রাজা রামমোহন রায় সুরাপান শিক্ষা দিবার একজন গুরু ছিলেন।" রাজা রামমোহন রায় বিলাতী খানা খাইতেন; তাহাতেই হিন্দু সমাজে একটা কাণাকাণি চলিতেছিল। ডিরোজিওর ছাত্রদিগের দ্বারা হিন্দু সমাজের মধ্যে বিলাতী খাদ্য ও বিলাতী পানাদির প্রচলন, অনেকটা সমাজের কাণাকাণির সীমা অতিক্রম করিয়া জানাজানির মধ্যে আসিয়া পড়ে। অবশেষে, ইহাদের মধ্যে বিলাতী ক্লাবের সামাজিকতা এত অধিক হইয়া উঠে যে, তদ্দর্শনে কলেজের দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষ ভীত হন। এই ছাত্রদিগের মধ্যে সকলের অপেক্ষা রামগোপালের দূরদর্শন ও আত্মসংযমের ক্ষমতা অধিক ছিল। তিনি ডিরোজিওর অধ্যাপনা বুঝিতে যত যত্ন করিতেন, বিলাতী মুখরোচক খাদ্যাদি ব্যবহার দ্বারা জ্ঞানের পরিচয় দিতে তাহার অধিক ব্যগ্র হইতেন না। তিনি স্বভাবতঃ পরিশ্রমী ছিলেন। বিশেষতঃ, পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল নয় দেখিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব কলেজের পাঠ শেষ করিয়া, কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করিতে পারেন, ও পরিবার-পোষণ বিষয়ে পিতার সাহায্য করিতে পারেন, এই ইচ্ছা তাঁহার মনে সতত জাগরূক ছিল। এই জন্য তাঁহার অধ্যয়নে উপযুক্ত যত্ন ও শ্রমের সীমা ছিল না।

রামগোপাল অচিরে ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠিলেন। একদিন Locke পড়িতে-পড়িতে রামগোপাল বলেন যে, লক্ বুদ্ধি বৃত্তির বিবরণটি প্রাচীনের পরিণত মস্তিষ্ক লইয়া চিন্তা করিয়াছেন, এবং বালকের সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত, অথচ অর্থপূর্ণ মন্তব্যটিতে ডিরোজিও যুগপৎ আনন্দ ও গৌরব বোধ করিয়াছিলেন। সে সময়ে আধুনিক কালের ন্যায় পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা ছাত্রের পিতামহীর বয়সের সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইত না। যে কয়খানি পুস্তক নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহা তদানীন্তন সময়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; এবং সেই পুস্তকগুলি সম্পূর্ণরূপে অধীত হইয়া তাহাদের ভাব ও ভাষা আয়ত্তীকৃত হইত। রামগোপাল ও তাঁহার সহপাঠীরা নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া, ডিরোজিওর প্রতিষ্ঠিত তর্ক-সভায় নানা বিষয়ের বিচার ও কথোপ-কথনে অধীত জ্ঞানের যথোচিত নিয়োগ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে বিদ্যা ও বুদ্ধি উভয়েরই উত্তমরূপে অনুশীলন হইয়াছিল। শিক্ষা বিষয়ে ডিরোজিওর সভা ছাত্রদিগের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল।

পূজার ছুটি

[শ্রীনীহারবালা দেবী]

(১)

পূজার ছুটি আরম্ভ হইয়াছে। রাজসাহী কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র মন্মথ ও সুধীর দুই বন্ধু দিনাজপুরে যাইতেছিল। দুজনেরই বাড়ী সেইখানে। ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কিনিয়া ট্রেণে উঠিবার সময় তাহারা দেখিল, সেখানে ভয়ানক ভীড়,—ঠাসাঠাসি করিয়াও কোনও কামরায় একটু ঠাঁই পাওয়া গেল না। থার্ড ক্লাসের দিকেও তাকাইয়া দেখিল, সেখানেও, উত্তম না হউক, মধ্যম এবং অধম শ্রেণীর নরমুণ্ডে তিল ধারণের ঠাঁই নাই। কাবুলী ও মাড়োয়ারী পাগড়ীধারীদের এবং তাহাদের ঘুঙুর-পরা, ঘাগরা-পরা লক্ষ্মীদের মধ্যে অবোধ্য ভাষায় কিচিকিচি লাগিয়া গিয়াছে। এদিকে দ্বিতীয় ঘণ্টাও পড়িয়া গেল, গাড়ীও একটু দুলিয়া উঠিল। তাহারা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে ছুটিল। আর ভাবনা-চিন্তার সময় নাই,—তাহারা সম্মুখে যে গাড়ীখানা পাইল, উঠিয়া পড়িল। খুব জোরে একটা ঝাঁকুনী দিয়া ট্রেণ ছুটিল। তাহারা কপালের ঘাম মুছিয়া এতক্ষণে কামরার ভিতরকার আরোহী ভদ্রলোকদের পানে চাহিয়া দেখিল। সর্ব্বনাশ! দুইজন আরোহী তাহাদেরই প্রফেসার! আরও জন-তিনেক আছেন, তাঁহারা তাহাদের অপরিচিত। নিঃশব্দে পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া তাহারা দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। অন্য লোকগুলি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহাদের দুইজনের পানে চাহিলেন। মন্মথর খুব কাছেই একটি ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন,—তাঁহাকে দেখিয়া পদস্থ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার মাথার দুই পাশে, কাণের উপরে, ও পিছনে, কয়েকগাছি সাদা চুল ছাড়া, সমস্ত মাথা-জোড়া প্রকাণ্ড টাক। রং খুব উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; গোলগাল দেহখানি; মুখভাব খুব অন্যমনস্ক; যেন গভীর চিন্তামগ্ন; কোথায় যে বসিয়া আছেন তাও যেন ভুলিয়া গিয়াছেন। অন্য দিকে, যে দিকে সুধীর ছিল, সে দিকে ছিলেন, প্রৌঢ়-বয়স্ক শীর্ণকায় শ্যামাচরণ বাবু,—ইনি সম্পর্কে সুধীরের কাকা হন। সুধীরকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "এই যে সুধীর! বাড়ী যাচ্ছো বুঝি?" সুধীর বলিল, "হ্যাঁ; আপনি?" শ্যামাচরণ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি? আমি যাচ্চি একবার রংপুরে।" সুধীর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "রংপুরে? কেন?" "সেখানে না কি একটি পাত্র আছে; তাই দেখি গে একবার, যদি বিন্নকে উদ্ধার ক'রতে পারি।" আরও একজন রংপুর-যাত্রী এই কামরাতে ছিলেন; তিনি একটু নড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "আমিও রংপুরেই নাম্‌বো।" শ্যামাচরণ বাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আর কথনো গিয়েছিলেন সেখানে, না এই নূতন?" তিনি বলিলেন, "আমার ত বাড়ীই ওখানে।" "তা'হলে ত সে পাত্রদের চিন্‌তেও পারেন আপনি?" "কি নাম সে ছেলের বাপের?" শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, "সে ছেলের ত বাপ নেই। খুড়ো আছেন; তিনি না কি পেস্কার না এই রকম কি একটা কাজ করেন। তা সে ছেলের খুড়ো দর বলেছেন,—না যদি কমে, ত মেয়ের বিয়ে দেওয়া আমার কপালে নেই।" মন্মথর পাশের টাকগ্রস্ত ভদ্রলোকটি এতক্ষণে মুখ ফিরাইলেন; বলিলেন, "আপনি বুঝি কন্যাদায়গ্রস্ত? দেবেন না মশাই,—মেয়ের বিয়ে দেবেন না আর!" কামরাশুদ্ধ লোক এই প্রবীণ ভদ্রলোকটির কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া উঠিলেন। কি বেদনাহত, করুণ সে কণ্ঠ! এতক্ষণে সকলে বুঝিলেন, ভদ্রলোকটি শোকাতুর,—বুকের ঘা এখনও শুকায় নাই। যুগপৎ সকলকার চক্ষু একসঙ্গে তাঁহার উপর পড়িল।

(২)

শ্যামাচরণ বাবু তাঁহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "না দিয়ে কি উপায় আছে? একটি নয় মশায়,—এইটি তৃতীয়া কন্যা; এর আগে যাদের পার করেছি, তাদেরই জের মেটাতে পারিনে,—তত্ত্ব-তাবাসের এতটুকু খুঁত হলেই কি,

না হলেই কি,—মেয়েগুলোর খোরাক শুনে-শুনে হায়রাণ হ'য়ে গেলুম।" রংপুরের ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আজকাল দেশের দিনকালই পড়েছে এম্‌নি,—উপায় কি?" টাকগ্রস্ত ভদ্রলোকটি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "উপায় কেন থাকবে না? আমরা যে দেখ্‌তে পাইনে সে উপায়! দেবো না আমরা কেউ মেয়ের বিয়ে,—দেবো না; দেখা যাক্‌,-কারো ছেলের বিয়ের দরকার আছে কি না! উপায় নেই, এও কি একটা কথা?" রংপুরের ভদ্রলোকটির সম্ভবতঃ বি-এ পাশ করা পুত্রটি অবিবাহিত ছিল। তাই তিনি বিদ্রূপ করিয়া ব'ললেন, "রেখে দিন মশায় ও-উপায়ের কথা,—উপায় ক'রবে কারা?" টাকগ্রস্ত ভদ্রলোকটি চারিদিকে চাহিয়া, মন্মথ ও সুধীরের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "উপায় এরা-ই! আমাদের মেয়ে-পোড়া গন্ধ যদি এদেরই নাকে লাগে! মেয়েরও যে একটা দর আছে, সে যে শুধু গলগ্রহই নয়;—মাও মেয়ে, বোনও মেয়ে—এই কথা যদি জাগে ত ঐ তরুণ মাথাতেই ঢুকবে।" কামরার আর একদিকে একজন বিরাট্‌কায় কটা রংয়ের শ্মশ্রু-শোভিত ভদ্রলোক ছিলেন; তিনি উৎকট সিগারেটের ধোঁয়ায় একটু কাসিতে-কাসিতে কহিলেন, "মেয়ে-পোড়া! হা-হা-হা, ও-সব ভেঁপোমি মশায়,—স্রেফ ভেঁপোমি—কতক-গুলো মেয়ে হয়েছে আজকাল,—তাদের ঐ এক ফ্যাসান বেরিয়েছে আর কি! নইলে, মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাব্‌বে মেয়ের বাপ্‌,—মেয়ের ম'রবার কি দরকার?" টাকগ্রস্ত ভদ্রলোকটি বলিলেন, "তাই ত! ম'রে যে বাঁচে তারা—এটুকু স্বস্তিও বুঝি লোকের অসহ্য হ'য়ে উঠেছে?" শ্যামা-চরণ বাবু শুষ্ক-হাস্যে বলিলেন, "মরণ কি আর ফ্যাসান হয় মশায়! বাপের মুখের মরণাপন্ন দশা দেখে,—আর নিজেকে তার হেতু জেনে, মেয়ের মনে কি কষ্ট একটুও হয় না? তা হয় বই কি! তা ছাড়া, নিজেদের লাঞ্ছনা-অপমানের জ্বালায়, একটু-আধটু খোঁচা বাড়ীর মেয়েদেরও দিয়ে ফেলি বই কি!" দাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকটি কিছু বলিবার পূর্ব্বে টাকগ্রস্ত লোকটি বলিলেন, "তাই কি শুধু বিয়ে পর্য্যন্ত! ঐ যা বলেছেন মশায়! বিয়ের পর হাঙ্গাম আরো বেশী। শুনুন না,—আমারও অবস্থা এমন কিছু নয়; তবু ইচ্ছে করে আর মেয়েকে ফাঁকি দিইনি। কিন্তু আমার মেয়েটাকে মেরে ফেলে, তারা আমায় জব্দ ক'রলে।" ভদ্রলোকটির দুই চক্ষু ছলছল্‌ করিতে লাগিল। শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, "কোথায় দিয়েছিলেন বিয়ে?" একটু কাসিয়া, সিক্ত কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া, তিনি বলিলেন, "এই দিকেই। সেই-খান থেকেই আস্‌চি আমি। মেয়ের মা কেঁদে-কেটে অস্থির হ'য়ে প'ড়েচেন; তাই তাঁর মেয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলাম। মেয়ে আমার বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল। তা, ভগবানই তার সকল দুঃখ ঘুচিয়ে নিয়ে গেছেন। তবে বাপ্‌-মায়ের আক্ষেপ! তা থাক্‌। বিয়ের সময় যে গহনা দিয়েছিলাম, সেগুলোর রং না কি পেতলের মত ছিল; আর কাপড়-চোপড়—এ-সবও না কি পুরণো ছিল। তাঁরা হুকুম ক'রলেন, গহনা সব বদ্‌লে দিতে। তা আমি দিতে পারিনি। দান-সামগ্রীর বাসন-কোসন সবই তাঁদের অপছন্দ হ'ল; আবার বদ্‌লে দিলাম। তাতেও তাঁরা খুসী হ'লেন না। আমার মেয়েটাকে আট্‌কে রেখে কষ্ট দিতে লাগলেন। সে কেঁদে-কেঁদে চিঠি লিখ্‌তো। তাতে আমি বড় টলিনি; কিন্তু তার মা অস্থির হ'য়ে উঠলেন। তার পর ইদানীং আর বড় চিঠিপত্রও দিত না; দিলেও লিখ্‌তো, আমার অসুখ করেছে, আমি মরে যাবো—এই সব। আমি অনেক ক'রে লিখ্‌লাম যে, হুকুম পেলেই আমি মেয়েটাকে আনি। কিন্তু আমার চিঠির একটা উত্তরও তাঁরা দিলেন না। শেষে, তাঁদের এক প্রতিবাসীর মুখে শুনলাম, মেয়ের আমার সত্যিই ব্যায়রাম। আহা, মা আমার সত্যিই ভুগছিল। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি; ভাবতাম, বুঝি আস্‌বার জন্যই লেখে।" শ্যামাচরণ বলিলেন, "আপনার জামাই কি দেখতেন না?" "নাঃ! সে কি ক'রবে? সে কলেজের ছেলে; তার পড়াশুনোর সময়।" "পড়াশুনো ক'রতে হ'লে কি মনুষ্যত্ব ঘুচিয়ে দিতে হয় না কি?" ট্রেণ একটা ছোট ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। মন্মথ ও সুধীর অন্য কোনও একটা ইণ্টার ক্লাশের সন্ধানে নামিয়া গেল। কোনও ষ্টেসনেই কেহ নামে নাই; সর্ব্বত্র তেমনি ঠাসা। একটি কামরায় অসংখ্য প্যাসেঞ্জারদের মধ্য হইতে তাহাদের সতীর্থ বন্ধু সত্যেনের মাথাও দেখা গেল; কিন্তু সময় অভাবে কথা হইল না; তাহারা যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। সেই ভদ্রলোকটি তখনো তাঁর দুঃখের কথাই গাহিতেছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু কহিলেন "তারপর?" "তার পর আর কি,—সে বাড়ীতে পা দিয়েই শুনলাম, আমার সধবা ভাগ্যবতী মেয়ে সতীলোকে চলে গিয়েছে। জানেন মশায়, তার মা আমার পথ চেয়ে বসে

আছে। তা ছি ছে, বাড়ী গিয়ে কি বল্‌বো—" ভদ্রলোকটি হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

(৩)

দুই ধারে শঠির নিবিড় বন। ভরা ভাদ্রের জল-ভরা খাল-বিলে কুমুদ কহ্লারের গালিচা পাতা। শঠির বিচিত্র বর্ণের ফুলের ছড় বাতাসে দুলিয়া জল-বর্ষণ করিতেছিল। বিছুটির বড়-বড় সর্পাকৃতি পাতাগুলা প্রায় ট্রেণের গায়ে আসিয়া লাগিতেছিল। এক-এক স্থানে বন ঘুচিয়া গিয়া আউশ-ধান-কাটা ক্ষেত আসিয়া পড়িতেছিল। শোকাতুর ভদ্রলোকটি রুমাল হাতে করিয়া দুয়ারের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রোতারা শ্বাস ফেলিয়া সকলেই একবাক্যে বলিলেন "আহা!" ক্রমশঃ প্রসঙ্গান্তর আসিয়া পড়িল। শ্যামাচরণ বাবু রংপুরের ভদ্রলোকটির সঙ্গে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগিলেন। সুধীর চুপি-চুপি কহিল, "ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কিনে, সেকেণ্ড ক্লাসে বসা, কেমন হচ্ছে রে?" মন্মথ কহিল, "বসা আর কই রে,—দাঁড়িয়েই ত আছি।" সুধীর বলিল, "তা বটে। কিন্তু এবারকার ষ্টেসনটা একটু বড়—সেখানে চেকার আসতে পারে।" মন্মথ বলিল, "তা কি ক'রবো। আসুক না চেকার,—ইণ্টার ক্লাসে ঠাঁই নেই ত কি ক'রবো?" ট্রেণের গতি মন্থর হইয়া আসিল। সুধীর ও মন্মথ মাথা বাহির করিয়া দেখিল, ষ্টেসন নিকটে। গাড়ী থামিতেই তাহারা নামিয়া গিয়া সত্যেনের ঘাড়ের উপর ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়াইল। সুধীর বলিল, "তবু সুখ চেয়ে স্বস্তি ভালো।" সত্যেন হাসিয়া বলিল, "চমৎকার! স্বস্তি দেখ্‌ছো না? রাত্রের মধ্যে কেউ নামবে না জেনে রাখো আগে।" মন্মথ বলিল, "তাই ত! বেশ ছিলাম ওখানে। এই রাস্কেলটাই ত একরকম টেনে আন্‌লে।" সুধীর বলিল, "বেশ ছিলে? তবে চল হে, আবার সেইখানেই চল। সত্যেন চল হে, তোমাকেও বেশ থাকতে নিয়ে যাই।" সত্যেন জিব কাটিল, "বাপ্‌রে, ওখানে কি আমি ঢুকতে পারি?" "মন্মথ বলিল, "কেন? ওখানে এমন কি?" সত্যেন বলিল, "তা নয়,—ওখানে শ্বশুর মশায়ের গলা শুন্‌ছিলাম। সেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ।" "কোন্‌টি? কোন্‌টি তোমার শ্বশুর? যার আবক্ষ—" "আরে দূর,—না,—না,—তিনি নন্‌। আচ্ছা, নামলে দেখিয়ে দেব'খন।" মন্মথ বলিল, "তুমি কি সেই অসার খলু সংসারের সারং শ্রীমন্দিরের যাত্রী না কি হে?" সত্যেন বিকৃত মুখে বলিল, "না। আমি মামার বাড়ী যাচ্ছি। আমি যে এই ট্রেণে আছি, উনি তা জানেনও না।"

(৪)

হু-হু করিয়া ট্রেণ চলিতেছিল; পরস্পর কথাবার্ত্তাও সব সময়ে শোনা যাইতেছিল না। অকস্মাৎ একটা উচ্চ কোলাহলের, একটা আর্ত্তনাদের সঙ্গে-সঙ্গে একটা জলা-ভূমির মাঝেই সেই দ্রুত-ধাবমান ট্রেণ থামিয়া পড়িল। কন্যা-শোকাতুর ভদ্রলোকটি মূর্চ্ছিতাবস্থায় গাড়ীর কপাট খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ কপাটটা ভাল করিয়া আটকানো ছিল না; তাহাতে সে বিপুল দেহের ভার সহ্য করিতে পারে নাই। সেখানে গাড়ীর আরোহী জমিয়া ভীড় হইয়া উঠিল। রক্তাক্ত দেহখানা টানিয়া তোলা হইল। একটা বড় পাথরে মাথা ঠুকিয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সুধীর, মন্মথ, সত্যেন কেহই সেই ভীড় ঠেলিয়া প্রথমে কিছু দেখিতে পায় নাই। এক-জন ভদ্রলোক বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবুর যে এমন হবে, এমন ক'রে যাবেন, তা কেউ ভাবিনি।" মহেন্দ্রবাবু! সত্যেন্দ্র সাগ্রহে বলিল, "মহেন্দ্রবাবু কোথায়?" লোকটি সবিস্ময়ে বলিল, "এই যে! তুমি না তাঁর জামাই! তোমারই শ্বশুর মহেন্দ্রবাবু! এস, এস একবার এদিকে।" সুধীর ও মন্মথ সত্যেনের সঙ্গে ভীড় ঠেলিয়া গিয়া দেখিল, সন্তপ্ত পিতার বুক তখন জুড়াইয়া শীতল হইয়া গিয়াছে। মৃতদেহ ধরাধরি করিয়া টানিয়া তুলিবার সময় সত্যেনকেও একটু ধরিতে হইল। তাহাতে তার হাতের অঙ্গুরীটী হাত হইতে খসিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি এই শ্বশুরেরই দেওয়া মূল্যবান্‌ হীরার আংটীটা কুড়াইয়া পুনরায় হাতে পরিল।

মানুষ-গড়ার কথা

[শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্‌-এম্‌-এস্‌]

য়ুরোপে গত চার বৎসর ধরিয়া যে মহাকুরুক্ষেত্র অভিনীত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সশরীরে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বর্ত্তমান না থাকিলেও, অশরীরি বেদব্যাস সহস্রমুখে সেই কুরুক্ষেত্র-ব্যাপারের শিক্ষা লোক-সমাজে বিবৃত করিতেছেন। আমাদের দিব্যকর্ণ নাই, তাই সকল সময়ে আমরা সেই শিক্ষার বাণী শুনিতে পাইতেছি না। কিন্তু আজ না শুনিলেও, একদিন না একদিন, সে সকল কথা আমাদিগকে শুনিতেই হইবে।

শ্রবণযোগ্য যাবতীয় কথার মধ্যে, মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে কথাটি অন্যতম। হস্তপদাদিযুক্ত নরাকার জীবের কথা বলিতেছি না; যে-যে গুণ থাকিলে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে, এবং যাহার অভাবে ক্লীবত্ব আসে, সেই কথাই বলিতেছি। পৃথিবীতে কে কোথায় "মানুষ" আছে, এখন সেই সন্ধানেরই সাড়া পড়িয়াছে—মানুষ ও অমানুষে বাছাবাছির ধূম লাগিয়াছে। য়ুরোপীয় অতিকুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণ-ভূমি হইতে, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "মানুষ চাই" —এই একই শব্দ নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। আমরা নানারূপ ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া, সে ডাক শুনিতে পাইতেছি না। কিন্তু, সে ডাক শুনিতে পাই আর নাই পাই, অথবা, সে ডাক শুনিয়াও নিজের ক্ষুদ্রত্বের দীনতায় বিহ্বল হইয়া সে ডাক উপেক্ষা করিলেও,—একদিন না একদিন, বাধ্য হইয়া, সে ডাক শুনিতেই হইবে। তবে কেন সময় থাকিতে, আজ হইতে সে ডাকে কর্ণপাত করি না?

মানুষ কে,—মনুষ্যত্ব কি? দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে, মানুষ ও মনুষ্যত্ব বিভিন্ন-রকমের হয়। তবে নিঃসঙ্কোচে এ কথা বলা যায় যে, দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে, সেই-ই মানুষ, যে সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কথাটি বলা হইল বড়ই ছোট্ট করিয়া,—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে হইলে, স্বয়ং বেদব্যাস ও মহাভারত ব্যতীত বুঝান অসম্ভব। অতএব, সে ভার লইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিব না। দুঃখের বিষয়, মহাভারত রহিয়াছে, কিন্তু সত্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা, ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই!

এখন, সমগ্র জগত ছাড়িয়া দিয়া, এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক-ভাব ত্যাগ করিয়া, আমরা যদি আমাদিগের নিজেদের উপরে দৃষ্টিপাত করি, তবে মনুষ্যত্বের কি পরিচয় পাই, একবার তাহাই দেখা যাউক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, বিবেকানন্দ প্রভৃতি "একমেবাদ্বিতীয়ম্‌" মহাপুরুষদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে, বাঙ্গালাদেশে ঘরে-ঘরে মানুষ কই? সত্যের খাতিরে বলিতে হয়—অভাব শুধু বাঙ্গালায় নহে, অভাব অনেক দেশেই,—তবে বাঙ্গালাদেশে অত্যন্তাভাব। কাযেই, ইহার কারণ ও প্রতীকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

দেহ ও মন পরস্পরের উন্নতি পরস্পর-সাপেক্ষ। মানুষ সুস্থ ও সবল থাকিলে, মনের উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর; মন সর্ব্বদা বিষণ্ণ ও মলিন থাকিলে, দেহযন্ত্র কখনও সুপরিচালিত হইতে পারে না। এই কারণে, মনুষ্যত্বের বিকাশের অন্যতম সহায়, দেহ। কিন্তু আমাদের অধ্যাত্ম-বহুলদেশে আজকাল দেহটাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাই জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচায়ক। বর্ত্তমান-কালে, আমাদের দেশের রমণীরা লিখন-পঠন-কুশলা হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ঘোরতর অজ্ঞান,—(মা লক্ষ্মীরা সন্তানের মূঢ়তা মার্জ্জনা করিবেন)। কিন্তু রমণীদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এদেশের পুরুষেরাও যেমন অজ্ঞান, তেমনই কুসংস্কারাপন্ন। উভয়ের অজ্ঞতারই দৃষ্টান্ত দিব। এদেশে ছেলে জন্মাইলেই পিতামাতাকে রাজত্ব পদ দেয়, কন্যা জন্মাইলে পিতামাতাকে নরকগামী করে। এদেশে জন্মাইলেই; কি ছেলে, কি মেয়ে, সকলকেই বিবাহ করিতে হয়। এদেশে ছেলেদের সকলকেই হাইকোর্টের জজীয়তির জন্য আদা-জল খাইয়া লাগিয়া যাইতে হয়। এদেশের রমণীরা দুনিয়ার সকল বিদ্যায় পারদর্শিনী হয়েন, কেবল জানেন না নিজ দেহতত্ত্ব, জানেন না মাতৃতত্ত্ব, জানেন না

সন্তানতত্ত্ব এদেশের পুরুষেরাও ঠিক্ ঐ বিষয়ে অজ্ঞ। অথচ, শুচিতত্ত্ব, "সকড়ী"তত্ত্ব, ব্যারামের নিদান ও চিকিৎসা, প্রেততত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে কত না কুসংস্কার আছে।

যাহা হউক, পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা সাধারণভাবে অজ্ঞ হইলেও, এদেশে যাঁহারা শিক্ষকের ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্ব-স্ব কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহারা আরো অজ্ঞ। তজ্জন্য, কিন্তু, শিক্ষকগণকে দোষ দেওয়া যায় না; যে হেতু, সমাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বলদেহ ও দুর্ব্বলচিত্ত, সকল কর্ম্মে অপটু লোককে, অতি সামান্য বেতনে, আমরা আজ শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করি। একবার একটা গল্প পড়িয়াছিলাম, তাহা এই;—কোনও এক দম্পতি বেশ সুখে থাকিতেন; তাঁহারা নিতান্ত সেকেলে ধরণের। যাহাই হউক, চল্লিশ বৎসর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিয়া, একদিন স্ত্রী হঠাৎ বলিয়া বসিলেন—"হে স্বামিন্, আপনি নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া আজ এই ৪০টা বৎসর কাটাইলেন; আপনার বেশী খরচ করাইব না, আপনি শুধু মাথার পাগড়ীটা পরিবর্ত্তন করুন।" স্ত্রীর এই সঙ্গত আবেদন বা আব্দার রক্ষা করিবার জন্য, স্বামী একটি নূতন শিরস্ত্রাণ ক্রয় করিলেন। কিন্তু, সে শিরস্ত্রাণ এত বড়, যে তাহা লইয়া আর শকটে প্রবেশ করা যায় না। কাযেই, শিরস্ত্রাণের স্বচ্ছন্দ-প্রবেশোপযোগী শকট প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। সে শকট পুরাতন অশ্বশালায় সঙ্কুলান না হওয়ায় নূতন অশ্বশালা প্রস্তুত করিতে হইল; এবং অশ্বশালা বৃহৎ হওয়ায়, সমগ্র বাটীটিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইল। আমাদের কাযটাও অনেকটা এই ধরণের। প্রাচীন হিন্দুরা যে পথে চলিতেন, সেইটাই প্রকৃষ্ট পথ ছিল; তখন শিক্ষার ও শিক্ষকের মর্য্যাদা যথেষ্ট ছিল, বেতনের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, না বলাই ভাল এবং এই শিক্ষককুলের আজ্ঞায় স্বয়ং সম্রাট্‌কেও চলিতে হইত। এখন ঠিক উল্টা হইয়াছে,—এক্ষণে শিক্ষকেরা বেতনভুক্ ও সিংহাসন-চ্যুত হওয়ায়, সমাজের সকল স্তরেই ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছে। তাই আজ দেশে প্রকৃত শিক্ষকের অভাব। প্রকৃত ত্যাগী সন্ন্যাসী শিক্ষক কয়জন? আজ এ দুর্ভাগ্য দেশে শিখাইতে চাহে সকলেই, শিখিতে কেহ চাহে না। আমিও শিক্ষকের স্পর্দ্ধা করিতেছি! তাই ঘরে-ঘরে এত অজ্ঞতা, তাই এত মানুষের অভাব। যে দেশে শিক্ষা বিড়ম্বিত, সুশিক্ষকের দারুণ অভাব, সে দেশের জন্য ভগবান্ কৃপাকণাও রাখেন নাই। যে হিন্দুস্থানে জন্মগুরু, শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু একাসন প্রাপ্ত হইতেন, সেই দেশের পক্ষে এ অভাব কি ভয়াবহ!

ফল কথা, বর্ত্তমানকালে, আমাদের দেশে, যত রকমের অভাব আছে, তন্মধ্যে শিক্ষকের, কাযেই শিক্ষার অভাবটাই খুব বেশী ও বড় অভাব। দু'দশজন এম্-এ পাশ করিতেছেন, বহুসহস্র যুবক এণ্ট্রান্স, আই-এ, বি-এ, প্রভৃতি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতেছেন; অনেক রমণী উপাধি-ভূষিতা হইতেছেন; বি-টি, এল্-টি প্রভৃতি উপাধি উপসর্গরূপে অনেক শিক্ষককে আশ্রয় করিতেছে; প্রাথমিক শিক্ষারও বিস্তৃতি শনৈঃ-শনৈঃ হইতেছে ও হইবে;—কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা কোথায়? "মেসের" বাসা উঠিয়া গিয়া, বিদ্যুতালোক-উদ্ভাসিত প্রাসাদশ্রেণী রাজবর্ম্মের উভয় পার্শ্বে মস্তক উত্তোলন করিতেছে; কলেজে-কলেজে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলি নিত্যই নূতন যন্ত্রাদি মণ্ডিত হইতেছে; বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা নিত্যই বৃদ্ধি পাইতেছে; সংবাদপত্র, মাসিক-পত্র, বই-কেতাবও রাশি-রাশি দেখা দিতেছে। কিন্তু শিক্ষার বাড়ী কোথায়? আমাদের সামাজিক বন্ধন শিথিল, গৃহে উচ্চাদর্শের অভাব, শিক্ষামন্দিরে বণিগ্‌বৃত্তি সুপ্রকট, কর্ম্মস্থলে হীন-স্বার্থপরতার পূতিগন্ধ এবং যথাতথা বৈষম্য ও স্বপ্রবৃত্তির বিকট লীলা,—শিক্ষা হইবে কোথা হইতে? আহার যদি শরীরের উপযোগী না হইয়া, শরীরকে আহারোপযোগী হইতে হয়, তাহা হইলে যে অঘটনকে ঘটান হয়, বর্ত্তমানকালের শিক্ষাপ্রণালী সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পথে চলিয়াছে। যে দুর্ভাগ্য দেশে, গৃহে শিক্ষার উপযুক্ত আদর্শ নাই, সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব-নৃত্য, শিক্ষামন্দিরে হীন কুক্কুর-নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়, সে দেশে প্রকৃত শিক্ষার স্থান কোথায়? কাযেই মানুষ সে দেশে জন্মাইবে কি করিয়া?

এমন অবস্থায়, মানুষ ও মনুষ্যত্ব যে বাঙ্গালায় অতি দুষ্প্রাপ্য হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? মানুষের অভাব হইয়াছে, এই কথা কি সকলে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন? অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে দিন এ কথা আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করিতে শিখিব,

দেই দিলেই ইহার প্রতিকারের সম্ভাবনা। মুখে বক্তৃতার চোটে "মানুষের" সাধারণ প্রাপ্য দাবী করিতে কখনো আমরা পশ্চাৎপদ হই না; কিন্তু, কর্ত্তারা একটু রক্ত-চক্ষুঃ হইলেই, আমরা তাড়াতাড়ি স্ত্রীর অঞ্চলের আড়ালে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকি। মনুষ্যত্ব লাভের ইহা প্রকৃষ্ট পথ নয়। সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, পরের জন্যে, নিজের সর্ব্বস্ব পণ করিতে যে শিখিবে, সেই মানুষ হইবে। স্বার্থের জন্যে, স্বার্থের নামে সুধু নিজ দেশের জন্য যে আত্মাভিমান পুষ্ট করিতে ব্যস্ত থাকিবে, সে ভাবী মহাকুরুক্ষেত্রের আয়োজন করিয়া যাইবে। ইহাই এই মহাযুদ্ধের শিক্ষা। কলিকালের যে হীনমতি দ্রোণ সুধু নিজের পুত্রের দুগ্ধপানের ব্যবস্থায় অস্থির হইয়া বেড়াইবে, সেই ভাবী মহাকুরুক্ষেত্রের সূচনা করিয়া যাইবে; যে ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্রের প্রতি মমতাবশতঃ মোহান্ধ হইয়া ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিবে, সেই তাঁহার ভাবী বংশধরের বংশলোপের ব্যবস্থা করিয়া যাইবে। বড় কথা ছাড়িয়া, খুব ছোট একটা কথা বলি,—কথাটা সামান্য হইলেও, বর্ত্তমান বাঙ্গালার সমাজে ইহা অনন্যসাধারণ এবং সর্ব্বকালের পক্ষে অতি মহৎ কথা। পুণ্যশ্লোক ধনকুবের তারকচন্দ্র পরামাণিক মহাশয় প্রত্যহ প্রাতে পদব্রজে গঙ্গাস্নানে যাইতেন, এবং যাইবার কালীন প্রায়ই মহাপ্রাণ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিত। একদা শীতকালে সূতির চাদর গায়ে, শীতার্ত্ত অবস্থায়, পরামাণিক মহাশয়কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া, সিংহ মহোদয় বলিলেন, "পরামাণিক মহাশয়, একখানা বনাত গায়ে দিলে ত পারেন?" তদুত্তরে পরামাণিক মহাশয় "আজ্ঞা হাঁ, দিব বৈ কি" বলিয়া চলিয়া যান। পরদিন প্রাতে, সিংহ মহোদয় পথে, ঘাটে, সর্ব্বত্র শত শত গরীব-দেহে উৎকৃষ্ট বনাতের কাপড় দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ গো, আজ ব্যাপার কি?" তদুত্তরে সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"আজ পরামাণিক মহাশয় বনাত গায়ে দিয়াছেন, তাই আমাদিগকেও একখানা করিয়া দিয়াছেন"—অর্থাৎ, নিজে কোনও সুখভোগের সামগ্রী ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে, দেবতা ও দরিদ্রনারায়ণকে ও প্রতিবেশীকে তাহা তুল্যাংশে দিয়া, তবে, নিজে ভোগ করিতে হয়। আজ ইয়ুরোপের অতিকুরুক্ষেত্র এই-ই শিক্ষা দিতেছে—আজ ক্ষুদ্র "আমাকে" মহা মানবত্বে ডুবাইয়া দাও,—এই কথাই অশরীরি বেদব্যাস বলিতেছেন। আমার নিজের, আমার জাতির, আমার দেশের বলিয়া চেঁচাইও না। আজ মানুষকে মানুষ করিতে, মানুষ হইতে, ও মানুষের মত চলিতে দাও—পৃথিবী সুখের স্থান হইবে। নতুবা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আজ বাঙ্গালী কি ঐ কথা শুনিতে পাইয়াছে? দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ব্যাধির প্রকোপ, রাজদণ্ড,—এ সকল মহা অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ঐ একই শিক্ষা জ্বলন্ত অক্ষরে বাঙ্গালার বক্ষে মহাকুরুক্ষেত্রের শিক্ষাকাহিনী লিখিয়া দিতেছে—"বাঙ্গালি, স্বাবলম্বনে মানুষ হও, নতুবা নিশ্চিহ্ন হইয়া ধরাতল হইতে মুছিয়া যাও।"

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে, আমরা সর্ব্বপ্রথমে বৈদিক যুগের কথাই পাই। তৎকালে "জাতি"-বিভাগ ছিল না, কিন্তু "চতুর্ব্বর্ণের" বিভাগ ছিল; বিজেতা-বিজিত সংমিশ্রণের অবশ্যম্ভাবী ফলে, "বর্ণ"-বৈষম্য সৃষ্ট হইয়াছিল; মানবেতিহাসের আদিম যুগে সমাজ-বন্ধনের প্রথম চেষ্টার ফল স্বরূপ বর্ণ-বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই চতুর্ব্বর্ণ লইয়া, হিন্দু-রাজগণ সমস্ত ভারতবর্ষেই ক্রমশঃ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেন; ক্রমে হিন্দুরা ব্যবসায়-বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতবর্ষের গণ্ডী ছাড়াইয়া, সমুদ্র পার হইয়া, দেশ-বিদেশ যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শনৈঃ শনৈঃ কর্ম্ম-বিভাগানুসারে "জাতি"-বিভাগের সূত্রপাত হইতে লাগিল। পরে যতই নানা জাতীয় প্রবল লোকের সঙ্গে হিন্দুদিগের সংঘর্ষ হইতে লাগিল, ততই হিন্দুর নৈতিক শৈথিল্য, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, ধর্ম্মে অনাস্থা প্রভৃতি দেখা দিতে লাগিল;—কাযেই হিন্দু-ধর্ম্মের উপর পরগাছা-স্বরূপ "লোক-ধর্ম্ম" "লোকাচার" প্রভৃতি গজাইয়া উঠিতে লাগিল—হিন্দুরা জাতি হিসাবে হীনবল, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিলেন;—সংক্ষেপে ইহাই হিন্দুজাতির ইতিহাস। এই ইতিহাসের মধ্যে, বৈদিক যুগে, মনুষ্যত্বের আদর্শ ছিল—শিক্ষিত ব্রাহ্মণ হওয়া। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম উপবীতে পর্য্যবসিত ছিল না;—ত্যাগে, জ্ঞানে, মহিমায় ও সাত্ত্বিক-জীবনে উহার সার্থকতা ছিল। তৎকালে যথা-যোগ্যরূপে বৈদিক বিদ্যায় ও অনুষ্ঠানে সমর্থ হওয়াই অর্থাৎ দেবলোকের সঙ্গে যোগাযোগ সংঘটিত হওয়া মনুষ্যত্বের

আদর্শ ছিল। বালকেরা অল্প বয়সে গুরুগৃহে প্রবেশ করিতেন এবং ব্রহ্ম-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া গৃহী হইতেন। অল্প বয়স হইতে, পিতামাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অন্ধ মমত্ববোধ হইতে দূরে থাকিয়া, গুরু-গৃহে অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইবার সময়ে, সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম্মে তাঁহারা পটু হইবার অবকাশ পাইতেন; এবং দৈহিক বল ও কার্য্যকুশলতা, সাংসারিক অভিজ্ঞতা, ও পরমার্থ-জ্ঞান এবং নৈতিক বল সঞ্চয়ের সঙ্গে-সঙ্গে, আদর্শ-পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁহারাও প্রত্যেকে আদর্শ-পুরুষ হইতে পারিতেন;—কাযেই সমাজে তাঁহাদের চরিত্রবল এক অসাধারণ জিনিষ হইয়া দাঁড়াইত। তাৎকালিক সমাজ, এই সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের ভরণপোষণের ভার লইতেন, এবং সত্যের সন্ধানদাতা ব্রাহ্মণেরাও নিস্পৃহ হইয়া, সমাজে মানুষের মত বিচরণ করিতেন। এই শিক্ষা-প্রণালীর ফলে, মানব-সমাজে দেব-চরিত্র সুলভ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সন্দেহ আছে শুধু এক বিষয়ে—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল, তাহা জানি না; সম্ভবতঃ ভালই ছিল, কারণ, আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি ঐ যুগের পরে। এতদ্ব্যতীত, তখন যুদ্ধবিগ্রহাদি তাদৃশ নিত্য-ঘটনা ছিল না, থাকিলেও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; এই জন্য, ব্রাহ্মণ ছাত্রদিগের দৈহিক উন্নতি সংঘটিত হইত কি না, জানি না। যৎকালে স্বর্গীয় অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক বিষয়ক বক্তৃতা করিতেছিলেন, তৎকালে আমি তাঁহাকে একটি বড় রকমের তৈল-চিত্র অঙ্কন করাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। ঐ চিত্রে বৈদিক যুগের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের প্রকৃত আকৃতি, বেশ-ভূষা, অঙ্গরাগ, দৈহিক বর্ণ, দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রভৃতি যথাযথ দিয়া বৈদিক যজ্ঞের একটি প্রতিকৃতি দিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক অমায়িকতা-সহকারে নিজের ঐ-ঐ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের অভাব দর্শাইয়া, আমাকে নিরস্ত করেন। যদি কোন মহোদয় এই সম্বন্ধে তথ্য প্রচার করেন, তবে বৈদিক যুগের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আমরা জানিতে পারি।

বৈদিক যুগের পরে, হিন্দু-সমাজে অন্য যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হউক না কেন, শিক্ষা বিষয়ে বাহ্যিক পরিবর্ত্তন তাদৃশ ঘটে নাই;—অর্থাৎ, এখনো হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা অধ্যাপক-বৃত্তি করেন, ছাত্রেরা অবৈতনিক-ভাবে গুরু-গৃহে সকল কায-কর্ম্ম করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করে—কিন্তু—সে আদর্শ শিক্ষক নাই, সে নিস্পৃহতা নাই, সে বিদ্যোন্মাদ নাই;—আছে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়তঃ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা, আছে তুচ্ছ নিরর্থক আচার-বিভ্রাট; আছে ফাঁকি-বাজী ও চালবাজী। কাযেই বলিতে হয় যে, এখন হিন্দুর বিদ্যার মন্দির আছে, দেবতার বেদী আছে, কিন্তু বিগ্রহ নাই। এককালে, এই দেবতাই জাগ্রত ছিলেন, এই দেবতাই সত্যের রুদ্রমূর্ত্তি পূজা করিতেন এবং তিনিই নিজ হাতে সমাজের জন্য মানুষ গড়িতেন। সেই ঠাকুর যে দিন হইতে কুকুর বিবেচিত হইতেছেন, সেই দিন হইতে শিক্ষক ও শিক্ষকতার লোপ হইয়াছে, দেশে মানুষের লোপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাই বলি—আবার চাই মানুষ, আবার চাই ত্যাগী, সন্ন্যাসী শিক্ষক।

কিন্তু, এখন মনুষত্বের আদর্শ ভিন্ন রূপ হইয়াছে, সমাজের রীতি-নীতি বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে। এখন অর্থোপার্জ্জন করাই মনুষ্যত্বের প্রধান পরিচায়ক। এখন নিজের ও নিজের দেশের স্বার্থ দেখাই মনুষ্যত্ব। এখন অর্থ-শাসিত সমাজ; এখন অর্থেরই মূল্যের অনুপাতে সকল জিনিষের পরিমাপ হইয়া থাকে। এ জগতে ও এই বর্ত্তমান সমাজে, নিস্পৃহতা দুর্লভ, "গো ব্রাহ্মণায় জগদ্ধিতায় চ গোবিন্দায় নমো নমো" বলিয়া মানব-জাতির কল্যাণ-কামনা করা সুদুর্লভ। তাই আজ দেশ-কাল-পাত্র-কথা স্মরণ করিয়া, সমস্ত মানব জাতির কল্যাণ-কথা উপেক্ষা করিয়া, শুধু বর্ত্তমান সমাজ ও বর্ত্তমান জগতের মুখ তাকাইয়া মানুষ গড়িবার কথার আলোচনা করিব।

মানুষ মনুষ্যত্বের বীজ লইয়া জন্মায়; এবং সমাজ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার ফলে, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ মানুষকে মানুষ করিয়া লইতে হয়। মনুষ্যত্ব জন্মগত ধর্ম্ম; শিক্ষা সমাজের কর্ম্ম। তবে ক্রমিক পারিপার্শ্বিক উন্নতির ফলে, মনুষ্যত্বের বিকাশের অনুপাত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সমাজ উন্নত হইলে মানুষও বেশী-বেশী জন্মায়। দেশে মানুষ পাইতে হইলে, মানুষ গড়িয়া লইতে হয়। মানুষ গড়িতে হইলে, ছেলে বয়স হইতেই তদুদ্দেশ্যে যত্ন করিতে হয়। ভাল ছেলে পাইতে হইতে, ছেলের

পিতামাতার স্বাস্থ্যের উপরে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই কথাগুলি যথার্থ-রূপে সকলকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। সেই সঙ্গে আরো একটি কথা সকলকে মনে রাখিতে হইবে—এ কায একলার, ব্যক্তি-বিশেষের, দল বা গোষ্ঠিবিশেষের নহে, এ কায সমগ্র দেশের, সমগ্র মানবজাতির। জাতিগত, বর্ণগত, ধর্ম্মগত, ভাষাগত বা অপর সকল রকমের বৈষম্য ভুলিয়া, সমগ্র মানবজাতিকে এক ভাবিয়া, এই কায করিতে হইবে। এই কাযে রাজায়-প্রজায়, ধনি-নির্ধনে, সাহেবে-বাঙ্গালীতে, হিন্দু-মুসলমানে, এমন কি স্ত্রী-পুরুষে একত্র প্রাণপাত করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তবে কায হইবে। পিতামাতার পক্ষে নিজ নিজ পুত্রকন্যাকে শুধু নন্দের দুলাল ভাবিলে চলিবে না,—তাহাদিগকে বংশধর ভাবিয়া, বংশের ভাবী হিতচিন্তা করিয়া, মানবসমাজের কল্যাণকামনা করিয়া মানুষ করিতে হইবে। সমাজের পক্ষে, দেশের পক্ষে ও রাজ-পক্ষ হইতে, প্রত্যেক পুত্রকন্যাকে দেশের ভাবী কর্ম্মঠ, বলিষ্ঠ, সুস্থ প্রজা করিবার উৎকট বাসনা বর্ত্তমান থাকা চাই। রাজদ্রোহ দমন করিবার জন্য কত অর্থ ব্যয়, কত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে, তবুও এ দেশ হইতে রাজদ্রোহ নির্ব্বাসিত হইল না। ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বসন্ত, ওলাউঠা, সর্পদংশন, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধিতে কত প্রাণ, কত ধন, কত চেষ্টা ব্যয় হইল; কোথায় কে দেশ ত্যাগ করিল? খঞ্জ, অন্ধ, বধির, মূক, পীড়িত, রুগ্ন কত ব্যক্তি কায করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া দেশের ধন বৃদ্ধি করিতে পারিত, তাহা না হইয়া তাহারা সংসার-বিশেষের বা সমাজের গলগ্রহ হইয়া রহিল। জেলায়-জেলায় কত জেলে, কত কয়েদী দেশের অন্নধ্বংস করিতেছে; হিসাব-মত, এ সবগুলিই বাজে খরচ—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্বামীর শিরস্ত্রাণ পরিবর্ত্তনের ফলে গৃহকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে যেমন উল্টা পথে চলা হইল, সমাজে ও দেশে এই সকল জাতীয় লোকের উপস্থিতিও তজ্জাতীয় উল্টা ব্যবস্থার ফল। সমাজ যদি পূর্ব্বাপর প্রত্যেক শিশুর হিতকল্পে মনোযোগী হন, তবে সমাজে পাপ, রোগ, দুঃখ, অঙ্গবৈকল্য, দৈন্য প্রভৃতি এক রকম থাকেই না। দেশে যত লোক মারা পড়ে, বা ব্যায়রামে জীবন্মৃত হইয়া থাকে বা অকাল-বার্দ্ধক্য লাভ করে, তাহারা যদি সুস্থ ও কর্ম্মঠ থাকিত, তবে তাহারা কত টাকা উপার্জ্জন করিয়া কত সংসার সুখে [illegible] থিত, এবং তাহারাই কত সহস্র পুত্রকন্যার জন্ম দিয়া দেশের লোকবল ও অর্থবল বৃদ্ধি করিতে পারিত। যে সকল লোক জেলে আটক আছে, তাহারা যদি বাল্যকাল হইতে যথাযোগ্য যত্ন ও শিক্ষা পাইত, আজ তাহারা দেশের ধন ও জনবল বৃদ্ধি করিতে পারিত। কিন্তু, সমাজের ঔদাসীন্যবশতঃ, দেশে রোগী, পাপী প্রভৃতির সংখ্যা দিন-দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে—এবং সেই সকল রোগী, পাপী ব্যক্তিকে কায-কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিয়া, বসিয়া খাওয়াইবার জন্য ও মোটা বেতনের বিলাতী কর্ম্মচারীদ্বারা তাহাদিগের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করাইবার জন্য, আমরাই টেক্স্ দিতেছি! একটি পাগড়ীর জন্য সমস্ত বাড়ীটাকেই বদলাইতেছি! মানবকে মানুষ মনে করিয়া গোড়া হইতে চলিলে এত বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত না। আমরা মানুষকে টাকার বলদ মনে করি, তাই এই দুর্দ্দশা!

অনেকে ভাবিবেন, আমি কথাগুলি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি। সে আরোপ সত্য কি মিথ্যা, তাহা আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন। অনেক সংসারে দেখিয়াছি, পিতা আপিস ও সাহেব লইয়াই ব্যস্ত, তাহার ঘর সংসার দেখিবার সাবকাশও নাই, প্রবৃত্তিও নাই; তিনি পুত্রের জন্য প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকেন। বাটীর গৃহিণী হয় ত প্রত্যেক ছেলের জন্য একটি করিয়া দাস বা দাসী নিযুক্ত করিয়া দিয়া, কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সদা সর্ব্বদাই মালা জপ করিয়া ইহ-জগতে পরমার্থ ও পর-জগতের জন্য পারের কড়ি কিনিয়া রাখিতেছেন। এই জাতীয় অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম—কিন্তু বাহুল্য ভয়ে দিলাম না। মোট কথা কিন্তু এই—ব্যক্তিগত-ভাবে পুত্রকন্যা মানুষ করা সম্বন্ধে দায়িত্ব, কর্ত্তব্য-বোধ ও কর্ম্মজ্ঞান খুব অল্প লোকেরই আছে। ব্যষ্টিতে যে ভাব দেখিতে পাই, কর্ণধারহীন, আদর্শশূন্য স্বার্থলিপ্সু, প্রতিযোগিতা-বহুল সমষ্টিতে (সমাজে) সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন, সেই উচ্ছৃঙ্খল, সেই অবিবেকিক অনুষ্ঠানই বর্ত্তমান আছে! এই উল্টা রীতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইতেই হইবে। তজ্জন্য সমাজ চাই, সার্থক অর্থ-ব্যয় চাই। প্রাণ চাই—তবে ত অনুভূতি আসিবে!

কি পথে, কোন্ ভাবে চলিতে হইবে, এইবার সেই

কথাগুলির আলোচনা করিব। স্থূলতঃ, সাতটী ভাগে বক্তব্য বিভাগ করা যায়। আমরা সেই কয়টি ভাগের নির্দ্দেশ নিম্নে করিলাম ;—

(১) পিতামাতার স্বাস্থ্যানুকূল বিধি নির্দ্দেশ করা।
(২) গৃহস্থালী ও মাতৃত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা।
(৩) গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কর্ত্তব্য।
(৪) আঁতুড়-ঘরের ব্যবস্থা।
(৫) প্রসবান্তে মাতার প্রতি কর্ত্তব্য।
(৬) শিশুর প্রতি কর্ত্তব্য।
(৭) বিদ্যার্থী শিশুর প্রতি কর্ত্তব্য।

পিতামাতার স্বাস্থ্যানুকূল বিধি কি কি, তাহা এক কথায় বলা যায় না। সে সম্বন্ধে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিলে, তবে সকল কথা বলা যায়। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া নাই, এমন স্থানই নাই। কাযেই, ম্যালেরিয়ার অল্প-বিস্তর অধিকাংশ পিতামাতাই ভুগিয়া থাকেন। ম্যালেরিয়ায় ভুগিলে, স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়, দেহের বৃদ্ধির হ্রাস হয়, রক্তাল্পতা, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। কাযেই আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কায—দেশ হইতে ম্যালেরিয়াকে তাড়ান। ফরমাইসটি সহজ, কাযটি অতি বিরাট। একযোগে দেশের লোকে ও রাষ্ট্রশক্তি কায করিলে, তবে যদি এই অসাধ্য-সাধন করা সম্ভবপর হয়।

ম্যালেরিয়ার পরে, বাঙ্গালাদেশের বড় ব্যারাম—পেটের রোগ, অম্ল, অজীর্ণ, আমাশয়, ওলাউঠা প্রভৃতি। সূতিকাও এই দলভুক্ত। এদেশে এত পেটের ব্যারাম কেন হয়, তাহার উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। দেশের লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া, কেহ পয়সার লোভে, কেহ ভোগ-লালসায়, সহরে দলে-দলে চলিয়া যাইতেছেন ; তাহার ফলে, গ্রামে একদিকে যেমন নূতন পুষ্করিণী খনন করা বন্ধ হইয়াছে, সেই সঙ্গে অপরদিকে এঁদো ডোবা, মজা পুষ্করিণীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে ; তাহার ফলে, সুপেয় জলের দারুণ অভাব ঘটিতেছে। রেল চলাচলের সুবিধার জন্য, বড়-বড় পুল, বাঁধ ও আলি বাঁধানর দরুণ গ্রামের জল-নিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে, নদীগুলি মজিয়া যাইতেছে। একদিকে এই রকমে সুপেয়ের অভাব, অন্যদিকে অশিক্ষিত লোক কর্ত্তৃক বর্ত্তমান পানীয় জলের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি অমনোযোগ। দ্বিতীয়তঃ—দেশে দারিদ্র্যের বৃদ্ধির জন্য, লোকের যথেষ্ট শারীরিক পুষ্টির অভাব ঘটিতেছে। উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি যেমন অতি-ভোজনের ফলে ঘটে, তেমনি নিত্য অপুষ্টির ফলেও ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালার চলিত ভাষায় ইহাকে "মরা-নাড়ী" কহে। তৃতীয়তঃ—চতুর্দ্দিকে রেলের বিস্তারের ফলে, ও সেই সঙ্গে সাধারণের কৃষিকার্য্যে অনাদরবশতঃ, টাট্‌কা ও যথেষ্ট পরিমাণে দুধ ও তরকারির অভাব ঘটিয়াছে। নিত্য বাসি ও নিরেশ খাদ্য ভোজন উদরের পীড়ার একটি কারণ। চতুর্থতঃ—ইংরাজদিগের শীতপ্রধান দেশের আচারগুলি এদেশে প্রবর্ত্তিত করার ফলে, লোকে অসময়ে তাড়াতাড়ি অসিদ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, তাহার উপরে সারাদিন গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়। অজীর্ণ তাহার একটি অবশ্যম্ভাবী ফল। বিদ্যালয়ের ছাত্র, চাকুরি-জীবী, উকীল, মোক্তার, রেল-ষ্টীমারযাত্রী, আদালতে বিচারপ্রার্থী,—কে না এই নাগপাশে বদ্ধ? গতিকেই বাঙ্গালাদেশ পেটের পীড়ার আগার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই দুইটি ব্যারাম ছাড়া, বাঙ্গালাদেশে আরো যে কত ব্যাধি আছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। বেরিবেরি, হাম, বসন্ত, প্লেগ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি যে-যে মহাপ্রভু এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দেশে আসিতেছেন, তিনিই এখানে রহিয়া যাইতেছেন! শুধু যে সমগ্র দেশের অস্বাস্থ্যতাই তাহার কারণ, তাহা নহে ; বাঙ্গালী আজ অন্তঃসারহীন,—তাহার কাটাম যেমন খর্ব্ব, চেহারাও তেমনি ক্যাংলা হইতেছে, তাহার ভিতরের সারেরও তেমনি অভাব হইতেছে। এই অন্তঃসারহীনতাই তাহার সংক্রামক রোগ-প্রবণতার প্রধান কারণ। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা শীত দেশের ব্যারাম এবং শীতদেশে সহজেই লোকে উহাতে জখম হইয়া পড়ে ; কিন্তু পৃথিবীব্যাপী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ হইয়াও এ ব্যারাম রহিয়া গেল শুধু ভারত-ভূমিতেই!

বাঙ্গালাদেশে, ইংরাজ আমলে, আমরা কতশত বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইলাম ; আমরা কত কূট শাস্ত্র আলোচনা করিতে অভ্যস্ত হইলাম ; আমরা সমগ্র পৃথিবীর ভাব-সম্পদের অধিকারী হইলাম—শিখিলাম না কেবল স্বাস্থ্যনীতি!!! কখনো কোথাও কোনও কর্ত্তার খোস-খেয়ালের বশে, নিম্ন প্রাইমারী অথবা মাইনর কোর্সের মধ্যে ঐ বিষয়ে এক-আধখানা পাঠ্য পড়ান হয় মাত্র, কিন্তু

এই বিরাট মনুষ্য-সংসারে এই বিংশ শতাব্দীতে স্বাস্থ্যশিক্ষার স্থান নাই! আমরা সকল বিষয়েই পণ্ডিত হইব, কিন্তু বিশ্ব-মহাপণ্ডিতেরা দেশের সকল লোককেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন,—অথচ আমরাই শিক্ষিত!

ফল কথা, বঙ্গের জনক-জননীর স্বাস্থ্য উন্নত করিতে যে আমূল পরিবর্ত্তন, যে অসম্ভব ব্যয়, যে অমানুষিক পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা একপ্রকার অসাধ্য। বাঙ্গালাদেশের আবহাওয়াকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিতে হইবে। রেলপথের মাঝে-মাঝে যথাযোগ্য জল-চলাচলের পথ করিতে হইবে। নদী, খাল, বিলের পঙ্কোদ্ধার করিতে হইবে। গ্রামবাসীদিগকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিতে হইবে;—তজ্জন্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, পথ-ঘাট, জল-সরবরাহ প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি করিতে হইবে।

বাল্য-বিবাহ, জাতিভেদ, মেলবন্ধন, অবরোধ-প্রথা, সাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব, এই কথাগুলি নিতান্ত সুলভ হইলেও, এতৎ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বড় কঠিন। তবে সংক্ষেপে এই বলিতে পারি—হিন্দু সমাজে, প্রতিপদেই সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; হিন্দুর দৈনিক জীবনের প্রতি কর্ম্মে ঐ ভাব পরিস্ফুট। হিন্দু-সমাজ মৃত; কাযেই আচার-বিড়ম্বিত হিন্দুয়ানির অপভ্রংশ মাত্র বর্ত্তমান। এই কারণে, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য এদেশ হইতে লোপ পাইয়াছে। আজকাল এমন যুবক নাই, অন্ততঃ সহরে, যাহাকে বাল-ব্রহ্মচারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। এমন অবস্থায় বাল্য-বিবাহের বিপক্ষে মত দিতে পারি না। এ সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এটর্ণী মহাশয়ের বক্তৃতা পাঠকগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বস্তুতঃ আমার নিজেরই সন্দেহ আছে যে, চিকিৎসকের দিক দিয়া, বাল্য-বিবাহ যে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ গর্হিত কর্ম্ম, এটা সহজ-প্রমাণ্য কি না? এই গেল বাল্য-বিবাহ-সম্বন্ধে। জাতি-ভেদ প্রথার বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনা যায়; কিন্তু কোন্ দেশ জাতিভেদ-প্রথা-শূন্য? জাতিভেদ পৃথিবীতে থাকিবেই। তবে যদি জাতিভেদের দোহাই দিয়া কোনও জাতিবিশেষকে পদদলিত, ঘৃণিত বা ক্ষুণ্ণ করা হয়, সে দোষ জাতিভেদের নহে, সে দোষ লোকবিশেষের বা সমাজবিশেষের। Trade guild হিসাবে জাতিভেদ-প্রথা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর; জাতিভেদ-প্রথার জোরে এতদিন হিন্দু জগতে বর্ত্তমান আছে; এবং জীবাণু ও তজ্জনিত রোগের নিদানের দিক হইতে দেখিলে, জাতিভেদ অবৈজ্ঞানিক প্রথা নহে বলিয়াই প্রতীতি হয়। আমি বরঞ্চ মেলবন্ধনের বিরোধী; কারণ, দেখা যায় যে, অনবরত একই গোষ্ঠির মধ্যে বিবাহ হইলে, সে গোষ্ঠির দৈহিক ও মানসিক পতন ঘটে। অবরোধ-প্রথা শুধু সহরেই দেখা যায়, পল্লীগ্রামে ইহার অস্তিত্ব নাই। কতকটা অভিমান, কতকটা আত্ম-বলের উপরে সন্দেহ-বশতঃই অবরোধ-প্রথা সহরে প্রচলিত। যাহা হউক, আমার ধারণা এই যে, উপর্য্যুক্ত সাতটি কারণবশতঃ এদেশের পুরুষ বা রমণীর অল্পবিস্তর ক্ষতি হইলেও উহারা তাদৃশ বিরুদ্ধ কারণ নহে। তবে এমন দিন আসিয়াছে, যখন কোনও দেশে এক জনেরও নিরক্ষর থাকা বাঞ্ছনীয় নহে, একটি রমণীরও অবলা থাকা উচিত নহে; যে কোনও "উচ্চ" জাতীয়ের সহিত যে কোনও "নীচ" জাতির মধ্যে ব্যবহারগত পার্থক্য থাকিলেও, সমাজে ও সাধারণ কাযে কর্ম্মে সমদৃষ্টি ও ভ্রাতৃভাব থাকা উচিত। এইরূপ হইলে, সমাজের সর্ব্বদিকে কল্যাণ হইবে, সমাজে রমণীরা ও পুরুষেরা স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ও যথাযোগ্য শক্তিশালী হইবেন।

এই সকল আদর্শ-নির্দ্দেশক কথা। কিন্তু সমাজে এখন হিংসা, দ্বেষ, অনাচার, অত্যাচার, অসংযমের বিষম প্রবাহ চলিয়াছে। সেই সকলের ফলে, নানা রকমের কুৎসিত ব্যাধি অনেককেই আক্রমণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে ভীতি-চকিত ভঙ্গীতে কথা বলা অভিপ্রেত নহে। আমরা সামান্য চাউল-ডাইল ক্রয়কালীন কত বিচার, কত পরীক্ষা করি; কিন্তু আজীবন বিবাহসূত্রে বন্ধন করিবার কালে, পাত্র-পাত্রীর অর্থের ও রূপ-লাবণ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বিবাহ দিই। তাহার ফলে, এক পুরুষ নহে, সাত পুরুষ ব্যারামে ভোগে। এই যে রক্তদোষ-ঘটিত ব্যারাম, ইহা অতি কুৎসিত ব্যাধি; এবং ইহা অসংযমের ফল। এই কারণেই সাধারণের মধ্যে ইহার উল্লেখও ভদ্রতা-বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু আমার মনে হয় যে, শ্লীলতার বাড়াবাড়ি করার ফলে, ঐ ব্যারামের সম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞতা আজ সমাজে বিদ্যমান। তাহার ফলে কত লোকে যে পাপের পিচ্ছিল পথে যাইয়া পড়িয়াছে, তাহা চিকিৎসককুলের অবিদিত নাই। এমন কি বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রেরা পর্য্যন্ত আজ ঐ পথের পথিক।

আমার মনে হয় যে, খোলাখুলি ভাবে এই ব্যারামের বিরুদ্ধে ...কল তাহার সকল পত্রেই অলোচনা হওয়া উচিত। তবে ...দি কায হয়। নতুবা, এ দেশে, বড়মানুষদের দূষিত দৃষ্টান্তের ...লে, বিষম অজ্ঞতার অন্তরালে, কত সহস্র যুবক যে নিজ ...দেহ ও বংশকে কলুষিত করিতেছে, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া ...উঠিতে হয়। ইংরাজদিগের অধীনে চাকুরি করিবার প্রথম ...আমলে, যখন রেল-ষ্টীমার হয় নাই, যখন আত্মীয়-স্বজনের ও ...মাজের লোচনের অন্তরালে লোকে বহু দূরদেশে একাকী ...থাকিত ও কাঁচা পয়সা রোজকার করিত ও পাশ্চাত্য ...বিলাসিতার চটকে মোহিত হইত, সেই সময়েই সমাজে ...এই রাক্ষসী প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহার পরে, নগদ ...মাহিয়ানা বরাদ্দ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এবং সামাজিক ...উচ্ছৃঙ্খলতার বৃদ্ধি প্রাপ্তির সঙ্গে, এই পাপ সমাজের সকল ...রেই অল্পবিস্তর প্রবেশ লাভ করিয়াছে; তাহার ফলে, ...র্ত্তমান কালে, কলিকাতার ভদ্রলোকদিগের মধ্যে শতকরা ...আন্দাজ চল্লিশ জনের দেহে ঐ বিষের লক্ষণ বর্ত্তমান। এ ...ড় সামান্য কথা নহে। আমরা যখন আমাদের কন্যাদের ...বাহ দিই, তখন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলি যে, ...আমি "শারীরিক সুস্থা" কন্যাকে সমর্পণ করিলাম। কত ...বাহস্থলে এই মিথ্যা কথা শুনিয়াছি। হয় ত পিতা-মাতা ...দোষ বা অজ্ঞ; রক্তদুষ্টি আরো দুই-এক পুরুষ পূর্ব্বে ...টিয়াছিল, তাঁহারা সে কথা জানেন না। আজ যে এত ...অবৎসা, কচি ছেলেদের লিভারের দোষ, মৃগী, উন্মাদ, ...ভৃতি দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ রক্তের দোষ। ...আজ যে এত কচি ছেলেরা থাঁদা নাক, উঁচু কপাল, সরু-...সরু হাত-পা লইয়া জন্মাইতেছে, তজ্জন্য তাহাদের পিতৃ-...পুরুষের কেহ দায়ী। সমাজের ভাবী বংশের দিকে ...চাহিয়া, এই পাপ স্রোত বন্ধ করিতেই হইবে। কোন্ ...কোন্ বংশে কাহার রক্তদোষ আছে, তাহা সঠিক নির্ণয় ...করিয়া তাহাদিগের রীতিমত চিকিৎসা করিয়া আরাম ...করিতে হইবে। সন্তানদিগের বিবাহকালে এই রক্তদুষ্টির ...এক বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তবে তাহাদিগের জন্য পাত্র-পাত্রী ...স্থির করিতে হইবে।

সমাজের ভাবী কল্যাণ কামনা করিয়া, পিতা-মাতার ...স্বাস্থ্যকে উন্নত করিতে হইলে—দেশ হইতে ম্যালেরিয়া ...তাড়াইতে হইবে, দেশে সুপেয় জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে, দেশ হইতে কুৎসিত ব্যারাম তাড়াইতে হইবে, চাকুরি ছাড়াইয়া বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক লোকেই যাহাতে স্বগ্রামে যাইয়া বাস করে, তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দেশের জঙ্গল কাটান, রাস্তা, পথ, ঘাট প্রস্তুত করান, পুষ্করিণী খনন করান, বিদ্যালয় স্থাপন করা, চিকিৎসালয় স্থাপন করা সর্ব্বপ্রথমেই চাই। এই সকল সুবিধা হইলে, তবে লোকে গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। গ্রামে পঞ্চায়েৎ সৃষ্টি করিতে হইবে, গ্রামে দেবালয় স্থাপন করিতে হইবে, কথকতার সাহায্যে জ্ঞান-প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বায়ত্তশাসনোপযোগী মিউনিসিপ্যালিটি বা জেলা বোর্ডের শাখা গ্রামে-গ্রামে বসাইতে হইবে। তবে কমার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি পুনরায় স্ব স্ব বৃত্তি পুনরায় ধরিবে,—তবে ত গ্রামে প্রাণ ফিরিয়া আসিবে। বাঙ্গালীর পক্ষে গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া, আজ অতি বেশী রকমে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সকলে গ্রামে ফিরিয়া গেলে গ্রামগুলি এত অস্বাস্থ্যকর থাকিবে না। গ্রামে একবার ভাল করিয়া বসবাস পুনরায় করিতে পারিলে, স্বাস্থ্যোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আমার মনে হয় যে, সহরতলীতে পাকা ঘরে বসিয়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাঠা না পড়াইয়া, বা চারতলা আপিসে বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া খাইয়া স্যানিটরী কমিসনের মড়া দপ্তর না জাগাইয়া, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে চিকিৎসককুল যাইয়া স্বাস্থ্যানুকূল বিধিগুলি হাতেকলমে করিতে থাকুন এবং চাক্ষুষ দেখাইয়া দিন কেমন করিয়া ভূতলে স্বর্গ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যাঁহারা সাহেবদিগকে আসামের জনমানব-হীন, ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে সুরম্য চা-বাগান করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই আমার প্রস্তাবের সারবত্তা অনুভব করিতে পারিবেন। যদি আবশ্যক হয়, তবে প্রথম-প্রথম সাহেবকে অগ্রণী করিয়াও এই কার্য্য কর, এই আমার অনুরোধ। তাহাতে কোনও অমর্য্যাদা নাই। আমাদের দেশে মহাপ্রাণ লোক এখনো আছেন, তাঁহারা জাগ্রত হউন—সর্ব্বাগ্রে পল্লীগুলিকে বাসপোযোগী করুন। দেশের লোককে আগে ভাল থাকিতে দাও ভাল খাইতে দাও, বাঁচিতে দাও,—পরে তাহাদিগের স্বাস্থ্য আপনা আপনি ভাল হইবে। প্রতিজ্ঞা কর এই কথাগুলি ভুলিয়া যাইবে, কখনো ভুলিয়াও নিজ নিজ সন্তান-সন্ততিগণকে এই কথাগুলি

চিনিতে দিবে না:—(১) "যেমন তেমন চাকরি ঘি ভাত।" (২) "হিন্দুরা মানুষ নয়, হিন্দুদিগের ছিল না কিছু, সকলই পাশ্চাত্যদিগের প্রসাদাৎ হইয়াছে। হিন্দু-দিগের ধর্ম্ম, সমাজ-নীতি, আচার-ব্যবহার সকলই জঘন্য ঘৃণিত।" এই আত্মঘাতী কথা স্বার্থপর কালাপাহাড় সদৃশ ব্যক্তিদিগের রচিত উপকথা। কি উদ্দেশ্যে উহা রচিত হইয়াছিল এবং কি উদ্দেশ্যে উহা আমাদিগের প্রতি পদে শুনান হয়, তাহা নির্ণয় করা বুদ্ধিমান বিবেচকের পক্ষে সহজ।

সন্ন্যাসী

[শ্রীকুমুদিনীকান্ত কর]

নদীকূলে বিস্তৃত আম্রকুঞ্জ। গাছের পাতায়-পাতায়, মাথায়-মাথায়, শাখায়-শাখায় মিশামিশি। বৃক্ষপল্লব পবন-হিল্লোলে নাচিয়া-নাচিয়া তরঙ্গ তুলিতেছে। আম্রকুঞ্জের শেষ সীমায় নদীর ধারে পঞ্চবটী—সন্ন্যাসীর আশ্রম,—তাহার মাঝখানে শিব-মন্দির।

মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত ত্রিশূলধ্বজ ক্ষীণ কিরণে ঝলসিত করিয়া, বৃক্ষশির চুম্বন করিতে-করিতে, ক্ষুব্ধ নদীবক্ষ আলিঙ্গন করিয়া, গ্রাম, বনের উপর দিয়া নিস্তেজ কিরণ বর্ষণ করিতে-করিতে, পশ্চিমাকাশের ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত মেঘখণ্ডে ঈষৎ স্বর্ণরেখা সংযুক্ত করিয়া দিয়া, পৃথিবীকে পরিম্লান করিয়া দিনমণি ডুবিয়া গেলেন। বিভূতি-ভূষিত সন্ন্যাসী প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে-দেখিতে মগ্ন হইয়া রহিলেন। এমন সময় চৈত্র মাসের আকাশে দুর্যোগের লক্ষণ দেখা দিল।

দেখিতে-দেখিতে, পূর্ব্ব দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল,—চাঁদ আচ্ছন্ন হইল,—বাতাস বেগে বহিতে লাগিল। মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল। নদীর জল থলথল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। নদীতীরবর্ত্তী আন্দোলিত আম্রকুঞ্জের মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল। ঝিল্লীধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা। চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে, মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে। দেখিতে-দেখিতে গুরুগুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল,—বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল,—মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসী কি দেখিয়া মহা ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময়ে বামাকণ্ঠনিঃসৃত আর্ত্তনাদের সঙ্গে-সঙ্গে একখানি নৌকা মন্দিরের নিকটেই ডুবিয়া গেল।

* * * *

সেই মহাপ্রলয়ের মধ্যে নদীগর্ভ হইতে উঠিয়া, এক অচেতনা, চম্পকবরণা, সালঙ্কৃতা পূর্ণ যুবতীকে স্কন্ধে করিয়া সন্ন্যাসী যখন অবসন্ন-দেহে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে,—পবনদেব ভৈরব রবে হুঙ্কার করিতেছেন,—প্রকৃতি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। সন্ন্যাসী ধীরে-ধীরে, অতি সন্তর্পণে রমণীকে শোয়াইয়া রাখিলেন,—তার পর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রম সার্থক হইল,—রমণী সংজ্ঞা লাভ করিয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিল। সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি একটু দুধ গরম করিয়া আনিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিলেন। রমণী যেন মৃত-সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া জীবন পাইল; চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। তাহার বিস্মিত নয়ন চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল।

সুন্দরীর অঙ্গের বসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল; সিক্ত এবং ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত কেশপাশ মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; স্বেদবিন্দু মুক্তাবিন্দুর ন্যায় কপোলদেশ বেষ্টন করিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল; তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ইহাতে যেন আরো উজ্জ্বলতর হইয়া অঙ্গ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সন্ন্যাসী মুগ্ধ হইয়া রমণীর সেই অপরূপ রূপ-সাগরে ডুবিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীর ইহাই প্রথম রমণীর সৌন্দর্য্য দর্শন। রমণী লজ্জিত ভাবে বসন সংযত করিয়া

কেশপাশ পৃষ্ঠে এলাইয়া দিল এবং জড়সড় হইয়া বসিল।

সন্ন্যাসী মনে-মনে লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি এই ভিজা কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেল। নিরাপদ স্থানে আসিয়াছ, তোমার কোন ভয় নাই।"

মাতৃ-সম্বোধনে সাহসী হইয়া রমণী সন্ন্যাসী-প্রদত্ত বস্ত্র পরিধান করিল। তাহাকে আগুনের কাছে বসিতে বলিয়া সন্ন্যাসী তাহার খাওয়ার জোগাড় করিতে-করিতে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে পরিচয় দিল। সব শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই মা! কাল আমি নিজে গিয়া তোমায় বাড়ী রাখিয়া আসিব,—এই রাত্রিটা মন্দিরেই থাক।"

ফলমূলাদি প্রচুর পরিমাণে আহার করিবার পর ঘুমে রমণীর শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। সন্ন্যাসী তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "মা, তুমি এখন ঘুমাও।" রমণী শয়ন মাত্র গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত। বাহিরে বৃষ্টি কিম্বা বায়ুর হন্‌হন্ সন্‌সন্ শব্দ ছিল না। তরুশির, নদীবক্ষ তাণ্ডব নৃত্যে বিরত হইয়াছিল। শান্ত প্রকৃতির চতুর্দ্দিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। আকাশ হইতে মেঘ অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। ধীরে-ধীরে আকাশের নীলাবরণ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। দুইটা একটা করিয়া তারকাও মিট্‌মিট্ করিতে-করিতে উঁকিঝুঁকি মারিয়া দেখা দিতেছিল। চাঁদ তখন অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। এমন সময়ে সন্ন্যাসী একাকী মন্দিরের বাহিরে নদীর ধারে পাদচারণা করিতেছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক, সরল, গম্ভীর মূর্ত্তি তখন চিন্তাক্লিষ্ট; তাঁহার শান্তি-রসাপ্লুত মন অশান্তি-বিক্ষোভিত। তিনি আপন মনে প্রশ্ন করিতেছিলেন, "আজ আমার চিত্ত এত চঞ্চল হইতেছে কেন? মন্দিরে থাকিলে মনেই এত উত্তেজনা বোধ করি কেন? ...." সন্ন্যাসী পুনরায় নতমস্তকে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া ভাবিলেন, "না! ও কিছু নয়, দেখিয়া আসি মা ঘুমাইয়াছেন কি না......"

সন্ন্যাসী মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। যুবতী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তাঁহার নিদ্রাভিভূত মুখমণ্ডল হইতে চারিদিকে সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সন্ন্যাসী স্বপ্নাবিষ্টের মত বাস্তব জগৎ ভুলিয়া গিয়া রমণীর রূপ-রস-পানে বিভোর হইয়া রহিলেন। হঠাৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, মাথার জটাজাল নড়িয়া উঠিল, ঝড়ের মত উষ্ণ শ্বাস বহিয়া গেল, প্রতি লোমকূপ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল, অন্তরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল! কিসের এত উত্তেজনা? উত্তেজনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী অস্থির হইয়া উঠিলেন। অজ্ঞাতসারে রমণীর প্রতি তাঁহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালিত হইতে লাগিল, বাহু প্রসারিত হইল, চরণদ্বয় দুইপদ অগ্রসর হইল........'গুরুদেব! গুরুদেব! রক্ষা কর!' সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীর দৃঢ় সঙ্কল্প, তিনি চিত্ত সংযত করিবেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু অসম্ভব! তিনি একবার ছুটিয়া গিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন, একবার বেগে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন;—সন্ন্যাসী উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল। এইবার—এইবার বুঝি সর্ব্বনাশ!—না, না—সন্ন্যাসী উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া নিদ্রিতা যুবতীর শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সাবধান! সাবধান! মা! মা! উঠ, উঠ, পলাও, পলাও—"

সন্ন্যাসীর চীৎকারে জাগ্রত হইয়া রমণী দেখিল, সন্ন্যাসী পাগলের মত ছুটাছুটি করিতেছেন, আর চীৎকার করিয়া তাহাকে ঐ সব কথা বলিতেছেন। যুবতী সবিস্ময়ে বলিলেন, "বাবা! আপনার কি হইয়াছে? আপনি ও-রকম করিতেছেন কেন? আপনার এ সমস্ত কথার অর্থ কি? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!" রমণী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। এক লাফে তিন হাত পিছাইয়া গিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "সাবধান! সাবধান! কাছে আসিও না,—পলাও, পলাও,—সর্ব্বনাশ হইবে, সর্ব্বনাশ! আমি উন্মত্ত—কামোন্মত্ত! পলাও, শীঘ্র পলাও........"

রমণীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। সম্মুখে সর্প দেখিলে লোকে যেমন ভয়ে পশ্চাতে সরিয়া যায়, সেও তেমনি পশ্চাতে সরিয়া গেল,—ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে কাঁপিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী দৌড়িয়া বাহিরে গিয়া বলিল, "মা! মা! দরজা বন্ধ করিয়া দাও! আমার শত অনুনয়-বিনয়ে, কাঁদাকাটিতে, আমার মা বুলিতে, এমন কি আমার জীবন নষ্ট করিবার ভয় প্রদর্শনেও দরজা খুলিও না। মনে রাখিও, কিছুতেই খুলিবে না। আর মুহূর্ত্ত দেরী করিও না! আর মুহূর্ত্তের জন্য তুমি আমার সম্মুখে আসিলে সর্ব্বনাশ হইবে। আমি উন্মত্ত, শক্তিহীন। সাবধান! সাবধান!"

সন্ন্যাসী বেগে নদীর দিকে ছুটিয়া গেলেন। রমণী সশব্দে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিল।

কামোন্মত্ত জ্ঞানশূন্য সন্ন্যাসী মন্দিরের চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে-করিতে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উহা খুলিয়া দিবার জন্য পুনঃ-পুনঃ অনুনয় করিতে লাগিলেন, কাঁদাকাটি করিলেন, দ্বারে মাথা ঠুকিলেন, শেষ ভয় দেখাইলেন এবং দ্বারে পদাঘাত করিলেন। উন্মত্ত বলবান সন্ন্যাসীর সবল পদাঘাতে বহুকালের জীর্ণ মন্দির থরথর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু ভীতিবিহ্বলা রোরুদ্যমানা রমণী কিছুতেই দ্বার খুলিল না। অবশেষে জলনির্গমের ছিদ্রপথে সন্ন্যাসী 'সাবল' মারিতে লাগিলেন। দুম্ দুম্ শব্দে যুবতীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে একখানা দুইখানা করিয়া ইট্ ভাঙ্গিয়া আল্‌গা হইয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। ছিদ্র আরো বড় হইল—ক্রমে আরো বড়, আরো বড়—এইবার মন্দিরের ভিতরের সমস্ত দেখা যাইতে লাগিল। ভয়ে রমণী "রক্ষা কর, 'রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রমত্ত সন্ন্যাসী উৎসাহিত হইয়া আরো জোরে ভগ্ন দেওয়ালে আঘাত করিল। এইবার ঝুপ্‌ঝুপ্ করিয়া কতকখানি দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িল, সঙ্গে-সঙ্গে আরো অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া ইট্ আল্‌গা হইয়া গেল। এইবার সন্ন্যাসী সাবল দূরে ফেলিয়া দিয়া উন্মত্তের মত সেই ছিদ্রপথে মস্তক প্রবিষ্ট করাইয়া দিল। বক্ষ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে, এমন সময়ে অর্দ্ধভগ্ন প্রাচীর সশব্দে ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া তাঁহার বক্ষের উপরে চাপিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। পরে অতি কষ্টে, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "মা! মা! একবার এদিকে আয় মা! আর তোর ভয় নাই,—বিধাতা বিচার করিয়াছেন। এ পাপিষ্ঠের জীবন শেষ হওয়ার আর দুই দণ্ডও বাকী নাই·········"

রমণী কাঁদিতে-কাঁদিতে উঠিয়া তাঁহার নিকটে আসিল। সন্ন্যাসী ক্ষীণ কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মা! এই পাপিষ্ঠকে নিজগুণে ক্ষমা করিস্। ভগবান আছেন,—তাঁহাকে ধন্যবাদ,—তোর ধর্ম্মরক্ষা হইয়াছে। বড় দর্প ছিল, চূর্ণ হইয়াছে। অহঙ্কার করিয়া গুরুদেবকে বলিয়া আসিয়াছিলাম, 'আমি কামজয়ী', কিন্তু ত্রিকালদর্শী গুরুদেবের বাক্য ফলিয়াছে। মা! অন্তিমের একটা কাজ করিস্—মন্দিরের গায়ে আমার বুকের রক্ত দিয়া এই পাপীর পরাজয়-সংবাদটা লিখিয়া রাখিস্।"

দেখিতে-দেখিতে মৃত্যুর কালো ছায়ায় সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; তাঁহার জ্যোতিঃহীন নয়ন যেন অনুতাপ প্রকাশ করিতে-করিতে, রমণীর নিকট ক্ষমা মাগিয়া চিরদিনের জন্য মুদিত হইল।

যুদ্ধ-বন্দীর আত্ম-কাহিনী

[শ্রীআশুতোষ রায়]

১। পূর্ব্বাভাষ।

সে অনেক দুঃখের কথা, লিখিতে লেখনী কম্পিত, হৃদয় স্তম্ভিত হয়। এবার সুক্ষণে কি কুক্ষণে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়াছিলাম, তাহা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে যে কেশ পলিত ও দন্ত গলিত হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। বার্দ্ধক্যের দশা ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছে। মন নিস্তেজ, নানারূপ দৈব-দুর্ব্বিপাকে শরীর অবসাদগ্রস্ত। এমতাবস্থায় লিখিবার ইচ্ছা কিরূপ বলবতী থাকিতে পারে, তাহা লেখা দেখিয়া পাঠকগণ সিদ্ধান্ত করিবেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রেল তারিখে এবারকার আমার প্রথম যুদ্ধাভিযান। দুই দিনের ছুটীতে বাটী আসিয়া, স্ত্রী-পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়া যে দিন রওনা হই,—ষ্টেসনে গিয়া শুনিলাম, আমার যাইবার নির্দ্দিষ্ট ট্রেণখানা ৭।৮ দিন হইল বন্ধ হইয়াছে। অতএব প্রথম

পা বাড়াইতেই বিঘ্ন। পর দিন আবার যখন গন্তব্যস্থানের অভিমুখে রওনা হইব, অর্দ্ধাঙ্গিনী আগু বাড়াইয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার মাথার দিব্য,—গোলা-গুলির মধ্যে যাইও না।" আমার যেন ঘরের কথা! এবং তাহার অনুরোধ কিরূপে রক্ষিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা ক্রমশঃ দেখিতে পাইবেন। ১৪ই এপ্রেল লক্ষ্ণৌ হইতে বোম্বাই যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে একজন ট্রেজারারবাবু (খাজাঞ্চি) এবং তেইশজন নানা কাজের জন্য ক্যাম্প-ফলোয়ার ছিল। লক্ষ্ণৌ হইতে ডাকগাড়ী যখন ঝাঁসিতে পৌছিল,—ষ্টেসন মাষ্টার বলিলেন, তোমাদের জাহাজ বোম্বাই হইতে ১৭ই এপ্রেল ছাড়িবে, এরূপ মর্ম্মে এজেণ্ট আফিস হইতে তার পাইয়াছি; (এবং তারখানিও আমাদিগকে দেখাইলেন।) অতএব তাড়াতাড়ি করিয়া ডাকগাড়ীতে যাইবার প্রয়োজন নাই,—রাত আটটায় ছাড়িবে যে প্যাসেঞ্জার, তাহাতে তোমরা যাইবে। কিন্তু আমরা তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। আমাদের বড় সাহেবকে তার করিয়া সমুদয় হাল জানাইতে হইল, এবং তাঁহার অনুমতি চাহিলাম। বেলা তখন প্রায় সাড়ে তিনটা। রাত আটটায় ট্রেণ; সুতরাং ঝান্সি সহর দেখিবার জন্য একখানা টঙ্গা ভাড়া করিয়া, ট্রেজারার বাবুটিকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলাম। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় দেড় মাইল। সহরটী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়,—পাহাড়ময় স্থান বলিয়া দৃশ্য অতি মনোরম। পাহাড়ের উপর ঝাঁসির কেল্লাটী অবস্থিত; এবং দুর্ভেদ্য প্রাচীরমালায় বেষ্টিত। এখানে মাড়োয়ারী ব্যবসাদারই অধিক; সুতরাং ইহাকে মাড়োয়ারী সহর বলা যাইতে পারে। দোকানে লোভনীয় বস্তু বিশেষ কিছুই নয়নগোচর হইল না। এখানকার রেলের কারখানা উল্লেখযোগ্য। বাজার হইতে কিছু লুচি-মিঠাই কিনিয়া, সন্ধ্যা সাতটার সময় আমরা ষ্টেসনে ফিরিলাম। যথাসময়ে ট্রেণ আসিলে, বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ১৬ই তারিখে বেলা ৮টার সময় বোম্বাই পৌছিলাম। আমাদের লইবার জন্য, একটী সার্জ্জেণ্ট, ২টী গোরা সেপাই, ও ৪।৫ জন দেশী সেপাই ৩।৪খানা মোটর গাড়ী লইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত ছিল। তাহাদের কার্য্যই—সর্ব্বদা ষ্টেসনে উপস্থিত থাকিয়া, আগন্তুকদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া। তখন লড়াইএর জন্য এত লোকের আমদানী হইতেছে যে, ঐরূপ বন্দোবস্ত না থাকিলে তাহার মধ্যে স্থান পাওয়া দুষ্কর। তাহারা আমাদিগকে মোটরে করিয়া বম্বে মেরিন লাইনে লইয়া গিয়া, নির্দ্দিষ্ট তাঁবু দেখাইয়া দিয়া, রসদাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিল। সেখানে সঙ্গী লোকদিগকে রাখিয়া, আমি আমাদের কমিসারিয়েট ডিপোর অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। শুনিলাম, আলেকজান্দ্রা ডকে আড্ডা হইয়াছে। ট্রামে কিছু দূর গিয়া, পরে পদব্রজে উক্ত ডকে প্রবেশ করিলাম। ৮নং সেডে গিয়া দেখিলাম, অনেক লোকজন ১৭ই তারিখে রওয়ানা হইবার জন্য তথায় সমবেত হইয়াছে। সেখানকার সকলেই অবশ্য কমিসারিয়েটের লোক। সেখানকার ইন্‌চার্জ্জ সার্জ্জেণ্ট আমাকে অফিসে গিয়া পৌছা সংবাদ দিতে বলিল, এবং আমাদিগকে তথায় থাকিবার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। ২।১ জন লোক পাঠাইয়া দিয়া আমাদের আর-আর লোকজন এবং জিনিস-পত্র তথায় আনাইয়া লইলাম। রসদাদি লইয়া তথায় আহারাদির বন্দোবস্ত করা হইল। চিঠিপত্র লিখিয়া আহারাদির পর সহরের কতক অংশ দেখিয়া আসিলাম। ১৭ই তারিখে বেলা ৯টার সময় আমরা বি, আই, এস, এন, কোং'র এস্, এস্ "অরনকোলা" নামক জাহাজে আরোহণ করিলাম। প্রায় বারশত লোক একত্র যাত্রা করিলাম। বেলা ১২টার সময় জাহাজ ছাড়িল। মনে কত কথাই উঠিতে লাগিল। হে জননী ভারতবর্ষ, তোমার কত সন্তান এইরূপে তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে তোমার এই অধম সন্তান অন্যতম। সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই জানেন, ফিরিয়া এ অকৃতি সন্তান তোমার চরণ দর্শন করিতে পারিবে কি না। মনে-মনে পুত্র-পরিবার, দেশ,—একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলাম, মন নিতান্ত বিষণ্ণ ও ম্রিয়মান হইল। কিছুক্ষণ পরে নিজের মনকে দৃঢ় করিয়া, জাহাজের গতি এবং সমুদ্রের লহরীলীলা দেখিতে লাগিলাম। বোম্বাই সহর ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া, দূরে, অতি দূরে আকাশের গায়ে মিশাইয়া গেল। এক্ষণে নীলাকাশ-তলে সুনীল অম্বুরাশির অবিশ্রান্ত তাণ্ডব নৃত্যলীলা ব্যতীত অপর কিছুই পরিলক্ষিত হইল না। বারিধির সুশীতল বায়ু স্পর্শে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও মন প্রফুল্ল হইল। মানসিক অবসাদ ঐন্দ্রজালিকের যষ্টি-প্রভাবে যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। সন্ধ্যার পর আহারাদি সমাধা করিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রভাতে উঠিয়া দেখি, জাহাজখানা অজগর সর্পের মত গড়াইতে-

গড়াইতে নীলোর্ম্মিরাশি ভেদ করিয়া চলিয়াছে। চতুর্দ্দিকে শুধু অনন্ত-বিস্তৃত জল,—নীল চন্দ্রাতপ-তলে নীলিম-বারি-রাশির অহোরাত্রব্যাপী নৃত্য-গীত-বাদ্য। এ নৃত্যের বিরাম নাই, এ গীতের অন্ত নাই। এ আসর সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। প্রাতঃস্নান সমাধা করিয়া সূর্য্যদেব সমুদ্র-মধ্য হইতে ধীরে-ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। উজ্জ্বল রক্ত-চন্দনের ফোঁটায় পূর্ব্বদিক উদ্ভাসিত হইল। কি মনোরম দৃশ্য! এ দৃশ্য যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। এ জীবনে অনেকবার সমুদ্রোপরি সূর্য্যোদয় দেখিয়াছি; কিন্তু তবুও যখনই দেখি, তখনই তাহা নূতন এবং নয়নানন্দদায়ক। তৃতীয় দিনে এডেন (Aden) বাম দিকে রাখিয়া আমাদের জাহাজ পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করিল। অনেক উড্ডীয়মান মৎস্য এবং (Seal) মৎস্য যাইবার পথে দেখিতে পাইলাম। পঞ্চম দিনে মস্কট (Muscat) ও বুসায়ার (Bushire) ছাড়িয়া চলিলাম। মস্কট পাহাড়ের গাত্রে অবস্থিত। এখানে ব্রিটিশ-রাজের সেনা-নিবাস আছে। স্থানটি স্বাস্থ্যকর। এখানকার মস্কট ডালিম বিখ্যাত, হালুয়াও উল্লেখযোগ্য। বুসায়ারেও সেনানিবাস আছে। এই স্থানে পারস্য সীমান্ত। ষষ্ঠ দিন প্রাতঃকালে সাটেল আরব (Shat el-Arab) নদীর মুখে প্রবেশ করিলাম। নদীর উভয় পার্শ্বে অসংখ্য খেজুর গাছ,—যেন অগুন্তি সিপাহী কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ক্রমে জাহাজ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, বৃক্ষশ্রেণী ততই ঘন-সন্নিবিষ্ট এবং বহুদূর-বিস্তৃত দেখা যাইতে লাগিল। এই দেশকে অপর নামে অভিহিত না করিয়া, খেজুরের দেশ বলিলেই বোধ হয় অধিক শোভা পায়। বেলা ২।৩-টার সময় আবেদান (Abedan) নামক স্থানে পৌছিলাম। এখানে এংগ্লো পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানী স্থাপিত। এখান হইতে প্রচুর কেরোসিন তৈল রপ্তানী হইয়া থাকে। তুর্কীর সহিত এখানেই প্রথম সংঘর্ষ হয়। প্রথমে আমাদের সিপাহীরা বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরিশেষে ক্রুইজার (Cruiser) যুদ্ধ-জাহাজ আসিয়া যখন গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন তুর্কীরা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলাইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই,—কাটা ধান্যের মত বিছাইয়া গেল। এখান হইতে তাড়া খাইয়া তুর্কীরা একেবারে বসোরা (Basra) গিয়া হাজির হইল, এবং কতকগুলি এওয়াজের (Ahwaz) দিকে গিয়া আরবদিগকে একত্র করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। তুর্কীরা বসোরায় যাইবার পথে দুইখানা ক্ষুদ্র ষ্টীমার সেখ মামেরার (Sheik of Mamera) বাটীর নিকট নদীর মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মনের ভাব এই ছিল যে, ইহাতে বৃটিশ বাহিনীর গতিরোধ হইবে, তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবে না। বুদ্ধদেবের ছাতা মাথায় দিয়া চীনেরা যেমন গোলা-গুলির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশা রাখিত, তুর্কীর কার্য্যও অনেকটা সেই ধরণের। ও সব কথা থাকুক। রাস্তা পরিষ্কার করিতে ২।৩ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে নাই। ষ্টীমার দুইখানা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া, এক দিকে একখানা জাহাজ যাইতে পারে, এমন স্থান করিয়া লওয়া হইল। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি,—মামেরার সেখ, যাঁহার বাটীর নীচেই নদীর মধ্যে ষ্টীমার ডুবাইয়া রাস্তা বন্ধ করা হইয়াছিল,—রাস্তা পরিষ্কার করিতে তিনি তাঁহার অধীন আরবদিগের দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই এই সেখ ইংরেজের সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অতএব, তুর্কীরা ভয়ে রাস্তার মধ্যে আর কোন স্থানে বসিবার অবসর পায় নাই। এই সেখের অধীনে অনেক আরব-যোদ্ধা ছিল। মামেরা স্থানটীও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়,—সেখের প্রাসাদও বড় জমীদারের বাটীর ন্যায়। তাঁহার হারেমে এক শতের উপর বেগম। সুতরাং লোকটী যে প্রভূত ক্ষমতাশালী, তাহা সহজেই অনুমেয়। সাটেল আরব হইতে একটী সুপ্রশস্ত নালা (canal) সেখের বাটীর পাশ দিয়া এওয়াজ সহর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এওয়াজ সহরের অপর পারে পারস্য-সীমা,—এই স্থানেও তুর্কীর সহিত আর একবার সংঘর্ষ হয়। এখানেও তুর্কীরা ভয়ানক ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া পলায়নপর হয়। তুর্কীরা বসোরায় পৌছিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল; মনে করিয়াছিল, ইংরেজ আর অতদূর হঠাৎ গিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে না; যদিই বা উপস্থিত হয়, তখন তুর্কীরা নদী তীর হইতে মেসিন গান (Machine Gun) চালাইয়া ইংরেজকে বিধ্বস্ত করিবে। আরব্য-উপন্যাসের দেশ কি না,—তাই তাহাদের কল্পনাও তদ্রূপ। একদিন রাতারাতি ইংরেজের যুদ্ধ-জাহাজ অন্ধকারে

া ঢাকিয়া, বসোরার নিকটে পৌছিয়া, অজস্র গোলা-বর্ষণ রারম্ভ করিল। তুর্কীরা তথন যে যে অবস্থায় ছিল, সে সই ভাবেই উভরড়ে পলাইয়া গেল। প্রত্যুত্তরে একটী কামানও দাগিবার অবসর রহিল না, কিম্বা আলাদিনের াশ্চর্য্য প্রদীপের দৈত্য তাহাদিগকে রক্ষা করিতে আসিল া। প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বধ্বংসী কামান উপর্য্যুপরি অগ্নি দগীরণ করিয়া স্থানটীকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। প্রাতঃ ালে যখন দেখা গেল, তুর্কীদের কেহ কোথাও নাই, াহাদের যুদ্ধাশ্বগুলি নদী-তীরে বন্ধন-দশায় পঞ্চত্ব পাইয়াছে, ানা দিকে তুর্কী সিপাহীরা হাত-পা ছড়াইয়া বীভৎস রসের মভিনয় করিতেছে,—তথন আমাদের পক্ষের সিপাহীদের পর অবতরণের হুকুম হইল। তীরে গিয়া দেখা গেল, ানটী একেবারে পরিত্যক্ত এবং জন-মানব-শূন্য। যেখান-ার জিনিস সেইখানেই পড়িয়া আছে। এক বিষয় বলিতে িয়া অপর বিষয়ের অবতারণা করিয়া অনেক দূর আসিয়া ড়িয়াছি। এখন আমার বক্তব্য বিষয় বলি।

২৩শে তারিখে বেলা ১০টার সময় বসোরায় পৌছিলাম। খন এওয়াজের দিকে সৈন্যগণ যাইতেছে। এওয়াজের কে যুদ্ধ বাধিয়াছে। সৈন্যগণের আসবাবপত্র পারাপারের ন্য সমুদয় বোট নিযুক্ত; সুতরাং, আমাদের অবতরণ করিতে ।১ দিন বিলম্ব হইবে, এই মর্ম্মে বসোরা হইতে হুকুম আসিল। তএব, আমাদের জাহাজের উপরই থাকিতে হইল। ২৪শে ারিখ এই ভাবেই কাটিয়া গেল। ২৫শে তারিখে জাহাজ ইতে নামিবার হুকুম পাইলাম। তখন সেখানে খুব বৃষ্টি ইতেছে। এ সময়ে এখানে এইরূপ প্রায়ই হয় না। তকালে মেসপটেমিয়ায় বর্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু এবারে জস্র গোলাগুলি বর্ষণে আকাশের মুখ খুলিয়া গিয়াছিল, লোকে এইরূপ বলিতে লাগিল। এ ধারণা কতকটা জ্ঞানসম্মত বলিয়া মনে হয়। যাই হোক, বোটে করিয়া ক হাঁটু কাদার মধ্য দিয়া আমরা বসোরা তীরে অবতরণ রিলাম। নদীর জল এখানে অগভীর,—বড় জাহাজ কিনারায় লাগিতে পারে না, তাই এ ব্যবস্থা। নীচে নামিয়াই আমাদের প্রথম কার্য্য আফিসে গিয়া রিপোর্ট করা; অতএব, আমরা তাহাই করিলাম। পরে রসদাদি লইয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম। দুইটী বন্ধুর সহিত দেখা হইল। তাঁহারা খুব আগ্রহ করিয়া তাঁহাদের বাসায় আমার স্থান দিলেন। আঃ! তাঁহার মধ্যে একজন আর ইহজগতে নাই! তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর বিবরণ পাঠকগণকে পরে বলিব। মৃত বন্ধুর নাম ৺কৃষ্ণহরি মুখোপাধ্যায়। তাঁহার মত পরোপকারী, সদালাপী, স্থিরবুদ্ধি, নিরহঙ্কার বন্ধু আর পাইব না। তাঁহার সহিত একসঙ্গে টিরা (Tirah) অভিযানেও গিয়াছিলাম। ২।১ দিনের মধ্যেই আমাদের কাহাকে কোথায় কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহার তালিকা বাহির হইল। আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এখানে বলিয়া রাখি, আমাদের বসোরা পৌছিবার ৮।৯ দিন পূর্ব্বে, বসোরা হইতে ৩ মাইল দূরে সাহেবা (Saheba) নামক স্থানে, তুর্কীর সহিত ইংরেজের যে ভীষণ সংঘর্ষ হয়, তাহাতে হার হইলে মেসপটেমিয়ার আশা ইংরেজকে বোধ হয় ছাড়িতে হইত। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর কি অপূর্ব্ব খেলা! তুর্কী এই যুদ্ধে এরূপ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল যে, ইহার পর মেসপটেমিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যতগুলি লড়াই হইয়াছিল, কোনটীতেই তুর্কীরা জয়লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং বলিতে গেলে, এই যুদ্ধেই মেসপটেমিয়ার ভাগ্যচক্র স্থির হইয়া গেল। প্রাগুক্ত যুদ্ধে আমাদের সৈন্যেরা যেরূপ শৌর্য্য-বীর্য্যের ও অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ও গৌরবের বিষয়। বৃষ্টিধারার ন্যায় গোলাগুলির মধ্যে কোমর-জলে দাঁড়াইয়া ৫।৬ ঘণ্টা-কাল গুলি চালান সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা এবং অসমসাহসের আদর্শ স্থল বলিতে হইবে। এরূপ বাহাদুর বীর সন্তানগণ যে দেশের মুখোজ্জ্বলকারী, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। 'এই বীরত্ব-গুণেই বৃটিশ-রাজ মুগ্ধ এবং সহস্র দোষ সত্ত্বেও সিপাহীর 'সাত খুন মাপ'।

খোকা

[শ্রীভূপতিনাথ দত্ত বি-এ]

(১)

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমি তখন কলিকাতায় এম্-এ ও আইন পড়িতাম। যে গলিতে আমাদের মেস্‌টী ছিল, তাহার পাশের বাড়ীতে এক ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেন। পরে জানিলাম তাঁহারা না কি বিহারে থাকেন; সম্প্রতি বিশেষ কার্য্য বশতঃ বৎসর-খানেকের জন্য কলিকাতা আসিয়াছেন। আমাদের মেস্‌টা প্রকাণ্ড একটা তেতালা বাড়ী। বাড়ীটি দুই অংশে বিভক্ত ছিল। যে অংশ হইতে ভদ্রলোকটীর বাসা দেখা যাইত, সে অংশে আমার বন্ধু পরিতোষ বাবুর সিট্ ছিল। আমার সিট্ ছিল অন্য অংশে। আমার খুব স্মরণ আছে, সেবার আমার এম্-এ একজামিন্ বলিয়া আমি পূজার ছুটীতে বাড়ী যাই নাই। সেই বন্ধে আমরা দুইটি প্রাণী সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটিতে নির্ব্বাসিতের ন্যায় বিচরণ করিতাম। সকালবেলা উভয়েই পড়াশুনা করিতাম। বেলা ৯টার সময় বাড়ীর নির্জ্জনতা, দূরে শরতের মেঘশূন্য আকাশের কোল হইতে অজানা পাখীর রব, কোলাহলময় কলিকাতা নগরীর ক্ষুদ্র গলিতে আমাদের উভয়েরই মনে প্রত্যহই একটা অলস ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর অতীতের এক স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত;—তাহা সুখের কি দুঃখের ছিল—কিম্বা সুখ বা দুঃখ উভয়েরই সমান অংশ তাহাতে বিদ্যমান ছিল, তাহা স্মরণ নাই। তখন আমরা প্রত্যহই উভয়ে পড়াশুনা ছাড়িয়া কখনও আমার ঘরে, কখনও বা পরিতোষ বাবুর ঘরে বসিয়া গল্প করিতাম।

আমার ঠিক স্মরণ নাই, হয়ত সেদিন লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন ছিল। আমি বেলা প্রায় ১০টার সময় পরিতোষ বাবুর ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছি। সেবার মা আমাদের পূজার ছুটী হইবার কিছু দিবস পূর্ব্বে গঙ্গাস্নান করিতে দেশ হইতে কলিকাতা আসিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে উঠাইয়া দিতে গিয়াছিলাম। সেখানেও মা আমাকে বাড়ী যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাড়ী গেলে পড়াশুনার ক্ষতি হইবে শুনিয়া দুঃখিত মনে অশ্রুপূর্ণলোচনে তিনি আমাকে বারংবার আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। যতক্ষণ গাড়ী ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়া আমার চক্ষুর অন্তরাল হইয়া না গিয়াছিল, ততক্ষণ আমি সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমার ছোট ভাইভগিনীগুলি গাড়ীর জানালা দিয়া আমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া এক অন্যকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছিল। গাড়ী ছাড়িয়া বহু দূর চলিয়া গেলেও আমি জননীর অসীম অপত্য-স্নেহের ও ছোট ভাইভগিনীদিগের মধুর সম্ভাষণের কথা মনে করিয়া অনেকক্ষণ ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমার দুই চক্ষু বহিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল পড়িতেছিল। আমি কতক্ষণ এই রকম ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই; পরে যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখিলাম ষ্টেশনের সেই প্লাটফরমে আর একখানি লোকাল ট্রেণ আসিয়াছে। আরোহী ও কুলিদিগের চীৎকার, ষ্টেশনের অফিসারদিগের ব্যস্ততা আমাকে তন্দ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিল।

বোধ হয় এই সব কথাই সে দিন পরিতোষ বাবুকে বলিতেছিলাম; এমন সময় দেখিলাম পাশের সেই ভদ্রলোকটীর বাড়ীর খিড়কি দিয়া একটী ত্রয়োদশ কিম্বা চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমিও পরিতোষ বাবুর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে তাহার দিকে কয়েকবার চাহিলাম। জানি না আমার মনে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইল! সুনীল গগনের পূর্ণ শশধরের ন্যায় তাহার দিব্য কান্তি, অনিন্দ্য-সুন্দর পটলচেরা চোখ্ দুটী, গোলাপ ফুলের পাপড়ির ন্যায় তাহার ওষ্ঠদ্বয় ও ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি তাহাকে যেন দেব-বালকের ন্যায় প্রদীপ্ত করিয়াছিল। আমার মনে সেই মুহূর্ত্তেই আকাঙ্ক্ষা হইল যে উহার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করি। মিনিট দুই তিন থাকিয়াই ছেলেটী তাহা-

দের জানালার সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইল। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে তাহাদের বাড়ীর তিন চারিটী জানালা দেখা যাইত; কিন্তু সকলগুলাই পরদার দ্বারা আবৃত ছিল, সুতরাং দরজা খোলা থাকিলেও তাহাদের বাড়ীর অভ্যন্তরের কিছুই দেখা যাইত না। খোকা (কারণ পাঠক দেখিবেন এই খোকাই আমার সংসার মরুতে একমাত্র বন্ধু হইয়াছিল। আমি তাহাকে চিরকাল খোকাই বলিতাম এবং এখনও বলি) হঠাৎ কোথায় চলিয়া যাওয়াতে আমি আবার মায়ের কথা মনে করিয়া বিচলিত হইলাম। কিন্তু খোকার দেবদুর্লভ চক্ষু দুটীর পবিত্র চাহনি আমার মনে থাকিয়া থাকিয়া সকল বিষাদময় স্মৃতি দূর করিয়া আমাকে জরামৃত্যু-রহিত এক কল্পনাময় সুন্দর রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল! খোকার সহিত আলাপ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রহিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই দরজার দিকে চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু কই সে ত আর আসিল না!

আমি অনেকক্ষণ সেই ভাবে বসিয়া থাকিয়া আমার নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম ও খোকার কথা ভাবিতে-ভাবিতে স্নানাহার সম্পন্ন করিলাম। আহার করিয়া আবার পরিতোষ বাবুর ঘরে গিয়া বসিলাম। পরিতোষ বাবু তখন একটু দিবানিদ্রা উপভোগের আয়োজন করিতেছিলেন। আমি খোকার দেখা পাইব বলিয়া সেখানে গিয়া বসিলাম।

অনেকক্ষণ এই ভাবে বসিয়া রহিলাম; কিছুক্ষণ পরে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া আমি হঠাৎ খোকাদের বাসার নিম্নতলার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম খোকা সেখানে জানালার দিক্ পিছু করিয়া বসিয়া আছে। পরিতোষ বাবুর ঘর দোতলায়। আমি সেখান হইতে খোকাকে যখন সেই দিন প্রথম দেখিয়াছিলাম, তখন সেও তাহাদের দোতলার ঘরে ছিল, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। কিন্তু এখন তাহাকে দেখিলাম তাহাদের একতলার ঘরে। সেই ঘরের অপর পার্শ্বেই আমাদের গেট্ বা সদর দরজা ছিল। জানালা দিয়া যতদূর দেখা যায়, তাহাতে বুঝিলাম যে খোকা সেখানে বসিয়া রহিয়াছে—সেখানে তাহার সম্মুখেই একটী কার্ড টেবিল। টেবিলটীর উপর একখানি সবুজ বর্ণের ক্লথ পাতা ছিল। তাহার উপর অনেকগুলা বই ছড়ান ও চারিখানা চেয়ার ছিল। দেখিলাম সেখানে চারিখানা চেয়ারে চারিজন উপবিষ্ট। তাহাদের মধ্যে দুইজনের দাড়ি ছিল। তাহাতেই অনুমান করিলাম, উঁহারা কলেজের ছাত্র। আর দুই জনের মধ্যে একজন খোকা ও আর একজন তাহা হইতে অল্প একটু বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইল। আমি অনিমেষ লোচনে খোকার দিকে চাহিয়া রহিলাম; আমি তাহাকে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু সে আমাকে দেখিতে পাইল না।

তাহার পরে পরিতোষ বাবুর ঘরেই আমার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। বন্ধের প্রথম কয়েক দিবস বেশ পড়াশুনা করিয়াছিলাম; কিন্তু যে দিন খোকাকে দেখিলাম, সেই দিন হইতেই আমার পড়াশুনা একেবারে বন্ধ হইল। আমি মনকে ফাঁকি দিবার জন্য পড়িবার ছল করিয়া পুস্তক হস্তে পরিতোষ বাবুর ঘরে গিয়া বসিতাম, কিন্তু আমার মন পড়িয়া রহিত খোকার দিকে। আমি খড়খড়ির ভিতর দিয়া সর্ব্বদা খোকার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। খোকা যখন তাহাদের বাসায় অন্য কাহারও সহিত কথা বলিত, অমনি আমি তাহার কথা শুনিবার জন্য কাণ খাড়া করিতাম। আঃ! যেমন রূপ তেমনি কণ্ঠস্বর! কণ্ঠস্বরে যেন এক অব্যক্ত মধুর সঙ্গীত ছিল—যাহা শুনিবামাত্রই আমার মনকে উদাস করিয়া ফেলিত! তাহার কথা শুনিবামাত্রই তাহার আরও নিকটে যাইয়া তাহার সহিত কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিবার জন্য এক অদম্য পিপাসার উদ্রেক হইত! হায়, সে কি আমার সহিত কথা বলিবে? আমি তাহার অপেক্ষা প্রায় ৭।৮ বৎসরের বড়। সে বোধ হয় খুব ধনীর ছেলে—আর আমি তাহার চেয়ে ঢের দরিদ্র পিতা মাতার সন্তান। সে নগরের গগনস্পর্শী অট্টালিকাবাসী; আর আমি পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক শান্ত পল্লীগ্রামের নিভৃত কুটীরবাসী। সে বোধ হয় ব্রাহ্মণ; কারণ, তাহার গলায় উপবীত—আর আমি কায়স্থের সন্তান। শিশির-ধোয়া ফুলের মত তাহার রূপ—আর আর আমার সৌন্দর্য্যহীন চেহারা! হায়, কোন মতেই আমার সহিত তাহার খাপ খায় না। তবে আমার তাহার সহিত মিশিবার, তাহাকে অনুজের ন্যায় ভালবাসিবার আশা কি সুদূরপরাহত?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের মেসে তখন কেবল আমি ও

পরিতোষ বাবু—এই দুইজনেই ছিলাম। আমাদের একমাত্র সহায় ছিল মেসের দারোয়ানটী। তাহার ঘর আমাদের সদর-দরজার পাশেই—বৈঠকখানা-ঘরের ঠিক সামনে বরাবর। দারোয়ান দ্বিপ্রহরে যখন আমাদের বৃহৎ বাড়ীটার গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রামায়ণ পাঠ করিত, তখন বালকসুলভ চাপল্যবশতঃ, কিম্বা পড়াশুনায় বিশেষ মনোযোগের অভাববশতঃ,—যে কারণেই হউক, খোকা অনেক সময় তাহাদের বাসার একটা ছোট ছেলেকে কোলে করিয়া, সেই খিড়্‌কির নিকটে দাঁড়াইয়া, দারোয়ানের দিকে চাহিয়া থাকিত বটে, কিন্তু তাহার চোখ্-দুটী যেন অন্য কাহারও আশায় আমাদের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিত! হায়, তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে, খোকার কোমল, প্রেমময়, পবিত্র মন প্রথম দৃষ্টিতেই আমার প্রতি একটু আকৃষ্ট হইয়াছিল।

এই রকম ভাবে কতক দিবস কাটিয়া গেল। তখন বোধ হয় আমাদের কলেজ খুলিবার আর মাত্র ৮।১০ দিবস আছে। তখন হঠাৎ জগদীশ্বর আমার বাঞ্ছিত বস্তুর সহিত মিলনের পথ সুগম করিয়া দিলেন। খোকাকে যে দিবস প্রথম দেখিয়াছিলাম, সেই দিবসই তাহার সহিত দুটা কথা বলিবার, আলাপ পরিচয় করিবার জন্য কোন এক সুযোগ ঘটাইবার জন্য তাঁহার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এক দিবস আমি সাহস করিয়া খিড়্‌কির দরজা খুলিয়া, খোকা যেখানে পড়িতে বসে, সেখানে দাঁড়াইয়া, খোকার দিকে চাহিলাম। খোকাও আমার দিকে দুই চার বার দৃষ্টিপাত করিল। আমি তখন বুঝিলাম, আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। তাহার দৃষ্টিতে এক করুণ ভালবাসার ভাবের সহিত এক ভীতির ভাবও বোধ হয় ছিল। ভীতির ভাবটুকু কেন আসিয়াছিল, বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় তাহাতে ও আমাতে বয়সের অনেক পার্থক্য থাকাতেই, এই ভাবটুকু আসিয়া থাকিবে। আমি সেখানে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। নানা প্রকার ভাবের স্পন্দন আমার ক্ষুদ্র মানস-রাজ্যটুকুকে যেন উদ্বেলিত করিয়া ফেলিল! আমি তৎক্ষণাৎ খিড়্‌কি হইতে আসিয়া, পরিতোষ বাবুর খাট্‌লির উপর বসিয়া, ক্ষিপ্ত মনকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে প্রয়াস পাইলাম। এমন সময় দেখি, খোকা আসিয়া তাহাদের দোতালার খিড়্‌কিতে দাঁড়াইয়া, আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন ভাবিলাম, সত্য-সত্যই কি সেও আমাকে চায়? তাই আমি সাহস করিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভাই, তোমার নামটী কি?"

সে ধীর ভাবে উত্তর করিল—"আমার নাম শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি পড়?"

"হেয়ার স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি।"

"তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

"আমাদের বাড়ী পূর্ব্বে ছিল নদীয়া জেলায়। কিন্তু এখন আমরা বিহারেই থাকি। আমার বাবা দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট।"

"এই বাসার কর্ত্তা তোমার কে হন?"

"তিনি আমার ভগিনীপতি। আমার বাবাকে কার্য্যবশতঃ নানা স্থানে ঘুরিতে হয় বলিয়া, আমাকে ভগিনীপতির নিকট রাখিয়াছেন। আমরা এখানে অল্প দিবসের জন্য আসিয়াছি, আগামী মাঘফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত থাকিব, আবার চলিয়া যাইব।"

আহা কি সুন্দর বালক! তাহার সহিত যতক্ষণ আলাপ করিলাম, ততক্ষণ মনে করিলাম, যেন সেই সময়টুকু ইন্দ্রের নন্দনকাননে ভ্রমণ করিয়াছি। আরও কত কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ যেন কে খোকাকে বাড়ীর ভিতর হইতে ডাকিল,—"যোগেন্, যোগেন্, ও যোগেন্, শিগ্গীর দেখে যা!"—পুনঃ-পুনঃ ডাকে যেন বাছা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, আমার প্রতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক চলিয়া গেল।

আমি আনন্দিত কি দুঃখিত মনে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই। তাহার পর পাঁচ-সাত দিবস পরে আমি সন্ধ্যার সময় কলেজ স্কোয়ার হইতে বেড়াইয়া বাসায় ফিরিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, খোকা তাহার বাসার একটী ছোট ছেলেকে সঙ্গে করিয়া বাসায় ফিরিতেছে। আমি সে দিবস অধিকতর সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বেড়াইতে এসেছিলে?"

"হাঁ।"

"এটী তোমার কে হয়?"

"বোনের ছেলে।"



মোহিনী

শিল্পী— শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার

Blocks by Bharatvarsha Halftone Works

Emerald Printing Works
CALCUTTA

এ পর্য্যন্ত খোকা আমাকে একটা প্রশ্নও করে নাই। আজ সে সাহস পাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়, আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"পারবে না কেন ভাই! আমার নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু।"

"আপনাদের বাড়ী কোথায়?"

"পূর্ব্ববঙ্গে—ঢাকা জেলা।"

এইখানে আমি খোকার ভাগিনেয়টীকে কোলে লইলাম। দেখিলাম, বালকটী আমার কোলে আসিতে একটুও আপত্তি করিল না। খোকাকে বলিলাম,—"চল, ঐ ঘাসের উপর আমরা একটু বসি।" খোকা কোন আপত্তি করিল না। বসিবার পর খোকাকে বলিলাম,—"ভাই, তুমি আমাকে এত সঙ্কোচ কর কেন? আমি যে তোমার ভাই। তুমি আজ হইতে আমাকে রবিনদাদা বলিয়া ডাকবে—কেমন?" খোকা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। আমি তাহাকে বলিলাম,—"ভাই, যখন তোমার কোন পড়া বুঝিতে কষ্ট হয়, তখনই তুমি অবাধে আমার নিকট যেও।"

পর দিবস প্রত্যূষে আমি অমর কবি কিট্সের অতুলনীয় কাব্যের প্রথম ছত্র "A thing of beauty is a joy for ever" পড়িতে না পড়িতেই দেখি, খোকা "Lamb's Tales from Shakespeare" হাতে হাজির। আমি প্রাতঃকালে এরূপ অনিন্দ্যসুন্দর, পবিত্র-হৃদয় বালকের কমল-আনন দর্শন করিয়া কতই না আনন্দিত হইয়াছিলাম। বিধাতাকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাইলাম—যে আমার হৃদয়ের ধনকে দেখিবার জন্য আমি এক প্রকার আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, সে অমূল্য মাণিক আজ আমার ক্ষুদ্র কুটীর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! আমি খোকাকে আদর করিয়া বসাইয়া, তাহার পাঠ বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। তখনও আমাদের কলেজ খোলে নাই; সুতরাং অন্য ছেলেরা আসে নাই। আসিলে না জানি তাহারা কত কি মনে করিত।

তাই খোকাকে তার পর দিন বলিলাম—"খোকা, ভাইটী আমার, কাল থেকে আমি তোমাদের বাড়ী যাইয়া তোমাকে পড়াইয়া আসিব।" খোকা তাহাতে অত্যন্ত সুখী হইল। কারণ, খোকা ইতিপূর্ব্বেই তাহাদের বাড়ী যাইবার জন্য আমাকে বলিয়াছিল। আমি লজ্জাবশতঃ যাই নাই। কিন্তু এখন দেখিলাম, লজ্জা আমার পক্ষে নির্বুদ্ধিতা ও মনঃকষ্টের কারণ হইবে।

পর দিবস খোকা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। খোকা যেখানে বসিয়া পড়িত, সেখানে আর যে তিন জন পড়িত, উহারা তাহার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। খোকা তাহাদের নিকট আমার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছিল। আমার মনে কতই না সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল,—হয় ত তাহারা আমাকে কি না মনে করিবেন। কিন্তু সেখানে যাইয়া দেখি, খোকার ভগিনীপতি ও অন্যান্য ছেলেরা আমার খুব সমাদর করিলেন। খোকার ভগিনীপতি আমার পিতা মাতা, বাড়ী ঘর ইত্যাদির সকল খবরই জানিয়া লইলেন।

যথাসময়ে আমার কলেজ খুলিল। আমি রীতিমত উদ্যমের সহিত পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। খোকার সহিত বৈকাল ও সন্ধ্যা প্রায়ই অতিবাহিত করিতাম। পৌষ মাসে খোকার পরীক্ষা হইয়া গেল। সে সকল বিষয়েই ভাল নম্বর পাইয়া প্রমোশন পাইল। ইতিমধ্যে খোকাদের বাড়ীতে মাঝে-মাঝে আমাকে জলযোগ করিতে হইয়াছে। আমি কায়স্থের সন্তান হইলেও, খোকার ভগিনী আমাকে ছোট ভাইয়ের ন্যায় দেখিতেন; কারণ, তিনি আমার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন।

হঠাৎ মাঘ মাসে খোকা আমাকে একদিন তাহাদের বাসায় ডাকিয়া লইয়া গেল। খোকার ভগিনী আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"রবিন, আমরা কালই দারভাঙ্গা চলিয়া যাইব। আর বোধ হয় আমাদের কলিকাতা আসা হ'বে না। তোমাকে ছেড়ে যেতে আমাদের বড় কষ্ট হ'চ্ছে।" এই কথা বলিতে-না-বলিতেই দিদির (কারণ খোকার সঙ্গে আমিও তাহাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করিতাম) চক্ষু দুইটি অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল।

আমি কি বলিব স্থির করিয়া উঠিতে না পারিয়া, চক্ষের জল ছাড়িয়া দিলাম। খোকাও কাঁদিতে লাগিল।

দিদি একটু স্থির হইয়া বলিলেন, "ভাই, তোমার পরীক্ষা শেষ হইলেই আমাদের ওখানে যাইবে। আর ইহার পূর্ব্বে সর্ব্বদা পত্র লিখিবে।"

আমি অশ্রু-গদগদ-কণ্ঠে বলিলাম, "দিদি, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।" বলিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইলাম। আমি আবার কাঁদিতে লাগিলাম। কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলাম, "দিদি, আমি আপনাদের, বিশেষতঃ খোকাকে ছাড়িয়া কি করিয়া থাকিব।" খোকাও আবার কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া-কাঁদিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "রবিন্-দাদা, আমি তোমাকে ছেড়ে কি ক'রে থাক্‌ব, আমি বোধ হয় পাগল হ'য়ে যাব।" আমি খোকাকে পাশে বসাইয়া বলিলাম, "ভাইটী আমার, আমি পরীক্ষার পরই তোমার নিকট ছুটে যাব। তোমাকে ফেলে কি আমি বেশী দিন থাক্‌তে পারি?"

পর দিবস অশ্রুসিক্ত লোচনে খোকাদের হাওড়া ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া মনকে একটু দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া বাসায় ফিরিলাম।

(২)

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। দেখিতে-দেখিতে দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসরের ভিতর আমার দুর্ব্বল দেহ ও মনের উপর দিয়া কত প্রবল ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গিয়াছে। আমি যথাসময়ে এম্-এ, ও বি-এল্, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিন-চার বৎসর পরেও যখন বাৎসরিক আয় একশত টাকার উপর উঠিল না, তখন অগত্যা অনেক চেষ্টা করিয়া মুন্সেফির পদ গ্রহণ করিলাম। আমি প্রথম কয়েক বৎসর বাঙ্গলাদেশে চাকরি করিয়া, পরে বিহারে বদলী হইয়াছিলাম। কয়েক স্থান ঘুরিয়া অবশেষে এখন মুঙ্গেরে আছি।

আমি এম্-এ, পরীক্ষা দিয়া খোকাদের বাসায় যাইয়া বন্ধের অধিকাংশ সময় তথায় যাপন করিয়াছিলাম। পরে পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার সংবাদ পাইয়াই কলিকাতায় ফিরিয়া যাই। তাহার পর আমার উপর্য্যুপরি কতই না বিপদ গিয়াছে। ক্রমে স্নেহময়ী জননী ও অনুজকে হারাইয়া, আমি অনেকটা পাগলের ন্যায় হইয়া গিয়াছিলাম। তাহার উপর প্র্যাক্‌টিসে কিছু না হওয়াতে, অর্থাভাবও আমার ভগ্ন হৃদয় ও দেহের উপর কতই না ভীষণ হইতে ভীষণতর ভাবে অগ্নিবর্ষণ করিয়াছিল। যাহা হউক, সময়ের প্রভাব অতি আশ্চর্য্য। সে আমার উপর্য্যুপরি কষ্টের যাতনা অনেক লাঘব করিয়া ফেলিল! এম্-এ, পাশের পর খোকা আমার নিকট কয়েকখানা পত্র লিখিয়াছিল। আমার নানা বিপদের সময় আমি খোকার চিঠির রীতিমত উত্তর দিতে পারিলাম না। পরে সেও চিঠি বন্ধ করিয়া দিল। সে সময় হইতে আজ দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আমি এখন মুঙ্গেরের মুন্সেফ। প্রায় ছয় মাস হইল এখানে আসিয়াছি। এখানে বাঙ্গালী যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সহিত আমার ভাল করিয়া আলাপ-পরিচয় হয় নাই। কয়েক দিবস যাবৎ স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর আদর-স্নেহের কথা মনে করিয়া, আমার মনটা যেন সর্ব্বদাই হু-হু করিতেছে। আমি মুঙ্গের সহরের এক নিভৃত ভদ্রপল্লীতে একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতেছি। আমার পরিবারের মধ্যে কেবল একটী পাচক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য জান্‌কি।

এক দিবস রবিবারে আমার আফিস্ বন্ধ। আমি দ্বিপ্রহরে একটু তন্দ্রা অনুভবের পর, চেয়ারে বসিয়া একখানা বই পাঠ করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, বারান্দায় বসিয়া জান্‌কি অনুমান এক বৎসর বয়স্ক একটী ছেলেকে কোলে লইয়া আদর করিতেছে। জান্‌কিকে আমি আমার নিকটে ডাকিলাম। জান্‌কি ছেলেটীকে কোলে করিয়া আমার নিকটে আসিল। বার-তের বৎসরের একটী হিন্দুস্থানী চাকরও তাহার সঙ্গে আসিল। সহজেই অনুমান করিলাম, হয় ত সে কোন বাঙ্গালীবাবুর বাসার চাকর; বাবুর ছেলেটীকে কোলে লইয়া জান্‌কির নিকট গল্পগুজব করিতে আসিয়াছে। ছেলেটীকে দেখিয়াই আমার প্রাণটা হঠাৎ যেন কেমন করিয়া উঠিল। ছেলেটীর প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় মুখ, ও তাহাতে স্বর্গীয় হাসিরেখা আমার মনে যেন সেই মুহূর্ত্তেই কাহার কথা জাগাইয়া তুলিল! আমি ছেলেটীকে কোলে লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলাম। সে ঝম্প দিয়া আমার কোলে আসিল; অপরিচিত বলিয়া একটুও ইতস্ততঃ করিল না। আমি তাহাকে কোলে করিয়া সংবাদপত্র দিয়া খেলা দিতে-দিতে, সেই চাকরটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কোন্ বাবুকা লেড়্‌কা হ্যায়?"

সে উত্তর করিল, "যোগেন্দ্রবাবু ডিপুটীকা লেড়্‌কা হ্যায়।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবুকা পূরা নাম ক্যা হায় ?"

সে আমাকে বাঙ্গালী জানিয়া, ভাঙ্গা হিন্দীতে উত্তর করিল, "বাবু যোগেন্দ্রলাল মুখার্জ্জি, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।"

সেই মুহূর্ত্তেই আমার মনে কি এক ভীষণ সমস্যা উদিত হইল। এ কোন্ যোগেন বাবু? কিছু দিবস পূর্ব্বে গেজেটে দেখিয়াছি, এক যোগেন্দ্রলাল মুখার্জ্জি, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুঙ্গেরে বদলী হইয়াছেন। এই তবে সেই? এই কি আমার সেই খোকা? ছেলেটার গঠন দেখিয়া ত আমার সেই ভালবাসার ধন খোকাকেই মনে পড়ে। তবে কি আমার খোকা ইতিমধ্যে বি,-এ, এম্,-এ, পাশ করিয়া, ডেপুটী হইয়াছে? আমার সেই কত আদরের খোকার খোকা হইয়াছে?

কতকক্ষণ পরে ভৃত্যটাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহাদের বাসাও অতি নিকটে।

ভৃত্যটি কিছুক্ষণ পরে ছেলেটাকে লইয়া প্রস্থান করিল। যাইবার সময় আমি তাহাকে বলিয়া দিলাম যেন সে প্রত্যেক রবিবারেই ছেলেটাকে লইয়া আমার বাসায় বেড়াইতে আসে। জান্কিও তাহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিল।

তাহার পর কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আমি প্রত্যেক রবিবারেই ছেলেটার আশায় বসিয়া থাকি; এবং আসিলে তাহাকে কোলে লইয়া কতই না আদর করি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের বাসায় যাইয়া নবাগত ডেপুটী-বাবুর সঙ্গে আলাপ করিতে সাহস করি নাই। প্রত্যহ অফিসে গেলে, কেবল আমার বহুদিবসের পরিচিত খোকার কথাই মনে পড়িত। খোকা এখন কতই না বড় হইয়া থাকিবে। এখন তাহার নিশ্চয়ই দাড়ি-গোঁফ উঠিয়াছে। এখন আর আমি তাহাকে দেখিলে হয় ত প্রথমে চিনিতে পারিব না। সেও আমাকে প্রথমে চিনিতে পারিবে না। কারণ, এই কয় বৎসরে সংসাররূপ মরুভূমির উত্তাপে, আমারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

সেই দিবস পূর্ণিমা। সূর্য্যাস্তের পর আমি আমার বাসার বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি। কখনও বা পূর্ণ শশধরের দিকে তাকাইয়া, আমি আমার অতীত জীবনের ঘটনাগুলিকে একে-একে স্মরণ করিতেছিলাম। মনে হইল, আমার পরলোকগতা জননী যেন নক্ষত্র হইয়া আমার দিকে চাহিয়া কখনও হাসিতেছেন, কখনও বা অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ভাবিতে-ভাবিতে তন্দ্রার ন্যায় আসিল।

তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা। ভৃত্য জানকি আসিয়া ডাকিল, "বাবু!"

আমি তাহার ডাকে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, "কেন রে?"

সে বলিল, "একজন বাবু আপনাকে ডাকছেন।"

আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া, বহির্বাটীতে যাইয়া দেখিলাম, অনুমান চতুর্বিংশ বৎসর বয়স্ক একজন যুবক আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। সে আমাকে দেখিয়া হঠাৎ আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "রবিন্-দাদা, আমাকে চিন্তে পারছ না। আমি তোমার সেই খোকা।"

আমি আমার বহুদিনের হারানো-মণি পাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "খোকা, ভাই আমার, তুমি এত বড় হইয়াছ। তুমি তোমার রবিন্-দাদাকে ভুলিয়া এতদিন কেমন করিয়া ছিলে?"

সেই দিবস হইতেই আমি আবার আমার খোকাকে ফিরিয়া পাইয়াছি। আমি অবিবাহিত চিরকুমার। খোকাই এখন আমার সংসারমরুতে একমাত্র আশ্রয়স্থল। জানি না, মুঙ্গের হইতে অন্যত্র বদলী হইয়া গেলে, খোকার বিরহ সহ্য করিতে পারিব কি না।

প্রেমের কথা

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় প্রকার

এতক্ষণ প্রথম প্রকারের প্রণয়-সঞ্চারের কথা বলিলাম। এইবার দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কখন কখন প্রথম-দর্শনের সঙ্গে-সঙ্গে নায়িকার হৃদয়ে গুণানুরাগ সঞ্চারিত হইবার অবসর ঘটে, যথা ধনুর্ভঙ্গ, লক্ষ্যবেধ প্রভৃতি স্থলে। দ্বিতীয় প্রকারের প্রণয়-সঞ্চার ইহারই প্রকারভেদ বটে, এবং প্রথম-দর্শনজনিতও বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে আরও একটু বিশিষ্টতা আছে। নায়ক নায়িকাকে বিষম বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলেন, তদুপলক্ষে নায়িকার হৃদয়ে গুণানুরাগ ত জন্মিলই, সঙ্গে-সঙ্গে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হইল, এই উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে প্রণয়ের উদ্ভব হইল। নায়কের হৃদয়ও করুণার্দ্র হইল, সেই আদ্র হৃদয়ে প্রণয়ের বীজ সহজেই অঙ্কুরিত হইল। অথবা সেই করুণাই ঘনীভূত হইয়া প্রেমে পরিণত হইল। ইংরেজ কবিগণ বলিয়াছেন —"'I pity you'. 'That's a degree to love.'" "Pity melts the mind to love." আমাদের কবিদের কথায়—'একই সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা।' 'কৃপাই প্রেমের পূর্ব্বসূত্র'। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, অথচ আলঙ্কারিকগণ ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী নির্দ্দেশ করেন নাই। এক 'দর্শনাৎ' বলিয়াই সকল কথা শেষ করিয়াছেন।

মহাভারতে (আদিপর্ব্ব, ৭৮শ ও ৮১শ অধ্যায়) দেখা যায়, মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করাতে দেবযানীর অনুরোধে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। * 'বিক্রমোর্ব্বশী'তে পুরূরবাঃ উর্ব্বশীকে অসুর-হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন, ফলে উভয়ের হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চার হইল (১ম অঙ্ক)। 'বিক্রমোর্ব্বশী'তে প্রকৃত বিপদ্ উদ্ধার (serious); 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' কালিদাস এই বিপদ্‌উদ্ধার লইয়া যেন রঙ্গ করিবার জন্যই দুর্বিনীত মধুকরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থা শকুন্তলার বিপদ্ উদ্ধারের জন্য দুষ্মন্তের আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন (১ম অঙ্ক)। 'মালতীমাধবে' অপ্রধান আখ্যানে মকরন্দ মদয়ন্তিকাকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে উদ্ধার করিলেন, নিজেও আহত হইলেন, মদয়ন্তিকার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আহত ভয়ত্রাতার প্রতি করুণার উদ্রেক হইল, উভয়ে মিলিয়া প্রণয়ে পরিণত হইল, মকরন্দের হৃদয়েও প্রণয়-সঞ্চার হইল (৩য় ও ৪র্থ অঙ্ক)। তবে এই ঘটনার পূর্ব্বে 'শ্রবণাৎ' পরিচয় ছিল। ভাসের 'অবিমারকে' অবিমারক (বিষ্ণুসেন) রাজকন্যা কুরঙ্গীকে মত্তহস্তীর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিলেন (১ম অঙ্ক)। ফলে উভয়ের হৃদয়ে অন্যোন্যানুরাগ জন্মিল (২য় অঙ্ক)। 'মৃচ্ছ-কটিকে' চারুদত্ত যদিও ঠিক বসন্তসেনার বিপদ্‌উদ্ধার করেন নাই, তথাপি শকারের উপদ্রবভীতা বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় লইলেন, এবং পরস্পর-দর্শনে প্রণয় জন্মিল। দশকুমারচরিতে মন্ত্রগুপ্ত দুষ্ট কাপালিকের অত্যাচার হইতে রাজকন্যা কনকলেখাকে উদ্ধার করাতে রাজকন্যা তাঁহার অনুরাগিণী হইলেন। ফলতঃ সংস্কৃত

* মহাভারতোক্ত উপাখ্যানে প্রণয়-সঞ্চারের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কূপ হইতে উদ্ধারকালে রাজা তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে বিবাহ করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য, দেবযানী এই যুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া অনুমান হয়, তিনি বিপদ্‌উদ্ধারের জন্য রাজার অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকে দেবযানীর তথা মুখ হইতে যযাতির রীতিমত পূর্ব্বরাগের বর্ণনা করিয়াছেন।

সাহিত্যে এই প্রকারে প্রণয়-সঞ্চার একটি সুপ্রচলিত কাব্য-কৌশল।*

ডন্‌লপ্ উল্লেখ করিয়াছেন যে গ্রীক রোম্যান্স Ephesiacaয় Perilaus নামক বীরপুরুষ Anthiaকে ডাকাতের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার প্রেমে পড়েন। তবে Anthia বিবাহিতা ও স্বামিগতপ্রাণা ছিলেন, সুতরাং এই প্রেম একতরফা। (*Dunlop: History of Fiction*, Ch. I. p. 35.) আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে ভিক্টর হিউগোর Notre Dameএ বেদিয়াকন্যা বলিয়া পরিচিতা Esmeraldaকে Captain Phoebus বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন, কৃতজ্ঞহৃদয়া Esmeralda উদ্ধারকর্ত্তার প্রেমে পড়িল। তবে কাপ্তেনটি মোটেই একনিষ্ঠ প্রণয়ী নহেন।

ইংরেজী সাহিত্যেও দেখা যায়, স্কটের বিখ্যাত আখ্যায়িকা 'The Bride of Lammermoor'এ নায়ক নায়িকাকে দুর্দ্দান্ত ষাঁড়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলেন, ফলে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে অন্যোন্যানুরাগ জন্মিল (৫ম ও ১৯শ পরিচ্ছেদ)। অট্‌ওয়ের 'Venice Preserved' নাটকে নায়ক (Jaffier) নায়িকা (Belvidera)কে জল-মজ্জন হইতে রক্ষা করিলেন, ফলে উভয়ের হৃদয়ে অন্যোন্যানুরাগ জন্মিল (১ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য)। নায়কের এজাহার শুনুন।

As she stood trembling on the vessel's side,
Was by a wave washed off into the deep;
When instantly I plunged into the sea,
And, buffeting the billows to her rescue,
Redeemed her life with half the loss of mine.

... ...

I brought her, gave her to your despairing arms.
Indeed you thanked me; but a nobler gratitude
Rose in her soul; for from that hour she loved me,
Till for her life she paid me with herself.

এই 'nobler gratitude' ই এ সকল ক্ষেত্রে প্রণয়ে ঘনীভূত।†

আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী হেমচন্দ্রের প্রণয়-সংঘটন-ব্যাপারে এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। নায়িকার একরার শুনুন—"আমি একদিন মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে নৌকায় জল-বিহারে গিয়াছিলাম। তথায় অকস্মাৎ প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, নৌকা জলমধ্যে ডুবিল।...আমি ভাসিয়া গেলাম। দৈবযোগে এক রাজপুত্র সেই সময়ে নৌকায় বেড়াইতেছিলেন। জলমধ্যে আমার চুল দেখিতে পাইয়া স্বয়ং জলে পড়িয়া আমাকে উঠাইলেন। আমি তখন অজ্ঞান।...তাঁহার বাসায় আমায় লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলেন। আমি জ্ঞান পাইলে তিন দিবস পর্য্যন্ত ঝড়বৃষ্টি থামিলনা।...সুতরাং তিন দিন আমাদিগের উভয়কে এক বাটীতে থাকিতে হইল। উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম। কেবল কুল-পরিচয় নহে উভয়ের অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলাম। তখন আমার বয়স পনর বৎসর মাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই আমি তাঁহার দাসী হইলাম। সে কোমল বয়সে সকল বুঝিতাম না। হেমচন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিলাম।" ['মৃণালিনী'; ৪র্থ খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।] অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্টি, দৈবযোগে রাজপুত্রের আবির্ভাব, বিপদ্ উদ্ধার, সবই রীতিমত রোম্যান্স; তবে বঙ্কিমচন্দ্র 'দেখিল আর মজিল' এই কথা সম্পূর্ণরূপে মানেন না (সাক্ষাদ্দর্শন প্রবন্ধ, ৬৩৭ পৃঃ ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২৬), তাই তৎক্ষণাৎ উভয়কে প্রেমে ভরপূর করেন নাই, সেবা-শুশ্রূষায় ও তিন দিন ধরিয়া হৃদয়ের পরিচয়ে প্রেম ঘনীভূত হইয়াছে। (অট্‌ওয়ের নাটকে নায়কের আর একটি একরার পড়িয়া বোধ হয় নায়িকার জলমজ্জনের পূর্ব্বে নায়িকার পিতৃগৃহে নায়কের গতিবিধি ছিল, সুতরাং পূর্ব্ব হইতে পরিচয় ছিল।)

* ভয়ত্রাতাকে পিতার ন্যায় ও বিপন্মুক্তাকে কন্যার ন্যায় দেখা উচিত, আমাদের শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশ। তবে এ সব স্থলে ব্যতিক্রম কেন?

† পূর্ব্বে বলিয়াছি, As You Like Itএ Celia ও Oliverএর প্রথমদর্শনে প্রণয়সঞ্চার ঘটিয়াছে। কিন্তু এই নাটকের মূল Lodge-এর Rosalindএ Saladin অর্থাৎ Oliver Aliena অর্থাৎ Celia-কে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ফলে উভয়ের অন্যোন্যানুরাগ জন্মে।

গোবিন্দলাল ও জলমগ্না রোহিণীকে উদ্ধার করিয়া শুশ্রূষা ও চিকিৎসা দ্বারা তাহার মৃতবৎ দেহে প্রাণসঞ্চার করেন [কৃষ্ণকান্তের উইল, ১ম খণ্ড ১৬শ পরিচ্ছেদ]। গোবিন্দলালের হৃদয়ে বোধ হয় সেই উপলক্ষে প্রণয়ের সঞ্চার হইল, তবে পূর্ব্ব হইতেই উভয়ের পরিচয় ছিল, এবং পূর্ব্বেই রোহিণীর প্রতি দয়া তাঁহার হৃদয় আর্দ্র করিয়াছিল ও রোহিণীর মনোভাব জানিয়া তাহার সহিত সমবেদনা জাগিয়াছিল। আর রোহিণীর হৃদয়ে পূর্ব্বরাগ-সঞ্চার এই ঘটনার পূর্ব্বেই হইয়াছিল, এমন কি, এই পূর্ব্বরাগের জন্যই রোহিণী জলমজ্জনে আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। [১ম খণ্ড ৭ম, ৮ম, ৯ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।] বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট এই উভয় ঘটনার অনুকরণে আমাদের সাহিত্যে আরও অনেক জলমগ্নার উদ্ধার হইয়াছে এবং কোথাও দোতরফা, কোথাও একতরফা, প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছে। যথা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছিন্নমুকুল,' শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী,' শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অশ্রু,' শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'পুণ্যের সংসার' ইত্যাদি। 'ভারতবর্ষে' সম্প্রতি প্রকাশিত 'বৈরাগ যোগ' ও উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে' ইহা লইয়া বেশ একটু মজা করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বর কমলাকে জলমজ্জন হইতে উদ্ধার করিয়াছিল; 'যেদিন সে ঘাটে সাঁতার দিতে গিয়া কিছুদূর ভাসিয়া গিয়াছিল, সেদিন বিশ্বেশ্বরই তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করে।...কমলা সেই ঘটনার পর হইতে এই তিন বৎসরে যত পুস্তক পড়িয়াছে, তাহাতে এরূপ স্থলে একই কথা লেখে।...উপরি উক্ত অনিবার্য্য নীতি অনুসারে সে তাহাকে ভালবাসিতে বাধ্য, বাসেও, অতএব বিশ্বেশ্বরই বা কেন না ভালবাসিবে?' ইত্যাদি (১ম পরিচ্ছেদ)।

যাক্, জলমজ্জনের চূড়ান্ত হইয়াছে। এক্ষণে অন্য প্রকারের বিপদুদ্ধারের দৃষ্টান্ত দিই। হরলাল একদিন রোহিণীকে দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিল (কৃষ্ণকান্তের উইল ১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ), ইহাতে রোহিণীর হৃদয় কৃতজ্ঞতাবশতঃ বোধ হয় একটু হরলালের অনুকূল হইয়াছিল। যাহাহউক এটা নিতান্ত নগণ্য দৃষ্টান্ত। (আর পরে গোবিন্দলাল-ঘটিত ব্যাপারে রোহিণীর হৃদয়ের গতি অন্যদিকে ফিরিল।) অমরনাথ রজনীকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার প্রেমে পড়িলেন ('রজনী,' ২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), তবে রজনীর হৃদয় পূর্ব্ব হইতেই শচীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরাগে পূর্ণ ছিল, সুতরাং তাহার মনে ভাবান্তর হইল না। 'বিবাহ কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নহে' 'রাধারাণী'তে কামাখ্যা বাবুর এই উক্তি (৩য় পরিচ্ছেদ) রজনীর বেলায় ঠিক খাটে; যদিও রজনী অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের বলে অমরনাথের সহিত বিবাহ-প্রস্তাবে অনিচ্ছাসত্বেও সম্মতি দিয়াছিল। 'রুক্মিণীকুমার' রাধারাণীকে দারিদ্র্য রাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করিলেন, এক মুহূর্ত্তের পরিচয়েই উভয়ের হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চার হইল। ঘটনা প্রথম পরিচ্ছেদে, ফলশ্রুতি ৩য় পরিচ্ছেদে (নায়িকার বেলায়, আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ) ও ৫ম পরিচ্ছেদে (নায়কের বেলায়)। "সেই রাত্রি অবধি, রুক্মিণীকুমারের একটী মানসিক প্রতিমা গড়িয়া আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে, রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া প্রত্যহ মনে মনে পূজা করে।" (সখী বসন্তকুমারীর এজাহার।) "আমি একরাত্রি মাত্র তাহাকে দেখিয়া—দেখিয়াছিই বা কেমন করিয়া বলি, এই আট বৎসরেও তাহাকে ভুলি নাই।" (নায়কের একরার।) নগেন্দ্রনাথ-কুন্দনন্দিনীর বেলায়ও পিতৃবিয়োগ বিধুরা-নিরাশ্রয়া কুন্দনন্দিনীকে আশ্রয়দানে প্রণয়ের উদ্ভব নহে কি? ভবানন্দ বিষমূর্চ্ছিতা কল্যাণীকে শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিয়া তাহার মৃতবৎ দেহে প্রাণসঞ্চার করিলেন ('আনন্দমঠ' ১ম খণ্ড ১৭শ পরিচ্ছেদ), সঙ্গে-সঙ্গে তাহার প্রেমে পড়িলেন [৩য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ]। "যে দিন তোমার প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত।" (ভবানন্দের একরার)। অবশ্য সতী সাধ্বী কল্যাণীর হৃদয় অকলুষিত ছিল। নবকুমার দস্যুহস্তে নিগৃহীতা মতিবিবিকে উদ্ধার করিলেন, কৃতজ্ঞতা প্রণয়ে ঘনীভূত হইলেই যথেষ্ট হইত, কিন্তু ইহার উপর আবার মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতী নবকুমারকে স্বামী বলিয়া চিনিল। ['কপালকুণ্ডলা' ২য় খণ্ড ১ম ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।] রমা বিপদে পড়িয়া গঙ্গারামকে ডাকাইলেন, এই বিপদে উদ্ধার-উপলক্ষে গঙ্গারামের হৃদয় মোহবিকৃত হইল, তবে এ ক্ষেত্রেও প্রথমদর্শনে প্রণয়-সঞ্চার হইয়াছিল। 'দেখিবামাত্র গঙ্গারাম মনে করিলেন, এমন সুন্দরী পৃথিবীতে

জন্মে নাই।' [সীতারাম ২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ৫ম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।] বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়াছেন ইহা প্রণয় নহে, এ একটা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি। রমার হৃদয় অবশ্য কল্যাণীর মত অকলুষিত ছিল।* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' নাটকে বাদশাহ-জাদা সেলিম ফরিদ খাঁর অত্যাচার-পীড়িতা অশ্রুমতীকে অভয় ও আশ্রয় দিলেন (২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য), ফলে অন্যোন্যানুরাগ জন্মিল (৩য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য দ্রষ্টব্য)। এ দৃষ্টান্তটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পুরুষ বীরত্ব, সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি দেখাইয়া নারীর বিপদ্উদ্ধার ও প্রাণরক্ষা করিবে, ইহাই স্বাভাবিক—বিশেষতঃ পৃথিবীর (Age of Chivalry) ক্ষাত্রযুগে। কিন্তু কতকগুলি স্থলে বিপরীত ব্যাপারও দেখা যায়। অর্থাৎ নারী করুণা-পরবশ হইয়া সাহস বা কৌশল-প্রয়োগে পুরুষের বিপদ্উদ্ধার করিতেছেন, নারীর হৃদয়ে যুগপৎ করুণা ও প্রণয়ের উদ্রেক হইতেছে। পুরুষ কৃতজ্ঞতাবশতঃ সেই প্রণয়ের প্রতিদান করিতেছে (অথবা কোথাও কোথাও প্রতিদান করিতেছে না।) গ্রীক পুরাণে জেসন্ ও মিডিয়া, থিসিউস্ ও এরিয়াড্নি ইহার দৃষ্টান্ত। হোমারের 'অডিসি'তে রাজকন্যা নসিকেয়াও বোধ হয় ইহার দৃষ্টান্ত। 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্বে' বুঝাইয়াছি যে কপালকুণ্ডলা অবিমিশ্র-করুণা-প্রণোদিত হইয়া নবকুমারের বিপদ্উদ্ধার করিয়াছিলেন, করুণা ও প্রণয়ের যৌগিক প্রভাবে নহে। ইহাই কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের বিশিষ্টতা। নারীর দয়ায় পুরুষের বিপদ্উদ্ধার কেমন একটা কাপুরুষোচিত, লজ্জাকর ব্যাপার, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারের মনে উক্ত ভাবের উদয় করাইয়াছেন;—'মনে-মনে ভাবিলেন, "এও কপালে ছিল!"' এবং মন্তব্য করিয়াছেন—'নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না। জানিলে এ দুঃখ করিতেন না।' ['কপালকুণ্ডলা', ১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।] কিন্তু ভীরু বাঙ্গালী বলিয়া এই আত্মধিক্কারের প্রয়োজন ছিল না। ইহা একটি মামুলি কাব্যকৌশল, গ্রীক বীর জেসন্ থিসিউস্ ইউলিসিস্ ত ভীরু ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকেও বিপৎকালে নারীর করুণার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহার পূর্ব্বেই নবকুমার-কপালকুণ্ডলার প্রথম দর্শন হইয়াছিল এবং যথা-নিয়মে নবকুমারের হৃদয়ে 'প্রথম দর্শনে' প্রণয়-সঞ্চারও হইয়াছিল, এই খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদ পাঠ করিলে তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। 'বহুক্ষণ দুইজনে চাহিয়া রহিলেন' 'এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল' ইত্যাদি বাক্য হইতেই নবকুমারের অবস্থা বুঝা যায়। তবে পরে বার বার কপালকুণ্ডলার দয়ায় বিপদ্উদ্ধার হওয়াতে যে নবকুমারের প্রণয় দৃঢ়মূল হইয়াছিল তাহাও নিঃসন্দেহ।

বীরত্ব ও সাহস যেমন পুরুষের ধর্ম্ম, করুণা মমতা সেবা শুশ্রূষা তেমনি নারীর ধর্ম্ম। ইংরেজ কবি বলিয়াছেন;—

When pain and anguish wring the brow
A ministering angel thou.* সুতরাং কাব্যজগতে দেখা যায় যে কোমলহৃদয়া নারী আহত বা পীড়িত পুরুষের সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে তাহার প্রতি প্রণয়বতী হইতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার করুণা ঘনীভূত হইয়া প্রণয়ে রূপান্তরিত হইতেছে, পুরুষও কৃতজ্ঞতাবশতঃ অনেক ক্ষেত্রে তাহার প্রতিদান করিতেছে।† তবে ইহা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিপদ্উদ্ধারের মত এক মুহূর্ত্তে ঘটে না, ক্রমে এই পরিণতি ঘটে। Romances of Chivalryতে দেখা যায় Tristan বা Tristram নামক বীর আহত হইয়া Yseult with the White Hands নাম্নী অপরিচিতা রমণীর শুশ্রূষা ও চিকিৎসার গুণে আরোগ্যলাভ করেন এবং কৃতজ্ঞচিত্তে উপকারিণী রাজকন্যাকে বিবাহ করেন (যদিও Tristanএর পূর্ব্ব হইতেই মাতুলানী অপর Yseultএর

* ইহার মধ্যে কোনও কোনও দৃষ্টান্ত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রণয় নহে, তথাপি এই সঙ্গেই প্রাসঙ্গিক-বোধে উল্লেখ করিলাম। বাস্তবিকপক্ষে এগুলি অবৈধ প্রণয়ের স্থল। কিন্তু বৈধই হউক অবৈধই হউক, প্রণয়-সঞ্চারের প্রণালী এক।

* ভূদেব বাবুর 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়ে' (২য় অধ্যায়ে) নারীর এই সেবাধর্ম্মের সুন্দর আলোচনা আছে। বিস্তৃতিভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

† এ ক্ষেত্রেও বলা যায়, এই করুণা নারীর মাতৃভাব। অথচ ইহা প্রণয়ে রূপান্তরিত হয় কেন? এ কি রহস্য?

তৈরী করছেন, জলখাবারের ব্যবস্থা করছেন;—মনে হোলো, আমরা যেন তাঁর পরম আত্মীয়। যোগেশ বাবুর শরীর ভাল নয়; কিন্তু তিনিও সে কথা ভুলে গেলেন; তিনি, এবং কলিকাতার অস্লার কোম্পানীর এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ও মহা ব্যস্ত হলেন। আমার ত লজ্জাই বোধ হ'তে লাগ্‌ল। বাবা এঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। তিনি বল্লেন, "আপনারা যদি এমন করেন, তা হ'লে আজই আমাদের পালিয়ে যেতে হবে।" কিন্তু কার কথা কে শোনে। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর খবর পাঠিয়ে দিলেন যে, আমরা যেন নটার সময় রাজবাড়ীতে যাই। যোগেশবাবু বল্লেন, "তা হ'লে, তার পূর্ব্বেই আপনাদের একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি।" জলযোগ শেষ করে আমরা সবাই, অর্থাৎ আমরা চারজন, আর দেবগড়ে যে কয়জন বাঙ্গালী আছেন, সবাই পদব্রজে সহর দেখ্‌তে বাহির হয়ে পড়লাম। প্রথমেই গেলাম জেলখানা দেখ্‌তে; কারণ, সেটী আমাদের বাসার কাছে। জেলে অনেকগুলি কয়েদী দেখ্‌লাম। তাদের দিয়ে নানা রকম কাজ করিয়ে লওয়া হয়। তার মধ্যে প্রধান কাজ হচ্চে কাপড় তৈরী। জেলের তৈরী কাপড়, আসন দেখলাম; কয়েদীরা মাটীর খেলনাও তৈরী করতে শিখেছে। স্বর্গীয় রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব মাইনে দিয়ে লোক রেখে, কয়েদীদের এই সব কাজ শিখাতেন। এখনও তাই চল্‌ছে। জেলখানার মধ্যে মেয়ে কয়েদীদের জন্য পৃথক স্থান আছে। তিনটী মেয়ে তখন জেলে আবদ্ধ ছিল। যোগেশ বাবু বল্লেন, মেয়েদের শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা হয় না; তাদের তুলো দেওয়া হয়, তারা তাই থেকে সূতো কাটে। জেলের সুমুখেই একটা বাড়ীতে জনকয়েক কয়েদী কাপড় বুন্‌ছিল। আমরা তাদের কাজ দেখ্‌লাম। সেখান থেকে গেলাম, নূতন যে হাসপাতাল ও ডিস্পেন্‌সারী তৈরী হচ্চে, তাই দেখ্‌তে। এই প্রকাণ্ড হাসপাতাল ও ডিস্পেন্‌সারীর নিৰ্ম্মাণ-কার্য্য স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরই আরম্ভ করে গিয়েছিলেন, শেষ করে যেতে পারেন নাই। এখন যে ভাবে কাজ চল্‌ছে, তাতে আর মাস দুইয়ের মধ্যেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে। শুন্‌লাম, এর জন্য প্ল্যান রাজা বাহাদুর নিজেই করেছেন। প্রকাণ্ড দুইটী দ্বিতল অট্টালিকা—একটা মেয়েদের হাসপাতাল, আর একটা পুরুষদের। বর্ত্তমান সময়ে সকল রকম বিশেষ ভাবে চিন্তা করে, বড়-বড় ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে মোটা-বেতনের ইঞ্জিনিয়াররা যে সব হাসপাতাল তৈরি করে থাকেন, স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর নিজেই সে সব ভেবে প্ল্যান করেছিলেন। তার পর ডিস্পেন্‌সারী,—তাতে মেয়েদের ও পুরুষদের ঔষধ নেবার ব্যবস্থা এমন করে করা হয়েছে যে, কারও সঙ্গে কারও দেখা-সাক্ষাৎ হবার যো নাই; এমন কি স্ত্রী-পুরুষের অস্ত্রোপচারও বিভিন্ন স্থানে হবার ব্যবস্থা হয়েছে। বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর প্রতিদিন নিজে নিৰ্ম্মাণ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে থাকেন। পিতার আরব্ধ কাজ শেষ করবার জন্য তাঁর যে কি আগ্রহ হয়েছে, তা আর বলা যায় না। এখান থেকে বাহির হয়েই আমরা বাজার দেখ্‌তে গেলাম। সহরের রাস্তা এমন পরিচ্ছন্ন, ড্রেনের এমন ব্যবস্থা যে, দেখলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। পথের ধারে একটু-একটু দূরেই জলের কল; কিছু দূরে-দূরে মেয়ে-পুরুষদের স্নানের জন্য চারিদিকে-দেওয়াল দেওয়া স্থান। তার মধ্যে শুধু-জলের কল নয়—মাথার উপর ঝাঁঝরা-পর্য্যন্ত আছে, ধারা-স্নানের কত সুবিধা। ভিতরে মেজেতে মার্ব্বেল পাথর দেওয়া। আমাদের কলিকাতার রাস্তার ধারের স্নানাগার এর কাছেও এগুতে পারে না। বাজারটা দেখ্‌লাম ছোট; কিন্তু ঠিক আমাদের কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের মত। তেমনি ষ্টল; তেমনি ইলেক্‌ট্রিক আলোর বন্দোবস্ত, তেমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সারাদিনই বাজার থাকে। তবে জিনিসপত্র অতি কম—ক্রেতা যে সবই গরিব লোক। বাজার দেখা হ'লে আমরা গেলাম 'পটারী' দেখ্‌তে। স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর এই 'পটারী' প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। শুন্‌লাম, রাজ্যের মধ্যে নানা স্থানের মাটী নিজে পরীক্ষা করে, একটা স্থানের মাটী পছন্দ করেন। তার পর নানা স্থান থেকে কারিগর এনে এবং নিজে হাতে কাজ করে, তাঁর প্রজার মধ্যে কয়েকজনকে নানা রকম পুতুল, বড়-বড় লোকের প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি তৈরী করতে শেখান; কল বসিয়ে খুব সুন্দর টাইল প্রস্তুত করা আরম্ভ করেন। এখানকার কাজ খুব ভাল চল্‌ছে; বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর এই পটারীর তৈরী পুতুল, প্রতিমূর্ত্তি ও টাইল প্রভৃতি কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে পাঠিয়ে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। তাতে এই পটারীর কাজ আরও বেড়ে যাবে

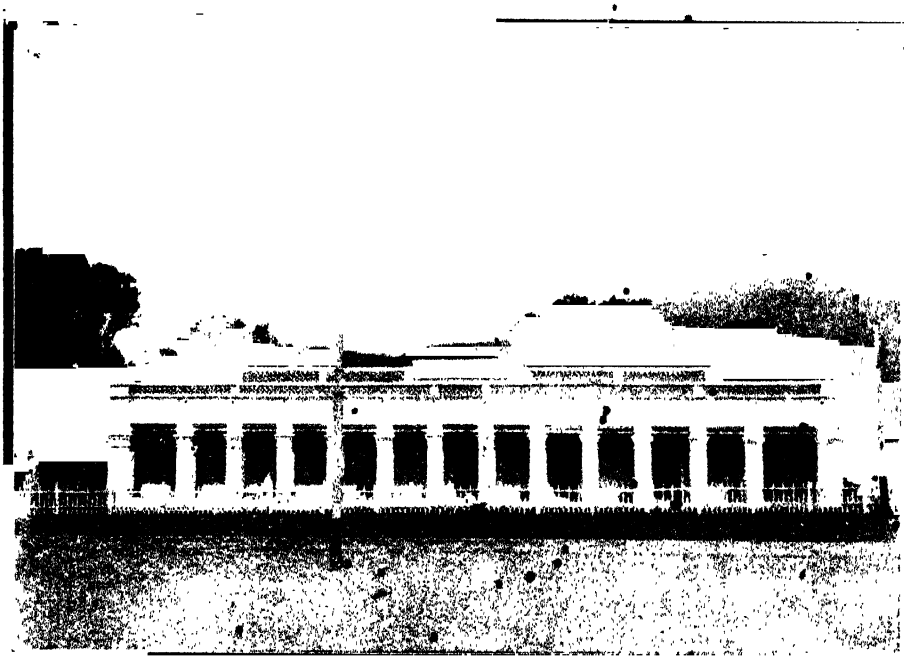
এবং যথেষ্ট আরামও হবে। পটারী দেখ্‌তেই আমাদের অনেক সময় লাগ্‌ল,—বেলা প্রায় নয়টা বাজে কাজেই তাড়াতাড়ি আমরা রাজদর্শন করবার জন্য রাজবাড়ী গেলাম। রাজবাড়ী বড় নয় [illegible] বড় ক'রে নানা বিলাস দ্রব্যে বোঝাই করবার ইচ্ছা স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরেরও ছিল না, বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরেরও নেই। যে টাকা বৃহৎ অট্টালিকায় ও বিলাস বাসনে ব্যয় হবে তাতে দেশের হিতকর অনেক কাজ হ'তে পারে এই তাঁদের মনের ভাব। রাজ-প্রাসাদের দ্বারে সিপাহী পাহারা মোটেই নেই—অবারিত দ্বার। প্রাসাদের মধ্যে শোভা সৌন্দর্য্য, পারিপাট্যের কোন চিহ্ন নাই সব সাদাসিধে,—আমরা যে রাজভবনে প্রবেশ করলাম, তা একবারও মনে হোলো না। মনে হোলো, যেন কোন সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে এসেছি।

একটা ছোট সতরঞ্চ বিছানায় ব'সে আমরা রাজা বাহাদুরের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লাম। একটু পরেই রাজা বাহাদুর সহাস্য বদনে এলেন, আমরা সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করলাম। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ জাঁকাল মত কিছুই নেই—ধুতি জামা পরা, তাও নিতান্ত সাদাসিধে। তিনি বাবা ও রতন কাকার সঙ্গে নানা আলাপ করলেন, খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। তাঁকে দেখেই মনে হোলো, তিনি অতি সরল-চেতা, অতি পরিশ্রমশীল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরই তিনি চারিদিক ঘুরে দেখ্‌বার জন্য মোটরে চড়ে চলে গেলেন, আমরা যোগেশ বাবুর সঙ্গে তাঁর বাসার দিকে অগ্রসর হলাম। পথের পার্শ্বেই একটা সুদৃশ্য ও কারুকার্য্যখচিত অট্টালিকার মধ্যে স্বর্গীয় রাজা সার বাসুদেব সুটলদেবের শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত প্রমাণ মূর্ত্তি দেখ্‌লাম। তার পরই আমরা ক্লাবে গেলাম। ক্লাবে খেলাধূলার সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে। ক্লাবের পার্শ্বেই আর একটি অনতি বৃহৎ সুন্দর অট্টালিকায় রাজ পুস্তকালয়। পুস্তকালয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও উড়িয়া পুস্তক অনেক আছে, সংবাদপত্রও আছে। তাহারই নিকটে আর একটা বাড়ীতে ছাপাখানা। এই ছাপাখানা হইতেই 'সম্বলপুর হিতৈষী' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। রাজ-ষ্টেট হইতেই এই কাগজের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হ'য়ে থাকে। কাগজের সম্পাদক মহাশয়ের সহিত আলাপ হোলো,—বেশ পণ্ডিত লোক। রাস্তার অপর পার্শ্বে হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু বাবার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু, খিদিরপুরে তাঁর বাড়ী। তিনি এখানে শুধু ঔষধ বিতরণ করেন না, [illegible] করতে হয়। কম্পাউণ্ডারী ও মোটামুটি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য একটা ক্লাস আছে। সেই [illegible] ছাত্রদিগের শিক্ষাদানের ভারও অমূল্য বাবুর উপর। শুনেছি আগে এখানকার লোকে বিলাতী ঔষধ ব্যবহার করতে চাইত না, রোগীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে জোর করে [illegible] খাওয়াতে হোতো, [illegible] মাথার উপর তারই পরিচয়ও রয়েছে। সে একটা [illegible]। একজন লোক কিছুতেই [illegible], তাকে জোর করে ধরে ডাক্তার বাবু [illegible] দিয়েছিলেন। আরও এখন শুনলাম, [illegible] ডাক্তার [illegible] দেখে আমরা বাসায় ফিরে এলাম। বাসার সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড সুন্দর [illegible]। সেইটা রাজ ইংরেজী বিদ্যালয়। এখানে [illegible] প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়ান হয়। [illegible] পরীক্ষার [illegible] হয়েছেন। এই রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের কথা এখানে বিশেষ ক'রে উল্লেখ করতে হবে, কারণ, এই শিক্ষা বিস্তার স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। [illegible] বিদ্যালয়ে হিন্দুর ছেলেরা পড়ে। যাহারা অনার্য্য, তাহাদের ছেলেদের পড়াবার জন্য বিদ্যালয় আছে, তাহার নাম 'অনার্য্য বিদ্যালয়'। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। শুধু এখানে নয়, রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বত্র এই প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালা আছে। এই দুইটা বিদ্যালয় ব্যতীত, দেবগড়ে একটা বালিকা বিদ্যালয়, একটা সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, একটা জ্যোতিষ বিদ্যালয় আছে। কোন বিদ্যালয়েই ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হয় না,—বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নিজের পয়সায় কিনতে হয় না—সমস্ত রাজ-ষ্টেট থেকে দেওয়া হয়। তা ছাড়া, যে সব ছেলে দূর স্থান থেকে আসে, তাদের জন্য বোর্ডিং আছে, তার সমস্ত ব্যয় রাজ-সরকার থেকে দেওয়া হয়। রাজ্যের মধ্যে যেখানে যে বিদ্যালয় আছে, সব স্থানেই এই ব্যবস্থা। আরও একটা নিয়ম আছে। রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বত্রই হিন্দু-ছেলেদের স্কুলে পড়িতে দিতেই হইবে, কোন

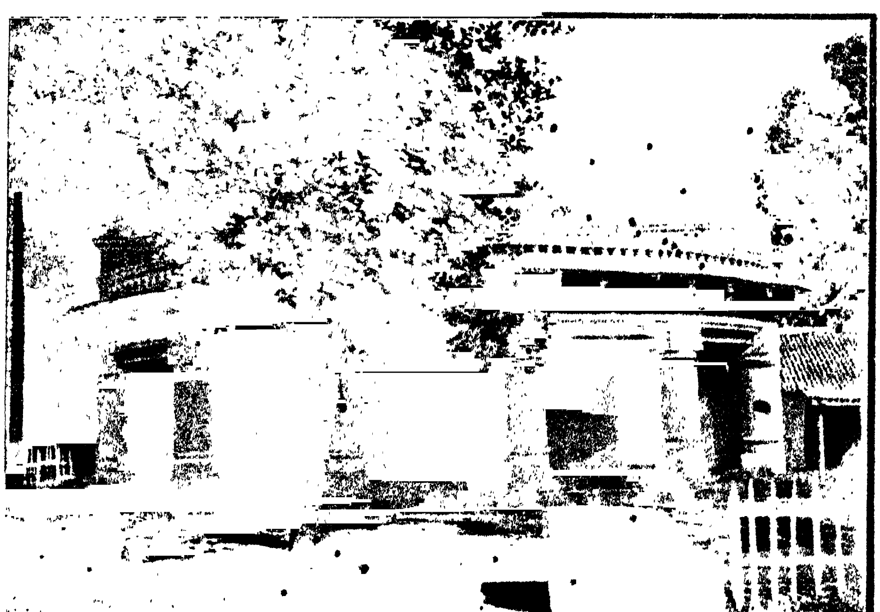
গৃহস্থই ছেলেকে মূর্খ করিয়া ঘরে বসাইয়া রাখিতে পারিবে না; সকলকেই ছেলে স্কুলে পাঠাইতেই হইবে। যদি কেউ বড় গরিব বলে যে, তাহার ছেলে ক্ষেতে কাজ না করলে তাহার চলে না,—তাহা হইলে সেই ছেলের পরিবর্তে লোক রাখলে যে খরচ হয়, সম্ভবমত তাহা ষ্টেট হইতে সেই ছেলের অভিভাবককে দেওয়া হয়। ছেলেকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইতে হইলে, উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে রাজার নিকট আবেদন করতে হয়; রাজা সে কারণ সঙ্গত মনে করলে ছেলেকে যাইতে দেন। শিক্ষা-বিস্তারের এমন সুব্যবস্থার কথা আমি ত আর কোথাও শুনি নাই। শুধু কি তাই! এই রাজ্যের মধ্যে যে নানা রকম কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে, তাতে এখন সবই দিশী লোক,—রাজার প্রজারাই কাজ করে। তাদের এই সব কাজ শিখ্‌বার জন্য প্রথম-প্রথম বিদেশ থেকে লোক আনা হয়েছিল; তার পর যেই দেশের লোকেরা কাজ-কর্ম্ম শিখে নিল, আর অমনি বিদেশী লোক বিদায় হ'লেন। সেই জন্যই এখানে বাঙ্গালী চাকুরে এত কম। যে সব কাজের উপযুক্ত লোক দেশের প্রজার মধ্যে এখনও তৈরী হয় নাই, সেই সব কাজেই বাঙ্গালী রয়েছেন। ক্রমে তাও থাক্‌বে না; কারণ, স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর স্পষ্ট আদেশ প্রচার করেছিলেন যে, তাঁর প্রজার মধ্যে যারা যে কার্য্যের উপযুক্ত হবে, রাজ্যের মধ্যেই তাদের সে কাজ দেওয়া হবে। এ সব কথা শুন্‌লেও আনন্দ হয়—দেখ্‌লে যে কি মনে হয়, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

বিকালবেলা আমরা কি-কি দেখ্‌তে যাব, তার প্রোগ্রাম রাজা বাহাদুর নিজেই স্থির করে, শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুকে খবর পাঠিয়ে দিলেন। সে স্থানগুলি সহর হইতে একটু দূরে; তাই বেলা তিনটার সময় রাজা-বাহাদুর বড় মোটর পাঠিয়ে দিলেন। যোগেশবাবু আমাদের সঙ্গী হলেন। প্রথমেই আমরা নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত 'বসন্ত-নিবাস' নামক রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম। স্বর্গীয় রাজা সচ্চিদানন্দ এই স্থানে গ্রীষ্ম ও বসন্তকাল অতিবাহিত করতেন; এবং এই মনোরম স্থানে অবস্থিতি সময়েই তিনি বাণীর আরাধনা করতেন। এই বসন্ত-নিবাসের উঠানে দাঁড়াইয়া অদূরে একটী সুন্দর জলপ্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্ত-নিবাসের চারিদিকে রেলিংয়ের গায়ে যে সব স্তম্ভ আছে, তাতে উড়িষ্যাদেশের বড়-বড় কবিদিগের কবি খোদিত আছে। 'বসন্ত-নিবাসে'র আর একটু উপরেই আ একটী প্রাসাদ; তাহার নাম 'বসন্ত-ধাম'। এই দুইটী প্রাসা বেশ সুসজ্জিত,—সম্ভ্রান্ত অতিথিদিগের সমাগম হইলে তাঁহা দিগকে এখানেই বাসা দেওয়া হয়। ইহারই নিকটে আ একটী ক্ষুদ্র অথচ মনোরম অট্টালিকা আছে, তাহার না 'ললিত-বসন্ত'। এই কয়টী স্থানেই স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরে স্বহস্ত-অঙ্কিত অনেকগুলি তৈল-চিত্র ও অন্যান্য চিত্র আছে এই ছবিগুলি দেখ্‌লেই বুঝতে পারা যায় যে, রাজা বাহাদুর একজন উৎকৃষ্ট চিত্রকর ছিলেন। এই সব দেখে মনে হচ্ছিল যে, স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এমন কাজ নেই, এমন বিষয় নেই, যাতে তিনি অসাধারণ দক্ষতা না দেখিয়েছেন। একাধারে এত গুণ,—বিশেষতঃ রাজা-রাজড়ার মধ্যে,—অতি কমই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এই তিনটী ভবন দেখা হ'লে, যোগেশবাবু আমাদের একেবারে পূর্ব্বোক্ত ঝরণার নিকটে নিয়ে গেলেন। ঝরণার নিকটে যাবার জন্য সুন্দর পথ তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে, যেখানে ঝরণার জল পড়ছে, ঠিক সেইখানে উপস্থিত হলাম। এতক্ষণ ভয়ানক গ্রীষ্ম বোধ হচ্ছিল,—ঝরণার পদতলে গিয়ে একেবারে শরীর জুড়িয়ে গেল। কি যে সুন্দর স্থান, তা আর বলা যায় না। যতীন কাকা কবি মানুষ, তিনি ত সেইখানে একখানি আসনে বসে, হাঁ ক'রে সেই জল-প্রপাতের শোভা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর এই স্থানটীকে এমন সুন্দর ভাবে রেখেছিলেন যে, দেখলেই বুঝ্‌তে পারা যায় যে, এই জলপ্রপাতের শোভা দেখে তাঁর কবি-হৃদয় আকুল হয়ে পড়েছিল। তাই এই প্রপাতে আস্‌বার রাস্তা এত সুন্দর করে তৈরী করে দিয়েছিলেন। দেবগড়ের শিল্পীদের দিয়ে মাটীর বড়-বড় সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ, ময়ূর, সর্প প্রভৃতি তৈরী করে, এখানে চারিদিকে সুন্দর স্থানে বসিয়ে দিয়েছেন; দেখলেই মনে হয়, যেন তারা প্রপাতের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে এই রকম মাটীর তৈরী প্রকাণ্ড সাপ দেখে ত বাবা একেবারে চম্‌কে উঠেছিলেন। বোধ হয়, তাঁর মনে হয়েছিল, একটা প্রকাণ্ড জীবিত সাপ পাহাড়ের গর্ত্তের মধ্যে মাথা লুকিয়ে ফেলেছে, তার শরীরের এক অংশ দেখা



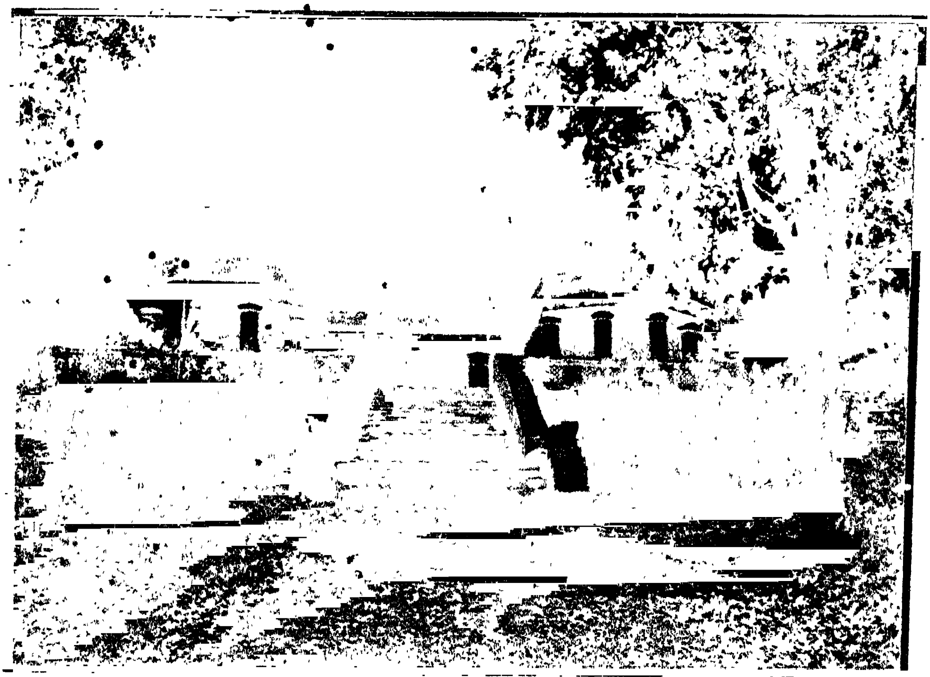
দেবগড়—রেকট হল



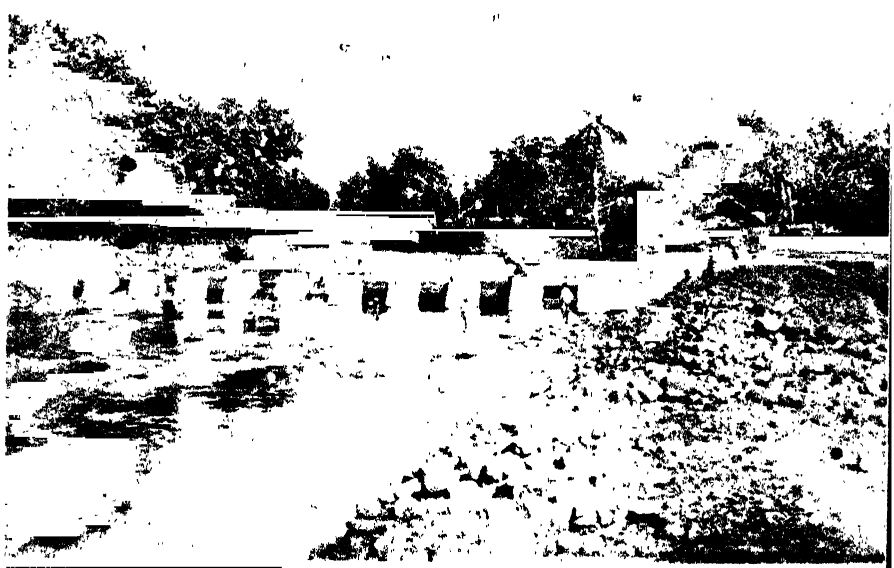
দেবগড়—রব

যাচ্ছে। যোগেশবাবু যখন তাঁর ভ্রম ভেঙ্গে দিয়ে বললেন, যে, এ সব এখানকার একজন আটটাকা বেতনের লোকের তৈরী, তখন সকলেই সেই শিল্পীর সাধুবাদ করতে লাগলেন। এই ঝরণার জলে কাউকে নামতে দেওয়া হয় না,—সারাদিন এখানে প্রহরী নিযুক্ত আছে; কারণ, এই প্রপাতের জলই নলের সাহায্যে নিয়ে গিয়ে সহরের পথে-পথে বাড়ীতে-বাড়ীতে সরবরাহ করা হয়।

বেলা গেল দেখে, আমরা প্রপাত দেখা শেষ করে,

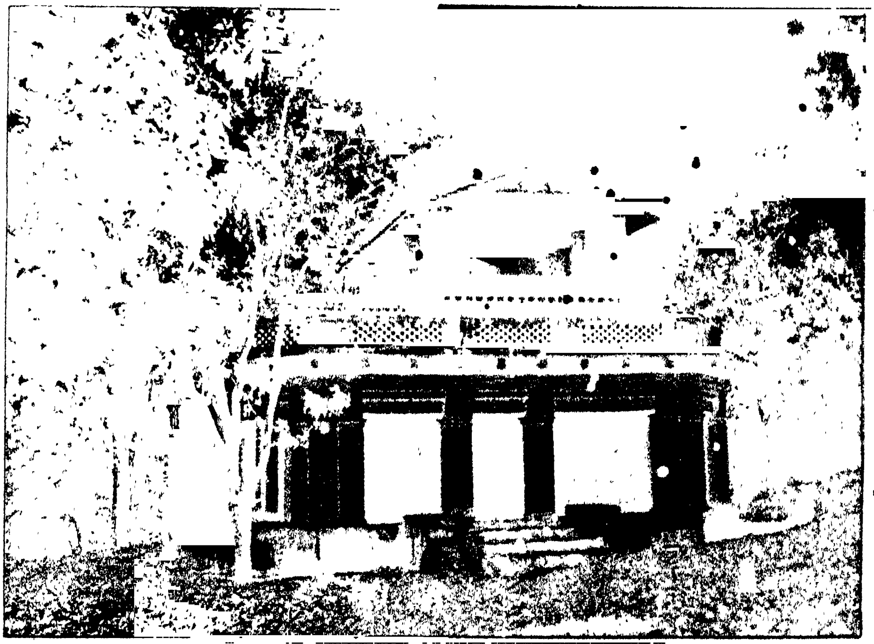


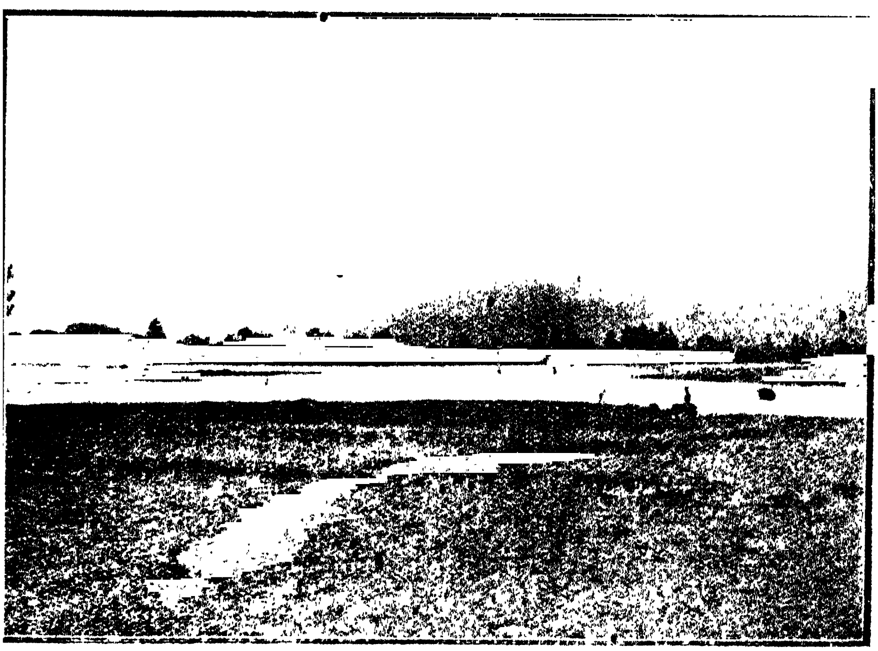
বলম পাহাড়ের উপর বাড়ী



বলম এনিকাট

পাহাড় থেকে নেমে এসে রাজ-উদ্যান দেখতে গেলাম। এ দলের বাগান। বাগানটা খুব বড়। বাগানের স্থানে স্থানে উদ্যানে কিছু প্রমোদ ভবন নেই। উদ্যান থাকে থাকে, দেশী কারিগরদের প্রস্তুত মাটির মূর্তি। আমরা প্রাতঃকালে এটা তাই। দলের বাগান, পাকে সকার বাগান, আর একটা অট্টালিকায় স্বর্গীয় রাজা স্যর বাসুদেব সুতলদেবের





বরকত [illegible]

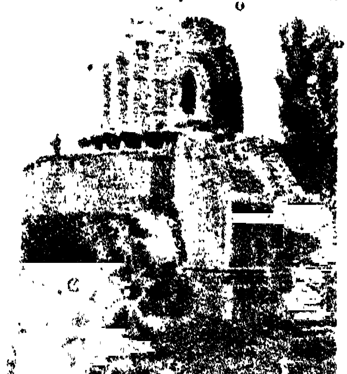
শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত মূর্ত্তি দেখেছিলাম। অনেক হাজার টাকা ব্যয় করে, বিলাতের বড় শিল্পী দিয়ে সেই মূর্ত্তি তৈরী করে আনা হয়েছিল। সেই মূর্ত্তি দেখে দেবগড়ের গ্রামের আটটাকা বেতনের দেশী শিল্পী সার বাসুদেবের এক প্রস্তর [illegible] [illegible] [illegible], সাহেবদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। বেতনের উড়িয়া কারিগরের মাটির-গড়া মূর্ত্তি অনেক ভাল













১। নাগা জাতি ২। কেলসাল রোড—শিলং ৩। চুনারবাগে যাইবার পথে সেতু ৪। গমনোন্মুখ উষ্ট্র
৫। তক্ত-ই-সোলিমান—কাশ্মীর ৬। কাশ্মীর মহারাজের প্রাসাদ—শ্রীনগর

টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কিম (১)

[শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার, এ-এম্, সি-এস্-টি, ম্যানচেস্টার]



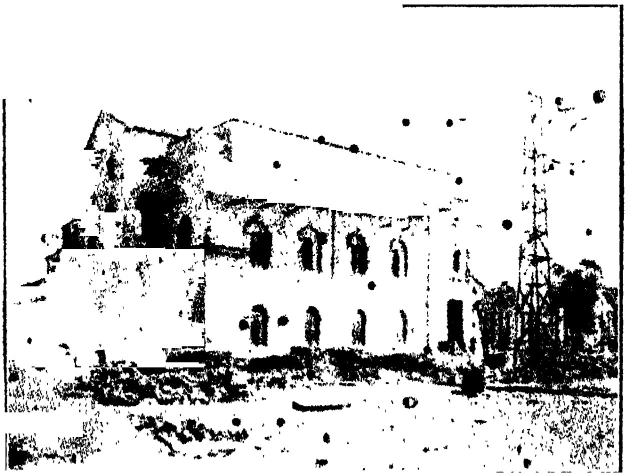
বোম্বাইয়ে তুলার কলে ইলেকট্রিক মোটর



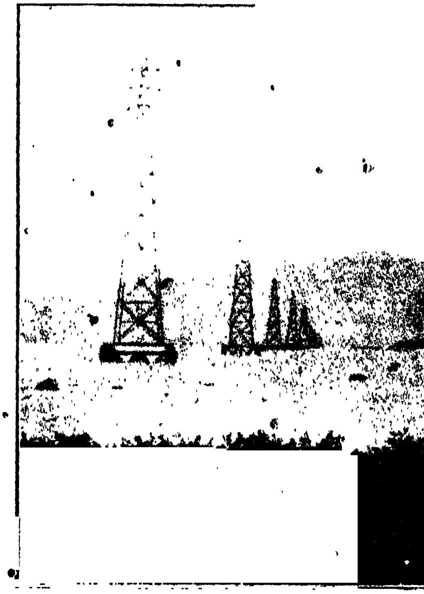
পাওয়ার হাউসের অভ্যন্তর-ভাগ

বোম্বাইয়ে অবস্থিত ৩০টি কাপড়ের কলে বৈদ্যুতিক শক্তি জোগাইবার জন্য "টাটা হাইড্রো ইলেকট্রিক স্কিম" গঠিত হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি সহজ-লভ্য ও সস্তা হওয়ায়, তথায় আরও অনেক কাপড়ের কল ও অন্যান্য কারখানা বসিবে, এরূপও আশা করা যায়। টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কিম খুলিবার সময় একটি সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। বোম্বাইয়ে যে ৩০টি কাপড়ের কল আছে, তাহা চালাইবার জন্য

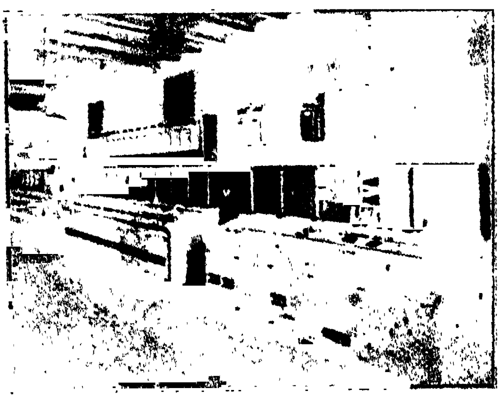
(১) জেম্‌সেদপুর এ্যাসোসিয়েসনের সাহিত্য সভায় পঠিত।



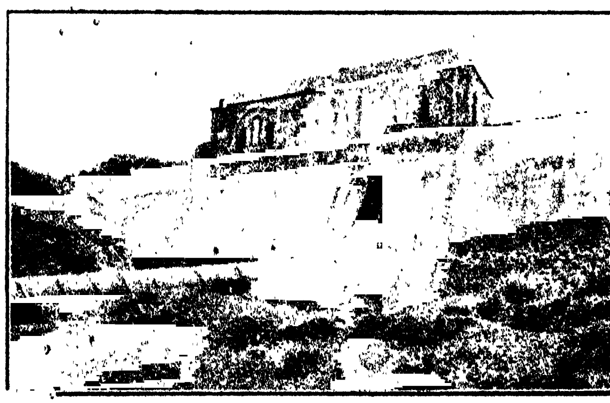
পাওয়ার হাউস (অন্যদিক)



বোম্বাইগামী তারের স্তম্ভ



সুইচ্‌বোর্ড



পাওয়ার হাউস (একদিক)

প্রত্যেকেরই ষ্টিম্ এঞ্জিন্ (Steam Engine) ছিল; বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করিতে হইলে, সে এঞ্জিন্- (Engine)গুলির কোন আবশ্যকতা থাকে না,—কাজেই তাহাদিগকে বসাইয়া রাখিতে হয়। অবশ্য কাপড়ের কলওয়ালারা তাহাদের এঞ্জিনে কয়লা পোড়াইয়া ও লোক-জনের মাহিনা দিয়া যে খরচে 'শক্তি' পাইতেছিল, তাহা অপেক্ষা সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাইলে এ বিষয়ে রাজি হওয়া তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করিতে হইলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া বৈদ্যুতিক মোটর কেনা ও তাহা বসানো আবশ্যক। এত টাকা একেবারে খরচ করিতে অনেকেই নারাজ হইয়া পড়িলেন। তখন হাইড্রো-ইলেকট্রিক কোং প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহারাই বৈদ্যুতিক মোটর সরবরাহ করিবেন, এবং তাহার জন্য প্রতি ইউনিটে (One Unit, i.e., one killowatt hour) ৵১২॥ পয়সা হারে মূল্য ধার্য্য করিবেন; আর যেখানে তাঁহার মোটর দিবেন না, সেখানে প্রতি ইউনিটের জন্য ৵১০ মাত্র হারে মূল্য ধার্য্য হইবে। কলিকাতায় মোটরের জন্য প্রতি ইউনিটের মূল্যের হার দুই

আনা। অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া মোটর ক্রয় করা অপেক্ষা, ২।। আড়াই পয়সা হারে ইউনিট দিয়া, মোটর ও বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া কাপড়ের কলওয়ালাগণের পক্ষে বিশেষ লাভ। এ ক্ষেত্রে তফাৎ ২।। আধ পয়সা মাত্র হইলেও, উহা একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। ধরুন, একটি ১০০ কিলোওয়াট মোটর (100 killowatt = 133 Horse power) প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৫০ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিলে, বৎসরে প্রায় ২৬০,০০০ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়। দুই পয়সা করিয়া ইউনিট হইলে তাহার দাম ৮১০০৲ টাকা ও আড়াই পয়সা করিয়া হইলে ৮৯১০৲ টাকা। সাধারণতঃ একটি মোটর ১৫ বৎসর কার্য্য করিতে সমর্থ। কাপড়ের কলওয়ালার মালিক ঐ মোটরটি ক্রয় করিলে, তাঁহাকে এক সঙ্গে সমস্ত টাকা দিতে হয়। কিন্তু তিনি প্রতি ইউনিটে আধ পয়সা হিসাবে বেশি দিয়া, ঐরূপ একটি মোটর যদি টাটা কোম্পানির নিকট হইতে ভাড়া লন, তাহা হইলে দশ বৎসর পরে খতিয়ানের সময় দেখা যাইবে যে, শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে চক্রবৃদ্ধি সুদসহ মোটরের দাম, ঐরূপ সুদসহ ১০ বৎসরের মোটরের ভাড়া অপেক্ষা প্রায় হাজার টাকা কম। উপরন্তু, মোটরটি সে ক্ষেত্রে কারখানার মালিকেরই থাকিয়া যায়। এই সামান্য আধ পয়সা চলতি খরচ কোন কারখানায় কমাইতে পারিলে কত লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচান যায়। (২)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই স্কিমটি, হাইড্রো-ইলেক্ট্রিকের যতগুলি সুবিধা পাওয়া আবশ্যক, প্রায় সে সবগুলিই পাইয়াছে। কিন্তু তবু অনেক বড়-বড় এঞ্জিনিয়ার ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই কারণেই কোম্পানী যখন বিলাতে তাঁহাদের শেয়ার (Share) বিক্রয়ের চেষ্টা করেন, তখন সেখানে কেহই তাহা লন নাই। এখন অবশ্য অনেকে পস্তাইতেছেন। মেজর জেনারেল বেরেসফোর্ড লভেট বলিয়াছিলেন, "টাটা কোম্পানী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহীশূর, কাশ্মীর, সিমলা ইত্যাদি হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক স্কিমের মত গভর্ণমেণ্ট কিম্বা মিউনিসিপ্যালিটি হইতে কোনরূপ অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। টাটা কোম্পানী প্রথমে লণ্ডনের ধন-কুবেরগণের নিকট হইতে সাহায্য পাইতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। অবশেষে পার্শী ব্যবসায়িগণ নিজেরাই প্রায় সমস্ত মূলধনের টাকা প্রদান করেন। এই স্কিমের প্রতিষ্ঠা এদেশে অসমসাহসিকতার পরিচায়ক। ধরুন, এক হাজার কোটি ঘনফুট জল বর্ষার সময় ধরিয়া রাখা সামান্য ব্যাপার নয়।" আবার বড়-বড় জলপ্রপাত হইতে জল সংগ্রহের জন্য কল বসাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে।

হ্রদ ও বাঁধ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনটি উপত্যকার উপর পাথরের বাঁধ দিয়া তিনটি হ্রদ প্রস্তুত করা হইয়াছে। তিনটি বাঁধে এত মাল-মসলা খরচ হইয়াছে যে, তাহা দিয়া কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং রেলের রাস্তার উপর বরাবর এক মানুষ উঁচু ও ২ ফিট প্রশস্ত একটি প্রাচীর গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ঐ তিনটি হ্রদে এত জল সঞ্চিত থাকে যে, তদ্দ্বারা একখানি ষ্টীমার গমনের উপযোগী পৃথিবীর চতুর্দ্দিক দিয়া ১৭ ফিট প্রশস্ত ও ৪ ফিট গভীর একটি খাল পূর্ণ হইতে পারে। ইহা হইতে, ব্যাপারটি কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমেয়।

খাল

তিনটি হ্রদ হইতে, খাল কাটিয়া, জল একটি ছোট পুকুরে (Fore bay) আনা হয়। ঐ খালের মধ্যে যে জল থাকে, তদ্দ্বারা ১২০ হাজার অশ্ব শক্তি (Horse-power) উৎপাদিত হইতে পারে। ঐ খাল কাটিবার সময় নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি টানেল কাট (Tunnel cuts) প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। এই খালের ভিতর দিয়া জল আসিয়া যে পুকুরে পড়ে, তাহাতে ইচ্ছামত জল রাখিবার ও ছাড়িবার জন্য পাইপ, কপাট ও নানারূপ আবশ্যকানুযায়ী কলকব্জা সংযুক্ত আছে।

পাইপ লাইন (Pipe line)

সেই পুকুর হইতে জল, লোহার নলের সাহায্যে, উঁচু-নীচু পাহাড়ের উপর দিয়া, নীচে বিদ্যুতাগারে আসে।

(২) মিঃ ডিকিন্‌সন নামক একজন ইংরেজ এঞ্জিনিয়ার "দি বোম্বে হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক স্কিম্" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বিলাতে The Institution of Electrical Engineers গৃহে পাঠ করেন। প্রবন্ধটি ১৯১৫ সালের ১৫ই মে তত্রত্য কাগজে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের অনেক অংশ সেই সন্দর্ভ হইতে গৃহীত।

যখন জল ঐ নলের ভিতর দিয়া নীচে আসে, তখন তাহার শক্তি অত্যধিক হয়। পৃথিবীতে আর কোথাও জলের এত অধিক শক্তি পাইপ দিয়া আঁটান হয় নাই। পাইপ স্থানে-স্থানে ৬ হইতে ৭ ফিট পর্য্যন্ত মোটা, ১৩ হাজার ফিট লম্বা। জল প্রায় ১৭২৫ ফিট নীচে আসিয়া পড়িতেছে, এজন্য এখানে জলের চাপ প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে প্রায় ৭৩৪ পাউণ্ড। বয়লার (Boiler) মধ্যে ষ্টিমের (Steam) চাপ অত্যধিক হইলেও, তাহা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৭৫ পাউণ্ডের বেশী সাধারণতঃ হয় না। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নায়গারা প্রপাতে জলের চাপ অধিক বলিয়া বিদিত ছিল; কিন্তু সেই বিশ্ব-বিশ্রুত নায়গারা প্রপাতের উচ্চতা মোটে ১৪৩ ফিট; অর্থাৎ টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিকের কৃত্রিম প্রপাত ইহা অপেক্ষা দশগুণেরও অধিক উচ্চ।

বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিতে চলতি খরচ কিছুই নাই বলিলেই হয়। তথাপি অনেক এন্‌জিনিয়ার বলেন যে, জল প্রপাত হইতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি যেরূপ মূল্যে দেওয়া যায়, কয়লা পোড়াইয়া, অধিক পরিমাণে শক্তি উৎপাদিত করিয়াও, ঐরূপ দরে দেওয়া যাইতে পারে। অনেক এন্‌জিনিয়ার তাহার যুক্তিও প্রদর্শন করেন; কিন্তু মিঃ ডিকিন্‌সন্‌ ও সকল মতের খণ্ডন করেন। অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমের পর টাটা হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক স্কিম যেরূপ সুচারু রূপে চলিতেছে, তাহাতে কোম্পানীর ডাইরেক্‌টারগণের দূরদর্শিতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। গত যুদ্ধের সময় কয়লা যখন ৬গুণ দর হইয়া উঠিয়াছিল, তখন যদি বোম্বাইয়ের ৯০টি কাপড়ের কলের জন্য কয়লা আবশ্যক হইত, তাহা হইলে কয়লার মূল্য আরও বাড়িয়া যাইত, অথবা কয়লার অভাবে অনেক কাপড়ের কল বন্ধ করিতে হইত।

যে কোন জিনিস হউক না কেন, শিল্প বুদ্ধির সংস্পর্শে আসিলে, তাহা হইতে অনেক বৃহৎ ব্যাপার সাধিত হয়। বৃষ্টির জল চারিদিক ধৌত করিয়া, খাল বিল নালা হইয়া, ক্রমে কত দিকে কত দেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়া, অবশেষে সাগরে পড়ে। কিন্তু বর্ষার জল ঐরূপে যাইতে না দিয়া যদি সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে কত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই টাটা হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক স্কিম। পশ্চিম-ঘাট পাহাড়ের উপর পতিত অজস্র বর্ষা-বারি পূর্ব্বে যদৃচ্ছাক্রমে বহিয়া যাইত। কিন্তু এখন সেই জল ধরিয়া ও তদ্দ্বারা সাংবৎসর এই বৃহৎ বিদ্যুতাগারের কল চালাইবার জন্য পাহাড়ে উপর তিনটি উপত্যকায়—লোনাভোলা, ওয়ালন ও সিরোওটায়—বাঁধ দিয়া তিনটি বৃহৎ হ্রদ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

এই তিনটি হ্রদ হইতে খাল কাটিয়া জল লইয়া গিয়া একটি ছোট পুকুরে (Fore bay) রাখা হইতেছে; এবং তথা হইতে সেই জল লোহার ১৩ হাজার ফিট লম্বা নল দিয়া ১৭৫০ ফিট নীচে পাওয়ার হাউস (Power House) গিয়া পড়িয়া, নিজ শক্তিতে কল চালাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতেছে। বোম্বাই হইতে পাওয়ার হাউসের দূরত্ব তীরের মত সোজা পথে ৪৩ মাইল। বর্ত্তমানে পাওয়ার হাউসে ১১ হাজার অশ্ব শক্তি (Horse Power) সম্পন্ন ৮টা কল চলিতেছে; পাওয়ার হাউস (Power House) প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ৭৩৪ পাউণ্ড চাপযুক্ত জল টারবাইন (Turbine) চালাইয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিতেছে। জলের সমস্ত শক্তিই বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয় না; শতকরা ৫৮৬ অংশ মাত্র শক্তি পাওয়া যায়। বাকী অংশ শক্তি-প্রস্তুত-কালে এবং তাহা তার দিয়া পাঠাইতে ও মোটর চালাইতে নষ্ট হইয়া যায়। কয়লা পোড়াইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে শতকরা মোটে ১২ অংশ বিদ্যুৎ পাওয়া যায়; আর সব নষ্ট হয়। টাটা কোম্পানীর একটি ১১ হাজার অশ্ব-শক্তি-(Horse Power) সম্পন্ন কলে এই নষ্ট-শক্তির যদি শতকরা এক অংশও বাঁচান যায়, তবে বৎসরে ২২ হাজার টাকার উপরে লাভ হয়। টাটা কোম্পানী সমস্ত পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিয়া থাকেন। একবার মনে করুন দেখি, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে যে সকল দেশে কৃষি শিল্পের জন্য পশু ও মানুষের শক্তির সাহায্য লওয়া হয়, সেই সকল স্থান ব্যতীত, অন্যান্য সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য ও কৃষির জন্য কলের সাহায্য লওয়া হয়। সেই সকল কলে যে শক্তি নষ্ট হয়, যদি তাহার শতকরা এক অংশ মাত্র বাঁচান যায়, তবে কত টাকা বাঁচে। আজ-কাল যদিও কলকারখানার মালিকেরা অজস্র টাকা দিয়া ভাল-ভাল এন্‌জিনিয়ার রাখিতেছেন, কিন্তু তবুও নূতন রকমের ভাল কল উদ্ভাবন এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের অধিবাসীদিগকে নানারূপ সুবিধা প্রদান, ইত্যাদি অনেক কার্য্য এন্‌জিনিয়ারদিগের জন্য

এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। এজন্য এন্‌জিনিয়ারদিগের ব্যবসাক্ষেত্র বহু-বিস্তৃত।

প্রত্যেক জলচক্র (Turbine) একটি করিয়া বৈদ্যুতিক কলের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। তাহাতে ৫ হাজার ভোল্‌ট (Volt) ৩ ফেজ (3 Phase) ৫০ চক্র (50 Cycle) বিদ্যুৎ প্রস্তুত হইতেছে। এই বিদ্যুৎ কনট্রোল বোর্ডের (Control Board) মধ্য দিয়া ট্র্যানস্‌ফরমার (Transformer) ভিতরে যাইতেছে। এক-একটি ট্র্যানস্‌ফরমার তৈল সমেত ৮৫০ মন ভারি। এই ট্র্যানস্‌ফরমারে বিদ্যুৎ ৫ হাজার ভোল্‌ট হইতে একলক্ষ ভোল্‌টে পরিণত হইতেছে। এই একলক্ষ ভোল্‌ট বৈদ্যুতিক শক্তি তার সাহায্যে ৪৩ মাইল দূরে অবস্থিত বোম্বাই সহরে প্রেরিত হইতেছে। ঐ বৈদ্যুতিক তার লইয়া যাইবার জন্য সারি-সারি বৃহদাকার লৌহস্তম্ভ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি স্তম্ভ এত বৃহৎ যে, এই উদ্দেশ্যে উহা অপেক্ষা বৃহত্তর স্তম্ভ পৃথিবীতে আর কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। পৃথিবীতে খুব অল্প স্থানেই ১ লক্ষ ভোল্‌টেজ ব্যবহৃত হয়। এই লক্ষ ভোলটেজের শক্তি বোম্বাই সহরের নিকট পারেল নামক রিসিভিং ষ্টেসনএ (Receiving Station) আসে এবং তথায় পুনরায় ট্র্যানস্‌ফরমারের সাহায্যে আবার ৬৬০০ ভোল্‌টে পরিণত হয়। এই বিরাট বজ্র-শক্তিকে ঠিক ভাবে পরিচালিত করিবার জন্য যে কনট্রোল বোর্ড (Control Board) আছে, তাহার কার্য্য অতীব বিস্ময়কর। এই বজ্রশক্তি কোথায় কি ভাবে চলিতেছে; কোথায় কম কোথায় বেশী, এবং কোথাও কিছু খারাপ আছে কি না, সমস্তই এই কনট্রোল বোর্ড হইতে অতি সহজে ধরিতে পারা যায়। ইহার বিশদ্ বিবরণ প্রদান করিতে হইলে, বৈদ্যুতিক শক্তির বিষয় আগাগোড়া আলোচনা করা আবশ্যক। রিসিভিং ষ্টেসন হইতে ৬,৬০০ ভোল্‌টের বৈদ্যুতিক শক্তি মাটির নীচে দিয়া তারের সাহায্যে কাপড়ের কল-গুলিতে প্রেরিত হয়, এবং কাপড়ের কলওয়ালারা তথায় বোতাম টিপিয়া সেই শক্তির সাহায্যে কল চালাইয়া লন; এবং যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করেন, কেবল তাহার মূল্য দিয়াই অব্যাহতি পান।

টাটা হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিকের যাবতীয় কলকব্জা ইংলণ্ড, আমেরিকা ও য়ুরোপের প্রধান-প্রধান কারখানা হইতে বহু পরীক্ষার পর খরিদ করা হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার সার এ্যালফ্রেড হপ্‌কিনসন্ বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন কার্য্যোপলক্ষে এদেশে আগমন করেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর ম্যাঞ্চেষ্টার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একটি সভায় ভারতের স্বাস্থ্যপান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, এদেশে অবস্থান কালে কয়েকটা দৃশ্য তাঁহাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিল। উহা, এলোরা ও অজন্টার ভূগর্ভস্থিত অতি পুরাতন মন্দির। উহা সমগ্র জগতের মধ্যে স্থাপত্য-বিদ্যার অপূর্ব্ব প্রাচীন নিদর্শন, তাহারই অদূরে টাটার এই বিচিত্র হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক কারখানা নবীন বিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ লীলা-নিকেতন। প্রাচীন ও নবীনের—অতীত ও বর্ত্তমানের—অলঙ্কার ও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সমাবেশ।

সন্ন্যাসিনী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ]

প্রাণেশ বালার দেশান্তরী,—নয় সে বাথা সঙ্গোপনে,
নয় ক মৃত, সন্ন্যাসী সে প্রেমামৃতের অন্বেষণে।
নাই কো খবর দ্বাদশ বরষ, করছে বরষ বঞ্চনা কি?
দেবতা পতিব্রতার কথা একেবারেই শুনছে না কি?
উঠলো কথা, আর পাবে না পরতে সিঁদূর শঙ্খ সাড়ী,
এয়োতের এ চিহ্নটুকু প্রাণের অধিক অঙ্গনারি।

ভাঙবে লোহা, পড়লো শোনো, টিকটিকী ওই সুমুখ চাঁদে,
বল্লে বালা, 'আমার স্বামী অমর দেবের আশীর্ব্বাদে'।
দ্বাদশ বরষ কাটলো আরও, আর পাবে না প্রেমাস্পদে,
কাজ কি তাহার বিফল-জীবন ভর্ত্তৃবিহীন এ সম্পদে;
বদ্রীবিশাল, কঠিন কেদার, মত্ত তুষার অমরনাথে,
দেখলে বালা রুক্ষ কেশে রুক্ষ বেশে মায়ের সাথে।

গঙ্গোত্রীতে স্নান করিতে সন্ন্যাসী এক জিজ্ঞাসিল,
'অশাস্ত্রীয় বাকল্প এ কোন্ গুরুতে তোমায় দিল।
হস্তে তোমার শঙ্খ লোহা, সঙ্গে তোমার নেইক স্বামী,
বৃথায় কঠিন তীর্থে এলে হয়ে বিপুল পুণ্যকামী'।
বলেন বালা, 'হে সন্ন্যাসি, সত্য কথা কবই কব,
যোগের বলে তোমরা সবাই করতে পার অসম্ভবও;
আমার স্বামী সন্ন্যাসী যে, তাই সেজেছি সন্ন্যাসিনী,
ধ্যানের দেশে আপনি এসে পূর্ণ-ফলই দেবেন তিনি'।
সন্ন্যাসীবর পুণ্য-করে করলে পরশ বধূর পাণি,
যুগান্তেরি সাত-পাকেরি সেই সে শুভ দৃষ্টিখানি;
চিন্‌তে পেরে, শিউরে বালা পড়্‌লো তাঁহার চরণতলে,
মিশ্‌লো মিলন-নেত্র-সলিল গঙ্গোত্তরী তীর্থ-জলে।

ইমান্‌দার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

তখন বৈকালের বেলা পড়িয়া গিয়াছে। ফৈজু প্রিয় সহচর বর্শাটিকে হাতে লইয়া, প্রফুল্ল মুখে ছোটবাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইতেই দেখিল, সামনে নজিরুদ্দীন মিঞা,—একজন সঙ্গী সমভিব্যাহারে আসিতেছে। সঙ্গীটি গ্রামের লোক নহে, একজন অপরিচিত বিশ-বাইশ বছরের, উৎকৃষ্ট বেশ-ভূষায় সজ্জিত সৌখীন্ ছেলে। ফৈজু তাহাকে চিনিতে পারিল না, চিনিবার জন্য আগ্রহও প্রকাশ করিল না। নজিরুদ্দীনের দিকে চাহিয়া সৌজন্যচ্ছন্দে 'সেলাম আলেকম্' জ্ঞাপন করিয়া, পাশ কাটাইয়া নিজের গন্তব্য পথ ধরিল। কিন্তু নজিরুদ্দীন সহসা অত্যন্ত উৎসুক ভাবে বলিল, "ফৈজু মিঞা, দাঁড়াও দাঁড়াও,—তোমার সঙ্গে বড় জরুরী কথা আছে।"

ফৈজু দাঁড়াইল। নজিরুদ্দীন নিকটে আসিয়া, ফৈজুকে দেখাইয়া, সঙ্গীর উদ্দেশে বলিল, "বুঝলেন মদনবাবু! ইনিই হচ্চেন সুনীলবাবুর ডান হাত ফৈজু মিঞা;—ইনি ইচ্ছা করলে এখুনি সুনীলবাবুর কাছ থেকে, পাঁচ-শো টাকা আদায় করা তো ছোট কথা—তাঁকে শুদ্ধ আমাদের থিয়েটার-পার্টির মেম্বর করে দিতে পারেন! সুনীলবাবুরা ফৈজুকে বড় ভালবাসেন। ওঁর বোনও খুব পয়সাওলা ঘরের বৌ;—তাঁর কাছে ফৈজুকে দিয়ে সুপারিস করতে হবে,—ফৈজুকে তিনি খুব মেহেরবাণী করেন, একবার অম্নি শুধুহাতে ফৈজুকে পঞ্চাশ টাকা—"

এই কুলজী পরিচয়ে যে তোষামোদের সুরটা বঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল, সেটা ফৈজুর কাণ এড়াইল না। মনে-মনে অসহিষ্ণু হইয়া, বাধা দিয়া সে বলিল—"এই বাবু-সাহেব কোথা থাকেন? এঁকে তো কখনো দেখিনি!"

গর্ব্বভরে নজিরুদ্দীন বলিল, "উনি সহরের গিরীশ বাবু উকীলের ছেলে মদনবাবু। ইনিই আমাদের থিয়েটারের ম্যানেজার হবেন। ইনি সহরের সমস্ত বড়লোকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করবেন। নিজের পকেট থেকে চল্লিশ টাকা দিয়ে ইনি আজ প্রথম চাঁদার খাতা খুল্‌লেন। এবার সুনীলবাবুর কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে, গাঁয়ের ষোল আনা লোকের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে—তবে ইনি সহরে ফিরে যাবেন। এখন দু-চারদিন অবশ্য গাঁয়ে থাকবেন।"

মদনবাবুর রেশমী-ফুল-কাটা মোজা, মূল্যবান পম্প-শু, চুণট-করা কোঁচান ধুতি,—সার্জ্জের কোট, দামী আলোয়ান—সর্ব্বোপরি মাথার লম্বা চুলে তুফান-খেলানো টেড়ি দেখিয়া ফৈজু নিঃসংশয়ে বুঝিল, তিনি একজন অতি-সৌখীন্ শ্রেণীর মহাত্মা মানুষ! কিন্তু তাঁহার মুখপানে চাহিয়া ফৈজু হতাশ হইল! ছেলেটির মুখের চামড়া বেশ ফর্শা বটে, কিন্তু চোখ দুটিতে না আছে বুদ্ধিমত্তার ঔজ্জ্বল্য, না আছে কর্ম্মঠ-জনোচিত উদ্যমশীলতার চিহ্ন!—ফৈজুর মনে-মনে আক্ষেপ বোধ হইল;—আহা, এই নিরীহ গোবেচারীর ঘাড়ে কে শক্রতা করিয়া থিয়েটারী হুজুগের ভূত চাপাইল! বেচারা কখনই মনের ওজন ঠিক রাখিয়া চলিতে পারিবে

না, শেষ পর্য্যন্ত সেই—'বোঝে না সোঝে, ঠ্যাঙা লাঠি খোঁজে' গোছের আহাম্মকী প্রকাশ করিয়া ছেলেটি নাস্তানাবুদ হইবে আর কি!

যাহাই হউক, ছেলেটির আখের ভাবিয়া মনে-মনে ক্ষুণ্ণ হইলেও, প্রকাশ্যে ফৈজু সরল শিষ্টতার সহিত "আদাব" জ্ঞাপন করিয়া লইল। তার পর নজিরুদ্দীনের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমায় কি করতে বল্‌ছ নজরু সাহেব?"

পরম সৌহার্দ্দের সহিত ফৈজুর পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া নজরু সাহেব বলিল, "ছোটবাবুর কাছে কায হাঁসিলের ভারটা তোমার ওপর, দাদা! ওঁর বোনও অনেককে দান করে থাকেন,—আমাদের জন্যে মোটা রকম কিছু আদায় করার ভারও তোমায় নিতে হবে।"

সুমতি দেবীর বৈষয়িক ব্যাপারের বর্ত্তমান অবস্থাটা ভাবিয়া, ফৈজু প্রতিবাদ করিতে গিয়া—তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া লইল। সত্য হইলেও উত্তরটা তাহার পক্ষে শোভন হইবে না! একটু থামিয়া বলিল, "আচ্ছা, বলে দেখ্‌ব—"

মদনবাবু নিজের তেল-চক্‌চকে টেড়ির বাঁ পাশটা বাঁ হাতে মাজিয়া আরো চকুচকে করিতে-করিতে—ইঁচড়ে পাকা মুরুব্বি ধরণে একটু কাশিয়া বলিলেন, "শুধু বলে দেখা নয় হে,—আজ নিদেন শ-পাঁচেক টাকা ওদের কাছ থেকে আদায় করে, সন্ধ্যাবেলায় আমাদের আখ্‌ড়া-বাড়ীতে হাজির হয়ে, তোমায় জমা দিয়ে যেতে হবে, বুঝলে? এটা না হলে তোমার এড়ান নাই।"

ফৈজু দেখিল, তাহার অনুমান ঠিক। ছেলেটি শুধু আহাম্মকী-ধরণে কর্ত্তৃত্ব প্রকাশেই উৎসুক নয়,—সে যে ধনী উকীলের পুত্র—সেটাও বড়-বড় কথার জাঁকে সকলকে জানাইয়া দিবার জন্য ঘোরতর ব্যস্ত! একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল, "আচ্ছা বাবুজী, আমার দ্বারা আদায় যদি কিছু হয়, তো, আপনাদের ওখানে জমা দিয়ে আস্‌ব,—আজ আপনাদের আখ্‌ড়া বস্‌বে কোথা?"

বাবুজী দম্ভভরা পরিহাসের স্বরে বলিলেন, "আজ আমায় 'কন্‌গ্রাচুলেট্' করবার জন্যে মালপো'র আড্ডায় মদের চাট্ আসবে! আজ সব খরচ মোহন্ত মশাইয়ের! উনি আমাদের ষ্টেজ্-ম্যানেজার কি না,—ভারী আমুদে লোক! যেও না তুমি, ঢের মজা দেখ্‌তে পাবে!"

ফৈজুর বিস্ময় দীপ্ত চক্ষু দেখিয়া, নজিরুদ্দীন সঙ্কুচিত ভাবে তাড়াতাড়ি বলিল, "না—না, ঠাকুর-বাড়ীর মধ্যে মদ আস্‌বে কেন? ওটা মদনবাবু তোমায় ঠাট্টা করছেন, ফৈজু—তুমি সত্যি যেন তাই মনে করে সুনীলবাবুকে কিছু বোল না! আজ আমাদের আখড়া বস্‌বে, ঠাকুর-বাড়ীর যাত্রার ঐ যে আটচালা আছে, ঐখানে। তুমিও এস ফৈজু!" একটু থামিয়া বলিল, "কিছু টাকা আজ আদায় করে মদনবাবুর চাঁদার খাতায় জমা দিতে পার্‌বে ফৈজু?"

ফৈজু বিপন্ন ভাবে কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল,—সহসা দূরে শ্যামল ছুটিয়া আসিতে-আসিতে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ফৈজু মামু, জল্‌দি এস, মামাবাবু ডাকছেন্!"

ফৈজু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তৎক্ষণাৎ বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া, মুখ ফিরাইয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "চেষ্টা করে দেখ্‌ব ভাই।"

ফৈজু পিছন ফিরিতেই নজিরুদ্দীন তাহার সুহৃদ্বয়ের কাণে-কাণে কি একটা গোপন কথা বলিল। মদনবাবু চেঁচাইয়া বলিল, "আমরা কাল সকালে জমিদার-বাবুর সঙ্গে দেখা করব হে, তাঁকে বলে রেখো।"

"বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া ফৈজু রাস্তার মোড় ফিরিল।

ফৈজুকে নিকটে পাইয়া শ্যামল বলিল, "মার জয়দেবপুরের নায়েব বাক্সো সব টাকাকড়ি চুরি করে নিয়ে, সঙ্কটপুরে সেজবাবুর কাছে পালিয়ে গেছে ফৈজু মামু! মিত্তির মশাইয়ের সেই টিক্ হয়,—সোণামুখীর দারোগাবাবু—তিনি খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন। মামাবাবু তো 'ভয়ঙ্কর' রেগে গেছেন,—বলছেন, ব্যাটাকে এইখানে ধরে এনে, 'পেস্তা-বাদাম' কি-না, তা করবেন্!"

ব্যাপার শুনিয়া ফৈজু উগ্র দুশ্চিন্তায় পড়িল। তবুও শ্যামলের কথিত 'পেস্তা-বাদামের' মর্ম্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া, একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "পেস্তা-বাদাম্ কি?"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া শ্যামল বলিল, "হাঁ জী, পেস্তা-বাদামই তো মালুম্ হচ্ছে,—পেস্তা বাদাম নয়? সেই যে ও-বেলাও মামাবাবু বল্লেন, সেই—মোহন্ত মশাই ওবেলা মারের চোটে কৈবৎদের ছেলেটাকে পেস্তা বাদামই কর্‌তে গেছ্‌ল না?—হাঁ তো, পেস্তা-বাদামই তো বটে!"

আশ্চর্য্য হইয়া ফৈজু বলিল, "কি জানি পেস্তা-বাদাম্

কাকে বলে,—কখনো শুনি নি তো!" একটু থামিয়া সংশয়পূর্ণ স্বরে বলিল, "কীচক্-বধ নয় তো?"

উৎসাহভরে লাফাইয়া উঠিয়া, শ্যামল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "হাঁ—হাঁ, ফৈজু মামু! ঠিক্ বটে, ঠিক্ বটে,—কীচক্-বধ! ভারী বিদ্‌কুটে কথা,—আমার তো খালি মনে হয় পেস্তা-বাদাম্।"

ফৈজু হাসিয়া বলিল "আচ্ছা মন বটে! থাক্; তার পর বল,—আর কি খবর শুনেছ?"

শ্যামল বলিল, "আর কিছু শুনি নি। মা বল্‌ছেন, ফৈজুর কথা শুনে তাকে আগে পাঠালেই ঠিক্ হোত,—নায়েব মশাই তখনি ধরা পড়্‌ত। এখন চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে কি না?"

ফৈজু সে কথায় কাণ দিল না; বলিল, "আমার বাবা মোড়ল মশাইকে নিয়ে হরিশপুরে ধান আটক্ করতে চলে গেছে?"

"গেছে বই কি, তাদের ফির্‌তে আজ রাত নটা।"

শ্যামলের সহিত আরও দু' চারিটা কথা কহিতে-কহিতে ফৈজু আসিয়া জমিদার-বাড়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। রোয়াকের উপর সকলে জমায়েৎ হইয়া বসিয়া ছিলেন। পিসিমা কুটনা কুটিতেছিলেন। সুমতি দেবী শান্ত মুখে মালা জপিতেছেন, আর সুনীলের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন—খুব সংক্ষিপ্ত ভাষায়। সুনীল উত্তেজনারক্ত মুখে এক-একটা উত্তর দিতেছে, আর মাঝে মাঝে গুম্ হইয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে। মোক্ষদা দিদি তাঁহার পাঁচ বছরের মেয়ে মেনুকে কোলে করিয়া একপাশে বসিয়া পান চিবাইতে-চিবাইতে, ঘোমটার ভিতর হইতে 'প্রত্যেকের মুখপানে চাহেন কেবল!'

ফৈজু আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিতেই, সুনীল তাহার হাতের চিঠিখানা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই দেখ, নীলকণ্ঠ বাবুর কথায় বিশ্বাস ক'রে মিত্তির মশাই চলে এলেন,—আমাদের কথা গ্রাহ্য করলেন না,—বল্লেন, 'তোমরা ছেলেমানুষ, তাই ব্যস্ত হচ্ছ!' এইবার মজা দেখ! এখন উপায়! এখন জয়দেবপুরের নায়েব যে সমস্ত কাগজ, টাকা-কড়ি নিয়ে এসে সঙ্কটপুরে ঢুকেছে! এবার সেজবাবু হাঁকিয়ে দিলেই তো বেশ হবে!"

ফৈজু চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে পাঠ করিয়া বলিল, "মিত্তির মশাই চিঠি দেখেছেন?"

"দেখেছেন!" বলিয়া সুনীল অপ্রসন্ন ভাবে চুপ করিল।

সুমতি দেবী ধীরভাবে বলিলেন, "তাঁর জ্বর এসেছে খুব,—তিনি উঠতে পারছেন না। সুনীলকে ব'লে দিলেন, কাউকে সঙ্কটপুরে পাঠিয়ে আগে সত্যি খবরটা জানা। তার পর—" সুনীল বাধা দিয়া উষ্ণ ভাবে বলিল, "তার পর 'কালে রাজা ভবিষ্যতি!' মিত্তির মশাই পুলিশ নিয়ে গিয়ে নায়েবকে গ্রেপ্তার করবেন, এই মতলব! নায়েব ততক্ষণে দিল্লী লাহোর পার হয়ে চম্পট দিতে পারবে—মিত্তির মশায়ের সবই ঢিমে চাল কি না?"

সুমতি দেবী বলিলেন, "আঃ! কেন মিছে রাগারাগি করিস সুনীল? সত্যিই তো, ঠিক খবরটা আগে জানা চাই—"

সুনীল বলিল, "কিন্তু ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধর্‌লেও কিছু লাভ নেই দিদি!"

সুমতি দেবী চুপ করিয়া রহিলেন। সুনীল গুম্ হইয়া, গালে হাত দিয়া বসিয়া, কি ভাবিতে লাগিল।

ফৈজু চুপ করিয়া সমস্ত শুনিয়া গেল। এইবার নির্ঝুমের পালা দেখিয়া, অসহিষ্ণু চিত্তে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এখানে বসে-বসে ঘরের লোকের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া ক'রেও কোন লাভ নাই ছোটবাবু! ও সব কথা যেতে দেন। এখন আমায় যদি মেহেরবাণী ক'রে হুকুমটা দেন, তা'হলে আমি একবার সঙ্কটপুরে গিয়ে সত্যি-মিথ্যে খবরটা জেনে আসি। আর নায়েব যদি সত্যিই সেখানে এসে থাকে, তবে তাকেও যাতে ধরে আন্‌তে পারি, তেম্নি একটা চিঠিও দেন। সঙ্কটপুরের সেজবাবু মিত্তির মশায়ের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছেন; উনি তো তাঁকে খুব ভাল বল্‌ছেন। এবার আমাদের তিনি কি বলেন দেখি—"

সুনীল বলিল, "তুমি ক্ষেপেছ ফৈজু! খল তার নিজের স্বভাব কখনও ছাড়ে? নীলকণ্ঠ বাবু সাধু সেজেছেন বলে, ভেতরেও সাধু হয়ে গেছেন! হুঁ!"

সুমতি দেবী ধীরে-ধীরে বলিলেন, "ও কথা বলিস্‌নি সুনীল,—মানুষ কি বদলায় না? বদলায় বৈ কি। চেষ্টা করলেই মানুষ ভালর দিকে বদলাতে পারে।"

ফৈজু বলিল, "তা বৈ কি। ভালর দিকে যার বদলাবার চেষ্টা আছে, সে নিশ্চয়ই বদলায়!"

সুনীল বলিল, "কিন্তু যার সে চেষ্টা নাই, তার কথা কি বলবে ফৈজু?"

ফৈজু একটু হাসিয়া বলিল, "আগে আমার নিজের চোখে দেখবার হুকুম দেন, তার পর যা বুঝব, তাই বলব।" একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিল, "যতই যা হোক,—তিনি দিদিমণির জ্ঞাতি, তায় সরিক,—তাঁকে হঠাৎ কিছু বলাও তো উচিত নয়। বেশ তো, আমরা প্রথমেই ভাল মুখে কথা কয়ে দেখি না! তার পর যা হয়, করা যাবে। দিদিমণি, আমায় তা'হলে হুকুমটা দেন।"

সুমতি দেবী ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "সর্দার আসুক, তার পর কাল সকালে—"

বাধা দিয়া সবিনয়ে ফৈজু বলিল, "আর গাফিলি করতে বলবেন না দিদিমণি! অনেকটা দেরী হয়ে গেছে। আমায় এখুনি বেরুবার হুকুম দিন। ছোটবাবু কি বলেন?"

সুনীল বলিল, "আমার যা বলবার, আমি অনেকক্ষণ বলেছি। এখন দিদির মত হলে তবে তো?"

ফৈজু বলিল, "এবার শুধু দিদিমণির মতের অপেক্ষা? ওটা আর জাঁকজমক ক'রে চেয়ে চিন্তে নেবার সময় আমার নাই,—চল্লুম দিদিমণি!" মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিয়া, বর্শা ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া, ফৈজু বলিল, "আমি ভোর থাকতে গিয়ে সঙ্কটপুরে পৌছাব। যদি নায়েব সেখানে থাকে, আর সেজবাবু যদি না বাধা দেন, তা'হলে আমি কাল সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ীতে এসে পৌছাব। আপনারা ভাববেন না।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও,—তুমি একলাই যাবে,—সেইটে কি ভাল হবে?"

একটু হাসিয়া ফৈজু বলিল, "সেইটেই সব চেয়ে ভাল হবে দিদিমণি! এ যে আমার মনিবের কুটুমবাড়ী! এখানে তো আমি দাঙ্গা করব না,—শুধু খবর আনতে যাচ্ছি। বড় তাড়াতাড়ি হোল,—না হলে গোটা-দুই বড় মাছ ধরে নিয়ে গিয়ে, তত্ত্ব দিয়েই আসতুম! কিছু ভাববেন না।"

হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুনীল বলিল, "দাঁড়াও ফৈজু, এক কলম লিখে দিই। সঙ্কটপুরের সেজবাবু এম-এ পাশ, প্রোফেসার লোক,—তিনি হাতের লেখা ছাড়া যাকে-তাকে বিশ্বাস করেন না। চিঠি না থাকলে হয় তো সেই ছুতোয় তোমায় ফেরৎ দিতেও পারেন।" সুনীল দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেল।

সুমতি দেবী উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "দেখো ফৈজু, খুব সাবধান! ঠাকুরপো বড় রাগী-স্বভাবের মানুষ,—যদি নায়েবকে না আসতে দেন, তুমি বেশী কিছু বোল না—চুপ-চাপ চলে এসো।"

পিসিমা বললেন, "দেখো বাছা,—কাল সন্ধ্যার আগে বাড়ী এসে পৌছো, না হলে আমরা ভেবে মরব।"

ফৈজু হাসি মুখে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকৃত হইল।

সুমতি দেবীর উদ্বেগ কাটিল না, পুনশ্চ বলিলেন "দেখো ফৈজু, যদি ঠাকুরপো রুখে ওঠেন—"

অসঙ্কোচে সরল দৃষ্টি তুলিয়া ফৈজু হাসমুখে বলিল, "বেশ তো দিদিমণি, আমি চুপ চাপ চলেই আসব। কেন ভাবছেন?"

অধিকতর উদ্বিগ্নতার সহিত সুমতি দেবী বলিলেন, "তাঁর মুখ বড় খারাপ। আমার বড় ভয় হচ্ছে ফৈজু, যদি হঠাৎ ফস্ করে তোমায় অপমান করে বসেন, তা'হলে?" সুমতি দেবী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফৈজুর মুখপানে চাহিলেন।

বালকের মত উচ্ছ্বসিত কৌতুকে হাসিয়া ফৈজু বলিল, "এ যে সেই চণ্ডীর গানের খুল্লনা দেবীর ছেলেকে সিংহলে পাঠান হচ্ছে দিদিমণি! সকলটার জবাবই আগে চাই!—তিনি আমায় যদি অপমান করে খুসি হন, হবেন! আমি আপনাদের ঢের নিমক খেয়েছি,—না হয় নিমকের মান রেখে, দু-দশটা গালিই নিঃশব্দে হজম করে নেব। তাতে কি হয়েছে!"

সুনীল লিখিত পত্র হাতে করিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, "নীলকণ্ঠ বাবুকে বোলো, সুনীল বাবুই নিজে আসতেন, শুধু এলেন না—কি দিদি, কি বলব কেন গেলুম না?"

বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া সুমতি দেবী বলিলেন "ঐ! তা আমি কেমন করে বলব? তুই কেন গেলি না, সে তুই-ই জানিস্,—সত্যি তুই যেতিস্ না কি?"

"যেতুম দিদি, কিন্তু—" সুনীল একটু থামিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "কিন্তু তাঁর পণ্ডিতি মুখের ইতর ভাষা—সে

শুন্‌তে আমার ভারী ঘৃণা বোধ হয়। সেই জন্যে ঐ লোকটার সংস্রবে আস্‌তে আমার ভয় করে।"

ফৈজু বাধা দিয়া বলিল, "আমার সময় যাচ্ছে ছোটবাবু, —আমি তাঁকে ঠিক করে বুঝিয়ে বল্‌ব যে, ছোটবাবু কাযে ব্যস্ত আছেন বলে আস্‌তে পার্‌লেন না। এর পর সুবিধামত এক সময় আস্‌বার চেষ্টা করবেন্। কেমন, তা হলেই হবে তো?"

সুনীল অত্যন্ত আরাম পাইয়া বলিল, "হাঁ—হাঁ, তা বই কি,—তোমাকে কি আর গুছিয়ে বল্‌তে হবে ফৈজু? তুমি সব ঠিক করে বলে দিও।"

ফৈজু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তা হলে আমি চলি?"

ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত নয়নে চাহিয়া সুমতি দেবী সকরুণ কণ্ঠে বলিলেন, "বড় ভাবনায় রইলুম তোমার জন্যে—"

"আমার জন্যে?" ফৈজু হাসিল। সেলাম করিয়া বলিল, "কাল ঠিক এম্নি সময়ের মধ্যে আস্ত শরীরে এসে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আবার সেলাম করব,—কিছু ভাব্‌বেন না। বাড়ী থেকে জুতো, কম্বল, আর পাগ্‌ড়ীটা নিয়ে যাই।" ফৈজু বাহির হইয়া গেল। সুনীলও দুই চারিটা প্রাসঙ্গিক কথা কহিতে-কহিতে ফৈজুর সঙ্গে চলিল।

ফৈজুর পিছনে শ্যামল এতক্ষণ নিথর হইয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে সমস্ত কথা শুনিতেছিল,—কোন কথা কহে নাই। এইবার সুনীলকে প্রস্থিত দেখিয়া, সরিয়া আসিয়া সুমতি দেবীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া, আব্দারভরা সুরে আবেদন সুরু করিল, "অ—মা, আমায় সুদ্ধ ফৈজু মামুর সঙ্গে যেতে বলুন। আমি তো মা সেখানকার মামাবাবুকে কখনো দেখি নি,—আমি একবার দেখে আসি, বলুন মা—"

পিসিমা কুট্‌নো-কুটা স্থগিত রাখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "সেখানে আবার তোমার মামাবাবু কে আছেন?"

মৃদু-মৃদু হাসিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "বুঝ্‌তে পারছ না পিসিমা—আমার ভাই সুনীল যদি ওর মামাবাবু হয়, তা' হ'লে আমার দেওরও শ্যামলের মামাবাবু। কিন্তু তিনি কংস মামা!"

পিসিমা বলিলেন, "ধ্বংস মামাই বটে! হুজুগ কোর না শ্যামল, থাম—"

শ্যামল সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি থাম্‌বো না। অ—মা, আপনি বলুন—" শ্যামল নাকে-কান্না সুরু করিল!

সুমতি দেবী জপের মালা কপালে ঠেকাইয়া, প্রণাম করিতে লাগিলেন। শ্যামল থামিয়া, উত্তরের প্রতীক্ষায় অধীর চিত্তে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সুমতি দেবী কোন উত্তর দিলেন না,—প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "পিসিমা, এখনো একটু বেলা আছে,—এস, ততক্ষণ তোমায় শ্রীমদ্ভাগবত পড়ে শোনাই, মনটা স্থির হবে। শ্যামলও শুন্‌বে চল।"

শ্যামল অধীর ভাবে বলিল, "আমি ওসব শুন্‌ব না,—ওর মানে বুঝ্‌ব না। বরং আমায় ফৈজু মামুর সঙ্গে যেতে বলুন।"

সুমতিদেবী বলিলেন, "আমি বুঝিয়ে দেব, এস।"

শ্যামল দারুণ আক্ষেপ সহকারে হাত-পা আছড়াইয়া, নাকি সুরে কাঁদিয়া বলিল, "আমি ও-সব কিছুই শুন্‌ব না,—কিছুই না! আপনি বলুন মা, আমি ফৈজু মামুর সঙ্গে বেড়িয়ে আসি, আপনার পায়ে পড়ি মা!"

সুমতি দেবী বলিলেন "পায়ে পড়লেও না,—মাথায় পড়লেও না! যদি আমার কথা শুন্‌তে চাও, তাহ'লে চুপ কর,—ওসব মতলব ছাড়।"

ছল্‌-ছল্ নয়নে চাহিয়া শ্যামল বলিল, "সব মতলবই যদি ছাড়ব, তাহ'লে কি নিয়ে থাক্‌ব? আমায় রাঁধতে দেবেন না,—কোথাও যেতেও দেবেন না,—তাহ'লে আমি কি করব?" ক্ষোভে তাহার কণ্ঠরোধ হইল!

হাসি-হাসি মুখে চাহিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "করবার কায ঢের আছে বাবা,—অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এই এখুনি যদি আমি মরে যাই, তাহ'লে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে, মুখে আগুন দিতে হবে, হবিষ্যি করতে হবে,—তারপর শ্রাদ্ধ তো আছেই।"

এবার আর রক্ষা নাই! শ্যামলের চোখ দিয়া টপ্‌-টপ্ করিয়া অশ্রু খসিয়া পড়িল! রাগে সে আর কথা কহিতে পারিল না; হঠাৎ উঠিয়া, টক্‌-টক্ করিয়া রান্নাঘরের ছাদের উপর গিয়া সশব্দে ধুলার উপর শুইয়া পড়িল! সমস্ত ছাড়িয়া-ছুড়িয়া নিরীহ ভাবে শুইয়া থাকাই শ্যামলের চরম ক্রোধের প্রধান লক্ষণ!

সুমতি দেবী চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিলেন। তার পর কোন কথা না বলিয়া, অন্য দিকের সিঁড়ি ধরিয়া দ্বিতলের ঘরে চলিয়া গেলেন।

মোক্ষদা দিদি এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া একাগ্র অধ্যবসায় সহকারে, চোয়াল নাড়িয়া পাণই চিবাইতেছিলেন। এইবার শ্যামলের উদ্দেশে ক্রূর-বিদ্বেষ-ভরা দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "বাপ্‌রে, কি আদুরেই হয়েছেন! নবাব সিরুজুতুল্লা আর কি!"

পিসিমা একটু অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "সত্যি, শ্যামলটা বড় মগ্‌রা হয়েছে!"

বক্র কটাক্ষে এদিক-ওদিক চাহিয়া, কাপড়ের খুঁটে ঠোঁটের দুই পাশ মুছিয়া, মোক্ষদা দিদি বলিলেন, "তাইতো লোকে কত নিন্দে করে! না হয় পয়সাই আছে, না হয় গাঁয়ের জমিদার—কিন্তু অন্যাই, তো কেউ সইতে পারে না! শুধু শ্যামল কেন পিসিমা;—থাকে ফাঁড়া উপরে যাবে, আমি সত্যি কথা বলব, ঐ যে ফৈজুকে অতটা আস্কারা দেওয়া—ওটাই কি ভাল হচ্ছে বাছা? মোহন্ত মশাইকে যে ওবেলা অতটা অপমান করলে, তার কোন কূল-কিনারা হোল না, গাঁয়ের লোক সবাই ছিঃ ছিঃ করছে—"

ঘাট হইতে বাসনের গোছা লইয়া ঝি আসিতেছিল;—মোক্ষদা দিদি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "সুদো'ও না ওকে! রায়দের বাড়ী দুপুর বেলা বেড়াতে গেছলুম,—সবাই কত কথা বল্লে! আমি তো লজ্জায় বাঁচি না!—"

ঝি বাসনের গোছা নামাইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অভিপ্রায়, পিসিমা কৌতূহলী ভাবে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই, সে তাহার অন্তর-গহ্বরস্থ সমস্ত প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি নিষ্কাশিত করিয়া দিবে! কিন্তু পিসিমা, সে বিষয়ে নিরুদ্যম হইয়া, শুধু দুঃখিত ভাবে বলিলেন—"কি বলব মা,—এখনকার ছেলেরা তো কথা শোনে না। সুনীল বল্লে, মোহন্তর দোষ,—উনি ফৈজুকে তেড়ে মারতে গেলেন কেন? ফৈজু আবার যোড়হাত করে মাপ চাইতে যাবে কেন? ও যাবে না!"

এবার মোক্ষদা দিদির একা মুখে সহস্র স্রোত বহিয়া গেল! বৈষ্ণব যাহাই করুন, তিনি ত্রিভুবনের সম্মানের পাত্র! ভক্তির পাত্র! পূজার পাত্র! আরো কত কি! স্বয়ং নারায়ণ ভৃগুমুনির পদচিহ্ন যে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, সে কেন? কিসের জন্য? তাহাতে তাঁহার কি স্বার্থ ছিল?

আরো বিস্তর উদাহরণ ও প্রমাণ-প্রয়োগ করিয়া, খুব স্পষ্টাস্পষ্টি উচ্চারণে সাধু ভাষায় শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিয়া, মোক্ষদা দিদি এমন এক লম্বা বক্তৃতা করিয়া বসিলেন যে, পিসিমা তাহার মানে একবিন্দুও বুঝিতে না পারিলেও, খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! উত্তর দিবার মত কোন কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া, তিনি আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন, "কি জানি বাছা, সুনীল কি বুঝলে—"

বাধা দিয়া, তীব্র শ্লেষের স্বরে মোক্ষদা দিদি বলিলেন, "শুধু সুনীল কেন বাবু,—সুনীলকে অমন করে নাচালে কে?"

বিস্মিত হইয়া পিসিমা বলিলেন "কে নাচালে?"

ঠোঁট উল্টাইয়া, তাচ্ছল্য ভাবে মোক্ষদা দিদি বলিলেন, "কে নাচালে তা কি করে জানব? আর জানলেই বা বলব কেন? বড়লোকের ঘরের কথাই আলাদা! কি বল ঝি?—"

ঝিএর দিকে চাহিয়া, ইঙ্গিত-সূচক কটাক্ষ হানিয়া, বিদ্বেষভরা বিদ্রূপের সুরে মোক্ষদা দিদি বলিলেন, "কতই দেখছি, কতই দেখব লো! সেই যে গানে বলে শুনেছিস লো—সেই—'খুদিরাম ভাসি হাসি, পরবে ফাঁসি, দেখবে ভারত-বাসী!' চোখ আছে আমাদের, দেখে যাই......!"

ঝি তাহার বক্ষ কণ্ঠে সংগৃহীত স্বর্ণে গড়ানো বাঁ হাতের সোণার অনন্তটা খুঁটিতে খুঁটিতে, এদিক ওদিক চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল "হুঁ।"

পিসিমা হ্যাবাচ্যাকা খাইয়া, একবার এর মুখপানে, একবার ওর মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। মোক্ষদা দিদি রহস্যগর্ভ বচন-বিন্যাসে আবার কি একটা রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সুনীল বাড়ী ঢুকিল,—আলোচনা-স্রোত সেইখানেই থামিয়া গেল।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

[অধ্যাপক শ্রীরজনীকান্ত গুহ এম-]

বংশ, বাল্য-জীবন, শিক্ষা

জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্ব-কালে শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা নামক একজন দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী মজিলপুর গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। "ইঁহার বংশধরেরা আবহমান কাল কেবল যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা কার্য্যে রত থাকিয়া গৌরবান্বিত দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়া আসিয়াছেন।" পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা হইতে অধস্তন নবম পুরুষ। ইঁহার প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার পাণ্ডিত্য, ধর্ম্মভাব ও সাধন-নিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার পিতা পণ্ডিত হরানন্দ বিদ্যাসাগর চরিত্রের দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সদৃশ ব্যক্তি ছিলেন, এবং ইঁহাদিগের দুইজনের মধ্যে আজীবন অকৃত্রিম বন্ধুতা ছিল। শিবনাথের মাতা চাঙ্গারীপোতা গ্রামের হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের কন্যা, এবং সোম-প্রকাশের সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভগিনী ছিলেন। ইনি অতি স্নেহশীলা, ধর্ম্মানুরাগিণী ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। শিবনাথ ১২৫৩ সালের ১৯শে মাঘ (ইংরাজী ১৮৪৭, ৩১শে জানুয়ারী) মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকালে ইঁহার দেহ অতি রুগ্ন ছিল; এক-একবার ইনি এমন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইতেন, যে ইঁহার জীবনের আশা থাকিত না। তখন ইঁহার জননী পুত্রের প্রাণরক্ষার কামনায় যে কঠোর ব্রত পালন করিতেন, তাহার কাহিনী এখনকার দিনে উপন্যাস অপেক্ষাও অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়।

পাঁচ বৎসর বয়স হইলেই জননী তাঁহাকে গ্রামের একটি পাঠশালায় প্রেরণ করেন, এবং কিছু দিন পরে কোন কারণে তাঁহাকে হাড়িঞ্জ বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। নবম বৎসরে তাঁহার উপনয়ন হইল, এবং প্রপিতামহ নিজে তাঁহাকে সন্ধ্যা-আহ্নিক শিখাইয়া দিলেন। এই বৎসরেই তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বালক শিবনাথকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ছাত্র-জীবনে ইঁহাকে আগা-গোড়া কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিদ্যার্জ্জনে সিদ্ধি লাভ করিতে হইয়াছিল। মেধা, শক্তি ও স্বাভাবিক নিবিষ্টচিত্ততা জ্ঞানসাধনে ইঁহার পরম সহায় ছিল। এইকালের একটি ঘটনা বিদ্যার্থীদিগের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। ঘটনাটি তাঁহার নিজের কথায় বর্ণিত হইতেছে।

"ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা দ্বারা আমার হৃদয়-পরিবর্ত্তন ঘটিলে, আমার প্রাণে এক নূতন সংগ্রাম জাগিয়াছিল। সকল বিষয়ে আপনাকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত করিবার জন্য দুরন্ত প্রতিজ্ঞা জন্মিয়াছিল। ইহার ফল জীবনের সকল দিকেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকল বিষয়ে আপনাকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আত্ম-নিগ্রহের উদ্দেশে, পাঠ বিষয়ে মধ্যে-মধ্যে অপ্রীতিকর বোধে যে যে বিষয় অবহেলা করিতাম, তাহাতে অধিক মনোযোগী হইলাম। যে যে বিষয়ে আসক্তি ছিল, তাহা ত্যাগ করিতে এবং যে-কিছু অরুচিকর তাহা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার মনে আছে, অঙ্কে অমনোযোগী ছিলাম, তাহার ফল স্বরূপ পরীক্ষাতে কখনও একশতের মধ্যে বিশের উপর নম্বর পাইতাম না। ১৮৬৬ সাল হইতে তাহা বদলাইয়া গেল। অঙ্কে এরূপ মনোযোগী হইলাম যে, ১৮৬৬ (১৮৬৭) সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলাম। তৎপরে সেই প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ় ব্রত রহিয়া গেল। এই সময়ে আমি প্রথমে মাংসাহার পরিত্যাগ করি, প্রাণী-হত্যা নিবারণের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু মাংসের প্রতি আসক্তি ছিল বলিয়া। মাংসাহারে এমনই আসক্তি ছিল যে, ভবানী-পুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ীতে বাস কালে প্রায় প্রতি রবিবার প্রাতে কালীঘাট হইতে জীবন্ত পাঁঠা আসিত। ডাক শুনিলেই আমার পড়া-শুনা বন্ধ হইত। তাহাকে কাটিয়া-কুটিয়া রাঁধিয়া পেটে না পুরিতে পারিলে আর কিছু

করিতে পারিতাম না। কবিতা পড়িতে ও কবিতা লিখিতে অতিরিক্ত ভালবাসিতাম বলিয়া কিছুদিন কবিতা পড়া বন্ধ করিয়া দিলাম; ফিলজফি ও লাজিক পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বন্ধুদের সহিত হাসি ঠাট্টা ও গল্প-গাছা করিতে ভালবাসিতাম, কিছুদিন মনের কাণ মলিয়া দিয়া মৌনব্রত ধরিলাম। এই মনের কাণ মলাটা তখন অতিরিক্ত মাত্রায় করিতাম।"

এই আত্ম-নিগ্রহ ও দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার ফলে তিনি এল্ এ পরীক্ষায় অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। এই সময়ে বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারের কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়াতে ইঁহার পাঠে সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। পরীক্ষার যখন তিন মাস বাকী, তখন দেখিলেন, যে এই কয়টি মাস জগৎ সংসার ভুলিয়া পাঠে নিমগ্ন না হইলে আর রক্ষা নাই। আমরা তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, যে 'প্রাণ থাক আর যাক, একবার মরণ বাঁচন চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে'। এই দুরন্ত প্রতিজ্ঞায় বুক বাঁধিয়া ইনি এই সময়ে দিবা রাত্রি একুশ ঘণ্টা করিয়া পাঠ করিতেন। এই দুরন্ত শ্রমের অত্যাচারে ইঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তখন দেখা গেল, যে ইনি প্রথম শ্রেণীর একটি বৃত্তি, ইংরাজী ও সংস্কৃতে প্রথম হইয়া ডফ সাহেবের নামের বৃত্তি, সংস্কৃত কলেজের বৃত্তি, সর্ব্ব সাকল্যে মাসে ৫৯, টাকার বৃত্তি পাইয়াছেন (১৮৬৯ সন)। ইঁহার পরে ইনি ১৮৭১ সনে বি-এ ও ১৮৭২ সনে সংস্কৃত সাহিত্যে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শেষোক্ত পরীক্ষায় সংস্কৃত সাহিত্যে ইনি একাকী কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। আগা-গোড়া সংস্কৃত কলেজের ছাত্র বলিয়া নিয়মানুসারে ইঁহাকে "শাস্ত্রী" উপাধি প্রদত্ত হয়।



পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

বিষয়-কর্ম্ম

বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের কুলপ্রথা অনুসারে শিবনাথের বয়স যখন দুই বৎসর, তখন একমাস বয়সের একটি বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। বার বৎসর বয়সে এই বালিকার সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন হইল। এই বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে পিতা হরানন্দ বৈবাহিক পরিবারের প্রতি বিরক্ত হইয়া ইঁহাকে আবার বিবাহ করাইলেন। ইনি তখন পিতাকে এমনই ভয় করিতেন, যে এই কার্য্যটি নিতান্ত অন্যায় ও ভবিষ্যতে সমূহ অশান্তি ও যন্ত্রণার নিদান বলিয়া বুঝিলেও ইহার প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। তৎপরে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের ফলে পাঠদশাতেই ইনি দুই স্ত্রী ও সন্তানদিগের ভরণপোষণের ভার বহন

করিয়া আসিতেছিলেন; সুতরাং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াই ইঁহাকে বিষয়-কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে হইল। ইনি প্রথমে হরিনাভি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন; সেখানে কিছুদিন দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়া সাউথ-সুবার্ব্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া ভবানীপুরে আগমন করেন; তৎপরে ১৮৭৬ সনে ইঁহার উৎসাহদাতা ও সহায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আনুকূল্যে ইতি হেড পণ্ডিতের পদ লাভ করিয়া হেয়ার স্কুলে কার্য্য আরম্ভ করেন। বৈষয়িক উন্নতির দিকে মন দিলে ইনি কালক্রমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইতে পারিতেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই ইঁহার ধর্ম্ম-জীবনে গুরুতর বিপ্লব ঘটিয়াছিল। হেয়ার স্কুলে দুই বৎসর কর্ম্ম করিয়া আপনাকে পূর্ণ রূপে ঈশ্বর ও মানবের সেবায় সমর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে শিবনাথ সরকারী চাকুরী ইস্তাফা দিয়া জীবনব্যাপী দারিদ্র্যব্রত বরণ করিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ—প্রচার-ব্রত

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে শিবনাথ অধ্যাপক-বংশের সন্তান, এবং তিনি বাল্যকালে প্রাচীন তন্ত্রের পক্ষপাতী নিষ্ঠাবান্ পরিবারে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহের একাগ্র ধর্ম্মসাধনের প্রভাব ও জননীর অকপট বিশ্বাস যে তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই; কিন্তু কলিকাতায় অবস্থান কালে কিশোর বয়সেই ইঁহার ধর্ম্ম-জীবনে ধীরে ধীরে গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিল। তাহার প্রথম কারণ তাঁহার দ্বিতীয় বারের বিবাহ। তিনি স্বয়ং বলিতেছেন—"এই বিবাহের পরেই আমার মনে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। একটি নিরপরাধা স্ত্রীলোককে অন্যায় রূপে গুরুতর সাজা দেওয়া হইল, এবং আমি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেই অন্যায় কার্য্যের প্রধান পুরুষ হইলাম, ইহা ভাবিয়া লজ্জা ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। * * * আত্ম-নিন্দাতে আমার মন অধীর হইয়া উঠিল। সে তীব্র আত্ম-নিন্দার কথা মনে হইলেও এখন শরীর কম্পিত হয়। আমি আমুদে, উপহাস-রসিক বক্তৃতা-প্রিয় মানুষ ছিলাম; আমার হাস্য-পরিহাস কোথায় উবিয়া গেল। আমি ঘন বিষাদে নিমগ্ন হইলাম। পা ফেলিবার সময় মনে হইত যেন কোন নীচের গর্ত্তে পা ফেলিয়া যাইতেছি। রাত্রি আসিলে মনে হইত আর প্রভাত না হইলে ভাল হয়। এই অবস্থাতে আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাস কখনও করি নাই। * * * কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে কখনও গুরুতররূপে চিন্তা করি নাই। ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনার অভ্যাস ছিল না। এই মানসিক গ্লানির অবস্থাতে তাহা করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে ভক্তি-ভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার মানসিক অবসাদের কথা অবগত হইয়া আমাকে একখানি পার্কারের Ten Sermons and Prayers পাঠাইয়া দিলেন। পার্কারের প্রার্থনাগুলি যেন আমার চিত্তে নবজীবন আনিল। আমি প্রতিদিন রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একখানি খাতাতে একটি প্রার্থনা লিখিয়া পাঠ করিয়া শয়ন করিতে লাগিলাম। কেবল তাহাই নহে, দিনের মধ্যে প্রত্যেক দশ পনর মিনিট অন্তর ঈশ্বর স্মরণ করিতাম ও প্রার্থনা করিতাম। * * * প্রার্থনা করিতে করিতে হৃদয়ে দুইটি পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম। প্রথম, দুর্ব্বলতার মধ্যে বল আসিল, আমি মনে সঙ্কল্প করিলাম, 'কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা, যায় যাক থাকে থাক ধন মান প্রাণ রে।' আমি ধর্ম্মের আদেশ ও হৃদয়বাসী ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দ্বিতীয়, ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজে ঈশ্বরের উপাসনাতে যাইব স্থির করিলাম। যাইতে আরম্ভ করিলাম।"

এইরূপে তিনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম-সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার স্বগ্রামবাসী স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত প্রভৃতি যুবক মজিলপুরে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বার্ত্তা লইয়া যান। ভবানীপুরে মহেশ চৌধুরীর গৃহে অবস্থান কালে কেশবচন্দ্র সেনের একটি ইংরাজী বক্তৃতা এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র ঠাকুর ও স্বর্গীয় অযোধ্যা নাথ পাকড়াশী মহাশয়ের উপদেশও তিনি শুনিয়াছিলেন। তাহা হইলেও তিনি প্রথম-প্রথম ব্রাহ্মদিগের সহিত বড় মিশিতেন না। কিন্তু পূর্ব্ববর্ণিত বিবাহজনিত নির্ব্বেদ ও সহাধ্যায়ী বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ও অঘোরনাথ গুপ্তের আকর্ষণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে পরিশেষে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাবের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। এইবার তিনি যে পরীক্ষায় পড়িলেন, তাহা তাঁহার নিজের কথায় বর্ণিত হইতেছে।

"বল ও আশা পাইয়া আমি নিজ বিশ্বাস অনুসারে চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলাম। এইবার আমার কঠিন সংগ্রাম আসিল। ইহার পূর্ব্বে গ্রীষ্মের ছুটীতে বা পূজার বন্ধে বাড়ীতে গেলেই আমাকে ঠাকুর পূজা করিতে হইত। আমাদের কুলক্রমাগত কতকগুলি ঠাকুর ছিল। বাবা সচরাচর তাঁহাদের পূজা করিতেন। আমি বাড়ীতে গেলে তিনি সেই কার্য্যভার আমার উপর দিয়া অপরাপর গৃহকার্য্য করিবার জন্য অবসর লইতেন। যেবারে আমার হৃদয় পরিবর্ত্তন হইয়া আমি বাড়ীতে গেলাম, সেবার প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলাম যে আর ঠাকুরপূজা করিব না। গিয়াই মাকে সে সঙ্কল্প জানাইলাম। মা ভয়ে অবশ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন একটা মহাসংগ্রাম আসিতেছে। আমাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন। আমি কোন মতেই প্রস্তুত হইতে পারিলাম না। ধর্ম্মে প্রবঞ্চনা রাখিতে পারিব না বলিয়া করযোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলাম। অবশেষে সেই সঙ্কল্প যখন বাবার গোচর করা হইল, তখন আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গমের ন্যায় তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কুপিত হইয়া আমাকে প্রহার করিয়া ঠাকুর ঘরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য লাঠি হস্তে ধাবিত হইয়া আসিলেন। আমি ধীরভাবে বলিলাম, 'কেন বৃথা আমাকে প্রহার করিবেন? আমি অকাতরে আপনার প্রহার সহ্য করিব। আমার দেহ হইতে এক-একখানা হাড় খুলিয়া লইলেও আর আমাকে ওখানে লইতে পারিবেন না।' এই কথা শুনিয়া ও আমার দৃঢ়তা দেখিয়া তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলেন এবং প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল কুপিত ফণীর ন্যায় ফুলিতে লাগিলেন। অবশেষে আমাকে পূজার কাজ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া নিজে পূজা করিতে বসিলেন। সেইদিন হইতে আমার মূর্ত্তিপূজা রহিত হইল। আমি সত্যস্বরূপের উপাসক হইলাম।"

এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেনের পরিচালনায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আন্দোলন দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, বাগ্মিতা ও কর্ম্মোৎসাহের খ্যাতি কেবল বঙ্গদেশেই আবদ্ধ ছিলনা। কেশবচন্দ্রের সাহচর্য্য তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিল।* ১৮৬৯ সনের ভাদ্রমাসে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিনে ইনি এবং স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, রজনীনাথ রায়, কৃষ্ণবিহারী সেন, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ষোলজন যুবক কেশবচন্দ্রের নিকটে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করিলে পিতা হরানন্দ এমত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া পুত্র গৃহে আসিয়াছেন ইহা জানিতে পারিলেই তাঁহাকে শারীরিক দণ্ড দিবার আয়োজন করিতেন, এবং প্রায় বিশ বৎসর কাল তাঁহার মুখ দর্শন করেন নাই।

১৮৭২ সনের পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রাচীন ও নবীন সভ্যদিগের মধ্যে মত ও আদর্শের অনৈক্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে, তখন শিবনাথ প্রমুখ অগ্রগামী যুবকেরা আপনাদিগের মতামত প্রচারের উদ্দেশ্যে সমদর্শী (Liberal) নামক একখানি দ্বিভাষী পত্রিকা প্রচার করেন, শিবনাথ উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৮ সনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অপর দুইজনের সহিত প্রচারক পদে ব্রত হন। তদবধি প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল তিনি একাগ্রচিত্তে একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় প্রচারক ব্রত উদযাপন করিয়া গিয়াছেন। একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না যে, "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার ও জনসাধারণের সেবা," তাঁহার জীবনের এই মূলমন্ত্র সাধনেই তিনি দেহপাত করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি কয়বার সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এদেশে এমন জনাকীর্ণ নগর নাই, যথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসংবাদ ঘোষণা করেন নাই। ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি ১৮৮৮ সনে ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' ও 'Indian Messenger' এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন। প্রথম-প্রথম এই দুইখানি কাগজের সমুদায় প্রবন্ধ তাঁহাকে প্রায় একাকী রচনা করিতে হইত, এজন্য কতবার তাঁহাকে সারারাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল এই দুইখানি কাগজের সম্পাদক ছিলেন। শুধু তাহাই নহে; কিন্তু যতদিন না দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল,

ততদিন তিনি বিবিধ প্রকারে উহাদের পরিচালনায় সহায়তা করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের জন্মাবধি তিনি উহার আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার অটল বিশ্বাস, গভীর আকুলতা ও অনন্য-সুলভ বাগ্মিতাপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া কত তৃষিত নর-নারীর প্রাণ জুড়াইয়াছে, ও কত দুর্ব্বল-চিত্ত সাধক জীবন-পথে নববল লাভ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। তাঁহার মুদ্রিত বক্তৃতা ও উপদেশগুলি ধর্ম্ম-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব বস্তু। ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তি' আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৯২ সনে তিনি সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। উহাকে তিনি রন্ধনশালার সহিত তুলনা করিতেন, কেননা, একদল অনন্যকর্ম্মা সেবক ও প্রচারক প্রস্তুত করা উহার উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্য যথেষ্ট সাফল্য-লাভ করিয়াছে। 'তনু মন ধন' দিয়া ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ইনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার সমুচিত আলোচনা করা এস্থলে অসম্ভব।

শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বহুমুখী মনস্বিতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি কেবল ধর্ম্মপ্রচারেই আবদ্ধ ছিল না। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকার কৃতদাস রোমক নাট্যকার টেরেন্স (Terence) বলিয়াছিলেন, "fomo sum, humani ni a me alienum puto."—"আমি মানুষ, মানুষের সহিত যাহার সম্পর্ক আছে, তাহার কিছুই আমার সহিত অসংস্পৃষ্ট বলিয়া মনে করি না।" শিবনাথের জীবনে এই বাক্যটি উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সিটি স্কুল, ব্রাহ্ম বালিকা-শিক্ষালয়, ছাত্রসমাজ, ভারতসভা প্রভৃতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৭ সনে তিনি বাঁকিপুরে রামমোহন রায় সেমিনারী নামক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি মদ্যপান-নিবারিণী সভার একজন উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৯১৬ সনে যশোহরে যে সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তিনি তাহার সভাপতিরূপদে বৃত হইয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় যে অধিবেশনের প্রাক্কালে শরীর রোগে একেবারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলতঃ বিগত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে এমন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয় নাই, যাহার সহিত তিনি কোন না কোন প্রকারে যুক্ত না ছিলেন। স্বদেশবাসীদিগের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। ১৯০৭ সনে, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যাহ্নকালে, এই সহানুভূতির কার্য্যতঃ প্রমাণ দিয়া তাঁহাকে সমূহ নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি নারীজাতির ও অবনত শ্রেণীর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। ইহাদের উন্নতির জন্য কেহ কিছু করিতেছে, শুনিলেই তাঁহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত।

সাহিত্য-চর্চ্চা

শাস্ত্রী মহাশয় স্বভাবদত্ত কবিত্ব-শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাল্যকালেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইনি যখন সংস্কৃত কালেজের ছাত্র, তখন ইঁহার 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরে ইনি ক্রমে 'পুষ্পমালা' 'পুষ্পাঞ্জলি' 'হিমাদ্রি-কুসুম' 'ছায়াময়ীর পরিণয়' প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক রচনা করেন। গম্ভীর, পবিত্র ও উদার ভাব ইঁহার কবিতাগুলির বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের পরে ইনি কাব্যরচনা হইতে অনেকটা অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি সরলপ্রাণ ধর্ম্মার্থিগণের নিকটে প্রচুর সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। গদ্যসাহিত্যে শিবনাথের স্থান অনেক উচ্চে। ইঁহার সরস, প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দগতি লিখন-পদ্ধতি সহজেই পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। ইঁহার প্রথম উপন্যাস 'মেজবউ' ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, এবং 'যুগান্তর' প্রভৃতি উপন্যাসও বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের একখানি মনোহর ইতিহাস। তাঁহার 'প্রবন্ধাবলি' বাংলা ভাষার অক্ষয় সম্পদ। প্রবন্ধ-রচনায় শিবনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, রাজকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য, একথা বলিলে আশা করি কেহই রুষ্ট হইবেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষযামে বাংলাভাষায় তাঁহার সমকক্ষ বক্তা অধিক ছিলেন না।

তাঁহার বক্তৃতায় কি ভাবের তরঙ্গ খেলিত, হৃদয়ে-হৃদয়ে কি বিদ্যুৎস্রোতঃ বহিয়া যাইত, তাঁহার কবিত্বপূর্ণ আবেগময়ী ভাষা শ্রোতার প্রাণকে কিরূপ আবিষ্ট করিত, তাহা যাঁহারা নিজে না দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহার যে বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিও বঙ্গ-সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবে। শিবনাথ ইংরাজীতেও কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস' বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অনেকগুলি কবিতা ও প্রবন্ধ এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

চরিত্রের বিশেষত্ব

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পূত চরিত্র সম্যক্ বর্ণনা করিতে পারি, আমাদের এমত সামর্থ্য নাই; কেন না, মহাজনদিগের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্ম্মময় জীবনের পশ্চাতে এমন কিছু বিদ্যমান থাকে, যাহা লোকচক্ষুর অগোচর এবং বিশ্লেষণ ও বর্ণনার অতীত। তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ লইয়া সকলে ধরাতলে আগমন করে না, কিন্তু তিনি সাধনবলে যে কণ্টকময় পথ চলিয়া সিদ্ধির পবিত্র তীর্থে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই অনুকরণ করিতে পারে। তাঁহার জীবনে যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই প্রভুর চরণে আপনাকে বিকাইয়া দিয়াছিলেন; শত পরীক্ষার মধ্যেও তাঁহার বিশ্বস্ততা টলে নাই। তিনি নিয়ত জীবন-স্বামীর সান্নিধ্যে বাস করিতেন; "তাঁহার জন্য ছাড়িতে পারি না এমত সুখ নাই, ও করিতে পারি না, এমত শ্রম-সাধ্য কর্ম্ম নাই"—তাঁহার জীবনের যে কঠোর ব্রত এই বাক্যে উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহা তিনি পূর্ণরূপেই উদ্যাপিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আজীবন যে দুরন্ত সংগ্রাম বহন করিতে হইয়াছে, অনভিজ্ঞ জনের পক্ষে তাহা কল্পনারও অধিগম্য নহে; কিন্তু তিনি অবিচলিত বিশ্বাস, ঐকান্তিক ভক্তি ও দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার বলে সকল ক্ষেত্রেই বীরোচিত জয়মাল্যে অভিনন্দিত হইয়াছেন। ভক্তির সহিত কর্ম্মের মিলন হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার প্রাণে ঊর্দ্ধলোক হইতে এমন শক্তির ধারা নামিয়া আসিয়াছিল। স্বদেশের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া আকুল হইয়া প্রথম বয়সেই তিনি গাহিয়াছিলেন, "খাটিতে বাঁচিব, খাটিয়া মরিব"—আমৃত্যু একনিষ্ঠ সাধন দ্বারা তিনি দেখাইয়া গেলেন, ইহার একটী অক্ষরও তাঁহার পক্ষে বৃথা হয় নাই। তাঁহার মত হৃদয় মনের উন্মুখিতা খুব অল্পই দেখা যায়। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা যেন কিছুতেই মিটিত না; তাঁহার হৃদয় যেন প্রেমের দ্বারা জগদ্বাসী সকলকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিত। তাঁহার গৃহে কত অনাথ বালিকা আশ্রয় পাইয়া অকূলে কূল পাইয়াছে, জীবনে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। এমন প্রেমিক, উদার ও বালকবৎ সরলচিত্ত মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া শত শত ব্যক্তি আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছে। ভগবান্ বুদ্ধ ধম্মপদে বলিয়াছেন, অপ্রমত্ত ব্যক্তি ধ্যানরত, অধ্যবসায়ী, নিত্য দৃঢ়পরাক্রম, উত্থানশীল, স্মৃতিমান, শুচিকর্ম্মা, বিমৃশ্যকারী, সংযত ও ধর্ম্মজীবী। এই সকল লক্ষণের দ্বারা বিচার করিয়া আমরা বলিতে পারি, শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন বিশ্বাস ও অপ্রমাদের মণি-কাঞ্চনযোগেই এমন মনোহররূপে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মাদর্শের দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি কালপ্রাপ্তে ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমৃতত্ত্বের অধিকারী হইয়াছেন; বুদ্ধদেবের বাণী আমাদিগকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছে—

> অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্চুনোপদং,
> অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি, যে পমত্তা যথামতা।

অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্ত ব্যক্তিগণের মৃত্যু নাই, যাহারা প্রমত্ত, তাহারা যেন মরিয়াই আছে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

প্রতিকার প্রার্থনা

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

সম্প্রতি আবার একটী কেরোসিনে আত্ম-হত্যার কথা সংবাদ-পত্রে পাঠ করিলাম। স্থান কলিকাতা। যে বাটী এ দুর্ঘটনার দৃশ্যভূমি, তাহা অসভ্য, অশিক্ষিত বা নীচ ইতর জাতির আবাস নহে; ভদ্রবংশীয় বাঙ্গালী কায়স্থ পরিবার তার মালিক। বাড়ীর কর্ত্তা ইংরেজি জানেন; ভাল আপিসে কাজ-কর্ম্মও করেন;—সমাজে নিশ্চয়ই এতকাল উচ্চ সম্মানের আসন দখল করিয়া আসিয়াছেন।

করোনার রায়ে, সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছে,—আত্মহত্যার হেতু নির্য্যাতন ও জ্বালা-যন্ত্রণা। যে হতভাগিনী নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করিয়াছে, তার মনটাকে পূর্ব্বেই কেহ হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল; নচেৎ এমন কাজ সম্ভবে না। দেহের প্রতি আসক্তি ও মমতা এত স্বাভাবিক ও সংস্কারজাত যে, মনটা ভিতরে বাঁচিয়া থাকিতে—অর্থাৎ ভিতরের মানুষটার না অপঘাত হইলে, কেহ দেহটাকে নিজের হাতে নষ্ট করিতে পারে না।

এই মৃতা বালিকাটী যতদিন শ্বশুরবাড়ী বাঁচিয়াছে—গৃহ-ধর্ম্মের জন্য পরিজন, নারী-ধর্ম্মের জন্য স্বামী,—এতদ্ব্যতীত অপর কাহারও সংসর্গে আসিতে পায় নাই, এ কথা নিঃসন্দেহ। ইহার মধ্যে এমন কাহার আবির্ভাব হইতে পারে, যাহার হস্তে তাহার ভিতরের মানুষটা জবাই হইয়াছে।

সে যে সংসারে প্রবেশ করিল, সেটা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র;—যাহাদের পাইল, তাহাদের সহিত সম্পর্কটা এ জন্মের মত অবলম্বন;—এ কথা সে বুঝিতে পারে নাই, ইহা কখনই যথার্থ হইতে পারে না। নারীর সহজাত-সংস্কার তাহার সঙ্গে ছিল; সমাজের পুরুষপরম্পরা-লব্ধ অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত বয়সও যে তাহার হয় নাই, এমন নহে। আর অন্য পথ অবলম্বন করিতে হইলে, সমাজের মধ্যে স্থানটা অথবা আপনার আত্মাটা—দুয়ের একটাকে না নষ্ট করিতে পারিলে, বাহির হইবার দরজা খুলিবে না—এও সে জানিত।

ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না যে, সে শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে সেই সংসারের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে চেষ্টা করে নাই। হইতে পারে, বালিকাটী অভিমানিনী ছিল; হইতে পারে, ঘা খাইলে ফিরিয়া মারিবার প্রবৃত্তিকেও সে সম্যক্ বশে রাখিতে পারিত না; কিন্তু এ তথ্য সম্ভবাসম্ভবের অতীত এবং নিশ্চিত সত্য যে, যাহাদের হাত এড়াইবার জন্য সে মরিল, তাহাদের ভালবাসা পাওয়াটা তাহার ঔদাসীন্যের বস্তু ছিল না। হতভাগিনী এই বস্তুটীর আমরণ প্রতীক্ষা করিয়াছে—এইটার অভাবে মর্ম্মে-মর্ম্মে গুমরিয়াছে। এটা পাইলে তার জীবন অঙ্কুরে বিনষ্ট না হইয়া ফলে-ফুলে, পত্রে পুষ্পে বিকশিত হইয়া উঠিত।

এদিকে শ্বশুর-শাশুড়ী,—স্বামী পর্য্যন্ত,—সকলেই করোনারের আদালতে একবাক্যে সাক্ষ্য দিয়া গেলেন—তাহাকে ভালরূপে খাওয়া-পরা দেওয়া হইত; তাহার উপর কোনও প্রকারই কুব্যবহার হয় নাই। যাক্, কোনও দিকে কোনও ফাঁকই রহিল না। এ শোচনীয় ঘটনার জন্য দায়ী বলিয়া কোনও মানুষকেই আর দোষ দিবার উপায় নাই। দায়ী অদৃষ্ট!

এমনি করিয়া অদৃষ্ট বেচারা আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলার অন্তঃপুরের শত-শত বালিকা ও যুবতী বধূর নীরব অশ্রুজল ও শোচনীয় অপমৃত্যুর দায় নিঃশব্দে বহন করিয়া আসিতেছে।

এবারেও তেমনি হইত। বৃক্ষ হইতে শুষ্কপত্র পড়িলে যেমন কেহ চাহিয়া দেখে না, তেমনি নিদ্রিত সমাজের কেহই এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিত না। এ অপমৃত্যু মৃত্যুর তালিকাভুক্ত করিয়াই রাখিত।

ঘটনাটা না কি আদালতে উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর ব্যাপারে বাংলা সংবাদপত্রের মৌনতাকে লজ্জিত করিয়া কোনও খ্যাতনামা ইংরেজ সম্পাদক আপনার সম্পাদকীয় স্তম্ভ পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এমনটা কয়েকবার হইলে, ফলে, গবর্ণমেণ্ট বিচলিত হইতে পারেন। তখন দেশের পক্ষ হইতে এই শ্রেণীর আত্মহত্যাগুলি উপেক্ষিত না হইবারই সম্ভাবনা। দেশ-নেতৃদিগের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি তখন হুজুগের সফলতার আশায় জাগিয়া উঠিলেও উঠিতে পারে।

ইহার ফলে, গবর্ণমেণ্ট যদি পশ্চাতে থাকেন, কাজ হইবেই। অসহায়া নারীগুলিকে উপলক্ষ করিয়া আর একটী সমাজের কলঙ্ক এই উপায়েই লোপ পাইতে বসিয়াছে। ধর্ষিতা নারীর বাধ্যতামূলক হতভাগিনীর রূপজীবিকা—ঐ অসৎ উদ্দেশ্যে বালিকা পালন আর উপেক্ষিত হয় না। সেখানে মানুষের পশু-কীর্ত্তি রাজদণ্ড ভয়ে দিন-দিন অনেকটা সংযত হইতেছে।

কিন্তু দেশের ভিতরের সাহায্য এ বিষয়ে এত সামান্য যে, ধর্ত্তব্য নহে। মুখে আমরা বার-বার বলি যে, "সমাজ-সংস্কার সমাজের ভিতর হইতেই হওয়া চাই"; অথচ বাহিরের চেষ্টা সমাজের বড়-বড় ফাটল মেরামত আরম্ভ করিয়াছে—আমরা নির্ব্বাক্।

যাহা হউক, এই কেরোসিনে আত্মহত্যা বা গৌণভাবে বাঙ্গালীর ঘরের বধূ-হত্যা যদি বাহির হইতে বন্ধ হইবার চেষ্টা হয়,—সমাজ

যদি এটারও কেবল দর্শক থাকে, তবে বাহিরের দিককার ধাক্কা-ধাক্কিতে ভিতর অনেকটা ধসিয়া পড়িবে।

এই ধাক্কা-ধাক্কি কেহই থামাইয়া রাখিতে পারিবে না। দেশেও সমাজ-বহিষ্কৃত এমন দল প্রস্তুত, যাহাদের ঘরে নারী নরের সম্বন্ধ শুধু প্রয়োজনের নহে—হৃদয়ের। আর যে ইংরেজ ভারতে বিবিধ অমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে সতীদাহ, নরবলি প্রভৃতি প্রথা রহিত করিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতি এমনি জিনিসগুলা সত্যই উপেক্ষা করিতে অসমর্থ। নারীর আদর তাঁহাদের নিজেদের ঘরে অনেকখানি। আজন্ম সেই অভ্যাস পালন করায়, তাঁহারা যে দেশেই হউক, নারী নির্যাতন জিনিসটা দেখিলেই চঞ্চল হইয়া উঠেন,—প্রতিকারের চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্ররোচনা ও ভরসা পাইলে—এই ধরণের হত্যা-কাণ্ডগুলির প্রতিবিধিৎসা স্পৃহা দেশে জাগিবেই।

তখন ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা, আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত প্রভৃতির ভিতর দিয়া, একটা কিছু বাহির হইয়া আসিবেই, যাহার ফল—সমাজে গৃহ-বন্ধন-প্রথার মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারে।

যাহাই মনে ভাবি না কেন, তখন এ কথা বলিয়া কিছুতেই আমরা আমাদের কোট বজায় রাখিতে পারিব না যে, দেশে বৎসর বৎসর অসংখ্য লোক কলেরা, ম্যালেরিয়া, শ্বাস-কাশ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় মরিতেছে,—তাহাদের রক্ষার উপায় কর গিয়া—এই মুষ্টিমেয় এবং সম্পূর্ণরূপে অন্তঃপুর সংক্রান্ত মৃত্যুর কথা লইয়া তোমাদের মাথা ঘামাইতে হইবে না।

তখন বিশ্বের মানুষের বিবেক-দৃষ্টির আলোকে তোমাদের অন্তঃপুরিকারা সত্যই আলোক প্রাপ্ত হইবে।

কিন্তু এমনভাবে না ভাবিয়া—চিন্তার অন্যরূপ ধারা-প্রবর্ত্তনই আজ বাঞ্ছনীয়। আমাদের ঘরের বধূ স্থানবিশেষে নির্যাতনে অতিষ্ঠ হইয়া আত্মহত্যা অবধি করিতেছে,—এটা আমরা অন্তরে-অন্তরে দোষ এবং কলঙ্ক বলিয়া সত্যই কি স্বীকার করি না? পরে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই নিজেদের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইব,—সত্যই কি সমাজের মধ্যে এ শক্তি আর অবশিষ্ট নাই? প্রায়শ্চিত্তে ইহলোকেই পাপের ক্ষয় হয়—পারত্রিক শাস্তিটা তখন আর বড় থাকে না। এই সমাজগত পাপের কি প্রায়শ্চিত্তের উপায় নাই?

এখনও সমাজে যে সব পরিবার আছেন, যেখানে বধূ বধূর সম্মান ও কন্যার আদর পাইতেছে,—তাঁহাদের মর্য্যাদা দিয়া সকলের সম্মুখে সম্মানিত করিবার মত উদ্যমশীল ব্যক্তির সত্যই কি অভাব? সামাজিক শাসনের যে কাঠামটা ভূতের ভয় দেখাইতে অন্ধকারে সাজাইয়া রাখিয়াছি, সেটার স্খলিত দড়ি দড়া আবার বাঁধিয়া লইয়া তাহাকে আলোয় দাঁড় করাইতে ক্ষতি কি?

আর ইহার অপেক্ষা অধিক পরিতাপের কথা কি হইতে পারে যে, যে দেশে পারিবারিক কর্ত্তব্য শিখাইতে এখনও রামায়ণ সর্ব্বত্র পঠিত, সে দেশের লোক ঘরে অশান্তি ও কলহের আগুন জ্বালিয়া, বিলাতী Humanityর দমকল আনিতে সাংকেতিক ঘণ্টা বাজাইতেছে,—সময় থাকিতে প্রতিকার করিতেছে না।

ইহার হেতু যদি এই বুঝিতে হয় যে, সমাজ বলিয়া এমন কিছু এদেশে নাই, যে চেষ্টা করিলে কোনও কুপ্রথার উচ্ছেদ করিতে পারে;—এখানে সকলেই উচ্ছৃঙ্খল আত্মমতাবলম্বী;—কতকগুলি সৌখীন ধারণা ছাড়া এ দেশের মাতব্বর ব্যক্তিদের মধ্যে কোনও সার পদার্থ নাই;—জাতিকে চালাইতে-ফিরাইতে তাঁহারা সমর্থ নহেন,—তবে পিনাল কোডের উপর নির্ভর করিয়াই দাম্পত্য-জীবন পরিচালিত করিতে হয় বটে। তবে বেদপুরাণের পরিবর্ত্তে ছেলেদের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ, আর বিলাতী বিজ্ঞানের মধ্যেই নীতির আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া সমীচীন? তবে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উকিল, ব্যারিষ্টারদেরই গুরুপুরোহিতের স্থান ছাড়িয়া দিতে হয়।

আজকাল বাঙ্গালীর মেয়ে কত যে সৌখীন ও ক্লেশ-সহনে অপারগ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা যখন স্মরণ হয়, তখন তাহাদেরই মধ্যে কেহ পরিধেয় বস্ত্র কেরোসিনে সিক্ত করিয়া স্বহস্তে পুড়িয়া—মরিয়াছে, এ কথায় উত্তেজিত নহে, উন্মত্ত হওয়াই অন্তর্যামীর উপযুক্ত কাজ। দহনের যন্ত্রণাভয় মন হইতে মুছাইয়া দিতে পারে সে কতদিনের ও কতখানি অসহ্য জ্বালা! সে জ্বালা, সে মর্ম্মবেদনা, চৈতন্য, জয়দেব, চণ্ডীদাসের দেশে এখন এই বিংশ শতাব্দীতে মানুষে মানুষকে দিতে পারিতেছে;—আমাদের জাতির সভ্য নাম বজায় রাখিতে আমরা তাহার কি প্রতিকার কল্পনা করিতেছি?

বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, বড় বড় প্রকাশকগণ, যাত্রা, থিয়েটার, কথকতা-ব্যবসায়ী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত সকলে যদি আপন আপন কাজ ভাগ করিয়া লইয়া একযোগে সমীর সাধন আরম্ভ করিয়া দেন—তাহা হইলে, অল্পদিন-আগত ঘৃণিত ব্যাধি এখনও ভিষকের চেষ্টাতে সমাজ-দেহ ত্যাগ করিতে পারে।

যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা য়ুরোপের বোলশেভিজম্‌, এসিয়ায় পীত-জাতির অভ্যুদয়, বিলাতের কেল্‌টিক আন্দোলন—সমস্তেরই নিয়মিত সংবাদ রাখিয়া, সে সব মনস্তত্ত্ব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে ব্যবচ্ছেদ করিয়া আয়ত্ত করিতেছেন। হায় রে! ঘরের কোণের এই সব দুর্গতি ও গণ্ডগোল—ইহার অন্তর্গূঢ় মনস্তত্ত্ব তাঁহাদের চিন্তার বিষয় নয়! এ যে বড় ছোট, বড় প্রাকৃত!

যাঁহারা লেখক, তাঁহারা জ্ঞানের প্রদীপ এমন ভাবে জ্বালিয়া ধরিয়া অগ্রসর হউন, যাহাতে জাতি আপনার অন্তরটাকে বার-বার সুস্পষ্ট-রূপে দেখিতে পায়। সার্চ্চলাইট ফেলিয়া দেশ-বিদেশের অন্তস্তল দেখাইলে লাভ কি? উভয়ের যে ব্যবধান-পথটুকু অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেটুকু আলোকিত না করিলে, ইহারা ঘর হইতে বাহির হইতে পারিবে কেন?

তাঁহারা দেখান, কোন দুষ্প্রবৃত্তি কেমন করিয়া ধীরে-ধীরে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া আজ কোথায় বসিয়া আছে, যাহার নির্দ্দেশে কৌশল্যার মত শাশুড়ীর আদর্শ বাঙ্গালী গৃহিণীর মধ্যে ফুটিতেছে না;—জীনকীর

আদর্শ বধুর মধ্যে ফুটিতেছে না। ভরত লক্ষ্মণের আদর্শ ভ্রাতার মধ্যে ফুটিতেছে না,—রামচন্দ্রের জন্ম দুর্লভ হইয়াছে।—এই দুষ্প্রবৃত্তি দূরীভূত করিতে হৃদয়কে কোন উপায়ে করগত কোন মন্ত্রে সম্মোহিত করা সম্ভব? তাঁহারা চিত্রিত করুন এমন সব চরিত্র, যাঁহাদের সৌন্দর্য্য মানুষকে জয় করিতে পারিবে। লোকের চিন্তাধারা গোপন আকর্ষণে তাঁহাদের মনোবৃত্তির পরতে-পরতে মিশিয়া যাইবে—কখন যে গিয়াছে, তাহারা বুঝিতে পারিবে না।

আরব জাতির জ্ঞানচর্চ্চা—কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়

[শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম্-এ, বি-টি]

জ্ঞানালোচনায় কায়রো নগরও বোগ্দাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই জ্ঞানকেন্দ্রে প্রখর প্রতিভাশালী ক্ষণজন্মা মহা পণ্ডিত ইবন য়ুনুসের (Ibn Yunus) আবির্ভাব হয়। তাঁহার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী-শক্তির প্রভাবে তিনি ঘড়ীর দোলকযন্ত্র (Pendulum) আবিষ্কার করেন।

কায়রো নগরের প্রতিষ্ঠা

কায়রো নগরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অবিদিত নাই। বার্ব্বারীরাজ্যের অধিপতি ফতেমাবংশীয় চতুর্থ খলিফা আল্মোইজ ৯৬৭ খৃষ্টাব্দে মিসরপ্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করেন। তথায় আব্বাসবংশের আধিপত্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়। সেই বৎসরই মিসরের প্রাচীন রাজধানী কোস্তাত নগরের অনতিদূরে নীলনদের তীরে আল্কাহারা নামধেয় এক সুরক্ষিত নগর স্থাপিত হয় এবং তথায় খলিফার বাসোপযোগী এক রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। আল্মোইজ স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধব ও পাত্র-মিত্র সমভিব্যাহারে তাঁহার বার্ব্বারী রাজ্যের রাজধানী কেরাওয়ান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন নগরে আগমন করিয়া নবনির্ম্মিত রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি এই নগর সমস্ত মিসরদেশের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হয়। এই নগরই এক্ষণ কায়রো নামে পরিচিত।

আল্মোইজ (৯৫৩-৯৭৫)

আল্মোইজের শাসনাধীন কায়রো নগর জ্ঞানচর্চ্চায় বোগ্দাদের প্রায় সমকক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। আব্বাস-বংশের খলিফা মামুন যেরূপ বিদ্যানুরাগী ও সুশিক্ষিত ছিলেন, ফতেমাবংশীয় মোইজ সেইরূপ বিদ্যোৎসাহী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। গ্রীক্, বার্ব্বার ও সুদনী ভাষা তাঁহার আয়ত্ত ছিল। আরবী ভাষায় তিনি এত ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, উক্ত ভাষায় তিনি সুন্দর-সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। তিনি এরূপ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত। রাজধানীর নিকটে তিনি আল্ আজহার নামে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ৯৭১ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদের সংস্রবে আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় অদ্যাপি সেই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও মুসলমান জগতের বিভিন্ন অংশ হইতে প্রতি বৎসর এই শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় দুই সহস্র বিদ্যার্থী সমবেত হইতেছে। এই স্থানে কোরাণশাস্ত্র এখনও বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে।

আল্হাকিম (৯৯৬-১০২১)

ফতেমাবংশীয় আল্হাকিমও জ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। ইনি গজনীর সুলতান মামুদের সমসাময়িক। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে ও বিদ্বন্মণ্ডলীর উৎসাহবর্দ্ধনে ইনি সুলতান মামুদের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। সুলতান মামুদ গজনীতে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন; আল্হাকিমও কায়রো নগরে বিজ্ঞানমন্দির (Hall of Science) প্রতিষ্ঠা করেন (১০০৫ খৃষ্টাব্দে)। এই স্থানে সিয়া-ধর্ম্মমত, কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আইন ও চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত। গজনীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন পাঠাগারে নানা ভাষায় অসংখ্য দুর্লভ পুস্তক সংগৃহীত হয় এবং বহুবিধ অদ্ভুত জীবজন্তু ও নৈসর্গিক বস্তু সম্বলিত এক যাদুঘর নির্ম্মিত হয়। কায়রো নগরেও বিজ্ঞানমন্দির-সংশ্লিষ্ট পাঠাগারে তদ্রূপ নানাবিধ মূল্যবান্ গ্রন্থ রাজব্যয়ে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য রক্ষিত হইত। গজনীতে সুলতান মামুদের রাজদরবার যেরূপ গুণী ও জ্ঞানী লোকের সমাবেশে সুশোভিত ছিল, কায়রো নগরে আল্হাকিমের বিদ্বজ্জন-সেবিত রাজসভাও তদ্রূপ জ্ঞান-গৌরবমণ্ডিত ছিল। গুণগ্রাহী মামুদের রাজকোষ যেরূপ পণ্ডিতমণ্ডলীর উৎসাহ-বর্দ্ধনে উন্মুক্ত ছিল, বিদ্যোৎসাহী হাকিমের রাজভাণ্ডারের দ্বারও তদ্রূপ জ্ঞানচর্চ্চার সহায়তাকল্পে সর্ব্বদা উদ্ঘাটিত থাকিত। দয়াশীল-মুক্তহস্ত খলিফার অনুগ্রহ ও উৎসাহ লাভের আশায় নানাদেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী তথায় আকৃষ্ট হইত। এইরূপে বিদ্বজ্জনাধ্যুষিত কায়রো নগর এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে।

বিজ্ঞানমন্দির-সংশ্লিষ্ট পাঠাগারের জন্য প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ব্যয়িত হইত। এই পাঠাগারের হস্তলিখিত পুঁথির কাগজের জন্য রাজা বৎসরে ৯০ দিনার* কালি কলমের জন্য বৎসরে ১২ দিনার, পুরাতন পুস্তক সংস্কারের জন্য ২২ দিনার, গালিচা ও আসনাদির জন্য ১৯ দিনার, জলের জন্য ১২ দিনার, পাঠাগারের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর বেতনের জন্য ৬৩ দিনার, একুনে ২৭৫ দিনার প্রদান করিতেন। ইহা যদিও বর্ত্তমানে সামান্য বলিয়া পরিগণিত হইতে

* ১৩১ দিনার=৭০ পাউণ্ড=৭০০ টাকা। ১ দিনার=৫ টাকার কিছু বেশী।

পারে, তথাপি তদানীন্তন রাজার বিদ্যানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ধর্ম্মজনিত কলহ উপস্থিত হওয়ায় ইহা ১১১৯ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হইয়া যায়। আবার ১১২৩ খৃষ্টাব্দে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি নব-বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুস্তানসির (১০৩৬-১০৯৪)

ফতেমা-বংশের অন্যতম নৃপতি মুস্তানসির যে পাঠাগার স্থাপন করেন, তাহাতে প্রত্যেক বিভাগে এক লক্ষের অধিক সংখ্যক গ্রন্থাবলী বিরাজিত ছিল। পাঠাগারের কার্য্য পরিচালনার জন্য একজন অধ্যক্ষ, দুইজন নকলনবিশ, ও দুইজন অনুচর ছিল। হস্ত-লিখিত পুঁথির মধ্যে ২৪০০ কোরাণ বিদ্যমান ছিল। ইহা ব্যতীত, নানা বিষয়ের অসংখ্য দুর্লভ পুস্তক সেই পাঠাগারের শোভা বৃদ্ধি করিত। পরিতাপের বিষয় এই যে, রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, তুরস্ক সৈন্যগণের হস্তে পতিত হইয়া বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ চিরতরে বিলুপ্ত হয়, বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অগ্নিমুখে পতিত হয়। কিন্তু ফতেমাবংশীয় রাজগণের বিদ্যানুরাগ এত প্রবল ছিল যে, তাঁহারা আবার পুস্তক সংগ্রহ কার্য্যে ব্রতী হইয়া ১০০ বৎসরের মধ্যে প্রায় ১২০০ গ্রন্থ একত্র করেন।

ফতেমাবংশের কতিপয় নরপতি শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া বিদ্যোৎসাহিতা ও বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের মন্ত্রিগণের মধ্যেও কেহ-কেহ প্রভুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার কার্য্যে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। সুকবি, সুপণ্ডিত বা শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি কখনও তাঁহাদের আনুকূল্য ও সহায়তা লাভে বঞ্চিত হন নাই।

উজির ইবন কিলিস।

খলিফা আজিজের (৯৭৫-৯৯৬) প্রধান উজির ইবন কিলিস্ নিজেই একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া, সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিতেন। তথায় তিনি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করিতেন, এবং কবিগণ তাঁহাদের কবিতা সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর মন মুগ্ধ করিতেন। তিনি হস্তলিখিত পুঁথি নকল করিবার জন্য একদল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। তাঁহারা প্রতিদিন যথারীতি তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাঁহাদের কার্য্যের বিরাম ছিল না। প্রতিদিন পণ্ডিতমণ্ডলী আসিয়া তাঁহার সভায় উপস্থিত হইতেন। তথায় নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া উজীর ইবন কিলিস পণ্ডিতমণ্ডলীর উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন।

এইরূপে ফতেমা-বংশের রাজত্বকালের প্রথম ভাগে মিশর প্রদেশে ঐতিহাসিক, সুকবি, বিজ্ঞানবিদ্ ও আইনজ্ঞ লোকের আবির্ভাব হয়। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে কাজি এন্ নোমান (Kadi en-Noman) ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা যে শুধু আইনজ্ঞ, সুদক্ষ ও সুবিজ্ঞ বিচারক ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা আরবীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্র কাব্য ও ইতিহাসের আলোচনায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

হাকিমের সভার অপর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল আল্‌মুসোব্বিহি (el-Musobbihi)। তিনি মিশরদেশীয় লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার নিজ দেশের ইতিহাস ২৬০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ করেন; এবং ধর্ম্ম, কাব্য, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

ফতেমাবংশের রাজগণ এইরূপে বিদ্যানুশীলনে যথেষ্ট উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতেন; সুতরাং বিদেশ হইতে বহু লোক শিক্ষালাভার্থ কায়রো নগরীতে আসিয়া সমবেত হইত। এই বিদেশাগত পণ্ডিতগণও, নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা দ্বারা, মিশরের যশঃ ও খ্যাতি বিস্তার কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রাজবংশের রাজত্ব কালে মিশরের এই বিদ্যানুশীলন-স্পৃহা দিন-দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং তাহার ফলস্বরূপ মিশরের সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানকেন্দ্র আজহোর-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফতেমা-বংশের রাজগণ মিশর প্রদেশে ইস্‌লাম-জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক ছিলেন। সালাহ-উদ্দীন প্রভৃতি পরবর্ত্তী রাজগণ মিশরে উচ্চশিক্ষা প্রদান উদ্দেশ্যে কলেজ স্থাপন করিয়া সেই পূর্ব্ব-প্রদর্শিত পথ সুপ্রশস্ত করিয়াছেন; এবং জ্ঞানরাজ্যের সম্মোহন চিত্র সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন।

সালাহ্-উদ্দীন (Saladin)—(১১৬৯-১১৯৩)

সালাহ্-উদ্দীনের রাজত্বকাল মিশরের ইতিহাসে এক গৌরবময় ও স্মরণীয় যুগ। তিনি দেশজয় ও রাজ্য-বিস্তার করিয়াই নিরস্ত ছিলেন না। বিজিত দেশসমূহ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ করিবার জন্য সুরক্ষিত দুর্গপ্রাকার নির্ম্মাণ করেন, এবং রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও সুশাসনের বন্দোবস্ত করিয়া রাজোচিত গুণের পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি যে এক নবপ্রথার প্রবর্ত্তন করেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম জগতের ইতিহাসে আদরণীয় ও সম্মানার্হ হইবার উপযুক্ত।

মিশরদেশে সালাহ্-উদ্দীন (Saladin) সর্ব্ব প্রথম মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া উচ্চশিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। ইহার পূর্ব্বে কায়রো নগরীতে উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য কোনরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফতেমা-বংশের রাজত্বকালে বিজ্ঞা[illegible]র ভিন্ন অন্য কোনরূপ উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র তথায় ছিল না; সেখানেও সিয়া-ধর্ম্ম-মতের প্রাবল্য ছিল। নিয়মিত উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য সালাহ্-উদ্দীনই সর্ব্বপ্রথম মিশরদেশে উচ্চাঙ্গের কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল কলেজ সাধারণতঃ বিনা-বেতনে শিক্ষা প্রদান করিত ও সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত থাকিত। এই শিক্ষা-প্রণালীর

দেশে প্রচলিত ছিল। তথা হইতে সিরিয়া প্রদেশে প্রবর্ত্তিত হয় এবং সালাহ্‌-উদ্দীন কর্ত্তৃক মিশরদেশে আনীত হয়।

মিশরদেশে এই নব প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া সালাহ্‌-উদ্দীন এই বিনশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মিশরবাসিগণের অধিকাংশই "সিয়া মতের" অনুসরণ করিত। শিক্ষা প্রভাবে তাহাদের মত পরিবর্ত্তন করিয়া শাফি (Shafi-ite) মতের পক্ষপাতী করার উদ্দেশ্যে সালাহ্‌-উদ্দীন এই সকল শিক্ষালয় স্থাপন করেন। আলেকজেন্দ্রিয়া ও কায়রো নগরীতে তিনি দুইটি কলেজ স্থাপন করেন। এইরূপে অন্যান্য স্থানেও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশে এক নবযুগের, নবভাবের ও নব ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল। প্রাচীন (orthodox) ধর্ম্মমতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হানাফি, শাফি, মালিকি ও হাম্বলি--শিক্ষকবর্গ (Doctors) সালাহ্‌-উদ্দীনের মৃত্যুর পরেও তথায় ধর্ম্ম-পিপাসু শিষ্যবর্গের মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করিত।

তেলি-গড়

[শ্রীসুধাংশুমোহন দাসগুপ্ত]

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন ছাড়াইবার পর লাইনের পার্শ্বে মুসলমান শাসনকালীন এক বিরাট দুর্গের ভগ্নাবশেষ ভাগলপুর-যাত্রিগণের দৃষ্টিগোচর হয়। এই দুর্গের সৃষ্টি-কাহিনী আজও অন্ধকারের অন্তরালে রহিয়াছে।—হয় ত এমন দিন আসিবে, যে দিন ইহার পুরাতন তথ্য লোক-চক্ষুর গোচরীভূত হইবে। বাংলা বিহারের সঙ্গম-স্থলে, প্রকৃতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত এই দুর্গ মুসলমান যুগে এরূপ দুর্ভেদ্য ছিল যে, "ওরমে" প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ইহাকে "বাংলার চাবি" আখ্যায় অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

"হুমায়ুন নামা"-লেখিকা 'গুলবদন বেগম' লিখিয়াছেন, ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন যখন পিতৃ-রাজ্যের অধীশ্বর হ'ন, তখন মোগল শক্তি অতি হীনদশা প্রাপ্ত হইল। একটী একটী করিয়া সম্রাট্‌ বাবর শাহের অধিকৃত রাজ্যখণ্ডসমূহ মোগলের হস্তচ্যুত হইতে লাগিল। হুমায়ুনের বৈরিগণ মধ্যে বাংলার প্রবল প্রতাপান্বিত ভূম্যধিকারী অন্যতম; এবং ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি চুণার পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড হস্তগত করিলেন। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন সের শাহের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করিলেন, এবং আংশিক বিজয় লাভ করিলেন। ব[illegible] পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সের শাহের পুত্র জেলাল খাঁ তখন গৌড়ে পাঠান সেনাপতি খারাজ খাঁর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। সের শাহ গৌড়ে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন, এবং খারাজ খাঁকে "গড়ি" দুর্গ সুরক্ষিত করিতে আদেশ করিলেন। "হুমায়ুন নামায়" উল্লিখিত এই গড়ি দুর্গই বাংলার সীমান্তস্থিত তেলিগড় দুর্গ।

চরমুখে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হুমায়ুন তদীয় অন্যতম সেনাপতি জাহাঙ্গীর বেগ কুইচিনকে লিখিলেন, "কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গড়ি দুর্গ অবরোধ কর।" ভাগীরথীর নিভৃত তটভূমিতে রণদামামা বাজিয়া উঠিল। কিন্তু জয়শ্রী পাঠানের ভাগ্যই বরণ করিলেন। জাহাঙ্গীর বেগ স্বয়ং আহত হইলেন এবং অসংখ্য মোগল সৈন্যের রুধিরপাতে ভাগীরথীর স্বচ্ছ সলিল রক্তবর্ণ ধারণ করিল।

সম্রাট্‌ এই সময়ে কলগঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। এই পরাজয়-কাহিনী জ্ঞাত হইয়া, তিনি স্বয়ং এক বিপুল বাহিনী লইয়া "গড়ি" অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; এবং দুর্গের নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিলেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সের শাহ রাত্রিযোগে পলায়ন করিলেন এবং পরদিবস দিল্লীর সম্রাট্‌ বিনা রক্তপাতে গড়ি অধিকার করিলেন। ১৫৩৬—৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

অল্পদিন পরে হুমায়ুন গৌড় অধিকার করিয়া বিলাসসাগরে দেহ ভাসাইয়া দিলেন। ফলে তাঁহার বহু সৈন্য রোগে এবং বিলাস-পাপে দেহ বিসর্জ্জন করিল। তাঁহার এই দৌর্ব্বল্যের ফলে সের শাহ স্বীয় নষ্ট প্রাধান্য পুনরুদ্ধার মানসে গৌড় এবং দিল্লীর মধ্যে অসংখ্য সৈন্য সমাবেশ করিলেন। অপর দিকে দিল্লীতে হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিন্দাল সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন।

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন গৌড় পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার বামতট দিয়া মুঙ্গের পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। পাছে সের শাহ মনে করেন যে, অগ্রসর হইবার পথ পরিত্যাগ করিয়া হুমায়ুন পলায়নের পথ গ্রহণ করিয়াছেন, এই আশঙ্কায় আমীরগণের পরামর্শানুসারে তিনি গঙ্গার দক্ষিণ তটভাগ অবলম্বন করিলেন। কর্ম্মনাশার তীরে মোগল পাঠানে আবার ভীষণ সংঘর্ষ হইল। বিজয়-গৌরবে গরীয়ান্‌ পাঠান ছত্রভঙ্গ মোগল সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিল। হতশ্রী হুমায়ুন বহু কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। এই সমুদায় ঘটনা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, সুতরাং ইহার পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র।

আমরা আলোচ্য বিষয় হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন দেখা যাউক, তেলিগড় দুর্গ সম্বন্ধে কি তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি।

কেহ-কেহ বলেন, সের শাহ কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মতানুসরণ করিলে, দুর্গের নির্ম্মাণকাল নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুর্গ সের শাহের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইহার প্রাচীর প্রস্থে ১৮ ফিট হইতে ২০ ফিট।

এক একখানি কঠিন সবুজ বর্ণের পাথরের (৩ ফিট × ১ ফুট × ৮ ইঞ্চি) সহিত একখানি করিয়া পাতলা ইটের (৬½ × ৫½ × ১¼ ইঞ্চি) দ্বারা এই প্রাচীর গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে।

এইরূপ সবুজ বর্ণের পাথর ইদানিং তেলিগড়ের চতুঃপার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় নৌকাযোগে এই সমুদয় পাথর অন্য স্থান

হইতে এই স্থানে আনীত হইয়াছিল। এই দুর্গ-প্রাচীরের গাঁথুনি-কৌশল হইতে অনুমিত হয় যে, ইহা মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের গেজেটিয়ারে ইহার নির্ম্মাণ পরবর্ত্তীকালে হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাঁহার মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনৈক তেলী জাতীয় ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই জন্যই ইহার নাম "তেলিয়াগড়ি।" হাণ্টার সাহেব আরও বলিয়াছেন যে, এই জমিদার পরে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। বেভেরিজ-পন্থী ইহার "টেরিয়া-গড়ি, প্রেষ্টেড্ (১৭৩৭) তেলিগান, এবং ওরমে (১৮০৪) টাক্রাগলি নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট এই স্থান তেলিগড় বা তেলিয়াগড় নামেই পরিচিত। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার নাম "গড়ি" ছিল, সুতরাং হাণ্টারের কাল-নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ হইতে কাশী, পাটনা, ভাগলপুর পর্য্যন্ত যে পথ ছিল, তাহা তেলিগড় দুর্গের পার্শ্ব দিয়াই গিয়াছিল। বিগত শতাব্দীতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নির্ম্মিত হইলে এই পুরাতন পথ পরিত্যক্ত হইল এবং আজকাল স্থানে-স্থানে ইহার চিহ্ন মাত্রও লুপ্ত হইয়াছে। এই পথের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া ইহা দেখিলে মনে বাস্তবিক দুঃখ হয়; এবং মনে হয়, নূতনের পক্ষপাতী অকৃতজ্ঞ মানবের হস্তে পতিত হইয়া পুরাতনের অবস্থা সর্ব্বত্রই এইরূপ। হয় ত একদিন এই পথ সৈন্যগণের অস্ত্র-ঝঞ্ঝনায় মুখরিত হইয়া উঠিত; লক্ষ-লক্ষ অশ্ব, রথ, গজের গমনাগমন-শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। হয় ত কতদিন সুসজ্জিত তাঞ্জাম-আরোহিণী সুন্দরী ললনাকুলের মধুর বলয় কিঙ্কিণি মুগ্ধ পথিকের কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করিত। আর আজ সেই পথের নামটুকু পর্য্যন্ত লোকের হৃদয় হইতে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী ডাক্রানালার সেতু হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত এই স্মরণীয় পথের অনুসরণ করিয়াছিলাম। মুঙ্গের হইতে পীর-পাহাড়, সুলতানগঞ্জ, ভাগলপুর, কলগঙ্গ পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় নীলকরগণের সৌধমালা ইহার পূর্ব্ব গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কিন্তু কলগঙ্গ হইতে পীরপাইতি পর্য্যন্ত পথের চিহ্ন লুপ্ত হইয়া জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের মতে এই জলাভূমি গঙ্গা নদীর আদি প্রবাহ। পীরপাইতিতে সাহেবদের একটা গোরস্থান ও সামুয়েল মিড্‌লটন নামক জনৈক ইংরেজের একটী সমাধি-স্তম্ভ আছে। পীরপাইতি ছাড়াইয়া সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বত-মালার গভীর অরণ্যের পার্শ্ব দিয়া পথের চিহ্ন রহিয়াছে। তাহার পরই একটী সুউচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে তেলিগড় দুর্গ অবস্থিত; এবং ইহার সম্মুখ দিয়া পথ সাত মাইল দূরবর্ত্তী সাহেবগঞ্জে পৌছিয়াছে। এইস্থানে একটী মৃণ্ময়দুর্গ আছে, কিন্তু তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে কেহই কিছু বলিতে পারে না। আমার বিশ্বাস, এই দুর্গ ঐতিহাসিকের কৌতূহল উদ্দীপন করিতে পারে। সাহেবগঞ্জ হইতে পথের চিহ্ন স্থানে-স্থানে আবার বিলুপ্ত হইয়াছে; এবং অনেক স্থলে পথের উপরেই ধান্যের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কিছু দূরে সাকরিগলি নামক একটী স্থানে কিছু পুরাতন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার অধিকাংশই মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর তালঝারি নামক একটী স্থান। এই স্থানে C. M. S মিশনের একটা ভজনালয় আছে। তালঝারির পর মঙ্গলহাটে একটী বৃহৎ মসজিদ ও একটী সুন্দর সেতুর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার পরই রাজমহল। রাজমহল হইতে পথ উধুয়ানালা ও ঘেরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে স্যার আয়ার কুট, মুঙ্গেলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একদল সৈন্যসহ তেলিগড় দুর্গে বাস করেন। তাহার পর গভর্ণমেণ্ট এই দুর্গের কোন উপযোগিতা না দেখিয়া ইহার কোনরূপ তত্ত্বাবধান করেন না; এবং সেই জন্য ইহা ধ্বংসের পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। শুধু ইহার অস্তিত্বমাত্র ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যাত্রিগণের নয়ন-গোচর হয়। কারণ, রেল লাইন দুর্গ-প্রাকারের মধ্য দিয়াই গিয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই পুরাতন কীর্ত্তির শেষ কঙ্কাল সযত্নে রক্ষা করা গভর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় ধনী অধিবাসীদিগের কর্ত্তব্য।

তাপ-বিজ্ঞান

থার্মমিটার বা তাপমান-যন্ত্র

[অধ্যাপক শ্রীনলিনীনাথ রায় এম-এ]

তাপ মাপিবার জন্য আমরা অনেকেই এই যন্ত্রটি নিত্যই ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু ইহার প্রস্তুত-প্রণালী হয় ত সকলে অবগত নহেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাপমান কি প্রকারে প্রস্তুত করা হয় তাহাই বলিব।

তাপমান অনেক প্রকারের আছে; কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন কাজে দুই প্রকার তাপমানই বেশী ব্যবহৃত হয়। তাহার মধ্যে একটী wall thermometer; ইহা আমরা বায়ু কিম্বা জলের উত্তাপ দেখিবার জন্য ব্যবহার করি। অপরটি clinical thermometer; ইহা জ্বরের সময় রোগীর গায়ের উত্তাপ পরীক্ষার জন্য ডাক্তারেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অনেক প্রকারের তাপমান ব্যবহার করা হয়। এমন কি প্রত্যেক কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকারের তাপমানের প্রয়োজন হয়। সকল তাপমানেই দেখা যায় যে, কাঁচ-নলে পারা ভরা থাকে; এবং সেই পারা নলের উপর উঠিয়া কিম্বা নীচে নামিয়া অধিক কিম্বা অল্প উত্তাপ জানায়। পারা ব্যতীত কখন-কখনও সুরাসার বা গন্ধক-দ্রাবকও তাপমানে ব্যবহৃত হয়।

এই যন্ত্র দ্বারা কি প্রকারে কোন পদার্থের উত্তাপ মাপিতে পারা যায় তাহা বুঝিতে হইলে, পদার্থের উপর তাপের কি ফল, প্রথমে তাহা

বুঝা আবশ্যক। কোন পদার্থকে উত্তপ্ত করিলে, প্রধানতঃ তাহার পাঁচটি ফল আমরা দেখিতে পাই (১) আকারের বা আয়তনের বৃদ্ধি, (২) তাহার তাপের পরিমাণের বৃদ্ধি, (৩) অবস্থার পরিবর্ত্তন (যেমন কঠিন হইতে তরল পদার্থে এবং তরল হইতে বায়বীয় পদার্থে পরিণতি) (৪) রাসায়নিক ক্রিয়া এবং (৫) তড়িৎ উৎপাদন। তাপের যে-কোন ফল অবলম্বন করিয়া আমরা তাপ মাপিতে পারি। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কঠিন, তরল কিম্বা বায়বীয় যে-কোন পদার্থে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে তাহাদের আয়তনের বৃদ্ধি অথবা প্রসারণ হয়, এবং এই প্রসারণ বায়বীয় পদার্থে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও কঠিন পদার্থে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, তাপের প্রথম ফলের সাহায্যে আমরা তাপ মাপিতে পারি। কঠিন পদার্থের প্রসারণ অত্যন্ত স্বল্প বলিয়া, সচরাচর তাপমানে ইহা ব্যবহৃত হয় না। তরল পদার্থের ব্যবহার অধিক হইয়া থাকে। যদি একটি ফাঁপা গোলকবিশিষ্ট সূক্ষ্ম ছিদ্রের কাঁচের নল রাখিয়া জলে কিম্বা কোন তরল পদার্থে পূর্ণ করিয়া, নলের মুখ অগ্নি-শিখায় গলাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং পঞ্চাশ কিম্বা শত সমান অংশে বিভক্ত করা কাগজের ফিতা ঐ নলের গায়ে লাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মোটা-মুটি ধরণের তাপমান-যন্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এই যন্ত্রের দ্বারা উত্তাপ মাপিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার দোষ এই যে, আর একটি এইরূপে প্রস্তুত তাপমানের সহিত ইহার ঐক্য থাকে না। সেজন্য তাপমানের বিভাগ একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে করা হইয়া থাকে।

যখন আমরা কোন বস্তুকে ওজন করি কিম্বা তাহার দৈর্ঘ্য মাপি, তখন আমরা সের কিম্বা গজ বলি। এই 'সের' ও 'গজ'কে ওজন এবং দৈর্ঘ্যের ইউনিট (unit) বলে। সেইরূপ তাপ মাপিবার জন্য তাপেরও ইউনিট্ আছে। বরফ যে তাপে গলিয়া যায় এবং জল যে তাপে ফুটিয়া উঠে, এই দুই নির্দ্দিষ্ট তাপ-পরিমাণকে বিবিধ প্রকারে ভাগ করিয়া, বৈজ্ঞানিকেরা তাপের ইউনিট্ স্থির করিয়াছেন। এই ইউনিটকে ডিগ্রী বলে। বরফ সকল সময়ে এক নির্দ্দিষ্ট তাপে গলিয়া যায় বলিয়া, বৈজ্ঞানিকেরা এই তাপকে তাপমানের নিম্ন-নির্দ্দিষ্ট ক্রম ঠিক করিয়া লইয়াছেন। জল সকল সময়ে এক তাপে ফুটে না, বায়ুর চাপের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত ফুটন্ত জলের তাপের তারতম্য হইতে দেখা যায়। কিন্তু বায়ু-চাপ যদি একই থাকে, তাহা হইলে জল একই তাপে ফুটিয়া থাকে। বায়ু-চাপ যখন ৩০ ইঞ্চি থাকে, সেই সময় জল যে তাপে ফুটে, সেই তাপকে তাপমানের উচ্চ-নির্দ্দিষ্ট ক্রম বলিয়া ঠিক করা হইয়াছে।

তাপমান প্রস্তুত-প্রণালী

প্রথমে সূক্ষ্ম ও সমান পরিসরের ছিদ্রবিশিষ্ট কাঁচের নল লইয়া অগ্নিশিখায় গলাইয়া তাহার এক মুখ বন্ধ করা হয়। পরে অধিক তাতাইলে যখন নলের কিছু অংশ পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠে, তখন অপর মুখে ফুঁ দিলেই উত্তপ্ত অংশ ফুলিয়া একটি ফাঁপা গোলক তৈয়ারী হয়। এই কাজের জন্য সচরাচর 'ব্লো পাইপ' (blow pipe) ব্যবহৃত হয়। এই গোলকবিশিষ্ট নলে কোন তরল পদার্থ ভরিতে হয়। তরল পদার্থের মধ্যে পারা, সুরাসার ও গন্ধক-দ্রাবক অধিক ব্যবহৃত হয়; জল ব্যবহার করা কেন হয় না, তাহা পরে বলিব। নলের ছিদ্র সূক্ষ্ম বলিয়া, ঢালিয়া দিলেই, পারা কিম্বা অন্য কোন তরল পদার্থ সহজে উহার ভিতর যায় না। সে জন্য অন্য একটি উপায় অবলম্বন করা হয়। কোন পাত্রে খানিকটা পারা রাখিয়া, তাহার মধ্যে নলের মুখ ডুবাইয়া, গোলকবিশিষ্ট অংশকে উপর দিক করিয়া কাৎভাবে নলটিকে রাখিতে হয়; এবং বার কয়েক পর্য্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল করিলে যন্ত্র পারায় পূর্ণ হইয়া যায়। উত্তাপ দিলে নলের ভিতরের বায়ু প্রসারিত হইয়া বাহির হইয়া যায়। পরে যখন শীতল হইতে থাকে, তখন ভিতরের বায়ু সঙ্কুচিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে পারাকে ভিতরে টানিয়া লইয়া আইসে। এইরূপ বার কয়েক উষ্ণ ও শীতল করিলে, নল ও গোলক পারায় পূর্ণ হইয়া যায়। অবশেষে খাড়া ভাবে রাখিয়া, সমস্ত যন্ত্রটিকে সতর্কতার সহিত তাপাইয়া, উহার ভিতর হইতে অবশিষ্ট বায়ু ও জলীয় বাষ্প যাহা কিছু থাকে, বাহির করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর (blow pipe) ব্লো পাইপ সাহায্যে নলের মুখ গলাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর কিছুকাল ধরিয়া যন্ত্রটিকে ধীরে ধীরে শীতল হইতে দেওয়া হয়। গোলককে অধিক বার তাপানর জন্য তাহার সঙ্কোচন পূর্ণ-মাত্রায় হইতে বিলম্ব হয়,—যদিও বেশীর ভাগ সঙ্কোচন প্রথম ঘণ্টায় হইয়া থাকে। উত্তম তাপমান প্রস্তুতের সময় পূর্ণ-মাত্রায় সঙ্কুচিত হইবার জন্য প্রায় দেড় বৎসর পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হয়।

বিভাগ-প্রণালী

তাপমানকে ডিগ্রীতে বিভক্ত করিবার পূর্ব্বে নিম্ন ও উচ্চ নির্দ্দিষ্ট ক্রম দুইটি প্রথমে ঠিক করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বরফ যে তাপে গলে, তাহাই নিম্ন-ক্রম ঠিক করা হইয়াছে। নিম্ন-লিখিত প্রণালীতে তাহা সম্পন্ন করা হয়।

ত্রিপদির উপর একটি ফনেল রাখিয়া তাহার নীচে একটি পাত্র রাখা হয়। ফনেলের মধ্যে তাপমানকে খাড়া ভাবে রাখিয়া তাহার গোলক ও নলের কিছু অংশ পর্য্যন্ত বরফের চূর্ণ দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। বরফ গলিয়া গেলে, যাহাতে জল তাপমানের নিকট থাকিতে না পারে, এজন্য ফনেলের ব্যবহার, এবং ঐ জল ধরিবার জন্য নীচের পাত্রের প্রয়োজন। যন্ত্রটি কিছুক্ষণ বরফের মধ্যে থাকায় পর, তাহাকে একটু উঁচু-নীচু করিয়া এমন ভাবে রাখা হয় যে, পারার সূত্রটি বরফের উপর দিয়া বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় পনর মিনিট থাকার পর, পারার সূত্র যেখানে স্থির থাকিবে, সেই স্থানে হীরার কলম কিম্বা ত্রিকোণ উখা দ্বারা চিহ্নিত করিতে হয়। এই চিহ্নিত স্থান তাপমানের নিম্ন নির্দ্দিষ্ট ক্রম এবং ইহাকে '০' ডিগ্রী বলা হয়।

উচ্চ ক্রম ঠিক করিবার জন্য তাপমানের গোলক ও নলের অধিক অংশ ফুটন্ত জলের বাষ্পে রাখা হয়। ইহার জন্য একটি বিশেষ যন্ত্র

আবশ্যক; একটি ধাতুময় পাত্র দেখিতে কৌটার মত। তাপমানটি এমন ভাবে রাখা উচিত যে ফুটন্ত অবস্থায় জল উহাকে স্পর্শ করিতে না পারে। কারণ ফুটন্ত জলের তাপ তাহার বাষ্পের তাপ অপেক্ষা অধিক। এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পর পারার সূত্র যে স্থানে স্থির হইয়া থাকে, সেই স্থান পূর্ব্বের ন্যায় চিহ্নিত করা হয়। এই চিহ্নিত স্থান উচ্চ নির্দ্দিষ্ট ক্রম। এই চিহ্ন করিবার সময় বায়ুচাপ ৩০ ইঞ্চি কিম্বা ৭৬ সেণ্টিমিটার হওয়া আবশ্যক; কারণ, এই বায়ুচাপে জল যে তাপে ফুটে, তাহাই উচ্চ ক্রম ধার্য্য করা হইয়াছে। বায়ুচাপ যত অধিক হয়, জলের স্ফুটন-তাপ (boiling point) তত অধিক হয় এবং বায়ুচাপ কম হইলে স্ফুটনতাপও কম হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের ভিতরের চাপ ও বাহিরের বায়ুর চাপ সমান কি না জানিবার জন্য নলের ব্যবস্থা একটী আছে। যখন বাহিরের ও ভিতরের চাপ সমান থাকে তখন রঙ্গিন জল নলের দুই বাহুতে সমান পরিমাণে থাকে। চাপ যে দিকে অধিক হয় তাহার বিপরীত দিকে জলকে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

এই দুই নির্দ্দিষ্ট তাপের মধ্যে, উর্দ্ধে ও নিম্নে তাপ কি প্রকারে মাপিতে পারা যায় দেখা যাউক। আমরা জানি যে, তাপে পদার্থের আয়তনের (volume) বৃদ্ধি হয় এবং এই বৃদ্ধি তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। তাপ অধিক দিলে আয়তনের বৃদ্ধি অধিক হয়। যদি নলের ছিদ্র সমান পরিসরের হয় এবং পারার বৃদ্ধির হার সমান হয়, তাহা হইলে নলকে সমান ভাগে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক ভাগ এক ডিগ্রী নির্দ্দেশ করিবে। এই বিভাগ প্রায়ই নলের গায়ে করা হইয়া থাকে। কোন-কোনও তাপমানে, যে কাষ্ঠফলকে উহা আবদ্ধ থাকে, তাহাতেই এই বিভাগ করা হইয়া থাকে। কাচের নলের উপর এই বিভাগ-চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হইলে প্রথমে মোম দিয়া সমস্ত যন্ত্রটিকে ঢাকিয়া দিতে হয়। পরে সূচ দিয়া বিভাগগুলি চিহ্নিত করা হয়। ইহাতে চিহ্নিত স্থানের মোম গলিয়া যাইয়া কাচ বাহির হইয়া পড়ে। তাহার পর হাইড্রোফ্লোরিক (hydrofluoric) এসিডের বাষ্পে তাপমানকে কিছুক্ষণ রাখিলে অনাবৃত অংশ হইতে কিছু পরিমাণে কাচ খাইয়া যায় ও সেই সকল স্থানে খাদ পড়িয়া দাগ হইয়া যায়। পরে মোম পরিষ্কার করিয়া কাল রং লাগাইয়া দিলে দাগগুলি বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিভাগকে ডিগ্রী বলে ও '০' চিহ্ন দ্বারা তাহার নির্দ্দেশ করা হয়।

১৭১৪ খৃঃ অঃ ডানজিকের ফ্যারেনহিট এইরূপ ডিগ্রীতে বিভক্ত তাপমান প্রথমে প্রস্তুত করেন। নিম্নক্রম নির্ণয় করিবার সময়ে তিনি বরফ ও লবণ মিশ্রণের মধ্যে তাপমান রাখিয়াছিলেন এবং তাহাই তাঁহার তাপমানের নিম্ন-নির্দ্দিষ্ট ক্রম বলিয়া ঠিক করেন। কাজেই বরফ বিগলন তাপ ৩২° ডিগ্রী হইয়াছে। জলের স্ফুটন-তাপ ২১২° দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া ৩২° ও ২১২° মধ্যে ১৮০ বিভাগ করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক ডিগ্রীকে ফ্যারেনহিট ডিগ্রী বলে। এইরূপে বিভক্ত তাপমান ইংলণ্ডে গার্হস্থ্য কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়।

অপ্সালার সেলসিয়স্ আর এক প্রকার বিভাগ প্রচলন করেন। তাহাতে তিনি নিম্ন ও উচ্চ ক্রমে মধ্যে একশত বিভাগ করেন। এই বিভাগকে শতাংশিক বিভাগ বলে এবং যে তাপমানে এই বিভাগ থাকে, তাহাকে শতাংশিক তাপমান বলে। যুরোপের অধিকাংশ স্থানে, বিশেষতঃ ফরাসী দেশে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ইহার ব্যবহার অধিক।

রাসিয়া প্রভৃতি স্থানে আর এক প্রকার বিভাগের প্রচলন আছে। ইহাতে দুই নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে আশীটি বিভাগ আছে। ইহাকে রিউমারের বিভাগ বলে। এরূপ বিভাগযুক্ত তাপমানকে রিউমার তাপমান বলে।

তাপমানে যে-কোন প্রকার বিভাগ থাকুক না কেন, আমরা অনায়াসে ০ ডিগ্রীর নীচে কিম্বা ১০০° ডিগ্রীর উপরে বিভাগ করিতে পারি। এই উপায়ে আমরা এক ডিগ্রীর পরিসর কতখানি হয় তাহা জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে সেই পরিসরের বিভাগ উপরে ও নীচের করিলেই উপর ও নীচের বিভাগ পাওয়া যাইবে। ০° ডিগ্রীর নিম্নের বিভাগগুলিতে '-' চিহ্ন দেওয়া হয়। ফ্যারেনহিটের বিভাগে 'নিম্নক্রম' অর্থাৎ যে তাপে বরফ গলে তাহা ৩২ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। ইহার নীচের তাপ যথাক্রমে ৩১, ৩০ চিহ্ন দিয়া পরে ০° নীচে '—' চিহ্ন আরম্ভ হয়।

একই তাপমান দ্বারা অধিক উচ্চ ও অধিক নিম্ন তাপ মাপা যায় না। ইহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ, তাপমানের নল অধিক লম্বা করিতে হয়। তাহাতে ব্যবহারের অসুবিধা হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাপমানে ব্যবহৃত তরল পদার্থ সকল তাপে তরল অবস্থায় থাকে না। পারদ ৩৫৭° শতাংশিক তাপের উর্দ্ধে বাষ্পে পরিণত হয় ও —৩৯° শ নিম্নে জমিয়া কঠিন হইয়া যায়। কাজেই পারদ তাপমান দ্বারা ৩৮° শ হইতে ৩৫৭° শ তাপ মাপিতে পারা যায়। ০° শ নিম্নের তাপ মাপিতে হইলে সুরাসার ব্যবহার করা হয়, ইহা —১৩০° শ হইতে ৭৭° শ মধ্যে তরল অবস্থায় থাকে। ৩০০° শ বা তাহার উপরের তাপ মাপিতে হইলে বায়ু কিম্বা ধাতু তাপমানের সাহায্য লইতে হয়। প্রত্যেক কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ও আকারের তাপমান ব্যবহৃত হয়। নীচে কতকগুলি তাপমান ও তাহাদের ব্যবহার কি প্রকারে করিতে হয় তাহা দেওয়া গেল।

ক্লিনিক্যাল্ তাপমান। এই তাপমান ডাক্তারেরা রোগীর গায়ের তাপ পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করেন। উপরে বর্ণিত তাপমানের এক বিশেষ অসুবিধা এই যে, যে বস্তুর তাপ মাপা হয়, তাহা হইতে সরাইয়া লইলেই যন্ত্রের পারদ সূত্র নীচে নামিয়া আইসে। সে জন্য তাপ কতদূর উঠিয়াছিল নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। যদি কোন রোগীর দেহের তাপ পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সাধারণ তাপমান দ্বারা জানা কঠিন। কারণ, যখন রোগীর নিকট হইতে তাপমান পৃথক করা যায়, তাহার পারদ-সূত্র নীচে নামিয়া যায়। উত্তপ্ত পদার্থ হইতে পৃথক করিলে যাহাতে পারদ সূত্র নীচে নামিতে না পারে,

তাহার জন্ত এই ক্লিনিক্যাল্ তাপমানে একটি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। তাপমানের গোলক যেখানে নলের সহিত সংযুক্ত থাকে, সেই স্থানের ছিদ্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে প্রসারণের সময় পারা ঐই সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়, কিন্তু সঙ্কোচনের সময় ইহা গোলকে ফিরিয়া আসিতে পারে না। পারদ সূত্র যে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, সেইখানেই থাকিয়া যায় ও তাপ যতদূর উঠিয়াছিল, অনায়াসে জানিতে পারা যায়। এই যন্ত্রে ফ্যারেনহিটের বিভাগ থাকে ও ৯৫° হইতে ১১০° ফ্যাঃ পর্য্যন্ত বিভাগ আছে। বিষয় অবস্থায় মানুষের গায়ের তাপ ৯৮·২° থাকে। তাপ ইহার উপরে উঠিলেই জ্বরের অবস্থা মনে করা হয়। তাপ একবার পরীক্ষা করিবার পর তাপমান ঝাড়িয়া পারদ সূত্রকে ৯৮·২ তে আনা হয় ও তখন আবার তাহা তাপ-পরীক্ষার উপযুক্ত হয়।

ম্যাক্সিমম্ ও মিনিমম্ তাপমান (maximum and minmum thermometer).

কোন বস্তুর কিম্বা বায়ুর সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বনিম্ন তাপ জানিবার জন্ত এই যন্ত্রের ব্যবহার হয়। যে যন্ত্রে সর্ব্বোচ্চ তাপ জ্ঞাপন করে, তাহাকে ম্যাক্সিমম্ এবং যাহাতে সর্ব্বনিম্ন তাপ জ্ঞাপন করে, তাহাকে মিনিমম্ তাপমান বলে। 'ক' একটি পারদ তাপমান। প্রথমটি ইহার ছিদ্রের পরিসর অন্যান্য তাপমান অপেক্ষা অধিক এবং ইহার পারদ-সূত্রের আগে একটি লোহার ক্ষুদ্র নির্দ্দেশক (index) আছে। তাপে যখন পারদের প্রসারণ হয়, তখন এই নির্দ্দেশককে পারা ঠেলিয়া লইয়া যায়, কারণ লোহা অপেক্ষা পারার আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক; সে জন্ত পারার মধ্যে লোহা ডুবিয়া যায় না। যখন তাপ কমিতে থাকে, তখন পারা সঙ্কুচিত হয় এবং নির্দ্দেশককে পশ্চাতে ফেলিয়া আইসে। এই অবস্থায় নির্দ্দেশক সর্ব্বোচ্চ তাপ জ্ঞাপন করে।

একটি সুরাসার তাপমান, দ্বিতীয়টি ইহার নির্দ্দেশক কাচের ও ইহার পরিসর তাপমানের নলের ছিদ্রের পরিসর অপেক্ষা কম। প্রসারণের সময় সুরাসার এই নির্দ্দেশকের দুই পাশ দিয়া আগে চলিয়া যায়, কিন্তু সঙ্কোচনের সময় নির্দ্দেশককে টানিয়া লইয়া আইসে। কারণ সুরাসার কাচকে সিক্ত করে, সে জন্ত সুরাসার যতদূর সরিয়া আইসে surface tension দ্বারা নির্দ্দেশককে ততদূর টানিয়া লইয়া আইসে। এই অবস্থায় নির্দ্দেশক সর্ব্বনিম্ন তাপ জ্ঞাপন করে। তাপ পরীক্ষার নির্দ্দেশকটিকে পারদ কিম্বা সুরাসার সূত্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিয়া পুনরায় তাপ পরীক্ষার উপযোগী করিয়া দেওয়া হয়। পারদ তাপমানের লৌহ নির্দ্দেশককে চুম্বক দিয়া টানিয়া আনা হয় ও সুরাসার তাপমানের কাচ নির্দ্দেশককে তাহার স্থানে আনিতে হইলে তাপমানকে সোজা ভাবে ধরিয়া টোকা দিতে হয়। ব্যবহারের সময় যন্ত্রটিকে অনুপ্রস্থে (horizontally) দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখা হয়।

সিক্সের তাপমান (Six's thermometer).

সিক্স উপরিউক্ত তাপমানের উন্নতি সাধন করেন। এই যন্ত্রে দুইটি পৃথক তাপমানের প্রয়োজন হয় না। একই তাপমানে দুই প্রকার তাপই সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন তাপ একেবারে জ্ঞাপন করিতে পারে। অন্যান্য তাপমান অপেক্ষা ইহার গোলক লম্বাকৃতি এবং ইহার নল চারিবার সমকোণে বাঁকান ও নলের অপর প্রান্তে আর একটি গোলক আছে। গোলক দুইটি ও তাহাদের সংলগ্ন নলের কিছু অংশ সুরাসার এবং মধ্য স্থলে পারা দিয়া পূর্ণ করা আছে। গোলকের উপরের কিছু অংশ খালি আছে। পারাকে নলের দুই বাহুতে সমান অবস্থায় রাখিবার জন্ত দুই বাহুতে পারার উপর সুরাসার দেওয়া হইয়াছে। পারদ সূত্রের অগ্রে ও পশ্চাতে দুই স্থানে দুইটি লোহার নির্দ্দেশক আছে। নলের যে কোন স্থানে যাহাতে ইহারা লাগিয়া থাকিতে পারে, সে জন্ত প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া স্প্রিং লাগান থাকে; এই তাপমানে বিভাগ দুই স্থানে থাকে। তাপ পরীক্ষা একবার করার পর নির্দ্দেশক দুইটিকে অশ্বপাদুকাকৃতি চুম্বক সাহায্যে পারদ সূত্রে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, তখন আবার তাহা পরীক্ষার উপযুক্ত হয়।

আপেক্ষিক বায়ু-তাপমান

Differential Thermometer

যখন দুইটি পদার্থের মধ্যে একটি অপরের অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত কি না জানিবার প্রয়োজন হয়, তখন এই তাপমান ব্যবহার করা হয়। যদিও সাধারণ তাপমান দ্বারা কোনটির তাপ অধিক জানিতে পারা যায় বটে; কিন্তু এই যন্ত্রের সাহায্য অতি শীঘ্র জানিতে পারা যায়। ইহার দুইটি গোলক আছে ও দুইবার সমকোণে বাঁকান এবং একটি নলের দ্বারা সংযোজিত। ইহার দুইটী গোলক ও নলের কিছু অংশ বায়ু দ্বারা এবং বাকী অংশ পারা কিম্বা কোন রঙ্গিন তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ আছে। যদি প্রথম গোলকে উত্তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে গোলকের মধ্যের বায়ু প্রসারিত হইয়া পারদ সূত্রকে নলের উপরের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। যদি দ্বিতীয় গোলকে উত্তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে পারা বিপরীত দিকে যায়। ইহাতে পারদ-সূত্র নির্দ্দেশকের কাজ করে। এই তাপমান দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইলে পদার্থ দুইটিকে গোলকের সংলগ্ন করিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে তাপ যাহার অধিক তাহার বিপরীত দিকে নির্দ্দেশককে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

যদি পরীক্ষার পদার্থ দুইটি তরল পদার্থ হয়, তাহা হইলে এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারা যায় না; সে জন্ত ইহার আকারের কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহার গোলক দুইটি নীচের দিকে ঝুলান ও সংযোজক নল দুইবার সমকোণে বাঁকান। কখন কখনও দুই

বাহুর মধ্যে আর একটি সংযোজক নল থাকে ও তাহার মধ্যস্থলে একটু ষ্টপকক্ (stop cock) থাকে। পরীক্ষার সময় কক্ বন্ধ থাকে ও তাহার পর ইহা খুলিয়া দিলেই পারদ সূত্র দুই বাহুতে সমান অবস্থায় আসে। গোলক দুইটি ঝুলান থাকায় তরল পদার্থের পরীক্ষার সুবিধা হইয়াছে—তরল পদার্থ দুইটি আলাদা পাত্রে রাখিয়া তাহাদের মধ্যে গোলক দুইটিকে অনায়াসে প্রবেশ করাইয়া তাহাদের তাপ পরীক্ষা করিতে পারা যায়।

ধরিতে গেলে, উপরিউক্ত দুইটি তাপমানই বায়ু-তাপমান; কারণ ইহাতে বায়ুর প্রসারণ দ্বারা তাপ মাপা হইতেছে। এই দুইটি যন্ত্রকে তাপমান না বলিয়া তাপদর্শক বলা যাইতে পারে; কারণ, ইহারা তাপ মাপে না, তাপ দেখায়।

ধাতু তাপমান

৪০০° কিম্বা তাহার অধিক তাপ মাপিতে কাচের প্রস্তুত তাপমান ব্যবহার করিতে পারা যায় না, কাচ এই তাপে গলিয়া নরম হইয়া যায়। সে জন্য ধাতু তাপমানের ব্যবহার। এই যন্ত্রে ধাতুর প্রসারণ দ্বারা তাপ মাপা যায়। এই শ্রেণীর তাপমান মধ্যে পাইরোমিটার (pyrometer) ও প্লাটিনম্ থার্ম্মিটার এখানে উল্লেখযোগ্য। পাইরোমিটার—কোন অঙ্গার কিম্বা এস্‌বেস্‌টস নলের একটি ধাতুদণ্ড রাখিয়া তাহাকে উত্তাপের মধ্যে রাখা হয় ও সেই ধাতুদণ্ডের প্রসারণ মাপা হয়, এবং তাহা হইতে তাপের পরিমাণ মাপা হয়।

যখন তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তখন তার এই প্রবাহের গতি কিছু পরিমাণে রোধ করে। এই রোধক শক্তি তামার তারে কম ও প্লাটিনম্ তারে অধিক হইয়া থাকে। উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর এই রোধক শক্তি নির্ভর করে। উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে রোধক শক্তি কমিয়া যায় ও তাপ কমিলে রোধক শক্তি বাড়ে। যদি উত্তাপ ও রোধক শক্তির পরস্পরের সম্বন্ধ জানা থাকে, তাহা হইলে রোধক শক্তি মাপিয়া তাপ জানিতে পারা যায়। খানিকটা সরু প্লাটিনম্ তার লইয়া চিনে মাটির কিম্বা সহজে গলিয়া না যায়, এমন কোন পদার্থের প্রস্তুত নলের মধ্যে রাখিয়া ঐ নল উত্তাপের মধ্যে রাখা হয়। তারের এক প্রান্তে তড়িৎ-মাপক যন্ত্রে (galvanometer) ও অপর প্রান্ত ব্যাটারির সহিত সংযোজিত করিয়া ব্যাটারির অপর প্রান্ত তড়িৎ মাপক যন্ত্রে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয়। প্রবাহ তারের ও তড়িৎ মাপকের মধ্য দিয়া যায়। শীতল ও উত্তপ্ত অবস্থায় তারের রোধক শক্তির (resistance) পরিমাণ বাহির করা হয়। পরে তাপ ও রোধক শক্তির হার হইতে তাপের পরিমাণ বাহির করা হয়।

এই দুইটি তাপমান চুলি, তন্দুর প্রভৃতির উত্তাপ মাপিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি

[অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্-এ, পি-আর-এস্, আই-ই-এস্]

এই যে এখন আমাদের নব-ভারত চলিতেছে, ইহার শরীরের কোন্ অঙ্গটি, জীবনের কোন্ শক্তিটি রামমোহন রায় এনে দিয়েছেন?

এলাহাবাদের বিখ্যাত উকীল মদনমোহন মালবি, একবার হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা তুলিবার সভায়, শ্রোতাদের মনোমুগ্ধকর বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, যে সব ভারতীয় সম্প্রদায় হিন্দু ধর্ম্মের বা আচারের সংস্কার করিতেছেন, তাঁহারা যেন হিন্দু-ধর্ম্মের গাঢ় ক্ষীর বা ঘৃতটুকু ভোজন করিয়া আছেন, কিন্তু বক্তা স্বয়ং এবং তাঁহার অসংখ্য "সনাতনী" শ্রোতা হিন্দু ধর্ম্মের দুধ পান করিতেছেন। তাহার পর উকীল মহাশয় বিজয়-নিনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মানুষের পক্ষে শুধু ঘৃত খাইয়া বাঁচা সম্ভব, না দুধ খাইয়া? এই প্রশ্নে শ্রোতাদের মধ্যে হাস্য ও উল্লাস পড়িয়া গেল,—যেন বক্তার উপমাটিই অকাট্য যুক্তি,—যেন সংস্কারকগণ "বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবেন!"

আমার মনে হয় যে, রামমোহনের প্রধান কীর্ত্তি এই যে তিনি ভারতবাসীদিগকে এবং আমাদের সমান অবস্থাপন্ন অন্য দেশীয় লোকদিগকে চিরজীবন দুগ্ধপোষ্য করিয়া রাখিতে অস্বীকার করিয়াছেন, এবং যাহাতে তাহাদের দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় বাঁচিতে, মরিতে অথবা জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে না হয়, তাহার পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই তিনি নব-ভারতের পিতা, এই জন্যই একমাত্র তিনি আমাদের পক্ষে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক।

প্রত্যেক সভ্যতার অন্তস্তলে এক-একটি ভিন্ন-ভিন্ন ভাবের বীজ নিহিত রহিয়াছে,—অর্থাৎ সেই সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা জাতি জগতের দিকে একটি বিশেষ ভাবে

ফেয়েছে,—জগতের ভিতর তাহারা কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছে,—তাই তাহাদের জীবনের গতি ঐ বিশেষ পথ দিয়া চলেছে,—তাঁহাদের সভ্যতার কলেবরে ঐ বিশেষ ভাবটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রামমোহন রায় এমন একটি ভাব ভারতের জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন, যাহার ফলে নব্য-ভারতবাসীরা দেশকাল-পাত্র-ভেদের ছোট-ছোট ডোবার মধ্যে ডুবে মরতে না পারে; যাহাতে ভারতবাসীর আত্মা, ভারতবাসীর বুদ্ধি, ভারত-বাসীর আকাঙ্ক্ষা মহাদেব-শির-নিঃসৃতা, অনন্ত-সাগর-গামিনী, চির-প্রবাহিতা, অমলা, ধবলা, জীবনদায়িনী জাহ্নবীতে ভাসিতে পারে, প্রাণের পিপাসা ও অবসাদ ঘুচাতে পারে,—কোন সম্প্রদায়-বিশেষের কারণ-বারিতেও নয়, কোন তীর্থ-বিশেষের কুণ্ডের জলেও নয়।

তিনি ভারতকে সেই চির-সত্যের পথে যাত্রী হতে বলেছেন, কেবলমাত্র যে সত্য-শিব-সুন্দরের মাঝারে চিত্তের চির-বসতি খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব। তিনি ভারতে একটি নূতন পন্থ স্থাপন করিতে চান নাই; ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা তাঁহার উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীত। তিনি মানব-আত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন; এবং সেই স্বাধীনতা লাভ করিবার, সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহা সাময়িক, যাহা সাম্প্রদায়িক, যাহা ব্যক্তিবিশেষের বা দেশ বিশেষেরই বিশেষত্ব—তাহা ধর্ম্মের জীবন হইতে পারে না; তাহা বন্ধন-শৃঙ্খল মাত্র,—এই উদার বাণী নবযুগে তিনি প্রচার করিয়াছেন। এই বাণীই মানব-স্বত্বের প্রকৃত ঘোষণাপত্র (Declaration of the Rights of Man), মানব-সমাজের সুখের, প্রকৃত শান্তির, সজীবতার, উন্নতির মূলমন্ত্র। যতদিন আমরা সংসারে ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডী এড়াতে না পারব, পোষাক দেখে মানুষের মূল্য ধরতে থাকব, ততদিনই শ্বেতাম্বরধারী ও দিগম্বরধারীর লড়াই চলবে,—সাদা চন্দনের তিলক ও লাল চন্দনের তিলকের লড়াই চলবে,—অমুক কর্ত্তাকে যাহারা ভজে, তাহারা অপর কর্ত্তা-ভজাদের পাষণ্ডী বলিতে থাকবে। ততদিনই; শুধু ধর্ম্মের তত্ত্ব নয়, জীবনের সব সূত্রাই গুহায় নিহিত থাকবে,—আমাদের শত সাধনায়ও ধরা দিবে না।

সেই সাম্প্রদায়িকত্বের অতীত চিরসত্যই যে মানবের একমাত্র মুক্তির পথ,—কর্ত্তাভজাগণের ভক্তেরা যে ক্রীতদাস মাত্র, আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব কর্ত্তা বা গুরুগুলির উপরে যে এক কর্ত্তা আছেন, তাঁহার রাজ্যে না গেলে যে স্বাধীনতা নাই,—রামমোহন রায় এই মন্ত্র আমাদের দিয়েছেন,—শুধু ধর্ম্মে নহে, রাজনীতিতে, সমাজে, সাহিত্যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাঁহারা শিষ্যগণকে হাত ধরিয়া চালান না, পদে-পদে বিশেষ বিধি দেন না, তাহাদের জন্য একখানি বৃহৎ নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি লিখিয়া রাখিয়া যান না। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষমাত্রেই শুধু তাঁহার মূল মন্ত্রের ভাবটি সমাজে স্থাপিত করিয়া যান, মানবের মধ্যে একটি নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেন, এবং সেই ভাব, সেই শক্তি তাঁহার অবর্ত্তমানে, তাঁহার চোখের আড়ালেও, সেই মহাকার্য্য করিতে থাকে।

ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত অনেক। এই যে ইউরোপে কতদিন ধরিয়া বৈজ্ঞানিক যুগ চলিতেছে, ইহার প্রবর্ত্তক লর্ড বেকন। তিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চায় সফলতা লাভের উপায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশুদ্ধ প্রণালী মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া, প্রমাণ দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সাধারণ বিশুদ্ধ পদ্ধতি বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই ফলবতী হয়, সর্ব্ব সময়েই ইহা সত্য ও প্রত্যক্ষ ফল-প্রদ। কিন্তু বেকন কোন যন্ত্র-নির্ম্মাণের খুঁটিনাটী, বা বিশেষ দ্রব্যের জন্য বিশেষ বিধি, বা বিভিন্ন শাখার জন্য বিভিন্ন বিধি দিয়া যান নাই। এগুলি নশ্বর; যুগে যুগে ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে ও হইবে, এবং বেকন-শিষ্য বর্ত্তমান কালের অতি সামান্য বৈজ্ঞানিকও এই খুঁটিনাটির বিষয়ে তাঁহার যুগ অপেক্ষা অনেক বেশী জানে। কিন্তু যে মহাবীজের এগুলি ডালপালামাত্র, তাহা বেকনের সৃষ্টি।

রাজ-নীতির ক্ষেত্রেও এই সত্য জলন্ত দেখা যায়। ইংলণ্ডে যখন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রিফর্ম্ বিল্ পাস করা হইল, তাহাতে শুধু আইন করিবার সভার সংস্কার করা হইল; বিশেষ-বিশেষ প্রকারে দেশবাসীদিগের উন্নতির, দুঃখ দূর করার, বা বলবৃদ্ধি করার বিধি ইহাতে রহিল না। কিন্তু এই রিফর্ম্ বিল্ই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রজা-তন্ত্রের যুগের প্রবর্ত্তক, বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ জন-উন্নতির বীজ। এই বিলের ফলে আইন-সভা প্রজাদের হাতে আসিল, তাহারা জমিদার ও

আমলাদের কর্তৃত্ব হইতে স্বাধীনতা লাভ করিল। তাহার পর এখন তাহারা সর্ববিধ ক্ষেত্রে নিজ-নিজ অভাব মোচন করিতেছে, নিজ উন্নতির শত-শত পথ খুলিয়া দিতেছে। রিফর্ম বিল শুধু এই সমস্ত জন-উন্নতির মূল মন্ত্রটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, খুঁটিনাটির মধ্যে যায় নাই।

ভারতেও তাহাই ঘটিয়াছে। মহামতি লর্ড রিপণ ও লর্ড মর্লি অমুক দেশীয় লোকটিকে উচ্চপদ দাও, অমুক ব্যক্তিগত অবিচারের প্রতিকার কর, অমুক শহরে একটা বিশেষ উন্নতির পথ খুলিয়া দাও, এরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষের মত তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের মূলমন্ত্র দিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কারণ এই মূলমন্ত্রটী যে দিন প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে দিন সমস্ত বিশেষ-বিশেষ শাসন-বিভাগে, অভাবে-অভিযোগে, শিল্পকলায়, রাজস্বে, লোকশিক্ষায়, লোক-স্বাস্থ্যে ভারতবাসীরা নিজেই নিজের কাজ উদ্ধার করিবে,—তাহার জন্য বিশেষ বিধি, বিশেষ উপদেশ দেওয়া হয় নাই, এবং দেওয়াও উচিত নয়।

রামমোহন রায়ও সেইমত একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষি, যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। কারণ, তিনি এই নবযুগের ভারতের জন্য বীজমন্ত্র দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন নাই যে, তোমরা চাপ্‌কানটার বাঁ দিকে বোতাম লাগাইবে (সাবধান, ডানদিকে নয়!), কলাপাতার পিঠের দিকে ভাত খাইবে (মসৃণ দিকে খাইলে নরকের সম্ভাবনা), "নমস্তে" বলিয়া সকলকে সম্বোধন করিবে (কদাচ "নমস্কার" বা "সলাম" নহে!), রবিবার প্রাতে ৮টার সময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেই তাহা উপরে গৃহীত হইবে, অন্য সময় করিলে তোমাদের আত্মার সদগতি সম্বন্ধে সন্দেহ হইবে; অমুক ভাষাটি দেবভাষা, তাঁহাতে স্তোত্র উচ্চারিত না হইলে ভক্তের শ্রম পণ্ড হইবে; অমুক ব্যক্তি শেষ ত্রাণকর্ত্তা, তাঁহার পর হইতে ঈশ্বর মানবগণকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। পূজা, জাতকর্ম্ম, বিবাহ, সংস্কার সম্বন্ধে রামমোহন রায় কোন পদ্ধতি লিখিয়া আমাদের হাত বাঁধিয়া দিয়া যান নাই;—তিনি শুধু বলিয়াছেন যে, যাহা আন্তরিক, যাহা সত্য বিশ্বাস, তাহাই পবিত্র, তাহাই ঈশ্বরের গ্রাহ্য; এবং সুস্থ, সবল, বলিষ্ঠ মানব-হৃদয় অতীত যুগের শৃঙ্খল কাটিয়া নিজের গতির পথ নিজে করুক।

এই একমাত্র সাধারণ বিধিই, শুধু ধর্ম্মে নয়, রাজ-নীতিতে, সমাজে, সাহিত্যে ও কলাবিদ্যায় নবজীবন আনিতে পারে। যে পরিমাণে আমরা রামমোহন রায়ের এই বীজমন্ত্র গ্রহণ করিব, সেই পরিমাণেই আমরা নবভারতকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারিব;—সেই পরিমাণেই আমরা জগৎ-সভার মাঝে আমাদের উচিত আসন লইতে পারিব; সেই পরিমাণেই আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ, আমাদের জাতি জীবনে অকাল মৃত্যু হরণ সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন অমৃতৌষধি পাইবে, এবং মরণেও আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ হইব।

রুবেইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম *

[শ্রীকুঞ্জধর সেন]

কবি ওমর খৈয়ামের নাম এখন পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে খুব বেজে উঠেছে। কবি কিন্তু একখানি কাব্যও লেখেন নাই, এক কুড়ি কবিতাও লেখেন নাই,—লিখিয়াছেন অল্প কয়েকটি রুবেইয়াৎ অর্থাৎ চতুষ্পদী। তারও সংখ্যা কত, সে কথা কেহ ঠিক বলতে পারেন না, কারণ ওমর খৈয়াম প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে পারস্যদেশের নৈশাপুর গ্রামে ব'সে রুবেইয়াৎ কয়টি লিখেছিলেন। তার পর এই হাজার বৎসর কবির কোন খোঁজই হয় নাই—তাঁর দেশেও না, বিদেশেও না। কথাটা শুনলে আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, এসিয়া দেশের এত বড় কবিকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে দিবালোকে টেনে বাহির করলেন য়ুরোপ। এর কারণ এই যে, ওমর খৈয়াম যা বলেছেন, মুসলমানের ধর্ম্মে তা বলে না; সেই জন্য এত বড় কবি চাপা প'ড়েছিলেন,—বা, সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, তাঁকে সেকালের ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাশয়গণ আমল দেন নাই,—শাস্ত্রে অটল বিশ্বাস তখন এতই প্রবল ছিল। বর্ত্তমান য়ুরোপের, তথা সভ্যজগতের লোক এখন স্বাধীন ভাবে চিন্তা করছেন,

* শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

বিজ্ঞানের ও জ্ঞানের প্রভাবে এখন অনেকে শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্য বিনা বিচারে মেনে নিতে চান না। এখন সকলেরই মনেই ওমর খৈয়ামের মতই এই প্রশ্ন উঠেছে—

"কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া এই যে বিপুল বিশ্বমাঝ,
আসছি ভেসে কিসের স্রোতে—হেথায় বা মোর কিসের কাজ?
কোথায় পুনঃ—কেই বা জানে—ফিরতে হবে একটা দিন—
উধাও সে কোন্ মরুর 'পরে হাওয়ার মতই লক্ষ্যহীন!"

এই ভাবনা য়ুরোপে, এসিয়ায়, বা সর্ব্বত্র জেগে উঠেছে। তাই বিস্মৃতপ্রায় ওমর খৈয়াম এতকাল পরে বেঁচে উঠেছেন।

কথাটা আরও একটু সোজা করে বুঝতে চাই। 'কেন এসেছি, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব' এ প্রশ্ন আবহমান কাল চলে আসছে—ওমার খৈয়ামের পূর্ব্বে ও পরে অনেকেই এ প্রশ্ন করেছেন। শাস্ত্রকারেরা তার সমাধান করেছেন এই ভাবে,—তাঁরা বল্‌ছেন, সব মিথ্যা—এক ব্রহ্মই সত্য। সেই ব্রহ্মেরই শরণ লও। ওমর বল্‌ছেন—সব মিথ্যা, ব্রহ্ম মিথ্যা; অতীতও ভেব না, ভবিষ্যৎও ভেব না—বর্ত্তমানই সব—বর্ত্তমানই সত্য—

"অতীত যা তার দুখের স্মৃতি, ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর—
দিল্ পিয়ারা সাকী গো আজ পেয়ালা ভরে ঘুচাও মোর।"

ওমর খৈয়াম মহা পণ্ডিত ছিলেন;—অনেক চিন্তা করে, কোন দিকে আলো দেখ্‌তে না পেয়ে, গভীর নিরাশায় কাতর হয়ে সব চিন্তা, সব ভাবনা দ্রাক্ষারসে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এই নিরাশার দীর্ঘশ্বাস অনেকেরই বুকে বেজেছে। সেইজন্য ওমর খৈয়াম আজ বরণীয় আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই তাঁহার রুবেইয়াৎ পৃথিবীর সকল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আমাদের বাঙ্গলা ভাষাতেও কবিবর শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ ঐ রুবেইয়াৎগুলি অনুবাদ করেছেন! এবং সেই বইখানির কথা বল্‌বার জন্যই এত কথা বলা গেল।

ওমর খৈয়ামের রুবেইয়াতের দুইখানি ইংরাজী অনুবাদ আমরা পড়েছি; একখানি মিঃ ফিট্‌জ জেরাল্‌ডের, আর একখানি ডাক্তার জন পোলেনের। মূল ফারসীতে কি আছে জানি না; ফারসী-নবীশ পণ্ডিতেরা বলেন যে, মিঃ ফিট্‌জ জেরাল্ড অনুবাদ করেন নাই; তিনি রুবেইয়াৎগুলির ভাব নিয়ে নিজে কবিতা লিখেছেন; ডাক্তার পোলেন কিন্তু বলেছেন যে, তিনি ঠিক ঠিক অনুবাদ করেছেন। বাঙ্গালা অনুবাদক কান্তিবাবু সে সব কথা কিছুই বলেন নাই। আমরা ইংরেজী ও বাঙ্গালা তিনখানি বই মিলিয়ে দেখলাম যে, মিঃ ফিট্‌জ জেরাল্ড যে পন্থা অবলম্বন কোরেছেন, কান্তিবাবুও সেই পথ ধরেছেন—অনুবাদ করেন নাই—ভাব নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কোন ভাষার কবিতা অন্য ভাষার কবিতায় ঠিক ঠিক অনুবাদ যে করা যায় না, তাহা নহে; কিন্তু তাহা কবিতা হয় না, তাহাতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয় মাত্র। যিনি কবি, তিনি এমন হাত-পা বাঁধা কার্য্যে অগ্রসর হতেই চান না। কান্তিবাবু সেই জন্য অনুবাদ করেন নাই, ওমরের ভাব নিয়ে নিজে কবিতা লিখেছেন, তাই তাঁর কবিতা এত সুন্দর হয়েছে।

একটু উদ্ধৃত করে দেখাই। ডাক্তার পোলেন মূলের যথাযথ অনুবাদ করেছেন—

"I've nevet grieved two days anent—
—'The day to come'—'the day that's spent'."

আর কবি কান্তিচন্দ্র সেই কথাই বল্‌ছেন—

"একটা 'কাল' তো মরণ-পারে, আসছে যে 'কাল' কোথায় আজ?
তাদের কথা ভাববি ব'সে এই ক্ষণিকের ফূর্ত্তি মাঝ।"

কবি কান্তিচন্দ্র যদি লাইনে-লাইনে অনুবাদ করতেন, তাহা হলে কবিতা কেমন হোতো বল্‌তে পারি না, কিন্তু তিনি নিম্নোদ্ধৃত কবিতা কিছুতেই লিখ্‌তে পারতেন না, যথা—

"রাজ্য সুখের আশায় বৃথা কেউ বা কাটায় বরষ মাস,
স্বর্গ-সুখের কল্পনাতে পড়ছে কারুর দীর্ঘশ্বাস।
নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক—
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে?—মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।"

ইহা অনুবাদ নহে; অনুবাদে এমন মিষ্ট আদায় হয় না। কান্তিবাবুর এই বইখানিতে আগাগোড়া এমনই ভাবে এমনই ললিত ছন্দে ওমর খৈয়ামের ভাব প্রকাশিত হয়েছে।

কান্তিবাবুর এই কবিতাগুলি যখন 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়, তখন পড়ে আনন্দ লাভ করেছিলাম মাত্র; এখন অবকাশ সময়ে পুস্তকের পৃষ্ঠায় সেই কবিতাগুলিই পড়ে, সত্য সত্যই মুগ্ধ হয়েছি। এই পুস্তকের ভূমিকায় সুধী সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেছেন "অনুবাদের ভিতর যত্ন আছে, পরিশ্রম আছে, নৈপুণ্য আছে, প্রাণ আছে।" আমরা বলতে চাই, এ অনুবাদের ভিতর যত্ন নাই, পরিশ্রম নাই, নৈপুণ্য নাই,—আছে শুধু প্রাণ। কান্তিবাবু যদি যত্ন, পরিশ্রম করতেন, যদি নৈপুণ্য দেখাবার প্রয়াস করতেন, তা হ'লে কবিতাগুলি এমন প্রাণস্পর্শী হ'ত না। কান্তিবাবু ওমর খৈয়ামের ভাবে বিভোর হয়েছিলেন; তাঁহারই ফলে তাঁহার কবি-হৃদয় হ'তে স্বতঃই এই রস-ধারা প্রবাহিত হয়েছে,—কোন যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম করতে হয় নাই।

আমার এক পরম শ্রদ্ধেয় কবি-বন্ধু কান্তিবাবুর এই বইখানার প্রশংসা করে বলেছিলেন যে, কবিতার ছন্দটা একটু গুরুগম্ভীর হলে বেশ হোতো। আমি কখন কবিতা লিখি নাই, আমি কবিও নহি; কিন্তু আমার মনে হয় যিনি প্রকৃত কবি, তিনি আগে থাকতে ছন্দ নির্ব্বাচন করেন না; ভাবের আবেগে যে ছন্দ এসে পড়ে, কবি তাই মঞ্জুর ক'রে নেন—নির্ব্বাচনের অবকাশ তিনি পান না। আমার এ কথা ঠিক কি না, কবিরা তার বিচার করবেন।

কবিবর কান্তিবাবুর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে। তিনি এই বইখানির মূল্য এক টাকা করে গরিব পাঠকদের উপর অবিচার করেছেন। এ অমৃত ধনী, দীন সকলের পাতে পরিবেশন করাই কবির উচিত ছিল।

সফল-পাওয়া

[শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ]

(১)

তুমি যখন এলে সেদিন দিবা-উজল রথে,
আমি তখন দাঁড়িয়েছিনু পথে।
শতেক দিঠি প'ড়ল তোমার ক্লান্ত মুখের পানে,
কণ্ঠ-শতের মিলন-বাণী বাজ্‌ল উঠে গানে;
সুপ্ত-ব্যথা যদিই জাগে সে মঙ্গল সুরে—
আমিতো তাই দাঁড়িয়েছিনু দূরে।

(২)

তুমি সে দিন চিন্‌বে মোরে স্বপ্নে ভাবি নাই,
কাছে যেতে সাহস নাহি পাই।
শুন্‌ব দূরে নূপুর-ধ্বনি, দেখ্‌ব চ'লে যাওয়া,
লাগ্‌বে গায়ে পরশ তব আঁচলটুকুর হাওয়া,
চ'ল্‌তে পথে যদিই বা হয় চারটী চোখে দেখা—
সেই আশাতেই দাঁড়িয়েছিনু একা।

(৩)

ভিড়ের মাঝে লুকিয়েছিনু দৈন্য-নত শিরে,
তুমি যখন নাম্‌লে এসে ধীরে।
ভাবিনে কভু মনেতে তুমি আমারি পাশে এসে,
দৈন্য-লাজ ঘুচায়ে দিয়ে বরিবে মোরে হেসে;
জানিনে তো কোন্ জনমের কোন্ স্মৃতিরি টানে—
অসঙ্কোচে পশিলে এসে প্রাণে।

(৪)

ঘরের মাঝে বিফল সে যে—ভিক্ষা শুধুই চাওয়া,
পথের মাঝে এই পাওয়াটাই পাওয়া।
বঙ্কণ আঁখির দৃষ্টি তব সাঁঝের-তারা সম,
দীপ্তি-উজল রইবে ফুটে হৃদ গগনে মম;
অতীত কথা, স্মৃতির ব্যথা, অসম্মান বাণী,
পথের মাঝে ঘুচালে সে যে রাণী।

পশ্চিম-তরঙ্গ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

১। ম্যালেরিয়ার বাহন

বহু অনুসন্ধানের পর স্থির হইয়াছে যে, ম্যালেরিয়া মহামারী অতি প্রাচীন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যাধি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতেও এই ম্যালেরিয়ার অস্তিত্ব ছিল। তাঁহারা বলেন, গ্রীক সভ্যতার অধঃপতনের একটা প্রধান কারণই এই ম্যালেরিয়া। গ্রীকেরা এই প্রবল পরাক্রান্ত অদৃশ্য শত্রুর সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন নাই; কারণ তাঁহারা ইহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এই ব্যাধির যে নামকরণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহারা বায়ু হইতে ইহার সৃষ্টি অনুমান করিয়াছিলেন; (a malady from the air) বিশেষ করিয়া নিশীথ বায়ুকেই তাঁহারা এই ব্যাধির জনক স্থির করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই গুপ্তশত্রুকে কেহই চিনিতে পারেন নাই। তাহার পর ডাক্তার Ross প্রভৃতি কয়েকজনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে ম্যালেরিয়া-বীজাণুর রহস্য আবিষ্কার হইল। এক জাতীয় মশকই যে ম্যালেরিয়ার "চিহ্নিত প্রচারক" এ সংবাদ বোধ হয় আর এখন কাহারও অবিদিত নাই। ম্যালেরিয়ার সহিত মশকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে মশক-জাতির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। নিত্য নব নব মশকগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই জীবটী যদিও প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশেরই অধিবাসী, তথাপি পৃথিবীতে হেন স্থান নাই যেখানে ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এক

আমেরিকা যুক্ত-রাজ্যেই প্রায় চল্লিশ প্রকার বিভিন্ন জাতীয় মশককে সনাক্ত করিতে পারা গিয়াছে! সুদূর উত্তর মেরুর তুষারাবৃত দ্বীপপুঞ্জেও ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান! ইহারা যদিও ঠিক আপন ইচ্ছামত সর্ব্বস্থানে যাতায়াত করিতে পারে না, কিন্তু অনুকূল মৃদু বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইলে ইহারা সূতিকাগার হইতে বাহির হইয়া প্রায় বিশ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে সমর্থ। ইহাদের আকৃতির পরিমাপ এক ইঞ্চির ষোড়শ ভাগের এক ভাগ হইতে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে!

এই সনাতন মশকের উৎপাত মানুষের নিকট চির দিনই অসহনীয় বটে; কিন্তু একটা বড় সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাহারা সকলেই রোগ-উৎপাদক নহে। আমেরিকায় যে চল্লিশ প্রকার মশকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল এক জাতীয় মশকই রোগের বীজাণু বহন করিয়া আনে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে। ইহাদের সকলঙ্ক পক্ষপুট (spotted wings) দেখিলেই ইহাদিগকে দাগী আসামী বলিয়া সহজে চিনিতে পারা যায়।

এই জাতীয় মশক-বংশের কর্ত্তারা নিতান্ত নিরীহ ভদ্র লোক। তাঁহারা কাহাকেও কামড়ান না, এবং তাঁহাদের শ্রীচঞ্চু এতই ভোঁতা যে, ইচ্ছা থাকিলেও বেচারীরা কোন জীবেরই রক্ত শোষণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের গৃহিণীরাই ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশী। যত মশক শ্রীমতীরাই ঐ মারাত্মক জ্বর ব্যাধির প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। উষার প্রাক্‌কালে এবং সূর্য্যাস্তের পরই এই ম্যালেরিয়া জননীরা তাঁহাদের ব্যাধি-বিস্তার ব্রত লইয়া বিশেষ ব্যস্ত থাকেন। শ্রীমতীরা উজ্জ্বল আলোক একেবারেই পছন্দ করেন না, আঁধার বর্ণই তাঁহারা বেশি ভাল বাসেন। ইঁহারা লোকালয়বাসিনী এবং মাঠের অপেক্ষা গৃহেরই অধিক পক্ষপাতিনী। হেমন্তকালে ইঁহাদের কর্ত্তারা সকলেই ইহলীলা সম্বরণ করেন, এবং গৃহিণীরা শীতাবাসের সন্ধান করিতে আসেন। প্রায়ই গৃহের সর্ব্বনিম্নতলের অন্ধকার কোণটীতে ইঁহারা শীতযাপন করেন, এবং শীতান্তে বসন্তের প্রথম প্রভাতেই ডিম্ব প্রসব করিতে বাহির হইয়া যান। কেবল এই শীতযাপন-কাল সমাগত হইলেই তাঁহারা অপেক্ষাকৃত কিছু দীর্ঘায়ু লাভ করেন, নচেৎ শ্রীমতীদের পরমায়ু প্রায়ই এক হইতে দুই মাসকাল পর্য্যন্ত! আর কর্ত্তারা জীবিত থাকেন সবে দিন কয়েক মাত্র! মশকের খাদ্য লতাগুল্মের রস ও উদ্ভিজ্জ মধু! এতদ্ব্যতীত অবশ্য মনুষ্য পশু সরীসৃপ এমন কি কীট পতঙ্গের পর্য্যন্ত ইহারা রক্ত-শোষণ করিয়া থাকেন।

যে কোনও প্রকার তরঙ্গহীন প্রশান্ত জলের উপরই স্ত্রী-মশকেরা এককালীন ৫০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে, এবং তিন দিনের মধ্যেই ডিম্বগুলিকে ফুটাইয়া তোলে। বাচ্ছাগুলি প্রথমে যদিও অত্যন্ত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হয়, কিন্তু খুব শীঘ্র-শীঘ্র বাড়িতে থাকে, এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ণ-যৌবন লাভ করে। আমাদের দেশে পচা খানা আর ডোবার ধারে যাহাদের ঝাঁক উড়িতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাই সেই মহাপ্রভু!

ডিম্ব হইতে সদ্যজাত যে মশক শিশু, বায়ুই তাহার জীবনের প্রধান অবলম্বন! পুচ্ছদেশে সংযুক্ত একটী বক্র নলের সাহায্যে সে এই বায়ু গ্রহণ করে। এই ক্ষুদ্র জীব-গুলি এই সময় ঠিক জলের উপরিভাগে উর্দ্ধ-পুচ্ছ হইয়া অবস্থান করে। এই সময় জলের উপর যদি কোন প্রকারের সূক্ষ্ম তৈলাবরণ পড়িয়া যায়, তবে উহা ঐ মশক-শিশুগুলির প্রাণনাশের অব্যর্থ কারণ হয়। ঐ তৈলাক্ত পদার্থ মশক-শিশুর পুচ্ছদেশস্থ নলের মুখ আবদ্ধ করিয়া ফেলে, এবং তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। এই উপায়ে অতি সহজেই ম্যালেরিয়া-বাহী মশক-শাবকের ধ্বংস সাধন করা হইতে পারে।

৭ হইতে ১৪ দিবস পর্য্যন্ত মশক-শাবকগুলি এই অসহায় শিশু অবস্থায় থাকে। এই অবস্থাতেও তাহাদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার বাহনগুলিকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারা যায়; কারণ তাহারা জলের উপর সমরেখায় অবস্থান করে, কিন্তু অন্য জাতীয় মশক-শিশুগুলি উর্দ্ধ-পুচ্ছ ও নত-মুখ হইয়া অবস্থান করে। অণ্ড ভেদ করিয়া বাহির হইবার সময়টাই মশক জাতির জীবনের অতি সঙ্গীন অবস্থা। এই সময় তাহাদের পক্ষপুট অত্যন্ত কাঁচা ও কোমল অবস্থায় থাকে; এজন্য উহারা তৎক্ষণাৎ পক্ষ ব্যবহার করিতে পারে না, সুতরাং প্রায়ই জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে সকল খানা ডোবা ও জলা-ভূমিতে এই প্রকার মশকের প্রাদুর্ভাব, তাহাতে কোন উপায়ে জলের স্রোত বহাইতে

পারিলে অসংখ্য ম্যালেরিয়ার ভবিষ্যৎ বাহনের করাল-কবল হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

একটী পূর্ণ পরিণত মশকের দেহের তিনটী বিভাগ,—মস্তক, বক্ষ বা শরীরের মধ্যভাগ ও পুচ্ছদেশ। মস্তকের উপর দুইটি বড়-বড় চক্ষু আছে। ঐ এক একটি চক্ষু সহস্র ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চক্ষুর সমষ্টি মাত্র। এই জন্য মশকেরা চতুর্দ্দিকেই দৃষ্টি রাখিতে পারে। ইহাদের চোয়ালের সম্মুখ হইতে দুইটি শাখার ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়। এই শাখাদ্বয়ে প্রায় ১৫।১৬টী গ্রন্থি থাকে। প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রোমগুচ্ছ নির্গত হয়। এই শাখার ন্যায় পদার্থ দুইটাই উহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়। চোয়ালের ঠিক নিম্নদেশেই ইহাদের শুঁড় ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র থাকে। প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় উহার হুল! কোনও জীব জন্তুর দেহ ভেদ করিবার সময় এইটি উহার তুরপুণের কাজ করে। এই দীর্ঘ অস্ত্রটির গায়ে রক্ত শোষণ করিয়া পান করিবার জন্য একটী খাদের ন্যায় নালী-পথ আছে। ইহার নিম্নে একটী সূক্ষ্ম ফলক আছে। এই ফলকটি ইচ্ছামত হুলের গায়ে সন্নিবদ্ধ করা যায়; অর্থাৎ শোষিত শোণিত নির্ব্বিঘ্নে গলাধঃকরণ করিবার জন্য উক্ত ফলকটী হুলের গাত্রস্থ খাদের উপরিভাগে আবদ্ধ করিয়া একটী চমৎকার রক্ত পানোপযোগী নলের সৃষ্টি হইতে পারে। এই ফলকটির অভ্যন্তরেও আবার একটী সূক্ষ্ম নালী-পথ আছে। এই পথ দিয়াই মশক-দষ্টের দেহে ম্যালেরিয়ার বীজাণু প্রবেশ করে। হুলের দুই পার্শ্বে ও নিম্নদেশে সরু সরু বর্শার মত দুই জোড়া সূক্ষ্ম অস্ত্র আছে, ইহাদের মুখগুলি অনেকটা তীরের মত। দংশন করিবার সময় হুলের সঙ্গে-সঙ্গে এই দুই জোড়া অতি সূক্ষ্ম তীরমুখী বর্শা-ফলকের মত অস্ত্রও ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে, এবং মশককে রক্ত-পানে বিশেষ সহায়তা করে। এই সকলের নিম্নে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় একটি 'খাপ' আছে; ইহা কোমল এবং নমনীয়। যখন মশকের অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় না, তখন এই খাপের মধ্যে ওই সকলগুলি আবৃত থাকে। শুঁড়ের দুই পার্শ্বে নিম্ন চুয়ালের উত্তর দিকে ইহাদের সূত্রবৎ স্পর্শেন্দ্রিয় থাকে।

বক্ষদেশ বা শরীরের মধ্যভাগে ইহাদের পক্ষপুট ও চরণ সংযুক্ত থাকে। শরীরের মধ্যভাগটুকু আবার তিনটি চক্রাকার বেষ্টনীতে বিভক্ত। মধ্যের বেষ্টনীটিই ইহাদের পক্ষ-যুগল ধারণ করিয়া থাকে। অপর দুইটী বেষ্টনী এত সূক্ষ্ম ও পেলব যে "ছায়া-চিত্র"-বিজ্ঞান তাহার প্রতিকৃতি তুলিতে পারে না। ইহাদের পক্ষপুট অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শিরা-যুক্ত স্বচ্ছ ও ক্ষীণতম আবরণে নির্ম্মিত। জাতি হিসাবে ইহাদের পক্ষ-পুটের আকৃতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ার বাহনগুলির প্রত্যেক পক্ষপুটে ৪টি করিয়া কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাদের পাগুলি ফাঁপা নলের মত। এই নলের মত পায়ের খোলের ভিতর অংশে পেশীর অধিষ্ঠান। অতি অপূর্ব্ব কৌশলে শরীরের সহিত পাগুলি উহাদের অস্থ্য-সংযোগস্থলে গ্রথিত। এজন্য উহা অতি সহজে সঞ্চালিত ও ক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের ছয়টি পায়ের প্রত্যেকটাতে সাতটি করিয়া গাঁট আছে। সর্ব্বশেষের দিকের চরণ-যুগল পাদচারণের জন্য ব্যবহৃত হয় না। উহা মশককে উড়িবার সময় শরীরের ভার সমান রাখিতে সাহায্য করে এবং স্পর্শেন্দ্রিয় রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক মশকের দুইটি করিয়া "পাম্প" বা জলশোষক যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে উহারা শরীরের অভ্যন্তর হইতে শোণিত টানিয়া তুলিয়া লইতে পারে। যখন এই যন্ত্র দুটি একত্র কার্য্য করে, তখন অতি সত্বর আমাদের শরীর হইতে রক্তবিন্দু উহাদের গলাধঃকরণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের শরীরের ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে ম্যালেরিয়ার বীজাণু প্রবেশ করিয়া থাকে।

আমেরিকার প্রাণিতত্ত্ব-বিভাগের যাদুঘরে স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় মশকের কতকগুলি প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। মশক-শাবকের শৈশব হইতে যৌবনে পরিণত হইবার মধ্যে নানা অবস্থাও এই 'অনুকৃতি'র সাহায্যে দেখান হইয়াছে। এই প্রবন্ধ সংলগ্ন চিত্রগুলি ঐ সকল অনুকৃতি হইতে গৃহীত।

('Scientific American, 14. 6. 19.)

২। পানীয় জল বিকৃত হইবার কারণ

পানীয় জল যখন বিস্বাদ বোধ হয় এবং উহাতে এক প্রকার অপ্রীতিকর গন্ধ পাওয়া যায়, তখন অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে উহার মধ্যে এক প্রকার জীবাণুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই জীবাণুগুলিকে 'synura' বলে। ইহাদের আকৃতির পরিমাপ অনধিক এক

র শতাংশের এক অংশ মাত্র। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া জলের মধ্যে অবস্থান করে। প্রতি দলে প্রায় পঞ্চাশটী করিয়া পরস্পর ঈষৎ সংলগ্ন হইয়া একটি গোলকের আকারে সংবদ্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যেকের অঙ্গ অতি কোমল ত্বক্‌-বিশিষ্ট এবং পশ্চাদ্ভাগে প্রায়ই বোঁটার মত দুইটী করিয়া সূক্ষ্ম সূত্রবৎ পদার্থ প্রলম্বিত থাকে। জলের কলে, পানীয় জল যখন বৃহৎ জলাধার হইতে শোধন-যন্ত্রের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে—এই সময় ইহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও দলচ্যুত হইয়া পড়ে এবং সহজেই জলের কলের পাইপের ভিতর সঞ্চালিত হইয়া যায়। ইহাদের এই পৃথক-পৃথক অস্তিত্ব যদিও অতি তীক্ষ্ণ অণুবীক্ষণেও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু সেই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীটাণুর সংস্পর্শে জল বিস্বাদ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। ঈষৎ তাম্রক্ষার যুক্ত লবণাম্লজানের (copper sulphate), দ্রবঅংশ ঐ সকল বৃহৎ আধারস্থ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে মানুষের তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না এবং অল্প দিনের মধ্যেই জলের আস্বাদহীনত্ব ও দুর্গন্ধ দূর হইয়া যায়।

এতদ্‌সংলগ্ন চিত্র হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, এক গ্লাস পরিষ্কার পানীয় জলের ভিতরও দৃষ্টির অগোচরে কত অসংখ্য কীট-পতঙ্গ বর্ত্তমান থাকে। ইহারা হয়ত বা ভীষণ মারাত্মক ব্যাধির জীবাণু, হয়ত ইহারা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর নহে; কিন্তু পানীয় জলের আস্বাদ ও গন্ধ বিকৃত করিবার হেতু স্বরূপ অথবা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ কোন উদ্ভিজ-বীজাণু বা জীবাণু হওয়াও সম্ভব। এজন্য এই জীবগুলির প্রতি মুন্সিপালের জল-সরবরাহ-বিভাগের প্রভুদের সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। কারণ পানীয় জলের মধ্যে ইহাদের কোন এক জাতীয় কীটাণুর প্রাদুর্ভাব হইলেই জল ঘোলা, বিস্বাদ বা দুর্গন্ধ যুক্ত হইতে পারে। এই বিভিন্ন জাতীয় জীবাণুর দেহ-ঘ্রাণের এক একটী বিশেষত্ব আছে। উপরিউক্ত Synura' জাতীয় কীটের মধ্যে 'শসা' ফলের গন্ধ ও আস্বাদ পাওয়া যায়। 'Asterionella' জাতির মধ্যে তীব্র আঁশটে গন্ধ বিদ্যমান। 'Aphanizomenon' জাতীয় জীবাণুর প্রাদুর্ভাব হইলে পানীয় জলে কেমন একটা ঘাসের গন্ধ পাওয়া যায় এবং জল বিস্বাদ বোধ হয়। 'Uroglena' জাতীয় কীটাণুর সংস্পর্শে জলে মাছের তেলের অপ্রীতিকর গন্ধ হইয়া থাকে।

(Scientific American. 14. 6. 19.)

৩। নূতন ধরণের মোটর ট্যাক্সী (Motor Taxi-cab.)

কলিকাতা সহরের রাজ-পথে অনেক 'মোটর সাইকেলে'র পার্শ্বে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র গাড়ী সংযুক্ত থাকে, ইহা বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন। ইংলণ্ডে এইরূপ গাড়ী সংযুক্ত 'মোটর সাইকেল' সাধারণের জন্য ভাড়া খাটে। সেখানে এই ভাড়াটীয়া মোটর সাইকেলের পাশের গাড়ীগুলি একটু বড় করিয়া তৈয়ার করা হয়, যাহাতে দুই জন লোক পাশাপাশি বসিয়া যাইতে পারে। সাইকেলের উপর মোটর-চালক বসিয়া থাকে এবং যাঁহারা ভাড়া ল'ন তাঁহারা পার্শ্বের গাড়ীতে বসিয়া থাকেন। এতদ্‌সংলগ্ন চিত্র হইতে এই বিষয়টি সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে। পার্শ্বের গাড়ীর উপরিভাগে একটী ছত্রী আছে এবং দু'ধারে পর্দ্দা খাটাইবার ব্যবস্থা আছে; সুতরাং বর্ষাকালেও ইহাতে যাইবার কোনও অসুবিধা হয় না। গাড়ীর 'স্প্রীং'গুলি এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, অসমতল পথেও ইহা অক্লেশে যাইতে পারে। এই গাড়ীগুলিতে যাইবার একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহা বড় মোটর গাড়ী অপেক্ষা দ্রুত যায় এবং ইহার ভাড়াও অপেক্ষাকৃত কম।

(Scientific American. 14. 6. 19.)

৪। অগ্নিতপ্ত গিরিগাত্র

একই স্থানে একই সময়ে বৃষ্টি বন্যা ও অগ্নি-দাহের যুগপৎ দৃশ্য 'লো এঞ্জেলেসের' (Lo Angoles) গিরি-গাত্রে একটা কিছু অলৌকিক বা অস্বাভাবিক দৃশ্য নহে। সেখানে বর্ষাকালে প্রায়ই এই ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখা যায়। কালিফোর্ণিয়ার দক্ষিণ উপকূলের শান্তা মনিকা (Santa monica) প্রদেশও এই প্রকার একটী অভাবনীয় প্রাকৃতিক বিস্ময়ের লীলাভূমি। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্ত হইতে সমুত্থিত দীর্ঘ ঋজু গিরিগাত্রগুলি প্রায়ই কর্দ্দমাক্ত ও মৃত্তিকালিপ্ত। কিন্তু যখনই এক পশলা বৃষ্টি হয় তখনই এই গিরিগাত্র হইতে প্রচুর ধূম ও বাষ্প



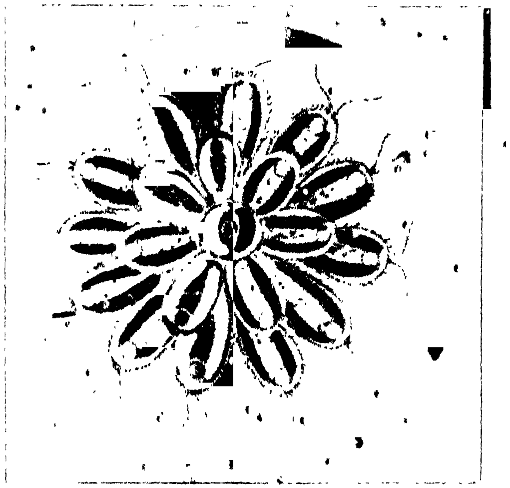
মশক-মহিলার মস্তকের গঠন
(ইহারাই বিশ্বে ম্যালেরিয়া-বিস্তার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে)



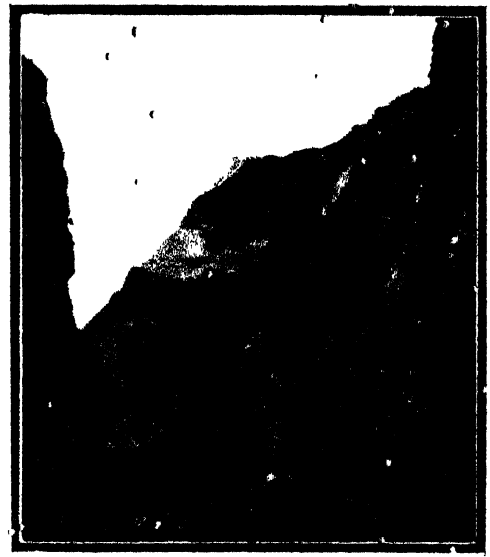
শ্রীমান মশক মহাপ্রভুর মস্তক
(ইঁহারা কাহাকেও দংশন করিতে বা কাহারও রক্ত শোষণ করিতে পারেন না।)



প্রথমেই অণ্ডজাত মশকশিশু, পরে যৌবন-গর্ব্বিতা মশকবালা, শেষে ম্যালেরিয়া-বিস্তার-কারিণীদের সকলঙ্ক পক্ষপুটের প্রতিকৃতি



পানীয় জলের জীবাণু
অণুবীক্ষণে দৃষ্ট 'Syrura' কীটাণুর চিত্র
(স্বাভাবিক আকৃতি অপেক্ষা ১৬০০শতগুণ বড়)

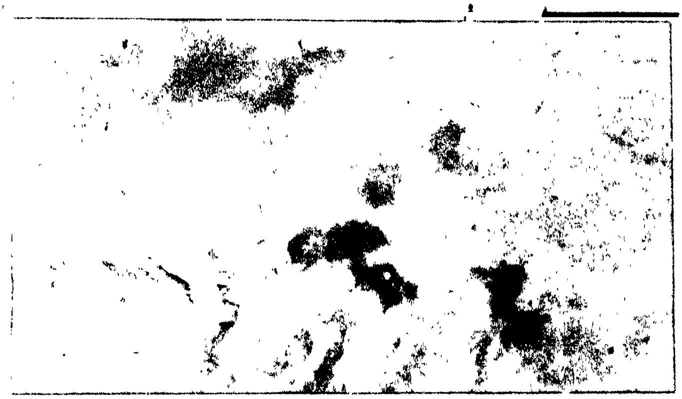


কর্দমাক্ত ও মৃত্তিকালিপ্ত জ্বলন্ত গিরিগাত্র

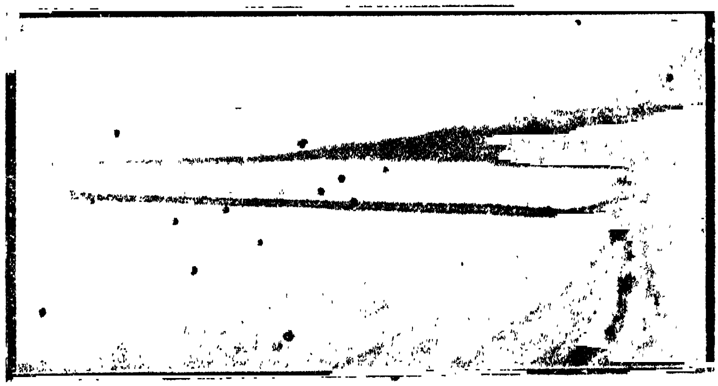


নূতন ধরণের 'ট্যাক্সী' গাড়ী

নির্গত হইতে থাকে! কাচের ন্যায় উজ্জ্বল প্রস্তরে মণ্ডিত গিরিগাত্রের শিখরদেশ ও চূড়াগুলি যেন পুড়িয়া মেটে সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠে! স্থানীয় লোকেরা এই সকল পর্ব্বতগাত্রে ভূত প্রেত ও দানব দৈত্যের নিবাস বলিয়া ভয়ে নিকটবর্ত্তী হয় না। এই সকল স্থানে কদাচ ভূমিকম্প হইতে দেখা যায়। কিন্তু যখন হয় তখন ঐ সকল গিরিগাত্র হইতে অনর্গল গন্ধক বাষ্প ও ধূম নির্গত হইতে থাকে। এই সকল পর্ব্বত-গাত্র হইতে



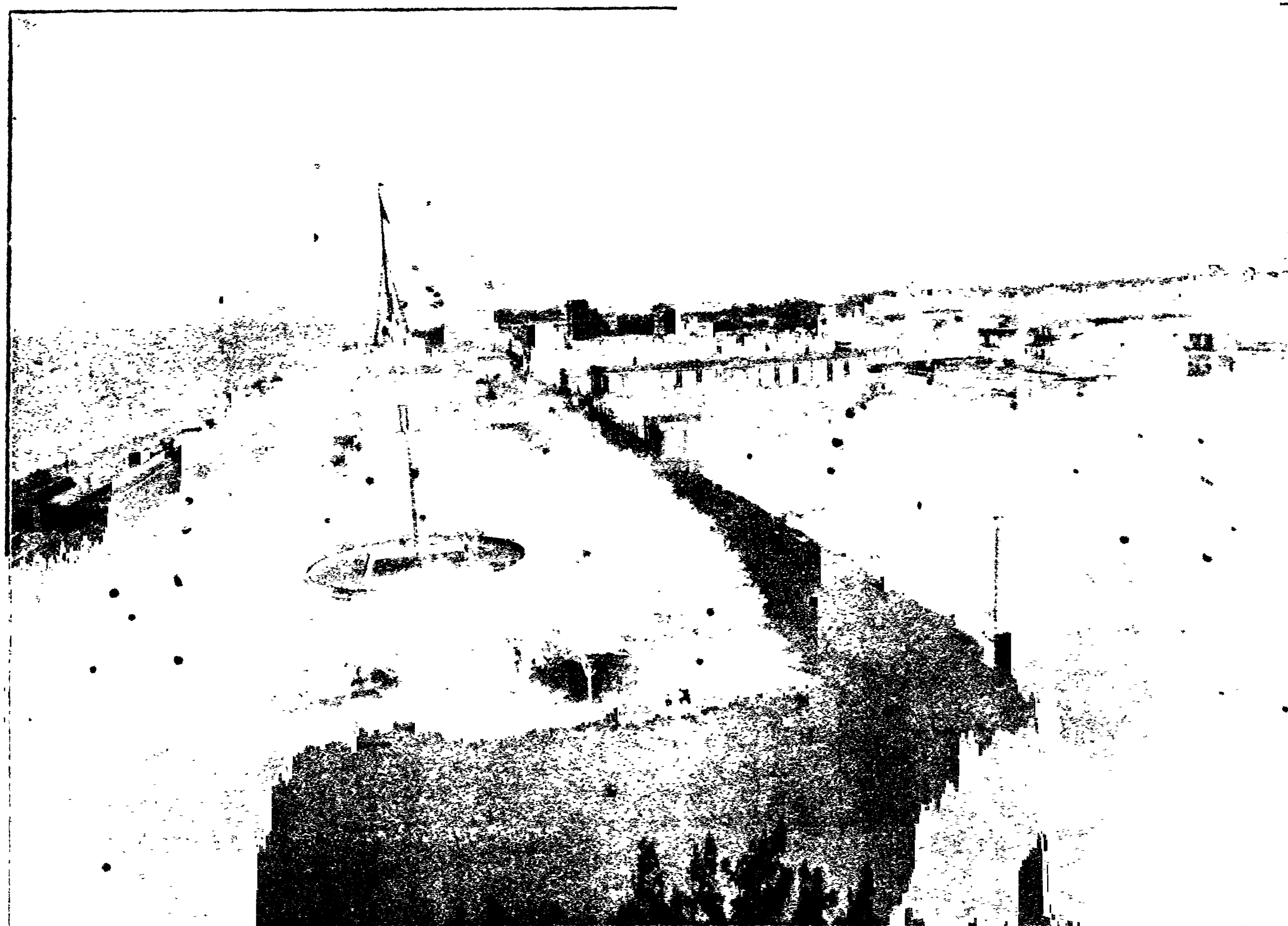
বর্মায় পর্ব্বতের সানুদেশ বন্যাপ্লাবিত এবং পর্ব্বতগাত্র হইতে ধূম ও বাষ্প নির্গত হইতেছে



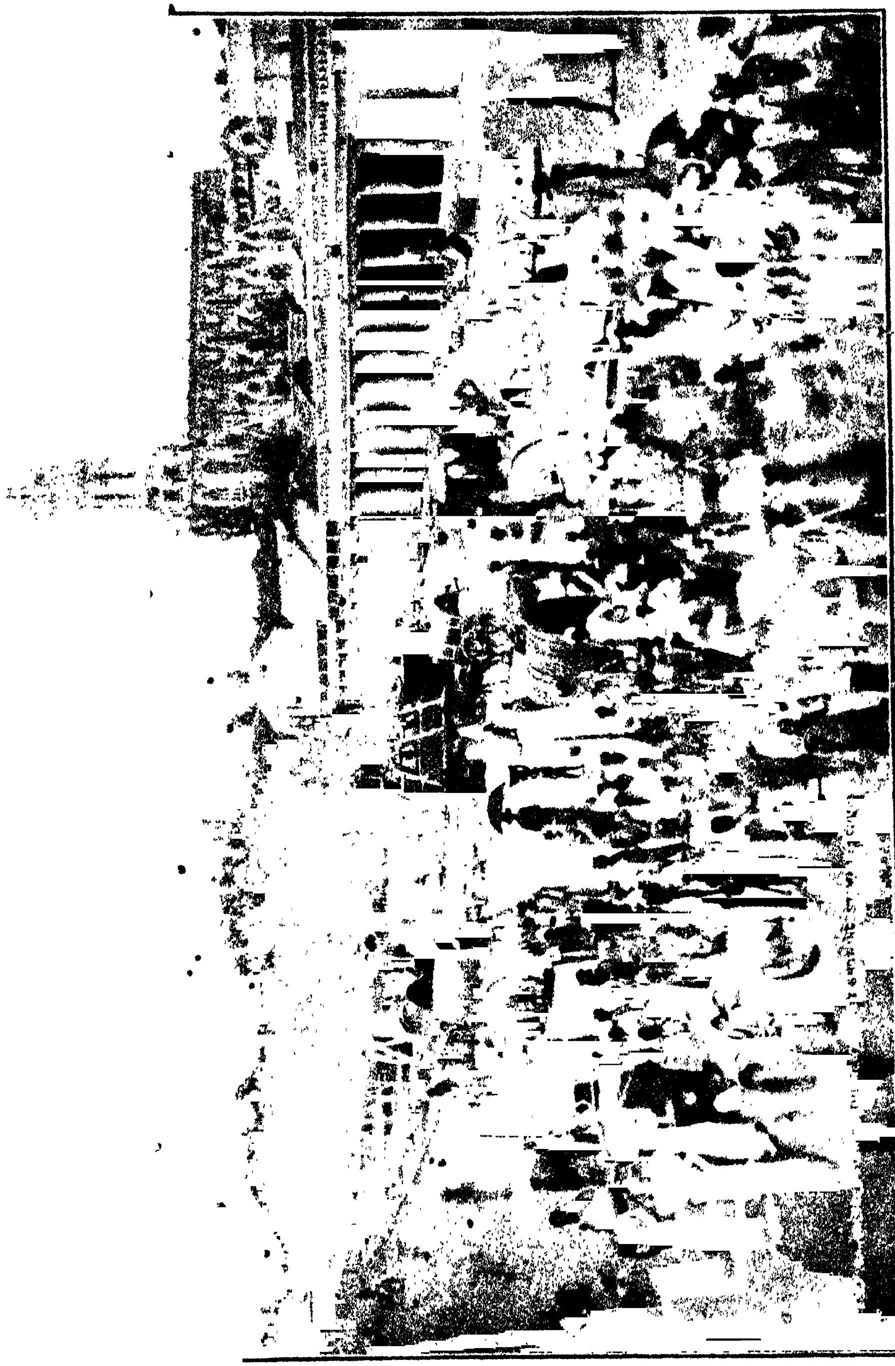
'শান্তা মণিকা' উপসাগরের সুদীর্ঘ বন্দরপ্রান্তে অগ্নিতপ্ত গিরিগাত্রের আকৃতি

স্থানে স্থানে অগ্নিশিখাও নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে, অথচ এগুলি একেবারেই আগ্নেয় গিরি নহে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ইহার কারণ আর কিছুই নহে; ঐ যে পর্ব্বত গাত্রে মৃত্তিকাবলিপ্ত থাকে, ঐ মাটীর মধ্যে পেট্রল প্রভৃতির ন্যায় আশু দাহ্য এক প্রকার তৈল আছে। উহাতেই অগ্নি সংলগ্ন হইয়া এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপার সংগঠিত হয়। কিন্তু অগ্নি সংলগ্ন হইবার কারণটি তাঁহারা ঠিক নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। কেহ বলেন, সম্ভবতঃ বৃষ্টির সময় বজ্রপাত হইয়া ঐ স্থানে অগ্নি-সংলগ্ন হয়; কেহ বলেন বোধ হয় কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীতই আপনা হইতে এই অগ্নিকাণ্ড উদ্ভূত হয়। কারণ পাহাড় ভেদ-খানার গহ্বরে ... হইতে এক সহস্র ফুট নীচেও সর্ব্বদা অগ্নি-দগ্ধ মৃত্তিকার অস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, তখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই তৈলসিক্ত মৃত্তিকারাশি আপনা আপনিই উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং সহসা তৎক্ষণাৎ অগ্নিতে পরিণত হয়।

Scientific American, 11-6-19



হোটেল ডি ভিলি ও ডুপ্লের স্মৃতি-চিহ্ন—পণ্ডিচেরী





বিজাপুর—আলি আদিল শাহের অসমাপ্ত সমাধি

৺দেবেন্দ্রবিজয় বসু

আজ যাঁহার পরলোক-গমন সংবাদ সাশ্রুনয়নে লিপিবদ্ধ করিবার দুর্ভাগ্য আমাদের অদৃষ্টে বিধাতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি—সেই দেবোপম চরিত্র দেবেন্দ্রবিজয় বসু—আমাদের বড় গৌরবের, বড় শ্রদ্ধার দেবেন দাদা,—বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে একজন বিজয়ী বীর। তাঁহার মরলীলা শেষের পর বাঙ্গালা দেশের সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার জীবন-কথা প্রকটিত হইয়াছে। কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া দেবেন্দ্রবিজয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; পাঠাবস্থাতেই প্রকাণ্ড পরিবারের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়াও তিনি ক্লান্ত হৃদয়ে মধ্যপথে পাঠ ত্যাগ করেন নাই; ওকালতীতে বিফলমনোরথ হইয়া তিনি মাষ্টারী, প্রফেসারী, গৃহশিক্ষক প্রভৃতি নানা কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে মুন্সেফীতে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে সবজজ পদে উন্নীত হইয়া চারি বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান হইতে অবসর গ্রহণ করেন; তাহার পর এই কয় বৎসর রোগের জ্বালা, পুত্র ও আত্মীয়গণের বিয়োগ-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। দেবেন্দ্রবিজয়ের জীবনের ইহাই এক অংশের ইতিহাস। আর এক অংশে তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল; তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদক, টীকাকার, তাঁহার 'বিজয়-টীকা' সত্য-সত্যই তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের বিজয়-টিকা—রত্নমুকুট; তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধ-সমূহ বাঙ্গালা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত ও সম্পদশালী করিয়াছে। দেবেন্দ্রবিজয়ের জীবনের ইহা আর একটা অংশ। শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই দেবেন্দ্রবিজয়ের জীবনের এই দুই অংশের সহিত পরিচিত। কিন্তু যাঁহারা দেবেন্দ্রবিজয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন, এগুলি দেবেন্দ্রবিজয়ের বাহিক সামান্য পরিচয় মাত্র। দেবেন্দ্রবিজয় একজন মানুষ ছিলেন; ৬২ বৎসর বয়সের মধ্যে কোন দিন দেবেন্দ্রবিজয় কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই; বালকের সরলতা, বাল্যের মাধুর্য্য, কৈশোরের কমনীয়তা দেবেন্দ্রবিজয়কে একদিনের জন্যও পরিত্যাগ করে নাই। অনেক বিদ্বান দেখিয়াছি, অনেক পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন ব্যক্তি দেখিয়াছি, অনেক পণ্ডিত দেখিয়াছি, কিন্তু দেবেন্দ্রবিজয়ের মত বিদ্বান, জ্ঞানী, পাণ্ডিত্য সম্পন্ন, আত্মভোলা বালক দেখি নাই। তাঁহার



৺দেবেন্দ্রবিজয় বসু

অনেক অনুবাদক দেখিয়াছি, গীতা-ব্যাখ্যাতা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু দেবেন্দ্রবিজয়ের ন্যায় মূর্ত্তিমান গীতা দেখি নাই। দেবেন্দ্রবিজয় যে দিন, রজনীর দ্বিতীয় যামশেষে 'বাসাংসি জীর্ণানি' ত্যাগ করেন, সেই সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আর মিনিট পূর্ব্বে তাঁহার এক আত্মীয় জিজ্ঞাসা করেন—'কেমন বোধ করছেন?' দেবেন্দ্রবিজয় ধীর স্বরে বলিলেন "আনন্দ!" তাহার পরই সব শেষ,—আনন্দময় পুরুষ আনন্দময় ধামে, পরমানন্দ নিকেতনে, সদানন্দময়ের প্রসারিত বাহুদ্বয়ের মধ্যে আনন্দ সাগরে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার জন্য শোক করিতে নাই, বল—'সচ্চিদানন্দ হরে!' ইহাই মহাত্মা দেবেন্দ্রবিজয়ের স্মৃতি-তর্পণের মন্ত্র!

পেশবাদিগের রাজ্য-শাসন-পদ্ধতি

[অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-আর-এস]

গ্রাম্য-সমিতি

বাঙ্গালা দেশের শস্য-শ্যামল সমতলের সহিত যেমন মহারাষ্ট্রের কঙ্কর-পাষাণময় উপত্যকার প্রাকৃতিক পার্থক্য আছে, তেমনই বাঙ্গালার সমতলবাসী কৃষকের ও পর্বত-পরিবেষ্টিত শ্বাপদ-সঙ্কুল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মারাঠা-পল্লীর অধিবাসিগণের মধ্যেও যথেষ্ট চরিত্রগত প্রভেদ আছে। বাঙ্গালী কৃষক নিরীহ, নির্বিবাদে সকল উৎপীড়ন সহ্য করিয়া যায়; সহজে রাজা বা ভূস্বামীর সহিত বিরোধ করিতে চাহে না। পেশবা-যুগের মারাঠা কৃষকেরও রাজভক্তির অভাব ছিল না; কিন্তু সেই রাজভক্তি কোন দিনই তাহাকে তাহার ন্যায্য অধিকারের প্রতি উদাসীন হইতে দেয় নাই। ব্যক্তিগত সম্মানের বোধটা তাহাদের মধ্যে বড়ই প্রবল ছিল। তাই, যে সমস্ত ইংরেজ কর্মচারী উত্তর-ভারত হইতে নববিজিত মহারাষ্ট্র শাসন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা এই অর্দ্ধনগ্ন দরিদ্র পাহাড়ীদের নির্ভীক আচরণে একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। এলফিনষ্টোন বলেন যে, "সরকারী কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া মারাঠা কৃষক কোন দিনই দাঁড়াইয়া থাকা আবশ্যক বোধ করে নাই। অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই তাহারা বসিয়া পড়িত।" পেশবা-যুগেও তাহারা এইরূপ করিতেই অভ্যস্ত ছিল। উত্তরের মুসলমান দরবারের আদব-কায়দায় তাহাদের মেরুদণ্ড নত হয় নাই; তাই, সকল কাজেই তাহাদের চিরন্তন অধিকারের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া, তাহারা জন্মভূমির উচ্চ শৈলশৃঙ্গের মত সোজা হইয়াই চলিত। মারাঠা জাতির চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই, স্বেচ্ছাতন্ত্রের নায়ক পেশবাদিগের ক্ষমতা কতকটা সংযত করিয়া রাখিয়াছিল।

রাষ্ট্রের ও সমাজের নেতা হিসাবে পেশবাগণ মধ্যযুগের য়ুরোপীয় নরপতিগণের অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতাশালী ছিলেন। রাষ্ট্রের নেতা য়ুরোপীয় রাজগণ সামাজিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না; যাজক সম্রাট্ পোপের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে প্রায়ই পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু পেশবাগণ রাষ্ট্র ও সঙ্ঘ উভয়েরই নেতৃত্ব করিতেন। তথাপি মারাঠা-চরিত্রের দোষ গুণের কথা ভাল করিয়া জানিতেন বলিয়াই, তাঁহারা প্রজাগণের কোন প্রাচীন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। সে দুঃসাহস যাঁহার হইয়াছিল, তাঁহার সহিতই মারাঠা সাম্রাজ্য ও পেশবার প্রভুত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পেশবাদিগের আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। প্রথম হইতেই তাঁহাদের জমার অঙ্ক অপেক্ষা খরচের অঙ্ক হইয়াছিল অনেক বেশী। সুতরাং বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা ব্যতীত তাঁহাদের আর্থিক অনটন ঘুচাইবার আর উপায় ছিল না। দূরদর্শী শিবাজী স্বদেশ-প্রেম-প্রণোদিত হইয়া যে বাণিজ্য-নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছিলেন, পেশবাগণও প্রয়োজনের অনুরোধে সেই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। এই কারণেই মারাঠাগণ বিজিত রাজ্য শাসন কালে লুণ্ঠন-প্রিয়তার পরিচয় দেয় নাই। তখন তাহাদের লক্ষ্য থাকিত রাজস্ব স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করার দিকে। এই সমস্ত কারণেই মারাঠা রাজ-নীতিজ্ঞেরা পুরাতন প্রথা, পুরাতন অধিকারের উপর বড় সহজে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাই মারাঠা-সাম্রাজ্যের স্থাপনের পূর্ব্বেও যেমন পল্লী-সমিতিগুলি আপনাদের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপার স্বাধীন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে, মারাঠা-সাম্রাজ্যের পতনের দিন পর্য্যন্তও তাহাদের স্বাধীন সত্ত্বা তেমনই অব্যাহত রহিয়াছে।

এই পল্লী-সমিতিগুলিই ছিল মারাঠা শাসন-পদ্ধতির প্রাণ-স্বরূপ। ইহাদিগকেই ভিত্তি করিয়া পেশবা-যুগের

শাসন-তন্ত্র গঠিত হইয়াছিল। পেশবার কতকগুলি কর্মচারী কখন-কখনও গ্রাম্য-সমিতির কোন-কোন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই কর্মচারিগণ পরিচালিত হইত পেশবার কারভারীর হুকুমে, আর তাহাদের সমস্ত কাযের হিসাব লইত হুজুর দপ্তর বা ইম্পিরিয়াল সেক্রেটেরিয়েটের কর্মচারীরা। সর্ব্বোপরি পেশবা, কারভারী ও হুজুর দপ্তর, সর্ব্বনিম্নে অসংখ্য গ্রাম্য-সমিতি, আর এই দুয়ের মধ্যে সংযোগ-সেতু একদল কামাবিশদার ও মামলতদার। মোটের উপর পেশবা যুগের শাসন তন্ত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি ইহা হইতেই অনুমান করা যাইবে। সুবিধার জন্য গ্রামাসমিতি ও হুজুর দপ্তর সম্বন্ধে পৃথক-পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

এলফিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন—যে ভাবেই দক্ষিণের দশীয় শাসন-তন্ত্রের বিচার কর, ইহার প্রধান প্রকৃতি হইতেছে গ্রাম-বিভাগ। এই সমিতিগুলিতে অল্পের মধ্যে একটী অসম্পূর্ণ রাষ্ট্রের সকল উপাদানই থাকিত; এবং অন্য সকল গবর্ণমেণ্ট তিরোহিত হইলেও, ইহারা গ্রামবাসিগণকে রক্ষা করিতে পারিত। আজ বাঙ্গালা দেশ হইতে পল্লী-সমাজ একেবারে তিরোহিত হইয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে বোধ হয় স্বাধীন, স্বতন্ত্র, এবং আত্মনির্ভরপর এক-একটি পল্লী-সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা সহজ হইবে না। কিন্তু এই সম্পর্কে আরও একটি কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। মধ্যযুগে যখন উত্তর-ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতে শোণিতসিক্ত, যখন উত্তর-ভারতে স্বেচ্ছা-তন্ত্রের শক্তি অপ্রতিহত, তখনও দক্ষিণ-ভারতের পল্লী-সমিতি হইতে প্রজাতন্ত্রের সাম্যবাদ তিরোহিত হয় নাই। গ্রামের পঞ্চায়েতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের আসন সমান। শূদ্রও যখন পঞ্চায়েতে বিচারকের আসন অধিকার করিত, তখন সে পঞ্চ পরমেশ্বরের অংশ, তখন সে বাদী-প্রতিবাদীর পিতৃস্থানীয়। আলুতা ও বলুতাদের মধ্যে কেহ-কেহ অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য। কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা গ্রামের বলুতা,—তাহাদের সহি না থাকিলে গ্রামের সকল দলিল অসিদ্ধ। বিচারালয়ে তাহাদের সহিরও যে মূল্য, ব্রাহ্মণ কুলকর্ণী, দেশমুখ ও দেশাইয়ের সহিরও সেই মূল্য। খৃষ্টের কত শত বৎসর পূর্ব্বে এই পল্লীসমাজের উৎপত্তি, কখন তাহাদের মধ্যে এই সাম্যবাদের প্রচলন হইয়াছিল তাহা বলিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুযুগেও যে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল, তাহার বহু প্রমাণ প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিতে, মুদ্রায়, সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে বিদ্যমান। (যাঁহারা এ বিষয়ে ভাল করিয়া জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন হিন্দু-ইতিহাসের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের নব-প্রকাশিত গ্রন্থ Corporate Life in Ancient India পাঠ করিতে অনুরোধ করি।)

মারাঠা গ্রামগুলি হয় পর্ব্বত-শিখরে, না হয় পর্ব্বত-মূলে উপত্যকায় অবস্থিত। সেকালে পথ-ঘাটের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। দেশ অরাজক, সুতরাং বিপদে-আপদে এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের লোকের নিকট হইতে সাহায্যের আশা করিতে পারিত না। তাই প্রত্যেক গ্রাম এক-একটি প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত হইত। মারাঠাতে এই প্রাচীরের নাম 'গাঁওকুস্'। গ্রামের জমিগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগে শাদা জমি, এই জমির উপর গ্রামবাসীদের বাসভবন নির্ম্মিত হইত। আর, অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর কালো জমিগুলি চাষ-আবাদের জন্য আলাদা করিয়া রাখা হইত। সকল গ্রামবাসী পল্লী-প্রাচীরের ভিতর বাস করিতে পারিত না। রামোসী ও ভিল, বেতর প্রভৃতি কতকগুলি জাতি থাকিত প্রাচীরের বাহিরে; কারণ, চৌর্য্যই তাহাদের কৌলিক বৃত্তি। গ্রামবাসিগণের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য যাহাতে গ্রামেই পাওয়া যায়, এই জন্য প্রত্যেক গ্রামেই কামার, কুমার, সুতার প্রভৃতি শিল্পী থাকিত। সাধারণতঃ গ্রামবাসীরাই গ্রামের মামলা মোকর্দ্দমার বিচার করিত। আর, প্রত্যেক গ্রামেই রাজস্ব আদায় করিবার জন্য, হিসাব রাখিবার জন্য, শান্তিরক্ষা করিবার নিমিত্ত, পঞ্চায়েত ডাকিবার জন্য, গ্রামের ময়লা, আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার জন্য কতকগুলি কর্মচারী থাকিত। পেশবা সরকার ইহাদিগের নিয়োগ করিতে পারিতেন না; কিন্তু গ্রামবাসীরাও এই সকল কর্ম্মের জন্য কাহাকেও নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন না। বোধ হয়, অতি প্রাচীন কালে নির্ব্বাচন-প্রথাই প্রচলিত ছিল; কিন্তু পেশবা-যুগে এই প্রাচীন পদ্ধতি লোপ পাইয়াছিল। তখন গ্রাম্য-সমিতির প্রত্যেক কর্ম্মচারীর পদ তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া

পরিগণিত হইত; এবং তাহার পুত্র-কন্যাগণ উত্তরাধিকার-সূত্রে অন্যান্য সাধারণ সম্পত্তির ন্যায় পিতৃপদেরও অধিকারী হইত। তাহারা আবার ইচ্ছা করিলে, স্থাবর-অস্থাবর অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায়, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত পিতৃপদ বিক্রয় করিয়াও ফেলিতে পারিত।

মারাঠা-পল্লীর সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি পাটীল। রাজস্ব আদায়, পুলিশের বন্দোবস্ত, এবং পঞ্চায়েত ডাকিবার ভার তাঁহার উপর। প্রয়োজন হইলে পাটীলই পেশবা সরকারকে গ্রামবাসিগণের অভাব-অভিযোগ জানাইতেন; আবার সরকারী হুকুম গ্রামে জাহির করিতেন। গ্রাম্য-প্রজাতন্ত্রের ও পেশবা সরকারের সহিত সংযোগ সাধিত হইত পাটীলের দ্বারা। গ্রামে তিনি পেশবার প্রতিনিধি, আর গ্রামের বাহিরে পেশবার কর্ম্মচারী কামাবিসদার ও মামলতদারের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার সময়ে তিনি গ্রাম্য-সমিতির ক্ষমতা-প্রাপ্ত মুখপাত্র। পেশবার কর্ম্মচারী যখন গ্রামের রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিতেন, তখন তাঁহাকে পাটীলের মতামত গ্রহণ করিতে হইত। নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের মধ্যে আবার প্রত্যেক গ্রামবাসীর দেয় স্থির করিয়া দিতেন পাটীল। রাজস্বের পরিমাণ অতিরিক্ত বোধ হইলে, তিনি প্রতিবাদ করিতে পারিতেন; এবং সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহার প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিলে, তিনি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া রাজস্ব আদায় একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। তখন বাধ্য হইয়া সরকারী কর্ম্মচারীকে নরম হইতে হইত। এখানে দুইখানি প্রাচীন দলীল হইতে ইহার দুইটি উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৭৭৩—৭৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মাধব রাওয়ের শাসন-কালে ইন্দাপুর পরগণার কামাবিসদার গোপালরাও ভগবন্তের নিকট প্রেরিত একখানি পত্রে লিখিত আছে—"অনাবৃষ্টিতে পরগণার রবি ও খরিপ শস্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, পাটীলগণ শস্যের অবস্থা তদন্ত করিয়া তদনুসারে খাজনার নূতন হার নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছে। তাহারা (তাহাদের দাবী শুনাইবার জন্য) টেম্বুর্নীতে (পরস্থলে) চলিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে আনাইয়া, ক্ষেত পরিদর্শন করাইয়া, রাজস্ব আদায় করা উচিত বলিয়া তুমি পত্র লিখিয়াছ। তদনুসারে আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে যে, শস্যের অবস্থা তদন্ত করিয়া, রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবে।" (Peshwas' Diaries দেখুন) আর একখানি পত্রে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়।—"তালুক শিবনেরের জমিদার ও পাটীলগণ অসন্তুষ্ট হইয়া, স্থান ত্যাগ করিয়া আলে কসবায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের নিকট একজন কারকুন প্রেরিত হইয়াছিল,—তাহার নিকট তাহারা তাহাদের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এই সকল অভিযোগের তালিকা তুমি হুজুরে প্রেরণ করিয়াছ।" বলা বাহুল্য শিবনেরের পাটীলগণের অভিযোগের প্রতিকার করা হইয়াছিল। ১৭৭৫ সালে শিবনেরের পাটীলগণ কামাবিসদারকে, তথাকার জমিদারদিগের প্রতিশ্রুত রাজস্বের নিমিত্ত জামিন গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল,—ইহারও দলীল-বদ্ধ প্রমাণ আছে। তবে এ কথা ঠিক যে, নিতান্ত দায়ে না পড়িলে, পাটীলগণ কখনও সরকারী কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে এই চরম উপায় অবলম্বন করিত না। সাধারণতঃ তাহারা পেশবাকে আপনাদের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেই তাহার প্রতিকার হইত।

গ্রামবাসিগণের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হইলে, পাটীল প্রথমে আপোশ-মীমাংসার চেষ্টা করিতেন। আপোশ-মীমাংসা বা সালিসীতে কোন কায না হইলে, অগত্যা তিনি মোকদ্দমা সরকারী আদালতে না পাঠাইয়া পঞ্চায়েত ডাকিতেন। (প্রতাপসিংহের যাদী দেখুন) বিচার বিভাগের কর্ম্মচারী হিসাবে তাহার কর্ত্তব্যের এইখানেই শেষ। পুলিশের কর্ত্তা হিসাবে তাহাকে চুরি-ডাকাতির তদন্ত করিতে হইত। এই কার্য্যে গ্রামের বৃত্তিভোগী চৌকীদার তাহার সহকারিত্ব করিত।

পাটীল পেশবা কর্ত্তৃক নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারী ন'ন; সুতরাং সরকারী তহবিল হইতে তিনি বেতন পাইতেন না। গ্রামবাসীদিগের নির্ব্বাচিত নায়ক না হইলেও, পল্লীসমাজের সেবায়ই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত বলিয়া, পল্লীবাসীগণের প্রদত্ত বৃত্তি দ্বারাই তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত। এই বৃত্তির পরিমাণ ও পরিচয় পাওয়া যাইবে পেশবা-যুগের একখানি ক্রয়-পত্র হইতে। এই ক্রয়-পত্রখানির অনুবাদ উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে পাটীলের বেতন সম্বন্ধীয় একটি প্রথার আলোচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পাটীল ও গ্রাম্য সমিতির অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ নিজ

নিজ পদ ও তাহার উত্তরাধিকার বিক্রয় করিতে পারিতেন। কিন্তু কখন-কখন তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র বৃত্তি বিক্রয় করিয়া একেবারে নিঃসম্বল হওয়া অপেক্ষা, এক অংশ বিক্রয় করিয়া, অপর অংশ নিজের ও পুত্র পৌত্রাদির জন্য রাখিয়া দেওয়া ভাল বিবেচনা করিতেন। এইরূপ বৃত্তির আংশিক বিক্রয় কালে পাটীল নিজের জন্য কতকগুলি বিশেষ অধিকারও রাখিয়া দিতেন। আবার কোন পাটীলের পাটীলগিরি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভাগ হইয়া গেলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র কতকগুলি বিশেষ অধিকার পাইতেন। এই সকল অধিকারের মারাঠী নাম "বড়ীলপণ" বা জ্যেষ্ঠ-স্বত্ব। পাটীলের বৃত্তির পরিমাণ, প্রকার, ও বিক্রয়কালে উভয় পক্ষের মধ্যে তাহার বিভাগের রীতির সম্যক্ পরিচয় নিম্নলিখিত দলীলখানি হইতে পাওয়া যাইবে।

"১৬৫৬ শকে বিরোধকৃত নাম সম্বৎসরে আশ্বিনের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন রবি বাসরে ঋণদায়গ্রস্ত বঙ্গোজী পাটীল ঋণ শোধের নিমিত্ত আপনার পাটীলগিরির অর্দ্ধেক গোর খোজী নামক এক ব্যক্তিকে ৭৭৫১, টাকায় বিক্রয় করিয়া একখানি দলীল লিখিয়া দেয়। ঐ দলীলে পাটীলগিরির "মান পান হক" ও ঘরবাড়ী ক্ষেত বাগান নিম্নলিখিত ভাবে বিভাগ হইয়াছিল।(১)

১। পাটীলগিরি সম্বন্ধে নাম লিখিবার সময় আগে গোরখোজী পরে বঙ্গোজীর নাম লেখা হইবে।

২। সরকারী ভেট প্রথমে গোরখোজী ও পরে বঙ্গোজী দিবে।

৩। সরকারী শিরোপা ও পান প্রথমে গোরখোজী ও পরে বঙ্গোজী পাইবে।

৪। পোলা উৎসবের সময় প্রথমে গোরখোজীর বলদ ও তৎপশ্চাতে বঙ্গোজীর বলদ গ্রাম্য তোরণের ভিতর দিয়া বাহির হইবে।

৫। মঙ্গ ও মহার প্রথমে গোরখোজীর গৃহে তোরণ বান্ধিবে ও গেরু বা লাল রঙ্গ দিবে; ও পরে বঙ্গোজীর গৃহে দিবে।

৬। দেওয়ালীর বাদ্য প্রথম গোরখোজীর গৃহে বাজাইয়ে পরে বঙ্গোজীর গৃহে বাজাইবে।

৭। কোলী প্রথমে গোরখোজীর গৃহে ও পরে বঙ্গোজীর গৃহে জল দিবে।

৮। গোরখোজীর 'গণেশ' ও 'গৌর' প্রথমে মিছিল করিয়া বাদ্য বাজাইয়া 'দুর্গামাতা'র নিকট আনিবে; পরে বঙ্গোজীর গণেশ ও গৌর মিছিল ও বাদ্য সহ তথায় আসিবে। সেখান হইতে দুই মিছিল একত্র হইয়া প্রথমে গোরখোজীর ঠাকুর ও তৎপশ্চাতে বঙ্গোজীর ঠাকুর লইয়া যাইবে।

৯। কড়কণা (২) প্রথমে গোরখোজী ও পরে বঙ্গোজী পাটীলের গৃহে দিবে।

১০। হোলী উৎসবে বঙ্গোজী পাটীল প্রথমে বাদ্য-সহকারে পুরী আনিয়া আগুনে দিবে, পরে গোরখোজীর পুরী আগুনে দিবে।

১১। দসরার সময়ে প্রত্যহ দশটি বাদ্য প্রথমে বঙ্গোজী ও পরে গোরখোজীর ঘরে বাজিবে। গ্রামের মালী ও গুরব প্রথমে বঙ্গোজী ও পরে গোরখোজীর ঘরে ফুল ও বাবরী দিবে।

১২। দসরার সময়ে বঙ্গোজী প্রথমে ও তাহার পরে গোরখোজী আপ্‌সা গাছের পূজা করিবে।

১৩। বঙ্গোজীর শিরাল শেট (৩) মূর্ত্তি প্রথমে বাজাইয়া আনিয়া রাখিবে। তার পর গোরখোজীর শিরাল শেট আনিয়া, দুই মূর্ত্তি একত্র করিয়া, প্রথমে বঙ্গোজীর ও তৎপশ্চাতে গোরখোজীর মূর্ত্তি লইয়া যাইবে।

১৪। গ্রাম হইতে প্রথমে বঙ্গোজীকে পান তিলক দেওয়া হইবে। গোরখোজী তাহার পরে পাইবেন।

১৫। ব্রাহ্মণ কার্ত্তিকী দ্বাদশীর আগের তুলসী পূজা প্রথমে বঙ্গোজীর ঘরে ও তৎপরে গোরখোজীর ঘরে করিবে। বঙ্গোজী পাটীল প্রথম কার্ত্তিকের শুক্ল

(১) Peshwas' Diaries, Vol I, pp 146—150 দেখুন।

(২) নবমীর রাত্রে এবং অন্যান্য উৎসবের দিনে দেবমূর্ত্তির মাথার উপর গোল গোল কাগজের টুকরা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়, ইহাকে কড়কণা বলে।

(৩) শিরাল শেট একজন বানিয়ার নাম। এই বণিক কেবল এক ঘণ্টার জন্য রাজা হইয়াছিল। শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর দিন তাহার মৃন্ময় মূর্ত্তির পূজা হয়। পূজান্তে মহিলাগণ মূর্ত্তির চারিদিকে নৃত্য করেন। তাহার পর কূপোদকে ইহার বিসর্জন হয়।

প্রতিপদের দিন হরিজাগরণ করিবে। তৎপরে গোরখোজী পাটীল তাহার পর দিন করিবে।

১৬। মহার প্রথমে বঙ্গোজী পাটীলের ঘরে মোলী (জ্বালানি কাঠ) দিবে, পরে গোরখোজী পাটীলের ঘরে দিবে।

১৭। উভয় পাটীলের সম্মতি লইয়া কুম্ভকর্ণী দলীল পত্রের উপর লাঙ্গল চিহ্ন দিবে।

নিম্নলিখিত পাওনাগুলিতে উভয়ের সমান দাবী থাকিবে,—

১। শস্যের নৌকাপ্রতি পাটীলের প্রাপ্য দেড় মণ শস্য (ইহাকে মারাঠীতে শেলাপাটী বলে)।

২। প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে ২৫ আঁটি জওয়ারের কাঠি।

৩। প্রত্যেক ক্ষেত্র প্রতি ৫ মণ কাপাস।

৪। প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে এক আঁটি জওয়ার।

৫। প্রত্যেক চামারের নিকট হইতে বার্ষিক এক জোড়া জুতা।

৬। প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে এক আঁটি কাঁচা ঘাস।

৭। ঘানি প্রতি ৯ টাক তৈল। (১ টাক—৯ আনা।)

৮। প্রত্যেক পানওয়ালার নিকট হইতে প্রতিদিন ১৩টি পান।

৯। জোসী ব্যতীত অপরের সকলের ইক্ষু ক্ষেত্র প্রতি এক দলা গুড়, এক আঁটি আঁক ও এক পাত্র রস।

১০। প্রত্যেক পাল হইতে দসরার দিন এক একটি ছাগ।

১১। প্রত্যেক তাঁত হইতে বার্ষিক এক একখানি কাপড়।

১২। প্রত্যেক ধাঙ্গোরের তাঁত প্রতি এক একখানি কাপড়।

১৩। প্রত্যেক বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ ও বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়া উপলক্ষে আধখানি করিয়া নারিকেল।

১৪। সবুজীওয়ালার নিকট হইতে শাক।

১৫। প্রত্যেক ক্ষেত হইতে ধান্য ব্যতীত অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের এক এক পাত্র। (বাকা)

১৬। প্রত্যেক দোকানদারের নিকট হইতে প্রথানুসারে প্রাপ্য অংশ।

১৭। প্রত্যেক বাণিয়ার দোকানের খাজনা।

১৮। প্রত্যেক মুদীর নিকট হইতে মসলার ছালা প্রতি ১ পোয়া।

১৯। লবণের দোকানের হাশীল।

২০। বাহে জমাপ্রতি বর্ষ ২৫৲।

২১। প্রত্যেক মুদীর দোকান হইতে প্রতিদিন এক-একটি সুপারি।

পাটীল বাড়ীর অর্দ্ধেক গোরখোজীর ও অর্দ্ধেক বঙ্গোজীর।

যদি হাকিম, দেশপান্ডে ও দেশমুখের নিকট হইতে কোন ইনাম জমি পাওয়া যায়, তবে উভয়ের মধ্যে সমান বিভাগ হইবে।

মুণ্টী বসাত ও শিকার উভয়ের মধ্যে সমান বিভাগ হইবে। গোরখোজী তাহার অংশ প্রথমে লইবে, পরে বঙ্গোজী তাহার অংশ পাইবে।

যদি গ্রামের সন্নিকটে নূতন বাজার বা বসতি হয়, তাহার লভ্যাংশ এবং পাওনা উভয়ে সমান ভাবে বণ্টন করিয়া লইবে।

পাটীলদিগের গরু মরিলে, মহার মৃত পশুর চর্ম্ম উভয়কেই দিবে।

প্রত্যেক পাটীল আপন-আপন জ্ঞাতি ব্যতীত অপর সকলের নিকট হইতে পাওনা আদায় করিবে।

যে সমস্ত পুরাতন পাওনার কথা উপরে লিখিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন পাওনা থাকিলে বঙ্গোজী ও গোরখোজীর মধ্যে সমান ভাগ হইবে।

এতদ্ব্যতীত পাটীলগণ তাহাদের কাযের জন্য নিষ্কর জমিও ভোগ করিতেন। ঐ নিষ্কর ইনামজমির বিভাগের কথাও ঐই দলীলে আছে।

বলা বাহুল্য, এই দলীলখানিতে পাটীলের সমস্ত পাওনার তালিকা নিঃশেষিত হয় নাই। ভিন্ন-ভিন্ন গ্রামের প্রথা অনুসারে, পাটীলগণের পাওনা কম বেশী হইত। বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে কোন-কোন গ্রামের পাটীল যথাক্রমে ৷৷৹ ও ১৲ পাইতেন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি দলীলে, 'শ্রাবণ পর্ট', 'শিমগা নাচ পট্টী' এবং 'কুরলা'

প্রভৃতি অথর্ব কতকগুলি পাওনার উল্লেখ আছে। উপরি-উদ্ধৃত দলীলেই লক্ষিত হইবে যে, দস্‌রা পোলা প্রভৃতি কতকগুলি সার্ব্বজনিক উৎসবের সময় পাটীলকে কতকটা সামাজিক সম্মান প্রদান করা হইত। পাটীল মুসলমান হইলেও হোলির আগুনে পুরি নিক্ষেপ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেন না। আবার কোন কোন জায়গায় প্রত্যেক বিবাহেই পাটীলদের গৃহ হইতে একটি সধবা রমণীকে নিমন্ত্রণ করিতে হইত। আবার কোথাও-কোথাও পাটীলকে পর্ব্ব উপলক্ষে বলুতাদিগকে ভূরি ভোজনে তৃপ্ত করিতে হইত। বলা বাহুল্য, এই প্রকারের ভোজ কেবল শিষ্টাচারের খাতিরে দেওয়া হইত না।

পাটীলের পদ যেরূপ দায়িত্বপূর্ণ এবং গ্রাম্য সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে তাহাকে মাঝে মাঝে যেরূপ বিপদে পড়িতে হইত, তাহার অনুপাতে তিনি যে সামাজিক সম্মান ভোগ করিতেন তাহা মোটেই অতিরিক্ত নহে। গ্রামের রাজস্ব যথাকালে আদায় না হইলে, পাটীলকেই দণ্ড ভোগ করিতে হইত। গ্রামের কেহ বিদ্রোহী হইলে, বা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহাকে নজর-বন্দী করিবার দায়িত্ব পাটীলের স্কন্ধেই ন্যস্ত হইত। পেশবার শত্রুগণ যখন গ্রাম আক্রমণ করিয়া গ্রামবাসীদিগের নিকট নিষ্ক্রয় মূল্য আদায় করিতে চেষ্টা করিত, তখনও পাটীলের হাতেই দড়ি পড়িত। আবার যে কোন বিদেশীয় দ্রব্য গ্রামের সীমানার মধ্যে অপহৃত হইলে তাহার উদ্ধার বা ক্ষতিপূরণের দায় পড়িত বেচারা পাটীলের ঘাড়ে। স্টোন বলেন যে, কোন সম্ভ্রান্ত পরিব্রাজক গ্রামের ভিতর দিয়া গেলে, তাহার মোটবাহক জুটাইতে হইত। গ্রামবাসিগণের জন্য যাহাকে এত কষ্ট সহিতে হইত, তাহাকে যে আচারা-একটু সম্মান দেখাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

নিষ্পত্তি

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

(১)

ছল করি' বাধাইয়া বাদ
গেলে চলি' গুরু অভিমানে,
আর দেখা করিলে না আর কথা কহিলে না
গেল দিন চাহি পথপানে।

(২)

তার পর সহসা যেদিন
হ'ল দেখা তোমায় আমায়,
তুমি বসি' তরুতলে যতনে গাঁথিতেছিলে
চারু হার নব কলিকায়।

(৩)

আঁখি তুলি' চাহিলে কেবল
বসিলাম যবে গিয়া পাশে,
তবু কহিলে না কিছু করিলে নয়ন নীচু
দীর্ঘশ্বাস মিশিল বাতাসে।

(৪)

কোথা হ'তে অন্তর্যামী পাখী
ভাবি', তুমি কঠিন তো নও,
বুঝিল কি ব্যথা মম? গাহিল কি অনুপম
"কথা কও, বউ কথা কও।"

(৫)

তার পর ঘটিল যা কিছু
তুমি জান—তুমি জান—সব,
তুমি জান মুখর অধর
কিসে মোর করিলে নীরব।

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

একমাত্র কন্যার মৃত্যুর চেয়েও যে দুর্গতি আজ পিতার চক্ষে বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহার আভাস মাত্রই মৃণাল কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া যখন নিঃশব্দে সরিয়া গেল, তখন এই সাধ্বী বিধবা মেয়েটির লজ্জাটা যেন ঠিক একটা ভারী মুগুরের মত কেদারবাবুর বুকে আসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি একাকী চুপ করিয়া নিজের পাকা দাড়িতে হাত বুলাইলেন, তার পরে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে তেলের বাটিটা টানিয়া লইলেন।

আজ সকাল বেলাটা বেশ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু মধ্যাহ্নের কিছু পরে হইতেই মেঘলা করিয়া আসিতে লাগিল। কেদারবাবু এই মাত্র শয্যায় উঠিয়া বসিয়া পশ্চিমের ছোট জানালাটা খুলিয়া দিয়া বাহিরে চাহিয়া ছিলেন। সম্মুখেই একটা পুষ্পিত পেয়ারা গাছ ফুলে-ফুলে একেবারে ছাইয়া গেছে এবং তাহারই উপরে অসংখ্য মৌমাছির আনন্দ কলরবের আর অন্ত নাই। অদূরে লম্বা দড়িতে বাঁধা মৃণালের স্বহস্ত পরিমার্জ্জিত চিক্কণ পরিপুষ্ট গাভীটি বড় বড় নিশ্বাস ফেলিয়া চরিয়া ফিরিতেছে এবং তাহারই পিঠের উপর দিয়া পল্লী-পথের কতকটা অংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

বাবা, তোমার চা-টা এইবার নিয়ে আসি নে?

কেদারবাবু ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, এর মধ্যেই নিয়ে আস্‌বে মা!

বাঃ—বেলা বুঝি আর আছে?

তিনি একটু হাসিয়া বালিশের তলা হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া বলিলেন, কিন্তু এখনো যে তিনটে বাজেনি মা।

মৃণাল কহিল, নাই বাজ্‌লো বাবা তিন্‌টে। ও-বেলা যে তোমার মোটে খাওয়া হয়নি।

কেদারবাবু মনে মনে বুঝিলেন আপত্তি নিষ্ফল। তাই বলিলেন, আচ্ছা আনো।

মৃণাল মুহূর্ত্ত কাল স্থির থাকিয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, তুমি যে বড় বল তুমি গরম চিঁড়ে ভাজা বড্ড ভালবাসো?

কথাটা ত মিছে বলিনে মা।

তবে, তা'ও দুটি আনি?

তুমি'ও আন্‌বে? আচ্ছা, আনোগে, বলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া জোর করিয়া একটু হাসিলেন। মৃণাল চলিয়া গেলে আবার সেই জানালাটার বাহিরে দৃষ্টি-পাত করিতে গিয়াই দেখিলেন সমস্ত ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট হইয়া গেছে। এবং পরক্ষণেই পাঁচ ছয় ফোঁটা তপ্ত অশ্রু টপ্‌ টপ্‌ করিয়া তাঁহার কোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। ব্যস্ত হইয়া জামার হাতায় বৃদ্ধ জলের রেখা দুটি ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিয়া মুখখানি শান্ত এবং সহজ দেখাইবার চেষ্টায় এমার্সনের খোলা বইটা চোখের সুমুখে তাড়াতাড়ি মেলিয়া ধরিলেন।

তাহার পাতার ভিতরে যাই থাক্ মনের মধ্যে এই কথাটারই ছাপ পড়িতে লাগিল এ কি আশ্চর্য্য অজ্ঞেয় ব্যাপার এই সৃষ্টিটা! সংসারের দিনগুলা যখন গণনার মধ্যে আসিয়া ঠেকিল তখনই কি এই দীর্ঘ জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা সকল আয়োজন বাতিল করিয়া আবার নূতন করিয়া অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন পড়িল! বেশ দেখিতেছি আমার মানব-জন্মের সমস্ত অতীতটাই এক-প্রকার ব্যর্থ গেছে,—অথচ এ কথা বুঝিতেও ত বাকি নাই এত সুদীর্ঘ ফাঁকি ভরিয়া তুলিতে এই একটা মাসই যথেষ্ট হইল।

দ্বারে পদশব্দ শুনিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মৃণাল পাথর বাটীতে চা এবং রেকাবিতে চিঁড়ে ভাজা লইয়া প্রবেশ করিল। দুই হাত বাড়াইয়া সে গুলি গ্রহণ করিতে করিতে কহিলেন, আজ খাওয়া যে আমার ভাল হয়নি তা' এখন টের পাচ্ছি। কিন্তু দেখ মা—

না বাবা, তুমি কথা কইতে সুরু করলে সব জুড়িয়ে যাবে।

কেদারবাবু নীরবে চায়ের বাটিটা মুখে তুলিয়া দিলেন এবং শেষ হইলে নামাইয়া রাখিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, আমি এই কামনাই কেবল করি মৃণাল, তুমি আসচে বারে যেন আমার মেয়ে হয়ে জন্মাও। বুকে করে মানুষ করার বিদ্যেটা আমার খুব শেখা আছে মা,—সেইটে যেন সেবার সারা জীবন ভরে খাটাবার অবসর পাই।

শেষ দিকটায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু এই ধরণের আলোচনাকেই মৃণাল সবচেয়ে ভয় করিত। তাই তাঁহার অপরিস্ফুট আবেগের প্রতি লক্ষ্য মাত্র না করিয়া সহাস্যে কহিল, বেশ ত বাবা, তোমার অনেক ছেলে-মেয়ের মধ্যে আমিও যেন একজন হই।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না না, অনেক নয় মা, অনেক নয়। কেবল তুমি একা,—আমার একটি মাত্র মেয়ে। একলা তুমি আমার সমস্ত বুক জুড়ে থাক্‌বে। এবার যা' কিছু তোমার কাছে শিখে যাচ্ছি, সেই গুলিই আবার একটি একটি করে আমার মেয়েটিকে শিখিয়ে দিয়ে আবার ঠিক এম্‌নি করেই বুড়ো বয়সে সমস্তটুকু তার কাছ থেকে ফিরে নিয়ে পর-জন্মের পথে যাত্রা কোরব। বলিয়া তিনি অলক্ষ্যে একবার চোখের কোনে হাত দিয়া লইলেন।

মৃণাল ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিল, তুমি কেবল আমাকে অপ্রতিভ কর বাবা। আমি কি জানি বল ত?

এই যে মা, আমার খাওয়া হয়নি আমি নিজে জানতুম না কিন্তু তুমি জানতে।

ও ত ভারি জানা। যার চোখ আছে সেই ত দেখতে পায়।

কিন্তু ওই চোখটাই যে সকলের থাকেনা মৃণাল। বলিয়া একটুখানি থামিয়া কহিলেন, কিন্তু আমি সবচেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি এই দেখে, মা, ভগবান কোথায়, কবে, আর কি উপায়ে যে মানুষের যথার্থ আপনার জনটিকে মিলিয়ে দেন তা কেউ জানেনা। এর না আছে আড়ম্বর, না আছে কোন সম্পর্কের বালাই, না আছে সময়ের হিসেব। নিমিষে কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়,—কেবল বুক্‌ভরে যখন তাকে পাই, তখনই মনে হয় এত কাল এত বড় ফাঁকাটা সয়েছিলুম কেমন কোরে?

মৃণাল আস্তে আস্তে বলিল, সে ঠিক কথা বাবা। নইলে, তোমার একটা মেয়ে যে এই বনের মধ্যে ছিল এতদিন ত তার কোন খোঁজ খবর রাখোনি?

কেদারবাবু কহিলেন, সাধ্য কি মা রাখি তিনি যতদিন না হুকুম করেন। আবার হুকুম যখন দিলেন তখন কোথাও এতটুকু বাধলনা, কিসে যেন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলো। আজ লোকে দেখ্‌চে এই ত কেবল একটা মাসের পরিচয়। কিন্তু আমি জানি এতো শুধু আমার ভাঁড়ার-হিসেব নয় যে পাঁজির পাতার সঙ্গে এর গণনায় মিল হবে। এ যেন কত যুগ-যুগান্ত কাল ধরে কেবল তোমার ছায়াতেই বসে আছি,—এর আবার দিন-মাস-বছর কি!

এই বলিয়া তিনি আবার একটু থামিলেন। মৃণাল নিজেও কি যেন একটা বলিতে গেল, কিন্তু সহসা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল এই বৃদ্ধের অন্তরের মধ্যে এতদিন ধরিয়া যে দুঃখের চিতা নীরবে জ্বলিতেছিল, সে যেন কেমন করিয়া নিবিয়া আসিল বলিয়া। এবং, ইহারই শেষ আভাটুকু তাঁহার মুখের উপরে, যে দীপ্তিপাত করিয়াছে সেই ম্লান আলোকে কোথাকার কোন সুগভীর স্নেহ যেন অসীম করুণায় মাখামাখি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা কহিলেন না,—মৃণালের আনত দৃষ্টি মেঝের উপর তেম্‌নি স্থির হইয়া রহিল। এই নীরবতা কেদারবাবুই পুনরায় ভঙ্গ করিলেন। বলিলেন, মৃণাল, আমি এক ধর্ম্ম ত্যাগ করে যখন আর এক ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছি, তখন, বাইরের কাছে না হোক্‌, অন্ততঃ নিজের কাছেও একটা সাবাদ্দিহির দায়ে পড়েছি। সেটা এতদিন কোন মতে এড়িয়ে গেছি বটে, কিন্তু আর বুঝি ঠেকাতে পারিনে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখন এই কথাটা যেন বুঝতে পারচি—

পলকের জন্য মৃণাল একটুখানি চোখ তুলিতেই কেদারবাবু বলিয়া উঠিলেন, ভয় নেই মা, ভয় নেই, আমি বারম্বার তোমার নাম উল্লেখ করে আর তোমাকে সঙ্কোচে ফেল্‌বনা। কিন্তু এতকাল পরে এই সত্যটা নিশ্চয় বুঝেচি

পেরেছি যে লড়াই-ঝগড়া বাদাবাদি রেষারেষি করে আর যাকেই পাওয়া যাকনা, ধর্ম্ম-বস্তুটিকে পাবার যো নেই।

মৃণাল তাঁহার অন্তরের বাক্যটি অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, সে কথা সত্যি হতে পারে বাবা, কিন্তু যে ধর্মটি আমি ভাল বলে বুঝেচি তাকে গ্রহণ করতে হলেই যে লড়াই-ঝগড়া বাদা-বাদি করতে হবে, আমি ত তার কোন প্রয়োজন দেখ্‌তে পাইনে।

কেদার বাবু বলিলেন, আমিও যে ঠিক একদিন পেয়েছিলুম তাও নয়, কিন্তু প্রয়োজন হয়ে পড়ে বই কি মৃণাল। কোন বস্তুকেই পরিত্যাগ ত আমরা প্রীতির ভেতর দিয়ে প্রেমের ভেতর দিয়ে করিনে। যাকে ত্যাগ করে যাই তার সম্বন্ধে সেই যে মন ছোট হয়ে থাকে সে ত কোন কালেই ঘোচে না। সেই জন্যেই ত আজ মস্ত কৈফিয়তের দায়ে ঠেকেচি মা। কিন্তু তোমরা যা জন্ম থেকে আপনা আপনি, অতি সহজেই পেয়েচ, সে ভাল হোক্ মন্দ হোক্ তাকেই অবলম্বন করে চলেচ। তফাৎটা একটু চিন্তা করে দেখ দেখি।

মৃণাল মৌন হইয়া রহিল, প্রতিবাদ করিবার মত জবাবটা সে সহসা খুঁজিয়া পাইল না! কেদারবাবু নিজেও মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, মা, আজ অনেক দিনের অনেক ভুলে যাওয়া কথাও ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌চে,—কিন্তু এতকাল এরা কোথায় লুকিয়ে ছিল!

মৃণাল চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল কার কথা বাবা?

কেদারবাবু বলিলেন, আমারি কথা মা। বড় হবার মত বুদ্ধিও ভগবান দেন নি, বড়ও কখনো হতে পারিনি। আমি সাধারণ মানুষ, সাধারণের সঙ্গে মিশেই চিরদিন কাটিয়েচি। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁরা বড়, যাঁরা সমাজের মাথা, সমাজের আচার্য্য হয়ে গেছেন, তাঁদের আদেশ উপদেশই চিরকাল ভক্তির সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে এসেছি। তাঁদের সেই সব কতদিনের কত বিস্মৃত বাক্যই না আজ আমার স্মরণ হচ্চে। তুমি বলছিলে মৃণাল, ধর্ম্মান্তর গ্রহণের মধ্যে, ভালটাকে বেছে নেবার মধ্যে রেষা-রিষি থাক্‌বেই বা কেন, থাকার প্রয়োজন হবেই বা কিসের জন্যে? আমিও এতকাল তাই বুঝেচি, তাই বলে বেড়িয়েচি। কিন্তু আজ বুঝ্‌তে পেরেচি প্রয়োজন ছিলই! নইলে আমাদের মধ্যে যাঁরা সকল বিষয়েই আদর্শ, এমন কি সমস্ত মানুষের মধ্যেই যাঁরা আদর্শ-পদবাচ্য, তাঁদের মুখ দিয়ে ধর্ম্মের মন্দিরে, ধর্ম্মের বেদীতে দাঁড়িয়ে 'রাম'কে রেমো, 'হরি'কে হোরে, 'নারায়ণ'কে নারাণে বেরুবে কেন? সকলকে আহ্বান করে উচ্চ কণ্ঠে কিসের জন্যে এ কথা ঘোষণা করবেন যে দুর্ভাগারা যদি আঘাটায় ডুবে মরতে না চায় ত আমাদের এই বাঁধা ঘাটে আসুক। মা, ধর্ম্মোপদেশের এই প্রচণ্ড তাল-ঠোকায় আমাদের সমাজ-শুদ্ধ সকলের রক্তই তখন ভক্তিতে যেমন গরম শ্রদ্ধায় তেমনি রুখিয়া হয়ে উঠ্‌ত,—আলোচনায় পুলকের মাত্রাও কোথাও এক তিল কম পড়তনা,—কিন্তু, আজ জীবনের এই শেষ প্রান্তে পৌঁছে যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করচি, তার মধ্যে উপদেশ যদি বা কিছু থাকে ত থাক, কিন্তু ধর্ম্মের লেশমাত্রও কোনখানে থাক্‌বার যো ছিলনা।

মৃণাল ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, বাবা, এ সব কথা আমাকে তুমি কেন শোনাচ্চ? তাঁরা সকলেই যে আমার পূজনীয়, আমার নমস্য!

এই বলিয়া সে দুই হাত জোড় করিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিল। এই ভক্তিমতী তরুণীর নম্রনত মুখখানির পানে চাহিয়া বৃদ্ধ যেন বিভোর হইয়া রহিলেন। এবং ক্ষণপরে বাহিরে দাসীর আহ্বানে মৃণাল উঠিয়া চলিয়া গেলেও তিনি তেমনি একভাবেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শাশুড়ী কেন ডাকিতেছিলেন শুনিয়া খানিক পরে মৃণাল ফিরিয়া আসিতেই কেদারবাবু অকস্মাৎ দুই হাত প্রসারিত করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, মৃণাল, এমনি পরের দোষ-ত্রুটির নালিশ করতে করতেই কি সারা জীবনটা আমার কাট্‌বে? এর থেকে কি কোন কালেই মুক্তি পাবোনা মা?

মৃণাল কহিল, তোমার মশারির কোনটা একটু ছিঁড়ে গেচে বাবা, একবারটি সরে বোসো না ওটুকু সেলাই করে দি, এই বলিয়া সে কুলুঙ্গি হইতে সেলাইয়ের ক্ষুদ্র কৌটাটি পাড়িয়া লইতেই বৃদ্ধ শয্যা হইতে উঠিয়া একটা মোড়ায় গিয়া বসিলেন, এবং ওই কর্ম্মনিরত নির্ব্বাক মেয়েটির আনত মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সে কোন দিকে মুখ না তুলিয়া আপন মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া কেদারবাবুর দুই চক্ষু নিতান্ত অকারণেই বারম্বার অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিতে লাগিল

কৌটাটি খুঁট দিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন।

সেলাই শেষ করিয়া মৃণাল কৌটাটি তাহার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও-বেলা তুমি কি খাবে বাবা?

প্রশ্ন শুনিয়া কেদারবাবু হঠাৎ একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার অশ্রুকরুণ ওষ্ঠপ্রান্তে একটুখানি হাসির ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ও-বেলার খাবার কথা ভাববার জন্যে এ-বেলায় ব্যাকুল হবার আবশ্যক নেই মা, সে চিন্তা যথাসময়েই হতে পারবে। কিন্তু তুমি একবার স্থির হয়ে বোসো দিকি মা।

বলিলেন, এ অপরাধের আজই শেষ। আমার মুখ থেকে আর কখনো কারও নামে অভিযোগ শুনবে না মৃণাল। একটু থামিয়াই পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু, আমার উপরে তুমি বিরক্ত হোয়ো না মা, আমি ঠিক এর জন্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিনি।

তাঁহার সজল কণ্ঠস্বরে মৃণাল চকিত হইয়া বলিল, এমন কথা তুমি কেন বললে বাবা, আমি কি কোনদিন তোমার প্রতি বিরক্ত হয়েচি।

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ সবেগে মাথা নাড়িয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, কখনো না মা, কখনো না। তুমি আমার মা কিনা, তাই এই বুড়ো ছেলের সকল অত্যাচার উপদ্রবই সস্নেহ হাসিমুখে সয়ে আসচ। কিন্তু এতকাল পরে যে সত্যটা আজ বুকের রক্ত দিয়ে পেয়েচি তাকেই কেবল তোমাকে দেখাতে চেয়েচি মৃণাল, পরের নিন্দা গ্লানি করতে চাই নি। আজ যেন নিশ্চয় জানতে পেরেচি ধর্ম্ম জিনিসটিকে একদিন যেমন আমরা দল বেঁধে মৎলব এঁটে ধরতে চেয়েছি তেমন করে তাঁকে ধরা যায় না। নিজে ধরা না দিলে হয় ত তাঁকে ধরাই যায় না। পরম দুঃখের মূর্ত্তিতে যে দিন মানুষের চরম বেদনার উপরে পা দিয়ে তিনি একাকী এসে দাঁড়ান তখন কিন্তু তাঁকে চিনতে পারা চাই!—এতটুকু ভুল-ভ্রান্তির ভয় সয় না মা, তিনি মুখ ফিরিয়ে ফিরে যান। কিন্তু তার মত দুর্ভাগ্য আমার নিকৃষ্ট শত্রুর জন্যেও আমি কামনা করতে পারিনে মৃণাল।

যে প্রসঙ্গকে মৃণাল ক্রমাগত বাধা দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে এ যে তাহারই ইঙ্গিত ইহা অনুভব করিয়াই তাহার সঙ্কোচ ও বেদনার অবধি রহিল না, কিন্তু আজ আর সে যে-কোন-একটা ছুতা করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলনা, নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

ক্রমাগতই বাধা পাইয়া কেদারবাবুর নিজের দৃষ্টিও এদিকে অতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, আজ কিন্তু তিনিও কোন খেয়াল করিলেন না, বলিতে লাগিলেন, মা, এক কথা বারবার বল্লেও আমার তৃপ্তি হচ্চেনা, যে তুমি ছাড়া এতবড় সংসারে আমার আপনার বল্‌তে আর কেউ নেই, কেউ কোন দিন ছিল না। তাই বুঝি আমার শেষ জীবনের সমস্ত বোঝা, সমস্ত ভালমন্দ কি করে জানিনে তোমার উপরে এসেই স্থিতি লাভ করেচে। যিনি সকল বিধি ব্যবস্থার মালিক এ তাঁরই ব্যবস্থা জেনে অসংশয়ে বুঝে নিয়েচি বলেই আর আমার কোন লজ্জা কোন হীনতা নেই। পরগৃহ বলে প্রথম ক'দিন আমার ভারি বাধবাধ ঠেকেছিল, কিন্তু আজ আমার মন থেকে তার সমস্ত জঞ্জাল সমস্ত বালাই নিঃশেষ হয়ে মুছে গেছে।

মৃণাল মুখ তুলিয়া শুধু একটু হাসিল। কেদারবাবু একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তবু কেমন বাধে মৃণাল, তবু কেমন গলা দিয়ে কথাটা কিছুতে বার হতে চায়না।

মৃণাল ম্লান মুখে বলিল, থাকনা বাবা,—নাই বল্‌লে আজ তেমন কথা। কেদারবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না না, আর থাকচে না,—আর থাকলে চলবে না। আমার নিশ্চয় মনে হচ্চে সে সুরেশের সঙ্গেই—

এ সংশয় মৃণালের নিজের মনেও বহুবার ঘা দিয়া গেছে তাই সে শুধু মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বহিয়া গেলে কেদার-বাবু প্রবল চেষ্টায় যেন আপনাকে আপনি পরাভূত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, একবার মহিমের কাছে যেতে চাই মৃণাল,—একটিবার তার মুখের কথা শুনতে চাই,—শুধু এরি জন্যে আমার বুকের মধ্যেটা যেন অনুক্ষণ হুহু কোরে জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু একাকী গিয়ে তার কাছে আমি কেমন কোরে দাঁড়াব মা?

মৃণাল তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া তাহার সকরুণ চক্ষু দুটি দুর্ভাগ্য বৃদ্ধের লজ্জিত, ভীত মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া

কহিল, কেন বাবা তুমি একলা যাবে,—যদি যেতেই হয় ত আমরা দুজনেই এক সঙ্গে যাবো।

সত্যি যাবে মা ?

যাবো বই কি বাবা। তা'ছাড়া, তোমাকে একলা আমি ছেড়েই বা দেব কেন? তুমি যেখানেই যাওনা, আমি সঙ্গে না গিয়ে কিছুতে ছাড়বনা তা' বলে রাখ্‌চি। আমাকে কেউ সঙ্গে নিতে চায়না বাবা, আমি কোথাও একটু বেড়াতে পাইনে।

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধ কোন কথা কহিল না, কেবল দুই করতল মুখের উপর চাপা দিয়া নিজের দুই জানুর উপর উপুড় হইয়া পড়িল, এবং পরক্ষণেই দেখিতে পাওয়া গেল সেই শুষ্ক শীর্ণ দেহখানির এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভিতরের কোন্ এক অব্যক্ত অপরিমেয় বেদনায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

মৃণাল নিঃশব্দে স্থির হইয়া তাঁহার শিয়রের কাছে বসিয়া রহিল, একটি কথা, একটি সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিলনা। একমাত্র কন্যার ঘৃণ্যতম দুর্গতিতে যে পিতার হৃদয় বিদ্ধ হইতেছে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার তাহার কি-ই বা ছিল!

এমন করিয়া বহুক্ষণ কাটিলে পরে বৃদ্ধ আত্ম-সম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন, মা?

সেই মরণাহত পাণ্ডুর মুখের প্রতি চাহিয়া মৃণালের বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু সে প্রাণপণে অশ্রু নিরোধ করিয়া সাড়া দিল, কেন বাবা?

সংসারে ব্যথার পরিমাণ যে এতবড়ও হতে পারে এ তো কখনো ভাবিনি মৃণাল! এর থেকে নিষ্কৃতির কি কোথাও কোন পথ নেই? কেউ কি জানেনা?

কিন্তু বাবা, লোকে মৃত্যুর শোকও ত সহ্য করতে পারে!

কেদারবাবু বলিলেন, আমার পক্ষে সে মৃত এই ত, তুমি বলচ মা? এক হিসেবে তাই বটে। অনেকবার আমার মনেও হয়েছে,—কিন্তু মৃত্যুর শোক যেমন বড়, তার শান্তি, তার মাধুর্য্যও তেমনি বড়। কিন্তু সে সান্ত্বনার উপায় কই মৃণাল? এর দুঃসহ গ্লানি, অসহ্য লজ্জা আমার বুকের পথ জুড়ে এম্‌নি বেঁধে আছে যে কোথাও তাদের নড়িয়ে রাখবার এতটুকু ফাঁক নেই। এই বলিয়া চক্ষু মুদিয়া বুকের উপর হাতখানি মুহূর্ত্তকাল পাতিয়া রাখিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, মা, সন্তানের মৃত্যু যিনি দেন তাঁকে আমরা এই বলে ক্ষমা করি যে তাঁর কার্য্য-কারণ আমরা জানিনে। আমরা—

মৃণাল হঠাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা, আমরাও তা'হলে তাই করতে পারি? যে-কেউ হোক্ না, যার কার্য্য-কারণ আমাদের জানা নেই তাকে মাপ করতেও যদি না পারি অন্ততঃ মনে মনে তার বিচার করে তাকে অপরাধী করে রাখবনা!

বৃদ্ধ ঠিক যেন চমকিয়া উঠিলেন, এবং দুই চক্ষের তীব্র দৃষ্টি অপরের মুখের প্রতি একাগ্র করিয়া পাথরের মত নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মৃণাল সলজ্জমুখে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, তা'ছাড়া আমি সেজদার কাছেই শুনেচি বাবা যে সংসারে এমন অপরাধ অল্পই আছে ইচ্ছে করলে যাকে ক্ষমা করা না যায়।

কেদারবাবু উত্তেজনায় সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এ অপরাধও কি কেউ কোন দিন মাপ করতে পারে মৃণাল?

মৃণাল চুপ করিয়া রহিল; তিনি তেম্‌নি তীব্রস্বরে কহিতে লাগিলেন, কখনো নয়, কখনো নয়। বাপ হয়ে তার এ দুষ্কৃতি আমি কোনমতেই ক্ষমা কোরবনা। ক্ষমার যোগ্য নয়, ক্ষমা করা উচিত নয়,—এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলে দিলাম।

মৃণাল ধীরে ধীরে বলিল, যোগ্য অযোগ্য ত বিচারের কথা বাবা,—তাকে ত ক্ষমা বলা চলেনা। তা'ছাড়া ক্ষমার ফল কি শুধু অপরাধীই পায় বাবা? যে ক্ষমা করে সে কি কিছুই পায়না?

বৃদ্ধ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। মেয়েটির এই শান্ত স্নিগ্ধ কথাগুলি এক মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, এমন কোরে ত আমি কখনো ভেবে দেখিনি মৃণাল। তোমার কাছে আজ যেন আবার এক নূতন তত্ত্ব লাভ করলুম মা। ঠিক কথাই ত! যে গ্রহণ করে লাভের খাতায় তাকেই কি কেবল ষোল আনা উসুল দিয়ে দাতার অঙ্কে শূন্য বসাতে হবে? এমন কিছুতেই সত্য হতে পারেনা! ঠিক, ঠিক! কার অপরাধ কত বড় সে বিচার যার খুসি সে করুক, আমি ক্ষমা কোরব কেবল আমারই পানে চেয়ে! এই না মা তোমার উপদেশ?

কেন বাবা এই সব বলে আমার অপরাধ বাড়াচ্চ?

তোমারও অপরাধ? সংসারে তারও কি স্থান আছে মা?

মৃণাল হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ঐ বুঝি মা আমাকে আবার ডাকচেন,—আমি এখনি আসচি বাবা! এই বলিয়া সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

ভারত গবর্ণমেন্ট, ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের সুব্যবস্থা করিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেন্টের শিক্ষা-বিভাগ হইতে একটী রেজোলিউসন সাধারণের অবগতির জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। রেজোলিউসনটি অতি দীর্ঘ; বিষয়টিও গুরুতর। এই রেজোলিউসনে গবর্ণমেন্ট স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথার অবতারণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রধান-প্রধান কথাগুলি সংক্ষেপে এইরূপ :—ভারতবর্ষে এখন যতগুলি মেয়ে লেখা পড়া শিখিতেছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা দুইজন মাত্র মাধ্যমিক (secondary) শিক্ষা লাভ করিতেছে। অথচ, এই শিক্ষার উপরই দেশের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে। এই সকল মাধ্যমিক বালিকা-বিদ্যালয় প্রায় জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। গবর্ণমেন্টের খাসে মাত্র কয়েকটি স্কুল আছে। আর, লোকাল বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটীসমূহের হাতে যে সকল মাধ্যমিক বালিকা-বিদ্যালয় আছে, তাহারা সংখ্যায় আরও সামান্য। তবে, বেসরকারী অধিকাংশ বালিকা-বিদ্যালয়ই সরকার হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। লোকাল বোর্ড সমূহ তাঁহাদের সাধ্যমত বালকদিগের জন্য প্রাইমেরী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে গবর্ণমেন্ট আশা করিতেছেন যে, তাঁহারা বালিকাগণকেও প্রাথমিক শিক্ষাদান-কল্পে যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করিবেন না। কিন্তু লোকাল বোর্ড সকল যে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার উপযুক্তরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, গবর্ণমেন্ট ইহা আশা করেন না। এইজন্য গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিয়াছেন যে, মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট অর্থ সাহায্য করিবেন ; এবং বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন ও control করিবেন ; আর জনসাধারণ এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালন করিবেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের গবর্ণমেন্ট এক সময়ে ঐ প্রদেশে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিবার জন্য শিক্ষিতা মহিলাগণের দ্বারা যেরূপ য়্যাড্‌ভিসরী কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, ভারত গবর্ণমেন্ট তাহার অনুমোদন করিয়া ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে ঐরূপ দুই-একটী কমিটি গঠনের কল্পনা করিয়াছেন। তবে যেখানে-যেখানে জনসাধারণ বালিকাদিগের মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালন করিবার জন্য ভাল রকম বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, সেই সকল স্থলে অবশ্য ঐরূপ কমিটির কোন প্রয়োজন হইবে না ; কেবল এইরূপ বিদ্যালয়ে কি ধরণের শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, সে বিষয়ে স্কুলের পরিচালকবর্গ স্থানীয় জনসাধারণের মতামতের অনুসরণ করিয়া চলিবেন, ইহাই গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায়।

গবর্ণমেন্ট রেজোলিউসনে বলিতেছেন যে, বালিকাদিগকে মাধ্যমিক শিক্ষা দিতে হইলে, কোন্-কোন্ বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে সকল দেশেই দুইটা মত দেখা যায়; কিন্তু ভারতবর্ষে এই দুইটা মতের মধ্যে পার্থক্য খুবই বেশী। এই দুইটা মতের মধ্যে একটা মত এই যে, মেয়েদেরও বালকদিগের সঙ্গে ঠিক সমান ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা উচিত। দ্বিতীয় মতের অনুসরণ-কারীরা বলেন, না, মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিয়া কাজ নাই। তাহারা গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম্ম, সন্তান-পালন, গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য-রক্ষা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করুক,—যাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ সাংসারিক জীবনে খুব কাজে লাগিবে। গবর্ণমেন্ট এই দুইটা মতের সম্বন্ধে নানা স্থান হইতে অভিমত সংগ্রহ করিয়া বিস্তৃত ভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। কলিকাতা-ইউনিভার্সিটী-কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টের XIV, XXXVI, ও LII পরিচ্ছেদে এই দুইটী মতের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। আবার এ দেশে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের দুই-একটা প্রধান অন্তরায়ও আছে,—তাহাদের অবরোধ-প্রথা, এবং বাল্য-বিবাহ। গবর্ণমেন্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন—উভয়েই, এই বিষয়টিও বিবেচনা করিতে ভুলিয়া যান নাই। বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন দুই প্রণালীই বজায় রাখিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তবে, এইরূপ ভাবে পাঠ্য নির্ব্বাচন করিতে বলিয়াছেন, যাহাতে এই দুইটা প্রণালীর মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য না থাকিয়া যায়। গবর্ণমেন্ট কিন্তু এখনও এ বিষয়ে কোনরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই ; কেবল কোন-কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের মন্তব্যের সমর্থন করিয়াছেন। এই দুইটা মত লইয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যেও অনেক দিন ধরিয়া একটা দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। যে সকল পরিবারের পুরুষেরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা খুব সাহেব-ঘেঁসা, অথবা বিলাত-ফেরত বা ইঙ্গ বঙ্গ সম্প্রদায় ভুক্ত, তাঁহারা ছেলেদের সঙ্গে সমান ভাবে মেয়েদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক এবং দিতেছেন। আর যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার দিকে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, অল্প শিক্ষালাভ করিয়াই সন্তুষ্ট, তাঁহারা মেয়েদের গৃহস্থালীর কাযে কর্ম্মে নিপুণ হইবার মত শিক্ষা দিবারই পক্ষপাতী। এই 'ভারতবর্ষে'ই কিছুদিন আগে সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই বিষয়টির একটু বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমরা আজ আর এই বিষয়টি লইয়া বেশী নাড়া-চাড়া করিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের বিশ্বাস, ঐ দুই প্রণালীর শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কালে উহাদের দোষ গুণ ধরা পড়িয়া যাইবে ; তখন দুইটী মতের সামঞ্জস্য করিয়া একটা মধ্যপন্থা খাড়া করা কঠিন হইবে না।

শিক্ষা-দান-ব্যাপারের পর পরীক্ষা-গ্রহণের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশের ছেলেরাই স্কুলের পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—প্রভৃতি নানা পরীক্ষার আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। মেয়েদিগকেও সেই পরীক্ষার আবর্ত্তে ফেলিয়া কাজ নাই,—ইহাই এখন অনেকের মত। যাঁহারা শিক্ষার সম্বন্ধে একটু বেশী রকম আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা আবার ছেলেদেরও পরীক্ষা দিতে বাধ্য করিবার পক্ষপাতী নহেন। এরূপ অবস্থায় মেয়েদেরও পরীক্ষা দেওয়াইবার বাধ্য-বাধকতায় অনেকেই যে বিরোধী হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মেয়েদের পরীক্ষার বিরুদ্ধে দেশবাসীর আর্ত্তনাদ গবর্ণমেণ্টের কাণেও পৌঁছিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ইউনিভার্সিটী-কমিশনের মতের অনুসরণ করিয়াছেন। কমিশন পরীক্ষা-গ্রহণের আবশ্যকতা একেবারে অস্বীকার করেন না; তবে পীড়া-পীড়িরও পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু এ কেবল secondary স্কুলের ছাত্রীদিগের সম্বন্ধে। যাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চাহে, তাহারা বালকদিগের মত পরীক্ষা দিতে বাধ্য থাকিবে,—ইহাই কমিশনের মত।

আপাততঃ সমগ্র ভারতে ৯১৪টি ছাত্রী কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন আই-এ শ্রেণীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আমলেই আনিতে চান না,—উহাকে স্কুলের শিক্ষার আমিলেই রাখিতে চান। সে হিসাবে, উচ্চশিক্ষালাভার্থিনী ছাত্রীর সংখ্যা কলিকাতায় তিনটি মেয়ে কলেজে ৫৩টির বেশী হয় না। এ বিষয়ে বরং মান্দ্রাজের দুইটী মেয়ে কলেজের অবস্থা অধিকতর উন্নত। কমিশন বলেন, কলেজে আই-এ শ্রেণীতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা অনেক স্কুলেও দেওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ, কমিশন মেয়েদের হাই স্কুলগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার পক্ষপাতী। আর, কমিশন বি-এ পরীক্ষার্থিনীর পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে কেবল স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে উপযোগী কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের প্রবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন আরও একটু কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যে সকল বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদে আছে, সেই সকল বিষয়ে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদেরও শিক্ষালাভের ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। তবে বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এ বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যেরূপ, ভারতের আর কোন প্রদেশে সেরূপ অবস্থা দেখা যায় না। বোম্বায়ে এবং অন্যত্র মেয়েরা পুরুষদের কলেজে পুরুষদের সঙ্গে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে,—বিশেষতঃ, professional অর্থাৎ; আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে। কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের অবস্থা অন্য প্রদেশের অপেক্ষা কিসে বিভিন্ন তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজে এবং ক্যাম্বেল-স্কুলে মেয়ে-পুরুষের এক সঙ্গে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ত রহিয়াছে এবং তাহারা ত এই ভাবেই শিক্ষালাভ করিতেছে। তবে আইন-কলেজে বোধ হয় সেরূপ ব্যবস্থা নাই। অথবা, তাই বা কেমন করিয়া বলি? তাহা হইলে পরলোকগতা কুমারী রেজিনা গুহ কেমন করিয়া বি-এল পাশ করিলেন? তাঁহার একার জন্য কি একটা স্বতন্ত্র আইন-কলেজ খোলা হইয়াছিল? সে যাহা হউক, খোদ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্নমত,—তাঁহারা মেয়ে-পুরুষে একসঙ্গে শিক্ষালাভের পক্ষপাতী নহেন। আলোচ্য রেজোলিউশনে গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন, "The Government of India however, fully realise the desirability of instituting separate collegiate institutions for women, staffed by women, but with arrangements, if necessary, for lectures in certain subjects by the professors of neighbouring men's colleges." বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের মতামত এ বিষয়ে আরও একটু conservative বলিয়া মনে হয়।

মেয়েদের স্কুল-কলেজ staffed by women হইবে, ইহা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হইলে কি হয়, এই সদভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করা অত্যন্ত কঠিন। সমগ্র ভারতে ১৯১৫ অব্দে ২২০৪টি মহিলা শিক্ষয়িত্রীর ব্রত গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ট্রেণিং-কলেজে তালিম দিয়াছিলেন; এই কয় বৎসরে তাঁহাদের সংখ্যা মাত্র ৩০৯৬ দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র ভারতের পক্ষে এই সংখ্যা যে খুবই অপ্রচুর,—একেবারেই নগণ্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহাই শিক্ষা বিস্তারের পথে একটা মস্ত বাধা। এই কারণেই মিশনারী মেমদের, এবং দেশীয় খৃষ্টান মহিলাদের হাতে আমাদের মেয়েদের শিক্ষার ভার স্বতঃই গিয়া পড়িয়াছে। তবে গবর্ণমেণ্ট অধিক পরিমাণে ভারতীয় মহিলাকে শিক্ষয়িত্রীর কাজ শিখাইবার জন্য ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে অনেক গুলি ইউরোপীয় মহিলাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। আর, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দান ও পরীক্ষা গ্রহণ করেন, সেই সকল বিষয়ের অতিরিক্ত আর একটী বিষয়ও—শিক্ষা-দান-ব্রত—তাঁহাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিয়া লউন, এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকেই এই বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা করুন, এবং এল-টি, ডিপ্লোমা ও বি-টি উপাধি দিবার ব্যবস্থা করুন। আমাদের মনে হয়, এম-টি উপাধিও চালাইলে মন্দ হয় না। যে সকল মহিলা মেয়েদের কলেজের অধ্যাপক হইবেন, তাঁহাদের standard আর একটু বড় হইলে ক্ষতি কি?

তার পর গবর্ণমেণ্টের রেজোলিউসনে মেয়েদের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার কথার আলোচনা করা হইয়াছে। মধ্যে কথা উঠিয়াছিল যে, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। সৌভাগ্যের বিষয় সে প্রস্তাবটা পরিত্যক্ত হইয়াছে। মেয়ে-পুরুষের এক সঙ্গে লেখাপড়া শিখাইবার পক্ষপাতী যদিও আমরা নই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে উপায়ান্তরের অভাবে কাজেই উহার সমর্থন করিতে হইতেছে। দেশে মেডিক্যাল-স্কুল

কলেজের সংখ্যা অগণ্য বলে। ং মেয়েদের, চিকিৎসা বিদ্যা
শিক্ষা দিবার জন্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিব ব্যবদায় ধরিলে, একেবারে
শিক্ষা খরচই করিতে হয়; অথচ, মে মেয়ে-ডাক্তারের, সুশিক্ষিতা
ধাত্রীর অভাব কত বেশী! পুরুষদের ই একটা মেডিক্যাল কলেজ
স্থাপন করিতে হিমসিম খাইয়া যাই য়,—তা মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র
মেডিক্যাল-কলেজ! এ বিষয়ে নিভার্সিটী-কমিশন কিন্তু আমাদেরই
দোষ দেখিয়াছেন;—বলিয়াছে "until Hindu and Mussalman
society has material modified its attitude on the
training of women real solution for this problem
will be possible." টা ঠিক বটে। দেশের লোকে অধিক
সংখ্যায় মেয়ে-ডাক্তার শিক্ষিতা ধাত্রী, নার্স চাহিতেছে, এ দিকে
সামাজিক বিধি-নিষেধে জন্ত হিন্দু-মুসলমান সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের
এই সকল বিষয় শি করিবার উপায় নাই। আবার, মেয়েদের
জন্য arts college স্থাপন করা যতটাই কঠিন হউক, একেবারে
অসম্ভব নহে; কিন্তু য়েদের জন্য স্বতন্ত্র মেডিক্যাল-কলেজ স্থাপন
করিবার প্রস্তাব করা কল্পনা স্বপ্নেরও অগোচর,—বিশেষতঃ দেশের বর্তমান অবস্থায়। এই অসুবিধার যৎকিঞ্চিৎ সমাধানের চেষ্টা কমিশনই করিয়াছেন,—সাধারণ আর্ট কলেজে সামান্ত পরিমাণ চিকিৎসা-বিদ্যা ও স্বাস্থ্য-তত্ত্ব শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বঙ্গ গবর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারকল্পে সরকার যাহা করিতেছেন এবং করিতে চাহেন, আমরা যথাসাধ্য তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু দেশের জনসাধারণের এ বিষয়ে একটা কর্ত্তব্য আছে। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে গবর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য করিবেন, পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন কিন্তু পরিচালনের ভার দেশবাসীর হাতেই রাখিতে চাহেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ-সাহায্য করিবেন, এত বড় দেশের পক্ষে তাহা বোধ হয় প্রচুর হইবে না; সে কারণে, মনে হয়, সাধারণকেও এই বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের এই সাধু সঙ্কল্প যাহাতে সফল হয়, অন্য প্রকারেও সে চেষ্টা দেশের লোককেই করিতে হইবে।

"ছোঁয়াচ-পড়া"

[শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার, বি-এ]

আমাদে গ্রামের ঐতিহাসিকগণ বলিতেন যে, কৈলাস গাঙ্গুলী অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের কৌলিন্য ও বিদ্যার খ্যাতি ছিল বলিয়া, স্থানীয় জমিদার তাঁহাকে একটা সালঙ্কারা কন্যা ও পঞ্চাশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি দিয়া আমাদের গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। এ হেন মহাকুলীনের সন্তান কৈলাস গাঙ্গুলী বর্ত্তমানে জমিদারের সেরেস্তায় মহাফেজ-দপ্তরের কাজ করিয়া ১৫৲ টাকা বেতন পা'ন। এই বেতন ও ব্রহ্মোত্তর জমির আয়ে নিঃসন্তান গাঙ্গুলী মহাশয়ের বেশ সচ্ছল অবস্থাতেই দিন কাটিত। নির্ব্বিবাদ, ভাল-মানুষ এবং একটু মুখচোরা গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত আমাদের গল্পের বিশেষ কোন যোগ নাই; তবে তিনি ছিলেন গাঙ্গুলী-গিন্নির স্বামী—এই যা'। গ্রামেও তাঁহার অস্তিত্ব গৃহিণীর জন্যই লোকে ভুলিতে পারিত না।

গাঙ্গুলী-গিন্নি আমাদেরই গ্রামের মেয়ে—কাজেই ...দানিত ...। তিনি না জানিতেন, গ্রামের দুই-তিন ... মধ্যে এমন কেহ ছিল না। আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীতে পাঁচ জন প্রাতঃস্মরণীয়া, সুবিখ্যাতা পাড়া-কুঁদুলী ছিলেন, গাঙ্গুলী-গিন্নি তাঁহাদের মধ্যে শীর্ষ-স্থানীয়া না হইলেও, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন, ইহা অবিসংবাদী; এমন কি, আমাদের দিগ্বিজয়িনী ক্ষান্ত বোষ্টমী গাঙ্গুলী-গিন্নিকে "গুরু" বলিয়া অনেক সময়ে তাঁহার পদধূলির প্রার্থিনী হইয়াছে, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

কিন্তু এ হেন গাঙ্গুলী গিন্নি বিখ্যাত ছিলেন তাঁহার "শুচি বাইয়ের" জন্য। তিনি কত রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিতেন, তাহা জানি না, তবে এইটুকু জানি যে, বাড়ীর ভিতরকার দুইখানি শয়নকক্ষ, রান্নাঘর, গোয়াল বিশেষ করিয়া গোময়লিপ্ত করিয়া, আঙ্গিনায় নিয়মিত পাঁচবার গোবর-জল ছড়াইয়া গ্রামের বাহিরের "ভট্‌চাজ-পুকুর" হইতে, স্নান সারিয়া যখন তিনি গৃহে ফিরিতেন, তখন আমরা ছেলের দল পাঠশালায় যাইতাম, এবং পথে গাঙ্গুলী-গিন্নির গমনভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিতাম। স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় তাঁর গমনভঙ্গী বড় বিচিত্র ছিল। অশুচি হইবার ভয়ে তিনি পথ দিয়া সোজা চলিতে পারিতেন না; এবং মধ্যে-মধ্যে স-কলসী লম্ফ দিতেন। তাহা দেখিয়া আমরা

যেমন আমোদ পাইতাম—তাঁর অদৃশ্য, শত্রুর প্রতি গালাগালির রকম শুনিয়া তেমনি বিস্মিত হইতাম। ঐ কোথায় পোড়ারমুখো কাক কি ফেলিয়া গিয়াছে, কোথাও বা কলসী-ভাঙা, কাগজের টুকরা, ছাই পড়িয়া আছে—আর কোথাও বা "পাড়ার শতেক-খোয়ারীরা" ইচ্ছা করিয়া তাঁকে জব্দ করিবার জন্যই ছেঁড়া "ন্যাকড়া" ফেলিয়া দিয়াছে। এসব ফেলিবার কি আর "পোড়াকপালী"দের জায়গা ছিল না। এক জায়গায় কোন "মুখপোড়া মিন্‌সে" কল্কের ছাই ফেলে গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সময় গাঙ্গুলী-গিন্নির পদযুগল বা রসনা একমুহূর্ত্তও বিশ্রামলাভ করিত না। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও তিনি "ছোঁয়াচ-পড়া" হইতে রক্ষা পাইতেন না; এবং তাহার ফলে পথে যতগুলি পুকুর বা ডোবা পড়িত, প্রত্যেকটিতেই একটা করিয়া ডুব দিয়া তাঁকে শুদ্ধ হইতে হইত। এমনি করিয়া তিনি যখন গৃহে পৌঁছিতেন—তখন আবার পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময় আমাদের সঙ্গে দেখা হইত। একবার আমাদের মধ্যে একজন অতি-সাহসী বালক গাঙ্গুলী-গিন্নিকে বলিয়াছিল—"গাঙ্গুলী ঠাক্‌মা, তুমি পচা ডোবার জলে নেয়ে কি করে শুদ্ধ হও। আর ঐ ডোবার জলেই কি ঠাকুরদা'র জন্য রান্না কর?"—উত্তরে, উক্ত দুঃসাহসিক বালকের ঊর্দ্ধতন সপ্তম-পুরুষের জন্য গাঙ্গুলী-গিন্নি যে সকল সুখাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের শৈশব-অভিজ্ঞতার অনেক বাহিরে। ফলে কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ আর এ দুরূহ সমস্যার ব্যাখ্যার জন্য গাঙ্গুলী-গিন্নিকে ঘাঁটাইতে সাহস করে নাই। এ হেন ভীষণ স্নান-কার্য্য শেষ করিয়া তিনি যখন বস্ত্র-পরিবর্ত্তন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন, বলা বাহুল্য, তাহাতে অনেক প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইত। এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা বোধ হয় সুরুচিসঙ্গত হইবে না, কাজেই তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকিলাম। তার পর বেলা দ্বিপ্রহরে রন্ধন। "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"—"পোড়া পেটের জন্যে দু'টো রাঁধা—তাও কি শুদ্ধ হ'য়ে রাঁধবার যো' আছে—" বলিয়া, গাঙ্গুলী-গিন্নি তাঁর অন্তরঙ্গদের কাছে অনেক দুঃখ প্রকাশ করিতেন। কোনও দিন ঘুঁটের সঙ্গে চুল, কোন দিন বা সাতবার করিয়া ধোয়া কাঠের মধ্যে 'ন্যাকড়ার ফালি'। তার উপর "পোড়ার-মুখো" কাক ও চড়াই পাখী সব তাতেই মুখ

দেয়। কোন দিন ব...কটা ডেঁয়ে পিঁপড়ে আঁস্তাকুড় সোজা এসে একেবা... "মড় মড়" করে তরকারীর ওঠে—কাজেই সব ...নিস ফেলিয়া দিয়া, রান্নাঘর আবার নূতন করিয়া র...র যোগাড় করিয়া লইতে ফলে নিরীহ গাঙ্গুলী মহা...কে কাছারী হইতে ত তৃতীয় প্রহরে স্ব-পাকে হা...ন্ন রন্ধন করিয়া আ ব্যবস্থা করিতে হয়। তা' সে ...ত' আর গিন্নি ... পারেন না—কাজেই তাঁকে ফলা... করিয়া কাটাইতে এমন ঘটনা মাসের মধ্যে অন্ততঃ ...শ দিন হইয়া কিন্তু উপায় কি?—অদৃষ্ট ছাড়া ত...র পথ নেই! "অশুদ্ধ" খাদ্য খাইয়া "জাত-জন্ম ...য়া" তা' গাঙ্গু... জীবন্ত থাকিতে পারিবেন না—তা' ...ই বা একটু ব...

বৈকালে গাঙ্গুলী-গিন্নি পল্লী-...ে বাহির হই... সে সময়ে তাঁর নিত্য সহচরী (?) ছি...একটি পিতলে... জলভরা ঘটি! আমরা বালকের দল ...ইহার সা... বুঝিতাম না। শেষে জানিয়াছিলাম যে, তি...যে ব... গিয়া উঠিতেন—প্রথমে পা'য়ে জল দিয়া তবে দাওয়ায় গিয়া বসিতেন। এই প্রিয়া সহচ...ঘটি-... গাঙ্গুলী-গিন্নি আমাদের কল্পনায় আসিত না। ...ই অ... জল ঘাঁটার ফলে গাঙ্গুলী-গিন্নির হাত-পা ...াজি "পাঁকুই" হইয়াছিল। সে হাতে তিনি কোন খ... গেলে, মিষ্টান্ন-লোলুপ আমরাও শ্রদ্ধা করিয়া লইতে না। একবার বেশ মনে পড়ে—এই "পাঁকুই" বিশেষ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। সেবার ... পুরোহিত ভট্টাচাজ মশায়ের পুত্রের বিবাহের ... "যগ্‌গিতে" আমাদের গ্রামের সেরা সেরা "দ্রৌপদীরা" রন্ধন করিয়াছিলেন। গাঙ্গুলী-গিন্নিরও রন্ধনে সুনাম... কাজেই তিনিও "যগ্‌গি রাঁধিয়েদের" মধ্যে একজন। তার পর যখন বেলা তৃতীয় প্রহরে আহারের ডাক... তখন দেখা গেল, নব্যদলের একজনও আসিল না। বিরক্ত হইলেন। লোকের উপর লোক পাঠাইয়া আসিল—তাহাতে গ্রাম্য-বৃদ্ধের দল একেবারে ... গেলেন! কুলীনের কন্যা, মহাকুলীনের স্ত্রী, ... রন্ধনে যোগ দিয়াছেন—এত বড় সৌভাগ্য ... অর্ব্বাচীনের দল বলে কি না, গাঙ্গুলী-গিন্নির হা... "পাঁকুই"—ওঁর রান্না আমরা খাইব না! এই ...